# ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

১ম বর্ষ ঃ ৩য় খণ্ড



শুক্রবার, ২১ কার্তিক, ১৩৭৬—শুক্রবার, ১৬ মাঘ, ১৩৭৬
Friday, 7th November, 1969—Friday 30th January, 1970.

লেখক ... বিষয় ও পৃষ্ঠা

---

স্থানাভাববশতঃ পুরো সূচীপত্র এ সপ্তাহে দেওয়া সম্ভব হ'ল না। আগামী সপ্তাহে বাকী অংশ প্রকাশ করা হবে। অঃ সঃ

# অমৃত

পরিবারের সকলাকে
সবল ও সুস্থ রাখতে
ফসফোমিন

ফসফোমিন
• শরীরে শক্তি যোগায়
• খিদে বাড়ায়
• কাজ করার ক্ষমতা যোগায়
• সহজে রোগে কাবু হ'তে দেয়না

SQUIBB
Phosfomin
VITAMINS ELIXIR
There's health in Phosfomin for all the family

১০ম বর্ষ

৩য় খণ্ড

৩০ সংখ্যা

মূল্য ৪০ পয়সা

Friday 4th December, 1970 শুক্রবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ 40 Paise


## সূচীপত্র



প্রচ্ছদ : শ্রীমধুকর

# চিঠিপত্র

## আমার প্রিয় অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হঠাৎ রেডিওতে সেই দুঃসংবাদটা ছড়িয়ে গেল। মনে হল, এই তো সেদিন দেখা হোল। আর এরই মধ্যে—!

সেই স্কুল জীবনেই তাঁর ছোট গল্পের এক অনুরাগী পাঠক ছিলাম। তারপর সিটি কলেজে তাঁর আকর্ষণেই ভর্তি হয়েছি। তাঁর কাছে এসে, তাঁকে আরও ভালবেসেছি। সুন্দর দেখতে ছিলেন। একটা অদ্ভুত হাসি সর্বদাই মুখে আটকে থাকত। কখনও কারও নিন্দে শুনি নি তাঁর মুখে। শুনি নি তাঁর নিজের লেখা কোন বই-এর নাম। নিরহংকার পুরুষ ছিলেন।

পানিত্রাসে শরৎচন্দ্রের বাড়ি দেখতে গিয়েছিলেন একবার। সেই সময় তাঁর মনের একটি গোপন বাসনার কথা বলেছিলেন আমাকে। তাঁর ইচ্ছা ছিল য়ুরোপ মহাদেশে যাওয়া। এ-ইচ্ছা তাঁর সফল হয় নি। সফল না-হওয়ার পিছনে তিনি নিজেই দায়ী। তিনি ভীষণ স্পষ্টভাষী ছিলেন। মনে হয় সেই জন্যে অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। যেখানে তিনি কাজ করতেন, তার দোষ-ত্রুটি অকপটে তুলে ধরতেন। তাঁর ডকটরেট খেতাবটি সম্বন্ধে পরিহার করার নিগূঢ় কারণটি সকলেরই জানা। স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ছিল। এমন কিছু 'আহামরি' ছাত্র ছিলাম না। তবু দীর্ঘ দশ বছর পর দেখা হতে তিনি বললেন, এই যে সমর কেমন আছো? এছাড়া সিটি কলেজে বহু অধ্যাপককে তাঁর শরণাপন্ন হতে দেখেছি। কবির নাম, কবিতার নাম বা কবিতার পরের লাইনটিতে কি আছে তিনি সহাস্যে তখনই বলে দিতেন। শেষে বলে দিতেন, তবু ঠিক আছে নাকি একটু দেখে নেবেন। তাঁর সহকর্মীরা জানতেন, বই খুলে দেখার প্রয়োজন হবে না।

সিটি কলেজ থেকেই অধ্যাপক হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। আশ-পাশের কলেজ থেকে ছেলেরা আসত তাঁর ক্লাস করতে। কথার মধ্যে একটা জাদু ছিল। নিরেট, নিটোল ছিল তাঁর বক্তৃতা। ক্লাসকে সজীব করে রাখতেন তিনি। টুকরো-টুকরো হাসি দিয়ে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তুলতেন। যিনি অধ্যাপক হিসাবে এত নাম করেছিলেন, তাঁর প্রথম অধ্যাপনা জীবনের একটি ছোট্ট ঘটনা আমাদের বলেছিলেন।

এম.এ পরীক্ষায় পাশ করে জলপাইগুড়ি কলেজে প্রথম অধ্যাপনার কাজ পেলেন। মেয়েদের ক্লাস। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। অস্বস্তি ছিল—তার সঙ্গে প্রথম অধ্যাপনার ভয়ও যুক্ত হয়েছিল। বক্তৃতার মধ্যে, বোধহয় তিনি একটি কথা বার-বার বলেছিলেন। বলেছিলেন, তোমরা যখন আরও বড় হবে, তখন বিষয়টা ভাল করে বুঝতে পারবে। সাহিত্যের ক্লাস। হঠাৎ তিনি দেখলেন পিছনের বেঞ্চি থেকে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তাঁর বক্তৃতা থেমে গেল। মেয়েটি সরাসরি প্রশ্ন করল—স্যার আপনার বয়স কত?

ব্যাপারটা এমন চকিতে ঘটে গিয়েছিল যে, তিনি একেবারে অবাক। ক্লাস ভর্তি ছাত্রীর দল। প্রথম অধ্যাপনার জড়তা ইত্যাদি মিলিয়ে তিনি খুব সংকটাপন্ন হয়ে পড়লেন। মেয়েটি সম্ভবত উত্তরের আশায় দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি সভয়ে বললেন, আমার বয়স বা—ইশ।

'আমার সাতাশ' বলেই মেয়েটি দুম করে বসে পড়ল।

এমনি সহজ সরলভাবে নিজের জীবনের টুকরো ঘটনা পরিবেশন করতেন। আর আমরাও তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজ বোধ করতাম।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি ভীষণ ভালবাসতেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে আমরা নারায়ণবাবুকে ধরে বসলাম কিছু বলতে। ছোট্ট ক্লাস। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, ফণিভূষণ আচার্য, রমা বাগচী, এই রকম মাত্র কয়েকজন ছিলাম ক্লাসে। তিনি বিভূতিবাবুর সরলতা, আন্তরিকতা—সব জড়িয়ে তাঁর উদাসীনতার কথা এমন সুন্দরভাবে দীর্ঘ সময় ধরে বলে চললেন যে, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইলাম। আমরা যেন সেই ছাতা হাতে, খাটো কাপড়-পরা মানুষটিকে আমহার্স্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তাঁর বলার মধ্যে এমনই একটা জাদু ছিল। কিন্তু বিভূতিবাবু সম্পর্কে জানতে চেয়ে পরে আমরাই বঞ্চিত হয়েছিলাম। যখন তাঁর বলা প্রায় শেষ তখন দেখি সেই চশমার পুরু লেন্সের মধ্যে চকচকে দু ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। আমরা তাঁকে সেই একদিন মাত্র শোকে অভিভূত হতে দেখেছিলাম। আশ্চর্য হলাম, চশমাটা খুলে, রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে তাঁর ঠোঁটে সেই অদ্ভুত হাসিটাকেই যখন আবার প্রত্যক্ষ করলাম।

এমনি কত শত ছোটখাট ঘটনা সিটি কলেজে পড়ার সময় ঘটেছিল। সব আজ বিস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে গেছে। তাই যে কয়েকটা আছে সেগুলোই এখানে দেবার চেষ্টা করলাম।

সমর দত্ত
কলকাতা—৬

## রাগ ভৈরব

আমি একজন 'অমৃতে'র নিয়মিত পাঠক। চলতি বছরের শারদীয়া সংখ্যা 'অমৃতে'তে বিমল মিত্রের লেখা উপন্যাস 'রাগভৈরব' পড়লাম। উপন্যাসটি সত্যিই খুব চমৎকার লাগল। বিশেষ করে উপন্যাসটিতে 'প্রভা'র উক্তিগুলি চমৎকার লাগল। এই উপন্যাসটি নির্বাচন করার জন্য আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানালাম সম্পাদক মহাশয়কে এবং লেখক মহাশয়কে।

—অরূপ কুণ্ডু
ডায়মণ্ডহারবার,
২৪-পরগণা।

## একক প্রদর্শনী

আমি অমৃত পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করি। শারদীয় অমৃত প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত প্রকাশিত চিঠিগুলির মধ্যে একটিতেও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'একক প্রদর্শনী' উপন্যাসটির উল্লেখ নেই দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে, শুধু শারদীয় অমৃত কেন এ বছর পূজো উপলক্ষে প্রকাশিত সকল উপন্যাসের মধ্যে এটি সচেতন পাঠকের বিশেষ মনোযোগ দাবী করে। অন্যান্য রচনাকে আমি ছোট করতে চাই না। কিন্তু 'একক প্রদর্শনী' নিশ্চয়ই আধুনিক বাঙলা উপন্যাসকে একটি নতুন ডায়মেনশন দিয়েছে আমি মনে করি।

গল্পটি সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টের পৌঁছবার জন্যে নায়ক অরুণের প্রাণপণ চেষ্টা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাকে রাত ৯টা অবধি যেতে হয়। এ ঠিক স্থান থেকে স্থানে যাওয়া নয়। বা ক্লাসিকসমূহের বিখ্যাত টাইম-স্পেস সমস্যাই এখানে। তাকে বাধা দিচ্ছে বাল্যবন্ধু বেচুর ফিসফ্রাই থেকে মিছিল। বস্তুত গোটা পরিবেশই তাকে বাধা দিচ্ছে। সে গলি,

# চিঠিপত্র

কাঁদানে গ্যাস ও আগুনের মধ্যে দিয়ে লাশ ডিঙিয়ে ছুটতে-ছুটতে নার্সিং হোমের রাত ৯টার দিকে শেষহীন ছুটে চলেছে। অন্যদিকে পাঠককে বাধা দিচ্ছে তার আজন্ম জীবন ও স্মৃতি। কেননা আজ সকাল ১১টায় অরুণের যাত্রা শুরু হলেও সে কিছু ভুইফোঁড় নয়। সে জন্যেই পাঠককে বার-বার নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার ফেলে-আসা জীবনের কাটা-ছেঁড়া ছবির মধ্যে। এভাবে পাঠককে বাধা দেওয়া হয়েছে। গোটা রচনাটি এককথায় অরুণের অতীত ও বর্তমানের ক্রমাগত ইন্টার-অ্যাকশান ঠিক যেন একটি 'কোলাজ'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সে লাহিড়ীকে দুবার মারছে, একবার দিবাস্বপ্নে ও একবার সত্যি-সত্যি। এই অংশটি বারংবার মন দিয়ে (পড়া দরকার) পড়ে বুঝেছি যে, লাহিড়ী প্রতীকমাত্র। বাস্তবিক উপন্যাসের শেষে মিছিলের 'নিপাত যাক ঃ নিপাত যাক। নিপাত যাক!' — এই ধ্বনি দিতে-দিতেই সে লাহিড়ীকে মারছে। এটা লক্ষণীয়।' মৃতবৎ লাহিড়ীকে সে-ই আবার হাসপাতালের গেটে ফেলে আসে। অদৃষ্ট-পূর্ব নতুন ভাষায় মাত্র ৪৫ কলামের উপন্যাসটি পড়ে আমি তৃপ্ত হয়েছি জানবেন। নমস্কার। ইতি, ভবদীয়,

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
কলকাতা—৫৭

## 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রসঙ্গে

শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে' উপন্যাসের আশ্বিন মাসের ধারাবাহিক পর্যায়ে শিশুদের যৌনাচারের আভাষের মধ্যে শ্রীগৌরগোবিন্দ চক্রবর্তী 'অশ্লীলতা' আবিষ্কার করেছেন জেনে (২৭শ সংখ্যা, ২৭শে কার্তিক, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) বিস্মিত হলাম।

সহজাত মানবিক প্রবৃত্তিকে আমাদের দেশে এখনও আলো-আঁধারিতে রেখে দেবার প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। শিশুদের যৌনশিক্ষা (sex-education) সুষ্ঠুভাবে না দেবার অনিচ্ছার মধ্যেই 'তা' প্রতিফলিত। সুতরাং অদম্য কৌতূহল যদি কখনও বিকৃতিকে perversion স্বরান্বিত করে, তবে সেটাকে স্বাভাবিক ব'লে মেনে নেওয়াই মঙ্গল।

যৌবনোন্মেষের ইঙ্গিত 'সর্বজনগ্রাহ্য' সাহিত্যে থাকলেই তা' 'অশ্লীল' হয়ে যায়, এ-ধরনের শিশুসুলভ যুক্তি কি গ্রহণ-যোগ্য? একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কয়েক মাস আগে একটি 'সর্বজন গ্রাহ্য' সংবাদ পৃথিবীর সমস্ত খবরের কাগজ ফলাও ক'রে প্রচার করেছিল ঃ 'সাউথ এণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ২৩ আগস্ট—কনের নাম শ্রীমতী ফয়েড—দুটি নারী গত বৃহস্পতি-বার এখানকার বিবাহ-রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।' এই সংবাদের অন্তঃসার—সমকামিতার চূড়ান্ত পরিণতি—কি 'সর্বজনগ্রাহ্য' হয়নি? কিন্তু কেহই 'গেল-গেল' রব তোলেননি বা 'অশ্লীল' সংবাদ প্রচারের অপরাধে কোনো সম্পাদকই অভিযুক্ত হননি। কারণ, সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরাই ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরাই ধরে নিয়েছেন যে কোনো কিছু Lesbianism ব'লে মানব-সমাজ যদি থাকে, তাহলে এ-ধরণের ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়।—চক্রবর্তী মশায়কে scondalized হওয়ার আগে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ইচ্ছাকৃত মাত্রাধিক্য ঘটিয়ে (শিল্পের প্রয়োজন ছাপিয়ে) সাহিত্যের শুচিশুভ্র নন্দন-কাননকে যৌন-বর্ণনার স্তূপীকৃত জঞ্জাল দিয়ে পূতিগন্ধময় করা হয়েছে কি না—সাহিত্যে অশ্লীলতা নিরূপণের এই নিরিখে 'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে' উপন্যাসে শ্রীচক্রবর্তী নির্দেশিত জায়গাটুকু 'অশ্লীল' বলে ধরে নিতে আমি অন্তত রাজী নই।

চন্দন ভট্টাচার্য
গৌহাটি, (আসাম)।

## মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

বহুল প্রচারিত সৎ-সাহিত্যের মুখপত্র 'অমৃতে' কার্তিকের ২০ তারিখে প্রকাশিত মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে 'গ্রন্থদর্শী'র সাক্ষাৎকার আলোচনাটি মনো-যোগসহকারে পড়েছি। পড়েছি অঘ্রাণের ৪ তারিখে প্রকাশিত তরুণ গল্পকার মনসা-রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সময়োপযোগী চিঠিটি।

এ প্রসঙ্গে মফঃস্বলের একজন তরুণ অখ্যাত সাহিত্যসেবীরূপে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আমাদের সুখ-দুঃখের কথা শত-সহস্র পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরার জন্য সম্পাদক (অমৃত), গ্রন্থদর্শী, ও পত্রলেখক মনসাবাবুকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন।

গভীর দুঃখ এবং বুকভরা ব্যথা নিয়েই আজ বলতে হচ্ছে যে, আমরা যারা মফঃস্বলে থেকে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হয়েছি, তাদের জন্য রাজধানী কলকাতার বড়-বড় পত্রিকা কার্যালয়ের দরজা বন্ধ। মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত দু-একটি পত্রিকায় মাঝে-মধ্যে তাদের লেখা মুদ্রিত আকারে বেরোয় মাত্র। কিন্তু যদি যোগ্যতার মানদণ্ডে কলকাতার পত্রিকাগুলোতে তারা স্থান পান তাহলে বুকভরা উৎসাহ নিয়ে স্পন্দিত হৃদয়ে সাহিত্যের তীর্থপথে এগিয়ে যেতে সাহস পান।

আশা করি মাননীয় সম্পাদকবৃন্দ এবং কর্মকর্তাবৃন্দ আমাদের এই ব্যথার কথা সহানুভূতির সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে আগামী দিনে দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসবেন সোনার ফসলের সন্ধানে।

অশোককুমার সাহা
মল্লারপুর, বীরভূম

## শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

বিগত 'অমৃতে'র কয়েক সংখ্যা থেকে 'শারদ সাহিত্য পরিক্রমা' এই শিরোনামে প্রকাশিত রচনা আমার খুব ভাল লেগেছে। পর্যবেক্ষককে এজন্য ধন্যবাদ।

আমরা যারা মফঃস্বলে থাকি, বিশেষত সাহিত্যানুরাগী, তাদের পক্ষে কলকাতার সব পত্রিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। পর্যবেক্ষক পরিশ্রমসহকারে পত্রিকার নামোল্লেখসহ আলোচনা করে আমাদের মত যোগাযোগবিচ্ছিন্ন উত্তরবঙ্গবাসীদের শারদ সাহিত্য সংগ্রহের নির্বাচনে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিলেন। শারদ সাহিত্য পরিক্রমা শিরোনামে গল্প, কবিতা, ছোট গল্প-উপন্যাস এবং মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি ভেবেছিলুম প্রবন্ধ বিষয়েও আলোচনা হবে। কিন্তু বিগত সংখ্যায় উক্ত বিষয়ে আলোচনা না হওয়ায় আমার দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হয়েছে এ পর্যায়ে আগামীতে আর কোন রচনাই প্রকাশিত হবে না। আমার বিনীত অনুরোধ, প্রবন্ধ (শারদ সাহিত্যের) বিষয়ে একটি রচনা প্রকাশ করে আমাদের অনালোকিত জ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল জ্ঞান-সমাহিতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে উৎসাহিত করলে আনন্দিতই হবো।

অভিজিৎ দেব
কোচবিহার

# শা[illegible]চোখে

বেকারসমস্যা নিয়ে বর্তমানে দেশব্যাপী খুব হৈ চৈ চলছে। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে কোথাও কোথাও আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টাও হচ্ছে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে অদ্যাবধি এই সমস্যা নিরসনকল্পে কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ কি রাজ্য আইন সভা কি লোকসভায় তুরুপের তাসের মত এই সমস্যাটাকে একটি ইস্যু হিসাবে ব্যবহার করেছেন মাত্র। নিদেন পক্ষে একটি মিছিল, এর বেশী কিছু কোনদিন করেছেন বলে মনে পড়ে না। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তাঁদের অন্যান্য দাবীর সঙ্গে বেকারদের কাজ চাই শ্লোগানটা জুড়ে দিয়ে নিজেদের জনপ্রিয়তা বজায় রাখবার চেষ্টা করেন নি এমন নয়। অপরদিকে যাঁরা গদীয়ান অর্থাৎ দেশের অর্থভান্ডারের চাবিকাঠি যাঁদের হাতে তাঁরাও যে বারংবার আশার বাণী পরিবেশন করেন নি এমন নয়। এক একবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী শুনেছেন অমুক পরিকল্পনার শেষে কত বেকার সাকার হবে, আর জাতীয় আয় বেড়ে দেশের অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে যাবে। অতএব মাভৈঃ! বর্তমানের অমানিশা কেটে গিয়ে স্বর্ণ-প্রভাত আসল বলে! কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, বেকারী ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মানুষের চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের যে দুস্তর ব্যবধান ক্রমেই গড়ে উঠছে তার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে সমাজে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠছে। আর এই অশান্তির মাত্রা বেড়ে উঠে যখন হিংসাকে আশ্রয় করে লঙ্কাকান্ডের সৃষ্টি হয় তখন আবার রাজনৈতিক নেতাদের টনক নড়ে। গবেষণা সুরু হয় কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। দেশপ্রেমের সুললিত বাণী দিয়ে বেকারের জঠর জ্বালাকে উপশম করার ব্যর্থ প্রয়াস দেখা দেয়। যখন তীব্রতা কমে তখন আবার প্রচেষ্টায় ভাটা পড়ে। নেতারা সমস্যার কোলে ঘুমিয়ে পড়েন।

হালফিল ডান কম্যুনিস্ট পার্টি দেশব্যাপী বিক্ষোভের মাধ্যমে পুনরায় বেকার সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন। এবং শুধু তাই নয়,—আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করার জন্য আইন অমান্য করতেও দ্বিধা করেনি। এমন কি কোলকাতায় বিড়লা বাড়ীর সামনেও কয়েক সহস্র যুবক বেকারের চাকুরীর দাবীতে এবং লে-অফ, ছাঁটাই ইত্যাদি বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। কালনায় একটি বেকারী বিরোধী সম্মেলনও হয়ে গেছে। সেই সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসাবে এস এস পির শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র বর্তমানে বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রেখে সেই মূলধন নয়া উদ্যোগে নিয়োজিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবার আবেদন জানিয়েছেন। দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি সমর্থিত গণতান্ত্রিক যুব সংস্থার বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য প্রণিধান করে স্বয়ং শ্রী বি এম বিড়লা বলেছেন যে তিনি নাকি ১৫ মাস পূর্বেই বেকারদের চাকুরী সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকারী নীতির পুনর্বিবেচনা করার দাবী তুলেছিলেন। বিশেষ করে মূলধন বিনিয়োগের প্রশ্নে, উৎপাদন ক্ষেত্রে এবং সম্ভোগের ব্যাপারে নয়া নীতি গ্রহণের কথা বলছিলেন। শ্রী বি এম বিড়লার মতে বিগত ২৫ বছরে দেশে বিশ কোটি লোক বেড়েছে কিন্তু চাকুরীর সংস্থান হয়েছে মাত্র ২০ লক্ষ লোকের।

দেখা যাচ্ছে সরকার, রাজনৈতিক দল এমন কি শিল্পপতিরা পর্যন্ত বেকার সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ এবং প্রত্যেকেই সমাধানের জন্য নানারকম পরিকল্পনাও পেশ করছেন। কিন্তু অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরে। এবং শুধু তাই নয়, সমস্যাটা যেন ক্রমশ আরও তীব্রতর হচ্ছে। পশ্চিম বাংলার বর্তমান ঘটনাবলীকে এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে অনেকে সঙ্কটের পরিধিটা যে ক্রমেই ব্যাপ্তি লাভ করছে তা বুঝাবার চেষ্টা করছেন। রাজ্যের বর্তমান অবস্থা বেকারীর আংশিক প্রতিফলন মাত্র। সম্পূর্ণ ছবি নয়। যে অশান্তি পশ্চিম বাংলায় চলছে তা রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত জনিত ফলশ্রুতিও বটে।

যা হোক, এখন ভাবা যাক কি করে এই সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠছে এবং এই দৈত্যের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায়ই বা কি? ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত মানে টেনে তুলবার জন্য বা দেশকে আধুনিকীকরণের জন্য অদ্যাবধি যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তা শুধু এক একটি 'সেকটরকে' সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা মাত্র। সমগ্র দেশকে অর্থাৎ সমস্ত মানুষকে একই সঙ্গে একটি জীবন-মানের স্তরে উন্নীত করবার চেষ্টা এখনো হয়নি। আরও বিশদ করে বললে এই দাঁড়ায় যে দেশের মধ্যে ছোট ছোট 'লন্ডন' গড়ে এক শ্রেণীর মানুষের জীবন মান উন্নত করবার প্রচেষ্টাই এতদিন চলেছে, এবং এখনও চলছে। ফলে কখনও এদেশে অভাব হয়েছে কারিগরের। আবার বর্তমানে কারিগর হচ্ছে বেকার। ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে জীবন মানের যে পার্থক্য আছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে দেশকে স্থির করতে হবে, সমগ্র জাতিকে একই সঙ্গে দারিদ্র্যমুক্ত করবার চেষ্টা করা হবে না অংশ বিশেষকে পাশ্চাত্য জীবন মান আহরণে সাহায্য করবেন। যদি সমগ্র জাতিকে একই সঙ্গে টেনে তুলবার প্রচেষ্টা না চালানো হয়, একটি অংশকে সব সময়েই বেকারীর তীব্র জ্বালা অনুভব করতেই হবে। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই।

এক শ্রেণীর নাগরিকের ভোগ্যপণ্যের জোগানের দিকে নজর দিয়ে অর্থনীতি গড়া হচ্ছে কিনা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। যে দেশে মানুষ বাদুড়-ঝোলা হয়ে বাসে ট্রেনে যাতায়াত করে এবং পয়সার অভাবে অনেকেই পদযুগলের উপর নির্ভর করতে হয় কিম্বা যে দেশে মানুষের প্রতিদিনের গড়পড়তা আয় 'তিন আনার বেশী নয়' সেই দেশে টেলিভিশন প্রচলনের পরিকল্পনা কাদের ঘরে হাসি ফোটাবার জন্য? নিশ্চয় ভারতের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক যারা সাধারণ চাষী তাদের সম্ভোগের জন্য নয়? কিম্বা মুটে মজুরের জন্যও নয়। কাজেই বলছিলাম সমগ্র দেশকে একসঙ্গে টেনে তোলার চেষ্টা করতে হবে এবং পরিকল্পনাও সেভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। এমন কি স্বয়ং বিড়লাজীও সম্ভোগের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। কথাটা অতীব খাঁটি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে চাই, সোভিয়েত দেশে বিপ্লব হবার এত বৎসর পরও বিলাস সামগ্রী মায় মোটরগাড়ী পর্যন্ত নির্দিষ্ট হারে উৎপন্ন হয়ে থাকে। ভারতের সরকারের সমস্ত মন্ত্রীই সমাজবাদের কথা বলে থাকেন, কিন্তু অর্থনীতির এই দিকটা আদৌ তাঁরা অনুধাবন করার চেষ্টা করেন নি বলেই মনে হয়।

মাত্র কয়েক মাস আগে থেকেই ভূমি সমস্যা সমাধানের কথা বলা হচ্ছে এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প সংগঠনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টার পিছনেও আন্তরিকতার যে [illegible] অভাব আছে তা

বেশ বোঝা যায়। এদেশের অর্থনীতির বনিয়াদ কৃষির উপরই ভিত্তি করে চলে আসছে, অথচ সেই দিকেই বিশেষ করে নজর দেওয়া হয়নি। ফলে নয়া উদ্যোগের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে আছে। কাজেই বেকারের অন্ন সংস্থানের সুযোগও বাড়ে নি। উপরন্তু, শিল্পের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও মন্দাভাব দেখা দেওয়ার ফলে—এতদিন যেভাবে প্রাণপণ বাস্তুকার ও কারিগর হওয়ার জন্য জীবন পণ করে যুবকরা ছুটে যাচ্ছিলেন তাতেও ভাঁটা পড়ছে। কেননা ঐ ক্ষেত্রেও বেকারীর অশুভ ছায়া দীর্ঘায়িত হয়ে উঠেছে।

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে মূলধনের সমস্যা ভয়ঙ্করভাবেই দেখা দেয়। এবং মূলধন জোগাড় হলেও তার বিনিয়োগ করলে জাতীয় অর্থনীতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে এবং সমগ্র জনগণের কল্যাণ হবে তা নির্ভর করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের শ্রেণী চরিত্রের উপর। ভারতে এই প্রশ্নটা তখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। ফলে, যে মূলধন অদ্যাবধি বিনিয়োগ করা হয়েছে তার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব হয় নি। এবং শুধু তাই নয়, নয়া মূলধন সৃষ্টির ব্যাপারেও উৎপাদনের সাহায্য পাওয়া যায়নি। শ্রমিক অসন্তোষ সেখানে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে, এবং এই অসন্তোষ যে শুধু একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত এমন নয়। কারণ সম্ভোগের বৈষম্য অহরহ মানুষের মনে যে ঈর্ষা ও অসূয়ার ভাব সৃষ্টি করছে সেটা আখেরে সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়তে বাধ্য। জনতার জাগৃতি ক্রমেই বাড়ছে, এবং দেশ বিদেশের খবরাখবর পেয়ে তা আরও সচেতন হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায় সম্ভোগের বৈষম্য যদি ক্রমেই আকাশচুম্বী হতে থাকে তবে বিক্ষোভের দাবানল যে জ্বলে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি? আর তার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হবে উৎপাদনের ঘাটতি। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শুধু নয়া পুঁজি সৃষ্টিতে বাধা নয়, অধিকন্তু বিনিয়োগীকৃত মূলধনের সঙ্কোচন। অবশ্যম্ভাবী ফল : বেকার সমস্যার সৃষ্টি। সাকারদেরও বেকারত্ব প্রাপ্তি ঘটবে এতে।

টাকার মূল্যমান কমার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। এটাই হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক নিয়ম। আর জিনিষের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাবী উঠে মাগগীভাতা বৃদ্ধির কিম্বা বেতন বৃদ্ধির। বামপন্থী দলগুলি, যাঁরা শ্রেণী সংগঠন করেন বা মজদুর আন্দোলন করেন তাঁরা অনতিবিলম্বে এই সমস্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ও ধর্মঘট করতে পেছপা হন না। আবার এমনও দেখা যাচ্ছে, এক এক শিল্পে বেতনের প্রচুর তারতম্য থাকা সত্ত্বেও একই হারে বেতন মান নির্ধারণের আন্দোলন আসে না। যাঁদের বেশী বেতন তাঁরা আরও বেতন বৃদ্ধির জন্য জোরদার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। তখন কেউ বেকার সমস্যার কথা ভাবেন না। সেই কথা না ভাবাটাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, তাঁরা বিরোধী দল—সরকারের পতনই তাঁদের কাম্য। কিন্তু সরকারের এই বিষয়ে ত ওয়াকিফহাল থাকা উচিত। তাঁরা যদি সরকারী ও বেসরকারী সর্ব ক্ষেত্রেই একই বেতন হার প্রবর্তনের উদ্যোগী হতেন, অবশ্য কর্ম অনুসারে পার্থক্য নিশ্চয়ই থাকবে, তাহলে দেশব্যাপী এত গুঞ্জন উঠত না। এমন কি, বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে মরোটোরিয়াম ঘোষণা করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতেন তবে এত অসন্তোষ সৃষ্টির সুযোগ হত না। অন্যদিকে বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে যে অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে তা কোন পুঁজির সৃষ্টি করছে না। কাজেই সেই অর্থকে যদি মূলধন সৃষ্টির কাজে বিনিয়োগ করা যেত তবে যে তীব্র বেকার সমস্যা আছে তার হয়ত কিঞ্চিৎ সুরাহা হতে পারতো। বামপন্থীরাও এই বক্তব্যকে সামনে রেখে আন্দোলন করলে মনে হয় জনতার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন না, শুধু বেতন বাড়াবার দাবী নিয়ে বিশেষ করে কোন সংগঠিত শ্রেণীর—আন্দোলন করলে সেটাও সরকার যে এক শ্রেণীর ব্যক্তির জীবন মান উন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন তার মতই মনে হয়। পার্থক্য খুব কমই থাকে।

বর্তমান অশান্ত অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কেউ কেউ আরও একটা কিছু করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যে কোন একটা পরিকল্পনা নিয়ে নেমে পড়লেই কিছু লোক ত চাকরী পাবে। তাঁদের ধারণা এই চাকুরী পেলেই সব রোগ সেরে যাবে। এসব সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে কোন রকমে নিজের জানটাকে পরপারের ডাক না আসা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে টিকিয়ে রাখা। নিজে পরিত্রাণ পেলেও এতে জাত বাঁচতে পারে না। একটা উন্নয়নমূলক কাজ শেষ হলেই আবার বেকার আসবে। এখনও এমন অনেক নজীর আছে। ফারাক্কা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কাজেই জোড়াতালি দিয়ে কিছু করলে সুফল পাওয়া যাবে না। কেউ কেউ এমন কি বামপন্থী দলগুলিও বেকার ভাতার দাবী করে থাকেন। সমদর্শী বেকার ভাতার বিরোধী। জাতকে এবং উদীয়মান তরুণকে বেকার ভাতা দিয়ে পঙ্গু করার মত প্রস্তাব সমীচীন বলে মানা যায় না। সমগ্র দেশের মানুষকে একসঙ্গে টেনে তুলবার জন্য নয়া অর্থনীতি গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য চিন্তা করতে হবে উৎপাদনের কৌশল পরিবর্তন করে কি ভাবে সমস্ত লোককে কাজে লাগানো যায়। যে পদ্ধতিতে এদেশে উৎপাদন হচ্ছে সেই পদ্ধতির সুফল ফলে সেসব দেশে, যেখানে জনসংখ্যার চেয়ে সম্পদ অনেক বেশী। ভারতের মত দেশে নয়। কাজেই গোটা দেশে বিস্ফোরণ ঘটবার আগে রাষ্ট্রকর্ণধারদের অবিলম্বে ভাবা উচিত কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে সমস্ত মানুষকে বিরাট কর্মসংঘের অংশীদার করা যায়। শুধু একটি রাজ্যের সমস্যা বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে এই সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব জাতীয় সমস্যা হিসাবে অগ্রাধিকার দিয়ে দলমত নির্বিশেষে এর সমাধান খুঁজে বার করা দরকার। যদি বামপন্থীরা মনে করেন যে তাঁরা গদীতে এলেই সমস্যা সমাধান করে দিতে পারবেন—সে আশা দুরাশা। লক্ষ লক্ষ লোককে অসীম দারিদ্র্যে রেখেই তাঁদের তখত-এ-তাউস বজায় রাখতে হবে। আর যদি সরকার নয়া নীতি গ্রহণে অনিচ্ছুক হন তবে শুধু পূজা পার্বণ অনুষ্ঠানের মত সময়ে সময়ে বেকারদের জন্য অশ্রুমোচন করলে চলবে না, মত, পথ ভুলে একাত্ম হয়ে বেকারদের বাঁচবার পথ খুঁজতে হবে।

—সমদর্শী

পূর্ব পাকিস্থানের ঘূর্ণিবাত্যাবিধ্বস্ত সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে সাহায্য পেশছে দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্থানের মিলিটারি সরকার যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে সেখানকার জনমত সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ঢাকায় রোজ হাজার হাজার লোক মিছিল বার করে ইয়াহিয়া খার সরকারকে ধিক্কার দিচ্ছেন। 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্থান জিন্দাবাদ' বলে সেখানে ধ্বনি উঠছে।

অথচ পাকিস্থানের মিলিটারী শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গী এমনই সংকীর্ণ যে, তাঁরা ভারতের সাহায্য নিতে রাজী হচ্ছেন না।

সেই প্রলয়ংকর ঝড় ও বন্যার পর বারো দিন কেটে গেল। বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি থেকে যেসব খবর আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এখনও সব জায়গা থেকে লাশই সরান হয় নি, যারা জীবিত আছে তাদের খাদ্যবস্তু, ঔষধ ইত্যাদি পেশছে দেওয়া তো দূরের কথা। প্রকৃতির হাতে মার খেয়ে যারা মরেছে তারা তো মরেছেই, যারা বেঁচে গেছে তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই ভয়ংকর বিপদের দিনে অন্য মানুষদের তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার দরকার ছিল। সারা পৃথিবীর মানুষ পাকিস্থানের এই দুর্যোগে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন দেশ, এমন আন্তর্জাতিক সংগঠন বোধহয় নেই বললেই চলে যারা কোন না কোনভাবে এই প্রায় আধ কোটি দুর্গত মানুষকে সাহায্য করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নি। বিদেশ থেকে আগত অনেকগুলি সাহায্যকারী ও উদ্ধারকারী দল ইতিমধ্যে ঐসব অঞ্চলে কাজ আরম্ভও করে দিয়েছেন। আমেরিকান সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার ত্রাণসামগ্রী পেশছে দিচ্ছে। কিন্তু এই বিপদ থেকে মানুষগুলিকে উদ্ধার করার মুখ্য দায়িত্ব যাদের সেই পাকিস্থান সরকার কি করছেন? ইসলামাবাদের কর্তৃপক্ষের কাছে সামরিক বাহিনীর গোটা কয়েক হেলিকপ্টার চাওয়া হয়েছিল যাতে দুর্গত মানুষগুলির কাছে সাহায্য নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু হেলিকপ্টার পাওয়া যায় নি। এই অভিযোগ করেছেন স্বয়ং পূর্ব পাকিস্থানের গভর্নর ভাইস-এ্যাডমিরাল এ এম আহ্সান। নিতান্তই একটা যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল বলে পিকিং থেকে ইসলামাবাদে ফেরার পথে ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকায় একদিন থেকে রিলিফের ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। তারপর দশদিনের মধ্যে পাকিস্থানের আর কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঢাকামুখো হন নি। ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ মানুষ, যারা ঝড়-জল থেকে বেঁচে গেছে, তারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অসুখের বিরুদ্ধে অসহায়ভাবে লড়াই করতে করতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামাবাদ 'দূর অস্ত্'। পূর্ব পাকিস্থানের মানুষ মরে-হেজে গেলে পশ্চিম-পাকিস্থানের পাঞ্জাবী-পাঠান শাসকদের কি আসে যায়? পূর্ব পাকিস্থানের মানুষ বুঝছেন যে, পশ্চিম পাকিস্থানের শাসকরা তাঁদের প্রদেশটির প্রতি বরাবর যে অবহেলা দেখিয়ে এসেছেন আজ এই ভয়ঙ্কর বিপদের দিনেও সেই অবহেলার মনোভাব তাঁরা ছাড়তে পারছেন না। পূর্ব পাকিস্থানের হতভাগা মানুষগুলিকে সাহায্য করার জন্য পাকিস্থানের জঙ্গী সরকার তাঁদের মিলিটারি বন্দোবস্ত নড়চড় করতে, সামরিক বাহিনীকে ত্রাণের কাজে নামাতে অথবা এমনকি সামরিক বিমান বা হেলিকপ্টারগুলি পশ্চিম পাকিস্থান থেকে পূর্ব পাকিস্থানে পাঠাতে প্রস্তুত নন। পূর্ব পাকিস্থানের মানুষ এই কারণেই এত ক্ষুব্ধ এবং ঢাকায় রোজ মিছিল বেরোচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্থানের মানুষ এটাও দেখতে পাচ্ছে যে, এই দুর্দৈবের মধ্যেও পাকিস্থান সরকার তাদের কাছে ভারতবর্ষের সাহায্য পেশছতে দিচ্ছেন না। ভারতবর্ষের সরকার দুর্গত অঞ্চলে দুটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল পাঠাতে চেয়েছিলেন। একটি হাসপাতালের লোকজন ও যন্ত্রপাতি সীমান্তের কাছে তৈরী হয়ে আছে; কিন্তু পাকিস্থান সরকারের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। ভারত সরকার বলেছিলেন তাঁরা মাঝি-মাল্লা সমেত জলযান পাঠাবেন। পাকিস্থান সরকার তারও অনুমতি দেন নি। ভারতের বিমান ও হেলিকপ্টারও পাকিস্থান নিতে চাইছেন না। এমনকি ভারত থেকে যে বিমানে করে ত্রাণসামগ্রী পূর্ব পাকিস্থানে পাঠানো হবে তার বৈমানিকদের ভিসা মঞ্জুর করতেও পাকিস্থান সরকার রাজী হন নি।

অথচ নয়াদিল্লী পূর্ব পাকিস্থানের এই মহাবিপদের দিনে স্বাভাবিক মানবিকতার ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে। ভারত সরকার শুধু যে এক কোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছেন তাই নয়, পাকিস্থানের পশ্চিম অংশ থেকে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে পূর্ব পাকিস্থানে যাওয়ার জন্য ভারতের আকাশপথ ব্যবহার করার ঢালাও অনুমতি দিয়েছেন।

আর কয়েক দিনের মধ্যেই পাকিস্থানে নির্বাচন হওয়ার কথা। যদি নির্ধারিত সময়মত নির্বাচন হয় তাহলে এই ঝড়জলের অভিজ্ঞতা ও ইসলামাবাদের এই নির্মমতা সেই নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

*

অন্ধ্র প্রদেশের সিদ্দিপেট কেন্দ্রে যে উপনির্বাচন হয়ে গেল তার ফলাফল তেলেঙ্গানার আন্দোলনকারীদের দারুণভাবে উৎসাহিত করবে। তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির প্রার্থী শ্রী এ মদনমোহন এই নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস ও সি-পি-আই প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, শাসক কংগ্রেসের প্রার্থী পি পি রাজেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে তাঁর ভোটের ব্যবধান প্রায় ২০ হাজার এবং কম্যুনিষ্ট প্রার্থী, যিনি প্রথম সাধারণ নির্বা-

চনে এই কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁর জামানৎ বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে।

তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে এবং পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের দাবীই এই উপনির্বাচনে প্রধান প্রশ্ন ছিল।

পাঁচ মাসের মধ্যে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির এই দ্বিতীয় নির্বাচনী সাফল্য। এর আগে গত জুন মাসে সমিতির প্রার্থী হায়দরাবাদ শহরের খয়রাতাবাদ কেন্দ্র থেকে লড়ে জয়ী হয়েছিলেন। খয়রাতাবাদ ছিল শহরাঞ্চলের নির্বাচকমন্ডলী আর সিদ্দিপেট হচ্ছে গ্রাম্য নির্বাচনকেন্দ্র। অর্থাৎ তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতি এটা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে যে, তেলেঙ্গানার শহর ও গ্রাম, দুয়ের অধিবাসীরাই পৃথক তেলেঙ্গানার দাবী সমর্থন করছেন।

তেলেঙ্গানা আঞ্চলিক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী জে চোক্কারাও এই নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন, "এটাই দেখা গেল যে, তেলেঙ্গানা সমস্যার নিরসন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী গত বছর আগস্ট মাসে যে আট দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন তাতে মানুষ খুশী নয়, তারা আরও বেশ কিছু চায়।"

অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি কিন্তু এই ভোটাভুটি থেকে সে ধরনের কোন শিক্ষা নিচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য হল, অন্ধ্র রাজ্য ভেঙ্গে দু'টুকরো হবে কিনা সেটা শুধু তেলেঙ্গানা অঞ্চলের অধিবাসীদের রায়ে স্থির হবে না, ভারতের সংবিধান অনুসারে এই প্রশ্ন পার্লামেন্টের বিবেচ্য।

সিদ্দিপেট কেন্দ্রে তাঁর দলের প্রার্থীর পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে শ্রীরেড্ডি বলেছেন যে, সি-পি-আই নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করিয়ে সমিতির সুবিধা করে দিয়েছে। ভোটের ফলাফলে অবশ্য একথা প্রমাণ হয় না। কারণ শাসক কংগ্রেস আর কম্যুনিস্ট পার্টির মিলিত ভোটসংখ্যা যেখানে ১৯,২৯৩ সেখানে তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির প্রার্থী পেয়েছেন ৩১,৬৩৩ ভোট।

শাসক কংগ্রেস এই উপনির্বাচনের উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী জে বেঙ্গলরাও থেকে আরম্ভ করে রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্তত পাঁচজন সদস্য এই নির্বাচনকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে ভোটযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। অবশ্য, খবরে প্রকাশ যে, ঐ এলাকায় তেলেঙ্গানা প্রজা সমিতির এমন বিপুল প্রভাব যে, মন্ত্রীরা কেউ তাঁদের ডাক বাংলো ছেড়ে বেরোতে পারেন নি। প্রজা সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ এম চান্না রেড্ডি অভিযোগ করেছেন যে, ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্য নিয়ে শাসক কংগ্রেস দল ঐ এলাকায় টাকা ছড়িয়েছে এবং রাজ্য সরকার রাতারাতি নির্বাচনী এলাকার ২০টি গ্রামে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার বসিয়েছেন।

এই উপ-নির্বাচনে সি-পি-আই প্রার্থীর পরাজয় আরও শোচনীয়। [illegible]

প্যারেল কেন্দ্রের উপনির্বাচনে পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই আবার এই পরাজয় ঐ পার্টির পক্ষে একটা বড় আঘাত। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সিন্দিপেট কেন্দ্র থেকে যে কম্যুনিস্ট প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন এবার তিনি সেই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই জামানত হারিয়েছেন। অথচ. এই ভোটযুদ্ধের আগে কম্যুনিস্ট পার্টি ঐ কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত আস্থাবান ছিল, এমনকি শাসক কংগ্রেস দলও প্রথম প্রথম ভেবেছিল যে, ঐ কেন্দ্রে প্রজা সমিতির প্রার্থীর বিরুদ্ধে তারা কোন প্রার্থী না দিয়ে কম্যুনিস্ট প্রার্থীকেই সমর্থন করবে। কিন্তু তারপর প্রজা সমিতির ভিতরকার গোলযোগের দরুন ঐ অঞ্চলে সমিতির কিছু কর্মী সমিতি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং শাসক কংগ্রেস দলকে বলেন যে, সিন্দিপেট উপ-নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস প্রার্থী দিলে তাঁরা সেই প্রার্থীকে সমর্থন করবেন। তখনই শাসক কংগ্রেস দল মত পরিবর্তন করে সিন্দিপেটে প্রার্থী দাঁড় করাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

মানচিত্রে ভারত মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে একটি সরল রেখা এ'কে যদি সিংহল দ্বীপকে মরিশাস দ্বীপের সংগে যুক্ত করা যায় তাহলে ঐ সরলরেখার প্রায় মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারের দ্বীপ নজরে পড়বে। সেই দ্বীপটির নাম ডিয়েগো সারসিয়া। আয়তন মাত্র ১১ বর্গ-মাইল। অর্থাৎ কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে তিনটিরও বেশী ডিয়েগো গার্সিয়া ধরে যাবে।

ঐ ক্ষুদে প্রবাল দ্বীপটি চাগোস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। আর গোটা চাগোস দ্বীপপুঞ্জই এক সময়ে মরিশাস দ্বীপের এক্তিয়ারভুক্ত বলে গণ্য হত। বৃটিশ সরকার যখন মরিশাসকে স্বাধীনতা দেন তখন সংগে সংগে এই সর্ত আরোপ করেন যে, চাগোস দ্বীপপুঞ্জটি ছেড়ে দিতে হবে। বৃটেন ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড দিয়ে মরিশাসের কাছ থেকে দ্বীপপুঞ্জটি ইজারা নেয়।

এই দ্বীপপুঞ্জ নিজের হাতে রাখার পিছনে যে বৃটিশ সরকারের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল সেটা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কারণ, খবর হচ্ছে এই যে, ডিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে বৃটিশ ও আমেরিকার একটি যুক্ত নৌঘাঁটি হচ্ছে। বৃটেন ও আমেরিকা দুই দেশই ভারত মহাসাগরে পা রাখার জন্য কিছুকাল যাবৎ যে চেষ্টা করেছে এটা সেই চেষ্টার পথেই একটি পদক্ষেপ।

ভারত সরকার এই নৌঘাঁটি তৈরীর পরিকল্পনায় আপত্তি জানিয়েছেন এবং ভারত সহ গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলি ভারত মহাসাগরকে যুদ্ধমুক্ত এলাকা হিসাবে গণ্য করার জন্য যে আবেদন জানিয়েছে সেকথা বৃটেন ও আমেরিকাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভারত মহাসাগরে রুশ নৌবহরের তৎপরতা বেড়ে গেছে বলেই বৃটেন ও আমেরিকার নৌঘাঁটি তৈরী করতে হচ্ছে, এই যুক্তি মানতেও ভারত সরকার প্রস্তুত নন। কেননা, ভারত মহাসাগরে সোভিয়েট রাশিয়া কোন নৌঘাঁটি স্থাপন করেছে বলে নয়াদিল্লীতে খবর নেই।

২৬-১১-৭০ —পুণ্ডরীক

# সম্পাদকীয়

## পরীক্ষা বাঁচাবার সংকল্প

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস এলেই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের চিন্তা শুরু হয় বার্ষিক পরীক্ষা, টেস্ট পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে। বাংলাদেশে গত কয়েক বৎসর ধরে পরীক্ষা নিয়ে রীতিমত একটা দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। পরীক্ষার বিভীষিকা বলে একটা কথা চালু আছে। আমাদের পরীক্ষাপদ্ধতিটা আসলে মুখস্তবিদ্যা বা স্মৃতিশক্তির যাচাই পদ্ধতি বলেও অনেকে মনে করেন। সে-কারণে পরীক্ষার ধারা পাল্টাবার কথাও শোনা যাচ্ছে। শিক্ষা নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁরা একথাও বলছেন যে, পরীক্ষা দেওয়াই শুধু নয়, পরীক্ষা নেওয়াটাও স্কুলের বা কলেজের কর্তৃপক্ষদের রীতিমত একটা পরীক্ষা।

এবারে আবার নতুন দুশ্চিন্তা পরীক্ষা পরিচালনা নিয়ে। এক রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দেশ যাচ্ছে। ছাত্রসমাজেও এই অস্থিরতার স্পর্শ লেগেছে। পরীক্ষায় টোকাটুকি, প্রশ্নপত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ইত্যাদি ঘটনা তো চলছেই ক'বছর ধরে। কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, এখনও অধিকাংশ ছেলেই পরীক্ষা দিতে চায়। আজ যদি পরীক্ষা পণ্ড হয়ে যায় তাহলে ছাত্ররাই হবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

আসলে পরীক্ষা পণ্ডের হুমকি কারা দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে তা খুব স্পষ্ট নয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে উড়ো চিঠিতে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। কোথাও বা হামলাও হয়েছে। স্বভাবতই এই অবস্থায় পরীক্ষা নেবার এবং দেবার একটা ঝুঁকি আছে। তাই সর্বত্র একটা অনিশ্চয়তার ভাব। অথচ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সোজা জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরীক্ষা না নিয়ে কোনো ছাত্রছাত্রীকে প্রমোশন দেওয়া বা হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার্থী হিসাবে পাঠানো চলবে না। এই গোলমালে মুড়ি মিছরি একদর হয়ে না পড়ে, ফাঁকি দিয়ে প্রমোশন পাক এটা কেউ চান না। ছাত্রদের মেধা বিচারের অন্য পদ্ধতি যখন আবিষ্কৃত হয়নি, বর্তমান পরীক্ষাকেও তখন বাতিল করা যায় কি?

কিন্তু অভিভাবকরাই বা এই অশান্তির মধ্যে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার হলে পাঠাবেন কোন্ ভরসায়? কে ভরসা দিচ্ছেন যে, পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে হবে? অনেক স্কুলে ছাত্রদের সহযোগিতায় পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু সর্বত্র তা সম্ভব না হলে পরীক্ষায় পাহারা দেবার দায়িত্ব কে নেবেন? পুলিশের ভরসায় পরীক্ষা দিতে গেলে হিতে বিপরীত হবার আশঙ্কা। এদিকে শিরে-সংক্রান্তি। বাংলাদেশে এত রাজনৈতিক দল থাকতে—যাঁরা নাকি মানুষের ভাল করার জন্য দিনরাত্রি চিন্তা করেন—আজ সামান্য পরীক্ষাকার্যটি নির্বিঘ্নে হতে পারছে না কেন? এ তো নির্বাচন নয় যে, একে অপরকে পরাস্ত করতে পারলেই জিৎ। শিক্ষায়তনে গলদ অনেকদিন থেকেই ঢুকেছে। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে শিক্ষাকে কলুষমুক্ত করতে পারলে একটা কাজের কাজ হয়। কিন্তু তা না করে ছেলেদের পরীক্ষা থেকে নিবৃত্ত করে লাভটা হচ্ছে কার? ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎই জাতির ভবিষ্যৎ—একথা যখন বলা হয় তখন শুধু আপ্তবাক্যের মতই তা উচ্চারিত হয় না। তাদের কল্যাণেই জাতির কল্যাণ, তাদের শুভবুদ্ধির ওপরেই জাতির আত্মিক ও বৈষয়িক বিকাশ। এই সত্য উপলব্ধি করেই আমাদের এগোতে হবে। গোটা জাতিকে এগিয়ে দিতে হলে এমন পথ বার করতে হবে যেখান দিয়ে সকলের আনাগোনা সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়। এ কাজে তরুণদের বিবেচনা সকলেরই কাম্য। তাদের জীবনের পথে যাতে বাধা না আসে এবং তারা যাতে পরম নির্ভরতার সঙ্গে জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে, সে-কাজই এখনকার বড় কাজ। রাজনৈতিক বিরোধ আর মতান্তর যেন কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জীবনে অনিশ্চয়তা ডেকে না আনে।

* * * *

# এঙ্গেলস্ স্মরণে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেড়শো বছর আগে, ১৮২০ সালের ২৮শে নভেম্বর তারিখে, জার্মানীর বারমেন শহরে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্-এর জন্ম হয়েছিল। মার্কসবাদ বলে অভিহিত যে বিশ্ববীক্ষা আধুনিক জগতে যুগান্ত এনেছে, তার মূল প্রবক্তা রূপে কার্ল মার্কস্-এর সঙ্গে এঙ্গেলস্-এর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্যকাল ধরে কীর্তিত হবে।

কার কাছে যেন শুনেছিলাম এঙ্গেলস্ সম্বন্ধে, যে তিনি হলেন যেন 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। মার্কস্-এর নামে জগৎ জুড়ে যে জয়জয়কার, তার ছিটেফোঁটা মাত্র নাকি এঙ্গেলস্-এর ভাগ্যে জুটে থাকে, অথচ মার্কসবাদ বিশ্বজনের সামনে উত্থাপনা ব্যাপারে এঙ্গেলস্-এর ভূমিকা বিরাট।

কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। এঙ্গেলস্ নিজেই শেষজীবনে এক চিঠিতে (১৪ জুলাই ১৮৯২) এ-ধরনের কথার সুন্দর জবাব দিয়ে গেছেন। বন্ধু মেহ্‌রিংকে তিনি লেখেন যে, 'আমার কৃতিত্বের প্রাপ্য যে প্রশংসা তার বেশি' দিলে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকেন। চিঠিতে আরও রয়েছে : 'চল্লিশ বছর ধরে মার্কস্-এর মতো মানুষের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য ঘটলে নিজের জীবনকালে কেউ যতটা স্বীকৃতি পাওনা মনে করতে পারেন তা না পাওয়াই স্বাভাবিক। তারপর মহত্তর মানুষটির তিরোভাব যখন ঘটে, তখন স্বল্পতর ব্যক্তিটি সহজেই অতিরিক্ত সুখ্যাতি পেয়ে থাকেন। বর্তমানে আমার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারই ঘটছে। তবে জানি যে অবশেষে ইতিহাস সবকিছু ঠিক করে দেবে, আর তখন ঘটে যাবে ব্যক্তির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। কোনো বিষয়ে কোনো কিছুই তখন আর জানার উপায় থাকবে না।"

শুধু স্বভাবসিদ্ধ বিনয়পরবশ হয়ে নয়, প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা ছিলেন বলেই এঙ্গেলস্ এমন কথা বলতে পেরেছিলেন। আত্মচিন্তা তাঁর কখনও ছিল না, নিজের সমাধিটুকুও তিনি চান নি। দেহাবশেষ ভস্ম করে সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে দেবার ইচ্ছাই তিনি বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। 'কোনো বিষয়ে কোনো কিছু জানার' বাইরে তিনি চলে গেছেন। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ কখনও তাঁকে ভুলবে না। মার্কস্-এর মহত্তর প্রতিভার কথা তাঁর মতো অকুণ্ঠে কেউ কখনও বলেনি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অবিসম্বাদিত যে মার্কস্‌বাদের জনক তাঁরা উভয়েই। এজন্যেই এঙ্গেলস্-এর মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল মার্কসবাদ সম্বন্ধে একটি কথা— "Our doctrine" ('আমাদের তত্ত্ব')—যার প্রথম প্রবচন ও বাস্তবে রূপায়ণের প্রয়াস করেছিলেন ঐ দুই মহাপুরুষ মিলে।

অভিন্নহৃদয় সৌহার্দ্য ও সাহচর্য ও সহকারিতার যে উদাহরণ মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্-এর জীবনে মেলে তার তুলনা ইতিহাসে নেই। মার্ক্‌স্ জন্মাবার দুই বৎসর পরে এঙ্গেল্‌স্ জন্মেছিলেন। প্রথম যৌবনে উভয়ের শিক্ষার ধারা প্রায় একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। হেগেল্-এর প্রভাবে পড়া এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা, ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সঙ্গে একাত্মতা অর্জন, সাহিত্য শিল্প এবং মনীষার সর্ববিধ ব্যঞ্জনায় অপার আগ্রহ, যে সমাজ সত্য 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' তাকে জানার একাগ্র আকুলতা, উভয় মনস্বীর জীবনে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রথম যৌবনেই উভয়ের পরিচয়, ১৮৪৪ সাল থেকে সর্বকর্মে উভয়ের অন্তরঙ্গ সহযোগিতা, তৎকালীন জার্মানীর খন্ড-বিপ্লবে উভয়ের অংশগ্রহণ, ক্রমশ হেগেল-এর তত্ত্বকে অতিক্রম করে নূতন জগজ্জয়ী চিন্তার উন্মেষ, সংগঠন ব্যাপারে ক্লান্তিহীন চিন্তা ও সিদ্ধান্তে উপনয়নের ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল উভয় মনস্বীর প্রথম জীবনের বৈশিষ্ট্য। পিতার কর্মব্যপদেশে ইংলন্ডে অবস্থান এঙ্গেল্‌স্‌কে বিপ্লবী কর্মধারা থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি—২৫।২৫ বৎসর বয়সে ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে প্রামাণিত তথ্য-সমৃদ্ধ তত্ত্বালোকিত গ্রন্থে শ্রেণীসংঘর্ষ ও তার অবসান-সংঘটনের আলেখ্য তিনি এঁকেছিলেন। অসামান্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তীক্ষ্ণ ও অক্লান্ত লেখনীধারণের ক্ষমতা তাঁকে প্রথম জীবনেই জার্মান সাম্যবাদ চিন্তার নির্ধারণ ও প্রচারে পুরোধারূপে দাঁড় করিয়েছিল। ১৮৪৭-৪৮ সালে যে 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' তৎকালীন দুনিয়াতে বজ্রনির্ঘোষের মতো শোনা গিয়েছিল, যার রচনায় ছত্রে ছত্রে কার্ল মার্ক্‌স্-এর অগ্নিগর্ভ ভাতি সুস্পষ্ট, তার ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়েছিল এঙ্গেল্‌স্-কৃত খসড়ায় "The German Ideology'-র মতো পূর্বতন রচনায়, যেমন, তেমনিই 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে' তার রচয়িতা হিসাবে নাম রয়েছে উভয় মনীষীর—কার্ল্ মার্ক্‌স্ এবং ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেল্‌স্। দুজনাই হলেন ইতিহাসের নবপর্যায়ে যুগ্ম পথিকৃৎ।

মার্ক্‌স্ তাঁর মহাগ্রন্থ 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম ও সবচেয়ে মহার্ঘ খন্ড সমাপ্ত করে বন্ধুকে লিখেছিলেন : 'এইমাত্র পান্ডুলিপি শেষ করলাম। তোমাকে আলিঙ্গন জানাই, কারণ তোমার সহায়তা বিনা একাজ সম্পূর্ণ হতো না।' বিপ্লবী মার্ক্‌স্-কে দেশ থেকে দেশান্তরে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে অবশেষে ইংলন্ডে বসবাস করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করার পর তাঁকে কালাতিপাত করতে হয়েছিল অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে, পত্নী অভিজাতকন্যা হয়েও হাসিমুখে স্বামীর সহধর্মিণী হয়ে সকল কষ্ট তুচ্ছ করেছিলেন, পুত্রকন্যাকে চোখের সামনে চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে মরতে দেখতে হয়েছিল তাঁদের, দৈনন্দিন জীবননির্বাহের বিড়ম্বনার অবধি ছিল না। তবুও যে মার্ক্‌স্ হার মানতে বাধ্য হন নি, তার হেতু হল বন্ধু এঙ্গেল্‌স্-এর নিরত সহায়তা। শুধু অর্থ দিয়ে নয়, সর্বতোভাবে মার্ক্‌স্-এর একাত্ম হয়ে সহকারিতায় তিনি নিরন্তর লিপ্ত ছিলেন। উভয় বন্ধুর পরস্পরলিখিত পত্রগুলি যেন এক মহাকাব্যের উপাদান—তাতে আছে জীবনযাত্রা বিষয়ে টুকরো টুকরো খবর, আর অনেক বেশী আছে দুই মনীষীর বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড নিয়ে যে চিন্তা, মানুষের সমাজ-জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনার যে আগ্রহ এবং মনীষাদীপ্ত যে প্রজ্ঞান তার চমৎকার প্রতিকৃতি।

সাম্যবাদের প্রচারে নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন এঙ্গেল্‌স্—সঙ্গে সঙ্গে মূলগত তত্ত্ব নির্ধারণ ব্যাপারে মার্ক্‌স্-এর সহযোগীরূপে তাঁর ভূমিকা ছিল এত স্পষ্ট যে বহির্জগতের চোখে প্রায়ই এঙ্গেল্‌স্‌কে উভয়ের মধ্যে অগ্রণী বলেই মনে হওয়া অসংগত ছিল না। যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে তিনি গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন; বন্ধুমহলে তাঁর ডাকনাম ছিল 'জেনারল', তাছাড়া মার্কিন বিশ্বকোষের মতো গ্রন্থে সাময়িক বিষয়ে লেখার আহ্বানও তাঁর কাছে আসত। কৃষিসমস্যা সম্বন্ধে মূলগত মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তার প্রথম প্রকাশ তাঁর রচনায়। মার্ক্‌স্-এর বহু অমূল্য চিন্তাফল যখন সাধারণ পাঠকের নাগালের প্রায় বাইরে, তখন সেই গভীর চিন্তার জটিল জাল কিছু পরিমাণে সরিয়ে, বক্তব্যের প্রখরতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে অথচ যথাসম্ভব সরল ভাষায় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন এঙ্গেল্‌স্ তাঁর 'অ্যান্টি ড্যুরিং' গ্রন্থে, (১৮৭৮), যার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'বৈজ্ঞানিক ও আকাশচারী সমাজবাদ' নিয়েই অধিকাংশ মার্ক্‌স্‌বাদীর হাতেখড়ি ঘটেছে। পরিবার, ব্যক্তিগত স্বত্ব ও রাষ্ট্রের উদ্ভব বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তার সমুজ্জ্বল রত্নবিশেষ। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও আগ্রহ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক বিকাশের সম্যক্ উপলব্ধিতে সহায়তা করার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়। তাঁর লিখিত বিভিন্ন পত্রাবলীতে যে মনীষার দীপ্তি তা ইতিহাসে অম্লান থাকবে।

১৮৭০ সাল থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে কাজ-কর্ম ছেড়ে সম্পূর্ণ সময় বিপ্লবী প্রচেষ্টায় নিয়োগ করা এবং মার্ক্‌স্-এর সান্নিধ্যে থাকার উদ্দেশ্যে এঙ্গেল্‌স্ লন্ডনে বসবাস আরম্ভ করেন। পূর্ব হতেই সর্বব্যাপারে তিনি ছিলেন মার্ক্‌স্-এর দক্ষিণহস্ত; 'প্রথম আন্তর্জাতিক' গঠন ও পরিচালনে তাঁর অবদান ছিল বিপুল। বিশ্বের দেশে দেশে সাম্যবাদের বারতা তখন বিস্তৃত হয়ে চলেছে। ভারতবর্ষ থেকে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর দফ্‌তরে চিঠি গেছে ১৮৭১ সালে। মার্ক্‌স্-এর মতোই এঙ্গেল্‌স্ ভারতবর্ষ নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন, লিখেছেন, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখেছেন, পরে আশা প্রকাশ করেছেন ভারতবর্ষে আসন্ন বিপ্লব নিয়ে। সাম্যবাদীর ঐ দুই মহান্ প্রবক্তা বিপ্লবকে কখনও পাশ্চাত্যের সংকীর্ণ গন্ডীতে বেঁধে রাখেন নি, তাঁরা চেয়েছেন জনগণের মুক্তি, আজীবন অক্লান্ত কাজ তদুদ্দেশ্যেই করে চলেছেন।

১৮৮৩ সালে মার্ক্‌স্-এর মৃত্যুর পর এঙ্গেল্‌স্ হলেন সাম্যবাদী সংগ্রামের অবিসংবাদী অধিনায়ক। তাঁর ব্রত হল মার্ক্‌স্-এর অপ্রকাশিত রচনাবলী অবিকৃতভাবে (অথচ বোধগম্য অবস্থায় সজ্জিত করে) প্রকাশ করা। তাঁর লক্ষ্য হল মার্ক্‌স্‌বাদের বিপ্লবী চরিত্রকে বিকৃত করে ফেলার যে প্রবৃত্তি বহু বিদ্বান অথচ অদূরদর্শী কিম্বা সুবিধাবাদী নেতার মধ্যে দেখা দিয়েছিল, তাকে রোধ এবং পরাস্ত করা। জীবনের শেষ অধ্যায়ে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা তাঁকে পেতে হয়েছিল। যখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলে খ্যাত কাউট্‌স্কি পর্যন্ত জার্মান সমাজবাদীদের মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তারই ফলে মার্ক্‌স্-এর ঐতিহাসিক রচনার কদর্থ করার চেষ্টা হলে এঙ্গেল্‌স্-এর নিজস্ব প্রবন্ধেরই অংশবিশেষ ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হল, মার্ক্‌স্‌বাদের বিপ্লবী সত্তাকে ক্রমশ নিস্তেজ করে দেওয়ার অপচেষ্টা দেখা গেল। মৃত্যুশয্যা থেকেই এঙ্গেল্‌স্ এই অপকর্মের প্রতিবাদ তেজস্বীস্বরে অনুগামীদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত জার্মান সমাজবাদী মহলে এই বিকৃতির ভয়াবহ ফলাফল ইতিহাসকে লক্ষ্য করতে হয়েছে।

মার্ক্‌স্-এর মতোই এঙ্গেল্‌স্-এর অন্তরে সাহিত্যবোদ্ধা শিল্পপিপাসু একটি মানুষ সর্বদা ছিল। জগদ্ধিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা; সর্বমানবের সর্ববিধ অনুভূতি নিয়েই তাঁদের আগ্রহ তাই দেখা গেছে। সাহিত্য শিল্প বিষয়ে এঙ্গেল্‌স্-এর বক্তব্য নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ সমুচিত। এখানে তার আলোচনা সম্ভব নয়।

"আমাদের মধ্যে মার্ক্‌স্ ছিলেন একমাত্র সর্বাগ্রগণ্য প্রতিভা, তুলনায় আমরা সবাই নিষ্প্রভ"— একথা বলেছিলেন এঙ্গেল্‌স্। এ নিয়ে বিতর্ক অবান্তর। মার্ক্‌স্ ছিলেন প্রকৃতই অলোকসামান্য মানুষ। কিন্তু তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও সহযোগী এঙ্গেল্‌স্-এর যে সুবিপুল কীর্তি, তার দীপ্তি কখনও ম্লান হয়ে না।

# যে নাম বলে দিল ॥

শ্যামসুন্দর দে

সারাটা পৃথিবী জুড়ে বিজয়ের যাত্রা
হাতে পায়ে যুগান্তের শেকল জড়ানো
সেগুলোই হারিয়ে যাবে শুধু খুলে খুলে
হারাবার নেই আর কিছু।
হাতুড়ি লাঙলে ধরা অনেক অনেক কড়া হাতে
সারাটা পৃথিবী জোড়া জয়ের নিশান।

আমরা নিপুণ যোদ্ধা
বিদ্যুতের রেখা জ্বলে ওঠে
মনন আকাশ থেকে যখন বিদায় নিল
সংশয় ও কল্পনার মেঘ।
সময়ের নুড়িগুলো পেরোতে পেরোতে
আমরা আগুন জ্বালি
পাথরের হাতিয়ার ছেড়ে ছুটে যাই মহাকাশে
শেকল ভাঙার গান গাই লাওস ভিয়েতনামে
আমার বাংলার ঘরে ঘরে
বিদ্রোহী ভাবনাগুলো,
উদ্ধত বাসনা হাতছানি দিল আকাশকে
নক্ষত্রের সঙ্গে মিতালির স্পর্ধা...
ইতিহাসের পাতায় দুইটি মানুষ
একক নামের বন্ধনে
যুগের একান্ত প্রিয় নাম
কার্লমার্কস আর এঙ্গেলস
বলে দিল পৃথিবীকে জয় করা বাকি।

ছবিটা ময়লা বিবর্ণ হয়ে গেছে। কাল্‌চে দাগ পড়েছে। অনেকদিন আগেকার তোলা ওই ছবিটাকে তবু একনজরেই চেনা যায়; অনেক স্মৃতি-জড়ানো ছবিটা দীর্ঘ এতগুলো বছর আর এতো ঘুরপাক খাওয়া ওই রং-চটা সুটকেশের এক কোণে পড়েছিল। হাতে নিয়ে চমকে উঠেছি। ম্লান আবছা আলোয় ছবির বুকে ফুটে উঠেছে একটি কিশোরের মুখ; ডাগর চোখদুটোয় প্রথম ছবি তোলবার উত্তেজনা, সরল চাহনিতে রয়েছে ভয় আর কৌতূহল মেশানো। পিছনে একটা বকুলগাছ—ওদিকে খড়ের চালাঘর—তাতে উঠেছে সবুজ কুমড়োতলা—সাধারণ হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরা একটি ছেলে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—বুম্‌ ম বুম্‌ ম! অন্ধকারে প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। কোথায় বোমা ফাটলো, একটা—একটার পর একটা। কাঁপছে মহানগরীর আকাশ-বাতাস, আমার বর্তমানের আশ্রয় জীর্ণ মাটকোঠার বাড়িটাও। মানুষগুলো কি ভয়ে মুখ বুজে চুপ করে আছে। কাদের উত্তেজিত কণ্ঠের চীৎকার—গর্জন শোনা যায়।

প্রায়ই এমনি কাণ্ড বাধে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগেই মহানগরীর মানুষগুলো যে-যার আস্তানায় ফেরার চেষ্টা করে। গোলমাল-হাঙ্গামা আছেই, ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

এই জীবনের মাঝে হঠাৎ এই ছবিটা একটা সাড়া আনে। গ্রামের ছাপ আঁকা ওই শিশুকে আমি চিনি—একদিন অমনি শান্ত সুন্দর সবুজ জগতে ওকে নিবিড়ভাবে চিনেছিলাম। এ যেন আমার অন্য সত্তা—ওই ছবির কিশোরকে আজ চিনি না; হঠাৎ এই পরিবেশে ওকে দেখে তাই চমকে উঠেছি।

খোলা একটু জানলা দিয়ে ওপাশে কোন শেঠজীর বাগানের ফুলগন্ধমাখা হাওয়ার মিশেছে ধোঁয়া আর বারুদের পোড়া গন্ধ। তবু এই মাটকোঠার বন্ধ ঘরে ওই হাওয়ার দাক্ষিণ্যই সম্বল, কারণ বিজলী নেই, পাখা কেনার কথা স্বপ্ন। তাই ওই শেঠজীর বাগানের ওই বাতাস-টুকুই আমার সম্বল—তাও বিষগন্ধে বিষিয়ে উঠেছে। বোধহয় টিয়ারগ্যাস ছেড়েছে পুলিশ, চোখ ছাপিয়ে জল নামে—জ্বালা করছে।

তবু এই পরিবেশে ওই বাগানের গাছের পত্রাবরণের মাঝে কোকিল ডাকছে। শীত ফুরিয়ে বসন্ত আসছে, তারই খবর নিয়ে এসেছে পাখীটা। ঠিকানা-হারানো আজকের আমি ওই ছবিটার দিকে চেয়ে থাকি। সেইদিনের ওই ছবির জগতে মনটা উধাও হয়ে যায়। আজকের বোমাফাটা আরণ্যক যুগ থেকে অনেক পিছনে।

সেদিন সেখানে ছিল সবুজ পাখী-ডাকা ফুলগন্ধভরা একটি জগৎ। অনেক-দিন আগে সেই রাজ্য থেকে হারিয়ে গেছি। তবু ভুলিনি আজও।

বাতাসে আমবোলের মধুঝরা তীব্র মদির সুবাস, মৌমাছিগুলো গুনগুন করে উড়ে ফেরে, বাগানের নীচে ঝরাপাতায় পা দিয়ে ছুটে চলেছে ছেলেটি রঙীন একটা প্রজাপতির সন্ধানে। আমাশেওড়ার সবুজ

পাতার আড়ালে থোকা থোকা লাল সাদা ফুলগুলো ফুটেছে—ঘেঁটু ফুলের ঝাঁ ঝাঁ গন্ধমাখা বাতাসে ভর করে দৌড়চ্ছে ছেলেটা। শুকনো পাতার মর্মর ওঠে।

হঠাৎ বাগানের বাইরে সবুজ মাঠে এসে থমকে দাঁড়াল। পুঞ্জ গাঢ় হলুদের স্তূপে পড়েছে বৈকালের সোনা রোদ। গাঢ় হলুদ রং-এ ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। এ-দৃশ্য সে আগে দেখেনি। দ্রোণপুষ্পফোটা মাঠে একটা নীলকণ্ঠ পাখী আকাশের উপরে ডেকে ডেকে হারিয়ে গেল। প্রজাপতিটাও যেন হারিয়ে গেছে।

একটা অপরূপ সুন্দরী এলোচুল মেলে মাঠের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে, ওকে ডাকছে বাতাসের ফিসফিসানির সুরে।

কাছাকাছি কেউ নেই। দূরে আখ-ক্ষেতের ওপাশে কাদের টুকরো কথার শব্দ ভেসে আসে। পাখীগুলো কিচমিচ করছে। শান্ত এই জনহীন অরণ্যসবুজে ওই রূপসী তাকে ডাকছে। ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঠাক্‌মার কাছে সে গল্প শুনেছে—কোন রাক্ষসী নাকি নানা রূপ ধরে ছেলেদের ভুলিয়ে নিয়ে যায়। তারপর ঘাড় মটকে সব রক্ত খেয়ে ফেলে। আর খালের ধারে ছিকু বুড়ি নাকি ডাইনি। ও অনেক সময় ছেলে-দের ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

উজ্জ্বল হলুদ রং-এর মসৃণ লতা-গুলো গাছটার সারা গা ঢেকে ফেলেছে।... ওরই আড়ালে কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।...

—ক ও-ক্।... ক ও-ক্।...

জলার দিক থেকে সাদা বকগুলো দীঘল রেখার মত আকাশে উড়ে চলেছে। ছেলেটার মনে হয় কার যেন গলা টিপে ধরেছে। ভয়ে ঘেমে নেয়ে উঠছে।

*দৌড়ল সে বাড়ির দিকে।*

—খোকা—অ খোকা! কাদের ছেলে গ' তুমি!

ছেলেটা একদৌড়ে মাঠ পার হয়ে বাগান-বাঁশবন ছাড়িয়ে ধুলো-ঢাকা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। হাঁপাচ্ছে সে। ডাগর দুচোখে ভয়ের চিহ্ন, কেমন ভয় ভয় চাহনি। মাথার চুলগুলোর দু-চারটে চোখের উপর এসে পড়েছে। ঘামে জড়িয়ে আছে কপালের উপর।

ওর ডাকে চাইল। তখন গাছে গাছে আবছা আঁধার নেমেছে, বাঁশবনের ঘন ছায়ায় সেই আঁধার জড়ানো। হলুদ শুকনো পাতাঝরা বাঁশবনের নীচে কারা আগুন দিয়ে জড়-করা বাঁশপাতা পোড়াচ্ছে ওই ছাই-এ সার হবে। ধোঁয়াগুলো জট পাকিয়ে উঠছে।

...কাদের বাড়ির গ?

বুড়ির দিকে চাইল ছেলেটা। পাকা শনমুড়ির মত চুলগুলো। চোখের চাহনিতে একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব।

কিশোর ওইদিকে চাইল। বুড়ির হাতে একটা নোনা আতা। গাঢ় লাল রং-এর মসৃণ ফলটা ওর দিকে এগিয়ে দেয়।

—খাবে? নাও—ভয় কি!

কিশোর এগিয়ে আসে ওর দিকে। বলে—

—বামুনপাড়ায় বাড়ি আমাদের।

—নবুর ছেলে তুমি, না?

ওর বাবার নামই নবকৃষ্ণ। তাই কিশোর মাথা নাড়ে। বুড়ি বলে—

—বনে-বাদাড়ে এ-সময় যেতে নাই গোপাল। সোজা সড়ক ধরে বাড়ি চলে যাও। মা-বাবা ভাববে।

ছেলেটা দৌড় দিল। মনে হয় এই ফুলগন্ধভরা বাগানে ওই ধুলোভরা পথটায় কোথায় কারা যেন মুখ লুকিয়ে আছে। *ঝোপের মধ্যে একটা গাছ দেখে দাঁড়ালো।* হলুদ-শুকনো পাতাঝরা গাছগুলোর মধ্যে *ওই গাবগাছে এসেছে নোতুন পাতার রাশ, কচি পাতাগুলোয় গাঢ় বেগুনী রং।* ওই গাছটার সারা গায়ে কে যেন রং-এর *পোচড়া বুলিয়ে দিয়েছে।*

রাংচিত্তির কালো-সবুজ বেড়াঘেরা পথে এসে দাঁড়াল ছেলেটা। তার এটা চলাপথ, পাঠশালে যায় এই পথেই। একটু এগোলে বকুলগাছতলা পার হয়ে তাদের মাটির বাড়িটা দেখা যায়। ঘাসে ঘাসে ছড়িয়ে আছে ঝরা বকুল ফুলগুলো। বাতাস তারই গন্ধে মৌ মৌ করছে।

কিশোর এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। আকাশের উঠোনে তখন দু-একটা তারা জ্বল জ্বল করছে। বাবা ততক্ষণে হাট থেকে ফিরেছে। সেখানে পাটের মহাজনের গদিতে খাতাপত্র লেখার কাজ করে, মা এগিয়ে এসে বলে—

—এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে? বলেছি বনে-বাদাড়ে যাবি না—।

কিশোরের হাতে নোনা আতা দেখে মা বলে—কার গাছ থেকে আনলি? মা বোধহয় ভেবেছে কাদের গাছ থেকে তুলে এনেছে সে। কিশোর বলে—

—একটা বুড়ি দিল। বুঝলে মা—দেখতে ঠিক ঠাক্‌মার মত। এমনি পাকা চুল—সাদা কাপড়পরা।

মা তবু বলে—না-না। এমনি করে যাসনে যেখানে-সেখানে এই ভরসন্ধে-বেলায়। যা পড়তে বসগে।

হ্যারিকেনের আলো জেলে সন্ধ্যার অন্ধকারে পড়তে বসে সে। মাঝে মাঝে মন কোথায় হারিয়ে যায়। সেই আম-বাগানের ছায়ায় ছায়ায় বাতাসের মিষ্টি গন্ধ—পাখীর ডাক—হলুদ একটা বিরাট গাছের গোল ছাতার মত রূপ—নোতুন পাতা-আসা গাবগাছটা—সব তার মনের পরতে কেমন ঘুম ঘুম ভাব আনে। শান্ত-সুন্দর তার জগৎ! এই জগতের ধুলো-ভরা পথে পা ফেলে ফেলে কে যেন এগিয়ে আসে। সেই শিশুকে সে চেনে।

—খোকন! অ খোকন! দেখেছো পড়তে বসেই ছেলের ঘুম!

বাবার ডাকে ওর ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে চেয়ে দেখে কিশোর বই খোলা—শ্লেট পড়ে আছে আর সে ঘুমোচ্ছে তার বিচিত্র নোতুন দেখা জগতের স্বপ্ন নয়ে।

তবু এই জগতটা সুন্দর-শান্ত আর বৈচিত্র্যময়। সেদিন হাটে গেছে কিশোর। এর আগে এদিকে আসেনি। ধুলো-ভরা পথটা দিয়ে গ্রামের সীমা পার হয়েই খালের ধারের রাস্তা ধরে চলেছে ওরা। খাল নয়—ছোটখাটো বিলই বলা যায়।

অশ্বত্থ গাছে নোতুন পাতা এসেছে—খালের জলে ফুটে আছে পদ্মফুল—সবুজ পাতার ভিড়ে লাল ফুলগুলো বিন্দুর মত ছড়িয়ে আছে। তার ওদিকে গভীর কালো জল সীমার ওপারে গ্রামগুলো দেখা দেয়। গম-যবের ক্ষেতে হলুদ রং লেগেছে কুসুম ফুল—সাদা সাদা মৌরীফুলে ছেয়ে-ওঠা ক্ষেতের ধার দিয়ে চলেছে রাস্তাটা।

হাটের লোকজন মালপত্র, তরি-তরকারী নিয়ে চলেছে, গরুর গাড়িগুলো ক্যাঁকিয়ে শব্দ তোলে। বাবা বলে—চাকায় তেল না দিলে অমনি শব্দ হয়।

গরুগুলো ল্যাজ ঝাপটে মাছি তাড়িয়ে যাচ্ছে।

—হাটে চললেন নাকি অ চাটুয্যে মশায়?

কিশোর চেয়ে থাকে ওদের দিকে। বাবাকে ওরা চেনে। কোথায় কামারশালে হাঁপরের টানে ফোঁস ফোঁস করে হাওয়া বের হচ্ছে—কয়লাগুলো গনগনে হয়ে ওঠে। একটা লোক দুমদাম করে তাতানো লাল লোহাটাকে পিটছে, তার থেকে ছিটিয়ে পড়ে লোহার লাল ফুলঝুরি।

বাবা বলে—ওর থেকে কোদাল কাস্তে তৈরী হয় খোকন!

অবাক হয়ে দেখছে কিশোর। তার এসব খবর জানা ছিল না। ছায়াঢাকা পথে কোথায় কলরব [illegible]

হাটতলায় কাছে এসে পড়েছি; এত লোকজন দোকানপসার এর আগে আমি দেখিনি। তরিতরকারী মাছ চাল আরও কিসব গাদা করে বিক্রী করছে। কেনবারও লোকের অভাব নেই। আমি তখন নাগর-দোলা, বাঁশীর কথা ভাবছি। ওসব না দেখে শুধোই—

—বাবা এসব মেলায় নাগরদোলা, তাল-পাতার বাঁশী নাই?

বাবা হাসল। বলে—এটা মেলা নয়, এতো হাট। হপ্তায় দুদিন বসে। জিনিস-পত্র কেনাবেচা হয়।

হাট-এর লোকজনদের দিকে চেয়ে দেখি। বাবা একটা ধামায় তরকারি চাল কিনে তালপাতার শিকে একটা মাছ গেঁথে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরছে। আমিও মাথায় একটা কুমড়ো নিয়ে ফিরছি। সেদিন এক পয়সার বঁইচি পাকা কিনেছিলাম। পাকা টুসটুসে গাড় লাল বেগুনী রং-এর ফলগুলো মিষ্টি। চুষতে চুষতে সেই ফুলের গন্ধভরা পাতাঝরা পথ দিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

হাটের গল্পই মাকে শোনাই কদিন ধরে।

—রথের মেলার চেয়েও অনেক বেশী লোক সেখানে।

পাঠশালায় পরীক্ষা হবে, এবার দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠবো।

বাবা বলে ভালো করে পড় খোকা। ফার্স্ট হতে হবে। লেখাপড়া শিখবি—শহরের স্কুলে যাবি পড়তে।

অনেক স্বপ্নই দেখি। শহরটা বোধহয় অনেক বড়। আমাদের গ্রামের মত এতো গাছ—এতো বড় মাঠ—জলভরা পদ্মফুল ঢাকা জলা নেই। জোনাকি জ্বলে না সেখানে, নীলকণ্ঠ, বাজবৌরি, বউকথাকও, ময়না পাখীর ডাক শোনা যাবে না।

হরি বোষ্টমের গানও সেখানে পৌঁছে না। ভোরের আলো ফোটার আগেই পাখীর ডাকে সুর মিলিয়ে হরি বোষ্টমের গলা ভেসে আসে। ওই সুরটা আমার খুব চেনা।

—রাই জাগো, রাই জাগো বলে শুক-সারী ডাকে।

হরিলাল গ্রামের ওই শিশির-জমা পথে ঘুমভাঙানী গান গেয়ে যায়।

বকুলতলির আমড়া গাছের পাশে মাধবীলতার ফুল ফোটা বেড়াঘেরা একটি আশ্রম। ওখানে ওঠে ধূপের মিষ্টি গন্ধ। কত সন্ধ্যার অন্ধকারে সেখানেও সুর শুনেছি। খঞ্জনীর তালে তালে গাইছে সে।

—কিশোর যে! এাঁ নওল কিশোর! এসো—এসো।

ওর ডাক শুনে এগিয়ে যাই। ছোট রেকাবিতে করে নারকেল খণ্ড, শশাকুচি এগিয়ে দেয়।

—নাও, পেসাদ নাও।

মন্দির বলতে ওই চালাঘর; দত্তদের ঠাকুরবাড়ির মত বাঁধানো নাটমন্দির, ঠাকুর-দালান নেই। লোকজন জুটিয়ে ঘটা করে নেচে নেচে আরতিও করা হয় না এখানে। তবু শান্ত মধুর একটি স্বপ্নময় পবিত্র পরিবেশ।

হরিদার হাসিটুকুও অমনি সুন্দর। তাই মাঝে মাঝে মা-বাবাকে না বলে পালিয়ে আসি। অনেক আশাভরে শুধোই হরিদাকে।

—তোমার ঠাকুর খুব জাগ্রত নয়?

হাসে হরিদা—ঠাকুর আমাদের দয়া-ময়। কেনে গো?

—আমাকে পরীক্ষায় ফার্স্ট করে দিতে পারে তোমার ঠাকুর? সত্যি!

হরিদা চাইল আমার দিকে। বলি—ফার্স্ট হতে হবে। বাবা বলেছে—আরও অনেক দূর পড়তে পাবো। শহরে যাবো—

হাসে হরিদা—পড়বে বৈকি! ঠাকুর ঠিক দয়া করবেন গো।

সেদিন প্রণাম করেছিলাম ঠাকুরকে।

গুপীনাথ বলেছিল—ছিকু বুড়ির ওখানে যাসনে! বুড়ি ডাইনী!

ভয় লাগে ওর কথায়। গুপী এসব অনেক কিছুই জানে। সে নাকি রতন ওস্তাদের কাছে যাদুমন্তর শিখেছে। গুপী বলে।

—দেখিস, ওই ছিকু বুড়ির পাগুলো উল্টো দিকে ফেরানো। ও-বুড়ি যদি কোন ভালো ছেলেকে দেখে, অমনি গিলে দেবে।

—গিলে ফেলবে? ভয়ে কাঠ হয়ে শুধোই।

গুপী বলে—ধ্যাৎ! গিলবে নাকি? ছেলেটা শুকিয়ে যাবে দাঁড়ির মত, না-হয় মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে যাবে।

ছিকু বুড়িকে দেখিনি। তবু মনে হয় সাংঘাতিক একটা কিছু জীব সে।

তাই সেদিন পদ্মদীঘির ধারে গিয়ে ঘাবড়ে গেছলাম—গুপী, আমি আর নেটন। গুপীই বলেছিল—ওখানে ছিপে মাছ খাচ্ছে

খুব। অনেক দল যাচ্ছে দীঘিতে মাছ ধরতে। তাই আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় মাছ, কোথায় বা মাছ-শিকারী। ছায়া ছায়া আঁধার নেমেছে চারিদিকে। মেঘ জমেছে আকাশে, কালো জমাট মেঘ।

থমথম করছে বড় বড় শিরীষ গাছ-গুলো—ওদের ছায়া পড়েছে দীঘির গহন কালো জলে। ভয় ভয় করে। শোঁ শোঁ শব্দ ওঠে কোথায়।

—গুপী!

তখন আর সময় নেই। আকাশ ছেয়ে কালো মেঘ জমেছে। কে যেন একটা দোয়াতের কালি ঢেলে দিয়েছে আকাশের গায়। আর বিলের ওপারের গাছগুলো তখন মাথা নুইয়ে ঝড়ো হাওয়ার দাপটে নাচন জুড়েছে। গর্জন ওঠে—শোঁ, ও...ও...

সেই দৈত্যটা আশমানে ভর করে এগিয়ে আসছে, ওই জলসীমা পার হয়ে এপারে চটকা-শিরীষ-অশ্বত্থ গাছগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কি মত্ত আক্রোশে।

তিনজনে তখন দৌড়চ্ছি। কোথায় মড় মড় শব্দে একটা জীর্ণ ডাল খসে পড়ল। বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির সেই ফোঁটাগুলো তীরের ফলার মত বিঁধছে সারা গায়ে-মুখে।

সামনে গাছের একটু তফাতে একটু কুঁড়েঘর দেখে এগিয়ে গেলাম। চালটা মড় মড় করছে। তবু মাটির দাওয়ায় উঠে দাঁড়ালাম।

—কে রে গোপালরা? অ খোকন তুমি!

গুপী কাঠ হয়ে গেছে। নোটনও বোধ-হয় নেমে পালাতো নেহাৎ বৃষ্টি আর ঝড়ের ভয়েই আটকে পড়েছে। ওই বুড়িকে আমি চিনি। ও আমাকে সেদিন বাঁশবনে দেখেছিল—আতা পাকা দিয়ে বলেছিল সন্ধ্যার সময় বনবাদাড়ে না ঘুরতে।

তাই ওকে দেখে বলি—মাছ ধরতে এসেছিলাম।

—ওমা! তুমি ধরবে ওই দীঘিতে মাছ? এক-একটা মাছই তো তোমার মতো! ভিজে গোবর হয়ে গেছো! অ গুপেও আছিস দেখছি? এ তোরই কাজ। যতো সব অনাছিষ্টি কাজ তোরই।

বুড়িই একটা ছোট টুকরিতে মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা এনে দেয়।

—মাথা মোছো গোপাল, ততক্ষণ দু কল মুড়ি চিবোও কাঁচালঙ্কা দিয়ে, ঝাল লাগলে জল আর লাগবে না।

খিদেও লেগেছিলো খুব। মুড়িগুলো চিবোতে থাকি।

—খা রে?

গুপী-নোটন কি ভাবছে। আমাকে খেতে দেখে তারাও খেতে শুরু করে। ওদেরও দারুণ খিদে পেয়েছে। কোন সকালে বাড়ি থেকে খেয়ে বের হয়েছে। আর কিছুই খায়নি।

বৃষ্টি কমে আসছে। আমরা ফিরছি বাড়ির দিকে। মাটির বুক থেকে ভিজে ভিজে গন্ধ উঠছে। গাছগুলোর পাতায় পাতায় জমা জল দমকা বাতাসে ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ে। পথের ধারের নয়ানজুলি দিয়ে কলকলিয়ে জল বয়ে চলেছে। ঝরা বকুল ফুলগুলো ভেসে চলেছে সেই স্রোতে। মেঘভাঙা আকাশে সূর্য উঠেছে—নিভু নিভু আলোয় ওই বর্ষণক্লান্ত গাঢ় সবুজ গ্রামপথ—গাছগাছালি সব কেমন বিচিত্র সুন্দর আর স্বপ্নময় বলে মনে হয়।

এই অপরূপ জগতের পথে কিশোরটি কোথায় হারিয়ে গেছে।

গুপী বলে—মুড়ি খেলি কেন ওখানে? ওই ডাইনীর বাড়িতে? ওর দিকে চাইলাম। ওই ওদের ছিকু বুড়ি। ভয়ানক একটা জীব। আমার কাছে ও তেমন কিছু নয়। সাধারণ একটি মানুষ। ওর পাকা চুল—সৌম্য চেহারা দেখে ভয় আদৌ করেনি। বলি—

—ও কেন ডাইনী হবে?

ওরা বলে—তোকেও ও ভেড়া বানিয়েছে। জানিস, কাউর কামিখ্যের জাদুতে লোককে ভেড়া বানিয়ে দেয়।

—ধ্যাৎ! আমি আদৌ বিশ্বাস করি না ওর কথা। মনে হয় ছিকু বুড়ি অনেকের চেয়েই ভালো। অনেক ভালো।

সব গাছগাছালি—পাখির ডাক—ওই পাড়াগাঁর নিকানো-চাটা জগৎ পদ্ম-দীঘির ছায়াঘন পরিবেশ ছাড়াও অনেক বৈচিত্র্য আছে এইখানে।

যেদিকে দেখেছি মনে হয়েছে এর বহু বিচিত্র রূপ আর মনে এসেছে কি আনন্দ। সেদিন নদীর বুকে নৌকোয় করে গোবিন্দপুরে ঝুলনের মেলা দেখতে যাবার সময় কথাটা মনে হয়েছিল।

বাবার কোন জানাশোনা মস্ত লোকের বাড়ি সেখানে। কলকাতায় তাঁর যাতায়াত—বাবা নাকি এখানে থাকতে চাইছে না, অন্য কোথায় ভালো চাকরীর সন্ধান করছে। কথাটা বাবা মাকে বলে।

নৌকাটা ভেসে চলেছে বর্ষার ভরা নদীর বুকে। দুদিকে সবুজ বট-অশ্বত্থ-তেঁতুল গাছের জটলা। গোঁদালে লতাগুলো জড়িয়ে আছে ঘন সবুজ বেত গাছের দীঘল পাতাগুলোকে, লাল-লাল ফল ঝুলছে, ওদিকে চরের বুকে জল—বাবলা গাছগুলো দলবেঁধে বুক ডুবিয়ে ওই জলে যেন চান করতে নেমেছে। নৌকার দাঁড়ের শব্দে কোথায় বসে থাকা পানকৌড়ি বারকতক ডুব দিয়ে সরে গেল।

—মা একটা পানকৌড়ি!

মা অন্য কি ভাবছে। আমার কাছে ওই সুন্দর জগৎটা কি বিচিত্র রূপে দেখা দেয়। চরে কোথায় সোনারং আউশ ধান-গুলো সিঁড়ি সিঁড়ি ধান ক্ষেতে দাঁড়িয়ে আছে। নীল আকাশে উড়ে ফেরে ফুটকির মত দু একটা চিল। নদীর জলে মাছের সন্ধান করে ফেরে রঙীন মাছরাঙা পাখী।

ঝুলনের মেলায় আলো দেখা যায়—আরও দূরে চারটে নৌকা চলেছে মেলার দিকে। বাবা বলে।

—এই নদী কোথায় গেছে জানিস খোকা?

ভূগোলে পড়েছি, তাই জবাব দিই—নদী গিয়ে পড়েছে সাগরে। সাগরের কল্পনা আমার নেই। মনে হয় ধু ধু নীল আর নীল চারিদিকে। সেই-খানের অসীম শূন্যতার মাঝে আমাদের সবুজ তীর ঢাকা ছোট নদীটা কোথায় হারিয়ে গেছে।

বাঁশী বাজছে—ভেঁপু—ব্যাণ্ডের শব্দ আসে। মেলায় সার্কাস এসেছে। তাঁবুটা দেখা যায়। বাবা বলে

—সার্কাস দেখে ফিরবো কিন্তু।

খুশী হই—তাই ভালো বাবা। বাঘ আছে—না?

বাবা কেমন হাসিখুশী হয়ে গেছে। মা কি ভাবছে।

—রাত হবে যে ফিরতে?

—এই তো পথ। দিব্যি চলে যাবো। বাবা বলে।

যখন ফিরলাম তখন তারা জ্বলা রাত্রি। নদীর থির জলে ওদের ঝিকিমিকি ওঠে। কোথায় গানের সুর ভেসে আসে। উদাসী কণ্ঠে কোন মাঝি দিকহারা নৌকা থেকে গাইছে ওই গান—কোথায় অকূল গাংএ সে যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে। উধাও হয়ে চলেছে জীবন নদীতে সে ভুল পথে। রাতের আঁধারে ঢেউগুলো নৌকার নীচে লাগছে ছপ্ ছপ্ ছপ! ওই সুরটায় যেন তাল দিচ্ছে, মনে হয় কোথায় একটা নিবিড় দুঃখ আর বেদনা রয়ে গেছে, এত কিছুর মধ্যেও।

মানুষ পথ হারিয়ে গেলে বোধহয় এমনি আঁধারে হারিয়ে যায়—তার কণ্ঠে জাগে এমনি হতাশ কান্নার সুর।

—খোকন।

বাবার ডাকে উঠলাম। আমরা ঘাটে এসে গেছি। দত্তবাড়ির আলোটা দেখা যায়। ওদের দেউড়িতে সারারাত আলো জ্বলে। একটি দিন ঝুলনের সেই চাঁদনী রাতে অকূল নদীতে ভেসে যাওয়ার স্মৃতি নিয়ে ফিরে এলাম। এ যেন কোন স্বপ্ন! বাঁশীর সুর ব্যাণ্ডের শব্দ সার্কাসের তাঁবুতে ক্লাউনের রংচং মাখা পোশাক পরে নাচ, চাঁদনী রাতে নদীর বুকে সেই হারিয়ে যাবার বেদনার গান সব মিলে আমার মনে একটি বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করেছে। এর সঠিক রূপ আমি জানি না; টুকরো টুকরো সেই ঘটনাগুলো আমার চোখে—মনে কি নোতুন অদেখা একটি জগৎকে বিচিত্র অনুভূতিতে রূপায়িত করেছে।

এবার শীত আসছে। পদ্মদীঘির বাঁদিকে যাই—ছিকু বুড়িকে দেখেছি কতো-দিন, হরিদার আখড়ার মালতী গাছে নোতুন সাদা ফুল ফুটেছে—সবুজ লতা ছেয়ে। পাখীগুলো কলরব করে। মাঠে মাঠে সোনা হলুদ ধান মাথা দোলাতে দিয়েছে, টিয়ে

ঝিলে বুলবুলি পাখীর দল ঝাঁক বেঁধে কলরব করে, বাতাসে ওঠে খেজুর রসের মাতানো গন্ধ। গাছিরা কলসী কলসী খেজুর রস ঢেলে জ্বাল দিচ্ছে—রস ফোটার মিষ্টি সুবাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। পথে পথে মাঠ থেকে গরুর গাড়ি বোঝাই পাকা ধান আসছে—ধুলো ঢাকা পথে সেই ধানের শিষ লুটিয়ে আসে। খামারে খামারে ধান এর স্তূপ।

হরিদার আখড়ার ঠাকুরের মাহাত্ম্য আছে। সেবার আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম স্কুলের পরীক্ষায়। বাবা বলে—এবার ভালো ইস্কুলে পড়তে যাবি কিশোর।

আমিও স্বপ্ন দেখি গ্রামের, ওদিকে হাটতলার কাছে বাগানঘেরা বড় বাড়িটার—ওইটাই বড় ইস্কুল, ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং বাতাসে সেই শব্দটা বিলের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে আসে। কতো ছেলে পড়ে সেখানে। আমিও বড় হয়ে উঠেছি। এবার একাই পদ্মদীঘিতে মাছ ধরতে যাবো। নৌকায় চড়ে নদীর ওপারের সাঁইবাবলার ফুল ফোটা চরে বেড়াতে যাবো মৌরীফুল আনতে। একাই সেই স্বর্ণলতার বেড়া ঘেরা গাঢ় হলুদ গাছের নীচে উঁকি দিয়ে দেখবো তার আলোমাখা রূপটাকে। আম বাগানে ঝড়ের বৈকালে একাই আম কুড়োতে যাবো। ওই ধুলোঢাকা রাস্তা ধরে খেয়া পার হয়ে খালের ধার দিয়ে ঝুলনের মেলার বাজি সার্কাস দেখতে যাবো. তালপাতার বাঁশিতে আর সখ নেই। পিতলের পিকলু বাঁশী কিনবো এক টাকা দু আনা দিয়ে। পয়সা জমাতে শুরু করেছি একটা ভাঁড়ে অনেক পয়সা জমে গেছে। চড়কের মেলায় এবার বাঁশী কিনবো।

আমার এই জগত অনেক বেড়ে গেছে পরিধিতে। পাখী ডাকা আলোভরা বিচিত্র ফুলগন্ধভরা এই সবুজ সুন্দর পৃথিবী-টুকুকে আপন করে চিনেছি। এরই বৈচিত্র্যের মাঝে নিজেকে খুঁজে খুঁজে ফিরেছি। ক্ষণিক দেখা আলোয় শান্ত এই পৃথিবীতে একটি কিশোর কি পরম তৃপ্তির স্বাদে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বাবা হঠাৎ সেদিন বৈকালে হাটের পাট গুদাম থেকে ফিরছে খুশী খুশী ভাব আজ। হাতে মাটির ভাঁড়ে আনা রসগোল্লা। মা দুটো আমার হাতে দিয়ে বলে—খেয়ে দেখ। এখনও গরম রয়েছে। বাবা দাওয়ায় বসে গল্প করছে—বুঝলে, দর অনেক বেশী নিচ্ছে গোপাল ময়রা। ছ' আনা সের।

রসগোল্লা বড় একটা খাই না। সেবার খেয়েছিলাম ঝুলনের মেলায় আর দত্ত-বাবুদের বাড়িতে ওদের ছেলের বৌভাতে। মিষ্টি ওর স্বাদ।

বাবা বলে—তাহলে এবার সব গোছ-গাছ করে নাও বড়বৌ। ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। উঃ কি দিনগুলো গেল!

বাবা অভাব আর কষ্টের কথা বলছে। কিন্তু আমার কাছে এটা কষ্ট বলেই বোধ হয়নি। ভাতের সঙ্গে কলমীশাকের ঝোল, কোনদিন খিচুড়ি আর বুনো কাঁকরোল ভাজা—রাতে একবাটি মুড়ি। তবু আমি যেন অনেক কিছু পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম মুক্ত উদার ভালো লাগা সবুজ মাটির সান্নিধ্য, পাখী ডাকা ফুলগন্ধভরা একটি জগৎ। হরিদার সুর—ছিকু বুড়ির ভালোবাসা—আরও কত মানুষকে।

বাবা কোলিয়ারীর দিকে চাকরী পেয়েছে, আমাদের নিয়ে চলে যাচ্ছে সেখানে। গ্রামে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। মণি দাদুও আসে। বুড়ো হুঁকো টানে আর কাশে, ও বলে—ভালো করেছো নবু, ছেলেকে মানুষ করতে পারবে, দুটো পয়সার মুখ দেখবে। কি হবে অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে?

হরিদাকে দেখেছিলাম, সন্ধার আবছা অন্ধকারে ওর আখড়ার ঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। লোকটার সুর থেমে গেছে, বলি—আমরা চলে যাচ্ছি হরিদা!

মাধবী মালতীর গন্ধওঠা আশ্রম, ওই সুরময় জগৎটাকে আজ নোতুন করে চিনতে পারি। হরিদা জড়িয়ে ধরে বলে আবার এসো নওলকিশোর। আবার এসো তুমি।

ছিকু বুড়ির দুচোখে জল নেমেছিল, পদ্মদীঘির কালো জলের বুকে হাওয়া লেগে কাঁপছে পাপড়িগুলো, ঝরে ঝরে পড়ছে শীতের ছোঁয়ায় ওদের শেষ চিহ্ন। আমার জীবন থেকেও যেন সেই দিনগুলো ঝরে ঝরে খসে গেল—হারিয়ে গেল।

পাথুরে কালো মাটির জগৎ, শূন্য রিক্ত প্রান্তর। এখানে পদ্মদীঘি নেই সবুজ স্বপ্ন জড়ানো আমবাগান বাঁশবন ঘেঁটু ফুলফোটা মাঠ—পাখী ডাকা জগৎ নেই। এখানে আমার সব হারিয়ে গেছে।

এ মাটির বুক শুধু ক্ষতে ভর্তি। গর্ত—লম্বা আঁকাবাঁকা খাদ—ধ্বসে যাওয়া বিবর্ণ পৃথিবী। বাবা এইখানে এসে কি শান্তি পেয়েছে জানি না।

ছোট দুখানা ঘরের একটু খোপমত, আর গায়ে গায়ে বাড়ি—মানুষ। অনেককে দেখেছি সন্ধ্যার অন্ধকারে মদ খেয়ে টলতে টলতে ফিরতে। খিস্তি করে মারামারি করে গালাগালি দেয় ছেলেমেয়েদের কুৎসিত ভাষায়। কে চীৎকার করে কাঁদছে।

এমনি সন্ধ্যায় মনে পড়ে মাধবী মালতীর গন্ধভরা সুর ওঠা হরিদার আশ্রম-টুকুকে। সেখানে সন্ধ্যা নেমেছে—আম-বাগানে এসেছে মঞ্জরী—তার মিষ্টি গন্ধ মেশে বাতাসে. নদীর বুকে তারাগুলো দোল খায়; পদ্মদীঘির কালো গহিন অতল জলে আবার ফিরে এসেছে হারিয়ে যাওয়া পদ্মফুলগুলো।

গুপী-নকুল-বৃন্দাবন-গদাই আরও অনেকে মাছ ধরতে যায় সেখানে। আমি নেই আজ—।

বাবা এখান থেকে ধানবাদের দিকে কোথায় গেছে তারপর আরও কোথায়। যাযাবরের মত ঘুরতে ঘুরতে একদিন একটা ছোট ধাওড়ার ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। মনে হয়েছে তার সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে। তার আগেই আমাদের দেশের বাড়ি-বাগান-সামান্য জমিটুকুও বিক্রী হয়ে গেছে দত্তবাবুদের কাছে দেনার দায়ে।

সেখানে ফেরারও পথ নেই।
রাত হয়ে গেছে।
বুম-মু...

একটা আলোর ঝলক ওঠে। প্রচণ্ড শব্দে কোথায় ওদিককার বস্তির ধারে বোমা ফাটছে। ওপাশের রেল লাইনে কাদের কলরব শোনা যায়। রাতের আদিম অন্ধকারে মানুষ যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে গেছে।

সেই দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। তবু এই ছবিটা দেখে মনে পড়ে হারানো অতীতের কথা। সবুজ ছায়াস্নিগ্ধ ধুলোঢাকা পথে রাংচিত্তির বেড়াঘেরা একটি জগৎ, পদ্মবনের বুকে মৌমাছিরা গুনগুন করে ফেরে—আলোকলতার ভালোবাসা জড়ানো হলুদমাখা গাছগুলোর পাশ দিয়ে ঘাসে ঢাকা দ্রোণপুষ্পের মাঠে আজও কোন কিশোর দুচোখে বিমুগ্ধ চাহনি মেলে নীল আকাশে পাখীদের আনাগোনার পথে মনকে উধাও করে দেয়।

সোনাধানের দিগন্তপ্রসারী ক্ষেতে এখনও বাতাসে ধানভারাবনত মঞ্জরীর শিহর জাগে, ভরা নদীর রূপালী জল-ধারায় তারার ঝিকিমিকি আলোয় কোন ভেসে যাওয়া নৌকার মাঝির গানের সুর ওঠে কি বেদনা নিয়ে। আঁধার নামে বাঁশবন গাছগাছালি ঘেরা গ্রামের আকাশে।

এমনি শান্ত সবুজ জগতের সন্ধান আমি পেয়েছিলাম, পেয়েছিল ওই ছবির দেখা সেদিনের কিশোর। ওর ডাগর দু চোখের চাহনিতে সেই সুর—প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের সারল্য আর স্বপ্নরেশ।

সেই শিশিরভেজা ধুলোঢাকা গ্রাম্যপথে কোন ঘরছাড়া বাউলের সুর—ভুলে যাওয়া নাম না জানা ফুলের সুরভির রাজ্য থেকে আমি হারিয়ে গেছি আজ কোন হিংস্র আদিম অন্ধকার আর নিষ্ঠুরতার জগতে।

সেই স্বপ্নভরা সুন্দর জগত থেকে আমি নির্বাসিত—সেই হারানো আমিকে আজকের মানুষ আর ফিরে পায়নি।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে জীর্ণ নড়বড়ে মাঠকোঠার টং-এর ঘরটা নড়বড় করছে। বাতাসে ওঠে ধোঁয়া আর বারুদের বিষাক্ত তীব্র গন্ধ। মনে হয় মাঠকোঠার এই আশ্রয়টুকুও ধ্বসে পড়বে। ভীতত্রস্ত একটা মানুষ ওই অন্ধকারে কি সর্বনাশ আর ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করেছে আজ।

বাসুদেব মন্দির

# বাঁশবেড়িয়া ও মুক্তবেণী—ত্রিবেণী চলুন

হংসেশ্বরী মন্দির

শীতটা জাঁকিয়ে না হলেও মোটামুটি পড়েছে। ঘোরা বেড়ানো শীতকালে একদিকে যেমন সুবিধে, অন্যদিকে অসুবিধেও আছে। সুবিধেটা হোল বেশিক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেও ক্লান্তি আসে না, অসুবিধে প্রয়োজনীয় গরমের জামা না থাকা। গরমকালে পাতার একটা চাদর থাকলেই যত্রতত্র ঘুমিয়ে নেওয়া যায়, শীতে সেটা চলে না।

এবারের ট্রিপটা একেবারে বাড়ির কাছেই। কোন গোছগাছের বালাই নেই, এমন কি পয়সাকড়ি সামান্য কিছু পকেটে থাকলেই চলে যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপলে মাত্র ২৮ মাইলের রাস্তা, ব্যান্ডেল থেকে মাইল তিনেক—বাঁশবেড়িয়া। চলতি নাম বাঁশবেড়ে, পোশাকী নাম বংশবাটী। বেশ খোলামেলা জায়গা, আধবেলার সময় হাতে থাকলেই ঘুরে আসা যায়। বাঁশবেড়ে তখনকার দিনে বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা ছিল। রায় মহাশয় উপাধিধারী প্রাচীন জমিদারবংশের জন্যেই এখানের প্রসিদ্ধি ছিল। এই বংশের আদিপুরুষ রামেশ্বর রায়চৌধুরী।

রামেশ্বর রায়চৌধুরী সম্রাট আওরঙ্গ-জেবের কাছ থেকে 'রাজা মহাশয়' উপাধি পেয়েছিলেন। রাজা মহাশয়দের পুরো বাড়ি গড় দিয়ে ঘেরা। এই গড়ের মধ্যেই বাসুদেব স্বয়ম্বরা কালী, হংসেশ্বরী ও চতুর্দশেশ্বরের মন্দির। হংসেশ্বরীর মন্দির স্থাপত্যের দিক থেকে অতুলনীয়। বাংলা-দেশে এই ধরনের কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির আর নেই। ছ'তলা ও তেরোটি চূড়াবিশিষ্ট ৭০ ফুট উঁচু এই মন্দিরটি বারানসীর স্থাপত্যশিল্পের আদর্শে তৈরী। এর গঠন-প্রণালীতে যৌগিক ষটচক্রভেদের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। মানুষের দেহে যেমন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনী নামে পাঁচটি নাড়ি আছে এই মন্দিরে তেমনি এদের প্রতীক পাঁচটি সিঁড়ি আছে এবং হংসেশ্বরী দেবী কুলকুণ্ডলিনী রূপে অবস্থিতা।

বাঁশবেড়ের রাজা নৃসিংহদেব এই মন্দির তৈরী আরম্ভ করেন এবং পরে তাঁর স্ত্রী রাণী শঙ্করী দেবী এটি শেষ করেন। তখনকার দিনে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়। শাস্ত্রালোচনা ও যোগসাধনার ফলে নৃসিংহদেবের বিষয়বাসনা মন থেকে চলে যায় এবং গচ্ছিত যা কিছু টাকা মামলা-মোকদ্দমায় খরচ না করে হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির তৈরীতে খরচ করেন। হংসেশ্বরীর মূর্তি নিম কাঠের তৈরী, দেবীর বর্ণ নীল, শবরূপী শিবের নাভিপদ্মের ওপর উপবিষ্টা। মন্দিরের দক্ষিণ অর্থাৎ সামনে দিকের বারান্দায় ১২টি কারুকার্যখচিত খিলান। মাঝখানের চূড়াটি প্রায় ৭০ ফুট উঁচু। মন্দিরের ছাদে ওঠবার জন্যেও তিনটি সিঁড়ি আছে। ছাদে উঠলে কাছেই গঙ্গা। বিকেলের দিকে মন্দির-গঙ্গা মিলিয়ে এক ধরনের ছবি মনের মধ্যে তৈরী হয়ে যায়। বাসুদেবের মন্দিরটি বাঁশবেড়ের মধ্যে প্রাচীন। মন্দিরের ছাদে একটি বড় গম্বুজ আছে। সামনের দেওয়াল ইঁটের ওপর প্রচুর পৌরাণিক ছবি উৎকীর্ণ আছে। এটিও শিল্পসুষমার দিক থেকে উল্লেখ্য।

বাঁশবেড়ে এক সময় সংস্কৃত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। নীলের চাষও হত। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে যে নীলকুটির বর্ণনা আছে তা বাঁশবেড়ের ছিল। কলকাতার তত্ত্ববোধিনী সভা এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। পরে দেখা গেল ছাত্ররা বেদান্ত পড়ার দিকে বেশি মন দিচ্ছে, এতে অভিভাবকরা সন্তুষ্ট না হয়ে ছেলেদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন। ফলে স্কুলটি উঠে যায়।

বহু পূর্বে বাঁশবেড়েয় একটি গির্জা ছিল, এর আচার্য ছিলেন ইংরেজি, ফরাসী পর্তুগীজ ভাষাবিদ তারাচাঁদ নামে একজন দেশীয় লোক। কেউ বলেন এই গির্জাটিই বাংলাদেশের প্রথম গির্জা।

বাঁশবেড়ে সেরে ত্রিবেণীতে ঘুরে নিতে পারেন। ব্যান্ডেল থেকে পাঁচ মাইল দূরে। প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী একধারায় মিলিত হওয়ার পর এখানে এসে আলাদা হয়ে গেছে বলে লোকের বিশ্বাস। এজন্য ত্রিবেণীকে মুক্তবেণী বলে। আগেকার দিনে পালপার্বনের সময় ত্রিবেণীতে স্নান করার জন্যে বহু দূর থেকে পুণ্যার্থীরা আসতেন, এখনও মাঘীপূর্ণিমা, মকরসংক্রান্তিতে বেশ ভিড় হয়। ঐতিহাসিকরা একে ফিরোজাবাদ বলে থাকেন। ফিরোজ সাহ এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন।

সপ্তগ্রাম বিজেতা জাফর খাঁ ভাগীরথী ও সরস্বতীর সংগমস্থলে একটি পুরাতন প্রস্তর মন্দিরের মধ্যে সমাহিত হয়েছিলেন। নবদ্বীপের মত ত্রিবেণীও এককালে সংস্কৃত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীর অধিবাসী ছিলেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। গল্প আছে, একদিন তিনি গঙ্গার ঘাটে বসে আহ্নিক করছিলেন, দুজন গোরা প্রচুর চিৎকার করে মারামারি করে। তিনি আদৌ ইংরেজি জানতেন না, কিন্তু আদালতে সাক্ষী দেবার সময় হুবহু তাদের বাদানুবাদ বলে দিতে পেরেছিলেন।

পুণ্যার্জনের মন নিয়ে না গেলেও ত্রিবেণীর সুদূর বিস্তৃত গঙ্গার ধার বেশ ভালই লাগে।

**নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়**

একটি আলোচনা

# পূর্ববঙ্গের সংগৃহীত পালা গান

ময়মনসিংহের 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক সাহিত্য-সাধক কেদারনাথ মজুমদারের নির্দেশে ও উৎসাহে প্রায় একই সময়ে নেত্রকোণার চন্দ্রকুমার দে এবং কিশোরগঞ্জের পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ময়মনসিংহের লুপ্তপ্রায় লোকসংগীত উদ্ধার ও সংগ্রহ করতে থাকেন। চন্দ্রকুমারের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অভিজ্ঞ দৃষ্টি পতিত হয় চন্দ্রকুমারের নামে প্রকাশিত সৌরভ পত্রিকার পালাগানগুলির ওপর। কেদারনাথের মাধ্যমে এবং ময়মনসিংহের গৌরীপুরের প্রখ্যাত কবি শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সহায়তায় দরিদ্র চন্দ্রকুমারকে দীনেশচন্দ্র অতি সহজেই আপন প্রভাবাধীনে আনতে সক্ষম হন।

ভূগর্ভস্থ খনির অনন্ত তিমিরলোক থেকে মহামূল্য হীরক যারা সংগ্রহ করে আনে, তারা অখ্যাত ও অবজ্ঞাত শ্রমিক মাত্র। সংগৃহীত হীরকের ব্যবহারে যেমন তাদের অধিকার থাকে না, তেমনই ঐ রত্নের সংগ্রাহকরূপেও তাদের নাম কখনও কেউ মনে করে রাখে না। ধনতান্ত্রিকজগতে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তারা 'সভ্যতার পিলসুজ' মাত্র। শুনতে রূঢ় হলেও একথা সত্য যে, চন্দ্রকুমারও সাহিত্য-খনির 'শ্রমিক', এবং অদৃষ্টের পরিহাসে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় তাঁর ভূমিকাও ঐ পিলসুজের চেয়ে বেশি আর কিছু নয়।

চন্দ্রকুমারকে সোপান-স্বরূপ ব্যবহার করে দীনেশচন্দ্র যশের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করলেন বটে, কিন্তু চন্দ্রকুমার যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন। তাঁর না হলো আশানুরূপ যশ, না এলো অর্থ।

পালাগান সংগ্রহে চন্দ্রকুমার নিযুক্ত হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক, আর পূর্ণচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা। পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহে অন্য আর কোনও বিদগ্ধজনের হস্তাবলেপ ঘটেনি বলে মৌলিকতা ঠিক-ঠিক বজায় রইলো। তাঁর সংগৃহীত পালার নামও তাই—'বাদ্যানীর গান বা নদ্যাঠাকুর ও বাদ্যাছেঁড়ি মেওয়া সুন্দরী'।

পুস্তকের নামকরণেই একেবারে পূর্ব-ময়মনসিংহের মুখের ভাষার অমার্জিত ও অপরিবর্তিত লৌকিক রূপ! সংগ্রাহক পূর্ণচন্দ্রের সৎ সাহসের জয়-জয়কার এখানেই। ভাষাবিচারের ছুঁৎমার্গী রুচিবাগীশদের মতে পূর্ণচন্দ্র হয়তো এক্ষেত্রে ভাগ্যহার বটে, কিন্তু সত্যকে অবিকৃত রাখতে হলে যথার্থ গবেষকের পক্ষে স্থানবিশেষে ভালগার হওয়া ছাড়া গত্যন্তরই বা কি?

দীনেশচন্দ্রের পালার ভিতর ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের অপ-প্রয়োগ ও অর্থের অসংগতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে আপাতত না গিয়ে বর্তমান আলোচনায় কেবল তার প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। দীনেশচন্দ্রের সংগে পূর্ণচন্দ্রের মৌল পার্থক্য কোথায় এবং কতখানি—এর থেকে তা বোধহয় কতকটা হৃদয়ংগম হবে।

এসম্পর্কে পূর্ণচন্দ্র কি বলেন, তাঁর নিজের ভাষায় 'বাদ্যানীর গান'-এর 'সংগ্রাহকের নিবেদন' থেকে উদ্ধৃত করি:—

'শ্রীমান্ চন্দ্রকুমার মাটি কাটিয়া কোহিনুর উদ্ধার করিয়া দিলেন, আর জহুরী রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন তাহা কাটিয়া ছাঁটিয়া ধোপ-দুরস্ত করিলেন। তাঁহার মত সুসাহিত্যিকের হাতে পড়িয়া পালাগানের চেহারা বদল হইল,—নামটাও ভদ্রসমাজের যোগ্য হইয়া গেল। 'বাদ্যাছেঁড়ী' 'মেওয়াই' কবিজনোচিত 'মহুয়া' নাম লইয়া সভ্য সমাজের দরবারে বাহবা পাইয়া নৃত্য করিল।...মহুয়া শব্দটা এদেশের আধুনিক শিক্ষিতের বাবা-দাদারাও জানিতেন না,—বাজে লোকের তো কথাই নাই। এই পালা-গানে 'মেওয়া না সুন্দরী' প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 'মেওয়ার বাপ' আমাদের পাড়ায় অনেক। 'মহুয়া' কোনদিন ছিল না।—আজও নাই।...তারপর 'হোমরা বেদে'। হোমরা-চোমরা পশ্চিমবঙ্গ হইতে রেলে ষ্টীমারে এ-দেশের শিক্ষিত ঘরে আসিয়াছে। গ্রামে যায় নাই। উন্দুর, উন্দরা, উন্দুরী নাম আমাদের গ্রামে-গ্রামে অনেক পাওয়া যায়। উন্দরা বাদ্যার নামটা বেমালুম বদল করিয়া দীনেশবাবু বেচারাকে পদ্মাপার করিয়া দিয়াছেন।'

বাদ্যানীর গানের আদিস্থল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ণচন্দ্র বলেন, ময়মনসিংহ জেলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্রাম, বাংলার বার-ভূইঞার অন্যতম ঈশা খাঁর রাজধানী, জংগলবাড়ী বা তার পার্শ্ববর্তী কোনও স্থল হওয়াই সম্ভব। ঈশা খাঁর অধস্তন বংশধর দেওয়ান আজিজ দাদ খান সাহেব ছিলেন এই গানের পৃষ্ঠপোষক। যতদূর জানা যায়, তাঁরই নেতৃত্বে শেখ কাঙ্গালী চৌকীদার জঙ্গলবাড়ী অঞ্চলে বাদ্যানীর গান সর্বপ্রথম প্রচার করেন। পালাটির রচয়িতা হিসাবে দ্বিজ কানাই বলে এক ব্যক্তির নাম শোনা যায়; কিন্তু তিনি কে, কি তাঁর পরিচয়—সে সম্পর্কে সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।

পূর্ণচন্দ্রের মতে বাদ্যানীর গানের প্রথম প্রচারকাল অনুমান ১২৬৫—৭৫ বঙ্গাব্দ। পূর্ণচন্দ্র স্বয়ং কাঙ্গালীকে দেখেছেন এবং তার নাম শুনেছেন। সেটা ১২৯৪—৯৫ সালের কথা। 'কাঙ্গালী ছিলেন ভারী সৌখীন, ঝাকরী ছাঁটা চুল, মোটা লাঠি—নাচের তালে তালে হাঁটা—গুটিকয়েক দাঁত সম্বল বদনমণ্ডল,—দীর্ঘ দেহকান্তি।'

'বাদ্যানীর গান অভিনয় করতে বিশেষ সাজ-সরঞ্জামের দরকার হয় না। একটা ধনু, লাঠি, বর্শা—হাতিয়ার। মাথায় রঙ্গীন ছোট পাগড়ী। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি। আলো-মশাল। বাদ্য—ঢোল বা ঢোলক, মন্দিরা, বাঁশের বাঁশি, বেহালা। মেয়েদের লম্বা চুল। মোটা কাপড় বা বেঁটে শাড়ী। কাঁসা ও পিতলের গহনা। বাঁশ, দড়ি ইত্যাদি।'

১৩২১-২২ সালে পূর্ণচন্দ্র ঐ পালা-গানটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ করেন এবং ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলকাতার আর মিত্র কর্তৃক তা ছাপা হয়। বর্তমানে 'বাদ্যানীর গান' দুষ্প্রাপ্য। বহু চেষ্টা করেও এর কোনও কপি আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। অবশেষে বংগীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য, সাহিত্যরসিক শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে, তাঁর পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে পুস্তকখানার এক জীর্ণ ও কীটদষ্ট কপি আবিষ্কৃত হয়। বর্তমান আলোচনার অবলম্বন সেটি।

পুস্তকখানার পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮+৭৯। আখ্যাপত্র এইরূপ:—

"ময়মনসিংহের গীত-সাহিত্য
বাদ্যনীর গান
বা
নদ্যাঠাকুর ও বাদ্যা ছেঁড়ি
মেওয়া সুন্দরী

(জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান সোহবান দাদবান সাহেবের নেতৃত্বে প্রথম গীত ও শেখ কাঙ্গালী চৌকিদার কর্তৃক নানাস্থানে প্রচারিত। অনুমান ১২৬৫—৭৫ সাল।)

সংগ্রাহক—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যাবিনোদ
মশোয়া।"

শ্রীক্ষিতীশ মৌলিক 'প্রাচীন পূর্ববংগ গীতিকা' নামে যে পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন, এবং যাতে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় মৌলিকতা পরিহারের প্রশ্ন নিয়ে দীনেশচন্দ্রেরপ্রতিকূলে অভিযোগ উত্থাপনকরেছেন আশা করি, উপরিউক্ত আলোচনায় তার সমর্থন পাওয়া যাবে, এবং সেই সংগে একথাও প্রমাণিত হবে যে, 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পূর্ণচন্দ্রই প্রথম পথপ্রদর্শক।

**ব্যোমকেশ মজুমদার**

---

১। বেদের ছুড়ী।

২। এই না কন্যা কোলে লইয়া উন্দরা
বাদ্যার নারী।
বাছ্যা গুছ্যা নাম থইল মেওয়া না
সুন্দরী।।
—বাদ্যানীর গান (পৃঃ ১২)

৩। ১ অগ্রহায়ণের 'অমৃত' পত্রিকায় 'বৈকুণ্ঠের খাতার' গ্রন্থসমীক্ষার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

।। এক ।।

এই পাইন গাছের আলোয়-ছায়ায় ঘুরে ঘুরেই কেটে গেল সারাটা দিন। কেটে গেল পাখীর ডাক শুনে আর দূরের শিবালিক পাহাড় দেখে।

বেশ লাগল। অনেকদিন পর মনটা সত্যি খুশীতে ভরে গেল। বেশ হালকা মনে হলো নিজেকে।

এই পৃথিবী বড় বিচিত্র। তিন ভাগ জল থাকা সত্ত্বেও বড় নিষ্ঠুর। বড় নির্মম। সব কিছু থেকেও কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে গেছে। সেই অদৃশ্য অজ্ঞাত ছিদ্র দিয়েই মানুষকে হারাতে হয় কত কিছু। মাঝে মাঝে ভাল লাগলেও সুর কেটে যায় বড় বেশী। রঙীন বসন্তের পিছনেই শীতের জড়তা।

আজ কিন্তু বেশ লাগছে। গন্ডীবদ্ধ সংসারের বাইরে উদার সবুজ প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেশ লাগছে। এই মৌন প্রকৃতি যেন সিদ্ধপুরুষ। সর্বত্যাগী মহাসন্ন্যাসী। সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দেব জোয়ার-ভাটা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। একটা মিষ্টি পরিতৃপ্তিতে আমার মনটা ভরে গেল।

বোটানিক্সের পাশ দিয়ে ঘুরতে বেশ লাগছিল। একটা কাঠবেড়ালী সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ। একেবারে আমার মুখোমুখি। হয়ত আগন্তুক দেখে খবর নিতে এসেছে। একবার যেন হাসল। লেজ নাড়াতে নাড়াতে হাসল। বিদ্রূপের হাসি নাকি? ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমিও হাসলাম। ব্যস! কাঠবেড়ালীটা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালাল বনের মধ্যে।

আমি বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। অপলক দৃষ্টিতে ওর পথের দিকে চেয়ে রইলাম। ছোট্ট একটা জীব। কতটুকুই বা ওর প্রাণ! তবু কত প্রাণচঞ্চল। কত চাসিখুশী। বিদ্যা-বুদ্ধি-বিবেচনা থাকা সত্ত্বেও আমরা কি অত প্রাণচঞ্চল হতে পারি? অত সহজ সরল?

আশপাশের গাছপালা আর ঐ দূরের শিবালিক পাহাড়কে আরো ভাল লাগল। ভাল লাগল নিজেকেও। পর পর কয়েকবার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে সারা বুকটা ভরিয়ে নিলাম।

কাঠবেড়ালীটার পথ চেয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হয়ত কয়েক মিনিট, হয়ত আরো বেশী। পিছন থেকে একটা গাড়ীর হর্ন শুনে সরে দাঁড়ালাম। গাড়ীটা চলে গেল। আমিও হাঁটতে শুরু করলাম।

বোটানিক্স পিছনে ফেলে এলাম বিরাট সবুজ মাঠের মাঝে। দূরে এফ-আর-আই-এর মেন বিল্ডিং। পাষাণে গাঁথা অত বড় বিল্ডিংটাকেও খারাপ লাগল না। বেসুরো মনে হলো না। মনে হলো এই বিরাট সবুজ প্রান্তর আর চারপাশের অজস্র বনানীর দ্বাররক্ষক।

পিচের রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে এফ-আর-আই'এর মেন বিল্ডিংকে ডানদিকে রেখে এসেছি টের পাইনি। সামনেই বোধহয় হোস্টেল। আবার দাঁড়ালাম। ছোট্ট রাস্তা কিন্তু ভারী সুন্দর। দু' পাশে ক্রিস্টমাস ট্রির মত গাছগুলি সাজান। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। সারাদিনের শেষে পাখীর দল ফিরে এসেছে নিজেদের আস্তানায়। ওদের উত্তেজনার কলগুঞ্জন ভেসে এলো গাছের ফাঁক থেকে।

কতদিন পর পাখীর কিচির-মিচির শুনলাম? বেশ লাগল।

গেস্ট হাউসে ফিরে এলাম। লাউঞ্জ পার হয়ে ডানদিকের কোণার ঘরে চলে গেলাম। চেয়ারে বসে টেবিলের 'পর পা তুলে দিয়ে সিগরেট ধরালাম। সিগরেট টানতে টানতেই ডানদিকে তাকাতেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে দেখতে পেলাম। বার বার দেখলাম। ভাল লাগল।

সিগরেটটা শেষ করে উঠে গেলাম ড্রেসিং টেবিলের সামনে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। একবার হাসলাম। বাঃ! বেশ লাগছে তো!

দরজায় নক্ করে বেয়ারাটা ঘরে আসতেই ঘুরে দাঁড়ালাম।

'সাব চায়।'

চায়ের ট্রে টেবিলের উপর রেখে বেয়ারা চলে গেল।

আমি আবার আয়নার সামনে ফিরে এলাম। মনে হলো বহুদিন পর নিজেকে দেখছি। বেশ ভালই লাগল।

আয়নার সামনে কয়েক মিনিট থাকার পরই বুঝলাম, আমার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। সেই দুঃশ্চিন্তা আর হাহাকার ভাব নেই কোথাও। চোখ দুটো আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে নিজেকে দেখলাম। বিউটি কনটেস্টের মেয়েদের মত ঘুরতে ঘুরতে নিজেকেই নিজে পরীক্ষা করলাম।

আরো ভাল লাগল নিজেকে। ভাল করে বাঁচার নেশায় হঠাৎ আমি পাগল হয়ে উঠলাম। হব না? কত দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে অবহেলা করেছি। দেহ-মনের প্রতি অবিচার আর অত্যাচার করেছি বছরের পর বছর। পথভ্রষ্ট পথিকের মত অন্ধকার অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। মাথাটাও কি ঠিক ছিল? সব কিছু গোলমাল হয়েছিল। ওলট-পালট হয়েছিল সব হিসাব-নিকাশ। ভেবেছিলাম ঘটনার স্রোতে ভেসে যাব, বিলীন হয়ে যাব। এতদিন কিভাবে বেঁচে ছিলাম জানি না। জানি না কিভাবে এই অন্ধকার দিনগুলো কাটালাম। আজ এই আয়নায় নিজেকে দেখে বুঝলাম সেই অন্ধকার অরণ্যে বিচরণ করেও বেঁচে আছি।

অনেকদিন নিজেকে ভালবাসিনি বলে আজ সত্যি নিজেকে বড় ভাল লাগল। নিজেকে ছাড়া আর কাকেই বা ভালবাসব এই দুনিয়ায়? মানুষকে তো একটা কিছু নিতে বাঁচতে হবে। আমি ছাড়া আমার আর কে আছে?

আজ নয়, অনেকদিন আগে একবার মনে হয়েছিল বাঁচব কি? বাঁচার কোন উত্তর খুঁজে পাইনি। শুধু এইটুকু জেনেছি মৃত্যু হলেই পরাজয় হবে। সবকিছুর পরাজয়। তাইতো মরতে চাইনি, মরতে পারিনি। মরতে আমি চাই না, মরতে আমি পারব না। পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার আগে মৃত্যু? অসম্ভব।

দরজায় নক্ করার আওয়াজ হলো। ঘুরে দাঁড়ালাম।

'সাব, চায় পি-লিয়া?'

'নেই।'

একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চা খেতে গেলাম। বেয়ারাটা চলে গেল।

চা খেয়ে একটা সিগরেট ধরিয়ে কি যেন ভাবছিলাম এমন সময় চৌকিদার এসে বল্লো, সাব, আপকা টেলিফোন।

আমার টেলিফোন? অবাক হলাম। 'হামারা টেলিফোন?'

'হা সাব।' চৌকিদার একটু থেমে বলল, দো-নম্বার সাব আপকো বুলায়া।

'দো নাম্বার সাব কোন্ হ্যায়?'

'বাঙালী রয় সাব।'

আর কথা না বাড়িয়ে উঠে গেলাম। টেলিফোন তুলে বললাম, হ্যালো!

'নমস্কার। আমি রয় কথা বলছি...'

'নমস্কার।'

'আমি ঠিক সন্ধ্যার আগে আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপনি বোধহয় একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলেন......

'আপনি এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। ইন ফ্যাক্ট আই সুড হ্যাভ মেট ইউ আর্লিয়ার বাট.....

অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করলাম। বার

সাহায্যে ও সহযোগিতায় আমাকে এখানে কাজ করতে হবে, আমারই আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করা কর্তব্য ছিল কিন্তু...

ছি, ছি, আপনাকে এত কষ্ট দিলাম...

ভাবছিলাম মার্জনা চাইব কিন্তু সেকথা বলার আগেই মিঃ রায় বললেন, ইফ্ ইউ আর নট বিজি চলে আসুন না আমার এখানে। মোটে তো সাড়ে ছ'টা বাজে।

'না, না, বিজি আর কি! তবে ছুটির দিনে আপনাকে বিরক্ত করব?'

ডেরাডুন রওনা হবার আগে প্ল্যানিং কমিশনের ডকটর চৌবে বলেছিলেন, ডোণ্ট ওরি। ইউ উইল গেট অ্যান একসেলেণ্ট জেণ্টলম্যান টু হেলপ ইউ।

দু' একজনের মুখে রাই-রয় শুনেছিলাম। কিন্তু তিনি পাঞ্জাবী না ক্রিশ্চিয়ান বুঝতে পারিনি। এত দূরদেশে এসে যে বাঙালী মিঃ রায়কে পাব, তা সত্যি আশা করিনি। তাছাড়া জানব কেমন করে বাঙালীকে সর্বত্র পাওয়া যায়? ছোটবেলা থেকে তো শুনে আসছি বাঙালী মাত্রেই মায়ের আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকে, সে গান গায়, কবিতা লেখে, বিপ্লবী হয়, কেরানী হয়, জেলে যায়, ফাঁসিতে চড়ে কিন্তু ঘর ছেড়ে নড়তে চায় না।

মুসৌরী এক্সপ্রেসে আজ সকালেই এসেছি। রবিবার। ছুটির দিন। নিজের খুশী মত ঘুরে বেড়িয়েছি। ছুটির দিনে খোঁজখবর করে কোন অফিসারকে বিরক্ত করতে সাহস হয়নি, মনও চায়নি। কিন্তু আগে থেকে যদি জানতাম উনি বাঙালী তাহলে হয়ত একবার ঘুরে আসতাম। আবার না যেতেও পারতাম। একে প্রবাসী বাঙালী, তারপর অফিসার। কি বিচিত্র তাঁর মনোবৃত্তি তা জানা অসম্ভব। প্রবাসী বাঙালী খুব বেশী দেখিনি। যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে ওরা হয় পুরো সাহেব নয়ত বাংলাদেশের বাঙালীর চাইতেও খাঁটি বাঙালী। মাদ্রাজী আই-সি-এস'এর বাড়ীতে মাদুরে বসে গল্প করা হয় কিন্তু বাঙালী এল-ডি-সি ডাইনিং টেবিলে চচ্চড়ি না খেলে লজ্জায় সমাজে মিশতে ভয় পায়। ব্যতিক্রম আছে বৈকি! কিন্তু মিঃ রায় যে ব্যতিক্রম, তা জানব কেমন করে?

দূর ছাই! একলা একলা থেকে শুধু আজে-বাজে আলতু-ফালতু চিন্তা করতে শিখেছি। মানুষের ভীড়ের মধ্যে থাকলে এত আজে-বাজের চিন্তার অবকাশ থাকে না। তাছাড়া প্রাণ খুলে কথা বলার কাউকে পেলে নিজের মনের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা-ভাবনা জমতে পারে না। কতকাল প্রাণ খুলে কথা বলি না!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল! দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়বে না? গৌরচন্দ্রিকাতেই তো নাটক সমাপ্ত হলো।

বুশ সার্টটা চেঞ্জ করে নিলাম। অবিন্যস্ত চুলের 'পর দিয়ে চিরুনিটাকে টেনে নিলাম। তবুও যেন ঠিক হলো না। দুটো হাত দিয়ে ঠিক করলাম। তোয়ালে নিয়ে মুখটাকে ভাল করে পরিষ্কার করলাম। সুটকেশ থেকে একটা পরিষ্কার রুমাল বের করে প্যাণ্টের পকেটে পুরলাম। ফাইন্যাল চেক্ আপের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াতে গিয়েই হাতের ঘড়িটায় নজর পড়ল। চমকে উঠলাম। আর এক মুহূর্ত দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম।

সুন্দর পিচের রাস্তা। কিছু দূরে দূরে ইলেকট্রিক আলো। তবুও রাস্তাগুলো বেশ অন্ধকার। দু'পাশেই গাছপালা। মাঝে মাঝে অফিসারদের বাংলো। কাচের জানলায় পর্দা দেওয়া সত্ত্বেও একটু একটু আলো দেখা যায়। নতুন কনে-বৌ'এর মত আলোগুলো যেন ঘোমটা দিয়ে ঢাকা। এত গাছপালার মাঝে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে দ্বিধা করছে।

এমন রাস্তা দিয়েও কেউ বেড়াতে চায় না? এই আবছা আলো, এই পরিবেশে কি দুজনে মিলে বেড়াতে কারুর ইচ্ছা করে না? এখানে কি কোন মেয়ে নেই, যে গান গাইতে পারে, ভালবাসতে পারে? একলা গিয়ে পুরীর জগন্নাথ দর্শন করা যায় কিন্তু দীঘার সুবিস্তীর্ণ সমুদ্র-সৈকতে কি একলা বেড়ান যায়?

এফ-আর-এই'এর এই রাস্তা দিয়েও ঠিক একলা হাঁটতে ভাল লাগে না। বড় বেমানান, বড় বেসুরো মনে হয় নিজেকে। আমারও মনে হলো। কিন্তু আমি তো অসহায়। আমার শূন্যতা তো পূর্ণ হবার নয়। তা তো জানি। তবুও এই মুহূর্তে এই সুন্দর আবছা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মন চাইল পূর্ণ হতে।

জানি যে পূর্ণতা আমি চাই, তা কোনদিন পাব না। পেতে পারি না। যে অন্ধ, যে দৃষ্টিহীন, সে তো জানে এই রঙীন পৃথিবীর কিছুই সে দেখতে পাবে না, পেতে পারে না। তবুও ইচ্ছা তো হয়। মনে মনে স্বপ্ন তো দেখে। চিরদিন চিরকালের জন্য না হোক, একবার একটি মুহূর্তের জন্যও যদি সে রঙীন পৃথিবীর দেখা পেত তবুও তার সান্ত্বনা থাকত। কলকাতার ফুটপাতের পাশে ছেঁড়া ন্যাকড়া মুড়ি দিয়ে যারা জীবন কাটায়, তারা যদি মাত্র একটি রাত্রির জন্যও ঐ মনুমেণ্টের সমান বড় বড় প্রাসাদ বাড়ীতে ঘুমুতে পারত! আহাহা! জীবন সার্থক হতো! জন্ম সার্থক হতো!

আমি তা চাই না। চাইতে পারি না। তবুও মনে হলো এই মুহূর্তে যদি কেউ পাশে থাকত, যদি একটু হাসত, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত আমার বুকের 'পর! অথবা? অথবা শুধু আমার হাতটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে গুন গুন করে গাইত......

ন্যায়-অন্যায়, সম্ভব-অসম্ভব সব বুঝি। সবাই বোঝে। তবুও মানুষের মন তো! সে তো মুক্ত বিহঙ্গ! উড়ে বেড়ায় মহাকাশের কোলে। কোন শাসন নেই, কোন নিয়ম নেই, যত্রতত্র তার বিচরণ। তাইতো পুত্রশোকাতুরা জননী স্বপ্ন দেখে যদি তার প্রাণের দুলাল একটিবার, মাত্র একটি বারের জন্য দেখা দিত, মা বলে ডাকত। শোকাতুরার মত আমিও কি যা তা ভাবছি?

'সামনের বিরাট বারান্দাতেই মিঃ রায় আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন, আসুন।

বারান্দার ডান দিকে মিঃ রায়ের স্টাডি। সে ঘরেই আমরা গেলাম। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই একবার চার পাশে চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেওয়ালের চারপাশ বইতে ভর্তি। সেক্রেটারিয়েট টেবিলেও অনেক কাগজ-পত্তর বই-টই রয়েছে। দুটো-একটা

ছবিও নজরে পড়ল। স্বদেশের নয়, বিদেশের।

মিঃ রায় টেবিলের সামনের চেয়ারে বসলেন। আমাকেও বসতে বললেন। আমি না বসে একবার ঘরের চারপাশ ঘুরে বই-পত্তর দেখে নিলাম। ইংরেজি-বাংলা সাহিত্যের বইও প্রচুর। ছবি ক'টাও দেখলাম। একটা লণ্ডনের বুঝতে অসুবিধা হলো না। চেহারা দেখেই বুঝলাম ছাত্র-জীবনের ছবি। বুঝলাম আমার মত শিলচর গুরুচরণ কলেজ আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই ওর শিক্ষাজীবন শেষ হয়নি।

'আরে বসুন বসুন। কি দেখছেন?'

'বাঃ! আপনার তো ভারী সুন্দর কালেকশন।'

'কি আর কালেকশন করেছি একসেপ্ট সাম বুকস্ অ্যান্ড এ ডিভোটেড ওয়াইফ......

মিঃ রায় হো হো করে হেসে উঠলেন। আমিও না হেসে পারলাম না। ভারী মজার লোক তো! আমাদের দেশে সাধারণত বিদ্বান-পন্ডিতরা রসিক হন না, আবার রসিকেরা বিদ্বান হন না। যারা জীবন উপভোগ করতে পারেন, রসিকতা তাদেরই। তাইতো পশ্চিমের পন্ডিতরাও রসিক। আমাদের দেশের পন্ডিতরা হাসতেও দ্বিধা করেন।

'আপনি তো বেশ হাসতে পারেন।'

হাসতে হাসতেই মিঃ রায় বললেন, 'হাসব না কেন?'

'আমাদের দেশের গুণীজ্ঞানীরা ঠিক হাসতে জানেন না।'

'আমি তো গুণীজ্ঞানী নই।'

'শুধু গুণীজ্ঞানী কেন, আমাদের দেশে যারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত তারাও হাসতে জানেন না।'

হাসি হাসি মুখেই মিঃ রায় জানতে চাইলেন, আমাকে কি খুব গুণীজ্ঞানী বা সুপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে হচ্ছে?

'নিশ্চয়ই।'

'মাই গড!' মিঃ রায় আবার হাসতে শুরু করলেন।

আমিও হাসলাম।

একটু পরে উনি আবার বললেন, পঁচিশ বছর চাকরির পর ষোল শ' পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেয়েই সুপ্রতিষ্ঠিত?

আজকের যুগে আমেরিকান বা রাশিয়ান আর্মির গোপনতম খবর সংগ্রহ সম্ভব, কিন্তু পুরুষের মাইনে বা মেয়েদের বয়স জানা প্রায় অসম্ভবই থেকে গেছে। যে পুরুষ বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করে নিজের মাইনে বলতে পারেন, তার চাইতে সরল মানুষ আজ পাওয়া দুষ্কর। বুঝলাম, মিঃ রায় শুধু হাসতেই জানেন না, প্রাণ খুলে কথাও বলতে পারেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আপনার এখানে এসে মনে হচ্ছে সত্যি আমার বৃহস্পতির দশা সুরু হলো।

'কেন বলুন তো?'

'সময়টা ... কাটবে বলে মনে হচ্ছে...'

'কেন এর আগে কি রাহুর দশা ছিল?'

'আপনি জ্যোতিষীও জানেন নাকি?'

মিঃ রায় হেসে ফেললেন। 'আপনি দেখছি নামকরা ক্রিমিন্যাল ল' ইয়ারের মত ন্যাকা ন্যাকা প্রশ্ন করে আমার সব সিক্রেট জেনে ফেলার চেষ্টা করছেন।'

বিস্ময়ের সঙ্গে বেশ মজা লাগল ওর কথা শুনে। 'তার মানে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মিঃ রায় একটু জোর করেই ডাক দিলেন, শুনছ!

কোন সাড়াশব্দ নেই। আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম।

ছোটবেলায় মিনার্ভা-শ্রীরঙ্গমে থিয়েটার দেখার কথা মনে পড়ল। রাজপ্রাসাদের দৃশ্য। মন্ত্রী, সেনাপতি থেকে শুরু করে নর্তকীর দল পর্যন্ত স্টেজে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন অথচ কারুর মুখে একটি শব্দ নেই। এমনকি কেউ হাত-পা পর্যন্ত নাড়ছেন না। চোখের পাতাও পড়ছে না কারুর। কোন মহানায়কের প্রত্যাশায় ওরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। শুধু কি তাই? ব্যাক-গ্রাউন্ড থেকে বেহালার একটু ক্ষীণ শব্দও শুনতে পেতাম না। মনে হতো কুমারটুলির কোন শিল্পীর তৈরী রাজ-দরবারের দৃশ্য দেখছি। তারপর হঠাৎ রাজবেশে ভূমেন রায় বা নির্মলেন্দু লাহিড়ী অথবা রাজমহিষীর বেশে সরযূবালার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজদরবার প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠত, পিছন থেকে ভেসে আসত সুমধুর সঙ্গীত। সুরু হতো নাটক।

মিসেস রায়ের আগমন হতেই আমরা দুজনে চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

আনন্দে-খুশীতে হাসি মুখে মিঃ রায় বললেন, আমার স্ত্রী........

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করে বললাম, আমি সাগর চট্টোপাধ্যায়।

মিঃ রায়ের মত মিসেস রায় যতটা ফর্সা না হলেও বেশ সুশ্রী। বয়স চাল্লিশের ঘরের শেষের দিকে হলেও দেহে বেশ একটা বাঁধুনী আছে, মুখে লালিত্য আছে। তার চাইতেও বড় কথা চোখের কোণায় ঠোঁটের পাশে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে আছে। মাধুর্য আর গাম্ভীর্য মিলে মিসেস রায়কে প্রথম দর্শনে বেশ লাগল।

মিসেস রায় হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আপনার নামটি তো ভারী সুন্দর।

আমি মাথা নীচু করে একটু মুচকি হাসলাম। বললাম, দোকানের সুনাম না থাকলেই সাইনবোর্ডটা একটু বড় আর জমকালো করতে হয়।

মিসেস রায় হাসলেন।

মিঃ রায় বললেন, লাভলি!

মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম কে রেখেছিলেন?

'আমার মা।'

'হঠাৎ সাগর নাম রাখলেন?'

আমি একটু হাসলাম। দুঃখের হাসি কিন্তু ওরা ঠিক বুঝলেন না। অনেক দিন কোন সন্তান না হওয়ায় মা খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। তারপর কোন এক সাধু নাকি ওকে বলেছিলেন পৌষ সংক্রান্তিতে সাগর মেলায় গিয়ে পুজো দিতে.........

মিঃ রায় মাঝপথে জানতে চাইলেন, আপনার মা গিয়েছিলেন?

'হ্যাঁ। ঠিক পরের বছর পৌষ সংক্রান্তির ভোরেই আমার জন্ম......

আমার বলা শেষ হয়নি। পরের কাহিনীটুকু বলবার আগেই মিসেস রায় একটা ছোট্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কি আশ্চর্য!

মিঃ রায় বললেন, রিয়েলি?

'হ্যাঁ।' এক মুহূর্ত থেমে একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বললাম, আর সেই পৌষ-সংক্রান্তির সন্ধ্যাতেই আমার মা মারা গেলেন।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, সে কি?

(ক্রমশঃ)

# সুখের মেলা

## এবং খড় কাস্তে আলীমদ্দি

ধানের 'কাঁড়ি' ভাঙা হয়েছে, দশটা জন লেগেছে, ভোর-বেলাতেই হালিমা বালতিতে করে গোবর গুলে খামারে গোবর-জল দিয়ে নিকিয়ে দিতেই আলীমদ্দি বাঁশের বাখারী বোনা 'আগড়' ফেলে ধানের কাঁড়িতে উঠে বিচালীগুলো নামিয়ে দিয়েছে। বীজধানের আঁটিগুলো আলাদা করে ফেলে দিতে পাতলা কাঁথা মুড়ি দিয়ে পি'ড়ে পেতে বসে বীজধান বাছতে বসেছে আলীমদ্দির মা দুলালী বিবি। প্রত্যেকটা ধানের আঁটি পায়ের কাছে মাটিতে রেখে শীষগুলো মেলে ধরে মিশেল ধানগুলোর শীষ হাত দিয়ে ছু'ছে ঝরিয়ে দিতে হয়। সাদা পাটনাই ধান 'ভেঙন' বা বীজ থাকবে। তার সঙ্গে লাল মউলো ধান এসে মিশেছে বীজ ছড়াবার সময় 'তলাপোড়ে' থেকে। লাল কালো ধানগুলো সহজেই চোখে পড়ে কিন্তু সাদা ধানের সঙ্গে অন্য সাদা ধান মিশলে তাও বেছে বার করতে হয়। আলীমদ্দির ডাগর মেয়ে সেরিনা ধান বাছতে বসে ঠিক চিনতে না পারলে বুড়ী চেঁচামেঁচি করে : 'বে' দিলে মাগীর দুটো ছেলে হয়ে যেত, এখনো তুমি ধান চেন না? এটা কি ধান, সরু? কলমকাটি আর এটা দুধ-কলম। দুধ-কলম ধানও সাদা, মাথায় কালো ছোট্ট একটু টিপ আছে। সরে যা তুই ধান বাছলে জমির বীজধানের মধ্যে সব 'ভেল' হয়ে যাবে।'

'হলেই বা ক্ষতি কি! সবেই তো ভাত বা মুড়ি হবে।'

'তোর মাথা! পাটনাই ধান যে-জমিতে হবে, সেই জমিতে কলমকাটি হবে কেন? পাটনাই একটু নাবি জমিতে হয়, কলম-কাটি হয় চড়াতে। ভাত তো সব ধানেরই হয়, তার মধ্যে মুড়ির ধান মোটা, ডহর জমিতে হয়, চড়া জমিতে আদৌ ভাল হবে না। সরু ধানে মুড়ি হয় না। ভাত চিঁড়ে হয়। আবার ধর, নাজানি ধান—মুড়ি ভাত দু-ই হয়। মাঝারি ধানে দু'রকমই হয়।'

'কে জানে বাবা, অতো 'বিধেন' আমি জানি না।'

'তুই ইসকুলের পড়া পড় যেয়ে। তোর দাদাটা এম-এ পাশ করেছে, সে একটা ধানও চেনে না।'

শাল মুড়ি দিয়ে মুখের মধ্যে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে হরিণের চামড়ার জুতো পায়ে দিয়ে লুঙ্গি পরে এসে দাঁড়ায় খয়রুল বাসার। বলে, 'কি বলছ দাদি, আমি ধান চিনি না?'

'চিনিস?' হাসলে বুড়ী দুলালী বিবি। 'বল তো এটা কি ধান?'

খয়রুল ঠাকুরমার কাছে গিয়ে বসে ধানটা হাতে নিয়ে চিনবার চেষ্টা করতে থাকলে তার বাপ হাসে, জনেরা হাসতে থাকে আগড়ের ওপরে ধানের আঁটি কাছড়াতে কাছড়াতে। পাড়া মাৎ করে পটাস পটাস শব্দ উঠছে।

খয়রুল বাসার বলে, 'এটা আঙুরশাল ধান।'

বুড়ী খলখল করে হাসতে থাকে।

খয়রুল গম্ভীর হয়ে বুড়ীর হাসি দেখে।

সেরিনা বলে, 'বুড়ী এবার একটা মিথ্যে কিছু বলে দেবে।'

বুড়ী চোখ বার করে। 'দূর হারামী! লক্ষ্মীর নামে মিথ্যে বলে দোব? এটা হল গয়াবালি ধান।'

শীষটা কেটে নিয়ে সেরিনা তার বাপকে দেখিয়ে শুধোয়, 'এটা গয়াবালি ধান হাঁ বাবাজী?'

আলীমদ্দি বলে, 'মা ঠিক ধান চেনে। ওটা গয়াবালি ধানই।'

বুড়ী আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলে, 'তোর বাপকেই বা ধান চেনালে কে? মোকে শিখেয়েছে তোদের দাদু।'

•

কলেজে-পড়া দুটো মেয়ে—মঞ্জুশ্রী আর হেমলতা পড়তে এসেছে খয়রুলের কাছে। মুখে জল দিয়ে চা খেয়ে নিয়ে গিয়ে পড়াতে বসায় তাদের খয়রুল পাকা বৈঠকখানাটার মধ্যে।

বাড়ির মধ্যে রেডিও চলছে।

অনেক মোরগ-মুরগী ধান খুঁটে বেড়াচ্ছে।

গোয়াল থেকে গাই-বাছুর, ছেলে-গরু চারটেকে বাইরের রোদে বার করে বেঁধে দেয় আলীমদ্দি।

চারটে লোক পান গুছোতে বসেছে বৈঠকখানার দাওয়ায় একদিকে।

প্যাকাটির খদ্দের এলে আলীমদ্দি তাদের মাল দেখায়, দরদস্তুর নিয়ে কচলা-কচলি করে। শেষে মতামত ঠিক হলে লোকগুলো প্যাকাটিগুলো গুনে নিতে থাকে। পাটের খদ্দের আসে. আটাশ টাকায় চল্লিশ কেজি। আলীমদ্দি রাজি হয়। না হয়ে উপায় নেই। দুলালী বিবি হাত ইসারায় কাছে ডেকে বলে দেয়, 'দিয়ে দে বাবা. ইঁদুরে পাট কেটে নষ্ট করে ফেলছে।'

'বজন' সমেত একশো মণ পাট দিয়ে দেয় আলীমদ্দি। কাঁটা করে মেপে বেঁধে নিয়ে টাকা দিয়ে চলে যায় লোকগুলো। পাঁচশো আশী টাকা। প্যাকাটি বেচার দাম পায় দুশো টাকা।

সুপারি, নারকোল, বাঁশ, উলু, খড়, কেশে, কলা, আখ—এসব বেচা টাকা আসে অনেক—কিন্তু রোজ পনেরো-ষোলোটা জনের রোজ যায় মাথাপিছু তিন টাকা করে। তাদের মুড়ি-বিড়ি আছে। জমি চাষের খরচ আছে। পঞ্চাশ বিঘে জমি। একটা ছেলে এম-এ পাশ করে প্রফেসারি করছে। আর একটা মেয়ে ক্লাশ টেনে পড়ছে। টেস্টে ফার্স্ট হয়েছে—সব সময়েই মেয়েটা ফার্স্ট হয়। পাশ করে যাবে। দেখতেও পরীর মতন। ওদের মাকে যে দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। বিশটা গ্রাম খুঁজে শতখানেক মেয়ে দেখার পর দুলালী বুড়ী বউ করে এনেছিল। যেমন নাকের গড়ন, তেমনি দুটো চোখ। গায়ের রঙ একেবারে যাকে বলে দুধে-আলতা গোলা।

বউমা এক গ্লাস গরম দুধ এনে দেয় শাশুড়ীকে—সর-পড়া ঘন মিষ্টি দুধ। বুড়ী খেয়ে নিয়ে বলে, 'খয়রুলকে আর একটু বেশি করে দুধ দাও বউমা, ও কেন যেন দিন-দিন কাহিলপানা হয়ে যাচ্ছে। গাই-গরুটার দুধ কমে গেছে। মুলতানী গাই, অতো টাকা খরচা করে আনা হল। ছ' কেজি দুধ দিতে দিতে পাঁচ কেজিতে নাবলো।'

বউমা হালিমা মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে খাটো গলায় শুধোয়, 'আজ কি রান্না হবে হাঁ মা? মাছ-গোস্ত কিছু নেই।'

বুড়ী হাঁ বলে-বউমার দিকে তাকায়। হামান দিস্তেতে ছেঁচে-আনা গুঁড়োপানের গুঁড়োগুলো গালে ফেলে বলে, 'খয়রুলে তো খেয়ে কলেজে যাবে। এই ইনসান, জাল ফেলে মাছ ধরে দে বাবা—তোর ধানঝাড়া এখন থাক।'

ইনসান বললে, 'পানি বা 'কালা' ঝি-মা!' বলে সে গামছায় গা ঝেড়ে ফেলে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। একটা বালতি আর খেপলা জাল নিয়ে বিলের দিকে মাছ ধরতে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে ইনসান মাছ নিয়ে এলো। আলীমদ্দি মাছ দেখে খুশী হল। একটা ভেটকি মাছ পড়েছে কেজি-তিনেক। অনেকগুলো বাটা মাছ পড়েছে। ভারী বর্ষায় মানুষের পুকুর ভেসে গিয়ে রাজ্যের পোনা মাছ এসে জড়ো হয়েছে তাদের মাঠের বিলে।

আলীমদ্দি খেতে এসে বসে বসে টাকা গুনতে থাকলে তার বউ বলে. 'খোকা বলছিল টাকা সব ব্যাঙ্কে রাখতে. চুরি-ডাকাতি হলে সব যাবে।'

আলীমদ্দি বললে, 'চোর তো এক-জনই আছে।'

হালিমা লজ্জা দেখিয়ে দাঁতে মাথার কাপড়ের পাড়টা কামড়ে কটাক্ষ হেনে বললে, 'সে-চোর বুঝি হালিমা?'

দুটো ডিম সিদ্ধ. খানিকটা হালুয়া, লুচি আর নারকোল নাড়ু খেতে দেয় হালিমা। এক গ্লাস দুধ এনে দেয়।

'কত টাকা জমিয়েছ তবু শুনি?

হালিমা বলে. 'কোথা গো! আমার কাছে কিছু নেই। মেয়ে আর ছেলে কি টাকা আমার কাছে রাখে?

'হুঁ! শালা, মেয়েমানুষ কখনো কি তার গোপন ভাঁড়ারের খবর দেয়। কই আমার মাথায় হাত দিয়ে বলো দিকিনি একটা টাকাও নেই আমার কাছে।'

'বললে তোমার মাথায় আর একটাও চুল থাকবে না। মিথ্যে কথা বললে চুল সব উঠে মাথা ওল হয়ে যাবে।' হি হি করে হাসতে থাকে হালিমা।

'এই শোন'—হাতটা ধরে কাছে টেনে আদর করে আলীমদ্দি। বলে, 'কত আছে বল না, মেয়ের বিয়ে দিতে টাকা লাগবে না? হাজার-পাঁচেক হবে তো?'

'হাজার-পাঁচেক! এক লাখ বলো! বাড়ি করবার সময় তুমি আমার সাত হাজার টাকা নিলে, নারকোল পাতা, ঘুঁটে, খড়, মাছ, কাঁঠ-বেচা টাকা, আমার বাপ দুশো দিয়েছিল—সব গেল—সে-টাকা দিতে হবে, হাঁ।'

'এই যে দোতলা পাকা বাড়িতে বাস করছ, এটা কার? তোমার মা?'

'এই দেখ রগড়, আমার ঠোঁট কেটে গেছে, দিলে তো রক্ত বার করে। গালে ইয়ে কর কেন? দাগ বসে যায়—মেয়েটা এসে পড়ে যদি জিজ্ঞেস করে মা তোমার গালে এমন লাল দাগ কেন?'

'কেন, সত্যি কথাই বলবে!'

'মরণ! বুড়ো বেলায় ঢং!'

'এই—বল না কত টাকা আছে?'

'কেন?'

'খয়রুলের বিয়ে দোব। মেয়ে দেখা ঠিকঠাক।'

'তোমার সব মিথ্যে গুলপট্টি। জানো, সতীসাধ্বী অবলা বউকে মিথ্যে কথা বললে পাপ হয়!'

'হয় বৈকি! তবে যে-বউ টাকা চুরি করে তাকে সত্যি কথা বলাও পাপ। সত্যিই খোকার বিয়ে দোব এ-বছর। হাজী কবি-রুল গাজির মেয়ের সঙ্গে। বি-এ পাশ করেছে। দেখতেও মন্দ নয়।'

'ধোৎ! আমি সে-মেয়েকে দেখেছি। কালো। ও-মেয়ে আমি ঘরে তুলবো না বলে দিচ্ছি।'

'কালো না হাতি! ওকে কালো বলে না!'

'ছেলের বিয়ে থাক, বরং মেয়ের বিয়ে দাও—বড্ড ডাগর হয়ে গেছে।'

'বেশ দোব। কথা তো একরকম হয়েই আছে। ভাগ্নে বলে নয়, মনসুর ভাল ছেলে, বি-এ পাশ করে মাস্টারী করে—জমি-জিরেতটাই যা বড্ড কম।'

'তা হোক। এই শোন, মনসুর মা, সেদিন এসেছিল, আর সিঁড়ি-ঘরের নিচে হঠাৎ দেখি দুজনে—'

'কি!' সচকিত হাসিতে শুধোয় আলীমদ্দি।

'এই!' বলে চুম্বন করে দেখালে হালিমা।

'ওঃ!' হাসলে আলীমদ্দি।

'তরকারী পুড়ে যাবে' বলে হালিমা রান্নাঘরের মধ্যে চলে গেল। টাকা তার কাছে কত আছে আর জানা হল না আলী-মদ্দির। একটা হাসকিং মেশিন কিনবে বলে ভাবছিল সে।

মেয়েদের পড়িয়ে এসে জামা-কাপড় খুলে সাবান-তোয়ালে হাতে নিয়ে খয়রুল বলে, 'মা, তোমার ভাত হল?'

হালিমা কাছে এসে ছেলেকে বসিয়ে তার মাথার চুলে একপলা তিলের তেল ঘষে দিতে দিতে বলে, 'মাছটা হয়ে যাক। তোর 'গোসল' (স্নান) করে আসতে আসতেই সব হয়ে যাবে।'

খয়রুল মায়ের মুখে চক্রাকার টিপ-টিপ লাল দাগ দেখে ক্ষণিক এক চোখ তাকালে। তারপর বললে, 'শীতকালের চান মা, কাকের মতন পড়ব আর উঠব, উঃ! আমার যা ঠান্ডা লাগে। হাড় যেন কনকন করে।'

'কান দুটোর তোর কি ধুলো-ময়লা বাবা! মুখেই খালি সাবান ঘষিস! আর এই নখগুলো কত বড় বড় হয়েছে রে তোর? ক'মাস পর পর নখ কাটিস?'

'জানো মা, একটা ছেলে না বারো ইঞ্চির মতন নখ রেখেছে—হাতে মুঠো করতে পারে না! নখে আবার 'চিত্তির' করে রঙ দিয়েছে। বলে পয়সা দিন! অধ্যবসায় করে নখ রেখেছি। আমার দেখলে ঘেন্না করে—গা শিউরে ওঠে। আর পায়ের আকারে এতখানি করে জুলপি!'

হালিমা হাসতে থাকে। বলে। 'কেউ দাড়ি রাখছে, কেউ জুলপি রাখছে, কেউ নখ রাখছে—তুই যেন বাবা ওসব কারিসনি—তোকে এমনিতেই দেখতে ভাল—যা গা ধুয়ে আয়।'

সেরিনা এসে বলে, 'মা আমার মাথায় উকুন!'

'উকুন!'

'হাঁ! একটা 'ড্যাঙোড়'! এত বড়!'

'কোথা থেকে এলো?'

'অজুর চুল দেখছিলুম সেদিন। তার চুলে রাজ্যের উকুন। সদাই ঘযোর ঘযোর করে।'।

'বেশ করেছিস, তোর মাথায় নুড়ো জেলে দোব। একবার উকুন হল মামার বাড়ি বেয়ে, তোর মামীর কাছে শুয়ে। কত ওষুধ দিয়ে ভাল করনু। চুল ভাল করে আঁচড়া বেয়ে। আজ বাদে কাল তোর বে' হবে!'

'বে' হবে!'

'হাঁ। বে' হবে। মেয়েছেলে—ঘরে কি তোলা থাকবি। তোর জন্যে ছেলে দেখা হয়ে গেছে। বর্ধমানে। এক জোতদার ধনী লোকের ছেলে।'

'মিথ্যে!'

'মিথ্যে কিরে!' মা অবাক হয়।

সেরিনা বলে, 'তাহলে মনসুর গাজি আমার জন্যে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে!'

'আর তুই?'

'আমি? আমি গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরব!'

'মরণ! পুচকে মেয়ে! পীরিত শিখেছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঝাঁটাব বাড়ি দোব। সিঁড়ির তলায় সেদিন তোরা কি করছিলি শুনি? ওসব বিয়ের আগে করতে নেই। 'গোনা' (পাপ) হয়।'

'একালে 'গোনা'টা একটু পাতলা হয়ে গেছে মা। তোমাদের সময়ে ঘন কালো ছিল। এই পাতলা রঙটা আবার বিশ বছর পরে একেবারে ফরসা হয়ে যাবে।'

'পাজী হতভাগী, মায়ের সঙ্গে কথা বলছিস, না নানী দাদির সঙ্গে?'

'মা মেয়েতে যা কথা হয় মা, বাপ-ছেলেতে তার শতাংশের একাংশ হয় না। বোনে বোনে যা হয়, ভায়ে ভায়ে হয় না—কেন হয় না মা?'

'আমি জানি না। ওটা স্বভাব। ভাল-বাসার রকম আছে। যা, জনেদের মুড়ি দিয়ে আয়। তোর দাদিকে খেতে ডাক। দেরি হলে টিপে টিপে কথা শোনাবে।'

আলীমদ্দি বাড়িতে এসে হাঁকাহাঁকি শুরু করলে: 'কই গো, 'খয়রুলের বউ' (বউ-মা), দেখ, কতখানি হাত কেটে ফেলনু, ঝুজিয়ে শালা 'লউ' (রক্ত) বেরুচ্ছে!'

হালিমা ছুটে বেরিয়ে এসে দৃশ্য দেখে বললে, 'ওমা! ই-কি কাণ্ড করেছ! হুঁস করে এট্টু কাজ করবে তো। দাঁড়াও, চুন দিয়ে বেঁধে দিই।'

বুড়ী ছুটে এসে আঙুলটা টিপে ধরে নিজের আঁচলে রক্ত মুছে একাকার করে বলতে থাকে, 'হাঁ র‍্যা হতভাগা, তোকে কে ধারালো কাটারী নিয়ে পাকা হাড় কামিনী কাঠ কেটে গরুর খুঁটো বানাতেই হবে বলে মাথার দিব্যি দিয়েছ্যালো! জনেদের বললে কি তারা করে দিতে পারতুনি?'

খয়রুল স্নান করে এসে বাপের কাটা হাতে চুন লাগাতে যেতে দেখে বললে, 'না মা, চুন দিও না। দাঁড়াও আমি ডেটল দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি।'

হাতটা বেঁধে দেবার পরই আলীমদ্দি চলে গেল জনেদের কাছে। স্থির হয়ে একটু বসে থাকবার বান্দা সে নয়। রাত দুটোর সময় যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তো টর্চ হাতে নিয়ে উঠে গিয়ে গরুর গোয়ালে যাবে। খড়ভুষি আছে কিনা দেখবে। কুকুর ডাকলেই টর্চের আলো ফেলে ফেলে চারদিক দেখবে চোর-ডাকাত কেউ এলো কিনা।

দুপুরে জনেরা চলে গেলে খেয়ে-দেয়ে নিয়ে শুয়ে-শুয়ে জনেদের হিসেব লেখে সে।

পাড়ার তিনটে সখির সঙ্গে সেরিনা ক্যারাম খেলে কোলাহল করতে করতে। হালিমা কতক্ষণ রেডিও ঘোরায়। তারপর স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ে ঘুমোতে থাকে।

বিকালে জনেরা এসে খড়ের 'তড়পা' বেঁধে ফেললে আলীমদ্দি নিজেই 'টাল' দিয়ে দেয়। জনেরা কুলোর হাওয়া মেরে 'ধান সারতে' থাকলে আলীমদ্দি বলে, 'কি করে তোদের তিন টাকা জনের দাম দোব বল? স্যায়দালি দশ পণ বিচালী ঝেড়েছিস মোটে। মাহিন্দ বারো পণ। শুধু পুর্ণে সরদার এক কাহন বিচালী ঝেড়েছে। সাতবার ঝোঁক মারবি সব। আর এ বছর ধান যা হল গায়ে জ্বর! বিঘে প্রতি ছ' মণ হলে কপাল মনে করব! দু'বার ঝড়-পানিতে পচেগলে গেল। তবু সাতবিঘেটে'তে দু' লরী থাপার ময়লা সার দেওয়া ছিল বলে ফসটা এট্টু ভাল হয়েছে যা। খড়ের দাম এ বছর আগুন হবে। কত পোয়াল হয়েছে দেখ না!

গাটি থেকে সব ছেড়ে গেছে। আর ঐ কালো পানি-ডোবা দাগঅলা খড় গরু খাবে কি? আমার গরুগুলো শালা সৌখিন জীব হয়ে গেছে—খইল-ভুষি না দিলে ম্যাচলার মুখ ঠেকাবেই না!'

জনেদের ধান 'সারা' হলে একজন বলে, 'আলীমদ্দি চাচা। ধান মাপবে কে? তোমার তো হাত কাটা।'

'স্যায়দালি না হয় পুর্ণে সরদার মাপ!'

স্যায়দালি বলে, 'মোর বড্ড পিঠের চাল কনকন করে। 'ছেঁ'টো' ধরে যায়। পুর্ণে তুই মাপ ভাই।'

পুর্ণে ধান মাপতে বসে পাঁচ সেরি পাল্লা নিয়ে। বস্তায় করে ধান ধরে নিয়ে জনেরা গোলায় ঢেলে দিয়ে আসে। রাত হয় কাজ শেষ হতে।

দুলালী বুড়ী জনেদের ঘটিভরা গরম চা এনে খাওয়ায়। তেল মাখানো মুড়ি খেতে দেয়।

খয়রুল ফিরে আসে, সঙ্গে মনসুর। তার মামাতো ভাই। যার সঙ্গে সেরিনার বিয়ে হবার কথা আছে।

সালাম করতে হেসে প্রতি সালাম করলে আলীমদ্দি। কিন্তু হঠাৎ সে যেন চমকে গেল। মনসুরের কথার মধ্যে কোন যেন জড়তা। অস্বাভাবিক হাসি বা তোয়াজ করার ভঙ্গি। মদ গিলেছে নাকি?

খয়রুল বললে, 'বাইরে বস মনসুর। আসছি আমি!'

'বাইরে কেন 'বাওয়া'!'

'প্লিজ! বাইরে মানে আমার পড়ার ঘরে। তুই মাল টেনেছিস, মা-দিদা-বাবাজী জানলে মুশকিল হবে!'

'ও স্যরি! 'ধাম্মিক'রা 'হেট' করবে! বেহেশতে গেলে সুরা মিশবে, কিন্তু দুনিয়াতেই শালা অচল!'

খয়রুল বাড়ির মধ্যে এসে ডাকলে, 'মা!'

হালিমা ছেলের ঘরে ঢুকল।

খয়রুল বললে, 'মনসুর এসেছে। বাইরের ঘরে তাকে বসতে বলে এসেছি।'

'কেন, বাইরে কেন বাবা?'

'ওকে ভূতে ধরেছে।'

সেরিনা কাছে এলে তার বেণীটা ধরে পাক দিয়ে আদর করে খয়রুল বলে, 'মনসুর মদ খেয়ে এসেছে। বলে, অন্তরে অনেক জ্বালা! বাবা বুড়ো বয়েসে নিকে করে আনলে, তার তিনটে ছেলে, শরীক ভাগ করে দিচ্ছে। খুব ঝগড়া করেছে। ওকে নাকি বলেছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।

'তা মদ খেতে গেল কেন?'

'ও খায় তো!'

'তা কি তুই কোনোদিন বলেছিলি?'

'ভেবেছিলুম শুধরে ফেলতে পারব। ও যে এখন এখানে কিছুদিন থাকতে চায়!'

সেরিনা একটা হ্যারিকেন নিয়ে বাইরের পড়ার ঘরে এলে মনসুর বলে ওঠে, 'হ্যালো, ডার্লিং! হাউ নাইস! বিউটি!'

'কি খেয়েছ?' কড়া হয়ে শুধোয় সেরিনা।

'এই মাইরি, এট্টু মাল টেনে ফেলেছি। কিছুতেই যাব না, শালা?'

বাপ ভীষণ ক্ষিপ্তে গেছে। হারাম জিনিস খাও তুমি! তুমি এক্ষুনি চলে যাও। আর আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না!'

সোরিনা চোখ মুছতে লাগল এসে গোলার ধারে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

আলীমদ্দি একটা উচিত কথা শুনিয়ে ছোঁড়াটাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেবে বলে ভেতর থেকে বাইরে আসতে গিয়ে হঠাৎ মেয়েকে গোলার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখলে। সে ইতস্তত করলে একটু। ভাবতে লাগল। তারপর খয়রুলের পড়ার ঘরের দিকে তাকে আসতে দেখেই মনসুর হ্যারিকেনের আলোটা নিভিয়ে দিলে। আলীমদ্দি নীরবে সেই ঘরের দোরে তালা চাবি এঁটে দিয়ে গেল।

সারা রাত আর কেউ এল না। অন্ধকার। মশা। শীত। চুরি করে একটা কম্বল জানালা গলিয়ে দিয়ে যেতে চেয়েছিল সোরিনা—কিন্তু আলীমদ্দির তা চোখে পড়ে যেতে কম্বলটা কেড়ে নিলে।

আলীমদ্দি বললে, 'মরচে ধরা লোহাকে পুড়িয়ে পিটে অন্তর তৈরি করতে হয়—যদি খাঁটি অন্তর হয় তবে এখানেই থাকবে—অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।'

বাপের কথা শুনে সারা মুখটা যেন আলো হয়ে গেল সোরিনার।

—আবদুল জব্বার

# সাহিত্য ও সংস্কৃতি

## ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদ

বাংলা অনুবাদ সাহিত্য একদা যেমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, এখন আর সে অবস্থা নেই। এর কারণ অক্ষম অনুবাদ, পাঠকের আগ্রহের অভাব এবং সর্বোপরি প্রকাশকবর্গের উৎসাহ স্রোতে ভাটা পড়া। এছাড়া আরো কারণ থাকা সম্ভব।

একদা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকরা অনুবাদের কাজকে হেয় মনে করতেন না এবং সেই কারণেই বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দ অজস্র অনুবাদ করেছেন। এ যুগের সাহিত্যিকদের অনুবাদ করার কোনো ঝোঁক আছে মনে হয় না। গিরীশচন্দ্র ঘোষ একদা 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ করেছিলেন এবং সেই অনুবাদ আজো পণ্ডিতমহলে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অজস্র বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে সন্দেহ নেই, অনুদানপুষ্ট এই সব অনুবাদ গ্রন্থের মূল্যও অনেক কম, কিন্তু সেই সব অনুবাদ গ্রন্থাবলীর অনুবাদক সর্বদা সুনির্বাচিত না হওয়ায় অনুবাদের মূল্য হ্রাস পেয়েছে।

সাহিত্যের নিজস্ব প্রয়োজনে বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ প্রয়োজন। ফরাসী ভাষাতে যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেই সব গ্রন্থ প্রায় একই সময়ে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়ে ইংরাজীভাষীদের জন্য প্রচারিত হয়। বলাবাহুল্য এই অনুবাদের ফলে অনূদিত ভাষাই পুষ্টি লাভ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

দুঃখের বিষয় সাহিত্য অকাদেমী পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত ক্লাসিক সাহিত্যকে ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় পাঠক সাধারণের কাছে পরিবেশনের একটি কার্যক্রম স্থির করেছেন এবং সেই পরিকল্পনানুসারে কিছু কিছু ধ্রুপদী সাহিত্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে 'ওথেলো'র বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ভলত্যারের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'কাঁদিদ' ও জাঁ জাক রুশোর 'সামাজিক চুক্তি'। এই দুটি গ্রন্থই মূল ফরাসী ভাষা থেকে অনূদিত এবং যথাক্রমে অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত কবি ডঃ অরুণ মিত্র ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক ননীমাধব চৌধুরী।

ভলত্যার (১৬৯৪--১৭৭৮) ও রুশো দুজনেরই লেখনী ছিল তরবারির ক্ষুরধার। মানব সমাজের সমস্যার কথা চিন্তা করেছেন এই দুই মনীষী এবং তার সমাধানের পথ নির্দেশ করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রেরণাও সঞ্চার করেছেন। ফরাসী জাতীয় জাগরণে যে মূল প্রেরণা ও বর্তমান যুগের সমাজবাদের আদর্শ যে প্রেরণায় চালিত তার মূলে এই দুজন মানব দরদী ফরাসী মনীষীর অবদান অবিস্মরণীয়।

ভলত্যারের প্রকৃত নাম ফ্রাঁ-মারি আরুয়ে। এই নামটিকে নানাভাবে রূপান্তরিত করে ভলত্যার এই নামকরণ তিনি নিজেই করে নেন। প্যারিসের একটি অবস্থাপন্ন সংসারে জন্মেছিলেন ভলত্যার এবং আইন ব্যবসায় না গ্রহণ করে সাহিত্যকে তিনি আশ্রয় করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই মহান চিন্তা নায়ক সমগ্র দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভাবনার মূর্ত প্রতীক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের রূপায়ণ যেন ফরাসী বিপ্লব।

কাব্য, নাটক এই দুই জাতীয় রচনায় হাত পাকিয়েছিলেন ভলত্যার। এদিক থেকে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন কিন্তু সেখানেই তিনি থামেননি। অন্যায় এবং অবিচার তাঁকে ব্যথিত করে তুলতো। এই সময় নাবালক রাজা পঞ্চদশ লুই-এর অভিভাবকদের বিষয় ব্যঙ্গ করে দুটি নাটক রচিত হয়। নাম না থাকলেও এই নাটক যে ভলত্যার রচিত এমন সন্দেহ করা হল এবং তার ফলে ১৭১৬-তে তিনি নির্বাসিত হলেন আবার চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে একটি শ্লেষ ব্যঞ্জক কবিতার রচয়িতা সন্দেহে তাঁকে কুখ্যাত বাস্তিল কারাগারে বন্দী করে রাখা হল।

সারা জীবন তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। জীবনেও যেমন, মরণেও তেমনি অশ্রদ্ধা পেয়েছেন রাজ সরকারের হাতে। প্যারিসের সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাধিস্থ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

ষোড়শ লুই-এর আমলে তাঁর নাম উচ্চারণ করাও দণ্ডনীয় ছিল।

ভলত্যার ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

'আমি যা সব দেখছি তা সমস্তই এক বিপ্লবের সূচনা। এ বিপ্লব অনিবার্য তবে আমার চোখে তা দেখা হবে না। যাদের বয়স অল্প তাঁরা ভাগ্যবান, অনেক আশ্চর্য ও চমকপ্রদ ঘটনা তাঁরা দেখতে পাবেন।'

ভলত্যারের সেই আশা পূর্ণ হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের পর তাঁর মরদেহ আবার পূর্ণ মর্যাদার প্যারিসে এনে পাঁতেয়'তে সমাধিস্থ করা হল।

ভলত্যার বলতেন—'আমি চাই সমস্ত অবিচারের কাহিনী সমস্ত মানুষের কানে সব সময় প্রতিধ্বনিত হোক—'

'কাঁদিদে'র প্রথম প্রকাশ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে জেনিভায়। জার্মান দার্শনিক লাইবনিৎস-এর কথা—এই জগৎ সব চেয়ে উত্তম এবং এখানকার সব কিছুই বিধাতার ইচ্ছায় আমাদের কল্যাণের জন্য ঘটছে। এই তত্ত্বটি ভলত্যার পছন্দ করেননি। এই তত্ত্বটির মধ্যে যে আশাবাদ প্রচ্ছন্ন আছে তিনি তার বিরোধী এবং সেই মতবাদকে আক্রমণ করে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে লিসবন শহরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়, এই ভূমিকম্পে বিধাতার ভূমিকা নিয়ে রুশোর সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়। সেই তর্ক থেকেই এই গ্রন্থের উৎপত্তি। অবিচার ভরা পৃথিবীর অসামঞ্জস্য ও অসাম্যের ছবি তিনি এই গ্রন্থে রূপায়িত করেছেন।

কাঁদিদ প্রথম প্রকাশ কালে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। গ্রন্থটি সেই সময় কাল্পনিক এক জার্মান লেখক ডকটর রালফের মূল গ্রন্থের অনুবাদ হিসাবে প্রকাশিত হয়। তবে এই গ্রন্থের আসল লেখককে সহজেই চেনা গেল।

'কাঁদিদ' ইতিপূর্বে ইংরাজী অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন অশোক গুহ। ডক্টর অরুণ মিত্র ফরাসীবিদ এবং বাংলা সাহিত্যের একজন সম্মানিত লেখক, তাঁর অনুবাদে 'কাঁদিদে'র মূল বক্তব্য বাঙালী পাঠক মূল কাহিনীর মতই উপভোগ করবেন। ডক্টর মিত্রের ভূমিকাটুকু বিশেষ মূল্যবান। এই ভূমিকায় ভলত্যারের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই অনুবাদ যে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ফরাসী গণজাগরণে রুশোর 'কঁত্রা সোসিয়েল' এক মহাগ্রন্থ। এই গ্রন্থে রুশো রাষ্ট্রীয় অধিকারের মূলকথা বিশদভাবে তুলে ধরেছিলেন। এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 'সামাজিক চুক্তি বা রাষ্ট্রীয় অধিকারের মূল কথা' নামে প্রকাশ করেছেন সাহিত্য অকাদেমী। মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছেন প্রবীণ সাহিত্যিক ননীমাধব চৌধুরী। অনুবাদক এই গ্রন্থটির সূচনায় লিখেছেন—

"সাহিত্যাচার্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবনে তখন বাংলার সুপরিচিত সবুজ-পত্র গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক বৈঠক বসিত। বৈঠকে শাসন সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন কথা উঠিল দেশে পলিটি-ক্যাল দর্শন ও বিজ্ঞানের বইয়ের অভাব আছে। এই আলোচনা পরবর্তী কয়েকটি বৈঠকেও চলিল এবং স্থির হইল তিনখানি বিখ্যাত গ্রন্থের, আরিস্ততলের politike, মাকিয়াভেল্লির Dal Principle এবং রুশোর Contrat Social মূল ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।"

সেইকালে অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনুরোধ করেন শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে রুশোর ফরাসী গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদের। এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ অনুবাদক স্বয়ং প্রকাশ করেছিলেন অনেকদিন পূর্বে।

'কঁত্রা সোসিয়াল' দুরূহ রাষ্ট্রদর্শনের বই এবং আজ থেকে অনেক বছর আগে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ বাঙালী মনীষার উপযুক্ত একথা স্বীকার করা কর্তব্য।

শ্রীযুক্ত চৌধুরী অসাধারণ নিষ্ঠায় এই দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন এবং সমকালীন বাঙালী চিন্তানায়কদের কাছে তার জন্য প্রশংসা অর্জন করেছিলেন আজ সেই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃসন্দেহে আনন্দ সংবাদ।

দুটি গ্রন্থই সুমুদ্রিত।

—অভয়ঙ্কর

---

(১) কাঁদিদ-ভলত্যার—অনুবাদ অরুণ মিত্র।

(২) সামাজিক চুক্তি—জাঁ জাক রুশো—অনুবাদ ননীমাধব চৌধুরী।

প্রকাশক — সাহিত্য অকাদেমি—নিউ-দিল্লী (ব্লক ৫বি, রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলিঃ-২৯)। মূল্য যথাক্রমে পাঁচ টাকা এবং ছয় টাকা।

# কটা ভাষা শেখা দরকার ?

বিদেশী ভাষায় দখল সংস্কৃতির দিগন্তকে অসম্ভব প্রসারিত করে। বুল-গারিয়ানদের মধ্যে একটি প্রবাদের চল আছে, একটি বিদেশী ভাষা জানা মানে আরেকটি আত্মার মালিক হওয়া। প্রত্যেকটি নতুন ভাষা শিক্ষা যে জীবন-সংগ্রামে আরেকটি হাতিয়ার হস্তগত করার সামিল, মার্কস এ-কথাটা বারবার আবৃত্তি করে আনন্দ পেতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মার্কস স্বয়ং তাঁর ডিপ্লোমার জন্যে থিসিস লিখেছিলেন লাতিন ভাষায়। তাঁর 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রবন্ধ ফরাসীতে, 'ক্যাপিটাল' জার্মান ভাষায় এবং বহু প্রবন্ধ ইংরেজিতে লেখা। সবশুদ্ধ তিনি জানতেন দশটির মতো ভাষা। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ কুড়িটি ভাষা জানতেন। সবকটি ভাষায়ই প্রচন্ড বিরক্তি প্রকাশ করতে পারতেন। এমনকি উচ্চারণের টান, মুদ্রাদোষ, আঞ্চলিক প্রবণতা খুব যত্ন সহকারে তিনি শিখতেন। সূক্ষ্মতম রসিকতা পর্যন্ত করতে পারতেন, এইসব ভাষায়। শোনা যায়, ভারতে ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হরিনাথ দে জানতেন ইউরোপের কুড়িটি এবং ভারতের চৌদ্দটি ভাষা। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বমোট আঠারোটি ভাষায় সসম্মানে এম-এ পাশ করেছিলেন তিনি। এ'র লাইব্রেরীতে ছিল প্রায় ষাট হাজার বই। রুশ-লেখক আলেক্‌শন্দর গ্রিবোয়েদভ ছিলেন মোট এগারটি ভাষায় পারঙ্গম। একদা তিনি মন্তব্য করেন, 'একজন লোক যত বেশি বিদেশী ভাষায় শিক্ষিত হবেন, তত বেশি তিনি স্বদেশের সেবায় কাজে লাগবেন।'

ভোল্‌ত্যার বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব মানবজাতির অন্যতম চরম দুর্ভাগ্যের সূচক।' বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা মোট ২,৭৯৬ এবং উপভাষা বা কথ্যভাষার সংখ্যা ৩,০০০। তাছাড়া আছে লাতিন, প্রাচীন গ্রীক, হিত্তাইত, আরামিক প্রভৃতি 'মৃত' ভাষা। একজন লোকের পক্ষে এই সবকটি ভাষা শেখা সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই। এদের মধ্যে 'প্রধান' ভাষা মোট তেরোটি (এদের প্রত্যেকটি ভাষাভাষীর সংখ্যা অন্ততপক্ষে ৫ কোটির উপর)। এই তেরোটি ভাষাভাষী জনসংখ্যা : চীনা ৭০ কোটি, হিন্দী ও উর্দু ২৮ কোটি, ইংরেজি ২৫ কোটি, স্প্যানিশ ১৫ কোটি, রুশী ১৩ কোটি, জার্মান ১০ কোটি, জাপানী ১০ কোটি, ফরাসী ৮ কোটি, ইন্দোনেশীয় ৮ কোটি, পোর্তুগীজ ৮ কোটি, আরবী ৭ কোটি, বাংলা ৬ কোটি, ইতালীয় ৬ কোটি। কেউ যদি মাত্র এই তেরোটি ভাষা জানেন, তাহলেই বিশ্বের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ে সমর্থ হবেন। এই তেরোটি ভাষা প্রায় পঁয়ষট্টিটি দেশের রাষ্ট্রভাষা। বিজ্ঞান, শিল্পকলা, কূটনীতি আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষাও ওরা।

মাত্র তেরোটি ভাষা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা কোন্‌টি? সংখ্যা দেখে মনে হতে পারে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা বুঝি চীনা। পৃথিবীর প্রতি চারজনে এক-জন এই ভাষায় কথা বলে। তার পরে স্থান পেতে পারে হিন্দীভাষা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চট্‌ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল। কোন ভাষার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অনেক ব্যাপারের ওপর নির্ভরশীল, সেই ভাষায় কত লোক কথা বলে, তার সংখ্যা ঐসব ব্যাপারের মধ্যে একটি। সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের পরিমাণ এবং ভাষাটি কতখানি তথ্য বহনে সক্ষম, তাও কম গুরুত্বপূর্ণ

নয়। আমরা বিদেশী ভাষা শিখি বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে ততটা নয়, যতটা অন্যান্য দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, সাহিত্য ও শিল্পকলা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ঘটনাবলীর অনুধাবন ও উপলব্ধির জন্যে। এইদিক থেকে বিচার করলে কোন্ ভাষার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি? ১৯৫৬ খৃঃ হিসাব থেকে জানা যাচ্ছে : দৈনিক সংবাদপত্রের মোট সংখ্যা : ইংরেজি ২,৪৩০, স্প্যানিশ ১,০০০, জার্মান ৬৭০, চীনা ৫৫০, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা ৫০০, ফরাসী ২৭০, পোর্তুগীজ ২৬০, রুশী ২৫০, জাপানী ১৬০, ওলন্দাজ ১৪০, ইতালীয় ১৩০। সংবাদপত্রের মোট প্রচারসংখ্যা : ইংরেজি ৯ কোটি ৮০ লক্ষ, জাপানী ৩ কোটি ৬০ লক্ষ, রুশী ৩ কোটি, জার্মান ২ কোটি, ফরাসী ১ কোটি ৪০ লক্ষ, স্প্যানিশ ১ কোটি ১০ লক্ষ, চীনা ৭২ লক্ষ, ইতালীয় ৫৭ লক্ষ, ওলন্দাজ ৪৫ লক্ষ, পোর্তুগীজ ৩৫ লক্ষ, ভারতীয় ভাষাসমূহ ৩৫ লক্ষ।

এখন দেখা যাক, বিভিন্ন ভাষায় ছাপা বইয়ের সংখ্যা কত। ১৯৫৯ খৃঃ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বইয়ের সংখ্যা : রুশী ৫৮,১০০, ইংরেজি ৪২,০০০, জার্মান ৩৩,৫০০ জাপানী ২৫,০০০, ফরাসী ১৬,০০০, স্প্যানিস ১৫,০০০, ইতালীয় ১৩,০০০, পোর্তুগীজ ৮,০০০, সুইডিশ ৬,০০০, রুমানিয়াম ৫,৬০০, অন্যান্য ভাষার ৩০,৬৭০। অতএব দেখা যাচ্ছে, রুশ ভাষাতেই সর্বোচ্চ সংখ্যক বই বেরোয়। এ-ব্যাপারে দ্বিতীয় স্থান ইংরেজি ভাষার। জাপানী ভাষায় ছাপা বইয়ের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। প্রয়োগবিদ্যা ও যথাযথ বিজ্ঞান-বিষয়ক বইয়ের প্রকাশ-সংখ্যা : রুশী ২৮,০০০, ইংরেজি ৯,২০০, জার্মান ৬,২০০, জাপানী ৪,০০০, ইতালীয় ২,৩০০, ফরাসী ২,২০০, স্প্যানিস ১,৮০০।

কোনো ভাষার 'কার্যকারিতা' সাধারণভাবে তার 'চাহিদা' দিয়ে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ সেই ভাষা থেকে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় তর্জমা করা বইয়ের সংখ্যা দিয়েই ঐ কার্যকারিতা ঠিক করা হয়। প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩০,০০০ বইয়ের তর্জমা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অনূদিত হয় ইংরেজি থেকে, শতকরা ১৫ ভাগ রুশ থেকে এবং ফরাসী ও জার্মান থেকে যথাক্রমে শতকরা ১৩ ভাগ ও ১০ ভাগ। যত বেশী অনুবাদের কাজ চলুক না কেন, পৃথিবীর যাবতীয় লিখিত রচনার তর্জমা কি সম্ভব? পরিসংখ্যান বলে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সব উল্লেখযোগ্য বই লেখা হচ্ছে, তার শতকরা ১·৫ ভাগও অন্য ভাষায় অনূদিত হচ্ছে কিনা সন্দেহ।

কোনো ভাষার গুরুত্ব বিচার করতে হলে ভৌগোলিক দিক থেকে তার বিস্তৃতিও বিচার্য। প্রথম যে-ভাষা তার মাতৃভূমির সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল, সে হল স্প্যানিস বুলি। কলম্বাসের হাল্‌কা দ্রুতগামী জাহাজ ও অভিযাত্রীদের তরোয়াল বিভিন্ন দেশে ভাষাটিকে রপ্তানী করে। অপরপক্ষে, ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা কিংবা অন্যভাবে পনেরোটি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। আরবী ছড়িয়ে আছে তেরোটি, ফরাসী ন'টি এবং জার্মান তিনটি বিভিন্ন দেশে।

দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর ৬০টি বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে দোভাষীর সাহায্য ছাড়া কথা বলতে গেলে মাত্র পাঁচটি ভাষা শিখতে হবে। আলোচনা শুরু হয়েছিল ২,৭৯৬টি ভাষা নিয়ে, তারপর তালিকাটিকে ছেঁটেকেটে ১৩টি ভাষায় দাঁড়ায়। আর শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছান গেল চারটি, কি বড়জোর পাঁচটি, ভাষায় দোরে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, নানা দেশের হাই স্কুলে যে প্রধানত এই চার-পাঁচটি ভাষাই শেখানো হয়, এটা আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। এই পাঁচটি ভাষা আয়ত্ত করতে পারলে যে-কেউ পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারে এবং দুনিয়ায় যত বই, খবরের কাগজ ও অন্যান্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে, তার শতকরা ৮০ ভাগই পড়তে পারে। তাছাড়া এর মধ্যে প্রত্যেকটি ভাষাই যেহেতু কিছু-না-কিছু পরিমাণে আন্তর্জাতিক ভাষার চেহারা নিয়েছে, তাই কথা বলা বা পড়াশুনোর সুযোগ-সুবিধা উপরের হিসেব ছাপিয়ে আরও বিস্তৃত হতে পারে।

—সাংবাদিক

---

# নতুন বই

**হাউসকীপিং অফ রেভলুশন ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড রাশিয়া**—(আলোচনা) গোবিন্দলাল ব্যানার্জী।—ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়। ৬।১এ, ধীরেন ধর সরণি। কলকাতা-১২।

নামটাই বিচিত্র বিপ্লবের গৃহকর্ম। উক্তিটি লেনিনের এবং অকটোবর বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বিবাহের দ্বারা একটি গার্হস্থ্য জীবনের সূচনা হয়। কিন্তু সেই জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে সুষ্ঠু গৃহকর্মের ওপর। লেনিনও রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সার্থক করার জন্য এক সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সমাজিক সংস্কারের সমাজতান্ত্রিক প্রয়োগপদ্ধতির রূপায়ণ করেছিলেন এবং সেই প্রচেষ্টায় জনগণের ব্যাপক সহযোগিতাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। লেনিনের মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পুনর্নির্মাণের মূল সর্তগুলি হল—জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও প্রগতি, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার যে হার তার দ্রুত বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ। কিন্তু বিজ্ঞানের নির্বাধ প্রয়োগ ব্যতীত এই প্রচেষ্টা অর্থহীন। বিজ্ঞানই সেই অবস্থা সৃষ্টি করে, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ সমাজব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব হয়।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠনের কর্মপ্রচেষ্টায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে লেনিনের নিউ ইকনমিক পলিসির চেহারাটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ফলে লেনিনকে একজন সংস্কারপন্থী গৃহকর্তার ভূমিকায় দাঁড় করান হয়েছে যার ফলে রাশিয়ার সামাজিক অবস্থাগুলির প্রতি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী রেখে এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ করেছেন এবং প্রয়োজনানুসারে অনেক ক্ষেত্রেই মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের বহু ঘোষিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি ও পদ্ধতি থেকে দূরে সরে গেছেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে স্বাধীন ভারতের সামাজিক পুনর্গঠনের কার্যপদ্ধতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। অবশ্য আগেই কংগ্রেস পরিচালিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে আকার এবং চরিত্রগত ভিন্নতা স্বীকার করেও লক্ষ্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে মূলগত ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থের সব থেকে আকর্ষণীয় অধ্যায় The Weapon of Non-violence. লেখক গান্ধীজীর অহিংস

আন্দোলনের যাথার্থ প্রমাণ করতে গিয়ে লেনিনের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে লেনিনের বহু উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

লেখকের মতে, গান্ধীজি যেমন এক অহিংস রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, লেনিনও সেইরূপ এক শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন। লেখকের শেষ সিদ্ধান্ত, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের আশু এবং অন্তিম লক্ষের সঙ্গে লেনিনের কোন মূলগত বিরোধ নেই। শুধু ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে সমাজবিপ্লবের আন্দোলন অহিংস পথে চলেছে। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস-পরিচালিত ভারত সরকার যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছেন,—লেখক সেই কর্মপ্রচেষ্টার একটি মোটামুটি চেহারা তুলে ধরেছেন। এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় সেদিন পরিচালিত কম্যুনিস্ট সরকারের নয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতির সঙ্গে ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিগত সাদৃশ্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করেছেন।

গ্রন্থটিকে ফলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি দুরূহ পরীক্ষা হিসেবে যথেষ্ট আকর্ষণীয় বলা যায়।

কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে ঐকামত হওয়া অসম্ভব। কারণ, এই ধরণের পরীক্ষার সবচাইতে যা অসুবিধা, তা হল অবৈজ্ঞানিক সামান্যীকরণের সমস্যা। ফলে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তথ্য এবং উৎপত্তি ভ্রান্তির অবকাশ থেকেই যায়।

তাই বর্তমান গ্রন্থে লেনিনের যে চেহারা ও চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা একদিকে যেমন মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী পাঠকদের মনে লেনিনের ভয়াবহ বিকৃতির আশঙ্কা ঘনীভূত করবে, তেমনি অপরদিকে যাঁরা গান্ধীজীর অহিংস মতবাদে বিশ্বাসী, তাঁরা গান্ধীজীর অহিংস-তত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যায় ক্ষুণ্ণ হবেন।

**দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন** (জীবনী)—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রকাশন বিভাগ। তথ্য ও বেতার মন্ত্রক। ভারত সরকার। পাতিয়ালা হাউস। নতুন দিল্লী—১। দাম ছ' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান যোদ্ধা, উজ্জ্বল আদর্শবাদী রাজনীতিবিদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মবার্ষিকী পালিত হোচ্ছে দেশব্যাপী। তাঁর মত বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ সত্যিই বিরল। তাঁর বিরাট সাহস ও অধ্যবসায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আলাপ আলোচনায় দক্ষতা ভারতীয় রাজনীতিকে করেছিল উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত। মাত্র ছ' বছর সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত থাকলেও, ভারতীয় জনগণের মনে দেশবন্ধুর দৃঢ় প্রভাব, আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তাঁর প্রয়াসের হেতু ছিল, এই পথেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। চিত্তরঞ্জন একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। ভারতীয় কৃষ্টি রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি এবং পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্তিই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য। দেশবন্ধুর এই চরিত্রাখ্যানই বর্ণনা করেছেন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ডঃ দাশগুপ্ত ছিলেন দেশবন্ধুর অন্যতম সহচর ও বন্ধু। এই সংক্ষিপ্ত জীবনকথায় প্রকাশ পেয়েছে লেখকের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস। দেশবন্ধুর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণগুলি সংযোজিত হওয়ায় বইটির প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে।

**অমৃতের পথে** (আলোচনা)—সত্যসাধক ব্রহ্মচারী মুরলীধর। পরিবেশক : দাশগুপ্ত এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দশ টাকা।

বইটির উদ্দেশ্য মহৎ। লেখকের ভাষায় : "স্ব-কল্যাণ ও জগৎ-কল্যাণের মুক্ত মহাজীবনে সমাহিত—আদর্শ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যতন্ত্রের সমাজধর্মে অনুপ্রাণিত জাতীয় চরিত্রধর্মের উদ্বোধন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।" মনে হয়, দীর্ঘকাল ধরে লেখক এ বইটি লেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এবং বিশ শতকের যুগসংকটে নিজের চিন্তাভাবনাকে শিক্ষিত করে মানবমুক্তির পথসন্ধান করেছেন। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর যোগ হওয়ায় বইটি আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, ভারত ধর্ম বলতে বোঝে 'শাশ্বত ধর্ম'। এই ধর্মের বাণী ভারতের শাস্ত্র ও সাহিত্যের পাতায় পাতায় উচ্চারিত হয়েছে। গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে ছিল তার অপরিমেয় প্রভাব। এটাই ছিল তার আন্তর্জাতিক নীতিও। কোনো রকমের ধর্মীয় মতবাদ এখানে বড় কথা নয়। প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করে, রাজনীতি ও অর্থনীতির ঘটনাশ্রয়ী উদাহরণ সহযোগে, তিনি সেই চিরন্তন সত্যের মর্মোদ্ধার করেছেন। বইটি অনেকের কাছে ভালো লাগবে।

**মানমন্দির** (কাব্যগ্রন্থ)— পরেশ মন্ডল। অব্যয়, ৪২ গড়পার রোড, কলকাতা-৯। দাম : দু' টাকা।

ষাটের কবিদের মধ্যে পরেশ মন্ডল সম্ভবত সবচেয়ে সংযতবাক্‌, ইঙ্গিতময় কবি। কবিতার শরীর নির্মাণে তিনি এমন সব শব্দ এবং পংক্তি ব্যবহার করেন, যার সঙ্গে দ্বিতীয় কারোর তুলনা চলে না। অনুভবের গোপন অন্তঃপুর থেকে মুখ বাড়িয়ে তিনি কথা বলেন। যেন কোনো কথাই শেষ নয়। একেকটি পংক্তির মধ্যে বহু না-বলা কথা থেকে যায়। বহু কবিতা ইঙ্গিতেই সমাপ্ত।

প্রথম কবিতার বই 'অদূরে জলের শব্দে' পরেশ মন্ডল এতটা সাংকেতিক ভাষায় কথা বলেন নি। 'প্রতিবিম্ব' থেকে তিনি পাল্টে গেছেন। অনেক সময় তিনি পাঠককে উপহার দেন অসম্পূর্ণ ছবি, অর্ধসমাপ্ত ইমেজ। পংক্তি সাজাবার বিশিষ্টতায় তিনি পাঠককে চমকে দেন।

**শহর কলকাতা** (কাব্যগ্রন্থ)—মৃণাল বসু চৌধুরী। অব্যয়, ৪২ গড়পার রোড, কলকাতা—৯। দাম : দু' টাকা।

মৃণাল বসু চৌধুরী নম্র সুরের কবি। লৌকিক ও অলৌকিকের আলো-ছায়ার বিষয়। জীবনের গভীরতায় প্রবেশের যাদুমন্ত্রটি তিনি জানেন। আর জানেন বলেই, অপরিচয়ের জগৎকে তিনি আবিষ্কার করেন পরিচয়ের পরিধিতে। কখনো সরলতম বিশ্বাসে বলে ওঠেন : "এখানেই ছোট হবে নদী / জেগে উঠবে বালুচর রাজ্যপাট গাজা ও মন্দির।"

কোনো রকম কঠিন শব্দের ব্যবহার নেই তাঁর কবিতায়। যেন নিজের সঙ্গে আলাপ করেন। এবং সেই আলাপের ভাষা তীক্ষ্ণতাবর্জিত, আত্মমগ্নতায় রহস্যময়। দুঃসাহসের সঙ্গে তিনি অস্বীকার করেছেন কবিতার প্রচলিত বিধিবিধানকে—হয়তো বা সময়ের আহ্বান এবং আমন্ত্রণকেও। তীব্রতম মানসিক অস্থিরতার মুহূর্তে তাঁর ভাষা কিছুটা শাণিত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারেন : 'দরোজা খুললেই অশ্বক্ষুরের শব্দ মিলিয়ে যায়।"

'শহর কলকাতা'য় কোনো কবিতায় যতিচিহ্নের ব্যবহার নেই। একেকটি কবিতায় কবির অনুভব যেন কয়েকটি শব্দ ও পংক্তিকে আশ্রয় করে প্রবহমান—সঙ্গীতের মতো অনিঃশেষ। মাঝে মাঝে তিনি এমন সব চিত্র উপহার দিয়েছেন, যা পাঠকের বিস্ময়কে বহুগুণ বর্ধিত করে।

অধিকাংশ কবিতাই সংকেত আশ্রয়ী ও প্রতীকধর্মী।

বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছেন তপনলাল ধর। চমৎকার রুচিসম্মত মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জায় আকর্ষণীয়।

---

## সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

---

**দেয়ালা**—সম্পাদক শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।। ১৯।৪, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-২৬।। এক টাকা।।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদারের উৎসাহে পত্রিকাটি বের করে ছুদে সম্পাদকেরা। প্রথম দুটো সংখ্যা বেরিয়েছিল ছোট আকারে। এবারের সাইজ বড়ো। ছবিসহ 'শহীদ মিনারের কথা' লিখেছেন কাফী খাঁ। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, সত্যজিৎ রায়, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সতীকান্ত গুহ, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। দেখতে শুনতে ভালো। পড়তে মজা। কয়েকটা লেখা সচিত্র।

# বইকুণ্ঠের খাতা

## বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ

সীমান্তের বন্ধ দরজাটা এখনো খোলেনি, কিন্তু তার কড়াকড়ি হ্রাস পেয়েছে। প্রহরীর চোখ এড়িয়ে আসছে. ওপার থেকে দু' একটা বই। এপারের খবরাখবরও মাঝে মাঝে ওপারে পেঁাছুচ্ছে। হয়তো, দুই বাংলার মধ্যে সহজ সম্পর্কের রাস্তা গড়ে উঠবে এভাবেই।

আমরা তার আভাস পেয়েছি। এবং সেটা আভাসই। অনুমানকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। যদিও জানি, রাজনৈতিক প্রাচীর তুলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটানো যায়, অন্তরের যোগাযোগকে রুদ্ধ করা যায় না।

সদর বন্ধ দেখলে, মানুষ খিড়কি দুয়ারে ভিড় করে।

১৯৬৫-র পর দুই বাংলার মানুষের সঙ্গে চলছে তেমনি এক ঘুরপথের খেলা। দেশভাগের পরেও যে-সম্পর্কটা ছিল সহজ, ছিল সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ব্যবস্থা—ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ সেই সম্পর্কটাকে ঘোলাটে করে দিয়ে গেছে। দীর্ঘ ছয় বছরেও রাষ্ট্রীয় ব্যবধানের কোনো মৌলিক পরিবর্তন হলো না। দুই বাংলার মানুষ ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে তাই নিয়ে। ঢাকার পাঠক কলকাতার বই পড়তে চান; পশ্চিমবাংলার মানুষ চান পূর্ববাংলার কণ্ঠস্বর শুনতে।

বছর দেড়েক আগে, 'ইত্তেফাক'-এর স্টাফ রিপোর্টার এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন: 'ঢাকার বাজার আবার পুনর্মুদ্রিত ভারতীয় বইয়ে ছেয়ে গেছে। এর আগে, ভারতসহ যে-কোনো বিদেশী বইয়ের পুনর্মুদ্রণ বিশেষ অনুমতি ছাড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিদিনই অজ্ঞাত জায়গা থেকে ছাপা হয়ে ভারতীয় বইগুলি বাজারে বিক্রয়ের জন্য চলে আসছে। বর্তমানে ঢাকার ফুটপাথে, রেল স্টেশনে, ও লঞ্চ ঘাটে বইগুলি বিক্রী হয়। বিক্রীর কৌশলও অভিনব। প্লাস্টিকের ঝুড়িতে বই নিয়ে বিক্রেতারা ফেরি করে। যে-বইয়ের দাম স্বাভাবিক অবস্থায় এক টাকার বেশী হতে পারে না, সেসব বইয়ের দাম লেখা থাকে আড়াই কিংবা তিন টাকা। ক্রেতাদের কাছে ৩০।৪০ পার্সেণ্ট কমিশনে—কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্ধেক দামে বই বিক্রী করা হয়। ক্রেতারা মনে করেন, একে তো ভারতীয় বই, যা পাওয়াই যায় না, দ্বিতীয়ত অর্ধেক দাম—তাই তাঁরা এক সঙ্গে অনেকগুলি করে কিনে ফেলেন।'

এই সাংবাদিকের ধারণা, 'পুনর্মুদ্রকদের সঙ্ঘবদ্ধ দল আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা মফঃস্বল শহরের প্রেসে বই ছাপিয়ে লাহোর, করাচী বা ঢাকার কোনো ছাপাখানার নাম দিয়ে বের করে। বইগুলির মধ্যে অজস্র ছাপার ভুল। মাঝে মাঝে লাইনের পর লাইন নেই। এভাবে ক্রেতারা জাল প্রকাশকের বই কিনে নিয়মিত ঠকে আসছেন।'

তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্টাফ রিপোর্টার লিখেছেন: '১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আগে পর্যন্ত ভারতীয় বইয়ের পুনর্মুদ্রণ পূর্ববাংলায় নিষিদ্ধ ছিল না। তারা যে-বই এখনো গোপনে বের করছে, তাতেও সেজন্যই ১৯৬৪।৬৫ সালকে প্রকাশের তারিখ হিসেবে উল্লেখ করছে। অধিকাংশ পুনর্মুদ্রিত পুস্তকে যে-ঠিকানা থাকে, তা অসম্পূর্ণ। এমন কি ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবাংলায় প্রকাশিত বইগুলি পর্যন্ত ১৯৬৫ সালের তারিখ দিয়ে পূর্ববাংলায় বেরিয়ে যাচ্ছে।'

কলকাতার প্রকাশকরা অবশ্য এখনো এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে থাকলে, কেউ যে সেই অসাধু উপায় অবলম্বন করবেন না, তাই-বা কে বলতে পারে? এখানকার কবি সাহিত্যিকরা নানাভাবে লেখা সংগ্রহ করে গল্প-কবিতার দু' একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন মাত্র।

### পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ

সম্প্রতি মৈত্রেয়ী দেবীর সম্পাদনায় বেরিয়েছে 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ'। উদ্দেশ্য একটাই, ওপারের মানুষকে জানা, অন্তরের সত্য উপলব্ধি করা। তিনি লক্ষ্য করেছেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলার মানুষকে নতুনতর জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু তার যথার্থ রূপটি আমরা বুঝে উঠতে পারিনি তখন।

সেদিনের কথা বলতে গিয়ে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন: 'সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে পরিষ্কার করার কাজে নেমে সহসা পূর্ব পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকা হাতে পেয়ে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের সংবাদ সামান্য সামান্য এদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তার যথার্থ রূপটি এবং তার ভিতরের অর্থটি আমার কাছে এবং আমার মত বহু ভারতীয় বাঙ্গালীর কাছেই অজ্ঞাত ছিল।'

এজন্য তিনি অভিযোগ করে লিখেছেন: 'যাঁরা সংবাদ সরবরাহ ও সংগ্রহ করেন, তাঁরা জানতেন না—একথা বিশ্বাস হয় না, পূর্ববঙ্গের অগ্রসর সমাজের চিন্তার বিবর্তন অবশ্যই ওয়াকিবহাল মহলের জানা ছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক, সেটা এদেশের জনসাধারণের কাছে প্রকাশ হয়নি। ফলে, এদেশের অধিকাংশ লোকের মনে বিশ বছর আগেকার পাকিস্তান আন্দোলনের চিত্রটিই স্থির ছিল, এবং পাকিস্তান সরকার ও তার জনগণের মধ্যে যে পার্থক্য ক্রমেই প্রসারিত হয়ে দুই পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বিপরীতমুখী হচ্ছে, সে সত্য একেবারেই আবৃত ছিল।...ধর্মরাষ্ট্রের মধ্যে...ধীরে ধীরে সেকুলার চরিত্র গড়ে উঠল।'

ফলে, এই সঙ্কলনের প্রবন্ধগুলিও ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংগৃহীত। পূর্ববাংলার মানুষ যে আজ উপলব্ধি করছেন—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীই মূলত একই মাটির সন্তান, অন্তর্নিহিত ঐক্যে বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক— তাই যেন মনে পড়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ে। হয়তো, সম্পাদিকা ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষা করে প্রবন্ধগুলি নির্বাচনের সুযোগ পাননি।

ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মন্তব্য করেছেন: 'পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী মহল এখনো দ্বিধাবিভক্ত।

আমরা এ গ্রন্থে একভাগের বক্তব্যই শুনতে পাচ্ছি। অবিমিশ্র ইসলামী গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত বলে কিছু কম সত্য নয়। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট এখনো কাটেনি। দাঙ্গা বাধানো হচ্ছে না বলে কেউ যেন সিদ্ধান্ত না করেন যে রাষ্ট্র কিম্বা দেশ কিংবা জনগণ সেকুলার হয়ে গেছে। বদরুদ্দীন উমরের বই ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

পূর্ব ইতিহাসের নজীর টেনে তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। উদ্ধৃতি দীর্ঘতর হলেও তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত রায় লিখেছেনঃ

চার হাজার বছরের পুরনো সভ্যতা ইরানের। কেন যে ইসলামের খাতিরে কেবল সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে তার সংস্কৃতির রেখা টানবে, তার পূর্ববর্তী আড়াই হাজার বছরকে বাতিল করবে, এর কোনো ন্যায়-সঙ্গত কারণ নেই। তেমনি পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা মিশরের। সেই-বা তার সংস্কৃতির সাড়ে তিন হাজার বছরকে বিসর্জন দিয়ে তেরশো বছরকেই সম্বল করবে কেন? সীরিয়া সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে।'

'পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে এই নিয়ে এখন দুমত। ইসলামের আগমনের পূর্বে থেকে যা আছে, তাকে যাঁরা আমল দিতে চান না, তাঁরা একদিকে। তেমনি অন্যদিকে যাঁরা সমগ্র ইতিহাসকে তথা ভূগোলকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে ইসলামের পুনর্মূল্যায়ন করতে চান। ইউরোপেও এর নজির মেলে। পাঁচশো বছর আগে প্রাক-খৃষ্টান সম্বন্ধেও অনুরূপ দ্বিমত দেখা যায়। একদল খৃষ্টের পূর্ববর্তী গ্রীক ও রোমক উত্তরাধিকারকে আপনার বলে স্বীকার করবে না। আরেক দল তাকেও মহামূল্য মনে করবেন।...এতদিনে এই দ্বিতীয় দলটিই জিতেছেন। কিন্তু একদিনে জেতেননি। খৃষ্টশিষ্যরা বাধা দিয়েছেন।'

পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত আগে-পরে পূর্ববাংলার মুসলমানদের মনে এমনি একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছিল হয়তো। পরে, প্রাথমিক উত্তেজনার পর্ব শেষ হলে বুদ্ধি-জীবী মহলে, নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। এখনঃ 'ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির মোহ যদিও কারো কারো মন জুড়ে রয়েছে, তবু তার সেই একচ্ছত্র দাপট আর নেই। দেশভিত্তিক লোক-ভিত্তিক সংস্কৃতির দিকেও সাধারণের দৃষ্টি পড়ছে।' অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেনঃ

'পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় পালার নাম 'রূপবান'। রেকর্ডে ও ফিল্মে ওর সমকক্ষ নেই। অথচ ওর কথাবস্তু আরব পারস্য থেকে আসেনি, আসেনি উর্দু থেকে। ওটা মুঘল দরবারেরও কিসসা নয়। আমাদেরই চিরপরিচিত মালঞ্চমালা।' অনুক্রমে 'ঠাকুমার ঝুলি'র সব কটা কাহিনীই মুসলমান্তরিত হয়ে গেছে।...সবই পূর্ব বাংলার মাটির ফসল।'

'পূর্ব পাকিস্তানে এই যে ব্যাপারটা চলছে, এটাও একপ্রকার রেনেসাঁস। এর থেকেই আসবে একপ্রকার রেফরমেশান; ইসলামের তথা ইসলামী শাস্ত্রাদির পুনর্মূল্যায়ন। ওই স্টেজটা এখনো আসেনি, তবে এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে কোরান শরিফের তর্জমা দিয়ে। যেমন জার্মানীতে হয়েছিল বাইবেলের অনুবাদ দিয়ে। পবিত্র ভাষা আরবী সম্বন্ধেও মোহভঙ্গ হয়েছে। বাংলার উপর টান এখন তার চেয়েও বেশী। লোকে বাংলার জন্য জান দিতে পেরেছে ও পারে। আরবীর জন্য একটি মানুষও মৃত্যু বরণ করবে না।'

## ধর্মনিরপেক্ষতা ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

মাস কয়েক আগে, কাজী আবদুল ওদুদ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আমাকে বলেছিলেন, বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে বুদ্ধির মুক্তি সম্পর্কে চেতনা এসেছে অনেক আগে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে আসেনি। ওঁর সম্পর্কে লিখুন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ওদুদ সাহেব অন্যতম।

আমি তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করার সুযোগ পাইনি। অল্প কয়েকদিন পরেই ওদুদ সাহেব মারা যান। এ সংকলনের প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে কেবল তাঁর কথাই মনে পড়ছে। 'বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্কট প্রসঙ্গে বদরউদ্দীন উমর লিখেছেন ঃ

'বাঙালীত্ব এবং মুসলমানত্বের মধ্যে বিরোধের কল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্ট। উনিশ ও বিশ শতকে সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে, সম্প্রদায়গত বিরোধ যত তিক্ত এবং তীব্র হলো, মুসলমানরা ততই সরে আসার চেষ্টা করলো বাংলার সংস্কৃতি থেকে। তাঁদের কাছে বাংলার সংস্কৃতি মনে হলো বিধর্মী, কাজেই বিজাতীয়। বাংলাদেশের হিন্দুরা যেহেতু নিঃসন্দেহে বাঙালী এবং মুসলমানেরা যেহেতু হিন্দুর থেকে পৃথক জাতি, সেহেতু তারা বাঙালী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না। সে পরিচয় দিতে সক্ষম হলে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ কখনই তীব্র আকার ধারণ করতো না।...কিন্তু সেটা না হয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করলো এবং তার ফলে মুসলমানেরা বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দিতে দ্বিধা এবং সঙ্কোচই নয়, অনেক ক্ষেত্রে ঘৃণাও বোধ করলো।'

বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বদরউদ্দীন উমর লিখেছেনঃ 'উনিশ শতকে হিন্দু মধ্যবিত্তের সমাজে দেশজ এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যোগাযোগ স্থাপনের ফলে সৃষ্টি হয় অনেক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের, যেগুলির দ্বারা বাংলার সংস্কৃতি হয়ে ওঠে অনেক সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময়। মুসলমানদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক চেতনার ক্ষেত্রে তেমন কার্যকরী অথবা ফলপ্রসূ হলো না। এর প্রধান কারণ, একদিকে তাদের ইংরেজ বিদ্বেষ, এবং অন্যদের প্রতি বিরূপতা। মুসলমান নবাব বাদশা ও আমীর ওমরাহদের পতনের পর অভিজাত এবং উচ্চবিত্ত বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যে এ সময় ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ দেখা দেয়। এর ফলে তারা হয়ে ওঠে একদিকে ইংরেজ এবং অন্যদিকে হিন্দু বিদ্বেষী। ইংরেজ বিদ্বেষের ফলে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অনেক ক্ষেত্রে হয় বিরূপ মনোভাবাপন্ন। আবার হিন্দু বিদ্বেষের ফলে তারা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বাংলার সংস্কৃতি থেকেও নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। পাশ্চাত্য এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রায় অস্বীকার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা গঠন করতে উদ্যত হয় তাদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি। এ প্রচেষ্টা যে কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক, সেটা তার ব্যর্থতার দ্বারাই অনেকাংশে প্রমাণিত হয়।'

অবশেষে তিনি একটি কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করে এই সঙ্কটের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন, 'আমরা বাঙালী না মুসলমান?' তাঁর মতে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে হিন্দুদের থেকে নিজেদের পৃথক করে দেখার মধ্যেই এ প্রশ্নের উদ্ভব এবং সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যেই এ চিন্তার বিকাশ।

বিভাগোত্তর কালে বাঙালী মুসলমানের জীবনচেতনায় এই পরিবর্তন যে আসবে বা আসা-সম্ভব, তা আমার কাছে ছিল একদা অ-ভাবিত। যেন চূড়ান্ত এক পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এখন দাঁড়িয়ে আছেন পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এই জাগরণের মূলে কোনো ধর্ম-অধর্ম নেই, পূর্বার্জিত কোনো সংস্কারবোধ নেই, আছে জীবনকে পুনর্মূল্যায়নের সুগভীর আকাঙ্ক্ষা। সেজন্যই আসাদ চৌধুরী রবীন্দ্র প্রসঙ্গে লিখতে পারেনঃ 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় মুসলমানদের সংরক্ষণে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনটি কোন বাঙালী মুসলমান দিতে পারেননি। এমন কি স্বয়ং মুহম্মদ আলী জিন্নাহও নন, অন্তত সে

সময় তো নয়ই। যে-পরিমাণে কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি এখনো ভারতীয় নাগরিক, যিনি ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানদের স্বার্থের ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে উদাসীন, তাঁকে নিয়ে আমাদের মমত্ববোধের কারণ বোধ করি তিনি মুসলমান। রবীন্দ্র বর্জনে উৎসাহী সাহিত্য ও সমাজসেবক এই বিচারে তেমন আগ্রহী নন। নজরুলের প্রতি অসম্মানজ্ঞাপন বা ভুল তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব না নিয়েও আমরা বলব, রবীন্দ্রনাথের প্রতি বোধ করি এতদিন সুবিচার করিনি। বিশ বছরের জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও যদি আমাদের মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না হয়—সে দোষ 'সাম্প্রদায়িক', রবীন্দ্রনাথের নয়।'

অর্থাৎ একটি সার্বিক মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে পূর্ববাংলার বাঙালী মুসলমানের জীবনে, চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। না হলে, মূর্তিপূজা বিরোধী মুসলমান লেখকের কলম দিয়ে বেরুতো না সুন্দরবনের প্রাচীন মন্দিরের ওপর আলোচনা। এই সঙ্কলনে গৃহীত হয়েছে 'প্রাচীন বরেন্দ্রীয় মা ও শিশু মূর্তি'র ওপরে লেখা মুখলেসুর রহমানের একটি প্রবন্ধ।

আবুল ফজল ঘোষণা করেছেন: 'রক্ষণশীলতার আয়ু কোনো সময়ই দীর্ঘ নয়।... বেঁচে থাকতে হলে সংস্কৃতিকে জীবন্ত হতে হবে, হতে হবে লিভিং। দৈনন্দিন আচার-আচরণে আর বিশ্বাসে তা যদি বাস্তবায়িত না হয়, তেমন সংস্কৃতির মৃত্যু কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।'

**অন্তর্ভুক্ত রচনা ও সঙ্কলনের সার্থকতা**

এই সঙ্কলনে ছাপা হয়েছে মোট ১৩টি প্রবন্ধ। প্রতিটিই বিভিন্ন দিক থেকে মূল্যবান। বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই বলে আমি এখানে সব কটি প্রবন্ধেরই নাম উল্লেখ করছি মাত্র। বিষয়ের বৈচিত্র্যে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে বলে আমার মনে হয়।

১। আমাদের বাংলা উচ্চারণ: মুহম্মদ আবদুল হাই।

২। বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্কট: বদরুদ্দীন উমর।

৩। সংস্কৃতি, আমাদের উত্তরাধিকার: আবুল ফজল।

৪। রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ: আসাদ চৌধুরী।

৫। পঁচিশে বৈশাখ: ডক্টর আহমদ শরীফ।

৬। প্রাচীন বরেন্দ্রীয় মা ও শিশুমূর্তি: মুখলেসুর রহমান।

৭। ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ: সারওয়ার মুর্‌শিদ।

৮। ইংরেজীর ভবিষ্যৎ: জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী।

৯। সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব: কাজী মোতাহার হোসেন।

১০। উর্দু ইতিহাস-সাহিত্য: আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ।

১১। প্রতিভাবানের প্রতীক্ষায়: আবুল কাসেম ফজলুল হক।

১২। লালন শাহের জীবনকথা: এস এম লুৎফর রহমান।

১৩। সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি: ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

পরিশিষ্টে প্রদত্ত লেখক-পরিচিতির পৃষ্ঠাগুলি পর্যন্ত মূল্যবান।

মৈত্রেয়ী দেবী এ সঙ্কলনের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে অচেতন নন। ভূমিকায় তিনি উল্লেখ ক'রছেন: 'বর্তমান সংকলনে আমরা যথেষ্ট বাছাই করার সুযোগ পাইনি। হাতের কাছে যা এসে পড়েছে, তার থেকেই নির্বাচন করতে হয়েছে।' আমি কিন্তু সাম্প্রতিক পূর্ববাংলার গল্প, কবিতা ও উপন্যাসের ওপর বিস্তৃত আলোচনা আশা করেছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন একটি প্রবন্ধও সম্পাদিকা সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ না ছাপলেও চলতো।

পড়ার পর সমস্ত ক্ষোভ নিঃশেষিত। পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী মানুষের যে কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি, তা অন্য দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়ে চলেছে এখন। আর এই প্রবন্ধগুলি যেন সেই জাগরণের প্রচ্ছন্ন ঘোষণাপত্র। এপারের পাঠক গ্রন্থটিকে সমকালীন পূর্ববাংলার 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'-এর একটি দলিল-সংকলন বলে গ্রহণ করতে পারেন।

—গ্রন্থদর্শী
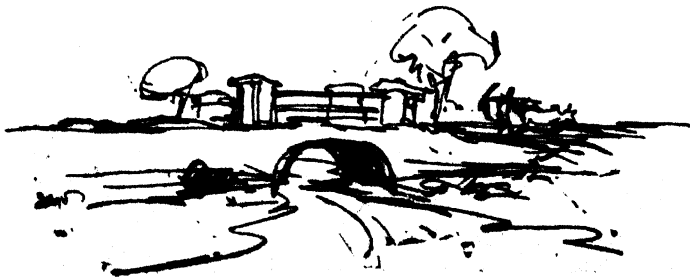
দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পঙ পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই নেপালী ভাষাভাষী। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে মিশ্র সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত। তিব্বতী, ভূটিয়া, সিকিমী সংস্কৃতির সঙ্গে রয়েছে ভারতের নানা প্রান্তের সংস্কৃতি; বিশেষ করে বঙ্গ সংস্কৃতি সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। দার্জিলিং-এর নেপালী ভাষাভাষীদের পূজাপার্বণের ওপর মূল নেপালের পূজা-পার্বণের প্রভাব ছাড়াও রয়েছে কিছু বৌদ্ধ প্রভাব ও বাঙালী পূজাপার্বণ উৎসবের প্রভাব।

বাঙলাদেশে বারো মাসে তেরো পার্বণ প্রবাদটি সুপরিচিত। নেপালীদের ক্ষেত্রে বলতে হয় বারো মাসে চোদ্দ পার্বণ। আরো একধাপ বেশি। নেপালীরা উৎসব-প্রিয় জাতি। যে কোন উপলক্ষে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠতে পারলেই হল। এখনো এরা ধর্মপ্রাণ ঈশ্বরবিশ্বাসী, প্রকৃতির অনেক কাছের, আপনজন। পূজাপার্বণ, ব্রতকথা, তুকতাক, মন্ত্রপাঠ, প্রায় প্রতিটি নেপালী পরিবারের অন্তরঙ্গ চিত্র। ধর্মে অবিচল নিষ্ঠা, ঈশ্বরভক্তি আছে বলেই শত কর্ম, দুঃখ, দুর্দশার মধ্যেও পূজা-পার্বণকে এরা জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িয়ে নিয়েছে। ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকতা, মানবপ্রেম দুটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হচ্ছে।

বৈশাখ সংক্রান্তি বা মেষ সংক্রান্তি একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে পরিষ্কার বেশভূষা পরে বিভিন্ন দেবদেবী দর্শন, পূজাপাঠ ইত্যাদি করা হয়। শ্রীসত্য-নারায়ণের পূজা করা হয় ঐদিন। অনেকে উপবাস করেন। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়ার দিন অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব। ওদের কাছে এটি অত্যন্ত পবিত্র দিন। এইদিনে জপ, হোম, যাগযজ্ঞ, পূজাপাঠ, দান ইত্যাদি যা কিছু করা হয় তার ফল অক্ষয়। অনেকে এইদিনটিকে 'যুগারম্ভ' বলে থাকেন। কথিত আছে, এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে সত্য যুগের আরম্ভ হয়েছিল। ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখ আছে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নারায়ণ পূজা করে জলপূর্ণ কলস দান করলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয় এবং সূর্যলোকে পৌছান যায়।

বৈশাখ মাসের অমাবস্যায় পালিত হয় 'মাতৃ-আউঁসি' বা মাতৃদিবস। বৌদ্ধগ্রন্থ 'বুদ্ধোত্ত কম্মম'এ এই উৎসবের উল্লেখ আছে। এইদিনে ছেলেমেয়েরা মাতৃপূজা করে, মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করে।

সিঠী চাড় জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে এইদিনই মহাদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র কার্তিকের জন্ম হয়।

প্রত্যেক মাসের সংক্রান্তির দিনটিকে পুণ্যদিন হিসেবে দেখা হয় এবং ঐদিন স্নান, দান, দেবমূর্তি দর্শন, দেবালয় পরিভ্রমণ করার রীতি আছে। শ্রাবণ-সংক্রান্তি বা সাউকে সংক্রান্তি বা কর্কট সংক্রান্তি আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্বণ।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীর দিন ঘন্টাকর্ণ পূজো করা হয়। এরা বলে 'গঠামুগল'।

শ্রাবণ মাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে 'নাগপঞ্চমী' পালিত হয়। এইদিনে প্রতি গৃহের দরজার ওপর নাগের ছবি টাঙান হয়। গোবর দিয়ে এই ছবি টাঙান হয়।

হরেন ঘোষ

এরপর সুপুরি, দুধ ও দুর্বা দিয়ে পূজা করা হয়। এইভাবে পূজা করলে এক বছর পর্যন্ত সর্পভয় থাকে না।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে অষ্টমী পর্যন্ত আটদিনব্যাপী চলে গাই-যাত্রা। কোন বাড়ির মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করে গাভী নিয়ে বা তার প্রতিকৃতি নিয়ে বেরোয় মিছিল।

পঞ্চদান উৎসবে বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে এই উৎসব উদযাপিত হয়। বুদ্ধদেবের প্রতি সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে এইদিন।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ-অমাবস্যায় ব্রাহ্মণরা পবিত্র কুশ পূজা করেন এবং এই কুশ বাড়ির দরজার ওপর রেখে দেন। যে কোন পবিত্র কর্মে কুশের প্রয়োজন হয়, তখন এই কুশ নেওয়া হয়। এই উৎসবকে 'কুশে অউঁসি' বা 'গোকর্ণ অউঁসি' বলা হয়।

ব্রতার্ক নামক ধর্মগ্রন্থে হরিতালিকা বা তীজ উৎসবের উল্লেখ আছে। পার্বতীর বিবাহের জন্যে পিতা হিমালয় বিষ্ণুকে পাত্র মনোনীত করেন কিন্তু পার্বতী পতিরূপে পেতে চান মহাদেবকে। মহাদেবকে পার্বতীর পতিরূপে কামনা করাই হল তীজ উৎসবের উদ্দেশ্য।

ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীর দিন গণেশ পূজা করা হয়। এই পূজা গণেশ-চতুর্থী বা চথা নামে পরিচিত। 'অগ্নি-পুরাণ পীযূষধারায়' গণেশ পূজার রীতি-নীতি ব্যাখ্যা করা আছে। অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে মিষ্টান্ন ও দুর্বা ইত্যাদি উপাচার সহযোগে এই পূজো করা হয়। এইদিন সন্ধ্যায় যদি গায়ে চাঁদের কিরণ লাগে তাহলে সারা বছর চোর অপবাদ সইতে হয়। সেজন্যে সন্ধ্যার আগে থেকেই সকলে দরজা বন্ধ করে রাখে। আবার এই রাত্রে যদি চোরেরা অসফল হয় তাহলে সারা বছর অসফল হয়। বিশেষ করে বাগানের শশা কুমড়ো ইত্যাদি চুরি করা হয় এই রাত্রে।

ঋষিপঞ্চমী মহিলাদের উল্লেখযোগ্য ব্রত। ঋষিশ্বর মহাদেবকে পূজো করেন মহিলারা। তাঁরা এই দিন ব্রাহ্মণভোজন করান।

এরপর আসে 'দশৈ'। সারা বছর সকলে আকুল আগ্রহে 'দশৈ'-এর প্রতীক্ষা করে। প্রায় প্রত্যেকেই সারারাত কিছু না কিছু সঞ্চয় করে রাখে এই সময় মনের ফুর্তিতে দরাজ হাতে খরচ করবে বলে। দূরের মানুষ ঘরে ফেরে। সবাই কাজ ছেড়ে ছুটির আনন্দে মেতে উঠতে চায়। 'দশৈ'-র মহোৎসব। আশ্বিন মাসের প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত এই দশদিনব্যাপী এই উৎসব উদ্যাপিত হয় বলে এর নাম 'দশৈ'। দশমীর দিন অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র স্বীয় পত্নী অপহরণকারী লঙ্কাপতি রাবণকে জয় করেন এবং অসুরশক্তি বিনাশ করেন। এইদিন বিজয়া-উৎসব। এই দিনটিকে 'টীকা-উৎসব'ও বলা হয়। বাবা, মা ও অন্যান্য গুরুজন দই ও চালের ফোঁটা দেন ছোটদের কপাল জুড়ে। এই বিজয়-তিলক পরে মনের আনন্দে সবাই ঘুরে বেড়ায়। এইদিন শত্রু-মিত্রের ভেদ থাকে না, সবাই আপন হয়ে যায়। বর্তমানে বাঙালী প্রভাবে দুর্গা পূজাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এরপর আসে যমপঞ্চক বা তিহার উৎসব। তিহারের সময় যমরাজা পাঁচদিন নিজের সব কাজকর্ম বন্ধ রেখে নিজের ছোট বোন যমুনার বাড়িতে অবসরযাপন করেন। সকলে আগে থেকে বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে, রঙ লাগায়, গাঁদা ফুলের মালা, পাতাবাহার দিয়ে ঘর সাজায়। দরজায় কলাগাছ বসায়। এরপর প্রদীপ জেলে দেন অজস্র।

তিহার উৎসবকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে আশ্বিন কৃষ্ণ দ্বাদশীর দিন গণেশ পূজা, ত্রয়োদশীর দিন কাক পূজো, চতুর্দশীর দিন কুকুর পূজো ও স্বাতীনক্ষত্র সংযুক্ত অমাবস্যার দিন সকালে গাভী পূজো করা হয়। এই রাত্রে হয় লক্ষ্মীপূজো। তারপর কার্তিক মাসের শুক্ল-প্রতিপদের দিন সকালে গোবর্ধন বা বলী পূজো করা হয়। দ্বিতীয়ার দিন,

দিদি ছোট ভাইকে এবং ছোট বোন দাদার কপালে ফোঁটা দেয়। এরপর সাঙ্গ হয় তিহার উৎসব। এরপর আসে ধান্য পূর্ণিমা। নবান্ন উৎসবের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের মিল আছে। তারপর মকর-সংক্রান্তি। এইদিন তিলের নাড়ু ও ঘৃত-জাত সুখাদ্য প্রসাদ হিসেবে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমীতে দেবী সরস্বতীর আরাধনা করা হয়। শিবরাত্রি একটি পরম পবিত্র পর্ব। নেপালীরা মহাদেবকে নানা নামে আরাধনা করে থাকে। শিব, রুদ্র, মহেশ ছাড়া এদের কাছে জনপ্রিয় নাম পশুপতিনাথ।

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত ফাল্গুন মহোৎসব বা হোলি-উৎসব পালিত হয়। এরপর আসে ঘোড়েযাত্রা ও পিশাচ চতুর্দশী। বছরের শেষ উৎসব চৈত্র দশৈ ও রামনবমী।

বুদ্ধ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত লাখে নাচ বা মুখোশ নৃত্য ইদানীং খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বৈদিক দেবদেবীর পাশাপাশি লৌকিক দেবদেবীর প্রতিও শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদর্শন করেন নেপালীরা। সারা বছরেই চলে নানা পুজা-পার্বণ উৎসব।

পুজা-পার্বণ ও ব্রত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায় সকলে, হতে চায় কলুষ-মুক্ত। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের নেপালীরাও সারা বছর নানা পুজা-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে থাকেন।

(৩৪)

গাছ পাতার ফাঁকে সূর্যের আলো—ছায়া ছায়া ভাব, হেমন্তের শীত। সোনা চিঠি হাতে অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। শীত এসে যাচ্ছে বলে সকাল সকাল দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। চিঠিটা অমলা লিখেছে। নতুবা কে তাকে চিঠি দেবে! অমলার কথা মনে হলেই সে নীল রঙের আবছা আলো, পুরানো পাঁচিলের গন্ধ টের পায়। সেই ভাঙা কুঠির অন্ধকার এবং অমলার মুখ, চোখ, শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চোখের উপর ভেসে ওঠে। তার ভিতরে কেমন একটা অনুভূতি হয়—মনে হয় জ্বর আসছে কম্প দিয়ে। শীত করছে। সে, ভিতরে, ভিতরে মায়ের মুখ মনে ভাবলে শক্ত হয়ে যায়। সে একটা পাপ কাজ করে এসেছে। মা বুঝি টের পেয়েছে। মুড়াপাড়া থেকে ফিরে আসার পরই মা ভালভাবে কথা বলে না। মা যেমন ওর সামান্য অসুখ করলে মুখ দেখে টের পায়, তেমনি টের পেয়ে গেছে। গায়ের গন্ধ শুঁকে মা টের পাচ্ছে বুঝি আর সোনা পবিত্র নেই। সোনা মুড়াপাড়া থেকে নতুন একটা অসুখ বাঁধিয়ে এসেছে।

সোনা বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকল। আজ সে খেলতে গেল না পর্যন্ত। প্রতাপ-চন্দের মাঠে ভলিবল নেমেছে। সোনা খেলে না। বোধহয় আগামীবার সে খেলতে পাবে। এখনও সে মাঠ থেকে বল কুড়িয়ে দেয়। এবং খেলা শেষ হলে ওর মতো সমবয়সীরা মাঠে নেমে কিছুক্ষণ বল নিয়ে লাফালাফি করে—সেই লাফালাফির নেশাও কম নয় তার। বিকেল হলেই সে ছুটবে। কিন্তু এই চিঠি সারাক্ষণ তাকে নানাভাবে বিব্রত করছে। সে কোথাও এমন গোপন জায়গা খুঁজছে যেখানে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়লে কেউ টের পাবে না। সে চিঠি পড়ে অমলাকে লিখবে, তুমি আমাকে আর চিঠি দিও না। কারণ সোনার ভয়, অমলা হয়ত লিখবে, তুই কাউকে বলে দিসনি তো! এসব কথা কিন্তু কেউ কখনও বলে দেয় না। বলতে নেই। শুধু আমি তুই জানি। আবার যখন তুই মুড়াপাড়া আসবি তখন আমরা আরও বড় হয়ে যাব। কি মজা হবে না তখন!

সোনা শোবার ঘরে ঢুকে আয়নায় নিজের মুখ দেখল। সে মাঝে মাঝে আজ-কাল চুরি করে আয়নায় মুখ দেখছে। আয়না ধরলেই মা জ্যাঠিমা রাগ করেন। জ্যাঠিমা বলবেন, কি এত মুখ দেখা! এমন ছোট বয়সে এত বেশি মুখ দেখতে নেই। কখনও বলবেন, আয়না ধরবে না সোনা। তোমাদের জ্বালায় কিছু রাখা যায় না। সব ভেঙে ফেলছ। সে চুরি করে মুখ দেখছে। মা বিছানায় শুয়ে আছেন। সোনা টেবিলের ধারে কি খুট খুট করছে। ধনবৌ মাথা তুলে দেখল, সোনা নিবিষ্ট মনে আয়নাটা মুখের কাছে এনে দেখছে। নানা-ভাবে দেখছে মুখ। চোখ বড় করে, কপাল টান টান করে দেখছে। টেবিল থেকে চুরি করে মার স্নো মাখছে। সুন্দর করে চুল আঁচড়ে সে বিছানার দিকে তাকাতেই মায়ের চোখে চোখ পড়ে গেল। ভারি লজ্জা পেল সোনা। ধনবৌ ছেলের সাজগোজ দেখে কাছে ডাকল। সোনা কাছে গেলে চুলটা আরও ভালো করে পাট করে দিল। স্নো যেখানে মুখের সঙ্গে মিশে যায়নি, সেটা সুন্দর নরম হাতে মিলিয়ে দিল। বড়বৌ এসেছে দেশলাই নিতে। এসে দেখল মা ছেলেকে সাজিয়ে দিচ্ছে। এই অবেলায় সোনা কোথায় যাবে! অন্যদিন এ-সময়ে খেলার জন্য ওকে কিছুতেই আটকে রাখা যায় না বাড়িতে। সে জামা কাপড় না পাল্টেই ছুটতে থাকে মাঠের দিকে। তাকে ধরে রাখা যায় না গোপাটে নেমে গেলে বড়বৌ ডাকবে, সোনা, লক্ষ্মী আমার, কাপড় জামা পরে যা। ঠাণ্ডা লাগলে জ্বর হবে। কে কার কথা শোনে। সে ছুটে মাঠে নেমে যায়।

অথচ আজ সোনা খেলার মাঠে যায়নি। বড়বৌ সামান্য বিস্মিত হল। বড়বৌ বলল, কিরে সোনা, মাঠে খেলতে গেলি না।

সোনা মাকে, জ্যাঠিমাকে দেখল। সে কিছু বলল না। সন্তর্পণে পকেটে হাত রাখল। নীল রঙের খামটা ওর পকেটে। সে তাড়াতাড়ি এ-ঘর থেকে পালাতে চায়। সোনা বের হবার মুখে শুনল, জ্যাঠিমা বলছেন, সোনা তোমার মাকে এক গ্লাস জল এনে দাও।

সোনার ভারি রাগ হল মায়ের উপর। মা ফাঁক পেলেই শুয়ে থাকে। শরীর খারাপ। কি যে অসুখ মায়ের সে বুঝতে পারে না। অন্য অনেকদিন সে চুরি করে আয়নায় মুখ দেখলে মা তাকে কাছে ডাকে, তাকে সাজিয়ে দিতে চায়। সে কাছে যায় না। গেলেই ধরা পড়ে যাবে এমন ভয়ে সে দূরে থাকে। নিজেই মাথার চুলটা ঠিক করে নেয়। মা রোগা হয়ে যাচ্ছে। ভাত খেতে চায় না। বড় জ্যাঠিমা সাধ্য সাধনা করে দুমুঠো ভাত খাওয়ান। মার সেই খাবার দৃশ্য দেখলে সোনার কান্না পায়। খেতে খেতে কোনদিন মা মালসাতে বমি করে ফেলেন। মার জন্য সে যে কি করবে ভেবে পায় না। অথচ আজ এই জল আনতে বলায় মার উপর ওর ভীষণ রাগ হচ্ছে। কি দরকার ছিল বলা জ্যাঠিমাকে, জল দিতে। জ্যাঠিমার হাতে গৃহের কাজ। সেজন্য তিনি সোনাকে জল দিতে বলছেন। সে বের হয়ে যাবার পর কেন মা জল চাইল না। সে এখন পাল বাড়ির পুকুর পাড়ে চলে যাবে। পাড়ে পাড়ে কত লটকন গাছ। ছোট ছোট গাছের ডাল সে অনায়াসে বেয়ে উপরে উঠে যেতে পারে। এত ঝোপ ডালপালার মাথায় যে সে যদি কোন ঝোপের

ভিতর বসে চিঠিটা পড়ে তবে কেউ টের পাবে না।

তার এখন তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে। সাঁঝ নামলে সে দূরে কোথাও যেতে পারে না। ভয় হয়। আর এসময় মা বলছেন জল দিতে। সে জল না দিয়েই চলে যেত, কিন্তু ঈশম বলেছে, জল না দিলে পরের জন্মে মাছরাঙা হয়। সে কিছুতেই মাছরাঙা হতে চায় না। সে মাছরাঙা হবার ভয়ে মার শিয়রে জল এনে রেখে দিল।

দরজার মুখে এলেই ধনবৌ আবার ডাকল, সোনা।

সোনা পিছন ফিরে তাকালে ধনবৌ বলল, কৈ যাবি?

সোনা বলল, কোনখানে যামু না।

—আমার শিয়রে একটু বসবি? আমারে বাতাস দিবি? শরীরটা আমার ভাল না।

একথা শুনে সোনার রাগ বাড়ছে। সে সব সময়ই মায়ের অনুগত। মেজদার মতো সে নয়। মেজদাকে মা কোন কিছু করতে বললেই পারবে না বলে চলে যায়। মা নিরীহ স্বভাবের। মেজদা শুধু ছোট কাকাকে ভয় পায়। সোনাই মার ফুট ফরমাস খেটে দেয়। অথচ আজ তার এমন কথার রাগে কান্না পাচ্ছে।

এবং এখন এই যে এত কথা মা তাকে বলছে, সে শিয়রে বসে থাকলে মায়ের খুব ভাল লাগবে, মার একা-একা ভাল লাগছে না, বাবাকে মা রাতে চিঠি লিখেছে, এই নিয়ে সে তিনটে চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে এসেছে—অথচ বাবা একটা চিঠির জবাব দেয়নি, আর কিছুক্ষণ মার কাছে থাকলেই জানবে হাঁরে সোনা পিয়ন আইছিল?

বাবার চিঠি এলেই মা সেদিন খুব সুন্দর সাজে। ভাল কাপড় পরে। লাল বড় সিঁদুরের টিপ কপালে এবং চুলে নানারকম ক্লিপ এঁটে মা বাবার জন্য কেবল কি প্রার্থনা করে।

সে আর মায়ের কাছে গেল না। কাছে গেলেই সে ধরা পড়ে যাবে। তার পকেটে একটা নীল খামের চিঠি। সে বলল, আমার ভাল লাগে না। সে মায়ের সঙ্গে এই প্রথম মিথ্যা কথা বলল, আমি মাঠে খেলতে যামু মা।

ধনবৌ এবার উঠে বসল। মুখে খুব অরুচি। কিছু খেতে ভাল লাগে না। আমলকি খেলে জীভের স্বাদ ফিরে আসতে পারে। সে বলল, সোনা আমার লাইগা আমলকি আনবি? মাঝি বাড়ির আমলকি গাছে খুব আমলকি হইছে।

মাঝিদের বাড়িতে আমলকি গাছ। সোনা গাছটা চেনে। সময়ে অসময়ে গাছটার ফল ধরে থাকে। সে ভাবল মার জন্য দুটো আমলকি চেয়ে নেবে। সে কতদিন আমলকি ফল খেয়ে জল খেয়েছে। আমলকি খেয়ে জল খেলেই মিষ্টি মিষ্টি লাগে জলটা। সে একটা আমলকি খেত, এবং এক ঢোক জল খেত।

এতক্ষণ মা তাকে এই অন্ধকার ঘরে আটকে রাখতে চেয়েছিল, যেমন অমলা তাকে একটা অন্ধকার ঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল—তখন চরাচরে কদম ফুল ফোটে, কদম ফুল ফুটলেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়—কেমন যেন একটা নতুন অসুখের জন্ম হচ্ছে শরীরে। ভালোবাসা, ভালো লাগার—কি একটা ব্যাপার, সে বুঝতে পারছে না, ছুঁতে পারছে না নিজেকে—কেবল ঘুরে ঘুরে লটকনের ডালে ডালে সে একটা নিরিবিলি ঝোপ পেতেই চিত হয়ে ডালের উপর শুয়ে পড়ল। কেউ গাছের নিচে হাঁটছে। সে তাড়াতাড়ি আবার চিঠিটা লুকিয়ে ফেলল। তারপর মুখ নিচু করে দেখল, না কেউ নেই। গাছের মাথায় একটা সাদা বক এসে বসেছে। সে যে এক বালক, অমলার চিঠি নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে বকটা টের পায়নি। সূর্যের মুখে মুখ করে বসে আছে। কুক কুক শব্দ করছে।

সোনা খুব যত্নের সঙ্গে নীল খামটা খুলল। জায়গাটা যথার্থই নির্জন। গ্রামের এটা উত্তর দিক। শীতকালে ভালো রোদ পায় না। পালেদের বাঁশবাগান সামনে। পশ্চিমে ছোট একটা নালা। এখনও জল আছে নালাতে। কত রকমের সব হেলাঞ্চা কলমি লতা এবং জল সেঁচ আর কত সব ফড়িঙ বিচিত্র বর্ণের। হেমন্তের পরই শীত আসবে। শীত শেষ হলে নালাতে জল থাকবে না। তখন সোনা এবং সকলে খাল পার হয়ে খেলার মাঠে যাবে।

এই খালটার জল আছে বলে এখনও এ-পথে মানুষ নেমে আসে না। সোনা পাড়ে পাড়ে সব লটকন গাছ দেখতে পাচ্ছে। গাছে গাছে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে আসবে—কতবার শীতের শেষে ওরা গাছের নিচে বসে থাকত নীলকণ্ঠ পাখি দেখবে বলে। কিন্তু পাখি এল না। সূর্যাস্ত হল। কোন কোন-দিন সাদা জ্যোৎস্নায় সে ঈশমের হাত ধরে বের হত। জ্যাঠামশাই সঙ্গে থাকতেন। তালি বাজাতেন হাতে। সোনা ভেবেছিল তিনি তালি বাজালেই ওরা কোন দূরের সরোবর থেকে অথবা পাহাড় থেকে নেমে আসবে। সে নীল খামটা খুলতে গিয়ে একটা পাখির চোখ দেখতে পেল। পাখিটা কি তবে সেই তার নীলকণ্ঠ। যা সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, জ্যাঠামশাই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। চোখে তার কি দুঃখ! সে দেখল পাখিটা সেই পাখি, সাদা পাখি—একটা সাদা বক, সে কক কক করছে। সে খামটা এবার ছিঁড়ে ফেলল।

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। বেশ বড় বড় করে লিখেছে অমলা। ধরে ধরে লিখেছে সোনাকে। সোনার মুখে এসে শেষ হেমন্তের রোদ পড়ছে পাতার ফাঁকে। মা তার শুয়ে আছে ঘরে। মার অসুখ। সে নিতান্ত বালক। সে চিঠিটা পড়ার জন্য এমন একটা গোপন জায়গায় চলে এসেছে।

সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা—প্রিয় সোনা। আশা করি তুই ভাল আছিস। কেমন বড় মানুষের মতো লিখেছে অমলা। কলকাতার মেয়ে। তার তো সবই তাড়াতাড়ি জানার কথা। সে সুন্দর ভাষায় চিঠি তো লিখবেই। প্রিয় সোনা এই কথা ভাবতেই ওর মুখটা লজ্জায় মহিমময় হয়ে গেল। তোর জন্য আমাদের খুব মন খারাপ। কিছু ভাল লাগে নারে। বড় একঘেয়ে। সকালে স্কুল, বিকেলে দুজনে আমরা টেবিল টেনিস খেলি আর রাতে মাস্টারমশাই আসেন! এখানে আসার পর থেকেই বাবা আমাদের সঙ্গে বেশি কথা বলেন না। তারপর কিছু লাইন অমলা কেটে দিয়েছে। এমনভাবে কেটেছে যে সোনা বুঝতে পারল না। আমরা আসার সময় তোর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি। সারা রাস্তায় আমরা কেঁদেছি কারণ আগামী শীতে শুনেছি মা মরে যাবে। তার পেয়ে আমরা চলে এসেছি। এসে দেখি মা একটা সাদা বিছানায় শুয়ে আছেন। আমাদের চিনতে পারছেন না। সাদা চাদরের নিচে মায়ের নীল রঙের পা কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি, কমল মায়ের সুন্দর পা ছুঁতেই দক্ষিণের দিকের জানালাটা খুলে গেল। দেখি সেখানে কার একটা সিল্কভার ওক লাগিয়ে রেখেছে।

কি যে হয়েছে মায়ের!

চিঠিটা পড়তে পড়তে সোনার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে:

মা এখন আমার জানালায় শুয়ে থাকেন। দক্ষিণের জানালাটা কারা খুলে রাখে। দুর্গের রেমপার্ট সেখানে থেকে স্পষ্ট। মনে হয় বাবা আর মাকে কেন কষ্ট দিতে চান না। মা যা ভালবাসেন বাবা তাই করছেন। সারাদিন শুয়ে থাকেন ওঠার ক্ষমতা নেই। গভীর রাতে রেকর্ডে বাবা কিছু ধর্মীয় সঙ্গীত বাজান, আমরা তখন ঘুমিয়ে থাকি। কোন কোন দিন ঘুম ভেঙে গেলে এসব টের পাই।

সকাল বেলাতে বাবা মাকে পাঁজাকোলে বারান্দায় নিয়ে আসেন। নার্সরা তখন কাছে থাকে না। রেলিঙের ধারে বসে থাকেন তিনি। যতক্ষণ না সিলাভারে ওকে রোদ এসে নামবে ততক্ষণ বসে থাকবেন। তারপর কাছটায় রোদ এসে পড়লেই বাবা আবার মাকে খাটে শুইয়ে দেন। যেদিন কলকাতার আকাশে রোদ থাকে না—সেদিন মায়ের যে কি কষ্ট! মার মুখ দেখলেই মনে হয় তখন আজ অথবা কাল তিনি মরে যাবেন।

কেন যে এমন হল সোনা!

মা মরে গেলে আমরা কার কাছে থাকব সোনা!

আমরা স্কুল থেকে এসে কিছুক্ষণ মায়ের পাশে বসি। বৃন্দাবনী মাকে সাজিয়ে

দের রোজ। মা এখন আর বব চুল কাটে না। চুল বড় হয়ে যাচ্ছে। বড় চুলে মাকে যে কি সুন্দর লাগে ! মা আর গাউন পরে না। সাদা রংঙের সিল্ক, লাল পাড়ের সিল্ক, মা সিল্ক পরে সারাদিন বড় খাটে প্রার্থনার ভঙ্গীতে শুয়ে থাকেন। আমরা ডাকি, মা মা ! মা আমাদের সঙ্গে কোন কথা বলেন না। বুঝি শুধু দুর্গের রেমপার্টে একটা নীল রঙের পাখি খোঁজেন।

মা বড় করে সিঁদুরের টিপ পরেন। কিটসের কবিতা মায়ের খুব পছন্দ। আমরা পায়ের কাছে বসে ছুটির দিনে কিটসের কবিতা আবৃত্তি করি। মা শুনতে পান কিনা জানি না। বাবা বলেছেন, তোমাদের মা যা ভালবাসতেন তাই করবে। আমরা মাকে আবৃত্তি করে কবিতা শোনাই। সেই সব স্তবক মা র খুব পছন্দ। বাবা সময়ে সময়ে যাই বলেন, সবই মাকে কেন্দ্র করে, বাবার সঙ্গে কার্তিকের কোন পার্কে মার প্রথম দেখা, বাবা মাকে কি বলতেন, বাবা ভারতবর্ষের মানুষ, বাঙালী, কলকাতায় তাদের বাড়ি, বাবা প্রথম মাকে এমনই বলেছিলেন। বাবা বলেন, জানিস না তোর মা কলকাতা বললেই কেমন বিষন্ন চোখে তাকাত।

যেমন সেই স্তবক—

I made a garland for her head,
And bracelets too, and fragrant zone; She looked at me as she did love, And made sweet moan.

কখনও কখনও বাবা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে গলা মেলান।

সোনা কবিতার কোন অর্থ ধরতে পারল না। সে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ল। সোনার স্মৃতিশক্তি প্রবল। সে দুবার পড়তে না পড়তেই কবিতাটা মুখস্ত করে ফেলল।

চিঠিটা পড়তে পড়তে এক সময় সোনা নিজেই কেমন একটা গাছ হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছে সে স্থবির হয়ে যাচ্ছে। কারণ তার মা বিছানায়। মার অসুখ। কিছু খায় না। আগামী শীতে কি তার মাও মরে যাবে! অমলা আমি কি করি! আমিও কি মার পায়ের কাছে বসে থাকব। সেই অন্ধকার ঘরে, অমলার সাপ্টে ধরা, ওর ভাল লাগা, এবং নদীর কাছে গিয়েও পাপ কাজের কথা বলতে না পারা, বলতে পারলে নদী, অর্থাৎ এই জল, জল মানেই জীবন, জীবন হচ্ছে প্রাচুর্যের দেবতা, সে তাকে অভি-শাপ দিত না। অসময়ে তুমি সোনা নদীর পাড়ে হেঁটে গেলে। বন্যা এসে তোমাকে ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে। সোনা নিচে নেমে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। সে বুঝতে পারছে ভিতরে ভিতরে তার বড় কষ্ট হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, মার পায়ের কাছে বসে কমলা অমলা আবৃত্তি করছে। সে কি করবে! মা বলেছে তাকে আমলকি ফল নিতে। সে খাল পাড় এসে প্যান্ট খুলে ফেলল। তারপর খাল পার হয়ে ফের প্যান্ট পরে ছুটল। ঘুরে গেলে রাত হয়ে যাবে। সে খাল পার হয়ে সোজা ঢুকে গেল মাঝি বাড়ি। কিছু আমলকি ফল নিয়ে গাঁয়ের পথে বাড়ির দিকে ছুটে চলল।

সে ঘরে ঢুকেই মায়ের শিয়রে দাঁড়াল। সে খুব হাঁপাচ্ছে। যেন ভয় পেয়ে সে ঘরে ঢুকেছে। অথবা কেউ ওকে পেছনে তাড়া করেছে।

ধনবৌ ছেলের কাতর মুখ দেখে বলল, তর কি হইছে?

সোনা কিছু বলল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে খেলার মাঠে। জানালাগুলো খোলা। দিনের আলো মরে আসছে। সে ফল-গুলো মায়ের হাতে দিল।

ধনবৌ ভেবেছিল, সোনা আমলকি না বলে এনেছে। মাঝিদের কেউ ওকে কিছু বলতে পারে। সে তাই ছুটে পালিয়ে এসেছে। সে তাই বলল, অরা কিছু কইছে তরে!

—না মা। কিছু কয় নাই।

কিন্তু অদ্ভুত, সোনা কিছুতেই ফল হাতে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে না। মায়ের শিয়রে চুপচাপ বসে রয়েছে। ধনবৌ অপলক ছেলের মুখ দেখছে। সোনা যেন কিছু বললেই কেঁদে ফেলবে। ধনবৌ মাথায় হাত রেখে বলল, কিরে তুই কথা কস না ক্যান। কথা না কইলে আমার ভাল লাগে।

এ-সময় বড়বৌ এসে ঘরে ঢুকল। সোনা শিয়রে বসে রয়েছে। চুপচাপ। মাথা গোঁজ করে হাঁটুর ভিতর মুখ রেখে বসে রয়েছে।

—ধন তুমি রাতে কি খাবে?

—কিছু খামুনা বড়দি।

—কিছু না খেলে চলবে কেন। তোমার জন্য পাতলা করে কই মাছের ঝোল করে দিচ্ছি। দুটো হেলাঞ্চার ডগা ফেলে দেব। খেতে ভাল লাগবে। শিয়রে লেবু পাতা রেখে গেলাম। ওক উঠলেই পাতা শুঁকবে। তারপর সোনার দিকে তাকিয়ে বলল, সোনা তুমি খেলতে গেলে না।

সোনা এবারেও জবাব দিল না। সে মাথা গুঁজে একগুঁয়ে বালকের মতো বসে থাকল।

বড়বৌ ধনবৌকে বলল, ওর হয়েছে কি!

—কি কই কন। চুপচাপ বইসা আছে। কথা কইলে জবাব দেয় না।

—তুই ওকে বকেছিস?

—না দিদি।

—তবে ও এমন শক্ত হয়ে বসে আছে কেন?

—জানি না।

সোনা এস। বলে বড়বৌ ওকে টেনে তুলতে চাইল। কিন্তু সে মায়ের শিয়র থেকে কিছুতেই উঠল না।

বড়বৌ বলল, ছোটকাকাকে ধরে নিয়ে গেছে। তাতে কি হল। ওরা কিছু করতে পারবে না, আবার চলে আসবে।

কিন্তু সোনা একইভাবে বসে থাকল।

বড়বৌ ভাবল, তবে কি রঞ্জিত নেই বলে! সে বলল, তোর মামাকে ধরে সাধ্য কার। ধরা পড়লে ত ওর ফাঁসি হবে। বলতেই বুকটা কেঁপে উঠল বড়বৌর।

এবং সোনার প্রতি বড়বৌ আরও কোমল হয়ে গেল। চল বাইরে। দেখ ত তোর জ্যাঠামশাই কোনদিকে গেছে। খুঁজে আনতে পারিস কিনা।

সোনার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে উঠল না।

বড়বৌ কেমন বিরক্ত গলায় বলল, কি হয়েছে সোনা, কেউ তোমাকে কিছু বলেছে!

সোনা বলল, না।

—তবে এভাবে বসে আছ কেন! খেলতে যাওনি কেন! শরীর খারাপ।

সোনা ফের নির্বাক। এই অসময়ে সোনা ঘরের ভিতর মায়ের শিয়রে চুপ-চাপ বসে রয়েছে। এভাবে বসে থাকা ভাল না। এবার বড়বৌ বলল, দ্যাখ তো সোনা তোর ঈশম দাদা তরমুজের খেত থেকে উঠে এসেছে কিনা।

কিছুতেই কিছু সে শুনল না। সে যেমন মায়ের শিয়রে বসেছিল, তেমনি বসে থাকল। মার কপালে ওর হাত। কি ঠান্ডা মার কপাল, শরীর! মা তার নিশিদিন বমি করে কেন। মাঝে মাঝে সে দেখেছে বমি করতে করতে মার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে কোন কোনদিন শিয়রে দাঁড়িয়ে মাকে বাতাস করেছে। বড় জ্যাঠিমা দুধ গরম করে দিয়েছেন। দুধ খেয়েই মা হড় হড় করে সব ফের তুলে দিয়েছে। একবার গোপাল ডাক্তার এসে-ছিল। মায়ের অসুখ দেখে জ্যাঠিমাকে হাসতে হাসতে কি বলে গেছে। তখন মনে হয়েছিল তার, চুরি করে ডাক্তারের সাই-কেল পানচার করে দেবে। সোনাকে এমন শক্ত থাকতে দেখে ধনবৌ পর্যন্ত উঠে বসেছে। মা তার সব টের পায়। মা বলল, আমার কিছু হয় নাই সোনা। এই যেই না বলা সোনা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—আমলকি ফল খাইলেই ভাল হইয়া উঠমু।

বড়বৌ এবার হাসতে হাসতে বলল, সোনাবাবুর সে জন্য কান্না। হ্যাঁরে তোর মার কিছু হয়নি! তোর এবার দেখবি বোন হবে একটা। বোকা। বলে সোনাকে জোর-জার করে চকি থেকে তুলে আনল। বোকা কোথাকার! তা তুমি বলবে তো ধন। সোনার দিকে তাকিয়ে বলল, সেজন্য তুই মার কাছে বসে আছিস। আয়। বড়বৌ সোনাকে বাইরে নিয়ে গেল। সে জ্যাঠিমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ টল টল করছে।

—বিশ্বাস হচ্ছে না!

ঈশম এতক্ষণে চলে এসেছে। সে বলল, তাই নাকি। এর লাইগ্যা কান্দন!

কি যেন এক পুলক শরীরে। আনন্দে সোনার ভিতরটা সহসা আকাশের নিচে খেলা করে বেড়াতে চাইল। সে ঈশমের কথায় ফিক্ করে হেসে ছুটে পালিয়ে গেল।

ঈশমও ছুটে গেল সোনার পিছনে। সে এসে ওকে নদীর চরে আবিষ্কার করল। কিছু খড়কুটো পাতার দরকার ছইয়ের নিচে। সে হাঁটতে হাঁটতে ছইয়ের দিকে গেল। সোনা কর্তাকে কিছু বলল না। ছোট্ট বাবুটি এখন নদীর চরে ঘাসের উপর বসে আছে। আনমনা নদী জল আকাশ দেখছে।

শীত পড়তে পড়তেই চন্দ্রনাথ চলে এল বাড়িতে। ভূপেন্দ্রনাথ আসবে মাঘ মাসের সতেরো তারিখ। কারণ সেই তারিখে শচীন্দ্রনাথ ছাড়া পাচ্ছে। কোর্ট-কাচারি অথবা কি করে কি যে হয়েছিল সোনা জানে না। ছোটকাকা ফিরে আসছেন। ছোট কাকা ছাড়া পাচ্ছে এটাই একটা এখন সুখবর। ওরা শীতের মাঠে রোদ পিঠে দিয়ে জোরে জোরে পড়ছিল।

এই শীতকালটা পড়ার চাপ কম। নতুন বই, নতুন চাদরের মতো, গায়ে দিলেই কি রকম একটা গন্ধ যেন, সোনা নতুন বই পড়তে পড়তে নাকের কাছে এনে গন্ধটা শোঁকে। নতুন বই এলেই শীতের ভোরে পিঠে রোদ দিয়ে গাছের নিচে পড়তে বসে ওরা। অর্জুন গাছের নিচে বড় একটা সতরঞ্চ পেতে দিয়ে যায় ঈশম। সকাল হলেই রোদ এসে নামে গাছটার নিচে। খুব ঘন পাতা বলে গাছের নিচে তেমন শিশির পড়ে না। ওরা সকলে মাস্টারমশাইকে ঘিরে পড়তে বসে। তখন ঠাকুমা ডালায় করে গরম মুড়ি তেলে মেখে রেদে পাঠিয়ে দেন। গাছের নিচে নরেন দাসের পেঁয়াজ খেত। লালটু কোন কোন দিন চুপি চুপি পেঁয়াজ কলি তুলে আনে। মাস্টারমশাই যেন জানতে না পারে সে এমনভাবে যায়। কোনদিন পলটু যায় মাঠে। শিশিরে পা ভিজে যায়। সে খেত থেকে ধনে-পাতা তুলে আনে। পেঁয়াজ কলি কুচি, ধনেপাতা কুচি তেলমাখা গরম মুড়ি, কাঁচালঙ্কা, হুসহাস ঝালের শব্দ আর পিঠে শীতের রোদ্দুর—সামনে নতুন বই, নতুন ছবি এসব মিলে সোনার এক ঐশ্বর্যভরা জগত। তিনজন তখন জোরে জোরে পড়ে। পড়ে না কাঁসর-ঘন্টা বাজায় বোঝা দায়। কারণ অনেক দূর থেকে মনে হয় শীতের ভোরে কয়েকটা মোরগ লড়াই করছে।

সেই শীতের সকালে চন্দ্রনাথ বাপের পায়ের কাছে বসেছিল। সে বাপের পা টিপে দিচ্ছে। শীত এলেই বুড়ো মানুষটার শ্বাসকষ্ট বাড়ে। কফের টানে এ-সময় তিনি খুব কষ্ট পান। হাত পা মাথা সব গরম কাপড়ে ঢাকা থাকে। ফ্লানেলের লম্বা টুকরো দিয়ে বুকে পিঠে যেন ব্যান্ডেজ বাঁধা। কাছে এলেই কেমন কর্পূরের গন্ধ। এবং কফের গন্ধ। গলায় গরম উলের মাফলার, পায়ে গরম মোজা এবং মাথায় ফেটি বাঁধা। শ্বাসকষ্ট এত প্রবল যে জানালায় শীতের রোদ, গাছে কমরাঙা ফুল, ফুলে মধু মধু খেতে এসেছে পাখিরা—সে-সব কিছুই টের পাচ্ছেন না। লেপ কম্বলে শরীর ঢেকেও শীত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না। পৃথিবীর সর্বত্র বুঝি তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেছে। পৃথিবীর শেষ উত্তাপ, শেষ সুখ সব বুঝি কেউ হরণ করে নিচ্ছে। নতুবা সারা রাত তিনি শীতে এত কষ্ট পাবেন কেন। সারা রাত উত্তাপের জন্য আর্তনাদ করবেন কেন! খাটের নিচে পাতিলে তুষের আগুন সারা রাত তুষের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে বড় বৌ। তবু মানুষটা উত্তাপ পায়নি। হাত-পা কি যে ঠান্ডা! সূর্য কি তবে পলাতক বালকের মতো সৌরজগতের অন্য কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। পৃথিবীতে সে সামান্য উত্তাপটুকু পর্যন্ত দিতে পারছে না। কবে একবার সূর্যোদয় দেখবেন বলে বের হয়েছিলেন আর বের হতে পারেন নি। এখন যে একবার বলবেন, অথবা তার যে বলার ইচ্ছা, পৃথিবীতে কি আর সূর্যোদয় হবে না! আমাকে তোমরা গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে সূর্যোদয় দেখাবে না! আমি কি সত্যি এভাবে ঠান্ডায় মরে যাব! তিনি বলতে পারছেন না। বললেই যেন তাঁর সন্তানেরা পায়ের কাছে এসে বসবে, যেমন এখন বসে রয়েছে চন্দ্রনাথ, বলবে সবুজ বনে মৃত বৃক্ষ হয়ে বেঁচে আর কি লাভ। এবারে চন্দ্রায়নটা তবে করে ফেলি। এবং এ সময়েই তিনি শুনতে পেলেন তাঁর তিন নাতি জোরে জোরে পড়ে চলেছে। নতুন বই এলেই ওরা এভাবে পড়ে। কঠিন যা কিছু শব্দ আছে ঘুরে ফিরে বার বার পড়ে। পড়ে বুঝি জানায়, এই যে আমরা বালকেরা আছি, আমরা কত কিছু শিখে ফেলেছি, আমরা পৃথিবীর কত খবর এনে দিচ্ছি তোমাদের। তোমরা কিছু জান না। আর নতুন বই পুরানো হলেই শরীরের মতো জরাজীর্ণ অবস্থা। —আর কতকাল পৃথিবীর জায়গা আপনি আটকে রাখবেন। এবারে চন্দ্রায়নটা করে ফেলি। তারপর বল হরি হরি বোল বলে আপনাকে আমরা নিজ হাতে আপনি যে গাছ রোপণ করেছেন তার নিচে দাহ করি। আর কতকাল! শতবর্ষ পার হতে আর বাকি কি।

ফলে মহেন্দ্রনাথ গলার কাছে যে কাশিটা উঠে আসছে তা আটকে রেখে-ছেন। তিনি কিছুতেই ধরা পড়বেন না, ভাল নেই তিনি, তীব্র কাশি, শরীর দুর্বল, হাত-পা ঠান্ডা। যেন তার যথার্থই কোন কষ্টবোধ নেই। পায়ের কাছে ছেলে তাঁর বসে আছে। তিনি কত সবল দেখানোর জন্যই যেন লেপের ভিতর থেকে শীর্ণ হাতটা বের করার চেষ্টা করলেন। হাওয়ার উপর দুলিয়ে দেখাতে চাইলেন, তিনি কত সবল আছেন, সুস্থ আছেন। চন্দ্রায়নের সময় তাঁর এখনও হয়নি।

চন্দ্রনাথ বাপের এ-সব বোঝে। মনে মনে সে হাসল। কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। চন্দ্রনাথ হাতটা আবার লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, আমি চন্দ্র-নাথ বাবা।

—তুমি যে চন্দ্রনাথ, তা বুঝি আমি টের পাই নাই মনে কর?

একেবারে বালক হয়ে গেছেন তিনি। পাছে চন্দ্রনাথ চন্দ্রায়নের কথা বলে, ভয়ে এমন বলছেন মানুষটা। সে এবার বলল, সোনা, লালটু, পলটুর উপনয়ন দিতে চাই। মাঘ ফাল্গুনে দিন আছে।

—তা ভাল। বলেই যে কাসিটা এতক্ষণ গলার কাছে আটকে ছিল এবার সেটা মুখে তুলে আনলেন। তারপর কোত করে গিলে ফেললেন কফটা। চন্দ্রায়ন করতে বলবে এই ভয়ে তিনি শরীর শক্ত করে রেখেছিলেন এতক্ষণ। কিন্তু ছেলে যখন বলছে উপনয়নের কথা তখন একবার উঠে বসা যায় কিনা চেষ্টা করা যাক।

—আমারে চন্দ একটু ধর। উইঠা বসতে পারি কিনা দ্যাখি।

চন্দ্রনাথ বলল, বারান্দায় রোদ নামুক, আপনেরে নিয়া যামু বারান্দায়।

বুড়ো মানুষটা এবার যথার্থই প্রাণ ফিরে পেলেন হাতে। হাসি হাসি মুখে বললেন, ধনবৌমার দিকে লক্ষ্য রাইখ। সন্তানাদি পেটে। সন্তানাদি কথাটা বল-লেন এই জন্য যে, পৃথিবীতে এই যে একটা জগত মা জননীরা গর্ভের ভিতর সৃষ্টি করে রাখে, সেই জগত সম্পর্কে এখন তার শিশুর মতো পুলক অথবা কৌতূহল. ক্রমে ছোট হতে হতে একে-বারে অণুর মতো হয়ে যাওয়া, এবং সেই সৃষ্টির আধারে প্রবেশ করা, প্রবেশ করার আগে অন্ধকারের ভয়। একবার প্রবেশ করে গেলে ভয় থাকে না। সেই জগত, যেখানে তিনি কিছুক্ষণের জন্য বিচরণ করবেন। অনন্ত নীহারিকাপুঞ্জে তার অস্তিত্ব ক্ষণে ক্ষণে নক্ষত্রের মতো আকাশের গায় জ্বলতে থাকবে। তারপর তিনি শিশিরপাতের মতো কোন ঝিনুকের অন্ধকারে টুপ করে একদা ঝরে পড়বেন পৃথিবীর মাটিতে। তার জন্ম হবে আবার। আবার সেই শৈশবের খেলা আরম্ভ হয়ে যাবে এই বৃক্ষের নিচে। সেই আদি অন্তহীন আধারের প্রতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার না করে পারলেন না। প্রায় যেন গৌরবে বহুবচনের মতো। সুতরাং তিনি সন্তান না বলে সন্তানাদি কথাটা ব্যবহার করলেন।

চন্দ্রনাথ বসে বসে বাবার মুখ দেখল। বাবার সেই মহিমান্বিত চেহারার সাদৃশ্য এই মানুষের মুখে কোথাও খুঁজে পেল না। কতকাল থেকে তিনি এই বিছানায় কালাতিপাত করছেন। এবং এই কালাতি-পাতের সময় তার শরীর ক্রমে ছোট হয়ে যাচ্ছে। হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। এত হাল্কা যে চন্দ্রনাথ কত অল্প আয়াসে তাকে একটা তুলপুতুলের মতো পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে এল বারান্দায়। বারান্দায় যেখানে রোদ এসে নেমেছে সেখানে দুপাশে বালিশ দিয়ে এক ছোট্ট পুতুলের মতো বসিয়ে দিল। বলতে পারেন না, তবু দুহাত সামনে বিছিয়ে যেমন শিশুদের ছবি তোলা হয় তেমনি তাকে চারপাশের বালিশে রেখে দেওয়া হল। দাঁত নেই। চোখ অন্ধ। এক বীর্যবান মানুষ এই সংসারে শতবর্ষের আয়ুতে আবার সেই আধারে ভ্রূণের মতো প্রবেশ করবেন। ক্রমে ভ্রূণ থেকে কীটে এবং তারপর সেই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলে পৃথিবীর শস্যভরা মাঠে নতুন আলোক বর্ষিত হবে। তখন সাদা জ্যোৎস্নায় উপ-নয়নের বালক সন্ন্যাসীরা মাথা নেড়া করে নদীর জলে দাঁড়িয়ে থাকবে। হাতের অঞ্জলিতে নদীর জল। পূর্বপুরুষকে জলদান করবে। বাপের তৃপ্ত মুখ দেখে চন্দ্রনাথের এমনই মনে হল।

(ক্রমশঃ)

# লোকটা ভীষণ সাধারণ

তো টাকা কি আমি বাড়ী বয়ে দিয়ে আসব? সময় মত আসেননি কেন? যান এখন এ জি বেঙ্গলে যান—সেখানে গিয়ে স্বয়ং খোঁজ নিন, কবে পাবেন। যত্ত সব। —বলতে বলতে একটা কলকে-টান চড়ালেন হাতে-ধরা সিগারেটের গোড়ায় পেশকার-বাবু। একই সঙ্গে গলগল করে খানিকটা ধোঁয়া আর কাশি উগরে দিয়ে, সুস্থির হয়ে বাইফোক্যালের আড়াল থেকে তেরচা চাউনিতে নিশ্চিত বধ্য শিকারটিকে আপাদমস্তক একবার সার্ভে করে নিলেন। 'আপাদ' কথাটা বোধহয় ঠিক নয়, কারণ টেবিলে টাল দিয়ে সাজানো ফাইলের পাহাড় মানুষটার কোমর উজিয়ে বুক পকেটে এসে ঠেকেছে। পকেটটা লেপটে আছে—টুকরো কাগজ, মানিব্যাগ বা অন্যকিছুই যে ওখানে নেই সেটা বুঝতে মুহূর্তও লাগেনি ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের ঝানু পেশকার অনিল মুৎসুদ্দীর। নিরেট গবেট। কবে পেমেন্ট অর্ডার বেরিয়ে গেছে, আজ এসেছে কিনা খোঁজ নিতে। খোঁজ নেওয়াচ্ছি। ঝাড়া দু মাস ঘুরিয়ে দেব শুধু এ জি বেঙ্গল বলেই। তারপর দেখাব নাজির সেকশন। পেশকারের সংগে কথা বলতে গেলে যে আগে টু পাইস টেবিলের তলা দিয়ে বাড়িয়ে দিতে হয় তাও শালার উকিল এই গবেটটাকে শেখায় নি। যত্ত সব। হুঁ—টুসকি দিয়ে ধোঁয়ার ডগায় জমা ছাই-টুকু ঝেড়ে ফেলে নথির গাদায় পিন খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন পেশকারবাবু।

আবার কবে আসব পেশকারবাবু? —লোকটা তাহলে যায় নি এখনো, ঠায় দাঁড়িয়ে। মুখ না তুলেই জবাব ছুঁড়ে মারলেন অনিল মুৎসুদ্দী, কি করে বলব। আপনার উকিলকে বলবেন মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে। আর পারেন যদি এ জি-তে গিয়ে তদবির করুন। পেমেন্ট নেননি। অর্ডার ফিরে গেছে। সময় লাগবে।

চটি ঘসটানির আওয়াজ শুনেই পেশকারবাবু টের পেলেন গবেটটা এবার বিদায় নিচ্ছে। ব্যাটার মাথায় কিসসু নেই। এতক্ষণ দাঁড়াল, এতকথা জিজ্ঞাসা করল অথচ যা করলে দু মিনিটেই কাজটা হয়ে যেত, সেধার দিয়েও গেল না। ঘুরুক ব্যাটা, যত পারে ঘুরুক। কোর্টে ঘুরেছে তেরো বছর, এখানেও ঘুরিয়ে দেব বছর-খানেক। তাতে যদি একটু হুঁশ হয়। এসব লোকের কিসসু হবে না।

পেশকারবাবু যখন নথি আর ফাইল, মক্কেল আর উকিল সামলাচ্ছেন, তখন লোকটা চটি ঘসটাতে ঘসটাতে সেরেস্তাখানা পেরিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ট্যাকসি আর মানুষের ভিড় কাটাতে কাটাতে এসে মোড়ের মাথায় ঝড়ে-উপড়ে পড়া খোড়ানিমের শুকনো ডালপালার আড়ালে দাঁড়াল। উল্টোদিকে চায়ের দোকানে এক একটা টেবিলে এক একটা কালো কোটের সংগে মাছির মত লেপটে আছে গন্ডা গন্ডা মানুষ। ওদেরও নিশ্চয় এই হালই হবে। তবু আশা কেউ ছাড়ে না। হাসি পেল লোকটার। হাসলে অদ্ভুত দেখায়। পান খাওয়া দাঁতগুলো কালোকুশ্টি, খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি রোগা গালে ঠিক ধান কাটা মাঠের মত সারি দিয়ে দাঁড়ানো। পরনের ধুতিটা ধুলোয়, ধোঁয়ায় কেমন কালচে মেরে গেছে। খয়েরী র‍্যাপারটা টুকুর মা রিফু করতে দিয়েছে কাচির দোকানে। শুধু সার্টে নভেম্বারের শীত ঠেকানো যায় না। অন্য-মনস্কের মত একবার বুক পকেটে হাত দিয়েই টের পেল পয়সাকটা ঝুল পকেটে আছে। ঠিক বাড়ী ফেরার ভাড়া। অথচ উকিলবাবুকে সব বলা দরকার। মনে মনে হিসাব করে দেখল পথ বড় জোর আড়াই মাইল। এটুকু হেঁটে গেলেই চলবে। গত সপ্তাহে দেখে এসেছে উকিলবাবু বাতে বিছানায় পড়ে আছেন। উঠবার ক্ষমতা নেই। মানুষটা বড় দয়ালু। গ্রামসুবাদে দাদা। এক পয়সাও নেননি এই মামলার জন্য। শুধু বলেছেন, জিতলে পার যা হয় কিছু দিও। জিতিয়ে তো দিয়েছেন। জজ রায় দিয়েছেন ওর পক্ষে—গবমেন্ট টাকাও দিতে রাজী। পেশকারটা শুধু শুধু ঘোরাচ্ছে। টাকাটা পেলে সুবোধ-দাকে অন্তত পাঁচশো টাকা দেবে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে লোকটা। সুবোধদা সেদিন পাশে না দাঁড়ালে কিই বা আর করতে পারত সে।

পাঁচশো? অত দিলে হাতে আর থাকবে কি। পেমেন্ট পাবে তো মোটে আড়াই হাজার। পাঁচশো দিলে যে টুকুর বিয়েটা আটকে যাবে। চলতে চলতে লোকটা একটু থমকে দাঁড়াল। স্যান্ডেলটার একটা পেরেক বেরিয়ে এসেছে। ঠিক গোড়ালির তলায় ফুটছে বার বার। কার্ছেপিঠে কোথাও মুচি নেই একটাও যে পেরেকটা একটু ঠুকিয়ে নেবে। কোর্টের মুখেই একটা বসে, কিন্তু তখন খেয়াল হয়নি। সামনেই বড় মোড়। চারদিক ভাল করে দেখল, নাহ্ কোথাও নেই। আজকাল মুচিরা আর রাস্তায় বসে না। কোথায় বসে?

যেখানে খুশী বসুক, চওড়া রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে উঠে এল লোকটা। পেচ্ছাবখানার গায়ে কয়েকটা আধলা পড়ে আছে। সব কটাই জলে ভেজা। একটা শুধু একটুখানি শুকনো তার মধ্যে। সেটা দিয়ে বারকয়েক পেরেকটা ঠুকে মাথাটা বেঁকিয়ে নিল। যদি পেশকারটার মাথাটা এভাবে ঠুকে ঠুকে ফাটিয়ে দেওয়া যেত—ইটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল লোকটা।

কজনের মাথা ফাটাবে? টুকুকে যারা পছন্দ করে গেল তাদের মাথা—ছি ছি। এসব সে কি ভাবছে। এমন কিছু তো বেশী চায় নি ওরা। ছেলে উপযুক্ত। জেলম্যান, মাস গেলে ওভারটাইম-টাইম ধরে কম করেও আড়াইশো টাকা রোজগার। ছেলের বাপের অবস্থা ভাল। একটা বাড়ী আছে। তাছাড়া ধানি জমিও কিছুটা আছে। হাজার টাকা পণ তো চাইতেই পারে। খাট-ফাট চায় না। ওসব রাখার জায়গা নাকি ওদের নেই। মেয়েকে যা দেবার তা দেবেন। ছেলেকে বরাভরণের আদায় হিসাবে দিতে হবে একটা ঘড়ি, সোনার আংটি আর বোতাম এরপর আছে খাওয়ানো দাওয়ানো। টুকুর মার সঙ্গে হিসেব করে দেখেছে কম করেও সাড়ে চার পাঁচ হাজার লাগবে। অথচ জমির দাম বাবদ গভর্নমেন্ট তো দেবে মোটে আড়াই হাজার। উকিলকে পাঁচশো দিলে আর থাকবে কি? আর বাকী টাকাটাই বা পাবে কোথায়? ওদিকে তো জিতেন বিশ্বাসকে একরকম কথাই দিয়ে দিয়েছে সে—আগামী ফাল্গুনেই টুকুর বিয়ে—হাজার টাকাই বরপণ দেবে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের লোনের জন্য দরখাস্ত করে রেখেছে। হাজার দেড়েক এখন থেকে পাওয়া যাবে। তার

সঙ্গে এই টাকাটা জুড়ে কোনরকমে কাজটা সে সেরে ফেলবে। ফেলবে তো কিন্তু পেশকারটা যা ঝ্যাগড়া দিচ্ছে তাতে আর কোন ভরসা পাচ্ছে না।

তেরো বছর মামলা ঝুলে রইল। সুবোধদা যদি ফি চাইতেন তাহলে তো পেমেণ্টের সব টাকাই তার প্রাপ্য। নেহাৎ ভালবাসেন তাকে, পয়সারও অভাব নেই কোন সুবোধদার তাই দয়া করে তরিয়ে দিলেন। শুধু যে স্বপ্নটা আজ তেত্রিশ বছর ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের মনের আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে শুনে পাগলা সে হয়ে যেত সেটাই গেল শেষ হয়ে—বাড়ী, নিজের বাড়ী আর কখনো হবে না।

অথচ জমিটা কেনার সময় সবই কত সহজ স্বাচ্ছন্দ্য মনে হয়েছিল। মাত্র পঁচাত্তর টাকা করে কাঠা। যুদ্ধ তখনো বাধেনি। ম্যাট্রিক পাশ করেই চাকরীতে ঢুকেছিল সে। বাবা মা সবাই তখন বেঁচে। চাকরীতে বসতে না বসতেই ও'রা জোর করে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখনো কার্তিক হয় নি। এক ব্যাটা দালাল খোঁজ নিয়ে এসেছিল অফিসে। কলকাতার গায়েই জলের দরে জায়গা বিকোচ্ছে। কিনতে হয় তো এখুনি। পরে হাজার টাকা দাম উঠবে। অনেকেই কিনল। কেউ পাঁচ, কেউ সাত, কেউ কেউ দশ কাঠা পর্যন্ত। সেও নিল চার কাঠা। ঠিক ছিল সুযোগ সুবিধা মত যে যার বাড়ী করবে। একই অফিসের লোক এক জায়গায় থাকবে—সবই নিজেদের মধ্যে।

সব প্ল্যান কিন্তু আপসেট হয়ে গেল। যুদ্ধ, দাঙ্গা, পার্টিশন, উদ্বাস্তু। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল গোটা দেশটা। যা ভেবেছিল কিছুই তার হোল না—সব কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। তবু সে হাল ছাড়ে নি। জানত দু দুটো ছেলে তার বড় হয়ে উঠছে। জমিটা সে কিনে ছিল। বাড়ী যদি সে বানাতেও না পারে, ওরাই বানাবে। আর একটা মাত্র ছোট বোন, তার বিয়ে তো ওরাই দেবে। অফিসে সবাই বলত—তার মত সুখী কে আর আছে।

হাসি পেল। সুখ! সে বস্তুটা তো লটারীর টিকিট। কোথায় কার কপালে যে জুটবে কে বলতে পারে। অন্তত আজ সে বলতে পারে, পেনসন থেকে মাত্র দু বছরের তফাতে দাঁড়িয়ে, তার কপালে ও-বস্তু নেই। কার্তিককে সে মানুষ করেছিল। এম এস সি পড়িয়েছিল ম্যাট্রিক পাশ জন্ম কেরানী বাপ তার বড় ছেলেকে। সে এখন কলেজে পড়ায়। অধ্যাপক! —মুখটা ঘেন্নায় বেঁকে গেল লোকটার। কি পড়ায় ও ছেলেদের? বুড়ো বাপ মাকে দেখাটা অন্যায়। তাঁর কার্তিক আজ প্রফেসর কে সি পাল। সিঁথিতে গবমেন্ট ফ্ল্যাটে থাকে। বিয়ে করেছে এক ছাত্রীকে। ছেলে-মেয়েও দু' কি হয়েছে। লোকজন মুখে মুখে

সব খবরই সে পেয়েছে। মেজ রতনটা মানুষ হল না। পাড়ায় খুব নামডাক ওর। বছরের অর্ধেক দিনই বাইরে বাইরে কাটায়। পড়াশুনাও করল না, চাকরীও করল না। জানে বাপ তো আর ফেলে দিতে পারবে না। বাসার খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে ফিরছিল এতদিন, এখন পুলিশের হুলিয়ার ভয়ে কোথায় যে গা ঢাকা দিয়ে আছে কে জানে। এখুনি যদি পেমেণ্টটা হাতে আসে তো বেঁচে যায় সে। নইলে অপদার্থটা ঘরে ফিরে যদি টের পায় বাবা জমি বেচার টাকা পেয়েছে তাহলে খাবলে-খুবলে যা পারবে আদায় করে নেবে। তাতে বোনের বিয়ে হল কি হল না কি যায় আসে তার।

যাক ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই। তবু তো টুকুর বিয়েটা দিয়ে যেতে পারবেন। ভাগ্যিস সেদিন জমিটা ওরা জবরদখল করেছিল। তেরো বছর আগে মানুষ তেরো বছর পরের কথা তো ভাবতে পারে না যে কি হবে। ওরা যারা জমি নিয়েছিল একসঙ্গে, সবাই মামলা ঠুকল। কথা ছিল সবাই একসঙ্গে মামলা লড়বে। খরচ ভাগাভাগি করে দেবে। তার ভাগে মাসে পঁচিশ টাকা পড়েছিল। কোথায় পাবে অত টাকা। দেড়শো টাকা মাইনের তিন তিনটে ছেলেমেয়ে মানুষ করে জমি বাঁচানোর মামলা লড়া কি চাট্টিখানি কথা। নিরুপায় হয়ে যখন হালই সে ছেড়ে দিয়েছিল তখন একদিন কোর্টেই দেখা হয়ে গেল সুবোধদার সঙ্গে। সব শুনে হাসতে হাসতে আশ্বাস দিয়ে দাদা বললেন—তুই আমার গ্রামের ছেলে। যা, ভাবিস না, সব ব্যবস্থা আমি করব।

তা করলেন। দু বছরেই তার কেসের ফয়সলা হয়ে গেল। জজ অ্যাওয়ার্ড দিলেন—জমি সে ফেরত পাবে। কিন্তু যারা দখল করে বসেছিল তারা এসে বলল—কোথায় যামু আমরা? একবার দেশ ছাইড়্যা আইসি। একটু সময় দ্যান। দেখেন আপনার জমি আমরা নিশ্চয় ছাইড়্যা দিমু।

বিশ্বাস সে করেছিল। তাই আর থানা পুলিশ করে নি। জোর করে নিজের জমির দখল সে নিতে যায় নি। তার ফল তো হোল এই। ছ মাসও ঘুরল না গবমেণ্ট সব জমি অ্যাকুয়ার করে নিয়ে ওদেরই দানপত্র লিখে দিল।

সেদিন যদি সুবোধদা পাশে না থাকত, ভাবাও যায় না। তারপর দশ বছর ধরে চলেছে মামলা। সে ভেবেছে অনেকবার কি হবে মামলা লড়ে। গবরমেণ্টের বিরুদ্ধে কি আর সে জিততে পারবে? বিশেষ যখন, কার্তিক বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেল। রতনটা তখন জেলে। সংসার আর চলে না। ধীরে ধীরে তলিয়ে গেছে সে। তবু সুবোধদা ছাড়ে নি। কিছু বলতে গেলে ধমকে উঠেছেন—এ কি মামদোবাজি। ওসব হবে টবে না। তুই বাড়ী যা, ওসব আমি

দেখব। —একথায় ওপর আর কি কিছু বলা যায়?

বলা যায় না। বলতেও সে পারে নি। বলবার সুযোগও আর রাখেন নি সুবোধ। বোঝা লোক। মামলা জিতে নিজের কথা রেখেছেন। গত মার্চে রায় বেরিয়েছে। গবমেণ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। চার কাঠার জন্য আড়াই হাজার টাকা।

কিন্তু টাকাটা আদায় করতে গিয়ে জেরবার হয়ে গেল সে। সুবোধদাকে বার বার বলা যায় না। ব্যস্ত মানুষ। কত কেস তাঁর হাতে। তাছাড়া বয়স হয়েছে। আগের মত ছোটাছুটি করতে পারেন না। তার ওপর বাতে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে। তাই সে নিজেই খোঁজ নিচ্ছে।

রায় বেরোনোর পরদিনই ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন জজের সেরেস্তায় গিয়েছিল। এই ব্যাটা পেশকার সেদিন অ্যাইসা খেঁকিয়ে উঠল—বলি এটা কি বিলেত না আমেরিকা। কাল রায় বেরোল, আজই পেমেণ্ট অর্ডার চান। যান যান মাস খানেক বাদে আসবেন।

এক মাস বাদে গিয়ে শুনল তার নথি পড়ে আছে নাজির সেকশনে। সেখানেও খোঁজ নিয়েছিল। তারা বলল—চিন্তা করবেন না। সময় মতই আমরা পাঠিয়ে দেব।

সেই সময় আর আজও হল না। এতদিন ছোটাছুটির পর পেশকার বললেন, নথি এসেছে ঠিকই, তবে পেমেণ্ট অর্ডার ফিরে গেছে এ জি বেঙ্গলে। কারণ কেউ পেমেণ্ট নিতে নাকি আসে নি। একি কথা! ফি মাসে সে খবর নিতে এসেছে। প্রত্যেকবারই তাকে ওরা বলেছে ফাইল আসে নি। আর এখন কিনা বলছে যে, ফাইল এসেছে, পেমেণ্ট নেওয়ার লোকের অভাবে অর্ডারটা ফেরৎ চলে গেছে! সুবোধদা বলে দিয়েছিলেন, তুই খোঁজ নিস ঠিকমত। অর্ডারটা এলে পর আমি সই করে আদায় দেব। তারপর ট্রেজারীতে গিয়ে ভাঙিয়ে ক্যাশ টাকা পাইয়ে দেব তোকে। সেই ভরসাতেই ফাল্গুনে টুকুর বিয়ের দিন সে স্থির করেছে—অথচ পেমেণ্টের কোন পাত্তা নেই!

ব্যাপার কি বলুন তো সুবোধদা?—আড়াই মাইল পথ হেঁটে এসে কেমন হাঁফ ধরে গেছে। নস্যি মোছা রুমালটায় রগড়ে রগড়ে কপাল, ঘাড়, গলায় জমা ধুলো ঘাম মুছতে মুছতে হাঁফাতে হাঁফাতে সে জিজ্ঞাসা করে।

বুঝলি না—প্রবীণ উকীল খাটে শুয়ে শুয়েই বুঝিয়ে দেন ব্যাপারটা—কিছু চায়। না দিলে বার বার এ জি বেঙ্গল আর নাজির সেকশন দেখাবে। আমি তো বাতে একরকম শয্যাশায়ী। এক মাস বিছানাতেই পড়ে আছি। তুই বরং কোন দালাল টালাল ধর। পেমেণ্টের ফাইভ পারসেণ্ট ছেড়ে দে, দেখবি তোকে আর কোথাও যেতে হবে না। অর্ডার-টর্ডার সবই বেরোবে। এ জি বেঙ্গলেও না, কোথাও না, অর্ডার ঐ সেরেস্তাখানাতেই আছে।

ফাইভ পারসেণ্ট! —লোকটা যেন শিউরে উঠল প্রস্তাব শুনে।

কি করবি বল। যে দেবতার পুজোর যে নিয়ম। না দিয়ে পার পাবি না। অনিল মুৎসুদ্দী ঘোড়েল লোক। টাকা না দিয়ে ওর কাছ থেকে কাজ আদায় করতে স্বয়ং জজসাহেব পারেন না তো আমরা কোন ছার। —বলতে বলতে রুগ্ন মানুষটার মুখে কেমন একটা হাসি ফুটে উঠল। তারপর ভেবে চিন্তে বললেন—তুই আর দালাল পাবি কোথায়? কাল আসিস। আমার মুহুরীকে বলে সব ঠিক করে রাখব। টাকা নিয়ে আসিস। দেখবি সব হয়ে যাবে।

সব হয়ে যাবে শুনে, উকীলবাবুকে প্রণাম জানিয়ে নীরবে উঠে আসছিল লোকটা। সুবোধদার ডাক শুনে চৌকাঠে ঘুরে দাঁড়াল—হ্যাঁরে, এবার তো পেমেণ্ট পাচ্ছিস। আমাকে কত দিবি? চমকে উঠল সে। কানে এল সুবোধদা বলছেন—এতদিন একা লড়লাম। তুই তো হাল ছেড়ে দিয়েছিলি। আমিই তো তোকে আড়াই হাজার টাকা পাইয়ে দিলাম। খরচ খরচা বা আমার ফীজ কিছু ধরছি না, সে তুই দিতে পারবি না। শ পাঁচেক দিস তাতেই আমি খুশী হব।

ফাইভ পারসেণ্ট মানে সোয়াশো প্লাস পাঁচশো হল গিয়ে সোয়া ছশ। হাতে পাবে তাহলে পৌনে আঠারো শ। প্রভিডেন্ড ফাণ্ড থেকে দেড় হাজারের বেশী পাবে না। টুকুর বিয়ের খরচা কম করেও সাড়ে চার হাজার। বাকীটা সে কোথায় পাবে? একবার কার্তিককে বলবে না কি?

না, থাক। এতদিন সে একলাই টেনেছে, বাকীটুকুর জন্য মিছিমিছি কেন মান খোয়াবেন। কার্তিক যদি মুখের ওপর না বলে দেয়। পাত্রপক্ষ ওদিকে রেডি হয়ে আছে। যে করেই হোক ফাল্গুনেই বিয়েটা সে দেওয়াবে।

তার আগে সোয়াশ টাকা এখন কোথা থেকে জোগাড় করবে সে? কাল আসতে বলে দিয়েছেন সুবোধদা। মুহুরী দালাল ঠিক করে রাখবে। কার কাছে যাবে? কে দেবে ধার? ধারে ধারে মাথাটা বিকিয়ে গেছে। এখন বললে কি কেউ বিশ্বাস করবে যে চার কাঠা জমির দাম বাবদ আড়াই হাজার সরকারী পেমেণ্ট পেয়ে সে শোধ দেবে। লোকে মনে করবে গল্প কথা। ধাপ্পা। পাশে আজ আর কেউ নেই যে দাঁড়াবে। রতনটাও নেই। হাঁটিতে হাঁটিতে সে টের পেল পেরেকটা আবার মাথা উঁচিয়ে উঠেছে। ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে গোড়ালি। সবই তো ফুটো হয়ে গেছে, একটু ফুটলেই বা। কিছু তো করার নেই। আর ঠিক তখুনি পান-দোকানের আয়নায় নিজেকে সে আবিষ্কার করল—কি অসম্ভব সাধারণ একটা লোক সে। সব চুল উঠে গেছে, চোখের কোণে কালি, গাল বসে গেছে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখময়। অথচ তেত্রিশ বছর আগে এই মুখটাই ছিল কি ভীষণ উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত। স্বপ্ন দেখত জমি কেনার, বাড়ী করার—ছেলেমেয়ে বড় হবে। তারপর তাদের নিয়ে এক আলাদা আশ্চর্য জগৎ। আর আজ?

—সব শেষ।

—সন্দিপংস

(২০)

বরদাবাবুর খবর কিছু পাওয়া গেল অশোকের কাছে। মাথা খারাপ হয়েছে বলে অফিসের কর্তারা ছাড়িয়ে দিয়েছেন, একটা ব্যবস্থা করে। পুরনো লোক বলে হাজার তিনেক টাকা গ্র্যাচুইটি দিয়েছেন, তবে এক সঙ্গে দেননি, মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিতেন। ঐ টাকা বাদে আর ষাটটি টাকা আসত বড় ছেলে ও স্ত্রীর চাকুরি থেকে। ছেলেমেয়ের পড়াশোনা দূরের কথা পেট চলতে পারে না এই টাকায়। নেশার বাবদ কিছু যেত এই টাকা থেকে, কাজেই অবস্থা অচল হয়ে উঠেছিল।

ফণীকে তার কারখানার ক্যানটিনে কাজ দিয়েছিল অশোক। মাস দুই পরে ফণীর কাছে খবর পেলাম বরদাবাবুর অসুখ হয়েছে। বলল, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না, দুধ আর আফিং মিকশ্চার খায়।

বললাম, চলো, তোমার বাবাকে দেখে আসি কি অসুখ হয়েছে। ওষুধপত্র খাওয়ানো দরকার।

ফণী বলল, না, আপনি যাবেন না আপনি গেলে লাঠি নিয়ে মারতে চাইবে। বাবার মাথা খারাপ হয়েছে। বিছানায় লাঠি রাখে, বলে আপনাকে মারবে, দিদিকে মারবে, মাকে মারবে। আমি বিছানার কাছে গেলে লাঠি তোলে মারবার জন্য, আমি রে যাই।

বললাম, তোমার দাদাকে লেখো বাবার বস্থা জানিয়ে।

লিখেছিলাম, পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে দখেছে ওষুধ কিনে দিয়ো।

পাড়ার ডাক্তারকে আজ বলব আমি, কে নিয়ে গিয়ে বাবাকে দেখাও, ওষুধ বলেন কিনে খাইয়ো, টাকা আমি দেব।

আপনি দেবেন কেন? বাবা জানতে রলে—

বলো না বাবাকে, বলো ডাক্তার বাকীতে ধ দিলেন।

ফণী আরও বলল, দিদির কাছে গিয়ে লাম দু'দিন আগে। বাবার অসুখের া শুনে আসতে চাইল।

বললাম, তোমার বাবার অসুখ বেড়ে যাবে দিদিকে আনলে, লাঠি মেরে তাড়িয়ে দেবেন হয়ত।

সে কথা বলেছিলাম আমি, তবু আসতে চাইল।

তোমার মা কি এসেছেন বাড়ীতে?

কাল এসে দেখে গিয়েছে। বাবা ঘুমোচ্ছিল, জানতে পারেনি।

ক'দিন পরে ফণীর কাছে খবর পেলাম ওষুধপত্র খেয়ে একটু ভাল আছেন বরদাবাবু।

একদিন ফণী বলল, ওষুধের দামটাম আপনি আর দেবেন না।

কেন বলো তো?

বাবার হাতে টাকা হয়েছে, আমাকে বেদানা, কমলালেবু কেনবার পয়সা দেয়, রেশনের টাকা চাইলে মারতে আসে।

কোথা থেকে টাকা এল? তোমার দাদা পাঠিয়েছে?

দাদা সেই পঁচিশ টাকা পাঠিয়েছে, আর কিছু পাঠায়নি। মনে হয় ধার করেছে। দুজন লোক ক'দিন ধরে বাবার কাছে যাওয়া আসা করছিল।

তোমার দিদিকে দেখতে গিয়েছিলে? কেমন আছে?

ভাল আছে। পড়াশোনা করছে পরীক্ষা দেবে বলে।

বাড়ীতে আসতে চাইল না?

না। বাবার অসুখ ভাল হয়েছে, আপনি ওষুধের, ডাক্তারের টাকা দিচ্ছেন বলেছি।

দিন কেটে যেতে লাগল। নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি, মাঝে মাঝে তুলসীকে দেখে আসি। না গেলে কাঁদা-কাটা করে, কর্তার মেয়েরা জানিয়ে দেয়। মনে একটু চিন্তা রয়েছে, পরীক্ষাটা হয়ে গেলে তুলসীকে কোথায় রাখব?

তুলসীর পরীক্ষার আর একমাস বাকী বরদাবাবুর মৃত্যু হল। স্ট্রোক হয়েছিল। দু'দিন বেঁচে ছিলেন অজ্ঞান অবস্থায়। ফণীর কাছে শুনলাম বরদাবাবু বিছানায় বসে নোট গুণছিলেন। ফণী কি কাজে ঘরে ঢুকেছিল। লাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করতে গিয়ে পড়ে যান।

ফণীকে পাঠিয়ে তার স্ত্রীকে আনতে হল, তুলসীকে নিজে নিয়ে এলাম। সত্যকে টেলিগ্রাম করলাম ফণীকে দিয়ে।

অদ্ভুত ব্যাপার, বরদাবাবুর বালিশের নীচে দু'হাজারের মত টাকা পাওয়া গেল।

সত্য শ্রাদ্ধের আগের দিন পৌঁছল।

তার আগেই টাকার রহস্য পরিষ্কার হয়েছিল দু'দল পাওনাদারের আবির্ভাবে। টাকা পাওয়া গিয়েছিল বাড়ীটা দ্বিতীয়বার বাঁধা দিয়ে। শোনা গেল দু'দলের দাবি সুদে আসলে প্রায় আট হাজার।

সত্য শ্রাদ্ধ সেরে বাপের টাকার জেরার নিয়ে চলে গেল, বলল, দেনা শোধ দিয়ে বাড়ী রাখবার সাধ্য নাই তার, বেচবার চেষ্টার নষ্ট করার মত সময়ও নাই।

এত সব ব্যাপারের পরেও সে পরীক্ষা দেবে তুলসী জানাল। বললাম, ফল খারাপ হবে, এবার নাই বা দিলে।

বলল অনার্স পেপার খারাপ হলে দেব না।

পরীক্ষা দিল, তার আগে আমাকে ক'দিন খুব খাটিয়ে নিল।

বাড়ী নিয়ে গোলমাল শুরু হল দুই পাওনাদারের মধ্যে। বাড়ীটা যাবে তাতে কোন সন্দেহ নাই, যে ক'দিন বরদাবাবুর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতে পারেন থাকবেন। তারপর কি করবেন সে ভাবনা তাঁদের।

(২১)

অশোকের ষষ্ঠ ইনস্টলমেন্ট।

আমার বাড়ীটা প্রায় হয়ে এসেছে, এক-মাস পরে গৃহপ্রবেশ করব ভাবছি।

মাস্টারমশাইকে নিমন্ত্রণ করব, বরদা-বাবুর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে দু'টিকে বলব, আর কারখানার লোকজন সবাইকে বলব ঠিক করেছি।

একটা কথা মাথায় ঘোরাফেরা করছে অনেকদিন ধরে। আমার দু'টি ছেলেই লায়েক হয়েছে, তারাই চালাচ্ছে কারখানার কাজ-কারবার। তাঁদের কাজে হস্তক্ষেপ করি না। করবার প্রয়োজনও হয় না। যেখানে আমার পরামর্শ নেবার দরকার তারা পরামর্শ নেয়। তাহলে আমার মধ্যে যে কর্মশক্তি রয়েছে তাকে অকেজো করে রাখছি কেন, নতুন একটা কাজে হাত দিতে পারি, এই হল আমার মনের কথা।

মাস্টারমশাইকে কথাটা বলব ভাবছি। তাঁর কাছে গিয়ে বসি মাঝে মাঝে। নানা রকমের কথা হয়। তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগে। শুধু পণ্ডিত নন, জ্ঞানী লোক তিনি, হৃদয়বান মানুষ।

তুলসীকে মাঝে মাঝে দেখতে পাই তাঁর বাড়ীতে। আমি গেলে বলে, আসুন বড়বাবু, বসুন। একটু চা করে আনি আপনার জন্য। চা, বিস্কুট নিয়ে আসে। তুলসী ডাক্তারি পড়ছে। খরচ দিচ্ছেন মাস্টারমশাই। তুলসীর ছোট ভাই ক্যানটিনে কাজ করছিল, তাকে কারখানার কাজে ঢুকিয়ে নিয়েছি। বেশ চটপটে, চালাক ছেলে।

কথায় কথায় একদিন মাস্টারমশাই বললেন, দেখো অশোক, তুমি আমার ছাত্র ছিলে এখন বন্ধু হয়েছে। মন খুলে কথা বলা যায় তোমার সঙ্গে।

চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ. তারপরে বললেন, আমি একটা বিপদে পড়েছি।

বললাম, কি বিপদ বলুন, যদি আমাকে দিয়ে—

হেসে বললেন, ব্যস্ত হয়ো না আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য। আমার বিপদ স্বখাত সলিলে পড়েছি। বেশীর ভাগ মানুষ তাই পড়ে, নতুন ব্যাপার কিছু নয়। সংসারের দায়দায়িত্ব আমার সাধ্যমত মিটিয়ে দিয়ে আমাদের শাস্ত্রের ভাষায় বাণপ্রস্থ নিয়েছি। শাদা কথায় রিটায়ার করেছি। গেম স্যাংচুয়ারী বাদে বন পাওয়া শক্ত দেখে শহর থেকে সরে এসে এখানে মাথা গোঁজবার একটু জায়গা করতে হয়েছিল। ভুল করেছিলাম আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। এই তুলসী মেয়েটি আমাকে ডুবিয়েছে।

বললাম, তুলসী তো খুব ভাল মেয়ে, আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

বললেন, ভক্তি-শ্রদ্ধার ওপরে কোন লোভ নাই আমার। আমি সংসারত্যাগী মানুষ। একটা বোঝাকে কাঁধে নিতে হয়েছে তার কোন উপায় নাই দেখে। তুলসী কেন এসে জুটল? তার জন্য বুড়ো বয়সে অনেক দুর্ভোগ পোয়াচ্ছি. আরও পোয়াতে হবে মনে হচ্ছে। বরদাবাবুর বাড়ীটা পাওনাদারদের হাতে গেলে মা ভাইকে নিয়ে ও যাবে কোথায়? বরদাবাবুর বড় ছেলে যে ওদের ভার নেবে মনে হয় না আমার কাঁধে এসে চাপবে না কি তুলসী? তুমি আমাকে অনেক দিন থেকে জানো ঝঞ্ঝাট পছন্দ করি না আমি। কি গেরোর মধ্যে পড়ে গেলাম দেখছ না?

হেসে বললাম, তুলসীকে আপনি খুব ভালবাসেন মাস্টারমশাই। তুলসীর ভার আপনার ভার বলে মনে হবার কথা নয়। তুলসী আপনার কাছে থাকতে পারে। ওর মা, ভায়ের জন্য একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে হয়ত।

কি ব্যবস্থা হবে?

ভেবে দেখি, তারপর বলব আপনাকে।

হেসে বললেন, তুলসীর ছোঁয়াচ তোমাকে লাগল নাকি অশোক?

বললাম, না, আমার চোখ রয়েছে ওর ছোট ভায়ের ওপরে, কাজের ছেলে হবে ফণী।

বললেন, বেশ, ভেবে যা বলবে শোনবার অপেক্ষায় থাকব।

একটা সারপ্রাইজ দেব মাস্টারমশাইকে গৃহ প্রবেশের দিন। আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানে না যে বরদাবাবুর বাড়ীটা আমি পাওনাদারদের দাবি মিটিয়ে কিনে নেব স্থির করেছি। একজনের টাকা দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয় পাওনাদারকে কাল টাকা দেবার কথা আছে। অনেকটা জমি আছে, ছাড়তে পারলাম না। জমিটা আমি কাজে লাগাতে পারব, বরদাবাবুর পরিবার থাকবে বাড়ীতে।

(২২)

আমার ষষ্ঠ ইনস্টলমেণ্ট।

কলেজ থেকে ফিরে আমাকে চা দিয়ে সামনে বসে চা খাচ্ছিল তুলসী, বকাবকি করছিলাম, বুড়ো জ্যেঠামশাইকে খাওয়াবার জন্য টফি কিনে এনেছে ক'টা।

এমনি করে পয়সা নষ্ট করছিস, পয়সা আসে কোথা থেকে বল তো?

তোমার কাছ থেকে। একটু হেসে, কেমন এক রকম চোখের ভাব করে বলল।

দেখো বাপু—

অধর একখানা খাম এনে হাতে দিল। দেখলাম বিদেশী স্ট্যাম্প লাগানো, হাতের লেখা দেখে বুঝলাম দেবাশিস লিখেছে।

আমার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল তুলসী, বলল, আমেরিকা থেকে কে তোমাকে চিঠি লিখেন জ্যেঠামণি, ডি ভাদুড়ী কে?

বললাম, খাঁচা ঘরে যে ছেলেটির ছবি রয়েছে সেটা ডি ভাদুড়ীর, মানে দেবাশিসের।

এখানে বলা দরকার এই ছবি ও আরও তিনখানা ছবি অশোকের কারখানার গুদাম ঘরে পড়ে থাকতে দেখে আমি চেয়ে নিয়েছিলাম। ছবিগুলো মিঃ ভাদুড়ীর বাড়ী থেকে সংগৃহীত হয়েছিল অশোক বলেছিল।

বললাম, দেবাশিস ভাদুড়ী আমার ছাত্র ছিল। সাত আট বছর বিদেশে রয়েছে ও।

সাত আট বছর? কি করছেন এতদিন?

ভাল মন্দ অনেক কিছু করছে, বেশীর ভাগ মন্দ।

তার মানে কি হল? বিদেশে পড়াশোনা করতে যাননি?

সবাই কি বিদেশে পড়াশোনা করতে যায়? বেড়াতে যায়, স্ফূর্তি করতে যায়, চাকুরি করতে যায়। দেবাশিস পালিয়ে গিয়েছিল।

সে কি? পালালেন কেন?

সে অনেক কথা তুলসী. এখন থাক। কি লিখেছে এতদিন পরে পড়ে দেখি।

আচ্ছা, তুমি চিঠি পড়ো, আমি উঠলাম।

উঠলাম মানে মহামায়ার কাছে গিয়ে বসবে, গল্প করবে।

দেবাশিস লিখেছে, মাস্টারমশাই, আমার প্রণাম নেবেন।

আমার এখানকার কাজ এক রকম শেষ হয়েছে। বাকীটা দু'চার মাসের মধ্যে শেষ করে আনতে পারব আশা করছি।

একটা ফ্যাকটরী ও রিসার্চ লেবরেটরীর ড্রাফট প্ল্যান দাঁড় করিয়েছি, অভিজ্ঞ লোকদের সেটা দেখিয়ে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সেটা পাকা করে নিতে হবে। এঞ্জিনীয়ারিং, টেকনোলজি, রিসার্চ, লেবর, প্রোডাকশন, এডভারটাইজিং, মার্কেটিং সব দিক দিয়ে স্টাডি করতে চাই জিনিসটাকে আমেরিকান এক্সপার্টদের সাহায্য নিয়ে।

ক্যাপিটালের কথাও ভাবছি। অনেক টাকার দরকার। এদেশের টাকাওয়ালাদের কিছু অংশ প্রাইভেট সেকটরের আন্ডারটেকিংয়ে টাকা খাটাতে অনিচ্ছুক নয়, পার্টির বোনাফাইডা' সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হলে। একটা জায়গায় আমার চেষ্টা সফল হয়েছে। মিসেস কে—মোটা টাকা দিতে রাজি হয়েছেন শেয়ারহোল্ডার হিসাবে, সর্ত দরকারী মালমশলার অন্ততঃ অর্ধেকটা আমেরিকা থেকে কিনতে হবে। মানে আমেরিকার টাকার খানিকটা যেন আমেরিকায় ফিরে যায়। আশ্বাস দিয়েছেন আরও টাকা তুলে দেবেন তিনি।

আমাকে বললেন, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি একটি হ্যানসম, চালবোলওয়ালা ইয়ং ইণ্ডিয়ান, আমার কিছু টাকা খসিয়ে পালাবে, বুড়ী সঙ্গিনীকে কতদিন আর সঙ্গ দেয়া যায়? তুমি য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে শুরু করা থেকে নজর রেখেছি তোমার ওপরে। ক্রমে বুঝলাম তোমার অভিপ্রায় এদেশ থেকে শিক্ষায় পাকা হয়ে দেশে ফিরে গিয়ে কিছু করতে চাও। তুমি স্ফূর্তিবাজ ছেলে বাট উইথ এ প্রিন্সিপল। তোমার মধ্যে ডেপথ আছে, তোমার একটা ক্যারেকটার আছে, ভাল মাথা আছে, কেজো লোকদের স্বভাবসিদ্ধ একগুঁয়েমি আছে। যে পথে চলতে চাইছ তুমি আমি জানতাম সেই পথে চলবে।

স্বচ্ছন্দে আমার কাছে কাটাতে পারতে যতদিন খুশী, দু' চারটে কম বয়সের গার্ল ফ্রেন্ডদের সঙ্গে মেলামেশায় আপত্তি করতাম না, ওড়াবার জন্য টাকা চাইলে দিতাম। তুমি চেহারায় সুন্দর, তোমার আলাপ-আলোচনা খুব ভাল, ইণ্টারেস্টিং, একসাইটিং, প্রোফাউন্ড উইজডমের কথা বলে ফেলো মাঝে মাঝে। আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে।

বললেন, গো এহেড মাই বয়, তোমার কাজের জন্যে টাকা দেব, টাকা তুলে দেব, যতটা পারি সাহায্য করব।

একদিন একটা মজার কথা বললেন। কথাটা এই রকমের, তোমার সাহায্যে ইণ্ডিয়াকে জানবার সুযোগ দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমার সাহায্যে আমেরিকাকে জানবার সুযোগ দেবার জন্য আমাকে ধন্যবাদ দাও তুমি।

দরকারী মাল সম্বন্ধে কথাবার্তা পাকা করে রওনা হতে আরও কিছু সময় লাগবে মনে হয়। আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। ফ্যাকটরী কোথায় করা যায় একটু খোঁজ খবর নেবেন। আপনার এখন কি-ভাবে চলছে জানি না। আপনি ভাল আছেন, আমাকে সাহায্য করবার জন্য ভাল থাকবেন বিশ্বাস করি মনে মনে।

নিজেরও কথা অল্প কিছু বলছি কাজের কথার পরে। নিজের কথা মানে আমার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটছে তার কথা। আমার বুদ্ধি সব জিনিসের আবরণ ছিঁড়ে কেটে তার ভেতরটা দেখতে চেয়েছে। সেকস-মোরালিটি কোনদিন মানিনি তবে মোরাল কোড অব কনডাকট মেনেছি। সেকস মোরালিটি না মানলেও ওয়াইল্ড লাইফের মধ্যে কখনও যাইনি, জিনিসটা অত্যন্ত ভালগার লেগেছে। এখন দেখছি একটা রেজিস্ট্যান্স গড়ে উঠছে ভেতরে সেকস

এপিলের বিরুদ্ধে। মিসেস কে—চোখ কপালে তুলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে বার বার চান আমার দিকে আমার জন্য ইয়ং গার্ল ফ্রেন্ড আমদানি করবার চেষ্টায় আপত্তি জানালে। আপত্তির কারণ বোঝবার মত মাথা তাঁর নাই।

রওনা হবার ব্যবস্থা হয়ে গেলে খবর দেব।

(২৩)

অশোকের সপ্তম ইনস্টলমেণ্ট।

ক'দিন একটা ফালতু কাজে ব্যস্ত ছিলাম। মাস্টারমশাইকে আমার নতুন কাজের কথাটা খুব সংক্ষেপে বলেছি মাত্র, ভাল করে বুঝিয়ে বলে পরামর্শ চাইব ভাবছি ক'দিন থেকে, সময় করে উঠতে পারিনি।

ফালতু কাজ হচ্ছে পাড়ার যে ছোট মেয়েদের স্কুল সেটাকে কিছু বড় করে স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা করবার কাজ। বারো বছর পর্যন্ত ছেলেরাও পড়বে। শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী, বি-এ, বি-টি স্কুলের হেড মিসট্রেস নিযুক্ত হয়েছেন। ইনি বরদাবাবুর বিধবা। গেল বছর বি-টি পাশ করে কলকাতায় একটা মেয়ে স্কুলে চাকুরি করছিলেন। বেতন চেষ্টা করেও দেড়শো টাকার বেশী দেয়া চলে না এখন, পরে দেয়া যাবে হয়ত।

আমার স্ত্রী বললেন, নিয়োগপত্র পেয়ে ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁকে বলেছেন আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবেন আপনার স্বামীকে, নিজের মুখে বলতে লজ্জা করবে তাই আপনাকে বলছি।

স্কুলের জন্য আর দু'টো ঘর দরকার, ফার্ণিচার দরকার, লাইব্রেরী দরকার। গভর্ণিং বডির মেম্বারদের সঙ্গে মিলে এগুলোর ব্যবস্থা করছিলাম।

রবিবার সকালে চা খেতে খেতে ভাবছিলাম আজ মাস্টারমশায়ের কাছে যাব। তুলসী আসছে দেখলাম।

আমার বসবার ঘরের পাশে একটা ছোট বাগান আছে, ক'টা গোলাপ গাছ আছে বাগানে। আসতে আসতে বাগানের পাশে দাঁড়াল তুলসী, আমার দিকে তাকাল, তারপর বাগানে ঢুকে মার্শাল নীলের ঝাড় থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নাকের কাছে ধরল।

ফুল হাতে আমার সামনে এসে বসল, বলল, বড়বাবু, একটা ফুল চুরি করলাম আপনার বাগান থেকে।

বললাম, আমি তাকিয়ে দেখছিলাম, একে চুরি করা বলে না।

হেসে বলল, কি বলে তাহলে?

বলো ফুল নেওয়া।

হাসতে লাগল।

বললাম, ব'সো তুলসী চা খাও।

খাব ভেতরে গিয়ে, আপনাকে একটা কথা জানাতে এলাম। জেঠামণি আপনার খোঁজ করছিলেন। পারলে, আজ যাবেন।

বললাম, আমিও ভাবছিলাম আজ যাব। তিনি ভাল আছেন?

ভাল আছেন। কোন একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছেন ক'দিন থেকে দেখছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি যাচ্ছি কাজ সেরে। তুলসী, অনেক অব্যবস্থার মধ্যে স্কুলের কাজ চালাতে তোমার মার হয়ত কিছু অসুবিধা হচ্ছে—

বড়বাবু, ও সব কথা বলবেন না। আপনার মত ভাল লোক হয় না, জেঠামণির ছাত্র কিনা আপনি। মা খুব খুশী হয়েছেন এই কাজ পেয়ে, কাজ করতে ভালবাসেন তিনি। আপনার অনেক প্রশংসা করেছে জেঠামণির কাছে, আপনাকে কি বলব বলুন।

বললাম, কিছু বলতে হবে না, ভেতরে যাও তুমি।

তুলসী ভেতরে গেল, কিছুক্ষণ পরে আমিও মাস্টারমশায়ের বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

নূতন খবর দিলেন মাস্টারমশাই।

বললেন, ঈস্ট ইণ্ডিয়া করপোরেশনের মিঃ ভাদুড়ীর ছোট ছেলে দেবাশিসকে চিনতে তুমি?

বললাম, আমি কাজে যোগ দেবার আগে তিনি বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে দু'চারটা কথা লোকের মুখে শুনেছি। তেমন কমপ্লিমেণ্টারী নয়।

হাসলেন মাস্টারমশাই, বললেন, তা জানি। প্রায় তিন বছর দেবাশিসের প্রাইভেট টিউটর ছিলাম আমি। আমার কাছে পড়তে পড়তে সে বিলাতে চলে যায়।

সাত আট বছর বাইরে ঘুরছে। শেষ পাঁচ বছর আমেরিকায় পড়াশোনা করছে। ভাল দু'চারটে ডিগ্রি পেয়েছে, চাকুরি করছে য়ুনিভার্সিটির রিসার্চ বিভাগে। তার পড়াশোনার বিষয় ড্রাগস, কেমিকেলস, ফার্মাসিউটিস ইত্যাদি। দেশে ফিরে একটা ফ্যাক্টরী ও রিসার্চ লেবরেটরী করবে জানিয়েছে। প্ল্যান তৈরী করেছে ওখানকার এক্সপার্টদের সঙ্গে পরামর্শ করে, ক্যাপিটেল সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে। ও যা ছেলে মাথায় যখন এই স্কীম ঢুকেছে কিছু একটা করবে।

তাই ভাবছিলাম ওর চিঠি পাবার পর থেকে। আর তিন চার মাসের মধ্যে দেশে ফিরে আসবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন, তারপর বললেন, তোমার নূতন কাজের কথা যা বলেছ সেটাও ঐ। তোমার ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা আছে, ড্রাগস, কেমিকেলস্ নিয়ে কাজ করবার অভিজ্ঞতা নাই। দেবাশিস থিওরেটিকেল ও প্র্যাকটিকেল জ্ঞান সংগ্রহ করেছে আমেরিকার মত অতি এডভান্সড্ দেশে। আমি বলি কি ও না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে তোমার চলবে কি? দেশে ফিরলে কথাবার্তা হোক তোমাদের মধ্যে, ভালো মনে করো যদি যোগ দেবে ওর সঙ্গে, নইলে স্বাধীনভাবে নিজে কাজ আরম্ভ করবে।

বললাম, তিনি কি যোগ দিতে বলবেন আমাকে?

সে কথা বলব তাকে। না বলবার কোন কারণ এখন চোখে পড়ছে না। না বলে তো তোমার কাজের স্বাধীনতা তো যাচ্ছে না।

বললাম, আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি।

চা খাবে অশোক? তুলসী, ও তুলসী!

দেখে বললাম, তুলসীকে আমার বাড়ীতে দেখলাম। সে খবর দিল আপনি ডেকেছেন।

বললেন, রবিবারে সকালে তুলসী আসে, সারাদিন থাকে। ভুলে গিয়েছিলাম আজ আসেনি। বসো একটু, আমি বলে আসছি।

চা খেয়ে এসেছি মাস্টারমশাই।

তা হোক, আর একবার খাও।

মাস্টারমশাই উঠছেন দেখা গেল তুলসী ফটকে ঢুকছে। বসলেন তিনি।

বারান্দায় উঠে এল তুলসী, হাতে কটা গোলাপ। আমার দিকে চেয়ে হাসল! দু'টো ফুল মাস্টারমশায়ের পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করল, বলল, এ দু'টো পিসীমাকে দিয়ে আসছি।

মাস্টারমশাই গম্ভীর মুখে বললেন, আমাকে ঠাকুর বানিয়ো না তুলসী ঠাকরুন, আমি মানুষ।

ঠাকুরকে মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় তুমি জানো না কি জেঠামণি?

তুমি বললে তাই জানলাম।

বাজে কথা। তুমি তো বলেছ যার মধ্যে যতটুকু ভাল আছে সেই ভালটুকু আশ্রয় করে ঠাকুর থাকেন।

মনে নাই বলেছি। এখন এক কাপ চা এনে দাও তো অশোককে।

আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তুলসী ভেতরে গেল।

মাস্টারমশাই বললেন, দেবাশিসের কথা আর একটু শোন। কয়েকটি বছর প্রাইভেট টিউটরী করেছিলাম জানো বোধ হয়। অদ্ভুত রকমের মন্দ ছাত্রছাত্রী জুটেছে বরাতে। মন্দ কথাটা না বলে উদভ্রান্ত বলা যায়। কিসের জন্য কি এরা করছে সে বোধ ছিল না। যদি মন্দ কথাটা ব্যবহার করতে চাও তাহলে বলব এদের মধ্যে দেবাশিস ছিল সেরা মন্দ। অথচ ভাল হবার প্রচুর উপকরণ তার মধ্যে ছিল। আমার কাছে পড়তে পড়তে সে ঘোরতর মন্দ হয়ে ওঠে, তার কুকাজের কথা মুখে আনা যায় না। কোনদিন উপদেশ দিইনি তাকে, কিছু ফল হত না তাতে জানতাম। আমার বিশ্বাস ছিল সাময়িক উদভ্রান্তি কাটিয়ে একদিন সে সুস্থ মানুষ হয়ে উঠবে হয়ত। তা যদি হয় তাহলে ও-ছেলের জুড়ি মিলবে না সহজে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে, অধীত বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে, কর্মনিষ্ঠায়, সাধুতায়। আমার বিশ্বাস কতদূর ঠিক বলতে পারছি না। তবে চিঠিপত্র থেকে মনে হয় জীবনে হয়ত পথ খুঁজে পেয়েছে দেবাশিস।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, সে এসে পড়লে আমি বুঝতে পারব অবস্থা, তোমার অসুবিধে হতে পারে এমন কোন—

বাধা দিয়ে বললাম, আমার মনে কোন ইতস্তত ভাব নাই মাস্টারমশাই, আপনার পরামর্শ আমি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছি।

হেসে বললেন, বেশ।

তুলসী চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আমাদের আলাপ শুনছিল। কথা থামতে এগিয়ে এসে চা দিল আমাকে। মাস্টারমশায়ের দিকে ফিরে বলল, তোমার সেই আমেরিকার ছাত্র আসছেন নাকি?

তাই তো লিখেছে, মাস্টারমশাই বললেন।

তুলসী বলল, জ্যেঠামণি, পিসীমার জ্বর মত হয়েছে, তাই নিয়ে পুজো সেরে রান্না করতে যাচ্ছিলেন, আমি শুইয়ে দিয়ে এলাম। তোমার জন্য ডুমুরের ঝোল ছাড়া আর কি করব বলো।

ডুমুরের ঝোলটাও তোমার হাতে ভালমত উতরোয় না, বেশী আর কি করবে? অধর বাজার থেকে কি আনল দেখি চলো।

থাক, তোমাকে যেতে হবে না। তোমাকে কিছু বলতে যাওয়া ভুল হয়েছে।

হাসলেন মাস্টারমশাই, জবাব দিলেন না।

তুলসী ভেতরে চলে গেল। একটু পরে বিদায় নিলাম তাঁকে প্রণাম করে।

( ২৪ )

আমার সপ্তম ইনস্টলমেন্ট।

মহামায়া খবর দিল তুলসীর ম... এসেছেন, কিছু বলতে চান।

ভেতরে যেতে প্রণাম করে তুলসীর ম... আমার কাছে মাটিতে বসলেন। বললেন দু'টো কথা জানাবার জন্য এসেছি।

বলুন।

সভায় একটা চিঠি পেয়েছি। লিখেছে, মাসের শেষের দিকে আমি বিয়ে করছি। …টা দিলাম শুধু, এ বিয়েতে তোমাদের …তে বলতে পারছি না নানা কারণে। …সীর ব্যবহারে খুব আঘাত পেয়েছিলাম …। আমার বিশ্বাস কবার অকালমৃত্যুর …া তুলসী খানিকটা দায়ী।

তারপর লিখেছে, খবর পেলাম বাড়ীটা …মুক্ত হয়েছে এবং তোমরা বাড়ীতে বাস …ছ। বাড়ীতে আমারও অংশ আছে। আমি …মার অংশ বিক্রি করতে ইচ্ছুক। তোমরা … কিনতে ইচ্ছা করো কি দাম দিতে …মরা প্রস্তুত আমাকে জানালে ভাল হয়। …মরা কিনতে ইচ্ছুক না হলে অন্য …দ্দরের খোঁজ করতে হবে।

বললাম, আর কিছু লিখেছে?

মাথা নেড়ে জানালেন না।

কিছুক্ষণ ভাবলাম। তারপর বললাম, …কে লিখে দিন বাড়ী সম্বন্ধে ভুল খবর …য়েছ তুমি। দেনার দায়ে বাড়ী বিক্রি …ছে, যিনি কিনেছেন দয়া করে তিনি …দিন থাকতে দিয়েছেন, যখন বলবেন …র দখল ছেড়ে দিতে হবে।

আর একটা কথা আছে, তুলসীর মা …লেন। তুলসীর বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছে। … নাই আর আপনার দয়ায় ডাক্তারি পড়ছে, …এতদিন এ কথা ভাবিনি। একজন …র, সরকারী চাকুরি করেন, নিজের বাড়ী …, তুলসীকে বিয়ে করতে চান। তুলসী … ছাত্রী বলে তুলসীকে কোন কথা …নি, আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। …টি জানাল এক পয়সা লাগবে না।

বললাম, আপনি তুলসীর মা, আপনার মনে হলে চেষ্টা করতে পারেন।

বললেন, আপনার মত না পেলে—

হেসে বললাম, তুলসীর মত বলুন। সঙ্গে কথা বলুন, সে রাজি হলেই

আপনি যদি একটু বলেন তুলসীকে—

…মার বলবার সময় আসেনি। তুলসীর …ানুন, ডাক্তারি পাশ করবার আগে … অবস্থাপন্ন ছেলে পাওয়া গেলে সে … করতে রাজি আছে কিনা। সে রাজি … আমি ছেলেটির সম্বন্ধে খোঁজ-খবর … আপনাকে জানাব, দরকার হলে …কে বলব।

…ক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি …, আচ্ছা তুলসীকে বলব।

…মায় প্রণাম করে উঠে মহামায়ার ঘরে …।

…বতে ভাবতে বাইরে এসে বসলাম। … বিয়ের কথা এই প্রথম উঠল। আগেই …পারত, কারণ মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে …কটা বড় কথা। জানি না কেরিয়ার … বিয়ের কথা তুলসীর মাথায় আসে … তার নিজের বাড়ীর অভিজ্ঞতা ভাল …রিয়ার হিসাবে বিয়েকে একটা পথ মনে করে দেখবার অনুকূল নয়। সে জন্য ডাক্তারি পাশ করে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করতে চায়। তার চরিত্রে খানিকটা স্বাধীনতা-প্রিয়তা আছে। মা বিয়ে দিয়ে মেয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চাইতে পারেন, এটা স্বাভাবিক, কিন্তু তুলসী কি চট করে রাজি হবে? মনে হয় না।

একটা জিনিস আছে তুলসীর স্বভাবে। স্বভাব ও চরিত্র এক জিনিস নয়। ইমোশনাল টাইপের মেয়ে তুলসী, ভালবাসতে চায়, ভালবাসা পেতে চায়। এ চাহিদা মেটবার আশ্বাস যেখানে আছে সেখানে সে কি করবে বলা শক্ত।

তুলসীর বিয়ে এখুনি যে হচ্ছে অমন, তবু একটা কথা মনে এল। ধরো তুলসীর পছন্দমত বিয়ে হল, সে স্বামীর ঘর করতে গেল, এখানে এসে দু' এক সপ্তাহ পরে পরেও দেখা দিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না, ধীরে ধীরে তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে লাগল, তার জেঠামণি ডাকের মধ্যে যে মধু আছে ডাইলিউটেড হয়ে হয়ে টিউবওয়েলের জলের মত হয়ে আসল, তার আদর কাড়বার প্রক্রিয়াগুলো আড়ষ্ট অভিনয়ের পর্যায়ে নামতে নামতে যবনিকার অন্তরালে চলে গেল, তার—

হেসে উঠলাম নিজের মনে। এই কথা? তা হলে বলো, তুলসী ছোটই থাকুক, দুঃখ পেলে তোমার কোলে মাথা রেখে কাঁদবে, আনন্দ হলে গলা জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে পিঠে চুমো খাবে। তোমার জামা-কাপড় গুছিয়ে রাখবে। জুতোগুলোয় ব্রাশ চালিয়ে পরিষ্কার করবে, টেবিলের, সেলফের বইয়ের ধুলো ঝেড়ে, ফুলদানিতে ফুল গুছিয়ে রাখবে, শরীর ভাল নয় শুনলে মাথা টিপে, পা টিপে দেবে, ইলেকট্রিক পাখার ঠাণ্ডা লাগবে বলে হাতপাখা চালাবে—

হ্যাঁ, বলো তাহলে ও তুলসী, আর বড় হোসনে, যতটা বড় হয়েছিস সেটা বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে, কিছুটা বোঝে, অনেকটা বোঝে না এ রকম বয়স তোকে ভাল মানায়। কেন সেই বয়সের খুঁটি আঁকড়ে রইলি না?

বয়স হলে, ডাক্তারি পড়লে কি হবে, তুলসীর বুদ্ধি পাকেনি, ভাগাও হয়নি।

এক শনিবার বিকেলে এসে বলল, এখানে থাকব রাতে মাকে বলে এসেছি।

সন্ধ্যার পরে গল্প হচ্ছিল তিনজনের মধ্যে, আমি, মহামায়া, তুলসী।

গল্পের মধ্যে তুলসী এক সময়ে বলল, পিসীমা, ফণী আমার ছোট কিন্তু খুব কাজের, খুব ভারিক্কি হয়েছে, রাতের বেলাতেও তার গল্প করবার সময় হয় না। আমি যদি মন্তর জানতাম জেঠামণিকে ছোট খোকা বানিয়ে দিতাম, আমি ছোট খুকি হতাম। সারাদিন দুজনে ছুটোছুটি খেলা করতাম, গাছে চড়ে পেয়ারা পেড়ে খেতাম, তোমাকে লুকিয়ে পশ্চিম দিকের ডোবায় সাঁতার কাটতাম। আড়ি হত, ভাব হত দিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বই এখন করতে করতে …বানদের কবি লোকেরা … মনোজ্ঞ। সাহিত্য সেখা…

বললাম, খোকা … থাকলে?

আমিও বড় হতাম। দুজনে এক সঙ্গে স্কুলে যেতাম, বাড়ী ফিরে এক সঙ্গে খেলা করতাম, খেতাম।

আড়ি ও ভাব হত না?

সে তো হতই। ঝগড়া হলে পিসীমার কাছে নালিশ করতাম। সে করত, আমিও করতাম।

আরও বড় হলে?

তখন দুজনে কলেজে পড়তাম। সে আমার কলেজের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, আমাকে নিয়ে বাড়ী আসবার জন্য। ডালমুট কিনত সে, খেতে খেতে বাড়ী ফিরতাম।

মহামায়া বলল, তারপর তোর বিয়ে হয়ে গেল, দুজনের ছাড়াছাড়ি হত তো?

হেসে তুলসী বলল, ছাড়াছাড়ি হবে কেন? আমি ওকে ভালবাসতাম, ওকেই বিয়ে করতাম।

হেসে মহামায়া বলল, এমন মন্তর কোথায় পাবি তুলসী?

তারপর বলল, তুই বড় হয়েছিস, এবার তোর বিয়ে দিতে হবে। তোর মা একটি ডাক্তার ছেলের খবর পেয়েছেন—

মুখ গম্ভীর হল তুলসীর। একটু পরে হাসতে লাগল। বলল, ভারি মজার লোক পিসীমা এই ডাক্তারবাবু। ইণ্টারেস্টিং করে তাকান বার বার ক্লাসে পড়াবার সময়, বাইরে দেখা হলে।

জেঠামণির দিকে তাকিয়ে পিসীমাকে দেখাল কি রকম ইন্টারেস্টিং করে ডাক্তারবাবু তার দিকে তাকান।

মহামায়া বলল, তোর পছন্দ হয়েছে মনে হচ্ছে। তোর মাকে বলব সম্বন্ধ করতে?

জেঠামণি টাকা খরচ করে ডাক্তারি পড়াচ্ছেন ডাক্তারিটা পাশ করতে দাও। নিজে এত কষ্ট পেয়েছেন মা তবু বুদ্ধি হল না। দাঁড়াবার জায়গা নাই, যা পান তাতে পেট চলে না এ বাজারে।

বললাম, ফণী তো রোজগার করছে।

বলল, হ্যাঁ, রোজগার করছে, দাদাও রোজগার করছে। ফণীর রোজগার একটু ভাল হলে দাদার মত করবে দেখো। মার বয়স হচ্ছে, স্কুলের চাকুরি গেলে একমুঠো ভাত জুটবে না। আমি ডাক্তার হয়ে বেরোলে মার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হব। আমার সম্বন্ধেও। তোমার কাছে পড়বার খরচ নিচ্ছি এমনি এমনি নাকি?

বুঝলাম, তুলসীর বুদ্ধি একদিকে পাকেনি অন্যদিকে পাক ধরেছে।

বাইশ বছর বয়সে তুলসীর বুদ্ধি এ রকম কাঁচা-পাকা রয়েছে। হয়ত এইটে স্বাভাবিক ঐ বয়সে। তবু মনে হয় তুলসীর স্বভাবে কাঁচার ভাগটা বেশী।

(ক্রমশঃ)

টো হো ... থামে (ভিয়েতনাম)

ডঃ বচ্চন (ভারত)

ডঃ অগাস্টিনেৎ নেটো (অ্যাঙ্গোলা)

# চতুর্থ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন

এশিয়া এবং আফ্রিকা—পৃথিবীর দুই বৃহত্তম প্রতিবেশী দেশ। প্রাচীনতম ঐতিহ্যকে ধারণ করেও এই দুই মহাদেশ ঔপনিবেশিকতার শিকারে পরিণত হয়েছিল একদিন। বিগত চারশত বৎসর এই ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের ইতিহাস। কিন্তু আজ এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশই সেই ঔপনিবেশিক শোষনের শৃংখল ছিন্ন করে এগিয়ে এসেছে। আর কোথাও কোথাও চলেছে তাকে ছিন্ন করার সংগ্রাম। একদিক থেকে মানবিকতার এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অবস্থান করা সত্ত্বেও এই দুই মহাদেশের মানুষদের মধ্যে যোগাযোগ তেমন উল্লেখ্য নয়। আমরা ইউরোপ বা আমেরিকার শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে যত জানি, তার সামান্য অংশও এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন সাহিত্য, ভাষা শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানি না। এই অবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এবং আফ্রো-এশীয় সংহতিকে দৃঢ়তর করবার মানসে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের আয়োজন। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৬ থেকে ২০ নভেম্বর নতুন দিল্লির বিজ্ঞানভবনে অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন। এত বড় সাহিত্য সম্মেলন এর আগে ভারতে হয়নি। এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় চারশত লেখক এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এছাড়াও ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশ থেকেও কয়েকজন লেখক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া যোগ দিয়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় তিনশতাধিক কবি-লেখক।

**উদ্বোধনী অনুষ্ঠান**

সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় ১৬ নভেম্বর সকাল ৯টায় বিজ্ঞান-ভবনে। উদ্বোধন করেন সাহিত্য আকাদামির সভাপতি **ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।**

অ্যালেক্স লাগুমা (দক্ষিণ আফ্রিকা)

মাদাম জুলিফা (সোভিয়েত)

মামুদ দারিশ (প্যালেস্টাইন)

র্চার সুদীর্ঘ ভাষণে তিনি বলেন—"এই সম্মেলনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। পূর্ববর্তী দুটো সম্মেলনে আমি যোগ দিয়েছি। আমার এই আগ্রহের কারণ, এই সম্মেলন এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বদ্ধপরিকর।' ভারতীয় কার্যকরী সমিতির সম্পাদক **ডঃ মুলকরাজ আনন্দ** সাংগঠনিক বিবৃতি দিয়ে বলেন—"একদিকে থেকে আমরা গর্বিত এই কারণে যে, এই সম্মেলনের সূত্রপাত এই ভারতেরই যমুনাতীরে। ১৯৫৬ খৃঃ যে এশীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখানে, তাই আজ বিরাট মহীরূহ হয়ে চতুর্দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে।" সম্মেলনের মূল সম্পাদক মিশরের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক **ইউসুফ এল সেবাই** বেইরুটে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে এই সম্মেলন পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন সাংগঠনিক দিক পর্যালোচনা করে ভাষণ দেন। তিনি বলেন—"ঔপনিবেশিক শোষণ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হচ্ছে। এশিয়া ও আফ্রিকার লেখকদের এই সময়-চেতনাকে তাঁদের লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে। লেখকদের দায়িত্ব মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে কম নয়।"

সম্মেলনের শুভ কামনা করে ভারতের রাষ্ট্রপতি **শ্রী ভি ভি গিরি**, রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক **লিওনিদ ব্রেজনেভ**, মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান **ডঃ আনোয়ার সাদাৎ** প্রমুখ সুদীর্ঘ বাণী পাঠান। সম্মেলনে এগুলি পাঠ করা হয়।

**লোটাস পুরস্কার বিতরণ**

ঐদিন সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ পরিবেশে ৬৯ খৃঃ ও লোটাস পুরস্কার বিজয়ী-পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে উত্তর ভিয়েতনামের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক **তো হোয়াই**, দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক **আলেক্স লাগুমা**, প্যালেস্টাইনের **মহম্মদ দারবিস**, রাশিয়ার প্রখ্যাত কবি **জুলফিয়া** এবং ভারতের **বচ্চন** উপস্থিত ছিলেন। অ্যাঙ্গোলার কবি ও **আগস্টিনো নেটো** উপস্থিত থাকতে পারেন নি। পুরস্কার প্রদান করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী **শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী**। শ্রীমতী গান্ধী এক আসাধরণ ভাষণে এশিয়া এবং আফ্রিকার মধ্যে শিল্পী সাহিত্যিকদের নিকটতর হবার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—"এখনও এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইংরেজ, আমেরিকান বা ফ্রেঞ্চ লেখকদের বই পঠিত হয়। সেগুলি যত বস্তুনির্ভরই হোক না কেন, তাঁদের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত নয়।" তিনি সোজাসুজি প্রশ্ন করেন, দুই মহাদেশের ব্যাপারে তৃতীয় শক্তির অনুপ্রবেশ সুস্থ পরিবেশের কি সহায়ক হতে পারে? লুসাকায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তখন তিনি সেখান থেকে যেসব বার্তা ভারতে পাঠিয়েছেন, তা লণ্ডন হয়ে ভারতে এসেছে। "আমাদের উভয় মহাদেশের মধ্যে সোজাসুজি সংযোগ স্থাপনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।" এর মধ্যে তৃতীয় গোষ্ঠীর প্রভাব যতদিন থাকবে, ততদিন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অশুভ কীর্তি-কলাপ চলবে। তিনি এই দুই মহাদেশের মধ্যে নিজস্ব সংবাদ সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। উপসংহারে তিনি বলেন—"বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোন স্বাধীনতাই পূর্ণ হতে পারেনা। এশিয়া এবং আফ্রিকার লেখক সমাজ তা উপলব্ধি করে নিজ নিজ দেশে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করি।" তিনি অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত বিদেশী লেখকদের সঙ্গে করমর্দন করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চ ছেড়ে যাবার আগে তিনি সহসা রুশ কবি জুলফিয়ার কাছে যান। পরিচয় তাঁদের আগেই ছিল। বহুদিন পরে দেখা হওয়ার আনন্দে উভয়ে উভয়কে গভীরভাবে আলিঙ্গন করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটিতে এক অপূর্ব আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে।

**প্রতিনিধি দলের নেতাদের ভাষণ**

১৭ ও ১৮ নভেম্বর এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লেখক প্রতিনিধি দলের নেতারা তাঁদের নিজ নিজ সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বলেন। তাঁদের ভাষণ থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের লেখক **ফান তু** তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় দক্ষিণ ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের সুদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন—"আমাদের ভিয়েতনামের লেখকরা খুব ভালভাবেই জানেন যে, আমাদের স্বাধীনতালাভের সঙ্গে জীবন ও অস্তিত্ব জড়িত। আমি একথা বলতে গিয়ে গর্ববোধ করছি যে, দেশের এই পরিস্থিতিকে লেখকরা যথার্থভাবেই আমাদের সাহিত্যে তুলে ধরছেন। ১৯৬৮ খৃঃ থেকে ৭০ খৃঃ মধ্যে প্রায় ৫০টি বই আমরা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি।" তিনি তাঁর ভাষণের উপসংহারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—"তাঁর রচনা আমাদের উদ্দীপ্ত করে।" উত্তর ভিয়েতনামের নেতা **তো হোয়াইও** তাঁর ভাষণে সেখানকার সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি আফ্রিকার উপর রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথাও বলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক **আলেক্স লেগুমা** বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন তাঁর কোন রচনাই প্রকাশিত হয়নি। বর্ণবিদ্বেষ সেখানে এত তীব্র। দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি নিজ গৃহে বন্দী ছিলেন। পরে বন্ধুদের পরামর্শে তিনি লণ্ডনে চলে আসেন এবং তখন তাঁর বই প্রকাশিত হতে থাকে। 'সেভেন সিজ' থেকে তাঁর কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বই এখন পঠিত হয়। লেবাননের কবি **সোহেল ইদ্রিস** জানান যে, সাহিত্য সেখানে আজ নতুনভাবে পল্লবিত হয়ে উঠছে। সেনেগালের প্রখ্যাত সমালোচক **জা মেইরি** বলেন—"যদিও তাঁর দেশের রাষ্ট্রপ্রধান একজন কবি, তবু সেখানে লেখকদের স্বাধীনতা নেই। সরকারের অনুমতি ছাড়া বই প্রকাশ বন্ধ। সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁদের কিছুটা যোগাযোগ আছে, তারাই বিভিন্ন সুযোগ পান এবং তাঁদের লেখাই বিদেশে প্রচারিত হয়। সেনেগালে অনেক প্রতিভাবান লেখক অবহেলিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।" মালির **ডিওয়ারে গ্রোসু** বলেন—"মালির এখনও শতকরা ৮০ জন অশিক্ষিত। সৃজনশীল সাহিত্য রচনাতেও অনেক অসুবিধা আছে। তবে এখন অনেক নতুন নতুন লেখক এগিয়ে আসছেন।" ঘানার **আপ্রোস্তি জোয়া এরিক** সেখানকার লেখকদের বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলেন। গিনি বিসার মহিলা প্রতিনিধি **ড়ুলেস আলমাদা ডুয়ার্তে** সেখানকার লেখকদের সংগ্রামী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়াও জাপানের **জোশাই হোতা**, সিরিয়ার **মহম্মদ এল আহম্মদ**, জাম্বিয়ার **লি, এল, ব্যাস** কঙ্গোর **টাটি লওটার্ড**, গাম্বিয়ার **ডিক্সন কোলে**, কেনিয়ার **জনাথন কারিয়ারা**, মঙ্গোলিয়ার **এল, টুডের**, সুদানের **আবদুল্লা আলি ইব্রাহিম** প্রমুখও উল্লেখযোগ্য ভাষণ দেন। এইসব ভাষণ থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে ওঠে।

**আলোচনা সভা**

সম্মেলনে বোধকরি আলোচনা সভাগুলিই হয়েছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিন ভাগে এই আলোচনাকে ভাগ করা হয় — সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক। সাংস্কৃতিক বিভাগে আলোচ্য বিষয় ছিল দুটি। প্রথমটির বিষয় ছিল—'আফ্রো-এশীয় লেখক ও যোগাযোগ সমস্যা'। দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল—'ঐতিহ্য ও নবীকরণ'।

**আফ্রো-এশীয় লেখক ও যোগাযোগ সমস্যা**

এই আলোচনা সভাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লেখকরা এত সুন্দরভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন, যা ইদানিংকালে ভারতে আর হয়নি। এই আলোচনা সভার মূল সভাপতি ছিলেন লেবাননের প্রখ্যাত লেখক **ডঃ সোহেল ইদ্রিস**। সহসভাপতি ছিলেন **টাটি লওটার্ড** (কঙ্গো) এবং **দিওয়ারে গ্রোসু** (মালি)। রিপোর্টার ছিলেন **ব্যাসালিকিহিরা আরসেনি**।

প্রথমে সভাপতি আলোচ্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। এরপর **আশিস সান্যাল** বিষয়টির উপর অংশ গ্রহণ করে কয়েকটি

গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের উপস্থাপনা করেন। তিনি বলেন—"এশিয়া এবং আফ্রিকার লেখক আমরা যদিও জানি যে, আমাদের সাহিত্য জনগণের সমস্যা তুলে ধরে, তবু কিন্তু আমরা সকলের সাহিত্য ঠিক জানি না। এর প্রধান প্রতিবন্ধকতা ভাষা। এমন কোন ভাষা নেই যা এশিয়া ও আফ্রিকার সর্বত্র প্রচলিত আছে। তাই ইংরেজি বা অন্য কোন ভাষায় অনূদিত রচনা পাঠ করেই আমরা তাঁদের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলি। কিন্তু এর ফলে আমাদের নিজেদের দৃষ্টিতে আফ্রো-এশিয়ার সাহিত্য বিচার করতে পারি না। অন্যের দেখা দৃষ্টি থেকেই ধারণা গঠন করি। ফলে একটা বিরাট অসঙ্গতি থেকে যায়। এর সমাধান প্রয়োজন।" তিনি সাতটি প্রস্তাব এই সমস্যা দূরীকরণে পেশ করেন। মিশরের লেখক তাহা তাহের বলেন—"আমি আমার ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত। আমার মনে হয়, প্রতি-দেশের লেখক সংঘের এ ব্যাপারে তৎপর হওয়া উচিত। অবশ্য লেখক সংঘ গঠিত হওয়া উচিত খুব গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে। রুশ কবি শারিপভ এক সুদীর্ঘ ভাষণে রাশিয়ায় এ ব্যাপারে কি কি করা হয়ে থাকে, তা বর্ণনা করেন। সেনেগালের জাঁ মেইরি বলেন—"এই সমস্যাটি আমাদের দেশেও খুব প্রকট। এছাড়া আছে আমাদের অন্য সমস্যা। আমাদের দেশে অশিক্ষিতের হার খুব বেশি। সাহিত্য পড়তেই পারে না দেশের অধিকাংশ লোক। সেখানে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদির প্রভাব বেশি। কিন্তু তাতে তথাকথিত যৌনতারই প্রাধান্য বেশি। আমার মনে হয়, প্রতি দেশেই লেখকদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।' মাদাগাস্কারের র‍্যালসিফিহিরা আরসেনি বলেন—"আমার মনে হয়, কেবল চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন এই সমস্যার সমাধান করবে না। আফ্রো-এশীয় দৃষ্টি-ভঙ্গিতে দেখলে অর্থাৎ সংহতির কথা ভাবলে সাহিত্যের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। আমিও আমার ভারতীয় বন্ধু সান্যালের সঙ্গে একমত যে, অনুবাদের দিকে আরো দৃষ্টি দিতে হবে।" সিদ্ধেশ্বর সেন বলেন—"মধ্যপ্রাচ্যে কিছু কিছু ভারতীয় ছবি প্রচারিত হয় বটে, কিন্তু সেইসব ছবির অধিকাংশতেই ভারতীয় জীবনের কোন পরিচয় থাকে না। যেসব ছবির মধ্যে ভারতীয় জীবনের কথা আছে, তার প্রচার হয় কম।" এ ছাড়াও শ্রীসেন একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এই আলোচনা সভা প্রায় কুড়িটি প্রস্তাব কার্যকরী করবার জন্য মূল কমিটির কাছে সুপারিশ করে। এইসব সুপারিশের মধ্যে আছে নিজস্ব সংবাদ সংস্থা গঠন, এশিয়া ও আফ্রিকার বইয়ের প্রচার ও অনুবাদ, সাংস্কৃতিক উৎসব, আফ্রো-এশীয় বইয়ের প্রদর্শনী, নিয়মিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

### ঐতিহ্য ও নবীকরণ

এই সভার মূল সভাপতি ছিলেন গিনির মউসা দাদান ব্রোস। সহঃ সভাপতি ছিলেন দাহোমের প্রুডেনসিও ইউস্টাচে ও সেকোট টল (আপার ভল্টা)।

আলোচনায় মোটামুটিভাবে যা স্বীকৃত হয়েছে তা হল, সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরেই কমিটেড সাহিত্য এবং সাহিত্য সাহিত্যের জন্য—এ দুটি তত্ত্ব চলে আসছে। কিন্তু এশিয়া বা আফ্রিকার সাহিত্যে কমিটমেণ্ট কিছুটা থাকবেই। কারণ, এই দুই মহাদেশের সাহিত্যিকরা এখনও স্বাধীনতা ও প্রগতির জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার সব দেশের সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি তাই বলে একই রকম নয়। কারণ দেশে দেশে রয়েছে ঐতিহ্যগত পার্থক্য।

এই সমস্ত আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে অমৃত রায়, বটুক ভোরা, মানিক মুখার্জী এবং কয়েকজন বিদেশী লেখক।

### লেনিন শতবার্ষিকী

১৯ তারিখ সন্ধ্যায় মভলঙ্কর হলে লেনিন শতবার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রী কে, পি, এস, মেনন। শ্রীমেনন তাঁর ভাষণে বলেন—'এশিয়া ও আফ্রিকার লেখকদের লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার যোগ্য কারণ আছে। লেনিন নিজেও লেখক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আফ্রো-এশীয় দেশগুলির পরম বন্ধু।" তাঁর ভাষণের পর সভার কাজ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রুশ প্রতিনিধি দলের নেতা কামিল য়াশেন। তিনি প্রথমে লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

এর পর লেনিনকে নিবেদিত কবিতা পাঠ করেন ভিয়েতনামের তো হোয়াই। লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন মিশরের ইউসুফ এল, সেবাই, দক্ষিণ আফ্রিকার আলেক্স লাগুমা, রাশিয়ার শারিপভ ও ভারতের মুলক রাজ আনন্দ ও বচ্চন। অনুষ্ঠানে লেনিনকে নিবেদিত কবিতা পাঠ করেন রাশিয়ার মিখাইল লুকোনিন, প্যালেস্টাইনের মোইন বোসিসো, মঙ্গোলিয়ার দাম্ভোকোলান, রাশিয়ার ছুরসুনজেড, প্যালেস্টাইনের মাহম্মুদ দারবিশ প্রমুখ। মঙ্গোলিয়ার পক্ষ থেকে লেনিনকে নিবেদিত একটি কবিতা সংকলন সভাপতিকে উপহার দেওয়া হয়।

### আগামী সম্মেলন

উক্ত অধিবেশনে আরো স্থিরীকৃত হ[য়] যে, পঞ্চম আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেল[ন] অনুষ্ঠিত হবে কাজাখিস্থানের আল[মা] আতা শহরে ১৯৭৩ খৃঃ। এ ছাড়া[ও] ১৯৭১ খৃঃ ডিসেম্বরে সেনেগালের ডাকারে একটি আফ্রো-এশীয় কবিতা সেমিনার অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তও গৃহী[ত] হয়। অন্যান্য উল্লেখ্য সিদ্ধান্তের ম[ধ্যে] আছে, সম্মেলনের মুখপত্র লোটাস পত্রিকা প্রচার, আফ্রো-এশীয় সিরিজে বই প্রকা[শ] কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন ইত্যাদি।

### সম্মেলনে বাংলাদেশ

এই সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি[দল] খুব সুসংগঠিত মনোভাবের পরিচয় দে[ন।] এত সুন্দর, সংঘবদ্ধ আর কোন ভারতী[য়] প্রতিনিধি দলকে দেখা যায়নি। তাঁদে[র] আচরণ যেমন ছিল সংঘবদ্ধ, তেমনি যে[খানে] আলোচনায় তাঁরা অংশ গ্রহণ করেছে[ন] সেখানেই কুড়িয়েছেন অকুণ্ঠ প্রশংসা।

বাংলা প্রতিনিধি দলের নেতা সুভা[ষ] মুখোপাধ্যায় সর্বসম্মতিক্রমে ভারতী[য়] দলের নেতা নির্বাচিত হন। কার্যকরী সমিতিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া অ[ন্য] নির্বাচিত হয়েছেন মণীন্দ্র রায়। জাতী[য়] পরিষদে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, দক্ষিণারঞ্জন বসু, চিন্মোহন সেহানবিশ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল হালদার, তরুণ সান্যাল, দেবেশ রা[য়] দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির সেন, ধনঞ্জয় দাস, নিখিল সেন, মানিক মুখার্জি, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, প্রসূন বসু, বিষ্ণু দে, আশিস সান্যাল, যজ্ঞেশ্বর সাহা, সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখ। বাংলাদেশ থেকে সম্মেলনের জন্য 'স্পোকসম্যান' হিসেবে যে পাঁচজনকে নির্বাচিত করা হয়, তাঁরা হলেন মনোজ বসু, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মানিক মুখার্জি ও দেবেশ রায়।

### বইয়ের প্রদর্শনী

সম্মেলন উপলক্ষে ভারতীয় ভাষা[য়] এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যের উপ[র] অথবা সাহিত্যের অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেইসব গ্রন্থের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এতে ভারতের কোন কোন ভাষায় আফ্রো-এশীয় দেশগুলির কি রকম চর্চা হয়েছে, তার একটা আভাস পাওয়া গেল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ড[ঃ] নীহাররঞ্জন রায়।

—তাপস

## ডগমা ও ডিলিউশন

## সীতা-সংবাদ

সাময়িক উন্মত্ততা (টেমপোরারি ইন-স্যানিটি) কথাটি সাধারণের মধ্যে খুব চালু। বড়দরের কোনো মানসিক আঘাত সহসা মানুষকে অসুস্থ করে দিতে পারে। এই অবস্থায় রোগীর চিন্তাভাবনা আচরণের অস্বাভাবিকতার মধ্যে ডিলিউশন, হ্যালু-সিনেশনের উপসর্গ দেখা যায়। সামাজিক প্যারানইয়া ও গণহিস্টিরিয়ার স্বরূপ বুঝতে হলে ব্যক্তির এই আকস্মিক মানসিক বিপর্যয়ের বিকারতাত্ত্বিক ও শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা জানা দরকার। বিনা চিকিৎসায় বা শুধু ঘুমের ওষুধের চিকিৎসায় এরা অনেক সময় দু' চার সপ্তাহের মধ্যেই ভাল হয়ে ওঠে। সন্ধ্যালোকের মত স্বল্পক্ষণ-স্থায়ী বলে এই অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে, 'সাইকোজেনিক টোআইলাইট স্টেট'। চিকিৎসার চেয়ে এই অবস্থা প্রতিরোধ করার দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

এই 'টোআইলাইট স্টেটের' বৈশিষ্ট্য এই যে, রোগের প্রধান কারণের বিপরীত ধারণা দ্বারা রোগী প্রভাবিত হয়। বিপজ্জনক বা অস্বস্তিকর বাস্তব পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে রোগী কাল্পনিক নিরাপদ পরি-বেশের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়। এই রকম দু'একটি প্রায়-নাটকীয় রোগ-ইতিহাসের সংগে পাঠকদের পরিচিত করাচ্ছি।

মিসেস মিলের স্বামী দু' বছর পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাড়ী ফিরবেন। দু সপ্তাহ ছুটী। বীরত্বের জন্যে এর মধ্যে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখের দুদিন আগে খবর এল মিঃ মিল নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে কয়েক মিনিট মিসেস মিল স্তব্ধ হয়ে থেকে উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর সব থেকে ভাল পোশাকটা পরে নিলেন, বাচ্চা দুটিকে সুন্দর করে সাজালেন। ঘরদোর মেঝে মুছে ঝকঝক করে তুললেন। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ডিনারের নেমন্তন্ন জানালেন। রাত্রে ডিনারে এলেন প্রায় দশবারোজন লোক। মিসেস মিল খুসীতে ফেটে পড়ছেন। পুরনো খবরের কাগজের পাতা থেকে স্বামীর বীরত্ব কাহিনী পড়ে শোনাচ্ছেন সকলকে। প্রায় আধ ঘণ্টা হল ট্রেনটা স্টেশনে এসেছে। মিঃ মিল আর দু মিনিটের মধ্যে এসে পড়বেন। ঐ ত' কলিং বেল বাজল! এসেছেন, নিশ্চয়ই সে এসেছে। ছুটে বাইরে গেলেন। ঘরে ঢুকলেন একা, কিন্তু তাঁর কল্পনায় স্বামী সংগে রয়েছেন। ছেলে দুটো কেন বাবাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না? অতিথিরা অমন চুপচাপ বসে কেন? করমর্দনের জন্যে কেউ হাত বাড়াচ্ছে না কেন? মিসেস মিল অবাক হয়ে গেলেন।

এই ইতিহাসটি এক বিদেশী মহিলার। এক সোভিয়েত চিকিৎসকের কেস-রিপোর্ট।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অনুরূপ দুটি ঘটনা বলছি।

সুধীরের মৃত্যু হল স্ত্রীর চোখের সামনে। প্রায় মাসখানেক ধরে কল্পনা স্বামীর রোগশয্যার পাশে বসে রাত কাটিয়েছে। বছর সাতেক ওদের বিয়ে হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দুটী সন্তান, এই নিয়েই সংসার। রাইটার্স বিল্ডিংএর প্রাক-স্বাধীনতা যুগের কেরাণী সুধীর। একখানা ঘর ও একফালি বারান্দার মধ্যে ওদের জগৎ। যতদূর মনে পড়ে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই তিনকুলে আপনার বলতে কেউ ছিল না। সুধীরের সংগে দু'বছর এক কলেজে পড়েছি। বেশ সদ্ভাব ছিল; যাতায়াতও ছিল। অসুখের খবর পেয়ে দু'একদিন দেখতেও গেছি। মৃত্যুর সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। ডাক্তার হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবে। মৃত্যুর পর কল্পনা শোকে অধীর হয়ে যাবে, কি বলে তাকে সান্ত্বনা দেব? তাকে সামলানো খুবই কঠিন ব্যাপার হবে। সারাটা দিন এই সব কথা ভেবে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সকাল থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, আর কোনো আশা নেই। কিন্তু কল্পনা কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করল না। সুধীরের মৃতদেহের উপর আছড়ে পড়ে বিলাপ না করে শান্তভাবে উঠে গিয়ে সুটকেস গোছাতে লাগল। অন্য ভাড়াটেরা ওর দিকে নজর দিতে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। পরদিন গিয়ে দেখি কল্পনা সেজেগুজে মোড়ার ওপর বসে সেতার বাজাচ্ছে। দরোজার কাছে কয়েক-জন মহিলা দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ওকে দেখছেন। ছেলে দুটো কেঁদে কেঁদে বোধ হয় হাঁপিয়ে গিয়ে চুপ করেছে। আমাকে দেখে ফুঁপিয়ে আবার কেঁদে উঠল। প্রতিবেশীদের কাছে শুনলাম কল্পনা নাকি পাগল হয়ে গেছে। ছেলে-দের চিনতে পারছে না, প্রতিবেশীদের অনেককেও চিনতে পারছে না। আমাকে দেখে লাজুক হেসে অভ্যর্থনা জানাল। সেতার বাজানো ছাড়ল না, মোড়া থেকেও উঠল না। সবে পাশ করে বেরিয়েছি, মনের রোগ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই। কাজেই খুবই অবাক হয়ে গেলাম। যতটা অবাক হলাম, দুঃখ পেলাম তার থেকে অনেক বেশী। একখানা কোঁচকানো জীর্ণ সিল্কের শাড়ী দিয়ে দেহটাকে কোনো মতে আবৃত করেছে, গায়ে বোধ হয় ব্লাউজ নেই। মুখে সস্তা পাউডার মেখেছে, কপালে চন্দনের টিপ; সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর। বাজনা থামিয়ে মাঝে মাঝে যে দু একটা কথা বলছে, তার সংগে বর্তমানের কোনো সম্পর্ক নেই। আজই ওকে গানটা তুলে নিতে হবে। কোন গানটা? 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে', ঐ গানটা নাকি সুধীর বাসরঘরে গেয়েছিল। কল্পনা সাত বছর আগেকার একটি সন্ধ্যায় ফিরে গেছে, এই-টুকুই শুধু বুঝলাম। সে সময় এর বেশী কিছু বুঝবার বা ভাববার মত মানসিক অবস্থা ও বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না। কল্পনা চায় না আমি ওখানে থাকি। সুধীর ফুল কিনতে বাজারে গেছে। সে ফিরে এল বলে!

সেই মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য এখনও আমার মনে আছে। খুঁটিনাটি সমেত। এখন বুঝতে পারি ওটা 'টোয়াইলাইট স্টেট'। সহায়সম্পদহীন মেয়েটী স্বামীর মৃত্যুকে সত্যি বলে মেনে নিতে পারেনি। ভয়াবহ বাস্তবের মুখোমুখি হবার শক্তি তার নেই। তাই সে বর্তমানকে অস্বীকার করে অতীতের আনন্দময় একটি মুহূর্তকে

আঁকড়ে ধরতে চাইছে। এরেই বলা হয় 'ফ্লাইট ইন্টু ভিজিজ'। 'অপোজিং অফ অ্যান ইম্যাজিনারি সিচুয়েশন টু এ ডিসট্রেসিং রিয়ালিটি।'

উপরের দুটো কেসই হিস্টিরিয়ার 'টোয়াই লাইট স্টেট'। দুটিতেই ডিলিউশন ও হ্যালুসিনেশনের উপসর্গ আছে।

অনেক সময় বিপদের মুখে পড়ে বয়স্ক লোকেরা শিশুসুলভ আচরণ করে। এই 'পিউরিলিজম' স্কিজোফ্রেনিয়া রোগেও দেখা দিয়ে থাকে, তবে অন্যান্য লক্ষণ সেখানে আলাদা। এক ভদ্রলোক কোনো কারণে অফিসের ক্যাশ থেকে কিছু টাকা নিতে বাধ্য হন। আশা ছিল মাসকাবারে অন্য জায়গা থেকে টাকা সংগ্রহ করে হিসেব মিলিয়ে দিতে পারবেন। দুর্ভাগ্যবশত টাকা সংগ্রহ হল না। তাঁর স্ত্রীর ফোন পেয়ে গিয়ে দেখি ভদ্রলোক শুধু আন্ডার-ওয়ার পরে ঘরের মধ্যে 'রেল রেল' খেলছেন। কু-উ-উ, ভ্যাস ভ্যাস ভ্যাস—শব্দ করে ঘামতে তিনি দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছেন। মেয়েরা শিশুসুলভ আচরণ করে পুতুল খেলে, ধুলোমাটি নিয়ে রান্না-বান্না করে। অন্য সবদিক থেকেই তাদের আচরণ শিশুর মতন হয়ে যায়। শিশুর মত আচরণ করে এরা শৈশবে ফিরে যেতে চায়। কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না, নিজের জন্যে কোনো চিন্তা ভাবনা থাকবে না, বয়স্করা সব আপদবিপদ থেকে রক্ষা করবে। সোনার শৈশবে মাঝে মাঝে অন্তত কিছু-ক্ষণের জন্যে পালিয়ে যেতে আমরা সবাই বোধ হয় চাই।

অনেক 'টোআই লাইট স্টেটে' রোগীদের পুরোপুরি চিত্তভ্রংশ হয়েছে বলে মনে হয়। ডান হাত তুলতে বললে এরা বাঁ হাত উঁচু করে, সামান্য গুণ ভাগ করতে ভুল করে, সব রকম প্রশ্নেরই গোলমেলে উত্তর দিয়ে থাকে।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমার নাম কি? রোগী হয়ত বলবে, আপনার চশমাটি ভারী সুন্দর। আমি কে বলতে পারো? এই প্রশ্নের জবাবে বলে বসবে, সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। এই ধরনের 'টোয়াই-লাইট স্টেটকে' বলা হয় 'সিউডোডিমেনশিয়া।' এই চিত্তভ্রংশ বা ডিমেনশিয়া স্বল্পকাল স্থায়ী, তাই বোধ হয় সিউডো মানে নকল ডিমেনশিয়া। দেখা যাচ্ছে, মৃত্যু শোক, জেলে যাবার ভয়, অন্যান্য নানা রকমের অবাঞ্ছিত মানসিক আঘাত ব্যক্তিকে মোহ-গ্রস্ত, বিমূঢ়, বুদ্ধিভ্রংশ করে দিতে পারে। রূঢ় বাস্তব থেকে ব্যক্তি পালিয়ে গিয়ে কল্পনার দুর্গে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। বর্তমান থেকে অতীতে যাবার চেষ্টা ও কল্পনায় স্বর্গরাজ্য গড়ে সেখানে নিজেকে স্থাপিত করার চেষ্টা, একই ধরনের 'ফ্যাইট ফ্রম রিয়ালিটি'। সামাজিক অবস্থা যখন অনেকের পক্ষে দুর্বিসহ ভয়াবহ হয়ে ওঠে, তখন অনেক মানুষ একই সংগে এই 'টোয়াই-লাইট' স্টেটের প্রভাবাধীন হয়ে 'ইউটো-পিয়ার' আশায় শিশুসুলভ বিশৃংখল আচরণে মেতে উঠতে পারে। যাদের মস্তিষ্কের উত্তেজনার আধিক্য বেশী, কৌশলী অভিভাবকের বশে, ধ্বংসাত্মক কাজ-কর্মের সাহায্যে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে তৎপর হয়ে ওঠা, তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। আমরা জানি, সংকীর্ণ 'এথনোসেণ্ট্রিজম' (দল বা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক মনোবৃত্তি)এর মধ্যে গ্র্যাণ্ডার (জাঁকজমক) ও পারাসিকিউশন (নির্যাতন) দু রকমের ডিলিউশনের অংকুর বিদ্যমান। সামাজিক টেনসন যত বাড়তে থাকে; ইনগ্রুপ, আউট-গ্রুপ মনোবৃত্তি ততই পরস্পর বিরোধী ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়। এই সময় সামাজিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর অক্ষমতা, বিরোধী নেতৃত্বের ক্লীব-সুলভ আচরণ ইত্যাদির জোর এক-তরফা প্রোপাগান্ডা ও প্রচার জনসাধারণের মনে নিরাশা ও ভয়ের প্রক্ষোভ সঞ্চার করে তাদের মোহগ্রস্ত বিমূঢ় ও বুদ্ধিভ্রংশ করে তুলতে পারে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে বিশৃংখল আচরণ করা খুবই স্বাভাবিক।

শোক, রোগ, হতাশা, ভয় ইত্যাদি নঙর্থক প্রক্ষোভ যেমন ব্যক্তি মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে উন্মত্ততা আনতে পারে; তেমনি সদর্থক প্রক্ষোভ ও দু' এক সময় ব্যক্তিমানসে আলোড়ন এনে 'টোয়াই-লাইট' অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। লটারীতে একসঙ্গে অনেক টাকা পেয়ে কেউ কেউ পাগল হয়ে যায়। আকস্মিক শোক-সংবাদের মত আনন্দ সংবাদ ও অনেক সময় মস্তিষ্কের সাময়িক বিশৃংখলা নিয়ে আসে। আর্কিমিডিস্ যখন 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে চীৎকার করছিলেন, তখন তিনি সুস্থ বা স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ছিলেন না।

আশাতীত সাফল্যে সাময়িক উন্মত্ততার, 'টোয়াইলাইট স্টেটের' ঘটনার সঙ্গে সকলেই বোধহয় অল্পবিস্তর পরিচিত। এইরকম দুটি রোগ ইতিহাস এখানে বিবৃত করা চলতে পারে। প্রথমটি আমার এক পরিচিত ডাক্তারের কেস দ্বিতীয়টি আমার।

ঐ ডাক্তারের জবানীতেই বলি। পুরনো ঘটনা।

গভীর রাতে টেলিফোন বেজে উঠল। শহরতলীর এক থানা থেকে ফোন করছেন অফিসার-ইন-চার্জ। আমার বিশেষ বন্ধু দীনেশ মত্তাবস্থায় দাঙ্গাহাঙ্গামা করার অভিযোগে থানার ফাটকে আছে। আমার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করতে চায়। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে দীনেশ একজন। একসঙ্গেই পাশ করেছি। রাগ ও বিরক্তি দমন করেই থানায় ছুটতে হল। দীনেশ একটু আধটু মদ খায় বটে, কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার মত স্বভাব তার নয়। তাছাড়া সন্ধ্যের পর সে আমার ডিসপেন-সারি থেকে উঠেছে। তার বাড়ী উত্তর কলকাতায়। ফোন এসেছে দক্ষিণের এক থানা থেকে। সবটাই কেমন গোলমেলে। এইসব ভাবতে ভাবতে থানায় এসে উপস্থিত। অফিসার খুব সদয় ব্যবহার করলেন। লক্-আপ থেকে বন্ধুকে বাইরে এনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। বন্ধুকে দেখে আমি তো বিস্ময়ে হতবাক। চোখ ফোলা, গালে ক্ষতচিহ্ন, পোশাক অবিন্যস্ত ও অনেক জায়গায় ছেঁড়। ধস্তাধস্তির চিহ্ন বন্ধুর সর্বাঙ্গে। আমাকে দেখে একগাল হাসি। আমি ওর চেহারা দেখে হতবাক হইনি। অবাক হয়েছি দীনেশের বদলে বন্ধু পরমেশকে দেখে। পরমেশের মুখে মদের গন্ধ! পরমেশ মদ খেয়ে মারামারি করেছে! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। চরম-পিউরিট্যান ভালো মানুষ পরমেশের এ কি অধঃপতন! পরমেশকে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় থেকে চিনি। সেই সময় থেকে বন্ধুত্ব। অতি দরিদ্র পরিবারের ছেলে, বন্ধুদের আর্থিক সাহায্য না পেলে ওর ওকালতি পাশ করা সম্ভব হত না। আমরা সকলেই ওকে ভালবাসতাম। সাহায্য মুখ ফুটে ও কারুর কাছে চাইত না। আমরা অনেক কৌশলে সাহায্য করার সুযোগ তৈরী করতাম। টিউশনী করে, আধপেটা খেয়ে কোনো রকমে পড়া চালিয়েছে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কেটেছে। ওকালতীতে পশার করতে পারা খুবই কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে ওর মত দরিদ্র ও অতি-নীতিবাগীশের পক্ষে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। দীনেশ ওকে খুব ভালবাসে। দীনেশের অবস্থা ভাল। মাঝে মাঝে দীনেশের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হয় পরমেশ। হালে পরমেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। মুন্সেফ মনোনীত হয়েছে। বাইরে আছে তাই ওর সঙ্গে কয়েক মাস দেখা হয়নি। পরমেশের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম ও পাগল হয়ে গেছে। অর্থহীন প্রলাপ ও হাসি শুনে আমি কিছু পরে বিদায় নিলাম।

পরের দিন লালবাজার থেকে ওকে
মিনে ছাড়িয়ে আনা হল। দীনেশের
ড়ীতে রেখে ওর চিকিৎসা চলতে লাগল।
সময় 'রয়াপিলা' ছাড়া উন্মাদরোগের
র কোনো ওষুধ ছিল না। এই সময়
নেশকে কয়েকবার ও গলা টিপে ধরেছে।
মরা পাঁচ ছ'জন মিলে ওকে আয়ত্তে
াখতে পারতাম না। দীনেশের নামে ঐ
ত্তাবস্থায় কুৎসা রটাত আর সব বড়-
লাককে ও খুন করবে বলে শাসাত। তিন
প্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল।

এই পরমেশবাবু টোয়াইলাইট অবস্থার
ি্টরিয়ায় ভুগেছেন। কয়েক বছর হল
টায়ার করেছেন। পরমেশবাবুর কাছে
নসেফী চাকরি লটারীতে টাকা পাওয়ার
না হলেও, একটা মস্তবড় ব্যাপার।
র অসংলগ্ন প্রলাপের সাহায্যে তার
াগের কারণগুলো জানা গিয়েছিল।
টানা অভাব অনটনের মধ্যে দিন
টানোর ফলে হতাশায় যখন ভেঙে পড়তে
চ্ছ তখন বিধাতার আশীর্বাদের মত এল
য়োগপত্র। এ চাকরী পাবার ব্যাপারে
নেশের দাদার অনেকখানি হাত ছিল।
এ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনসের
র চাকরী হয়নি। দীনেশকে পরমেশ
বাসত ও মনে মনে তার প্রতি কৃতজ্ঞ
। প্রথম যেদিন মাইনের অনেকগুলো
একসঙ্গে হাতে এল, পরমেশ বাড়ী
টেবিল ল্যাম্পটা ভেঙে ফেলেছিল।
ধীরে মানসিক পরিবর্তন ঘটছিল।
ক মাস পরে যখন কোলকাতায় আসার
াগ পেল, সেদিন ওর পক্ষে একটা
ষ দিন। প্রায় হাজার টাকার বান্ডিল
টে নিয়ে কোলকাতায় যাবে। ফার্স্ট
র টিকিট কিনবে, ট্যাক্সি করে প্রথমেই
শের সঙ্গে দেখা করবে। তার চোখের
ন করকরে নোটগুলো মেলে ধরবে।
ঋণ শোধ করবে। সকলকে টেক্কা
'টোয়াইলাইট' অবস্থা চরমে উঠলো
পেগ মদ পেটে যাবার পর। পাঞ্জাবী
ওয়ালাকে বাঙালী মুনসেফবাবুর
তি দেখাতে গিয়ে তার কাছে পেল

উত্তম মধ্যম সম্বর্ধনা। তারপর তা[illegible]
দৌলতে হাজতবাস।

আমার রোগীটির ঘটনাও প্রায় একই
রকমের। এক লাখ টাকা খরচ করে বাড়ী
তৈরী করেছেন। ঐ তল্লাটে অত সুন্দর
বাড়ী আর নেই। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য।
গৃহপ্রবেশের কয়েকদিন পরই বনমালী
পাগল হয়ে গেছেন। বনমালীকে ধরে
রাখা যায় না। রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে,
তাকে নতুন বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে
ডাকছেন। সে রাজী না হলে অকথ্য ভাষায়
গালিগালাজ করছেন, তর্জনগর্জন করছেন।
শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ধরে বেঁধে আমার
কাছে হাজির করল। বনমালী আমার
কাছে এসেই চোখ রাঙিয়ে ধমকাতে
লাগলেন। আমার বাড়ীতে কখানা ঘর,
কিরকম ফ্লোরিং, কত টাকা খরচ পড়েছে
জানতে চাইলেন। অবশ্য ধমকের সুরে।
আমার বাড়ী নেই, ভাড়াটে বাড়ীতে থাকি,
শুনে কৃপাপরবশ হয়ে আমাকে তাঁর
বাড়ীতে থাকতে দেবেন বললেন তার পরই
কেঁদে ফেললেন। তাঁর শ্যালকগোষ্ঠী তাঁকে
বাড়ী ছাড়া করবে মতলব করেছে।
পুলিশে খবর দিতে বললেন আমাকে।

এখানেও 'টোআইলাইট' স্টেটের কারণ
হঠাৎ অবস্থান্তর। নানা কৌশলে, সাধু
অসাধু নানা উপায়ে বাড়ী তৈরী করেছেন
ভদ্রলোক। খুবই অল্প মাইনের চাকুরে।
আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারুর নিজের
বাড়ী নেই। বাড়ী তৈরীর কাজকর্ম সবই
করেছে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা। উনি শুধু
টাকা পাঠিয়েছেন। কোলকাতার বাইরে
চাকরী। চাকরীতে ছুটি নেই। গৃহপ্রবেশের
দিন কোলকাতায় পৌঁছেছেন। বাড়ীর
ব্লুপ্রিন্ট দেখা ছিল, কল্পনাতে ও বাড়ীটাকে
সত্যিকারের তাঁর নিজের বাড়ী হয়েছে,
এ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।
স্ত্রীকে বললেন—এটাতো আমার বাড়ী।
শ্যালককে বললেন, এইটেই তো আমার
আমার বাড়ী। তারপর তাদেরই ডেকে
ডেকে ঘর মেঝে পালিশ ইত্যাদি দেখাতে
লাগলেন। তারা প্রথমটায় মনে করলেন

বনম[illegible] সুবোধ, [illegible] রসিকতা করছেন।
[illegible] পরেই [illegible]লেন কোথাও কোনো
[illegible] বিশেষ করে যখন
[illegible] থেকে লোক ডেকে বাড়ী
দেখাতে শুরু করলেন, তখন আত্মীয়-
স্বজনরা বেশ ভয় পেয়ে গেলেন।

ডিলিউশনের একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য
করলাম বনমালীর মধ্যে। বাড়ীর মালিকানা
স্বত্ব সম্পর্কে তাঁর সন্দেহের কারণ আছে।
বাড়ী জমি সবই স্ত্রীর নামে। টাকা যদিও
তাঁর, খাটাখাটুনি করেছেন তো স্ত্রী ও
শ্যালক। বাড়ীটা ও'দের হবেই বা না কেন?
সব থেকে ভাল ঘরটা বনমালীকে থাকতে
দিয়েছেন কেন? শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা
নিজেদের বাসায় রয়েছে কেন? তাঁর
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বাড়ী থেকে
তাড়িয়ে দেওয়া হবে, এই ভয়ের সঙ্গে
সঙ্গে বনমালী চিন্তা করছেন যে ওরা
যেহেতু পরিশ্রম করেছে, বাড়ীতে ওদের
দাবী আছে। প্যারানইয়া রোগীর মত
ডিলিউশন দৃঢ় ও পাকাপোক্ত নয়। এর
পরদিন ভদ্রলোককে খুবই আতঙ্কিত
দেখলাম। তাঁর সাদা নতুন বাড়ীর গায়ে
আলকাতরা দিয়ে কি সব লেখা হয়ে গেছে।
তিনি আমাকে উকীল ডাকতে বললেন।
বাড়ীটা যারা তৈরী করেছে, সত্যিকারের
খাটাখাটনি করেছে, সেইসব মিস্ত্রী মজুর-
দের নামে তিনি উইল করে দেবেন
বাড়ীটা। পরক্ষণেই হাহাকার করে উঠলেন।
তাঁর স্ত্রী কোথায় থাকবে তিনি কোথায়
থাকবেন? বাড়ীটা ভেঙেচুরে গঙ্গার জলে
ভাসিয়ে দেওয়াই ভাল। কোনো ট্রাংকুই-
লাইজার দিয়ে ফল পাওয়া গেল না।
সপ্তাহ ছয়েক বাড়ী ছেড়ে বেনারসে গিয়ে
থাকলেন বনমালী। ফিরে আসার পর
দেখলাম সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। তিন
বছর কেটে গেছে, এখনও ভাল আছেন।
সুস্থ শরীরে, বহালতবিয়তে নিজের লাখ-
টাকার বাড়ীতেই অবস্থান করছেন।

এটিও সাময়িক উন্মত্ততা বা টো-আই-
লাইট অবস্থা।

—মনোবিদ

কয়েকজন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী : (বাম দিক থেকে) সি ভি রামন (পদার্থবিদ্যা), ফিশার (রসায়ন), সেইগবন (পদার্থবিদ্যা—১৯২৪), ল্যাণ্ডসটেইনার (প্রাণীবিদ্যা) ডলেন (পদার্থবিদ্যা—১৯১২), সিনক্লেয়ার লুইস (সাহিত্য—১৯৩০) এবং সেলমা লাগেরলফ (১০০৯)। নীচে সুইডেনের রাজা।

ডঃ সি ভি রামন

বিরাশি বছর বয়সে মৃত্যু সাধারণ বিচারে নিশ্চয়ই অকালমৃত্যু নয়। কিন্তু ডঃ সি ভি রামন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে তাঁরুণ্যস্থ জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন তা ছিল তারুণ্যমণ্ডিত। বিরাশি বছর বয়সের এই তরুণ বিজ্ঞানীর মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা পূরণ হবার নয়। যিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পুরস্কারে ভূষিত, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি অগ্রসর দেশের সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক সংগঠন-গুলির সদস্যপদে বৃত, অজস্র পদকে ও অজস্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটে সম্মানিত, যিনি দেশের সেরা বিজ্ঞানীদের গুরু, বিরাট এক বৈজ্ঞানিক সংগঠনের অধ্যক্ষ—তিনি যদি শেষ জীবনে নিজের হাতে গবেষণা নাও করতেন, শুধু ভাষণ দিয়ে, শুভেচ্ছা বিতরণ করে, দেশ-বিদেশের সম্বর্ধনা-সভায় স্মিত হাসি হেসে নিশ্চিন্ত আয়েসের মধ্যে ডুব দিতেন তাহলেও তাঁর সম্মানের আসন বিন্দুমাত্র টলত না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আমাদের এই দেশের আবহাওয়াতে মানুষ হয়েও তিনি তা করেন নি। ডঃ রামন কত বড়ো বিজ্ঞানী ছিলেন, কত কৃতী বিজ্ঞানী তৈরি করে গিয়েছেন, কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন সে-বিচার যোগ্যতর ব্যক্তিরা করবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে ডঃ রামন সম্পর্কে একথাটি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা দরকার যে, আজকের দিনে গোটা ভারতের কোনো একজন মানুষকে যদি আমাদের এই বিক্ষিপ্ত ও সন্ত্রস্ত জীবনের সামনে আদর্শ হিসেবে খাড়া করতে হয় তবে সেই মানুষটি হচ্ছেন তিনি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা ছেড়ে দিলেও নিরলস পরিশ্রমের এমন দৃষ্টান্ত আজকের দিনে পাওয়া শক্ত।

তুলনা করতে হলে, যাঁদের আমি চোখের সামনে দেখেছি তাঁদের মধ্যে এক-জনের কথাই মনে পড়ে : অধ্যাপক জে বি এস হলডেন। এই দুজন বিজ্ঞানীর বিচরণ-ক্ষেত্র ভিন্ন কিন্তু অন্য একটি ব্যাপারে দুজনের মধ্যে আশ্চর্য মিল। দুজনেই মনে করতেন, বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা, সততা ও একাগ্রতা যদি থাকে তাহলে অনেক কিছু বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্ভব। এ শুধু মুখের কথা নয়, এই দুজন বিজ্ঞানীর সারা জীবনের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার অজস্র প্রমাণ রয়ে গিয়েছে।

নিষ্ঠা, সততা, একাগ্রতা—এসব শব্দ-গুলোও অপাত্রে প্রযুক্ত হতে হতে আজ-

কাল অনেকটা খেলো হয়ে গিয়েছে। ডঃ রামন বা অধ্যাপক হলডেনের মতো বিজ্ঞানীর জীবনের দিকে তাকালে বোঝা যায় নিষ্ঠা কাকে বলে, সততার পরিচয় কী, একাগ্রতা কি রকম। অর্থ দপ্তরের বড়ো চাকুরে গাঁটের পয়সা খরচ করে নিজস্ব গবেষণাগার তৈরি করেছেন আর অবসর সময়ে এমন সমস্ত গবেষণা নিয়ে মেতে আছেন যার কোনো অর্থকরী ভবিষ্যৎ নেই, আবার সুযোগ পাওয়া মাত্রই প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনসন ইত্যাদির চিন্তামাত্র না করে অধ্যাপনার পদ নিচ্ছেন, এমনি আরো অজস্র ঘটনা, পাগলামি বলে মনে হলেও নিষ্ঠা, সততা ও একাগ্রতার প্রকাশ খুঁজতে হলে এমনিধারা ঘটনার ওপরেই হাত রাখতে হয়। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স বলতেই ভাবতেন সেই বৌবাজারের বাড়িটির কথা, যেখানকার গবেষণালব্ধ ফল থেকে রামন এফেক্ট আবিষ্কার ও নোবেল পুরস্কার লাভ—জীবনের অনেক প্রয়াস ও প্রাপ্তির সঙ্গে বিজড়িত একটি স্মৃতি। ১৯৫০ সালে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন উঠে গেল যাদবপুরের বিরাট আয়তনের বাড়িতে, তাঁর খুশি হবারই কথা, যে অ্যাসোসিয়েশন ধরতে গেলে তাঁর হাতেই বড়ো হওয়া, তাঁর কৃতিত্বেই বিশ্বের মানচিত্রে নামের অধিকারী—অথচ ঠিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে তিনি আর কোন সম্পর্কই রাখলেন না। এই ঘটনার মধ্যেও তাঁর একটি বিশেষ পরিচয় রয়ে গিয়েছে।

বাঙ্গালোরে রামন ইনস্টিটিউটের সামনে একটি সাইনবোর্ডে লেখা : আগন্তুকদের জন্য নয়, দয়া করে আমাদের বিরক্ত করবেন না। অনুরোধ বা ধমক যাই হোক, দেশের মানুষ মেনে নিয়েছিল। আশা করেছিল এই চিরতরুণ বিজ্ঞানীর আরো অনেক কিছু দেবার আছে, হয়তো তিনিও মাদাম কুরীর মতো দু-দুবার নোবেল পুরস্কার অর্জন করে ইতিহাস সৃষ্টি করবেন।

কিন্তু মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, ডঃ রামনের শূন্যস্থান পূরণ করতে পারেন এমন কাউকে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরো বেশি কৃতিত্ব অর্জন করবেন এমন বিজ্ঞানীর অভাব হবার কথা নয়, আমাদের দেশেও। কিন্তু জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু যেমনটা বলেছেন, আমাদের দেশের বহু বিজ্ঞানীর মৌলিক গবেষণায় হাতেখড়ি রামনের কাছে। পদার্থবিদ্যায় বিশ্বের মানচিত্রে ভারতের স্থান যে তুচ্ছ করার মতো নয়, তার মূলে ডঃ রামনের এই বৈজ্ঞানিক সংগঠনের অবদান অনেকখানি।

আমাদের দেশে আয়োজন ও সংস্থান থাকা সত্ত্বেও এই বৈজ্ঞানিক সংগঠনটি কোনো পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। মৌলিক গবেষণায় আগ্রহ যথেষ্ট উৎসাহ পায় না। অধিকাংশ গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের কাঠামোই এমন যে, বিজ্ঞানীদের সেখানে স্ব-স্ব পদে আসীন থাকতে পারার জন্যে ও উচ্চতর পদে উন্নীত হবার জন্যে যতোখানি তৎপরতার প্রয়োজন হয় তারপরে আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে ততোখানি অবকাশ থাকে না। অধ্যাপক হলডেন এদেশে এসে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলেন অ-বৈজ্ঞানিক কাজে বিজ্ঞানীদের এত বেশি সময়ের অপচয় হতে দেখে। দয়া করে আমাদের বিরক্ত করবেন না—এই কথাগুলো সাইনবোর্ডে তো লিখতে পারে যে কোনো লিপিকর, কিন্তু বিজ্ঞানীকে তাঁর আচরণে ও তাঁর কাজে তার প্রমাণ দিতে হয়।

ডঃ রামনের মৃত্যুতে ভারত অবশ্যই দরিদ্র হল, শুধু এই মুহূর্তের জন্যে নয়, আগামী বেশ কিছুকালের জন্যে। ডঃ রামন ছিলেন একজন প্রকৃত বিজ্ঞানী—শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, প্রতিষ্ঠানগতভাবেও।

সকলেই জানেন ডঃ সি ভি রামন নোবেল পুরস্কার পান এমন একটি ব্যাপার আবিষ্কারের জন্যে, তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করে যাকে বলা হয় 'রামন এফেকট'। ব্যাপারটি কি? সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

একগুচ্ছ একরঙা আলো স্বচ্ছ একটি বস্তুর ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে—আলোর গুচ্ছ বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করার সময়ে যা, বস্তু থেকে বেরিয়ে আসার সময়েও কি তাই? ডঃ রামন আবিষ্কার করলেন, না, তা নয়, মূল আলোর গুচ্ছের পথ থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আরো কিছু ভিন্ন ধরনের আলো। কোন দিক থেকে ভিন্ন ধরনের? তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিক থেকে। স্বচ্ছ বস্তুতে প্রবেশের আগে মূল আলোর গুচ্ছের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যা মাপ, স্বচ্ছ বস্তু থেকে বেরিয়ে আসার পরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া কিছু আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাপ তার চেয়ে বড়ো। ডঃ রামন এই ব্যাপারটিই আবিষ্কার করেছিলেন ১৯২৮ সালে। তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই ব্যাপারটিরই নাম 'রামন এফেকট'। এই আবিষ্কারের জন্যেই ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

এই আবিষ্কারের সঙ্গে একটি গল্পও জড়িত আছে। ১৯২৫ সালে রুশী বিজ্ঞান আকাদেমির আমন্ত্রণে আকাদেমির দ্বিশততম বার্ষিকী উৎসবে যোগ দেবার জন্যে তিনি মস্কো ও লেনিনগ্রাদে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ভারতে ফেরার পথে সমুদ্রে পাড়ি দেবার সময়ে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিলেন সমুদ্রের দিকে। নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র—আকাশের নীল প্রতিফলিত হয়েছে নীল সমুদ্রে, কিন্তু আশ্চর্য, সমুদ্রের রঙ তো আকাশের নীলের হুবহু প্রতিফলন নয়, সমুদ্রের রং ক্ষণে ক্ষণে এত বদলাচ্ছে কেন? ব্যাপারটা তাঁর কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হল। দেশে ফিরেই তিনি গবেষণা শুরু করে দিলেন।

একটি স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়ে একরঙা আলোর একটি গুচ্ছ পার হয়ে যাচ্ছে, পার হয়ে আসার পরে বিচ্ছুরিত কিছু আলোয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য যাচ্ছে বদলে—এ ব্যাপারটি কি চোখে দেখা সম্ভব? সম্ভব যদি স্বচ্ছ পদার্থটি হয় বেশ বড়োসড়ো—ধরা যাক বেনজিন ভর্তি প্রকান্ড একটি কাঁচের গোলক বা বাল্ব—আর এই বাল্বের ওপরে তির্যকভাবে আলো এসে পড়ুক একটি মার্কারি আর্ক ল্যাম্প থেকে। এবারে স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালী নিলে কতকগুলো বাড়তি রেখার অস্তিত্ব ধরা পড়বে। স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশের আগে যে আলোর গুচ্ছ, তার বর্ণালীতে কিন্তু এই রেখাগুলো নেই। তার মানে এই বিচ্ছুরিত আলো মূল আলো থেকে ভিন্ন। গবেষণার সুবিধের জন্যে সাধারণত এই বর্ণালীর ছবি ফটোগ্রাফে ধরে রাখা হয়, তাতে পর্যবেক্ষণের যেমন সুবিধে, সঠিক মাপজোকেরও।

এখানে মনে রাখা দরকার আলোর বিচ্ছুরণ এমনিতেও ঘটে থাকে এবং বেশ বেশি মাত্রাতেই, তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কোনো বদল ছাড়াই।

কিন্তু 'রামন এফেকট' ঘটার সময়ে যেখানে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বদলাচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠছে—কেন বদলাচ্ছে? জবাবে বলা হচ্ছে বিচ্ছুরণকারী বস্তুর (অর্থাৎ যে স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়ে আলো পার হচ্ছে সেই বস্তুর) অণুর গতিবিধির দরুন। এখানে মনে রাখা দরকার, কি গ্যাসীয়, কি তরল, কি কঠিন—কোনো পদার্থেই অণুগুলো স্থির অনড় নয়। গ্যাসীয় পদার্থে অণুগুলোর সঞ্চরণশীলতা সবচেয়ে বেশি, ফলে বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালীতে বাড়তি রেখার অস্তিত্বও অনেক বেশি প্রকট। আর তরল পদার্থের বেলায় বর্ণালীর চেহারাটিই এমন যে, বোঝা যায় অণুর সঙ্গে অণুর সংঘর্ষের দরুন অণুর আবর্তন কিছুটা বাধাগ্রস্ত।

ব্যাপারটির সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে একমাত্র কোয়ানটাম তত্ত্বের ভিত্তিতে। বিষয়টি জটিল। খুব সরলভাবে প্রকাশ করতে হলে এইভাবে বলা যায় : আলোর কোয়ানটা আর যে পদার্থটির ওপরে আলো আছড়ে পড়ছে সেই পদার্থের অণুর মধ্যে তেজ-বিনিময়ের ফল হচ্ছে এই ব্যাপারটি। সহজ ভাষায় এটুকু বুঝে নেওয়া যেতে পারে, স্বচ্ছ পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসার পরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া আলো যে ভিন্ন ধরনের হচ্ছে তার কারণ, তার আগেই সেই আলো আর সেই স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে

একটা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

অবশ্যই ব্যাপারটি এত সহজ ও সরল নয়। অণুর অপটিক্যাল ধর্ম, অণুর আবর্তনের ও কম্পনের গতিবেগগত তত্ত্বও এই সংগে বিচার্য।

'রামন এফেক্ট'-এর প্রয়োগ কিন্তু ঘটেছে বহু ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই কারণে যে, বর্ণালীর ধরনটি নির্ভর করছে অণুর প্রকৃতির ওপরে, তা থেকে অণুর গড়ন সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ফলে, রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রচলিত পদ্ধতিতে বস্তু সম্পর্কে যে-সব খবর বার করতে অনেক সময় লাগে, বা একেবারেই বার করা যায় না, বর্ণালীর বিশ্লেষণ থেকে তা পাওয়া সম্ভব।

বিশেষ করে হীরে, পাথর ইত্যাদি স্ফটিক থেকে বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে বস্তুর কঠিন অবস্থার প্রকৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়। বিষয়টি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ডঃ রামন নোবেল পুরস্কারের প্রায় সমস্ত টাকা খরচ করেছেন হীরে-মুক্তোপাথর কেনার জন্যে এবং স্ফটিকের গড়ন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্যও আবিষ্কার করেছেন।

# লুনা-১৭ ও লুনাখোদ-১

চাঁদের মাটিতে আট চাকার একটি গাড়ি চালিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আরো একবার প্রথম হবার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। স্পুৎনিক-একেকে আকাশে তুলে ও কক্ষপথে পাক খাইয়ে তাঁরাই প্রথম পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তীকালের মহাকাশ গবেষণার ও অভিযানে আরো অনেক ব্যাপারেই তাঁরা প্রথম—যেমন, চাঁদের বিপরীত দিকের আলোকচিত্র, পৃথিবীর কক্ষপথে মানুষ, চাঁদের মাটিতে আলগাভাবে অবতরণ, চাঁদ থেকে টেলিভিশন বার্তা ও ছবি, নভশ্চরদের দলবদ্ধ শূন্য-পরিক্রমা, মহিলা নভশ্চর, শূন্যে অবস্থান কালে ব্যোমযান থেকে নিষ্ক্রমণ, পৃথিবীর কক্ষপথের গবেষণাগার। উল্লিখিত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পথ-প্রদর্শক।

এবারে এই তালিকায় আরো একটি কৃতিত্ব যুক্ত হল : লুনোখোদ—১।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বারবার ঘোষণা করেছেন, মহাকাশ গবেষণার বর্তমান অবস্থায় অভিযান হওয়া উচিত মনুষ্য-বিহীন। তাতে খরচ অনেক কম, ঝুঁকি বিন্দুমাত্র নেই, তথ্য-সংগ্রহের সম্ভবনা প্রচুর। এখনকার অবস্থায় মহাকাশে মানুষ গিয়ে যেটুকু করতে পারে, যন্ত্র তার চেয়ে কম নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষে বেশি। মহাকাশে মানুষ পাঠানোর জটিলতা তো আছেই, তাছাড়া এখনো পর্যন্ত রকেট-বিদ্যা যতোদূর অগ্রসর তাতে বড়ো জোর শুক্র বা মঙ্গল পর্যন্ত মানুষের পক্ষে পাড়ি দেওয়া সম্ভব—অন্তত কাগজে-কলমে। কিন্তু মহাকাল তো আর পৃথিবী আর তার ঘরের কাছের দুটি গ্রহ নয়। আমাদের এই সৌরমন্ডলই বা আমাদের এই বিশ্বের কতটুকু অংশ? আমাদের এই বিশ্ব গোটা মহাবিশ্বের? এত বিরাট ব্যাপারের মধ্যে না গিয়েও এটুকু বলা চলে যে, আমাদের এই সৌরমন্ডলের গ্রহ প্লুটোতে পাড়ি দেওয়াও মানুষের আয়ুষ্কালের মধ্যে সম্ভব নয়।

অতএব সামান্য এই সৌরমন্ডল সম্পর্কে খবর জানতে হলেও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ওপরে নির্ভর করতেই হয়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সঠিক দিকেই চলেছেন। আর চাঁদের মাটিতে যদি একটি আট-চাকার গাড়ি চালানো সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে মঙ্গল বা শুক্রগ্রহের মাটিতে কেন হবে না? বা আরো দূরের কোনো গ্রহে? নিশ্চয়ই সম্ভব। লুনোখোদ—১ থেকেই এই আশ্চর্য সম্ভাবনার সূত্রপাত।

লুনা-১৭ আকাশে উঠেছিল ১০ই নভেম্বর তারিখে। ১৫ই নভেম্বর চাঁদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছয় ও চাঁদের কক্ষপথে পাক খেতে শুরু করে। ১৭ই নভেম্বর আলতোভাবে চাঁদের মাটিতে নামে। এ পর্যন্ত নতুন কিছু নয়, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আগেও করেছেন। কিন্তু তারপরে যা ঘটেছে তা নতুন। ব্যোমযান থেকে চাঁদের মাটিতে নেমে আসে একটি গ্যাংওয়ে আর সেই গ্যাংওয়ে দিয়ে গড়িয়ে মাটিতে নেমে আসে আট-চাকার গাড়ি লুনোখোদ—১। আর সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটানো হয় পৃথিবী থেকে দূর-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে।

তারপরে আরো আশ্চর্য ব্যাপার। চাঁদের মাটির ওপরে সেই আট-চাকার গাড়ি চলতে শুরু করে! পথ চিনে চিনে চলে, কোথাও গর্তে পড়ে গিয়ে বা পাথরে-ঢিবিতে ঠেকে গিয়ে আটকে যায় না। এই পথ চেনবার কাজটিও সম্পন্ন করা হয় পৃথিবী থেকে।

পাঠকরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, ব্যাপারটা যতো সহজে লেখা যাচ্ছে ততো সহজে ঘটানো যায়নি। সাঁতা-কারের গাড়িটি চাঁদের দিকে পাঠাবার আগে এই পৃথিবীর মাটিতেই অজস্র রকমের গাড়ি বানিয়ে দেখতে হয়েছে কোনটি সবচেয়ে উপযোগী, নকল চাঁদের মাটি বানিয়ে পরখ করতে হয়েছে কেমন-ভাবে গাড়ি চলবে, ইত্যাদি। সংগে সংগে আরো একটি বড়ো অসুবিধের কথা মনে রাখতে হয়েছে। চাঁদের মাটির ছবি টেলি-ভিশনে পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় লাগছে দেড় সেকেন্ড, সেই ছবি দেখে পৃথিবী থেকে লুনোখোদকে চলার যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তা যন্ত্রে পৌঁছতে সময় লাগছে আরো দেড় সেকেন্ড। মোট এই তিন সেকেন্ড সময় কিন্তু লুনোখোদ থেমে থাকে নি। এমনও হতে পারে, এই তিন সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই এমন একটা বাধা লুনোখোদের সামনে পড়ে গেল যে লুনোখোদ অচল। গাড়ি চলছে চাঁদের মাটিতে, চালক বসে আছে পৃথিবীতে, রাস্তা দেখতে আর হুকুম পাঠাতে সময় লাগছে তিন সেকেন্ড, তাছাড়া চাঁদের জমি এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে এমন কিছু পরিচিত জায়গা নয় যে, চোখ বুজে গাড়ি চালানো চলে—অন্য সব ছেড়ে দিয়ে শুধু এই ব্যাপারটুকু মনে রাখলেও ধারণা করা যাবে চাঁদের মাটিতে আট-চাকার গাড়িটি চালানো ও চালু অবস্থায় রাখা কতখানি কৃতিত্বের পরিচয়।

আর গাড়ি চালাতে পারলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি, তা তো নয়। গাড়ি চালানো হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাবার জন্যে, সে জন্যে হাজারো যন্ত্রপাতি রয়েছে গাড়ির মধ্যে। গাড়ি চলবার সংগে সংগে এইসব যন্ত্রপাতিও ঠিক-ঠিক চলা চাই।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্বাস করতে হয় যে, সব কিছুই ঠিক-ঠিক চলেছে। অর্থাৎ লুনা—১৭ থেকে শুরু হল চাঁদ নিয়ে গবেষণায় নতুন একটি পর্ব। লুনা—২ চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়েছিল, লুনা—৯ ও লুনা—১৩ চাঁদের মাটিতে আলতোভাবে নেমেছিল কিন্তু তারপরে আর নড়াচড়া করে নি, লুনা—১৭ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে নড়াচড়া করেছে একটি আট-চাকার গাড়ি নামিয়ে দিয়ে।

আর এতসব কান্ড ঘটল মাত্র এগারো বছরের মধ্যে—১৯৫৯ থেকে ১৯৭০। আগামী এগারো-বছরে যে কী ঘটবে তা কল্পনা করাও শক্ত।

### ধাঁধার জবাব

গ ও খ এই দুজনের একজন ছেলে একজন মেয়ে, গ ও ঘ এই দুজনের বেলাতেও তাই। অতএব ঙ ও চ একজন ছেলে একজন মেয়ে, খ ও ঘ দুজনেই ছেলে বা দুজনেই মেয়ে। তার মানে হয় খ ঘ ও ঙ ছেলে এবং গ ও চ মেয়ে, কিংবা, খ ঘ ও চ মেয়ে এবং গ ও ঙ ছেলে। অলিম্পিক ১০০ মিঃ হার্ডল প্রতি-যোগিতায় যোগ দিতে পারে শুধু মেয়েরা। অতএব সঠিক জবাব হচ্ছে—

গ ও ঙ ছেলে

ক, খ, ঘ ও চ মেয়ে।

—অয়স্কান্ত

---

### ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছে পাকিস্তানে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত আছে ২২ মিলিয়ন ঘনফুট, হবে ২২ মিলিয়ন মিলিয়ন ঘনফুট।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কোনরকম আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে ়চমকা বিনয় চেয়ার ছেড়ে উঠে পিছন ়কে শেফালীকে জড়িয়ে ধরল। তারপর ়ধের উপর পর পর কয়েকবার চুম্বন ়ল। শেফালী প্রথম কয়েক মুহূর্তে হত- ়ম্বর মত স্থির হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে ়র পায় শরীরে অসহ্য শিহরণ। কাঁধের ়র গরম নিঃশ্বাস। সে এক ঝটকায় ়রয়ে দিতে চায় বিনয়দাকে। পারে না। ়চোখ ছাপিয়ে জল আসে। অবরুদ্ধ ়া চেপে ভাঙা গলায় বলল, ছি! ছেড়ে ়।

তারপর আলিঙ্গন শিথিল হলে ক্ষিপ্র- ়গ বুকের কাপড় ঠিকঠাক করে ঘর ়ড় বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কী যেন ভাবল ়য়। একটা সিগারেট ধরিয়ে হাসল ়নিমনে। সত্যি, বেশ ঘাবড়ে গেছে ়টা। দেখা যাক ফলাফলটা কি রকম শেফালী রেগে গেল না তো? দূরে ! ফালতু কেন এসব ভাবছে। আর ়ন পর একসঙ্গে শুতে হবে। হ্যাঁ, ়জানিয়ে দেবে মাকে, শুরু করে উৎসব। মা, তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ়। এখন না করলে আর কবে করবে ! তার যখন ইচ্ছে করছে শেফালীকে ় আর কোন কথা থাকতে পারে না।

এবার সে দেখবে নারীর ভালবাসায় জীবন পূর্ণ হয় কিনা।

ছাইদানীর মধ্যে সিগারেটের শেষাংশ গুঁজে ঘর ছেড়ে বারান্দায় আসে বিনয়। মীরা কী ঘুমিয়েছে?

হ্যাঁ, স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে মা আর মীরার মধ্যে। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খুব স্বাভাবিক, মীরার জীবনধারা বা অকস্মাৎ রজতদাকে ত্যাগ করে এখানে চলে আসা ও স্বাধীনভাবে রোজগার তথা বেঁচে থাকার চেষ্টা—এতটা হজম করে উদার মনোভাবের পরিচয় দেওয়া মার পক্ষে বেশ কঠিন। তবে কী পরোক্ষে বলা যায় মা অনুদার ও তাঁর মনোভাব সংকীর্ণ? না, তা নয়। অগাধ ভালোবাসা স্নেহ আছে মার বুকে। সময়বিশেষে তা উজাড় করে দেন। সুতরাং রাগ বা অভিমানের কথা বললে এমনকি তিরস্কার পর্যন্ত—সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে মীরার উচিত ধৈর্য ধরা। নইলে কপালে অশেষ দুঃখ। মীরার এসব বোঝা উচিত।

ঘড়ি দেখল বিনয়। প্রায় আটটা বাজে। শেফালীর জন্যে সন্ধ্যা টিউশোনীটা বদলে সকালের দিকে করে নিয়েছে। এ-ব্যবস্থা সাময়িক। শেফালীর মা পরোক্ষে টাকা দেবার কথা বলেছিলেন। ভদ্রমহিলার হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে মেজাজ আর একটু হলেই বিগড়ে যেত। অতিকষ্টে সংযত করেছে নিজেকে।

রান্নাঘরে যাওয়ার সময় এ-ঘরে একবার উঁকি দিল বিনয়। পল্টুর পাশে মীরা শুয়ে।

—মা। বিনয় হাঁটু ভেঙে নীহারের পাশে বসল, তোমার পুজোর সময় পেরিয়ে গেল। কখন বসবে?

—রান্না শেষ না হলে যাই কিভাবে।

—মীরাকে ডাক। রাত্রের রান্না ওই তো করতে পারে। ও শুয়ে রয়েছে কেন এমন অসময়ে?

নীহার অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে বলেন, কে জানে! তোদের কখন কি খেয়াল হয়, মেজাজ কখন কি রকম থাকে, আমি এসব বুঝিনে বাবা। আর কতদিন চোখের সামনে এসব অনাছিষ্টি দেখে যেতে হবে ভগবান জানে! বিনু, আর বেশীদিন বোধহয় আমি বাঁচবো না। আমাকে তুই কাশী পাঠিয়ে দে।

মার গলা জড়িয়ে বিনয় হাসল, তুমি রাগলে বা অভিমান করে দূরে সরে গেলে আমরা কোথায় যাই মা। তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে! এভাবে বাধা দিয়ে মীরার ভাল করতে পারবে না। বরং ওকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও। শোন একটা কথা। ও কিন্তু ভীষণ জেদী মেয়ে। বেশি শাসন ফলাতে গেলে উল্টো ফল হবে। অত ভেব না। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। ওঠ তুমি মা। কোন কথা শুনবো না। পুজোয় বসবে। মীরাকে ডেকে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায় একটা মোড়ায় বসে বিনয়। মীরা কড়ায় খুন্তি নাড়তে নাড়তে মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে কথার জবাব দিচ্ছিল।

—একটা রেডিয়ো কিনবে দাদা? তোমার তো কোন সখ নেই দেখছি।

বিনয় সশব্দে একটা হাঁচি দেয়, উঃ একেই বলে বাঙ্গালের রান্না। খালি ঝাল দেবে সব জিনিসে। কী বললি একটু আগে ঃ সখের কথা বলছিলি বোধ করি। সখ বল, ফ্যাসান বল, আনন্দ স্ফূর্তি সব—পয়সার দরকার বোনটি।

একটা সিগ্যারেট ধরিয়ে বেশ জোরে কয়েকবার টানল বিনয়। মীরার মুখের দিকে ঘনঘন তাকাল।

'অথচ ভেবে দ্যাখ মীরা, শহরের এদিক-সেদিক ঘুরলে, বিশেষ করে সন্ধ্যের পর, একবার গিয়ে যদি দাঁড়াস পার্ক স্ট্রীটে; হাঁ করে দেখবি নিয়নের বিজ্ঞাপন, মদের দোকানের সামনে গাড়ির কিউ, সুসজ্জিত নরনারীর ঘন ঘন আনাগোনা, ভিখিরি বালিকার জোড়হাতে গাড়ির সামনে দাঁড়ানো। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে পারবি তোদের নিম্নমধ্যবিত্তসুলভ জোলো অহংকার। আমাদের আর কী আছে বল শুধু দাঁত খিঁচিয়ে পরস্পরের দিকে তেড়ে যাওয়া ছাড়া!'

মীরা হাসল, অসংলগ্ন কথা বলছো দাদা। আমি জানি আসলে তুমি কী বলতে চেয়েছো। পয়সার অভাবে একটা রেডিয়ো কিনতে পারছো না অথচ এ-বাসনাটুকু তোমার স্বাভাবিক। অন্যদিকে কী বিপুল অর্থের অপচয় মদ ও নানারকম বিলাসে। কারা করছে? মুষ্টিমেয় কিছু লোক। এদের প্রতি তোমার ঘৃণা প্রকাশ করা উচিত দাদা। তা না করে স্ব সমাজের নিন্দা করছো। বেশ স্বার্থপর তুমি!

—আমি বিশেষ কোনও সমাজের অংশীদার হিসেবে নিজেক ভাবি না। বলতে বলতে বিনয়ের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। আর কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। ফিরে এল নিজের ঘরে। একবার চেয়ারে বসতে গিয়ে কি ভেবে সবুজ আলো জেনলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। দপ্‌দপ্‌ করছে কপালের দুদিকের রগ। অশরীরী একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করছে। সে কী স্বার্থপর? সে কী স্ব-সমাজের কথা মোটেও ভাবে না? মীরার অভিযোগ কতদূর সত্য?

অনেকক্ষণ এলোমেলো চিন্তায় সময় কেটে যায়। শুধু টেবিল ঘড়িটার একঘেয়ে টিক্‌টিক শব্দ কানে এসে আঘাত করছে। বিনয় চিৎ হয়ে শুয়ে সবুজ আলো দেখল কিছুক্ষণ। মীরা জানে না কিছু। ও জানে না স্ব-সমাজের অস্তিত্ব এখন আর নেই। সব তালগোল পাকিয়ে জগাখিচুড়ি বনে গেছে। আর স্বার্থপরতার কথা ওঠে না। সে প্রতিদিন চলাফেরায়, মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে, নিমন্ত্রণ বা অনুষ্ঠানে, লক্ষ্য করেছে চরম অসহিষ্ণুতা, নির্বিকার মনোভাব, স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে চলা। লক্ষ্য করেছে সামান্য কারণে, যা অনায়াসে অগ্রাহ্য করা যায়, বিস্ফোরণ ঘটে যায়। সাধারণ মানুষদের কথাই সে বলছে। তার মত সাধারণ একজন নিম্নমধ্যবিত্তের পক্ষে অ-সাধারণদের জানার কথা নয়। অ-সাধারণ অর্থে বিত্তবানদের কথাই বোঝাতে চায়।

—বিনু!

মাথায় নরম স্পর্শ। বিনয় আবছায়া আলোয় মার মুখ দেখার চেষ্টা করল। কাতর আবেদন কী মার কণ্ঠস্বরে? যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। বিশেষ কোনও আর্জি নিয়ে এসেছেন মা। স্বস্তিবোধ করল সে। নইলে একাকী চিন্তার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হোত। চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে-করতে এক সময় ক্লান্ত হতাশ হয়ে উঠতো। বাস্তবিক অত খুঁটিয়ে ভাবলে সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলাই যে কষ্টকর হয়ে উঠবে। বরং একটু কম ভেবে কাজের মধ্যে ডুবে থাকা ভাল। অলস চিন্তার মত ক্ষতিকর আর কিছু নেই।

মার কোলে মাথা রাখে বিনয়। নরম গলায় বলে, খিদে পেয়েছে মা। ভাল লাগছে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়বো।

—চল তাহলে রান্নাঘরে। মুখে বললেও ওঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না নীহারের হাবভাবে। বরং তিনি আরও গুছিয়ে বসলেন।

বিনয় মনে-মনে হাসল। মা নিজেকে প্রস্তুত করছেন। প্রথমেই আসল কথাটি বলবেন না। কিছুক্ষণ নানা রকম গল্প করবেন। মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখবেন ছেলের মুখ-চোখ। যদি দেখেন খোস মেজাজ এখন আসল কথাটি প্রকাশ করবেন।

—শেফালীর লেখাপড়ায় মাথাটা কেমন বিনু। পাশ-টাশ করতে পারবে তো?

—ভালভাবে পড়লে কেন পারবে না।

—শোন বিনু। নীহার কিছুক্ষণ চুপ করে বলেন, ওরা খুব তাগাদা দিচ্ছে। ভাল লাগে না বাপু, ইচ্ছে হলে মত দে। নইলে ওদের স্পষ্ট জানিয়ে দি আপনারা অন্য ছেলে দেখুন।

সঙ্গে-সঙ্গে কোন উত্তর দেয় না বিনয়। চট করে রাজী হয়ে গেলে মা ভড়কে যাবেন। হ্যাঁ, এ নিয়ে আর চিন্তা করার নেই। ইচ্ছে করছে বিবাহিত জীবনকে একটু চেটে-চুটে দেখতে। কেমন তার স্বাদ। কেমন তার গন্ধ বর্ণ ঘ্রাণ। অতএব শুভস্য শীঘ্রম।

—বেশ তোমার যা ইচ্ছে মা। উদাসীন-ভাবে মার দিকে তাকাল বিনয়।

এর পর অনেক কথা বললেন নীহার। অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। মনে-মনে ভাবলেন শেফালী জাদু জানে। বিনয়কে বশ করতে পেরেছে। খুশী হলেন তিনি। বয়স হয়ে যাচ্ছিল ছেলের অথচ বিয়ে-থা করে সংসারী হবার আগ্রহ নেই। শুধু বই আর বই। স্কুল আর টিউশোনী করতে যা বাইরে বেরোয়, বাকী সময় বই মুখে গুঁজে পড়ে থাকে। বেড়ানো কি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্প-গুজব করা, ওর বয়সী আর পাঁচটা ছেলে যেভাবে সময় কাটায়—এসবের ধারে কাছ দিয়ে ও যাবে না। যাক বাঁচা গেল। এখন শেফালী এসে ছেলের মুখে হাসি ফোটাক। ছেলেপুলে হোক। শিশুর কল হাস্যে মুখরিত হোক এই ঘর। প্রাণ জেগে উঠুক এই ঘরে। নিষ্প্রাণ নিষ্প্রভ দিনে যেন নতুন উৎসাহে হাসি মুখে বাঁচতে পারে। ছেলের সুখেই তাঁর সব!

—ঘুমোলি নাকি বিনু? নীহার সস্নেহে চুল ধরে টান দেন, এই বললি খিদে পেয়েছে। ওঠ দুষ্টু ছেলে।

বিনয় আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠতে উঠতে চল। মীরা মীরা! চিৎকার করে ডাকে খেতে দিবি না মুখপুড়ি! এতক্ষণ ধরে এত কী রাঁধছিস।

—চেঁচিয়ো না দাদা। মীরা ঘ... বলল, এটা কী হোটেল পেয়েছো।

—দ্যাখ মা। বিনয় কপট ক্রোধে বলল তোমার মেয়ে আমার একটা কথাও শো... না। আবার মেজাজ দেখাচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বিনয় চারখানা রুটি খেয়ে নিল। সঙ্গে ছোলার ডাল আর আলুর দম। প্রথম দিকে রুটি দেখলে গায়ে জ্বর আসত। এখন বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। বরং রাত্রে রুটি না খেলে রীতিমত অস্বস্তিবোধ করে।

মীরার মুখ অনেকটা গম্ভীর। একবার আড়চোখে সেদিকে তাকাল বিনয়। গুমোট ভাবটা সম্পূর্ণ কাটে নি। যদিও যথাসাধ্য চেষ্টা সে করেছে। হাসি-গল্প-ঠাট্টায় সহজ আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে চেয়েছে। এখন মনে হচ্ছে সে ব্যর্থ। মা বা মীরা উভয়েই আপন-আপন জেদ বজায় রাখতে সচেষ্ট ফলে যত গণ্ডগোল। অন্তত একজন নরম হলে আর কথা ছিল না।

—কবে হচ্ছে বিয়েটা? মীরা গম্ভীর গলায় বলল, শেষ পর্যন্ত হবে তো না ভেস্তে যাবে।

—ভেস্তে যাবে! বিনয় হাসল, অভিশাপ দিচ্ছিস?

—বাজে বকো না দাদা। বিয়ে করছো এতে সবচেয়ে খুশি আমি।

নিঃশব্দে খেয়ে যায় বিনয়। খাওয়া শেষ হলে ওঠার আগে বলল, তোর শর্ট হ্যান্ডের স্পীড কত হলো? এখন থেকেই চাকরীর জন্যে দরখাস্ত কর। বলা যায় না লেগে যেতে পারে।

মীরা আস্তে-আস্তে কী বলল শুনতে পেল না। বারান্দায় চৌকির উপর বসে মা রাত্রের জলযোগ সারছিলেন। হাল্কা খাবার। বিনয় সেদিকে এক পলক তাকিয়ে ঘরে ঢুকল। দরোজা বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরে শুনল কান্না পল্টুর গলা। সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে উঠল আর একটি মুখ। তন্দ্রার মধ্যে বিনয় অস্ফুটস্বরে চিৎকার করে উঠল। ঘুম ভেঙ্গে গেলে টের পেল কপালে ঘাম

লেপেরতলা থেকে সিগারেট বের করে ল। কী স্বপ্ন যেন দেখছিল? এখন পড়ছে। হ্যাঁ, বিশ্রী অস্বস্তিকর প্নটা। রজতদা রিভলবার হাতে ছুটে সছে। সে ছুটছে প্রাণভয়ে ভীত জন্তুর । এর পর ঘুম ভেঙে যায়।

মশারি তুলে বিমর্ষ দরোজা খুলে বাইরে ।

।। পাঁচ ।।

চেয়ারের উপর থেকে কোটটা নিয়ে ায়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরতে থাকে ত। কব্জী উল্টে ঘড়ি দেখল। সাড়ে ার। আবার আয়নার দিকে চোখ পড়ল। সুন্দভাবে গাল কামানো। উল্টে চুল াঁচড়ানো। দু চোখের নীচে কেমন ফোলা-ফোলা। বাইরে থেকে দেখলে বেশ তৃপ্ত ন হবে। সুখী লোকদের চেহারা বোধহয় ারকমই। তা হবে।

ক্রিং-ক্রিং করে টেলিফোন বাজছে। দিকে কোন মনোযোগ দিল না প্রথমটা ত। একমনে টাই বাঁধল বেশ কিছুক্ষণ। ন্তু পলায়নের কোন উপায় নেই। ক্রিং-ং করে টেলিফোন বেজেই চলেছে। ম্মোহিতের মত সেদিকে টেনে নিয়ে গেল কে। রিসিভার তুলে যান্ত্রিক স্বরে বলল, ঃ রজত বোস কথা বলছি। কে বলছেন? চ্ছা, কেমন আছেন? না, অত্যন্ত ঃখিত। আজ আমার একটা জরুরী পয়েন্টমেন্ট আছে। কী বললেন? সে র ঠিক করা যাবে। পরে রিং করবেন। াই-বাই!

বেশ শব্দ করে রিসিভার রেখে দিল ত। তারপর টেবিলের উপর থেকে কিছু কারী কাগজপত্র ড্রয়ারে বন্ধ করে সুইং-র ঠেলে বাইরে আসে। বেয়ারা উঠে লাম জানায়। কোনদিকে না তাকিয়ে, ন্যান্য কর্মচারীদের চোখের দিকে রণত সে তাকায় না, লিফটের দরোজার ানে এসে দাঁড়াল।

জনস্রোত ঠেলে রজত হাঁটতে থাকে। পিল করে আশে-পাশের বাড়িগুলো ক লোক বেরুচ্ছে। আর ছুটছে বাস-র দিকে। মিঃ মেনন টেলিফোন ছল। একটা আধা-বিলিতি কোম্পানীর ার্জিং অফিসার। ভাল মাইনে। তার-া বেশী পায় এদিক-সেদিক করে। রোধ করছিল আজ সন্ধ্যাটা ওর সঙ্গে তে। রজত অতিকষ্টে এড়াতে পেরেছে। অফিসের পর ঐসব লোকদের সাহচর্য লাগে না। আজ বাড়ি ফিরবে তাড়া-। বিশ্রাম করবে।

বাড়ির কাছাকাছি গলির মুখে ট্যাকসী নামল রজত। মিটার দেখে ভাড়া র সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে অবাক। কিছুটা দূরে একটা গাড়ি বারান্দার কয়েকজন বসে। হঠাৎ একজন সেখান উঠে দৌড়ে পালাল। স্পষ্ট দেখল ছুটছে রামু। কী করছিল ওখানে? এদের কাউকে চেনে না সে। বস্তুত এ পাড়ায় বহুদিন থাকলেও একরকম সে অপরিচিত। পাশ দিয়ে যাবার সময় ছড়ানো তাস, পয়সা, ইতঃস্তত বিড়ির টুকরো, ওল্টানো মাটির ভাঁড় লক্ষ্য করল। আচ্ছা, রামু তাহলে ইদানীং জুয়ো খেলতে শিখেছে। জানতো বিড়ি খায়। ঠোঁট দেখলেই বোঝা যায়।

ঘরে ঢুকে রজত সোফার উপর বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইল। রান্নাঘর থেকে পেয়ালা-পিরীচের ঠুংঠাং শব্দ ভেসে আসছে। অনেকক্ষণ পর আলো জ্বলতে চোখ মেলল সে। টেবিলের উপর ধূমায়িত কফি আর বিস্কুট। মাথা নীচু করে রামু দাঁড়িয়ে। ব্যাটা, খুব লায়েক হয়ে উঠেছিস! ভেবে-ছিল আচ্ছা করে ধমকে দেবে। এখন মনে হচ্ছে কোন প্রয়োজন নেই। যা খুশি করে বেড়াক রামু সেজন্যে সে ধমকাতে যাবে না। ঠিকমত আমার কাজ করো। আর কিছু চাই নে। তারপর তোমার জীবন তোমার। ডু এনিথিং ইউ লাইক।

ইসারায় ওকে যেতে বলে কফিতে চুমুক দিল সে। ড্রেসিং টেবিলের উপর ফটো। তার আর মীরার যৌথ ছবি। অনেকক্ষন তাকিয়ে দেখল। কী তেজ মহিলার! স্বাধীনভাবে থাকবে বলে চলে গেল। ক' মাস হলো চলে গিয়েছে মনে পড়ছে না। এখানে কী মীরা পরাধীনতার মধ্যে ছিল? জানে না সে। যাক চলে গিয়ে ভালই হয়েছে। রোজ ঝগড়া করার চেয়ে আলাদা থাকা ভাল। মীরা চেয়েছিল ওর মর্জি-মাফিক সে চলবে। হাউ ফানি? একটা ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে। অফিস যাও বাড়ি ফিরে আস, মুখের কাছে মুখ এনে গল্প কর, বাজার বার, রাত্রে পাশে শুয়ে যৌন খিদে মেটাও— ওরকমভাবে চলা কী তার পক্ষে সম্ভব? হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবেই চলতে পারে নি। তারপর নানারকম বিধি-নিষেধ। এরকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে তিন-চার বছর কিভাবে কাটিয়েছে, আজ ভাবলে রীতিমত মাথা ঘুরে যায়!

মীরার সব খবর সে রাখে। না, কোন ইণ্টারেস্ট নেই। নিছক কৌতূহল। বেশ আরামেই তো ছিলে। এখন হাড়ে-হাড়ে টের পাবে অভাব-অনটনের মধ্যে থাকায় মজা আছে কিনা। সব জানে। আবার চাকরী করবে তারই প্রস্তুতি নিচ্ছে মীরা। বেশ তো চাকরী-বাকরী করে নিজের পায়ে দাঁড়াও। সেদিন এই অহঙ্কার কোথায় ছিল? হাস-পাতালে ভাই শয্যাশায়ী, ঘরে দুবেলা খাবার মত অবস্থা নেই, নিজে শখের থিয়েটারে নেমেছো। তখন এই শর্মা বাঁচিয়েছে তোমাদের সকলকে। তুমি নষ্ট হয়ে যেতে। শকুনে ছিঁড়ে খেত তোমার নধর শরীর! আজ পরিবর্তিত অবস্থায় তোমরা সব ভুলে গিয়েছো। স্বার্থপর নেমকহারামের দল! রজত উত্তেজনায় পকেটে দু হাত দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আলমারী খুলে রামের বোতল বের করল রজত। গ্লাসে খানিকটা ঢেলে বোতলটা ফের যথাস্থানে রেখে দিল। আলমারী বন্ধ করল না। তারপর আলতো-ভাবে হেঁটে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। এক চুমুকে সবটা পান করল সে। আয়নার ভিতর একটি মুখ। চুল এলো-মেলো। ঘর্মাক্ত। টাই-এর নট আলগা। কাঁধের কাছে জামা কোঁচকানো। সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল রজত। তারপর গ্লাসের নীচের তলানিটুকু ছুঁড়ে মারল ফ্রেমে বাঁধানো ফটোর দিকে। ভালবাসা ঢেকে গেল তরল মদে!

একটু পরে রজত সোফায় দেহ এলিয়ে দেয়। আঙুলের ফাঁক থেকে সিগারেট খসে পড়ে। টের পায় রামু নীচু হয়ে ঝুঁকে জুতো খুলছে। তারপর রামুর কাঁধে ভর দিয়ে এগোয়। পাশের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে! ওর দু পা ধরে টেনে রামু সোজা করে রাখে। বালিশ ঠিকঠাক করে। মাথা উঁচু করে বালিশের মাঝখানে রেখে আলো নিভিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে যায়।

ঘণ্টা খানের পর রজত জেগে উঠল। বিছানা ছেড়ে মেঝেয় নেমে আলো জেলে সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। চোখে জলের ঝাপটা দিল অনেকক্ষণ। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে বাথরুমের আলো নিভিয়ে ঘরে এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াল বেশ মনোযোগ দিয়ে। চোখ-মুখ ফোলা-ফোলা। রান্নাঘর থেকে সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে। খাসা রাঁধে রামু!

মীরার রান্না তার পছন্দ হোত না। আঃ ফের কেন মনে পড়ছে! অস্থির পদ-শব্দ করে পাশের ঘরে আসে। সব জিনিস ঠিক তেমনি সাজানো। রামু রোজ সাজিয়ে রাখে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ ফটো দেখল। ধীরে-ধীরে মুখে হাসির রেখা ফুটল। তারপর রজত হাত দিয়ে খিমচে ধরল ফটো। ড্রয়ার খুলে ফটো রেখে বন্ধ করল। ঘরের চারিদিকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল। খালি আলনা। খালি বিছানা। শূন্য তক্তপোষ। খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক। শুধু মৃদুভাবে শোনা যাচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। রজত ঘরের মাঝখানে শূন্যদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তখন পর-পর কয়েকবার কলিং বেল বেজে উঠল। চমকে উঠল রজত। ঘরের চারিদিকে ঘুরল অস্থিরভাবে। চারিদিকে দেয়াল। ওঘরে ছুটে গেল। তবু কানে আসছে কলিং বেলের অমোঘ শব্দ। দু হাতে কান চেপে ধরল। তবু সে স্পষ্ট শুনল তেমনি বেজে চলেছে কলিং বেল। তার পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায় রামু। রজত দরোজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি এঁটে

মিল সে। অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

দামী একটা সেন্টের গন্ধ ভেসে আসছে। কে এলো? সে রামুর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সেই সঙ্গে বোধহয় ফিসফিসে রমণী কণ্ঠস্বর। ঠিক চিনতে পারছে না। মনে পড়ছে, পড়ছে না। লতা কী?

পদশব্দ এগিয়ে আসছে। আরও কাছে এগিয়ে এল। রামু মৃদু কণ্ঠে ডাকল, সাব! আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান এক ভদ্রমহিলা। পাশের ঘরে বসিয়েছি তাকে।

রজত কোন উত্তর দিল না। দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। পদশব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সন্তর্পণে ছিটকিনি খুলে উঁকি মেরে দেখল। পা টিপে-টিপে বাইরে এল। সিগারেটের সুন্দর গন্ধ ভেসে আসছে।

কপালের দু পাশের রগ চেপে পাশের ঘরে এল সে। সোফায় আধশোয়াবস্থায় বসে লতা মুখার্জি। বাঁহাতে রং-করা নখের ফাঁকে সিগারেট। শ্যাম্পু-করা চুল কাঁধ পর্যন্ত। দু চোখের পাতার উপর কাজল। বেশ বড় টানা চোখ। নাক-চোখ-চিবুক-ভ্রূ সব মানানসই। বয়স তিরিশের ঊর্ধ্বে। রীতিমত সুন্দরী মহিলা। দোহারা গড়ন। বেশ লম্বা। সোফার হাতলের উপর শাড়ি লম্বা বাহু এলিয়ে রয়েছে। গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে শাড়ি-ব্লাউজ পরেছে।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলে রজত? বিরক্তির সঙ্গে লতা বলল, সেই কখন থেকে বসে আছি। ঘনঘন সিগারেট টানল। কানের দুল জোড়া কথা বলার সময় দুলছে। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকের মত আলো বিকিরণ করছে।

বিব্রত চোখ-মুখে রজত উত্তর দিল, ভীষণ মাথা ধরেছে। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। এই মনোরম সন্ধ্যায় হঠাৎ পথ ভুলে এখানে কেন লতা!

ছাইদানীর মধ্যে লতা সিগারেটের টুকরো গুঁজে রজতের হাত ধরে টেনে পাশে বসাল। বলল, দুষ্টুমী না করে চুপচাপ বসো। দেখি কোথায় ব্যথা করছে। অডিকোলন বা ভিকস আছে? নেই বুঝি। না থাকাই স্বাভাবিক। আই ফিল পিটি ফর ইউ পুওর বয়!

ঠোঁট চেপে অদ্ভুত এক ধরনের চুকচুক শব্দ করে লতা। সরু-সরু আঙুল দিয়ে কপালের রগ টিপতে থাকে। বুঝতে পারল উসখুস করছে রজত। ডোন্ট বি নটি রজত। গুড বয়ের মত চুপচাপ থাক কিছুক্ষণ। দেখবে একটু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ছাড় লতা! রজত জোর করে হাত সরিয়ে উঠে উল্টো দিকের সোফায় বসল, রামু যখন-তখন চলে আসতে পারে।

—সো হোয়াট? লতা খিলখিল করে হেসে সোফার উপর গড়িয়ে পড়ল। রেশমের মত নরম চুল চোখ-মুখের উপর এসে পড়েছে। বেশবাস অসম্বৃত হয়ে উঠল। সেদিকে কোন খেয়াল নেই ওর। হাসির বেগে শরীরটা দুলে-দুলে উঠছে।

স্থির চোখে লতাকে দেখল রজত। এখন রামু এসে পড়লে ভারী বিব্রত অবস্থায় পড়বে সে। এখানে এর আগেও কয়েকবার এসেছে লতা। প্রতিবার রজত বাড়িতে ছিল। লতার হাসি থেমেছে। চোখাচোখি হতে সে শরীরে এক ধরনের শিরশিরানি অনুভব করল। লতার চোখে কিসের ইসারা?

—কী খাবে? চা না কফি।

—বাঃ সুন্দর গন্ধ আসছে। বলে লতা উঠে দাঁড়াল, দেখে আসি রামু কি রাঁধছে। সেই সঙ্গে কফির অর্ডার দিয়ে আসি। শোন, মাথা ধরা কমেছে। নাকি রামুকে পাঠাব দুটো অ্যানাসিন নিয়ে আসতে।

—থাক লতা। একটু বিশ্রাম করলে মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর একটু ইতস্তত করে রজত বলল, আমার একটু শোয়া দরকার। দ্যাখ তো, এমন সময় এলে যখন আমি ঠিক সুস্থ নই।

—ওসব শুনছি না। আমি বাপু সহজে নড়ছি না। কতদিন দেখা হয় না, বলতো! এক মিনিট রজত। বলে লতা নাচের ভঙ্গিতে সমস্ত শরীর দুলিয়ে ভিতরে চলে যায়।

বাঃ ব্যাপারটা মন্দ নয়। যেন এ বাড়ির সব কিছুর উপর লতার অবাধ অধিকার। কত স্বচ্ছন্দগতিতে চলাফেরা। মীরাও এমন সহজভাবে চলতে-ফিরতে পারত না। কিন্তু লতার উদ্দেশ্য কী? আজও কী রাতটা এখানে কাটাবে? ভাবতেই বিরক্তিতে সমস্ত মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল রজতের।

একটা সিগারেট ধরাল সে। না, সে একা থাকতে চাইলেও পারবে না। কেউ না কেউ আসবেই। এড়াতে পারবে না। তার পরিচিতের সংখ্যা অনেক। লতার সঙ্গে এক পার্টিতে আলাপ। আলাপ থেকে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা। প্রাইভেট গার্ল। তবে ইদানীং রজত ছাড়া অন্য কাউকে এন্টারটেইন করে না। অবশ্য এটা লতারই স্বীকারোক্তি। সত্য-মিথ্যা সে জানে না। জানার কৌতূহলও নেই। বিশেষ মুহূর্তে লতার সঙ্গ ভাল লাগে। এর বেশি অন্য কিছু নয়। লতার হাবভাবে মনে হয় সে যেন প্রেমে পড়েছে। ভেবে মৃদু হাসল রজত। আর প্রেম-ট্রেম নয়। বরং যখন প্রয়োজন হবে, মাঝে-মাঝে হয় বৈকি, তখন লতা বা অন্য কাউকে পেলেই চলবে।

—সব ঠিক করে এলাম। বলতে-বলতে লতা ঘরে ঢুকল। পিছনে রামু কফি নিয়ে। টেবিলের উপর কাপ রেখে রামু চলে যায়। লতা বেশ ঘনিষ্ঠভাবে পাশে বসল রজতের। বলল, শুরু করো। বেশ ফ্রেস লাগবে।

কফিতে চুমুক দিয়ে রজত বলল, সব কী ঠিক করলে।

—যথাসময়ে দেখবে। লতা মুচকি হাসতে থাকে। মাঝে-মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের সামনে থেকে চুল পিছনে সরিয়ে দিল। প্যাকেট খুলে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে অফার করল রজতকে। রজত দু আঙুল দিয়ে সিগারেট টেনে নিল একটা। বাহুতে বাহু ঠেকাচ্ছে। উরুতে উরু। উষ্ণ ও নরম। দৃঢ়ভাবে নিজেকে সংযত করল রজত। আজ নয়। আজ এসব সে চায় না।

—কী ভাবছো তুমি সেই তখন থেকে। মাথা নেড়ে লতা বলল, বৌ-এর কথা মনে পড়ছে বুঝি? ছেলের কথা? যাই বলো না কেন মুখে, তোমার মন জুড়ে ওরা রয়েছে। এভাবে মন খারাপ না করে বরং ওদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

—থাক ওসব কথা। রজতের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, তুমি আমার সেন্টিমেন্টে আঘাত দিতে চাও কেন! যা ভাবছো তা নই লতা। আমাকে দুর্বল ভাবলে ভুল করবে।

—রাগ করো না রজত। তোমাকে মনমরা দেখলে ভীষণ কষ্ট পাই। লতা সারা শরীরে ঢেউ তুলে হাসল, কেমন বীরপুরুষ তুমি জানা আছে। কী আশ্চর্য! অনেকক্ষণ এসেছি এখনও তুমি ড্রিংক অফার করছো না। এসো একটু গলাটা ভিজিয়ে নি।

রজত আঙুল দিয়ে আলমারী দেখাল, ওখানে রয়েছে। প্লীজ আমাকে দিয়ো না।

লতা কোন কথা না বলে আলমারী খুলে দুটো গ্লাসে দু পেগ ভরে রাম ঢেলে নিল। তারপর আলমারী বন্ধ করে গ্লাস হাতে রজতের মুখোমুখি বসল। টেবিলের উপর দুটো গ্লাস রেখে হেসে তাকাল রজতের দিকে।

—ধরো। ও কি রজত! ডোন্ট বিহেভ লাইক এ চাইল্ড।

রজত চিৎকার করে বলতে চাইল, চলে যাও লতা! আমাকে বিরক্ত করো না। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। দোহাই আমাকে নিস্তার দাও!

(ক্রমশঃ)

শিল্পী ডি, এ, ক্লোটোচেএর কাগজের মণ্ডের কাজ

# প্রদর্শনী পরিক্রমা

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ক্যালকাটা পেন্টার্স গত ৩ থেকে ৮ নভেম্বর তাঁদের গোষ্ঠীর একটি সুসজ্জিত প্রদর্শনী করলেন। সাতজন শিল্পীর পঁয়ত্রিশখানি ছবির মধ্যে এবারে নন-ফিগারেটিভ কাজের নিদর্শন একটু কম দেখা গেল। অনীতা রায়চৌধুরীর ফ্যাকাশে ক্যানভাসগুলি ছাড়া রবীন মণ্ডলের কয়েকটি ক্যানভাসে এই রীতির নমুনা রাখা হয়। বাকী সকলের কাজেই একটা সমকালীন জীবনের কোন না কোন দিককে প্রতিফলিত করবার একটা ব্যাকুলতা দেখা গেল।

যোগেশ চৌধুরীর রঙ্গীন ড্রয়িং-গুলিতে স্টিল লাইফকে কতকটা সুর-রিয়্যালিস্টিক ভঙ্গীতে দেখানোর চেষ্টা আছে। ড্রীম সিরিজের এই ছবিগুলিতে ফুল, প্রজাপতি, চায়ের পেয়ালা আর মানুষের হাতের একটা অস্বস্তিকর সমাবেশ করা হয়েছে। এই স্বপ্নের জগৎটা মোটেই সুখকর নয়। ড্রয়িংগুলি খুঁটিয়ে করা।

ইশা মহম্মদের বড় ক্যানভাসগুলির রং বেশ উচ্চগ্রামে বাঁধা। সাময়িককালের অনেক অসঙ্গতি ও অবিচারের দিকে কিছু কিছু ইঙ্গিত কোথাও কোথাও আছে। বিশেষ করে তাঁর 'ইনোসেন্ট বয়' এবং 'ম্যান এন্ড মেশিনের' নাম করতে হয়।

অমিতাভ সেনগুপ্ত কতকটা হাল্কা চালে কাজ করেছেন। টুকরো টুকরো রঙের ছোপের ওপর নকশা বা ফিগার বসিয়ে কতকটা ডুফি বা কিছুটা পানিক্করের ধরনের ছবি তৈরী হয়েছে। ছোট মাপের 'র‍্যাপসডি' ছবির রঙের বণ্টন প্রশংসনীয়।

দিলীপ কুণ্ডুর ক্যাপটিভ বার্ড সিরিজটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাঁচায় বন্ধ পাখির স্পন্দনের ব্যাকুলতা ছবিগুলিতে বলিষ্ঠ-ভাবে উপস্থিত করা হয়। বিশেষ করে তাঁর ৬, ২৯ এবং ৩০ নম্বরের ছবিগুলি চোখে লাগে। ছোট ছবি এবং বাহুল্য-বর্জিত রং ও কম্পোজিশন। কোথাও অতিশয়োক্তি দোষ নেই।

প্রকাশ কর্মকার কলকাতার বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির ওপর বড় বড় ক্যানভাস উপস্থিত করেছেন। তাঁর ছবির ... ক কম্পোজিশন খুব আগ্রহ জাগাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। বড় ক্যানভাসেও শুধু চিত্রের মাধ্যম ছাড়া লেখার মাধ্যমেরও সাহায্য তাঁকে নিতে হয়েছে কিন্তু বক্তব্য ঠিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। ফলে ছবিগুলি ভাল পোস্টার বা সুঅংকিত পেন্টিং ঠিক কোনটাই যেন হয়ে ওঠেনি।

●

৬ নম্বর সাকলাত প্লেসের গ্যালারী ইউনিকে এস সিনহার আঁকা ভারতীয় রাগের চিত্ররূপের একটি আলো অন্ধকার ও শব্দময় প্রদর্শনী ৮ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল। শ্রীসিনহা সঙ্গীত-বিশারদ তবে এই তাঁর প্রথম চিত্রকর্মে হস্তক্ষেপ। গোটা পনেরো ছোট মাপের ছবি কালো কাগজে দেওয়াল মুড়ে তার ওপর সাজিয়ে রাখা হয়। ছবিগুলির ফ্রেমও কালো। অন্ধকার ঘরে প্রতিটি ছবির ওপর একটি করে আলো ক্রমান্বয়ে জ্বলতে ও নিবতে থাকে। তার সঙ্গে টেপ রেকর্ডে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর আলাপ শোনা যায়। প্রতিটি ছবিই বিমূর্তরূপী। গোলাপী, সাদা, নীল, ধূসর ইত্যাদি বর্ণের সাহায্যে মেঘের মত ডিজাইন। একটি ঘোর রঙের কাজ প্রায় অদৃশ্য। এই মৌলিক শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজনের কৃতিত্ব ম্যাক্সমুলার ভবনের।

●

অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফট বোর্ড-এর উদ্যোগে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের রিজিওনাল ডিজাইন সেন্টারে মণিপুর সরকারের সহায়তায় মণিপুরের হস্ত-শিল্পের একটি প্রদর্শনী হল। ৭ থেকে ১৬ নভেম্বর ধরে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে প্রধানত বিভিন্ন রকমের বয়ন শিল্পের নমুনা দেখানো হয়। শাড়ি, চাদর, লাইসাম্বি প্রভৃতির নমুনাগুলির সরল ডিজাইন ও উজ্জ্বল রং সহজেই মনোহরণ করে। এছাড়া, রূপার গহনা এবং মাদুর ও বেতের কাজ তার বৈচিত্র্য ও ব্যবহার্যতার দরুন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মণিপুরী নাচের ভঙ্গীতে করা কতকগুলি পুতুল আকর্ষণীয় হয়েছিল।

ভারত সোভিয়েট সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রকল্পে সোভিয়েট সংস্কৃতি দপ্তর একটি সোভিয়েট লোকশিল্প প্রদর্শনী এদেশে পাঠাতে মনস্থ করেছেন।

প্রদর্শনীতে তিনশর মত দ্রষ্টব্য বস্তু থাকবে। সেরামিকস কাঠ ও হাড়ের কাজ, রূপোর কাজ, কার্পেট, মাটির পুতুল ও গ্রামজীবনের নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিস প্রদর্শনীতে দেখানো হবে। যেসব লোক-শিল্পীরা তাঁদের কাজের জন্যে স্বদেশে খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছেন তাঁদের অনেকের কাজ এই প্রদর্শনীতে দেখা যাবে।

শঙ্কর গুহ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ৮ থেকে ১৭ নভেম্বর তাঁর ছাব্বিশখানি ক্যানভাস প্রদর্শিত করলেন। প্রধানত অ্যাবস্ট্রাক্ট ও আধা ফিগারেটিভ কাজ, কতকটা সত্যেন ঘোষাল প্রভাবিত ছবি।

●

বিড়লা অ্যাকাডেমির পাঁচ তলায় ১২ নভেম্বর সমকালীন শিল্পের একটি নতুন গ্যালারি খোলা হল। সংগ্রহটি আমেরিকা থেকে করা হয়েছে তবে আমেরিকান ছাড়া অন্যান্য অনেক দেশের শিল্পীর ছবি, ড্রয়িং ভাস্কর্য ও গ্রাফিক কাজ এখানে সংরক্ষিত হওয়ায় মোটামুটি একটা আন্তর্জাতিক চেহারা দেখা যায়।

আধুনিক শিল্পরীতির পেন্টিং-এর মধ্যে নন্‌ফিগারেটিভ কাজের সংখ্যাই সর্বাধিক। হার্ড এজ অ্যাবস্ট্র্যাকশন থেকে অটোম্যাটিক পেন্টিং পর্যন্ত নানারকম কাজের নিদর্শন এখানে দেখা যাবে। সালিবা দুরাই, জোস গেরিও, আঁদ্রে ম্যাসন কিম্বা মরিস জোসেফ স্টেলা প্রমুখ শিল্পীদের নমুনা পাওয়া যাবে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কন-স্টানটিনো নিভোলার কয়েকটি ছোট টেরা-কোটা মূর্তির বিশেষ আবেদন রয়েছে। ড্রয়িং ও গ্রাফিকের ক্ষেত্রেও উন্নত ধরনের কাজ দেখবার সুযোগ এখানে পাওয়া যায়। প্রদর্শনীর সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে বন্ধ হওয়ার ফলে দর্শকদের কিছুটা অসুবিধা হতে পারে।

—চিত্রবণিক

# গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
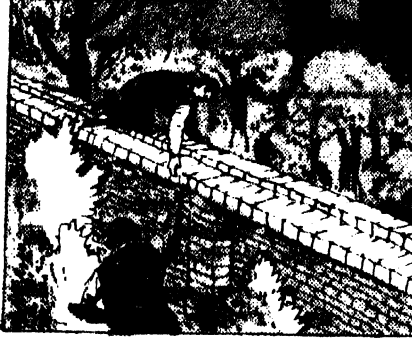
বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় মিস গ্রেণাডার (জেনিফার হোস্টেন) চারপাশে বাণার্স-আপের সুন্দরীরা এসে সমবেত হয়েছেন। কমেডিয়ান বব হোপ মিস গ্রেণাডার মাথায় মুকুট ধরে আছেন। ডানে পার্ল জ্যানসেন (মিস দঃ আফ্রিকা) দ্বিতীয় এবং বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত মিস ইস্রায়েল (ইরিন ল্যান্ডি) তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

# অঙ্গনা

## বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার একদিক

এবারে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মিস জেনিফার হস্টেন। তাঁর জয়লাভকে কেন্দ্র করে এখানে খুব হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। এর অন্তর্নিহিত রহস্যটুকু হলো বর্ণবৈষম্য। অবশ্য প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। তাঁদের মতে, রূপের চেয়ে সাম্যই বড়।

এর চেয়েও এবারকার বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার বড় খবর হলো যে, দক্ষিণ আফ্রিকার দুজন প্রতিনিধি এতে এই প্রথম অংশ নিলেন। সব দেশের প্রতিনিধি ছিলেন একজন করে। শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসেন দুজন। এই দুজনের মধ্যে একজন শ্বেতকায়া এবং অপরজন বর্ণশংকর। তবে তাতেও দক্ষিণ আফ্রিকার সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয়নি। এজন্য প্রয়োজন ছিল তিনজনের। প্রতিযোগী দুজনের মিস জিলিয়ান জেসাপ শ্বেতকায়া এবং মিস পার্ল জানসেন বর্ণ-শংকর। যথার্থ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি প্রতিযোগিতায় অনুপস্থিত।

১৯৫১ সালে এই প্রতিযোগিতার শুরু। ...দ্যোক্তা শ্রীমতী জুলিয়া মোরলি এই প্রতি-যোগিতার গোড়ায় বলেছিলেন, সব দেশের প্রতিনিধিত্বকে সমান মর্যাদা দেওয়া হবে। কোনরকম রাজনীতির অনুপ্রবেশ চলবে না। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন।

এই দুজন দক্ষিণ আফ্রিকার সুন্দরী লণ্ডনে এমনভাবে মেলামেশা করেন যেটা ওদের দেশে সম্ভব নয়। দুজন একসঙ্গে ঘুরেছেন, ফিরেছেন। ফটোগ্রাফাররা এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি। তাঁরা ও'দের ফটো তুলেছেন। এবং তা খবরের কাগজে ছাপিয়েছেন। ও'রা যেন বলতে চাইছেন, দেখ, আমরা দুজন একসঙ্গে। এটা কিন্তু ও'দের দেশে সম্ভব নয়। ওদের বর্ণভেদই এজন্য দায়ী। তাই এই ফটো দেশে দেখাতে পারবে না। তা হবে আইন বহির্ভূত।

যদি ঘটনাক্রমে মিস পার্ল জানসেন নয়-জন জুরীর বিচারে বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত হতেন তাহলে বর্ণবৈষম্য নীতি প্রচণ্ড ঘা খেত। সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে শ্বেতকায়া তুলনায় অশ্বেতকায়াদের চেয়ে উন্নত—এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হতো। কিন্তু মিস জানসেন এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হন।

হঠাৎ কর্তৃপক্ষ এহেন একটি প্রতি-যোগিতার আসরে মিস জানসেনকে আসার ছাড়পত্র মঞ্জুর করলেন কেন এ প্রশ্ন অনেকের মনেই ঘোরাফেরা করছে। কেউ কেউ বলছেন, সবাই জেনেশুনে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ তো দূরের কথা তিনি পাত্তাই পাবেন না। তাছাড়া এতে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে প্রচারকার্য চালানোও সুবিধে হবে। ১৯৫১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত এই খেতাব লাভ করেছেন উনিশজন। তন্মধ্যে কৃষ্ণকায়া কেউ নেই। যদিও ১৯৬৬ সালে ভারতের রীতা ফরিয়া এই সম্মান লাভ করেন।

## সবুজ বিপ্লব

জনসংখ্যার স্ফীতি এক বিরাট সমস্যা। সবকিছুর মধ্যেই এই সমস্যাটি মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। খাদ্য, গৃহ, বাসস্থান, কর্ম-সংস্থান—জনসংখ্যা বৃদ্ধির তীব্রতায় সবাই কাহিল। দিনকে দিন অবস্থা এমন দাঁড়াচ্ছে যে, বিনামূল্যে পাওয়া আলো-বাতাসও রেশনের দাখিল। প্রায় রোজই বরাদ্দ হ্রাস পাচ্ছে। শেষে অবস্থা এমন সংগীণ হওয়াও অসম্ভব নয় যে, এরই জন্য নিজেদের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে লাঠালাঠি। এমন দিনের শংকাই এখন প্রবল। জনসংখ্যার এই জলোচ্ছ্বাস যদি কোন উপায়ে স্তিমিত না করা যায় তবে সবাই আমরা একদিন ভেসে যাব।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সব কিছুতেই টান পড়ছে। কোন একটা নির্দিষ্ট কিছুর মধ্যে তা সীমিত থাকছে না। প্রকৃতির দেওয়া আলো-হাওয়ার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই গেল। সে অভাব এখনও এমনকিছু তীব্র হয়নি। তাই এ নিয়ে হানাহানি করার দিন বেশ দূরেই আছে বলে মনে হয়।

আবার সবকিছুই নির্ভর করছে মানুষের শুভবুদ্ধির উপর। সুস্থ জীবনবোধে মানুষ যদি উদ্দীপিত হয় তাহলে এ সমস্যা কোনদিন না দেখা দেওয়ার সম্ভাবনাও বেশ উজ্জ্বল।

সে যা হোক, এখনকার ভাবনাটা কিন্তু তা নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির আশু ফল যা আমরা হাতে হাতে পাচ্ছি তা হলো, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থান সমস্যা। দেশে লোক বাড়ছে। তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই চাই। দুবেলা দু' মুঠো অন্ন বা অন্য যে ধরনের খাদ্য উপযোগী তার সুব্যবস্থা চাই। সেজন্য প্রয়োজন যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ। এই দুটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দেশে শিল্পের সম্প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী। নতুন নতুন শিল্প সংস্থাপনার মধ্য দিয়ে নতুন পরিকল্পনায় যেমন ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে। আবার মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের জন্য চাই সুপ্রতুল বাসস্থানের ব্যবস্থা। ঘরবাড়ি না করলে মানুষ থাকবে কোথায়? গুহাবাসের দিন তো কবে ফুরিয়েছে। সেদিন মানুষ কম ছিল। খুব একটা সমস্যা ছিল না। এখন মানুষের সংখ্যা যেমন বেড়েছে সংস্কার-সংস্কৃতিতেও তারা অনেক বলীয়ান। এখন তাই উন্নত গৃহব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই দুটোর মাধ্যমেই জমির উপর হাত পড়ছে। চাষের জমির বরাদ্দ প্রতিবারই হ্রাস পাচ্ছে। আর এছাড়া বাসস্থান এবং কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান তো সম্ভব নয়। জনসংখ্যা যত বাড়ছে এই সমস্যা ততই তীব্র হচ্ছে। প্রতিবারই জমির আয়তন হ্রাস পাচ্ছে। যদি এই অবস্থা অব্যাহত থাকে তাহলে একদিন যে অচিন্ত্যনীয় অবস্থার উদ্ভব হবে তা কল্পনাও করা যায় না। সেদিন সমস্ত সভ্যতা, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের নাভিশ্বাস উঠবে। পণ্ডিতদের অনুমান, মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাবে। এরকম বীভৎস অবস্থার কল্পনায় হৃদয়-মন ভীষণভাবে আহত হয়। তাই অনাগত দিনের এই প্রসঙ্গকে যথাসম্ভব হ্রস্ব করাই ভাল। কিন্তু উপায় তো নেই। খুবই দুঃসময়ের কাছাকাছি আমরা। অচিরেই হয়তো মুখোমুখি সংঘাত ঘটে যেতে পারে।

আজ তাই অগ্রিম এই সমস্যা মোকাবেলা করার একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। চাষের জমিতে টান পড়ছে। অথচ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মুখে দুবেলা দুটো গুঁজে দেবার ব্যবস্থা চাই। এর একমাত্র ব্যবস্থা স্বল্প জমিতে অধিক উৎপাদন। রাশিয়ার সুবিখ্যাত ফসল-অঞ্চল ইউক্রেন-এর আয়তন আগের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। কৃষকদের বাসস্থান আর স্কুল-হাসপাতাল এবং সামাজিক জীবনের অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে গিয়ে প্রচুর জমি খেয়ে গেছে। কিন্তু উৎপাদন সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখী। ঘাটতি হলেই দুর্ভিক্ষ। শুধু রাশিয়া নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আজ এই একই অবস্থা। স্বল্প জমিতে বেশি ফলন সকলের লক্ষ্য। না হলে চলতি দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলা যাবে না।

আমাদের দেশে জনসংখ্যার ভার সম্পর্কে নতুন পরিসংখ্যান যোগ করা নেহাতই ধৃষ্টতা। একথা সত্যি যে, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকে বেশি নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ অন্যান্য সবকিছুর মতোই। বিশেষ, চাষের জমিতে যখন টান পড়ছে। দেশের খাদ্য সমস্যা দূর করার জন্য সবুজের অভিযানই আমাদের পক্ষে একমাত্র পথ।

দেশে যে হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে সে তুলনায় শস্যের উৎপাদন খুব একটা পর্যাপ্ত নয়। এদিকে চাষের জমির আয়তনও ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছে। তাই এই সীমিত জমিকে অবলম্বন করেই ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর মুখে অন্ন জোগাতে হবে। সীমিত জমি থেকে সর্বাধিক ফলন পেতে হলে উন্নত জাতের বীজ, সার ও সেচের যেমন দরকার তেমনি সারা বছরই বিভিন্ন ফসলের চাষ করে জমি ও সময়ের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা দরকার। সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করতে হলে জমিকে কোন সময়ই অকেজো ফেলে রাখা চলবে না। কারণ, পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, একই জমি খণ্ড থেকে পর পর তিন চারটি ফসল তুললে সময়ের অপচয় বন্ধ হয়ে ফলনের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে ওঠে। একই জমিতে বহু ফসল চাষ পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হলো, দিনপ্রতি শস্যের উৎপাদন সর্বাধিক বাড়িয়ে সম্বৎসরের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রায় ৩৭-৫০ মিলিয়ন একর জমিতে বহু ফসল চাষের একটি কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে। উন্নত প্রথায় চাষ করে পর্যাপ্ত ফলন পেতে আমাদের চাষীরাও আজ যথেষ্ট উৎসাহী। একই জমিতে একাধিক ফলন বা পালাক্রমে ফসল চাষ অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। চাষীরা তাই একই জমি থেকে তিন বা চারটি ফসল তোলা শুরু করেছে। ভারতের দক্ষিণে এই কার্যসূচী দ্রুত এগিয়ে চলেছে। উত্তর ভারতও খুব একটা পিছিয়ে নেই। একই জমিতে বহু ফসল চাষের ফলে হেকটার প্রতি এখন আগের থেকে চার হাজার টাকা বেশি লাভ হচ্ছে।

শস্যের এই নিবিড় চাষ কৃষিক্ষেত্রে নতুন নয়। জাপান সহ এশিয়ার কয়েকটি দেশে এই প্রথায় চাষবাস বহুদিন থেকেই প্রচলিত। বহু ফসল চাষের কার্যসূচীতে প্রতি একরে মোট উৎপাদনের বদলে দৈনিক কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হচ্ছে তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ, যত অল্প সময়ে ফলনের পরিমাণ বেশি হবে, কৃষকেরা তত বেশি লাভবান হবেন।

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষ করে একই জমি থেকে মুগ, ভুট্টা, আলু, গম প্রভৃতি চারটি ফসল তুলেছেন। ১৯৬৯-৭০ সালে ৩০৪ দিনে মোট জমি থেকে প্রায় ১৫-২ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। হিসেবে দেখা গেছে যে, এভাবে ফসল হওয়াতে প্রতি হেকটারে দৈনিক ফলনের পরিমাণ হয়েছে প্রায় ৪২-৪ কিলোগ্রাম। ১৯৪০ সালে এক বছর অন্তর গম চাষ এবং ১৯৫০ সালে পর্যায়ক্রমে ভুট্টা ও গম চাষ কার্যসূচীর সঙ্গে তুলনামূলক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, নতুন পদ্ধতিতে একই জমিতে বহু ফসল চাষ করে লাভের মাত্রা যথাক্রমে ৫ গুণ এবং ৩ গুণ বেশি হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে অপর্যাপ্ত সূর্যকিরণে চাষের উপযোগী উচ্চ ফলনশীল বেঁটে জাতের ধান, গম, ভুট্টা, বাজরা, ডাল এবং আলুর উদ্ভাবন করে বহু ফসল চাষের কার্যসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সহজ করে দিয়েছেন। এর ফলে, সব ঋতুতেই এখন চাহিদামতো ফসল চাষ করা যায়। নিবিড় চাষের কার্যসূচীতে বহু ফসল চাষ এবং পালাক্রমে চাষ দুইই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পালাক্রমে চাষে মুগ বৈশাখী বর্ষার বদলে গ্রীষ্মে চাষ করেও প্রতি হেকটারে ১০ কুইন্টাল ফলন পাওয়া গেছে, সে তুলনায় বর্ষায় চাষ ক'রে ফলন হয়েছে মাত্র ২-৫ কুইন্টাল। আবার রবিখন্দে শঙ্কর ভুট্টা চাষ করায় হেকটর প্রতি ফলন হয়েছে প্রায় ৭৩ কুইন্টাল। ভুট্টার পর সরবতী সোনারা গম (ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল) চাষ করলে প্রতি হেকটারে প্রায় ৮৬-৫ কুইন্টাল ফলন তোলা সম্ভব। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার মতে, পালাক্রম চাষে জমি চাষের জন্য খরচ লাগে না বললেই চলে। এখানে একটি প্রদর্শন ক্ষেত্রে ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৭ সালে পালাক্রমে তিনটি ফসল মুগ-ভুট্টা-গম বুনেও জমি কর্ষণের জন্য কোন খরচ হয়নি।

বিভিন্ন অঞ্চলে পালাক্রম চাষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফসল উপযুক্ত। এই চাষের জন্য এমন শস্য বেছে নিতে হবে যারা একই প্রকৃতির রোগ ও পোকা দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না। তাছাড়া প্রথম শস্যটির মূল যদি গভীর হয় তবে দ্বিতীয় শস্যটির মূল অগভীর হওয়া দরকার। এর ফলে মাটির প্রত্যেকটি স্তরেরই উর্বরতার সদ্ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার মাটির উর্বরা শক্তি বাড়াতে বছরে অন্তত একটি উদ্ভিদ জাতীয় ফসল চাষ করা উচিত।

দেশের সেচ ব্যবস্থার আরো উন্নতি হলে বহু ফসল চাষের কার্যসূচী খুবই লাভজনক হবে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার পরিচালকের মতে, খরা প্রতিরোধী জলদি জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজই 'বহু ফসল' চাষের পক্ষে ভাল। তিনি বলেন, মুগ, বাজরা, চীনাবাদাম, রেড়ি, বেঁটে জাতের গম, ভুট্টা প্রভৃতি নিবিড় চাষের অন্তর্গত বহু ফসল চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাও রোধ হবে এই অধিক ফলনের সুপ্রয়োগে। —প্রবালী

[কাশ্মীরের সিংহাসনে তখন চক বংশীয় ইউসুফ শাহ অধিষ্ঠিত। এঁর হাত থেকেই মোগল সম্রাট আকবর কাশ্মীর কেড়ে নেন। ইউসুফ শাহ রাজা হলেও রাজকার্যে মনোনিবেশ করতেন না। তিনি আসলে ছিলেন কলা-বিলাসী। শিল্প-সংগীতের চর্চায় নিজেকে নিবিষ্ট রাখতেন।]

শরৎকালের একটি বিকেলে আকাশে তখন মদির প্রশান্তি। পামপুরের মাঠে অজস্র জাফরান ফুল। সোনালী-লালছে রঙ। পাইনবনের কাছের পাহাড়গুলোতে বর্ণ-বৈচিত্র্য। ইউসুফ শাহ ঘোড়ায় চড়ে জাফরান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে, ঢালু পথ ধরে নামছিলেন—। সামনেই দেবদারু আর পাইন গাছের বন।

একপাল ভেড়া বনের ধারে, কচি-কলা-পাতা রঙের ঘাসের আস্তরণে মুখ দিয়ে চরে বেড়াচ্ছিল। দূরে কয়েকটা চেনার গাছ এখানে-ওখানে একাকভাবে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ঘোড়ার রাশ টেনে সেই নির্জন প্রান্তরে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। কেউ কোথাও গান গাইছে। পাখির গানও হ'তে পারে; কিংবা ছোট-ছোট নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়া ঝর্ণাধারার জলতরঙ্গও হতে পারে। কিন্তু—এ-গান মানুষেরই। দূরের চেনার গাছের আড়াল থেকে ভেসে আসছে। গানের প্রতিটি শব্দ এখন তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন।

ইউসুফ শাহ্ বিমুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। এমন অপূর্ব কণ্ঠস্বর তিনি এর আগে কোনদিন শোনেননি। তাঁরই কাশ্মীরে এমন সংগীতের মূর্ছনা আছে—যার সামান্যতম স্পর্শে সারা পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যেতে পারে, এ ধারণা তাঁর ছিল না। পামপুরের সন্নিকটে জুন নামে কোন এক অপূর্ব লাবণ্যবতী তরুণী ভালো গান গায়, একথা কে যেন একবার তাঁকে বলেছিল,—কিন্তু সে কথার উপর তেমন গুরুত্ব দেন নি তখন। সেই জুনের গান কিনা কে জানে! গানের সুরে বিরহের তীক্ষ্ম যন্ত্রণা ফেটে পড়ছে যেন।

ইউসুফ শাহ্-র অন্তঃস্তলে সেই বেদনা সঞ্চারিত হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। এক অলৌকিক আনন্দে তিনি বিভোর হয়ে গেলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন গ্রামের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দীর্ঘ পাইনবনের ভেতর দিয়ে ছোট্ট একটি টলটলে হ্রদের পাশ দিয়ে কয়েকটি কুঁড়ে ঘরের কাছে পৌঁছে গেলেন। যার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হল, তার নাম আবদুল্লা। রাজাকে কোনদিন সে দেখেনি। কিন্তু ইনি যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি, তা' সে চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিল। ইউসুফ ওকে দেখে ঘোড়া থেকে নামলেন। আবদুল্লা বিনীতভাবে সেলাম জানিয়ে বললো, মেহের-বান কি শহর থেকে আসছেন? ইউসুফ বললেন—ঠিক ধরেছ। এদিকে বেড়াতে এসেছি। তোমাদের গ্রামটি সত্যি ভারী সুন্দর।

আবদুল্লার ভালো লেগে গেল ইউসুফের কথাবার্তা। উনি আজ গাঁয়ের মেহমান। কিন্তু কোথায় বসাবো ওঁকে আমার কুঁড়ে ঘরে!—আবদুল্লা ভাবছিল। নিজের শ্রীহীন মলিন পোষাকে দারিদ্র্যের স্পষ্টছাপ—ইউসুফের কুর্তা ঝলমল করছে। বেশ কুণ্ঠিত হয়ে পড়লো আবদুল্লা। একজন খানদানী ব্যক্তির সামনে।

ইউসুফ বললেন—তোমার নাম কি?

আবদুল্লা বললো—আবদুল্লা হুজুর। লোকে আবদি বলে ডাকে।

ইউসুফ বললেন—তোমাদের গ্রামে কেউ গান গায়—পাখির মত মিষ্টি গলায়—! আসবার সময় মনে হল, চেনার গাছের আড়ালে বসে কেউ যেন গান গাইছে। এমন ভালো গান এর আগে কোনদিন শুনিনি।...

আবদুল্লার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো : আমার মেয়ের গান শুনেছেন আপনি। ওর নাম জুন। খুব ভালো গাইতে পারে। ওই দিকে ভেড়া চরাতে গেছে। ও ছাড়া আর কেউ গান গায় না এখানে।

ইউসুফ ঘোড়া থেকে তত্‌ক্ষণে নেমে পড়েছেন। আবদুল্লার কথা শুনে বললেন—ওয়াহ্‌, ওয়াহ্‌—এমন মেয়ের বাপ তুমি। খুব ভাগ্যবান তুমি।

আবদুল্লার পিতৃহৃদয় উল্লসিত হয়ে উঠলো। কিন্তু সংগে সংগেই মলিন হয়ে গেল তার মুখ। গভীর দীর্ঘনিশ্বাসকে সে আর চেপে রাখতে পারলো না। বললো,—সবই আল্লার মর্জি হুজুর। মেয়ে আমার সুখী নয়। ওর সাদী দিয়েছিলাম, কিন্তু সবই তক্‌দির। মেয়ে সেখানে থাকতে পারলো না।

ইউসুফ বললেন কেন?

আবদুল্লা বললো,—মেয়ে গান গাইতো, দামাদ গান ভালোবাসতো না। দিনরাত গাধার মত খাটিয়ে মারতো। বন থেকে কাঠ কেটে আনতে হতো জুনকেই; রান্নাবান্না জল-আনার কথা তো ছেড়েই দিলাম হুজুর, মেয়েকে ক্ষেতে গিয়ে ঢেলা ভাঙতে বলতো। খেতেও দিতো না ভালো ক'রে। একদিন এসে জুন আমার ভেঙে পড়লো হুজুর আমার বুকে। বললো,—বাপজান, জহর এনে দাও; খেয়ে মরি। এমন জানোয়ারের মত জিন্দগী আমি চাই না বাপজান!...সেইদিন থেকে আমাদের কাছেই আছে হুজুর। তিন বছর হল। সতেরো বছর বয়সে ওর সাদী দিয়েছিলাম—

আবদুল্লার চোখদুটো ছলছল করে উঠলো।

আকাশে তখন সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি! চারদিকে অপরূপ লাবণ্য। ইউসুফের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ শরীরে রক্ত-সন্ধ্যার আভাস। ইউসুফ একটু আনমনা হয়েছিলেন।

হঠাৎ একপাল ভেড়ার কর্কশ ডাকে তাঁর ধ্যান ভাঙলো। কোন এক রঙীন জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে নেমে এলেন তিনি।

আবদুল্লা বললো : এই যে আমার মেয়ে হুজুর।

জুন বেশ সপ্রতিভ হয়েই এগিয়ে এসে ইউসুফের দিকে তাকালো। ইউসুফ বিস্মিত।

জুন হঠাৎ আরক্ত হল; তারপর চোখ নামিয়ে নিল।

আবদুল্লা বললো, বেটি—ইনি শহর থেকে এসেছেন। তোমার গান শুনতে পেয়েছেন। তাই—

ইউসুফ বললেন—খু-উ-ব ভালো লেগেছে।

জুনের মনে হল,—এমন কথা সে এর আগে কোনদিন শোনেনি।

জুন বললো,—বাপজান আমি যাই, দুম্বাগুলো চলে যাচ্ছে।

জুন চলে গেল।

ইউসুফ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন। রূপের লাবণ্যে কাশ্মীর-কন্যাদের তুলনা হয় না; কিন্তু জুনের লাবণ্যকে কারুর সংগেই তুলনা করা যায় না। জুনের আঙরাখায়, ঘাঘরায়, দারিদ্র্য, কিন্তু তার দেহের মহিমায় দারিদ্র্য পরাহত হয়েছে।

ইউসুফের সংগে আবদুল্লার কি কথা-বার্তা হল, কেউ জানে না।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে পাইনবন-বিহারিণী জুন পামপুরের জাফরান ক্ষেত পেরিয়ে শ্রীনগরে রাজ-প্রাসাদে এসে ইউসুফ শা' চকের প্রিয়তমা পত্নীতে রূপান্তরিতা হল। তার নাম হল হাব্বা খাতুন।

হাব্বা খাতুন, হাব্বা খাতুন। এই নামই খ্যাতি লাভ করলো সর্বত্র। জুনের নাম ভুলে গেল সবাই।

এবারে গানে গানে ঝংকৃত হয়ে উঠলো ঝিলম নদী; শ্রীনগরের প্রাসাদ। সারা কাশ্মীরে হাব্বা খাতুন হলেন শিল্প-সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গানের পর গান রচনা করতে লাগলেন হাব্বা খাতুন, সুরের পর সুর সৃষ্টি করলেন হাব্বা খাতুন। রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়ে সেই গান ভূস্বর্গ কাশ্মীরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ঝিলম নদীর উপর রাজকীয় শিকারায়—গভীর রাতে হাব্বা খাতুনের গান নদীর জলে ঢেউ তুলেছে। পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনায় নদীর জল ফুলে ফুলে উঠেছে।—ইউসুফ শা' ওকে অবাধ অধিকার দিয়েছেন—স্বাধীনতা দিয়েছেন। বিশ্বাসে, প্রেমে হাব্বা খাতুনকে তিনি অসামান্যা করেছেন। হাব্বা খাতুনের সারস্বত প্রতিভা এবং অলৌকিক লাবণ্য এতদিনে তার যোগ্য আবাস লাভ করেছে। হাব্বা খাতুন চরিতার্থ হয়েছেন। রাণী হয়েছেন বলে নয়, ইউসুফের মত গুণবান রূপবান সংগীতানুরাগীর পত্নী হয়েছেন বলে। এ সৌভাগ্য তাঁর কল্পনাতীত ছিল। কেবলমাত্র রূপ-কথার জগতেই এ-ধরনের ব্যাপার ঘটে। ঘুঁটেকুড়োনী হয় রাজমহিষী। হাব্বা খাতুনের বুদ্ধিদীপ্তি ও হৃদয়বত্তার নানা কাহিনীও ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়লো কাশ্মীরে।

কলাবিলাসী ইউসুফ এমনিতেই রাজকার্যে মনোযোগী ছিলেন না; হাব্বা খাতুনকে পেয়ে তিনি ভুলেই গেলেন যে তিনি রাজা ইউসুফ শাহ্‌ চক। তাঁর মনের মধ্যে একটি মাত্র ধারণা ভ্রমরগুঞ্জনের মত গুন-গুন ক'রে উঠতে লাগলো—যে তিনি হাব্বা খাতুনের প্রেমের দেবতা। হাব্বা খাতুনের সংগে সারা কাশ্মীরের স্বর্গভূমিতে তিনি লাবণ্যবিহারে ডুবে গেলেন। গুলমার্গের আর শোনমার্গের প্রাকৃতিক পরিবেশে আছাবলের আর আহরাবলের পাহাড়ে কন্দরে হাব্বা খাতুন গান গাইতে লাগলেন। তাঁর গানের সুরে পাখির কাকলী নদীর কল্লোল, ঝর্ণার জলতরঙ্গ, বাতাসের গতি আর পর্বতের গাম্ভীর্য সৃষ্টি হল সারা কাশ্মীরের পার্বতীনিকেতনে ইউসুফ আলি হাব্বা খাতুনকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন।

একদিন শ্রীনগরের রাজ-অন্তঃপুরের ঝরোখা দিয়ে ঝিলমের বাঁকা স্রোত দেখতে দেখতে নোতুন একটি সুরের সৃষ্টি করে-ছিলেন হাব্বা খাতুন; নির্জন কক্ষে। হঠাৎ মৃদু পদশব্দে তিনি উচ্চকিত হলেন। সম্ভবতঃ ইউসুফ! চোখ ফিরিয়ে দেখেন—তাঁর প্রিয় বাঁদি সায়রা। এ ক'দিন ভালো ক'রে লক্ষ্য করেননি। দেখে মনে হল, সায়রার চোখের কোণে কালি জমেছে। মুখে গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ। সায়রাও সুন্দরী, কিন্তু এখন যেন স্তিমিত প্রদীপের মত মনে হচ্ছে। সায়রাকে খুব ভালোবাসেন হাব্বা খাতুন। মাত্র কয়েক মাস হল রাজ-অন্তঃপুরের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। এর মধ্যেই সেবায়, শ্রমে, আচারে-আচরণে নিপুণতা দেখিয়ে হাব্বা খাতুনের অন্তরঙ্গ বাঁদিই হতে পেরেছে। সায়রার স্বামী থাকে শহরের এক প্রান্তে। স্বামীর কাছে কয়েক-দিন যেতে পারেনি বলেই হয়তো—

হাব্বা খাতুন মনে মনে দুষ্টুমি করার লোভ সামলাতে পারলেন না। ঈষৎ হেসে ওর দিকে তাকালেন। সায়রা হঠাৎ হাব্বা খাতুনের পায়ের কাছে মাথা লুটিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। করুণায়, স্নেহে বিগলিত হলেন হাব্বা খাতুন। সায়রার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—কি হয়েছে, সায়রা? বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে?

সায়রা ধীরে ধীরে মাথা তুলে হাব্বা খাতুনের দিকে তাকালো। দেখলো তার সামনে দোষভোগ্যা লাবণ্য। মনে মনে বললো—অসম্ভব, অসম্ভব। এ সৌন্দর্যকে দূর থেকে দেখতে হয়। কোন উন্মাদের জন্য এ সৌন্দর্যের আবির্ভাব হয়নি।—

হাব্বা খাতুন বললেন—কি দেখছিস, এমন করে? আমাকে আগে দেখিসনি?

সয়ারা বললো : আমাকে প্রাণদণ্ড দিন বেগমসাহেবা। আমাকে ডালকুত্তা দিয়ে—বলেই আবার তাঁর পায়ের কাছে মাথা লুটিয়ে দিল সে।

হাব্বা খাতুন বিস্মিত হয়ে বললেন : কারণটা বলবি তো?

সায়রার অবস্থা তখন উন্মাদের মত। বলো,—সবই বলবো হুজুরাইন। বলার ন্য তৈরী হয়েই এসেছি। শোনার পরই পনি আমাকে টুকরো টুকরো করে ট্টে ফেলতে আদেশ দেবেন, তা-ও জানি। ধু একটি মাত্র প্রার্থনা আমার দোহাই— কোন ক্ষতি করবেন না বেগম সাহেবা; কোন দোষ নেই। আমি ওকে ভালো-সি। আমি—

আর কোন রহস্যের মধ্যে থাকতে লেন না হাম্বা খাতুন। দৃঢ় কণ্ঠে লেন,—এবারে বলে ফেল।

সায়রা কোনরূপে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ লো। মাত্র চারটি পাঁচটি শব্দের একটি । বলার পর, সায়রা দারুণ আতঙ্কে লো—এক নিমেষের মধ্যে হাম্বা খাতুনের এক রূপ। রুদ্রাণী হাম্বা খাতুনকে আগে কোনদিন সে দেখেনি।

হাম্বা খাতুনের মনে হল তাঁর সারা আগুনের শিখা। সে আগুনে শুধু া নয়, সারা কাশ্মীর পুড়ে ছাই হয়ে । ঘৃণায় ক্রোধে হাম্বা খাতুন তে'র মধ্যে দানবী হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখে বাঘিনীর হিংস্রতা। তাঁর র আঙুলগুলো নাগিনীর ফণার মত ার গলার দিকে এগিয়ে যেতে লা। আর এক মুহূর্তের মধ্যেই ার নিষ্প্রাণ শরীর লুটিয়ে পড়বে তাঁর র তলায়। হাম্বা খাতুন চীৎকার করে যেন বলতে গেলেন। কিন্তু এই ায় তাঁকে বেশীক্ষণ থাকতে হয়নি। তঃ সায়রার চোখের দিকে তাঁর চোখের দৃষ্টি পড়ে থাকবে। সায়রার র মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন কিক ভালোবাসার দীপালোক। হাম্বা র মনে হ'ল—সায়রার অস্বাভাবিক তাকে দুঃসাহসী করে তুলেছে।

াম্বা খাতুন চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ন কিছুক্ষণ। সেই অবস্থায় তাঁর লে,—দুনিয়াতে প্রেমের চেয়ে বড় আর নেই। সায়রার ভালোবাসাকে ক্রোধের ন জ্বালিয়ে দেবার বাসনা থেকে তিনি হলেন।

ায়রা সম্পূর্ণ নির্বাক। শুধু তাই মন করে তার আতঙ্কও তখন হত। মৃত্যুকে সহজভাবে বরণ করার ন তখন প্রস্তুত।

ম্বা খাতুন ভাবতে পারলেন— ক কত গভীরভাবে ভালোবাসলে, ুঃসাহসী হওয়া যায়। নৈলে এমন ী কথা সে কিছুতেই উচ্চারণ পারতো না।

য়রা কিছু বে-অকুফ রমণী নয়, সে ী। একথা তার অজানা থাকার যে হাম্বা খাতুনের শরীর স্পর্শ অধিকার দেবতাদেরও নেই; একমাত্র ই তার দেহের অধীশ্বর। সায়রা জানে, তার স্বামী উন্মাদের মত র চাঁদ চাইছে। উন্মাদ না হ'লে াতুনকে একটি রাতের জন্য শয্যা-সঙ্গিনী করার বাসনা তা'র হয় কি করে? আর বাসনা হলেও সেই বাসনাকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে পারে একমাত্র বাতুলই। সায়রা সেই বাতুলকেই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

হাম্বা খাতুন তাঁর আশ্চর্য কুহকে নিজেকে পূর্বলাবণ্যে ফিরিয়ে নিলেন। তারপর হাসলেন। সায়রা এবারে বিস্মিত হল। তার মনে হল, বেগমসাহেবা তাকে ক্ষমা করেছেন; সম্ভবত তার স্বামীকে ক্ষমা করবেন।

হাম্বা খাতুন বললেন, সায়রা, তোর ভয় নেই। তবে এমন কথা আর কোনদিন বলিস না।

সায়রা কাঁদছিল। মাথা নেড়ে জানালো এমন কথা আর কোনদিন সে বলবে না।

হাম্বা খাতুন ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন,—তুই কি ওকে এতই— ভালোবাসিস যে, অন্য কোন রমণীকে শয্যা-সঙ্গিনী করতে চাইলেও বাধা দিবি না?

সায়রা ধীরে ধীরে বললো,—অনেক চেষ্টা করেছি বেগম সাহেবা। কিন্তু কি যে হল ওর। আপনার কথা ভাবতে ভাবতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, এক অসহ্য বেদনায় প্রতিদিন পুড়তে পুড়তে আমার স্বামী এখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওকে আমি আর বাঁচাতে পারবো না বেগমসাহেবা। ও মরে গেলে আমিও একদণ্ড বাঁচবো না। আমি তাই—। আর কিছু বলতে পারলো না সায়রা। চোখের জলে সে বুক ভেজাতে লাগলো।

হাম্বা খাতুন একবার ঘরের মধ্যে লঘু-পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর ঝরোখায় গিয়ে ঝিলমের স্রোত দেখতে দেখতে গুন-গুন করে গান গাইতে লাগলেন—প্রেম তুমি আসমানের তারার চেয়েও উঁচুতে,—তোমায় ছুঁতে পারি এমন সাধ্য নেই।

হঠাৎ এসে বললেন—সায়রা তোকে আমি ভালোবাসি। তাই এমন অশ্রাব্য কথা শুনেও তোকে ক্ষমা করলুম। তোর প্রেমের হিসেব করার সাধ্য আমার নেই। তুই এখন যা।

দিন কয়েক পরে সায়রাকে দেখতে পেলেন তিনি। এ ক'দিন সায়রা ও'র কাছে আসেনি: দেখলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই বিশীর্ণা পাহাড়ী নদীর মত সে ঝিমিয়ে পড়েছে। তার গালের হাড় দু'টো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখের লাবণ্য নিঃশেষে ঝরে গেছে।

বললেন—এস, সায়রা,—শোন!

সায়রা কাছে আসতেই বললেন,—তোর খসম কেমন আছে!

সায়রা বললো—ও আর বাঁচবে না বেগমসাহেবা।

হাম্বা খাতুন বেশ রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে দিলেন। বললেন, তা' হলে তুইও তো বাঁচবি না!

সায়রা বললো—সবই খোদার ইচ্ছে বেগমসাহেবা। নৈলে ওকে আমি কেন বোঝাতে পারিনি যে আকাশের চাঁদ চাইলে পাওয়া যায় না!—ওর জন্য মরতে আমার কোন কষ্ট হবে না বেগমসাহেবা।

হাম্বা খাতুন ঈষৎ হাসলেন। বললেন, —তাহ'লে তো তোকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হয় আমাকে। তুই আমার পেয়ারের বাঁদি, তুই মরে গেলে আমার উপায় কি হবে!

সায়রা বললো—খোদা মেহেরবান। তিনি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবেন বেগম-সাহেবা।

হাম্বা খাতুন বললেন—শোন সায়রা। এদিকে আয়। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে রহস্যময় ভাবে বললেন—ওকে নিয়ে আসিস আমার কাছে, কেমন?

সায়রার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। হতচকিত হয়ে বললো,—মা—মা—বেগম-সাহেবা—। না—না,

হাম্বা খাতুন বললেন, কোন ভয় নেই। বলেই বিশ্বজয়ী হাসির লাবণ্যে সায়রাকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন। বললেন—তা' বলে রাতের বেলায় নয়, দিনের বেলাতেই— কেমন?

সায়রা তখন তার বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। 'এ-ও কি সম্ভব! বেগমসাহেবা তার উন্মাদ স্বামীকে নিয়ে আসতে বললেন —না-কি আমিই পাগল হয়েছি!'

এরপর এক নির্জন কক্ষে হাম্বা খাতুনের কাছে সায়রার স্বামীকে দেখা গেল। হাম্বা খাতুনের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে একটিবার তাকাবার চেষ্টা করেই চোখ নামিয়ে নিল। হাম্বা খাতুন দেখলেন লোকটি কাঁপছে। লোকটি আগে সুপুরুষ ছিল, কিন্তু এখন তার শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছে। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকলে যেমনটি হয়।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে হাম্বা খাতুন বললেন, তোমার সব কথা আমি শুনেছি।

লোকটি আর একবার তাকালো হাম্বা খাতুনের দিকে। সে দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা, প্রেম, বিস্ময়, একাকার। হাম্বা খাতুন বুঝতে পারলেন, লোকটি উন্মাদ নয়। হাম্বা খাতুনের রূপে গুণে, মুগ্ধ এবং বিমূঢ় এই যুবক। ভালোবাসাকে দেহের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারেনি বলেই এই নিদারুণ যন্ত্রণায় সে আত্মহত্যা করছে।

হাম্বা খাতুনের করুণা হল। লোকটিকে বাঁচাবার ইচ্ছে হল তাঁর; সায়রাকে-ও তো বাঁচাতে হবে। লোকটি কিন্তু কোন কথাই বললো না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে চাইলো না। সে শুনলো হাম্বা খাতুন বলছেন, : তুমি আজ রাতে আমার শয়ন-কক্ষে এসো।

লোকটির গলা দিয়ে অস্ফুট একটি শব্দ নির্গত হল।

হাব্বা খাতুন বললেন—তবে সর্ত থাকলো। একথা তুমি কোনদিন কাউকে বলবে না,—ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকবে; আর—তোমার সঙ্গে আমার কোনরূপ বাক্যালাপ হবে না।

লোকটি আনন্দে চীৎকার করতে চাইলো। তার বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেল যেন! একি স্বপ্ন, না মায়া; নাকি তার মনের গুমরানো কথা-ই তার কানের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে! লোকটি থরথর করে কাঁপতে লাগলো। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখলো—তার সম্মুখে সায়রা।

সায়রার মুখের দীপ্তি তখন তার নজরে পড়বার কথা নয়।

সায়রা ওর হাত ধরে রাজপ্রাসাদের বাইরে নিয়ে গেল।

সেই প্রস্তাবিত রূপকথার অপরূপ রাত্রি কখন আসবে! লোকটি গোটা দিন ঝিলম নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তার সেই অসুস্থতার ভাব কেটে গেছে; তার চোখে নোতুন আলোকরশ্মি।

গভীর রাতে, সায়রা ওকে রাজপুরীতে নিয়ে গেল, গোপন পথে। তারপর অন্ধকার পথ দিয়ে ওকে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। সায়রা ফিসফিস করে বললো—এই ঘরটি হাব্বা খাতুনের শয়নকক্ষ। এখানেই তুমি যাবে। তার আগে, এস তোমাকে সাজিয়ে দিই।

লোকটি নির্বাক আনন্দে মগ্ন। সায়রা তার নিজের ঘরে ওকে নিয়ে গেল। স্বামীকে মূল্যবান মহার্ঘ্য বসনে শোভিত করলো। সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিল অগুরু। চোখের কোণে এঁকে দিল সুর্মা। পা ধুইয়ে, পরিয়ে দিল জরিমণ্ডিত পাদুকা। তারপর মুগ্ধ হয়ে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। তারপর ওকে নিয়ে গেল সেই রূপকথার রাজকন্যার শয়নকক্ষে।

স্তিমিত প্রদীপের আলোকে লোকটি বিস্মিত হয়ে দেখলো—এক অলৌকিক ইন্দ্রপুরীর মধ্যে সে পৌঁচেছে। সুসজ্জিত কক্ষ বিরাট পালঙ্ক: মখমলের শয্যা, কাশ্মিরী পশমের গালিচা: কস্তুরীর সুবাস—

লোকটি সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সায়রা অন্তরে সুন্দর করে হাসলো। স্বামীর কপালে চুমু খেলো। তারপর ফিসফিস করে বললো—এই ঘরেই তিনি আসবেন। আমি, আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে যাচ্ছি। এই মখমলের পালঙ্কে তুমি অপেক্ষা করো। এখানে আসবার আর একটি গোপন দরজা আছে; তা কোথায় আমিও জানি না। সেই পথেই উনি আসবেন। গভীর রাতে। কিন্তু সাবধান সমস্ত শর্ত যেন মনে থাকে; নৈলে তোমার আমার দুজনেরই মৃত্যু ঘটবে। —আলো নিবিয়ে সায়রা চলে গেল। দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল তার স্বামী।

পৃথিবীর যত অন্ধকার কি এই ঘরের মধ্যে বাসা বাঁধলো। লোকটি ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলো, কিছুই দেখা গেল না। তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। ঘন ঘন উচ্ছ্বাসের মধ্যে ওর দেহের তাপমাত্রা বাড়তে লাগলো। কস্তুরীর সুবাসে তার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগলো। মনে হল, তার সর্বাঙ্গে মাদকতার নেশা। শুনতে পেল,—কোথাও টুংটাং করে জলতরঙ্গ বাজছে। কোত্থেকে গানের মৃদু রেশ ভেসে আসছে! কোথাও যেন পাখি ডাকছে সুরতরঙ্গে—মৃদু অথচ স্পষ্ট সেই সংগীত। লোকটি পালঙ্কের উপর বসেছিল। তার চেতনা বিলুপ্ত হতে যাচ্ছিল—, হয়তো বা এইখানেই তার হৃৎস্পন্দন চিরকালের মত থেমে যাবে!

কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে! কতক্ষণ ধরে সে অপেক্ষা করে আছে! অনন্তকাল ধরেই আছে। অনন্তকাল ধরেই থাকবে হবে!

লোকটি তার চোখ দুটোকে দীপ-শিখার মত উজ্জ্বল করে অন্ধকার ভেদ করে দেখতে চাইলো। গৃহশয্যার অস্পষ্ট চেহারা কিছুটা অনুমান করতে পারলো, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

এমনিভাবে কতক্ষণ কেটেছে, সে জানে না। ঘুমিয়ে পড়েছিল কি না, তাও সে জানে না। কিন্তু তার মনে হল রাত গভীর হয়েছে। পৃথিবীতে কেউ কোথাও জেগে নেই। হঠাৎ মৃদু পদক্ষেপের শব্দে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো হরিণের মত। ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে সে দেখবার চেষ্টা করলো; তার সমস্ত ইন্দ্রিয় একসঙ্গে সজাগ হয়ে উঠলো। স্পষ্ট দেখতে না পেলেও তার অনুমানের মধ্যে ধরা পড়লো,—সেই অরূপলাবণ্যবতী অপ্সরা হীরামুক্তাখচিত বেশবাসে সজ্জিত হয়ে, সেই পালঙ্কের দিকে এগিয়ে আসছেন। তার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হল সে আবার মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারপর এক সময় বুঝতে পারলো, সে স্বপ্ন দেখছে না। সেই রাজকীয় পালঙ্কের মনোহর শয্যায় সে একা নয়। আরও একজন রমণী হাব্বা খাতুন। তার সমস্ত যৌবনের অস্পৃ কামনার দেবী। কামনা পূর্ণ করার জন্য সে আর কালবিলম্ব করলো না; তারপর সেই মখমলের শয্যায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

রাত তখনো বাকী। ঘুম ভাঙার পর লোকটি দেখলো বিছানাতে সে একা। তার মনের মধ্যে কিন্তু স্বর্গীয় আনন্দ। লোকটি আর অপরিপূর্ণ নয়।

ভোর হবার অনেক আগেই খোলা দরজা দিয়ে, পূর্বনির্দিষ্ট পথে লোকটি রাজপুরী ত্যাগ করে গেল। সবাই তখনো ঘুমিয়ে আছে। শেষরাতে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ঝিলমের জলে অতিকায় পাখির মতো শিকারা। কয়েকটা জ্বলজ্বলে তারা ঝিলমের জলে ভাসছে। আনন্দের আতিশয্যে সে পাখির মত হাল্‌কা হয়ে ঝিলমের সেতু অতিক্রম করে নিজের কুটিরে পৌঁছে গেল।

ভোরবেলায়, মহার্ঘ্য বসনে সজ্জিত সেই রাতের অপ্সরী হাব্বা খাতুনকে কুর্নিশ করে তাঁর সামনে সলজ্জ ভঙ্গীতে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো। হাব্বা খাতুন হেসে বললেন : ধরা পড়িস নি তো?

সারা পৃথিবীর লজ্জায় আপেলের মত আরক্ত হয়ে উঠলো সায়রা। মাথা নেড়ে জানালো, ধরা পড়ে নি। আনন্দের আতিশয্যে তার চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে এল। রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিলেন বেগমসাহেব; আমাকেও বাঁচিয়ে দিলেন বেগমসাহেবা—আমি আপনার—বলেই উন্মাদের মত হাব্বা খাতুনের পায়ে চুম্বন করতে লাগলো।

হাব্বা খাতুন বললেন,—এয়, সায়রা,—এ কি হচ্ছে, ছাড় ছাড় পা ছাড়।

সায়রা মুখ তুলে বললো,—ও কিন্তু চিরকালই জানবে বেগমসাহেবা, আপনার শয্যায়—সে আপনাকেই—

রহস্যময় ভঙ্গীতে হাব্বা খাতুন নিজের মুখে তর্জনী ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

# জলসা

দিল্লী বিমানবন্দরে মেনুহিনকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন গ্রামোফোন কোম্পানীর মিঃ দুবে এবং মিঃ গৌতম

লতা মঙ্গেশকারের কণ্ঠে ভাগবত গীতা : শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে ...ক্তিমূলক গান আগেও শুনেছি তাঁর লং-প্লেয়িং ডিস্কে। কিন্তু সেদিন লতার সংগীতজীবনের পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে দু'বছর আগে বোম্বেতে তাঁকে গ্রামোফোন কোম্পানী প্রদত্ত অভ্যর্থনা ...র টেপ-ধৃত রেকর্ড শুনতে গিয়ে ...রি-পাওনা হিসেবে শোনা গেল লং-প্লেয়িং ডিস্কে লতার কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার নবম ও একাদশ শ্লোক। শুনে মুগ্ধ হয়ে পারলাম না এই কারণে যে, প্লে-...ক ক্ষেত্রের সম্রাজ্ঞী লতা ছায়াচিত্রের চটুল প্রাণধর্মী গান গেয়েই জনচিত্ত জয় করে ...য়েছেন। এ সত্য সবারই জানা। কিন্তু ...ীর রসের রসিক যাঁরা তাঁদেরও যে ...তী মঙ্গেশকারের কাছে অনেক কিছু ...বার আছে এবং সে বিষয়ে শিল্পী যাতে ...সীন না থাকেন—সে সম্বন্ধে তাঁর কাছে ...রো প্রতিনিধি আবেদন জানান—গত-...রের আগের বছর 'ক্রীড়া-বিনোদন' সংখ্যার ...কাশকরের সময়। শ্রীমতী লতা আশ্বাস ...য়েছিলেন— এদিকে তিনি অবশ্যই মন ...বেন। সে অনুরোধের মর্যাদা যে তিনি ...খছেন তারই প্রমাণ সম্প্রতি প্রকাশিত ...প্লেয়িং ডিস্কে তাঁর গাওয়া ভগবদ্গীতার ...ট পরিচ্ছেদ। নবম পরিচ্ছেদে—অর্জুনের ...নর জবাবে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন শরণাগতকে ...ন সকল ঝঞ্ঝা ও বিপদ থেকে রক্ষা করে ...ন। ভক্তের ভক্তি ও ভালবাসাই ভগবানের ... এবং তার বিনিময়ে ভক্তকে অদেয় তাঁর ...ই নেই। দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্ন ... যোগযুক্ত হয়ে যাঁরা ভগবৎ উপাসনা ...ন এবং অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনাকারী, ...দের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যেই নিত্য যোগী-পরমশ্রদ্ধায় আমাতেই মন নিবিষ্ট করে ...র ভজনা করেন—আমার মতে তাঁরাই যোগী।

ঈশ্বরের জ্ঞান-গভীর বাণী লতার ...ন্ত পরিবেশনায়, অপরূপ কণ্ঠের ...য় এবং ভাবতন্ময়ী অন্তরের নিষ্ঠায় পূজোর অঞ্জলি হয়ে উঠেছে। গান শেষ হবার পরও শিল্পীর আত্মনিবেদনের ...তা মনের মধ্যে অনুরণিত হয়—

...হং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ
...ন চিরাৎ পার্থ ময্যা-বশিত
চেতসাম্'।

...ই অমূল্য ডিস্ক চিরকালের সম্পদ থাকবে।

**উত্তরা :** নবগঠিত অতুলপ্রসাদ স্মারক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'উত্তরা'র উদ্যোগে গত রবিবার ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় একটি সুন্দর একক গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শিল্পী শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায় সেদিন অতুলপ্রসাদের ১০খানি গান পরিবেশন করেন। সবগুলি গানই সুগীত, বিশেষ করে 'মধুকালে এলো হোলি', 'আমার বাগানে এত ফুল', 'যখন তুমি গাওয়াও গান' প্রভৃতি আরও দু-চারটি গান শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। শিল্পীর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীকালোবরণ দাস। সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅরুণ সরকার তাঁর ভাষণে বলেন, উত্তরা শুধু অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, নজরুল প্রভৃতি বিশিষ্ট বাঙালী গীতিকারদের রচিত গানই প্রচার করবেন না, এর কর্মসূচীর মধ্যে এসব গানের শিক্ষাদানের ব্যাপারটিও আছে।

সুশীলবাবুর গানের শেষে, শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে, বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত তাঁর ভাবমাধুর্যভরা অনবদ্য কণ্ঠে দুখানি অপ্রচলিত অতুলপ্রসাদের গান পরিবেশন করেন।

পাঁচটি অতুলপ্রসাদের এবং ছয়টি দ্বিজেন্দ্রলালের মোট এগারখানি গান গত ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় পরিবেশন করলেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী কৃষ্ণা রায় (চট্টোপাধ্যায়)। আসরটি নবগঠিত অতুলপ্রসাদ স্মারক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'উত্তরা'র প্রযোজিত দ্বিতীয় গানের অনুষ্ঠান। শিল্পী অতুলপ্রসাদ রচিত 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ'—ভৈরবী সুরে বাঁধা প্রসিদ্ধ গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু করে পরপর গাইলেন 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে গেয়ে' সে-দিনের গানের অনুষ্ঠান শেষ হয়। তাঁর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীহরেন মান্না। অনুষ্ঠানের পূর্বে 'উত্তরার' কর্মাধ্যক্ষ শ্রীসোমেন গুপ্ত সকলকে স্বাগত জানান। উত্তরার সহযোগীদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশ্রী সাহানা দেবী, রেণুকা দাশ-গুপ্ত, মঞ্জু গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল এবং অতুলপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গ।

অনুষ্ঠানের শেষে উত্তরার পক্ষ থেকে শ্রীসন্তোষ সেন শিল্পী, নিমন্ত্রিত ও গৃহ-কর্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত মণ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রী হরেন চট্টোপাধ্যায় (শিল্পীর পিতা), পাহাড়ী সান্যাল, দিলীপ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য।

**অগ্নিবীণার বার্ষিক উৎসবে :** গত ১১ নভেম্বর বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা 'অগ্নিবীণা'র বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক সংগীতানুষ্ঠান নিবেদিত হয় রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। 'নজরুল সন্ধ্যা'র এই বাৎসরিক অধিবেশনে কবির মানসলোকের বিভিন্ন রূপ-কল্পনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাওয়া যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ উৎসবের একটি বিশেষ মূল্য আছে। সেদিনের একক সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইলা বসু, শংকরলাল মুখোপাধ্যায়, লীনা সাহা, রূপালি, সুস্মিত দে, প্রদীপ ঘোষ, শ্রাবন্তী মজুমদার। এছাড়া গীতিআলেখ্য পরিবেশন করেন বালি শাখার অগ্নিবীণা ও দার্জিলিং শিশুসংঘ। এদের অনুষ্ঠান অকারণ দীর্ঘসূত্রতার কারণে বেশ কয়েকজন শিল্পীর অনুষ্ঠান থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। এ অব্যবস্থাপনার ত্রুটি

অমার্জনীয়। সেদিনের সঙ্গীতসভার বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল, শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়, শেফালী ঘোষ, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে নজরুলগীতি বলতে অনেকেই শুধু গজল-জাতীয় গানকে বুঝে থাকেন। বাংলা গানে গজল নজরুলের অন্যতম অবদান নিশ্চয়ই। কিন্তু এছাড়াও নজরুলের স্বদেশী গান, শ্যামাসংগীত, কাব্যে রাগপ্রধান কাব্যগীতি—এক সময় বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিল এবং জনগণের গান হয়ে উঠেছিল—একথা ভোলা অন্যায় এবং রসিকমহলে আজও যে এসব গান সমাদৃত [illegible] থাকে সেদিন এইসব শিল্পীরাই তা প্রমাণ করলেন তাঁদের প্রাণবন্ত পরিবেশনা দিয়ে। শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে কবির হাসির কবিতা আবৃত্তি করেন কাজী সব্যসাচী এবং গীটারে নজরুল গীতির সুর বাজিয়ে শোনান কাজী অনিরুদ্ধ।

'নজরুল সন্ধ্যা' উপলক্ষে স্মারক পুস্তিকায় কবির একটি অপ্রচলিত রচনা এ উৎসবের বিশেষ সম্পদ।

**মহেন্দ্র-জ্ঞানদা স্মরণিকা সভায় :** শ্রীমতী বীণাদেবী সেন পরিচালিত গত সপ্তাহে দক্ষিণ কলকাতায় জনকল্যাণমূলক সংস্থা মহেন্দ্র-জ্ঞানদা স্মরণিকা-র বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী আরতি শ্রীমলের বাসগৃহে এক সংগীতোৎসবের আয়োজন করা হয়। শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবীর পৌরোহিত্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুরু হয় সুনীল ঘোষ ও নবনীতা ঘোষের 'বন্দেমাতরম' গান দিয়ে। সুনীল ঘোষের কাছে জানা গেল বন্দেমাতরম সঙ্গীতের বহুপ্রকার সুরের মধ্যে তাঁর অগ্রজ পান্নালাল ঘোষের দেওয়া 'মল্লার' রাগে এবং ত্রিতালে এই গান তাঁরা পরিবেশন করবেন। সুরের মধ্যে নতুনত্ব ছিল এবং মল্লার-এর করুণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে সু-পরিবেশিত হওয়ায় যথাযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

এরপর দীপ্তি ভট্টাচার্যের কণ্ঠের দুটি 'শ্যামাসংগীত' শিল্পীর ভক্তিভাব, সুরেলা কণ্ঠ ও উচ্চারণ স্পষ্টতায় খুবই চিত্তস্পর্শী হয়। বিশেষ করে প্রথম গানটি 'পুরবী' রাগাভিত্তিক হওয়ায় একাধারে সময়োপযোগী হয়ে গানের অন্তর্নিহিত উদাসভাবকে বিমূর্ত করে তুলেছিল। সুপ্রীতি ঘোষ ভক্তিমূলক ও রবীন্দ্রসংগীতে আপন সুনামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় প্রথমে কবি নজরুলের একটি শ্যামাসংগীত পরে বিশেষ অনুরোধে সেই সুবিখ্যাত 'উড়িয়ে দে তোর মন-ঘুড়িটা'—গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। প্রাণবন্ত গায়কী, আবেগ ও পরিশীলিত কণ্ঠের মাধ্যমে গানের ভাববস্তু হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। দীপক মিত্র কবি নজরুলের দুটি কবিতা আবৃত্তি করে সমবেত সুধীবৃন্দকে আনন্দ দিয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপন চেষ্টায় নিষ্ঠায় পরিশ্রমে অর্থ সংগ্রহ করে শ্রীমতী বীণাদেবী সেন তাঁর পিতা সুবিখ্যাত ডাক্তার ও কল্যাণব্রতী মহেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত এবং তাঁর সুযোগ্যা পত্নী জ্ঞানদা দেবীর নামে এই প্রতিষ্ঠান করেছেন অভাবগ্রস্তা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের সাহায্যার্থে।

শ্রীরবিজ্যোতি ঘোষ 'ইমন কল্যাণ' রাগে সেতার বাজিয়ে শোনান। তবলাসঙ্গতে ছিলেন শুভ্রজ্যোতি ঘোষ। শ্রীমতী বীণাদেবী সেন 'হাস্য কৌতুকে নক্সা' পরিবেশন করে আসর মাতিয়ে তোলেন।

—চিত্রাঙ্গদা

---

# কোন একটি সুবর্ণ জয়ন্তীতে ॥

**হেমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়**

জটায়ু কুণ্ডল থেকে থমকে বেরিয়ে,
আরণ্যক বিভীষিকা চমকে পেরিয়ে
রোদ্দুরে জ্বলজ্বলে সাংগীতিক নদী—
দুরন্ত প্রাণভরা হাসি যেন ঝলকায়
বহু যুগ আগে দেখা বিলুপ্ত অলকায়।

তুমি আজ কাছে শুধু থাকতে যদি!

কেটেছে, প্রহর বহু ভয়ে ঘোর নীল,
ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ। হায়নার হাসি।
বাদুড়ের কালো পাখা
বিষে বিশ্বেষে মাখা :
সবচেয়ে বড়ো পাপ : আমি ভালোবাসি?

নেমে এলো লাখে লাখ চামচিকে পেঁচা।
জোনাকিরও আলো নেই। ঝিল্লীর সুর নেই।
বিতন্দ্র কোকিলের নেই কোনো স্বর।
পায়ে জোঁক, কাঁটা ফোটে।
হিসহিসে কেউটে জোটে।
আসে তেড়ে খসখসে সাত অজগর।

তখনো সাবিত্রী হয়ে থাকতে যদি!

আজ জানি সৃষ্টি মায়া, শুধু প্রতিভায়।
আশা আর ভালোবাসা—সেইতো নিঃশ্বাস।
ভয়ে হোলোনাক ক্ষয়। যেহেতু শ্বাপদ
বিবশ স্নায়ুর সৃষ্টি। কল্পিত আপদ
সাংকেতিক চলচ্চিত্রে নায়কের দুঃস্বপ্ন-চারণ,
পরিচালকের যেন চালাকী প্রয়াসে।

তখনো নায়িকা হয়ে থাকতে যদি!

অরণ্যের বিভীষিকা অরণ্যেই থাক।
স্নায়বিক জঞ্জাল, স্মরণের বিকৃত মরণ,
কাল্পনিক পাপ-পুণ্য, লেজারের হিসেব-নিকেশ
— আজ হোলো শেষ।

সম্মুখে স্বাগত নদী। দীপ্ত দিন। শ্যামলের প্রাণ।
ঝলমলে রোদ্দুরে দিগন্তের গান।
ছোট্ট এই স্বপ্ন আর ছোট্ট ভালোবাসা
সঞ্চারিত বিশ্বে বাঁধে বাসা।
সঞ্জীবিত অহল্যার প্রাণ।
ধন্য আমি। ধন্য হোলো অভিশপ্ত পাষাণ।

এখনো যোমটা টেনে বলবে : যদি?

# প্রেক্ষাগৃহ

বেশ কয়েক মাস বাদে তনুজাকে দেখলাম ফ্লোরে। রাজকুমারীর ঝড়ের শেষ দৃশ্য শেষ কাজ করেই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন কলকাতা থেকে। আমেরিকায় ওঁর ভাই পড়াশুনো করেন। সেখানে গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। ফিরেই বোম্বে সোজা চলে এসেছিলেন কলকাতায় সলিল সেনের অপর্ণার স্যুটিংয়ে অংশ নিতে। যাবার আগে সলিলবাবুর সঙ্গে প্রাথমিক কথা হয়েছিল। সেইমত সব কথা পাকাপাকি। তনুজা এসেই এক-বিশ্রামান্তে কাজ শুরু করেছেন।

দেয়া নেয়া, তিন ভুবনের পারে, এন্টনী ফিরিঙ্গী, রাজকুমারী, প্রথম কদম ফুল—তনুজার এই পাঁচখানা ছবি দেখার পর স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হতে পারে এখন ওঁর বাংলা ভাষায় বেশ দখল এসেছে। আসল ব্যাপারটা তা নয়। অপর্ণার সেটেও দেখলাম আগের মতই ডায়ালগগুলোকে ইংরেজী অক্ষরে লিখে দিতে হয়। অথচ বাংলা কিন্তু খারাপ বলেন না। শুনলাম উনি এখন বাংলা শিখছেন।

—হিন্দী আপনার অতি পরিচিত আর বাংলা তো আপনার দেশীয় অজানা ভাষা। আপনার তো বেশী হিন্দী ছবিতে কাজ করা উচিত, অথচ ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে তাই না?

—এখন আর বাংলা ভাষা আমার মোটেই অজানা ভাষা নয়! প্রথম সুনীলবাবুর ছবিতে কাজ করতে এলাম, তখন সত্যিকথা বলতে কি ভয়-ই ছিল মনে। উত্তমবাবু, ...বাবু ও অন্য সকলের সহযোগিতায় ভয়টা চলে গিয়েছিল অল্প কদিন পরেই। তারপর থেকেই শুধুমাত্র বাংলা ছবিতেই। টালিগঞ্জের মায়ায় যেন পড়ে গেছি। এখানকার পরিবেশ, এখানকার মানুষ আমাকে আকর্ষণ করল খুব। তাই আছি। থাকতেও চাই।

—অপর্ণা ছাড়া আর কোনো ছবি হাতে আছে নাকি?

—সাইন করিনি এখনও। কথাবার্তা চলছে, দেখি কি হয়! তবে সুনীলবাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে (যমুনা কে...) সম্ভবতঃ কাজ করব।

—আর বম্বেতে ছবি নেই?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। খান চার-পাঁচ। এখান থেকে গিয়েই তো আবার কাজ শুরু করব। তবে আবার কলকাতায় ফেরার দিনটা আসবে তারই অপেক্ষা। বিশ্বাস করুন বা না করুন এখানে এলে যেন রিলিফ পাই।'

...রেন নাগ বিগলিত করুণা জাহ্নবী ছবির একটানা প্রায় এক মাসের আউটডোর শিডিউল শেষ করেই পাড়ি জমিয়ে-ছেন বিহারের নেতারহাটে অন্য অতীত ছবির জন্য। সেখানেও বেশ কয়েকদিন চিত্রগ্রহণের পর সম্প্রতি ফিরেছেন কলকাতায়। এ মাসের শেষ দিকে কদিনের ইনডোরের কাজ আছে জানালেন হীরেনবাবু। একই সঙ্গে দুটো ছবির কাজ করছেন, কোনো অসুবিধে হয় না—জিজ্ঞেস করায় বললেন—না, অসুবিধে কিসের? একমাত্র শরীরের ওপর যা একটু চাপ বেশী পড়ে। তবে আনন্দ আছে তো কাজে, তাই পেরে উঠি।'

নেকস্ট ভেঞ্চারের কথা তুলতেই বললেন'—দাঁড়ান মশাই, আগে কাঁধ থেকে এ দুটো ছবি নামাই তারপর অন্য কথা।'

—উত্তর ভারত সফর কেমন হোল? প্রশ্ন করতে শ্রীনাগ বললেন—'সফর বলছেন! তাতো বলবেনই। কি প্রচন্ড স্পিডে যে কাজ হয়েছে তা আপনি ভাবতে পারবেন না। দু-একবারের রিহার্সাল, তারপরেই টেক্, বেশীর ভাগই একবারে ও-কে। শর্মিতা, শুভেন্দুকে জিজ্ঞেস করবেন। স্টুডিওতে অমন কাজ ভাবাই যায় না।'

—কোথায় কোথায় কাজ করলেন?

ঃ হৃষিকেশ থেকে উত্তরকাশী যাবার পথে বহু জায়গায় কাজ করেছি, সব জায়গার নাম এখন মনেই নেই। তবে গোমুখ পর্যন্ত আমরা গিয়েছিলাম। কয়েকটা নাম বলি, তাহলে জায়গাটা যে কত দুর্গম আন্দাজ করতে পারবেন। যেমন লছমনঝোলা, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, পথে কুতনোর, হনুমানচটি, ফুলচোটি, ভৈরবঘাটি, চিরবাসা ও অন্য অনেক জায়গায়!'

বাংলা ছবির এমন দীর্ঘ আউটডোর স্যুটিং অমন দুর্গম জায়গায় এর আগে

তুম হসীন মায় জওয়ান/ধর্মেন্দ্র এবং হেমা মালিনী

মুক্তি হয়নি। হীরেনবাবু সে ব্যাপারে পাইওনীয়ার বলা যায়।

নেতারহাটের **অন্ধ অতীত**-এর আউট-ডোর স্যুটিংয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন উত্তমকুমার, স্বরূপ দত্ত, সুপ্রিয়া দেবী ও নতুন মেয়ে দেবযানী হাজরা। ছবিখানি প্রযোজনা করছেন অসীম সরকার।

'ইন্টারভিউ' মুক্তি পাবার আগে থেকেই মৃণালবাবু 'গোত্রান্তরে'র কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এ ছবির প্রযোজক মৃণালবাবু নন। বম্বের অরুণ কাউল প্রোডাকসন্সের ব্যানারে নির্মিত হচ্ছে এ ছবি। ডিসেম্বর মাসে দল রওনা হবেন উত্তরপ্রদেশে। সেখানেই ছবির প্রায় সব কাজ শেষ হবে। প্রথমে যা শোনা গিয়েছিল যে বম্বের অমিতাভ বচ্চন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন—এখন বোধহয় শেষ মুহূর্তে বদল হয়ে গেল শিল্পী। প্রধান দুটি চরিত্রে কাজ করবে কলকাতারই বিবেক চ্যাটার্জি ও আরতি ভট্টাচার্য।



স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে/ দিলীপ রায় এবং মাধবী

# বিবিধ সংবাদ

**অভিনয় :** অভিনয় পত্রিকা ১ম বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ঊনিশশো সত্তরের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, মঞ্চশিল্পী এবং যে মফস্বল সংস্থা ঐ বছরে সর্বাধিকবার অভিনয় করেছেন এবং যার নাটক সর্বাধিক অভিনীত হয়েছে তাঁদের সম্বর্ধনা জানাবেন ও পুরস্কৃত করবেন।

**অন্ন চাই প্রাণ চাই :** অন্নের সাথে প্রাণের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর এই অন্ন নিয়েই সারা দেশ জুড়ে চলছে নানা সংঘাত। এই সংঘাত নিয়েই নাটক রচনা করেছেন উমানাথ ভট্টাচার্য 'অন্ন চাই—প্রাণ চাই'। গত ১১ই নভেম্বর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে এই নাটকটির অভিনয় করলেন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বহুবাজার ব্রাঞ্চ এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা। অভিনয়াংশে মিলন মুখার্জি, কানুময় পাল, দিলীপ চ্যাটার্জি, প্রদীপ সুর, শৈলেন ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেন কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত মুখোপাধ্যায়, তিলক চক্রবর্তী ও নিত্যরঞ্জন রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ শীল, সমরদেব চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত দাস, নন্দেরচাঁদ দত্ত, প্রণব মুখার্জি, শিখা ভট্টাচার্য ও বেলা রায়। নাটকটি পরিচালনা করেন বিশু চট্টোপাধ্যায়।

**শেষ কোথায় ? :** সুপরিচিত নাট্য-সম্প্রদায় 'অভ্যুদয়' তাঁদের নতুন নাট্য-প্রযোজনার যে নামটি ঘোষণা করেছেন সেটি হলো 'শেষ কোথায় ?' রচনা ও পরিচালনা : কিরণ মৈত্র। বর্তমান মধ্যবিত্ত জীবন নাটকটির উপজীব্য। প্রথম অভিনয় রঙ্গনায় আগামী ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়।

**দীপাবলী উৎসব :** গত শনিবার ২ নভেম্বর দরগা রোডে দীপাবলী উৎস উপলক্ষে একটি মনোরম সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলে উদ্দীপনীর (পার্কসার্কাস) কালীপূজ কমিটি। ঐ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পীদে মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যা নির্মলেন্দু চৌধুরী, অনুপ ঘোষাল, মণ্ড ভট্টাচার্য (হরবোলা), ললিতা ধরচৌধুরী দুই বেচারা এবং কয়েকজন স্থানী শিল্পী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে শ্রীবাচ্চু রহমান।

**'অল ফর ইওর ডিলাইট': দুটি নাটক সন্ধ্যা:** ব্রিটিশ ব্যালে শিল্পী যুগলের সফল কলকাতা সফরের প্রা সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কাউন্সিল আগামী ৯ ও ১০ ডিসেম্বর কলকাতার কলা মন্দিরে শেকসপীয়র নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যা বলীর এই অনুষ্ঠান নিবেদন করবেন লণ্ডন শেকসপীয়র গ্রুপ।

ব্রিটিশ থিয়েটারের বিশিষ্ট ব্যক্তি পিটার 'পটারের নির্দেশনায় এই নাট্য-গোষ্ঠীর 'অল ফর ইওর ডিলাইট' নামের নাটক সন্ধ্যা দুটিতে শেকসপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'উইন্টারস টেল', 'ওথেলো', 'হ্যামলেট' ও 'টুয়েলফথ নাইট' থেকে নির্বাচিত দৃশ্যাবলী পরিবেশিত হবে।

নাট্যগোষ্ঠীটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন: মারিয়া এ্যাটকিন, হেলেন ডুর-ওয়ার্ড, টম ক্রিডল, ব্রায়ান রবিনসন ও রবার্ট সোয়ান। সকলেই অভিজ্ঞ শেকস-পীয়র নাট্যশিল্পী এবং কয়েকজন চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন শিল্পী হিসাবেও সুপরিচিত।

পিটার পটার একদা সুবিখ্যাত ওল্ড ভিক নাট্য দলের হয়ে লণ্ডনে নাট্য প্রযোজনা করেছেন। কোভেন্ট গার্ডেনের রয়াল অপেরা হাউস-এরও তিনি দ

বছরের জন্য আবাসিক প্রযোজক ছিলেন। অতি সম্প্রতি তাঁরই প্রযোজনায় কোভেন্ট গার্ডেনে 'দি রিং' ও ভার্দির 'এইডা' পরিবেশিত হয়ে গেল। ১৯৬৯-৭০ সালে পটার গ্রাণাডা টেলিভিশনের হয়ে ১০'টি নাটকের এক সিরিজ প্রযোজনা করেন।

লণ্ডন শেকসপীয়র গ্রুপ গত দশ বছর ধরে সফরকারী দল হিসাবে মাঝে মাঝেই বিশ্ব পরিক্রমায় বার হয়েছেন। বর্তমান সফরে তাঁরা জাপান, কোরিয়া, হংকং, তাইল্যাণ্ড পরিক্রমার পর কলকাতায় আসবেন ও এখান থেকে মাদ্রাজ ও দিল্লী যাবেন।

**মুক্তিপথে অন্য মাটি অন্য রং:** রামকৃষ্ণ পিকচার্স নিবেদিত রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী পরিচালিত 'অন্য মাটি অন্য রং' ছবিটি সেন্সর কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পেয়ে বর্তমানে মুক্তির অপেক্ষা করছে। গ্রাম-বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে শহরের যান্ত্রিক জীবনসংঘাতের এক বাস্তবধর্মী কাহিনী নিয়ে এই ছবির চিত্রনাট্যের বিস্তার। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—অনুপকুমার, সুব্রতা সান্যাল, জ্ঞানেশ মুখার্জী, জহর রায়, গীতা দে, শিবানী বসু, অবনীশ ব্যানার্জী, সম্মথ রায়, দ্বিজু ভাওয়াল, ক্যাপ্টেন ঘোষ ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ। সংগীত পরিচালনা হৃদয় কুশারী।

**জনতা আদালত সমাপ্ত প্রায়:** জনতা ফিল্মস কর্পোরেশন নিবেদিত মধুকর সেন্টিনট পরিচালিত জনতার আদালত ছবিটির চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর মাত্র ৩ দিনের বহির্দৃশ্য গ্রহণ হলেই ছবির কাজ শেষ হয়ে যাবে। জোতদার উচ্ছেদ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে এই কাহিনীর বিস্তার। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—অনিল কুমার। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—শুভেন্দু চ্যাটার্জী, রত্না ঘোষাল, সুধারাণী, অসিতবরণ, জুঁই ব্যানার্জী, বিক্রম ঘোষ, সুখেন দাস, গঙ্গাপদ বসু, অশোক মৈত্র, রসরাজ চক্রবর্তী, নির্মল রায়, সুধীর দে এবং নবাগতা চৈতালী দে।

**স্মরণ উৎসব:** 'সংবাকা সংকর্ম সংঘের' প্রবক্তা স্বামী ঈশানন্দ ব্রহ্মচারী পরমহংস ২৪ পরগণা জেলার ফুলবাড়ি গ্রামে তাঁর স্ব-প্রতিষ্ঠিত শিবাশ্রমে সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন। দুই বাংলায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর শিষ্য ভক্ত অনুগামীরা তাঁকে ঘিরে আগামী ৬ ডিসেম্বর '৭০ (২০ অগ্রহায়ণ) রবিবার থেকে তিনদিন-ব্যাপী এক 'স্মরণ-উৎসব'এর আয়োজন করেছেন উক্ত আশ্রমে। শ্রীবিমল বসু এই 'স্মরণ উৎসব'-এর উদ্বোধন করবেন।

**জুলাই ১৯৭১-এ মস্কোতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব:** সপ্তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১৯ জুলাই থেকে আগষ্ট, ১৯৭১ পর্যন্ত মস্কোতে অনুষ্ঠিত হবে। একথা জানিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্র কমিটি ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র কর্মী ইউনিয়ন। উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে ক্রেমলিন কংগ্রেস প্রাসাদে।

**বিজয়া সম্মিলনী:** ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে বাটা স্পোর্টস ক্লাবের বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন—বাটা স্পোর্টস ক্লাবের সহ-সভাপতি শ্রী জে এস গোপাল মহাশয়। নৃত্যাংশে, নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের কৃষ্ণা রায়ের ভারতনাট্যম (আলারিপু, নটরাজবন্দনা), মায়া ভট্টাচার্য, রুনু সেন, অরুণা দে, রিঙ্কু ভাদুড়ী, তন্দ্রা রায়, অনিতা ঘোষের সাঁওতালী, অলকাসরদা, চিত্রলেখা সরদার রাজস্থানী লোকনৃত্য, শুক্লা সেনগুপ্তা, অরুন্ধতী সেন, শান্তি চৌধুরী, কৃষ্ণা রায়ের নাগা, সোমাসুর রায়, শিপ্রা সেনের 'শিব-পার্বতী', নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও ঝিনুবী বাসুর তারকাসুর বধ (কথাকলি), অনুপ-শঙ্কর, সুতপা দত্ত, বনানী চৌধুরী, মিতা পালের অন্যান্য নৃত্যে দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে। বিভিন্ন লোকনৃত্যের সঙ্গে লোকসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা ও অরবিন্দ মিত্র। সংগীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শ্যামল মিত্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত, সলিল মিত্র ও মানস-কুমার। ঐকতানে অংশগ্রহণ করেন 'ইকো-ডি-লা'।

# খেলার কথা

## পরপর দুবার

অজয় বসু

পর-পর দুবার। এশীয় ক্রীড়ার অনুষ্ঠান উপর্যুপরি দুবারই হলো থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংককে। নজীর হিসেবে এটি অনন্য। কারণ, এশীয় ক্রীড়া অথবা বিশ্ব ওলিম্পিক বা ওই জাতীয় কোনো প্রতিনিধিমূলক আন্তর্জাতিক ক্রীড়া পর-পর দুবার সংগঠনের অধিকার আর কোনো শহর পেয়েছে বলে জানা নেই।

বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়া বা এশীয় ক্রীড়ার আসর ঘুরে-ফিরে নানা অঞ্চলে বসানো হয়ে থাকে। এক-একটি অঞ্চলকে এক-একটি অনুষ্ঠান সংগঠনের ভার দেওয়া হয়। মূলে অনুষ্ঠানের এই ঘোরাঘুরির পরিকল্পনার পেছনে একটি যুক্তি রয়েছে, যে যুক্তি সর্বজন সমর্থনীয়। যুক্তি এই যে, আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হলো দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা। অনুষ্ঠান যদি বিভিন্ন অঞ্চলে হয় তাহলে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্যান্য দেশ আগত ক্রীড়া প্রতিনিধিদের মেলামেশার ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। কাজেই পর-পর দুবার ব্যাংককে এশীয় ক্রীড়াকেন্দ্র হিসেবে মনোনীত হওয়ায় এত দিনে অনুসৃত রীতি ও নীতি থেকে এশীয় ক্রীড়া সংস্থাকে সরে আসতে হয়েছে। কাজটা হয়তো অনেকের পছন্দ মাফিক হয় নি। কিন্তু ব্যাংককে পর-পর দুবার এশীয় ক্রীড়া সংগঠনের অধিকার দিয়ে দেওয়া ছাড়া এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের অন্য উপায়ও ছিল না।

আর দ্বিতীয়বার এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার ব্যবস্থাপনার ভার নিতে ব্যাংককও স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে নি। ভারটা ওই শহরের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংককে এশীয় ক্রীড়ার পঞ্চম অনুষ্ঠান চালু থাকার সময়েই এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সভায় স্থির হয় যে, চার বছর পর এশীয় ক্রীড়ার পরবর্তী অনুষ্ঠান হবে দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে। সাংগঠনিক অধিকার সিওলের হাতে দেবার জন্যে ওই শহরের পক্ষ থেকে যে আবেদনপত্র পেশ করা হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এশীয় গেমস ফেডারেশন সিওলের অনুকূলে তখন সিদ্ধান্ত নেয়।

ফেডারেশনের এই সিদ্ধান্ত জানার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন ব্যাংককে সমাগত দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রীড়া প্রতিনিধি মহলে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। উৎসাহের আতিশয্যে দক্ষিণ কোরিয়ার সাংবাদিক বন্ধুরা একদিন রাত্রে ব্যাংককের প্রেস সেণ্টারে অন্যান্য দেশের সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে একটি পার্টিই দিয়ে বসলেন।

নৈশ পার্টির ঘরোয়া পরিবেশে ঘন্টা দুয়েক কাটাবার ফাঁকে সিওল আগত দুজন কোরীও সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'সাংগঠনিক সাফল্যের সূত্রে আপনারা থাইদের টেক্কা দিতে পারবেন তো? টেক্কা দিতে নাও যদি পারেন তাহলেও কিন্তু এঁদের মতো নিখুঁত আয়োজনের নায়ক হতে হবেই। নইলে দক্ষিণ কোরিয়ার (ওঁরা অবশ্য শুধু কোরিয়াই বলে থাকেন) বদনাম হয়ে যাবে কিন্তু।'

মন্তব্য শুনে ওঁরা কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবেন। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে আস্তে আস্তে বলেন, 'তা ঠিকই বলেছেন। এঁরা কিন্তু সব কাজ বেশ গুছিয়েই করতে পেরেছেন। ওঁদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। তবু ভার যখন নিয়েছি তখন আমাদের পারতেই হবে।'

পারতেই হবে, ওঁরা যতো জোরেই শব্দ দুটি উচ্চারণ করে থাকুন না কেন, দেখা গেল যে, শেষ পর্যন্ত সিওল এশীয় ক্রীড়া সংগঠনের জোয়ালটিকে কাঁধ থেকে নামিয়েই দিল। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করতে হয়, বিদেশীদের কাছ থেকে সুনাম পাওয়ার আশায় সংগঠকদের কর্মোদ্যমে গা ভাসাতে হয়। নইলে আধুনিককালে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার আয়োজন ঘটিয়ে লাভ নেই। এতো সব কাজ করে তোলা বেসরকারী কর্মোদ্যোগের পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারকে পাশে না পেলে টকালে এই জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব।

দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষেও এই কাজ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ায় তারা একদিন ষষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠনের দায়িত্ব ছেড়েই দেয়। ফলে এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশন অসুবিধেয় পড়ে। এই অসুবিধে আরও বাড়ে যখন দক্ষিণ-কোরিয়ার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব এশীয় অঞ্চলের আর কোনো দেশই ঘাড় পেতে নিতে চায় না। ষষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠনের ভার নেবার অনুরোধ জানিয়ে এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশন এক সময় প্রায় সব দেশের দোরে দোরে ঘুরেছিল। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষায় সাড়া পাওয়া যায় নি। ফলে এক সময় ষষ্ঠ ক্রীড়া বাতিল হয়ে যাওয়ারই উপক্রম ঘটেছিল। অনুরোধ, উপরোধে ব্যাংকক যদি আবার ঘাড় পাততে রাজী না হোতো তাহলে হয়তো ষষ্ঠ ক্রীড়া সময়ে অনুষ্ঠিতই হোতো না। ব্যাংকক অবশ্য একেবারে নিঃশর্ত রাজী হয় নি। ষষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠনে যে টাকা খরচ হবে তার মোটা অংশ ব্যাংককের সংগঠকেরা এশীয় ক্রীড়া সংস্থার সদস্য দেশগুলির কাছ থেকে পাবে। খরচ হবে সাড়ে সাত লক্ষ ডলারেরও বেশি। ব্যাংকক অন্যান্য দেশের কাছ থেকে সাহায্য হিসেবে পেয়েছে কিঞ্চিদধিক চার লক্ষ ডলার।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংগঠনে ব্যাংককের অভিজ্ঞতা পরিণত। তাছাড়া ১৯৬৬ সালে এশীয় ক্রীড়ার ব্যবস্থাতে হাত দিয়ে ব্যাংকক অনেকগুলি নতুন ক্রীড়াঙ্গন নির্মাণ করেছিল। গড়া জিনিস হাতে থাকার বাড়তি সুবিধেও রয়েছে এবার। বছর চার-পাঁচ আগে গড়ে তোলা ব্যাংককের একটি ক্রীড়াঙ্গনের কথা তো আজও ভোলা যায় নি।

এই ক্রীড়াঙ্গন হলো হুয়া মাকের ইনডোর স্টেডিয়াম, প্রধানমন্ত্রীর নামানুসারে ক্রীড়াঙ্গনটির নামকরণ হয়েছে কিটিকাচণ স্টেডিয়াম। আধুনিক স্থাপত্যকলার এক নির্ভেজাল নিদর্শন এই ইনডোর স্টেডিয়ামটি। ওপর থেকে স্টেডিয়ামের ছাদটিকে পাপড়ি মেলা এক পদ্মফুলের মতো দেখায়। স্টেডিয়ামের ভেতর বিশ হাজার দর্শক আসন আছে। বেশির ভাগ আসনই গদী আঁটা। স্টেডিয়ামের অভ্যন্তরে একতলা ও দোতলায় বড় বড় দরজার সংখ্যা এতো বেশি যে ওই সব দরজা গলে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হাজার বিশেক দর্শক বাইরে চলে আসতে পারে। বাইরের আঙিনাতেও গাড়ি রাখার পর্যাপ্ত জায়গা। তাছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত জিমনাসিয়াম, সাইক্লিং ভেলোড্রম, চাঁদমারি এবং রামা রোডে গুটিকয়েক ছোট-খাটো ক্রীড়াঙ্গন সমেত জাতীয় স্টেডিয়ামও নয়নাভিরাম।

হুয়া মাকের এই ইনডোর স্টেডিয়ামটি রামা রোডের ন্যাশনাল স্টেডিয়াম বা ব্যাংকক শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ওখানে পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ার মুষ্টিযুদ্ধের ফাইনাল দেখতে গিয়ে আমি থাই আতিথেয়তার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা সত্যিই বলার মতো।

যে রাত্রে হেভিওয়েট ফাইনালে ভারতের হাওয়া সিং জিতলেন অভিজ্ঞতা সেই রাত্রেরই। হেভিওয়েট ফাইনালই ছিল সেই রাতের সর্বশেষ অনুষ্ঠান। হাওয়া সিং জেতার পর তাঁকে নিয়ে ভারতীয় দর্শক মহলে স্বাভাবিক কারণেই নাচানাচি সুরু হয়ে গিয়েছিল। মাতামাতি থামার পর হাওয়ার বিবৃতি যোগাড় করতে গিয়ে আমার বেশ দেরীই হয়ে যায়। এতো দেরী যে হলের বাইরে এসে দেখি শহরের মাঝখানে এবং ক্রীড়াগ্রামে যাবার জন্যে যেসব ভ্যান ও মোটর ছিল তা কখন ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে।

তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। এতো রাত্রে হরে ফিরি কি করে। রাস্তাঘাটও অচেনা। রী মুস্কিলই পড়া গেল যা হোক। ন্তু মুস্কিল আসানের জন্যে থাই আতি-য়তা যে সদাই প্রস্তুত ছিল তা কি আমি গে জানতে পেরেছিলাম। পারলে এক হূর্তের জন্যেও ঘরে ফেরার দুশ্চিন্তায় গতে হোত না।

কিন্তু থাই আতিথেয়তার রীতিনীতির দোপান্ত জানা না থাকায় কিছুক্ষণের ন্য দুশ্চিন্তায় ভুগতেই হলো। সেই শ্চিন্তা নিয়েই পথে এসে দাঁড়ালাম। রাত রোটা বেজে গেলেও হুয়া মাক অঞ্চলে খন গাড়ীতে গাড়ীতে সরগরম। ওই ঞ্চলেই সেবার এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সছিল। প্রদর্শনী দেখে থাইল্যাণ্ডের ধিবাসীদের অনেকেই সেদিন গাড়ীতে হে ফিরছেন।

সারি সারি গাড়ী চলেছে। হঠাৎ একটি গাড়ী এসে আমার পাশেই থমকে দাঁড়ালো। গাড়ীর ড্রাইভার এক থাই মহিলা, আরোহীও কজন আছেন। মহিলাটিই জিজ্ঞাসা করলেন এতো রাতে শহরতলীর পথে আমি একলা দাঁড়িয়ে আছি কেন? কারণটি আমি জানালাম। যেই না জানা অমনি প্রায় টেনে-হিঁচড়েই আমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে বললেন, 'আগে বলতে হয়, আপনি এশিয়ান গেমসের জন্য আমাদের দেশে এসেছেন! জানেন, ব্যাঙ্ককের প্রত্যেক গাড়ীর মালিক ও ড্রাই-ভারের ওপর নির্দেশ রয়েছে যে, এশিয়ান গেমস সংশ্লিষ্ট কোনো বিদেশীকে পথে দেখলেই তাকে লিফট দিতে হবে। না দিলে সরকারের পক্ষ থেকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এবং আরও বুঝলাম যে, এশীয় ক্রীড়া উপলক্ষে ব্যাঙ্ককের ব্যবস্থাদির সুষ্ঠু ইমেজ বিদেশীদের সামনে তুলে ধরতেই থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীরা ছিলেন যথার্থই সনিষ্ঠ। এই আন্তরিকতা ছাত্র-ছাত্রী মহলেও প্রসারিত হয়েছিল বলেই থাই ছাত্র-ছাত্রীরা পঞ্চম এশীয় ক্রীড়াকালে ক্রীড়াগ্রামে, প্রেস ভবনে, বিভিন্ন হোটেলে অতিথি সৎকারে হোটেলবয়ের কাজ করেছিলেন। সবারই লক্ষ্য ছিল, মাতৃভূমির অনুকূলে বিদেশীদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা ও সুনাম পাওয়া। সেই সুনাম ও কুণ্ঠাহীন প্রশংসা ব্যাঙ্কক আদায় করে নিতে পেরেছে চার বছর আগেই। চার বছর পর এবারে পাওয়া আর এক অভাবনীয় সুযোগে ব্যাঙ্কক যে অর্জিত শুভেচ্ছা ও সুনামের পুঁজি যে আরও অনেক বাড়িয়ে ফেলতে পারবে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এশীয় ক্রীড়ার মতো বৃহৎ ব্যাপার সংগঠনের ঝক্কি যে দেশ পরপর দু'বার ঘাড় পেতে নিতে পারে সে দেশের প্রাপ্যও বাড়তি অনেক কিছুই। তাই না?

দর্শক

## ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমস্

আগামী ৯ই ডিসেম্বর তাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ককে ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন হবে। প্রতিযোগিতা শেষ হবে ২০শে ডিসেম্বর। চার বছর আগে এই ব্যাঙ্কক হরে ৯ই ডিসেম্বর তারিখেই ৫ম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, তাইল্যাণ্ড ছাড়া অপর কোন দেশে বার এশিয়ান গেমসের আসর বসেনি। ইতিপূর্বে এশিয়ান গেমসের আসর বসেছে ৯৫১ সালে ভারতবর্ষে, ১৯৫৪ সালে ফিলিপাইনে, ১৯৫৮ সালে জাপানে, ৯৬২ সালে ইন্দোনেশিয়াতে এবং ১৯৬৬ সালে তাইল্যাণ্ডে।

প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে ১৮টি দেশ। তাইল্যাণ্ডের প্রতিযোগী সংখ্যা সব থেকে বেশী হবে। তারপরই জাপানের স্থান। ১৯৬৬ সালে ৫ম এশিয়ান গেমসে সর্বাধিক পদক সংগ্রহের তথা পদক জয়ের তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছিল জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা আসন্ন ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া গতবারের থেকে বেশি সংখ্যক পদক জয়ী হবে।

ব্যাঙ্ককের আসন্ন ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসের ১৩টি খেলাতেই ভারতবর্ষের যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু খবরে প্রকাশ, ব্যাডমিণ্টন এবং ভলিবল—এই দুটি খেলায় ভারতবর্ষ যোগদান করবে না। এই দুটি খেলার খেলোয়াড় নির্বাচনের পর এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাডমিণ্টন দলের না-যাওয়ার কারণ, নিম্ন ক্রীড়ামান। অন্যদিকে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি ভলিবল দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম অনুমোদন করেননি। ফলে তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব এবং স্বেচ্ছাচার আচরণের প্রতিবাদে জাতীয় ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি এশিয়ান গেমসে দল পাঠাবেন না ঘোষণা করেছেন।

ভারতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত যে ২০ জন খেলোয়াড়ের নাম সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন বাংলার ১১ জন, বোম্বাইয়ের ৪ জন, মহীশূরের ২ জন, পাঞ্জাবের ১ জন এবং রাজস্থানের ২ জন খেলোয়াড়। বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এই ১১ জন খেলোয়াড়: মোহনবাগানের চারজন—চন্দ্রশেখর প্রসাদ, কল্যাণকুমার সাহা, সুভাষ ভৌমিক ও সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার; ইস্টবেঙ্গল দলের চারজন—সুধীর কর্মকার, সৈয়দ নঈম (অধিনায়ক), মহম্মদ হবিব এবং শ্যাম সিং থাপা; মহমেডান স্পোর্টিং দলের ২ জন—আলতাফ আমেদ এবং আবদুল লতিফ; বি এন আর দলের নির্মল সেনগুপ্ত।

অ্যাথলেটিকসে বিশেষ আকর্ষণ হবেন প্রজাতন্ত্র চীনের কুমারী চী চেং। তাঁর বর্তমান বয়স ২৬। ১০০ গজ, ২০০ গজ এবং ২০০ মিটার দৌড়ে তাঁর বিশ্ব রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ন আছে। তাছাড়া ১০০ মিটার দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডে তিনি একজন ভাগীদার। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, আসন্ন এশিয়ান গেমসের ১০০ মিটার দৌড়ে তিনি তাঁর ১১ সেকেণ্ড সময়ের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে সক্ষম হবেন।

### যোগদানকারী দেশ

ভারতবর্ষ, নেপাল, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ইরান, ইস্রায়েল, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, প্রজাতন্ত্র চীন, ফিলিপাইন, সিংগাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং তাইল্যাণ্ড।

### প্রতিযোগিতার নির্ঘণ্ট

**ব্যাডমিণ্টন**: ১০—১৯; **বাস্কেটবল**: ১০—১৯; **ভলিবল**: ১০—১৯; **ফুটবল**: ১০—২০; **হকি**: ১০—১৯; **বক্সিং**: ১০—১৬; **সাইক্লিং**: ১০—১৯; **সাঁতার**: ১২—১৬; **ভারোত্তোলন**: ১০—১৭; **কুস্তি**: ১০—১৩; **নৌচালনা**: ১১—১৬; **অ্যাথলেটিক্স**: ১০—১৫ এবং **সুটিং**: ১০—১৯।

১৯৬৬ সালের ৫ম এশিয়ান গেমসের পদক জয়ের তালিকায় জাপান বিপুল সংখ্যায় স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়ে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দক্ষিণ কোরিয়া, তৃতীয় স্থান অধিকারী তাইল্যাণ্ড এবং চতুর্থ স্থান অধিকারী ভারত—এই তিনটি দেশের মোট পদক সংখ্যা যেখানে ছিল ১০৯, সেখানে জাপান একাই পেয়েছিল মোট ১৬৯টি পদক (স্বর্ণ ৭৮, রৌপ্য ৫৮ ও ব্রোঞ্জ ৩৩)। কি বিরাট ব্যবধান! শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য এবং খেলাধুলায় জাপান এশিয়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠ দেশ।

### ৫ম এশিয়ান গেমসের পদক তালিকা

(প্রথম চারটি দেশ)

| | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ |
|---|---|---|---|
| জাপান | ৭৮ | ৫৮ | ৩৩ |
| দঃ কোরিয়া | ১২ | ১৮ | ২১ |
| তাইল্যাণ্ড | ১২ | ১৪ | ১১ |
| ভারতবর্ষ | ৭ | ৩ | ১১ |

## টেবল টেনিসে প্রজাতন্ত্রী চীন

সম্প্রতি সুইডেনের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে প্রজাতন্ত্রী চীন অপ্রত্যাশিতভাবে ২-৩ খেলায় হাঙ্গেরীর কাছে হেরে গেছে। ১৯৬৬ সালের পর প্রজাতন্ত্রী চীনের টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের এই প্রথম ইউরোপ সফর তথা আন্তর্জাতিক খেলায় প্রথম যোগদান।

এখানে উল্লেখ্য, জাপানের পরই বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রজাতন্ত্রী চীনের খেলোয়াড়রা এক সময় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় তাঁদের প্রথম যোগদান ১৯৫৯ সালে। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মোট খেতাবের সংখ্যা ৭টি—দলগত বিভাগের দুটি এবং ব্যক্তিগত বিভাগের পাঁচটি। প্রজাতন্ত্রী চীন বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় তাদের চারবারের যোগদানে এইভাবে ১২টি খেতাব জয়ী হয়েছিল—১৯৫৯ সালে ১টি, ১৯৬১ সালে ৩টি, ১৯৬৩ সালে ৩টি এবং ১৯৬৫ সালে ৫টি। ১৯৬৫ সালের ২৮তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান এবং প্রজাতন্ত্রী চীন সাতটি বিভাগেরই ফাইনালে খেলে এশিয়া মহাদেশের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। প্রজাতন্ত্রী চীনের দুজন খেলোয়াড়—চুয়াং সে-তুং এবং লি ফুজুং যে পরস্পর উপর্যুপরি তিনবার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে খেলেছিল তা আজও একমাত্র নজির হয়ে আছে। তাঁদের মত আর কোন একটি দেশের দুজন খেলোয়াড় এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে উপর্যুপরি তিনবার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে মিলিত হননি। ১৯৬৫ সালের পর রাজনৈতিক কারণে প্রজাতন্ত্রী চীন বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার পরবর্তী দুটি আসরে (১৯৬৭ ও ১৯৬৯) অংশ গ্রহণ না করায় জাপানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে আর কোন দেশ ছিল না।

## টেনিসে 'গ্র্যাণ্ড প্রিক্স'

ইন্টারন্যাশানাল লন টেনিস ফেডারেশন কর্তৃক নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে আমেরিকার ক্লিফ রিচে সর্বাধিক পয়েন্ট অর্জনের সূত্রে ফেডারেশনের 'গ্র্যাণ্ড প্রিক্স' পুরস্কার লাভ করেছেন। এই পুরস্কারের মূল্য নগদ ১০,২৫০ স্টার্লিং। ক্লিফ রিচে 'গ্র্যাণ্ড প্রিক্স' পুরস্কার পর্যায়ের শেষ প্রতিযোগিতা—স্টকহোম টেনিস প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় জয়ী হয়ে মোট ৫৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন এবং সেই সূত্রেই তাঁর এই পুরস্কার লাভ। এই প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে স্বদেশের নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশের কাছে তাঁর পরাজয়ের সঙ্গে প্রথম পুরস্কার লাভের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই ১০,২৫০ স্টার্লিংয়ের প্রথম পুরস্কার লাভের পথে এক সময় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দুজন—আমেরিকার নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশ এবং অস্ট্রেলিয়ার কেন রোজওয়াল, যাঁরা যথাক্রমে ২য় এবং ৩য় স্থান পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত রড লেভার পেয়েছেন ৪র্থ স্থান।

## কাউড্রের রেকর্ড রাণ

বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার চলতি প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলার তৃতীয় দিনের যে বিবরণ বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে বলা হয়েছে, কলিন কাউড্রে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিসবেনের ১ম টেস্টের ১ম ইনিংসে ২৮ রান করে টেস্ট খেলায় তাঁর ব্যক্তিগত মোট ৭২৫৬ রান সংগ্রহ করেছেন এবং এই সূত্রে ইংল্যাণ্ডের ওয়াল্টার হ্যামণ্ড প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রানের রেকর্ড (৭২৪৯) রান ভেঙ্গেছেন। ন্যায়ের কষ্টিপাথরে কাউড্রের এই ৭২৫৬ রান পরীক্ষা করলে বেশ কিছুটা খাদ পাওয়া যাবে। কাউড্রের এই ৭২৫৬ রানের মধ্যে ১৯৬৫ সালে তিনি যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিনটি বে-সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন, তার রানও ধরা হয়েছে। এইভাবে সরকারী এবং বে-সরকারী টেস্ট খেলায় সংগৃহীত রান একত্রিত করা নিশ্চয় সঙ্গত নয়। এবং এ ব্যাপারে আপত্তির কারণ খুবই যুক্তিপূর্ণ।

দক্ষিণ আফ্রিকা যে-দিন থেকে কমনওয়েলথ গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করেছে, সেই দিন থেকেই তাদের ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের (বর্তমানে ইন্টারন্যাশানাল ক্রিকেট কনফারেন্স) সদস্য পদও বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং ১৯৬১ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে (ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বাদে) যে-সব টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছে তার সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার এইসব টেস্ট ক্রিকেট খেলাগুলি বেসরকারী খেলা হিসাবেই গণ্য। এখানে উল্লেখ্য, ক্রিকেট খেলার প্রখ্যাত গ্রন্থপঞ্জী 'প্লেয়ারস ক্রিকেট এ্যানুয়েল' প্রথম দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৬০ সালের পরবর্তী টেস্ট খেলাগুলিকে বেসরকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে এক যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে তাঁরা টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ব্যাটিং, বোলিং প্রভৃতি পরিসংখ্যানের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বেসরকারী টেস্ট খেলার ফলাফল একত্রিত করেন নি।

অবিশ্যি ১৯৬৬ সালের সংস্করণ থেকে তাঁরা কোন রকম বিবৃতি না দিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বেসরকারী টেস্ট খেলার সঙ্গে সরকারী টেস্ট খেলার ফলাফল যোগ করে চলেছেন। প্রখ্যাত প্রামাণ্য গ্রন্থপঞ্জী 'উইসডেন' প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ অনুমানের উপর ভরসা করে দক্ষিণ আফ্রিকার বেসরকারী এবং সরকারী টেস্ট খেলার ফলাফল যোগ করে যাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, দক্ষিণ আফ্রিকা ভবিষ্যতে ইম্পিরিয়াল তথা ইন্টারন্যাশানাল ক্রিকেট কনফারেন্সের সদস্য পদ লাভ করে তাদের ১৯৬০ সালের পরবর্তী বেসরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলাগুলি হয়ত সরকারী টেস্ট খেলা হিসাবে অনুমোদন করিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

সুতরাং ঘটনার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ক্রিকেট খেলা বেসরকারী হিসাবেই ধরা উচিত এবং সরকারী টেস্ট খেলার ফলাফলের সঙ্গে তা যোগ করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

## রোভার্স কাপ

পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা গত ১লা ডিসেম্বর থেকে সুরু হয়েছে। ১৯৭০ সালের প্রতিযোগিতায় ৪০টি দল অংশ গ্রহণ করেছে। কলকাতা থেকে ৬টি দল খেলবে—প্রথম রাউণ্ডে বি এন রেলওয়ে, বাটা স্পোর্টস ক্লাব ও এরিয়ান্স এবং সরাসরি ৪র্থ রাউণ্ড থেকে খেলবে গত বছরের বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল, রানার্স-আপ মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং। গত বছরের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করেছিল।

### সন্তরণ প্রতিযোগিতা

রাজ্য সংস্থা অনুমোদিত চাতরা সুইমিং ক্লাবের পরিচালনায় গঙ্গায় চব্বিশ মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা আগামী ৬ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

এই ঠিকানায় খবর পাওয়া যাবে— সম্পাদক, চাতরা সুইমিং ক্লাব, ৬৭নং এ. পি. ঘোষ রোড, চাতরা, শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

"যে অন্যদের ঘৃনা করে
ঘৃনা তাকেই আঘাত দেয়
ঘৃনিতকে নয়"
মহাত্মা গান্ধী

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩১শে সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 11th December, 1970 শুক্রবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ 40 Paise

## সূচীপত্র

| পৃষ্ঠা | বিষয় | | লেখক |
|---|---|---|---|
| ৪০৪ | চিঠিপত্র | | |
| ৪০৬ | সাদাচোখে | | —শ্রীসমদর্শী |
| ৪০৮ | দেশেবিদেশে | | —শ্রীপুণ্ডরীক |
| ৪১০ | পরলোকে জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় | | |
| ৪১২ | যেদিন চিঠি থাকে না | (কবিতা) | |
| ৪১১ | সম্পাদকীয় | | —শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত |
| ৪১২ | সুখের মতন কিন্তু | (কবিতা) | —শ্রীহেনা হালদার |
| ৪১২ | পাতা ঝরে, ঝরবে পাতা | (কবিতা) | —শ্রীসনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৪১৩ | পূর্বরাগ | (গল্প) | —শ্রীপ্রদোষ দত্ত |
| ৪১৯ | মুখের মেলা | | —আবদুল জব্বার |
| ৪২১ | তুলসীচরিত | (উপন্যাস) | —শ্রীননীমাধব চৌধুরী |
| ৪২৫ | এই আমাদের দেশ | | —শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৪২৭ | জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে : যদুনাথ সরকার | | —শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত |
| ৪২৮ | সাহিত্য ও সংস্কৃতি | | —শ্রীঅভয়ঙ্কর |
| ৪৩৩ | নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে | (উপন্যাস) | —শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৪৩৯ | কন্যাবিদায় | | —শ্রীঅমিয় দত্ত |
| ৪৪৪ | নিকটেই আছে | | —শ্রীসন্ধিৎসু |
| ৪৪৭ | তোমাকে | (উপন্যাস) | —শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য |
| ৪৫০ | মনের কথা | | —শ্রীমনোবিদ |
| ৪৫৩ | স্টেশনমাস্টারের ডায়েরী | (গল্প) | —শ্রীজগৎ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৪৫৭ | বিজ্ঞানের কথা | | —শ্রীঅয়স্কান্ত |
| ৪৫৯ | পিঞ্জর | (বড় গল্প) | —শ্রীসুভাষ সিংহ |
| ৪৬২ | গোয়েন্দা কবি পরাশর | | —শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত<br>—শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত |
| ৪৬৩ | অঙ্গনা | | —শ্রীপ্রমীলা |
| ৪৬৪ | প্রদর্শনী পরিক্রমা | | —শ্রীচিত্ররসিক |
| ৪৭১ | জলসা | | —শ্রীচিত্রাঙ্গদা |
| ৪৭৩ | প্রেক্ষাগৃহ | | —শ্রীনান্দীকর |
| ৪৭৭ | খেলার কথা | | —শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র |
| ৪৭৯ | খেলাধুলো | | —শ্রীদর্শক |

প্রচ্ছদ : শ্রীগৌতম কর রায়

## নিয়মাবলী

### লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

### এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

### গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

### চাঁদার হার

| | কলিকাতা | মফস্বল |
|---|---|---|
| বার্ষিক | টাকা ২০-০০ | টাকা ২২-০০ |
| ষান্মাসিক | টাকা ১০-০০ | টাকা ১১-০০ |
| ত্রৈমাসিক | টাকা ৫-০০ | টাকা ৫-৫০ |

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

# চিঠিপত্র

## 'নিকটেই আছে' ও 'মুখের মেলা' প্রসঙ্গে

শ্রীসঞ্জয় গুহঠাকুরতা (অমৃত-চিঠিপত্র, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭) বলেছেন—কতকগুলো জায়গায় 'মুখের মেলা'র তুলনায় 'নিকটেই আছে'-র চরিত্রের কাহিনী অনেক বাস্তবতার ছোঁয়া এনেছে। তাঁর কাছে 'মুখের মেলা'র ঘটনা অপেক্ষা 'নিকটেই আছে' অনেক বাস্তব মনে হয়। কোন জিনিস 'ভালো লাগা' বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত মানসিকতার উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে তর্ক অর্থহীন।

'মুখের মেলা' ও 'নিকটেই আছে' 'অমৃত'-র নিয়মিত দুটি ফিচার। একটিতে গ্রামবাংলার বিচিত্র জনজীবনের এক একটি চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। আর একটিতে সমাজ-জীবনের তথাকথিত ভদ্রবেশধারী ঠগ-প্রতারকদের চরিত্র আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়। 'নিকটেই আছে' শীর্ষক ফিচারে বাস্তবতার ছোঁয়াচ নিশ্চয়ই আছে। লেখক শ্রীসন্ধিৎসু অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তার জন্য 'মুখের মেলা'র লেখক আবদুল জব্বারের লেখায় বাস্তবতার অভাব ঘটেছে বলতে যাওয়া কিঞ্চিৎ ভুল নয় কি?

পাগল শশীকান্ত রায়কে নিছক গল্পে বলা চরিত্র বলতে আমার ইচ্ছে করে না। চলমান জীবনের বহু ঘটনাই গল্পের চেয়ে অদ্ভুত—আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব। গ্রামীণ জীবনের সোঁদা মাটি মাখা বহু চরিত্রই আমাদের অজানা। একালের গ্রামবাংলার চরিত্র শিল্পীকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবদুল জব্বার প্রভৃতিরা অবশ্যই আমাদের অভিনন্দন পাবেন—অবহেলিত মুখগুলোকে গাঙের জলে ধুয়ে মুছে আমাদের সামনে আনার জন্য।

কামাল হোসেন,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

(২)

গত ২৭ কার্ত্তিক, ১৩৭৭ 'অমৃত' পত্রিকার 'চিঠি-পত্র' স্তম্ভে মুদ্রিত অপর্ণা চ্যাটার্জি'র 'নিকটেই আছে' প্রসঙ্গে বিবরণটি পাঠালাম।

লেখিকা যে অসৎ-অসাধু পুস্তক প্রকাশকদের (কোনও নামী প্রকাশক নন) সংবাদ তুলে ধরেছেন তা সম্পূর্ণরূপে সত্য। আমার জানাশোনা এমন অনেক তরুণ লেখক-লেখিকা আছেন; যাঁরা এইসব অসৎ-অসাধু-অনামী পুস্তক প্রকাশকদের কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তাই আজ এ'দের অসাধুতা ও প্রতারণার মুখোশ সর্বসমক্ষে খুলে দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করছি। শুধু খুলে দেওয়া নয়; এ'দের বিরুদ্ধে তরুণ লেখক-লেখিকাদের সঙ্ঘবদ্ধ একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যাতে এইসব অসৎ-অসাধু-অনামী প্রতারকদের বংশ নির্মূল করা যায়।

এইসব অসৎ পুস্তক প্রকাশকেরা তরুণ লেখক-লেখিকাদের প্রথমে কতই না প্রলোভন দেখান। এ'দের সঙ্গে 'কনট্রাক্ট' করলে তরুণ লেখক-লেখিকারা যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রখ্যাত লেখক বা লেখিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবেন, সে সম্বন্ধেও অনেক 'মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা' এ'রা করে থাকেন। অধিকাংশ ঠগ্ বা প্রতারকদের যে 'সাইকোলজি' বা 'মনস্তত্ত্ব' সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকে তা কিছুদিন আগে এক প্রখ্যাত 'অপরাধ বিশেষজ্ঞের' লেখায় পড়েছিলাম। কিন্তু তা যে আজ বাস্তবে এমন করে সত্য হয়ে উঠবে, একথা কোনও দিন ভাবিনি।

আপনাদের অমৃতে 'নিকটেই আছে'-'মনের কথা'-'মুখের মেলা' প্রভৃতি এমন কয়েকটি বিভাগ আছে যা প্রকৃতপক্ষে অনেক অজ্ঞাত জগৎ ও অপরিচিত ব্যক্তিদের আমাদের চিনিয়ে দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। এর জন্য আমি 'অমৃতের' একজন গুণগ্রাহী পাঠক হিসাবে আপনাদের সম্পাদনা বিভাগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

দেবজিৎ মজুমদার,
কলিকাতা—৪৯।

## বিহারীলালের "সারদা-মঙ্গল" কাব্যের নামকরণ

নামকরণ একটি বিরাট সমস্যা। কিছুদিন আগে 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'এর নামকরণ নিয়ে পর পর দুটি মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে 'অমৃত' সাহিত্য-রসিকদের মন হরণ করে অগ্রণী হয়েছে। অনেক দিনের ইচ্ছা, সারদা মঙ্গলএর নামকরণ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখব। কাব্য আলোচনার অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল'এর নামকরণ নিয়ে বিশেষ আলোচনা নেই। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে কিছুটা আলোচনা করেছেন। আমি 'সারদা-মঙ্গল' কাব্যটি পড়ে যা ধারণা করেছি তা পাঠক সাধারণের কাছে দিতে পারলে খুশী হব। অবশ্য বিচারের ফল যা হবে তা অবশ্য 'অমৃত'এর সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করবেন।

'সারদা-মঙ্গল' নামটি শুনলেই মধ্য যুগের মঙ্গল কাব্যের কথা সহজই মনে পড়ে যায়। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে আলোচনা করলে এর অসারতাই প্রমাণিত হবে, আর পাঠকরা বিভ্রান্ত হবেন। 'মঙ্গল কাব্য' সাধারণত গীতি বহুল আখ্যানমূলক দেব-দেবী নির্দেশিত কাব্য। এর মূলে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার। কিন্তু বিহারীলালের 'সারদা-মঙ্গল' এর ধারে-কাছেও যায়নি। অবশ্য পাঁচটি সর্গই গীত আকারে লিখিত। কিন্তু সর্গ পরম্পরায় কোন যোগসূত্র নাই। অত্যন্ত রহস্যালোকে প্রবেশ করলে একটি অস্পষ্ট ক্ষীণ আখ্যান পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাও নিতান্ত বস্তুহীন। প্রথম সর্গে ঊষাদেবী, গায়ত্রীর বন্দনা গান; দ্বিতীয় সর্গে হারানো আনন্দলক্ষ্মীর উদ্দেশে কবি-চিত্তের অভিসার। কবি-চিত্ত যেন সতীহারা শিব। দীর্ঘ বিরহের হতাশা। তৃতীয় সর্গে কবি-চিত্তের সংশয়। হারানো আনন্দরসের অন্বেষণে হয়রাণ হয়ে কবি দ্বিগুণ ব্যথিত। চতুর্থ সর্গে হিমালয়ের উদার প্রশান্তির মধ্যে কবিচিত্তের আশ্বাস-অন্বেষণ। পঞ্চম সর্গে সেই পুণ্যভূমিতে অভিলষিত আনন্দ উপলব্ধি (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড)।

কবি সৌন্দর্যকে আকণ্ঠ উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু তার প্রকাশে তিনি ব্যর্থ। রূপকে অরূপের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি। কবি কাব্য রচনাকালে সংযমের কোন বাঁধ বাঁধতে পারেননি। তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না, কারণ তাঁর আর্টের কোন সংযম ছিল না। তাই তাঁর কাব্যটি হয়েছে আত্ম সর্বস্বতায় ভরা। তাই বলছিলাম বিষয়বস্তুটি মঙ্গল কাব্যের পক্ষে মূল্যহীন। কবি সারদার বিরহেই পীড়িত, সারদাকে নিয়েই তাঁর কাজ, সারদাকে বাদ দিয়ে কবির কল্পনা, শুধু লুকোচুরির খেলা।

বিহারীলাল ঐতিহ্যের অনুবর্তন করতে চেয়েছিলেন কিনা জনা যায় না, তবে কাব্যটির 'নামকরণ' দেখলেই বোঝা যায় হয়ত তাই। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—'সারদা-মঙ্গল' নামকরণে কবি বাহ্য-প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের রীতি অনুসরণ করেছেন। কাব্যটি গীতি-প্রণোদিত এবং গীতি-বহুল, সুতরাং আধুনিক ও প্রাচীন এই

# চিঠিপত্র

অর্থেই গীতি-কাব্য। কাব্যের বিষয় দেবী-মাহাত্ম্য, তবে লোক উপাস্য দেবী নয়—কাব্য সরস্বতী (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড)। এই কি নামকরণের যৌক্তিকতা? আমার মনে হয় ডঃ সেন মহাশয় এড়িয়ে গেছেন।

কাব্যটি প্রথমে অসম্পূর্ণ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নীর অনুরোধে বিহারীলাল সম্পূর্ণ করেন। তিনি একথা তাঁর 'সাধের আসন' কাব্যে স্বীকার করে গেছেন। তবে কি বলা যায় কবির প্রেরণা-দাত্রী জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের স্ত্রীই সারদারূপে কবির কাছে ধরা পড়েছেন। নিশ্চয়ই কাব্যটির লেখার আগে কবির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি কখনও সারদাকে 'মা' বলেছেন, কখনও বা প্রেয়সী, প্রেমিকা। কবির আসল কল্পনা যখন প্রচ্ছন্নের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে তখন হয়ত লোকচক্ষুর ভয়ে 'মা' বা দেবী বলেছেন। 'ললাটিকা মেয়ে' বলতে কি বুঝায়? এত বিশেষণের প্রয়োজন কি ছিল? 'মা'কে নিয়ে কি কখনও রোমাণ্টিক কবিতা লেখা যায়? তবে ভেবে দেখা দরকার কবির সারদা কে।

কবির মানসী সারদা, জীবন-মরণের সাথী। তাঁর বিরহে কবি কাঁদেন, তাঁকে কাছে পেলে কবির উচ্ছ্বাস বাড়ে। প্রেমিক বা দয়িত তাঁর প্রেমিকা বা দয়িতার সকল সময় মঙ্গল কামনা করবেন এতে আর বিচিত্র কি। কবির সঙ্গে সারদার সম্পর্ক, বলতে বাধা নেই, অতি আধুনিক যুগে 'ভালবাসা' যাকে বলা যায় সেইরূপ। কবি তাঁর সারদার মঙ্গল চেয়েছেন অর্থাৎ কুশল কামনা করেন। তাঁর সুখে কবির সুখ। তবে কি বলা যায় না, 'সারদা-মঙ্গল' নামটির পেছনে এই আইডিয়া প্রচ্ছন্ন থাকা বিচিত্র নন। আমার মতে হয়ত তাই আছে।

কবি পঞ্চ সর্গের শেষে লিখেছেন—

'বিহঙ্গম! খুলে প্রাণ
ধর রে পঞ্চম তান।
সারদা-মঙ্গল-গান গাও কুতূহলে',

এই দেখেই কি 'মঙ্গল-কাব্যের' পর্যায়ে ফেলা যায়? মোটেই তা যায় না, যুগ কবিকে সৃষ্টি করে, কবি যুগের প্রতিনিধিত্ব করবেন এটাই স্বাভাবিক। তার গণ্ডির বাইরে যাবার ক্ষমতা কবির নেই। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে মঙ্গল-কাব্য লেখা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

নামটি দেখলে ঐতিহ্যের অনুবর্তন মনে হতে পারে, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে কাব্যটি প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে না। এটা আধুনিক খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতা মাত্র, যা আত্মসর্বস্বতায় পূর্ণ।

কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
(বাংলা বিভাগ),
উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,
দার্জিলিং।

## মফঃস্বলের সাহিত্য পত্রিকা

আপনার বহুল প্রচারিত 'অমৃতের' একজন নিয়মিত পাঠিকা। আপনার পত্রিকায় 'গ্রন্থদর্শী' মফঃস্বল সাহিত্যিক এবং পত্রিকার দুরাবস্থার উপরে যে আলোচনা করেছেন তা আমার মনে আঘাত করেছে। সম্প্রতি দেখলুম, মফঃস্বলের একটি শারদীয়া সংখ্যা (আর্য, বর্ধমান) ২ খানি উপন্যাস, কিছু গল্প, কিছু কবিতা এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের প্রবন্ধের সমষ্টি, যেটাকে কলকাতার যে কোন শারদ সংকলন বা পত্রিকার সমতুল্য বলা যেতে পারে। (দেশ, অমৃত, যুগান্তর, আনন্দবাজার ইত্যাদি কয়েকটি ব্যতিরেকে।) এর মধ্যে একটি উপন্যাস চোখে পড়লো, লেখকের নাম রাধাদামোদর মিত্র। উপন্যাসের নাম 'সর্বহারা ঋমুর।' লেখকের লেখা ইতি-পূর্বে পড়িনি। কিন্তু এই উপন্যাসটি পড়বার পর আমার মনে দাগ কেটে গেল। ঐতিহাসিক ঋমুরকে নিয়ে লেখক কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, চার্বাকের শাস্ত্র, দামোদরের সঙ্গীত বাণী ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সুন্দর উপন্যাস তৈরী করেছেন যা কলকাতার পত্রিকায় বেরোন উচিত ছিল। অমৃত, দেশ, যুগান্তর, আনন্দবাজার প্রভৃতিতে শারদ সংখ্যায় খ্যাতনামা লেখকেরা লেখেন, একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু কলকাতায় আরো যে সমস্ত পত্রিকা আছে যাঁরা অত্যন্ত বাজে লেখা ছাপেন, তাঁরা মফঃস্বলের এই সমস্ত লেখকদের অভ্যর্থনা জানাতে পারেন না? লেখাটি ইতিহাস নিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের উপকারে আসবে. কিন্তু বড় কথা হলো, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মফঃস্বলের ঐ পত্রিকা পাবে কোথা থেকে? গ্রন্থদর্শীর এই সমালোচনা আমার অভিনন্দন পাবে।

রীণা গুপ্তা,
(ছাত্রী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
কলকাতা—২৮।

(২)

উপরোক্ত শিরোনামায় গত ২০শে নভেম্বরের 'অমৃতের' চিঠিপত্র স্তম্ভে মনসারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিটি পড়লাম। পত্রলেখক মফঃস্বলের কবি-সাহিত্যিকগণের আত্মপ্রকাশের সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আমার মনে হয়, লেখক হওয়ার সমস্যা কোন স্থান বিশেষের কবি-সাহিত্যিক-দের সমস্যা নয়। প্রায় সকল নবীন কবি-সাহিত্যিকগণের আত্মপ্রকাশের পথ বর্তমানে রুদ্ধ। কোনরূপ অসম্মান না করেই বলতে চাই তথাকথিত প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ নাম-করা পত্র-পত্রিকার অধিকাংশ পৃষ্ঠা দখল করে থাকায়, তরুণেরা বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই শুধু মফঃস্বল নয়, শহরের তরুণ কবি-সাহিত্যিকগণও আত্মপ্রকাশের তাগিদে নিজেদের চেষ্টায় পত্রিকা প্রকাশ করছেন, না হয় প্রখ্যাত পত্র-পত্রিকা কর্তৃক বার বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে অগত্যা লেখা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এছাড়া আর কি পথ আছে? আমার দীর্ঘ বার বছরের লেখক-জীবনে এ-ব্যাপারে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু এই স্বল্প-পরিসরে তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

অজিতকুমার দাস,
হাওড়া।

## টপ্পা গায়কের লোকান্তর প্রসঙ্গে

বর্তমান সংখ্যা [১০ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ২৮শ সংখ্যা] অমৃতে প্রখ্যাত টপ্পা গায়ক কালীপদ পাঠকের লোকান্তরগমনে একটি শোকবার্তা ছাপা হয়েছে, তার শেষের দিকে উল্লেখ আছে, "এইচ এম ভি থেকে 'ভালোবাসি বলে ভালোবাসিনি' এবং 'মনোহরা নয়ন তোমার' এই দুটি গানের রেকর্ড বাজারে বছরখানেক আগে বেরিয়েছে। এছাড়া তাঁর আর কোন রেকর্ড নেই।" এই তথ্যটি সম্পূর্ণ নয়। আমার পুরানো রেকর্ড সংগ্রহে দেখতে পাচ্ছি কালীপদ পাঠকের একখানি রেকর্ড আছে। তার [এন ৩৫১৭] এক পিঠে আছে, 'আমার প্রেম রাখা দায় হল', ও অপর পিঠে, 'আমারে কাঁদায়ে যাবে যদি যাও'।

পুরানো রেকর্ড সঙ্গীতে দেখছি আরো দুখানি রেকর্ডের উল্লেখ আছে। একখানির [পি ৯৬৬৭] গান দুটি হল, 'আমি পূজিব পিরীতি প্রেম আজ প্রতিমা করে নির্মাণ', ও 'বিবাদ হইল আমার মন ও নয়নে।' অন্যটির [পি ৯৯৭৭] এক পিঠে, 'দূরে থাক, কাছে এস না,' ও অন্য পিঠে, 'মনহরা নয়ন তোমার প্রাণ।' তবে এইসব রেকর্ড এখন বাজারে প্রচলিত নেই।

করুণাময় বসু,
টাকী, ২৪ পরগুণা

রাজনৈতিক অস্থিরতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়নে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করে। এ কথা যেমন সত্যি তেমনি গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা গদীয়ান না থাকলে অশান্ত রাজনীতির প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসাবে গড়ে ওঠে সংকীর্ণ মনোভাব। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছে তার ফলে এই রাজ্যের দুই প্রান্তে অশুভ মনোভাব ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। আদর্শের আবেদন ক্রমেই ব্যর্থ হয়ে আঞ্চলিক মনোভাব মাথা চাড়া দিচ্ছে।

আমি 'উত্তরাখণ্ড' ও 'ঝাড়খণ্ড' আন্দোলনের কথাই বলছি। "উত্তরা খণ্ড" আন্দোলনের কথা সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনায় এখনো পর্যন্ত তেমন গুরুত্ব লাভ করে নি। ফলে এই আন্দোলন যে কতখানি দানা বেঁধে উঠেছে তার সম্বন্ধে সাধারণের ওয়াকিবহাল হওয়ার কথা নয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মানুষের সঙ্গে আলাপ করলেই তাঁদের ক্ষোভের ও দুঃখের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। আর এই ক্ষোভ ও দুঃখ এত গভীর যে তাঁরা মুক্তির জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা ভাবতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। এবং ক্রমেই এই আত্মনিয়ন্ত্রণ বা স্বাতন্ত্র্যের প্রস্তাব উত্তরবঙ্গবাসীর মনে গভীর নাড়া দিচ্ছে, ইতিমধ্যেই অনেক সভা-সমিতি হয়েছে। উত্তরাখণ্ড আন্দোলনের প্রবক্তাদের অভিযোগ কোলকাতার বিরুদ্ধে।

কোলকাতা বলতে শহর কোলকাতা নয়। কোলকাতায় অবস্থিত পশ্চিম বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা মহাকরণবাসীদের বিরুদ্ধেই তাঁদের এই অভিযোগ। উত্তরবঙ্গবাসী মনে করেন কোলকাতা তাঁদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেয় না। তাঁরা অবহেলিত, অবজ্ঞাত। স্বাধীনতার ফল ভোগ তাঁরা করতে পারছেন না—তাঁরা বঞ্চিত। যত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী স্বাধীনোত্তর যুগে রূপায়িত হয়েছে, তার বেশীর ভাগই কোলকাতাকে শ্রীমণ্ডিত করবার জন্য এদিকে করা হয়েছে। ওদিকে কেবল প্রসাদং কণিকা মাত্র।

তাঁদের এই অনুভূতি বিক্ষোভের আকার ধারণ করেছে খুব বেশী দিন আগে নয়। এই সেদিন যখন প্রকৃতির রুদ্ররোষে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহর সহ অনেকগুলি জায়গা মহাপ্লাবনের শিকার হয়েছিল, তখন। স্মরণ থাকতে পারে যে ঐ হঠাৎ-আসা প্লাবনে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। এবং শুধু তাই নয়-অজস্র মানুষ সেদিন গৃহহারা হয়েছিল, সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। এই দুঃখের দিনে উত্তরবঙ্গবাসী অনেক আশার বাণী শুনেছিলেন। তখনও ছিল পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন—শ্রীধর্মবীরের রাজত্বকাল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে স্বয়ং ইন্দিরাজী পর্যন্ত সেই বন্যাগ্রস্ত এলাকার মানুষের কাছে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সর্বনাশা তিস্তাকে শান্ত করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবেন না। তাঁদের অভিযোগ হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত কতকগুলি নিয়মমাফিক বাঁধ মেরামতের কাজ ব্যতীত আর কিছুই হয় নি। আর সেই '৬৭ সালের ভয়ংকর দিনগুলোর পরও যে তিস্তা করালরূপ ধারণ করে নি এমন নয়, কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য অদ্যাবধি কোন প্রচেষ্টাই হয় নি।

শুধু সর্বনাশা সেই প্লাবনের পরই যে তিস্তাকে শায়েস্তা করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে এমন নয়। যখন এই রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল তখনই উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা যথাক্রমে দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে একটি "মাষ্টার প্লান" তৈরী করা হয়েছিল। এই প্ল্যানে শুধু প্লাবন রোধের পরিকল্পনা ছিল না। ছিল—সিঁচাই-এর কার্যক্রম, নয়া নয়া সড়ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি এবং আরও অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর রূপরেখা। ১৯৬৫ সালে রচিত এই মহাপরিকল্পনার ব্যয় ধরা হয়েছিল আনুমানিক ১৮৬-২৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন এই পরিকল্পনা অদ্যাবধি অনুমোদন লাভ করে নি। এই প্রসংগে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বলা হয়েছে যে, এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। উত্তরবঙ্গবাসীদের তরফ থেকে অনেকবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে ডেপুটেশান দিয়ে বলা হয়েছে যে অন্ততপক্ষে, এক লহমায় সম্ভব না হলে, পর্যায়ক্রমে এই মাষ্টার প্ল্যানকে রূপদান করা হোক। কিন্তু তাঁদের আবেদন এখনও পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। অথচ এক একবার বন্যার তাণ্ডবের পরই প্রতিশ্রুতি এসেছে। আর সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই রয়ে গেছে। কার্যক্ষেত্রে কিছুই হয় নি।

এই বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগের অক্ষমতার কথা চিন্তা করে নতুনভাবে কিছু করা যায় কিনা তা নিয়ে পরিকল্পনা রচনার জন্য একমাত্র বিশেষজ্ঞদের নিয়ে "নরসিং রাও" কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিও পর্যায়ক্রমে দুটি রিপোর্ট পেশ করে অবশেষে বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁদের চূড়ান্ত পরিকল্পনা পেশ করেন। কতকগুলি আশুকরণীয় স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচীর কথা এই পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে, এবং ঐ সমস্ত কর্মকাণ্ডের সমাধানের ব্যয় ধরা হয়েছে মাত্র ৮০ কোটি টাকা। কিন্তু এই সুপারিশসমূহেরও কি দশা হবে তা ভেবে উত্তরবঙ্গবাসীরা আতঙ্কিত বোধ করছেন। দীর্ঘসূত্রতা যদি এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে তবে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গবাসী বিক্ষুব্ধ হতে পারেন। তাঁদের দাবী, অবিলম্বে অন্তত তিস্তাকে শায়েস্তা করার কাজে হাত দেওয়া হোক। তিস্তা-মহানন্দা প্রোজেকটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হোক। বন্যার পর যে সমস্ত রেলপথ বন্ধ করে রাখা হয়েছে তা পুনরায় চালু করা হোক, এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণের কাজ আরম্ভ করা হোক' বিশেষজ্ঞরা নাকি বলেছেন যে, বনসম্পদ দ্রুত বিনষ্ট হওয়ার ফলে মৃত্তিকার অবক্ষয় বার বার বিপর্যয় ডেকে আনছে। কাজেই বৃক্ষ ইত্যাদি রোপণের মাধ্যমে বনভূমি সৃষ্টির কাজ ত্বরান্বিত না করলে যতই তিস্তায় বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক না কেন—সেই বাঁধের দ্বারা তীক্ষ্ণ স্রোতা তিস্তার বন্যারূপকে লাবণ্যময় করে উত্তরবঙ্গবাসীর সম্পদ আহরণে সাহায্য করা যাবে না।

এ সমস্ত দাবী-দাওয়াকে কেন্দ্র করে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। এবং উত্তরবঙ্গবাসী মনে করেন যে, যেহেতু লালদীঘির চত্বরে তাঁদের প্রতিনিধি নেই তাই "কোলকাতা তাদের অবজ্ঞা করে চলেছে—কাজে গড়িমসী করছে।" উত্তরবঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বলেন, ঐ অঞ্চলের চা ও পাট—ভারত সরকারের বিদেশী মুদ্রার যোগান দিচ্ছে। অথচ যাঁরা এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত তাঁরাই যুগসঞ্চিত বেদনায় আজ ও ভারাক্রান্ত। এই দুর্দশার অবিলম্বে অবসান হওয়া উচিত। ইতিমধ্যে নয়াদিল্লীতে দরবার করতে গণডেপুটেশান গেছে। যদি তার কোন সফল পরিণতি না ঘটে তবে অনেকেই ভয় করবেন "উত্তরাখণ্ড" আন্দোলনের নেতাদের হাতই মজবুত হবে মাত্র।

অনুরূপভাবে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরাও বিক্ষুব্ধ। তাঁদের ভাষা—নেপালী ভাষা—এখনও স্বীকৃতি লাভ না করায় তাঁদের মধ্যেও বিক্ষোভ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অথচ, এই সকল পার্বত্যবাসীদেরও বারংবার একই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আবার কোন শিল্প গড়ে না ওঠায় বা সেখানকার কুটীরশিল্প পর্যন্ত সহযোগিতা না পাওয়ার ফলে তাঁদের মধ্যেও স্বয়ং শাসিত ইউনিট গড়ে তুলবার মনোভাব বেশ জোরালো হয়ে উঠছে।

এবার চলে আসা যাক পশ্চিমবঙ্গের বিহার-উড়িষ্যা সীমান্তের ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে। এই প্রকৃতির সন্তানদেরও জীবনযাত্রার মান বলতে কিছুই নেই। এঁদের মধ্যে লোধা নামক যে উপজাতি আছে তা প্রায় মুছে যেতে বসেছে। বর্তমানে ২০।২২ ঘর মাত্র অবশিষ্ট আছে। পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়ে এখনও এরা সভ্যজগতের আওতায় এসে পৌঁছুতে পারেন নি। জঙ্গলের ফলমূল আহরণ করে, কাঠ কেটে বা কোথাও 'মুনীষ' খেটে 'মুনীষ অর্থ দিন মজুর'—সংসার-রথ টেনে চলেছেন। জীবনে অন্ততপক্ষে চাহিদা বলতে কিছুই নেই। এঁদের মধ্যে যাঁরা কিছু

কিছু জমিজমা ভাগে অথবা অন্য উপায়ে চাষ আবাদ করেন তাঁরা হয়ত দু'বেলা অন্ন সংস্থান করতে পারেন। অন্যদের ত এক-বেলার খাওয়ার জোগাড় করতেই প্রাণান্ত। একটানা অবজ্ঞাত হওয়ার ফলে কিছু শিক্ষিত আদিবাসী—সেও বিদেশী মিশনারীর অনুকম্পায়—একদিন যে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গড়ার শপথ নিয়েছিল সেই আন্দোলনের এখন সমর্থন আসছে গোটা ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে। আর তার ঢেউ লেগে কাঁপন ধরেছে ঝাড়গ্রামের শালবনে। তাঁদের মধ্যেও পৃথক ঝাড়খণ্ড আন্দোলন সাড়া জাগিয়েছে। আর অভিযোগ সেই এক। কোলকাতা তাঁদের অবজ্ঞা করছে। তাঁরা যদি নিজেদের কর্তৃত্ব নিজেরা হাতে নিতে পারেন তবে সমান তালে জীবন মান উন্নয়নের যুদ্ধে তাঁরাও এগিয়ে যেতে পারবেন। তাঁদের প্রতি অবহেলার জবাব দিতে পারবেন।

জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কষ্টিপাথরে যাচাই করলে মনে হবে এ ধরনের অনুভূতি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং এই সমস্ত পক্ষপাতদুষ্ট আন্দোলন জাতীয় ঐক্যের বিঘ্ন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সব অবহেলিত মানুষের বিক্ষোভের কারণগুলিও সহৃদয়তার সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। এদের মধ্যে কেন এই ঐক্যবিরোধী মনোভাব বা "Separatist tendency" ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে তার কারণগুলি যথাযথভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে আশু বিবেচনা করা দরকার। বলতে গেলে পরিকল্পনা যে এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের উন্নতিকল্পে গৃহীত হয় নি এমন নয়। কংগ্রেসের আমলে অনেক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল এবং কিছু কিছু কাজও হয়েছিল। অবশ্য তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই। তারপর পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা সুরু হয়েছে তার ফলে বস্তুতপক্ষে ১৯৬৭ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন গণকল্যাণমূলক কাজেই কেউ হাত লাগাতে সমর্থ হন নি। এমন কি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য যথাযথভাবে রাখা সম্ভবপর হয় নি। কে এই রাজ্যের হাল ধরবে তার ফয়সালা না হওয়ার ফলে এই রাজ্যের ক্ষেত্রে বার বার পরিকল্পনার রূপ অদল বদল হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকলে তিনি তাঁর এলাকার কথা যত দরদ দিয়ে বলতে পারবেন বা তাঁর এলাকার উন্নয়নকল্পে যে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন, অন্য কারো পক্ষে তা করা মোটেই সম্ভব নয়। এবং এটা সর্বজনস্বীকৃত বক্তব্য। কাজেই এই যে অশুভ আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে তাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা দরকার। যদি তা না করা হয় তবে এই ধূমায়িত বিক্ষোভ যখন লোলিহান হুতাশনের রূপ পরিগ্রহ করবে তখন এই ভঙ্গ বঙ্গদেশ আরও ভাঙনের দিকে এগিয়ে যাবে। শুধু তার ভৌগলিক অবক্ষয় ঘটবে তা নয়। ম্রিয়মান অর্থনীতির উপর এমন চাপ আসবে যে সেই পঙ্গু অর্থনীতি নিয়ে রাজ্যের কোন মঙ্গল সাধনই সম্ভবপর হবে না। শোনা যাচ্ছে, দাবী পূরণ না হলে উত্তরবঙ্গবাসী খাজনা বন্ধ আন্দোলন সুরু করবেন। এর পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য। কেননা কোন দলগত ব্যাপার এটা নয়, [illegible] কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের [illegible] সাধনের কৌশলও এটা নয়। কোন আসনের হক বাঁধা কথাও এদের নিরস্ত করতে পারবে বলে মনে হয় না। সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের জনসাধারণের এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দলগত পথ ভুলে তাঁরা তাঁদের এলাকার উন্নয়নের প্রশ্নে একজোট হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। অনুরূপভাবে জোট বাঁধছে সেই ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়ার প্রকৃতির সন্তানরা।

বিপদ সামনে। একথা যদি নেতৃবৃন্দ ভুলে যান তবে সমস্যা সঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গ আরও সঙ্কটের আবর্তে পড়বে। পরিত্রাণের কোন উপায় থাকবে না। কাজেই রাজ-[illegible]ক অস্থিরতা অবিলম্বে অবসান করা [illegible]ার। বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতিনিধি মারফৎ তাদের দুঃখ দুর্দশা দূরীকরণের আশু চেষ্টা না করা হলে স্বার্থদুষ্ট আন্দোলনের হাত জোরদার হবে। শুধু দবী-দাওয়া আদায়ের ভিত্তিতে এই আন্দোলনগুলি সংঘটিত হলে হয়ত কেবল প্রশাসনিক উপায়ে নিরসন করা সম্ভব হত। এর সঙ্গে পৃথক সংস্থা গড়ে তুলবার অর্থাৎ নয়া রাজ্য পত্তনের মনোভাব সংশ্লিষ্ট থাকার ফলেই সমস্যাটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিয়েছে। অতএব, সময় থাকতেই সাবধান হওয়া উচিত।

—অমদর্শী

# দেশে বিদেশে

লোকসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচন ডাকা হতে পারে, সংবাদ পর্যালোচকদেরও রাজনৈতিক মহলের এই গবেষণা যেন 'মরিয়া না মরে রাম।' সকলেই একজন মানুষের মন পড়বার চেষ্টা করছেন। তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। শ্রীমতী গান্ধী কি বলেন, সেটা বড় কথা নয় গবেষকদের কাছে, তিনি কি ভাবছেন বা ভাবতে পারেন, সেটাই তাঁদের কাছে বড় কথা।

শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা ভেঙে দিলেন বলে, এমন গবেষণা এর আগে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যাঁরা বলেছিলেন যে, লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন বসার আগেই নির্বাচনের ডাক আসবে তাঁদের কথা থাকেনি। ইতিমধ্যে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন শেষ হওয়ার সময় হয়ে এল।

এখনকার সর্বশেষ গবেষণা হচ্ছে, ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি নাগাদ যদি লোকসভা ভেঙে দেওয়া না হয় তাহলে বুঝতে হবে, অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে না, ১৯৭২ সালে যথানির্দিষ্ট সময়ে লোকসভার পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন হবে। যাঁরা এই মত প্রকাশ করছেন তাঁদের যুক্তি হল, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে যদি লোকসভার নির্বাচন করতে হয় তাহলে ডিসেম্বর মাসের পর আর অপেক্ষা করা চলে না। আর ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে যদি নির্বাচন না হয় তাহলে ঐ বছর সেপ্টেম্বর-অকটোবরের আগে নির্বাচন সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চেই যখন স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন হওয়ার কথা তখন কয়েক মাসের জন্য আগেভাগে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার যুক্তি থাকবে না। সুতরাং ১৯৭০ সাল শেষ হওয়ার আগেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, বর্তমান লোকসভা কি তার নির্দিষ্ট পরমায়ু ভোগ করতে পারবে, অথবা তার কপালে অকাল সংহারই লেখা আছে।

মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার দিল্লী সংবাদদাতা শ্রীকে কে রেড্ডি লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী এখন (অন্তর্বর্তী নির্বাচনের) সপক্ষ ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, যদি ঝাঁপ দিতে হয় তাহলে সময় বড় বেশী নেই।'

আর একটি সর্বশেষ গবেষণা এই যে, অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে কি হবে না তা অনেকটা নির্ভর করছে প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মামলার রায়ের উপর। এই মামলার শুনানী হয়ে গেছে এবং ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি এই বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায় প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আদালতের রায় যদি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যায় তাহলে শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন হওয়ার সিদ্ধান্ত করতে পারেন, এই হচ্ছে বর্তমান জল্পনা-কল্পনা।

কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যাতে মনে হচ্ছে, প্রাক্তন রাজন্যরাও কেউ কেউ তৈরী হচ্ছেন। তাঁদের ভাতা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার প্রশ্নটা আগামী নির্বাচনের অন্যতম 'ইস্যু'তে পরিণত হতে পারে একথা উপলব্ধি করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনীতিতে (ও নির্বাচনে) নামার জন্য তোড়জোড় করছেন। মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়রের মহারাজা (রাজমাতা বিজয়া রাজে সিন্ধিয়ার ছেলে) বিভিন্ন নির্বাচনমণ্ডলীতে সফর করে বেড়াচ্ছেন। তিনি অন্যান্য রাজামহারাজাদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাঁদের সক্রিয় রাজনীতিতে নামার পরামর্শ দিয়েছেন। আগামী নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে যেসব রাজা-মহারাজের নাম শোনা যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ও চিত্রাভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর ওরফে আয়েষা সুলতানার স্বামী পতৌদির নবাব।

কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব উপনির্বাচন হয়েছে সেগুলির ফলাফল শাসক কংগ্রেস দলের দপ্তর থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। এই বিশ্লেষণে যে হিসাব পাওয়া গেছে সেটা দলের পক্ষে উৎসাহজনক। কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর বিধানসভার মোট যে ৩২টি আসনে নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে ২৯টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে শাসক কংগ্রেস ১৮টি আসন লাভ করেছে। অপরপক্ষে বিরোধী কংগ্রেস ১৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১১টিতে জামানত হারিয়েছে ও মাত্র চারটিতে জয়ী হয়েছে। লোকসভার যে নয়টি আসনে উপনির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে পাঁচটিই শাসক কংগ্রেসের হাতে এসেছে। শুধু তাই নয়, এই কেন্দ্রগুলির নির্বাচনে ১৯৬৭ সালে অবিভক্ত কংগ্রেস শতকরা যে হারে ভোট পেয়েছিল উপনির্বাচনে শাসক কংগ্রেস ভোট পেয়েছে তা থেকে ৭-১২ শতাংশ অধিক হারে। কেরলে গত সাধারণ নির্বাচনের সময় অখণ্ড কংগ্রেস পেয়েছিল মোট ভোটের ৩৫-৪০ শতাংশ। আর গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে সেখানে শাসক কংগ্রেস পেয়েছে মোট ভোটের ৪৪-৫ শতাংশ।

শ্রীমতী গান্ধীর সিদ্ধান্ত এই হিসাবের দ্বারা প্রভাবিত হবে কিনা বলা যাচ্ছে না। তবে, এই হিসাব যে শাসক কংগ্রেস দলের পক্ষে আশাজনক তাতে সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে বিহার নিয়ে শাসক কংগ্রেস দলের উদ্বেগ কাটছেই না। জনাব ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ও শ্রীওয়াই বি চাবন, পর পর এই দুই নেতা মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের দুজনের চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। দলের নেতৃত্ব থেকে শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়কে সরতে হবে, এই দাবীতে বিধানসভার শাসক কংগ্রেস দলের একাংশ অনড় রয়েছেন। পি-এস-পির একাংশও বেঁকে বসেছেন এবং সর্বশেষ খবর হল, সি-পি-আইয়ের দাবী মেনে নেওয়া না হলেও তারাও কোয়ালিশন থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে।

অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে এটা প্রায় নিশ্চিত যে, শ্রীদারোগাপ্রসাদ রায়ের বদলে অন্য কোন একজন গ্রহণযোগ্য নেতা পাওয়া গেলেই শ্রীরায়কে বিহারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। এর বিকল্প হচ্ছে বিহারে আর এক দফা রাষ্ট্রপতির শাসন।

বিহারের বিপরীত পরিস্থিতি উত্তরপ্রদেশে। সেখানে ৫৩ জন মন্ত্রীর একটি স্ফীতকায় মন্ত্রিসভা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীটি এন সিংহ তাঁর সমর্থকদের সামলিয়ে রাখতে পারছেন না। মন্ত্রিসভার আয়তন আরও বাড়ান হতে পারে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় ক্রান্তি দলের নয়জন সদস্য সংযুক্ত বিধায়ক দলের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সচিবালয়ে যে সংবাদ আছে তাতে দেখা যায় যে, গত দু মাসে বিধানসভার ৪২ জন সদস্য দলত্যাগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ৮ জন দুবার দলত্যাগ করেছেন। সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় সদস্য হারিয়েছে ভারতীয় ক্রান্তি দল—মোট ২২ জন। সংগঠন কংগ্রেস দল হারিয়েছে ১৪ জন সদস্য। সরকারী হিসাবে অবশ্য বিধানসভায় ক্ষমতাসীন সংযুক্ত বিধায়ক দলের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে—৪২৬ জন সদস্যের বিধানসভায় ২৩৬ জন।

ভারতের সেনাপতিরা এক বছর অন্তর অন্তর একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে দেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে দেখেন। এবার দিল্লীতে সেই সম্মেলন হয়ে গেল। গত পাঁচ বছরে পাকিস্থানের সামরিক শক্তি দ্বিগুণ হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবারকার সম্মেলন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল।

এই সম্মেলন উপলক্ষে ভারত ও পাকিস্থানের সামরিক শক্তির একটি তুলনামূলক হিসাব প্রকাশিত হয়েছে।

এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্থানের সশস্ত্র বাহিনীতে এখন সাড়ে তিন লক্ষ লোক আছে এবং সেদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর দরুন সালিয়ানা প্রায় ৩০০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে আছেন প্রায় দশ লক্ষ মানুষ এবং তার বাৎসরিক প্রতিরক্ষা ব্যয় ১১০০ কোটি টাকা।

১৯৬৫ সালে পাকিস্থানের ছয়টি ইনফ্যানট্রি ও দুটি সাঁজোয়া ডিভিসন ছিল। এই ডিভিসনগুলির সাজ-সরঞ্জাম যোগায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেসময়ে তার ১০ স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমান ও এক স্কোয়াড্রন বোমারু বিমান ছিল আর তার ক্ষুদ্রায়তন নৌবহরে ছিল কয়েকটি ডেস্ট্রয়ার ও ফ্রিগেট এবং একটি সাবমেরিন। ১৯৬৫ সালের পর পাকিস্থান চীনের কাছ থেকে সাজ-সরঞ্জাম পেয়ে তিনটি নূতন ইনফ্যানট্রি ডিভিসন গড়ে তোলে। তাছাড়া সে চীনের কাছ থেকে পাঁচ স্কোয়াড্রন মিগ-১৯ বিমান ও এক স্কোয়াড্রন আই-এল-২৮ বোমারু বিমান, কিছু টি-৫৪ ট্যাঙ্ক, কামান ও পরিবহনের সাজ-সরঞ্জামও পেয়েছিল। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানকে ২৫০ টি-৫৪ ও টি-৫৫ ট্যাঙ্ক এবং কিছু ১৩৫ মিলিমিটার বন্দুক রেডার ও বিমানের যন্ত্রাংশ দিয়েছে। (প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম অবশ্য লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্থানকে টি-৫৪ ট্যাঙ্ক অথবা ১৩৫ মিলিমিটার বন্দুক দিয়েছে বলে তাঁদের কাছে কোন খবর নেই)। ইরাণের মারফৎ পাকিস্থান পেয়েছে প্রায় ৯০টি এফ-৮৬ স্যাবার জেট বিমান আর ন্যাটো সূত্র থেকে সে পেয়েছে শতখানেক মেরামত করা পুরানো প্যাটন ট্যাঙ্ক। নগদ অর্থ দিয়ে পাকিস্থান ফ্রান্সের কাছ থেকে কিনে দুই স্কোয়াড্রন মিরাজ জঙ্গী—বোমারু বিমান, এক স্কোয়াড্রন আলুয়েৎ হেলিকপ্টার ও চারটি ডাফনে শ্রেণীর সাবমেরিন।

অর্থাৎ পাকিস্থান গত পাঁচ বছরে তার সামরিক শক্তি বাড়িয়ে কার্যত দ্বিগুণ করেছে। তার স্থল সৈন্য বাহিনীতে এখন রয়েছে ১২টি ইনফ্যানট্রি ডিভিসন, আমেরিকান, সোভিয়েট ও চীনা ট্যাঙ্ক ও কামান-বন্দুকে সজ্জিত চারটি সাঁজোয়া ব্রিগেড। তার বিমানবাহিনীতে আছে ১৮ থেকে ২০ স্কোয়াড্রন বিমান, যার মধ্যে আছে ছয় স্কোয়াড্রন এফ-৮৬ স্যাবার, পাঁচ স্কোয়াড্রন মিগ-১৯, দুই স্কোয়াড্রন মিরাজ, এক স্কোয়াড্রন এফ-১০৪, দুই স্কোয়াড্রন আই-এল-২৮ বোমারু বিমান। এছাড়া আছে কয়েক স্কোয়াড্রন হেলিকপ্টার।

এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ভারতবর্ষের সামরিক শক্তির। ভারতের এখন ২৩টি ইনফ্যানট্রি ডিভিসন আছে, (এই ২৩টির মধ্যে ১০টিই পার্বত্য ডিভিসন)। আর আছে দুটি সাঁজোয়া ডিভিসন, একটি পৃথক সাঁজোয়া ব্রিগেড, ছয়টি পৃথক ইনফ্যানট্রি ব্রিগেড ও দুটি প্যারাসুট ব্রিগেড। ভারতীয় বিমানবাহিনীতে রয়েছে ৪৫ স্কোয়াড্রন বিমান যার মধ্যে আছে আটটি মিগ-২১ স্কোয়াড্রন, আটটি ন্যাট স্কোয়াড্রন ছয়টি হান্টার স্কোয়াড্রন, একটি মিস্টেয়ার স্কোয়াড্রন, তিনটি ক্যানবেরা বোমারু স্কোয়াড্রন ও ১৫টি অন্যান্য পরিবহনে ও যোগাযোগরক্ষী বিমানের স্কোয়াড্রন।

ভারতীয় নৌবহর পাকিস্তানী জল-বহরের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। একটি বিমানবাহী জাহাজ, দুটি ক্রুইজার, তিনটি ডেস্ট্রয়ার, চারটি সাবমেরিন, [illegible] ফ্রিগেট, দুটি টহলদার জাহাজ এবং ৪০টি অন্যান্য ছোটখাট জাহাজ নিয়ে গঠিত ভারতীয় নৌবাহিনী আর পাকিস্তানের নৌবাহিনীতে রয়েছে মাত্র একটি ক্রুইজার, দুটি ডেস্ট্রয়ার, চারটি সাবমেরিন, দুটি ডেস্ট্রয়ার এসকর্ট, দুটি ফ্রিগেট, আটটি মাইনবিধ্বংসী জাহাজ এবং ছয়টি টহলদার জাহাজ।

দুই দেশের এই তুলনামূলক সামরিক শক্তির বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন ভারতীয় সেনাপতিরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্থান সম্প্রতি যেসব অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে সেগুলিও ভারতীয় সেনাপতিরা গণনার মধ্যে এনেছেন। প্রকাশ যে, ভারতীয় সেনাপতিরা মোটামুটি এবিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, পাকিস্থানের মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে। তবে পূর্বাঞ্চলে চীনা সীমান্তবর্তী ও পাকিস্থান সীমান্তবর্তী এলাকায় অসামরিক অধিবাসীদের মধ্যে যে অশান্তি দেখা দিচ্ছে তাতে ভারতীয় সমরনায়করা নাকি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, পশ্চিম অঞ্চলে সেনাবাহিনীর পক্ষে স্থানীয় অসামরিক জনগণের সহযোগিতা লাভ যতখানি সহজ হচ্ছে পূর্ব অঞ্চলে তা হচ্ছে না।

•

'আমার কথা শুনুন। চার বছর ধরে আমি আপনাদের জন্য ব্যর্থ প্রতীক্ষা করে রয়েছি। আমি প্রতীক্ষা করে আছি সেই-দিনের জন্য যেদিন আপনারা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবেন। আপনারা কি যোদ্ধা? যদি তাই হয় তাহলে আপনারা কেন সেই সংবিধানকেই রক্ষা করার চেষ্টা করছেন, যে সংবিধান আপনাদের বাহিনীর অস্তিত্বের কারণটাই অস্বীকার করছে? কেন আপনারা বুঝতে পারছেন না যে, সংবিধান যতদিন আছে ততদিন আপনাদের রক্ষা নেই? আপনাদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যিনি সেই সংবিধানের বিরুদ্ধে নিজের দেহকে ছুড়ে ফেলতে পারেন, যে সংবিধান জাপানকে মেরুদণ্ডহীন করে তুলেছে। আসুন, আমরা মাথা তুলে দাঁড়াই, এক-সঙ্গে লড়ি এবং একসঙ্গে মরি এমন একটা কিছুর জন্য যা আমাদের জীবনের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেটা স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র নয়, সেটা হচ্ছে জাপান, যার মূল্য আমাদের কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী।'

টোকিওর পশ্চিমাংশে ইচিগায়া হিলের উপর অবস্থিত একটি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে যে প্রায় ১২০০ জাপানী সৈনিক সেই রৌদ্রালোকিত সকালে ৪৫ বছর বয়স্ক সুপরিচিত জাপানী সাহিত্যিক, চিত্রাভিনেতা, চিত্র পরিচালক, গায়ক, ব্যায়ামবিদ যুকিও মিশিমার ঐ কথাগুলি শুনছিলেন তাঁরা তাঁর কথায় উদ্বুদ্ধ হননি, উপরন্তু [illegible] একজন মূর্খের প্রলাপোক্তি বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মিশিমার শ্রোতারা জানতেন না যে, আর কয়েক মুহূর্ত পরেই অভিনেতা মিশিমা তাঁর জীবনের শেষ বাস্তব নাটক দেখাতে চলেছেন। 'তেন্নো হাইকা বানজাই' (সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন) ধ্বনি দিয়ে মিশিমা তাঁর শ্রোতাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। ঐ সেনাবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল কানেতোশি মাশিতার ঘরে তিনি ঢুকলেন। জেনারেল মাশিতা তখন তাঁর চেয়ারের সঙ্গে অষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধা। মিশিমার অনুগামী চারজন ছাত্র আগেই জেনারেল মাশিতাকে বেঁধে রেখেছিলেন। মিশিমা জামা খুললেন, জেনারেল মাশিতার চেয়ার থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে মেঝের উপর বসে নিজের পেটের উপর একটি ছুরি ধরলেন, তারপর সেই ছুরি সজোরে পেটের উপর চেপে ধরলেন। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ২৫ বছর বয়সের ছাত্র মাসাকাৎসু মোরিতা তরোয়ালের এক কোপে মিশিমার মাথা কেটে মেঝের উপর ফেলে দিলেন। তারপর মোরিতা নিজের পেটে ছুরি চালালেন আর তাঁর আর একজন সঙ্গী তাঁর মাথা কেটে ফেললেন।

এইভাবে জাপানের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক মিশিমা ও তাঁর একজন অনুগামীর জীবনাবসান ঘটল জাপানের প্রাচীন সামুরাই প্রথায়। আর এইভাবে মিশিমার নিজেরই লেখা একটি ছোট গল্পের কাহিনী যেন বাস্তব রূপ পেল। তাঁর সেই গল্পের নায়ক সেনাবাহিনীর একজন তরুণ লেফটেনান্ট হারিকিরি করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে তাঁর এই গল্প অবলম্বন করে যে ছায়াচিত্র তোলা হয়েছিল তাতে ঐ তরুণ সামরিক অফিসারের ভূমিকা গ্রহণ করে মিশিমা হারিকিরির অভিনয় করেছিলেন। সেদিন যা ছিল অভিনয়, পাঁচ বছর পরে তাই হয়ে দাঁড়াল নিদারুণ বাস্তব।

মিশিমা পুরানো জাপানকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। আজকের জাপান মিশিমার পছন্দ নয়। এই জাপান বড় বেশী বাস্তববাদী, বড় বেশী পশ্চিম-ঘেঁষা, এই জাপান তার পুরানো ঐতিহ্যকে ভুলে গেছে, আমেরিকার চাপানো সংবিধান যুদ্ধ করার সার্বভৌম অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে মেরুদণ্ডহীন করে তুলেছে। মিশিমা চেয়েছিলেন, সেনাবাহিনী মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক, আমেরিকান সংবিধান ছুড়ে ফেলুক এবং সম্রাটকে তাঁর পুরাতন আধিপত্য দিয়ে জাপানের রাজতন্ত্রী সংবিধান ফিরিয়ে আনুক। তাঁর এই ভাবধারা প্রস্তাব করার জন্য তিনি 'শীল্ড সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা গড়েছিলেন।

সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান ঘটাবার শেষ মরিয়া চেষ্টা করার জন্যই মিশিমা চারজন অনুগামীকে নিয়ে সেদিন ইচিগায়া হিলে গিয়েছিলেন। তাঁর ব্যর্থতার কাহিনী লেখা হয়ে গেল রক্তের স্রোতে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মিশিমার এই মৃত্যু জাপানের জঙ্গী জাতীয়তাবাদী অতি দক্ষিণপন্থী সংবিধানগুলিকে কতখানি প্রভাবিত করবে? এই ধরনের প্রায় চার শত সংগঠন রয়েছে। এই সংগঠনগুলি ইতিমধ্যেই জাপানের নূতন গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। জঙ্গী জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলি যদি মিশিমার আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে তারা গভীরতর বিপদের সৃষ্টি করতে পারে।

৪-১২-৭০ —পুণ্ডরীক

# পরলোকে জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

এককালের খ্যাতনামা বিপ্লবী এবং ভারতীয় ওয়ার্কার্স পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল রোগভোগের পর একাশি বছর বয়সে মারা গেছেন ৩০ নভেম্বর।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবনের কুড়ি বছরেরও বেশী সময় জেলে কাটিয়েছেন। ১৯০৭ খৃঃ ঢাকা জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি বাঘা যতীন প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯১৬ খৃঃ বালেশ্বর ষড়যন্ত্রের সংগে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাঁচ বছরের জন্য দণ্ডিত হন। পরবর্তীকালে তিনি
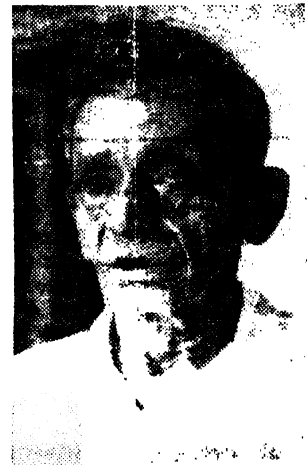
পুনরায় তিন নম্বর আইনে ধরা পড়েন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সংগে মান্দালয় জেলে পাঁচ বছর কাল আটক থাকেন। ১৯৩০ খৃঃ তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারির পদ লাভ করেন।

১৯৩৮ খৃঃ তিনি শ্রীএম এন রায়ের র‍্যাডিক্যাল পার্টিতে যোগদান করেন। পাঁচ বছর পরে তিনি র‍্যাডিক্যাল পার্টি ত্যাগ করে ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড পার্টি সংগঠন করেন। পরে ১৯৬০ খৃঃ ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড ওয়ার্কার্স পার্টিতে রূপান্তরিত হয়।

## বেকারদের কথা ভাবুন

গত সপ্তাহে সংসদে ভারতের ক্রমবর্ধমান বেকারদের সমস্যা নিয়ে আরেক দফা আলোচনা হয়ে গেছে। তাতে সমস্যার তীব্রতা প্রকাশ পেলেও সরকার পক্ষ থেকে এই সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি। তিনটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শেষ করে চতুর্থ পরিকল্পনার মুখে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ এক অভূতপূর্ব বেকার সমস্যায় আজ বিব্রত। এর প্রতিকারের পথ বার করতে না পারলে গোটা সমাজেরই বিপদের আশঙ্কা। সংসদ সদস্যরা সেদিকেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

জীবিকার অধিকারকে মৌলিক নাগরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী আজ অনেক দিনের। জীবিকাহীন নাগরিকদের কাছে অন্য মৌলিক অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির পথেও তারা হয়ে ওঠে প্রবল প্রতিবন্ধকস্বরূপ। আজকের সমাজের দিকে তাকালে এ সত্য আমাদের কাছে দিনের আলোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কর্মসংস্থানের দুটি প্রধান ক্ষেত্র—কৃষিকার্য ও শিল্পসংস্থা। কৃষিপ্রধান দেশ ভারতে কৃষিকার্যকে শিল্পায়িত করার প্রয়োজনীয়তাও আজ অনুভূত হচ্ছে। মান্ধাতার আমলের গরু-লাঙ্গলের দ্বারা কৃষিকার্য না করে এতে ট্র্যাকটর নিয়োগ এবং আধুনিক পদ্ধতিতে সমবায় খামার বা যৌথ উদ্যোগে চাষের ব্যবস্থা করতে পারলে উৎপাদনও বাড়বে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও এতে নিয়োগ করা সম্ভব হবে। কৃষি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, আমাদের দেশে কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা দশ কোটির মতো হবে। সরকারী ও বেসরকারী শিল্পসংস্থায় কর্মনিযুক্ত লোকের সংখ্যা দেড় কোটির মতো। যে-দেশে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হবে অন্তত কুড়ি কোটি সেখানে তার বিপুল সংখ্যক হয় বেকার বা পরাশ্রিত হয়ে বসে আছে। এভাবে কোনো দেশের বৈষয়িক উন্নতি হতে পারে না। তার সামাজিক শান্তিও এর দ্বারা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা।

কেন্দ্রীয় সরকার আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা অর্থাৎ ডাল-ভাতের সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। সে গুড়ে এখন বালি পড়বে বলে মনে হয়। কারণ, চতুর্থ পরিকল্পনার ছাঁটকাট শুরু হয়েছে। আশার আমলকীটি আর জনসাধারণের করায়ত্ত হবে না। প্রধানমন্ত্রী নিরাশার সুরে বলেছেন যে, ১৯৭৫ সালের মধ্যে জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না। এদিকে বছর-বছর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে গ্রাজুয়েট, ইনজিনিয়ার, টেকনিশিয়ান বেরুচ্ছেন। তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের কোনো পথ নেই। সরকারকে আজ এঁদের কথা ভাবতে হবে। রাজ্যসভার প্রবীণ সদস্যরা বার-বার সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাস ছাড়া এই তীব্র বেকার সমস্যার হাত থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতি প্রচলিত। সরকারের হাতে সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পদ নেই। বেসরকারী শিল্পপতিদেরও এ বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য করতে হবে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতেও সরকারী ও বেসরকারী শক্তি সম্মিলিত হয়ে দেশের তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান করে থাকেন। এদেশে সেই সহযোগিতার আজ নিতান্ত অভাব। বৃহৎ শিল্পকারখানার দিকে ঝোঁক দিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দেশের কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংস্থান সুগম হয়েছে কিনা তা নিয়েও যথেষ্ট দ্বিমত আছে। সরকারী সাহায্যে শিক্ষিত বেকাররা ছোট-ছোট শিল্পসংস্থা গড়ে তুলে নিজেদের জন্য কর্মসংস্থান করতে পারে। এ দিকেও আজ সরকারকে বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহকে নজর দিতে হবে। কেরলে সম্প্রতি বেকার ইনজিনিয়ার ও টেকনিসিয়ানরা সমবায় ভিত্তিতে একটি স্কুটার কারখানা নির্মাণ করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্বল্প ব্যয়ে এবং সম্পূর্ণভাবে ভারতে-তৈরী যন্ত্রপাতি দিয়ে তাঁরা আড়াই হাজার টাকার মধ্যে স্কুটার নির্মাণ করে প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়েছেন। এই দৃষ্টান্ত দেশের অন্যান্য বেকার যুবকেরাও অনুসরণ করতে পারেন যদি সরকার এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

সত্তরের দশকটিকে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো সম্ভাবনার দশক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভারতবর্ষের জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে আমরাই বা কেন এই দশকে দেশের মানুষের জন্য পূর্ণ কর্মসংস্থান করতে পারব না? এই প্রশ্ন আজ দেখা দিয়েছে। বেকার তরুণদের জীবিকার প্রশ্নটিই আজ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। একে অবহেলা করার অর্থ হবে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ওপরে বসে থাকা।

## যেদিন চিঠি থাকে না॥

নরেন্দু সেনগুপ্ত

যেদিন চিঠি থাকে না আমি স্টেশনের দিকে বেড়াতে যাই। ইঞ্জিন, বগী বাক্স, সান্টিং, কেবলই এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চলে যাওয়া দেখতে দেখতে ভাবি অন্তত আজকে আর আমার কোনো সঙ্গী নেই: অশোকস্তম্ভের ভিতরে জমানো এক-একটা অক্ষর থেকে ছিটকে আসা স্নেহ বা ঘৃণার উত্তর আমাকে আজ লিখতে হবে না। শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রীচরণেষু থেকে ছুটি।

স্টেশন খুব ভাল লাগে। এমন আত্মভূক নিকেতন আর নেই। মানুষ ওঠে, মানুষ বগী থেকে নেমে যায়। প্রত্যেকের মুখে ভিন্ন ভিন্ন প্রাপ্তিমার জলবায়ু। কেউ টিফিন-ক্যারিয়ারে ব্যস্ত, কেউ 'আরে ভুবন না!' চীৎকার করে খুশীর বুদবুদে ফেটে যেতে যেতে বলছে 'আমি এ ট্রেনেই এলাম আর তুমি ফিরে যাচ্ছো, হাঃ হাঃ!' অর্থাৎ বিপরীতমুখী দুই বন্ধুর দেখা হল। কখনো চোখে পড়ে মফঃস্বল প্ল্যাটফরমে ধূসর কোম্পানীকোর্তা গায়ে দাঁড়িয়ে আছে চেকার। সে প্রতি মানুষের প্রবাস মিলিয়ে দেখছে টিকিটের সঙ্গে। এক হাতে নীল অন্য হাতে লাল নিয়ে ব্যস্ত গার্ডবাবু বারবার কব্জিতে দেখছেন সময়। লাইন বদলাবার সংকেত—বাঁশরী মুখে তিনি খুবই গম্ভীর এবং বাবু। আমার কাছের কেউ নেই, যেদিন চিঠি থাকে না আমি দূরের মানুষের কাছে আসা দেখি। তাদের মুখের বিভিন্ন আলো ও অন্ধকারের মধ্যে এক সাময়িক সুসময় আমাকে মূর্তির মতো বসিয়ে রাখে, বসিয়ে রাখে, বসিয়ে রাখে ............রাখে,

যেদিন চিঠি থাকে না।।

## সুখের মতন কিন্তু॥

হেনা হালদার

সুখের মতন অনুভূতি কিন্তু
সুখ নয়। অথচ দুঃখের সঙ্গে কোনো মিল নেই।
সিনেমা হলের মধ্যে আলো-আঁধারিতে
ইংটার্ভালের সাঁকো! সংক্ষিপ্ত ভাষায়
এ-ও হয়, ও-ও হতে পারে।

একে তাই বড় জোর বলা যায় সুখের মতন
কিন্তু সুখ নয়। দুঃখের মতন কিন্তু

দুঃখ নয়। মস্তিষ্কের হৃদয়ের মাঝামাঝি
বিন্দুটা যে আলো নয় অন্ধকারও নয়।
প্রেম নয় ঘৃণা নয়। সহানুভূতির মত
ধূসরাভ। যেন ডিমের মধ্যের প্রাণ......

যাকে দাবী করছে না আকাশ
অথবা মাটির স্নেহ। অবয়বহীন শরীরের
স্মৃতি নেই ভবিষ্যৎও নেই।

বর্তমানও অনিশ্চিত। যেন দুই মহাদেশ
জোড়া দেওয়া ক্ষুদ্র যোজক

যে-কোনো দিকেই চলে যেতে পারে অকস্মাৎ
যে-কোনো সুযোগে।

## পাতা ঝরে, ঝরবে পাতা॥

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরের আকাশ ছুঁয়ে উদ্ধত শিমুল শাখে
ইচ্ছেগুলি যেন সব ফুল ফুল কৃষ্ণচূড়া
মাছ-রাঙা ঠোঁটে নাচে জীবনের স্বাদ
ফোটে রক্ত-রূপসা যৌবন
মুগ্ধ চোখে ভাস ভাসে আলো

অপার আনন্দ আহা, রক্তিম আহ্লাদ
তারপর একদিন স্খলিত বৃন্তের মুখে
টুপ টাপ বৃষ্টি ফুল, ফুল বৃষ্টি
সময় প্রবীণ হয় নিভে যায় আলো
এই সত্য, এই ভাবে নিভড়ে আয়ু
মহজান অস্তিত্ব জীবন

বিদ্যুৎ চমক দিলে অন্ধকারে শুধু
দুরন্ত মারীচ ছোটে
অভিযাত্রী চোখে নাচে স্বর্ণ আলো

সেই আলো,

সেই পদচিহ্ন ধরে তার পথ চলা
যেতে যেতে বার বার ফিরে ফিরে দেখা
ভালোবাসা বড় দায়

সব ভালোলাগা আজ
কড়ি দিয়ে কিনে নিতে হয়
নেচে নেচে যে খঞ্জনা
পাখিটি তোমার কাছে এলো
সেও দেখ একদিন উড়ে চলে গেলো।

সব জানা, এই হয়
পাতা ঝরে, ঝরবে পাতা
শুধু ঝরার শব্দে তার বড় ভয়—
ভালোবাসা, উদাম, সংশয়।

অতসী ধীর পায়ে খোলা জানলার ধারে এসে দাঁড়াল নীরবে। তার জীবনটা এখন বোধ করি দোলাচ্ছে। এটা নারী-জীবনের একটা বিশেষ পর্ব, একটা প্রচন্ড ঝড়ের আলোড়ন। সুখেন এখনও ঘরে ঢোকেনি। এবারে নিশ্চয় ঢুকবে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেছে অনেকক্ষণ। পরশুদিন বিয়ে গেছে, আজ বউভাত গেল। শেষ দলের খাওয়াদাওয়া মিটতে রাত দুটো বেজে গেল। এতক্ষণ সমস্ত বাড়িটা উত্তাল কলরবে ছিল ভরপুর। এখন বেশ ঝিমিয়ে আসছে। মেলা ভাঙ্গার নিস্তেজ নিরানন্দময় ক্ষণটুকুর মতই। অতসীর বাবা মা আর ছোট বোনটা সন্ধ্যের পর পরই এসে খেয়ে গেছে। দলে আরও লোক ছিল—পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব। দেরি করেনি তারা। টিপটিপ করে

# পূর্বরাগ

প্রদোষ দত্ত

সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। আকাশটা তখন ধরেছিল। শ্রাবণের শেষ লগ্ন গেল এটা। তাই যা হোক করে বিয়েটা সারতেই হোল এই লগ্নে অতসীর বাবাকে। এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল—অতসীর বিয়ে না দিলেই নয়। শ্রাবণে না হলে আবার তিন মাস ভরসা-হীন অনিশ্চিত অপেক্ষায় থাকতে হোত। এমনটি বহুবারই ঘটেছে। বাবা মা বোনের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা হয়নি অতসীর, অথচ বলা উচিত ছিল। যতটা সময় কথা বলেছে তার বেশি সময় কেঁদেছে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, না হয় গম্ভীর হয়ে থেকেছে বিষন্ন মনে। অতসীর বন্ধুবান্ধব যারা এসেছিল তারা কেউ খেল কিনা খেয়ালই করেনি সে ভাল করে।

গোটা ঘরখানা ফুলে ফুলে ছড়ান। রজনীগন্ধা, বেল, জুঁই, চন্দ্রমল্লিকা, চাঁপা, করবী। অতসীকেও এরা ফুল আর চন্দন দিয়ে সাজিয়েছে। রজনীগন্ধা দিয়ে তৈরী সিঁথিময়ূরটা এখনও চড়ান রয়েছে কপালে। ফুলের গয়না হাতে, মালা গলায়। ক্রিমসন লাল রংয়ের ওপর জরির বসান একখানা বেনারসী পরেছে অতসী। গায়ের ব্লাউজটাও একই কাপড়ের। সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে রাঙা সিঁদুর। হাতে লাল শাঁখা, নোয়া, সোনার চুড়ি, কংকণ। হাত দিয়ে জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকল অতসী একনিমেষে চেয়ে। কদিন ধরে বিয়েবাড়ির এতো হাঁকডাক লোকের কোলাহল ব্যস্ততা সবই যেন দুর্যোগর্ভ বলেই মনে হচ্ছে তার কাছে। কোথা দিয়ে কেমন করে বিয়ের এ কটা দিন কেটে গেল তা এতটুকুও তার ভাবনায় আসেনি। কলের পুতুলের মত যে যা বলেছে করে গেছে সে। আজ এই মুহূর্তে কেবলি মনে হচ্ছে অতসীর পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই একটা দুরারোগ্য ভয়ংকর ব্যাধির মতই।

এপাশেরখোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে চোখে পড়ে একটা ডোবা, সেই সঙ্গে ঝোপ-ঝাড় আর নানান আগাছার জঙ্গল—কিছুদূরে একটা বড় পুকুর। জোলো হাওয়া এসে ঘরে ঢুকছে। অতসীর ক্রিমসন লাল বেনারসী শাড়িতে ঢেউ খেলছে সে হাওয়া। হাওয়াটুকু এখন ভাল লাগছে অতসীর কাছে। সারা সকাল ধরে একটানা বৃষ্টি হয়েও দুপুরে আর বিকেলের দিকেও বিরাম ছিল না, সমানে চলেছিল টিপ-টিপ-টিপ। সন্ধ্যের দিকে থেমেছিল সে বৃষ্টি। তারপর থেকে আর হয়নি। বাইরের আকাশটা তেমন পরিষ্কার নয়। শুক্লাতিথির ভরাট চাঁদটার দিকে চোখ পড়ল অতসীর। চাঁদটা কেমন যেন ঘোলাটে। ধূসর অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না। তবুও বাইরের সবকিছুই পরিষ্কার চোখে পড়ছে। কিছু দূরে বৃষ্টির জলে টইটুম্বুর ডোবাটার ধারে এই মাঝ রাতেই চোখে পড়ল অতসীর—একজন মেছো, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে কোমরে গামছা বেঁধে খালি গায়ে ত্রিশূলের মত একখানা খোঁচ হাতে মাছ মারতে বেরিয়েছে। হাতে একটা টিম-টিমে লণ্ঠন। সুযোগ বুঝে আশ্চর্য তাক করে ডোবার জলে খোঁচ মারছে মেছোটা।

মেছো লোকটাকে দেখে এক নিস্পন্দ চেতনা থেকে এক মুখর অতীতে ফিরে যেতে চেষ্টা করল অতসী। মনের মধ্যে শীতাংশুর ধূসর মুখখানা আন্দোলিত হোল। অতসী তখন জলপাইগুড়িতে থাকে তার কাকার কাছে। তার কাকা ছিল অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশন মাস্টার। রেলের কোয়ার্টারে থাকত তারা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ বরাবর তিস্তার বাজারের দিকে সোজা পিচের রাস্তাটা চলে গেছে। বাজারের কাছাকাছি বড় রাস্তার ধারেই একটা দোতলা বাড়িতে থাকত শীতাংশুরা। শীতাংশুদের অবস্থা খুবই ভাল। বাবা অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার। জলপাইগুড়ি শহরে বাবার ডিসপেনসারি। আবার শহরের নীচে তিস্তার বাজারে একটা বড় ওষুধের দোকান। অতসীর কাকার সঙ্গে শীতাংশুর বাবার ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল। কাকার কোন সন্তান ছিল না বলে অতসীকে নিয়ে তিনি মানুষ করছিলেন। নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। কাকা কাকী আর অতসী।

বেশ মনে পড়ছে অতসীর প্রায় বছর চারেক আগে একবার শীতাংশুর সঙ্গে পিকনিক করতে গিয়েছিল সে। শীতাংশু তখন সবেমাত্র প্রি-মেডিক্যাল পাশ করে কলকাতায় আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তারি পড়তে শুরু করেছে। হস্টেলে থাকতে হোত তাকে। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে চলে আসত জলপাইগুড়িতে। অতসী তখন ওখানকার স্কুল থেকে পাশ করে জলপাইগুড়ির কলেজে পড়াশোনা করছে। পিকনিক করতে গিয়েছিল জলপাইগুড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে—একটা ছোটখাটো পাহাড়ের নীচে করলা নদীর কাছাকাছি জায়গায়। অতসীদের পাড়ার এবং কলেজের ছেলেমেয়ে ছিল সঙ্গে। পাহাড় বললে ভুল হবে। নুড়ি পাথর আর মাটির উঁচু ঢিপি। টিলার মত। ওপরটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে সমতলভূমি। আশপাশে শিমুল শাল সেগুন আমলকী আর হরিতকীর গাছ। টিলার গা ঘেঁষে প্রায় একশো ফুট নীচে নেমে গেছে গভীর খাদ। টিলাটার নীচে একটা বড় বাদাম গাছ। বাদাম গাছের গোড়ায় আস্তানা নিয়েছিল অতসীদের দল। দক্ষিণ দিক বরাবর বেশ কিছুটা দূরে করলা নদী বয়ে চলেছে।

তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে অতসীদের দল উঠে এসেছে টিলাটার ওপরে, শীতের বিকেলের রং-এ হরিৎ ছায়া কাঁপছে বিশৃঙ্খল ডালপালা ঊর্ধ্বমুখে তুলে। চারিদিকে যেন আদিম নিস্তব্ধতা। দিনান্তের রক্তরাগ ছুঁয়েছে পশ্চিম আকাশ। শীতের বেলা শেষে পাইন আর ফার্ণের মর্মরিত বিলাপ শুনতে পেল অতসী। টিলাটার ওপর থেকে দেখতে পেল অতসী তিস্তার একফালি চর। দূরে দূরে ধান ক্ষেত, চায়ের বাগান। করলা নদীর এপারে শহর—দীনবাজার, পান্ডাপাড়া, নিউ টাউন-পাড়া, বেগুনটারি এবং ওপারে রায়কতপাড়া, ওয়কারগঞ্জ, হাসপাতালপাড়া, সেনপাড়া। খাদের দিকে চোখ ফেরাল অতসী। বুকটা কেঁপে উঠল। কাছেই নাকি ডুয়ার্সের গভীর অরণ্য। শীতাংশু আর অতসী খাদের কাছাকাছি সরে এসেছে দল ছেড়ে। জঙ্গলের দিকে চোখ মেলে নরম গলায় বলে উঠল অতসী—ওরা কি বলে জান?

শীতাংশুর চোখেমুখে কৌতূহল ফুটে উঠল, শুধাল—কি?

—এই জঙ্গলে নাকি চিতাবাঘ থাকে, ডুয়ার্সের বন থেকে আসে। আচ্ছা মনে কর, এই মুহূর্তে একটা চিতাবাঘ যদি আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে—তবে তুমি কি করবে?

খানিকটা উচ্ছলভাবে হেসে উঠল শীতাংশু অতসীর কথায়। পরে স্বাভাবিক সুরে বলল—কোনই সন্দেহ নেই, চিতা-বাঘের কবল থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে পড়ব তক্ষুনি।

—ইশ, এ তোমার ডাক্তারি ছুরি কাঁচি নিয়ে মড়া কাটা নয়—এ একেবারে মানুষ খেকো জ্যান্ত বাঘ—অতখানি বুকের পাটা তোমার নেই।

—বাঘের কবলে পড়েই দেখ না—বুকের পাটা আছে কি নেই তখনই বুঝতে পারবে।

—থাক থাক হয়েছে।

—কি আশ্চর্য—

শীতাংশু তার কথা শেষ করল না। অতসী তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অস্তমিত সূর্যের দিকে। সূর্যের ম্লান রক্তাভ গোলক-পিন্ডটা তখন দিকচক্রবালের অন্তরালে অদৃশ্য হচ্ছে ধীরে ধীরে। তার শেষ রশ্মিটা কতকটা বাদুমন্ত্রের মতই কখন গোলাপী কখন কমলালেবু কখন পীতাভ রঙের আকার ধারণ করে মেঘের পরতে পরতে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সন্ধ্যে ঘনাবার সাড়া পেয়ে সাদা আর পাঁশুটে রঙের বুনো বকগুলো মালার মত উড়ে চলেছে নরম আকাশের গায়ে।

পিকনিক পার্টির আরো একটা দল উঠে এলো টিলাটার ওপরে। এরা অতসীদের পরে এসেছে। এদের খাওয়াদাওয়া এতক্ষণে শেষ হোল। যারা ওপরে উঠে এলো তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে চেনে বলে মনে হোল অতসীর। সে এদের দেখে কেমন যেন একটু বিব্রত বোধ করল। এখানে শীতাংশুর সঙ্গে এমনি যথেচ্ছভাবে ঘুরতে ফিরতে গল্প করতে দেখলে নিশ্চয় কিছু সন্দেহ করতে পারে তারা। কারণ, সুখেনের সঙ্গে তার বিয়ে প্রায় পাকাপাকি হয়ে রয়েছে। সুখেনদেরই জানাশোনা লোক রয়েছে এদের মধ্যে, হয়তো কেউ কেউ আত্মীয়ও থাকতে পারে। সন্দেহ করে করুক, ব্যাপারটা আরও জানাজানি হোক, ছড়িয়ে পড়ুক, সেইটেই চায় অতসী, সুখেনের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙ্গে যাবে তাহলে। সুখেনরা থাকে কলকাতায়। সুখেনের মামা-মামী থাকেন জলপাই-গুড়িতে। কলকাতা থেকে অতসীর বাবাই ঠিক করেছেন এ বিয়ে। এ খবর চেনামহলে পড়েছে ছড়িয়ে। অথচ অতসীর কাকা-কাকীর আন্তরিক ইচ্ছে শীতাংশুর সঙ্গেই বিয়ে হোক অতসীর। শীতাংশু আর অতসীর অবাধ মেলামেশা দেখে এখানকার পাড়া-পড়শী আর অন্যান্য পরিচিত মহল অনেক জল্পনা কল্পনাই করেছে তাদের দুজনকে নিয়ে। শীতাংশুর সঙ্গে অতসীর বিয়ে না হওয়াটা তাদের কাছে এখন একটা অত্যন্ত অবৈধ ও চিন্তার দুরধিগম্য ব্যাপার। শীতাংশু হঠাৎ চাপা হেসে বলে উঠল—আচ্ছা অতসী তুমি কি করবে—আমি যদি হঠাৎ স্লিপ খেয়ে গভীর খাদে পড়ে যাই? অতসী হাসল না। অতি সহজ ভঙ্গিতে রুমালটা দু হাতে পাক দিতে দিতে বলল—আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দেব—এখানে নয় একেবারে স্বর্গে গিয়ে মিলব দুজনে—বেশ মজা হবে।

—যাই বল অতসী, অতখানি বিশ্বাস বা ধৈর্য আমার নেই।

অতসী এবারে সোজাসুজি তাকাল শীতাংশুর দিকে। শীতাংশুর অনিন্দ্য সুন্দর চেহারাটা বেলাশেষের পড়ন্ত আলোকে আরও উজ্জ্বল মনে হোল। বড় বড় দুচোখের তারায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। নাক কান মাথার চুল কপাল নিখুঁতভাবে কামান নীলাভ দুই গাল রক্তাভ দুই ঠোঁট চিবুক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকেও আশ মেটে না। অথচ এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে তার বাবা রাজী নয়। তার বাবা অপরেশ-বাবু জলপাইগুড়িতে এসে শীতাংশুকে কয়েকবার দেখেও গেছেন। অপরেশবাবু বহু আগে থেকেই সুখেনের সঙ্গে অতসীর বিয়ের ব্যাপারটা প্রায় ঠিক করেই রেখে ছিলেন মনে মনে। তিনি ব্যবসাদার লোক। ঢালাইয়ের কারখানা রয়েছে। সুখেনের বাবার সঙ্গে অপরেশবাবুর বহুদিনের বন্ধুত্ব। শহরতলির দিকে দুখানা সিনেমা হলের মালিক সুখেনের বাবা বেশ কিছু জমিজমাও রয়েছে। ধান পাট বিক্রি করে মোটা টাকা আসে ঘরে। কলকাতায় একখানা বাড়ি, দেশের দিকে একখানা বাড়ি।

সুখেন বি-এ পর্যন্ত পড়েছে। এখন সিনেমা হল দুটোর দেখাশোনার ভার তার ওপরেই।

শীতাংশুকে হারাবার ভয়ে অতসী নিজেই নিজের মৃত্যুকামনা করেছে কতবার কল্পনায় কল্পনায়। প্রচন্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে করতে হবে সুখেনকে। শীতাংশু সরে যাবে তার জীবন থেকে—একথা ভাবলেও একটা দুর্দমনীয় ব্যথার শিহরণ খেলে যায় অতসীর বুকের মধ্যে। অপরেশবাবু যখন সুখেনের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবেনই, সেখানে কারোর কোন যুক্তি বা মতই যখ টিকবে না, সেক্ষেত্রে অতসীর পালিয়ে গিয়ে শীতাংশুর সঙ্গে বিয়ে করা ছাড়া অন্য পথও নেই—একথা বহুবার ভেবেছে অতসী। শীতাংশুকে কয়েকবার পালিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিল সে। কিন্ত শীতাংশু পালিয়ে গিয়ে গোপনে বিয়ে করতে নারাজ। সেখানে তার ঘোর আপত্তি।

তার মতে বিয়ে যদি করতেই হয়, অনুষ্ঠান করে সকলের আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা কুড়িয়ে সে ঘরে এনে তুলবে অতসীকে। জীবনের এটা একটা প্রচন্ড রকমের আনন্দের ব্যাপার। এই মত পোষণের জন্যে তাকে যদি কেউ যুগধর্ম সম্বন্ধে অচেতন বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে তা মানতে রাজী আছে শীতাংশু। তবুও এ মতকে সে হাজার যুক্তি দিয়েও ফেলতে পারবে না। এরপর অতসী আর কোন কথা বলতে সাহস করেনি। আর কোন প্রস্তাবও রাখেনি। অথচ শীতাংশু অহেতুক অতসীর বাবার সম্মতির অপেক্ষায় থেকেছে। অতসীর কাকা-কাকীও অপরেশবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তাদের যথাসাধ্য। কিন্তু কোন ফলই হয়নি। অতসীকে, অতসীর কাকা-কাকীকে বহু উপায়ে চাপ দিয়েছে শীতাংশু অপরেশবাবুর মত পাওয়ার জন্যে। এর ফলে অশান্তিই হয়েছে কাকা-কাকীর সঙ্গে অপরেশবাবুর। এখন অপরেশবাবু নাকি আর তার মেয়েকে রাখতে চান না এখানে। শুধু এখানে থাকাই নয়—বিয়ে না দিয়ে পড়াতেও আর চান না তিনি।

অতসী দেখল, কথায় কথায় সত্যিই টিলাটার একেবারে কিনারায় চলে এসেছে শীতাংশু। কিনারায় দাঁড়িয়ে মিটমিট করে হাসছে সে। পা নাচাচ্ছে থেকে থেকে। লাফিয়ে নীচে পড়বার ভান করছে। ভয় দেখাচ্ছে অতসীকে। অতসী নীচের দিকে আর একবার তাকাল—গভীর খাদ। বুনো গাছ-গাছড়া আর জঙ্গলে ভর্তি। তাকালে মাথা ঘুরে যায়। তার নিজেরই মনে হচ্ছে এখুনি পড়ে যাবে সে। শীতাংশু মাঝে মাঝে এই রকমের ছেলেমানুষি দুঃসাহসিকতা দেখায়। সেবারে পুরীতে গিয়ে সমুদ্রের জলে চান করতে নেমে সাঁতরে চলে গিয়েছিল বহুদূরে। এই মুহূর্তে তার মনে পড়ছে সেই ঘটনা। এখনও শিউরে ওঠে অতসী সে ঘটনার কথা ভাবলে। ঘটনা তো নয়—একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা।

—দেখবে অতসী সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে সাঁতার কতদূরে যেতে পারি?

স্বর্গদ্বার ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল শীতাংশু অতসীকে। অতসীর কাকীর অসুখ করেছিল। অসুখ ভাল হলে কাকা কাকী অতসী বেড়াতে এসেছিল পুরীতে। এদের সঙ্গে শীতাংশুও এসেছিল সেবারে। বহুদূরে সাঁতরে চলে গিয়েছিল শীতাংশু। কাকা কাকী অতসী এবং আরও অনেকে নিষেধ করেছিল তাকে। সমুদ্রের ঢেউকে বিশ্বাস নেই। কোথা দিয়ে কেমনভাবে তুলে নিয়ে কোথায় ফেলবে তার ঠিকঠিকানা নেই। হোলও ঠিক তাই। বহুদূরে চলে যাওয়ার পর বেশ কয়েক মিনিট শীতাংশুকে কারুরই আর চোখে পড়ল না। সকলেই শঙ্কিত হোল। অতসীর কাকা কাকী এবং পাড়ের অন্যান্য পরিচিত লোকেরা মরিয়া হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। হাঁক পাড়ল সকলে থেকে থেকে। কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না শীতাংশুর। শেষে নুলিয়াদের ধরল তারা অসহায়ের মত। এমন ঘটনা সমুদ্রে চান করতে এসে হামেশাই হয়ে থাকে। অতসীর মনে হোল শীতাংশুর এটা যেন গোঁয়ার্তুমি। রাগও হোল মনে মনে। কারোর কথাই শুনল না শীতাংশু? তার কথা না হয় না শুনতে পারে—কাকা-কাকীর কথা? এমনই অবস্থা, কিছু করবারও নেই। আতঙ্কে মন তোলপাড় করে উঠল। কাকা কাকী বিহ্বল দিশেহারা। কয়েকজন নুলিয়া জেলেডিঙি নিয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল তক্ষুনি। আশ্চর্যরকমভাবে কিছুক্ষণ পরে তাদের ঘাট থেকে বেশ কিছুটা দূরে হঠাৎ শীতাংশু হাত তুলে ইঙ্গিত করল সকলকে। হৈ-হৈ করে উঠল সকলে। পরে নুলিয়ার গিয়ে তুলে আনল তাকে। পাড়ে যখন এলো, দেখে মনে হোল ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেশ কাবু হয়ে পড়েছে সে। হাত-পা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে হয়ে গেছে। মুখখানা জীবনহানির আতঙ্কে অস্বাভাবিক রকমের পাংশুটে মেরে গেছে। প্রচন্ড শক্তিতে দম নিতে লাগল শীতাংশু। শীতল অনাক্রোশে দুচোখের ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে তাকল সে অতসীর দিকে। অতসীর মন জুড়ে তখন আনন্দের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে সে। শীতাংশু ফিরে এসেছে অনাহত অক্ষত অবস্থায়।

সে ঘটনা এখনও ভাসছে চোখের সামনে।

অতসী এবারে তাড়াতাড়ি কাছে এসে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল শীতাংশুর দিকে। শীতাংশু অতসীর দুটো হাতই শক্ত মুঠোয় ধরে আরও খানিকটা নিজের কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করল তাকে। শীতাংশু বলল—অতসী এবারে যদি লাফ খেয়ে পড়ি, দুজনেই মরব।

—হ্যাঁ, বেশ মজা হবে, পরের দিন কাগজে অন্তত ছোট্ট করেও ঘটনাটা থাকবে।

—অর্থাৎ, পিকনিক করতে এসে কেচ্ছাটা ভাল করেই প্রকাশ পাবে।

—কেচ্ছাই বল আর যাই বল—যা সত্যি তাই। কেচ্ছাকে অত ভয় পাও কেন? ডাক্তারি পড়ছ, তবুও গোঁড়ামিগুলো গেল না?

অতসী হঠাৎ শীতাংশুর হাত ছাড়িয়ে টিলাটার একেবারে ধারে চলে এলো। তার চোখে পড়ল টিলার গা ঘেঁষে একটা বড় গুলঞ্চফুলের গাছ দাঁড়িয়ে। সে তাড়াতাড়ি করে হাত বাড়িয়ে একটা ডাল ধরবার চেষ্টা করল। শীতাংশু কাছে এসে বাধা দিল। হাত ধরে টেনে সরিয়ে আনল অতসীকে। ডালটায় অনেকগুলো গুলঞ্চফুল ফুটে রয়েছে। অতসী উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল—কি সুন্দর ফুলগুলো ফুটে রয়েছে—পারবে শীতাংশু ছিঁড়ে আনতে?

শীতাংশু ব্যস্ত হয়ে এবারে নিজে চেষ্টা করল। কিন্তু ডালটার নাগাল পেল না। এবারে একটু ঝুঁকে পড়ল। তাও নাগালে এলো না। দেহের খানিকটা অংশ খাদের দিকে শূন্যে বাড়িয়ে দিল। পেছন থেকে অতসী চিৎকার করে উঠল—বেশি বাহাদুরি দেখাতে যেও না শীতাংশু—থাক থাক হয়েছে।

অতসী আবার হাত বাড়িয়ে দিল। শীতাংশু ফের অতসীর হাত ধরল এগিয়ে এসে, বলল—এতোই যদি ভালবাস আমাকে, সুখেনকে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে?

—উপায় কি বল?

—কেন বিয়ে না করে থাকতে পারবে না?

—কেন পারব না—ভাল যখন বেসেছি একজনকে—অন্য কাউকে বিয়ে করার সেখানে প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—এটা কেন বুঝছ না—তোমরা ছেলে, আর আমরা মেয়ে। মেয়েদের যন্ত্রণা নানান রকমের নানান চেহারায় রূপ নেয়। এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, বিয়ে করেও যন্ত্রণা—বিয়ে না করেও যন্ত্রণা। বিয়ে না করে থাকলে তোমার-আমার মধ্যে কি কোনদিন এমন সময় আসবে না যে বিয়ে না করে থাকার যন্ত্রণা থেকে কিভাবে আমরা দুজনেই রেহাই পেতে পারি তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে? দিন যত যাবে সে চিন্তা ততই প্রকট হবে—কারণ কি জান?

—কি?

—তোমাকেও এসব কথা বুঝিয়ে বলতে হবে শীতাংশু?

—বলই না। তোমার মুখে কথাগুলো শুনতে বেশ ভালই লাগছে।

আর একটিবারের জন্যে অস্তায়মান সূর্যের দিকে তাকাল অতসী। তুম্বার্সের গভীর অরণ্যের ভয়ালতা বুঝি ঘনিয়ে আসছে। করলা নদীর তীরে টিন আর কাঠের চাল ছাওয়া ছোট ছোট বাড়িগুলো চোখে পড়ল। অস্পষ্ট আবছা হয়ে আসছে দূরের দৃশ্য। অতসী মুখ ফিরিয়ে নিল শীতাংশুর দিকে। বিচক্ষণ ভঙ্গীতে বলে

উঠল সে—মানুষ সব সময়ই চায়, তার সীমিত গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে। নিজের মধ্যে সে চায় বিস্মৃতি—এই বিস্মৃতির জন্যেই মানুষ লেখাপড়া শিখছে, বিয়ে করছে, সন্তান কামনা করছে, সংসার করছে, সংসারের মঙ্গল চাইছে। এর মধ্যে কোন ভুল নেই শীতাংশু। কেউ অবচেতন মনে চাইছে, কেউ সচেতন মনে চাইছে। তুমিও কি চাইবে না ভাবছ? তুমিও—শীতাংশু—ও-কি ছেলেমানুষি করছ শীতাংশু।

শীতাংশু হঠাৎ অতসীর হাতখানা ছেড়ে দিয়ে টিলাটার একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের সমস্ত দেহটাকে গুলঞ্চ-গাছের দিকে হেলিয়ে দিয়েছে গুলঞ্চের ডাল ভাঙবার জন্যে। সেই মুহূর্তে কেমন করে পা-টা পাথরের টুকরোয় হড়কে গিয়ে দেহের টাল না রাখতে পেরে একেবারে সোজা তীরবেগে প্রায় একশো ফুট নীচে খাদের জঙ্গলে গিয়ে পড়ল শীতাংশু। অতসীর চোখের সামনে নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা। উল্কাপাত ঘটল অতসীর শরীরে। সমস্ত দেহের ভেতর দিয়ে রক্তের হিমশীতল প্রবাহ বয়ে গেল। সে আস্ত বেকুফ সেজে বোবার মত বিকট চিৎকার করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—শী—তাং-শু!

অতসীর অসহায় আতঙ্কগ্রস্ত চিৎকারে পিকনিক করতে যারা এসেছিল তারা হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এলো কাছে। তারা সকলেই অপ্রস্তুত হয়ে ভীত দৃষ্টি মেলে দেখল তাকিয়ে নীচের দিকে—একজোড়া অসহায় নিরস্ত্র হাত ছটফট করছে শূন্যে, গাছপালার গভীরে শীতাংশুর দেহের অংশটা চাপা পড়ে গেছে। তলাকার ডালপালা নড়ছে।

অতসী সোজা নীচের দিকে তাকাল। তার মাথাটা ঘুরছে—ভীষণভাবে ঘুরছে। মনে হোল সে যেন আরও গভীর খাদে তলিয়ে যাচ্ছে। শীতাংশু কি ইচ্ছে করেই এমন কাজ করল? সে নিজেও এখুনি ঝাঁপ দেবে—মরণ-ঝাঁপ—কেউ ঠেকাতে পারবে না এরা। মৃত্যু কত সোজা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। শীতাংশু গেছে। সুখেনকে বিয়ে করতে হবে না। শীতাংশুর এই দুর্ঘটনা যত আকস্মিকই হোক, কতকটা নিজের দোষ ছাড়া আর কী? বড় বেশি গোঁয়ার্তুমি করছিল। সে অবশ্য বলেছিল ফুল ছিঁড়ে আনতে, কিন্তু সম্ভব না হলে জোর-জবরদস্তি করেনি কিছু অতসী। জীবন বিপন্ন করে ফুল ছিঁড়তে যাওয়ার দরকার কি ছিল তার? অতসীকে খুশি করতে চেয়েছিল সে? নাকি এ আত্মহনন পূর্ব পরিকল্পিত? অতসী এই মুহূর্তে নিজে কেন পারছে না ঝাঁপ দিতে? সে কি তবে শীতাংশুকে ভালবাসতে পারেনি? শীতাংশু যেমন সামান্য কারণে নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে পারল, তুচ্ছ করতে পারল, তার কিসের এতো দ্বিধা? এতক্ষণে শীতাংশুর দেহটা হয়তো বিকৃত হয়েছে। ক্ষত-বিক্ষত দেহটাকে হয়তো হাজার চেষ্টাতেও আর প্রাণ ফেরান সম্ভব হবে না। শীতাংশু মারা গেছে, একথা ভাবতেই পারল না অতসী। দুই গণ্ড বেয়ে চোখের জল ঝরতে লাগল। ভাবল সে, শীতাংশুর মৃত্যুর কৈফিয়ৎ তাকেই দিতে হবে সকলের কাছে—পুলিশ আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে। ঘটনাটা নিশ্চয় কাগজেও বেরোবে। স্রোতের মত রাষ্ট্র হয়ে পড়বে সমস্ত ঘটনা। মৃত শীতাংশু আর তাকে ঘিরে নানান গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরবে। মনের মধ্যে শীতাংশুর বিকৃত মৃত মুখখানা কল্পনা করবার চেষ্টা করল। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করল অতসীর। এই হিমেল আসন্ন সন্ধ্যায় নিজের অস্তিত্বটাকে ঠিকমত মালুম করতে পারল না সে। পাহাড় আর জঙ্গলের পরিবেশ জুড়ে তার নিরেট নিরবলম্ব ব্যথাতুর মনটা ঝোড়ো বাতাসে দোল খাওয়া একটা প্রকাণ্ড ক্যানভাসের মতই দুলতে লাগল। অতসীর মনে হোল ছায়ার মত নড়ছে টিলার ওপরের মানুষ-গুলো। অসহায়ভাবে ব্যস্ত পদচারণা করে ফিরছে সকলে। বেকুফের মত হাঁক পাড়ছে তারা খাদের নীচে কাকে উদ্দেশ করে। সেখানে মৃত শীতাংশুর দেহ ছাড়া আর কি থাকতে পারে?

অতসী এতক্ষণে ভাল করে দেখেওনি—খাদটা সত্যিই খাদ কি না? কতখানি গভীর? সেখানে বুনো গাছপালা ছাড়া আর কি আছে? একেবারে তলার দিকে ভালকরে তাকিয়ে দেখল—অতি তাজ্জব ভাবে শীতাংশুর অবিকৃত অক্ষত দেহটা এবারে দু-হাতের শক্ত মুঠোয় গাছের ডাল ধরে ঝুলছে। আরো তলায় একজন মেছো একগাছা মোটা দড়ি শীতাংশুর দিকে ছোঁড়বার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। কিছু সময় পরখ করে দেখল অতসী। দেখল, নামেই খাদ, বেশি গভীর নয়। ঘন গাছ-পালায় ঢাকা চতুর্দিক। গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে নজরে গেল ঝিলমত রয়েছে নীচে। মেছোটা তারই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। খাদটাকে যতটা গভীর গহন আর ভয়াবহ ভেবেছিল অতসী এখন দেখে মনে হচ্ছে অতটা নয়। মেছোটাকে চেনে সে। তাকে তাদের কোয়ার্টারের কাছাকাছি একটা ঝিলের ধারে বর্ষাকালে খোঁচ দিয়ে মাছ মারতে কতবার দেখেছে। দেখেছে তাকে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে, কোয়ার্টারের আশপাশের জঙ্গলে, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে। সে শুধু মাছই মারে না, কখন কখন টিয়া ময়না হরিয়াল পাখি ধরে ধরে বেড়ায়। পাখি ধরে বিক্রি করে। এ অঞ্চলের অনেকেই চেনে মেছোটাকে। মুহ্যমান টিলার লোকগুলো ফেটে পড়ল মেছোটাকে দেখে। এই মুহূর্তে অতসীর মনের মধ্যে যে বিপর্যস্ত দুঃশোর ছায়াপাত ঘটেছিল তা যেন ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। অতি অবাস্তব আর অসম্ভব ব্যাপারই ঘটে গেল। অবিশ্বাস্য চোখে দেখল সে—মেছোটা দড়ি ছুঁড়ে ঠিকমত গাছের ডালের সংগে কি করে আটকে দিল এক অলৌকিক কায়দায়। অক্ষত শীতাংশু দড়ি বেয়ে সড়সড় করে নেমে পড়ল নীচে। ওই দারুণ শীতেও অতসীর মুখমণ্ডলে আর দুই করতলে ঘাম জমে উঠেছিল ভয়ে আর আনন্দে। সারা মুখে ক্লান্তির ছায়া উঠেছিল ফুটে। একটা দুঃস্বপ্ন দেখার মতই কয়েকটা অদ্ভুত মুহূর্ত কেটে গিয়েছিল সেবার।

এরপর আর একটা দিনের জন্যে দেখা হয়েছিল তার শীতাংশুর সঙ্গে। দেখা হয়েছিল শীতাংশুর বাড়িতে। অতসী নিজেই গিয়েছিল শীতাংশুকে দেখতে। শীতাংশু একলাই ছিল তার ঘরে। মনে মনে পড়ছিল সে চেয়ারে বসে। টেবিলের ওপরে একখানা মোটা ডাক্তারি বই খোলা ছিল, আর একটা মড়ার খুলি নিয়ে নাড়া-চাড়া করছিল সে। শীতাংশু সেদিন মোটেই কথা বলেনি। অতসী লঘু পায়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শীতাংশু চোখ তুলে একটি বারের জন্যে তাকিয়েছিল অতসীর দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই মড়ার মাথার খুলিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে দিয়েছিল। অতসী নিজে থেকেই আগে কথা বলেছিল তুমি যে সেদিন অতবড় বিপদ থেকে বেঁচে ফিরে আসবে, একথা ভাবতেই পারিনি শীতাংশু—আর যা কিছু ঘটেছিল সে-তো আমারই জন্যে।

শীতাংশু সেই মুহূর্তে অতসীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল শুধু। অতসী হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে শীতাংশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিল—আমায় ক্ষমা করো শীতাংশু।

শীতাংশু তক্ষুনি চেয়ার ছেড়ে উঠে তার দু-বাহুর বিপুল শক্তিতে অতসীকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনেছিল। অতসী সেদিন মনে মনে ভেবেছিল—শীতাংশু তাকে তার দু-বাহু দিয়ে আরো বিপুল শক্তিতে দলে মুচড়ে পিষ্ট করে ফেলুক। বেহুঁস করুক দু-হাতের চাপে। শীতাংশুর দেহের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছিল একাত্ম হয়ে। যেন অনেক কালের অতৃপ্ত কামনা ফুঁসে ফুঁসে উঠেছিল সেদিন। অস্থির মুহূর্তগুলোর মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল তারা দুজনেই। অতসীর মনে হয়েছিল তার বুক ঠেলে উঠছে ফেনায়িত অশ্রু। কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল শীতাংশুর বুকখানা। অনাস্বাদিত স্পর্শ গন্ধ আর স্মৃতির আবেশে মথিত হচ্ছিল সমস্ত চেতনা।

এ ঘটনা আজ থেকে প্রায় চার বছর আগেকার। তারপর থেকে অতসীর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে বহু অশান্তিই গিয়েছে সংসারে। অপরেশবাবু এবারে আর দেরি না করে সুখেনের সঙ্গে অতসীর বিয়ের ব্যাপারটা পাকাপাকি করে ফেললেন। তড়ি-ঘড়িতে শ্রাবণের শেষ লগ্নেই পার করলেন মেয়েকে।

অতসী দেখল, আকাশের ম্রিয়মাণ চাঁদটা আবার পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। মেছোটা তখনও লন্ঠন হাতে বড় পুকুরের ধারটায় ঘুরঘুর করছে লোভদৃষ্টি মেলে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অতসী। খুট করে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ এলো কানে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, সুখেন দরজাটা বন্ধ করে হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে আসছে তার দিকে। একেবারে তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে একখানা হাত ধরে জিগ্যেস করল সে—জানলা দিয়ে এতক্ষণ ধরে কি দেখছিলে?

অতসীর সারা দেহ, থরথর করে কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি বেনারসীর আঁচল, দিয়ে চোখের জল মুছে কাঁপা-কাঁপা বিষণ্ণ গলায় বলল—মেছোটাকে।

অবাক কন্ঠে শুধাল সুখেন—মেছো?

অতসী নির্বাক রইল। সুখেন জানলা দিয়ে ভাল করে তাকিয়ে হেসে বলে উঠল——ও নিরাপদ জেলেকে! নিরাপদ ওই রকম—রাত-বিরেত নেই—সময়-অসময় নেই পাগলের মত মাছ ধরে ধরে বেড়ায়। জান, নিরাপদর একটা টুকটুকে বউ ছিল—কে যেন তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে। তারপর থেকে নিরাপদ আরও ওইরকম হয়ে গেছে।

ঘরে নিওনের আলো জ্বলছে। সুখেনকে এর আগে ভাল করে দেখেনি অতসী। সেই আলোয় লক্ষ্য করল, সুখেনের চেহারাটা বেঁটে নাদুস-নুদুস। গায়ের রঙটা তীব্র কটাশে, রস-কষহীন, চোখে পীড়াদায়ক ঠেকে, বিতৃষ্ণা জাগায়। কেমন যেন রক্তঝরা চোখ দুটো। সুখেন এবারে অতসীর দু-হাত ধরে জোর করে কাছে টানতে গেল এবং সেই সঙ্গে বলে উঠল—একে শ্রাবণের প্যাঁচপেঁচে বর্ষা, তার ওপর গাঁয়েতে বিয়ের ব্যবস্থা, আমি নিষেধই করেছিলাম এই সময়টাতে, তোমার বাবা আর আমার বাবা মিলেই তো—

অতসী ভীষণভাবে বাধা দিয়ে মুক্ত করে নিল নিজেকে। হঠাৎ মদের তীব্র কটু গন্ধ নাকে গেল তার। ভয়ে কুঁচকে গেল তার দু-চোখ, হিম হয়ে গেল শরীর। অতসী মদ কখনও চোখে দেখেনি, মদের গন্ধ কেমন তাও ঠিকমত জানে না সে, তবে আন্দাজে বুঝতে কষ্ট হল না—এ গন্ধ মদেরই গন্ধ। এমন গন্ধ স্বাভাবিক মানুষের মুখ দিয়ে বেরোয় না। ভক্ করে নাকে গেল। গাটা ঘিন-ঘিন করে উঠল। নাকে বেনারসী শাড়ীর আঁচলটা চাপা দিল। মুখ নীচু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অতসী। খাটের বাজু ধরে বসে থাকল অস্বস্তিকর স্বপ্ন মন নিয়ে। কেমন যেন অশরীরী একটা রহস্যময় পরিবেশে আসতে লাগল সে।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে দামী সিগারেট কেস বার করে সিগারেট ধরাল সুখেন।

অতসীকে ভীষণ রকম গম্ভীর আর বিষণ্ণ দেখে সে অবশ্য বিচলিত হল না বিন্দুমাত্র। কেন অতসী অমন করে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে সরে গেল তাও জানে সুখেন। তবুও কতকটা না বোঝার ভান করে শুধাল সে—অমন করে সরে গেলে যে? নাকে আঁচল চাপা দেবার কি হল?

অতসী কোন কথাই বলল না। নির্বিকার বসে রইল খাটের এক কোণায়। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর অতসীর কাছ থেকে যখন কোন জবাবই এল না, তখন ব্যাপারটাকে সহজ করে নেবার চেষ্টাতেই সরলভাবে বলে উঠল সুখেন—বুঝেছি—গন্ধ গেছে নাকে।

মুহূর্ত কয়েক নীরব রইল সে। পরে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল—মনে কিছু করো না—এটা আমার অনেকদিনের অভ্যেস—তাই আজকের দিনেও না খেয়ে থাকতে পারলুম না—জানি একদিন তো তুমি জানতেই পারবে—তাই লুকোছাপা করে আর লাভ কি? বিশ্বাস কর, বেশি না, অল্প একটু খেয়েছি।

সুখেন এবারে ফুল ছড়ান খাটের এক পাশে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল। অতসী এতটুকু নড়ল না। মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে। অতসী যেন তার অনিদ্রিত দু-চোখে কালবেলার মহাচ্ছায়ার ছবি স্পষ্ট দেখতে পেল। জানলার বাইরে জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা কালপেঁচা ডেকে উঠল বিশ্রী কর্কশ কন্ঠে। অনড় অচল বসে থাকল অতসী সুখেনের পায়ের দিকে খাটের বাজু ধরে। সুখেনের অনেক চেষ্টাতেও অতসী গেল না তার কাছে বা ফুলশয্যার বিছানাতে গা ঠেকাল না।

ভাবতে লাগল অতসী, ইচ্ছা বা রুচির বিরুদ্ধে অপরিচিত একজনকে সহজে মেনে নিতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সে এ' ক'দিনে।

শুধু নেশা করাই নয়, নেশার পরিচয় সে আগেই পেয়েছে, সুখেনের চাল-চলন, কথাবার্তা আর ব্যবহারের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পায়নি সে, বড্ডই অসংগত আর অমার্জিত মনে হয়েছে। এও ভেবেছে অতসী, সুখেনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ব্যাপারে সুখেনের যদি কিছু অপরাধ থেকে থাকে, তার থেকে ঢের বেশি অপরাধ রয়েছে তার নিজের বাবা অপরেশবাবুর। অপরেশবাবুর অদম্য ইচ্ছেতেই এ বিয়েটা ঘটে গেল। এর পেছনে কোন উপযুক্ত কারণ বা যুক্তি খুঁজে পায়নি অতসী। অপরেশবাবুর

একটা খেয়ালী ইচ্ছেই সেখানে দুর্দমনীয় প্রবল মনে হয়েছিল। তাই বিয়ের পর থেকেই আত্মীয়-অনাত্মীয় কারোর সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি অতসী। একটা বিশ্রী নিঃসংগতায় কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। এ-যেন তিলে-তিলে দগ্ধ হওয়া। এখন অতসীর যা মনের অবস্থা, যে কোন উপায়ে হঠাৎ আত্মহত্যা করা ছাড়া এই দুর্বহ জীবন থেকে তার রেহাই নেই।

অতসী বুঝতে পারল, সুখেন নিজে থেকেই ঘরের ডিম-লাইটটা জেলে নির্বোধ অসহায়ের মত শুয়ে পড়েছে খাটে। হয়তো এতক্ষণে তন্দ্রাও এসেছে। ঘরের শূন্যতা কেঁপে উঠল অতসীর কাছে। খোলা জানলা দিয়ে খানিকটা উদোম জলো-বাতাস খেলে গেল ঘরের ভেতরে। অতসীর গা'টা সির-সির করে উঠল। জানলার ফাঁক দিয়ে দুচোখ চালিয়ে দিলে মধ্যরাতের সমস্ত আকাশটাই দুলে ওঠে অতসীর কাছে। হা-হা বুকে কান্নার প্রপাত ভেঙে পড়তে চাইল। বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠল অলৌকিক এক রাতজাগা পাখির ডাকে। কেমন যেন একটা বুক দুরুদুরু অজানা আশংকা ঘিরে ধরল। ফেলে আসা জীবনের অবশ স্মৃতিটা মগজে দংশন করতে লাগল। শীতাংশুও তো বাড়ির অমতে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। সুখেনের হাত থেকে রেহাই পাবার কি উপায়ই বা তার ছিল? দুঃসাহসের সঙ্গে জাত-কুল হারিয়ে সে তো শীতাংশুর হাত ধরে বেরিয়ে আসতেই চেয়েছিল। কিন্তু নির্বিকার, নিঃস্পৃহ থেকেছে শীতাংশু। এই মুহূর্তে শীতাংশুকে প্রচন্ড রকমের একটা ফেরেব্বাজ বলেই মনে হচ্ছে তার। অথচ শীতাংশু ডাক্তারি পড়ে। মড়া কাটে। তার দায়িত্ববোধ নির্ভরযোগ্য। দুদিন পরে পাশ করে বেরিয়ে এলে মানুষের জীবন-মরণের গুরু দায়িত্ব তার ওপরে এসেই বর্তাবে। অতসীর ভবিষ্যৎ ভেবে এতটুকুও কি সে বিচলিত হয়নি? তার পড়াশোনায় মন বসবে? লাশকাটা ঘরে মড়ার ওপরে ছুরি চালাতে গিয়ে তার এতটুকুও হাত কেঁপে উঠবে না? ঘুমে তার দু-চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। আশ্চর্য নিঃশেষে শেষবারের মত এবার সে তলিয়ে যেতে লাগল। অতসীর দু-চোখের সামনে অজস্র মাকড়সার জাল বিস্তার করল। এখন এই মুহূর্তে প্রায় নিরালা ঘরে একটা দমবন্ধ হাহাকার চারিদিক থেকে উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল। তন্দ্রা-জড়িত ক্লান্ত দু-চোখের পাতায় দুঃস্বপ্ন নাচতে লাগল।

অতসী দেখতে পেল কিসের একটা পার্বণ উপলক্ষে দলে দলে উপোসী মেয়ে-পুরুষেরা চলেছে গঙ্গাস্নানে। পথে-ঘাটে

অসম্ভব ভিড়। ভিড় ঠেলে অতসী তার মা অচলা দেবীর সঙ্গে চলেছে গঙ্গা-ঘাটের দিকে। কোনমতে ভিড় ঠেলে ঘাটে এসে পৌঁছল তারা। অতসীর চোখে পড়ল, গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে বিচিত্র লীলা। জলতরঙ্গ বেজে উঠছে হাজারো নর-নারীর অবগাহন স্নানে। ঘাটেতে অজস্র কাকলি মেয়ে-পুরুষের। যৌবনোচ্ছলা তরুণ-তরুণীর দলও রয়েছে। মধ্যবয়স্ক গেরস্থ মেয়েদের কোলে-কাঁখে সন্তান। কারোর দেহ ভেঙে পড়েছে উপোসে আর শ্রান্তিতে। অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পুণ্যার্থীরা ঘাটে ঘাটে। চারিদিকে কত রঙ-বেরঙের ফুল, বেলপাতা। ছোট-বড় ছেলে-মেয়েরা মুখে নিচ্ছে শ্বেত আর রক্তচন্দনর ছাপ। পাড়েতে বিরত মানুষের দল, জলেতে তরঙ্গায়িত বেতালা সুরে। গঙ্গার জলটা আরও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। গেরুয়া জলের ঢেউয়ে তালে মানুষের ছায়াগুলো কাঁপছে। ছোট-বড় ঢেউ জেগে উঠে ভেঙে ভেঙে পড়ছে পাড়ে। গাংচিলগুলো উদ্‌ভ্রান্ত পাক খেয়ে খেয়ে।

অচলাদেবী চান সেরে ঘাটে উঠে এসেছেন। অতসী এবারে এগিয়ে গেল ঘাটের কিনারে, জলের ধারে। অতসী জলে নেমে গিয়ে শুনতে পেল কোলাহল মুখরিত বাতাসে সোঁ-সোঁ শব্দ। জলেতে দাপাদাপি। অতসী আরও খানিকটা নেমে গেল, প্রায় বুক জলে। ডুব দিতে যাবে, অকস্মাৎ কিসের একটা ঘন্টা বেজে উঠল। তার কানে গেল, ঘাটের জনতা সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে—বান আসছে, বান!

যে যার আত্মীয়স্বজনকে ডেকে বলতে শুরু করেছে সবাই—ওরে ঘাটে উঠে আয় শীগ্গির, বান আসছে!

অতসীর কানে এল তার মায়ের আর্ত কন্ঠস্বর—অতু শীগ্গির আয় মা, বান আসছে। ঘন্টা পড়ে গেছে, জলে আর থাকিসনে।

অতসী তখনও কি যে ভাবছিল তন্ময় হয়ে। মায়ের কথা সে ভ্রূক্ষেপ করল না। বান ডাকল হু-হু শব্দে। অতসী বেশ বুঝতে পারছে, সবাই উঠে যাচ্ছে পাড়ে হুড়োহুড়ি করে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সবই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেন যেন তীব্র যন্ত্রণা আর নিঃসঙ্গতার প্রতিনিধি হয়ে থাকতে চাইল না সে। সঙ্গীহীন ব্যাপ্ত চরাচরে নিজের নিরুপায় অস্তিত্বটাকে ফুৎকারে মিলিয়ে দিতে চাইল সে নীরবে। একটা দুস্তর কঠিন জলের চাপ অনুভব করল সারা দেহে।

অতসী বুঝতে পারল, মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার পেয়েছে সে ফেরি নৌকোর মাঝিদের হাতে। তক্ষুনি তারা তাকে পাঠিয়ে দিল হাসপাতালে। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ব্যস্ত হয়ে অতসীকে পরীক্ষা করে দেখলেন বারবার, কিন্তু অতসীর জীবন সম্পর্কে তারা কোন আশা-ভরসা দিতে পারলেন না। বহু ইনজেকশন ওষুধ পড়ল। ঘন-ঘন নাড়ী দেখলেন ডাক্তার, কিন্তু অতসীর নাড়ীর কোন স্পন্দন পেলেন পেলেন কিনা তিনি, বোঝা গেল না। ডাক্তারের মুখখানা গম্ভীর আর ফ্যাকাশে মনে হল। স্থির নিশ্চল হয়ে গেল সবকিছু। অতসী অনুভব করল, সে মরে গেছে। অনড় নিঃস্পন্দ তার দেহ। তার নাম-ঠিকানার কোন হদিসই পেল না কেউ। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ তার মৃতদেহটাকে রেখে দিল সনাক্ত করবার জন্য। কিন্তু কেউই এল না অতসীর মৃতদেহটাকে সনাক্ত করতে।

অতসীর মনে হল, তার মৃতদেহটা যেখানে থাকবার কথা সেখানে নেই। তার হিমশীতল বাসী লাশটা চিৎ করে শোয়ান রয়েছে হাসপাতালের অ্যানাটমিক্যাল হলের টেবিলের ওপর। অ্যানাটমিক্যাল হলটা কেমন যেন শান্ত নিস্তব্ধ। ছেলে-মেয়েরা একমনে ডিসেকশন করে চলেছে। একজন প্রবীণ ডাক্তার অ্যাপ্রন পরে পায়চারি করে ফিরছেন। থেকে থেকে এ-টেবিল সে-টেবিল ঘুরে দেখছেন—ঠিকমত ডিসেকশন হচ্ছে কি না! ছেলেমেয়েদের চোখেমুখে বিস্ময়ের চিহ্ন, কিছুটা অদ্ভুত আনন্দ আর ভীতি-বিহ্বলতা। ছেলেমেয়েদের মধ্যে শীতাংশুকে চোখে পড়ল অতসীর। শীতাংশু কেমন যেন নিষ্পন্দভাবে দাঁড়িয়েছিল। অ্যাপ্রন পরা প্রবীণ ডাক্তার শীতাংশুকে বিমর্ষ দেখে জিগ্যেস করে উঠলেন—হ্যালো শীতাংশু, হোয়াই ডু ইউ লুক স্যাড?

শীতাংশু তার দাড়ি না কামান শুকনো মুখখানা কোনমতে ডাক্তারের দিকে তুলে নিজের বিমর্ষভাবটাকে চাপা দেবার চেষ্টায় বলে উঠল—ও কিছু না, কি ডিসেক্ট করব আজ স্যার?

ডাক্তার কি ভেবে নিয়ে জিগ্যেস করলেন—থোর্যাক্স হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—তবে আজ থেকে অ্যাবডোমেন হবে। ছ-নম্বর টেবিলে চলে যাও।

অতসী শিউরে উঠল। ছ-নম্বর টেবিলে তারই মৃতদেহ রয়েছে শায়িত অবস্থায়। অতসী শীতাংশুকে চিৎকার করে ডাকবার চেষ্টা করল, দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বহু-প্রকার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই হল না। মনে হল সে যেন নিঃসীম শূন্যে মাধ্যা-কর্ষণ হারিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। শীতাংশু কিন্তু ধীরে ধীরে ছ-নম্বর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই বায়োলজির বাক্স থেকে স্ক্যালপেল, ফরসেপ, ছুরি, কাঁচি বার করল। স্ক্যালপেল হাতে করে ছ-নম্বর টেবিলের মৃতদেহটার দিকে এবারে তাকাল শীতাংশু। অতসী দেখতে পেল, স্ক্যালপেল দিয়ে অ্যাবডোমেন চিরতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই নিশ্চল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল শীতাংশু কয়েক মুহূর্তের জন্যে। অবিশ্বাস্য এক নির্মম কঠিন দৃশ্য দেখছে নাকি সে? শুধুই কি ছ-নম্বর টেবিলে শায়িত একটি নগ্ন যুবতীর শবদেহ? না, অতি পরিচিত এক নিষ্পাপ মুখ? একটা অতৃপ্ত অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষিত জীবন? নিষ্কলঙ্ক ছায়ার গভীরে নিরক্ত নিষ্প্রাণ-বিকৃত অতসীর দেহটাকে বুঝতে পারল নাকি শীতাংশু? হয়তো কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারছে না শীতাংশু। তাল করে পরখ করবার চেষ্টা করল সে। অতসী তার নিজের মৃত লাশটাকে চেনবার চেষ্টা করল। দেহ যেন কিছুটা বিকৃত হয়ে গেছে। মাথায় তার একটিও চুল নেই। ঘোলাটে চোখ দুটো ঈষৎ বোজা। অল্প একটু হাঁ-করা মুখটা যেন শেষ নিশ্বাসটুকু নেবার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যর্থ। সমস্ত শরীরে তার জারকরস মাখান। বহু পরিচিত লোকেরও এক নজরে চিনে ওঠা সম্ভব হবে না। আশ্চর্য, অতসী নিজেই তার মৃত লাশটাকে চিনে উঠতে পারল না। মুহূর্তকয়েক নিষ্পন্দ নির্বাক বিমূঢ়ের মত স্ক্যালপেল হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকল শীতাংশু, পরক্ষণেই তার মুখখানা কেমন যেন ভয়াল-কঠিন হয়ে উঠল। গোটা মুখের মাংসপেশী যথাসম্ভব শক্ত করে তেমনি যন্ত্রচালিতের মতই স্ক্যালপেল দিয়ে অতসীর পেট চিরতে এগিয়ে এল শীতাংশু। অতসী প্রচন্ড বিস্ময়ে শীতাংশুর ওপর বিশ্বাস হারাল যেন। শীতাংশুকে কেন যেন এই মুহূর্তে একটা নির্মম কঠিন পাষাণ মূর্তি মনে হল। মুহূর্ত মধ্যে প্রচন্ড একটা ভয়ার্ত চিৎকারে নড়ে উঠল অতসী—না, না, না।

দম আটকে এসেছিল তার। বুকে ভরে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হল। একটা প্রবল আবেষ্টনীর উষ্ণ চাপ অনুভব করল সে। আবর্তিত হল অতসী। আর একবার তীব্র আর্তনাদে ফেটে পড়তে চাইলেও পারল না। কে যেন তার সমস্ত শরীরটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে দুবাহুর বেষ্টনে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরেছে শূন্যে, জড়িয়ে নিয়েছে বুকের কাছে। খুবই দুর্বল মনে হল নিজেকে মুক্ত করতে। তবুও কষ্ট করেই ভয়ে ভয়ে স্বপ্নোত্থিত অতসী দুচোখ মেলে তাকাল, দেখল—উদগ্রীব লালসাতুর আর একজোড়া চোখ গিলছে তাকে। একেবারে মুখো-মুখি—রাতজাগা উষ্ণ মাতাল নিশ্বাস অনুভব করল মুখের ওপর। লক্ষ্য করল, ঘরের ডিম লাইটটা নেবান। তবুও শেষরাত্রের অবসন্ন নক্ষত্রের আলোয় চিনতে তাকে কষ্ট হল না। অতসী কোন বাধাই দিল না। তার যা কিছু একান্ত গোপন, অতীতের যা কিছু নিজস্বপ্রিয় এবং বর্তমানের ভয়-ভীতি-ঘৃণা তলিয়ে গেল এই মুহূর্তে।

# সুখের মেলা

## ধুনুরী হোসেন মিয়া এবং রাহিলা

'কি নাম তোমার?'

'মহম্মদ আলী হোসেন রিয়াজউদ্দিন খান।'

'বাপস্। এত বড় নাম একজন ধুনুরীর হয় না। অত বড় নাম নামজাদা লোকেরা ব্যবহার করেন। তোমার আসল নাম কোনটা?'

'হোসেন।'

'কোথায় বাড়ি?'

'বিহারে, ছাপরা জেলায়।'

'কতদিন আছ বাংলাদেশে?'

'চব্বিশ বছর হবে।'

'তাহলে তো বাঙালী হয়ে গেছ।'

'আজ্ঞে হাঁ, তা পেরায়।'

'এক নম্বর তুলো কত করে কেজি?'

'সাড়ে চার টাকা। কলকাতায় খুচরো দর পাঁচ টাকা।'

'কোথা থেকে কেনো?'

'হাওড়ার সালকিয়া থেকে।'

'এটা কোন দেশের তুলো?'

'পাঞ্জাবের বোধহয়।'

'লেপে তুলো জমে যায় কেন?'

'এক নম্বর তুলো হলে জমবে না। দু' নম্বর তিন নম্বর তুলো হলে জমবে।'

'এক নম্বর তুলো কতটা লাগবে একখানা লেপের মধ্যে?'

'সাড়ে তিন কেজি। চার কেজি দিলে একটু বেশি মোটা হবে। এইসব একটু সস্তা ছাপা কাপড়ের খোলে দু' কেজি করে তুলো দিয়েও হিন্দুস্থানীরা লেপ বানাচ্ছে। ওরা চটকলে, তেলের ডিপোতে কাজ করে। ভাল ছাপা কাপড়ও আছে। এটাতে করলে প'য়ত্রিশ টাকা পড়বে।'

'লাল সালুতে করলে?'

'পঞ্চাশ টাকার কম নয়।'

'খোরোতে।'

'সাতাশ আটাশ। আপনি প'য়ত্রিশ টাকাতেই করুন।'

'আচ্ছা করো। কিন্তু শোনো, খুব ধনী মানুষদের লেপ রোদে দিতে দেখেছি, সাটিন কাপড় দেওয়া—সেসব কত পড়ে।'

'হুজুর, যত গুড় দেবেন ততই মিষ্টি হবে। সাটিন দিলে পেরায় দুশো টাকা পড়ে যাবে।'

'তোমার বউ ছেলেমেয়েরা কি দেশে থাকে?'

'না, এখানেই আছে। দেশে মা বাবা আছে। এখানে আমার আরো দু'ভাই থাকে। তাদের দোকান নেই। পাড়ায় ঘুরে ঘুরে কাজ করে। এখন 'সীজেন' পড়েছে, রোজ খান কুড়ি করে লেপ হয়, ভাইরা বা যত ধুনুরী আছে আমার লেপ সেলাই করে দিচ্ছে। সাড়ে তিন টাকা লেপ-সেলাই নেবে ওরা। আপনাকে যেটা প'য়ত্রিশে দিলাম, সেটা চল্লিশ বিয়াল্লিশে বেচি।'

'প্রতি লেপে কত লাভ পাও?'

'টাকা পাঁচেক করে?'

'ওরে বাস্—কুড়িটা লেপে তাহলে তো দিনে একশো টাকা পেয়ে যাবে।'

'এই সীজেনের কটা দিন পাব বাবু। তারপর সারা বছর বসে থাকতে হয়। ঐ বালিশ তোষক করি টুকটাক করে।'

'তুমি বা বাড়ি দেশে কি করেছ?'

'আমি কিনেছি কিছু বিঘে আর একতলা চার কামরা পাকা বাড়ি করেছি। দুটো মোষ আছে। মায়ের হুকুমে বাপের নামে, ছোট দুটো ভাইয়ের নামে জমি কিনেছিলাম। কথা ছিল খোরাকী-বাদে যা জমবে সে টাকা আমাকে দেবে আর আমি সেই টাকায় এখানে খানিকটা জায়গা কিনে বাড়ি বা দোকান বাঁধব। তা বাবু, বাপও যে বিশ্বাসঘাতক হয় কে জানত! বাপ এখন খুব মদ খায়—ছোট ভাইরা বলে, কিসের টাকা? তারা ঝগড়া করলে, ভীষণ কাণ্ড হল, পিঠ বাঁচিয়ে চলে এলাম। আর কখনো দেশে যাব না।'

'এ দোকানবাড়িটা কি ভাড়ার?'

'হাঁ। কুড়ি টাকা মাসে ভাড়া লাগে। যান, এই লেপের খোলে মুড়ে তুলো নিয়ে যাচ্ছে, আপনি সেলাই বা ধুনুরীদের কাজ দেখুন যেয়ে ওদিকের মাঠটাতে। সেখানে আমার বাসা আছে। বউ ছেলেদের দেখতে পাবেন।'

আমি একজন নামকরা লোকের নাম বলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চেন তাঁকে। তিনি আমার বন্ধু। অবশ্য তিনি বাংলা জানেন না। তিনিও একজন গরিব ধুনুরীর ছেলে।'

'জানি। ধুনুরীরা সবাই প্রায় বিহারের মুসলমান। মেদিনীপুরের কিছু বাঙালী চর্মকার আছে—যারা ধুনুরীর কাজ করে।'

রাস্তার পশ্চিম পারের লাইন ঘরের পিছনে এসে দেখলাম শিশির না শুকোতেই মাঠের মাঝখানে গোটা ছয়েক লেপ মেলে সেলাই করছে কতগুলো হিন্দুস্থানী।

একজন কানে আংটো পরা পেশোয়ারী, একজন কাবুলী, দুজন তেলকল শ্রমিক, দুজন চটকল শ্রমিক বসে আছে তাদের লেপের জন্যে।

একজন ধুনুরী আমার তুলোগুলো প্রথমে বাঁখারীর ছড়ি মেরে মেরে কোষা ছাড়িয়ে নিলে চালাঘরটাতে বসে। তারপরে তাদের তাঁতের টংকার তুলে 'জিস্তা' মেরে তুলো ধুনতে বসল।

শুধোলাম, 'এই ধুন-যন্ত্রগুলো এদেশে তৈরি হয় কি?'

'না বাবু। দেশ থেকে আনি।'

বাতাস বইছিল। পেঁজা তুলোর আঁশ উড়ে এসে প্রশ্বাসের আকর্ষণে নাকের মধ্যে ঢুকছিল। গায়ের জামা-কাপড়ে জড়াচ্ছিল। মাঠের রোদে চলে গেলাম। ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

হোসেনের বউ এসে দু' মগ লাল চা আর রুটি দিয়ে গেল দুজনকে। বাসাটার সামনে অনেক খুঁটি ঠেস দেওয়া। ঘরটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি তিনটি খেলনা হাঁড়ি পাতিল নিয়ে খেলছে 'বাকস' বনটার পাশে। সামনে একটা কাঁশিমোল্লা গাছ। লাউগাছ উঠেছে বাসার চালে। মাঠের দুপাশে দুটো ডোবা। কচুরী পানায় ভরে আছে। চমৎকার সুন্দর হালকা বেগুনী রঙের ফুল ফুটে আছে পানাগুলোয়। কশাইখানার হাড়-গোড়গুলো হাতে করে বাজারের পিছনের দিকের নোংরা নাবাল জমিটাতে ফেলে দিতে এল একটা লোক—তার মাথার ওপর দিয়ে কাকের পাল উড়ে চলেছে। সঙ্গে ছুটেছে গোটা চারেক নেড়ি কুত্তা। পশ্চিম দিকের ডোবাটার বাঁশ-ঘিরে-পানা-আটকানো-কালো-মতন জলে চান করে উঠে ভিজে গ্রাপিড়ের ওপরে যেভাবে সায়া বা শাড়ি পরছে যতগুলি পুরুষ চারপাশে ছিল সবাই হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল তাকে। তার কাপড় ছাড়ার 'ব্যাভার' দেখে মনে হল মেয়েটি স্বাধীন এবং তার বিনা মূলধনের 'ব্যাওসা' আছে। আর খদ্দেরও তার কাক-চিলের মতন প্রচুর—যেমন কশাই-খানার বাতিল চামড়া বা হাড়গোড়ের ওপরে আছে ইতর জীবদের লোলুপ বুভুক্ষা।

ওমা! একটা নয় দুটো নয়, পালকে পাল বেউশো মাগীরা একে একে জলে নামছে। জলকেলি শুরু করেছে। এপারের আধুনিক প্যাটার্নের দোতলা বাড়িটার ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে যে বুড়ো মানুষটি খবরের কাগজের তলায় চাপা পড়েছিলেন তিনিও মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে জল-পরীদের দেখতে লাগলেন। পুরুষ মানুষের নাকি যত বয়স আর বিত্ত বাড়ে তত চিত্ত রসসিক্ত হয়।

টাপ-টাপ করে সূঁচের শব্দ তুলে লেপ সেলাই করছে লোকগুলো।

হোসেন এসে দাঁড়িয়েছিল এর মধ্যে। তাকে বললাম,

'হোসেন মিয়া তুমি কি লেখাপড়া জানো?'

'খানিকটা জানি বাবু, বাংলা বইটই পড়ি। আর আমরা সব্বাই যাকে বলে 'লাল সালাম।''

'আচ্ছা!'

'দেশে আমরা হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে চিরকাল গায়ে গায়েই ছিলাম। ধান-কাটা, গম চাষ করা এইসব একসঙ্গেই চলত। আমাদের দরিদ্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কিছু হল না, অর্থনৈতিক উন্নতিও হল না। পেটের ধান্ধায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কত মার খেলাম আমরা। জমিজিরেত হারা হলাম। মোট কথা নিচের তলার জীব হয়ে গড়াতে লাগলুম। সে গড়ানো এখনো চলেছে। নেই শিক্ষা, জমি, ঘর বাড়ি, মান-ইজ্জত, চাকরী-বাকরী। এই আমরা ধুনুরী হয়ে তাঁত চালাই। মেদিনীপুরের হিন্দু 'চর্মকাররা' যেমন চালায়—বোধহয় ওরাই আমাদের পূর্বপুরুষ। ...ধর্ম একটাই, মনুষ্যত্ব অর্জন—বহু সম্প্রদায়ে বহু ব্যাখ্যা দিয়ে তার চেহারা অচেনা করে ফেলেছে। শিক্ষা না পেলে ধর্ম করাই কঠিন।'

'থাক ওসব তত্ত্বকথা। অনেক জানো দেখছি তুমি।'

হোসেন মিয়া লজ্জা পেয়ে জিব কাটলে। বললে, 'ছিছি, আমি কিছুই জানি না। তবে একটা মজার কথা বাবু, আমার যে বাপ মদ খায়, যে ভাইরা আমার রক্ত-জল-করা টাকায় কেনা জমির হারাম ফসল খাচ্ছে আমাকে বঞ্চিত করে, ওরা এমনিতে খুব জ্ঞানী মানুষ।

বললাম, 'ঈদের দিন বাড়ি যাও—বউ ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাও—আনন্দ করে এসো—আর বাপের কাছে, ভাইদের কাছে টাকা চাও—দিয়ে দেবে। আজ এতদিনে নিজেদের ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়েছে নিশ্চয়ই। তোমার ছেলে-বউ নিয়ে এই হুমড়ি-খাওয়া-ঘরে থাকা চলে না। হঠাৎ হুড়মুড় করে ঘরটা পড়ে যাবে একদিন।'

কুকুর-ছাঁড় পদ্ম-চৌকাপ, কত রকম সেলাই দেখছি লেপের।

হোসেন মিয়া হঠাৎ চোখের জল মুছতে লাগল। 'বাবু আমার কত কষ্টের টাকা! সব গেল। ছেলে-মেয়েদের এই শীতের সময় জামা কাপড় দিতে পারছি না।'

হোসেন মিয়ার বউ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল: 'কাহে বে, রোতা কাহে! আওরত কা মাফিক রোতা কাহে বাবু, উ-শালা লোক বহুত হারামী আছে। ত্যাখন আমার বাত শুনা নেই। ওগো আমার বাপ! আমার মা! বাংলা কিতাব পড়হা-লিখা করে শালার দীলটা বড় সিধা হয়েছিল। ভদ্দর মানুষ হয়ে গেছিল গো! এখন রোজা কিসের গ্যা! ওগো মদ্দমানুষ!'

অদ্ভুত প্রাণবন্ত এবং নাটুকে গলা হোসেনের বউয়ের। সে কথা বলতে বলতে এসে বসে থাকা স্বামীকে পাঁজা করে ধরে তুলে 'ওগো মদ্দমানুষ' বলে একটা ঝাঁকানি দিয়ে আবার ঠুকে বসিয়ে দিতেই সবাই হা হা করে হেসে উঠল।

হোসেন মিয়া খেঁকিয়ে উঠল: 'আরে গিধাড় জানানা!'

মেয়েটি তখন তার সামনে এসে নাচের ভঙ্গিতে বার চারেক কোমর দোলাল। তার ভারি পাছাটা চমৎকার ভাবে দোল খেলো। তারপর সাপের ফণার মতন হাত দেখিয়ে কানে পাক খেয়ে অঙ্গভঙ্গি করে বাসার দিকে চলে গেল।

আমার লেপটা হয়ে গেলে হোসেন মিয়া সেটা বগলদাবায় নিয়ে দোকানে এল। আমি টাকা দিয়ে লেপ নিয়ে চলে আসছি যখন হোসেন মিয়া বললে, 'রাহিলা মানে আমার বউটা, আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বাবু। ও বলে, 'যা গেছে তার কথা ভেবে কি জোয়ান বয়সেই বুড়ো হয়ে যাবে? মনটা বুড়ো করেছ, এবার দেহটাও বুড়ো করলে আমি কি নিয়ে থাকব? ...আবার সব হবে—কেঁদো না।... আবার আমাদের সব হবে।'

বললাম, 'ঠিকই তো। রাহিলা ঠিকই বলেছে।'

'কিন্তু বাবু ও-শালীও কাঁদে। ছেলেদের কষ্টে ওর বুক ফেটে যায়। যেন ঝড়ের সময় দরিয়ায় নৌকো বেয়ে চলেছি আমাদের নিয়ে আঁধার রাতে। ও বড় ভাল মেয়ে। ওর জন্যে আমাকে আবার বাঁচতে হবে।'

—আবদুল জব্বার

(২৫)

মাস্টারমশাই খবর পাঠিয়েছেন আগামী পরশু মিঃ ভাদুড়ীর ছোট ছেলে মিঃ ডি ভাদুড়ী দমদমে পৌঁছবেন, যদি অসুবিধা না হয় আমি গেলে ভাল হয়।

নির্দিষ্ট সময়ে তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে দমদম রওনা হলাম।

মাস্টারমশাই বললেন, কোথায় উঠবে দেবাশিস জানি না। নিজের বাড়ী তো বেহাত। দাদাদের খবর দিয়েছে কিনা লেখেনি। দমদমে তাদের কেউ আসলে জানা যাবে। যদি কেউ না আসে হোটেলে উঠবে, পৌঁছে দিতে হবে হয়ত।

বললাম, বেশ, পৌঁছে দেব।

বললেন, আট বছর পরে ফিরছে, কতটা সাহেব হয়ে ফিরছে বুঝতে পারছি না।

বললাম, আপনার ছাত্র, ভক্তিশ্রদ্ধা করেন আপনাকে, আপনার কাছে কেন সাহেবিয়ানা করতে যাবেন?

না, সে কথা বলছি না। ওখানে এক-রকম ভাবে থাকত—

বললাম, দামী হোটেলে এখানেও সেইরকমভাবে থাকতে পাবেন।

দমদমে পৌঁছে মিঃ ভাদুড়ীর বড়ছেলে-দের কাউকে দেখা গেল না।

মাস্টারমশাই বললেন, হয়ত ঠিক সময়ে এসে যাবে। যদি না আসে—আচ্ছা, কোন হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে ফোন করে দেখবে না কি অশোক?

বললাম, আমি খোঁজ নিচ্ছি। বড় বড় হোটেলের টাউটরা ঘোরাফেরা করছে এখানে।

খোঁজ নিলাম। বড় হোটেলের এজেন্টরা আছে, কিন্তু মক্কেল ধরবার জন্য নয়, মক্কেলদের রিসিভ করবার জন্য, জায়গা আগেই বুক করা হয়েছে। একটা হোটেলে জায়গা আছে খবর পেলাম, তেমন ভাল নয় সেটা। মাস্টারমশাইকে খবর জানিয়ে বললাম, এখনকার মত উঠতে পারেন, তার-পর দেখেশুনে অন্য জায়গায় যাবেন।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে প্যান-আমেরিকান প্লেন পৌঁছল।

মাস্টারমশাই আমার কাছে সন্দেহ প্রকাশ করলেন দেবাশিসকে চিনতে পারবেন কি তিনি। গিয়েছিল কুড়ি-একুশ বছর বয়সের ছোকরা—

বললাম, আপনাকে চিনতে পারবেন নিশ্চয়। চুলগুলো পেকেছে, অন্য পরিবর্তন বিশেষ হয়নি।

মিঃ ভাদুড়ীর বড় ছেলেদের কাউকে দেখা গেল না।

যাত্রীরা বেরোতে লাগলেন, অধিকাংশ অভারতীয়। আরও কিছুক্ষণ পরে হাতে একটা এটাচি কেশ ও একটা সুটকেশ নিয়ে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। অতি সুপুরুষ, দামী পোশাক। য়ুরোপীয় বলে মনে হয়, কিন্তু মুখের ভাবে, গায়ের রঙে একটু সন্দেহ হয়।

সন্দেহ প্রকাশ করলাম মাস্টারমশায়ের কাছে।

ভাল করে চেয়ে দেখে বললেন, দেবা-শিস বলে মনে হচ্ছে। এগিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোকের চোখ পড়ল তাঁর দিকে। দেখলাম মুখের গম্ভীর, অন্যমনস্ক ভাব বদলে গেল, দ্রুতপদে এগিয়ে এসে হাতের জিনিস নামিয়ে রেখে প্রণাম করলেন।

অশোক, অশোক, চেঁচিয়ে ডাকলেন মাস্টারমশাই।

পরিচয় হল মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে।

এই স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, গম্ভীর যুবক মিঃ এন সি ভাদুড়ীর কুখ্যাত ছোট ছেলে যে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল। যে মাস্টারমশাইকে ভোলেনি, মাস্টারমশাইও যাকে ভোলেননি? এক নজরে মনে হয় পার্সোনালিটিওয়ালা বড় দরের অফিস একজিকিউটিভ।

হাঁটতে হাঁটতে মাস্টারমশাই বললেন, তোমার দাদাদের কাউকে দেখলাম না, খবর দাওনি কাউকে?

একটু হেসে মাথা নাড়লেন।

কোন হোটেল ঠিক করেছ কি?

আবার মাথা নাড়লেন।

বললেন, অশোক খবর নিয়েছে একটা হোটেলে জায়গা আছে। অশোক, তাড়াতাড়ি জায়গাটা বুক করে আসলে ভাল হয়।

চোখের ইঙ্গিতে মিঃ ভাদুড়ী আমাকে যেতে বারণ করে বললেন, এখন চলুন তো আপনার বাড়ীতে, তারপর দেখা যাবে।

থমকে গেলেন মাস্টারমশাই মনে হল, বললেন, তুমি আমার বাড়িতে যেতে চাচ্ছ সুখের কথা কিন্তু তোমার যে অনেক অসুবিধা হবে।

মিঃ ভাদুড়ী বললেন, সে দেখা যাবে।

আমার দিকে তাকালেন মাস্টারমশাই, দৃষ্টির অর্থ কি করব বলো তো অশোক?

উৎসাহ দিয়ে তাকালাম তাঁর দিকে, বললাম, চলুন।

শহরের দক্ষিণ পাড়ায় বাঙালীপাড়ায় কাপড়ের বড় একটা দোকানের সামনে এসে একটু দাঁড়াতে বলে নেমে গেলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন দুটো প্যাকেট হাতে নিয়ে।

গাড়ীতে মাঝে মাঝে কথা চলছিল, আমি ও মাস্টারমশাই বেশী কথা বলছিলাম, মিঃ ভাদুড়ী চুপ করে শুনছিলেন, কোন প্রশ্ন করলে সংক্ষিপ্ত, পরিষ্কার জবাব দিচ্ছিলেন। মাস্টারমশাই খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়েছেন দেখলাম।

একটু হবার কথা। তাঁর জীবনযাত্রা সবরকম বাহুল্যবর্জিত, একটু ঢিলেঢালা রকমের, যেমন মধ্যবিত্ত স্কুল, কলেজের চাকুরিওয়ালাদের হয়। বাঁধবার লোক নাই, বিধবা ভগ্নী রান্না করেন, কাজেই নিরামিষ চলে। সংসারের কাজের জন্য একটা ঝি, বাইরের কাজ অধর একা সব করে। এরকম সংসারে সদ্য আমেরিকা-ফেরৎ পয়সাওয়ালা অতিথিকে নিয়ে তিনি কি করবেন বুড়ো-মানুষ চিন্তার কথা বটে।

অতিথি কিন্তু কোন চিন্তা বা ইতস্তত না করে কাঁধে চেপে চলে এলেন য়ুরোপীয় বা আমেরিকান কায়দায় নয়, একেবারে ভারতীয় কায়দায়।

পথের মধ্যে একবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নতুন বাড়ীতে সংসার দেখে কে?

মাস্টারমশাই বললেন, সংসার নাই, দেখবে কি? সংসার ছেড়ে পালিয়েছি। এক বিধবা ভগ্নী আমার কাছে থাকেন, দুবেলা দুটি খেতে দেন।

বাড়ী পৌঁছে মাস্টারমশাই বললেন, অশোক, একটু বসো।

আমাদের বারান্দায় বসিয়ে রেখে ভেতরে গেলেন। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে মিঃ ভাদুড়ী বললেন, মাস্টারমশাই একটু বিব্রত হয়ে-ছেন। আপনার বাড়ীটা কতদূরে?

হেঁটে গেলে মিনিট দশের পথ।

বললেন, বাবার বাড়ীটা কি অবস্থায় আছে এখন বলতে পারেন?

পারি। আপনি অনেক দূরে থেকে আসছেন, ক্লান্ত, দুদিন পরে শুনবেন।

আরও দু' চারটে কথা চলছে আমাদের মধ্যে মাস্টারমশাই এলেন, বললেন, আমার ভগ্নী মহামায়া তোমাকে ডাকছেন।

আমাকে বললেন, অশোক, তুমি বাড়ী যাও এখন, ওবেলা যদি সময় হয় একবার এসো।

মিঃ ভাদুড়ীকে নমস্কার করে বেরিয়ে বাড়ীর দিকে যাবার সময় পথে দেখলাম একটা মোটা বই ও খাতা নিয়ে তুলসী

কলেজে যাচ্ছে। গাড়ী থামিয়ে তাকে ডাকলাম। মিঃ ভাদড়ীর কথা জানিয়ে বললাম, মাস্টারমশাই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন তাঁর অর্ডার থেকে নিয়ে মনে হল। হাতে সময় থাকলে পাঁচ দশ মিনিট তার সংগে কথা বলে যেয়ো।

তুলসী বলল, এ কেমন ছাত্র জেঠামণির? একটু ভেবে দেখলেন না একা বুড়ো মানুষের কত অসুবিধা হবে? আচ্ছা, আমি কলেজ থেকে ফেরবার সময় যাব, এখন সময় নাই।

তুলসী চলে গেলে, আমি বাড়ীর পথ ধরলাম।

(২৬)

আমার অন্টম ইনস্টলমেন্ট।

পেঁছবার পরদিন দিল্লী চলে গেল দেবাশিস, কথাবার্তা বিশেষ কিছু হল না। সাত দিন পরে দিল্লী থেকে ফিরে এল, সেই দিন নতুন কেনা গাড়ী এল তার জন্য। পরদিন গাড়ী করে আমাকে নিয়ে গেল একটা বাড়ী দেখতে। আমার বাড়ী থেকে মাইল খানেক দূরে। শহরের কোল ঘেঁসে দোতলা নূতন বাড়ী, এখনও কাজ চলছে। বাড়ীর ভেতরে ঘুরে ফিরে দেখিয়ে বলল, বাড়ীটা দশ বছরের জন্য লিজ নিয়েছে। একতলায় অফিস বসবে, দোতলায় সে থাকবে। দুজন আমেরিকান একসপার্ট আসছেন আসছে মাসে, তাঁরাও থাকবেন। কিছু অদলবদল করে নিতে হবে বাড়ীর ব্যবস্থায়, নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পরদিন সকালে চা খেয়ে কারখানা করবার জন্য যে জমিটার কথা বলেছিলাম, সেটা দেখতে চলল আমাকে নিয়ে। জমি দেখা হলে অশোকের বাড়ীতে গেল। এটাচি কেস থেকে কতকগুলো নকসা বের করে আধ ঘণ্টাখানেক সময় বোঝাল তার স্কীম কি। তারপর বলল, আমি কাল রাত্রে বেরিয়ে যাচ্ছি, ফিরতে ক'দিন দেরি হবে। আপনি যদি আজ সন্ধ্যার পরে সময় করতে পারেন মাস্টারমশায়ের বাড়ীতে আসবার---

অশোক রাজি হল। তাকে বলল, চলুন আপনার কারখানা একটু দেখে যাই যদি আপনার অসুবিধা না হয়।

অশোকের সংগে খানিকটা সময় কারখানা ঘুরে ফিরে দেখল, নানা রকম প্রশ্ন করল। এই ফাঁকে আমি অশোকের নতুন কাজের আইডিয়ার কথা দেবাশিসকে বললাম, তার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছি জানালাম। চুপ করে শুনল আমার কথা। আমার বক্তব্য শেষ হতে অশোককে ক'টা প্রশ্ন করল। তারপর বলল, আচ্ছা, সন্ধ্যার পরে কথাবার্তা হবে।

সন্ধ্যার পরে অশোক তার দু ছেলেকে সংগে নিয়ে আসল। দেবাশিস বাইরে গিয়েছিল, বলে গিয়েছিল সাড়ে সাতটায় ফিরবে। এই অবসরে অশোককে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু ধরতে পারলে কি দেবাশিসের প্ল্যান?

হেসে অশোক বলল, বৃহৎ ব্যাপার মনে হচ্ছে, আর মনে হচ্ছে একটা নতুন আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রি আরম্ভ হচ্ছে এখানে। ক্যাপিটেল আমেরিকান, আমেরিকান একসপার্টরা এসে পড়বে।

দেবাশিসের নিজের পোজিশান কি রকম হবে মনে হয়?

বলল, আমেরিকান একসপার্ট বেষ্টিত ম্যানেজিং ডাইরেকটর। কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় মাথা খুব পরিষ্কার, সব কিছু নখদর্পণে, বেশ পার্সোনালিটি আছে, তবে বিজনেস ব্যাপারে টাকা যায় শেষ কথাও তার। আমেরিকান একসপার্টদের সংগে মত বিরোধ ঘটলে—

একটু চিন্তা করে বলল, আমার নিজের এই লাইনে নতুন কাজ আরম্ভ করা সম্বন্ধে দ্বিধার মধ্যে পড়েছি।

বললাম, দেবাশিসের সংগে কথা হোক আগে, তোমার দ্বিধার কারণ পরে শুনব। আলাদা কাজ করবার কথা মাথায় আছে তাই কম্পিটিশনের কথা ভাবছ।

দেবাশিস ফিরে এল।

অশোক তার ছেলেদের সংগে দেবাশিসের পরিচয় করে দিচ্ছিল তুলসী ভেতর থেকে বাইরে এসে বলল, আপনারা সবাই চা খাবেন কি?

অশোক বলল, আমরা খেয়ে এসেছি।

দেবাশিস বলল, আমি চা খাব, সংগে দুখানা বিস্কুট দেবেন। দুটো প্যাকেট হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

প্যাকেট দুটো হাতে নিয়ে তুলসী বলল, দুটোতেই বিস্কুট?

দেবাশিস বলল, একটাতে চকোলেট আছে, আপনার, আপনার জেঠামণির জন্য।

প্যাকেট দুটো নিয়ে তুলসী ভেতরে চলে গেল।

কথা চলছে তুলসী থালায় করে চা, বিস্কুট, চকোলেট নিয়ে এল।

অশোকের দিকে তাকিয়ে দেবাশিস বলল, আপনার ছেলেদের সংগে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম। একটা অনুরোধ করছি তাঁদের। একটু পরিশ্রম করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন আপনাদের কাজ কোনদিকে বাড়ানো যায় কিনা, তাতে কত টাকা পড়বে, লাভের সম্ভাবনা কতটা। এখানকার চালু মাঝারি ফাউণ্ড্রি ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে যতটা পারেন খবর সংগ্রহ করুন। আমি ফিরে এসে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব। অশোকবাবু আপনার প্ল্যান কাগজে-কলমে দাঁড় করালে আমার বোঝবার সুবিধে হবে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি কাল ফ্যাকট-ফাইন্ডিংয়ের কাজে বেরোচ্ছি; মানে ক'টা জায়গায় ড্রাগস, কেমিকেলস, ফার্মাসিউটিকসের কারখানা। দেখতে হবে, খোঁজ খবর নিতে হবে। অসুবিধা না হলে আমার সংগে বেরোতে পারেন। খানিকটা অভিজ্ঞতা হবে যখন একাজে নামবার ইচ্ছা আছে। খরচপত্র আমার কারণ আমি একজন সঙ্গী খুঁজছিলাম।

অশোক জানতে চাইল কোথায় কোথায় যাওয়া হবে।

বলল, তালিকা তৈরী আছে, পরিচয়-পত্রও আছে কর্তাদের নামে। দশ বারো দিন লাগতে পারে। তার বেশী লাগলে আপনাকে ছেড়ে দেব।

অশোক রাজি হল।

কিছুক্ষণ পরে অশোক ছেলেদের নিয়ে বিদায় নিল। বলল, তুলসী বাড়ী গেলে তাকে পেঁছে দিতে পারি।

ভেতরে গিয়ে খবর নিলাম। তুলসী জানাল সে মাকে বলে এসেছে রাতে এখানে থাকবে।

অশোকরা চলে গেলে দেবাশিস খাঁচা-ঘরে ঢুকল। তার ব্যবহারের জন্য সেটা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

(২৭)

দেবাশিস ও অশোক ফিরে আসবার দুদিন পরে দেবাশিস তার ভাড়া করা বাড়ীতে চলে গেল। তার কাছে খবর পেলাম অশোকের শরীর কিছু খারাপ হয়েছে।

দেবাশিস চলে যাবার পরে অশোককে দেখতে গেলাম। বিশেষ কিছু না, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনিয়মের ফলে একটু স্বাস্থ্যহানি হয়েছে।

বলল, কাল আমি যেতাম, আপনি কেন কষ্ট করে এলেন?

আধ ঘণ্টা মত সময় নানা রকম কথা হল। তার কথা থেকে বুঝলাম নতুন কাজের আইডিয়া সে এক রকম ছেড়ে দিয়েছে। খাটবার শক্তি কমে গিয়েছে। বড় কিছু করবার মত টাকা নাই, ছোটখাটো কিছু করা যায় হয়ত, কিন্তু তা থেকে লাভ টানা যাবে না। তার চেয়ে ফাউণ্ড্রির কাজ বাড়াবার দিকে সে টাকা খরচ করলে লাভ পাওয়া যাবে মনে হয়।

বললাম, দেবাশিসের সংগে যোগ দিতে চাও না?

বলল, তাঁর ক্যাপিটেলের অভাব আছে মনে হয় না, কুড়ি লাখের ওপরে আমেরিকা থেকে তুলেছেন। আর তাঁর কাজে সাহায্য করা আমার সাধ্যের বাইরে। মিঃ ভাদড়ীর কাজের উন্নতি কামনা করা ছাড়া আমার কিছু করবার আছে মনে হয় না।

দেবাশিসের সম্বন্ধে অনেক কথা বলল, প্রশংসা করে। শেষে বলল, বড় জিনিস গড়ে তোলবার শক্তি ওঁর আছে এতে কোন সন্দেহ নাই আমার মনে। যেমন মাথা তেমনি কঠোর পরিশ্রম করবার শক্তি। কাজ তাঁর ধ্যানজ্ঞান। পনের দিন ঘুরে বেড়ালাম এক সংগে, একটা বাজে কথা মুখ ফসকে বেরোতে শুনলাম না। ভারি আশ্চর্য লেগেছে আমার।

বাড়ী ফেরবার পথে ভাবছিলাম একটা পুরনো কথা। জায়েন্ট মরবে না মনস্টার মরবে দেবাশিসের সংগে পরিচয় হবার পরে এই ছিল আমার প্রশ্ন, আমার উৎকণ্ঠার বিষয়। মনস্টার মরেছে কি? না মার খেয়ে মরবার মত হয়ে পড়ে রয়েছে?

দেবাশিস খুব ব্যস্ত, তার আমেরিকান একসপার্টরা এসে গিয়েছেন, কারখানার বাড়ীঘর উঠছে, নানা রকমের মাল আসছে আমেরিকা থেকে। পাঁচ সাত দিন পরে

পরে দশ পনের মিনিটের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

মাস কয়েক কেটে গেল।

দিন পনের দেবাশিসের সঙ্গে দেখা নাই, শুনেছিলাম সে বাইরে গিয়েছে। তারপর একদিন সকালে সাইকেল নিয়ে একটি লোক এসে একখানা চিঠি দিল। দেবাশিসের চিঠি। লিখেছে, মাস্টারমশাই, পিসীমাকে বলবেন আজ দুপুরে আমার জন্য যেন দু'টি ভাত রাখেন। বারোটা নাগাদ যাব।

মহামায়াকে চিঠির কথা বললাম।

বাইরে ফিরে এসে খবরের কাগজটা হাতে নিয়েছি গাড়ীর শব্দ পেলাম। অশোকের বড় ছেলে রমেন বারান্দায় উঠে এসে বলল, আপনি একবার আসুন। ফণীর মা মারা গিয়েছেন, বাবা ও বাড়ীতে রয়েছেন।

চমকে উঠলাম, তুলসীর মা মারা গিয়েছেন?

মহামায়াকে খবর জানিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে অশোকের গাড়ীতে তুলসীদের বাড়ীতে পৌঁছলাম। আমাদের নামিয়ে দিয়ে রমেন গাড়ী নিয়ে বাড়ীতে গেল তার মাকে আনবার জন্য।

দেখলাম কয়েকজন প্রতিবেশী এসেছেন, অশোক পায়চারি করছে উঠোনে। মহামায়া ঘরে গেল। অশোক আমার কাছে এসে বলল, কাল রাত থেকে রক্ত দাস্ত ও বমি আরম্ভ হয়েছিল। ডাক্তার ডেকেছিল ফণী। ওষুধ দেয়া হয়েছিল, তুলসী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে ক'টা ইনজেকশান দিয়েছিল, কোন উপকার হয়নি। ভোরবেলা ফণী আমাকে ডাকতে গিয়েছিল, আমি এসে গাড়ী পাঠিয়ে ডাক্তারকে এনেছিলাম। তিনি পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন হার্ট ফেলিওর।

ঘরে ঢুকে দেখলাম মেঝেতে খান দুই ডাক্তারী বই, ইনজেকশানের সরঞ্জাম, ওষুধের শিশি, তুলসী মায়ের বুকের ওপরে মাথা রেখে দু'হাতে তাঁকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

অশোকের ছেলেরা ও প্রতিবেশীরা সব ব্যবস্থা করছিলেন। মহামায়া তুলসীকে জড়িয়ে ধরে বাইরে নিয়ে এল। অশোক তার ছোট ছেলেকে বলল, তাদের দু'জনকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে। তুলসী মহামায়ার হাত ছাড়িয়ে ছুটে এসে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, আমার কি হল জেঠামণি, কোথায় যাব আমি মাকে ছেড়ে?

একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল বাড়ীর সামনে, দেবাশিস নেমে এসে কাছে দাঁড়াল।

তুলসীকে বললাম, আমার কাছে যাবি তুই, চল।

তাকে ধরে নিয়ে অশোকের গাড়ীর দিকে এগোতে দেবাশিস বলল, আমার গাড়ীতে উঠুন, অশোকবাবুর গাড়ীটা দরকার হতে পারে।

মহামায়া ও তুলসীকে দেবাশিসের গাড়ীতে বসিয়ে অশোককে বললাম, ঘরগুলোর তালা দিয়ো, কাজ শেষ হলে ফণীকে আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে ব'লো রমেন বা সুরেনকে, সেখানে তার হবিষ্যের ব্যবস্থা হবে।

মৃতদেহ বাইরে আনা হল। তুলসী গাড়ী থেকে নেমে ছুটে গিয়ে মায়ের পায়ে মাথা রেখে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। তাকে তুলে আনতে হল।

বরদাবাবুর বড় ছেলেকে খবর দেয়া হয়েছিল, সে এল না, ফণীকে মায়ের শ্রাদ্ধ করতে হল।

ফণীর ব্যবস্থা অশোক করল। সে বাড়ীতে রইল, কারখানার দু'জন লোকও বাড়ীতে স্থান পেল, তুলসীর একা ও বাড়ীতে থাকা চলে না, সে আমার কাছে রইল।

মাসখানেক যেতে তুলসী পড়াশোনা আরম্ভ করল। আরও মাস দুই যেতে লক্ষ্য করলাম তুলসীর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটছে। পরিবর্তনের মানে কি ধরতে একটু সময় লাগল। পরিবর্তনের একটা লক্ষণ দেখলাম সে বুড়ো জেঠামণির ওপরে আরও নির্ভরশীল হয়েছে, আবার তাঁর অভিভাবিকা পদে ওঠবার চেষ্টাও করছে। আগেও করত ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে। আরেকটা লক্ষণ দেখলাম সকাল বেলা ও সন্ধ্যাবেলা কিছুটা সময় মহামায়ার সঙ্গে তার পুজোর ঘরে, মানে তার শোবার ঘরের এক কোণে যেখানে তার দেবদেবীর ছবি, পুজো করবার দু'চারটে তৈজসপত্র থাকে সেখানে কাটাতে আরম্ভ করেছে। তারপর দেখলাম ভেতরের আঙিনায় তুলসী গাছ লাগিয়ে তুলসীমঞ্চ তৈরী করেছিল মহামায়া সকালে সেটা গোবর জল দিয়ে নিকোতে, সন্ধ্যার সময় বাড়ী থাকলে সেখানে প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজাতে আরম্ভ করল। প্রদীপ দেবার সময় মহামায়ার তসরের থান পরত, ক'দিন পরে দেখলাম লাল পাড় তসরের শাড়ি উঠেছে অঙ্গে। সম্ভবত মহামায়ার হস্তক্ষেপের ফলে এটা ঘটল।

ডাক্তারি পড়ছে যে বছর তেইশের মেয়ে আড়াল থেকে তার এই কাণ্ড দেখে কৌতুক বোধ করতাম, ভালও লাগত। আমাকে দেখে লজ্জা পেতে পারে মনে করে সামনে যেতাম না। তারপর দেখলাম এটা ভুল, লজ্জা পাবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করল না দু' একদিন বারান্দায় আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। একদিন ডাকলাম প্রদীপ দিয়ে শাঁক বাজিয়ে ফেরবার সময়ে। কাছে এসে দাঁড়াল হাসিমুখে। দাঁড়াবার ভঙ্গীটা নতুন লাগল। বললাম, একটা শেমিজ কি ব্লাউজ পরিস।

মুখ তুলে বলল, কেন? তোমাকে লজ্জা করব কি জেঠামণি?

বললাম, আমাকে লজ্জা করবি কেন? বাইরের কেউ হঠাৎ এসে পড়লে—

কেউ আসবে না।

গলায় ওটা কি পরেছিস? এতদিন তো গলা খালি দেখেছি।

একটু হেসে বলল, তুলসীর মালা। পিসীমা দিয়েছেন।

আচ্ছা, যা এবার।

এরপর মাস দুই খুব ব্যস্ত রইল তুলসী তার পরীক্ষা নিয়ে। রাত জেগে পড়তে লাগল। ঘরে আলো জেলে পড়লে মহামায়ার ঘুম হবে না বলে খাঁচাঘরে বসে পড়তে লাগল। তার ফলে আমাকে বারান্দায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে আরাম চেয়ারে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, ওটা তোমার কি হচ্ছে জেঠামণি? বুড়ো মানুষ, রাতে ঘুমুতে না পারলে—

বললাম, কি করতে হবে আমাকে তাহলে?

নিজের ঘরে শুয়ে আরাম করে ঘুমুবে। আমার ঘুম পেলে ঘর বন্ধ করে ভেতরে চলে যাব।

যদি পড়তে পড়তে খাঁচাঘরে ঘুমিয়ে পড়িস।

হাসতে লাগল, সে চান্স নাই বলা যায় না।

বললাম, কাল একটা টেবিল ল্যাম্প কিনে আনিস। সেটা জেলে পড়লে মহামায়ার চোখে আলো লাগবে না।

শেষ পরীক্ষার দিন তুলসীর ফিরতে দেরি হচ্ছিল। ও মেয়ে তো দেরি করে না বাড়ী ফিরতে। একটু চিন্তার ভাব এল মনে সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে।

অশোক এল।

ক'দিন তাকে দেখিনি; তার নিজের, বাড়ীর সকলের কুশল প্রশ্ন করলাম, কাজ কর্মের কথা জিজ্ঞেস করলাম। কাজ বাড়াচ্ছে অশোকের ছেলেরা, কারখানা বড় করছে বলছিল অশোক। সাইকেল রিকসার বেল বাজল।

তুলসী এল বোধ হয়, উঠে দাঁড়ালাম।

তুলসী বারান্দায় উঠতে বললাম, এত

দেরি কেন তোর? পরীক্ষা ভালভাবে হয়েছে তো?

বলল, বাড়ী গিয়েছিলাম ফণীর সঙ্গে দেখা করতে। খিদে পেয়েছে, পেট ঠাণ্ডা হলে কথা বলব।

অশোককে দেখে বলল, ভাল আছেন বড়বাবু? বসুন, চা করে আনছি।

ভেতরে যাবার আগে বলল, একটু দেরি হলে উঠে পড়বেন না যেন।

মিনিট পনের পরে ফিরে এল, কাপড় বদলে, দু' হাতে দুটো ডিশ নিয়ে।

বললাম, খিদে পেয়েছে বললি, এ সব করতে গেলি কেন?

বলল, পিসীমা সব ঠিক করে রেখে-ছিলেন, ভেজে দিলেন। আমাকে ক'খানা খাইয়ে দিয়েছেন, আরও ভাজছেন।

ভেতরে গিয়ে একটু পরে চা নিয়ে এল, বলল, বড়বাবু খান। আবার ভেতর গেল।

চা খেয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে ওঠবার সময় অশোক বলল, কাল মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা হল, তাঁর বাড়ীর সামনে। বেরোচ্ছিলেন, সঙ্গে দু'জন সাহেব। দু' একটা কথা হল।

বললাম, ব্যস্ত আছে কাজে, আমার সঙ্গে সাত আট দিন দেখা হয় না।

অশোক চলে গেলে ভেতরে গিয়ে তুলসীকে ডাকলাম। মহামায়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, এখন পিসীমার ঘরে একটু বসছি, এরপর কিছুক্ষণের জন্য রান্না-ঘরে যাব। খাবার পরে গল্প করব। পরীক্ষায় পাশ করতে পারি বলে মনে হয়।

রাতের খাওয়া শেষ হলে তুলসী বলল, আজ পিসীমার ঘরে বসে গল্প হবে, তুমি এসো। অধরকে বলছি সব বন্ধ করে শুতে যাবে।

ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে গল্পের আসর বসল। তুলসী নিজের বালিশ দুটো আমাকে দিয়ে বলল, ঠেস দিয়ে বসো আরাম করে, একখানা চাদর দিয়ে পা ঢেকে দিল।

বললাম, কি গল্প হবে? ডাক্তারের বিজ্ঞানের না ভূতের?

বলল, আমি গল্প বলব, তোমরা শুনবে।

বললাম, ভাল প্রস্তাব।

তুলসী বলল, আজ বাড়ীতে গিয়েছিলাম ফণীর সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। ঠিক তা নয়, দু' চারটে জিনিস আনতে গিয়েছিলাম। ফণীকে বলে জিনিসগুলো আনলাম, নইলে কিছু মনে করত হয়ত। জিনিসগুলো কি শোন। মার একখানা গীতা, একটা ছোট রূপোর কৌটো, তাতে কেদারনাথ ও বদ্রি-নাথের নির্মাল্য থাকত, তাঁর এক কাকার কাছে মা এই নির্মাল্য পেয়েছিলেন শুনেছি, বিয়ের পরে বাবার সঙ্গে তোলা মার একখানা কাচ ভাঙা ফটো আর লাল রেশমি সুতোয় মার হাতে আমার নাম লেখা একখানা ছোট বৃন্দাবনী ছাপা শাড়ি। মার গিটারটা আনবার ইচ্ছা ছিল, নষ্ট হয়ে গিয়েছে অযত্নে পড়ে থেকে, আনলাম না।

মা দেখতে বেশ ভাল ছিলেন, বড়লোকের মেয়ে, বি-এ পাশ। অনেক ভাল বিয়ে হতে পারত তাঁর, হয়নি। ভালবাসার বিয়ে হয়েছিল তাঁর। বাবা আমার এক মামার বন্ধু ছিলেন, ও বাড়ীতে যাতায়াত ছিল তাঁর। চেহারা ভাল, শৌখিন পোশাক পরিচ্ছদ, লেখাপড়া জানেন, অল্প বয়সে ভাল চাকুরি করতেন, দেশে বাড়ীঘর, জমিজমা ছিল। দাদুর আপত্তি সত্ত্বেও মার ইচ্ছা ও মামার চেষ্টায় বিয়ে হলে গেল।

সেই ভালবাসার বিয়ের কি পরিণতি হল তোমরা দু'জনে জানো। ক'টা বছর হয়ত সুখেই কেটেছিল মার। বেশ শৌখিন মানুষ ছিলেন মা, ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ, ঠাকুর দেবতায় গভীর ভক্তি ছিল। বাড়ীটা তৈরী হলে নিজের হাতে ফুলের বাগান করেছিলেন পুজো করবার ফুলের জন্য, সুন্দর তুলসীমঞ্চ করেছিলেন। তুলসীমঞ্চ নিজের হাতে নিকোতেন, সন্ধ্যাবেলা মঞ্চে প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করতেন, শাঁখ বাজাতেন। ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, আমার বেশ মনে আছে। এ জিনিসটা পেয়েছিলেন তাঁর মার কাছে। বড়লোকের বাড়ীর কর্ত্রী, পুরনো আগের নিয়ম মেনে চলতেন। দিদিমার তৈরী তুলসীমঞ্চটা আর নাই, মামারা বাড়ী ভাগ করবার সময়ে সেটা ভেঙ্গে পার্টিশান দেয়াল তুলেছেন।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া করপোরেশনে চাকুরী করতেন বাবা, শুনেছি একটা সেকশানের কর্তার পদে উঠেছিলেন। কোম্পানী ফেল করল। সে চাকুরি গেল, একটা ছোট চাকুরি যোগাড় হল। তার আগে থেকে বাড়ীতে অশান্তি আরম্ভ হয়েছিল।

একদিন ভালবেসে যাঁকে বিয়ে করে-ছিলেন মা, চরম তাচ্ছিল্য, অপমান, লাঞ্ছনা পেয়ে তাঁকে ত্যাগ করে সরে যেতে হল। দারিদ্র্যের কষ্টে ভয় পেতেন না মা, অসম্ভব খাটতে পারতেন। অপমান গায়ে মাখতেন না, মতিচ্ছন্ন, নেশাখোর, অর্থলোভী স্বামীর মতিগতিতে ভয় পেয়ে চলে গেলেন, নিজে রোজগার করে আমার পড়বার খরচ চালাবেন প্রতিজ্ঞা করে। তিনি জানতেন না তাঁর দেয়া টাকা বাবা কেড়ে নিতেন, আমার পড়াশোনা আগেই বন্ধ হয়েছিল।

সংসারে আটানব্বই জন লোক তো দরিদ্র, তাই না জ্যেঠামণি? দরিদ্র হলেই কি উচ্ছন্নে যায় মানুষ? তাহলে মানুষ কোথায় পাব দেশে? দারিদ্র্যের সঙ্গে অসম্ভব লোভ এসেছিল বলে বাবা পাগল হয়ে গিয়ে-ছিলেন, অতি স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী হয়েছিলেন।

মার সমস্ত জীবনটা একটা গল্পের মত মনের মধ্যে বাসা করে রয়েছে। সুন্দর ছিল তাঁর বাইরের রূপ। আরও সুন্দর ছিল তাঁর ভেতরের রূপ। উন্নত আদর্শ ছিল তাঁর মনে পতিব্রতা স্ত্রীর, কর্মকুশলা গৃহিণীর, স্নেহময়ী মায়ের। কোন কাজে লাগল কি তাঁর আদর্শবাদ?

জ্যেঠামণির দয়ায়, অশোকবাবুর দয়ায় শেষের ক'দিন মনে কিছুটা শান্তি পেয়ে- [illegible]। তুলসী কাজ শিখছে, আমি [illegible] ড়াচ্ছি, দুটো অন্নের সংস্থান [illegible] স্বামীর ভিটায় বাস করতে [illegible] এতেই সুখী হয়েছিলেন তিনি। একটা ভাবনা ছিল মনে আমার জন্য। তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিলাম আমার ভার তো জেঠা-মণি নিয়েছেন, তুমি একটুকুও ভেবো না আমার জন্য। নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে আমার বিয়ে করা যে কোনমতে উচিত নয় মা একথা কি বুঝতে পারছ না? বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, দেবতার পায়ে তোকে দিয়ে দিয়েছি, তুই তাঁর, আমি আর ভাবব না।

অকালে বিনা চিকিৎসায় মা মারা গেলেন জ্যেঠামণি। তোমার কাছে থেকে পড়াশোনার মধ্যে থেকে তাঁর কথা ভুলতে পারি না, মনে হয় তাঁকে সুখী করতে পারলাম না, একটা সুন্দর জীবন দুঃখ পেয়ে অকালে বিদায় নিল সংসার থেকে। কত ভাল হত যদি তার মুখ হাসিতে ভরে দিতে পারতাম। এটা অবশ্য আমার কথা। জানতাম ভগবানকে বুকের মধ্যে রেখে মা লড়াই করেছেন সংসারের সঙ্গে, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর মার খেয়ে হার স্বীকার করেননি।

মাঝে মাঝে কেমন হয়ে যায় মন, কান্না চাপতে পারি না। তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে দু-তিনটে জিনিস নিয়ে এলাম আজ বাড়ীতে গিয়ে। আমার চোখের সামনে থাকবে তাঁর গীতা তাঁর নির্মাল্যের কৌটো, তাঁর দুঃখের জীবনে এক সময়ে সুখের স্মৃতি কাচভাঙা ফটোখানা।

তুলসী চুপ করল। মহামায়ার দিকে তাকালাম, তার দু' চোখ থেকে জল পড়ছিল। তুলসী থামতে দু' হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

তুলসীর কথা শুনে বুঝলাম আমার একটু ভুল হয়েছিল। মহামায়ার দৃষ্টান্ত দেখে নয়, তার মার কথা মনে রেখে তুলসী-মঞ্চ নিকোতে, প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজাতে শুরু করেছিল তুলসী। আরও বুঝলাম বাইরে থেকে দেখতে এই চটপটে, ঝকঝকে মেয়েটির মনে পুরনো দিনের আদর্শ, পুরনো দিনের ভগবদ্ভক্তি মূল বিস্তার করেছে ছোটবেলা থেকে। তার আবেগপ্রবণ স্বভাবের সব সরসতা এই আদর্শ ও ভক্তিকে আরও উজ্জ্বলতা দিয়েছে সে বড় হবার পরে।

যে বস্তুর ইঙ্গিত পেয়েছিলাম তুলসীর সঙ্গে প্রথম আলাপের পরে তার সন্ধান পাওয়া গেল।

তুলসীর মাথায় হাত রেখে বললাম, তোর গল্প শুনে ভাল লাগল, এবার দোর বন্ধ করে বিছনায় যা, আমি যাচ্ছি।

হ্যাঁ, শুতে যাও তুমি, তুলসী বলল।

(ক্রমশঃ)

# গঙ্গার কোল ঘেঁষে ঘণ্টাধ্বনি-মুখর ব্যাণ্ডেল ঘুরে আসুন

গির্জার ঘন্টাধ্বনির মধ্যে একটা করুণ অথচ প্রত্যয়িত সুর ভেসে বেড়ায়। কেমন যেন মনে হয় চোখে না দেখা অনুষ্ঠানের উচ্চারিত মন্ত্র যদি শুধু কানে আসতো কিংবা দূরের গির্জার ঘণ্টাধ্বনি যদি অবসর মুহূর্তগুলি ভরিয়ে দিত তবে তার নিস্তরঙ্গ আনন্দ উপভোগ করা যেত বুক ডুবিয়ে। খুব ভোরে খোলা মাঠের অন্তর পেরিয়ে আজানের সুর যে কোন মানুষকে নতুন দিনের সন্ধান দিতে পারে।

ব্যাণ্ডেল চার্চে গিয়ে প্রাঙ্গনটা ঘুরে আসার পর প্রার্থনা-ঘণ্টা বেজে উঠল। শীতের মিষ্টি রোদ্দুর এসে পড়েছে সমস্ত চত্বরটায়. রোদে পিঠ দিয়ে প্রার্থনা দেখছিলাম। সারি সারি মানুষ নিবিষ্ট চিত্তে যিশু-মেরির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। দীপাধারে মোমবাতির স্নিগ্ধ আলো গিয়ে পড়েছে যিশু-মেরির মূর্তির ওপর। সমস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে এক একটি লাইন। সব মিলিয়ে প্রার্থনা ঘরটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

হাওড়া স্টেশন থেকে ব্যাণ্ডেল মাইল পঁচিশেক দূরে। ব্যাণ্ডেল থেকে চার্চ সামান্য দূরে, হেঁটে বা রিকসায় যেতে পারেন। চার্চটিই ব্যাণ্ডেলের একমাত্র আকর্ষণ। পর্তুগীজরা চার্চটি নির্মাণ করেন ১৫৫৯ খৃঃ। অনেকের মতে এটিই বাংলাদেশের খৃষ্টানদের আদি উপাসনা মন্দির। গির্জার ভেতরে দেওয়ালের গায়ে প্রচুর ছবি খোদাই করা আছে। প্রত্যেকটি ঘরই ঝকঝকে তকতকে। ছোট্ট বাগানের ভেতর দিয়ে ছাদে ওঠার সিঁড়ি। ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের গঙ্গা, গঙ্গার ওপারের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

অনেকবারই গির্জাটি যুদ্ধবিগ্রহে ধ্বংস ও ভস্মিভূত হয়েছে। ১৬৩১ সালে মোগলদের কাছে পর্তুগীজরা পরাজিত হয়। হুগলী অধিকার করার সময় পর্তুগীজদের দুর্গ ও এই গির্জা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সে সময় বহু খৃষ্টানকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আগ্রায়। এ নিয়ে সুন্দর একটা প্রবাদ আছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর আদেশ দিলেন বন্দী পাদ্রী দা' ক্রুজকে উন্মত্ত হাতির পায়ের সামনে ফেলে দাও। হলও তাই। কিন্তু মত্ত হাতি দা' ক্রুজকে পদদলিত করার বদলে শুঁড় দিয়ে তুলে আদর করতে লাগল। এতে সম্রাট বিস্মিত হলেন, মনে মনে ভয়ও পেলেন। দা' ক্রুজকে অব্যাহতি দিলেন। দা' ক্রুজের অনুরোধেই ব্যাণ্ডেলের গির্জা আবার তৈরী করার অনুমতি দিলেন। গির্জা নির্মাণের খরচ বাবদ বহু নিষ্কর জমি দিয়ে দিলেন। উন্মত্ত হাতির পায়ের তলা থেকে দা' ক্রুজের আশ্চর্যভাবে রক্ষা পাওয়ার ঘটনাটি স্মরণ করে এখনও এই গির্জায় 'ডোমিংগো দা' ক্রুজ' নামে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আরও একটি প্রবাদ জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। ম্যা মেরির যে মূর্তিটি এখন গির্জায় আছে সেটি আগে হুগলীর সেনা-নিবাসে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মূর্তিটি পাদ্রী ক্রুজের খুব ভাল লেগেছিল। ক্রুজের এক বন্ধুও মূর্তিটির অনুরক্ত ছিলেন। মোগল পর্তুগীজ সংঘর্ষের সময় মূর্তিটি বিনষ্ট হবার আশঙ্কায় বন্ধুটি মূর্তিটিকে নিয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, পরে আর মূর্তিটির কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। পাদ্রী ক্রুজ এই ঘটনায় খুব আঘাত পেয়েছিলেন এবং বন্ধু ও মূর্তিটি ফিরে পাওয়ার জন্যে রাতদিন প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আগ্রা থেকে মুক্তি পাবার পর ভারতবর্ষ ও সিংহলের খৃষ্টানদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন গির্জা সংস্কারের অর্থ সাহায্যের জন্যে। অবশেষে তিনি গির্জা সংস্কারের কাজে লেগে যান। সংস্কারের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে তিনি দেখলেন গির্জার সামনের নদীর জল ভীষণভাবে আছাড় খাচ্ছে। জলের শব্দে ক্রুজের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শুনতে পেলেন জলের মধ্যে থেকে বহুদিন পূর্বের জলমগ্ন বন্ধুটি

তাঁকে ডাকছেন। জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন ধবধবে জ্যোৎস্নায় নদীর একটা দিক ঝলমল করছে আর জ্যোৎস্না পেরিয়ে একটি লোক তাঁর দিকে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল, জ্যোৎস্না মিলিয়ে গেল। পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙার পর দা' ক্রুজ দেখলেন প্রচুর লোক গির্জার সামনে জমায়েত হয়ে বলাবলি করছে 'গুরুমা এসেছেন'। দা' ক্রুজ চমকে উঠলেন, একটু এগিয়ে যেতেই দেখলেন মেরীর মূর্তিটি ফিরে এসেছে। আনন্দে উল্লাস করে উঠলেন দা' ক্রুজ, তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মূর্তিটি আর কখনও যে ফিরে পাবেন এ আশা ছিল না। গত রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, প্রিয় বন্ধুটির জন্যে কষ্ট বোধ করলেন দা' ক্রুজ। তারপর খুব ধুমধাম করে মেরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

গির্জার দক্ষিণে কয়েকটি সমাধির মধ্যে দেখতে পাবেন জাহাজের একটি মাস্তুল পোঁতা রয়েছে। এটি নিয়েও অদ্ভুত ধরনের এক কাহিনী আছে। যেদিন মেরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিনই হঠাৎ একটি জাহাজ এসে সামনের ঘাটে ভিড়ল। জাহাজ থেকে নেমে এলেন ক্যাপটেন। বললেন, জাহাজটি বঙ্গোপসাগরে ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়ে। পরিত্রাণের কোন পথ না পেয়ে তিনি মাতা মেরীর কাছে বারবার প্রার্থনা করতে থাকেন জাহাজটিকে নিরাপদ কোন বন্দরে পৌঁছে দেবার জন্যে। ঝড় থেমে গেলে সহসা ক্যাপটেন দেখতে পান তিনি জাহাজ সমেত এই গির্জার ঘাটে এসে পৌঁছেছেন।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার পর জাহাজের নাবিকরা মেরীর প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগ দিলেন খুশিমনে আর মানত রক্ষার জন্যে ক্যাপটেন জাহাজ থেকে একটি মাস্তুল নিয়ে গির্জায় উপহার দিলেন। সেই থেকেই মাস্তুলটি পোঁতা রয়েছে প্রাঙ্গণে।

গির্জার সামনে বিস্তৃত মাঠ, মাঠের পরে গঙ্গা। প্রাঙ্গণে কিছু গাছপালা, শীতের দিনে রোদছায়া প্রাঙ্গণে গাছের নীচে গল্প-গুজব করতে ভাল লাগবে। যে কোন একটা দিনের ছুটিতে সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসার কোন অসুবিধে নেই। এমনকি কিছু জিনিষপত্র কেনাকাটা করে নিয়ে পিকনিক করাও যেতে পারে পাশাপাশি গাছপালা-ওলা মাঠে। শীতকালের পিকনিক স্পট হিসেবে ব্যাণ্ডেল আপনি অনায়াসেই বেছে নিতে পারেন। গঙ্গা সেদিক থেকে প্রচুর সহায়তা করবে। পিকনিক সেরে গঙ্গায় নৌকো চড়ার ইচ্ছে করলেও পেয়ে যাবেন ভাড়াটে নৌকা। ফুরোনে সে আপনাকে বেশ খানিকদূর ঘুরিয়ে আনবে, ওপারেও যেতে পারেন। দাঁড় বাইতে জানলে বা উৎসাহী হলে নৌকা ভ্রমণ বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

—ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

# যদুনাথ সরকার

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

জীবনব্যাপী ইতিহাস চর্চায় যদুনাথ সরকার, সতের শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত, ভারতের এই দুশ বছরের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস নতুনভাবে আবিষ্কার করে গেছেন। শাজাহান আওরঙ্গজেবের আমল থেকে দ্বিতীয় শাহ আলম, শিবাজী থেকে তাঁর উত্তরাধিকারী পেশোয়াদের আমল নানান তথ্যে ও প্রমাণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পেশোয়াদের সময়ে মারাঠা জাতির চারিত্রশৈথিল্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বই এই জাতিকে মোগল সাম্রাজ্যের ওপর অধিকার বিস্তারে অক্ষম করেছিল—তাই দেশপ্রেমিক যদুনাথ ক্ষোভ করেছিলেন আন্তরিকভাবে, বহু রচনায় তা নানাভাবে পরিস্ফুট। যদুনাথের মতে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কালে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবাসীর চরিত্রহীনতা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থাকে বিকৃত করে তুলেছিল। এই রন্ধ্রপথে ঘটে ইংরেজের অনুপ্রবেশ। শেষ জীবনে যদুনাথ তাঁর রচিত ভারতের সামরিক ইতিহাসে বিভিন্ন যুদ্ধে ভারতবাসীর পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখান। এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন ভারতের রক্ষাব্যবস্থা যাতে সুদৃঢ় করা হয় এবং অতীতের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি না ঘটে। যদুনাথের ইতিহাস সাধনার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তি ছাড়া তিনি একপদও অগ্রসর হন নি। ফরাসী, পর্তুগীজ, হিন্দী, মারাঠী, রাজস্থানী, গুজরাটি, গুরুমুখী, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষা তিনি সযত্নে শেখেন ঐতিহাসিক নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি নিজে পড়ে জ্ঞানলাভের জন্য। ঐ সব ভাষায় লিখিত তথ্যাবলী নিজের রচনায় ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিক উপকরণ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান ও যুদ্ধক্ষেত্রগুলি দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে যদুনাথ কমপক্ষে ৪০ বার উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেছিলেন।

১৮৭০ খৃঃ ১০ ডিসেম্বর অবিভক্ত বাঙলার রাজশাহী জেলার করচমারিয়া গ্রামে এক বিশিষ্ট জমিদার পরিবারে যদুনাথের জন্ম। বিদ্যোৎসাহী পিতার বহু পুস্তকপূর্ণ পাঠাগারে বসে অল্প বয়সেই যদুনাথ ইতিহাস ও সাহিত্য সংক্রান্ত বহু বই পড়েছিলেন। প্রবেশিকা ও ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পেয়ে যদুনাথ কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরাজী ও ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে ১৮৯১ খৃঃ বি-এ পাশ করেন। ১৮৯২ খৃঃ ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে যদুনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ডিগ্রী পান। তারপর কয়েক বছর রিপন কলেজ ও মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। ১৮৯৭ খৃঃ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে যদুনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৮৯৭ খৃঃ থেকে ১৯২৬ খৃঃ পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা বিভাগ থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, পাটনা কলেজ ও কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে প্রথমে ইংরাজী ও পরে ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। এরই মধ্যে দুই বৎসর কাল তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও ইতিহাসে অধ্যাপনা করেছিলেন। যদুনাথের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় অবশ্য পাটনাতেই অতিবাহিত হয়। ১৯১৭ খৃঃ থেকে ১৯২৬ খৃঃ অবসর গ্রহণ কাল পর্যন্ত যদুনাথ আই-ই-এস পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ খৃঃ সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে দুই বৎসর কাল যদুনাথ (১৯২৬—২৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে জড়তা ও দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। নিজের ঐতিহাসিক গবেষণা ও অধ্যয়নের পক্ষে বিঘ্নকর মনে করে যদুনাথ প্রথমবারের কার্যকাল শেষ হওয়া মাত্র উপাচার্যের পদ থেকে অবসর নেন। অনুরুদ্ধ হয়েও দ্বিতীয়বার এই পদ গ্রহণ করেন নি। ১৯২৬ খৃঃ যদুনাথকে সরকার 'সি-আই-ই' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৯ খৃঃ তিনি নাইট (স্যার) উপাধি পান। ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধি দিয়েছিলেন। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের নানা বিদ্বৎ সংস্থা যদুনাথকে নানাভাবে সম্মানিত করেন। যদুনাথ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। কয়েক বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদের দায়িত্বও বহন করেন।

১৮৯৭ খৃঃ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত যদুনাথ ইংরাজীতে প্রায় পঁচিশটি বই লিখেছিলেন। এর মধ্যে আছে :—

India of Aurangzib (1901), Economics of British India (1909), History of Aurangzib (5 vols, 1912-1924), short History of Aurangzib (1930), studies in Aurangzib's Reign (1933), Mughal Administration (1925), Shivaji and his times (1919), House of Shivaji (1940), Shivaji —a study in leadership (1950), fall of the Mughal Empire (4 vols, 1932-1950), India through the ages (1928), Chaitanya's Li'e & teachings (1913, 1919), Military History of India (1950)

প্রভৃতি। যদুনাথ মুসলমান ঐতিহাসিকদের দ্বারা লিখিত কয়েকটি ফার্সী গ্রন্থ এবং মারাঠী ও ফার্সীতে লিখিত দলিলপত্রও ইংরাজীতে অনুবাদ বা সম্পাদনা করেছিলেন।

Ain-i-Akbari, Massir-i-Alamgir, Persian Records of Maratha History, Poona Residency Correspondence,

প্রভৃতি। সুপ্রসিদ্ধ কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ার চারটি অধ্যায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ২) গ্রন্থের প্রায় এগারটি অধ্যায় (১৫৫৫ খৃঃ—১৭৫৭ খৃঃ) যদুনাথ রচনা করেছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থটির যদুনাথ ছিলেন সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগেই যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ ও গল্পের অনুবাদ 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে প্রকাশ করে ইংরাজী পাঠক সমাজের কাছে তাঁকে পরিচিত করান। 'শিবাজী' (১৯২৯ খৃঃ) ও 'মারাঠা জাতীয় বিকাশ' (১৯৩৬ খৃঃ) যদুনাথ রচিত এই দুটি ইতিহাস গ্রন্থ বাঙলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

দেশের স্বাধীনতা লাভের পর নির্ভীকভাবে সরকারী ও সামাজিক স্তরের অকর্মণ্যতা ও শৈথিল্যের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে তিনি দেশ ও জাতির সেবা করে গেছেন। শেষ বয়স পর্যন্ত বিশ্বের সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ও অধ্যয়ন অব্যাহত ছিল। এই সময় দেশে তিনি শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কুলপতি বলে বিবেচিত হতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যদুনাথ দীর্ঘকাল সভাপতিরূপে যুক্ত ছিলেন। বহু সাহিত্যসেবী ও গবেষক তাঁর অকুণ্ঠ সহায়তা ও উৎসাহে বিদ্যাচর্চা করে খ্যাতিমান হন। গবেষক ছাত্রদের জন্য তাঁর মূল্যবান পাঠাগারের দ্বার অবারিত ছিল।

মৃত্যুর পূর্বে ২৫,০০০ বহু মূল্যবান পুস্তক, পুস্তিকা, পাণ্ডুলিপি, নথিপত্র-সমন্বিত বহু অর্থ ব্যয়ে গঠিত নিজস্ব গ্রন্থাগারটি যদুনাথ জাতির সেবায় উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থ সংগ্রহটি কলকাতা জাতীয় পাঠাগারকে দান করা হয়েছে। ১৯৫৮ খৃঃ ১৯ মে যদুনাথ তাঁর কলকাতার বালীগঞ্জ পল্লীস্থ বাসভবনে প্রায় ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

# সাহিত্য ও সংস্কৃতি

## ম্যাকস্ওয়েলী থিসিস

১৯৬২-তে চীন-ভারত সীমান্ত নিয়ে যে সংঘর্ষ ঘটেছিল স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের ইতিহাসে তা এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই সংঘর্ষের 'অকথিত কাহিনী' অনেকে অনেক রকম ভঙ্গীতে ইতিমধ্যেই বলেছেন। যাঁরা এই সব গ্রন্থ লিখেছেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সংঘর্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

নেভিল ম্যাকসওয়েল একজন সাংবাদিক, তিনি 'টাইমস' পত্রিকার সাউথ এশিয়া করসপণ্ডেন্ট ছিলেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৭-র জুলাই পর্যন্ত তিনি নয়া-দিল্লীতে ছিলেন, সুতরাং এদেশের অনেক নেপথ্য কাহিনী তিনি সহজেই সংগ্রহ করেছেন। এমন কি যে হেনডারসন ব্রুকসের রিপোর্ট ভারত সরকারের সম্পত্তি তারও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ম্যাকসওয়েলের কুক্ষীগত। এছাড়া কত রকমের তথ্য এবং দলিলপত্র যে তিনি সংগ্রহ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ম্যাকসওয়েল রচিত 'ইণ্ডিয়াস চাওন-ওয়ার' নামক গ্রন্থটি তাই তথ্য-সমৃদ্ধ। এছাড়া তিনি লণ্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে দীর্ঘকাল গবেষণা করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ম্যাকসওয়েল তথ্য প্রমাণাদি প্রয়োগ করে একটি প্রচলিত ধারণা খণ্ডনের জন্য প্রয়াস করেছেন। ভারত সম্পর্কে সাধারণত একটা ধারণা আছে যে, এই দেশ শান্তিপ্রিয় এবং কোনোরূপ উত্তেজনা-না-থাকলেও সে একটা সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। ম্যাকসওয়েল সেই ধারণা যে ভিত্তিহীন তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এই সূত্র পক্ষপাতহীন নিরাসক্তের দৃষ্টিতে রচিত নয়। তিনি ভারতবিদ্বেষী না হলেও ভারত প্রেমিক নন এবং ভারত-বর্ষকে হেয় প্রমাণিত করার দিকেই তার চিত্ত সদাজাগ্রত।

এই গ্রন্থটি ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে যে-কালে, সেইকালেই চীন-ভারত সম্পর্ক ক্রিপিং সহজ হওয়ার সম্ভাবনা ঘটেছে, অর্থাৎ কোনো এক রাষ্ট্রদূত চীন কর্তৃ-পক্ষের মুখে হাসি লক্ষ্য করেছেন। এছাড়া স্বদেশে চীন-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার জন্য একটা দাবী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে যদি এই দুই মহাদেশের সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছিল তা জোড়া লাগে তাহলে এশিয়া ভূখণ্ডেরই মঙ্গল একথা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষই স্বীকার করবেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, আমাদের ত ভাই-ভাই সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্কটা এত তিক্ত হল কি করে। ম্যাকসওয়েল এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের দলিলপত্র, সামরিক গুপ্ত তথ্য ইত্যাদি নানাবিধ প্রমাণ (!) প্রয়োগ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে সীমান্ত নিয়ে কোনো রকম একটা মীমাংসা করার ব্যাপারে ভারত নাকি একটা বিরাট ভুল করেছে, এবং সেই ভুলটুকু সংশোধনের কোনো চেষ্টা না করে তাকে নাকি আঁকড়ে রাখারই চেষ্টা হয়েছে। এই বক্তব্যের সপক্ষে ম্যাকসওয়েল অনেক তথ্য হাজির করার চেষ্টা করেছেন, এবং যদিও তিনি বলেছেন কোনো পক্ষকেই দোষী সাব্যস্ত করা তাঁর অভিপ্রায় নয় তথাপি গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই তিনি ভারতকে অভিযুক্ত করেছেন। ম্যাকসওয়েলের বক্তব্য সাজালে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়—

সীমান্ত বিরোধ যে বিশেষ গুরুতর ছিল তা মনে করার কারণ নেই। ১৯৫৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন:

> "There was no territorial dis pute or controversy between India and China".

তিনি যখন এই কথা উচ্চারণ করেন তার কয়েক মাস পূর্বে ১৯৫০-এর নভেম্বর মাসে লোকসভায় জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন—

> "Our Maps show the MacMa honline is our boundary map or no map. That fact remains and we stand by that boundary, and we will not let anybody come ac-ross that boundary".

ম্যাকসওয়েল লিখছেন যে, সীমান্ত বিরোধের সব সময়েই বিশ্বজাগতিক মনো-ভাব ভারতের প্রতি অনুকূল ছিল। শুধু পশ্চিমে নয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব য়ুরোপের ধারণাও তাই ছিল। সকলে মনে করেছিলেন যে, এই ক্ষেত্রে নিরপরাধ ভারতকে চীন-দেশ বিপন্ন করছে। প্রকৃত ঘটনা (ম্যাকসওয়েলের মতে) বিপরীত, এবং এই গ্রন্থে সেই বক্তব্য তিনি প্রমাণের জন্য বুক ঠুকে লেগেছেন।

তিনি বলতে চান যে, ব্রিটিশ ভারতের হাতে রাজত্বভার সমর্পণ করার সময় সীমানা মোটেই ঠিকমত নির্ধারণ করেনি। সীমানার সংজ্ঞা এবং প্রকৃতিও স্পষ্ট ছিল না। ভারতের দাবীর ভিত্তিমূল দুর্বল।

১৯১৪-তে ম্যাকমোহন লাইন তিব্বতী প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপনে আলোচিত হয় সিমলায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে এই সীমানা কোনোদিনই জাতীয়তাবাদী বা কম্যুনিস্ট চীনা রাষ্ট্র মেনে নেয়নি।

এমন কি তিব্বতও প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষা করেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অবস্থা আরো জটিল। কারাকোরম পর্বত থেকে রাশিয়াকে দূরে রাখার জন্য ব্রিটিশ উদগ্রীব ছিল, চীনাদের কথা চিন্তা করেনি। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ চীনের কাছে যে সীমানা প্রস্তাব দিয়েছিল তার ফলে আকশাই চীনকে দুভাগে বিভক্ত করা যেত, চীনকে দেওয়া হত তিব্বত সিংকিয়াং অংশ আর চিপ-চাপ নদী থাকত ভারতের ভাগে। পরে ব্রিটিশ মত বদলায়, কারণ সিংকিয়াঙে চীনা প্রভুত্ব হ্রাস পায়। স্বাধীন ভারত উত্তরকালে যে সীমানার দাবী করেছে সেই সীমানার স্বপক্ষেই ব্রিটিশ বরাবর কথা বলে এসেছে।

ম্যাকসওয়েলের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, ভারত আকশাই চীন নিয়ে কোনো কথা বলা চলবে না এই মত গ্রহণ করায় সংঘর্ষের মুখে সে নাকি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে। এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে 'কলিশন কোর্স'।' ম্যাকসওয়েলের তৃতীয় বক্তব্য 'ফরওয়ার্ড পলিসি' বা ভারতের অগ্রগামীনীতি। ম্যাকসওয়েলের দৃঢ় ধারণা যে, এই ফরওয়ার্ড পলিসিই চীন-ভারত সংঘর্ষের জন্য মুখ্য দায়ী।

মোদ্দা কথা এই যে, ম্যাকসওয়েল বলতে চান—নয়াদিল্লীর উচিত ছিল পিকিং-এর সঙ্গে এক কোবনে বসে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি করে সীমানা নিয়ে একটা মীমাংসায় পেঁছানো, কারণ ব্রিটিশ নির্ধারিত সীমানা স্থিরীকরণের ব্যাপারে চীন রাষ্ট্রের কোনো হাত ছিল না। আর তা যখন হয়নি, ম্যাকস-ওয়েলের মতে, ভারতের উচিত ছিল চীনারা যা চাইছে তা নীরবে মেনে নিয়ে চীনকে আকশাই চীনে অবস্থান করতে দেওয়া এবং তাহলে চীনও পাল্টা-পাল্টি ব্যবস্থায় ম্যাকমোহন লাইন মেনে নিত। ভারত কর্তৃক তাওয়াং অঞ্চল অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা কথা বলতো না।

ভারত যখন তাওয়াং অধিকার করে নেয় তখন চীনারা কোনো প্রতিবাদ করেনি। এই নীরবতার এই অর্থ করা যায় যে,

চীনারা ম্যাকমোহন লাইন মেনে নিয়েছিল। ম্যাকসওয়েল বলছেন যে, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে স্যার গিরিজাশংকর বাজপেয়ী ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরকে একটি চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন যে, চীনা সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভারত যেন ম্যাকমোহন লাইনের প্রশ্নটির মীমাংসা করে নেয়।

তখন সর্দার কে এম পানিক্কর ছিলেন পিকিং-এ রাষ্ট্রদূত, তিনি স্যার গিরিজাশংকরের উপদেশে কর্ণপাত করলেন না। তাঁর মতে ভারত যখন তার অধিকার সম্পর্কে ঘোষণা করেছে তখন তার জবাব দেওয়ার দায়িত্ব চীনা সরকারের।

স্যার গিরিজাশংকর এই কথা শুনে শুধু মন্তব্য করেন—

"Naturally; they have no intention of raising it until it suits their convenience"

ম্যাকসওয়েল বলেন, পরবর্তী ঘটনায় নাকি প্রমাণিত হয়েছে প্রবীণ চিন্তানায়ক স্যার গিরিজাশংকরের কথাই ঠিক।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন 'পঞ্চশীল' চুক্তি স্থাপিত হল তখন হয়ত এই ব্যাপারে একটা মীমাংসা করে নেওয়ার উপযুক্ত অবসর মিলেছিল, কিন্তু তা হয়নি।—এও ম্যাকসওয়েলের মত।

চীন ভারত সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ১৯৫৪ এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের নেহরু-চৌ আলোচনা। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের অকটোবরে তিনি পিকিং গিয়েছিলেন এবং পরে চৌ-এন-লাইকে তিনি একটি পত্রে জানান—আমাদের আলোচনার সময় আমি আপনাকে সংক্ষেপে জানিয়েছিলাম যে, চীন থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি ম্যাপে আমাদের দুটি দেশের সীমানা ত্রুটিপূর্ণভাবে দেখানো হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল এটা ভুল হয়ে থাকবে এবং আপনাকে বলেছিলাম, আমাদের সীমানা ত' নির্ধারিত হয়েই আছে, এ নিয়ে আর কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। আপনিও বলেছেন যে, এসব ম্যাপ লিবারেসনের পূর্বকালের ম্যাপ ও আর 'রিভাইজ' করার সময় পাওয়া যায়নি। আপনাদের হাতে অনেক কাজ তাই হয়ত রিভিশন সম্ভব হয় নি, এইবার আশা করি অচিরাৎ সংশোধন করা হবে।"

সেই বছরই ভারত একটি সরকারী মানচিত্র প্রকাশ করে পূর্বাঞ্চলে ম্যাকমোহন লাইনকেই সীমানা হিসাবে দেখালো। চীন কোনোরকম প্রতিবাদ জানালো না। পরে কিন্তু চীনা প্রধানমন্ত্রী বললেন, এই সর্বপ্রথম দেখলাম চীনা ভূখণ্ডের ওপর ভারতের দাবী সরকারী মানচিত্রে প্রদর্শিত হল।

ভারত নাকি এরপর নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় চুপ করে রইল, কেননা ম্যাকসওয়েল বলেছেন, ভারতের ধারণা হল যে, চীনারা এই সদ্য প্রকাশিত মানচিত্র মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ঠিক এই অবসরে ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনারা আকশাই চীনের ভিতর পথ তৈরী করে ফেলল।

চীন সমর্থক লেখক ডিক উইলসন লিখেছেন—

"While the Chinese Premier was talking to Nehru Chinese Engineers were busy building a road across the desolate Aksai Chin, triangle—

নেহরু যে এই অঞ্চলটি পুরোপুরি ভারতীয় বলেই দাবী করেন সে কথা চৌ-এন-লাই ভালো রকম জানতেন। তবে তিনি নেহরুকে এই পথ নির্মাণের কথা কিছু বলেননি। এই গ্রন্থের লেখক ম্যাকসওয়েল ভারতের দাবীর দিকে সম্পূর্ণ চোখ ফিরিয়ে রেখেছেন, চীনারা যে ভারতের অনেকখানি অংশ গ্রাস করে তাদের দাবী বলপ্রয়োগে মিটিয়ে নিতে চেয়েছিল এই দিকটা তিনি উপেক্ষা করে গেছেন। স্বদেশের সীমানা রক্ষার প্রয়োজনে গৃহীত নীতিকে 'ফরওয়ার্ড পলিসি' বলে উল্লেখ করা অনুচিত হয়েছে, এবং এর জন্য ভারতকে অনেকখানি মূল্য দিতে হয়েছে।

—অভয়ঙ্কর

INDIA'S CHINA WAR: By NEVILLE MAXWELL, Published by JAICO PBLISHING HOUSE, BOMBAY. Price Rupees Thirty only.

# রেকর্ডে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামটি বাংলা কথাশিল্পের সঙ্গে চিরদিনের জন্য স্বর্ণসূত্রে জড়িত হয়ে আছে। তাঁর আকস্মিক এবং অকাল বিয়োগে বিমূঢ় জাতির কাছে তাঁর আর একটি পরিচয় তুলে ধরবার জন্য এই নিবন্ধের অবয়োজন।

কি ছোট গল্প কি উপন্যাসে ভাষার চমৎকারিত্বে এবং ভাবের গভীরতায় এবং আন্তরিকতায় ক্ষণে ক্ষণে যে সব রূপকল্প পাঠকদের চমকিত করে, বিমোহিত করে, তাতে একথা বুঝতে বিলম্ব হয় না, মুখ্যত গদ্যলেখক হলেও নারায়ণবাবুর মনটা ছিল কবির মন, দৃষ্টিটাও ছিল কবির দৃষ্টি। তাই তাঁর অনেক রচনাকে সহজেই গদ্য কবিতার মতই মনে হয়।

কিন্তু কবিতার মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে আমরা দেখেছি। আমরা যাঁরা তাঁর সমবয়সী এবং সহযাত্রী তাদের অনেকেই যখন ছোটগল্প লিখছি তখনও তিনি কবিতাতেই মনের আবেগ প্রকাশে তৎপর ছিলেন। তাঁর 'খোলা চিঠি' নামক দীর্ঘ কবিতা (বিচিত্রা, ফাল্গুন, ১৩৪৪) একটি নিটোল সুন্দর প্রেমের ছোটগল্প বললে অত্যুক্তি হয় না। ঐ বিচিত্রাতেই যখন তাঁর 'নাগকেশরের ফুল' বেরিয়েছিল—তার সুগন্ধে সৌন্দর্যে তখন আমরা বিমুগ্ধ হয়েছিলুম।

পরে যখন ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এবং উপন্যাসে তাঁর প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেল তিনি কবিতার ক্ষেত্র হতে ইচ্ছা করেই যেন নির্বাসন নিয়েছিলেন। কিন্তু কলম ধরলেই যে তিনি অবলীলাক্রমে বিশুদ্ধ ছন্দে চমৎকার কবিতা এবং গান রচনা করতে পারতেন তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

নারায়ণবাবু আমারই মত পূর্ববঙ্গের লোক। পাশাপাশি জেলায় বাড়ি, সমবয়সী এবং কলকাতাতেও পঁচিশ বছরের বেশি একেবারে কাছাকাছি বাস করবার দরুণ প্রায় নিত্য দেখ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ফলে বিচিত্রার আসরে সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈঠকে আমাদের যে সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল তা দিনে দিনে নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সম্বন্ধে পর্যবসিত হয়েছিল। তিনি তাঁর দুই দুখানি গ্রন্থ আমায় উৎসর্গ করে আমাকে চিরঋণী করে রেখে গেছেন।

এই বন্ধুত্বের দাবীতেই তাঁর কাছে প্রস্তাব করেছিলাম তাঁর কণ্ঠে তাঁরই রচনা আবৃত্তি রেকর্ড করবার। হিন্দুস্থান রেকর্ড বনফুলের মধুসূদন নাটকখানি যখন বেরোয় তাতে বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নারায়ণ সেখানেও ছিলেন। তাঁর নিজের নাটক 'ভাড়াটে চাই' অভিনয়ে এবং সাহিত্যিকদের অন্যান্য অভিনয়েও তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পুরোপুরি আবৃত্তির রেকর্ডিং বোধহয় রেডিওতেও করেন নি। রেডিওতে তাঁর অগুণতি ছোটগল্প, বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতির রেকর্ড আছে। এমন কি 'কি করে সাহিত্যিক হলাম' এই পর্যায়ে তাঁর কথিকাটিও কবিতার মতই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু সত্যিকারের কবিতা লিখে আবৃত্তি করতে স্বীকৃত হলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য। এই কোম্পানীতে আমার মত তাঁর আরও অনেক বন্ধু এবং গুণগ্রাহী আছেন। এমন কি রেকর্ডিং বিভাগেরই অন্যতম অধিকর্তা মিঃ রায়চৌধুরী নারায়ণবাবুর সহপাঠী। সুতরাং আমাদের দাবী মানতে তাঁকে বিশেষভাবে কলম নিয়ে বসতেই হল। আর সেই ঐতিহাসিক দিন এই নভেম্বরের ছয় তারিখ শুক্রবার তিনি দমদমে

গেলেন রেকর্ড করতে। ঐ দিন কবি মণীন্দ্র রায়ও স্বরচিত কবিতা রেকর্ড করেন।

সকালে দশটার কিছু পরে তাঁর রেকর্ডিং হলে তিনি দমদম থেকে সোজা বিশ্ববিদ্যালয় চলে যান, সেখান থেকে বাড়ি। সেই রাতেই তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যান, মাঝে মাত্র শনিবার, রবিবারে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। সুতরাং গ্রামোফোন কোম্পানীর স্টুডিওর অন্তরালে তিনি সেদিন যে আবৃত্তি করেছিলেন তাই তাঁর শেষ ভাষণ—দেশের কাছে, জাতির কাছে তাঁর সর্বশেষ দান। এ হিসাবেও এই আবৃত্তির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ঐদিন তিনি 'স্বপ্ন' আর 'রবীন্দ্রনাথকে' নামক দুটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে 'স্বপ্ন' কবিতাটিতে মৃত্যুর পদসঞ্চার যেন শুনতে পাওয়া যায়। আর রবীন্দ্রনাথকে যে তিনি কি গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন তারই প্রমাণ এই শেষ কবিতায় রেখে গেছেন। এখানে নারায়ণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আমরা সেই 'রবীন্দ্রনাথকে' কবিতাটিই তুলে দিচ্ছি। যখন এই আবৃত্তি রেকর্ডে বেরুবে তখন তা নিশ্চয় যুগপৎ রবীন্দ্রনাথ ও নারায়ণের স্মারক হয়ে থাকবে।

**রবীন্দ্রনাথকে**

স্রোতের সেতারে বাজে
 দিনান্তের সুর ;
গৈরিক গঙ্গায় বোট চলে
তিন পাহাড়ের ছায়া
 সন্ধ্যার তারাকে ছুঁতে চায়
দিয়াড়ার ঘরে ঘরে
 প্রদীপের শিখাগুলি কাঁপে
'নিরুদ্দেশ যাত্রা' পড়ি
 কৈশোরের বিমুগ্ধ আবেগে
তোমাকে প্রথম পাই
 রক্ত-আলো তরঙ্গিত জলে।

যৌবনের রাত্রি আসে
 চৈত্র-গন্ধে বিধুর উদাস ;
কোথায় নিঃসঙ্গ বাঁশী বাজে ;
'যখন তুমি বাঁধছিলে তার
 সে কী বিষম ব্যথা'—
অগণ্য নক্ষত্রপটে
 অসীম আঁধার দীপায়ন
আমার জীবনভরে
 হে বিরাট, তোমার অপার।

উদ্বেল প্রাণের ঝড়
 —মিছিলের উত্তাল জনতা ;
বাধা-বন্ধ-মৃত্যু ভাঙে
 ইতিহাসে অমোঘ স্বাক্ষরে—
আমার রক্তের তালে
 গুরু গুরু তোমার মন্দিরা ;
'ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়,
 ঊর্ধ্বে তোলো শির।'

—সন্তোষকুমার দে

# সাহিত্যের খবর

কলকাতায় প্রাক্তন বিচারপতি পি বি চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনারত মিশিমা

**মিশিমার হারাকিরি** ।। য়ুকিয়ো মিশিমা আর নেই। গত ২৫ নভেম্বর একটি সামরিক দপ্তর দখল করতে গিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে হারাকিরি করে মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ মিশিমা এবং অ্যাসোসিয়েশন অব শিল্ডসের কয়েকজন সদস্য টোকিওতে অবস্থিত পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যবাহিনীর জেনারেল কম্যাণ্ডিং-এর অফিসে ঝড়ের বেগে ঢুকে তাঁকে বন্দী করে ফেলেন এবং জাপানী সংবিধান সংশোধন করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দাবী জানান। তিনি বলেন—'জাপানের বর্তমান রাজনীতি দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ।' তিনি জাপানী সেনাবাহিনীর পুরোনো ধ্বনি তেন্নো বানজাই অর্থাৎ সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন, এই বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। এর পরেই তিনি এই বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যান এবং একটি খালি ঘরে গিয়ে নিজের পেটের মধ্যে ছুরি বসিয়ে দেন। এরপর তাঁর একজন অনুগত তরবারির আঘাতে দেহ থেকে মুণ্ড ছিন্ন করে নেয়। সামুরাই প্রথানুসারে এই হল হারাকিরি। এভাবে পেট চিরে নিয়মিত করে মৃত্যুবরণ সাহসী যোদ্ধাদের গৌরবের মৃত্যু বলে বিবেচিত হয়। তাঁর একজন অনুগতও অনুরূপভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

য়ুকিয়ো মিশিমা জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর নাম নোবেল পুরস্কারের জন্যও উঠেছিল। অবশ্য তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি। তাঁর বহু রচনা ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। ১৯৪৪ খৃঃ তিনি যখন টোকিওর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারশাস্ত্রের ছাত্র, তখনই তাঁর প্রথম গ্রন্থ দি ফ্লোয়ারিং ফ্রোস্ট প্রকাশিত হয়। সেই থেকে এ পর্যন্ত ১০০টির উপর তাঁর গল্প, উপন্যাসের বই প্রকাশিত হয়েছে। জাপানের জেলেদের জীবনকে নিয়ে লিখিত ওয়েভ অব মেলোডি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১৯৬৭ খৃঃ মিশিমা এসেছিলেন ভারতে। ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের পর তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। তখন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। অমৃত পত্রিকায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণও প্রকাশ করা হয়েছিল তখন। পার্ক হোটেলে এক সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেছিলেন যে, নিউ ইয়র্কের জীবনের চেয়ে কলকাতার জীবন তাঁর কাছে আকর্ষণীয়। দুর্গোৎসবের অষ্টমীর দিন তাঁকে নিয়ে বের হয়েছিলাম পুজো দেখতে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। তবু কি অসীম উৎসাহ নিয়ে তিনি দক্ষিণ কলকাতার একাধিক পুজামণ্ডপে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তা অন্য কোন বিদেশীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তিনি বলেছিলেন—'মণিকর্ণিকার উপর তিনি একটি উপন্যাস লিখবেন। এজন্য আবার তাঁকে আসতে হবে ভারতে।' কিন্তু সে সুযোগ আর তিনি কোনদিন পাবেন না। কিন্তু তাঁর স্মৃতি চিরকাল উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে আমাদের মনে।

**নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণ-সভা** ।। কোচবিহারের সুহৃদ গোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রণজিৎ দেব, তপনকিরণ রায়, সমীর চট্টোপাধ্যায় পলাশ পাল, পরেশ সোম, চিন্ময় রায়, তপন মজুমদার, আশিস ভট্টাচার্য প্রমুখ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক কৃতিত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ভাষণ দেন। জানা গেছে, 'উত্তর বাংলার গল্প' নামে যে সংকলনটির কাজ চলছে, তার জন্য উত্তর বাংলার বন্যার পটভূমিকায় লেখা 'দোসর' গল্পটি তিনি দিয়েছিলেন। বইটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেননি।

### ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ পরলোকে

বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যের পণ্ডিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ ৯৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে শয্যাশায়ী হন। তাঁর মৃত্যুতে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হলো। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরে নিরলস ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা এক দিকে যেমন তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন, তেমনি অপরদিকে অকুণ্ঠভাবে তিনি তাঁর জ্ঞান বিতরণ করে মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেছেন।

অনন্যসাধারণ মেধাসম্পন্ন দীর্ঘ ৯৪ বছরের বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী ডঃ নাথের জন্ম ১৮৭৯ খৃঃ। পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত নোয়াখালীর বসুদুহিতা তাঁর জন্মস্থান। গ্রাম্য পাঠশালা, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং কলেজের পাঠ শেষ করে ১৯০৫ খৃঃ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত শাস্ত্রে এম-এ পাশ করেন। ভারতের জাতীয় জীবনের সেই পুনর্জাগরণে তিনিও উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে, চট্টগ্রাম সরকারী অধ্যাপকের রাজ সম্মান প্রত্যাখ্যান করে তিনি কুমিল্লা বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

এই সময় থেকেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় তিনি নিজেকে যুক্ত করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক ও অপর কয়েকটি যৌথ প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক গঠন সম্ভব হয়েছিল।

বহুবিধ কর্মের মধ্যে যৌবনের অফুরন্ত উদ্যম নিয়োজিত করলেও তিনি নিরলসভাবে সুপ্রাচীন সংস্কৃতি সাহিত্য ও বঙ্গভাষার সেবায় বেশী সময় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্য ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক, রসজ্ঞ পণ্ডিত ডঃ নাথের রচিত 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর নিকট এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। তাঁর ভাগবৎ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (৫ম খণ্ড) গ্রন্থও সকলের কাছে সমানভাবেই সমাদৃত।

তাঁর অপরিসীম পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে

রাধাগোবিন্দ নাথ

সরোজিনী বসু সুবর্ণ পদক ও ডি-লিট উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ডি-লিট উপাধিতে সম্মানিত করেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের জন্য বৃন্দাবন বৈষ্ণব থিয়লজিক্যাল ইনিউভার্সিটিও তাঁকে ডি-লিট উপাধি দেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ তাঁকে 'বিদ্যাবাচস্পতি' ও সিঁথির বৈষ্ণব সম্মিলনী তাঁকে 'ভাগবৎভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সম্প্রতি তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারও লাভ করেন। অসাধারণ তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েও তিনি ব্যবহারে প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'শ্রীমদ্ভাগবৎ'-টিকা রচনার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

**পত্রিকা প্রদর্শনী ।।** কোচবিহার জেলা প্রদর্শনী উপলক্ষে ২৬ জানুয়ারী থেকে ৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এক পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এর উদ্যোক্তা 'ত্রিবৃত্ত' গোষ্ঠী। প্রদর্শনীটি হবে রাসমেলার মাঠে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদকের কাছে দুই কপি করে পত্রিকা পাঠাবার জন্য আবেদন জানান হয়েছে। পাঠাবার ঠিকানাঃ ত্রিবৃত্ত।৯ ত্রিবৃত্ত সরণী, কুচবিহার।

**জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিতরণ ।।** এবার 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' পেয়েছেন প্রখ্যাত উর্দু কবি ফিরাক গোরখপুরী তাঁর 'গুল-এ-নাগমা' গ্রন্থটির জন্য। গত ২৬ নভেম্বর দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে তাঁকে এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সভায় বিশিষ্ট লেখকরা উপস্থিত ছিলেন।

**ইউসুফ এল সেবাইয়ের সঙ্গে ।।** আজকের মিশরের সবচেয়ে খ্যাতিমান সাহিত্যিক ইউসুফ এল সেবাই। সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর মত শক্তিশালী সাহিত্যিক আর নেই। গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মিশরীয় সাহিত্যে চিরকাল লেখা থাকবে। এ পর্যন্ত তাঁর পঞ্চাশের উপর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি বই অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, রুশ ও জর্মান ভাষায়। তিনি আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের সম্পাদক। সম্প্রতি দিল্লিতে যে চতুর্থ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, সেই সময় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সামান্য সুযোগ হল। খুব ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের কিছু কথা বললেন আমাদের প্রশ্নের উত্তরে।

সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহ তিনি কিছুটা পারিবারিক সূত্রেই লাভ করেছেন। তাঁর পিতাও ছিলেন মিশরের একজন বিশিষ্ট লেখক। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার বয়স যখন দশ বছরের মত, তখনই আমার বাবা তাঁর সমস্ত লেখার প্রুফ আমাকে দিয়ে পড়াতেন। সেই থেকেই সাহিত্যের প্রতি আমার একটা অনুরাগ জন্মায়। সাহিত্যই আমার জীবন এবং সাহিত্য ছাড়া আমার চলা সম্ভব নয়।' মিশরের বর্তমান সাহিত্যের অবস্থা জানাতে গিয়ে তিনি বললেন—'মিশরে সাহিত্য রচনার অনুকূলে সময় বলা যায় সাম্প্রতিক কালেই সৃষ্টি হয়েছে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনায় তরুণরা খুবই সার্থকতার পরিচয় দিচ্ছেন।' আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—'তাঁর রচিত কয়েকটি উপন্যাসই এর মধ্যে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। এর মধ্যে আছে ঐতিহাসিক উপন্যাস 'চিত্তের প্রত্যাবর্তন' 'জল সরবরাহকারী এখন মৃত' ইত্যাদি।' সম্প্রতি একজন মিশরবাসীর জীবন নিয়ে দুই খণ্ডে তিনি একটি দীর্ঘ উপন্যাস রচনায় ব্যস্ত আছেন।

সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য তিনি দেশ ও বিদেশ থেকে অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এর মধ্যে সর্বশেষ যে পুরস্কারটি পেয়েছেন, তা হল ওগোনিয়োক। ১৯৬৮ খৃঃ শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসেবে তিনি এই পুরস্কার লাভ করেছেন। সাহিত্য ছাড়া সাংবাদিকতায় ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। মিশরের বিখ্যাত দৈনিক 'আল গামারিয়া' পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনা করেন কিছুদিন। এছাড়াও 'আকের সা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক। জিজ্ঞেস করেছিলাম : 'এসবের জন্য সাহিত্য রচনায় কি কিছু অসুবিধা হয় না।' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'না। প্রায় প্রতিটি মিশরীয় লেখক এক অর্থে সাংবাদিকও বটে। কারণ, অনেকেই সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।'

ইউসুফ এল সেবাই এক সময়ে মিলিটারি আকাদমির ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্ট নাসের ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। কিন্তু সেবাই পরে মিলিটারী জীবন ত্যাগ করে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

**দি অ্যান্ডার্সন টেপস্‌।—লরেন্স স্যান্ডার্স। ডবল্যু. এইচ এলেন অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড। প্রাপ্তিস্থান ঃ রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ত্রিশ শিলিং।**

রহস্য উপন্যাসের বনিয়াদ হলো জোরালো কাহিনী। জোলো কাহিনী নিয়ে ভালো রহস্য গল্প হয় না। লরেন্স স্যান্ডার্সের লেখা অ্যান্ডার্সন টেপস বইটির গল্পাংশ রীতিমত তীক্ষ্ণ এবং জোরালো। কিন্তু শুধু এইটুকু বললে বইটির সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলা হল না। এর বিশেষত্ব অন্য কিছু। অ্যান্ডার্সন টেপস নতুন রীতিতে লেখা এক বিস্ময়কর রহস্য কাহিনী এবং আনন্দের কথা, এই নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষায় লেখক আশ্চর্য সফল। বইটির সার্থকতা সেখানেই।

একদিন আগস্ট রাত্রে নিউ ইয়র্কের ৫৩৫ নং ইস্ট সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীটের বাড়িতে একটি বড় রকমের চুরি হয়ে গেল। অনেকেরই বহু মূল্যবান জিনিস অপহৃত। খবর পেয়ে পুলিশ এল অনুসন্ধান করতে। বলা বাহুল্য নিউ ইয়র্কের পুলিশ। তাদের তদন্তের কৌশলই ভিন্ন। আগে থেকেই টেপের সাহায্যে কথাবার্তা তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা ওদেশে আছে। সেই বাসরঘরে আড়ি পাতার নতুন কৌশল। ইলেকট্রনিক সার্ভেলেন্স যন্ত্রের সাহায্যে এই টেপ ঘরের মধ্যে, কোণের পাশে, এমন কি পার্কের গাছেও লাগানো। প্রায় সমস্ত কাহিনীটাই টেপ বাজিয়ে বলা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থান থেকে টেপে তোলা কণ্ঠস্বর শুনে অপরাধ রহস্যও ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে।

গল্পের নায়ক অ্যান্ডার্সন। 'আইন মানে বুজরুকি, অপরাধ হল সত্যি।' এই তার জীবনদর্শন। লোকটা ছোটবেলা থেকেই অবহেলিত। শৈশবে ভালো শিক্ষা পায় নি। বড় হয়ে অপরাধের পথই সে বেছে নিয়েছে। কিন্তু তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং সংগঠন শক্তি অরাতিরও প্রশংসা পেয়েছে।

এই উপন্যাস প্রসঙ্গে একটি চরিত্রের উল্লেখ করা প্রয়োজন। একজন পঙ্গু বালকের কথা বলছি। ঘটনার দিন রাত্রে দুর্বৃত্তরা তার প্রতি নজর দেয় নি। ছেলেটি সকলের অজ্ঞাতে একটি ঘরোয়া শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে এই বার্গলারির কথা ঘোষণার চেষ্টা করছিল। শহর থেকে অনেক মাইল দূরে কোনো স্থানে এই ঘোষণা কেউ কেউ পায়। সম্ভবত এই শর্ট-ওয়েভ ধরা পড়েছিল, তবু বাইরের তারা শুধু ইয়র্কের পুলিশ বিভাগকে এই অদ্ভুত ঘোষণার কথা জানাতে দেরি করে নি। বইটি ধীরে ধীরে না পড়লে মুখরোচক কাহিনীর স্বাদ ঠিকমতোই পাওয়া সম্ভব নয়।

লরেন্স স্যান্ডার্সের এই রহস্য কাহিনী সাসপেন্সের দিক থেকে সুন্দর, বিন্যাসে বিচিত্র এবং কলাকৌশলের প্রয়োগে অনুপম এবং চমকপ্রদ।

**গতকাল আজ এবং আমি (কাব্যগ্রন্থ)—রত্নেশ্বর হাজরা।। দাম—তিন টাকা, পরিবেশক, সিগনেট বুক শপ, কলি-১২।**

'গতকাল আজ এবং আমি' রত্নেশ্বর হাজরার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। এর আগেই 'লোকায়ত অলৌকিক' এবং 'জলবায়ু' রত্নেশ্বরকে কবিতানুরাগীদের কাছে প্রিয় করে তুলেছে, কারণ রত্নেশ্বরের নিজস্ব মেজাজ এই কাব্য দুটির বহু কবিতার অত্যন্ত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে সে পরিচয় আরও উজ্জ্বল: এক্ষণে কবি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত। যে বিশেষ কারণে রত্নেশ্বর বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন, তা হল ঃ তাঁর কবিতার নিজস্ব চরিত্র; কী বক্তব্যে, কী কবিতার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে, বা প্রকরণ চেতনায়। 'গতকাল আজ এবং আমি'-র 'সম্রাজ্ঞী' 'হংসধ্বনি' মনে পড়ে' 'হ্রদ' 'বনান্তরে'—এই সব কবিতা পড়লে সহজেই বোঝা যায় তিনি তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছেন, আর তাই কবিতার বহিরাঙ্গিক চমক, চতুর কখন বা কাব্যোক্তিকে অনায়াসে বর্জন করে তিনি আমাদের অনুভবকে আলোড়িত করে তুলতে পারেন। কবিও সহজেই আমাদের বিশ্বাসের দিগন্তকে ছুঁয়ে যেতে পারেন। রত্নেশ্বরের রচনায় মানুষের মৌল বিষাদ, নিঃসঙ্গতা বা অস্তিত্বের গূঢ়েষণা মূর্ত হয়ে ওঠে, যখন তিনি বলেন ঃ

বয়স মানে আয়ু মানে কিছুটা সময়
একটা পরিধিতে
হেঁটে পার হওয়া চলে
দৌড়ে কিংবা—
মানে গতি বেড়ে যায়
বাড়ে মানে কমতে থাকে কিছু
দুঃখ অথবা দুঃখ—

অথবা যখন কবি বলেন ঃ

'আমার পথের শেষে অন্য আমি
পথের শেষে

অন্য পথ—
বিকাল পড়ে উঠতে উঠতে ভেঙে যায়'

তখন টের পাই দুঃখ বা লৌকিক বিষাদ নয়, এক অনির্দেশ্য বেদনা কবির

অভিজ্ঞতাকে আলোড়িত করে। আবার সুন্দর গাম্ভীর্যময়তা যখন শুনতে পাই ঃ

কৈশোর পেরিয়ে যায় বয়স
তারা খসে
আমি সরে দাঁড়াই—

'মা এলো' 'একবার আমাকে' 'কেউ না কেউ সঙ্গে থাকেই' 'আবরণ অবরোহী'—এই সব কবিতা পড়লে সন্দেহ থাকে না বাংলা কবিতার পালা বদলের ইতিহাসে রত্নেশ্বর অত্যন্ত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব; বিশ্বাস করা যায় যে তিনি হাঁটছেন; অচিরেই পৌঁছবেন হয়তো পরিণত শিল্পস্বভাবে।।

## সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

**প্রগতি—(ঈদ সংখ্যা)—সম্পাদক মহম্মদ আলি।। আকড়া মাদ্রাসা বাজার, বাটানগর, ২৪ পরগণা।। এক টাকা।।**

প্রচুর বিজ্ঞাপন নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'প্রগতি'র ঈদ সংখ্যাটি। প্রবন্ধ লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, মৌলানা জয়নুল আবেদীন, মহম্মদ মুরসালিন, খাজিমউদ্দীন আহমেদ এবং মহম্মদ আলী খান্দার। তাছাড়া লিখেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নূরুল ইসলাম মোল্লা, মোঃ লুৎফর রহমান খাঁ, শিবশম্ভু পাল এবং আরো অনেকে।

**শ্লোক (সপ্তম সংখ্যা)—সম্পাদক শিপ্রা ঘোষ ও মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।। এল পি ১৯৭ শ্রীমা পল্লী, বেহালা, কলকাতা ৬০।। দাম ঃ দু টাকা।।**

বিশেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সম্পাদক। আধুনিক কবিতার ওপরে লেখা মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ ছাপা হয়েছে এ-সংখ্যায়। কবিতা লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ। তাছাড়া ছাপা হয়েছে দীর্ঘ কবিতা, কাব্যোপন্যাস, নাট্যকাব্য ও একটি কবিতার সৃজনপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা। লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা ঘোষ। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা চমৎকার। ছাপা ভালো। সম্পাদকীয় দৃষ্টি প্রশংসনীয়।

(৩৫)

আবার সেই বাদ্য বাজছিল। ঢাক-ঢোল শানাই বাজছে। জল ভরতে গেছে মেয়েরা। মাথা নেড়া করছে সোনা লালটু পলটু। উৎসবের বাড়ি, কত আত্মীয় কুটুম। তাদের সন্তান-সন্ততি। সব ছেলেপুলে চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা বুঝি তামাসা দেখছে—এমন এক ভাব চোখে-মুখে। ওরা কেউ কেউ ঠাট্টা তামাসা করছে। সোনা শক্ত হয়ে বসে আছে, সে মাথা নেড়া করবে না। তাদের তাড়িয়ে না দিলে মাথা নেড়া করবে না। যারা হাসছিল তাদের তাড়িয়ে দিল ঈশম। এবার মাথা পেতে দিয়েছে সোনা। ঈশমের এমন খুচরো কাজ কত। ঈশম অবসর পাচ্ছে না। সে এইমাত্র নয়াপাড়া থেকে ঘুরে এসেছে। আবার তাকে বিশ্বাস পাড়া যেতে হবে। যাবার আগে সে গাছে উঠে আমের শুকনো ডাল, বেলপাতা, পল্লব, হোমের জন্য পেড়ে রেখে দিয়েছে।

রান্নাঘরের পাশে কাল সারাদিন খেটে ঈশম একটা নতুন চালাঘর তুলেছে। বড় বড় ডেগ, হাঁড়ি, পেতলের বালতি, মালসা চালার নিচে। ফুল কপি, বাঁধা কপি কাটছে হারান পালের বৌ। বড় মাছ কাটছে দীনবন্ধুর দুই বউ। বড় ডেগে গরম হচ্ছে দুধ। মুসলমান পাড়া থেকে সবাই দুধ দিয়ে যাচ্ছে। শচি সব দুধ মেপে রাখছে।

এই উৎসবের বাড়িতে একমাত্র ধনবৌ কিছু করতে পারছে না। পেটে তার সন্তান। সন্তান পেটে নিয়ে শুভকর্মে হাত দিতে নেই। ধনবৌ চুপচাপ বারান্দার এক কোণে বসে শুধু পানের খিলি বানাচ্ছে। সুতরাং বড়বৌর উপরই চাপ বেশি। বড়বৌ এই শীতেও ঘেমে গেছে। খুব ভোরে উঠে স্নান করেছে বড়বৌ। লালপেড়ে গরদ পরেছে। আত্মীয়স্বজনদের জন্য সকালের জলখাবার ঠিক করতে হয়েছে। দক্ষিণের ঘরে ফরাস পাতা হয়েছে। পঞ্চমীঘাট এবং ভাটপাড়া থেকে সব বড় বড় পণ্ডিত এসেছেন। ও'রা ধর্মাধর্মের তর্কে ডুবে আছেন। ও'দের জন্য বাটিতে গরম দুধ এবং মুড়ি, দুটো সন্দেশ জলখাবার গেছে। সন্ধ্যা আহ্নিকের জন্য ঘাটের পাড়ে জমি সাফ করে দেওয়া হয়েছে। সারা সকাল পণ্ডিতেরা সেখানে বসে আহ্নিক করেছেন।

যারা দূরে থেকে আসছে তাদের চন্দ্রনাথ দেখাশোনা করছে। ভূপেন্দ্রনাথ টাকা-পয়সা এবং কোথায় কি প্রয়োজন হবে সারাক্ষণ তাই দেখাশোনা করছে। কেউ বেশিক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়াতে পারছে না। শশিভূষণ বৈঠকখানায় পণ্ডিতদের সঙ্গে ন্যায়নীতির গল্পে ডুবে গেছে।

মাঝে মাঝে ভূপেন্দ্রনাথ কাজ ফেলে পণ্ডিত প্রবরদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। কোন ত্রুটি যদি হয়ে থাকে—মার্জনা ভিক্ষার মতো মুখ—আমাদের এই পরিবারে আপনাদের আগমন প্রায় তীর্থ-যাত্রার সামিল। এভাবে সে ঘুরে ঘুরে সবার কাছে পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। আপনাদের আগমনেই এই উৎসব সফল, এমন নিবেদন করছে।

শচীন্দ্রনাথ তখন শশীবালার কাছে গিয়ে বলল, মা তোমার আর কি লাগবে?

শশীবালা আলু, বাঁধাকপি, পটল, কুমড়ো এসবের ভিতর ডুবে ছিল। যত লোক খাবে তার হিসাব মতো সব বের করে দিচ্ছে শশীবালা। মায়ের পাশে শচীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সুলতানসাদির বাজারে আর বারদীর হাট থেকে মাছ এসেছে। তবু মাছে কম হবে কিনা, একবার দেখা দরকার। পুকুরে জাল ফেলা যদি দরকার হয়, সেজন্য গগনা জেলে জাল নিয়ে পুকুর পাড়ে বসে রয়েছে। সে গগনা জেলেকে কিছু মাছ তুলে দিতে বলল।

তাছাড়া শচীর পকেটে ঘড়ি, সে মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখে কখন বৃদ্ধিতে বসার সময়, কটার ভিতর চন্দন দেওয়া হবে এবং হোম কটা থেকে কটার ভিতর শেষ করা দরকার, আহ্নিক হোমের আগে না পরে করাতে হবে এসব সে হিসাব রাখছে বলে ভূপেন্দ্রনাথ আর তাকে অন্য কোন কাজের ভার দেয়নি।

সে তাড়াতাড়ি পুকুর পাড়ে এসে দেখল এখনও কামান হয়নি। সোনার মাথায় অর্ধেকটা চাঁচা হয়েছে। সাদা ধবধবে মাথা, পিঠে ঘাড়ে চুল, শীতে সোনা কাঁপছে। সোনা জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে। কান ফুটো করা হবে এই বলে সকলে ওকে ভয় দেখাচ্ছে। সে ভয়ে শক্ত হয়ে আছে। ভূপেন্দ্রনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, না কান তোমার কেউ ফুটো করব না। ভূপেন্দ্রনাথ সোনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। যারা পুকুরে জল ভরতে গেছে ওরা ফিরে এলেই স্নান। হলুদ রাঙানো কাপড় পরেছে সোনা। হলুদ মেখে স্নান করানো হবে। স্নানের শেষে ওরা নতুন কাপড় পরবে। সোনার মাথা নেড়া হলে ভূপেন্দ্রনাথ মাথায় হাত রাখল। ছোট্ট একটা শিখা তালুতে। সোনা দুবার শিখাতে হাত রেখে কেমন পুলক বোধ করল।

এবং তখন গান হচ্ছিল পুকুর পাড়ে। যারা জল ভরতে গেছে তারা গান গাইছে। সুর ধরে অদ্ভুত সব গান। সোনা, লালটু, পলটুর মঙ্গল কামনায় গান গাইছে। এরা এই সংসারে বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে ওরা এক ধর্ম প্রচারে ডুবে যাবে—সে ধর্মের নাম হিন্দু ধর্ম। নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের ভিতর তুমি মহাভারতের মানুষ এমন যেন এক বোধ গড়ে দিতে চাইছে তারা।

সোনা যেমন একবার নদীর পাড়ে ল্যান্ডোতে ফিরতে ফিরতে ভেবেছিল—সে ক্রমে উপকথার নায়ক হয়ে যাচ্ছে, আজও সে তেমনি নায়ক, তার জন্য কি সব জাঁকজমক। এদিনে ফতিমা কাছে নেই। থাকলে কি না সে খুশী হত।

কিন্তু নতুন কাপড় পরার সময়ই যত গণ্ডগোল দেখা গেল। পিসিমার ছোট ননদের মেয়ে দীপালি দাঁড়িয়ে আছে। শীতের রোদে ওদের স্নান করানো হচ্ছে। সেই ঢাক-ঢোল বাজছে, সানাই বাজছে। শুভকার্যে উলুধ্বনি, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ওড়ার মতো যেন ওদের মাথায় পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সোনা কাপড় পরে না, পরার অভ্যাস নেই। সে কাপড় পাল্টাবার সময় দেখল ভিড়ের ভিতর থেকে দীপালি তাকিয়ে আছে। ওর ভীষণ লজ্জা লাগছিল। সে দুহাতে দশহাতি কাপড়, কাপড়টা এত বড় দেবার কি দরকার, দশহাতি কাপড় সে কোমরে জড়িয়ে রেখেছে, ছাড়তে পারছে না, ছেড়ে দিলেই সে নেংটো হয়ে যাবে। নেংটো হয়ে গেলে দীপালি ওর সব দেখে ফেলবে—সে শীতের ভিতর হিহি করে কাঁপছে অথচ কাপড় ছাড়ছে না। সোনা এ-সময় তার জ্যাঠিমাকে খুঁজছিল।

পিসিমা বললেন, কাপড়টা ছাড়।

সে কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

মেসোমশাই এসে বললেন, কি সোনা, শীতে কষ্ট পাইতাছ ক্যান? কাপড় ছাড়।

সোনা আবার তাকাল।

লালটু বলল, কি আদর আমার। জ্যাঠিমা না আইলে তিনি কাপড় ছাড়তে পারতাছে না।

তখন এল বড়বৌ।—কি হয়েছে সোনা। এখনও তুমি ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছ।

সোনা এবার চারপাশের ছোট ছোট মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

বড়বৌ বলল, ও তার জন্য। আয়। বলে সে সোনার হাঁটুর কাছে পা ভাঁজ করে বসল।—আমার কত কাজ সোনা! তোরা যদি এমন করিস তবে কাজের বাড়িতে চলে?

সোনা কিছু শুনেছে না মতো হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বড়বৌ শুকনো কাপড়টা আলগা করে আড়াল দিয়ে ভিজা কাপড়টা খুলে ফেলল। তারপর সুন্দর করে ধুতিটা কুঁচি দিয়ে পরিয়ে দিল। কাপড়টা সোনার মাপ মতো নয়। বড় বলে কিছুটা জবুথবু অবস্থা সোনার। সে নিজের কাপড়ে প্যাঁচ খেয়ে কখনও উল্টে পড়ে যেতে পারে। সেজন্য বড়বৌ কাপড়ের কোঁচটা কোমরে গুঁজে দিল।

এবার ওরা গিয়ে বসল আচার্যদেবের সামনে। আচার্যের আসনে বসে আছেন পন্ডিত সূর্যকান্ত। তিনি দীর্ঘ এক পুরুষ এবং সূর্যের মতোই আজ তাঁর দীপ্ত চোখ-মুখ।

তিনি যেন তিন বালককে, কঠোর চোখে দেখতে থাকলেন। হে বালকেরা, তোমাদের পুনর্জীবন হচ্ছে, এমন চোখে তাদের দেখছেন। বালকদের মুখ দেখে তিনি বুঝতে পারছেন, এত বেলা হয়ে গেছে, এখনও সামান্য জলটুকু পর্যন্ত ওরা খেতে পায় নি। ফলে চোখমুখ শুকিয়ে গেছে। এবার তিনি হাঁক দিয়ে জানতে চাইলেন, ষোড়শ মাতৃকার কতদূর, বৃদ্ধি শেষ হল কিনা, না হলে এই ফাঁকে চলনের কাজ সেরে নেওয়া যেতে পারে।

পাল্কিতে বসার সময় সোনা দেখল দীপালি ওর ও-পাশে চুপচাপ উঠে বসে আছে। সোনার গলায় পদ্মফুলের মালা। কপালে চন্দনের তিলক। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, হরিণের চামড়ার উপর সে বসে রয়েছে। আর কত রকমের ফুল ছড়ানো সেই হরিণের চামড়ার উপর। তিনটে পাল্কি যাত্রা করবে। ওরা যতদূর প্রতিদিন গ্রাম মাঠ ভেঙে নদীর পাড়ে যায় ততদূরে এই পাল্কিতে ওরা চলে যাবে।

সোনা দীপালিকে পছন্দ করে না। কারণ দীপালি ঢাকা শহরে থাকে। সে বড় বড় কথা বলে সোনাকে অযথা ছোট করতে চায়। আজ সে দেখছে সেই দীপালি সব সময় তার কাছে কাছে থাকতে চাইছে।

সোনা প্রায় ভিতরে ঘরের বেঙে বসেছিল। সে দীপালির দিকে তাকাচ্ছে না। বরং পাল্কিটা দুলছে। ওর ভয় ভয় করছিল। একবার চলতে থাকলে ওর আর ভয় ভয় করল না। পিছনে বাজনা বাজছে। সানাই বাজছে। প্রতিবেশীরা সকলে মেয়ে এসেছে। ওরা নরেন দাসের মাঠে এসে নামল। তারপর গোপাটে। গোপাট ধরে অশ্বথ তলা পার হবার সময় মনে হল পাল্কি টোডার বাগের কাছে এসে গেছে।

দীপালি বলল, সোনা তুই আমারে দ্যাখ।

—কি দাখমু!

—আমি কি সুন্দর ফ্রক পরেছি।

সোনা বলল, বাজে ফ্রক।

দীপালি বলল, তুই কিছু জানিস না।

সোনা উঁকি দিল এবার। আর তখন সে আশ্চর্য হয়ে গেল। দেখল মঞ্জুর মিঞার বড় বটগাছের নিচে অনেকের সঙ্গে ফতিমা দাঁড়িয়ে আছে। সে পাল্কিতে সোনাবাবু যায় দেখতে এসেছে।

বড় দ্রুত যাচ্ছিল বেহারা। নিমেষে মুখটা মিলিয়ে গেল। সোনা উঁকি দিয়েও মুখটাকে ভিড়ের ভিতর আর খুঁজে পেল না।

পাল্কিটা পাশ কাটিয়ে গেল ফতিমার। কি সব সুমিষ্ট ফুলের সুবাস ছড়িয়ে গেল। ভুর-ভুর গন্ধে চারপাশটা ভরে গেল। সোনাবাবু ফুলের উপর বসে আছে। প্রায় যেন রাজপুত্রের সামিল। পাশে কে একটি মেয়ে। ফতিমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। অভিমানে ওর চোখ ফেটে জল আসছে। সে সোনাবাবুর সঙ্গে একটা কথা বলতে পারল না।

সামুর মা সাদা পাথরের রেকাবিতে তিনটে তাঁতের চাদর এবং তিনটে আতাফল রেখে দিয়েছে। ওর কোমরের ব্যথা আবার বেড়েছে। মাঝে কিছুদিন বিছানায় পড়েছিল, এখন সে লাঠি ঠুকে চলাফেরা করতে পারছে। ঠাকুরবাড়িতে উপনয়ন। সে বাবুর হাট থেকে তিনটে তাঁতের চাদর আনিয়ে রেখেছে। এ-সব নিয়ে তার বাবার কথা। কিন্তু এই শরীরে সে যাবে কি করে। সামুর স্ত্রী আলিজানও চিন্তিত। এই উপনয়নে অথবা বিবাহে, যখন যা কিছু হয়, সামুর বাপ বেঁচে থাকতে কিছু না কিছু দিয়েছে। এবং সামুর বিয়েতেও বড়ো কর্তা নারানগঞ্জ থেকে পাছা পেড়ে শাড়ি আনিয়ে দিয়েছিলেন।

এমন শুভ দিনে, এমন উৎসবের সময়ে ফতিমা সোনাবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারল না—ওর ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল খুব। সে দেখল, মা একটা সাদা পাথরের রেকাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাকে দিয়ে যে পাঠায়! ফতিমা বলল, মা আমি নিয়া যামু। দাও আমারে।

তখন সেই পন্ডিত সূর্যকান্ত, আচার্যদেব, ঋজু চেহারা যে মানুষের, বয়সের ভার যাকে এতটুকু অথর্ব করতে পারেনি, নামাবলী গায়ে, সাদা বস্ত্র পরণে এবং শিখাতে জবাফুল বাঁধা—তিনি জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন এবং সাধুভাষায় মাণবকের নির্দেশাদি সহ : মানবক ক্ষৌরাদিকার্য সমাপনপূর্বক স্নান করিয়া গৈরিকাদিরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিবে। পৈতা উপলেপনাদি মেখলা সংস্কারান্ত কর্ম করিয়া যথাবিধি চরু শ্রপন করিবেন, যথা—সদাসম্পত্তয়ে জুষ্টং গৃহ্নামি, এই বলে তিনি আঃ আঃ আঃ যেন অন্দেহ স্বাহা আঃ আঃ অনেক দূরে দূরে এই উচ্চারণ প্রতিনিয়ত বাতাসে ধ্বনি তুলে গ্রামে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে। ফতিমা গ্রাম থেকে নেমে গোপাটে পড়তেই সেই গম্ভীর শব্দ শুনতে পেল। যেন কোন মহাঋষি হাজার হাজার হোমের কাষ্ঠ জেলে কলসী কলসী ঘি ঢেলে দিচ্ছেন। তেমন এক পূত পবিত্র ধ্বনি ফতিমাকে আপ্লুত করছে। সে মাথায় রেকাবি আর কোমরে আতাফল নিয়ে ছুটতে থাকল।

অতঃপর আচার্যদেব বলিলেন, সমস্ত কার্য সমাপনপূর্বক একটি যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধাবলম্বন ভাবে কুমারের বাম স্কন্ধে দিবে। মন্ত্রক যথা—ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং......এমন সব মন্ত্র সূর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

সোনা আচার্যদেবের সামনে এবার অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বলল, ওঁ উপনয়ন্তু মাং যূয়ম্ পাদাঃ।

আচার্যদেব বলিলেন, ওং উপসেব্যামি ভবন্তম্। অনন্তর আচার্য অগ্নির উত্তর-দেশে গমনপূর্বক চারিটি ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন। তাহার পর আচার্যদেব অগ্নির দক্ষিণ দিকে দন্ডায়মান হইলেন।

সোনার সম্মুখে যজ্ঞের কাষ্ঠ প্রজ্বলিত হইতেছিল। উজ্জ্বল অগ্নি-শিখায় তাহার মুখমন্ডল কম্পমান হইতেছে। মনে হইতেছে মুখমন্ডলে কে তাহার দেবীগর্জন লেপন করিয়াছে। মাথায় কিরণ পড়িতেছে। সেই আদিত্যের কিরণ। ক্ষুধায় কাতর। মুখমন্ডল বড় বিষণ্ণ। ক্লান্ত। সে দন্ডায়মান থাকিতে পারিতেছে না। তাহার উরু কাঁপিতেছে। সে তবু আচার্যদেবের সম্মুখভাগে করপুটে দন্ডায়মান। যজ্ঞ হইতে ধূম্র উত্থিত হইতেছে। চক্ষু জ্বালা করিতেছে। ওর চক্ষুদ্বয় সহসা লাল অগ্নিবর্ণ ধারণ করিতেছে এবং সুবাসিত হোমের যজ্ঞকাষ্ঠ হইতে মন্ত্রের মতো এক অপরিচিত বোধ ও বুদ্ধি উদয় হইবার সময়ে ভিতরে কি যেন গুড়ু গুড়ু করিয়া বাজিতেছে। সোনার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, আমি তৃষ্ণার্ত, জলপান নিমিত্ত তৃষ্ণার্ত।

আচার্যদেব হাসিলেন। হাসিতে বিষাদ ফুটিয়া উঠিল। কৃচ্ছ্রসাধন নিমিত্ত এই উপবাস অথবা বলিতে পার সন্ন্যাস জীবন-যাপন। তিনি এইবার ধীরে ধীরে ওর অঞ্জলিতে জল সিঞ্চন করিলেন। অতঃপর সেই অঞ্জলিতে স্বীয় অঙ্গুলি মিশ্রিত-পূর্বক কহিলেন, বশিষ্ঠ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগ। তিনি কুমারকে অভিষেক করিলেন।

অনন্তর আচার্য মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সূর্য দর্শন করাইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, কিং নামাসি?

—শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর দেবশর্ম্মাহং ভোঃ!

আচার্যদেবের পুনরায় প্রশ্ন, কস্য ব্রহ্মচার্য্যাসি?

এবার আচার্যদেব খুব আস্তে আস্তে কিছু মন্ত্র পাঠ করিলেন। সে তাহার বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে পারিল না। সে সেই মুখের প্রতি অবলোকনপূর্বক অধোবদনে নিবিষ্ট হইল।

এ-ভাবে সোনা যেন ক্রমে অন্য এক জগতে পৌঁছে যাচ্ছে। যা সে এতদিন দেখেছে এবং শুনেছে—এই জগত সম্পূর্ণ তার থেকে আলাদা। সে সকালে উঠে যে সোনা ছিল, এখন আর সে সোনা নেই। সে অন্য সোনা, সে পূত এবং পবিত্র। চারপাশে তার পবিত্রতার বর্ম পরানো হচ্ছে। মন্ত্র সে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারছে না, না পারলে চুপচাপ আচার্যদেবের দিকে তাকিয়ে থাকছে। কারণ আচার্যদেব এত দ্রুত মন্ত্র পাঠ করছিলেন যে সোনার পক্ষে অনুসরণ করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। সে শুধু তখন মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকছে। হরিণের চামড়ার উপর সে বসেছিল। সামনে কোষাকুষি, গঙ্গাজল, হাতে কুশের আংটি এবং বিচিত্র বর্ণের সব ফুল, দূর্বা, বেলপাতা, তিল তুলসি।

আচার্যদেব কহিলেন, আচমন কর। সোনা আচমন করিল।

আচার্যদেব কহিলেন, কুশের দ্বারা মাথায় জল সিঞ্চন কর।

সে মাথায় জল সিঞ্চন করিল।

মন্ত্র পাঠের পর আচার্যদেব সন্ধ্যা পাঠের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিলেন।

তিনি কহিলেন, একদা সন্দেহ নামক মহা বলিষ্ঠ ত্রিংশতকোটি রাক্ষস মিলিত হইয়া সূর্যের সংহারার্থে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন দেবগণ ও ঋষিগণ সমবেত হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণপূর্বক সন্ধ্যার উপাসনাকরতঃ সেই সন্ধ্যোপাসনাকৃত বজ্রভূত জল প্রক্ষেপ দ্বারা সমস্ত দৈত্যের বিনাশ সাধন করেন। এইজন্য বিপ্রগণ নিত্য সন্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন। তারপরই তিনি কহিলেন, ওঁ শন্ন আপো ধন্বনাা শমন সন্তু নূপ্যা. ...মরুদেশোদ্ভব জল আমাদের কল্যাণ করুক, অনুপদেশজাত জল আমাদিগের মঙ্গলপ্রদ হউক, সাগর বারি আমাদিগের শ্রেয় বিধান করুক, এবং কূপজল আমাদিগের শুভদায়ী হউক। স্বেদাক্ত ব্যক্তি তরুমূলে থাকিয়া যে প্রকার স্বেদ হইতে মুক্তিলাভ করে, স্নাত ব্যক্তি যেইরূপ শারীরিক মল হইতে মুক্ত হয়, জল আমাকে তদ্রূপ পাপ হইতে পরিত্রাণ করুক। হে জলসকল তোমরা পরম সুখপ্রদ; অতএব ইহকালে আমাদিগের অন্ন সংস্থান করিয়া দাও এবং পরলোকে সুদর্শন পরম ব্রহ্মের সহিত আমাদিগের সম্মিলন করাইয়া দাও। স্নেহময়ী জননী যেমন স্বীয় স্তন্য দুগ্ধ পান করাইয়া পুত্রের কল্যাণবিধান করেন, হে জলসমূহ, তোমরাও তদ্রূপ ইহলোকে আমাদিগকে কল্যাণময় রসের দ্বারা পরিতৃপ্ত কর। হে বারিসমূহ, তোমরা যে রস দ্বারা জগতের তৃপ্তি করিতেছ, সেই রস দ্বারা আমাদিগের যেন তৃপ্তি জন্মে। তোমরা আমাদিগের সেই রসভোগের অধিকার প্রদান কর।

মন্ত্রপাঠের দ্বারা সোনার মুখমণ্ডল নানা বর্ণে রঞ্জিত হইতেছিল। মাথার উপর দ্বিপ্রহরের রৌদ্র। সম্মুখে সেই হোমাগ্নি এবং কোষাকুষিতে তাহার হাত। আর আচার্যদেব যেন নিরন্তর তাঁহার নাভি হইতে মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। সোনা এইসব ক্রিয়া-কর্মাদির ভিতর এক দুজ্ঞের্য় রহস্যে প্রোথিত হইতেছিল।

তিনি কহিলেন, মহাপ্রলয় কালে কেবল ব্রহ্মা বিরাজমান ছিলেন। তখন সমস্ত অন্ধকারাবৃত ছিল। তদনন্তর সৃষ্টির প্রাক্কালে অদৃষ্টবশে সলিলপূরিত সাগর সমুৎপন্ন হইল। সেই সাগর-বারি হইতে জগত-সৃষ্টিকারী বিধাতা সঞ্জাত হইলেন। সেই বিধাতাই দিবা প্রকাশক সূর্য ও নিশা প্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসরের কল্পনা করেন অর্থাৎ সেই সময় হইতে দিবারাত্রি, ঋতু, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি যথা-নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হইল।

সোনা ভাবিল, তাহার নাম শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর দেবশর্মা। দেবশর্মা ভোঃ। ভোঃ শব্দ উচ্চারণে তাহার মনে হাসির উদ্রেক হইল। সে তাড়াতাড়ি হাসি নিবারণার্থে কহিল, সূর্যাশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম-ঋষি...

আচার্যদেব কহিলেন, 'সূর্যাশ্চ মা' মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা। প্রকৃতি ইহার ছন্দ। জল—দেবতা, এবং আচমন কর্মে ইহার প্রয়োগ হয়।... সূর্য, যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি অমরগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞজনিত পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। আমি রাত্রিকালে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, জঠর ও শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি দিবা তাহা বিনষ্ট করুন। আমাতে যে পাপ

আছে, তৎসমস্ত এই সলিলে সংক্রামিত করিয়া, এই পাপময় সলিল হৃৎপদ্ম মধ্যগত অমৃতজ্যোতি জ্যোতির্ময় সূর্যে সমর্পণ করিলাম। উহা নিঃশেষে ভস্মীভূত হউক।

সোনা আর পারছে না। ওর তেষ্টা পাচ্ছে। সে, বোধহয় পড়ে যেত—ফতিমা ঠাকুরঘরের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। সে আলগাভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একা। সে নাকে নথ পরেনি। পায়ে মল পরে আসেনি। ওর লম্বা ফ্রক ঝলমল করছে এবং ওড়না দিয়ে মাথায় ঘোমটা। সোনা জানে না ওর ঠিক পিছনে এক বালিকা চুপচাপ বসে সোনাবাবুর মন্ত্রপাঠ শুনছে। যত শুনছে তত বিস্মিত হয়ে যাচ্ছে। সে এইসব শব্দ সংস্কৃত শব্দ জানে। সে কোন অর্থ বুঝতে পারছে না। অথচ কেমন এক ভাবগম্ভীর আওয়াজ এই উৎসবকে মহিমামণ্ডিত করছে। বাবু যে দাঁড়াতে পারছে না, পা কাঁপছে, সে শেফালি গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে তা টের পাচ্ছিল।

সূর্যকান্ত বুঝতে পারলেন উপবাসে সোনা কাতর। তিনি তাকে এক গ্লাস জল খাবার অনুমতি দিলেন। সে এক নিঃশ্বাসে জলটুকু খেয়ে ফেলল। ফতিমার মনে হল এবার সোনাবাবু ওর দিকে তাকাবে। সে তিনটে চাদর তিনটে আতাফল এবং তিনটে আমলকি নিয়ে এসেছে। বড়বৌ এগুলো সে মাটিতে রেখে দিলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘরে নিয়ে গেছে। গঙ্গাজল বড় দুর্লভ বস্তু। একঘটি জল এনে সেই জল শিশি করে বাড়ি বাড়ি এবং এক কলসি জলে এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথ অষুধের মতো ব্যবহার। ফতিমা জানে এ-ভাবে না নিলে এই উৎসব ওদের পবিত্র থাকবে না। বড়বৌ ওকে গাছটার নিচে বসতে বলে গেছে। সে বলে না গেলেও বসে থাকত। এত কাছে এসে সে সোনাবাবুর পৈতা হচ্ছে না দেখে চলে যেতে পারত না। সোনাবাবু কখন ওকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে সেই আশায় অপলক তাকিয়ে আছে।

এবার ওরা পুবের ঘরে ঢুকে যাবে। এই ঘরে ঢুকলে ওরা আর তিনদিন বের হতে পারবে না। চন্দ্র সূর্য দেখতে পাবে না। এই তিনদিনের অজ্ঞাতবাস সোনা অথবা লালটু পলটুর কাছে প্রায় বনবাসের মতো। ওরা ঘরে ঢুকে গেল। এবং দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ফতিমার দিকে সোনাবাবু একবার তাকাল না।

ওরা তিনজন পাশাপাশি দাঁড়াল। হাতে বিল্বদণ্ড। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, গৈরিক রঙের একখণ্ড কাপড় কোমরে জড়ানো। প্রথম ধনবৌ এবং বড়বৌ এল ডালা সাজিয়ে। ওরা তিনজনকে তিনটে সোনার আংটি দিল।

সোনা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ভবতু ভিক্ষাং দেহি।

ভিক্ষা দিতে গিয়ে সোনার মুখ দেখে ধনবৌ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একেবারে ঋষি বালকের মুখ। যেন কোন অরণ্যের ছোট্ট বিহারে ভিক্ষু, বিদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এমন মুখ দেখলেই ধনবৌর ভয় হয়। পাগল মানুষের কথা মনে হয়। বংশের কেউ না কেউ কোন না কোনদিন নিরুদ্দেশে চলে যাবে। সোনার মুখ ঠিক ওর পাগল জ্যাঠামশাইর মতো। সোনা মাকে দেখছে। ধনবৌ ছেলের মুখের দিকে আর তাকাতে পারছে না। যেন এক্ষুনি জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলবে। লালটুর জন্য ধনবৌর এত কষ্ট হয় না। সে মায়ের পাশে শোয় না। সে আলাদা শোয়। নিজের দায়িত্ব যেন নিজেই নিতে পেরেছে। ধনবৌ সোনাকে ভিক্ষা দিয়েই তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল।

বড়বৌ তখন এক ছোট্ট হাঁড়িতে নানা রকমের মিষ্টি সাজাচ্ছিল। খুব যত্নের সঙ্গে কলাপাতা দিয়ে মুখটা বেঁধে দিয়েছে। ঈশম এত লোকজন যে পা ফেলতে পারছে না। কখন কাকে ছুঁয়ে দেবে এই ভয়। সে ফতিমাকে নিয়ে এল। বড়বৌ ঈশমের পঙ্গু বিবির জন্য আলাদা একটা বাসনে কটা মিষ্টি তুলে রাখল। ফতিমাকে বলল, এটা নিয়ে যা। তোর নানীকে বলবি, শরীর ভাল হলে যেন একবার আসে। কতদিন দেখি না।

ফতিমা ঘাড় নাড়ল।

—তোর বাবা এসেছে?

ফতিমা বলল, না।

—নিয়ে যেতে পারবি ত? না ঈশম দিয়ে আসবে।

ফতিমা বলল, পারমু।

—ফেলে দিস না কিন্তু।

ঈশম মিষ্টির হাঁড়িটা ওর হাতে দিল। কিন্তু হাতে নিতে অসুবিধা। ফতিমা হাঁড়িটা অর্জুন গাছটার নিচে এসেই মাথায় তুলে নিল। তারপর যেমন সে গোপাটে নেমে এসেছিল সাদা পাথরের থালাতে তিনটে তাঁতের চাদর নিয়ে, আতাফল নিয়ে, তেমনি সে এখন মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে ছুটছে। ছুটছে আর সেই সোনাবাবু তার দিকে তাকাল না, সে কতক্ষণ থেকে শেফালি গাছটার নিচে বসেছিল—একবার অন্তত দেখুক সোনা-বাবু, সে এসেছে, সুন্দর ফ্রক পরে সে এসেছে, সে তার সবচেয়ে ভাল ফ্রক গায়ে দিয়ে এসেছে। সে কত কথা বলবে বলে এসেছিল, অথচ সোনাবাবু একবার চোখ তুলে তাকাল না। ফতিমা এখন অভিমানে ফেটে পড়ছে। আর তখন দেখল হাজি সাহেবের সেই খোদাই ষাঁড়টা। টের পেয়েছে ছোট্ট এক বালিকা হাঁড়িতে মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছে। ষাঁড় ত এখন আর জীব নেই। ধর্মের ষণ্ড হয়ে গেছে। সে ফতিমাকে দেখেই শিঙ বাগিয়ে ছুটে আসছিল।

ফতিমার প্রাণ তখন উড়ে যাচ্ছে। এক চোখ কানা ষণ্ডটা ওকে দেখে ছুটে আসছে। পাগলের মতো, উন্মত্ত প্রায় ছুটে আসছে। কে কাকে রক্ষা করে—তাবৎ জীবের উপর রোষ তার। মুখের একটা দিক পুড়ে বীভৎস। চামড়া ঝুলে গেছে। ষণ্ডের সঙ্গে লড়াই করতে হলে যেদিকে চোখটা নেই, সেদিকে লড়াই আরম্ভ করতে হয়। মেয়েটা হা হা করে চিৎকার করতে করতে ছুটছে। লেজ তুলে ধম্মের ষণ্ড ছুটছে। পাগল মানুষ অশ্বত্থের ডালে বসে মজা দেখছেন। মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। এই দুপুরে সহসা এই চিৎকার শুনতে পাচ্ছে না কেউ। সামনে শীতের মাঠ। মেয়েটা কিছুতেই মিষ্টির হাঁড়িটা ফেলে দিচ্ছে না। প্রাণপণ সে চেষ্টা করছে গ্রামে উঠে যাবার। কিন্তু পেছনে তাকাতেই সে আর নড়তে পারল না। ষণ্ডটা ক্ষেপা ঝড়ের মতো ওকে ফালা ফালা করে দেবে। ফতিমা চোখ বুজে ফেলল।

আর কি এক যাদুর মায়া, পাগল মানুষ যেন সব জানেন, বোঝেন, তিনি সেই গাছের ডালে বসে বুঝে শুনে কোন গ্রন্থ থেকে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই চালানো যায়, এই ভাবতেই মনে হল, গাছের ডাল নিচু—অনেকদূর পর্যন্ত শাখা-প্রশাখা জমিতে চলে গেছে। সে ডালে বসে হাত বাড়ালেই মেয়েটাকে তুলে নিতে পারবে। এক চোখ কানা জীব টের পাবে না কোথায় গেল সামনের মেয়েটা। ক্ষেপা ঝড়ের মতো ষণ্ডটা যেই না এসে পড়ল তিনি হাতে আলগোছে যেমন এক দৈত্য ছোট্ট পুতুল তুলে নেয়, তেমনি তুলে নিয়ে ডালে বসিয়ে দিলেন ফতিমাকে আর হা হা করে হাসতে থাকলেন। ষণ্ডটা জমিতে কাঁকড়ালে যেমন এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে ছুটে বেড়ায় তেমনি সে ছুটে বেড়াতে থাকল। আর পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ গায়ের জামা খুলে ষণ্ডটাকে নিচে দোলাতে থাকলেন।

যেন তিনি এই ষণ্ডের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন। তাঁর হাতের কাছে ফতিমা। কাঁপছে। চোখ বুজে আছে। ভয়ে চোখ খুলতে পারছে না। আর তখন মানুষটা ষণ্ডটাকে নিয়ে খেলায় মেতে গেছে। সে পা দিয়ে জামাটা দোলালেই ওটা ক্ষেপে যায়, তেড়ে আসে, সে জামাটা উপরে তুলে নিলে ষণ্ডটা সামনের একটা কাফিলা গাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বার বার এমন হচ্ছে। এক সময় ফতিমা চোখ খুলল। দেখছে সব। আর ষণ্ডের মুখ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, শিঙ দিয়ে রক্ত পড়ছে। আর পাগল মানুষের সঙ্গে ফতিমাও খেলাটা বড় মজার ভেবে গাছের ডালে বসে উঁকি দিয়ে দেখছিল।

ষণ্ডটা এক সময় বোকা বনে মাঠের দিকে চলে গেল।

ফতিমা এখন গাছের ডাল থেকে ইচ্ছা করলে লাফ দিয়ে নামতে পারে। কিন্তু ষণ্ডটা ভিটাজমিতে গিয়ে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোনদিকে তাকাচ্ছে না। শুধু বড় অশ্বত্থ গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে।

এখন গাছের ডালে ওরা দুজন পা ঝুলিয়ে বসে আছে। দুজনের মাঝখানে মিষ্টির হাঁড়ি। মণীন্দ্রনাথ হাঁড়িতে কি আছে দেখার জন্য উঁকি দিলেন। ছেঁড়া কলাপাতার ভেতর থেকে তিনি দেখতে পেলেন, সব রকমের মিষ্টি একসঙ্গে মিশে গেছে। ফতিমা হাত দিয়ে একটা মিষ্টি বের করে মণীন্দ্রনাথের মুখের কাছে নিয়ে গেল। বলল, খাবেন?

মণীন্দ্রনাথ হাঁ করল।

ফতিমা প্রথম একটা দিল। তারপর একটা। আবার একটা। দিচ্ছে আর খাচ্ছে। ফতিমার কি যে ভাল লাগছে। কৌতূহল ফতিমার এই মানুষ, পাগল মানুষ, পীর না হয়ে যায় না—যেন কথা ছিল এই দিনে ফতিমা যখন গাঁয়ে উঠে যাবে তখন এক ধর্মের ষণ্ড তাড়া করবে। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে—এই পীর মানুষ বুঝি জানতেন। তিনি আগেভাগে এসে অশ্বত্থের ডালে বসে আছেন। সে দেখল এবার আর একটা মিষ্টিও নেই। ফতিমা বলল, আর কি দিমু খাইতে?

মণীন্দ্রনাথ এবার হাঁড়িটা তুলে যে রসটুকু পড়েছিল চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললেন।

ফতিমা বলল, বাড়িতে নিয়া যামু কি!

মণীন্দ্রনাথ এবার লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লেন। তারপর মেয়েটাকে কাঁধে তুলে খালি হাঁড়িটা হাতে নিয়ে গোপাট ধরে হাঁটতে থাকলেন।

বাড়িতে উঠে মণীন্দ্রনাথ অর্জুন গাছটার নিচে খালি হাঁড়ি নিয়ে ফতিমার সঙ্গে বসে থাকলেন। ওরা দুজন যেন এ-বাড়িতে অনেক দূরদেশ থেকে উৎসবের খবর পেয়ে চলে এসেছে। সবাই খেয়ে গেলে যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে—ওরা পাত পেতে খাবে।

ঈশম খালি হাঁড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল। ফতিমা এবং পাগল মানুষ উভয়ের ভিতর যেন কতকালের আত্মীয় সম্পর্ক! ফতিমা মণীন্দ্রনাথকে ছেড়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ ষণ্ডটা ঠিক সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঈশম বলল, তুই বাড়ি যাস নাই?

—না।

—বড়কর্তার লগে তর কি কাম।

ফতিমা দুষ্টুমি করে বলল, তাইন আমার সব মিষ্টি খাইয়া ফেলছে।

এই না যেই শোনা, ভূপেন্দ্রনাথ ছুটে এল। কি যে হবে! আবার মানুষটার পাগলামি বেড়ে গেল! ঈশমকে বলল, আবার একটা হাঁড়ি নিয়া আয় মিষ্টির। হাঁড়িটা ঈশম তুই দিয়া আয়।

মণীন্দ্রনাথ বলল, গ্যাৎচোরেৎশালা!

ফতিমা বলল, তাইন মিষ্টি খাইতে চায় নাই। আমি তাইনরে খাওয়াইছি।

ঈশমের মাথায় বজ্রাঘাত। সে তেড়ে গেল। —মাইয়া তুই আর খাওয়ানের মানুষ পাইলি না। কি একটা অপরাধ হয়ে গেল: সে বলল, মাইজা মামা, পোলাপান মানুষ, বোঝে না কিছু।

ভূপেন্দ্রনাথ কিছু বলল না। বড়বৌ মিষ্টির হাঁড়ি আবার পাঠিয়েছে। ঈশম ওটা নিয়ে যাচ্ছে। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ ফতিমাকে নিয়ে ঈশমের পিছনে হাঁটছেন। তিনি ফতিমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। বাড়ি পৌঁছে না দিলে ষণ্ডটা আবার ঈশম এবং ফতিমা উভয়কে তেড়ে আসতে পারে। যিনি ষণ্ডটাকে ভয় দেখাবার জন্য অর্জুনের ডাল ভেঙে নিলেন। পাতা ছিঁড়ে ডালটা মাথার উপর পাইক খেলার মতো বার বার ঘোরাতে থাকলেন।

তখন সারাদিন পর সোনা একটু কাঁচা দুধ, গণ্ডুষ করে ঘি এবং কিছু ফল আহার করছে।

বড়বৌ ওদের দেখাশোনা করছে। সে আর বের হবে না। পাথরের বাটিতে কাঁচা মুগ ভিজিয়ে রেখেছে। নানা রকমের ফল, তরমুজ ফুটি সব একটা পাথরে কেটে রেখেছে বড়বৌ।

লালটু হাপুস হুপুস ঘি খাচ্ছে। কাঁচা দুধ খেতে গিয়ে সোনার ওক উঠে আসছে। সে মধু খেল সামান্য। বেলের সরবত খেল। আর খেল দু টুকরো ফুটি। আর কিছু সে কিছুতেই খেতে চাইছে না।

বড়বৌ নানাভাবে ওকে খাওয়াবার চেষ্টা করছে। তার কম বয়সে পৈতা। এত ছোট বয়সে পৈতা হচ্ছে বলে ওর আদর বেশি। লালটু দু তিনবার খেঁকিয়ে উঠেছে। বড়বৌ তখন ধমক দিয়েছে ওকে। তোমার এত মাথা ব্যথা কেন। আমি তো খাওয়াচ্ছি ওকে। বলে দুটো কাঁচা মুগ ওর মুখের কাছে নিয়ে গেল। সোনা আর কিছুতেই খেল না।

বড়বৌ বলল, রাতে চরু হবে। খেতে দেখবি ভাল লাগবে।

সোনা উঠে পড়ল। সে দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল সবাই খাচ্ছে।

বড়বৌ বলল, এই কি হচ্ছে তোমার। এ-সব দেখতে নেই। দরজা বন্ধ করে দাও।

সোনা দরজা বন্ধ করে ফের এসে জ্যোঠিমার পায়ের কাছে বসল। সে ভেবেছিল ক্ষুধার জন্য পেট ভরে খেতে পারবে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে আর কিছুই খেতে পারবে না। পেটে যেমন ক্ষুধা ছিল তেমনি আছে। উঠোনে সবাই খাচ্ছে, সে কিছু খেতে পারছে না, মাছ এবং বাঁধাকপির তরকারির গন্ধ আসছে। ক্ষুধায়

সময় ক্ষিতে জল চলে আসছিল। যত জল চলে আসছিল তত সবার উপর ওর রাগ বাড়ছে। সকাল থেকে তাকে নিয়ে যে কি সব হচ্ছে!

বড়বৌ বলল, তুই সোনা যদি এটুকু খেয়ে নিস তবে একটা আতাফল পাবি।

সে আতাফল খেতে ভালবাসে। সে বলল, কৈ দ্যাখি।

বড়বৌ তিনটা আতাই দেখাল। —তুই যদি আর একটু খাস তবে দেব।

সোনা শেষবার চেষ্টা করল কাঁচা মুগের সঙ্গে নারকেল দিয়ে খেতে চেষ্টা করল। কোনরকমে পাথরের সবটুকু খেয়ে হাত প তল।

বড়বৌ একটা আতা দিল সোনাকে। সে তিনদিনে তিনটা আতা পাবে। এই আতাফলের লোভে যেন সোনা অনায়াসে তিনদিন এই ঘরে বনবাসী হয়ে কাটিয়ে দেবে। অথবা প্রায় সবটা ওর অজ্ঞাতবাসের মতো। ওর সমবয়সী আত্মীয়স্বজনেরা এসে গোল হয়ে বসেছে। দীপালি আসছে বার বার। কেউ কেউ গল্প জুড়ে দিয়েছে এবং এক সময় রাত গভীর হলে বড়বৌ একপাশে, মাঝে সোনা লালটু পলটু এবং সব শেষে পাগল মানুষ খড়ের উপর কম্বল পেতে শুয়ে পড়বে।

ঠিক জানালার নিচে মাটির গাছা। তার উপর প্রদীপ। তিনদিন অনির্বাণ এই প্রদীপ শিখা ওদের শিয়রে জ্বলবে। বড়বৌ রাতে ঘুম যেতে পারবে না ভাল করে। সলতে তুলে না দিলে কখন সলতে প্রদীপের বুকে এসে একসময় নিভে যাবে—নিভে গেলেই অমঙ্গল হবে ওদের—বড়বৌর প্রায় সারারাত জেগে থাকার মতো, লক্ষ্য রাখা প্রদীপ না নিভে যায়। প্রদীপ নিভে যাবার আশংকাতে কিছুতেই ঘুম আসে না চোখে।

তখন স্মৃতির ভিতর বড়বৌকে ডুবে যেতে হয়। বালিকা বয়সের কথা মনে হয়। যেন কোন কনভেণ্টের সবুজ মাঠে সে ছুটছে। পাশে গীর্জা, গীর্জার চূড়োয় সোনালি রোদ, এবং তার ছায়ায় লম্বা আলখেল্লা পরে ফাদার দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে স্মিত হাসি। সব কিছু দেখছেন। গীর্জার ছায়ায় তার অবয়ব কেন জানি বড়বৌর বড় দীর্ঘ মনে হত। তিনি বলতেন, আদিতে ঈশ্বর, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর শূন্য ছিল তখন। এবং অন্ধকার জলধির উপর ভাসমান এই জগতে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল। ঈশ্বর, দীপ্তির নাম দিবস এবং অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। তখন বড় বেশি বালিকা বড়বৌ, বড় বেশি চঞ্চল, অথচ ফাদার গীর্জার বেদিতে উঠে দাঁড়ালেই সে কেমন গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই ঈশ্বর প্রতিম মানুষের কথা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যেত। বাইবেলের প্রাচীন মানব মানবীর ভিতর হারিয়ে যাবার ইচ্ছা হত। অথবা কোন কোন রাতে কেন জানি মনে হত সেই প্রাচীন মানব মানবী আর কেউ নয়, সে নিজে। এবং অন্য একজন মানুষ কোথাও নিষিদ্ধ ফল খাবার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে তখন। সে মাঝে মাঝে স্বপ্নে সেই মানুষের সঙ্গে নিষিদ্ধ ফল খাবার লোভে ঘুরে বেড়ালে মনে হত সামনে এক নির্মল জলের নদী, নদীর পাড়ে সে এবং তার প্রিয় পুরুষটি। ফাদার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছেন। যেন তিনি আর ফাদার নন। একেবারে দেবদূত। তিনি বলতেন হাত তুলে দেয়ার ইজ লাইট। এমন কথায় কোন গীর্জার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বড়বৌর ঘণ্টা বাজাবার ইচ্ছা হত। সংসারে সবাই পাগল মানুষকে ভালো করার জন্য সব কিছু করেছে, কেবল কেউ তাকে গীর্জায় নিয়ে যায়নি। বলতে পারেনি কেউ, দেয়ার ইজ লাইট। সিঁড়িতে উঠে গীর্জার সেই সুন্দর পবিত্র ধ্বনি শুনলে হয়ত তিনি আর পাগল মানুষ থাকতেন না। গীর্জার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ফাদারের মতো প্রিচ করতেন। তিনি ভালো হয়ে যেতেন। তিনিও বলতেন, দেয়ার ইজ লাইট।

আবার এও মনে হয় বড়বৌর, মানুষটা এ-পৃথিবীর মানুষ নয়। অন্য সৌরলোকের মানুষ তিনি। তাঁকে বুঝে ওঠার ক্ষমতা কারো নেই। সংসার থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এই মানুষ নদীর পাড়ে পাড়ে বেঁচে থাকার রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন বুঝি।

এখন সেই মানুষ ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে টের পাওয়া যাচ্ছে না। ওর জন্য দুটো আলাদা বালিশ রেখেছিল বড়বৌ। কিন্তু তিন বালক শুয়ে আছে, শিয়রে তাদের কোন বালিশ নেই, শক্ত খড়কুটোর উপর, কম্বলের উপর শুয়ে আছে এবং তাদের গায়ে কম্বল, আর কিছু নেই, নেই মানে থাকতে নেই, তাদের এই কৃচ্ছ্রতার প্রতি সমবেদনা জানানো বুঝি তার ইচ্ছা, তিনি বালিশে মাথা রাখেন নি। আলগা শুয়েছেন। ওদের মতো কম্বল গায়ে শুয়েছেন। বড়বৌ যতবার শিয়রে বালিশ দিয়ে এসেছে ততবার তিনি তা সরিয়ে দিয়েছেন।

সোনা ঘুমের ভিতর গায়ে কম্বল রাখছে না। সে দুপুরবেলার কাপড় ছাড়ার সময় লজ্জায় ম্রিয়মাণ ছিল। এখন তার গৈরিক কাপড় খুলে কোথায় সরে গেছে। একেবারে সেই আদি মানব। বড়বৌ কম্বলটা ফের তুলে ওর শরীর ঢেকে দিল। এইসব কাজ তার এখন এই ঘরে। কে বালিশ রাখছে না মাথায়, কার হাত কম্বলের বাইরে এবং প্রদীপের আলো কমে গেলে বাড়িয়ে দিতে হবে—এসব কাজের ভিতর তার রাত কেটে যাচ্ছে। পাগল মানুষ, ঘি-এর প্রদীপ, ফলমূলের গন্ধ আর রাতের নির্জনতা এবং পাখিদের ডাক তাকে বার বার অন্যমনস্ক করছে। মালতী নিখোঁজ। রঞ্জিত এখন কোথায়? ওর মনে হল তখন রাত পোহাতে বেশি আর দেরি নেই। সে এবার পুবের জানালাটা খুলে দিল। সে দেখল অনেক দূরে মাঠের উপর দিয়ে লণ্ঠন হাতে কেউ এদিকে উঠে আসছে। যেন অর্জুন গাছটার নিচে উঠে আসার জন্য প্রাণপণ হাঁটছে। কে মানুষটা! সবাই যখন এ-পৃথিবীতে ঘুমিয়ে পড়েছে এমন কি কীটপতঙ্গ, তখনও একজন মানুষের কাজ থাকে। তার কাজ ফুরোয় না। এতক্ষণে মনে হল, এ নিশ্চয়ই ঈশম হবে। সূর্যকান্ত পণ্ডিতকে বারদির স্টিমার ঘাটে তুলে দিয়ে ফিরে আসছে। এসে লণ্ঠন রাখবে দক্ষিণের ঘরে। হাত পা ধোবে। নামাজ পড়বে। তারপর বালির চরে নেমে তরমুজ খেত পাহারা দেবে।

ঈশম বলেছিল, সাদা জ্যোৎস্নায় যখন বালির চরে পাতার ভিতর তরমুজ ভেসে থাকে এবং নদীতে যখন রাতের পাখিরা নামতে শুরু করে, দূরের মসজিদে আজান শুনলে তখন তার দুহাত উপরে তুলে কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। তার ঘুম আসে না চোখে। সে সেই এক জগতের মায়ায় জড়িয়ে যায়। নির্জন মাঠে তার তখন কেবল মনে হয়, আল্লা এক, তার কোন শরিক নেই।

বড়বৌ বলেছিল, আমায় একবার নিয়ে যাবে? সাদা জ্যোৎস্নায় আমি তোমার তরমুজ খেত দেখব। তোমার আল্লার করুণা দেখব।

ঈশম বলেছিল, গেলে আর ফিরতে ইচ্ছা হবে না।

বড়বৌ বলেছিল, কেন আমি কি সেই মায়ায় জড়িয়ে যাব!

সাদা জ্যোৎস্না, নদীর চর এবং তরমুজ খেত আর নির্জন রাতের কোন এক দূরবর্তী আলোর মায়া বড়বৌকে টানে। কে জানত এই মায়ার টানে যথার্থই বড়বৌ এক রাতে পাগল মানুষের পিছু পিছু প্রায় সেই আদম ইভের মতো নদীর চরে নেমে যাবে।

সেটা এক বসন্তকালের ঘটনা।

(ক্রমশঃ)

অমিয় দত্ত

আছি এখন বাংলাদেশের একপ্রান্তে। দক্ষিণে আর ডাঙা নেই,—আন্দোলিত বিশাল মহাসমুদ্র—বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে কয়েক মাইলের মধ্যে উড়িষ্যার সীমানা। তাই এখানকার গ্রামীণ মানুষদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় উৎকলবাসীদের সামাজিক জীবন-চর্যার ছাপ পড়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। এদের কথায়-বার্তায়, হেলায়-দোলায় এবং চলায়-বলায় কেমন যেন উৎকলীয় টান। এখানকার অনেকের পূর্বপুরুষদের বাস-স্থানের খোঁজ করলে অতীত ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে উড়িষ্যা-যাত্রা করতে হয়। এখনো বাংলা ও উড়িষ্যা—এই দুই রাজ্যের সীমান্ত-বর্তী অধিবাসীদের মধ্যে আদান-প্রদান চলেছে সংস্কৃতি ও আত্মীয়তার। পারস্পরিক পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে বঙ্গীয় ও উৎকলীয় দেহ-মন। ফলে গাঙ্গেয় ও নাব্য বাংলার পূর্ব সীমান্তের মানুষদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে সমুদ্রাঞ্চলের এই সীমান্ত বাংলার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মিল নেই তেমন। এখানকার গ্রামীণ জনজীবনের চলমানতায় যে সুর ও ছন্দ বাজে তার অনেকটাই উৎকলীয়।

একটা গ্রামে গিয়েছিলাম একবার। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে গ্রামটি ; আমাদেরই বাংলাদেশের সীমারেখার মধ্যে। তখন শীত ফুরিয়েছে। দক্ষিণের হাওয়া দূরে সমুদ্রের বুক ছুঁয়ে এসে লুটোপুটি খাচ্ছে গাছে-পাতায়—গায়ে-মাথায়। ফাগুনের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পুষ্পিত পলাশের ডালে ডালে। সোনালী বালুচরের বুকে গাথা শীর্ণকায়া সুবর্ণরেখা তার স্ফটিকস্বচ্ছ জলধারায় কুল-কুল ধ্বনি-তরঙ্গ তুলে ছোট্ট মেয়ের চঞ্চলতা নিয়ে ছুটে চলেছে। তার সঙ্গে মিশছে এসে হাজারো পাখির কিচির-মিচির ডাক। আমরা—জন চারেকের একটা ছোট দল তখন নরম বালুচরের মধ্যে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে হাঁটছি। সামান্য দূরেই যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে, আমরা যাব ওখানেই। সকালের মৃদু আলোর প্রসন্নতা আর পারি-পার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশের ঐশ্বর্যময় রমনীয়তা আমাদের মধ্যে খুশির ঢেউ তুলছে। মিষ্টি, মিষ্টি, মিষ্টি—সব কিছুই মিষ্টি; আমরা অনুভব করছিলাম আমরা কত সুখী—আমরা বসন্তের সঙ্গী। আমাদের প্রত্যেকের হাতে যেন ধরা ছিল খুশির ফানুস।

ঠিক এই সময়েই—এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দমগ্ন সময়—সমুদ্রের বুকে হঠাৎ যেন বেদনার ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো। আকাশ-বাতাস, গাছ-পালা, পাখি, নদী ও মানুষের কলহাস্য মুখরিত প্রসন্ন পরিবেশের বুকে হঠাৎ কোথা থেকে কান্নার করুণ সুরের একটা তীক্ষ্ন তীর এসে বিঁধলো। আমরা থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের খুশির ফানুস-গুলো চুপসে গেল। নদীচরের ঠাণ্ডা ও নরম পলিমাটির মধ্যে পা ডুবে যেতে লাগলো। আমরা স্তব্ধ—আমরা মর্মাহত। এমন ছন্দোময় আনন্দ-যাত্রায় কেন এই ছন্দপতন? এই সুন্দরের লীলাক্ষেত্রে কেমনভাবে ঘটলো অসুন্দরের আবির্ভাব? শান্তি ও সুখের প্রাণময় হিল্লোলের মধ্যে কোথা থেকে এল বেদনার প্লাবন? মন আকুল হ'ল। আহা! কে এমন হতভাগ্য, যে এই মধুর প্রভাতেও বিধুর কান্নায় ভেঙে প'ড়ছে? কান পেতে ভালো করে শুনতে চেষ্টা করলাম। কথা বুঝতে পারলাম না। কেবল মেয়েলী গলার কান্নার করুণ সুর একটা এসে বুকের ভেতরে আঘাত হানতে লাগলো। মনে হল আমাদের উদ্দিষ্ট গ্রামের মধ্য থেকেই কান্নাটা ভেসে আসছে। আমরা ব্যথিত চিত্তে গ্রামের দিকে পা চালালাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবেশ করলাম গ্রামের মধ্যে। ঘন গাছ-পালায় ঘেরা গ্রাম। ছায়ায় ঢাকা মেঠো পথ তখনো রোদের হাসি বুকে ধরেনি। পথের দুদিকে মাটির বাড়ী। কান্নার উৎসের নিকটবর্তী হচ্ছি আমরা ক্রমশ। এখন কেবল সুর নয়, কথাও কানে বাজছে। তবে সব বোধগম্য নয়। চারদিক ঘিরে কেমন যেন নিস্তব্ধতা। একটা থমকানো এবং চাপা ভাব। এই নৈঃশব্দের বুকে সপাং সপাং করে চাবুকের ঘায়ের মত এসে লাগছে নারী কণ্ঠের একটানা কান্নার রেশটা। একটা বাড়ীর কাছে এসে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। এই বাড়ীর ভেতর থেকে কান্নাটা ভেসে আসছে। আমরা দাঁড়িয়েছি, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাড়ীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন এক ব্যক্তি। আমাদের রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কাকে চাই?

আমরা থতমত—কিছুটা অপ্রস্তুতও। একটা অপরিচিত বাড়ীর সামনে হুট করে এসে দাঁড়িয়ে পড়াটা যে ভদ্রতা-বিরুদ্ধ তা মনে হল। কিন্তু না দাঁড়িয়ে আমাদের উপায় ছিল না। কান্নাটাই আমাদের দাঁড় করিয়েছিল—তার কথা এবং সুরের অভিনবত্ব আমাদের আকর্ষণ করেছিল। একটা নরম কণ্ঠোচ্ছৃত করুণ সুরের কান্না যে ভাষার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছিল তা বাংলা নয় মোটেই;—তা ওড়িয়া। স্বাভাবিকভাবে তাই কান্নার সুরের ঢেউয়ে কিছুটা বৈচিত্র্যময়তার টান লেগেছিল। বাড়ীটার সামনে এসে এইজন্যে দাঁড়িয়ে-ছিলাম। আমাদের কানে এসে তখন বাজছিল ঃ

হৃদয় মোহর ফাটি যাউছি মা গো।
আলি করিবার সরি যাউছি মা গো।।
দশ মাস দশ দিন গর্ভর মা গো।
খরিম পিলত কেতে কষ্টর মা গো।।
নিজ ন খাইত খুআউ থিল মা গো।
যেল বর্ষ মাত্র পাশে রখিল মা গো।।

ঠিক এই সময়েই ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন—কাকে চাই? অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে আমাদেরই একজন সঙ্গী বাঁচিয়ে দিল। বললে—আচ্ছা, শীতল প্রধানের বাড়ী কোনটা বলতে পারেন?

—কে? শীতল প্রধান? ও হো—আপনারা আমাদের নুটুর কথা বলছেন? আরে সে তো এই বাড়ীই! দাঁড়ান একটু আপনারা—আমি এখুনি তাকে ডেকে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক আমাদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমরা আর একবার হতভম্ব হলাম। সত্যিই আমরা আজ শীতল প্রধানের বাড়ী যাবার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলাম সাত-সকালে। গতকাল সন্ধ্যের সময় সুবর্ণরেখার চরে বেড়াতে বেড়াতে তার সঙ্গে আলাপ। লেখা-পড়া বেশিদূর করেনি শীতল। চাষীর ঘরের ছেলে চাষবাস নিয়েই থাকে। আর আছে দুধের ব্যবসা। বেশ সরল, দিলখোলা এবং আমুদে যুবক। অল্প সময়ের মধ্যেই তাই আলাপ জমে উঠেছিল। বিদায়কালে বারংবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল—কাল সকালে আসুন না আমাদের বাড়ী। ঐ তো সামনের গ্রামেই থাকি। এইখান দিয়ে নদী পেরিয়ে যে রাস্তা পাবেন সে রাস্তা ধরে গ্রামে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলে আমাদের বাড়ী পেয়ে যাবেন। গ্রাম দেখতে যখন বেরিয়েছেন তখন আমাদের গ্রামটাও দেখে যান একবার।

শীতলের কথায় টান ছিল—আঞ্চলি-কতার প্রভাব ছিল; কিন্তু আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তার সরব আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে না পেরে আজ তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কী অশুভক্ষণেই না যাত্রা আমাদের! আনন্দ লুটতে বেরিয়ে এ কী বিব্রত অবস্থার মধ্যেই না পড়লাম! নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে আজ শীতলদের বাড়ীতে। বিপদের বাড়ীতে ফুর্তি করার মন নিয়ে আকস্মিক আগমন বড় বেশি

বেদনাদায়ক। সব আনন্দ মাটি হয়ে গেল। এইটাই শীতলদের বাড়ী জানলে রাস্তা থেকেই আমরা ফিরে যেতাম—এমন অপ্রস্তুত হতাম না। একদম ভালো লাগছে না। শীতলকে কি অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই না ফেলতে চলেছি কে জানে? নিজেদের অদ্ভুত ঘটনায় বাহক মনে করে মরমে মরে যেতে লাগলাম। আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছি; কি করবো না করবো ভেবে পাচ্ছি না। কান্নাটাও আবার হঠাৎ থেমে গেল। নিজেদের শোক প্রকাশের বাধা-স্বরূপ ভেবে ভারী অপরাধী মনে হতে লাগলো।

এই রকম যখন অবস্থা—আমরা সকলেই যখন নির্বাক—ঠিক তখনই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল শীতল। খালি গা। কোঁচাটা কোমর বেড় দিয়ে কষে বাঁধা। হাঁটুর নিচে কাপড় নামে নি। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখি—বড় তাজ্জব ব্যাপার—শোকের চিহ্নমাত্র নেই শীতলের মুখে! ছায়ার অন্ধকার নেই—তার বদলে ঝলমলে রোদ্দুর—মুখভর্তি হাসি। টগবগে যৌবন যেন খুশির উজ্জ্বলতায় টলোমল। আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে সে সাদর আহ্বান জানালো—আসুন, আসুন। এলেন তা হলে—অ্যাঁ?

আমাদের বিস্ময়ের ঘোর তবু কাটেনি। কিছুক্ষণ আগে আমরা যে আশঙ্কা ক'রছিলাম তা কি অমূলক? কিন্তু কি করে হবে? আমরা স্বকর্ণে যে কান্না শুনেছি! শীতলদের বাড়ীর ভেতর থেকেই যে তা ভেসে আসছিল!!

আমাদের আড়ষ্ট হ'য়ে থাকতে দেখে শীতল তাগাদা দিল—কই, আসছেন না কেন আপনারা? আসুন বাড়ীর মধ্যে?

আর বোকার মত নিশ্চুপ থাকা উচিত নয় বিবেচনা ক'রে আমি বললাম—না, আজ থাক ভাই। আজ আমরা ফিরেই যাই। এবার বিস্মিত হবার পালা শীতলের। বললে —সে কি, দোরগোড়ায় এসে ফিরে যাবেন কেন?

বিষণ্ণ গলায় ব'ললাম—না ভাই, তোমাদের বড় অসুবিধেয় ফেলেছি আজ এসে। একটা কিছু ঘটেছে তোমাদের বাড়ীতে।

—কৈ, না তো! —ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে শীতল।

—কিন্তু কে যেন কাঁদছিল? আমরা নদীর চর থেকেই সে কান্না—আমার কথা শেষ হ'ল না। নিমেষে শীতলের মুখের ভাব বদলে গেল। হো-হো করে হেসে উঠলো সে। দমকে দমকে হাসি। তার হাসির বানের তোড়ে আমার উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত কথার টুকরোগুলো ভেসে গেল। আমরা একেবারে হতবাক! করুণ কান্না যে কারো অফুরন্ত হাসির কারণ হতে পারে তা আমাদের ধোলাই করা মগজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝে উঠতে পারলাম না। একেবারে বোকা বনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম সবাই।

হাসি থামিয়ে শীতল তার ডাগর ডাগর হাসি-উপচানো চোখ নিয়ে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলো। ব'ললো—আসুন।

তবু আমাদের পা ওঠে না। মনে একটা ধন্দ। ছেলেটা কি পাগল? আমার কথা শুনে এমন করেই বা হাসলো কেন? শীতল বোধহয় টের পেল মনের কথা। তাই সহাস্যে হাঁক দিল আবার—আরে আসুন আপনারা! কিছু ভাবনা নেই আপনাদের। যে কান্না শুনেছেন তা তেমন কিছুই নয়। ঘরে আসুন আগে, তারপর সব বলছি।

তার কথায় আশ্বস্ত হ'লাম। হাসির আলোয় ভরা শীতলের মুখ-চোখ ও ভাব-ভঙ্গি দেখে বুঝলাম আমরা কোথাও একটা মস্ত ভুল করে ব'সে আছি। তার মনের প্রসন্নতা আমাদের মন ছুঁলো। তাকে অনুসরণ করে তাদের ঘরে ঢুকলাম। ঢোকার আগে পিছন ফিরে দেখি, ইতিমধ্যে কখন ছায়া সরে গিয়ে গ্রামের রাস্তার ওপরে ঝলমলে রোদ্দুর এসে প'ড়েছে।

একটা ঘরের মধ্যে এনে মাদুর বিছিয়ে বসালো আমাদের শীতল। মাটির দেওয়াল। খড়ের ছাউনি। দরজা-জানালা ছোট। কিন্তু কী পরিষ্কার! গোবর ও মাটি দিয়ে নিকানোর জন্যে দেওয়াল ও মেঝে ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে। আমাদের আপ্যায়নের জন্যে শীতল ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। আমরা তাকে বাধা দিলাম। হাত ধরে জোর করে আমাদের মধ্যে বসালাম। সে হাঁ-হাঁ করে বাধা দিতে গেল। ব'ললাম—ওসব পরে হবে। এখন আসল ব্যাপারটা খুলে বলতো দেখি? বাড়ীর ভেতরে কান্না—তোমার মুখে হাসি—আমরা যে বড় বেকায়দায় পড়েছি হে!

আর একবার হি-হি করে হাসির পালা। তারপর শীতল যা ব'ললো, তাতে আমাদের চক্ষুস্থির। হাসবো না কাঁদবো কিছু ঠিক ক'রতে পারলাম না। এমন বিস্ময়, বেদনা ও সরস কৌতুকও যে আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রছিল তা কে জানতো? শীতলের কাছ থেকে জানতে পারলাম, কিছুক্ষণ আগে আমরা যার কান্না শুনেছি সে শীতলেরই বোন। বয়স চোদ্দ-পনেরো। নাম সরলা। করুণ কান্নায় সেই মেয়েটিই এতক্ষণ ভেঙে প'ড়ছিল। না, না—বিষণ্ণ হবেন না আপনারা। সবটা শুনুন আগে। সরলার বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেছে। আর দিন পনেরো বাদেই 'দোল দোল চতুর্দোলায় চড়ে' বর আসবে। তাকে চলে যেতে হবে। নিজের মা-বাবা, আপনার ভাই-বোন, নিকট-দূর আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত সমাজ-সংসার, তার এতদিনের অতি আপনার মানুষ-মাটি-গাঁ—এই সব কিছু ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। সুতরাং যাবার দিনের চরম মুহূর্তে এই ব্যাপক বিচ্ছেদ-বেদনাকে যে ভাষায় ব্যক্ত করবে কিছুক্ষণ আগে সরলা তারই মহড়া দিচ্ছিল। খুব অবাক হ'য়েছেন নিশ্চয়ই? তা অবাক হবারই কথা। আমরাও হ'য়েছিলাম। অভিনয়, বক্তৃতা বা মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যেই মহড়ার প্রয়োজন হয় জানতাম। কিন্তু পতিগৃহে যাত্রাকালে অবলা সরলাবালার হৃদয়-বেদনায় অভিব্যক্তির প্রয়োজনেও যে 'রিহার্স্যালে'র দরকার তা স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। কিন্তু কি ক'রবেন বলুন? এখানের রীতিই যে এই। অন্তত শীতল আমাদের সে কথাই ব'ললো। বিয়ের দিনের বেশ কিছু আগে থেকেই নাকি কনে সময়ে সময়ে কাঁদতে বসে যায়;—যাবার দিনটিতে যাতে সহজে কাঁদতে পারে তারই অভ্যাস করে। কান্নার কথাগুলো বিয়ের কনেরা নিজেরা বানায় কি না? না, না—ওর ভাষা তৈরীই আছে। কোন্ এক আদ্যিকালে কোন এক বিয়ের কনে হয়তো কেঁদে উঠেছিল আপন আবেগে। সে কান্না প্রকাশের ভাষা ছিল তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। তারপর থেকে বিয়ের কনের সেই একই ভাষায় কেঁদে চলার রীতি বোধহয় গড়ে উঠেছে। তবে কালক্রমে গ্রাম্য কবিদের কল্পনার ছোঁয়ায় এই কান্নার কথা রূপের কায়া-স্ফীতি ঘটেছে ব'লে মনে হয়। সে যাই হোক না কেন, কান্নার ভাষা এখন আর নতুন ক'রে বানাতে হয় না। কেবল আবৃত্তি ক'রে ক'রে মুখস্থ করা আর একই বাঁধা বুলিকে হৃদয়ের বেদনার সকরুণ রাগমণ্ডিত করে মর্মস্পর্শী ক'রে তোলা—এই হ'ল বিয়ের কনের কাজ। শীতলের বোন সরলা এতক্ষণ এই মহৎ দায়িত্ব পালনের কাজেই প্রাণপণে ব্যস্ত ছিল। সুতরাং দুর্ভাবনার কিছু কারণ নেই। আমরাও যেন না ভাবি।

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। আমাদের চোখে-মুখে খুশির রং লাগে। আমাদেরই বাংলাদেশে কন্যা-বিদায়ের এমন অভিনব পালা যে সংঘটিত হয় তাতো আমাদের—তথাকথিত সভ্যতার চোখ-ধাঁধানো আলোকোজ্জ্বল অংশের অধিবাসীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। বাংলাদেশের এমন কত কিছুই না অজানা থেকে যাচ্ছে—ঘটে চলেছে আমাদের দৃষ্টির বাইরে। অথচ আমরা 'সংস্কৃতি' ও 'ঐতিহ্য' শব্দ দুটো নিয়ে বুক ফুলিয়ে কত লোফালুফিই না করি! আমরা নিজেদের সভ্য ও সংস্কৃতিবান ভাবি—সব জান্তার ভানে ভরপুর থাকি। এই ধরনের আত্ম-অহমিকাভাবের অসারত্ব কল্পনা করা যায় ইট, কাঠ, পাথর ও চোখ ঝলসানো আলোর শহর ছেড়ে গ্রাম বাংলার নিভৃত শান্ত বুকের মধ্যে এসে দাঁড়ালেই। গ্রামের মধ্যে চলে আসুন। দেখুন কী বিচিত্র এই বাংলাদেশ। এক জেলার ভাষার সঙ্গে অন্য জেলার ভাষার কী দুস্তর ব্যবধান। এক অঞ্চলের রীতি-নীতির সঙ্গে অন্য অঞ্চলের —এপাশের সঙ্গে ও পাশের অনেক ক্ষেত্রেই আশমান জমিন ফারাক। এই ধরুন না কেন, আজ এখানে না এসে পড়লে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের এমন পরমাশ্চর্য কন্যা বিদায়ের রীতি-নীতি কি আমাদের

গোচরীভূত হ'তো না এমনভাবে আমাদের মনে বিস্ময় ও কৌতূহলের তরঙ্গ-শিহরণ জাগতো?

যাই হোক, আমরা অবাক মেনে অনুরোধ করি। সবাই মিলে শীতলকে ধরে বসি—তার বোন সরলার গলায় কান্নার মহড়া শুনতে চাই। আমাদের অনুরোধ জানাতে শীতল অন্দরে যায়। সরলা কিন্তু সরল হয় না। শীতল ফিরে আসে। মিটি-মিটি হেসে বলে, তার বোন লজ্জা পেয়েছে। আপন আবেগে কিছুক্ষণ আগে সাতপাড়া জাগিয়ে কান্নার যে সুর সে সাধছিল সে সুরের তাল আমাদের মত অপরিচিত কয়েকজন বন্ধুর আগমনজনিত লজ্জায় গেছে কেটে। এখন শত চেষ্টাতেও তা জোড়া লাগবে না। সুতরাং আমরা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। কিন্তু একেবারে হাল ছাড়ি না। শীতলকে বলি—তুমি শোনাও তবে। সে তো হেসেই খুন। বলে—ও মা, আমি পুরুষ মানুষ—আমার গলায় খেলবে কেন ও সুর? আমরা জানাই, সুরের দরকার নেই—ভাষা হ'লেই হবে। কান্নার কথাগুলোই কেবল আমরা জানতে চাই।

—ও, এই কথা? আচ্ছা আপনারা একটু বসুন। এই বলে আমাদের আশ্বস্ত করে খুশি হয়েই শীতল পাশের ঘরে গেল। ফিরে এল একটা খাতা হাতে নিয়ে। বাড়িয়ে দিল আমাদের দিকে। বললে—এই নিন। এর ভেতরেই কান্নার সব কথা লেখা আছে। লাল বালির কাগজের একটা খাতা খবরের কাগজ দিয়ে মলাট করা। উল্টে-পাল্টে দেখি আর বিস্মিত হই। মলাটের পর ভেতরের প্রথম পাতার একেবারে ওপরে লেখা আছে ছোট অক্ষরে 'ও' তৎ সৎ।' তার নিচেই বড় বড় অক্ষরে লেখা 'গেহলা-ঝিঅ' কথাটায় সহজেই চোখ আটকায়। তারপর পাতা তিনেক জুড়ে পুরনো ধাঁচের আঁকা-বাঁকা কাঁচা বাংলা হরফে গানের আকারে অনেক কিছু লেখা। পড়তে গিয়ে ঠেক খাই। আসলে হরফ বাংলা হ'লে কি হবে ভাষা ওড়িয়া। কিছু আগে শোনা সরলার কান্নার ওড়িয়া কথাও কিছু কিছু মনে পড়ে যায়। বিদায়ী বাঙালী কন্যার কান্নার ভাষাটা পুরো-পুরি ওড়িয়া হওয়ার কারণের কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে হ'ল, বাংলা ও উড়িষ্যা এক সময়ে এক ছিল। তাছাড়া বাংলা-দেশের এই সীমান্তের মানুষদের ওপর উৎকলীয় প্রভাব যে খুব বেশি ক'রেই পড়েছে তাতো আরম্ভেই বলেছি। আসলে উৎকলীয় বিবাহ-রীতিই এতদঞ্চলে প্রচলিত হ'য়েছে।

শীতলকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, খাতাটা অনেক দিন ধরে তাদের বাড়ীতে আছে। জ্ঞান হওয়ার সময় থেকেই দেখে আসছে সে। সম্ভবত তার ঠাকুরদার হাতের স্পর্শ আছে ঐ খাতায়। জিজ্ঞাসা ক'রলাম—'গেহলা ঝিঅ' মানে কি বিয়ের কনে?

আমার অজ্ঞতায় খিলখিলিয়ে হাসে শীতল। বলে—না, না। 'গেহলা ঝিঅ' মানে আদুরে মেয়ে—যাকে আপনারা বলেন আহ্লাদী। ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে তখনো বিন্দুমাত্র পরিচয় ঘটেনি আমার। খাতাটার সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়লো। নিজের কাছেই রাখলাম ওটা। ইতিমধ্যে দুধ, মুড়ি আর পাটালি এসে হাজির হয়েছিল। শীতলের পৌনঃপুনিক অনুরোধে সবাই মিলে সেগুলোর সদ্গতি করলাম। তারপর বিদায় নেবার সময় খাতাটা বগলদাবা করে পরদিন ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

খাতাটা ফিরিয়ে দেবার আগে নতুন একটা খাতায় তুলে নিয়েছিলাম সব লেখাটুকু। তারপর ধীরে ধীরে অর্থোদ্ধার করেছি 'গেহলা-ঝিঅ'-র। অর্থ জানার পর বিশ্বাস জন্মেছে, লেখাটার অধিকাংশই অজ্ঞাত এক (বা একাধিক) গ্রাম্য কবির সহানুভূতিশীল ও সমবেদনা-কাতর সরল হৃদয়েরই ফসল। পিতৃ-তান্ত্রিক দেশের বিয়ের কনেদের বিচ্ছেদ-বেদনাকাতর হৃদয়ের কথা সম্ভবত স্পর্শ করেছিল এই গ্রাম্য কবির অন্তর। তিনি তাঁর আকুলিত হৃদয়ের আবেগকে মুক্ত করে দিয়েছেন 'গেহলা-ঝিঅ'-র রোদন-সঙ্গীতের মধ্যে। 'রোদন-সঙ্গীত' বলছি এ-জন্যে—এ কান্নার মধ্যে লোকগীতির একটানা সুর যেন বেজে ওঠে। তাছাড়া এ কবিতার মত ক'রে লেখা বলে এর সুরে-ছন্দে গীতি-ময়তার ছোঁয়াচ লেগেছে। লেখাটার অনেক জায়গাতেই কল্পনার রামধনু-রং লেগে রমণীয় বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হ'য়েছে।

আমার কোথাও বা অজ্ঞাত ভ্রান্তি লেখাটির মধ্যে স্থান পেয়ে অল্প-শিক্ষিত গ্রামীণ কবির অকপট সরল হৃদয়টিকেও মেলে ধরেছে। এখন লেখাটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

'গেহলা ঝিঅ'-র প্রথম অংশে আছে বিদায়ী ঝিয়ের কনের মায়ের কাছে কান্না, নাম দেওয়া হ'য়েছে তাই : 'মাআঙ্ক পাশে রোদন'। আদরিণী কন্যার বিয়ে হ'য়ে গেছে। বিদায়-ক্ষণটি এসে হাজির হ'য়েছে। বাইরে সাজানো পাল্কি দাঁড়িয়ে। বিচ্ছিন্নতার স্রোতে ভাসিয়ে এই পাল্কিই মেয়েটিকে তার অজানা কোন এক সংসার-দ্বীপে নিয়ে গিয়ে তুলবে কে জানে? বাঁধ ভাঙা বন্যার মত চোখের দু-কূল ছাপিয়ে জলের ঢল নেমেছে মেয়ের চোখে। জানা জগৎ তার চোখের সামনে থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে আর কয়েক মুহূর্ত পরেই। চেনা মানুষ হয়ে যাবে ক্রমশ পর—তাদের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্ক যাবে ঘুচে। এ অসহনীয় বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা সে সইবে কেমন করে? তার বেদনা-ব্যাকুল হৃদয় মায়ের কাছে তাই কান্নায় ভেঙে পড়ে :

উঠিলে সবারি বসিব নাহি মা গো।
ধুরি চাঁহিলেত দিশিব নাহি মা গো।।
গাঁ পহারিলে নাম লুচিব মা গো।
ঢেকা ছাটিলেত যাই বুজিব মা গো।।

অর্থাৎ,—মা গো, পাল্কি চলতে আরম্ভ করলে তো আর থামবে না। দূরে তাকালে তো আমি কিছুই দেখতে পাব না। মা, গাঁ বেরিয়ে গেলেই আমার

লক্ষ যাবে এমে। কোদালে কাটা মাটি ছুঁড়লে নালা যাবে বন্ধ হ'য়ে (শেষ পংক্তিটি গভীর অর্থবহ। কোদালে কাটা মাটির চাপকে যেমন স্থানচ্যুত করে দূরে ছুঁড়ে নালা বন্ধ করা হয় তেমনি মেয়েকে পিতা-মাতা অনেক দূরে বিয়ে দিয়ে বাপের বাড়ীর সঙ্গে তার সদা সান্নিধ্য-সম্পর্কের পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছেন।)।

এই ছবি অবশ্য আমাদের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। বাংলা দেশের প্রায় সব জায়গাতেই বিয়ের পর নববধূকে শ্বশুর ঘর ক'রতে যেতে হয়। সেই যাত্রা-লগ্নটি বড় করুণ। কত আত্মীয়-অনাত্মীয়ের বিয়ের স্মৃতিই তো চোখের সামনে ভাসছে। বিশেষ করে সেই সময়ের ছবি, যখন মেয়ে মা-বাপ ও পরিচিতজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পা তুলতে চলেছে অপেক্ষমান পালকি বা গাড়ীতে। পা আর কিছুতেই ওঠে না মেয়ের। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কান্নার আবেগে থরথরিয়ে কাঁপছে। বেদনার অনুচ্চ ধ্বনি উথাল-পাথাল হৃদয় থেকে যেন উৎক্ষিপ্ত হয়ে গলা চিরে আসছে বেরিয়ে। মায়ের অবস্থাও মেয়ের মত। বাবা চোখ মুছছেন কোঁচার খুঁটে। ছোঁয়াচে রোগের মত সংক্রামিত হয়ে পড়ছে এই কান্না আশে-পাশের জমায়েত নরনারীর মধ্যে। সকলের চোখেই জল—ছলোছলো ভাব। ছেলেবেলায় ভারী অবাক হ'তাম এই অবস্থার মধ্যে বড়দের কাঁদতে দেখে। যাঁকে গুরুগম্ভীর রাশভারী বলে মনে হ'ত সেই মানুষকেই যখন কন্যা-বিদায়কালে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখতাম তখন খুব বিস্ময় আর কেমন এক রকমের অস্বস্তি জাগতো মনে। যাই হোক এই সীমান্ত বাংলার কন্যা-বিদায়ের সময়েও সেই একই পালার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে; তবে একটু তফাৎ আছে। কন্যা-বিদায়-লগ্নে আমরা যে কান্নার সঙ্গে পরিচিত সে কান্নার কোন বাঁধা ভাষা নেই; কিন্তু এখানকার কান্নায় আছে। মেয়ে, মা, বাবা ও আত্মীয়স্বজনদের ঐ বিশেষ সময়ের কান্নার বাঁধা ভাষাই 'গেহলা ঝিঅ'-র রূপ নিয়েছে। অবশ্য খোঁজ নিয়ে জেনেছি, 'গেহলা-ঝিঅ'-র তিরিশ পাতা জুড়ে যে দীর্ঘ কান্না-কথা আছে তার সবটাই পতিগৃহ-যাত্রাকালে মা-মেয়ে ইত্যাদির কান্নায় ব্যবহৃত হয় না—অংশবিশেষ মাত্র আবৃত্ত হয়।

এতক্ষণে অনেক পাঠকই হয়তো ঠোঁট টিপে হাসছেন আর ভাবছেন এই অভিনব কান্নার কথা। হয়তো মনে ক'রছেন, বিচ্ছেদ-বেদনার আন্তরিক সুর এই বানানো কান্নায় ফুটে ওঠে না। ও কান্না কৃত্রিম। ওতে মনে কৌতুক জাগায় কেবল। কিন্তু আমি সবিনয়ে বলি—এমন ক'রে কি এক-কথায় নাকচ করে দেওয়া যায়! আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে কত সময়েই তো আমরা হৃদয়ের সুগভীর অকৃত্রিম অনুভূতিকে—সে সুখেরই হোক আর দুঃখেরই হোক—বাঁধা কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে থাকি। কতকাল ধরে লক্ষ-কোটি প্রেমিক-প্রেমিকাই তো পরস্পরকে—"আমি তোমায় ভালবাসি" ব'লে প্রেম নিবেদন করে আসছে; প্রায় সব মা-ই তো সন্তানের মৃত্যুতে "ওরে বাবারে (বা মারে)—কোথা গেলি রে" বলে কেঁদে মৃত্যুশোক প্রকাশ করছেন; কিন্তু এই ধরনের বাঁধা গতে সুখ ও দুঃখানুভব-গুলিকে প্রকাশ করার সময় কই একবারও তো তা কৃত্রিম বলে মনে হয় না? সুতরাং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কন্যা-বিদায়কালীন এই কান্না বানানো হলেও তাই কৃত্রিম হয়ে ওঠে না বলেই আমাদের ধারণা। আমরা স্বকর্ণে শীতলের বোন সরলার কণ্ঠে কান্নার মহড়া শুনেছি যে! তা আমাদের হৃদয়কে যে গভীরভাবেই নাড়া দিয়েছিল সে কথাতো আগেই বলেছি।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে। ফাঁকা কথা দিয়ে তো আর এই কান্নার ভাষা তৈরী হয়নি। ব্যথিত হৃদয়ের শাশ্বত সত্য অনুভূতিগুলি যে অনুভূতি সর্বজনীন—বাণীরূপের মধ্য দিয়ে 'গেহলা-ঝিঅ'-রূপ রোদনসঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে। তাই শাক্ত-সঙ্গীতের 'বিজয়া'-গীতির মতই এ সত্য, অকৃত্রিম এবং এর আবেদনও সর্বব্যাপ্ত হতে বাধ্য। সেদিন সরলার কান্নার যে অংশটুকু ("হৃদয় মোহর ফাটি যাউছি...") আমাদের কানে বেজেছিল তা তো সহৃদয়া আদরিণী কন্যার অনুভূত মর্মান্তিক হৃদয়-বেদনারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র:—'মা গো, আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে; আদর করার লোক চলে যাচ্ছে। মা, আমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরে কত কষ্টই না পেয়েছিলে। ষোল বছর ধরে আমায় পাশে রেখেছিলে।'

প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে এমন কোন মেয়ের মনের মধ্যেই এই ধরনের কথা উঁকি দিয়ে ব্যথার কাঁটা না ফোটায়? এই রকম একটা নয়। হৃদয়ের অসংখ্য গভীর দুঃখময় অনুভূতির কথাই 'গেহলা-ঝিঅ'-র মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। তারই কিছু প্রমাণ রাখছি।

বিবাহিতা নারীজাতি পরাধীনা—বিশেষ করে ভারতবর্ষে—গ্রামজীবনে। ছেলে মানুষ করা, রান্না-বান্না আর হেঁসেল-হাতা-খুন্তি নিয়েই তার দিন যায়। শ্বশুর-বাড়ী যাবার প্রাক্‌কালে মেয়ে তাই মায়ের কাছে পরাধীনতার বেদনা ব্যক্ত করে কেঁদে বলে:

কপোতী ঝুলেই করঞ্জ ডালে মা গো।
মুত ঝুরিথিবি রোশাই শালে মাগো ।।

—'কপোতী করঞ্জ ডালে ঝোলে; আমি ঝুলবো রান্নাশালায়।' এই বলেই থামে না মেয়ে। তার কান্নার মধ্যে এই কথাগুলোও বাজতে থাকে:

'তোমার পায়ে আমি কি দোষ করেছি মা যে, আমায় দূর দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছ। মা গো, তোমার মনে যদি এই ছিল তা হলে জন্মকালে আমার গলা টিপে মেরে ফেললে না কেন? শ্বশুর ঘর যমের ঘরের সমান—বিনা দোষে আমাকে দণ্ড দেবে। মাথা হেঁট করে সব সময়ে পরাধীন হয়ে চলতে হবে। সব সময় মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে আমায় থাকতে হবে। মা গো, সারী যেমন কর্মের দোষে বন্দী হয়ে খাঁচার ভেতরে থাকে, আমাকেও সেইভাবে বন্দী করে রা এবং ননদের দল আমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কাকে আমি 'মা' বলে ডাকবো? তোমার সমান কি কেউ হবে? যার দিকেই তাকাই না কেন, সবাই তো পর। আমাকে স্নেহ-আদর করবে কে?'

বিদায়ী কন্যার এই কান্নার মধ্যে তার অভিমানক্ষুব্ধ ও বেদনা-কাতর শঙ্কিত হৃদয়ের ছবি অকৃত্রিম হয়েই ফুটে উঠেছে। একটি অসাধারণ ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ কাব্যাংশও আমরা এই অংশে পেয়েছি। আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছবিটা: স্বাধীন কুমারী জীবনের অবসানে বিদায়ী কন্যার মনের তটে ব্যথার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বারংবার—যেন খাঁচায় আবদ্ধ মুক্তি-ব্যাকুল চঞ্চল একটি পাখি পাখা ঝাপটে চলেছে অবিরাম। 'মাতাংক পাশে রোদনের একটি অংশে অভিমানিনী কন্যা তার পিতার অর্থ-লোভের প্রতি কটাক্ষ করে দোষারোপ করতেও ছাড়েনি। সে বলেছে, যখনই তার বাবা ধবধবে টাকা দেখলেন তখনই তার বাবার লোভ জন্মালো:

যহুঁ যহুঁ টঙ্কা ধুব দিশি লা মা গো।
তহুঁ তহুঁ বাপার লোভ বাসিলা মা গো।।

এখানে ধবধবে টাকা বলতে রৌপ্য-মুদ্রাকেই হয়তো বোঝানো হয়েছে। এই পঙ্‌ক্তি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কন্যা-বিদায় সম্পর্কে নতুন কটা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণত, পণ-প্রথার নিষ্ঠুর কবলে বাংলাদেশের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বা অভিভাবকদেরই পড়তে হয়। শুধু মেয়ে দিয়েই নিস্তার নেই তাঁদের। পাত্রের হাতে মেয়ে সমর্পণ করার সময় দানে-যৌতুকে আশীর্বাদে মোটা পরিমাণের টাকার তোড়াও একটা তুলে দিতে হয়। কিন্তু এখানের রীতি তার বিপরীত। 'গেহলা-ঝিঅ'-র কান্নার মধ্য থেকেই পাচ্ছি যে, বর পক্ষই বিয়ের সময় কনের বাপের হাতে টাকা তুলে দিয়ে মেয়ে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে।

এরপর মেয়ে থামলেও কান্না থামছে না। মেয়ের পর মায়ের পালা। নাম দেওয়া হয়েছে: 'মাতাঙ্কর উপদেশ'। মেয়েকে বিদায় দিতে গিয়ে মাতৃ-হৃদয় থেকে উত্থিত বাৎসল্য-প্রেম গভীর আবেগে বেদনাময় রূপ নিয়ে থরথরিয়ে যেন কেঁপে উঠেছে:

সুনা পরি ঝিঅ পর ঘরকু গোহিলারে।

—'সোনার মত মেয়ে আমার পরের ঘরে চলে যাচ্ছিস।' —এই বলে কান্না আরম্ভ করেছেন মা। দীর্ঘ কান্না। তার মধ্যে বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে উপদেশ দান। শ্বশুরবাড়ীতে যাবার পর মেয়ের আচরণ কিরকম হবে সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সুমন্ত্রণা-সুনির্দেশ। মেয়েকে পটের বিবি সেজে থাকতে বলেননি মা। গৃহস্থ ঘরের লক্ষ্মী বধূ হবার উপদেশই দিয়েছেন। বলেছেন, শ্বশুর-শাশুড়ীকে

দেবতা মনে করে ভক্তি করছে; খুব সকাল-সকাল উঠছে। তারপর কি করবে মেয়ে? গৃহ-প্রাঙ্গণে গোবর-জল ছড়া দেবে—এ'টো বাসন-কোসন হাত-মুখ ধোবার নালার কাছে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করবে—ঘর-দোর ন্যাতা দেবে এবং স্নান সেরে এসে হাঁড়ি ধরে রান্না চাপাবে মন দিয়ে। রান্না শেষে অন্ন-ব্যঞ্জন বেড়ে সকলকে সমানভাবে যেন পরিবেশন করে। এ প্রসঙ্গে মায়ের উপদেশের অবিকৃত রূপ একটু শোনা যাক :

গোবর কিছি জলে গোলি দেই।
ছিচিবু বাড়ি অগণারে নেই।।

... ... ... ...

চলান্তি বাসন বেতে গুহরে।
নেইন মাজিবু নলা মুহরে।।
ঘর বাহার সর্ব দেবু মণ্ডি।
স্নান সারি আসি ধোইবু হাণ্ডি।।

... ... ... ...

তৎপরে বাড়িবু অন্ন-ব্যঞ্জন।
সমস্তটুকু বাড়ি দেবু সমান।।

এইখানেই মেয়ের কর্তব্য শেষ নয়। পড়াশোনাও সে করবে। কিন্তু কি পড়বে—আধুনিক নাটক নভেল কি? না, পড়বে সীতা-সাবিত্রীর পূত-পবিত্র কাহিনী :

সীতা দময়ন্তী সাবিত্রী সতী।
শৈব্যা চিন্তারাণী সে দুর্গাবতী।।
কাহিনী পড়িবু বই ধরিণ।
হিত কথামান থিবু বুঝিণ।।

এতে করে পতি-মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে মেয়ে। অনুভব করবে পতিই নারীর পরম গতি। মা মেয়েকে সাবধান করেছেন :

গাঁ আ ভুআষুণী আসিলে কেহি।
তা সঙ্গে টাপরা করিবু নাহি।।

—'গ্রামের কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা এলে তাঁর সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করবি না।' কারণ?

ধীর ধীর কথা ধীর চলন।
বহু ভুআষুণী পক্ষে শোভন।।

এরপর মা বলেছেন, সন্ধ্যে হলে মেয়ে যেন গৃহে সন্ধ্যা-দীপ জ্বালে এবং ঈশ্বরের পায়ে যেন প্রণাম নিবেদন করে সকল সময়। মায়ের এই হিত-বাণী মনে রাখলে মেয়ে যে সুখী হবে সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত।

'গেহলা-ঝিঅ'-র এই অংশে প্রাচীন সমাজের কন্যা-বিদায়ের রীতি-নীতির ছাপই বেশি পড়েছে মনে হয়। এপ্রসঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে বর্ণিত শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে মহর্ষি কণ্ব ও মা গৌতমীর শকুন্তলাকে উপদেশ দানের কথাই বেশি করে মনে পড়ে।

এরপর মায়ের কাছ থেকে মেয়ে গেছে পিতার কাছে। করুণ সুরে কে'দে কে'দে বলেছে :

সজনা গাছরে ছাড়িলা চুই বাপা গো।
তুম্ভর কোলভ ছাড়িলে মুহি বাপা গো।।

—'সজনা গাছ থেকে ফুল খসে পড়লো। বাবা গো, আমি তোমার কোল ছেড়ে গেলাম।'

এখানে গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়ার সঙ্গে পিতার স্নেহ-কোমল আশ্রয় ত্যাগ করে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী যাত্রার তুলনাটি চমৎকার। জল-ভরা ছলছলে চোখ নিয়ে এই মেয়েই আবার পিতৃ-হৃদয়ের নিষ্ঠুরতার প্রশ্ন তুলে কাঁদায় পিতা সম্পর্কে তার মনোভাবের মধ্যে সুন্দর বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়েছে :

টিকিরে দয়া মনে ন বহিল।
গরীব ঘররে মোতে ছন্দিল।।

—'তোমার মনে এতটুকু দয়া হল না। আমাকে গরীবের ঘরে বিয়ে দিলে।'

স্বাভাবিকভাবেই তারপর পিতার কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। এখানেও পিতা তাঁর কন্যাকে উপদেশ দিয়েছেন প্রথমে দার্শনিকের মত :

কি পাই কাঁদুছ মা মোহর।
এহি নিয়ম জড় জগতর।।
ঝিঅ জন্ম হেলে পর ঘরকু।
পুত্র জন্মি পালে পিতা মাতাকু।।

—'মা আমার, কাঁদছো কেন? জড় জগতের এই নিয়ম। মেয়ের জন্ম পরের ঘরের জন্যে, আর পুত্র জন্মে পিতা-মাতাকে পালন করে।'

তারপর পিতা খুব বড় করে তাঁর কন্যার শ্বশুর-বংশের যশোগান গেয়েছেন। বংশ-মর্যাদা ও সম্মান-সম্ভ্রমের দিক থেকে অমন পরিবার যে কোটিকে গুটিক মেলে—বিত্ত ও বিদ্যা দুই-ই যে এই বংশের সকলের করায়ত্ত—সে কথা পিতা খুব বড় গলায় মেয়েকে শুনিয়েছেন। বলেছেন, তাঁর কন্যার শ্বশুরকুলের কেউ ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, আবার কেউ বা কমিশনার। 'গেহলা ঝিঅ'-র এই অংশের কিছুটা বেশ মজার। এক জায়গায় আছে :

বি-এ বি-টি পড়ি তো দেড়সুর।
মেডিকেল কলেজরে ডাক্তার।।
আ. এসি পড়িণ স্বামী তোহর।
মুনসফ হেলে বালেশ্বর।।

এখানে রচয়িতার অজ্ঞ ও সরল গ্রাম্য মনটি বিচিত্র ও ভ্রান্ত ধারণার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। বি-এ, বি-টি পাশ করে যে কারো পক্ষে ডাক্তার হওয়া সম্ভব নয়, অথবা আই-এস-সি পড়ে যে কেউ মুন্সেফী করতে পারে না—এটুকু জ্ঞান রচয়িতার না থাকলেও উ'চু ধরনের অবাধ কল্পনায় তাঁর সরল কবি মনটি কিন্তু পিছিয়ে থাকে নি।

বিদায়-পর্ব সমাপ্ত হতে এখনো কিছুটা বাকি। পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়ে তারপর পর্যায়ক্রমে বড় ভাই, বড় ভাজ, কাকীমা, কাকা, ঠাকুরমা ও সেজ বোনের কাছে কে'দেছে এবং তারাও একের পর এক উপদেশ দিয়েছে (সেজ বোন বাদে)। এদের মধ্যে ননদ-ভাজের উক্তি-প্রত্যুক্তিই চিত্তাকর্ষক। ননদ যখন কে'দে বলেছে—'কাল তোমার সঙ্গে ছিলাম বৌদি গো, আর আজ আমি যাচ্ছি যম-মন্দিরে। তোমার স্নেহ-ভালোবাসার কথা মনে পড়বে প্রতি মুহূর্তে। কে আর আমার সিঁদুর লাগিয়ে দেবে? কার সঙ্গেই বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে কথা কইবো? কার সঙ্গেই বা নদীতে যাব গা ধুতে? কার পাশে বসে পুঁথি পড়বো—আমার রাত জাগার সাথীই বা হবে কে?' —রসিকা বৌদি তখন রঙ্গ করে উত্তর দিয়েছে চমৎকার :

কাহিঁকি কান্দুছ ডালিম্ব কসি
ফুল গো:
স্বামী সঙ্গে রঙ্গে হোইবু খুসী
ফুল গো।।
যেতে ভাব সবু হেব পাশোর
ফুল গো।
কান্ত হেব একা গলার হার ফুল গো।।
পাইছু সুন্দর রসিক বর ফুল গো।
সঙ্গে বসি থিব দিবা নিশির
ফুল গো।।

—'ডালিম ফুলের কুঁড়ি গো, কাঁদছো কেন? স্বামীর সঙ্গে রঙ্গে খুশি হবে। যত ভাব-ভালোবাসা এখানকার সব ভুলে যাবে; একা কান্তই হবে গলার হার। সুন্দর রসিক বর পেয়েছো। দিন-রাত্রি কাছে বসে থাকবে।'

ননদ-ভাজের মিষ্টি-মধুর সম্পর্কের ছবিটাই এখানে সুন্দর ফুটেছে। আসন্ন বিচ্ছেদের টলটলে কান্না রঙ্গ-কৌতুকের ঝকমকে পাপড়ির আড়ালে যেন অদৃশ্য থেকেছে।

এই হল মোটামুটি 'গেহলা ঝিঅ'-সংবাদ। তবে বলে রাখা ভালো, কন্যা-বিদায়ের এই রীতি অধুনা দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রতিটি গৃহে সর্বতোভাবে আর অনুসৃত হচ্ছে না। কারণ নাগরিক শিক্ষা-অত্যুজ্জ্বল সভ্যতার আলো এসে ঠিকরে পড়েছে প্রায় ঘরেই। ফলে আধুনিক ও নাগরিক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে ও উঠছে ছেলে-মেয়েদের দল। আজকের দিনের নবীনা বিদুষীরা চীৎকার করে কান্নায় লজ্জা পায় ভীষণ। আগেকার দিনের সরল আবেগের উচ্চ প্রকাশভঙ্গির মধ্যে গ্রাম্যতা ও স্থূলত্ব ধরা পড়ছে আজকের দিনের আধুনিকাদের মার্জিত রুচির মাপন-যন্ত্রে। সেই জন্যেই রুচি-মার্জনের প্রয়োজনে বর্জনের নীতিকে তারা গ্রহণ করছে প্রাণ-পণে। গোটা বাংলাদেশের সর্বত্রই লোক সংস্কৃতির অনেক কিছুই এখন পুরনো ও স্থূল আখ্যায় অভিহিত হয়ে লোক-লোচনের অগোচরে থেকে অবলুপ্তির অন্ধকারে ডুবতে বসেছে। শীতলদের পরিবারের মত দু-একটা পরিবারই এখনো অনাধুনিক (?) থেকে পুরনো প্রথা ও রীতি-নীতিকে পালন করে বাংলা লোক-সংস্কৃতির বাহক হয়ে রয়েছে। কিন্তু সে আর কতদিন? নগর সভ্যতার আলোক-বন্যায় ভাসলো বলে সব! কারণ আলোর গতি যে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল!!

# অপারেশনের পর

হাসপাতালে পা দিলেই মনটা কেমন বিষন্ন হয়ে যায়। লম্বা চওড়া বাড়ীগুলো গাদাগাদি ঠেসাঠেসি দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। ঝাঁঝালো একটা কটু গন্ধে সব যেন আচ্ছন্ন। ভারী ভারী লাগে হাত-পা সব; জোরে নিঃশ্বাস ছাড়তে পর্যন্ত ভয় হয়। লম্বা লম্বা এক-একটা করিডোর, চওড়া-চ্যাটালো সব সিঁড়ি, খাকী ইউনিফর্ম পরা দরোয়ান কোলাপসিবেল গেটের মুখে টুল পেতে বসে। একটু মুখটা ঘুরিয়ে ওপরের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে ও-টি—এখন ঝিম ধরে পড়ে আছে। অথচ একটু আগেও একচোখো দানবের কমচা-লাল চোখটা স্থির হয়ে জ্বলছিল— ডক্টর বাড়ুরী তখন তারকের জামাইবাবুর পেট চিরে ব্লাডার-টব্লাডার সব কেটেকুটে সাফ-সুতরো করছিলেন। সোয়া তিনটের জামাইবাবুকে সাজিয়ে-গুজিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে ঠেলাগাড়ীতে চাপিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল, ফেরৎ পাঠাল সেই সাড়ে পাঁচটায়। তারক দেখেছে জামাইবাবু চোখ খুলে ছিলেন, তবে নিশ্চয় জ্ঞান ফিরেছে। নার্স কথা বলতে দিল না কাউকে। স্যালাইনের বোতলটা একহাতে ধরে বিছানার পাশ ঘেঁষে চলতে চলতে সবাইকে বারণ করে দিল রুগীকে যেন ডিসটার্ব না করে কেউ।

দিদি একটি কথাও বলেনি। বলার ক্ষমতাই ছিল না কোনো। তিন দিন ধরে মনে মনে যা ঝড় চলেছে, বুঝতেই পারে তারক। এতক্ষণ শুধু দাঁড়িয়েছিল, ও-টি থেকে বিছানা বেরোতেই তারকের কেন জানি মনে হল দিদির বোধহয় শরীরটা ভাল নেই। তক্ষুনি ছুটে গিয়ে না ধরলে হয়তো পড়েই যেত। টেনসন তো নয়, হাইপার টেনসন।

পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন তালইমশাই। তারক ফিসফিস করে বলল, তাইমশাই আপনি বরং দিদিকে নিয়ে বাসায় চলে যান, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে, যা-যা করার সব করে ঘন্টাখানেক বাদেই যাব।

বৃদ্ধ কামাখ্যা গাঙ্গুলী যেন, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এসেছেন সেই কাক-ডাকা ভোরে। সারাদিন নাওয়া-খাওয়া কিছুই হয়নি। ঠায় পুত্র-বধূর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তারক বলতেই ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—রাম ভালো আছে তো তারক?

হ্যাঁ, তাইমশাই। দেখলেন না জামাইবাবু চোখ মেলে রয়েছেন। মানে জ্ঞান ফিরে এসেছে। এখন ওরা কাউকেই কাছে যেতে দেবে না। আপনারা আর মিছি-মিছি দাঁড়িয়ে কেন কষ্ট পাবেন। এবার বাসায় ফিরে একটু জলটল খান। এদিকে যা করার আমিই সব করব।

তারক ট্যাক্সি ডেকে তাইমশাই, দিদিকে উঠিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এল ওয়ার্ডে। ঘড়িতে দেখল ছটা বাজে। যারা রুগী দেখতে এসেছিল, সবাই যাচ্ছে ফিরে। স্কার্ফ সোয়েটার কোট, র‍্যাপার, মাংকি ক্যাপ দলে দলে যেন বিল্ডিংয়ের কোলাপসিবেল গেট থেকে বেরোচ্ছে। ঘরে ঘরে, করিডোরে, সিঁড়িতে, রাস্তায়, এমারজেন্সিতে আলো জ্বলে উঠছে। গাড়ি বারান্দার এধারে ওধারে খান চার-পাঁচেক গাড়ি দাঁড়িয়ে। এখুনি একবার ডক্টর বাড়ুরীর সঙ্গে দেখা করা দরকার। মন বলছে অপারেশন সাকসেসফুল, তবুও ডাক্তারের মুখ থেকে না শুনলে যেন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

নামতি ভিড়ের পাশ কাটিয়ে একটু একটু করে ওপরে উঠতে লাগল। কাল বিকেলে স্টাফ নার্স যে প্রেসক্রিপসনখানা দিয়েছিল, তার সব কটা ওষুধই যোগাড় করেছে তারক। শুধু একটা কোথাও পেল না। সিং সাহেব, ট্যাঙ্করস, দত্তজ, মসকস, গুপ্তী, স্যাফারাজ—কলকাতার কোন দোকানই বাদ দেয়নি। সব জায়গাতেই একই উত্তর পেয়েছে—নেই, আপনি বরং ওদের ওখানে চেষ্টা করে দেখুন। আমাদের যা ছিল অনেকদিন ফুরিয়ে গেছে। ওদের লাইসেন্স আছে, হয়তো দু-চারটে ইনজেকশন থাকতেও পারে।

যে সব দোকানে ভিড় বেশী, তারা তো চোখ বুলিয়েই জবাব দিয়ে দিয়েছে না নেই। ফাঁকা দোকানের দোকানী ওষুধের রেজিস্টার খুলে মিলিয়ে দেখেছে চালান এসেছে না কি কোন। তারপর ঘাড় নেড়ে বলেছে—এ ওষুধটা আজকাল বড় কেউ প্রেসক্রাইব করে না। উনি কেন করলেন তাতো বুঝতে পারছি না। আমরা তো আর আনিনি।

কেন ওষুধটা কি আউট অব মার্কেট? উদ্বিগ্ন তারক চটপট জিজ্ঞাসা করেছে।

হাসির গুড়ো মাখানো উত্তরে শুনেছে—ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা কি জানেন এত হাজার রকমের পেইন-কিলিং ড্রাগ বেরিয়েছে যে আজকাল এটা কেউ ইউজ করেন না। অপারেশনের পর কাটাছেঁড়ার যন্ত্রণাটা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যই এসব ইনজেকশন দেওয়া হয়। তবে এই ইনজেকশনটার বিরুদ্ধে মস্ত অভিযোগ—এতে ভমিটিং টেনডেনসি দেখা দেয়। আর বমি পেলে পেসেন্টের ক্ষতি, বুঝতেই পারছেন।

বুঝতে তো পারছেই কিন্তু তারক কি করবে। ডাক্তার প্রেসক্রিপসন করেন, নত ঝামেলা রুগীর। আমরা তো সাধারণ মানুষ, ডাক্তারীর কি জানি। কেন ডাক্তারবাবু কোন ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন, তার কারণ তো এক ডাক্তারবাবুই বলতে পারেন। কম করেও ত্রিশটা দোকান, মানে গোটা কলকাতাটাই চষে বেড়িয়েছে তারক। কোথাও পায়নি।

কোথাও না পেয়ে রাত দশটার সময় বাকী ওষুধ কটা আর তেইশ বোতল স্যালাইনের বাকসটা নিয়ে হাসপাতালে এসে খোঁজ করেছে ডাক্তারের। স্টাফ নার্স সব ওষুধপত্তর বুঝে নিয়ে ভ্রূ জোড়া নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন—এটা আনেননি?

আজ্ঞে না, কোথাও পাইনি—ভয়ে ভয়ে উত্তর দিয়েছে তারক। বড়-ছোট কোন দোকানই বাদ দিইনি। এটা তো অপারেশনের সময়ই লাগছে না। পরে লাগবে। আমি কাল আর একবার চেষ্টা করব। দরকার

হলে বাগড়ি মারকেটে যাব। দেখবেন ঠিক খুঁজে এনে দেব।

তারকের কথায় বোধহয় আশঙ্কা, উত্তেজনা, সিনসিয়ারিটি সব কিছু দলা পাকিয়ে উঠেছিল। দিদি, ওর ওপরেই সব ছেড়ে ছুড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। ভাইমশাই বুড়ো মানুষ। চোখে ভাল দেখেন না। সত্তরের ওপর বয়স। এই বয়সে চল্লিশ বছরের একমাত্র উপযুক্ত ছেলের মেজর অপারেশনের কথা শুনেই কেমন বোবা হয়ে গেছেন। এখন সব নির্ভর করছে তারকের ওপর। ওরা জানেন তারক তার ডিউটি ঠিকই করবে। সবই করেছে তারক। হঠাৎ পুজোর মাঝামাঝি দিদির বাসার চাকর এসে খবর দিল জামাইবাবুর শরীল ভাল না, আপনারে দিদি ডাকতাসে। সেই থেকেই সব ঝামেলা একসঙ্গে জট পাকাল। পাড়ার ডাক্তার দেখেশুনে বললেন, গতিক ভাল না। আপনারা একবার ডক্টর বাড়ুরীকে দেখান। উনি স্পেশালিস্ট। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

তিনবার ষোল টাকা ভিজিট দিয়েছে ডকটর বাড়ুরীকে। আশী টাকা খরচ করে পেটের একস-রে করিয়েছে। তারপরেই ব্যথাটার আসল কারণ জানা গেল—গল ব্লাডার। আসল রোগটার নাম ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপসনে যা লিখেছিলেন তা বানান বা উচ্চারণ করার ক্ষমতা নেই তারকের। বাইশ তেইশটা ওয়ার্ড বর্ণমালা থেকে তুলে এনে পাশাপাশি বসালে যা হয় তাই।

রোগ জানা গেল। প্রতিকারের পথও বাতলালেন ডকটর বাড়ুরী—অপারেশন। দেরী হলে ক্ষতি হবে।

ক্ষতি তো হবে, কিন্তু বাড়ুরী সাহেবের আণ্ডারে কোন বেড খালি নেই। দিনের পর দিন আর এস, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সবার কাছে ধরণা দিয়েছে তারক। সবারই মুখে একই উত্তর—বেড, কেবিন কিছু খালি নেই। ওদিকে পেটের যন্ত্রণায় বাসায় পড়ে পড়ে জামাইবাবু ব্যথা ভুলবার জন্য গাদা গাদা ওষুধ গিলেছেন। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বিছানায় পড়ে থেকেছেন। শেষ পর্যন্ত তারক অফিসের এক কলিগকে ধরে ব্যবস্থা করেছে। কলিগের মামা শ্বশুর হেলথ ডিপার্টমেণ্টের একজন মারকসাই কর্তা। তাঁর একটা ফোনেই বেড জুটে গেল।

জামাইবাবু ভর্তি হলেন শুক্রবার, অপারেশন হল সোমবার। সব হল অথচ একটা ওষুধের জন্যই তারকের মনটা কেমন খচ-খচ করছে। কোথাও পেল না। না পেয়েই নার্সকে জানাতে এসেছে—দরকার হলে বাগড়ি মারকেটে যাব। দেখবেন ঠিক খুঁজে এনে দেব।

তারকের কথা শুনে হেসে ফেললেন নার্স। সিসটার্স রুমের কোণের টেবিলে বসে যে নার্সটি এতক্ষণ একমনে খাতায় কি সব লিখছিলেন, তিনিও চোখ তুলে তাকালেন—কি ব্যাপার রে টুটুদি? কি ওষুধ?

ঠোঁটের কোণে টুকরো হাসির রেখা জাগিয়ে টুটুদি বললেন—একটা পেইন-কিলিং ড্রাগ। ভদ্রলোক সারা শহর খুঁজেও পাননি।

নার্সের কথার সুরে যেন একটা চাপা অবিশ্বাস, আর সন্দেহের আভাস খুঁজে পেল তারক। তবে কি উনি বিশ্বাস করছেন না? সন্ধ্যে ছটা থেকে রাত দশটা অবধি ট্রামে-বাসে, ট্যাকসিতে শহরের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত যে তারক চষে বেড়িয়েছে একটা ওষুধের জন্য তা কি উনি অবিশ্বাস করছেন? রাগে থর-থর করে কাঁপে তারকের সারা শরীর। অনেক কষ্টে ভেতরটা ঠাণ্ডা রেখে কাঠ কাঠ গলায় তারক বলে, দেখুন সত্যিই আমি খুঁজেছি। পেশেন্ট তো আমারই। মাথাব্যথা তো আমারই হবে।

নার্স দুজনের একজনও বোধহয় ওর কথায় কান দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। কোণে বসা নার্সটি হাসতে হাসতে কৌতুকের কোড়ন মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কার প্রেসক্রিপসন রে টুটুদি?

কার আবার, ডকটর বাড়ুরীর হাউস সার্জেন সুভাষ ঘোষ।—জবাব দিলেন টুটুদি।

এবার কৌতুকের বদলে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের কয়েকটা সরু মোটা রেখা জেগে উঠল অল্পবয়সী নার্সটির মুখে। অ—শুধু এইটুকু বলেই আবার সে খাতায় ডুবে গেল।

টুটুদি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—ঠিক আছে, কাল এনে দিলেও চলবে। বলেই অন্য ওষুধগুলোর প্যাকেট ও স্যালাইনের বাকসটায় একবার চোখ বুলিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তারক ফস করে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা ডাক্তারবাবুকে বলে এটার কোন সাবসটিটিউট পাওয়া যায় না।

থমকে দাঁড়ালেন স্টাফ নার্স। তারপর খুব ব্যস্তভাবে কথা কটা বলেই ঘর ছেড়ে ওয়ার্ডে চলে গেলেন—কোথায় পাবেন ডক্টর ঘোষকে? উনি তো কোয়ার্টারে থাকেন না। আর কাল সকালে ওর দেখাই পাবেন না। ডক্টর বাড়ুরীর কাল পাঁচটা অপারেশন। ডক্টর ঘোষ এসেই অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে যাবেন।

তেতলার ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওয়ার্ড বয়, নার্স হাউস সার্জনদের ব্যস্ততা দেখছিল তারক। ওষুধটা আজও যোগাড় করতে পারেনি। দিদিকে এসব কিছু বলেনি। একেই অপারেশনের ভয়ে

আধমরা হয়ে আছে, তার ওপর ওষুধ পাওয়া যায়নি শুনলে হয় তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। তাইমশাই তারকের ওপরেই সব দায় ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। আর যার প্রয়োজন সে তো এখন ওয়ার্ডের এক কোণে লাল কম্বলের আড়ালে বিছানায় শুয়ে ঝিমোচ্ছে, জানেই না তার কি দরকার বা প্রয়োজন। প্রচণ্ড অস্বস্তি, ভয়ে এই শীতেও তারকের কান-ফান সব গরম হয়ে উঠেছে। একবার রুমাল দিয়ে কপাল, ঘাড়, গলা মুছে নিল। তার মত আরো জনকয়েক দাঁড়িয়ে ওয়ার্ডের সামনে। হয়তো এদেরও রুগীর অপারেশন-টেশন হয়েছে আজ বা গতকাল বা হবে আগামীকাল। ডাক্তারবাবুর সংগে কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করছে। তারকের মনে হল সোয়েটারটা খুলে ফেলতে পারলে ভাল হত।

কি রে তারু না?—প্রশ্ন ও সমান জোরে একটা চড় এসে পিঠে পড়তেই তারক ঘুরে দাঁড়াল। অবিনাশ। ইউনিভার্সিটি লাইফের বন্ধু অবিনাশ স্যুট-বুট পরে ঝকঝকে চামড়ার একটা পেটমোটা ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। কি ব্যাপার? তুই এখানে কেন রে তারক?

ভগবান-টগবান বিশ্বাস করে না তারক এমনিতে। এখন করতে ইচ্ছে হল। পুরোনো ক্লাসমেট অবিনাশ। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। ও চেষ্টা করলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমার জামাইবাবুর আজ অপারেশন হল, বলতে বলতে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল প্রেসক্রিপসনখানার জন্য।

—তাই নাকি, কি অপারেশন?

—গল ব্লাডার।

—কে করল?

—ডাক্তার বাড়ুরী।

—কেমন, এখন ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁরে দেখে তো তাই মনে হল, তবে একটা ব্যাপারে খুব ঝামেলায় পড়েছি রে অবিনাশ। কাগজখানা পকেট থেকে বার করে ভাঁজ খুলতে লাগল তারক।

—কি ঝামেলা রে?

—ন্যাখ না। এই ওষুধটা কোথাও পাচ্ছি না।

—দেখি দেখি, কি ওষুধ। ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে কাগজখানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল অবিনাশ। আংগুল রেখে বলল—কোনটা পাসনি? এইটা?

—হ্যাঁ। কম করে ত্রিশটা দোকান ঘুরেছি। কলকাতার কোন বড় দোকান বাদ রাখিনি। কিন্তু কোথাও পেলাম না।

—পাবি কি করে। গম্ভীর গলায় এক-হাতে প্রেসক্রিপসনখানা ধরে অন্য হাতে চশমাটা অ্যাডজাস্ট করতে করতে বলল অবিনাশ, এটা আজকাল কেউ প্রেসক্রাইব করে না। তোর কপাল খারাপ। ডক্টর ঘোষের খপ্পড়ে পড়েছিস। শালা এক নম্বরের ঘুষখোর।

খুব আস্তে চাপা গলায় কথা কটা বললেও তারক শুনতে ভুল করেনি। চমকে উঠল—তার মানে?

—মানে পরে বলব। দাঁড়া এর একটা সাবস্টিটিউট আগে ডাক্তারকে দিয়ে লিখিয়ে নিই। তুই একটু দাঁড়া, বলতে বলতে মাটি থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে কাগজখানা সমেত ডাক্তারদের ঘরে ঢুকে পড়ল অবিনাশ।

মিনিট পাঁচেক বাদে বেরিয়ে এল। কাছে এসে বলল, চ আমার সংগে চ। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

তারক চুপচাপ ওকে অনুসরণ করল। হাসপাতাল ছাড়িয়ে বড় রাস্তার মোড়ে এসে একটা ডিসপেন্সারীতে ঢুকে বলল—আমায় তিনটে পেথিড্রিন দিন তো।

ইনজেকশনকটা নার্সকে বুঝিয়ে দিয়ে তারক আবার ফিরে এল সেই ডিসপেন-সারীতে। এসে দেখল অবিনাশ চুটিয়ে দোকানদারের সংগে আড্ডা মারছে। কানে এল দোকানদার বলছেন,—হ্যাঁ ওরকম একটা ওষুধ চাইতে বোধ হয় আপনার বন্ধুই আজ সকালে এসেছিলেন। আনকমন বলেই মনে আছে। ডকটর ঘোষরাই প্রফেসনটার নাম ডোবাবেন। আজকাল কেউ এ সব ওষুধ দেয়! বুঝতেই তো পারছেন টমসন ফ্রাই-এর রিপ্রেজেনটেটিভ মোটা টাকা খাইয়েছে।

সে আর বলতে, অবিনাশ খেই ধরল, তিন বচ্ছর যে ওষুধ চলছে না, সেটাই আবার ধরাতে চায় আর কি? আয় তারক আয়। বস।

তারক দোকানদার, অবিনাশের কোনা-কুনি টুলটায় বসল। দোকানদার ওকে ভালভাবে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আজ সকালে আপনি এসেছিলেন না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল তারক।

—ব্যাপারটা কি জানিস তারক, আমা-দের প্রফেসনে আজকাল নানা গ্যাড়াকল ঢুকেছে। ঐ তোকে যে ওষুধটা ডকটর ঘোষ দিয়েছিলেন ওটা আজকাল চলে না। ঐ গ্রুপের ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে। কে আর জেনে-শুনে ঐ ওষুধ কিনবে—ওর আফটার এফেক্ট খারাপ হতে পারে। কোম্পানী তা শুনবে কেন? ওদের হয়তো, হয়তো কেন টমসন-ফ্রাইএর অবস্থা তো আমি জানি, ঐটা ছাড়া ভাল কোন ড্রাগ আর হাতে নেই। তাই রিপ্রেজেনটেটিভ ডাক্তারকে জাপ্টে ধরেছে। মোটা টাকা খাইয়েছে, খানকয়েক প্রেসক্রিপসনে ওটার নাম ঢোকানোর জন্য। ধর তুই নিজেই তো বললি ত্রিশটা দোকান ঘুরেছিস। এরকম যদি আরো কয়েকজন ঐ ওষুধের জন্য দোকানে দোকানে ঘোরে, তাহলে দোকান-দাররা জানবে বাজারে ওষুধটার ডিম্যাণ্ড রয়েছে। তখন তারাও কোম্পানীকে অর্ডার পাঠাবে। আর সেই সুযোগে ডকটর ঘোষকে পাঁচশো হাজার খাইয়ে কোম্পানী চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারের ব্যবস্থা করে নেবে। বুঝতে পারলি?

ঘাড় নেড়ে তারক জানাল, বুঝতে সে পেরেছে। মুখে বলল—তবে যে বললি এ ওষুধটার আফটার এফেকট খারাপ, সেটা জেনেও—।

তারকের কথাকটা শেষ করতে না দিয়েই অবিনাশ মাঝপথে মুখ খুলল—ক্ষতি হলে তোর পেশেণ্টের হবে। ডাক্তারেরকি। আর তোরা মনে করিস সেই ডাক্তার এত বড় যার ওষুধ দোকান-বাজার চষেও মেলে না। বল ঠিক তাই কিনা?

এর জবাবে তারক আর কি বলবে? গত রাত্রি আর আজ সারাদিনের একটানা ঘোরার ফলে যে অবসাদ এসেছে শরীরে, এখন একটু বিশ্রাম ওর প্রয়োজন। বাড়ী ফেরা দরকার। কিন্তু জানে এখুনি ফেরা যাবে না। দিদি, তাইমশাই, বোনঝি সুপু সব ওর জন্য বসে আছে। জামাইবাবু যে ভাল আছেন, সে কথাটা ওদের বলে তবে বাসায় ফিরতে পারবে।

কানে এল অবিনাশ বলছে—চ, তোকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে। চলি ভাই ব্যানার্জী। কাল একবার আসব। যদি নতুন ওষুধটা চাও তো কালই অর্ডার দিও। এরপর আর পাবে না। হট কেকের মত বিকোচ্ছে।

অবিনাশ ট্যাকসিতে উঠে বলল, কোথায় যাবি?

—আলীপুর।

ট্যাকসি ছুটে চলল। দুপাশের কাচ তোলা। ট্যাকসির গদিতে শুয়ে চোখটা বুজল তারক। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ঝক-ঝকে সুন্দর চেহারার একটা মানুষ লম্বা করিডোর দিয়ে হাঁটছে। বয়স বেশী নয়। বড় জোর সাতাশ আটাশ। নিষ্পাপ উজ্জ্বল মুখ। ঐ লোকটার হাতেই এখন জামাইবাবুর জীবন। অথচ—।

বাঁয়া রাস্তামে চলিয়ে সর্দারজী, অবিনাশের ভারী গলার আওয়াজে তারকের চিন্তার জট ছিঁড়ে গেল, তাকিয়ে দেখে ট্যাকসি পোটোপাড়ার ভেতর দিয়ে জোরে ছুটে চলেছে।

—[illegible]

## (দুই)

ঘরের থমথমে আবহাওয়া কাটতে একটু
র লাগল।

মিসেস রায় আমার দিকে তাকিয়ে
শ্নসা করলেন, চা খাবেন না কফি?

'যা হয়।'

'কোনটা পছন্দ করেন?'

পছন্দ? একটু না হেসে পারলাম না।
পছন্দ-অপছন্দ করতে তো শিখিনি।'

'যে কদিন এখানে আছেন সে কদিন
ততঃ পছন্দ-অপছন্দের পূর্ণ অধিকার
ন আপনার।'

আমি মাথা নীচু করেই আছি। মিসেস
আবার জানতে চাইলেন, চা আনব না
?

'কফি।' আমি ছোট্ট উত্তর দিয়ে আবার
া নীচু করে চুপ করে রইলাম। বুঝলাম
সস রায় ভিতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ মিঃ রায়ও চুপ করে রইলেন।
পর বললেন, আপনার বয়স কত?

'পঁচিশ।'

'ওনলি? আপনি তাহলে ঠিক আমার
লর বয়সী।'

'তাই নাকি?'

বুঝলাম মিঃ রায়ের ছেলে আছে কিন্তু
বাংলো বাড়ীর শান্ত আবহাওয়া দেখে
হলো এখানে ওরা দুজনেই থাকেন।

মিঃ রায় এবার আমার কাজকর্মের
নিলেন। 'প্ল্যানিং কমিশনে কতদিন
ছন?'

'মাত্র ছ' মাস।'

'ছ' মাস?'

'হ্যাঁ।'

'তার আগে কি করতেন?'

'টুকটাক ছোটখাট অনেক চাকরি-
রি করেছি।'

'প্ল্যানিং কমিশনে ঢুকলেন কি করে?'

'আমার এক পুরান অধ্যাপক একবার
নিং কমিশনের অনুরোধে কলকাতার
সোসিও-ইকনমিক সার্ভে করেন;
আমিও ওঁর সঙ্গে কাজ করেছিলাম।
অধ্যাপকের সুপারিশেই প্ল্যানিং
শনে ঢুকেছি।'

মিঃ রায় চশমাটা ঠিক করে আবার
করলেন, 'তা আপনাদের সোসিও-
ইকনমিক স্পেশ্যাল সার্ভে ইউনিটের
কাজ কি?'

'পঞ্চাশজনকে নিয়ে এই ইউনিট।
আমরা এক একজনে দুটো-তিনটে বা
চারটে এরিয়ায় কাজ করব। প্রথমে দেখব
এই এক একটা এরিয়ার গত দশ বছরে
কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ
প্ল্যানের ইমপ্যাক্ট কি হয়েছে, কি হতে
পারত এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া দরকার।'

'তাহলে তো বেশ দায়িত্বপূর্ণ ও
ইণ্টারেস্টিং কাজ।'

আমি হেসে বললাম, 'ঐ যা বলেন
আর কি?'

'আপনি কোন কোন এরিয়ায় কাজ
করবেন?'

'এই ইউ পি'র ডেরাডুন বেল্ট ছাড়া
মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর—সাঁতারা—
প্রতাপগড় এরিয়ার।'

'আর কোথাও?'

'তারপর বোধহয় উড়িষ্যার।'

'এই এরিয়াগুলো আপনি নিলেন
কেন?'

মিসেস রায় ঘরে ঢুকলেন। পিছনে
পিছনে ট্রে হাতে চাকর। টেবিলে কফি
আর মিষ্টির প্লেট নামিয়ে রাখলেন।

আমি মিঃ রায়কে বললাম, 'এই এরিয়া-
গুলোতে নানা ধরনের লোক পাব বলে।'

'যেমন?'

'ডেরাডুন ইজ অ্যান ইমপর্টাণ্ট
বিজিনেস সেণ্টার। বড় বড় ব্যবসাদার পাব।
মিলিটারী একাডেমীর জন্য হাই অ্যাণ্ড
লো মিলিটারী অফিসার পাব, আপনাদের
এফ-আর-আই আর পাশের অয়েল অ্যাণ্ড
ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনে টেকনিসিয়ান্স,
সাইনটিস্টস আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাব।
তাছাড়া সাধারণ অফিস কর্মচারী ছাড়াও
ভ্যালী, শেল্টন ও হিল এরিয়ার বহু লোক
পাব।'

'দ্যাটস্ রাইট।'

মিসেস রায় কফি আর মিষ্টির প্লেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন।'

প্লেটে চারটে বড় বড় রসগোল্লা দেখে বললাম, 'এখন এত মিষ্টি খাব না।'

'মোটেই এত না।'

মিঃ রায় এগিয়ে এলেন স্ত্রীকে সাপোর্ট করতে, 'ওকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কখনো না বলবেন না। সব কিছু নিজের হাতে তৈরী। সুতরাং না বললেই মোশান অফ নো কনফিডেন্স বলে মনে করবে।

আমি কি বলব? শুধু হাসলাম। আমি আর মিঃ রায় খেতে শুরু করলাম।

মিসেস রায় টেবিলের এক পাশে একটা চেয়ারে বসলেন। আমাদের মিষ্টি খাওয়া হলে কফি এগিয়ে দিতে দিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?'

'তিন-চার মাস।'

'গেস্ট হাউসেই থাকবেন?'

'হ্যাঁ, তাইতো ব্যবস্থা হয়েছে।'

কফি খাওয়াও শেষ হলো।

মিসেস রায় এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাকে নাকি অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে।'

'বেশী দূরে যেতে হবে না। তবে কাছাকাছির মধ্যে কিছু ঘোরাঘুরি করে অনেক লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে।'

মিঃ রায় জানতে চাইলেন, মেয়েদেরও ইন্টারভিউ করবেন?

'নিশ্চয়ই।'

'পুরুষদের সঙ্গে কথা বললেই তো ফ্যামিলীর আয়-ব্যয় বা স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং-এর সব খবর জানতে পারবেন। তাহলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার কি দরকার?'

'নানা কারণে দরকার। পুরুষের যে ইনকামই হোক না কেন, অ্যাকচুয়াল স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং—আই মীন অফ দি ফ্যামিলী—জানতে হলে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাছাড়া পুরুষের পুরো ইনকাম ফ্যামিলীতে নাও আসতে পারে'......

মিসেস রায় বললেন, 'তার মানে?'

'আয় বেশী হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের ব্যয়ের রাস্তাও বাড়তে পারে। তারা ফ্যামিলীতে খরচ না করে সিনেমা দেখতে পারে, মদ খেতে পারে, চরিত্রহীন হতে পারে, দামী জামাকাপড় পরতে পারে বা আরো অনেক কিছু হতে পারে'......

মিসেস রায় সমর্থন জানালেন আমার বক্তব্যকে. ঠিক বলেছেন।

'তাছাড়া আরো অনেক কারণে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

মিসেস রায়ই প্রশ্ন করলেন, 'আর কি কারণ?'

'হেলথ, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার, ফুড হ্যাবিট বা ফ্যামিলী প্ল্যানিং নিয়েও মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার দরকার।'

মিঃ রায় জানতে চাইলেন, কিন্তু মেয়েরা কি আপনাকে এসব কথা বলবে?

'সবাই নিশ্চয়ই বলবেন না। তবে লোক্যাল দোকানদার, কেমিস্ট শপ, ডাক্তার-নার্স-হাসপাতাল, স্কুল, রিকসাওয়ালা, ট্যাকসির ড্রাইভার, পুলিশ স্টেশন থেকেও অনেক কিছু জানা যাবে।'

ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হাসলেন। মিসেস রায় মন্তব্য করলেন, আপনি তো দেখছি অনেকের অনেক গোপন খবর জেনে যাবেন।

'গোপন খবর ঠিক নয়, ফ্যামিলী প্যাটার্ন কিছুটা জানব। অফিসে গিয়ে খোঁজ করলেই জানা যায় কার কত মাইনে, কে কত লোন বা অ্যাডভান্স নিয়েছেন। দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যায়, কে কত টাকার জিনিস কেনেন বা কে ধারে, কে নগদ কেনেন। সব মিলিয়ে লোকের প্যাটার্ন অফ লিভিং জানা যাবে, জানা যাবে গত দশ বছরে কোন ধরনের লোকের ভাল হয়েছে বা মন্দ হয়েছে।'

মিঃ রায় এবার জানতে চাইলেন, আপনি কি ম্যারেড ছেলেমেয়ে বা যারা চাকরিবাকরি করেন তাঁদেরই ইনফরমেশন জোগাড় করবেন?

'না, না, তা কেন করব? ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে গ্রোন আপ ছেলেমেয়েদের খবরই বরং বেশী দরকার।'

ডান হাতের 'পর মুখের ভর রেখে মিসেস রায় বললেন, 'কেন?'

'ভবিষ্যতের সব পরিকল্পনাই তো মুখ্যত ওদের নিয়েই হবে।'

মিঃ রায় এবার ওর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁগো, আর এক কাপ কফি দেবে নাকি?'

আমি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'না, না, আর কফির দরকার নেই। এবার আমি উঠি। আপনাদের অনেক দেরী করে দিলাম।'

মিঃ রায় হাসলেন। মিসেস রায় বললেন, 'কথা না বলে বলে আমরা তো বোবা হবার উপক্রম।'

'কেন? এখানে তো বহু লোক আছেন।'

মিঃ রায় বললেন, 'তা ঠিক। তবে অধিকাংশই ইনক্রিমেন্ট, ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স আর ট্রান্সফার প্রমোশনের গল্প করতেই পছন্দ করেন। তাই লোক্যাল কলিগস্ বা ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক আনন্দ পাই না।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'সব সরকারী বা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কলোনীরই এই দোষ। দুর্গাপুরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী বা মিউজিক কনফারেন্সেও জে... ম্যানেজার সভাপতিত্ব করবেনই।'

'ঠিক বলেছেন', মন্তব্য করলে... রায় আর হাসি হাসি মুখে ... জানালেন ওর ডেডিকেটেড ওয়াইফ।

মিসেস রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে ... বললেন, 'বসুন। আর এক কাপ ... খেয়ে যান।'

আর এক কাপ কফি খেয়েই উ... বিদায় নেবার সময় মিঃ রায়কে ... 'সকালেই আপনার অফিসে আসছি।'

'আমিই বরং অফিস যাবার ... আপনাকে তুলে নেব।'

'আপনি আবার কেন ঘুরতে ...

মিসেস রায় হেসে ফেললেন, ... দেড় মাইল করে গাড়ী চল... ব্যাটারীর চার্জ থাকে না, তাই ... পেলেই......

মিঃ রায় শত্রু বিমানকে বাধা ... জন্য তাড়াতাড়ি ফাইটার নিয়ে উ... 'কেন? গাড়ী নিয়ে কি শুধু ... যাতায়াতই করি? তোমাকে ... বেরই না?'

'আমাকে না নিয়ে বেরুলে ... গাড়ী ধাক্কা দেবে কে?'

বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে ... বিধানসভা—লোকসভার স্পীকারের ... গম্ভীর হয়ে ঘোষণা করলাম, ... অ্যাডজর্নস্ টিল টুমরো ইভনিং।

মিসেস রায় হাসলেন। মিঃ রা... চীৎকার করে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ! ... ইউ! গুড নাইট!

'গুড নাইট!'

হাত জোড় করে মিসেস ... নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'চলি।'

'আসুন।'

যে পথ দিয়ে গিয়েছিলাম, ... দিয়েই ফিরে এলাম। সেই আবছা ... রাস্তা, সেই নির্জনতা, সেই ... পরিবেশ। দু' পাশে সেই গাছপাল... শত পাখী আছে এইসব গাছের ... ডালে কিন্তু সবাই মহাশান্তিতে ... করছে। যেন কারুর কোন অভিযো... কারুর জীবনে কোন হাহাকার ...

আমি শুধু একা একা হেঁটে ... হয়ত ওদের সবার শান্তি নষ্ট ক...

তাছাড়া বড় বেমানান মনে ... নিজেকে। নিঃসঙ্গতার যেন কোন ... নেই এই পরিবেশে, এই দুনিয়ায়।

অফিসারদের বাংলোর আলো ... কমে গেছে। দুটো একটা জা... আলো দেখা যাচ্ছে। তাও কে... আলো। পর্দার মধ্যে দিয়ে ঠিক ... পারছি না। তবে মনে হলো অনে... রঙীন আলো জ্বলছে। যারা ... ডিয়ারনেস-ইনক্রিমেন্টের নেশায় ... ছিল, তারাও বোধহয় এখন রঙীন ... মশগুল।

ঐ আলো দেখতে দেখতে আমি আস্তে …স্তে চলেছিলাম গেস্ট হাউসের দিকে। … লাগছিল ঐ বাংলোগুলোর বেডরুমের …লো দেখতে।

এই পথ দিয়ে যখন গিয়েছিলাম তখন …র সন্ধ্যা হয়েছে। আর এখন বেশ রাত …য়েছে। ল্যাম্প পোস্টের আলোর …ওয়ার কমে যায়নি কিন্তু রাত্রির …ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। তাই …তাতেও আরো বেশী অন্ধকার মনে …চ্ছ। যখন এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম …ন বিশেষ কোন মানুষ দেখিনি, এখনও …খছি না। তখনও কোন হৈ হুল্লোড় …ল না, এখনও নেই। তবু মনে হলো …ত্রি গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে আরো …ন্তি, প্রশান্তি অনুভব করতে পারছি। …মি একলা একলা হাঁটছি। আর কাউকেই …খতে পারছি না। আমি নিজেকে আরো …ল করে দেখতে পারছি। ড্রেসিং …রুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে …টা দেখতে পেয়েছি, তার চাইতে যেন …রো ভাল করে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। …রো স্পষ্ট করে নিজের হৃদয় স্পন্দন …নতে পাচ্ছি। আমি কথা বলছি না, …ও মনে হচ্ছে আমার অন্তর থেকে …ছু কথা, কিছু বেদনা শুনতে পাচ্ছি। …ণ স্পষ্ট, বেশ জোরে জোরেই যেন …তে পাচ্ছি। শুধু বেদনা কেন? আমার …র মধ্যে কত অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা বোধহয় … পড়েছিল। এই রাত্রির অন্ধকারে …কে একা পেয়ে সেইসব আকাঙ্ক্ষা যেন …র হৃদয় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে …ছে।

কি আশ্চর্য! ঐ আবছা আবছা …নি আলোগুলো যেন আমাকে হাত-…ন দিয়ে ডাকছে।

হঠাৎ গেস্ট হাউসের কথা মনে হলো। … হলো, বেয়ারাটা নিশ্চয়ই খাবার নিয়ে … আছে। গেস্ট হাউস তো ফাঁকা। …র ডিনার খাওয়া না হলে তো ওর … নেই।

একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে চেষ্টা …লাম কিন্তু পারলাম না। রাত্রির এই …ন্ধতার মধ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করল …র। এমন মুক্তির আনন্দ, এমন শান্তি … জীবনে অনুভব করিনি। মায়ের …হের মত রাত্রির অন্ধকার আমার …দকে ঘিরে রয়েছে। এতদিন মানুষের …ভির মধ্যে থেকেও ভয় করেছে কিন্তু … এই রাত্রিতে, এই অন্ধকারে কোন … কোন সঙ্কোচ নেই আমার।

মানুষ নিঃসন্দেহে সব চাইতে নিজেকে … ভালবাসে। এই গভীর রাত্রির …কারে আমি শুধু আমাকেই কাছে …। সমাজ সংসারের অসংখ্য পরিচিত-…রিচিতরা আমার কাছে ভীড় করে সেই, …র দৃষ্টিকে কালিমা করে দিচ্ছে না, …র মনের সুন্দর অনুভূতিকে আহত … না, আমার অন্তরের ভাবসম্পত্তিকে অসুন্দরো করতে পারছে না। প্রাণপ্রিয় আমি এখন নিঃসঙ্গ হলেও পরিপূর্ণ।

আস্তে আস্তে হাঁটছি। মুখ দিয়ে কোন গান গাইছি না কিন্তু একটা মিষ্টি সুর শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু একি? সুরটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে! ঐ যে পাহাড়ের উপরের লাল লাল রক্তবর্ণ স্যাণ্ডস্টোনে মোড়া ফতেপুর সিক্রী বা আগ্রা ফোর্টের মধ্যে থেকে যেমন দরবারী কানাড়ার মিহি মিষ্টি সুর ভেসে আসত দূরের গ্রামে-গ্রামান্তরে, যমুনার পাড়ে, ঠিক তেমনি একটা সুর যেন বহুদূর থেকে আমার বুকের মধ্যে খোঁচা মারছে।

খোঁচা মারছে? তবে কি? এখন তো আমি একা। সব কিছু বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি আমার সব আছে, প্রাণ আছে, মন আছে, অনুভূতি আছে, আকাঙ্ক্ষাও আছে। সুরটা যেন হারিয়ে গেছে। না, না, হারিয়ে যাবে কেন? আমি নিজেই তো বেসুরো হয়ে পড়েছিলাম। তাইতো সুর দূরে গেছে, ক্ষীণ হয়ে গেছে।

রায়-দম্পতিকে দেখে এই শান্ত, পবিত্র অন্ধকার রাত্রিতে ঐ দূরের বাংলোর আবছা রঙীন আলো দেখে আমাকে যেন সুরের নেশায় মাতাল করে তুললো। যে সুরের মূর্চ্ছনায় আমি পাগল হয়েছি, সে সুরের স্বাদ কি আর পাব?

জানি না। সে সব কিছু জানি না, জানতে আমি পারি না, পারব না। গুরু-চরণ কলেজে পড়ার সময় বরাক নদীর ধারে বা দূরের অরুণাচলে যে সুর শুনেছি, শিখেছি, ভালবেসেছি, সেই সুরই কি আজ শুনতে পাচ্ছি?

আরো কিছুদূরে এগুলাম। গেস্ট হাউসের আলো দেখতে পাচ্ছি। এইত আর একটু গেলেই গেস্ট হাউসের কম্পাউণ্ডে ঢুকব। কিন্তু এখনও বুঝতে পারলাম না, এ সেই সুর নাকি অন্য কোন সুর?

গেস্ট হাউসে ঢুকে পড়েছি। পোর্টিকোর পাওয়ারফুল আলোটা বড় বেশী চোখে লাগছে। আর ভাবতে পারছি না। তাছাড়া আমি যেন আমাকেই হারাচ্ছি। হারাব না? আমি তো এখানে একা নই।

চৌকিদার সেলাম দিল। দৌড়ে গিয়ে আমার ঘরের দরজা খুলে আলো জেলে দিল। আমি যে অন্ধকারের মানুষ অন্ধকারই ভালবাসি, তা তো ও বেচারা জানে না!

কোথা থেকে বেয়ারাটাও হাজির হয়ে সেলাম দিল। 'সাব খানা তৈয়ার।'

আমি কোন জবাব না দিয়ে সোজা ওকে অনুসরণ করে ডাইনিং রুমে গেলাম। খেলাম। সামান্য কিছুই খেলাম।

ফিরে এলাম ঐ ডান দিকের কোণার ঘরে। একটা সিগারেট খেলাম। তারপর জামা-কাপড় বদলে একটা পায়জামা-গেঞ্জি পরলাম। আবার চেয়ারে বসে একটা সিগারেট খেলাম। সারাদিন অনেক ঘুরেছি। বেশ ক্লান্ত লাগল। উঠে গিয়ে আলো অফ করে শুয়ে পড়লাম।

আবার চারদিক অন্ধকার। একেবারে সূচীভেদ্য অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে নজর পড়ল। দূরের অন্ধকার শিবালিক পাহাড়ের গলায় মুক্তোর মালা দেখলাম। মনে হলো অন্ধকার শিবালিক পাহাড় যেন আমাকে নর্তকী সেজে ডাকছে। ইসারা করছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিবালিক পাহাড় বশীকরণ করে ফেললো। আমি জানতেই পারলাম না ঐগুলো মুসৌরীর আলো।

(ক্রমশঃ)

# সুরাশক্তির মনস্তত্ত্ব

## শ্রীকুমার ও মাখনলাল

সুরাসক্তি (এ্যালকোহলিজম) সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার ফলে প্রচুর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পুরনো দিনের মনের ডাক্তাররা সুরা বা এ্যালকোহলকে নানা ধরণের মনের অসুখের জন্য দায়ী করতেন। আজকাল রোগনির্ণয় পদ্ধতির উন্নতির ফলে সুরাপান-জনিত উন্মাদ রোগের অনেকগুলোই অন্য জাতের উন্মত্ততা বলে পরিগণিত। সুরাসক্তি মনের রোগের কারণ বহু ক্ষেত্রে, তার থেকে বেশি ক্ষেত্রে রোগের ফল বা উপসর্গ।

সুরাসক্তির মানসিকতাবিচারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপের (হত্যা, রাহাজানি, বলাৎকার ইত্যাদি) সঙ্গে সুরাসক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। অনেক দেশের রাষ্ট্র ও সমাজের কর্ণধাররা সুরাপান নিষিদ্ধ করে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে থাকেন। সমাজের অন্তর্নিহিত গলদগুলোর দিকে নজর না দিয়ে সুরাপান নিষিদ্ধ করলে অভিলষিত ফল পাওয়া সম্ভব নয়।

সুরাসক্তির কারণ ও সুরাসক্তির ফল আমরা এক সঙ্গেই আলোচনা করব। আলোচনার সূত্রপাত করা যাক কবি শ্রীকুমারকে দিয়ে।

কবি শ্রীকুমারকে দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। অনেক দিন আগের কথা। এর আগে খুব কাছ থেকে কোনো কবিকে দেখার সৌভাগ্য হয় নি। আমি তখন কলেজে পড়ি, শ্রীকুমার পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়ে কবিতা লেখে। গায়ের রং, বাবরি চুল, এলোমেলো পোশাক শ্রীকুমারকে দেখে মনে হয়েছিল যে, কবিতা লেখা এই চেহারাতেই সাজে। একটা সাহিত্যের মাসিক পত্রিকা বের করবার জোড়জোড় চলছিল, সেই সূত্রে শ্রীকুমারের আবির্ভাব। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে শ্রীকুমারের 'সুরা' কবিতা প্রকাশিত হল। কয়েকটা লাইন এখনো মনে আছে।

হে সুরা, বিস্মৃতি দাও
জীবনের দুর্বাপিনজ্বালার
যে ক্ষত হৃদয় দহে
বেদনার কণ্টকমালার
করো তারে প্রশমিত
তব সুখ স্পর্শের প্রলেপে।
যে প্লানি প্লাবন ওঠে
মানসপ্রান্তরে কেঁপে কেঁপে,
টানো তার যবনিকা।......

সুরা তুমি বিচিত্রের সুর,
তুমি যেন বীণাধ্বনি
জেগে ওঠা মানসমধুর
মোর কল্পলোকে।

হয়তো যতিলয়ের গোলমাল হল, কিন্তু কথাগুলো বোধহয় ঠিক আছে। সুরা নিয়ে নানা ভাষায় নানা কবি কবিতা লিখেছেন, সুরা-প্রশস্তি আরো অনেক পড়েছি। কিন্তু এত অকপটভাবে সুরাপানের ব্যক্তিগত কারণ বোধ হয় আর কেউ বিধৃত করেন নি। গোটা কবিতার মধ্যে শ্রীকুমারের জীবনের দুর্বাপিন-জ্বালার পরিচয়। আত্মীয়-স্বজন তাকে পরিত্যাগ করেছে, বন্ধুবান্ধব নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে, হৃদয়বীণা ভগ্ন হয়ে গেছে, অবিচার অত্যাচারে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তাই সে সুরাশ্রয়ী। সুরা তার আত্মীয়, সুরা তার বন্ধু, সুরা তার প্রেয়সী।

দুদিনের মধ্যে এই বাউণ্ডুলে কবির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার জীবন ইতিহাস জানতে পারলাম।

পূর্ববঙ্গের অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বিমাতা পরিবারের কর্ত্রী। বাড়ী থেকে কোনো রকম অর্থ সাহায্য আসে না। কারণ সে বোহেমিয়ান, সে নন-কনফরমিস্ট। এক আবাসিক বিদ্যালয় থেকে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে বিতাড়িত, এক কো-এডুকেশন কলেজের কর্তৃপক্ষের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত। জীবিকার জন্যে বন্ধুবান্ধব ও মাসিক পত্রিকার মালিকদের উপর নির্ভরশীল। সে সময় কবিতার জন্য দক্ষিণা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না, কিন্তু শ্রীকুমারকে বিমুখ করা যেত না। অন্তত পাঁচ টাকা না পেলে সে কম্পোজিটারদের টুল ছেড়ে উঠতো না। অবস্থান ধর্মঘট চালাতো।

ওর সুন্দর চেহারা, অকপট সারল্য আর আন্তরিকতার দৌলতে অনেকের প্রিয়পাত্র ছিল। আবার বেশিক্ষণ ওর সঙ্গী হতেও কেউ চাইতো না। কেন না, আদিরসাশ্রিত ওর কথাবার্তা বেশীক্ষণ সহ্য করা দুঃসাধ্য [illegible] নিয়ে ওর কোনো রকম মাথাব্যথা ছিল না। লঘুগুরু নির্বিশেষে ওর বোহেমিয়ান মতামত নির্বিচারে প্রকাশ করতে ইতস্তত করত না। ফলে বয়স্ক ও গম্ভীর প্রকৃতির লোকের দেখা পেলেই এক বোতল বিয়ারের দাম চেয়ে বসত। বেশি নয় দশ আনা। জাপানী বিয়ার তখন ঐ দামেই পাওয়া যেত।

আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর জানলাম, ওর কোনো থাকবার জায়গা নেই। সারাদিন রাস্তায় ঘোরে, প্রেসে বা বন্ধুদের মেসে গিয়ে আড্ডা [illegible]
[illegible]
বেলের উল্টোপিঠে কবিতা লেখে। পকেটে পয়সা থাকলে খাওয়া-দাওয়া করে, না হলে উপবাস। খাবারের থেকে পানীয়ের প্রতি ওর অনেক বেশি আসক্তি। এক সঙ্গে আমার বেশী পয়সা পেলেই এক গেলাস বিয়ার খাবে, ভাত খাবে না। রাত বারোটা একটার পর নিষিদ্ধপল্লীর একটি মেয়ের ঘরে আশ্রয় মেলে।

ওকে যারা ভালবাসত, তারাও ওকে মা বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত না, পরিবারের স্নেহ-গণ্ডীর মধ্যে ডেকে আনতে পারত না। কারণ আগেই বলেছি। ওর মুখে কোনো লাগাম ছিল না। সামাজিক স মূল্যবোধকে নস্যাৎ করে দেওয়াই ছিল ও কথাবার্তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এখ বুঝি অ্যালকোহলের প্রভাবে ও উচ্চমস্তিষ্ক ক্রমশ নিস্তেজিত হয়ে আস ছিল, তাই ইচ্ছে করলেও নিজেকে সংয করতে পারত না। আত্মীয়, বন্ধু, সমা সবার ওপরেই ওর ক্ষোভ ছিল, সবা বিরুদ্ধেই ওর ক্রোধ ছিল। সেই ক্ষো ক্রোধ চেপে শালীনতা ও শোভনতা বজা রাখবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি শ্রীকুমার। ব্যক্তিগত বিক্ষোভকে নৈর্ব্যক্তি স্তরে তুলতে পারলে মহান সৃষ্টি সম্ভাবনা। তার জন্য সময়ের প্রয়ো জন। সেই সময় আসবার আগেই আমা সঙ্গে আলাপের দুবছরের মধ্যেই হা পাতালে অবহেলিত এই তরুণ কবির মৃ হয়। সে কথা থাক।

আমাদের আলোচ্য শ্রীকুমারের সুর সক্তির কারণ ও সুরাসক্তির ফল। প্রথ সামাজিক দিকটির কথা ভাবা যাক। তিরিশে দশকের সুরু। আইন-অমান্য আন্দোল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, মীরাট ষড়যন্ত্রে মামলা, এবং মেদিনীপুরে বিপ্লবীদে অসমসাহসিক কার্যকলাপে রাজনৈতি আবহাওয়া সরগরম। যুব সমাজের সাম সশস্ত্র বিপ্লব, অহিংস আন্দোলন ও সা বাদী আদর্শের ডাক। গ্রামাঞ্চলে অর্থনীতি অবস্থা বিপর্যস্ত। শ্রীকুমারদের মত মধ্যবি পরিবারের আয়ের উৎস লুপ্তপ্রায়। চাষ দের দারিদ্র্য চরমে পৌঁছেছে। তাদের রা কজা ফেলে অনেক শোষণ করলেও আয়

ছে না। যৌথ আয়ের মায়া মত কমছে, পরিবারও তত ভেঙে পড়ছে। পল্লী- া ধ্বংসপ্রায়, সামাজিক শাসন অচল। ন আনুগত্য কমতির মুখে। নাগরিক ম উন্মাদনা আছে, শৃংখলা নেই। রের মত কবিমন বিপরীতধর্মী মায়া- উদ্দীপনায় অস্থির চঞ্চল। দেশীয় তি সভ্যতা মূল্যবোধ ও বিদেশী ভাব- সংমিশ্রণে এক নতুন ধরনের অব- র সৃষ্টি হয়েছে। প্রচলিত ও স্থাণু নীতির বিরুদ্ধে তরুণমনে বিদ্রোহ ত হচ্ছে। শ্রীকুমার পরিবারভিত্তিক ভালবাসা পাচ্ছে না, আবার কোনো রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করে নির্দিষ্ট পথে চলবার প্রেরণাও পাচ্ছে না। বাহির দুদিকের দুয়ারই তার কাছে না পারছে দুয়ার ভেঙে পুরোপুরি যেতে, না পারছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ফরতে। এই বন্ধ হবার কারণ অবশ্য ত। পরিবারের প্রথম সন্তান শ্রীকুমার াত্রায় আদর ও প্রশ্রয় পেয়ে বড় হয়েছে। র বয়স থেকে তার সুশ্রী চেহারা অন্যকে করেছে। তার খুব অল্প বয়সে কবিতা পড়ে গুণীজন মুগ্ধ হয়েছেন। র প্রশংসা পেতে পেতে আত্মকেন্দ্রিক উঠেছে নিজের অজ্ঞাতসারে। প্রথম এক বয়স্ক মহিলা কর্তৃক প্রলুব্ধ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। মায়ের পর বাবা এক অল্পবয়সী মেয়েকে করাতে বাপের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে। স্নেহ ইত্যাদি সুকুমার মনোবৃত্তিগুলো উত হবার আগেই অঙ্কুরে বিনষ্ট । বয়স্ক ঐ নারীর ব্যবহার ও পিতার ভার্যা গ্রহণের ফলে তার ধারণা মানুষ মাত্রেই লালসার দাস। আবা- বিদ্যালয়ে ও কো-এডুকেশন কলেজে স মেয়েদের সঙ্গে অনায়াসে অশালীন করতে সাহস পেয়েছে। ছোট বয়স বাবাকে সুরাপান করতে দেখেছে, কোলক তার এসে তার পদাংক অনু- করতে একটুও দ্বিধা হয় নি। অতি- পান করার সুযোগ পেলেই বাবাকে চন কটূক্তি ভরা চিঠি লিখেছে। র নামে নানা রকমের মনগড়া কুৎসা করেছে। শ্রীকুমারের মস্তিষ্কে প্রথম িক স্তরের অতি প্রাধান্য, যুক্তি তর্ক াছে তাই অর্থহীন। আমি যখন তাকে তখন সে ক্রনিক অ্যালকোহলিক। অভাবে পুসীমিত পানসুখে বঞ্চিত। খাদ্যাভাব ও আনুসঙ্গিক নানা কারণে াত্রার এ্যালকোহল তাকে অভিভূত ছন্ন করে ফেলছে। অনেক সময় আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। এই কে কাব্যায়িত করেছিল 'ড্রেন' য়। 'অদৃশ্য প্রদেশ হতে জ্বলি তব সংকেত। চুম্বকের জাদু সম নেমে পাতালের প্রেত।' নিজের জীবন দিয়ে াবার সে জন্ম থেকে চলেছে।

আমার মনে হয় স্নায়ুতন্ত্রের ইন- লটি, অস্থিরতা থেকে তার সুরা- অ্যালকোহল আবার উচ্চ মস্তিষ্কের দুর্বলতা ঘটিয়ে এই অস্থিরতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। যাদের মস্তিষ্কে দুই স্তর সম- পাঙ্কবিশিষ্ট, যাকে বলি, 'ওয়েল ব্যালান্সড্', তারা পিতার দ্বিতীয় বিবাহকে অতটা গুরুত্ব দিত না। আঘাত পেলেও সামলে উঠতে পারত। সমাজের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখতে পারত, বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত না।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে শ্রীকুমারের মনস্তত্ত্ব সঠিক বোঝা যাবে না। ঘটনাটি অন্যের কাছে শোনা। সত্যাসত্য যাচাই করে দেখা হয়নি। আবাসিক বিদ্যালয়ের হোস্টেলে বসে শ্রীকুমার কবিতা লিখছিল, এমনি সময় অদূরবর্তী পাশের ঘরে আগুন লাগে। সব ছেলে ছুটে বাইরে চলে যায়, জল আনতে, আগুন নেভাতে ব্যস্ত। শ্রীকুমার আগুনের ধ্বংসলীলা দেখে নাকি সেই সময় উল্লাসে নৃত্য করছিল। মতান্তরে, সে কিছুই টের পায়নি, কবিতার মধ্যে নাকি একেবারে ডুবে গিয়েছিল। এ-সময় শ্রীকুমার সুরাপানে অভ্যস্ত হয়নি। ওর এই আচরণ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? স্কিজোফ্রেনিয়া তার মধ্যে বোধহয় সুপ্ত ছিল, অথবা সবে উপ- ক্রান্ত হতে চলেছে (যাকে বলা হয় 'ইনসি- পিয়েণ্ট স্টেট); এই গল্প থেকে সেইরকম ভাবাই স্বাভাবিক।

এবার একেবারে বিপরীত চরিত্রের একটি রোগীর কথা বলব। রোগীর নাম মাখনলাল। একে চিকিৎসার জন্য এনেছিল এঁর বন্ধুরা। ছোটবেলা থেকে দুঃখকষ্টের মধ্যে বড় হয়েছেন। বর্তমানে এক কলেজে অধ্যাপনা করেন। বিজ্ঞান পড়ান। নানা- রকমের সংগঠন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। একটি ঘর নিয়ে একলা থাকেন। সেখানে সন্ধ্যার পর বয়স্ক লোকদের নিরক্ষরতা দূর করেন ও সহজ ভাষায় বিজ্ঞান শেখাবার চেষ্টা করেন। যা রোজগার করেন সবই এই ধরনের সমাজকল্যাণে ব্যয় করেন। গত কয়েক মাস ধরে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। সন্ধ্যার পর নাইট স্কুলের ছাত্ররা তাঁকে দেখতে পেত না। বন্ধ দরজার সামনে কয়েকদিন অপেক্ষা করে তাঁর ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। বন্ধুরা লক্ষ্য করল রোজ রাত এগারোটার পর মাতাল হয়ে টলতে টলতে তিনি বাড়ী ফিরছেন। অন্ত- রঙ্গ বন্ধু অবিনাশ একদিন এ নিয়ে কথা তুলতে মাখনলাল প্রথমটায় রেগে উঠলেন, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনবরত কান্না। পরদিন সকালে অনেকটা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় পেয়ে অবিনাশ চেপে ধরলেন। বলতেই হবে কি হয়েছে। কেন সে নাইটস্কুল তুলে দিল? কেন সে ক্লাব আড্ডা ছেড়ে ছিল? কেন সে অনিয়মিতভাবে কলেজে যাতায়াত করছে? তার নামে বদনাম রটেছে, তাকে নিয়ে লোকে নানা কথা বলছে। সে কি জানে না? ও জানে সবই, কিন্তু কিছুই ওর করবার নেই। নিজের ওপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে। একদিন সব বলবে, আজকে ওকে রেহাই দিক অবিনাশ। অবিনাশ ওর বন্ধু ও সহকর্মী। বেশিদিন রেহাই দিতে পারলেন না। কেননা, একবার একদিন মাখনবাবু অজ্ঞানাবস্থায় কলেজে আসাতে খুব অসন্তোষের সৃষ্টি হয় অধ্যাপকমহলে। তার পরদিনই কয়েকজন বন্ধু মিলে মাখনলালকে আমার কাছে নিয়ে এলেন।

মাখনবাবু সহযোগিতা করলেন। নিজের ইতিহাস ব্যক্ত করলেন। —কেউ জানে না যে আমি কলেজ থেকেই অ্যালকোহলে আসক্ত। ল্যাবরেটরি থেকে অ্যাবসলুট অ্যালকোহল নিয়ে এসে জল মিশিয়ে রোজ রাত্রে খেতাম। অবশ্য খুব অল্পমাত্রায়। মাঝে মাঝে ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে রাত হয়ে যেত। অন্য কেউ না থাকলে আমি অ্যালকোহল খেতাম। অ্যালকোহল না খেলে আমার ঘুম হত না। কাজে মন বসত না। একলা বেশিক্ষণ থাকলে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ মাথার দিকে উঠতে থাকত। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর। আমি অস্থির হয়ে পড়তাম। হাতের কাছে যা থাকত, তাই ভাঙতে ইচ্ছে হত। অ্যাল- কোহল, বেশি নয়, আউন্সখানেক খেলেই আমার স্নায়ুগুলো বশে আসত। কি চিন্তা আমাকে উদভ্রান্ত করত? সুই- সাইডের চিন্তা। ল্যাবরেটরীতে নানা রকমের বিষ নিয়ে কাজ করতে হত। খুব লোভ হত। কেন সুইসাইড করব? ঠিক বলতে পারব না। আমি জীবনকে ভালবাসি, মানুষকে ভালবাসি। আমার মা-বাবা, ভাই- বোন কেউ নেই বটে, কিন্তু আমি তো অনা- মানুষকে ভালবাসি। আমি তো অ্যান্টিসোশ্যাল নই। তা বলে সব মানুষকে ভালবাসি না। একটি মানুষকে খুন করার চিন্তা আমি সযত্নে লালন করে এসেছি এতদিন। এই প্রথম আপনাকে জানাচ্ছি। সেই মানুষটি আজ কয়েকমাস কলকাতায় এসেছে। আমার পাড়াতেই থাকে। কয়েকদিন পর পর সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তার ভয়ে আমি সন্ধ্যায় বাড়ী থাকি না। বেরিয়ে গিয়ে বারে আশ্রয় নেই। কি ভয়? তাকে দেখলেই আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঢেউ মাথার দিকে উঠতে থাকে। সব ভাবনাচিন্তা জট পাকিয়ে যায়। মনে হয় দুহাত দিয়ে ওর গলাটা টিপে ধরি। ষাট বছরের জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আমার আক্রমণ রোধ করতে পারবে না। যদি এই ইচ্ছা কাজে পরিণত হয়, তাহলে কি হবে? আমি কামুর 'আউট সাইডার' পড়েছি। কামুর সেই নাটকটাও পড়েছি, যার মধ্যে মা তার বোর্ডিং-এ নিজের ছেলেকে হত্যা করেছিল। মা অবশ্য নিজের ছেলেকে চিনতে পারেনি। চিনতে পারলেও হত্যা করত। হত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তার। আমি কিন্তু আমার শিকারকে (হ্যাঁ, ঐ বৃদ্ধ অমায়িক ভদ্রলোক আমার শিকার) ঘৃণা করি। আমার সমস্যা আউট- সাইডারের প্রব্লেম নয়। বরং উল্টো বলা

চলে। আমি নিজের দেহকে, আমাকে, আমার ডিগ্রী ডিপ্লোমা ডক্টরেটকে ঘৃণা করি। ঐ বৃদ্ধকে যতটা ঘৃণা করি, তার থেকেও বেশি ঘৃণা করি। কেন? যতদিন পড়াশুনো করিছি, আমার নামে মাসে মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা উনি পাঠিয়েছেন। অবশ্য বেনামিতে। আমি জানতাম কার টাকা। তবুও সে টাকা নিয়েছি, সেই টাকায় খাবার কিনেছি, বই কিনেছি, বেঁচে থেকেছি। আজ পাঁচ বছর টাকা আসছে না, পাঁচ বছর আমি চাকরী করছি। লোকটাকে ভুলে যাচ্ছিলাম, হয়তো ক্ষমা করেই ফেলতাম। কিন্তু হঠাৎ দুষ্ট গ্রহের মত আমার জীবনে ও আবার উদিত হল কেন? প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল, আমি টের পেলাম ওর চোখ দিয়ে স্নেহ ঝরছে। স্নেহমমতার জিভ বের করে ও আমাকে চাটছে। আমি শিউরে উঠলাম। ঘৃণায় আমার অন্তরাত্মা বিষিয়ে উঠল। ও কি করেছে? কেন আমি ওকে বিষ-নজরে দেখেছি। বলছি শুনুন।

মাখনবাবুর মুখ থেকে জানলাম যে এই বৃদ্ধের নাম পরেশ। এঁর দাক্ষিণ্যে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছেন। মাখনবাবুদের গ্রামে পরেশবাবুর আশ্রম। পরেশবাবুর আশ্রমে চরখায় কাটা সুতো বেচতেন ওঁর মা। পরেশবাবু জেলখাটা পর্ব শেষ করে এই আশ্রম খুলে অনাথা বিধবা-দের জীবিকার্জনের একটা পথ দেখাতে চেয়েছিলেন। নানারকমের কুটীরশিল্প, তাঁত, ঘানি ইত্যাদিতে গ্রামের অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছিল। পরেশ-বাবুর অনেক ত্যাগ, অনেক মাহাত্ম্য। ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে নিজের হাতে তাঁত বুনতেন, করাত চালাতেন, দরকার হলে হালবলদ নিয়ে মাঠেও নেমে পড়তেন। মাখনের মা'র প্রতি তাঁর করুণাকে গ্রামের লোকেরা কিন্তু ভাল চোখে দেখে নি। অল্প বয়সের এই বিধবাকে বিশেষভাবে সাহায্য না করলে মাখনকে তিনি মানুষ করতে পারতেন না। স্কুলের কয়েকজন ছেলে মাখনলালকে এ নিয়ে টিটকারী দেওয়াতে মাখনলাল স্কুলে পড়তে অস্বীকার করে। পরেশবাবুর চেষ্টাতে জেলা স্কুলে স্থান পায় মাখন। খরচাপত্তর মা-ই জোগাতেন: কি করে জোগাতেন মাখন জানতো না। মাঝে মাঝে গ্রামের সেই কুৎসিত গুজবটা তার সত্যি মনে হত, আর তখনই, স্কুলে থাকতেই তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বিদ্যুতের ঝলক মাথা অবধি উঠে আসত। নদীর ধার দিয়ে হনহন করে একলা পায়-চারী করতে থাকত মাখন। কলেজে ভরতি হতেই মা মারা যান। পড়া হবে না ভেবে যখন হতাশ হয়ে পড়েছে, তখন প্রিন্সিপ্যাল ডেকে বলেন যে তার এক নিকটাত্মীয় তার পড়াশুনোর খরচা বাবদ বিদেশ থেকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাবেন। সে নিশ্চিত মনে পড়াশুনো চালিয়ে যাক। প্রিন্সিপাল পরেশবাবুর বিশেষ বন্ধু, এ খবর মাখনবাবুর অজানা ছিল না। তার সন্দেহ হয়, ক্রমে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে এ টাকা পরেশবাবুই দিচ্ছেন। পরেশবাবুর সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক নিয়ে কুৎসা, তার এখন থেকে, সত্যি বলে মনে হতে থাকে। এর মধ্যে গ্রামের দু-একজন হিতৈষী দেখা করতে এসে আকারে ইঙ্গিতে এইরকম আভাসই দিয়ে যান। ঘৃণায় বিদ্বেষে মাঝে মাঝে মাখনবাবুর সর্বশরীর জ্বালা করে উঠত, নিজেকে ও পরেশবাবুকে শেষ করে দেবার তীব্র বাসনা জন্মাত, আর সেই জ্বালা বুকে রেখে, সেই বাসনা চেপে, পরেশ বাবুর টাকায় মাখনবাবু খাবার কিনতেন, বই কিনতেন, বেঁচে থাকতেন। এই অস্বাভাবিক মনের অবস্থা নিয়ে দীর্ঘ ন' দশ বছর কাটাবার পর চাকরী হয়। টাকা আসা বন্ধ হয়। কিন্তু পরেশবাবু এতদিন পরে মাখনবাবুকে দেখা দেওয়ায় পুরনো সন্দেহ ঘৃণা তীব্র হয়ে উঠেছে। অ্যালকোহলের মাত্রা বাড়াতে হচ্ছে। তবু চিন্তা যাচ্ছে না। শান্তি পাচ্ছেন না।

সুরাতৃষ্ণা ও সুরাসক্তির মূলে এখানেও মানসিক অসুস্থতা। পরেশবাবু সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি যে এইরকম অযাচিত সাহায্য তিনি আরো অনেককে করেছেন। অনাথারা তরুণী না হলেও তাঁর দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। পিতার মৃত্যুর পর পাড়াপড়শীর লাঞ্ছনা, মায়ের প্রতি তাদের লালসার দৃষ্টি, দারিদ্র্যের কষাঘাত, সব মিলে মাখনবাবুকে অসুস্থ করে তুলেছে। তাঁর মস্তিষ্কে দ্বিতীয় সাঙ্কেতিক স্তরের প্রাধান্য। শৈশবে তাঁর মনে গ্রামের লোকেরা সন্দেহের যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে তাই আজ তাঁর সমস্ত মনে ছড়িয়ে পড়েছে। অবিশ্বাসের অঙ্কুর আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান-ধর্মী মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্যই সন্দেহ করা, মার্কস বলেছেন সন্দেহ থেকে শুরু কর— এইরকম অনেক কথা মাখনবাবু আমাকে সেদিন শুনিয়েছিলেন।

অ্যালকোহলের ক্ষতিকর প্রভাবে বর্ত-মানে যুক্তিচিন্তার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেল-ছেন মাখনবাবু। মনের অসুখ থেকে সুরাসক্তি, সুরাসক্তি থেকে রোগবৃদ্ধি।

তবে মনে রাখা দরকার যে, মাখনবাবুর কাছে অ্যালকোহল সহজপ্রাপ্য হবার ফলে তাঁর পক্ষে সুরাসক্ত হবার সুযোগ অনেক-খানি বেশী হয়েছে। প্রথম থেকেই প্রকাশ্যে সুরাপান করার সাহস তাঁর ছিল না। শ্রীকুমারের মত 'ননকনফরমিস্ট' বোহেমিয়ান তিনি নন। দলে মিশে পার্টির ভিড়ে সুরা-পান করে মাসে এক-আধদিন হৈ-হল্লা করার মত মানসিকতা মাখনবাবুর নয়। দলের মধ্যে অনেকের সঙ্গে মিলে 'মেলে' মদ্যপান করাটা অবশ্য কনফরমিজম: এতে সাহসের প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের সুযোগ বা নিমন্ত্রণ মাখনবাবুর হয়তো আসেনি। আসলেও বোধহয় সে সুযোগ তিনি নিতেন না। বন্ধুদের সাধুবাদ ও ছাত্রদের শ্রদ্ধাকে তিনি গুরুত্ব দিতেন।

### মনের কথা প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ কর

২৪শ সংখ্যার অমৃত কোনো কারণে আমার হাতে দেরীতে আসে। কাজেই ধীরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের চিঠিটির উত্তর দিতে দেরী হল। এজন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত। ভর হওয়া মেয়ের জ্বলন্ত কয়লা হাতে নিয়ে ফোস্কা না পড়ার মত আরো দু-চারটি ঘটনার বিবরণ শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় জানিয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

হিস্টিরিয়ার শারীরবৃত্ত ও বিকারতত্ত্ব নিয়েই 'মনের কথা' লিখতে শুরু করি। এই বছরের প্রথম দিককার পাঁচটি সংখ্যায় (যতদূর মনে পড়ে), হিস্টিরিয়ার দরুণ অবেদন ও স্মৃতিলোপের (এ্যানেসথেসিয়া ও এ্যামনেসিয়া) বিশদ ব্যাখ্যা আছে। অনুগ্রহ করে শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক যদি সংখ্যা-গুলো একবার উল্টে দেখেন তো বিশেষ বাধিত হব। এরপর যদি কোনো জিজ্ঞাস্য থাকে তবে দয়া করে অমৃত পত্রিকার কেয়ারে আমাকে চিঠি লিখবেন আমি যথাসাধ্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করব।

—[illegible]

# স্টেশন মাস্টারের ডায়েরী

রাতের শেষ লোকাল প্ল্যাটফর্মে এসে ...কতেই মাঝপথে বেহালার ছড় থেমে গেল। ...টশনমাস্টার অতুলশশী চোখ খুলে তাকা-...ন প্ল্যাটফর্মের দিকে। বেহালা তখনো ...ধের ওপর। নিরুত্তাপ নিস্পৃহ চোখে ...নি তাকিয়ে রইলেন। সে-দৃষ্টির সীমানা ...ন আদি-অন্তহীন। এমনিতে অতুলশশীর ...খ দুটি একটু বড় এবং টানা-টানা। ...স্ত মুখের মধ্যে ও দুটিই প্রথম চোখে ...বে মানুষের। আর যখন তিনি গম্ভীর-...বে তাকান, তখন যে কোনো মানুষের ...ন হবে যেন সমুদ্রে ডুব দিচ্ছি। যে-কোনো ...নুষ সে চোখের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ের ...দ খুঁজে বার করতে পারবে। কিন্তু ...ন এত রাতে সেসব কথা ওঠে না, ট্রেন ...কে নেমে যে যার বাড়ি ঢুকতে পারলে ...চে। তাই গাড়ি প্ল্যাটফর্মে লাগতে না লাগতে ঘরমুখো ডেলি-প্যাসেঞ্জার, ব্যাপারীরা গাড়ি খালি করে একে একে নেমে গেল লম্বা ডাউন প্ল্যাটফর্মের শেষ কিনার দিয়ে। যেখানে কয়লা বোঝাই মাল-গাড়ি প্রায়শঃই দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে, তার ঠিক পিছন দিয়ে বাজারে পড়ার খোয়াওঠা সড়ক নেমে কে কোথায় মিলিয়ে গেল। অতুলশশী বন্ধ্যা দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ অবধি শূন্য প্ল্যাটফর্মে তাকিয়ে রইলেন। গার্ড-সাহেব হাতবাতি হাতে নিয়ে ঘোষের সরু রাস্তা পেরিয়ে রানিংরুমের দিকে চলে গেল। এবং তা অতুলশশীর চোখের নিচে দিয়ে গলে, তা তিনি টেরই পেলেন না। সবশেষে সেই ছায়ামূর্তি। চোখ বুজেই সে মূর্তির পূর্ণ অবয়ব দেখতে পেলেন অতুলশশী। কোয়ার্টারের সামনেকার টিমটিমে আলোতেও ঝলমলে শাড়ির আঁচল খসে খসে পড়ছে। বুকের অনেকখানি অবধি অর্ধ-বৃত্তাকারে কাটা ফিরোজা রংয়ের ব্লাউজের ভিতর পুষ্ট দেহাংশ রাতের বিশ্রাম চাইছে। একটা দমকা হাওয়ার মতো ছায়ামূর্তি পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লো কোয়ার্টারের দরজা ঠেলে। যেন অতুলশশীর কাঁধে শোয়ানো বেহালাখানার সব তার ছিঁড়েখুঁড়ে বাতাসটা মিলিয়ে গেল। ঘেমেওঠা প্রসাধনের কটু কষী গন্ধ তখনো বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে বেশ বুঝতে পার-ছিলেন অতুলশশী।

কতকগুলো আলুথালু ভাবনা কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ অবধি চুপচাপ বসে রইলেন স্টেশনমাস্টার অতুলশশী। কতকগুলো শুকনো [illegible] শুঁকে শুঁকে ফেলতে লাগলেন। তারপর এক সময় দেহটাখানা বাকসে ঢুকিয়ে রেখে ঝুলে রাখলেন। শুধু [illegible] আগে রোজকার মতো স্টেশন ঘরের পিছন দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ঐ আপ [illegible] না গেলে পাতিং ঠিক ঠিক [illegible] এ এস এম ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো সুইচ বোর্ডেই মাথা রেখে তন্দ্রা গেছে, একবার লক্ষ্য করে আসা আর কি। এখনকার সব লেখাপড়া জানা স্টাফ, দায়িত্বজ্ঞান কতদূর টনটনে তা জানা আছে তাঁর। কথায় কথায় কেবল 'মাইনে যা পাই তাতে এই যথেষ্ট'—এইসব মন্তব্যগুলি শুনে শুনে কানে তালা ধরে গেছে অতুলশশীর। স্টেশন ঘরে আর ঢুকলেন না তিনি। ঘুরে সামনের দিকে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। বারান্দার কোণে অ্যাভারির ওজন মেসিনটা একবার দেখলেন। মেসিনের হাতলে সিঁদুর দিয়ে আঁকা গণেশ মূর্তিটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। বাবার কথাও না। রাতে এ যন্ত্র মরা। যা কিছু প্রসাদ আশীর্বাদ এ থেকে পাওয়া যায়, আফিমের মোড়কের মতো ভাগ তৈরি হয়—সবই দিনের বেলা। ভেন্ডারদের বখরা জমে জমে পাহাড় হয় চত্বরময়। বুকিং ক্লার্ক গার্ড এ এস এম সবার দৃষ্টিই একমুখো: সবাই যেন ঘুরে ঘুরে একই বন্দনা গায় গলা মিলিয়ে। ছাব্বিশ বছরের চাকরিতে এসব এখন পুরোনো হয়ে গেছে অতুলশশীর। তিনি নিজে এ সবের বাইরে এটুকুই যথেষ্ট। আর এই বাইরে থাকাটাই তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকে দেউলিয়া করে কানাবাড়ির পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছে। তথাপি ঐ একটা জোরেই সম্ভবত অতুলশশী নিজেকে নিজে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে। কিন্তু নিজেই তো সব না, লীলার কথা না হয় বাদ যাক, বাকি পাঁচটা ছেলেমেয়ে। সংসারে প্রবেশ করার আগে অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে লীলার সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল...। ওভারব্রীজের প্রথম ধাপের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন অতুলশশী। এতক্ষণ খেয়ালই হয়নি ভাবতে ভাবতে কখন প্ল্যাটফর্মে উঠেছেন, তারপর পায়ে পায়ে একেবারে ওভারব্রীজের ওপরে না উঠে পারলেন না তিনি।

প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের পরিচিত প্ল্যাটফর্ম। একেবারে ঘরবাড়ি বলা যায়। তথাপি এই নিশুতি রাতে তা যেন সম্পূর্ণ আলাদা। কর্ড লাইনের জলা জায়গা বলে স্বভাবতই একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব মাটিতে। দুদিকে যতদূর চোখ চলে নাবাল জমি। পটপটি আর আগাছার জঙ্গলে রাত্রিকে আরো ঘোরালো করে তুলেছে। বাঁদিকে ইস্ট কেবিনের ধার বরাবর কিছু পিটুলি দেবদারু ও বুনো জামের জটলা। কুয়াশার সময় সমগ্র বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে কেমন এক জটিল রহস্যের খেলা চলে। ফগ সিগন্যাল লাগাতে গিয়ে পটাকা-ম্যান সহদেও মাঝে মাঝে থ' হয়ে লাইনের ওপর বসে থাকে। যেন নিশিতে পাওয়া মানুষ তখন সহদেও। কিন্তু এই মুহূর্তে অতুলশশী ওভারব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে যেন এক নতুন আস্বাদ অনুভব করলেন। এইসব জটলার মধ্যে দিনে সূর্যের আলো ঢুকতে পারে কিনা কে আর দেখেছে, কিন্তু রাতে যে চাঁদের নরম আলো এখানকার মাটি পর্যন্ত ছুঁতে পারে তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল অতুলশশীর। তার চেয়ে ভাল লাগছে নিজেকে এই গোপন আশ্রয়ে একান্ত করে কাছে পাবার আনন্দে। খাগড়াঘাটের সেই নড়বড়ে ওভারব্রীজটা এতদিনে লীলা সম্ভবত ভুলে গেছে। মৃতের শোক বুকে আঁকড়ে বছরের পর বছর হা-হুতাশ করে কাটানো লীলার ধাতে সয় না, জানেন অতুলশশী। আর তা তিনি চানও না। কিন্তু তেইশ বছর পিছনকার সেই চঞ্চল কিশোরীর প্রেমিকের বুকে মুখ লুকিয়ে স্বপ্ন ও প্রতিজ্ঞার রাতটা আজ অতুলশশীর কাছে দুঃস্বপ্নের রাত্রি হয়ে ক্রমাগত বুকে হাতুড়ি পিটতে থাকলে তা তিনি রুখবেন কেমন করে! ছবিটা আজও যে স্পষ্ট।

ব্রীজের একদিকে আবছা অন্ধকারে বুকের মধ্যে একেবারে লেপটে থেকে লীলা কাঁপছিল থরথর করে। দূরে ডিসট্যান্ট সিগন্যাল পিছন করে একটি যুগলমূর্তি দ্রুত নিঃশ্বাসের মধ্যে পরস্পর একে অন্যের উষ্ণতা আকণ্ঠ পান করছে। বৃষ্টিধোয়া আকাশের গায়ে ফালি চাঁদের নিচে তারা *প্রতিজ্ঞায় ভরপুর—প্রতিজ্ঞা জীবনের, প্রতিজ্ঞা প্রেমের। মাঝে মাঝে নিজের দিকে তাকিয়ে লীলা শিউরে উঠছিল। অতুলশশী অভয় দিয়েছেন, বার বার ধরে পথ বাতলে*ছেন দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পাবার। যুদ্ধ [illegible] পর তাঁরা প্রবেশ করবেন নতুন জীব[illegible] কিন্তু রাজী হয়নি লীলা। অসাধারণ প্র[illegible] লীলা বলছে, 'না'। কোনোও অন্যায় [illegible] এর মধ্যে—যে আসছে অসুক। আর [illegible] মেনে না নিলেও আমাদের কাছে সে [illegible] মিথ্যে নয়! বরং এই প্রথম আশীর্বাদ [illegible] লীলার গলা বুজে এসেছিল, আর [illegible] বলতে পারেনি সে। দুচোখে জলের [illegible] সম্ভবত পরিপূর্ণ তৃপ্তির আনন্দাশ্রু।

এরপর অতুলশশীর হাতে মাত্র ক[illegible] সময় ছিল ভাববার। ভাবনার আর [illegible] নয়, ভবিষ্যৎ জীবন ছাড়া। লীলার [illegible] বাসায় হয়তো খাদ নেই বিশ্বাস করেন তি[illegible] নইলে বিপদের কথা জেনেও সে নি[illegible] এমনি করে অতুলশশীর কাছে ঠেলে [illegible] না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনমাস্টার [illegible] শ্বশুর মশায়ের ধারাকেও অস্বীকার [illegible] উপায় নেই। খাগড়ার এ এস এম-এর [illegible] টির মধ্যে অতুলশশী রাঘববাবুর প্রতি[illegible] জীবনটাকে দেখেছেন। দু-এক পয়সা [illegible] জন্যেও মানুষটা কতো নীচে নামতে [illegible] কত হীনতম কাজ অনায়াসে করতে [illegible] তা যে নিজের চোখে দেখেছেন অতুল[illegible] লীলা এ রক্তের বাহক, এটা কোনো [illegible] ভুলতে পারছিলেন না তিনি।

কিন্তু না। নিজের শক্তিকে বিশ্বাস [illegible] অতুলশশী। প্রেমের শক্তি দিয়ে লী[illegible] তার ট্র্যাডিশন থেকে মুক্ত করবেনই। লী[illegible] চোখে-মুখেও সেদিন এ প্রতিজ্ঞা উজ্জ্ব[illegible] হয়েছিল। সুস্থ জীবন যাপনের অঙ্গী[illegible] নিয়ে লীলা নিজেকে সমর্পণ কর[illegible] অতুলশশীর কাছে।

খাগড়ার সেই জরাজীর্ণ ওভা[illegible] এতদিনে হয়তো ভেঙেচুরে নতুন করে [illegible] হয়েছে। ব্রীজের ওপর পাতা যে [illegible] কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে সেদিনের সেই [illegible] মূর্তি জীবনের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, সে[illegible] ব্রীজ ভাঙার কত দিন পরে পোড়া[illegible] পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে, তা কবরের [illegible] পর্যন্ত জানতে ইচ্ছে করতো অতুলশশী[illegible] যেমন ইচ্ছে করতো রাঘববাবুর শেষের [illegible] ভয়াবহ দিনগুলির কথা জানতে। বাবার [illegible] শোচনীয় দিনের কথা বলতে বলতে [illegible] একদিন কান্নায় ভেঙে পড়েছে [illegible] অতুলশশী মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে [illegible] শুনতে চান নি। আজও সেই আধা[illegible] ঘটনা তেমনি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। [illegible] সম্পূর্ণ ছবিটা ভাবতে গিয়ে গলা [illegible] শুকিয়ে আসে অতুলশশীর। পাঁচটি [illegible] মেয়ে সমেত নিজের সংসারের কর্তা [illegible] তিনিও চাকরির অপরাহ্নে হাজির [illegible] চলেছেন। যদিও সুদীর্ঘ চাকরিজী[illegible] কোনো অন্যায়ই তিনি করেন নি।

মাথার ওপর দিয়ে দু-একটা নিশাচর পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। অতুলশশী অনেকক্ষণ বাদে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সম্ভবত এখন দুটো-আড়াইটা রাত হবে। কোয়ার্টারের দরজা নিশ্চয়ই খোলা আছে। লীলা জানবে তিনি সামনেই আছেন, দরজা বন্ধ না করে ভেজিয়ে রাখবে। অতুলশশী দ্রুত পা চালালেন ওভারব্রীজ থেকে নেমেই। কিন্তু খাগড়ার সেই নড়বড়ে ওভারব্রীজ যেন তাঁকে পিছু পিছু তাড়া করতে থাকলো।

অতুলশশীর রাত্রি ও দিনের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য আছে একথা আজ আর কোয়ার্টারের কোনো মানুষই বিশ্বাস করবে না। সকাল থেকেই মানুষটা যেন ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি হয়। লম্বা চওড়া দশাশয়ী চেহারার মানুষটি এই মুহূর্তে হয়তো গুডসের রসিদ কাটছেন, পরক্ষণেই দেখা যাবে কোয়ার্টারের পিছন দিকে গোয়ালঘরে গরুর জাব রাখছেন। সকাল নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বেনারসীকে হাঁকডাক। ক্যাশ বাঁধতে হবে। বেনারসী গুনে গেঁথে না দিলে ক্যাশ বাঁধাই হবে না হয়তো, এমনি ভাব। তারপর রানিং রুমের জিনিসপত্রের হিসেব মেলানো। এটা সপ্তাহে একবার হলেও বেনারসী ছাড়া যেন কেউ নেই তাঁর। তবে দরাজগলার হাসিটা কিছুদিন থেকে ঝিমিয়ে এসেছে অতুলশশীর। সংসার এমনি জিনিস, মানুষকে কোনো সময়ই হালকা হয়ে কাটাতে দেয় না। অথচ চোখের সামনে তিনজন এ এস এম—যেন ফুরফুরে হাওয়ায় সব সময়ই উড়ছে। এবেলা ওবেলা মাছ মাংসের হটরা, নতুন নতুন গয়নার ডিজাইন গিন্নীদের গায়ে—অতুলশশীর যেন কোনো কিছুতেই আসে যায় না। লীলা বলে, শুয়োরের গোঁ। সাধু সন্নিসি হবে তো পাঁচ-পাঁচটা পোষা সংসারে আনলে কেন? আশ্ডারের সবাই যে যার গুছিয়ে নিচ্ছে, আর উনি...। কথা শেষ হবার আগেই লীলা এক দলা থুতু ফেলে রান্নাঘরে চলে যায়। অথচ আজও অতুলশশী নিজের সততায় অটল। ঐ একটি জোরই এখনো পর্যন্ত সম্ভবত বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁকে।

কিন্তু তাতে কি। রেলের সেই পুরোনো স্রোতের ধারাকে তিনি কি মুছতে পেরেছেন সংসার থেকে। মুক্ত রাখতে পেরেছেন নিজের আত্মজদের। সারাটা দিনের মধ্যে এক-একটা গাড়ি ঢোকে প্ল্যাটফর্মে, আর অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকেন অতুলশশী। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরোনোর পথে লাইন বেঁধে যারা হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের মধ্যে পিন্টু-মিন্টু-নিন্টু যে নিশ্চয়ই থাকবে এটা অবধারিত। এ এস এম-দের ছেলেমেয়ে কেউ কেউ দাঁড়ায় হয়তো, কিন্তু নিছকই তা ভাগের ভাগ আদায় নিতে। সব কটি পোর্টার তো বটেই। ফলে টি সি মল্লিকবাবুর কাছে কথা শুনতে হয় হামেসাই। অর্থাৎ যার যা এক্তিয়ার, সে তা পাবে না কেন? আর গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢোকা থেকে সেই যে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে লীলা, ছেলেরা আদায় নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত এক পাও নড়ে না। কখনো কখনো ছোট মেয়ে সর্বাণীকেও প্ল্যাটফর্মে পাঠায় লীলা দাদাদের সঙ্গে।

প্ল্যাটফর্মের রুক্ষ রুক্ষ জানালার ধারে খাটে শুয়ে পাশ ফিরে তাকিয়ে থাকেন অতুলশশী, তাঁর নির্বিকল্প সমাধি যেন। হাত-পা বেঁধে তাকে যেন ক্রমাগত কে চাবুক কষিয়ে চলেছে। অতুলশশী পংগু নিশ্চল তাঁর নির্মম অদৃষ্টের কাছে। কোনো একজনের এক পুরুষের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকেও এমনি করে করতে হবে তা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন অতুলশশী।

বিশ্বের ক্রিয়া অনিবার্য গতি নেবে, তাকে ঠেকিয়ে রাখার হাজার চেষ্টা করেও অতুলশশী হার মেনেছেন। যেদিন ক্যাশ বাঁধার সময় বড় ছেলে মিন্টুকে দাঁড়াতে বলে তিনি কোয়ার্টারে কি যেন নিতে এসেছিলেন,—সেদিনের ঘটনা থেকেই অতুলশশী যেন নির্বিকার হয়ে গেছেন বেশী মাত্রায়। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছিল দিন দুই পরে ফেরৎ ক্যাশ ব্যাগের মধ্যে একশো টাকার কেসিয়ার্স মেমোখানা পেয়ে। এতদিনের চাকরিতে থেকে একশো টাকার সর্ট সেই প্রথম অতুলশশীর। মুহূর্ত বিলম্ব হয়নি ব্যাপারটা বুঝে নিতে। কিন্তু লীলার জন্যে মিন্টুকে কিছু বলতে পারেননি সেদিন। তাছাড়া, এর ওপর লীলার কাছ থেকে উপরি পাওনা—সেই পুরোনো কাসুন্দি ঘাটতে আর ইচ্ছে হয়নি অতুলশশীর। আর বলে লাভই বা কী!

পরিবর্তে বিকেলের দিকে সেদিন সকাল করে বাজনায় বসে গিয়েছিলেন অতুলশশী। কোয়ার্টারের সামনে যথারীতি মাদুর বিছিয়ে ডাকহাঁক করেছিলেন পাশের কোয়ার্টারে। পাশের কোয়ার্টার থেকে এ এস এম বিনয় হালদার তবলা নিয়ে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত অতুলশশী মাদুর থেকে পা দুটো ঘাসের ওপর ছড়িয়ে চোখ বুজে বসেছিলেন। বড় মতো হাঁ করে মুক্ত বাতাস নিচ্ছিলেন কিছুক্ষণ অবধি। তারপর তবলার বোল উঠতে বেহালার ছড়ে টান দিয়ে সুর তুলেছিলেন। এবং একের পর এক রাগ-রাগিণীর মুর্ছনায় অনেক রাত পর্যন্ত বিভোর হয়েছিলেন। নিত্যকার বরাদ্দমতো প্রসাধনের জৌলুষ এঁকে লীলা কখন বেরিয়ে গেছে সামনে দিয়ে বড় মেয়ে কল্যাণী রান্না শেষ করে কখন সিঁড়িতে এসে বসেছে বাজনা শুনতে, কিছুই খেয়াল করেননি অতুলশশী।

একটা রাগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণীর ডাকে চোখ খুলে তাকান অতুলশশী। —ও, বিনয় কখন উঠে গেছে বুঝতেই পারিনি। তো রাত্রি হয়েছে নারে? কল্যাণী বিষণ্ন করুণ দুটি চোখে বাবাকে দেখছে। রক্তাক্ত জন্মদাতার যাবতীয় দুঃখ, সবটুকু যন্ত্রণা যেন সে নীলকণ্ঠের মতো গ্রহণ করতে চায়। তাই সম্ভবত জ্ঞান হবার পর থেকেই কল্যাণীর দু'চোখের দৃষ্টিতে ব্যথার অশ্রু যেন টলমল করে। অতুলশশী তা বোঝেন। জীবনের এই প্রথম ফসলকেই তিনি একদা উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। আজ ভাবলেও কেমন কাঁটা দেয় গায়ে। নিজের ওপর এই এক জায়গায় অশ্রদ্ধা জন্মায়। অতুলশশী মাঝে মাঝে হাতড়াতে থাকেন, লীলার চরিত্রের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র মিল আছে কিনা। না। কল্যাণী একক এবং অনন্যা।

বেহালাখানা বাক্সে তুলতে গিয়ে অতুলশশীর চোখ পড়লো হরেনের দিকে। গার্ড হরেন দাশগুপ্ত। ছিমছাম চেহারার বছর তিরিশের যুবক। মাঝে মাঝে অফ থাকলে সে বাজনার আসরে যোগ দেয় শ্রোতা হিসেবে। দক্ষিণের একটা কোয়ার্টার হরেন দখল করে আছে। অতুলশশী জানেন, বাজনার টানই হরেনের একমাত্র টান না এখানে, তা ছাড়াও আছে কিছু। কল্যাণীর চোখ দেখে অতুলশশী একদিন বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা। কিন্তু কল্যাণীর ওপর বিশ্বাস ছিল তাঁর। সত্যিকার খাঁটি সোনা চিনে নিতে সে ভুল করবে না। ছেঁড়া তারেও সুরের মূর্ছনা তুলতে কল্যাণী অদ্বিতীয়া হবে। এবং সেইটাই সম্ভবত অতুলশশীর জীবনে চরমতম আনন্দের দিন হয়ে দেখা দেবে।

এমনি একটা অস্ফুট আনন্দের কম্পন অতুলশশীকে মাঝে মাঝে নাড়া দিচ্ছিল আজকাল। তারই মাঝে একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন, লীলার পরিবর্তনটা। বোধহয় কল্যাণীর ব্যাপার বুঝতে পেরেই ইদানীং কিছুটা সংযত হতে চাইছে সে। নিত্যকার সেই নৈশ ভ্রমণের কলকাতাকে এখন খানিক পাশ কাটিয়ে চলছে লীলা। প্রাক চল্লিশের শিথিল যৌবনকে এখনো সে বাঁধতে চায় প্রসাধনের রসিতে ঠিকই, কিন্তু হয়তো তার বেশী কিছু না। অনেকদিনের তিল-তিল গড়ে ওঠা অভ্যাস লীলা একেবারে ছেঁটে বাদ দেবে কেমন করে। অবশ্য এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতে আজ আর কোনো উৎসাহ নেই অতুলশশীর। অনেককাল আগেই লীলার সঙ্গে সবকিছু বোঝাপড়া তিনি শেষ করে দিয়েছেন।

অতুলশশী তাঁর কথা রেখেছেন। লীলার কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর তিনি হস্তক্ষেপ করেননি কখনো। একান্ত অসহ্য হলে আগে আগে মৃদুভাবে প্রতিবাদ জানাতেন কখনো বা। কিন্তু ইদানীং লীলার পরিবর্তনটা অতুলশশীকে যেন ফিরে ভাববার জন্যে অনুরোধ করছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কার্যত তাঁর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

সেদিন রাতে খাওয়ার পর্ব কিছু আগেই শেষ হয়েছে। পিছনদিকের দরজা খুলতে গিয়ে গোয়ালের আড়ালে চাপা ফিস ফিসানি শুনতে পেয়ে অতুলশশী নিজের ঘরে ফিরে এলেন। জিনিসটা অনুমান করে কিছুটা ভালও লাগছে তাঁর। সারাটা দিন পরিশ্রমের পর মেয়েটা এতক্ষণে বিশ্রাম পেয়েছে। মনটা উন্মুক্ত করতে তাই সন্তর্পনে বাইরে গেছে। অতুলশশী কদাচিৎ কখনো এ সময় বেহালা নিয়ে বসেন। কিন্তু আজ বসলেন বাইরের সেই নির্দিষ্ট জায়গায় মাদুর বিছিয়ে। তারের ওপর ছড় টেনে সুর তুললেন একের পর এক। রাগ-রাগিণীর মূর্ছনার মধ্যে অবশেষে একসময় বিভোর হয়ে ডুবে গেলেন। আনন্দে অতুলশশীর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে দু চোখের ধারা। মানুষটা যেন নিশ্চল পাথর মূর্তি। কেবল ছড়টা ওঠানামা করছে তারের ওপর।

রাত্রি কতো হয়েছে খেয়াল নেই অতুলশশীর। চারদিক নিস্তব্ধ থমথমে। কোয়ার্টারে তাঁর শোবার ঘরের দরজা দুহাট করে খোলা। একসময় ঘুম ভেঙে কল্যাণী বাইরে আসে। একী। মানুষটা সারা রাত্রি ধরে বেহালা বাজিয়ে যাবে নাকী। ছায়া মূর্তির মতো বাবার সামনে এসে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কল্যাণী। অতুলশশীর চোখ মন দুই বোজা। কে এল গেল কিছুই তাঁর জানবার কথা নয়। কল্যাণী বাবার মাথায় হাত রাখলো।—রাত্রি অনেক হয়েছে যে, শোবে না। যেন স্বাভাবিকভাবেই ফিরে তাকালেন অতুলশশী। বেহালা থামলো। —তোদের খাওয়া হয়েছে? মা'র?

অস্ফুটে কল্যাণী বললে, আমরা তো তোমার পরেই খেয়েছি। ওরা যে যার ঘুমোচ্ছে। কিন্তু...

—কিন্তু কী? অতুলশশী গভীর চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন।

—মা এখনো ফেরেনি। এখন রাত্রি একটা বাজে, লাস্ট লোকাল তো অনেক আগেই...।

কল্যাণীর কথা শেষ হবার আগেই মেয়ের দিকে আর একবার তাকালেন অতুলশশী। সে-দৃষ্টির মধ্যে অতলতা ছিল ঠিকই, কিছু একটা জিজ্ঞাসার কথাও বুঝতে পারলো কল্যাণী।

—মা সন্ধ্যে থেকে আজ ঘরেই ছিল। হরেনবাবু এসেছিলেন।

—হরেন! তারপর?

—পিছন দিকের দরজা খুলে বাইরে গিয়ে কথা বলছিল। তুমি খাবার ঠিক আগেই তো!

—হুঁ, তুই কোথায় ছিলি? অতুলশশীর চোয়াল দুটো ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে।

—ঘরে। তারপর খেয়ে শুয়ে পড়েছি।

—হুঁ। তারপর?

কল্যাণী উত্তর না দিয়ে অসহায়ভাবে কেবল তাকিয়ে রইলো।

—বল্ না, তারপর?...তারপর, তারপর কী?

নিজের উদভ্রান্ততায় নিজেই কেমন লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন অতুলশশী। তারপর অনেকক্ষণ অবধি পাথরের মতো নিশ্চল রইলেন। এতক্ষণে বুঝতে পারলেন গোয়ালের পিছনে অন্ধকারে সেই ফিস-ফিসানি গলা কার বা কাদের। এ এমন কিছু না, তাই বলে হরেনের সঙ্গে...।

অতুলশশী ফিরে তাকালেন। কিন্তু তার আগেই খোলা দরজার ভিতর চলে গেছে কল্যাণী। তার শান্ত করুণ দুটি চোখ মনে পড়তেই বেহালাটা তৎক্ষণাৎ কাঁধের ওপর টেনে নিলেন অতুলশশী। তাঁর তিরিশ বছরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, অনেক জন্ম-মৃত্যুর সাক্ষী, সেই রংচটা বিবর্ণ বেহালাটিকে কাঁধের ওপর জোর করে চেপে ধরলেন। তারপর সেই ভোর অবধি কটা তারের ওপর ছড় টেনে চললেন।

আশপাশের মানুষজন যে যখন জেগে উঠেছে একটানা করুণ সুর শুনতে পেয়েছে। স্টেশনরুমে সুইচ বোর্ডের সামনে বসা অন-ডিউটি এ এস এম ধরবাবু সুরের মধ্যে ডুব দিয়ে পাথর হয়ে বসে থেকেছে ভোর পর্যন্ত। আশ্চর্য! মানুষটা সুরের নেশায় মরিয়া হয়ে উঠলো নাকি। এখন থেকে জীবনভোর এমনি একভাবে বসে থেকে বোধহয় ক্রমাগত বেহালা বাজিয়ে যাবেন অতুলশশী। সন্ধ্যেরাতে এই মানুষের হাতেই সুর উঠেছিল, সে অন্য সুর। দুটি লজ্জানম্র প্রেমিক-প্রেমিকার আসন্ন-মিলন-লগ্নের কথা স্মরণ করে বেহালায় সুর তুলেছিলেন তিনি সমস্ত হৃদয় উজাড় করে। ফোঁটা-ফোঁটা আনন্দাশ্রু চোখে নিয়ে অতুলশশী তন্ময় হয়ে বিচরণ করছিলেন সুরের জগতে। আর ঠিক তখনই তাঁর চোখের ওপর বাতাসের ঝটকা মেরে পক্ষীরাজের গতিতে বেরিয়ে গেছে বোম্বাই মেল, দুটি অসমবয়সী প্রেমিক-প্রেমিকাকে আঁচলে ঢাকা দিয়ে। এ কথা স্টেশন মাস্টার অতুলশশীর জানার কথা না। কেননা তাঁরই আজ্ঞাবহ ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলো একবারও বাধা দেয়নি। কোনো একটিও নিশাচর পাখি বারেকের জন্যেও ডানা ঝাপটিয়ে ডেকে ওঠেনি। কেবল ঝড়ে ডানাভাঙ্গা পাখির মতো মূর্তিমতী কল্যাণী নিঃশব্দে পা ফেলে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাত গভীর হওয়ার সংবাদ বহে নিয়ে জন্মদাতার পাশে অপেক্ষা করছিল।

# বিজ্ঞানের কথা

মস্কো সোভিয়েটের চান্দ্রযান লুনোখোদ থেকে টেলিভিশন যোগে এই ছবি পৃথিবীতে পৌঁছেছে লুনোখোদ চাঁদে নামার পর যখন স্বয়ংক্রিয় যান চলতে আরম্ভ করে তখন চন্দ্রপৃষ্ঠে তার চাকার দাগ ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

## চোখের চাউনি

কথা বলার দরকার নেই, একজন মানুষ শুধু তার চোখের চাউনি দিয়েই অপর একজন মানুষ সম্পর্কে তার মনোভাব বুঝিয়ে দিতে পারে। এমনকি মনোভাব গোপন করতে চাইলেও অনেক সময়ে চোখের চাউনিতে তা ধরা পড়ে যায়। মানুষের চোখের চাউনি হচ্ছে জগতের একটি সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা।

কবি, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিকদের কাছে মানুষের চোখের চাউনির স্থান খুবই উঁচুতে।

দুটি চোখের চাউনির সঙ্গে দুটি চোখের চাউনির মিলন হল, এ এক অপার রহস্য। কবি, ঔপন্যাসিক ও দার্শনিকরা তাবং দুনিয়ার ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন, কিন্তু চার চোখের চাউনির রহস্য পুরোপুরি জেনে উঠতে পারেননি।

একজন মানুষ, যখন অপর একজন মানুষের দিকে তার চাউনি মেলে ধরে তখন সেই চাউনির মধ্যেই প্রকাশ পায় তার ব্যক্তিত্ব তার চেতনা, তার অভিপ্রায়। অর্থাৎ একজন মানুষ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে তার চাউনির সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার।

একজন মানুষ বই পড়ছে। এই মানুষটির চোখের দিকে যদি তাকাই তাহলে মনে হবে চোখ দুটি যেন দুটি পদার্থ, লাইন থেকে লাইনে নড়াচড়া করছে। তারপরে মানুষটি আমার চোখের দিকে তাকাল। চোখ দুটি তখন আর পদার্থ নয়, সেই চোখের দিকে তাকিয়ে তখন দেখতে পাচ্ছি মানুষটিকেই। চোখের চাউনির মধ্যে দিয়েই মানুষটির প্রকাশ।

আবার, শুধু আমিই দেখতে পাচ্ছি তা নয়, আমি নিজেকেও দেখাচ্ছি। একতরফা দেওয়া বা একতরফা নেওয়া নয়, একই সঙ্গে দেওয়া ও নেওয়া। চোখের ধর্মই তাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে চার চোখের মিলন হচ্ছে একটি নিখুঁত দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। দুটি মানুষ পরস্পরের দিকে পরিপূর্ণ চোখে তাকাচ্ছে, এ-ঘটনায় মানুষটির সম্পর্কের সবখানিই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

সম্ভবত এ-কারণেই আমরা অপরিচিত মানুষের চোখে চোখ রাখতে চাই না, অপরিচিত মানুষের চাউনি এড়িয়ে চলি। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে এত মানুষের ভিড়, কিন্তু আমরা পারতপক্ষে কারও চোখের দিকে তাকাই না। যদি কখনো তাকাই (ধরুন কেউ আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছে, তখন) নিজের খানিকটা প্রকাশ করতেই হয়, অপরের খানিকটা টের পেতেই হয়।

বাংলায় একটা কথা আছে, চোখ দেওয়া। অনুরূপ কথা পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষাতেই আছে। কথাটার মানে, চোখের চাউনি থেকে অনিষ্ট হওয়া। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়ে যাওয়ার মতো। সজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক অনিষ্টকর চাউনি থেকে নিজেকে ও নিজের প্রিয়জনদের বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা আমরা অহরহই করে থাকি। আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান যেমনই হোক, এই সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারি না, কেননা সেই পুরাণ কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই সংস্কারটি নানাভাবে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। কিছুকাল আগে এমনকি একজন পোপ সম্পর্কেও ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, তাঁর চোখের চাউনি অনিষ্টকর। ১৮৪৬ সালে তিনি পোপ হয়েছিলেন, পোপ হবার পরে তাকিয়েছিলেন একটি নার্সের দিকে। নার্সের কোলে ছিল একটি শিশু, শিশুটি কোল থেকে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিল।

অপরের চোখের চাউনি আমরা অনিষ্টকর মনে করি বা না-করি, অপরের চোখের চাউনি এড়িয়ে চলার চেষ্টা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অত্যন্ত প্রবল। কোনো একটি কামরায় আমরা জনকয়েক লোক যদি এক সঙ্গে যাই (ডাক্তারের চেম্বারে, স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে বা অন্যত্র) তাহলে কিছুতেই অপরের চোখের দিকে তাকাই না। পাছে চোখ পড়ে যায় সেজন্যে খবরের কাগজে চোখ ঢাকি। চিন্তার দিক থেকে আমরা যতোই আধুনিক হই, শিক্ষার দিক থেকে যতোই অগ্রসর হই, আমাদের রক্তেমজ্জায় এই সংস্কার মিশে আছে।

কিংবা যদি উলটো ব্যাপারটি ঘটে? ঘরের মধ্যে আমরা যে-কজন আছি, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে সরাসরি ও পুরোপুরি তাকিয়ে আছি, তাহলে? আমা

একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে যে, আমরা প্রত্যেকেই পালিয়ে বাঁচতে চাইব। এমনই ক্ষমতা চোখের চাউনির।

পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞানীরাও গত দশ বছর ধরে মানুষের চোখের চাউনি নিয়ে গবেষণা করছেন। চোখের চাউনি *সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের গবেষণার সঙ্গে লেখকদের বর্ণনায় অনেক মিল পাওয়া যাচ্ছে।*

*দৃষ্টান্ত হিসেবে শেক্সপীয়রের একটি কবিতার উল্লেখ করা হয়। কবিতায় রাজার ছেলে শুধু তার মুগ্ধ চোখের চাউনি দিয়েই এক নিষ্পাপ সরলার হৃদয় জয় করেছিল।* তারপরে যা হবার তাই হয়ে যাবার পরে মেয়েটি ভাবে, মানুষের চোখের চাউনিতে এত ছলাকলা, এ শুধু পুরুষের পক্ষেই সম্ভব, মেয়েরা পারে না! তারপরে বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করে, কেননা বেঁচে থাকলে তার চোখের চাউনিতেই পাপ প্রকাশ হয়ে পড়ত।

এই কবিতায় চোখের চাউনি সম্পর্কে বেশ কিছু জানার কথা আছে। চোখের চাউনি যদি পারস্পরিক হয় তাহলে মোহ সৃষ্টি হতে পারে। মোহ যাতে সৃষ্টি না হয়, সেজন্যে চোখের চাউনি এড়িয়ে চলার শিক্ষা থাকা দরকার, যে শিক্ষা সামাজিকভাবে আয়ত্ত করতে হয়। মনের মধ্যে পাপ নিয়েও কেউ কেউ সাহসের সঙ্গে দুনিয়ার দিকে তাকাতে পারে, কেউ কেউ পারে না।

এবারে বিজ্ঞানীদের চোখ দিয়ে বিষয়টির দিকে তাকানো যাক।

বিজ্ঞানীদের অধিকাংশ পর্যবেক্ষণ—চোখের চাউনি এড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কে এবং অন্য মানুষের চোখের দিকে তাকাতে না পারা সম্পর্কে। মস্তিষ্ক যাদের স্বাভাবিক নয়, এমন বিশেষ বিশেষ রোগীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে, প্রসঙ্গটি যদি ব্যক্তিগত হয়, তাহলে রোগী কিছুতেই চিকিৎসকের চোখের দিকে তাকাতে পারে না।

এই রোগীদের মধ্যে তিন ধরনের চাউনি লক্ষ্য করেছেন চিকিৎসকেরা : নাটকীয় চাউনি (একটানা তাকিয়ে থাকা), সতর্ক চাউনি ও চোখ-পিটপিট-করা চাউনি।

রোগীদের কথা থাক, সাধারণ মানুষের চাউনিতেও কি অস্বাভাবিকতা কিছু নেই? দুজন মানুষ যখন সামনাসামনি বসে কথা বলে তখন তাদের চাউনি কি রকমের হয়ে থাকে?

গবেষণাগারে একটি পরীক্ষাকার্য চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এ-সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করেছেন। পরীক্ষাকার্যটি এই রকম :

দু'জন মানুষকে একটি টেবিলের দু-দিকে মুখোমুখি বসিয়ে দেওয়া হয়। আড়াল থেকে দু'জন আলাদা আলাদাভাবে এই দুটি মানুষের ওপরে নজর রাখে। মানুষটি উল্টোদিকের মানুষটির চোখের দিকে তাকালেই একটি বোতাম টেপা হয়। চোখ ফিরিয়ে নিলেই বোতাম ছেড়ে দেওয়া হয়। বোতাম টিপলেই একটি চলন্ত কাগজের ওপরে কলমের সাহায্যে দাগ পড়তে শুরু করে, বোতাম ছেড়ে দিলেই দাগ বন্ধ। কিংবা বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক গণক চালু করেও সময়ের হিসেব রাখা যেতে পারে। মাইক্রোফোনও ব্যবহার করা যেতে পারে। কথা বলতে বলতে মানুষটি কতক্ষণ ধরে শ্রোতার চোখের দিকে তাকাচ্ছে, কিংবা কথা শুনতে শুনতে কতক্ষণ বক্তার চোখের দিকে—তার একটা হিসেব এভাবে নেওয়া সম্ভব।

*দুটি মানুষ : ক ও খ। ক যদি খ-কে পছন্দ করে, তাদের সম্পর্ক যদি হয় সহযোগিতার, প্রতিযোগিতার নয়,* তাহলে ক আরো বেশিক্ষণ ধরে খ-এর চোখের দিকে তাকাবে। ক যদি সম্প্রতিকালে খ-কে প্রতারিত করে থাকে তাহলে তার চোখের দিকে বড়ো একটা তাকাতে চাইবে না। তাছাড়া মেয়ে-পুরুষ ভেদও আছে। দুজন পুরুষের চেয়ে দুজন মেয়ে পরস্পরের দিকে অনেক বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ব্যক্তিগত বা অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করলে কি মেয়ে কি পুরুষ চোখের দিকে কেউ বড়ো একটা তাকাতে চায় না।

একটা প্রচলিত ধারণা আছে, অপরাধীরা নাকি চোখের দিকে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না। কথাটা সবসময়ে সত্যি নয়। বিজ্ঞানীরা এমন ব্যাপারও লক্ষ্য করেছেন, যে যতো বড়ো অপরাধী সে ততো দুর্বিনীতভাবে তাকায়। এমনকি মেয়ে অপরাধীরাও। শেক্সপীয়রের নায়িকা ভেবেছিল, ভিতরে যদি পাপবোধ থাকে তাহলে মেয়েদের চোখের চাউনিতে তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই। কিন্তু বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গিয়েছে, ভিতরে পাপবোধ নিয়েও বহু মেয়ে চোখের চাউনিতে নিষ্পাপ ও সরলা।

অতএব চোখের চাউনির নানা রকমের অর্থ। কখনো তা আমন্ত্রণ, কখনো তা প্রত্যাখ্যান। অপরের চোখের দিকে আমরা তখনই তাকাই যখন কিছু জানতে চাই, স্নেহমমতা ইত্যাদির বশেও তাকিয়ে থাকি। কিন্তু বেশিক্ষণ একটানা তাকিয়ে থাকলে সবক্ষেত্রেই তা অস্বস্তিকর। ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের দুটি মানুষের মধ্যেও একথাটি সত্যি। এক্ষেত্রে, বিজ্ঞানীদের ধারণা, শেষপর্যন্ত একটি ভারসাম্য গড়ে ওঠে। কিছুটা চাউনি, কিছুটা শারীরিক সান্নিধ্য, কিছুটা অন্তরঙ্গ কথা, কিছুটা হাসি—সব মিলিয়ে। একটিতে বাড়াবাড়ি হলে অন্য একটিতে বা একাধিকে টান পড়ে, একটিতে টান পড়লে অন্য একটিতে বা একাধিকে বাড়াবাড়ি। যেমন, লক্ষ্য করা গেছে, দুটি মানুষের সান্নিধ্য যতো বেশি পরস্পরের চোখের দিকে, তাদের চাউনি ততো কম। আর যে-কথা আগে বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উঠলে চোখের দিকে চোখের চাউনি কমবেই। অন্তত একটি পরীক্ষাকার্যে দেখা গেছে, মেয়েটি যতো বেশি হেসেছে ছেলেটি ততো বেশি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ভারসাম্য বজায় থাকা।

বলা বাহুল্য, পরিবেশও অবশ্যই বিবেচ্য। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নাইট-ক্লাবে গিয়ে যতো বেশিক্ষণ ধরে পরস্পরের চোখের দিকে তাকাবে, যতো প্রচণ্ডভাবে হাসবে, বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে এসে দাঁড়ালে তা নিশ্চয়ই পারবে না।

দুজন মানুষ যখন কথা বলে তখন তাদের মধ্যে চোখের চাউনি ইত্যাদি ছাড়াও আরো একটা ব্যাপার এসে যায়। তা হচ্ছে *মাথা নাড়া। এই অঙ্গভঙ্গীটি কথোপকথনকে একটানা চলতে দিতে সাহায্য করে।* চলচ্চিত্রের টেকনিক প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা দুটি মানুষের কথোপকথন লক্ষ্য করেছেন। বক্তা তার কথা শেষ করবার আগে শ্রোতার চোখের দিকে তাকাবেই, অর্থাৎ যেন বলতে চায়—'আমি শেষ করলাম, এবার তুমি বলো।' শ্রোতা কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিতে চায়—'এবার আমার কথা বলার পালা।' বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে শ্রোতাই অপেক্ষাকৃত বেশিক্ষণ বক্তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে, অর্থাৎ বলতে চায়—'আমি শুনছি তুমি বলে যাও।' বক্তা যদি থেমে যায় তো শ্রোতা মাথা নাড়ে, অর্থাৎ বলতে চায়—'এরপরে তুমি কী বলবে বলো, আমি অপেক্ষা করছি।' এমনি আরো নানাবিধ সূক্ষ্ম সংকেত আছে যার সাহায্যে দুজন মানুষের কথোপকথন নির্বিঘ্নে চলতে পারে। কোনো একটিতে ছেদ পড়লে কথোপকথনেও ছেদ পড়ার সম্ভাবনা।

চোখের চাউনিতে কখনো প্রকাশ পায় আধিপত্য, কখনো বশ্যতা। একটি পরীক্ষাকার্যে দশজন মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি করা হয়েছিল। মাঝখানের পর্দা উঠিয়ে দেবার পরে দু-জোড়া চোখের চাউনি পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ হল। একজনকে প্রথমে চোখ ফিরিয়ে নিতেই হয়। এখানে কি আধিপত্য ও বশ্যতার কোনো ব্যাপার আছে?

মুরগির ছানারা সবাই সবাইকে ঠোকরায় না, ওদের বংশধারায় একটা ক্রম আছে। যে যেখানে তার চেয়ে নিচের ছানাগুলোকে ঠুকরিয়ে থাকে। ওপরের পরীক্ষাকার্যেও বিজ্ঞানীরা এমনি একটি ক্রমের সন্ধান পেয়েছেন। যারা বশ্যতা স্বীকার করে তারাই আগে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

এমনি আরো পরীক্ষাকার্য চালিয়ে চোখের চাউনির ব্যাপারটিকে বিজ্ঞানীরা খোলসা করে ফেলতে চাইছেন। তবুও সম্ভবত চোখের চাউনির অপার রহস্য থেকেই যাবে, মানুষ যতোদিন থাকবে। আজ থেকে একশো বছর পরে জীবনযাত্রা যখন একেবারেই অন্য রকম, বিজ্ঞান যখন অনেক অনেক উন্নত, তখনো কিন্তু একজন মানুষের চোখের চাউনি দেখেই আরেকজন মানুষ বুঝতে পারবে, সে ভালোবাসে না ঘৃণা করে। চোখের ঠুলি না আঁটলে মনের ভাব গোপন করা যাবে না, আজ নয়, ভবিষ্যতেও নয়।

—[illegible]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রজত গ্লাস হাতে বসে রইল। কানের মধ্যে বেজে চলেছে অবিশ্রান্ত উৎকট শব্দ। এদিক-ওদিক তাকাল। চারিদিকে দেয়াল। দরজা-জানালা বন্ধ। লতা টলছে। বুকের কাপড় সরে গিয়েছে। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। লতা বুক কোমর বেঁকিয়ে সারা ঘর জুড়ে নাচছে। মাঝে মাঝে দুটো হাত ওপরে তুলে বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাততালি দিচ্ছে। এরই মধ্যে একবার আলমারী খুলে বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢেলেছে। লতা নাচতে নাচতে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়িয়ে রজতের দিকে তাকাল। রজতের হাতে ধরা গ্লাসের দিকে। কিছু-ক্ষণ তাকিয়ে দেখল। তারপর ঝপ্ করে রজতের পাশে বসে ওর গলা এক হাতে জড়িয়ে অন্য হাতে গ্লাস ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল। রজতের মনে হল তার দমবন্ধ হয়ে আসছে। লতার মুখ কাছে এগিয়ে আসছে। এ্যালকোহলের তীব্র গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল তার। শরীরে তীব্র জ্বালা। গলার ভিতর জ্বলে যাচ্ছে। কানের কাছে গরম নিঃশ্বাস। জড়িত কণ্ঠস্বর। ইংরেজী গানের টুকরো সংলাপ। আলো বড্ড বেশি উজ্জ্বল। দু'চোখ জ্বালা করে উঠল। আমাকে ছেড়ে দাও লতা! সে জোর গলায় কিছু বলতে যায়। কিন্তু অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

বোঝা যাচ্ছে কোন নিষ্কৃতি নেই। রজত দু'হাত দিয়ে ঠেলে দিল লতাকে। লতা গায়ের সঙ্গে লেপটে। দূরে থেকে পদশব্দ ভেসে আসছে। লতা সরে বসে। বুকের উপর কাপড়টা আলগোছে তুলে দেয়।

এক ধরনের বিভ্রম আর রহস্যময় কুয়াশার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল রজত। সব সে দেখছে। ভাল লাগছে না। প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা নেই। কথা বলার স্পৃহা নেই। মাতাল সে হয়নি। দু'-চার পেগ টেনে মাতাল হওয়ার পাত্র সে নয়।

—ওটা বন্ধ করে দাও। রজত দু'হাতে কান চেপে ধরে। মুখ বিকৃত করে তাকায় লতার দিকে।

লতা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রামুকে আসতে দেখে থেমে যায়। রামু নিস্পৃহ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকায়। তারপর মাথা নীচু করে বলল, খাবার রেডি। এখানে আনবো?

—হ্যাঁ। লতা উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে রামুর পাশ কাটিয়ে ও-ঘরে যায়।

রজত একটু পরে শুনল ছপ্‌ছপ্ শব্দ। রামু টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে রেখে চলে যায়। আজ ও বাইরে শোবে। সায়েবের ঘরে রাতে মেয়েছেলে থাকলে বাইরে রাত কাটায়।

চোখেমুখে জলের কণা চিকচিক করছে। লতা পাশে বসে মৃদু হাসল, ভীষণ খিদে পেয়েছে। নাও শুরু করো। আমি কিন্তু আরম্ভ করলাম।

রজত চুপচাপ খেতে থাকে। আড়চোখে তাকায় লতার দিকে। মুরগীর একটা ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে। বিশ্রী খাওয়ার ভঙ্গি। ওর মতলবটা কী? খেয়ে বিদেয় হও বাপু। আজ আর ওসব নয়।

—আমার এক বন্ধু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

—তোমার বন্ধু। কে? ভ্রূ কুঁচকে তাকাল লতা।

—মিঃ মেনন। বেশ দিলদরিয়া মেজাজের লোক। বড় অফিসার। বাঙালী সমাজের সঙ্গে মিশতে চায়। আমাদের চিন্তাভাবনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি জানতে চায়।

—বেশ তো মিশুক! তা আমার সঙ্গে কেন! বলে চোখ বড় বড় করে তাকাল রজতের দিকে, সত্যি বল তো রজত, আমার সম্পর্কে কী বলেছো।

—ভয় নেই। রজত খাওয়া শেষ করল দ্রুত। তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বলল, তোমার প্রশংসা করেছি। বলেছি চার্মিং লেডি। কালচারড।

ন্যাপকিনে হাত মুছে লতা একটা সিগারেট ধরাল। শরীরটা সোফায় এলিয়ে খানিকক্ষণ দেখল রজতকে। তারপর সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারী করল কিছুক্ষণ। মৃদুস্বরে একটা বাজনা বেজে চলেছে। লতা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরেফিরে দেখল। কৌটা খুলে পাউডারের পাফ মুখে আলতোভাবে বুলোয়। তারপর কৌটা বন্ধ করে ড্রয়ার খুলে রাখতে যায়। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে সমস্ত মুখে হাসি

ঢেউ-এর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। বটুয়া রেখে দু'হাত দিয়ে ফটো তুলে ধরে। চোখের সামনে নিয়ে আসে।

হঠাৎ কাঁধে অসম্ভব চাপ অনুভব করল লতা। মুখ ফিরিয়ে দেখল দু'চোখ জ্বলছে রজতের। ভয় পেয়ে যায় সে। উন্মাদের দৃষ্টিতে রজত তাকিয়ে। এক হাত দিয়ে ফটো ছিনিয়ে রজত কঠিন গলায় বলল, এই মুহূর্তে চলে যাও লতা। হাঁ করে দেখছো কী! যাও, দেরী করো না।

ওর ডান হাতের মুঠোয় বটুয়া গুঁজে দিল রজত।

রজতের ব্যবহারে রীতিমত হতভম্ব লতা। এমন কী অপরাধ সে করল যে তাড়িয়ে দিচ্ছে! নাকি ভদ্রলোক স্ত্রীর লোকে, যে-রকম অশিক্ষিতসুলভ আচরণ, কোন ভদ্রমহিলা দীর্ঘকাল এর সঙ্গে ঘর করতে পারে না। একদম বদ্ধ উন্মাদ বনে গিয়েছে! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল লতা। প্রায় বারটা। এতক্ষণ কিভাবে কেটে গেল টের পাইনি আমি। কীভাবে ঘরে ফিরবো? একটা ট্যাক্সীও মিলবে না। তাছাড়া এত রাত্রে একা পেয়ে গুণ্ডা বদমাস পিছনে লাগতে পারে। রজত কী এতটা নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হতে পারে?

যেন কিছু হয়নি এমনি নিরীহ চোখ-মুখে লতা বলল, অযথা মেজাজ গরম করো না। তোমার না শরীর খারাপ। চল শোবে।

চোখের পলকে এগিয়ে এসে রজতের হাত জড়িয়ে ধরল। রজতের চোখদুটো বাঘের মত জ্বলছে। কোনপ্রকার প্রস্তুতি না দিয়ে কোমল দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে সমস্ত মুখে চুম্বন করল অসংখ্যবার। রজত প্রথমদিকে দু' একবার চেষ্টা করল লতাকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু লতা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে। লতার নরম শরীর তার দেহে যেন আগুন ছড়িয়ে দিল।

—চল শোবে ডার্লিং! আবেশবিহ্বল কণ্ঠস্বর লতার। রজতকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে যায়। কোন বাধা দিল না রজত। বাধ্য ছেলের মত এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

লতা কপালের উপর কয়েকবার চুম্বন করে বলল, তুমি বড্ড দুষ্ট হয়েছো রজত! চুপচাপ শুয়ে থাক। এখুনি আসছি।

পাশের ঘরে মৃদু হাঁটাচলার শব্দ। একটু পরে মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসে। রজত দু' চোখ বন্ধ করে ভাবনা-হীন হতে চায়। স্মৃতিহীন হতে চায়। অনামনস্কভাবে মনে হয় খুব কাছে হাল্কা পায়ে কে যেন চলাফেরা করছে। মনে পড়ে বহুদিন সূর্যোদয় দেখেনি। এ ঘরে শিশুর কলকণ্ঠ শোনা যায় না দীর্ঘদিন। ভোর কানের কাছে মুখ এনে ভোরবেলা আধ আধ সুরে ডেকে ঘুম ভাঙায় না কেউ। তবু যখনি সে একা থাকে এ ঘরে বই পড়ার সময় হঠাৎ মনে হয়, পিছনে কে যেন দাঁড়িয়ে চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ছে। সেইসব মুহূর্তে চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছে কেউ নেই। শূন্য ঘরে সে একা।

—ঘুমোলে নাকি রজত?

চোখ খুলে তাকাল সে। ঘরে সবুজ আলো। অ্যালকোহলের তীব্র গন্ধ। লতার চোখমুখ উজ্জ্বল। সেন্টের গন্ধ ভেসে আসছে।

মুখের কাছে গ্লাস এনে লতা আদুরে গলায় বলল, প্লীজ!

যন্ত্রচালিতের মত হাঁ করল রজত। এক নিঃশ্বাসে সবটা গিলে বিকৃত মুখে বলল, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে লতা।

—তোমার শুধু ঘুম আর ঘুম। লতা শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা রেখে ওর পাশে শুয়ে পড়ল। রজতকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বলল, প্লীজ!

লতার উষ্ণ দেহের উত্তাপে ডুবে যায় রজত। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দিল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ল টের পেল না সে।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে রজত গতরাত্রির সব কিছু মনে পড়তেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। নরম রোদ ঘরে। লতা নেই। পাশের ঘরে এল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কোথায়ও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। রান্নাঘর থেকে পেয়ালা পিরিচের ঠুং ঠাং শব্দ ভেসে আসছে। ঘড়ির দিক তাকিয়ে চমকে উঠল। ইস কত বেলা হয়ে গিয়েছে! তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে দাড়ি কামাল। বাঁ গালে একটা জায়গায় লাল হয়ে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে হেসে উঠল সে। গুনগুন করে একটা গানের সুর ভাঁজল। এমনিতে লতা ভাল। নাইস ফিগার। আনন্দ দিতে জানে। কিন্তু ঐ প্রেম ভালবাসা জাতীয় কথাবার্তা, ওসব শুনলে গা জ্বালা করে। লতারও কী হৃদয়ের এক কোণে নীড় বাঁধবার গোপন কোন আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে? 'রজত, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। আই অ্যাম টায়ার্ড রজত! আমি একটু স্থির হয়ে কোথায়ও বসতে চাই।' শুনলে হাসি পায় তার। একটা সীমা আছে! মিঃ মেনন শুনে খুব ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠেছে। দেখলে মাথা ঘুরে যাবে। আলাপ করিয়ে দেবে।

ফিটফাট সেজে রজত লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। কাউকে সে পরোয়া করে না। কোন ধরাবাঁধা জীবনকে সে সহ্য করতে পারে না। স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। তবে মাঝে মাঝে বিষাদ কেন তোমাকে আক্রমণ করে? নিজের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে রজত ট্রাম স্টপের দিকে এগোয়।

।। ছয় ।।

করিডোরে দাঁড়িয়ে সামান্য দ্বিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিনয়। লম্বা করিডোর। বেয়ারা, কেরানীবাবুদের যাওয়া-আসা, কয়েকটি মেয়ে-বউ পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতে করতে পাশ কাটিয়ে যায়। মাঝে মাঝে লিফট থেকে দু'-চারজন নেমে হুটহাট করে এ-ঘরে সে-ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝল এই মাত্র টিফিন শেষ হয়েছে। বিমল নিশ্চয়ই সিটে রয়েছে। এক সময়ে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইদানীং দেখা-সাক্ষাৎ নেই। বিয়ের সময় বলতে পারেনি। দু'-চারজন ছাড়া, তারাও আবার স্কুলের সহকর্মী, নিমন্ত্রণ বিশেষ কাউকে করা হয়নি। আর আত্মীয়স্বজন বলতে যারা এসেছিল তাদের সে চেনে না। কোনদিন দেখেনি। তাদের সম্পর্কে কোন উৎসাহ নেই।

এখানে একদা কাজ করেছে সে। ঘরে ঢুকলে পরিচিত মুখের সংখ্যা কম হবে না। সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে বিনয় নানারকম কথা ভাবতে থাকে। বিমল যখন শুনবে বিয়ের সময় আমন্ত্রণ না জানিয়ে এখন এসেছে বাড়ি যাবার অনুরোধ জানাতে—ও কী মনে মনে ক্ষোভ প্রকাশ করবে না! তখন?

একটা সিগারেট ধরিয়ে বিনয় দরোজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ওই তো বিমল, ঠিক তেমনি পুরনো সিটে বসে মাথা নীচু করে রয়েছে। অসংখ্য ফাইল বন্দী র‍্যাকের পাশ দিয়ে এগোয় সে। আশেপাশে কোনদিকে তাকায় না। টের পায় অনেকের তীর্যক দৃষ্টি। কৌতূহল মাখানো। কিন্তু কেউ ডাকে না। সত্যবাবু বা অমিয়বাবু নিশ্চয়ই টেরিয়ে দেখছে তাকে। দেখুক। সবকিছু অগ্রাহ্য করে বিমলের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই বিমলের। মাথা গুঁজে, মাথায় এখন মাঝখানে ছোট্ট একটা টাক, চিঠির মুসাবিদা করছে। সশব্দে চেয়ার সরিয়ে বিনয় বসতেই মাথা তুলে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যে নানা ধরনের অভিব্যক্তি মুখে প্রকাশ পেল। বিনয় মৃদু হেসে সব লক্ষ্য করতে থাকে।

—এতদিন পরে মনে পড়ল! বিমল কলম বন্ধ করে এক পাশে সরিয়ে রাখল, আমরা তো একই শহরে রয়েছি, কি বল? যাকগে মান-অভিমান করবো না বিনয়। তোর কাছে ওসবের কোন দাম নেই। কী জন্যে এসেছিস শুনি?

বিনয় একটা সিগারেট এগিয়ে বলল, আগে চা-কেকের অর্ডার দে। বলছি বন্ধু। এত ব্যস্ত কীসের। ফিরে তোর দেখি মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। শুনি টাক পড়লে নাকি টাকা-পয়সা হয়।

—তোর মুণ্ডু হয়! বিকৃতমুখে বিমল বেয়ারা ডেকে চা আনতে বলল। তারপর কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল বন্ধুর দিকে। চকচক করছে বিনয়ের চোখমুখ। পোশাকের দিকে নজর গেল। দামী ধুতি পাঞ্জাবী জুতো। সোনার বোতাম। ঠিক যেন জামাইটি সেজে

বেরিয়েছে। তাহলে দাদার বেশ আছে! থাকবেই তো! ঘাড়ে সংসারের চাপ নেই। ছেলে-মেয়েদের নিত্যিনতুন বায়না শুনতে হয় না। ঘরে অফিস থেকে ফিরে রুগ্না স্ত্রীর মুখচোপা শুনতে হয় না। নির্বিকার নিরুদ্বেগ জীবন কাটাচ্ছে। ও কী জানে আজকাল চালের কিলো কত? রেশন আনার জন্যে লাইনে কতক্ষণ দাঁড়াতে হয়?

বিমলের তাকানো দেখে রীতিমত অস্বস্তিবোধ করে বিনয়। কী দেখছে অমন তন্ময় হয়ে?

—একটা খবর আছে বিমল। আন্দাজ করতে পারিস?

—জানি। বিয়ে করেছিস। পোশাক দেখেই বুঝেছি।

—সামনের রোববার তুই স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ি আসবি। সকালের দিকে যাবি কিন্তু।

বিমল কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায়। প্রথমদিকে দু'চোখে উৎসাহের ঝিলিক দেখা গেলেও এখন বেশ নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। আস্তে আস্তে সারামুখে বিষণ্ণতা ছড়ায়। সেদিকে তাকিয়ে বিনয় ভাবল : বিমল অকাল প্রৌঢ়ত্ব লাভ করেছে। এত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেল কেন?

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিমল। বলল, শেষপর্যন্ত বিয়ে করে ফেললি বিনু। আঃ ভেবে আমার যা শান্তি হচ্ছে কী বলবো মাইরি! তোর কথা প্রায়ই মনে হোত। ওরকম দাঁত বের করে হেসো না চাঁদ! বিশ্বাস কর, মনে হোত তোর কথা। কিছু করতে পারতিস তুই একটু স্বাভাবিক দৃষ্টি থাকলে। দ্যাখ, কোন কলেজে বা স্কুলে মাস্টারী করে বাঁচার কথা বলছি না। অন্য কিছু হওয়ার কথা ভেবেছিলাম। তোর তো প্রতিভা টতিভা ছিল।

একসঙ্গে এত কথা বলে বেশ হাঁফিয়ে উঠল বিমল। মুখের শিরা-উপশিরা মোটা হয়ে উঠল। ঘনঘন নিশ্বাস নিচ্ছে দেখে বিনয় গম্ভীর গলায় বলল, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। বলে এক কামড়ে কেকের অর্ধেকটা মুখে পুরে দু'চোখ বুঁজে চিবুতে থাকে। একটু পরে চোখ খুলে চায়ে চুমুক দেয়। সিগারেট ধরিয়ে জোরে টান মারল কয়েক-বার। বিমল ইডিয়টের মত ওর দিকে তাকিয়ে। ওর কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়। কী বলবার আছে?

—তাহলে রোববার যাচ্ছিস।

—তুই কী এখনই উঠবি? বিমল আহত চোখমুখ করে তাকাল, এতদিন পর পুরনো বন্ধুর কাছে এলি, একটু গল্প-গুজব কর। তারপর একটু থেমে বলল, যাওয়া হবে কিনা সন্দেহ।

বিনয় মনে মনে বেশ বিরক্ত। সোজা জবাব সে চায়। এত ভনিতা কীসের। স্পষ্ট করে বলে ফেল এ ভাই অসুবিধে আছে, যেতে পারবো না। আর অসুবিধেটাই বা কীসের। অভিমান করে যদি না যেতে চায় বলার কিছু নেই। আমি বাপু তোমার পায়ে ধরতে পারবো না।

বিমল বন্ধুর মুখভাব লক্ষ্য করে সামান্য হাসল, রাগ করিস না। তুই কী আমার কোন খবর রাখিস? আমার স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ। কোথায়ও যাওয়া হয় না। শেষপর্যন্ত হয়তো আমাকে একাই যেতে হবে। থাক এসব কথা। এখন তোর খবর শোনা। বউ কেমন হলো? বলে অর্থ-পূর্ণদৃষ্টিতে হাসল সে।

—কেমন আর কি। বিনয়-এর ঘুম পাচ্ছিল। জোর করে চোখদুটো খুলে মুখ হাঁ করে হাই তুলে জড়ানকণ্ঠে বলল, নাম শেফালী। দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। বঙ্গ-ভাষায় মাস্টার্স ডিগ্রী নিতে চলেছে। বিয়ের আগে জানাশুনো ছিল। মার খুব পছন্দ মেয়েটিকে। দাঁড়া, এক মিনিট ভেবে নি। আরও বলবার কিছু আছে কিনা। বলে বিনয় দুটো হাত কোল-এর উপর রেখে ঝিমোতে শুরু করে।

বিমল খুব অভ্যস্ত ওর কথা বলার ঢংয়ে। তাই সে অবাক হলো না। বন্ধুর অবস্থা দেখে মনে মনে হাসল। নতুন বিয়ে করেছে। রাতে ঘুমোতে পারে না। বছর-খানেক এরকম চলবে। পরে উন্মাদনা কমে যাবে। সেই বিনয়। বিয়ে-টিয়ের নামে ঠোঁট উল্টে অদ্ভুত ব্যঙ্গ করতো। এখন দেখলে মনে হয় ও অনেক শান্ত সমাহিত। এই রকমই হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

—এই বিনু! মৃদু ঠেলা দিয়ে বিমল বেয়ারাকে ডেকে আবার দু' কাপ চা আনতে বলে। চা খেলে জড়তা কেটে যাবে। ও কী এখনো ওই সব অদ্ভুত ধারণা মনে মনে পোষণ করে? এখনো সেইরকম জেদ, অহংকার বা বেপরোয়া মনোভাব বজায় আছে কী? ওই জন্যেই কিছু করতে পারল না জীবনে। মাস্টারী করে...হঠাৎ মনে পড়ল সেই বা এমন কী লোভনীয় কেরিয়ার তৈরি করতে পেরেছে! নিতান্ত দিনযাপন ছাড়া আর অবশিষ্ট কিছু আছে কী জীবনের? এইসব ভেবে সে বিমর্ষ চোখে বিনয়ের দিকে তাকাল।

চা খেয়ে বিনয় উঠে দাঁড়াল, এবার চলি। তাহলে তুই আসিস কিন্তু। অনেক-ক্ষণ আড্ডা মারলাম। তোর কাজের ক্ষতি হল।

লিফটের দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে এল বিমল। মৃদুস্বরে কানের কাছে মুখ এনে বলল, দেখলি না তো কিভাবে তোর দিকে তাকিয়ে ছিল অমিয়বাবু।

জবাব দেবার আগে লিফটের দরোজা খুলে যায়। বিনয় দ্রুত এগিয়ে যায়। লোক-জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গিয়ে দেখল নিঃশব্দ গতিতে লিফট নীচে নেমে যাচ্ছে। বুকের ভিতর শিরশির করছে। চোখ বন্ধ করল সে। কেমন অদ্ভুত শীতল মনে হচ্ছে। লিফটে উঠলে এরকম হয় তার। মনে হয় পাতালে চলে যাচ্ছে।

—নামুন।

বিনয় চোখ খুলে লিফটম্যানের দিকে তাকাল। তেরচা চোখে লোকটা তাকিয়ে। মনে হলো মুচকি হাসছে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। পিছন ফিরে তাকায় না। সহজভাবে নিশ্বাস ফেলল রাস্তায় পা দিয়ে।

চারিদিকে তাকিয়ে সে রাস্তা পার হল। ফুটপাতে উঠে দাঁড়াতেই তেলে-ভাজার গন্ধ ডাকল বিনয়কে। সারি সারি পর পর তেলেভাজার দোকান। এই চারটের সময় এখনও কিছু সংখ্যক অফিসের বাবুরা টিফিন করছে। বেগুনি আর আলুর চপ কিনে ঠোঙা হাতে সে হাঁটতে থাকে। অনেকটা জুড়িয়েছে ভেবে খেতে শুরু করল। বিমলটা একটা হামবাগ! বিয়ের সময় রজতদার কথা একবার মনে হয়েছিল। সেই রজতদা! এক সময়ের হিরো আদর্শ-বান পুরুষ। এখন আমরা কেউ কাউকে দেখতে পারি না।

ঠোঙা রাস্তায় ছুঁড়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল বিনয়। এরই মধ্যে ট্রামে ভিড় শুরু হয়েছে। একটাতে উঠে পড়ল। বাড়ি ফিরবে। শেফালী বার বার বলে দিয়েছে তাড়াতাড়ি ফিরতে। সন্ধ্যের দিকে বেড়াতে বেরুবে। দিনরাত ঘরে বসে থাকা অসহ্য মনে হচ্ছে বিনয়ের। আর কয়েকটা দিন। তারপর ছুটি ফুরোবে। স্কুলে জয়েন করবে।

অফুরন্ত অবসর এত ক্লান্তিদায়ক মনে হতে পারে আগে ভাবেনি। শেফালীর সঙ্গে সর্বদা সময় কাটানো ভালো দেখায় না। সংসারের টুকিটাকি কাজ আছে। মীরার চাকরী হয়েছে। ওর একটা গতি হল। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। এতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ তার।

গণেশ টাকর মোড়ে ট্রাম আটকে যায়। একের পর এক অনেকগুলি ট্রাম। যাত্রীদের নানারকম মন্তব্য ছিটকে আসে কানে বিনয়ের। হৈ-চৈ শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে। একটু পরে বোমা ফাটার আওয়াজ শুনল। অনেক যাত্রী তাড়াতাড়ি নেমে যায়। অনেকের চোখমুখে আতংক। বাচ্চারা কেঁদে ওঠে। মহিলাদের মুখ বিবর্ণ। ভয়ের চিহ্ন।

—কী হয়েছে মশাই? একজন মুখের কাছে মুখ এনে পান চিবুতে চিবুতে নীচু গলায় বলল, গুলিটুলি চলতে পারে, কী বলেন?

—জানি না। নিরাসক্তকণ্ঠে জবাব দিয়ে বিনয় একটু সরে দাঁড়াল। কিন্তু কোথায় সে যাবে? সর্বত্র এক আলোচনা। কান বন্ধ করে দাঁড়াবে সে উপায় নেই। মিনিট-দশেকের উপর ট্রাম দাঁড়িয়ে। কখন চলতে শুরু করবে কে জানে। একবার সে ভাবল নেমে যায়। হেঁটেই বাড়ি পৌঁছবে। থাক, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখবে। একটু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

(ক্রমশঃ)

# গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত
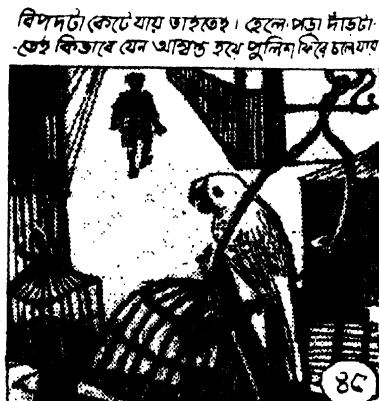
# অঙ্গনা

## হ্যাণ্ডিক্রাফট সেণ্টারের সেই মেয়েটি

অনেকদিন আগে একটা হ্যাণ্ডিক্রাফট সেণ্টারে গিয়েছিলাম। অনেক মেয়ে সেখানে হাতের কাজ শেখে। নানারকম কাজও হয়। এখানকার কাজের নাকি খুব কদর। বাজারে নাকি খুব দর। বাজারে যেতে পায় না। অনেকে এসেও অর্ডার দিয়ে যায়। আর দশটা হ্যাণ্ডিক্রাফট সেণ্টার যেমনি এর উদ্দেশ্যও তেমনি : দুঃস্থ মেয়েদের সংস্থান করা আর অভাবের সংসারের বিরাট চাহিদায় কিছু যোগান দেওয়া।

কলকাতা শহর এবং আশেপাশে এরকম প্রতিষ্ঠান অসংখ্য। সবাই সমাজ সেবার তাগিদে এক একটি হ্যাণ্ডিক্রাফট সেণ্টার খুলে নিজের নিজের সাধ পূরণ করেছেন। এসব সেণ্টারে কর্মরত অনেক মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাঁরা স্বীকার করেছেন, কষ্ট স্বীকার করেও এই অর্থে তাঁরা সংসারে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারছেন। ছেলের লেখাপড়া, সংসারের টুকিটাকি প্রয়োজন তাঁরা এখান থেকেই মেটান। স্বামী যা আয় করেন তাতে সারা মাস চালানো খুবই দুঃসাধ্য। এদিক থেকে এসব সেণ্টার তাঁদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ।

এধরনের কথা অনেকের মুখে শুনেছি। ভালই লেগেছে। ভাগ্যিস এসব সেণ্টার ছিল তাই এঁরা বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও হাল ধরে আছেন। নাহলে যে কি অবস্থা হতো ভাবা যায় না। স্রোতের মাঝে পড়ে শুধুই ঘুরপাক খেতেন। সুস্থ জীবন হয়ে উঠতো অকল্পনীয়। কে কোথায় ভেসে যেতেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আর আজ-কালকার দিনে একার আয়ে সংসার চালানোও অসম্ভব। ডানে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তাই বাধ্য হয়েই অন্যকিছু ভাবতে হয়। সংসার স্বাভাবিক রাখার জন্য স্বামীর আয়ের সঙ্গে কিছু যোগান দেওয়ার উপায় চিন্তা করতে হয় স্ত্রীকে। কিন্তু আয়ের পথ নীরন্ধ্র।

আবার সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা চাই চাকরির জন্য। ইদানীং অতটা অসুবিধা হয় না। অনেকেই লেখাপড়া জানা। তাঁরা চাকরি পেয়ে যান। অন্তত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনিতেই চাকরির বাজার এখন খুব টাইট। ছুঁচ গলবার সুযোগ নেই। তবু লেখাপড়া জানা সবাই অপেক্ষা করেন চাকরির জন্য। আর তাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষার প্রসার বহুল হলে অনেকেরই শিক্ষাগত যোগ্যতার আয় করা সম্ভব নয়। তাদের অন্যকিছু ভাবতে হয়। তখন প্রশ্ন ওঠে হাতের কাজের! আর সে মুহূর্তে এসব হ্যাণ্ডি-ক্রাফট সেণ্টার তাঁদের বড়ো সহায়। অবশ্য লেখাপড়া শিখে দশটা-পাঁচটা অফিস করতে না পারার জন্য তাঁদের আক্ষেপ থাকলেও কোন অভিযোগ নেই। এখানে কাজ করে তাঁরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান। সংসারে দুটো বাড়তি পয়সাও আসে। চাকরিও করা হয়। ওদিকে আবার সংসারে ছেলে-পুলের কোন অসুবিধাও হয় না।

এদিক থেকে তাঁরা অফিসের চাকুরিয়া মায়েদের চেয়ে অনেক বেশি সুখী এবং স্বাধীন তো বটেই। তাঁরা ঘর-সংসারের কাজ করেন। স্বামী অফিস যায়। ছেলেমেয়ে স্কুলে। তারপর অনেকখানি অবসর। এ সময়টুকুই তাঁরা কাজে লাগান। হ্যাণ্ডি-ক্রাফট সেণ্টারে গিয়ে কাজ করেন। প্রথমে সবাই শিক্ষার্থী। তারপর কাজ শেখা হয়ে গেলেই দুটো পয়সার মুখ দেখতে পান। স্বামী এবং ছেলেপুলে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন গিন্নি এবং মা বাড়িতে হাজির। ওঁরা জানতেও পারেন না। ছেলেমেয়ে তো নয়ই। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী জানেন। তাও প্রথম প্রথম নয়। বেশ কয়েক মাস গড়িয়ে যাওয়ার পর।

দশটা-পাঁচটার অফিসের চাকুরিয়া মায়ে-দের কিন্তু এই সুবিধাটুকু নেই। তাঁদের ঠিক সময়ে অফিসে হাজিরা দিতে হয়। মা-বাবা আগেই বেরিয়ে যান। ছেলেমেয়ে পরে স্কুলে যায়। আবার ফিরে এসেও দেখে যে মা অনুপস্থিত। সবচেয়ে অসুবিধা নিতান্ত শিশুর বেলায়। অফিসের সময়টুকু তাকে আগলাবার জন্য একজন বাড়তি লোকের বন্দোবস্ত করতে হয়। তারই তত্ত্বা-বধানে শিশু বেড়ে ওঠে। তার ফলে গোড়ায় ভিতই হয়ে যায় নড়বড়ে। মায়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের অভাবে সে যে কি রূপ পাবে তা ভাবাও যায় না। এরকম একটি ছেলের মুখে শুনেছিলাম, মা আমার প্রতি তাঁর কর্তব্য করেননি তাই আমিও তাঁর প্রতি কোন কর্তব্য আছে বলে মনে করি না। এরকমভাবে বেড়ে ওঠা শিশুর মানসিক গঠন সম্পূর্ণতা পায় না। অথচ সে একবারও ভাবলো না যে, তাদের মানুষ করার জন্য মা এই দশটা-পাঁচটার ঘানিতে জুতে বসে-ছেন। না হলে কোন দরকারই ছিল না। অবশ্য যাঁরা শখের চাকুরিয়া তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। এঁদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

দিনে দিনে অবস্থা আরো সঙ্গীণ হচ্ছে। অর্থনৈতিক দুর্গতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। একার আয়ের উপর কোনরকমেই আর নির্ভর করে থাকা যায় না। আর মেয়েরাও এখন লেখাপড়া শিখছেন। উচ্চ-শিক্ষায় তাঁরা এখন অনেক পুরুষকেও হার মানাচ্ছেন। তাই চুপচাপ ঘরে বসে থাকারও কোন অর্থ হয় না। নিদেন লেখাপড়ার সদ্ব্যবহার তো চাই। তাই চাকরি আজ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু আমরা প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূরে সরে এসেছি। আমাদের প্রসঙ্গ ছিল হ্যাণ্ডিক্রাফট সেণ্টার এবং কর্মী মেয়েরা। প্রতিটি হ্যাণ্ডিক্রাফট সেণ্টার জন্ম নেয় সমাজসেবায় নুঃস্থ তাগিদ থেকে। আর মেয়েরা এবং মায়েরা এখানে আসেন ভিড় করে। বিরাট কোর্স থাকে। প্রথমে ওঁদের শিখে নিতে হয়। তারপর চাকরির প্রশ্ন। সেই স্কুল-কলেজের পরীক্ষার মতোই। কারো কারো চাকরি হয়। তাঁরা ভাগ্যবান। আর অনেকেরই চাকরি হয় না। তাঁরা প্রশ্ন করেন, আমাদের কি হবে? এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।

এমনি একটি হ্যাণ্ডিক্রাফট সেণ্টারে সেই মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। রোগা কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়। গোটা কেন্দ্রটি ঘুরেফিরে দেখা হয়ে গেল। সেণ্টারের প্রতিষ্ঠাত্রী ভদ্রমহিলা গৌরবে গদগদ হয় বললেন, অনেক মেয়ের আর্থিক সংস্থান হয় এখান থেকে। সকলেই কিছু না কিছু রোজগার করেন। কাউকে বঞ্চিত করা হয় না! আর আমাদের কিছু কিছু জিনিস বিদেশী প্রবাসীদের মধ্যেও জনপ্রিয়। ওঁরা দেশে যাবার সময় অনেক জামাকাপড় আমা-দের এখান থেকে নিয়ে যান। ওঁদের কেউ কেউ এসে অর্ডারও দিয়ে যান। ওঁরা নাকি ওঁকে ওদেশে নিয়ে যেতে চান এরকম একটি হ্যাণ্ডিক্রাফট সেণ্টার চালু করার জন্য। ভদ্রমহিলার চোখমুখ আনন্দের ঔজ্জ্বল্যে চকচক করছে।

একটি সুন্দর ধারণা হয়েছিল এই সেণ্টারটি সম্বন্ধে। এবার ফেরার পালা। হঠাৎ সেই মেয়েটি এসে দাঁড়ালো সামনে। এসেই আর কোন ভনিতা না করে সরাসরি প্রশ্নটি ছুঁড়ে মারলে, একটা চাকরি দিতে পারেন? একটু হকচাকিয়ে গেলুম। কোন জবাব দিতে না পেরে সেই মেয়েটির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। এমনসময় ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করলেন সেই ভদ্র-মহিলা। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, ওঁকে বিরক্ত করছো কেন? উনি তোমায় চাকরি দেবেন কোত্থেকে? আচ্ছা যাও। তোমার জন্য তো আমি চেষ্টা করছি।

সেদিন চলে এসেছিলাম। তারপর প্রায় গতানুগতিক জীবনে সেই মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল কলকাতার রাস্তায়। আমি পাশ কাটাতে চেয়েছিলাম। সেই মেয়েটি পালাতে দিলো না। এক নজর ওকে দেখলাম। সেই একইরকম চেহারা। দৃঢ়তা আরো বেড়েছে। কাঁধে একটি ব্যাগ। একথা, সেকথার পর জানতে চাইল্যম এখন কি করা হচ্ছে। জবাবে মেয়েটি বললো, লটারির টিকিট বিক্রি করছি। অফিসে অফিসে। আমাদের কথা কেউ ভাবে না। আমরা নিজেরাই আমাদের পথ করে নিই।

মেয়েটি আর দাঁড়ালো না। হনহন করে এগিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে মনে হলো, ও যেন নতুন পথের দিশারী।

—প্রমীলা

# প্রদর্শনী পরিক্রমা

৩ নম্বর রমণী চ্যাটার্জি স্ট্রীটের আর্ট অ্যাকাডেমির ছোট ও বড় সদস্যদের একটি চিত্র প্রদর্শনী এবারে ২১ থেকে ২৭ নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ২৩ জন সদস্যের আঁকা ১১৭ খানি ছবির মধ্যে কনিষ্ঠদের ছবিগুলিই সব চাইতে আকর্ষণীয় হয়েছিল। ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা উজ্জ্বল রঙের ছবির মধ্যে তন্ময় বোসের প্যাস্টেলে আঁকা সার্কাসের বড় ছবি বর্ণালী বোসের বেলুনওয়ালা, সোমনাথ মিত্রের আলাদীন প্রভৃতি ছবি ছাড়াও পর্ণা বোস, সুবীর ঘোষ, জয় বিশ্বাস ও সুজাতা ঘোষের কয়েকটি ছবি উল্লেখযোগ্য। বড়দের মধ্যে মাধুরী দাস, কৃষ্ণা চৌধুরী ও সুনীলম কোহলীর তৈরী বড় মাপের কয়েকটি বাটিক পেণ্টিং আঙ্গিকের কৌশলের দরুন উল্লেখের দাবী রাখে।

*

২১ থেকে ২৬ নভেম্বর অ্যাকাডেমির পশ্চিম গ্যালারীতে সরিৎ নন্দীর ১৮টি পেণ্টিং ও কতকগুলি ড্রয়িং-এর একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীনন্দীর বেশীর ভাগ কাজই নন-ফিগারেটিভ এবং অনেকগুলিতে হেয়ার পিন, বোতাম ইত্যাদি লাগিয়ে জ্যামিতিক ঘেঁষা ডিজাইন তৈরী করে যন্ত্রশিল্প সভ্যতার একটা রূপ খাড়া করার চেষ্টা করা হয়েছে। রঙ সাধারণত নীলাভ ধূসর, মেটে লাল, বাদামী ইত্যাদি ঘেঁষা। ফিগারেটিভ কাজের মধ্যে 'দি বার্ড', 'দি ডীয়ার' এবং লোক শিল্প ঘেঁষা 'বুল অ্যান্ড দি বার্ডস'এর নাম করা যায়। তবে তাঁর ছোট জল রঙের স্কেচগুলির মধ্যে নানা রঙের ডেকরেটিভ ডিজাইনের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেল। এর কিছু কিছু বড় ছবির প্রস্তুতি হিসেবে করা হলেও স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দাবী রাখে।

*

মাত্র ছ' বছরের ছেলে সিরাজ দীনশা কোতয়ালের ছবিতে আশ্চর্য রঙের ব্যবহার দেখা গেল। অ্যাকাডেমির দক্ষিণের গ্যালারীতে ২২ থেকে ২৮ নভেম্বর ২৪ খানি ছবিতে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনেককেই চমৎকৃত করেছে। সিরাজের ছবি খুব বেশী রকম অ্যাবস্ট্রাক্ট ঘেঁষা হলেও বেশীর ভাগ কাজেই তার বক্তব্য বিষয়কে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে দেখা গেছে। সূর্যাস্তের ছবিটি মাত্র কয়েকটি রঙের আয়তক্ষেত্রে ভাগ করা কিন্তু দূরত্বের আভাস চমৎকার। 'গার্লস নেকলেস' এবং 'লেডিজ লিপস' ছবিতে শুধু রঙের সাহায্যে কেবলমাত্র বর্ণিত বিষয়টুকু ছাড়া আর সব কিছু সযত্নে বাদ দিয়ে অত্যন্ত সরল ও সুন্দর ডিজাইন সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ছাড়া বড়দের পার্টি, ছোট ছেলেমেয়েদের পার্টি, নিদ্রিতা রমণী, ঘুমন্ত মোটা লোক—এইসব ছবিতে তার চোখে দেখা জগতের এক হাস্যরসময় জগতকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তার নীল, বেগুনী, সবুজ, হলদে ও লাল রঙের ব্যবহার প্রশংসনীয়।

*

আঁজোলী এলা মেনন (পূর্ব নাম অঞ্জলি এলা দেব) এই প্রথম কলকাতায় তাঁর একক চিত্রপ্রদর্শনী করলেন। ১৯৫৪ থেকেই তিনি প্রদর্শনী করে আসছেন। বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ছাড়া ভারতের বাইরেও তাঁর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে; সমালোচকদের প্রশংসাও পেয়েছেন প্রচুর। গত ২২ থেকে ৩০ নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত ৩১ খানি চিত্রসম্বলিত প্রদর্শনীতে কয়েকটি পরিণত হাতের কাজ দেখা গেল।

শ্রীমতী মেনন আধুনিক এবং প্রধানত ফিগারেটিভ শিল্পী। রঙ ব্যবহারে তাঁর নৈপুণ্য প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধিকাংশ ছবিতেই খুব পাতলা করে তিনি রঙ ব্যবহার করেছেন বলে মনে হল। বিষয়বস্তু এবং বর্ণিকাভঙ্গে একটা গভীরতা এবং রোমাণ্টিক মেজাজ পরিস্ফুট। অনেকগুলি প্যানেল গথিক পেণ্টিং-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। 'মরিয়ম' ছবিটি এদিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। 'বার্ড' এবং 'নুড' ফিগার দুটি প্রতিকৃতিতেও তাঁর এই ধরনের কাজ। 'নাটাশা' ও 'আয়েষা' নামের দুটি প্রতি-কৃতিতেও তাঁর এই ধরনের আঙ্গিক পারদর্শিতা দেখা গেল। 'ইডেন' ছবিতে লতার সঙ্গে ছন্দোময় ইভের মূর্তি মানান-সই। তবে লাল আপেল হাতে বাদামী রঙের বিবসনা লক্ষ্মী আর যাই হোক লক্ষ্মী প্রতিমা নয়। তবে বাদামী ইভ বলা যেতে পারে। অনেকগুলি কাজে গুণগত তারতম্য দেখা যায়। যেমন তাঁর সবজে ঘোড়া (স্পেকটার) বা লোত্রেক ঘেঁষা 'কাউণ্টেস' বা কতকটা বাইজ্যাণ্টাইন প্রতিকৃতি 'বাতুসাকা' প্রভৃতি যথেষ্ট আকর্ষণীয় মনে হয়নি। তাঁর ভিন্ন স্টাইলে আঁকা 'হাউস অন দি বীচ', 'ব্য হাউস' এবং 'ভিলেজ' ছবির দ্যোতনাময় রূপ বেশ ভাল। সুন্দর কাজ খুব বিলিতী ঘেঁষা ছবি।

শিল্পী ঃ রামানন্দ ব্যানার্জি

রামানন্দ ব্যানার্জি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের শিল্প শিক্ষক। কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর তাঁর ২৬ খানি ছবি ও শ'খানেক স্কেচের প্রদর্শনী হয়ে গেল। শিল্পী তাঁর ছবিতে ভারতীয় প্রথাগত কাজের সঙ্গে আধুনিক রীতির একটা সিন্থেসিস করতে চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি ছবি নব্যভারতীয় প্রথায় অতি অল্প রঙে বেশ দক্ষতার সঙ্গে আঁকা। নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে লোকশিল্পের প্রভাবটাই বেশী। রঙ উজ্জ্বল এবং কম্পোজিশন মুরাল ঘেঁষা। সোহাগী, সন্তান, যুগলে, গণেশ জননী প্রভৃতি ছবি-গুলি এদিক দিয়ে নাম করা যায়। ছোট স্কেচগুলির মধ্যে গ্রামজীবনের ক্ষণিক দৃষ্ট রূপ এবং নিসর্গ দৃশ্য সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।'

*

বোগদান য়োভানোভিক যুগোশ্লাভ শিল্পী স্বদেশে ও প্যারিসে শিল্পশিক্ষা লাভ করেছেন। বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন ও চিত্রপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন। অ্যাকা-ডেমিতে প্রদর্শিত ৩৪ খানি ছবিতে তাঁর আফগানিস্তান, ইরাণ, পাকিস্তান, নেপাল ও ভারত ভ্রমণের ডায়েরী দেখা গেল। আফগানিস্তানের ছবির মধ্যে প্রধানত বিভিন্ন বয়সের মানুষের মুখ দেখা গেল। হাল্কা জল রঙে কাজ। ইরাণে আঁকা তেল রঙের কাজের মধ্যে কাগজের ঠোঙা থেকে লুটিয়ে পড়া স্ট্রবেরী, পুতুল বিক্রেতা, হুকো হাতে বোট ক্যাপ্টেন, বাজার ইত্যাদি ছবিগুলি প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ বলে মনে হল। নেপালের বড় একটি মন্দিরের জল রঙ-এ করা ছবি এবং গয়ার একটি পুরাতন গীর্জার গম্ভীর রূপ প্রশংসার যোগ্য।

—চিত্ররসিক

# ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়া

## ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

**বিরোধের পটভূমি**

ইণ্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হিসাবে গত ৩রা আগস্ট, ১৯৭০ তারিখের সাংবাদিক সম্মেলনে যে ভাষণ দিয়েছিলাম তাতে আমার বক্তব্য প্রধানতঃ ভারতীয় মালিকানাধীন সিগারেট প্রস্তুতকারী ইউনিটগুলোর বর্তমান দুর্যোগ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, সিগারেটের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য এইসব ইউনিটকে উৎসাহদানের জন্য সরকারী নীতির প্রয়োগ এবং বৈদেশিক একচেটিয়ার কবল থেকে সামগ্রিকভাবে এই শিল্পের মুক্তি সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম।

তবে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং (পূর্বতন ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো)-এর চেয়ারম্যান মিঃ এ এন হাকসার কিন্তু আমার বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করার বদলে গোল্ডেন টোব্যাকোর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের পথ বেছে নিলেন, অথচ এই কুৎসা লক্ষণীয়ভাবে অগভীর ও কুতর্কমূলক। তাঁর বাক্‌সর্বস্ব অভিযানে যদি গোল্ডেন টোব্যাকোর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও মানহানিকর বিবরণী না থাকতো তবে তাকে আমি আহত নির্দোষিতার মুখোশ পরিহিত একটি বৈদেশিক একচেটিয়ার বড়রকমের প্রচার অভিযানের চমকসৃষ্টিকারী কৌশল বলেই উপেক্ষা করতাম। কিন্তু মিঃ হাকসারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি আবার বলছি, এই গোল্ডেন টোব্যাকো ভারতে এই ধরনের জাতীয় সংথার মধ্যে বৃহত্তম।

সুতরাং গত ৩১শে আগস্ট, ১৯৭০ তারিখে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে আই টি সি-এর চেয়ারম্যান যে ভ্রমাত্মক ও মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন, গোল্ডেন টোব্যাকোর পক্ষ থেকে আমি তার প্রত্যেকটির উত্তর দেবো এবং তা বিচার করবার ভার আপনাদের ওপর, সংবাদপত্র, জনসাধারণ ও সরকারের ওপর ছেড়ে দেবো।

আমি প্রস্তাব জানিয়েছিলাম যে, (ক) সরকারের উচিত কেবলমাত্র ১০০% ভারতীয় কোম্পানিগুলোকেই সম্প্রসারণ করতে দেবার জন্য তাঁদের ঘোষিত নীতি প্রয়োগ করা, (খ) সিগারেট শিল্পে একচেটিয়াকে, বিশেষ করে বৈদেশিক একচেটিয়াকে উৎসাহ দেওয়া হবে না, (গ) আগে ২৫% পর্যন্ত বাড়তি উৎপাদনের যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল একচেটিয়ার সেই বাড়তি উৎপাদন ১৮ই জুলাই তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রত্যাহার করে নিতে হবে, এবং (ঘ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাপাসিটির বাইরে একচেটিয়ার যে বাড়তি উৎপাদন হয় তা রপ্তানি করতে হবে যাতে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হয় এবং দেশীয় ইউনিটগুলোর যে ৭০% ক্যাপাসিটি অলস হয়ে পড়ে আছে তা কাজে লাগানো যায়—এর অর্থ বছরে ১০০০০০/১২০০০০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদন।

আমি জানি, বৈদেশিক একচেটিয়ার এসব কথা ভালো লাগবে না, কিন্তু তাই বলে আমি এ আশাও করিনি যে, তাঁরা এতদূরে নীচে নেমে যাবেন এবং মিঃ হাকসারের বিবৃতিতে যে ভিত্তিহীন যুক্তি প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁরা তুলবেন—একে আমি স্বাধীন ভারতে ১০০% ভারতীয় কোম্পানিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির নগ্ন প্রচেষ্টা বলেই মনে করি।

**উৎপাদনের গোজ—কার্যকরী পন্থা**

আমরা সংবাদপত্রে রোজই পড়ি যে, বৈদেশিক যৌথ প্রতিষ্ঠানের সৌভাগ্যের দিন শেষ হতে চলেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখনও যা ঘটছে তা হচ্ছে, সরকারী নীতি ও আইন অন্যরকম নির্দেশ দিলেও তারা যা চাইছে তা পেয়ে যাচ্ছে। এই রকমের দুর্ঘটনা পরিহারের জন্য আমি তাদের উৎপাদন ঠেকাবার কথা বলেছিলাম, তা হলেই নির্ধারিত নীতির অপহ্নব ঘটানোর উদ্দেশ্যে যে খিড়কি-দরজার কৌশল তারা অবলম্বন করেছে তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হবে।

যেদিন একটি সংবাদে আমি জানতে পারলাম যে, ওয়াজির সুলতান তার উৎপাদন ৮৮৮০০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০৬২০০ লক্ষ সিগারেটে সম্প্রসারিত করার আবেদন করেছে সেদিন থেকেই এসব শুরু হয়েছে। আমি কয়েকবার দিল্লি এসেছি এবং সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ইউনিটকেই কেবল সম্প্রসারণের অনুমতি দেবার যে সরকারী নীতি রয়েছে তা, এবং ওয়াজির সুলতানের ব্যাপারটি, যে ওয়াজির সুলতান আই টি সি-এর সংগে পারস্পরিকভাবে যুক্ত এবং যারা তাদের মধ্যে দেশের সিগারেট উৎপাদনের ৭০% নিয়ন্ত্রিত করে ও একটি একচেটিয়া গড়ে তুলেছে, সেই ওয়াজির সুলতানের ব্যাপারটি মনোপলিজ কমিশনের বিচারের জন্য পাঠানো উচিত বলে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ব্যাখ্যা করেছি।

একবার যদি ভি এস টি-এর সম্প্রসারণ মঞ্জুর করা হয় তবে দেশীয় ক্ষেত্রকে সুদিনের জন্য ১০ থেকে ২০ বছর অপেক্ষা করতে হবে, অথচ এই দেশীয় ক্ষেত্র তাকে উৎসাহ দানের জন্য সরকারের বর্তমান নীতির মুখ চেয়ে আছে।

একচেটিয়া যখনই চায় তখনই তার কাজটি যেভাবে সে চায় সেইভাবেই হয়ে যায়। কাজেই ভি এস টি/আই টি সি-এর মঞ্জুরী লাভের জন্য যুক্তপ্রচেষ্টা, সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় সত্ত্বেও যখন ভি এস টি-এর আবেদন পিছিয়ে গেল এবং অতীতের মত সাফল্যের বদলে ব্যর্থতা পেল তখন স্বভাবতঃই তারা আহত ও ক্রুদ্ধ হবে। ভ্রমাত্মক ধারণা সৃষ্টির জন্য তারা সবরকমের যুক্তির অবতারণা করে যাচ্ছে, কিন্তু সোজাসুজির বিষয়, বাস্তব ঘটনা ও পরিস্থিতির সত্যতার ওপর ভিত্তি করে এখনও অনেক প্রত্যয়সিদ্ধ পাল্টা যুক্তি আমার কাছে রয়েছে।

**উচ্চপর্যায়ের তদন্তের উপযোগী একটি বিষয়**

এই বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই আমাদের বক্তব্য পেশ করার পূর্ণ সুযোগ দানের জন্য বিষয়টি আমি মনোপলিজ কমিশনের কাছে পাঠানোর বা অনুরূপ কোন সংস্থা দ্বারা ব্যাপক তদন্তের প্রস্তাব দিয়েছি। আই টি সি-এর চেয়ারম্যান বলেছেন যে, আই টি সি/ভি এস টি পারস্পরিক সংযুক্ত নয়। তা হলে, এই ধরনের তদন্ত যাতে না হয় তার জন্য কেন তাঁরা সবরকমের প্রভাব খাটাচ্ছেন ও চাপ দিচ্ছেন: তাঁরা অগ্রণী বিচারকদের মতামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি বলতে চাই যে, তাঁদের যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের মতামত প্রকাশ পেয়েছে; কাজেই সঠিক অভিমত পেতে হলে উভয় পক্ষ থেকেই পুরো তথ্য বিচারকদের এমন একটি সংস্থার কাছে পেশ করতে হবে যা, আমি আশা করি আপনারা স্বীকার করবেন, সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হয়। মনোপলিজ কমিশন ইতঃপূর্বেই গঠিত হয়েছে এবং তদন্তের পক্ষে এটিই সঠিক সংস্থা হবে।

আমি একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছি যে, ভি এস টি-এর বিরুদ্ধে আমি নিজে সম্প্রসারণের জন্য আবেদন পেশ না করে আমি বৈদেশিক একচেটিয়াকে মোটেই কৃতার্থ করতে যাচ্ছি না, এবং সরকার কাকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন—৬৭% বৈদেশিক মালিকানাধীন কোম্পানিকে, না ১০০% সম্পূর্ণ ভারতীয় মালিকানাধীন কোম্পানিকে—তা নির্ধারিত করার ভার আমি সরকারের ওপরই ছেড়ে দেবো। গোল্ডেন টোব্যাকো একচেটিয়া হয়ে উঠবে, বৈদেশিক একচেটিয়ার এই যে আশঙ্কা তা সত্যিই কৌতুককর। আজকের বাজারে ৭০% একচেটিয়া রয়েছে যাদের তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে উঠছেন, বাজারের মাত্র ১৪% অংশের অধিকারী একটি ক্ষুদ্র ভারতীয় কোম্পানির আগামীকাল একচেটিয়া হয়ে উঠবার ভয়ে। এই একচেটিয়াটি বাজারে তাঁদের ৭৫% ও তারও বেশী অংশ ভোগ করায় এত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, অন্য কারুর প্রবেশকে স্বাগত জানাতে ও একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে তাঁরা যে শুধু রাজী নয় তা-ই নয়, তাঁরা একথা চিন্তা করতেও প্রস্তুত নয়।

( পর পৃষ্ঠায় দেখুন )

# ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং আমি প্রস্তাব জানাচ্ছি যে, সবচেয়ে ভাল পথ হচ্ছে বৈদেশিক একচেটিয়া এবং অন্যান্য বড় বড় ভারতীয় প্রস্তুতকারক যারা সরকারের আশঙ্কামত পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তাদের উৎপাদন ঠেকানো। অবশ্য সরকারের এই আশঙ্কা অযৌক্তিক ও অকারণ। এই উৎপাদন যদি ঠেকানো যায়, তা হলে বেসরকারী ক্ষেত্রে এবং রাজ্য ক্ষেত্রেও নতুন নতুন অনেক উদ্যোক্তা ব্যর্থতার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে এই শিল্পে প্রবেশ করবে।

## আই টি সি নিজের বিরুদ্ধেই বক্তব্য রাখছে

জি টি সি যা কিছু বলেছে তা-ই ভুল, একথা প্রতিপন্ন করার জন্য মিঃ হাকসার সযত্নক্রমের ও ধরনের যুক্তি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু যার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন বস্তুতঃপক্ষে তা প্রমাণ করতে পারেননি। নীচে আমি যে বিস্তৃত উত্তর দিয়েছি তাতেই তা পরিষ্কার হবে। তিনি যে টুকরো টুকরো তথ্য দিয়েছেন তার সম্পূর্ণার্থ ১০০% ভারতীয় সিগারেট শিল্পের জন্য আমার দাবির সমর্থনে যেসব বক্তব্য রেখেছিলাম তারই মত। এগুলো হচ্ছে :

(১) আই টি সি একটি একচেটিয়া, কারণ তাদের উদ্বর্তপত্র অনুযায়ী ১৪৫ কোটি টাকা বিক্রয় সর্বভারতীয় অঙ্ক ২৫০ কোটি টাকার ৬০%। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক পত্র 'টোব্যাকো' তাদের ৫ই জুন, ১৯৭০ তারিখের সংখ্যায় বলেছেন : "ভারত—উৎপাদন বেড়ে গেলেও সিগারেটের রপ্তানি অত্যন্ত কমে যাচ্ছে :
"ভারতীয় সিগারেট-বাজারে প্রভুত্ব করে একটি বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং লিঃ। মোট বাজারের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশই এই কোম্পানিটির আয়ত্তে।"

(২) আই টি সি এবং ভি এস টি যদি পারস্পারিক সংযুক্তই না হবে তবে কেন তারা মনোপলিজ কমিশনে যেতে দ্বিধা করছে? তাদের উচিত এর জন্য চাপ দেওয়া এবং নিষ্কলঙ্কের সার্টিফিকেট লাভ করা তা হলেই একটি বাধা অপসৃত হবে।

## পারস্পরিক সংযুক্ত আই টি সি এবং ভি এস টি

এখন আপনাদের গোচরে আনতে চাই যে, আই টি সি এবং ভি এস টি সন্দেহাতীতভাবে পরস্পর-সংযুক্ত, কারণ :

(ক) এদের সমগ্র ইতিহাসে চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর ও পরিচালনা বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা উভয় কোম্পানিতে একই এবং পারস্পরিক বদলীযোগ্য; এই ব্যাপারটি যে কেউ খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন;

(খ) ভি এস টি প্রস্তুত করে আই টি সি'এর উইলস ব্র্যান্ড এবং আই টি সি তৈরী করে ভি এস টি'এর চারমিনার—আই টি সি'এর স্লোগান 'পরস্পরের জন্য নির্মাণ'-এর প্রতি সাক্ষাৎ বিশ্বস্ত। ব্লেন্ডিং'এর পর্যায় থেকে বাজারে পাঠানোর চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়েই তারা পরস্পরের জন্য এই কাজ করে যাচ্ছে; আবার এটিও স্মরণে রাখতে হবে যে, ব্লেন্ডিং কাজটি হচ্ছে একটি মন্ত্রগুপ্তি এক নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই এটি দেওয়া চলে না। অনুরূপ ধরনের কাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন প্রস্তুতকারক সিগারেট প্রস্তুতের জন্য, এবং অন্যের ফ্যাক্টরিতে তা প্যাক করার জন্য অপরকে কেবল ব্লেন্ড-করা রেডিমেড কাটা তামাকই দেয়, এইভাবে ব্লেন্ডিং গোপন রাখা হয়।

(গ) আই টি সি হচ্ছে ভি এস টি'এর ব্র্যান্ডগুলোর সোল সেলিং এজেন্ট; এই ব্র্যান্ডগুলো একই দামের তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড-গুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। উভয়েই যদি এক না হবে তবে আপনি কি একথা চিন্তা করতে পারেন যে, কোন প্রস্তুতকারক নিজের ব্র্যান্ডের বদলে অন্যের ব্র্যান্ডের প্রচার করবে?

(ঘ) আই টি সি/ভি এস টি, উভয়েরই জনক হচ্ছে লন্ডনের ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো কোং লিঃ; এই কোম্পানি অসংখ্য সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিবারের কর্তা—এই সদস্যরা সকলেই পরস্পর-সম্পর্কিত এবং মাকড়সার জালের মত পরস্পরযুক্ত। একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক জানতে হলে আপনাদের মূলে যেতে হবে; আপনাদের অবগতির জন্য আমি এখানে মাত্র দুটি দলিলের কথা উল্লেখ করছি—একটি, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত ইউ কে মনোপলিজ কমিশনের রিপোর্ট, অপরটি ওয়ার্ল্ড টোব্যাকো ডিরেক্টরি।

(৩) এটি কাগজে-কলমে তর্কাতীত সত্য যে, অনুমোদিত সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির বাইরে একচেটিয়ার বাড়তি উৎপাদন রয়েছে, পক্ষান্তরে বহু দেশীয় কোম্পানির ক্যাপাসিটি অলস পড়ে আছে। অন্যের ক্ষতি করে আর্থনীতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করার এটি একটি নির্ভেজাল ঘটনা। তা হলে, অন্যরকম প্রমাণ করবার জন্য কেন এতসব যুক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক কথা তোলা হচ্ছে? ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্টের দলিলপত্র থেকে আপনারা প্রকৃত ঘটনা যাচাই করে নিতে পারবেন।

(৪) আই টি সি দেশের একটি বোঝা—লভ্যাংশ, তামাক ও অন্যান্য জিনিস আমদানী, ভবিষ্যতে প্রেরণের জন্য দায়েম পাহাড় গড়ে তোলা, মূলধনে পরিণত গুডউইল ও ট্রেডমার্ক ইত্যাদির ওপর লাভাংশ হিসাবে অর্থ প্রেরণ—এত সবের আকারে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় সে ঘটাচ্ছে। এই অপচয়কে ঢাকা দেবার জন্য আই টি সি বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারী এমন সব বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছে যেগুলোতে নিজেকে বৈদেশিক মুদ্রার নীট অর্জনকারী বলে দেখানো হচ্ছে—তাও করা হচ্ছে নিজস্ব সামান্য ২ লক্ষ টাকা মূল্যের সিগারেট রপ্তানির সঙ্গে ১০০% একটি ব্রিটিশ কোম্পানির শাখা ইন্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির অর্জিত ৯৯৮ লক্ষ টাকা যোগ করে, যার মোট যোগফল হচ্ছে ১০ কোটি টাকা; এই কোম্পানিটিকে আবার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে ভ্রাতৃ-কোম্পানি বলে। ছলনার কি চমৎকার দৃষ্টান্ত!

(৫) ভি এস টি, আমার মনে হয়, ক্ষুব্ধ; আই টি সি এত বিচলিত হয়ে উঠছে কেন? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ভি এস টি নীরব কেন, আই টি সি'ই বা তার পক্ষ হয়ে সওয়াল করছে কেন এবং আই টি সি'এর চেয়ারম্যান তার মুখপাত্র হয়ে উঠলেন কেন? এটিই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, তারা পরস্পর সম্পর্কিত?

## গোল্ডেন টোব্যাকোর বিরুদ্ধে কুৎসা

এখন আলোচনা করবো জি টি সি'এর বিরুদ্ধে আই টি সি'এর কুৎসা রটনা সম্পর্কে। বস্তুতঃপক্ষে, দুটি কোম্পানির মধ্যে তুলনা করার ব্যাপারে মিঃ হাকসারের বক্তব্যে শুধু আমাদের ক্ষতি করার ও আমাদের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কলেপন করার চেষ্টা ছাড়া কোন যুক্তি আমি দেখতে পাচ্ছি না। এ ব্যাপারেও তিনি সফল হয়েছেন বলে আমার সন্দেহ আছে। তবু আমার প্রতিক্রিয়া আপনাদের জানাচ্ছি এবং কে যে কি তার বিচারের ভার আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।

১) জি টি সি চমৎকার অগ্রগতি লাভ করেছে—আই টি সি'এর চেয়ে অনেক বেশী। আপনাদের অবগতির জন্য আরও জানাচ্ছি, আমি কখনও এ তথ্যের বিরোধিতা করিনি যে, আই টি সি/ভি এস টি শতকরা ভিত্তিতে সিগারেটের ক্রমসম্প্রসারণশীল বাজারের সবটুকু দখল করে নিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বর্ধিত চাহিদার ৮০%-ই চলে গিয়েছে এই একচেটিয়া গোষ্ঠীর মালিকানাধীন ফ্যাক্টরিগুলোর কবজায়।

আপনার যদি ১০, টাকা মূলধন থাকে এবং কোন এক সময়কালে যদি আপনি ১০, টাকা আয় করেন তবে আপনার ১০০% বেড়ে

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

# ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

( পূর্ব পৃষ্ঠার পর )

গেল। কিন্তু আপনার যদি ১০ কোটি টাকা মূলধন থাকে এবং আপনি যদি ১ কোটি টাকাও আয় করেন, তবে তা হলো মাত্র ১০%। এই একই সময়কালে ১০ টাকা ও ১ কোটি টাকা আয়ের পার্থক্যটা উপলব্ধি করতে পারলেন তো? তা হলে আপনি—একই রকমভাবে যে-কোন ভারতীয়—কি চাইবেন যে, পণ্যশিল্পে ভারতীয় বাজারের কল্যাণ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মুখ চেয়ে থাকুক? এখনই কি এসব বন্ধ করা হবে না?

(২) আমি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি যে, একচেটিয়া অবস্থা সত্ত্বেও বৈদেশিক একচেটিয়া জি টি সি থেকে কম লাভ দেখায়, অথচ জি টি সি-কে একমেবাদ্বিতীয়ম্ প্রতিযোগীর সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। জি টি সি-এর মুনাফার হার ৯·৫%, তার সঙ্গে তুলনীয় আই টি সি-এর মুনাফা ৬·৪%, অর্থাৎ শতকরা ভিত্তিতে ৫০% বেশী। সঠিক মুনাফা দেখানো কি অপরাধ? আমরা স্বীকার করি যে, বিদেশে আমাদের ইচ্ছুক ও সহযোগিতামূলক শেয়ারহোল্ডার নেই, যারা সস্তা দরে তামাক কিনে আমাদের মুনাফার বোঝা হ্রাস করে আমাদের বাধিত করবে কিংবা এই শিল্পের সর্বক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখবার জন্য বৃহত্তর ও মোটা বেতনভোগী কর্মচারীমণ্ডলী আমরা পুষি না। যদি তদন্ত করা যায়, তবে

সমগ্র বিষয়টি চমকপ্রদ তথ্য উদ্ঘাটিত করবে।

যথেষ্ট সম্প্রসারণ লাভের শর্তে ভারতীয়করণ একচেটিয়ার কব্জা আরও জোরদার করে তুলবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বাড়িয়ে দেবে। ভি এস টি ৮৮৮০০ লক্ষ থেকে ২০৬২০০ লক্ষ, অর্থাৎ ২৫০% সম্প্রসারণ লাভের জন্য বৈদেশিক শেয়ার ভারতীয় জনসাধারণের কাছে বিক্রী করে নয়, বরঞ্চ ৬৭% থেকে ৪৯/ কিংবা তারও কম অর্থাৎ ১৮%-এর মত অতিরিক্ত ইকুইটি ইস্যু করে যদি বিদেশী শেয়ার মালিকানা হ্রাস করার প্রস্তাব দেয়, তবে দেশীয় সিগারেট শিল্পে তার অর্থ উপলব্ধি করা যে কারুর পক্ষে সহজ। সবটাই হচ্ছে বাজারের সামঞ্জস্যহীন বৃহত্তর লাভের উদ্দেশ্যে ভারতীয় শেয়ারমালিকানার নামমাত্র বৃদ্ধি কার্যকর করার খেলা। আই টি সি যেসব বিষয়ের উপর রহস্যের সৃষ্টি করেছে এখন আমি সেগুলো একটি-একটি করে ব্যাখ্যা করবো।

রহস্য-বনাম-ঘটনা

রহস্য-বনাম-ঘটনা

৩১শে আগস্ট, ১৯৭০ তারিখে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ হাকসার ইণ্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং গোল্ডেন টোব্যাকো'র বিরুদ্ধে একটি সুশৃঙ্খল আক্রমণ চালিয়েছেন। কুৎসা রটনার অভিযানে তিনি যেসব প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলো সম্পর্কে আমি নীচে সত্য বিবরণ জানাচ্ছি।

ক ১। আই সি এম এ—দি সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের আছে ১০টি সদস্য, পক্ষান্তরে নবগঠিত ইণ্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হচ্ছে ছয়টি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্থার সব কয়টি। এই সংস্থাগুলোর নাম:

(১) ক্রাউন টোব্যাকো কোং,
(২) গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ,
(৩) দি হায়দরাবাদ ডেকান সিগারেট ফ্যাক্টরি,
(৪) মাস্টার্স টোব্যাকো কোং (ইণ্ডিয়া),
(৫) এস জি আগরওয়াল,
(৬) ইউনিভার্সাল টোব্যাকো কোং।

অন্যান্যরাও পরে যোগ দিতে পারে।

২। আই সি এম এ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, কারণ উৎপাদনের ২০%-এর প্রতিভূ সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় মালিকানাধীন ক্ষুদ্র ক্ষেত্রটির কণ্ঠ কোন সময়ই শোনা যায় নি। শক্তিশালী বৈদেশিক একচেটিয়া এবং সি এম এ সহ শিল্পের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার সর্বব্যাপক প্রভাবের বিরুদ্ধে এই সংগঠনের বলার কিছু নেই। সি এম এ'তে আবার ভোটের অধিকারের মধ্যে কোন সমতা নেই।

আই সি এম এ গঠনের ফলে তার সদস্যরা ইতোমধ্যেই সুফল পেয়েছে। গত মাসে সি এম এ'এর সভায় বৈদেশিক একচেটিয়ার প্রতিনিধিরা বেশ ভদ্রভাবেই প্রশ্ন করলেন, "ভারতীয় ক্ষেত্রের উৎসাহদানে কোথায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি এবং আমাদের কি করতে হবে?"

মেশিনারি, কারিগরী কলাকৌশল সরবরাহ করে, সুযোগ-সুবিধা বিক্রী করে ও বিপণন করে, অর্থের যোগান দিয়ে ভারতীয় সিগারেট প্রস্তুতকারকদের সাহায্য করার লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মিঃ হাকসার তাঁর ভাষণে বলেছেন, একটি কোম্পানি, যে নাকি খুঁড়িয়ে চলছিলো তাকে সাহায্যের অনুরূপ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ফলে পরিস্থিতির চাপে সর্বাধিক সুবিধা লাভের আশায়, দীর্ঘকাল যারা সাহায্য করে এসেছে কোম্পানিটি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। আমি আশা করি, আই সি এম এ বা সি এম এ'র অন্যান্য সদস্যও বৈদেশিক একচেটিয়ার কাছ থেকে নিশ্চয় ভবিষ্যতে অনুরূপ সুবিধা আদায় করবে।

খ ১। জি টি সি-এর বিরুদ্ধে আই টি সি-এর কুৎসা

আই টি সি যাকে 'কুৎসার কাহিনী' বলে আখ্যাত করেছেন তা দেশীয় সিগারেট শিল্পের দুর্দশা সম্পর্কে যে পূর্ণ বিবরণ আমি জনসাধারণ ও সরকারের সমক্ষে উপস্থিত করেছি তাছাড়া আর কিছু নয়। লোকেই যাদের কাছে কাহিনীগুলো বলে উঠেছে, তারা স্বভাবতই এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। আমি এখানে বলতে চাই যে, অতীতের মত এখনও আমি আপনাদের কাছে এবং জনসাধারণের কাছে শুধুমাত্র প্রকৃত ঘটনাই উপস্থাপিত করছি। আমি এগুলো এখনও বলছি এবং সব সময়ই বলবো।

২। আমাদের কাছে এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দেশীয় সিগারেট প্রস্তুতকারকদের পক্ষ থেকে আমরা যেসব সরল বাস্তব বিষয় উত্থাপন করেছি তা আমাদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু আক্রমণ চালাতে আই টি সি'এর চেয়ারম্যানকে প্ররোচিত করলো। আমরা যা বিবৃত করেছি, তা যদি কুৎসা রচনা হয়, তবে তাঁর প্রতিক্রিয়া বর্ণিত করবার মত ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। বহু ব্যাপারে তিনি গোল্ডেন টোব্যাকোর এবং তার ভাবমূর্তির যে ক্ষতি করেছেন তার জন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে।

৩। গোল্ডেন টোব্যাকো কোং—তার সাফল্য

বিক্রয় ও উৎপাদন ব্যাপারে আমাদের সাফল্য সম্পর্কে তিনি যেসব ঘটনা ও অঙ্ক উপস্থাপিত করেছেন তার জন্য আমরা বস্তুতই কৃতার্থ। একথা খুবই সত্য যে, অতি সাধারণভাবে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম; সমগ্র বিশ্বের ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রের বহু ওজনদার সংস্থাই এইভাবে শুরু করেছিল।

গোল্ডেন টোব্যাকো যে অগ্রগতি লাভ করেছে, পরিষ্কার ভাষায় তা খুবই প্রশংসার্হ। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে আজও ক্রমসম্প্রসারণশীল সিগারেট বাজারে গোল্ডেন টোব্যাকোর মাত্র ১৪% অংশ রয়েছে। আই টি সি'এর পরিসংখ্যানে ১৯৪৮-৭০ সালের মধ্যে জি টি সি'এর বিক্রয়/মুনাফা ১১৫০০% বেড়েছে বলে যে দেখানো হয়েছে তা যেন কতকটা সেই কাহিনী—শাড়ির ওজন ৭ পাঃ থেকে ১৪০ পাঃ অর্থাৎ ২০০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিজের ওজন কমে গেছে বলে ঠাকুরদা'র আক্ষেপ!

পানামার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আপনারা পরিচিত। এই সিগারেট এখন দেশের সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। এটি হলো এই শ্রেণীর সবচেয়ে বেশী বিক্রীত ব্রাণ্ড। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে তা সহজেই আপনারা অনুমান করতে পারেন। বৈদেশিক একচেটিয়ার প্ররোচনায় ব্যবসায়ী মহলের অনুসৃত অশোভন রীতিনীতি ও অসহযোগিতামূলক মনোভাব তাদের কাছেই অকল্পনীয় যারা বস্তুতপক্ষে দুঃখ-দুর্দশার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়নি। গলা-টেপা প্রতিযোগিতাও সমান ক্ষতিকারক, যেমন দেখা গিয়েছে পানামা সিগারেটের বিক্রী ছিনিয়ে নেবার জন্য বাজারে প্রবর্তিত বিভিন্ন শিরনামের ব্রাণ্ডের—যথা আমেরিকান ক্লাব, অতিরিক্ত ফিল্টার আকর্ষণযুক্ত সিজার, অতিরিক্ত লম্বা প্যারট কিংস, লেজার, উডবাইন ২০টির প্যাকেটে শাস্ক'কে ক্যাপস্টান ব্রাণ্ডনাম, ফিল্টারসহ উইলস ফ্লিস্টল ইত্যাদি—আকস্ত।

উপর্যুপরি উল্লেখিত ইস্যুগুলি মূলধন, রিজার্ভ ও অন্যান্য যা একের বড় বড় হিসাব সম্পর্কে আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে গোল্ডেন টোব্যাকো উচ্চ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করে তাদের মুনাফা কুক্ষিগত করেনি। যে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে তা ৩০%'এর কম

( পর পৃষ্ঠায় দেখুন )

# ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

( পূর্ব পৃষ্ঠার পর )

বক্তব্য নেই। উৎপাদন ঠেকাতে হবে, যেমন করা হয়েছিল জাতীয় স্বার্থে সরকার যে পর্যায়েই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন সেই পর্যায়েই দেশলাই শিল্প, সাবান শিল্প ও তৈল শিল্পে।

(গ) বৈদেশিক একচেটিয়া ও পারস্পরিক সংযুক্ত সংস্থাগুলোকে আর সম্প্রসারণ করতে দেওয়া হবে না বলে আমি যে অভিমত জানিয়েছিলাম তা জানিয়েছিলাম জাতীয় স্বার্থেই। বৈদেশিক একচেটিয়াকে যদি সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হয় তবে তা শেষ পর্যন্ত একচেটিয়ার কবজা বাড়িয়ে দেবে এবং বর্ধিত মুনাফা হেতু বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ডেকে আনবে। একচেটিয়া সৃষ্টিকে জাতীয় বিকাশ বলে মুখোশ পরালে পার পাওয়া যাবে না।

(ঘ) কয়েকটি প্রস্তুতকারকের উৎপাদন হ্রাসের প্রস্তাব বস্তুতঃপক্ষে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাপাসিটির বাইরে বাড়তি উৎপাদন না করতে অদের বলা, কারণ তারা একাজ করে যাচ্ছে অন্যান্য এমন বহু প্রস্তুতকারকের ক্ষতি করে যারা তাদের মাত্র ৩০% ক্যাপাসিটির কাজ করছে, ৭০% পড়ে আছে অলস হয়ে।

এখানে আমি কলকাতার ন্যাশনাল টোব্যাকোর জ্বলন্ত উদাহরণ দিচ্ছি। শ্রমিক বিশৃঙ্খলার জন্য ১৯৬৭ সালে এই কোম্পানিটির ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়; ৪½ মাস পর আবার যখন তারা ব্যবসা শুরু করলো, তখন তারা দেখতে পেলো যে, চাহিদা অন্যান্য কোম্পানিতে ছড়িয়ে গেছে এবং তারা তাদের আগেকার উৎপাদনের এমনকি এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত বিক্রী করা কষ্টকর হলে দেখতে পেলো। ৩।৪ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর এখনও তারা তাদের আগেকার বাজারের এক-তৃতীয়াংশের বেশী লাভ করতে পারলো না, অথচ দুই-তৃতীয়াংশ অলস পড়ে রইলো। শ্রমিক, পরিচালনা ও অন্যান্য খাতে ব্যয় হ্রাস করা যায় নি এবং এই বিশৃঙ্খলার জন্য কোম্পানিটির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। এই কোম্পানিট তাদের যা ছিল ও যা হারিয়েছিল তা যদি আবার ফিরে পায় তা কি যুক্তিযুক্ত ও শোভন হবে না।

শুধু তাই নয়, যে বাংলা ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন সেও বেশ ভালভাবেই উপকৃত হবে, কারণ ন্যাশনাল টোব্যাকো বাজারে তার মূল অংশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে বাংলায় সিগারেটের উৎপাদন ৫০% কমে গেছে—ন্যাশনাল টোব্যাকোই বাংলায় সিগারেট প্রস্তুতকারী একমাত্র বৃহৎ কোম্পানি। আরও এমন অনেক প্রস্তুতকারক আছে যাদের ক্যাপাসিটি অলস পড়ে রয়েছে এবং বৈদেশিক একচেটিয়ার যে মোটমাট ৮০০০০/৯০০০০০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদন তা যদি ছেঁটে দেওয়া হয় তা হলে তারাও উপকৃত হবে। বিদেশী/বৃহৎ ফার্ম কর্তৃক ২৫% বাড়তি উৎপাদনের শিথিলতা ১৮ই জুলাই তারিখে প্রত্যাহৃত হয়েছে বলে এই সিদ্ধান্ত যে কার্যকর করা হবে, তা তো স্বাভাবিক।

**৯। এইসব প্রতিবেদের ফলশ্রুতি**

(১) বৈদেশিক কোম্পানীগুলোকে সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর ভারতীয়করণের ফলে একচেটিয়ারও হ্রাস হবে না, বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়ও বন্ধ হবে না। ভারতীয়করণের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে চাহিদা বৃদ্ধির সবটাই ভারতীয় প্রস্তুতকারকদের হাতে যেতে দেওয়া। চাহিদার বার্ষিক প্রত্যাশিত ৬% বৃদ্ধি যদি বৈদেশিক একচেটিয়া ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানির হাতে যায়, তা হলে দেশীয় ক্ষেত্রের অংশ ১০ বছরে ৫০% এবং ২০ বছরে ৭৫% বেড়ে যাবে। এটিই কি সিগারেট শিল্পকে ভারতীয়করণের শ্রেষ্ঠ পথ নয়? কারণ এতে শুধু ভারতীয়করণই হবে না, সকলের কল্যাণে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা এনে দেবে।

(২) উৎপাদনযোগ্যতা হারানোর কোন প্রশ্ন নেই। যদি কিছু হয়ই তা হবে, উৎপাদনযোগ্যতা বৈদেশিক একচেটিয়ার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকার বদলে এমন অন্যান্য ফ্যাক্টরীতে ছড়িয়ে পড়বে যেগুলোতে লোক, মালপত্র ও মেশিনারি ওপরে উল্লেখিত মত অলস পড়ে আছে।

(৩) সিগারেট শিল্পে দুষ্প্রাপ্য মূলধনী সম্পদের ভীতি এক-চেটিয়ার মূলধন বিনিয়োগ ও তার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার অনবরত অপচয়ের কথা বিবেচনায় নিতান্তই স্বল্পমেয়াদী ও নগণ্য ধরনের।

(৪) মোলিনস্ ইণ্ডিয়া এখন যে প্ল্যান্ট ও মেশিনারি উৎপাদন করছে তা ভারতীয় ইউনিটগুলো সস্তা দরে পেতে পারে। আনুষঙ্গিক মেশিনারি সম্পর্কে বক্তব্য, আমরা আশা করি এগুলো যাতে পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, যুক্তিসঙ্গত দামে যাতে এগুলো পাওয়া যায় তার জন্য বৈদেশিক একচেটিয়া তাঁদের প্রভাব খাটাবেন।

(৫) বৈদেশিক একচেটিয়া ঠেকালে জনসাধারণেরই কল্যাণ হবে, কারণ এতে ক্রেতা স্বার্থে বৃহত্তর স্বার্থেরই সৃষ্টি হবে।

(৬) বর্তমান শ্রম আইনে শ্রমিক ছাঁটাই বা লে-অফের প্রশ্ন উঠে না অন্যান্য ফ্যাক্টরির যদি জন্ম হয় তবে এইসব ফ্যাক্টরি চালাবার জন্য শ্রমিক ও পরিচালনা বিভাগে কর্মীদের চাকরী হবে। তা না হওয়া পর্যন্ত বৈদেশিক একচেটিয়া তাদের চাকরিতে রেখে দিতে পারেন। এতে তাঁদের বড় জোর মুনাফা কমে যাবে, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে সেই পরিমাণ।

(৭) পাতা তামাকের উন্নয়নের ওপর এর প্রতিক্রিয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সিগারেট যদি দেশে প্রস্তুত হয় এবং তামাক যদি ব্যবহৃত হয়, তবে সিগারেট কে তৈরী করলো, ক, খ না গ, সে প্রশ্ন অবান্তর।

(৮) রপ্তানির ভীতি যে কমে যাচ্ছে তা কিন্তু উপলব্ধি করা আমার পক্ষে কষ্টকর! তামাকের বিদেশী ক্রেতারা তাদের দৃষ্টি অন্যান্য দেশের দিকে কেন যে ফেরাবে তার কোন যুক্তি নেই। তামাক নিয়ে নাড়াচাড়া করে এমন একটি পৃথক কোম্পানি যার সহযোগীরা ও তার প্রধান কার্যালয় রয়েছে বহির্ভারতস্থ একটি দেশে।

(৯) তামাক চাষের ওপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না। বস্তুত চাষীরা একচেটিয়ার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং অবাধ প্রতিযোগিতার সুফল লাভ করতে পারবে।

(১০) সিগারেট ও তামাক শিল্পে উন্নয়ন ও গবেষণা ব্যাহত হওয়ার প্রশ্ন বৈদেশিক একচেটিয়া ঠেকানোর মূল প্রশ্নে অপ্রাসঙ্গিক। অন্যকে এই ক্ষেত্রে আসতে দেবার জন্য একচেটিয়ার কেবলমাত্র ভূমিকাই নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে।

(১১) আনুষঙ্গিক শিল্প সম্পর্কে আমার মনে হয়, একচেটিয়ার প্রভাব যদি হ্রাস করা যায় তবে তাদের অবস্থা ভালো হয়ে উঠবে।

(১২) নিজেদের প্রিয় ব্র্যাণ্ডের প্রতি ক্রেতাদের আনুগত্য হেতু সরকারী অর্থভাণ্ডারে রাজস্বের হানি চিন্তা করার মত বিষয়, কিন্তু ন্যাশনাল টোব্যাকোর অভিজ্ঞতা ও বাজারে তার অংশ সরে যাওয়ার প্রশ্নটি মনে রাখলে এটি অসম্ভব বলেই মনে হয়।

(১৩) এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বিকাশের নিয়ন্ত্রণ যাদের এক-চেটিয়া রয়েছে তাদের মনঃপূত হবে না। কিন্তু তা যদি করা না হয় তবে দেশীয় ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটবে না এবং গত ২২ বছরের মতই তা ২০% মানেই স্থাণু হয়ে থাকবে এবং বর্ধিত চাহিদা—বর্তমানের মত এর অন্ততঃ ৮০%—বৈদেশিক ক্ষেত্রেই চলে যেতে থাকবে। বস্তুতঃ বৈদেশিক ক্ষেত্রের অংশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত বিবৃতি অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের ৬৮% থেকে বেড়ে ১৯৬৯ সালের ৮০% হয়ে গেছে।

( অবশিষ্টাংশ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য )

# জলসা

অনাথ শিশুদের চিত্ত বিনোদনার্থে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সোনু মালহোত্রা

**কল্যাণমূলক অনুষ্ঠানে মালহোত্রা ভগ্নীত্রয় :** ৭নং প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের বিরাট প্রাঙ্গনের সেই শিশু উৎসবের চিত্তহারী অনুষ্ঠান সংস্কৃতি জগতের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ এটা গতানুগতিক নৃত্য-গীতানুষ্ঠান নয়, সারা কোল্‌কাতার সবগুলি অনাথ আশ্রম থেকে শিশুদের সংগ্রহ করে কন্যাত্রয় সোনু, গীতা ও মীরা মালহোত্রার সংগীত ও নৃত্য দিয়ে তাদের চিত্ত বিনোদনের এই অভিনব প্রয়াস-এর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এর জন্য তাদের পিতা ও মাতা মালহোত্রা-দম্পতিধন্যবাদার্হ। শিল্পমূল্য ছাড়াও এ অনুষ্ঠানের শিক্ষার দিকটিও চিন্তা করবার মত। জ্ঞান হয়ে অবধি যে সব দুর্ভাগা শিশুর দল আপনজনের স্নেহ-মমতা কিছুই পায় নি তাদেরই জন্য নৃত্য-গীতের আয়োজন করে এ আশ্বাসই যেন মেলে ধরা হয় যে তারা একা নয়। বছরের এই একটি দিন প্রাণ খুলে আনন্দ করবার জন্য যেন এরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যেবেষ্ঠিত হয়েও জীবনের অন্ধকার দিকটি সহায় সম্বলহীন নিরাশ্রয় শিশুর অভাববোধ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং এ অভাব পূর্ণ করবার কাজে এগিয়ে আসা, মালহোত্রা ভগ্নীত্রয়েরও শিক্ষার অঙ্গ হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ উৎসবের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মীরা এবং গীতা মালহোত্রা যথাক্রমে ইমন, বেহাগ ও ভজন গেয়ে গুরু এ কাননের সু-শিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন।

পরিশেষে সোনু মালহোত্রা 'ভারত-নাট্যম'-এর আলারিপু, পদম এবং লোকনৃত্য জিপসী নৃত্যে আঙ্গিক কুশলতা, সৌন্দর্য লাবণ্যের সুষ্ঠু প্রকাশ ও লয় সুর অভিব্যক্তির মধুরতায় মুগ্ধ করে দিয়েছে।

**ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি বাসর :** বাংলার সংস্কৃতি জগতের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মৃত্যু-বার্ষিকী পালনার্থে ব্রজেন্দ্রকিশোর সংগীত সমিতির পক্ষ হতে সভাপতি কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সম্পাদক কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য ৫৫নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এক ধ্রুপদী সঙ্গীতাসরের আয়োজন করেন।

প্রথমে সমিতির পক্ষ হতে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের দুই প্রবীণ ধ্রুপদী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওস্তাদ ওমর খাঁকে মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। স্বস্তি-বাচন পাঠ করেন কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য।

তারপর যোগীনবাবু ধ্রুপদী আঙ্গিকে 'পুরিয়া' গেয়ে শোনালেন। রাগশুদ্ধতা, কণ্ঠমাধুর্য এবং আত্মসমাহিত পরিবেশনায় এক মর্যাদাগম্ভীর পরিবেশ রচিত হয়।

কৌকব খাঁর পৌত্র ওমর খাঁ আলাপ মসিদখানি এবং রেজাখানি গৎ কৌশী-বাহার রাগে এবং রেজাখানি গৎ 'কাফি' রাগে বাজিয়ে শোনান। রবাবী ঢঙের বাজনা এক বিশেষ যুগের সংগীত-চিন্তার সুষ্ঠু প্রকাশ চিন্তাশীল ছাত্র-ছাত্রীদের অনুধাবনীয় বিষয় উপহার দিয়েছে। উভয়ের সঙ্গে পাখোয়াজ ও তবলা সঙ্গতে ছিলেন যথাক্রমে প্রতাপনারায়ণ মিত্র ও অমলেশ চট্টোপাধ্যায়।

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিষ্য ও শিষ্যা সম্প্রদায়ের মধ্যে মালকোষ রাগে পঞ্চানন রায়চৌধুরীর বীণ বাজান। রামকৃষ্ণ কোলের 'দেশ' রাগে কণ্ঠসংগীত (ধ্রুপদী অঙ্গে) এবং ইরা চক্রবর্তীর সেতারবাদন শ্রোতাদের প্রশংসা পেয়েছে। আর এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান সত্যকিংকর চট্টো-পাধ্যায়ের জার্মান শিষ্য ফিলিপ ক্যালনের ধ্রুপদ গান।

**ব্রাহ্ম যুব-সমিতির বিচিত্রানুষ্ঠান :** গত সপ্তাহে ব্রাহ্ম যুব-সমিতির পক্ষ হতে রবীন্দ্র সদন মঞ্চে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রারম্ভে সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ রায়ের ভাষণে জানা গেল জাতি-ধর্ম এবং বর্ণ-নির্বিশেষে মানবিক অনুভূতির তাগিদেই এ'রা জন-কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে এসেছেন। ঐ বিশেষ সান্ধ্য উৎসবে সংগৃহীত অর্থ বালাভবন, মহিলা ভবন, রিলিফ-মিশন, সাধারণ গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ'রা দুঃস্থ মানবের সেবায় ব্যয় করবেন বলে জানালেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর শুরু হোলো অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান দিয়ে। ধ্রুপদী অঙ্গের ভক্তিমূলক গান দিয়ে অশোকতরুবাবু যেন এক শুদ্ধ, সুন্দর পুজোর আবহাওয়া রচনা করেন। 'হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই', 'আমার যা আছে', 'নয়ন মেলে দেখে নি', 'না বাঁচালে আমায় যদি' প্রভৃতি গানেই আত্মনিবেদনের আকৃতি উদ্বেলিত।

**হেমন্ত মুখোপাধ্যায়** 'তুই ফেলে এসেছিস কারে', 'যৌবন সরসী নীরে', 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই', 'আমার মন মানে না', 'পথে যেতে ডেকেছিলে' 'আমার গোধূলি লগন', 'শুধু তোমার বাণী নয় গো' ও 'দিনের শেষে' কবির গানের নানা ভাব ও ভাবনায় এক রঙিন মালা গেঁথে শ্রোতাদের উপহার দিলেন।

**চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়** 'ও কি এল, ও কি এলো না', 'ন্যায় অন্যায় জানিনে', 'সেদিন দুজনে', 'আমার মন কেমন করে' ও 'বলি গো সজনী' তথা প্রেম-সংগীত তাঁর স্বাভাবিক আবেগ বিহ্বলতায় মেলে ধরেছেন।

**সুচিত্রা মিত্র**—'কার মিলন চাও', 'রাখো রাখো হে জীবনে', 'এই উদাসী হাওয়ার পথে', 'আয় আয় রে পাগল' এবং 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'তে একাধারে রবীন্দ্রসংগীতের দর্শন ও আধ্যাত্মিক দিকটি ও নাটকীয় গীতি-কবিতার সরস দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন।

পরিশেষে 'সৌভনিক' গোষ্ঠী 'গোরা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকের প্রারম্ভটি সুন্দর। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে অন্তরাল থেকে ভেসে আসা 'স্বপন যদি ভাঙো রে' গানটি নাটকের আসন্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে। সুদক্ষ শিল্পিবৃন্দ নাটকের মর্মবস্তুকে তার যথাযথ মর্যাদায় পরিস্ফুট করেছেন।

**আমজাদ আলি খাঁর সরোদ বাদন ঃ** ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ ম্যানেজমেন্টের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সংস্থার সভ্যবৃন্দ আমজেদ আলি খাঁর একটি একক সরোদ বাদনের আসরের আয়োজন করেন। তবলা সংগতে ছিলেন পন্ডিত শান্তাপ্রসাদ।

তরুণ সরোদিয়া আমজেদ আলি খাঁ যন্ত্রসংগীতের এক উজ্জ্বল তারকা। বর্তমান যুগের দিকপাল যন্ত্রীদের প্রভাবের আলোতেই আপন দীপ্তি খুঁজে নিয়ে তিনি যন্ত্রসংগীতের আসরে আপনার স্থান করে নিতে পেরেছেন।

কিন্তু সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধ আমাদের খুশী করতে পারে নি। আলি আকবরের পদ্ধতিতে অনুসারী আলাপ জোড় ঝালার অংশ বিশেষ সুরের সূক্ষ্ম শ্রুতিতে, মীড় ও বাজের চমকপ্রদ সমন্বয়ে চকিত দ্যুতি সঞ্চার করেছে। কিন্তু সামগ্রিক আবেদন মনে কোনো স্থায়ী দাগ কাটতে পারে নি। 'ঝিঁঝিট'-এর মত রাগকে প্রধান রাগরূপে নির্বাচন করতে হলে যে পরিণত ধ্যান ধারণা এবং ধ্রুপদী রীতিতে বিস্তারের অনুশীলন অবশ্য প্রয়োজনীয় তারই অভাবে অবশ্যম্ভাবী একঘেয়েমির হাত এড়ানো আমজেদের মত শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হয় নি। অবশ্য রাগ শুদ্ধতায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং উত্তরাঙ্গে সুপরিচিত পকড় সরগমপধ, পধনসা-তে স্বকীয়রূপে লোকসংগীতের খন্ড মাধ্যমে শ্রোতাদের মন মাঝে মাঝে ভিজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগ কৌশল প্রদর্শনের উদ্দীপনায় 'ঝিঁঝিট'-এর প্রধান লক্ষণ [illegible] রূপ বিস্তার একেবারেই অবহেলিত হয়েছে। শান্তাপ্রসাদের সংযত সংগতে গতের অঙ্গ মোটের ওপর উপভোগ্য। কিন্তু ঝালার অতিদ্রুত গতি প্রয়াসী মন সব সময় ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে নি। তার ফলে সংগীতানভিজ্ঞ শ্রোতার করতালি তিনি পেয়েছেন তবে তা অর্জন করতে হোলো সংগীতবোদ্ধা রসিকজনের ক্ষুণ্ণতার মূল্যে।

দ্বিতীয়ার্ধে তিনি বাজালেন কিরবাণী। ১৯৫৩ সালে এই দক্ষিণভারতীয় রাগটিকে কোলকাতার শ্রোতাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পন্ডিত রবিশঙ্কর। তারপর আলি আকবর ও রবিশংকর ক্রমাগত বাজিয়ে এই রাগকে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং 'কিরবাণী' আজ উত্তর ভারতের ঘরের রাগ হয়ে উঠেছে।

আলি আকবরীয় আঙ্গিকেই কিরবাণীর রূপ কল্পনায় রত হলেও আমজেদের নিজস্ব আবেগ রসবোধ ও আঙ্গিক কুশলতায় এ অনুষ্ঠান রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠে প্রথমার্ধের অতৃপ্তির অনেকখানি ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছে। শান্তাপ্রসাদের তবলা সংগত এ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ।

—চিত্রাঙ্গদা

# কলকাতায় ওবারহাউজেন চিত্রমেলা

ছোট-ছোট ছবি। কোনটার স্থায়িত্ব পনের মিনিট, কোনটার এগার মিনিট, কোনটার পাঁচ মিনিট আবার কোনটা এক মিনিটেই শেষ। অথচ মনে ছাপ থেকে যায় অনেক বেশী সময়ের জন্য। ছোটোর দাবী যে অনেক সময় বড়োর জন্মগত গাম্ভীর্যকে দাবীয়ে রেখে এগিয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ চাক্ষুষ করা গেল গত ১-২ ডিসেম্বর ম্যাকসমুলার ভবন (ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ ছিলেন যুগ্ম আয়োজক) আয়োজিত ওবারহাউজেন চিত্রমেলার কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির বিশেষ প্রদর্শনীতে। পশ্চিম জার্মানীর এই শহর-টিতে প্রতি বছরই ছোট ছবির এক মেলা বসে। মেলার সহকারী পরিচালক ভ্রীউইল ওহেলিং উৎসবের বাছাই-কার বাইশটি ছবি নিয়ে সম্প্রতি এদেশে এসেছেন।

এক্সপেরিমেন্ট বলতে যা বোঝায় স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিতে সে কাজের সম্ভাবনা খুব বেশী। স্বল্প পরিসরে ও সময়ে পরিচালক নিজের কুশলতা ও বক্তব্যকে অত্যধিক জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সারা ইউরোপ জুড়ে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিবর্তন আসছে সে ছাপ দেশের কাহিনী-চিত্রে যেমন পড়ছে, এই সব ছোট ছবিতেও তার আঁচড় কম জোরালো নয়। বরং আরও বেশী তীক্ষ্ন, সরস ও সরলীকৃত। উৎসবে প্রদর্শিত কয়েকটি ছবির কাব্যিক মেজাজও লক্ষ্যণীয়।

এগারটি দেশের বাইশটি ছবির মধ্যে চেকোশ্লাভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ছবির সংখ্যাই বেশী। কিউবার একমাত্র ছবি 'এল-বি-জে' তিনজন উত্তর আমেরিকার রাজনৈতিক নেতার হত্যা কাহিনীর ওপর তৈরী। পরিচালক আলভারেজ কমিকের সুরে ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। উৎসবের সেরা ছবি দুটি হল চেকোশ্লাভা-কিয়ার 'দি অ্যাপার্টমেন্ট' (জাঁ স্ভনাক-মাজের) ও বৃটেনের 'পীচেস' (মাইকেল গিল)। চার পাশের বিলাসব্যসন, অলস মানুষের পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি নিয়ে বিদ্রুপাত্মক ছবি 'দি অ্যাপার্টমেন্ট'। 'পীচেস' পনের মিনিটের ছবি হলেও মেজাজে অনেকটা কাহিনীচিত্রের। একটি বড় পরিবারের এক যুবতীর একাকীত্ব ছবিটির মূল উপজীব্য। পরিচালক গিল অভ্রান্ত দক্ষতার সঙ্গে চরিত্রের মানসিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। শেষ দৃশ্য (যেখানে মেয়েটি প্রেমিকের পেছনে দাঁড়িয়ে নির্বিকার চাউনিতে পেঁয়াজ চিবোচ্ছে) বড় কাব্যিক, অস্বাভাবিক ব্যাঙময় এবং সুন্দরও সেই কারণে। ডান দ্রাসিনের 'সানডে' (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) আরেকটি স্মরণীয় ছবি। ১৯৬১-তে নিউইয়র্ক পার্কে নিয়মিত জমায়েতে বাধা দানের ফলে এক দল লোক-সংগীত শিল্পী যে সক্রিয় প্রতিবাদ জানিয়ে-ছিল, তারই ভিত্তিতে পরিচালক এক প্রামাণিক চিত্র তৈরী করেছেন। পোলানস্কির 'দি ফ্যাট ওয়ান এন্ড দি থিন ওয়ান' (ফ্রান্স) আপাতদৃষ্টিতে হাস্যরসাত্মক ছবি হলেও গভীর ইঙ্গিতবহ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই এ ছবির মূল বক্তব্য।

জন মার্শালের এক মিনিটের ছবি 'পীস' উপস্থাপনা কৌশলে অভিনব। যুগোশ্লা-ভিয়ার 'দি ডেজ কাম' (নেদলজকো দ্রাগিক) কার্টুন ছবিগুলির মধ্যে সব চাইতে আকর্ষণীয়। পশ্চিম জার্মানীর 'দি ফার্স্ট লেসন' (পরিচালক ঃ জোখেন রিমার ও জোখেন সিরহাক) বর্তমান জনজীবনের অ্যালিনেশনজনিত সমস্যাকে নিয়ে তোলা। সমষ্টিগত বোঝাপড়াই জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ ছবি সেই কথাই বলতে চায়।

# প্রেক্ষাগৃহ

### সেতারশিল্পী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য

সানফ্রান্সিস্কোর 'আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক'-এর অন্যতম সেতার-শিক্ষক ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য ১০ নভেম্বর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করবার পরে যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন, তাতে নানা কথার মধ্যে তিনি বলেছেন, আলি আকবর খাঁ সাহেবের প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে যাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন এবং এখনও করছেন, ১৯৬৫ থেকে আজ পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০০-এ। ভারতীয় সঙ্গীতকে এঁরা সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। এবং সঙ্গীত-সাধনা সম্পর্কে এদের নিষ্ঠা অসামান্য; এক একজন দিনে আট থেকে বারো ঘন্টা পর্যন্ত রেওয়াজ করে থাকেন।

সেতার শিক্ষা দেওয়া ছাড়া শ্রীভট্টাচার্য সানফ্রান্সিস্কোর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে, মিউজিক ক্লাব বা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে একক অনুষ্ঠান করেছেন এবং সমবেত সঙ্গীতেরও আসর বসিয়েছেন। 'ফ্যামিলি ডগ' নামে একটি বিখ্যাত সঙ্গীতানুরাগীদের প্রতিষ্ঠানে—যে প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে 'হিপি'-দের নিয়েই গঠিত, সেখানে তিনি 'আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক'-এর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পঁচিশজনকে নিয়ে গঠিত একটি দলের সাহায্যে সম্পূর্ণ ভারতীয় রাগরাগিণীর অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে অসামান্য সাফল্যলাভ করেছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানের শেষ সমবেত যন্ত্রসংগীত—যা 'আহের-ললিত'-এর উপর গড়া হয়েছিল—এমনভাবে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল যে, তাঁরা ঐ একই জিনিস ফিরে ফিরে পাঁচবার বাজাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্রীভট্টাচার্য ব্যক্তিগত জীবনে সরোদ-বাদক ও সঙ্গীত-পরিচালক তিমিরবরণের একমাত্র সন্তান। তাঁর বাবারই মতন তিনিও প্রথমত শিক্ষালাভ করেন মাইহারের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে ১৯৫৩ থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত পুরো ন' বছর ধরে। আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক-এর সেতার শিক্ষক-রূপে তিনি যোগ দেন ১৯৬৯-এর জুন মাসে। ওখানে এক নাগাড়ে দেড় বছর থাকবার পর শ্রীভট্টাচার্য দেশে ফিরে এসেছেন কিছুদিনের জন্যে। আবার ১৯৭১-এর জুন মাসে উনি সানফ্রান্সিস্কোতে ফিরে যাবেন। যে ক'মাস শ্রীভট্টাচার্য দেশে রয়েছেন, তার মধ্যে উনি সম্ভবত কিছু অর্কেস্ট্রার আসর বসাতে ইচ্ছুক এবং সুবিধা হলে একটি ছবির সঙ্গীত-পরিচালনাও করতে পারেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীভট্টাচার্যের অল্পক্ষণের জন্যে সেতার-বাদন সমবেত সকলকেই উচ্ছ্বসিত করে তুলেছিল।

আমরা শ্রীভট্টাচার্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

রূপসী / সন্ধ্যা রায় শমিত ভঞ্জ

### অগ্রদূতের 'মঞ্জরী অপেরা'

শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী নিঃসন্দেহে বিচিত্র পথগামী। 'দিনের রাজা রাতের ফকির' অর্থাৎ নট-নটীদের নিয়ে তিনি লিখেছেন, 'মঞ্জরী অপেরা'। ছবির শুরুতে সেই কথা বলেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। শুধুমাত্র শিল্পীদের সুখদুঃখ ব্যথাবেদনার কথাই তিনি লেখেননি। যাত্রাপালা যে বাংলার লোক-সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্য সে-কথাও বলেছেন।

বাংলা ছবিতে যাত্রাপালার চিত্রায়ণ এই প্রথম নয়, তবে সম্পূর্ণরূপে যাত্রাভিত্তিক ছবি এই প্রথম। মঞ্জরী অপেরা নামের এক যাত্রা দলের শিল্পীরাই ছবির প্রধান কর্ণ চরিত্র। কীর্তনিয়া তুলসী দাসীর মেয়ে মঞ্জরীর সঙ্গে নাটকপাগল গোরার প্রথম দেখা এক গানের আসরে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। দুজনেই নীরব তখন। পরবর্তী সাক্ষাৎকারের সময় মঞ্জরী মা-হারা এবং গোরাও বিবাহিত জীবনের সূত্র ছিঁড়ে গৃহত্যাগী। তার রিক্ত জীবনে আশা নিয়ে এল মঞ্জরী। দুজনে মিলে দল তৈরী করল। নাম 'মঞ্জরী অপেরা'। দুজনে মিলে অভিনয় করে মাতিয়েছে বহু আসর। খ্যাতি, অর্থ কোনটাই কম হয়নি।

কিন্তু হাওয়া ঘুরল অন্যদিকে যখন রূপসী যুবতী অলকা এল যাত্রাদলে নতুন শিল্পী হয়ে। গোরা-মঞ্জরী-অলকাকে নিয়ে ত্রিভুজ প্রেমের নাটক হয়েছে এখানে। দ্বিধাচিত্ত গোরা কামনার আগুনকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ঝাঁপ দিয়েছে সে আগুনে। অলকার দলত্যাগের সঙ্গে গোরাও দল ছেড়েছে। পরিচালক স্বাভাবিক পরিমিতি-বোধের সঙ্গেই এই ঘটনার চিত্রায়ণ করেছেন। অতি-নাটকীয়তার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও এই অংশ বাস্তবানুগ।

ছলনাময়ী অলকার প্ররোচনায় গোরা তখন সিনেমার হিরো বিজয়কুমারে রূপান্তরিত। সবশেষে অবশ্য গোরার ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছে। অলকার

**হেমন্ত মুখোপাধ্যায়** 'তুই ফেলে এসেছিস কারে', 'যৌবন সরসী নীরে', 'হায় হায় জীবন পূরণ নাই', 'আমার মন মানে না', 'পথে যেতে ডেকেছিলে' 'আমার গোধূলি লগন', 'শুধু তোমার বাণী নয় গো' ও 'দিনের শেষে' কবির গানের নানা ভাব ও ভাবনায় এক রঙিন মালা গেঁথে শ্রোতাদের উপহার দিলেন।

**চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়** 'ও কি এল, ও কি এলো না', 'ন্যায় অন্যায় জানিনে', 'সেদিন দুজনে', 'আমার মন কেমন করে' ও 'বলি গো সজনী' তথা প্রেম-সংগীত তাঁর স্বাভাবিক আবেগ বিহ্বলতায় মেলে ধরেছেন।

**সুচিত্রা মিত্র**—'কার মিলন চাও', 'রাখো রাখো হে জীবনে', 'এই উদাসী হাওয়ার পথে', 'আয় আয় রে পাগল' এবং 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'তে একাধারে রবীন্দ্রসংগীতের দর্শন ও আধ্যাত্মিক দিকটি ও নাটকীয় গীতি-কবিতার সরস দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন।

পরিশেষে **'শৌভনিক' গোষ্ঠী** 'গোরা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকের প্রারম্ভটি সুন্দর। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে অন্তরাল থেকে ভেসে আসা 'স্বপন যদি ভাঙ্গে রে' গানটি নাটকের আসন্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে। সুদক্ষ শিল্পিবৃন্দ নাটকের মর্মবস্তুকে তার যথাযথ মর্যাদায় পরিস্ফুট করেছেন।

**আমজেদ আলি খাঁর সরোদ বাদন :** ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সংস্থার সভ্যবৃন্দ আমজেদ আলি খাঁর একটি একক সরোদ বাদনের আসরের আয়োজন করেন। তবলা সঙ্গতে ছিলেন পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ।

তরুণ সরোদিয়া আমজেদ আলি খাঁ যন্ত্রসংগীতের এক উজ্জ্বল তারকা। বর্তমান যুগের দিকপাল যন্ত্রীদের প্রভাবের আলোতেই আপন দীপ্তি খুঁজে নিয়ে তিনি যন্ত্রসংগীতের আসরে আপনার স্থান করে নিতে পেরেছেন।

কিন্তু সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধ আমাদের খুশী করতে পারে নি। আলি আকবরের পদ্ধতিতে অনুসারী আলাপ জোড় ঝালার অংশ বিশেষ সুরের সূক্ষ্ম প্রভৃতিতে, মীড় ও বাজের চমকপ্রদ সমন্বয়ে চকিত দ্যুতি সঞ্চার করেছে। কিন্তু সামগ্রিক আবেদন মনে কোনো স্থায়ী দাগ কাটতে পারে নি। 'ঝিঁঝিট'-এর মত রাগকে প্রধান রাগরূপে নির্বাচন করতে হলে যে পরিণত ধ্যান ধারণা এবং ধ্রুপদী রীতিতে বিস্তারের অনুশীলন অবশ্য প্রয়োজনীয় তারই অভাবে অবশ্যম্ভাবী একঘেঁয়েমির হাত এড়ানো আমজেদের মত শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হয় নি। অবশ্য রাগ শুদ্ধতায় তিনি সু-প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং উত্তরাঙ্গে সু-পরিচিত পকড় সরগমপধ, পধনসা-তে প্রতিক্রমণে লোকসংগীতের খণ্ড মাধুর্যে শ্রোতাদের মন মাঝে মাঝে ভিজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগ কৌশল প্রদর্শনের উদ্দীপনায় 'ঝিঁঝিট'-এর প্রধান লক্ষণ [illegible] রূপে বিস্তার একেবারেই অবহেলিত হয়েছে। শান্তাপ্রসাদের সংযত সঙ্গতে গতের অংশ মোটের ওপর উপভোগ্য। কিন্তু ঝালার অতিদ্রুত গতি প্রয়াসী মন সব সময় ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে নি। তার ফলে সংগীতানভিজ্ঞ শ্রোতার করতালি তিনি পেয়েছেন তবে তা অর্জন করতে হোলো সংগীতবোদ্ধা রসিকজনের ক্ষুন্নতার মূল্যে।

দ্বিতীয়ার্ধে তিনি বাজালেন কিরবাণী। ১৯৫৩ সালে এই দক্ষিণভারতীয় রাগটিকে কোলকাতার শ্রোতাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তারপর আলি আকবর ও রবিশংকর ক্রমাগত বাজিয়ে এই রাগকে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং 'কিরবাণী' আজ উত্তর ভারতের ঘরের রাগ হয়ে উঠেছে।

আলি আকবরীয় আঙ্গিকেই কিরবাণীর রূপ কল্পনায় রত হলেও আমজেদের নিজস্ব আবেগ রসবোধ ও আঙ্গিক কুশলতায় এ অনুষ্ঠান রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠে প্রথমার্ধের অতৃপ্তির অনেকখানি ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছে। শান্তাপ্রসাদের তবলা সঙ্গত এ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ।

—চিত্রাঙ্গদা

# কলকাতায় ওবারহাউজেন চিত্রমেলা

ছোট-ছোট ছবি। কোনটার স্থায়িত্ব পনের মিনিট, কোনটার এগার মিনিট, কোনটার পাঁচ মিনিট আবার কোনটা এক মিনিটেই শেষ। অথচ মনে ছাপ থেকে যায় অনেক বেশী সময়ের জন্য। ছোটোর দাবী যে অনেক সময় বড়োর জন্মগত গাম্ভীর্যকে দাবীয়ে রেখে এগিয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ চাক্ষুষ করা গেল গত ১-২ ডিসেম্বর ম্যাক্সমুলার ভবন (ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ ছিলেন যুগ্ম আয়োজক) আয়োজিত ওবারহাউজেন চিত্রমেলার কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির বিশেষ প্রদর্শনীতে। পশ্চিম জার্মানীর এই শহরটিতে প্রতি বছরই ছোট ছবির এক মেলা বসে। মেলার সহকারী পরিচালক শ্রীউইল ওহেলিং উৎসবের বাছাই-করা বাইশটি ছবি নিয়ে সম্প্রতি এদেশে এসেছেন।

এক্সপেরিমেন্ট বলতে যা বোঝায় স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিতে সে কাজের সম্ভাবনা খুব বেশী। স্বল্প পরিসরে ও সময়ে পরিচালক নিজের কুশলতা ও বক্তব্যকে অত্যধিক জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সারা ইউরোপ জুড়ে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিবর্তন আসছে সে ছাপ দেশের কাহিনীচিত্রে যেমন পড়ছে, এই সব ছোট ছবিতেও তার আঁচড় কম জোরালো নয়। বরং আরও বেশী তীক্ষ্ণ, সরস ও সরলীকৃত। উৎসবে প্রদর্শিত কয়েকটি ছবির কাব্যিক মেজাজও লক্ষ্যণীয়।

এগারটি দেশের বাইশটি ছবির মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ছবির সংখ্যাই বেশী। কিউবার একমাত্র ছবি 'এল-বি-জে' তিনজন উত্তর আমেরিকার রাজনৈতিক নেতার হত্যা কাহিনীর ওপর তৈরী। পরিচালক আলভারেজ কমিকের সুরে ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। উৎসবের সেরা ছবি দুটি হল চেকোশ্লোভাকিয়ার 'দি অ্যাপার্টমেন্ট' (জাঁ স্ভনাকমাজের) ও বৃটেনের 'পীচেস' (মাইকেল গিল)। চার পাশের বিলাসব্যসন, অলস মানুষের পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি নিয়ে বিদ্রূপাত্মক ছবি 'দি অ্যাপার্টমেন্ট'। 'পীচেস' পনের মিনিটের ছবি হলেও মেজাজে অনেকটা কাহিনীচিত্রের। একটি বড় পরিবারের এক যুবতীর একাকীত্ব ছবিটির মূল উপজীব্য। পরিচালক গিল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চরিত্রের মানসিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। শেষ দৃশ্য (যেখানে মেয়েটি প্রেমিকের পেছনে দাঁড়িয়ে নির্বিকার চাউনিতে পেঁয়াজ চিবোচ্ছে) বড় কাব্যিক, অস্বাভাবিক ব্যাঙময় এবং সুন্দরও সেই কারণে। ডান প্রাসিনের 'সানডে' (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) আরেকটি স্মরণীয় ছবি। ১৯৬১-তে নিউইয়র্ক পার্কে নিয়মিত জমায়েতে বাধা দানের ফলে এক দল লোক-সঙ্গীত শিল্পী যে সক্রিয় প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তারই ভিত্তিতে পরিচালক এক প্রামাণিক চিত্র তৈরী করেছেন। পোলানস্কির 'দি ফ্যাট ওয়ান এণ্ড দি থিন ওয়ান' (ফ্রান্স) আপাতদৃষ্টিতে হাস্যরসাত্মক ছবি হলেও গভীর ইঙ্গিতবহ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই এ ছবির মূল বক্তব্য।

জন মার্শালের এক মিনিটের ছবি 'পীস' উপস্থাপনা কৌশলে অভিনব। যুগোশ্লাভিয়ার 'দ ডেজ কাম' (নেদলজকো দ্রাগিক) কার্টুন ছবিগুলির মধ্যে সব চাইতে আকর্ষণীয়। পশ্চিম জার্মানীর 'দি ফার্স্ট লেসন' (পরিচালক : জোখেন রিমার ও জোখেন সিরহ্যাক) বর্তমান জনজীবনের অ্যালিনেশনজনিত সমস্যাকে নিয়ে তোলা। সমষ্টিগত বোঝাপড়াই জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ ছবি সেই কথাই বলতে চায়।

# প্রেক্ষাগৃহ

রূপসী / সন্ধ্যা রায় শমিত ভঞ্জ

## সেতারশিল্পী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য

সানফ্রান্সিস্কোর 'আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক'-এর অন্যতম সেতার-শিক্ষক ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য ১০ নভেম্বর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করবার পরে যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন, তাতে নানা কথার মধ্যে তিনি বলেছেন, আলি আকবর খাঁ সাহেবের প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে যাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন এবং এখনও করছেন, ১৯৬৫ থেকে আজ পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০০-এ। ভারতীয় সঙ্গীতকে এঁরা সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। এবং সঙ্গীত-সাধনা সম্পর্কে এদের নিষ্ঠা অসামান্য; এক একজন দিনে আট থেকে বারো ঘন্টা পর্যন্ত রেওয়াজ করে থাকেন।

সেতার শিক্ষা দেওয়া ছাড়া শ্রীভট্টাচার্য সানফ্রান্সিস্কোর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে, মিউজিক ক্লাব বা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে একক অনুষ্ঠান করেছেন এবং সমবেত সঙ্গীতেরও আসর বসিয়েছেন। 'ফ্যামিলি ডগ' নামে একটি বিখ্যাত সঙ্গীতানুরাগীদের প্রতিষ্ঠানে—যে প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে 'হিপি'-দের নিয়েই গঠিত, সেখানে তিনি 'আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক'-এর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঁচশজনকে নিয়ে গঠিত একটি দলের সাহায্যে সম্পূর্ণ ভারতীয় রাগরাগিণীর অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে অসামান্য সাফল্যলাভ করেছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানের শেষ সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত—যা 'আহের-ললিত'-এর উপর গড়া হয়েছিল—এমনভাবে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল যে, তাঁরা ঐ একই জিনিস ফিরে ফিরে পাঁচবার বাজাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্রীভট্টাচার্য ব্যক্তিগত জীবনে সরোদ-বাদক ও সঙ্গীতপরিচালক তিমিরবরণের একমাত্র সন্তান। তাঁর বাবারই মতন তিনিও প্রধানত শিক্ষালাভ করেন মাইহারের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে ১৯৫৩ থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত পুরো ন' বছর ধরে। আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক-এর সেতার শিক্ষক-রূপে তিনি যোগ দেন ১৯৬৯-এর জুন মাসে। ওখানে এক নাগাড়ে দেড় বছর কাটাবার পর শ্রীভট্টাচার্য দেশে ফিরে এসেছেন কিছুদিনের জন্যে। আবার ১৯৭১-এর জুন মাসে উনি সানফ্রান্সিস্কোতে ফিরে যাবেন। যে ক'মাস শ্রীভট্টাচার্য দেশে রয়েছেন, তার মধ্যে উনি সম্ভবত কিছু অর্কেস্ট্রার আসর বসাতে ইচ্ছুক এবং সুবিধা হলে দু একটি ছবির সঙ্গীত-পরিচালনাও করতে পারেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীভট্টাচার্যের অল্পক্ষণের জন্যে সেতার-বাদন সমবেত সকলকেই উচ্ছ্বসিত করে তুলেছিল।

আমরা শ্রীভট্টাচার্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

## অগ্রদূতের 'মঞ্জরী অপেরা'

শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী নিঃসন্দেহে বিচিত্র পথগামী। 'দিনের রাজা রাতের ফকির' অর্থাৎ নট-নটীদের নিয়ে তিনি লিখেছেন, 'মঞ্জরী অপেরা'। ছবির শুরুতে সেই কথা বলেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। শুধুমাত্র শিল্পীদের সুখদুঃখ ব্যথাবেদনার কথাই তিনি লেখেননি। যাত্রাপালা যে বাংলার লোক-সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্য সে-কথাও বলেছেন।

বাংলা ছবিতে যাত্রাপালার চিত্রায়ণ এই প্রথম নয়, তবে সম্পূর্ণরূপে যাত্রাভিত্তিক ছবি এই প্রথম। মঞ্জরী অপেরা নামের এক যাত্রা দলের শিল্পীরাই ছবির প্রধান ক'টি চরিত্র। কীর্তনিয়া তুলসী দাসীর মেয়ে মঞ্জরীর সঙ্গে নাটকপাগল গোরার প্রথম দেখা এক গানের আসরে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। দুজনেই নীরব তখন। পরবর্তী সাক্ষাৎকারের সময় মঞ্জরী মা-হারা এবং গোরাও বিবাহিত জীবনের সূত্র ছিঁড়ে গৃহত্যাগী। তার রিক্ত জীবনে আশা নিয়ে এল মঞ্জরী। দুজনে মিলে দল তৈরী করল। নাম 'মঞ্জরী অপেরা'। দুজনে মিলে অভিনয় করে মাতিয়েছে বহু আসর। খ্যাতি, অর্থ কোনটাই কম হয়নি।

কিন্তু হাওয়া ঘুরল অন্যদিকে যখন রূপসী যুবতী অলকা এল যাত্রাদলে নতুন শিল্পী হয়ে। গোরা-মঞ্জরী-অলকাকে নিয়ে ত্রিভুজ প্রেমের নাটক হয়েছে এখানে। দ্বিধাচিত্ত গোরা কামনার আগুনকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ঝাঁপ দিয়েছে সে আগুনে। অলকার দলত্যাগের সঙ্গে গোরাও দল ছেড়েছে। পরিচালক স্বাভাবিক পরিমিতি-বোধের সঙ্গেই এই ঘটনার চিত্রায়ণ করেছেন। অতি-নাটকীয়তার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও এই অংশ বাস্তবানুগ।

ছলনাময়ী অলকার প্ররোচনায় গোরা তখন সিনেমার হিরো বিজয়কুমারে রূপান্তরিত। সবশেষে অবশ্য গোরার ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছে। অলকার

প্রকৃত চরিত্র তখন প্রকাশ পেয়েছে তার কাছে। গোরা তাই ফিরে এসেছে মঞ্জরীর পাশে।



এণ্টারটেনমেণ্ট ছবি করার ক্ষেত্রে অগ্রদূতের নাম উল্লেখযোগ্য। 'মঞ্জরী অপেরা' সে-সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। যাত্রার সুর অনুপস্থিত থাকলেও নাটককে স্বচ্ছন্দ গতিতে শেষ অবধি পৌঁছে নিয়ে যাওয়ার কাজ প্রশংসনীয়। নাট্যরস দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া, বাস্তবানুগ। যাত্রার আসরের চাইতে গ্রীনরুমের দৃশ্যপরিকল্পনা সুপরিকল্পিত। ব্যক্তিগত কথাবার্তার মাঝে যাত্রার ঢংয়ে সংলাপ চরিত্রগুলির মেজাজ ও পরিবেশ গঠনে যথোপযুক্ত। সুবীর হাজরাকৃত চিত্রনাট্যের আঁটসাঁট বাঁধুনী দীর্ঘ ছবিটিকে মুহূর্তের জন্যও শ্লথ হতে দেয়নি। অবশ্য এ-কাজে সম্পাদনার (বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়) কৃতিত্ব কম নয়। ক্যামেরার কাজ (বিভূতি লাহা) পরিচ্ছন্ন।

গোরাবেশী উত্তমকুমার অনবদ্য। বিজয়কুমারের বেশে তিনি স্বাভাবিক। চরিত্রের জটিলতা প্রকাশে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মঞ্জরী চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রাণময়। চরিত্রটির অসহায়তা, ব্যথা-বেদনা প্রতিটি অনুভূতির অভিব্যক্তি প্রকাশে তিনি সুনিপুণ। বিচ্ছেদের চরম আঘাত পাওয়ার মুহূর্তে তিনি সংযত ও স্বাভাবিক। অলকাবেশী জ্যোৎস্না বিশ্বাস চরিত্রের প্রতি সুবিচার দিয়েছেন। চরিত্রটি তাই উপভোগ্য ও বিশ্বাস্য। যাত্রাশিল্পীর অন্য দুটি চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা দে-র অভিনয় মনে রাখার মত। অন্যান্য সুঅভিনীত চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন বনানী চৌধুরী, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, বেবী গুপ্তা, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

## অভিনেত্রী

'সুবোধ মুখার্জি প্রোডাকসনের ছবি চিরনতুন আমোদের খনি'—এমনতরো বিজ্ঞাপন ছবির শেষে আছে। ছবিকে আমোদের খনি করে তুলতে নাচ-গান-হাসি-মস্করা-রোমান্সের সহযোগে যে উদ্ভট বস্তু করে তুলতে হয়, সুবোধ মুখার্জির পূর্ববর্তী বহু ছবিতে সেইসকল উপাদানের প্রাধান্য ছিল। নবতম ছবি 'অভিনেত্রী' সেইসকল উদ্ভট রস ও দৃশ্যকল্পনার অনুপস্থিতিতেও যথেষ্ট আমোদের খনি এবং আনন্দের খোরাকও জোগাতে পারবে। এ-ছবিতে অযথা মারপিট নেই, ভাঁড়ামো নেই, অতিসুন্দর পরিচ্ছন্ন ছবি। হিন্দী চিত্রজগৎ যে ফর্মুলা ভেঙে নতুন ধরনের ছবি তৈরীর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার প্রমাণ 'অভিনেত্রী'।

সুখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী অঞ্জনার সঙ্গে শিক্ষানবিশী তরুণ গবেষক শেখরের পরিচয় এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায়। মাতৃহারা অঞ্জনা প্রথম দর্শনে শুধুমাত্র শেখরের প্রতিই অনুরক্ত হয় না, শেখরের মাকেও নিজের মায়ের মত ভালোবেসে ফেলে। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় দুজনে। দুটি উচ্ছল তরুণ দম্পতির জীবন কাটে ছোটোখাটো ভুল বোঝাবুঝি আর খুনসুটির মাধ্যমে। পতিসোহাগিনী অঞ্জনার অত্যধিক উচ্ছলতা শেখরের গবেষণার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কাজে মন দিতে পারে না সে। এই নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি। অঞ্জনার একাকিত্বকে দূর করার জন্য এগিয়ে আসেন তাঁর নৃত্যগুরু। আবার তাকে স্টেজে নামতে অনুরোধ জানান তিনি। কিন্তু শেখর গররাজি। অথচ অঞ্জনা তার নৃত্যকলার প্রতি আকর্ষণ ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। স্বামীর অমতেই ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে যায় অভিনয়ের জন্য। সবশেষে বান্ধবীর দৌত্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে দুজনার। মিলিত হয় শেখর ও অঞ্জনা।

গল্পে কোথাও ছাল্কা রস পরিবেশনের সুযোগ নেই, পরিচালক আরোপও করেননি, ফলে ছবিটি অনেকাংশে লাবণ্য ও স্বচ্ছন্দ গতি পেয়েছে। ছবির দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে নায়ক-নায়িকার দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত খুঁটিনাটি পর্যায়

গতি অতি শ্লথ। দুর্জনায় ভুল বোঝাবুঝির পর নাট্যউপাদান যেখানে ঘনীভূত, নিপুণ পরিবেশনকৌশলের গুণে সেই সকল দৃশ্য-পর্যায় উপভোগ্য, অপেক্ষাকৃত গতিশীলও বটে।

লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুরে সব-ক'টি গানই সুগীত ও আকর্ষণীয় (বিশেষভাবে কিশোরকুমার-লতা মঙ্গেশ-করের দ্বৈতকণ্ঠে 'সা-রে-গা-মা-পা-পা-পা' গানটি)। বহির্দৃশ্য ও অন্তর্দৃশ্য গ্রহণে ক্যামেরার কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দর।

প্রধান দুটি চরিত্রে শশীকাপুর ও হেমা মালিনী অপূর্ব অভিনয়-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রেমাবেগে উচ্ছল হতে তাঁরা যেমন সক্ষম হয়েছেন, নাট্যদ্বন্দ্বের মুহূর্তেও তাঁরা সমান নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। দু-একটি ক্ষেত্রে অতিউচ্ছলতা প্রকাশ পেলেও বিশেষ কয়েকটি নাট্য-মুহূর্তে তাঁরা যথেষ্ট সংযত ও বাঙ্ময়। বান্ধবীর চরিত্রে নাজিমা স্বভাবজ দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। মায়ের চরিত্রে নিরূপা রায়, মনভোলা প্রফেসরের চরিত্রে নাজির হোসেন, ভৃত্য নারায়ণবেশী অসিত সেনের অভিনয় প্রাণবন্ত। অপর একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অতিথিশিল্পী হিসেবে দেবু মুখার্জি ভালো কাজ করেছেন। ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কৃতী ছাত্র পুণ্য দাসকে একটি ছোটো হাল্কা চরিত্রে বিসদৃশ লাগে। তিনি সম্ভবত অপব্যবহৃত।

সব মিলিয়ে সুবোধ মুখার্জি'র 'অভিনেত্রী' হিন্দী চিত্রজগতের প্রমোদ-উপকরণের ভিড়ে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতি-ক্রম ও সংপ্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত।

## স্টুডিও থেকে

**এই সপ্তাহে রূপসী :** অরুণ রায়-চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিবেশিত এ আর সি প্রোডাকসন্সের বহির্দৃশ্য প্রধান গীতিবহুল ছবি 'রূপসী' রাধা, জ্যোতি, পূর্ণ ও অন্যত্র আজ থেকে সুরু হল। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী। এই ছবির পরিচালনায় অজিত গাঙ্গুলীর যশ ও খ্যাতি আরো বহুগুণ যে বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকবে না। গৌরী-প্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানের সুর দিয়ে-ছেন সুরের যাদুকর অনিল বাগচী। ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে আছেন সন্ধ্যা রায়, কালী ব্যানার্জি, তপেন চ্যাটার্জি, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, বঙ্কিম ঘোষ, জহর রায়, অনুভা ঘোষ, সুলতা চৌধুরী, সুতপা চক্রবর্তী, জুঁই ব্যানার্জি, সমিত ভঞ্জ। ছবির নেপথ্য কণ্ঠে আছেন মানবেন্দ্র মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, অনুপ ঘোষাল, আরতি মুখার্জী, অধীর বাগচী, সুবোধ রায়, আরতি বর্মন প্রভৃতি। বাউল, ভজন, ঝুমুর গান সঙ্গীতের বিশেষ দিক।

**প্রতিবাদ :** বিশ্বজিৎ নিবেদিত ও নিমাই মৈত্র প্রযোজিত আর্ট মুভিজের 'প্রতিবাদ' মিলি পিকচার্স ও দি মিলি ডিস্ট্রীবিউটর্সের পরিবেশনায় রাধা, পূর্ণ ও অন্যত্র আসন্ন মুক্তির পথে। চিত্রনাট্য ও কাহিনী রচনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী। তপেশ্বর প্রসাদ এই ছবিখানির পরিচালনা করেছেন এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ছবিখানির পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দেবেন। যাঁরা সমাজের অপাংক্তেয় বলে পরিচিত, এই ছবির মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠবে। ছবির প্রধান চরিত্রে বিশ্বজিৎ ও মৌসুমী চ্যাটার্জি'র অভিনয় যেমন দর্শকমনে এক নতুন রেখাপাত করবে, তেমনি এ'দের সঙ্গে অভিনয়ে আর যাঁরা পূর্ণ সহ-যোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন—জুঁই ব্যানার্জি, রবি ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী, সুলতা চৌধুরী, অপর্ণা দেবী, পদ্মা দেবী, সুলেখা রায়, হারাধন ব্যানার্জি, মণি শ্রীমানী, গৌর সী, কালীপদ চক্রবর্তী, চিন্ময় রায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও তরুণকুমার প্রভৃতি। সুরারোপ করেছেন শ্যামল মিত্র। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন বিশ্বজিৎ, প্রতিভা ব্যানার্জি ও বনশ্রী সেনগুপ্ত।

# মঞ্চাভিনয়

**'সংগঠনী'র মঞ্চাভিনয় :** বারাসতের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সংগঠনী'র শিল্পীরা কিছুদিন আগে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি পয়সা' মঞ্চাভিনয় করে স্থানীয় নাট্যানুরাগীদের মনে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। বাস্তব জীবন সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই নাটকের পরিবেশনে শিল্পীরা যে স্বাতন্ত্র্যের নজীর রেখেছেন, তা সাধারণতঃ যাত্রার আসরে চোখে পড়েনা। এ ব্যাপারে পরিচালক বরুণ চট্টোপাধ্যায়ের শিল্পবোধ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রায় প্রতিটি শিল্পী চরিত্রোপযোগী অভিনয় করতে পেরেছিলেন বলে সামগ্রিক প্রযোজনায় শৈথিল্য কখনো চোখে পড়েনি। অভিনয়ের ব্যাপারে অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন দিলীপ মৌলিক, তাঁর 'রূপনারায়ণের' চরিত্র চিত্রণ প্রায় প্রতিটি দর্শককেই মুগ্ধ করেছে। 'দিবাকরের' ভূমিকায় বরুণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় হয়েছে প্রাণস্পর্শী, আশুতোষ ঘোষালের 'ভুজংগ নারায়ণ' হয়েছে দৃঢ় অথচ সংযত। 'মৌসুমী'র প্রাণচাঞ্চল্য মুখর হয়ে উঠেছে বেলা মজুমদারের সাবলীল প্রয়াসে, পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শবরী'ও হয়েছে কোমল ও সুন্দর। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন কিরণ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দে, সমরজিৎ দে, প্রীতি দে, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ দে। সংগীত পরিচালনায় প্রাণের স্পর্শ রাখেন প্রবীণ সুরকার শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল। পাগলা কবি চরিত্রে বারীন চট্টোপাধ্যায়ের গান সমগ্র প্রযোজনার একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

**শিল্পী যাযাবরের দুটি একাংক :** উত্তর কলকাতার অন্যতম প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'শিল্পী যাযাবর' অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রমত্ত প্রহসন' ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাহার নামটি রঞ্জনা' একাঙ্ক দুটি মঞ্চস্থ করলেন। গত ২৪শে নভেম্বর রংগনায় অভিনীত এই নাটক দুটি সুপ্রযোজিত। তুলনামূলকভাবে প্রথম নাটকটি সত্যই উচ্চমানের। অভিনয়ে শিল্পী যাযাবরের সমস্ত শিল্পীই আন্তরিক, নিষ্ঠাবান। তবু ওদের মধ্যে হীরক মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ বসু, দীপংকর চট্টোপাধ্যায়, গৌতম বসু ও কৃষ্ণ চক্রবর্তী বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখেন। মঞ্চ ও আলোর কাজ অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের। পরিচালক জগন্নাথ বসু দুটি নাটকেই সার্থক।

**রাহুমুক্ত :** 'আলেখ্য'র শিল্পীরা সম্প্রতি বীরু মুখার্জীর যাত্রাধর্মী নাটক "রাহুমুক্ত" জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বাবুরাম শীল লেন, বহুবাজার-এ পরিবেশন করেন। বিমল ভট্টাচার্য নাটকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন এবং আবহসংগীতের দায়িত্ব সার্থকভাবে বহন করেন উমাপতি শীল। সলিল চ্যাটার্জী, নিশিথ বড়াল, গৌতম মুখার্জী, বিদ্যুৎ মিত্র, লতিকা বসু, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, শ্যামল দে, বেবী সেনগুপ্তা, কুমারী মঞ্জু রায় প্রভৃতি শিল্পীর সুঅভিনয়ে নাটকটি বেশ সফলতা লাভ করে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অমিতাভ চক্রবর্তী, উমাপ্রসাদ ব্যানার্জী, মৃণালকান্তি রায়, অশোক পাইন, সুভাষ বসু, ফটিক সেন, স্বপন ব্যানার্জী, সীতাংশু চ্যাটার্জী ও দিলীপ বড়াল।

# বিবিধ সংবাদ

**৬ষ্ঠ বার্ষিক জেলা শিক্ষাশিবির :** ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পরিচালনায় ইছাপুরে ৬ষ্ঠ বার্ষিক শিক্ষাশিবির আগামী ১৯ ডিসেম্বর '৭০ থেকে ২২ ডিসেম্বর '৭০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৫০০ জন শিক্ষার্থীকে শিবিরে গ্রহণ করা হবে। যোগাযোগ কেন্দ্র : শিবির সংগঠন-সম্পাদক, ৬।১, পঞ্চাননতলা রোড, কলিকাতা-৫৬। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা পর্যন্ত।

**শিল্পী সংস্থা** (সোদপুর, ২৪ পরগণা) আয়োজিত সারা বাংলা অপেশাদার সঙ্গীতশিল্পীদের প্রতিযোগিতায় এবার কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে নৃত্য, তবলা এবং দেশাত্মবোধক গানের প্রতিযোগিতা। বয়স অনুযায়ী প্রতিযোগীদের তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে এবং সংগীতজগতের প্রখ্যাতনামরা বিচারক হিসেবে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিতে সম্মত হয়েছেন। প্রতিযোগিতায় নাম তালিকাভুক্ত করার শেষ তারিখ : ২০ ডিসেম্বর। যোগাযোগ কেন্দ্র : তপন চৌধুরী, মৌচাক, স্টেশন রোড, সোদপুর স্টেশনের পূর্বদিক ও নরেন্দ্রনাথ রায়, ১।১, শম্ভুবাবু লেন, কলকাতা-১৪

**সাংস্কৃতিকী হাওড়া :** কবি অতুলপ্রসাদের জন্মশতবর্ষ পূর্তির প্রাক্কালে তাঁর স্মৃতিচারণার উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিকী হাওড়া একটি একক সংগীতের আসরে শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায়ের গানে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন সম্প্রতি সাঁত্রাগাছির একটি ঘরোয়া আসরে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় পনেরটি গান গেয়েছিলেন। সঙ্গে তবলা ও এসরাজ সহযোগিতা করলেন যথাক্রমে শ্রীকালোবরণ দাস ও শ্রীবারীন মৈত্র। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অতুলপ্রসাদের সংগীত সম্পর্কে আলোচনা।

গত ১১ নভেম্বর টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে হিট প্রডাকশনস নিবেদিত 'নন্দ ডাকাত' ছবির শুভ মহরৎ সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়। সংগীত পরিচালনা করেন অনিল দত্ত। সংগীতাংশে নেপথ্য গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে শ্রীগোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্তা, বুলা সাহা, নবীন শিল্পী তুষার সেনগুপ্ত ও সুরকার অনিল দত্ত স্বয়ং। ছবিটির পরিচালনার দায়িত্বে আছেন শ্রীসমর চৌধুরী। আগামী মাসে ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণের মাধ্যমে নিয়মিত সুটিং শুরু হবে।

## খেলাধুলার কথা

# ক্রিকেটে দ্বিতীয় সোবার্স এবার মহিলা

খেলাধুলার বিভিন্ন বিষয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও কৃতিত্বের কাহিনী প্রায় সমান চমক লাগিয়ে চলেছে। বিশ্ব অলিম্পিক এ্যাথলেটিকসে মেয়েদের রেকর্ডও কমতি যায় না। সাঁতারেও তাদের দক্ষতা পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। হকি, ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল প্রভৃতিতেও মেয়েদের কৃতিত্বের কাহিনী ক্রীড়ামোদীদের অজানা নয়। কিন্তু ক্রিকেটে মেয়েদের দক্ষতার কথা খুব কমই শোনা যায়। তবে মেয়েরাও ক্রিকেট খেলে থাকে। ভারতে মেয়ে ক্রিকেটারদের নাম-ডাক শোনা না গেলেও ক্রিকেটের জন্মভূমি ইংলণ্ড বা অস্ট্রেলিয়ায় মেয়েদের মধ্যে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা অন্য কোন খেলার চেয়ে নগণ্য নয়। ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে পুরুষদের ক্রিকেট খেলা 'ছাই'এর লড়াই নামে জগদ্বিখ্যাত। উভয় দেশের মধ্যে মেয়েদের ক্রিকেট খেলা আন্তর্জাতিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ না করলেও বহুকাল থেকেই (সম্ভবতঃ ১৯৩৪ সাল থেকে) চলে আসছে।

১৯৩৪ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের দশটি সিরিজ খেলা হয়েছে, পাঁচটি ইংলণ্ডে এবং পাঁচটি অস্ট্রেলিয়ায়। মেয়েদের অন্যান্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আপেক্ষার কোন রেকর্ড পাওয়া না গেলেও টেস্টম্যাচগুলির রেকর্ড পাওয়া যায়। এই দীর্ঘকালের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার তালিকায় এমন একটি মহিলার নাম সম্প্রতি লিপিবদ্ধ হয়েছে, দক্ষতায় যিনি কোন পুরুষের চেয়ে কম যান না এবং মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের নাম উচ্চারণ করতে হলে তাঁরই নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য।

এই মহিলার নাম এনিড বেকওয়েল। ১৯৬৯ সালে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট টেস্টে তিনি খেলোয়াড়ের আকাঙ্ক্ষিত 'ডবল' গৌরব অর্জন করেছেন অর্থাৎ এক মরশুমে এক হাজার রাণ করেছেন এবং একশো উইকেট পেয়েছেন।

এনিড ছেলেবেলা থেকেই ক্রিকেটের অনুরাগী এবং অন্যান্য খেলার চেয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতেই ভালবাসতেন। তাঁদের বাড়ীর কাছে একটা খোলা মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলত। তাদের দলে কম খেলোয়াড় হলে তাঁর ডাক পড়তো এবং ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে হুটোপুটি করে খেলতে পারতেন বলে ছোটদের ক্রিকেটে তাঁর সমাদর বাড়ে। এনিডের মা-বাবা উভয়ের দিক থেকে বংশে কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় জন্মায় নি। মেয়ের উৎসাহ দেখে মা-বাবা তাঁদের একমাত্র মেয়েকে ক্রিকেট খেলার সাজ-সরঞ্জাম কিনে দিয়ে সাহায্য করতে থাকেন। তাঁদের নিউ হেড গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমস্ত ছেলেমেয়ের মধ্যে এনিড শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় হয়ে দাঁড়ালেন। অন্যান্য ছেলেরা খেলার প্রয়োজনে তাঁর ব্যাট, প্যাড বা অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম চেয়ে নিত।

চোদ্দ বছর বয়সে এনিড নটিংহ্যামের মহিলা ক্রিকেট ক্লাব—নটস ক্যাজুয়েলসের নিয়মিত খেলোয়াড় হিসাবে স্থান লাভ করেন। এনিড এই সময় বেশ শান্ত ও ধীর মেজাজের ওপেনিং ব্যাট হয়ে ওঠেন এবং রানের দিকে লক্ষ্য না রেখে বেশীক্ষণ টিঁকে থাকাই তাঁর লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এইভাবে খেলতে খেলতে তাঁর ব্যাটও দ্রুত চলতে শুরু করে এবং পরিশেষে তিনি ভাল ব্যাটসম্যান হয়ে ওঠেন।

**শঙ্করবিজয় মিত্র**

১৯৫৭ সালে এনিডের বয়স যখন ১৬ তখন ব্যাটসম্যান হিসাবে তাঁর নাম-ডাক হয়। মেয়েদের ইন্টার-ক্লাব প্রতিযোগিতায় লিস্টারসায়ারের বিরুদ্ধে এনিড ৪৩ রান করেও অপরাজিত থেকে যান। এই খেলায় তাঁর দলের মোট রান ছিল একশো এক। আবার ফিরতি খেলায় এনিড ঐ দলের বিরুদ্ধে ৫৬ রান করে নট আউট ছিলেন। তরুণী ক্রিকেটারের পক্ষে এটা কম কথা নয় এবং মহিলা ক্রিকেট জগতে তাঁর একটি স্থান হবার উপক্রম হয়। ১৯৫৯ সালে এনিড ডার্টফোর্ডের শারীর শিক্ষা কলেজ থেকে স্নাতক হন। সেই বছরেই ইংলণ্ডের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণীদের নিয়ে গঠিত উইমেন্স ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলে স্থান পেয়ে হল্যাণ্ড ভ্রমণে যান। এই পর্যটনে এনিড ভালই ফল দেখান এবং ক্রিকেটের আর একটা দিকের প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়ে। সেটা হল বোলিং। ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার টনি লকের বোলিং দেখে এনিড অনুপ্রাণিত হন এবং লকের ধরনে বোলিং শেখার চেষ্টা করেন। তাঁর ক্লাবের তরফ থেকেই এ বিষয়ে তাঁর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। এনিড একেবারে টনি লকের অনুকরণে বল করতে থাকেন। লক যে কটা স্টেপ নিয়ে বল করতেন, সেই একই সংখ্যক পদক্ষেপে এবং আম্পায়ারকে প্রায় প্রদক্ষিণ করে দৌড়ান পর্যন্ত অনুকরণ করে এনিড বাঁ হাতে স্পিন বল দিতে থাকেন।

আস্তে আস্তে মহিলা ক্রিকেট জগতে এনিড একটা বিশেষ স্থান করতে সমর্থ হন। ১৯৬৩ সালে অস্ট্রেলিয়া পর্যটনের জন্য যে মহিলা দল বাছাই করা হয় তাতে সম্ভাব্য খেলোয়াড়ের তালিকায় এনিডের নাম ওঠে। কিন্তু বাছাই দলের তালিকায় তাঁর নাম বাদ যায়। এর পর ১৯৬৬ সালে নিউজিল্যাণ্ড মহিলা ক্রিকেট দল যখন ইংলণ্ড পর্যটনে আসে এনিডের তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং এনিড সন্তান-সম্ভাবা। কাজেই তখনও ইংলণ্ড দলে তাঁর স্থান লাভ সম্ভব হয় নি। ১৯৬৯ সালেই এনিড বেকওয়েল ইংলণ্ডের টেস্ট টিমে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে গিয়ে প্রথম সফরেই এনিড সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। এই পর্যটনে এনিড ১০৩১ রান ও ১১৮টি উইকেট সংগ্রহ করে মহিলাদের ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অভিনব নজির রেখেছেন।

তন্বী ও খর্বকায় এনিডকে 'ফুল' ক্রিকেটার বলা হয়। খর্বকায় হলেও এ্যাথলেটিকসের সমস্ত গুণের তিনি অধিকারী। সদা সতর্ক, ক্ষিপ্রগতি এই মেয়েটি খেলতে নামলে কোন দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ থাকে না। খেলার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—এই তিন বিভাগে তাঁর সমান দক্ষতা ও অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাঁকে যে কোন দলের সম্পদরূপে পরিণত করে। অস্ট্রেলিয়া সফরে এনিড ২৯ ইনিংস খেলে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা রেখেছিলেন ৩৯·৬, আর বোলিংয়ে তাঁর হিসেব দাঁড়িয়েছে ৫০৪·১-১১৫৩-১১৮-৯·৭। একবার অস্ট্রেলিয়া এবং দুবার নিউজিল্যাণ্ডে—এই তিন দফায় এনিড এক ইনিংসে ৮টি উইকেট নিয়েছেন এবং আর ন দফায় এনিড পাঁচ বা ততোধিক উইকেট নিয়েছেন। তাছাড়া প্রথম টেস্টে আবির্ভাবে

এনিড 'সেঞ্চুরী' করার কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলায় এনিড ১১৩ রান করেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পর পর দুটি টেস্টে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে এনিড সেঞ্চুরী করে মহিলাদের মধ্যে নতুন নজির রেখেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে এনিড যথাক্রমে ১২[illegible] ও ১১[illegible] রান করেন। এই সমগ্র পর্যটনে এনিড [illegible] অর্ধশত রান করেন এবং দশটি ক্যাচ ধরেন।

প্রতি খেলাতেই এনিড তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং তাঁর এই নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যে প্রতিপক্ষের বোলার ও ব্যাটসম্যানরা এনিডকে সমীহ করে চলতে থাকেন। অস্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহে এনিডের দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হয়। অস্ট্রেলিয়াতে ভিকটোরিয়ার বিরুদ্ধে এনিড দলের সর্বোচ্চ রান (৫১) করেন এবং মাত্র ২৮ রান দিয়ে সাতজন ব্যাটসম্যানকে আউট করে দেন। এডিলেডের এক সংবাদপত্র এই খেলার বিবরণ প্রসঙ্গে এনিডকে সোবার্সের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটিকে 'বেকওয়েলের ম্যাচ' বলে অভিহিত করা হয়। এই টেস্টে ইংলণ্ড সাত উইকেটে জয়ী হয়। এনিড এই ম্যাচে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। প্রথম ইনিংসে এনিড ১১৪ রান করেন এবং ৬৮ রান দিয়ে চারটি উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে এনিড ৬৬ রান করে অপরাজিত থেকে যান এবং ৫৬ রান দিয়ে পাঁচটি উইকেট নেন। তাছাড়া খেলা শেষ হবার মাত্র চার মিনিট আগে এই ম্যাচে জেতার জন্য অতিপ্রয়োজনীয় একটি রান সংগ্রহ করে নিজ দলকে বিজয়ী করার গৌরবও এনিড অর্জন করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের পর এইটিই মহিলাদের ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের প্রথম জয়। এনিডের অসাধারণ কৃতিত্বই এই বিজয়ের মূল কারণ বলে উল্লেখ করা হলে কোন ভুল হবে না। এই ম্যাচকে তাই 'বেকওয়েলের ম্যাচ' বলা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে সাফল্যের পর এনিড বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা অলরাউণ্ডাররূপে (চৌকশ) স্বীকৃতি পেয়েছেন। ক্রীড়া সমালোচকেরা তাঁর ব্যাটিং এবং বোলিংকে যে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ক্রিকেটার-এর সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং দ্রুত রান তোলার দক্ষতা নাকি পুরুষদেরও হার মানিয়েছে। স্লো বোলিংয়ে বিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের কাবেল করার ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ বলে তাঁরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। এডিলেডের কাগজে তো তাঁকে মেয়েদের মধ্যে 'সোবার্স' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ পর্যটনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে তাঁর জীবনের বিরাট সম্পদ বলে এনিড নিজেই তা স্বীকার করেন এবং টেস্ট দলে স্থান পাওয়াকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে মনে করেন। নিরহঙ্কার, সাদাসিধে গৃহবধূ এনিড এই গৌরবে দেশের গৌরব বলেই অভিহিত করেছেন এবং এজন্য দলের অধিনায়িকা ও ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরান্তে এনিড স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে নটিংহ্যাম কাউন্টি কাউন্সিল তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সম্বর্ধনা সভায় নটিংহ্যামের মেয়র, অল্ডারম্যান মিসেস জোয়ান কোল, নটিংহ্যাম কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মিঃ আর এ গ্যারেট তাঁকে অভিনন্দন জানান। এনিড নানা প্রতিষ্ঠান ও গুণমুগ্ধদের কাছ থেকে নানা উপহার পান। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে যে বলটি এনিড ব্যবহার করে নিউজিল্যান্ডের বিপর্যয় ডেকে এনেছিলেন সেই বলটি বাঁধিয়ে আবার তাঁকেই উপহার দেওয়া হয়।

ব্রিসবেন টেস্টের চতুর্থ দিনে সকালে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যান ডি'ওলিভিয়েরা উইকেটের পেছনে ক্যাচ তুললে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক মার্স ঝাঁপিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত বলটি ধরতে পারলেন না। ডি'ওলিভিয়েরা ঐদিন ৫৭ রান করার পর ম্যাকেঞ্জির বলে সিম্পসনের হাতে ক্যাচ আউট হয়ে যান।

দর্শক

### ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া: ৪৩৩ রান (কিথ স্ট্যাকপোল ২০৭, ডগ ওয়াল্টার্স ১১২ এবং আয়ান চ্যাপেল ৫৯ রান। জন স্নো ১১৪ রানে ৬ এবং ডেরেক আন্ডারউড ১০১ রানে ৩ উইকেট)

ও ২১৪ রান (বিল লরী ৮৪ রান। সাটলওয়র্থ ৪৭ রানে ৫ এবং স্নো ৪৮ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড: ৪৬৪ রান (জন এডরিচ ৭৯, ব্রায়ান লকহার্স্ট ৭৪, এ্যালান নট ৭৩ ও ডি'ওলিভিয়েরা ৫৭ রান। ওয়াল্টার্স ১২ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩৯ রান (১ উইকেটে)।

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে আয়োজিত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। ব্রিসবেন মাঠে এই নিয়ে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ১০টি টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল অস্ট্রেলিয়ার জয় ৪, ইংল্যান্ডের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ৩। ব্রিসবেনের এই প্রথম টেস্ট খেলাটি ধরে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যে ১০৮টি টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল: অস্ট্রেলিয়ার জয় ৫৫, ইংল্যান্ডের জয় ৪০ এবং খেলা ড্র ১৩।

প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া মাত্র দুটি উইকেট খুইয়ে ৩০৮ রান সংগ্রহ করে। কিথ স্ট্যাকপোল ১৭৫ রান এবং ডগ ওয়াল্টার্স ৫৫ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। এই নিয়ে স্ট্যাকপোল তিনটি টেস্ট সেঞ্চুরী করলেন, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের সূচনা শুভ হয়নি, মাত্র ১২ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৪৩৩ রানের মাথায় শেষ হয়। কিথ স্ট্যাকপোল ৪৫৪ মিনিট খেলে তাঁর ২০৭ রানে ২৫টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী করেন। টেস্ট খেলায় তাঁর এই সর্বাধিক রান (২০৭)। ডগ ওয়াল্টার্স ১১২ রান করেন—টেস্ট খেলায় তাঁর এই ৮ম সেঞ্চুরী। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে স্ট্যাকপোল এবং ওয়াল্টার্স দলের ২০৯ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ হয়—৪৮ মিনিটের খেলায় মাত্র ১৫ রানের বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়ার শেষ সাতটা উইকেট পড়ে যায়। ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৯৯ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৬৫ (৬ উইকেটে)—অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৪৩৩ রানের থেকে ৬৮ রান কম। তাদের হাতে জমা ছিল ৪টে উইকেট।

চতুর্থ দিনে চা-পানের কিছু আগে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪৬৪ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ৩১ রানে এগিয়ে যায়। খেলার বাকি ১২৭ মিনিটে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৫৬ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২১৪ রানের মাথায় শেষ হলে হাতে এক ঘন্টা খেলার সময় নিয়ে ইংল্যান্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৮৪ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। কিন্তু এক উইকেটের বিনিময়ে ইংল্যান্ড ৩৯ রান তুলেছিল। ফলে খেলা ড্র হয়।

### কাউড্রের রেকর্ড

খেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় কলিন কাউড্রে ২৮ রান করে আউট হন। বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে কোন একটি বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত সংবাদে বলা হয়েছে এই ২৮ রান করার সূত্রে কলিন কাউড্রে তাঁর ১০৫টি টেস্ট খেলায় মোট ৭২৫৬ রান সংগ্রহ করলেন এবং ইংল্যাণ্ডের ওয়াল্টার হ্যামণ্ড প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক মোট রানের রেকর্ড (৭২৪৯) ভাঙ্গলেন। কাউড্রের এই ৭২৫৬ রানের মধ্যে বেশ কারচুপি আছে। ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিনটি বে-সরকারী টেস্ট খেলায় কাউড্রে যে ৩২৭ রান করেছিলেন তা ধরেই তাঁর এই ৭২৫৬ রান দাঁড়িয়েছে। কাউড্রের ১০২টি সরকারী টেস্ট খেলায় সংগৃহীত রান সংখ্যা ৬৯২৯। সুতরাং ওয়াল্টার হ্যামণ্ডের মোট ৭২৪৯ রানের রেকর্ড ভাঙ্গতে কাউড্রেকে এখনও ৩২১ রান সংগ্রহ করতে হবে।

### রঞ্জি ট্রফি
### বাংলা বনাম উড়িষ্যা

**বাংলা :** ২৮৬ রান (প্রকাশ পোদ্দার ৫৮, গোপাল বসু ৭২ এবং শ্যামসুন্দর মিত্র ৯৯ নট আউট। অশোক মহান্তি ৪৯ রানে ৩ এবং স্বামী ৭৮ রানে ৩ উইকেট)

**উড়িষ্যা :** ৫১ রান (এইচ ভিজ ১৮ নট আউট। সুব্রত গুহ ২৯ রানে ৭ উইকেট)

ও ১১৩ রান (এইচ ভিজ ৩৬ এবং বি আর রাও ২৯ রান। সুব্রত গুহ ২০ রানে ৫ উইকেট)

ইডেনের রঞ্জি স্টেডিয়ামে অয়োজিত পূর্বাঞ্চলের রঞ্জি ট্রফির খেলায় বাংলা দল এক ইনিংস ও ১২২ রানে উড়িষ্যা দলকে পরাজিত করেছে।

প্রথম দিনের খেলায় বাংলা ৭ উইকেট খুইয়ে ২৬৮ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস ২৮৬ রানের মাথায় শেষ হয়। শ্যামসুন্দর মিত্র ৯৯ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান। উড়িষ্যার প্রথম ইনিংস মাত্র ৫১ রানের মাথায় শেষ হলে তারা বাংলার প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ২৩৬ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৯ উইকেট খুইয়ে ১১৩ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনে মোট ২২টি উইকেট পড়েছিল—বাংলার প্রথম ইনিংসের ৩টে এবং উড়িষ্যার প্রথম ইনিংসের ১০টা ও দ্বিতীয় ইনিংসের ৯টা।

তৃতীয় দিনে খেলার ১৫ মিনিটের মধ্যে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এই দিনের খেলায় উড়িষ্যা একটা রানও সংগ্রহ করতে পারেনি।

বাংলার পেস বোলার সুব্রত গুহ বোলিংয়ে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ৪৯ রানে ১২টা উইকেট পান—প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৯ রানে ৭টা এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২০ রানে ৫টা। এই সূত্রে তিনি রঞ্জি ট্রফির খেলায় মোট ১০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। বর্তমানে তাঁর উইকেট পাওয়ার সংখ্যা ১০৬টি।

### এশিয়ান গেমস্

#### ফুটবল

ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোট ১০টি দেশ অংশ গ্রহণ করবে। এই দশটি দেশকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলানো হবে। গতবারের চ্যাম্পিয়ান ব্রহ্মদেশ 'বি' গ্রুপে, রানার্স-আপ ইরান 'সি' গ্রুপে এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী জাপান 'বি' গ্রুপে খেলবে।

ভারতবর্ষের খেলা পড়েছে 'এ' গ্রুপে। এশিয়ান গেমসের বিগত পাঁচটি আসরে ভারতবর্ষ মাত্র দু'বার স্বর্ণপদক পেয়েছে — ১৯৫১ ও ১৯৬২ সালে।

গ্রুপ 'এ' : ভারতবর্ষ, তাইল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম।

গ্রুপ 'বি' : ব্রহ্মদেশ, জাপান, কম্বোডিয়া এবং মালয়েশিয়া।

গ্রুপ 'সি' : ইরান, ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া।

#### হকি

হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ৯টি দেশকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলানো হবে। গতবারের স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারতবর্ষ 'এ' গ্রুপে এবং রৌপ্যপদক বিজয়ী পাকিস্তান 'বি' গ্রুপে খেলবে। এখানে উল্লেখ্য, এশিয়ান গেমসের হকি প্রতিযোগিতায় এপর্যন্ত পাকিস্তান ২ বার (১৯৫৮ ও ১৯৬২) এবং ভারতবর্ষ ১ বার (১৯৬৬) স্বর্ণপদক বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ 'এ' : ভারতবর্ষ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়া।

গ্রুপ 'বি' : পাকিস্তান, জাপান, হংকং এবং থাইল্যাণ্ড।

### ইস্টবেঙ্গল অ্যাথলেটিকস্

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বার্ষিক অ্যাথলেটিকসে এরিয়ান্স ক্লাব মহিলাদের দলগত এবং পুরুষ ও মহিলাদের ব্যক্তিগত খেতাব জয়ী হয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

#### পুরুষ বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ান : ইস্টবেঙ্গল ক্লাব (৭২ পয়েন্ট)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান : রঞ্জিৎ শেঠ (এরিয়ান্স) (১০ পয়েন্ট)

#### মহিলা বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ান : এরিয়ান্স (৩৪ পঃ)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান : গোপা ঘোষ ও তৃপ্তি ঘোষ (এরিয়ান্স) — ৮ পয়েন্ট

#### বালক বিভাগ

দলগত চ্যাম্পিয়ান : বাটা স্পোর্টস (১৭ পঃ)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান : তুষার গুণ (কৃষ্ণনগর এ সি, নদীয়া) — ৮ পয়েন্ট।

### ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল

১৯৭১ সালের ক্রিকেট মরশুমে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে বের হবে। ইতিপূর্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল দু'বার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করেছে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ২ তারিখে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি জামাইকায় পৌঁছবে। সফরের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ৫ই ফেব্রুয়ারী জামাইকা দলের বিপক্ষে এবং শেষ ম্যাচ শুরু করবে ১৩ই এপ্রিল (কুইন্স পার্কে ৫ম অর্থাৎ শেষ টেস্ট ম্যাচ)। চারটি টেস্ট ম্যাচ ছাড়া আরও কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর খেলায় রবিবারও খেলার দিন হিসাবে ধার্য করা হয়েছে।

#### টেস্ট খেলার নির্ঘণ্ট

| | | |
|---|---|---|
| ১ম (সাবিনা পার্ক) | : ফেব্রুয়ারী | ১৮—২৩ |
| ২য় (কুইন্স পার্ক) | : মার্চ | ৬—১১ |
| ৩য় (বোর্দা) | : মার্চ | ১৯—২৪ |
| ৪র্থ (কিংস্টন) | : এপ্রিল | ১— ৬ |
| ৫ম (কুইন্স পার্ক) | : এপ্রিল | ১৩—১৮ |

এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট আসরে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং পাকিস্তান—এই চারটি দেশের বিপক্ষে ভারতবর্ষ জয়ী হয়েছে. কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে আজও হারাতে পারেনি।

#### টেস্ট খেলার ফলাফল

| স্থান | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী | ভারতবর্ষ জয়ী | খেলা ড্র |
|---|---|---|---|
| ভারতবর্ষ | ৬ | ০ | ৭ |
| ওয়েস্ট ইণ্ডিজ | ৬ | ০ | ৪ |
| মোট | ১২ | ০ | ১১ |

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আর শক্তিদায়ক পুষ্টি যোগানো আরেক জিনিষ

আর কেমন মজা কোরে চিবিয়ে খেতে খেতে সেই পুষ্টিলাভ করা যায়। পার্লে গ্লুকো বিস্কুটে দুধ, গম, আর চিনির যাবতীয় উপকারিতা পাওয়া যায়— প্রোটিনে আর ভিটামিনে একদম ভরপুর।

তাইতো

বাচ্চাদের পক্ষে সবিশেষ উপকারী

ভারতে সর্বাধিক বিক্রীত বিস্কুট

everest/949d/PP bn

যে পাতা-চায়ের
সব চেয়ে বেশী বিক্রি
রেড লেবেল
মানে, অনেক বেশী কাপ আর সত্যিই
Brooke Bond Tea
Red Label

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 18th December, 1970 শুক্রবার, ২রা পৌষ, ১৩৭৭ 40 Paise

## সূচীপত্র





## নিয়মাবলী

### লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

### এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

### গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

### চাঁদার হার

| | কলিকাতা | মফঃস্বল |
|---|---|---|
| বার্ষিক | টাকা ২০·০০ | টাকা ২২·০০ |
| ষাণ্মাষিক | টাকা ১০·০০ | টাকা ১১·০০ |
| ত্রৈমাসিক | টাকা ৫·০০ | টাকা ৫·৫০ |

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

# চিঠিপত্র

## আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন

চতুর্থ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন হচ্ছে দিল্লীতে—এই সংবাদটি সংবাদপত্রের ভেতরের কোন পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত আকারে দেখেছিলাম। তারপর নভেম্বরের ১৬ থেকে ২০ পর্যন্ত ৫ দিন চলে গেছে; আর কি কোন সংবাদ দেখেছি? উল্লেখযোগ্য নিশ্চয়ই নয়। না, আমি হলপ করে বলতে পারি, কোন সংবাদপত্রই একমাত্র কোন পূর্ণ পৃষ্ঠা নষ্ট করেন নি। এমন কি, কোনখানেই একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বা আলোচনাও চোখে পড়েনি। দোষটা কার, আমার জানা নেই। আমাদের একটা বৈশিষ্ট্যই বোধহয় এই যে, সম্মেলন যখন হচ্ছে—তখন দিব্যি সব ভাল ভাল কথা, বড় বড় পরিকল্পনা—কিন্তু অন্যত্র আর সব নীরব। সম্মেলনের মানুষগুলোও অন্যথায় নীরব! 'অমৃত' সম্পাদককে ধন্যবাদ যে, বিলম্বে হলেও এ-সম্পর্কে একটা আলোচনা প্রকাশ করলেন। চার্বাককেও আন্তরিক অভিনন্দন যে, তিনি শ্রম স্বীকার করে বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত জানার সুযোগ দিলেন।

'চার্বাকে'র এই আলোচনা পড়ে মনে হ'লো, আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন একটা গালভরা বুলি নয়, দুই মহাদেশের একালের জ্ঞানীগুণী বরিষ্ঠ সারস্বত সাধকদের জীবনাচরণ ও চিন্তাভাবনাকেই তাঁরা এই সম্মেলনের মাধ্যমে রূপদান করতে ইচ্ছুক। একদা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে-ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (পারস্য যাত্রী দ্রষ্টব্য), এ-কালের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যে সে গুরুত্ব স্বীকার করেছেন সেটা সুখেরই কথা। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মুলকরাজ আনন্দ, মিশরের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ইউসুফ এল সেবাই, ডঃ ভিয়েৎনামের তো হোয়াই, দঃ ভিয়েৎনামের লেখক ফান্ তু, দঃ আফ্রিকার লেখক আলেক্স লেগুমা সেনেগা'লর সমালোচক জাঁ মেইরি, ঘানার আপ্রোন্তি জোয়া এশ্লিক প্রমুখ বিখ্যাত সব লেখকগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে সাহিত্যের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ভিয়েৎনামের দুই প্রান্তের প্রতিনিধিই রবীন্দ্রনাথের কথা বলেন এবং আফ্রিকার উপর তাঁর কবিতার উল্লেখ করেন। সম্মেলনের মূল সম্পাদক ইউসুফ এল সেবাই নাকি বলেছেন, 'লেখকদের দায়িত্ব মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে কম নয়।' তাঁর বক্তব্যটা ভারতের মাটিতে সম্ভবত মাঠে মারা যাবে। তেমনি আমরা কি খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করব, দঃ ভিয়েৎনামের লেখক ফান তুর বক্তব্য, 'আমাদের ভিয়েৎনামের লেখকরা খুব ভালভাবেই জানেন যে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে জীবন ও অস্তিত্ব জড়িত। আমি এ কথা বলতে গিয়ে গর্ববোধ করছি যে, দেশের এই পরিস্থিতিকে লেখকরা যথার্থভাবেই আমাদের সাহিত্যে তুলে ধরেছেন।'

শচীন বিশ্বাস
কৃষ্ণনগর

(২)

আপনাদের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'অমৃত'তে গত ১৬—২০শে নভেম্বর, '৭০ তারিখগুলিতে নোতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত '৪র্থ আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন' প্রসঙ্গে প্রবন্ধ পড়ে খুব আনন্দিত হলাম। সারা ভারতের প্রগতিবাদী লেখকদের এত বড় সম্মেলন আগে আর ভারতে হয়নি। আজকের জীবনের নবমূল্যায়নে এ-সম্মেলনের মূল্যও নোতুন। বাংলাদেশের আর কোন সুপ্রচারিত পত্রিকায় এবারের নোতুন দিল্লীর আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের বিষয়ে এখনো কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি। দুঃখের কথা।

বলা বাহুল্য, অমৃতের আলোচনাটি যথেষ্ট সময়োচিত হয়েছে। সেজন্যে লেখক এবং 'অমৃত'কে ধন্যবাদ।

বীরেন্দ্র বসু
কলিকাতা-১০

## বৈকুণ্ঠের খাতা সম্পর্কে

গত ১১ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার 'বৈকুণ্ঠের খাতা' শীর্ষনামের পুস্তক আলোচনায় গ্রন্থদর্শী কর্তৃক স্বনির্বাচিত সংকলন গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু উক্ত আলোচনায় তথ্যগত কিছু ত্রুটির মধ্যে অন্তত একটি ভ্রম সংশোধনের জন্যে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অমৃতে'র অগণিত পাঠক-পাঠিকার কাছে এই সঠিক তথ্যটি পরিবেশন করলে বাধিত থাকবো।

আলোচনার যেখানে বলা হয়েছে যে ৫০ জন কবি নিয়ে শান্তনু দাস এ গ্রন্থটির কাজ আরম্ভ করেছিলেন পরে সুপ্রেন্দু সরকারের সহযোগিতায় তার বৃহৎ রূপায়ণ এবং তাতে ৬৬ জন কবি সংকলিত হয়েছেন, প্রকৃত তথ্য তা নয়। কারণ সুপ্রেন্দু বাবুই একটি কবিতা সংকলন করার অভিপ্রায় নিয়ে আমার কাছে আসেন। সংকলনের পরিকল্পনা, রূপায়ণ যোগাযোগ আমার হলেও মূল সূত্র কিন্তু তিনি। আমরা গোড়াতে পঞ্চাশ জন কবি নিয়ে কাজ সুরু করি এবং পরে পুব-বাংলা ও 'স্মরণ' বিভাগ যোগ করে শেষ পর্যন্ত তা দাঁড়ায় ৬৬তে। পরে সংকলনের শ্রীবৃদ্ধিতে শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আসেন ডঃ অমিয়কুমার সেন, তাম্রাড় সরস্বতী প্রেসের মহেন্দ্র দত্ত, জীবপ্রিয় গুহ, বন্ধুবর মিহির দাস। বইয়ের আশাতীত সাফল্যের সোপানে দাঁড়িয়ে এ'দের কথা ভুললে চলবে কি করে? সাক্ষাৎকার রচনায় এ সব তথ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। আশা করি পত্রালাপের ত্রুটি মার্জনা করবেন। আপনাদের পত্রিকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আস্থা রেখে বক্তব্যটি পত্রস্থ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শান্তনু দাস
সম্পাদক স্ব-নির্বাচিত

## ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র

২২শে আশ্বিনের অমৃতে মানসী মুখোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধ 'ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র' পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম। লেখিকাকে এ প্রবন্ধ লিখতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর এ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। আজকের দিনে যখন আমরা সর্বনাশা প্রাদেশিকতায় পীড়িত, তখন তাঁর লেখা এ ধরনের প্রবন্ধ যে পারস্পরিক সম্পর্ককে সম্প্রীতিবদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করবে তা খুবই স্বাভাবিক। লেখিকাকে এজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি 'অমৃত'-র পাতায় এ ধরনের প্রবন্ধ আমরা আরও দেখতে পাব।

পার্বতী সাহা
কুচবিহার।

## রাজার শেষ ঘুম প্রসঙ্গে

আপনাদের পত্রিকায় মাঝে মাঝে বেশ ভাল গল্প বেরুচ্ছে—অনন্য, চলতি ধারার ব্যত্যয়, মৌলিক, নূতন প্রতিশ্রুতিতে ভাস্বর। গত ২৩শে অকটোবরের (২য় খণ্ড ২৪শ সংখ্যা) পত্রিকায় এমন একটি গল্প পড়লাম, মানব সান্যালের 'রাজার শেষ ঘুম'। গল্পের স্টাইলের মধ্যে নতুনত্ব, বিষয়ের মধ্যেও রয়েছে নবতর বক্তব্য, অথচ সবই স্বাভাবিক, গল্পের সাধারণ প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়েই অভিব্যক্ত। কোথাও কোন চমক সৃষ্টির প্রয়াস নেই। সব মিলিয়ে গল্পটি সুন্দর। এমন গল্প আমাদের ভাবায়, এবং পড়বার পরও তার রেশ মনের মধ্যে তরঙ্গিত হতে থাকে। লেখকের আরও কিছু গল্প আপনাদের পত্রিকায় পড়েছি—চাঁদের হাট, পাপ,

# চিঠিপত্র

আয়নার মুখ প্রভৃতি। সেগুলিতেও সম্ভাবনা ছিল, বর্তমান গল্পটিতে সে সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল। আমরা তাঁর কাছ থেকে আরও ভাল গল্প আশা করছি।

ঝরণা বসু
বগুইআটি,
কলকাতা—৫৯

(২)

১০ম বর্ষ ২য় খণ্ড ২৪ সংখ্যায় (৬ই কার্তিক, ১৩৭৭ সাল) প্রকাশিত মানব সান্যালের 'রাজার শেষ ঘুম' গল্পখানি পড়লাম। ইতিপূর্বে ছোটগল্পে নর ও নারীর সম্পর্ক নিয়ে তাঁকে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোরতে দেখেছি। এ গল্পটি অবিশ্যি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের, বাঁধাধরা পথ নেয় নি। পরমেশ সেনের গগনচুম্বী লোভ এবং তার অপরাধ-প্রবণ মনের যে বিশ্লেষণ তিনি স্বল্পপরিসরে করেছেন সেটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। আমার মতে এ গল্পটির অন্যতম আকর্ষণ পরমেশ সেনের 'psycho-analysis' এবং fantasy'র ব্যবহার। পরমেশ সেনের অন্তিম মুহূর্তের বর্ণনা এবং সেই প্রাচীন ঘড়িটার ঢং ঢং আওয়াজ 'Marlowe'র Dr. Faustus-এর শেষ soliloquy টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে কতকগুলি শব্দপ্রয়োগ অবিশ্যি আসল সুরটিকে বহুলাংশে ব্যাহত করেছে। আমার মনে হয় এই বিশেষ গল্পটিতে 'শালা পরমেশের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দাও', 'ব্যাঙ্কে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা' (রাশি রাশি বললে কি ক্ষতি হোত?), 'তখনই ওটার (ঘড়িটার) সারাদেহে চাঁদের মা বুড়ীর হিজিবিজি মুখ আঁকা' (ছেলেমানুষী বর্ণনা বলে মনে হয় না কি?) ইত্যাদি বাক্যগুলি প্রয়োগের ব্যাপারে মানববাবু কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলম্বন কোরলেও পারতেন। তবে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এবং ভাষার সার্থক প্রয়োগে 'রাজার শেষ ঘুম' মানব সান্যালের একটি সার্থক রচনা।

সুহাসকুমার বিশ্বাস
উলবেড়িয়া
হাওড়া

## অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ

অমৃত পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। পাঠকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ভাল-মন্দ বক্তব্যের স্থান চিঠিপত্রে দেখতে পাই বলে আমিও কিছু বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করছি। সূচীপত্রের কিছু কিছু বিষয়ে স্বাদ পাই আবার কিছু কিছু বিষয়ে বিস্বাদ লাগে।

অমৃত পত্রিকায় আমাকে আকর্ষণ করে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'সাহিত্যের খবর', 'নতুন বই', নতুন লেখকদের গল্প ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা-মূলক বিভাগগুলি। বিশেষতঃ ২৬ সংখ্যায় শারদ সাহিত্য, শারদ সাহিত্য পরিক্রমা, বইকুন্ঠের খাতায় মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ক লেখাগুলি পড়ে নতুন নতুন পত্র-পত্রিকার ও লেখক-লেখিকার খবরাখবর জানা যায়। তাছাড়া পূজার কোথায় কে কেমন লিখলেন তারও একটা ইমেজ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ গ্রন্থদর্শী মফঃস্বলের তরুণ ও নতুন লেখক-সম্পাদক-দের যে চিত্র অংকন করেছেন তা প্রশংসা ও সাহসের পরিচয় রাখে। অমৃত পত্রিকা যদি এভাবে প্রকৃত সমস্যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে তবে সাহিত্য জগতে ছোটখাট এক বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। শুধু তাই নয় কলকাতা ও মফঃস্বলের নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা ও তাদের লেখক সম্পাদকদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যেমন তুলে ধরছেন তেমনি তুলে ধরলে আগামী যুগের লেখক সাহিত্যিকদের কাছে অমৃতের এক বিশেষ ভূমিকা থাকবে।

অমৃত পত্রিকায় বিস্বাদ লাগে 'এই আমাদের দেশ', 'নিকটেই আছে', 'মনের কথা' ও 'মুখের মেলা' বিভাগগুলি। বিষয়-বস্তু যাই হোক বড্ড দুর্বলভাবে উপ-স্থাপিত করা হয়। জম্বর সাহেবও ভেজালে চলছেন। তাঁর ভক্ত পাঠক হয়েও বলছি তাঁর লেখায় একঘেয়েমি, পৌনঃপুনিকতা ও নানা মুদ্রাদোষ দেখা দিয়েছে। তাছাড়া পত্র-পত্রিকার সমালোচনাকালে কয়েকজন নামী-স্বল্পনামী লেখকদের নাম করে 'আরো অনেকে' বলে অন্যদের অবজ্ঞা করা হয় কেন? একটি নাম প্রকাশের জন্য একজন লেখকের লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা বা সুযোগ পেতে কত সুবিধা হয় তা কি জানেন না? আশা করি ভবিষ্যতে এ ধরনের কৃপণতা করবেন না। শুধু অনুরোধ অমৃত পত্রিকা যেন অমৃতই পরিবেশন করে, স্বনামে সার্থক হয়ে ওঠে।

সত্যানন্দ গুহ
দক্ষিণ চাতরা,
চব্বিশ পরগণা।

## 'তুলসী চরিত' প্রসঙ্গে

আমরা দুজনে বাংলাদেশের নামকরা কয়েকখানা সাপ্তাহিক ও মাসিক নিয়মিত পড়ে থাকি। কিন্তু স্বাদ বদলের ক্ষেত্রে "অমৃত"র সঙ্গে কারুরই তুলনা হয় না। কয়েকটি রমণীয় সংযোজনে "অমৃত" অপূর্ব হয়েছে। বিশেষ করে বলতে গেলে, প্রথমেই বলতে হয় শ্রীননীমাধব চৌধুরী মহাশয়ের লেখা "তুলসীচরিত"। বহুদিন এইরূপ সুন্দর লেখা বাংলা সাহিত্যে পড়ি নি। সবচেয়ে দুঃখ লাগছে এই লেখকের আরো কোন লেখা এর আগে পড়িনি ভেবে। শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা-নিবেদন করি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না জানিয়ে পারছি না, তা হোল, প্রায়ই সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি তাদের নিজেদের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যেই তাদের উপন্যাস, গল্প, কবিতা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু "অমৃত" নিয়মিত নতুন লেখক-লেখিকাকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, এবং এই সমস্ত নবাগত, নবাগতারা যথেষ্ট সাহসী এবং শক্তিমান। তাই আমরা সম্পাদক মহাশয়কে জানাই অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা।

গোপাল বসু
অমল দস্তরায়
ভবানীপুর, খড়্গপুর

(২)

আপনার সম্পাদিত 'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন অনুরাগী। সব সময়েই আপনারা সুন্দর রচনার অর্ঘ সাজিয়ে 'অমৃত'কে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। এবারও কিছুদিন থেকে ননীমাধব চৌধুরীর অনিন্দ্যসুন্দর উপন্যাস 'তুলসী চরিত' পড়ছি, ভাবছি, কখনো বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছি। প্রতিবারের সংখ্যা হাতে পেলেই রুদ্ধনিশ্বাসে পড়তে শুরু করি, এমন সুন্দর রচনা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবার ভয়ে আস্তে আস্তে পড়ি, তবুও একসময়ে শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী সংখ্যার দিন গুণি। সাত্যকথা বলতে কি এমন একটি মৌলিক নতুন স্বাদের বাস্তবধর্মী রচনার তুলনা হয় না বর্তমান যুগে। দেবাশিস আমার কাছে একটি অদ্ভুত চরিত্র। লেখক দেবাশিষের মুখ থেকে জীবন অর্থাৎ লাইফ, রিলিজিয়ন, সিভিলাইজেশন, মোরা-লিটি সম্বন্ধে মহামূল্য কথা বলেছেন, যেগুলো সুধী পাঠকসমাজের মনে স্থায়ী ছাপ এঁকে দেবে। এমন একজন শক্তিশালী বাঙালী লেখকের জন্য বাঙ্গালী আমরা গর্ব অনুভব করি। নমস্কার জানাই ও সেই সংগে আশা করব উপন্যাসটির সুন্দর সমাপ্তি।

অশোক চক্রবর্তী
জয়টেশ্বর, নদীয়া

# শাদা চোখে

একদা গান্ধীজি এই পশ্চিম বাংলার কই 'লবণ সত্যাগ্রহ' করেছিলেন। দশ্য ছিল বাঙালী তথা ভারতবাসীর া নামমাত্র মূল্যে 'নুনের' সংস্থান করা। লকার দিনে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন এই ভাগ্য দেশের মানুষকে লবণ পর্যন্ত রী করতে দিত না, যদিও অপর্যাপ্ত সম্পদ জনতার আয়ত্বের মধ্যেই ছিল। ন্ত থেকে লবণ আসত, আর চড়া দামে ুমাত্র 'নুন-ভাতের বাঙালী' ালীকে সেই লবণ খরিদ করে নিবৃত্তি করতে হোত। গান্ধীজির াগ্রহ সেদিন নব-দিগন্তের দ্বার াটন করেছিল—বাঙলায় লবণ তৈরী ু হোল। সেই থেকে এই নিত্য-াজনীয় দ্রব্যের মূল্য শত উত্থান-পতনের ও একই জায়গায় স্থির ছিল। কিন্তু ত দু' এক বৎসরের মধ্যে এর মূল্যও গত বাড়তির দিকে এবং আজ সেটা য়েছে ২৬ পয়সা কিলো। শুধু তাই কখনও কখনও বাজারে আবার দ্রব্যটি ন্ত হয়েও ওঠে। আর সেই ফাঁকে ার ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়। হালফিল এই । ঘটেছে।

একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা আর দকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির গগন-মূল্য বৃদ্ধি—এই দুই সমস্যার াতিঘাতে বঙ্গবাসীর জীবন আজ য় হয়ে উঠেছে। লবণের প্রসঙ্গটি াই উত্থাপন করার কারণ হচ্ছে, হিক জীবনে লবণ অপরিহার্য, কিন্তু ন সামান্য মূল্যের বিনিময়ে এই ট পাওয়া যেত বলে এর তেমন কদর না। কিন্তু এর পেছনে যে রাজনৈতিক াস আছে তার মূল্য অনেকখানি। গত দেশপ্রেমিকের অশ্রুসজল কাহিনী যখন সত্যাগ্রহের সঙ্গে বিজড়িত। আজ দেশের নেতৃবর্গ ঐ ঐতিহাসিক মর মর্যাদার স্মারক হিসাবে লবণের ায়ত্বে রাখতে পারলেন না বলেই হয়। তাই এই অতি সামান্য অথচ প্রয়োজনীয় বস্তুটির কথা উল্লেখ া।

াজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যেই এই অবস্থা অবসানের উপায় নিহিত।

একথা মেনে নিয়েও বলতে হয়, বর্তমান প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও এ ব্যাপারে কম নয়, কিন্তু অদ্যাবধি অনুরোধ ও আবেদন ছাড়া সক্রিয় কোন পন্থাই গ্রহণ হয় নি। ফলে, বিপর্যস্ত বাঙালী জীবনে আরও অভিশাপ নেমে এসেছে। আবহাওয়া ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

ঋতু পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার রূপ বদলায় বাঙালী জীবনে নয়া নয়া পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নতুন ধানে নবান্নর গানে যখন আকাশ বাতাস ধ্বনিত হয় তখন সুজলা-সুফলা বাংলার মাঠে ঘাটে আবার সবুজের আস্তরণ পড়ে। নলেন-গুড়ের গন্ধে বাতাস মধুময় হয়—শীত তার সম্ভোগের উপকরণ নিয়ে হাজির হয়। হাটে বাজারে সবুজের মেলা বসে।

এবারও যে সে মেলা বসে নি তা নয়। কিন্তু বাঙালীর মুখে কই হাসি ত ফুটছে না। কেন এমন হল—উত্তর কে দেবে? এই মরশুমে শাক-সব্জী এবং অন্যান্য তরিতর-কারির দাম শুনলে কে না আঁৎকে ওঠে। সারা বছরের কৃচ্ছসাধনের পর মানুষ এই সময়টার দিকে চাতকের মত চেয়ে থাকে। কিন্তু বাঙালী এবার দারুণ আঘাত পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যে এর কোন সুরাহা হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

আলু, কপি, কড়াইশুঁটি, বেগুন, মুলো এমন কি শাক পর্যন্ত যে দামে বিক্রি হচ্ছে, সাধারণ মানুষের তা ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। যাঁরা 'সাকার' আছেন তাঁদের কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি হয় নি এমন নয়, কিন্তু যা বৃদ্ধি হয়েছে তা কোনক্রমেই বাজারের পণ্যের মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য অনেকে হয়ত বলবেন এবারের অকাল বর্ষা উৎপাদন ব্যাহত করেছে বলে রবি-শস্যের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ফলে পর্যাপ্ত উৎপাদন না হওয়াতে চাহিদা পূরনে ঘাটতি পড়ায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। সমদর্শী' এই যুক্তি মোটেই মানতে রাজী নয়। কেননা এ যুক্তির সারবত্তা নেই। প্রসঙ্গক্রমে আলুর কথাই ধরা যাক। গত বৎসর এই সময়ে আলু ত্রিশ পয়সা থেকে সুরু করে পঞ্চাশ পয়সার মধ্যে বিক্রি হয়েছিল। যারা আলুর ব্যবসা করেন তাঁরা ত ২৫ পয়সা করে আলু কিনে কোল্ড স্টোরেজে ভর্তি করে রেখেছিলেন। সেই আলু এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে মজুত আছে। আর ঐ ২৫ পয়সা করে কেনা আলু ঠান্ডা ঘরের মহিমায় এই সেদিন পর্যন্ত ১-৬০ পয়সায় বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। ঐ পুরনো আলু যতক্ষণ স্টক শূন্য না হচ্ছে ততক্ষণ বাজারে নতুন আলু আমদানী সীমিত করে রাখা হবে। এটাই হচ্ছে ব্যবসার রীতি—মুনাফা শিকারের পন্থা। চাহিদা পূরনে যে ঘাটতির কথা বলা হচ্ছে তা মুনাফা লুঠবার একটি প্রচার কৌশল মাত্র। এই ঠান্ডা ঘরের দৌলতে সারা বছর চড়া দামে সমস্ত মরশুমী ফসল—কোলকাতায় পাওয়া যায়। কিন্তু 'ঠান্ডা ঘরকে' ঠান্ডা করার মত কোন ব্যবস্থা অদ্যাবধি অবলম্বিত হয় নি।

কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ করার জন্য স্বর্গত ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে যথেষ্ট সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল পচনশীল উদ্বৃত্ত মরশুমী ফসল মজুত রেখে সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা, এবং মানুষকে যাতে চড়া দামে মরশুমের পরেও এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য খরিদ করতে না হয় তার ব্যবস্থা করা। কৃষকরাও যাতে 'distress sale' -এর হাত থেকে রক্ষা পায় এবং সমবায়ের মাধ্যমে ফসলের উপযুক্ত ও ন্যায্য উৎপাদন মূল্য লাভ করতে পারে সেদিকে নজর রাখা। কিন্তু ক্রমেই তাঁর সেই উদ্দেশ্যকে দুষ্ট ব্যবসায়ীরা বানচাল করে দিয়েছে এবং বর্তমানে ঐ ঠান্ডা ঘর কুক্ষিগত করে বাঙালী জনতাকে প্রায় ঠান্ডা করে ফেলেছে।

বিগত যুক্তফ্রন্টের আমলে এই 'ঠান্ডা ঘরকে' সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করবার জন্য বিধানসভায় একটি বিল উত্থাপনের কথা হয়েছিল এবং শুধু তাই নয়, একটি খসড়াও অনুমোদিত হয়েছিল। যে কোন কারণেই হোক সে বিল আর উত্থাপিত হয় নি, ঠান্ডা ঘরেই থেকে গেছে। আর জনতার পকেট কেটে অসাধু ব্যবসায়ীরা ভূতের নৃত্য করে চলেছে। বর্তমানের প্রশাসকগণ এত আলোড়ন ও বিক্ষোভ সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত সেই ঠান্ডা ঘর

নিয়ন্ত্রণকারী বিলটিকে নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে হুঙ্কার দিচ্ছেন মাত্র, কিন্তু কাজের কাজ কিছু করছেন বলে ত মনে হয় না।

সেদিনও রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীবি বি ঘোষ সর্ষের তেল ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে তেলের দামটা জনতার ক্রয়-ক্ষমতার আয়ত্তের মধ্যে রাখেন। ক্রমাগত দাম বৃদ্ধিতে ঘোষ মহাশয় বিচলিত হয়ে সেদিন এক সম্মেলন বা সভা—যাই বলুন না কেন—ডেকেছিলেন, সেখানে যথারীতি ভাষণদান প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীদের কাছে তিনি এই অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উত্তর আসে, এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য তাঁরা আদৌ দায়ী নন। ভিন্ন প্রদেশ থেকে সর্ষে আমদানী করতে হয়, আর সেখানেই এমন দাম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে তাঁরা কোন ক্রমেই তেলের দাম আয়ত্তে রাখতে পারছেন না। মোক্ষম যুক্তি। অতএব অনুরোধ ছাড়া গত্যন্তর কি? সঙ্গে সঙ্গে হিসাব নিকাশ হল। এই রাজ্যের চাহিদা পূরণের জন্য নাকি দরকার সাড়ে চার লক্ষ টন সর্ষের অথচ উৎপন্ন হয় মাত্র ৫৫ হাজার টন। সুতরাং সর্ষে উৎপাদনের জন্য তাহলে পরিকল্পনা রচনা করা হোক্। এই পরিকল্পনা রচনার জন্য অবশ্য বিল আনার প্রয়োজন নেই, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কবে সেই সর্ষে উৎপাদিত হবে, এবং সেই সর্ষে বীজ থেকে তেল হবে?

সরকারী প্রচেষ্টার কথা শুনে হয়ত বঙ্গবাসী আতঙ্কিতই বোধ করবেন। ভিন্ন প্রদেশ থেকে আমদানী করতে হয় বলে সেই জায়গার কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছ খুশী দাম নেবেন, এই বা কেমন কথা? বাংলায় সর্ষের তেলের চাহিদা বেশী বলে অন্যরা খুশী মত দাম বাড়াবেন, এ ত চলতে পারে না। একই রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ রাজ্যে যদি এই নিম্নস্তরের মুনাফাখোরী ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে, তবে সেটা সমগ্র দেশের ঐক্য ও সংহতির ক্ষতিকারক নয় কি? নিতান্ত প্রাদেশিকতা ছাড়া একে আর কি বলা যায়? আর এই প্রাদেশিকতার জবাবে এই রাজ্যের মানুষ যদি ভিন্ন প্রদেশের লোকেদের চেয়ে চাকুরীতে অগ্রাধিকার দাবী করে, তখন হৈ-চৈ করবার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকবে কি?

আবার ব্যবসায়ীরা যে কারণ দেখিয়ে-ছেন সেটাও পুরোপুরি [illegible] মেনে নেওয়া কঠিন। বাজারে প্রতিদিনই যে দাম বাড়ছে তার কারণ অন্যত্র নিহিত। প্রত্যেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম রোজই বেড়ে চলেছে এবং এই বৃদ্ধির মুখ্য কারণ হচ্ছে অতি মুনাফার লোভ। ব্যবসায়ীরা জানেন, সরকারী প্রশাসন যন্ত্র এখন তথাকথিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারেই সততবিব্রত। ফলত, অন্য দিকে মাথা দেওয়ার মত ফুরসৎ নেই। ব্যবসায়ীরা অতীব ধূর্ত। তাঁরা এই সঙ্কটের কথা বিলক্ষণ বোঝেন এবং এই সঙ্কটকে কাজে লাগিয়ে দু' পয়সা করে নিতে তাঁরা পিছ পা হচ্ছেন না। আর এই মুনাফা শিকারের মনোবৃত্তি আজকে আর শুধু বড় ব্যবসায়ী-দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কারবারি পর্যন্ত এই অতি লোভের শিকার হয়ে পড়েছেন। দাম বাড়বার হেতু জিজ্ঞাসা করলে খদ্দেরের পক্ষে অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কেননা, নানাবিধ জবাবও তারা সাজিয়ে রেখেছে।

এই ভয়াবহ অবস্থার অবসানকল্পে যথোচিত কর্মসূচী গ্রহণ করার প্রয়ো-জনীয়তার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সমস্ত পণ্যের এই আকাশচুম্বী মূল্য বৃদ্ধির ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ ক্রমেই কপর্দকহীন হয়ে পড়ছে। সঞ্চয় ত দূরের কথা, গ্রাসাচ্ছাদনই কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠছে। কিন্তু এই এলাকার মানুষ যদি স্বল্প পরিমাণেও সঞ্চয় করতে না পারে তবে দেশের মূলধন সৃষ্টির কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হতে বাধ্য। আর মূলধন বৃদ্ধি না পেলে জাতীয় আয়ের মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে না। ফলে, অর্থনৈতিক সংকট ক্রমশই তীব্রতর হতে সুরু করবে। গড়পড়তা হিসাব করে যে অঙ্কের কেরামতি দেখানো হয় তা দেশের অর্থনৈতিক চিত্রের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি নয়। একজনের মাসিক আয় ধরুন হাজার টাকা—আর একজনের আয় মাত্র দুশো টাকা। অতএব দু'জনের মাসিক গড়পড়তা আয় ৫৫০ টাকা। এ হিসাব আর চলে না। বাস্তব অবস্থায় মূল্যায়নের কোন মর্যাদা থাকে না। এ যেন চোখ দিয়ে জল টানার মত। কাজেই প্রকৃত অবস্থার মূল্যায়ন করে সঠিক নীতি অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য।

অদ্যাবধি সরকার কোন 'দাম-নীতি' ঘোষণা করেন নি। শুধু বেতন বৃদ্ধি করে পণ্যমূল্যের সঙ্গে ঘোড় দৌড় করেছেন মাত্র। কিন্তু পণ্য মূল্যের নীতি নির্ধারণ হলেই সরকারকে কিছু কিছু মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সেগুলি হচ্ছে, কৃষিনীতি ও ভূমি বন্টনের নীতি। এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের আইন কানুন চালু করবার প্রচেষ্টা চলছে না এমন নয়, তবে সেগুলি কার্যকর করার জন্য যে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার প্রয়োজন, অদ্যাবধি বক্তৃতা ছাড়া তেমন কিছু লক্ষ্য করা যায় নি। যেটুকুও বা করা হচ্ছে তা সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। সমস্যার তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎ।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ শত বাধা সত্ত্বেও যে তড়িতগতিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দুটি আইন পাশ করিয়ে নিলেন—তার শতাংশের একাংশ চেষ্টা করেও যদি কোল্ড স্টোরেজ আইন পাশ করাবার জন্য আগ্রহী হন তবে পশ্চিম বাংলার আপামর জনতা স্বাগতই জানাবে। কেউ বিরোধিতা করতে সাহসী হবেন বলে মনে হয় না। আর এই ঠাণ্ডা ঘর যদি নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা যায় তবে অন্ততঃ পক্ষে আলুর সমস্যাটা সমাধান করা যাবে, একথা স্থির নিশ্চয় বলা চলে। আলু বাঙালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের তালিকাভুক্ত। সরকার যদি আগ্রহী হয়ে সমবায়ের মারফৎ বা নিজস্ব এজেন্টের মারফৎ আলু ক্রয় করে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বাজারে সরবরাহ করতে পারেন তবে এই ভোগ্য বস্তুটি সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে। এবং এই কাজ না করতে পারার কোন হেতু নেই। সব এক সঙ্গে করা হবে এ হেন প্রতিজ্ঞা নিয়ে যদি চলেন, তবে আখেরে কিছুই হবে না। একটা বিষয়ে সরকার অন্তত তৎপর হোন, তাঁদের সদিচ্ছা প্রমাণ করুন, এটাই জনসাধারণের একান্ত অনুরোধ।

—অমরবন্ধী
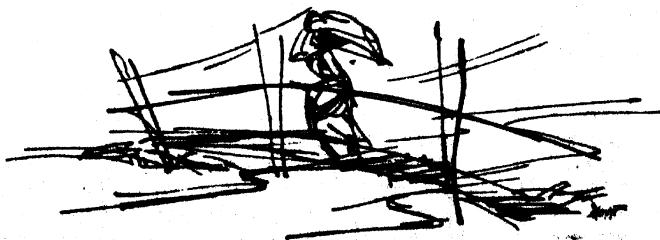
# দেশে বিদেশে

কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর দলের যে অংশ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গিয়েছিল সেই অংশটি দেখতে দেখতে আমেদাবাদ থেকে লখনৌতে, গান্ধীনগর থেকে জওহরনগরে পেঁ'ছে গেল। "দলের অস্তিত্বই যদি না থাকে তাহলে নীতির দাম কি থাকবে?"—শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহের এই একটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে লখনৌতে সদ্যসমাপ্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (বিরোধী) বৈঠকের মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে গেল।

"দল রেখে কি হবে যদি নীতিই বিসর্জন দিতে হয়?"—অল্প যে কয়জন ই পাল্টা প্রশ্ন তুলতে চেয়েছিলেন লখনৌ অধিবেশনে তাঁদের হার হয়ে গেছে। ডাঃ রামসুভগ সিং প্রশ্ন করেছিলেন—"মাত্র বছরখানেক হল তো আমরা ক্ষমতা হারিয়েছি। এখনই ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার না আমরা এত ব্যস্ত হয়েছি কেন?" এই প্রশ্নের জবাব দিলেন শ্রীমোরারজী দেশাই। তাঁর কথা হল, ক্ষমতা হাতে না পেলে দল বাঁচানো যাবে না, দেশ বাঁচানো যাবে না।"

এই ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার অঙ্ক কষেই, অতএব, বিরোধী কংগ্রেস দলের কমিটি স্থির করলেন যে, সমস্ত গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে একযোগে মিলিত কার্যক্রম গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যতখানি সম্ভব বোঝাপড়া করার জন্য এবং উপযুক্ত কর্মপন্থা স্থির করার জন্য কংগ্রেস সভাপতিকে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের" ক্ষমতা দেওয়া হবে। কংগ্রেস সভাপতি অন্যান্য দলের সঙ্গে পরামর্শ করে "আমাদের গণতন্ত্রের সামনে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার মধ্যে নির্বাচনী বোঝাপড়া ও একসঙ্গে কাজ করার উপযোগী ব্যবস্থা গড়ে তোলার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্নের বিচারও আলোচনা করবেন।"

"গণতান্ত্রিক দল" বলতে কাদের বোঝাবে সেকথা প্রস্তাবে অনুল্লিখিত রয়ে গেছে, "নির্বাচনী বোঝাপড়া"র বস্তুত রূপটা কি হবে, এই "বোঝাপড়া" সারা দেশের ভিত্তিতে হবে অথবা স্থানীয় ভিত্তিতে এক এক জায়গায় এক এক ধরনের বোঝাপড়া হবে সেসব কথাও প্রস্তাবের মধ্যে খুলে বলা হয় নি। কম্যুনিস্ট পার্টি, স্বতন্ত্র, জনসংঘ ও মুসলিম লীগের নাম করে এই দলগুলিকে প্রস্তাবিত নির্বাচনী বোঝাপড়ার বাইরে রাখার জন্য তিনজন সদস্য একটি সংশোধন প্রস্তাব এনেছিলেন। সেই প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। কাদের সঙ্গে কি ধরনের বোঝাপড়া হবে, বোঝাপড়া করার জন্য দলের তরফ থেকে কারা আলোচনা করবেন সে সবই স্থির করবেন দলের সভাপতি।

এই প্রস্তাবের বিরোধীরা শেষ পর্যন্ত বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। বিশেষ করে, গুজরাট, মহীশুর ও পশ্চিম বাঙ্গলার সদস্যরা এতদিন পর্যন্ত যেভাবে মহাজোট গঠনের বিরোধিতা করে এসেছেন তাতে অনুমান করা গিয়েছিল যে, অন্তত এই তিনটি রাজ্য থেকে নির্বাচিত এ-আই-সি-সি সদস্যরা একজোট হয়ে এই ধরনের একটি প্রস্তাব গ্রহণে বাধা দেবেন। কিন্তু জওহরনগরের অধিবেশন মণ্ডপে প্রস্তাবটি যখন ভোটে দেওয়া হল তখন দেখা গেল, তার বিরুদ্ধে পড়েছে মাত্র সাতটি ভোট।

নেপথ্যের সংবাদ হল, দলের হাই-কম্যাণ্ড আশ্বাস দিয়েছেন যে, কোন্ রাজ্যে কোন্ দলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত হবে বা না হবে সে বিষয়ে বিরোধী কংগ্রেস দলের সংশ্লিষ্ট রাজ্য শাখার সঙ্গে পরামর্শ না করে এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এই আশ্বাস পাওয়ার পর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই ও মহীশুরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিলসহ মহাজোট-বিরোধীদের একাংশ তাঁদের আপত্তি প্রত্যাহার করে নেন।

স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসংঘের সঙ্গে জোট বাঁধার প্রস্তাবের আর একজন প্রধান বিরোধী ছিলেন ডাঃ রামসুভগ সিং। তিনিও শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব গ্রহণে বাধা দেন নি যদিও তাঁর সংশয় তিনি এখনও প্রকাশ করে চলেছেন।

এ-আই-সি-সি অধিবেশনে শ্রীমোরারজী দেশাই বলেছিলেন যে, যাঁরা "জাতীয় গণতান্ত্রিক" দলগুলির সঙ্গে সমঝোতার বিরোধী তাঁদের দল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল।

আর কোথাও না হোক, অন্তত শ্রীদেশাইয়ের নিজের রাজ্য গুজরাটে এই প্রস্তাবের বেশ কিছুটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলে মনে হচ্ছে। ঐ রাজ্যে বিরোধী কংগ্রেস দলের শ্রীমনুভাই শাহ্ নিজের দলের নেতাদের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন যে, তাঁরা "আত্মবিনাশ এবং গণতন্ত্র ও ভারতবর্ষের ধ্বংসের জন্য" "নীতিহীন, অপবিত্র ও অকার্যকর পথ" বেছে নিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, কংগ্রেস তার ৮০ বছরের ইতিহাসে যেসব নীতি ও আদর্শের জন্য কথা বলে এসেছে ও লড়াই করেছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। (শ্রীশাহ্ বিরোধী কংগ্রেস দলের ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থায়ী আমন্ত্রিত। কিন্তু তিনি এবার কমিটির অধিবেশনে যোগ দেন নি।)

গুজরাটের মন্ত্রী ও জোট-বিরোধীদের আর একজন মুখপাত্র শ্রীযশোবন্ত মেহ্‌তা দলের নেতাদের এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, পার্টির গুজরাট শাখা একটা আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছে এবং জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে মিতালি করার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ রয়েছে সেটা যদি নেতারা উপেক্ষা করেন তাহলে ঐ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটবে।

সর্বশেষ খবর হচ্ছে শ্রীমেহ্‌তা ও তাঁর একজন সহকর্মী শ্রীচিমনভাই প্যাটেল গুজরাট মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

*

এক সপ্তাহের মধ্যে দুজন সরকারী কর্মচারীকে ও একজন প্রাক্তন সরকারী কর্মচারীকে দুটি পৃথক ব্যাপারে লোকসভার কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করান [illegible]। দশ বছর আগে আর একবার লোকসভার বিশেষ অধিকারভঙ্গের দায়ে [illegible] "ব্লিৎস" পত্রিকার সম্পাদককে সভার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল।
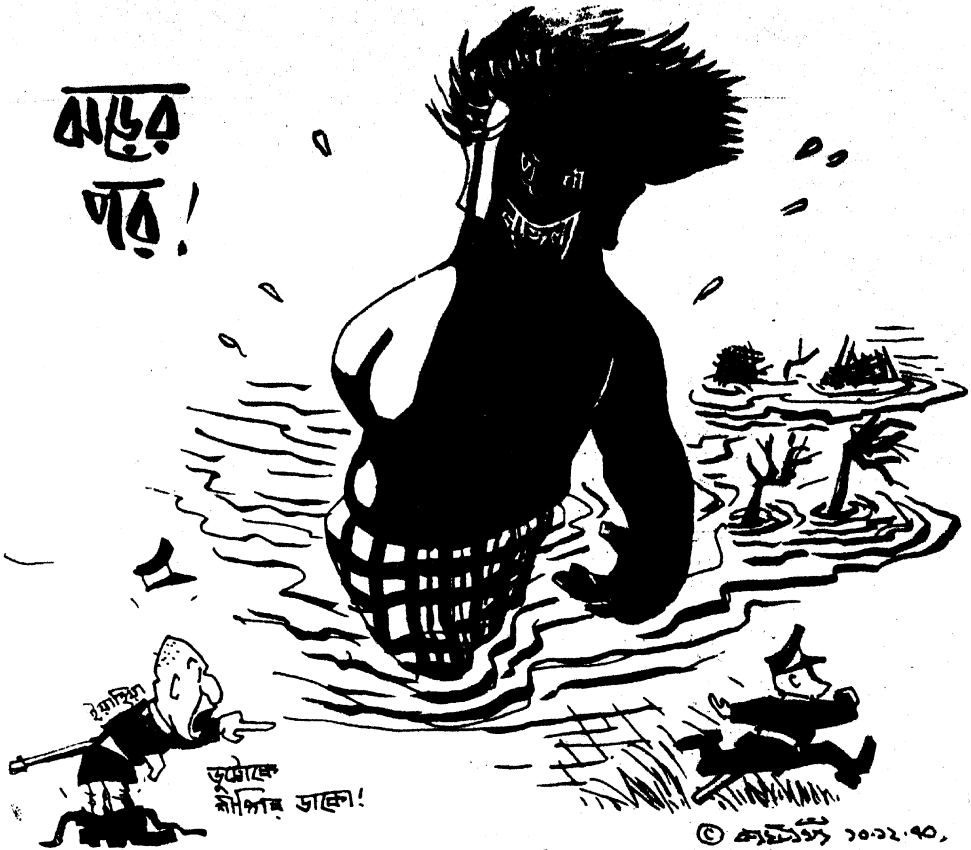
এই নয় বছরের মধ্যে আর কখনও সংসদ এভাবে বিচারালয় হিসাবে কাজ করেন নি।

ভারত সরকারের প্রাক্তন ডেপুটি আয়রণ অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোলার শ্রী এস সি মুখার্জি সংসদের পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটিতে মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে সংসদের অধিকারভঙ্গের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন। লোকসভার স্পীকার শ্রীধীলন তাঁকে তলব করে এনে সেই কথাটা শুনিয়ে দিলেন এবং সভার পক্ষ থেকে তাঁকে সেজন্য তিরস্কার করলেন। এই মিথ্যা বিবৃতির দরুন তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে বলে সভার তরফ থেকে আগেই সরকারকে অনুরোধ জানান হয়েছে।

নাগপুরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শ্রী কে পদ্মনাভন্ ও শ্রী এম পি চৌবের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা ততটা সরল ছিল না। তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু একটা অভিযোগ ছিল। অভিযোগকারী হচ্ছেন লোকসভার স্বতন্ত্র দলভুক্ত সদস্য শ্রী কে এম কৌশিক। অভিযোগের বিষয়বস্তু হচ্ছে গত ২৭ মে তারিখে নাগপুরে ঐ দুজন পুলিশ অফিসার শ্রীকৌশিককে প্রহার ও গালি-গালাজ করেছেন। এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি, সংশ্লিষ্ট দুজন পুলিশ অফিসার অভিযোগটির সত্যতা মেনে নেন নি এবং আরও বড় কথা, কোন সংসদ সদস্য যখন সদস্য হিসাবে কাজ করছিলেন না তখন তাঁকে বাধা দিলে সেটা সংসদের বিশেষ অধিকারভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে কিনা, এই প্রশ্নেরও মীমাংসা হয় নি।

স্পীকারের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপদ্মনাভন্ ও শ্রীচৌবে শুধু এইটুকু স্বীকার করেছেন যে, যেদিন ও যেখানকার ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেদিন সেখানে তাঁরা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৌশিককে মারধর করার কথা স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই না করে তাঁরা শুধু 'সেদিন যা কিছু হয়েছিল' তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সেখানেই প্রসঙ্গটির ইতি ঘটে।

পার্লামেন্টের বিশেষ অধিকারের কোন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট নেই। কোন্ ব্যাপারটা সংসদের বিশেষ অধিকারের মধ্যে পড়ে তা স্থির করার এবং কখন সেই অধিকার ভঙ্গ হল তার বিচার করারও একমাত্র মালিক সংসদই। সংসদের বিশেষ অধিকারের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে এ বিষয়ে তার হাত বেঁধে দেওয়ার জন্য আগেও দাবী উঠেছে। সম্প্রতি পর পর দুবার লোকসভা নিজেদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা প্রকাশ করায় ঐ দাবী আবার নূতন করে বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছে।

*

পাকিস্তানের ২৩ বছরের জীবনের এই সর্বপ্রথম সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে পাকিস্তান রেডিও বলেছে যে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে একটা দ্বিদলীয় ছাঁচ গড়ে উঠল।

এই বিশ্লেষণ একদিক দিয়ে ঠিক আবার আর একদিক দিয়ে বেঠিক। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও পিপলস্ পার্টি ছাড়া পাকিস্তানের অন্যান্য কয়েক ডজন রাজনৈতিক দল ধরাশায়ী হয়ে গেছে। দ্বিদলীয় ছাঁচ বলতে যদি শুধু দুটি দলের আধিপত্য বোঝায় তাহলে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে অবশ্যই দ্বিদলীয় ছাঁচ তৈরী হয়েছে। কিন্তু লোকায়ত্ত শাসনব্যবস্থার 'দ্বিদলীয় পদ্ধতি' কথাটা ভিন্ন আর একটা অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেটা হচ্ছে এই যে, এক দল আর একটির বিকল্প হিসাবে কাজ করে, যাতে এক দল ক্ষমতাচ্যুত হলে অন্য এক দল

তার স্থান নিতে পারে। যেমন, গ্রেট ব্রটেনের রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাব্লিকান পার্টি ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এই অর্থে [illegible] স্তানের নির্বাচনে যা হল তাকে [illegible] পদ্ধতির প্রবর্তন বলা যায় না। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত শেখ মুজি- বর রহমানের আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি একে অপরের বিকল্প নয়। পাকিস্তান যেমন দুটি বিচ্ছিন্ন ভূখন্ডের যোগফল তেমনি এই নির্বাচনের দ্বারা গঠিত জাতীয় পরিষদ হচ্ছে আঞ্চ- লিক দলের সমাহার।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ যে জভাবে সেটা আগে থেকেই অনেকে অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেটা যে এত ড় জয় হবে তা অনেকেরই অনুমানের াইরে ছিল। "মুজিবর ইতিহাস তৈরী রবে।"—ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সেই কথাই ত্য হল। পূর্ব পাকিস্তানের সাইক্লোন- বধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে যে নয়টি নির্বাচন- কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত আছে সেগুলি াদ দিয়ে বাকী ১৫৩টি নির্বাচনকেন্দ্রে াট নেওয়া হয়েছিল। এই ১৫৩টির মধ্যে ৫১টি আসন লাভ করে আওয়ামী ীগ ৩০০ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে রঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। া এখন নিশ্চিত যে, স্থগিত নির্বাচন- লি হলে এবং পূর্ব পাকিস্তানের েদের জন্য জাতীয় পরিষদে যে সাতটি সন নির্দিষ্ট আছে সেগুলির নির্বাচন য় গেলে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী গের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আরও বাড়বে।

আয়ুব সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপ্‌লস্ র্টি ৮১টি আসন লাভ করে জাতীয় রষদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে তষ্ঠা পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের াটদাতাদের সমর্থন যেমন আওয়ামী গের সাফল্য এনে দিয়েছে তেমনি জাব ও সিন্ধুর ভোটদাতাদের সমর্থন প্‌লস্ পার্টির সাফল্য এনে দিয়েছে।

এই নির্বাচনের ফলাফলের একটি ণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, পুরানো, ধকতর প্রতিষ্ঠিত পার্টিগুলির এবং রানো আমলের অনেক নেতার পতন টেছে। যে মুসলিম লীগ একদা পাকি- স্তান প্রতিষ্ঠা করেছে তার বর্তমান তিন অংশের কোনটিই সুবিধা করতে পারে নি। পুরানো আমলের যেসব নেতা হেরে গেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন মুসলিম লীগের (আয়ুব গোষ্ঠী) সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী, সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের নেতা জি এম সৈয়দ, ঘুরো, নসরুল্লা খাঁ, আয়ুব খাঁর ভাই ও প্রাক্তন বিরোধী দলপতি সর্দার বাহাদুর খাঁ। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রবক্তা দলগুলিকে ও মিলিটারি রাজ- নীতিকদের জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। জমিয়ৎ-উল-উলেমা-ই-পাকিস্তান, জমিয়ৎ -উল-উলেমা-ই-ইসলাম ও জামাৎ - এ - ইসলামি দলগুলি ইসলামের নাম করে ভোট কুড়োবার চেষ্টা করেছিল। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামী মুজিবরকে ভারতের দালাল হিসাবে চিহ্নিত করে জামাৎ-এ-ইসলামি দল আসর মাৎ করার চেষ্টা করেছিল। তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। অপর দিকে, সামরিক বাহিনীর যেসব প্রাক্তন অফিসার ভোট যুদ্ধে নেমেছিলেন তাঁরা সবাই হতমান হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন বিমান বাহিনীর প্রাক্তন মার্শাল আসগর খাঁ ও তিনজন প্রাক্তন জেনারেল।

এই নির্বাচনের পর পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া খাঁর হাত থেকে কৃপার দান হিসাবে এসেছে এই নির্বাচন। কিন্তু এই নির্বা- চনের সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াহিয়া খাঁ ও অন্যান্য জঙ্গী শাসকরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সোজা ব্যারাকে ফিরে যাচ্ছেন না। তা করার আগে ইয়াহিয়া খাঁ আরও কয়েকটি সর্ত পূরণ করিয়ে নেবেন। সেগুলি হচ্ছে : (১) জাতীয় পরিষদকে গণপরিষদ হিসাবে বৈঠক করে ১২০ দিনের মধ্যে একটি সংবিধান তৈরী করতে হবে। (২) এই সংবিধান ইয়াহিয়া খাঁর গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং (৩) পাকি- স্তান হবে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র, ইয়াহিয়া খাঁ কর্তৃক নির্দিষ্ট এই মূল- নীতি বদলানো চলবে না।

এখন প্রশ্নটা যা দাঁড়াচ্ছে তা হল, ১২০ দিনের মধ্যে ইয়াহিয়া খাঁর গ্রহণযোগ্য একটা সংবিধান পাকিস্তানের এই নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদে প্রস্তুত করা যাবে কিনা।

স্পষ্টতই এজন্য সর্বপ্রথম যেটা প্রয়ো- জন সেটা হল আওয়ামী লীগ ও পিপল্‌স্ পার্টির মধ্যে একটা বোঝাপড়া। এই দুই পার্টির নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকলেও গরমিলই বেশী।। দুই দলই চায়, পাকিস্তান সেন্টো, সিয়াটো প্রভৃতি সামরিক জোট থেকে বেরিয়ে আসুক। দুই দলই, কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা বলে। শেখ মুজিবর রহমানের দল চায় "গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র" আর ভুট্টোর কথায় 'ইসলাম, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র হচ্ছে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দিক।'

যে জায়গায় এই দুই দলের মধ্যে সব- চেয়ে বড় গরমিল এবং তাদের সহযোগিতার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা আসার সম্ভাবনা সেটা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত- শাসনের প্রশ্ন। শেখ মুজিবর রহমান নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও তাঁর ছয় দফা দাবীর পুনরুক্তি করেছেন। এই ছয় দফা দাবীর মূল কথা হল, শুধু বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষাকে কেন্দ্রীয় এক্তিয়ার- ভুক্ত বিষয়রূপে নির্দিষ্ট রেখে অন্যান্য সকল বিষয়ে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিতে হবে। জুলফিকার আলি ভুট্টো কি এই দাবী সমর্থন করবেন? সম্ভবত, না। অন্তত এখন পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকি- স্তানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের প্রশ্নটি এড়িয়ে চলেছেন।

তাছাড়া, দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির দিক দিয়েও পাকিস্তানের এই দুই নবীন নেতার মধ্যে ব্যবধান সেদেশের দুই অংশের মতোই বিরাট। ভুট্টো অভিজাত সামন্ত- তান্ত্রিক পরিবারের সন্তান, বৃটিশ ও আমে- রিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ভুখোড় ব্যারিষ্টার, চীন-ঘেঁষা, বামপন্থী বুলি বলেন এবং ভারতকে চিরশত্রু জ্ঞান করেন। আর শেখ মুজিবর রহমান সাধারণ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক তিনি ভাল করতে চান, চীনের প্রতি তাঁর সবিশেষ প্রীতি কিছু নেই।

দুই দিকে এই দুই নেতা আর তাঁদের মাথার উপর জঙ্গীশাহীর নেতা ইয়াহিয়া —এই ত্রিভুজের মধ্যে গিয়ে এখন পাকি- স্তানের রাজনীতি, আটকে রইল।

১১-১২-৭০ —পুণ্ডরীক
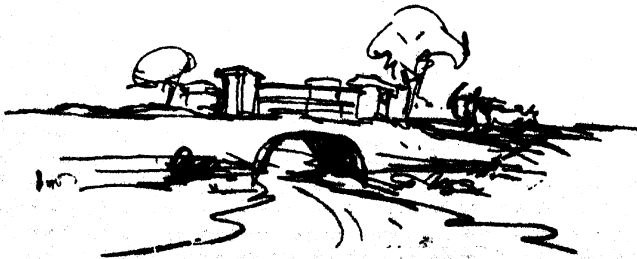
## পাকিস্তানে নির্বাচনী বিপ্লব

গত সপ্তাহে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি দল নিঃসংশয় প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমানের জাতীয় আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৫১টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি ৮১টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। আওয়ামী লীগের সব ক'টি আসনই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাওয়া। ভুট্টোর দলও পশ্চিম পাকিস্তানেই পেয়েছে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এতে প্রমাণ হল যে, পাকিস্তানে ঠিক জাতীয় দল বলতে কোনো দল নেই। প্রত্যেক দলেরই প্রাধান্য আঞ্চলিক এবং সে-অঞ্চল পূর্ব ও পশ্চিমে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত। কিন্তু যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে লোকসংখ্যা অনুপাতে আসনসংখ্যা বেশি সেজন্য আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পেরেছে। অর্থাৎ শেখ মুজিবর পূর্ব পাকিস্তানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা—যদিও গোটা পাকিস্তানের নয়। তেমনি ভুট্টোর জনপ্রিয়তা পশ্চিম পাকিস্তানে। এখন এই দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগের সেতু স্থাপন করতে পারেন এই দুইজন নেতাই।

পাকিস্তানে এই প্রথম প্রাপ্ত বয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানের জনগণের এই অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন এটা তাঁর পক্ষে গৌরবের সন্দেহ নেই। কারণ, এর আগে এই দীর্ঘ তেইশ বছরে পাকিস্তানের মানুষ এই অধিকারের স্বীকৃতি পায়নি। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের দান অনস্বীকার্য। তাঁরা এর জন্য রক্ত দিয়েছেন বহুবার। আওয়ামী লীগের নেতা মুজিবর রহমানকে আয়ুব খাঁ জেলের বাইরে বেশিদিন থাকতে দেন নি। আয়ুব খাঁ বিদায় নেবার কিছু আগে মাত্র তিনি কারাগার থেকে ছাড়া পান। তিনি যে কত জনপ্রিয় পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে এই নির্বাচনে ভোটাররা তার অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ তাঁর বার্তাতে মুজিবর ও ভুট্টোকে অভিনন্দিত করে বলেছেন যে, পাকিস্তানের এই সংকটকালে দেশের মানুষ এই দুই পার্টির ওপর আস্থা জ্ঞাপন করেছে। নির্বাচিত সদস্যদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হবে পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান রচনা করা। জাতীয় পরিষদ এখন গণ-পরিষদ বা কনস্টিট্যুয়েন্ট এসেম্বলির দায়িত্ব পালন করবে। যেদিন থেকে গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসবে তার ১১০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে—এ' হল প্রেসিডেন্টের নির্দেশ। সংবিধান তাঁর মনোমত হলেই অর্থাৎ যদি তিনি মনে করেন এর দ্বারা পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকবে তাহলেই তিনি তা অনুমোদন করবেন। কোনো বিষয়ে তাঁর আপত্তি থাকলে তিনি অগ্রাহ্যও করে দিতে পারেন। কারণ, পাকিস্তানে তিনি সামরিক আইন জারী করে রেখেছেন।

নির্বাচনের পর গণ পরিষদে এই দুটি প্রধান দল কীভাবে কাজ করবে তাই এখন সকলে সাগ্রহে লক্ষ্য করবেন। ভুট্টো বলেছেন যে তিনি মুজিবরের সঙ্গে আলোচনায় রাজী। মুজিবরের সঙ্গে ভুট্টোর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। মুজিবর পূর্ব বাংলার সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবী নিয়েই নির্বাচনে লড়েছেন এবং জিতেছেন। ভুট্টো তা স্বীকার করেন না। তিনি পূর্ব বাংলাকে একটি প্রাদেশিক সরকারের যতটুকু ক্ষমতা তার বেশি দিতে নারাজ। রাজনীতিতেও মুজিবর জাতীয়তাবাদী। ভুট্টো বামঘেঁষা এবং ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা। মুজিবর ভারতের সঙ্গে সম্প্রীতি চান। ভুট্টো প্রচন্ড ভারত-বিরোধী। মুজিবর পশ্চিমী-ঘেঁষা এবং রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল। ভুট্টো চীনের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক রাখার পক্ষপাতী। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর জনপ্রিয়তা রাখতে হলে ভুট্টো কিছুতেই মুজিবরের ছয়-দফা দাবী মানতে পারেন না—যা গৃহীত হলে পাকিস্তান একটি শিথিল ফেডারেশনে পরিণত হবে; পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা ছাড়া কোনো দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের থাকবে না, এমনকি কর ধার্য করার ক্ষমতা কিংবা কারেন্সি নোট বাজারে ছাড়বার ক্ষমতাও না।

এখনি মুজিবর তথা পূর্ব বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অগ্নিপরীক্ষা। তাঁদের ছয় দফা দাবী সংবিধানে প্রতিফলিত না হলে মুজিবরের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হবে না। এবং এই ছয় দফা দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি মেনে নেবে কিনা এবং মেনে না নিলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগ একাই এই দাবী আদায় করবে কিনা তাই হবে পাকিস্তানের নির্বাচনোত্তর রাজনীতির সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন।

# পোষা বেড়াল বা কুকুরের মতো ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সময় যেন এক পোষা বেড়াল,
পোষা বেড়াল নয়তো পোষা কুকুর।
ঠিক একটি পোষা বেড়ালের মতোই
সময় একেবারে নাছোড়বান্দা এবং
আমার একান্ত বশংবদ ও অনুগত।
ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে চলবো সময়কে,
তার কোনো উপায়ই নেই। প্রকৃতির
আলো-হাওয়ায় অন্ধকারে দুর্যোগে
সময় আমায় সর্বক্ষণই একইভাবে
অনুসরণ করে চলেছে এবং চলবেও।
আগে আগে চলাই আমার অভ্যাস,
আর সময় তার রাগ-অনুরাগ এবং
নিন্দা-প্রশংসার ডালি নিয়ে এগোয়,
আমার পিছু নেয় এবং ছুটে চলে।
এখানেই আমার তৃপ্তি, আমার অহংকার,
কারণ আমি অনুসরণ করি না, কখনো না।
চিরকালই আমি অনুসৃত হয়ে আসছি—
সেই তো আমার গৌরব, আমার সান্ত্বনা!
সত্যি সত্যি ঠিক এক পোষা বেড়ালের মতো,
কিংবা পুরণো একটা পোষা কুকুরের মতো
সময় আমার একান্ত বশংবদ ও অনুগত
এবং সময়ের সেই আনুগত্য সম্পূর্ণ অকৃত্রিম!

# কি করি ॥

সুচেতা মিত্র

কি করি সময় নিয়ে
বড়ো বেশি মাপাজোকা দিন
এখনও বিশ্রাম চাই
পাণ্ডুলিপি অসমাপ্ত আছে
এখনও চোখের কালি
কতো দিন এই পরবাস?

দক্ষিণে জানালা নেই
হাওয়া চাই রুক্ষ শরীরে
বড়ো বেশি মাপজোক
পরিমিত সমস্ত বিষয়
কতো দিন ছুটি পেলে
এখনও চোখের কোণে কালি।

কি করি সময় নিয়ে
এখনও বিশ্রাম বাকি আছে।

# কবিতা ॥

অমিতকুমার দে

নির্জন সৈকতে বেলাভূমির তীরে
বহুদিন গেছি আমি
মন মিশে যেত সবুজ ঘাসে, নানা ঢেউয়ের
কলেবরে।

নানা যাযাবরের দেশে ভিড়ে যেতাম
জনতার মাঝে। চিনত না কেউ
হতে পারিনি কবিতা।

একদিন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে
তলিয়ে যাবো!

তোমাদের সবাইকে ফেলে রেখে
সুন্দর শুভ্র জোছনার পরিবর্তে
মিশে যাব অমায় অন্ধকারে।

অভিনয়ের অন্তে
যখন গ্রীনরুমের পর্দায় ঢাকা পড়ব
তখনো কি জ্বলে উঠব না
কোনো ঢেউয়ের চূড়ায় ফসফরাসের চিত্রকল্প।

# মায়া

সতীকান্ত গুহ

আমি চিরকুমার। এবং চরিত্রবান। একারণেই, ইউক্লিড ও জৈমিনির মতে নিঃসন্দেহে নিঃসন্তান। সুতরাং আমার সংসার বলতে কিছু নেই। এছাড়া আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল নিতান্ত খেয়ালের বশে আমার নামে কয়েক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে মানসিক সুস্থতা ফিরে পাবার আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে, বিশেষ করে যেহেতু কাজে আমার ছেলেবেলা থেকেই প্রবল আপত্তি, আমার ভবঘুরে হবার পথে কোন বাধাই রইল না।

বাধা হয়ে দাঁড়াল আমার চরিত্রগত আলস্য। ভবঘুরে হতে গেলে উঠে বসতে হয়, বাক্স-পেটরা গোছাতে হয়, ভেবে আমার হৃৎকম্প হত। আমার আলস্যের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে যাতে কেউ অনর্থক সন্দেহ পোষণ না করেন, গোড়াতেই বলে নেওয়া ভাল আমার বয়েস চল্লিশ, দেখে মনে হয় ত্রিশ। এ সত্ত্বেও আমার পক্ষে হৃদয়-ঘটিত ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হয় নি। তার একমাত্র কারণ আলস্য, অচিন্ত্য অভূত-পূর্ব আলস্য। যাঁরা আমার এ উক্তি পরিহাস জ্ঞান করে হাসছেন, তাঁরা আমার টেবিলের বাঁ দিকের ড্রয়ারে তরুণীদের ও তরুণী-ভাবাপন্ন প্রৌঢ়াদের চিঠির তাড়াগুলোর চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন।

প্রাণীজগতে আমি আমার তুলনা খুঁজে পাই না। শ্লথ নামের যে জীবটির কথা এ প্রসঙ্গে কারো-কারো মনে আসতে পারে, তার সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি। পাতা খেতে তাকে গাছে উঠতে হয়। স্বেচ্ছায় না অনিচ্ছায়, জানি না। তবু গাছে উঠে সে আলস্যের প্রাথমিক নিয়ম ভঙ্গ করে। হয়তো খিদের জ্বালায় এবং দ্বিতীয় উপায় না থাকায়। কিন্তু যেহেতু শ্লথের আচরণ সন্দেহমুক্ত নয়, তাকে সমগোত্র হিসেবে মেনে নিতে আমার সংস্কারে ও বিবেকে বাধে। স্বীকৃত ইতিহাসে আমি অনন্য। মহাকাব্যের যুগের কুম্ভকর্ণের কথা অবশ্য থেকে-থেকেই মনে হয়। তবুও, কুম্ভকর্ণেরও পদস্খলন হয়েছিল। তিনিও একদিন, যে কারণেই হোক, লঙ্কাযুদ্ধে বিলক্ষণ দাপাদাপি করে লণ্ডভণ্ড বাধিয়ে-ছিলেন।

যাঁরা আমাকে সজীব জড়পিণ্ড ভেবে মানুষের হিসেবের খাতা থেকে আমার নামটা বাদ দেবার পক্ষপাতী, তাঁরা শুনে বিস্মিত হবেন যে আমি একটি গভীর অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করছি। আকাশের দিকে তাকিয়ে পাথরের কল্পিত তপস্যা নয়। জীবনের সুগভীর স্তরে সন্ধানী মনের অনন্ত যাত্রা। এ যে কি এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা, তা খানিকটাই শুধু বোঝান সম্ভব। যাঁরা অন্তত চোদ্দ আনা অলস সেই মুষ্টিমেয় মানুষরাই আমার উক্তির তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝবেন। জীবন ধারণের প্রয়োজনে কয়েকটা খুঁটিনাটি কাজে দেহের শরণাপন্ন হতেই হয়। ঐ গৌণ ভূমিকায় দেহকে ব্যস্ত রেখে, মন আঁকড়ে পড়ে থাকা এবং মানুষের জীবনের সক্কটা ফাঁকে উঁকি দিয়ে গুপ্ত তথ্য উদ্ধার করা যে কি এক রোমাঞ্চকর কাজ তা শুধু আমার মতো নিরলস-অলস মানুষরাই জানেন। এ প্রসঙ্গে স্থান-মহিমার বিষয় উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অনেকটা অবাস্তব মনগড়া ঠেকবে। অনেকের মতে প্যারী যেমন ভবঘুরেদের রাজধানী, আমার মতে কলকাতা হচ্ছে কুঁড়েদের স্বর্গ। এ শহরে সাধারণ জীবনযাত্রার ব্যাপারে যত অব্যবস্থাই থাক না কেন, চারিদিকে কুঁড়েমির অপরিমিত অবকাশ। এখানে কাজ করতে-করতে মানুষ তার অজ্ঞাতসারে কুঁড়েমির ডাকে সাড়া দেয়। কান পাতলে শোনা যায় কে যেন কয়েকটা পর্দার আড়ালে নীচু পর্দায় অথচ গভীর স্বরে বলে চলেছে, 'এসো-এসো। কাজ থেকে ছুটি নিয়ে আমার সঙ্গে আমার পথে এসো।'

এই কলকাতা শহরে নির্ঝঞ্ঝাটে আমি বছরের পর বছর কাটাচ্ছি। সমাজ কুঁড়েমিকে গাল দেয়, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কুঁড়েকে মাথায় করে নাচে। তার কারণ, বাইরে থেকে অনেক কুঁড়েকেই বিশেষ বাস্তলোক বলে মনে হয়। কাজের ফলাফলে যার কিছুই আসে যায় না, তার পক্ষে একাধিক কাজে জড়িত হতে বাধা কী? যে কুঁড়ের অর্থবল আছে, সে যদি ব্যয়কুণ্ঠ না হয় এবং বাহ্য জগতে সমাজের মন জুগিয়ে চলতে পারে, সমাজ তাকে মাথায় করে নাচতে দ্বিধা করে না।

আমার এত কথা বলে ভনিতা করার অর্থ এই যে, আমি একটি বিশেষ শ্রেণীর কুঁড়ে। শহরে নানা অনুষ্ঠানে আমি সভাপতি। কাগজে এখানে সেখানে মাঝারি ও ছোট হরপে আমার নাম উল্লেখ করা হয়। কালেভদ্রে আমার ছবিও ছাপা হয়। আমার বেতার ভাষণে কখনোসখনো ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের কান ঝালাপালা হয়। এর অর্থ এই নয় যে, আমি সমাজকে প্রতারিত করছি। কাগজে যা ছাপা হয় এবং লোকমুখে যা শোনা যায় যদি বিশ্বাস করেন তাহলে না মেনে উপায় থাকে না যে, সমাজ আমার কাছ থেকে চতুর্বর্গ ফল পাচ্ছে।

অদৃষ্ট তবুও একদিন আমাকে জীবনের খরস্রোতে টেনে নিয়ে এক কুটিল পাকে ফেলে দিল। তারপর কি হল, একথা বলার সময় এখনও নয়। কারণ এই মুহূর্তে আমি সেই পাকে পড়ে মুক্ত হবার চেষ্টা করছি। আমি বিপন্ন। আমার কুঁড়েমির ইতিহাসে মহাসংকট উপস্থিত।

সন্ধ্যাটা আমি গঙ্গার ঘাটেই কাটাতাম। যেদিন বেঞ্চে স্থানাভাব হত, কোন একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থান বেছে নিয়ে কাগজ বিছিয়ে বসতাম। যখন যে কাগজের উপর আক্রোশ থাকত, তারই একটা ফর্দ পেতে চেপে বসতাম। শত্রুমর্দন করছি ভেবে বেশ একটা তৃপ্তি পেতাম। কারো সঙ্গে কোনদিন বাক্যালাপ হত না। আমি নিজেকে নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতাম। গঙ্গার ঘাটের পৃথিবীটাকে মাতৃজঠর বলে মনে হত। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজেকে একটি ঈষৎ স্পন্দিত ভ্রূণ কল্পনা করতে ইচ্ছা বা যুক্তির দিক থেকে কোন বাধা পেতাম না। আমি যেখানে সচরাচর বসতাম তারই বাঁ দিকে খানিকটা তফাতে একটা বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। গঙ্গার ঘাটে পোঁছে গাড়ি থেকে নেমে কোনদিকে দৃকপাত না করে সোজা নিজের জায়গায় এসে বসতাম। লক্ষ্যই করি নি যে বাড়ি তৈরী শেষ হয়ে গিয়েছে। একদিন সন্ধ্যায় ওদিকে চোখ পড়তে দেখলাম বাড়িটা শুধু শেষ হয় নি। জেগে উঠেছে। টানা কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে দোতলার ছোট হলঘরটা দেখলাম। আলোয় ঝলমল। আরামে আলস্যে এধারে ওধারে একদল মানুষ। বুঝলাম ওখানে সভ্যজীবনের এক পরিচিত কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে।

চা ও কফির রেস্তরাঁটা একেবারে গঙ্গার ধার ঘেঁষে উঠেছিল। তখন থেকে ঐ রেস্তরাঁয় আমি আসতে শুরু করলাম। প্রায় প্রতিদিনই আসতাম। কদাচিৎ ন' মাসে ছ' মাসে একদিন, এই রুটিনের ব্যতিক্রম ঘটত। গঙ্গার ধারে জানলা ঘেঁষে একটা টেবিলে বসতাম। আমি জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে পাড়ের ধারে স্রোতের মুখে ছোট-ছোট মাছের খেলা দেখতাম। দেখতাম নৌকো, স্টিমার ও জাহাজের পৃথিবীটার ওধারে আর একটা জগৎ জেগে উঠেছে। দিনের হাওড়া-শিবপুর কখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত! দিনের আলোয় যে মানচিত্র সত্য বলে মনে হত, সন্ধ্যায় মনে হত তার চেয়ে বড় মিথ্যে আর নেই। আকাশে একে-একে তারা ফুটত। আমার মনে একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যেত—ঐ যে দূর আকাশ ও কি আমাদের ঘরের দূর না বাইরের সুদূর?

রেস্তরাঁ কখনো বেশ ফাঁকা থাকত। কখনো সেখানে ভিড় জমত। আমি কিন্তু আমার টেবিলে আমার কুঁড়েমির তত্ত্ব আঁকড়ে আমিরী মেজাজে বসে থাকতাম। মাঝে-মাঝে ভয় হত কেউ এসে টেবিলে মুখোমুখি না বসে পড়ে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই, অন্য কোন টেবিলে জায়গা না থাকলেও আমার টেবিল সকলেই এড়িয়ে চলত। শুনেছি জন্তু-জানোয়ার, বিশেষ করে শেয়াল, মানুষের মনের কথা টের পায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একা একটি মানুষের এরকম কোন ক্ষমতা না থাকলেও মানুষের ভিড়ে এই ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের ভিতর এসে যায়। অন্য কোন টেবিলে স্থান না পেয়ে আমার টেবিলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে পৃষ্ঠভঙ্গ দেবার মুহূর্তে হঠাৎ কারো চোখে চোখ পড়লে স্পষ্ট বুঝতাম সে নিঃশব্দে বলছে, 'নিজেকে নিয়ে তুমি সুখে থাকো। তোমাকে ঘাঁটানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।' রেস্তরাঁর ম্যানেজার থেকে শুরু করে স্টুয়ার্ড, বয়, দারোয়ান সকলেই আমাকে চিনে নিয়েছিল। আমার টেবিলের কাছে এসেই তাদের চলার গতি মন্থর হয়ে যেত। কথা বলতে গিয়ে তারা গলা নামিয়ে নিত। রেস্তরাঁয় যত ভিড়ই হোক না কেন, সন্ধ্যায় গিয়ে আমার টেবিল খালি পেতাম।

শীত তখনও পড়ে নি। কিন্তু হাওয়া ঈষৎ ধারালো হয়ে উঠেছে। একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব মাঝে-মাঝে শিশুর নরম দাঁতের মতো চামড়া কেটে বসছে। শরীরের প্রতিটি স্নায়ু ও প্রতিটি রক্তকণা এই মধুর আক্রমণে সাড়া দিচ্ছে। আমিও কুঁড়েমির সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে গঙ্গার ঘাটের পৃথিবীর উপর কৃপাকটাক্ষপাত করছি। রেস্তরাঁয় তখনও তেমন ভিড় জমে নি। এই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার কুঁড়েমির স্বর্গে আক্রমণ এসে গেল।

কফির পেয়ালা সম্মুখে নিয়ে কয়েকটা উড়ো চিন্তায় আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ল। অনুভূতির কোথাও একটা সূক্ষ্ম সংকেতে সজাগ হয়ে পড়লাম। পরমুহূর্তে টের পেলাম আমার টেবিলের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে। আমি মুখ তুলে তাকালাম। চোখে চোখ পড়তে আমরা উভয়েই যেন চমকে উঠলাম।

আগন্তুক আমার ভিতর কী লক্ষ্য করলেন বলা কঠিন, কিন্তু তাঁর ভিতর আমি আমার মনের শিকড় ধরে নাড়া দেবার মতো একটি ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ করলাম। আগন্তুক যুবতী। সুবেশা, সুরূপা। মুখের প্রতিটি রেখায় দৃঢ় চরিত্রের ছাপ। আগন্তুক যেন আটপৌরে মাপের নন। দেহের ছন্দ, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, চক্ষের চাহনী, সবকিছুই যেন উন্নত মার্জিত জীবনের ছকে ফেলে বেঁধে দেওয়া। রেস্তরাঁয় স্থানাভাব হয় নি, আমার টেবিলে হানা দেবার কোন কারণ ঘটে নি এই ইঙ্গিত দেবার চেষ্টায় আমি একবার এদিকে-সেদিকে তাকালাম। আগন্তুক অপ্রস্তুত হলেন। হয়তো অপ্রস্তুত হয়েছেন এই আভাস দেবার চেষ্টা করলেন।

বললেন, 'যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই একটু বসি।'

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'আপনি স্বচ্ছন্দে বসতে পারেন।'

হেসে বললেন, 'জানলার ধারে চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছেন। দূর থেকে দেখেই লোভ হয়েছিল।'

আমি উত্তরে হাসলাম।

আগন্তুক বললেন, 'কাজটা স্বার্থপরের মতো হল। জানি না কী মনে করলেন!'

সৌজন্যের খাতিরে বললাম, 'কিছুই মনে করি নি। মনে করার কী আছে?'

আগন্তুক বললেন, 'আমি হলে তো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতাম।'

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'কেন বলুন তো?'

আগন্তুক হাসতে-হাসতে বললেন, 'নিশ্চিন্ত মনে সখের চিন্তায় তন্ময় হয়ে বসেছিলেন। সেই সময়ে এসে উৎপাত করেছি। ধ্যানভঙ্গ করেছি। পুরাকালে মুনি-ঋষিরা তো এসব ক্ষেত্রে শাপ দিয়ে বসতেন।

বললাম, 'এই রকম ধ্যান চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর আমার ষোল ঘণ্টা চলে। ভেঙে গেলে অনায়াসে জোড়া দেওয়া যায়।'

আগন্তুক চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলেন কি? ধ্যানী মানুষ, বিশেষ করে তাঁর প্রশান্ত মুখ, নিমীলিত চক্ষু, আমার জীবনের স্বপ্ন। সাধে কি আপনার টেবিল দেখে লোভ হয়েছিল!'

বয় এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াতে আগন্তুক দু কাপ কফির ফরমাস করলেন। আমি আপত্তি করতে বললেন, 'কফি সামনে রেখে ধ্যানে বসেছিলেন। নির্ঘাৎ জুড়িয়ে গিয়েছে।' তারপর ঈষৎ হেসে বললেন, 'হঠাৎ চড়াও হয়ে আপনার টেবিলে যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছি। যদি ভাবেন কোন দুরভি-সন্ধি নিয়ে এসেছি'—

বাধা দিয়ে বললাম, 'সে কী কথা!'

আগন্তুক বললেন, 'আশ্বস্ত হলাম। এখন পরিচয় দিয়ে আপনার সন্দেহ খানিকটা নিরসন করি। আমার নাম মহারাণী দেবী। এ শহরে নতুন। মাসখানেক এসেছি। কত দিন থাকব ঠিক করি নি। উত্তর মুলুকে থাকি। সত্যি কথা বলতে কোথাও বেশী দিন থাকি না। দেশ থেকে দেশে, শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াই।'

পরিহাসছলে বললাম, 'অর্থাৎ ভব-ঘুরে।'

মহারাণী যেন আমার টিপ্পনির ভিতর একটি নতুন সত্য আবিষ্কার করলেন। অপরূপ মুখভঙ্গি করে বললেন, 'আমার মনের কথাটা ধরে ফেলেছেন। ভবঘুরে কথাটা শুনতে কেমন লাগে! কিন্তু কয়েকটা বছর তো এই কাণ্ডই করে বেড়াচ্ছি!'

কিছুক্ষণ পর বললেন, 'যে কাজে হাত দিয়েছি, ভবঘুরে না হয়ে উপায় কী?'

আমার মনে হল একটা অস্বস্তিকর চিন্তা যেন তাঁর মুখে ছায়া ফেলল। বিষয়টা হাল্কা করে নেওয়া দরকার। বললাম, 'আপনাকে তো ভবঘুরে বলে খালাস! এখন নিজের সম্বন্ধে কী বলি?'

মহারাণী সকৌতূহলে আমাকে দেখতে লাগলেন।

বললাম, 'আমি এ শহরের সবচেয়ে নামী ও খাঁটি কুঁড়ে। সম্প্রতি চল্লিশে পা দিয়েছি। আজ পর্যন্ত এক ছটাক কাজ করি নি।'

মহারাণীর মুখে কৌতূহল ও কৌতুকের দ্বৈরথ শুরু হল।

আমি বললাম, 'কাজ করি নি। কিন্তু ঘুমোনো ছাড়া একমুহূর্ত অপচয় করি নি।'

মহারাণীর মুখে কৌতূহল ও কৌতুক আচ্ছন্ন করে প্রকাশ পেল গভীর বিস্ময়।

বললাম, 'অহর্নিশি চিন্তা করেছি। চিন্তাসমুদ্রে আমি যে পরিমাণ সাঁতার দিচ্ছি তা পৃথিবীর যে কোন দেশের সাঁতারুদের রেকর্ড।'

মহারাণী সুগভীর বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এত চিন্তা করেন! কিসের চিন্তা?'

সাহঙ্কারে বললাম, 'তুচ্ছ কার্য-কারণের চিন্তা নয়। সঙ্কীর্ণ জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণের, পাপ-পুণ্যের চিন্তা নয়। বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ নিঃস্বার্থ চিন্তা। আমার চিন্তায় সুবিধে মতো লেবেল এঁটে রসাতলে যাওয়া যায়, স্বর্গেও ওঠা চলে।'

মহারাণী গাঢ় স্বরে বললেন, 'কোথাও যেতে চাই না। স্বর্গেও না রসাতলেও না। আপনার মতো একটি লোক পেলে চিন্তার পাড়ে বসে সারাটা দিন কাটাতে চাই।'

আমি দেখলাম মহারাণীর দুটি চোখ অলক্ষিত এক আকাশের শিশিরে ভিজে ছলছল করছে।

বয় কফি দিয়ে গিয়েছিল। একটা পেয়ালায় চিনি মিশিয়ে মহারাণী সযত্নে আমার সম্মুখে এগিয়ে দিলেন। হেসে বললেন, 'চেখে দেখুন। এক রতি কম-বেশী নয়। চিনির ব্যাপারে আমার অভ্রান্ত বিচার। কখনো ভুল হয়েছে মনে পড়ে না।'

তাঁর কথায় আমার মনের একটা নরম দিক সাড়া দিতে উন্মুখ হল। আত্ম-সম্বরণ করার আগেই বলে ফেললাম, 'চিনির ক্ষেত্রে শুধু নয়। মনে হয় তার চেয়ে অনেক দামী জিনিসের বেলায়ও।'

মহারাণী তাঁর পেয়ালায় চিনি মেশাচ্ছিলেন। আমার কথার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর হাত কেঁপে গেল। কিছুটা কফি ছলকে পিরিচের উপর পড়ল। আমি পিরিচটা সাফ করার জন্য হাত বাড়াতে মহারাণী বাধা দিতে গেলেন। আমার হাতের উপর হাত পড়তে সরিয়ে নিলেন। কিন্তু সরাতে গিয়ে দু-তিন সেকেণ্ড বিলম্ব হল। মহারাণীর সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হল। মহারাণী চোখ নামিয়ে নিলেন।

কিছুক্ষণ পর মহারাণী হেসে বললেন, 'আপনার ভবঘুরে কথাটা আমার মন থেকে সরতে চাইছে না। থেকে-থেকে আমাকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে। আর কেউ এভাবে পিরিচে কফি ফেললে আমি আঁৎকে উঠতাম।'

স্পষ্ট বুঝলাম মহারাণী চিনির প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করছেন।

বললাম, 'ভবঘুরে হবার একটা আকাঙ্ক্ষা চিরকালই আমার ছিল। কিন্তু কুঁড়ের সঙ্গে ভবঘুরের আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক। সেজন্য যে কুঁড়ে সে কুঁড়েই থেকে গিয়েছি। তবে আপনার ক্ষেত্রে ভবঘুরে কথাটা খাটে না। আপনি বিশেষ কাজে কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরছেন, আপনাকে ভবঘুরে বলি কী করে?'

কথা বলতে গিয়ে মহারাণী থেমে গেলেন। তারপর নিবিড় দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে বললেন, 'ঠিক বোঝাতে পারব না। বাধা আছে। কিন্তু আপনার চিন্তার সঙ্গে আমার কাজের একটা নিকট-সম্পর্ক আছে। মানুষ মাথা দিয়ে চিন্তা করে। মাথার কী দাম আপনাকে বলে বোঝাতে হবে না। ঐ মাথা, চিন্তার উৎস ও আধার, মানুষের মুকুট ঐ মাথা, আমাকে ঘরছাড়া করে দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়ে মারছে।'

মহারাণীর দৃষ্টি কোথায় চলে গেল? জীবনের কোন নিরন্ধ্র অন্ধকারে? সভ্যতার আদি যুগের কোন্ অরণ্যে?

আমি বললাম, 'এতক্ষণে হেঁয়ালি পরিষ্কার হল। আপনি তাহলে একজন নৃতত্ত্ববিদ।'

মহারাণী তৎক্ষণাৎ হাঁ না বললেন না। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন, "আপনার চিন্তার মতো আমারও কাজের লেবেল নেই। কেন নেই এই মুহূর্তে বোঝানোর উপায় নেই।' মহারাণীর মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটল। চেয়ারের পাশে মেঝের থেকে তাঁর বিরাট ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মনে হল ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে চলতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। যেতে-যেতে নীচের তলায় নামবার মুহূর্তে সিঁড়ির প্রান্তে তিনি একবার থমকে দাঁড়ালেন। দেখলাম তাঁর দু চক্ষের দৃষ্টি রেস্তরাঁর সবকিছু দু পাশে সরিয়ে রেখে আমার উপর পড়েছে।

পরদিন রেস্তরাঁয় গিয়ে আমি স্তম্ভিত হলাম। মহারাণী আমার টেবিলে আমার উল্টো দিকের চেয়ারটায় বসে আছেন। পিছন থেকে দেখে বুঝলাম তিনি চিন্তা-মগ্ন। তাঁর দেহ নিশ্চল। কোন সাড়া নেই।

আমি টেবিলে পেঁছে বসতে গিয়ে আমার চেয়ারটা ধরে টান দিতে তিনি চমকে উঠলেন। অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আপনি এসেছেন টেরই পাই নি। বসুন। বসুন।'

আমি রসিকতা করে বললাম, 'আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, আদরে-আপ্যায়নে আপনি আমাকে অতিথি বানিয়ে ছাড়ছেন। কাল এসে হয়তো দেখব আপনার হুকুমে আমার টেবিলে আমার বসা নিষেধ হয়ে গিয়েছে।'

মহারাণী হেসে উঠলেন। যুবতীর নয়, কিশোরীর তরল হাসি। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে একটা কথা বার-বার মনে হচ্ছে যে, সত্যি-সত্যি কাজ এড়াতে পারলে, হাল্কা হতে পারলে একটা সহজ সুখের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায়। কাজ হচ্ছে জীবনের গ্রহণ। ঐ গ্রহণমুক্ত হতে গিয়ে

মানুষকে আকাশ-পাতাল তোলপাড় করতে হয়। সে বড় হয়, ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম লেখে। কিন্তু সুখ? কাজের পৃথিবীতে সুখ কোথায়? কাজের গা জুড়ে ছোট বড় অসংখ্য ফাটল। ঐ ফাটল দিয়ে অতৃপ্তি, ব্যর্থতা এসে ঢোকে। সুখ-দুঃখের বোঝা হিসেবে দুঃখটাই বড় হয়ে ওঠে। দুঃখের বোঝা কাঁধে বয়ে মানুষ যখন উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, তখন পৃথিবীর চোখে, হয়তো নিজের চোখেও সে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বড় হওয়া আর সুখী হওয়া তো এক জিনিস নয়।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মহারাণী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কিন্তু মুস্কিল বাধে কাজ যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায়। তখন কাজের পিছনে মানুষ ছুটে মরে। প্রতি-মুহূর্তে কাজের হাতে তিলে-তিলে মরছে জেনেও। উদ্দেশ্য আদর্শ হচ্ছে কথার কথা। আসল কারণ হচ্ছে নেশা। ঐ নেশাই কাজের পৃথিবীকে টিঁকিয়ে রাখে।'

মহারাণীর কাজ সম্বন্ধে এই খেদোক্তি আত্মবিলাপের মতো ঠেকল। নিশ্চয়ই কোন কারণে তাঁর দেহমন ক্লান্ত। আমি বললাম, 'ক্ষয় হতে হতে মরতে মরতে মানুষ কাজের ভিতর দিয়ে কীর্তি রেখে যায়।'

মহারাণী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

আমি বললাম, 'ব্যক্তিগত কারণে আমি কুঁড়ে। কুঁড়ের বাদশা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। কিন্তু অদৃষ্ট কুঁড়েদের হাতে মানুষের ইতিহাস বা ভবিষ্যৎ তৈরী করার ভার দেয় নি। সে দায়িত্ব কাজের মানুষ-দের। বিশেষ করে কাজের নেশাখোরদের।'

আমার কথায় কান না দিয়ে মহারাণী বললেন, 'কাজের বোঝা আরো ভারী হয়ে ওঠে কখন জানেন?'

আমি নিরুত্তর।

মহারাণী তাঁর দু চক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে বিদ্ধ করে বললেন, 'যখন কাজ মানুষের চক্ষের আড়ালে করতে হয়। যখন কাজের অর্থ এত সূক্ষ্ম, এত জটিল যে খুলে বলা চলে না। কাজ গোপনে শুরু হয়ে গোপনে শেষ হয় বলে কীর্তির বা খ্যাতির প্রশ্নই ওঠে না। একমাত্র পুরস্কার আত্মতৃপ্তি।'

আমি বললাম, 'আপনার কাজ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করা উচিত হবে না। বুঝতে পারছি সংগোপনে আপনি নৃতত্ত্বের একটা কঠিন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন।'

মহারাণী তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'নৃতত্ত্ব বলতে সচরাচর যা বোঝায় তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ফাঁকা মাথার খুলি নিয়ে গবেষণা শুধু হাস্যকর নয়, কুৎসিত।'

আমি বললাম, 'আপনি কি মাথার ফটো তুলে নেন না কুমোর বা ভাস্করকে দিয়ে প্রতিকৃতি তৈরী করান?'

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে মহারাণী বললেন। 'আমার কাছে মানুষের নীচের দিকটার কোন দাম নেই। এমন কি হৃদয়েরও তেমন দাম নেই। গোটা মানুষের ইতিহাস বা তত্ত্ব লিখতে গেলে সব কিছুরই কম-বেশী দাম ধরতে হয়। কিন্তু আমি গোটা মানুষের তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমার লক্ষ্যস্থল হচ্ছে তার মাথা। মাথার তত্ত্ব নয়। মাথার কবিতা। সারি-সারি অজস্র সুন্দর মাথার একটা পৃথিবী গড়ে তোলার নেশায় আমি পাগল। এখন আমার ছত্রিশ বছর চলছে। বাইশ বছর বয়সে এই আশ্চর্য কল্পনা আমার মাথায় আসে। তারপর চৌদ্দ বছর দেশ-দেশান্তরে লোকচক্ষের আড়ালে কঠোর পরিশ্রমে তিলে-তিলে কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছি। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবি নি। বিপদকে বিপদ বলে গ্রাহ্য করি নি।'

কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি বললাম, 'আপনি নিজেই হয়তো স্কাল্পটর। সেজন্যই হয়তো একা গোপনে কাজ করতে পারছেন।'

মহারাণী আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'অনেকটা তাই। মাথার ব্যাপারে কারো উপর নির্ভর করা চলে না।'

আমি বললাম, 'আমার কুঁড়েমির ঝঞ্ঝাট না থাকলে আমি আপনার কাজে লেগে যেতাম। আমার উপর আপনি অনায়াসে নির্ভর করতে পারতেন।'

মহারাণী গভীর দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে-দেখতে বললেন, 'যদি জানতেন আপনাকে দিয়ে আমার কী প্রয়োজন!'

আমার শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে সম্পূর্ণ নতুন। আমি কিছুটা অভিভূত হয়েই বললাম, 'আপনার প্রয়োজনে লাগতে পারলে সুখী হব।'

মহারাণীর দুটি চোখ মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে নিবে গেল। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, 'একটা বড় রকমের বাধা এসে দাঁড়াচ্ছে। তবু, আপনাকে আমার কাজে লাগাতেই হবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিসের বাধা?'

মহারাণীর মুখে একটা ম্লান হাসির আভাস দেখলাম। ক্লান্তকণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে দেখলে বার-বার গোটা মানুষটার কথা মনে পড়ে। শুধু মাথার কথা ভাবতে গিয়ে বাধা পাই, ব্যথা পাই। তবু, অসাধ্য সাধন করতে হবে। আমার কাজে আপনার চিহ্ন থাকবে না, ভাবতেই পারি না।'

মহারাণী উঠতে গিয়ে বসে পড়লেন। কী একটা কথা ভেবে তাঁর মুখ হাসিতে অপরূপ হয়ে উঠল। বললেন, 'আজই কাজে ছোট রকমের একটা হোঁচট খেতে বসে-ছিলাম। একটি শিশুকে নিয়ে মুস্কিলে পড়েছিলাম। এরকম সুন্দর মুখ ও নিখুঁত মাথা সচরাচর চোখে পড়ে না। র‍্যাফেল বটিচেলীর ছবির শিশু। কলকাতার বস্তিতে এ শিশু গোবরে পদ্মফুল। কিন্তু হঠাৎ বাধা এসে গেল। মা বলে ডেকে হাসতে লাগল। আমিও আত্মবিস্মৃত হয়ে তাকে আদর করতে লাগলাম। তারপর—'

মহারাণী একটু থেমে বললেন, 'কোন রকমে কাজ শেষ হল।'

আমি বললাম, 'আপনার মুখে বর্ণনা শুনে এই শিশুকে দেখতে লোভ হয়।'

মহারাণী একটা চাপা উত্তেজনায় যেন কাঁপতে লাগলেন। এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে ভারী ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে ফিসফাস করে বললেন, 'দেখবেন?'

আমি বললাম, 'পাথরে খোদাই করার আগে প্ল্যাস্টার অব প্যারিস-এ তুলে নিয়ে-ছেন বুঝি!'

মহারাণী যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। আমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দু হাতে শক্ত করে ভ্যানিটি ব্যাগটা ধরে ভাঙা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ। তাই। তবে—আমার যে কী হয়েছে! কী বলতে কী বলি! কোথায় মাথা আর কোথায় আমি!' বলে মহারাণী ঈষৎ হাসলেন। কিন্তু সে হাসি তাঁকে একে-বারেই মানালো না।

সে সন্ধ্যায় আলোচনা আর বেশী দূর এগোল না। কোন কারণে, সম্ভবত ক্লান্তি-বশত, মহারাণী স্বল্পভাষী হয়ে পড়লেন। আমরা যে যার গাড়িতে উঠলাম। একথার মহারাণী বললেন, 'আপনার বাড়িটা দেখে গেলে ভাল হত। আপনাকে যখন কাজে লাগাবার সংকল্প করেছি, আপনারও আপত্তি নেই। এ অবস্থায় যে কোন সময় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার হতে পারে।' তারপর কী ভেবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ থাক! আজ বড় রকমের ধকল গিয়েছে। চোদ্দ বছরের বিরাট কাজ পণ্ড হতে বসেছিল। এ কাজের এই হচ্ছে মুস্কিল। কখন কোথা দিয়ে বিপদ আসে বোঝা শক্ত। কোন রকমে দুকূল রক্ষা করেছি। যা হোক, কাল দেখা হবে।' মহা-রাণীর গাড়ি কয়েক মুহূর্তে অন্ধকারে অদৃশ্য হল।

বাড়ি ফিরে এসে সাত তাড়াতাড়ি পেটে কিছু দিয়ে আমি শয্যা নিলাম। তারপর মহারাণীর সঙ্গে আমার দু দিনের আলো-চনার একটা খতিয়ান মনে-মনে খসড়া করতে লাগলাম। আমার চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় মহারাণীর তুলনা খুঁজে পেলাম না। কুঁড়ের বাদশা হলেও পড়াশোনা আমার নেহাৎ কম ছিল না। ইতিহাসে কাহিনী কিংবদন্তীতে শিল্পীদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে ভাস্কর, কুমোর, পটুয়াদের নিয়ে লেখকদের কল্পনায় অতিরঞ্জিত অনেক আশ্চর্য-আশ্চর্য কাহিনী পড়েছি। কিন্তু মহারাণীকে কোন একটা ছকে ফেলা সম্ভব হল না। তাঁকে আগাগোড়া একটা রহস্য বলে মনে হল। হয়তো তাঁর মনের ক্রিয়া এত সূক্ষ্ম ও জটিল, উদ্দেশ্য এত অসাধারণ যে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর সাধনার কোন মূল্যই নেই। অকিঞ্চিৎকর, এমন কি হাস্যকর মনে হতে পারে। হয়তো এমন একটা মস্তিষ্ক নিয়ে মহারাণী জন্মেছেন যে তাঁর বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের

সংস্কার ও বিজ্ঞানের মিল হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। শুধু, বার-বার, মনের অতল থেকে প্রশ্ন উঠতে লাগল, ব্যাপারটা কী? যে শিল্পীদের, ভাস্কর-স্থপতিদের চিনি-বুঝি, যত বড়, যত প্রতিভাবান ও কীর্তিমান হোন না কেন, যাঁদের কারো-কারো সাধনা বাদে জাতির চিরকালের বিস্ময়, তাঁদের সঙ্গে মহারাণীর তফাৎ কী? যে কাজ, যে সৃষ্টি সম্পূর্ণ মানুষ, হয়তো আগাগোড়া গোপনেই করতে হয়। কিন্তু বিপদ? মহারাণীর কাজে বিপদ কোন্ পথে আসে? কেন আসে? তার আসল চেহারাটা কি রকম? ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মহারাণীকে নিয়ে একটা অর্থহীন স্বপ্নও দেখেছিলাম। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম মহারাণীর চিন্তায় মাথা আধ মণ ভারী হয়ে আছে। ভোর হতে-না-হতে উঠে পড়লাম। দুটো অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেয়ে নিয়ে আর এক দিনের কুঁড়েমির জন্য তৈরী হলাম।

রেস্তরাঁয় সেদিন সন্ধ্যায় আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিলাম। উপলক্ষ্য মহারাণী। কিন্তু সেই সূত্র ধরে চিন্তা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। পরিচিত তত্ত্বগুলো এক-একটা নতুন অর্থ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল। জানলার পাশে গঙ্গার ঘাটের সন্ধ্যা প্রতিদিনের মতো অপেক্ষায় রইল। কিন্তু তার দিকে নজর দেবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। মনটা কানায়-কানায় রহস্যে ভরপুর হয়ে পূর্ণিমার সমুদ্রের মতো অস্থির উত্তাল হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ, একটা অজ্ঞাত কারণে মনে হল একবার সিঁড়ির দিকে তাকালে কি রকম হয়। তাকালাম। এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ময়ের একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। দেখলাম মহারাণী সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। আমি মুখ নামিয়ে আড়চোখে তাঁকে দেখতে লাগলাম।

মহারাণী সিঁড়ির দু-তিনটে ধাপ বাকী থাকতে দাঁড়িয়ে গেলেন। নির্নিমেষে আমাকে দেখতে থাকলেন। তিনি যেন কোন আশ্চর্য দৃশ্য দেখছেন। তাঁর দৃষ্টিতে অনন্ত ক্ষুধা। দেখে-দেখে তাঁর যেন সে ক্ষুধা মিটছে না। এভাবে আজ পর্যন্ত কোন নারী আমাকে দেখে নি। এ দৃষ্টিপাত নয়। দৃষ্টি রাহুর পূর্ণগ্রাস। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেহের প্রতিটি রক্তকণা সাড়া দিয়ে উঠল।

এভাবে হার মেনে লাভ কী? সাহস সঞ্চয় করে সম্মুখে তাকালাম। চোখে চোখ পড়তে মহারাণী একটু চমকে উঠলেন। তারপর হাসতে-হাসতে এগিয়ে এলেন।

বললেন, 'এদেশে প্রাচীন যুগের ঋষিরা কী চোখে সূর্যকে দেখেছিলেন, বেদের শ্লোকে তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সবটা বুঝতে গেলে এই রকম একটা মুহূর্তে সিঁড়িতে উঠতে-উঠতে আপনাকে দেখতে হয়। দেয়াল থেকে আলো এসে আপনার মাথার উপর পড়েছে। যদি নিজেকে দেখতে পেতেন বুঝতেন চোখে দেখার জগতে আপনি আজ কী একটা আশ্চর্য ঘটনা। আমার মনে হচ্ছিল কয়েক যুগ আগের গ্রীসে মিশরে ফিরে গিয়েছি। কিংবদন্তীর জগৎ থেকে সূর্যোদয় দেখছি।'

জোরে হেসে বলতে-বলতে কাছে এলেন, দেখতে-দেখতে ভিতরটা কেঁপে উঠে। অসহ্য আনন্দে কেঁপে মরে। ঐ কাঁপাই তো গান।'

অনেকক্ষণ কিছুক্ষণ পরে মহারাণী নীচু পর্দায় গান ধরলেন। আশ্চর্য কণ্ঠে আশ্চর্য গান। সুরের মদিরতায় উচ্ছল। রেস্তরাঁর মুখ চাওয়া চাওয়ি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য। স্থির হয়ে উৎকর্ণ হয়ে সবাই শুনলো। ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিলেন। অর্ধপথে থেমে গেলেন। আর সকলের মতো স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন।

গান শেষ হতে চারিদিক হাততালির শব্দে মুখর হল। ম্যানেজার এগিয়ে এসে কিছুং মাথা নুইয়ে বললেন, 'ম্যাডাম। ইওর মিউজিক হ্যাজ এন্‌নোব্‌ল্‌ড্‌ মাই রেস্তোরাঁ। ইউ হ্যাভ গিভন আস এ ফিউ মোমেন্টস অব রিয়্যাল হ্যাপিনেস। উই অল আর মোস্ট গ্রেটফুল টু ইউ।'

মহারাণী মাথা নুইয়ে অভিবাদন গ্রহণ করলেন। যেন বহু বিগত যুগের কোন ঐতিহাসিক চিত্র থেকে তিনি বার হয়ে এসেছেন। মুগ্ধ হৃদয়ের অভিবাদন গ্রহণ যেন তাঁর কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তারপর ধীরে-ধীরে আমার চোখের সম্মুখে ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল। দেখলাম আমার পরিচিত মহারাণী আমাকে দৃষ্টি-বিদ্ধ করে আমার সম্মুখে এসে বসেছেন।

তবু আজ তাঁকে একটু স্বতন্ত্র মনে হল। তিনি যেন একটা সংকল্প করে এসেছেন। এবং একমনে সে বিষয়ে চিন্তা

করছেন। তাঁর মুখে একটা আনন্দ ও উত্তেজনার আভাস। কিন্তু সেই সঙ্গে সংকল্পে ঈষৎ কঠোর। আমি কফি ফরমাস করতে গিয়ে বাধা পেলাম। খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে বললেন, 'এখনই উঠতে হবে। সময় নেই।'

সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকাতে বললেন, 'আসুন। আজ আমাদের অনেক কাজ।'

মহারাণী তাঁর গাড়িতে আমাকে টেনে তুললেন। আমার গাড়ি ফেরৎ চলে গেল। মহারাণী নিজে ড্রাইভ করেন। স্টিয়ারিং ধরে বসলেন। আমি পাশে বসলাম।

সেদিন সন্ধ্যায়ই জমাট অন্ধকার, পথ-ঘাট নির্জন। গঙ্গার ঘাট থেকে যে রাস্তা-গুলো শহরে গিয়েছে, কোনটাতেই জন-মানব নেই। গাড়ি আস্তে-আস্তে চলল। এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা, কোন তাড়া নেই, ব্যস্ততা নেই। অনেক কাজ বলে মহারাণী আমাকে টেনে নিয়ে এলেন। কিন্তু অনেক কাজের সঙ্গে গাড়ির অলসগতির কোন মিল নেই।

মহারাণী আমার মনোভাব অনুমান করে বললেন, 'আজ মন বেঁধে ফেলেছি। আজ রাতেই আপনি আমার কাজে লাগবেন। ভাবি নি এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে। কিন্তু এই কদিন যা হবার নয় বলে ধারণা হয়েছিল হঠাৎ দেখছি তা না হয়ে পারে না। আমার কাজে আপনার চিহ্ন না থেকে পারে?'

মহারাণীর পাশে গাড়িতে বসে তাঁর কথা শুনতে-শুনতে আমি নিজের ভিতর বিশেষ রকমের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। আমার মন আশঙ্কা ও উদ্বেগে বার-বার দুলে উঠছিল। কিন্তু মহারাণীর কাছ থেকে সরে যাবার কোন ইচ্ছাই নিজের ভিতর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মহারাণী খেয়ালী অপ্রকৃতিস্থ হতে পারেন, এরকম একটা যুক্তি আমার পক্ষে খণ্ডন করা সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ আমারই ভিতর কে আমাকে বার-বার মহারাণীর দিকে তিলে-তিলে টেনে আনছিল।

মহারাণী বললেন, 'বুঝতে পারি কখনো-কখনো আমার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে আপনি সন্দিহান হয়ে পড়েন। সেটা স্বাভাবিক। কারণ আমার কথাগুলো একান্ত আমার। আমার আগে এই কথা কেউ বলেছে কিনা জানি না, কিন্তু একথা ঠিক আমার মতো করে কেউ বলে নি।'

আমি বললাম, 'অন্তত আমার অভি-জ্ঞতায় আপনার কথাগুলো সম্পূর্ণ নতুন।'

মহারাণী বললেন, 'এতদিন শুধু শুনেছেন। কাজে হাত দেবার আগে কথা-গুলোর ভিতর ঢুকতে হবে। অর্থ বুঝতে হবে।'

তারপর সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'কেন মাথা নিয়ে আমার এত মাথাব্যথা পুরো-পুরি বুঝবার চেষ্টা করেছেন?'

আমি একটা জবাব দাঁড় করাবার চেষ্টা করছিলাম। আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মহারাণী বললেন, 'একবার সৃষ্টির চারদিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। সবাই মাথা নিয়ে ব্যস্ত। সবাই মাথা তুলতে চায়। মানুষের কথা বাদ দিন। সে তো যখনই নিজেকে জাহির করতে চায়, মাথা তুলে দাঁড়ায়। হাতী শুঁড় তোলে, সিংহ কেশর ফুলিয়ে দাঁড়ায়। যে সাপ মাটিতে বুকে হাঁটে, সেও আস্ফালন করতে গিয়ে ফণা তোলে।'

আমি বললাম, 'আশ্চর্য!'

মহারাণী বললেন, 'প্রাণীজগতের কথা ছেড়ে মৃতজগতে আসুন। দেখুন পাহাড় তার চূড়োয় মাথা তোলে, সমুদ্র ঢেউয়ে, গাছ উঁচু ডালে। যার মাথা নেই সেও কোন না কোন কৌশলে মাথা তোলে। কেন জানেন?'

আমি একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিলাম। মহারাণী বললেন, 'তীরের ফলার মতো মাথা হচ্ছে আমাদের অস্তিত্বের তীক্ষ্ণতম প্রকাশ। সৃষ্টির আড়ালে যে সত্য, যে শক্তি, তারই স্থূলরূপ হচ্ছে মাথা। মাথাই ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বত্র। সর্বভূতে। সেদিক থেকে প্রতিটি মুণ্ডিকণা ঈশ্বর। কিন্তু মাথা হচ্ছে পূর্ণতম ঈশ্বর। ঈশ্বরের পরিপূর্ণ প্রকাশ।'

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। অন্ধ-কারে ঠিক তাঁর পাশে বসে মহারাণীর কথা-গুলি অমোঘ সত্য বলে মনে হচ্ছিল।

মহারাণী বললেন, 'মূর্খের হাতে সেই মাথার লাঞ্ছনা দেখুন। মানুষের মৃত্যুর পর তার মাথা হয় কবরের তলায় পোকায় খায়, নয় শ্মশানে শেয়াল-কুকুর নিয়ে খেলা করে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা যাই হোক, আমার একার শক্তিতে যেটুকু সম্ভব করে যাবো। মাথাকে জীবনের উঁচু বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করে যাবো। আজ আমি আপনাকে পেয়েছি। আমার আনন্দের সীমা নেই। আজ আমি ধন্য। আপনিও ধন্য।'

আমার ভিতরে হঠাৎ কোথাও একটা কপাট খুলে গিয়েছিল। যে একটা ভয় ও সংশয় এতদিন চাপা পড়ে ছিল, নিছক অস্বস্তি মনে করে যে ভয় ও সংশয়কে দেখেও দেখি নি, সেই মুহূর্তে খোলা কপাট দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। গাড়ি ইতিমধ্যে রাস্তার এক পাশে থেমে গিয়েছিল। নিদারুণ আতঙ্কে আমার দেহ-মন অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। আমি চেঁচাতে গেলাম। আক্রমণের অপেক্ষায় না থেকে আক্রমণ করতে গেলাম। পারলাম না। আমি অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। যেটুকু জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল তাতে অনুভব করলাম মুখের উপর রুমাল, তীব্র গন্ধ, হাতের চাপ। জ্ঞান-সম্পূর্ণ হারানোর মুহূর্তে অনুভব করলাম কণ্ঠদেশে নরম হাত ও শাণিত ইস্পাত।

দুঃস্বপ্নে দেখছিলাম একটা কুয়োয় পড়ে গিয়েছি। কিছুতেই উঠতে পারছি না। পিছল দেয়াল ধরতে গিয়ে বার-বার পড়ে যাচ্ছি। চেঁচাতে গিয়ে কথা আটকে যাচ্ছে। এই সময়ে হঠাৎ দুঃস্বপ্নের জগৎটা একটা ট্রাকের আওয়াজে ভেঙে গেল। আমি এক অবসাদের গহ্বর থেকে ধীরে-ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম। জ্ঞান ফিরে পাবার মুহূর্তে বুঝলাম অবসাদের চেয়েও আমাকে বেশী অভিভূত করছে ভয়। প্রথমেই দুটি প্রশ্ন মনে এল। আমি কোথায়? মহারাণী কোথায়?

কলকাতার ময়দানে একাধিক মাতাল রাত্রিবাস করে বাড়ি ফেরে। তাদের একজন না হয়েও তাদেরই মতো সে রাতে বাড়ি ফিরে এলাম। হাত-মুখ ধুয়ে শুতে যাবার আগে যে কারণেই হোক পকেটে হাত দিয়েছিলাম। একটা ভাজ-করা কাগজ হাতে পড়েছিল। বার করে ভাঁজ খুলতে দেখলাম মহারাণীর চিঠি। লিখেছেন : গোটা মানুষটাকে বেশী ভাল লেগে গেলে বিপদ। তখন মানুষ থেকে মাথাকে আলাদা করা চলে না। এই ভাল লাগার ব্যাপারটা ছাড়া আজ আর কোন বাধাই ছিল না। আপনাকে যেমনটি পেয়েছিলাম তেমনটি রেখে গেলাম। আপনার মাথার কথা চিরকাল মনে থাকবে। যদি কোনদিন গোটা মানুষটার চেয়ে আপনার মাথাকে বেশী ভাল লাগা সম্ভব হয়, আবার দেখা হবে। আপাতত বিদায়।

পরদিন যথাসময়ে রেস্তরাঁয় গিয়ে আমার টেবিলে বসলাম। ম্যানেজার ঘরের এক কোণ থেকে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। এগিয়ে এসে অভিবাদন করলেন। মহারাণী যে চেয়ারে বসতেন দেখিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উইল দিস রিমেইন এমপটি?'

আমি কাষ্ঠহাসি হেসে বললাম, 'ইয়েস। শী ইজ অ্যাওয়ে।'

ম্যানেজার কী ভেবে বললেন, 'গড ব্লেশ হার।'

ম্যানেজারের এ কথায় চমকে উঠলাম। সারাটা দিন যে চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেই মুহূর্তে এক কঠিন প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হল। মাথায় ঈশ্বরের মহিমা দেখে তাকে পেতে গিয়ে মহারাণী কোন্ যুক্তিতে কোন্ পথে চলেছেন? আদি সত্যের দুটি মুখ, আলো ও অন্ধকার, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা। মহারাণীর দিকে সেই সত্য কি শুধু তার ভয়ঙ্কর অন্ধকার মুখ তুলে চেয়েছে? মহারাণী আলোয় ফিরে আসুক, আমার মনের এই নিবিড় প্রার্থনা যেন শুনতে পেলাম। হয়তো একদিন আমাকে কুণ্ডমির ইতিহাস শেষ করে মহারাণীর সন্ধানে ভবঘুরের ভূমিকায় নামতে হবে।

'ভিড়ের মাঝখানেও কবি য়েটস্ চাপা পড়েন না; তাঁহাকে একজন বিশেষ কেহ বলিয়া চেনা যায়। যেমন তিনি তাঁহার দীর্ঘ শরীর লইয়া মাথায় প্রায় সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহাঁর যেন সকল বিষয়ে একটা প্রাচুর্য আছে, এক জায়গায় সৃষ্টি-কর্তার সৃজনশক্তির বেগ প্রবল হইয়া ইহাকে যেন ফোয়ারার মতো চারিদিকের সমতলতা হইতে বিপুলভাবে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য দেহে মনে-প্রাণে ইহাঁকে এমন অজস্র বলিয়া বোধ হয়।'

এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ ১৩১৯ সালে চার বছর এক মাসের কনিষ্ঠ আইরিশ কবির বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধটি আরম্ভ করেন। ইংরেজি সেই জঙ্গীয় যুগেই রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন যে ইয়েটস্ অধিকাংশ ইংরেজি কবিদের মধ্যে এক ব্যতিক্রম, কারণ তাঁর কাব্যশক্তি আসে তিনি বাস্তব জগতের কবি বলেই, নিছক সাহিত্যিক লিখিয়ে বলে নয়, যাঁরা আমাদের সঙ্গীত জগতের অনেক ওস্তাদের মতো সঙ্গীত চর্চা করেন সমগ্র সত্তার তাগিদে নয়, শুধুমাত্র প্রচলিত সঙ্গীত জগতের রীতির আদর্শেই।

১৯১২-তে রবীন্দ্রনাথের এই সহজাত বোধি আশ্চর্য বিচারই করেছিল, বিশেষত যখন দেখি প্রবন্ধটির শেষে তিনি নিজেই বলেছেন যে, তখনও এই কৃতী আইরিশ বন্ধুর লেখা তিনি কিছু পাঠ করেন নি।

বর্তমানে ইয়েটসের সমস্ত এবং বহুবিধ রচনা পাঠকের আয়ত্তে, তার ফলে সঠিক কেন্দ্রায়ত্ত দীর্ঘ আলোকপাতে পাঠ ও বিচার সহজ। এবং এখন আমরা দেখতে পাই কী ট্রাজিকভাবে মহৎ ছিল তাঁর শুচির সেই সাধ যাকে তিনি বলতেন দি গ্রেটের মাদের বা আদি জননীর সান্নিধ্যে, সংস্কৃতির ঐক্যে, জীবনের অখণ্ডতায় প্রত্যাবর্তনের অভীপ্সা, কারণ তা হলেই লেখা সম্ভব হবে লোকসাধারণের মহাগ্রন্থের জন্যে। তিনি তো জাত-ইংরেজ ছিলেন না এবং তাঁর দৃপ্ত কীর্তি সম্ভব হয়েছিল অনেকটা তাঁর আইরিশ স্বাজাত্য এবং যন্ত্রণাকর আত্মসচেতনতার কারণে।

অবশ্য এ স্বপ্ন ছিল প্রতিভাধরের পক্ষেই, যিনি সম্পূর্ণভাবে ছিলেন এক কবি, কবিমানসের নিঃসঙ্গ কিন্তু সময় ব্যক্তিকতা যাঁর স্বভাবে। কিন্তু আজকাল বোঝা যাচ্ছে, যেমন অধ্যাপক শ্রীমতী স্টক স্পষ্টই দেখিয়েছেন ইয়েটসের কবিতায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাঁর স্বদেশ আয়ার-ল্যাণ্ড, পীয়র্সের, কাথলীকের, ফর্গাসের, অরসিনের আয়ার্লণ্ডে যা সর্ জন্ এণ্ডারসনের (পরে বাংলার লাট) বা ব্ল্যাক-এণ্ড-ট্যানদের, যোলটি নিহত মানুষের, ডাক আপিসে চড়াও আক্রমণেরও 'এয়রে' ঘটে। এই আয়ার্ল্যাণ্ডেই সেই সরল মেয়ে-মানুষটিরও দেশ, সেই এক মাতা যে গৃহ-দ্বারে শুধু দাঁড়িয়ে বা বসেছিল এবং যাকে অকারণে মেরে ফেলল মাতোয়ালা ইংরেজ পল্টন দল। এবং কবির উপলব্ধি যথার্থ হয়ে উঠল কিভাবে 'ভীষণ সৌন্দর্য হয় জাত'। এখন বোঝা যাচ্ছে ইয়েটসের মানসে এই সব অভিজ্ঞতা কতটা অর্থবহ হয়ে উঠেছিল, যেমন আবার হয়েছিল সেই 'কেল্টিক গোধূলি', যা মূলত তৎকালীন সীমার মধ্যে এয়রীয় নবজাগরণই। এবং আইরিশ নাট্যআন্দোলনের সূত্রপাত এবং সার্থকতার বিকাশও সেখান থেকেই। এই দূরায়ত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে ইয়েটসকে আইরিশ ফ্রী স্টেটের সেনেটরের জাগ্রত দায়িত্বে, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের এবং সংস্কৃতি সংক্রান্ত সর্ববিষয়ে বক্তৃতা আলোচনায় আমাদেরও মুগ্ধ হতে হয়।

সত্যিই ইয়েটসের দীর্ঘ জীবন ও কর্মের সম্পূর্ণ পটে আমাদের কবির 'গীতাঞ্জলি'-অনুবাদের বইয়ের বিখ্যাত ভূমিকাটি এক নতুন অর্থ পায়, যে অনুবাদগুলির খসড়া তিনি পকেটে নিয়ে বেড়াতেন ও থেকে থেকে পড়তেন। ঐ ভূমিকায় ইয়েটস এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'এই লিরিকগুলি', আমার ভারতীয়েরা আমায় বলেছেন, মূলে বাংলায়, ছন্দস-এর ব্যঞ্জনাতৈলপূর্ণে, বর্ণাঢ্যতার অনুবাদাতীত সূক্ষ্মতায়, পদমাত্রার বহুবিধ নবত্বে পরিপূর্ণ এবং এগুলিতে চিন্তার যে জগত প্রকাশিত সারাজীবন তারই স্বপ্ন আমি দেখেছি। চূড়ান্ত এক কৌশলের, এক সংস্কৃতির রূপকর্ম এগুলি, অথচ মনে হয়, এরা মাঠের ঘাসের মতো, জলের শ্যাওলার মতোই সাধারণের মাটিতেই বেড়ে উঠেছে। কাব্য ও অধ্যাত্ম-ধর্মে একাকার এক ঐতিহ্য বহু শতাব্দী ধরে এই সংস্কৃতিতে চলেছে, উপমা উৎপ্রেক্ষা তথা অনুভূতি-ভাব সংগ্রহ করে বিদ্বজ্জন তথা প্রাকৃতজনের ভাষা থেকে আবার সেই স্রোতকে নিয়ে গেছে পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্তজনের চিন্তায় বিন্যাসে।

'যদি বাংলায় এই সভ্যতা, অবিভক্ত থাকে, যদি ঐ মানসিক সাধারণ্য যা— আন্দাজ করি — সর্বব্যাপ্ত, দশ বিশটা পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে টুকরো টুকরো না হয়ে যায়—'

কিন্তু, ইয়েটসের 'ভারতীয়েরা' ব্যাপারটা অতিসরল করেছিলেন এবং ঐ যদিটা মস্ত-বড় যদি। রবীন্দ্রনাথের এই বাংলাদেশেও— প্রায় ইয়েটসের আয়র্ল্যাণ্ডের মতোই with her great hatred and little room—বিপুল ঘৃণায় আর তিক্ত স্থানাভাবে।

এবং ইয়েটস ১৯১০-এই লিখেছিলেন:

যা কঠিন, তারই আকর্ষণ<br>
আমার ধমনী থেকে শুষে নেয়<br>
সব রস-কষ,<br>
দূর করে স্বতস্ফূর্তি, সহজ সন্তোষ<br>
আমার হৃদয় থেকে—

তখনই ইয়েটসের কাব্যরীতি, জীবন-ছন্দ আর নির্ভীক বাচনপদ্ধতিতে যে একটা শক্ত পেশল অনমনীয়তা এসেছে তাতে মনে হয় যে তিনি তাঁর তারুণ্যের কেল্টিক স্বপ্ন থেকে পাকাপাকিভাবে বেরিয়ে পড়েছেন, এবং ঢুলুঢুলু চোখে ইন্দ্রিয়পরায়ণ প্রতীকবাদ বা সাইমনসের পেটার-ছাঁচের শৌখিনতা তখনই অতিক্রান্ত। বস্তুত ইয়েটস সেই যুগেই পাউণ্ড এলিঅটদের মতো নবীন আধুনিকদের পুরো-ভাগে। আশ্চর্যরকম আত্মসচেতন কবি জীবনের প্রথমার্ধে নাটুকেপনা বা পের্সোনা বা ব্যক্তিস্বরূপের সচেতন রূপ বা সন্ধানের অস্থিরতা এই কারণেই তাঁকে বিড়ম্বিত করত। কিন্তু ঐ কারণেই তাঁর ব্যাপক ও গভীর নানারকম সমালোচকমনা উপলব্ধি, শতবার্ষিকীর পরেও আমাদের মনন উদ্রেক করে। দীর্ঘায়ু ও ক্লান্তিহীন প্রয়াসের ফলে তাঁর অপ্রমত্ত দৃষ্টিতে কল্পনোদ্ভ্রান্ত

পথে পথে ভ্রাম্যমাণ চিন্তার, তথা
ংলগ্ন তাঁর কাব্যের ও নাটকের বিবর্তনে
কটা একসূত্রে সঙ্গতি আজ দেখা যায়।
য়েটসের কৃতবিদ্য পিতা তাঁকে ঠিকই
াবধান ক'রে দিতেন, সত্যিই ইয়েটস
ার্শনিক ছিলেন না, তিনি এক মহাকবি
ায়, অনেক তাঁর মুখচ্ছদ, ব্যক্তিস্বরূপের
নান মুখোশ এবং তথাকথিত দর্শন ও
াপদর্শনের তত্ত্ব তিনি ব্যবহার করেছেন
স্তুতপক্ষে তাঁর কবিতাকে অলঙ্কৃত দেবার
ন্য।

ভারতীয় নিগূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্বের চিন্তা
কে তাঁকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্কুলে কলু-
দের জয়-জয়কারের প্রতিবাদে প্রতিক্রিয়ার
বং হয়তো কিছুটা অসাধারণ মোহিনী
টার্জের মতো ভারতীয়ের ঘনিষ্ঠ
ংস্পর্শে, সেই ১৮৮৬-তেই। প্রসঙ্গত
কটি চালু ভারতীয় চিন্তার বিষয়ে তাঁর
ক কাঁচা বয়সের বিলাসী কবিতার সঙ্গে
। কবিতাটি তিনি পরিণত কবিষে তাঁর
ীবনের শুরুর বিষয়ে লেখেন তার বাঙ্ময়
িষ্টিতির তুলনাটা Knva on Himself
পা হয়—রজাটা, লক্ষ্য করুন, ১৮৮৮তে
he Vegetarian বা নিরামিষাশী নামক
ক পত্রে—

Now wherefore hast thou tears innumerous?
Hast thou not known all sorrow and delight
Wandering of yore in forests rumorous,
Beneath the flaming eyeballs of the night,

And as a slave been wakeful in the halls
Of Rajas and Maharajas beyond number?
Hast thou not ruled among the gilded walls?
Hast thou not known a Raja's dreamless slumber?

এবং আরো দুটি সুইনবর্নীয় বিলাস-ভারাক্রান্ত চতুষ্পদীর পরে :

Then werefore fear the usury of Time,
Or Death that cometh with the next life—Key?
Why, rise and flatter her with golden rhyme,
For as things were, so shall things ever be.

মোহিনী চট্টোপাধ্যায় মশায়ের বিষয়ে
বিতাটি প্রায় একসঙ্গে লণ্ডন মর্কারিতে
র ১৯৩১, ১৪ই জানুআরির নিউ-
পাব্লিক পত্রে Meditations Upon Death
মক দীর্ঘ কবিতার অংশরূপে ছাপা হয়।
ন আছে একদিন আমার বাবার কাছে
াগত দৃষ্টিহীন মোহিনীবাবুর সংযত
ীতাবস্থা যখন পিতৃআজ্ঞায় কবিতাটি
ামার পড়ে শোনাতে হল; এবং সাম্প্রা-
কটি তিনি তাঁর পুত্রের জন্যে লিখেও
লেন :—

উপাসনা করব আমি কিনা,
আমার এ প্রশ্নের উত্তরে
ব্রাহ্মণ বললেন আমায় :
কোরো না কিছুই প্রার্থনা
বোলো প্রতি রাত্রে বিছানায়,
আমি তো ছিলাম মহারাজ,
আমিই ছিলাম ক্রীতদাস,
দুনিয়ায় কিছু নেই আজ,
মূর্খ জুয়াচোর বা বদমাশ
আমি যা হই নি একবার,
অথচ আমার বক্ষ'পরে
রুকমালা রেখেছে তো ভার?

কামকের চণ্ড দিনরাত
ব্যস্ত হয় প্রশান্ত অন্যথা,
মোহিনী চ্যাটার্জি বললেন
ঐ যা অমনিতর কথা :
আমি জুড়িং চীৎকার ব্যাখ্যানে,
স্মৃতি প্রেমিকেও পেতে পারে
কাল যা দেয় নি এতকাল—
মিটবে তাদের সাধ, তাই
কবরে কবর গাদা করে,
দুনিয়ার আস্তার জমিয়ে
চিরস্থায়ী ফৌজের কাওয়াজ,
জন্মের গাদায় জন্ম জমে
যাতে ঐ কামান-দাগার
আওয়াজেই ত্রিকাল পালান,
জন্মমৃত্যুলগ্ন মিশে যায়,
অথবা ঋষিরা যা বলেন :
মানুষের নৃত্য নিত্য মৃত্যুহীন পায়।

ইয়েটস নিজেই তাঁর Commentary on Supernatural Songs—এ বলেন যে, তিনি প্রথম পর্বের খৃস্টীয় আয়ার্ল্যাণ্ডকে ভারতের স্বগোত্র ভাবতেন এবং কৈলাস-পর্বত ও মানস সরোবরের তুল্য তিনি প্রাচীন আয়ার্ল্যাণ্ডে পেয়েছেন?

একালের বাস্তব আয়ারল্যাণ্ডের কথায় এলে দেখা যায়, ইয়েটসও বহু মহান আইরিশম্যানদের মতো মুষ্টিমেয় ভদ্রলোক-শ্রেণীরই মানুষ, প্রটেস্টান্ট ইংরেজের শাসনে ক্যাথলিক দেশে অল্প কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক প্রটেস্টান্ট সমাজের প্রতিভা-ধর ব্যক্তি। তাঁদের মনস্থির করতে হয় এবং ঘোষণা করতে হয় ইয়েটসের ভাষায় :

আমি আয়ার্ল্যাণ্ডেরই
পুণ্যভূমি আয়ার্ল্যাণ্ডেরই।

একদিকে দেশবাসীর দীর্ঘ এবং মহৎ এক ঘৃণা, অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন মননশীলের স্বকীয় গর্ব, তারই মধ্যে আইরিশ ভাষায় অজ্ঞ ইয়েটসকে শক্তি সঞ্চয় করতে হয় নিজের সমৃদ্ধ কল্পনালালিত আইরিশরিতে। এমন কি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তাঁর স্বদেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে বলেন—

Cast your mind on other days
That we in coming days may be
Still the indomitable Irishry.

এই মনোভাবেই তিনি তাঁর কবর-নামা লেখেন—

Under bare Ben Bulben's head
In Drumcliff churchyard Yeats is laid.

এবং তাঁর একাধিক আলোচ্য প্রতীকের অন্যতম, ঘোড়সওয়ার-কে ৪।৯।১৯৩৮এও হুকুম দিতে পারেন :

হিম চক্ষু মুহূর্তেক দাও
জীবনে, মরণে, আর
ঘোড়সওয়ার, পার কেটে যাও।

অবশ্যই তিনি জানতেন অস্থিসর্বস্ব বৃদ্ধ ব্যক্তি হওয়া কাকে বলে; বস্তুতপক্ষে, তিনিই বোধহয় বার্ধক্যের শ্রেষ্ঠ কবি, লীভিসের সমালোচনার সংশোধনে এলিঅট যে কথাটা বলেছিলেন :

এখন যে আমার সে মইটা উধাও
আমায় শুতেই হবে সব মই শুরুই যেখানে
হৃদয়ের নোংরা ন্যাকড়া হাড়ের দোকানে।

ইয়েটসের ভাবণ-উচ্চতা বা প্রকাশ্য কণ্ঠস্বর হয়তো কাব্যের নিভৃতিবাদী পাঠকের মনে হতে পারে আলঙ্কারিক আবৃত্তিতে মহাকবির সচেতন প্রয়াস to make the Centre hold কেন্দ্রকে অচ্যুত রাখার চেষ্টা। অথচ অতি সুকুমার এক কবিমানসের ভয়ানক ট্রাজিক ভাষা এল তাঁরই কবিতায় যিনি 'বরাবর মুলত ব্যবসায়ী চাকুরিয়া শ্রেণীর সংস্পর্শে থেকে যদিচ সর্বশ্রেণীর থেকে নয় সিঁটিয়ে থেকেছেন।' ভিকটোরীয় ব্রিটিশ স্থূলতা, তা সে ধর্মাধর্ম-বিষয়েই হোক বা বিজ্ঞান-বিষয়েই হোক তাঁর সময়ের পজিটিভিস্ট, ইউটিলিটেরিআন, মরমিয়াবিরোধী, ইংল্যাণ্ড-এর শিক্ষিত সমাজ থেকে তরুণ কবি মুক্তি খোঁজেন স্বদেশের দুর্গত জেলে চাষীদের মধ্যে, তাদের কাহিনীতে গানে তাদের ঐতিহ্যে।

ইয়েটসের সুপরিচিত কবিতা Down by the Saeby Gardens লিখিত হয়—এক গ্রাম্য বৃদ্ধার মুখে শোনা গানের অনু-প্রেরণায়, যদিচ ইয়েটস নাকি ছিলেন টোন্-ডেফ অর্থাৎ শ্রুতিবোধবঞ্চিত। আর আইরিশ ভাষাও ছিল তাঁর অজানা।—যে গানটি ক্যাথলীন ফেরিঅর-গীত রেকর্ডে অনেক পরে শোনা গেছে।

তাইতো নিঃসঙ্গ মিনারের মহাকবির সাধ ছিল লোকসাধারণের গ্রন্থ প্রণয়নের, তাই তিনি ভাবতেন আর ঘুরে-ফিরে বলতেন জীবনের ও শিল্পসাহিত্যের, সংস্কৃতির অখণ্ডতার কথা। এই দীর্ঘস্থায়ী অখণ্ডতার অতৃপ্ত সাধই নিশ্চয় তার এক সময়ের রবীন্দ্র-উৎসাহের একটা কারণ ছিল।

উৎসাহের একটা কারণ ছিল। কেন তাঁর রবীন্দ্রনাথে আগ্রহ কমে গেল আর পাউণ্ডের মতো তিনিও বলতে লাগলেন ড্যাম ট্যাগোর, সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে পরে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যহীন সাধুসন্তমার্কা ইংরেজি রূপে ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দিকে তাঁর উৎসাহের একটা কারণ অবশ্য ছিল, তাঁর ধারণাটাই—ঘ্যাংদুর ... সভ্যতায় ... অপূর্ব-

বর্তনীরতা এবং ঐ সাধারণব্যাপ্ত মানস। রাজনৈতিক তুলনীয়তাও নিশ্চয়ই তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। ১৯৩৭-এও তো তিনি লেখেন ঃ

John Bull has stood for Parliament,
A dog must have his day.
The country thinks no end of him,
For he knows how to say.
At a beanfeast or a banquet,
That all must hang their trust
Upon the British Empire,
Upon the Church Christ,

The ghost of Roger Casement
Is beating at the door.

John Bull has gone to India
And all must pay him heed,
For histories are there to prove
That none of another breed
Has had a like inheritance
Or sucked such milk as he,
And there's no luck about a house
If it lack honesty.

The ghost of Roger..etc.

ইয়েটসকে গড়তে হয়েছিল সে সময়ের বীরত্বময় আইরিশ রাজনীতি নিয়েও কাব্যিক মিথ বা একটা পৌরাণিকত্ব। তাই পিআর্স, কনোলি ও ও'রাহিলি এবং অনুরূপ অনেকে ইয়েটসের কাব্যে বলেন ইয়েটসীয় গোলাপগাছেরই কথা। বস্তুত, ইয়েটসের অতীন্দ্রিয় — কাব্যিক রোজ্ প্রোথিত হয় রক্তপাতে ঃ

There is nothing but our own red blood
Can make a right Rose Tree.

এক হিসাবে ইয়েটস বরাবরই নানা প্রকার লিখতে চেয়েছেন ঃ

স্বজাতির আর সত্যের তাগিদে। ১৯১৬-র এবং তার পরবর্তী ক' বছরের অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর একেবারে অন্তিম কবিতাবলীতেও তাই ছায়া ফেলে। সেটা যে শুধুমাত্র কবিতা লেখার সুযোগের জন্যে নয়, তা বেশ বোঝা যায় মার্কিন যুবাপণ্ডিতের কষ্ট সংগৃহীত সক্রিয় সেনেটর ইয়েটসের বহু বাস্তব বিষয়ে সজাগ বক্তৃতাগুলিতে, বৃহৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক ও সজাগ তীক্ষ্ম ভাষণে মন্তব্যে,—যদিও সাম্যবাদে তাঁর ভয় যায় নি, বরং একটা অপরিচ্ছন্ন আকর্ষণ ছিল কিয়দপরিমাণে ফাসিসমের প্রতি—অপ্রবীণতর এজরা পাউণ্ডের মতো।

অথচ কবিতার বিবেচনায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঃ এ কথাও বলা যায় কবিতা বা পদ্যকে যদি পুনরায় মানবিক হতে হয় তাহলে তাকে ধরতে হবে কর্কশ চড়া সুর।

প্রায় পরিণত ত্রিশ বছর ধরে তাঁর কাব্য এই প্রবল মানবিকতার সন্ধান। এমন কি খৃস্টীয় আটত্রিশ সালেও তিনি জানতেন যে বাসনা-কামনা আর রাগই তাঁকে গাইয়েছে। এই মেজাজেই তাঁর কবিত্বের আশ্চর্য বিকাশ। কেউ কেউ মনে করেন যে মাঝে একটা ছেদ আছে, কেউবা বলেছেন যে রীতির পরিবর্তনটা এল প্রায় পঞ্চাশ বছরে বিবাহের পরে। খানিকটা হয়তো তাই কিন্তু ইয়েটস-কাব্যের একটা ক্রমিকতাও আছে এবং ১৯১০-এর 'গ্রীন হেলমেট' উভয় দিক থেকেই এক সীমা-চিহ্ন। আবার পাউণ্ড এলিঅটের মতো কিছু উদ্বাস্তু তরুণদের আধুনিক কাব্যে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গেও ইয়েটসের প্রগতির সম্পর্ক আছে। ইয়েটসের কবি-স্বভাবই চাইত নানান মুখোশ নিজের স্টাইল অর্জন করতে। নিজেকে তিনি কি বলেন নি যে, লোক লেখকমাত্র, কর্মী নয় তার আত্মজয়ই হচ্ছে স্টাইল (এবং একটি নামহীন কবিতায়, এক চৌপদীতে কবিই তো বলেছেন) কেন তিনি বারম্বার তাঁর গানগুলি পুনর্নির্মান করে যান—করে যান নিজেকেই পুনর্গঠিত করতে। ইয়েটসের নিজের প্রতিমূর্তি বা ব্যক্তিস্বরূপের ক্রমিক সংলগ্নতা—যার প্রমাণ আমরা এখন পাই মার্কিন পণ্ডিতের পরিশ্রমে তাঁর কবিতার ভ্যারিওরম সংগ্রহে এবং নাটক সংগ্রহে আর সমস্ত গদ্য-রচনার সংগ্রহে। তাঁর সেই বিখ্যাত পয়লা নম্বর বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত কবিতা An Irish Airman foresees his Death এখন তাই তুলনা করা যায় মরণোত্তর প্রকাশিত Reprisals -এর সঙ্গে ঃ

Some nineteen German planes they say
You had brought down before you died.
We called it a good death. Today
Can ghost or man be satisfied?
- - - - - - - - -
Then close your ears with dust and lie
Among the other cheated dead.

তুমি গোটা উনিশ জর্মান প্লেন, ওরা বলে,
ভূমিসাৎ করেছিলে অকালে তোমার মরণের আগে,
আমরা বলেও ছিলুম, মহৎ মরণ। আজ কোন ছলে
প্রেত বা মানুষ কার মনে তৃপ্তি লাগে?
সুতরাং কান ঢেকে ধুলায় মাটিতে পড়ে থাকো
প্রবঞ্চিত মৃতদের ভিড়ে।

ভাষার কর্তৃত্ব তাঁর ছিল, তিনি জানতেন নিজের কৃতিত্বের মূল্য, তাই তিনি প্রথম বয়সের কবিতাবলী পাল্টাতেন, যৌবনোচিত প্রয়াসে লজ্জিত হয়ে নয়, তাঁর গোটা কাব্যসংগ্রহের একটা সমগ্রতা আনবার জন্যেই। হ্যাঁ, ইয়েটসের ছিল বটে এক কর্তামশায়ের চরম গর্ব নিজের পছন্দ-অপছন্দে। তাই তিনি বিনাসঙ্কোচে দারুণভাবে স্বকীয় অকস্‌ফোর্ড বুক অব মডার্ণ ভর্সে গোগার্টিকে সতেরোটি, ডবলিউ জে টর্ণারকে বারোটি, লেডি ডরথি ওয়েলেসলিকে আটটি, মাইকেল ফীল্ডকে নটি, মার্গো রডককে ছটি, এলিঅটকে মাত্র সাতটি, হার্ডিকে মাত্র চারটি, তাঁর শ্রীপুরোহিতস্বামীজিকে তিনটি এবং নিজেকে চোদ্দটি কবিতা বরাদ্দ করতে পেরেছিলেন। দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথেরও তিনি সাতটি কবিতানুবাদ নিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যাহত আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ ছিলেন ইয়েটস এবং তাই কি তাঁর কীটস-বর্ণিত ইগোটিসটিকল্ সব্লাইম অহমনির্ভর মহত্ত্ব শেষ অবধি তাঁকে তাঁর নেগেটিভ কেপেবিলিটি অহমবিসর্জমান সমশক্তিমত্তা অর্জনে সফল হল? তিনি তাঁর ভাবাবেগকে জাদুবলে দাঁড় করাতে পারতেন ইওরোপীয় ভূখণ্ডের প্রতীকবাদীদের চেয়ে ভালেরি, রিলকে বা পাস্টেরনাক—চেয়ে বেশি সার্থকতায়, প্রাণময়তায়। তাই বৃদ্ধ ইয়েটস সোজা লিখতে পারতেন তাঁর জানলার পাশে ময়নার বাসার বিষয়ে কবিতা ঃ

আমরা সব অবরুদ্ধ, আমাদের অনিশ্চয়তার
কপাটে পড়েছে চাবি, পথে ঘাটে ঘরে
কেউ বা হয়েছে খুন, কারো ঘর পুড়ে ছারখার।
অথচ নিশ্চিত তথ্য স্পষ্টও বোঝাই হল ভার।
এসো বাসা বাঁধি পরিত্যক্ত এই ময়নার কোটরে।

সেইজন্যই বৃদ্ধ কবি মৃত্যুর কিছুকাল আগেও ভাবনাচিন্তা করেন বালক-বালিকাদের শিক্ষা বিষয়ে, যে প্রবন্ধেই তিনি প্রসঙ্গত লেখেন ঃ 'ইংলণ্ড জোর করে ভারতে শিক্ষা-দীক্ষায় ইংরেজীভাষা চাপিয়েছে এবং আজও কোনো ভারতীয়ই কয়েকপুরুষ ধরে ইংরেজিশিক্ষা চালিয়েও প্রাণবন্ত ইংরেজি লিখতে বলতে পারে না এবং তাঁর মাতৃভাষাই হয়েছে তাই ঘৃণিত এবং দূষিত।'

# দুঃখের মেলা

## স্বর্গাদপি গরীয়সী

'আমার মা কোথা? আমার মা! আমি তার কাছে যাব। আমি মায়ের কাছে শোব। মা নেই কেন? আমার মা কোথা?'

'তোমার মা? তুমি সোনামণি ঘুমোও। ঘুমোলেই ঠিক দেখতে পাবে। তোমার মা এসে দেখা করবে।'

'আমাকে চুমু খাবে?'

'হাঁ সোনা, তোমাকে চুমু খাবে।'

'মা কোথা গেছে?' পাঁচ বছরের খোকন সুজন হঠাৎ ফুকরে কেঁদে উঠে শুধোয় তার বাবাকে। তিন বছরের খুকীটির কান্না আর প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিব্রত হয়ে নির্মল সরকার নিজেও গোপনে কাঁদতে থাকে। কন্ঠমালী তার শিশি গাছের কাঁটা মারার যন্ত্রণায় যেন ফেটে যাচ্ছে। এক বছরের কচি খোকনটি চিৎকার করে ঘন্টা খানেক কাঁদার পর এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। নেতিয়ে পড়েছে যেন ...রার মতন।

খুকী কণা আবার বাবার চিবুক ধরে মায়া মাখানো আদুরে ...লায় শুধোয়, 'ঘুমোলেই মা আসবে? মা ভাল। খোকন আমাকে ...রে। মা এলেই মাকে বলে দোব। মা খুব বকে দেবে।'

'হাঁ, খুব বকে দেবে।'

খোকন হঠাৎ বলে বসে, 'মা তো মারা গেছে। মা তো আর ...সবে না। সোনালী, কাকলী, মুক্তা—ওরা বলেছে, তোর মা ...রে গেছে রে! সে কোন্ অন্ধকারে চলে গেছে। আর আসবে ... আর হাসবে না। তোদের আর কোলে নেবে না। চুল আঁচড়ে ...বে না। এই শীতের সময় গায়ে জামা-কাপড় দিয়ে দেবে না। ...দের কাপড় ময়লা হয়ে যাবে। গায়ে মাথায় ধুলো-কাদা ...মবে। আর তোর বাবাও তোদের কান্নায়, তোদের মায়ের ...ন্যে কেঁদে কেঁদে পাগলা হয়ে যাবে। হাঁ বাপী, তুমি পাগলা ...য় যাবে?'

নির্মল এবার ফুকরে কেঁদে উঠল: 'মন্দিরা, মন্দিরা! তুমি ...মাকে কি পাগল করতে রেখে গেলে? আমি কি করব এখন! ...দের আমি কেমন করে বাঁচাব?'

বড় মেয়ে সুধার বয়স আট। সে উপুড় হয়ে পড়ে লেপের ...ধ্যে একটানা ফুলে ফুলে কাঁদছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল: ...পী তুমি কাঁদবে না, তুমি কাঁদলে আমরা ভয় পাই!'

সুধা, সুজন, কণা, যীশু—চারটি কাঁচ-কাঁচা সোনা। ওদের ...লে রেখে হঠাৎ ওদের মা চলে গেছে। যাবার সময় সন্তানদের ...া ভেবে কেমন করে শেষ কান্না কেঁদে উঠেছিল মন্দিরা বড় ... চোখ মেলে সে দৃশ্যটা ভুলতে পারে না নির্মল। কী নির্মম ...র্বাহ ছিল তার চোখে।

ছেলেমেয়েরা কেঁদে কেটে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। কি ...র খাবে ওরা? দুটো ভাত রেঁধেছিল নির্মল সুধার সাহায্য ...য়। মেয়েটা ফেন গড়াতে গিয়ে হাত পোড়াল।

কে তোকে ফেন গড়াতে বললে, দুষ্টু মেয়ে!' ত...ড়া ...ল নির্মল।

সুধা মুখ ঝুলিয়ে কাঁদতে লাগল নিমগাছটার কাছে গিয়ে যেখানে তুলসীতলা—তার মাকে শেষ শোয়ানো হয়েছিল। যে পথে হরিবোল দিয়ে কাঁধে করে সবাই তার মাকে নিয়ে গিয়ে কোথায় সুদূর নদীর চরে পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে সেদিকে তাকিয়ে থেকে নীরবে ফুলে ফুলে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়।

কচি বাচ্চাটা ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে সেই চিৎকার

করে তাড়া দেয় নির্মল, সন্ধ্যা, ওখানে কাঁদা হচ্ছে—বাঁশুকে নিতে পারিস না? আমার আর কী। এই করি? অফিস গেল, রোজ-গার গেল।...

ছেলেমেয়েরা এখন ঘুমিয়েছে। হ্যারিকেনটা খুব নিস্তেজ করে আলো কমিয়ে দেয় নির্মল। কচি বাচ্চা বাঁশু ঘুমের ঘোরে চুকচুক করে স্তন টানার মতন শব্দ করে। কচি কচি হাত দুটো দিয়ে মায়ের নরম নরম তপ্ত মধুর বুকের অমৃতাধার খুঁজে বেড়ায়।

স্বপ্ন দেখে সুজন হঠাৎ হাসতে থাকে। কথা বলতে থাকে : জানো মা, সোনালী বলে তুমি নাকি মরে গেছ।...বাপী আমাকে আজ মারল।...' তারপর সুজন কাঁদতে লাগল।

বাইরে হিমার্ত পৃথিবী কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে বেঘোরে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

প্যাঁচা ডাকতে লাগল—চ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ স্বরে।

শিয়াল ডাকে—কাক-কাক কা—হুয়া—হুয়া! কা হুয়া, কা হুয়া!

খটাশ ডেকে ওঠে—বাফ-বাফ-বাফ—তুষ। তুষ!

রাতচরা পাখি ডাকছে—চিকুর-চিকুর-চিকুর।

—ঘরের আড়কাঠার বাঁশে একটা ঝিঁকুর পোকা ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ তুলে ক্রমাগত একটানা বাঁশ কুরে খাচ্ছে। হাড়ের মজ্জা কুরে খাচ্ছে যেন পোকাটা।

খাটের ওপরের শয্যাটা শূন্য পড়ে আছে। মেঝেতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঠিক যেখানটাতে মন্দিরা শুয়ে থাকত আজ পাঁচদিন হল সেখানটাতে শুচ্ছে নির্মল। সারা রাত মোটেই ঘুমোতে পারে না সে। একটু তন্দ্রা ঘনিয়ে এলেই হঠাৎ মন্দিরা এসে হাজির : একি গো! তুমি মা হয়েছ নাকি! হি-হি-হি বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াচ্ছ? ওঠ-ওঠ—এই উঠে গিয়ে খাটে শোও! তারপর হঠাৎ সে হাঁক দেয় বল হরি হরিবোল হরি।'

উঠে বসে থাকে নির্মল।

কাঁচটা বিছানা ভিজিয়ে ফেললেই উঠে পড়ে। কাঁথা পালটে দিতে হয়। নোংরা করলে পরিষ্কার করে দিতে হয়। সকালে সেসব ধুতে হবে। রোদে শুকোতে হবে। মন্দিরার যে অলক্ষ্যে কত কাজ ছিল সেসব করতে গিয়ে এখন চোখে পড়ে যায়।

হাসির ব্যাপার, সুধা খানিকটা গোবর কুড়িয়ে এনে মাটির ঘরের মেঝে-দাওয়া নিকিয়েছিল সকালে।

মন্দিরা ওদের জন্যে টিন ভর্তি করে মুড়ি ভেজে রাখত। মুড়ি ভাজতে পারে না নির্মল। চাল দিতে পাড়ার সোনালীর মা ভেজে দিয়ে গেছে গতকাল। সোনালীর দুজনী এসে ওদের ঝোলে নেয়, দেখে মাঝে-মধ্যে। নির্মল এসে পড়লেই পালিয়ে যায়। অষ্টাদশী কুমারী মেয়ে। মন্দিরার যেন সখীর মতন ছিল—তার গন্ধ তেল মাথায় দিত—হিমানী মুখে দিত। মন্দিরা তামাসা করে বলত 'আমি যদি মরে যাই হঠাৎ তুই আমার সতীন হবি। তুই অনাথ মেয়ে—তোর দাদাবাবু তোর বিয়ে দিচ্ছে না। দেখিস যেন আমার পুরুষটাকে দখল করিস না।'

জমিতে ধান পেকে গেছে। জন লাগাতে হবে। পাশাপাশি আটনের ধান কাটা হয়ে গেছে। অনেকের ধান উঠে গেছে মাঠ থেকে খামারে।

নির্মলের শ্বশুর আছেন, তিনি বৃদ্ধ, স্কুল মাস্টার—শাশুড়ী নেই। নিজের মা-বাবা নেই। বাবা মারা যান তাকে মাত্র বছর দশেকের রেখে। মা মারা গেছেন গত বছরে। তিনি অনেক কষ্টে জমি-জিরাত চাষ করিয়ে ছেলেকে বি-এ পর্যন্ত পাস করান। বিয়ের ব্যাপারটা নির্মলের 'লভ ম্যারেজ'। মা কিছু আপত্তি করেন নি। কারণ মন্দিরা সুন্দরী ছিল দেখতে, অসামান্যা সুন্দরী। আগুনের শিখার মতন। মন্দিরার রূপের প্রশংসা করলে সে বলত, কত মেয়ের মাথা ঘোরালো তোমারও রূপ আছে বাপু!

চ! ভালবাসা! মন্দিরার ভালবাসা! ...ণ'চাঁপার কুঁড়ির মতন দুধে ধোয়া ...আজ কোথায় হারিয়ে গেল। তার ...দেহের বিচিত্র গোপন চিত্র! তার ...। চারটি সন্তান! সুধা-সুজন-কণা- ...সবাই শিশু! সবাই শিশু!...

...রটি সন্তান হয়ে গেল! অফিসে সে ...ন্লে বন্ধুরা বলত, তুই কোন্ যুগে ...রছিস রাঁ? সগররাজার মতন ষাট সন্তানের জনক হবি নাকি? সন্তান করতে টাকা লাগবে না? বন্ধ কর ...ন্ধ কর—ভগবানের নাম করে এখন ...সে। বলতেও লজ্জা করে না তোর? তোর সুন্দরী বউটা বুড়ী হয়ে ...ল পাকবে, দাঁত খসবে তাড়াতাড়ি! ...কুর-মা হয়ে যাবে!'

...দরাকে এসব কথা বললে সে হাসত। ...ই না না, ইয়ার্কি না। আমি ...গন করে নিই।'

...। কক্ষণো তা করবে না। করতে হয় ...া-হয় করব।'

...ব করব করে যীশুও তো আবার ...জির হল।'

...দরা বললে, 'ভাগ্যি কিছু করিনি। ...ানার চাঁদ এল আমার কোলে!'

...নিয়ে থাকো। বিশ-বাইশটা ছেলে- ...াক তোমার। তোমাকে তো মেয়ের টাকা যার করতে হবে না। ছেলেকে ...

...করো। আমারই সব দোষ। তবে ...ন, 'এই এসো না'—আমার ঘুম ...া!'

... হঠাৎ একদিন [illegible] ...া থেকে অংশ নিয়ে এল

...[illegible] পর দ্বিতীয়টা এল তিন ...।

...[illegible] দু'বছর পরে। শেষেরটা দেড় বছর পরেই। প্রাক্তন ডাক্তার ...নাকি মন্দিরাকে বলেছিলেন, ...সাবধান হোন, ঘন ঘন সন্তান ...কেন না ইউটেরাস নষ্ট হয়ে

...ী [illegible] আগমন আতঙ্কেই ...া এসেছিল মন্দিরা। জন্ম- ...কাজ [illegible] বন্দনা চ্যাটার্জিও তার ...ন্ত, বোকাও। জুপে না নেওয়া যে

কত বোকামী তা হাসিকান্নার নাটক করে বুঝিয়ে বন্দনা মন্দিরাকে শিকার করে ফেললে।

কিন্তু মন্দিরার আর শান্তি ছিল না। না কোনো কাজে, না দেহে, না মনে। অনেকবার দেহ দেখিয়ে এল। কেবলই বলত, 'ঘেন্না! ঘেন্না! লজ্জায় মরে যাই! ছি!...আমি খুলে ফেলব—আমার যন্ত্রণা হয়—রক্তপাত হয়—মাথা ঘোরে—ভ্রম হয়ে সেদিন খাটে পড়ে গেলাম—জ্ঞান ছিল না। ছেলেমেয়েরা কেঁদে-কেটে পাগল! আমাদের মা মারা গেছে!'

'খুলেই এস তাহলে! কারো কারো আবার ওসব সয় না।'

'কিন্তু সোনালীর মা নিয়েছে, রাধার মা নিয়েছে—ওদের তো কিছু হয় না। দেদার মোটা হচ্ছে। তবে একটা মজার কথা, হাস্নুর মায়ের নাকি লুপের ওপরেই বাচ্চা হয়েছে। সেও মাথা ঘুরে পড়ে যায়। অজ্ঞান হয় মাঝে মাঝে।'

'তোমারও তাই নয় তো?'

'কে জানে!' হাসলেও মহা চিন্তিত দেখা যেত মন্দিরাকে। অত সুন্দরী মেয়ের মুখেও মেছেতা দাগ পড়তে লাগল।

তারপর মন্দিরা একদিন ভোর থেকে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। মন্মথ ডাক্তার এলেন। বললেন, 'ইঞ্জেকশন দিয়ে গেলাম। সেরে যাবে।'

ঘন্টা দুই পরে আবার যন্ত্রণা।

নির্মলের এখন মনে হয়, ইউটেরাসের ভেতরটা বোধহয় মন্দিরার পচে গিয়েছিল।

মন্দিরা কাটা মুরগীর মতন আছাড়-কাছাড় করতে লাগল। ছেলেদের বুকে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগল : 'ওরে তোদের ভাল করে মানুষ করবার জন্য আমি মরে গেলাম! আমার 'যৌবন' চলে যাবে!...আমি আত্মহত্যা করেছি!' কর্কশ দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে লাগল সে।

'মন্দিরা!'

ছেলেমেয়ের দিকে বড় বড় চোখ মেলে দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘাড় কাত্ হয়ে গেল মন্দিরার।

কণা জেগে ওঠে : 'মা কই? আমার মা কোথা? আমি তোমার কাছে শোব না। মা'র কাছে শোব। মায়ের বুকে মাথা রেখে শোব! মা কেন আসে না? মা—মাগো'—চিৎকার করে কাঁদতে লাগল কণা। সুজন উঠে পড়ে বসল। সেও বললে, 'মা, আমার মা কই?'

'ঘুমোও।' নির্মল তাড়া দিলে।

সুজন চিৎকার করে ওঠে : 'হাঁ খালি তুমি বলো ঘুমোও! কি করে ঘুমোবো—মা নেই!'

'তোমাদের মা আসবে।'

'কবে আসবে? কখন আসবে?'

'আচ্ছা সুজন, সোনালীর মাসীকে মা বলতে পার না? সে যদি তোমার মা হয়?'

"ছ্যা! মা'র মতন কেউ হয়? মা মরে গেছে বলে কি আর আসবে না? আমরা তাহলে মরে যাব!'...

কচি বাচ্চাটা উঠে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদতে লাগল। কিছুতেই থামে না। মন্দিরা কেমন করে থামাত কে জানে! নারীর কাজ পুরুষরা পারে না। নারী হল পুরুষের চারপাশের সোনার প্রাচীর। সে প্রাচীর ভেঙে গেছে নির্মলের।

ক্ষেতে পাকা ধান পড়ে আছে, অফিসের কাজ গেল, সন্তান মানুষ হবে না, অনাহার, রাত্রি জাগরণ, দুঃস্বপ্ন। বাপ মারা গেলে মা তবু সন্তানদের মানুষ করতে পারে, বাপ পারে না। মায়ের কষ্ট বাপ সহ্য করতে পারে না।

কিন্তু সোনালীর মাসী পারুলকে যদি বিয়ে করে তবে সে কি এইসব বাচ্চাদের নিজের পেটের বাচ্চার মতন করে আর দেখবে? তার সুখ-আহলাদ নেই? তার নিজের ছেলে আসবে! আবার ছেলেমেয়ে? যার জন্যে মন্দিরা বিদায় নিলে। তার ভাষায় 'আত্মহত্যা' করলে!

ছেলেরা আবার একটু ঘুমিয়ে পড়লে মন্দিরার সঙ্গে দীর্ঘ এগার বছরের সংসার চিত্রটা কত চেনাজানা হয়ে অথচ ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে।

ভাবতে ভাবতে নির্মল হঠাৎ কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল একটু।

হঠাৎ মন্দিরা সেই বিয়ের দিনের আগুন রঙের শাড়িটা পরে এসে হাজির। ডেকে বললে, 'এই! ওখানে কেন?' 'মন্দিরা' হয়ে গেছ? মা হয়ে গেছ? ওঠ ওঠ—দেখ—আমি সেই বিয়ের পোশাক পরে এসেছি গো! শানাই বাজছে কেমন সুরে, শুনতে পাচ্ছ না?'

আশ্চর্য! ঘুম ভেঙে যেতে সত্যিই শানাইয়ের বাজনা শুনতে পেলে নির্মল সরকার।

হাসলে সে। সকাল হয়ে গেছে কখন। পাশের বাড়ি থেকে রেডিও বাজছে। রেডিও শংখনিনাদে শানাই বাজাচ্ছে।

কণা ঝেড়ে মেড়ে উঠে পড়ে বললে, আমার মা নেই কেন? হাঁ বাপী, মা কই? আমার 'মাকে কোথা গেলে পাব?'

(২৯)

পরদিন সকালে তুলসীকে জিজ্ঞেস করলাম কি রকম পরীক্ষা দিলি বললি না তো?

বলল, থিয়োরেটিকেলে পাশ করব হয়ত, ভাইভা ভোসিতে ফুল মার্কস পাব।

বললাম, কি করে জানলি?

এগজামিনার বার বার তাকাচ্ছিলেন, আমার মুখ দেখে নম্বর দিচ্ছিলেন মনে হল।

হাসতে লাগল।

তুলসী কলেজে গেলে বসে-বসে তার কালকার কথাগুলো ভাবছিলাম। দেবাশিস এল তার দুটি আমেরিকান বন্ধুকে নিয়ে।

জানাল কাল সকালে কারখানায় কাজ আরম্ভ হবে, আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। বলল, সন্ধ্যাবেলায় একটা কালচারাল ফাংশান হবে, তাতেও মিস ভটচাযকে নিয়ে যেতে হবে।

বলল, রাস্তায় দেখা হয়েছিল, বলেছি। বললেন, আপনি নিয়ে গেলে যেতে পারেন।

তার আমেরিকান বন্ধুরা খাঁচা ঘরে ঢুকলেন, ঘরের আসবাবপত্র ছবিগুলো দেখলেন। দেবাশিসের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ, দেবাশিসকে জিজ্ঞেস করলেন কোন বয়সের ছবি।

দেবাশিস বলল, বছর কুড়ির হবে, তখন প্রোঃ গাঙ্গুলীর ছাত্র ছিলাম।

বুদ্ধদেব ও প্রভাতী, চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়ার ছবির মানে জিজ্ঞেস করলেন। মানে বললাম। বুদ্ধদেবের ছবি দেখিয়ে একজন বললেন, দি গার্ল হেজ দি লুক অব মেরী ম্যাগডালীন।

হেসে বললাম, ইউ আর রাইট।

বার প্রীতিভরে দিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন। দেবাশিস [illegible] গাড়ী আনবে।

[illegible] প্রশ্ন করলাম।

বলল, কাল তাঁকে বলেছি, ছেলেদের নিয়ে যাবেন বলেছেন।

কারখানা খোলার ফাংশান সকাল সাড়ে আটটায়। আটটায় গাড়ী আসলে তুলসীকে নিয়ে উঠলাম। বলল, সকাল বেলায় কথা তো মিঃ ভাদুড়ী কিছু বলেন নি?

আমি বলছি। আমার বডিগার্ড হয়ে চল।

বডিগার্ড? বরং বলো মেডিকেল এটেন্ডেন্ট।।

বেশ, তাই।

দেখলাম বিরাট ব্যাপার। প্রচুর সরকারী, বেসরকারী অতিথি সমাগম হয়েছে, আমেরিকান কনস্যুলেটের লোক, বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লোকেরাও এসেছেন। আপত্তি করব বলে দেবাশিস আগে বলে নি, মালা গলায় দিয়ে, ফিতে কেটে, বোতাম টিপে কারখানা উদ্বোধনের কর্তব্য পালনের ভার দিল প্রোঃ পি এন গাঙ্গুলীর ওপরে।

আমেরিকান বন্ধু দুটি তুলসীর গলায় মালা দিয়ে নমস্তে জানালেন। মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিটের বক্তৃতা শেষ করে হাততালি শেষ হবার আগে নিজের জায়গায় ফিরে গেলাম।

দেখলাম ছেলেদের নিয়ে অশোক একটু দূরে বসেছে। তুলসীকে নিয়ে তাদের পাশে গিয়ে বসলাম। কথাবার্তা হচ্ছে দেবাশিস এসে বলল, আপনারা কারখানা দেখবেন আসুন।

আধ ঘণ্টা ঘুরে দেখবার পরে যে আমেরিকান বন্ধুটিকে দেখাবার ভার দিয়েছিল দেবাশিস তার কাছে ছুটি চাইলাম, বুড়ো মানুষ আর পারব না আজ।

অশোকদের দাঁড় করিয়ে রেখে বললেন, এখানে অপেক্ষা করুন, প্রোফেসরকে বসিয়ে দিয়ে ফিরে আসছি।

অতিথিরা দলে-দলে বিভক্ত হয়ে গাইড সঙ্গে নিয়ে কারখানা দেখে বেড়াতে লাগল। সবটা এখনও তৈরী হয় নি, কাজ চলছে। যা হয়েছে তাই প্রকাণ্ড ব্যাপার।

আধ ঘণ্টা পরে তুলসী ফিরে এল দেবাশিসের সঙ্গে। বলল, মিস ভটচায ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন আপনার জন্য, তাই নিয়ে এলাম।

চলে গেল ছুটতে-ছুটতে। অশোকরা ফিরে এল আরও আধ ঘণ্টা পরে ক্লান্ত হয়ে। একটু পরে ট্রেতে করে আইসক্রীম নিয়ে এল উর্দি-পরা বয়। তুলসী ও অশোকের ছেলেরা একটা করে তুলে নিল।

দেবাশিসকে আর দেখতে পেলাম না, খুব ব্যস্ত রয়েছে নিশ্চয়। বেরোবার সময় কারখানার ফটকের কাছে দেখা হল, বলল, চলুন গাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি।

বললাম, অশোকের গাড়ীতে যাচ্ছি, ব্যস্ত হয়ো না তুমি।

তুলসীকে বলল, ওবেলা আসবেন আপনারা, সাড়ে ছটায়।

ছটায় অশোক ছেলেদের নিয়ে এল আমাদের তুলে নেবার জন্য। শরীরটা একটু খারাপ লাগছিল যেতে পারলাম না। তুলসী বেঁকে বসল, বলল, বড়বাবু, আপনারা যান। বকে-ঝকে তাকে পাঠালাম অশোকদের সঙ্গে, অশোকের বড় ছেলেকে বললাম, চলে আসবার বায়না করলে পৌঁছে দিয়ে যেয়ো।

বলল, নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।

ন'টার বেরিয়েছে নটা বাজে, এখনও ফিরল না তুলসী। বেশ ভাল লাগছে বোধহয়, বিশেষ দেখে নি তো এসব জিনিস। ঘড়িটার দিকে চোখ যাচ্ছে থেকে-থেকে, আশ্বাস দিচ্ছি নিজেকে তুলসীর খুব ভাল লাগছে নাচ, গান, সিনেমা। গাড়ীর শব্দ পেলাম।

একটু পরে একটা কাগজের বাকস হাতে নিয়ে বারান্দায় উঠে এল তুলসী।

বললাম, কার সঙ্গে এলি?

কাগজের বাকস খুলে একটা কেক নিয়ে মুখের কাছে ধরল, খাও, তোমার ছাত্র দিয়েছেন।

দেবাশিস এল হাতে দুটো বড় কাগজের বাকস নিয়ে।

বললাম, তোমাকে [illegible] হল দেবাশিস, অশোকরা এল না?

বলল, অশোকবাবু [illegible], বাড়ীর কাছে নেমে গেলেন। ছেলেরা শেষ পর্যন্ত থাকবেন।

[illegible] না?

কাগজে দেখলাম, জাল মামলার কথা শুনেছি, বিশেষ লক্ষ্য করবার কি আছে?

বলল, বাবার বিজনেসের দামটা একটু কমে নিয়েছেন মিঃ ভাদুড়ী। পৈতৃক বাড়ীটাও উদ্ধার করবেন মনে হয়।

এ খবর তো জানি না অশোক। কি করে বাড়ী উদ্ধার করবে দেবাশিস?

হেসে বলল, টাকা ও কৌশলের জোরে। বাড়ীর ব্যাপার সম্বন্ধে আমি যতটা জানতাম শুনে নিয়েছেন আমার কাছে। তাঁর দুই দাদার সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁর বাবার এটর্ণির সঙ্গে দেখা করে নতুন কিছু খবর বের করেছেন মনে হয়। আদালতে জাল দলিল দেখিয়ে বাড়ী বেদখল করেছে অভিযোগে, আসবাবপত্র চুরি করবার অভিযোগে গুরুদেবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে, তাঁর নামে সমন গিয়েছে উত্তর কাশীর আশ্রমে। শুনছি শিষ্যরা ভড়কে গিয়েছে, তাদের লোক আনাগোনা করছে মিঃ ভাদুড়ীর কাছে গুরুদেবকে বাঁচাবার জন্য।

বললাম, এত কাণ্ড? দেবাশিস কিছু বলে নি আমাকে।

বলল, আমি মামলার একজন সাক্ষী।

তুমি সাক্ষী? দলিল যে জাল তার কোন প্রমাণ আছে?

বলল, আদালতে কি দাঁড়াবে বলতে পারি না, কিছু কানাঘুষা শুনেছিলাম মিঃ ভাদুড়ী দলিল সই করতে রাজি না হওয়ায় নার্কোটিক খাইয়ে অর্ধচেতন অবস্থায় মিসেস ভাদুড়ী হাত ধরে তাঁকে সই করিয়েছেন দলিলে, সইটা ঠিক না হওয়ায় নিজের নাম সই করেছেন স্বামীর নামের নীচে।

কার কাছে এ খবর পেলে?

মিঃ ভাদুড়ীর বাড়ীর দু-একজন পুরানো ভৃত্যের মুখে।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার? মিঃ ভাদুড়ীর বড় দু ছেলে কিছু সন্দেহ করে নি?

বলল, তাঁরা অনেক আগে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন গুরুভাইদের উপদ্রবে।

বললাম, পৈতৃক বাড়ী, দেবাশিস চেষ্টা করে উদ্ধার করতে পারলে ভাল হয়।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে অশোক চলে গেল।

বসে-বসে ভাবছিলাম নানা কথা। আমার সামনে দিয়ে কলেজে যাবার সময় তুলসী কাছে দাঁড়াল, বলল, তোমার কিছু হয়েছে জেঠামণি? কি ভাবছ অমন করে?

বললাম, বুড়ো মানুষের মাথায় নানা রকমের কথা যাওয়া আসা করে, কিছু হয় নি আমার। তোর রিকশা এসেছে?

হ্যাঁ, ঘণ্টি বাজাল, শুনতে পাও নি তুমি?

শুনতে পাই নি। আচ্ছা, তুই যা।

[illegible]

অবস্থায়। একটা গোলমেলে কথা মাথার মধ্যে নীচে থেকে ঠেলে উঠছিল ওপরে, মিসেস ভাদুড়ী, দেবাশিসের মা, স্বামীর সর্বনাশের জন্য দায়ী কি? স্বামীকে নার্কোটিক খাওয়ানো অভ্যাস করিয়ে হাতের মুঠোয় এনেছিলেন কি? কেন? কি মোটিভ ছিল তাঁর? দেবাশিসের মত ভদ্র, মার্জিতরুচি প্রথম শ্রেণীর মেধাবী ছেলের মধ্যে বন্য জন্তুর প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছিল কোন সূত্রে?

নানা রকম অস্বস্তিকর চিন্তা আসছিল মাথার মধ্যে।

মহামায়া খবর পাঠাল স্নান করবার বেলা হয়েছে। উঠতে হল। উঠে স্নান করলাম, খেলাম, কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিলাম, মনের মেঘ একেবারে কাটল না। একবার মনে হল অশোক আমাকে অত খবর না দিলেও পারত।

(৩০)

মাস খানেক কেটে গেল।

দেবাশিস মাঝে-মাঝে আসত, পাঁচ-দশ মিনিট বসে কথাবার্তা বলে চলে যেত। একদিন জানাল রিসার্চ লেবরেটরী তৈরী হয়েছে, কাল আমাকে নিয়ে যাবে।

দামী, নতুন যন্ত্রপাতি আনিয়ে রিসার্চ লেবরেটরী গড়ে তুলেছে দেখলাম। একটা ছোট কামরা দেখিয়ে বলল, এটা আপনার ঘর।

বললাম, আমার ঘর? আমাকে আসতে হবে এখানে? আমাকে দিয়ে তোমার কি কাজ হবে শুনি?

হেসে বলল, আপনার বাড়ীর লেবরেটরীর জিনিসপত্র নিয়ে আসব এখানে। আপনার পুরনো কাজের জায়গায় যেতে পাবেন না, যা করবার ইচ্ছে এখানে করবেন।

বললাম, আমাকে এত দাম দিচ্ছ কেন দেবাশিস? আমি বকেয়া হয়ে গিয়েছি।

বলল, আপনার দুটো এন্টি-বায়োটিক বাজারে চলছে। এর পর যা করবেন তা হবে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার সম্পত্তি। আপনার পুরুষ-যত্ন সহকারী নিযুক্ত করবেন, আমিও কিছু সময় কাজ করব আপনার সঙ্গে।

রিসার্চ লেবরেটরীর ব্যবস্থা দেখে, যে ঘর আমার জন্য করেছে বলল সে ঘরের বুককেসে নানা দেশের রিসার্চ জার্নালগুলো দেখে লোভ হল একটু, না বলতে পারলাম না। মনে-মনে বুঝলাম নুলো জগন্নাথ ঠাকুরের মত বেদীতে বসিয়ে রাখতে চায় আমাকে, আধুনিক রিসার্চের অগ্রগতি সম্বন্ধে খবর রাখবার বয়স ও বিদ্যা আমার নাই তা বোঝে না এমন নিরেট নয় দেবাশিসের মাথা।

আমার যাতায়াতের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা হল।

আমাকে কাজে বসিয়ে দিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেল দেবাশিস, বলল, পনের-কুড়ি দিন পরে ফিরবে।

তুলসী পাশ করেছে। তাকে ওয়ার্ড ডিউটি দিতে হয়। মাঝে-মাঝে রাতেও ডিউটি পড়ে। বাধ্য হয়ে কলেজের কাছে একটা মেয়েদের হোস্টেলে তার থাকবার বন্দোবস্ত করতে হল। হোস্টেলে যাবার আগের দিন তাকে বললাম, তোর বেশী কাপড়-জামা লাগবে হোস্টেলে থাকতে হলে, যা-যা দরকার কিনে নে।

বলল, ব্যস্ত হয়ো না। কিছু আছে, যখন দরকার হবে কিনে নেব। এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন বল তো?

বললাম, মাথা ঘামাচ্ছি এই জন্য যে, তুই একা থাকিস নি আগে, কিছু জানিস না—

থাক, জেঠামণি, আর বকো না।

বললাম, নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে পারলে ভাল, আমি আর ক'দিন?

হেসে বলল, অনেক দিন।

অনেক দিন বাঁচবার ইচ্ছে নাই তুলসী, তুই ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়ে এলে রোজ

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব আমাকে দাও।

চুপ করে রইল। তাকিয়ে দেখলাম চোখ ছলছল করছে।

এগিয়ে এসে আমার মাথার ওপরে হাত রেখে বলল, আমি হোস্টেলে যাব না জেঠামণি। তোমার কাছে থাকব। সেই ব্যবস্থা করে দাও।

দু হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে, চোখে জলের ফোঁটা পড়ল।

বললাম, বোস সামনে, কাঁদছিস কি, ধরলে এত বড় মেয়ে?

বসল সামনে। মুখ নামিয়ে বলল, আমি হোস্টেলে যাবনা সত্যি বলছি।

কোলে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগল।

পায়ের শব্দ পেয়ে তাকালাম। এটাচি কেস হাতে দেবাশিস ঘরে ঢুকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

বললাম, কবে ফিরলে?

কাল রাতে ফিরেছি।

বসো। পাগল মেয়ের কাণ্ড দেখ। এই তুলসী, মুখ তোল।

মুখ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তুলসী।

খুলে বলতে হল সব। বললাম, সব ঠিক, কাল হোস্টেলে যাবে, টাকা দেয়া হয়েছে, এখন বলছে অন্য ব্যবস্থা করো, হোস্টেলে যাবে না। তাই নিয়ে কান্না। নিজের চোখে দেখলে মেয়ের কাণ্ড, লোকে শুনলে বিশ্বাস করতে চাইবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দেবাশিস বলল, আমি পরশু আমেরিকা যাচ্ছি, মিসেস কে-র খুব অসুখ, আমাকে ট্রাঙ্ক-কল করে যাবার অনুরোধ করেছেন। আমার গাড়ীটা আপনার কাছে থাকবে, উনি যাতায়াত করবেন। রাতে যেতে হলে আপনার বাড়ীর অধরকে সঙ্গে পাঠাবেন।

বললাম, তুলসী যদি রাজি হয় এ ব্যবস্থায় আমার আপত্তি নাই। তোমার ফিরতে কত দেরী হতে পারে?

বলতে পারছি না, কিছু দেরী হবে ধরে নিচ্ছি।

এখানকার সব ব্যবস্থা করেছ?

বলল, আমার আমেরিকান বন্ধুরা থাকছেন, সব ভার তাঁদের হাতে থাকবে, একটু হেসে বলল, আপনার ভার ছাড়া। আপনার ভার আপনার হাতে।

তুলসীকে ডাকি, সে কি বলে শুনি।

বলল, দরকার নাই। আপনাকে ছেড়ে হোস্টেলে না যাবার যে কোন অলটারনেটিভ ব্যবস্থায় উনি রাজি হবেন। আপনি জানিয়ে দেবেন এই ব্যবস্থা আপনি করেছেন।

তারপর বলল, আমেরিকা যাচ্ছি খবরটা দিতে এসেছিলাম, এখন উঠি। গাড়ীটা কাল থেকে আপনার বাড়ীতে থাকবে, ড্রাইভার খাবে, শোবে অফিস বাড়ীতে।

প্রণাম করে চলে গেল।

তুলসীর মতিগতি কোন পথে যাবে জানা নাই, তাকে বলতে হল দেবাশিস গাড়ীটা এখানে রেখে গেল আমার দরকার হতে পারে ভেবে, ড্রাইভার বাইরে থাকবে সে গাড়ীটা এখানে থাকবে। যদি হোস্টেলে না যাবার জেদ ছাড়তে না পারিস, এই গাড়ীতে যাতায়াত কর।

তারপর কি করবে?

সে তারপর দেখা যাবে।

দেবাশিসের রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে যাই, জার্নালগুলো পড়ি, কিছু কাজ আরম্ভ করেছি। তুলসীর রাতে ডিউটি থাকলে গাড়ীতে যাতায়াত করে, অন্য সময় গাড়ী নেয় না, আগের মত চালায়। এইভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল।

এক মাস কেটে গেল। তারপর তার বন্ধুদের কাছে খবর পেলাম মিসেস কে-র মৃত্যু হয়েছে, তাদের ফিরতে আরও এক মাস দেরী হতে পারে।

দিন-দশ পরে দেবাশিসের চিঠি পেলাম। লিখেছে, মাস্টার মশাই, বোধহয় খবর পেয়েছেন মিসেস কে মারা গিয়েছেন। তিনি যে গুরুতর অসুস্থ, মৃত্যু আসন্ন এখানে পৌঁছবার আগে জানতে পারি নি, কারণ আমাদের মধ্যে চিঠিপত্র চলত না। তিনি আগে কোন খবর দেন নি, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই জেনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

দু-চারটে কাজের ভার আমার ওপরে দেবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন বললেন। আমার য়ুনিভার্সিটি, আরও দুটি য়ুনি-ভার্সিটিতে টাকা দিয়েছেন টেকনোলজির ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ দেবার জন্য। আমাদের জন্য দেশের দুটো য়ুনিভার্সিটি ও অন্য দু-তিনটি প্রতি-ষ্ঠানকে টেকনোলজি শিক্ষার উন্নতির জন্য দেবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার ও এদেশের কটি সমাজ-কল্যাণ প্রতি-ষ্ঠানকে দেবার জন্য টাকা দিয়েছেন আমার হাতে।

তাঁর জীবনের শেষ কদিন আমি যেন তাঁর শয্যার পাশে উপস্থিত থাকি অনুরোধ করেছিলেন। খামে বন্ধ-করা অনেকগুলো চিঠি সিল্কের থলিতে ভরে আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন। চিঠিগুলো তোমাকে লেখা, পাঠাই নি। আমার দেহের সঙ্গে ক্রিমেটো-রিয়ামে এ থলিটা দিয়ো। একটা প্লাটি-নামের কাজ-করা রুপোর কৌটো আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, এক মুঠো ছাই রেখো এটাতে, দেশে ফিরে দিয়ে পবিত্র নদী গঙ্গায় দিয়ো। কিছু টাকা রেখে গেলাম, দেশে ফিরে গরীব-দুঃখীকে একদিন পেট ভরে খাইয়ো।

মৃত্যুর দুদিন আগে আমাকে বলে-ছিলেন, দেব, তুমি আমার কাছে এসেছিলে, কিছুকাল আমার জীবনে ছিলে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। কি সম্পর্ক ছিল এক সময়ে আমাদের মধ্যে সেটা তুচ্ছ ব্যাপার, কি স্থায়ী বস্তু তোমার কাছে পেয়েছি সেইটে বড় কথা। তোমার কাছে পেয়েছি জীবন সম্বল, যাকে বলা যায় বিশ্বাস। জীবনযাত্রার বাইরের দিকটাতে বেশী মন দিতে গিয়ে মন খালি হয়ে গিয়েছে আমাদের, মন ভরবার সব কিছুতে বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে।

ভগবানে বিশ্বাস রাখি না আমরা, মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক আত্মীয়তায় বিশ্বাস করি না, জীবনের সত্য অবলম্বন যে ভালবাসা তাতে বিশ্বাস করি না, সব মানুষ যে অন্তরে বাইরে এক, তাদের প্রয়োজন, তৃপ্তি যে এক আমরা মানি না। স্পেস ক্রাফটে চড়ে পৃথিবীর বাইরে যাচ্ছে মানুষ, কিন্তু তার মন পৃথিবীর পাঁকের মধ্যে লুটোপুটি খাচ্ছে।

দেব, মানুষের সনাতন সত্যবস্তুর সঙ্গে যদি সায়েন্স ও টেকনোলজির মিলন ঘটে কোন দিন—

কথা শেষ না করে দুর্বল হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন, আমার হাতের মধ্যে হাত-খানা নিলাম।

বললেন, দেব, তোমার স্পর্শ পাবার জন্য আমার এই যে দুর্বল হাত বাড়িয়ে দিলাম, এ হাত আর ক'দিন পরে থাকবে না, তোমার ঐ স্বাস্থ্য সবল, সুন্দর হাত-খানাও থাকবে না একদিন, কিন্তু তোমাকে স্পর্শ করবার জন্য আমার যে আকাঙ্ক্ষা সেটা মানুষের বুকে থেকে যাবে, তাই না?

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম, মনে হল একটি সুন্দর, স্বাস্থ্য-সম্পন্না অল্প বয়সের মেয়ে পরম নিশ্চিন্ত, গভীর দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রয়েছে।

একি আমার চোখের ভুল না মনের ভুল বুঝতে পারলাম না, কারণ দৃষ্টিবিভ্রম কয়েক সেকেণ্ডের বেশী স্থায়ী হয়নি।

মাস্টারমশাই, মিসেস কে-র মৃত্যুর পরে নিজের মনের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ হল একটা গোলমালের মত কিছু ঘটেছে সেখানে। ক্রিমেটোরিয়ামে তাঁর মৃতদেহ দাহ শেষ হলে ভস্ম নেবার সময় নিজের মনের ভাব নিজে বুঝতে পারলাম না।

মিসেস কে-র ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থাগুলো শেষ করতে কিছু সময় লাগবে; তারপর দেশে ফিরব।

আমার প্রণাম নেবেন।

(ক্রমশঃ)

## বঙ্কিমচন্দ্র

বাঙালীর নবজন্মে রাজা রামমোহনের দান যেমন চিরস্মরণীয়, তেমনই বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র এক হিসাবে স্বহস্তে পথ নির্মাণ করেছেন। তাঁর কালে বাংলা ভাষার বাঁধা সড়ক ছিল না। আজ বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী সাহিত্যিকের পরম শ্রদ্ধার পাত্র, বঙ্কিম সাহিত্য বাঙালীর কাছে অবশ্য পাঠ্য। বঙ্কিমের সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে এতাবৎ অনেক আলোচনা হয়েছে। ১৮৫৬ খৃঃ থেকে ১৮৭৯ খৃঃ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র নানাবিধ রচনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর মোট প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা চৌত্রিশ (এর মধ্যে ইংরাজীতে রচিত রামমোহনের স্ত্রী-ও আছে)—এ ছাড়া তিনি স্বনামে ও বেনামে যে সব প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখেছেন তার সবগুলি হয়ত সংকলিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে প্রায় পনেরখানি উপন্যাস ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে এবং ভারতের সমস্ত ভাষায় তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি অনূদিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজনশীল সাহিত্যিক। এই সাহিত্যগুরুর উপন্যাসের গঠনশৈলী বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'Bankim Chandra : A study of his craft". —এবং গ্রন্থটির লেখকের নাম ডঃ সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজী সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। তিনি এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির গঠনশৈলী বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। ইংরাজী ভাষাতেও, বিশেষ কোনো উপন্যাসকারের গঠন শৈলী নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি, ভারতীয় লেখকদের কথা ত' না বলাই ভালো। লেখক ভূমিকায় বলেছেন যেহেতু বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠন শৈলী নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি সেই কারণে তাঁর এই প্রয়াস একান্তভাবে নিজস্ব এবং সেই বিশেষ কারণটি পূর্ণ করার মানসে তাঁকে সমালোচনার একটি নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করতে হয়েছে।

লেখকের এই উক্তি গ্রহণযোগ্য, কারণ তিনি এই দায়িত্ব পালনে বঙ্কিমচন্দ্রের কাল এবং সমসাময়িক পরিবেশ স্মরণে রেখেছেন এবং সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালের পাশ্চাত্য সাহিত্য (বিশেষতঃ ইংরাজী সাহিত্য) কি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

লেখক বলেছেন—উপন্যাসের আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ইংরাজী আলোচনাগুলি আমার পথ নির্দেশকের কাজ করেছে। কিন্তু সেই কর্মে তিনি সর্বতোভাবে তাদের ওপর নির্ভর করেন নি, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মতপার্থক্য ঘটেছে।

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় এই গ্রন্থের ভূমিকা অংশে বলেছেন —

> "Dr. Banerjee seems to have a good background knowledge of the ideas, standards, and methods of contemporary criticism in the field of English Literature, which he has turned to profitable account in his work. In fact this study of the craft of fiction of an Indian Author, patterned as it is on the English methodology of recent years, is written in a style that has its distinctive English flavour".

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের উক্তিটি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। এই গ্রন্থের লেখক সম্পূর্ণ ইংরাজী পদ্ধতিতে গ্রন্থটি রচনা করেছেন এবং সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। লেখক সর্বাগ্রে বঙ্কিম আবির্ভাবের পটভূমি আলোচনা করেছেন। রাজা রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করে বলেছেন—

> "The diapason of the Indian renaissance closed full in Bankim Chandra Chatterji (1838-1894)".

বঙ্কিম বাঙালী সংস্কৃতির নবজন্মের উজ্জ্বলতম পুষ্প এবং বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জনক। মধুসূদনের কাব্য এবং দীনবন্ধুর নাটকে যে প্যাটার্নের উদ্ভব হয়েছিল তাতে প্রাণ সঞ্চার করলেন বঙ্কিমচন্দ্র, আধুনিক উত্তরাধিকার রচনায় বঙ্কিমের অবদান অনস্বীকার্য। বঙ্কিমের গদ্য সাহিত্যের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ আকৃতির উদ্ভব ঘটে।

লেখক তাঁর ভূমিকা অংশে বিস্তারিতভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং ফরস্টার রচিত "এ্যাসপেকটস্ অব দি নভেল" (যা এরিস্টটলের 'পোয়েটিকসে'রই বিস্তারিত আকার এবং অধিকতর দৃষ্টান্তভিত্তিক) গ্রন্থটির ওপর লেখক বেশী নির্ভর করেছেন।

বঙ্কিম প্রতিভার বিকাশ রোমান্সে। রোমান্টিক ভঙ্গী দীর্ঘস্থায়ী হলেও ধীরে ধীরে তা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে। এই একই সঙ্গে তাঁর অন্যান্য গুণাবলীও বিকশিত হয়ে উঠেছে।

লেখক প্রথমেই দুর্গেশনন্দিনী' ও মৃণালিনী'র আলোচনা করেছেন। এই দুটি উপন্যাস যথাক্রমে ১৮৬৫ এবং ১৮৬৯-এ প্রকাশিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)—এই দুটি উপন্যাসের মাঝে প্রকাশিত হলেও এই গ্রন্থের লেখক স্বেচ্ছায় সেটিকে একসঙ্গে আলোচনা করেন নি। এর কারণ এই দুটি গ্রন্থ মূলতঃ রোমান্স।

আর প্রায় সেই একই কারণে কপালকুণ্ডলা থেকে বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) এবং কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)

—এই ভারটি গ্রন্থকে তিনি বলেছেন 'প্যাসন অরিয়েন্টেড প্যাটার্ন'। লেখক বলেছেন যে এই উপন্যাসগুলি রচনা কালে লেখক হয়ত সুগভীর মানবিক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন ১৮৭২ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এই সাময়িক পত্রের পরিকল্পনা ও প্রকাশ বঙ্গসাহিত্যে আরেকটি সুস্পষ্ট পথচিহ্ন। যুগমানস এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে।

দুর্গেশনন্দিনী থেকে আনন্দ মঠে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাবেগ একটি নতুন পথে প্রবাহিত। এই আঙ্গিক বিষবৃক্ষেরও অনুসৃত। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে বিষবৃক্ষ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার তৃতীয় স্তরে ইন্দিরা (১৮৭৩) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) রাধারাণী (১৮৭৫) ও রজনী (১৮৭৭) প্রকাশিত হয়। ঠিক এর মাঝখানেই 'চন্দ্রশেখর' প্রকাশিত। চন্দ্রশেখরের মধ্যে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় আছে। পূর্বোলিখিত রাজসিংহ বঙ্কিমের শেষতম উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনশৈলী সম্পর্কে লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে এবং সেই সঙ্গে তিনি অভিনব দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপাদন করেছেন। ইংরাজী ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তেমন আলোচনা পাওয়া যায় না। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি সেই অভাব পূরণে সহায়ক হবে।

—অভয়ঙ্কর

BANKIM CHANDRA: A Study of His Craft.
By Dr. SUNILKUMAR BANERJI
Published by FIRMA, K. L. MUKHOPADAYAY, CALCUTTA.
Price Rupees Fifteen only.

# সাহিত্যের খবর

**প্যারিসে তামিল ভাষা বিষয়ক সেমিনার।।** সম্প্রতি প্যারিসে তৃতীয় আন্তর্জাতিক তামিল ভাষা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনে আমেরিকা, ফ্রান্স, মালয়, সিংহল ও ভারত থেকে তামিল ভাষাবিদরা যোগদান করেন। ডঃ আক্‌স পারপোলা এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় বলেন যে, সিন্ধু উপত্যকার লিপিই প্রাচীন দ্রাবিড় লিপির নিদর্শন। তিনি তাঁর এই মন্তব্য প্রমাণের জন্য কম্পিউটারের সাহায্য গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত তামিল ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ এ মহাদেবনও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, সিন্ধু উপত্যকার লিপিই প্রাচীন তামিল লিপির নিদর্শন, একথা প্রথম বলেছিলেন ফাদার হেরাস। প্যারিসের এই আলোচনা সভাতেও এই মতবাদটিই অধিকাংশ গবেষক সমর্থন করেন।

**বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সমাবর্তন উৎসব।।** নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি সুদীর্ঘদিন ধরে অবাঙালিদের মধ্যে বাংলা ভাষা প্রশিক্ষণ এবং প্রচলনের চেষ্টা করে আসছেন। এই প্রচেষ্টা যে ফলপ্রসূ হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। প্রতি বছরই বহু ভারতীয় এবং বিদেশী এই প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য আসেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দরদীদের কাছ থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করবেন, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির দিকে আমাদের সরকারের ঔদাসীন্য খুব কম। মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ হিন্দি শিক্ষার প্রসার সমিতি জাতীয় কিছু একটা করতেন, তাহলে অনেক বড় বড় শিরোপা পেতেন এতদিন। আর সমিতির কার্য পরিচালনায় বা গৃহ নির্মাণের জন্য যে আর্থিক কষ্ট ভোগ করছেন, তা হয়ত করতে হত না।

গত ৫ ডিসেম্বর কলকাতায় সমিতির ৩৪ ও ৩৫তম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এতে সর্বভারতীয় বাংলা পরীক্ষায় প্রায় ৫০ জন ভারতীয় ও বিদেশীকে উপাধি, ডিপ্লোমা ও পদক প্রদান করা হয়। সমাবর্তনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। তিনি সভাপতির ভাষণে বলেন—'বাংলা দেশ অদ্ভুতভাবে গড়ে উঠেছে। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ভৌগোলিক দিক থেকে যদিও বাংলাদেশ হারিয়ে যায়, তবু বাংলা ভাষা কোনদিন বিলুপ্ত হবে না। এই ভাষার শক্তি এতই প্রবল।" অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কন্সাল জেনারেল মিঃ হার্বার্ট গর্ডন। এ বছর পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখান শ্রীমতী নন্দিনী ভাট। তিনি ৬টি পুরস্কার পেয়েছেন।

**জাপানের নতুন লেখক সমিতি।।** জাপানী লেখকদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কাওয়াবাতা এবং যুকিয়ো মিশিমার নামের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচয় আছে। অনুবাদের মাধ্যমে তাঁদের কিছু কিছু লেখা পড়ার সৌভাগ্যও আমাদের হয়েছে। বস্তুতপক্ষে তাঁদের রচনা পাঠ করেই জাপানী সাহিত্যের ইদানিংকাল সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু ধারণা। কিন্তু জাপানী লেখকদের একটা বিরাট অংশের সাহিত্য এবং তাঁদের সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপ এখনো আমাদের তেমন জানা নেই। শিন নিহন বুনগাকু কাই জাপানের নতুন লেখক সমিতির নাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর যখন একটা প্রচণ্ড হতাশা জাপানীদের মন অধিকার করে বসেছিল, তখন এই লেখক সমিতির সৃষ্টি। উদ্দেশ্য ছিল নতুন আশাবাদের প্রচার। তারপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। এখন এই সংস্থার উদ্দেশ্য হল, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সৎসাহিত্য রচনা। বর্তমানে এই সমিতির সভাপতি হলেন জাপানের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক হিরোসী নোমা। কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছেন ১৭জন বিশিষ্ট কবি, লেখক এবং সাংবাদিক। এই সংস্থার একটি মাসিক পত্রিকাও আছে। এতে যেমন নতুন প্রতিভাবান জাপানী লেখকদের রচনা প্রকাশিত, তেমনি অন্য দেশের রচনাও জাপানী অনুবাদে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যেরও কিছু কিছু অনুবাদ সেখানে প্রকাশিত হয়েছে। মাসিক সাহিত্য সভার অনুষ্ঠানও এই সমিতির উল্লেখ্য কার্যক্রম।

**কসমো পিটার্স বলেন।।** দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট কবি কসমো পিটার্স। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি বাস করতে পারেন না। বর্ণবৈষম্য এবং রাজনৈতিক কারণে অনেক আফ্রিকান লেখকের মত তিনিও এখন লন্ডন প্রবাসী। সেখানে একটা কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। 'আফ্রিকান' পত্রিকাটির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হলো এবার। এসেছিলেন আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগদানের জন্য। তাঁকে আফ্রিকার বর্তমান সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি একটু ভেবে নিয়ে তারপর বললেন: ইট ইজ ওয়ান অব ডিসইলউসানমেন্ট এণ্ড হোয়াট আই মে কল, অব ডিপ এগনার এণ্ড বিটারনেস। সাধারণভাবে সমস্ত আফ্রিকান সাহিত্যিকেরই একরকম মনোভাব।

তিনি একটু জোর দিয়েই নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির সাহিত্যে আত্মানুসন্ধানের কথা বলছিলেন। তিনি বললেন: মনস্তাপ এবং হতাশা এখন সেদেশের সাহিত্যিকদের কণ্ঠ ভারাক্রান্ত করে

ফুলছে। এর কারণ, আমার মনে হয়, সেনঘরএর অর্থ দেখার যোগ।" যে সোনালী স্বাধীনতার আশায় তাঁরা স্বপ্ন দেখে আসছিলেন, স্বাধীনতা লাভের পর সে স্বপ্নের বাস্তব রূপ অধিকাংশ আফ্রিকার দেশেই তাঁরা দেখতে পেলেন না। স্বাধীনতার পর জনজীবনে একটা পরিবর্তন দেখবেন বলে তাঁরা আশা করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ব্যর্থ হয়েছে। এটাই হতাশার অন্যতম কারণ বলে মনে হয়।"

একটু থেমে তিনি নিজেই আবার বলে চললেন: "কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তাঁদের লেখার শক্তি কমে গেছে কিংবা বৈচিত্র্যহীন। আসলে পরিবর্তন হয়েছে কনটেন্টের। অবশ্য এ্যাঙ্গোলার বা মোজাম্বিক এদিক দিয়ে স্বতন্ত্র। কারণ, এখনও তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে।"

আফ্রিকার কবিতা সম্বন্ধে জাঁ পল সার্ত বলেছিলেন: 'আফ্রিকান সাহিত্য আমাদের সময়ের সবচেয়ে বিপ্লবী সাহিত্য।' এই উক্তিটি উদ্ধৃত করে পিটার্সকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি যেন কিছুটা সপ্রতিভ হয়ে উঠলেন। বললেন: 'এটা সার্ত লিখেছিলেন সেনেগালের বিখ্যাত কবি এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি লিওপোল্ড সেদার সেনগোরের একটি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে ১৯৪৭ সালে। তখনকার সেনগোর আর এখনকার সেনগোরের মধ্যে পার্থক্য অনেক। রাষ্ট্রপতি হয়ে আসার পর তাঁর সংগ্রামী চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে।'

আর কথা নয়, পিটার্সের বাড়ি থেকে প্রস্থান করলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে পিটার্স দেখালো তাঁর স্ত্রী [illegible] এখন উনিশ। [illegible] চল্লিশ পেরিয়ে গেছেন। আলাপ হলে আমার দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। সেখানে হাসি-খুশি ভরা মানুষটি, কিন্তু প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে জানার কি অপরিসীম আগ্রহ। বিদায়ের আগে বললেন: "আবার ভারতে আসার ইচ্ছে রইল। এখানকার মানুষের ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে, যেন আমার জন্মভূমিতেই আছি।"

—চার্বাক

# নতুন বই

The Intimate Enemy —Dr. George R Bach and Peter Wyden—Souvenir Press. London. To be had of Rupa and Co. 15. Bankim Chatterjee St. Cal-12. P. 35s net.

শত্রু অথচ ঘনিষ্ঠ — নামের মধ্যেই আপাতবৈপরীত্য। অথচ বই পড়বার পর উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ডাঃ জর্জ বাখ ক্যালিফোর্নিয়ার বিভারলি হিলসে ইনস্টিটিউট অব গ্রুপ সাইকোলজির প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক হিসাবে একজন মনোবিজ্ঞানীর সহযোগিতায় স্বামী-স্ত্রী এবং প্রেমিক-প্রেমিকাদের নানা পারস্পরিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে এক নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন। তত্ত্বটি হল গঠনমূলক আগ্রাসনের তত্ত্ব। বর্তমান গ্রন্থটি সেই ভিত্তিতে লেখা। মূল বক্তব্য হল—আদর্শ দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেই বিবাহিত জীবনে স্থায়িত্ব আনতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এই বক্তব্যের মধ্যে একটি প্যারাডক্সের চেহারা ধরা পড়ে। কিন্তু লেখকদ্বয়ের মতে—এটা সত্যিই কোন প্যারাডক্স নয়। যে সব দম্পতি এই যুদ্ধকে এড়িয়ে চলেন—তাঁরা প্রকৃতপক্ষে এক বিপজ্জনক খেলা করেন এবং এই খেলায় ফলস্বরূপ পরস্পরের মধ্যে আবেগ-সঞ্জাত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে এবং ক্লান্তি, হতাশা ও বিচ্ছেদের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

দুর্ভাগ্যবশত যে সব দম্পতি পরস্পরের মধ্যে লড়াই-এর পথ বেছে নেন—তাঁরাও খোলাখুলি যুদ্ধে নেমে পড়েন এবং এই ধরনের যুদ্ধের ফল হয় আরও মারাত্মক। স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা ইত্যাদির মধ্যে উন্নতিসাধনের জন্য এক বাস্তবধর্মী, গঠনমূলক পরিকল্পনা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে বইটিতে। ডাঃ বাখের মতে—যে সব অসুখী দম্পতি এবং প্রেমিকার ক্ষেত্রে তার নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের শতকরা ৮৫ জনের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতির সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে। ডাঃ বাখ দাম্পত্য যুদ্ধের এমন এক নমনীয় নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছেন—যে নিয়ম-অনুসারে স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারস্পরিক নিন্দাবাদ এবং দৈহিক ও মানসিক আঘাতের প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে স্থায়ী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন।

*লেখকদ্বয়ের মতে মানুষকে যখন সর্বঅবস্থায় লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হয় তখন লড়াই-এর ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ মানবিক বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে দাম্পত্য জীবনেও লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে পুরুষ এবং নারী পরস্পরের আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিবাহিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এই লড়াইয়ের উপায় সৎ হওয়া চাই।*

এই গ্রন্থে আছে অজস্র কেস হিস্ট্রি। লেখকরা জোরের সঙ্গে বলেছেন, যে সব অসুখী দম্পতিকে তাঁরা সৎ এবং স্বাভাবিক লড়াইয়ের পথ নির্দেশ করেছেন, তাঁরা গঠনমূলক আগ্রাসনের নিয়মানুসারে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠতা এবং সন্তোষ লাভ করেছেন।

লেখকদ্বয়ের মতে এই নতুন তত্ত্বের ভিত্তিতে অসুখী এবং কলহরত দম্পতিদের তাদের আক্রমণাত্মক শক্তিকে বিচ্ছেদ এবং অশান্তির পথে না নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ গঠনমূলক ভূমিকায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। তবে এই গঠনমূলক আক্রমণের শিক্ষণ-পরিকল্পনা খুব সহজ নয় এবং সবার পক্ষে একে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভবও নয়। তার জন্য চাই ধৈর্য, শুভেচ্ছা এবং মানবিক সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করার অভ্যস্ত পথের বাইরে যাওয়ার মানসিক শক্তি এবং নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী। আর এ সবই সম্ভব যদি হৃদয় ও মন সর্বদা পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী এবং উন্মুক্ত থাকে। ডাঃ বাখের ইনস্টিট্যুটে যে সব দম্পতি শিক্ষার্থী হিসাবে আসেন এবং তার উদ্ভাবিত যুদ্ধের নিয়মাবলী অনুসরণ করে দাম্পত্য জীবনে যুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করেন—তারা বিবাহিত জীবনের *স্বাভাবিক সঙ্কট এবং হতাশা থেকে বহুলাংশে মুক্তি পান। বন্ধু-বান্ধব এবং ছেলে-মেয়েদের সামনেই স্বামী এবং স্ত্রী যুদ্ধে নেমে পড়েন। বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রীকে যৌন-কর্মের আগে, পরে, এমন কি যৌনকর্মরত অবস্থায় যুদ্ধের পরামর্শ দেওয়া হয়, এর ফলে পারস্পরিক মিথ্যাচার এবং অবদমনের প্রবণতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়।* স্বামী এবং স্ত্রী বিবাহিত জীবনের প্রচলিত আচরণবিধিকে প্রয়োজনানুসারে পরিহার করতে শেখেন—ফলে তাঁদের যৌন-জীবন অনেক বেশী সৃজনশীল এবং উৎপাদনমূলক হয়ে ওঠে, তাঁদের যৌন-সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়, সন্তানপালনের দায়িত্বে যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ফলে তাঁরা খুব সহজে ক্লান্তি, হতাশা এবং বিচ্ছেদের শিকার হন না। যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই তাঁরা পারস্পরিক সম্পর্কে বৈধ এবং অবৈধ দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন হন এবং এই

সচেতনতা তাদের বিবাহিত জীবনে রক্ষা-কবচের কাজ করবে।

সমগ্র গ্রন্থে একজন বারটি কেস হিস্ট্রির উল্লেখ করে তাঁরা নাম এবং ঠিকানা বদলিয়েছেন দেখিয়েছেন — কিভাবে তাঁদের উদ্ভাবিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে বৈধ উপায়ে দ্বন্দ্বের দ্বারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন।

লেখকদ্বয় তাঁদের এই পদ্ধতিকে যৌথ নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যৌথ-নৃত্যের মত এই দ্বন্দ্বেও সহযোগিতামূলক দক্ষতার প্রয়োজন। এটা এমন একটি অন্য কিম্বা জীবন-পদ্ধতি যা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়সাধনের ভূমিকা গ্রহণ করে।

লেখকদ্বয় স্বীকার করেছেন তাঁদের এই নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতি এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। বরং এই পদ্ধতি সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। তাঁরা এই বিভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন এবং সেজন্যই তাঁদের পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন,—মানুষকে কোন অবস্থাতেই কতকগুলো কঠোর এবং অপরিবর্তনীয় নিয়মের শৃংখলে বাঁধা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, লেখকদ্বয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মার্কিন সামাজিক জীবনেই সীমাবদ্ধ। আমেরিকার মত উন্নতমানের অর্থনৈতিক জীবনে যেসব জটিল সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, পুরুষ এবং নারীর যৌন-জীবনেও তার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ফলে বিবাহিত দম্পতির দৈহিক এবং মানসিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং বিচ্ছেদের প্রবণতা সমাজ-বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। ওদেশের সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধানের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত।

ভারতের দরিদ্র জনগণের ক্ষেত্রে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সার্থকতা আদৌ আছে কিনা তা সন্দেহের বিষয়।

**বঙ্গ সংস্কৃতির কথা**—প্রসিতকুমার চৌধুরী। শৈব্যা পুস্তকালয়। ৮।১বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম চার টাকা।

বাঙলার নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কে বাঙালীদের ধারণাই সম্ভবত সবথেকে বেশী অস্বচ্ছ। বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরোবার পর অনেকেই তার সংস্কৃতি চর্চায় নিজেদের না জড়িয়ে, দিন অতিবাহিত এবং সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্নে ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া সহজ ভাষায় লেখা ছোট আকারের কোন বইও বিশেষ পাওয়া যায় না বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়সমৃদ্ধ। সম্প্রতি প্রসিত-কুমার চৌধুরী 'বঙ্গ সংস্কৃতির কথা' লিখেছেন। বইটিতে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ আছে। হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, হাওড়া, কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদা-বাদ, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, কোচবিহার, দার্জিলিং এবং মালদহ জেলার ওপরই কয়েকটি স্বতন্ত্র আলোচনা স্থান পেয়েছে বইটিতে। গ্রন্থকারের সাধু প্রয়াস নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি পাবে। শ্রীচৌধুরী বইটির নামকরণ করেছেন 'বঙ্গ সংস্কৃতি কথা'। কিন্তু আলোচনা করেছেন মাত্র পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে—পূর্ববঙ্গের কোন তথ্য পরিবেশন করা হয় নি। মনে রাখতে হবে দুই বঙ্গ একই সংস্কৃতির ধারাবাহী। গ্রন্থকার আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ বিষয়ে আলোকপাত করবেন।

**অন্য স্বাদ অন্য রঙ** (কাব্যগ্রন্থ) — সুষমা মৈত্র। প্রভাত কার্যালয়, ২সি নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা—৯। তিন টাকা।

হৃদয়ের জটিলতায় যখন অনেক আধুনিক কবি নিজের মুখ পর্যন্ত দেখতে পান না, তখন সুষমা মৈত্র একালের যন্ত্রণা ও আবেগকে অনায়াস সায়ল্যে মুক্তি দেন। হয়তো অন্তঃপ্রবণতায় তিনি রোমান্টিক কবি। ঋতুঋতুর ঐশ্বর্য তাঁকে যতটা সান্ত্বনা দিতে পেরেছে, আধুনিক সভ্যতা ততটা পারে নি। তবু মানুষ সম্পর্কে অবিশ্বাসী নন। প্রথম কবিতাতেই তিনি লিখেছেন :

অন্য স্বাদ অন্য রঙ
জীবনকে স্বতন্ত্ররূপে রাঙিয়ে
নেওয়া যায়।

এবং অবশেষে দুঃখ, পীড়নের নানা স্তর অতিক্রম করে উপলব্ধি করেন : 'নিশ্চিত সোচ্চার প্রত্যাশায় আন্দোলিত মন।' জীবনের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আশার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বলেন : 'চলি আমি সোজা পথে,/জীবন যেখানে সহজ সরল হবে।'

এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ৩৮টি কবিতা। মোটামুটি একই ভাবনার বিবিক্ত বিকিরণ। সমকালীন ঘটনা-প্রবাহের ছায়া পড়েছে প্রায় সব কটি কবিতায়। আমরা কবির কাব্যিক সাফল্য কামনা করি।

---

## সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

---

**কবিতা পরিচয় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭)**— সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। ৩০৬ যোধপুর পার্ক। কলকাতা—৩১। দাম দেড় টাকা।

বাঙলা ভাষার প্রতিষ্ঠিত এবং তরুণ কবিদের কাছে সম্পাদক শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী পৃথক-পৃথকভাবে পাঁচটি করে প্রশ্ন পাঠান। আজকের সমাজজীবন, রাজ-নৈতিক অস্থিরতা, বাঙলা দেশ, এবং আনুষঙ্গিক আরো কয়েকটি প্রসঙ্গে ছিল প্রশ্নগুলো। কয়েকজন পৃথক-পৃথকভাবে, কয়েকজন এক সঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর পাঠিয়েছেন। যাঁরা উত্তর লিখেছেন : অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, সিদ্ধেশ্বর সেন, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শান্তিকুমার ঘোষ, তরুণ সান্যাল, তুষার রায় এবং আরো কয়েকজন। সাম্প্রতিক কবিতা এবং সমাজচিত্র সম্পর্কে এঁদের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কবিতা পাঠে সম্ভাব্য সহায়তার প্রয়াসে পরিকল্পিত ত্রৈমাসিক কবিতা সমালোচনামূলক এই সংক্ষিপ্ত পত্রিকাটি প্রকাশ করে সম্পাদক একটি দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

**অভিনয়** (অকটোবর)—সম্পাদকমণ্ডলী সম্পা-দিত। রঞ্জনা প্রেস। ১৩১ হরিশ মুখার্জি রোড, কলকাতা—২৬। দাম এক টাকা।

বাঙলা দেশে সম্প্রতিকালে নাটক নিয়ে চলেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়। সে সম্পর্কে অভিনয় পত্রিকা একাঙ্ক নাটক, নাটিকাভিনয়ের সংবাদ, নাটক বিষয়ে নানান নিবন্ধ প্রকাশ করে একটি গুরুতর দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমান সংখ্যায় উৎপল দত্তের 'নাটকে রাজনীতি' আলোচনাটি সব থেকে উল্লেখযোগ্য। আরো কয়েকটি আলোচনা এবং কিছু ছবি আছে।

# বইকুণ্ঠের খাতা

## সার্ধ-শতকে বিদ্যাসাগর

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে কম নয়। ফর্ম, টেকনিকের বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। হয়তো পৃথিবীর যে-কোনো সমৃদ্ধ ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তুলনা চলে। কেবল একটা বিষয়ে আমরা এখনো স্থির, আগের মতোই অনড়। জীবনী লেখার ধরন ও পদ্ধতি পাল্টায়নি। সেই সাবেকী আমলের ধ্যানধারণা আর মূল্যবোধকে আশ্রয় করেই লেখা হয়ে যাচ্ছে, একেকটি জীবনীগ্রন্থ।

তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি হিমসিম খেয়েছি, নানাজনকে প্রশ্ন করেছি, কিন্তু কোনো সদুত্তর পাইনি কারো কাছ থেকেই। অনেকের ধারণা : অন্যান্য মৌলিক রচনার মতো জীবনীমূলক রচনাকে আদৌ সাহিত্যকর্ম বলা যায় না। অতি মাত্রায় তথ্য-সচেতন হতে হয় বলে কোনো সৃজনশীল লেখকই এ-জাতীয় রচনার ব্যাপারে আকর্ষণ বোধ করেন না তেমন। কেউবা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন : জীবনী লেখা কোনো সাহিত্যিকের কাজ নয়, ঐতিহাসিকের আলোচ্য বিষয়।

এইসব মন্তব্যের সত্যতাকে আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু পুরোপুরি মেনে নিতে কোথায় যেন বাধে। আমি আজ পর্যন্ত খুব কম ঔপন্যাসিককেই বলতে শুনেছি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি অবাস্তব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা সেই বাস্তবতাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেন অসতর্ক মুহূর্তে।

তাই নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

কেবল বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, আমাদের দেশে জীবনীকারদের অধিকাংশই না-লেখক, না-ঐতিহাসিক—এমনি এক শ্রেণীর মানুষ। কেউ আলোচ্য ব্যক্তির বন্ধু কিংবা নিকট আত্মীয়, শিক্ষক কিংবা অধ্যাপক। তাঁদের মধ্যে জাতলেখকও আছেন দু-চারজন। যে-রকম স্বচ্ছ দৃষ্টি-ভঙ্গি ও ঐতিহাসিক চেতনা থাকলে একেকটি জীবনী-গ্রন্থ প্রামাণ্য ও সজীব হয়ে উঠতে পারে— সে-রকম জীবনবোধ নেই অনেকেরই। নেই শিল্পদৃষ্টি।

একা রবীন্দ্রনাথেরই জীবনী বেরিয়েছে অনেকগুলি। প্রচ্ছদ আলাদা। গ্রন্থসজ্জা ভিন্ন রকম। কিন্তু পড়তে বসে বারবার মনে হয়, পূর্ববর্তী কোনো একটি বই যেন কপিরাইট আইন বাঁচাবার তাগিদে ভাষার সামান্য অদলবদল করে ছাপা হয়েছে অন্য লেখকের নামে, অন্য প্রকাশকের ঠিকানায়।

জানি, জীবনীকারের অসুবিধা অনেক। মূল ঘটনার তিনি পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না। ঘটনাকে অবিকৃত রাখার দায়িত্বও তাঁর। তবু একটা কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, লেখকের নিজস্ব বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে একাধিক জীবনী-গ্রন্থ লেখার সার্থকতা কোথায়? আলোচ্য মনীষীর পুনর্মূল্যায়ন যদি না হলো, ঘটনার পুনর্বিচার যদি না হলো, তথ্যের বিভ্রান্তি যদি সমানই থেকে গেলো—তাহলে লেখকই বা কেন লিখবেন? আর, পাঠক হিসেবে, আমরাই বা তা কিনবো কেন পয়সা খরচ করে?

এ-প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা দরকার।

কেননা, অতীতের কাছ থেকে আমরা আলো চাই—আরো আলো—যে-আলো আমাদের পথ চলতে সাহায্য করবে, ভবিষ্যতের নিশানা দেবে। আমরা আরো অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে চাই, আরো শিক্ষিত। অন্তঃসত্তায় যদি অন্তরালবর্তী সত্যকে উপলব্ধি করতে না পারি, তাহলে জীবনী লেখা মূল্যহীন।

ঘটনার সঙ্গে তার সুদূরতম ইঙ্গিতকেও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের ছন্দোময় জীবনী-গ্রন্থ 'চৈতন্য চরিতামৃত' লিখতে বসে কৃষ্ণদাস কবিরাজ হয়তো সেজন্যেই তথ্যের ওপরে বেশী জোর দেননি, তত্ত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ককতোর আত্মজীবনী 'প্রফেসানেল সিক্রেটস'-এর উদাহরণ দেবো না। এ প্রসঙ্গে তা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ফ্রান্সিস স্টিগমুলারের লেখা ককতোর জীবনীটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, বিদেশে জীবনী লেখার আদর্শ কিভাবে উপন্যাসের সম্ভাবনাকে আত্মসাৎ করে চলেছে।

### সার্ধ শতকে বিদ্যাসাগর

আমার এই আক্ষেপোক্তির কারণ আর যাই থাক, উপলক্ষ্য সন্তোষকুমার অধিকারীর লেখা 'বিদ্যাসাগর' নামে একটি জীবনী-গ্রন্থ। আমি বইটির প্রতি আকৃষ্ট *হয়েছিলাম প্রধানত দুটি কারণে : প্রথমত, সন্তোষবাবু কবিমানুষ, দ্বিতীয়ত তাঁর পিতামহী বিনোদিনী দেবী ছিলেন বিদ্যা-*সাগরের তৃতীয়া কন্যা। স্বভাবতই আশা করেছিলাম, বইটির পাতায় পাতায় বিদ্যাসাগরের সেই নির্জন ব্যক্তিত্বের স্বগতোক্তি শুনতে পাবো। দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে, আমি তা শুনতে পাইনি। প্রতি মুহূর্তেই লক্ষ্য করেছি, একটি বিরাট স্তম্ভের গঠনশৈলী—রবীন্দ্রনাথ যাকে তুলনা করেছিলেন, [illegible] মধ্যে বনস্পতির সঙ্গে।

তিনি আমাদের সম্বোধন করে গেছেন, আমরা তাঁর হাহাকার শুনতে পাইনি। কিংবা শুনতে পেলেও তা বৃহত্তর ঘটনাবলীর কোলাহলে ডুবে গেছে। তাঁর অন্যতম জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিকে অনেককাল আগেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

হয়তো বিদ্যাসাগরের চরিত্রে স্বতো-বিরোধিতাও ছিল।

সন্তোষবাবু লিখেছেন : "১৮৬৯ সালে একটি ঘটনা ঘটে।...ক্ষীরপাই গ্রামের অধিবাসী জনৈক শিক্ষক মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বালবিধবা মনোমোহিনী দেবীকে বিয়ে করতে চান।...এদিকে ক্ষীরপাই গ্রামের হালদাররা বিদ্যাসাগরের বন্ধু। গুচিরাম হালদারদের ধর্মপুত্র। হালদাররা এসে ধরলেন বিদ্যাসাগরকে, এ বিয়ে তিনি যেন না দেন।"

"বিদ্যাসাগর চরিত্রের এ এক দুর্বোধ্য রহস্য। যিনি বিধবা বিবাহ দেওয়াকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সৎকর্ম বলে মনে করেন এবং এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত, তিনিই হালদারদের অনুরোধে এ বিয়ে ভেঙে দিতে রাজী হলেন।"

শেষজীবনে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন : "সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি—সে-বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না।"

স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিও তাঁর সেই বেদনাময় জীবনের স্মৃতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। দীনময়ী দেবীকে লিখেছিলেন : "এক্ষণে তোমার নিকট এ-জন্মের মতো বিদায় লইতেছি। এবং বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যদি কখনও কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে।"

'প্রভাবতী সম্ভাষণের' প্রায় প্রতিটি ছত্রে তাঁর জীবনের এই করুণ বিষণ্ণতার দিকটাই প্রতিফলিত হয়েছে। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধুবান্ধব—প্রায় সকলের কাছ থেকেই তিনি শেষজীবনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কঠোরতার সঙ্গে তীব্রতর অভিমান-বোধই হয়তো তার কারণ।

কিন্তু এই [illegible] করবে কে?

অনেকেই তাঁর সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষে নানারকম প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। বিধবা বিবাহের প্রচলন, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার, গদ্য সাহিত্যের উন্নয়ন, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু মহৎ হৃদয়ের মহৎ বেদনাবোধও যে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় [illegible] জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন 'অন্ন-বন্যার গান' নামে। আমার ধারণা, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন নিয়েও তেমনি একটা উপন্যাস লেখা যায়, বিশেষত শেষ কয়েক বছরের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন: "বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিরাট—এখনো বহু পরিমাণে অনাবিষ্কৃত মহাদেশের মতো। তাঁকে সম্যকভাবে জানা ও বোঝার অভিযানে এখনো বহু বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।"

মনে পড়ে বছরখানেক আগের কথা।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যাসাগর জীবনের অন্য একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে বলেছিলেন: 'রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই সমাজ-সংস্কারক হিসেবে প্রসিদ্ধ। তবু রামমোহনের চেয়ে বিদ্যাসাগর অনেক সফল হয়েছিলেন। তার কারণ, বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, সমাজের বাইরে গিয়ে সমাজ-সংস্কার করা যায় না। রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করে বিধর্মী হয়ে পড়েছিলেন। সেইজন্যেই তাঁকে হিন্দু সমাজ যতটা অগ্রাহ্য করতে পেরেছিল, বিদ্যাসাগরকে ততটা পারেনি।'

এখন তাঁর সার্ধ শতবার্ষিকীতে সে-কথা স্মরণ করার সময় হয়েছে।

## সন্তোষকুমার অধিকারীর 'বিদ্যাসাগর'

সন্তোষবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি অবজেক-টিভ। বিচার-বিশ্লেষণের পদ্ধতিও তাই। সংক্ষিপ্ত একটি জীবনীগ্রন্থে তিনি যে তথ্য সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তার পরিমাণ কম নয়। পাঠক হিসেবে আমি তাইতেই সন্তুষ্ট। বইটির প্রথমদিকে একটি অপ্রকাশিত চিঠির ব্লক ও হাডসনের আঁকা প্রতিকৃতি অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের একটি ছবি ছাপা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে 'পটভূমিকা' বিচার-প্রসঙ্গে সন্তোষবাবু লিখেছেন: "১৮১৮ থেকে ১৮২১ যেন পৃথিবীর এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এই চার বছরে মহৎ চিন্তানায়ক ও মানবপ্রেমী কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্ম। ১৮১৮-তে কার্ল মার্কস, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ওয়াল্ট হুইটম্যান ও জন রাস্কিন এবং ১৮২০-তে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, হার্বার্ট স্পেনসার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অমর কথাশিল্পী কথাসাহিত্যিক মানবতাবাদী দস্তয়েভস্কির জন্ম দিল।"

বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত একটি চিঠির অংশ।

আর, ১৮২৯ সালে দূরে ইউরোপের একটি দেশ গ্রীসের যে-বছর বন্ধনমুক্তি ঘটলো, ঠিক সে-বছরই ন' বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ইংরেজী সংখ্যা গণনা শিখতে শিখতে। হয়তো এই তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই ছিল মহত্তর সম্ভাবনার সংকেত। কলকাতায় না এলে হয়তো ঈশ্বরচন্দ্র অন্যভাবেই তৈরী হতেন। ইংরেজী শিক্ষা না পেলে হয়তো তাঁর প্রতিভা অন্য দিকে বাঁক নিতো।

মনে রাখতে হবে, তখনটা ঊনিশ শতকের প্রথম দু-তিন দশক। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। ১৮২৪-এ স্থাপিত হয়েছিল সংস্কৃত কলেজ। রিচার্ডসন আর ডিরোজিওর ছাত্ররা তখন দুরন্ত আবেগের সৃষ্টি করেছেন। তারুণ্যের আলোড়নে তাঁরা বিপর্যস্ত করছিলেন সমাজদেহকে।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন: "দেড়শত বছর আগে জন্মগ্রহণ করলেও বিদ্যাসাগরের কালাতীত প্রতিভা আমাদের সময়ের পক্ষেও যে কতখানি তাৎপর্যময় তা উপলব্ধি করতে না পারা আমাদের পক্ষে শুধু লজ্জাকর নয়, ক্ষতিকরও বটে। শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারীর 'বিদ্যাসাগর' সেই উপলব্ধিকে সার্থক ও প্রগাঢ় করে তোলবার মত বিরল একটি বই।"

অন্তঃ প্রচ্ছদে ঘোষণা করা হয়েছে: "দীপ্ত সূর্য ও অতলান্ত সাগরের মিলন কোথাও যদি সম্ভব হয়, তাহলে তা হয়েছে বিদ্যাসাগরের মধ্যে। অন্যায় আর অবিচারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর দুর্ধর্ষ। আবার অসহায় আর আশ্রিতের কাছে তিনি করুণাসাগর। ...সেই বিস্ময়কর চরিত্র ও জীবনচর্যার একখানি মূল্যবান দলিলচিত্র এই গ্রন্থখানি।"

সন্তোষবাবু অবশ্য অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছেন। সবক'টি বই এখন বোধহয় পাওয়া যায় না। পাঠক সে-বইগুলি পড়বার সুযোগ পেলে আরো উপকৃত হতেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে অবশ্য সন্তোষবাবুর বইটিই যথেষ্ট।

—গ্রন্থদর্শী

**সুরাপায়ীর আচরণ, মিসেস মুখার্জির ডিপ্সোম্যানিয়া**

সুরাপায়ীর প্রধানত দু ধরনের আচরণের সংগে আমরা পরিচিত। একদিকে উচ্ছৃংখল আড়ম্বরপূর্ণ আচরণ, আর অন্যদিকে বিষাদগ্রস্ত করুণ আচরণ। একদল লোক সুরাপানের পর উত্তেজিত হয়ে ওঠে; বেশী কথা বলে, বেশী হাত পা নাড়ে, বিনা-কারণে বা সামান্য কারণে হেসে গড়িয়ে পড়ে অথবা রেগে অশালীন অশোভন আচরণ করে। হৈচৈ করতে করতে হঠাৎ মারমুখী হয়ে অন্যকে আক্রমণ করে বসে। তবে বেশির ভাগ সুরাপায়ী সাধারণত বেশ সদয় দের ব্যবহারই করে থাকে। দিলদরিয়া মেজাজে আধচেনা অচেনা লোককেও নিজের পয়সায় পান করাবার জন্য ব্যস্ত হয়, অনেক কিছু সাধু সংকল্প প্রকাশ করে, নানাবিষয়ে উদারতা দেখায়। অন্যের সংগে আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য উৎসুক বন্ধু-বৎসল এই সুরাপায়ীদের প্রথমটায় আপনার বেশ ভাল লাগবে। আবার এরাই যখন সামান্য কারণে চোখ লাল করে টেবিল চাপড়িয়ে নিজের মতামত জাহির করতে বোতল-গেলাস ভেঙে হৈচৈ সুরু করে দেবে, আপনি নিঃসন্দেহে ভয় পেয়ে পালাবার পথ খুঁজবেন। সাধারণত বার রেস্টুরেন্টে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যে অথবা অনেক লোকের কোনো উৎসব পার্টিতে একজাতীয় সুরাপায়ীর এই রকম অসংযত ব্যবহার দেখতে পাবেন। এই ব্যবহার অনেকটা পরিবেশ-নির্ভর। এই লোকই যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় অথবা গৃহ-কোণের উত্তেজনাহীন পরিবেশে পান করে, তখন আবার তার অন্য রূপ। সামান্য প্রগল্ভ হয়ে উঠে পরক্ষণেই ঝিমিয়ে পড়বে; তার মাথার ভেতরটা ভারী হয়ে উঠবে, কাজকর্মে ঔদাসীন্য, আলস্য দেখা যাবে; তারপর সে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়বে।

কিন্তু সুরাপায়ীর বিসদৃশ আচরণের সবটাই যে পরিবেশ-নির্ভর, তা বলা চলে না। আনন্দ-উৎসবের পার্টির মধ্যেও একটু লক্ষ্য করতে দেখতে পাবেন, হলঘরের বা লনের এক কোণে, নিরানন্দ নিরাসক্ত একজন পানপাত্র হাতে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি তার অন্যলোকে, উৎসবের আলো, গান, কোলাহল, কিছুই তার কানে পৌঁছুচ্ছে না— আপনি কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও সে অভ্যর্থনা জানাবে না। রাস্তাঘাটে অফিসে তার যে মূর্তি দেখেছেন, সুরাপানের পর সে মূর্তি আর নেই। ক্লান্ত, উদাসীন, বিষণ্ণ।

সুরাপানের পর কে কি রকম আচরণ করবে, সেটা তার স্নায়ুতন্ত্রের টাইপের উপরও অনেকটা নির্ভরশীল। হঠকারী (কোলেরিক) স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী স্বভাবতই উদ্ধত আক্রমণাত্মক আচরণ করবে, আশাবাদী প্রত্যয়শীল (স্যাংগুইনাস) টাইপ সহৃদয় হবে ও আত্মম্ভরিতার পরিচয় দেবে: ধীরস্থির সুস্থিত (ফ্লেগম্যাটিক) টাইপ গম্ভীর ও দার্শনিক বনে যাবে; আর বিষণ্ণ টাইপের (মেলানকলিক) মানুষ বিলাপ করতে থাকবে।

আগে মনে করা হত, অ্যালকোহল একটা উত্তেজক পানীয়। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে ডাক্তাররাও প্রায়ই ব্রাণ্ডী পানের নির্দেশ দিতেন। ভেষজবিজ্ঞানের কৃপায় এখন আমরা জানি অ্যালকোহল স্টিমুল্যান্ট বা উত্তেজক পানীয় নয়। অ্যালকোহল মস্তিষ্ককোষগুলো নিস্তেজিত করে। আপাতদৃষ্টিতে উত্তেজক মনে হবার কারণ প্রধানত দুটি। এক, অ্যালকোহল গাত্র-চর্মের প্রান্তস্থ ছোট ছোট রক্তবাহী শিরা-গুলোর সম্প্রসারণ ঘটায়; দুই, উচ্চ-মস্তিষ্ককে নিস্তেজিত করার ফলে নিম্ন-মস্তিষ্কের বাধাদানকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এই দুই কারণে মনে বেশ একটা উল্লাসের ভাব আসে, মনে হয় যেন দেহমনের শক্তি, উৎসাহ বেড়ে গেছে। এই প্রাথমিক অজ্ঞ লজ্জার ভাবটাই সুরাসক্তির প্রধান কারণ।

এই বেপরোয়া স্ফূর্তির মনোভাব বোধ হয় সব মানুষের না হোক, অনেকেরই কাম্য, তাই অতি প্রাচীনকাল থেকে সুরাপানের প্রতি মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য আকর্ষণ। যুক্তিবুদ্ধি পরিচালিত মানুষ হিসেব করে চলতে চায়, ভেবেচিন্তে কথা বলতে চায়, সব সময় আত্মসচেতন থাকবার চেষ্টা করে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কার্যক্রম ঠিক করে। সহজপ্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভাধীন হয়ে হঠকারী কোনো কিছু করে না বসে এবিষয়ে সব মানুষই প্রায় সজাগ। নিম্ন-মস্তিষ্ক ও উচ্চমস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্রের পুরনো ও নতুন অংশ, সব সময়েই দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ে ব্যাপৃত। এটা নিশ্চয়ই অনেকের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সুরার প্রসাদে সাময়িকভাবেও যখন এই যুক্তিবুদ্ধি, ভাবনা-চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, মানুষ তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে। বেপরোয়া স্ফূর্তির ভাবকে দেহমনের শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি বলে ভাবে ও এ্যালকোহলকে বিধাতার আশীর্বাদ মনে করে।

অ্যালকোহলের নিস্তেজনাক্রিয়া মস্তিষ্কের উপরতলা থেকে ক্রমশ নীচুতলায় নেমে আসে। ক্রমবিকাশের পর্যায়ে যে অংশ সবশেষে সংগঠিত, সেই অংশ প্রথমে প্রভাবিত হয়। সুরার প্রসাদে, তাই দেখতে পাই, প্রথমে ঘটে সূক্ষ্মতম ভাব-অনুভূতির হ্রাসপ্রাপ্তি, যুক্তিবুদ্ধির অবনতি। এই অবস্থায় সুরাপায়ীকে অনেক সময় স্মার্ট ও স্পষ্ট বক্তা বলে মনে হয়। হব ক... ঘুমিয়ে দেবার জন্যে সে বাহবা পা... যুক্তিবুদ্ধি যে সব ভাবপ্রকাশের বাধা ... অবলীলাক্রমে সেই সব ভাব প্রকাশ করা স... হয়ে যায়। উপরওয়ালার অন্যায় আচ... বন্ধুর সংকীর্ণতা, স্ত্রীর স্বার্থপরতা ইত্যা... অথবা নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে সুরাপানে... পর, অনায়াসে অভিযোগ কিম্বা হা-হুতা... করা চলে ; যেটা স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় চলছিল না। অনেকে মনে করেন, অ্যালকোহলে আত্মসমালোচনার ক্ষমতা নষ্ট করে। সঠিক আত্মবিশ্লেষণ ক্ষমতা হয়তো থাকে না, কিন্তু আত্মধিক্কার ও অতিমাত্রায় নাটকীয়-ভাবে আত্মসমালোচনা করতে এদের দেখা যায়। অহম্মন্যতা ও আত্মম্ভরিতা-প্রকাশের প্রবণতার মতই আত্মসমালোচনার প্রবণতা এই অবস্থায় তীব্র হয়ে ওঠে। এই প্রক্ষোভ-আধিক্য অবস্থায় আমরা সুরাপায়ী-দের বেশি দেখি। দ্বিতীয় পর্যায়ে, হাত-পা নাড়া, চলাফেরায় বিশৃংখলা। যে কাজে দক্ষতা ও সূক্ষ্ম ক্রিয়াকৌশলের প্রয়োজন, সে কাজ করা এই পর্যায়ে অসম্ভব। মদের গেলাস মুখে তোলা, টেবিলে নামানো, সিগারেট ধরানোর মত সহজ সাধারণ কাজও ক্রমশ এলোমেলো এবং কথাবার্তা সামঞ্জস্যবিহীন হয়ে পড়ে। তারপর সুরাপায়ী বুঝতে পারে তার চলাফেরা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সে শুধু তাৎক্ষণিক উদ্দীপনায় সাড়া দিচ্ছে। এই অবস্থায় যদি সে একা থাকে, তবে সে স্বপ্নময় আবেশে বা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। তৃতীয় পর্যায়ে, নিস্তেজনা নিম্নমস্তিষ্কে নেমে আসে। বিচারবুদ্ধি, আত্মসমালোচনার, আত্মসংযমের ক্ষমতা একেবারেই লোপ পায়। প্রক্ষোভ স্তিমিত, নাটকীয়-ভাব অন্তর্হিত। শুইয়ে দিলে এখন ঘুম শুধু ঘুম। যতক্ষণ এ্যালকোহল রক্তের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ ঘুম ভাঙানো খুব কঠিন ব্যাপার।

অ্যালকোহলের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে। রোগীদের সংগে কথাবার্তা বলে ধারণা হয়েছে, তাঁদের অনেকেই অ্যালকোহলকে একটা উত্তেজক পানীয় মনে করেন। বেশি মাত্রায় খেলে ক্ষতি হয়ে বটে, কিন্তু অল্পমাত্রায় সেবন করলে নাকি দেহমনের ফিটনেস বাড়ে। ওষুধের মত নিয়মিত মাত্রায় পান করলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, একথাও অনেকের মুখে শুনেছি। একজন নামকরা শিল্পী একদিন বলেছিলেন সুরা মহৎ শিল্প-সৃষ্টির ইনস্পিরেশন। বিচার-বিবেচনার যুক্তিবুদ্ধির, সচেতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সংগে শিল্প সৃষ্টির সম্পর্ক নেই যাঁরা মনে করেন,

তাঁরা সৃজন-[illegible] অ্যালকোহলের সাহায্য নিয়ে থাকেন। [illegible] অনুপ্রাণিত (!) এই শিল্পী সাহিত্যিকরা সৃষ্টির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক [illegible] বিজ্ঞানসম্মত ধারণা পোষণ করেন না। শিল্প সাহিত্যের মধ্যে সমাজ-চেতনার অভি-ব্যক্তিকে এঁরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন না। এঁদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এই তথাকথিত উত্তেজনাদায়ী পানীয়ের প্রভাবে অকালে নষ্ট হয়ে যায়, প্রচুর সম্ভাবনাময় শিল্পীদিগের ঘটে করুণ ও আকস্মিক পরিসমাপ্তি। অনেক বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিকের জীবনের নজীর টেনে আমার শিল্পীবন্ধু বলেছিলেন যে, এদের সাফল্যের মূলে আছে সুরা। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ার দরুণ নিজের সুরাসক্তির চিকিৎসা করা তো দূরের কথা, সুরাসক্তিকে তিনি প্রশ্রয়ই দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে যেসব সুরাসক্ত বরেণ্য শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁর আদর্শ, সুরাসক্তি তাঁদের মহৎ সৃষ্টির কারণ নয়; বরং বলা চলে সুরাসক্তির জন্যে তাঁদের প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটেনি, তাঁদের অসীম সম্ভাবনার পূর্ণ স্বাক্ষর তাঁরা রেখে যেতে পারেননি। সুরাসক্তির চিকিৎসা প্রসঙ্গে সুরাসক্তকে প্রথমেই বোঝানো দরকার যে, সুরা উত্তেজক পানীয় নয়, সুরা সৃজন প্রতিভার উন্মেষ ঘটায় না, সুরার আপাত উত্তেজনার পিছনে আছে অবসাদ ও নিস্তেজনা। সুরা মাদকদ্রব্য বিশেষ, ইংরিজীতে যাকে বলা হয় নারকোটিক। সুরাসক্তি মানসিক রোগের লক্ষণ ও সুরাসক্তি মানসিক রোগের কারণ। সুরার প্রভাবে পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে, এবং ফলে শিল্পী সাময়িকভাবে অবাধে সৃষ্টি-কার্যে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এই কারণে অনেকে এ্যালকোহলকে শিল্প সৃষ্টির সহায়ক বা শিল্পীর ইনস্পিরেশন বলে মনে করেন। বলা বাহুল্য, এ ধারণা ভুল ও ক্ষতিকর।

সুরাপানজনিত উন্মত্ততার নানা ধরনের অভিব্যক্তি দেখা যায়।

সামান্য সুরাপান করে কেউ কেউ হঠাৎ অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠে মানুষ খুন করতে পারে। খুন করার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে থাকে, অ্যালকোহলের ক্রিয়ায় বুদ্ধি-বিবেচনা ও কৃতকর্মের ফলাফলের ধারণা লোপ পাওয়ার ফলে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা সহজ হয়। প্রণয়ঘটিত হত্যাকাণ্ডের সংগে সুরা-উন্মত্ততার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। এই রকম বহু ঘটনার উল্লেখ আইনের কেতাবে দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে হত্যাকারী আগে থেকেই মনের রোগে ভুগছিল। এই অবস্থাকে বলা হয় ম্যানিয়া এ্যা পটু। একটি লোক তার স্ত্রীকে ও স্ত্রীর প্রণয়ী সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গুলী করে মারার পর উন্মত্ত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। থানায় [illegible] আগে পর্যন্তও সে অপরাধ [illegible] থাকে। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে সে খুন করার আগে মদ খেয়েছিল। এমন কিছু বেশি-

মাত্রায় [illegible] এই [illegible] [illegible] করেননি। [illegible] উত্তেজনার [illegible] দেখে যারা মনে [illegible] তার মধ্যে [illegible] উন্মাদরোগের [illegible]। [illegible] সামান্য [illegible] [illegible] আছে। [illegible] প্রতি সন্দেহ [illegible] মানসিক অসুস্থতাকে বাড়িয়ে তোলে। সামান্য পরিমাণ এ্যালকোহল সেবনে সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয় ও ইতস্তত ভাব দূর হয়ে যায়। তার নিস্তেজনাপ্রবণ স্নায়ুতন্ত্র সামান্য পরিমাণ এ্যালকোহলেই নিস্তেজিত হয়ে পড়ে। প্রথমে উচ্চমস্তিষ্কের নিস্তেজনার ফলে খুন ও হিংসা প্রবণতা (নিম্নমস্তিষ্কের সাময়িক উত্তেজনার ফল) তীব্রভাবে প্রকাশ পায়, পরে নিস্তেজনা-তরঙ্গ সমগ্র মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে অস্বাভাবিক নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে।

'ডিপসোম্যানিয়া' কথাটির সংগে আপনারা অনেকেই পরিচিত ডিপসো-ম্যানিয়াক'রা মাঝে মাঝে সুরাপান করে উন্মাদের মত আচরণ করে। কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস, সুস্থ স্বাভাবিক জীবন, তারপর হঠাৎ কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরে চলে পানোন্মত্ত অস্বাভাবিক অবস্থা। এরা সাধারণত চিকিৎসার আশায় ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। এই রকম একটি রোগীর কথা শুনুন।

রোগীর নাম প্রিন্স মুখার্জি। নিয়ে এলেন কোলকাতার এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। ম্যানেজার সাহেব বললেন, ওকে আমরা প্রিন্স বলে ডাকি। ওর চেহারা তো দেখছেন, প্রিন্সের মতই। আচার ব্যবহারেও প্রিন্স। ওর বাবা ছিলেন এক নেটিভ স্টেটের দেওয়ান। বর্তমানে ওরা মধ্য-প্রদেশের বাসিন্দা। আমাদের কোম্পানীর এজেন্সী নিয়েছে প্রিন্স। ও তল্লাটে ওর চেষ্টায় আমরাই এখন সব থেকে বেশি বিজনেস করছি। কোম্পানীর একটা মস্ত-বড় এ্যাসেট আমাদের এই প্রিন্স। ওর মত গুণী ছেলে হাজারে আপনি একটা পাবেন কিনা সন্দেহ। এই বলে ভূমিকা শেষ করলেন ম্যানেজার সাহেব।

প্রিন্স মুখার্জিকে দেখলাম। হ্যাঁ, দেখ-বার মতই চেহারা। যেমন চেহারা, তেমনি পোষাক। সবটাই আভিজাত্যে মোড়া। প্রিন্স চোখ নীচু করে ম্যানেজার সাহেবের ভূমিকা শুনছিলেন। এইবার মুখ তুলে তাকালেন। মুখের রং লালচে, যেন রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে। চোখের কোণ দুটো একটু ফোলা-ফোলা, চোখ দুটো ভিজেভিজে। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, আশা করি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। আপনার সাহায্য পেলে বোধ হয় আমি এই ন্যাস্টি হ্যাবিট ছাড়তে পারবো। মিঃ মেহতা, আই মিন, আমাদের ম্যানেজার এই রকমই ভরসা দিয়েছেন।

—আপনার ন্যাস্টি হ্যাবিট-এর পরিচয় এখনো পাইনি মিঃ মুখার্জি।

মিঃ মেহতাই পরিচয় দিলেন। ওর এক একটা স্পেল আসে। তিন মাস, চার মাস অন্তর। তিন মাস চার মাস একেবারে স্ট্রিক্ট টিটোটেলার। সে সময় পর্যন্ত [illegible]

না। [illegible] বলে [illegible] [illegible] ছোঁবে [illegible]। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] না ছুঁয়ে [illegible]। [illegible] [illegible] উঠে [illegible] চালাবে। সব খাঁটি [illegible]। শুধু [illegible] বলে [illegible] না, পবিত্র [illegible] হওয়া চাই। তার পাঁচ দিন এমনি চলবে। এক একটা স্পেল দশবারো দিনও চলে যায়। নিজের ঘোর টাউনে নয়। সেখানে সবাই জানে ও খাঁটি টিটোটেলার। ও চলে আসবে বাঙ্গালুর কি বিলাসপুরের কোনো [illegible], কিম্বা এই কোলকাতার কোনো সম্ভ্রান্ত হোটেলে। হোটেলগুলোতে ওর দেদার ক্রেডিট। তারা ওকে কিছু বলবে না। যখন বিলের পরিমাণ দেড় হাজার ছাপিয়ে যাবে, তখনই ওরা ঠিক জায়গায় খবর পাঠাবে। আমাদের অফিসের ঠিকানায় খবর চলে যাবে। অফিস থেকে লোক গিয়ে বিলের টাকা শোধ করে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে। আবার চলবে চার পাঁচ মাস একনাগাড়ে বিজনেস। তখন ও একেবারে অন্য মানুষ। আবার হঠাৎ এক-দিন হেডকোয়ার্টার্স থেকে উধাও। খবর পেলেই আমরা বুঝে নেব প্রিন্স ইজ ইন হিস স্পেল। আমার মনে হয় এটা একটা ন্যাস্টি হ্যাবিট। এ হ্যাবিট নিশ্চয়ই আপনার ট্রিটমেন্টের ডোমেইনে পড়ে।

এর পরদিন প্রিন্স নিজের ন্যাস্টি হ্যাবিট ও প্রাইভেট লাইফের সম্পূর্ণ পরিচয় দিলেন। ছোটবেলা কোলকাতায় কেটেছে, মামার বাড়ীতে। ছুটিছাটাতে বাবার কাছে যেতেন। বাবা উড়িষ্যার একটা ছোট নেটিভ স্টেটের দেওয়ানের অধীনে সামান্য কাজ করতেন। মেহতা এবং বাইরের অনেকের কাছে তিনি দেওয়ানপুত্র বলে পরিচিত। শৈশব থেকেই এই রকমভাবে নিজেকে জাহির করার ঝোঁক। ছোটবেলা থেকেই কোলকাতায় স্কুলের ছেলেদের কাছে নিজে-দের সম্বন্ধে অনেক গালগল্প বানিয়ে বল-তেন। এতে বেশ প্রেস্টিজ বাড়তো। প্রেস্টিজের মোহে নানারকমের মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়েছেন। প্রেস্টিজের প্রয়োজন ছিল। কোলকাতা থেকে বাবার কাছে গেলেই বুঝতে পারতেন তাঁদের দীনহীন অবস্থা। আমরা হোটেলের বয়কে যতটা মর্যাদা দিয়ে থাকি, ততটুকু মর্যাদাও দেওয়ানজী ওঁর বাবাকে দিতেন না। সব আমলাদেরই ঐ একই অবস্থা ছিল। বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে, মা বাবা দিদি সকলকেই দেওয়ানজীর বাড়ীর লোকজনদের ফাইফরমাশ খাটতে হত। কোলকাতা থেকে ওখানে গেলে মনে হত যেন জেলখানায় এসেছেন। চেহারার জন্য বাইরে সকলের কাছে আদর ও সম্মান পেতেন, কিন্তু দেওয়ানজির বাড়ীর লোক-দের কাছে এই চেহারাই ছিল সব থেকে ওঁর বড় শত্রু। দেওয়ানজির ছেলেমেয়েদের চেহারা মোটেই ভাল ছিল না। তারা ওঁর চেহারার জন্যে ওঁকে হিংসে করতো, ঘৃণা করতো। দেওয়ানজির বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ওকে দেখলেই নানারকম অর্ডার করতো, তাদের সে অর্ডার তামিল না করে উপায় ছিল না। দেওয়ানজীই বিদ্রূপ করে ওকে

প্রিন্স নাম দিয়েছিলেন। শেষেরটুকু প্রিন্সের নিজের কথাতেই বলি। এই কথাগুলো বলবার সময় ওঁর মুখ আরো একটু বেশি আরক্ত হয়ে উঠেছিল। দুঃখ আবেগে প্রশস্ত বুক ওঠানামা করছিল। উনি বললেন,—

দুঃখ দুঃখে সব অত্যাচার, সব অপমান সহ্য করে যেতাম, কিন্তু মাঝে মাঝে বিদ্রোহও করতাম। সেদিন রাজবাড়ীতে বিশেষ একটা উৎসব ছিল। সেজেগুজে উৎসব দেখতে যাবো বলে তৈরী হয়েছি, এমনি সময়ে দেওয়ানজির বাড়ী থেকে হুকুম এলো সাইকেলে করে তিন মাইল দূরের বাজার থেকে এখুনি দেওয়ানপুত্রের জুতোর ফিতে কিনে আনতে হবে। আমি রাজী হলাম না। বাবা মা অনেক সাধ্যসাধনা অনুরোধ করলেন। ঘোঁ ধরে বসে রইলাম। কিছুতেই যাবো না। শেষ পর্যন্ত বাবাকে যেতে হলো। আমি উৎসবেও গেলাম না। জামা কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শয্যা নিলাম। মাথার মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগলো। সারা শরীরের মধ্যে কিসের যেন কাঁপুনী। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বদ্ধ পশুর মত রাগে অপমানে নিজের হাত কামড়ে রক্ত বের করলাম। বিছানার চাদরটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লাম, বালিশটার তুলো বের করে ঘরময় ছড়িয়ে দিলাম। পরদিন সকালে দেওয়ানজির তত্ত্বাবধানে বাবা আমাকে শাসনের নামে বেদম প্রহার করলেন। আমি তিন চারদিন বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। সেই থেকে ছুটিগুলো যথাসম্ভব কোলকাতাতে কাটাতে লাগলাম। মা কান্নাকাটি করে চিঠি লিখলে উড়িষ্যার সেই শহরটাতে কয়েক দিনের জন্যে যেতাম। গেলেই আমার প্রায়ই ঐ ধরনের মাথার যন্ত্রণা হতো। হাতের কাছে যা পেতাম ভেংগেচুরে তছনছ করতাম। কলেজে পড়ার সময় মা মারা গেলেন। বাবা ডেকে পাঠালেন স্টেটে চাকরী নেবার জন্যে, ওঁর রিটায়ার করার সময় হয়েছে। আমি রাজী হলাম না। মামা বাবার অমতে আমাকে তাঁর বাড়ীতে ঠাঁই দিতে রাজী হলেন না। আমি বি-এ পরীক্ষা না দিয়ে ভ্রাম্যমাণ সেলস-ম্যানের চাকরী নিয়ে সংসার সমুদ্রে ভেসে পড়লাম। দেওয়ানের দেওয়া প্রিন্স নাম আর ঈশ্বরের দেওয়া চেহারা,—এই দুটোকেই আমি ঘৃণা করি; আবার এই দুটো ভাংগিয়েই আজ এই বেয়াল্লিশ বছর অবধি আমি রুজিরোজগার করে আসছি। শৈশব থেকে প্রতিদিন অনুভব করেছি নিজের দৈন্য নিজের অসহায়তা। প্রতিপদে প্রেস্টিজ খুইয়েছি, তাই প্রতিমুহূর্তে প্রেস্টিজ ফিরে পাবার জন্যে সংগ্রাম করছি। আপনারা যাকে মন্দ কাজ, অসামাজিক আচরণ বলেন, সে রকম সব কাজেই বোধ হয় আমি অভ্যস্ত! প্রেস্টিজের জন্যে সব রকম মিথ্যাচারে সব রকম শঠতা করতে আমি প্রস্তুত। তা সত্ত্বেও, আমার মনের গ্লানি ঘুচছে না, অপমানের জ্বালা দূর হচ্ছে না। তিনচার মাস অন্তর অল্প অল্প শরীর খারাপ লাগে, তখনই বেরিয়ে পড়ি, কোনো পুরনো পুরনো আস্তানায় গিয়ে ঢুকে পড়ি। মাথার যন্ত্রণা করে। তারপর চলতে থাকে ঐ অবস্থা। মেহতা যাকে বলে স্পেল। মদ খাই, মদ খাওয়াই, গোলমাল, ভাঙ্গি অন্যকে বিনাকারণে অপমান করি। সব টাকা ফুরিয়ে যায়। বিল সই করে চলি। অবস্থা চরমে উঠলে ওরা আমাকে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখে। আমার প্রিন্সিপালকে (যখন যে কোম্পানীতে চাকরী করি, তার কর্তাব্যক্তিদের) খবর পাঠায়। তারা এসে আমাকে টাকা দিয়ে লাগেজ খালাস করার মত, আস্তানার লোকদের কাছ থেকে খালাস করে বাড়ী নিয়ে যায়। তাদের অনেক টাকা খরচ হয়, কিন্তু আমার সেলসম্যানশিপের জোরেতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেতাদের খরচ সুদে-আসলে উশুল হয়ে যায়। প্রেস্টিজ রিগেইন করতে গিয়ে বারবার প্রেস্টিজ হারাই। কিন্তু আমি মনে মনে জানি শেষ পর্যন্ত আমি জিতবোই। বাবা বেঁচে নেই, বিয়ে করেছি, ছেলেমেয়েও হয়েছে। দশ বছর ধরে অন্যের কাছে প্রেস্টিজ বজায় রেখে চলেছি। এই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। বাড়ীতে প্রেস্টিজ চলে গেলে বাইরে রাজকীয় সম্মানেও আমার মন ভরবে না। এবারকার স্পেলের খবর ওদের কানে পৌঁছেছে। সত্যি এই ন্যাস্টি হ্যাবিট থেকে পরিত্রাণের সত্যি সত্যি কোনো উপায় আছে কি? আমাকে যে বড় হতে হবে। হ্যাঁ, বড় আমি হবোই। প্রিন্সের মত প্রেস্টিজ পাবোই।

জিজ্ঞাসাবাদের ফলে আরো অনেক তথ্য জানা গেল। পালাপার্বণে দেওয়ানজীর বাড়ীতে সুরার স্রোত বয়ে যেতে দেখেছেন মুখার্জি। বাবা কোলকাতা থেকে পেটি পেটি মদ নিয়ে যেতেন, সবই হোয়াইট লেবেল। 'হোয়াইট লেবেল' ছাড়া দেওয়ানজী আর কিছু ছুঁতেন না। রাজা-মশাই কোন ব্র্যান্ড দিয়ে রাজকীয় প্রেস্টিজ রাখতেন, সে খবর প্রিন্স রাখেন না। বাবা মদের মধ্যে থেকেছে কিন্তু কোনোদিন গলা ভেজানোর ইচ্ছেও তাঁর হয়নি। মা মাঝে মাঝে বিষন্নতায় ভুগতেন। তিনচারদিন বিছানা থেকে উঠতেন না, কিছু খেতেন না, কথা বলতেন না। আবার যখন কাজ করতেন, দারুন উৎসাহ উদ্যম দেখা যেত তাঁর মধ্যে। প্রথম সেলসম্যানের চাকরী নেবার পরই মদে তার হাতেখড়ি। মণিরাম, তার সে সময়কার অন্তরঙ্গ বন্ধু, মাথার যন্ত্রণা লাঘব করতে হুইস্কি পানের উপদেশ দিয়েছিল। মণিরাম সিনেমায় ঢুকে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ট্যুর থেকে তিনমাস চারমাস অন্তর ফিরে এসে, মণিরামের সঙ্গে, মাথার যন্ত্রণা লাঘব করতে হোটেলের ঘর ভাড়া করে তিনচারদিন ধরে মদ খেত মুখার্জি। স্পেলের শেষের দিকে যখন ও উন্মাদ হয়ে উঠতো মণিরাম জোরজবরদস্তি করে ওকে ধরে নিয়ে মামার বাড়ীর দোরগোড়ায় রেখে সরে পড়তো। এই হচ্ছে প্রিন্স মুখার্জির ন্যাস্টি হ্যাবিট ও প্রাইভেট লাইফের ইতিহাস।

এই কেসটি বিশদভাবে পর্যালোচনা করার ফলে বুঝতে পারলাম যে মুখার্জি এক ধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন। অধিকাংশ ডিপসোম্যানিয়াকই ম্যানিয়াক-ডিপ্রেসিভ সাইক্লোথিমিক বা এপিলেপটয়েড মত কোনো মোলজ্ঞাপক হতে [illegible] হয়। ম্যানিয়াক-ডিপ্রেসিভ (সংক্ষেপে এম ডি পি) রোগে চক্রাকারে অতি উত্তেজনা ও অতি-নিস্তেজনার অবস্থা দেখা যায়। এটা অবশ্য পুঁথির কথা। কিছুসংখ্যক রোগী কিছুদিন অক্লান্ত উত্তেজিত অবস্থায় মুখ উন্মাদের মত আচরণ করে, নিস্তেজিত বা বিষন্ন অবস্থা তাদের দেখা যায় না। আবার কিছু রোগীর মধ্যে বিষন্ন অবস্থাটাই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়; অতি-উত্তেজিত উন্মাদ অবস্থা দেখা যায় না। অন্য সময় এরা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক ও সুস্থ। এপিলেপসী বা মৃগী রোগের সঙ্গে সকলেই কমবেশী পরিচিত। মৃগীর উপসর্গও এম, ডি, পির মত কিছুদিন অন্তর চক্রাকারে দেখা দিয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলেন জন্মগত স্নায়ু-বৈশিষ্ট্য এই রোগের জন্যে দায়ী। শতকরা ষাটটিরও বেশী ক্ষেত্রে পিতামাতা বা পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এই রোগলক্ষণের ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু পরিবেশের প্রভাবকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

মুখার্জির মা খুব সম্ভব ডিপ্রেসনের রোগী ছিলেন। সে নিজে কিছুদিন অন্তর ম্যানিয়াক হয়ে পড়ছে। তার পিতার নেটিভ স্টেটের দেওয়ানের আমলাগিরি চাকরী নিঃসন্দেহে মায়ের অসুস্থতাকে প্রভাবিত করেছে। মুখার্জির অসুস্থতার ইন্ধন জুগিয়েছে। সুস্থ পরিবেশের মধ্যে মানুষ হলে হয়তো মুখার্জি ডিপসোম্যানিয়াক হতো না।

মুখার্জির মানসিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। প্রিন্স মুখার্জি অতিমাত্রায় আশাবাদী। অনেকবার অনেক চাকরী খুইয়েছেন, দেনায় আকণ্ঠ ডুবে গেছেন, নানারকমের বিপদে পড়েছেন; কিন্তু হতাশায় ভেংগে পড়েন নি। বেয়াল্লিশ বছর বয়সেও স্বপ্ন দেখছেন মানমর্যাদায়, ঐশ্বর্য-সম্পদে, দেওয়ানজীকে ছাড়িয়ে যাবেন, চেনা-শোনা সবাই তাঁকে বাহবা দেবে। সত্যিকারের রাজার মত প্রেস্টিজ হবে। মাঝে মাঝে একটা স্পেলের পরে কচু হতাশার ভাব মনে হলেও, মুষড়ে পড়তে কোনোদিনও তাঁকে দেখা যায়নি। তাঁর প্রেস্টিজলাভের কল্পনা অনেকটা আলেয়ার পেছনে ছোটার মত। তিনচার মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে, বাস্তবের সংগে সংগ্রাম করে যখনই অন্তরে হতাশার ভাব জাগে, তখনই তিনি প্রেস্টিজ স্বপ্নকে জীইয়ে রাখার জন্যই সুরার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্ষোভ, হতাশা, হীনমন্যতাকে মদের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। নিজের শক্তি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা ও বাস্তবের ভ্রান্ত মূল্যায়ন মুখার্জিকে অসুস্থ করে রেখেছে, তাঁকে সুরাশ্রয়ী করেছে।

—[illegible]

**ভ্রম সংশোধন**

১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখের 'মনের কথা'র সাবটাইটেল 'সামরিক উন্মত্ততা: টোয়াইলাইট স্টেট'-এর বদলে আগের সংখ্যার সাবটাইটেলটি ছাপা হয়েছে। এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

(৩৬)

আজ দণ্ড বিসর্জনের দিন। খুব সকালে উঠে সোনা, লালটু, পলটু আহ্নিক করল। সূর্যোদয়ের আগে ওদের আজ নদীর পাড়ে হাজির হতে হবে। আহ্নিক শেষে ওরা এসে উঠোনে দাঁড়াল। তরমুজ খেত পার হলেই নদী। সেই নদীতে ওরা ডুব দিতে যাবে। নদীতে ওদের বিল্বদণ্ড, যে দণ্ড এ-তিনদিন ওদের হাতে ছিল, তা আজ বিসর্জন দিতে যাবে। ব্রহ্মচারী বালকেরা সন্ন্যাসীর এই আলখেল্লা ছেড়ে ফেলবে নদীর পাড়ে। ডুব দেবে জলে, ডুব দিলেই ফের তারা গৃহী হয়ে যাবে।

সূর্যোদয় না হতে আজ ঠাকুর বাড়ির সবাই নদীর পাড়ে নেমে যাবে—সোনাবাবু-দের আজ দণ্ড বিসর্জনের দিন, সে-দিনে কি কি হয় সব জানে সামসুদ্দিনের মা। রাতে যখন ফতিমাকে পাশে নিয়ে শুয়ে ছিল, তখন গল্প করেছে, খুব ভোরে উঠে বাবুরা যাবে নদীতে ডুব দিতে। যা কিছু বসন ভূষণ সন্ন্যাসীর সব ছেড়ে ফেলবে। ছেড়ে সব নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে।

ফতিমা ভোর রাতের দিকে একটা স্বপ্ন দেখল। রাজপুরীর পাশে এক বন। বনে এক রাজপুত্র জন্ম নিচ্ছে। বৈশাখী পূর্ণিমা। এক মহামানবের জন্ম হচ্ছে। তার পরই সে স্বপ্নে দেখল—কিছু জরা-গ্রস্ত মানুষ হেঁটে যাচ্ছে শহরের উপর দিয়ে, কারা যেন হাজার হাজার মৃতদেহ ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে এবং এক পাগল মানুষ সবাইকে ঘরে ফিরতে বলছে। পাগল মানুষের সঙ্গে সেও সবাইকে ঘরে ফিরতে বলছে। কিন্তু কেউ ফিরছে না। এমন কি সোনাবাবু ওর প্রিয় পাগল জ্যাঠামশাইকে ফেলে পালাচ্ছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল ফতিমার। সে উঠে বসল। স্বপ্নটার সঙ্গে তার বইয়ে পড়া একটা ইতিহাসের দৃশ্য কিছু কিছু মিলে যাচ্ছে। সে চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপরই সহসা মনে হল খুব সকালে, সূর্যোদয়ের আগে, এমন কি মনে হয় যখন কেউ ঘুম থেকে জাগবেনা তখন ওরা নদীতে যাবে। ফতিমা বাইরে এসে দাঁড়াল। মোরগগুলি ডাকছে। সে নেমে যেতেই মোরগগুলো মাঠে শস্যদানা খেতে বের হয়ে গেল। সে চুপি চুপি পেয়ারা গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। মাঠ ফাঁকা। শস্যদানা কিছু আর এখন পড়ে নেই। সে দেখল, সোনাবাবুর নেড়া মাথা, হাতে বিল্বদণ্ড, গায়ে গৈরিক বসন। সেই মহা-মানবের মতো মুখ চোখ সব। যেন খুব বড় হয়ে গেছে, লম্বা হয়ে গেছে সোনাবাবু। পাগল কর্তার মতো কোনদিকে না তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে একা মাঠের ভিতর নেমে গেল।

একটা মিছিল যাচ্ছে মানুষের। সবার আগে পাগল মানুষ। পরে সোনা লালটু পলটু। পিছনে আশ্বিনের কুকুর এবং চন্দ্র-নাথ, শশিভূষণ, ভূপেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আরও পিছনে হেঁটে হেঁটে নদীর পাড়ে যাচ্ছে। সবার শেষে যাচ্ছে ঈশম। সে ভোর রাতে জেগে গেছে, কারণ তাকে গিয়ে ডেকে তুলতে হবে সবাইকে। ভোর হয়ে গেছে, এবারে উঠতে হয়। সূর্য উঠতে দেরি নেই। সবাইকে ডেকে দেবার ভার ছিল তার।

ঈশম এই তিন ব্রহ্মচারীকে দেখবে না বলেই সকলের পিছনে আছে। দেখলে যা কিছু পুণ্য এই তিন বালক উপবীতের ঘরে অর্জন করেছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। সে সেজন্য সবার শেষে, সবার পিছে থাকছে। ডুব দিয়ে উঠলেই আর কোন বাধা নিষেধ থাকবে না। সে ওদের সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত পারবে।

ওরা যাচ্ছিল, ওদের উপবীত গলায়। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে। ওদের মুখ উপ-বাসে কাতর। তিনদিন শুধু ফলমূল আহার এবং দুপুরে চরু রান্না হয়েছিল গতকাল। খেতে বিস্বাদ। আজ পুকুরে জাল ফেলবে চন্দ্রনাথ। এবং বড় মাছ, পাবদা, কই অথবা রুই মাছের ঝালঝোল, এই নদীর জলে নেমে থেকে সেই এক খাদ্য বস্তু মনোরম গন্ধ বয়ে আনে। চন্দ্রনাথ, ওরা নদীতে ডুব দিয়ে উঠলেই পুকুরে গিয়ে জাল ফেলবে।

সোনা ধীরে ধীরে জলে নেমে গেল। পাশাপাশি দাঁড়াল তিনজন। পুবের আকাশ গাঢ় লাল। ঠাণ্ডা কনকনে শীত। মনে হচ্ছিল সমস্ত শরীর এই হিমঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাচ্ছে। তবু ওরা দাঁড়াল। মন্ত্রপাঠ করল। প্রথম উত্তরীয় ফেলে দিল জলে। তারপর বিল্বদণ্ড জলের নিচে গুঁজে দিল। সেই দণ্ড বিসর্জন দিয়ে আবার মন্ত্রপাঠ করল ওরা। এবার পরনে যে বাসটুকু ছিল তাও জলে ভাসিয়ে দিল। ওরা এবার সূর্য প্রণাম সেরে উঠে আসার সময় দেখল, ঈশম দাঁড়িয়ে আছে তরমুজ খেতে। ফতিমা ঈশমের পাশে দাঁড়িয়ে বাবুর দণ্ড বিসর্জন দেখছে।

তখন পাগল মানুষ নদী সাঁতরে ও-পারে চলে যাচ্ছেন।

এ-ভাবেই ফতিমা দাঁড়িয়ে থাকে, বড় জ্যাঠামশাই নদী পার হয়ে চলে যায়। ফতিমা কি যেন বলতে চায় তাকে, মেলাতে যাবার সময় কি একটা কথা বলেছিল, যার অর্থ সে বোঝেনি। মেলাতে ওরা একসঙ্গে পুতুল নাচ দেখেছিল একবার। রাবণের সীতা হরণ। এ-ভাবেই বর্ষা আসার আগে পাট গাছগুলো ক্রমে বড় হতে থাকে। শীতের ছুটিতে এসে দেখে গেছে ফতিমা ফসল-বিহীন মাঠ, আর গ্রীষ্মের ছুটিতে এলে দেখতে পায় ফতিমা পাট গাছগুলো বড় হয়ে গেছে মাঠে। পাট গাছ বড় হলেই সে চুপি চুপি-অতি সহজে এ-গাঁয়ে উঠে আসতে পারে। কেউ দেখতে পায়না, সহরের এক মেয়ে প্রায় চুপি চুপি অর্জুন গাছটার নিচে এসে বসে থাকে। বাবুর জন্য সে নানা-রকমের জলছবি নিয়ে আসে। কখনও রাজা রাণীর, কখনও প্রজাপতির। সে বাঘ হরিণের ছবি আনে না। রাবণের সীতা হরণের ছবি আনতেও সে ভয় পায়।

এ-ভাবেই এ-দেশে নিদারুণ গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসে। থেকে থেকে এ অঞ্চলে ঝড় হতে থাকে, বৃষ্টি হতে থাকে। আবার কি রোদ! রোদের উত্তাপে শস্যের চারা সকল জ্বলতে থাকে।

ঈশমের শরীর ভাল ছিল না বলে মাঠে যায়নি। সে কয়েদবেল গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছিল। সোনা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামনের সবুজ মাঠ দেখছে। মাঠে মাঠে কত কামলা। ওরা রোদের ভিতরে মাথলা মাথায় জমিতে নিড়ি দিচ্ছে। এবং গান গাইছে। সোনা এবং ঈশম বসে সেই গান শুনছিল। বেশ জারি জারি সারি সারি গান, গমকে গমকে আকাশে বাতাসে বাজছে।

ঈশম গাছের ছায়া দেখে এখন বেলা কত, এই বেলায় বেলায় জমিতে যারা নিড়ি দিচ্ছে শেষ করতে পারবে কিনা, না পারলে আকাশের যা অবস্থা, ঈশান কোণের একটা বড় মেঘ দেখে টের পায় ঈশম ঝড় উঠবে একুনি. তাড়াতাড়ি মাঠে যা কিছু আছে, যেমন গাই বাছুর, আস পাতা সব নিয়ে আসতে হবে।

ঈশম পাশের জামরুল গাছটার দিকে তাকাল। গাছের ডাল, বড় বড় পাতা সব জামরুলে ঢেকে গেছে। সাদা সাদা ফল, কি মনোরম দেখতে, যেন সারা অঙ্গে লাবণ্য। ঝড় উঠলেই সব ঝুর ঝুর করে পড়বে। মনে হবে কেউ যেন শুভ কাজে গাছের নিচে বড় বড় খৈ বিছিয়ে গেছে। ওর এই গাছ এবং ফলের জন্য মায়া হবে তখন।

তখন কালো রঙের মেঘটা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। কেমন ঘুরে ঘুরে অথবা আসলে নিজেই একটা মেঘের সমুদ্র তৈরি করে ফেলছে। ঘুরে ঘুরে প্রচণ্ড ঢেউ তুলে মেঘগুলো ক্রমে কালো রং থেকে ছাই রং হয়ে যাচ্ছে। আকাশের অবস্থা বড় খারাপ। ঈশম বলল, চলেন কর্তা বাড়ি যাই।

কোথাও বজ্রপাতের শব্দ। দুটো একটা পাতা বাতাসে মাথার উপর দিয়ে উড়ে উড়ে গেল। দু এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল শরীরে। দারুণ যে গ্রীষ্ম গেছে এই বৃষ্টি অথবা ঝড়ে তা ঠাণ্ডা হবে। সোনার এই বৃষ্টিতে বড় ভিজতে ইচ্ছা হচ্ছে।

জমিতে যারা পাট ধান নিড়ি দিচ্ছিল, আগাছা বেছে দিচ্ছে জমি থেকে তারা এখনও উঠছে না। আর বৃষ্টির ঢলে জমি কাদা না হলে উঠবে না। ওরা প্রাণপন কাজ করছে, এবং উতরোলে গাইছে জারি জারি সারি সারি গান। যেন ঝড় অথবা বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমস্বরে গেয়ে চলেছে। এই শেষ সময়—আর ওরা এসে জমিতে বসতে পারবে না, নদীনালা পুকুর সব জলে ভরে আছে—বড় ঢল নামলেই নদী নালা উপচে জল জমিতে উঠে আসবে, তারপরই জোয়ারের জলে সরপুঁটি, বোয়াল মাছ। কাজ কাম তখন কম। সারাদিন বৃষ্টি। বৃষ্টিতে মাছ মারো খাও।

সারা মাঠে মাথলা মাথায় মানুষ। জমিতে জমিতে জোয়ারের জল। কোথাও হাঁটু জল, কোথাও পায়ের পাতা ডোবে না। সারাদিন সারারাত বৃষ্টি। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। মাঠে মাঠে মানুষ। মাথলা মাথায় কোচ পলো হাতে মানুষ। ওরা সকাল সন্ধ্যা কেবল মাছ মারবে। লণ্ঠন হাতে, কেউ পলো হাতে ঝুপঝাপ জল ভেঙ্গে বড় মাঠে নেমে যাবে অন্ধকারে। অন্ধকারে মাছেরা মানুষকে এ-দেশে ভয় পায় না।

সুতরাং এই যে সব মাঠ ঘাস এতক্ষণ রোদে পুড়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল দাবদাহে পৃথিবীর শেষ রসটুকু বুঝি এবার বিধাতা শুষে নেবেন, তখন আকাশে আকাশে মেঘের খেলা। জলে জলে আবার দেশ ভরে যাবে। ওরা দুজন তখনও ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ভিতর কৃষকদের গান শুনছিল। কত ঘাস এবং প্রজাপতি এই মাঠে। পঙ্গু বিবির কথা মনে পড়ছে ঈশমের। আগামী হেমন্তে অথবা শীতে বুঝি তার বিবিটা মরে যাবে। ক্রমে বিবি বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এত কাজ এই সংসারে, সময় করে দুবার বেশি যাবে তা পর্যন্ত পারে না। মনে হয় কেবল কিছু না কিছু কাজ বাকি থেকে গেল।

ঝুপ ঝুপ করে এবার ঢল আরম্ভ হল। ঘাস পাতা সব ভিজে যাচ্ছে। জল পড়ছে টুপটাপ। সোনা, ঈশম, পাগল জ্যাঠামশাই সবাই দক্ষিণের ঘরের জানালাতে বসে আছে। বৃষ্টির শব্দ শুনছে। ঘাস পাতা কেমন বর্ষার জলে ভিজে ভিজে নাচছে। কোথাও একটা গরু ডাকছে—হাম্বা। বোধ হয় ওর বাছুরটা এখনও মাঠে, বৃষ্টিতে ভিজছে।

টিনের চালে বৃষ্টি পড়ছিল—ঝুম ঝুম। সোনা দুটো হাত দু কানে চেপে রাখছে, সহসা হাত দুটো আলগা করে দিচ্ছে। দিলেই বিচিত্র এক শব্দ। কান থেকে হাত আলগা করে দিলেই, বৃষ্টির জলাম্বর অশ্বেষণের মতো এক শব্দ। যার যার কান চেপে, হাত মৃদু আলগা করে—ওর এক ধরনের কানের ভিতর ঝম ঝম খেলা, বেশ মজা পেয়ে যাচ্ছে সে। সে এমন একটা মজার খবর জ্যাঠামশাইকে দেবার জন্য ইজিচেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জ্যাঠামশাই ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। হাত কচলে কবিতা আবৃত্তি করছেন। সমস্বরে সেই গানের মতো। মায়া মাখানো জগতে কোথায় যে তুমি ঈশ্বর এই মাটি এবং ঘাসে কখন কিভাবে নেমে আস জানি না।

সোনা জ্যাঠামশাইর দু কানে দু হাত চেপে তালে তালে হাত খুলে দিয়ে তালি বাজাতে থাকল। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনতে বলল জ্যাঠামশাইকে—শুনতে পাইতাছেন না! ও'রা ও'রা কইরা কাডাছে কারা? সে এমন বলল।

এই পৃথিবীতে নিরত কারা যেন কাঁদছে। আমরা জন্ম নেব এবার। ধনবৌ তখন বারান্দায় একটা বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সেও সেই কান্না শুনতে পাচ্ছে। আমি এবারে জন্ম নেব। ব্যথায় মুখ নীল হয়ে যাচ্ছে ধনাবৌর। উঠোনে এক হাঁটু জল। জলে বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড়। অজস্র তারার মতো জলের উপর ফুটছে। উঠোনে আঁতুড় ঘর। শুকনো কাঠ ফেলে দিয়ে গেছে ঈশম। পাট কাঠির বেড়া। উপরে শনের চাল। ঝাঁপের দরজা। ঈশম সারাদিন খেটে ঘরটা করেছে। ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে মুখটা। এ-ঘরে কেউ নেই। তার ডাকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। কারণ সারা আকাশ যেন এখন মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ছে। আকাশ ভেঙ্গে প্লাবন নেমেছে। ব্যাং ডাকছে। কচুপাতায় পুতুল নাচ হচ্ছে। পাতাগুলো জলের ভারে নাচছে। রামরাবণের যুদ্ধ অথবা রাবণের সীতা হরণ। ধনবৌর মুখটা ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে। সে আর পারছে না।

বড় বৌ ভাবল, একবার খোঁজ নিয়ে যাবে। রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরি করতে যাবে সে। সন্ধ্যা না হতেই রাতের খাবার করবে। খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা। খাবার সময় ধনের খবর নেবে।

সে হাঁটু জলে কাপড় তুলে রান্নাঘরে উঠে যাবার সময়ই দেখল ধন একটা বাঁশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখে টের পেল, পৃথিবীতে ঈশ্বর আসছেন।

সে তাড়াতাড়ি দক্ষিণের ঘরে গিয়ে ডাকল, ঈশম একবার যাও নাপিত বাড়ি। নাপিত বৌকে ডেকে আন। ধন বড় কষ্ট পাচ্ছে ব্যথায়।

ঈশম যখন দরজায় এসে দাঁড়াল, বড় বৌ দেখল, ওর চোখ লাল।

—তোমার শরীর খারাপ!

—না মামী।

—চোখ লাল কেন?

—হাঁটু জ্বর হইছে। সাইরা যাইব।

এবার বড় বৌ বলল, লালটু কোথায়? পলটু!

—জানি না মামী।

—সোনা, এদিকে এস।

সোনা এলে বড় বৌ ছাতা খুলে দিল। —তুমি যাও। নাপিত জ্যাঠিকে ডেকে আনো।

—আমি যামুনে! ঈশম তাড়াতাড়ি গামছা মাথায় বের হয়ে এলে বড়বৌ বলল, ঈশম তোমার শরীর ভাল না, তুমি শুয়ে পড়গে। রাতে ভাত পাবে না। বার্লি খাবে। ছেলেরা সব বড় হয়েছে। তোমার যা কাজ, এবার থেকে ওরা কিছু কিছু করবে।

বড় বৌর এমন কথায়, ঈশমের চোখ জলে ভার হয়ে এল। সে বলল, শুকনা গাছের গুঁড়ি আর-ও আছে। গোয়াল ঘরে তুইলা রাখছি। অসুজ ঘরে লাগলে কইয়েন। দিয়া আমু।

সোনা এমন দিনে বৃষ্টিতে ভেজার একটা কাজ পেয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি নেমে এল উঠোনে। এবং ছাতা মাথায় যাবার সময় দেখল, মা একটা বাঁশে হেলান দিয়ে কেমন ঝুলে আছে যেন। মা, তার মা। কি সুন্দর আর সজীব ছিল। এখন তার মা ক্রমে কি হয়ে যাচ্ছে। ঘরের বারান্দা টিন কাঠের, দুটো খুঁটির উপর বাঁশ ঝুলছে এবং মা এখানে অন্যদিন তার ভিজা কাপড় মেলে দেন। কিন্তু আজ কাপড় নয়, ভিজা কাঁথাও নয়, মা নিজেই কেমন ঝুলে আছেন। সোনার বড় কষ্ট হল মাকে দেখে। মাটিতে মার পা দুটো ঈষৎ ঝুলে আছে অথবা ছুঁয়ে আছে যেন মাটি। চোখ দুটো বড় বিষন্ন মায়ের। সে কেমন নড়তে পারছে না আর।

বড় বৌ বলল, দাঁড়িয়ে কি দেখছিস! তাড়াতাড়ি যা। বলবি, এক্ষুনি যেন চলে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে ধনবৌ কাতর গলায় বলল, যা বাবা, নাপিত বাড়ির জ্যাঠিরে ডাইকা আন। লালটু কই গ্যাছে? অরে কখন থাইকা দ্যাখতাছি না। মার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকল না। সে এক দৌড়ে যাবে, এক দৌড়ে ফিরে আসবে। কোথাও কারো সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলবে না। গল্প করবে না।

সে ছুটল ছাতা মাথায়, জলে ভিজে ছুটল। ছাতায় জল আটকাচ্ছে না। মাথার নিচে জল পড়ছে টুপটাপ। ওর শরীর ভিজছে। কাদা জল ছলাৎ ছলাৎ ছড়াচ্ছে চারপাশে। সে যার কষ্টের মধ্যটা ভাবছে আর ছুটছে। পাল বাড়ির বাঁশ বাগান অতিক্রম করে সে মাঝি বাড়িতে উঠে গেল। নাপিত বাড়ির জ্যাঠি, এখানে কি একটা কাজে এসেছে। সে ডাকল জ্যাঠিকে, জ্যাঠি তুমি লও যাই। মার কেমন করতাছে।

মাঝি বাড়ির ছোট বৌর দাঁতগুলো কালো। কি সব বলছে মার সম্পর্কে। ওর এ-সব শুনতে ভাল লাগছে না। বৌটির দাঁত কালো। মার বয়সী কি তারও বড়, মনে হয় জ্যাঠিমার বয়সী। কালো কুচকুচে দাঁত, কালদুটি কালপাহাড়ের মা। সোনা এবার উঁকি দিল ঘরে। কালপাহাড় ঘরে নেই। কালপাহাড় নিশ্চয়ই জোয়ারের জলে মাছ ধরতে গেছে। এমন বর্ষার দিনে সে মাঠে নেমে যেতে পারল না, জোয়ারের জলে সে সরপুঁটি, পিয়ের বোয়াল ধরতে পারল না। ওর ভিতরে কষ্ট। বড়দা মেজদা হয়ত পালিয়ে চলে গেছে মাছ ধরতে। তার ভিতর থেকে এমন দিনে মাছ ধরতে না পারার কষ্ট ঠেলে ঠেলে উঠে আসছে। সে বলল, অ জ্যাঠি লও যাই! মার কেমন করতাছে!

নাপিত জ্যাঠিকে খবর দিয়েই সোনা ছুটতে থাকল। ছুটছে আর ছুটছে। কাদা জলে ওর জামা প্যান্ট নষ্ট হচ্ছে। শুধু সে

ছুটেছিল। কারণ এখন জল নামছে অবিশ্রান্ত ধারায়। আহা কি বৃষ্টি। কি বৃষ্টি। মাঠ জমি সব জলে ভেসে যাচ্ছে। সে এসেই খবর দিল মাকে, মা, জ্যাঠিরে কইছি। সে বড় জ্যাঠিমাকে খবর দিল, জ্যাঠিমা লাপিত্ত জ্যাঠি আইতাছে। বড় বৌ তখন উনুনে জল গরম করছে। আভারাণী এসেছে ছুটে। দীনবন্ধুর দুই বউ মানকচু পাতা মাথায় এসেছে খবর নিতে। বড় বৌ সবার সঙ্গে জল গরম করতে করতে কথা বলছে।

সোনা দেখল, মা তখন টিনকাঠের ঘরটা থেকে কেমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছোট ঘরটায় ঢুকে যাচ্ছে। সোনার ইচ্ছা হচ্ছিল মার মাথায় ছাতা ধরে। মার মুখ এমন নীল বর্ণ হয়ে গেছে কেন। সেই যে সে একবার নীল রঙের একটা আলো জ্বলতে দেখেছিল একটা ঘরে, নীল রঙের আলোর ভিতর সে এবং অমলা, অস্পষ্ট মুখের ছবি, মার মুখ কি কষ্টে যেন তেমন নীলবর্ণ ধারণ করছে। সে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে না।

ঈশম তখন বৃষ্টিতে ভিজে আরও দুটো শুকনো কাঠের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে গেল। মা ঘরে ঢুকে গোঙাচ্ছে। সোনার ভারি কষ্ট হতে থাকল। সে ঝাঁপ খুলে মাকে বলবে ভাবল, তোমার কষ্ট হচ্ছে মা, আমি কি করতে পারি। আমি জোয়ারের জলে মাছ ধরতে যাব, বড় বড় সরপুঁটি সব জোয়ারের জলে উঠে আসছে।

আভারাণী বলল, বৌদি মুখটা দ্যাখছেন।

সোনার রাগ হচ্ছিল বড় জ্যাঠিমার উপর। এখনও জ্যাঠিমা রান্না ঘরে কি করছে। বের হচ্ছে না।

বড় বৌ বলল, মুখ দেখেছি। সময় হয়নি। তুই ঘরে যা। আমি যাচ্ছি। ধনের মাথা কোলে নিয়ে বসে থাক।

সোনা রান্নাঘরে এসে দেখল বড় জ্যাঠিমা আবু শোভার মার সঙ্গে ফিস ফিস করে কি কথা বলছে। সে বুঝতে পারছে না কিছু। নিরামিষ ঘরের পাশে বৃষ্টির জল বড় বড় ফোঁটায় পড়ছে। জলে দুটো ব্যাঙ লাফাচ্ছিল। এমন বৃষ্টির দিনে মার কষ্ট, অথবা ছোট ঘরটায় মার গোঙানি সে সহ্য করতে পারছে না। তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে গেলে এ-সব শুনতে হবে না, দেখতে হবে না, সে পলোটা নিয়ে ছাতা মাথায় মাঠে নেমে গেলে জ্যাঠিমা বলল, ভাল হবে না সোনা। জলে ভিজলে জ্বর হবে।

সোনা বৃষ্টির শব্দে জ্যাঠিমার কথা শুনতে পেল না। সে ছাতাটা মাথায় দিল, এবং পা টিপে টিপে জল ভেঙে হাঁটছে। হাতে পলো। সে হাঁটছে। চার পাশে সতর্ক নজর, মাছ উঠে আসতে পারে। সে কালো জাম গাছটা পার হতেই শুনল কচুর ঝোপে কি খলবল করছে। সে উঁকি দিল ঝোপের ভিতর। মাছ। কৈ মাছ। পালেদের পুকুর থেকে নতুন জলের গন্ধ পেয়ে কৈ মাছ উঠে আসছে। সে পলো দিয়ে চাপ দিল। ভেবেছিল সব কটা কৈ পলোর নিচে, সে হাত দিয়ে দেখল মাত্র দুটো। রান্নাঘরের দরজায় সে মাছ দুটো ছুঁড়ে দিল। বলল, জ্যাঠি দুটো কৈ। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে টাপুর-টুপুর। সে তখন দুটো কৈ মাছ ফেলে দিয়ে আরও মাছের জন্য মাঠের ভিতর নেমে গেল।

বৃষ্টি ফের জোর নামছে। আকাশটা ছাই রঙের। সুতরাং এসব দিনে বৃষ্টি ভিজে হাঁটু জল ভেঙে কোথাও যাওয়া অথবা ধানখেতে জোয়ারের জলে মাছ ধরা সবই সুখী ঘটনার মতো, আর ব্যাঙেরা ডাকছে চারিদিকে। ডালে বসে কাক ভিজছে। পাখিরা আকাশে উড়ছে না। ঘন মেঘ সব এখন আকাশে পাখিদের মতো ডানা মেলে ঝাপটাচ্ছে। চারিদিকে জল নামার শব্দ। পুকুরগুলো সব মাঠের জলে ভরে গেছে এবং কচুর পাতায় তখন পুতুল নাচ হচ্ছিল। বৃষ্টি পড়ছে টুপটাপ, পাতা ভিজছে, টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটায় কচুর পাতা নাচছে। সোনা পতুল খেলা দেখছে— রাম লক্ষ্মণ সীতা, রাবণ সুর্পনখা। এখন কচুর পাতা পুতুল নাচের মতো। জলের ফোঁটায় ওরা হাত-পা তুলে নাচছে। কখনও হেঁটে যাচ্ছে যেন। কখনও ডগাগুলো বৃষ্টির ফোঁটায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কচুর ঝোপটায় সোনা অনেকক্ষণ পুতুল নাচ দেখল। ওর মন ভালো না। সে ধানখেতে নেমে একটা পাতা ছিঁড়ল ধানের। ভাবল ফতিমা ওর সঙ্গে মেলায় পুতুল নাচ দেখেছে। ফতিমা ফেরার সময় সোনাকে একটা মন্দ কথা বলেছে। এই যে ঈশ্বর তাকে একটা ভাই দেবে, মাকে ভগবান, একটা ভাই হতে পারে, বোন হতে পারে দিয়ে যাবেন—সেটা যেন ঠিক না। ফতিমা মন্দ কথা বললে সোনার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রাতে মাকে চুপি-চুপি কথাটা বলে দিয়েছিল।

মা বলেছিল, ফতিমা নচ্ছাড় মেয়ে।

মা হয়ত আরও বলতে চেয়েছিল, তুমি ওর সঙ্গে যাবে না সোনা। তুমি ওর সঙ্গে কোথাও একা যাবে না।

মা সোনাকে বলেছিল, ঘরটায় ঢুকে মা বসে থাকবে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে ঈশ্বর ভাইটাকে মার কাছে দিয়ে যাবে। ওর বড় জানার ইচ্ছা তখন, সে কি করে এসেছে মার কাছে?

মা বলত, ওকে কারা রাস্তায় ফেলে গিয়েছিল, মা তাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছে।

সোনা তখন হাউ-হাউ করে কাঁদত। কোন কোন দিন সে তার জামা-প্যান্ট নিয়ে চলে যেত গোপাটে। সে অন্ধকারে একা-একা সেখানে বসে থাকত। মা তাকে খুঁজে নিয়ে আসত। কোলে তুলে বলত সোনাকেও তার ভগবান কোল আলো করে রেখে গেছে।

এখন সোনার জানার বড় ইচ্ছা, মা এই যে আজ। ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকে গেল, কাঠের শুকনো সব গুঁড়ি, গুঁড়িতে আগুন জ্বালানো হবে, ধূপ ফেলে মা আগুন জেলে আরাধনা করবে, সেই এক ছোট্ট ঘরে থেকে মা তাকে নিয়ে তেমনি বের হয়েছিল কিনা!

কিন্তু কেন জানি, কি এক রহস্য এই জন্মের ভিতর, সে বুঝতে পারে না ছুঁতে পারে না রহস্যটাকে। ধানপাতাগুলি নড়ছে। টুপটাপ বৃষ্টি। সে ছাতা মাথায় অল্প জলে দাঁড়িয়ে আছে। জল আর জল, পুকুর খাল বিল ভরে জমিতে জল উঠে আসছে। ধানের গোড়া জলে ডুবে গেছে, পাতাগুলো বাতাসে নড়ছে। সে বুঝতে পারে না, ছুঁতে পারে না রহস্যটাকে। জোয়ারের জলে তার পা ডুবে যাচ্ছে। চার পাশের জমি, ধানখেত, পাটখেত জোয়ারের জলে ভেসে যাচ্ছে। মার নীলবর্ণের মুখ দেখে সেও কেমন ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে।

আর তখনই সে দেখল একটু দূরে ধানগাছগুলো তিড়িং তিড়িং করে সরল রেখায় ছুটে যাচ্ছে। আবার দূর থেকে তিড়িং তিড়িং করে ধানগাছগুলো বৃত্ত সৃষ্টি করে ক্রমাগত এক জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে। খেলাটা বড় মজার। গাছগুলো প্রাণ পেয়ে যাচ্ছে। কখনও সরল রেখায়, কখনও ছোট্ট ত্রিভুজের মতো অথবা কোণ সৃষ্টি করে গাছগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে। গাছের পাতা বৃষ্টির ফোঁটায় নড়ছে না। জলের নিচে মাছ ছুটে আসছে, খেতের ভিতর ঘুরছে—একটা দুটো নয়, অনেক কটা মাছ। জোয়ারের জলে তার পায়ের পাতা ডুবে গেছে কখন। হাঁটুর নিচে জল উঠে এসেছে। গাছের গোড়ায় জোয়ারের জলে খেলা করছে বলে ধানগাছগুলো এখন তিড়িং তিড়িং করে ছুটে বেড়াচ্ছে। সে এবার সন্তর্পণে ডাহুকের মতো পা বাড়াল। কারণ জলে বেশি শব্দ করতে নেই। বৃষ্টির শব্দ, ব্যাঙের শব্দ, ঝিঁ-ঝিঁ পোকার শব্দকে ডিঙিয়ে জলে তার পায়ের শব্দ কিছুতেই বেশি হবে না। মাটি জল শুষে নিচ্ছে বলে ফুর্-ফুরর্ এক শব্দ এবং জলের উপর অজস্র ফুটকরি। জলের উপর অজস্র ফুটকরি ভেসে উঠে ভেঙে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে। এত সব শব্দের ভিতরও সোনা সন্তর্পণে পা সুচলো করে একটা ডাহুকের মতো শিকারের আশায় পা বাড়াতে থাকল।

সে মাছগুলোর পিছনে হেঁটে-হেঁটে অনেক দূর চলে এসেছে। আর দুটো জমি পার হলেই ফতিমাদের পুকুর, মোত্রাঘাসের জঙ্গল। মোত্রাঘাসের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে জমির জলটা ওদের পুকুরে পড়ছে। মোত্রাঘাসের ভিতর ঢুকে ফতিমা নিশ্চয়ই মাগুর মাছ ধরার জন্য বঁড়শি ফেলেছে।

সামনের জমি উঁচু, জল কম। মাছগুলো এখনও গাছের গোড়ায় নড়ছে। কম জলে উজানে উঠে যাচ্ছে মাছ। সে মোত্রাঘাস অতিক্রম করে যেখানে ফতিমার মাছ

ধরার কথা সেখানে গিয়ে বসে থাকবে কিনা ভাবল। কারণ সে বুঝতে পারছে না, এই যে চারপাশে সব ধানগাছ দ্রুত ছুটে বেড়াচ্ছে তার নিচে কি সব মাছ আছে। মাছ হতে পারে আবার সাপও হতে পারে। জলের নিচে মাছ না সাপ সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

তখন একটা শোল মাছ কিছুতেই ধানখেতের আল পার হতে পারছিল না। আলে এসে মাছটা আটকা পড়েছে। এবং বাধা পেয়ে মাছটা জলে লাফ দিতেই দেখল সোনা এক ছাতা মাথায় পলো হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠময় জোয়ারের জল। সবাই জোয়ারের জলে মাছ ধরার জন্য কোচ পলো নিয়ে হাঁটছে। সোনা জলে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে। মাছটা ভয়ে-ভয়ে লেজ নেড়ে সহসা মোথাঘাসের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সোনা মাছটা এত সামনে পেয়েও ছুটে গেল না। সে জানত মাছটার সঙ্গে সে ছুটে পারবে না। ধীরে-ধীরে খুব সন্তর্পণে আবার ডাহুকের মতো সে ধানখেতে হাঁটতে থাকল। যদি কোথাও বোয়ালের উপর চোখ পড়ে। অথবা সোনার ইচ্ছা এখন, বৃষ্টি আরও ঘন হোক, এবং পাটখেতে ঘন অন্ধকার নামুক। আকাশ ছেয়ে মেঘ তাড়কা রাক্ষসীর মতো ছুটে বেড়াচ্ছে এবং ভয়ংকর বজ্রপাতের শব্দ, পৃথিবী যেন ভেসে যাবে, মাছেরা কি নিরাপদে জলের ভিতর খেলে বেড়াচ্ছে তখন! সোনাও খুব নিরাপদে ফতিমার পাশে চুপি-চুপি দুজনে ছাতা মাথায় মাছ ধরার নামে পাশাপাশি বসে থাকবে। এক সঙ্গে বসে জল নামার শব্দ শুনবে। কোথাও তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ চমকালে সে আর ফতিমা পরস্পরে ভয়ে জড়িয়ে ধরবে। তারপর ছোট একটা কথা বলে ফতিমার মুখ দেখবে। মুখের রেখায় কি রং ফুটে ওঠে দেখবে।

যদি রঙটা জানপার আমগাছের সিদুঁরে আমের মতো হয়, যদি পাতার মতো রঙ ধরে, যদি ফতিমা রাগ করে অথবা ওদের চাকরটাকে বলে দেয়...ছিঃ-ছিঃ সোনা কি সব জোয়ারের জলে দাঁড়িয়ে ভাবছে! মার মুখটা মনে পড়ল নীলবর্ণ মুখ। ঘরের কোণে শুকনো কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে। আগুনের চার পাশে মা, জ্যাঠিমা সকলে গোল হয়ে বসে আছে। ওরা প্রার্থনা করছে হাত তুলে। রাত হলেই ঈশ্বর নেমে আসবেন পৃথিবীতে। আগুনের পাশে এক শিশুকে শুইয়ে দেবে। সে যে কি নাম রাখবে ভাইটার! ভাই না বোন। বোন হলে ভাল হয়। আকাশে কি প্রচণ্ড মেঘের গর্জন। যেন সব দেবদূতেরা মিলে পৃথিবী থেকে সব দুঃখ তাড়িয়ে দিচ্ছে। তাড়কা রাক্ষসীকে তাড়িয়ে ওরা আকাশের অন্য প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। অথবা সে যেন দেখতে পেল চারপাশে আগুন, মা মাঝখানে, জ্যাঠিমা, নাপিত জ্যাঠি, আবুর মা আগুনের চারপাশে নৃত্য করছে। ভয়ে মা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শালুক পাতার মতো রক্ত মুখে। মা যদি সোনার মনের ভাবটা এখন জানতে পারত! মা, সোনার মা, জগতে একটি মাত্র মা, সোনার মা। সে মা-মা বলে ডেকে উঠল।

বিচিত্র সব চিন্তা সোনা আজকাল করতে শিখেছে। সেই অমলা ওকে কি যে শেখাল! তারপর থেকেই সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় মাঝে-মাঝে। কি সব আজেবাজে দৃশ্য চোখের উপর ভাসতে থাকে। আঁধার রাত, গ্রামের সব কুকুর-কুকুরী এবং মেনি গাইর বাচ্চা হবার আগের ঘটনা। বাচ্চা হবার আগে, কোন গ্রীষ্মের দিনে গরুটা সারা মাঠে ছুটে বেড়াত। কেউ কাছে যেতে সাহস পেত না। কাছে গেলেই লাফাত। তারপর ঈশমদা ওটাকে কত কায়দায় ধরে আনত। ঈশমদা আর ও-পাড়ার হরিপদ গরুটাকে নিয়ে সকালে-সকালে কোথায় চলে যেত। গরুটা তখন হাম্বা করে ডাকত কেবল। হরিপদর কাঁধে দুটো বাঁশ, ঈশমদা গরুটার দড়ি ধরে রাখত। আর ফিরত রাত করে। এসেই ছোট কাকাকে কৌশলে কি বলত। সোনা কিছু বুঝতে পারত না। এই মেনি তখন গোয়ালে ঘন্টার পর ঘন্টা লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুমা বার-বার সাবধান করে দিতেন ঈশমকে, ঈশম মেনির খাওয়াম দেইস না, দিলে ডাক থাকব না।

ঠাকুমার কথা শুনে মনে হত গরুটা সারা দিন সারা মাঠ ছুটিয়ে মেরেছে সকলকে। তার শাস্তি দিচ্ছে ঠাকুমা। সোনা তখনই দেখল অনেকগুলো ধানগাছ নড়ে উঠছে। নিশ্চয়ই ধানগাছের গোড়ায় জলের ভিতর অনেকগুলো মাছ এক সঙ্গে খেলা করছে। সোনা এবার পলোটা চেপে বসাল মাটিতে। সে পলোর উপর উঠে দাঁড়াল। উঠতেই একেবারে সর্বনাশ—ওর চোখের তারা বড় হয়ে গেল। গোল-গোল হয়ে গেল। কি বড় সাদা বোয়াল! মাছটা চিৎ হয়ে আছে। ফোটকা মাছের পেটের মতো সাদা বোয়ালের পেট জলের উপর ভাসছে। মাছটার সে সবটা এখন দেখতে পাচ্ছে। মাছটা খুশীতে, এমন জোয়ারের জলে, মেঘলা দিনে লেজ নাড়ছে।

সোনা এর আগে কোনদিন পিরের বোয়াল ধরে নি। ঈশমদা, চন্দদের চাকর, কালপাহাড়, পিরের বোয়াল ধরেছে। এবং এমন সব গল্প সোনা ঈশমদার কাছ থেকে শুনেছে। সোনা পিরের বোয়াল ধরা দূরে থাকুক, সে দেখে নি পর্যন্ত। আজ প্রথম দেখল। দেখে বুঝতে পারল, এটা মেয়ে বোয়াল, ডিমে পেট উঁচু। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ওর কেন জানি সহসা মনে হল মা ঠিক বোয়াল মাছটার মতো অসুস্থ ঘরে শুয়ে আছে। আগুন জ্বলছে চারপাশে। জ্যাঠিমা ঘুরে-ঘুরে নৃত্য করছে। মার নীলবর্ণ মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

সোনার মনে হল জলের ভিতর এত বড় মাছটাও কাতর। ব্যথায় নীলবর্ণ না হলে এত বড় মাছটা এমন কম জলে উঠে আসবে কেন!

আবার সেই ডাহুক, ডাহুকের মতো সে হাঁটছে। কিছু সাদা বক ধানখেতের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। ওরা কম জলে কুচো মাছ ধরে খাচ্ছে। সোনার ইচ্ছা হল সাদা বকেরা যেমনি সন্তর্পণে পা বাড়ায় জলে সে তেমনি হাঁটবে। বকগুলো গপাকাড়িং খাচ্ছে এবং ছোট-ছোট পুঁটি মাছ ধরছে। ডারকিনা মাছ ধরছে। ডারকিনা, পুঁটি শাড়ি পরেছে বর্ষার জলে। লাল চেলি, তসর গরদ, ঠিক যেন পুজো মণ্ডপে মার মতো। তখন কে বলবে এই মা তার একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকে আগুন জ্বেলে বসে থাকবে।

কালপাহাড় হলে এতক্ষণে কোচ ফিকে দিত বোয়ালটার গায়ে। এবং বোয়ালটাকে ডিমসুদ্ধ ধরে নিয়ে যেত। কিন্তু সে তা চাইল না। খেলাটা জমুক। বোয়ালের আরও কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। অন্য বোয়ালগুলো যখন ওর উঁচু পেট কামড়াতে আসবে অথবা গির বাঁধবে সকলে মিলে তখন সুযোগ মতো পলোতে এক চাপ এবং সঙ্গে-সঙ্গে আট-দশটা বোয়াল পলোর নিচে। একসঙ্গে সে এতগুলো বোয়াল নিয়ে যাবে কি করে!

গাভীন বোয়ালটার কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকল সোনা। ভয়, ওকে দেখে মাছটা না আবার গভীর জলে নেমে যায়। কিন্তু একটা খবর সে রাখে, গাভীন বোয়ালের ব্যথা উঠলে বেশি নড়তে পারে না। বোয়ালটার এখন নিশ্চয়ই ব্যথা উঠেছে। ডিম পাড়ার ব্যথা। মাছটার ভয়ংকর কষ্ট। বৃষ্টির ফোঁটা বড় হয়ে পড়ছে না এখন। ছোট-ছোট ফোঁটা। ঝড়ো হাওয়া থেমে গেছে। কড়াৎ-কড়াৎ শুধু বজপাতের শব্দ। গুটিকয় অন্য বোয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়ত মাঠে। প্রসবের এক নির্মজ্জিত গন্ধ এই জলের ভিতর অন্য মাছেদের উত্তেজিত করে তুলছে। এবং ওরা মেয়ে বোয়ালটার কাছে

আসবেই। না এলে পেট ফুটে ডিম বের হবে না। পুরুষ বোয়ালেরা, কি ওরা মেয়ে বোয়ালও হতে পারে—জোরে-জোরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে পেটে, পেট থেকে ডিম বার করে দেবে। মাছটা তাই নড়তে পারছে না। চিত হয়ে পড়ে আছে। সুতরাং সোনা একটা শ্যাওড়া গাছ হয়ে গেল। সে ছাতা-মাথায় চুপচাপ ঠিক একটা ছোট্ট গাছের মতো মাঠের ভিতর মাছটাকে দেখতে থাকল। সে নড়ল না। উলানি পোকা পা কামড়ে ফুলিয়ে দিয়েছে। সে তবু চুলকাল না। চুলকালেই নড়তে হবে, নড়তে হবে। শ্যাওড়া গাছ ইচ্ছামতো নড়তে পারে না। সে অনেকক্ষণ নিজেকে শ্যাওড়া গাছ করে রাখল। অন্যান্য মাছেরা ডিমের গন্ধে উঠে আসুক, না আসা পর্যন্ত সে শ্যাওড়া গাছ হয়েই থাকবে। তখন কিনা একটা ছোট্ট বোয়াল ওর পা ঘেঁষে চলে গেল। কি আশ্চর্য মাছটা ওকে শ্যাওড়া গাছ ভেবে ফেলেছে। মাছটা গা ভাসিয়ে বড় মাছটার পেট কামড়ে ধরল। পেট থেকে ডিম বার হচ্ছে। জলে-জলে ডিম ভেসে স্রোতের মুখে কাগজের নৌকার মতো ভেসে গেল। সোনা সারাক্ষণ শ্যাওড়া গাছ হয়ে কাগজের বিন্দু-বিন্দু নৌকা জলের উপর ভাসতে দেখল।

জীবের এই জলরহস্য সোনাকে কিছুক্ষণ অভিভূত করে রাখল। গাছপালা পাখি নিরন্তর তার চারপাশে ঘুরছে। বড় হচ্ছে আবার বিনষ্ট হচ্ছে। এই সব গাছের নিচে কত মাছ হবে আবার। বিন্দু-বিন্দু কাগজের নৌকা আবার মাছ হয়ে যাবে, বড় হয়ে যাবে, বড় হলেই জোয়ারের জলে উঠে আসবে। খেলা করবে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবে। সোনা এমন মজার খেলা দেখতে-দেখতে ক্রমে কেমন প্রস্তরীভূত হয়ে যাচ্ছে। ওর হুঁস নেই যেন। তখন মনে হচ্ছে গ্রামের ভিতর থেকে তাকে কে ডাকছে—সোনাবাবু আপনের আর মাছ ধরতে হইব না। বাড়ি আসেন।

সোনা দেখল বৃষ্টি মাথায় ঈশমদা গাছতলা থেকে ডাকছে। সে উঠে দাঁড়াল। একটা মাছও নেই সামনে। মাছগুলো এই জলে এসেছিল সন্তানের জন্ম দিতে। ওরা জন্ম দিয়ে চলে গেছে। কেবল কিছু জল আর ধানগাছ, আর বৃষ্টি, ভাঙ্গা রাক্ষুসীর মতো মেঘেদের ভেসে বেড়ানো, এবং এক গম্ভীর অন্ধকার চারপাশে যেন নামছে। সোনা খালি হাতে উঠে যাচ্ছে। সে এত সামনে এমন পিরের বোয়াল পেয়েও ধরতে পারল না। কেমন এক অন্য পৃথিবী ক্রমে তার রহস্য খুলে ধরছে। যত ধরছে তত সে সোনা থাকছে না, অতীশ দীপঙ্কর হয়ে যাচ্ছে। সে ফতিমার খোঁজে তাড়াতাড়ি মোত্রাঘাসের জঙ্গলে ঢুকে গেল। দেখল ফতিমা নেই। তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

বৃষ্টির ফোঁটা এবার বড় হয়ে পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটল। টিলা ধরে বাড়ির সীমানায় উঠে দেখল, কচুর ঝোপে আবার পুতুল নাচ হচ্ছে। রাম রাবণ সুর্পনখা। সে মুখ ভেংচে দিল সুর্পনখাকে। শুধু রাম রাবণ এখন কচুর ঝোপটায় যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। ওর মন ভাল নেই বলে কচুর ঝোপে বৃষ্টির ফোঁটায় রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখতে থাকল।

ঈশম আবার ডাকল, কি করতাছেন কচুর ঝোপে!

সোনা জল ভেঙ্গে উঠোনে উঠে এল। ঈশম দক্ষিণের ঘরে চলে গেছে। সে এখন একা। কেউ নেই চারপাশে। রান্নাঘরের শেকল তোলা। ছোট্ট ঘরটার চার পাশে কত বড়-বড় সব সোনা ব্যাঙ। ওরা মুখ তুলে কেবল ডাকছে। তুমুল আর্তনাদের মতো মনে হচ্ছে, এই বৃষ্টির শব্দ, এবং কীট-পতঙ্গের ডাক। অজস্র বেতপাতা ঘরটার চারপাশে। ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়ার গন্ধ বের হচ্ছে। পিরের বোয়াল গেছে, মোত্রা-ঘাসের জঙ্গলে ফতিমা নেই, মা ছোট ঘরটায় চুপচাপ আগুন জেবলে শুয়ে আছে। ওকে আজ মেজদার সঙ্গে একা থাকতে হবে। একা থাকতে হবে ভয়ে ওর এই বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হল।

তখনই মনে হল ছোট্ট ঘরটায় মা ভীষণ কষ্টে গোঙাচ্ছে। মার মুখ নীলবর্ণ বড় জ্যাঠিমার গলা সে পাচ্ছে। নাপিত বাড়ির জ্যাঠি কথা বলছে। আবুর মা হারান পালের বৌ ঘরের ভিতর কি যেন করছে। মার কষ্টের আওয়াজটা কিছুতেই থামছে না। তার মতো অথবা মেজদার মতো মা আবার একটা ভাই ভগবানের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছে। সে যে এখন এখানে একা দাঁড়িয়ে কি করবে বুঝতে পারছে না। পলোটা ফেলে দিল উঠোনে। এবং মা, তার মা, পুজোমণ্ডপের মা ছোট্ট ঘরটার কি করছে এখন! সে স্থির থাকতে পারছে না। চুপি চুপি সে ছোট ঘরটার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। পিরের বোয়াল ধরার সময় অথবা ফতিমার পাশে বসার মতো উত্তেজনায় ও কাঁপছে। ঠিক প্রার্থনা নয়, ঠিক কষ্ট নয় ঠিক অন্য কিছু হচ্ছে এই সংসারে যা সে এতদিন জানতে পারেনি। সে চার পাশে যখন দেখল কেউ নেই, বেড়ার ফাঁ
গোপনে মুখ গুঁজে দিল।

তারপর, তারপর সোনার এই সংসা
জগৎময় বিস্ময় পাক খেতে থাকল। (
চোখের উপর এসব কি দেখছে! সে আশ্চর
না কি সে [illegible] বোবা হয়ে যাচ্ছে! তার ম
তার একমাত্র মা, জগতে যার নাই তুলন
মরা সাপের মতো অথবা থাড়ি বোয়ালে
মতো পেট উঁচু করে পড়ে আছে। ব
জ্যাঠিমা, নাপিত বাড়ির জ্যাঠি, হার
পালের বৌ সকলে খোলা পেটের উপ
উবু হয়ে আছে। ওর এবার সহসা চিৎক
করে উঠতে ইচ্ছা হল—মা! গলার
ফুলে উঠছে তার। পুজোর সময় বাবুদে
বাড়ি পাঁঠা বলি হয়—ছাল তুলে নেও
বলির পাঁঠার মতো মাকে দেখতে
বীভৎস। ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল
এ যেন তার মা নয়, সে তার এ-মাকে চে
না। কারণ তখন পৃথিবীতে আর এ
ঈশ্বর নামছিলেন। নাপিত বাড়ির জ্যা
তিনবার উলু দিতে বলছে। সবাই এক
জীবের পাশে দাঁড়িয়ে উলু দিচ্ছে। সো
সেই ঈশ্বরকে দেখল। সে ওর জন্ম দেখ
এবং নিজের জন্মের কথা ভেবে সে কো
বেদনায় মূক হয়ে গেল। জল ভেঙ্গে
দক্ষিণের ঘরে উঠে গেল চুপচাপ। তেম
বৃষ্টি পড়ছে বড় বড় ফোঁটায়। ঈশ
বৃষ্টির শব্দ শুনছে দরজায় বসে। পাশ
জ্যাঠামশাই ইজিচেয়ারে বসে আছেন। ঝ
হাওয়া, বৃষ্টি এসব দেখে তিনি কে
উদ্বিগ্ন। সোনা জলে ভিজে শী
কাঁপছে। শশিভূষণ ওর গামছা দি
শরীরের জল মুছে দিল। বলল—
একটা বোন হয়েছে সোনা।

সোনা কথা বলতে পারছিল না। শী
থর থর করে কাঁপছিল। শশিভূষণ চ
দিয়ে ওর শীত নিবারণের চেষ্টা কর
সোনা তক্তপোষের উপর বসে স্থবি
মতো চোখ মেলে তাকাল বাইরে। ভয়
কঠিন কিছু দেখে সে স্থবির হয়ে যা
জ্যাঠামশাই পর্যন্ত ওর এমন মুখ দে
ভয় পেয়ে গেলেন।

সোনা একা জানালার পাশে চাদর গ
বসে থাকল। ক্রমান্বয় বৃষ্টি হচ্ছে। ক্রমা
কচুর পাতায় পুতুল নাচ হচ্ছে। সব
যাচ্ছে একভাবে। বৃষ্টি, বজ্রপাত, পু
নাচ এবং জীবের জন্ম, সব একভাবে
যাচ্ছে। গাছের গুঁড়িতে কাগজের বি
বিন্দু নৌকা মাছ হয়ে গেল। পু
মণ্ডপের মা আর মা থাকল না। যে
একটা মরা সাপ হয়ে গেল। সে আর
মাকে কাছে নিয়ে শুতে পারবে না। যে
এক দুরারোগ্য ব্যাধি মানুষের শর
মাকে ছুঁতে গেলেই তার এমন মনে হ
সে এবার ভীষণ কষ্টে দু হাঁটুর বি
মাথা গুঁজে দিল। মার নীলবর্ণের মু
কিছুতেই আর মনে করতে পারল
কেবল সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁ
থাকল।

(ক্রম

**নট ট্রান্সফারেবল**

স্টেশনের গায়েই কার্তিকচরণ সাহার দোকান—শ্রীদুর্গা স্টোর্স। এনামেলের হাঁড়ি-কড়াই, বাসন-কোসন, বালতি-টালতি সবই পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় রেলের মান্থলি। জবর ব্যবসা। দুটোই সমানে চালাচ্ছেন সাহামশাই একযুগের ওপর। হিসেবে কোন ভুলচুক নেই। সাইড বাই সাইড একই টিনের চালের তলায় দুটো ব্যবসা চললেও হিসেবের খাতা আলাদা—হিসেবকারীও আলাদা। এনামেলের বিক্রী-বাটা, হিসেব-টিসেব সব দেখে মেজভাই গণেশ। ওতে ঝামেলা কম। ঝামেলার ব্যাপারটা দেখাশোনা করেন নিজেই। এতো আর শুধু বড়বাজার থেকে সস্তায় মাল কিনে এনে পেঁড়াদামে বেচা নয়, এর সঙ্গে যে অনেক মামুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—তাদের পাওনা ঠিক-ঠাক সময়মত মেটাতে না পারলে যে হাতে দড়ি পড়বে। জেনেশুনে তো আর বয়সে ছোট, অনভিজ্ঞ গণেশের ঘাড়ে এ বোঝা চাপাতে পারেন না। এতে অনেক ফ্যাচাং, পান থেকে চুন খসলে, ঘটি-বাটি বেচেও তখন আর নিস্তার মিলবে না। আগে এতো ঝামেলা ছিল না, এখন লাইনে অনেক গ্যাঁড়াকল। সুযোগ বুঝে সব শালা দাঁও মারছে।

তা মারছে মারুক। ভগমানের আশীর্বাদে তবু যা আসছে তাই যথেষ্ট। কিন্তু ঘরের লোক যদি অবুঝ হয় তাহলে আর কার্তিকচরণ কি করবেন। ইচ্ছে করে সব শালাকে ঘাড় ধরে বিদায় করে দেন, কিন্তু উপায় নেই। উপায় নেই বলে কি রতন যা ইচ্ছে তাই করবে? চীৎকারে ফেটে পড়লেন কার্তিকচরণ—রতন, শালা হারামীর বাচ্চা কোন চুলোয় গেছে? দোকানের দোরগোড়ায় টুলের ওপর বসে গণেশ ঢুলছিল। লাস্ট ট্রেন পৌঁছোতে আর বাকী নেই বেশী, মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে পড়বে। এত রাতে বেচাকেনার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে দোকান খোলা না রেখেও উপায় নেই। লাস্ট ট্রেনেই বেশী মান্থলি জমা পড়ে। তাছাড়া কাল সকালের হিসেবটা এখনই রেডি না রাখলে সকালে আর থৈ মিলবে না। কার্তিকচরণ সন্ধ্যে থেকে সেই হিসেবই করছিলেন। কার পাওনা কত? কে কত জমা দিয়েছে? কমিশন বাদ দিয়ে দোকানের থাকল কত? কাল কোন কোন পার্টি বায়না করে গেছে? তার ওপর পরশু মাসপয়লা। সরকারী অফিস সব ছুটি—মায়না হবে পরের দিন। কিন্তু শ্রীদুর্গা স্টোর্সের তো আর পেমেন্ট ফেলে রাখার উপায় নেই। রাখলেই মামুরা বেজার হবেন। বড়মামুর পাওনা দেড়শো—উনি কোতোয়ালীর বড় কর্তা। ছোটমামু, স্টেশন মাস্টার, তাকে দিতে হয় একশো। সব মিলেছে শুধু মেলে নি চব্বিশটা মান্থলির পাত্তা। গণেশ জানে সব, ভয়ে বলতে পারে নি।

তখনই পই পই করে রতনকে বারণ করেছিল—দ্যাখ দাদা টের পেলে কিন্তু আর আস্ত রাখবে না। তোর দরকার থাকে, আমি টাকা দিচ্ছি সাধুখাঁর দোকান থেকে ভাড়া নিয়ে নে। দোকানের হিসেবে হাত দেওয়া দাদা পছন্দ করে না। আর অন্য দোকানেও যখন ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে—।

মেজদা গণেশের উপদেশ গায়েই মাখে নি রতন। বিশ বছরের ডাগড়া জোয়ান, বীণাপাণি স্পোর্টস ক্লাবের পার্মানেন্ট স্টপার রতন। ক্যাশবাক্সের ঢাকনা খুলে মান্থলি টিকিটের তাড়া থেকে গুণে গুণে চব্বিশখানা টিকিট তুলে নিয়ে, মেজদাকে বলেছে—দাদা তো আসবে সেই সন্ধ্যের পর। আমাদের খেলা শেষ হয়ে যাবে সাড়ে চারটের ভেতর। এখান থেকে তো মোটে চারটে স্টেশন। দেখিস ঠিক সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত দুপুর হতে চলল এখনো ছেলের পাত্তা নেই। একটু বাদেই লাস্ট ট্রেন আসবে। ছেলেটা একেবারে গোল্লায় গোবিন্দ। কারো কথা শুনবে না। মা লাই দিয়ে দিয়ে একেবারে বাঁদর করেছে। কিছু বললেই বলে কোলের ছেলে, ও যদি দুষ্টুমি না করে তো কি তোরা করবি?

কার্তিকচরণ পঞ্চাশ ছুঁয়েছেন। গণেশের চুলেও পাক ধরেছে। তারপর পাঁচটি বোন। সবশেষে রতন। কিছু বললেই মার মুখ হাঁড়ি হয়ে ওঠে। ওদিকে ছেলে যে পাড়ার ক্লাবের কাপ্তান হতে গিয়ে ব্যবসা লাটে তুলছে সে কথা তো আর মা জানে না। প্রায়ই এখানে ওখানে দল নিয়ে যাচ্ছে ফুটবল খেলতে। আর সব দায় এই দোকানের। এসব কথা দাদাও জানেন না। জানেন না মানে গণেশ বলেনি তাকে। এমনিতেই রাগী মানুষ। খেপলে আর দিশে থাকে না। তাই যতটা সম্ভব আড়াল করেই রেখেছে গণেশ এতদিন। কিন্তু আজ আর ঢাকা যাবে না।

সন্দেহ কার্তিকচরণেরও যে হয়নি, তা নয়। ভোর চারটের এসে দোকানে বসেন, দুপুর বারোটা দশের ট্রেন ছাড়ার পর বাড়ী যান দুটি খেতে। এর মধ্যে গণেশ বাড়ীর বাজার-টাজার শেষ করে দোকানে চলে আসে। ওকেই সব হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ী ফেরেন কার্তিকচরণ। খেয়ে দেয়ে, ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে সন্ধ্যের মুখে মুখেই দোকানে চলে আসেন। তখুনি খদ্দেরদের ভিড়টা উথলে ওঠে। একা গণেশ সামলে উঠতে পারে না। কিন্তু রোজই দেখেন বিশ বাইশটা মান্থলি পড়ে থাকছে। ভাড়া হয় না। মান্থলি যাদের তারা তো আর সে কথা শুনবে না। কমিশন ঠিকই তারা আদায় করে নেবে। মাঝখান থেকে লোকসান হচ্ছে দোকানের। ব্যাপারটা কি ঠিক ধরতে পারছিলেন না। গণেশকে জিজ্ঞাসা করলে হুঁ হাঁ করে কি যে জবাব দেয়, বোঝা দায়। তাই আজ বাড়ী থেকে আসার সময়ই ঠিক করে এসেছিলেন-এর একটা বিহিত করবেন। একটু আগে বাসার চাকর ধনা এসে খবর দিয়ে গেছে—ছোটবাবু এখনো ফেরেন নি। বাবু গেছেন ফুটবল খেলতে। সেই সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের কাছে মান বজায় রাখতে চব্বিশখানা টিকিটও নিয়ে গেছেন। আজ আসুন—ওর একদিন কি আমার একদিন। ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিলেন কার্তিকচরণ, এবার সুলুক মিলতেই ফেটে পড়লেন বোমার মত—কোথায় গেছে রে সে?

ধড়মড় করে লাফিয়ে ওঠে গণেশ। উল্টো হাতে চোখ রগড়াতে, রগড়াতে গণেশ জবাব দেয়—এত করে বারণ করলুম, দাদা তবু শুনলো না।

শুনেলো না, খেঁকিয়ে ওঠেন কার্তিকচরণ—আর ইদিকে আয়। দেখে যা সব। এভাবে যদি রোজ রোজ চোট যায়, তবে দোকান যে লাটে উঠবে। দু মাস ধরে দেখছি দোকানের আয় গেছে কমে। ওদিকে কারো হুঁশ নেই। বলি বল্ল কি এক পয়সাও কমেছে না কমবে?

গণেশ জানে সবই, শুধু দাদার ডাক না শুনে উপায় নেই। হাঁড়ি, কড়াই, বালতির স্তূপ ডিঙিয়ে দোকানের কোণে সামান্য উঁচু গদীটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লম্বা পোড়া-ইট কাপড়ে বাঁধাই খেরো খাতাখানা খুলে দাদা হিসাব দেখাতে শুরু করলেন—।

দেড়শোখানা টিকিট মোটে। এর মধ্যে মাত্র দশখানা নিজস্ব। এক একখানা মান্থলির দাম উনিশ টাকা বিরাশী পয়সা। বছর বছর রেল কোম্পানী টিকিটের রেট বাড়াচ্ছে। কৈ আমরা তো আর ভাড়া বাড়াতে পারছি না। গজ গজ করতে করতে কার্তিকচরণ বকে চলেন। সবই জানে গণেশ। জানে শেয়ালদা থেকে আটচল্লিশ মাইল দূরে এই শহর। মোটে, মাঝারী কয়েক হাজার দোকানী ছাড়া শহরের অধিকাংশ বাসিন্দাই কলকাতায় যায় চাকরী করতে। একপিঠের থার্ড ক্লাস ফেয়ার দু টাকা তিন পয়সা। নিত্যযাত্রীর পক্ষে রোজ টিকিট কেটে যাতায়াত সম্ভব নয়। আর নয় বলেই এই চোরাই ব্যবসার পত্তন ঘটাতে পেরেছিলেন দাদা—এক যুগ আগে।

শহরের অনেকেই কলকাতার মেসে বা আত্মীয় বাড়ীতে থাকে সারা সপ্তাহ। শনিবার দুপুরে ছুটির পর টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে ফিরে আসে এই শহরে। রোববারটা কাটিয়ে ফেরে সেই সোমবার ভোরের ট্রেনে। পাঁচটা দিন বেকার টিকিট পড়ে থাকে। শুধু যে অফিসবাবুদের টিকিটই বেকার পড়ে থাকে তাই নয়, মাঝারী ব্যবসায়ী যারা, তাদেরও সপ্তাহে বড় জোর দিন দুয়েক মালটাল কিনতে কলকাতায় যেতে হয়। বাদবাকী দিনগুলো মান্থলি কোন কাজেই লাগে না তাদের। বুদ্ধিটা এ তল্লাটে প্রথম এসেছিল কার্তিকচরণের মাথায়। তিনিই প্রথম খান পাঁচেক টিকিট কেটে এনামেলের পাশাপাশি এ ব্যবসা শুরু করেন।

বড় বড় হরফে মান্থলির গায়ে লেখা আছে নট ট্রান্সফারেবল। লেখা আছে মান্থলিধারীর নাম ও সই এবং বয়স। কিন্তু কে কার কড়ি ধারে। পঞ্চতাল্লিশ বছরের গণেশ সাহার মান্থলি নিয়ে যদি নিতাই সাঁপুই কি অনিল দে কলকাতায় যায় কার সাধ্য যে চ্যালেঞ্জ করবে—এ মান্থলি তার নয়। আস্তে আস্তে একে ওকে তাকে বুঝিয়ে ভাজিয়ে দাদা গণ্ডা গণ্ডা মান্থলি জোগাড় করতে লাগলেন। দশ বছর বাদে আজ শুধু শ্রীদুর্গা স্টোর্সের কাছেই আছে দেড়শোখানা মান্থলি। নিজেদের খান দশেক বাদবাকী একশো চল্লিশটা শহরের নানা ব্যবসায়ী ও চাকরীজীবির। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য মান্থলি ভাড়া দেওয়া হয়। একদিনের রেট এক টাকা কুড়ি পয়সা। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর যতবার খুশী কলকাতায় যাও আর আসো—ভাড়া ঐ একই। এই শহরেই যারা থাকেন বারো মাস, স্কুল কলেজের মাস্টার, ছোটখাট সরকারী অফিসের বাবুরা বা খুব ছোট ছোট ব্যবসায়ী যাদের মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতে হয় বা বিয়ের পার্টি বা অন্য সব পার্টি সবাই জানে কোথায় মান্থলি ভাড়া পাওয়া যায়। এক টাকা কুড়িতে যদি চার টাকা ছ পয়সা বা তার ডবল কি তে-ডবলের দাম উশুল করা যায় তবে কে না এই সুযোগ নেবে? নিচ্ছেও শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে লোক। বিনিময়ে কার্তিকচরণ আদায় করছেন মোটা মুনাফা। নিজের টিকিটে এক টাকা কুড়ি পয়সাই থাকে। অপরের টিকিটে মান্থলিধারী পাবে পঁচাত্তর পয়সা কমিশন, বাকী পঁয়তাল্লিশ পয়সা দোকানের।

কমিশন, পুলিশ আর স্টেশন মাস্টারের পাওনা মিটিয়েও কম করে মাসে হাজার দুয়েক ঘরে আসে। কিন্তু রতনের দোয়াখিতে গত মাস থেকেই আরটা শ দুই টাকা কমে গেছে। গোড়ায় দাদা ধরতে পারছিলেন না। পরে সন্দেহ করেছেন। আর আজ সেই সন্দেহ হাতে নাতে পাকা হয়ে গেছে। সন্ধ্যেবেলায় ঘোড়ায় ফেরার কথা—এখনো ফেরেনি। দাদা আর ওকে আস্ত রাখবেন না। গণেশও নিস্তার পাবে কি? ভয়ে শিটিয়ে চুপ করে গদীর সামনে দাঁড়িয়ে দাদার কথাগুলো শুনতে শুনতে থর থর করে কাঁপতে লাগল গণেশ। যদি কোন মারদাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে থাকে রতন, যদি আজ রাতে ফিরতে না পারে? ফুটবল নিয়ে এসব ঘটনা তো আকছারই হয়ে থাকে। তাহলে কাল ভোরে যাদের মান্থলি তারা যখন কমিশন আর টিকিট নিতে আসবে তখন? ভাবতে ভাবতে অন্য মনস্ক হয়ে পড়েছিল গণেশ। আর ঠিক তখুনি দাদার তর্জন গর্জন সব ছাপিয়ে দিয়ে পুলের ওপর লাস্ট লোকালের আগমনী ঝম ঝম করে বেজে উঠল। হে ভগবান, এই ট্রেনেই যেন রতন ফেরে। দোকানের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সিটি বাজিয়ে দুরন্ত ঝড়ের মত ট্রেন-খানা প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। দরজা থেকে চোখ জোড়া সরিয়ে এনে দাদার মুখে ফেলতেই দেখল, কার্তিকচরণও ক্যাল ক্যাল করে স্টেশনের দিকে তাকিয়ে। খেরোখাতাখানা কোলের ওপর খোলা পড়ে আছে। বোধ হয় একই আশঙ্কায় বড় ভাবনা কঠিন কঠোর দাদার প্রাণেও তুফান তুলেছে।

—ক্রমশঃ।

# ভারতের সিগারেট শিল্পে বৈদেশিক একচেটিয়া

## ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১৪) দেশের স্বার্থের প্রতি সচেতন থেকে সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগের ওপর নজর রাখছেন এবং উন্নয়ন যখন অন্যভাবে সম্ভব হবে না কেবল তখনই তাদের সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হবে।

(১৫) ক্রেতারা যা চান না তা-ই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন, এ বক্তব্য ঠিক নয়। বহু গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে সরকারী একচেটিয়া সিগারেট নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, যেমন জাপান, তাইল্যান্ড, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, বুলগেরিয়া, ইতালি, চেকোশ্লোভাকিয়া ফ্রান্স ও অন্যান্য বহু দেশে বাছাই করার ব্যাপক সুযোগ ক্রেতাদের রয়েছে।

আজকের দিনেও ভারতের ক্রেতারা প্রাপ্তব্য ব্যান্ডগুলোর বাইরের জিনিস চান এবং তার ফলেই বাজারে চোরাপথে আগত ব্র্যান্ড দেখা যায়।

### ঘ। আই টি সি-এর বক্তব্যে আমাদের উত্তর

**দফা নং ১ : আই টি সি বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় করছে।**

বিদেশী শেয়ারহোল্ডার আছে বলেই বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। আমরা, ভারতীয় সিগারেট প্রস্তুতকারকরা, একথা বারবার বলে যাবোই।

এ বিষয়টি বেশ কৌতুককর যে, গত ৩. বছরে গড়ে যে ১০ কোটি টাকার রপ্তানি হয়েছে বলে আই টি সি বিজ্ঞাপন দিয়েছে তার মধ্যে তামাকও রয়েছে, এদিকে গত বছরে সিগারেট রপ্তানি হয়েছে মাত্র ২ লক্ষ টাকার। এর অর্থ ৯৯৮ লক্ষ টাকার রপ্তানি হয়েছে তামাক। তা হলে, সিগারেট প্রস্তুতকারী হিসাবে আই টি সি তামাক রপ্তানি থেকে অর্থ অর্জনের কৃতিত্ব দাবি কি করে করতে পারে এবং ৭৬% বিদেশী শেয়ারমালিকানার জন্য লাভাংশ দিতে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অপচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়ের কিভাবে সামঞ্জস্য ঘটতে পারবে? ব্যাপারটি হচ্ছে যেন এস টি সি বা এম টি সি'এর লৌহ-পিণ্ড রপ্তানির কৃতিত্ব হিন্দুস্তান স্টীলের কিংবা কোটি কোটি টাকার কাঁচা তুলা রপ্তানির কৃতিত্ব দাবি যেমন করতে পারে কোন টেকসটাইল মিল।

লাভাংশ পাঠানো সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, গত ১১ বছরের মত যদি আই টি সি'কে অবাধে বেড়ে যেতে দেওয়া হয় তা হলে তবে এই লাভাংশ পাঠানো বৃদ্ধি পাবেই। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আই টি সি'এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও মুনাফা ৩০০% বেড়ে গেছে। আজ সিগারেট শিল্পের বৈদেশিক ক্ষেত্র ৪ কোটি টাকার লাভাংশ পাঠিয়ে দিচ্ছে। যদি তা অবাধে চালিয়ে যেতে দেওয়া হয় তা হলে লাভাংশ হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় চক্রবৃদ্ধি হারে ১২/১৪% বেড়ে যাবেই।

আই টি সি সম্পর্কে আরও একটি মজার ঘটনা আছে। আই এল টি ডি হচ্ছে একটি ১০০% ব্রিটিশ কোম্পানি; ভারতে তার শাখা আছে। আই টি সি হচ্ছে একটি ভারতীয় কোম্পানি যার অধিকাংশ শেয়ারমালিকানা বিদেশীর। মজার ব্যাপার হলো, এই আই এল টি ডি'কে আই টি সি'এর 'ভ্রাতৃ-কোম্পানি' বলে আখ্যাত করা হয়েছে। এর কারণ বোধ হয় এই যে, আই টি সি'এর পেশাধারী ম্যানেজাররা, যাঁরা লণ্ডনস্থ একটি বিদেশী যৌথ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী তাঁরা, আই এল টি ডি'কেও পরিচালনা করেন। এইসব পেশাধারী ম্যানেজারের কয়েকজন এখন বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সে উন্নীত করা হয়েছে; তাঁরা আবার আই এল টি ডি'এর স্থানীয় পরামর্শদাতা সমিতিতেও আছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য—ডি এল টি'এর সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগের কথা আই টি সি অস্বীকার করছে; বস্তুতঃ এই ডি এল টি হচ্ছে আই টি সি'এর ভ্রাতৃ-প্রতিষ্ঠান—মূল উভয়ের এক।

### আই এল টি ডি—তদন্তের একটি বিষয়

আই এল টি ডি'এর কাজকর্ম সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে আমি অক্ষম, কিংবা আমি বুঝতে অক্ষম কিভাবে এর ওপর কর ধার্য করা হয়। বিক্রয়ের হিসাব যা হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক কম—এর কারণ হয়তো বৈদেশিক একচেটিয়াকে স্থানীয়ভাবে যে সরবরাহ তারা দেয় তা এবং তামাকের রপ্তানি বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া—এই বিক্রয়ের হিসাব কিন্তু কোম্পানীসমূহের রেজিস্ট্রারের অফিসে প্রাপ্তব্য হিসাবের সঙ্গে মেলে না। ইচ্ছাকৃত কোন কারচুপি আছে বলে যে আমি সন্দেহ করি, তা নয়। আমি যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে, যেভাবে এটি উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে আই এল টি ডি'র পুরো কাজকর্ম প্রতিফলিত হয় না। আই এল টি ডি'এর কাজকর্ম বোঝার জন্য সরকার কর্তৃক আরও বিশদ তদন্তের প্রয়োজন।

সরকার যেখানে বিদেশী কোম্পানীগুলোকে ভারতীয়করণে এত আগ্রহী সেখানে, বৈদেশিক একচেটিয়াকে তামাক সরবরাহের এত বড় ব্যবসা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান আই এল টি ডি যে কোনভাবেই হোক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আমি আশা করি, এ ব্যাপারে নজর দেওয়া হবে, তা হলেই দেশ শুধু আয়করের দিক দিয়েই নয়, অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক দিয়েও উপকৃত হবে; কারণ খরচ-খরচাদির সঙ্গে মুনাফা যুক্ত হবে এবং উচ্চ হারে বিক্রয়মূল্য অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা আনবে।

### গুডউইল ট্রেডমার্ক

একথা জানতে পেরে আমি আনন্দিত যে, আই টি সি রয়ালটি কারিগরী কলাকৌশল বা সহযোগিতা ফী হিসাবে কাউকে কিছু দেয় না। এখানেও যদি আপনারা আই টি সি'এর উদ্বর্তপত্রের ওপর চোখ বুলান তবে দেখতে পাবেন যে ৪৯০ লক্ষ টাকার মত একটি অঙ্ক "গুডউইল ট্রেডমার্ক" খাতে মূলধনজাত করা হয়েছে। এর ওপর যে লাভাংশ ঘোষিত হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা ৬% থেকে বেড়ে ১৩% হয়েছে—এর পরিমাণ বছরে ৩০ লক্ষ থেকে ৬৫ লক্ষ টাকা। লাভাংশের নামে এটি কি রয়ালটি পাঠানো নয়?

**দফা নং ২ : আই টি সি একচেটিয়া ছাড়া আর কিছু নয়**

ভারতের সিগারেট শিল্পে একটি বৈদেশিক একচেটিয়া রয়েছে।

সিগারেট শিল্পের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ২৫০ কোটি টাকার মধ্যে আই টি সি'এর বিক্রীর পরিমাণ তাদের উদ্বর্তপত্র অনুযায়ী ১৪৫ কোটি টাকা। এটা কি ৫০%-এর বেশী নয়? একচেটিয়ার ব্যাখ্যা কি হালে পরিবর্তিত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে আই টি সি খাঁটি ও সঠিক একচেটিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

বুলাওয়ে থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ক্রনিকল'-এর ৫ই জুন তারিখের সংখ্যা থেকেও আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এতে 'ভারত' শিরোনামে 'উৎপাদন যত বাড়ছে সিগারেট রপ্তানি তত কমছে' উপ-শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যান্য বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াও "ভারতীয় সিগারেটের বাজার প্রভুত্ব করে একটি বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানি—ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং লিঃ। এই কোম্পানিটি মোটা বাজারের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশের উপর প্রভুত্ব করে।" এ দিয়ে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, সত্য কোথায় নিহিত।

### আই টি সি এবং ডি এল টি পারস্পর সংযুক্ত

বিদেশী শেয়ারহোল্ডার সম্বলিত তিনটি কোম্পানির কোনটিই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয়—একথা সত্য হলে হতেও পারে। কিন্তু এই বক্তব্যে এই তিনটি কোম্পানি ও অন্যান্য বহু সহযোগী কোম্পানিতে

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

# ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

একই শেয়ারহোল্ডারের প্রশ্নটি উপেক্ষা করা হয়েছে। মূল কোম্পানি—লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোং লিং-এর সঙ্গে সাধারণ যোগাযোগের কথাও এতে গ্রাহ্য করা হয় নি। ওয়াজির সুলতানে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর কোন শেয়ারমালিকানা নেই, কিংবা নেই ইণ্ডিয়া টোব্যাকোতে ওয়াজির সুলতানের শেয়ারমালিকানা, কিন্তু তবু বি এ টি-এর মাধ্যমে যে বন্ধন তা বহু যোগসূত্রের মধ্যে একটি—হয়তো সবচাইতে বেশী শক্ত—যা পরস্পরকে সংযুক্ত করেছে।

অত্যন্ত বিতর্কমূলক ও অসমর্থিত কোন বক্তব্যের সমর্থনে বিচারকদের নাম উল্লেখ করা নীতিসম্মত কিনা আমি জানি না।

প্রাজ্ঞ বিচারকদের মতামতের উপর স্থাপিত অবস্থার দিক বিচার করলে, মনোপলিজ কমিশনের কাছে ভি এস টি-এর সম্প্রসারণের দরখাস্ত যাতে না যায় তার জন্য আই টি সি কেন যে তার প্রভাব খাটাচ্ছে তা আমার বোধগম্য নয়। বিচারকদের অভিমত সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আই টি সি যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেছে তাঁদের সকলের ওপরই আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু সঠিক মতামত তাঁরা যাতে দিতে পারেন তার জন্য সমস্ত তথ্য ও প্রাসঙ্গিক মালমশলা তাঁদের দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আই টি সি যা বলেছে তা সেইভাবে ধরে নিলেও শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রকাশ্য শুনানীর পর মনোপলিজ কমিশনে বিচারকগণ কর্তৃক প্রশ্নটি মীমাংসা করা।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, বিক্ষুব্ধ পক্ষ হচ্ছে ভি এস টি, সম্প্রসারণের জন্য তার দরখাস্তই ভি এস টি এবং আই টি সি-এর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তিন মাসেরও বেশী কাল পিছিয়ে পড়েছে। আই টি সি-এর চেয়ারম্যান যা বলেছেন ভি এস টি-এর চেয়ারম্যানও যদি তা-ই বলতেন তা হলে তাও বোঝা যেতো। পারস্পরিক সংযুক্তির এটি কি আর একটি উদাহরণ নয়?

**দফা নং ৩ : আই টি সি আন্তর্জাতিক ব্রান্ড বিক্রী করে**

আই টি সি বলেছেন যে, চোরা পথে আসা ব্র্যাণ্ডগুলো ছাড়া দেশে কোন আন্তর্জাতিক ব্র্যাণ্ড বিক্রী হয় না। আমি জানি বিভিন্ন দেশের সিগারেট শিল্পের বিভিন্ন ব্যক্তি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন, এ নিয়ে আমি কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চাই না। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে, আই টি সি-এর প্রস্তুত বিদেশী মালিকানায় দাবিসম্বলিত ব্র্যাণ্ডগুলো, যেমন উইলস গোল্ড ফ্লেক, গোল্ড লীফ, এমব্যাসি, সিজার্স, ব্রিস্টল প্রভৃতি কোন কোন দেশে আমদানী করা হয় লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল টোব্যাকোর কাছ থেকে বা অন্যান্য দেশে তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে। এমন কি ভারতেও যে প্যাকেটে এগুলো বিক্রী হয় তাতে লেখা থাকে 'এই প্যাকেজের জিনিসগুলো ব্রিস্টল ও লণ্ডনের ডবলিউ ডি অ্যান্ড এইচ ও উইলস-এর উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি।' এতে কি বোঝায়? লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো বা ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কেন এই সিগারেটগুলো ভারত থেকে রপ্তানির চেষ্টা করেন না? দেশ যেখানে সবরকমের রপ্তানি বাড়াবার এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য গভীরভাবে চেষ্টা করছে সেখানে সে বৈদেশিক একচেটিয়াকে তার বাড়তি উৎপাদন চালিয়ে যাবার অনুমতি দিতে পারে যদি এই বাড়তি উৎপাদন রপ্তানির জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। বৈদেশিক একচেটিয়া যদি দেশের বাজারের জন্য উৎপাদন তার সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে এবং বাড়তি উৎপাদন রপ্তানিতে যেতে দেয় তা হলে কেউ তাতে আপত্তি করবে না।

কাঁচা মাল, শ্রমিক ব্যয় ইত্যাদি ব্যাপারে ভারত যেখানে সুবিধাজনক অবস্থায় অবস্থিত এবং আই সি টিস-এর সব রকমের কারিগরী কলাকৌশল অধিকারে রয়েছে সেখানে শেষ পর্যন্ত ভারত থেকে সিগারেট রপ্তানি লাভজনকই হবে। তাতে শুধু দেশই নয় কোম্পানির বিদেশী শেয়ারহোল্ডাররাও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ফলে উপকৃতই হবে। এবং তামাক আমদানী, সিগারেট প্রস্তুত করা এবং তারপর তা রপ্তানি করার বদলে আমার মনে হয় বি এ টি অধিকতর লাভবান হবে যদি ভারত তার তামাক থেকে প্রস্তুত সিগারেট রপ্তানি করে।

একথা জানতে পেরে আমি আনন্দিত যে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো যে ট্রেড মার্ক ব্যবহার করে আইন ও চিরাচরিত ব্যবহারের ফলে এগুলির মালিক। একথা জানতে পেরে আমি আনন্দিত, কারণ ব্র্যাণ্ডগুলো যেখানে ইচ্ছা রপ্তানি করার ব্যাপারে আই টি সি-র ওপর এখন কোন বিধিনিষেধ আরোপিত নেই।

**দফা নং ৪ : ২০০টি দেশীয় সিগারেট কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে গে**

গত চারটি দশকে ২০০টি দেশীয় সিগারেট কোম্পানি বিলু হয়ে গেছে।

দুটি সিগারেট প্রস্তুতকারী কোম্পানি—ডি ম্যাক্রোপোলো এ ক্রাউন টোব্যাকো কোং ৭০।১০০ বছরেরও বেশীকাল ধরে সিগা প্রস্তুত করে আসছে। এরা হলো অগ্রদূত, আই টি সি-এর আবির্ভা বহু আগেই এরা এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। গত ৫ বছরে ডি ম্যাক্রোপো প্রতি বছর ৬০ থেকে ১১০ লক্ষ সিগারেট উৎপাদন করেছে, আর ক্রা টোব্যাকোর উৎপাদনের পরিমাণ বার্ষিক ৭০ থেকে ১১০ লক্ষ সিগারে কাজেই প্রতি বছর ৬০০০ লক্ষ (অর্থাৎ প্রতি মাসে ৫০০ ল সিগারেট হচ্ছে ক্ষুদ্রতম গ্রহণযোগ্য আর্থনীতিক ইউনিট বলে হাকসারের যে ধারণা, তা সঠিক নয়। আজ যদি তারা ৭০ লক্ষ উৎপ করে থাকে, তবে ৭০ বছর আগে তারা নিশ্চয়ই ৭০ লক্ষের অন্তত বি কম উৎপাদন করেছে। আই টি সি-এর এটি আর একটি অতিকাহিন

তিনি বলেছেন যে, আই টি সি ৬০ বছরের মধ্যে কোন এব দেশীয় সংস্থাকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়নি বা যুক্ত হয়নি বা কি নেয়নি। এটা সর্বসাধারণের জানা ব্যাপারে যে, কলকাতার ইউনি টোব্যাকো এবং হায়দরাবাদের হিন্দু টোব্যাকো চালু প্রতিষ্ঠান হিস আই, টি সি কিনে নিয়েছে। আমি আরও জানতে পেরেছি যে, ব আমেরিকান কোম্পানি এ জে গ্রীন কিনে নিয়েছে আই টি সি। আই সি-এর বর্তমান বম্বে ফ্যাক্টরি এখন চলছে সেই জায়গায় যেখানে এ গ্রীন ছিল। বহু সংখ্যক যে সব কোম্পানি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এ আরও যে বহুসংখ্যক কোম্পানিকে একচেটিয়ার ক্ষেত্রে প্রবেশ কর দেওয়া হচ্ছে না, এগুলি তাদের ওপরে।

আই টি সি বলেছে যে, যে অল্প কয়েকটি সংস্থা এই শি প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিল, তারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের অপ্র বিনিয়োজ্য সংগতি বা অপ্রতুল পরিচালন ব্যবস্থা বা ক্রেতাদের দ মিটাতে অক্ষমতা হেতু। ভারতীয় সিগারেট শিল্পের উদ্যোক্তার প বিনিয়োজ্য সংগতি বা পরিচালনব্যবস্থার ব্যাপারে বৈদেশিক একচেটি সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কষ্টকর এবং এটিই হলো তাদের উন্নতি ব্যা হওয়ার প্রধান কারণ। এই জন্যই আমরা বলি যে, একচেটিয়ার উৎপ যদি ঠেকানো না যায় তবে অন্যান্যরা বেড়ে উঠতে পারবে না, কারণ ও বৈদেশিক একচেটিয়ার সংগে প্রতিযোগিতা করার উপযুক্ত নয়।

সাতটি দেশীয় কোম্পানি যে চালু আছে এবং তাদের কাজক সন্তুষ্ট হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে—আমার কাছে এটি এ সংবাদ বটে। আমি যতদূর জানি, এদের মধ্যে ন্যাশনাল টোব্যাকোই হ বৃহত্তম। এদের উদ্বর্ত পত্রেই দেখা যায়, এদের কাজকর্মের কি দৈ দশা। অন্যান্য কোম্পানির উদ্বর্তপত্র এখন আমার হাতের কাছে থাকলেও এটি জানা ঘটনা যে, তাদের বিকাশ ঘটছে না। এই সব ক কোম্পানীর উৎপাদন একত্র করলে মোট উৎপাদনের ১ শতাংশও হয়

একটি মালিকী প্রতিষ্ঠান বিকাশলাভ করছে বলে যে উল্লেখ হয়েছে এবং তার বিক্রয়ের পরিমাণ ৫৪ লক্ষ টাকা থেকে ৯০ লক্ষ টা মধ্যে বলে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা কেবল তাদেরই বিভ্রান্ত ক পারে, যারা এই শিল্পের সঙ্গে পরিচিত নয়। বৈদেশিক একচেটি নির্মম প্রতিযোগিতার জন্য সেই কোম্পানিটি অলাভজনক দ সিগারেট তৈরী ও বিক্রী করছে।

একটি কোম্পানির ২০ লক্ষ টাকা মূলধন ও ১-১৮ কোটি টা আয় আছে বলে মিঃ হাকসার যে কথা বলেছেন, তা ঠিক হতে পা কিন্তু আমি এমন কোন নতুন সিগারেট কোম্পানির কথা জানি না, নিজস্ব ব্র্যান্ডে এত মোটা টাকা আয় হয়। হয়ত কোম্পানিটি কোম্পানির জন্য কোন কোন ব্রান্ড তৈরী করে দেয়।

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

# ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

আমি এ বিষয়ে আনন্দিত যে, তিনি ভারতের বৃহত্তম সিগারেট ফ্যাক্টরির কথা উল্লেখ করেছেন। এবং বলেছেন, ১৯৬৭ সালে ৩/৪ মাস লক-আউটের ফলে তাদের অবস্থা ভাল নয়। একথা ঠিক যে, ক্রেতারা ৩/৪ মাসের মত সময় অপেক্ষা করে না; ফলে এই কোম্পানীটির বাজারের অংশ অন্যান্য সিগারেট প্রস্তুতকারকের হাতে চলে গেছে। আমি খুবই সুখী হব যদি আমার বাড়তি উৎপাদন রোধের প্রস্তাব এই হতভাগ্য কোম্পানিটিকে তার আকস্মিকভাবে হারানো বাজার যা হারিয়েছিল, তা ফিরে পেতে সাহায্য করে। তাদের যা ছিল তা যদি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে তা-ই হবে ন্যায়সঙ্গত ও শোভন।

একথা আই টি সি-এর পক্ষে বেশ মনোমত যে, সে কোম্পানিটির প্রধান ব্র্যান্ড হচ্ছে ইস্ট ক্লাব, সে গোল্ডেন টোব্যাকোর ভাজ ছাপ-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়নি। সম্প্রতি বৈদেশিক একচেটিয়ার প্রতিনিধিরা ম্যানেজারি, মালপত্র বিক্রয় ও বিপণনের সুযোগ-সুবিধা দানের যে প্রস্তাব কোম্পানিটিকে দিয়েছে তা পালনের দিকে আমি উৎসুক নয়নে চেয়ে আছি। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তা হলেই এই কোম্পানিটি গোল্ডেন টোব্যাকোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে। ৬০ বছর নির্মম ও অশোভন প্রতিযোগিতার পর—যে প্রতিযোগিতা, এতগুলো প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে—ক্ষুদ্র প্রস্তুতকারকদের সাহায্যদানের ব্যাপারে বৈদেশিক একচেটিয়ার মনোভাবের সাম্প্রতিক পরিবর্তন সাদরে গ্রহণীয়। ইস্ট ক্লাব প্রস্তুতকারী কোম্পানিটি এবং এই রকম আরও ছোট ছোট কোম্পানিকে যদি বৈদেশিক একচেটিয়া সাহায্য করে তবে আমার সমস্যার বেশ সুন্দর সমাধানই হয়ে যাবে। কিন্তু যাই হোক-না কেন, মনোভাবের পরিবর্তন আবার যাতে পরিবর্তিত হয়ে না যায় তার জন্য উৎপাদন ঠেকানো অত্যন্ত আবশ্যক।

আই টি সি মোটা মুনাফা আহরণ করছে বলে মিঃ হাকসার যে বিবৃতি দিয়েছেন সে সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর অঙ্ক পড়ায় তাঁর যে অক্ষমতা তার বিচার কিভাবে করবো আমি জানি না। 'আহরণ' কথাটি ঠিক নয়, কারণ এই মুনাফা উচ্চহারে আয়কর সাপেক্ষ এবং তা জাতীয় অর্থনীতি একটি বাস্তব অবদান। কর বাদ দেবার পর যে মুনাফা থাকে তার ৯০% আবার ব্যবসায়ে খাটানো হয়েছে যাতে ভারতীয় সিগারেট শিল্প বৈদেশিক একচেটিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়।

**দফা নং ৫ : অলস দেশীয় ক্যাপাসিটি রয়েছে**

এই শিল্পে সম্পূর্ণ দেশীয় ক্ষেত্রে প্রচুর অলস ক্যাপাসিটি রয়েছে। এটা কোন গোপন কথা নয়। পার্লামেন্টে শিল্পমন্ত্রীর প্রদত্ত বিবৃতিতে যা কিছু বলা হয়েছে তা ছাড়াও ছয়টি ভারতীয় সিগারেট ফ্যাক্টরির ১৬৭৬৮০ লক্ষ সিগারেটের ক্যাপাসিটি আছে এবং তারা ...০০০০ লক্ষের কম সিগারেট উৎপাদন করছে আর ১১০০০০ লক্ষের ... সিগারেট উৎপাদনের ক্যাপাসিটি অলস রাখতে বাধ্য হচ্ছে। তার ... তুলনীয় বিদেশী একচেটিয়ার ৮০০০০ থেকে ১০০০০০ লক্ষ সিগারেটের বাড়তি উৎপাদন। এটা কি বাঞ্ছনীয় নয় যে, বিদেশী একচেটিয়ার বাড়তি উৎপাদন রোধ করা হোক যাতে ছ'টি ভারতীয় কোম্পানি যথেষ্ট কাজ পেতে পারে?

১৮ই জুলাই তারিখের নীতি বিষয়ক বিবৃতি অনুসারে ২৫% বাড়তি উৎপাদনের শিথিলতা প্রত্যাহৃত হয়েছে বিদেশী বৃহৎ ফার্মের ব্যাপারেই। সিগারেট শিল্পের বিদেশী একচেটিয়াকে বিনা অসন্তুষ্টিতে ... নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘটনার বিকৃতি না ঘটিয়ে এটি মেনে নিতে হবে।

**দফা নং ৬ : বৈদেশিক একচেটিয়া সিগারেটের বাজার নিয়ন্ত্রিত করে**

'বৈদেশিক মূলধন সিগারেট-বাজারের ৮০% নিয়ন্ত্রণ করে'—মিঃ হাকসার একথা অস্বীকার করেন। বস্তুতঃপক্ষে আমি যে বলেছিলাম ... হচ্ছে বড় বিদেশী শেয়ারমালিকানা নিয়ে বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো সিগারেট-বাজারের ৮০% নিয়ন্ত্রণ করছে। পার্লামেন্টে মন্ত্রী মহোদয় প্রদত্ত বিবৃতি অনুসারেই এটি এবং আমি সুনিশ্চিত যে, তিনি ঠিকই বলেছেন। নিজের মতের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য মিঃ হাকসার যে কথা বলছেন তা এলোমেলো এবং নিজের যুক্তির উপযোগী করে অঙ্কের হিসাবও বিকৃত।

সম্প্রসারণের অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক শেয়ার-মালিকানার শতকরা হার হ্রাসের যে অঙ্গীকার বৈদেশিক একচেটিয়া দিয়েছে তা জাতীয় স্বার্থে নয়, কারণ এতে একচেটিয়া যেমন হ্রাস পাবে না তেমনি হ্রাস পাবে না বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়। এখানে আমি বলতে চাই যে, এই বৈদেশিক একচেটিয়াটি ভারতীয়করণ না করেই তার কাজকর্ম ১০০০ গুণ বাড়িয়েছে, কাজেই, সম্প্রসারণ ছাড়াই যাতে তাদের ভারতীয়করণ হয়, না হলে তারা যেখানে আছে সেখানেই থাকুক সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং বাজারে তাদের অংশ ধীরে ধীরে যাতে কমে যায় ও তার ফলে সত্যিকারের ভারতীয়করণ ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা এখন সরকারের উচিত।

**দফা নং ৭ : বৈদেশিক একচেটিয়া দেশীয় ক্ষেত্রের ক্ষতি করে**

কয়েকটি কোম্পানির জন্য অন্যান্য কোম্পানি সমৃদ্ধ হতে পারে না তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে দেশলাই, সাবান ও তেল-শিল্পের ক্ষেত্রে। এই শিল্পে যে মুহূর্তে বৈদেশিক একচেটিয়ার তৎপরতা ব্যাহত করা হলো সেই মুহূর্তেই দেশীয় ইউনিটগুলি দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠলো।

**নাম—'ইণ্ডিয়া'**

আমি একথা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারি যে, ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর চেয়ারম্যান তাঁদের উৎপাদনে আসন্ন ২৫% হ্রাসের জন্য আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন—এই উৎপাদন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাপাসিটি ছাড়িয়ে গেছে এবং তার ফলে শ্রমিক ও পরিচালন বিভাগের কর্মী উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছে, বাজারের ক্ষতি, মুনাফার ক্ষতি, মর্যাদার হানি ইত্যাদি ঘটেছে। কোন সন্দেহ নাই যে, আমি ভারত সরকারের নির্ধারিত নীতির আশ্রয় নিয়েছি এবং এইসব নীতির চৌহদ্দির মধ্যে যা ঘটা উচিত নয় তা দেখিয়ে দেবার কৃতিত্বই কেবল নিচ্ছি।

**আই টি সি আন্তর্জাতিক ব্রান্ড বিক্রী করে**

আই টি সি-এর চেয়ারম্যান আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ইণ্ডিয়া কিংস সিগারেট প্রস্তুতের কথা উল্লেখ করেছেন। ইণ্ডিয়া কিংস সিগারেট যদি আন্তর্জাতিকভাবেই খ্যাত হয়ে থাকে তবে, কেন যে তিনি বলেন আই টি সি আন্তর্জাতিক সিগারেট তৈরী করে না তা আমি জানি না। কারণ, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, অন্যান্য যে-সব ব্র্যাণ্ডের কথা আমি উল্লেখ করেছি, যেমন গোল্ড ফ্লেক, এমব্যাসি, সিজার্স, ব্রিস্টল ইত্যাদি মিঃ হাকসারের উল্লেখিত আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ইণ্ডিয়া কিংস সিগারেটের চাইতে বেশী বিক্রী হয়।

সিগারেটের ক্ষেত্রে 'ইণ্ডিয়া' নাম ব্যবহারের ব্যাপারে এক যৌক্তিকতার প্রশ্ন নিয়ে আমরা আমাদের নিজ নিজ মতামত গড়ে তুলবার অধিকারী। আমি জানি, অতীতে বীর চক্র নামের সিগারেট প্রস্তুত-কারীরা এই নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়, কারণ তা দেশের আইনানুগ ছিল না কিংবা কোন কোন নামের পবিত্রতা হেতু এ ধরনের নামকরণ অন্যায় ছিল। গণরাজী বিড়ির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। যদি আমাদের দেশের আইনে ব্যবসারের উদ্দেশ্যে নেতাদের নাম জাতীয় মনুমেন্ট ও স্মারক চিহ্ন ব্যবহার নিষিদ্ধ হয় তবে দেশের নামই বা কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে?

**ঘ। ইণ্ডিয়া টোব্যাকো ও গোল্ডেন টোব্যাকোর অবদানের মধ্যে তুলনা**

অন্য দুটো কোম্পানি সম্পর্কে খোঁজখবর এখনও আমার নেওয়া হয়নি। তবে আমি জানি আই এল টি ডি ১০০% ব্রিটিশ কোম্পানি এবং নিউ অ্যান্ড ওরিয়েন্ট টোব্যাকো কোং আই টি সি'এর অর্থ সাহায্যপুষ্ট। এ বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে যে, এইসবগুলোর সৃষ্টি দেশের অর্থনীতিতে সত্যিকারের কোন অবদান রাখিয়াছে কিনা, কারণ একই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে একক অখণ্ড ব্যবসায় স্বচ্ছন্দে পাঁচটি কোম্পানির বদলে মাত্র একটি কোম্পানি এই কাজ করতে পারতো।

(শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন)

# ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

১। রপ্তানি-আমদানি-বৈদেশিক মুদ্রা

একথা জানতে পেরে আমি আনন্দিত যে, দেশের সঙ্কটাপন্ন বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা সম্পর্কে আই টি সি অবহিত আছে। আমি ইতঃপূর্বেই দেখিয়েছি আই টি সি তামাক রপ্তানির কৃতিত্ব কত অন্যায়ভাবে নিজের কোলে টেনে নিয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে আই টি সি-এর ক্ষেত্রে যতদূর বলা যায়, বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটছে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৯ ও ১৯৭০ সালের মধ্যে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং ১৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ এই কয়টি বছরে ঘোষিত মোট লাভাংশের ৯০% পাঠিয়ে দিয়েছে।

একথা জেনে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হবে যে, গোল্ডেন টোব্যাকো যদি এক্ষেত্রে না থাকতো তবে বিক্রয়ের এক অংশ বৈদেশিক একচেটিয়াদের হাতে চলে যেতো এবং তার ওপর লাভ বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের কাছে চলে যেতো। শুধু তা-ই নয়, যদি খুব কম প্রতিযোগিতা থাকতো তবে বৈদেশিক একচেটিয়াদের মুনাফা বহুগুণে বেড়ে যেতো, কারণ কেবলমাত্র প্রতিযোগিতাই লোভকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এমনকি আই টি সি/আই এল টি ডি কর্তৃক তামাক রপ্তানিও গত তিন বছরের মধ্যে প্রত্যেক বছরেই কমে গেছে। সিগারেট রপ্তানির ক্ষেত্রেও তা-ই, এখন এর পরিমাণ বছরে মাত্র ২ লক্ষ।

রপ্তানিতে ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি যে সাফল্য লাভ করেছে, নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই তা তার বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্যের ফল। এতে প্রমাণিত হয় যে, এই শেয়ারহোল্ডাররা শুধু শেয়ারহোল্ডারই নন, বরং তাঁরা এই লাইনেরই লোক। এই বিদেশী সহযোগীরা ভারত থেকে রপ্তানি ব্যাপারে সাহায্য করতে আগ্রহী ও ঐকান্তিক। তাঁরা আমাদের দেশের কিছুটা কল্যাণ করছেন। এই সহযোগীদের নাম আমি জানতে চাই, তাহলেই জানা যাবে এই সহযোগীরা কারা এবং কিভাবে তাঁরা শুধু আই টি সি, আই এল টি ডি-ই নয়, অনুরূপ অন্যান্য কোম্পানিও নিয়ন্ত্রিত করছেন।

গোল্ডেন টোব্যাকোর রপ্তানি সম্পর্কে, আমি ইতঃপূর্বেই বিবৃত করেছি যে, আগ্রহী ও ঐকান্তিক বিদেশী মালিকানা কিম্বা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড কিংবা সারা বিশ্বে বিদেশী সহযোগী না থাকা সত্ত্বেও সিগারেট রপ্তানি ব্যাপারে আমরা অনেক ভাল করেছি। আমাদের যথাসাধ্য আমরা এখনও করে যাচ্ছি।

২। ভারতীয় মূলধন—ভারতীয় ইকুইটি শেয়ারহোল্ডার

আই টি সি'র ২১৪৩০ জন শেয়ারহোল্ডার আছেন—একথার প্রচারমূল্য বেশ জোরদার। কিন্তু তাঁদের যে শেয়ার আছে তার মোট শতকরা হার ২৫%-এরও কম। শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা নয়, তাঁদের শেয়ারমালিকানার পরিমাণই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মালিকানার প্রশ্নের আসল বিবেচ্য বিষয়। গোল্ডেন টোব্যাকো সম্পর্কে জ্ঞাতব্য এই যে, এটি হচ্ছে একটি মালিকী কোম্পানি। স্বভাবতঃই তার শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, কিন্তু বড় রকমের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এর ১০০% শেয়ারমালিকানাই ভারতীয়দের হাতে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়, শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা নয়।

ভোটদানের অধিকারবিহীন গরীব ভারতীয় শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে আদায়-করা প্রিমিয়াম এবং ডিবেঞ্চারসহ ৯·১১ কোটি টাকার অঙ্ক কি করে যে কোম্পানির শেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ বলে উল্লেখ করা হলো তা আমি বুঝতে পারি না। ডিবেঞ্চার ব্যবসা বৃদ্ধি/মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ঋণ ছাড়া আর কিছু নয়—এবং শেয়ার প্রিমিয়াম ইকুইটিও নয়।

আমি আরও বলতে চাই যে, ভারতীয় জনসাধারণ এবং এল আই সি ও ইউনিট ট্রাস্টের মত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ সত্ত্বেও বোর্ডে এই বিনিয়োগকারীদের কোন প্রতিনিধি নাই। আমি জানি না কেন এটি করা হলো না। ভারতীয় শেয়ারহোল্ডাররা বিনিয়োগকারী হতে পেরে সুখী এবং যে পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের বিনিয়োগের প্রতিদান পেতে থাকেন সে পর্যন্ত কোম্পানির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন না বা প্রতিনিধিত্বের দাবি জানান না। দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করার সময় এসে গেছে এবং আমি নিশ্চিত যে, অতি শীঘ্র এই ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা—ব্যক্তিই হোক আর আর্থিক প্রতিষ্ঠানই হোক—বোর্ড অব ডিরেক্টর্সে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত স্থান লাভ করবেন।

৩। পরিচালনা

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁরা পেশাধারী ম্যানেজার ছাড়া আর কিছু নন, বিদেশীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য তাঁদের দ্বারাই নিযুক্ত ও নির্দেশিত। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, এটি বোর্ড অব ডিরেক্টর্স নয়, একদল ম্যানেজার মাত্র যাঁরা বিদেশীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ও নিয়োগকর্তাদের কাছে ভালো ফল দেখাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং জাতির স্বার্থ রক্ষিত হোক আর না হোক, নিয়োগকর্তাদের কাছে এটিই প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালনার সব রকম পন্থাই প্রয়োগ করছেন যে, বিদেশী পূর্বসূরীদের চাইতে তাঁরা বেশী দক্ষ বা সামর্থ্যবান। বস্তুতঃপক্ষে পেশাধারী ম্যানেজারদের সঠিক স্থান হচ্ছে ম্যানেজারের স্থান, বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের স্থান এঁদের ওপর হওয়া উচিত যাতে তাঁরা এঁদের সংযত করতে পারেন বা উৎসাহ দিতে পারেন এবং কোম্পানি যাতে কোন অশোভন বা জাতীয়তাবিরোধী কাজ না করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য ও প্রেরণা ও প্রেরণা থাকলেও আর্থিক ঝুঁকি যাঁর রয়েছে সবকিছুর ওপর তাঁর দৃষ্টি থাকা দরকার।

গোল্ডেন টোব্যাকোর পরিচালনা

মিঃ হাকসার বলেছেন, পরিচালনা বিভাগের অধিকাংশ সদস্যই মালিকের আত্মীয়। আমাদের কোম্পানির ব্যাপারে তাঁর যে জ্ঞান আছে তার বেশী তাঁর কাছে আমি আশা করি না। আপনাদের অবগতির জন্য আমি বোর্ড অব ডিরেক্টর্স ছাড়া ম্যানেজারবৃন্দ ও কোম্পানির শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য ব্যক্তিবৃন্দের পরিচয় নীচে দিচ্ছি :

শ্রী এস কে ওঝা ... সেক্রেটারি
শ্রী এস আর শঙ্করপুরী ... ম্যানেজার
শ্রী ব্রিজে সি শাহ ... সেলস ম্যানেজার
শ্রী এস পি শাহ ... অ্যাকাউন্ট্যান্ট
শ্রী পি ডি নাগদা ... বিজনেস ম্যানেজার
শ্রী এম এস রাম ... পাবলিসিটি ম্যানেজার
শ্রী আর এল জয়সোয়াল ... ম্যানেজার
শ্রী এ ডি মারফাতিয়া ... ম্যানেজার
শ্রী বি এইচ বাহালিয়া ... ফ্যাক্টরি ম্যানেজার
শ্রী পি এস ভেঙ্কটাচলম ... চীফ এঞ্জিনিয়ার
শ্রী জি বি সাবন্ত ... অ্যাসিঃ চীফ এঞ্জিনিয়ার
শ্রী জি আর চাবলানি ... অ্যাসিঃ চীফ এঞ্জিনিয়ার
ডাঃ পি ডি কুট্টান ... চীফ কেমিস্ট
শ্রী এস এ সাবন্ত ... পার্সোনাল অফিসার
শ্রী সি এন মাথুরিয়া ... ইন্ডাস্ট্রিয়াল এঞ্জিনিয়ার
শ্রী এ আর কাদাকিয়া ... কোয়ালিটি কন্ট্রোল এঞ্জিনিয়ার
শ্রী এল ভি ধাতিয়া ... চীফ এঞ্জিনিয়ার
শ্রী ডি এন মূর্তি ... টোব্যাকো লীফ অ্যাডভাইজার
শ্রী আর ভি এস রাও ... টোব্যাকো লীফ অ্যাডভাইজার
শ্রী টি এস এম গান্ধী চৌধুরী ... ম্যানেজার
শ্রী এম রামস্বামী ... ম্যানেজার
শ্রী. কে কে খেলানি ... ফ্যাক্টরি ম্যানেজার
শ্রী চ নারায়ণ ... ম্যানেজার
শ্রী চ ভি পি গোপাল রাও ... ম্যানেজার

এঁরা কোম্পানির ডিরেক্টরদের আত্মীয় নন। তবে, যদি পরিচালনা বিভাগের কোন বিশেষ শাখার কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে তাঁর থাকে তবে তার এমন সব কারণ নিশ্চয়ই আছে যেগুলোর খুঁটিনাটি বিচার করতে তিনি ইচ্ছুক নন। কারণ এতে তিনি নিজেই বেকায়দায় পড়ে যাবেন। কাজেই এ বিষয়ে বেশী কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

# ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর ভিত্তিহীন অভিযোগ ও কুৎসার উত্তরে গোল্ডেন টোব্যাকো

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

পেয়েছে, এই তথ্য মর্মস্পর্শ করে। এ ব্যাপারে গোল্ডেন টোব্যাকোর অবদান কিছুই নেই, একথা বলার আগে আই টি সি-এর চেয়ারম্যান জি টি সি-এর কাছে খোঁজখবর নিলে বা পরামর্শ করলে ভাল করতেন, যেমন আমি মাঝে মাঝেই করেছি এবং তার স্বীকৃতি পেয়েছি—এই স্বীকৃতি আমার কাছে জানলে জানাতেও পারেন আবার না-ও জানাতে পারেন।

### গবেষণা ও উন্নয়ন

কোন লেবরেটরিতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা দিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের পরিমাপ করা যায় না। কোন নতুন উদ্ভাবনা ঘটেছে তা-ই আমাদের জানা দরকার, তা হলেই আমরা জানতে পারবো এটি সমগ্র শিল্পের ওপর বোঝা হয়ে রয়েছে, না কিছুটা প্রয়োজনীয়।

আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পর্কে বলার এই যে, ক্রেতাদের কাছে আমরা পণ্য উপস্থাপিত করি তার কোয়ালিটি ও মূল্যের ভিত্তিতেই আমাদের বিচার করা হোক, এই দাবি আমরা জানাই। এটিই হলো ফলশ্রুতি যা স্বতঃই প্রকাশিত এবং এনিয়ে কারো গর্ব করার কিছু নেই। অন্যেই বিচার করুক।

একচেটিয়া অধিকার যদি হ্রাস করা হয় তবে অন্যান্য কোম্পানিতেও গবেষণা ও উন্নয়ন দ্রুত ঘটতে থাকবে, কারণ তারা তখন বুঝতে পারবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাদের সামনে রয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ বেশ ব্যয়বহুল। উৎপাদন, সঙ্গতি ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে।

### কর্মসংস্থান — কর্মচারী

জি টি সি-তে আমাদের পক্ষে সব চাইতে সন্তুষ্টির বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রতি আমাদের কর্মীদের অবিচল আনুগত্য ও সহযোগিতা—এ আনুগত্য আর্থিক প্রশ্ন অতিক্রম করিয়া আরও গভীরে প্রবেশ করিয়াছে। এই সমর্পিত মন যদি না থাকতো তবে জি টি সি বিশেষ করে জন্মকাল থেকেই বিরাট বৈদেশিক একচেটিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যে অগ্রগতি লাভ করেছে তা করতে সক্ষম হতো না।

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোং-এর নিয়োগাধীনে ১২০০০জন শ্রমিক আছে। তারা ভালোভাবেই কাজ করছে। কর্মচারিগণকে চাকরির যেসব ভাল ভাল শর্ত দেওয়া হয়েছে তা সুপরিজ্ঞাত। জি টি সি-তে কাজের পারিশ্রমিক ও পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল এবং আই টি সি-এর সঙ্গে তুলনীয়। আই টি সি-তে তথাকথিত পেশাধারী ম্যানেজাররা যা পান তা অত্যন্ত বেশী, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ হয়তো তাঁরা বৈদেশিক একচেটিয়ার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

একথা জেনে সুখানুভব করবেন যে, জি টি সি কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা আই টি সি-এর সঙ্গে তুলনায় উৎপাদনের প্রতি ইউনিটে কিছু কম। এর কারণ কি? এর অর্থ কি এই যে, বৈদেশিক একচেটিয়া এমন অনেক বেশী লোক নিয়োগ করে যারা উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু আর্থনীতিক ও আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখার জন্য তাদের প্রয়োজন? প্রদত্ত মজুরী সম্পর্কে একথা জেনে কৌতুক অনুভব করবেন যে, জি টি সি অত্যন্ত কম মজুরী দেয় বলে যে উক্তি করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। জি টি সি-এর ক্ষেত্রে মাথাপিছু গড় পরিমাণ হচ্ছে ৬১০০ টাকা, আই টি সি-এর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ৬৩৫০ টাকা। এই পরিমাণ কি খুব কম?

### ইউনিয়ন নেই বিক্ষুব্ধ শ্রমিকও নেই

জি টি সি-তে সংঘবদ্ধ দরকষাকষির জন্য নির্বাচিত ওয়ার্কার্স কমিটি রয়েছে এবং তা সক্রিয়ভাবে কাজও করছে। শ্রমিকরা এবং পরিচালনা বিভাগের কর্মীরা একই পরিবারের সদস্যের মত ঐক্যবদ্ধ। আমরা স্বীকার করি, এটি ঈর্ষণীয়।

একথা জেনেও কৌতুক অনুভব করবেন যে, আই টি সি-এর চেয়ারম্যান জানতে পেরেছেন, জি টি সি-এর নিযুক্ত সর্দারদের দ্বারা—যারা "গ্রুপ লীডার" নামে আখ্যাত—কাছ থেকে সমস্ত শ্রমিক সংগৃহীত হয়েছে। শ্রমিকদের সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, এরা স্থানীয় এলাকা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই কচ্ছী নয়। তারা মারাঠী, মুসলিম, খৃষ্টান, পার্শী, শিখ—মহারাষ্ট্রের অধিবাসী সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক।

### ৯। বৈদেশিক মুদ্রা — সহযোগিতা — রয়ালটি

গুডউইল—ট্রেডমার্ক আই টি সি-এর উত্তরপত্রে প্রদর্শিত মত মূলধনে পরিণত করা হয়েছে এবং তার ওপর প্রদত্ত লভ্যাংশ—বছরে ৬৫ লক্ষ টাকা—রয়ালটি দানেরই সমতুল। বিদেশী মালিকানাধীন ব্রান্ড উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত রয়ালটি প্রদান কম ব্যয়বহুল হইবে, কারণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই রকমের ব্র্যাণ্ডের স্থানে ভারতীয় ব্র্যান্ড ধীরে ধীরে বদল করতে পারবে এবং তাতে মূলধনে পরিণত গুডউইলের জন্য স্থায়ী দায়ের বদলে রয়ালটি প্রদান হ্রাস পাবে। একে যদি দেশের পক্ষে সর্বাধিক অনুকূল পন্থায় মূলধন থেকে বের করে আনা যায় তবে বৈদেশিক মুদ্রার অনবরত অপচয় বন্ধ করবার জন্য এখনই তা করা উচিত।

### ১০। কৃষি — অর্থনীতি

দেখেশুনে মনে হয় বৈদেশিক একচেটিয়া যদি ভারতকে শোষণ করার জন্য এখানে আসার সিদ্ধান্ত না করতো তবে ভারতীয়রা বোধহয় তামাক দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতো না। যা কিছু কল্যাণ সাধিত হয়েছে তা সব সময়ই স্বাগত। কিন্তু দেশের অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়, একচেটিয়া কর্তৃক চাষী, ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের শোষণ রোধ করতে হবে।

তামাকের ক্রেতা হিসাবে গোল্ডেনের অবদান এই অর্থে অনন্য যে, এই ভূমিকা একচেটিয়ার অধিকার ও তামাক-চাষীদের শোষণ হ্রাস করতে সাহায্য করেছে এবং এ জিনিসটি উপলব্ধি করতে হলে আপনাদের তামাক-চাষের এলাকায় যেতে হবে।

### ১১। রপ্তানি বাজারের জন্য ব্র্যান্ড

আই টি সি যখন বিশ্ব প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম এমন সিগারেট তৈরী করতে পারে তখন তাদের সিগারেট রপ্তানিতে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাধা কোথায় তা আমি জানি না। সিগারেট রপ্তানি করলে যে অর্থ অর্জিত হবে তা তামাক রপ্তানি থেকে অর্জিত অর্থের অন্ততঃ দ্বিগুণ। শুধু তাই নয়, শ্রমিক এবং অনুষঙ্গী প্রেরণাও পাবে। আমি সেইদিনের দিকে চেয়ে আছি যখন আই টি সি ১০ কোটি টাকার তামাক রপ্তানির ভুয়া দাবি করার বদলে ২৫ কোটি টাকা মূল্যের সিগারেট রপ্তানি করবে।

### ১২। মুনাফা — সামাজিক দায়িত্ব

সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে মিঃ হাকসারের বক্তব্য আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আমি আগেও বলেছি, আই টি সি-এর উৎপাদন যেখানে ৭ শতাংশ বেড়েছে সেখানে মুনাফা বেড়েছে ৭০ শতাংশ। তবে, মনে হয় সংস্থাপিত ক্যাপাসিটিতে উৎপাদন সীমাবদ্ধ করার ভীতির সঙ্গে মুনাফা হ্রাসের ভীতি মিশে গেছে বলেই সামাজিক দায়িত্ব ও মুনাফা অর্জনের তত্ত্বকথা টেনে আনতে তাঁকে বাধ্য করেছে।

জি টি সি যে মুনাফা অর্জন করে তা তিনি যেরূপ অসামাজিক বলে মনে করেন সেরূপ নয়। অল্পসংখ্যক শেয়ারহোল্ডার নিয়ে গঠিত কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সর্বোচ্চ কর প্রদানের পর মাত্র ৩০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে, বাকি ৭০ শতাংশ বৈদেশিক একচেটিয়া হ্রাসের উদ্দেশ্যে আরও সাহায্য দানের জন্য আমাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে নিয়োজিত করা হয়েছে। তার তুলনায় আই টি সি ১০ বছরে লাভাংশ হিসাবে ১৫ কোটি টাকা বিদেশে পাঠিয়েছে। আপনারা এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, দেশের আইনবিরুদ্ধ কিছু জি টি সি করেনি।

আমি ইতঃপূর্বেই আমদানী প্রতিকল্পের যুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সিগারেট মেশিনারি, সিগারেটের কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুত যদি আই টি সি-এর শীর্ষস্থ একচেটিয়ার বিরাট কর্মকাণ্ডের অংশ না হয়ে থাকে, তবে আমি তার সমর্থনই জানাবো।

সবকিছু ব্যাপার আপনাদের কাছে, সংবাদপত্র জনসাধারণ ও সরকারের সমক্ষে উপস্থিত করলাম। এখন আপনারাই বিচার করুন, এই শিল্পের ভারতীয় ক্ষেত্রকে কিভাবে বৈদেশিক ক্ষেত্রের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

বিজ্ঞাপন

# তোমাকে

## নিমাই ভট্টাচার্য

(তিন)

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে গেস্ট হাউসের সামনের লনে ঘুরে-ঘুরে সিগারেটটা শেষ করতেই মিঃ রায় গাড়ী নিয়ে হাজির হলেন।

আমি এগিয়ে আসতে-আসতেই মিঃ রায় গাড়ী পোর্টিকোতে পার্ক করে নেমে এলেন। 'গুড মর্ণিং'।

'গুড মর্ণিং'।

'রাত্রে ঠিকমত ঘুম হয়েছিল তো?'

'প্রথমে একটু অসুবিধে হলেও পরে ঠিকই ঘুমিয়েছিলাম।'

মিঃ রায় একটু উতলা হয়ে উঠলেন, কি অসুবিধে হলো বলুন তো?

আমি হেসে বললাম, একে এত সুন্দর বাংলো, তারপর স্প্রীং-এর খাট আর ফোমের গদী। এত আরামে কি ঘুম আসে?

সকাল বেলায় মিষ্টি রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে মিঃ রায় প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, ইউ আর এ ভেরী গুড হিউমার। ভারী মজা লাগে, আপনার কথা শুনতে।

'এক্ষুনি যাবেন নাকি একটু সময় আছে?'

'কেন বলুন তো?'

'সময় থাকলে এক কাপ কফি খাওয়া যেত।'

'নিশ্চয়ই' বলে মিঃ রায় চৌকিদারকে বললেন, 'ইধার দো পেয়ালা কফি দেনে বোলো।'

চৌকিদার দৌড়ে ভিতরে গিয়ে কফির অর্ডার দিয়ে দু হাতে দুটো গার্ডেন চেয়ার নিয়ে বাইরে এলো। লনের এক ধারে দুটো চেয়ার রেখে আবার ভিতরে গেল, বেরিয়ে এলো একটা টিপাই নিয়ে। আমরা চেয়ারে বসলাম।

হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। কল-কারখানায় সাইরেন বাজে কিন্তু এই ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কেন? একটু অবাক না হয়ে পারলাম না।

'এমন সুন্দর পরিবেশে সাইরেনের আওয়াজ শুনতে বিশ্রী লাগে না?'

'সকালের সাইরেন সত্যি বিশ্রী লাগে কিন্তু বিকেলে ছুটির সাইরেনটা কিলমিজাম সানাইয়ের মত মিষ্টি লাগে।'

না হেসে পারলাম না। হাসি থামলে বললাম, 'অনেকের হয়ত সকালের সানাই-ই মিষ্টি লাগে।'

মিঃ রায় মাথা নেড়ে বললেন, 'ইউ আর পারফেক্টলি রাইট।'

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। আমি একবার চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখলাম।

উনি কফির কাপে চুমুক না দিয়েই বললেন, 'জানেন মিঃ চ্যাটার্জি, ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের চাইতে বড় ট্রাজেডি হতে পারে না। তাছাড়া আমাদের সোসাই-টিতে তো ডিভোর্সের চলন নেই। প্রতিদিনই তিক্ততা বাড়ে, দুঃখ বাড়ে...'

'ঠিক বলেছেন।'

'বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তো দেখছি, বড় দুঃখ লাগে, বড় কষ্ট হয়।' মিঃ রায় একটু চুপ করে আবার বললেন, 'আন-হ্যাপি ম্যারেড লাইফের জন্য কত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে-মেয়ের লাইফ যে নষ্ট হচ্ছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই'।

ওর বক্তব্যের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলাম না। 'আমার মতামত পরে বলব।'

কফির কাপ হাতে তুলে হাসতে-হাসতে বললেন, অল রাইট, অল রাইট। দি হোল ইভনিং ইজ ইয়োর্স।

আমাদের কফি খাওয়া হতে-হতেই এফ-আর-আই-এর নির্জন পথ-ঘাটের ক্ষণিক চাঞ্চল্যের পর্ব শেষ। আর কোন অফিসযাত্রীকে সাইকেল চড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে না। আমরাও উঠে পড়লাম।

মিঃ রায় গাড়ীতে উঠলেন। আমি তখনও উঠি নি। জিজ্ঞাসা করলাম, থাকা দেব নাকি?

গম্ভীর হয়ে উত্তর এলো, আমার স্ত্রী ছাড়া আর কারুর সে অধিকার আছে নাকি?

অফিসে এলাম কিন্তু ঠিক অফিস-অফিস মনে হলো না। লোকজনের চেঁচা-মিচি, করিডরের কোণায়-কোণায় পানের পিকের ছড়াছড়ি, ভাঙা নোংরা টেবিল, শ্মশান ঘাটের পরিত্যক্ত কাঁথার মত ফাইলের স্তূপ না দেখলে ঠিক অফিস বলে মনে হয় না। এখানে সে সব কিছুই দেখলাম না। এত বড় বিল্ডিং অথচ কোথাও একটা পোস্টার নেই? দেয়ালে একটাও স্লোগান নেই? আশ্চর্য!

তাই তো আমি বললাম, আমাদের ওদিককার লোকজন আপনাদের এই অফিস দেখলে মনে করবে এটা বোধহয় স্যানা-টোরিয়াম।

'তা বটে।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো নানা বিষয়ে একবার চা খাওয়াও হলো। তারপর কাজকর্মের কথা শুরু হলো।

মিঃ রায় জানতে চাইলেন, কাজকর্ম সম্পর্কে কোন প্রোগ্রাম করেছেন কি?

'না।'

'কিভাবে করবেন ভাবছেন?'

'প্রথম কয়েক দিন চারদিক একটু ঘুরেফিরে দেখব আর কিছু-কিছু লোক-জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার চেষ্টা করব। তারপর অ্যাকচুয়াল কাজ শুরু করব।'

সোসিও-ইকনমিক সার্ভের রিপোর্ট লেখার জন্য দুন ভ্যালীর লোকজনের সঙ্গে খাতির-ভালবাসার সম্পর্ক দরকার হবে না, তা আমি জানতাম। জানতাম এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়লেই কাজ শুরু করা সম্ভব। কিন্তু মন তা চাইল না। শেষ রাত্রে বিয়ের লগ্ন হলেও বরযাত্রীরা হাজির হয় সন্ধ্যার পরই। শুধু বিয়ে করাই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে শেষ রাত্তিরে এলেও চলত। শালী-দের তির্যক চোখের চাহনি আর বন্ধুদের সরস মন্তব্যও দরকার। ভাল লাগে। পরিবেশ সৃষ্টি করে, মনকে মাতাল না করলেও মদির করে তোলে।

তাই তো আমিও চাইছিলাম এই শিবালিক পাহাড়ের কোলে শাল-পাইনের ছায়ায়-ছায়ায় ঘুরে বেড়াতে। যে কাঠ-বেড়ালীটি সেদিন দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে আবছা-আবছা আলো-ছায়ায় আমাকে দেখা দিয়ে ঐ শাল-পাইনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে-ছিল, তার সঙ্গে মিতালী করতে ভীষণ ইচ্ছা করছিল।

আর?

আর ঐ শাল-পাইনের বনে আলো-আঁধারের খেলা দেখতে-দেখতে যারা শৈশব-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব কাটাচ্ছে, তাদের একটু ভালভাবে জানতে চাইছিল আমার মন। যাদের সুখ-দুঃখের বিচার করব সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে, তাদের ভাল করে দেখব না?

আরো একটা কারণ ছিল। গত রাত্রির অন্ধকারে যেভাবে নিজেকে আবিষ্কার করেছি, নিজেকে ভালবেসেছি, তার স্বাদ আরও একটু ভাল করে অনুভব-উপভোগ করব না? দিনের বেলা মানুষের হাহাকারে বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস নিলে বুকের ভেতরটা কেমন জ্বালা করে, অতৃপ্তি লাগে। নিখিল ব্যানার্জি সেতারে কোমল রেখাব আশাবরীতে আলাপ করলে মনটা যেমন অব্যক্ত ব্যথায় ভরে যায়, দিনের বেলা মনটায় ঠিক তেমনি ব্যথা অনুভব করি। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে? কালকের মত নির্জন নিশীথ রাত্রে? বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে কত ভাল লাগে, কত শান্তি, কত আরাম! আঃ! এক্ষুনি যদি সূর্য অস্ত

যেত? সারা পৃথিবীটা যদি অন্ধকারে ঢেকে যেত?

আমার প্রায় অজান্তেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল।

মিঃ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলো?

'না, কিছু না।'

'তাহলে দু-চার দিন একটু ঘুরে-ফিরে দেখে নিন।' একটু থেমে বললেন, সেই ভাল। কয়েক দিন একটু প্রাণ খুলে আড্ডা দিই, তারপর কাজকর্মের কথা ভাবা যাবে। কি বলুন?

মিঃ রায় কথা শেষ করে আমার দিকে তাকালেন। আমি শুধু হাসলাম। মুখে কিছু বললাম না।

'হাসছেন কেন?'

'বিশেষ কোন কারণ নেই।'

'তবুও?'

'একে আড্ডা তারপর রসগোল্লা—কাজ-কর্ম করতে ইচ্ছা করবে তো?'

মিঃ রায় হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক আছে। নো মোর রসগোল্লা বাট ছানার জিলেপী ফ্রম টু-ডে।

আমি এবার উঠে পড়লাম। এফ-আর-আই বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে একবার ভাল করে এই নিউ ফরেস্টকে দেখলাম। গাছ-পালার মধ্যে দিয়েও দুটো-একটা বাংলো নজরে পড়ল। দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিতে নজর পড়ল দূরের বোটানিক্স। কাষ্ঠবিজ্ঞানীর খেলাঘর।

বোধহয় একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। ঠিক মনে নেই। খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে গেলাম নিউ ফরেস্ট আর তার ছোট্ট বোটানিক্সকে পিছনে ফেলে।

চাকাতা রোডের পর এসে একটু দাঁড়ালাম। বোধহয় কয়েক মিনিট। ভাবছিলাম কোন্ দিকে যাব—ডাইনে, না বাঁয়ে? মনে আছে গতকাল ডেরাডুন শহর থেকে আমার নজর বাঁদিক থেকে এসেছি। সেই-জন্যই ডানদিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

এফ-আর-আই আর মিলিটারী একাডেমীর প্রান্তে ছোট্ট একটা বাজার। হরেক রকম জিনিসের কয়েকটা ছোটখাট দোকানের মেলা। দোকানগুলোর আশে-পাশে চাকাতা রোডের এপাশে-ওপাশে শাকসব্জী সাজিয়ে বসেছে আরো কিছু লোক। লোকজন বিশেষ দেখতে পেলাম না। আমি সামনের দিকে আরো এগিয়ে চললাম। কিছুদূর যাবার পর একটা নদী এলো। নদীর উপর পুল। দাঁড়ালাম। চারপাশ দেখলাম। সাদা-কালো ছোট-বড় পাথরনুড়ির জন্যে জলের ধারা প্রায় চোখেই পড়ে না। তবু ভাল লাগল। বরাক নদীর জলের তোড়ে কাছাড়ের মানুষকে ঘরছাড়া হতে হয়। শত-সহস্র মানুষের চোখের জল দেখে ব্রহ্মপুত্রের পাগলামী মাতলামী আরো বেড়ে যায়। এখানে মানুষ জোর, নদীর জল [illegible] হয়েরথবাদ। আর এখানে?

পুল পার হয়ে নদীর বুকে নেমে পড়লাম। পাথরনুড়ি তুললাম, দেখলাম, ছুঁড়লাম। যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকেই ছুঁড়লাম। ভারী মজা লাগল। বহুদিন পর এমন ছেলেমানুষী করার সুযোগ পেয়ে ভারী ভাল লাগল। বহুদিন আগে কিশোর-বেলায় বরাকর নদীর পাড়ে বেড়াতে গিয়ে আমরা একদল ছেলে ইট-পাটকেল ছুঁড়তাম নদীর বুকে। কেন গুরুচরণ কলেজে ভর্তি হয়ে এমন ছেলেমানুষী করিনি?

গুরুচরণ কলেজের কথা মনে হতেই হাতের পাথরনুড়িটা আর ছুঁড়তে মন চাইল না। হাতটা যেন অবশ হয়ে এলো। সুন্দর সাদা পাথরের নুড়িটা বেশ সযত্নে নীচে নামিয়ে রাখলাম। আমি তাড়াতাড়ি নদীর বুক থেকে রাস্তায় উঠে এলাম। যে-নদীর বুকে এতক্ষণ খেলা করলাম, তার দিকে একবার পিছন ফিরেও তাকালাম না। একটা সিগরেট ধরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম।

কতক্ষণ ধরে কতদূর হাঁটলাম, মনে নেই। হাঁটতে হাঁটতে কটা সিগরেট খেয়েছিলাম, তাও মনে নেই। মনে আছে আবার সিগরেট ধরাতে গিয়ে দেখলাম প্যাকেটে একটাও সিগরেট নেই। সামনেই একটা ছোট্ট দোকান দেখতে পেলাম। এগিয়ে গেলাম। দোকানটা ছোট্ট হলেও বেশ ভাল। দোকান-দার বৃদ্ধ। মাথায় পাগড়ী।

দু' প্যাকেট সিগরেট নিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট দিলাম। বৃদ্ধ দোকানদার হিসাব-নিকাশ করে আমাকে টাকা-পয়সা ফেরত দিল। সাধারণতঃ সিগরেট-টিগরেট কিনে পয়সাকড়ি গুণে নেবার অভ্যাস আমার নেই। তবুও গুণলাম। প্রথম কথা নতুন জায়গা, তারপর সিগরেটের দামটাও জানা দরকার। আমাদের দেশে জিনিস-পত্তরের দামের কোন মাথামুণ্ড নেই। একই শহরে একই জিনিসের দশ রকম দাম। কলকাতায় যে সিগরেট খেতাম, এখনও সেই সিগরেট খাচ্ছি কিন্তু দামের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। যে-কাজে আমি দুন ভ্যালীতে এসেছি তাতে জিনিসপত্তরের দামের প্রতি আমার নজর রাখতে হবে। তাইতো নানা কারণে টাকা-পয়সা বেশ ভালভাবে গুণে নিলাম। কিন্তু একি? কলকাতা ছাড়ার পর তো এই দামে কোথাও সিগরেট পাইনি। দোকানদার বৃদ্ধ। হয়ত চোখে কম দেখে অথবা দোকানের মাল-পত্তরের দামের হিসাব জানা নেই বলেই কম দাম নিয়েছে।

'আপ পয়সা ঠিক লিয়া হ্যায়?'

বৃদ্ধ যেন চমকে উঠল, কিউ সাব? জ্যাদা লে লিয়া?

'না, না, জ্যা-দা লিয়া না কিন্তু কম নাওনি তো?'

বৃদ্ধ হাসল। বেশ মধুর আত্ম হাসি। না সাব! কম-বেশী নেবার নেই।'

আমি অবাক না হয়ে পারলা দিল্লী, মীরাট, মজফ্‌ফরনগর, ডেরাডুনে সিগারেট কিনেছি। কো দামের চাইতে প্রত্যেকে বেশী দাম নি কেউ পাঁচ পয়সা, কেউ আট পয়সা, আবার দশ পয়সা। ডেরাডুন শহর এত দূরে এই গ্রামের বৃদ্ধ দোক আরো বেশী দাম নিলেও আমি করতাম না বা অসন্তুষ্ট হতাম না স্বাভাবিকই মনে হতো। কিন্তু...

হাতে টাকা-পয়সা নিয়ে বো কয়েক মিনিট চুপ করেই দাঁড়িয়ে হাজার হোক বৃদ্ধ মানুষ। আমার অনেক বেশী অভিজ্ঞ। তাইতো মনের দ্বিধার কারণ বুঝতে পেরেছি

'আপ ইধার পহেলে আয়ে হ্যা

'হ্যাঁ।'

'নোকরী পেয়ে এসেছেন, বেড়াতে?'

'এখানে চাকরি করি না, তবে চ কাজেই এসেছি।'

আমি প্যাকেট থেকে একটা সি বের করে ধরালাম। একটা টান বললাম, অনেক দিন পর একজন দোকানদার দেখলাম।

বৃদ্ধ একটু ব্যস্ত হয়ে দু'হাত করে বলল, আরে সাব! এসব বলবে জীবনে কত অন্যায় করলাম তার কি আছে?

বৃদ্ধ একটু উদাস হলো। আমার দিক থেকে সরিয়ে কোথা নিয়ে গেল। সাধারণ দোকানদারদের করতে আমি শিখিনি কিন্তু এই ম এই বৃদ্ধকে আমি শ্রদ্ধা না করে প না।

'না, না, অন্যায় আবার কি কর

মাথার পাগড়ীটা ঠিক করে বললো, দু'বেলা দু'টুকরো রুটি প্রতি মুহূর্তেই অন্যায় করছি। বৃদ্ধ চুপ করতেই ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস জানি না খুদার কি মর্জি!

আমার কোন কাজ ছিল না। দু' লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছি। সুতরাং আমি পাশের একটা ভাঙা চেয়ার টেনে

আমাকে চেয়ার টানতে দেখেই ভীষণ লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে দিতে দিতে বলল, মা না সাব। আপ মেহেমান হ্যায় আপনাকে বসতে পর্যন্ত বলিনি।

আমি চেয়ারে বসতেই বৃদ্ধ চ করে উঠল, কাক্কা, ইধার আনা।

কাক্কা? এর আগেও কাক শুনেছি কিন্তু মনে বুঝিনি। শহরে

কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। আজ তাই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাকা কিয়া হ্যায়? চাচা?

বৃদ্ধ হেসে বলল, ছোট ছোট লেড়কা-দের আমরা আদর করে ডাকি কাকা!

আচ্ছা!

বাড়ীর ভিতর থেকে একজন যুবক বেরিয়ে আসতেই বৃদ্ধ বলল, কাকা, চা পাঠিয়ে দাও তো।

আমি আপত্তি করলাম, না, না, চা কি হবে?

'সাব, আমরা ফ্রন্টিয়ারের লোক। মেহেমানকে আমরা খুদা জ্ঞান করি।'

চা খেতে খেতে শুরু হলো গল্প। বৃদ্ধের গল্প।

...আমরা পেশোয়ারের লোক। ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের পাঠান।...

গল্প শুরু হতে না হতেই আমার প্রশ্ন, আপনারা কি মুসলমান?

'নেই সাব, আমরা হিন্দু।'

'তবে এর আগে কথায় কথায় খুদা বলছিলেন কেন?'

বৃদ্ধ হো-হো করে হেসে উঠল, খুদা ভী ভগবান।

সংস্কারমুক্ত বৃদ্ধের হাতে আমি যেন একটা থাপ্পড় খেলাম।

...জান সাহেব, তখন মানুষের হাতে এত পয়সা ছিল না কিন্তু শান্তি ছিল। খাওয়া-পরার অভাব ছিল না কারুর। তাছাড়া তখন মানুষ অনেক উদার, অনেক সৎ ছিল। আমাদের দেশের সাধারণ গরীব মানুষ লেখাপড়া শিখতে পারত না কিন্তু মানুষকে অবিশ্বাস করতেও শিখত না।...



বৃদ্ধ যেন কতকগুলো কেতাবী বুলি বলে গেল আমাকে। আমি হয়ত বিশ্বাস করলাম না ভেবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলতে শুরু করল, আমি যখন বারো সালের তখন পিতাজীর সঙ্গে ফোর্ট স্যান্ডেমান গিয়ে জীবনে প্রথম তালা দেখলাম।

সে কি?

হাঁ সাব। আমাদের গাঁওতে কেউ ঘরে-দোরে তালা-চাবি লাগাত না। তালা-চাবি লাগাবার মতলব তো পড়শিদের অবিশ্বাস করা। সে কি কখনও সম্ভব?

চুরি হতো না?

চুরি! গাঁওতে? কভি নেহি। গাঁওকা সব আদমী ভাই-রিস্তেদার হতো। তারা তো চুরি করতেই পারে না...

বাইরের লোক এসেও তো চুরি করতে পারত?

বৃদ্ধ আবার হাসল। বললো, বাইরের লোকের এতনা সাহোস কাঁহাসে হোগা? তাছাড়া চোর পাকড়ালেই তো তার জান খতম!

জান খতম?

জি হাঁ সাব। গুস্সামে জরুর কেউ না কেউ মেরে দেবে। বৃদ্ধ একটু থামল। একটু ভাবল। আবার শুরু করল, পাঠান লোগ বহুত ঠাণ্ডা হয় কিন্তু গুস্সা হলে সবকিছু করতে পারে।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ নিজের কথাই বলে গেল। আমার কথা কিছুই শোনেনি, জানেনি। এবার বোধহয় খেয়াল হলো।

সাব, আপ কাঁহাকা রহনে বালা?

আমি একটু দ্বিধা-সঙ্কোচে বললাম, আমি বাঙালী।

আপনি নেতাজীর দেশের আদমী? আপনারা সত্যি ভাগ্যবান।

নেতাজীর মত আমিও বাঙালী সত্যি কিন্তু শুধু সেজন্য আমার গর্ব করার অধিকার আছে কি নেই, তা ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি চুপ করে রইলাম।

বৃদ্ধ যেন থামতে পারছিল না। বাঙালকা আদমী খুব শরীফ হয়। তাছাড়া পাঠানদের মত আপনারাও দুষমনকে বরদাস্ত করতে জানেন না। আপনারা অনেক পড়াই-লিখাই করেন বলে আমাদের মত গুস্সা আপনাদের নেই।'

বাঙালীকে এত শ্রদ্ধা করার কারণ আছে কিনা তা আমি জানি না। তবে এই সদ্য-পরিচিত বৃদ্ধ পাঠানের মুখে নেতাজীর প্রতি ভক্তি, বাঙালীর প্রতি শ্রদ্ধা শুনে স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না।

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে মাত্র দু'-একজন খদ্দের এসে সামান্য কিছু নিয়েই চলে গেল। বৃদ্ধ পাঠান তাদের প্রতি বিশেষ নজরও দিলেন না। আগের মতই আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

মনে হলো অনেক দিন কারুর সঙ্গে খুলে কথা বলেন না বা বলার সু
পাননি। তাইতো আমার মত শ্রোতা
বড় খুশী।

'নেতাজী আপনা আইক কোর
দেবার জন্য সবসে পহেলে এগিয়ে
ছিলেন। তাছাড়া দুসরা হিন্দুস্
নেতাদের মত ফিজুল ঝুটা মিঠা
বুলি দিতেন না। সাফ সাফ সবা
বলতেন আংরেজকে হাটাতে হলে তোম
খুন দিতে হবে, কোরবাণী করতে
জান-প্রাণ...

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলেই এ
থামলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা
দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

'পাঠানরা সিধা বাত বলতে ও শু
পসন্দ করে। তাইতো পাঠানরা নেতাজ
পসন্দ না করে পারেনি। হাজার হা
পাঠান আজাদ হিন্দ ফৌজে নাম লিখ
ছিল, খুন দিয়েছিল, কোরবাণী দিয়ে
প্রাণ।'

বৃদ্ধ পাঠানের দৃষ্টিটা হঠাৎ
আমার দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরে গে
লক্ষ্য করলাম, চোখদুটো শূন্যতায় এ
ঝাপসা হয়ে শিবালিক পাহাড়ের কো
অন্ধকার অরণ্যে হারিয়ে গেল।

চাকরাতা রোডের নিস্তব্ধতা
দুটো-একটা গাড়ী চলে গেল। বৃদ্ধ
দূরের দৃষ্টিকে কাছে গুটিয়ে এনে এ
উত্তেজিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, ইম্ফ
নাম শুনেছেন?

'খুব শুনেছি।'

'কভি ইম্ফল গিয়েছেন?'

'খুব কাছেই থাকতাম কিন্তু যা
হয়নি।'

'আপনি কি মণিপুরে থাকতেন?'

'না। তবে মণিপুরের পাশেই শিল
থেকেছি অনেকদিন।'

'তবুও ইম্ফল যাননি? বড়া ত
শোসের কথা।'

আমি চুপ করেই রইলাম।

একটু পরে বৃদ্ধই ভেজা ভেজা গ
বললেন ঐ ইম্ফলের কাছেই মৈরাং পাহ
আমার ভাই জান দিয়েছিল লড়াই ক
করতে। এক বেইমান অফিসার
আংরেজকে খবর না দিত ওদের রা
খতম হয়ে যেত, তাহলে হিন্দুস্থা
কাহানী বদলে যেত।

বাড়ীর ভিতর থেকে যুবকটি বে
আসতেই বৃদ্ধ আর এগুতে পারল
আমারও খেয়াল হলো অনেকক্ষণ বসে অ
হয়ত ওঁদের কাজের অনেক ক্ষতি কর

'আচ্ছা নমস্তে। আজ চলি।'

বৃদ্ধ করজোড়ে নমস্কার করে বল
নমস্তে সাব। মেহেরবাণী করে আ
দর্শন দেবেন।

'জরুর।'

আমি উঠতেই বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতর
গেলেন। (ক্রমশ

# বিশালাক্ষী

দিলীপ সেনগুপ্ত

হাত দুখানা তক্তপোষের দু প্রান্তে
না। দুই পা একটি অন্যের সঙ্গে
ায়া। মাথার চুলের গোছা চাপ লেগে
প আছে ঘাড়ের নীচে। চিত হয়ে শুয়ে।
জোড়া সোজাসুজি ওপরের কালি-
পড়া কড়িকাঠে আটক। অনেকক্ষণ
। এক-আধবার পাতা নড়ছে।
ঘরের চারপাশে দেখার মত চলনসই
তপনা আর কিছু নেই। তক্তপোষের
পায়ের দিকে ডানদিক ঘেঁষে লম্বা-
হর আয়নার সামনে কে যেন বসে।
া। চোখ কপালে তুলে কি যেন দেখল।
ঝুলের রেখা সেঁটে আছে দেয়ালে।
নিষ্কতার দৃষ্টি আর একটু টেরিয়ে
বাঁপাশে। ওখানে একজন ঘুমোচ্ছে।
ঘুমোচ্ছে না। [illegible] করছে।
[illegible]

দিয়ে। খুব ক্লান্ত। ক্লান্তই মনে হয় না
শুধু, বেশ অসুস্থ লাগে। শোভার বাবা।

শোভা দিদির জন্যে অপেক্ষা করে আছে। এখনও আসছে না দিদি। নির্ঘাৎ গল্পে মেতে গেছে বাচ্চুদার সঙ্গে। বরাবরই দিদি খুব গল্পবাজ। শোভা তেমন নয়। গম্ভীর ধরনের। বাচ্চুরা কাজলামি করতে এলে পাত্তা দেয় না।

আজ শাড়ি পরেছে শোভা। অন্যদিন ফ্রক পরে।

—একটু [illegible]

তক্তপোষের শায়িত দেহটি নড়ে উঠল। মা ডাকছে শোভাকে। তাড়াতাড়ি উঠে এল শোভা।

—ডাকছো মা?

ছড়ানো হাতখানা সামান্য উঁচু করে শোভার হাত চাইল মা। শোভা বাড়িয়ে দিতেই খপ করে ধরে ফেলল। বলল, কি করছিলি রে?

—কিছু না মা। ঝপ করে কেঁদে ফেলল শোভা।

—কাঁদছিস কেন রে?

মা জিজ্ঞেস করতেই সামলে নেবার চেষ্টা করল নিজেকে। তাতে আরও কান্না পেল। সেই অবস্থায়ই বলল, কাঁদি নি তো।

—হ্যাঁ কাঁদিস না। সব তো ভগবানের হাত।

মা শোভার গালে হাত বোলাল। শোভা মা'র কপালের দিকে চেয়ে রইল। যে কপাল মাকে এমন দশায় ফেলেছে।

—আজ তুই কাপড় পরেছিস—মাগো?

শোভার কাঁধ থেকে হাতড়াতে-হাতড়াতে আঁচল পেয়েই আলতো টান মারল মা। শোভা ঝুঁকে পড়ল মার বুকের ওপর। তাড়াতাড়ি শোভার মাথাটাকে বুকের ওপর চেপে ধরেই ফোঁস-ফোঁস করে কাঁদতে লাগল

মা অন্ধ হয়ে যাবে কেন? ঠিক সেরে যাবে চোখ।

সব হাড় হয়ে গেল। দৃষ্টি খুলল মায়ের। বাইরে নিয়ে যেতে পয়সার দরকার তো কিছু করা যেতে পারে। ভারত-ভূখণ্ডের বাইরে। যা ওরা কেউ ভাবতেই পারে না।

মায়ের অন্ধত্ব সম্পর্কিত দুর্ঘটনার মধ্যে আর কোন নতুনত্ব নেই। এই কদিনেই ব্যাপারটা পুরোন হয়ে গেছে। এখন আর শোভার মনে হচ্ছে না, ওর মা অন্ধ হল কেন? স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে যে, মা আর দেখতে পারছে না। এবং পারবেও না। শেষেরটি ভাবতে ঠোঁট কোঁচে। বুকের ভেতরটা ভেঙে যায়। থেকে-থেকে চিৎকার করে উঠছে মা। শুনতে-শুনতে তা-ও সয়ে গেছে।

এই ভাবনা আর শাড়ি পরার সঙ্গে কোন মিল নেই। যেহেতু মা বলত, 'তোকে আর ফ্রকে মানায় না' সেজন্যেই কি সাজ বদল করা? কিন্তু মা তো আর বলবে না কিছু? কিসে ভালো দেখায় না দেখায় তা-ও বুঝবে না আর। এই যে ওর শাড়ি পরার সংবাদ মা ওর আঁচল টেনে কাঁদল, কিসের জন্যে? তক্ষুনি ধরতে না পারলেও একটু পরে বুঝল। শোভাকে শাড়ি পরে কেমন দেখায় তা নিজের চোখে দেখা হল না বলেই এই কান্না। মেয়ে যে তাঁর আজ দুপুর থেকে যুবতী হয়েছে, তা স্বচক্ষে দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিতার দুঃখই এই কান্নায় ভেঙে পড়েছে। না পরলেই পারত শোভা।

—বিভা কোথায় রে? জিজ্ঞেস করল মা।

মার চোখের কোণ দুটো আঙুলের ডগা দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে বলল শোভা, ও বাড়ী গেছে।

—কেন? গম্ভীর হল মা।

—ওরা ডেকেছে।

মা ঠোঁট চাপল। প্রাণপণে দু চোখ একবার বন্ধ করে আবার খুলল। নয় তো দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্যে মরীয়া হল একবার। শোভার হাতখানা আরও শক্ত করে পাঁচ আঙুলে জাপটে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, ডেকে আন। এক্ষুনি ডেকে আন। আমি দেখতে পাই না বলে যা খুশি তাই করবে? ডাক এক্ষুনি।

—এক্ষুনি যাচ্ছি।

শোভা ওঠার চেষ্টা করল। দিদিকে ওরও দরকার। একা-একা থাকতে পারছে না। তক্তপোষে অন্ধ মা। মেঝেয় ক্লান্ত বাবা। কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে। তাই দিদির জন্যে বসে ছিল তখন থেকে। উঠতে গিয়ে আটকে গেল শোভা। মা ধরে আছে। রাগের মুখখানা বদলে গেছে। ঠোঁট কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করল, দেরী করবি না তো?

কোন দিক তাকিয়ে কথা বলছে মা? শোভা তাকিয়ে রইল। অন্ধ মা। যেন এই একটু আগে চোখ ছিল। এখন নেই। অথচ বোঝা যায় না। খোলা চোখ। ঘরের দেয়াল, কড়িকাঠ, আয়না, এমন কি খানিক তফাতে শায়িত বাবা, সকলকে দেখছে। এ তো ওরই মা। যাঁর চোখ নেই, সে অন্য কেউ।

মাথার মধ্যে ঝিম-ঝিম করছে শোভার। বুক কাঁপছে। দারুন অস্বস্তি। কি যেন—কি যেন একটা করতে হবে এখন। ও হ্যাঁ, দিদিকে ডাকতে হবে। মনে-মনে মুক্তির জন্যে উতলা হয়ে উঠল। মায়ের হাত থেকে মুক্তি। অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি। কখনও এই রকম সব কথা মনে আসে নি আগে। বইতে পড়েছে। যত দিন যায়, তত অভিজ্ঞতা বাড়ে। সেটাই বোধ হয় ঘটে যাচ্ছে ভেতরে-ভেতরে। শোভার বয়েস বেড়েছে। শোভা শাড়ি পরেছে।

—বলেই চলে আসবো মা। শোভা তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

—শোভা কি চলে গেলি? মিনিট-খানেক পরে জিজ্ঞেস করল মা।

—হ্যাঁ। বিভাকে ডাকতে পাঠালে তো। বিপিনবাবু উঠে বসলেন।

অন্য মনে কি যেন ভাবল মা। আপন মনে একবার হাসল।

—হ্যাঁ গো—! কাপড় পরে শোভাকে কেমন লাগছে গো?

যাঁকে জিজ্ঞেস করল, তিনি কিন্তু চট করে কোন জবাব দিতে পারলেন না। বাইশ বছর সুখ-শান্তি, কলহ-প্রেমে ঘর করতে-করতে একি হল শেষে? ভেতরটা খাক হয়ে যাচ্ছে। নিরীহ মানুষ। মেয়ে দুটো না থাকলে হয় তো পাগল হয়ে যেতেন। বাপ হিসেবে সন্তানের মন সামলানো কর্তব্য বলেই বহু দুঃখে চেপে আছেন সব। মৃত্যু-দুর্ঘটনা সব কিছুকে ছাপিয়ে দিয়েছে স্ত্রীর এই অন্ধত্ব। মেনে নিতে কষ্ট হয়। তবু সত্যি।

দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বোধ হয়। ঘুমের মধ্যে দেখেছেন, অন্ধ নয়। স্ত্রী তাঁর চক্ষুষ্মতী। তার পরেই দীর্ঘশ্বাসের হাওয়ায় মেঘের ধুলো সরে গেছে। শোভাকে কেমন দেখাচ্ছে, এ প্রশ্নের কি জবাব হবে বুঝতেই পারছেন না। কি বলবেন, ভালো না খারাপ?

—চুপ করে আছো যে? আবার প্রশ্ন।

উঠে এলেন বিপিনবাবু। হাত বাড়িয়ে দিল শোভা-বিভার মা। ধরতে গিয়ে থর-থর করে হাত কাঁপল বিপিনবাবুর। বললেন, বলো কি বলছিলে?

—শোভাকে ডাক না একটু! চেঁচিয়ে ডাকো—ওকে নিয়ে বড় ভয় আমার। ও বাড়ীর বাচ্চু ছেলেটা ভালো নয়। হ্যাঁ গো—কেমন দেখাচ্ছে ওকে?

—ভালো। ছোট্ট জবাব দিলেন বিপিনবাবু।

—ও কি কথার ঢং তোমার? আর কিছু বললে না যে? আবার প্রশ্ন। দ্বিতীয়বার উত্তরের আগে শোভা ঢুকল ঘরে। পেছনে বিভা। তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে সরে বসলেন বিপিনবাবু।

—দিদি এসেছে মা। শোভা মায় মাথার কাছে বসল।

আবার একটু মুচকি হাসল মা। চোখ দুটো স্থির। শোভা-বিভা-স্বামী সকলেই কাছে আছে। অথচ অন্ধকার। আবার গম্ভীর। বিষন্ন।

—মা গো—আর পারি না। অস্ফুটে আর্তনাদ করল মা।

কেউ তাঁকে ভালবাসে না। কেউ ভক্তি করে না। সব স্বার্থপর। নিষ্ঠুর। কোথায় গেল? আলো কোথায় গেল? ছিল কোনদিন? হ্যাঁ ছিল, ছিল। এই ছিল। এই নেই। শোভাকে কেমন দেখতে? বিভাকে? শোভা-বিভার জন্মদাতাকে? ওদের একবার দেখতে ইচ্ছে করছে এখন। ভগবান! এ কি করলে? থাক। ওরা সুখে থাক। আনন্দে থাক। অন্ধের জন্যে ওদের যেন একটুও দুঃখ না হয়। ওরা হাসুক। খেলুক। যা খুশি করুক।

—বিভা-শোভা কাছে আয়। আমায় একটু তুলে বসা।

চিৎকার, তারপর কান্না। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। তারপর এক নাগাড়ে।

—কেঁদো না মা। আমাদের দিকে তাকিয়ে কেঁদো না।
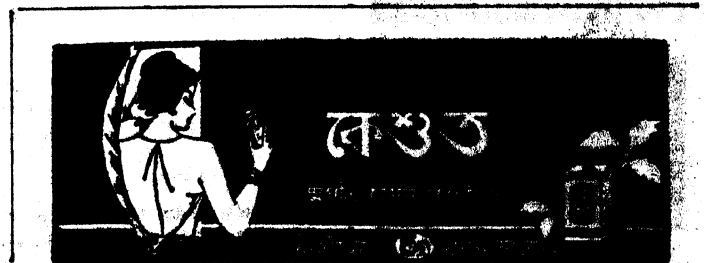
বিভা বড় হয়েছে। গুছিয়ে কথা বলতে পারে।

—তোদের দিকে তাকাবো? কি বললি বিভা? কি বললি? আমি রেঁকে আছি কেন—ঠাকুর—একটিবার দেখাও সব। এক ঝলক দেখাও। আর কিছু চাই না।

বিপিনবাবু মুখে 'উঃ' শব্দ করে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরময়। মা থেমে গেছে। শোভা চোখ মুছছে। বিভা আঁকড়ে ধরে আছে মাকে।

—কি করছিলি ও বাড়ীতে? শীতল প্রশ্ন করল মা।

—ওরা ডেকেছিল। বলল বিভা।

—কেন?

—তোমার কথা জিজ্ঞেস করতে। মাসীমা খুব কাঁদলো।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল মা। শোভা আর বিভা মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগল। দুজনের মুখময় চোখের জল গড়িয়ে শুকিয়ে আছে।

হঠাৎ থম্‌কে উঠল, আর কখনও ও বাড়ীতে যাবি না। কোথাও যাবি না আর বুঝলি? কাকে বলছে দুজনেই তা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

—বাচ্চুটা ভালো ছেলে নয়। শোভা আর ফ্রক পরবি না।

বিভা হতভম্ব। সোজাসুজি মার দিকে খানিক তাকিয়ে দেখে চোখ ঘুরিয়ে নিল শোভার দিকে। শোভার ফ্রক আর বাচ্চুদার মাঝখানের সম্পর্কটাকে কিছুতেই কোন অনিবার্য লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারল না। বরং বিভার শাড়ি আর বাচ্চুদার মধ্যে সম্পর্ক আছে। বাচ্চুদাকে ভাল লাগে বিভার। বাচ্চুদাও তার ভাল লাগার কথা জানিয়েছে বিভাকে। আর মা বলছে কি এসব? কেন যে মা বাচ্চুদাকে সহ্য করতে পারে না কে জানে? অথচ বাচ্চুদা বেশ ভাল ছেলে। দেখতেও ভদ্রলোকের মত।

শোভা প্রতিবাদ করছে না কেন? শাড়ি পরে চাঁদে হাত দেবার মতলব করছে না তো? আর, মা বললেই কি অসম্ভবটা সম্ভব হয়ে যাবে? কোন কাজ নেই তো, চোখ বুইয়ে আনাড়ির মত আজে-বাজে বকতে শুরু করেছে।

—কথা বলো না মা একটু শান্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করো। বিভা বলল মাকে। ফল হল উল্টো।

—কেন কথা বলবো না? এই অবেলায় ঘুমোবই-বা কেন? তোরা আমার ঘুমও খেয়েছিস। তোর বাবা যদি একটু শক্তপোক্ত হত, তবু নিশ্চিন্ত হতাম। আমি এখন কি করি? উঃ—আমায় একটু বসিয়ে দে শোভা।

কারও সাহায্য ছাড়াই উঠে বসল মা।

—তোর বাবা কই রে?

—এই তো। কিছু চাইছো? বিপিনবাবু এগিয়ে এলেন।

—শোন—না থাক। আবার চুপ।

—এখন কটা বাজলো গো? নিজের পায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল মা।

—চারটে। বিপিনবাবু বললেন।

—চারটে? বিভা চা কর না একটু।

—করছি মা।

স্টোভ ধরিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল বিভার। বাচ্চুদা বলে দিয়েছে।

—খুব সাবধানে থাকবে বিভা। তোমার মা ন্যাচারাল খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠবেন। অনাদর না করলেও কেবলই ওনার মনে হবে তোমরা অনাদর করছো। ক্রেডারলি না চলতে পারলে অশান্তি ঘটবে। সত্যি, বড় স্যাড!

বাচ্চুদা অনেক কিছু বোঝে। বিভা মিলিয়ে দেখল, ঠিকই বলেছে বাচ্চুদা। মা যেন কেমন হয়ে গেছে। যাকে বলে সেন্টি-মেন্টাল।

রান্নাঘর থেকে শুনতে পেল না বিভা। শোভাকে মা জিজ্ঞেস করেছে, বাচ্চু ঘরে ছিলো?

এ্যাঁ—না মা। মিথ্যে বলে ফেলল শোভা।

শোভাও ঠিক বোঝে না, বাচ্চুদার ওপর মার এত রাগ কেন? 'ছিল' বললেই চটে যেত। উপস্থিত বুদ্ধিতে মাকে ঠাণ্ডা করেছে শোভা। কিন্তু এতে কি দিদিকে প্রশ্রয় দেওয়া হল না?

মা আজ দেখতে পায় না বলে দিদি মার মতের বিরুদ্ধে বাচ্চুদার সঙ্গে চলা-ফেরাই বা করবে কেন? অবশ্য, আগে করত।

বুদ্ধি খাটিয়ে বিচার করে দে শোভা। দিদিকে নিয়ে মার কোন ভাব নেই। যত ভাবনা ওকে নিয়ে। বাচ্চু ওকে দেখলেই ইয়ার্কি মারার চেষ্টা কর কিন্তু দিদির সঙ্গে কথা বলার সময় গম্ভীর চাল দেখায়। যেন শোভা খুকি। ফালতু একটা। দিদিকে কথ জিজ্ঞেস করতে হবে একবার।

বিভা চা নিয়ে এল। দু' হাতে দু কাপ। একটা বাবার দিকে এগিয়ে দি বলল, ধরো বাবা। অন্য কাপটা টেবি ওপর রেখে, খুব আস্তে আস্তে টেবিলটা তক্তপোষের কাছে এনে, একখানা হাত টেনে আনল। চায়ের কাপ তুলে নিল।

—এই নাও মা চা।

—দেখিস্‌, পড়ে না যেন। ব সাবধান করলেন বিভাকে।

খুব সাবধানে মা'র হাতে কাপ ধরি দিয়ে মুখোমুখি বসল বিভা।

—আমার চুলটা একটু বেঁধে দে কেউ।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে চিরুনি আ শোভা।

—আজ কি বার রে?

—রবিবার মা।

চিরুনির টানে মা'র মাথা পেছ হেলে পড়ল একটু। গরম চা চল জোড়া পায়ের একখানায় কয়েক ফো পড়তেই থম্‌কে উঠল মা, আস্তে আঁচ না—।

—শোভাকে কাপড়ে কেমন লাগ্‌চে বিভা? হেসে এবার জিজ্ঞেস করল মা।

—আমার চেয়েও বড় লাগ্‌চে। বল বিভা। হেসে।

অদ্ভুত দেখাল মা'কে এবার। বিভ মনে পড়ল বাচ্চুদার কথাগুলো।

একটা ঠোঁট ভিজে ভিজে লাগ মায়ের। ভিজে ঠোঁটটা মুখের ভেতরে চে বলল, তোকে আজ কাপড় পরতে বলে কে রে শোভা?

শোভা থম্‌কে গেল। এই রকম এক কথা যে উঠবে তা কল্পনাতীত ছিল দিদির দিকে নিরুপায়ের মত তাকি রইল। চিরুনি থেমে গেল।

—কি রে—কি ভাবছিস্‌? আবার বল মা।

উত্তর দিতে এবারেও দেরী হ শোভার। থেমে থেমে বলল, নিজে থেকে পরেছি মা।

—ও। আমার কথায় নয়?

বাচ্চুদার কথাই ঠিক। বিভা আবার ভাবল। বাচ্চুদার প্রীতি সপ্রশংস ভাবনার দৃষ্টিটা পড়ল এসে শোভার ওপর। বিভার অন্যমনস্কতায়।

—হাস্‌ছিস কেন রে দিদি?

শোভার প্রশ্নে থাবড়ে গেল বিভা। কোনমতে জবাব দিল, কই? হাসলাম কখন?

বাবা পেছন ফিরে কি যেন ভাবছেন। মা গম্ভীর। কপালে ভাঁজ পড়েছে। বলা যায়, দুশ্চিন্তায়। কার জন্যে? শোভার, বিভার না বিপিনবাবুর?

—মা—! হঠাৎ ডুক্‌রে উঠল শোভা। জড়িয়ে ধরল মা'কে। বাবা ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যস্তভাবে বললেন, কি হল?

—না, কিছু না। শোভা সামলে নিল আবার।

কি একটা ভাবতে ভাবতে শোভা হঠাৎ দেখল, মা চোখ ফিরে পেয়েছে। মনে হল, একটুখানির জন্যে অন্ধ হয়েছিল মা। তারপর সকলকে লক্ষ্য রেখেছে আগাগোড়া। এই কথা ভেবে প্রথমে অস্বস্তি, পরে আনন্দ হল। তারপর ঘোর কাটতেই দেখল, মা অন্ধ। চোখ নেই। আছে। তবে দৃষ্টি নেই। সঙ্গে সঙ্গে হাহাকার করে উঠল।

—কি হল রে শোভা? মা আর বিভা এক সঙ্গে প্রশ্ন করল।

শোভা জড়িয়ে আছে মাকে। এবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, তুমি আর ভালো হবে না মা?

বাবা ধমক লাগাল, কি ছেলেমানুষি করছিস্?

মা কেঁপে উঠতেই সব চা বিছানায় কাত্ হয়ে পড়ল।

শোভাটা এত বোকা! এখনও বুদ্ধি খরচ করে কথা বলতে শিখল না। কোথায় মা'কে সান্ত্বনা দেবে, না, আরও কাঁদাচ্ছে। বাচ্চুদাকে বলতে হবে সব। বিভা বড়। সামলাতে হবে ওকেই। বাবা তো মাটির পুতুল। ঘরে আছে এখন বাচ্চুদা। একবার যাবে।

—আমি একটু আস্‌ছি মা। বিভা উঠে দাঁড়াল।

—কোথায় যাচ্ছিস্? মা জিজ্ঞেস করল।

—এখুনি আসবো।

—তা তো বুঝলুম। যাচ্ছিস কোথায়? ও বাড়ীতে?

—হ্যাঁ। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল বিভার।

—না। যেতে হবে না। এখানে বসে থাকু।

বিভা বাধ্য মেয়ের মত বসে পড়ল। বাচ্চুদা এইভাবেই চলতে বলেছে।

বেশ ছিল এতদিন। এবার থেকে জ্বালিয়ে মারবে মা।

—কি রে—বস্‌লি?

—হ্যাঁ মা। এই দ্যাখো না। রাগে হাতখানা মার কোলে ছুঁইয়ে দিল বিভা। বিছানার যে অংশ চা পড়ে ভিজেছে, সেখানে হাত পড়তেই মুখখানা বেঁকিয়ে মা বলল, শুকনো একটা কিছু দে তো এখানে।

বিপিনবাবু আল্‌না থেকে ভাঁজ করা একখানা কাপড় এনে ভিজে জায়গায় চেপে দিলেন। অসাবধানে পায়ে হাত লাগতেই পা দুখানা গুটিয়ে জড়সড় হয়ে বসল মা, বলল, কি করছো—পায়ে হাত লাগ্‌চে না?

বিপিনবাবু তাকালেন। বিমর্ষ চাহনি। তারপর ওইখানেই বসলেন।

—বস। আয় বিভা, এপাশে বস্।

তিনজনে তিন দিকে বসেছে। মাঝখানে মা।

—কাল তোর বাবার আপিস। তোরা গুছিয়ে নিতে পারবি তো? আমিও কাছে কাছে থাকবো।

—আমরাই পারবো মা। বিভা বলল।

—না। পারবি না। কোনদিন যদি করতি তবু হত। মা ধম্‌কে উঠল।

শোভা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, আগেই আবার বলল মা, কাল কলেজ যাবি না বিভা?

—কাল ছুটি মা।

—শোভার ইস্‌কুলও ছুটি?

বিভা মাথা নাড়িয়ে শোভাকে 'হ্যাঁ' বলতে ইসারা করল।

—হ্যাঁ মা। শোভা দিদির ইঙ্গিত মানল।

—মিথ্যে কথা। কাল কিসের ছুটি?

এবারে কি উত্তর দেবে? দুজনেই ফাঁপরে পড়ল। বাবা মুখ নীচু করে আছেন

—কাল স্ট্রাইক। বিভা কথা খুঁজে পেল।

বিপিনবাবু এবারে মুখ তুলে বিভাকে দেখলেন। ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চন করলেন। তাঁর স্ত্রীকে মিথ্যে বলে বাঁচাবার যে চেষ্টা করছে, এর একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত কিনা ভাবলেন হয়তো। আবার মুখ নামালেন। যেমন ছিলেন।

—তবে চ। সবাই মিলে ঘুরে আসি। মা'র অকেজো চোখের তলায় নাকের গর্ত ফুলে উঠল।

—কোথায় মা? শোভা অবাক হয়ে জানতে চাইল।

—বর্ধমানে। মা বলল।

বর্ধমানে মায়ের বাপের বাড়ী। ওদের মামাবাড়ী। মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই মার। ভাই আছে একজন। চৌকিদারি করা হয়েছে। এখনও পাত্তা নেই। এলেই বা করবে কি? ভাবল বিভা। এলেই যে মার চোখ ফিরে আসবে তা-ও নয়।

—তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর্ তো, কাল ছুটি নিতে পারবে কিনা।

বিপিনবাবু দুই মেয়েকে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। দুজনের মুখেই একটু করে মিহি হাসি লেগে আছে। তাড়াতাড়ি ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমার ভাই হয় তো এসে পড়তে পারে এখানে।

—তবে থাক্। যদি না আসে তো সামনের রোববার যাবো, কি বলো?

—সেই ভালো মা। শোভা-বিভা প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল। কঠিন রোগাক্রান্ত শিশু ভাত খেতে চাইলে বড়রা যেমন বলে, 'এই তো—কালই খাবে'; ঠিক সেইভাবে।

মাঝখানে মা। তিন দিকে তিনজন। দুজনের কারও আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। শোভা-বিভা উসখুস করছে তাই। উঠি উঠি মন। বিপিনবাবু একটা আঙুল দিয়ে গালের নরম জায়গাটা চেপে রেখে বসে আছেন। স্থির হয়ে।

খুব জোরে একটা নিশ্বাস টানল মা। বুক ওঠানামা করল। গম্ভীর দেখাল।

হঠাৎ হেসে ফেলল মা। একটু নড়ে-চড়ে বসল।

বলল, থাক্ গে—চোখ গেছে যাক্। তোরা তো আমার কাছে আছেই আছিস্। তাহলেই হল।

# গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

ইলোরার দেওয়ালগাত্র থেকে

## কেশ বিন্যাস

কথায় বলে, যে মেয়ে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। রান্না এবং চুল বাঁধায় এদেশের মেয়েদের খুব সুখ্যাতি। এত রকমফের ব্যঞ্জন তৈরি করা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যতটা খেয়ে নয় তার চেয়ে বেশি খাইয়ে আমাদের মেয়েরা আনন্দ পায়। রান্নার সুখ্যাতি ফেরে মুখে মুখে। অতিথি-অভ্যাগতদের দেশ আমাদের। যাতে সুনাম অক্ষুন্ন থাকে সেদিকে সকলের নজর। সবাই সতর্ক। তাই মেয়েদের দিনের বেশির ভাগটাই কেটে যায় হেঁসেলে। আর একবার হেঁসেলে ঢুকে পড়লে কখন যে ছুটি মিলবে তা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। অনেকের সারাদিন কেটে যায়। এরই মধ্যে কিন্তু একটু অবসর চাই। এরও প্রয়োজন আছে।

সাতসকালে চান, ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়া। ভেজা চুল শুকোয় উনুনের তাপে। একদিন অবশ্য ছিল যখন কেশবতী কন্যা ধুনোর ধোঁয়ায় চুল শুকিয়ে নিতো। সেই সঙ্গে নিজেও হতো সৌরভে আমোদিত। আজ আর এ নিয়মটা ঠিক চালু নেই। সেদিনও অবশ্য সকলের বেলায় এ বিলাস সম্ভব ছিল না। অনেকেই চুল রান্নাঘরে উনুনের আঁচেই শুকিয়ে নিত। অন্তত সংসারের যাঁতায় এ ছাড়া বিশেষ কোন উপায়ও থাকতো না।

রান্নাঘর থেকে এক ফাঁকে বেরিয়ে গা ধুয়ে মুছে তেল, চিরুনি, আয়না নিয়ে বসতো সবাই। এখন চুল বাঁধবার পালা। সবাই সুন্দর করে চুল বাঁধতে চায়। কারো বিনুনি আবার কারো খোঁপা। অধিকাংশের পছন্দ অবশ্য খোঁপা। কেউ কেউ বিনুনির পর খোঁপা করতো। কারো বা আবার সোজা বেণী বেঁধে খোঁপা। সারাদিন চুল এলো থাকলেও সবাই দিনের শেষে চুলের যত্ন নিতো। মা-ঠাকুমারা বলতেন, সারাদিন যা হয় হোক সন্ধ্যেবেলা চুল এলো রাখতে নেই। তাহলে গেরস্থের ঘোর অকল্যাণ। লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হন। মেয়েদের ওপর কুগ্রহের নজর পড়ে। তাই দিনের বেলা হাজার কাজে ব্যস্ত থাকলেও বিকেলে চুল বাঁধতেই হবে।

অবশ্য, মা-ঠাকুমার এই ধারণাটুকু নেহাতই সংস্কারপ্রসূত। আসলে অযত্ন অবহেলায় চুল নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই এই সতর্কতা। কারণ চুল হলো মেয়েদের সৌন্দর্যের অনেকখানি। সেই চুলই যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে মেয়েদের আর থাকবে কি! তাই মেয়েরা সংস্কারের বশেই হোক বা সজ্ঞানেই হোক দিনের শেষে কেশপরিচর্চায় বসতো দল বেঁধে। সময় লাগতো অনেক।

নিজের চুল নিজে বাঁধা এক কঠিন ব্যাপার। সকলে আবার ভাল চুল বাঁধতেও পারে না। তাই অপেক্ষা করতে হতো। চিরুনি দিয়ে সবাই নিজের চুল সমান করতো। তারপর সময় মতো নিজের খোঁপাটি বাঁধিয়ে নিতো। আয়নায় বারবার দেখে নিজের মনের মতো করে।

আর যেদিন নাপিতবৌ আসতো সেদিন কথাই ছিল না। সেদিন বাড়িতে যেন চুল বাঁধানোর ধুম পড়ে যেতো। নাপিতবৌ ঝামা দিয়ে ঘষে পা পরিষ্কার করে আলতা পরিয়ে দিতো। আলতা পরানো হয়ে গেলে চুলে চিরুনি চালাতে বসতো। গল্পে গল্পে মাথায় আঁজলা আঁজলা তেল পুরে দিতো। তারপর চিরুনি। এবং সবশেষে খোঁপা। সে খোঁপা কেউ কেউ মাথায় রাখতো অনেকদিন। এক দুদিন তো বটেই। কেউ কেউ আবার তারো বেশি। চুল খুলে বাঁধা এক শক্ত ব্যাপার। এই পরিশ্রমটুকু তারা এড়িয়ে যেতো। আর যখন চুল খুলতো তখন কারো শরণাপন্ন হয়ে খোঁপা বাঁধিয়ে নিতে হতো। না হলে নিজে যেমন পারতো তেমনিতেই চালিয়ে দিতো নাপিতবৌ আবার না আসা পর্যন্ত।

সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এখন আর নাপিতবৌ বাড়ি বাড়ি ঘুরে

পায়ে আলতা পরায় না, চুল বাঁধে না। দিনকাল বদলে গেছে অনেক। ইতিমধ্যে কলকাতায় অনেক জল বয়ে গেছে। নাপিত-বৌয়ের জন্য এখন কারো খুব একটা মাথাব্যথা নেই। নিজের চুল এখন নিজেই সবাই গুছিয়ে নেয়। চুলের আয়তনও কমেছে অনেক। চুলের মধ্যে কিশিদার অন্ধকার নিশার সন্ধান মেলা ভার।

রেওয়াজটা সেদিনও ছিল। শহরের মেয়েদের চুল কাঁধ অবধি এসে ঠেকলো। কেশের সমাপ্তি ঘটলো। চালু হলো ববছাঁট। ছোট চুলে তো বিনুনি বা খোঁপা হয় না। তাই সে পাট উঠেই গেল। নিজের চুল এবার নিজেই পরিচর্যা করা চলে। আর এবার তো চুল বাঁধার প্রশ্নই নেই। স্রেফ চুল আঁচড়ে নেওয়া অথবা ব্রাশ করে চুল সমান রাখা। এতদিনের মা-ঠাকুমার সংস্কার যেন নিমেষে মিথ্যে হয়ে গেল। ঘরসংসারের অকল্যাণ বা ভূতপেত্নীর ভয়ে তাঁদের বুক একটুকু কাঁপলো না। ছোট ছোট চুল খোলামেলা রেখে দিব্যি তারা চলাফেরা করতে লাগলো। আর ববছাঁটের এটাই তো বৈশিষ্ট্য।

শহরে শহরে শুরু হয় ববছাঁটের ঢেউ। আর চুলের ফ্যাশন বলতে তখন এটাই সকলের ধ্যানজ্ঞান। এতে একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, যাদের মাথায় এমনিতেই কম চুল তারা ভাবনামুক্ত হলো। আর চুল যাদের আজানুলম্বিত তারা আগলে রইল! পুরনো পথ। তারা তেমনি চুল আঁচড়াতো, মাথায় তেল দিতো। সবশেষে খোঁপা বাঁধতো। কিন্তু এই রেওয়াজ ক্রমেই অপ্রচলিত হয়ে আসছিল। তাছাড়া চুলে তেল দেওয়াও যেন পুরনো ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল। চুল ফোলানোর জন্য ব্যবহার শুরু হলো শ্যাম্পুর। নাপিতবৌয়ের পাট একরকম চুকেই গেল।

হালফিলে ঘটনার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। স্রোত এবার ভিন্নমুখী। ববছাঁট অন্তিম নিশ্বাস ফেলেছে বলা চলে। কাঁধের উপর চুল রাখা এখন অনেকটা সেকেলে ফ্যাশান। কেউ কেউ এ ফ্যাশানে আঁকড়ে আছে। সত্যি কিন্তু তারাও নতুন কথা ভাবছে। ইতিমধ্যেই নতুনের ধাক্কা এসেও গেছে। পশ্চিমে হিপির আবির্ভাব থেকেই নতুনতর ফ্যাশানের সূচনা। চুল এবার কাঁধের কিছুটা নীচে নেমেছে। তবে চুল বাঁধাছাঁধা নয়। স্রেফ এলো করে ফেলে রাখা। অনেকেই এই ফ্যাশানে বিশ্বাসী। তারা চুল বাঁধে না। সযত্ন প্রয়াসে চুল কাঁধের নীচ পর্যন্ত ফেলে দেয়। তেলের ব্যবহার তারা পরিহার করেছে। শ্যাম্পু আর ক্রীমের দৌলতে চুলকে করে তোলে বাহারী। আয়না, চিরুনি আর ব্রাশের ব্যবহার যথারীতি আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এ যেন অযত্নলালিত ফসল। কেয়ারলেস বিউটি। আসলে কিন্তু তা নয়। এ হলো পুরোপুরি কেয়ারফুল কেয়ারলেস।

এই হলো চুলের হালফ্যাশান। এরই পাশাপাশি আবার খোঁপা বাঁধার প্রবণতাও বেড়ে চলেছে। পালে, পার্বণে এবং নানা অনুষ্ঠানে এরাই আবার মাথার বিরাট খোঁপা নিয়ে হাজির হয়। কাঁধের নীচ অবধি চুল যেন কোন মাজকদমবলে আজানুলম্বিত হয়ে পড়ে। চুলের ফ্যাশান করতে গিয়ে এখনকার তারা শুধু নিজের চুল নয়। বাজারে প্রচুর পরচুলা পাওয়া যাচ্ছে। ইচ্ছেমত এবং মনোমত। এককালে শুধু যাত্রা-থিয়েটারেই পরচুলার ব্যবহার হতো, সে ধারার পরিবর্তন ঘটেছে কোন অদৃশ্য যাদুকরের মায়ামন্ত্রে। এখন তা উঠে এসেছে ফ্যাশানবিলাসীদের মাথায়।

আরো একটা সুরাহা হয়েছে যে, খোঁপা করার জন্য এখন আর নাপিতবৌ বা আর কারো দ্বারস্থ হতে হয় না। একেবারে তৈরি খোঁপাই কিনতে পাওয়া যায় বাজারে। হরেকরকম খোঁপার সমাবেশে চুল বাঁধার ভাবনাই মিটে গেছে। আর একটা লক্ষণীয় ব্যাপার যে, এসব খোঁপার মধ্যে অধিকাংশ হলো ভারতীয়। আসলে, খোঁপার ব্যাপারটাই হলো একান্ত আমাদের নিজস্ব। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে ছড়িয়ে আছে তার অসংখ্য নিদর্শন। অজন্তা, ইলোরায় কিছু কিছু নিদর্শন এখনো আছে। খোঁপা বাঁধায় আমাদের পুরনো ঐতিহ্য এমনি করেই আবার ফিরে আসছে।

ইদানীং শহরেও গড়ে উঠেছে একাধিক কেশ বিন্যাসের প্রতিষ্ঠান। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দু'ধরনের কেশবিন্যাসই তারা করে। তবে প্রাচ্য এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় খোঁপার দিকেই সকলের ঝোঁক। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার বিয়ের কনে সাজানোর দায়িত্ব পর্যন্ত নেয়। চুল বাঁধা থেকে শুরু করে কনের সমস্ত সাজসরঞ্জাম দায়িত্ব তাদের। তাছাড়া এমনিতেও অনেকেই এসব জায়গায় খোঁপা বাঁধাতে আসে। মাঝে মাঝে এরা কেশসজ্জার প্রদর্শনীও করে। এমনি এ প্রদর্শনীতে হাজির ছিলাম। যেসব খোঁপা সেখানে দেখানো হলো তার সবই ভার ঐতিহ্যআশ্রিত। প্রাচীন মন্দিরগাত্র স্থাপত্যনিদর্শন থেকে সংগৃহীত। সজ্জার ব্যাখ্যার ভাষ্যকার জানালেন খোঁপার ভারতীয় ঐতিহ্যই দেশবি প্রসার লাভ করেছে এবং দেশকালের তা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। মূলে তা ভারতীয়।

কেশসজ্জা দেশের গণ্ডী পে বিদেশেও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। দশ আগে লেপজিগে একটি কেশসজ্জার বসে। নানা ধরনের পাশ্চাত্য খোঁপায় অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে মনোরম। ত থেকে প্রতি বৎসর এই কেশসজ্জার বসছে। পোল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মান, রুমা রাশিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভা বুলগেরিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার নিধিরা এবারের অনুষ্ঠানে অংশ কেশসজ্জার এই আসর বসে মস্ অনন্যসুন্দর এই প্রতিযোগিতায় প্রথম অধিকার করে মস্কো-সুন্দরী।

এভাবেই কেশবিন্যাসে খোঁপা দেশবিদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে। আশা করা এই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে খোঁপার প্রচলন বেড়ে যাবে। কুঁচবরণ কন্যা আবার মেঘবরণ চুলে দিনের শেষে তেল চিরুনি চালাবে আর সুন্দর করে বেঁধে আয়নায় বারবার নিজেকে দে অনেকদিন পর আবার নিজেকে নতুন আবিষ্কার করার আনন্দে বিভোর হয়ে

—প্র

# এবার পুজোয়-নিউইয়র্ক

আমরা এবার শারদীয়া উৎসবের ক্ষণটুকুকে হারিয়ে যেতে দিইনি—এবার আমরা মিলেছি সবাই, মিলেছি পুজোপ্রাঙ্গণে—নিউইয়র্কে বিশ্ববিখ্যাত কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে।

শারদীয়া উৎসবের ক্ষণটুকুকে হারিয়ে যেতে দিইনি—এবার আমরা মিলেছি সবাই, মিলেছি পুজোপ্রাঙ্গণে—নিউইয়র্কে বিশ্ব-বিখ্যাত কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে।

পুজোতে ছুটি ছিল না এবার। কিন্তু দেখেছি বাঙালীর সেই চিরপরিচিত উন্মাদনা, সেই ছোট্টবেলার প্রতিমাদর্শনের যে আকর্ষণ তা দীর্ঘ প্রবাসবাসে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, তাই অনেক অনেক দূরের থেকেও কাজের শেষে ক্লান্ত বাঙালী এসে মিলেছে পুজোপ্রাঙ্গণে—বাকসবন্দী ধুতি পাঞ্জাবীগুলোর এতদিনে মুক্তি মিলেছে।

অনেক মেয়েই সারাদিন উপবাসী থেকে অঞ্জলি দিয়েছে। ছোট ছোট শিশুর দল নতুন জামাকাপড় পরে হৈচৈ করেছে। অনেকেই দেখছে তাদের জীবনের প্রথম পুজো। তারা বুঝতে পেরেছে তাদেরও একটা নিজস্ব উৎসব আছে—জেমস, হেনরীদের খ্রীষ্টমাসের মত। নিজেদের গর্বিত মনে করেছে।

অনেক প্রবাসী যাঁরা প্রায় মার্কিনী হয়ে গেছেন, তাঁদেরও দে বহুদূর থেকে পুজোয় যোগ দিতে—ছেলেমেয়েরা, যারা বাংলা বোঝে না, প্রতিমার রূপ বুঝিয়ে দিতে।

আমি নিউইয়র্কে থাকি না, তিরিশ মাইল দূরে, আমি পুজোর কিরিনি—কোন সাহায্যই করতে পা কিন্তু যখন মহাষ্টমীর পুণ্যক্ষণে সব সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে অঞ্জলির মন্ত্রো করেছি, তখন একবারও মনে হয়নি, পুজো আমার নয়। —এ পুজো বাঙালীর—সমস্ত ভারতীয়ের।

হাজার হাজার মাইল দূরে বিদেশী পরিবেশের কলাম্বিয়া ভার্সিটির আর্ল হল যখন ধূপের সৌ ভরে উঠেছে, লালপাড় শাড়ী পরে মহি পুজার কাজে ব্যস্ত, পুজারী মন্ত্রো করছেন নিষ্ঠার সঙ্গে তখন কখন অ চোখের কোনদুটো ভিজে উঠেছে ব পারিনি—জানি এ অশ্রু আনন্দের।

—দুর্গা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটু পরে হুড়মুড় করে অনেকে উঠল। সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে। কী বললেন মশাই? দুটো প্রসেশানের মধ্যে ঝগড়া বোমা ফাটাফাটি। পুলিশ কিছু লোককে গ্রেপ্তার করেছে। অনেকে দৌড়ে পালিয়েছে।

বিনয় প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। খপ করে একটা হাতল ধরে ফেললো। ট্রাম পুনরায় চলতে শুরু করেছে। ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার দমবন্ধ হয়ে আসছিল। মিছিলের শহর কলকাতা। কে বলেছিলেন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এই উক্তি একজন দেশবরেণ্য নেতার। আরও অনেক রকম উক্তি আছে কলকাতা সম্পর্কে। দূর! এসব আজেবাজে চিন্তা কেন সে করছে। শেফালীর হাসিমুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। ইস, দেরী হয়ে যাচ্ছে ফিরতে। বিমল, তুমি একটা আস্ত খচ্চর। আমাকে গ্যাস দিতে চেয়েছিলে। গ্যাসে ভুলছি না। বলে কিনা তুই আমাদের মত সাধারণ...। কী ভীষণ হীনমন্যতায় ভুগছে বিমল!

হঠাৎ খেয়াল হতে বিনয় দেখল ট্রাম ডানদিকে বেঁকে গ্রে স্ট্রীটে মোড় নিচ্ছে। বিনয় লোকজন ঠেলে এগোয়। কয়েকজন গরম গরম কথা বলল। কোন প্রতিবাদ না করে সে চলন্ত ট্রাম থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। প্রায় একটা স্টপেজ পেরিয়ে এসেছে। উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে সে। মানুষজন ক্ষেপে আছে। হঠাৎ যে-কোন বিষয় নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। ট্রামে বাসে ট্রেনে জনতার এই ক্ষিপ্ত চেহারা মাঝে মাঝে দেখে থাকে।

শোভাবাজারের মুখে একটা রিক্শায় চেপে বসে বিমল। রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলতে শুরু করেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই শেফালী সেজেগুজে তৈরী। কোন্‌দিকে যাওয়া যায় ওকে নিয়ে ভাবল বিনয়। গঙ্গার পাড় দিয়ে বেড়াবে। নাকি কোন সিনেমায় যাবে? ইভিনিং শো পাওয়া যাবে না। নাইট শো-তে যেতে পারে। দেখা যাক শেফালীর মনোভাব কিরকম।

আশেপাশে সুসজ্জিত দোকান। আলোয় ঝলমল করছে। রিক্শা গলির মধ্যে ঢুকল। ল্যাম্পপোস্টের কৃপণ আলোয় গলিপথ ছায়াছায়া ধোঁয়াটে। অনেকগুলি গুদাম পরপর। পরপর কয়েকটা লরি। মাল ওঠানামা হচ্ছে। কাঁচা পাটের গন্ধ। নাকে রুমাল চাপা দেয় বিনয়। প্রচুর হাওয়া। গঙ্গার দিক থেকে ভেসে আসছে।

বাড়ির সামনে রিক্শা থামলে ভাড়া মিটিয়ে তাড়াতাড়ি এগোয় বিনয়। তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠে।

ভেজানো দরোজা ঠেলে বারান্দায় পা দেওয়া মাত্র পল্টুর কান্না শুনতে পেল। রান্নাঘরের দিকে একবার উঁকি মারল। পিছন ফিরে মা বসে আছেন। উনুনে ভাত টগবগ করে ফুটছে।

—মা, পল্টু কাঁদছে কেন? বিনয় চৌকাঠের সামনে দাঁড়ায়।

—বায়না ধরেছে বৌমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। নীহার মুখ ফিরিয়ে হাসেন, ওর জন্যে কিছু ভাবিস না বিনু। আমি ওকে সামলাবো। তোরা বেরিয়ে পড়। এত দেরী হল কেন তোর?

মার হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিনয়। তাঁর মনোমত পাত্রীকে বিয়ে করার জন্যে খুব খুশি। পল্টু বড় দুষ্ট। মা কী পারবেন ওকে সামলাতে? নাকি পল্টুকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবে। মীরার এতক্ষণে ফিরে আসার কথা। রোজ কটায় ফেরে মনে পড়ছে না। মা এখনও নরম হননি। মীরাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। দু'জনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছে।

গম্ভীর চোখমুখে বিনয় শোবার ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে পল্টু কান্না থামিয়ে শেফালীর পিছনে মুখ লুকোয়।

পল্টুর মাথা নেড়ে শেফালী হাসিমুখে তাকায় বিনয়ের দিকে, কই বীরপুরুষ লুকোচ্ছ কেন! মামা কী বাঘ? শোন, পল্টু চলুক আমাদের সঙ্গে। তোমার এত দেরী হল কেন?

শেফালী এগিয়ে আসতে গিয়ে টের পেল শাড়িতে টান। ওরে দুষ্টু ছেলে! সে পিছন ফিরে দু' হাত দিয়ে জোর করে পল্টুর মুখ তুলে ধরে। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখমুখ মুছে দেয়।

—শুনে যা পল্টু। নরম হতে গিয়েও কণ্ঠস্বর শেষপর্যন্ত বিকৃত হয়ে ওঠে বিনয়ের।

আড়চোখে একবার বিনয়ের দিকে তাকায় পল্টু। এগোবে কি, ভয় পেয়ে দু'হাত দিয়ে শেফালীকে জড়িয়ে ধরে। তারপর ফুঁপিয়ে কান্না। ফুলে ফুলে ওঠে ছোট্ট নরম শরীর। বিনয়ের চোখমুখ আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। শেফালীর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। কি ভেবে সে পল্টুকে কোলে করে বাইরে যায়।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিনয় মাথা আঁচড়াল। তাপর পোশাক পাল্টাবার কথা ভাবল একবার। থাক দরকার নেই। আলনায় শাড়ি-ব্লাউজ-ধুতি। ঘরের গন্ধ শুঁকল কিছুক্ষণ। ধবধবে বিছানা। টেবিলের উপর ফুলদানীতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। ধূপ জ্বলছে। এ কী তার ঘর? এত ছিমছাম ঘরে সে কী অস্বস্তি-বোধ করছে না!

—চল এবার বেরুনো যাক। শেফালী ওর খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। কপালে ছোট্ট সিঁদুরের টিপ। চোখে কাজল। হাসি হাসি মুখ। সেদিকে তাকিয়ে সব ভুলে যায় বিনয়। দু'হাত দিয়ে শেফালীকে জড়িয়ে চোখের উপর চুম্বন করল।

শেফালী চোখ বুজে স্বামীর কাঁধে মাথা রাখে কিছুক্ষণ। তারপর ব্যস্ত হয়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলে, ছাড়ো! মা এখুনি এসে পড়বে।

রাস্তায় পা দিয়ে বিনয় তাকায় শেফালীর দিকে, কোথায় যাবে?

—নিরিবিলি কোথায়ও চল। কাছাকাছি ওই তো একটা জায়গা।

গঙ্গার পাড় দিয়ে হাঁটতে থাকে ওরা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শেফালী একবার কেঁপে উঠল। শাড়ির আঁচল দিয়ে ভালভাবে শরীর ঢেকে মুখ টিপে হাসল, রাগ করেছো?

না। ছোট্ট ও সংক্ষিপ্ত উত্তর বিনয়ের। এক পলক শেফালীর হাসিমুখ দেখল। একটা ফুচকেওয়ালা। রীতিমত খিদে পেয়েছে। 'ফুচকা খাবে?' শেফালী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। দুজনের হাতে শালপাতা। গোটা আটেক খাওয়ার পর শেফালী হাত গুটিয়ে নেয়। পীড়াপীড়ি করল না বিনয়। সে পরপর খেয়ে চলে। হিসাব নেই ক'টা খেল। 'আর একটাও না।' ওর হাত থেকে শালপাতা ছিনিয়ে নেয় শেফালী। দাম মিটিয়ে দেয়।

অনেকটা পথ হাঁটার পর ওরা একটা গাছের নীচে পাথরের বেদীর উপর বসল। এদিকটা একটু নির্জন। আবছা অন্ধকার। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে দুজনে। আশে-পাশে লোকজন কম। নির্জনে মিলিত হবার বাসনায় আরও কয়েক জোড়া নরনারী এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। সামনে গঙ্গা। ঢেউ-এর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ওরা শুনতে পায়। মাঝে মাঝে সিটি বাজিয়ে স্টিমার যাওয়া-আসা করছে।

পটপট করে চীনেবাদামের খোসা ভাঙার শব্দ। অন্ধকারে ঝাপসা লাগছে ওকে। কেমন অপরিচিত মনে হয়। শেফালী আরও ঘন হয়ে বসল। স্পর্শের মধ্য দিয়ে শুধু টের পাওয়া যায় ওর অস্তিত্ব। নইলে কখন যে ছিটকে দূরে চলে যাবে!

শেফালীকে সামান্য কাছে টানল বিনয়। বলল, কী ভাবছো? নাকি গঙ্গার সৌন্দর্যে তন্ময় হয়ে ভুলে গেছ আমাকে।

আবছা অন্ধকারে ও দেখতে পেল কারা যেন এদিকে আসছে। শেফালী একটু সরে বসে। স্তব্ধতাকে খানখান করে ভেঙে মালবোঝাই লরি ছুটছে। কয়েকটা লোক শিস দিতে দিতে চলে যায়। একটু পরে ওদের বিশ্রী হাসির শব্দ ভেসে আসে। তখন গাছের ডালে কয়েকটা পাখি অশান্ত-ভাবে পাখা ঝাপটায়।

—চল, বাড়ি ফিরি।

—ভয় পেলে শেফালী!

—না। মুচকি হাসল শেফালী, আমার শুধু ভয় তোমাকে!

বড় রাস্তায় আলোর মধ্যে এসে দাঁড়াল ওরা। শেফালীর দিকে আড়চোখে তাকাল বিনয়। আমাকে ভয় শেফালীর! হাসি পায় বিনয়ের। কীসের ভয়?

শেফালীর আহত কণ্ঠস্বর, তুমি সব সময় এত কী ভাব? না, হেঁয়ালী কথা-বার্তা বলো না। আমি কিছুটা বুঝতে পারি।

বিনয়ের অস্বস্তি আরও বেড়ে যায়। এত তাড়াতাড়ি সে সবকিছু বুঝতে দিতে চায় না। বেশ জোরে হেসে ওঠে সে।

—শিক্ষিতা মেয়ে, সব বুঝবে বৈকি!

বাড়ি ফেরা পর্যন্ত বাকি পথ বিনয় অনর্গল কথা বলে। শুনতে শুনতে দু' চোখ বড় হয়ে ওঠে শেফালীর। ভাড়া বাড়িতে চিরকাল থাকা যায় না। শেফালীর রেজাল্ট বেরোলে, পাশ তো নির্ঘাৎ করবে, মফঃস্বলে কোন স্কুলে একটা কাজ জুটে যাবে। তারপর টাকা জমিয়ে কয়েক বছর পর শহর থেকে দূরে ছোট্ট একটা বাড়ি। সুন্দর একটা বাগান। বাড়িটা হবে স্টেশনের কাছে। হুইশেলের শব্দে ভোর-বেলা ঘুম ভাঙবে। চোখ মেলে ভোরবেলা পাখির কিচিরমিচির ডাক, নরম রোদ, সবুজ গাছপালা যেন দেখা যায়। ক্রমশ কলকাতা বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে। সকাল সন্ধ্যা ধোঁয়া, ছত্রিশ ফ্ল্যাটে কয়েকশো লোকের গরম নিঃশ্বাস, হৈ-হট্টগোল, জল তোলা নিয়ে কুৎসিত কলহ, অনেকের অযাচিত আলাপের আগ্রহ ইত্যাদি।

—থাম! মৃদু ধমক দিয়ে শেফালী অদ্ভুত মুখভঙ্গি করল, আমি মাস্টারী নেব কোন দুঃখে।

—সে কী! বিনয় হতভম্বের মত তাকায়। এতক্ষণ তবে কী বোঝাল শেফালীকে। বিয়ের আগে কতদিন বলেছে পাশ করতে পারলে চুপচাপ ঘরে বসে থাকবে না। কাজকর্ম করবে। এখন উল্টোসুরে কথা বলা কেন! বিশ্বাস হচ্ছে না ওর কথা। নিশ্চয়ই পরিহাস করছে। ব্যাপার কি? মিটমিট করে হাসছে কেন শেফালী।

ভ্রূ কুঁচকে বিনয় বলল, তোমার মতল[illegible] কী শেফালী? মাস্টারী করবে না, ত[illegible] করবে কী?

—কী করবো মানে! শেফালী রীতিম[illegible] অবাক, আমি ঘরের বউ। সংসারের কাজক[illegible] করবো। মার সেবা করবো। কত কা[illegible] সংসারে তুমি তার কী বুঝবে। এমন ন[illegible] নয় যে, আমি কাজে না বেরুলে হাঁ[illegible] চড়বে না।

বিস্ফারিত চোখমুখে তাকায় বিনয়[illegible] না, রীতিমত গম্ভীর চোখমুখ শেফালীর[illegible] রাগ বা বিরক্তি কোন কিছুই অনুভব কর[illegible] না সে। নীরবে সিঁড়ি ভেঙে উপ[illegible] উঠতে থাকে। কিছু বলার নেই। প[illegible] আলোচনা করা যাবে। জোর জবরদস্তি[illegible] চলে না। বলা যায় না তোমাকে[illegible] মাস্টারীতে নামতেই হবে। সেটা হ[illegible] দৃষ্টি কটু। ওর বাবা মা অন্য রক[illegible] ভাবতে পারে। শেফালীই বা ভাববে কী[illegible]

বারান্দায় চৌকির উপর বসে নীহা[illegible] চোখ বুজে জপ করছেন। মীরার ডাকে[illegible] শেফালী হাসিমুখে ওঘরে যায়। বিন[illegible] শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ঘ[illegible] ঢোকার আগে অস্ফুটস্বরে ডাক শুনত[illegible] পায়, বিনু!

এ কী! বিনয় বারান্দার আবছা[illegible] আলোয় দেখল মার চুপসে যাওয়া মু[illegible] ঝুলন্ত চোয়াল, দু'চোখে জলের ধারা[illegible] শব্দহীন।

—কী হলো? বিব্রত অসহায় বিন[illegible] চৌকির একধারে বসল।

—আমাকে তুই কোন তীর্থস্থানে[illegible] পাঠিয়ে দে বিনু। দিনরাত অপমানে[illegible] মধ্যে আর থাকতে পারছি না!

—চুপ কর মা! দোহাই কান্না বন্ধ কর[illegible]

শোবার ঘরে পালিয়ে এল বিনয়[illegible] পোশাক পাল্টে বাথরুম থেকে মুখ ধু[illegible] আসে। ওঘরে হাসি-ঠাট্টা চলছে[illegible] বারান্দায় নীরবে অশ্রুপাত করে চলেছে[illegible] মা। শেফালী স্পষ্ট জানিয়েছে পাশ করা[illegible] পর মাস্টারী করবে না।

খানিকক্ষণ পায়চারী করে নানারকম[illegible] চিন্তায় সময় কাটিয়ে দিল বিনয়। খাটে[illegible] উপর এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে ধুতি[illegible] পাঞ্জাবী চাদর। শেফালীর পাত্তা নেই[illegible] এত কী গল্প! মা কী একটু মানিয়ে চলতে[illegible] পারেন না? মীরা সব সম্পর্ক ত্যাগ করছে[illegible] না কেন রজতদার সঙ্গে? ডিভোর্স করু[illegible] সত্যি এভাবে কতদিন চলবে। মনের দিক[illegible] থেকে শুধু অস্বীকার করলেই চলবে না[illegible] আইনের কথাও ভাবতে হয়। রজতদা[illegible] ধূর্ত, বুদ্ধিমান। সহজে রেহাই দেবে না[illegible] মীরাকে। দু' একদিন ভেবেছে এ সম্পর্কে[illegible] রজতদার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা[illegible] করবে। পরক্ষণেই মনে হয়েছে মীরার[illegible] কথা। ওর কথাও ভাবতে হয়। অন্যের[illegible] স্বাধীনতায় সে হস্তক্ষেপ করতে চায় না[illegible] কারণ যাই থাক না কেন।

—দাদা, খেতে এসো।

বিনয় নীরবে খেয়ে উঠে পড়ে। মীরার উসখুস ভাব নীরবে লক্ষ্য করেছে। অন্য-

দিন হলে হাসি-ঠাট্টা চলত। আজ ভাল লাগছে না। বারবার মার অশ্রুসজল মুখ মনে পড়ছে। কাউকে সে অপরাধী ভাবছে না। দিন দিন সংসারে বিশৃঙ্খলা অশান্তি বেড়ে চলেছে। সেটা তার ভীষণ অপছন্দ।

মার সেবা করছে শেফালী। একপলক চেয়ে দেখল সে। চোখাচোখি হতে শেফালী মুখ টিপে হাসল। বিনয় হাসল না। বরং গম্ভীর মুখে শোবার ঘরে চলে এল।

—দাদার কী হয়েছে বল তো? গম্ভীর মুখে খেয়ে উঠে গেল। একবার আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

—কে জানে! শেফালী বেপরোয়া হতে চাইল, তোমার দাদাকে আমি ভাই ঠিক বুঝতে পারি না।

মীরা চোখ ছোট করে হাসল, তবে ছাই এতদিন কী প্রেম করলে! তোমার কপালে দেখছি অনেক দুঃখ। ওকি বৌদি! না, সেটি হবে না। সব ভাত খেয়ে তবে উঠতে পারবে। ব্যাপার কি। রেস্টুরেন্টে খুব খেয়েছো বুঝি—

—পেট ভরে খেয়ে এসেছি। বেশ জোরে হাসল শেফালী, মাইল দুয়েক গঙ্গার পাড় দিয়ে হাঁটা। ফুচকা আর চানেবাদাম। প্রচুর গঙ্গার হাওয়া। ওই খেয়েই পেট ভরেছে।

খাওয়ার পর বাসনে হাত দিতে গেলে তেড়ে এল মীরা, রেখে দাও। তুমি মুখ হাত ধুয়ে চলে যাও। নীচু গলায় বলল, দ্যাখ

৫৪৮

সে, দাদা অশান্তভাবে খাটের এপাশ ওপাশ করছে। তাড়াতাড়ি যাও। আর ঢং করে দাঁড়িয়ে থেক না।

—কী অসভ্য! শেফালী লজ্জায় আর দাঁড়াতে পারে না। মুখে হাত চাপা দিয়ে ঘুরে ঘরে ফিরে দেখল বিনয় টেবিল ল্যাম্পের সামনে গম্ভীর মুখে অধ্যয়নরত। সন্তর্পণে খিল এঁটে পায়ে পায়ে পিছনে এসে দু' হাত দিয়ে চোখ টিপে ধরল।

সারা ঘর নরম আলোয় স্নিগ্ধ মনোরম। শেফালী অস্ফুটস্বরে ডাকল, শুনছো। ঠিক হয়ে ঘুমোও।

—লাগছে তোমার?

—না। বাইরে যাবে না?

—চল।

শেফালী দু' হাত দিয়ে মৃদু ঠেলে বিনয়কে সরাতে পারল না।

।। সাত ।।

অফিসে ঢোকার মুখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল মীরা। খানিকটা দূরে ফুটপাত ঘেঁষে একটা ট্যাক্সীর মধ্যে মুখ বের করে বসে রজত। চোখাচোখি হল একবার। মীরার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। কোন দিকে না তাকিয়ে প্রায় ছুটে যায় লিফটের দিকে। সেখানে দশ বারজনের পিছনে দাঁড়ায়। কিন্তু এক মুহূর্ত কি ভেবে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে থাকে। চার দেয়াল ঘেরা ঘরে আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কেননা পিছনে এক অবাঞ্ছিত বিভীষিকা। তাকে একা পেলে হিংস্র নখ বের করে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ঘরে ঢুকে মীরা ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে। বুকের ভিতর কী প্রচণ্ড কাঁপুনি! এক গ্লাস জল খেয়ে অস্ফুট স্বরে স্বগতোক্তি করল, আঃ বাঁচলাম! তারপর কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়। মেসিন পরিষ্কার করে ডিকটেশনের খাতা ওল্টায়। দু' তিনখানা ছোট চিঠি টাইপ করার আছে। ডিরেক্টার মিঃ কাপুর আসার আগে রেডি করে রাখতে হবে।

সুইং ডোর খুলে বাইরে এল সে। যে-যার কাজে ব্যস্ত। তবু কয়েকজন আড় চোখে তাকাল। অধিকাংশই পুরুষ কর্মচারী। মেয়ে করণিক মাত্র দুজন। এরই মধ্যে এদের সঙ্গে বেশ খাতির হয়ে গিয়েছে। টিফিনের সময় সবাই এক সঙ্গে ওর ঘরে এসে জমায়েত হয়। হাসি ঠাট্টা গল্পে সময়টা ভালই কাটে।

বাথরুম থেকে চোখ মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এল মীরা। ঘরে ঢোকার আগে দেখল দূর থেকে বাঁধু ওর দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটছে। ম্লান হেসে সে সুইং-ডোর ঠেলে ভেতরে ঢোকে। মেসিনের সামনে বসে ডিকটেশনের পাতা ওল্টায়। বেশ আছে বাঁধু। বীথিকা মণ্ডল। লম্বা ছিপছিপে একহারা চেহারা। গায়ের রং কালো। নাক চোখ মুখ প্রায় নিখুঁত। ভালই লাগে দেখতে মেয়েটাকে। ওরই সমবয়সী।

হ্যাঁ, বাঁধুর আর কি! ওদের একটা ছেলে বাগিয়েছে—দু-দিন পর বিয়ে হয়ে যাবে। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। যেমন স্মার্ট তেমনি সুন্দর চেহারা। একটা ব্যাঙ্কের কাজ করে। শিগগির প্রোমোশান পেয়ে অফিসার হয়ে যাবে। ছি! নিজেকে ধমক দিল মীরা। সে কী প্রিয় বান্ধবীর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মীরা চমকে উঠল। এগারোটা বেজে গিয়েছে। মিঃ কাপুর হয়তো এসে গিয়েছেন। সই করার জন্যে চিঠিগুলি দিতে না পারলে... তাড়াতাড়ি টাইপ করতে সুরু করে। নতুন চাকরী। মাইনে ভাল। এক কথায় তিনশো টাকায় রাজি হয়েছেন। মিঃ কাপুর মধ্য-বয়স্ক। সুন্দর চেহারা। ভাল বাংলা জানেন। মনে পড়ল ইন্টারভিউ দিয়ে যোগ্য বিবেচিত হলে তাকে উদ্দেশ্য করে ডিরেক্টর বলেছেন, ভালভাবে যদি কাজ করেন তবে এখানে উন্নতির বেশ সুযোগ আছে। বে-সরকারী অফিস, এখানে এফিসিয়েন্সি বড় কথা মিস মিত্র।

মিস মিত্র! হ্যাঁ, এই পরিচয় তার অফিসে। সে তার পূর্ব ইতিহাস গোপন করেছে। কেউ জানে না। এমন কি বাঁধু পর্যন্ত। ইদানীং ভাবছে বাঁধুকে সব খুলে বলবে। আজকাল বাঁধু তার বাড়ি আসবার জন্যে যেভাবে পীড়াপীড়ি করছে ওকে সব কথা জানাতে হবেই। তাছাড়া বাঁধু সব দিক থেকে বিশ্বাসযোগ্য। সেও চায় এমন ঘনিষ্ঠ একজন বান্ধবী যাকে নির্ভর করা চলে, যার কাছে চোখের জল ফেলে মন প্রাণ হাল্কা করা যায়।

বারবার টাইপে ভুল হয়ে যাচ্ছে। মীরা রেগে কাগজ মেসিন থেকে তুলে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারে। আবার নতুন কাগজ মেসিনে চাপায়। খটখট শব্দে মেসিন চলে। ওই লোকটাকে দেখা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। নানা ধরনের দুশ্চিন্তা এসে উঁকি মারছে। রজতকে বিশ্বাস নেই। ওর দ্বারা সব সম্ভব। তাহলে গোপনে গোপনে সব খবর রাখছে তার। নইলে এই অফিসের ঠিকানা পেল কিভাবে। বোধ করি সর্বত্র তাকে অনুসরণ করছে। পাকা গোয়েন্দার মত পিছনে এঁটে রয়েছে। কিন্তু কেন?

কেন তার পিছনে লেগে থাকা! মীরার মুখ চোখ শুকিয়ে যায়। সে ভালভাবেই চেনে রজতকে। এত সহজে কী নিষ্কৃতি দেবে? অতিষ্ঠ করে তুলবে সমস্ত জীবন। চলে আসলে কি হবে, ওই লোকটার দু' চোখে প্রতিহিংসার আগুন দেখেছে তাকে পুড়িয়ে ছারখার না করা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই!

স্পষ্ট বুঝতে পারছে মীরা, আসলে রজত কী চায়। সে ফিরে যাক এই চায় রজত। নইলে সহজভাবে ওকে বাঁচতে দেবে না। ছায়ার মত পিছনে লেগে থাকবে। বলা যায় না কখন কোন্ দিক থেকে ওর আক্রমণ

জানতে পারে। ওর নতুন এই অফিসেও হানা দিতে জেনে যাবে আসল পরিচয় করেছে। তার স্বামী পুত্র কুমারী পরিচয় দিয়ে চাকরী মিথ্যা পরিচয়ে চাকরীতে ঢুকেছে। করেছে অফিসকে। ফলে নির্ঘাৎ তা যাবে।

ঘেমে উঠল মীরা। আর সে পারছে না। মেসিনের উপর মাথা অবরুদ্ধ কান্নাকে প্রাণপনে চেপে ঘরে বাইরে যুদ্ধ করতে করতে সে ক্ল মার সঙ্গে রোজ কলহ আর ভাল না। কিছু বুঝবেন না। বোঝাবার অ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। বুঝবে না তার নিজেরও পছন্দ-অপ বলে একটা ব্যাপার আছে। রজত বোঝে মা বুঝতে চান না। রজত চেয়েছিল বুজে সে সর্বকিছু সহ্য করবে। সব বেলেল্লাপনা সহ্য করে ওর সেবায় জ উৎসর্গ করতে হবে! এই ছিল রজ দাবী। এখানে ভালবাসা কোথ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা কোথায়?

পল্টু সোনা মানিক আমার! সকালে অফিসে আসার সময় বায়না ছিল ওর সঙ্গে আসবে। কোন কথা শু না। 'মামণি আমাকে তোমার সঙ্গে চল। তুমি রোজ কোথায় যাও?' আর করে তাকিয়ে দেখেছে ওর সাজগোজ। দু' চোখে অসংখ্য প্রশ্ন। কচি কচি দু' দিয়ে শাড়ি আঁকড়ে ধরেছে। অফিস কি, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে মীরা অস্থির। এই ছেলেকে ঘিরেই তার জীবন। নতুনভাবে বাঁচবার স্বপ্ন ওই ছে কথা ভেবে।

এখনই অনেক কিছু বুঝতে শি ছেলেটা। ওর কানে মা কী মন্ত্র দেন জানে। নইলে ও-সব কথা ওইটুকু বলে কিভাবে। 'কোথায় আমার বাবা-মা-মণি, আমি তার কাছে যাব। তুমি বিচ্ছিরি খারাপ!' আরও অনেক কথা এভাবে ছেলেটাকে বিগড়ে দিচ্ছেন কেন এই শত্রুতা তার সঙ্গে? তোমার ক্ষতি করেছি মা! আমার ভাল তে দেখতে হবে না। শুধু আমাকে দাও। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

—দিদিমণি। বড় সাহেব ডাকছেন।

তাড়াতাড়ি মাথা তুলে সোজা হয়ে মীরা। বেয়ারার দিকে না তাকিয়ে ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। বলে ফাইলের মধ্যে চিঠিপত্র গুছিয়ে তারপর বটুয়া খুলে ছোট্ট আয়নায় মেকআপ করে। ঠোঁটে মৃদু লিপ ঘষে। প্রথমদিন অফিসের সাজগোজ মা চিৎকার করে উঠেছিলেন। অশ্রাব্য করেছিলেন। সেসব ভেবে আপনমনে হেসে সে সুইংডোর ঠেলে বাইরে আসে।

মাথা নীচু করে মিঃ কাপুর ফাই উপর ঝুঁকে। হাতে জ্বলন্ত সিগা বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। এ

...লুকিয়ে যেত মীরার। ...ার পর সহজ স্বাভাবিক ... অবশ্য বড় সায়েবের আন্ত- ...ার জন্যে দায়ী। কাজকর্মে ...লে দুটো কথা না বলে বুঝিয়ে ...চ শুনেছে বড় সায়েব বেশ কড়া।

...ন। এক মিনিট। বলে আবার ...ব যান ফাইলের মধ্যে।

...ব রেডি আছে। শুধু একটা চিঠি হয়নি। মীরা খানিকটা অস্বস্তি-করল। হয়তো কিছু বলবেন না বড় ...য়েব। তবু এ তার গাফিলতী। দেড় ...টায় তিনখানা ছোট্ট চিঠি টাইপ হওয়া ...চিত ছিল। খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে মনটা। ...অফিসটা ভাল। মেয়েদের কাজ করবার ...ত উপযুক্ত পরিবেশ আছে। কত কী ...নেছে। অফিসার মহল সম্পর্কে একটা ...ভীতির ভাব ছিল। কখন কী হয় বলা ...য় না। মেয়েদের বিপদ নানাদিক থেকে। বিশেষ করে যার দেহ লোভনীয়, চেহারা সুন্দর—তাকে উত্যক্ত করার জন্যে কী কেরাণী কী অফিসার, চেষ্টার ত্রুটি কেউ করবে না!

মনে মনে সে শ্রদ্ধা করে মিঃ কাপুরকে। অন্যরকম হলে টের পেত। লোভী পুরুষ-দের আচার আচরণ সহজেই ধরা পড়ে। এরকম একজন সজ্জন অফিসার পেয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। নইলে জ্বালা যন্ত্রণা আরও বাড়ত। একেই তো নানাভাবে জর্জরিত।

চিঠি সই করতে করতে মিঃ কাপুর এক-পলক তাকিয়ে ফের চোখ নত করে বলেন, আপনার শরীর কী ভাল নেই মিস মিত্র?

ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে মীরার মুখ। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নম্র সুরে বলল, ধন্যবাদ। আমি ভাল আছি স্যার। শুধু একটা চিঠি টাইপ হয়নি। এখুনি হয়ে যাবে।

—ডিকটেশন নিন। স্বল্পভাষী মিঃ কাপুর ফাইল দেখতে থাকেন।

পরপর অনেকগুলি ডিকটেশন নিয়ে মীরা নিজের কামরায় চলে আসে। গত-কালের চিঠিটা টাইপ করতে সুরু করে। টিফিনের সময় হয়ে এল। একটু পরে ওরা এসে পড়বে। ওদের সঙ্গ আজ তার ভাল লাগবে না। সে একটু নিরিবিলি থাকতে চায়। বীথুকে একা পাওয়া দরকার। আর কাউকে নয়।

ডিরেকটরের ঘর থেকে চিঠি সই করিয়ে নিয়ে আসে। ঘরে ঢোকামাত্র বীথু তেরচা চোখে তাকিয়ে বলল, ঘন ঘন ওঘরে যেয়ো না। কোনদিন লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে...ও একটা বাঘ!

—চুপ কর! বিরক্তি চাপা থাকে না মীরার কণ্ঠে, কী যা তা বলছিস। তোদের মন নোংরা হয়ে গেছে।

বীথু আর সীমা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। সীমা ওদের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। বিবাহিতা। বছর পাঁচেকের একটা মেয়ে আছে। বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা। ইদানীং মেদ বৃদ্ধি হচ্ছে।

ঘরে নিস্তব্ধতা। একটু পরে মীরার মনে হ'ল হাসি মুখেই ওদের সঙ্গে কথা বলবে। নিজের অশান্তি যতই হোক বাইরে হাসিমুখে সৌজন্য প্রকাশ করতে হবে। নইলে এরা ভাববে কী।

টিফিনের কৌটো খুলে একটা সন্দেশ এগিয়ে নিয়ে বলল, নে ধর। রাগ করিস না বীথু। মনটা বিশেষ ভাল নেই। সীমাদি, তোমাকে দুটো লুচি দেব।

—বীথুকে সন্দেশ আর আমার বেলায় আটার লুচি। হাসল সীমা, তোমার প্রাণের সই বীথু, সেটা কী এভাবে প্রকাশ করতে হয়!

—সই না ছাই! ঠোঁট উল্টে বীথু বলল, সব বাইরে বাইরে। যা চাপা মেয়ে, ভেবেছো কোন কথা বলে আমাকে।

ঝগড়া বেধে যায় দুজনের মধ্যে। সীমার মধ্যস্থতায় আবার ঝগড়া থামে। একটু পরে বেশ গাল গল্পে মেতে ওঠে ওরা। অধি-কাংশ আলোচনা অফিস কর্মীদের ঘিরে। বিশেষ করে অল্প বয়স্ক দুজন যুবক সহ-কর্মীকে ঘিরে রসাল আলাপ। বীথুর কথাবার্তার ধরন দেখে ওরা খুব হাসে। নকল করতে ওস্তাদ বীথু।

অন্যমনস্ক থাকে মীরা সব সময়। মাঝে মাঝে বীথুর প্রশ্নে চমকে যায়। ও কিছু নয়। কেন মন খারাপ? এড়িয়ে যায় সে। অন্যপ্রসঙ্গ তোলে। এভাবে টিফিনের সময় পেরিয়ে যায়।

—ছুটির পর থাকিস। কথা আছে বীথু।

—আচ্ছা। ঘাড় কাৎ করে হাসে বীথু, খুব গোপনীয় বুঝি?

ওরা বেরিয়ে গেলে কাজে মন দিল মীরা। সমস্ত চিঠি আজ রেডি করে রাখতে হবে। কাজের মধ্যে আর বড় সায়েবের ঘরে ডাক পড়ে না। বীথুর যা কথা। বড় সায়েব নাকি বাঘ! হাসি পেল তার। হঠাৎ একটা কথা মনে হতে সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। মেসিনের উপর আঙুল থেমে যায়। অফিস ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে যদি রজতের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। এরকম সম্ভাবনা যে আদৌ হবে না কে বলতে পারে। ভীড়ের মধ্যে তার হাত চেপে ধরতে পারে রজত। যদি বলে, "ফিরে চল মীরা। তোমাকে ছাড়া আমার দিন কাটছে না।" তখন সে কী করবে? বীথু নিশ্চয়ই চোখ বড় বড় করে তাকাবে। বুঝতে চেষ্টা করবে ব্যাপারটা কী।

না, এতটা সাহস হবে না রজতের। হাত ধরা টরা...বলা যায় না, ওর দ্বারা সব সম্ভব। মীরা বাইরে বেরোয়। বাথরুম থেকে চোখমুখে জল ছিটিয়ে আসে। ফের চিঠি টাইপ করতে সুরু করে। এর একটা বিহিত করতে হবে। দাদাকে সব খুলে বলবে। দাদা কথা বলুক রজতের সঙ্গে। রজত কী চায় জানা দরকার। ডিভোর্সের প্রোপোজাল দাদা দেবে। এটাই ভদ্রসম্মত উপায়। রাজী হবে কী? বিশ্বাস করা শক্ত। তবে তুমি কী চাও? খুলে ব'ল রজত। মীরা চিৎকার করতে পারে না। গলা চিরে যায়। বিশ্রী একটা শব্দ হয়। অস্ফুট আর্তনাদের মত।

ছুটির পর দুজনে রাস্তায় বেরোল। মীরা তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। বিবর্ণ মুখে চারিদিকে তাকায়। বড় বড় এক একটা বাড়ি থেকে পিলপিল করে পিঁপড়ের সারির মত অসংখ্য নরনারী বেরিয়ে আসছে। বাস ট্রাম গিজগিজ করছে। কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল ওরা। সতর্ক দৃষ্টি ফেলে মীরা এগোয়। সঙ্গে বীথু রয়েছে সে খেয়াল যেন নেই।

—তুই অমন ছটফট করছিস কেন। বীথু অসহিষ্ণুভাবে ওর একটা হাত চেপে ধরল, খালি এড়িয়ে যাচ্ছিস মীরা। বল কী হয়েছে?

—কী আবার হবে। হাত ছেড়ে দে বীথু।

—এভাবে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছিস কেন। তোর গোপনীয় কথা এবার বল।

—এখন তোর কোন কাজ আছে বীথু?

—কেন? বীথু খানিকটা অবাক। আপাতত বাড়ি ফেরাই একমাত্র কাজ।

—তবে আমাদের বাসায় চল। কথা দেখা সব হবে সেখানে।

বীথু অনেক চেষ্টা করল কিন্তু মীরা কিছুতেই মুখ খুলল না। সেই এক কথাঃ বাড়ি গিয়ে সব দেখবি জানবি। রীতিমত রহস্য। পেট ফুলে যাবার জোগাড় বীথুর। ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া এখন কোন উপায় নেই। মীরা ভীষণ জেদী মেয়ে। ওকে মেরে ফেললেও এখন কোন কথা বের করা যাবে না।

—তোর 'ইয়ের' খবর কী!

—একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। বীথু সশব্দে হেসে ওঠে, আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, স্থির করেছি বিয়েটা তাড়া-তাড়ি করে ফেলবো।

—সেই ভাল। মীরা মৃদু হাসল, হাতের কাছে খাবার অথচ খেতে পারছি না—না ভাই এরকম অবস্থায় বেশিদিন থাকা যায় না। বল, ঠিক বলেছি কিনা।

—জানি না। উঃ আর কত হাঁটাবি! বীথু ক্লান্তস্বরে বলল, এখান থেকে বাসে উঠবো। ঠেলেঠুলে উঠতেই হবে।

মীরা বাধ্য হয়ে দাঁড়াল। দাঁড়াবার ইচ্ছা তার নেই। বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কে বলতে পারে কখন কী হয়। হয়তো ভীড়ের মধ্যে বাঘের মত ওৎ পেতে লুকিয়ে রয়েছে রজত। আবার বাঘ! প্রাণ-পণে হাসি রোধ করে মীরা। বীথুর দিকে তাকায়। সব জেনেশুনে তাজ্জব বনে যাবে। চোখ বড় বড় করে তাকাবে।

লোকজনের ধাক্কা গুঁতো খেয়ে দুজনে বাসে উঠল। রড ধরে কোনরকমে দাঁড়াল। বীথু মুচকি হাসছে। মীরার সমস্ত শরীর রী রী করে উঠল। কিছু বলার উপায় নেই। লজ্জার মাথা খেয়ে বললে হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসবে। 'অত স্পর্শকাতর হলে এই ভীড়ে উঠেছেন কেন! আপনার গায়ের উপর কী ইচ্ছে করে এসে পড়েছি।' সেই সঙ্গে সুরু হবে আরও নানারকম রসাল মন্তব্য। অর্থাৎ অপমানের চূড়ান্ত। অতএব মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি।

(ক্রমশঃ)

# ১৯৭০-এর ২৫শে নভেম্বর

২৫ নভেম্বর, ১৯৭০ তারিখটি বাঙলায় নাট্যজগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিতভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এইদিন সন্ধ্যায় নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর ৩৯।১এ, গোপালনগর রোডস্থ বাসভবনের দ্বিতলে তাঁর যে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা ছিল, সেগুলিকে বাঙলাদেশের নাট্যপ্রেমীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই উপলক্ষে শ্রীচৌধুরী সমবেত সুধীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বাঙলাদেশের মানুষ নাটক ভালোবাসে। নাটকের জন্যে এ-দেশে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। আমি জীবনের পথপরিক্রমায় লক্ষ্য করেছি, এ-দেশের তরুণ মনে প্রত্যাশায় দৃষ্টি। আরো লক্ষ্য করেছি, বাঙলায় উর্বরা মাটির মতো এ-দেশের তরুণ মনে অংকুরিত নাটকের নানা সম্ভাবনা। এই যে প্রত্যাশা, এই যে সম্ভাবনা, তা পূর্ণ হবার অবকাশ কোথায়? জাতীয় নাট্যশালা নেই, যেখানে গড়ে উঠবে নাট্যপীঠ। নাট্যচর্চার জন্যে আছে 'রবীন্দ্র ভারতী নাটক আকাদেমী', কিন্তু তার বাইরে নাট্যচর্চার আর কোন কেন্দ্র নেই। অথচ থাকা দরকার।' এই অভাববোধ দ্বারা শ্রীচৌধুরী পীড়িত হয়েছেন বলেই তিনি নাটক বিষয়ে সুষ্ঠু চর্চা ও গবেষণার জন্যে তাঁর নাট্যগ্রন্থাগারটিকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক পাঠাগার রূপে সকলের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন।

শ্রীচৌধুরী জানিয়েছেন, এই নাট্যপাঠাগারের পরিকল্পনা ছিল তাঁর পরলোকগতা সহধর্মিণীর। 'ব্যক্তিগত তাড়নায় একদিন আমি পুস্তক থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছুই সংগ্রহ করেছি আমার ব্যক্তিগত পাঠাগার এবং সংগ্রহশালায়। পরবর্তীকালে মনে হতো, এই সংগ্রহশালা পাঠাগারের ভবিষ্যৎ কী? আমি তো চিরদিন থাকবো না। তখনই আমার স্ত্রী বলেছিলেন, বাঙলাদেশে নাট্যপ্রেমীর অভাব নেই—এই পাঠাগার এবং সংগ্রহশালার ভবিষ্যৎ বাঙলাদেশের নাট্যপ্রেমীদের হাতে তুলে দিও। আজ বলতে দ্বিধা নেই—এই পাঠাগারের পিছনে রয়েছে আমার স্ত্রীর সেই অনুপ্রেরণা।'

পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ভারতের জাতীয় গ্রন্থশালার গ্রন্থাগারিক (ন্যাশনাল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান) স্বনামধন্য বেঙ্কটাদ্রি সামানা কেশবন। রৌপ্যনির্মিত নূতন কর্তনী (কাঁচি) দ্বারা লাল রেশমী ফিতাটিকে ছেদ করে পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটনের পরে সুসজ্জিত গ্রন্থশালাটিকে তিনি শ্রীচৌধুরীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নাটকের ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের ঐতিহ্য এবং অগ্রবর্তিতার কথা উল্লেখ করে অভিনেতারূপে শ্রীচৌধুরীর অসামান্য জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের কথা বলে বাঙলাদেশে নাট্যচর্চার জন্যে তাঁর এই পরিকল্পনা ও দানকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যাত করেন। পরে তিনি শ্রীচৌধুরীকে জানান যে, তাঁর সংগৃহীত প্রচারপত্রগুলি (হ্যান্ডবিল) এমনই সস্তা দরের কাগজে ছাপা, যা খুব বেশী দিন টিঁকে থাকবে না; সেই কারণে তিনি ঐ হ্যান্ডবিলের ফাইলগুলি ... কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেন, যাতে ... বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ... আয়ু যথেষ্ট বাড়িয়ে দিতে ... শ্রীকেশবন বলেন, এই হ্যান্ডবিলগুলি ... ইতিহাস রচনার জন্যে অমূল্য।

এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ... মধ্যে নাট্যকার মন্মথ রায়, অধ্যা... অজিত ঘোষ, সাংবাদিক মনুজে... প্রভৃতি শ্রীচৌধুরীর এই স্মরণীয় অ... জন্যে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। প... চট্টোপাধ্যায় দ্বারা ধন্যবাদ জ্ঞাপনে... এই অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়। উ... সুধীবর্গকে শ্রীচৌধুরী চা-জলখাবার... আপ্যায়িত করেন। এই ঐতিহাসিক ...ষ্ঠানটির চলচ্চিত্র গ্রহণ করেন ... সরকারের ফিল্মস ডিভিশন ও প... সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ ... এ ছাড়া কলিকাতা বেতারকেন্দ্র ... এই অনুষ্ঠানে শ্রীচৌধুরী ও শ্রীকে... বক্তব্য রেকর্ড করা হয়।

পাঠাগারটির পরিচালনার জ... 'অহীন্দ্র চৌধুরী ট্রাস্ট' গঠিত হয়েছে... শ্রীচৌধুরী ছাড়া আর যে চারজন ... তাঁরা হচ্ছেন শ্রীচৌধুরীর কন্যা ও ... —মীরা ও সন্তোষ বসু এবং ... ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপ... গীতা সেনগুপ্ত ও গণেশ মুখোপ... এই ব্যাপারে যে দলিলটি রেজেস্ট্রী ... হয়েছে, তাতে পাঠাগার পরিচালনা ... দুঃস্থ শিল্পী, নাট্যকার, কলাকুশ... সাহায্য দান প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত ... হয়েছে। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর ... সাধনা ও নাট্যোন্নতির জন্যে ... ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লি... থাকবে।

# জলসা

**আনন্দশঙ্কর রচিত অর্কেস্ট্রায় :** ইন্ডিয়া পেন্টিং কোম্পানী পরিবেশিত বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আনন্দশঙ্কর রচিত অর্কেস্ট্রা নতুন করে আমাদের আশ্বাস দিল যে শঙ্করদম্পতির আন্তর্জাতিক শিল্পখ্যাতি তাঁদের সুযোগ্য পুত্র আনন্দশঙ্কর হয়ত অনাহত রাখতে পারবেন।

বিদেশ থেকে ফেরার পর আনন্দশঙ্করের অর্কেস্ট্রার ডিস্ক এক ঘরোয়া সম্মেলনে আমাদের শোনানো হয়েছে। সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম, ভারতীয় রাগসঙ্গীতের সঙ্গে মাঝে মাঝে পপ সং এবং পরিবেশে এদেশ ও ওদেশের শিল্পীসহযোগে 'রঘুপতি রাঘব' গান দিয়ে সকল দেশের কলারসিকবৃন্দকে ভারতীয় ঐক্যবোধের পতাকাতলে মিলিত করবার মহৎ প্রয়াস লক্ষ্য করে।

এদেশে এসে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ নতুন এক শিল্পীগোষ্ঠী সহযোগে এক নতুন ঐকতান সঙ্গীত সৃষ্টিতে আনন্দশঙ্করের সংগীতচিন্তার আর একটি দিক প্রতিফলিত—পারিপার্শ্বিক ও যুগচেতনা সম্বন্ধে তাঁর সজাগ এবং সক্রিয় বোধশক্তি ও শিল্পীজনোচিত প্রকাশভঙ্গী।

প্রধানতঃ ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীত-গঠিত এই সঙ্গীত প্রথমে বসন্তমুখারী রাগভিত্তিতে ৭ মাত্রার তালে পরিবেশিত হয়। ভৈরবীর সঙ্গে শুদ্ধ গান্ধারের মাধুর্যে এই রাগের আবেদন শ্রোতৃচিত্তে ছড়িয়ে দেরী হয়নি। মূল ভাব তার সরস ... তায় পূর্ণ উদ্যমে ১৫ মাত্রার তালে ... যেয়ে চরমে পোঁছল উপসংহার ... এখানে বর্তমান যুগের নানান ... অস্থিরতা দিশেহারা হয়ে ছুটে ... আবেগ—কণ্ঠসঙ্গীত সঙ্গতে সুরের ... পড়া, আলোর জ্বলা ও নেভার মধ্যে ... এক ছবির মত দৃশ্যরচনা করেছিল। ছন্দের থমকে চলার পরই দ্রুতগতি প্রেক্ষাগৃহে এক উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ করে জানিয়ে দিয়েছে শঙ্করের 'শো-শিপ'-এর যথার্থ উত্তরসাধক হয়ে পেরেছেন তাঁর পুত্র আনন্দশঙ্কর। একটি অনুষ্ঠান ছিল উদয়শঙ্কর কালচ... সেন্টারের নৃত্যনাট্য 'চিদাম্বরম'। শ্রী...

কমলাশঙ্কর রচিত ও পরিচালিত এই নৃত্যনাট্যে সুমিত্রানন্দন পন্থের জীবনদর্শন এক কাব্যসুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কয়েক সপ্তাহ আগে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কেনেট বি কিটিং-এর সম্মানার্থে এই অর্কেস্ট্রার আয়োজন এবং অনুষ্ঠান শেষে কেনেথ আনন্দকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

**দুটি উল্লেখযোগ্য প্রভাতী আসরে :** সম্প্রতি একক সেতারবাদনের দুটি প্রভাতী আসরের মনোরম উপস্থাপনা মনে রাখবার মত।

একটি হোলো বসুশ্রী প্রেক্ষাগৃহে সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনের পক্ষ হতে নিবেদিত পদ্মশ্রী আব্দুল হালিম জাফর খাঁ ও সদাশিব পাওয়ারের সেতার ও তবলা, অন্যটি জলসাঘরের সঙ্গীতচক্র আয়োজিত আসরে মণিলাল নাগ ও পণ্ডিত কিষণ মহারাজের অনুষ্ঠান।

একজন ভারতবিখ্যাত স্বনামধন্য শিল্পী—অপরজন প্রায় প্রতিষ্ঠিত তরুণ শিল্পী মণিলাল নাগ। উভয়েই আপনাপন বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতার মানে প্রতিষ্ঠিত।

**আব্দুল হালিম জাফর :** 'জৌনপুরী' রাগ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। কলাবন্তী আঙ্গিকে খাঁ সাহেব রাগ পরিবেশনায় ব্রতী হন এবং রাগের অন্তর্নিহিত কারুণ্য ও বেদনা সূক্ষ্ম-মীড় আশ্ ও চকিত ছুটতানের ভাষায় এক অপূর্ব রূপব্যঞ্জনায় ধ্বনিত। মপদা মপজ্ঞার অতৃপ্ত রেশ যেন গীতিকাব্যিক মধুরতায় রাগকল্পনাকে প্রসারিত করেছে। জোড়ের সঙ্গে নানান বাজ ও পর্দা-সমন্বয়ে শিল্পীর রঙিন মনটির উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটেছে।

'জৌনপুরী'র সঙ্গে ভাবসমন্বয় বজায় রেখে খাঁ সাহেবের 'ভীমপলশ্রী' রাগ-নির্বাচন অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পবোধের নিদর্শন। ভীমপলশ্রী রাগের জীবনবিবিক্ত বৈরাগ্যে গভীর ঔদাস্যের সুর প্রথম থেকেই অনুভূত হয়েছিল। শিল্পীর বর্ণবোধ, সুরবিন্যাস ও আলঙ্কারিক দক্ষতায় সঙ্গীত যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। তানের অঙ্গে বিলাপ মীড় ও জমজমায় রবিশঙ্করের প্রভাব পরিস্ফুট। কিন্তু এত-সত্ত্বেও শিল্পীর স্বকীয়তা সদাজাগ্রত ছিলো বলেই উপভোগের ভোজ থেকে মুহূর্তকালের জন্যও আমরা বঞ্চিত হইনি। আর মার্গসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যে সকল রীতিই সুরক্ষিত হয়েছে। সর্বশেষে খুব মিষ্টি করে দক্ষিণ ভারতীয় রাগ 'কণকাঙ্গী' দিয়ে তিনি অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

আব্দুল হালিম জাফরের সঙ্গে তবলাসঙ্গতে ছিলেন বোম্বাই-এর সদাশিব পাওয়ার। কোলকাতায় সদাশিব পাওয়ারের অনুষ্ঠান এই প্রথম।

**মণিলাল নাগ ও কিষণ মহারাজ :** পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র সদনে জলসাঘর সঙ্গীতচক্র নিবেদিত আসরে মণিলাল নাগ দেশী তোড়ি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু

আনন্দশঙ্করের অনুষ্ঠান

করলেন। 'দেশী'ও বেদনার্ত রাগ। তবে 'জৌনপুরী'র বেদনায় কাতরতাবোধের চাঞ্চল্য আছে। 'দেশী'র বেদনা শান্ত সংযত।

বেদনার এই সংযত রূপের ধ্যানকে অবিচলিত রেখেই তরুণ শিল্পী তাঁর রাগ-বিস্তার শুরু করেন সম্পূর্ণ ধ্রুপদী অঙ্গে। পিতা গোকুল নাগের বিষ্ণুপুর ঘরানার কাঠামো ত ছিলই—এই ছাঁচকে তিনি রবিশঙ্করজী, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অলঙ্করণে সজ্জিত করে পরিবেশনাকে অত্যন্ত সরস মধুর করে তুলেছেন। আলাপের বিলম্বিত অঙ্গে শান্ত বিস্তার, জোড়ের ছন্দবৈচিত্র্য ও ঝালার ধ্বনিসঙ্গতিতে শিল্পবোধ শিল্পীপ্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল। জোড়ের অঙ্গের কোনো কোনো মীড়ে কানাড়া এবং দ্রুতগতের আরোহীতে কাফি অথবা সারং-এর ভাব মাঝে মাঝে হয়ত এসেছে কিন্তু মূল রাগের বক্তব্য থেকে শিল্পী মুহূর্তকালের জন্যও সরে যাননি। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

এ অনুষ্ঠানের আর এক আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল পণ্ডিত কিষণ মহারাজের তবলা-সঙ্গত। কি ঠেকা, কি রেলা, কি সাথ-সঙ্গত অথবা সওয়াল-জবাব প্রতিটি অঙ্গে শোনবার মত বাজনাই তিনি বাজিয়েছেন। আর আমরা স-গর্ব পুলকে লক্ষ্য করেছি তরুণ বাঙালী শিল্পীর অসাধারণ লয়-কারীর দখল। ভৈরব-ঠুংরী দিয়ে বাজনা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হোলো।

আর এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান বাংলার প্রবীণ তবলিয়া নাটুবাবুর তবলা-লহরা। ত্রিতালে পরিবেশিত বোলের বাহার। তান, টুকরো, পরণ—সবতেই একনিষ্ঠ রেওয়া ও সুচিন্তিত পাণ্ডিত্য শ্রোতাদের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে। এ-অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

**লং প্লেয়িং ডিস্কে গুপী গাইন বাঘা বাইনের সঙ্গীত :** সত্যজিৎবাবুর 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এক বিস্ময়কর অবদান শুধুমাত্র বর্তমান চলচ্চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, সংগীতসৃষ্টি বিচারেও। সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানী প্রকাশিত গুপী গাইন বাঘা বাইনের সঙ্গীতের একটি লং প্লেয়িং ডিস্ক সঙ্গীতরসিক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। যাঁরা এই চিত্র দেখেছেন, তাঁরা রেকর্ডটি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে প্রতিটি দৃশ্যকে নতুন করে দেখার আনন্দে ডুবে যাবেন। যাঁরা দেখেননি, তাঁরাও এই সঙ্গীতসূত্র অনুসরণ করে উধাও হয়ে যাবেন কল্পনার সেই আশ্চর্য দেশে—যেখানে গায়ক গোপী এবং তালবাদ্য-বাদক বাঘার সঙ্গীত-প্রতিভায় একটার পর একটা অঘটন ঘটে চলেছে। বাঘার অলংকার সঙ্গতে গোপীর ৪খানি গান 'ভূতের রাজা দিল বর' 'মহারাজা তোমারে সেলাম', 'এক যে ছিল রাজা' ছন্দ ও সুরের অপূর্ব সমন্বয় যেন এই লোকসঙ্গীতধর্মী গানগুলির উপরি-পাওনা। 'দেখরে নয়ন মেলে' গানটিতে ভৈরবীর উদাসী সুর তানপুরা, সেতার ও বাঁশের বাঁশীর ভাষায় এক কাব্যসুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণ ভারতীয় রাগের ছোঁয়ায় ভায়োলীন ও বীণ সংগতে কৌতুকময়, বৈচিত্র্য, সৃষ্টির প্রয়োগ-কৌশল লক্ষ্য করবার মত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যন্ত্র-সমন্বয়ে রচিত অর্কেস্ট্রার কখনও ভূতের নৃত্য, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজস্থানী লোকসঙ্গীতের আভাসে শ্রাব্য সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে যেন দৃশ্যালোকও সৃষ্টি করে। 'পথের পাঁচালী'র পর ডিস্কে এ-ধরনের সঙ্গীত পরিবেশনা আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না। জনপ্রিয় গানগুলি গেয়েছেন অনুপ ঘোষাল—'গুপী গাইন'এর গান গেয়ে যাঁর ভাগ্য ফিরে গেল। সত্যজিৎ রায় রচিত অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেছেন অলোক দে।

—

# প্রেক্ষাগৃহ

হেমা মালিনী ফটো : অমৃত

**হৃদয় জয় করা মেয়ে**

এ-আর-সি প্রোডাকসন্স-এর দ্বিতীয় নিবেদন "রূপসী"র নায়িকা রূপসী গ্রাম বাঙলার চাষী-জোতদারের মা-হারা দামাল মেয়ে। সমবয়সী সাথীদের নিয়ে সে পরের বাগানের ফল ছেঁড়ে, ফল পেড়ে খায়, ফেলে-ছাড়িয়ে নষ্ট করে। দুঃসাহসী ডাকাতে মেয়ে বিষধর সাপ নিয়ে নির্ভয়ে খেলা করে, অনায়াসভঙ্গীতে সাঁতার কাটে, আবার গলা ছেড়ে গানও গায়। ভয়ডরহীন মেয়েটির বাতাসের মতো অবাধগতি। গাঁ-সুদ্ধ লোক তার জ্বালায় অস্থির; কিন্তু মা-হারা মেয়েকে নবীন মাহাতো কিছু বলে না, বলতে পারে না। কারুর কারুর চোখে রূপসী চরিত্রকে কিছুটা অবাস্তব ঠেকবে; কিন্তু তাঁদের কথা মেনে নিয়েও বলব, ভালোবাসার মতো হৃদয় জয়করা মেয়ে হচ্ছে এই রূপসী। এককড়ি ঠাকুর্দার বাগানের কলার কাঁদি চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে যখন ধরা পড়ল রূপসী এবং ঠাকুর্দার তরজা ও কবিগান-স্মরা নাতি বলরামের কাছে না হোক নাকাল হোলো, তখন সে প্রতিজ্ঞা করল, যে-ক'রে হোক ঐ বলরামকে জব্দ করতেই হবে। যেমন কথা, তেমনই কাজ। কবি-গানের আসরে সে গ্রামসুদ্ধ লোকের সামনে বলরামের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল এবং 'ধানিলঙ্কা' ও 'রসগোল্লা'র যুদ্ধে ধানি-লঙ্কারই হ'ল জয়—বলরাম ঐ মোহিনী মূর্তির সামনে সম্মোহিতভাবে পরাজয় স্বীকার ক'রে নিজের মেডেলের গোছকে ওর হাতে সমর্পণ ক'রে বিদায় নিল। দুজনে দুজনের মধ্যে কি দেখল, কে জানে! দুজনেই দুজনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। বলরাম গায় :

কাজল পরা ও চোখে তোর যাদু আছেরে।
আমি হাসিমুখে হার মেনেছি
তোর কাছেরে।।

অপরদিকে রূপসী গেয়ে ওঠে :

ভালোবাসার পরশ পেলাম
সেই পরশে সব হারালাম

ওদের এই প্রেমে বাধা দাঁড়ালেন এককড়ি ঠাকুর্দা। রূপসীর বাবাকে তিনি স্পষ্ট ব'লে দিলেন : তোমার মেয়ে আমি নাতবৌ ক'রে ঘরে আনব না—ও অলক্ষ্মীকে ঘরে ঢুকোলে আমার এই সংসার-মন্দির ভেঙে যাবে। কিন্তু অলক্ষ্মীর এই দুর্নাম ঘুচিয়ে মঙ্গলকারিণী লক্ষ্মীতে পরিণত হবার জন্যে রূপসী যে অসাধ্যসাধন করল, তারই কাহিনী চিত্রিত হয়েছে রূপসী'র শেষের হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যগুলিতে।

গ্রাম্য মেয়ে রূপসীর এই কাহিনীকে কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার-পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী চরিত্র-চিত্রণ, বিভিন্ন রসের ঘটনার সুষ্ঠু সমাবেশ, হৃদয়গ্রাহী সংলাপ এবং মন-মাতানো ছড়া ও গানের সাহায্যে এমন-ভাবে দর্শকসমক্ষে তুলে ধরেছেন, যাতে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, "রূপসী"ই হচ্ছে শ্রীগাঙ্গুলীর পরিচালক জীবনের শ্রেষ্ঠতম এবং সার্থকতম নিবেদন।

ছবির নাম-ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় বাচনে, ভঙ্গীতে যে-অসামান্য নটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা এই ভূমিকাটিকে তাঁর শিল্পজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ব'লে চিহ্নিত ক'রে রাখবে। বস্তুত, তাঁর অনবদ্য অভিনয়ই চরিত্রটি চিত্তজয়ী করে তুলেছে। নায়ক বলরাম বেশে সমিত ভঞ্জ তাঁর শিল্প-প্রতিভায় একটি নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছেন। 'আপন জন', 'অরণ্যের দিন-রাত্রি'র সমিত ভঞ্জ যে প্রেমিক-নায়কের ভূমিকাতেও সার্থক হ'তে পারেন, তা বিশ্বাস করবার জন্যে রূপসীতে তাঁর বলরাম-এর ভূমিকাভিনয় দেখতে হবে। শক্তিশালী চরিত্রাভিনেতা কালী বন্দ্যো-পাধ্যায় রক্ষণশীল চাষী গৃহস্থ এককড়ি ঠাকুর্দার ভূমিকাটিকে প্রাণবন্ত ও বাস্তব ক'রে তুলেছেন। রূপসীর বাবা নব জোতদারের ভূমিকাটি বঙ্কিম ঘো নটনৈপুণ্যে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। অথ প্রতি লোভ এবং ঈশ্বরের ন্যায়পরত উপর আস্থা—এই বিপরীতমুখী আকর্ষ দ্বন্দ্ব ও তারই সঙ্গে মাতৃহারা কন প্রতি স্নেহকে তিনি চমৎকারভাবে ফু তুলেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় সার্থক অভি করেছেন জহর রায় (বিষ্টু গায়েন), অন গুপ্তা (বড়বৌ), রবি ঘোষ (নীল তপেন চট্টোপাধ্যায় (মাধব), সু চৌধুরী (তরলা), জুঁই বন্দ্যোপাধ (টিয়া) প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভা মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বহির্দৃ চিত্র গ্রহণের চমৎকারিত্ব। সারা আকা জুড়ে কালো মেঘ, মাঝ দিকচক্রবা কছুটা মেঘহীন—এই দৃশ্যটির তুলনা নে গ্রাম-পরিবেশ রচনায় শিল্প নির্দেশ কৃতিত্বও প্রশংসনীয়। ছবির একটি বি আকর্ষণ হচ্ছে এর গানগুলি। প্রধানত গ বাউল, ভাটিয়াল প্রভৃতি সুরে গীত গ গুলি বারংবার শোনবার মতো—"ম্যাঘ

পানি দে'র সুরকে কিছুটা পরিবর্তন ক'রে 'ও সূর্য্যি আলো দে, ও মেঘ জল দে' গানটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত এবং অজিত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত 'রূপসী' কাহিনীর প্রাণোজ্জ্বলতায়, অভিনয়ের অসাধারণত্বে এবং সর্বোপরি সংগীতের সুষমায় ভরপুর হয়ে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

## স্টুডিও থেকে

গত ২৯ নভেম্বর ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় কলাকুশলীদের এক জনসভায় তাদের ন্যূনতম দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। এ-বছরের জুলাই মাসে স্টুডিও কর্তৃপক্ষের সংগে যে-চুক্তি হয়, সে অনুযায়ী তাঁরা নাকি এপর্যন্ত কোনো পাওনাই পাননি। অবিলম্বে সেই চুক্তি কার্যকরী করার দাবী জানিয়ে একটি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন সর্বশ্রী সৌমিত্র চ্যাটার্জি, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, রবি ঘোষ, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদার, ঋত্বিক ঘটক, অনুপকুমার, জয়া ভাদুড়ী, অপর্ণা সেন, মাধবী মুখার্জি প্রমুখ।

* * *

কৌতুকাভিনেতা রবি ঘোষ নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন অনেক দিন আগেই। কৌতুকরসের নাট্যরচনায় তাঁর খ্যাতি 'চলাচল', 'ঠগ' ইত্যাদি একাধিক নাটকে পাওয়া গেছে। সম্প্রতি জানা গেল, তিনি ছবির জন্য গল্পও লিখেছেন। নাম 'গোড়ায় গলদ'। চিত্রনাট্য তৈরী করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। রবি মুভিজের পতাকাতলে এ-ছবিটি পরিচালনা করবেন অজিত ব্যানার্জি। কৌতুকরসাশ্রিত এই ছবিটির চরিত্র-চিত্রণে অংশ নেবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখার্জি, অলকা সরকার, শমিতা বিশ্বাস, নীতা চ্যাটার্জি, অরুণ দত্ত প্রমুখ। সংগীত-পরিচালনা করবেন খোকন চৌধুরী ও মনু চৌধুরী।

## মঞ্চাভিনয়

**এম. জি. এন্টারপ্রাইজের 'মা' :** বিস্ময় আর সংশয় জেগেছিল তখনই যখন শুনেছিলাম যাঁরা 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ', 'রাণী রাসমণি', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি নাটক পরিবেশন করে নাট্যানুরাগী বাঙালী দর্শকদের ভক্তিবহ্বল চিত্তকে এক অপূর্ব উন্মাদনায় অভিভূত করে রেখেছিল, তাঁরা ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা'র তীক্ষ্ম জীবনসচেতনতা ও দুর্বার জীবনসংগ্রামকে মঞ্চের আলোয় পরিস্ফুট করে তুলতে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু একটি কৌতূহলে ভরা সন্ধ্যায় এম জি. এনটারপ্রাইজের শিল্পীরা সাবলীলভাবে সেই সংশয়ের অবলুণ্ঠন

শপথ নিলাম / শমিত ভঞ্জ

চৈতালী/বিশ্বজিৎ ও তনুজা

[illegible] / [illegible] চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন

খাঁ ও ছেলে ।। ফটো : অমৃত

স্বাভাবিক অভিনয় করেন দীপ্তেশ ব্যানার্জি, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, হিতেন চ্যাটার্জি, জয় দাশ, গৌর সোম, পরিতোষ চক্রবর্তী, শম্ভু দে, রথীন চক্রবর্তী, চঞ্চল ভট্টাচার্য।

**...রের নাটক :**

বোম্বাইয়ের চেম্বুর দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'ছায়া নায়িকা' নাটকটি সম্প্রতি সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ হোল। অভিনয়ে যাঁরা প্রশংসার দাবী রাখতে পারেন তাঁরা হোলেন উৎপল সেনগুপ্ত, বিকাশ মুখার্জি, অমিয় রায়, প্রণব দাস। আলোকসম্পাতে শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন সুনীল চক্রবর্তী।

মধ্যপ্রদেশ চিড়িমিড়ির কুরাশিয়া কালিয়ারি ইনস্টিটিউটের শিল্পীরা কিছুদিন আগে তাঁদের নিজস্ব মঞ্চে 'তাপসী' নাটকের সফল এক মঞ্চ-রূপ পরিবেশন করেন। 'তাপসী' চরিত্রে মঞ্জু রায়ের অভিনয় ও নির্মল পাল (সুকুমার) ও নীহার মাইতি (গোপেনে)র চরিত্রচিত্রণ দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। অন্যান্য ভূমিকাভিনেতারা প্রায় সবাই চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন।

নাগপুর সিভিল লাইনস গভর্নমেণ্ট কলোনীর নির্বাচিত শিল্পীরা সম্প্রতি মন্টু গাঙ্গুলীর 'দ্বিবর্ণ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। অভিনয়ে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন অমল রায়চৌধুরী, পরিতোষ গোস্বামী, গীতা দাশগুপ্তা, নীলা গুহঠাকুরতা, রেবা রায়, মুকুল সরকার, দিলীপ মুখার্জি, মমতা ঘোষ।

**কালিন্দী অভিনয় :** নাট্যজগতে সাফল্যের ইতিহাসে অফিস ক্লাব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। গত ১৫ নভেম্বর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে তা আর একবার নতুন করে প্রমাণ করলো এস এফ স্পোর্টস ক্লাব (ইণ্ডিয়া) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'কালিন্দী' নাটক মঞ্চস্থ করে। সুনিপুণ পরিচালনা এবং দলগত অভিনয় নাটকের গতি অক্ষুন্ন রাখে এবং পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আঙ্গিকের কিছু কিছু ত্রুটি পীড়াদায়ক হলেও শিল্পের সর্তকে সযত্নে রক্ষা করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কয়েকটি চরিত্রে অভিনয়-কুশলতা বিশেষ নৈপুণ্যে নিটোল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে নাম করা যায় ইন্দ্র রায় এবং রামেশ্বরের ভূমিকায় যথাক্রমে রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুরারী সেনের নাম। অচিন্ত্যরূপী নারায়ণ চক্রবর্তী বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে এবং সেই সংগে বলা যায় নায়েব শিবেন মুখার্জির নাম। অহিনের ভূমিকায় রামরঞ্জন নাথ এবং মহীনের ভূমিকায় অলোক দে প্রশংসার দাবী রাখে এবং স্ত্রী-চরিত্রে সারীর ভূমিকায় আশা বোসের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন অরুণ মজুমদার, নীহার মুখার্জি, দিপালী ঘোষ, রবি মিত্র ও শাশ্বতী মুখার্জি ইত্যাদি। নাটকটি পরিচালনা করেন অরুণচন্দ্র মজুমদার।

এল এফ স্পোর্টস ক্লাবের কালিন্দী নাটকে রামরঞ্জন নাথ, দীপালি ঘোষ এবং অলক দে।

এক মিনিটের ছবি : দি স্টোরি অফ অ্যান আর্টিস্ট / নায়ক : নিতাই ঘোষ

# বিবিধ সংবাদ

**প্রমথেশ স্মৃতিসভা :** প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল কমিটির উদ্যোগে গত রবিবার ২৮ নভেম্বর চিত্রাচার্য প্রমথেশ বড়ুয়ার ১৯তম মৃত্যুদিবস পালিত হয় উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে। সভানেত্রী ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে চন্দ্রাবতী দেবী ও যমুনা দেবী। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন রবীন মজুমদার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেশ মুখোপাধ্যায়। সভাশেষে বড়ুয়ার 'শেষ উত্তর' চিত্রটি দেখানো হয়।

**ভুল সংশোধন**

ইংলিশ করেসপন্ডেন্স ইনস্টিটিউট-এর গত ২০।১১।৭০ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটির ঠিকানা ভুল ও নিম্নলিখিত ছাত্রটির নাম বাদ পড়ায় ভুল সংশোধন করা হল।
২২এক, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিঃ—৬
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ গিরি, ক্যাল ই ১৫৭

**বারাণসীতে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম :** বারাণসী কর্পোরেশন হলে আকাশবাণী এলাহাবাদের উদ্যোগে তিনদিন ধরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। প্রথম দিন তিনটি হাস্য নাটিকা মঞ্চস্থ হয়। প্যার পালকি আউর পালনা কেশব বর্মা, বিনোদ রাস্তোগী, শান্তি মেহরোত্রার রচনা। পুরাণী মর্জ নয়া ইলাজ মলিয়ারের অনুবাদ। মারাঠী লেখক বসন্ত কা প্রেমকে রস নিকালা। নাট্যপরিচালক বসুর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। পুরুষ বিপিন ট্যান্ডন, জীবনকৃষ্ণ ব্যানার্জি চরিত্রে আশা গুপ্তা, অঞ্জু ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ দর্শকদের মুগ্ধ করেন। দ্বিতী হয় হাস্য কবি সম্মিলন। স্থানীয় পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক শ্রীমো গুপ্ত বা ভাইয়াজী বেনারসীর কা প্রশংসা অর্জন করে। শ্রীকাশীনাথ উ শ্রীকান্তানাথ পান্ডের প্রভৃতি প্রখ্যাত কবি এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। দিনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন বেহালা শ্রীবিষ্ণুগোবিন্দ যোগ। রাগ আলাপ, জোড়, পালা, ধ্রুপদ, পা ধুন বাজান। তাঁর সুরবিস্তারিকা মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। পাটনা কেন্দ্রের পণ্ডিত সীতারাম তেওয়ারী ধ্রুপদ পরিবেশন করেন।

**তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিশু উৎসব :** এই সংগঠন কর্তৃক আ "তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিশু চ উৎসব" ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বর কোলকাতার রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষ অনুষ্ঠিত হবে।

**শিশু রংমহলের বিংশতিতম বার্ষিক**

শিশু রংমহল (সি-এল-টি) তার জীবনের কুড়িটি বৎসর অতিক্রম এই উপলক্ষে যথাযোগ্যভাবে ২০তম উৎসব পালিত হবার ব্যবস্থা ক সি-এল-টির কর্তৃপক্ষ। ১৮ই ডি থেকে এই উৎসবের শুরু।

জয়জয়ন্তী / চন্দ্রাবতী

## খেলার কথা

# খেলোয়াড়দের নামে টেস্ট খেলা

গত ২রা ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট সিরিজের যে প্রথম টেস্ট খেলাটি শেষ হল তা উভয় দেশের ২০৪তম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা। এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাই ২০০ সংখ্যায় পূর্ণতা লাভ করেছে। তাছাড়া পৃথিবীর মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলার প্রবর্তক এই দুই দেশই। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে, ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ। এই দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যে সুমহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার তুলনা নেই। বিগত ৯৪ বছরে (১৮৭৭-১৯৭০) ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ২০৪টি টেস্ট খেলার মধ্যে কয়েকটি খেলা কয়েকজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত অসামান্য ক্রীড়াচাতুর্যের স্বীকৃতিতে তাঁদের নামেই উৎসর্গীত হয়েছে। যেমন ১৯০২ সালে ওভালের ৫ম টেস্ট 'জেসপের খেলা', ১৯২১ সালে লর্ডসের ২য় টেস্ট 'উলীর খেলা', ১৯৩০ সালে লিডসের ৩য় টেস্ট 'ব্র্যাডম্যানের খেলা', ১৯৩৪ সালে লর্ডসের ২য় টেস্ট 'ভেরিটির খেলা', ১৯৩৮ সালে ওভালের ৪র্থ টেস্ট 'হাটনের খেলা' এবং ১৯৫৬ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের ৪র্থ টেস্ট 'লেকারের খেলা'—এইভাবে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত নামে খেলাগুলি অমরত্ব লাভ করেছে। টেস্ট সিরিজও খেলোয়াড়দের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে—১৯২৮-২৯ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ ওয়াল্টার হ্যামন্ড এবং ১৯৩০ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ ডন ব্র্যাডম্যানের নামে।

### জেসপের খেলা

**(ওভাল, আগস্ট ১১, ১২ ও ১৩; ১৯০২। ইংল্যান্ড ১ উইকেটে জয়ী)**

ক্রিকেট খেলায় দলকে সময় সময় এমন অনেক সংকটে পড়তে হয় যখন খেলার শোচনীয় পরিণতির কথা ভেবে খেলোয়াড়রা আত্মরক্ষামূলক নীতি নিয়ে খেলতে বাধ্য হন। তখন একমাত্র উদ্দেশ্য, পরাজয়ের হাত থেকে কোন রকমে দলকে রক্ষা করা। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ-রকমের নজির অজস্র আছে। কিন্তু দলের অতি চরম সংকটে ব্যাটসম্যান আক্রমণাত্মক ভূমিকায় নেমে ঝড়ের গতিতে রাণ তুলে শেষ পর্যন্ত নিজ দলকে জয়যুক্ত করেছেন এমন ঘটনা বিরল। এদিক থেকে ১৯০২ সালে ওভাল মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যান গিলবার্ট জেসপের সার্থক ভূমিকা সর্বকালের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। তাঁর এই অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ওভালের টেস্ট খেলার নামকরণ হয়েছে 'জেসপের খেলা'।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১৯০২ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়। এবং অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্ট খেলায় জয়ী হয়। ফলে অস্ট্রেলিয়া ২-০ খেলায় এগিয়ে ওভালের শেষ পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামে। ওভালের এই পঞ্চম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড দল থেকে রঞ্জিৎ সিংজী, আবেল এবং টেটকে বাদ দিয়ে তাঁদের শূন্য স্থানে জেসপ, হার্স্ট এবং

**ক্ষেত্রনাথ রায়**

হেওয়ার্ডকে নেওয়া হল। এই পরিবর্তনে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেল, অন্তত জেসপ এবং হার্স্টের ক্ষেত্রে। জেসপ দ্বিতীয় ইনিংসে ঐতিহাসিক ১০৪ রাণ করেন এবং হার্স্ট বোলিং ও ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন—প্রথম ইনিংসে ৭৭ রাণে ৫টা উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট ৫৮ রাণ। প্রকৃতপক্ষে জেসপ এবং হার্স্ট—এই দুজন খেলোয়াড়ই ইংল্যান্ডের জয়লাভের স্তম্ভ ছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩২৪ রাণের উত্তরে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৮৩ রাণ করে,—অস্ট্রেলিয়ার থেকে ১৪১ রাণ কম। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ১২১ রাণ সংগ্রহ করে। ফলে খেলায় জয়লাভ করতে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৩ রাণের প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় দিনে সকাল দিকে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা হাতে পায়। যেখানে খেলায় জয়লাভের জন্য ২৬৩ রাণের প্রয়োজন, সেখানে মাত্র ৪৮ রাণের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। ফলে অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ড দলের এই দারুণ সংকটের সময় জ্যাকসনের সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে খেলতে নামেন জেসপ। খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁরা খেলতে থাকেন। কারণ রাত্রির বৃষ্টিতে পিচ ভিজে গিয়ে খেলোয়াড়দের কবরস্থানে পরিণত হয়। লাঞ্চের সময় জ্যাকসনের ৩৯ রাণ এবং জেসপের ২৯ রাণ দাঁড়াল। লাঞ্চের পরই জেসপ সংহার মূর্তিতে খেলতে লাগলেন। জ্যাকসন ৪৯ রাণ করে আউট হন। ৬৫ মিনিটের খেলায় ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ইংল্যান্ডের ১০৯ রাণ উঠেছিল। জেসপ আউট হন দলের ১৮৭ রানের মাথায় ব্যক্তিগত ১০৪ রাণ সংগ্রহ করে। তিনি মাত্র ৭৫ মিনিটে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই ১০৪ রাণ তুলেছিলেন—বাউন্ডারী ১৭টা এবং ওভার-বাউন্ডারী একটা। জেসপের রাণ তোলার গতি উপলক্ষ্য করেই ইংরেজী ভাষায় 'জেসোপিয়ান' নামে যে নতুন শব্দটি যোজনা হল তার মর্মার্থ—যে কোন কাজ, যা প্রচণ্ড এবং গতিসম্পন্ন।
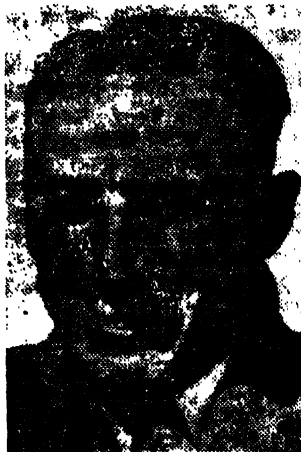
ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)

ওয়াল্টার হ্যামন্ড (ইংল্যান্ড)

লেন হাটন (ইংল্যান্ড)

জেসপের কথা এখানে শেষ করে হার্স্টের প্রসংগে আসা যাক। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৪৮ রাণের মাথায় ৯ম উইকেট পড়ে যায়। শেষ খেলোয়াড় রোডস খেলতে নেমে হার্স্টের ১০ম উইকেটের জুটি হলেন। দুই খেলোয়াড়ই ইয়র্কসায়ার কাউন্টি দলের। তখনও ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে আরও ১৫ রাণ দরকার। কিংবদন্তী আছে, তাঁরা শলাপরামর্শ ক'রছিলেন এক রাণ এক রাণ করে জয়লাভের প্রয়োজনীয় বাকি ১৫ রাণ সংগ্রহ করবেন; শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাই করেছিলেন অতি সতর্কতার সগে ৪৫ মিনিট খেলে। ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত ১ উইকেটে জয়ী হয়ে অস্ট্রেলিয়ার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। হাজার হাজার দর্শক আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়েন।

## উলীর খেলা

(লর্ডস, জুন ১১, ১৩ ও ১৪, ১৯২১। অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী)

অস্ট্রেলিয়ার দুই ফাস্ট বোলার গ্রেগরী এবং ম্যাকডোনাল্ড ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের কোণঠাসা করেছিলেন। ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ১৮৭ রাণ এবং ২য় ইনিংস ২৮৩ রাণের মাথায় শেষ হয়। খেলার এই প্রতিকূল অবস্থায় ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঙ্ক উলী ১ম ইনিংসে ৯৫ রাণ এবং ২য় ইনিংসে ৯৩ রাণ করে অল্পের জন্য উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন।

## ব্র্যাডম্যানের খেলা

(লিডস, জুলাই ১১, ১২, ১৪ ও ১৫, ১৯৩০। খেলা ড্র)

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৫৬৬ রাণের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ৩৯১ রাণ সংগ্রহ করে। ফলে ইংল্যান্ড ১৭৫ রাণের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের ৯৫ রাণের (২ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৫৬৬ রাণের মধ্যে ডন ব্র্যাডম্যান একাই ৩৩৪ রাণ করেছিলেন ৩৭৫ মিনিটের খেলায়। তাঁর এই ৩৩৪ রাণে ছিল ৪৬টা বাউণ্ডারী, ৬টা ওভার-বাউণ্ডারী, ২ রাণ করে ২৬ বার এবং সিংগলস ৮০টা। ব্র্যাডম্যান এই ৩৩৪ রাণ করার সূত্রে ১৯৩০ সালে কিংস্টন মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের স্যান্ডহাম এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত রাণের যে বিশ্ব রেকর্ড (৩২৫ রাণ) করেছিলেন তা ভেংগে দেন।

## ভেরিটির খেলা

(লর্ডস, জুন ২২, ২৩ ও ২৫, ১৯৩৪। ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ৩৮ রাণে জয়ী)

ইংল্যান্ডের এই জয়লাভের মূলে ছিলেন ভেরিটি। তিনি অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৬১ রাণে ৭টা এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৩ রাণে ৮টা উইকেট পান। এই খেলায় ভেরিটির বোলিং উল্লেখ করার মত। ২৫শে জুন তারিখে এক দিনের খেলাতেই তিনি ৮০ রাণে ১৪টা উইকেট পান এবং উভয় ইনিংসে মোট ১৫টা উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় রোডস যে ১৫ উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করেছিলেন তা স্পর্শ করেন।

## হাটনের খেলা

(ওভাল, আগস্ট ২০, ২২, ২৩ ও ২৪ ১৯৩৮। ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ৫৭৯ রাণে জয়ী)

টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ইংল্যান্ড ছাড়া আর কোন দেশ এই রকম বিরাট ব্যবধানে (এক ইনিংস ও ৫৭৯ রাণে) জয়লাভ করতে সক্ষম হয়নি। ইংল্যান্ডের এই বিরাট জয়লাভের পথে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন লেন হাটন। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৯০৩ রাণের মধ্যে (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) লেন হাটন একাই যে ৩৬৪ রাণ করেন তা ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত রাণের বিশ্ব রেকর্ড ছিল।

লেন হাটন দীর্ঘ ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট ব্যাট করে তাঁর এই ৩৬৪ রাণ সংগ্রহ করেন —বাউণ্ডারী করেন ৩৫টা। তাছাড়া ১৫ বার তিন রাণ, ১৮ বার দু' রাণ এবং ১৩৪ বার এক রাণ করে সংগ্রহ করেন। এখানে উল্লেখ্য, হাটনের আগে অপর কোন পেশাদার খেলোয়াড় এক ইনিংসের খেলায় এত বেশী রাণ করেননি এবং ইংলিশ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে যাঁরা তাঁর আগে এক ইনিংসে ৩০০ রাণ করেন তাঁদের মধ্যে হাটন সর্বকনিষ্ঠ।

## লেকারের খেলা

১৯৫৬ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের জিম লেকার বোলিংয়ে যে দুটি বিশ্ব রেকর্ড করেন তা আজও অক্ষুন্ন আছে; এমনকি তাঁর এই দুই বিশ্ব রেকর্ড কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন নি—এক ইনিংসে সর্বাধিক

জিম লেকার (ইংল্যান্ড)

উইকেট (১০টি উইকেট ৫৩ রানে) একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট (১ উইকেট—৩৭ রানে ৯ উইকেট ও ৫৩ ১০ উইকেট)। এছাড়া ১৯৫৬ সালের সিরিজে তাঁর মোট ৪৬টি উই (৪৪২ রান এবং গড় ৯-৬০)—ইংল ও অস্ট্রেলিয়ার একটি টেস্ট সি সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড হি আজও গণ্য।

## ব্র্যাডম্যানের সিরিজ

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৩০ সা টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাড (পরবর্তীকালে 'স্যার') মোট ৯৭৪ সংগ্রহের সূত্রে একটি টেস্ট সি সর্বাধিক মোট রান করার যে বিশ্ব রে করেন তা আজও বিশ্ব রেকর্ড হি গণ্য। শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যাটিং পরিসং দাঁড়ায় : খেলা ৫, ইনিংস ৭, নট আউ মোট রান ৯৭৪, এক ইনিংসে সবে রান ৩৩৪, সেঞ্চুরী ৪ এবং ১৩৯-১৪।

## হ্যামণ্ডের সিরিজ

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯২৮- সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের ওয়া হ্যামন্ড মোট ৯০৫ রান সংগ্রহ করে এ টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক মোট রান সংগ্র যে বিশ্ব রেকর্ড করেন তা পরবর্তীক (১৯৩০ সালে) ডন ব্র্যাডম্যান ভে দিলেও আজ পর্যন্ত ডন ব্র্যাডম্যান ওয়াল্টার হ্যামন্ড ছাড়া আর কেউ টে একটি সিরিজে মোট ৯০০ রান তু পারেন নি। ১৯২৮-২৯ সালের সিরিজে হ্যামণ্ডের ব্যাটিং পরিসং ছিল : খেলা ৫, ইনিংস ৯, নট আউট মোট রান ৯০৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ২৫১, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১১৩-১২

যোগীন্দর সিং (বাঁ দিকে) এবং পারভিন কুমার ঃ ব্যাঙ্ককের ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসে যোগীন্দর সিং সটপ্যুটে নতুন এশিয়ান গেমস রেকর্ড করেছে (১৭·০৯ মিটার) এবং পারভিন কুমার ডিসকাসে নতুন এশিয়ান গেমস রেকর্ড করেছে (৫২·৩২ মিটার) স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছেন।

দর্শক

## স্কুল টেস্ট ক্রিকেট

**ভারতীয় স্কুল ঃ ২৫৩ রান** (রমেশ বোরদে ৬৭ এবং সুভাষ ফাদকার ৩৯ রান। বুচার ৪৫ রানে ৩, বার্কলে ১৭ রানে ২ এবং রো ৩১ রানে ২ উইকেট)

**ও ১৬৫ রান** (মুকুল দাস ৩৮ রান। বুথ ৩৮ রানে ৩ এবং বার্কলে ১০ রানে ৩ উইকেট)

**ইংলিস স্কুল ঃ ২৪৭ রান** (জিওফ মিলার ৩৮ এবং রো ৩৭ রান। প্রভীন ওবেরয় ৫৮ রানে ৪ এবং রমেশ বোরদে ৪২ রানে ৩ উইকেট)

**ও ১১৬ রান** (৬ উইকেটে। জে এল কুপার ৫৩ রান। ইকবাল ৯ রানে ২ উইকেট)

দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে আয়োজিত ভারতীয় স্কুল বনাম ইংলিস স্কুল দলের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

প্রথম দিনে ভারতীয় স্কুল দলের প্রথম ইনিংস ২৫৩ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি ২০ মিনিট সময়ে ইংলিস স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের এক উইকেটে ১৩ রান উঠেছিল। ভারতীয় স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় রমেশ বোরদে উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ৬৭ রান করেছিলেন। ফাদকার এবং মুকুল দাস (২৫ রান) ৩য় উইকেটের জুটিতে দলের ৬৬ রান তুলেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংলিস স্কুল দলের প্রথম ইনিংস ২৪৭ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় স্কুল দল মাত্র ৬ রানের ব্যবধানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৪৪ রান সংগ্রহ করে। তাদের মাত্র ১ রানের মাথায় ১ম এবং ১২ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। রমেশ বোরদে ইংলিস স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৪২ রানে ৩টে উইকেট নিয়ে ব্যাটিং ও বোলিংয়ে সমান কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

তৃতীয় দিনে ভারতীয় স্কুল দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৫ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি ১৩০ মিনিটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭২ রান সংগ্রহ করতে ইংলিস স্কুল দল ২য় ইনিংস খেলতে নামে। যেখানে তাদের দুটো উইকেট পড়ে ৯৪ রান উঠেছিল সেখানে ৯৪ রানেরই মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে গেল। দলের এই সঙ্কটে তারা জয়লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা নীতি গ্রহণ করে। ইংলিস স্কুল দলের ২য় ইনিংসের ১১৬ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

## এশিয়ান গেমস

গত ৯ই ডিসেম্বর ব্যাঙ্ককে ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে। খেলা আরম্ভ হয়েছে ১০ই তারিখে। গত চার দিনের (১০—১৩ ডিসেম্বর) খেলায় জাপান সর্বাধিক স্বর্ণ এবং রৌপ্যপদক জয়ের সূত্রে পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে, জাপান ৩৬টি স্বর্ণ, ২৪টি রৌপ্য এবং ৫টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। তালিকায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী ইরাণ এবং ভারতবর্ষের থেকে জাপান বিরাট ব্যবধানে এগিয়ে আছে। ভারতবর্ষের পদক জয় মোট ১৫টি—স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ৮। এখনও অনেক খেলা বাকি। বিশেষজ্ঞ মহলের দৃঢ় ধারণা, জাপান অন্যান্য দেশকে বিরাট

এশিয়ান গেমসের 'স্প্রিন্ট কুইন্স' তাইওয়ানের কুমারী চি চেং। ইনি ইতিমধ্যে ১০০ মিটার দৌড় ১১·৬ সেকেন্ড সময়ে (এশিয়ান রেকর্ডের সমান) শেষ করে স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

ব্যবধানে পিছনে রেখে পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান পাবে।

**ভারতবর্ষের পদক জয়**

(১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত)

**স্বর্ণপদক**

**শটপাট ঃ** যোগীন্দর সিং স্বপ্রতিষ্ঠিত এশিয়ান গেমসের রেকর্ড (১৬-২২ মিটার) ভেঙে উপর্যুপরি দু'বার (১৯৬৬ ও ১৯৭০) স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। তাঁর বর্তমান এশিয়ান রেকর্ড ১৭-৯ মিটার।

**ডিসকাস ঃ** প্রভীন কুমার—দূরত্ব ৫২-৩২ মিটার (নতুন এশিয়ান গেমস রেকর্ড)

৪০০ মিটার ঃ কুমারী কমলজিৎ সান্ধু

১০০ কেজি মল্লযুদ্ধ ঃ চাঁদগিরাম

**রৌপ্যপদক**

৮০০ মিটার দৌড় ঃ শ্রীরাম সিং

৫০০০ মিটার দৌড় ঃ এডওয়ার্ড সিকুইরা

৯০ কেজি ঃ জিৎ সিং

**ব্রোঞ্জ পদক**

৩০০ মিটার দৌড় ঃ শুচা সিং

লং জাম্প ঃ লাভ সিং

৩০০০ স্টিপলচেজ ঃ গুরমেজ সিং

হাইজাম্প ঃ ভীম সিং

৪×১০০ রীলে ঃ ভারতবর্ষ

৬৮ কেজি ঃ ওমপ্রকাশ

৭৪ কেজি ঃ মুক্তিয়ার সিং

৮২ কেজি ঃ নেত্র পাল

## সুব্রত কাপ

দিল্লীর কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের যুগ্ম-বিজয়ী গোর্খা বয়েজ কোম্পানী (দেরাদুন) ২—১ গোলে দেরাদুনেরই গোর্খা মিলিটারী স্কুল দলকে পরাজিত করে সুব্রত কাপ জয়ী হয়েছে। সেমি-ফাইনালে গোর্খা বয়েজ কোম্পানী ৮—০ গোলে বাঙ্গালোর মিলিটারী স্কুলকে এবং দেরাদুনের মিলিটারী স্কুল ১—০ গোলে গত যুগ্ম-বিজয়ী কার নিকোবর গ... সেকেন্ডারী স্কুল দলকে পরাজি... ফাইনালে উঠেছিল।

## রঞ্জি ট্রফি

মণ্ডপাতে রঞ্জি ট্রফির পূর্বাঞ্চলে... খেলায় বাংলা এক ইনিংস ও ... আসামকে পরাজিত করেছে। ত... নির্ধারিত খেলা দ্বিতীয় দিনেই শেষ হ...

আসাম টসে জয়ী হয়ে প্রথ... করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম ... আসামের প্রথম ইনিংস ১০৭ রানের... শেষ হয়। লাঞ্চ খেয়ে তারা মাত্র ... খেলেছিল। বাংলার লেফট আর্ম ... দিলীপ দোসী একাই মাত্র ২৯ রা... উইকেট পেয়েছিলেন। প্রথম দিনের... সময়ের খেলায় বাংলা প্রথম ই... তিনটে উইকেট খুইয়ে ১৫৩ রান... করেছিল। প্রকাশ পোদ্দার ৯২ রা... আউট হন: তাঁর এই ৯২ রানই... দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান।

দ্বিতীয় দিনে ২৩৬ রানের বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হলে ১২৯ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় খেলতে নামে এবং ১২১ রানের তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়।

**সংক্ষিপ্ত স্কোর**

**আসাম ঃ** ১০৭ রান (বিমল ভারালী... দিলীপ দোসী ২৯ রানে ৭ উই...) ও ১২১ রান (মেধী ২৯। দেস... রানে ৪ এবং গোপাল বসু ৫৪ ... ৪ উইকেট)।

**বাংলা ঃ** ২৩৬ রান (প্রকাশ পোদ্দা... এবং দেবু মিত্র ৪২ রান। ঘটব... রানে ৫ এবং চৌধুরী ৯৬ রা... উইকেট)।

**আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিকস**

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচ... আন্তঃ কলেজ স্পোর্টসে বিদ্যাসাগর ... ছাত্র ও ছাত্রীদের দলগত এবং ব... খেতাব জয়ের সূত্রে বিরাট সা... পরিচয় দিয়েছে।

**দলগত খেতাব**

ছাত্র বিভাগ ঃ বিদ্যাসাগর কলেজ (... —৪

ছাত্রী বিভাগ ঃ বিদ্যাসাগর কলেজ (স... —৪

**ব্যক্তিগত খেতাব**

ছাত্র বিভাগ ঃ তাপস পাল (বিদ্যাস... রাত্রি)—...

ছাত্রী বিভাগ ঃ কুমারী শ্রীরূপা চ্যাটা... (বিদ্যাসাগর—সকাল)—১...

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

আবদুল জব্বারের
অনন্যসাধারণ রচনা
**বাংলার চালচিত্র ১০৲**
ভূমিকা লিখেছেন—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডঃ ভবতারণ দত্তের
ছড়ার বিপুল সংকলন
**বাংলাদেশের ছড়া ১০৲**
ভূমিকা লিখেছেন—ডঃ সুকুমার সেন

কমলা মিত্রের ভ্রমণ কাহিনী
**কাশ্মীর থেকে কুমারিকা ৭৲**
ভূমিকা লিখেছেন—প্রমথনাথ বিশী

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
**সেই মরুপ্রান্তে ১১৲**

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
স্বয়ংবৃতা ৬৲
বিদেশিনী ৪৲

লাহালা দেবীর
দেশবন্ধুর অমর স্মৃতি-কাহিনী
**মৃত্যুহীন প্রাণ ৪॥**

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
ভাগবতীতনু ১০৲ গোপনপত্র ৪৲

জয়ন্তকুমারের
অভিনেত্রী খুন ৪৲ নায়িকার প্রতিহিংসা ৪৲

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ ৫৲ তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ (১ম) ৮৲ (২য়) ৮৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
**নতুন তোরণ ৫৲**
**কলধ্বনি ৪॥**

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**মগ্ন মৈনাক ৫৲**

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
**নগরপারে রূপনগর ১৮৲**
**কাল, তুমি আলেয়া ১২॥**

শংকু মহারাজের
**গঙ্গাসাগর ৮৲ সাতপাকে বাঁধা ৫৲ শিলাপটে লেখা ৮৲**

বিমল মিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি
যুগান্তকারী উপন্যাস
**কড়ি দিয়ে কিনলাম**
প্রথম খণ্ড—২০৲
দ্বিতীয় খণ্ড—১৪৲
**প্রথম খণ্ডের নূতন একাদশ মুদ্রণ প্রকাশিত প্রায়**

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
**মণিমহেশ ৬॥**

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
**মক্ষিরাণী ৫॥**

বাংলার বাউল কবি
কুমুদরঞ্জন মল্লিকের
**কুমুদ কাব্যসম্ভার ১০৲**

**বিভূতি রচনাবলীর চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড ছাপা চলিতেছে**

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ॥ ফোন : ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 25th December, 1970 শুক্রবার, ৯ই পৌষ, ১৩৭৭ Rs. 1.00


# ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা, ১৩৭৭

## সূচীপত্র

## সূচীপত্র

# সূচীপত্র



প্রচ্ছদ : শ্রীকুমার সান্যাল

# এইচ-এম-ভি রেকর্ডে জনপ্রিয় শিল্পীদের অবিস্মরণীয় গীতি সংকলন

## লং প্লেয়িং রেকর্ড

### গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

**'দি বেস্ট অব সন্ধ্যা মুখার্জী'**

বরেণ্য শিল্পীর কণ্ঠে স্মরণীয় আধুনিক গান : আজ কেন ও চোখে লাজ কেন; প্রেম তো জীবনে একবারই আসে; যারে যা, যা ফিরে যা; ভালবাসার দিনগুলি মোর; মধুমালতী ডাকে আয়; ওই চাঁদ দোলে ॥ ঝরা পাতা আর ঝড়ে নেবা; পথ ছাড়ো ওগো শ্যাম; কে গো এলে তুমি; কেন তা জানো; বনের বসন্ত এলো; রুপালী চাঁদ মিলে ॥

### ফিরোজা বেগম

**'এ ট্রিবিউট টু কাজী নজরুল ইসলাম'**

নজরুল গীতির সেরা শিল্পীর কণ্ঠে চিরস্মরণীয় গান : চৈতালী চাঁদনী রাতে; আয় বনফুল ডাকিছে মলয়; ওরে শুভ্র বসনা; আমি পুরব দেশের পুরনারী; বুলবুলি নীরব কেন নার্গিস বনে ॥ আমার ভুবন কান পেতে রয়; দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি; রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম; দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে; মুসাফির মোছ রে আঁখিজল ॥

### আব্বাস উদ্দিন আহ্মদ

**'আব্বাসউদ্দিন সিঙ্স ফোক সঙ্স অব বেঙ্গল'**

পল্লীগীতির জনপ্রিয় শিল্পীর এক অনন্য সংকলন : সোনা বন্ধুরে কোন্ দোষেতে; ঐ শোন কদম্বতলায়; নদীর কূল নাই; আমার হাড় কালা করলাম; আমায় এত রাতে কেন ডাক দিলি; আমি ভাবি যারে পাই না গো তারে ॥ নাও ছাড়িয়া দে; গুরুর পদে প্রেমভক্তি; ময়ূরপঙ্খী নৌকা; ও সুখের ময়না রে; বৈঠা জোরে বাওরে বন্ধু; ও মন গুরু ভজরে ॥

### দিলীপকুমার রায়

**'দি গোল্ডেন ভয়েস অব দিলীপকুমার রায়'**

সাধকশিল্পীর কণ্ঠে ভক্তিগীতি : শ্রীঅরবিন্দ স্তোত্র; মাতৃস্তোত্র; মা; মধ্যামরী; সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম ॥ আঁধার-নিশা; বাঁশীর ডাক; সখি মোর প্রাণধন; যদি দিয়েছ দিয়েছ; আনন্দ কারা ॥

### 'শ্রীরাধার মান-ভঞ্জন'

**সংগীত পরিচালনা—রবীন চট্টোপাধ্যায়**

প্রণব রায় রচিত কীর্তনাঙ্গ গীতিনাট্য—শিল্পী : মান্না দে, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, নির্মলা মিশ্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, সুবোধ রায়, শমিতা বিশ্বাস, তপতী ঘোষ ও রূপক মজুমদার।

### হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

**'হেমন্ত — এ লিজেন্ড অব গ্লোরি'**

স্বনামধন্য শিল্পীর দরদী কণ্ঠে গাওয়া বারোটি চিত্রগীতি-সংকলন : লিখিনু যে লিপিখানি (শ্রীতুলসী দাস); স্মরণের এই বালুকা-বেলায় ('প্রিয়তমা'); কান্দো কেনে মনরে ('অসমাপ্ত'); পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে ('গরীবের মেয়ে'); জীবনপুরের পথিক রে ভাই ('পলাতক'); যে বাঁশী ভেঙে গেছে ('স্বরলিপি') ॥ ও বাঁশীতে ডাকে সে ('সূর্যমুখী'); সুরের আকাশে তুমি ('শাপমোচন'); মুছে-যাওয়া দিনগুলি ('লুকোচুরি'); আজ দুজনার দুটি পথ ('হারানো সুর'); পথের ক্লান্তি ভুলে ('মরুতীর্থ হিংলাজ'); ও নদীরে ('নীল আকাশের নীচে') ॥

### 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'

সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত চিত্রের গান (শিল্পী—অনুপ ঘোষাল ও অন্যান্য)। সঙ্গে নির্বাচিত আবহ সঙ্গীতও রয়েছে।

### 'ঠাকুরমার ঝুলি'

প্রথম খণ্ড : বুদ্ধু ভুতুম

দ্বিতীয় খণ্ড : নীল কমল—লাল কমল

ছেলেমেয়েদের অপরূপ রূপকথার গীতিনাট্যরূপ। অংশ গ্রহণ করেছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কাজী সব্যসাচী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অনুপ ঘোষাল এবং আরো অনেকে।

**দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড**

(ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম)

কলিকাতা · বোম্বাই · দিল্লী · মাদ্রাজ · গৌহাটি · কানপুর

GC 6342

## ক্রীড়া বিনোদন ও বাংলার নিজস্বতা

অন্যান্য বারের মতো এ-বছরও আমরা অমৃতের অগণিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের হাতে এই ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যাটি তুলে দিচ্ছি। জীবনের চারদিকে যখন হতাশার অন্ধকার, তখনি তো মানুষের সৃজনী প্রতিভার পরিচয় গ্রহণের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। দুঃখ ও হতাশা জয় করার জন্য মানুষের চিরকালের যে-সংগ্রাম তাকেই আমরা পরিস্ফুট করে দেখতে চাই মানুষের নানা প্রশংসনীয় উদ্যমে, তার শিল্পসৃষ্টিতে, তার ক্রীড়াকুশলতায়। মানুষ যখন ঘর বাঁধতে শেখেনি, সমাজ তৈরী করেনি, তখনও গুহাগাত্রে অবসর সময়ে প্রাচীর-চিত্র উৎকীর্ণ করে সে তার উদ্বৃত্ত আনন্দের চিহ্ন রেখে গেছে উত্তরকালের মানুষের জন্য। সেই শিল্পনিদর্শন দেখে আমরা আদি মানুষের জীবন-তৃষ্ণার পরিচয় পাই। মানুষের এই শিল্পবোধ, সৃজনপ্রতিভাই তৈরী করেছে এক আনন্দের জগৎ যা শুধু অবসরের ফসল নয়, মানবজীবনেরই এক মহত্তম বিকাশ।

বাংলাদেশে এই সময়টাতে খেলাধুলো ও শিল্প-সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য। তরুণ সমাজের কাছে খেলাধুলোর আকর্ষণ অসাধারণ। জীবন-গড়ার এমন সুযোগ দ্বিতীয় আর নেই। একদিকে যেমন জ্ঞান সঞ্চয়ন অন্যদিকে তেমনি শরীর চর্চা। তরুণ মনে ক্রীড়ানুশীলনের যে গভীর প্রভাব আছে তা সর্বজনস্বীকৃত। আমরা আমাদের দেশের তরুণদের কতটুকুই বা সে সুযোগ দিতে পারি। ঘনবসতিপূর্ণ শহরে, বিশেষ করে কলকাতায়, ছেলেরা অর্থাভাবে এবং স্থানাভাবে খেলাধুলোর নিয়মিত সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ক্রিকেটের প্রতি অনুরাগ এখন সর্বব্যাপী। অথচ মাঠের অভাবে, অর্থের অভাবে আমাদের তরুণ কিশোররা অলিতে-গলিতে, রাস্তায়-রাজপথে ক্যানভাসের বল নিয়ে ক্রিকেট খেলতে বাধ্য হয়। উপযুক্ত সুযোগ পেলে এদের মধ্যেই কতজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার হতে পারত, কে জানে? স্কুল-কলেজগুলোতে ছাত্রদেরই বসবার জায়গা হয় না। স্কুল-কলেজের নিজস্ব মাঠের কথা তো অকল্পনীয়। তা সত্ত্বেও আমাদের তরুণরা ক্রীড়াজগতের নানা ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় রাখছেন এটা আশা ও গৌরবের বিষয় নিঃসন্দেহে। সম্প্রতি ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ক্রীড়াকুশলীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আশা করি ভবিষ্যতে এই গৌরব মহত্তর বিজয়ে মহিমান্বিত হবে।

শিল্পজগতে বাংলাদেশ চিরকালই অগ্রণী। সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, থিয়েটার এবং কাব্য-সাহিত্যে বাংলার সৃজনধর্মী মন স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছে দেশবাসীর সামনে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে শুরু করে আধুনিক ও লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারায় গুণী শিল্পীরা যে-অনুশীলন ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। বাংলার নিজস্ব গান, টপ্পা, ধ্রুপদ, শ্যামাসঙ্গীত, বাউল, ভাটিয়ালীর আবেদন এঁদের কণ্ঠের পরিশীলিত সৌকর্যে আরও আদরনীয় হয়ে উঠেছে। বাংলার নিজস্ব মহিমার এক উজ্জ্বল বিকাশ হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। কবিগুরুর প্রতিভাস্পর্শে উদ্ভাসিত এই অনন্য সঙ্গীতের প্রচার আজ ঘরে ঘরে। সাধারণ মানুষের কণ্ঠেও আজ এই গানের অনুরণন শুনি। রবীন্দ্র-ঐতিহ্য আজ জাতীয় ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে আমাদের মননধর্মকে উজ্জ্বলতর করেছে।

চলচ্চিত্রজগতেও বাংলার দান বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রথম যুগে প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসুর শিল্পসৃষ্টি বাংলার চলচ্চিত্রকে যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, পরবর্তী যুগে সত্যজিৎ রায় তাকে দেন এক নতুন রূপ যার শিল্পসৌন্দর্যের সূক্ষ্মতা, অনুভূতির ব্যঞ্জনা এবং জীবনের বিশ্বস্ত রূপায়ণ আমাদের বিস্ময়ে মুগ্ধ করে দেয়। চলচ্চিত্র একটি মিশ্র শিল্পকর্ম যদিও ফলশ্রুতির দিক দিয়ে সর্বাঙ্গীণ ও গোটা শিল্পেরই নামান্তর। বাংলার বিশ্ববন্দিত পরিচালক তার অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের দেখিয়েছেন। বর্তমান যুগে চলচ্চিত্রই সবচেয়ে শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও নাটকের সমস্ত গুণ। গুণী শিল্পীর হাতে চলচ্চিত্র কী অসাধারণ শিল্পকর্মে উন্নীত হতে পারে বাংলার তরুণ পরিচালকরাও তা দেখিয়েছেন।

রঙ্গমঞ্চেও বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত। গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু করে বিশ্ববিখ্যাত নট ও পরিচালক শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁদের অনন্য প্রতিভায় বাংলার রঙ্গমঞ্চকে অশেষ গৌরবে সমৃদ্ধ করে রেখেছেন। নাটক রচনা ও প্রযোজনার এই বৈশিষ্ট্যকে উত্তরোত্তর গৌরবের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন আধুনিক নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীরা। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' দিয়ে বাংলাদেশে নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত। নাটকেই জীবনের সত্য অকুণ্ঠ প্রকাশের সুযোগ পায়। 'একটা জাতিকে চেনা যায় তার নাটক দিয়ে' এই গ্রীক উক্তির সত্যতা অবিসম্বাদী। বাংলাদেশে নতুন নাটকের এক আশ্চর্য পরীক্ষা চলছে গত দুই দশক ধরে। পেশাদার মঞ্চের পাশাপাশি অসংখ্য অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠি বা গ্রুপ থিয়েটার পরীক্ষামূলক নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে জীবনের বহুবর্ণ জিজ্ঞাসাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করছে।

আমরা বর্তমান সংখ্যায় বঙ্গ-সংস্কৃতির এই বিচিত্র ধারা নিয়ে আলোচনার যে আয়োজন করেছি তা থেকে পাঠকরা বাঙালীর চিন্তা ও মননের একটি পরিচয় পাবেন বলেই আশা করি। জীবন নানাদিক থেকে সন্ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত হলেও তার ধ্রুবত্ব অপরিবর্তনীয়। সেই ধ্রুব ধ্যান ও ধারণাই মানুষের সৃজনকর্মে প্রতিফলিত ও প্রসারিত হয়। পাঠকদের যদি এই স্বল্প পরিসরে সে সম্পর্কে খানিকটা অবহিত করতে পারি, তাহলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক বলে গণ্য করব।

# রক্ত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আমি ডাক্তার। অনুভূতিপ্রবণতার বাড়াবাড়ি দেখলে নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে আসি। মানুষের সুখে দুঃখে নিজেকে অনেকখানি নির্বিকার নিরাসক্ত ভাবি। কারো ভালো দেখলে ভালো লাগে, মন্দ দেখলে খারাপ লাগে, এই পর্যন্ত। অন্য প্রয়োজনের ডাক এলে সেই ভালো-মন্দের ছাপগুলো কখন মন থেকে খসে যায় নিজেই জানতে পারিনা।

জীবনের প্রৌঢ় প্রহরের এই সন্ধ্যায় অনেক দেখা সুখে-দুঃখে নির্লিপ্ত আমারই এই দুই চোখের কোণ দুটো সিরসির করে উঠেছিল। এর নাম অনুভূতি-প্রবণতা কিনা আমি জানি না। ছেলেটা চলে যাবার পর আমি নাকি বিড়বিড় করে কি বলছিলাম শুনলাম স্ত্রীর মুখে।...আমি কিছু বলছিলাম না, আমি প্রার্থনা করছিলাম। একটু আগে ছেলেটাকে যে চোখে দেখলাম, তার সবটুকু সত্যি হোক। সত্যি হোক, সত্যি হোক, সত্যি হোক।

দুটি ঘটনা। দুটিরই আমি প্রত্যক্ষ-দর্শী। দুটো ঘটনার সঙ্গেই আমি প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্ত। কিন্তু দুটো ঘটনার তেইশ বছরের ফারাক। এত বড় ব এত সহজে এক সুতোয় জোড়া যা করে সেও যেন আমার কাছে এক নিয়ে হাজির।

প্রথম ঘটনা, অর্থাৎ তেইশ বছর ঘটনাটা বলি। একটি মেয়েকে আমার লেগেছিল। বছর উনিশ বয়েস হবে। সুষমা। রূপসী কিছু নয়। আর সাধারণ মেয়ের মতোই চেহারা। মোটামুটি ভালো আর বয়েসের শ্রী

কিছুটা, এই পর্যন্ত। আসলে মেয়েটির ভিতরের অকপট স্বচ্ছতা আমাকে টেনেছিল।

একই পাড়ায় বাড়ি। আমার বাড়ি থেকে মিনিট চারেকের হাঁটা পথ। এ পাড়ায় আমিই নতুন তখন। সদ্য বিলেত-ফেরত ডাক্তার, ঝকঝকে নেমপ্লেট এ'টে এবং চোখে পড়ার মতো করে চিকিৎসার আসর সাজিয়ে বসেছি।

ও বাড়ি থেকে প্রথম ডাক পড়ল রাত্রি ন'টার পরে। রাতে চেম্বার আওয়ার্সের পরে রোগী দেখা রীতি নয় আমার। তাছাড়া আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্টও করা নেই। কিন্তু পাড়ার বাড়ি, আর রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে শুনে গেলাম দেখতে। যে ভদ্রলোক ডাকতে এসেছিলেন আমাকে, তিনি ও বাড়ির জামাই। এক নজর দেখেই ভদ্রলোককে বেশ অবস্থাপন্ন এবং শৌখিন মানুষ মনে হয়। হাতে সোনার ঘড়ি, গিলে-করা পাঞ্জাবীর সোনার চেন-এ হীরের বোতাম, আঙুলে জ্বলজ্বলে চুণীর আংটি। তাঁরই শ্বশুর অসুস্থ।

বাড়িটা দেখে বাড়ির মালিককে তেমন অবস্থাপন্ন মনে হল না। সে-দিক চিন্তা না করে রোগী দেখায় মন দিলাম। আধা অজ্ঞান অবস্থায় শয্যায় মিশে আছেন। দেখে শুনে আশাপ্রদ কিছু মনে হল না। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কে চিকিৎসা করছেন শুনলাম এবং যে চিকিৎসা চলছিল তার প্রেসক্রুপশন দেখলাম। মুখ তুলতেই দুজোড়া উদগ্রীব চোখ আমার ওপর ন্যস্ত দেখলাম। এক-জোড়া বয়স্কা রমণীর চোখ, কপালে বড় জ্বলজ্বলে সিঁদুর। রোগীর শিয়রের কাছে বসে আছেন। অন্য জোড়া মহিলাটির পাশে দাঁড়ানো উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ের। রোগীর পায়ের দিকে আর একটি মহিলা দাঁড়িয়ে, বছর ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বয়েস হবে—বিবাহিতা। অনুমান ইনিই রোগীর বড় মেয়ে, অর্থাৎ আমাকে যিনি ডাকতে গেছলেন তাঁর স্ত্রী। পরে জেনেছি অনুমান মিথ্যে নয়, ওরা দুই বোনই বটে, মাঝে আরো গোটাকতক ছেলেমেয়ে ছিল, তারা বিগত।

ইশারা বুঝে বড় জামাইটি আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু আলোচনায় বসার আগে হাত দুটো সাবান দিয়ে ধোয়া দরকার।

একটু জল—

ও—সুমি—সুমিই—

অবিবাহিত মেয়েটি ছুটে এলো। তারপর নির্দেশমতো জল আর সাবান নিয়ে এলো। ঘরের বাইরে নর্দমার কোণে ঝুঁকে আমি সাবানে হাত ঘষে নিলাম। মেয়েটি আমার হাতে জল ঢেলে দিতে লাগল। তখনই আর একবার আমি তার দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই দুটো কান্না-থিতনো টানা চোখের অব্যক্ত করুণ মিনতি দেখলাম আমি।

রুমালে হাত মুছতে মুছতে পরে এলাম। জামাই ভদ্রলোককে খোলাখুলি বললাম, বুঝতেই পারছেন অবস্থা সুবিধের

নয়, তবে একটা চেষ্টা করা যেতে পারে, তাতে করে আরো কিছুদিন হয়তো টিঁকে থাকবেন, কিন্তু সে-চেষ্টা একটু খরচা-সাপেক্ষ।

শৌখিন ভদ্রলোকটির মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। কি-রকম খরচসাপেক্ষ জানতে চাইলেন। খরচের আভাস দিতে আরো বেশি চিন্তাচ্ছন্ন মনে হল তাঁকে। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কথা মতো চিকিৎসা করলে আর কতদিন উনি বাঁচতে পারেন মনে হয়?

—সেটা সঠিক বলা শক্ত, তবে মনে হয় দু'তিন মাসের বেশি নয়।

বেজার মুখ করে ভদ্রলোক বলেই ফেললেন, তাহলে আর কি লাভ! এ-রকম বলে ফেলার জন্য অপ্রস্তুত যে একটু না হলেন এমন নয়। ঢোক গিলে বললেন, আপনাকে খোলাখুলিই বলি ডক্টর, গত ছ'মাস ধরে আমরা শ্বশুরমশাইয়ের চিকিৎসা করে চলেছি, এ-পর্যন্ত হাজার দেড়েক টাকা খরচা হয়ে গেছে...মানে আমাদের যতটুকু সাধ্য তার একরকম শেষে এসে ঠেকেছি...এখন আপনার কথা-মতো চিকিৎসা চালিয়ে গেলে আরো হাজারখানেক টাকার ওপর খরচ হবে, অথচ দু'-চার মাসের মধ্যে যাবেনই উনি, এ অবস্থায় টিঁকিয়ে রেখে...ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না......

ঈষৎ বিস্ময়ে আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে আছি। ও'র হাতে আর আঙুলে আর জামায় যা লাগানো আছে তার বিনিময়ে যা খরচ হয়েছে আর যা হবে তার সবটাই উশুল হয়েও উদ্বৃত্ত থাকতে পারে। অথচ উনি বলছেন, সামর্থ্যের একেবারে শেষের মাথায় এসে ঠেকেছেন।

—আপনাকে আরো একটু খুলে বলি ডক্টর, আপনার ব্যবস্থামতো দু' চার মাস টিঁকিয়ে রাখার চিকিৎসাও করা যেতে পারে...কিন্তু তাহলে শ্বশুরমশাই তাঁর অবিবাহিত মেয়েটির বিয়ের জন্য মাত্র যে চারটি হাজার টাকা আলাদা করে সরিয়ে রেখেছেন, চিকিৎসার টাকা তার থেকেই টেনে নিতে হবে, এ-ছাড়া আর অন্য কিছু সম্পত্তি নেই...সে-রকম করাটা ঠিক হবে কিনা ভাবছি...



এ-রকম পরিস্থিতিতে কোনো চিকিৎসক কখনো পড়েছেন কিনা আমার জানা নেই। মনে হল ভদ্রলোকের হাতের ঘড়ি আর জামার বোতামগুলো যেন আমার দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসছে। বললাম, এ-সব নিতান্তই আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কি করবেন না করবেন আপনারাই ভেবে ঠিক করুন। একটা কাগজ—

জামাই ভদ্রলোক যেন বাস্তবে ফিরলেন এতক্ষণে। একটা প্যাড এনে সামনে ধরলেন। পুরনো প্রেসক্রিপশন থেকে আমি দুই-একটা ওষুধ বদলে নতুন প্রেসক্রিপশন লিখে দিলাম। সম্পূর্ণ জ্ঞান হবার আগে এবং পরে কি করণীয় জানিয়ে বললাম, ব্লাড-প্রেসার এখন হাই, কয়েক ঘণ্টা পরপর চেক করা দরকার।

শোনামাত্র আহত মুখ জামাইটির। বলে উঠলেন, তাহলে তো যে ভদ্রলোক রোজ দেখছেন তাঁকে এনে বসিয়ে রাখতে হয়।

যে সুরে বললেন কথাগুলো, তার একটি মাত্র অর্থ হল, আবার আমি তাঁদের অহেতুক কিছু বাড়তি খরচের মধ্যে ফেলছি। মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও হেসেই বললাম, আমাকে বার বার এসে প্রেসার চেক করতে হলে আপনাদের আরো বেশি অসুবিধা। যা উচিত তাই বললাম, সেটা করা না করা আপনাদের বিবেচনা। আচ্ছা—

উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। দরজার ও-ধারে দেখলাম অবিবাহিতা মেয়েটি, যার বিয়ের জন্য তার বাবা মাত্র চার হাজার টাকা সরিয়ে রেখেছেন—উদগ্রীব মুখে সে দাঁড়িয়ে। ব্যস্তসমস্তভাবে জামাইটি পিছন থেকে এগিয়ে এলেন।—আমাদের ঠিক জানা নেই, আপনার ফী কত ডক্টর?

—থারটি টু।

—এক মিনিট ডক্টর, প্লীজ্।

টাকা আনার জন্য হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরুতেই মেয়েটির মুখোমুখি। দেখলাম মেয়েটি তার হাতে টাকা গুঁজে দিল। বত্রিশটি টাকা হাতে নিয়েই সে অপেক্ষা করছিল। টাকাটা জামাইয়ের হাত থেকে আমার হাতে এলো। হাত বাড়িয়ে ফী নিলাম বটে, কিন্তু এই প্রথম কি-রকম যেন সঙ্কোচও বোধ করলাম একটু। বাড়ি থেকে নেমে আসার পরেও মেয়েটির জলে-ভরা চোখ দুটো আমার চোখে ভাসছিল। আবার হাসিও পাচ্ছিল। আমার তিন বছরের একটি মেয়ে আছে, ভাবী জামাতাটি ওই গোছের হতে পারে কিনা সেই উদ্ভট চিন্তা মাথায় এসেছিল। ও'দের ওই জামাইটি আমার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ আনাবেন কিনা সেই সংশয়ও ছিল। ...ছোট মেয়ের বিয়ের বাবদ তার বৃদ্ধ বাবা মাত্র চার হাজার টাকা সরিয়ে রেখেছেন, সোনার ঘড়ি চুনীর আঙটি আর হীরের বোতামঅলা জামাই আনতে ভদ্রলোকের কত টাকা খরচ হয়েছিল?

বাড়ি ফিরে নতুন অভিজ্ঞতার ব্যাপারটা স্ত্রীকে বলতে তিনি সবিস্ময়ে মন্তব্য করে উঠলেন, আচ্ছা চামার তো জামাইটা!

আমি বললাম, তা নয়, প্র্যাকটিক্যাল মানুষ।

ওই রোগী নিয়ে আর আমায় মাথা ঘামাতে হবে ভাবিনি। কিন্তু পরদিন সকাল আটটা না বাজতেই টেলিফোন। সাড়া দিতে ও-দিক থেকে উদবেগভরা মিষ্টি গলা কানে এলো।—কাল রাতে আপনি আমার বাবাকে দেখে গেছলেন, আমি সেই বাড়ি থেকে কথা বলছি—

—হ্যাঁ বুঝেছি। কেমন আছেন উনি?

—আমাদের মনে হচ্ছে একটু ভালো, এখন পরিষ্কার জ্ঞান আছে, কাল আপনার সব ওষুধ ঠিক-ঠিক পড়েছে—আপনি দয়া করে এক্ষুনি একবার আসুন ডাক্তারবাবু, মা আমাকে বার বার করে বলছেন—

বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেলাম। বললাম, এখনই গিয়ে কি হবে, ওষুধটা চলুক, আর ব্লাড-প্রেসার নেওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ, এখনো বেশি শুনেছি, আপনি দয়া করে এক্ষুনি একবারটি এসে বাবাকে দেখে যান ডাক্তারবাবু, মা কাল সমস্ত রাত মুখে জল দেয়নি, ঠায় বসে কাটিয়েছে, আপনার অসুবিধে থাকলেও একবারটি আসুন—

অনুরোধ নয়, টেলিফোনে যেন কান্না-ভরা আকুতি বাজছে কানে। ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ভগ্নিপতি কোথায়?

—তিনি সন্ধ্যায় আসবেন। তাঁর জন্যে কিছু ভাববেন না ডাক্তারবাবু, বাবার চিকিৎসা আমরা করাচ্ছি, আপনি দয়া করে এক্ষুণি আসুন।

অগত্যা রাজি হলাম। একটু বাদে গেলামও। আজ ওই মেয়েটিই আমাকে রোগীর ঘরে নিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে নিবিষ্ট মনে রোগী দেখলাম। মেয়ে আর তার মায়ের দু'জোড়া উদগ্রীব চোখ আমার মুখের ওপর। রোগীর অবস্থার খুব একটা তারতম্য দেখলাম না। তবু তাঁকে এব বয়স্কা রমণীটিকে আশ্বাস দিলাম, একটু ভালই তো মনে হচ্ছে—

হাত ধোবার জন্য বাইরে এলাম মেয়েটি আগের থেকেই সাবান জল তোয়ালে ঠিক করে রেখেছিল। আমি জল-সাবা হাতে ঘষতে ঘষতে তার দিকে তাকালা একবার। এটুকুর প্রতীক্ষাতেই ছিল যেন জলের ঘটি হাতে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞা করল, সত্যি সত্যি কি রকম দেখলেন ডাক্তা বাবু?

এটুকু থেকেই বোঝা গেল, মেয়ে বুদ্ধিমতী। সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম, এ রকমই।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের ঘটিটা মেঝেতে রে এক কাণ্ড করে বসল মেয়েটি। দু'হাত আমার সাবানমাখা হাত দুটো ধরে ফেল কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে উঠল, ডাক্তারবা আপনি জামাইবাবুর কোনো কথা ধরবে না, যত টাকা লাগে লাগবে, আপনি যে করে পারেন বাবাকে বাঁচিয়ে রাখুন ডাক্তা বাবু, টাকার জনো কিছু আটকাবে আপনি শুধু বাবাকে বাঁচান—বাবা দা আমাদের আর কেউ নেই।

আমি বিধাতা নই। কিন্তু মেয়েটির দিকে চেয়ে সেই স্বল্পক্ষণের জন্যেও আমার বিধাতা হতে ইচ্ছে করছিল।

মাথা নেড়ে আশ্বাস দিলাম, চেষ্টা করব। হাত ধুতে ধুতে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি?

—সুষমা।

—পড়ো?

মাথা নেড়ে সায় দিতে গিয়েও দিল না। বলল, পড়তাম...বাবা অসুখে পড়ার পর থেকে আর কলেজে যাচ্ছি না।

প্রেসক্রপশনে আরো একটা ওষুধ যোগ করে এবং আনুষঙ্গিক নির্দেশ দিয়ে বললাম, সন্ধ্যার পর এসে একবার দেখে যাব, তারপর যা হয় করা যাবে।

কৃতজ্ঞ মুখে মেয়েটি মাথা নাড়ল, আমি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

—ডাক্তারবাবু!

ঘুরে দেখি তার হাতে টাকা। নোট ক'টা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

আমি হেসেই বললাম, ওটা থাক এখন, বাবা সেরে উঠুন, পরে দেখা যাবে।

—না না না। চোখে মুখে সত্যিকারের বিড়ম্বনা।—আপনি চেষ্টা করবেন এই ঢের, তাছাড়া টাকা না নিলে আমি যখন তখন আপনাকে ডাকব কি করে?

এরকম সরল উক্তিও আমি বেশি শুনিনি। হেসেই জবাব দিলাম, সকালের মতো ফোনে ডাকতে পারো, সে রকম দরকার মনে হলে চলেও যেতে পারো—কাছেই তো বাড়ি।

—ডাক্তারবাবু!

পা বাড়াতে গিয়েও আবার বাধা পড়ল। আবারও ফিরে তাকালাম। সুষমা একবার বাবার ঘরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে গলা আরো খাটো করে বলল, জামাইবাবু কাল আপনাকে সত্যি কথা বলেন নি, বাবা আমার বিয়ের জন্য চোদ্দ হাজার টাকা রেখেছেন, চার হাজার নয়...আজকের ফী-টা অন্তত আপনি নিন, ও-বেলা না-হয় নেবেন না।

মেয়েটির মর্যাদা বোধ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। অথচ তেমনি অকপট সরল। কেন যেন ওই বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি দেখার সাধ হল আমার। গম্ভীর মুখ করে জবাব দিলাম, এক শর্তে নিতে পারি, তোমার বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করলেও আমি আসব না।

লালচে মুখ দেখলাম। প্রত্যাশিত হাসিটুকুও দেখলাম। নেমে এলাম। টাকা দেবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করল না।

রাতে আবার সেই সোনার ঘড়ি হীরের বোতাম চুণীর আংটি ভগ্নিপতির মুখোমুখি। আমার সকালে আসা এবং ফী না নেবার সংবাদও শুনে থাকবেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে উচ্চ-বাচ্য করলেন না। রোগী দেখে পাশের ঘরে আসতে চিন্তিত মুখ করে বললেন, আপনার কালকের কথাটা ভেবে দেখলাম, ডক্টর...যে চিকিৎসা করতে চান করুন...এঁদেরও তাই মত, টাকা যা লাগে লাগবে, তবে একটু কমে-সমে যাতে হয় দেখবেন, বুঝতেই তো পারছেন...এদিকে আবার মেয়েটার বিয়ের কথাবার্তা খানিকটা এগিয়েছে, হয়তো এ মাসের মধ্যেই দিয়ে ফেলতে পারব বিয়েটা...তার মধ্যে কর্তা চোখ বুজলে একটা বিতিকিচ্ছিরি ফ্যাসাদ হবে...তার থেকে করুন চিকিৎসা।

ডাক্তার হিসেবে এমন বাস্তবের মুখো-মুখি আর বোধহয় আমাকে দাঁড়াতে হয়নি কখনো।

আমার ইচ্ছে মতই চিকিৎসা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সুষমার বাবাকে দেড় মাসের বেশি বাঁচান যায় নি। দেড় মাসের মাথায় ভদ্রলোক চোখ বুজলেন। যাবার সময় হয়েছে আগের দিনই বোঝা গেছল। পরদিন রাত দশটায় সুষমার টেলিফোন, বাবা নেই। বিকেলেই গত হয়েছেন। তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাবার পর সুষমা শেষ খবরটা আমাকে জানালো।

অভ্যস্ত নই বলে দুটো সান্ত্বনার কথাও বলে উঠতে পারলাম না। সুষমাই বরং বলল, আপনার জন্যেই বাবাকে দিনকতক বেশি পেলাম। আপনাকে কি আর বলব—

সুষমা সত্যিই সুষমা। এর পরেও মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। মায়ের বা নিজের কিছু হলে নিজেই আমার চেম্বারে আসে। ওষুধের ব্যবস্থা নিয়ে যায়। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও ওর আলাপ হয়েছে। মেয়েটাকে তাঁরও ভাল লেগেছে।

এর বছর দেড়েক বাদে সুষমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি এবং আমার স্ত্রী সানন্দে সেই বিয়েতে গেছি। বাড়ি ফেরার পর অনেকবার আমার মনে হয়েছে, মেয়েটার আর একটু ভালো বিয়ে হলে ভালো হত। ছেলেটার ছোট স্টেশনারি দোকান আছে একটা, সেই সম্বলের ওপর নির্ভর করে বিয়ে। আমার স্ত্রী অবশ্য বললেন, বেশ বিয়ে হয়েছে।

সুষমার শ্বশুরবাড়ি আমার বাড়ি থেকে মাইল দুই দূরে। দেখা সাক্ষাৎ এর-পর স্বাভাবিকভাবেই কমে এসেছে। বিয়ের বছর কয়েকের মধ্যে বারতিনেক আমি ওর শ্বশুরবাড়ি গেছি ওর ছেলে-মেয়েকে দেখতে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ওর। সেই ছেলেমেয়ের কখনো একটু বেশি অসুখ হলেই আমার ডাক পড়েছে। গেছি। নিজের দাদার মতই আদর আপ্যায়ন করেছে আমাকে। ওর সংসারের অবস্থা খুব স্বচ্ছল মনে হয়নি আমার। কিন্তু সহজ হাসিটুকু মুখে লেগে থাকতে দেখেছি। আমাকে দেখামাত্র ও ধরে নেয় ছেলেমেয়ের অসুখ পালালো বলে। শেষবার দেখা হতে শুনেছি-লাম সুষমা একটা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করছে।

মাঝে দীর্ঘকাল আর দেখা হয় নি। হিসেব করলে ওর বিয়ের পর তেইশটা বছর কেটে গেছে। হিসেব করিনি, কারণ সুষমা-প্রসঙ্গ আর তেমন মনেও ছিল না।

সেদিন সকালের দিকে দেখলাম আমার চেম্বারের সামনে একজন নিম্ন-মধ্যবিত্ত গোছের লোক দাঁড়িয়ে আছে। বিমর্ষ মুখ। ঢুকবে কি ঢুকবে না ভেবে ইতস্ততঃ করছে। মুখটা চেনা-চেনা মনে হল আমার। এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই?

লোকটা মিনমিন করে যা বলল, তার সারমর্ম, সে সুষমার স্বামী। সুষমার বোধহয় খুব সাংঘাতিক রকমের কিছু অসুখ হয়েছে, আমি যদি দয়া করে একবার তাকে দেখতে যাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, সুষমা আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে?

কেন জিজ্ঞাসা করলাম জানি না। সুষমার স্বামী মাথা নাড়ল, তারপর বিড়-বিড় করে বলল, না আমার ছেলে আপনার কথা বলছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সুষমার কি হয়েছে?

জবাব শুনে বিষম চমকে উঠলাম। পাড়ার ডাক্তার ক্যানসার সন্দেহ করছে। কাঁধের কাছে দু-তিন জায়গায় ফোলা ফোলা। আগে ব্যথা বেদনা ছিল না, এখন একটু একটু ব্যথা শুরু হয়েছে।

বিকেলে যাব বলে দিলাম। মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। পুরনো কথা মনে পড়ল। আমার হাতে জল দেবার সময় ওর সেই দুটি চোখ আজও ভুলিনি।

বিকেলে আমাকে দেখে সুষমা যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারপর যেমন খুশি তেমনি রাগ। রাগটা ওর স্বামীর ওপর। কেন ওকে না বলে-কয়ে আমাকে ডেকে কষ্ট দেওয়া হল, স্বোয়ামীর মুরোদ জানা আছে, ইত্যাদি। স্বামী বেচারা নির্বাক।

গম্ভীর মুখে আমি রোগা পরীক্ষায় মন দিলাম। দেখে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে আমার মনে হল সন্দেহ অমূলক নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি বিশেষজ্ঞ নই।

পরদিন বড় সার্জন নিয়ে এলাম একজন। তাঁরও একই সন্দেহ। দুদিনের মধ্যে বায়পসি করা হল। বায়পসির রিপোর্ট পজিটিভ। ক্যানসার।

বিশেষজ্ঞর সঙ্গে পরামর্শ করে বোঝা গেল একটাই রাস্তা এখন। ইমিডিয়েট অপারেশন। তাতেও শতকরা পঁচিশ ভাগ মাত্র জীবনের আশা। আর, ভিতরে বেশি দূর ছড়িয়ে থাকলে তো হয়েই গেল। অপারেশন করতে খুব কম হলেও সর্বসাকুল্যে হাজার আড়াই টাকা লাগবে।

সুষমার স্বামীকে আড়ালে ডেকে খোলাখুলি সব বললাম। অপারেশন এক্ষুণি করা দরকার তাও বোঝালাম।

সব শোনার পর লোকটা মিনমিন করে বলল, আশা যখন নেই-ই প্রায়, কাটাছেঁড়া করে কি হবে...তাছাড়া অতগুলো টাকা জোগাড় করা......

রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে সুষমার ঘরে এলাম। পিছনে ওর স্বামীও এলো। আমাকে দেখেই সুষমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, ও-ঘরে কি ফিস-ফিস হচ্ছিল? কার কত মুরোদ আপনি জানেন না। স্বামীর দিকে চোখ পড়তেই জ্বলে উঠল যেন দেখো, দাদার জন্য আমি কিছু বলব না, কিন্তু অন্য ডাক্তার আনতে আর ওই সব করতে যা খরচ হয়েছে, তার এক পয়সা অবধি মিটিয়ে না দিলে আমি রক্ষে রাখব না বলে দিলাম!

দাদা অর্থাৎ আমি। ওর স্বামী পালালো ঘর ছেড়ে। আমি হাসতে চেষ্টা করে বললাম, ডাক্তার দাদার বোনের চিকিৎসা করতে অন্য ডাক্তার টাকা নেয় না।

সুষমা যেন আমার ওপরেও রেগে গেল। বলে উঠল, আপনাকে তো আজ দেখছি না, আপনার চালাকি আমি জানি। আমার জন্যে আর চেষ্টা করে লাভ কি, আমার কি হয়েছে আমি বুঝি না?

বললাম, জানো যদি তাহলে চুপ করে থাকো, লাভ আছে বলেই আমি ভাবছি।

একটু বাদে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমার ছেলেমেয়েকে দেখছি না, তারা কোথায়?

নির্বিকার মুখে সুষমা গরগর করে যা বলে গেল শুনে ভিতরটা টনটন করে উঠল আমার। মেয়ে বছরখানেক হল কার সঙ্গে চলে গেছে। মেয়েটার সাধ আহ্লাদ ছিল, এ অভাবের সংসারে দু-দন্ডও মন টিকত, সুযোগ পেয়ে চলে গেছে। আর ছেলেটা তার থেকেও ঢের বেশি বজ্জাত হয়ে উঠেছে। বেশ ভালো বুদ্ধিমান ছেলে ছিল, হায়ার সেকেন্ডারিতে ছোটখাট স্কলারশিপ পেয়েছিল একটা। সুষমার বড় সাধ ছিল ছেলে আমার মতো ডাক্তার হোক। কোনো কথায় কান না দিয়ে ছেলে সোজা কলেজে ভর্তি হল। অবশ্য ডাক্তারি পড়ার সংগতিও ছিল না। কি-যে হাওয়া এলো, ছেলের মাথাটাই বিগড়ে গেল একেবারে। পড়াশুনা সিকেয় উঠল। এরই মধ্যে বার তিনেক জেলও খাটা হয়ে গেছে, পুলিশ এখনও মাঝমাঝে বাড়িতে হানা দেয়। শেষের মাথায় সুষমা বলে উঠল, চুলোয় যাক সব, আমি খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছি, ও-ছেলের রক্তে শুধু মন্দ ছাড়া ভালো কিছু নেই।

নির্বাক বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি দরজার কাছে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। বছর একুশ বাইশ হবে বয়েস, কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখখানা কমনীয়, আর টানা গভীর দুটো চোখ।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে সুষমাও তাকে দেখল। তারপরেই তীক্ষ্ণ কন্ঠে বলে উঠল, কি দেখতে এসেছিস? এখনো তোদের দুকথা শোনাবার জন্য আমি বেঁচে আছি, বুঝলি? নিজেদের এক রতি মুরোদ নেই, লজ্জা করে না মায়ের জন্য তার দাদার কাছে গিয়ে ভিক্ষে চাইতে? যা দূর-হ দূর-হ' আমার সামনে থেকে!

অপ্রস্তুত মুখে ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে হাসল একটু। তারপর চলে গেল।

মায়ের বকুনি তার কোথাও স্পর্শ করেছে বলে মনে হল না।

পরদিন আর সুষমাদের বাড়ি যাইনি। কি করা যেতে পারে এখনো ভেবে উঠতে পারিনি। নিজে খরচা করতে চাইলে সুষমা কতটা বেঁকে বসবে তাও অনুমান করতে পারি। মোট কথা মনটা ভালো ছিল না।

রাত্রিতে চেম্বার আওয়ার্স এর পরে চাকর এসে খবর দিল, একটি ছেলে ডাকছে, জরুরী দরকার বলছে। মা নীচে থেকে খবর দিলেন।

নীচে নেমে দেখি সুষমার ছেলে। ছেলেটার কমনীয় মুখখানা দেখেও কেম যেন আমার রাগই হয়ে গেল। বসতেও বললাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই?

ছেলেটা সপ্রতিভ মুখে হাসল একটু। বলল, আমি আপনার সুষমা বোনের ছেলে কাল দেখেছিলেন। বাবার মুখে শুনলাম অপারেশন হলে মা বাঁচতেও পারেন, আড়াই হাজার টাকা লাগবে তাতে...টাকাটা এনেছি, আপনি চেষ্টা করে দেখুন, মা-কে যদি বাঁচাতে পারেন।

সত্যিই একরাশ নোট সে আমার টেবিলের ওপর রাখল। আমি হতভম্ব। হঠাৎই কি-রকম একটা শিহরণ অনুভব করলাম যেন। ছেলেটার সপ্রতিভ মুখ বটে, কিন্তু তেইশ বছর আগে বাপের অসুখে হাতে জল দেবার সময় এক মেয়ের যে দুটি চোখ দেখেছিলাম—অবিকল সেই দুটো চোখই দেখছি এখন।

—তোমার নাম কি?

—কমল।

—এরই মধ্যে এত টাকা কোথা থেকে জোগাড় করলে?

আমার দিকে চেয়ে তেমনি সপ্রতিভ মুখেই ছেলেটা হাসল আবার। জবাব দিল, আপনি যা ভাবছেন সে-রকম কিছু নয়, অসৎ উপায়ের টাকা দিয়ে মায়ের চিকিৎসা করলে আর পরে সেটা জানতে পারলে আমাকে আক্কেল দেবার জন্যে মা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরবে। ...এক বড়লোক বন্ধুর কাছে ধার করেছি, এ টাকা নিজে খেটে উপার্জন করে শোধ করতে হবে। মোট কথা আপনি মাকে বাঁচাতে চেষ্টা করুন, মা চলে গেলে আমাদের বাড়িতে আর বাতি জ্বলবে না।

ছেলেটা চলে গেল।

আমি বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে।

জীবনের প্রৌঢ় প্রহরের এই সন্ধ্যার অনেক দেখা সুখে-দুঃখে নির্লিপ্ত আমারই এই দুই চোখের কোণ দুটো সিরসির করে উঠছে।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, আই উইল নট্ বরো মেরিট ফ্রম আউটসাইড, ইট সুড বি ইন্ মাই ব্লাড।

আমার স্ত্রী নীচেই ছিল। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল। তার মুখে শুনলাম, ছেলেটা চলে যাবার পর আমি নাকি বিড়বিড় করে কি বলছিলাম।

আমি কিছু বলছিলাম না, আমি প্রার্থনা করছিলাম। একটু আগে ছেলেটাকে যে চোখে দেখলাম তার সবটুকু সত্যি হোক। সত্যি হোক, সত্যি হোক, সত্যি হোক।

সমতলের পথ পেরিয়ে অনেক দূরে
ল এসেছি। স্মৃতির ভেতরে এখনো
ায়ারের ডাক। চোখের পাতা বুজিয়ে
খি, আয়োজন সোনার সমুদ্র। সমুদ্র এত
ন্ত হয় জানা ছিল না। বয়সের ভাঁড়ারে
াকিছুই তোলা থাকে। সময় এলে নিপুণ
দুকরের মত একে-একে সে তা দেখায়।
কৃপণ, বড় হিসেবী। আসা-যাওয়ার
পারে বুঝি একটুও তাড়াহুড়ো থাকতে
ই। সে জানে, তার পথে যান-বাহনের
াই নেই। ট্রেণ ফেল হবার ভয় দেখিয়ে
কে যে ব্যস্ত করে তুলবো, মর্জিমাফিক
জ হাঁসিল করিয়ে নেবো তেমন সাধ্যি
াথায়?

কাঁধে হাত রাখতে গেলে ককিয়ে ওঠে
মা। পায়ে-পায়ে কী করে যে এতটা পথ
এসেছি তাই ভাবি। প্রথম দেখা
াথায় হয়েছিল মনেও পড়ে না। কেমন
র যে হৃদয়ের উত্তাপে ঘন হতে-হতে
াপ পেরে ঘনিষ্ঠতায় জমাট বেঁধে
বুঝিনে। আমরা এখন দুজনে মিলে
। জীবন যদি রসাল ফল হত তাহলে
আধখানা কিন্তু আমিই। আমার বাকি
াখানা সীমা। এখন জোর করে কেউ
আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়
সেই সুন্দর আর সুস্বাদু ফলটাই দু-
য়ো হয়ে যাবে। তার মানে সে এক
ণ, কদর্য পরিণতি। যা আমাদের কাম্য
।

কিন্তু সীমার চোখে চোখ রাখতে গিয়ে
ম এই প্রথম ভয়ের মুখ দেখি। কথা
ত গিয়ে খেয়াল হল, আমার মধ্যে এত-
কাল নিশ্চিন্তে বিচরণ করছিল একপাল
হরিণ শাবক। আচমকা বাঘের তাড়া খেয়ে
এবার তারা ভরা জ্যোৎস্নায় মাঠ মাড়িয়ে
অন্ধকার বনের গভীরে ছুটে চলেছে। অথচ
এই নিরুদ্দেশ পলায়নের পরিণাম কেউ
জানে না। ইচ্ছে হল, বুঝিয়ে বলি
সীমাকেই। ব্যাপারটা জলের মত তাহলে
ভুল না বুঝে ও বরং সময় থাকতে
সামলে নেবে সব।

'আমরা পথ ভুল করিনি তো, জীবন?'

আর্ত, আহত চোখ মেলে অপলক
চেয়ে থাকে সীমা।

নানা কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমিই
তো একদিন ঘর থেকে বাইরে টেনে এনে-
ছিলুম। ভেবে আফশোস হচ্ছে। চেহারা
দেখে আঁতকে উঠি এখন। কী ছিল, কী
হয়েছে। তুষারের মত শাদা মুখ, রক্তহীন।
দেখে মায়া হল। অপরাধ যে আমারই।
রাগে, অনুশোচনায় দিশে হারাবার আগেই
বৃক্ষের সবুজ শাখা ও পল্লবের মত কোমল
অথচ বলিষ্ঠ দুই বাহু প্রসারিত করে গাঢ়
স্বরে গভীর আবেগ মিশিয়ে বলি, 'আমাকে
বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না আর?'

শুনে লজ্জায় অবনত হল সীমা।
আমার ওপরেই সুখ-দুঃখের সমস্ত ভার
অর্পণ করে নির্দ্বিধায় অভিমান আর
অভিযোগের সুরে বেজে উঠল যেন।

'সারাক্ষণ কি তাই ভাবো নাকি?'

ক্ষুণ্ণ মনে হল সীমাকে। ভেতরে
ভেতরে ও যে খুব কষ্ট পাচ্ছে তা টের
পাই। হয়তো ফেলে আসা ঘর-বাড়ি-
ফসলের ক্ষেত নিরন্তর তোলপাড় করে
ওকে। ওর চোখের তারায় এখনো সবুজের
ছোঁয়া লেগে আছে কিনা বুঝিনে। মাঝে-
মাঝে বিদ্যুতের চমক শুধু দেখতে পাই।
অথচ যেহেতু শুধু স্মৃতি নিয়ে ঘরকন্না
অচল, ও তাই এতবড় ঘটনাটাকেই আমার
চোখের আড়ালে রাখতে চেয়ে মরিয়া।
কারণ, সীমা এখনো শৈশব-কৈশোরের
টুকরো-টুকরো ছবিগুলোকেই পরম মমতা-
ভরে আগলে বেড়ায়। তবু জননীর মত
স্নেহ দিয়ে, স্তন্য দিয়ে গোপন স্বপ্ন-
গুলোকেই বড় করে তোলার একান্ত বাসনা
যেন মরে না। ওর দিকে চেয়ে, ওর কথা
ভেবে নিজেকে অক্ষম ঠেকে বার-বার।
হয়তো আমরা আমাদের ভালোবাসার যোগ্য
হব না কোনোদিন। এই অযোগ্যতার দায়
কিন্তু আমাদের কারো নয়। তাহলে কি
ভুল? সমস্তই ভুল? কাছে আসা, কথা
বলা, আঙুলে আঙুল জড়িয়ে নির্নিমেষ
চেয়ে থাকা—এইসব যা কিছু প্রিয়, পবিত্র
ও কাম্য মনে হয়—মিথ্যে হয়ে যাবে? একে-
একে শূন্যে মিলিয়ে যাবে সব? চিন্তা-
ভাবনাগুলি একটার গায়ে আরেকটা পাকিয়ে
যাচ্ছে কেমন।

'জীবন, তোমার বুকের ভেতরই কালি
জমে আছে। একটু সাফ-সুতরো হওয়া
দরকার। নইলে যে বাঁচাটাই মিথ্যে হবে।'

সীমা অভিযোগ করে। আবার
সান্ত্বনাও দেয়। কেমন রহস্য মনে হয়
ওকে।

ভাবসাব দেখলে রাগ হয়। মনে-মনে
নিরুপায় জ্বলতে থাকি আমি। মুখ
ফুটে [illegible] দু-কথা শুনিয়ে দেবো তেমন

সাহস নেই। আমি কি কাপুরুষ? লোকে হয়তো তাবে তাই।

কাঁটাতারের বেড়ার ঠিক ওপারেই সেই দেশ। আমাদের জন্মভূমি। তারপর খেলা-ভাঙার সেই খেলা! আমরা আর আগের মত নেই। এখন একটুতেই ফুঁসে উঠি। অভিমানে, অবিশ্বাসে মন ভরিয়ে পরস্পরকে ঘৃণা করি। ভালোবাসার নাম করে একজন অন্যজনকে চাতুরী দিয়ে ভোলাতে চাই। আর মনে-মনে তৃপ্ত হতে চেয়ে নিজেকেই চোখ ঠারি। বলি, জীবন তুমি আছো? এখনো বেঁচে আছো তো? দ্যাখো, এর নাম সুখ! এর নাম দুঃখ! আমার ডাইনে-বাঁয়ে দুই হাতের দুই শূন্য মুঠি মেলে ধরি। প্রাণ খুলে হাসতে পারিনে। চেঁচিয়ে যে কাঁদবো তেমন শক্তিই বা কোথায়? শুধু আমার রকম দেখে বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে আরেকজন। তাকে আমরা কেউ-ই চিনিনে। না আমি, না সীমা। আবার হাতে-নাতে বোকামিটাই যে ধরে ফেলবো ঘটে তেমন বুদ্ধিও নেই।

কাতরগলায় আকুতি ফুটিয়ে সীমা বলে, 'জীবন, তুমি কি ভাবো?'

'কিছু না......কিছু না তো!'

যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছি। লুকিয়ে প্রেম নিবেদন করছি আর কাকে! হঠাৎ চমকে উঠি।

'দিন-দিন বেজায় রোগা হয়ে যাচ্ছো।'

ক্লিষ্ট হাসি হাসলে সীমা। জবাবে আমি যে কী বলি! অসহায় চেয়ে থাকি। যেন নদীর ওপারে গ্রাম কিংবা বনান্তের শোভা দেখি। আমি যে কবি। কথাটা সীমাকে থেকে-থেকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। পাছে ভুলে যায়!

সারা গায়ে হাত বুলিয়ে পরখ করে সীমা। ভয়ংকর করুণ আর একা আর অসহায় ঠেকে ওকে। সত্যি বলতে কি, আজ অবধি ওর জন্যে কিছুই করিনি। করতে পারিনি। কথা ছিল, কেউ কাউকে ঠকাবো না। স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রেখেছি এতকাল। আর কী পারা যায়? মনের মধ্যে জমে উঠছে ক্ষোভ, দুঃখ, হতাশা। রাগ হয়। নিজেকে অপদার্থ ভেবে যে সমস্ত দায় থেকে দূরে সরিয়ে রাখবো, দুহাতের ধুলো ঝেড়ে মনে-মনে নিশ্চিন্ত হব, তেমন সুযোগ মেলে না। এ আমি চাইনি। এমন করে চাইনি কোনোদিন। সবকিছুই আমাদের জানান না দিয়ে ইচ্ছে, শক্তি, আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। এখন মূক, মৌন বধিরের মত শুধু চলা, চলা আর চলা। মাঝে-মাঝে ক্ষেপে উঠি কেন যে! অকারণ রক্তাক্ত, বিক্ষত করে তুলি যে-যার আপনাকে। লোকে বলে, ধীরে ধীরে আমি নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছি। হাতের কাছে একটা আর্শি পেলে হ'ত। অন্তত ভালো করে মুখটা দেখে নেয়া যেতো একবার।

সীমা কিন্তু সান্ত্বনার কথা শোনায়। গাঢ় স্বরে কিসের টান! ঝর্ণার নাকি বাতাসের বুঝিনে।

'জীবন, আমার জীবন! তুমি না কবি?'

'তুমি আছো বলেই আমি কবি।'

'তাহলে কথা রাখো! মাঝপথেই ভেঙে পড়লে কি আমাদের চলে?'

'আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে চোখে।' কান্না পেলো। ইচ্ছে হ'ল এত-কালের পুষেরাখা গোপন ব্যথা দিয়েই সন্ধ্যার আকাশের মত সীমাকে-ও রক্তিম আবেগে ভরিয়ে তুলি।

কিন্তু ও আমাকে ধমকে উঠলো। বললে, 'মিথ্যে কথা।' তারপর খুব ঘনিষ্ঠ হতে চেয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় যথাসম্ভব গুরুত্ব ফুটিয়ে বললে, 'দেখতে না পাও তো কান পাতো। পায়ের শব্দ নিকট হচ্ছে ক্রমশ। দিন আসছে, দিন!'

উৎকণ্ঠায়, অধৈর্যে আমি আমার সমস্ত সত্তাকেই মুহূর্তে টান-টান করে তুলি।

এই শ্রাবণে সীমার বয়স হবে তেইশ।

আর আমি?

চল্লিশেই প্রৌঢ়ের মত আরেকটু নুয়ে পড়বো।

জানি, এখন খুব সাবধানে চলতে হবে আমাদের। খানা-খন্দে অন্ধকার ওঁত পেতে আছে দু'পাশেই। আশা ছিল গোপে-গোপে পেঁছে যাবো। জোয়ার এলো আর গেলো। হাওয়া উঠলো আবার পড়লো। অথচ ঘুমের ঘোর কাটিয়ে একটিবারও সজাগ হবার কথা মনে পড়লো না। এমনি করেই হালে বসে পাল তুলে নদী পেরোবার সময় না জানি উধাও হল কখন!

সম্পর্কটা কারো কাছেই পরিষ্কার ছিল না কোনোদিন।

যে যার যেমন খুশি ভেবে নিচ্ছে নিক!

প্রতিবাদ করিনে। কারণ, প্রতিবাদ মানেই তো সময় আর উদ্যমের অযথা অপ-চয়। আমরা কেবল একজন অন্যজনকে ঘিরে তুষ্ট থাকতে চাই। চেয়েছি এতকাল। আর ওইখানেই হয়েছে কাল। অবশ্য কেউ কাউকে ঘুণাক্ষরে-ও টের পেতে দিচ্ছিনে, বুকের ভেতরে চলেছে কী তুমুল আলো-ড়ন। কেবল চোখের পাতা বুজিয়ে কোনো-মতে দিন পার করে দিচ্ছি এই ভেবে যে সুসময়ের নাগাল হয়তো আবার পাবো।

'আর কেন?'

অনেক দিন হয়ে গেলো—তাই না?'

'চল, এইবার ফেরা যাক।'

'কোথায়?'

'একদিন যেখান থেকে এসেছিলুম।'

শুনে ঠোঁট উল্টিয়ে হেসে উঠলে সীমা। আমি অবাক চোখে চেয়ে থাকি। অভিমানে আহত হই।

মাঝে-মাঝে অধীর হয়ে উঠেছে সীমা-ও। মনে-মনে হতাশ হয়ে আক্ষেপ করেছে, আফশোস জানিয়েছে। শেষে আবেদন-নিবেদনে প্রায় ভেঙে পড়তে চেয়েছে। দিন-দিন ও কেমন অবুঝ হয়ে উঠেছে। এখন আর কিছু দিয়েই বাগ মানাতে পারিনে। ভাবি, চুপ-চাপ থাকবো। চোখ থাকতে অন্ধ, কান থাকতে বধির। যে যেমন ভাবুক, যা খুশি বলুক না কেন আমাকেই!

'এমন হলে একদিন পালিয়ে যাবো।' সীমা ক্ষেপে যায়।

'আর আমি? আমি তাহলে কী নিয়ে থাকি, কাকে নিয়ে?' শব্দ না করে চোখে চোখ রাখি।

'জানিনে।' মাথা ঝাঁকিয়ে ও যেন আমার কথার প্রতিবাদ করতে চাইলে। উড়িয়ে দিতে চাইলে সব। আমার দুঃখ, আমার ঈর্ষা, আমার অভিমান—পাছে কিছু চেয়ে বসি! ওকেই যদি দাবি করি আবার! বললে, 'আমার মন ভালো না। ভালো আর হবেও না কোনোদিন। এখন তাই যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো।' অঝোর ধারায় বুক ভাসিয়ে কাঁদতে শুরু করে সীমা।

আমি তো জানি, ও কেমন! ওর দুঃখ আমাকে তাই দ্বিগুণ করে বাজায়। এমন উদাস, গম্ভীর, বিষণ্ণ হবে তা ভাবিনি। আর কোনোদিন এমন করে, এত কাছে থেকে ওকে দেখার সুযোগ পেয়েছি কিনা মনে-ও পড়ে না। না জানি ওর চোখের কোলে জমে আছে কতকালের কালি। রাত্রে হয়তো ঘুমোতে পারে না। কারণ, বিবেক। কারণ,

চোখের আগল বন্ধ করলেই দুঃস্বপন এসে ভর করে। সত্যিকারের ঘর বাঁধা এ-জীবনে আর হয়তো হবে না।

সেবার শীতের শুরুতেই পাহাড়ের মাথায় দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে গ্রাম আর শহরের দখল নিতে চেয়ে এগিয়ে আসছিল হলুদ রঙের এক দঙ্গল মানুষ। আতঙ্কে আর অন্ধকারে কেমন করে যে কাটে দিন। সীমা কিন্তু স্থির, অবিচল। আসলে ও আমাকে জানে, বোঝে-ও ঠিক। আমি যে ওকে ছেড়ে আর কোথাও যাবো না কিংবা কারো হাতে তুলে দেবো না ওকে—মনে-মনে সে খবর পেয়ে গেছে সীমা। আমার তবু ভয়। সবচেয়ে বড় দায় যে ওকে বাঁচানো। দুঃসময়ে কথাটা বেশী করে ভাবতে হয়। কত রক্ত, কত অশ্রুপাতের বিনিময়ে যে পেয়েছি সীমাকে তার হিসেব রাখে ক'জন?

আগুন নেভে। পথে-ঘাটে তবু সাজো-সাজো রব। কোতোয়ালের সেপাই দেখি হন্যে কুকুর। রাস্তা থেকে পিঁপড়েটাকে অবধি তুলে নিয়ে যেতে চেয়ে ব্যস্ত। এক-বার রাজার কয়েদখানায় পুরে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। আর কী আশ্চর্য ভাখো! এতসব কাণ্ড নাকি সীমার জন্যে, সীমাকে নিয়েই! কারণ, সীমাকে ওরা সবাই চেনে, সবাই চায়। শুনে বুকের মধ্যে সে কি দারুণ বৃষ্টি! সে কি তুমুল ঝড়। ব্যাপারটা খোলসা করে বোঝাতে পারিনে কাউকে। কেবল অসহায় ঈর্ষার আগুনে জ্বলে-পুড়ে

থাক ইতিহ সারাক্ষণ। সীমা তাহলে আমার একার নয়? একা আমিই তাহলে সীমার নই?

অমনেই মিষ্টি একটা মেয়ের মত আদরে গলে গেলো সীমা। কাঁধে মাথা রেখে ঘাড় নুয়ে চুপি-চুপি বললে, 'আমি তোমার। চিরদিন তোমারই থাকবো, জীবন!'

যেন বলা আর। খোলসা করলে সীমা।

সন্দেহ তবু ঘোচে না। সন্তর্পণে চিবুক তুলে চোখ দেখি, মুখ দেখি। প্রাণ-পণে পুঁথির মত পড়ে দেখতে চাই। শেষে মরিয়া হয়ে বলি, 'কিন্তু ওরা যে বলে তুমি ওদের?'

'পাগল!' সারা মুখে কি অনির্বচনীয় হাসিই যে ফুটিয়ে তোলে সীমা। চেয়ে থাকতে-থাকতে অজান্তে আমার চোখের সামনে দুলে উঠলো জোয়ারে ভরা নদীর জল, পাকা আউশের ক্ষেত! কাউ বনে হাওয়ার মত অনর্গল কন্ঠ যেন সীমার। ও বললে, 'দেখতে পাচ্ছো না, কেটে-ছিঁড়ে ওরা আমার কী হাল করেছে? আমি আর কখনো ওদের হই?'

'তিন সত্যি?' আবেগে টল-মল করে উঠি। উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে হতে চাই। মনে হল, আজ আমার নতুন জন্মের দিন।

'তিন সত্যি!' সীমার হাত আমার হাত ছুঁয়ে কাঁপতে থাকে এবার।

আবার একদিন।

বর্ষা না পেরোতেই আলোগুলি কলুর বলদ হয়ে গেলো। এপারে-ওপারে শুরু হল তুলকালাম কান্ড। সবাই ভাবলে, যা-হোক একটা হেস্ত-নেস্ত হবে এবার। হল না কিছুই। কাঁটাতারের বেড়াটা যদিও এ'কে-বেঁকে গেলো খানিক, বাঁধনটা কিন্তু



শক্ত হল আরো। লাভের মধ্যে এইটুকুই যা হল আর কি।

তারপর অনেকদিনের অনেক কথার স্মৃতি হয়ে ভোর রাত্রের দিকে একটা মানুষ এলো। মানুষ তো নয়, আলোর পাখি। সবাই বলে, চারণ। কেউ বা বলে, পাগল।

সীমা খুব আস্তে ফিস-ফিস করে বললে, 'চেয়ে দ্যাখো!' বলেই নিজের চারপাশে টেনে দিলে রহস্যের মায়াবী আড়াল।

আমি তো অবাক। এ কি! এ যে আমারই আধখানা! ওপারে কোথায় ছিলে এতদিন! কেমন করে ছিল!

আগন্তুকের চোখেও ঠিক আমার মতো বিস্ময়। সে কি ভাবলে। মৃদু হেসে এগিয়ে এলো কাছে। বললে, 'তুমি?'

বলি, 'জীবন।'

শুনে উদাস, চিন্তিত হল। তার সঙ্গে, সমস্ত অবয়বে কী এক বিষাদ। সে ভাবলো। [illegible] করলে খানিক। তারপর অস্পষ্ট, জড়িত কণ্ঠে বললে, 'আমিও জীবন। তবে আধখানা।'

চেয়ে দেখি তার চোখে জল। টের পাই, কাছে-দূরে ফসলের ক্ষেত পুড়ছে কোথায়। নিজের ঘর আর ঘরের চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে নৃত্য করছে কারা। অন্ধকার রাত্রির গভীরে তাদের হৈ-চৈ, চীৎকার শোনা যাচ্ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার চারদিক। চোখ জ্বালা করছে আমার। বুকের ভেতরে খাল-বিল-নদী-নালার সমস্ত সুপেয়, সুস্বাদু জল দারুণ রোষে শোঁ-শোঁ করে শুকিয়ে খট-খটে হচ্ছে ক্রমশ। যেন আমাকে ঘিরে আমারই চারপাশে প্রতিমুহূর্তে গড়ে উঠছে খাঁ-খাঁ করা দুরন্ত এক মরুভূমি। অচিরে সে হয়তো গ্রাস করবে আমাকে!

অথচ আগন্তুক নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'দেখতে এসেছিলুম।'

'কী দেখলে?'

'একই রকম। যেমন আমরা, তেমনি তোমরা। উনিশ-বিশ কোথাও নেই।' তার কথায়, প্রতিটি শব্দের গায়ে ভেজা মাটির গন্ধ।

আর এখানে? মানুষ পশু, পাখি, বৃক্ষ—তাবৎ সংসার দগ্ধ হচ্ছে। শুকিয়ে কাঠ হচ্ছে।

গলায় সাবধানতা ফুটিয়ে বলি, 'ফিরে তো যেতে হবেই। ভোর হবার আগেই চলে যেও। পাছে ওরা না টের পায়......'

তার দিকে চেয়ে থেমে যাই। শুনে সে নিথর। থম-থমে দেখাচ্ছে। সারা মুখে কালি লেপে দিয়েছে কে। হয়তো ভেতরে- ভেতরে মেঘ জমেছে কোথাও। এখুনি বৃষ্টি নামবে। অনর্গল ধারায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে শোক-তাপ সমস্ত জঞ্জাল। আপাতত চুপ-চাপ অপেক্ষা করা ভালো।

অনেকক্ষণ পরে ধরা গলায় বললে, 'এমন করে বাঁচা যায় না।' বলে থামলে। আমার চোখের মনি হাতড়ে বেড়ালো তার চোখ। সে চোখে অতলান্ত অন্ধকার। অন্ধকারের ওপারেই বিদ্যুতের চকিত কশাঘাত। লক্ষ করে চমকে উঠি। ভাবি, তুমি তো আমার মত নও। আমি কেমন নিজের দুঃখকেই কৃপণের ধনের মত একা-একা বয়ে বেড়াই। [illegible] এতেই আমার সুখ। অথচ দুঃখ আর মেটে না! আর তুমি? কোথা থেকে কোথায় এলে বল তো? অন্ধকারের বাধা মানলে না, চারণ! খুঁজে-খুঁজে ঠিক তো বার করে নিয়েছো আমাকে।

'কেমন করে টিকে আছো যে ভেবে পাইনে!' [illegible] আগন্তুক। মায়ের মত মিষ্টি গলায় তিরস্কার করলে আমাকেই। তারপর ঝাঁঝালো সুরে নতুন খবর শোনাতে চাইলে। 'আমরা কিন্তু মেঘের নিশান উড়িয়ে দিয়েছি ওপারে। একটু পরেই ঝড়ের মিছিল শুরু হবে দেখে নিও।' বলে চুপ। খানিক থেমে হয়তো আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভেবে নিলে। শেষে সন্তর্পণে মাটি আর জলের গন্ধ মাখা তার নিজস্ব ভাষায় প্রশ্ন করলে, 'আর তোমরা? তোমরা কী করবে এবার?'

জবাব আর খুঁজে পাইনে। এখন আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। ইতি-উতি তাকাই। আবছায়ার আবডালে রাজার কোটাল না জানি লুকিয়ে আছে কোথায়। শুনতে পেলে ধড়-মুন্ডু দু'ভাগ করে ছাড়বে। নিরুপায় তাই নিজেকে শোনাবার মত করে বলি, 'চুপ-চাপ আবার থাকা যায় বুঝি? ভেতরে-ভেতরে আমরাও তৈরী হচ্ছি জেনে রাখো। এই দ্যাখো না আমার বুকের মধ্যে আগুন!'

যেই না বুক চিরে দেখাতে যাবো অমনি সীমা এসে হাজির। আচমকা আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেমন শাসনের সুরে দু'জনকেই ধমকে ওঠে।

'বোকা আর কাকে বলে! এই বুঝি প্রাণের কথা বলার সময়?' বলতে-বলতে দেখলে আমাদের। কী ভাবলে। শেষে সারা মুখে, চোখের চাউনিতে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে বললে, 'শোনাবার কী দরকার? তার চেয়ে যে কাজগুলো এখনো বাকি পড়ে আছে সেগুলোই সেরে ফেলা দরকার।'

মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকি। দেখতে দেখতে নিজেকে নদীর মত দুই দিকে ছড়িয়ে দিলে সীমা। সে-নদীর একপ্রান্তে আমি, অন্যপ্রান্তে আমারই আধখানা—আগন্তুক। দু'জনার কাঁধে কোমল দুই হাত রেখে সীমা বললে, 'আপাতত এমনি একটা সাঁকো থাকা ভালো। সবার আগে হারানো বিশ্বাসটা তো ফিরে আসুক। নতুন করে পুরণো ভালোবাসাটাই জমে উঠুক আবার।'

আমাদের কাছে-দূরে নিভন্ত চিতার ছাই। কঙ্কাল-করোটি মাঠ। কবরের হাঁ-করা মুখে অন্ধকার। তবু সীমাকে ছুঁয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠি। আবেগে উষ্ণ, অধীর হয়ে উঠি আমরা। আর মনে-মনে শুধু ভাবি, আমাদের প্রাণ থেকে উৎসারিত আনন্দ আর আনন্দ থেকে উদ্গত অশ্রুই বন্যা হয়ে একদিন সব ছাই, সমস্ত অন্ধকার ভাসিয়ে দিয়ে দিগন্তের কাছে ছুটে যাবে। আজ কিংবা কাল।

চৌধুরী লেনের সেই বিয়ে বাড়িটায় দুজনে মুখোমুখি। মনীষা ভাবল এ সুমিতা না হয়েই যায় না। বাঁ গালে সেই ছোট্ট কালো আঁচিলটি ওর ধবধবে ফর্সা রঙে যা জেল্লা খুলে দিয়েছিল। কিন্তু এখন রঙটা জ্বলে গিয়ে কেমন মেটে মেটে ঠেকল। তবু ও সুমিতাই।

মনীষা দেখল সুমিতার সিঁথে ফ্যাক-ফ্যাকে শাদা, কালা আধলাপাড় সাদা শাড়ি তার পরণে। চোখের কোলে ক্লান্তির ছায়া। তখন সাহস করে বলেই ফেলে—তুমি ত সুমিতা তাই না?

নাম শুনে সুমিতা চমকে উঠল, এ নামটা আজকাল মুছে গেছে। এখন সে শুধু মা নয় মাসীমা—এমন কি দিদিমা, ঠাকুমাও। মনীষা বলে যে মেয়েটি তার নাম ধরে ডাকছে তার কাছে সে ছিল সুমিতা মানে সুমিতা সেন।

—মনীষা মানে তুই! তার মানে তুই আমি বেঁচে আছি! আমাদের নামটার আওয়াজ কানে শোনা যায়?

সুমিতা মনীষাকে এক নিমেষেই চিনে নেয়। হলেই বা মনীষা বিশাল আয়তনের এক প্রৌঢ়া। পরণে লাল পাড় গরদের শাড়ী, গলায় পেল্লাই সাইজের মুক্তোর মালা। তবু মুখটায় এখনও তার কাঁচ ভাবটুকু রয়েছে।

—কি রে হাঁ করে চেয়ে কি দেখছিস! আমার মুক্তোর মালা না এই বিশাল বপু কোনটা?

সুমিতা মুচকি হাসে—সবটাই। মানে ভাবছি আমি কেন আর্টিস্ট হলাম না?

—কি হ'ত কি তাহলে?

—মানে সেদিনের মনীষা বাগচি যে ছিল একটি বিদ্যুৎশিখা আর আজকের দুটো ছবি পর পর আঁকতাম।

—চুপ কর। এই বুড়োবয়সে আবার কাব্যি রোগ ধরল নাকি?

দুটি প্রৌঢ়া—একজন সধবা একজন বিধবা, দুজনের মুখেই খই ফুটছে।

একেবারে করিডরের মুখে সামনে তাদের গুঁতো খেতে হয়।

—আপনারা প্লিজ একটু জায়গা দিন।

—দেখুন এখানে ভিড় করবার জায়গা না।

—কনের বাড়ীর সবাই আসছে, রাস্তা দিন......

মনীষা আর সুমিতা সরে এল

দক্ষিণের বারান্দায়, আর একটু এগোলেই সিঁড়ি। সেখানে কনে বসেছে। কিন্তু ঠিক খুঁজে খুঁজে ওদের আবিষ্কার করল একটি কমবয়সী বউ, সুমিতার দিকে চেয়ে বলে, অবাক কাণ্ড, মা, আপনি এখানে। সেই দিক আমি সারা বাড়ি খুঁজে খুঁজে মরছি।

—কেন খুঁজছ আমার বৌমা? স্বাশুড়ি বউয়ের দিকে চেয়ে সস্নেহে হাসে।

—বলছি কি খোকন বড্ড বিরক্ত করছে। ওকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। আপনি ছেলের সঙ্গে পরে আসবেন। সুমিতার মুখটা প্রসন্ন হাসিতে ভরে ওঠে। এতদিন বাড়ি যেতে হলেই হয়েছিল। অনেক কতদিন পর মনীষা মাঝে তার সেই হারানো জগত, ছেলেবেলা, কৈশোর সাক্ষী আজ আর কেউ নেই। একমাত্র মনীষা রয়েছে সেদিনের স্মারক।

—বৌমা এঁকে প্রণাম কর। আমার ইস্কুলের বন্ধু।

—ওমা তাই নাকি!

বৌটি এগিয়ে এসে প্রণাম করে সকৌতুকে তাকায়।

—আমি চিনি তোমার বউমাকে, জান মনীষা। অতুলপ্রসাদের গান যা গায়...। শিল্পী বাপের বাড়ি, তারী গুণের মেয়ে আমার বৌমাটি।

—অতুলপ্রসাদের জিনিস ত আজকাল দিল্লীতে। হাজার হলেও রাজধানী ত!

মনীষা এবার ফুট কাটে। তারপর হঠাৎ যেন তার মনে হয়—আচ্ছা তোর এখনও তেমনি গানের গলা রয়েছে?

বৌমার চাপা হাসি জড়ান মুখের দিকে চেয়ে সুমিতার লজ্জা হয়। আঃ এ আবার কী বলে বসে। বলে—বৌমা তুমি খোকনকে নিয়ে বাড়ি যাও। আমি পরে যাব'খন।

কিন্তু মনীষা অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রীই নয়—সেই একবগ্গার মত বলে চলে—

তোর বউয়ের গলা আর যার গলাই বলিস না কেন, তোর গলার পাশে আর কারও গলা দাঁড়াতে পারত! সাধে কি আর দেবুদা তোর জন্য পাগল হয়েছিল!

—কার কথা বললি? সুমিতা কেমন থতমত খায়।

—কেন দেবুদাকে ভুলে গেছিস। ধন্য মেয়ে! তাহলে আমাকেই বা চিনলি কি করে?

সুমিতা স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে দিশেহারা হয়ে যায়—দিনাজপুরের সেই সদর ইস্কুলে দুই বন্ধুতে এক সঙ্গে পড়তে যাওয়া। কতই বা বয়স হবে—বছর চোদ্দ নয় পনের। জেলার মিউজিক কনফারেন্সে সুমিতা সেন পর পর তিন বার ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল, কথাটা গল্পচ্ছলে বললেও তার নাতি খোকন ভাববে ঠাকুমা বুঝি রূপকথার গল্প শোনাচ্ছে। কিন্তু সেটা যে গল্প নয় সত্যি তার একমাত্র সাক্ষী এই মনীষা, কিন্তু দেবুদা...।

এতক্ষণে মনে পড়ে দেবুদা মানে দেবেশ দত্ত। উকিলপাড়ার লাইব্রেরীঘরের পাশে ছোট্ট ঘরখানায় থাকত একটি কম-বয়সী ছেলে। লোকে বলত স্বদেশী করত বলে ইনটার্ন করে রেখেছে। হপ্তায় হপ্তায় থানায় তাকে হাজিরা দিতে যেতেই হবে।

মনীষা বেপরোয়া মেয়ে। সেই বলে—জানিস সুমি, দেবুদা তোর গানের প্রেমে আসলে তোর প্রেমে পড়েছে। বাপস কী কথা, গায়ে আলোয়ান জড়ান সেই নিরীহ চেহারার ভয়ানক মানুষটা সত্যি সুমিতার গান শুনতে আসত......

—কি যে মনে পড়ছে না—এ ভান করার কি দরকার ছিল বলত?

—ভান আবার কি! একটু আস্তে কথা বল দিকি, চারিদিকে সব চেনাজানা মানুষ, শুনলে বলবে কি?

—বলবে আবার কি? এখনও কি সবার শাসন মেনে চলতে হবে?

—তা হয়ত চলবে না তবে এখন ত আর পীড়া বই কারও চোখের আরাম নই আমরা!

মনীষা ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে। সুমিতা ওর মুখের দিকে চেয়েছিল এক-দৃষ্টিতে। একটু থেমে বলে—মনে হচ্ছে বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে তোর। বেচারী প্রশান্ত। তোকে কী বা দিতে পারত! ওর চিঠিটা তোর বাবার হাতে পড়ায় কী কাণ্ডটাই না হল।

—কি আর হল! বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। বলেন আমার কাছে রোজ অঙ্ক কষতে আসবে, অঙ্ক কষলে মনের অনেক ঘোর কেটে যায়।

মনীষা ওর ফর্সা ভারি বোকা মুখটা নাড়িয়ে বলে—সেইজন্যেই ত আমার অঙ্ক দু চক্ষের বিষ।

টুকটুকে লাল বেনারসী শাড়ী-পরা উচ্ছল একটি মেয়ে এসে মনীষার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়—মাগো তোমাকে কখন থেকে সারা বাড়ি খুঁজছি। জান মিতুদি শ্বশুর-বাড়ি থেকে যা সব প্রেজেন্ট পেয়েছে।

উল্টে মা বলে—তুমি বলছ মিতুদির মত তোমাকে চটপট বিয়ে দিতে, তাই না? সে আমি মোটেই দেব না। মেয়েটি কপট রাগের ভঙ্গীতে বলে—তাই বলেছি বুঝি। তোমার বড় বাজে কথা বলা স্বভাব।

—তোমার মার এ অভ্যাসটি জন্মগত, এমন গল্পকথাই যে বানাতে পারে।

—তাহলে বুঝুন আমার বাবার হাল, মেয়েটি ফস করে বলে বসে।

—বাঃ বেশ সপ্রতিভ ত তোর মেয়ে মনীষা।

—আপনারা বুঝি ছোটবেলার বন্ধু?

—কি করে বুঝলে?

—নইলে এত বয়সে হালফিল চেনায় কেউ কি আর অমন তুই তুই করে কথা বলে?

দুই বন্ধুই কথা শুনে জোরে হেসে ওঠে।

—ধন্যি মেয়ের মা হয়েছিস তুই। সুমিতা বুঝি তারিফ না করে আর পারে না।

কপট গাম্ভীর্য নিয়ে মনীষা বলে—তুমি যাও দিকি বাপু। তোমার ঐ গন্ডা-খানেক বয় ফ্রেন্ড না আর কিছু, তাদের সঙ্গে বক বক কর। আমাকে একটু আমার ছোটবেলার বান্ধবীকে নিয়ে থাকতে দাও।

—তথাস্তু।

মেয়েটি বুঝি পালিয়ে বাঁচল।

তারপর সুমিতা আর মনীষা পাশা-পাশি খেতে বসল।

ওদের আসেপাশে কত চেনা-জানা মানুষ, কেউ মাথা নাড়ে, কেউ দু-চার কথা বলে চলে যায়। আসল কথা সবাই বোধহয় টের পেয়ে গেছে যে দিনাজপুরের সেই কদমতলার দুই সখী আজ পরস্পরকে কাছে পেয়ে বিশ্বজগৎ ভুলে গেছে। ওরা দুজনেই অতীতের রাশিপাতে ডুব দিয়েছে তাই বর্তমান ওদের কাছে মিথ্যে

সুমিতা ত ভুলে ভুলেও জিজ্ঞেস করতে পারত—

- হ্যাঁ রে মনীষা, ক' ছেলেমেয়ে তোর?

কিংবা মনীষাও ত সুমিতাকে বলতে পারত—

—কর্তা তোর জন্যে কি রেখে গেছেন রে। ক্যাশ টাকাই যা কত। ওরা ক্যাশ নেই, না রইল, অমন দু দুখানা কলকাতার বাড়ি। হ্যাঁ রে ভাড়া কত পাস মোটমাট।

ওরা কিন্তু সেই ছেলেবেলার স্কুল-পালান একটি দিনের গল্পে মশগুল।

মনীষা বল্লে—জানিস সুমি, তুইও ত কত পার্টি আর নেমন্তন্ন খেয়েছিস, কিন্তু মনে আছে সেই হাসিখালি চরে চড়ুই-ভাতির কথা।

—হাসিখালি চর তাই না? সেই যেখানে চোরাবালিতে তোর কোমর পর্যন্ত গেঁথে গিয়েছিল।

—তারপরটা মনে পড়ে?

—ইস্, পড়ে না আবার? প্রশান্তই ত তোকে কোলে করে টেনে তুল্ল।

হাসতে হাসতে মনীষার চোখে জল এসে পড়ে।

সুমিতা বল্ল—আসল সবটাই তোর ছল, তুই জানতিস প্রশান্ত আসবেই, নয়ত ওকে পরখ করতে চেয়েছিলি এই ত?

মনীষা বলে—হয়ত তাই, তবে আজকের মন নিয়ে সেদিনের অনুভূতিটা স্পর্শ করতে পারছি না।

উলটো দিকের সারিতে কয়েকটি কলেজের মেয়ে খেতে বসেছিল, ওরাও নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি, খুনসুটি করতে করতে একজন এদের দিকে চোখ ঠেরে বলে—দুই বুড়ীর গল্প হচ্ছে দেখছিস?

একজন বলে—কি রকম কাঁদো কাঁদো মুখ করেছে দেখ,—নির্ঘাৎ বউ ছেলের হাতে নাকাল হওয়ার কথা।

--মোটেই না, বাতের ব্যথার কষ্ট, রাতভোর ঘুম না হওয়া, মেয়েগুলি খিল-খিল করে হেসে ওঠে। ওদের হাসির ছোঁয়াচ ওদিকেও লাগে।

—বাস্তবিক সুমি দেবুদার মত ঐ ভীষণ মানুষটা তোর সামনে কি রকম বোকা বোকা হয়ে যেত।

সুমিতা প্রথম চোটে মনে পড়ায় খুব হাসল। তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীরভাবে বলে—আসলে আমরা খুব খারাপ ছিলাম রে, অতবড় মানুষটা, কত তাঁর দেশপ্রেম, কত ত্যাগ সে কথা না ভেবে নিজেদের মত করে দেখেছি।

মনীষা ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে—যেন কথা সাজিয়ে মালা গাঁথতে জানে না সেটাই ও'র মস্ত অপরাধ তাই না?

কিন্তু এবারে উঠতেই হল, খাবার জায়গা ছেড়ে সবাই নেমে যাচ্ছে। নতুন ব্যাচ বসবে। দোতলায় মস্ত হলঘরটায় ওরা দুজন দু দরজা দিয়ে ঢুকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তখন সেই চোরাবালির জগৎটা যেন ক্রমশই সরে যেতে থাকল।

—বাবা ডাকছে মা, চল এবার বাড়ি ফিরবে না?

—হ্যাঁ যাচ্ছি। একবার বলে আসি।

দুজনেরই আবার মুখোমুখি হল।

—জানিস সুমি, দেবুদা আর নেই। বছর পাঁচেক হল মারা গেছে।

—তাই বুঝি। আর প্রশান্তর খবর জানিস না বুঝি? কি রকম যেন ছন্নছাড়া মানুষটা। ঘরসংসার করল না, শুনেছি পন্ডিচেরীতে নাকি বছর দশেক হল চলে গেছে।

—তা হবে।

ভিড়ের ধাক্কায় ওদের ভারি শরীর দুটো দুদিকে ছিটকে পড়ল।

সুমিতার ছেলে তাকে পেছন থেকে ধরে ফেলে। বলে—ঐ ত তোমার জুতো, তবে কি খুঁজছ এখানে?

সুমিতা বিড় বিড় করে বল্লে—জুতো খুঁজব কেন? খুঁজছি মনীষাকে। কি যে শুনেছে মেয়েটা। দেবুদা মারা যাবে কেন? নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী দেবেশ দত্ত কলেজ স্ট্রীটে 'চরণপদ্ম' জুতোর দোকান খুলেছে। সেখানে দিব্যি বহাল তবিয়তে রয়েছেন দেবুদা। উপসংহারটা শেষ করে আর বলাই হল না মনীষাকে।

গাড়ীতে উঠতে যেতেও খাবারটা গন্ধ যেন পাচ্ছিল ছাড়া ছাড়া।

মেয়ে তাড়া দেয়—নেমন্তন্নবাড়ি থেকে যে একেবারে নড়তে চাও না মা। এখনও গল্প শেষ হয় নি বুঝি?

মনীষা আমতা আমতা করে। বলে, একটা কথা বলা হল না।

কি কথাটা সেটা এদের কারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু সুমিতাকে সেটা জানান হল না।

প্রশান্ত আসলে মনীষার ছোট বোনের জন্য, ওদের বিয়ের কথাটা ত সুমিতা জানে না। তাই হাসিখালির ঘটনাটার অত রং চড়িয়েছিল।

প্রশান্তর সঙ্গে ওর বোনের বিয়ে হয়। এখন ওরা দিল্লীতে। আসছে কাল বড়দিনের ছুটিতে প্রশান্তরা আসছে কলকাতায়। এ-ক'দিন ওদের কাছেই থাকবে ওদের পরিবার।

কিন্তু সেই মেটে মেটে রং, অগোছাল আর আধপাকা চুল নিয়ে নালো-কালো পাড় শাড়ীর ভারি মানুষটিকে আর দেখতেও পেল না মনীষা।

# রূপালী মাছ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লতার দিকে। লতা যেন একটু অন্যমনস্ক। লতা কোনের একটা টেবিলে বার-বার তাকাচ্ছে। রূপক, অনিমেষ এবং অবনী কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। ওরা নিজেরা গল্পে মসগুল। লতা একটা মটন ওমলেট নিয়ে বসেছে। ওমলেট খাবার পর সে কফি খাবে। রূপক প্রথম খেয়াল করেনি, পরে দেখল লতা উঠতে চাইছে।

অনিমেষ বলল, এত তাড়াতাড়ি!

লতা ঠাট্টা করে বলল, ঘরের বৌ বাইরে কতক্ষণ থাকে। বলে একটু হাসল।

লতা এবং রূপক তিনটে ছটার শো মেরে যাবার পথে একটু ঢু মেরে যাচ্ছে। রূপক বলল, দেখি কে কে আছে। লতার আসার ইচ্ছা ছিল না। সে তার ক্লাশ পালিয়ে এখানে অনেকদিন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিয়েছে। এখন আর এসব ভাল লাগে না। তবু রূপকের অনুরোধে কিছুক্ষণ এখানে বসে যাওয়া। অনেকদিন পর যখন এদিকটাতে আসা গেল তখন একটু বসে যাওয়া যাক। রূপক পুরোনো আড্ডায় এসে দেখল অনিমেষ, অবনী যথানিয়মে এখনও আসছে। রূপকের বিয়েতে ওরা বরযাত্রী গিয়েছিল। সুতরাং লতা ওদের যথেষ্ট চেনে। তবু কেন যে সে এসে এসেই এমন অস্বস্তি বোধ করছে রূপক প্রথম প্রথম বুঝতে পারছিল না।

রূপক বলল, তা হলে উঠি রে।

অবনী বলল, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি উঠে পড় বাপু। রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে।

অবনী একটু ফাজিল গোছের ছেলে বরাবরই সে এমন থেকে গেল। রূপক বলল শালা তোমার আর বয়স হল না।

—বিয়ে না করলে বয়স হয় না।

—এবারে করে ফেল চাঁদ। বলে সে লতার দিকে তাকাল। এবং ওঠার চেষ্টা করতেই মনে হল লতা কোনের টেবিলটা অপলক দেখছে। চার পাঁচজনের একটা টেবিল। লতা যে কাকে দেখছে বোঝা যাবে না।

রূপক নেমে আসার সময় বলছিল, তুমি কি দেখছিলে!

—কিছু না।

ওরা একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। খুব লাক। রূপকের মনে হল ট্যাক্সি চড়লে থাকলে লতা ওকে সব বলবে।

কিন্তু ট্যাক্সিতে লতা সারাক্ষণ কোন কথা বলল না। যেন সে কি ভাবছে। ভাবনাটা শরীরটা সিটে এলিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে বড় দূরাগত। মাঝে মাঝে রাস্তার আলো এসে মুখে পড়লে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে মুখখানা। এমন মুখ দেখে রূপক লতাকে কোন কিছু আর জিজ্ঞাসা করতে পারল না।

সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় লতা মানুষটাকে কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করল

মানুষটা বার বার চোখ তুলে সকলের অলক্ষ্যে ওকে দেখছিল। লতা ওর দিকে তাকালে সে চোখ নামিয়ে [illegible] সুন্দর ছাঁটা গোঁফ। [illegible] সাদা রঙের হাফসার্ট গায়। সেই বড় বড় চোখ। এবং মানুষটা বড় বেশি উঁচু লম্বা।

খেতে বসে রূপক বলল, তোমার শরীর খারাপ!

—না।

—খাচ্ছ না। মুখে গোমড়া করে রয়েছ।

লতা জবাব দিল না। [illegible] ফুল প্লেটে চালিয়ে দিল।

রূপক আর কিছু জানতে চাইল না। মাথার কাছে জানালাটি বন্ধ ছিল, সেটা সে খুলে দিল। ছোকরা চাকরটা ঘুমোতে চলে গেছে। লতা খেতে বসে খুব অল্প খেয়েছে। মটন ওমলেট খেয়ে সে দুটো ঢেকুর তুলে খাব না এমন [illegible] রূপকের পীড়াপীড়িতে সে দুটো মুখে দিয়েছে।

রূপক জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। ঠিক ঠিক কিছু জবাব দিচ্ছে না লতা। ওর ভিতরটা খচ-খচ করছিল। —তুমি কোনের টেবিলটাতে কাকে দেখছিলে!

লতা যেন ধরা পড়ে গেছে এবার। সে বড় বিরক্ত বোধ করল এবং সে বেমালুম অস্বীকার করার চেষ্টাতে কোনরকমে যেন বলল, কাকে আবার দেখব!

রূপক হাসতে হাসতে বলল ঠিক আছে বলতে হবে না। তবে তুমি আমার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছ।

—আমার ভাল লাগছে না রূপক। এবার আমি শুয়ে পড়ব।

রূপক জানে এখন সে লতাকে ক্ষেপিয়ে দিতে পারে। আসবার সময় সে কোনের টেবিলটাতে আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছিল। এটা অবশ্য কৌতূহলবশতঃও হতে পারে। কতরকমের মানুষ আছে—লেখক, চিত্রকর, অভিনেতা। একবার লতা কোন বন্ধুর সঙ্গে এসে বড় এক অভিনেতার সঙ্গে দুটো কথা বলেছিল, অটোগ্রাফ চাইলে তিনি বলেছিলেন, বাড়ি আসবেন। অবশ্য লতা পরে তার বাড়ি আর যায়নি। অনেকদিন দুজনে শুয়ে শুয়ে ইউনিভার্সিটির জীবনের দুটো একটা এমন অভিযানের গল্প বলে রূপককে চমকে দিতে চেয়েছে। রূপক তখন ঠোঁটের কোনে হাসত। —আমি যে কোথায় ছিলাম তখন রাণী। বলে জড়িয়ে ধরেই দুগালে বাচ্চা ছেলের মতো চুমু খেত।

লতা বলত, কি দস্যিপনা হচ্ছে।

রূপক আরো জোরে এবার কোমরে সাপ্টে ধরত। তারপর কামড়ে কামড়ে লতার লাবণ্যময় শরীরে অজস্র ক্ষত সৃষ্টি করতে চাইত।

লতা বলত, আমি আর তোমার সঙ্গে শোব না।

—কি করবে?

—বাবার কাছে চলে যাব।

— বলবে গিয়ে বাবাকে।

—বাবাকে সব বলে দেব। বলব. কি একটা গুণ্ডাচহলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছ। রাত হলেই ওর কেবল দস্যিপনা আরম্ভ হয়। আমি আর যাব না। [illegible] কাছে থাকব। বলে দুজনই তারপর হা[illegible] [illegible] কিন্তু আজ কি [illegible] [illegible] আর লতাকে রূপক জেরে পা[illegible] না। কারণ রূপকের ভিতর আবার সেই দস্যিপনাটা জেগে উঠেছে। যেমন বিয়ের কিছুদিন পর, শোওয়ার আগে লতাকে অনুরোধ করত, রাণী তুমি দেবী হয়ে যাও, আজও তেমন বলার ইচ্ছা। প্রথম প্রথম এমন বললে, লতা বলত, ওমা কি অসভ্য!

অসভ্য বললেই রূপক ছুটে যেত। এবং পেছন থেকে সাপ্টে ধরে বলত, কি এখন কি হবে?

—আর বলব না।

—ঠিক।

—ঠিক।

তারপর দুহাতে মুখ-চোখ ঢেকে বলত, আমার ভারি লজ্জা করছে রূপক।

—আমার কাছে তোমার আবার লজ্জা কি! তুমি তো আমার কাছে দেবী হতেই এসেছ। তোমার বাবা বলে দেননি, ও যা যা বলবে তাই করবে। দেবী হতে বললে দেবী হবে।

—কি জানি বাপু, তুমি যে কি বল না।

রূপকের বলতে ইচ্ছে হত, ন্যাকা। কিন্তু তা না বলে বলত, রাণী তোমাকে ভীষণ মিষ্টি লাগছে দেখতে।

এরপরই লতার কি উৎসাহ। আজও সে লতাকে যা বললে খুশী হয়, যেমন সম্বোধনে রাণী বলা, এবং তুমি কি সুন্দর এসব বলে দেখা, খেলবে নাকি দেবী দেবী খেলা, অনেকদিন খেলাটা খেলছি না, ভুলে যাচ্ছি। এদিনে খেলাটা জমবে ভাল। বলে সে বলল, রাণী তুমি কতদিন দেবী হওনি বলত। আজ আমার সামনে এসে একটু দেবীর মতো দাঁড়াবে?

লতা হাই তুলল। লক্ষ্মী রূপক। আজ শুয়ে পড়। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। কাল থেকে আবার সকালে স্কুল। আমাকে সকাল সকাল উঠতে হবে।

—না রাণী তুমি অমন করো না। তুমি আমার সামনে কতদিন দেবীর মতো দাঁড়াওনি বলত।

—কাল দাঁড়াব।

—কাল বললেই কালে পায় তোমার। তুমি আর দাঁড়াও না।

লতার আবার হাই উঠল। কোথায় যে সে দেখেছে মানুষটাকে। বড় বড় চোখে সে লতাকে দেখছিল। সে কিছু দূরাগত ছবির মতো স্মৃতির ভিতর তাকে মনে করার চেষ্টা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ওর যাকে যাকে ভাল লেগেছিল, এই যেমন রমেশ, অনিন্দ্য আর দেবজ্যোতি, ওদের একজন কেউ কি হবে—কিন্তু না, ওরা ছিল কালো একটু বেটে, রমেশের চুল ব্যাকব্রাস করা। ওর চোখ এত বড় ছিল না, এবং ঠোঁট এমন তীক্ষ্ণ নয়। রমেশ রেস্তোরাতে একা পেয়ে একবার চুমু খেয়েছিল লতাকে—ঠোঁটে ওর তেমন তীক্ষ্ণতা ছিল না। যে মানুষটা চুরি করে তাকে দেখেছে, সে মানুষের ঠোঁটে প্রবল আকর্ষণ আছে। ঠোঁটে [illegible] না তিনুকে না উঁচু লম্বা এবং [illegible] এমন মনে হচ্ছে, সে [illegible] কিছুই [illegible] নীল [illegible] দেবী হয়ে যাবে, না আবো [illegible] শুয়ে পড়বে বুঝতে পারছে না।

রূপকের সিগারেট খাওয়া শেষ। বাইরে এখন জ্যোৎস্না উঠেছে। ক্রিম রঙের পর্দা জানালায়। নিচে লনের ঘাসে একটাও পাতা পড়ে নেই। ওর এই প্রাচুর্যের ভিতর লতা মাঝে মাঝে বড় হাঁপিয়ে ওঠে। সে একটা মিশনারি স্কুলে সেজন্য কাজ নিয়েছে। অথচ বিকেল হলেই লতা আর কোথাও যেতে পারে না। সেজেগুজে রূপকের জন্য বসে থাকতে হয়। সে সোজা অফিস থেকে সিঁড়িতে কোন শব্দ না করেই উঠে আসে। তারপর যথারীতি ওকে সামান্য যা কিছু করার কার বৌকে নিয়ে বের হয়ে যায়। এইভাবে জীবন বেশ কেটে যাচ্ছিল লতার—আজ কোথকে একটা উটকো লোক এসে ওকে এমনভাবে পীড়ন করতে থাকল বুঝতে পারল না। চোখ দুটো বড় চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

রূপক বলল, আর কতক্ষণ দেরি।

—তুমি আজ রূপক নীল আলোটা নিভিয়ে দাও। এসো না বসে বসে গল্প করি। আমার কি তোমার কাছে চিরটাকাল দেবী হয়ে থাকার কথা! আমার কি অন্য কোন দাম নেই তোমার কাছে।

—তা হলে আমি দেবতা হয়ে যাচ্ছি রাণী, বলে সে লতার দিকে এগুতে থাকলে, লতা জানালায় উঠে গেল। রূপককে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, দেখ আকাশে কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে। এবং তখনই একটা ওক উঠে এল লতার।

—তোমার কি হল?

—তোমাকে বার বার বললাম, মটন ওমলেট খাব না, খেয়ে এখন শরীর কেমন গুলাচ্ছে।

—তুমি এত হজম করতে পার আর সামান্য মটন ওমলেট হজম করতে পারবে না কি করে জানব।

রূপককে লতা কিছুতেই বশে আনতে পারছে না। সে ভাবল আর কথা বলবে না। চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

ওদের দুটো খাট। মাঝখানে একটা পিংক কালারের ছোট কাঠের টিপয় এবং তার উপর টেবিল লাইট। ওরা দুজন দু খাটে শোয়। রূপকই প্রয়োজনে নিজের খাট ছেড়ে চলে যায়। প্রথম রাতে খেলাটা ভাল না জমলে সেটা ভোর রাতের দিকে পুষিয়ে দিতে হয়। আজ লতা কোনরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের খাটে এসে শুয়ে পড়েছে। একটা ভয় আছে ভিতরে এখনও। ভোর রাতের দিকে উঠে চলে আসতে পারে রূপক। সে ভয়ে ঘুম যেতে পারল না। সে দেখছে রূপক এখনও শোয়নি। একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে। লতা এবার বলল, রূপক তুমি তো দেখলে আমার শরীরটা ভাল নেই। শরীর গুলাচ্ছে। তুমি ভোর

রাতে কিন্তু আমার খাটে এল না। এরো কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারব না।

—একটু [illegible] অন্ধকার হয়েছে। [illegible] নিজেই নিয়ে এল। সে একটা মুড়ি ছিঁড়ে দিল। শিয়র বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার সময় বলল, লোকটা কে?

—লোকটাকে আমি চিনি না রূপক। কেন যে সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল।

রূপক দেখল, লজ্জায় মুখ খুব বিবর্ণ দেখাচ্ছে। সে বলল, তোমার কি ভয় করছে।

—না।

—ভয় করলে আমার খাটে এসে শুতে পার।

—আমার ভয় করছে না রূপক। কারণ লতা জানে ওর [illegible] সে ওকে নিয়ে হাসি [illegible] না পারবে ততক্ষণ কেবল [illegible]। ওকে ঘুম যেতে দেবে না।

রূপক বলল, আমি কিছু বলব না। তুমি ইচ্ছা করলে আমার পাশে শুতে পার।

—ও ঠিক আছে রূপক। আলো নেভালেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব।

বস্তুত লতার আর কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। রূপক তার স্বামী এ মুহূর্তে ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। বরং মনে হচ্ছে ওর যেন কার কাছে যাবার কথা ছিল, সেখান থেকে রূপক ওকে ধরে নিয়ে এসেছে।

আলো নিভিয়ে দিলে এক ফালি জ্যোৎস্না এই ঘরে ঢুকে ঘরটা অদ্ভুত রহস্যময় করে দিয়েছে। রূপক ঘুমোচ্ছে। ওর নাক ডাকছিল। লতা ঘুমাতে পারছে না। ওর মাথা ধরেছে। সেই মানুষটা কে! ও কি রাণি মাসির ভাসুরপো অমর। অমরের মুখ এমন সুন্দর নয়। অমরের চোখ ছোট। ভ্রূ অমরের এত টানা নয়। সে এ-ভাবে তাকাতে জানে না।

রাণি মাসির মেয়ের বিয়ের দিন, ভোর রাতের দিকে লতা বাসর থেকে বের হয়ে উপরের সিঁড়ি ভাঙছিল। মনে হল কেউ দাঁড়িয়ে আছে ছাদে। আর না ঘুমিয়ে ছাদে পায়চারি করে সকাল করে দেবে ভেবেছিল—নাকি সে অমরকে খুঁজতেই সেখানে সেদিন উঠে গেছিল—সারা দিন মানুষটা তাকে হাসিয়েছিল এবং চোখের দৃষ্টিতে সামান্য ভালবাসা ছিল যেন। ছাদে উঠে সে দেখল সেই মানুষই দাঁড়িয়ে আছে। কেউ দেখে ফেলতে পারে। বুকটা লতার কাঁপছিল। তবু সে কেন যে পাগলের মতো সে রাতে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, খুব পরিষ্কার আকাশ তাই না!

—অমর বলেছে, না। খুব পরিষ্কার না। একটু মেঘলা।

—আপনি খুব কথা জানেন।

—যা সত্যি তাই বললাম লতা।

লতা আর হাসতে পারে নি। সে কেমন বিহ্বল হয়ে গেছিল। যেন ওর বলার ইচ্ছা ছিল, অমর তুমি জোর করে এখন কিছু করতে পার না।

লতার ঘুম না পেলে যা হয়, কেবল হাই ওঠে। জলতেষ্টা পায়। সে, তার যে যে জীবনের উঠতি বয়সে কাছে এসে গেছিল তাদের মুখ স্মরণ করার চেষ্টা করল। অনিল, অমল, সুরেশ এবং সেই ছেলেটি যে দেখা হলেই কলেজের গেটে বলত, লতা আমি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি কখন আসবে। লতা এমন ইতর কথাবার্তা সহ্য করতে পারত না। একা পেলেই ওর ক্লাসের ছাত্রটি ওকে এ-ভাবে টিপ করত। লতা সেজন্য যতটা পারত বান্ধবীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত। কলেজে আসার সময় সে অলকাদের বাড়ি হয়ে আসত। সে এবং অলকা সঙ্গে থাকলে কুমার ঠোঁটের কোণে হাসত। অলকা বলত, স্যারকে বলে দিস না কেন!

লতা বলেনি। কারণ জানে এ-ভাবে বোকামি করার অর্থ সারা কলেজে সে ট্রেড মার্ক হয়ে যাবে। সে কিছু না বলে বরং একদিন ওকে একা কাছাকাছি পেলে বলেছিল, গাছটা কি গাছ?

—গাছটা কদম ফুলের গাছ।

—গাছে ফুল ফুটেছে?

—তুমি আমি একসঙ্গে দাঁড়ালেই গাছটা বলেছে ওর ফুল ফুটবে।

—তা হলে তুমি নিজের জন্য বলছ না কুমার?

—না। গাছটার জন্য বলছি। গাছটাতে কতদিন থেকে ফুল ফোটেনা। আসবে নাকি।

লতার কিন্তু ওর কথাবার্তা তখন আর কেন জানি তেমন অস্বস্তিকর মনে হয়নি। বরং সে মনে মনে ওর চোখে মুখে সামান্য ভালবাসার উত্তাপ দেখেছিল।

—তুমি আমার এ-ভাবে পিছনে লাগ কেন কুমার!

—আর লাগব না লতা। তুমি আমার দিকে কিছুতেই তাকাতে না কিন্তু।

—মেয়েদের কারু দিকে তাকাতে নেই।

—কিন্তু সুরেশ যে বলল, তুমি ওকে পালিয়ে পালিয়ে দ্যাখো।

—অ মা! কি ছেলেরে বাবা! কি মিথ্যুক। ওকে আবার কবে পালিয়ে পালিয়ে দেখলাম!

—ও তাই বলে সকলকে। তখন আমার হিংসা হত।

লতা ভাবল, তবে ওকে সঙ্গে নিয়ে সুরেশকে একটু জব্দ করতে হবে। সে বলল, কবে যাব তোমার গাছের নিচে।

—তুমি যেদিন বলবে।

—গাছটা কোথায়?

—স্টেসনে যেতে লাল রংয়ের গীর্জা [illegible] একটা, তার সামনে। বড় মাঠ আছে।

—সুরেশকে আসতে বলবে।

—ও বড় ফাজিল।

—এলে কেমন ওকে লাথি একবার দেখা যেত।

—তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ লতা। [illegible] নিয়ে আর কি কি কথা হয়। কুমার তাকে নিয়ে ছেলেরা কে কি বলে সব শুনত এবং বলে দিত। যে কুমারকে মনে হয়েছিল ধূর্ত এবং ইতর কিছুদিন ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর মনে হল সরল এবং ভীতু গোছের মানুষ কুমার। সে কুমারকে ভয় পেত না। এবং কলেজের সব মিনমিনে শয়তানদের সে এই কুমারকে দিয়ে সায়েস্তা করেছিল। সুরেশ ছিল পয়লা নম্বরের।

ওদের দুজনের কেউ হবে সে মানুষটা। প্রায় বারো তেরো বছর আগের ঘটনা। কলকাতা এলে অনেকের রং ফর্সা হয়ে যায়। ভাল চাকরি করলে [illegible] লাবণ্যময় হয়ে যায়। মানুষটার [illegible] অপরিসীম লাবণ্য। তখনই রূপক বুঝি টের পেয়ে গেছে—লতা ঘুমায় নি। কারণ ওর হাই উঠছে। সে বিছানা থেকে তড়াক করে লাফ মেরে উঠল। এবং মশারি ঠেলে ভিতরে ঢুকে বলল, লক্ষ্মী, তুমি ঘুমাও নি।

লতা জানে কেন সে উঠে এসেছে। সে পাশ ফিরে শুল।—আমি ঘুমোচ্ছি। তুমি ঘুমাও গে।

—তবে হাই উঠছে কেন তোমার।

—কখন হাই উঠল!

—আমি তোমার হাই উঠলে টের পাই। তুমি উঠে দুবার জল খেয়েছ।

—এবার মনে হচ্ছে ঘুম আসবে। এখন বিরক্ত করলে সারা রাত আর ঘুমাতে পারব না।

—আমি আর পারছি না।

—পারছ না তো যা খুশি করো।

—তুমি রাগ করলে?

—রাগ করলে কি তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে।

তখন লতা পাগলের মতো খুঁজছে সেই মানুষের স্মৃতি। শরীরের উপর একজন পুরুষের অহমিকা বজ্রপাতের মতো শিরায় শিরায় ঘৃণা প্রবাহিত করছে, আর অন্যজন শীর্ণ নদীটির পাশে বসে রয়েছে তার অপেক্ষায়। সে গেলে এক বিস্তীর্ণ ফসলের খেতে তাকে নিয়ে যাবে—শৈশবে এমনই একটা কথা ছিল যেন। আর তখনই মনে হল সেই মনের মানুষ তার মিলে গেছে। বড় কৈশোর কাল তখন লতার। সে তার দাদুর সঙ্গে বর্ষাকালে গুরুবাড়ি গিয়েছিল। একটা জলপাই গাছের নিচে তার সমবয়সী এক বালক, কচি হাত পা, শিশু সরল মুগ্ধ বালক দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটে নৌকা ভিড়লে সে লাফিয়ে পাটাতনে উঠে এসেছিল। দাদু বলেছিলেন মামাবাড়িতে বেড়াতে এয়েছেন কর্তা। সে দাদুর কথার জবাব না দিয়ে বলেছিল, এ কে নুটু দাদু।

—এ লতা। আমার নাতিন। মা মরা যাবার পর আমার কাছে নিয়ে এসেছি।

তারপর কি আনন্দ, আনন্দ সারা গাছে, বনে এবং রথতলার মাঠে অথবা

ব্যাপারটা আপনারও ভালো লাগতে পারে। অবশ্য যদি আপনি জীবনের অলৌকিকতায় বিশ্বাসী হন, কিংবা সোজা কথায় বলতে গেলে বিশ্বজগত এবং জীবনের সবকিছু আপনার কাছে জলবৎ প্রাঞ্জল না হয়ে থাকে। আমার বন্ধু শঙ্কর বলে, জীবনটীবন বাজে কথা। আর কী ভেলকি দেখাবে বাবা? সব জানা হয়ে গেছে যে 'সত্য শুধু বাঁচা-পশুর মত বাঁচা।'...আমার বন্ধু শঙ্কর জল দ্যাখে না, আকাশ দ্যাখে না, ফুল পাখি প্রজাপতি দ্যাখে না। ঝুলন্ত ছুটন্ত মানুষ গোঁফ জুলপী দাড়ি স্কাইস্ক্রেপার ইলেভেটর বোমা ছুরি রক্ত লাস এবং সুন্দরীদের দেহ ইত্যাদি সমন্বিত জটীল একটা 'নুভেল ভাগ' তার—ওই যে কী বলে, 'অস্তিত্ব! অস্তিত্ব—একজিসটেন্স!...কিন্তু আমি? ঈশ্বর বেঁচে থাকলে আমাকে রক্ষা করুন। আমার সামনে বাংলাদেশ। পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ হরিতেশ্যামলে সোহাগেরঙ্গে ভিজে সোঁদাগন্ধেভরা মাটি, পূবে উতলা নদীর ভাটিয়ালি পশ্চিমে গেরুয়া বাউল, উত্তরে 'আলকাপে'র মোহিনী কিশোরগণ—যারা পুরুষ কিন্তু পুরুষ নয়—নারী তবু নারী নয়—ঘুঙুরে ঘুঙুরে ধ্বনির নক্ষত্র ফোটা অন্য এক আকাশ সেখানে মাথার ওপর আগুনের পাশে সোনা জলের 'বরিশাল গান।'

প্রায় কবিতা হয়ে উঠছে, কিন্তু কবিতা নয়। ফুল ফোটে পাখি ডাকে প্রজাপতি ওড়ে। আমি যদিও বা কবিতা লিখি, ফুল পাখি প্রজাপতি কদাচ কবিতা নয়। এবং সেই জটিল 'ন্যুভেল ভাগে'র জাল ছিঁড়ে যদি বেরোতে পারেন, মাত্র সামান্য কমাইল দূরেই অদ্ভুত সরল একটা জগত আপনার দৃষ্টিগোচর হতে পারে। প্রান্তরের একান্তে কোন ঋজু বৃক্ষদেহ—নিরাসক্ত দীর্ঘপ্র ঋষির মত কোন পুরুষ তার তলার বসে পৃথিবীকে অবহেলা করছে না ঠিকই, সে দেখছে দূরের দিকে সোনালীগমের শীষের মত ছিপছিপে হালকা গড়নের মেয়ে—কাজলরেখা যার নাম, মাথায় দুপুরের অন্নের থালা নিয়ে এগিয়ে আসে। আপনি দেখবেন, অলস সাঁইবাবুদের মত অস্থিসার কিছু কুটির। ছোট্ট এক নদী—যার অববাহিকার নিম্নভূমিতে এখনও এ শীতে বিগত বর্ষার জল জমে রয়েছে। আমি ঠিক এখানেই আসতে বলেছিলাম আপনাকে। হ্যাঁ, এই জলটার পাশে। বলেছিলাম, ব্যাপারটা আপনারও ভালো লাগতে পারে। জলার ধারে সজীব নরম দূর্বা থেকে শিশির শুকিয়ে গেছে এখন।

...র্যে এত কাছে যে তাকে মামা সম্ভাষণ ...হজেই করা যায় এবং তার পুরনো স্নেহও ...নর্গল আপনাকে আবিষ্ট করে। এই ঘাসের ...পর স্নেহময় রোদ্দুরে বসলে পায়ের নীচে ...ন্ডা স্বচ্ছ জলের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে ...াবেন। এবং যে ব্যাপারটা বলেছিলাম, জলের ...ীচের পাল্টা আরেকটা জগত আপনার ...ছন্দ হয়ে যেতেও পারে। ওই মাছের ...াকটার দিকে লক্ষ্য রাখুন। পিঠের দিকটা ...ন নীল, নীচেটা রুপোলী। দেবদূতেরা ...নকালে ঠিক এরকমই ছিলেন। এ কথা ...াবতে ভাবতে আপনার লোম কাঁটা দিতে ...ারে। মুহূর্মুহূ চমকে উঠতে পারেন। ...কাথায় ছিলেন আপনি? কোন প্রাগৈতি-...াসিক সময়ে এদেরই অন্তবর্তী অনুচর ...শেষ, যূথবন্ধ, বহুর অনুগামী! অধুনা ...াপনি যূথভ্রষ্ট, নিঃসঙ্গ, বিদিশ। আর, ...ই যে ন্যাংটো বাগদী ছেলেটি এইমাত্র জল ...থকে ভিজে গায়ে একগুচ্ছ শাপলা নিয়ে ...ঠে এল, একদা আপনিও কি অনুরূপ ...কান মাতৃ জলাশয় থেকে ন্যাংটো উঠে এসে-...ছলেন? তারপর একটা কিছু ঘটেছিল। ...াপলা বেচতে হয়তো বা চলে গিয়েছিলেন ...হরের শেয়ালদার ফুটপাতে। তারপর আর ...ফরা হল না। হায়, আর ফেরা হয় নি ...াপনার! ওদিকে চব্বিশটি পরগণা কাঁপিয়ে ...নবনশস্যময় প্রান্তর ভেঙে কবে কোন ...নশুতিরাতে কে খুঁজে বেড়াচ্ছিল ...াপনাকে। চেরা গলায় ডাকছিল, পরাণ ...কাথা গেলি রে!

প—রা—ণ-রে! মধ্যরাতে বাবলা ডালে ...লোনো লন্ঠনের মত শীতের চাঁদ। হট্টিটি ...াখি কঁকিয়ে ওঠে, টি...টি...টি! দূর থেকে ...রে ছড়িয়ে পড়ে ভাঙা ডাক মায়ের গলায় —পরাণ কো-থা-গে-লি—রে!

আমার তো ভালই লাগে ব্যাপারটা। ...ামি যেন সেই শ্যামলা বাছুর—গলায় ঘর ...ধের ঘন্টা বাঁধা। মাতৃগাভী হাম্বা রবে ...ুলের আঘাতে প্রান্তরের ধুলো উড়িয়ে ...টোছুটি করছে। দূরে আমার ঘন্টা বাজে ...ন্ধকারে—দূরে মাতৃধ্বনি সঞ্চারিত হয় ...ক্ষত্রের দিকে। চিৎকার করে উঠি—যাই ...া! হায়, এ এক দুর্ধর্ষ কসাইয়ের কঠিন ...ুঠিতে আমার গলা, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

*

তবে, প্রকৃত কথা হচ্ছে, আপনাকে ...কন্তু বাংলাদেশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাবলা ...ালে ঝুলন্ত পুরনো লণ্ঠনের মত চাঁদ। ...ট্টিটির ডাক। এবং এতক্ষণে তাহলে এখান ...থকেই গল্পটা সুরু করা যেতে পারে।

বিবাদটা খুব সামান্য কারণেই সুরু ...য়েছিল। আমার কাছে সামান্য ছিল না ...অবশ্য। তাহলে কেনই বা হুট করে বেরিয়ে ...ড়ব প্রতিদিনের নিরুদ্দিষ্ট দলের সংখ্যা ...াড়াতে কিংবা খবরের কাগজওলাদের ...াক ফুলিয়ে তুলতে? যদিও টাকাপয়সা ...রচ সম্ভবতঃ বাবারই, কাগজওয়ালা ...বজ্ঞাপনের পাতায় 'স্নেহের খোকা' ছাপবে ...এ একটা জঘন্য ব্যাপার। মোট কথা, আমি ...ঠক খোকা নই। আমার বয়স পঁচিশ ...পরোচ্ছে। আমার রাত্রিযাপনের বিহিত ...ুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে বাবা একটি স্ত্রীলোক ...আইনানুগ যোগাড় করে দিয়েছেন। আমি একটা মাঝারি ধরনের কারখানার লেবার অফিসারও ছিলাম মাস ছয়েক। তারপর লক আউটের ফলে চাকরীটা গেল। তারপর একটা চেষ্টা চলছিল আমার জন্যে—বাবাই চালাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে ঘটনাটা ঘটল।

বাবার ছেষো আর আমার ছেষো হয়ে উঠতেই—মোট বারোশো, আমরা ত্বরিতে চলে এসেছিলাম ছিরু মিস্তিরি লেনের গুদামঘর ছেড়ে একটা বড় রাস্তার ধারে তেতালায়—তিনদিকে যার আকাশ অবাধ ব্যাপ্ত, অনেক ছোট বড় মাঝারি গাছপালা আছে, ময়দান আছে একটা; অদূরে রেল লাইন থাকায় বৃষ্টির রাতে ট্রেনের শব্দের সঙ্গে ওয়াগন-ব্রেকার আর পুলিশের লড়াইয়ের শব্দও শোনা যায়। এই ফ্ল্যাটটায় আসবার পর আমাদের ছোট পরিবারটার খরচও ডবল হয়ে উঠেছিল। বাবা তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমার মাকে সবসময় চমৎকার শাড়ি পরে থাকতে বলছিলেন। এ নিয়ে ও'দের ছোটখাটো ঝগড়াঝাঁটিও হচ্ছিল। ছিরু মিস্তিরি লেনে প্রায়ই আমাদের ঝি পালাত। এবং নতুন ঝি আসবার মাঝের সময়গুলোয় মাকেই ঝিয়ের কাজ করতে হত। আমার বউ চাকরী করে। (বাবার মতে, বউমার আয়টা স্বাধীন এবং হিসেবের বাইরে—অর্থাৎ সঞ্চয়) একটা আপিসের নাকি রিসেপসনিষ্ট। মা তাকে কোন কাজ করতে দেয় না। নিজে খাটতেই তার ভালো লাগে। বাবার ধারণা, মধ্যযুগীয় এই মহিলার দরুনই ঝি টিঁকছিল না আমাদের বাড়ি। ঝিয়ের কোন কাজ মায়ের পছন্দ নয়। ফলে নিজেই ঝিয়ের হাত কেড়ে কাজ করে যেত। এবং তার দরুন খুব সাধারণ কমদামী তাঁতের শাড়ি পরে থাকায় মায়ের সবিশেষ অভিরুচি। এ ফ্ল্যাটে আসবার পরও মা সেইসব 'নগণ্য ইতর' শাড়ি পরার অভ্যাস ছাড়ছে না দেখে এক-দিন বাবা করলেন কী, দুপুর রাতে চুপি-চুপি সবগুলো বাথরুমে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন। পরে জানতে পেরে মা...সেকথা থাক। ক্রমশ দেখছিলাম, মা এই নতুন জীবনের সঙ্গে যেন নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে। চমৎকার নকসাছাপা টেরি-ভয়েল পরে, মুখে ক্রীম ঘষে, সিঁদুরের টিপ কপালে রেখে, পুবের জানালার পাশটিতে মা হাসিমুখে বসে থাকছে। কিন্তু এর মধ্যে কী একটা অসহায়তা, একটা ভীরু গোপন আর্তি তার মধ্যে রয়েছে, সেটা টের পেতে আমার দেরী হত না। অন্যমনে ও'কে বলতে শুনেছি, 'কী দরকার এতসবের! আমি তো কারো মত নই!' মায়ের রহস্যময় শব্দ 'কারো মত' আমার কাছে প্রাঞ্জল হয়েছিল পরে। বউমা অর্থাৎ আমার স্ত্রী রুচিরা সম্পর্কেই এ শব্দটা প্রয়োগ করছিল মা। সে তো ঠিকই। রুচিরার 'এত সবের' দরকার। ও রিসেপসনিষ্ট। ওকে সুন্দরী হতেই হয়। ওর পোশাক আসক জরুরী। মাথায় কলসী খোঁপা, চোখে কাজল ঠোঁটে পুঁয়ের মত রং...এবং নিতান্ত ব্রেসিয়ারের মত জামাটাও ওর দরকার। ওর জনসংযোগ এবং অভ্যর্থনার কাজে এসবই ভারি মূল্যবান। তবে আশ্চর্য লাগে, শাশুড়ি-বউমার সম্পর্কে কোন তিক্ততা ছিল না। বরং বউ-মাকে সহযোগিতাতেই ব্যস্ত থেকেছে মা। এবং একবার মৃদু হেসে বলেছিল, 'ছোটকুর (আমার ছোটভাই) বউ কিন্তু চাকুরে হবে না। বউমাকে সারাটি দিন কাছে পাই নে। এত একলা লাগে!' হ্যাঁ, ছোটকুর বউ চাকুরে হবে না এবং মায়ের প্রত্যঙ্গ হয়ে থাকবে, এই আশা একটা আশার মত আশা। আমার মনে হয় না, শশুরের বাচ্চা (সরি!) বিয়ে করবে বা ঘরসংসার করবে। আমি ভেবেই পাই না, মেকসিকো এলাকার অ্যামেরিকান-ওয়েষ্টার্ণ ভেড়াচরানো রাখাল ছোঁড়াদের পাতলুন—শুধু পাতলুন কেন, চেহারার ছিরি কী করে একটা বাঙালীবাচ্চার কাছে প্রিয়তম মডেল হয়ে ওঠে! ছোটকুর এক বান্ধবী আবার 'লুঙ্গি' পরে ঘোরে। অবশ্য এ বিষয়ে আমার জ্ঞান হাস্যকরভাবে (রুচিরা থাকা সত্ত্বেও) তুচ্ছ।...বাবা মাঝে-মাঝে তাঁর কনিষ্ঠপুত্রকে 'মস্তান' বলে গাল দিয়ে থাকেন। 'হিপ্পি বাঁদর' বলেন। তিনি আরও বলেন যে সম্পদ প্রাচুর্যের ঘৃণ্য গর্ভস্রাবস্বরূপ এক বিশেষ তরুণ সম্প্র-দায়ের উদ্ভব যদিচ স্বাভাবিক এবং সম্ভবত অর্থনীতির অবজেকটিভ ল অনুসারেই সৃষ্ট, এ পোড়া ক্ষুৎপীড়িত দেশে ইহাদের উদ্রেক হইল কেন? ইহা কি কায়িক শ্রমক্লিষ্ট ভারতবর্ষের দেহে দুর্গন্ধ ঘর্মস্রাবের মধ্যে জমিয়া ওঠা নুনবিন্দুসমূহ?......বাবার সম্পর্কে ঠাট্টা তামাসা অশোভন। এবং লাইন দুটো পিতৃস্তাবক হিসেবে অধুনা জনবেদ মহান অপৌরুষেয় নিত্যগ্রন্থ সংবাদ-পত্রের ভাষায় সাজিয়ে দিলাম—এটাও শ্রুতিকটু। কিন্তু কী করব? আমার সব-জান্তা ত্রিকালদর্শী বাবার চরিত্র এ ছাড়া প্রকাশ পাবে না।

নতুন বাসায় আসবার পর বাবার এক [illegible] শুরু হয়েছে। আমায় উনি খোকা বলে ডাকতেন। বাথরুমে ছিলাম। খোকা খোকা [illegible] চিৎকার শুনে [illegible] বেরোলাম। দেখলাম, বাবা জানালার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। আঙুল দিয়ে কী দেখাচ্ছেন। পাশে মা এবং রুচিরা। মায়ের মুখের হাসিটা আমি বুঝতে পারি। ওটা মোল-দুপিঠের মত স্বাভাবিক ও সহজ। রুচিরারটা মাপিক। মনে লিপ্ত হলেও, মজার কথা, ওই কথাটা হাসে। ভালবাসার কথাতেও হাসে। এবং বাবার হাসিটা ছিল রাস্তার ছেলেটার মত, দারুণ মজার হাসি। বাবা হাততালি দিচ্ছিলেন। শিস দিচ্ছিলেন। আবিষ্টভাবে অতি ধীরে বলছিলেন, আর আর ঘুলেঘোনা আর...

উঁকি মেরে দেখলাম, নীচের বস্তি-বাড়ির দেয়ালঘেঁষে ওঠা পেয়ারাগাছের ডালে একটা এখাবৎ-অদৃষ্ট পাকা পেয়ারা ঠোকরাচ্ছে দুটো পাখি। খয়েরী রং, মাথায় ঝুঁটি, পেটের নীচেটা লাল। বাবা একগাল হেসে আমায় বললেন, খোকা, বুলবুলি, বুলবুলি!

বুলবুলির কথা জীবনে কখনও ভাবিনি। বুলবুলি কী আমি জানতাম না। জানলেই বা কী। পৃথিবীতে অষ্টোত্তর শতকোটি রকমের প্রাণী থাকা সম্ভব। অন্তত যতক্ষণ না তার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে উঠছে অর্থাৎ খবরের কাগজের খবরের যোগ্য ব্যাপার না ঘটছে, ততক্ষণ সবকিছুই আমার পক্ষে নিরর্থক। চিড়িয়াখানার—তবুবে দেখুন—সেই শয়তান সিংহ কিংবা সেই খাঁচাছাড়া ময়াল সাপটার হাতে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা। হ্যাঁ, এইবার আপনার সিংহ বা ময়াল সম্পর্কে কিছু ঔৎসুক্য হতে পারে। তবে তার বেশী কিছু নয়। অন্তত যতক্ষণ আপনি নিজে না জড়িয়ে পড়ছেন প্রাণী-ঘটিত ঘটনার সঙ্গে। কিন্তু বুলবুলি! ভাবা যায় না। সেকালের শহর কলকাতায় নবা-বাবুরা নাকি হাতে-পোষা বুলবুলি নিয়ে গণিকালয়ে গমন করতেন। টেকচাঁদে এ বিষয়ে বিশদ থাকা সম্ভব। বাবার এ বুল-বুলি—কাতরতার অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। বাবা ছেলে বেলায় গ্রামে ছিলেন। প্রবীণ বাঙালী সন্তানের পক্ষে, সুতরাং, এই সব স্পর্শকাতরতা থাকা সহজ। এক বাঙালী লেখক সম্পাদিত বাঙালী লেখকদের ছোট গল্পের ইংরেজী ভাষায় সঙ্কলন গ্রন্থ সমা-লোচনা প্রসঙ্গে মার্কিন পত্রিকায় মার্কিন সমালোচকের বক্তব্য পড়েছিলাম—যথা ঃ 'বাঙালী মানসিকতায় কেন গাছপালা পাখি প্রজাপতি আকাশ রোদ্দুর বৃষ্টি ইত্যাদির প্রতি কেমন প্রিমিটিভ ঝোঁক আছে।'... প্রিমিটিভ শব্দটা লক্ষ্য করুন। গা জ্বালা করে বাঙালী হিসেবে—তাই না? আরও গা জ্বালা করে, যখন শুনি সাহেববাচ্চা বিভূতি বাঁড়ুয্যেকে বলে, গরীব ন্যাচারালিস্ট অর্থাৎ প্রকৃতিবিলাসী! আমরা প্রিমিটিভ, তা মানতেই চাইব না, এটা খুব প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, গাছ ফুল পাখি প্রজাপতি বৃষ্টি রোদ্দুরই খাঁটি বাঙালী শিল্প। এ নিয়েই জগতসভায় আমাদের গর্ব। হিন্দুটে কোন আজা যাও কী বলল, তাতে কী আসে-যায়!

আমার বাবারও আসাইল-আছিল না—তা আমি যতই প্রিমিটিভ ঝোঁকের কথা তুলে তামাসা করি। এই নতুন বাসায় আশ-পাশে এই বোমা ছুরি গুলি রক্তভরা ভীষণ শহরের মধ্যে একান্ত 'প্রিমিটিভ' একটা পরিবেশ পুনঃ পুনঃ দিনে-রাত্রে বাবা আবিষ্কার করছিলেন। বাবা কতকটা ধেই-ধেই করে নাচতে বাকি রাখছিলেন। ইউরেকা! ইউরেকা! এই যে আমাদের বাংলা দেশ। দক্ষিণের জানালায় সামনে বিশাল শিমুল গাছ। বাবা মাকে বলছিলেন, শীত যেতে-যেতে ওইখানটা লাল-লাল ফুলে ভরে উঠবে। ভাবতে পারো কী হবে টুক? বাবা আদর করে সোহাগভরে বলছিলেন, টুকটুক, আমার টুকটুক। থামো, আগুন লেগে যাবে, মাইরি! ওরে ব্যাস, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে গো। দ্যাখো, আমার যেন শালা যৌবন ফিরে আসছে!...মা হাসছিল শুধু হাস-ছিল। এবং আমি ছিলাম খুব কাছের বাথরুমে।

জানতাম, বাবা তাঁর নতুন বাসার গল্প বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে কিছু বাকি রাখেন নি। আমার সঙ্গে দেখা হলেই ওরা আগেই বলছিলেন, এই যে! খুব চমৎ-কার বাসা পেয়ে গেছ শুনেছি। ভীষণ সবুজ গাছপালা, ফাঁকা চান্দিক, খুব আলো-হাওয়া কী বলো?

মাঝে-মাঝে বাবা বন্ধুদের ডেকে এনে (একেবারে বেডরুমের মধ্যে) জানালা দেখিয়ে বলছিলেন, ওইটে খুললেই তুমি সূর্যোদয় দেখতে পাচ্ছ। একেবারে নাকের ডগায়। চমৎকার না? এই শালা কলকব্জাওলা শহরের মধ্যে...ভাবা যায়? গণ্ডগোল নেই একদম। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙছে। পাখির ডাকে সন্ধ্যা নামছে। মাঝরাত্রে প্যাঁচা ডাকছে। আর ওই যে—ওইখানে চাঁদখানা...আঃ, সে এক জিনিস। ঘিয়েভাজা ফুলকো লুচি মাইরি। দারুণ জোস্না। অগাস্টে এসেছি। এসে প্রথম রাত্তিরেই বিষ্টি। শুতে গেছি। ক্ষমানে বিষ্টি। মাঝরাত্তিরে—ওমা! শুনি, ব্যাং ডাকছে গ্যাঙোর গ্যাং। হাজার-হাজার ব্যাং। হুঁ, ব্যাংও ডাকে।

এক প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা কী সুবাদে বাবার বন্ধু। বাবা যখন বললেন, এ বাসার পাশে পাখি ডাকে ব্যাং ডাকে... তখন হঠাৎ ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বলে বসলেন, হ্যাঁ, তারপর মাসের শেষে বাড়ি-ওলাও ডাকে! আমরা সপরিবারে হাসতে-হাসতে প্রায় মারা পড়ছিলাম আর কী! তার পরই কিন্তু—জোর হাসির পর ক্লান্তির মত তাৎক্ষণিক হাল্কা ধরনের বিষণ্ণতা যেন বাবার মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। শুধু বললেন, হ্যাঁ—ভাড়াটা ভীষণ বেশি। মাসে-মাসে অতগুলো টাকা আমার যোগানো তো অসাধ্যই ছিল। খোকা ভালো চাকরীটা পেল, তাই।

একটা ব্যাপারে আমি এসবের থেকে খুঁজে বের করেছিলাম। সেটা ওই 'প্রিমিটিভ ঝোঁক'। আলো-হাওয়া গাছপালা প্রজাপতি ঘাস ইত্যাদির জন্যে যেন প্রতিটি বাঙালী হাপিত্যেস করছে এ শহরে। কথাটা একদিন বাবার কাছে তুললাম। তুললাম, আমার চাকরী যাবার পর। সাড়ে চারশো টাকা ভাড়া দিয়ে বাবার মাসে থাকে দেড়শো। সুতরাং রুচিরা তার চারশো যোগাতে বাধ্য হচ্ছিল। এটা যে বাবার পরি-বারের পক্ষে অপমানজনক হচ্ছে, সরাসরি সেকথা না বলে অন্যভাবে ওঠানো গেল। এবং কেন যেন বাবা ফেটে পড়লেন।... প্রিমিটিভ বলছ? কিন্তু এই হচ্ছে আমাদের জীবন।...বাবার প্রৌঢ় খসখসে আঙুল-গুলো ভীষণ কাঁপতে-কাঁপতে টেবিলে আওয়াজ তুলল এবং উনি খাঁটি ভারত-সন্তানের মতই ইংরেজীতে ক্রোধোক্তি করতে থাকলেন।...দিস ইজ আওয়ার রিয়্যাল লাইফ। দিস ইজ আওয়ার মাদারল্যান্ড। ইস্! তুমি খুব মডার্নিজমের গল্প করে বেড়াও শুনি। জানো? তোমার এই শহর সামান্য দু-চার মাইল গেলেই ভাঙা কুঁড়ে-ঘর, হাড়সর্বস্ব বলদ, পান্তাভাত খেয়ে ধুঁকছে কোটি-কোটি মানুষ? এখনও বুকে পোকা-মাকড় নিয়ে কত মানুষ ঘুমোয় জানো?

কী কথার কী জবাব শুনে আমি থ। থাক, ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। ভিন্ন সুরে বললাম, আজকাল বাসা তো পাওয়া যাচ্ছে—ভাড়াও কমছে। সুবোধ বলছিল, হেদোর দিকে...

হেদোর এঁদো গলিতে আর আমি যাবো না।...বাবা লাল মুখে জবাব দিলেন। এত রাগ কখনও দেখি নি ওঁর।

ছোটকু দাঁড়িয়েছিল আমার ডান দিকে। হঠাৎ বলে বসল, যাবেন না। আর বউদির রোজগারে দিব্যি সংসার চালিয়ে যাবেন বাঃ!

কথাটা আমি বা রুচিরার পক্ষে অপমানজনক হলেও চুপ করে থাকলাম। ছোটকুকে আমি ঘৃণা করি।

বাবা যেন লাল-নীল-হলুদ-ধূসর বিচিত্র রঙের মুখোশ পরে ছোটকুর দিকে তাকালেন। যেন বা বাকশক্তিরহিত। জিম করবেট বলেছেন, বাঘকে এক গুলীতে কাত করতে হলে ঘাড়ে গুলী করো। নয়তো কিস্যু হবে না। বাঙালীবাঘের ঘাড়ে গুলী করল ছোটকু। বাঘটা নড়ল না। আমি বোকার মত বুকে অর্থাৎ হৃদয়ে গুলী করতে গিয়েছিলাম। ওখানে গুলি বেরিয়ে যায়, আটকে থেকে তক্ষুনি মৃত্যু ঘটায় না।

সন্ধ্যার অনেক পরে রুচিরা এল। রুচিরা একটা প্রেসার কুকার কিনে এনে-ছিল। এবং হঠাৎ ছোটকুর মত সোজাসুজি বাবার ভাষায় বলে উঠলাম, কী সব আজে-বাজে কিনে পয়সা নষ্ট করছ? এখনও বাংলা দেশে কোটি-কোটি উনুনে কাঠ-খড়

জেলে রান্না- হচ্ছে নুকোনো—কয়লাও জোটে না।

রুচিরা অবশ্য হাসল একটু। শুধু বলল, তুমি দেশভক্ত। ব্যস! রুচিরা বাথরুমে ঢুকল। আমি অস্থিরভাবে গাল চুলকোলাম। সিগ্রেট খেলাম। পায়চারি করলাম। ছোটকু একটা মোক্ষম গুলী মেরেছে। এতদিন নিঃশব্দে নির্বিচারে কিছু না ভেবে আমি বা আমরা খাবার-দাবার খেয়ে গেছি। এখন প্রতি বারই মুখে তোলার আগে দেখতে পাব, বড়-বড় অক্ষরে রুচিরার স্বাক্ষর আছে।

শুতে যাবার আগে বাবার আকাশবাণী শোনা গেল : শীগগীর আমরা খাসা বদলাচ্ছি।

এবং, তাহলে বলা যায় — আমাদের পরিবারটা ভেঙে গেল এমনি করে। একটা বিকট রকমের অবিচারের ঝড় বয়ে যেতে দেখলাম। বাবা ছোটকু আর মাকে নিয়ে হেদোর দিকেই কোথায় গেলেন। আমি আর রুচিরা জানলাম না। কারণ, রুচিরাই বলে-ছিল—আপনারা যান, আমরা (!) এখানেই থাকছি। বলেছিল বটে—কথাটা শুনতেও সাংঘাতিক স্বার্থপর, কিন্তু রুচিরার দোষ ছিল না। ও বাবাকে খুব পিড়াপিড়ি করে-ছিল। বাবা তো শুনলেন না!

কিন্তু মাসে সাড়ে চারশো দেবে কেমন করে রুচিরা? তথ্য ফাঁস হল পরে। ডাবল কিচেন-প্রিভিসমন্বিত চার ঘরের দুটো ঘর দেওয়া হল ওর এক বান্ধবী আর তার স্বামীকে। তারপর আমরা রাজা-রাণী। আমাদের জীবনের সমুদয় জটিলতার পিছনে নিতান্ত অর্থনীতির খেলা, এটা প্রাঞ্জল হল আমার কাছে। বেশ চমৎকার একখানা জীবন আমরা পেলাম। এ্যামিবার কোষ-বিভাজনের মত ঘটনার ফলে দুটি সুখী পরিবারের জন্ম হল। শুধু কষ্ট হয়। ওই জানালা খুলতেই 'ফুলকো লুচির মত চাঁদ'। আঃ, বাবা এতক্ষণ কী দেখছেন? শ্যাওলা-পড়া কালো দেয়াল, ভ্যাপসা গন্ধ, গোলমাল, বুট জুতোর শব্দ! ছিরু মিস্তিরির লেনে ওই সব বুট জুতোর শব্দ মধ্য রাতে বাইরে থেকে যেন ক্রমশ আমার ওপর—আমাকে পেরিয়ে চলে যেত। জুতো মাড়ানো শরীর—ক্লান্ত থ্যাৎলানো লাগত। হঠাৎ ভয় পেয়ে ঘুমের রেশ নষ্ট হয়েছে, লম্বা-লম্বা পায়ে জুতো পরে হাঁটতে-হাঁটতে ওই, ওই এসে পড়ল যেন বুকের ওপর। এখন বাবা ফের কি সেই রকম উত্যক্ত হচ্ছেন? নাঃ, কে যেন বলছিল, দোতালায় দেড়শো টাকার ফ্ল্যাট—ভালোই। হবে! স্মৃতি শুধু কামড়ায় আমাকে, এই যা। স্মৃতি বলে, তুমি ব্যাটা এখানে দিব্যি জানালা খুলেই দেখছ বিশাল শিমুলের লাল ফুল। তোমার যৌবনে যৌবন আসছে—আর ওদিকে লোকটা ফের বুড়ো হতে-হতে শাদা হতে হতে সিঁটিয়ে যাচ্ছে। একটুখানি যৌবন, মাত্র একটু চেয়েছিল! (যযাতি-পুরু সংবাদ যেমন)।

... আমরা এ বাসাতেই আলাদা হয়ে বাস করতে পারতাম। নাকি তা অসম্ভবই হত? বাবা থাকতেন না। ওই ছোটকু শুওরটা...

তারপর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। অনেকগুলো গাছ এক সঙ্গে থাকলে সে একটা অরণ্য। এবং কোন গাছের পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা বৃহত্তে একাকার থাকার দরুন মারাত্মক কিছু দ্যাখায় না। কিন্তু এবার? রুচিরা এই পাঁচজনের সংসারে যা ছিল, এখন তা রইল না। তা ছাড়া মাত্র দুটো গাছ এ উষর অরণ্যে। এবার রুচিরাকে খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছিল। কাজকর্ম সেই—সুপ্রচুর অবসর—সেকারণে কিছু নিয়ে থাকতেই হয়। অনর্গল ভাবনা আসে। এলেমেলো। ঝড়ের মত ভাবনা ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করতে থাকে। কত প্রিয় গ্লাস ভাঙে। বইয়ের পাতা ছেঁড়ে। জামা-কাপড় ওড়ায়। মাই গুডনেস! রুচিরা কে? আমি তো জানিই নি—জানবার চেষ্টাও করি নি! কেন ওকে এমন পোশাক পরে সেজে-গুজে থাকতে হয়? ওর ওই পেটেন্ট করা হাসি, ওর—যাকে বলে, দেহবল্লরী—অর্ধোন্মুক্ত কোষাগারের মত রোমাঞ্চকর লাগে। স্পষ্ট জানা গেল, রুচিরার এক বৃহৎ অংশ বহুর জন্য বিক্রীত। কত চটুল, কত নিবিড় গরমা-গরম টাটকা সঙ্গ, কতবার দুলে-ওঠা উচ্ছ্বাসে ভেঙে-পড়া, প্যাকেটে প্রসিদ্ধ তালমিছরির মত দুটো চোখ। আমি ভীষণ গোঁড়া সেকেলে হয়ে পড়ছিলাম। এবং রাতে শুয়ে একটা নিস্তেজ ভারি শরীর ছাড়া কী পাওয়া যেতে পারে এর পর ... কেন, কী হল? আমি প্রশ্ন করলে রুচিরা শুধু বলেছে, বড় ক্লান্ত। যা ধকল যাচ্ছে আজকাল!...তাই-ই তো। ওর জীবনের সেরা জিনিসগুলো ফেরিওলার মত বেচে দিয়ে খালি ঝাঁকা নিয়ে ঘরে ফিরতে হচ্ছে। ওর প্রাণচাঞ্চল্যের প্রায় সবটাই আপিস কিনে ফেলেছে। বাঙালী মেয়ের কাছে এর পর আরকিছু আশা করা তো উচিতই নয়। একটা—অনুমোদন পরীক্ষার মত প্রাণ, তাকে মাইলের পর মাইল ওড়ানোর চলন্ত। এ একটা [illegible] আলাদা। হুঁ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

রুচিরাকে বাঁচানোর জন্য কিছু করা জরুরী। ফার্স্ট একটা পাঁচিলের দরকার। সেই সময় একদিন ছোটকুর সঙ্গে দেখা। ওকে দেখলেই আমার নেশা হয়। বিশেষত ওর সবজান্তা হাবভাব, দন্ত্য স দিয়ে শ ষ উচ্চারণ, ওর পোশাক চেহারা। ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র, তা ভাবাই যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও পড়াশুনোর নাম করে সোজা চলে যায় রেলপোলের নীচের জুয়োর আড্ডায়। মদ খেয়ে হিজড়েদের নাচ দ্যাখে। কখনও ওয়াগনব্রেকারদের দলে এ্যামেচার হয়ে ওঠে। আমার আরও বিশ্বাস, ওর বিছানার নীচে থাকে পাইপগান রিভলবার। ওর পকেটে থাকে মস্তো ছুরি। ওর বন্ধু সেরকম ছুরি খেয়ে মারা গেল সম্প্রতি—হলফ করে বলতে পারি, এ কীর্তি ছোটকুর।

এবং সেদিন ছোটকুর হঠাৎ কথায় জবাবে এগুলোই গলগল করে তেতোমুখে বলে দিলাম। গ্যাস বেরিয়ে গেল। ছোটকু বলছিল, বউদির দিকে নজর-টজর দেবে নাকি? সেদিন একটা বারে দেখলাম—সঙ্গে এক জব্বর কাপ্তেন...

জবাবে ওইসব বললে ছোটকু একটু হাসল।...তোমার তো সত্যিকার প্যাট্রিয়টি-জমই নেই। তুমি বুঝবে কী!

এইবার অসহ্য লাগল। মেকসিকান মাথালসাজা বাঙালী ছোকরা তুমি আমায় প্যাট্রিয়টিজম শেখাবে? ঠিক ভ্রাতৃসুলভ নয় ব্যাপারটা—খাই করে ঘুঁষি মেরে বস-লাম। বাসস্ট্যান্ডে ভিড় ছিল। পিছনের রেস্তোরায় কতকগুলো বসেছিল। ছোটকু টাল সামলানোর পরই দেখা গেল, সেই ছোকরাগুলো লাফ দিয়ে এসেছে। তারপর বেদম মার লাগাল আমার দেহে। কানের

পাশ দিয়ে কতবার চাকার শব্দ গড়িয়ে গেল শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

*

একটা ব্যাপার এতে স্পষ্ট। ছোটকু আমাদের সুখের অরণ্যে বজ্রাঘাত। নষ্ট অরণ্যের পায় এখন শুধু অগাধ শূন্যতা জেগে রইল।

ওদিকে এসটাবলিসমেন্টের দৈত্য রুচিরাকে বখশিস দিয়েছে এক স্টুমিন্ট কাপেতন। ধুস্ শালা! আমার জীবনটা এবারে সত্যিকার অনর্থ হয়ে উঠল। সেই দুপুরবেলা আমি তলিয়ে যেতে যেতে বাসস্ট্যান্ড খালি হয়ে গিয়েছিল বা দোকান-পাটে ঝাঁপ পড়তে সুরু করেছিল এটা নিশ্চিত। তারপর কখন দেখি, আমার হাত ধরে যে টেনে তুলছে, সে ছোটকুই। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে টলতে টলতে হেঁটে গেলাম। সেই সময় মাথার ওপর থেকে কে চাপা গলায় বলল, পালান দাদু, কেটেপড়ুন! ওরা ছুরি আনতে গেছে। মুখ তুলে দেখলাম না লোকটা কে। কিন্তু কথাটা ভারি মূল্যবান মনে হল। ওরা ছুরি আনতে গেছে। অবশ্যই। রুচিরারা ছোটকুরা আমার প্রাক্তন মালিকেরা। এক ইঞ্চি করে ফলা বাড়ছে। একটা শবব্যবচ্ছেদ হবার প্রস্তুতি যেন— বড়যন্ত্রসংকুল পারিপার্শ্ব, এবং আমার নাড়ি মোচড় দিতে থাকল।

আমি পালালাম। সত্যিসত্যি পালালাম। জেনেশুনেই পালালাম যে এর পর সম্ভবত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের পাতায় নিরুদ্দিষ্ট কলামে 'স্নেহের খোকা' ছাপা হতে পারে। থাকতে পারে কোন ফোটো। এবং এমন তো হতেই পারে যে আজকালকার অজস্র অ-সনাক্তকৃত লাসের মধ্যে আমাকে খুঁজতে বাবা কিংবা কেউ কেউ সচেষ্টও হবেন। হতে পারে সদ্যপ্রাপ্ত আটটি লাসের আমি একজন।

সেই সন্ধ্যায় দূর পাড়াগাঁর দেশে এক ছোট্ট স্টেশনে বসে ভাঁড়ে চা খেতে খেতে আমার মনে হল, সভ্যতার শেষ দরজা পেরিয়ে আমি এবার 'বাঙ্গালী প্রিমিটিভে' পৌঁছতে যাচ্ছি। একটু হেসে মনে মনে বললাম, অবাধ সভ্যতা! তোমার ময়দানবের টেকনোলজি সঙ্গে নিয়ে তুমি গোল্লায় যাও। তুমি শুওরের বাচ্চা, ক্রমাগত জাহান্নাম কিনে কিনে সাজিয়ে রাখছ। প্রাজ্ঞল বাগান ধ্বংস হয়ে যাও। সব স্কাইস্ক্রেপার গুঁড়ো হোক। সব সেতু নষ্ট হোক। লাইনচ্যুত হোক সব রেলগাড়ি, উল্টে পড়ুক যানবাহন, পুড়ে ছাই হোক উড়োজাহাজগুলো। পচে যাক ল্যাবরেটরী। বিজ্ঞানী এন্জিনিয়ার ডাক্তারদের ফুসফুসে ছ্যাঁদা হোক। এবং ভীষণতম ভূভারহরণের পর বেঁচে থাক শুধু একজোড়া মানুষ— একটি পুরুষ আর একটি মাত্র নারী। ফের সুরু হোক নতুন যাত্রা। এই গ্রহে—কিংবা অন্য কোথাও।...

স্টেশন মাস্টারের রীতিমত ফ্যামিলি রয়েছে। সভয়ে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে টেলিগ্রাফের চাবি টিপছিল। তার-পর সটান উঠে দরজা বন্ধ করে কেন্ খালাসী-টার উদ্দেশ্যেই বলল, বড্ড শীত রে, অলক। অলক—বেশ নামটা তো! বাঙ্গালী পয়েন্টস-ম্যান—বয়সে প্রৌঢ়। একা থাকে। ভাব হয়ে গেল। দুজনে চা খেলাম পাশাপাশি বসে। চাওলা কিন্তু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কয়েকবার অলকের উদ্দেশ্যে বলল, আজকের কাগজে দেখেছ অলকদা? অলক ঘাড় নাড়ছিল। চাওলা ওকে শেষ অব্দি না শুনিয়ে পারল না।...কাদের লাস পাওয়া গেছে সব।

অলক নিরাসক্তভাবে বলল, কাদের? (কতকটা দাবা খেলতে খেলতে কাদের সাপ বলার সুরে।)

চাওলা চাপা গলায় বলল, তা কে জানে। তবে বিকেলবেলা দারোগাবাবু এয়েছিলেন এদিকে। খুনী নাকি এ তল্লাটেই এয়েছে— জোর খোঁজখবর চলছে।

অলক খিকখিক করে হাসল। আমার দিকে তাকাল।...শুনছেন?

আমি বললাম, শুনছি।

অলক বলল, এখন আপনাগো নতুন মাইনষের হব জ্বালা। বোঝলেন কথাটা?

চাওলা এবার যেন সাহস পেয়ে প্রশ্ন করল, বাবু যাবেন কোথায়?

জবাব অলক দিল। চমৎকার খাঁটি মানুষ সে।...বাবু মাথার ঘায়ে পাগল। ছুটো ভাই পলাইয়া রইছে। খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজবার নাহান...ফের খিকখিক করে সকৌতুকে হাসতে থাকল সে।

চাওলা সন্দিগ্ধ চোখে বারবার আমাকে দেখছিল। জায়গাটা প্রায় বসতিবিহীন। কোন লোক নেই কোথাও। একটা কাঁচা রাস্তামত চলে গেছে বিরাট মাঠ পেরিয়ে। দোকান বলতে স্টেশনের ছাউনির একান্তে এই চায়ের দোকানটাই আছে। অলকের কাছেই জানা গেছে, ওদিকে কোথায় কোন দেশদরদীর জন্মভূমি—সেই সুবাদে এই স্টেশনটা নতুন হয়েছে। চাওলা প্রবল প্রতিবাদে বলল, না, না—তেমন কেউ এ স্টেশনে নামেনি। এক আধ মাসের খবর আমি বলতেই পারি। নামেই নি। সব্বাই আমার চেন্ন।

অলক ফের জবাব দিল, তাহলেও মন মানবার কথা না। কী বলেন সার?

'সার' শুনে আমি খুসি, কিন্তু অপ্রস্তুত। কিছু করার ছিল না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভাগিস, অল্প আলোয় ওরা আমার মুখের কালসিটেগুলো দেখতে পাচ্ছিল না সম্ভবত। অন্ধকারকে ধন্যবাদ। কথামত অলকের ঘরে শুতে গেলাম। এত সাধারণ মানুষের অসাধারণ হৃদয় থাকতে পারে, জানা ছিল না। দুটো রেল কম্বলের একটা দিল সে। রুটি আর আলুর তর-কারি বানিয়ে ফেলল। সেইসময়, পূর্ব-বাংলার অজস্র ব্যপার সে বর্ণনা করছিল। শেষ রুটিটি সেঁকবার পর উপসংহার শুন-লাম—এই দ্যাশটা অনেক বড়। যা ভাবছেন, এটুখান না। কত কমু? তবে কী কই-ছিলেন, হ, ছুটো ভায়ের কথা। ছুটো ভাই আমারও এডড়া আছিল। বাবু, ছুটো ভাই থাকলেও কষ্ট, না থাকলেও কষ্ট। যখন ছিল, জ্বালাইয়া বুক কালা কালা করছে—এ্যাখন নাই, এখনও...হ, কী কইছিলাম? ছুটো ভাই একখান চাক্কু...জোরে হাসতে থাকল লোকটা।

বললাম, যা বলেছ। চাক্কুতে বাংলা-দেশ ভরে গেছে আজকাল।

অলক কী বুঝল, মাথা নেড়ে সায় দিল।

*

পরের দিনটা যা ঘটল, সুরুতে ব[...] ফেলেছি। আবার বলার দরকার হবে কি[...] সোজা বেরিয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন হেঁ[...] যাচ্ছিলাম—যেন এই পথটাই অবশিষ্ট, য[...] কোন জাগ্রত দেবীর তীর্থে নিয়ে যাবে। আর এই প্রথম আমার মনে হল,

...আমার সামনে বাংলাদেশ। পূ[...] পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণে হরিতেশ্যামলে সোহা[...] রক্তে ভিজে সোঁদা গন্ধেভরা মাটি। পূ[...] উতলা নদীর ভাটিয়ালী পশ্চিমে গেরু[...] বাউল। উত্তরে মোহিনী কিন্নরগণ—পুরু[...] তবু পুরুষ নয়, নারী তবু নারীও নয়-ঘুঙ্গুরে ঘুঙ্গুরে ধ্বনির নক্ষত্রফোটা অ[...] এক আকাশ যেখানে মাথার ওপর বুকে[...] ভিতর; এবং দক্ষিণে খামারজ্বলা আগুনে[...] পাশে লোনাজলের 'বরিশাল গান'।

তারপর সেই জলার ধারে, অবিকল [...] সব বলেছিলাম,

...প-রা-ণ-রে! মধ্যরাতে বাবলা ডা[...] ঝুলন্ত লণ্ঠনের মত শীতের চাঁদ। হট্টি[...] পাখি কাঁকিয়ে ওঠে, ট্টি ট্টি ট্টি। দূর থে[...] দূরে ছড়িয়ে পড়ে ভাঙ্গা ডাক মায়ের গলা[...] পরাণ কো-থা-গে-লি-রে!!

সাড়া দিতে ইচ্ছে করছিল, যাই মা[...] কিন্তু এ এক দুর্ধর্ষ কসাইয়ের কঠি[...] মুঠিতে আমার গলা। শ্বাস রুদ্ধ হ[...] আসছিল। ধরা পড়ে গেল তাহলে! ধ[...] পড়ে গেল সব। প্রতীক কখনও বাস্তবতা[...] একাকার হয়ে ওঠে। যে মাটি কবর [...] শ্মশান, সে-মাটিই ফলনশীলতা। শস্য [...] হাড় ওতপ্রোত হয়।

শীতে ঠান্ডা নিঃসাড় হয়ে আমি ফি[...] আসছিলাম। সামান্য পয়েন্টসম্যানের সে[...] রেলকম্বলটাই এখন জীবিত মানুষের অব[...] শিষ্ট প্রার্থনা। অলক চোখ মুছে বল[...] জানতাম, পাইবেন না। ও জিনিস আ[...] মিলবার না। আমি তো জানি, 'ভুক্তভুগী'

হ্যাঁ, ছোটভাই তার মন জুড়ে বাস ক[...] ছিল।

সকালেই স্টেশনে খবরের কাগজ আসে চাওলাটা রাখে। সেই কাগজে একটা খব[...] পড়লাম। মথুরাবাবু লেনের একটা লাস এ গলিতে এই প্রথম। বিশ্ববিদ্যালয়ে[...] ছাত্র (২২) শ্রীঅনিন্দ্য চক্রবর্তী ওর[...] ছোটন ওরফে ছোটকু। বুকে কাঁধে ও পে[...] আঘাতের চিহ্ন। পুলিশের ধারণা, পারি-বারিক কলহেরই পরিণতি। আগের দি[...] তার বেকার দাদার সঙ্গে মারামারি হয়েছিল আসামী বেপাত্তা। খোঁজ হচ্ছে লোকটাকে ...এবং রিপোর্টারের মন্তব্য; কী সু[...] ফরসা ছেলেটি! দেখলে বুক টাটায়।

ঝাপসা বাংলাদেশের শীতের আকা[...] জুড়ে আস্তে আস্তে একটা মধ্যরাত ছড়ি[...] আসার পর অনেক দূর থেকে ফের কে চে[...] গলায় ডাকতে লাগল, পরাণ কো-থা-গে-লি[...] প-রা-ণ-রে!

কখনো কোন রান্না করে, বেশীর ভাগ সময় শ্দধ্ পর্দড়িয়ে।"

"অগো!" পাখির মাংস লোকে খায়? ভাবলেও ঘৃণা আসে! ওয়াক—!"

"উঁহু! তুমি যে মুরগী খেয়ে এত ভালবাস? হাফ কেজি মুরগীটা লোটাই ত আজ তুমি খেলে চাঁদ!"

"হুঁ-হুঁস্—বেশ, খেয়েছি। গল্প বলবে কিনা বল না হলে আমি কিন্তু সত্যিই ঘ্দমিয়ে পড়ব, আমার ঘুম পাচ্ছে!"

"ঘ্দম আসছে এই গরমে! গায় হাত দিয়ে দেখ, ঘামে ভেসে যাচ্ছি। দেখি তোমার গা,—এঃ! তুমিও যে ভেসে যাচ্ছ অ্যাঁ!"

"ছোটলোক! ম্-ন'ঃ! গল্প বলবে ত বল না হলে ঘ্দমতে দাও।"

"সারাদিন ত বাবা পড়ে পড়ে ঘ্দমোও। দ্দপ্দরে কী কর গো, ঘ্দমো'ও সত্যি? মাঝে মাঝে কোথাও বেরোও না? প্দরোনো বন্ধ্দরা, পাড়ার দাদারা কেউ কেউ আসে না গল্প করতে?"

"ছোটলোক!"

'ছেলেবেলায় পাখি ধরা ছিল আমার একটা মস্ত শখ। ঠিক শখ নয়, শখের চেয়ে বেশী, কী বলব—তোমাকে অনেকবার বলেছি না?'

'হ্যাঁ; তুমি একটা আস্ত ব্যাধ ছিলে!'

'নাঃ। ব্যাধ ঠিক ছিলাম না কিন্তু। ব্যাধেরা পাখি ধরে সাধারণত পাখি বিক্রী করার জন্যে। কাকমারাদের নাম শ্দনেছ? কাকমারারা কাক ধরে কাকের মাংস খবার জন্যে। আমরা যেসব পাখি ধরতাম, যেমন —ঘ্দঘ্দ; বাঁট্দল দিয়ে ঘ্দঘ্দ মারতাম। কাদা দিয়ে গোল গোল গ্দলি পাকিয়ে সেগ্দলো রোদে শ্দকিয়ে উন্দনে প্দড়িয়ে নিতাম; তার-পর বাঁট্দল দিয়ে সেই গ্দলি তাক করে মারতাম গাছের ডালে বসা ঘ্দঘ্দকে। ডাক-পাখি, পাতকো—এদের ধরবার জন্যে এক-ধরনের খাঁচা তৈরী করতাম। খালের পাড়ে, বাঁশবনে, ঘরের কানাচে ঝোপঝাড়ে সেই খাঁচা বসিয়ে দিতাম। খাঁচার মধ্যে ঝোলানো থাকত কয়েকটা ধানের শীষ। ডাকপাখি, পাতকো চরতে চরতে খাঁচার কাছে এসে সেই ধান খাবার জন্যে খাঁচার মধ্যে ম্দখ গলিয়ে দিত, তারপর তাদের ঠোঁটের ঠোক্করে খাঁচার গায়ে লাগানো ফাঁস একসময় তাদের গলায় আটকে যেত। আমি, আমার পাখি শিকারের সঙ্গী দ্দ-একজন বন্ধ্দ মিলে এই সব পাখির মাংস খেতাম।

"আঃ! আচ্ছা বাবা আচ্ছা, রোজ দ্দপ্দরে তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘরের মধ্যে ঘ্দমিয়ে থাক। কিন্তু সারাদ্দপ্দর আমি যে আগ্দনের মত গরম কারখানা ঘরে লোহা পিটে পিটে—।"

"ভাল করে লেখাপড়া শিখলে পারতে, অফিসের ঠান্ডা ঘরে গদি-আঁটা চেয়ারে বসে ঘ্দমতে মজা করে!"

"অফিস! অফিসে চাকরী করলে ক' পয়সা পেতাম? লোহা এখন ত আর সত্যিই পিটি না। পিটতাম, তিন বছর আগে। এখন মেজাজে মজ্দরদের লোহা-পেটা তদারক করি, শেখাই। অনেক থার্ড ক্লাস সরকারী অফিসার—অফিসারবাব্দর চেয়ে বেশী কামাই। আর তা না হলে

পাড়া মাতানো এমন জবরদস্তিতে সুন্দরীকে—।"

"আঃ! লাগে না আমার? লোহাপেটা হাত ত, সব কিছুকে লোহা মনে করে!"

চোখা চেকুর উঠল ননীর। "আজ মাংসে তুমি বেশী রোসন দিয়েছিলে না? ঘুম আর আসবে না। কী গপ্পোট বলত?"

"লক্ষ্মীসোনা, বল না একটা গল্প। বল না গো, যেটা বলছিলে,—বল বল।"

"একটা শর্ত।"

"কী বল?"

"এই—।"

"ইস্! ঘেন্না করে না তোমার? কী গো তুমি? নাও এবার বল। আবার তুমি বিড়ি ধরাচ্ছ?"

"গ্রাম্য রক্ত ত শরীরে, না কী? সিগারেটে ঠিক্ মৌজ আসে না জান!"

"কিন্তু তোমার মুখে যা বিশ্রী গন্ধ হয়—। তুমি একটুও সভ্য নও। কেমন যেন তুমি—।"

"মানুষও ত এক ধরনের জন্তু! হা-হা-হা-হা-হা।" উলঙ্গ হাসি দিয়ে শুরু করল ননী। "পায়রা ধরা ছিল আমাদের সবচেয়ে উত্তেজনাকর শিকার। আমাদের পাশের বাড়ীর একটা ছেলে, আমারই বয়েসী, তখন সে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, ভবেন তার নাম। তার চেহারাটা ছিল আমার প্রায় দ্বিগুণ. ভীষণ শক্ত, ষণ্ডা-মার্কা। ফাঁদ তৈরীতে সেই ভবেন ছিল ওস্তাদ। আর আমি ওস্তাদ ছিলাম ফাঁদ পাততে; কখন, কোন জায়গায় কী রকম ফাঁদ বসাতে হবে—। দুপুরবেলা পাড়ার এর ওর গোয়ালে ঢুকে আমরা দুজনে গরুর লেজের চুল ছিঁড়ে আনতাম। আর সেই চুল পাকিয়ে ফাঁদ তৈরী করত ভবেন। তারপর একটা লম্বা মোটা সুতোয় সেই ফাঁদ সারিসারি বাঁধতাম।

যে মাঠে, পোড়ের পায়রার ঝাঁক এসে বসে সেখানে ফাঁদ বসিয়ে ফাঁদের চারপাশে খুদ, ডাল, কড়াই ছড়িয়ে দিতে হত। উড়ো পায়রা,—কাদের পায়রা, কোন গ্রাম থেকে আসত—আমরা কিছুই জানতাম না। আমাদের ফাঁদে পায়রা পড়ত, আমরা মাংস খেতাম।

পায়রারা কিন্তু বছরের সব সময় আসত না। মাঠের ধান কাটা হয়ে যাবে। খেসাড়ী কড়াই মাঠ থেকে তোলা হয়ে যাবে। আর সেই সময় মাসখানেক ধরে রোজ দুপুরে তারা দেখা দেবে।

এমনি এক পায়রার মরশুমে, একদিন ভবেন আর আমি বেরিয়েছি। আমাদের গ্রাম থেকে একটা বড় মাঠ পেরিয়ে একটা খাল; এই সময় খালে জল থাকে না। সেই খালের পাড়ে একটা ঢালু পড়ে মতন জায়গায় ফাঁদ পাতলাম। ফাঁদের চারপাশে যথারীতি খুদ ডাল ছড়িয়ে দিলাম। ফাঁদের সুতোটা একটা আধলা ইটের সঙ্গে বেঁধে দিলাম। তারপর একটু দূরে, মাঠের মধ্যে একটা বাবলা গাছের ছায়ায় জাঙালের ওপর গিয়ে বসলাম।

আমি তখনও ভাল করে বিড়ি ধরিনি। ভবেন একটার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে যাচ্ছে। আকাশের দিকে, যেদিক দিয়ে পায়রারা আসে চেয়ে আছি, কখন পায়রার একটা ঝাঁক দেখা দেবে। একটা ঝাঁক পড়েতে নামবে, চরতে চরতে পায়রাগুলো ফাঁদের কাছে আসবে, খুদ ডাল খুঁটে খুঁটে খাবে তখন আমরা হই হই করে তাদের তাড়া করব, উড়ে পালাতে যাবে আর তাদের কারো কারো পা ফাঁদে আটকে যাবে।

সেদিন কী হল, আকাশে আর পায়রার দেখা নেই। ঠিকঠিক দুপুর, কোথাও লোকজনের চিহ্ন নেই। কিন্তু শীত-কালের বেলা, দু' দণ্ডেই দুপুর বিকেলে গড়িয়ে পড়ে, তখন খালপাড়ের পথে লোক-জনের চলাফেরা শুরু হবে, পায়রারা আর নিচে নামবে না। তাহলে আজ আর পায়রার ঝাঁক আসবে না নাকি! উত্তেজনায় ভবেন ঘন ঘন বিড়ি ধরাচ্ছে। আমিও দু'চার টান খাচ্ছি। ভবেন একবার মুখফুটে বলেই ফেলল, "কী হল বল দিকিন, শালারা আজ আসবেনে নাকি!"

"তাই ত দেখতিচি।" আকাশের দিকে হা পিত্তিশ নয়নে চেয়ে আছি। মাঝে মাঝে ঘাড় টন-টন করে; চোখ জ্বালা করে। মাঠে দূরে দূরে কতগুলো গরু চরছে। জাঙালে জাঙালে সারি সারি বাবলা গাছ। রোদটা যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। "নাঃ! আজগে আর হল নি বুজলি?"

ভবেন দেখলাম হতাশ হল না। বলল, "দাঁড়া না, আরো খানিকক্ষণ দেকি। নিদেন একটা ঝাঁক আসবেই—রোজ আসে!"

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। কারো মুখে কোন কথা নেই। আশা নিরাশার দোলায় দুলছিলাম নীরবে।

আমার কী রকম ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। কখন একটু তন্দ্রা এমন এসেছিল, ভবেনের কনোই-এর গুঁতনিতে হঠাৎ চমকে জেগে উঠে 'কোথায়' বলে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি কোথাও পায়রার চিহ্ন নেই।

"ঐ দেখ।" ভবেন আঙুল দিয়ে দেখাল।

দেখি কী, খালের ওপারে মাঠে একটা মেয়ে। কাঁখে গোবরের ঝোড়া। কোন গ্রামের বৌ-ঝি কেউ হবে। তখনও ভাল করে আমার ঘুমের ঘোর কাটেনি। বললাম, "একটা মেয়ে ত। কী রে, মেয়ে কি পায়রা?"

ভবেন চাপা গলায় বলল, "চুপ!"

"কেন?"

"চুপ্! একদম চুপ মেরে থাক্।"

ব্যাপার কিছু আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। দেখি যে মেয়েটা গোবর কুড়তে কুড়তে খাল পেরিয়ে আমাদের ফাঁদের পাশ দিয়ে এপারের মাঠে এসে নামল। তারপর দেখি মাঝে মাঝে নিচু হয়ে গোবর কুড়চ্ছে আর মুখ তুলে ঘন ঘন আমাদের দেখতে দেখতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। মেয়েটা বয়েসে আমাদের চেয়ে দু' এক বছরের ছোট কী বড় হবে। লাল ডুরে কাপড় পরা, ফর্সা ফর্সা রং, একপিঠ এলো

চুল; নরম নরম রোদে বেশ মিষ্টি মি[illegible]
দেখতে লাগছিল।

ভবেন হঠাৎ বলে উঠল, "চারপাশ[illegible] ভাল করে চেয়ে দেক ত, কেউ কোত্থা[illegible] আছে কি না—।"

না, লোকজন কেউ নেই কোথাও।

মেয়েটা অনেকটা এগিয়ে এসেছে অম[illegible] ভবেন উঠে দাঁড়াল। আমি তার একটা হা[illegible] ধরে তাকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলে এ[illegible] ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে 'দাঁড়া না ম[illegible] হবে' বলেই সে এগিয়ে গেল।

ভবেনের মতলব কিছুটা আমি আন্দা[illegible] করতে পেরেছি। একবার ভাবলাম ভবেন[illegible] ডাকি, বলি, ভবেন ফিরে আয়,, অমন ক[illegible] কোথায় চললি, ফিরে আয়। কিন্তু তখ[illegible] সে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছে। মেয়েটা[illegible] পাশাপাশি হেঁটে এগিয়ে চলেছে।

কী করব, পালাব কী না বুঝে উঠ[illegible] পারছি না; বুক আমার কাঁপছে। দাঁড়ি[illegible] দাঁড়িয়ে ভবেনের কাণ্ড দেখছি।

হঠাৎ ভবেন পিছন ফিরে হাতছানি দি[illegible] আমাকে ডাকল।

এক ছুটে তার কাছে গিয়ে পেঁৗছলাম মেয়েটা তখন একটু তফাতে একটা বাব[illegible] গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবে[illegible] আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফি[illegible] করে যা বলার বলল।

আমি আমতা আমতা করে বললা[illegible] "কিন্তু কেউ যদি দেকতে পায়? যদি কে[illegible] জানতে পারে? কিম্বা মেয়েটা যদি ঘ[illegible] গিয়ে বলে দেয়?"

ভবেন আমাকে গালি দিল। তা[illegible] পর অনেকটা হুকুমের মত করে বলল "তুই খালপাড়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজ[illegible] রাকবি। লোকজন কাউকে আসতে দেকলে তিনবার জোরে জোরে হাততালি দিবি।[illegible] আমিও তোকে এমনি পাহারা দোব।" ভবে[illegible] হন হন করে এগিয়ে গেল।

আগে আগে চলেছে ভবেন; তার দ[illegible] পনের হাত তফাতে পিছনে পিছনে মেয়েটা আর আমি ভয়ে উত্তেজনায় অভিভূতের ম[illegible] তাদের অনেকটা পিছনে পা পা করে চলেছি

একসময় তারা রাস্তা পেরিয়ে খালে[illegible] নিচে নামল। আমি রাস্তার ওপর এ[illegible] দাঁড়ালাম। তারা খালের শুকনো পা[illegible] ধরে দক্ষিণদিক বরাবর কিছুটা গিয়ে তার[illegible] পর একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হ[illegible] গেল।

রোদের মধ্যে দাঁড়িয়েও আমার শী[illegible] করছিল। বিড়ির বাণ্ডিল, দেশলাই সব ভবে[illegible] সঙ্গে নিয়ে গেছে। চারদিকে ঘন ঘ[illegible] তাকাচ্ছি। না, লোকজনের চিহ্ন নেই, শুধ[illegible] কতগুলো গরু চরছে। গরুরো কি আ[illegible] মানুষ যে আমাদের কাণ্ডটা টের পাবে[illegible] তেড়ে আসবে! জীবনে এই প্রথম,—ক[illegible] রকম ভয় আবার দারুণ রোমাঞ্চ লাগছি[illegible] ভাবতে। ঠিকমত গুছিয়ে ভাবতে পারছিলা[illegible] না জীবনে এই প্রথম কী করতে চলেছি ভড়কে যাচ্ছিলাম। কেমন একটা ঘোরে[illegible] মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম বারবার। যেন স্বপ্নের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে কোথায় চলে যাচ্ছি, হাত পা সর্বশরীর অবশ হয়ে

আসছে; এবার বোধহয় জলিয়ে যাব, রাস্তায় পড়ে যাব। পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাব।

হঠাৎ দেখি মেয়েটা চলে যাচ্ছে; হ্যাঁ সেই মেয়েটাই। কাঁখে গোবরের ঝোড়া, লাল ডুরে কাপড় পরা,—যে দিক দিয়ে এসেছিল সেই দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

ভবেন এল একটু পরে।

খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ভবেনকে।

বললাম, 'ঘরে যাই চ।'

'চ।'

আমাদের ফাঁদের কথা মনে পড়ল হঠাৎ।

ছুটতে ছুটতে ফাঁদের কাছে এসে দেখি কী, একটা সুন্দর সাদা পায়রা ফাঁদে আটকে নেতিয়ে পড়ে আছে ধুলোয়। কতক্ষণ আগে, কখন পায়রার ঝাঁক এসে বসেছিল, কখন উড়ে গেছে, আর এই পায়রাটা—। তাড়াতাড়ি গলা থেকে ফাঁদ ছাড়িয়ে দিলাম। যত ডানা ঝাপটেছে উড়ে পালাবার জন্যে ফাঁদ গলায় ততোই শক্ত হয়ে বসেছে। খুব খারাপ লাগছিল। একটা পায়রা পোষার শখ আমার অনেকদিন থেকে। এমনি সাদা এমনি সুন্দর একটা পায়রা ফাঁদে পড়ুক, কতদিনের ইচ্ছা আমার। একদিন যদি বা ইচ্ছাটা পূর্ণ হল, ফাঁদটা কিনা গলায় লাগল! দম বন্ধ হয়ে মরল পায়রাটা!

'তারপর?'

বিনতার কণ্ঠস্বরে ননী যেন রীতিমত বিস্মিত হল। 'এত মন দিয়ে শুনছিলে তুমি? আমি ত ভাবলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে, পরেরটুকু কাল বলব।'
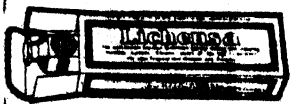
'না না, আজই বল। বল না গো, বল বল।'

'ঘুম পাচ্ছে সত্যি, পারছি না।'

'কাল ত রোববার, দুপুরে ঘুমিও; বল বল।'

'কাল তোমার ইংরাজী সিনেমার ম্যাটিনী শোর টিকিট কাটা আছে যে—।'

'তোমাকে কাল সকাল সকাল রান্না করে দোব। বল বল। কই বল।'

'আচ্ছা মেয়ে যাইহোক! বাকীটা আর না শুনলেই নয়? শোন, এতই যখন ইচ্ছে!'

'বল বল।' আবেগে বিনতা ননীর গলা জড়িয়ে ধরল।

'উঃ! ছাড় ছাড়,—দম বন্ধ হয়ে যাবে যে! শেষকালে পায়রাটার মত অবস্থা না হয় আমার!'

'আহা! নিজে কিনা আস্ত একটা ব্যাধ।'

'হুঁ'। তারপর ফাঁদ গুটিয়ে নিয়ে মরা পায়রাটা হাতে করে ফিরছি। আমরা কেউ আর কোন কথা বলছি না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ভবেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'ননী, কী এত ভাবতিছিস রে?'

আমি বললাম, 'কই, কিছু ত ভাবিনি। কেন?'

'নাঃ। এমনি বললুম। আমি মনে করলুম তুই বুঝি সেই মেয়েটার কথা ভাবতিছিস।'

ভবেনের কেন এমন মনে হল আমি সেই মেয়েটার কথা ভাবছি? কেমন করে ভবেন আমার মনের কথা টের পেল?

হঠাৎ ভবেন হো হো করে হেসে উঠল।

কী ব্যাপার, এমন করে হাসে কেন ভবেন? 'কী রে, হাসতিছিস কেন? কী হয়েচে?'

'না কিছু হয় নি। এমনি।'

'এমনি মানে? এমনি এমনি কেউ হাসে এমন করে?'

তখনও সে তেমনি হাসছে।

তার ভাবভঙ্গি আমার কীরকম অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। আমি জোরে জোরে ছুটিতে লাগলাম।

আমাকে ছোবল মারল ভবেন, 'তোকে কীরম ফাঁকি দিলুম!'

'মানে!' আমি শিউরে উঠলাম।

ভবেনের সেই জ্বালাময় হাসি আবার।

মুহূর্তে, বাজ পড়ার মত কী যেন আমার মধ্যে ঘটে গেল। ভবেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। নুট করে পড়ে গেল সে। চকিতে তার বুকের ওপর চড়ে বসলাম। এক হাতে তার গলা টিপে ধরে আর এক হাতে আমি তার মুখে কপালে ঘুসির পর ঘুসি চালাতে লাগলাম। লোহার মত শক্ত শরীর ভবেনের, ষাঁড়ের মত শক্তি; কিন্তু আমার গায় তখন একটা অসুরের তেজ। ভবেন চীৎকার করতে লাগল,—'ননী ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, মরে যাব ননী, ছেড়ে দে—।' দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল আমার শরীর মনে—। ভবেনের থুথনি ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল,— আমার তবু হুঁশ নেই—।"

এই সময় বিনতা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, 'জান, আমার জীবনে না একবার এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল; আমি না আমি না কী বলব, আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম,—কী বলব,—কী যে আমার হয়েছিল—।'

ননী হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল। 'কী হয়েছিল, কী ঘটনা ঘটেছিল তোমার জীবনে?'

স্বামীর কণ্ঠস্বরে বিনতা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। খুব ভয় পেয়ে গেল স্বামীর প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে। কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দিল, 'নাঃ! কিছুই ঘটে নি।'

'বাঃ! এই যে বললে তোমার জীবনে এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল! ঘটনাটা কী, বল?'

আতঙ্কে বিনতা বিছানার মধ্যে আত্ম-গোপন করতে চাইল। 'ব-বলছি ত, কি-কিছু নু-নাঃ!'

'কিছু না মানে? লুকোচ্ছ! এই মাত্র তুমি নিজেই বললে—।'

'আ-আমি কিছু বলি নি!'

'বল নি? ইয়ার্কি!'

অন্ধকারে উবু হয়ে বসা কালো বিশাল-শরীর ননীকে দেখাচ্ছিল যেন একটা জন্তু-জানোয়ার। নিজেকে বিনতার ভীষণ অসহায় মনে হল। 'বিশ্বাস কর, সত্যি! কিছু নয়। কী বলতে কী বলেছি! স-সত্যি—।'

'বলবে না? বল বলছি!' ননী হুঙ্কার ছাড়ল।

'বিশ্বাস কর; সত্যি, সত্যি কিছু নয়, বিশ্বাস কর।' বিনতার আর্তস্বর ননীর গর্জনে ডুবে গেল,—'আমি কিছু জানি না ভেবেছ! তাই ত ভাবি তোমার ছেলে হয় না কেন! বল, বল বলছি কী হয়েছিল? বল!'

'ছোটলোক!' বিনতা ছোট্ট ছোবল মারল।

'শয়তানী!' ইস্পাতের ছুরির মত ননীর দশটা আঙুল অদ্ভুত উল্লাসে বিনতার রোগা ঘর্মাক্ত শরীরটা ফালা ফালা করতে লাগল।

যন্ত্রণায় দম বন্ধ হয়ে ক্রমশ থিতিয়ে পড়তে পড়তে বিনতা শুধু দু-একবার সর্পিনীর মত ফুঁসিয়ে উঠল, —'ইতর!'

**সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়**
—জাতীয় অধ্যাপক

আমাদের সময়ে বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষে যে-সমস্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সাহিত্যে-শিল্পকলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে রাষ্ট্র-পরিচালনে আর জীবনের অন্য নানাদিকে যাঁরা অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শিশিরকুমার ভাদুড়ি যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। আমার নিজের দীর্ঘ আশি বৎসরের জীবনে ছোটো বড়ো ব্যক্তিত্বশালী বহু অসাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছে। দূর থেকে পরোক্ষভাবে কতকগুলি মহাপুরুষের অনুপ্রাণনা পেয়ে, আর প্রত্যক্ষভাবে কয়েক-জন বিরাট পুরুষের স্পর্শ পেয়ে (তাঁদের মধ্যে যাঁকে 'পূর্ণ মানব' বলা যায় সেই কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন প্রধান), জীবনে সার্থকতা এসেছে, জীবন ধন্য হয়েছে। এঁদের কথা গুছিয়ে বলা সহজ নয়, আর তা বলবার চেষ্টার অর্থ হবে—নিজের আভ্যন্তর জীবনের সমীক্ষা আর প্রকাশ করার ব্যর্থ প্রয়াস, যার জন্য বিশেষ শক্তি আপেক্ষিত, আর যার পিছনে থাকবে আত্মানুসন্ধান আর উপলব্ধির আলোক। ভারতের শাশ্বত ইতিহাসের ধারার কথা বলবো না—আমাদের এ যুগেই আমাদের পিতা-পিতামহদের কালের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের চিন্তা আর শিক্ষার মন্দাকিনী স্রোতের যে দুই এক বিন্দু বারি আমাদের জীবনে সার্থকতা এনে দিয়েছে, তার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া তো আমার শক্তির বাইরে। আমার গুরুজনদের কাছ থেকে, বিশেষ করে আমরা ইস্কুলের আর কলেজের শিক্ষকদের কাছ থেকে যে চিত্তের প্রসার আর মানসিক বিকাশ তাঁদের দয়ায় আমি লাভ করেছি, সেটিও একটি মস্ত বড় সম্পদ, আর তার জন্য আমি ভাগ্য বা নিয়তি বা দেবকৃপা বা কর্মফল যাই থাকুক তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমার পিতৃদেব, মাতৃদেবী, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহী, মাতুলদ্বয়, আর অন্য আত্মীয় আর আমার শিক্ষকদের সান্নিধ্যের আর তাঁদের স্নেহের কথা মনে হলে কোটি কোটি প্রণাম তাঁদের উদ্দেশে নিবেদন করি।

এঁরা ছাড়া, আমার সতীর্থ সহচর সুহৃৎ মিত্র যারা ছিল, তাদের কাছ থেকে জীবনের ক্ষেত্রে যখন প্রথম অবতীর্ণ হলুম তখন থেকে যা পেয়েছি তার জন্যও নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। সমস্ত সহপাঠীদের আর কৈশোর আর যৌবনের অন্য মিত্রদের সব কথার আলোচনার স্থান এ নয়। তবে বর্তমান প্রসঙ্গ হচ্ছে আমার যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের অন্যতম একজন অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠ মিত্রকে নিয়ে, সুতরাং সেই প্রসঙ্গে অন্য মিত্র দু-চার জনের কথা এসে পড়বে। সেই অকৃত্রিম আর ঘনিষ্ঠ মিত্র হচ্ছে শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

দু বছর ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়া, দু বছর বি-এ, আর দু বছর এম-এ—এই ছয় বছরের কলেজের জীবন। এই ছয় বছরের দুর্লভ ছাত্রজীবনে, প্রথম যৌবনে, পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করেছি। পরীক্ষায় ফল ভাল হয়েছিল বরাবরই, কিন্তু কখনও book-worm বা পুঁথি-মুহা বা বই-মুয়ো ছিলুম না—চোখ খুলে কান সজাগ রেখে সব দেখতুম শুনতুম, ছাত্রজীবনের প্রায় সব ব্যাপারেই সচেতন থাকতুম, কোনও কোনও ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহও দেখাতুম। ভাল ছেলে, মন্দ ছেলে, নিরীহ গোবেচারী ফন্দীবাজ ধড়ীবাজ নীতিবাগীশ অনৈতিক রুচিবাগীশ, দামপাণ্ডা, রসবোধযুক্ত বেরসিক—সব রকমের ছাত্র ছিল বন্ধুদের মধ্যে। নাম-করা ভাল ছেলেদের সঙ্গে পরিচয়ও হত, আবার আড্ডা জমত সাধারণ ছেলেদেরও সঙ্গে কিন্তু আমার দলের আমরা সকলে, এ বিষয়ে ক্রমে একমত হই যে লেখাপড়ায় মার্কা মারা পরীক্ষায় ফার্স্ট-ক্লাস পাওয়া ছেলে না হলেও,

আমাদের এই ছয় বছরের কলেজের জীবনে সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে উজ্জ্বল-মতি, সবচেয়ে সুবুদ্ধি, আর চেহারায়ও তেমনি সুদর্শন ছাত্র ছিল শিশিরকুমার ভাদুড়ি। এক কথায়—শিশিরই ছিল, প্রায় সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে

> The Most Brilliant and the Most Popular student in Calcutta University for near about a decade.

এ কথা বলায় বিদ্যার ক্ষেত্রে যে সব দিগগজ ছাত্র ছিল তাদের কারো লাঘব করা হয় না—তাদের কৃতিত্ব ছিল অন্য ধরনের, আর একটু সীমিত। বিদ্যায় বুদ্ধিতে শিশির আর কারও চেয়ে খাটো ছিল না, আর উপরন্তু ছিল তার একটা সহজ আকর্ষণীয় শক্তি, একটা মার্জিত উচ্চশিক্ষিত মন আর আচার-ব্যবহারে আভিজাত্য, আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রতা ভব্যতা আর শালীনতাবোধ, রসবোধ আর সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশবার আগ্রহ—এইসব ছিল যে আকর্ষণী শক্তির মূলে। কোনও রকমের 'চাল' অর্থাৎ কৃত্রিমতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কেউ শিশিরের আচরণে ধরনধারনে কল্পনাই করতে পারত না। মানুষ হিসেবে শিশির ছিল সরল, সহজ, সোজা, খাঁটি—ঋজু, ঋতম্ভর। আমরা যারাই শিশিরের সংস্পর্শে এসেছিলুম সকলেই তার সঙ্গে এক অতি সহজ মৈত্রীসূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিলুম। বহু বৎসর ধরে, আমাদের কলেজের জীবনে আর তার পরেও শিশির ছিল বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যমণি, এমন কি মিত্রমালার গাঁথন-সুতো।

নাট্যাভিনয়ে আর পরিচালনায় শিশিরের দিব্য প্রতিভার কথা বলতে বসবো, নাট্যকলারসিকের ভাবনাময় দৃষ্টি নিয়ে কখনও শিশিরের কৃতিত্বের বিশ্লেষণের চেষ্টা করি নি—সে চেষ্টা আমার এলাকার বাইরে। শিশিরকে পেয়েছিলুম মিত্রভাবে, সাহিত্য-বন্ধুভাবে, মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে সতীর্থ আর সমানধর্মারূপে, আর একজন পরিপূর্ণ বিদগ্ধ রসিকজনরূপে। তার [illegible]

দিকগুলির সম্বন্ধে দুই একটি কথা মাত্র এই প্রসংগে নিবেদন করবো।

অবশ্য, কোন তারিখে শিশিরের সংগে আমার প্রথম আলাপ বা পরিচয় ঘটে তা মনে নেই। তবে মোটামুটি বলতে পারি, ১৯০৭ সালে এন্ট্রান্স পাস করে যখন জেনেরাল-অ্যাসেমব্লিজ-ইনস্টিটুশনে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হই (জেনেরাল-অ্যাসেমব্লিজ পরের বছরেই ডফ-কলেজের সংগে পুনর্মিলিত হয়ে স্কটিশ-চার্চেস কলেজ-এ রূপান্তরিত হয়ে যায়), তখন থেকেই, বোধ হয় প্রথম বছরের শেষ পর্যায়ে যখন আমরা পড়ছি তখন থেকেই, শিশিরের সংগে আলাপ হয়। তখনকার দিনে ক্যালকাটা-ইউনিভার্সিটি-ইনস্টিট্যুট নামে আধা-সরকারী কলেজের ছাত্রদের ক্লাব কলকাতার ছাত্রজীবনে বেশ একটা লক্ষণীয় উঁচু স্থান করে নিয়েছে। ক্যালকাটা-ইউনিভার্সিটি-ইনস্টিট্যুটে ঐ সময়ে ছাত্রদের জন্য আর ছাত্রদের নিজেদের অনুষ্ঠিত অন্যান্য নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতি বৎসর আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হত। বিভিন্ন কলেজ থেকে দুজন করে ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারত। আবৃত্তি হত ইংরেজি, বাঙলা, সংস্কৃত, ফারসী আর আরবী ভাষায়। তিনটি করে পারিতোষিক প্রত্যেক ভাষার জন্য দেওয়া হত। ১৯০৮ সালে জেনেরাল-আসেমব্লিজ-ইনস্টিট্যুট থেকে সংস্কৃতের জন্য নির্বাচিত হই, বোধ হয় শিশির নির্বাচিত হয় ইংরেজির জন্য। সেবার আমি পারিতোষিক পাই নি। শিশির পেয়েছিল কিনা ঠিক মনে পড়ছে না।

এই আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম শিশিরের সংগে পরিচয় হয়। সহজ হৃদ্যতার সংগে শিশির অতি শীঘ্র আমার অন্তরংগ মিত্র হয়ে দাঁড়ায়। এর পরে ঐ বৎসরই, আমাদের কলেজে বাঙলা নাটক, ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য', ছাত্রদের দ্বারায় অভিনীত হয়। শিশির আমার এক ক্লাস উপরে পড়ত—দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে—কিন্তু অভিনয়ের ব্যাপারে ইণ্টারমিডিয়েট আর বি-এ, এই দুইয়ের চার ক্লাসেরই ছাত্রেরা অংশ গ্রহণ করত। এই অভিনয়ের সম্বন্ধে লক্ষণীয় কিছু মনে পড়ছে না। ফণীন্দ্রনাথ মিত্র বলে আমাদের ক্লাসের এক সুদর্শন সহপাঠী প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় অভিনয় করে, নাটকের কল্যাণীর ভূমিকা নেয় শৈলেন্দ্রনাথ বসু। একটা দৃশ্যের কথা মনে আছে—দুজন মুসলমান আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কল্যাণী যখন খাঁড়া ধরে দাঁড়িয়েছে, তখন ঠিক সন্ধানী মুহূর্তে প্রতাপাদিত্য আর সূর্যকান্ত এসে হাজির, দুজনের হাতে একটি করে প্রমাণ আকারের খেলার বন্দুক, তাঁরা আক্রমণকারীদের উপর তাড়া করে বন্দুক ধরলেন, স্টেজের ভিতর থেকে দুম-দাম করে 'কলেরা পটাশ' অর্থাৎ 'ক্লরেট-অফ-পটাশ'-এর পটকা ফাটানো হলো, আর সংগে সংগে দুই আততায়ী ধরণীশায়ী। তবে একটু বে-হিসাবি হয়ে পড়ায়, পটকা ফাটাবার আওয়াজটা ৩।৪ সেকেন্ড পরে হয়ে যায়—তার আগেই আততায়ীদ্বয় ঘায়েল হয়ে শুয়ে পড়ে। দর্শকদের মধ্যে একটু হাসাহাসি হয়, স্টেজ-ম্যানেজার তো চটে কাঁই। এইভাবে আমাদের বাংলা নাটক হয়। পরের বছর, আমরা তখন সেকেন্ড ইয়ার ক্লাসে, ইংরেজি নাটক শেকস্পিয়রের জুলিয়স সীজার-এর অভিনয় করি। আমাদের কলেজ জীবনের সময়ে কলকাতার প্রায় সব বড় বড় কলেজে বছরে একটি করে বাংলা নাটক, আর একটি করে ইংরেজি নাটক—সাধারণতঃ শেকস্পিয়রের কোনও বই—অভিনয়ের রেওয়াজ ছিল। এটা যেন ছিল ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষার একটা ছাত্রপ্রিয় অংগ। এ সম্বন্ধে দু কথা বেশ লেখা যায়। ১৯০৮ সালে দুটো স্কচ মিশনারী কলেজ, আমাদের জেনারেল-অ্যাসেমব্লিজ-ইনস্টিট্যুশন আর ডফ কলেজ, মিলে একটি কলেজ হয়ে গেল—'স্কটিশ চার্চেস কলেজ' (পরে স্কটল্যান্ডে ওদের খৃষ্টান প্রেসবিটেরিয়ান দলের ধর্ম সংক্রান্ত মত-ভেদের সমাধান হলো, যখন একটি মাত্র 'স্কটিশ চার্চ' পুনঃস্থাপিত হল, তখন 'স্কটিশ চার্চেস কলেজ'-এর নামও পাল্টে গিয়ে হল 'স্কটিশ চার্চ কলেজ')। ঐ সালের স্কটিশ চার্চেস কলেজের 'জুলিয়স সীজার' অভিনয় নানান দিক থেকে এক লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। আর এতে আমি পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলুম—কুশীলব বা অভিনেতারূপে নয়, 'ব্যাশ-কারী' বা বেশকারী অর্থাৎ পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়ে সাজানোর ভার নিয়ে। কেন এই কাজ আমি ঘাড়ে করে নিই, সে সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি কথা আছে—সব কথার অবতারণা এখন করবো না। তবে শিশির এই নাট্যাভিনয়ে ব্রুটাস-এর ভূমিকা গ্রহণ করে, আর সেই জন্যই আমার পোষাক তৈরি করার প্রচেষ্টা মনে হয়েছিল যেন সার্থকই হয়েছিল।

এই অভিনয়কে অবলম্বন করে শিশিরের সংগে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে হল, আর মনে হয়, এই সময়ে শিশিরের সংগে আমার মিত্রতা 'আপনি'র পর্যায় থেকে একেবারে 'তুই'-এর পর্যায়ে এসে পৌঁছয়—সেই থেকে বাকী জীবনে শিশির এমন একজন বন্ধু হয়ে দাঁড়ায় (এ রকম অল্প আরও দু-চারজন হয়েছিলেন) যার সংগে 'তুই-তোকারি' ছাড়া আর অন্য সম্বোধনের কথা ভাবতেও পারতুম না।

জুলিয়স সীজার নাটক অভিনয় হবে ঠিক হল। মহা উৎসাহে মহড়া চলল। কলেজের কাজ হয়ে যাবার পরে বিকাল ৫টা থেকে ৭টা ৮টা পর্যন্ত মহড়া চলত। আমাদের অধ্যাপকদের কেউ-না-কেউ থাকতেন, স্কচ সাহেব অধ্যাপকেরা, আর তাঁদের ইউরোপিয়ান অভিনয়-রসিক বন্ধুরাও কখনও কখনও এসে আমাদের তালিম দিতেন। কলেজ থেকে টাকা বেশী পাওয়া যেত না। ইংরেজি সাহিত্য চর্চার অংগ হিসেবেই এই ইংরেজি (বিশেষতঃ শেকস্পিয়রের) নাটক অভিনয়কে দেখা হত বলে কলেজের কর্তৃপক্ষ উৎসাহ দিতেন। ছেলেরাই চাঁদা তুলে বাইরে থেকে দুই-একজন কলেজের হিতৈষী পুরাতন ছাত্রের কাছ থেকে টাকা যোগাড় করে কাজে নামত। শেকস্পিয়রের নাটক হবে, বাজার থেকে শলমা-চুমকী দেওয়া ঝুটো মখমলের 'রাজবেশ', সাদা রেশমের 'মন্ত্রীর বেশ' প্রভৃতি শস্তায় ভাড়া করে এনে তো ইংরেজি নাটক হবে না। তখন চৌরঙ্গী রোডে গ্রান্ড-হোটেলের একতলায় ব্যান্ডম্যান অপেরা কোম্পানি বলে ইউরোপিয়ান আর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা ফিরিঙ্গিদের এক থিয়েটার কোম্পানি ছিল, তারা মাঝে মাঝে কলকাতার ইংরেজদের জন্য ইংরেজি নাটকের অভিনয় করত। আমরা শুনেছিলুম যে, তারা বাইরের লোকেদের যেমন বিভিন্ন ইংরেজ আর বাঙ্গালী কলেজের নাটকের জন্য দরকার মত পোষাক ভাড়া দিত। আমাদের একটি বন্ধু আগবাড়া হয়ে এল, বললে, ঐ ব্যান্ডম্যান কোম্পানির কর্তাদের সংগে তার জানাশোনা আছে। সেই আমাদের জন্য পোষাক ভাড়া করে আনতে পারবে। আমরা রোমান পোষাক জুলিয়স সীজার নাটকের জন্য যা যা চাই তার তালিকা করে তাকে দিলুম। সে পরে আমাদের জানালে, ১৫০ টাকা না কত পড়বে। টাকাটা কিন্তু আগাম দিতে হবে। আমরা তো অকূলে কূল পেয়ে তাতেই রাজী হলুম, টাকা তার হাতে দেওয়া হল। তার পরে সে হঠাৎ ডুব মারলে—আর কলেজে আসে না, তার বাড়িতেও তাকে পাওয়া যায় না। আমাদের কেমন সন্দেহ হল। নাটকের আর দু-তিনদিন মাত্র বাকী আছে, অভিনয় যারা করবে তারা সব তৈরী, কিন্তু পোষাক? শেষে দু তিনজনে গেল ব্যান্ডম্যান অপেরা কোম্পানীর ডেরায়—পোষাকের খোঁজ বা তদবির করতে। সেখানে গিয়ে জানা গেল, কেউ তাদের কাছে পোষাকের জন্য আসেই নি, টাকা দেওয়া তো দূরের কথা। সব শুনে তারা বললে, কলেজের ছেলে হলেও

তোমাদের বন্ধুটি চোর, পুলিসে দাও। সে তো পরের কথা—এক শনিবার সন্ধ্যায় নাটক হবে, তার পরেই লম্বা দেড় মাসের পুজোর ছুটি। এখন কলেজের মান বাঁচানো যায় কি করে? অভিনয় যে করেই হোক, করতেই হবে। নিমন্ত্রণের কার্ড পর্যন্ত ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছে।

গ্রীক রোমান জগতের প্রাচ্য সংস্কৃতি, তার শিল্পকলা পোষাক আশাক সম্বন্ধে আমার আগ্রহ ছিল—সেকেন্ড ইয়ার ক্লাসে গ্রীস ও রোমের ইতিহাস আমার প্রিয় বিষয় ছিল। বন্ধুরা জানতেন। কেউ কেউ এসে বললে, একটা গতি কিছু করো। আমি সাহস করে এগিয়ে এলুম, আমার হামরাই হয়ে এলেন আর দুজন সহপাঠী, আনন্দকৃষ্ণ সিংহ (পরে ইংরেজির অধ্যাপক হন রিপন কলেজে) আর নীহার মিত্র। আমি বললুম, কুছ পরওয়া নেই—রোমান পোষাক অতি সাদা সিধে ব্যাপার। সাদা সিল্কের চাদরে হল রোমান পোষাকের প্রধান অঙ্গ, toga টোগা বা অঙ্গবস্ত্র বা উত্তরীয়, প্রায় সারা গা-টা ঢেকে। ভিতরে সাদা কাপড়ের লম্বা একটা পাঞ্জাবী, সেটা হল ভিতরের tunic টুনিক বা chiton খিটন বা জামা। পায়ে চপ্পল। মাথায় একটা রঙ্গীন কাপড়ের ফেটা—বাস্, এইতেই রোমান পোষাক চমৎকারভাবে হয়ে গেল। এখন আমরা আমাদের বন্ধুদের আর দর্শকদের একেবারে কাৎ করে দিলুম, রোমান সেপাইদের পোষাক বানিয়ে। সোলার টুপি যা তখনকার দিনে সাহেবরা পরত তাই গোটাকতক আনিয়ে তার মাথার খুলি-টুকু ঢাকা যেত যে গোল অংশে সেইটুকু রেখে বাকী সবটা কেটে বাদ দেওয়া গেল। তার পরে মোটা পিজ-বোর্ডের একটা করে Crest বা চুড়ো (মোরগের ঝুঁটিতে যেমন থাকে) কেটে নিয়ে ঐ সোলা-টুপীর মাথাটা চিরে তাতে বসিয়ে দেওয়া গেল। তার পরে সবটার উপরে রুপোলি বা সোনালি কাগজে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হল—ঝক্ঝক্ করতে লাগল, যেন পিতল বা ইস্পাতের helmet বা টোপর অর্থাৎ শিরস্ত্রাণ। গালের দু-পাশে আবার cheek-guards বা পিজবোর্ডের এই শিরস্ত্রাণের গাল-বাঁচাবার ধাতুর অংশ তৈরী করে সেঁটে দিলুম, রুপালী বা সোনালী কাগজ লাগিয়ে, রবারের সূক্ষ্ম ইলাস্টিক লাগিয়ে যাতে খুলে না পড়ে বা আলগা না হয়ে যায়। শিরস্ত্রাণের মাথায় পাখীর পালক বা ঘোড়ার বালাম-চীর অলঙ্করণ থাকত, সেটার কাজ সারলুম তুলো সেঁটে, দূর থেকে চলনসই হল। সেই রকম হাঁটুর নীচে চপ্পলের উপরে ধাতুর অনুকারী Greaves বা পাদত্রাণ, আর বড় বড় পিজবোর্ড কেটে তাতে রুপালী বা সোনালী কাগজ, কালো কাগজ সেঁটে হল রোমান ঢাল—এমন কি তাতে S.P.Q.R. (অর্থাৎ Senatus Populusque Romanus—রোমীয় শাসন ও জনসাধারণ') এই মন্ত্র লাগানো গেল—আর রোমের প্রতিষ্ঠাতা দুই ভাই রোমুলুস আর রেমুস নেকড়ে-বাঘের পেটের তলায় বসে তার দুধ খাচ্ছে, এই দৃশ্যের ছবি। পোর্শিয়া ছিল একমাত্র মেয়ের ভূমিকা, বড় সেমিজ সায়া দিয়ে ফিতে দিয়ে তার পোষাকও এক রকম খাড়া করানো গেল। এখন সাদা রেশমের চাদরের টোগা পরে পিজবোর্ডের সোনা টোপর বা বর্ম-শিরস্ত্রাণ পরে এস পি কিউ আর লেখা পিজবোর্ডের ঢাল নিয়ে, বর্মের উপরে লাল রোমান ফৌজী cloak বা দুকূল পরে, অভিনেতারা মাচার উপরে বার দিলেন, আমরা নিজেরা তো মুগ্ধ হয়ে গেলুম, আর সাহেব মেম আর বাঙ্গালী দর্শকেরাও হাততালি দিয়ে তারিফ করলেন। এখন এসব আমার ১৮ বছর-বয়সের ছেলেমানুষী মনে হয়। কিন্তু নাটক জমেছিল শিশিরের Brutus ব্রুটাসের ভূমিকার অভিনয়ে। আর ব্রুটাস-এর প্রতিস্পর্ধী Mark Antony মার্ক আন্টনির ভূমিকা যিনি করেছিলেন ফোর্থ ইয়ার ক্লাসের ছাত্র, আমাদের অগ্রজ-কল্প, নামটা মনে পড়ছে না—তিনিও চমৎকার করেছিলেন, শিশিরের সঙ্গে তাল রেখে চলেছিলেন। যতীন গাঙ্গুলী বলে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছেলে Portia পোর্শিয়ার অভিনয়ও সুন্দর করেছিল।

এইভাবে তো পরের মাথায় খুর চালিয়ে রক্তপাত করে নাপিত যেমন তার ব্যবসা শেখে, সেইভাবে শিশির আর অন্য অভিনেতা সহপাঠীদের উপর আমাদের এই experiment চালিয়ে আমরা 'ঐতিহাসিক পোষাক তৈরীর কাজে ছাত্রমহলে সুনাম অর্জন করলুম, প্রধানতঃ আমরা তিনজন—আনন্দ সিংহ, নীহার মিত্র, আর আমি। পরে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের নাটকাভিনয়ে 'চন্দ্রগুপ্ত', 'অশোক', 'জনা' প্রভৃতিতে আমাদের জয়-জয়কার আরম্ভ হল, আর শিশির যখন উত্তরকালে পুরোপুরি নাট্যকার বৃত্তি নিলে, তখন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক অগ্রজ-কল্প রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দলে এলেন, সহজেই আমাদের পরিচালক নেতা হয়ে গেলেন—শিশিরের 'আলমগীর', 'সীতা', 'দিগ্বিজয়ী' প্রভৃতি অভিনয়ে। আর আমাদের সাহায্যে এলেন—বরাবরই ছিলেন—গিরীন সেন। শিশিরের প্রযোজনার ফলেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে হিন্দুযুগের পোষাক-পরিচ্ছদ stage decor বা মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টির আধারে একটা যুগান্তর এসে গেল। শলমা চুমকির কাজে কটকটে লাল নীল সবুজ কালো হলদে ভেলভেটের কোট চাপকান ফুলপ্যান্ট বা হাফপ্যান্ট, আর পালখ লাগানো শামলা বা জরীর টুপির রেওয়াজ ধীরে ধীরে উঠে গেল—ইনস্টিট্যুটে আর পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরের পরিচালিত অভিনয় দেখে। হিন্দু রাজার পোষাক বেনারসী জোড়, খালি গায়ে প্রচুর গয়না, পায়ে চপ্পল, মেয়েদের পোষাকে জরীর কাজ করা বা ছাপা রঙ্গীন সাড়ী, আর তদনুরূপ ওড়না এসে গেল। নাট্যাভিনয়ের পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে এই নতুন হাওয়া ক্রমে উত্তর ভারতে আর ভারতের অন্যত্রও ছড়িয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথের আর নন্দলাল অসিতকুমার প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের ছবি—আর পিছনে রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতা আর অন্য লেখা, এ বিষয়ে এগুলিরও অনুপ্রাণনা ছিল নিভৃতে, কিন্তু অত্যন্ত গভীর আর সুদূর-প্রসারী।

শিশিরের সঙ্গে এই ভাবে, নাট্যকলার প্রযোজনা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা, বাংলা ইংরেজী আর সংস্কৃত এই তিন ভাষায় সাহিত্য নিয়ে—যে ভাব-

লাভ্য পাওয়া গেল, যে ঘনিষ্ঠতা ক্রমে উঠল, সেটাকে আমার জীবনে একটি পরম পদার্থ বলে মনে করি। এই ঘনিষ্ঠত বন্ধুত্ব কেবল আমাদের অন্তরঙ্গ সুহৃদ মহলের লোকেরাই জানত, এর বাহ্য প্রকাশের আশঙ্কা বা চেষ্টা ছিল না। শিশিরের নট-গৌরবের কথা বাইরের লোকে সকলেই জানে, তার শিল্পি-জীবনের তার সাধনার তার কৃতিত্বের বিদগ্ধ রসজ্ঞ আলোচনা আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠীর কেউ কেউ তো করেছেনই, বাইরের নাট্যরসিক নাট্যকলাবিৎ সুধীজনও করেছেন। শিশিরের লোকপ্রিয়তা এমন ছিল, অন্য সকলকে আপনার করে নেবার ক্ষমতা এমন ছিল যে, যে কেউ তার সান্নিধ্যে আসত তারই মনে হত, শিশির তার অত্যন্ত আপন জন, নিকট মিত্র। মহৎ চরিত্রের, সর্বশ্বর-মানস-যুক্ত অসাধারণ পুরুষের পক্ষে বলা যায়, তাদের ব্যক্তিত্ব যেন একটি পল-কাটা হীরা—তার নানা বা মুখ আছে, প্রত্যেকটি থেকে তার নানা Facet বা মুখ আছে, প্রত্যেকটি থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে—আর সেই অসাধারণ পুরুষের সান্নিধ্যে যারা এসেছে তাদের প্রত্যেকেরই মনে হবে, বুঝি এমন একটা স্থান তার সৌহার্দ্যের মধ্যে আছে যেখানে আর কারো ঠাঁই নেই, সেখানে তারা দুজনই একক।

শিশিরের সঙ্গে এই হৃদ্যতাটুকু আমার জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য, যেমন আরও দশজন মিত্রও অবশ্যম্ভাবী সঙ্গে আমারই মত শিশিরের সম্বন্ধে একথা বলবেন। সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক নানা আলোচনা আর নাট্য প্রযোজনা, রাজনীতি, চরিত্র-বিচার প্রভৃতি গুরু লঘু নানা বিষয়ের অন্তরালে শিশিরের সঙ্গে আমার বহু কথাবার্তা হত। তার আর আমার দু-জনেরই নানা ব্যক্তিগত কথা আর সমস্যা, সুখ-দুঃখের আদর্শ আকাঙ্ক্ষার অভাব-অভিযোগের কথা জীবন-মৃত্যু প্রভৃতি অবিনশ্বর জগৎ-শাশ্বতসত্তা নিয়ে, শুয়ে বসে পা-চারী করতে করতে অন্তরঙ্গ আলোচনা কতবার না শিশিরের সঙ্গে আর পান্নালাল মুখুজ্যের মত দুই এক-জনের সঙ্গে আমাদের হত। সে সবের কোনও record বা স্মরণিকা নেই—তবে আমার মনন আর চিন্তাধারা গড়ে তোল-বার পথে সেই সব আলোচনার একটা সার্থকতা ছিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শিশিরের পিতৃ-বিয়োগ হল। এই মহাগুরু নিপাতের সময়ে আমরা জনকয়েক উপস্থিত ছিলুম, শ্মশানবন্ধুর মত শিশির আর তার ভাইয়েদের সঙ্গে তার পিতার দেহ নিম-তলার শ্মশানঘাটে নিয়ে যেতে কাঁধ দিয়ে-ছিলুম। মৃতদেহের সৎকারে আমার অভিজ্ঞতা বিশেষ ছিল না, কেবল পিতা-মহের বেলায় শ্মশানে গিয়েছিলুম, তবুও কালোচিত সবকিছু করার কাজে সহায়তা করি। চিতার উপর পিতার দেহ স্থাপনের পরে শিশির, তারাকুমার আর বিশুর পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। অন্য নানা বিষয়ে পিতার আর মাতার প্রতি শিশিরের ভক্তি ভালবাসার ছোটখাট অনেক নজীর দেখেছিলুম—মাতামহ মেদিনীপুরের মনীষী কৃষ্ণকিশোর আচার্য মহাশয় সম্বন্ধেও তেমনি ভক্তি ভালবাসার পরিচায়ক অনেক কথা শিশিরের মুখে শুনেছি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে শিশির-কুমারের স্ত্রী বিয়োগ হয়। শিশিরের স্ত্রী উষা দেবীর সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎকার হয় নি, শিশিরের বাবা একটু রক্ষণশীল সেকেলে ধরনের মানুষ ছিলেন বলেই বোধহয় শিশির বন্ধুদের বাড়িতে এনে পত্নীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে নি। শিশিরের বিয়ে হয়েছিল সুদূর আগরা শহরে, তার শ্বশুর ছিলেন আগরার বিখ্যাত ডাক্তার রায়বাহাদুর নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী—আমরা অত দূর বর-যাত্রায় যেতে পারি নি। কিন্তু পরে আমাদের দলের সকলের শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্র, জ্ঞানপ্রিয় মিত্র, আমাদের অতি আপন-জন 'গুরুদেব'-এর সঙ্গে আর অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কথায় বুঝেছি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক গভীর ভালবাসার যোগ ছিল। যখন খবর এল আগরা থেকে বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, শিশির আমাদের দলের মধ্যে সকলকেই উদ্দেশ করেই 'গুরুদেব' জ্ঞানপ্রিয়কে উদ্ভাসিত আনন্দে জানাচ্ছে— Gurudev, you'll be glad to hear, I have got a son শিশিরের চোখে মুখে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য। মাত্র ছয় বছরের বিবাহিত জীবনের পরে এমন কি হল যে ১৯১৬ সালে শিশিরের স্ত্রী আত্মহত্যা করলেন, তাও আবার ভীষণভাবে কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে। বন্ধুবর পান্নালাল মুখুজ্যের সঙ্গে শিশিরের গভীর হৃদ্যতা ছিল, শিশিরের রাত্রে ঘুম হত না বরা-বরই, অনেক সময়ে আর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে তবে শিশির বাড়ি ফিরত, কখনও কখনও পান্নালালের মত কোনও বন্ধুর সঙ্গে বাড়ির কাছে এসেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা পায়চারি করে অনাবশ্যক আড্ডাবাজী করে সময় নষ্ট করত। পান্নালালের মুখে শুনেছি, প্রায় দেখা যেত, সেই রাত

বারোটা একটায় শিশিরের স্ত্রী দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিশিরের জন্য অপেক্ষা করছে—শিশির তখন ঝামাপুকুর লেনের একটি বাড়িতে থাকত।

১৯১৬ সালে আমার নিজের বিবাহের দুই বছর পরে (এই বিবাহে শিশির আর অন্য বন্ধুরা খুব উৎসাহ করে মেতেছিল—শ্রীরামপুরে আমার মামাশ্বশুরের বাড়িতে এই বিবাহ হয়, সকলে দলবেঁধে সেখানে বরযাত্র যায়, আর আমাদের বাড়িতে বৌভাতের দিনও সকলে মিলে এসে খুব হৈ-হুল্লোড় আনন্দ মাতামাতি করে), একদিন বেলা দুটো কি আড়াইটের কলকাতায় ৩নং সুকিয়াস রোডে আমাদের বাড়িতে রয়েছি, কি একটা বাজে বই পড়ছি, এমন সময় আমাদের ইনস্টিট্যুটের দলের বন্ধু ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষ হঠাৎ এসে হাজির। বয়সে আমার চেয়ে ৩।৪ বছরের বড় ছিলেন, আমরা তাঁকে 'অঘোরদা' বলতুম। ইনি ছিলেন হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার বটকৃষ্ণ বা বটু ঘোষের ছোট ভাই। এ'দের বাড়ি ছিল বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে, সুকিয়াস স্ট্রীটের মোড়ের কাছেই। তাঁকে আকস্মিকভাবে এই রকম আসতে দেখে আশ্চর্য লাগল, বিশেষ দেখলুম তাঁর মুখখানা গম্ভীর। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই বললেন—'তোমার চেনা এ পাড়ায় কোনও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট আছে?' 'অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট!' কি ব্যাপার? অঘোরদা বললেন, ঘণ্টা দেড়েক হল, শিশিরের বউ সম্ভবতঃ আত্মহত্যা করবার জন্যই কাপড়ে কেরাসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, গা অনেকটা ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছে, কথা কয়েছিল, এখন অজ্ঞান হবার অবস্থা। খবর পেয়েই গিয়ে আমি যা দেখেছি বোধ হয় বাঁচবে না—এখন একটা dying deposition শেষ উক্তি নেওয়া দরকার, তাই অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট চাই। চমকে গিলুম। তখনই পাড়ার মাতব্বর ছিলেন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায়-বাহাদুর চন্ডীচরণ চাটুজ্যে—তিনি এক ভদ্রলোকের নাম বলে দিলেন, প্রবীণ ব্যক্তি, নামটি ভুলে যাচ্ছি, আমাদের পাড়াতেই থাকতেন, তিনি রাজী হলেন এই শেষ উক্তি লিখে নিতে। তিনি তৈরী হতে হতেই ঘোড়ার গাড়ি এনে অঘোরদা আর আমি তাঁকে নিয়ে শিশিরের বাড়িতে এসে পে'ছিলুম—তৎক্ষণে বোধ হয় পোনে চারটে হয়ে গিয়েছিল। শিশিররা তখন আপার সার্কুলার রোডের পুবে, রাজা রামমোহন রায়ের বসতবাড়ি এখনকার সুকিয়াস স্ট্রীট থানার আপিসের কাছে যুগীপাড়া লেনে একটা দোতলা ভাড়া বাড়িতে থাকত। ঐ বাড়িতেই সপ্তাহখানেক আগে শিশিরের বোন গৌরীর বিয়ে হয়েছিল, শিশিরের ভগিনীপতি শম্ভু, কৃষ্ণনগরে বাড়ি, গিয়ে দেখলুম বরকনে তখন শিশিরদের ওখানেই বিয়ের পরে এসেছে। শিশিরের বাড়িতে পে'ছে দেখলুম, কিছু আত্মীয় বন্ধুর ভীড় বাইরে, শিশিরের এক জেঠতুতোদাদা নলিনীবাবু তিনি ডাক্তার, এসে গিয়েছেন, আর শিশিরের দুই হাতে হাতের পাতায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন। শিশির আমাকে দেখে কোঁঙে কান্নার ভাব যেন চেপে বললে, 'এসেছিস? মেয়েদের সম্বন্ধে কখনও উদাসীন হবি না।' অঘোরদা সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটকে উপরে নিয়ে গেলেন। মিনিট পনেরো পরে তিনি নেমে এলেন। সার্টিফিকেটের মত মুমূর্ষু উষা দেবীর জবানবন্দী ইংরেজিতে কালি দিয়ে তিনি লিখেছেন, কাগজখানি আমাদের সামনে পড়েছিলেন, আমাদের হাতে দিলেন। তিনি লিখেছিলেন—যতদূর মনে আসছে—

> Heard the dying declaration of the lady.

(তার পরে নাম).

> She seemed to be in a very bad condition and appeared to be rapidly sinking into unconsciousness. She declared that out of a mistaken idea that her husband neglected her and did not love her that she had herself set fire to her sari after puring kerosine oil on her person. She was sorry for what she did, and no one was to blame for this. Before she could reply to other questions, she bcame unconscious.

উপস্থিত দুই চারজনের নামও সাক্ষী-হিসাবে এই সার্টিফিকেটে ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় অতি সজ্জন, তাঁর সহানুভূতির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ি করে তাঁর ফিরবার ব্যবস্থা করে দিলুম। শিশিরের মুখে তখন সংক্ষেপে কিছুটা ব্যাপার শুনলুম—পরে আরও শুনি। বাড়িতে বিবাহের ব্যাপার নিয়ে আত্মীয়স্বজন এসেছিল, শিশিরের সঙ্গে তার স্ত্রীর সে কয়দিন নিভৃতে সাক্ষাৎ হত না। শিশির একটু খুনসুড়ি করত স্ত্রীর সঙ্গে, স্ত্রী তাতে একটু রাগারাগি করত। দাম্পত্য কলহ—শিশির বাহাদুরী দেখাবার জন্য—নিজেও খামখা রাগ দেখাত, কথা কওয়া লোক দেখানো বন্ধ করে দিয়েছিল। এর মধ্যে স্ত্রী দুবার এসে যেচে শিশিরের সঙ্গে কথা কইতে আসে, পুরুষ-পুঙ্গব বাহাদুরী দেখিয়ে চলে যায়। এটা তার স্ত্রীর মনে লাগে, ভীষণ অভিমান হয়। আক্ষেপের বিষয়, এখানে দাম্পত্য কলহে অল্পারম্ভে এক অভাবনীয় ট্রাজেডি ঘটে গেল শিশিরের জীবনে। শিশির কিন্তু আড়াল থেকে যেন মজা দেখছিল। যেদিন ঐ ভীষণ ব্যাপার হল, সকালে শিশির আর একবার মৌখিক রাগ দেখায়। সমস্ত সকাল তার স্ত্রীর মনটা যে গুমরে উঠছিল, সে খবর কেউ রাখে নি, শিশিরও নয়। তার স্ত্রী বেশ সহজভাবে ননদ আর নতুন নন্দাইয়ের সঙ্গে আলাপ করেছে, নিজের বাপের বাড়ি আগরায় ননদ-নন্দাই গেলে তাদের কি কি দেখাবে সে-সব কথাও বলেছে। শিশির বাইরের ঘরে ছিল। ছোট বাড়ি—হঠাৎ একটা শব্দ হল, যেন একটা বোতল পড়ে গেল। শিশিরের মা জিজ্ঞেস করলেন—'কিসের আওয়াজ? কে যেন বোতল ফেললে?' শিশিরেরও অনুমান ছিল, বোতল

স্ত্রীর হাত থেকেই পড়ে গিয়েছে. তাই স্ত্রীকে আরও চটাবার জন্য বলে উঠল—'কে আবার ফেলবে? তোমার গুণবতী বউ।' বলবার পরেই শিশিরের কেমন সন্দেহ হল. কেরোসিন তেলের বোতল ফেলতে গেল কেন? দেরী না করে শিশিরও তেতলার ছাতে গেল. ছাতে পৌঁছেই অভাবনীয় ব্যাপার—স্ত্রীর সর্বাঙ্গ আগুনে জ্বলছে, শাড়ীটা গায়ে দুপাট করে শক্ত করে জড়ানো. উষা শিশিরকে দেখেই চীৎকার করে বলে উঠল, 'ওগো আমায় বাঁচাও।' শিশির সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল. 'মা, মা, শীগগির এসো, সর্বনাশ হয়ে গেল! ওরে তারু, বিশু, শীগগির সব্বাই আয়।' আর নিজের দুই খালি হাতে স্ত্রীর দেহ ধরে চাপড় মেরে মেরে আগুন নেবাবার চেষ্টা করতে লাগল। দু ভাই তারাকুমার বিশ্বনাথ আর মা এরা এসে পড়লেন। বিশ্বনাথ বুদ্ধি করে ছাতের উপরে একটা ছেঁড়া শপ বা মাদুর পড়েছিল সেইটে দিয়ে বউদিদির জ্বলন্ত শাড়ীর উপরে জড়িয়ে দিলে। তাতেই আ... নিভে গেল। কিন্তু শিশিরের ... শোনা, তার স্ত্রীর পরনের শাড়ী সবটা ... যাওয়ায় জ্বলন্ত শাড়ী ... গায়ে ছিল সেটুকুও ছাড়তে চাইলে ... যা হোক, শেষটায় আগুন নিবে ... কিন্তু যা করবার তার চেষ্টা হল, ... যা হবার তা হয়ে গেল। ধরে ধরে নিচে শুইয়ে দেওয়া হল। অসহ্য যন্ত্র... শিশিরের প্রশ্নে—'কেন এমন করলে'

এন সব ছেলেমানুষি সন্দেহ চলে গেল। শিশিরকে বললে, 'আমি ভুল করেছি। এর কি সাজা হবে? আমি কি আবার বেঁচে উঠবো?' আর সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা—'আচ্ছা, যদি বেঁচে উঠি, আর সমস্ত গা তো পোড়ার দাগে ভীষণ হয়ে উঠবে। সবাই দেখে ভয় পাবে—তোমার মনে তখন কি হবে?' যতদূর পারা যায় সান্ত্বনা দিয়ে তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে লাগল। সকলেই ম্রিয়মান। জীবনের আশা বেশী নেই। নলিনীদার অঘোরদার পরামর্শ মত অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ডেকে শেষ জবানবন্দীর ব্যবস্থা হল।

এদিকে শিশিরের দুই হাতের চেটো আগুনে পুড়ে ফেটে গিয়েছে, মাংসের তলায় হাড় দেখা যাচ্ছে। তারও ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই করতে হল। শিশিরের মুখে যেন আর কথা বেরুচ্ছে না।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট চলে যাবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই উপর থেকে কান্নার রোল এল—তার আগেই শিশির উপরে গিয়েছিল।—সব শেষ।

আমরা তৈরী ছিলুম—শেষকৃত্য করবার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন উঠল, পুলিশের অনুমতির আবশ্যকতা আছে কি না—আত্মহত্যা অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের নেওয়া জবানবন্দী, এ সত্ত্বেও পোস্ট মোর্টেমের হাঙ্গামা হবে কি না। মৃত্যু হল সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ। আমাদের তিন চারজনের চেষ্টায়—বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ দাস, পুলিশের বড় অফিসার রায় বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের জামাতা আমাদের সহপাঠী শিশির-বন্ধু অনিলকুমার সান্যালের যত্নে, লাহিড়ি মহাশয়ের অনুগ্রহে যথাবশ্যক পুলিশের অনুমতি ঐ সার্টিফিকেটের আধারে পাওয়া গেল। সে সমস্ত খুঁটিনাটি বর্ণনার দরকার এক্ষেত্রে নেই।

শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে এবারও আমি কাঁধ দিলুম। শিশিরকে তার হাতের অবস্থা বুঝে নলিনীদা অঘোরদা বাড়িতে আটকে রাখলেন। শিশিরের মায়ের আকুল কান্না কানে ভেসে আসতে লাগল—'ওরে আমার শিশিরের ঘরের লক্ষ্মী এমনি করে চলে গেল রে।' শ্মশানেও শিশিরের ছোট ভাইয়েদের কান্নাও থামানো যায় না।

কি জন্য অনাশঙ্কিতভাবে এই রকম ঘটনা ঘটে যায়, তার কোনও হদিস আমরা পাই না। একটা কথা শিশিরের কাছে পরে শুনেছিলুম—ঐ পাড়ায় মাসখানেক আগে কি কারণে জানি না আর একটি বউ ঐ ভাবে শাড়ীতে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। শিশিরের বাড়ীতে ঐ ব্যাপার নিয়ে সকলের মধ্যে অনেক রাত পর্যন্ত কদিন ধরে চর্চা হত। শিশিরের স্ত্রীর মনের অবচেতনায় ঐ ব্যাপারটা ঘুরত হয়তো, তার পরে মানসিক দুর্বলতা কোনও মুহূর্তে হঠাৎ এইভাবে অবচেতনা থেকে কার্যক্ষেত্রে তার প্রকাশ হল। পাড়ার মুসলমান প্রতিবেশীর মেয়েদের মধ্যে দুঃখের সঙ্গে বলতে শুনি—'আহা হা, এমন রাণীর মতন বউ, এমন রাজপুত্তুরের মতন বেটা (শিশিরের এই একমাত্র সন্তান বোধ হয় তখন দুই আড়াই বছরের শিশু), তোর ঐ বেটার কথাও একবার মনে হল না, ঐ দিন সকালেও তো তাকে কোলে নিয়ে পিয়ার করছিলি।'

তারপরে প্রায় ২৪।২৫ দিন, শিশিরের হাতের ঐ ভীষণ হাড়-বের-করা পোড়া ঘা একটু না শুকিয়ে আসা পর্যন্ত আমরা দুপুরে ওর বাড়িতে যেতুম। শিশিরের অনুশোচনা—আমাকে উপদেশ—কখনও মেয়েদের ঐভাবে হেনস্থার ভাব দেখাবে না—আর তা ছাড়া অন্য প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক নানা কথা হল। জীবন মৃত্যুর এই রহস্যের মধ্যে আমাদের পরস্পরের মন আর সমানধর্মিতা আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। এই ঘটনা শিশিরকে আমাদের জনকয়েকের কাছে আরও অন্তরঙ্গ আরও আত্মীয় করে তুলেছিল।

চিরজীবন শিশিরের মনে এই দাগ রয়ে গিয়েছিল—শিশিরের মাতৃদেবীর উক্তি—এমনি করে শিশিরের ঘরের লক্ষ্মী চলে গেল—অতি সত্য কথা। উষা দেবী বেঁচে থাকলে শিশিরের জীবনের সম্ভাবনা আর সাফল্য, দুইই অনন্যসাধারণও হলেও, বোধ হয় আরও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারত—কতকগুলি বিষয়ে শিশিরকে 'বাওন্ডুলে' করে তুলত না, তাকে জীবনে reckless বা লা-পরওয়া হবার পথে ঘরের লক্ষ্মী অন্তরায় নিশ্চয়ই হতেন, শিশিরকে আরও পরিপূর্ণ মানুষ করত।

কিন্তু এই গুরুতর দুঃখেও শিশিরকে তার জীবনের ব্রত যা সে গ্রহণ করেছিল তা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। কত ঝড়-ঝাপটা তার উপর দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু শিশির ছিল অটল—তার path of rectitude সততার পথ ছিল তার পক্ষে একেবারে ধরাবাঁধা। শিশিরের চিত্তের প্রসন্নতা চাপা পড়ে নি—তার মানসিক গুণ, তার নিরাবিল পরিহাস-প্রিয়তা, তার সব মানুষের প্রতি দরদ, এ সমস্ত শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান ছিল। তার পরিহাস-প্রিয়তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করবো।

শিশির যখন শিক্ষাগুরুদের আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা নিয়ে নাট্যকার বৃত্তি অবলম্বন করল, তার পূর্বে সে কয়েক বৎসর ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করে বিদ্যাসাগর কলেজে। শিশির এম-এ পরীক্ষায় পাস করে যেন তুড়ি মেরে—রীতিমত পাঠ করার অভ্যাস ছিল না। আমাদের অন্যতম সহপাঠী সুহৃৎ অম্বিকা মল্লিক, যে বহু বৎসর ধানবাদে থেকে ওকালতি করে, শিশিরের এম-এ পরীক্ষার সময়ে তার তত্ত্বাবধারক ছিল—শিশির যে কষ্ট করে পাঠ্য পুস্তকগুলি পড়বে পরীক্ষার তৈরী হবার জন্য সে ধৈর্যও তার ছিল না। তার অভ্যাসমত মোটা বর্মা চুরুট ধরিয়ে সে টানত, অম্বিকা বইগুলি চেঁচিয়ে পড়ত, তাতে শিশিরও বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করত। কিন্তু সাহিত্যবোধ ছিল শিশিরের অসাধারণ, আর কি ইংরেজি আর কি বাঙলা, দুইয়েতেই তার দখলও ছিল লোভনীয়--প্রকাশ-ক্ষমতা অনেক তথাকথিত 'ভাল ছেলে'রও ছিল না। এইজন্য সে সহজেই এম-এ পাস করে, দ্বিতীয় বিভাগে। অধ্যাপকের পদও সে পায়। কিন্তু সব সময়ে ঘরে পড়াশুনা করবার আগ্রহ বা ইচ্ছা তার হত না। অমনি সাধারণ সাহিত্য-জ্ঞানের উপর দিয়েই ক্লাসে কাজ চালাত—আর চালাত সুন্দরভাবে। ইংরেজি কবিতার নাটকের পাঠেই যেন তার ব্যাখ্যা হয়ে যেত। কিন্তু এ সত্ত্বেও, মাঝে মাঝে তার একটু-আধটু বিপদও ঘটত। যথাসম্ভব শিশিরের মুখের কথাতেই তার অধ্যাপক জীবনের একটি মজার ঘটনা বলি।—'ওরে, কাল বড় বিপদে পড়েছিলুম। কিন্তু গুরু বলে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলুম। জানিস তো, বইটই অভিধান ঘেঁটে পাঠ তৈরী করে যাওয়া আর ধাতে সয় না—উপস্থিত যা মনে হয়, তাই সাজিয়ে গুছিয়ে নাটকানা ভঙ্গীতে বলি, ছেলেরা ভালবাসে, তাতেই খুশী হয়—এইতে আমার রক্ষে। এখন হয়েছে কি, কাল আমি থার্ড ইয়ার ক্লাসে মিলটনের Paradise Reained পড়াচ্ছি। কবে ছাত্রাবস্থায় প্রাচীনকালে একবার ভাসা-ভাসারূপে এই নীরস কাব্য পড়েছিলুম, সব কিছু মনে নেই। পড়াতে পড়াতে দেখি, তিন চার লাইন নীচে একটা শক্ত শব্দ রয়েছে. তার মানেটা মনে আসছে না। context থেকেও আঁচ করতে পারছি না। কি করি? মনে করলুম ঐখানেই ঐ দিনের মত ইতি করি, ক্লাসের ছুটি দিয়ে দিই। তখনও আধ ঘণ্টা বাকী আছে, এত আগে ভাগে ছেড়ে দিলে ভাল দেখাবে না—বিশেষতঃ যখন আগের কর্মদিন বাজে গল্প করেই কাটিয়েছি। কপাল ঠুকে তো ভাবের সঙ্গে সেই অংশটার 'রীডিং' পড়ে যেতে লাগলুম, মানে-না-জানা কথাটা অমনি আলটপকা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে চললুম। সঙ্গে সঙ্গে, যেমন আশঙ্কা করেছিলুম, ক্লাসের গ্যালারির এক কোণ থেকে একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে,

what is the meaning of this word, sir? মনে হল, বুঝি মাথায় ডাণ্ডা মারলে—সঙ্গে সঙ্গেই যে ব্যাখ্যা চাই। এখন যদি হঠাৎ ভূমিকম্প হয়, কিংবা কোনও ছাত্র যদি ভিরমি যায়, বা চেয়ার-সুদ্ধ প্লাটফর্ম-সুদ্ধ মা যদি আমায় গ্রাস করে, তাহলে যেন বেঁচে যাই। তা তো হবে না—একটু ভাববার জন্য সময় নিলুম--চশমাখানা চোখ থেকে খুলে রুমাল বার করে খুব ভাল করে কষে ২।৩ মিনিট ধরে পরিষ্কার করলুম, তারপরে রুমাল দিয়ে মুখখানা ভাল করে মুছে যেন মুখের চেকনাই করলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটা brain-wave এল—একটা উত্তর জুটে গেল। চশমা পুঁছে মুখ মুছে, চেহারাটা যেন বাগিয়ে ধরে, ছাত্রটির দিকে তাকিয়ে ইশারায় তাকে দাঁড়াতে বললুম—তারপরে তাকে বললুম,

you there, my friend : now take a good look at me. Do I look like a dictionary?

শুনে ছেলেটা তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়, আর সারা ক্লাস হো হো হেসে উঠল—যেন ছেলেটাই কিছু বেকুফি করেছে। তখন গম্ভীরভাবে ছেলেদের, বিশেষ করে ঐ ছেলেটিকে উপদেশ দিলুম—আজকালকার ছেলেরা নিজে খাটবে না, অভিধানে তাদের ভয়, তারা চায় অধ্যাপক সব জিনিস তাদের গিলিয়ে দেবে। এ চলবে না। তারপরে সেই ছেলেটিকে বললুম—

Look here, you must find out from the Dictionary what is the meaning of the word, and then tomorrow you must tell me and the class what the word means. See?

ছেলেটি Yes sir, বলে তো নিষ্কৃতি পেলে—আমিও নিষ্কৃতি পেলুম, পূর্ববৎ আমার এই [illegible] চলতে লাগল।' আমি শুনে বললুম, '[illegible] adding insult to injury, এতটা ধর্মে সইবে না, বেচারি তোমার কাছ থেকে জানতে এসেছে শিখতে এসেছে তো, তার উপরে এই ভার দেওয়া।' তখন শিশির বললে—'আরে ভাই, আমি যে ঠিক মনে করে কালকের ক্লাসের জন্য ডিকশনারি দেখে ঐ শব্দটির সম্বন্ধে যে ওয়াকিফহাল হয়ে আসবো, তারই বা কি স্থিরতা আছে' ?

এই রকম উপস্থিত বুদ্ধি ছিল শিশিরের—আর তার বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতাও উপরন্তু ছিল খুব উঁচুদরের, সেইজন্য ছেলেরা তাকে বড়ই শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। আমাদের স্কটিশ-চার্চেস কলেজের বিখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার আমাদের এক সতীর্থকে বলেছিলেন, (সে যখন তাঁর কাছে গিয়ে জানতে চাইলে successful professor হতে গেলে কি কি গুণ থাকা চাই)—"দেখ বাবা, তান্ত্রিকদের পঞ্চ-মকার জানো তো? শিখদের পঞ্চ-ককার জানো তো? তেমনি শিক্ষা-ব্যবসায়ে নাম করতে গেলে পঞ্চ-বকারের সাধনা করতে হয়—সেই পঞ্চ-বকার হচ্ছে, in order of their importance —বচন, বপু, বুদ্ধি, বিনয়, বিদ্যা। খুব বক্তার হলে, মুখে দিয়ে যদি খই ফোটে, তাহলে "মুখেন মারিতং জগৎ"—কথায় ছেলেদের বশে আনতে পারবে। তারপর চেহারাখানিও দশাসই হওয়া দরকার—চার ফুট আট ইঞ্চি সাইজের প্রফেসর পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি সাইজের ছাত্রকে কব্জা করতে পারবে না। তারপরে চাই বুদ্ধি—ঝানু ছেলে, বার বার ফেল করা পাকা পোড়খাওয়া পাজী ছেলেদেরও বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে, কৌশলে তাদের হাত করতে হয়। তারপরে বিনয় তো আছেই—বাবা, যা প্রাণ চায় করো, তবে আইনের মাত্রা লঙ্ঘন করে, ছা-পোষা মাস্টার, আমার বদনাম করো না। আর শেষ দরকার—বিদ্যা। এটার আধিক্য successful professor হতে গেলে ততটা দরকার নেই।' এই উপদেশ অনেকেই মেনে নেবেন। কিন্তু শিশিরের এই উপদেশের দরকার ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই তার বচন, বপু, বুদ্ধি, বিনয়, বিদ্যা সমস্তই ছিল, সে-সবের প্রয়োগও তার স্বাভাবসিদ্ধ। এটা শিশিরের ব্যক্তিত্বের যেন স্বরূপই ছিল।

এই ছিল আমাদের শিশির। কতকগুলি দুরপনেয় বাধা না পেলে, সে বাংলাদেশের ভারতবর্ষের তথা সমগ্র জগতের সংবুদ্ধি আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরও কত বড় হতে পারত তার যথার্থ কল্পনা করে লাভ নেই। সে যা ছিল তাইতেই বাঙালীর আর ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক জীবনে সে অমর হয়ে থাকবে।

রাধা ফিল্মসের বেশ কয়েকটি ছবিতে জহর গাঙ্গুলির বিপরীতে নায়িকারূপে অভিনয় করেছিলাম। তবু, এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এর কথা মনে পড়ে। কারণ বোধহয় এ ছবির পরই রাতারাতি আমাদের উভয়েরই বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মান। অন্যভাবে বলা যায় আমাদের আসন চিত্ররসিকের দরবারে কায়েমী হয় এ ছবিরই মাধ্যমে।

এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে ১৯৩৫ সালের ১৩ মে কর্ণওয়ালিশ টকিতে (এখনকার শ্রী) এ ছবি রিলিজ হয়েছিল। কর্মজীবনে সার্থকতার প্রথম সোপানরূপে যে ছবিকে আণ্ডারলাইন করা যায় সে ছবির 'হিরো' বা সাথীশিল্পীর একটি বিশেষ মূল্য সকল শিল্পীর কাছে থাকাটাই স্বাভাবিক। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। মেয়েদের মন একটু বেশী মাত্রায় ভাবপ্রবণ বলেই হয়ত 'মানময়ী গার্লস স্কুল' সম্বন্ধে আবেগ, আমার চাপা স্বভাব সত্ত্বেও, মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ত। আমার এ দুর্বলতা স্টুডিওতে সমসাময়িক সকল শিল্পী ও কর্মীর হাসি-কৌতুকের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছিলো। সে সময়েই দেখেছি স্বাভাবিক কৌতুকপ্রবণতাবশতঃ জহরবাবু মুখে হয়ত সেইসব হাসিঠাট্টায় যোগ দিয়েছেন, কিন্তু যে মুহূর্তে অল্পবয়সী মনের স্পর্শকাতরতা বা যে কারণেই হোক আমার চোখ অজ্ঞাতে ছলছলিয়ে উঠেছে অমনি জহরবাবু অন্য-মানুষ। 'যাঃ, ছেলেমানুষের পেছনে বড় লাগিস। ও ছবি সম্বন্ধে আমার দুর্বলতাই কি কিছু কম রে। ওরে বাব্বঃ, প্রথম যুগের সাকসেসফুল পিকচার। সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মী।' বলে দুহাত জোড় করে যখন কপালে ঠেকাতেন তখন তাঁর সেই গদগদ ভাবতন্ময়তার মধ্যে এমন একটা আন্তরিক দৃঢ়তা ফুটে উঠত যে, সকলেই হাসিকৌতুক ভুলে সিরিয়াস হয়ে উঠতেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশও পাল্টে যেত। এই রকম হাসির সুরে গভীর কথা বলতে পারা বা কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অন্যদিকটির সম্বন্ধেও সচেতন থাকাটাই যেন জহরবাবুর জীবনসংগীতের মূল সুর ছিলো। এই কারণেই হয়ত উত্তরকালে তিনি এই ধরণের অভিনয়-কুশলতায় পাকা কারিগর হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

অ্যালবামের প্রথমদিকের পাতা উল্টে যাবার মত জহরবাবুকে জড়িয়ে আজ কত ছবিই না মনে ভেসে উঠছে। কোনোটি স্পষ্ট, কোনোটি ঝাপসা।

সেসব দিনের অপরিণত মনের এলোমেলো স্মৃতির আলোছায়ার কাহিনী গুছিয়ে বলা বড় শক্ত। তবু সব মিলিয়ে জহরবাবুর আনন্দময় ব্যক্তিত্ব বুঝি ভোলার নয়।

বোধহয় 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এর আগেই হবে। জ্যোতিষবাবুরই পরিচালনায় 'কণ্ঠহার' নামে এক অপরাধমূলক রহস্যচিত্রে আমি ও জহরবাবু নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করি। আগেই বলেছি বয়স তখন অল্প, সবকথা ভাল করে মনে পড়ে না। কিন্তু দুটি সিনের কথা কেন জানি না ভুলতে পারি না। জহরবাবুর (নায়কের নাম মনে নেই) বন্ধু গৌরীকান্ত মদ্যপ এবং আনুষঙ্গিক দোষে অভ্যস্ত। ছিলেন গৌরীকান্ত (অভিনয়ে ছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য) নববিবাহিত বন্ধুকে নিজের পথে টানতে গিয়ে তাদের মধুর দাম্পত্যজীবনে অশান্তির ঝড় তোলে। মনে আছে বিয়ের কদিন পরে কোনো এক সন্ধ্যায় গৌরীকান্ত 'পুরুষমানুষের কি সবসময় ঘরের কোণে বসে থাকা? চল একটু বেড়িয়ে আসি।' বলে বন্ধুকে জোর ক'রে বাইরে নিয়ে আসবে। সে সময় বাইরে যাবার প্রবল অনিচ্ছা। অথচ সে অনিচ্ছা প্রকাশে পুরুষোচিত সংকোচভাবে দোলায়মান নায়ক, আর ঘোমটার আড়ালে নায়িকার ভ্রূকুটির নিষেধ—এই ছিল আমাদের এক্সপ্রেশনের বিষয়।

'যাচ্ছি, যাচ্ছি। আঃ ছাড় না'—বলে জহরবাবুর বারবার করুণ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে তাকানোর উত্তরে আমার ঘোমটা ধরে সজল নয়নে চেয়ে থাকার কথা। কিন্তু অমন লম্বা-চওড়া মানুষটার এহেন নাজেহাল অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে আমার প্রায় গড়িয়ে পড়ার অবস্থা হোত। আমার হাসি দেখে জহরবাবু, ধীরাজবাবু সবাই হেসে গড়াতেন। বার বার শট নষ্ট হওয়ার জন্য জ্যোতিষবাবুর কাছে বকুনী খেয়ে শেষটায় সত্যিই কেঁদে ফেললাম। 'বাস বাস, এইবার ঠিক হবে। না কাঁদলে কখনও কোনো ভাল কাজ হয়?'

জহরবাবুর কথার মানে সেদিন বুঝিনি। তবু চমকে উঠেছিলাম। আজ বুঝেছি। কিন্তু এই কথা ভেবে আশ্চর্য না হয়ে পারছি না। অমন চিন্তার কথা অত সহজে কেমন করে বলতে পেরেছিলেন? তাঁর সহজাত অন্তর্মুখীনতার প্রসাদেই নয় কি?

...অনেক পরে আমার প্রডাকশনে কাজ করবার সময় তাঁর আন্তরিক সরল ব্যবহার যে আমায় কত প্রেরণা দিয়েছে বলতে পারি না। ঠিক সময়ে সেটে আসা, কাজ করা, অভিনয় ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর পরমাত্মীয়ের মত সহায়তা ভোলার নয়। মনে আছে একদিন সামান্য অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সেটে এসেছিলেন বলে আমি রাগ করে বলেছিলাম, 'শরীর খারাপ নিয়ে সেটে আসার কি দরকার ছিলো? একটা ফোন করে দিলেই ত হোতো। সবেতেই আপনার বাড়াবাড়ি।

'সে কি হয়? এ ত শুধু তোমার আমার ব্যাপার নয়। অনেককে নিয়ে কাজ। একজন না এলে টিমওয়ার্ক সাফার করে। শিল্পী হয়ে সেটা কি করে বরদাস্ত করি বল।' জহরবাবুর কথার জবাব দিতে পারিনি। আমার প্রডাকশনেরই 'নববিধান' -এর স্যুটিং চলার সময় জহরবাবু তিন-চার দিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগার পর সুস্থ হয়ে যেদিন কাজে এলেন আমি ওকে স্টুডিওর খাবার না দিয়ে বাড়ী থেকে ওঁর জন্য তৈরী করে নিয়ে যাওয়া স্টু প্লেটে ঢেলে একটা চামচ দিয়ে ওঁর হাতে দিতেই বললেন, 'এটা কি? ওরে বাব্বাঃ! আমি বাঙালী মানুষ। এসব স্টু ফু কি আমার পোষায়? যাক এনেছ যখন দাও' বলেই চামচটা ফেলে দিয়ে এক

ছুমুকে যাকে বলে একরকম গলায় ঢেলেই হাঁক দিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'ওহে, এবার একটা কলাপাতা পেতে যা রান্না হয়েছে এনে দাও। হাঁটু অবধি কাপড় তুলে বাবু হয়ে বসে হাপুস-হুপুস করে কলা-পাতায় গড়ানো ঝোল দিয়ে ভাত না খেলে কি আমাদের পেট ভরে?' লোকেনুপে মেশানো এই নির্ভেজাল বাঙালীত্বকে তিনি আজীবন আঁকড়ে থেকেছেন। জহর গাঙ্গুলীকে যদি ভোলা যায়, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জনপ্রিয় 'সুলোকদা'কে ভোলা সম্ভব কি?

জীবনকে পরিপূর্ণভাবে জানবার তাগিদেই কোন যুগে যাত্রায় যোগ দিয়ে নাটক ও মঞ্চের পথ বেয়ে তিনি সিনেমায় এসে পৌঁছলেন জানি না। প্রয়োজনের চেয়ে শখটাই বোধহয় তাঁর কাছে বড় ছিল। জহরবাবুর ব্যাপক পরিচিতি সিনেমার মাধ্যমেই। কিন্তু শিল্পচর্চা তাঁর কাছে টবের শৌখীন ফুল ছিলো না। জীবনের মাটির সংগে যোগ ছিল বলেই তাঁর সকল অভিনয়ই মনকে এমন করে স্পর্শ করে। জহরবাবুকে দেখে বার বার একথা মনে হয়েছে।

তিনি সুন্দর ছিলেন কি ছিলেন না, এ প্রশ্ন কখনও মনে জাগেনি। এখনকার মত তখন ত এত শুক্রবারের পাতা, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ফিল্ম-জার্নাল ছিলো না। আজ শিল্পের ব্যাপক প্রচারের যুগ। এখন সকল রকম প্রতিভাকে নানা ভাবে ও বিন্যাসে ফুলের তোড়ার মত সাজিয়ে সাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। ছোট-বড় সকল শিল্পীকেই সকলের লক্ষ্যগোচর করাই



বনফুল/পরিচালনা : বিজয় ভাট/ববিতা ফটো : অমৃত

এ'দের কাজ। করেনও। কিন্তু তখন যে গাছের ফুল সেই গাছেই ফুটত, শুকোতো, ঝরত। এমন যুগের শিল্পী হয়েও জহরবাবু আপন ব্যক্তিত্বে, সরসতায়, সংবেদনশীল অন্তরের দাক্ষিণ্যে সকলকে কাছে টানতে পেরেছেন, জীবনবোধের সহজ আলোয় অভিনীত চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর সম্বন্ধে এইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

শিল্পীজীবনের সুদীর্ঘ তিনটি যুগের অজস্র দানে জহরবাবু চিত্রজগতকে ভরে দিয়েছেন। প্রথম যুগের মঞ্চঘেঁষা সিনেমা, দ্বিতীয় যুগে সিনেমার আরো আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাবার প্রবণতা এবং বর্তমান যুগের প্রগতিশীল ন্যাচারালিটি—এই প্রতিটি অধ্যায়,—পরিবর্তনের তালে তালে তিনি আশ্চর্য সুন্দরভাবে নিজেকে শুধু খাপ খাইয়েই দেননি—কাহিনী ও চরিত্রের অপরিহার্য অংগ হয়ে উঠেছেন তাঁর খোলামেলা গ্রহণশীল মনের শক্তিতে এবং সেটা জোর করে মানিয়ে নেওয়া নয়, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে জীবনে জীবনযোগ করা। একথা ভুললে চলবে না।

জহরবাবুর অন্তর্ধান নিঃসন্দেহ অভিনয় জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

কিন্তু তার চেয়েও ক্ষতিকর সমসাময়িক যুগের মতো প্রাণের এক উদার মানুষের সংগে [illegible] অনেকখানি সংগদ [illegible] সেখা হয়ত বা মিলবে, কিন্তু [illegible] ও শিল্পবোধ মেশানো সোবেদনে ভরা এমন এক নিটোল হৃদয়ের স্পর্শ এই আবেগকৃপণ হিসেবী জগতে কি আর বেশী পাওয়া যাবে?

এরপর নিউ থিয়েটার্সের নানা-রঙা উজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল কি মে মাসে মনে নেই রাধা ফিল্মস ছেড়ে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেবার সংবাদ ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও রাধা ফিল্মস ছেড়ে আসতে দেরী হয়েছিল। মনে পড়ে 'দেবদাস' ছবি সুরু করার আগে প্রমথেশ বড়ুয়া আমায় পার্বতীর রোল দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাধা ফিল্মসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলাম বলে, সেই দুর্লভ সুযোগ যখন হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হোল, নির্মম নিয়তির পায়ে যেন মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করছিলো। নিউ থিয়েটার্স তখন সবচেয়ে অভিজাত প্রতিষ্ঠান। আর মিঃ বড়ুয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে রূপকথার নায়কতুল্য। তাঁর সংগে এবং তাঁরই পরিচালনায় কাজ করাটা যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই তখন হাতে চাঁদ পাওয়ার সামিল। তার ওপর শরৎবাবুর বই। এমন দুর্লভ যোগাযোগ জীবনে কি আসে? কিন্তু আমি বিনা আয়াসে এমন লোভনীয় আহ্বান পেয়েও সাড়া দিতে পারলাম না,—এর পিছনে কোনো কুটিল গ্রহের চক্রান্ত ছিল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এ বাধা যে সত্যিকারের বাধা নয়, রাধা ফিল্মসের কর্তৃপক্ষের অছিলা এবং নিজেদের স্বার্থে অভিভাবকহীনা অনভিজ্ঞা অসহায়ার প্রতি উৎপীড়ন একথা জেনেছি অনেক পরে।

গভীর আক্ষেপ ও হতাশায় যখন মন ভরে এল তখন হঠাৎই একদিন মা আমার দীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করলেন। এই প্রসংগেই বলি একটি অনুভূতি যেন গানের কলির মতই বার বার আমার জীবনে ঘুরে ফিরে এসেছিল। মানুষ যখন একেবারেই অবলম্বনহীন, নিঃসহায় হয়ে পড়ে, অন্ধকারে পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয়ী হয়, ঠিক তখনই যেন কোন অপ্রত্যাশিত পথ বেয়ে স্নিগ্ধ আশ্বাস ঝর্ণার মত নেমে রুক্ষ জীবনকে সরস করে তোলে। আর তখনই উপলব্ধি করি তাঁর বরাভয় 'আমি আছি।'—তাই মাঝে মাঝে মনে হয় পথ হারানোটা বুঝি পথ খুঁজে পাওয়ারই রূপান্তর।

দীক্ষা নেবার দিনটি আজো মনে পড়ে। কোনো বিরাট দর্শন অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধি করবার মত বয়স অথবা মনের পরিণতি কোনোটাতেই তখন পৌঁছইনি। কিন্তু কানে কানে গুরু যখন ইষ্টনামটি বলে দিলেন কেমন এক অপার্থিব আনন্দের শিহরণে সারা দেহমন যেন কেঁপে উঠল। মনে হোল সারা পৃথিবী যেন আলোয় হেসে উঠেছে। কোথাও এতটুকু মালিন্য নেই। আমি যেন এতদিনের আমির চেয়ে আলাদা, আমার অসাধ্য কিছু নেই। তখন যাকে দেখছি,—যা দেখছি সবই যেন একটা নিটোল আনন্দের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠছে। এরই মধ্যে গুরুদেব ভাগবত পাঠ সুরু করলেন। সংস্কৃত শ্লোক পড়ে পড়ে উনি বাংলায় তর্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সবটা মনে নেই। কিন্তু যে শ্লোক জীবন্ত শক্তির মত মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো সেটি হোল—'পর্যায় যোগাম্বিহিতং বিধাত্রা কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ—যার অর্থ হোল বিধাতা সবই পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে রেখেছেন। যথাসময়ে মানুষ তা পাবে। ঐ একটি কথাই যেন অনেক আশা অনেক সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিতে সকল ক্ষোভ মুছিয়ে দিল।

সেদিন থেকেই এই ধরাবাঁধা জীবনের গতি যেন পাল্টে গেল। মনে হোল এই ধুলোর পৃথিবীতেও এমন রূপ আছে যাকে চিনতে না চিনতে মন মেনে নেয়, এমন ডাক আছে যা শুনতে না শুনতে প্রাণ সায় দেয়, এমন আলো আছে যা দেখতে না দেখতে মন বলে 'পেয়েছি।'

এ মুহূর্ত দুর্লভ। জীবনে এক আধবারই আসে, কিন্তু আসে যখন—জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে গোটা দৃষ্টিভঙ্গিটাকে যেন বদলে দিয়ে যায়। যে অনুভূতির বীজ সেদিন মনে উপ্ত হোলো পরে তাই বনস্পতি হয়ে ওঠে। কিন্তু সেকথা পরে বলব, যথাস্থানে। এখন যা বলছিলাম।

এরপরই হোল নিউ থিয়েটার্সের যুগ। যেদিন প্রথম নিউ থিয়েটার্সের ফ্লোরে যাই সে রোমাঞ্চকর অনুভূতির কাঁপন ভোলার নয়। কতদিনের কতরাতের স্বপ্ন দিয়ে-গড়া নিউ থিয়েটার্স হাতীমার্কা ব্যানার। এই রাজকীয় পতাকাবাহীদের মধ্যে স্থান পাওয়া,—এ সৌভাগ্য ভাবা যায়? কিন্তু প্রথম দিন যতখানি উৎসাহ নিয়ে গেলাম, ঠিক ততখানিই নিরানন্দ নিয়ে ফিরে আসতে হোল।

এও এক অভিজ্ঞতা। দুপুর থেকে স্টুডিওতে গিয়ে বসে আছি ত আছিই। কেউ কথাও বলে না, বার্তাও না। আর

সকলের সে কি গর্বিত চালচলন। যেন মাটিতে পা-ই পড়ে না। সবসময় যেন গোঁফে তা দেওয়া ভাব। বেয়ারা থেকে সুরু করে হোমরাচোমরা অবধি সকলের। আমরা কি যে সে লোক? এন টি ব্যানারে কাজ করি। এই ভাবেই ডগমগ। দিন গড়িয়ে বিকেল এল। বিকেলের পর সন্ধ্যা। হঠাৎ যেন 'সাজ সাজ' রব উঠল। 'কি ব্যাপার?' না, 'সাহেব আসছেন'। 'সাহেব?,—অবাক হয়ে তাকাতেই এক বেয়ারা আমার অজ্ঞতা দেখে কৃপা পরবশ হয়ে এগিয়ে এসে চুপিচুপি বলল 'সাহেব হলেন বি এন সরকার—নিউ থিয়েটার্সের ভগবান, এটা জেনে রাখুন।' বলেই শশব্যস্ত কোমরের বেল্ট, মাথার ক্যাপ ঠিক করে মুখে বৈষ্ণবী বিনয়ের গদগদভাব ফুটিয়ে সাহেবের গাড়ীর দিকে ছুটল। অন্যান্য সবাইও সাহেবের সম্মুখীন হবার আগে ঠিক ফার্নিচার ঝাড়ার মতই নিজেদের যথাসম্ভব ঝাড়পোঁছ করে নিলেন। স্যুট পরিহিতরা টাই-এর নটটা একটু টাইট করে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিলেন। কেউ বা সার্টের কলারটা একটু সোজা করে নিলেন। আবার ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিতরা পাঞ্জাবির হাতের ভাজ টান টান করে, কোঁচাটা ধরে ঠিক খেলার মাঠে দৌড়োনোর প্রতিযোগিতায় নামার মত তীরবেগে ধাবিত হলেন বি এন সরকারের গাড়ীর দিকে। তারপরের প্রতিযোগিতা হোলো কে সবচেয়ে আগে স্যারের চোখে পড়তে পারেন এবং কার অভিবাদনে আনুগত্যের প্রকাশ স্যারের কতটা বেশী প্রসন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে? সারাদিন বসে থাকার বিরক্তি ও ক্লান্তির বাধা ঠেলেও মনটা যেন মুহূর্তের জন্য কৌতুকে নেচে উঠল। নিজের অজ্ঞাতে কখন উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে এগোতে সুরু করেছি বুঝতেই পারিনি। হঠাৎই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঠিক তামাশা দেখার মতই উপভোগ করলাম অবস্থা বিশেষে বয়স্ক মানুষও কেমন ছেলেমানুষের মত হয়ে যায়। এন টির পদস্থ ব্যক্তিরা পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় পাঁচজনে মিলে স্যারের গাড়ীর দরজা খুললেন। স্যার গাড়ী থেকে মাটিতে পা দেবার সংগে সংগে দু পাশের অনুগতের দল তাঁর সংগে হাঁটতে সুরু করেন। তার আগে অবশ্য দুহাত জোড় করে প্রায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার করা হয়ে গেছে। আমি তাঁরই প্রোডাকশনের একজন শিল্পী, সেইদিনই প্রথম কাজে যোগ দিয়েছি, সারাদিন বসে আছি। অথচ আমার সংগে তাঁর পরিচয় করানোরও একটা প্রয়োজন আছে একথা কারো চিন্তাতেও স্থান পেয়েছে বলে মনে হোলো না। যে যাঁর নিজের ভাবনাতেই বিভোর। আমার মত সামান্য মানুষের দিকে তাকাবার তাঁদের সময় কই? আমি 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েই বুঝতে পারলাম তাঁর সংগে পরিচিত হবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকাটা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। গরজ করে একাজ সম্পন্ন করার মত কোনো মধ্যস্থ ব্যক্তি এতবড় প্রতিষ্ঠানেও নেই, এ অভিজ্ঞতা যেমন বিস্ময়ের তেমনই বেদনার। যাই হোক দূরে থেকে দুহাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে অন্য ঘরে চলে এলাম। সে নমস্কার সহস্র ভক্তের ভীড়ের আড়াল অতিক্রম করে স্যার বি এন সরকারের চোখে পড়েছিলো কিনা জানি না। কিন্তু তাঁরই প্রতিষ্ঠানের শিল্পী হয়ে যখন সেই-দিনই প্রথম প্রবেশ করলাম এ কর্তব্য না করলে সে অ-সৌজন্য নিজেকেই পীড়া দিত। যাই হোক আরো ঘন্টা দুয়েক বসে মিঃ পি এন রায়কে 'আমি এখন যেতে পারি?'—বলতেই খুব অবাক হয়ে তিনি বললেন 'সে কি। আপনি এখনও বসে?'—মনটা খুবই দমে গেল।

এই প্রসংগে একটা কথা জানানো দরকার। আমার নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেবার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনার কাহিনীর মধ্যে যেন স্যার বি এন সরকারের প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ বা শ্লেষ আছে ভেবে নিয়ে আমার প্রতি অবিচার না করেন। কারণ এখানে আমার আলোচ্য তাঁর পারিপার্শ্বিক, তিনি নন।

একথাও সবিনয়ে জানাচ্ছি বি এন সরকার প্রথম দর্শনেই আমার মনে গভীর শ্রদ্ধার ছাপ ফেলেছিলেন। নামে সাহেব, চেহারাতেও সাহেব। স্বল্পভাষী, গম্ভীর মানুষটির আভিজাত্য ও সম্ভ্রমবোধ চোখে না পড়ে পারে? চারপাশের মানুষের এই কৌতুকপ্রদ চাটুকারিতা তাঁর মনকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করতে পেরেছে বলে মনে হোলো না। এক অনায়াসলব্ধ স্বাতন্ত্র্যের রাজ্যেই যেন তিনি রাজকীয় মর্যাদার আসীন। কাজের অতিরিক্ত একটি অনাবশ্যক কথাও তাঁর মুখ থেকে শোনা যেত না।

তাঁর সংগে সরাসরি কোনো কথা বলার সুযোগ আমাদের ছিলো না, কারণ আমাদের অভাব-অভিযোগ ও বক্তব্য অন্যের মাধ্যমে তাঁর কাছে পৌঁছে দেবারই রেওয়াজ ছিলো। সকল কথা তাঁর কানে পৌঁছত কিনা তাও জানি না। তবে যে প্রার্থনা পৌঁছত তা মঞ্জুর হতে দেরী হোতো না। এই 'অমৃত'রই এক পুজোসংখ্যার লেখায় পড়েছি—সরকার সাহেব বলেছেন আমরা তাঁকে কর্মক্ষেত্রে নিতাম না বলেই আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা ও বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো ধারণা গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের (বিশেষ করে আমার কথাই বলতে পারি) ক্ষোভের সীমা নেই এই কারণে যে, তাঁর মত এক মহান ব্যক্তিত্বের আওতার মধ্যে এসেও তাঁর কাছাকাছি যাবার অথবা তাঁর সংগে কথা বলবার সুযোগ বিশেষ পাইনি। কাজেই এই আক্ষেপ বা অভিযোগ আমাদের দিক থেকে হওয়াটাই স্বাভাবিক কেন মিঃ সরকার তাঁর প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের তাঁরই সংগে সোজাসুজি দেখা করবার, আলোচনা করবার অথবা প্রয়োজনের কথা বলবার প্রথা চালু রেখে তাঁর সংগে সহজ সম্পর্ক স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে দেননি? পরে যখন যতবার তাঁর কাছে গিয়ে একটু-আধটু কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, ততবারই তাঁর সহানুভূতিশীল, উদার হৃদয়ের স্নেহস্পর্শ—তাঁর প্রতি মনকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে তুলেছে আর অতৃপ্ত ক্ষোভের সংগে বারবারই মনে হয়েছে 'এ সুযোগ কেন আগে পেলাম না? তাহলে ত কত সহজভাবে, কত স্বাচ্ছন্দ্যে মনের আনন্দে কাজ করতে পারতাম। যে কৃত্রিম আড়ষ্টতার আড়াল আমাদের ও তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল—তার কোনো প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল কিনা সে প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পাইনি। কিন্তু এই নীরব মানুষটি যে শিল্প ও শিল্পীর অকৃত্রিম পূজারী এবং ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতিকে ইনি একাই একশ বছর এগিয়ে দিয়েছেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সুরকার, গীতিকার, পরিচালকদের তাঁর পতাকাতলে একত্র করে এ বিষয়ের সন্দেহের অবকাশ নেই। এ অবদানের কাছে বাঙালী মাত্রেই ঋণী। জগতের রসিক দরবারে আজ ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই সম্মান ও স্বীকৃতি হয়ত স্বপ্নই থেকে যেত যদি না বি এন সরকারের মত মানুষ এই কাজে এগিয়ে এসে আনুকূল্যের হাল ধরতেন। যে যুগে সমাজের উঁচুমহল সিনেমা থিয়েটারকে হীন চোখে দেখতেন ঠিক সেই যুগেই এক অভিজাত পরিবারের সন্তানের তাঁর যথা-নির্দিষ্ট কৃতিত্বের কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে তথাকথিত উপহাস্য বাণিজ্যের (চলচ্চিত্র তখনও শিল্পের মর্যাদা পায়নি) উন্নতি-কল্পে আত্মনিয়োগ করাটা কতখানি বুকের পাটা থাকলে তবে সম্ভব হয় সে কথা আজ কল্পনাও করা যায় না। তাই এই সুযোগে প্রণাম জানাই এই দৃঢ়চিত্ত কর্ম-সফল মানুষটিকে, আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পীদের আজকের দিনের এই সম্মান গৌরব প্রাপ্তির মূলে যাঁর অকৃপণ সহায়তা অন্তঃপ্রবাহী প্রাণরসের মতই প্রবাহিত ছিল।

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন

(বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলেও এখানে প্রাসংগিক বলেই উল্লিখিত হয়েছে)

—কানন দেবী

# চটি

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

সারাজীবন বিপদগ্রস্ত হতে হতে শেষে যে বিপদ আসে তা হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস। বিপদের শুরু হয় মাসখানেক আগে, নির্মলের এবারের নতুন চটিজোড়া নিয়ে। কিন্তু নির্মলের চটি বললে মোটে ঠিক বলা হয় না। সম্পূর্ণ ভুল বলা হয়ে যায়।

সেই ছোটবেলায় যা নটিবয়, তারপর থেকে এক জোড়া চটি ছাড়া জুতো বলতে নির্মলের কোনো-কালেই কিছুই নেই। বিবাহের সময় একজোড়া পাম্প-শু পেয়েছিল বটে, সেটা বছর চারেক হতে চলল বিয়ের জোড় কি জামাইবাবুর সঙ্গে জয়পুরে তোলা মল্লিনার বালিকা বয়সের ছবিটার সঙ্গে হয়ত তোরঙ্গ বা আলমারির কোণায় পড়েই আছে। নতুন চাকরিটার ইন্টারভিউ-এর দিন শালার শু পরে গিয়েছিল ঠিকই, সওদাগরী অফিস, নইলে নাকি কাজটাই পেত না। তারপর থেকে চটিতেই তো দিব্যি চলে যাচ্ছে।

চটি ছাড়া সে কিছু পরে না, সে কখনো চটিতে হাফসোল লাগায় না। কাজে কাজেই, বুরুশ-পালিশ এ-সবের বালাই তাদের বাড়িতে নেই। মলিনাও চটি বা ঐ-জাতের জিনিশ কেনে। চটি ছিঁড়ে কি অকেজো হয়ে গেলে সে সটান চলে আসে কলেজ স্ট্রীটে। নিউ মার্কেটেও যায়, সে তো অফিসের লাগোয়া। সে বরাবর বাড়ি ফেরে নতুন চটি প'রে, পুরোনো চটি দোকানে দিয়ে দেয় ভালোই, নতুবা, নতুন বাক্সসহ কাছাকাছি মুচিকে নির্মল তা দান করে। ডাস্টবিনেও ফেলে দেয়। দোকানের পর দোকান ঘুরে বেছে নির্বাচন করেই ও বহুসময় ধরে সে চটি কেনে, টেকসই দেখে তো বটেই, প্রায়ই বছর কাবার হবার আগে চটি বদলের তার প্রয়োজন হয় না। সব সময় একদিনের চেষ্টাতে চটি কেনা যায় নাকি? সেক্ষেত্রে, ছেঁড়া চটি পরেই সে কোনোমতে ক'দিন চালায়, ফুটপাতে মুচিকে দিয়ে একটু সেলাই-ফোড়াই করিয়ে নেয় কখনো-বা, পুরোপুরি মনোমত না-পাওয়া পর্যন্ত চটি কেনা থেকে তবু সে বিরত থাকে। বাস্তবিক, একটি চটি মানে কি শুধু তার দীর্ঘায়ু নাকি? আরো নানান দিক আছে, যেমন, সেটা স্টাইলিশ তো হবে—যার মানে কিনা বেশ আধুনিক বা সমকালীন হবে—অথচ এমনটি হওয়া চাই যেন চোখে না পড়ে, যেন পথচারী শতসহস্র চটির ভিড়ে তা মিশে থাকার যোগ্য হয়। মোট কথা, তার একটা ইউনিকনেস থাকা দরকার। সাবালক হবার পর থেকে চটি থেকে চটি সে এ-ভাবেই কিনে যাচ্ছে, অর্থাৎ একা-একা, বন্ধুবান্ধব কারো সাহায্যের প্রয়োজন কোনোদিনই হয়নি। আজ সে একটা বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছে বলা চলে এ-ব্যাপারে, মানে, তার চটি-ব্যাপারে, সে। আর কিছু না বুঝুক, এটা মলিনা বোঝে; যে-জন্যে একদিকে যেমন মলিনা তার চটি কি চটিজাতীয় জিনিশ সে নিজেই কেনে বা কিনিয়ে নেয়, অপরপক্ষে সে কখনো চটি-সংক্রান্ত নির্মলকে বিন্দুমাত্র বা কোনোরূপ সাহায্য করার প্রস্তাব করে না। বস্তুত, বিবাহোত্তর চার বছরে নির্মলকে ৬-টি চটি কিনতে হয়েছে। দীর্ঘজীবনসহ তাদের সর্বৈব অতুলনীয়তার জন্যে মলিনা বরাবরই প্রতি চটিজোড়াকেই দিতে পেরেছে সেই চাউনি বা এ্যাডমিরেশনের ভরা। বিপদ-জ্ঞাপক শব্দটিটি তো একেবারে হাতেকিনে কেনা হয়েছিল।

বিয়ের পর যাকে অনেক সময় মধু-চন্দ্রিমা বলা হয়, কতকটা সে-কারণেই তারা চুনারে গিয়েছিল। চুনারে কবর অজস্র, নুড়ির মতন যত্রতত্র, একটা ছিলো শীতের গঙ্গার পারাপারহীন চরের ওপর 'কেশরী ভবন' নামে তাদের খেলাদেলির বাড়ির একেবারে খিড়কিতেই, সেখানে রোদে বসে ও পাহাড়ি হাওয়ায় সে বাক্সটি প্রথম খোলে ও দুধ-রঙের খর্খরে কাগজ দুহাতে সরিয়ে কাছে ডেকে মলিনাকে চটিজোড়া দেখায়, যার মাহাত্ম্য, সে কৃতজ্ঞ যে, প্রথম দৃষ্টিপাতেই মলিনা যা বোঝার বোঝে। 'ওও!' দেখে চকচকিয়ে উঠেছিল মলিনা, 'কখন কিনলে?' 'তুমি আমাকে আগে বলোনি!' ওষ্ঠাধর বিস্তৃত করে সে আরো বলে। সত্যি, ভারী আকর্ষণীয় ছিল মলিনার ঠোঁটজোড়াও, শুকনো এবং কাঁপত, ধুলোভরা পাখনা বললে বলা চলে। এ ছিল সেই ধরনের ঠোঁট, ডাগর এবং পুরন্ত, কথা বললেই যা মস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, পুরুষ-মাত্রকেই তার কাছে টানে যা। চুনারেই সে ঐ চটিজোড়া প্রথম ব্যবহার করে, আহা, অমন সৌখিন জিনিস দিনপনের ধরে উন্মাদ ও উপর্যুপর ব্যবহারে, পাথরে ঠোক্কর খেয়ে-খেয়ে, পাহাড়ি রাস্তায় ক্রমাগত ওঠা-নামার দরুণই বুঝি তা অমন কমজোরী হয়ে পড়ে। কলকাতায় ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই আবার চটি কিনতে হয়।

অপর একজোড়া চুরি হয়ে যায়। চুরি? হ্যাঁ, চুরি। সেটা অবশ্য, শেষ-বিপদের কারণ এই এবারের চটিজোড়ার মতন, আনকোরা নতুন ছিল না। তবে সেটিও ছিল কোলা-পুরী। সেবার চুনার থেকে ফিরেই নতুন চটি কিনতে হয় এবং মাসপাঁচেকের মধ্যে, মানে, তাদের বিয়ের বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই ঐ কাণ্ড! সেটা ছিল ভারী খুবসই, কালচে চামড়ার, আঙুলের সামনের স্ট্র্যাপটিতে ছিল একটিমাত্র প্যাঁচ! জরি যা তার লম্বাপানা ফর্সা পায়ে দিব্য মানিয়েছিল। আ, তার ফিটনেস আজো পায়ে লেগে আছে।

সত্যি, ভাবাই যায় না, কল্পনাতীত উপায়ে চটিটি চুরি হয়ে যায় এবং চোখের পলকে। সে-বছর দিনতিনেক ধরে প্রায় ১৯ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, এমন যে ডি ভি সি জল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বাড়ির চারদিকে বৃষ্টির জল এত জমে ওঠে যে নির্মল সেদিন অফিস যেতে পারে না। চারদিকে আর-সব ডুবে গিয়ে অদূরে খানিকটা খালি জমি ও বড়রাস্তার সঙ্গে সংযোগ-রক্ষাকারী কালভার্টটি শুধু জেগে থাকে।

দুপুরবেলা বৃষ্টি একবার থেমে যায়। আকাশ অবশ্য তেমনি মেঘময়, জোলো হাওয়া বইছে আগের মতই। এ বেশিক্ষণের ব্যাপার নয় বুঝে নির্মল একটা আর্জেন্সী বোধ করে বাইরে যাবার, চট করে উঠে পড়ে একটা পাঞ্জাবি গলাতে গলাতে ব্যগ্র-স্বরে সে মলিনাকে ডাকে,

'কিছু পয়সা দাও তো?'

'সিগারেট?'

'আঃ দাও না', বলে সে চটিজোড়ার দিকে অগ্রসর হয়।

একতলার বিড়ালীর বেশ কয়েকদিন হল বাচ্চা হয়েছে। তার একটি ভিজে একসা হয়ে কী-ভাবে ঢুকে পড়েছে তাদের ফ্ল্যাটে, বর্সাব তো বোস, নির্মলের চটির ওপরেই বসে আছে। 'হুশ', 'হুশ', 'যাঃ' বলে হাত নেড়ে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করে নির্মল, ইশ্, এক্ষুনি বৃষ্টি এসে যাবে। নির্মল এবার মারমুখো জোরে তাড়া দিলে, অতটুকুন বিড়ালছানা তারই চটিতে বসে মুখব্যাদান করে তাকে শাসায়, স্পষ্টত সে একটা ঠ্যাঙও তোলে। এ-সময় মলিনা এসে একহাতে টুঁটি ধরে ছানাটা তুলে ধরে ও অন্য হাতে একটা টাকা নির্মলের দিকে বাড়িয়ে দেয়। 'এত তেজ, নিশ্চিত বিড়ালী!' নির্মল সহাস্যে বলে। টাকাটা একরকম ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে সে তরতর করে চটি পরে একতলায় নেমে যায়। যা করার, বৃষ্টি আসার আগেই করতে হবে। তাদের ছাতা নেই।

দু' এক পশলা বৃষ্টি হলেই এদিকটা রীতিমতন নাব্য হয়ে ওঠে। একতলার খোলা দরজা থেকে গোড়ালি সমান জলে সে স্বিরুক্তিহীন নেমে পড়ে। চটি পরে? হ্যাঁ, চটি পরে। তবে আর তার কৃতিত্বটা কোথায় এমন চটিই যদি সে কিনবে যা নাকি রোদে-জলে-কাদায়-পিছলে পরা যায় না? বালির ওপর দিয়ে হাঁটা যায় না? যা, যা পরে পাহাড় ডিঙনো যায় না? এই চটিজোড়া সে কিনতে পায় কলেজ স্ট্রীটের 'পদাম্বুজ' থেকে। কেনার সময় ভারি মজার একটা কথা হয় দোকানের বালক-কর্মচারীর সঙ্গে। চার-পাঁচ জোড়া চটির একটাও ফিট করছে না দেখে ছেলেটি, 'আপনার পাঞ্জা সরু' বললে, উত্তরে নির্মল তাকে বলে, 'দ্যাখো ভাই, পা আমার যে-রকমই হোক তা তো আর তোমার জুতোর মাপে করা যাবে না, জুতোকেই আমার পায়ের মাপে হতে হবে।' উত্তরটি কোনো না-কোনো দিক থেকে মার্ভেলাস হয়েছিল, কেননা, উত্তর শুনে, দোকানের নিভৃতি থেকে দোকানের মালিক বেরিয়ে আসে ও স্বহস্তে প্রকৃত চটিটি নির্মলের পায়ে পরিয়ে দিয়ে যায়। সত্যি, নির্মল চটি কেনে কত মনস্কভাবে এবং প্রতি চটির সঙ্গে, কেনার আগে, একটা ভালোবাসাবাসি না-জন্মালে সে তা কেনে না বলা চলে। মাঝেমধ্যেই নির্মল তার চটিজোড়া ধোয়, মোছে, তাকে রোদে দিতে দেখা যায়। কোলাপুরিগুলো তো একবার রোদে দিয়ে একটু তেল ন্যাকড়া বুলিয়ে দিলেই তরতাজা হয়ে ওঠে। কিন্তু কে বলবে নির্মলের প্রাণে একটু মায়াদয়া আছে যখন সে, দৃপ্ত ও স্বিরুক্তিবিহীনভাবে জলে-কাদায় নেমে পড়ে—জুতো পরে নামতে কে না দ্বিধান্বিত হয়—দেখে মনে হয় যেন সে অনিচ্ছুক, মূক জানোয়ারকে চাবকে নামাচ্ছে। হাজার চটির ভিড় থেকে পরিশ্রম-সাধ্য পছন্দ করে সে, নির্মল রায়, সেই তো এটা কিনেছে। নির্মলকে সার্ভিস দিতে তা বাধ্য।

সেদিন শুকনো কালভার্টে উঠে তবু থমকে দাঁড়ায় নির্মল। মাঠে অল্প জল হলেও রাস্তায় জল একহাঁটু। গর্তগুলো এড়িয়ে যেতে না-পারলে জল বিপদসীমা ছাড়িয়ে, সে জানে। হঠাৎ, বহুকাল পরে, স্মরণকালের মধ্যে বোধ হয়তো এই প্রথম, চটিজোড়া কালভার্টে রেখে খালি পায়ে নির্মল জলে নেমে পড়ে।

কালভার্টটি এমনিতে বাড়ি থেকে দূরে; ২১০ টাকা দামী দমদম হাউসিং এস্টেটের তাদের এই দক্ষিণ-পূর্বদিকের চারতলার ফ্ল্যাট থেকে দূরতর, তবু জানালার পর্দার ওপর মলিনার মুখ তো জেগেই ছিল, সে চটির প্রতি একটা ইশারা করে যেতে পারত। মলিনার চোখে চশমা, তবে কাছের জিনিশই শুধু সে দেখতে পায় না। তা ছাড়া, জলে তো যা ভেজার ভিজেইছে, গভীরতর জলে চটিজোড়া কি বেশি-বেশি ভিজত নাকি?

পথ প্রাণীহীন। মোড়ে একটা রিকসা এখনো দেখা যায়, এখুনি বাঁক নিলে জঙ্গম বলতে আর কিছুই থাকবে না। রাস্তা পেরিয়েই ভুজাঅলার দোকান, এখন ঝাঁপ-ফেলা, তবে ব্যাটা ভেতরেই আছে। নতুন বৌ আনিয়েছে দেশ থেকে, আর এই বৃষ্টি, যাবেটা কোথা। লোকটা সিগারেটও বেচে। এখানে পৌঁছে কালভার্ট পর্যন্ত বেশ দেখা যায়। চারদিকের পানাভর্তি, ঘোলা, নোংরা জলের মধ্যে ঐ জেগে রয়েছে, ক্যালভার্টের ওপর, তার নাতিতরুণ চটিজোড়া, সে দ্যাখে। ডাকাডাকি করে সিগারেট পেতে কতটুকুই বা দেরী হয়ে থাকবে, বড়জোর পাঁচ মিনিট? ইতিমধ্যে মেঘ ঝুলে পড়ে।

এবং মুখ ঘুরিয়েই, কে বলে মিরাকল বলে কিছু নেই, জীবনের বিশ্বাসযোগ্য-অবিশ্বাস্যকে সে প্রত্যক্ষ করে। তার চটি-জোড়া আর নেই! নেই? নাঃ, কই নেই তো! এবং ঠিক সেই জায়গায় কোথা থেকে ও কী করে কে জানে একটি বেগুনি রঙের আস্ত কচুরিপানার ফুল। পাশে রাস্তায় জলের ওপর দাঁড়িয়ে ছেঁড়া গেঞ্জি-গায়ে ও কালো হাফপ্যান্ট-পরা একটি গরীব লোকের ছেলে।

ছেলেটি কোথা থেকে এল! ছপছপ শব্দ তুলে কোনাকুনি হেঁটে নির্মল কালভার্টের ওপর ওঠে। যেতে যেতে মেঘ ডেকে ওঠে ও হুড়মুড় করে বৃষ্টি নেমে পড়ে। বৃষ্টির মধ্যে ছেলেটি জলে গোড়ালি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে। যেন তার কোথাও যাবার নেই! কালভার্টের ওপর ঠিক অবিকল চটিজোড়ার জায়গায়, যেন চটির বদলেই রয়েছে মস্ত ফুলটা, হ-য-ব-র-ল'র সেই 'ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল' গোছের নাকি ব্যাপারটা? 'এখানে একজোড়া চটি

ছিল?' পাশেই কারখানার টিনের চালের জন্যে বৃষ্টির শব্দ এত বেশি যে ঠোঁট দুটি যথাসম্ভব ফাঁক করে নির্মলকে বেশ চেঁচিয়ে বলতে হয়, যে-জন্যে মুখের মধ্যে তীরের মত বৃষ্টির জল এসে পড়ে। ছেলেটি মাথা নেড়ে বলে, 'আমি তো জানি না।' 'সে কী!' অবাক লাগে নির্মলের, এ-রকম অবস্থায় পড়লে বড্ড বোকা-সোকাও লাগে, তার ওপর আবার মৃদু হাসি পায়, যা বোকারই। নির্মল অসহায়-ভাবে ওপর দিকে চায়, বৃষ্টি আরো ঝেঁপে আসছে, চারতলার জানালা একটুখানি ফাঁক করে মুহুর্মুহু হাত নেড়ে কালভার্টের দিকে ইশারা করছে মল্লিনা, সেদিকে চেয়ে বড়সড় একটা পানাফুলের জল-ধোয়া অমল বেগুনি ছাড়া কোনো চটি নির্মলের চোখে পড়ে না। ফলেফেঁপে বৃষ্টি আরো বাড়ে, ঘন ঘন বিদ্যুচ্চমক ও মেঘ ডাকাডাকির মধ্যে নিচু হয়ে নির্মল ফুলটা কুড়িয়ে নেয়। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে মল্লিনা একরকম কেড়ে নেয় তার হাত থেকে ফুলটি ও ভাসে জল ভরে তখুনি রাখে। তারপর শুকনো তোয়ালে বের করে নির্মলের হাতে দেয়। সেদিন আর বাইরে বেরবার দরকার করে না। ফ্ল্যাটে এ-ঘর ও-ঘর করতে গিয়ে যতবার চোখে পড়ে, নির্মল ততবারই বিশ্বাস করতে চায় যে ঐ অদ্ভুত বেগুনি ফুলটাই হচ্ছে তার চটি; সে ইচ্ছুক, তবু তার বিশ্বাস হয় না। ফুলের কারুকাজ থেকে বেগুনি আভা ছাড়া কিছু তার কোনো চটি তার চোখে পড়ে না।

যাই হোক, পরদিন ঘরে-পরার হাওয়াই চপ্পল পরে নির্মলকে বাজারে যেতে দেখার আগে ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেনি মল্লিনা। গত রাতে নির্মল তাকে যার-পর-নেই আপ্যায়ন করে। তবু চটিহারা নির্মলের রাতের ভালোবাসার যথার্থ-ব্যাপারে দিনের বেলায় সে রীতিমত বোকা বনে যায়।

*

কিন্তু এবারের চটি নিয়ে যে বিপদ আসে অভাবিত দিক থেকে, সত্যি, তা হৃদয়ঙ্গম করার জিনিশ। এ কিছু হঠাৎ স্ট্র্যাপ ছেঁড়া বা চুরি-টুরি হওয়ার ব্যাপার না। ব্যাপার এই যে, আসলে, গত মাস দুই ধরে নির্মল যে-চটিজোড়া পরে আসছে-যাচ্ছে সেটা তার চটিই নয়!

অথচ, এবার চটি কিনতে তাকে একটুও বেগ পেতে হয়নি। বিখ্যাত কলেজ স্ট্রীটে এবার তাকে আদৌ ঘোরাঘুরি করতে হয়নি। কিছু টাকার জন্যে সে গিয়েছিল শিবপুরে, মামুর ওখানে। টাকা পায়ও। স্টপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, ট্রাম-বাস কিছুরই দেখা নেই, মাঝে মাঝে শালিমারের দিক থেকে লরি-ভরা মাল ও ট্রাক ভর্তি সি. আর. পি. যায়। ওদিকে ঘন ঘন বোমার শব্দ আগেই পেয়েছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে, তারপর সিগারেট-এর দোকানে দড়ি তুলতে গিয়ে সে চমকে ওঠে—আরে! ধূলিমলিন কাচের লম্বালম্বি র‍্যাকের ভেতর দিয়ে মাস দুই আগে ও ধোঁয়া কুয়াশার মধ্যে সহসাই এবারে চটি-জোড়ার সম্মুখীন হয় সে। তবু হাতে না নিয়ে তথা পায়ে গলাবার আগে চটির মাহাত্ম্য সে বোঝে নি। হ্যাঁ, এর জাত আলাদা। স্ট্র্যাপের বদলে, ওহ্, এটা তৈরি হয়েছে কিনা চামড়ার কতকগুলো পাকানো দড়ি দিয়ে? ভাবা যায়! স্রেফ দড়ি দিয়ে—আব কিচ্ছু: না—না কোনো পেরেক, না একটা সেলাই, না-কিছু। এ-রকম চটি এখানে এই শিবপুরের এ'দো দোকানে এল কোত্থেকে, কতদিন ধরে বা পড়ে আছে এই ভাঙা ধুলোভরা শো-কেসে।' আর এর পাতলা সোল, আ, নারীর অনিচ্ছুক রূঢ় ঠোঁট যা, পায়ে গলিয়ে দু' পা হেঁটেই সে বুঝতে পারে, একে নিষ্পিষ্ট করার মত সুখ আর কী। এত হাল্কা! এ কী এ-দেশে তৈরি? উত্তরের জন্যে সে দোকানীর লোল মুখের দিকে তাকায়। আসন্ন বিক্রির লোভে দোকানে মলিন আলোতেও জ্যান্ত হয়ে উঠছে বৃদ্ধের কোটরাগত দুটি চোখ—এ-ছাড়া সে কিছুই সেখানে খুঁজে পায় না। নীরবে সে চটিজোড়া কেনে ও পুরোনোটি বিনা বাক্যব্যয়ে রেখে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। আগেরটা আরো মাসখানেক বেকসুর চলত। ঠিক এখুনি কেনার দরকার ছিল না। মামুর কাছে পাওয়া প্রায় সব টাকাই বেরিয়ে গেল।

সে অন্তত দু' মাস আগের কথা। তারপর মাসখানেক আগে একদিন ছুটে ট্রাম ধরতে গিয়ে ও অতি অনির্দেশ্যভাবে পড়ে গিয়ে নির্মলের প্রথম সন্দেহ হয়। উঠে দাঁড়িয়ে, পা থেকে খুলে, একপাটি উল্টিয়েই যা বোঝার সে বোঝে। দেখে তার মাথার ভিতরে, স্মরণকালের মধ্যে এই প্রথম, স্তব্ধ-এলাকায় নিউরণগুলির মধ্যে দারুণ কোলাহল পড়ে যায়; মাথার ভিতরে লক্ষ-লক্ষ-লক্ষ নিউরণের সহসা ছোটাছুটি সে টের পায় বললে একটুও বেশি বলা হয় না।

এ কার চটি সে পরে আছে গত এক, দেড় কি দু'মাস ধরে? এ তার চটি নয়! অথচ, কে বলবে এ তার নয়, অবিকল তারই, এটিও মাস দুয়েকের মত ব্যবহৃত। নিজের মনের ভুলে কখন সে দ্বিতীয়-রহিত ভেবে তার চটিজোড়াকে ভুল করেছিল। অথচ আছে; ছিল। অবিকল আর-একজোড়া ছিল এই কলকাতাতেই, কেননা, বিগত দু' মাসের মধ্যে সে কলকাতার বাইরে যায়নি এবং যা কিনা কেনা হয়েছিল আনুমানিক মাস দুই আগেই! অফিসফেরৎ জনস্রোতের মাঝখানে হতচেতন দাঁড়িয়ে থেকে ধাক্কা খেতে খেতে একপাটি চটি ধরে নির্মল দাঁড়িয়ে থাকে। তার গোড়ালির চাপ পড়ে বাঁ-দিকে। সাধারণত তাই তো পড়ে থাকে তার মত গড়পড়তা মানুষের? কিন্তু, ক্রমাগত পেষণে, এর ডানদিক ক্ষয়ে গেছে। সে এই জন্যে পিছলে গিয়েছিল—বাঁ-দিকে গোড়ালির চাপে ছুটন্ত শরীরের ভার অভ্যাসমতন রাখতে গিয়ে। কিছুদিন যাবৎ এ নিয়ে অসুবিধের আরো দু' একটি খুঁটিনাটি নির্মলের এবার মনে পড়ে। সে আর ট্রামে ওঠার চেষ্টা করে না। এখান থেকে বাসা পর্যন্ত মাইল তিনেক হাঁটার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ফুরনো সিগারেট থেকে আর একটা আস্ত ধরিয়ে সে এগোয়।-তবু তার কিছুতে মনে পড়ে না সে গত দু মাসে কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কোথায়-বা পা থেকে খুলে রেখেছিল চটি অথবা

কার বাড়িতে বা ঠিক কোথায় তার এহেন অজ্ঞাতসারে চটি বদলাবদলি হয়ে গেল। আকাশ-পাতাল রোমন্থন করেও সে কোনো কিনারা করতে পারে না। যত মনে করতে চেষ্টা করে, ভুলে-যাওয়া তাকে তত চেপে ধরে। অন্যদিকে গোড়ালি বসাতে সে একবার, দু'বার, পঞ্চাশবার চেষ্টা করে। পঞ্চাশ পা'র বেশি সে এগুতে পারে না। গোড়ালির অসমদিক থেকে একটা শিউরানি উঠে এসে মেরুদাঁড়া নরম করে দিয়ে এখন মাথায় ঢুকে পড়ছে, শরীর ভেসে যাচ্ছে ঘামে, বুকের ওঠা-পড়া অসম্ভব বেড়ে গেছে, সে বোঝে। সে থেমে যায়; থেমে সে আবার হাঁটতে শুরু করে।

*

এতে কোনো ভুল নেই যে অন্তত মাস-খানেকের বেশি সময় ধরে নির্মল যে চটিজোড়া পরে রয়েছে তা নির্মলের নয়। ট্রাম-অ্যাকসিডেন্টটি ঘটে আজ থেকে এক মাস আগে। সেটা ছিল পেনডে। পড়ে যেতে-যেতেই নির্মলের হাত চলে গিয়েছিল বুকের বাঁ-দিকে হার্টের ওপর, পে-প্যাকেটটি সে-দিকেই ছিল। চটির আসল মালিকও টের পেয়েছে নিশ্চয় এতদিনে। সন্দেহ কী যে, ও-প্রান্ত থেকে সেও এখ্নি খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে।

সমস্যা বটে একটা। সমস্যা যখন, সমস্যা মাত্রেরই একটা না-একটা সমাধান থাকার কথা। কিন্তু নির্মলের কেমন একটা পূর্বধারণা জন্মায় যে এটা বোধহয় গুজবের সেই অতিলৌকিক ধরনের, যত দিন যাবে যার জটিলতা ও রহস্য বাড়বে বই কমবে না। সুতো একটা আছেই যা অনুসরণ করলে জটিলতম জটও খোলে, হুঁ, এটা একটা সত্য ধারণা বটে। তবু স্থিরনিশ্চিত হবার আগে যে-কোনো একটি সুতো পরীক্ষামূলক ছুঁতে নির্মল সাহস পায় না। একটিমাত্র ভুলে, এক্ষেত্রে, এক-জীবনের ভুলচুক হয়ে যাবে, সে মনে করে। বহু রাত অব্দি জেগে জেগে সে ভাবে। এর শেষ কোথায় নির্মল কিছুতে বুঝে পায় না। 'আচ্ছা, জ্ঞানের বিয়েটা কত তারিখে ছিল বলো তো?' মলিনা মনে করে এটা কোনো প্রশ্নই না, যে-জন্যে, উত্তরে, অন্ধকার থেকে তার বুকের টিপকল-খোলার পুটপুট ভেসে আসে। 'আচ্ছা, জ্ঞানের বিয়েতে কি আমি চটি খুলে-ছিলুম?' মলিনার পিঠের দিক থেকে উপুড় হয়ে শুয়ে নির্মল এবার জানতে চায়। 'সবুর করো না, আঃ। হুকটা খোলো।' চাপা কামনাকাতর গলায় মলিনা জবাব দেয়। জ্ঞানের বিয়েতে চটি খোলার প্রশ্ন ছিল না তো, নির্মলের মনে পড়ে যায়।

শ্যামপুকুরের দেবজ্যোতির সঙ্গে এক-দিন দেখা, সেও প্রায় মাস দুই হতে চলল। 'সমথিং আছে, মোথ?' একটা মুদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে দেবজ্যোতি জিজ্ঞেস করছিল। ছেলের হাম নিয়ে-পড়া ..... জীবনের মানুষ এমন কত না বিপদে পড়ে। না, চটি সেখানে খোলেনি। সে কথা নয়। সে দেবজ্যোতির বাড়িতেই যায়নি। 'পা স্পঞ্জ করাও। আর হোমিওপাথি করাবে, বুঝলে?' মোহের বলে তাকে এড়িয়ে যায়। তখন সবে সন্ধে, তবু বাকি গলিটা অস্বস্তিকর ফাঁকা, আজকাল এদিকে গণ্ডগোল লেগেই আছে। এক জায়গায় আলগা কাঁসটা আঁট করার জন্যে জামাটা তুলতেই তড়াক করে তিনটি ছেলে অন্ধকার রক থেকে একসঙ্গে লাফিয়ে ওঠে। নির্মলও জামা তুলে রেখে যতক্ষণ উচিত তার চেয়ে বেশি সময় ধরে কষি আঁটে। সে কিছু প্লেন-ক্লোথস্ড নয়, এটাই দেখায় আর কী। কিন্তু এটাও কথা না। গলি থেকে পরিত্যক্ত রাজপথে পড়ে, ট্রামলাইনের দিকে একা যেতে যেতে ও একবারও মুণ্ডু না ঘুরিয়ে সেদিনই প্রথম নির্মল বুঝতে পারে যে, দূরত্ব বজায় রেখে একজোড়া চটি-পরা পা তাকে অনুসরণ করে আসছে।

কথা হল, সেদিন সে যে-চটি পরে ছিল সে কী তার? কেননা, সেই থেকে শুরু। তারপর থেকেই দিনকে-দিন সে কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সে ভেবে দ্যাখে। বিশেষত, ট্রাম অ্যাকসিডেন্টের পর থেকে এটা বেড়েই চলেছে। একটা চার্টার্ড ফার্মে পার্টটাইম সেরে ফিরতে আজকালকার হিশেবে নির্মলের বেশ রাত হয়ে যায়। দোকানপাট এদিকে বিলকুল বন্ধ হয়ে যায়। এস্টেটের মেন গেট থেকে তাদের এফ-ব্লক পর্যন্ত সুরকির পথটুকু ৯টা মাগাদ নিঃঝুম হয়ে পড়ে। এইটুকুর মধ্যেই নির্মল ঘাড় ফিরিয়ে বারকয়েক আশপাশ দেখে না-নিয়ে পারে না। কেউ বোধহয় একা-তাকে কোনো কিছুর জন্যে দায়ী করবে যে জন্যে সে অপরাধী নয়, অন্তত কোনো প্রমাণ নেই যে সে নয়। উল্টোদিকে সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ এই বোধও তার মধ্যে জন্মাতে দ্যাখে। আজ থেকে চার বছর আগে, ভোরবেলার কথা ভেবেই সে এই দক্ষিণ-পুবের বারান্দাঅলা ফ্ল্যাটটি নেয়। বরাবর সে ভোরে ওঠে, প্রত্যুষার এই লাল রোদ্দুরভাটটুকুর জন্যে পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দেওয়া সে যুক্তিযুক্ত মনে করে। কিছুদিন হল সে আর বারান্দায় বসে না। শুধু সে কেন, একটি ভ্যান আসতে দেখলে আজকাল ভয় কে না পায়। অনেকেই এ-রকম পাচ্ছে কিনা নির্মল জানে না। আজকাল কে বা কার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে, বিশেষত এ-সব ব্যাপারে। গত মাস দুই ধরে, প্রায় চটি বদলের সমসাময়িক কাল থেকে, তার এই অপরাধীবোধ না-কমে বরং বেড়েই গেছে।

তাদের ব্লকে ঢোকার মুখে একটা ছোট গেট রয়েছে। গেটের আঙটা খোলার 'টিং' করে ছোট্ট শব্দটা দিনের মধ্যে কতবারই না তার হৃৎস্পন্দন এলোমেলো করে তোলে। আগে তবু রাতের দিকেই ভয় করত বেশি, কর্কশ স্বরে কথা বলতে বলতে রাস্তা ..... কেউ গেলে সে উৎকর্ণ হয়ে পড়ত। এখন আর দিন-রাত নেই।

ব্লকে আরো এটি ফ্ল্যাট রয়েছে, তাদের
হতে পারে, এ-রকম ভেবে নির্মল
কোনো সান্ত্বনা পায়-না।

রাত এক সময় সত্যি সত্যি স্তব্ধ
ইয়ার্ডে মালগাড়ির শান্টিং-এর বিজা
ঝকঝক-এর সঙ্গে পা ফেলে
কলকাতার দিক থেকে এগিয়ে আসে
জোড়া চটি-পরা পা'র হেঁটে আসার
সে শুয়ে শুয়ে শোনে। রাস্তার ধু
কাঁকরের ওপর অসংলগ্ন পদপাত
অস্বাভাবিক ও রহস্যজনকভাবে
এস্টেটের চারদিকে ঘোরাফেরা
তারপর একদিন 'টিং' করে গেট
পদশব্দ ঢুকে পড়ে তাদেরই ব্ল
একতলায় সিঁড়ির নিচে দারোয়ানের
নিচু গলায় জিজ্ঞাসাবাদ নির্মল
শুনতে পায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আ
হৃৎস্পন্দন থামিয়ে নির্মল অপেক্ষা
একতলা...দোতলা...তিনতলা...পদশব্দ
দিন সত্যি সত্যি চারতলায় উঠে আ
তারপর একসময়, কোনো এক
চারতলার ৩৯ নম্বরের 'বজার'
ওঠে। নির্মল আর পারে না। ম
শেশ-এর মধ্যে ঢুকে পড়ে। ম
বলে ওঠে, 'কে?' বিয়ের পর থেকে
চার বছর ধরে এই মলিনাই ছিল
অনিদ্রারোগের একমাত্র চাবুক তথা অ
মকরধ্বজ। আজকাল মলিনাও পারে
মলিনা ঘুমিয়ে পড়ে। সে জেগে থাকে

এর ওপর একদিন ভোররাতে
একটা স্বপ্ন দেখে ফ্যালে। একটা
করোজ্জ্বল বালুকাময় উপত্যকায় খালি
সে দাঁড়িয়ে, তার পা পুড়ে যাচ্ছে,
ক্রমাগত পা বদল করতে সে দ্যাখে। ও
একটা পাহাড়, ত্রিকোণ, বেশী দূরে হবে
তার সবুজ বনানী স্পষ্ট দেখা যায়
ডিঙোবার সাহস তার নেই, যার ওপারে
সে জানে না। অথচ পিছনের জনপদ
তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দিনের
ধ্রুব তারকার জন্য ভুল করে আকাশে তা
তার আরো ভুল ভাঙে। আকাশে সূর্য
বিরতিহীন বিদ্যুচ্চমকে তৈরি এ
অলৌকিক দিনের বেলা, এখানে
নেই। 'আশার কবর তুমি', কে যেন
যায় তাকে।

ঠিক তখুনি বালির ওপর দিয়ে
মর্মরধ্বনি শুনে সে চমকে ওঠে—
অদূর দিয়ে একজোড়া চটি হেঁটে
তীরে ওঠার আগে হাঁসের মত সে
সরু ও লম্বা হয়ে যায় তার গর্দান,
তুমি কী প্রভু খুঁজছ?' সে বলতে
শুধু তার গলা দিয়ে স্বর বেরোয়
সে এক-পা এগুতেই দ্রুততর হেঁটে
অনেকটা এগিয়ে যায়। নির্মল হঠাৎ
শুরু করে দেয়। চটি ক্রমাগত দিক বদল
শুধু সে পাহাড়ের দিকেই ছুটে চ
নির্মল জানে—যেখানে ঢুকে পড়লে
আর তাকে খুঁজে পাবে না।
বালিতে ..... তার চটিছায়া
শুধু এই জনহীন নিকশিহ্নহীন উপত
সে লুকোবে কোথা,—লুকোবে উর্বী

জেব্রার দিকে মরুভূমির সোনালী সিংহের মত অবিশ্বাস্য দৌড়ে নির্মল বারংবার তার কাছাকাছি পৌঁছয় ও শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের প্রায় পাদদেশে তার জ্বলন্ত লাফের থাবা একটা পাটি চেপে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে রোদের প্রকান্ড ঝাপ্পড় তার গালে এসে লাগে। স্বপ্নের মধ্যে মাথা ঘুরে নির্মল লুটিয়ে পড়ে... 'এই—এই—কী হচ্ছে—অ্যাঁ—কী হচ্ছে' হাসি-হাসি মুখ মুখের কাছে নামিয়ে এনে মলিনা তাকে জাগায়। নির্মল বহু সময় ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ওঃ, কী কষ্ট তার সর্বাঙ্গে, কেউ যেন বাঁশপেটা করেছে সারা রাত। অতিকষ্টে মোচড়ানো হাত তুলে, চুল সরিয়ে মলিনার ঘাড়ে সে রাখে, 'আচ্ছা মলিনা, ওই যে সেদিন কাঠের পাটা দিয়ে টুবলুরা ক্রিকেট খেলছিল না, সেটা কোথায়। সেটা কাদের।'

'ওমা। তা নিয়ে তুমি কী করবে?'

'আঃ।' শরীরময় ব্যথা আড়মোড়া দিয়ে ভেঙে বুক থেকে মলিনাকে পাশে নামিয়ে রাখে নির্মল, 'তুমি কিছু বোঝো না। আজকালকার দিনে, ধরো যদি একটা হাউস ব্রেকার আসে, মাঝরাতে আসতে তো পারে? একটা-কিছু—কিছু—একটা থাকার তো দরকার। আমি কী দিয়ে তাকে রুখবো? কী আছে আমাদের, একটা বেড়াবার ছড়ি ছাড়া?' শূন্যে দু' হাত তুলে নির্মল বিলাপ করে, 'ডাকলে আজকাল কেউ সাড়া দেবে তুমি মনে করো?'

যার চটি সে এখন কোথায়। নির্মল ভাবে। নির্মলদের পৈতৃক ছোট্ট বাড়িটি কবেই, সেই ছোটবেলাতেই, বিক্রি হয়ে গেছে। সে বেশ কয়েক বছর হতে চলল, একদিন, তখন সন্ধেবেলা, কী একটা ছুতো করে সে বাড়িটায় ঢুকে পড়ে ও উঠোনে তাদের আমলেই অকেজো হ্যান্ডপাম্পটি আজো থেকে গেছে দেখতে পায়। ছোট-বেলায় তার একটা লাল মার্বেল ওর ভেতর পড়ে গিয়েছিল। মার্বেলটি আজো ওখানে থেকে গেছে, নির্মল জানে। এ শুধু নির্মলই জানে যে, যে চটি সে পরে আছে সেটা তার নয়।

নইলে এবারের চটিজোড়া যথার্থই প্রশংসা কুড়িয়েছিল। অফিসে এখনো কারো চোখে প্রথম পড়লে কিছু না-কিছু জানতে চাইবেই। আগে কত আগ্রহ ভরে উত্তর দিত। এখন এড়িয়ে যায়। অফিসে টেবিলটি তার কাছে একটা দাবার ছকে পরিণত হয়ে যায় যেন। একটিমাত্র কাল্পনিক ঘুঁটিকে সে দাবা-বোড়ে-রাজা-রানী কি মন্ত্রীর বেপরোয়া চালে চালায়, যত্র-তত্র রাখে। কোনো একটি ঘরে ঘুঁটিটাকে সে এক মুহূর্তের বেশি রাখতে পারে না। রেখেই, তাকে তুলে নিতে দেখা যায়। সে এখন ঠিক কোথায় বা কোন দিকে। সে কী ঠিক পথে? তার থেকে আর কত দূরে; নাকি সে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এটাই জানতে ইচ্ছে করে তার খুব বেশি। সে কী টের পেয়েছে? হ্যাঁ, পেয়েছে। না, পায় নি? টের পেয়ে, সে কী তুলে রেখেছে নাকি নির্মলের চটি না পরেই যাচ্ছে তার মত? সে হয়ত আর একজোড়া কিনেই নিয়েছে। নির্মল পারে নি কিনতে। মাসের শেষে নির্মল পারে না।

বাসে-ট্রামে সর্বত্র নির্মল লোকের চটি-পরা পা দ্যাখে। এত রকমের পা হয় নাকি মানুষের? রোভিনিউ-সেকসানের দোতলা থেকে ফুটপাত স্পষ্ট দেখা যায়। অনেক সময় ফুটপাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখে। গত রবিবার চটি পরে মলিনার জ্যাঠামনি এসেছিলেন। চুনোটের মধ্যে চটিটা পুরোপুরি দেখতে না পেয়ে নির্মল কৌতূহলী হয়ে পড়ে। সে বহুক্ষণ চোখ সরাতে পারে নি। প্রণাম করতে ভুলে যাবার জন্যে নয়, এঃ হে, ও'র পায়ে গোদ আছে এটা একদম ভুলে যাওয়ায় সে খুবই লজ্জিত হয়ে পড়ে। ঘন-ঘন কেশে খালি পা বদলাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। ক'দিন আগে মেজদার বাসা থেকে উঠতে কিছুটা রাত হয়ে যায়। বাসার সামনে ডিপো থেকে বেরবার মুখে ফাঁকা ট্রামের লাইন-পাল্টানোর ঘটাং-ঘট শুনেই সে বরাবর রাত বুঝেছে, আগে টু-দা-মিনিট বলে দিতে পারত। আজকাল অবশ্য আটটা-ন'টা থেকে ট্রাম-বাস ফাঁকা হতে শুরু করে। তবু এ কেউ শুনেছে, রাত সাড়ে দশটায় ফাঁকা বাসে শুধু সে ও আর একজনমাত্র যাত্রী, বাস পাইকপাড়া ছাড়ালে অন্যমনস্ক নির্মল সহসা পিছন ফিরে তবু তা-ই দ্যাখে। ওদিকে ছ'জন বসার লম্বা সীটের কোণে মুড়িসুড়ি দিয়ে সে একা ব'সে, লোকটি খর্বকায়, মধ্যবয়সী ও তার নাক বাঁকা, নির্মল দ্যাখে। লোকটি এতক্ষণ তাকে, হ্যাঁ তাকেই দেখছিল, নির্মল বুঝতে পারে। মুহূর্তে, কেন কে জানে, লোকটার পা দেখার জন্য নির্মল ব্যাকুল হয়ে পড়ে। লোকটা তখুনি পা সরিয়ে নেয়, সে দেখতে পায় না। লেক-টাউনের কাছে আচমকা দ্বিতীয়বার মুখ ফিরিয়ে নির্মল দ্যাখে দু'জন নিমগ্ন কন্ডাকটর ছাড়া হু-হু বাসে সে একা!

*

এর মধ্যে অফিসের কাজে এক সপ্তাহের জন্যে নির্মলকে বাইরে যেতে হয়। ভোরের ট্রেনে বাড়ি ফিরেই শোনে পানিহাটি থেকে কে একজন পর পর দু'দিন, পরশু এবং কাল, দু'দিনই সন্ধের পর তার খোঁজে এসেছিল। 'আচ্ছা লোক বাবা। বললুম তুমি আজ ফিরছ, তবু

আবার কাল এসে হাজির। কী অদ্ভুত-ভাবে বেল দেয় না লোকটা!'

'পা-নি-হা-টি! কোন দিকে? পানি-হাটিতে তার চেনা কেউ থাকে না তো। সে কখনো পানিহাটি যায় নি। সে যেখানে, পানিহাটি তার থেকে কত দূরে? হঠাৎ পানিহাটিকে পৃথিবীর একমাত্র ভ্রাম্যমাণ জায়গা বলে মনে হয় নির্মলের যা দূরে থেকে দূরে ক্রমাগত সরে যাচ্ছে।

'পানিহাটি?'

'পানিহাটিই তো বলল।'

'দেখতে কেমন?' মুখ মোলায়েম রেখে নির্মল জানতে চায়।

'ছোকরা মতন। বেশ স্মার্ট দেখতে।' সাধারণত নির্মল জেলাস। বলে তাই মলিনা ঠোঁট টিপে হাসে।

'নাম বলেছে?' শরীর শক্ত করে মুখ ফিরিয়ে রাখে নির্মল।

'আত্মীয় তো কিছু বলল না বাপু। তা না কাকি?'

'পানিহাটি কোন দিকে তুমি জানো?'

'না তো।'

হ্যাঙারে না ঢুকিয়ে হঠাৎ ট্রাউজারটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারে নির্মল। বোঁ করে ঘুরে দু' হাতে মলিনার কাঁধ ঝাঁকাতে শুরু করে, 'কেন জিজ্ঞেস করোনি তুমি নাম কী, অ্যাঁ?' চীৎকারে সে ঘর ফাটিয়ে ফ্যালে, 'পানিহাটি কোথায় জানো না, নাম কী জানো না, কেন এসেছিল জানো না... হোয়াট আর ইউ? কী করতে রয়েছ তুমি বাড়িতে? আমার কার সংগে কী দরকার... কতটুকু দেখতে পাচ্ছ তুমি আমার এ্যাঁ? গাধা কোথাকার!', বলে ঝোঁকে বিছানায় ঠেলে ফেলে দেয় নির্মল। তারপর পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। শুধু শু ও আন্ডারউয়্যার-পরা লোমশ তাকে দেখে মনে হয় যেন অতিপ্রকৃতি বা উপকথা থেকে যেন দু' পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এক দৈত্যাকার কুকুর-মানুষ। 'আজ সন্ধেবেলা সে আবার আসবে লিখেছে', অফিস বেরবার মুখে ম্রিয়মাণ মলিনা তাকে জানায়। সে কাঁদতে ভুলে গেছে।

অফিসে পাশের সিট থেকে প্রৌঢ় বিশুবাবু জোঁকের মত একখিলি পান এগিয়ে দেন, 'কী ব্যাপার মোশাই, রোজ টেলিফোন, রোজ টেলিফোন। যত বলি বাইরে গেছেন। তবু রোজ সেই এক কথা, নির্মল রায় আছেন? ব্যাপার কী নির্মল?'

আজ সকাল থেকে রেডিওয় সাই-ক্লোনের কথা বারবার বলা হচ্ছে। সারাদিন মেঘও করে রয়েছে। অনেকের মত নির্মলও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। এসে দ্যাখে মলিনা বাড়ি নেই। একটা চিঠিতে লোকটির আজ সন্ধেবেলা আসার কথা মনে করিয়ে দিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের টুবলুকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। রাতের খাবার করে রেখে গেছে অবশ্য। তবু এটা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে মলিনা।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে, তারপর পাজামা, পাঞ্জাবি ও হাওয়াই চপ্পল পরে নেয় নির্মল। বসার-ঘরে এসে তার বেশ সাফসুফ লাগে। বিয়ের পর চার-বছর গড়িয়ে গেল তবু ছাতা ও জুতো-বুরুশের মতই, গৃহস্থালীর বেশ কিছু অবশ্যম্ভাবী জিনিস তাদের নেই। যেমন, আজো তাদের কোনো বুক-সেলফ নেই। অথচ বইটই বিস্তর এবং কাগজপত্র—সব মেঝের ওপর, যত্রতত্র ছড়ানো। লোকটি যদি আসে ঐ কোনার সোফাটায় তাকে বসতে দিয়ে তার পিছনে ঘরের অপর ল্যাম্প-স্ট্যান্ডটি জ্বালিয়ে দেবে, নির্মল ঠিক করে ফ্যালে। বইপত্র সরিয়ে একটু পথ করে রাখবে নাকি? কার্পেট থেকে 'দি অ্যানালেক্টস অফ কনফুসিয়াস' বইটি হেঁট হয়ে তুলে রাখতে গিয়ে কী মনে নির্মল আবার ওখানেই রেখে দেয়। ক'দিন ধরেই ফুল-দানীতে গোঁজা রয়েছে খবরের কাগজের একটা দরকারী পাতা। সেটা খুলে রাখে। তারপর দেওয়াল-আলো নিবিয়ে এদিকের ল্যাম্পস্ট্যান্ডটি জ্বালিয়ে দেয় ও তার নিচে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বসে। ঝড় জল শুরু হবার আগেই ওরা পৌঁছে গেছে মনে হয়। টুবলুর কাছে একটু পরেই খবর পেয়ে যাবে। বাইরে মেঘ গর্জন।

ঠিক সাতটা বাজলে ঝড় আসে, হাড়-কলে যথারীতি সাইরেন বেজে ওঠে এবং আসে সে। 'ক্রিং... ক্রিং-ক্রিং... ক্রিং...ক্রিং-ক্রিং... ক্রিরুরুরিং...ক্রিরুরুরিং...' সত্যি ঠিকই বলেছিল মলিনা—অশ্রুতপূর্বভাবে বেল বেজে চলে, কাটা-কাটা, ঢালাটিঙ্গে অকুতোভয় ও জেদী, যেন কেউ মজা করছে। কেউ কারো বাড়িতে এসে এ-ভাবেও তাহলে বেল বাজায়? একটানা এ-হেন বেল বাজিয়ে অবিশ্বাস্যকে সে বিশ্বাস-যোগ্য করে তোলে। নির্মল একটু সময় নেয়। গলা জমকালো করে তারপর সাড়া দেয়, 'কে এএ?' বেল থেমে যায়।

দরজা খোলার সংগে সংগে আগন্তুক ঢুকে পড়ে। ঠাট্টা করেছিল মলিনা। মোটেই স্মার্ট বা ছোকরা নয়। আধবুড়ো লোকটা পিঠ দিয়ে পাল্লা চেপে ধরার আগে তার পিছনে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে, যে-জন্যে নির্মলের মনে হয় বিদ্যুৎ যাকে তাড়া করে এ সে।

লোক খর্বকায়, তবু তাকে বামন বলা চলে না। তার মাথায় ফেল্টের টুপি। সে একটি মেয়েলি রেনকোট পরে এসেছে যাতে এখনো বোতাম লাগাবার প্রয়োজন হয়নি যে-জন্যে অলিভগ্রীন ট্রাউজারের মধ্যে শার্ট ঠিক মতন গোঁজা হয় নি দেখা যায়, ময়লা আন্ডারউয়্যার দড়িসহ খানিকটা বেরিয়ে। সদ্য ডুব দিয়ে উঠলে যেমন হয়, ভিজে চুলগুলো লেপ্টে রয়েছে কপালে—অর্থাৎ, ফুর্ফুরে বৃষ্টিই এমনটি করেছে বা হতে পারে যায়। তার বেমানান চওড়া বুকের ওঠা-পড়া দেখে নির্মল ভেবেছিল লোকটি হাঁপাচ্ছে।

কাঁপা হাতে আগন্তুক নিজেই ছিটকিনি তুলে দেয়। তারপর তালু উল্টে ও এক সংগে ভ্রূ ও তর্জনী নাচিয়ে নির্ম[illegible]
তার সংগে ভেতরে যেতে বলে।

'আপনি নির্মল রায়?' ল্যাম্পস্ট্যা[illegible]
উজ্জ্বল নিচে এদিকের সোফাটায় গড়[illegible]
ভাবে বসে পড়ে আঙুল তুলে সে জা[illegible]
চায়। তার কণ্ঠস্বর প্রগাঢ়, বয়সকালে ম[illegible]
তার রূপ হত খুব, ঠিক যেন একটা [illegible]
দরজা খাচ্ছে সংখ্যাতীত কটু। নি[illegible]
মাথা নাড়া সত্ত্বেও লোকটা সৌজন্য[illegible]
বিস্মিত করে অকারণে আবার প্রশ্ন ক[illegible]
'নির্মল রায়?' বলে সে একটা খ[illegible]
নির্মলের দিকে বাড়িয়ে ধরে। খাম ছি[illegible]
ছিঁড়তে নির্মল দ্যাখে ইতিমধ্যেই [illegible]
সোফায় পা তুলিয়ে দিয়েছে। এ নয় যে[illegible]
অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, নির্মলকেই দেখ[illegible]
তবু সে তার দিকে তাকিয়ে নেই। অথ[illegible]
নির্মলের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার কে[illegible]
ধারণা আছে, এ তার চাউনি দেখে [illegible]
হয় না।

'ন'মামা' নির্মল পড়ে যায়, 'এই [illegible]
লোকের নামও নির্মল, তবে ইনি রায় [illegible]
এ'দের বাড়ি পানিহাটি, আমাদের বা[illegible]
কাছে সি-আই রোডে এ'র নতুন [illegible]
হচ্ছে। সেই কারণে আজকাল প্রায়ই আ[illegible]
ও যেচে আমাদের সংগে আলাপ ক[illegible]
তুমি শেষ যে-দিন আসো, ইনি পাশের [illegible]
বাবার সংগে কথা বলছিলেন। অনেক [illegible]
পরে গতকাল হঠাৎ এসে উনি ব[illegible]
আমাদের বাড়িতে সেদিন এ'র চটি-[illegible]
হয়ে গেছে, চটি দেখেই আমি বুঝি, তো[illegible]
সংগে। আজ তোমার ঠিকানা আর অফি[illegible]
নম্বর এ'কে দিলুম। শুনেছি ভদ্রলো[illegible]
বহু আগে পাগলাগারদে ছিলেন, তবে [illegible]
সম্পূর্ণ সুস্থ। তবু এ'র সংগে বুঝে-স[illegible]
কথা বোলো, মা বলে দিয়েছেন। ই[illegible]
তাপস।' চিঠির তারিখ দিন আগে[illegible]
আগেকার।

'আসলে বদলা-বদলি হয়নি, বুঝলে[illegible]
সব ঠিকই আছে। আমারই ভুল হয়ে[illegible]
মাপ করবেন। সব ঠিক আছে...' ফস্[illegible]
দেশলাই জ্বালিয়ে সে নির্মলের [illegible]
তেড়ে আসে। নির্মলের ঠোঁটের সিগারে[illegible]
ধরিয়ে দেয় ও নির্মলেরই প্যাকেট [illegible]
বের করে, নেভার আগে, নিজেও এ[illegible]
দিব্যি ধরিয়ে নেয়। তার আঙুল প[illegible]
যাবার কথা, নিশ্চিত গেছেও, তবু[illegible]
অবলীলভাবে অবশিষ্ট কাঠিটুকুর [illegible]
হাত ঝেড়ে ফেলার ও অ্যাসট্রেতে ফ্যা[illegible]
'তবু দেখুন', ঠোঁট বাঁকিয়ে ধোঁয়া ছে[illegible]
সে নির্মলকে হেসে বলে, 'আমি আপ[illegible]
সংগে আলাপ করতে এলুম। আলাপ [illegible]
গেলুম আমি আপনার সংগে। কেন গে[illegible]
উঁ, তাই না?'

নির্মল অনেকক্ষণ কথা বলতে পা[illegible]
না। স্কাইলাইটটা বিদ্যুতের আলোয় জ[illegible]
উঠে পরক্ষণেই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। [illegible]
সেদিকে চেয়ে থাকে। ঘর নীরবতায় [illegible]
যায়।

তারপর এক সময় নির্মল বলে, 'আ[illegible]
কিন্তু, আমার মনে হয়, প্রথমেই [illegible]

খুঁজেছিলেন। মানে যে-চটি আপনি পরে আছেন, সেটা...'

'ও নো! নেভার! আই অ্যাম সিওর। এ নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না।'

'তাহলে আপনি এলেন কেন। এত খোঁজাখুঁজি—এ কী জন্যে?'

'দেয়ার ইউ আর! তাই তো বলছি, আমি তবে এ-লুম কেন, উঁ?' নীল ঠোঁটের কোন মুড়ে সে হাসে, 'আমি এলুম কেন। তাই না...?' রেনকোটের পকেটে কনুই অব্দি ডুবিয়ে আগন্তুক একটা সবুজ চিরুনি বের করে চুল আঁচড়ে নেয়। তারপর ধীরে সুস্থে অপর পকেট থেকে একটা বড়সড় কাগজ বের করে অসম্ভব বাঁকা ও বেঁটে পায়ে বইপত্র মাড়িয়ে ও-প্রান্তে নির্মলের অন্ধকার সোফা পর্যন্ত হেঁটে যায়। নির্মল এবার এদিকের স্ট্যান্ডটির সুইচ টিপে দেয়। 'পড়ুন আপনি পড়ুন এটা...' নম্রগলায় সে অনুরোধ করে। কাগজটা দু' হাতে লম্বালম্বি খুলে ধরে নির্মল দ্যাখে দশ টাকার ননজুডিসিয়াল স্টাম্প একটা, খাঁটি পার্চমেন্ট। রুদ্ধশ্বাসে সে পড়ে যায়:—

ডীড অফ রেলিংকুইশমেন্ট

আমি শ্রী পিতা... সাকিন এতদ্দ্বারা অংগীকারপূর্বক বলিতেছি যে অদ্য শ্রীনির্মল সরকার পিতা উপেন্দ্রনাথ সরকার সাকিন পানিহাটি, ২৪-পরগণা......হইতে .........তারিখে ক্রীত যে চটি পরিয়া আছেন তাহাতে আমার কোনো সত্ত্ব-স্বামীত্ব নাই তথা ইহা আমার নিজের বলিয়া কোনো দাবী করি না কিম্বা ভবিষ্যতে করিব না কিম্বা আমার উত্তরাধিকারীগণ কোনো দাবী করিবে না কিম্বা দাবী করিলেও তাহা সর্বসময়ে আইনমোতাবেক অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে ও সজ্ঞানে এবং অন্যের বিনানুরোধে অত্র নাদাবীপত্র লিখিয়া দিলাম।

'এ-এ্যাই। এইখানে হ্যাঁ, এইখানে—' খোলা লালকালির পেন মেঝের ওপর 'দি এ্যানালেক্টস অফ কনফুসিয়াস'-এর পাশে একবার ঝেড়ে তর্জনী ঠুকে লোকটা দেখায়, 'এইখানে একটা সই করে দিন। জাস্ট নির্মল রায়। ব্যাস, আর কিছু লাগবে না।'

সেই পাঠ শুরু করার পর এতক্ষণে নির্মলের হৃদপিন্ডে প্রথম শব্দ হয়। তারপর অনেকক্ষণ পর পর বীট হতে থাকে। ভদ্রলোকের বুকের প্রকান্ড ওঠা-পড়া দেখে নির্মল বোঝে হাঁপানোর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সই-করার জায়গায় আগে থেকেই লালকালির একটা টিক মারা রয়েছে সে দ্যাখে।

সকৌতুক স্মিত হাসিতে মুখের বলিরেখা ও গর্তগুলি ভরিয়ে ফেলে আগ্রহভরে সে দাঁড়িয়ে।

'আমি দুঃখিত... নির্মলবাবু। আমি পারব না।'

'ও!' মুখ অন্ধকার করে আগন্তুক জানতে চাইল, 'কিন্তু কেন বলবেন কী?'

নির্মল বলল, 'কারণ আপনি যেটা পরে আছেন সেটা আপনার চটি নয়।' বিদ্রূপ ও ঘৃণায় আগন্তুকের মুখ বীভৎস হয়ে ওঠে।

'ওহ্, নো-নো! দ্যাটস ট্রু। এ নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না। এটা ছেড়ে দিন, প্লীজ, এটা ছেড়ে দিন...' ভূতগ্রস্তের মত সে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করে 'আচ্ছা। আমি বরং আর-একদিন আসব।'

'আপনি আর আসবেন না।' নির্মল উঠে দাঁড়ায়।

'আরে! বসুন, বসুন।' নির্মলের পিঠে সে এবার হাত রাখে। হাত পৌঁছয়। হুঃ-হুঃ-হুঃ-হুঃ করে ধোঁয়া ছেড়ে নির্মলের মুখোমুখি সামনে মুখমন্ডল ধোঁয়ায় লুকিয়ে ফেলে ধোঁয়ার আড়াল থেকে লোকটা বলতে থাকে, 'দেখুন নির্মলবাবু, আমি যেটা পরে আছি যদিও সেটা আমারই—অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ ফ্যাক্ট—তবু যখন কথাটা উঠেছে...মানে আপনারও যখন মনে হয়েছে—ভুল—তবু মনে তো হয়েছে, তাই না, উঁ? আসলে উই হ্যাভ আনউয়িটিঙলি মেড এ কেস আউট অফ ইট অল...আমাদের একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে—একটা বন্ধন—তাই তো? তাই যদি হয় তাহলে আমাকে আবার আসতে হবে, তাই না?' মাথা থেকে খুলে টুপি দিয়ে ধোঁয়া তাড়িয়ে মিনতি করে সে বলে, 'হেঃ হেঃ...ইউ সী মাই পয়েন্ট?'

'তার চেয়ে লেট আস মেক এ ডীল' অ্যাজ রেসপনসিবল পীপল অলওয়েজ ডু' আগন্তুক এবার ধমকের সুরে সোজাসুজি প্রস্তাব করে, 'আপনি এখানটা একটা সই ... জাস্ট নির্মল রায়, দ্যাট উড ডু। এবং আমাদের আর দেখা হবে না।' 'সী মাই পয়েন্ট?' চোখ পাল্টিয়ে সে জানতে চায়।

তর্জনীতে তর্জনী আটকে হাতদুটো কোলের ওপর ফেলে রেখে নির্মল বসে থাকে। স্কাইলাইটটা বহুক্ষণ অন্ধকার হয়ে আছে। বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে আছে তার মন। তবে তার হৃদপিন্ড কেটে দুখানা হয়ে যেতে চাইছে, 'তবে তাই হোক' সে বলতে চায়। তবু নিজের ম্যাট্রিস-এ হাত চেপে রেখে সে বসে থাকে।

'আমি। পারব। না।' সে বলে।

'সো ইউ ডোন্ট এগ্রি?' কলম বন্ধ করে কাগজটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে আগন্তুক মুখ কালো করে বলে, 'তাহলে দেখা হবে মাঝে-মাঝে? একদিন আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। এর-চেয়ে সই-করে-দেওয়া ভালো মনে করে হয়ত একদিন আপনি—ইউ কান্ট রুল দ্যাট আউট—যে-জন্যে আমাকে আসতেই হবে। আচ্ছা উঠি...' বলে গভীরভাবে সে সোফায় ডুবে যায়। ততক্ষণে তার পা'র দিকে তাকাবার কথা মনে পড়ে নির্মলের। সে তাকায়; সঙ্গে সঙ্গে গোটা ঘর ভরিয়ে মুহুর্মুহু ঝলসে ওঠে বিদ্যুৎ ও বিদ্যুতে ঝলসাতে থাকে তার পা। ল্যাম্প-স্ট্যান্ডের ঢাকা আলোর নিচে দ্রুণঅন্ধকারে

নির্মলের চটিজোড়াকে মরণকামড় কামড়ে ঐ পড়ে রয়েছে আগন্তুকের পা, ঐ বিচ্ছুরিত হচ্ছে চটি থেকে ঝন-ঝন বিদ্যুৎ... নির্মলের শরীর সে দিকে বেঁকে যেতে চায়। মরুভূমির সিংহের গা থেকে অবিরল সোনালী লাফে-লাফে ছড়িয়ে ফ্যালে তার বুক, তবু সে স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে। আজ থেকে দু' মাস আগে একদিন, কোনো-এক দিন, নিজের মনের ভুলে কখন সে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে সর্বান্তঃকরণে গলিয়ে দিয়েছিল তার পা, পথ ছেড়ে সেই থেকে ক্রমাগত বিপথে চলে গিয়ে আজ আর ফেরা বলতে কী থাকবে? আ, বুক উজাড় করে এবার একটা নিঃশ্বাস ফ্যালে নির্মল, ছোড়দির বাড়িতে একদিন সন্ধেবেলার একটিমাত্র ভুলে এক জীবনের ভুলচুক হয়ে গেছে।

গোল আলোবলয়ের নিচে ঐ বসে রয়েছে নির্মল সরকার। তার শরীর থেকে এখন শীতের বাষ্প বেরুচ্ছে। সে উঠছে না কেন। সরল বিশ্বাসে অতিথির বিদ নেওয়া একজন গৃহস্বামী হিসেবে অ্যা সেন্ট করার পর তার তো ওটাই উচি প্রতি মুহূর্তে সে একটা অপরিত্যাজ্য অ হয়ে উঠছে নির্মলের, ইতিমধ্যেই শারীরি ভাবে তাকে ফ্ল্যাট থেকে বের করে দে ক্ষমতা নির্মলের আর নেই। বোধহয় নি তাকে মুখেও আর চলে যেতে বল পারবে না। তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতস বাইরে সাইক্লোন শুরু হয়ে গেছে।
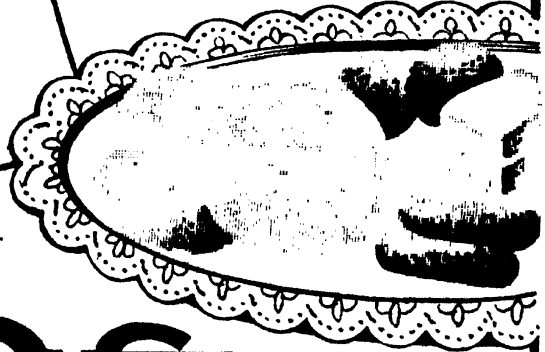
## তোমার নামেই ।। মণীন্দ্র রায়

তুমি, শুধু তোমার নামেই
তুমি, সর্বস্ব আমার,
তোমার নামেই লেখা আজীবন এই
কবিতার অক্লান্ত দলিল।
কৈশোরের ফুল আর পাখির ডানাতে
যৌবনের তারাভরা যন্ত্রণার রাতে
নিয়ত তোমারই দিকে, তোমার দিকেই
খোলা এই চোখের ঝিলমিল।

।। ২ ।।

যখনি দিয়েছি উঁকি মোজাইক মেঝের কুঠিতে,
বসেছি মিল-এর পাশে ভাঙা-বেঞ্চি চায়ের দোকানে,
ঘুরেছি নদীর ধারে, চলে গেছি চাষীর উঠানে,
বারে বারে নানা স্তরে দেখি যতো ছবি—
রঙিন কার্পেটে সেই কুকুরের মুখে ছোঁড়া রুটি,
অথবা এক-ভাঁড় চায়ে খুশির বঞ্চনা,
গুণটানা বাঁকানো দেহে ঘর্মাক্ত রোদ্দুর,
কিম্বা শূন্য মরাইয়ের অমানুষী চক্রান্তের দিকে
প্রশ্নময় চোখের ঝিলিক,
যা-কিছু দেখেছি আমি, এঁকেছি হৃদয়ে,
তুমি, শুধু তোমার নামেই
তুমি, সর্বস্ব আমার,
তোমার টানেই আজীবন
কবিতার মূর্তি গড়া এই।

।। ৩ ।।

যে আকাশ অযুত বছর
জেগে আছে মহীয়ান স্বাধীন স্বরাট,
অথচ রেশমকীটে গুটির উদরে যার খোলে না দুয়ার,
কেবলি গোপন অঙ্কে ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে বাড়ে রক্তচাপ,
কেবলি ধানের মাঠে ছুটে আসে বর্গীর বল্লম,
আর অন্ধ কোলাহলে শুধু আস্ফালন,
চতুর্দিকে মুখোশের আদিম উল্লাস,
কিম্বা কোনো অতিকায় ডাইনির মায়ায়
সুপ্তি-বিচরণে যেন দুঃস্বপ্নের ডাকে
অনন্ত আকাশ থেকে বহিষ্কৃত, আমরা মানুষ,
পাতালের জ্বালামুখে ঝুলে আছি অদৃশ্য সুতোয়।

আর, এই স্নায়ু-ছেঁড়া বুকচাপা দিনে
এই—যে শব্দকে খুঁজি মগ্ন উচ্চারণে
প্রেমিকার মতো তাকে স্পর্শ করি, আর
দামাল শিশুর মতো রাখি গালে গাল,
শব্দের মাটিতে এই-যে জন্ম-নেওয়া গাছের মতোই,
সে তো তুমি, তোমার নামেই
তুমি, সর্বস্ব আমার,
তোমার ডাকেই আমি খুঁজে ফিরি [illegible] কপাট—
আর আজীবন
অঙ্গারিত ক্রোমোজমে গড়ে চলি আজো
স্বপ্নগুলি, মগ্ন এই, আগুনের কাঠ।।

## প্রতীক্ষা রোজই তার ।। কৃষ্ণ ধর

রোজই প্রতীক্ষা তার আনন্দিত কোনো বা সংবাদ
এসে বসবে চায়ের টেবিলে প্রাত্যহিকে
হয়তো বা এইবার প্রসন্ন নিষ্পাপ কোনো মুখ
উঁকি দেবে জানালার ধারে চিরায়ত।

রোজই তার নিশ্চিন্ত হতাশা, রুষ্ট, ক্রুদ্ধ করতল
নিজেকেই যেন খোঁজে রক্তাক্ত নখরে অবিরত
ম্লানমুখ প্রতিবেশী, ভগ্নার্ত গলায় শুধু ডাকা
বাতাসে বারুদ-গন্ধ, শ্বাসকষ্ট এই অন্ধকারে।

তখনও চলেছে খোঁজা আঁকাবাঁকা কালির অক্ষরে
শব্দের বিচিত্র যাদু, চিত্রকল্প, ছন্দের চমক
মানুষেরই মতো করে নিরপেক্ষ কোনো বা আকৃতি
যাকে চিনি, যাকে জানি, যার সঙ্গে নিয়ত সংলাপ।

তাকেই তো আমরা চাই, পরস্পর মুখোমুখি বসা
যাকে নিয়ে থাকা যায় স্বাভাবিক মানুষের ঘরে
সাধারণ দুঃখসুখ কিংবা কোনো স্বপ্নেরই কথা
যার জন্য ভাবনা-চিন্তা, মাথাকোটা নির্মম পাথরে।

## মানুষ নেই ॥

রাম বসু

আমার নির্জনতায় তারা খসে পড়লো
ন' ইঞ্চি ফলা খোলা ছোরার মতো
তারা
ছোরা
আমার নির্জনতাকে এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে দিল

রাস্তায় ট্রাম চলছে, বাস চলছে, লোক চলছে
মানুষ নেই

কবে একদল আদিম মানুষ জ্বালিয়ে দিয়েছিল আকাশ
উপকথার সেই আকাশ এখন নিভে-আসা জঙ্গলের মতো
এখনও থ্যেৎলে-দেওয়া সাপের মতো ল্যাজের বাড়ি মারছে
হাওয়ায় উড়ছে ছাই, ফুলকি; হাওয়ায় হাওয়ায় গন্ধ

রাস্তায় কে যেন বলছে :
যারা ভুল করে না তারা কিছুই করে না
রাস্তায় কে যেন বলছে :
যারা ভুল ছাড়া আর কিছুই করে না, তারা কি করে?

রাস্তায় ট্রাম চলছে বাস চলছে আলো জ্বলছে
মানুষ নেই

আমার নির্জনতায় রক্তের গন্ধ
আমার ফসলের মাঠে আর্তনাদ
আমার গাছগুলো পাতা ফেলে দিয়ে মুখ ঢেকেছে
জ্যোৎস্নায় আমার নদী শাদা থানে মোড়া শব

শহর, বাসি ঠাণ্ডা মাংসের মতো শহর
মানুষে দানবে বোনা বিচিত্র শহর, দ্যাখো
নিমতলা থেকে চোখ মুছতে মুছতে এল সময়
দ্যাখো গঙ্গার জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে আহত যৌবন
তার মুখের এক পাশে পড়া চিতার আলোয় কি যেন নাচছে

আমার নির্জনতায় কে যেন ঘুরে দাঁড়াল, কে?

রাস্তায় ট্রাম চলছে বাস চলছে লোক চলছে
মানুষ নেই

## ভালবাসা কার ডাক নাম ॥

তরুণ সান্যাস

তাকে হয়ত ভালোবাসা ডাক নামে আজো ডাকা যায়,
কে জানে, আমার ঠিক জানা নেই, অন্য কেউ জানতে পারে
কারো জানা থাকতে পারে, অথবা কি জানি...

বাদল গড়িয়ে বেলা শরতের মেঘে উদাসীন
সন্ধ্যায় মলিন দূরে...অশ্রুপাতে রাঙা চোখ কেবলই বিদায়,
ছোট হয়ে আসে দিন, অন্ধকার বিপুল নিশ্চিত থাবা
দীর্ঘ, দীর্ঘতর হয়ে বিস্তৃত ছায়ায়
ম্লান ঝাঁকড়াচুলো ধুলোমোড়া গাছ কুয়াশায়
গা-ঢোল হিংস্র কাঁটা, আর
পাশব ধারালো রাস্তা বাঁকা তলোয়ার
কারো প্রতীক্ষায়
আষ্টেপাশে হাজার গলির বাঁকা নখে চোখ মটকে থাকে
আলো অন্ধকার—
যেন সব প্রলয়ের প্রণয়ের সাঁকোগুলি দুমড়ে খসে যায়
বিস্ফোরণ কালো হাতে উঠে যায়, ফেটে যায় নক্ষত্রে সুদূরে
মধ্যরাতে ভয়াল, কেবল রক্ত পাম্প করে সারা কলকাতায়
বিদ্যুতের শিরা বেয়ে ধক-ধক ডায়নামো
তপ্ত অঙ্গারিত দৃষ্টি, গলায় পিত্তের জ্বালা
ওঠে নূন, জাগরণ, নাকি জ্বর,
অথবা নাড়ির মধ্যে জন্মের মুহূর্তে কোনো
জননীর বিদীর্ণ যন্ত্রণা, নাকি
বেদনার প্লাবন, শ্রাবণ, স্মৃতি অন্ধকরা চৈতন্যের ঝড়?

কলকাতায় দিনরাত্রি ঘটাং ঘট ঘটাং ঘট দ্রুত কামরা ট্রেন
মধ্যরাতে অন্ধস্মৃতি ইয়ার্ডে ঘুমায়
গিঁঠে গিঁঠে বাঁধা লম্বা মালগাড়ি
ফাকজ্যোৎস্না পিছলে যায় লোকো শেডে, করোগেট চালায়
কে জানে-বা কোন ব্রীজে অন্ধ নীচে গোপনে কুটিল
জলের দু'ভাগ জিহ্বা নিভৃত ছোবল
ধ্বংসের গোপন চোরা মার
শব্দের ঝাঁকানি শুধু অভ্যাসে বিক্ষিপ্ত ছেঁড়া ঘুম...
একটি চূড়ান্ত টানে ঘোর দুর্ঘটনা

ভালোবাসা, তোর মুখ মনে পড়লে নেচে ওঠে
শ্যামলে উঁচানো কৃষ্ণচূড়া
চোখে জল ভরে আসে, আর রক্তবমনের শ্রমে
নাড়ি উল্টে আসা ঘৃণা দিগন্তে মলিন মূর্চ্ছা যায়
যা আমার নিরন্ত যন্ত্রণা

বিবাহ-মিছিল নয়, ভারি বুট, বিস্ফোরণ, সিসার অশ্লীল শিস,
ভালোবাসা, তোর কাছে এ-জন্মের মূল্য ফিরে চায়।

## রাবণের ফাঁদ ।। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

হতো সহজেই দ্যাখো পাখিদের বিঁধে আনো তুমি
দীর্ঘসূত্রী ঘুড়ির বল্লমে;
পুলিশেরও হাতে আছে নানান্ রঙের ঘুড়ি তাই
তোমার নাগাল পায় তার সাধ্যসময় কোথায়?
ইতিমধ্যে পাখিদের বিকিয়ে দিয়েছো তুমি আর
ভবন তুলেছো নয়া নতুন-নতুন আলিপুরে—
কীভাবে তোমার জামা তৈরি হয় অপরের ক্ষতির পশমে।

কোন খাতে শাস্তি পাবে তুমি বা পুলিশ, আমি ভাবি;
চোর-পুলিশ খেলায় দক্ষতা দিলে সেজন্যে বুঝি-বা
তোমার জিজিয়া-কর এক্ষুনি মকুব হতে পারে;
পাখির আসা ও যাওয়া বন্ধ করে দিলে এমন কি
অঢেল জায়গীরও পেতে পারো?
শুধু জানি আকাশেও রাবণের ফাঁদ পাতা ব'লে
জেনেশুনে নিলেমের শিকার হয়েছে সব পাখি!

## জেগে আছি ।। রত্নেশ্বর হাজরা

হাওয়া আসে
হাওয়া ফিরে যায়　　আমি
　　　　ঘুমুতে পারি না　　শুধু
রক্ত ভেসে যায় তার প্রত্যেক নদীতে　　তার
ফেরার সময়
প্রত্যেক উঠোনে লাল দোপাটিতে　　ঘাসে
　　　　সপ্তর্ষির মতো চিহ্নে
　　　　জেগে থাকে
যা কিছু স্বীকৃত তা-ই সত্য নয় সত্য নয় সত্য নয়—

শব্দ থেকে ছুটে যায় ধ্বনি
　　　　　　ধ্বনি প্রতিধ্বনি
চলে গেলে হাওয়া আসে
রাত্রি ফিরে যায়　　তার
　　　　আসার সময় কাঁপে প্রত্যেক নদীতে
　　　　প্রত্যেক জ্যোৎস্নায়　　আর
নদী চলে যায়
জ্যোৎস্না চলে যায়　　আমি
ঘুমুতে পারি না　　আমি কিছুতেই
　　　　ঘুমুতে পারি না—

## আমার ছায়া আমায় ।। শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার ছায়া আমায় করে আঘাত!
ভিতরে যাই বাহিরে যাই তখন করে আঘাত,
যেন সে চায়, আমার মরে যাওয়া...
যেন সে চায়, আমার ফাঁকা হাওয়ায়
দুহাত তুলে একক জেগে থাকাই...

আমার ছায়া আমায় করে আঘাত!

ওদের ছায়া আমায় করে আঘাত
রক্ত খেয়ে আঁচায় আর দুপাশে চোখ নাচায়
হাড়ের কাঠি ভয়াল লাঠি কাদের মেরে বাঁচায়?
ওদের ছায়া আমায় করে আঘাত!
বলার মতো কিছুই নেই, যখন নিজ বাঁহাত
নিজেরি ডান হাতকে দেয় কামড়
স্কন্ধকাটা, আপন দোষে পামর!

## যখন মনে ছায়া পড়ে । শ্যামসুন্দর দে

আমার হৃদয়টাকে আমি কখনো দেখিনি
প্রতিক্ষণ অনুভবে যদিও ঘোষণা
আমাদের আশেপাশে দৃশ্যপট
শরীরী আকার নিয়ে কত না কাহিনী
অথবা বাতাসে বয়ে-আসা কথাগুলো
সে সবের যোগফলে আমার হৃদয় উথাল-পাথাল।
যখন আমার মনে ছায়া পড়ে
একান্ত বন্ধুর কোন বিয়োগান্ত ছবি
চোখে যার আঁকা ছিল এক স্বপনেরই রেখা
যে আমার প্রিয় বন্ধু—দৃষ্টির আড়ালে
কোনদিন দেখিনিতো মুখচ্ছবি।
আমার প্রিয় কোরক ছিঁড়ে দিল
হিংসার বিকৃত নোখ।
নিহত কোরক তার দাউ দাউ আগুনের জ্বালা
বুকের আড়ালে ঢাকা হৃদয় তখন
শরীরী আকার ছেড়ে পরিব্যাপ্ত বিশ্বে
হাজার কথায় যেন ফেটে পড়ে
বাদল-বিদ্যুতে লেখে ইতিহাস।
যদিও চোখে দেখিনি হৃদয়টাকে
দুরান্তের ফুলগুলি দূরে দূরে ফোটে।

## নব তরঙ্গ ।। সত্যানন্দ ভট্টাচার্য

যে ভাষা হতে পারেনি মুখর
ছিল মূক
লুঠেরা পিশাচের আলিঙ্গনে
বুনো-অমার্জিত অভিধান তার—
অপাংক্তেয়—উপন্যাসে কাব্যের কথায়।
আজ মুক্তিস্নান
তাদের বিদেহী সুরে নবীনের কণ্ঠ ভরপুর।।

তারই কল্লোলিত ধ্বনি কালের দরবারে
খুঁড়ে বহু বসন্তের কবর
আসে নিয়ে ভোরের স্বপ্নের খবর।
মুক্ত জীবনের স্পৃহা—
করে চুরমার বন্দেদী শৃঙ্খলা
চলতি চিন্তার সৌধ ধূলিতে লোটায়।
গর্বোদ্ধতের রোশনাই
বহু অযুত বর্ষ পরে, যায় দ্বীপান্তরে
নির্জন চির অবসরে।।

লাঞ্ছিতের ঘৃণা ফুঁসেছে আক্রোশে—
কলনাদে উচ্ছ্বসিত বেগে যায় ধেয়ে
চৌচির প্রতিষ্ঠার বাঁধ দুরপনেয়
তাই গুঞ্জন নয়—উঠেছে বিভৎস আর্তনাদ
ফসিলের কণ্ঠ বেয়ে।

মেদহারা কঙ্কাল তুলেছে শির
দশন-প্রকট—প্রতিপক্ষের ভীতি-বিভীষিকা।
বুকচাপা বঞ্চনা জ্বালায় আগুন
খেত ও খামারে,
জাগৃতির শুকতারা হাসে
শোণিতের বিন্দুতে মুক্তির বারতা।

শ্রমিক কিষাণের জঙ্গী মন
গুচ্ছবাঁধা এক চেতনায়
বারুদের গন্ধেই
জনতার নির্দিষ্ট প্রত্যয়
সংঘাতী বার্তা গ্রামে জনপদে
নগরে নগরে তার আগমনী
অবরোধ দুর্জয় ঘনায়।

## রক্তে খুঁজি ।। গণেশ বসু

তাহলে আবার এলো ফিরে এলো সে-বুনো স্মৃতির কারাগার
আবার বাতাসে কাঁপে বিপন্ন যৌবন লাখো রাতের চূড়ায়
জমাট রক্তের পদ্ম মাথা খোঁড়ে, পেশীর মাদলে হাহাকার
দ্রিমিকি দ্রিমিকি জ্বলে ফসফরাস, কোন্‌দিকে যাবে বা কোথায়
গ্রাশন চাঁড়াল, অন্ধকারে হাসে।

দীর্ঘবেলা বয়ে গেল, দীর্ণ শ্বাস, অশ্রু হু-হু মাটির ওপর
ঝরানো পালক শাদা, আত্মদাহ, সময়ের সে-দাবি মেটাতে
বেঁচে আছি আন্দোলিত মেঘে বা শিকলে দীর্ঘ,
আপোষের দামাল কবর

দীর্ঘবেলা বয়ে গেল মুখর শব্দের ওম পারেনি ফোটাতে
ক্রোধের গভীর থেকে যন্ত্রণার স্বর্ণচাঁপা মাঝারিপনার দীনতায়
গ্রাশন চাঁড়াল হাসে, রক্তে খুঁজি অন্য পথ
আগুনের সে-ঝোড়ো ডানায়

## কাপুরুষের জন্ম ও জীবন বৃত্তান্ত ।। গৌরাঙ্গ ভৌমিক

জন্মের সময়
তুমি আমাকে মুড়ে দিয়েছিলে মৃত হরিণীর ছালে।
চোখ মেলেই দেখেছিলাম, একটি স্ট্যাচুর মুখ,
আর, কয়েকটি মৃত প্রজাপতি ও মৌমাছির পালক

যৌবনে আমি সৈনিক হয়েছিলাম,
তুমি বলেছিলে : 'সাহসে বুক বেঁধো।'
আমি পোষাক বানিয়েছিলাম, মৃত বাঘের ছালে।

আজ চতুর্দিকে শনশন ঝাউয়ের শব্দ।
আমি ফিরে এসেছি দীর্ঘতর উপকূলে।

তুমি বলেছিলে : 'সীমান্ত বদলের সময় দর্পণের সামনে দাঁড়িও।
সূর্যোদয়ের আগে গল্প করো নক্ষত্রের সঙ্গে।'

আমি নদীর আয়নায় নিজের মুখ দেখলাম,
অসম্ভব রুগ্ন, এক কাতর মুখ।
একটি মানুষ এখন ফিরে যাচ্ছে নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্র হয়ে।

## ভোর হতেই ॥

আশিস সান্যাল

সমস্ত রাত ধরে একটা হিংস্র অন্ধকার
বুকের চারপাশে
শব্দহীন হেঁটে বেড়ালো।
তারপর ভোর হতেই
ডানা ঝটপট করে
উড়ে গেলো এক অবিস্মরণীয় স্তব্ধতার দিকে।

অনেকটা দূরে
দেখা গেল,
এক ঝাঁক শব্দহীন রাজহাঁস
উত্তাল সমুদ্র ছুঁয়ে
ভেসে আসছে।
প্রভাতের সিংহ-দরজায়
তাদের প্রতিধ্বনি।

মনে হলো যেন অনাদিকাল ধরেই
কুটিল হিংস্রতা
বুকের মধ্যে ঝটপট করছিলো।
আর সমস্ত রাত
তার পদচারণার শব্দে
কেঁপে কেঁপে উঠছিলো।

ভোর হতেই
ত্রস্ত হরিণের মতো সেই অন্ধকার
ছুটে পালালো
অন্য এক নিরাবরণ স্তব্ধতার দিকে।
সমস্ত আকাশ
তোমার মুখের মতো প্রত্যাশায় অন্ধকার জ্বলে উঠলো।

## আনবে কি ?॥

সুমিত চক্রবর্তী

আকাশে আকাশে নিঃসীমে
পাহাড়বন্দী গ্রামের ঢেউ
শিমুল কুসুম রঙ্‌-য়ের ফেউ
হায়! জীবনের রঞ্জনা।

বাতাসে বাতাসে ডাকছে কে?
সুদূরে প্রহর গুনছে কে?
গুহার গর্ভে কিসের দীপ
গুল্মলতার প্রচ্ছদে?

না হয় থাকুক দুঃস্থ যুগ
সময় বিভোর দুর্গমে
আজ বেদনার দীর্ঘশ্বাস
রৌদ্রালু দিন আনবে কি?

## সঙ্গ নিঃসঙ্গতার দিনলিপি ॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

পরিবর্তে আমাকে দাও উন্মোচিত দুঃখ উন্মোথিত আনন্দ
আমাকে দাও নগ্ন আত্মার আলিঙ্গন
পুণ্য স্পর্শের প্রশ্নহীন সান্ত্বনা
আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি দিয়েছি মৃত্যুকেও

এই তো আমার পারাপারহীন জীবন—
গন্ধবিহীন প্রস্ফুটিত জাগরণ
এই তো আমি খুলে রেখেছি ধুলোয় আমার নাম—আমার
অলিখিত পরিচয়পত্র
দেবার মতন কিছুই নেই আলোও নয় ছায়াও নয়
দগ্ধ দিনে ছড়িয়ে দেবো দীর্ঘ ছায়া এমন হাত শরীরে নেই
কাঁধের পাশে ঝুলন্ত অক্ষমতা
শুধু নিতে পারে দিতে পারে না কিছুই

এই তো আমার পারাপারহীন জীবন—
গন্ধবিহীন প্রস্ফুটিত জাগরণ

আমাকে করুণা দাও
দাও উন্মোচিত দুঃখ
উন্মোথিত আনন্দ
আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি দিয়েছি মৃত্যুকেও

## কস্মৈ দেবায় ॥

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে
সোচ্চার মন্ত্র করে পাঠ
ঘন পত্র অরণ্য মর্মর,
মুখরিত সাম গান
নদী কলতানে,
বোধায়ন অবতংস ব্যঞ্জনামুখর
সু-উচ্চ সঘন তত
অধরার আকুতি শিহর,
তপোবন নিনাদিত স্বস্তি সম্ভাষণে
অগ্নিদেবায় স্বাহা।

কিন্তু সে কোন্‌ অগ্নি?
জোহু নাম যার
বেদযজ্ঞ পীঠ ভূমে,
অথবা সে খাণ্ডব দাহনে
পরিতৃপ্ত হয় নাই
তরুণ গরুড় ক্ষুধা যার?

# আণ্ডারগ্রাউণ্ড ছবি

কিছুকাল পূর্বে, বছর দুই বা তিন হবে বোধ করি, কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে ওঁদেরই নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে প্রথম কিছু 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড' ছায়াছবি দেখবার সুযোগ ঘটে।

তখন অবশ্য অতীত জীবনের কৈশোর বা প্রথম যৌবনের সেই বিস্ময়বহুল দশা বহু পূর্বেই কেটে গেছে, যখন 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' শব্দটা মনের মধ্যে একটা অনুচ্চার কৌতূহলের আবর্ত সৃষ্টি করত। বিশেষ এক ধরণের আন্দোলনকারীদের বা আইনের কবল থেকে মুক্তি প্রয়াসে তৎপর ব্যক্তি সম্পর্কেই এই কথাটার ব্যবহার, সেই তখন শুনে-শুনে অপার বিস্ময়ে ভাবতাম কি করে এইসব নির্ভীক, বেপরোয়া ব্যক্তিরা দিনের পর দিন পাতালপুরীর গোপন অন্ধকারে বসে আপনাদের কর্মকাণ্ড ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের চোখে ধুলো দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন। আবার লজ্জায় কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও পারতাম না, কোথায় যেন বাধতো—কি জানি, যদি কোন আপন অজ্ঞতা প্রকাশ পায়! তাই চুপ করেই থাকতাম।

অবশেষে একদিন যখন এই অজ্ঞতা-প্রসূত যন্ত্রণার অবসান হ'ল, শব্দটির তাত্ত্বিক অর্থ মোটামুটি উপলব্ধির গোচরে এল, তখনও কিন্তু এই দুঃসাহসিকদের সম্বন্ধে সম্ভ্রম বোধটা পুরোপুরি বিলুপ্ত হল না। ক্রমে চিত্র-সাংবাদিকতার কর্ম-জীবনের অনুভূতির পর্দায় একদিন 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' ছবির অভ্যুদয় ঘটল। বিস্ময়ে যতোটা নয়, কৌতূহল তার চাইতে অনেক প্রবল হল। কি এই শ্রেণীর ছবির মৌলিক বক্তব্য? কোথায় অন্য ছবির সংগে এর চারিত্রিক বিভেদ রেখা? তখনও ভারতের মাটিতে এই শ্রেণীর ছবির আমদানী ঠিক ঘটেনি, তাই জিগীষাটা ভেতরে রয়ে ও বেড়েই গেল, বিদেশের পত্র-পত্রিকায় এই সম্বন্ধে সমালোচনা ও নিবন্ধাদি পড়ে। কি তার ভাব, কিবা তার ভাষা, সে সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ ধারণা হল না, ছবি দেখার সুযোগ না পেয়ে। প্রথম যখন দেখলাম, তখনও খুব একটা সুস্পষ্ট প্রত্যয় মনে গড়ে উঠল না।

মেরা নাম জোকার / পদ্মিনী

সম্প্রতি কিছুদিন হ'ল এই ম্যাকস্-ম্যুলার ভবনেরই উদ্যোগে; ও'দের সেই প্রেক্ষাগৃহেই আবার কিছু আন্ডারগ্রাউন্ড ফিল্ম দেখলাম। ঠিক পরে পরেই এই একই উদ্যোক্তাদের আয়োজনে আর একটি স্মরণীয় চিত্র প্রদর্শনেরও অনুষ্ঠান ঘটে অ্যাকাডেমী অব্ ফাইন আর্টস-এর প্রেক্ষাগৃহে; 'ওবারহাউসেন ইন্ ইণ্ডিয়া ৭০' এই নামে। যেখানে দেখানো হয় জার্মানীর ওবারহাউসেন সর্ট ফিল্মস ফেস্টিভ্যালের জুরীগণ কর্তৃক 'শ্রেষ্ঠ' ব'লে নির্বাচিত বিভিন্ন দেশের হ্রস্বাকার চিত্রসমূহ থেকে নির্বাচিত এক চিত্রমালা। এই দ্বিবিধ ছবি দেখানোরই মূল উদ্দেশ্য এদেশের উন্নত স্তরের চলচ্চিত্র-আগ্রহী, শিক্ষার্থী ও চলচ্চিত্র-কারিগরদের মনে একটা সুস্পষ্ট আশ্বাস গ'ড়ে উঠতে দেওয়া,—চিত্রশিল্পের এই দুটি নবজাতকের শৈল্পিক, বৈজ্ঞানিক এবং আত্মিক ব্যাখ্যান ব্যাপারে।

আন্ডারগ্রাউন্ড ফিল্মের তালিকায় যেসব ছবি ছিল মোটামুটি তাদের নাম এইরকম:
Note from above (Great Britain); Water Melon (Great Britain); The Bed (U.S.A.); The Sweet Home (Holland); San Francisco Great Britain); Invocation (Great Britain); Film 68 (Federal Republic of Germany);

ইত্যাদি। এর মধ্যে যে ছবিগুলি দেখানো সম্ভব হল আমাদের, তার মধ্যে শেষোক্ত দুটি ছবি বাদ পড়েছিল। এই প্রদর্শিত ছবিগুলির আলোচনায় পরে সুযোগমত যাওয়া যেতে পারে।

'আন্ডারগ্রাউন্ড ছবিগুলি (সেই সঙ্গে খণ্ডচিত্রও) নিয়ে পাশ্চাত্যে আজ যেসব বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তত্ত্বাকারে নয়, হাতেনাতে, তাতে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, এই ছবিগুলির বিশেষ প্রকরণের ও সূক্ষ্মশ্রেণীর আঙ্গিকের যে দ্রুত হেরফের ঘটছে এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতের স্বাদের ছবিগুলির পরিকল্পনা ও রূপায়ণপন্থা তত্তে—বিশিষ্ট গবেষক-চিত্র দের শিল্পমাধ্যমে, তার প্রথম লক্ষ্যস্থল থিয়েট্রিক্যাল সিনেমার পুরোনো নৈ ও শৈল্পিক বিধিবন্ধ চিরাচরণের স্বৈরমৈরীর গণ্ডীর বাইরে এই অভিনব আধুনিক শিল্পমাধ্যমটিকে এক দুঃসা কতারমণ্ডিত স্বরূপকল্প দেওয়া, যার প্রকৃত শিল্পরসসঞ্চারনপুষ্ট, গোড়া মানবমন শিল্পটিকে তার রূপ, রীতি কল্পনার এতোকালের বন্দীদশা সজোরে উদ্ধার করে বাইরে এনে ছেড়ে দেবে একটা নতুন স্বচ্ছ ও মুক্ত শি প্রবাহের চলমান স্রোতে, যেখানে সে খ পাবে নতুন শিল্পজীবনের এষণা, অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা, নতুন শি অভিযানের প্রাণাতিসার।

চিত্ররসিকমনে এখন স্বতঃই প্রশ্ন উ পারে 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ফিল্মের য পার্থক্য কোথায় অন্য সেইসব অগ্র শিল্পরূপ ও রীতিচিহ্নিত ছবির যেগুলি ঐ তাদের মতে প্রকৃত শি অপাংক্তেয় থিয়েট্রিক্যাল সিনেমার এতোকাল উন্নতনাসিক আভিজাত্য পরিহার করে এসেছে, অথচ যারা আ গ্রাউন্ড ছবি নয়। এই শ্রেণীর আত্মি মর্যাদাবিশিষ্ট ছবির ভিন্ন দেশের কালের পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন নাম ঘটেছে। যেমন আভাগার্দ, নিউও নিউ এজ ইত্যাদি। মোটামুটি আলো সুবিধার্থে এদের সবগুলোকেই আভাগার্দ ছবির কল্পনাপুষ্ট বলে উ করা যাক এক্ষেত্রে।

একথা আজ 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছ স্রষ্টারা মেনে নিয়েছেন যে মূলগত দৈ ও আত্মিক রূপ বিশ্লেষণে ও বিচারে তেমনভাবেই এদের বলা চলে আভা ছবির উন্নততর সমগোত্রীয় ব'লে যেমন বলা চলে আজকের যুগের সি ভ্যারিটি-কে গতকালের প্রথাবদ্ধ ডকুমে বা প্রামাণ্য চিত্রের সর্বাধুনিক সং রূপে। অবশ্য 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির মতবাদীদের মতে এটাও এক ভ্রমাত্মক অন্যায় রূপবিশ্লেষণ। এর থেকে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে পূর্বে ছবির বীজ থেকেই এই ফল জন্ম নিয়ে এ'রা বলতে চান, 'আন্ডার গ্রাউন্ড' আভাগার্দ ছবিরই স্বাভাবিক আ নয়, কোথাও কিছু কিছু সৌসাদৃশ্য সত্ত্বেও। আগে একটা শিল্পরূপ ঘ জীবনের নিয়ত পরিবর্তনশীল আবহে প্রবাহের প্রভাবে সেটার দ্রুত বৈপ্ল ধারার রূপান্তর ঘটছে। এবং যে যথার্থ শিল্পসৃষ্টি নিত্যনতুন স্ব প্রকার-প্রকরণ আবিষ্কারের মেখলামু হয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না চায় না সেহেতু পূর্বকার শিল্পের প্র রূপ ও ভাবনাধারার সঙ্গে মানবদেশ বংশস্রোতধারায় প্রাকৃতিক নিয়মে কি

একাত্মরূপ ও ভাববোধ তার থাকবেই। কেননা উদ্ধত বিপ্লবী শিল্পস্রষ্টার ঠেকারিতাযোগে যদি কিছু তথাকথিত সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি রচিত হয়ও তবে তাদের অন্তিম স্থানলাভ ঘটবে মিউজিয়াম'-এর চিরশীতল ক্রোড়ে, কেবলমাত্র ঐতিহাসিক আগ্রহসূচক হ'য়ে। অনন্ত, নিরবধিকালের সদাগ্রসর স্রোতে সন্তরণশীল মানবজাতির শিল্পসৃষ্টি-মহিমা সর্বদাই ভাবধারার নতুন কায়কল্পকে চিন্তায় ও কর্মে গঠন করে নতুন দিনের ভাবধারার সঙ্গে সেই স্রোতের মেলবন্ধন রচনা করে। তেমনি করেই এসেছে আজ 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ফিল্ম, আভাগার্দ ছবির স্রোতধারার শিল্পসমুদ্রমুখী প্রবল আকর্ষণে।

আবার বিশেষজ্ঞরা এও বলেছেন, 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির সঙ্গে পূর্বেকার আভাগার্দ ছবির মূলগত পার্থক্য কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রের তুলনাগত বিচারে বা পারস্পরিক বিভেদ বিচারে নয়, পার্থক্য হলো উভয়ের এম্‌ফ্যাসিস বা গভীরতর আত্মমুদ্রণ প্রকৃতির বিভিন্নতায়। অর্থাৎ সোজা কথায়, এ প্রভেদ শিল্পপদ্ধতির ও তাদের বিশেষ বক্তব্য রীতির। তাদের বক্তব্যের বিশ্লেষণভঙ্গীর তীক্ষ্ণতা বা তার উপর গুরুত্ব স্থাপনের নির্ণয়-নীতির প্রভেদ। পাশ্চাত্যে আজ এ নিয়ে নানা পরীক্ষা সমীক্ষণ, নানা চিন্তাধারা ও কলাকৌশলের অভিযান চলেছে। এবং এ কথা আজ স্বীকৃত যে আভাগার্দ ছবি ও 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির বহিরাঙ্গের কিছু মিল থাকলেও পার্থক্য অনেক। প্রথমটা হলো প্রচলিত ফিল্ম শিল্প, যার আসন কমার্শিয়াল চিত্রেরই পাটে। তারই যোগ্য নতুন নতুন, চিন্তাধারা, বিষয়বস্তু ও চিত্রগ্রহণের রীতি ও প্রকৃতি নিয়ে 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির নানাবিধ নতুন পথের সন্ধানে অভিযাত্রা—যা পরিণতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করতে পারবে শুধু চলচ্চিত্রের শিল্পমাধ্যমের উপরেই নয়, তারই মধ্য দিয়ে গোটা দেশের ও জাতির ও বিশ্বসমাজের উপরে। কিন্তু 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ফিল্ম-এর কল্পনা ও বিস্তারের মর্মরূপ অনেক বেশী আপোষবিহীন, গম্ভীর এবং সমর্পিত আদর্শে আস্থাবান। এর স্রষ্টারা নাকি বিশ্বাস করে যে হলিউড এবং টি-ভি আপনাপন পথানুসরণেই চলবে, আভাগার্দ ছবিও তারই সূক্ষ্মতর, কিছুটা বিদ্রোহাত্মক সংস্করণ, কিন্তু মূলত বিভিন্ন গোষ্ঠির নয়। 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির মানসিকতা ও পথ, এর অনুগামীরা বলেন, নন-থিয়েট্রিক্যাল সিনেমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সমান্তরাল দূরত্বে, গতিতে, আত্মপ্রক্ষেপণে। এককথায় তাকে বলা যায় প্যারালাল সিনেমা।

১৯৩০ সালে প্রামাণ্য চিত্রগ্রহণ পদ্ধতির যখন এক বিস্ময়কর অভ্যুত্থান ঘটল গ্রেট ব্রিটেনে, ফ্লাহার্টির নানুক অফ দি নর্থ বা ওয়াইন্ড উয়িংস প্রভৃতি স্মরণীয় কয়েকটি চিত্রের মারফতে, তখন সেই সব চিত্রে ব্রতী হলেন যাঁরা তাঁরা বিদায় নিলেন পুরোনো মামুলী প্রথায় অর্থলগ্নীকারদের কাছ থেকে, আর সেই সঙ্গে নতুন আর্থিক ঝুঁকির মুখোমুখি হয়ে আপন গরজেই বিদায় দিলেন পুরোনো টেকনিকের শিল্প-আঙ্গিককেও। কিন্তু এ'দের তৈরী প্রামাণ্য চিত্রের আত্মিক রূপটা কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়াসী ছিল না, যদিও তাদেরও নয়নে ও ভঙ্গীতে ছিল অনেকখানি প্রসারিত দৃষ্টি, কল্পনায় বিস্তার আগামী দিনের প্রতি। কিন্তু যে ছবি মূল কল্পনাতেই ননথিয়েট্রিক্যাল দর্শকের জন্য বা এমন দর্শকের জন্য যাঁরা প্রথমত নয়, দ্বিতীয়ত থিয়েট্রিক্যাল দর্শক (কিছুটা গভীরতর অর্থে), সেই আন্ডার গ্রাউন্ড ফিল্ম এলো একটা সম্পূর্ণ ভিন্নতর স্বাদের, বলিষ্ঠতার ও বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে, তারা হতে চাইল নতুন প্রজাতির ভাব স্বাধীনতার দিগ্‌দর্শক, যা মানবে না মানুষের গড়া কোন বিধিনিষেধের আরোপ; সেন্সর প্রথার বা সমাজশাসনের ভ্রূকুটি যারা অগ্রাহ্য করবে। স্বভাবতই তাঁরা থিয়েট্রিক্যাল সিনেমাতে পৌঁছুবার রাস্তায় প্রবেশাধিকার পাবে না, এবং এবম্বিধ দর্শক তার কাম্যও নয়। তার প্রদর্শনক্ষেত্রও তাই সীমিত হল ভিন্নতর গণ্ডীতে, প্রাইভেট বা স্পেশালাইসড দর্শকের শিল্প-অনুশীলনার্থে। কাজেই বলা চলে, 'আন্ডার গ্রাউন্ড' ছবির দর্শক ও সমর্থক এক ভিন্ন তকমায় মণ্ডিত। তাঁরা এক নতুন সিনেমা-দর্শনের প্রতীক। যেমন ধরুন বীট পোএমস্‌, নবতর রূপের ফোকমিউজিক বা পপ-মিউজিক, যার প্রভাব আজ জন থেকে বহু জনান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাকে আগে বহুজনের ভাল না লাগতে পারে শ্লীলতার, সামাজিক রীতিনীতির বা শিল্পাদর্শের জটিল মানের প্রশ্নে। সেই সঙ্গেই আছে সাধারণ দর্শক বা রীতিবদ্ধ সমালোচকের কাছে অনেকখানি দুর্বোধ্যতার প্রশ্ন। কিন্তু তবু তার বার্তা তার ভৈরব কল্লোল নিয়ে আজ সমাজের মনের তটপ্রান্তে সমাগতপ্রায়। এবং তার ভাবভঙ্গী দেখে ঠিক এমন মনে করার কারণ নেই যে আজকের সিনেমার এই নবরূপকল্প আধুনিক যুগের দর্শকের ভাবধারাকে আচ্ছন্ন করবার প্রয়াসে হার মেনে অবশেষে পুরোনো দিনের চিত্রাদর্শের কাছে নতিস্বীকার করে স্বার থেকেই বিদায় নেবে। তা সে যতোই কেননা আজাদের অত্যান্ত রুচিতে আঘাত করুক, দুর্বোধ বলে অভিহিত হোক, নগ্নতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার পতাকাবাহী বলে রক্তচক্ষুশাসিত হোক। শিল্পে এই নব জলতরঙ্গ নিরুদ্ধ হবে কি আগামী যুগের দর্শকমনকে প্লাবিত করবে বলা কঠিন। কিন্তু তাকে প্রতিহত করাও কঠিন কার্য বলে মনে হয়। কেননা এ প্রশ্ন পুরাতনের সঙ্গে নবীনের ভাবযুদ্ধের প্রশ্ন।

# দেবিকা রানী

**বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য**

জীবনের সব আশা পূর্ণ হয়েছে এমন লোকের সঙ্গে আজও দেখা হলো না। মানুষের জীবনে কি চাই? ঐশ্বর্য, রূপ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এর কোনটা পান নি দেবিকারানী? ঐশ্বর্যের আলোচনা না-ই করলাম সেটা কে না জানেন? রূপ! আজও যেন ঠিক কুড়ি বছর আগের দেখা মূর্তিটাই দেখছি। এটা সত্যিই একটা অদ্ভুত আশ্চর্য ঘটনা।

আমি নিজে সিনেমায় কখনও বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলাম না। বছর সতেরো আগে দেবিকারানীর অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে দু একটা নাম-করা ছায়াচিত্রের পরিচয় পেয়েছি। সময় পাই নি। জীবন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত বাড়ীতে, পথে, ঘাটে অভিনয় দেখে এত ব্যস্ততার ভিতর সময় কেটেছে, কাটছে অভিনয় দেখার সময় জোটে নি। কি আশ্চর্য ঘটনা। কোত্থেকে ছিটকে পড়ে ঠেকলাম গিয়ে সেই অভিনয় জগতে, আজও যার সঙ্গে আমার পরিচয় মোটেই নিবিড় হয়ে উঠলো না।

তাঁকে শুধু একজন সাধারণ অভিনেত্রী হিসেবে ভাবতেই পারি না। সতেরো বছরে অন্ততঃ একহাজার চিঠি ও সতেরোশো ঘণ্টার নিবিড় আলোচনায় তাঁকে দেখেছি বিভিন্ন রূপে। বিশ্ববন্দিত দার্শনিক সর্বো-পল্লী রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে ঘণ্টার পর দর্শন আলোচনা করতে পারেন ক'জন অভিনেত্রী? দেবিকারানীকে সেই আলোচনা করতে। অন্তত পঞ্চ আমাকে তিনি নিয়ে গেছেন সঙ্গে, অকারণে। লাভটা আমারই হয়েছে। জ একটা নতুন জানালা খুলেছে। ত পরিধিটা কত বড়, জানার পরিমাণটা সেটা যেন আরও বেড়ে যায়।

একদিন ঘণ্টা তিনেক ধরে শোনাচ্ছিলেন কিভাবে 'অচ্ছুত কন্যা' তৈরী করেছিলেন। বলতে ভারী লজ্জা ততদিনে, তেইশ বছর বয়সে মাত্র সিনেমা দেখেছিলাম। তার ভিতর কন্যা' ছিল না। আমার 'ব্লাঙ্ক' দৃ ধূর্ত্তিদীপ্ত নজর এড়ায় নি। ঠিক ফেলেছেন। বললেন, 'তুমি তো মাত্র সিনেমা দেখেছো। তার ভিতর এটা কি?'

বললাম, 'আজ্ঞে বলার কিছু মানে, দেখো নি।

শিক্ষা বিভাগে কাকে টেলিফোন লেন। তখন কালচারাল সোসাইটি ফিল্মস্ বলে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। মহেন্দ্রনাথ তার একজন কর্তা তাকে বললেন পরদিনই সাপ্রু হাউসে কন্যা' দেখাবার আয়োজন করতে। বললেন বন্দোবস্ত যেন সব ঠিকভাবে তার 'বন্ধুকে দেখানো হবে এ

আমাকে বললেন যতজন খুশী নিয়ে সিনেমাটা দেখে আসতে। বলতে ছুটলুম না। যাকে পেলাম তাকেই নিয়ে গেলাম। একজন বাংলার এ্যানাউন্সার কমলা গুপ্তা। কে কে যেন ছিলেন। গিয়ে দাঁড়ালুম হয়ে গেছে। তবুও বই শুরু হচ্ছে না। ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করলেন। তোমাকে তামাসা করেছেন দেবিকারানী। তুমি পারো নি।

মনে মনে ভাবলুম আমি কি ততখানি বেকুব? মালা ফুল নিয়ে দ জন কর্মব্যক্তি দাঁড়িয়েছিলেন।

ভয়ে ভয়ে গিয়ে একজনকে জি করলুম মশাই এখানে আজ 'অচ্ছুত দেখানো হবার কথা ছিল। সেটা হবে

তিনি বললেন হবে। নিশ্চয়ই আমরা দেবিকারানীর বন্ধুর অ দাঁড়িয়ে। তিনি এলেই শুরু করে হবে।

বিনীতভাবে নিবেদন করলাম বন্ধু কিনা জানি না, তবে আমাকে এই সিনেমাটা দেখতে দেবিকা পাঠিয়েছেন। নামটা পেশ করলুম। ব্যস্তসমস্তভাবে সবাই মিলে ভিতরে বসালেন। আদর আপ্যায়নের ঠেলায় অতিষ্ঠ হবার জোগাড়। আমি হাঁ সিনেমাটা দেখলাম বসে বসে। লোক মাঝে মাঝে বিরক্ত করছিল। ঠান্ডা পানীয় নিয়ে। সিনেমা দেখে ফেরার জনতাজন কম নাকি। একরাশ ফুল

তোড়া তোড়া সাজিয়ে ব্যস্তভাবে এ, ও, সে, হাজির। ফুলগুলো যেন দেবিকারানীকে পৌঁছে দি আমি। একটা ফুলও আমি স্পর্শ করলাম না। বন্ধুর জন্য ফুলগুলো এসেছিল। সাদামাটা কটুর চেহারা দেখে ওরা স্ট্যাটেজিটা বদলে দিল। আমি বললাম ফুলগুলো দয়া করে ইন্দিরাদের পাঠিয়ে দেবেন কার্ড লাগিয়ে। অন্যের দেওয়া ফুল নিজের হাতে কখনও দিই না আমি।

তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে উঠলাম।

পরদিন সকালবেলা সংগীত-নাটক একাডেমির অফিসে বসলাম গিয়ে। বললেন, কেমন দেখলে? আমি তখনও তাঁর দিকে তাকিয়ে হাঁ করে। ঠিক যেন একটা বাঙাল সদ্য শিয়ালদা থেকে নেমে ট্রাম, বাসগুলো ছুটতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে।

কি দেখছো?

না কিছু না।

তা হবে না। বলতে হবে।

আবার বললাম কিছু না।

তবে অমনভাবে কি দেখছো।

কিছু অন্যায় হচ্ছে?

না ঠিক তা নয়। চরিত্তিরটা জানি তোমার। না হলে মেয়েদের অত নিকটে তুমি ঘেঁসতে পারতে না। তবুও আমার কৌতূহল জাগছে বইকি। কি দেখছো বলো।

বললাম আপনাকে দেখছি।

কি আশ্চর্য! এতগুলো বসন্ত এলো, গেলো, তার একটা রেখা পর্যন্ত ফেলে যায় নি রমণীয় মুখে।

বললাম, কি করে হলো এটা? কিভাবে এটা সম্ভবপর? আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না? কেমন দেখলে?

হেসে বললাম, আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব না পেলে আপনারটার জবাব দেব না।

শুধু প্রশ্নের কাটাকাটিতেই চাকরীটা জুটেছিল একদিন। সেসব আজ নিশ্চয়ই ফাঁস করে দেব না।

দিনের কাজ শুরু হয়ে গেল।

তেষট্টি সালের অখিল ভারতীয় ফিল্ম সেমিনার ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সাহিত্যিক, আর্টিস্ট, অভিনেত্রী, অভিনেতার এক মহামিলন। মিলন কেন্দ্র স্বাধীন ভারতের রাজধানী মহানগরী দিল্লী। এর পুরোধা ছিলেন দেবিকারানী। সেখানে প্রতিদিন দেখেছি বাংলা দেশের লেখক, বাঙালী অভিনেতা, অভিনেত্রীদের ওপর স্নেহমাখা নজর।

আলোচনার স্মারকলিপিতে, প্রচারপত্রে সব জায়গাতেই বাংলা দিয়ে সব কাজ শুরু।

পরিহাস করে ভারত সরকারের একজন কর্তাব্যক্তিই প্রশ্ন করেছিলেন। ম্যাডাম, সব জায়গাতেই দেখছি বাংলা দেশ দিয়েই শুরু। লিস্ট দেখে ঠিক বুঝতে পারছি না এটা অ্যালফাবেটিক্যালি না অ্যাকর্ডিং টু মেরিট।

পাঁচ সেকেন্ডও দেরী হল না।

জবাব এসে গেল ধারালো তীরের বেগে।

বাংলাদেশের চেয়ে একটা জায়গা নির্ধারিত করে দাও অভিনয়ে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, কলায়, সংগীতে, ডিরেকশনে যার অবদান সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বিন্দুমাত্র বেশী। সমস্ত প্রোগ্রাম আবার ছাপিয়ে, সমস্ত সাহিত্যপত্র আবার তৈরী করে এই সভায় আমি পরিবেশন করবো।

বাংলা দেশ থেকে এসেছিলেন পংকজ মল্লিক, এসেছিলেন সুপ্রভা মুখার্জি, সাহিত্যিক প্রবোধ সান্যাল, নৃত্যবিদ উদয়শঙ্কর, প্রডিউসার বিমল রায় (বোম্বে থেকে), অহীন চৌধুরী, সৌরেন সেন, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, নমিতা সিংহ, দেবকী বসু, এম ডি চ্যাটার্জি, অজিত বসু, মধু শীল, ডঃ আর এস রায়। সবার যত্ন নিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে। শুধু নিজে নেন নি। নেবার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের পুরোধা হিসেবে সামনে এগিয়ে দিয়েছেন 'শুকের বোঝার' প্রডিউসার নিউ থিয়েটার্সের বি এন সরকারকে।

জানো তো আমি শুধু বাঙালী নই। আমি বাঙাল। উত্তর বাংলার মেয়ে। মানে জানো? যা বলবো করিয়ে ছাড়বো। এদের একটু ইংরিজীতে বুঝিয়ে দাও তো।

দেবিকা সেদিনের মন্ত্রীর উক্তিতে মর্ম বেদনা পেয়েছিলেন। আমাকে সভার শেষে বলেছিলেন পার্টিশানে দুটো বাংলা শুধু আলাদা হয় নি। শুধু ফিজিক্যালি আমরা পিছনে হঠে যাইনি আমরা অ্যালফাবেটিক্যালিও কতো পিছনে হঠে গেছি দেখো।

সত্যিই তো। আজ অ্যালফাবেটিক্যালি সব অনুষ্ঠানের আয়োজনে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডাক আসে সবার শেষে। এ দুঃখ ক'জনের মনে ছোঁয়া লাগায়?

প্রেস কনফারেন্সে, সীমিত আলোচনা চক্রে, সাধারণ বৈঠকে প্রায়ই বাংলা কবিতা আবৃত্তির চেষ্টা করতেন। আটকে গেলেই কবিতাটা শেষ করতেন না। ডেকে বলতেন শুনিয়ে দাও না বাকীটুকু—গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ।

বলো, তোমরা তো অনেক ভাষায় গান শিখেছো, কবিতা পড়েছো—জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, ইংরিজী—এ কবিতার তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা। দেবিকারানী রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মেয়ে। লণ্ডনে যখন তিনি ইন্টিরিয়র ডেকরেশনে শিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন তখন সেখানে তাঁর লোকাল গার্জিয়ান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বললেন, জানো সেখানে একদিন পরিহাস করে বললেন গুরুদেব কি করেছো গো মণি? (মণি দেবিকারানীর ডাক নাম) দেখছি সব লাল করে ফেলেছো। যেন অগ্নিস্ফুলিংগ। মনে হচ্ছে যেন এখুনি আমায় স্পর্শ করবে।

রবীন্দ্রনাথ নাতনীকে কাছে টেনে আদর করেন।

বয়স আঠারো। শাড়ী, ব্লাউজ, জুতো মোজা কপালের টিপ, হাতের (কি যেন বলে ওটাকে নামও জানি না, জিজ্ঞাসা করার লোকও নেই কেউ পাশে) চুড়ি সব লাল।

দেবিকারানী বললেন আমার কিন্তু বিন্দুমাত্র খেয়াল ছিল না। আনুকনশাসলি সব লাল হয়েছিল।

ছন্দপতন করে বললাম, আজও তো আপনার ওটাই প্রিয় রঙ—ফেবারেট কালার। মানায় মিষ্টিভাবে।

স্বামী অধ্যাপক স্বেতোস্লাভ রোয়েরিকের প্রিয় রঙটা আবার লাল নয়। সেটা নীল—যে রঙের সঙ্গে ইউরি গ্যাগারিন তুলনা করেছিলেন মহাকাশ পথের।

আজও দেবকারানীকে ঐ লাল রঙের বেশেই সবচেয়ে সুন্দর মানায়।

কালো রঙ দেখতে পারেন না। আমার কালো স্যুট, কালো কোট ওর মোটেই পছন্দ নয়। টেবিলের টেলিফোনটা প্রথম দিন কালো ছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেটাকে বদলে লাল করে দিয়েছিল দিল্লীর ডাক তার বিভাগ।

জনমানসকে খুব ভালবাসেন। একদিন বলছিলেন এমন সহজ সরলভাবে লিখতে শেখো যাতে সাধারণ অর্ধশিক্ষিত মানুষও তা বুঝতে পারবে। ছায়াচিত্রের প্রথম উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন। সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষা। প্রতিটি ছায়া-চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এইটুকু সর্বদা মনে রাখতে হবে। আর্ট হলো জীবনের প্রতিচ্ছবি। 'মিরর অব সোল।' অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেখানে কৃত্রিমতা এলেই আর্টের মৃত্যু। আর একটা প্রধান কথা মনে রাখতে হবে। প্রতিটি ছায়াচিত্রের একটা উদ্দেশ্য থাকবে। শুধু চিত্তবিনোদন নয়। একটা মেসেজ থাকবে। লক্ষ্য করে দেখো আমাদের সময়ে আমরা যেসব ছায়াচিত্র তৈরি করেছি তার প্রত্যেকটিতে একটা বাণী ছিল—দেশের জন্য, জাতির জন্য, সমাজের জন্য সবাইকে কাছে টেনে ভাবতে শেখাতে হবে। তাদের নিয়েই তো জাতি। মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ধনী দর্শক ক্লাসিকাল আর্টস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে, আমাদের বক্স অফিস হিট তো ঐ সাধারণ মানুষের দল। তাদের জীবন নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা নিয়ে তাদের মতন সরল সহজভাবে শক্ত সমস্যা তুলে ধরতে হবে, আবার সে সমস্যার সমাধানের পথও দেখাতে হবে। আজকাল ডিরেকটাররা এদিকে ততখানি দৃষ্টি ফেলেন কি?

পাশে বসে মৃদু হাসছিলেন মনীষী শিল্পী স্বেতোস্লাভ। তিনি পরিষ্কার বাংলা বুঝতে পারেন। দু-একটা লাইন বলতেও চেষ্টা করেন। বললেন ঠিক কথা। যে শিল্প জনতার কাছে অবোধ্য সে শিল্প শিল্পই নয়। মডার্ন এ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্টের ওপর কটাক্ষ করে বললেন একটা জুতোকে উল্টো করে টাঙিয়ে রাখলে আর্ট হয় না। চিন্তাধারাকে উঁচু করতে হবে। রূপ হবে সত্য, শিব, সুন্দর। দুজনেই সুন্দরের উপাসক। এঁদের পাশে বসলে দুনিয়ার সব কিছু মন থেকে মুছে যায়। সকালে বসেছি। দুপুর গড়িয়ে গেছে। টের পাইনি। দিন গড়িয়ে গেছে, রাত কেটে গেছে খেয়াল হয় নি। কটা দিন এঁদের সান্নিধ্যে ছিলাম হিমালয়ে। দেরাদুন, মুসৌরী পর্যন্ত গাড়ী। তারপর পায়ে হাঁটা পথে।

হিমালয়কে আমরা এত ভালবাসি কেন জানো? এই হিমালয়ের ডাকেই আমার বাবা অধ্যাপক মহর্ষি নিকোলাস রোয়েরিক এসেছিলেন ভারতে। যা নেই হিমালয়ে তা নেই বিশ্বে। এত উঁচু শুধু জায়গাটাই নয়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় চিন্তার জন্মস্থান —বার্থপ্লেস অব দি গ্রেটেস্ট থটস অব দি ওয়ার্ল্ড। দি নোবলেস্ট থটস ওয়ের অল বর্ন হিয়ার। রাতের পর রাত অধ্যাপক রোয়েরিককে আমি মহামতি বুদ্ধের ধ্যান করতে দেখেছি। হিমালয়ের আকর্ষণে এ'রা সবকিছু ভুলে যেতে পারেন। কে না যায়?

স্বেতোস্লাভ ওষুধে বিশ্বাস করেন না। অ্যালোপেথিকে তো নয়ই। ও'র কাছে অন্তত দুশো গাছের শিকড় সেলুলয়েডের কাগজে মোড়া রাখা আছে। কানে ব্যথা, মাথায় ব্যথা, পেটে ব্যথা হয়েছে বলার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে একটুকরো শিকড় বের করে দেবেন শিল্পীসাহেব। 'নাও, চিবিয়ে এক সিপ্ জল দিয়ে গিলে ফেলো। হিমালয়ের গাছের শিকড়। এক্ষুনি অসুখ সেরে যাবে।'

একবার সন্ধ্যার একটু পরে দেখা করতে গেছি। দেখলাম ড্রইংরুমে নেই অভিনেত্রী। ডাকলেন ভিতরে। তিন রুমের স্যুট। ইম্পিরিয়ালের ১০৪ নাম্বার কামরা। ও'দের জন্য বাঁধা থাকে।

বললাম একি? চোখে জল কেন?

ভয়ানক মাথা ব্যথা করছে। তুমি লক্ষ্মীটি একটা কাজ করো। তাড়াতাড়ি কর্নেল আমারকে ফোন করে বলো অসুস্থতার লক্ষণগুলো। তারপর তাড়াতাড়ি 'কটন এ্যান্ড ক্লিস'-এ ফোন করে ওষুধটা আনিয়ে আমায় খাইয়ে দাও। খুব তাড়াতাড়ি। সাহেব এসে পড়ার আগে করা চাই।

সাহেব এসেই নিজের ওষুধ বের করে দেবেন। ডাক্তার কর্নেল চৌধুরীর মেয়ে

দেবিকারানীর ঐ হিমালয়ের শিকড় আর ভালো লাগে না।

তাড়াতাড়ি তাই করলাম। ওষুধটা মিনিট পনেরো-কুড়ির ভিতর দিয়ে দিলাম।

ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে আনন্দমনে শিস দিতে দিতে অধ্যাপক ঘরে ঢুকলেন। কি ব্যাপার?

বেকুবের মতন বলে ফেললাম শরীর ভারী অসুস্থ। ঘরে ঢুকেই মাথায় হাত দিয়ে, হাত ধরে নাড়ীটা পরীক্ষা করে শিকড়ের টুকরো আনতে ছুটলেন।

হেসে দেবিকারানী বললেন, কার মাথা ব্যথা করছে? আমার তো নয়। বোধহয় ওর। আমি এমনি শুয়েছিলাম।

বিপদ গুনলাম।

শিকড় গিলতে হল।

প্রাকৃতিক চিকিৎসার মতন জিনিস নেই। বলেই প্রাচীন ভারতবর্ষে অশ্বিনীকুমার থেকে শুরু করে হিস্টরি অব মেডিসিন ইন ইন্ডিয়ার ওপর যে লেকচারখানা পরিবেশন করলেন তার তুলনা শুধু স্বর্গত বিধান রায়ের বক্তৃতার সংগেই চলে।

আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের হিমালয়, আমাদের দর্শন, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সত্য শিব সুন্দরের উপাসনা, আমাদের বিবেকানন্দ, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলতে শিল্পী উন্মত্ত। ভারতবর্ষকে তিনি এত আপন করে নিয়েছেন যে, মাঝে মাঝে সহধর্মিণীর সংগে মাতৃভাষায় রাশিয়ানে কথা না বললে মনেই পড়ে না এ মহান্ শিল্পীর জন্ম ভারতের অনেক দূরে সোভিয়েট দেশে!

রবীন্দ্রনাথের নাতনী, কর্ণেল এম এন চৌধুরীর মেয়ে দেবিকার জন্ম দক্ষিণ ভারতের ওয়ালটেয়ারে। তিনি একাধিক দাক্ষিণী ভাষায় পারদর্শিনী। বিলেতে লেখাপড়া করেন। পাঠ্যাবস্থায় রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব্ ড্রামাটিক আর্টস ইন লন্ডনে অভিনয়ে পারদর্শিতা অর্জন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ কালেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বিলেতে তিনি ইন্টিরিয়র ডেকরেশন শিল্পে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। ১৯২৮ সালে ভারতের ছায়াচিত্র জগতের অগ্রদূত হিমাংশু রায় বিলেতে যান। সেখানে তাঁর প্রথম প্রণয়, তারপর পরিণয় ঘটে। সেখানে 'লাইট অব্ এশিয়া', 'শিরাজ', 'এ থ্রো অব্ ডাইস'এর প্রডিউসার হিসেবে হিমাংশু রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। লন্ডনে তিনি বিশ্ববিখ্যাত প্রডিউসার ব্রুস উলফের সংগে কাজ করেন। এটা ঘটেছিল ১৯২৮ খৃঃ। ১৯২৯ খৃঃ হিমাংশু রায়ের সংগে দেবিকারানী জার্মানিতে যান। সেখানে ডিরেকটর পাস্তু সাহেবের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তখন 'সাইলেন্ট টকি' থেকে 'সাউন্ড টকি'র সূত্রপাত। হিমাংশু রায়ের সংগে দেবিকারানী জার্মানী থেকে সুইজারল্যান্ড ও নরওয়ে সুইডেনে যান। ভারতে ফিরে 'কর্ম' ফিল্ম পরিবেশন করেন। এ ফিল্মে দেবিকারানীর সংগে ছিলেন বর্ধমানের রাজকন্যা সুধারানী।

বোম্বাই এবং বাংলার জনপ্রিয় নায়ক বিশ্বজিৎ।       ফটো: অমৃত

ভারতে 'কর্ম' প্রথম সাউন্ড পিকচার। বইখানা একসংগে ইংরিজী ও হিন্দুস্থানীতে পরিবেশিত হয়।

ধীরে ধীরে বম্বে টকিজের জন্ম। ১৯৩৪ খৃঃ ভারতের ছায়াচিত্র জগতে এক স্মরণীয় যুগ। ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে হিমাংশু রায় ভারতীয় অভিনেতা, অভিনেত্রী, টেকনিশিয়ানদের পারদর্শী করে তোলেন।

দেবিকারাণীর সৃষ্টির সংগে যাঁদের পরিচয় তাঁরা আমার চেয়েও ভালভাবে এ বিষয়ে বলতে পারবেন। তবে দিনের পর দিন তাঁর মুখে যে সব বইয়ের কাহিনী শুনেছি তার ভিতর জওয়ানি কি হাওয়া, জীবন নাইয়া, অচ্ছুত কন্যা, সাবিত্রী, জীবন প্রভাত, দুর্গা, বচন, ইজ্জত কিভাবে করে তিনি প্রডিউস করেছিলেন, কেমন করে অভিনয়ের জন্য নিজেকে তৈরী করেছিলেন আমার যেন মুখস্থ হয়ে গেছে।

সেদিন আলোচনা হচ্ছিল 'হিউম্যান সাফারিং'এর ওপর। রাধাকৃষ্ণনের দর্শন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উদ্ধৃত করে অভিনেত্রী আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন। কখন কিভাবে সময় কেটে গেছে খেয়াল হয়নি। বললেন, ওরিজিন্যাল গীতাঞ্জলি থেকে বলো তো সেই লাইনগুলো, 'এই করেছো ভালো নিঠুর হে, এই করেছো ভালো, এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।'

বললাম।

আজও জানি না এ'র জীবনে কি দহন থাকতে পারে। তবে একটা বেদনার কথা বলেছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এত বই প্রডিউস করলেন, এত খ্যাতিমান অভিনেতা, অভিনেত্রী তৈরী করলেন নিজের হাতে, বাংলা একটা বই প্রডিউস করলেন না? একটা বইতে অভিনয় করলেন না?

চোখে দেখলাম জল টলমল করছে।

বললেন, রিয়ালি ইউ টক্ লাইক অ্যান্ ওল্ড ফিলসফার। তোমার সংগে গল্প করে সেজন্যই এত আনন্দ পাই। আমার জীবনের এটা একটা কত বড় বেদনা তুমি ভাবতে পারবে না।

আঁচল দিয়ে জল মুছলেন।

**অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়**

আমার প্রথম শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রলাল রায়—মালবিকা কাননের বাবা। আমার সঙ্গে মালবিকার খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমরা মাঝে মাঝে একসংগে শিখতাম। রবীনবাবুর শিক্ষাপদ্ধতি এত সুন্দর ছিল যে, সরগমের মত শুষ্ক জিনিষও যেন কবিতার মতো সরস হয়ে উঠত। রবীনবাবুর কাছে শেখবার সময় আমি খেয়ালিয়া হবার স্বপ্নই দেখতাম। আমি ম্যাট্রিক পাশ করার পর লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে ভর্তি হবার কথা চলছিল। কিন্তু মার মত না থাকায় শান্তিনিকেতনে গেলাম। শান্তিনিকেতনের সংগে আমাদের পারিবারিক যোগাযোগ ছিল। বাড়ীতে তখনকার দিনের রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডের প্রচুর সংগ্রহ ছিল। ছোটবেলা থেকে সেইসব শুনে অজান্তেই রবীন্দ্র-সংগীতের ওপর একটা আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ-জাত সহজ বোধ থেকেই বাবা বুঝেছিলেন, কিছুদিন ক্লাসিক্যাল গান না শিখলে—শোনাবার উপযুক্ত গানের গলা তৈরী হয় না।

শান্তিনিকেতনে প্রথমে মারাঠি অধ্যাপক বিনায়ক ওয়াজেলওয়ারের কাছে উচ্চাংগ-সংগীতে তালিম নেওয়ার প্রথাই ছিল। তাঁরও ইচ্ছে ছিল আমি খেয়াল শিখি। তারপরই এল রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার অধ্যায়। তখনই দ্বন্দ্বের শুরু। কোনদিকে যাব? রাগ-সংগীতের ধারায় চলাটা আমার সংগীত ধর্মের অনুকূল হবে, না রবীন্দ্রসংগীতের পথেই সন্ধান মিলবে পরম প্রাপ্তির—জ্ঞানে-অজ্ঞানে, 'চেতনায় বেদনায় যাকে খুঁজেছি। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। একটা সুরের সীমাহীন ব্যাপ্তি আপনাকে প্রকাশের পথ খুঁজছে, নানান তান ও বিস্তারের বর্ণবৈভবে, অন্যটায় ভাষা যেন ভাষাতীতের মিলন-তৃষ্ণায় আত্মহারা। দুটি সংগীতের ধারায় সৌন্দর্য, মাধুর্যের বিভিন্ন রূপের রসলোক উচ্ছলিত।' দুটি দিকই আমায় সমান আকর্ষণ করত। তবু রবীন্দ্রসংগীতকেই বেছে নিয়েছিলাম বাণিজ্যিক সাফল্যের নিশ্চিত সোপানরূপে।

ইন্দিরা দেবী ও শৈলজাদা উভয়ের কাছেই আমি নিয়মিত ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করেছি।

ইন্দিরা দেবীর সংগে রবীন্দ্রনাথের গানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল—শান্তিনিকেতনের আগের যুগে, যখন কবি কোলকাতায় থাকতেন। কাজেই প্রথমের দিকের গানগুলিতে কবির যথাযথ ভাবনার রূপটি বিবিজির (ইন্দিরা দেবী) কাছে অতি অন্তরঙ্গ ছন্দে ধরা দিয়েছে। আবার শৈলজাবাবু শান্তিনিকেতনের যুগের রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি ভাবেই পেয়েছেন। দুটো রূপ স্বতন্ত্রধর্মী হওয়ার দরুন সংঘাত ত হয়ই-নি, উপরন্তু উভয়েই উভয়ের পরিপূরক হয়ে উঠতে পেরেছে।

এইরকম ভাবেই শিক্ষা চলছিল এবং অজান্তেই রবীন্দ্র-সংগীতকে কখন মনপ্রাণ দিয়ে ফেলেছি বুঝতেই পারিনি। সচেতন-ভাবে এ সত্য বোঝা গেল কোলকাতায় এসে 'সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে তালিম নেবার সময়। এই মানুষটির কাছে আমার ঋণের সীমা নেই। কারণ, রবীন্দ্র-সংগীতের অন্তর্লীন রূপটির সংগে আমার পরিচয় ঘটে তাঁরই শিক্ষায়।

সুরেশবাবু সংগীতজ্ঞ এবং উচ্চাংগ সংগীতের সাধক বলেই বোধহয় পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন উদার, বহুমুখী এবং রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। শুধু শ্রদ্ধাশীল বললে কমই বলা হয়। তিনি রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক সম্বন্ধে 'ওয়াকিবহাল' ছিলেন বলে সাধারণ ওস্তাদিপন্থীদের মত রবীন্দ্রসংগীতকে "সংগীত নয়" বলে অগ্রাহ্য করবার মত উন্নাসিকতা তাঁর ছিল না। আমার মানসিক প্রবণতা স্টাডি করেই হয়ত তিনি আমায় ধ্রুপদের তালিম দিলেন। থিওরী সম্বন্ধেও শিক্ষা দিতেন।

একটা রাগের তালিম নিয়েই সেই রাগের ছোঁওয়ালাগা নানারকমের রবীন্দ্র-সঙ্গীত তিনি আমার কাছে শুনতে চাইতেন। গান শোনার পর রবীন্দ্র-সংগীতে সুর বিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করে, কোনখানে আলতোভাবে কোনখানে স্পষ্টভাবে কো রাগের ছায়া এসে কেমন করে এ অচিন্তনীয় মধুরতায় পরিণতি পেয়ে কি সুন্দর করে যে বুঝিয়ে দিতেন রবীন্দ্রসংগীতের একটা নতুন রূপদৃষ্টি তাঁ কাছেই পেলাম। আর এ সম্বন্ধে চিন্তা দুয়ার তিনিই খুলে দিলেন। এতদিন অব শুধু গাওয়ার আনন্দেই গেয়ে গেছি এখন গাওয়ার সংগে মনটা যেন ভাবতে শুরু করে দিল। আর এ ভাবনার সংগে সংগে এমন অনেক নতুন দিক চোখে পড় যা আগে কখনও পড়েনি।

রাগের মর্মমূলে রবীন্দ্রনাথ যে কিভা প্রবেশ করেছেন—তার ভাবগ্রাহিতা কিভা রাগ-নির্যাসকে আত্মসাৎ করেছে রবীন্দ্র সংগীতের কম্পোজিশন বিশ্লেষণ ক সুরেশবাবু আমায় সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন

এখন আমরা সরগম দিয়ে রাগ চিনতে চাই। কিন্তু এই সরগমেরই প্রয়োগে ক যে তফাৎ। যেমন সারং, মল্লার, দেশ—এইস রাগের আরোহী ও অবরোহীতে তফা বিশেষ নেই। তফাৎটা হচ্ছে প্রতিটি স্বরের বর্ণ অথবা স্বরপ্রয়োগের প্রণালীতে। সকাল ও সন্ধ্যার অনেক রাগের পর্দা এক হলেও সকাল ও সন্ধ্যার রূপ আলাদা। একই পর্দা যেমন সরগা রসা-র সকালের রাগে বর্ণে অবরোহী-গতি সন্ধ্যার রাগে আরোহী গতি।

রবীন্দ্রনাথ রাগ ধরে হয়ত শেখেননি কিন্তু রাগের মেজাজটির নাগাল ছিল যেন তাঁর হাতের মুঠোয়। তাই কথার সংগে সুরের মালাবদল হয়ে গেছে তাঁর সংগীত-মানসের স্বধর্মের সহজ তাগিদে। এতদিন এ সত্য না বুঝেই গেয়েছি, এখন এ সত অন্তঃসলিলা প্রাণরসের মত মনের অতলে তার কাজ করে যাওয়ায় অনেক অজানা দিকও যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠল। বুঝলাম সহজ হতে হলে কতখানি গভীর বোধ থাকা প্রয়োজন। যেমন ধরুন ফিয়াজ খাঁ অথবা আলি আকবর কোনো জটিল তান অথবা কূট স্বরসমন্বয়ের মধ্যে না গিয়েও একটি পর্দার সোজা সরল প্রয়োগে কি অবর্ণনীয় রসসৃষ্টি করেছেন! কেন? না রাগের অন্তরে এঁরা প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। ধ্যানীর সহজ অধিকারে এই অধিকার সবার থাকে না।

স্বরলিপিকে অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়াটা আধুনিক কালের নিয়ম। আমি বিশ্বাস করি গুরুমুখী শিক্ষায়। আগেকার কালের পুরানো রেকর্ডের চেয়ে আজকালকার রেকর্ডকৃত রবীন্দ্রসংগীতের সুর অনেক বেশী স্বরলিপি-অনুসারী। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথকে পুরানো দিনের রেকর্ডের গায়েকী

ক্ষেন বেশী কাছে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে সাক্ষাৎভাবে যাঁরা গান শিখেছেন তাঁদের সুরের মধ্যেও কিছু পার্থক্য হয়ত লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেটা বাইরের আবরণ মাত্র। অন্তর্নিহিত ভাবের ঐক্যে সবাই এক পরিবারেরই। শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পী-ব্যক্তিত্বের একটি স্থান চিরদিনই আছে ও থাকবে। এতেই প্রমাণিত হয় স্বরলিপির চেয়ে 'গায়কী' অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রাবীন্দ্রিক ভঙ্গিমাকে অনাহত রাখাই রবীন্দ্রসংগীতের বড় কথা—স্বরলিপির সামান্য তফাতে কিছু যায় আসে না। এই গায়কী সম্বন্ধে বড়দের কাছে প্রত্যক্ষ শিক্ষা না নিয়ে শুধুমাত্র 'স্বরবিতানে'র বিদ্যাকে সম্বল করে রেডিওতে অথবা সাধারণ সভায় রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতে ছোটাটা আমি স্বেচ্ছাচার বলে মনে করি। বহুল প্রচার অথবা জনপ্রিয়তার বাঞ্ছিত পরিণতিতে পৌঁছনোটা এ সংগীতের অবশ্যই এক উজ্জ্বল দিক। কিন্তু এই বহুল প্রচারেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পরিবেশনায় সহজীকরণের প্রবণতা।

ভারতীয় সংগীতের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে আপন প্রতিভা ও শিল্পভাবনা অনুযায়ী এক রসরূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এইজন্যই সাধারণভাবে সংগীতশিক্ষা তথা ক্লাসিক্যাল গানের তালিমে কণ্ঠচর্চা দ্বারা ভিত্ তৈরী করে তারপর কবির স্বকীয়তাকে অনুভব করতে হবে। তাঁর ধ্যান-কল্পনার ছবিটি প্রত্যক্ষ করাটা সাধনাসাপেক্ষ। সর্বোপরি শিল্পীর আপন অনুভূতির স্পর্শ ত আছেই। এতগুলি বস্তুর সমন্বয় না ঘটলে রবীন্দ্রসংগীত কেন কোনো সংগীতই গাওয়া উচিত নয়। এ-কথা ভুলে শুধুমাত্র সু-কণ্ঠকে সম্বল করে গাইতে গেলে রসসৃষ্টি ত হয়ই না। রসসৃষ্টি না হলেই কৃত্রিমতা বা একঘেঁয়েমো এসে পড়ে।

এই হোলো একঘেঁয়েমোর একটা কারণ। আর একটা কারণ হোলো—রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন ধারার বিচিত্র অধ্যায়কে অধ্যয়ন করার অভাব। রবীন্দ্রসংগীত এবং সাহিত্য কখনও এক জায়গায় থেমে থাকেনি। কবির জীবনে নানা ঘটনা বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে সাহিত্যের মত তাঁর সঙ্গীতধারাও বারবার মোড় ঘুরেছে। আপন প্রতিভা, সাধনা ও অনুভবের সচেতন পরিমার্জনা দ্বারা বারবার কবি আপনার সঙ্গীতচিন্তা ও প্রকাশকে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। এ-সঙ্গীত তাঁর হঠাৎ জ্বলে ওঠা দীপ্তি নয়, মননশীল অন্তরের গভীরতার আলোক-সম্পদ। এ-সত্য বুঝতে হলে শিক্ষা, চিন্তা, ও ধ্যানের প্রয়োজন একথা আবার বলছি।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের পটভূমিকা স্টাডি না করে শুধুমাত্র স্বরলিপি অনুসরণ করে গাইতে গেলে, বৈচিত্র্য উপভোগের আনন্দ থেকে শ্রোতাদের বঞ্চিত করা হয়। যেমন ধরুন 'স্বপন যদি ভাঙিলে রজনীপ্রভাতে'—এখানে মপম ম সগমপ-র...সা'র রে সার মীড়ে যে ছবি ফুটে উঠল সেটা রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চেয়েছেন না বুঝে শুধুমাত্র স্বরলিপি তুলে গাইলে ফোটানো সম্ভব কি? কিম্বা 'বিরহ মধুর হোলো'—এভাবে গাইতে গেলে গাওয়া একরকম হয়ত হোলো, কিন্তু ছবিটি হারিয়ে গেল। মাঝে মাঝে ব্লাইন্ড অ্যাসথেটিক সেন্সের জাগিদে এক-আধবার সুন্দর হয়ে গেল পরমুহূর্তেই সেটি হারিয়ে যায়। কিন্তু বুঝে গাইলে সে দায়িত্ব থাকে না।

যেমন ধরুন 'আগে চল ভাই'—গানটি বঙ্গভঙ্গ যুগের ত? এখানে সেই পরিবেশানুযায়ী সুরের আদর্শ হয়েছে আবেগ উত্তেজনা। কিন্তু পুরানো আমলের ধ্রুপদী অথবা রাগসঙ্গীতেও কিম্বা শেষের দিকের প্রেম-সংগীত কি ঐ একইভাবে গাওয়া যায়? কিন্তু তবু এখন অনেকেই এভাবেই গাইছেন। সেটা আমার মনঃপূত নয়।

গান শুরু করার সময় থেকেই রবীন্দ্রসংগীতে মেয়েলিপনার অভিযোগ অনেকের কাছেই শুনে আসছি। কারণ কি? চিন্তা করে দেখলাম—আগেকার দিনে রবীন্দ্রসংগীতে মূলত মহিলা শিল্পীদের প্রাধান্য ছিল। কারণ, ঠাকুরবাড়ীর মেয়েরাই সংস্কৃতি জগতে অগ্রণী। কবি গান লিখেই আশেপাশে স্নেহের পাত্রীদের শিখিয়ে নিতেন, তাঁরাই জীবন্ত স্বরলিপি হয়ে উঠতেন। তার ফলে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রথমযুগে এক মহিলাগোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং তাঁদের গাওয়া গানগুলি বিখ্যাত হয়। এর পরে পুরুষরা যখন গাইতে শুরু করলেন, তাঁরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে ওজস্‌বর্জিত এক মেয়েলী গায়নরীতি চালু হয়ে গেল। রবীন্দ্রসংগীত প্রথম গাইতে গিয়ে একটা পুরুষালী গায়কের অভাব আমার বড় পীড়া দিত।

'রবীন্দ্রসঙ্গীতের যুগ প্রাপ্তি ঘরে শুরু হোলো রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। তাঁর প্রেম-সঙ্গীত, রূপকী গান ইত্যাদির দিকে অন্যান্য সকলের মত আমারও আগ্রহ আছে। তবু কবির তাঁর শেষের দিকের গানের বিমূর্ত রূপই আমার মন টানে বেশী। যেমন—'এসেছিলে তবু আস নাই'—এখানে যেন শব্দগুলো রঙ হয়ে উঠে একটা ছবির সৃষ্টি করছে—এই রূপকল্পনা আমায় যেন পাগল করে দেয়।

যথার্থ জনগণের গান বলতে যা হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথের গানে সে গুণ কতটা আছে তা সন্দেহাতীত নিশ্চয় নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ শুধু গীতিকার ও সুরকারই নন—অনেক কিছু জড়িয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই ব্যক্তিত্ব ও তাঁর গানের বহুল প্রচারত্বের সহায়ক।

এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন শিল্পী হয়ত আপন আকর্ষণে শ্রোতা তৈরী করে নিতে পারে। কিন্তু রসিকজনের চাহিদাও ফুটিয়ে তোলে শিল্পীর সৃজন-কাননের ফুল। যতই প্রচার হোক বিশুদ্ধ রবীন্দ্র-সঙ্গীত যথার্থ বিদগ্ধ মনের কাছে ছাড়া ঠিক জায়গায় ঘা দিতে পারে না। উচ্চতর সাহিত্য আশা করে তার পাঠকের কিছুটা প্রস্তুতি, উচ্চতর শিল্প আশা করে দর্শকের প্রস্তুতি, তেমনই সংগীতশিল্পীরও কি কিছু চাইবার বা আশা করবার নেই? জনসাধারণের রুচি শুদ্ধতর সংগীতরসের দিকে এগোবে না সংগীত তাদের রুচির কাছে মাথা নত করবে? শিল্পী হিসাবে রসগ্রাহীদের কাছে আমার আজ এই প্রশ্ন।

# বাঙলা রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে নতুন চিন্তা

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

১৯৩০ সালের অক্টোবরের একটি সন্ধ্যায় যেদিন হাওড়া স্টেশন থেকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত অভিনেত্রী ও নর্তকী দলকে নিয়ে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেন, সেদিন তিনি তাঁর মনের কোণে নিশ্চয়ই এই আশা পোষণ করেছিলেন, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রচিত 'সীতা' নাটকে রাম-এর ভূমিকায় তাঁর অভিনয়নৈপুণ্যে এবং ঐ নাটকের সামগ্রিক প্রযোজনা দেখে মার্কিনী দর্শকরা তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবেন। কিন্তু ইতিহাস বলে, তা বাস্তবে ঠিক তেমনভাবে ঘটেনি। বিজ্ঞজনে বলেন, শিশিরকুমার যদি বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে 'সীতা'র বিভিন্ন ভূমিকার জন্যে কুশলী অভিনেতা-অভিনেত্রী বাছাই ক'রে নিতেন ও বেশ ভালো ক'রে মহলা দিয়ে প্রস্তুত হতেন এবং অপরদিকে 'বিল্টমোর'-এর রঙ্গপীঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা প্রভৃতির মাপ আনিয়ে তার উপযোগী দৃশ্যপট প্রভৃতি প্রস্তুত ক'রে নিয়ে যেতেন, তাহ'লে তিনি সেখান থেকে যশের মুকুট মাথায় দিয়ে ফিরতে পারতেন।

কিন্তু আমি বলি, তাতেও হয়তো হত না। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'সীতা' নাটককে ১৯৩০-৩১ সালের নিউইয়র্কের দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করবার জন্যে ধরুন ঘণ্টা আড়াই-তিনের মধ্যে অভিনয় করবার মতো সংক্ষিপ্ত ক'রে নেওয়া হ'ল, বিভিন্ন ভূমিকায় শিশিরকুমার, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রমোহন রায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রভা, কৃষ্ণভাবিনী, চারুশীলা প্রভৃতি সে-যুগের সকল বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অবতীর্ণ করানো হ'ল, সখীসঙ্ঘে যথার্থ সুন্দরী তরুণীদের যথেষ্ট নৃত্যগীত শিক্ষা দেবার পরে মঞ্চস্থ করা হ'ল, দৃশ্য ও সাজসজ্জা অজন্তা-ইলোরার আদর্শে গঠিত হ'ল অর্থাৎ 'সীতা'কে সকল দিক দিয়ে সর্বগুণ-সমন্বিতা করার কোনো রকম ত্রুটি রাখা হ'ল না, তাহলেই কি বাঙ্গলা ভাষায় অভিনীত 'সীতা'কে সন্দর্শন করে নিউ-ইয়র্কের মার্কিন দর্শকরা সমস্বরে ধন্য ধন্য ক'রে উঠত? মনে রাখতে হবে, সময়টা ছিল ব্রডওয়ের থিয়েটারগুলির গৌরবময় যুগ। স্ট্যানিসলাভস্কির প্রযোজনা প্রথার সঙ্গে মার্কিনী দর্শকরা তখন সুপরিচিত; ম্যাক্স রাইনহার্ট নিজে সেখানে 'মিড সামার নাইটস ড্রিম', 'এভরিম্যান', 'ড্যান্টনস ডেথ' প্রভৃতি নাটক প্রযোজনা করেছেন। তা'ছাড়া ওখানকার দর্শকরা তখন এমিল জেনিংস, জন ও লাওনেল ব্যারিমুর, হেলেন হেজ, ক্যাথারিণ কর্ণেল প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাট্যকুশলতাকে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করছেন। এ অবস্থায় বাঙ্গলা ভাষার মাধ্যমে শিশিরকুমারের নেতৃত্বে একটি বাঙ্গালী নাট্য-সম্প্রদায়ের সু-অভিনয় তাদের কতখানি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হ'ত সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক নয় কি? শিশিরকুমারের মতো কুশলী অভিনেতা কোনোও দেশেই ভূরি ভূরি জন্ম-গ্রহণ করেন না। দিলীপকুমার রায় এক সময়ে অধুনালুপ্ত 'নাচঘর' সাপ্তাহিকে লিখেছিলেন, 'একমাত্র রাশিয়ার কাচালভ শিশিরকুমারের সঙ্গে তুলনীয়।' কিন্তু সংলাপকে বাদ দিয়ে ত' তাঁর অভিনয় নয়। সীতার 'কার কণ্ঠস্বর' দিগ্বিজয়ীর 'কতল! কতল!' রঘুবীরের 'ভীল নহে মায়ের সন্তান, শিশু ভীল সিংহ সনে যুঝে রণ', কিংবা শেষরক্ষার 'বড়বৌ' ডাক—সবই সংলাপাশ্রয়ী। যে-সব দর্শক এই সব সংলাপের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না, তারা তাঁর অভিনয় সৌকর্যের কতটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে? আমরা রুশ চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা চের-কাশভ-এর 'আইভান দ্য টেরিবল' এবং অন্যান্য ছবির অভিনয় দেখেছি। এবং তা দেখে মাত্র এইটুকু বুঝতে পেরেছি, উনি একজন ক্ষমতাশালী অভিনেতা; কিন্তু ও'র অভিনয়জাত চূড়ান্ত রস উপলব্ধি করতে কিছুতেই পারিনি রুশ ভাষার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকার দরুণ।

'সীতা' চূড়ান্ত সাফল্যমণ্ডিতভাবে অভিনীত হ'লেও নিউইয়র্কের সাধারণ দর্শক তা নিয়ে কিছুতেই মাতামাতি করত না; কারণ ঐ অভিনয় তাদের মধ্যে কোনোও অভিনবত্বের উপঢৌকন বহন করে নিয়ে যেত না। তারা দেখত, তাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মতো একটি মঞ্চে দৃশ্যপট-সমন্বয়ে একটি বিদেশী নাটকের অভিনয় হচ্ছে বিদেশী শিল্পীদের দ্বারা; মঞ্চসজ্জা ও বেশবাস ভারতীয়, গানে ভারতীয় সুর এবং নৃত্যে ভারতীয় ভঙ্গী। অভিনব কিছু নয়। জাপানী নো বা কাবুকী নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে আমেরিকার নাট্যাভিনয়ের যে-পার্থক্য প্রত্যক্ষ করা যায়, রাশিয়ার ব্যালের সঙ্গে আমেরিকার ব্যালের যে-তফাৎ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর, আমেরিক নাট্যাভিনয় থেকে ভারতীয় নাট ভিনয়ের তেমন কোনো পার্থক্য থাকা সম্ভ নয়। কারণ আমেরিকার নাট্যাভি বা নাট্যপ্রযোজনা পদ্ধতি যে ইংলণ্ড প্রথা থেকে উদ্ভূত, ভারতীয় মঞ্চাভি বা মঞ্চ-প্রযোজনা পদ্ধতিও সেই এব ইংলন্ডীয় প্রথার অনুরূপ।

এটাতো জানা কথা, বিদেশীয়ের জাহা চড়ে নাট্যাভিনয়ের রঙ্গমঞ্চটি আমাদের দে এসে পৌঁছেচে। সাঁ সুসি, ওল্ড হাউস, চৌরঙ্গী থিয়েটার, ক্যালকা থিয়েটার প্রভৃতির আদর্শেই প্রসন্নকুম ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' বা পাইকপাড় সিংহবাবুদের 'বেলগাছিয়া থিয়েটার' গ ওঠে। এবং পরে ঐ আদর্শ পথেই আম দের সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটা জন্মগ্রহণ করে। মঞ্চোপস্থাপনা রীতি বহু বিবর্তন সত্ত্বেও নাট্যপীঠ—স্টেজ প্রসিনিয়ম প্রভৃতি আজও অটুটভা ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য প্রভাবের সাক্ষ্য ব করছে।

প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দু রাজ রাজড়ার যুগে রঙ্গপীঠ প্রভৃতির যে অ ছিল, ভরত-নাট্য শাস্ত্রে তার উল্লেখ পাও গেলেও এবং রামগড় পাহাড়ে তার কিছু ভগ্নাবশেষের সন্ধান মিললেও ইংরাজ শিক্ষিত বাঙ্গালী যে তার থিয়েটারে প্রবর্তন ইংরেজেরই অনুকরণে করে এ-কথা সর্ববাদীসম্মত।

ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী তার এ থিয়েটারপ্রীতি দ্বারা তার একান্ত নিজস্ব যাত্রাকে করেছে চরমভাবে উপেক্ষা। যে শিশিরকুমারের আমেরিকা অভিযান নি এই প্রবন্ধের সূচনা, তিনিই বলেছেন 'গিরিশবাবুরা যদি যাত্রাকে উন্নত করবা চেষ্টা করতেন, ইংরেজি নাটকের মোহে চো ঝলসে না যেত, তাহ'লে বাঙ্গলা নাটকে চেহারা অন্য রকম হোত।' শুধু এইটুকুই নয়; তিনি একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন বিদেশীর অনুকরণে গড়া বাঙ্গলার ফ্রেমে আঁটা থিয়েটারে বাঙ্গালী বুদ্ধিবৃত্তি তথা প্রতিভার পূর্ণ বা সম্যক বিকাশ কোন মতেই সম্ভব নয়। এবং সেই জন্যেই তিনি বারংবার বলেছেন; বাঙ্গলার নিজস্ব বস্তু যাত্রার উন্নতি ঘটিয়ে তাকে বর্তমান থিয়েটারের জায়গায় বসাতে হবে। তা নইলে বাঙ্গালী জিনিয়াস কোনও দিনই তার পূর্ণ মহিমায় মুঞ্জরিত হয়ে উঠতে পারবে না।

আজ বার্টল্ট্ ব্রেখট নিয়ে আমাদের মধ্যে নূতন আলোড়ন শুরু হয়েছে। অভিনেতা সব সময়েই মনে রাখবে, সে একটি চরিত্রকে রূপায়িত করছে এবং দর্শককেও মনে রাখতে হবে, তিনি একটি অভিনয় দেখছেন, সত্য কোনো ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করছেন না—ব্রেখট-এর এই যে থিয়োরী, যা আমরা তাঁর 'ককেশিয়ান চক সার্কেল' বা 'থ্রী পেনী অপেরা।' অভিনয়ের ভিতর দিয়ে প্রযুক্ত হতে দেখি, তা' আমাদের দেশের যাত্রাভিনয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি আমাদের বাল্যকালে, থিয়েটারঘেঁসা যাত্রার প্রচলনের পূর্বে। যাত্রার আসর পাতা হয়েছে দর্শকদের মাঝখানে দশ হাত বর্গ পরিমিত স্থান জুড়ে—সেখানে আছে দুখানি চেয়ার বা টুল ভেলভেটের আচ্ছাদন দিয়ে মোড়া; এই আসনে বসবেন রাজারাণী বা নাটকের সম্মানিত পাত্র-পাত্রী। এই আসরের এক পাশে বসেছেন বাদ্যকরের দল হার্মোনিয়ম, তবলা, মৃদঙ্গ, বেহালা, ফ্লুট ক্ল্যারিওনেট কর্ণেট, স্যাকসোফোন, মন্দিরা, খঞ্জনী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। অপরদিকে বসেছেন দোহারের দল, সংখ্যায় আট, দশ বা বারো। আর আসরের চার কোণ জুড়ে বসে আছেন চারজন শামলা ও চাপকান পরিহিত জুড়ী। যাত্রাপালা শুরু হবার ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে বাদ্যযন্ত্রে ঐকতানবাদন হ'ত যে-প্রথা আজও চালু আছে। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়া মাত্র দোহার ও জুড়ীরা মিলে শুরু করত নান্দীপাঠ

অভিনেত্রী অপর্ণা

**জিন্দেগী জিন্দেগী**/পরিচালনা—তপন সিংহ/জনৈক শিশুশিল্পীর সঙ্গে তপন সিংহ, সুনীল দত্ত এবং ওয়াহিদা রহমান।

সাধনা ফটো : অমৃত

বা দেবদেবীর আরাধনা সঙ্গীতে। তৃতীয় ঘণ্টায় হ'ত আসল পালা আরম্ভ। নাটক চলতে চলতে যেখানেই নাট্যরস ঘনীভূত হয়ে ওঠে, আবেগের আলোড়নে দর্শকহৃদয় মথিত হয়ে ওঠে, দর্শকের নাটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেখানেই আসরের চার কোণে উপবিষ্ট চারজন জুড়ীর মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে উঠে অভিনয়কারী কোনো চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি উক্তিকে অবলম্বন ক'রে গান ধরেন এবং তাঁর গানকে অনুসরণ করেন দোহারেরা। এমনকি তাঁর গানের সুর অবলম্বন ক'রে এক একজন বাদ্যযন্ত্রী—কোনো বেহালা বা ক্ল্যারিওনেট বাদক কর্তবের মাধ্যমে তাঁর গুণপনা প্রকাশের সুযোগ নিতেন। যতক্ষণ এইভাবে গান-বাজনা চলত, ততক্ষণ আসরে উপস্থিত নট-নটীরা বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। আসরেরই এক পাশে উপবিষ্ট হয়ে কোনো নারী চরিত্রের পুরুষ-অভিনেতাকে সকলের সমক্ষে ধূমপান করতেও দেখা যেত। এর চেয়ে বড়ো 'অ্যালিয়েনেশন'-এর প্রক্রিয়া ব্রেখটও কল্পনা করতে পারেন না।

অশিক্ষিতের হাতে পড়ে একদিন যেমন আমাদের হিন্দুধর্মের অধোগতি হয়েছিল, আমাদের বাঙলা সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন যাত্রাও তেমনি অর্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতদের করতলগত হয়ে বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল। একদিন শ্রীচৈতন্যদেবের মতো ভক্ত-পণ্ডিত যে-যাত্রাভিনয়ের সাহায্যে সাধারণের মধ্যে ভক্তিরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, সেই যাত্রায় রসবিকার দেখা দিয়েছিল শিক্ষিত জনের চরম উপেক্ষার ফলে। আজ আবার জনসাধারণের দৃষ্টি যাত্রার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে বটে, কলকাতার শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক নিকেতন 'রবীন্দ্র-সদন'-এও যাত্রার আসর বসছে বটে, কিন্তু শিক্ষিত সুরসিক নাট্যস্রষ্টা যতদিন না যাত্রা সম্প্রদায়ের কর্ণধার হচ্ছেন, যাত্রার যথার্থ রূপ প্রকাশের উপযোগী দৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পীরা এই যাত্রাজগৎকে ঢেলে সাজাচ্ছেন, ততদিন আমাদের একান্ত নিজস্ব এই যাত্রাভিনয়কে আমরা গর্বের সঙ্গে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করতে পারব না।

যাত্রা বাঙলার লোক-সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। গ্রামকেন্দ্রিক বঙ্গদেশে যাত্রার আসর বসত হাটে, মাঠে, ঠাকুরতলায় এবং জমিদারবাড়ীর বহিরঙ্গনে। সেকালে যাত্রা দেখবার জন্যে দর্শককে কোনো রকম টিকিট কিনতে হ'ত না। যাত্রাদলের ব্যয়ভার বহন করতেন স্থানীয় জমিদার বা সমবেতভাবে দোকানদার, আড়তদার প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা। কিন্তু আজ শহরকেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গে যাত্রানুষ্ঠান যেখানেই হোক না কেন, সেখানেই দর্শকরা প্রবেশাধিকার অর্জন করে অর্থের বিনিময়ে সংগৃহীত প্রবেশপত্রের সাহায্যে। প্রতিটি যাত্রা-আসরই আজ থাকে ঘেরা—আগেকার মতো অবারিত নয়। এবং শহরেও বেশীর ভাগই থিয়েটারের মতো বাঁধা মঞ্চের উপর যাত্রার আসর বসানো হয় এবং সেই মঞ্চের সম্মুখভাগের প্রেক্ষাগৃহে আসনে উপবিষ্ট থেকে দর্শকরা যাত্রা দেখেন। আগেকার মতো আসরের চারদিকে উপবিষ্ট দর্শকের মাঝে যাত্রাভিনয় হয় কদাচিৎ কোনো গ্রামে বা কোলিয়ারী অঞ্চলে। কিন্তু সেখানেও আসর করা হয় একটি ফুট আড়াই-তিন উঁচু এবং বারো থেকে পনেরো ফুট লম্বা চওড়া একটি মঞ্চ বেঁধে, যে-মঞ্চ পর্যন্ত সাজঘর থেকে একটি রাস্তা ক'রে দেওয়া হয় শিল্পীদের প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্যে। এই মঞ্চ থেকে হাত কয়েক দূরে মঞ্চের চতুর্দিক একটি বেষ্টনী স্থাপন করে তার ওপাশে দর্শক আসন স্থাপন করা হয় গ্যালারীর আকারে। সামনের কয়েক সারি হয়ত' চেয়ারও বসানো হয় দর্শকদের মধ্যে টিকিটের হারের তারতম্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করার জন্যে। কিন্তু এ ত' হ'ল অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ কয়েক রাত্রি যাত্রাভিনয়ের জন্যে।

আজ এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের বাঙলার নিজস্ব এই সংস্কৃতির বাহনটির জন্যে শুধু কলিকাতা মহানগরীতেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের সকল মফঃস্বল শহরেই বিশেষভাবে নির্মিত স্থায়ী নাট্যশালা নির্মাণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই নাট্যশালা হবে সম্পূর্ণ গোলাকার। রঙ্গপীঠ বা মঞ্চটিও হবে সম্পূর্ণ গোলাকার এবং তিরিশ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ঘূর্ণনক্ষম। মঞ্চটিকে প্রেক্ষাগৃহের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপন করা কিংবা এক পাশ ঘেঁষে স্থাপন করা যেতে পারে। মধ্যস্থলে স্থাপন করলে মঞ্চকে ঘিরে চারদিকেই দর্শকআসন স্থাপন করা চলবে; আর এক পাশ ঘেসে স্থাপন করলে মঞ্চের তিনদিক ঘিরে বৃত্তের চাপের আকারে দর্শক আসন স্থাপন করতে হবে। প্রেক্ষাগৃহের ব্যাস হবে ১২০ থেকে ১৫০ ফুট। প্রেক্ষাগৃহের বাইরে যে তিরিশ ফুট চওড়া ঢাকা বারান্দা প্রেক্ষাগৃহটিকে বেষ্টন করে থাকবে, তার অর্ধেকটায় থাকবে দর্শক সাধারণের বিশ্রামস্থান, টিকিটঘর, শৌচাগার প্রভৃতি। বাকী সংরক্ষিত অর্ধেকটা জুড়ে থাকবে শিল্পীদের সাজঘর, বিশ্রামস্থান, অভিনয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ভাণ্ডার, যন্ত্রী সঙ্ঘের ভাণ্ডার, কলাকুশলীদের স্থান ইত্যাদি। প্রেক্ষাগৃহের দেওয়ালে বাইরের ঢাকা বারান্দা থেকে থাকবে নীচের দিকে প্রবেশের জন্যে চারটি পথ এবং গ্যালারীর পিছনদিকে যাবার জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে আরও চারটি প্রবেশপথ। শিল্পীদের মঞ্চ প্রবেশের জন্যে থাকবে দুটি ভূগর্ভ-পথ, যা থেকে সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চে আসা যায় এবং দুটি দেওয়ালের প্রায় অর্ধেক উঁচু থেকে ক্রমে মঞ্চ পর্যন্ত ঢালু হয়ে আসা পথ। এছাড়া ট্র্যাপ-ডোর বা চোরা দরজা ইত্যাদিও থাকতে পারে। বাদ্যকারগণ মঞ্চের চতুর্দিকে বিশেষভাবে নির্মিত অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের বেদীতে বসবেন এবং তাঁদের দুপাশে দুভাগে বসবেন দোহারবৃন্দ। জুড়ীদের জন্যে গোলাকার মঞ্চের চার কোণে অর্থাৎ পরিধির চার ভাগের সমান দূরত্বে চারটি বিশেষ আসন স্থাপিত থাকবে।

মঞ্চের ফুট দশ-বারো উপরে এক বা দেড় ফুট চওড়া একটি বৃত্তের আকারে একটি কাষ্ঠ, লৌহ বা কংক্রীট নির্মিত বেষ্টনী ঝোলানো থাকবে, যা থেকে আলোক-প্রক্ষেপ করার ব্যবস্থা থাকবে। বিভিন্ন রকম শব্দ-প্রক্ষেপন এবং অপরাপর বৈজ্ঞানিক সুযোগ-সুবিধার জন্যেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের কথাও চিন্তা করা যেতে পারে।

যাত্রাভিনয়ে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার সঙ্গত ব্যবহারকে সমর্থন জানিয়েও বলব, আমাদের যাত্রা থেকে আমাদের জীবনের সঙ্গী গানকে যেন কোনওমতে বর্জন করা না হয়। আমরা গান শুনতে শুনতে জন্মগ্রহণ করি, গান শুনতে শুনতে ধরাধাম থেকে বিদায় নিই। গান আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের নাটকেও গানের সুপ্রচুর প্রচলন দেখতে চাই। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত 'অ্যাণ্টনী কবিয়াল' বাঙালী সমাজে গানের জনপ্রিয়তার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেনি কি?

বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্ণ হবার আর বিশেষ দেরী নেই। ১৯৭২-এর ৭ই ডিসেম্বর থেকে আমরা যেন বিগত শতকের থিয়েটারগুলিকে চিরবিদায় দিয়ে বাঙলার মনীষার যথার্থ ক্ষেত্র বাঙালীর সংস্কৃতির যথার্থ বাহক যাত্রাকে পুনরুজ্জীবনের সংকল্প গ্রহণ করি। এবং এর মাধ্যমেই আমরা শিশিরকুমারের স্বপ্নকে সার্থক করতে পারব।

# হিন্দি নাট্য প্রচেষ্টা একটি সমীক্ষা

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

থিয়েটারের ব্যানারে ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাভাষীর তুলনায় বাঙালীদের এমনিতেই বেশ কিছুটা 'সুপিরিয়রিটি কমপ্লেকস' আছে। এই কমপ্লেকস থাকবার মত যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি আছে একথা বোঝাও খুব সোজা। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে-কোন ধরনের কমপ্লেকসই যেমন স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে, তেমনি থিয়েটার নিয়ে বাঙালীদের এই কমপ্লেকস ভারতবর্ষের অন্য ভাষায় নাটকের অগ্রসরমানতাকে ঠিকমত বুঝতে দেয় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে নাট্য রচনা, বোধ, প্রযোজনা, সমালোচনা এবং পত্রিকা সম্পর্কে আমরা সাধারণভাবে খুব অবহিত নই, তারই ফলে অন্যান্য রাজ্যে নাট্যপ্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাটকের স্থান সম্পর্কেও আমরা সঠিকভাবে জানী নই। এই জ্ঞানলাভের পক্ষে বাধা হল এই যে, মোটামুটি সব রাজ্যে থিয়েটার নিয়ে সংস্কৃতিক চর্চা করেন এমন মানুষদের সংযোগের ভাষা হল ইংরেজি। এ-ব্যাপারে সর্বরাজ্যভিত্তিক এমন কোন ইংরেজি কাগজ নেই যা সবার কাছে পৌঁছুতে পারে। দিল্লী থেকে শ্রীরাজিন্দর নাথ নামে এক সাংবাদিক যুবক (যিনি দিল্লীতে হিন্দী নাটক প্রযোজনায় একজন খ্যাতিমান নির্দেশকও) এবং শ্রী টি পি জৈন নামে আরেকজন সাংবাদিক যুবক (যিনি রাজিন্দর নাথের দলের মুখ্য অভিনেতা এবং শ্রীবাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস'-এর হিন্দী অনুবাদের নায়কের চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন) 'এনঅ্যাক্ট' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু তার মুদ্রণ-সংখ্যা খুবই কম। দিল্লী থেকে শ্রীনেমিচাঁদ জৈনের সম্পাদনায় 'নটরঙ্গ' নামে একটি ত্রৈমাসিক হিন্দী পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়, তাতে সর্বভারতীয় থিয়েটারের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, উত্তর ভারত ছাড়া হিন্দী ভাষা পড়া এবং লেখা সম্পর্কে আগ্রহ যথেষ্ট না হওয়ার ফলে 'নটরঙ্গ' সবার কাছে পৌঁছোয় না। আরেক মুস্কিল হল এই যে, কেন্দ্র থেকে যেভাবে রাতারাতি ভারতবর্ষের সব রাজ্যের ওপরে হিন্দী চাপিয়ে দেবার চেষ্টা রয়েছে, তাতে হিন্দী যাদের মাতৃভাষা নয় এমন সবাই মানসিকভাবে বিদ্রোহ প্রকাশ করার ফলেই এক ধরনের স্বেচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য আছে। তামিল, তেলেগু, মালয়ালম এবং কানাড়ি ভাষার নাটকের পরিচয় দক্ষিণ ভারতের বাইরে বিশেষ জানা যায় না। এমনকি দক্ষিণ ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৃত্যনাট্যের ভঙ্গী 'কুচিপুড়ী'ও আমাদের এদিকে তেমন পরিচিত নয়। শ্রীকালিন্দী পাণিগ্রাহী রচিত ওড়িয়ার মঞ্চসফল নাটক 'বনহংসী' সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। অসমীয়া নাটক সম্পর্কেও তাই। শ্রীগিরিশ কারনাড় রচিত 'মহম্মদ তুঘলক' নাটকটি উর্দু ঘেঁষা হিন্দী অনুবাদে আমাদের হাতে এসে না পৌঁছালে আমরা

তরুণ অভিনেতা বিজয় সাহানী
—ফটো ঃ অমৃত

সে সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জা
পারতাম না। বছরদুয়েক আগে প্রেসিডে
কলেজ ম্যাগাজিনে ইতিহাসে স্না
শ্রেণীতে পাঠরত একটি ছাত্রের
'মহম্মদ তুঘলক' সম্পর্কে ইংরেজীতে এ
গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছি
প্রবন্ধটির ভূমিকায় লেখা আছে, 'জে
অকালে ইহলোক ত্যাগ করে
প্রবন্ধটিতে মহম্মদ তুঘলকের দেশ, ক
কার্যপদ্ধতি এবং শাসনব্যবস্থাকে প্রচা
ইতিহাস বিচারের বিরুদ্ধে নতুন আলো
বিচার করা হয়েছে।' রচনাটি পড়ে প্র
জন্মায় লেখক বেঁচে থাকলে দেশ তাঁর
থেকে ভবিষ্যতে অনেক বেশী কিছু পে
পারতো। আশ্চর্য এই যে, তাঁর প্রব
মহম্মদ তুঘলক সম্পর্কে যে- যে কথা
আছে, শ্রীগিরিশ কারনাড়ের নাট
সেগুলি প্রায় হুবহু প্রতিফলিত। এছ
নাটকটির নাট্যগুণও অসাধারণ।
নাটকটির বাংলা অনুবাদ করে অভি
করলে বাংলা রঙ্গমঞ্চ একটি গুরুত্ব
ঐতিহাসিক নাটক পেতে পারে। দুঃ
এই যে, এই নাটকটি বাজারে মু
পুস্তকাকারে লভ্য নয়। দিল্লীর ন্যাশ
স্কুল অব ড্রামার অধ্যক্ষ শ্রীএব্রা
আলকেজি কেবলমাত্র তাঁর ছাত্রদের
এই নাটকটির অনুবাদ করিয়েছেন
কয়েকটি প্রতিলিপি হিন্দী টাইপে মু
করিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে সোজাসুজি যো
যোগ করলে অবিশ্যি এই নাটক নিয়ে
করার জন্যে প্রতিলিপি পাওয়া যেতে পা
কিন্তু তবু এই অনুবাদ তাঁর ব্যক্তি
প্রচেষ্টারই অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্রীয় সা
অ্যাকাডেমী শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য
'মলিয়র'-এর 'ত্যার্তুফ'-এর অনুবাদ প্র
করেছেন। বাজারে বিখ্যাত গ্রীক ন
'ভেক'-ও পাওয়া যায়, কিন্তু অন
রাজ্যের নাটকগুলির অনুবাদের ব্যা
সাহিত্য অ্যাকাডেমীর প্রচেষ্টা অ
উল্লেখ্য নয়। শ্রীআলকেজি তাঁর ছাত্র
জন্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী নাটকের এ
চমৎকার গ্রন্থাগার করেছেন, তাতে অ
কাংশই হিন্দী অনুবাদ এবং

ইংরেজী অনুবাদও টাইপ করে বাঁধিয়ে সংরক্ষণ করে থাকেন। সেগুলি খুবই মূল্যবান। বিদেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ নাটকগুলিকেই তিনি হিন্দীতে অনুবাদ করিয়েছেন। অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন নাটক অনুবাদেও তাঁর প্রচেষ্টা অগ্রগামী। হিন্দী ভাষায় অবশ্য শেক্সপিয়রের গোটা-কুড়ি নাটক বই হিসেবে প্রকাশিত হয়ে বাজারে বিক্রী হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক হিন্দীতে অনূদিত হয়ে বাজারে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের শ্রীদ্বিবেদী তো বহুকাল আগেই 'রক্তকরবী'-র (হিন্দী 'লালকনের') অনুবাদ করেছেন। বিসর্জনেরও হিন্দী অনুবাদ বাজারে পাওয়া যাবে। চার অধ্যায়ের (নাটক নয়, কিন্তু বাংলাদেশে বহুরূপীর সফল মঞ্চ রূপায়ণের পর নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য) অনুবাদ তো কলকাতায় বড়বাজারের হিন্দী বইয়ের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। মালঞ্চের হিন্দী অনুবাদ 'বিশ্বভারতী'ই প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিও হিন্দী অনুবাদে প্রকাশিত। এছাড়া যেসব নাটক একাধিকবার হিন্দীতে অনূদিত হয়ে মঞ্চসফলতা পেয়েছে সেগুলি হল শ্রীশম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত কাঞ্চনরংগ ও পৈসা বোলতি হ্যায়। কাঞ্চনরঙ্গ অনুবাদ করেছেন শ্রীনেমিচাঁদ জৈন। শ্রীবাদল সরকারের বাকি ইতিহাস-এর অনুবাদের কৃতিত্বও তাঁর। এবম্ ইন্দ্রজিৎ এবং শ্রীধনঞ্জয় বৈরাগীর রজনীগন্ধা অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল। শ্রীঋত্বিক ঘটকের সাঁকো নাটকের অনুবাদ করেছেন ডঃ মহেশ্বর। প্রতিভাজী ও মহেশ্বরজীর অনুবাদগুলি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে। এছাড়া হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে শ্রীবাদল সরকারের বল্লভপুর কী কাহানী, শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নিষাদ। হিন্দীতে নিষাদ প্রযোজিতও হয়েছে, বাংলায় এখনও হয়নি। উল্লিখিত নাটকগুলি শুধু হিন্দীতেই নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতেও অনুবাদ হয়েছে, এ-ব্যাপারে মারাঠি ও গুজরাটি ভাষার উল্লেখ করতে হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষায় বিভিন্ন নাটক হিন্দীতে প্রভূত পরিমাণে অনূদিত হয়েছে। নটরংগ পত্রিকায় প্রায়ই তার তালিকা পাওয়া যাবে। যেমন মারাঠি থেকে : 'কস্তুরীমৃগ' নাট্যকার শ্রীপুরুষোত্তম লক্ষণ দেশপাণ্ডে, অনুবাদক শ্রীরাহুল বারপুতে। 'রায়গড়ের জাগৃতি' নাট্যকার শ্রীবসন্ত কানেটকর অনুবাদক শ্রীবসন্ত দেব। 'রোদের আড়ালে' নাট্যকার শ্রীবসন্ত কানেটকর, অনুবাদক শ্রীবসন্ত দেব। 'লক্ষপতি' নাট্যকার শ্রীবিজয় তেণ্ডুলকার, অনুবাদক শ্রীবসন্ত দেব। শ্রীবিজয় তেণ্ডুলকারের 'চুপ, বিচার চলছে' এবং 'একটা জেদী মেয়ে' অনুবাদ করেছেন শ্রীকমলাকর সোনটক্কে এবং শ্রীবিজয় ওয়াপট। শ্রীখানোলকর-এর 'নিঃসঙ্গ বাজীরাও', শ্রীসাঠে রচিত কিচ্ছপ ও খরগোশ' এবং শ্রীবিদ্যাধর পুণ্ডলীক

রচিত 'চক্র' নাটকের হিন্দী অনুবাদ হয়েছে। প্রখ্যাত কানাড়ী নাট্যকার শ্রীআদ্য রঙ্গাচার্য রচিত 'শোন, জনমেজয়' নাটকের অনুবাদ করেছেন শ্রীনেমিচাঁদ জৈন এবং শ্রী বি ডবলিউ কারন্ত। শ্রীকারন্ত শ্রীরঙ্গাচার্য রচিত 'থাকরো কি!' এবং 'রঙ্গ-ভারত'-এর অনুবাদ করেছেন। শ্রীআদ্য রঙ্গাচার্য রচিত 'নায়ক বিনায়ক'-এর অনুবাদ করেছেন শ্রীপ্রেমা কারন্ত এবং শ্রীমীনা উইলিয়ামস।

শ্রীগিরিশ কারনাড়-এর 'মহম্মদ তুঘলক' ও 'যযাতি'র অনুবাদ করেছেন শ্রী বি ডবলিউ কারন্ত। শ্রীরসিকলাল পারেখ রচিত গুজরাটি নাটক 'শার্বিলক' এবং শ্রীশিবকুমার যোশীর 'শাপমোচন' নাটক-দুটিও হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। 'শাপমোচন' অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল। দক্ষিণ ভারতীয় নাট্যকার শ্রী টি এন গোপীনাথ নায়ার রচিত 'পরীক্ষা' এবং 'প্রতিধ্বনি' এবং শ্রীশঙ্কর পিল্লৈ রচিত 'বন্দী' নাটক হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। ওড়িয়া নাটক 'বনহংসী'র হিন্দী অনুবাদ করেছেন শ্রীমনমোহন দাশ। শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়-এর 'দেবী' (যে-গল্পটি নিয়ে সত্যজিৎবাবু ছবি করেছিলেন) গল্পটিকে হিন্দীতে নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীনেমিচাঁদ জৈন। শ্রীবাদল সরকারের 'সারারাত্তির'-এর হিন্দী অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল। মোহিতবাবুর 'নিষাদ' অনুবাদ করেছেন শ্রীকৃষ্ণকুমার। এছাড়াও হিন্দীতে বহু মূল নাটক রচিত হচ্ছে। সেগুলি বাংলাদেশের মৌলিক নাটকের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'মরণশীল জীব', 'আপনার অনুগত' 'রাজা! জিতে গেছি', 'দেওয়ালহীন বাতি', 'বড় খেলোয়াড়', 'তুষার প্রাসাদ', 'উত্তর প্রিয়দর্শী', 'সূর্যমুখী', 'কলঙ্কী', 'শ্রীযুক্ত অভিমন্যু', 'চায়ের আসর', 'বিন্ধ', 'ঘেরাও' 'চক্রব্যুহে অভিমন্যু', 'মনের ভ্রমর', 'অর্ধ-চক্র' (শ্রীমোহন রাকেশ রচিত), 'জনপদবধূ' (শ্রীঅমৃতলাল নাগরের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল), 'ময়লা একটা চাদর' (রাজেন্দ্রসিং বেদীর উপন্যাসের নাট্যরূপ), 'ভূমিকম্প', 'বড়-মানুষ', 'কাচের খেলনা', 'ডাক্তার', 'রক্তদান' 'মমতা', 'কীর্তিস্তম্ভ', 'রেখা', 'অশোক'



'ধর্মরাজ' ইত্যাদি আরও বহু নাটকের নাম করা যায়। এর মধ্যে কিছু কিছু নাটক আমার ব্যক্তিগত মতে আমাদের অধুনা প্রকাশিত নাটকগুলির চেয়ে শ্রেয়। রাজস্থান সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'রঙ্গযোগ'-এও বিভিন্ন হিন্দী নাট্য-প্রচেষ্টার খবর পাওয়া যাবে। তবু বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীমোহন রাকেশ রচিত 'আষাঢ় কা এক-দিন'। মহাকবি কালিদাসের কাব্যজীবন, ব্যক্তিগত প্রেম এবং রাজদরবারে সভাকবির আসনে উন্নীত হওয়ার সাফল্য ও বেদনা নিয়ে লেখা এ-নাটক। তাঁর 'লহরোঁ কী রাজহংস' রচিত হয়েছে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের কাহিনী নিয়ে কিন্তু তাঁর সর্বাধুনিক রচনা 'আধে অধুরে' বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পটভূমিকায় রচিত খন্ড-বিখন্ড সাংসারিক কাহিনী। কালো পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি এই নাটকের নায়ক। তিনি এই বাড়ীর স্ত্রীর স্বামী। পোশাক পরিবর্তন করে তিনি ঐ স্ত্রীর অফিসের অফিসার, অন্যত্র তিনিই তাঁর পূর্ব প্রণয়ী এবং সর্বশেষ তাঁর পুরুষ-বন্ধু। এছাড়া আর তিনজন পাত্রপাত্রী আছেন নাটকে। উক্ত স্ত্রীর দুই মেয়ে ও এক ছেলে। সামান্য কথা ও ভঙ্গীর পরিবর্তনে কিছু বিয়োজন ও সংযোজনে কেমন করে একই ব্যক্তি একজন মহিলার স্বামী অফিসার পূর্ব প্রণয়ী আর বন্ধু হয়ে উঠতে পারে এই উপস্থাপনা আশ্চর্য রকম সুন্দর। শ্রীজ্ঞানদেব অগ্নিহোত্রী রচিত 'সুতুর মুর্গ' (উটপাখী) সমসাময়িক অবস্থার ওপর কটাক্ষমূলক নাটক। শ্রীধরমবীর ভারতীর 'অন্ধাযুগ'-এর পটভূমিকা কুরুক্ষেত্র মহা-যুদ্ধের শেষ আটঘণ্টার ঘটনা। আধুনিক গদ্য কবিতায় লেখা নাটক। যুগের সিংহাসনে বসে আছেন অন্ধ রাজা ধৃত-রাষ্ট্র। সমস্ত যুগ অন্ধতায় লালিত। মমতার অন্ধত্ব, জড়তার অন্ধত্ব এবং অজ্ঞান-তার অন্ধত্বে প্রতিপালিত প্রজাকুল। মহা-নায়ক শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু আসন্ন। মহাযুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারছেন না। কেননা, প্রজারা সবাই পূর্ব-শাসনের ছাঁচে গড়া। অশ্বত্থামা পশুশক্তিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে রোগ-গ্রস্ত। যুযুৎসু কৌরব বংশ এবং দেশের চেয়েও সত্যকে বড় মনে করেছিলেন, তিনি মোহমুক্ত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন এবং সঞ্জয় যিনি ছিলেন নিরপেক্ষ জ্ঞানের অধিকারী, যুদ্ধের পর দিব্যদৃষ্টি হারিয়ে-ছেন। এই খন্ড-বিখন্ড ব্যক্তিত্বগুলিকে নিয়ে কেমন করে এক মহাযুদ্ধের শেষে মানুষ নতুন সৃষ্টির কাজে নিমগ্ন হয়ে অন্ধ যুগকে অতিক্রম করছে—এ-নাটকে তাই বিধৃত হয়েছে। শ্রীললিত সেহগল রচিত হত্যা এক আকার কী নাটকে চারজন পুরুষ চরিত্র আছে। গান্ধীজীর হত্যার ষড়যন্ত্রের ওপর রচিত এই নাটকটি হিন্দী

নাট্যরচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ দিল্লীর অভিযান গোষ্ঠী শ্রীরাজিন্দর নাথে নির্দেশনায় এই নাটক সাফল্যজনকভা অভিনয় করেছেন। হত্যা এক আকার ক ছাড়াও শ্রীললিত সেহগল 'বরদান', 'তামাস 'তিন ফরিস্তে', 'কাগজ কী দীবার' রচ করেছেন। এছাড়া মৃচ্ছকটিকের অনুবা করেছেন। হত্যা এক আকার কী নাট সংযোজিত ঃ

তু' সাড়ে পিন্ড কদী ন আয়া,
ভলা মৈনু' তেরি সেঁহ
তু' দেশ আজাদ করায়া,
ভলা মৈনু' তেরি সেঁহ
বীরাঁ তো ভোণাঁ খোহ লইয়াঁ,
ভলা মৈনু' তেরি সেঁহ
মাবাঁ তো ধীয়াঁ খোহ লইয়াঁ,
ভলা মৈনু' তেরি সেঁহ

নাটকটিকে আশ্চর্য বিশিষ্টতা দিয়েছে আধে অধুরে নাট্যরচনায় শ্রীমোহন রাকে হিন্দী কথ্যভাষা নিয়ে ভাঙাগড়ার এক অভূতপূর্ব গবেষণা করেছেন এবং তা আশাতীতভাবে সফল হয়েছেন। এ কাহিনী অবলম্বনে তিসরী কসম খ্যা চিত্র-পরিচালক শ্রীবাসু ভট্টাচার্য দিল্লী প্রযোজিত এই নাটকের ভূমিকালিপি অংশগ্রহণকারী শিল্পী ও পরিচালক শ্রী শিবপুরী এবং শ্রীসুধা শিবপুরীকে নি একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন। শ্রী শিবপুরী দিল্লীর একজন প্রখ্যাত যু অভিনেতা। শ্রীইব্রাহিম আলকেজি প্রযোজি মহম্মদ তুঘলক নাটকে তিনি প্রভূত খ্যা অর্জন করেছেন।

আগেই বলেছি, শ্রীললিত সেহগল-এ 'হত্যা এক আকার কী' নাটকটি দিল্লী শ্রীরাজিন্দর নাথের নির্দেশনায় উল্লেখযে মঞ্চসফলতা লাভ করেছে। এই কাহিনী অবলম্বনে বম্বেতে শ্রীবিমল আহ খ্যাতিমান অভিনেতা ডেভিডের সহযো তায় 'ফাইভ পাস্ট ফাইভ' নামে এব ইংরেজী ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করে এবং বিশেষ প্রশংসিত হয়েছেন। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত না হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে। শ্রীমোহন রা তো স্বয়ং অভিজ্ঞান শকুন্তলমের হি অনুবাদ করেছেন। এমনকি সংস্কৃত একা নাটক 'ভগবদজ্জুকম্'-এর অনুবাদ ক ছেন শ্রীনেমিচাঁদ জৈন।

পাটনা শহরে শ্রীঅনিলকুমার মু পাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিহার আর্ট থিয়ে বাংলা হিন্দী ও ইংরেজী নাটক প্রযো করে থাকেন। আর্থার মিলার-এর ডে অব এ সেলসম্যান এবং স্যামুয়েল বেকে ওয়েটিং ফর গোডো-র ইনি হিন্দী অনু করেছেন 'এক সেলসম্যান কী মৌত' ইন্তজার'। আয়োনেস্কোর 'রাইনো রাস'-এরও হিন্দী অনুবাদ ইনি করেছে এছাড়া এঁর রচিত হিন্দী নাটক 'পাগ 'জলী খিড়কী', 'বিজলী', 'কারণ

'বহুরূপী', 'বিনা দুলহিন কী শাদী', 'হুম জিনা চাহ্‌তে হৈ', 'বিল্লী' ও 'আসাম মেল' উল্লেখযোগ্য।

দিল্লীতে হিন্দী নাটক অভিনয়ের একাধিক দল আছে। তাঁদের প্রযোজনা অহিন্দীভাষীদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী শ্রীইব্রাহিম আলকেজি নিজে। তিনি রাজা ইডিপাস', 'দি ট্রোজান ওমান' এবং আধুনিক কালে কিছু বিদেশী নাটক হিন্দী ভাষায় প্রযোজনা ছাড়াও মহম্মদ তুঘলক এবং অন্ধাযুগ নাটকটির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা করেছেন। সাম্প্রতিককালে বার্লিনিয়র অাঁসাম্বল'-এ কার্ল ওয়েবার-এর যুগ্ম উদ্যোগে শ্রীআলকেজি প্রযোজিত বারটোল্ট ব্রেখ্‌টের 'দ্য ককেশিয়ান চক সার্কল এবং 'দ্য থ্রি পেনি অপেরা'-র হিন্দী প্রযোজনা সর্বভারতীয় স্তরে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। কলকাতায় একাধিক নাটকের দল আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'অনামিকা'। এই দলের প্রধান নির্দেশক শ্রীশ্যামানন্দ জালান। ইনি হাই-কোর্টের অ্যাডভোকেট। জীবিকাগত কারণে বিদেশে থাকাকালীন ইনি নাট্যচর্চা সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এদের প্রত্যেকটি প্রযোজনায় অসাধারণ বুদ্ধির ছাপ থাকে। এঁর মেয়ে কুমারী আভাও একজন ভাল অভিনেত্রী। শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল এই দলের একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। ইনি হিন্দীভাষার অধ্যাপনা করে থাকেন। এঁর মেয়ে রামা আগরওয়ালও বেশ সুন্দর অভিনয় করেন। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণ-কুমার, শ্রীকল্যাণ চট্টোপাধ্যায় এই দলের শক্তিমান অভিনেতা। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিন্দী ভাষার অধ্যাপক শাস্ত্রীজীও এই দলের উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত। হিন্দীভাষী ছাড়াও বিভিন্ন নাট্য দলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে এঁরা অনামিকা কলাসঙ্গম প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার কাজও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা বিভিন্ন সময়ে নাটকের ওপর আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করে থাকেন। ভারতবর্ষের গুরুত্ব-পূর্ণ নাট্যপ্রযোজনাগুলিকে অভিনয়ের জন্যে আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে থাকেন এবং হিন্দী নাটকের নিয়মিত অভিনয় সম্পর্কে এঁদের উদ্যম ও পরিকল্পনা খুবই প্রশংসা-জনক। এঁরা এঁদের সফল প্রযোজনাগুলি কলকাতায় একাধিকবার এবং বাংলাদেশের বাইরে সবকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে অভিনয় করে খুবই প্রশংসিত হয়েছেন।

বাংলাভাষায় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের নাটকের অনুবাদ কিংবা অভিনয় বিশেষ হয়নি। এক সময়ে মুক্ত অঙ্গনে শৌভনিকের প্রযোজনায় 'আন্ডার সেক্রে-টারী'র বাংলা অনুবাদ 'যা নয় তাই' শ্রীবীরেশ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী নিবেদিতা দাসের উদ্যোগে অভিনীত হয়েছে। প্রযোজিত হোক আর না হোক ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার নাটকগুলিকে বাংলা নাটকের নিজস্ব স্বার্থেও অনুবাদ করলে আমাদের পক্ষে ভাল হবে। এতে আমরা সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাটকের সঠিক স্থান নির্দেশ করতে পারবো। কেউ এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হলে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমীর সম্পাদক ডঃ সুরেশ ওয়াস্থি সাহায্য করতে আগ্রহী। তিনি অর্থ সাহায্য এবং প্রকাশনার ব্যাপারে সবরকম সাহায্য করতেই প্রস্তুত। কিন্তু এই প্রবন্ধের শুরুর দিকে উল্লিখিত কারণ-গুলির জন্যে এ-ব্যাপারে কাজ এখনও কিছুই এগোয়নি, এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নাট্যপ্রচেষ্টার ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতা দূরীকরণের কাজ বহুল পরিমাণে বাকী রয়ে গিয়েছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার নাটকের বাংলা অনুবাদ করতে হবে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই; যে-স্বার্থে বাংলা নাটক অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হচ্ছে সেই একই কারণে। ইতিমধ্যেই অন্যান্য ভাষায় বাংলা নাটকের অনুবাদের কাজ আমাদের গ্রহণ করা উচিত ছিল, কিন্তু সে-কাজ আগ্রহী ব্যক্তিরা আগেই গ্রহণ করেছেন। সুনাম কি পুরস্কারের লোভে নয়, বাংলা নাটকের নিজস্ব স্বার্থেই এই অনুবাদের কাজ অনেক বেশী করে গ্রহণ করা উচিত। এ-ব্যাপারে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী নাট্য-বিদ্যালয়ের উৎসাহ অনেক বেশী কার্যকর হতে পারে। বাংলাদেশে তো এপর্যন্ত জাতীয় নাট্য-শালা প্রতিষ্ঠিত হল না, নইলে সেখানেও কিছুটা কাজ হতে পারতো। এখন বাংলা-দেশে তুলনামূলকভাবে অনেকগুলি বিদেশী নাটক অনূদিত ও অভিনীত হচ্ছে। আবার অনুবাদের কথা তুললেই মৌলবাদীরা আঁতকে উঠবেন। তবু মৌলিক নাটক যে কী বস্তু তা বোঝার জন্যেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার নাটকের অনুবাদ আমাদের সাহায্য করবে।

আমাদের বাংলাদেশে কয়েকটি নিয়মিত মঞ্চ আছে। হিন্দী থিয়েটারের জন্যও অনেকগুলি মঞ্চ সারা ভারতবর্ষব্যাপী তৈরী হয়ে গেছে। এখনও ও'দের প্রযোজনা সাধারণভাবে বিদেশের বিভিন্ন প্রযোজনার মুখাপেক্ষী। এখনও ও'দের প্রযোজনাগুলি ও'দের ঐতিহ্যের সঙ্গে সার্থকভাবে যুক্ত হতে পারেনি। এখনও ও'রা নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার নাটকের চেয়ে বাংলা নাটককেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে থাকেন। এ-কথা সত্যি যে, বাংলা নাটকের শুরু থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নাট্যঐতিহ্য সৃষ্টিকারী তেমন বড় নাট্যকার হিন্দীতে এখনও আসেননি, কিন্তু প্রযোজনার ক্ষেত্রে ও'দের অসাধারণ সাফল্য এবং নাট্যরচনা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ও'দের বিরাট ও ব্যাপক কর্মকান্ড অদূর ভবিষ্যতে ও'দের নিজস্ব শ্রদ্ধার আসনটিকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে।
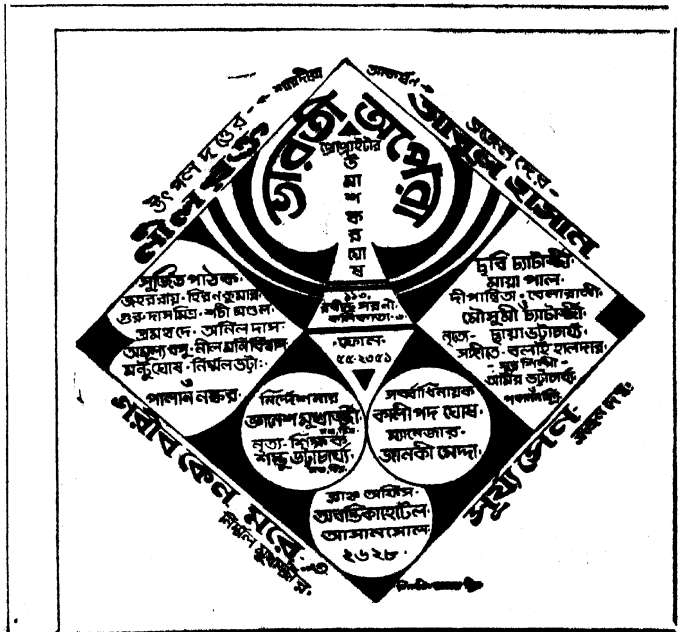
**শান্তিগোপাল**

সামনে পর্দা। নেপথ্যে কণ্ঠস্বর—

১৮৭০ খৃঃ ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯২৪-এর ২১ জানুয়ারী পর্যন্ত মানব-ইতিহাসের একটানা এক অধ্যায়—একটি অবিস্মরণীয় যুগ। কিন্তু এই ৫৩-৫৪ বছরের মাঝেই এর অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়নি। মানব-সভ্যতা যতদিন থাকবে ততদিন এই ক' বছরের ইতিহাস প্রতিবার নতুন করে মানুষের হাতে এসে নতুন প্রেরণা দেবে, আর বিশ্বমানবসত্ত্বা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবে সেই যুগন্ধর পুরুষকে, যিনি আদিম পৃথিবীর পেষণ-যন্ত্রটা সর্ব-প্রথম সরিয়ে নিয়েছিলেন সর্বহারাদের বুকের ওপর থেকে। সেই কীর্তিমান শুধু রাশিয়ার নন, সর্বজাতির, সর্বকালের গৌরবের ও গর্বের ধন। তিনি ভলোদয়া—তিনি ভ্লাদিমির উলিয়ানভ—আমাদের আদরের 'লেনিন'।

'লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে
অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ
মৃত্যুর সমুদ্র শেষ; পালে লাগে
উদ্দাম বাতাস,
মুক্তির শ্যামল তাঁর চোখে পড়ে,
আন্দোলিত ঘাস।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে ক্লীবতার কাছে
নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয়
আমিই লেনিন।'

*

—হ্যাঁ আমিই লেনিন।

সরে যায় মঞ্চের পর্দা। অজস্র, অগণিত শ্রোতা। শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে লেনিনের ডাক। দেশে-দেশে এই মানুষটি যেন নির্যাতিত মানুষের আত্মার আত্মীয়। ৩৫০ কোটিরও বেশি মানুষের বাস এই গ্রহে। লেনিনের নাম শোনেননি, এমন মানুষ আছেন সংখ্যায় খুব কমই। লেনিনের নাম জড়িত ১৯১৭ খৃঃ অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে। এই বিপ্লব পৃথিবীর চরিত্র বদলে দিয়েছে। শুধু রাশিয়ার জন্য নয়, এই বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির জন্য সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করেছে। লেনিন লড়াই করেছিলেন কাদের জন্যে? যারা নিজেদের শ্রমের দ্বারা পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে অবদান যোগায় এবং তার বৈষয়িক আত্মিক সম্পদ বৃদ্ধি করে তাদেরই সুখের জন্য। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এংগেলসের পর আর কেউ সেই লক্ষ্যের জন্য এমনভাবে লড়াই করেনি।

লেনিন চরিত্রাভিনয়ের কথা শুনে হতবাক্ হয়েছিলাম প্রথমে। চিন্তায় যে মানুষের পরিধি আমার অকল্পনীয়, তাকে আমি ধরব কিভাবে। তবুও পিছিয়ে পড়বার মত মন আমার নয়। প্রতিটি মুহূর্তের চিন্তা হোল তখন লেনিন। সেই সঙ্গে সাধ্যমতো পড়াশুনো। রাশিয়ার অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, লেনিনের ভূমিকা, অভ্যুত্থান, বিপ্লবের পটভূমি, বিপ্লব ও পরবর্তীকাল সম্পর্কে বিস্তৃত-ভাবে জানবার চেষ্টা করলাম। সেই সঙ্গে পড়েছি অসংখ্য লেনিনের জীবনী। যাঁর

দেখেছি। বোঝবার চেষ্টা করেছি মানুষ লেনিনকে। কথা বলবার ধরণ, চলা-ফেরার স্বাতন্ত্র্য, পোশাক পরিচ্ছদ, মুদ্রাদোষ আরো অনেক কিছু—যা নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি মানুষ। তাকে নিজের মধ্যে ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। সে এক নিদারুণ অধ্যবসায়—প্রতিটি ব্যর্থতা এনে দিয়েছে নতুন করে জানবার আগ্রহ।

তারপর একদিন মঞ্চে, আমি লেনিন হয়ে গেলাম। সে দিনগুলো, রাতগুলো, আজ স্বপ্ন। আবার আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে মানুষের মাঝখানে। মঞ্চে শান্তিগোপাল আর লেনিন সেদিন একাকার। সামনে বসে অজস্র জনতা। দূরে দূরে অঞ্চল থেকে এসেছে ওরা। কী অসীম আগ্রহ! কী নিদারুণ প্রতীক্ষা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে, তবু জায়গা থেকে নড়েনি কেউ। মনে হোত ঐ যে অগণিত শ্রোতা ওরা আমার দেশের বঞ্চিত অবহেলিত শোষিত মানুষ। ও'রা এসেছে নতুন দিনের কথা জানতে। একটি মানুষের সংগ্রাম-মুখর জীবন ওদের কাছে আজ বাস্তব। সে মানুষ লেনিন। আর সেই মুহূর্তে আমিই লেনিন।

*

হ্যাঁ, আমিই লেনিন।

কমরেড্‌স! বুকের রক্ত দিয়ে আমরা জয়ী হয়েছি। সেই রক্তে রাঙা হয়েছে আমাদের নিশান। এই নিশান হাতে নিয়ে এবার থেকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে, হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। সারা দেশে কোথাও থাকবে না শ্রেণীভেদ, দায়িত্ব নির্বিশেষে সব রকমের পদই পাবে সমান মর্যাদা। জড়তার বিরুদ্ধে, অজ্ঞানতা, সংকীর্ণতা, ক্লীবতার সংগ্রাম—আমাদের বিপ্লব। এই আনন্দের জোয়ারে কোনওদিন ভাঁটা না পড়ে। এই প্রাণোচ্ছলতার উদ্দামতা যেন কোনও দিন স্তিমিত না হয়। এই বিপ্লবের আগুন যেন কোনওদিন না নিভে যায়।

সত্যিই তো বিপ্লবের আগুন যাতে নিভে না যায়, সে দায়িত্ব শ্রমিক কৃষকের সঙ্গে শিল্পীর ওপর দিয়ে গেছেন লেনিন। এই কথাটি বারবার আমার মনে পড়ত। একটি কথাই তখন ভেবেছিলাম লেনিন রাশিয়ায় যে দুরবস্থার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন দুর্ধর্ষ শাসকদের উৎখাত করে, আমাদের দেশের অবস্থা কি তার থেকে এমন কিছু উন্নত! এদেশের মানুষও না খেয়ে মরে, এদেশেও বাবা মা পয়সার অভাবে লেখাপড়া শেখাতে পারে না সন্তানকে। পারে না নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য ওষুধ সংগ্রহ করতে, বুভুক্ষু মানুষের মিছিল শুধু শহরে নয়, গ্রামেও চোখে পড়বে। তাই আজ আমার কাছে লেনিনের স্বপ্ন বড় বাস্তব হয়ে ওঠে। হারিয়ে ফেলি নিজেকে। ভুলে যাই অর্থ, যশ। উন্মাদ হয়ে যাই যেন মুহূর্তে, মুহূর্তে।

যাত্রা জগতে আমার প্রথম প্রবেশ 'উদয়াচলে'। এই সংস্থার নানান বই-এ অভিনয় করেছি। অতি সাধারণ সে সব চরিত্র। তবুও নিজেকে তৈরী করার দিক থেকে, সে সব দিন ছিল আমার চরম শিক্ষার দিন। বেশ কিছুকাল পরে তরুণ রায়ের ওখানে শিখেছিলাম মঞ্চশিল্পের কলা-কৌশল। ব্যক্তিমত ধারণা, যে কোন অভিনেতাকে তার অভিনয় মাধ্যমের সামগ্রিক দিক সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান অর্জন করতে হবে। বুঝতে পারি না, তা না হলে, কি করে একজন শিল্পীর পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

অনেক পরে এলাম নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায়। মাসিক মাইনে ষাট টাকা। নতুন বইয়ে একটু বেশী গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেলাম। সে সব দিনগুলি যেন, ছবির মত সাজান। নির্জনে যখন অতীতকে ভাবি, তখনই তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

আজ থেকে তের বছর আগে 'রূপ-কুমার' পালায় রঘু ডাকাত চরিত্র পেলাম; সেই আমার প্রথম মুখ্য-চরিত্রাভিনয়। কিছু খ্যাতি পেলাম। কিন্তু তখন যাত্রা-জগতে বড় বড় অভিনেতা। তাদের টপ্‌কে যাওয়ার দুঃসাহস ছিল না। নানা প্রতিকূল আব-হাওয়া আমাকে কিছুটা বিভ্রান্ত করে ফেলল। তবুও শ্রদ্ধেয় পঞ্চু সেন আমাকে ভাগের বলি পালায় কঙ্ক চরিত্রে অভিনয় করতে দিলেন।

তারপর চন্দ্রাবলীতে জয়চন্দ্র। অভিনয় করে সামান্য স্বীকৃতি মিলল। তবুও যাত্রা জগতের প্রচলিত 'নায়ক চিন্তা'র থেকে আমি তখন অনেক দূরে। স্বপ্ন দেখছি সেই সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার। নানা প্রতি-কূলতার মধ্যে নট্ট কোম্পানীতে যোগ দিলাম। জাহান্দার শার ফিরোকশা অভিনয় আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই চরিত্র অভিনয় করে বহু দর্শকের অভিনন্দন পেয়েছি। কিছুটা তৃপ্তি তো বটে। আবার ফিরে গিয়ে নিউ রয়েল বীণা-পাণি অপেরায় যুযুৎসু পালায় অভিনয় করলাম।

তারপর এলাম তরুণ অপেরায়। তরুণ অপেরাই আমার জীবনে স্মরণীয় অধ্যায়। পরপর কয়েকটি পালায় মুখ্য চরিত্রাভিনয়ের সুযোগ পেলাম। রক্তের নেশা, শেষ অঞ্জলি, মেঘে ঢাকা রবি, ঘুম ভাঙার গান, হিটলার, লেনিন, রাজা রামমোহন, নেপোলিয়ান রমলা সার্কাস। হিটলার-এ অভিনয় রাম-মোহন অভিনয় থেকেও জনপ্রিয় হয়েছিল। নেপোলিয়ন এবং রমলা সার্কাস এখনও পরীক্ষার স্তরে। নিজস্ব বিশ্বাস, লেনিনই বোধহয় আমার সাম্প্রতিক অভিনীত শ্রেষ্ঠ চরিত্র। চারদিকের জীবন দেখে প্রত্যেকের মধ্যে একটি স্বপ্ন, আশা, ইচ্ছা যাই বলুন না, কিছু একটা করবার প্রেরণা জাগে। সেই প্রেরণায় কাজ করে যায় মানুষ। অভিনেতাও নিজের চরিত্র-ধর্ম অনুযায়ী উপযুক্ত চরিত্র পেলে তাতেই হয়ে ওঠেন সার্থকময়। আমার মনে হয় লেনিন চরিত্রে হয়ত তেমন কিছুই আমি পেয়েছিলাম। আমার অন্তরঙ্গরা কেউ কেউ বলেছেন, আজ যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেন, হয়ত আপনার ডাক পড়বে সিনেমায়। সে তো খুবই আনন্দের। কিন্তু তারা মনে রাখবেন, যাত্রা-জগতের যে সব শিল্পী আমার সঙ্গে অভিনয় করে, আমার দক্ষতাকে বিকশিত করেছেন, তাদের কি আমি ভুলতে পারি। আমি জানি যাত্রায় যেমন প্রচুর অর্থ,
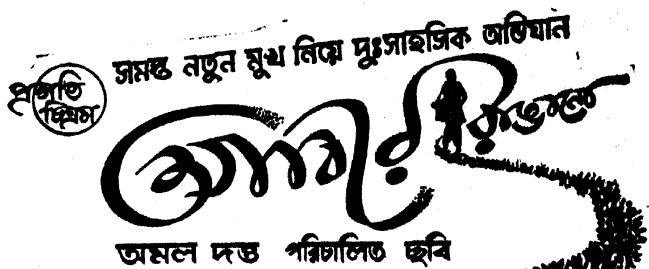
তেমনি আছে দারিদ্র্য। আমার বন্ধুদের ত্যাগ করে আমি কোথাও খ্যাতির লোভে যেতে পারি না। বর্ষার মরশুমে আমাদের কোন কাজ থাকে না। একমাত্র সেই সময়ই আমি সিনেমায় অভিনয় করব। অন্য সময় যাত্রা। কারণ, এই যাত্রা আমার খ্যাতির মূল। আগে যাত্রা তারপর সিনেমা। বিপুল ঐশ্বর্যের মোহ আমার নেই। আমি জানি কোন শিল্পীর পক্ষেই একক বিকাশ সম্ভব নয়। ঐ সব দুঃস্থ দারিদ্র্যময় সহযাত্রীদের জীবনেও আজ এসেছে নতুন দিনের স্বপ্ন, শিল্পবোধ। প্রত্যেকের মধ্যে জেগেছে আত্ম-মর্যাদা। ওদের সামনে নতুন স্বপ্ন। নতুন দিগন্তের ইশারা। একজন রুশ কবির ভাষায় বলতে পারি—

আজ আমরা
নবকালের দোরগোড়ায়,
আমাদের দুনিয়া
বদলাচ্ছে.
বদলে যাচ্ছে!

কমরেডস্,
এগিয়ে চলার আওয়াজ তোল!
প্রজ্জ্বলন্ত সূর্য
করুক করুক
অগ্নিবর্ষণ!
জীবন
সামনে আমাদের জীবন,
তার ভবিষ্যৎ সঙ্গী লেনিন,
আর ভবিষ্যৎ
সঙ্গী যৌবন!

# নবনাট্য আন্দোলন ও একটি প্রশ্ন

দিলীপ মৌলিক

চোখ ও মনের অজানা আকাশটা যদি হঠাৎ একটি বিস্ময়ের দোলা জাগিয়ে অতল গভীরতায় নতুন করে প্রাণময় হয়ে ওঠে, তখন চমক জাগে প্রাণের সোনালী সমুদ্রে। বিমুগ্ধ হয়ে তখন ভাবি, এই আলোড়নেই চিরন্তনের হবে সেতুবন্ধন; কিন্তু এই অনুভূতি সত্য হয়ে ওঠে তখনই যখন এই আকস্মিকতার আবেগ জীবনের বাস্তব বেগের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে নানা রকম শৈল্পিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে নতুন চিন্তার জোয়ার নাট্যানুরাগীদের মানসিকতাকে আপ্লুত করেছে, তার উচ্ছ্বসিত আমেজটা কতটা আজকের প্রশ্নমথিত জীবনকে উদ্বেল করতে পেরেছে: সীমানাবিহীন প্রতিটি প্রান্তরে প্রসারিত প্রতিটি মানুষের জীবনকল্লোল কতটা আভাসিত হয়েছে এই অন্য ধরনের থিয়েটারের নতুন আলোয়, তার নিরিখেই নাট্য-আন্দোলনের বা প্রগতিশীল নাট্যচর্চার মূল্যায়ন হবে। অচেনা আকাশটার বুকে জীবনের সুখ-দুঃখের মেঘ এনে দিলেই, চেনার বন্যায় দিগন্ত মিশে যায় মাটির মমতায়। এই সত্যের আলোতেই বিচার করা যাক, দেশের সাধারণ মানুষ আর নাট্যচর্চার গণ্ডী, এর মধ্যে পরিচিত কতটা অন্তরময় হতে পেরেছে।

ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের অতিরঞ্জিত ও অতিনাটকীয় পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে 'নবান্ন' যেদিন নতুন এক স্বাদ বাংলার নাট্যমঞ্চে এনে দিল, সেদিন থেকেই ধ্বনিত হল বাংলা থিয়েটারের যুগান্তরের বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপ। 'নীলদর্পণে'র মধ্যে যার সূচনা 'নবান্নে'র মধ্যে তা দৃপ্ত সম্ভাবনায় মুখর হয়ে উঠল। নবান্ন থেকে শুরু করে দেশের মঞ্চবিবর্তন কর্ম ও কনটেন্টের দিক থেকে বিপ্লবের ছন্দেই এগিয়েছে সন্দেহ নেই। নাটক করা যাদের পেশা নয়, তাঁদেরই শিল্পচর্চার নিষ্ঠায় দেশের নাট্যলোক রূপান্তরের আলো পেয়েছে। দেশের সামগ্রিক শিল্পসংস্কৃতির ইতিহাসে এটা একটা নিঃসন্দেহে গৌরবান্বিত অধ্যায়।

আজকের থিয়েটার সম্পর্কে যে অদম্য উৎসাহ ও অশ্রান্ত কৌতূহল জেগেছে, তার মূলে আছে বিভিন্ন ধরনের নাট্য-প্রযোজনা ও আঙ্গিকের চমকপ্রদ ব্যবহার। বিদেশী নাটকের অসংখ্য রূপান্তর লোকের পরিচিতির সীমা প্রসারিত করেছে এবং পরিবেশের স্বাতন্ত্র্যে চমকও জাগাচ্ছে মনে। এ্যান্টি প্লে, অ্যাবসার্ড নাটক ও রূপক নাটক প্রভৃতি বিভিন্নমুখী নাট্য-নিরীক্ষার বিপ্লবও আসছে চিন্তার জগতে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, এই বিপ্লবের স্বরূপ কি দেশের প্রতিটি দর্শকের মনে স্পষ্টতা পেয়েছে বা তা প্রাণের গভীরে তুলেছে আন্দোলন? এই প্রশ্নের সামনে আজ বলিষ্ঠভাবে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে। তার কারণ দেশের বহু সাধারণ লোক এই নাট্যচর্চার স্বাদ পাচ্ছে না, বহু ক্ষুব্ধ কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠতে শুনছি—'এ কি নাটক? আমরা কোথায়? আমাদের জীবন কোথায়?' যাঁরা এ কথা বলছেন, তাঁদের মনোবৃত্তি বা অনুভূতিকে পুরাতনপন্থী বা অগভীর বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না, বরং তাঁদের এই ক্ষোভের নেপথ্যে সত্যতা আছে কিনা, তাকেও বিচার করে দেখতে হবে। নচেৎ নাট্য-আন্দোলন একটি বিশেষ শ্রেণীর 'ইনটেলেকচুয়াল' দর্শকদেরই উপলব্ধির সামগ্রী হবে, দেশের জনসাধারণ সে সম্পদ থেকে হবে বঞ্চিত। সে বঞ্চনা কিন্তু শিল্পসংস্কৃতির ইতিহাসে মোটেই কাম্য নয়।

একটা কথা কিন্তু খুব সত্য যে, আজকের নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণে একটি বিদগ্ধ শিল্পবোধ কাজ করছে, যার ফলে মানসিকতার একটি উঁচু স্তর থেকে আলো ফেলে নতুনত্বের আবেগ আনা হচ্ছে নাট্য-নিরীক্ষায়। অবশ্য পুরনো চিন্তার গ্রন্থিমোচনের এই শৈল্পিক অনুরাগই প্রয়োজন। কিন্তু শিল্পের প্রাণময় ভিত্তি বাস্তব জীবনেরই গভীরে, এ সত্যটা ভুলে গেলে চলবে না। সাগর পারের নাট্য-সাহিত্য থেকে ব্রেখট, পিরাণদেলো, চেকভ, আয়ানেস্কো, অ্যালবি, ও'নীল, আর্থার মিলার প্রভৃতি নাট্যকারদের সৃষ্টিকে আমাদের দেশের দর্শকদের সামনে আজ মঞ্চের আলোয় দেখান হচ্ছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিদেশী চরিত্রগুলো দেশের জল হাওয়ায় আমাদের [illegible] হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টা সবক্ষেত্রে কতটা সার্থক হয়, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আসল কথা হল প্রতিটি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ কোন না কোন ব্যাপারে ভিন্ন। তাই ইটালী বা জার্মানীর একটি চরিত্রকে যখন বাংলার আলো, হাওয়ায় স্পন্দন দেওয়া হয়, তখন সে বাঙালী হতে গিয়েও পরিপূর্ণভাবে বাঙালী হতে পারে না, আবার ইটালী বা জার্মানীর প্রাণসত্তা হারায়। শেষ পর্যন্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একটি মিশ্র চরিত্রের মানুষ হয়ে দাঁড়ায়।

তাহলে কি এই সব নাট্যকারদের সান্নিধ্যের কোন অর্থ নেই? নিশ্চয়ই আছে, তবে এঁদের নাটকের চরিত্রগুলোর মত আমাদের দেশের মাটিতেও বহু চরিত্র মুঠো-মুঠো অনুভূতি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরও ধরতে হবে নাটকে। দেশের মানুষ মঞ্চের আলোয় নিজেকে আন্তরিকভাবে চিনলেই, পরে সেই নিজেকে চেনার নিবিড়তায় অন্য দেশের মানুষকে চিনে নেবে জানার নতুন উদ্দীপনায়। রূপান্তরিত নাটকের বিরোধিতা করতে চাইছি না, তবু বলছি আমাদের দেশের বহু প্রান্তরের জীবন্ত সমস্যা উপেক্ষিত আছে আজকের নাটকে। জীবনধর্মী নাট্য-প্রযোজনা কি আমাদের দেশের এই জীবনকে বাদ দিয়ে সম্ভব? এই জীবনের কথা না বলে একমাত্র বিদেশের জীবনচর্যায় শরণাপন্ন হওয়ার মধ্যে কোন্ গভীরতর শিল্পসত্য লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখার সময় আজ এসেছে।

অ্যাবসার্ড নাটকের প্রযোজনা আজকের নাট্যচর্চার একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। অদ্ভুত উদ্ভট গল্পের মধ্য দিয়ে নাট্যসংঘাত তৈরী হয় এবং দর্শককে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এক সত্যকে বিশ্বাস করে নিতে হয়। এ নাটকের নায়ক এক আগন্তুক; যে রুগ্ন, পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত; যার কাছে এই চলমান পৃথিবীর কোন অর্থ নেই, একটা শূন্যতাই এর একমাত্র শোভা। এই ধরনের এক বাস্তববিচ্ছিন্ন নায়কের আর্তনাদ 'আমার কণ্ঠনালীতে সূর্যটা আটকে গেছে' অ্যাবসার্ড নাটকের সীমানা জুড়ে আছে। ক্যামু, আয়ানেস্কো যাঁরা এই বিশিষ্ট নাট্যচর্চার পথ উন্মুক্ত করে প্রযোজনা এবং শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে এক নতুন পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের সৃষ্টিকে সামনে রেখেই বাংলা দেশে এই ধরনের নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল মানসিকতার দিক থেকে এ দেশের দর্শক

তেরে মেরে স্বপ্নে/পরিচালনা : বিজয়ানন্দ/হেমা মালিনী ও দেবানন্দ। ফটো : অমৃত

কি আয়নেস্কোর 'আমেদি' অ্যালবি'র 'জু স্টোরি'কে বাস্তব জীবনে গ্রহণযোগ্য শিল্প-সত্য বলে মেনে নিতে পারছে? যে কটি এই ধরনের নাটক এ দেশের মঞ্চে পরিবেশিত হয়েছে, তার আবেদন জেগেছে এক বিশেষ শ্রেণীর বিদগ্ধ দর্শকের কাছে; সাধারণ মানুষ তার মধ্যে কোন বিহ্বলতা বা আত্মমগ্নতা খুঁজে পায় নি।

আসল কথা হল যে, চোখে দেখা জীবনটাকে যেখানে সম্পূর্ণ করে জানা হল না; তার প্রতিটি মুহূর্তের বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা আন্দোলন বা আলোড়নকে যে নাটকের সংঘাতে নিঃশেষে যেখানে ভাষা দেওয়া হল না; সেখানে প্রথমেই এই জীবনটাকে অর্থহীন বলে ভাবা যায় কি করে? তাছাড়া জীবনের এই অর্থহীনতা আমাদের দর্শকের সমর্থন পায় না। তাহলে কি করে 'আগন্তুক' নায়ককে আমাদের প্রাণের দোসর হিসেবে মেনে নেওয়া যায়? ইউরোপের নাটকে জীবনকে বহু দিক থেকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। বাস্তব জীবন সমস্যার গভীরে আলোকসম্পাত সেখানে সম্পূর্ণ বলেই, সেখানকার দর্শক মনোবৃত্তির দিক থেকে জীবনের গভীরে লুকানো আর একটি নতুনতর জীবন সত্যের ছবি দেখে পরিচিতির সেতুবন্ধনের চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমাদের দেশে, শহরে ও গ্রামের প্রতিটি মানুষের চলমানতাকে, তার বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতকে এখনো সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া হয় নি। তাই মনে হয় অ্যাবসার্ড নাট্য-প্রযোজনা আমাদের দেশে আকস্মিকতার চমক সৃষ্টি করেছে, কেননা প্রত্যাশিত মুহূর্তের সাড়া পেয়ে তা আসতে পারে নি।

আঙ্গিকের দিক থেকেই আজকের নাট্য-প্রযোজনা অসাধারণ বলিষ্ঠতার সন্ধান দিয়েছে। আলোকসম্পাত, আবহ-সঙ্গীত, মঞ্চসজ্জার মধ্যে সব সময়েই একটা শৈল্পিক সাজেসটিভনেস কাজ করছে। ফর্মের দিকে দেখা দিচ্ছে অসাধারণ কৌতূহল, প্রযোজকের দৃষ্টি প্রায় বেশীর ভাগ সময়েই নিবদ্ধ থাকছে কি করে 'টেকনিক্যাল গ্ল্যামার' সৃষ্টি করে মঞ্চকে মায়ামন্দির করে তোলা যায় সেদিকে। নাট্য-প্রযোজনায় এই 'প্রসাধনকলা'র মূল্যকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি উপেক্ষা করা যায় না এর 'সাধনবেগ'কে। দুয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়েই তো সার্থক শিল্প-সৃষ্টি।

যে কথা স্পষ্ট করে বলতে চাইছি তা হল এই যে, আমাদের আজকের নাটক আমাদের দেশের বর্তমান জটিল পরিপ্রান্ত জীবনকল্লোলের মাঝপথে দাঁড়িয়েও যেন মনে হয় সরে যাচ্ছে দূরে, অন্যলোকে হয়ত বা সাগরপারে। অন্য দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশের আলো হাওয়ায় লালিত মানুষগুলোর প্রাণসত্তাকে কি স্পষ্টতায় ভাষা দেওয়া যায়? আর কেনই-বা এই দূরে সরে যাওয়া? এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কোন্ মহত্তর শিল্পসাধনার ইঙ্গিত থাকতে পারে? অনেকে বলবেন আমাদের দেশের মানুষের বাস্তব জীবন সমস্যা
অনেক নাটক লেখা হয়েছে এবং অ
হচ্ছে। কথাটার আংশিক সত্যতা
নিয়েও বলব যে, এক বিশেষ মধ্যবি
উচ্চ-মধ্যবিত্ত বা ধনীর জীবনকে এবং
আবর্তিত কিছু চরিত্রকে নাট্যসংঘাতে
দেওয়া হয়েছে; কিন্তু যে মানুষগুলো
থেকে দূরের জীবনধারাকে কর্মনিষ্ঠায়
উদ্বেল আন্তরিকতায় ধরে রেখেছে, ত
কথা আজকের নাটক মোটেই সো
বলছে না। অথচ এই মানুষগুলোর স
আমাদের দেশে অনেক। তাহলে কি এ
জীবনে কোন সংশয় বা সংঘাতের অ
নেই, যাকে কেন্দ্র করে বলিষ্ঠ জীবনবো
নাটক গড়ে উঠতে পারে? যদি তাই
থাকে, তাহলে কি করে 'নীলদ
'নবান্ন', 'ছেঁড়া তার' এসেছিল; কি
'দেবীগর্জন', 'গর্ভবতী জননী', 'অ
সৃষ্টি হয়েছে?

এখনও প্রচুর সমস্যা ও সংঘাত এই
মানুষের জীবনে ছড়ান আছে। এগ
নিয়ে এমন নাটক লেখা যেতে পারে,
সম্পূর্ণভাবে হবে আমাদের দেশের না
যা হবে আমাদের অনুভূতির স্বকীয়
প্রোজ্জ্বল একটি শিল্পসৃষ্টি। কিছু-ক
নাটকে আজ দেখতে পাচ্ছি কৃষক
শ্রমিক-জীবনের সমস্যা দেখাতে
বিদেশী নাট্যকারদের স্মরণ নেওয়া হ
কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমি
সমস্যা কি নিজেদের আলোয়-অন্ধক
প্রকাশের পথ পাবে না? এই সব মান
গুলো নাটকের মধ্যে তাদের জী
সংগ্রামের ছবি, এবং সবার ওপরে নিজে
দেখতে পেলেই তাদের জীবনের সাথে মি
যাওয়া সার্থক হবে এবং শিল্পবো
উন্নততর হবে। এবং সেই সূত্রে বিদে
নাট্যসম্ভারের সিরিয়াসনেসের দি
আকর্ষণও আসবে তাদের।

নাট্য-আন্দোলনের পথ বেয়ে যে না
এসেছে এবং যে নতুনতর প্রযোজনা সৃ
হয়েছে, তাকে শুধু কলকাতা শহ
দর্শকের জন্য সীমিত করে রাখলে, দে
নবনাট্য ঐতিহ্যের কোন বৈশিষ্ট্যই আ
পিত হবে না। 'অন্য ধরনে'র থিয়েটা
প্রথম যুগে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের নাট
গুলো কিন্তু এই প্রসারিত চিন্তার মূ
দিত, তখন নাটকগুলো শহরের মত যত
সম্ভব কিছু-কিছু গ্রামের মাঠে-মাঠে প
বেশিত হত। আজ তো সুযোগ আ
অনেক, আজ কেন এ কাজ ত্বরান্বিত হ
না? নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে শহর থে
দূরের মানুষগুলোকেও জড়াতে হবে, নই
আংশিক নাট্যনিরীক্ষার কোন মূল্য নে
বাংলা দেশের সামগ্রিক প্রাণসত্তাই যদি ন
তাহোলে সে আন্দোলনে আলো
নাট্য আন্দোলনে আন্দোলিত না হ
কোথায়?

সাহিত্য একটি স্বাধীন শিল্প মাধ্যম। ছবি ও (এমনকি স্টিল ফোটোগ্রাফীও) আবার শিল্প। দুয়ে মিলে তৈরী হয়েছে সিনেমা। সিনেমা বিশিষ্ট শিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প হিসাবে পরিচিত।

সাহিত্যে যেমন গল্প, উপন্যাস, কবিতাকে নির্দিষ্ট একটি সংজ্ঞার বেড়াজালে আটকে রাখা যায় (এখন অবশ্য সংজ্ঞার বেড়াজালে কেউই আর আটকা থাকতে চাইছে না), সিনেমাকে তেমন কোন গণ্ডির মধ্যে আটকানো যায় না। সাহিত্যের প্রধান তিনটিতেই তার অবাধ যাতায়াত। গল্প, উপন্যাসের তো কথাই নেই, কবিতা নিয়েও ছবি হয়েছে একাধিক।

শেক্‌সপীয়র থেকে শুরু করে আজ বাজারে যে সব যৌন-উপন্যাস হট কেকের মত বিক্রী হচ্ছে, তার উপর যেমন ছবি হচ্ছে, আবার ক্লাসিক সাহিত্যও বাদ পড়ছে না প্রযোজক-পরিচালকের চোখ থেকে।

প্রযোজক ছবির জন্য কাহিনী নির্বাচনের আগেই ভাবেন দর্শকের কথা। আর সেই কারণেই ছবির জন্য একটা মজাদার গল্পের কথা মনে রাখতে হয় তাঁকে। তাই তিনি স্বারস্থ হন জনপ্রিয় লেখকের। পরিচালক ছবি করেন, দর্শকের হাততালিও পাওয়া যায় অতি সহজেই।

এখনই/অপর্ণা সেন, স্বরূপ দত্ত এবং পরিচালক তপন সিংহ

মাল্যদান/পরিচালনা : অজয় কর/সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

সংসার/পরিচালনা : সলিল সেন/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নন্দিনী মালিয়া

আজকের নায়ক/পরিচালক দীনেন গুপ্ত এবং সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়
ফটো : অমৃত

এতদিন চলে আসছিল এইভাবেই। হয়তো বা চলতো আরও বহুদিন। কিন্তু সর্বনাশা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সব ওলট-পালট করে দিল। মানুষের চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে ধরে নাড়া দিয়েছে এই যুদ্ধ। সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম কোনোটাই আর কোনো একটা স্থিরকেন্দ্রে স্থির থাকতে পারছে না। কারণ যাই হোক, চারিদিকে আলোড়ন জেগেছিল যুদ্ধের পরে। সাহিত্য চিত্রকলা যেমন অন্য গতিতে বইতে শুরু করেছিল, ধর্মকে নিয়ে যেমন চুলচেরা বিচার শুরু হয়েছিল। সিনেমাও তখন আর অলস হয়ে বসে থাকেনি। শুরু হয় সিনেমার নব জাগরণ।

ফ্রান্স আর ইতালীই সেই দেশ যেখানে সিনেমাকে নিয়ে কাটা ছেঁড়া বিচার বিশ্লেষণ চলেছে প্রায় একটি দশক ধরে। এতদিনকার প্রচলিত নিয়মনীতি ব্যাকরণের জাল ছিঁড়ে পরিচালকরা সিনেমা আর্টকে এক নতুন প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এবং সেই দুরূহ কাজে তাঁরা সফলও। চিত্রনির্মাতারা নিজস্ব চিন্তাকে পর্দায় মূর্ত করে তুলতে সচেষ্ট হলেন, তাঁদের চিন্তার বাইরের যা কিছু সবই পরিত্যক্ত হলো অপ্রয়োজনীয় বলে। নাটক-সংঘাতের প্রচলিত পথ হারিয়ে গেল জঞ্জালের আড়ালে। আসল ব্যাপার চলচ্চিত্র আর পরনির্ভরশীল থাকতে রাজী হোল না। পরিচালকরাও সেই কথা ভেবে সিনেমাকে মুক্তি দিলেন।

সিনেমা যে তখন থেকে শুধুমাত্র স্বনির্ভর হোল তা নয়, আকৃতি ও প্রকৃতিতে এক বিরাট পরিবর্তনও এলো। নিটোল গল্পের বেড়া ডিঙিয়ে কবিতার মতো মানুষের মানসিক চিন্তার গভীরে ডুব দিতে চাইল সিনেমা। আমরা পেলাম 'লাস্ট ইয়ার ইন ম্যারিয়েনবাদ' পেলাম 'লা নত্তে'। এ সব ছবিতে যে গল্প প্রকাশেই অনুপস্থিত নয় যদিও, কিন্তু গল্প ছাড়িয়ে চরিত্রের বিশ্লেষণ সেখানে মুখ্য। তাই চিত্রনাট্যকার অ্যালা রোবো গ্রীলেৎ (ইনি একজন খ্যাতনামা ফরাসী কবি) বলেছিলেন—

নিজের ভাষায় ও নিজের ধর্মে সিনেমা নিজেই আপন পথ করে নিয়েছে। মৌলিকত্ব খুঁজে পেয়েছে নিজের চরিত্রে। অতীতে সিনেমাকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রধান শর্ত ছিল সার্বজনীন আবেদন, এখন তা পরিত্যক্ত। আজকের ছবিতে দর্শকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার এক প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

তাই গল্পের বাঁধান পথ ছেড়ে সিনেমা পা বাড়িয়েছে নতুন জগতের মেঠো পথে। যেখানে জীবন আছে, নাটক নেই। যেখানে সংকট আছে, পরিত্রাণের গলিঘুঁজি নেই। যেখানে বাস্তব আছে, উদ্ভট চিন্তা নেই।

তবে গল্প যে একেবারে অনুপস্থিত তা বলা ঠিক নয়। কারণ প্রতিমা খড়ের কাঠামো ছাড়া যেমন গড়া যায় না, তেমনি বক্তব্য যাই হোক না কেন, একটা অবলম্বন তো দরকার। কাঠামোকে ধরেই চরিত্র প্রাণ পায়। চরিত্রের বিভিন্ন অ্যাসপেকট লক্ষ্য করলে, আমরা বাস্তবের ছোঁয়া পাব।

সত্যজিৎ রায় 'নায়ক' থেকে অ-গল্পাশ্রয়ী ছবি করতে শুরু করেছেন। গল্প নেই অথচ ছবি—এমন ছবির সংখ্যা বাংলাদেশেই বেশী। মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' বা 'ইণ্টার-ভিউ' বা সত্যজিৎবাবুর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সেই জাতের ছবি।

গল্প নয়, দুঁদে অফিসার ভুবন সোমের একদিনের ছুটি কাটানোর অভিজ্ঞতায় তার অনুভূতির পরিবর্তনই 'ভুবন সোম' ছবির মূল কথা। রণজিৎ মল্লিক একমাত্র স্যুট না থাকার দারুন চাকরী পেল না—এ নিয়ে পরিচালক যত হাল্কা ভঙ্গিতেই ছবি করুন না কেন নায়কের মানসিক অস্থিরতাই 'ইণ্টার-ভিউ' ছবির প্রধান বক্তব্য। আবার সিদ্ধার্থ তার আশপাশের হাজারো শত্রুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না পেরে উঠলেও তার শহরের প্রতি আকর্ষণই তাকে যথার্থ 'প্রতিদ্বন্দ্বী' করে তুলেছে। অ-গল্পাশ্রয়ী ছবির উদাহরণ এগুলোই। কিন্তু গল্পের ফিকে আবরণ একটা আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রায়শঃই গল্প ছাড়া ছবি হতে পারে না। —এ সত্য কতদূর সত্য তা অবশ্যই বিচারের শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। চিত্রশিল্পী রং দিয়ে মুহূর্তের একটি বিভ্রান্ত চিন্তাকে ধরে রাখেন ক্যানভাসে। যদিও বহু ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতার আড়ালেই তাদের বাস, কিন্তু সর্ব ব্যাপ্তিতাও শিল্পের অন্যতম শর্ত।

তাই জন্ম নিয়েছে ইঙ্গিতধর্মী ছবি বা সিম্বলিক ফিল্ম, পোয়েটিক ফিল্ম বা কবিতাধর্মী ছবি। ইঙ্গিতধর্মী কাহিনী চিত্র আমাদের দেশে হয়নি, গুটিকয় ছোট্ট ছবি অবশ্য হুসেন সাহেব ও সত্যদেব দুবেজী করেছেন। বাংলাতেও হয়েছে কয়েকটি। কিন্তু কবিতাধর্মী ছবি একেবারেই অনুপস্থিত। ক'কতোর অরফি বা লা বেলে লা বিতে'র কথা মনে আসে এ প্রসঙ্গে। রোবো গ্রীলেৎ এ ইম্মরত্যাল'ও এই জাতের ছবি।

অনেক ক্ষেত্রে ছবির কবিতা ধর্মের কবিতাধর্মী ছবি মিশে যাওয়ার কথা। কবিতা ধর্ম বলতে বোঝায় ব্যক্তি বিমূর্ত অভিব্যক্তির মাধ্যমে চরিত্র বা পরিস্ফুটন। কিন্তু কবিতাধর্মী কোনো বিশেষ ঘটনা বা চরিত্র নয়, প্র ফ্রেমের মধ্য দিয়ে মনোজগতে বিচিত্র ব্য এক কাব্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ফিল্ম কাব্য ধারায় ইঙ্গিতম তাৎপর্য অপরিসীম। তবে বাস্তব চরি সমস্যার যে কোনো প্রয়োজন নেই ত না। ছবিতে কবিতা সৃষ্টির জন্য প্র 'বাস্তব চরিত্র ও ঘটনাগুলিকে স্রষ্টার ও অনুভূতির প্রতীকে রূপান্তরকরণ। ত সত্তার আভাসটুকু থাকে মাত্র, বেশী থাকলেই কিংবা অত্যধিক বর্ণনাত্মক বাস্তবনির্ভর হলেই লিরিকের শুধ নি টুকু হারিয়ে যায়। ফিল্মকাব্যের শর্তই হচ্ছে আঙ্গিক ও বিষয়কে সাম ভাবে শিল্পীর কল্পনায় রূপান্তর কর

সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা, কাঞ্চনজঙ্ঘ সাম্প্রতিক ছবি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে ছবির কা ধর্মিতার প্রকাশ একাধিক দৃশ্যে প যাবে। 'চারুলতা'য় ঝড়ের মধ্য অমলের 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' আ করতে করতে প্রবেশের দৃশ্য, 'কাঞ্চনজ শিশুর ঘোড়ায় চড়ে বার বার ঘোর বলা—'মা আমি তিনবার ঘুরেছি অ ঘুরব' বা শেষ দৃশ্যে নেপালী শিশু চকোলেট খাওয়ার দৃশ্যে নেপালী সংগীতের সুর বাজানোর দৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী'র শেষ দৃশ্য যথার্থ কাব্যের উদাহরণ। মৃণালবাবুর 'ভুবন বা তপন সিংহের 'অতিথি' ও ঋত্বিক ঘট 'সুবর্ণ-রেখা'য় এমনতরো ইঙ্গিতময় কাব্যধর্মী দৃশ্য একাধিক আছে।

অথচ এই সব প্রতিটি ছবিরই এ গল্প আছে। সুতরাং বলা যায় গল্প হ সাদা পর্দায় তা প্রকাশ করা গেলেও জনপ্র ছবি হতে পারে না, কিন্তু দু ঘণ্টা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। চরিত্র ঘটনার বিমূর্ত চিত্রায়ণ মূল ছবির কো বিশেষ অংশে স্থান পেতে পারে বটে, কি সম্পূর্ণভাবে স্থান পেতে পারে না।

অ-গল্পাশ্রয়ী ছবির কথা যত দিয়েই বলা হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে সো পাথর বাটির মত সেটি অপ্রাপ্য। ছবি উদ্ভট বা সুন্দর, যত ছোটো বা বড় হোক না কেন একটা 'গল্প' থাকতেই হ এক মিনিট স্থায়ী কয়েকখানা ছবি দেখে সেখানেও গল্প আছে, কোনোটির গ আবার এতো বড় যে বলতেই হয়তো এক মিনিট লাগতে পারে। কিন্তু ছবির স কাল মাত্র এক মিনিট। কাহিনীচিত্রের কথাই নেই।

# বিজ্ঞাপনে ফ্যাশান

ভবতোষ সাহা

হাতে অখণ্ড অবসর। আনমনে হাঁটছিলাম। লোকজনের দ্রুত চলাফেরা আর আলোর বাহার দেখতে দেখতে চলেছি। নিয়ন সাইনের জ্বলা-নেভা দেখতে এমনিতেই আমার খুব ভাল লাগে। তাই বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যের এই সময়টুকু পথ চলতি নিঃসঙ্গ অবসর আমার কাছে খুব প্রিয়। সারাদিনের ঝক্কি ঝামেলার পর এখন আমি সম্রাট। আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। যৌবনবতী শহরের আসল সৌন্দর্যটুকু কেউ দু'চোখ ভরে দেখতে পেলো না। ওদের জন্য আমার আপশোষের শেষ নেই।

অনেক দূরে চলে এসেছি। মনে মনে ভাবছি, শহরের রাস্তায় পথ চলা বিন্দুমাত্র ক্লান্তিকর নয়। বেশ মনোরম। হাঁটতে হাঁটতে সময় যে কোনখান দিয়ে গড়িয়ে যায় বোঝা দুঃসাধ্য। এই পথ চলায় আনন্দ আমি একা একা উপভোগ করতেই ভালবাসি। কারণ, নিয়ন সাইনের জ্বলা-নেভা দেখা আর রাস্তায় লোকজনের চলা-ফেরায় অসম্ভব দ্রুততায় আবিষ্কারের বিস্ময়কর আনন্দ কারো কাছে প্রকাশ করা চলে না। সবাই ভাববে, ছেলেমানুষী। তাই এই আনন্দের মুহূর্তে একা থাকাই আমার পছন্দ।

পথ চলছি আর রাস্তার সব সৌন্দর্য গিলে খাচ্ছি। এমন সময় চোখ আটকে গেল একটা শোকেসে। ভরা যৌবন এক যুবতী দিব্যি আরামে শুয়ে আছে একটা সুন্দর কার্পেটের উপর। আর একটু নজর করতেই দেখি, মেয়েটি বন্দিনী। শক্ত করে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। নড়বার উপায় নেই। ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। চারদিকে সোফা-কৌচ। দামী পর্দা ঝুলছে। নয়নমনোহর বর্ণসুষমা। মনে হোল, এই ঘরটি যদি আমার হতো। আমার মধ্যবিত্তের নীরন্ধ্র মানসিকতায় এই অসম্ভব স্বপ্ন তখন ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। একই চিন্তায় ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি। জানি কোনদিন এই সৌন্দর্যের রাজ্যে পৌঁছুতে পারবো না। তবু আজকের সান্ত্বনা, এমন জিনিষ দু-চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছি। এই পাওয়ার আনন্দও নেহাত কম নয়। সেই আনন্দে আমি মশগুল। ওটি যে শোকেস আর এই সাজানো গুছানো যে পণ্যের বিজ্ঞাপন সে চিন্তা ততক্ষণে আমার মাথা থেকে ডানা মেলে উধাও হয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। কতক্ষণ এমনভাবে কেটে গেছে সে খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখলাম, যন্ত্রণায় মেয়েটির মুখ নীল হয়ে গেছে। ও আর এ বাঁধন সইতে পারছে না। কাতর চোখে আমাকে ওর কাছে ডাকছে। সেই মুহূর্তে আমার পৌরুষ চিনচিনিয়ে উঠলো। মনে হলো, বন্দিনী যুবতী আমার সাহায্য চাইছে আর আমি চুপ করে থাকবো, তা হতে পারে না। রূপকথার রাজপুত্রের স্বপ্ন আমাকে পেয়ে বসলো। পক্ষীরাজ ঘোড়া আর খাপ খোলা তরবারির কথা চিন্তায় এলো না। এই যুবতীকে বন্দিনী দশা থেকে মুক্ত করাই আমার কাজ। এদিকে মেয়েটির কাতরতা আরো বাড়ছে। অজানা আশঙ্কায় ক্রমেই নীল হয়ে যাচ্ছে। হয়তো ওর অপহরণকারী দুর্বৃত্তেরা এক্ষুনি এসে হাজির হবে। তারপর ওর উপর চলবে উৎপীড়ন। না, ভাবা যায় না। আমি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ওর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম।

তাড়াতাড়ি ওর বাঁধন খুলে দিলাম। সেই সময় অনুভব করলাম, তরবারি না থাকায় বিশেষ অভাব বোধ। ধারালো কিছু থাকলে কত সহজে এই কাজটা শেষ করতে পারতাম। কিন্তু তখন এসব চিন্তায় কালক্ষেপের মুহূর্ত অবকাশ নেই। যদি দুর্বৃত্তেরা এসে পড়ে। যাই হোক হাত চালিয়ে বাঁধনগুলো আলগা করে দিলাম। মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীর থেকে মায়ামন্ত্রবলে সব বাঁধন মিলিয়ে গেল। আমার তখন দারুণ উত্তেজনা। প্রায় কাঁপছি। মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমিভরা চাহনিতে মিটি মিটি হাসছে। আমি ভাবছি, এবার সে নিশ্চয়ই এসে গদগদ হয়ে বলবে, তোমার জন্যই বাঁচলাম। আমি তোমারই।

কিন্তু সে সব কিছু নয়। মিটি মিটি হাসতে হাসতেই সে ছুট লাগালো। আমার পৌরুষ তখন ভীষণ আহত। লেজে পা পড়া সাপের মত ফুঁসছে। দেখতে দেখতে সে অনেক দূরে চলে গেছে। আমি আর দেরি না করে ওর পেছনে ছুটতে লাগলাম। কতদূরে চলে এসেছি কোন খেয়াল নেই। অন্ধকার অরণ্য। বিরাট বিরাট গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে মেয়েটিকে কি করে খুঁজে বের করে পেলাম না। তাছাড়া ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই একটা গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে তখন অন্য ভাবনা। মেয়েটি নিশ্চয়ই মায়াবিনী। ভুলিয়েভালিয়ে আমার প্রাণনাশই ওর উদ্দেশ্য। মনে পড়লো, দিদির ডাকের দু-চারটি শোনা কাহিনী। কি রকম ভয় ভয় করতে লাগলো। স্থির করলাম, রাতটা কাটাতে পারলে দিনের আলোয় চো চা দৌড়।

অন্ধকার আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে। আমি পালাবার ফিকির করছি। এমন সময়, সেই মেয়েটি আসছে। এবার সিংহবাহিনী। অদ্ভুত পোশাক। পুরোপুরি আদিম-অরণ্য। আর তার পেছন পেছন কাঁধ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়া পোশাকটি ধরে তিনজন মেয়ে। মেয়েটি সদ্যস্নাতা মনে হলো। কিন্তু অতশত ভাববার সময় তখন নেই। একে তো গভীর জঙ্গল। অচেনা অজানা। তারপর আবার সিংহ। প্রাণভয়ে আমি অস্থির। অথচ পালাবার সঠিক পথ জানা নেই। ক্রমে সেই সিংহবাহিনী আমার কাছে এগিয়ে আসছে। ভয়ে আমি শিটিয়ে যাচ্ছি। বিশাল বপু সিংহ ভীষণ হুংকার ছাড়ছে। একবার ভাবলাম, পরের উপকার করতে এসে একি বিপদ ডেকে আনলাম। মনে মনে স্মরণ করলাম সেই মহাজন বাক্য ঃ ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না। কাজটা আমি ভেবেচিন্তেই করেছি তাই উতলা না হয়ে বরং দেখা যাক। তবু বুকের ভেতরটা কেমন দুরু দুরু করছে। সেই গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সিংহবাহিনী আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। সেই দুষ্টুমিভরা চাউনি। মিটিমিটি হাসি। যেন স্বপ্ন দেখছি। মেয়েটি আমার কাছে পৌঁছে গেল। আমাকে ইশারায় ডাকতেই নিরুপায় সাড়া দিলাম। কিন্তু পা নড়ছে না। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে সে নিজেই এগিয়ে এলো। আমাকে তুলে নিলো সিংহের পৃষ্ঠে। আমরা এগুতে লাগলাম। ভয় থেকে এবার অনেকটা নির্ভয়ে উত্তীর্ণ হতে পেরেছি।

আমি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালী সন্তান কি করে সিংহের পিঠে চড়বো সে ছিল এক ভাবনা। অত ভাববার সময় নেই। তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে এক ভেল্কিবাজি। আমার পোশাকও মেয়েটির অনুরূপ। ভীষণ আরণ্যক। জন্তু-জানোয়ারের চামড়া। এবার একটু সাহস ফিরে এসেছে। পোশাকে হাত বুলিয়ে দেখলাম, ওগুলো সব জন্তুজানোয়ারের চামড়া, আসলে সবই আধুনিক পোশাক। এ যে কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে

পারছি না। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। একটু আগেই মনে হচ্ছিল, আমরা বুঝি আদম আর ইভ। এখন আর সেসব ভাবতেই পারছি না।

সিংহটি চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মেয়েটির ইশারায় এবার নেমে পড়তে হলো। সে নিজেও নেমে দাঁড়ালো। সামনেই একটা সুন্দর জলাশয়। সিংহ জল খেতে গেল। এবার মেয়েটির আসল রহস্য জানা যাবে আশা করলাম। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরাতে দেখি মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি ব্যগ্র হয়ে ওর দিকে তাকতেই ইশারায় আমাকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল। এদিকে তাকিয়ে দেখি সিংহ আর নেই। এ কোন গোলকধাঁধায় আমি ঘুরপাক খাচ্ছি তাই ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ সেই মেয়েটি এসে উপস্থিত। দু-হাতে ধরা একটি শার্টে ওর বুক আড়াল করা। সে যেন নাচতে নাচতে আসছে। সে পোশাকও আর নেই। পুরো নতুন পোশাক। কিন্তু ওই শা... জন্যে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ... শার্টটা আমার দিকে ছ‍ুড়ে দিল। ইঙ্গিতে ওটা পরে নিতে বললো। আর দেরি করলাম না। যত তাড়া... এই ধাঁধা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ... শার্টটা পরেই দেখি আমি পুরো... হাল ফ্যাশানে পেণছে গেছি। ক... প্যান্ট আর পয়েন্টেড সুয়ে আমি ...

বারে আধুনিক। এবার তাকাই মেয়েটির দিকে। ওর পোশাকেও বিপ্লব উপস্থিত। প্যান্টি আর সুন্দর ডিজাইন করা একটি কামিজ। আমি বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওর চোখেমুখে শুধু সেই দুষ্টুমিভরা চাউনি। এবার হাসিটা অনেক উজ্জ্বল মনে হলো।

আমরা চলতে শুরু করলাম। অনেক দূর চলে এসেছি। কখন জঙ্গল ছাড়িয়ে এসেছি খেয়াল নেই। একেবারে শহরের সীমায়। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। মনে হলো, পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবো। এই ভেবে এগুচ্ছি। এমন সময় দেখি গুটিকয় ছেলে আর মেয়ে মোটর বাইক ছুটিয়ে আসছে। মেয়েটি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো। ওরা আমাদের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কি একটা ইশারা করলো। দেখলাম ও একটা মোটর-বাইক চেপে বসেছে। আর আমার জন্যও একটা উপস্থিত। আমি যথাজ্ঞা উঠে পড়লাম। না বলার উপায় নেই। যদি এভাবে বেঘোরে জীবনটা যায়। তাই বাঁচবার ক্ষীণ আশা নিয়ে ওর কথামতোই চলছি।

সবেগে মোটর বাইক ছুটে চলেছে। বিরাট চওড়া রাস্তা। অজগরের মতো এঁকেবেঁকে গেছে। মোটর বাইক চালানোর এতক্ষণ কোন দিকে খেয়াল ছিল না। এবার স্পীড বজায় রেখেও মেয়েটির দিকে এক-নজর তাকালাম। পোশাক আবার বদলে গেছে। সেই প্যান্টি আর নেই। সর্টস আর সার্টে এবার প্রায় পুরুষের সমান। কোমরে চওড়া বেল্ট। সার্ট আর সর্টসে ঝালর দেওয়া। আমার পোশাকও তাই। আমার বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থা দেখে ওরা সবাই হেসে খুন। আমি চট করে বোকামি ভাবটা কাটিয়ে ওদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলাম।

মোটর বাইক ছুটিয়ে ক্লান্ত হয়ে আমরা সবাই এক জায়গায় বসে পড়লাম। সবাই বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছি। ঘাসের উপর গা এলিয়ে দিয়েছে মেয়েটি। আর সঙ্গে সঙ্গে পোশাকে পরিবর্তন। সর্টস আর শার্ট নিমেষে উধাও হয়ে গেছে। সুন্দর একটি শাড়ি নিখুঁত কায়দায় পরা। বেশ নামিয়ে। যেন শাড়িটা গায়ে বসে আছে। সে গা এলিয়ে দিতেই বুক থেকে আঁচলটা পড়ে গেল। এতক্ষণ শুধু সেই মেয়েটির দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। এবার নজর দিলাম অন্যদের দিকেও। ওরা সব ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে। দেখা হবার পর থেকে সকলেরই তো একই পোশাক ছিল। এবার পরিবর্তন হয়েছে। একজন পরেছে লুঙ্গি আর কামিজ। এ পোশাক আমার অজানা। কিন্তু বুঝলাম ব্রহ্মদেশের চাল এবার আমাদের ধরে ফেলেছে। আর একজনের অঙ্গে নতুন পোশাক। কিছুটা ঢিলা-ঢোলা প্যান্ট আর কামিজ। এ পোশাকটা ঠিক বুঝতে না পেরে সেই মেয়েটির দিকে তাকালাম। এই প্রথম সে মুখ খুললো, এ হলো বেল বটম। ফ্যাশানে এ দুটি লেটেস্ট। সে চুপ করে গেল। আর কোন কথা নয়। শুধু দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি। ও যত হাসছে আমি তত অবাক হচ্ছি। ওর হাসির কারণ ঠিক ধরতে পারছি না কোন-মতেই।

কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। চোখের সামনে অন্ধকার। ভোজবাজির মতো যেন সব উঠে গেল। এতক্ষণে খেয়াল হলো, আমি সেই শো-কেসের বন্দিনী মেয়ের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। ভীষণ লজ্জা হলো। কত কি ভেবেছিলাম বসে। আবার তাকালাম সেই মেয়েটির দিকে। ও তখনো তেমনি দুষ্টুমিভরা চাউনিতে মিটি মিটি হাসছে। নিজের লজ্জা ঢাকতে উল্টো পথ ধরলাম।

কল্যাণী বসু

সহজ কথায় ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিই পুতুল। প্রাচীনকালে পুতুলের প্রয়োজন হয়েছিল মোটামুটি দুটি কারণে। শিশুদের খেলার জন্য এবং টোটেম বা যা যাদুক্রিয়ার বিশ্বাসী গ্রামবাসীদের পুজার জন্য।

ছেলেভুলানো পুতুল ছিল নানারকমের! নানা জিনিসের তৈরি পুতুলের মধ্যে মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, শোলার পুতুল, কাগজের পুতুল, ন্যাকড়ার পুতুল, গালার পুতুল উল্লেখ করবার মত। তা ছাড়া ব্রত ইত্যাদি কাজের জন্য তৈরী হোত নানাধরনের পুতুল এই টোটেম বিশ্বাসের পটভূমিতেই।

বাঙলাদেশে মোটামুটিভাবে যে সব পুতুলের কাজ হোত বা এখনও হচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছে মাটির পুতুল। গায়ে কোথাও রং লেপা, কোথাও পোড়ানো কালো বা লাল রঙে। কাঠের রংদার পুতুল বাঙলা দেশের অনেক জায়গায় পাওয়া যেত। এখনও কিছু কিছু হয় নদীয়া আর বর্ধমান জেলায়। মাটির পুতুলে অভ্রের রংও লাগানো হয় কোথাও কোথাও। পোড়ামাটির পুতুল হয় পাঁচমুড়ায়—শুধু ঘোড়া নয়, হাতী, বাঘ-পুতুল, রেলপুতুল, ষষ্ঠীজননী, বঙ্গা-বঙ্গি অনেক রকমের পুতুল হয় ওখানে। ঘোড়া শুধু পাঁচমুড়া নয় সোনামুখী এবং আরও অনেক জায়গায় হয়—তবে চেহারায় তফাৎ আছে। ক্ষীরের, সরের, পিটুলীর এমন কি গোবরের পুতুলও হোত বাঙলা দেশে, এককালে।
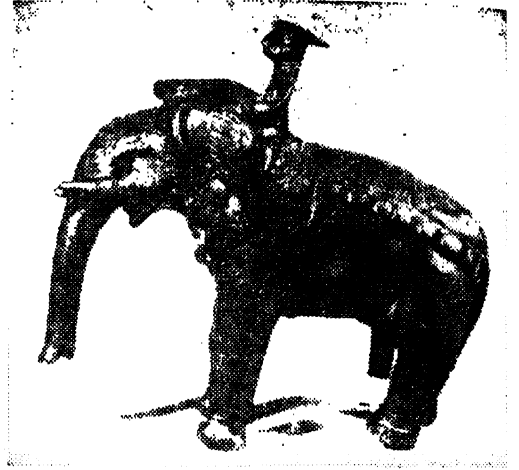
পশ্চিম বাঙলার যে সব অঞ্চলে এখনও পুতুল তৈরী হয়ে থাকে তাদের কয়েকটি জায়গার নাম উল্লেখ করছি। পোড়ামাটির পুতুল তৈরী হয় পাঁচমুড়া-সোনামুখীতে-বাঁকুড়া জেলায়। মাটির পুতুল হয় বীরভূমের রাজনগরে। সে পুতুলের ঢপ্ আলাদা। রাধাকৃষ্ণ মূর্তি আহ্লাদী বুড়ি, গণেশজননী এমনি নানা ক্ষুদ্রায়তন মূর্তি বা পুতুল তৈরী হয় রাজনগরে। কালীমূর্তি, দক্ষিণেশ্বর ও তার ছোট ছোট পুতুলের মতো সংস্করণগুলি তো ঘর সাজানোর কাজে এককথায় অপূর্ব। এ পুতুলগুলি তৈরী হয় কলকাতার কাছেই ২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুরে। এখনো দুটি পরিবার একাজ করে যাচ্ছেন। পোড়ামাটির ছোট ছোট পুতুল-হাতী, ঘোড়া, ষষ্ঠীঠাকরুণ এসব তৈরী হচ্ছে কলকাতার পাশেই। পূর্ব বাঙলা থেকে অনেক পটুয়া এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। তাঁরা কলকাতার আশেপাশে—বারাসত অঞ্চলে এবং আরও দু' একটি জায়গায় বাস করছেন—মনসার ঘট গড়ছেন, সরায় ছবি আঁকছেন, পুতুলও বানাচ্ছেন। ঘর সাজানোর কাজে সরা, মনসার ঘট এসবও বেশ চলতে পারে। সরাগুলিকে দেওয়ালে সাঁটা যেতে পারে—বিশেষ করে ড্রইংরুমের দেওয়ালে। বুক সেলফে বা আলমারীতে তো রাখা যাবেই।

আগেই বলেছি কাঠের পুতুলের কথা। কাঠের পুতুল বাঙলা দেশের প্রায় সব জায়গাতেই হয় কিছু কিছু। তবে বর্ধমান-নবদ্বীপ - পাটুলী - দাঁইহাট - শান্তিপুর

অঞ্চলের কাজের কথা প্রায়ই শোনা যায়। অগ্রদ্বীপের কাছে 'নতুনগ্রামে তৈরী হয় কাঠের প্যাঁচা, গৌরাঙ্গ মূর্তি, বামন মূর্তি, কালীঘাটের পুতুল ইত্যাদি। কালীঘাটের পুতুল কালীঘাটে তৈরী হয় না, হয় নতুন-গ্রামে, বিক্রি হয় কালীঘাটের মন্দিরসংলগ্ন বাজারে। সেই থেকেই নাম কালীঘাটের পুতুল। কালীঘাটের পুতুলকে কেউ কেউ বলেন 'মামী ডলস'। মিশরের 'মামী'র অনুকরণে চ্যাপ্টা শোয়ানো রংদার এই পুতুলগুলি ঘর সাজানোর পক্ষে একেবারে আদর্শ বলা যেতে পারে। এগুলিকে বুক-শেলফে, ম্যানটেলপিসে শুইয়ে বা দাঁড় করিয়ে রাখা চলে। দেওয়ালে কোনও 'অ্যাডেসিভ' দিয়ে লাগিয়ে দিতে পারেন। বিহারের রাঁচীর কাছে তুপুদান গ্রামে যে মা-ছেলে ও রাজা-রাণী পুতুল পাওয়া যায় তাও 'মামী ডলসে'র ঢপেই তৈরী এবং সমানভাবে ঘর-সাজানোর কাজে লাগানো যায়।

গালার পুতুল পাওয়া যেতো বীরভূমের ইলামবাজারে। এখন আর সে পুতুল পাওয়া যায় না। তবে উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার নওরংগপুরের গালার পুতুল যদি জোগাড় করতে পারেন তো তার জুড়ি নেই। উড়িষ্যার সরকারী এম্পোরিয়ামে পাবেন। কটক আর ভুবনেশ্বরে গেলে কিনে আনতে পারেন।

শোলার পুতুল মেলায় পাওয়া যায় কখনো সখনো। কুমোরটুলীর শোলার কারীগরেরা বানিয়ে দিতে পারেন। আসামের গোয়ালপাড়ার শোলার ফল, কালীমায়ের মুখোশ আর সব মজার মজার জিনিস যদি জোগাড় করা যায়, তো আপনার ড্রইংরুম দেখে লোকের তাক লেগে যাবে। আসামের নলবাড়ীর ঝাঁপি তো কলকাতার অনেক বাড়ীতেই দেখেছি। নাগাল্যান্ড বা নেফা অঞ্চলের বর্শা, তীর ধনুক এসব দিয়ে ঘরের চেহারা পালটে দেওয়া যায়।

পিতলের ঢোকরা মূর্তি আর পুতুল তৈরী হয় বর্ধমান জেলার ঘুষকরার কাছে দরিয়াপুরে আর বাঁকুড়া শহরে। এসব কাজ কলকাতার অনেক দোকানে পাওয়া যায়।

বালি-পাথরের মূর্তি আসে পুরীর পাথুরিয়াসাহী থেকে। কোনারকে যে সব মূর্তি থাকে তারই অনুকরণে তৈরী ছোট ছোট মূর্তিগুলি ঘরে কিংবা বাইরের বারান্দায় বা বড় মূর্তি হলে বাগানেও রাখতে পারেন, অবশ্য যাদের বাড়ীর সংগে বাগান আছে তারা।

একরকমের নাচিয়ে পুতুল বা 'ডান্সিং ডল পাওয়া যায় কলকাতায়। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সংলগ্ন ঘূর্ণি থেকে আসে তারের ফ্রেমের ওপর মাটির পুতুল, নানারকমের ফলের প্রতিকৃতি, মাটির আবশোলা, টিক-টিকি, মশলা-সুপুরী, এলাচ, লবংগ, দারচিনি সবই মাটির। পুতুলের মধ্যেও রয়েছে গ্রামের সব দৃশ্য—কৃষক চাষের হাল কাঁধে মাঠে যাচ্ছে, সাপুড়ে সাপ খেলা দেখাচ্ছে মাটিতে এমনি সব চিত্র ফুটিয়ে তোলা এ সব পুতুল সবাই দেখেছেন। এগুলি সবই ঘর সাজাবার পুতুল।

কাপড়ের বা আরও বুঝিয়ে বলতে গেলে কাটা কাপড়ের পুতুল বা 'র‍্যাগ ডলস' তৈরী হয় কলকাতায় আর কলকাতার আশেপাশের কয়েকটি অঞ্চলে। চটের টুকরো বা ছাঁট থেকে তৈরী হচ্ছে একরকমের ঝোলানো ঝুঁটিওলা পুতুল—এগুলি মোটর গাড়ীতে জানলায় ব্যবহার হচ্ছে। শহরে যারা থাকেন তারা অনেকেই এরকম পুতুল হামেশা দেখে থাকবেন।

বিয়ের তত্ত্বে ক্ষীরের পুতুল তৈরী হতে আজও দেখেছি। বৌবাজার অঞ্চল দিয়ে যেতে বিশেষ করে নির্মলচন্দ্র স্ট্রীটে দু একটি দোকানে ক্ষীরের এসব পুতুল হতে দেখা যায়।

মোটামুটি যা পুতুল পাওয়া যা নিয়ে কিছু আলোচনা করলাম। ভা অন্যান্য প্রান্তেও নানা ধরনের পাওয়া যায়। এটিকোপাকঙ্কা, আগ্রা, রাটের সাংখেড়া ইত্যাদি ভারতের নানা নানা ধরনের পুতুল রয়েছে। হরিণের মোষের শিংয়ের তৈরী পুতুল, জানোয়ারের প্রতিকৃতি—ময়ূর, মুরগী, চাঁদামাছ, চিংড়ি মাছ ইত্যাদি জিনিসের প্রতিকৃতি শিংয়ের দ্বারা করেন ত্রিবেন্দ্রামের কারীগরেরা। উ পারলেখামুন্ডী ও মেদিনীপুরের বৈষ্ণ জোতঘনশ্যামের কারীগরেরাও এ কাজ করে থাকেন। ঘর সাজানোতে পুতুলও ব্যবহার করা চলবে। কল এ সব জিনিস পাওয়া যায় সরকারী কতকগুলি বে-সরকারী দোকানে।

নাড়াজোল, রাজনগর, কাঁ ইত্যাদি বাঙলা দেশের নানা জায়গায় সব পুতুল তৈরী হয় সে সব কল বাজারে প্রায় আসে না বললেই চলে। কষ্টে এ সব গ্রাম থেকে কেউ কেউ সংগ্রহ করে এনেছেন শখের খাতিরে। বাঙলায় এখনো নানাধরনের যে সব কলকাতায় পাওয়া যায় তা দিয়ে নিঃসন্দেহে আপনার ঘরটিকে মনোরম তুলতে পারেন।

কলকাতার শহরে মানুষের গোঁজার জন্য যে সামান্য জায়গাটুকু যায় একটু চেষ্টা করলে অল্প খরচে যে মনের মতো করে সাজিয়ে তোলা একথা জোর গলায় বলতে পারি। অ দেশের ঘট, পট, পুতুল ইত্যাদির ফোটা যা আজও মেলে তা ব্যবহার ক সাজিয়ে দেখতে পারেন।

এইসব পুতুল ঘর সাজানয় নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পা

# ফুলসাজানোয় ভারতীয় ভাব

উমা বসু

আমাদের দেশে ফুল দিয়ে সাজানোর ধারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে একটু অন্য ধাঁচেই গড়ে উঠেছে। এ দেশের গরম হাওয়ায় ফুলের সজীবতা রক্ষা করাই এক সমস্যাবিশেষ. আর আমাদের দিশী ফুল সবই অত্যন্ত অল্পায়ু. সে জন্য এখানের ফুল ব্যবহারের রীতি জাপান বা ইউরোপে প্রচলিত রীতি থেকে ভিন্ন হবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ফুল ভালবাসি না কিংবা ফুলের ব্যবহার এদেশে নেই এমন বলাটাও ভুল। আমাদের দেশে সকালের তোলা ফুল বিকেলে ফেলে দিতে হয়. সন্ধ্যায় যে ফুলে খোঁপা সাজাই রাতে তার ক্লিষ্ট বিবর্ণ রূপ মন ভারাক্রান্ত করে তোলে পুজোর বেদীতে নিত্যনূতন ফুলের অর্ঘ্য সাজান হয় লাল নীল হলুদ ও সাদায়। গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসেবে ফুলের ব্যবহার গড়ে ওঠেনি তার আরো কারণ আছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেই প্রকৃতির কোলে এতদিন ছিলেন—ঊনিশ শতকের শেষ থেকে কিছু লোক পুরোপুরি শহুরে হতে থাকেন। এদেশের আকাশে এত আলো. প্রকৃতিতে এত রঙের ছটা যে ঘরের মধ্যে তাকে আবার ধরে রাখার প্রয়োজন বোধ হয় নি; এদেশে কোন ঋতুতেই আকাশ বা বনানী রঙের মাধুর্য হারিয়ে রিক্ত হয় না ওদেশের মত। বর্ষা বা শীতের প্রকোপ থেকে রেহাই পাবার জন্য আমাদের ঘরের মধ্যেও কাটাতে হয়নি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। সে জনাই বোধহয় শীতপ্রধান দেশে গৃহসজ্জায় যেমন যত্ন নেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়েছে তেমনটি আমাদের দেশে হয় নি। কিন্তু বর্তমানে দেশ ও কালের দূরত্ব ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে আর শহুরে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অল্প-বিস্তর হারাচ্ছে। এই ভাঙ্গাগড়ার খেলায় কি লাভ হোল কি লোকসান হোল তার বিচারের ভার পণ্ডিতদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা এদেশের ফুল সাজানোর রীতিতে বর্তমানে যে পরিবর্তন এসেছে তাই একটু আলোচনা করবো।

আমরা আজকাল যারা শহরে বাস করি তাদের কাছে ফুল ও পাতা শুধু প্রকৃতির একটি সুন্দর দান নয় তার মাঝে আরো বেশী কিছু দেখি আর পাই। শহুরে জীবন যে আজ ঘরের চার দেয়ালের মাঝেই আটকা পড়ে গেছে। আকাশ-মাটি-মাঠ-ঘাট-বন সবই আমাদের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছে। শহরের ইট-কাঠ, কংক্রীট আর কাঁচের মাঝে প্রাণ যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন ঘরে রাখা রজনীগন্ধার একটি গুচ্ছ কিংবা জানালার পাশে চৈতালী হাওয়ায় দুলে ওঠা গাছের ডাল পাতার শব্দ অনেক দূরে সরিয়ে রাখা সজীব পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দনটিই মনে করিয়ে দেয়। শহরের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য তাই আজ প্রয়োজন হয়েছে রঙের বৈচিত্র্য; রসপিপাসু মন আজ তাই ঘরটিকেই নানাভাবে সাজিয়ে তুলতে চায় নানা রঙে। সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্যই আজ আমরা ইংল্যান্ড বা জাপানের মত ঘর সাজাতে ফুলকে ব্যবহার করতে শুরু করেছি। এদেশে এখন নানা রকমের ফুল ও পাতাবাহারী গাছেরও আমদানী হয়েছে. যত্ন নিলে দু-চার দিন তাদের ফুলদানীতে তাজা রাখা যায়। এদেশেও ক্রমে ক্রমে বর্তমান রীতির ফুল সাজানোর একটি নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে উঠবে আশা রাখি।

আমাদের মধ্যে যাঁরা ফুল সাজান তাঁরা সাধারণতঃ পাশ্চাত্য রীতি কিংবা জাপানী-রীতিতে ফুল সাজান আর কয়েকজনা নিজস্ব স্বাভাবিক সৌন্দর্য-জ্ঞান থেকে সাজিয়ে থাকেন। যাঁরা সংখ্যায় বেশী অথবা নানা রঙের সংমিশ্রণ, পছন্দ করেন তাঁরা

পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুযায়ী সাজান। যাঁরা অল্প কয়েকটি ফুল ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য পছন্দ করেন তাঁরা জাপানী রীতিতে সাজান। এই দুই রীতিকে কেমন করে আমাদের দেশের উপযোগী করে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় সে বিষয়ে সবার দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি। কোন জিনিসকে শুধু অনুকরণ করলে যেমন তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শিল্প বিকাশ সম্ভব নয় তেমনি তার আকর্ষণও চিরস্থায়ী হতে পারে না। বর্তমান যুগের উপযোগী করে এই শিল্পটিকে কেমন করে ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বরণ করে ঘরে তোলা যায় আমাদের সবারই সে চেষ্টা করতে হবে।

অনেকেই হয়তো জানেন না জাপানের ফুল সাজানো যা আজ ইকেবানা সারা বিশ্বের মনোহরণ করেছে তার আমাদের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আ সুপরিচিত পূর্ণঘটেরই সুন্দর প আজকের প্রসিদ্ধ ইকেবানা। ৬০০ শতা জাপানে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ইকেবানার জন্ম হয় কিয়োটো শহরে বৌদ্ধমন্দিরে, এখানেই জাপানী পু দের স্বাভাবিক সৌন্দর্যজ্ঞান দিয়ে ঘ যুগান্তর। আমরা যদি ভারতের শিল্প ভাবধারার কথা স্মরণ করে ফ পাতার সঙ্গে মিতালী পাতাই তবে শিল্পটির উপযুক্ত সমাদর করতে পারব সাজানোর পাত্র হিসাবে আমরা ভা ছাঁচের কোন জিনিস ব্যবহার করতে যেমন পাথর বা ধাতুর তৈরী ঘট. কানাউঁচু থালা, পুষ্পপাত্র, বাটি মাপের, কোসা ধুপদানী প্রভৃতি।

এদেশী গাছের মধ্যে কা বকুল, ঝাউ, করগচা, ধুতরো, বা তেঁতুল ডালের সঙ্গে মানিয়ে র ফুল ব্যবহার করা চলে। ফুলের শোলা বা তালপাতার ফুল ব্যবহার নতুনত্ব আনা যায়। বিশেষ অনু দিন খই বা রঙীন পুঁথি এক ব ফুট লম্বা তারে গেঁথে সাজিয়ে চা আটকে দিলে বেশ সুন্দর দেখায়। ক পুজোর দিন ফুলের সঙ্গে ধানের কালীপুজোর দিনে পাতাবাহার করে বাড়ীতে ঠাকুমা দিদিমার সহজেই প্রশংসা আদায় করা চলে। ভাবে নিজেদের দেশের জিনিস 'ন আর দশজনার সামনে তুলে ধরতে শোলার ফুল কাঠি বা তারে গেঁথে ব্যবহার করা যায়, তা ছবিতে দেখান হ

# যাত্রা আর মঞ্চ মুখোমুখি আজ

**নন্দলাল ভট্টাচার্য**

১৭৯৫ সালের ৫ নভেম্বর। ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হলো ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন। লেবেডফ তাঁর বাঙালী কয়েদায় সাজান নতুন রঙ্গমঞ্চে 'ডিসগাইস' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করবেন। নাটকে অংশ নেবেন পুরুষ ও মহিলা শিল্পীরা। আর বিজ্ঞাপন ঘোষিত নাটকটির অভিনয় ১৭৯৫ খৃঃ ২৭ নভেম্বর। বাংলা দেশের মানুষ সর্বপ্রথম দেখলো বাংলা থিয়েটার। ভেঙে পড়লো গোটা কলকাতা। এতদিন পর্যন্ত বাঙালী নাটক দেখার সাধ মিটিয়েছিলো যাত্রা আর ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার অভিনয় দেখে, এবার তার আনন্দ বিনোদনের নতুন আরেক মাধ্যম।

কলকাতা গেজেটে যখন লেবেডফের বেঙ্গলী থিয়েটারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো প্রায় ঠিক সেই সময়েই পরমানন্দ অধিকারী প্রচলিত কৃষ্ণ বা কালীয়দমন যাত্রায় যোগ করলেন নাট্যিক ক্রিয়া আর সংলাপ। সূচিত হল নতুন যাত্রার জন্মলগ্ন।

ইতিহাসের পথ ধরে পিছু হটা যাক। মধ্যযুগের দেবউৎসবকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত যাত্রাকে বলা হোত নাটগীত। তারপর চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলা দেশ প্লাবিত হয় বৈষ্ণবী প্রেমের ধারায়। যার প্রভাবে যাত্রার আসরে একাধিপত্য বিস্তার করে কৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনী। কীর্তনের একই সুরে আসর হলো মুখরিত। এলো বৈচিত্র্যহীনতা।

তখন কেন্দ্রে মুসলমানী শাসন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। গড়ে উঠছে এক-একটি প্রায় স্বাধীন রাজ্য। দেখা দিচ্ছে ছোট ছোট রাজা জমিদারের দাপট। সামাজিক বন্ধন শিথিল হতে শুরু করেছে। অন্য দিকে বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যকে কেন্দ্র করে যথেচ্ছ আদিরসের বিতরণ হতে থাকে। এরপর ইংরেজ আগমনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের জ্ঞানে উদ্ভাসিত হলো দেশ। সৃষ্টি হলো নগরমুখী সংস্কৃতি। বাংলার লোকশিল্প তথা সংস্কৃতি যেন আবদ্ধ হলো ছোট্ট জলার মধ্যে। নিস্তরঙ্গ জীবন যাত্রায় প্রচলিত আমোদ প্রমোদ কোন ঢেউ আনে না। আদিরসাত্মক অশ্লীলতায় ভরা যাত্রাপালা যেন গ্রামজীবনে মাদকতার নেশা আনে। নাগরিকমন আর বিদগ্ধজন তখন অনেক দূরে সরে গেছে।

১৭৮০ শকাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে লেখেন, 'গত চারি বৎসরাবধি কলকাতা নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে।...এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেউর প্রভৃতি উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্তৃক বাংলাদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।' যাত্রা সম্পর্কে এই ছিল সেকালীন বিদগ্ধজনের অভিমত।

ওদিকে উনিশ শতকের বাঙালীর মনে নাট্যতৃষ্ণা জেগে উঠেছে। প্রচেষ্টা চলছে দেশীয় নাট্যশালা গড়ার। শ্যামবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয় নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালা। এ ছাড়া জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, সাতুবাড়ীর নাট্যশালা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুরু হয়েছে নতুন বাংলা নাটক রচনা। বাংলা সাহিত্যের আরেকটি ধারা পুষ্ট হতে থাকে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটক যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করলো তারই পরিণতি মাইকেল মধুসূদনে। রচিত হোল শর্মিষ্ঠা।

১৮২২ খৃঃ ২৬ জানুয়ারী 'সমাচার দর্পণ' থেকে 'কলিরাজার যাত্রা' নামে এক নতুন যাত্রার কথা জানা যায়। এসব যাত্রার আসরে নানা ধরনের সং-এর আবির্ভাব হোত। এরই পর নলদময়ন্তী ও নন্দ বিদায় যাত্রার কথা জানা যায়। এই 'নন্দ বিদায়' যাত্রায় মেয়েরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করত। সংবাদ ভাস্করের (১৮৪৯ খৃঃ ১৭ এপ্রিল) ভাষায় 'এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এ যাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে। ইহা নূতন প্রকার যাত্রা।' এই নতুন যাত্রার প্রতি নাগরিক মন বিমুখ তো ছিলই না, বরং তাদেরই উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতায় এ যাত্রা পরিপুষ্ট হতে থাকে।

বাংলা নাটকের আদি যুগেও দেখা যায় বাংলা নাটক সাধারণত শেকসপীয়র বা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদকে আশ্রয় করে অগ্রসর হচ্ছে। আলালের ঘরের দুলালের চার বছর পরে প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে গড়ে ওঠে। এর পর দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত যে কখানি নাটকের কথা জানা যায়, তার বেশীর ভাগই অনুবাদ। কয়েকখানি মাত্র মৌলিক নাটক। এর মধ্যে মধুসূদনের ঐতিহাসিক ও প্রহসনগুলিতে এক ধরনের জীবনমুখরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিও অলৌকিকতার দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে ফুটে ওঠে সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা। তাঁর 'নীলদর্পণ' বাংলা নাটকের এক দিকচিহ্ন হিসেবেই বর্তমান রয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের পর উল্লেখযোগ্য নাট্যকার গিরিশচন্দ্রর প্রথমদিকের নাটকগুলি রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের পৌরাণিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে রচিত। এতে অলৌকিকতার প্রভাব ছিল স্পষ্ট। সংলাপের ক্ষেত্রেও গিরিশচন্দ্র এক নতুন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। এই ছন্দ গৈরিশ ছন্দ নামে পরিচিত।

এর পাশাপাশি বিবর্তনের সূত্র ধরে না এলেও আরেক ধরনের যাত্রা আসরস্থ হতে থাকে। একে বলা হোত গীতাভিনয়। অপেরা ধরনের এই গীতাভিনয় কৃষ্ণযাত্রার গীত, নতুন যাত্রার নৃত্য ও পাশ্চাত্যধরনে বাংলা নাটকের সংলাপ গড়ে ওঠে। রসের দিক থেকে এতেও ছিল প্রাচীন যাত্রার ভক্তি, নতুন যাত্রার আনন্দ আর সেকালীন বাংলা নাটকের কারুণ্য রসের সংমিশ্রণ। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে প্রাচীন যাত্রা ও নতুন যাত্রায় যোগ থাকায় এ যাত্রা যেমন সাধারণের মনোরঞ্জন করতো তেমনি সেকালীন বিদগ্ধ জনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। দেখা গেল গীতাভিনয়ের মধ্য দিয়েই কবি সংগীতের উচ্চ ধরাগুলিসটিংকে থাকার চেষ্টা করে। ক্রমে গীতাভি-নয়ের গীতের অংশকে কমিয়ে অংশ বাড়ান হয়। যাত্রায় কাহিনীগুলি আসরস্থ হতে থা পর্বে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ন প্রভাবও যাত্রায় উপরে যথেষ্ট পড়েছিল। পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিক যাত্রাও কখনো বিয়োগ না। কাহিনী মিলনাত্মক ন পরিণামে সকলের মিলন দেখা মর্তে সম্ভব না হলেও স্বর্গ, শিবালোক যেখানেই হোক না পৌরাণিক নাটক কেন মঞ্চে ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক নাটক হয় তখন যাত্রাও সেই ধারাকে মে এগিয়ে যেতে থাকে। সূচনা হয় যাত্রার। প্রাচীন যাত্রায় যে অশ্লী তা দূর করতে সর্বপ্রথম এগি কৃষ্ণকমল গোস্বামী। তিনি স সমর্থ না হলেও যাত্রাকে যারা নত দিলেন তাঁদের মধ্যে মতিলাল নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রয়োগরীতি ও না ক্ষেত্রে মতিলাল এক নতুন ধারা করেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে যেমন নাটীয়কতা ছিল তেমনি ঢং-এ তিনি এর মধ্য দিয়ে স্বাদেশীকতাও প্রচার করে গেছে তিনি যাত্রাকে বর্তমানের মর্যাদা তুলে বসিয়ে গেছেন। তাঁর সবগু প্রায় পৌরাণিক পালা। তাঁর ধর্মদাস ও ভূপেন নারায়ণ এই অব্যাহত রাখেন। অন্যদিকে মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণযাত্রাকে সংস্কৃত নতুন স্বাদে সৃষ্টি করেন। বি তাঁর রচিত সংগীতগুলি এক মর্যাদার অপেক্ষা রাখে। যাত্রা আর এক উল্লেখ্য পুরুষ মথুরান ইনি সর্বপ্রথম থিয়েট্রিকাল প্রবর্তন করেছিলেন।

যাত্রার এই পর্বের লেখকদে বিশেষ করে লিখতে হয় ধন মতিলাল ঘোষ, ভবতারণ চ অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ, ভোলা নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ চ প্রভৃতির নাম। যাত্রা বা থিয়েটারে নাটকের কথা বলার আগে এর পর্বে সামাজিক অবস্থার ক দরকার। ১৯০৫ খৃঃ। লর্ড কার্জন প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি করলে ভঙ্গের ঘোষণা করে। কবি, স নাট্যকার—যে যেভাবে পারলেন উঠলেন এর বিরুদ্ধে। মঞ্চে তাঁর পুরানো নাট্যধারা ছেড়ে সিরাজদ্দৌলা, চন্ড, আনন্দরাহো নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলে পতন, প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখলেন নন্দকুমার প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি। এ ছাড়া মন্ম কারাগার, শচীন সেনগুপ্তের পতাকা', সিরাজদ্দৌলা, ধাত্রীপা বিপ্লব প্রভৃতি উল্লেখ করতে হয়

বাংলা নাটকের এই স্বাদেশিকতা যাত্রা পালাতেও প্রতিফলিত হোল। আগে যেসব পালাকারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের পালায় স্বাদেশিকতার উপাদান থাকলেও, স্বদেশী যাত্রাকার হিসেবে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেন মুকুন্দ দাস। যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশেও স্বাদেশিকতার বাণী প্রচার করেন। আর শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নয় সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর লেখনী সোচ্চার ছিল। তাঁর মাতৃপূজার পথ 'সাথী' প্রভৃতি পালার নাম উল্লেখ্য। যাত্রায় স্বাদেশিকতা প্রচারে যাঁরা এগিয়ে আসেন তার মধ্যে কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী, ব্রজেন দে, জিতেন বসাক, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, নন্দগোপাল রায়চৌধুরী, পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশী যাত্রা, যাত্রার ইতিহাসের মোড় ঘোড়ার এক দিকচিহ্ন। মূলত এই সময়েই যাত্রা থেকে ভক্তিভাব সম্পূর্ণভাবে দূরে হয়ে নাটকীয় কৌতূহল সৃষ্টির দিকেই বেশী করে নজর দেওয়া হোল। যাত্রা ও মঞ্চ এলো কাছাকাছি। অন্যদিকে রামায়ণ গান, চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি গানের দল ভেঙে যে যাত্রার সৃষ্টি হয় তা অক্ষম অভিনয়, অযোগ্য বেশভূষা ও কাহিনীর কদর্যতায় দর্শককে দূরে সরিয়ে দেয়। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত নাটকগুলির বিবর্তন হয়েছিলো পেশাদারী মঞ্চকে কেন্দ্র করে। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা নাটকের যে ধারাটি গড়ে উঠেছে তা কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই সৌখিন ও নাট্যদলগুলিকে কেন্দ্র করে।

স্বাধীনতার ঠিক আগে বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটককে কেন্দ্র করে গণনাট্য আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ অবক্ষয়ী সমাজের বিভিন্নমুখী সমস্যা ইত্যাদিই হোল নাটকের প্রধান উপজীব্য। এ ছাড়া যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ, আমেরিকার নানা সমস্যামুখর নাটকগুলির অনুবাদও প্রচুর পরিমাণে মঞ্চস্থ হতে থাকে। এ পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, তরুণ রায়, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী, শৈলেশ গুহ নিয়োগী, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, রতনকুমার ঘোষ, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে হয়। প্রসঙ্গক্রমেই আসে বনফুল, মনোজ বসু, বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাম।

মঞ্চের ক্ষেত্রে যা হোল, যাত্রায় তা হোল না। অর্থাৎ এখানে পেশাদারী যাত্রাদলগুলি যাত্রার অগ্রগমনের জন্য সংগ্রাম করে যেতে লাগলেন। কোন অপেশাদারী আন্দোলন এখানে গড়ে উঠতে পারলো না। দেশ বিভাগের ফলে প্রচণ্ডভাবে ঘা খাওয়া যাত্রাজগতে, বেশ কিছুকাল অচল অবস্থা দেখা দেয়। নতুন যাত্রায় সামাজিক ও বাস্তব সমস্যাগুলি এতে স্থান পেলেও কাল্পনিক নাটকগুলি আসর জাঁকিয়ে বসে। এইসব পালা ১৯৬০-৬২ খৃঃ পর্যন্ত টিঁকে থাকে। তারপর মঞ্চের মতই যাত্রার কাহিনী ও আঙ্গিকেও এলো পরিবর্তন এবং তা বেশ দ্রুতই। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যাত্রায় অতি আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা বা সমস্যা থেকে শুরু করে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস, আন্তর্জাতিক চরিত্র বা আন্দোলনও মঞ্চায়িত হচ্ছে। কাহিনীর এই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আধুনিকতার ছাপ স্পষ্টই হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া অভিনয়ধারা ও অতি-নাটকীয়তাও ত্যাগ করে বাস্তবমুখী হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় উৎপল দত্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, রমেন লাহিড়ী, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি নামী নাট্যকার ও সাহিত্যিকদের আগমনে যাত্রা বেশ পরিপুষ্ট হচ্ছে। বর্তমানে যাত্রার আসরে লেনিন, হিটলার, সূর্য সেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, [illegible] বিদ্যাসাগর, [illegible] নীলরক্ত, দিল্লী চলো, [illegible], দেবদাস, রজনী, বৌঠাকুরাণীর হাট, বিপ্লবী ভিয়েৎনাম, সিরাজের কান্না প্রভৃতি পালা আসরস্থ হচ্ছে। এ সব নাটকের সংলাপবৈচিত্র্য, কাহিনী পরিবেশনা, [illegible] ধারা সব কিছুতেই যে পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচির ছাপ রয়েছে তা অনেক সময় মঞ্চের চেয়েও প্রগতিশীল। যাত্রা সম্পর্কে এই দশকের সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের। আকাদামি পুরস্কার এবং তরুণ অপেরার সোভিয়েত দেশ পুরস্কার প্রাপ্তি।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

কলকাতা জীবন্ত মহানগরী, কিন্তু এ শহর দুর্গতির শহর। পথে বেরুলেই এখানে আতংক, সামনেই বুঝি দুর্ঘটনা কিংবা কোনো বিপত্তি!

কিন্তু কী করে কলকাতা এমন হলো? দেখতে দেখতে আজ একি তার অবস্থা? কারণ তার হয়তো অনেক। আসল কারণ, আমাদের শহরকে আমরা ভালোবাসি না।

কলকাতা ভাবনায় এলেই অন্য দেশ ও অন্য নগর-নগরীর কথা মনে পড়ে। তার সব নিয়ে আলোচনা অসম্ভব। একটি দেশের নগর-শাসন ব্যবস্থা এবং তাদের নাগরিক কর্তব্য-বোধের কথাই বলি।

আমেরিকার রাজনীতির অনেক কিছুর সংগেই আমার মনের সায় নেই। কিন্তু সে দেশের মানুষের নগর-পরিকল্পনায়, নগর-শাসন ব্যবস্থায় এবং তাঁদের পৌর-প্রীতি ও দেশপ্রেমে আমি মুগ্ধ। তা' নিয়েই এ আলোচনা।

বছর পনেরো আগের কথা। আমি নিউ অর্লিন্স শহরে। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তম বন্দর-শহর নিউ অর্লিন্স। দুটি জায়গা থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ আমার। একটি পোর্ট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। অপরটি মেয়র ও সিটি কাউন্সিলের। স্থানীয় স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিসেপশন সেণ্টারের ওপর আমার কর্মসূচী নির্ধারণের ভার। তাঁদের কাছ থেকে এ দুই আমন্ত্রণ সংবাদে আমি খুশি।

শেষটিতে আমেরিকার পৌরশাসন-পদ্ধতি শহর-জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত জানার নিশ্চিত সুযোগ। মার্কিন সফরে যাবার আগে পশ্চিমবংগ পৌরকরদাতা সমিতির অনুরোধও ছিল তা' জানবার।

সকালবেলা বন্দর-ঘাটে গেছি। পরিচ্ছন্নতায় মন তৃপ্ত। কলকাতার গংগার ঘাটের ছবিও সংগে সংগেই মানসনেত্রে। গংগা পুণ্যতোয়া! কিন্তু তার পবিত্রতা রক্ষায় আমাদের যত্ন, আমাদের প্রয়াস কতটুকু? কর্মহীন পুণ্যলোভ ওদের কাছে নিরর্থক—জীবনে সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় ওদের প্রাণ-প্রযত্ন। তাই মিসিসিপির দু'তীর জুড়ে স্বপ্নলোক।

দু' ঘণ্টার প্রমোদ-ভ্রমণ। আমন্ত্রিত আমরা দু'জন। আমি আর সুইডিশ পার্লামেণ্টের একজন সদস্য। পোর্ট কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সংগী আমাদের। তা' ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের আমেরিকান কয়েকজন।

বন্দর-প্রতিনিধি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আমাদের সব। নদীর বুকে জাহাজে বসে দেখছিলাম দু' তীরের কর্মব্যস্ততা আর কর্মকুশলতা। কাজে আলস্য নেই, কাজে অতৃপ্তি নেই। পূর্ণ সাফল্যে পূর্ণ সন্তোষ, পরিপূর্ণ শান্তি। সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি, ফাঁকি নেই কোথাও। জাতকে বড়ো করে তোলবার মূল রহস্য সেখানে।

পরদিন বিকেলে সিটি হলে একটি ছোট্ট অভ্যর্থনা। সিটি হল মানে মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং। মেয়র ও কাউন্সিলম্যানদের স্বাক্ষরিত নাগরিক অধিকার দান সমন্বিত সম্বর্ধনা-পত্রের ঘোষণায় আমিও নিউ অর্লিন্স শহরের একজন সম্মানিত নাগরিক! সে প্রসংগেই আরো একটি বিচিত্র প্রাপ্তি—'গোল্ডেন কী অব দি সিটি'। একটি সুরম্য কৌটোয় সুরক্ষিত একটি সোনালী চাবি। এ নাকি সম্মান-প্রতীক। এর কোনো প্রয়োজন ছিল না আমার। নগর-কর্তাদের সংগে আলাপ-আলোচনায় তাঁদের কর্মনিষ্ঠা এবং পৌর-প্রীতির পরিচয় পেয়েই আমার বেশি আনন্দ।

অনেক কথাই হলো আমেরিকার নগর-জীবন সম্বন্ধে, আমেরিকার নগর-শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে। সে বিষয়ে কিছু লিটারেচারও হাতে এলো। তারপর শুধু সিটি হল নয়, সারা শহর ঘুরে দেখে অনেক জ্ঞান সঞ্চয়। 'দস্যুনগরী' বলে শিকাগোর কুখ্যাতি। সেখানেও নগর-সৌন্দর্য নব নব পরিকল্পনা। আর তা রূপায়ণে সকলের সহযোগিতা। পৃথিবীর বৃহত্তম বাণিজ্য-কেন্দ্র নিউইয়র্ক। কর্মমুখর আরেক মহানগরী। ডলার মাহাত্ম্যে মশগুল মন। সেই নিউইয়র্কও রূপচর্চায় ও স্বাস্থ্যরক্ষায় সদা সতর্ক।

প্রবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আমেরিকায়। তা সত্ত্বেও সে দেশের নগর-জীবনের বিকাশে, জাতীয় জীবনের অগ্রগতিতে সহযোগিতার অবদান অতুলনীয়। এ শহর আমার, এ দেশ আমার—এ বোধ যতোদিন না আসছে আমাদের মধ্যে, শহরকে সুন্দর রাখবার, দেশকে এগিয়ে নেবার পথে সহযোগিতা দেবার সুবুদ্ধিও হবে না ততোদিন।

প্রতি বছর 'নাগরিক দিবস' পালনের রেওয়াজ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। এমনি অনেক 'দিবস' পালিত হয় এখানে। কিন্তু আমার মনে হয় 'নাগরিক দিবস'-এর গুরুত্ব সর্বাধিক। নাগরিক কর্তব্য স্মরণ ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ। এ প্রত্যেক নাগরিকের সেদিন অবশ্য করণীয়। জনগণের দ্বারা গঠিত জনগণের জন্যে জনগণের সরকারের প্রতি সেদিন সবার মুখে মুখে আস্থা ঘোষণা। নগর-শাসন ব্যবস্থায়ও সেই গণতান্ত্রিক বোধেরই প্রতিচ্ছায়া।

রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায়, শাসনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থায় আমাদের সংগে আমেরিকানদের অনেক মিল। এ আমাদের অনুকরণ-প্রিয়তার একটা দিক। কিন্তু জীবনযাপন প্রণালীতে এ দুই দেশে অনেক তফাৎ। আমরা গণতন্ত্রের বড়াই করি। কিন্তু গণতন্ত্রেরও যে একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে, আমার ভারতে তার স্বীকৃতি নেই। অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে তার কোনো পরিচয় নেই। বড়ো বড়ো কথার ফুলঝুরিই শুধু, কাজে কোথায় এবং কতটুকু তার রূপায়ণ? 'সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়' ভিত্তিক গণতান্ত্রিক জীবন-পদ্ধতির ব্যাপকতা আমেরিকায়। কি দেশ-শাসন, কি নগর-শাসন সবই সেখানে সে অনুযায়ী।

নগর উন্নয়নের শিক্ষা আমেরিকায় সর্বশ্রেণীর সকল নর-নারীর পবিত্র শিক্ষা। নগর-বিধি মেনে চলা ওদের ধর্মবিশেষ। শহরের সর্ববিধ সুখ সুবিধা বিধানে সহযোগিতা ও সমন্বয় সবার কাম্য। তীব্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বোধও কখনো বাধা হয় না সেখানে নাগরিক কল্যাণমূলক কাজে। তাঁর চেষ্টায় তাঁর পল্লী তাঁর শহর সুন্দরতর হতে পারে, আরো স্বাস্থ্যকর হতে পারে, এ সম্পর্কে প্রত্যেকেই সজাগ এদেশে। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সংগে সংগেই এদেশবাসী লাভ করে এ শিক্ষা। পল্লী ও শহর উন্নয়নমূলক কাজের জন্যে রয়েছে নানা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান। রাজনীতির স্পর্শমুক্ত এসব সংস্থা। পল্লী ও নগর সেবাতেই এদের সার্থকতা। সংখ্যায় অসংখ্য তারা। কয়েকটির কথা বলি। বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স, সিটিজেন্স লীগ, ট্যাক্স পেয়ার্স অ্যাণ্ড ভোটার্স ক্লাব, মিউনিসিপ্যাল লীগ,

ভোটদাতাদের ক্ষমতা রয়েছে মেয়রকে পদ-চ্যুত করার। বহু রাজ্যে আবার মেয়রের পদচ্যুতি গভর্ণরের হাতে।

এবার সিটি কাউন্সিলের কথা কিছু বলা াক। আমরা যাঁদের কাউন্সিলর বলি ামেরিকায় তাঁরা কাউন্সিলম্যান। নগর-রিধি ও নগর-গুরুত্বে তাঁদের সংখ্যার মবেশি। কোথাও পাঁচ, কোথাও পঞ্চাশ। ব বিভিন্ন পৌরসভায় কুড়ি থেকে ত্রিশই দের সাধারণ সংখ্যা। বড়ো বড়ো শহরের মেয়রের মতোই কাউন্সিলম্যানরাও গণসেবক। ছোট শহরে তা সম্ভব নয় বলেই বাইরের উপার্জনে তাঁরা নির্ভরশীল।

অনেক শহরে নির্বাচিত সভাপতিই পরিচালনা করেন কাউন্সিল সভা মেয়রের পরিবর্তে। নিউ অর্লিন্সে দেখেছি, সেখানে নগর-শাসন চলে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মতো। সে পৌরসভায় কাউন্সিলের দুজন সভাপতি। তাঁরা দুজনেই কাউন্সিলের নির্বাচিত। কাউন্সিল অধিবেশনে পর্যায়-ক্রমে সভাপতিত্ব করেন তাঁরা। এই রীতি। আর কোনো শহরে কাউন্সিলের এমনি জোড়া সভাপতি আছেন কিনা আমার জানা নেই।

কাউন্সিলম্যানদের কার্যকাল সাধারণত মেয়রেরই মতো। জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, নৈতিক মান সম্পর্কে বিধি-বিধান রচনা এবং জরুরী প্রয়োজনে অর্ডিন্যান্স জারী তাঁদের কার্যাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য। নগর-সৌন্দর্য বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখাও তাঁদের কাজ। কোনো কোনো পৌরসভায় বিভিন্ন

শাসন বিভাগও সংগঠন করে কাউন্সিল। কর্মীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে। কাউন্সিলের গুরুত্ব যেখানে বেশি সেখানে তাদের এতো কাজ।

এই হলো মেয়র-কাউন্সিল প্রণালীর মোটামুটি কথা। আমেরিকায় পৌর-শাসনে এ ব্যবস্থাই সর্বাধিক চালু। কমিশন ব্যবস্থাও চলতি আছে অনেক শহরে। এতেও মেয়রেরই অবশ্য প্রধান পদ। তবে এ পদ প্রাপ্য কোনো একজন কমিশনারেরই।

কমিশন প্রণালী প্রবর্তনের একটি কাহিনী আছে। আমেরিকার বৃহত্তম রাজ্য টেক্সাস। প্রাকৃতিক সম্পদে এ রাজ্য অতি সমৃদ্ধ। তা' বলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। টেক্সাসেরই এক শহর গালভেস্টন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই এ শহরের চরম বিপদ। ভীষণ বন্যা। প্রচণ্ড ঝড়ের পর মেক্সিকো উপ-সাগরের ক্ষিপ্ত রূপ। প্লাবিত গালভেস্টনে ধন-প্রাণের প্রচুর ক্ষতি। নগরজীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। নগর রক্ষায় রাজ্য আইনসভায় কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের পক্ষ থেকে একটি জরুরী পরিকল্পনা পেশ। সে পরিকল্পনা গৃহীত হলো। সিটি কাউন্সিল ও মেয়র পরিচালিত পৌরশাসন ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বাতিল করে দিয়ে নিয়োগ করা হলো পাঁচজনের এক নগর-কমিশন। পাঁচজন সংবুদ্ধি শিল্পপতির হাতে ভার পড়লো পৌর-শাসনের। পাঁচজন কমিশনার পাঁচটি বিভাগে ভাগ করে নিলেন তাঁদের কাজ। দ্রুত ফিরিয়ে আনলেন শহরের স্বাভাবিক অবস্থা। ফলে এ প্রণালী শুধু গালভেস্টনেই নয়, এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়লো সারা রাজ্যে, এমনকি টেক্সাসের বাইরেও অনেক পৌরসভা কমিশন ব্যবস্থা মেনে নিলো। কমিশনের সদস্য সংখ্যা সাধারণত তিন থেকে সাতের মধ্যে। স্থায়ী তারা কোথাও দু' বছর, কোথাও চার বছরের জন্য।

জনপ্রিয়তার দিক থেকে অবশ্য তৃতীয় পৌরশাসন প্রণালীর দ্বিতীয় স্থান। কাউন্সিল-ম্যানেজার শাসন ব্যবস্থার কথা বলছি। এও আরেক বন্যা-বিপর্যয়ের ফল। ১৯১৪। ওহাইও রাজ্যের ভীষণ প্লাবনে ডেটন শহর ডুবুডুবু। এ অবস্থায় মেয়র-কাউন্সিল ও কমিশন ব্যবস্থার অপূর্ব সমন্বয়ে এক অভিনব নগর-শাসন পদ্ধতির উদ্ভব ডেটনে। কমিশন ব্যবস্থার মতোই পাঁচজনের এক কাউন্সিলের হাতে নগর-রক্ষা ও উন্নয়নের দায়। নাগরিকরা নিশ্চিন্ত কিন্তু উদাসীন নয়। সবাই সহযোগিতায় সদা প্রস্তুত। ডেটন শহরের সে-বিপদ উদ্ধার এমনিভাবেই। তারই পর থেকে সারা দেশে হাজারেরও বেশি শহরে এই কাউন্সিল-ম্যানেজার শাসন চালু। শুধু আমেরিকাতেই নয়, কানাডাতেও অনেক শহরে এমনিতর পৌরশাসন।

প্রথম দুটি পৌরশাসন পদ্ধতির অর্থাৎ মেয়র-কাউন্সিল ও কমিশন প্রথার যা কিছু ভালো তা নিয়ে এই নতুন ব্যবস্থা। কাউন্সিল-ম্যানেজার শাসনরীতি। সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হবার সম্ভাবনা এতে। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত রূপা[য়ণের] ভার তাঁদেরই নিযুক্ত যোগ্য ম্যানেজ[ারের] ওপর। দায়িত্ব পালনে ম্যানেজারের স্বাধীনতা। দলবাজির কোনোই ব[ালাই] নেই সেখানে। কাউন্সিলের সভায় [যোগ] দিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণেও ম্যানে[জার] অধিকারী। কিন্তু কোনো বিষয়েই ভো[টা]ধিকার নেই তাঁর। তবুও এই ম্যানে[জার] পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা। কাউ[ন্সিল]ম্যানদের তাই কাজ হালকা। নতুন পরিকল্পনা চিন্তায়, উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাপনায় অনেক সময় তাঁদের হা[তে]। রাজনৈতিক কচকচি থেকে মুক্ত পৌরশা[সন]। আমেরিকার নগর-জীবন তাই এত সু[ন্দর], এত সুখকর! শুধু আমেরিকায় কেন, [সারা] জগতে প্রায় সর্বত্রই নগর-পরিবেশ ম[নোরম] —সবার আনন্দে আনন্দমুখর। নাগরি[ক] সব বড়ো শহরেই নিজ নিজ শহরে [গর্বিত]... গর্বিত।

আর আমরা আমাদের এ কলকাত[ায়]? আজ আর এ কলকাতায় গৌরব করার [মতো] আমাদের কী আর এমন আছে? কো[থায়] আনন্দ-মেলা আজ আর এই মহানগ[রীতে]? দিনের কর্মক্লান্তি শেষে সায়াহ্ন-শ[ান্তি] আহরণের কোথায় কতটুকু ব্যবস্থা এ শ[হরে] আর সহজলভ্য? বস্তীর অন্ধকার[ে] জীবন-বিষণ্ণতা মোচনে বক্তৃতা, বিবৃতি, বিজ্ঞাপন ছাড়া দৃঢ় প্রয়াসের লক্ষণই কোথায়? শ্রীহীন দীনতায় রাজপথগু[লির] অঙ্গে অঙ্গে শুধুই লজ্জাচিহ্ন! এ [কি] রাজপথ নামে এক একটি ব্যঙ্গ ক[রি]... পথ-চলায়ও আনন্দ আছে। কিন্তু মহানগরীতে চিত্তবিনোদন নয়, চিত্ত-বি[ক্ষোভ] ঘটে পথ-চলতে গিয়ে। দীর্ঘকাল [ধরে] এ তো প্রত্যেক নাগরিকেরই প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। হায় গঙ্গার ঘাট! পার্কগুলি বা কী শোচনীয় অবস্থা! বাজার পরিবে[শ] [ক]েন? কোন্টা বাদ দিয়ে কোন্টার ক[থা] বলবো?

প্রায়ই খবরের কাগজে কলকা[তা] কর্পোরেশনের বিতর্ক ও মাঝে মাঝে হা[তা]হাতির সংবাদ পড়ে বুঝতে পারি অন্য[তম] শ্রেষ্ঠ এই মহানগরীতেও একটি পৌরস[ভা] আছে। সেখানে পৃথিবীর বড়ো ব[ড়ো] সমস্যা নিয়ে ঝড় ওঠে। স্থানীয় নাগ[রিক] সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার তেমন স[ময়] কোথায়? পড়তে পড়তে তুলনা করি আ[র] ভাবি আমাদের অবস্থা। আমরা ত[র্কে] মাতি আর ওরা কাজে, নগরবাসীর স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কাজে মাতোয়ার[া]। আমাদের পৌরসভাগুলি কবে সত্যিকারে[র] কর্মসভার রূপ নেবে? পৃথিবীর অন্য[ান্য] উন্নত নগরের দৃষ্টান্তে আমরা কি কোনো দিনই উদ্বুদ্ধ হবো না?

অজয় বসু

হারপাসটাম বা ফলিসের কথা ছেড়েই দিলাম। ওসব তো আদ্যিকালের অনুষ্ঠান। রোমান আমলের। ও দুটোই হয়তো আধুনিক ফুটবলের পূর্বপুরুষ। কিন্তু পূর্বপুরুষের জীবন কাহিনী তেমন ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। বরং বলা যেতে পারে যে হারপাসটাম ও ফলিস, দুয়ের অঙ্গেই প্রাগৈতিহাসিক আমলের কিংবদন্তী জড়ানো। তাই পূর্বপুরুষের বাসভূমি যে মুলুকই হোক না কেন, সেখানে কিন্তু ফুটবলের বসবাস ঘটে নি।

ইংলণ্ডই ফুটবলের আঁতুড়ঘর এবং যৌবনের লীলাভূমি। কিংবদন্তীর সেই ড্যানিস হানাদারের কর্তিত মুণ্ডে লাথি মারতে মারতে, অথবা অন্য যে কোনো সূত্রে ইংলণ্ড ফুটবল খেলতে শিখেই খেলাটিকেও আপন করে নিয়েছিল। ভাল লাগা থেকে ভালবাসা জন্মায়। খেলতে ভাল লাগতো বলেই, খেলাটিকেও ইংলণ্ড ভালবেসে ফেলে। ফলে ইংলণ্ডের মাঠে ও মাটিতে ফুটবলের লালনপালনের পরিকল্পনাও সযত্নে রচিত হয়।

অপেশাদার থেকে পেশাদারী ফুটবল, প্রীতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে আন্তর্জাতিক ম্যাচ, ফুটবলের এক বিরাট কর্মকাণ্ডের হোতা ওই ইংলণ্ডই। ইংলণ্ড শুধু নিজেই খেলে নি, সুযোগ পেলেই দেশে দেশে ফুটবলকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইংরেজের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলার সর্বাত্মক চেষ্টার লগ্নেও ইংরেজের ওই উপহার ফুটবলের দিকে আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি নি। খেলাটির আবেদন এমনই সর্বজনীন। ইংরেজ যেখানে গিয়েছে, তার রাজ্যপাট অথবা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের টানে, সেইখানেই তার সঙ্গে ছিল একটি ফুটবল। কালের নিয়মে শাসক বা বেনিয়া ইংরাজ সে সব দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেও ফেরার সময় কিন্তু সেই ফুটবলটি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেনি। ইংরেজের ফুটবল ততোদিনে অন্য মুলুকে কায়েম হয়েছে। সেই ফুটবল যারা খেলে তারা সবাই ইংরেজের কাছে ঋণী। আমরা তো কোন্ ছার। একালের ফুটবল জগতের অবিসম্বাদী নায়ক যে দেশ সেই ব্রেজিল পর্যন্ত ইংলণ্ডের ঋণের ভারে আনত শির। কারণ, এক ইংরেজের চেষ্টাতেই খাস ব্রেজিলে ফুটবল খেলা চালু হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম চার্লস মিলার। জন্ম সাওপালোতে হলেও মিলার আসলে ছিলেন এক ইংরাজ পরিবারের সন্তান। মিলারের ছাত্র-জীবন কাটে ইংলণ্ডেই। অধ্যয়ন অন্তে আবার সাওপালোতে ফেরার সময় মিলার গুটিকয়েক ফুটবল সঙ্গে করে নিতে ভোলেন নি। ব্যাস্, ওই কটি ফুটবলই সারা ব্রেজিলে এক নতুন কালের অভ্যুদয় ঘটিয়ে দেয়। বেশি দিনের কথা নয়। মিলার বল নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন গত শতাব্দীর শেষ দিকে। কিন্তু এক শতাব্দী পেরিয়ে অন্য শতকের মাঝপথে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ব্রেজিল ফুটবল নিয়ে কি কাণ্ডই না করে বসলো! সবাইকে দিলো টেক্কা। ফুটবলে সবার গুরু ইংলণ্ডকে পর্যন্ত ঠুঁটো জগন্নাথ বানাতে ব্রেজিলীয় দক্ষতায় এতোটুকু টান পড়লো না।

কিন্তু তবু ইংলণ্ডই ফুটবলের জনক, সারা দুনিয়ায় পথিকৃৎ। এই সোচ্চার স্বীকৃতি শুনে ইংলণ্ডের গুমোর কিন্তু বহু বেড়েছিল। তাই ১৯৩০ সালে যখন বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম আসর বসে তখন ইংলণ্ড সেই আয়োজনটি উপেক্ষাই করে বসে। 'ফুটবলে আমরা গুরু ও ওস্তাদ। আমরা কেন শিষ্য সাকরেদদের সঙ্গে খেলবো?' এই ভেবেই বুঝি ইংলণ্ড সেদিন আত্মম্ভরিতার তুঙ্গে বসে অস্বাভাবিক উচ্চমন্যতায় ভুগছিল। এ ভোগান্তির জের চলেছিল, যতোদিন ততোদিন ইংলণ্ডকে বিশ্ব ফুটবলের আসরে দেখতে পাওয়া যায় নি। ওই আসরে ইংলন্ডকে প্রথম দেখা গেল ১৯৫০ সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালের প্রথম অনুষ্ঠানে।

শুধু দেখাই গেল না। সেবার ফুটবলে গুরু ইংলণ্ডের ওস্তাদী দেখে শিষ্যরা সব মুচকে মুচকে হাসতে সুরু করে দিলে। আর বুক ফাটা আর্তনাদ তুলে গুরু নিজের কণ্ঠেই দুনিয়াকে শুনিয়ে দিলে 'আমরাই তো ওদের আমাদের হারিয়ে দিতে শিখিয়েছি!' ওরা কারা? ওরা হলো

স্যার আলফ র‍্যামজে

আমেরিকান দল। ফুটবল যারা খেলে না, যাদের জয়ের সংবাদ পেয়ে স্বদেশীয় সংবাদপত্র পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই ছাপাতে কুণ্ঠাবোধ করেছিল, তারাই। সেই তারা হারিয়ে দিতেই ইংলণ্ডের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল। উচ্চমন্যতার মশলা দিয়ে সযত্নে বানানো ইংলণ্ডীয় ফুটবলের কাঠামোটির অস্তিত্ব কবে যে নমনীয় কাদামাটিতে রূপান্তরিত হয়েছিল তা ইংলন্ড আগে টের পায় নি। টের পেলো সেই ১৯৫০ সালে, ফুটবলে অজ্ঞাতকুলশীল আমেরিকার কাছে হেরে।

সেই থেকে লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে চেষ্টা চলেছে, সফলতায় যে চেষ্টার উত্তরণ হলো ১৯৬৬ সালে। স্বদেশে আয়োজিত বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেবারেই ইংলণ্ড পেলো শীর্ষসম্মান। পেয়ে আবার গুমোর বাড়লো। স্যার আলফ র‍্যামজে জাতীয় দলের হাল ধরে থাকতে সে গুমোর কমবে কি?

আগেরবারের বিশ্ব বিজয়ী এবার মেকসিকোতে কোয়ার্টার ফাইনালের গন্ডীই ডিঙোতে পারে না। জমজমাট এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংলণ্ডকে ৩—২ গোলে হারিয়ে পশ্চিম জার্মানী চার বছর আগেকার 'ওয়েম্বলী ডাকাতির' শোধ নিয়েছে। আর সব বাধাই টপাটপ ডিঙিয়ে ব্রেজিল ফুটবলের সোনার পরীকে চিরদিনের জন্যে নিজের সিন্দুকে পুরে রাখার অধিকার অর্জন করে নিয়েছে।

১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০, বারো বছরের ফাঁকে ব্রেজিল তিন তিনবার বিশ্ব ফুটবলের আসর মাতিয়ে দিয়েছে। তবু কি স্যার আলফ র‍্যামজে ভাঙবেন, না মুচ-

Brooke
Bond
Tea
Red Label
ভারতে
যে পাতা-চায়ের
সব চেয়ে বেশী বিক্রী
রেড লেবেল
মানে অনেক বেশী কাপ আর সত্যিই
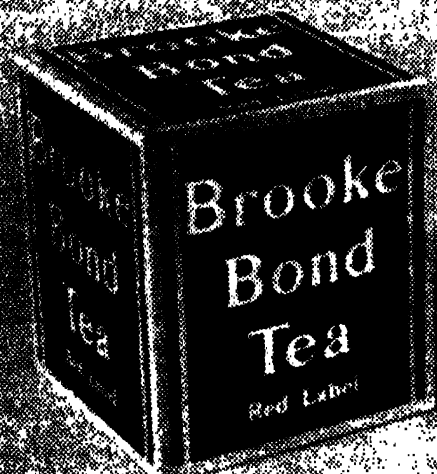
কাবেন! হেরে দেশে ফিরে কোথায় মুখ চুন করে লুকাবেন, তা নয় সাংবাদিকদের পেয়ে জাঁক করে বলে বসলেন 'ব্রেজিলের কাছ থেকে আমাদের কিছুই শেখবার নেই!' শুনুন কথা!

আলফ র্যামজে যৌবনে ছিলেন খেলোয়াড়। খেলা ছেড়ে দেবার পর অনেক দিন ধরেই কোনো না কোনো দলের তত্ত্বাবধান করছিলেন, কখনো কোচ, কখনো বা ম্যানেজার হিসেবে। ১৯৬৬ তাঁর ম্যানেজারীতে ইংলণ্ড বিশ্ব ফুটবল জয় করার সংগে সংগে কৃতজ্ঞ ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ আলফ র্যামজেকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কোনো খেলোয়াড়, দলপতি ববি মুর অথবা ১৯৬৬ সালের বিশ্ব ফুটবল আসরের অন্যতম সেরা (সর্বশ্রেষ্ঠ?) ববি চার্লটনও নন, নাইটহুড পেলেন দলের ম্যানেজার আল্ফ র্যামজে। পেয়েই আপনে ফুলে এমনই কলা গাছ হলো যে হারের পরও যুক্তিহীন কৈফিয়ৎ খাড়া করতে স্যার আলফ র্যামজে লজ্জা পেলেন না। বলে বসলেন 'ব্রেজিলের কাছ থেকে আমাদের কিছুই শেখবার নেই!'

শেখবার নেই? না, শিক্ষণীয় যা কিছু আছে তা স্যার আলফের দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না?

না পড়াই স্বাভাবিক। নাইটহুড পাওয়া এবং ১৯৬৬ সালে দেশ জোড়া অভিনন্দন পেয়ে আলফ র্যামজের মনে করতে ভাল লাগছিল যে ইংলণ্ডকে একবারের মতো জুলে রিমে কাপ পাইয়ে দেবার কৃতিত্ব তো একা তাঁরই। অন্যদের আবার ভূমিকা কি! এবং ইংলণ্ডকে যদি আবার বিশ্ব ফুটবল পেতে হয়, তাহলে তিনি ছাড়া গতিও নেই। ভাবতে ভাবতে স্যার আল্ফ র্যামজে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ, নির্বাচন এবং আনুসংগিক সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকারই নিজের কুক্ষিগত করেছেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০, এই চার বছরের তিনি ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে দলের 'বস্' হিসেবে শুধু নির্দেশ দেওয়ারই নয়, ভালমন্দ চিন্তা করার অধিকারও তাঁর ছাড়া আর কারুরই নেই।

যেন একপাল মেষ শাবককে তাদের করণীয় কি তা বোঝাতে শুধু পালকই ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছে। এই চার বছর ধরে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়েরা বিনা প্রতিবাদে শুধু ম্যানেজার স্যার আলফ র্যামজের চিন্তারই দাসত্ব করেছেন। ম্যানেজারের 'ইমেজ' ডিঙিয়ে দলের কোনো খেলোয়াড়ের প্রতিচ্ছবি যাতে বড় না হয়ে ওঠে তার দিকে স্যার আলফের নজর ছিল কড়া। তিনি 'স্টার সিস্টেমকে' ধ্বংস করেছেন, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিত্বকে বাড়তে দেন নি। নিজের ব্যক্তিসত্তার পক্ষপুটে অন্যদের ভূমিকাকে মিলে রাখতে চেয়েছেন।

এই অবস্থায় মেকসিকোতে ইংলণ্ড আবার বিশ্ব কাপ জয় করলে লোকে বলতো, স্যার আলফই ইংলণ্ডকে জুলে রিমে কাপ পাইয়ে দিয়েছেন! স্যার আলফ তাঁর খেলোয়াড়দের 'মানুষ' হতে দেন নি। চেয়েছিলেন তাঁদের মেসিনে পরিণত করতে। তাঁর একমাত্র পরিকল্পনাই ছিল, তিনি নিজে বোতাম টিপবেন আর মেসিনগুলো হাত পা নাড়া সুরু করে দেবে।

চার বছরের দীর্ঘ পরিকল্পনা। কাজেই স্যার আলফ তাঁর নিজের মতলব হাঁসিলে অনেক দূর এগিয়েও ছিলেন। কিন্তু ও পথে ইংলণ্ডকে বিজয় তোরণের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন নি। ১৯৬৬ সালে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের অনেক স্বাধীনতা ছিল। আর সেই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে ইংলণ্ডের এক একজন খেলোয়াড়ও সারা মাঠ জুড়ে বাহাদুরী দেখিয়েছেন। কিন্তু ১৯৭০-এ যা কিছু স্বাধীনতা তা একা স্যার আলফই ভোগ করেছেন। ফলে স্যার আলফের বোতাম টেপা কলের পুতুলগুলি আর মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারেন নি। এবং মাঠে নেমে মানুষের মোকাবিলায় হালে পানিও পায় নি।

স্যার আলফকে কে বলে বোঝাবে যে মেসিনের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু মানুষের সম্ভাবনার শেষ নেই! ছক বাঁধা জানা পথে মেসিন ছোটে গড়গড়িয়ে। কিন্তু অজানা পথের বাধা ডিঙোতে যে মুস্কিল আসানের ভূমিকা নিতে পারে, সে ওই বোতাম টেপা কলের পুতুলগুলো নয়। সে হলো জীবন্ত মানুষ, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধিতে বলীয়ান যে। যে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ম্যানেজার রাস্তা বাৎলায়, চলতি পথের বাঁকে বাঁকে কাঁটা গাছের ঝোপঝাড় যেখানে আছে তার সন্ধানও খেলোয়াড়দের জানিয়ে রাখে। কিন্তু পথের মাঝে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনো সমস্যার হদিশ ম্যানেজার দেবে কোথা থেকে এবং যে সমস্যা সমাধানের দাওয়াই বা তাঁর জানা থাকবে কি করে?

কাজেই অভাবনীয় পরিস্থিতি সামাল দিতে হলে খেলোয়াড়দের চিন্তা ভাবনায় প্রেরণা যোগাতে হয়। তাদের নিজের চিন্তার ক্রীতদাসে পরিণত করলে মুস্কিল আসান হয় না।

মেসিনের চেয়ে মানুষ বড়, এই সহজ, সরল তত্ত্বটি স্যার আলফ অনুধাবন করতে পারেন নি। অথচ এই তত্ত্বেই ব্রেজিলের বড়ো বিশ্বাস। আজ বলে নয়, সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালেই বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার পুনরারম্ভের লগ্ন থেকেই ব্রেজিল এই বিশ্বাসের পায়ে মাথা ঠুকে আসছে। এবং ব্রেজিলের অচলা ভক্তিতে ভাগ্য দেবীও যে কতো প্রসন্না তা ১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০, এই তিনবারের বিশ্ব কাপ ফুটবলের ইতিহাস থেকেই জানা যাচ্ছে।

ছক বেঁধে ফুটবল খেলেও ছকের পায়েই ব্রেজিল আত্মসমর্পণ করে বসে থাকে নি। প্রয়োজনে ছক ভাঙার নেশায় মেতে নতুন ছক গড়ে নিয়েছে। খেলতে খেলতে এই ভাঙচুর ও গড়ার কাজ চলে যেখানে, প্রত্যক্ষে সেখানে ম্যানেজারের ভূমিকা নেই। ভাঙা-গড়ার এই খেলার খেলোয়াড়েরাই বিশ্বকর্মা। চিন্তার স্বাধীনতা পেয়েই তাঁরা নতুন সৃষ্টি আনন্দে মাততে পেরেছেন। শুধু ম্যানেজারের হুকুম তামিলেই মন থাকলে কি আর নতুন সৃষ্টির কাজে হাত দেওয়া যেতো?

ফুটবল দলগত খেলা। দলের কল্যাণে ব্যক্তিসত্তাকে বিলিয়ে দিতে হলেও ব্যক্তিসত্তাকে বরবাদ করলে চলে কি? ব্যক্তি নিয়েই যেমন দল, তেমনি ব্যক্তির কীর্তিতেই সমষ্টির কীর্তি। ব্যক্তি বা খেলোয়াড় বিশেষে দলের সম্পত্তি বাড়ে। একজন পেলে থাকলেই একটি দল যে অসামান্য শক্তিধর হয়ে পড়ে তা ওই ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের গুণেই। ব্রেজিল এ সারতত্ত্বটি উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই ব্রেজিলীয় কোচ জাগিও জাগালো পেলে, জাইরজিনহো, টোস্টাও, গারসনদের উদ্দেশ্যে সুতো ছেড়ে রেখেছিলেন। সব সুতো লাটাইয়ে টান টান করে লাটাইটিকে নিজের হাতে তুলে রাখার লোভ দেখান নি। অথচ এই লোভটি সম্বরণ করতে পারেন নি ফুটবলের 'নাইট' আলফ র্যামজে। র্যামজের হাতের ঘুড়ি যতত্র উড়তে পারে নি। জাগালোর ঘুড়ি, মুক্ত বিহঙ্গের মতো পাখা দুটি মেলে সারা আকাশ জুড়ে ঘুরেছে, ফিরেছে। নেচেছে।

এই ছুটে বেড়ানোর ছবি কেমন রংদার তা এক বৃটিশ যোদ্ধার মুখেই শুনুন। ভদ্রলোকের নাম ডগ গার্ডনার। ফুটবলে

হিসেবেও এবং আত্ত জিখিয়ে হিসেবে গার্ডনারের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। তিনিই লিখছেন,

'হলদে রঙা জামা গায়ে টোসটাও, পেলে, রিভেলিনো এবং জাইরজিনহো মাঝ মাঠে মুহূর্তের জন্যে পরস্পরের কাছাকাছি জড়ো হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই কে কোথায় ছিটকে গেলেন। যেন আতসবাজীর টুকরো টুকরো স্ফুলিঙ্গ সব। এদিকে বল জেলজিল পায়ে পায়ে ফিরে। হঠাৎ দেখি কি চারজন আবার কাছাকাছি এসে একই কাজের জন্যে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। ছবিটি দেখবার মতো!'

ওয়ার্ল্ড কাপের বই
নীলমেশ রায়চোধুরী
জুলে রিমের নেপথ্যে
[ দাম চার টাকা ]
১৯৭০ সালের মেক্সিকো আসরের তথ্যপূর্ণ বই। বহু ফটো দেওয়া আছে।

এই ছবি যাঁরা আঁকতে পারেন, তাঁরা সৃজনধর্মী শিল্পী। শিল্পকর্মে প্রেরণা যোগাতে এই সব শিল্পীদের স্বাধীনতা দিতে হয়। মারিও জাগালো ব্রেজিলের খেলোয়াড়দের সেই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তাই মেকসিকোতে বিশ্ব কাপ ফুটবলের আসর ব্রেজিলের গন্ডা গন্ডা খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত ক্রীড়া নিপুণতার স্বাক্ষরে সমৃদ্ধ হয়েছে। দলগত খেলায়ও যে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য মস্তো ভূমিকা নিতে পারে, তারই প্রমাণ মেকসিকোতেই মিলেছে। কিন্তু স্যার আলফ এ স্বাধীনতা কাউকে দেন নি। তাই ইংলণ্ডের কোনো খেলোয়াড়ের নাম-ডাক মেকসিকোর আকাশ মুখরিত হয়নি। যতো হাঁকডাক তা ব্রেজিলীয় প্রতিভাদের ঘিরেই।

ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের ক্ষুরধার প্রভাবেই এবার মেকসিকোতে ৪+৪+২-এ গড়া রক্ষণাত্মক দুর্গ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। জান বাঁচাবার তাগিদে আঁটোসাটো যে ছক অনেক ভেবেচিন্তে গড়া হয়েছিল, প্রতিভা-ধরের আক্রমণাত্মক খেয়ালীপনা তা তছনছ করে দিয়েছে।

এমন কার্যকর খেয়ালীপনায় কি মেসিন মেতে উঠতে পারে! পারে মানুষই, যার চিন্তার জগৎ দিগন্তের মতো সীমাহীন এবং যার কর্মক্ষমতা মাপজোকের বাইরে। গড়া ছাঁচ ও রসদ যুগিয়ে বোতাম টেপো, যন্ত্র হনহনিয়ে ছুটবে। কিন্তু রসদ ফুরোলে যন্ত্র সক্রিয় থাকবে কোন্ সে যন্ত্রের কল্যাণ স্পর্শে? আবার বলি, মানুষের সামর্থ্য যন্ত্রের মতো সীমাবদ্ধ নয়। প্রশিক্ষক বা ম্যানেজার যে পরি-স্থিতির সন্ধান দিতে পারে না সেই পরি-স্থিতির সামনে পড়েও মানুষ যন্ত্রের মতো হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। একটা উপায় ঠাওরে পরিস্থিতির জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। এবং এসে নতুন সমস্যায় বিপক্ষকে জড়িয়ে চেষ্টায় নতুন কোনো ফাঁদ বিছোয়।

ফুটবল শুধু জগতের নয়, খেলা বটে। এবং মগজটি শুধু ম্যা কোচ ট্রেনারের থাকলেই চলে না, খেলোয়াড়দেরও থাকা চাই। নইলে না। পায়ের কাড়ি যোগাড়ও করা যে না, সে কথাটি এতোদিন মেসিন ওয়ালা স্যার আলফ রামজে বুঝতে নি। মেকসিকোয় হার, চারপাশের সমালোচনায় উত্যক্ত হওয়ার পর হয়তো তাঁর উপলব্ধি সত্যের দিকে এবং তিনি বুঝতে পারবেন যে যেমন, খেলার মাঠেও তেমনি, সত্য, মেসিনের চেয়ে অনেক বড়।

ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের ডানা দ দাঁড়ওয়ালা করাত দিয়ে কেটে দিয়ে স্পিরিট' বাড়াবার এক প্রাণান্তকর আমাদের দেশের অনেক ফুটবল কো পেয়ে বসেছে। তাঁরা খেলোয়াড়দের পথে সহজভাবে বিচরণ করতে দিচ্ছেন শিক্ষা-শিবিরে বল পাওয়া মাত্র পাশ হুকুম হাঁকছেন এবং খেলার পার্শ্বরেখার পাশে বসে অহরহ উ দিচ্ছেন, পাশ ওয়াল পাশ, চিপ্, এ এ'রা সবাই ঘুরছেন অবক্ষয়ের গো ধাঁধায়। তাই এ'দের শিক্ষণ পরিক পরিণামে তেমন কোনো খেলোয়াড় পাওয়া যাচ্ছে না। ক'বছর আগেও ফু খেলোয়াড়দের কথা উঠলেই সৃজনধর্মী দু-চার টুকরোর (প্রদীপ ব্যানার্জী, চুণী গোস্বামী) নমুনা নিশ্চয়ই পড়তো। কিন্তু আজ যে এই নম ছিটেফোঁটারও অস্তিত্ব নেই!

এই সব প্রশিক্ষক নিজের দুনিয়াতেই বাস করতে চাইছেন। আল্ফ র‍্যামজেও তাই চেয়েছিলেন পরিণাম যে ভাল হয় নি তা দেখে ও যদি শিক্ষালাভ না করা যায় তা আমাদের ফুটবলের কপালেও দুঃখ তোলা থাকবে। এবং অনেক দি জন্যেই।

একটি দলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এগারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যদি সামর্থ্য বাড়ে দলের পুঁজি পরিণত হয়। তাই স আগে প্রয়োজন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাড়ানো। ব্যক্তি সত্ত্বা ও ব্যক্তি বৈশিষ্ট বিসর্জনে এই জোর বাড়ানো সম্ভব তাই প্রস্তাব, অকারণে টিম স্পিরি দুয়ো না তুলে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হওয়ার সুগম করে তোলা হোক। মেসিনকেই মাত্র পরিত্রাণ কর্তা না ভেবে মানুষ মুক্তিদাতা বলে মানায় নিষ্ঠা দেখা হোক। তাহলেই ঘোড়ার সামনে গাড়ী জুতে গাড়ীর আগে ঘোড়া জোতার স কাজটি সম্পন্ন করে তোলার রাস্তা খুঁ পাওয়া যাবে।

# একদা ভারতে ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও বোলাররা ছিল

মতি নন্দী

১৯৭১-র ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে কোন্ দুজন ব্যাটিং-এ ও বোলিং-এ আমাদের ইনিংস শুরু করবে, এখনো তা জানি না। ১৯৬৯-এ নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফরে আটটি টেস্টে সাতজনকে —আবিদ আলি, চেতন চৌহান, অজিত ওয়াড়েকর, ইন্দ্রজিৎ সিংহজী, দিলীপ সরদেশাই, ফারুক এনজিনীয়ার, অশোক মাকড়—আমাদের ব্যাটিং ইনিংস শুরু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ছটি ইনিংসে আমাদের প্রথম উইকেট পড়ার সর্বোচ্চ রাণ ৫৭ (আবিদ ৬৩ ও চেতন ১৪)। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দশ ইনিংসে ৫০-এর বেশি রাণ তোলায় আটবার ব্যর্থ হয়েছে ওপেনিং জুটি। বাকি দুটি ইনিংসে ৮৫ ও ১১১ রাণ ওঠে ফারুক ও অশোকের চেষ্টায়। অর্থাৎ ১৬ ইনিংসের মধ্যে তেরোবারই আমাদের ব্যাটিং ইনিংসের ভিত্তি অর্ধশত রাণের উপর ওঠেনি।

অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম উইকেট পার্টনারশিপেও একই অবস্থা প্রায়। অস্ট্রেলিয়া প্রথম উইকেটে শত রাণের ভিত্তি তৈরী করতে পারে নি। নিউজিল্যান্ড পেরেছে একবার। কিন্তু তার কারণ আমাদের পেস-বোলাররা নন—প্রসন্ন, বেদী এবং বেঙ্কট-রাঘবন। দুটি সিরিজে ওপেনিং ব্যাটস-ম্যানদ্বয়ের ৩২টি উইকেটের মধ্যে প্রসন্ন একাই ১২, নট আউট ৫, রাণ আউট ৩, বেঙ্কটরাঘবন ৪, বেদী ২। অর্থাৎ আমা-দের ওপেনিং বোলাররা পেয়েছে মাত্র ৬টি। ওপেনিং বোলাররূপে ১৬ ইনিংসে বল করেছে সাতজন—রুসি সুর্তি, অজিত পৈ, আবিদ আলি, জয়সীমা, সুব্রত গুহ, একনাথ সোলকার ও মহীন্দর অমরনাথ। উক্ত ছয়টি উইকেটের মধ্যে অমরনাথ—১, সুব্রত—১, সুর্তি—২, আবিদ —২।

এখন ভারতের সেরা সাতজন—ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও ওপেনিং বোলারের (না হলে টেস্টে খেলান হল কেন!) সর্বশেষ টেস্ট নৈপুণ্য থেকে একটি কথা স্পষ্ট—আমাদের উইকেট ফাস্ট বোলার তৈরীতে অক্ষম তাই ব্যাটসম্যানরাও অনুশীলন না পেয়ে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলাতে পারছে না। আমাদের ৩৮ বছরের টেস্ট খেলার ইতিহাসে ব্যাপারটা কিন্তু প্রথম কুড়ি বছরে এমন শোচনীয় ছিল না। তখন ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও বোলারের অভাব ছিল না, বরং স্পিনারই দুর্লভ ছিল।

ভারতের প্রথম টেস্ট ম্যাচ লর্ডসে, ১৯৩২-এর জুনে। আমাদের দলে সেদিন কোন খাঁটি স্পিন বোলারই ছিল না। সি কে নায়ডু উঁচু করে অফ-ব্রেক বল দিতেন বটে, কিন্তু খাঁটি স্পিনারের পংক্তিতে তাঁকে রাখা যায় না। জার্ডিনের ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে ১৯৩৩-৩৪ সিরিজে বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্টে, ৪১ বছরের জামসেদজীকেই

মহম্মদ নিসার

আমাদের প্রথম টেস্ট স্পিন বোলাররূপে অভিহিত করা ছাড়া উপায় নেই। এই ল্যাটা পার্শি বোলার তিনটি উইকেট পেয়েছিলেন, কিন্তু আর ওকে টেস্ট খেলাতে ডাকা হয় নি। কলকাতায় দ্বিতীয় টেস্টে এলেন সি এস নায়ডু। ইনিই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় টেস্ট স্পিন বোলারদের আদি-পুরুষ। কলকাতা ও মাদ্রাজ টেস্টে ওঁকে মোট বল করতে দেওয়া হয়েছিল ২৩ ওভার যদিও অধিনায়ক ছিলেন ওর দাদা সি-কে। দুটি টেস্টে সি-এস কোন উইকেট পান নি।

১৯৩৬ ইংল্যান্ড সফরে খাঁটি স্পিনার তো কেউই ছিলেন না। অমরনাথকে ফেরাৎ পাঠানোর, তাঁর বদলী হিসাবে সি এস নায়ডু ইংল্যান্ড যান। পালিয়া প্রধানতই ব্যাটসম্যান, কিন্তু তাঁকেই স্পিন বোলার-রূপে টেস্টে কাজ চালাতে হয়েছিল। ১৯৩৬ লর্ডস টেস্টে সি-এস মাত্র তিন ওভার বল করার সুযোগ পান এবং কোন উইকেট পান নি। তিনটি টেস্টে খেলে একটিও উইকেট না পাওয়া সত্ত্বেও একজন স্পিন বোলারকে চতুর্থবার খেলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এমন ব্যাপার এখন অকল্পনীয়। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সি এস নায়ডু ১৭ ওভার বল করে টেস্টে প্রথম একটি উইকেট পান ৮৭ রানে।

অমর সিং

১৯৩২ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সাতটি সরকারী ও নয়টি বেসর-কারী টেস্টে ভারতের বোলার ছিলেন দুজনই—মহম্মদ নিসার ও লালা অমর সিং। একমাত্র এই দুজনের পেস ও সুইং-এর উপরই নির্ভর করত ভারতের টেস্ট আক্রমণ। সাতটি সরকারী টেস্টে ৮৪টি উইকেট পান ভারতের বোলাররা, তার মধ্যে নিসার পেয়েছেন ২৫ ও অমর সিং ২৮— অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ এই দুজনের। এই দুজনের আমলে ভারতের বিরুদ্ধে সরকারী টেস্টে শত রানের ওপেনিং পার্ট-নারশীপ একবারই হয়েছে, ১৯৩৩-৩৪, মাদ্রাজে। কিন্তু ১৯৩৬ ইংল্যান্ড সফরে

আমাদের প্রথম উইকেটের দুই ব্যাটসম্যান, বিজয় মার্চেন্ট ও মুস্তাক আলি, ২০৩ রানের পার্টনারশিপ তৈরী করেন অ্যালেন, গোভার, হ্যামণ্ড, ভেরিটি ও রবিন্সের পেস, সুইং, অফ-ব্রেক ও গুগলি ব্যর্থ করে। কুড়ি বছর পর প্রথম উইকেটের এই সংখ্যা অতিক্রান্ত হয় বিনু মাঁকড় ও পঙ্কজ রায়ের ৪১৩ রানের দ্বারা। কিন্তু এখন পর্যন্ত আর একবার দ্বি-শত রানের পর ভারতের প্রথম উইকেট পতনের নজীর পাওয়া যায় নি।

১৯৩৬-এর জুলাইয়ে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডেই প্রথমবারের মত মার্চেন্ট-মুস্তাক একত্রে ভারতের ইনিংস শুরু করেন। খেলোয়াড় জীবনে ও'রা দুজন মাত্র চারটি সরকারী টেস্টের সাতটি ইনিংস একত্রে ওপেন



করেছেন। তার মধ্যে ও'রা তিন ইনিংসে খেলেন—২০৩, ১২৪, ৯৪। এই দুজন যখন ক্রিকেট খেলা শিখেছেন, তখন ভারতের উইকেট ফাস্ট বোলারের সহায়ক ছিল।

ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে ভারতে খাঁটি স্পিনার খুব কমই ছিলেন। টেস্ট ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করার মত একজনও ছিলেন না। ১৯৩৬-এ অমরনাথের বদলে সি এস নায়ডুকে পাঠান হলে ডগলাস জার্ডিন মন্তব্য করেছিলেন, একজন ন্যাটা স্পিনারকে পাঠালে ফলাফলের অনেক হেরফের ঘটতে পারত। কিন্তু পাঠাবার মত একজনও তখন ছিলেন না। বিনু মাঁকড় এলেন দু বছর পর। এখন তো ঝাঁকে ঝাঁকে স্পিনার দেখা যাচ্ছে। এটা ঘটতে শুরু করেছে ১৬-১৭ বছর। ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে ঝোঁক পড়ায় টেস্ট ম্যাচগুলিকে পাঁচদিন ধরে টিঁকিয়ে রাখার জন্য এমনভাবে উইকেট-গুলি তৈরী করা হল যার ফলে নির্জীব উইকেটে ছেলেরা আর জোরে বল করায় উৎসাহ পেল না। ভারতীয় ক্রিকেট থেকে আপনা হতেই শক্তি ও শৌর্যের বিদায় ঘটে। নিষ্প্রাণ উইকেটে বল করে করে রমাকান্ত দেশাই তো দশ বছরের মধ্যেই নিজেকে খাক করে বিদায় নিলেন।

ফাস্ট বোলিং উৎখাত করার মারাত্মক ফল সব থেকে বেশি ফলেছে, বিদেশে আমাদের টেস্ট খেলাগুলিতে। ১৯৫৯ ইংল্যান্ড সফরে পাঁচটি টেস্টেই আমাদের হার হয়। পরের সফর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এবং পাঁচটি টেস্টেই পরাজয়। তারপর আবার ইংল্যান্ড এবং সিরিজের সবক'টি টেস্টে (তিনটি) আমাদের মুখে চুনকালি পড়ে। একটি টেস্টে কুন্দরন বল ওপেন করে-ছিলেন। এর পর অস্ট্রেলিয়া সফর এবং এখানেও সবক'টি টেস্টেই (চারটি) আমাদের মাথা হেঁট।

বিদেশের মাটিতে টানা সতেরোটি টেস্টে পরাজয়! কারণ? মনসুর আলি কারণ দিয়েছেন তার 'টাইগারস টেল' বইটিতেঃ—দেশের মাটিতে নির্জীব উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত ব্যাটসম্যানরা, বিদেশে প্রাণবন্ত উইকেটে পেস বোলারদের সামনে আর হালে পানি পায় না। যতদিন না ভারতীয়

লালা অমরনাথ

উইকেটগুলি দ্রুতগতি বলের সহায়ক হচ্ছে, ততদিন আমরা ফাস্ট বোলার তৈরী করতে পারব না এবং ব্যাটসম্যানরাও ফাস্ট বোলিং-এর মোকাবিলায় ব্যর্থ হবে।

আমাদের ফাস্ট বোলারের চমকপ্রদ সাফল্যের কথা বলতে গেলে ১৯৩২ লর্ডস টেস্টের প্রসঙ্গ প্রথমেই মনে পড়বে।

| | | |
|---|---|---|
| সাটক্লিফ | ব নিসার | ৩ |
| হোমস | ব নিসার | ৬ |
| উলী | রান আউট | ৯ |
| হ্যামণ্ড | ব অমরসিং | ৩৫ |

এই স্কোরশীট তৈরী হবার মাত্র দশ-দিন আগে সাটক্লিফ-হোমস ৫৫৫ রানের প্রথম উইকেট পার্টনারশিপের বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ১৫ মিনিটের মধ্যেই নিসার ওদের প্যাভিলিয়নে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। লাল সিং যখন উলীকে রান-আউট করলেন, ইংল্যান্ডের রান তখন ১৯!

এর থেকেও চমকপ্রদ প্রারম্ভিক বিস্ফোরণ আর একবারই মাত্র ভারতীয় ওপেনিং বোলারের দ্বারা ঘটেছে—১৯৪৬-এ লর্ডসেই আবার।

| | | |
|---|---|---|
| হাটন ক নাইডু | ব অমরনাথ | ৭ |
| ওয়াশব্রুক ক মাঁকড় | ব অমরনাথ | ২২ |
| কম্পটন | ব অমরনাথ | ০ |
| হ্যামণ্ড | ব অমরনাথ | ৩৩ |

বিশ্বের যে-কোন কালের যে-কোন বোলারের স্বপ্নের চারটি উইকেট! এই চারটি উইকেট অমরনাথ পেয়েছিলেন নিখুঁত পাঁচে, মাত্র ২৪ রানে, ১৭ ওভার বল করে নয়টি মেডেন নিয়ে। ওয়াশব্রুক ও কম্পটন আউট হন পর পর দুই বলে। হ্যামণ্ড হ্যাটট্রিক বন্ধ করেন। চারটি উইকেট পড়েছিল ৭০ রানে। চিরকালের বিশ্ব একাদশে এই চার-জনের মধ্যে তিনজন তো নিশ্চয়ই আসবেন। অমরনাথের মত এমন কৃতিত্ব আর কয়েক মাস পরই ব্রিসবেনে দেখান সম্ভব হয়েছিল কীথ মিলারের। ইংল্যান্ডের ৫৬ রানের মধ্যে প্রথম চার ব্যাটসম্যানকে—হাটন, ওয়াশব্রুক, এডরিচ ও কম্পটন—মিলার আউট করেন।
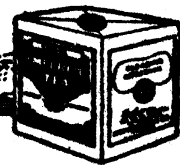
গত বছর টেস্ট ম্যাচ চলাকালে, বিশ্বনাথের ব্যাটিং নিয়ে কথা হচ্ছিল লালা অমরনাথের সঙ্গে। বললাম, "ছেচল্লিশের ভারতীয় দলে যদি বিশ্বনাথকে স্থান দেওয়া হত, তাহলে দলের কেউই ভ্রূ কুঁচকে বলত না 'এ আবার কে?' এখন পর্যন্ত, ভারতের সেরা টেস্ট দল হিসেবে কি ছেচল্লিশের দলকেই আপনার মনে হয় না?"

অমরনাথ হাসলেন বটে কিন্তু কথাটা যেন মনঃপূত হল না। বললেন, "আটচল্লিশে যে-দল অস্ট্রেলিয়ায় গেছল, সেই দলই বা সেরা নয় কেন? তখনকার অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দলের অন্তত দশজন অনায়াসে বিশ্ব একাদশে স্থান পাবার যোগ্য ছিল। তাদের বিরুদ্ধে আমরা কি খুব খারাপ খেলেছি?"

১৯৪৭-৪৮-এর অমরনাথের ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া পাঁচটি টেস্টে একবারও শত রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ স্থাপন করতে পারেনি। ব্রাউন, বার্ণেস ও মরিস ব্যাটিং-নৈপুণ্যের তুঙ্গে থাকা সত্ত্বেও। অথচ মাঁকড় ও সরবটে প্রথম উইকেটে ১২৪ রান তুলেছিলেন লিন্ডওয়াল, মিলার ও জনস্টনের বিরোধিতা তুচ্ছ করে। এই সিরিজে ভারতের এক নম্বর বিনু মাঁকড় দুটি শতরান করেন এমন আক্রমণের বিরুদ্ধে যার সমপর্যায়ী প্রারম্ভিক আক্রমণ টেস্ট ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যাবে। ১৯৫২ লর্ডসে তাঁর ১৮৪-র মত ইনিংসের জুড়ি মেলাও তেমন ভার হবে।

বিনু মাঁকড়ের পর পঙ্কজ রায়, নরী কণ্ট্রাক্টর, জয়সীমা, সরদেশাই, গায়কোয়াড়, কুন্দরন, এঞ্জিনীয়ার এবং আরো অনেকের পর এখন বিনুর ছেলে অশোক ভারতের ওপেনিং ব্যাটসম্যানদ্বয়ের একজন হিসাবে গণ্য হতে চলেছে। গত বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চারটি টেস্টে দু নম্বরে ব্যাট করতে নেমে অশোক কানপুরে ও দিল্লীতে ৬৮, ৬৪, ৯৭, ৭ করার পর ওপেনিং ব্যাটসম্যানের পরীক্ষা-কেন্দ্র কলকাতা ও মাদ্রাজে ৯,২০,০,১০ করে। কলকাতায় ওঁর ব্যাটিং দেখে লালা অমরনাথকে বলতে শুনি, "ভারতের সর্বকালের সেরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও সিলেকশান কমিটির চেয়ারম্যান বিজয় মার্চেন্টের উচিত, অশোককে নেটে নিয়ে গিয়ে, কিভাবে সুইং খেলতে হবে দেখিয়ে দেওয়া।"

অমরনাথের পর হাজারে, ফাড়কর, রামচাঁদ, উমরিগড়, দিভেচা, রঞ্জনে, সুরেন্দ্রনাথ, দেশাই, জয়সীমা, আবিদ আলি এবং আরো অনেকের পর এখন লালার ছেলে মহীন্দর টেস্ট সীমানায় পা দিয়েছে ওপেনিং বোলাররূপে। একটি টেস্ট সে খেলেছে, গত বছর মাদ্রাজে। স্পিনারদের উইকেটে বোলারদের দখল-করা মোট ৩৮ উইকেটের মধ্যে (প্রসন্ন ১০, ম্যালেট ১০, বেঙ্কট রাঘবন ৬ উইকেট) মহীন্দর দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ১২ রানের মধ্যে স্ট্যাকপোল ও চ্যাপেলকে বোল্ড করে বাহবা আদায় করেছিল। কিন্তু এখনো সে সম্ভাবনার পূর্ণতায় পৌঁছবার অপেক্ষায়।

বস্তুত, যে-কথাটা বলার জন্য নানান দৃষ্টান্তের তালিকা দাখিল করলাম, তা শুধু এই কথাটা বলার জন্য, একদা আমাদের ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও বোলার ছিল, কিন্তু গত দশ বছর ধরে আমাদের হাতড়াতে হচ্ছে এদের একজোড়া করে পাবার জন্য। কিন্তু এখনো পাইনি। অথচ অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন স্পিন বোলার প্রচুর পেয়েছি, কারণ নিশ্চয়ই উইকেটের আনুকূল্য। ফাস্ট বোলারদের অনুকূলে উইকেট তৈরী করাটা আমাদেরই হাতে। কিন্তু সে হাত কেন যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বোঝা যাচ্ছে না। বছর-পাঁচেক টেস্ট খেলা বন্ধ করলে বোধহয় আমরা আবার ওপেনিং বোলার ও ব্যাটসম্যান তৈরীতে মন দিতে পারব।

# ভারতের প্রথম অলিম্পিয়ান নর্ম্যান প্রিচার্ড

আরবি

সেই ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, আধুনিক ওলিম্পিক গেমস্-এর একেবারে দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে, ভারত সংযুক্ত হয়েছিল এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-অনুষ্ঠানের সঙ্গে, যা কিনা আজকের দুনিয়ার বৃহত্তম ও সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক যুব সম্মেলন। এবং তা ঘটেছিল কলকাতার এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকের উদারতায়। অথচ তাঁর সম্পর্কে আজকের ভারত তথা কলকাতার কি অপরিসীম উদাসীনতা।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, যে-যুগে বহু ভারতীয় নিজের জাতিসত্তা অস্বীকার করে নিজেকে ইংরেজ বলে ঘোষণা করবার জন্য ব্যগ্র, সেই যুগে কলকাতার এক ফিরিঙ্গী যুবক স্বেচ্ছায় ভারতীয়ত্ব ঘোষণা করে-ছিলেন এবং তাঁর ওই ভারতীয়ত্ব স্বীকৃতির ফলেই অন্য কোন ভারতীয়র অজান্তেই ভারত ওলিম্পিকে প্রথম আসন পেয়েছিল। এবং সেই সঙ্গে রৌপ্যপদক বিজয়ীর তালিকাতেও দু'-দুবার ঠাঁই পেয়েছে ভারত। যা কিনা এথ্‌লেটিক্‌সের ক্ষেত্রে ওই শুরু ও শেষ।

ফিরিঙ্গীরা ইঙ্গ-ভারত মিশ্র জাতি, কি ভারতে স্থায়ী বসবাসকারী খাঁটি শ্বেতাঙ্গ, সে-সমস্যার সমাধান আজও হয়নি, অন্ততঃ গৌরবর্ণ, কটা চুল ও নীল চোখসম্পন্ন ফিরিঙ্গী নামধারীদের পক্ষে। তবে আমাদের যৌবনে, অর্থাৎ দুই মহা-যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে, ফিরিঙ্গী সমাজের দাপট এদেশে ছিল প্রবল। এক সময় তারা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অভিধা পুরোপুরি অস্বীকার করে এবং নিজেদের সমাজের নামকরণ করে ডোমিসাইল্ড ইয়োরোপী-য়ানস্। তিরিশের যুগে একবার ফিরিঙ্গী সরকারী কর্মচারীদের উপর কোন পুরুষে ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল, তা ঘোষণা করার সরকারী নির্দেশে কি সাংঘাতিক উষ্মার প্রকাশ দেখেছি।

প্যারিসে দ্বিতীয় ওলিম্পিকে যোগ-দানকারী নর্মান প্রিচার্ড চেহারায় ইংরেজ বলেই চলে যেতেন। তাঁর মধ্যে ভারতীয় রক্ত কতটুকু ছিল, বা আদপেই ছিল কিনা, তাও জানবার উপায় ছিল না। তাছাড়া শেষজীবনে তিনি হলিউডের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে আমেরিকান চিত্র শিল্পে ছিলেন। তবু ওলিম্পিক গেমসের এণ্ট্রি-ফর্মে তিনি নিজেকে ভারতীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন।

ছাত্র হিসেবে প্রিচার্ড পড়তেন সেণ্ট জেভিয়ার্সে, ফুটবলও খেলতেন সেণ্ট জেভিয়ার্স-এর হয়ে, যে সেণ্ট জেভিয়ার্স তখনকার আই এফ এ-র নিয়মমাফিক ইয়োরোপীয়ান ক্লাব বলে চিহ্নিত ছিল, যেমন ছিল ওয়াই এম সি এ।

তখন আই এফ এ-র সম্পাদক পদেও ইয়োরোপীয়ানদেরই অধিকার, যদিচ এই শতাব্দীর প্রথম দিকে একবার মন্মথ গাঙ্গুলীকে জয়েণ্ট সেক্রেটারি করা হয়ে-ছিল। ১৯০০ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত প্রিচার্ড আই এফ এ-র অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। ফিরিঙ্গীদের চাকরির বাজারে প্রাধান্য, পুলিশ সার্জেণ্ট হিসেবে দাপট এবং ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞা ও দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে আমরা বলতাম, ওদের খাঁটি ইংরেজরা পোঁছে না, কিন্তু আমাদের আত্ম-প্রসাদের কোন বাস্তব ভিত্তি বোধহয় ছিল না।

তখনকার ফিরিঙ্গী সমাজ সম্পর্কে এত গাওনা যে গাইলাম, তার কারণ আজকের তরুণরা এদেশে পড়ে-থাকা অবশিষ্ট দু'-চারজন ফিরিঙ্গীদের আচরণ দেখে কল্পনাও করতে পারবেন না যে, সে-যুগের ফিরিঙ্গীরা ছিল মনে-প্রাণে ব্যবহারে ও মর্যাদায় বৃটিশ-রাজপরিবারের অতি নিকট জ্ঞাতি যেন। সুতরাং একজন ফিরিঙ্গী তরুণের পক্ষে স্বেচ্ছায় "আমি ভারতীয়" বলে ঘোষণা করা যুগের সঙ্গে একেবারেই সংগতিহীন। এবং তাঁর এই স্বীকৃতির দৌলতেই ভারত ওলিম্পিক গেমসে প্রথম এশিয়ান জাতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

এত বড় ঐতিহ্যের স্রষ্টা সম্পর্কে আমাদের একান্ত ঔদাসীন্যে আমি রীতি-মত মনঃপীড়া বোধ করি এবং তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াসেই তাঁর প্রসঙ্গ অব-তারণা করছি।

এই নর্ম্যান প্রিচার্ডের ব্যক্তিসত্তা নির্ণয়ের কোন আন্তরিক প্রয়াস আজ পর্যন্ত হয়নি। অনেকেই আলোচনাপ্রসঙ্গে 'কে এই নর্ম্যান প্রিচার্ড' প্রশ্ন করে কর্তব্য শেষ করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি বহু অনু-সন্ধান করে তাঁর সম্পর্কে যা জেনেছি তা কোন একটি বহুল-প্রচারিত ইংরেজী দৈনিকে একদা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্রের প্রবন্ধ পড়তে যতটুকু সময় লাগে ভুলতে সময় লাগে তার চেয়েও কম বিশেষ করে যদি বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ না থাকে। একথা কে না জানে যে, এক কপি খবরের কাগজের দামে পরদিন ওই কাগজের এক কিলোগ্রাম বিক্রি হয়।

নর্ম্যান প্রিচার্ড সম্পর্কে আমি জেনেছি, সে-বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হলে সকলেই যে তা নির্বিচারে মেনে নেবে তাও নয়। আমার সিদ্ধান্তে সন্দেহ নি আরো দশজনে তাঁর সম্পর্কে গবেষণা ক সত্য নির্ণয়ে ব্রতী হলে আমি বরং সুখী হব।

তবে গবেষণার ব্যাপারে বড় বেশি দে হয়ে গেছে। এখন বোধহয় আর কিছুই ক যাবে না। প্রিচার্ড-এর সমসাময়িক এথলে তিনজনের মধ্যে দুজনকে আমি পেয়ে ছিলাম, যাঁদের কাছ থেকে আমি তাঁ ব্যক্তিসত্তা নির্ণয় করতে পেরেছিলাম। আ তাঁরা সবাই মৃত।

ওলিম্পিক গেমসে নর্ম্যান প্রিচার্ড-এ কৃতিত্ব সম্পর্কে আমরা প্রথম জানলা সেদিন, পঞ্চাশের গোড়ার দিকে, হ্যারল এব্রাহামস-এর গ্রন্থে ওলিম্পিক পদক বিজয়ীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকায় তাঁর নামে উল্লেখ দেখে।

ভারত হিসেবে ভারতীয়দের ওলিম্পিকে প্রথম যোগদান ১৯২০ সালের অ্যান্টুয়ার্প গেমসে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সে প্রথম ওলিম্পিকে মোহনবাগানের পি সি ব্যানার্জি সমেত চারজন এথলেট ও দুজন কুস্তিগীর পাঠানোর প্রয়োজনেই স্যা ডোরাব টাটার নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশান সংগঠিত হয়, যেমন আই এফ এ সংগঠিত হয়েছিল সর্বভারতীয় ফুট-বল প্রতিযোগিতার জন্য একখানা শীল্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে।

প্রথম ওলিম্পিক গেমস যখন এথেন্সে অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৬ সালে, তার সাংগঠনিক সভা থেকে কোন অশ্বেতাঙ্গ দেশে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়নি। দেশে দেশে ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশান গঠনের কথাও তখনো কেউ ভাবেনি। রটনা শুনে স্ব যেভাবে পেরেছে গিয়ে যোগদান করেছে, সরাসরি এণ্ট্রি করেছে, তবে এণ্ট্রি-ফর্মে নামের সঙ্গে দেশ তথা জাতিসত্তা উল্লেখ করতে হয়েছে।

প্রথম ওলিম্পিকে ইয়োরোপের বাইরের দুটি রাষ্ট্র থেকে লোক এসেছিল আমে-রিকান যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া জাতি হিসেবে ব্রিটিশদের সঙ্গে। প্যারিসের দ্বিতীয় ওলিম্পিকের পর ওলিম্পিকের কোন খবরই অনেকে রাখতো না; যোগদানকারী-

দের কজনের তা জানা ছিল তাও সন্দেহ। প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতাই আধুনিক ওলিম্পিকের প্রবর্তক ফরাসী ব্যরন পিয়ের দ্য কুবার্তিনের চেষ্টায় ও আগ্রহে ওলিম্পিকের ছাপ পেয়েছিল এবং প্রথম ওলিম্পিকের চার বছর পরের অনুষ্ঠান হিসেবে দ্বিতীয় ওলিম্পিক হিসেবে নথিবদ্ধ হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে দক্ষিণ আমেরিকার মিশ্রজাতি একজন কিউবান এসেছিল। আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো আসে প্যারিসের পরবর্তী সেন্ট লুই ওলিম্পিকে।

এশিয়া ভূখণ্ড দীর্ঘকাল ওলিম্পিক থেকে দূরে পড়েছিল। প্রথম উদ্যোক্তারা প্রাচ্যের নব-অভ্যুদিত শক্তি জাপানকে পর্যন্ত আমন্ত্রণ জানায়নি—ভারত, চীন বা অন্য পরাধীন দেশগুলি সম্পর্কে তো কথাই ওঠেনি। জাপান প্রথম যোগ দেয় ১৯১২ সালের স্টকহোম ওলিম্পিকে। ওলিম্পিক ক্ষেত্রে এশিয়ার ওই প্রথম প্রবেশেরও ১২ বছর আগে ভারত থেকে নর্ম্যান প্রিচার্ড কি করে ওলিম্পিকে যোগদান করতে গেলেন, কে তাঁর কানে ওলিম্পিকের বার্তা পৌঁছে দিল, তা জানা যখন যায়নি, আর যাবেও না।

প্রিচার্ড যখন ওলিম্পিক থেকে দুখানা রৌপ্যপদক জিতে এনে কলকাতায় তাঁর সাথী এথলেটদের দেখিয়েছিলেন, কেউ আমল দেয়নি তাঁকে। ওলিম্পিক! সে আবার কি? ওরকম মেডেল কলকাতার স্পোর্টসে তাঁরা অনেক জিতেছেন।

বস্তুত কলকাতায় তখন দৌড়ের বাজীতে সবচেয়ে ওস্তাদ পরবর্তী কালে (১৯১২ সালে) আই এফ এ শীল্ডবিজয়ী মোহনবাগান দলের অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ী। কলকাতার স্পোর্টসে নর্ম্যান প্রিচার্ড কখনো তাঁকে মারতে পারেননি। এবং সেই কারণেই শিবদাস ভাদুড়ী, জিতেন দাশগুপ্ত ও এ এস আপকার—নর্ম্যানের তিন সাথী এথলেট তাঁর ওলিম্পিক রৌপ্যপদককে আমল দেননি।

এব্রাহামস-এর বইখানা এদেশে এসে পৌঁছতে প্রিচার্ড সম্পর্কে সামান্য কিছু কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। এবং বিষয়টি উত্থাপনের পর কলকাতা স্পোর্টসে তখনকার পিতামহ স্থানীয় আপকার যখন নর্ম্যান প্রসঙ্গে বলতে শুরু করেছিলেন, মুগ্ধবিস্ময়ে শুনেছিলাম। তাঁর বলা শেষ হতে, আমি প্রশ্ন করতে থাকি এবং মোটামুটি একটি ছবি খাড়া করতে সমর্থ হই। আপকারের নির্দেশেই কলকাতা স্পোর্টসের অপর পিতামহ জিতেন দাশগুপ্তের সঙ্গে সংযোগ করি। দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলেও আপকার প্রদত্ত তথ্যগুলির সমর্থন পাই।

নর্ম্যান প্রিচার্ড সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র হিসেবেই অতি তরুণ বয়সে সেণ্ট জেভিয়ার্স ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলেছিলেন। সেই ১৮৮৯ সালে কলকাতায় যখন সর্বপ্রথম ফুটবল টুর্ণামেণ্টের প্রবর্তন হয়, ট্রেডস কাপের সেই প্রথম রাউণ্ডের খেলায় সেণ্ট জেভিয়ার্সের হয়ে বাঙালীদের প্রধান দল শোভাবাজারের বিরুদ্ধে তিনটি গোল করেন নর্ম্যান দ্বিতীয়ার্ধে। সেই সুবাদে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে কলকাতার মাটিতে প্রথম হ্যাট্রিক করার কৃতিত্ব তাঁরই। মাত্র এক বছর আগে ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা, কেবল ফৌজী দলগুলির জন্য খেলা ডুরাণ্ড কাপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বছর ডুরাণ্ড কাপে কোন হ্যাট্রিক না যদি হয়ে থাকে, তবে ভারতের সর্বপ্রথম ফুটবল হ্যাট্রিকও নর্ম্যানের।

ওই পর্যন্ত। তারপর আর ফুটবলে তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের খবর পাওয়া যায় না। তবে ফুটবলের সঙ্গে নর্ম্যানের সম্পর্ক যে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল এবং কলকাতা ফুটবলে নর্ম্যান প্রিচার্ড যে একজন কেউকেটা বলে গণ্য হয়েছিলেন, তার প্রমাণ ১৯০০ সালে তাঁর আই এফ এ-র অবৈতনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়া।

আই এফ এ-র সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েই প্রিচার্ড হঠাৎ বিলেত চলে যান এবং ফিরে এসে বন্ধুবান্ধবদের তাঁর ওলিম্পিক মেডেল দেখান। এই তথ্য আমাকে জানান আপকার এবং তা সমর্থন করেন জিতেন দাশগুপ্ত মহাশয়।

প্যারিস ওলিম্পিকের খবর প্রিচার্ডের এখানে বসে জানার কথা নয়। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরবার পথে প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের আগ্রহ নিশ্চয়ই তিনি ইংল্যাণ্ডের এথলীটদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

ফিরে এসেও প্রিচার্ড আই এফ এ সেক্রেটারির পদে বহাল থাকেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, তখন মাত্র আটটি শ্বেতাঙ্গ দল নিয়ে গঠিত ফার্স্ট ডিভিশান লীগ ও আই এফ এ শীল্ড মে-জুন-জুলাই তিন মাসে সাঙ্গ হয়ে যেত। তারপর সাহেবরা রাগবি খেলতো। কাজেই আই এফ এ সম্পাদকের কাজের বোঝা মোটেই ভারি ছিল না। মাঠে মারামারি, কথায় কথায় প্রোটেস্ট প্রভৃতি কলকাতা ফুটবলের আধুনিক সমস্যাগুলি তখন আদপেই ছিল না। তাই আই এফ এ-র সেক্রেটারি প্রিচার্ডের হঠাৎ ফুটবল মরশুমে বিলেত চলে যাওয়াতে আই এফ এ-র কাজে কোন ব্যাঘাত হয়নি।

শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত আই এফ এ সম্পাদক হয়েও প্রিচার্ড কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি ইংরেজ ভেবে নেটিভদের থেকে দূরে থাকতেন না, একথাও বলেছেন আপকার। আসলে তিনি নিজেকে পুরোপুরি কলকাতার লোক ভাবতেই অভ্যস্ত ছিলেন; তবে সে কলকাতা ছিল ইংরেজদের কলকাতা, সেখানে নেটিভদের ঠাঁই ছিল, কিন্তু কল্কে ছিল না। তাই বিলেত ঘুরে আসার পর নর্ম্যানের স্থানীয়দের সঙ্গে মেলামেশায় অনেকটা ঢিলে পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আই এফ এ সেক্রেটারি দ্বিতীয়বার যে নিখোঁজ হলেন তার পাত্তা এখানে কেউই আর জানতে পারেনি। তবে সম্পাদক হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আই এফ এ-র তহবিলও কিছু নিখোঁজ হয়েছিল, এমন কানাঘুষাও নাকি শোনা গিয়েছিল।

বলা-কওয়া নেই, কলকাতার ছেলে প্যারিসে গিয়ে ওলিম্পিকের মেডেল জিতে নিয়ে এল—এমন কথা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়, যদিও আপকার প্রমুখরা ওলিম্পিক মেডেল জেতাকে সেদিন কোন বিশেষ কৃতিত্ব বলে মনেই করেননি এবং সেই কারণেই তা অবিশ্বাস করার কারণও খুঁজে পাননি।

তবে ১৯০২ সালে ভারত থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হবার পরবর্তী কাহিনী শুনলে প্রিচার্ডের কোন অভিযানই দুঃসাহসিক ও অবিশ্বাস্য মনে হবে না। কিন্তু তার খবর আপকার বা প্রিচার্ডের তখনকার অন্য বন্ধুরা তো দূরের কথা, এদেশে কেউই জানতেন কিনা সন্দেহ। শেষের কথা আমি যা জেনেছি, তা এই প্রবন্ধের শেষেই বলবো।

ওলিম্পিক থেকে ফিরে এসে প্রিচার্ড

যে গোঁফ রেখেছিলেন, তার সঙ্গে ১৮৯৬ সালের এথেন্স ওলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগীদের ছবিতে দেখা গোঁফের মিলের সাদৃশ্য আছে। তা থেকে মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে, ওই ধরনের গোঁফ তখন ইয়োরোপীয় তরুণ-সমাজে প্রচলিত ছিল এবং ইয়োরোপের তরুণদের দেখে এসেই প্রিচার্ড ওই গোঁফ রেখেছিলেন।

প্যারিস ওলিম্পিকে প্রিচার্ড তিনটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা করেছিলেন এবং তিনটিই ট্র্যাক ইভেন্ট। ওই তিনটিতে তাঁর ফলাফল আমরা জানতে পেরেছি। তবে ২০০ মিটার দৌড়ে যে দ্বিতীয় স্থান পেল, সে যে ১০০ মিটার দৌড়ে নামেইনি, তা মনে হয় না, তবে ১০০ মিটারের ফলাফলে প্রিচার্ডকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের টিউকেসবেরি ২২-২ সেকেন্ডে প্রথম হন। তখনকার দিনে ওই সময়টা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। কিন্তু দৌড়টি হয়েছিল সোজা ট্র্যাকে। দ্বিতীয় স্থান পেতে নর্ম্যান প্রিচার্ড কত সময় নিয়েছিলেন, তা জানা যায় না। তবে টিউকেসবেরি-কে অধুনা পরিত্যক্ত প্রতিযোগিতা ২০০ মিটার হার্ডলসে তৃতীয় স্থানে ফেলতে পেরেছিলেন প্রিচার্ড। তাতে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, ২০০ মিটার দৌড়ে তাঁকে খুব বেশি পিছনে ফেলতে পারেননি টিউকেসবেরি। ২০০ মিটার হার্ডলসে প্রিচার্ডের আগে দৌড় শেষ করে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন আমেরিকান ক্রায়েনজ্‌লাইন। আর ১১০ মিটার হার্ডলসে প্রিচার্ড হয়েছিলেন পঞ্চম, বিজয়ী সেই ক্রায়েনজ্‌লাইন।

ওলিম্পিক থেকে ফেরার দু' বছর পরে আই এফ এ-র সম্পাদক নর্ম্যান প্রিচার্ড অন্তর্ধান হয়ে কোথায় গেলেন, কি হল তাঁর, কিছুই জানবার উপায় ছিল না। এবং আমিও প্রিচার্ডের কাহিনীতে যবনিকা টেনে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

বেশ ক'মাস পরে সংবাদপত্র অফিসে একখানা চিঠি এল, প্রিচার্ড-এর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না—এই উক্তি পাঠ করে একজন পত্রযোগে জানালেন, প্রিচার্ডের জীবনের ভারতোত্তর অধ্যায়। নামের পরিচয়ে লেখক বৃটিশ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হওয়াও অসম্ভব নয়। ভারতেরই কোন দূরাঞ্চল থেকে লেখা চিঠিতে তিনি জানালেন যে, নর্ম্যান প্রিচার্ড ভারতবর্ষ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে সোজা ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন এবং সেখানে মঞ্চাভিনয়ে যোগদান করেছিলেন। ভারতবাসী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মুখের ইংরেজী সংলাপ উচ্চারণ-দোষে দর্শকসমাজের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করায় প্রিচার্ডকে বহু সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল এবং তাঁকে ইংল্যাণ্ডের মঞ্চ থেকে তল্পি গোটাতে হয়েছিল।

কিন্তু তাতে হার মানবার লোক ছিলেন না প্রিচার্ড। অ্যাটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে সোজা নতুন দুনিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানে তখনকার নবাবিষ্কৃত চলচ্চিত্র আকৃষ্ট করে প্রিচার্ডকে। খেলোয়াড় প্রিচার্ড-এর দেহসৌষ্ঠবের জোরেই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক প্রিচার্ড চলচ্চিত্রে অভিনেতা হিসেবে স্থান করে নিয়েছিলেন। বিশেষ সে-যুগের নির্বাক চলচ্চিত্রে প্রিচার্ডের ভারতীয় ইংরেজী উচ্চারণ কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

তবে অভিনেতা হিসেবে প্রিচার্ড সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং অনেকগুলি ছায়াছবিতে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয়ে সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি মিলেছিল বিশের মাঝামাঝি যুগের নির্বাক বো জেস্ত ছবিতে উপনায়কের ভূমিকা লাভে। বো জেস্ত্ নির্বাক যুগের এক যুগসৃষ্টিকারী ক্ল্যাসিক ছায়াছবি। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নক্ষত্র রোনাল্ড কোলম্যান। এমন ছবিতে উপনায়কের ভূমিকা যাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি কৃতী অভিনেতা ছিলেন নিঃসন্দেহে। হলিউডেই তিরিশের যুগে নর্মান প্রিচার্ড-এর মৃত্যু হয়, তবে সবাক চিত্রের অভ্যুদয়ে ওই নক্ষত্রটি নিষ্প্রভ হয়ে সরে গিয়েছিলেন।

ওই চিঠিখানা সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। কবে কোন্ তারিখে, কোন্ পৃষ্ঠার কোন্ কলমে, আজ তা আর স্মরণ করতে পারছি না। ওই পত্রেই নর্মান প্রিচার্ডের কলকাতার জীবনের সঙ্গে পরবর্তী জীবনের যোগসূত্র স্বীকৃত হয়েছিল।

তবে যে যুবক তখনকার ধীরগামী জাহাজী যাত্রার যুগে সকলের অজ্ঞাতে কলকাতা থেকে প্যারিসে গিয়ে ওলিম্পিকে যোগদান করতে পারেন, হোক তা পূর্বতন সংগঠনযুক্ত ওলিম্পিক, তাঁর পক্ষে পরবর্তী জীবনের বর্ণিত কাহিনী এতটুকুও অস্বাভাবিক বা অতিরঞ্জিত মনে হয় না এক দুর্ধর্ষ যুবকের চিরচঞ্চল মানসিকতার অখণ্ড কাহিনী নর্ম্যান প্রিচার্ডের জীবন, ইংল্যাণ্ডের জীবন ও আমেরিকার জীবন।

এথেন্সে ও প্যারিসে প্রথম দুই ওলিম্পিকেই অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর নাম দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। হঠাৎ প্যারিসে বেড়াতে গিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় উপস্থিতির আকর্ষণেই হয়তো নর্মান নাম দিয়েছিলেন এবং যেহেতু তিনি ভারত সরকারের পাসপোর্ট বহন করছিলেন, এণ্ট্রিফর্মে তাঁকে ভারতের লোক বলেই ঘোষণা করতে হয়েছিল।

পরবর্তী যুগে ভারতের ওলিম্পিক দলে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ছড়াছড়ি, এমন কি রোম ওলিম্পিকে (১৯৬০) স্বাধীন ভারতের হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন লেসলি ক্লডিয়াস। এ যুগে ওলিম্পিকে যোগদানের অধিকার পেতে হলে যে ভারতীয় হতে হয়, সেটুকু স্বীকৃতি কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা সহজে মেনে নেন নি। আমস্টার্ডামে (১৯২৮) ভারতের প্রথম ওলিম্পিক হকি দলের ফিরিঙ্গী খেলোয়াড়েরা বিদ্রোহ করে ঘোষণা করেছিলেন, আমরা ভারতীয় নই, ভারতে প্রবাসকারী বৃটিশ। ভবিষ্যতে অনুরূপ উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল বন্ধ করার জন্যই ভারতীয় ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশান নিয়ম করে দেয়, ভারতীয় দলের হয়ে ওলিম্পিকে যোগদান করতে হলে 'আমি ভারতীয়' বলে স্বীকৃতিপত্র সই করে দিতে হবে এবং মার্চপাস্টে মাথায় পাগড়ি পরতে হবে।

আমাদের যুগে যখন ভারতের সদাজাগ্রত স্বজাতিচেতনার চাপে ফিরিঙ্গী সমাজ কিছুটা ত্রস্ত ও বিব্রত, তখনও তাদের ওই ইংরেজ হওয়ার দাবি, যা দাবাতে কড়া আইন করতে হয়েছিল। আর এদেশের সর্বজন স্বীকৃত ইংরেজ প্রভুর ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি হিসেবে ফিরিঙ্গীদের স্বীকৃতি যখন অবিসংবাদিত, সেই যুগে—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরও পাঁচ বছর আগে বৃটিশের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র কলকাতার গৌরবর্ণ কটাচুল নীল চোখ ও ইংরেজ সমাজে গা ঘষাঘষি-করা যুবক নর্ম্যান প্রিচার্ড ভারতীয় বলে নিজেই স্বীকার করেছিলেন। প্রসঙ্গত, ১৯৩৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় এথলেটিক্‌সে বাংলার মহিলা দলের অধিনায়িকা শ্রীমতী ডরোথি প্রিচার্ড (হার্ডলার) নাকি সম্পর্কে নর্ম্যান প্রিচার্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন।

তিন মহাদেশ দাবড়ে বেড়ানো এবং উপন্যাস সুলভ চমকপ্রদ জীবন কাহিনীর অধিকারী ওই ব্যক্তিটিকে কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না।

# রাজার খেলা

অজয় হোম
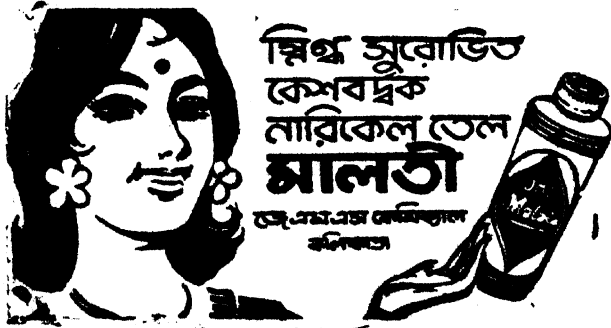
কলকাতার বাহান্ন নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিটকে, যাঁরা খেলাধুলো সম্বন্ধে একটু সচেতন তাঁরা জানেন ওটা ক্রিকেট খেলার বাড়ি এবং বাড়ির সব ছেলেরাই ব্যাট ঘোরায়। কিন্তু খুব কম লোকই জানেন ওখানে ক্রিকেট ছাড়াও নানা বিষয়ে চর্চা হতো। সংগীত-সাহিত্য-নাট্য থেকে শুরু করে শিকার, পশুপাখি পোষা—কি নয়। এর ওপর চূড়ান্ত আড্ডা। সব কিছুরই মধ্যমণি ছিলেন হিতেনদা অর্থাৎ স্বর্গত হিতেন্দ্রমোহন বসু। অসম্ভব ভালো ফার্সি জানতেন। ফার্সি থেকে মূল ওমর খৈয়াম অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন পণ্ডিত, সংগীতজ্ঞ ও নানা বিষয়ে গুণসম্পন্ন।

১৯৩৭-৩৮ সাল। আমাদের তখন পাখিপোষা এবং পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয়ের যুগ চলছে। উৎসাহদাতা হিতেনদা। তাঁর বিরাট লাইব্রেরি। পড়াশোনার সঙ্গে চলত হাতিবাগান, শেয়ালদা, হগসাহেবের বাজার থেকে পাখি সংগ্রহ এবং চিড়িয়াখানা ও যাদুঘরে গিয়ে পাখি দেখা।

ক্রিকেট মরশুম শেষ। পাখি নিয়ে মেতেছি। কিছু পাখিধরা বেদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাদের আড্ডা ছিল পাতিপুকুরে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কলকাতার আশেপাশে ঘুরি পাখিধরা ফাঁদ—সাতনলা চৌঘুড়ি ইত্যাদি নিয়ে। অনেক নতুন পাখির সঙ্গে পরিচয় হয়।

দৈনন্দিন পড়াশোনা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ পেশ করতে হয় আমাদের 'বার্ডস রিসার্চ ইনস্টিটিউট' বা পক্ষি-গবেষণা সংস্থার সভাপতি হিতেনদার কাছে। সেক্রেটারি ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বসু। আড্ডাটা বসে বাড়ির ভিতরের মাঠটায় যেখানে কংক্রিটের ক্রিকেট-পিচ আছে তার উপর। আমরা কজন সভ্য। আমাদের মধ্যে বর্তমান বোম্বাইবাসী ক্রিকেট-খেলোয়াড় বাপী বসু ছিল বৌ-কথাকও ও পাপিয়া পোষায় এবং ডাকানোতে সিদ্ধহস্ত।

একদিন হিতেনদা ওপর থেকে নেমে এলেন হাতে একটা বই নিয়ে। প্রশ্ন করলেন, রাজাদের স্পোর্টস অর্থাৎ খেলা কি? আমরা সমস্বরে বলি, কেন ক্রিকেট—'লর্ডস গেম'। তিনি বললেন, ক্রিকেট 'খেলার রাজা' হতে পারে কিন্তু রাজার খেলা ক্রিকেট নয়। কারণ সবদেশে ক্রিকেট খেলা হয় না এবং সব রাজামহারাজা বা লর্ড-ব্যারনরা ক্রিকেট খেলে না। আমরা বলি তবে শিকার? জবাব দেন, হ্যাঁ। তবে শিকারের রকম ভেদ আছে। তোমরা সবাই পুরোনো রাজপুত কাংড়া মোগল ছবি দেখেছ। সেইসব ছবিতে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ শিকারের ছবি এবং অন্য ছবিতেও রাজা-রাজপুত্র বা সমগোত্রীয় লোকের হাতে একটা বাজপাখি। ওই বাজপাখি দিয়ে শিকারই হচ্ছে রাজার খেলা।' কি ইংল্যান্ড, কি ইউরোপ, কি আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া পৃথিবীর সর্বত্র এর সমাদর। বাংলাদেশে এ নিয়ে কেউ চর্চা করছে কিনা জানি না, তবে ভারতের আর সর্বত্র এই শিকার-খেলার আদর আছে।' এই

বহেরি বা বাজবহেরি

বলে তিনি হাতের বইটি খুললেন। ফার্সিতে সুললিত ছন্দে লেখা বাজপাখি দিয়ে এক শিকার কাহিনী পড়ে শোনালেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম সেই অপূর্ব বর্ণনা। ওঁর কাছেই শুনলাম বাজপাখিকে শিকার শেখানোর সবচেয়ে ভালো বই 'বাজনামা-ই-নাসিরি।' ইংরেজি অনুবাদ আছে ডি-সি ফিলট-এর।

---

The Baz-Nama-Yi-Nasiri, a persian treatise on falconry, tr. by Douglas C. Phillot, Bernard Quaritch, 1908.

বাংলাদেশের শিকরেবাজ জোগাড় হল। অসম্ভব ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের ফলে কার্তিক বসু পাখিটাকে শিকারের উপযুক্ত করে গড়ে তুললেন।

ক্রিকেটার কার্তিক বসু যে দক্ষতায় বাজপাখিকে পোষ মানিয়ে শিকার ধরে আনতে শেখাতেন অপর কোন বাঙালীর সেরকম দক্ষতা আজও আছে কিনা আমার জানা নেই। দু-চারটি বড় জাতের বাজ ছাড়া প্রায় সব জাতের বাজ নিয়ে তিনি শিকার করেছেন।

বাজপাখি বশীভূত করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার—যথেষ্ট ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। প্রথমদিকে সারা দিনে যতক্ষণ পারা যায় এমনকি সন্ধ্যের পরও বাঁ হাতে পাখিটিকে নিয়ে হাতে হাতে ঘুরতে হবে। লোকজনের মধ্যে থাকতে হবে। পাখির সঙ্গে কথা বলতে হবে। মাঝে মাঝে ডানহাতটাকে মুখের সামনে এনে চাঁদিতে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত হাত বুলোতে হবে।

মানুষের হাতকে পাখির সবচেয়ে ভয়। তারা সবকিছু বরদাস্ত করতে পারে কেবল হাত ছাড়া। তাদের মানুষকাছা বা 'ম্যানিং' করতে বেশ সময় লাগে। আসল বশটা হয় খিদে এবং খাদ্য দিয়ে। মাংস হল বাজপাখির একমাত্র খাদ্য। পায়ের কাছে মাংসের টুকরো ধরলে যদি থাবা দিয়ে চেপে ধরে তবে বুঝতে হবে এ পাখি পোষ মানবে।

একবার হাজারিবাগ জেলায় গিরিডিতে একটা ঈগল (স্পটেড ঈগল; অ্যাকুইলা পোমারিনা) ফাঁদ পেতে ধরা হয়েছিল। সেটা কিছুতেই পায়ে মাংস চেপে ধরতো না। অর্থাৎ নিজে থেকে খেত না। জোর করে মাংসের টুকরো তার মুখের মধ্যে পুরে দিতে হত। মাস দেড়েক হরেক-রকম চেষ্টা করেও তাকে যখন খাদ্য ধরাতে পারা গেল না তখন ছেড়ে দেওয়া হল। প্রথমটা সে বুঝতে পারে নি যে, তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। অনুভব করার পর আমাদের মাথার উপর চক্কর দিতে লাগল, বৃত্ত ক্রমে বাড়াল, তারপর উত্তরদিকে সোজা উড়ে গিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। ওই ছুটে যাওয়াটা আজও মনের মধ্যে গাঁথা আছে।

মাংস পায়ে ধরার পর পাখি যেমন নিজে ছিঁড়ে খাবে তেমনি ওই মাংস থেকে

টুকরো কেটে পাখির মুখে ধরতে হবে। পাখি সাগ্রহে খাবে এবং মুখে 'কুই-কুই' খুশির আওয়াজ করবে। খাওয়ার সময়টা মোটামুটি নির্দিষ্ট রাখতে হয়।

এভাবে পালক ও পাখির মধ্যে সমঝোতা গড়ে উঠলে খাওয়াবার আগে একটা কাঠের চেয়ারের মাথায় পাখিকে বসিয়ে পায়ের বন্ধনীর সংগে সরু দাঁড় বা ফিতে লম্বা করে রেখে শেষপ্রান্ত চেয়ারে বাঁধতে হয়। দূর থেকে বাঁ হাতে উইকেটরক্ষকের দস্তানা পরে ডান হাতে মাংসের টুকরো ধরে বাঁহাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মধ্যে আস্তে আস্তে ঠুকে ও মুখে শব্দ করে বাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। মাংসের টুকরোর প্রতি বাজপাখির নজর পড়লেই মুহূর্তমধ্যে উড়ে এসে বাঁহাতের দস্তানার উপর বসে মাংসের টুকরো আঁকড়ে ধরবে। দ্রুতগতি ও পাঞ্জার জোর লক্ষ্য করার বিষয়। মাংসের টুকরো সরিয়ে নিয়ে শুধু হাতে পাখি বসানোর চেষ্টা করে দেখা গেছে খুব সময় তারা সাড়া দেয়। কয়েক-দিন পর লম্বা সুতোর আর দরকার হয় না, এমনিতেই বাজপাখি আসতে থাকে। দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়ে। শেষে গাছের উপর বা বাড়ির কার্ণিসের উপর উড়িয়ে দিলেও মাংস নিয়ে ডাকলেই আসতে থাকে।

পরবর্তী শিক্ষা—শিকার ধরা। বাজ-পাখি দিয়ে যে পাখি শিকার করতে হবে তার আস্বাদন বাজপাখিকে আগে করাতে হয়। তারপর সেই পাখি সংগ্রহ করে মাটিতে বেঁধে রেখে বাজকে হাতের মুঠোয় ধরে (যেমন পায়রাকে ধরা হয়) সেই বাঁধা পাখিকে দূর থেকে একটু আড়াল করে দেখাতে হয়। বাজ হাতের মধ্যে ছটফট করতে থাকে শিকার ধরার জন্যে। বাজকে এখন নিচু হাতে ছুঁড়তে হবে। হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সে ঝড়ের বেগে উড়ে গিয়ে দুপায়ে শিকারকে মোক্ষমভাবে চেপে ধরবে। পায়ের পিছনের নখ শিকারের দেহে বসিয়ে দেয়। ডানা ছড়িয়ে ডাক দিয়ে মালিকের জন্যে অপেক্ষা করে। মালিক গিয়ে শিকারকে ছাড়িয়ে নেয়। প্রথম যে পাখি শিকার করে তার কণ্ঠনালী ছুরি দিয়ে কেটে দু-এক ঢোক উষ্ণ রুধির বাজপাখিকে পান করতে দিতে হয়। এতে বাজের তেজ বাড়ে। মাঝে মাঝে একটু কলিজাও খাওয়াতে হয়। দু-চার জাতের পাখি শিকার রপ্ত হলে বুনো পাখি শিকারে নামতে হয়। বুনো পাখির পিছনে (বাজ পাখির) ধাওয়া ও শিকার ধরার দৃশ্য খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ও রোম-হর্ষক।

এতক্ষণ যে বাজপাখির কথা বললাম তা ছোটো-ডানার। বাজপাখি দুজাতের—ছোট-ডানা (হক) ও বড়ো-ডানা (ফকন)। ছোটো-ডানার সবচেয়ে বড়ো পাখি—বাজ (গোশক, অ্যাক্সিপিটার জেনটিলিস)। বাজের চোখের উপর চামড়ার ঠুলি পরিয়ে রাখতে হয়। এরা লম্বায় ২৪ ইঞ্চি, তাই [illegible] শিকারের দিকে ছোড়া যায় না। এরা হাতের ঝাঁকানি এবং পাল[illegible] ইঙ্গিতেই বুঝতে পারে কাকে ধরতে হ[illegible]

শিকারের দিকে ছোটো-ডানার বা[illegible] পাখিদের নিচু হাতে ছোড়াই ঠিক পদ্ধ[illegible] বাকি শেখানোর ধারা মোটামুটি এ[illegible] অন্ধকারে শেখানোরও এক ধারা আছে

বাজ, ঈগল ইত্যাদি মাংসাশী ও শিকা[illegible] পাখির স্ত্রীজাতিরাই দৈর্ঘ্যে বড়ো এ[illegible] তারাই প্রকৃত ভালো শিকারী। তাদের নাম[illegible] এই সব পাখিদের পরিচয়। যেমন, [illegible] বাজ, পুরুষ জুররা; স্ত্রী বহেরি, পুরু[illegible] বহেরি-বাচা; স্ত্রী শাহীন, পরুষ কোহি[illegible] কোয়েলা; স্ত্রী মেকার বা চেরা[illegible] পুরুষ চারখেলা; স্ত্রী লগ্গর, পুরু[illegible] জগ্গর; স্ত্রী ধুতি, পুং ধুতের (হা[illegible] স্ত্রী তরুমতি, পুং চেটওয়া; স্ত্রী শিক[illegible] পুং চিকেরা; ইত্যাদি।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি পা[illegible] বাসা থেকে সংগৃহীত বাচ্চা পাখি কখ[illegible] ভাল শিকারী হয় না। পালকের কা[illegible] থাকার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় খা[illegible] জন্যে নিজে থেকে শিকার করতে বাধ্য [illegible] না তাই আয়েসী হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে অমৃতস[illegible] প্রতি কালীপুজোর দিন বাজপাখির হাট [illegible] মেলা বসত। এখন বসে কিনা জানি ন[illegible] ভারতের বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য বাজপা[illegible] নিয়ে বাজের শিক্ষকরা যেমন আসত তে[illegible] আসতেন রাজামহারাজারা। ছোট-বড় কে[illegible] বাদ থাকতেন না। বেচাকেনা খুব হ[illegible] একবার এই মেলায় উপস্থিত ছিলা[illegible] জীবনে যেসব পাখি ছবিতে দেখেছিল[illegible] এবং বই পড়ে তাদের সম্বন্ধে যেট[illegible] জ্ঞানলাভ করেছিলাম তাদের চাক্ষুষ দেখ[illegible] আনন্দ পেলাম। এই মেলায় বাজপাখির দক্ষ[illegible] এবং শিক্ষকের কেরামতির পরিচয় পে[illegible] ছিলাম। কারা যেন কয়েকটা পায়রা ছে[illegible] ছিল। হাততালি ও শিসের জোরে তারা [illegible] উঁচুতে উঠেছিল। পাখির মাথার টুপি [illegible] 'হুড' খুলে এক শিক্ষক বহেরি বা ব[illegible] বউরি (পেরিগ্রিন ফকন; ফ্যালকো পেরি[illegible] গ্রিনাস) ছাড়লেন। বহেরি উড়ল। কে [illegible] বলল, জোরে 'পাত্তিয়ালা।' রকেটের ম[illegible] পায়রাগুলোর পিছনে ছুটল বাজ বউ[illegible] পাত্তিয়ালা। সাক্ষাৎ যম তাদের পি[illegible] নিয়েছে দেখে কয়েকটা পায়রা ঝপঝপ ক[illegible] নামতে শুরু করে দিল। বহেরির ল[illegible] একটি পায়রার দিকে যে সবচেয়ে উঁচু[illegible] এবং দ্রুতগামী। পায়রা উড়ে চলেছে, বা[illegible] বউরি আক্রমণ কাটাবার চেষ্টা কর[illegible] কখনও ডিগবাজি খেয়ে উল্টোমুখে, কখন[illegible] নিচুতে। এই সময় আর-একজন শিকা[illegible] একটা শাহীন বাজ (ফ্যালকো পেরিগ্রিনা[illegible] পেরিগ্রিনেটর) ছাড়লেন। বহেরির জাতভা[illegible] এই শাহীন, একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত[illegible] বহেরি বুঝেছে তার ভাগীদার জুটে গেছে[illegible] সে পায়রাটাকে ধরার জন্যে ব্যস্ত হ[illegible] পড়ল।

আমার ডানদিক থেকে কর্পূরথালার মহারাজার পক্ষিপালক তাঁর একটা বাজ পাখি ছেড়ে দিলেন। শ্যেনকুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাখি—এই বাজ। বাজ সম্বন্ধে শুধু বইয়ে পড়েছি, ছবিতে দেখেছি। অমৃতসরের মেলায় এসে চাক্ষুষ পরিচয় হল।

এদিকে বহেরি তার ভাগীদার শাহীনের আগমনবার্তা পেয়ে তার গতি বাড়িয়ে দিল। ফাইটার প্লেন যেভাবে তেরচা মেরে একটু দূরত্ব রেখে বাঁক খেয়ে শত্রুর বিমানের উপর গুলি বর্ষণ করে, ঠিক সেইভাবে বহেরি পায়রাটার পিছন ছেড়ে বাঁদিক দিয়ে অর্ধ চক্রাকারে এসে পড়ল তার সামনে। পায়রাটা ডিগবাজি খেয়ে নামার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্যর্থ হল। বহেরির দু পায়ের শক্তমুঠিতে ধরা পড়ল হতভাগ্য পায়রাটা। দর্শকরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল—সাবাস! সাবাস! বহেরির শিক্ষক মোচে চুমকুড়ি দিয়ে বুক ফুলিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। দর্শকদের বোঝালেন তাঁর পাখির কত এলেম।

উল্লাসধ্বনি মিলাতে না মিলাতে তলা থেকে শাহীন নিমেষের মধ্যে ছিনিয়ে নিল বহেরির পা থেকে তার শিকার। আক্রমণটা এত অতর্কিতে হল যে বহেরি বুঝতেই পারেনি, এমনকি যেন আশাও করেনি তারই জাতভাই এমন চৌর্যবৃত্তি করবে। বহেরির শিক্ষকও করেননি, তার উঁচু গোঁফ ঝুলে গেল। পরাজিত বহেরি ফিরে আসছে তার শিক্ষকের ইঙ্গিতে। এখন শাহীনের শিক্ষকের তারিফ না করে উপায় কি?

তাকিয়ে দেখলাম নীল আকাশে শাহীনকে মাঝে রেখে বাজ চক্কর দিচ্ছে। শাহীনের অবস্থা সঙ্গীন। সে পালাবার তাল খুঁজছে। বিপদ বুঝে শাহীনের শিক্ষক ঘনঘন নিশানা দিচ্ছেন ফেরার জন্যে। কিন্তু ফিরবে কি করে? ফিরতে দেবে কে? যাকে বলে বিনামেঘে বজ্রপাত—চোখের পলকে শাহীনকে আক্রমণ করে বাজ ছিনিয়ে নিল আধমরা পায়রাটা। ট্রফি নিয়ে ফিরছে রাজাধিরাজ বাজ। দর্শকদের উল্লাসধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠেছিল। অমৃতসরে এই রাজার খেলা আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বাজপাখি ওড়ানো বা ফকনারির একটা ঐতিহ্য আছে। প্রাচীন মিশরের বাজমাথা হোরাস দেবতা নিত্য পুজো পেতেন। প্রাচীন মিশরের ছবিতে এবং খোদাই করা দেওয়ালের গায়ে বাজ ও বাজ ওড়ানোর অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। চীনদেশে বাজ ওড়ানো শুরু হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব দু হাজার বছর আগে। ভারত, আরব, এশিয়া মাইনর, পারস্য ও জাপানে শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব ছ'শ বছরেরও আগে। খোরসাবাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটা খোদাই মূর্তি পাওয়া গেছে—এক পালকের হাতে বাজপাখি। পণ্ডিতরা বলেন, এ মূর্তির বয়স খৃষ্টপূর্ব ১৭০০।

পারস্য ও আরবদের হস্তলিখিত এক পুঁথি বলে যে বাজ ওড়ানো প্রথম শুরু করেন ইতিহাসপূর্ব এক পারসীক রাজা। ইতিহাস বলে, পারস্য থেকেই মোঘল রাজারা এই ঐতিহ্য ভারতবর্ষে বহন করে এনেছিলেন।

ইংরেজ এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের লেখকদের লেখায় বারবারি এবং টিউনেসীয় বাজের কথা পাওয়া যায়। মিশরে এখনও নাকি বাজ ওড়ানোর রেওয়াজ আছে। প্লিনি, অ্যারিস্টটল এবং মার্শাল প্রমুখদের লেখাতে ও বাজ ওড়ানোর কথা আছে। বাজ-ওড়ানোর চলন ইংল্যান্ডে প্রথম আসে ৮৬০ খৃষ্টাব্দে এবং তখন থেকে ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংল্যান্ডের খুবই জনপ্রিয় স্পোর্টস ছিল। আর কোনও খেলাধুলো এর ধারে কাছে ঘেঁসতে পারত না। আইন করা হয়েছিল রাজা ওড়াবেন ঈগল, লর্ড বা তার সমকক্ষরা বহেরি ও বাজ, সাধারণ লোকেরা স্পারো হক (অ্যাক্সিপিটার নিসাস)। আর মেয়েদের জন্যে ছিল মার্লিন বা তুরুমতি (ফ্যালকো কোলামবারিয়াস)। আইন লঙ্ঘনে দণ্ড দেওয়া হত। মধ্য এশিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় স্বর্ণ ঈগল (অ্যাকুইলা ক্রাইসায়েটস) ওড়ানোর প্রচলন ছিল। ইতালির বেনিতো মুসোলিনি বাজ ও ঈগল ওড়াতেন। তাঁর পক্ষিশালায় অনেক জাতের বাজ ও ঈগল ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই রাজার খেলার চলন এক মধ্য এশিয়া এবং আমেরিকায় সীমাবদ্ধ হয়েছে। যতদূর জানি বর্তমানে উত্তর আমেরিকার টেক-সাসের লস ফ্রেসনসে 'ফকনারি ক্লাব অব আমেরিকা'র হেডকোয়ার্টার্স অবস্থিত। ওখান থেকে এক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, নাম 'ফকনারি—নোটস অ্যান্ড নিউজ।'
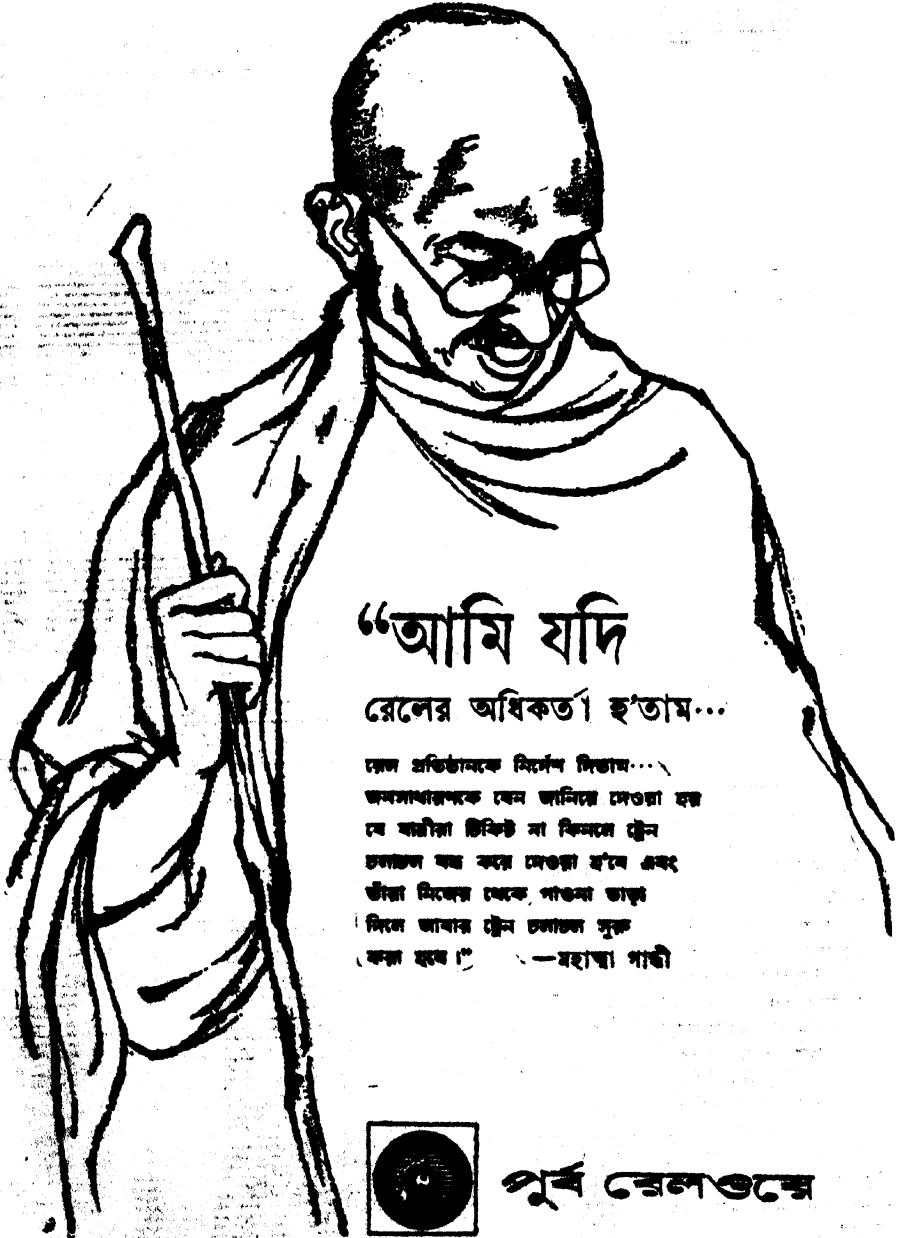
"আমি যদি
রেলের অধিকর্তা হ'তাম...
রেল প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতাম...
জনসাধারণকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়
যে যাত্রীরা টিকিট না কিনলে ট্রেন
চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হ'বে এবং
তাঁরা নিজের থেকে পাওনা ভাড়া
দিলে আবার ট্রেন চলাচল সুরু
করা হবে।"
—মহাত্মা গান্ধী
পূর্ব রেলওয়ে

# পঙ্কজ রায় একটি ইতিহাস

কমল ভট্টাচার্য

'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম'—পুরুষকার সাধনার মাধ্যমে নিজেকে অর্জন করতে হয়। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্র কর্ণের এই বাণী বোধহয় সবচেয়ে বেশী প্রতিফলিত হয়েছে পঙ্কজ রায়ের জীবনে। কেবলমাত্র সাধনার জোরে যাঁরা কৃতী হয়েছেন ক্রিকেটার পঙ্কজ রায় তাদেরই একজন।

কুমারটুলীর রায়বাড়িতে ক্রিকেট খেলার কিছু চর্চা ছিলো। বাড়ির সামনে কুমারটুলী পার্কের সবুজ মাঠটা রায়বাড়ির বারো বছরের কিশোর ছেলেটাকে অবিরত যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতো।

হাত ধরে কেউই খেলা শেখায়নি তাকে। বারো বছরের কিশোর পঙ্কজ নিজের তাগিদে প্রথম নাম লেখায় কুমারটুলী ক্লাবে। ধুতিপরা ফুটফুটে ছেলেটাকে রোজই দেখা যেতো কুমারটুলী পার্কে। রোদে পুড়ে জলে ভিজে প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের সঙ্গে খেলতো পঙ্কজ। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট তিনটি খেলাই খেলতো সে প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে। যে কোন খেলাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে নিজেকে সেই খেলায় কুশলী করে তুলতে চেষ্টার অন্ত ছিলো না তার। আন্তরিক নিষ্ঠা এবং নিরন্তর অভ্যাসের মধ্য দিয়ে প্রখ্যাতনামা খেলোয়াড়দের সমান ক্ষমতা লাভ করা যায়—বারো বছরের কিশোরের নিরন্তর চেষ্টার মধ্যে সেই বোধ যেন সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো।

১৯৩৯ সাল। খেলা মহামেডান স্পোর্টিং-র সঙ্গে। পঙ্কজও গিয়েছে থার্ড রিজার্ভ হিসেবে খেলতে। দাদা ঐ খেলায় ক্যাপ্টেন আর বুড়ো চক্রবর্তী আম্পায়ার। মনটা খুঁত খুঁত করছে ওর। ধুস্—থার্ড রিজার্ভ! —চোদ্দ নম্বর খেলোয়াড়? খেলার সুযোগ মিলবে কিনা সন্দেহ। অস্থির হয়ে উঠছিলো সে থেকে থেকে। হাতটা নিসপিস করছিলো। অবশেষে সুযোগ এলো হঠাৎ। ধুতি পরেই মাঠে নেমে পড়লো পঙ্কজ। ওর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন : প্রথম ম্যাচ খেলা, আর জীবনের এই প্রথম ম্যাচ খেলায় রান হলো দুই—নট-আউট।

রান যাই হোক না কেন, নট-আউট থেকে মুখ তো রাখা গেছে। কিন্তু ফিল্ডিং করতে গিয়েই গণ্ডোগোল। ফিল্ডিং করছিলো স্কোয়ার লেগে, একটু যেন

মাদ্রাজ টেস্ট মাঠে পঙ্কজ রায় এবং ভিনু মানকাদ : মাদ্রাজে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫৫—৫৬ সালের টেস্টে এই দু'জন প্রথম উইকেটের জুটিতে ৪১৩ রান সংগ্রহের সূত্রে প্রথম উইকেট জুটির যে বিশ্ব রেকর্ড রান করেছিলেন তা আজও অক্ষুন্ন আছে।

অন্যমনস্ক অসতর্ক ছিলো আর তারই ফাঁক দিয়ে বলটা ছুটে লাগালো একেবারে বাউণ্ডারীর বাইরে।

এজন্যে প্রচণ্ড বকুনি খেলো দাদার কাছে। চোখমুখ লজ্জায় লাল পঙ্কজের। জীবনের সেই প্রথম দিনটিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলো সে—খেলাটাই হলো জীবন। মুহূর্তের জন্যেও অন্যমনস্ক থেকে জীবনের খেলা এবং খেলায় জীবনকে বিপর্যস্ত হতে দেবে না কিছুতেই।

সত্যিই অসম্ভব স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছেলে পঙ্কজ রায়। উত্তরজীবনে কখনও সে ভুল করেনি খেলতে নেমে। কখনও অন্যমনস্ক হয়নি খেলার সময়।

ছোট্ট পঙ্কজ কুমারটুলী থেকে এলো 'সিটি টীমে'। শুরু হলো ওর সত্যিকারের ক্রিকেট খেলা। নিয়মিত খেলা শুরু হয় স্পোর্টিং ইউনিয়নে এসে। কল্পনাই করা যায় না একটা চোদ্দ বছরের কিশোর প্রথম শ্রেণীর একটা নামী ও দামী ক্লাবের সেকেণ্ড টীমে নিয়মিত খেলছে। বড়ো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ওর মনের মধ্যে তীব্র দীপশিখার মতো জ্বলছিলো। আর তার জন্যেই খেলাকে ধ্যান জ্ঞান করে নিয়মিত কঠোর অনুশীলন করে ঐ অতোটুকু বয়সেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছিলো।

প্রথমে পঙ্কজ ছিলো স্পোর্টিং ইউনিয়নের 'এ' ডিভিসনের ফুটবল খেলোয়াড়। 'নিয়মিত ক্রিকেটার' হওয়ার পিছনে একটা ঘটনা আছে।

সেবারে স্পোর্টিং ইউনিয়নের ফুটবল খেলা মহামেডানের সঙ্গে। ঐ ম্যাচে পঙ্কজ ছিলো ফরওয়ার্ডে। একবার সুযোগ পেয়েই বল ঢুকিয়ে দেয় মহামেডানের গোলের মধ্যে। গোলটা দিতেই মহামেডানের তাজ মহম্মদ অকারণে প্রচণ্ড ধাক্কা মারে পিছন থেকে। ঘুরে পড়ে যেতেই হাতের কনুই জখম হলো পঙ্কজের। এই জন্যে প্রায় তিন হপ্তার মতো খেলাধুলো সব বন্ধ রাখতে হয়। এই সময়েই পঙ্কজের অনুরাগী পরিচিত বন্ধুরা ওকে বারণ করে ফুটবল খেলতে। '—ক্রিকেট তো তুমি ভালোই খেলছো, ফুটবল ছেড়ে দিয়ে বরং এইদিকে মন দাও।' বন্ধুদের সানুরাগ আবেদন তার মনকে নাড়া দেয়। অবশ্য জখম হবার ভয়টাও কিছু কম ছিলো না। তখন থেকেই পুরোপুরি ক্রিকেটে সমর্পিতপ্রাণ।

ঘটনা ঘটেছিল বলেই বাংলা ক্রিকেটে এরকম এক রত্নের আবির্ভাব ঘটেছিল, ওয়ার্ল্ড রেকর্ড নিয়ে টেস্ট ম্যাচে যার বহু কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়।

ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের মতো কৃতিত্ব যার আছে তাকে কিন্তু চিরকাল লড়াই করতে হয়েছে ভাগ্যদেবতার সঙ্গে। জীবনের শুরুতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আসেনি তার। লড়াই করেই তাকে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়েছে কেউই তাকে সাহায্য করেনি এগিয়ে এসে। কেউই কখনও 'কোচ' করে ওকে খেলার মান বাড়ানোর জন্যে একমাত্র নীহার মিত্র ছাড়া। খুব ছো থেকেই নীহারদা ব্যাটিং বোলিং-এ যা এব সাহায্য করেছেন ওকে। নীহারদার প্রে অনেক সাহায্য করেছে ওকে বড়ো হত উনিই হাত ধরে ওকে নিয়ে এসেছিলে স্পোর্টিং ইউনিয়নে। যদি এব সুযোগ সুবিধা, আরও ভা কোচিং পেতো ছেলেটা, তাহলে আ অনেক অনেক বেশী সুনাম অর্জন কর পারতো সে। কিন্তু তা হয়নি। যতটু হয়েছে সবই তার নিজের সাধনার ফল।

পঙ্কজের সাধনা যেন একলব্যের মতো গুরু নেই। অথচ শিখবার আছে অদ বাসনা। তাই মনে মনে গুরু হিসেবে ব করে নিয়েছিল বরণীয় ক্রিকেটিয়ার বি মার্চেণ্টকে। মার্চেণ্টের খেলা, ত ব্যাটিং-র কলাকৌশল, বল আয়ত্ত কর অনায়াস স্বাচ্ছন্দ ভঙ্গী দিনের পর দিন ল করেছে গভীর আগ্রহ এবং শ্রদ্ধার সং এবং নিজে নিজে তা' রপ্ত করার চে করেছে। শুধু মাত্র খেলা দেখে খে শেখার চেষ্টা সত্যিই একেবারে অভাবনী সত্যই প্রশংসনীয়, আর পঙ্কজ নিঃসন্দে সত্যিই মহাভারতের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যে সার্থক শিষ্য একলব্যের জীবন্ত উদাহরণ।

খেলার মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে পনের বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে ক কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলা শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়-এর হয়ে প্রথম খেলা খে ছিলো আলিগড়ে। সে খেলায় পঙ্কজ যথে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

১৯৪৬ সালে উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে প্র রণজি ট্রফিতে খেলে পঙ্কজ। প্র খেলাতেই একশ'র উপর রাণ তুলে রণ ট্রফির ইতিহাসে রীতিমতো রেকর্ড—এ নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি। আজও পর্য বাংলা দলের কেউ রণজি ট্রফির খেলা পঙ্কজ রায়ের রেকর্ড (সর্বমোট রানের ভাঙতে পারে নি, ভবিষ্যতে কেউ ভাঙতে পারবে কিনা সন্দেহ।

রনজি ট্রফিতে ইতিহাস সৃষ্টি করা পিছনে আর একটা ইতিহাস আছে।

তখন স্পোর্টিং ইউনিয়নের পঙ্ক রায়ের নামডাক একটু একটু হতে শু করেছে। উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে রনা খেলার আমি ছিলাম বাংলা দলে অধিনায়ক। সিলেকশন কমিটির মি হচ্ছে কলকাতায়। মিটিংয়ে দশজ খেলোয়াড়ের নাম ঠিক হয়ে গেছে। কিন্ত মুশকিল বাঁধলো শেষজনকে ঠিক কর গিয়ে। আমাদের সামনে দুটো না আছে—পঙ্কজের আর বাবলুর (এ কে দাস) কমিটি ক্যাপ্টেন ছিলাম বলে আমার উপর ভার পড়লো এই দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার। মনস্থির করতে পারলু না হঠাৎ। সত্যি বলতে কি আমি কিন্তু তখন দুজনের কারও খেলা তেমন দেখিনি তবুও আমি শেষ মুহূর্তে পঙ্কজকেই দলে

নিলাম। কেননা, আমি ভেবেছিলাম ছেলেটা হাজার হোক ফুটবল তো খেলে, এর কাছ থেকে ব্যাটিং বোলিং যদি নাও পাই, ফিল্ডিংটা তো পাবো। আমার আশা কিন্তু ব্যর্থ হয়নি। পঙ্কজ দলের মান বাড়াতে পেরেছিলো সেদিন।

খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে ওকে নিয়ে আমার চিন্তা কম ছিলো না। যদিও 'ওপেনার' হিসেবে ওকে নামানোর কথা ছিলো তবুও আমি ভরসা পাচ্ছিলাম না। নতুন ছেলে, কি জানি ভয়ে বা অনভিজ্ঞতায় বেসামাল কিছু যদি করে ফেলে। কিন্তু পঙ্কজের সঙ্গে আলাপ করে আমার সমস্ত দ্বিধা কেটে গিয়েছিলো। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, প্রচণ্ড সাহস দেখেছিলাম ছেলেটার মধ্যে। আমার অভিজ্ঞতা যেন আমার এই আশ্বাসই দিয়েছিল যে এই মনোভাবের ছেলেরা কখনই ব্যর্থ হয় না। সত্যিই তাই জীবনের প্রথম রণজি খেলায় ব্যর্থ হয়নি পঙ্কজ।

শুধু আত্মবিশ্বাস বা সাহস নয়, তার মধ্যে দেখেছিলাম অসামান্য কষ্টসহিষ্ণুতা। খেলার জন্যে এতো কষ্ট স্বীকার কম খেলোয়াড়ের মধ্যে দেখা যায়।

ক্রিকেটকে আয়ত্ত করার জন্যে খুব ছোট বেলা থেকেই সে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতো। একথা সবাই জানে পঙ্কজ রীতিমতো সবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। কায়িক পরিশ্রম কখনই তাদের করতে হয়নি, তবুও অনুশীলনের জন্যে যে পরিশ্রম তার সামনে কখনও সে মাথা নোয়ায় নি।

রোজ খুব ভোরবেলায় গাড়ী নিয়ে সে চলে যেতো ময়দানে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা দৌড়ুতো সেখানে। তারপর ফিরে এসে বাড়ীতে কিছুক্ষণ 'স্যাণ্ডো' করতো। ব্যাট করতো রোজ দুপুরবেলা এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত। এই অনুশীলনে কোনদিনই ব্যতিক্রম দেখা যায়নি তার জীবনে।

কষ্টস্বীকারের কথাপ্রসঙ্গে পঙ্কজ পুণা ট্রায়াল ক্যাম্পের কথা প্রায়ই বলতো। কি অমানুষিক কষ্টস্বীকার করতে হয়েছে ঐ ক্যাম্পে।

এম-সি-সি'র বিরুদ্ধে ভারতীয় দলকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার জন্যে এই ট্রায়াল ক্যাম্প। বাংলা থেকে পাঁচজন যোগ দিয়েছিলো—পঙ্কজ, খোকন সেন, পুটুদা, প্রেমাংশু আর মণ্টু ব্যানার্জি।

সকালে উঠে পুণার রাস্তায় দৌড়ুতে হতো সবাইকে। তিন মাইলেরও বেশী। দৌড় শেষ হ'লে শুরু হতো দৈহিক ট্রেণিং বা শারীরিক ব্যায়াম। এ স্কুলের ড্রিলমাস্টারের 'পি-টি' নয়, সেনাবাহিনীতে যে কঠোর পদ্ধতি ট্রেণিং দেওয়া হয় তারই কারবন কপি আর কি। ভারী ভারী বস্তা নিয়ে দৌড়ুতে হতো এক এক সময়। তার মেয়াদ প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারপর প্রাতঃরাশের ছুটি। সকাল নটা বাজলেই আবার মাঠে—এবার ফিল্ডিং-র অনুশীলন। বারোটা অবধি কেবলমাত্র এই অনুশীলনই চলতো।

এরপরে মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। তিনটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে হাজির হতে হতো মাঠে। তিনটে থেকে ছটা পর্যন্ত চলতো ব্যাটিং আর বোলিং-র প্র্যাকটিশ। এই সময়ে প্রত্যেককে পনের মিনিট করে ব্যাট করতে হতো আর বল করতে হতো তিনজন করে ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

আপশোস হয়, আজকের দিনে এই প্রচেষ্টা কই। অথচ তখন দলকে শক্তিশালী করার জন্যে হাজারে, মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলীর মতো শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারও কি হাড়-ভাঙা খাটুনিই না খেটেছেন।

পঙ্কজের মনে কিন্তু দারুণ একটা ক্ষোভ আছে।

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে পঙ্কজ আর মানকড় মিলিয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলো কোন্‌টা সে সম্বন্ধেই। আস্তে আস্তে রান তুলছিলো ওরা। দেখেশুনে হিসেব করে বল মারছিলো দুজন। সেঞ্চুরী অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। পঙ্কজের মনে তখন দারুণ আশা সে ডাবল সেঞ্চুরী করবে। উইকেট ওদের পক্ষেই আছে, আর একটা সেঞ্চুরী করা এমনকি আর শক্ত

কাজ। কিন্তু ভাগ্য চিরকাল ওর বিরোধিতা করেছে। একবার টেস্টের খেলায় রান যখন তখন দলের ক্যাপ্টেন উমরিগড়ের কাছ থেকে একটা চিরকুট এলো ওদের কাছে—'হিট একরস বল।' দলের শৃংখলা রাখতে গেলে অধিনায়কের নির্দেশ মানতেই হয়, আর সেই মানাটাই কাল হ'লো। ১৭২ রানের মাথায় লং অফে ক্যাচ দিয়ে ফিরে এলো পংকজ। মানকড় কিন্তু অগ্রাহ্য করেছিলেন উমরিগড়ের নির্দেশ। উনি ঐ খেলায় 'ডাবল সেঞ্চুরী' করলেন। আর উমরিগড়? পংকজের ঠিক পরে নেমে আশী মিনিট উইকেটে থেকে রান তুললেন মাত্র দশ। তাহ'লে ডাবল সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব থেকে পংকজকে বঞ্চিত করলো কে? ভাগ্যদেবতা না অন্য কেউ?

আগেই বলেছি খেলার ব্যাপারে কেউই তাকে সাহায্য করেনি বরং বঞ্চনাই করেছে, তার প্রাপ্যটুকুও দেয়নি। নইলে ভারতীয় দল থেকে তাকে যখন বাদ দেওয়া হয়, তখন তার জৌলুষ মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো। ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, পর পর কয়েকটি সেঞ্চুরী, মঞ্জরেকার উমরিগড়ের সংগে তুলনামূলকভাবে ভালো ব্যাটিং এ্যাভারেজ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ ওপেনারকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো ভারতীয় দল থেকে। পংকজ অক্ষম হয়ে পড়েনি, স্তিমিত হয়ে আসেনি ওর ক্রীড়ানৈপুণ্য, দলের অনেকের তুলনায় তখনও যে দক্ষ ও কুশলী তাকে বাদ দেওয়ার কারণ কি। সত্যি বলতে কি এ জিনিষটা আজও বাংলাদেশের ক্রীড়া-রসিকদের মনে রহস্যই হয়ে আছে।

ইদানীং চোখে কম দেখতে শুরু করেছিলো পংকজ। চশমা নিতে ভয়, কি জানি যদি বল এসে চোখে লাগে তবে চোখটা তো চিরদিনের মতো যাবে। এই ভয়েই বিনা-চশমায় খেলতো সে প্রথম প্রথম। ওর এক বন্ধু ছিলো চোখের ডাক্তার। চক্ষু-চিকিৎসক বন্ধুই সাহস দিতে চশমা নেয়। পাওয়ার মাইনাস এক।

চশমা নেওয়ার আগে ও পরে চোখ সম্বন্ধে নানা কথা শুনে পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। ঘুরেফিরে বারবার একই কথা কানের কাছে বাজতে থাকলে শুধু বিরক্তিই নয়—নার্ভও কমজোরী হতে বাধ্য আর তখনই ভয় আতঙ্ক মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধার সুযোগও করে নেয়। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা রাতদিনই বলতে থাকে—এবার তোমার খেলা ছেড়ে দিতে হবে, চশমা নিয়ে ক্রিকেট খেলা যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। তবু পংকজ ভয় পায়নি, নার্ভ শক্ত করে রাখার দরুণ পংকজ এগুলো অতি সহজেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলো। জীবনে একবারই কেবল মুষড়ে পড়েছিলো, যখন নিউজিল্যান্ডের সংগে খেলার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ-এ তাকে বাদ দেওয়া হলো। দৃষ্টিশক্তিতে যে সামান্য ত্রুটি ছিলো সেটা পূরণ হতেই চৌকশ হয়ে ওঠে পংকজ।

পংকজের সবচেয়ে বড়ো গুণ উচ্চাশা আত্মবিশ্বাস আর সাহস।

তার উচ্চাশা ছিলো আকাশছোঁয়া। আর এটা থাকা দরকার। নইলে কেউই বড়ো হতে পারে না। পংকজ আমায় প্রায়ই বলতো—'কমলদা, আমি ষাট, সত্তর, আশী, নব্বুই করলে একটুও তৃপ্তি পাই না। যতক্ষণ না সেঞ্চুরী করছি ততক্ষণ আত্ম-তৃপ্তি আসে না। এটা কিন্তু তার জীবনে বহুবার আমি দেখেছি। অল্প রান করে মাঠ থেকে বিদায় নিলে তাকে কেমন ম্লান হয়ে যেতে দেখেছি বহুবার।

পংকজের আত্মবিশ্বাস আর সাহস প্রশংসনীয়। বাঘা বোলারের বলের সামনে অনেক ব্যাটসম্যানই সাহস হারিয়ে ফেলেন। শূন্য, দুই এক রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসেন তাঁরা দৃঢ় মনোবলের অভাবে। এ ব্যাপারে পংকজ ছিলো ঠিক উল্টো। কুশলতার জোরে অনেক বোলার তাকে প্রথম দর্শনে পরাস্ত করতে পেরেছে বটে, কিন্তু আপাত হার স্বীকার করলেও তার মনোবলে ঘুন ধরেনি। সাহস হারায়নি। বরং পরে ঐ বোলারের বোলিং পদ্ধতি, বল দেওয়ার কায়দাকানুন অত্যন্ত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখে আবিষ্কার করেছে বোলারের দুর্বলতা। আর তারই সুযোগ নিয়ে তার পরের খেলাগুলোতে কাবু করে দিয়েছে, সেই বোলারকে। যে সব খেলায় গোড়ার দিকে পংকজ সুবিধে করে উঠতে পারেনি, শেষের-দিকে সেই সব খেলায় যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে। একাধিকবার তার প্রমাণ সে রেখেছে অকাতরে। অসাধ্য সাধন করতে গেলে চাই ধৈর্য, আর পংকজ ছিলো অসীম ধৈর্যশালী খেলোয়াড়। এই সমস্ত গুণটা ছিলো স্যর লিওনার্ড হাটনের যাঁহার খেলার কলাকৌশল ব্যক্তিগতভাবে পংকজ রায়কে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে।

একটা কথা প্রায়ই বলতো—'কোন বল শরীরে প্রচণ্ড আঘাত করলে বোলারকে আমি বুঝতে দিতে চাই না যে আমার লেগেছে। আমি কখনই আহত জায়গায় হাত দিতুম না। আমি জানি বোলার যদি একবার বুঝতে পারে তার বলে ব্যাটসম্যান কাবু হয়ে পড়েছে, তবে তার আত্মবিশ্বাস বার বেড়ে। উল্টোটা হলে তেমনি হারিয়ে ফেলে বোলাররা। আর ঠি[ক সেই] জন্যেই আমি বুঝিয়ে দিতে চাইতুম বোলার, তোমার বলে আমার [কিছু] হবে না।'

পংকজের এ কথাটা অত্যন্ত [সত্যি।] উইকেটে দাঁড়িয়ে ব্যাটসম্যানের সবচে[য়ে বড়] কর্তব্য হলো নিজের আত্মবিশ্বাস [ও] মনোবলকে অটুট রাখা।

পংকজের অভিমত হলো [এ দেশের] ব্যাটসম্যানদের এই দুটি গুণকে আ[রো ভালো]ভাবে আয়ত্ত করা দরকার। কেন না, [এখানে] তেমন ফাস্ট বোলার নেই। ওয়েস্ট [ইন্ডিজ] অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় এখানকার বোলারদের বলে স্পীড অনেক কম। বেশী স্পীডের জন্যে ব্যাটসম্যানরা যেমন হয়, তেমনি হার স্বীকার কর[ে] সহজে। সেজন্য আত্মবিশ্বাস-এ[র] থেকে সাহসী মনোভাবকে পুঁজি ক[রে] থাকলে অনেক বেশী লাভবান ব্যাটসম্যানেরা।

পংকজ আজ সারা ভারতবর্ষের [গর্ব।] বিদেশের সংগে খেলায় বহুবার [বহু রানের] সংগে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছে [এই] দিক থেকে আমরা সবচেয়ে বেশী [গর্বিত] কেননা, সে আমাদের বাংলাদেশের [ছেলে।] বাংলা ক্রিকেটকে উন্নতির শিখরে [তোলায়] তার অবদান কোনদিনও ভুলবার [নয়।] খেলার প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা, [এই] গুলোকে সার্থকভাবে রূপায়িত করা[র] যে ভূমিকা তা' আজকের কোন ক্রীড়া-রসিক ভুলতে পারেন না।

বাংলা ক্রিকেটের এই জ্যোতিষ্কের [আ]নন্দময় ব্যবহার, অসীম ধৈর্য, যে [কোন] পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে [নেবার] ক্ষমতাকে আজকের তরুণদের নিশ্চ[য়ই গ্রহণ] করা উচিত। বিসর্জন দেওয়া উ[চিত] যেমন বিসর্জন দিয়েছিলো তার মনের ভাবকে। সম্মান করা উচিত সে করতো প্রবীণদের। তবেই তো তার জনপ্রিয় হয়ে উঠবে সবাই। আর একথ[া] স্বীকার্য, জনপ্রিয়তা খেলার মান বা[ড়ানোর] পক্ষে যথেষ্ট প্রয়োজন। ওটা টনিকের কাজ করে।

সাধনার জোরে পংকজ রায় ক্রিকেটে স্থান পেয়েছেন। তার জীবন বড়ো হওয়ায় যে গুণ আমরা পে[য়ে]ছি তা হলো প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, আন্তরি[কতা,] অসীম সাহস, অপার উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বীয় সাধনায় ও লক্ষ্যে পৌঁছবার অতন্দ্র অনুরক্তি, নিরলস প্রচেষ্টা, অপরসীম কষ্টসহিষ্ণুতা। এই সং[গুণ] গুলিই উত্তরণ ঘটিয়েছে পংকজ [রায়ের] কুমারটুলী পার্ক থেকে হাজির ক[রেছে] বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে অবিস্মরণীয় অ[ভিজ্ঞতায়] মণ্ডিত করে।

# হিরো

দিলীপ দত্ত

আর্থার মেইলী ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ন্যাটা স্পিন বোলার। তখন তিনি ক্রিকেট জীবনের প্রারম্ভে। এই সময় বিশ্ববিখ্যাত ভিকটর ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেলেন। ট্রাম্পার তখন বিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান, তাছাড়া তিনি মেইলীর 'হিরো'। ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে বল করার সুযোগ মেইলীর কাছে হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতন।

মেইলী এই অভাবিত সৌভাগ্যের কথা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। ভাবতে লাগলেন, এ কখনই হতে পারে না, খেলার দিনের আগে হয়ত যুদ্ধ লেগে যাবে, হয়ত ভূমিকম্প হবে, কত লক্ষ ঘটনা ঘটতে পারে কে জানে।

দেওয়ালে ট্রাম্পারের একটি ছবি টাঙানো ছিল। মেইলী বিছানায় শুয়ে সেই দিকে চেয়ে ছিলেন। বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, এই বিশ্ববিখ্যাত ব্যাটসম্যানটি তাঁরই সামনে উইকেটে এসে আম্পায়ারের কাছে গার্ড নেবেন 'টু লেগস প্লিজ, আম্পায়ার।'

এই খেলার ব্যাপারটি মেইলীর বাড়ীতেও সাড়া জাগিয়েছিল। মেইলীর বাবা বললেন, 'শনিবার ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলছ, যদি তোমায় বল করতে দেয় তাহলে মরেছ।'

মা বললেন, 'ওরকম কেন বলছ, কি হবে কেউ কি বলতে পারে।'

মেইলী কিছুই বলেননি। খেলার মাঠে কি হবে সে কথা তাঁর চিন্তার বাইরে। তিনি কেবল ভাবছেন, যদি ট্রাম্পারের কিছু হয়, যদি তিনি সেই ম্যাচে খেলতে না পারেন।

মেইলী তখনও পর্যন্ত ট্রাম্পারের খেলা দেখেননি। মাঝে মাঝে সিডনি ক্রিকেট ক্লাবের প্যাভিলিয়নের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর 'হিরো'কে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। একবার ট্রামে ট্রাম্পারের পাশে বসে কিছুটা রাস্তা গিয়েছিলেন, আরও কিছুটা যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু পকেটে টিকিট কাটার পয়সা ছিল না। কন্ডাক্টর যদি কান ধরে নামিয়ে দেয়, তাই তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে হয়েছিল।

মেইলী লিখেছেন যে, তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি কোনদিন ট্রাম্পারের সঙ্গে কথা বলবেন, খেলার কথা ত ছেড়েই দিন। 'তাই ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলায় দলে নির্বাচিত হবার পর থেকে খেলার দিন পর্যন্ত আমি আধপাগল হয়ে গিয়েছিলাম।'

তাঁর প্রথম টেস্ট ম্যাচ পর্যন্ত মেইলী নিজেই খেলার প্যান্ট এবং সার্ট ইস্ত্রি করতেন। কিন্তু সেই খেলার আগের দিন তিনি যে কতবার জামা প্যান্ট ইস্ত্রি করেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। খেলার দিন এল। সকালে ঘুম ভেঙেই তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে দেখলেন বৃষ্টি পড়ছে কিনা। না, বেশ সুন্দর সকাল, রোদ উঠেছে। কিন্তু কে জানে খেলা আরম্ভ হবার আগে হয়ত বৃষ্টি এসে যাবে, ট্রাম্পারের হয়ত অসুখ করে যাবে, কিংবা যদি কোন এ্যাকসিডেণ্ট হয়, ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লাগে যদি সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা মচকে যায়।

মেইলীর চিন্তায় বাধা পড়ল দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ায়। দুধওয়ালা দুধ দিতে এসেছে। 'মরুকগে, দুধ ফেলে দিক, আমি এখন আর এ জগতে নেই, আমি ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলছি, দুধ তুমি দাও আর না দাও আমার বয়ে গেছে।' মেইলী ঘড়ির দিকে তাকালেন। ঘড়িটা স্লো নেইত, বন্ধ হয়ে যায়নি।... ভাবতে লাগলেন, হয়ত তিনি ট্রাম্পারকে বল করতেই পারবেন না, তার আগেই যদি আউট হয়ে যান। কিংবা যদি তাকে বলই করতে দেওয়া না হয় 'আমি ত আর ক্যাপটেনের কাছ থেকে বল চেয়ে নিয়ে বল করতে আরম্ভ করে দিতে পারি না।' আচ্ছা ট্রাম্পার এখন কি করছে, তিনি কি জানেন আমি আজ খেলছি, দূর আমার কথা জানেনই না উনি। উনি বোধ হয় এখন প্রাতঃরাশ শেষ করছেন... উঃ সকালটা কি বড়, শেষ হতে আর চায় না। যাই বাগানটা কুপিয়ে দুটো গাছ পুঁতে আসি... আসি... না না ক্লান্ত হয়ে পড়ব, বরঞ্চ একটু শুয়ে বিশ্রাম নিই... না না যদি ঘুমিয়ে পড়ি...দূর ছাই।'

মেইলী অশ্রান্তভাবে সকালটা কাটালেন। তারপর ঠিক সময়ে মাঠে পৌঁছলেন। অধিনায়ক হ্যারি গড্ডার্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি এসেছেন?'

'কে উনি' গড্ডার্ড বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন। মেইলীর ইচ্ছে হয়েছিল বলেন যে,
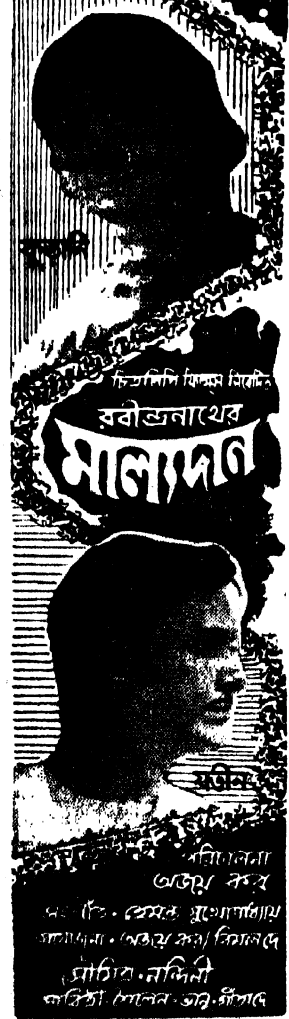
জুলিয়াস সীজার আবার কে, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেলেন।

ভিকটর ট্রাম্পারের দল টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ট্রাম্পার ব্যাট করতে নামতেই অধিনায়ক গডার্ড মেইলীকে বললেন, 'তোমাকে এখন বল করতে দেব না, তাহলে তোমার বলে এমন মার মারবে, যাতে তুমি প্রেড ক্রিকেটে খেলার সুযোগই পাবে না।'

মেইলী মনে মনে ভাবলেন কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু ভয়ের জন্যে ট্রাম্পারকে বল করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। জয় চাই না, কিন্তু নায়কের সঙ্গে একই মঞ্চে অভিনয়ের সুযোগ হারাব।'

কিন্তু গডার্ড তার মত পরিবর্তন করলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই মেইলীকে বল করতে দিলেন।

মেইলীর প্রথম বলটা কি হয়েছিল তা তাঁর মনে নেই। তখন তাঁর মাথা ঘুরছিল, সব কিছু যেন ঝাপসা, হঠাৎ প্রচণ্ড হাত-তালিতে তাঁর ঘোর কাটল। হয়ত বলটাতে ওভার বাউণ্ডারী হয়েছিল।

দ্বিতীয় বলটি মনে আছে। সেটা ছিল লেগ ব্রেক। তাঁর হাত থেকে বেরোবার পর থেকে লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে নিখুঁত লেংথের দিকে এগিয়ে গেল। প্রচণ্ড স্পিন থাকার দরুন বলটি বাতাসে অফস্টাম্প থেকে মিডল ও লেগস্টাম্পের দিকে ঘুরে গেল। অন্য কোন ব্যাটসম্যান হলে মেইলী আর ফিরেও তাকাতেন না স্টাম্পে লাগার আওয়াজ শোনার জন্যে অপেক্ষা করতেন, কিন্তু 'হিরোর' প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ট্রাম্পার ধীরচিত্তে বলটিকে দেখে নিলেন, তারপর বাঁ পা বাড়ালেন বলটি যেখানে মাটিতে পড়ছে তার কাছে, ব্যাট উঠল কাঁধের পিছনে। বিদ্যুতের মত নেমে এল, বল মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটে-বলে সংযোগ হল, তারপর শুধু একটি শব্দ কানে এল, বলটি বাউণ্ডারী লাইনের বেড়ায় লাগার আওয়াজ।

'এত সুন্দর সট আমি আর দেখিনি' মেইলী মন্তব্য করেছিলেন।

মাঠের মধ্যে শুধু একজন এই সটটির গতিপথ লক্ষ্য করেননি, তিনি হলেন ভিকটর ট্রাম্পার। সটটি মারার পরই তিনি পেছন ফিরে হেঁট হয়ে ব্যাট দিয়ে পীচ ঠুকতে লাগলেন। তিনি জানতেন বলটি কোথায় যাবে।

মেইলীর মনে পড়ল, ট্রাম্পার বাসান-কোয়েটের গুগলী বলে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। মেইলীর ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। পরের বলটি দিলেন গুগলী। লেগব্রেকের মত বাতাসে ঘুরে যাওয়া এবং মাটিতে পড়ার পর গতি পরিবর্তন করার পক্ষে বলটিতে স্পিন ছিল যথে... কেবল ছিল একটু বেশী টপস্পিন। আগের অন্য বলের চেয়ে আগে এবং ... বলের বাটিতে এক গতিতে অন্য কোন যেখানে মাটিতে পড়ে টপস্পিন থা... পড়বে অন্তত তার চেয়ে আঠারো ... আগে।

ট্রাম্পার বলটি ঠিক বুঝতে পারেন... আগেকার মতই ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এ... ছিলেন, কিন্তু বলটি তাঁর আন্দাজ যে জায়গায় পড়া উচিত ছিল সে জায়... না পড়ায় তাঁর বাঁ পাটি রইল বলের ফুট দূরে।

ট্রাম্পার ভুল বুঝতে পেরে সা... নেবার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটটি জো... জোরে চালিয়ে কিন্তু ব্যাটে-বলে সং... হয়নি। অল্পের জন্য লেগস্টাম্প স্পর্শ... করে বলটি চলে গেল। সঙ্গে স... উইকেটরক্ষক স্টাম্প করলেন। ট্রা... তখন ক্রিজ থেকে দু গজ দূরে। ... ক্রিজে ফিরে আসার কোন চে... করেননি। সেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

ট্রাম্পার উইকেট ছেড়ে যাবার ... মেইলীর দিকে চেয়ে বললেন, 'খুব ... বল আমার পক্ষে খেলা সম্ভব নয়।'

আর মেইলীর মনে জয়ের উল্লাস ... মনে হল তিনি যেন খুব প্রিয় জিনি... নিজের হাতেই ভেঙে ফেলেছেন।

# রাশিয়ায় দাবা খেলা

## যুগ পরিবর্তনের প্রতীক্ষা

গজানন্দ বোড়ে

রাশিয়ানদের দাবা খেলায় দক্ষতা কি কমছে? ১৯৭০ সালের দুটি শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা—(ক) রাশিয়া বনাম অবশিষ্ট বিশ্বদল এবং (খ) ঊনবিংশ দাবা অলিম্পিয়াডের ফলাফলের ভিত্তিতে এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। দাবার হাওয়া কি আবার পূব থেকে পশ্চিমে বইতে শুরু করেছে? অন্তত বলা যায়, যে সন্দেহ আজ আমাদের মনকে দোলায়িত করছে, সেই সন্দেহ আজ রাশিয়ার প্রত্যেক গ্র্যান্ডমাস্টারকেই ভাবিয়ে তুলেছে।

যেমন, কয়েক বছর ধরেই রাশিয়ার পত্র-পত্রিকায় এই নিয়ে সোরগোল হচ্ছে যে, বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বোরিস স্পাসকিই গত চোদ্দ-পনেরো বছর ধরে তাদের কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে আছেন। অর্থাৎ কিনা বর্তমানে রাশিয়ায় স্পাসকির চেয়ে কম বয়সের গ্র্যান্ডমাস্টার আর কেউ নেই। এই সংবাদ যদি সত্য হয়—চাঞ্চল্যকর সন্দেহ নেই। কারণ এত দিনে বোধহয় রাশিয়ায় নতুন দাবা-প্রতিভার ঘাটতি পড়তে শুরু করেছে। ওদেশের দাবার জগতে 'জেনারেশন গ্যাপ' আর বোধহয় ঘোচান গেল না।

### রাশিয়া বনাম অবশিষ্ট বিশ্বদল

এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ৭০ সালের পূর্বোক্ত দুটি প্রতিযোগিতা নিয়ে কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করব। সকলেই জানেন, এ বছর ২৯শে মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বেলগ্রেডে এক তুলনাহীন দাবার আসর বসেছিল। এক পক্ষে ছিল সোভিয়েত রাশিয়া এবং অন্য দিকে বাছাই-করা খেলোয়াড় নিয়ে অবশিষ্ট বিশ্বদল। 'শতাব্দীর সেরা ম্যাচ' হিসেবে চিহ্নিত এই প্রতিযোগিতায় প্রতি পক্ষে দশজন করে খেলোয়াড় দশটি বোর্ডে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিটি বোর্ডে মোট ৪টি করে গেম খেলা হয়। পৃথিবীর সেরা-সেরা গ্র্যান্ডমাস্টাররা — দু-তিনজনকে বাদ দিলে—সোভিয়েত রাশিয়াতেই রয়ে গেছেন, একথা মনে রাখলে ভাবতে অবাক লাগে যে, এই খেলায় সোভিয়েত রাশিয়ান দল মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে জয়লাভ করেছে। [দাবা খেলায় প্রতি জয়ের জন্যে ১, ড্র'র জন্যে ½ এবং পরাজয়ের জন্যে ০ ধরা হয়।] মোট ৪০ পয়েন্টের মধ্যে রাশিয়ার সংগ্রহ ২০½ পয়েন্ট, অবশিষ্ট দলের ১৯½। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ান দলের জয়লাভ মাত্র ½ পয়েন্টের জন্যে, কারণ তারা আর ½ পয়েন্ট কম পেলেই খেলার ফলাফল হত অমীমাংসিত। দাবার জগতে বর্তমান কালের প্রায় সবকটি শ্রেষ্ঠ নামই রাশিয়ান পক্ষ সমর্থন করেছে, পক্ষান্তরে অবশিষ্ট দলের ববি ফিশার এবং বেন্ট লারসেনকে বাদ দিলে আর কেউই এখন সেরকম জগৎজোড়া খ্যাতির অধিকারী নন।

তাছাড়া, প্রথম ৪টি বোর্ডের ফলাফল দেখুন। এই চারটি বোর্ডে বর্তমান রাশিয়ার প্রথম ৪ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছেন [মাত্র ১টি গেমে স্পাসকির জায়গায় খেলেন লিওনিদ স্তীন]। এই ৪টি বোর্ডের ফলাফলে রাশিয়া হেরেছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে, পরিষ্কার ৫ পয়েন্টের ব্যবধানে। রাশিয়ার পক্ষে স্পাসকি (স্তীন), পেত্রোসিয়াম, কর্চনয় এবং পোলুগায়েভস্কী অর্জন করেছেন মাত্র ৫½ পয়েন্ট, অপর দিকে বিশ্বদলের পক্ষে লারসেন, ফিশার,

আনাতোলি কারপভ

য়ুরী বালাশভ

পোরটিশ এবং হোর্ট সংগ্রহ করেছেন ১০½ পয়েন্ট। একমাত্র ১০ম বোর্ডের ৩-১ ফলাফলেই রাশিয়া খেলাটিকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যেতে পেরেছে। এই বোর্ডে রাশিয়ানদের পক্ষে খেলেছেন সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় পল কেরেস, যিনি অত্যন্ত সম্প্রতি দাবা খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর বিপক্ষে খেলেছিলেন একজন খ্যাতিহীন গ্র্যান্ডমাস্টার—বোরিস্লাভ ইভকভ। শেষ বোর্ডের খেলা ২-২ পয়েন্টে অমীমাংসিত থাকলেই রাশিয়ার পরাজয় ঘটে যেত।

রাশিয়ার বিপক্ষে সারা পৃথিবী একত্রিত হয়ে খেলেছে, এই যুক্তি দিয়ে রাশিয়ার আপেক্ষিক অসাফল্যের সাফাই গাওয়া যায় না। অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়া দাবা খেলায় কতবেশী অগ্রসর—এটা যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে এই 'সম্মিলিত বিশ্বদল' যুক্তি অসার। ব্যক্তিগতভাবে অনেক খেলোয়াড় এবং দেশ হিসেবে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি দাবার চর্চায় অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, এটা গত কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করেছি। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা গেল 'শতাব্দীর সেরা ম্যাচে' রাশিয়া সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে নি। এর একমাত্র কারণ রাশিয়ায় সত্যিকারের তরুণ প্রতিভার অভাব। আমরা জানি, বর্তমান রাশিয়ায় ৪০ লক্ষেরও বেশী রেজিস্টার্ড দাবা খেলোয়াড় প্রতিনিয়ত এই খেলার নিবিড় অনুশীলন করে চলেছেন। রাশিয়ান খেলোয়াড়রা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ পান, যে সুযোগ অন্য দেশে নেই।

রাশিয়ান দলে একজনও তরুণ খেলোয়াড় ছিলেন না। দল গঠনের জন্যে ডাক দিতে হয়েছিল—স্পাসকিকে বাদ দিলে—আরো চারজন প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং কয়েকজন 'ভেটারেন'কে যাঁরা প্রত্যেকেই বয়সের ভারে আক্রান্ত। এদের মধ্যে দুজন—বতভিনিক এবং পল কেরেস তো দাবার জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এই সঙ্গে যদি মনে রাখি যে, রাশিয়ার খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতা সুরু হবার এক মাস আগে থেকে সম্মিলিত অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছিলেন, এই সুযোগ স্বাভাবিক কারণেই অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়দের ছিল না। এবং অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়রা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লড়াই সুরু হবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এসে তাড়াহুড়ি করে রণক্ষেত্রে নেমেছিলেন, এ সংবাদ জানার পর রাশিয়ার কৃতিত্ব আরো কিছুটা ম্লান হয়ে যায়।

রাশিয়ার জয়লাভকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাইছি যে, দাবার জগতের চারপাশে সোভিয়েত রাশিয়া একাধিপত্যের যে প্রাচীর গড়ে তুলেছিল গত ২০।৩০ বছর ধরে, সে প্রাচীরে কিছু কিছু ফাটল দেখা দিতে সুরু করেছে। এবং এই প্রাচীর ভেঙ্গে যেতে পারে যদি না নতুন প্রতিভার সিমেন্ট ঢেলে একে মজবুত করা হয়।

### ঊনবিংশ দাবা অলিম্পিয়াড্

ঊনবিংশ দাবা অলিম্পিয়াডের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শতাব্দীর সেরা ম্যাচে রাশিয়ার আপেক্ষিক অসাফল্য কোন আকস্মিক বিপর্যয়মাত্র নয়। প্রতি দু বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, যা দাবা অলিম্পিক নামে খ্যাত। চারজন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হয় এক একটি দেশের টীম। ১৯৫২ সালে দাবা অলিম্পিকে প্রথম অংশ গ্রহণ করার সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক বারই (অর্থাৎ মোট ১০ বার) রাশিয়া দাবা অলিম্পিকে শীর্ষস্থান অধিকার করে আসছে। ১৯৭০ সালের স্যাইজেন (পশ্চিম জার্মানী) অলিম্পিকেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই ১০ বারের প্রতিযোগিতায় ফাইন্যালে রাশিয়া বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ১০০ বারের বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর মধ্যে তারা মাত্র ২ বার দুটি দেশের কাছে হেরেছে : ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীর কাছে এবং ১৯৬৪ সালে পশ্চিম জার্মানীর কাছে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, ১৯৬৮ সালের লুগানো অলিম্পিয়াডে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার পয়েন্টের ব্যবধান ছিল ৭½, কিন্তু এবারে সেই ব্যবধান একেবারে মাত্র এক পয়েন্টে নেমে এসেছে। এবারের অলিম্পিকে মোট ৭০টি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল। ফাইন্যালে উঠেছিল বারোটি দেশ। ফলাফল হোল : (১) রাশিয়া ২৭½ (মোট ৪৪ পয়েন্টের মধ্যে), (২) হাঙ্গেরী ২৬½, (৩) যুগোশ্লাভিয়া ২৬, (৪) ইউ-এস-এ ২৪, (৫) চেকোশ্লোভাকিয়া ২৩½, (৬) পশ্চিম জার্মানী ২২, (৭) আর্জেন্টিনা ২১½, (৮) বুলগেরিয়া ২১½, (৯) পূর্ব জার্মানী ১৯, (১০) রুমানিয়া ১৮½, (১১) কানাডা ১৭½, (১২) স্পেইন ১৬।

উল্লেখযোগ্য, এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে ওঠার আগে সেমি-ফাইন্যাল পর্যায়ে এই সর্বপ্রথম রাশিয়া ৩০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থানে নেমে যেতে বাধ্য হয়। প্রথম স্থান লাভের সম্মান অর্জন করে যুগোশ্লাভিয়া। শেষোক্ত দেশের প্রতিপক্ষবৃন্দ রাশিয়ার প্রতিপক্ষের তুলনায় মোটেই দুর্বল ছিল না।

ফাইন্যালেও রাশিয়া হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ড্র করেছে নেহাতই বরাত জোরে। নার্ভাস হয়ে গিয়ে ফোরিনটস কর্চনয়ের কাছে জেতা খেলা হেরেছেন এবং চসোম স্মাইসলভের কাছে জেতা খেলা ড্র করেছেন। কর্চনয়ের স্বীকারোক্তি থেকে আমরা তা জানতে পারি।

আমেরিকার সঙ্গে প্রথম বোর্ডে স্পাসকি ববি ফিশারকে হারালেও পোলুগায়েভস্কি এবং স্মাইসলভ যথাক্রমে ল্যারি ইভানস্ এবং লোম্বার্ডির বিরুদ্ধে অনেক কষ্ট করে ড্র করেছেন এটাও কর্চনয়েরই স্বীকারোক্তি। মুলতুবী খেলার পর্যালোচনা আমেরিকানদের পক্ষে ত্রুটিপূর্ণ হওয়াতেই রাশিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পেরেছে ২½-১½ পয়েন্টের ব্যবধানে।

রাশিয়ানদের কাছে স্পাসকি এখন 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়ের' মত অবস্থা। বাকী গ্র্যান্ডমাস্টারদের দিয়ে আরো কিছুদিন কাজ চললেও আর বেশী দিন চলবে না, একথা সোভিয়েত রাশিয়া আজ বুঝতে পারছে। তাই নতুন প্রতিভার জন্যে ওদেশে বেশ কিছুদিন ধরেই সোরগোল উঠেছে।

### যুগ পরিবর্তনের আভাস?

খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস তাঁরা অবশ্য ফেলতে পারছেন এ বছরের রাশিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপের সেমি-ফাইন্যাল পর্যায়ের খেলাগুলি দেখার পর। চারটি জোনে বিভক্ত এই সেমি-ফাইন্যালের প্রত্যেকটি জোনেই অনেক নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া গেছে। অনেক তরুণ খেলোয়াড়ই এ বছর বহু গ্র্যান্ডমাস্টারকে পিছনে ফেলে শীর্ষস্থানগুলি দখল করতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে মনে রাখতে হবে, যেহেতু এ বছরের রাশিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ, কিম্বা চ্যাম্পিয়নশীপের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ 'জোনাল' টুর্নামেন্ট নয়, সেহেতু অনেক নামকরা গ্র্যান্ডমাস্টারই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছেন না। তাছাড়া এ রকম নতুন মুখ প্রতিবারই রাশিয়াতে বি যায়, কিন্তু তাঁরা কেউই এখন পর্য সাইটে গ্র্যান্ডমাস্টারের পর্যায়ে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে নভোস্টি [illegible] এক প্রতিনিধির সা [illegible] তাঁর [illegible]যোগ্য :

'কয়েক বছর আগে এটা বোঝা যায় নি, আমরা স্পাসকি তাঁর সহযোগী গ্র্যান্ডমাস্টারদের স্থা করার মত সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি উঠতি তরুণ খেলোয়াড় প্রচুর ছিল স্পাসকি এবং তালের মত সং মেধাবী খেলোয়াড়ের দেখা পাওয়া য এখন আবার দাবার আকাশে বেশ ক সত্যিকারের সক্ষম এবং সম্ভাব খেলোয়াড়ের আবির্ভাব ঘটেছে। মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, কয়েকজন খুব শক্তিধর দাবা খে হবে, হয়তো স্পাসকি বা তালের সমান শক্তিধর।'

উক্ত প্রতিনিধির কাছে বং বলেছেন যে, ২১ বছরের যুরি ক এবং ১৯ বছরের আনাতোলি কা মধ্যে তিনি প্রতিভার বীজ পেয়েছেন। প্রথমোক্ত জন মস্কো ফি কালচার ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষে বর্তমানে ববি ফিশারের প্রতিভার গবেষণা করছেন তাঁর ডিপ্লোমা থি জন্যে। তাছাড়া তিনি পল কেরেসের পড়াশুনা করছেন। এর ফলে গত থেকেই তার খেলায় এক আশ্চর্য বর্তন এসেছে। আর কারপভ : বতভিনিকের বক্তব্য এই যে, বালক ও সে রকম প্রতিভার পরিচয় দিতে পারলেও ১৯৬৫ সালে রাশিয়ার ও বিখ্যাত কোচ ফারমানের কাছে নেবার ফলে কারপভের খেলাতেও নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে। স্পা পর একমাত্র কারপভই গত বছর জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছেন। চেয়েও বড় কথা, মাত্র ১৯ বছর ব তিনি রাশিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপের ফাই খেলবার অধিকার অর্জন করে বতভিনিকের মতে, এমন খেলোয়াড় কম দেখা যায়।

৩০য়ের দশকে বতভিনিক এবং বে চল্লিশের দশকে ব্রনস্তীন, পেত্রোসিয়ান স্মাইসলভ, পঞ্চাশের দশকে স্পাসকি তাল—তরুণ প্রতিভার এই নিরব অভ্যুদয়ে ছেদ পড়েছে ষাটের দশ সত্তরের দশকে বালাশভ এবং কারপভ হয় নব-যাত্রা সুরু করলেন। আমরা ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, কিন্তু এটাও রাখি, দাবার জগতে রাশিয়ার একাধি নষ্ট হলে দাবা খেলার উপকারই হবে

# রেকর্ড ভাঙছে এবং ভাঙবে

অমল দাশগুপ্ত

প্রশ্ন উঠেছে, বিভিন্ন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার এত যে রেকর্ড ভঙ্গ হচ্ছে সেজন্য কৃতিত্বটা কার? ক্রীড়া-প্রতিযোগীর, না বিজ্ঞানীর? এমন বিপদের সম্ভাবনা কি নেই যে, ক্রীড়ার আসরে আসল লড়াইটা চলবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন গবেষণাগারের মধ্যে, ক্রীড়া-সামগ্রীর উৎপাদকদের মধ্যে? বিশ্বের সেরা অ্যাথলীটরা এত যে রেকর্ড করছেন তার পিছনে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান কতখানি?

অলিম্পিক বিজয়ী নিগ্রো অ্যাথলীট বব বীমনকে লাফাতে দেখে এই প্রশ্নগুলো মনে জাগতে পারে। দৃশ্যটি কল্পনা করা যাক। বব বীমন দৌড় শুরু করেছেন। কিন্তু তাঁর দৌড় সাধারণ দৌড়ের মতো তো নয়! দৌড়বার সময়ে সাধারণ মানুষ যে-ভাবে পা ফেলে বব বীমন তো তেমনভাবে পা ফেলছেন না! মনে হচ্ছে ধীরগতি চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য যেন। যে জমির ওপর দিয়ে বব বীমন দৌড়চ্ছেন তাও সাধারণ জমির মতো নয়। লাফ দেবার সীমানায় এসে বব বীমন তাঁর পদক্ষেপকে একটু যেন থামিয়ে আনলেন। তারপরেই প্রচণ্ড এক লাফ। শূন্যে উঠে যাচ্ছেন বব বীমন, আরো, আরো, আরো। বেতারে ও টেলিভিশনে প্রচণ্ড একটা সোরগোল উঠে মিলিয়ে যেতে না যেতে বব বীমন জমি স্পর্শ করলেন।

লঙজাম্প বব বীমনের এই অলিম্পিক সাফল্যের মূলে শুধুই কি তাঁর শারীরিক পটুত্ব? নাকি, খানিকটা টার্টান রানওয়েরও, কৃত্রিম উপকরণে তৈরী যে রানওয়ে দিয়ে তিনি দৌড়েছেন?

নির্দ্বিধায় বলা চলে, অবশ্যই বব বীমনের শারীরিক পটুত্ব। তিনি যদি সাধারণ জমির ওপর দিয়ে দৌড়ে এসে লাফাতেন তাহলেও অনতিক্রম্য থাকতেন এবং সম্ভবত বিশ্ব-রেকর্ডও ভঙ্গ করতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর দৌড়ে প্রসার ভঙ্গিটি হয়তো এমন সুন্দর হত না, লাফ দেওয়াটি হয়তো হত না এমন নৈপুণ্যমণ্ডিত। স্বীকার করতেই হবে বব বীমন যে এমন একটি লাফ দিতে পেরেছেন তার পিছনে অনেকগুলো কারণ ক্রিয়াশীল : তাঁর ক্রীড়া-প্রতিভা, তাঁর শারীরিক পটুত্ব, তাঁর ট্রেনিং, তাঁর মানসিক প্রস্তুতি এবং অবশ্যই টার্টান রানওয়ে। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত কারণটিই একমাত্র কারণ নয়।

ট্র্যাক ও ফিল্ডের ক্রীড়ায় টার্টান রানওয়ের মতো উদ্ভাবন্য সচরাচর ঘটে না। তাই কিছু ঘটলেই সোরগোল পড়ে যায়। আমার তো মনে হয়, ব্যাঙ্ককের এশীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় সিংহলের দৌড়বীর খালি পায়ে দৌড়েই যে সকলকে টেক্কা দিয়েছেন তাও কম সোরগোল করার মতো ঘটনা নয়। কেননা খালি পায়ের চেয়ে কাঁটা-লাগানো জুতো পায়ে দৌড়তে সুবিধে অনেক বেশি, কাঁটার হেরফেরে সুবিধের তারতম্যও ঘটে থাকে। তবুও সিংহলী দৌড়-বীর খালি পায়েই আসর মাত করেছেন। জুতো পায়ে দৌড়বার ট্রেনিং পেলে তিনি যে কী করতেন তা অনুমান করা চলে। প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনা এক্ষেত্রে তাঁর শারীরিক পটুত্বের সহায়ক অবশ্যই হত।

কিন্তু যে-সব ক্রীড়ায় প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনা অহরহ ঘটে চলেছে, সেখানে কিন্তু ব্যাপারটা কোনো সময়েই সোরগোলের বিষয় হয় না। মোটর সাইকেল বা মোটরের রেসের কথা ধরা যাক। এই রেসে পুরনো মডেল অনবরত বাতিল হয়ে যাচ্ছে, নতুন থেকে নতুনতর মডেল অনবরত প্রবর্তিত হচ্ছে। যে মডেলের মোটর চালিয়ে একজন প্রতিযোগী রেস জিতলেন তাঁকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই মডেলটি বাতিল করে নতুনতর মডেলের সন্ধান করতে হয়। মোটরচালক যতোই অভিজ্ঞ হোন, যতোই পটু হোন, সাধারণ একটি ফোর্ড চালিয়ে তিনি মোটর-রেস জিতবেন বলে যদি কল্পনা করে থাকেন তাহলে তাঁকে হতাশ হতেই হবে।

বিমান-চালনার কলাকৌশল প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা সম্পর্কেও একই কথা। শুধু অভিজ্ঞতা ও পটুত্বের কাজ নয়, বিমান হওয়া চাই সর্বাধুনিক মডেলের।

মোটর-রেস বা বিমান-চালনার কলাকৌশল প্রদর্শনের প্রতিযোগিতার চেহারা এত দ্রুত পালটাচ্ছে যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আজকের দিনের চেহারাটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হবার সম্ভাবনা। ২০০০ সালের মোটর-রেস বা বিমান-চালানার কলাকৌশল প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা যাঁরা চাক্ষুষ করবেন তাঁদের চোখে ত্রিশ বছর আগেকার প্রতিযোগিতার চেহারাটি অবশ্যই মনে হবে মান্ধাতার আমলের। কলকাতার রাস্তায় ভিনটেজ কারের সমাবেশ দেখে আমরা আজকাল তা মনে করি। অথচ কত বছর আগেকারই বা ঘটনা!

হয়তো ২০০০ সালের মোটরটি হবে নিউক্লিয়ার বা ফোটোন তেজে চালিত। ফলে তখনকার মোটর-রেসের নিয়ম-কানুনও হবে আলাদা, হয়তো মোটর-রেস নামটিই আর থাকবে না, অন্য কোনো নাম দেওয়া হবে সেই প্রতিযোগিতার।

তবুও, যতো যাই হোক, সেই ২০০০ সালের নিউক্লিয়ার বা ফোটোন মোটরের চালকটিকেও শারীরিক পটুত্ব ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে আজকের দিনের মোটর-চালকের মতোই যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। মাত্রার দিক থেকে বেশি তো কম নয়।

এমন কথা উঠতে পারে, নিউক্লিয়ার মোটরের যুগে শারীরিক পটুত্ব ও অভিজ্ঞতা নির্ভর ক্রীড়ার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। ক্রীড়া হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ যন্ত্রনির্ভর। কথাটা সত্যি কিনা তা জানবার জন্যে ভবিষ্যতের নিউক্লিয়ার মোটরের যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই, বর্তমান কালের দিকেও তাকানো যেতে পারে।

সকলেই জানেন, হালে কম্পিউটারের সাহায্যে দাবাখেলার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। এই কম্পিউটার দাবা-খেলোয়াড়কেই দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক।

আসলে ব্যাপারটা কী? কম্পিউটার কি সত্যিই ভেবে-ভেবে দাবার চাল দিয়ে থাকে? মোটেই নয়। ভাবনা করার কোনো ক্ষমতাই কম্পিউটারের নেই। আসলে মানুষ খেলোয়াড়রাই প্রোগ্রাম রচনা করে থাকে, কম্পিউটারের দাবার চাল সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী। ফলে যে কম্পিউটারের প্রোগ্রামে যতো বেশি পটুত্ব ও অভিজ্ঞতা সেই কম্পিউটারের দাবার চালও ততো বেশি পাকা। কম্পিউটারে কম্পিউটারে লড়াই হলেও তাই সেখানেও হার-জিৎ এসে যায়। সোভিয়েত কম্পিউটার ও মার্কিন কম্পিউটারের দাবার লড়াইয়ে জিৎ হয়েছিল সোভিয়েতের। আসলে এই জিৎ প্রোগ্রামের, যন্ত্রের নয়।

কম্পিউটারের জিৎ শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রামের জিৎ হওয়া সত্ত্বেও একথা কিন্তু কিছুতেই ধরে নেওয়া চলে না যে, অতঃপর দাবাখেলা চলবে শুধু কম্পিউটারে কম্পিউটারে, মানুষে মানুষে নয়। প্রাক্তন বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন মিখাইল বোৎভিনিক বলেন, 'মোটরগাড়ি ও মোটর সাইকেল আবিষ্কার হয়েছে বলে অ্যাথলেটিক্স-এ আগ্রহ কমে যায় নি।... দৌড়ের ট্র্যাকে অ্যাথলীটরা প্রতিযোগিতায় নামে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী মানুষ কে তা স্থির করার জন্যে। দাবাখেলার বেলাতেও অনুরূপ অবস্থা থাকবে। মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো দাবা খেলে তা স্থির করার জন্য মানুষ প্রতিযোগিতায় নামবেই।'

কাজেই কম্পিউটার যতো বড়ো দাবা-খেলোয়াড়ই হোক, তার প্রোগ্রাম রচনায় মানুষের যতো পটুত্বই প্রকাশ পাক, নিছক মানুষ হিসেবে তার পটুত্ব কতখানি তা যাচাই করার জন্যেই সে নিজেও দাবার ছক সাজিয়ে বসবে। এই আগ্রহ নিয়েই মানুষ মানুষ, নইলে ক্ষুদ্র ধড় ও প্রকাণ্ড মুণ্ডু বিশিষ্ট একটি মামুলি জীব হয়ে দাঁড়াত মাত্র।

ঠাইক শাঁর পরিমাণে মন্ত্র

ফলে ক্রীড়াচর্চা থেকে মানুষ কোনোদিন বিরত হবে এমন সম্ভাবনা নেই। বরং যন্ত্রের কল্যাণে মানুষ যতো শারীরিক শ্রম থেকে অব্যাহতি পাবে, যতো জীবনধারণের দৈনন্দিন ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হবে, ততো বেশি বেশি সময় ব্যয় করবে ক্রীড়াচর্চায় ও অন্যান্য ধরনের শারীরিক বিনোদনে। বিশেষ করে ক্রীড়াচর্চা যেখানে তার মাংসপেশীর সক্ষমতার প্রমাণ উপস্থিত করতে হয়, দৃষ্টিশক্তির সঠিক বিচারে উত্তীর্ণ হতে হয়। আমাদের বংশধররাও যে আমাদের মতোই দৌড়বে, সাঁতার কাটবে, কুস্তি লড়বে, ফুটবল খেলবে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। হয়তো আরো কিছু নতুন খেলায় মেতে উঠতে পারে যা এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। খেলার কসরৎ দেখানোর ব্যাপারটা একদল রোবোটের ওপরে ছেড়ে নিজেরা জবুথবু জীবন কাটাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনা তো আর বন্ধ থাকবে না। ক্রীড়াজগতে তার অনুপ্রবেশ ঘটবেই। ফলে একই ক্রীড়া আজকের দিনে যে চেহারায় উপস্থিত হচ্ছে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির কল্যাণে আগামী দিনে তার চেহারা ভিন্নতর হবেই। প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন নতুন উদ্ভাবনার ফলে যখন উৎপাদনের পদ্ধতি উন্নততর হয় এবং আমাদের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, তখন আমরা ব্যাপারটাকে স্বভাবিক বলেই ধরে নিই। এমনটি তো হবেই। কিন্তু যেই মুহূর্তে প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে কোনো একটি বিশেষ ক্রীড়ার ধারায় উন্নতির যোগ ঘটল, অমনি চারদিকে গেল-গেল রব। ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে অনেকে বলতে শুরু করেছেন অলিম্পিক রেকর্ড-ফেকর্ড সবই বাজে, ব্যক্তি-মানুষের কোনো কৃতিত্ব সেখানে নেই, সবটাই প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনার কারসাজি।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। পোলজাম্পের দণ্ড হিসেবে ফাইবার-গ্লাসের ব্যবহার। গত দশ বছর ধরে ফাইবার-গ্লাসের সাহায্যে পোলজাম্প দেওয়া হচ্ছে এবং অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। গত দশ বছর ধরেই দাবি শোনা যাচ্ছে ফাইবার-গ্লাস নিষিদ্ধ করা হোক।

কথাটা সত্যি, ফাইবার-গ্লাসের সাহায্যে লাফ দেওয়া হচ্ছে বলেই পোলজাম্পে রেকর্ডের মাত্রা এত উঁচুতে উঠেছে। কিন্তু তাতে আপত্তি কেন? ফাইবার-গ্লাস অনেক বেশি নমনীয়, লাফ দেবার সময়ে ফাইবার-গ্লাস প্রথমে ধনুকের মতো বেঁকে যায় তারপরে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে ওঠে—এই তো কি? তাহলে তো আগেকার কালের বাঁশকেও বাতিল করতে হয়, লোহার রড হলেই সবচেয়ে ভালো।

ফাইবার-গ্লাসের সাহায্যে লাফ দিতে হলে কি কম শারীরিক পটুত্বের প্রয়োজন? মোটেই নয়। অন্যদিকে ফাইবার-গ্লাসের সাহায্যে লাফ দেবার সমগ্র ক্রিয়াকাণ্ডটির মধ্যে এমন এক সুষমা ফুটে ওঠে
পাকা শিল্পীর হাতের কাজ বলে মনে
ফাইবার-গ্লাসের সাহায্যে লাফ 
পাশে বাঁশের সাহায্যে লাফ 
ব্যাপারটি ... মানুষের 
... হবেই। একই
টার্টার রানওয়ে সম্পর্কে। রেকর্ড
হোক, কিন্তু ক্রীড়া হয়ে উঠছে শি
সুষমামণ্ডিত, শারীরিক পটুত্বের নি
তো অবশ্যই, বরং আগের চেয়েও হ
অনেক বেশি মাত্রায়—অতএব শুধু 
গোল তুলে ব্যাপারটাকে ঠেকানো যাবে
প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবনা হতেই থা
রেকর্ডও কদাচ অ-ভঙ্গ থাকবে না।

ব্যাপারটা তো কারও ইচ্ছের
নির্ভর করে না। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্র
বন্ধ হোক, প্রযুক্তিবিদ্যা পিছিয়ে য
এমন ভাবনা আজকের দিনে অর্থহ
আজকের দিনে হাওয়া-ভরা চামড়ার
গোলকটি দিয়ে ফুটবল খেলা হয়, দু
বছর আগে তার কোনো অস্তিত্ব ছিল
তাই বলে কি কেউ চাইলেই এখন অ
ন্যাকড়ার ফুটবল প্রবর্তন করতে পারে
যদিও পারেন তো সেই ন্যাকড়ার ফু
খেলতে নেমে এ-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলে
পেলে কি তাঁর নৈপুণ্য দেখাতে পার
ভবিষ্যতে হয়তো এই চামড়ার ফুট
বাতিল হয়ে যাবে—তখনকার খে
নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে তৎকালীন ফুটব
সাহায্যেই। জোর-জবরদস্তি করে
চামড়ার ফুটবলে তখন আর খেলা জ
না।

প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি হবেই।
ফলে খেলার সামগ্রী ও খেলার সাজসর
চেহারা পালটাবেই। খেলায় দেখা
নতুন নৈপুণ্য, রেকর্ডের পর রেকর্ড
হয়ে চলবে। কিন্তু তার ফলে প্রতিযোগি
রোমাঞ্চ কমবে কি? মেক্সিকো অলিম্পি
পোলজাম্পের প্রতিযোগিতায় সকল প্র
যোগীর হাতেই ছিল ফাইবার-গ্লাসের
—তাই বলে আগের থেকেই কি
গিয়েছে জয় হবে কার?

মানুষ সব সময়েই চায় তার শরী
ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রকাশ করতে। আ
ওজনের বারবেল কি কোনো মানুষ কে
দিন তুলতে পারবে? ১০০ মিটার দৌ
পারবে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে? পোলজা
লাফাতে পারবে দশ মিটার?

কোনো প্রশ্নের জবাবেই জোর গ
বলা চলবে না—না। বিজ্ঞানী 
দাঁড়িয়েছেন সাহায্যের হাত বাড়ি
মানুষের মাংসপেশীর ক্রিয়াকান্ড 
পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা চলছে, প্রযু
বিদ্যার উদ্ভাবনা অব্যাহত—অতএব কো
কিছুই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে
আজকের চোখে এখনো যা বিস্ময়
অনিবার্যভাবেই তা হয়ে উঠবে ঘট
রেকর্ড ভাঙছে এবং ভাঙবে—মানুষ য
দিন এই পৃথিবীতে আছে।

# ওয়েস্টইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষ

ক্ষেত্রনাথ রায়

ভারতীয় ক্রিকেট দল আগামী ১৯৭১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী জামাইকায় পৌঁছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট সফর শুরু করবে ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে। সফরের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে ১৩ই এপ্রিল। ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৭১ সালের এই সফর—তৃতীয়বারের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর। আগের দুটি সফর ১৯৫২-৫৩ এবং ১৯৬১-৬২ সালে। এ পর্যন্ত ভারতবর্ষ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের মধ্যে যে পাঁচটি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে তার প্রতিটিতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 'রাবার' পেয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি সিরিজে সর্বাধিক খেলায় জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে আগের দুটি টেস্ট সিরিজের ফলাফল : ১৯৫২-৫৩ সালে চারটি টেস্ট খেলা ড্র এবং একটি খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় এবং ১৯৬১-৬২ সালের পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী হয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়—আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটি সিরিজের পাঁচটি খেলায় জয়লাভের নজির মাত্র চারটি আছে।

আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ভারতবর্ষ যে-সব দেশের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ খেলেছে তাদের মধ্যে একমাত্র ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে আজ পর্যন্ত একটা টেস্ট খেলাতেও জিততে পারেনি। ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই আক্ষেপের কথা। তবে ভারতবর্ষের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন যুক্তি নেই এমন নয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে যে-সময়ে (১৯৪৮-৬৭) ভারতবর্ষ পাঁচটা টেস্ট সিরিজ খেলেছে সেই সময়ের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল ভারতবর্ষের থেকে। তাছাড়া ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সময়টা ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের স্বর্ণ যুগ। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং এবং দল পরিচালনা—খেলার সর্ব-বিষয়েই সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বেসরকারীভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানের সম্মান লাভ করেছিল। ব্যাটিংয়ে উইকস-ওরেল-ওয়ালকট—এই তিনজন 'ডবলিউ থ্রি' নামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে যে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার তুলনা নেই। এই তিনজন নিগ্রো খেলোয়াড়ের নামের ইংরেজী আদ্য অক্ষর 'ডবলিউ' নিয়েই এই 'থ্রি ডবলিউ'। খেলার আসর থেকে এই 'থ্রি ডবলিউ' অর্থাৎ উইকস, ওরেল এবং ওয়ালকট—সকলেই বিদায় নিলে তবেই বিপক্ষ দল হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। ব্যাটিংয়ে এমনই দাপট ছিল প্রত্যেকেরই। এখানে একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে।

ক্লাইড ওয়ালকট

এভার্টন উইকস

ভারতবর্ষের বিপক্ষে কিংস্টনে ১৯৫২-৫৩ সালের টেস্ট সিরিজের শেষ পঞ্চম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৫৭৬ রানে এই 'থ্রি ডবলিউ' ৪৬৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন—ওরেল ২৩৭, উইকস ১০৯ এবং ওয়ালকট ১১৮। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের আর একজন খেলোয়াড়—তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 'অল রাউণ্ডার' গারফিল্ড সোবার্স। দলের দক্ষ অধিনায়ক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। বোলিংয়ে ভ্যালেনটাইন, রামাধীন, কিং, গিলক্রাইস্ট, হল, গিবস এবং সোবার্স ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। বিশেষ করে ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে ওয়েসলী হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানরাও তাঁর বলের সম্মুখীন হয়ে 'বলির পাঁঠা' হয়ে যেতেন—এমনই ছিল তাঁর বোলিংয়ের সংহার মূর্তি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের সে স্বর্ণযুগ ১৯৬৭ সালে শেষ হয়ে গেছে। আজ তারা অতীতের ছায়ামাত্র।

১৯৬০-৬১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফর থেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের স্বর্ণ যুগের সূচনা এবং এই সময়েই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট মহলে শ্বেতকায়দের দীর্ঘ-কালের প্রভুত্ব এবং অশ্বেতকায়দের সম্পর্কে অন্যায়-অবিচার লোপ পায়। ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলে অধিনায়ক পদে নির্বাচিত হলেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল (পরবর্তীকালে স্যার)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলে নিয়মিতভাবে একজন অশ্বেতকায় খেলোয়াড়ের অধি-নায়কের পদলাভ এই প্রথম। ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ বদলে যায়। ওরেল ছিলেন উজ্জ্বল ক্রিকেটের

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

গারফিল্ড সোবার্স

ওয়েসলী হল

একনিষ্ঠ সাধক এবং এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো তাঁর একাত্মা হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজ একটি নতুন অধ্যায় যোজনা করেছে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট সিরিজে বিজয়ী দলের পুরস্কার হিসাবে ওরেলের স্মরণার্থে 'ওরেল কাপ' উপহার দিয়েছেন। পৃথিবীর অপর কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় তাঁর জীবদ্দশায় এত বড় আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেননি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভাগ্যদোষে ১—২ খেলায় (টাই ১ এবং ড্র ১) যে পরাজিত হয়েছিল তা অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁরা যে-ভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলকে নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় সম্মানিত করেছিলেন তার সঙ্গে একমাত্র রাজকীয় সম্বর্ধনার তুলনা চলে। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৬টি টেস্ট সিরিজ খেলে ৫টি সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয় এবং সেই সূত্রে তারা বেসরকারীভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছিল। এই সময়ে ওরেলের নেতৃত্বে তারা ভারতবর্ষকে ৫—০ খেলায় এবং ইংল্যাণ্ডকে ৩—১ খেলায় (ড্র ১) পরাজিত করে এবং সোবার্সের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়াকে ২—১ খেলায় (ড্র ২), ইংল্যাণ্ডকে ৩—১ খেলায় (ড্র ১) এবং ভারতবর্ষকে ২—০ খেলায় (ড্র ১) পরাজিত করে।
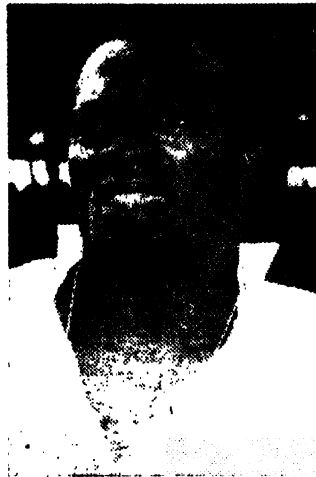
১৯৬৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের স্বর্ণ যুগ ছিল। তারপর ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে তাদের যে পতন আরম্ভ হয়েছে তা অব্যাহত আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সোবার্সের নেতৃত্বেই উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট সিরিজে হেরেছে—১৯৬৭-৬৮ সালে ইংল্যাণ্ডের কাছে ০—১ খেলায় (ড্র ৩), ১৯৬৮-৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার নিরপেক্ষ ১—৩ খেলায় (ড্র ১) এবং ১৯৬৯ সালে পুনরায় ইংল্যাণ্ডের কাছে ০—২ খেলায় (ড্র ১)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬৯ সালের ১৫ই জুলাই। এই শেষ টেস্ট খেলায় তারা ইংল্যাণ্ডের কাছে ৩০ রানে হেরেছিল।

**এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান**

**ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে**

ভারতবর্ষে : ৬৪৪ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), নিউদিল্লী, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৬৩১ (৮ উইঃ ডিক্লে), কিংস্টন, ১৯৬১-৬২

**ভারতবর্ষের পক্ষে**

ভারতবর্ষে : ৪৫৪, নিউদিল্লী, ১৯৪৮-৪৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৪৪৪, কিংস্টন ১৯৫২-৫৩

**এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান**

(পুরো ইনিংস অর্থাৎ ১০ উইকেটে)

**ভারতবর্ষের পক্ষে**

ভারতবর্ষে : ১২৪, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৯৮, ত্রিনিদাদ, ১৯৬১-৬২

**ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে**

ভারতবর্ষে : ২২২, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ২২৮, বার্বাদোজ, ১৯৫২-৫৩

**এক সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রান**

**ভারতবর্ষের পক্ষে**

ভারতবর্ষে : ৫৬০ রান—রুসী মোদী (টেস্ট ৫, ইনিংস ১০, নটআউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১১২, সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৫৬·০০), ১৯৪৮-৪৯।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৫৬০ রান—পলি উমরীগড় (টেস্ট ৫, ইনিংস ১০, নট আউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩০, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৬২·২২), ১৯৫২-৫৩।

**ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে**

ভারতবর্ষে : ৭৭৯ রান—এভার্টন উইকস (টেস্ট ৫, ইনিংস ৭, নটআউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৯৪, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১১১·২৮), ১৯৪৮-৪৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৭১৬ রান—এভার্টন উইকস (টেস্ট ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ১ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান

# ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

টেস্ট খেলার সূচনা : ১০ই নভেম্বর, ১৯৪৮, নিউদিল্লী

শেষ টেস্ট খেলা : ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬৭, মাদ্রাজ

**টেস্ট খেলার ফলাফল**

| সাল | স্থান | ভারতবর্ষ জয়ী | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী | ড্র | মোট খেলা | রাবার জয়ী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৪৮-৪৯ | ভারতবর্ষ | ০ | ১ | ৪ | ৫ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ |
| ১৯৫২-৫৩ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ | ০ | ১ | ৪ | ৫ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ |
| ১৯৫৮-৫৯ | ভারতবর্ষ | ০ | ৩ | ২ | ৫ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ |
| ১৯৬১-৬২ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ | ০ | ৫ | ০ | ৫ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ |
| ১৯৬৬-৬৭ | ভারতবর্ষ | ০ | ২ | ১ | ৩ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ |
| | মোট | ০ | ১২ | ১১ | ২৩ | |

২০৭, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১০২·২৮), ১৯৫২-৫৩

**এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান**

ভারতবর্ষের পক্ষে : ১৭২ নটআউট—পলি উমরীগড়, পোর্ট অব স্পেন ১৯৬১-৬২

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ২৫৬—রোহন কানহাই, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

**এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট**

**ভারতবর্ষের পক্ষে**

ভারতবর্ষে : ২২টি উইকেট—সুভাষ গুপ্তে (ওভার ৩১২·৩, মেডেন ৭১, রান ৯২৭ এবং গড় ৪২·১৩)—১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ২৭টি উইকেট—সুভাষ গুপ্তে (ওভার ৩২৯·৩, মেডেন ৮৭, রান ৭৮৯ এবং গড় ২৯·২২)—১৯৫২-৫৩।

**ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে**

ভারতবর্ষে : ৩০টি উইকেট—ওয়েসলী হল (ওভার ২২১·৪, মেডেন ৬৫, রান ৫৩০ এবং গড় ১৭·৬৬)—১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ২৮টি উইকেট—এ এল ভ্যালেনটাইন (ওভার ৪৩০, মেডেন ১৭৯, রান ৮২৮ এবং গড় ২৯·৫৭)—১৯৫২-৫৩

**এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট**

ভারতবর্ষের পক্ষে : ৯টি (১০২ রানে)—সুভাষ গুপ্তে, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ৮টি (৩৮ রানে)—লান্স গিবস, বার্বাদোজ. ১৯৬১-৬২

**বিভিন্ন মাঠে খেলার উদ্বোধন তারিখ**

**ভারতবর্ষে**

| খেলার স্থান | উদ্বোধন তারিখ | মোট খেলা |
|---|---|---|
| নিউ দিল্লী | ১০ই নভেম্বর, ১৯৪৮ | ২ |
| বোম্বাই | ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ | ৪ |
| কলকাতা | ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ | ৩ |
| মাদ্রাজ | ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৯ | ৩ |
| কানপুর | ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ | ১ |

**ওয়েস্ট ইণ্ডিজে**

| খেলার স্থান | উদ্বোধন তারিখ | মোট খেলা |
|---|---|---|
| ত্রিনিদাদ | ২১শে জানুয়ারী ১৯৫৩ | ৪ |
| বার্বাদোজ | ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ | ২ |
| জর্জ টাউন | ১১ই মার্চ ১৯৫৩ | ১ |
| কিংস্টন | ২৮শে মার্চ ১৯৫৩ | ৩ |

**বিভিন্ন কেন্দ্রে টেস্ট খেলার ফলাফল**

**ভারতবর্ষে**

| স্থান | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী | ভারতবর্ষ জয়ী | খেলা ড্র | মোট খেলা |
|---|---|---|---|---|
| নিউ দিল্লী | ০ | ০ | ২ | ২ |
| বোম্বাই | ১ | ০ | ৩ | ৪ |
| কলকাতা | ২ | ০ | ১ | ৩ |
| মাদ্রাজ | ২ | ০ | ১ | ৩ |
| কানপুর | ১ | ০ | ০ | ১ |
| মোট : | ৬ | ০ | ৭ | ১৩ |

**টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল**

| সাল | স্থান | খেলার ফলাফল |
|---|---|---|
| ১৯৪৮-৪৯ | নিউ দিল্লী | অমীমাংসিত |
| | বোম্বাই | অমীমাংসিত |
| | কলকাতা | অমীমাংসিত |
| | মাদ্রাজ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও [illegible] রানে জয়ী |
| | বোম্বাই | অমীমাংসিত |
| ১৯৫২-৫৩ | ত্রিনিদাদ | অমীমাংসিত |
| | বার্বাদোজ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৪২ রানে জয়ী |
| | ত্রিনিদাদ | অমীমাংসিত |
| | জর্জটাউন | অমীমাংসিত |
| | কিংস্টন | অমীমাংসিত |
| ১৯৫৮-৫৯ | বোম্বাই | অমীমাংসিত |
| | কানপুর | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২০৩ রানে জয়ী |
| | কলকাতা | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে জয়ী |
| | মাদ্রাজ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৯৫ রানে জয়ী |
| | নিউ দিল্লী | অমীমাংসিত |
| ১৯৬১-৬২ | ত্রিনিদাদ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে জয়ী |
| | কিংস্টন | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ১৮ রানে জয়ী |
| | বার্বাদোজ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩০ রানে জয়ী |
| | ত্রিনিদাদ | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭ উইকেটে জয়ী |
| | কিংস্টন | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১২৩ রানে জয়ী |
| ১৯৬৬-৬৭ | বোম্বাই | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৬ উইকেটে জয়ী |
| | কলকাতা | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৪৫ রানে জয়ী |
| | মাদ্রাজ | অমীমাংসিত |

**ওয়েস্ট ইণ্ডিজে**

| স্থান | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী | ভারতবর্ষ জয়ী | খেলা ড্র | মোট খেলা |
|---|---|---|---|---|
| ত্রিনিদাদ | ২ | ০ | ২ | ৪ |
| বার্বাদোজ | ২ | ০ | ০ | ২ |
| জর্জ টাউন | ০ | ০ | ১ | ১ |
| কিংস্টন | ২ | ০ | ১ | ৩ |
| মোট : | ৬ | ০ | ৪ | ১০ |

**মোট খেলার ফলাফল**

| | মোট খেলা | ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী | ভারতবর্ষ জয়ী | ড্র |
|---|---|---|---|---|
| ভারতবর্ষে | ১৩ | ৬ | ০ | ৭ |
| ওয়েস্ট ইণ্ডিজে | ১০ | ৬ | ০ | ৪ |
| মোট : | ২৩ | ১২ | ০ | ১১ |

**সেঞ্চুরী উপর্যুপরি চার ইনিংসে**

এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)—১২৮ রান (১ম টেস্ট, নিউ দিল্লী), ১৯৪ রান (২য় টেস্ট, বোম্বাই) এবং ১৬২ ও ১০১ রান (৩য় টেস্ট, কলকাতা) ১৯৪৭-৪৮। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত সফরের আগে উইকস কিংস্টনে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্টে সেঞ্চুরী (১৪১ রান) করায় উপর্যুপরি টেস্টের পাঁচ ইনিংসে সেঞ্চুরী করার যে বিশ্বরেকর্ড করেন তা আজও কেউ স্পর্শ করেন নি।

**একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী**

১৬২ ও ১০১ রান—এভার্টন উইকস, ৩য় টেস্ট, কলকাতা ১৯৪৭-৪৮।

**একটি ইনিংসে চারটি সেঞ্চুরী**

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ওয়ালকট ১৫২ রান, গোমেজ ১০১ রান, উইকস ১২৮ রান এবং ক্রিশ্চিয়ানী ১০৭ রান (১ম টেস্টের ১ম ইনিংসে, নিউ দিল্লী, ১৯৪৭-৪৮)। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই রকম নজির এর আগে মাত্র একটি ছিল—১৯৩৮ সালে নটিংহামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১ম ইনিংসে ইংল্যাণ্ডের হাটন (১০০ রান), বার্নেট (১২৬ রান), কম্পটন (১০২ রান) এবং পেণ্টার (২১৬ নট-আউট) সেঞ্চুরী করেন।

**উপর্যুপরি ইনিংসে ৬০০ রান**

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬৩১ (নিউ দিল্লী, ১ম টেস্ট) এবং ৬২৯ রান—৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড (বোম্বাই, ২য় টেস্ট), ১৯৪৭-৪৮।

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ/পরিচালনা : দীপক গুপ্ত। দিলীপ রায় এবং সুলেখা। ফটো : অমৃত

গত কুড়ি বছর ধরে ভারতবর্ষে ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলন চলা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেমা শিল্পের আদিপর্বে নির্বাক ছবির যে সুদীর্ঘ অধ্যায় তা এখনও আমাদের কাছে অপরিচিত। অথচ ছায়াছবি আবিষ্কৃত হয় ঐ সময়ে, আমেরিকাতে। ফিল্ম ও ফিল্মের ভাষা বলতে আজ আমরা যা বুঝি তার সৃষ্টিকর্তাও একজন আমেরিকান, ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ।

বিদেশে আজ অনেকেই হয়তো দাবী করতে পারেন যে, তাঁরাই হচ্ছেন ছবি তোলার যান্ত্রিক উপকরণ, এককথায় সিনেমা শিল্পের আবিষ্কর্তা। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সিনেমা শিল্পের আদিপর্বে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা কাজকর্ম হয়েছে তার অধিকাংশের সূত্রপাত যুক্তরাষ্ট্রে। যেহেতু ছায়াছবি যন্ত্রযুগের এক বিশেষ ধরনের শিল্পকলা, যান্ত্রিক কলাবিদ্যার প্রত্যক্ষ অবদান, তাই অতি স্বাভাবিক নিয়মে যন্ত্রবিজ্ঞানে অগ্রসর দেশেই যে এর জন্ম ও উন্নতি সাধিত হবে, এ ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছু নেই। সোভিয়েত রাশিয়ার বিখ্যাত চিত্রপরিচালক আইজেনস্টাইন বলেছেন : আমেরিকার শিল্পোন্নতির সঙ্গে তার ছায়াছবির প্রগতি গভীরভাবে যুক্ত।

১৯১৩ সালে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আনুমানিক ষাট হাজারেরও বেশি প্রদর্শনী কেন্দ্রে সিনেমা দেখানো হতো। আর এই ষাট হাজার প্রদর্শনী কেন্দ্রের চার ভাগের এক ভাগই ছিল শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

মার্কিন ছায়াছবির আদিপর্ব নিষ্পাপ ও সারল্যের প্রতীক। ছায়াছবিতে 'করাপ্টিং ফোর্স' বা কলুষ দিকগুলি প্রাধান্য পেলো পরবর্তীকালে, বেশ কিছু বছর পরে।

গোড়ার দিকে ছবি দেখানো হতো হাটে-বাজারে, সার্কাসের আসরে, মিউজিক হল বা পিপশোগুলিতে কিংবা রাস্তার ধারে। অধিকাংশ দর্শকই সাধারণ মানুষ। শিক্ষিত বা উচ্চবিত্তের যে শিল্পজগত, সেখানে তার প্রবেশ নিষেধ।

প্রদর্শনী মূল্য একখন্ড নিকেল, যার থেকে সিনেমার নামই হয়ে গেল নিকেলো-ডিয়নস। সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে এইসব সস্তাদরের শো-হাউসগুলিতে প্রধানত দেখানো হতো টুকরো টুকরো জীবন্ত ছবি—কোথাও ট্রেন এসে ঢুকছে স্টেশনে, প্রচন্ড জলোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নায়েগ্রা প্রপাত, আবার কোথাও বা মিউজিক হলে শরীর দুলিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে কোন তন্বী মেয়ে।

ছায়াছবির আদিপর্বে হাস্যরসিক হিসেবে নাম করেছিলেন যাঁরা—জন বুনে থেকে বেন তারপিন, বাসটার কিয়াটন, ফ্যাটি আরাবাকলস ও মাবেল নরমান্ড এবং পৃথিবীখ্যাত চার্লি চ্যাপলিন—তাঁরা সবাই একদা মিউজিক হলের সাধারণ কমেডিয়ানদের মতো অতি সাধারণ স্তরের হাস্যরসিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ছায়াছবি ছিল তাঁদের কাছে শিশুর হাতে নতুন পাওয়া খেলনার মতো। একান্তভাবে বাস্তব-নির্ভর ছবিগুলোর মধ্যে দিয়ে তাঁরা প্রচলিত রীতিনীতি ও শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারণ করতেন। ম্যাক সেনেট-এর কেস্টন কমেডিগুলোর উদ্দেশ্য হলো, কেস্টন পুলিশ বাহিনীর ব্যর্থতার আলেখ্য তুলে ধরা ও যারা আইনশৃঙ্খলার ধারক, প্রতি পদক্ষেপে তাদের নাস্তানাবুদের ছবি নানাভাবে দেখানো। এরা সবাই দরিদ্র ও সর্বহারাদের দিকে। রাঘববোয়াল যেমন চুনোপুঁটি গিলে খায় তেমনি একজন হৃষ্টপুষ্ট বড়লোক তার থেকে দীন খুদে একটি মানুষকে মুরগীর মতো খেয়ে ফেলতে চাইছে,—'গোল্ড রাশ'-এর এই দৃশ্যেই শুধু নয়, চার্লি চ্যাপলিন তাঁর সব ছবিতে এই একই বক্তব্য প্রকাশ করে গেছেন।

মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মের মাধ্যমে যখনই অর্থাগম শুরু হলো, ছবি নির্মাণের ব্যাপারটা তখনই প্রযোজকদের ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। সাধারণ মানুষের সঙ্গে চলচ্চিত্রের দীর্ঘ-দিনের সম্পর্কে ফাটল দেখা দিলেও বুর্জোয়া এবং শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্তের উপযোগী বিষয়বস্তু ছবিতে প্রাধান্য পেতে থাকলো। ডেভিড গ্রিফিথ তাঁর প্রথম ছবিতে নিজের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে চাননি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিলো নাটকে অভিনয় করে অভিনেতা হওয়া, ছায়াছবির মতো সস্তা ব্যাপারে নিজের নামকে তাই তিনি জড়াতে চাননি। অথচ গ্রিফিথ সম্পর্কে বলা হয় যে, আজকের দিনে ফিল্মের যে ভাষা ও আঙ্গিক, তিনিই তার জনক।

আজও যদি ১৯১৬ সালে তোলা ডেভিড গ্রিফিথের 'ইনটলারেন্স' ছবিটি দেখা যায়, চমকে যেতে হয় তাঁর কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রত্যক্ষ করে। চলচ্চিত্রে আঙ্গিকের এমন দুরূহ প্রয়োগ প্রায় দেখাই যায়না।

চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার নির্বাক যুগের খ্যাতিমান স্রষ্টা আইজেনস্টাইন ও পুডভকিনকে গ্রিফিথ অশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। গ্রিফিথের প্রভাব আইজেনস্টাইন কখনো অস্বীকার করতে পারেন নি। 'ডিকেন্স-গ্রিফিথ ও আজকের চলচ্চিত্র' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে আইজেনস্টাইন বলেছেন : সোভিয়েত চলচ্চিত্রে মন্তাজের বিবর্তন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রিফিথের অবদান অসাধারণ। সে অবদান গ্রিফিথের কাজে ডিকেন্সের যে অবদান তার থেকে কোন অংশেই কম নয়।

গ্রিফিথ সম্পর্কে আলোচনাকালে গ্রিফিথ ডিকেন্সকে প্রকাশ করতে গিয়ে কোথায় কৃতকার্য ও কোথায় অকৃতকার্য, আইজেনস্টাইন তা ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রিফিথের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, 'সে ছবিই ভালো যে ছবিতে ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ভালোর জয় ও মন্দের পরাজয় ঘটে।' আইজেনস্টাইন নিপুণভাবে এর সঙ্গে জুড়ে দিলেন, 'একেই অসবার্ট সিটওয়েল ডিকেন্স প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সৎ-অসৎ-এর যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন।' চলচ্চিত্র জগতে ভিক্টোরিয় যুগের মধ্যবিত্তের মার্কিন সমাজে গ্রিফিথ এক অতি সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফিল্মের কলাকৌশল ও আঙ্গিকের ব্যবহারে তিনি সিনেমাশিল্পের আদি পুরুষ।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত পরিচালিত বিলেত ফেরত/নির্মলকুমার এবং নবাগতা সোহাগ সেন।

[illegible]-চৌধুরী এবং কাজল [illegible]
ফটো ঃ অমৃত

আশ্চর্য এই যে, প্রথমদিকে ছায়াছবির নির্মাণকার্যে চ্যাপলিনের দান অকিঞ্চিৎকর হলেও তিনিই চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অমর হয়ে রইলেন। তাঁর ছবি সব সময় নতুন। অথচ গ্রিফিথ যিনি চলচ্চিত্রের স্রষ্টা তাঁর নাম প্রায় মুছে যেতে বসেছে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও চ্যাপলিনের প্রাচীনতম ছবিগুলি আজও অনাবিল আনন্দে উপভোগ করা যায়। আসলে, চ্যাপলিনের বিষয়বস্তু স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে, সমকালীন জগতের কোন নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ নয়। খুব সম্ভব কমেডিকে বেছে নিয়েছিলেন বলেই এ ব্যাপারে তিনি এতো কৃতকার্য হয়েছিলেন।

চলচ্চিত্র শিল্পের পথিকৃৎ যাঁরা তাঁদের ছবি দেখার সময় আমাদের উচিত সিনেমা-শিল্পে তাঁদের অবদান ও শিল্পকর্মের নৈপুণ্যকে আলাদা করে দেখা। ইতিহাসকে ভুলে গিয়ে আমরা যদি শুধুমাত্র তাঁদের ছবি দেখতেই চাই, তাহলে মনে হতে পারে কমেডিকে কেন্দ্র করেই বুঝি নির্বাক যুগের মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশলাভ ও পরিণত রূপ গ্রহণ করেছিল।

প্রতিবাদ/বিশ্বজিৎ এবং মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। ফটো ঃ অমৃত

[illegible]

সেই সময় উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় যে দৃশ্যগুলোকে অশ্লীল বলে বর্ণনা করেছিলেন, আজ আমাদের কাছে ছবির সে দৃশ্যগুলো নির্মল হাসির উৎস। ছবিগুলি দেখে আজ আমাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যাঁরা প্রথম এই ছবিগুলি দেখেছিলেন তাঁদের মনে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

এসব ছবি দেখতে দেখতে আমরা চলচ্চিত্র শিল্পের পথিকৃৎদের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হই, অবাক হয়ে যাই কেমন করে তাঁরা শিল্পকলার এই মাধ্যমটিকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতেই হবে, কখনো কখনো এসব ছবি যাদুঘরে যত্নে তুলে রাখা অতীতের শিল্পকর্ম হিসেবে দেখে থাকি, কখনো কখনো তাদের আজগুবি ধরনধারনে আমরা খুব মজা পাই, কখনো কখনো সিনেমা শিল্পের সানন্দ ও সরল শৈশবকে মনে করে আমাদের মনে বিধুরতা জাগে, কখনো কখনো গ্রেটা গার্বোর মতো কোন একক ব্যক্তিত্বের জাদুতে আমরা মুগ্ধ হই—এর চেয়ে আর বেশি কিছু নয়। যাই হোক, নির্বাক যুগের মহৎ কমেডিগুলি কিন্তু সময়ের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাস্টার কিটনের অদ্ভুত মুখভঙ্গি, কেস্টন পুলিশ বাহিনীর মজাদার ব্যাপারস্যাপার, চ্যাপলিনের গভীর মানবিকতা গত অর্ধ-শতাব্দীতেও যে তার সর্বজনীন আবেদন রক্ষা করে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতের পশ্চিম উপকূলের বিস্তীর্ণ তটরেখায় কোনো এক স্থানে শুরু এই কাহিনীর প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্রতট। চিরঅশান্ত আগর আর ধূ-ধূ সৈকতের সমান্তরাল রেখায় বেশ খানিকটা জমি। গোধূলিলগ্ন। নীল সাগরের ঢেউয়ের মাথায় নাচছে ধূসরাভা। নির্জন সৈকতও নিবিড় হয়ে উঠছে প্রদোষ বিষাদে।

সমান্তরাল রেখায় বিস্তৃত এক ফালি জমিতে গলফ খেলছে এক যুবক। একাই খেলছে। কিন্তু পরম উৎসাহে খেলছে। এলোপাতাড়ি মারের ধার দিয়েও যাচ্ছে না। প্রতিটি 'স্ট্রোক' হিসেব করা; চুলচেরা বিচারে বলের গায়ে ঘা পড়ছে; বল ছুটছে হিসেবের পথ ধরে—উল্টোপাল্টা নয়। সংক্ষেপে, জনহীন সাগরতীরে যুবক হাত পাকাচ্ছে। কব্জির পক্ব মোচড়ে স্টিক ঘুরছে, বল উঠছে, যেন ঘূর্ণিবায়ু বশ মেনেছে যুবকের জাদুকরী হাতের মোহে।

শুধু গলফ কেন, যুবক অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও বেশ পটু। খেলা শেখা তার কাছে ছেলেখেলা। ছ হপ্তায় বেহালা শেখা বা পত্রযোগে ফরাসী উচ্চারণ রপ্তকরা জাতীয় বিজ্ঞাপনে তাই তার এত আগ্রহ। বিজ্ঞাপনের এই অ্যাডভেঞ্চার দুনিয়ায় বিচরণ করতে যুবক তাই ভালবাসে।

যুবক অ্যাডমিরাল রাকা দত্তর প্রাইভেট সেক্রেটারী। অ্যাডমিরালের প্রাসাদোপম বাসগৃহ গলফ-জমি যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তারপরেই। যুবক আর পাঁচজন যুবকের চাইতেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবেই জীবন কাটিয়ে মোক্ষ লাভ করা তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সে জানে, প্রাইভেট সেক্রেটারীগিরির মেয়াদ যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যাবে, ততই উচ্চাশার উচ্চসোপানে আরোহনের সুযোগ আসবে। কিন্তু, সেক্রেটারী জীবিকায় ইস্তফা দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হল খুব ভাল সেক্রেটারী হওয়া। কথাটা একটু প্যাঁচালো বটে, কিন্তু মানেটা সোজা। যুবক তাই অত্যন্ত ভাল সেক্রেটারী। ঝটিকাবেগে অ্যাডমিরাল রাকা দত্তর চিঠিপত্তর সৎকার করতে সে অদ্বিতীয়। গলফ প্র্যাকটিসের মতই এ ব্যাপারে তার লেখনী আর হাত যুগপৎ ঘূর্ণিবায়ুর মত চলে।

অ্যাডমিরাল এখন সমুদ্রে। ছ' মাস তিনি গৃহছাড়া। ফেরবার সময় হয়েছে বটে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন আগে তাঁর আবির্ভাব ঘটছে না।

যুবকের নাম ধরা যাক ইন্দ্রকীল। উড়ন্ত বলের গতিবিধি দেখবার জন্যে একলাফে একটা ঢিবির ওপর উঠল ইন্দ্রকীল। উঠেই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখল। প্রথমে মনে হল বুঝি চোখের ভুল। অথবা, ফ্যানটাসি। নিশ্চয় ভুতুড়ে নাটক। নয়তো অসম্ভব কিছু। চোখ রগড়ে নিয়ে আবার তাকাল। দেখল,

ঝড়ের কালো মেঘ দিগন্তে যেখানে মিশেছে—সেখানে গোধূলির শেষ রক্তরাগ স্বর্ণরশ্মি নিয়ে কৃষ্ণ-নীল সমুদ্রের শীর্ষে কাঁপছে পশ্চিমের সেই তমিস্রাময় পটভূমিকায় যেন মূক অভিনয় করছে দুটি কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি।

পরক্ষণেই বিভ্রম খানিকটা পরিষ্কার হল। দিগন্তের বুকে নয়—সৈকতের ওপরেই শুরু এই মূকাভিনয়ের। বিচিত্র টুপী মাথায় দুটি মনুষ্যমূর্তি জংলীনৃত্যের মত বিদঘুটে নাচে মত্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে। স্বর্ণরশ্মির পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তাদের কৃষ্ণ দেহরেখা: দুজনেরই কটিবন্ধে ঝুলছে তরবারি। যেন মধ্যযুগীয় কোনো কাষ্ঠনির্মিত যুদ্ধজাহাজ থেকে আবির্ভূত হয়েছে দুটি প্রেত। এ যেন ভৌতিক নাটক। ভূতুড়ে জাহাজও নিশ্চয় আছে আশেপাশে কোথাও!

চোখ রগড়ে ভালভাবে তাকাতেই ফ্যানটাসি-কল্পনা তিরোহিত হল। ইন্দ্রকীল যা দেখল, তা ভূত নয়, প্রেত নয়, অসাধারণ বটে। কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়। দেখল, দুই মূকাভিনেতাই এমন জমকালো ইউনিফর্ম পরেছে, যা বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া পারতপক্ষে কেউ পরতে চায় না। পুরোধা ব্যক্তিকে চিনতে কষ্ট হল না। ঐ উঁচু নাক ছুঁচালো দাড়ি আর লোহার শিকের মত মজবুত শরীর শুধু একজনেরই আছে। নাম তাঁর অ্যাডমিরাল রাজা দত্ত। ইন্দ্রকীলের মনিব।

মজা হচ্ছে এই যে, পেছনের ব্যক্তি সম্বন্ধে অ্যাডমিরাল যেন মোটেই সজাগ নন। তিনি চলেছেন আপন মনে।

পেছনের লোকটিকে চেষ্টা করেও যেন চিনতে পারল না ইন্দ্রকীল। বুঝতেও পারল না এমন অসময়ে কেন জাহাজ ছেড়ে স্থলে অবতীর্ণ হলেন অ্যাডমিরাল। জমকালো পোশাক নিশ্চয় অকারণে পরেন নি। কিন্তু ইউনিফর্ম পরে সং সেজে অ্যাডমিরাল কদাচ বাড়িমুখো হননি। ইন্দ্রকীল সেই মুহূর্তে এ রহস্যের কোনো সমাধান খুঁজে পেল না। এর পরেও বেশ কিছুকাল ইউনিফর্ম রহস্য অনেকেরই মাথা ঘর্মাক্ত করেছে। পোশাক পরিবর্তনের জন্য পাঁচ মিনিট সময়ও কি পাননি অ্যাডমিরাল?

তাই, সেই মুহূর্তে ইন্দ্রকীল যা দেখল, তা কমিক অপেরার সমতুল্য।

এবার দ্বিতীয় মূর্তিটিকে নিয়ে গবেষণা করা যাক। লোকটির পরণে লেফটেন্যান্টের নিখুঁত পোশাক। অথচ ধরনটা লেফটেন্যান্টজনোচিত নয় মোটেই। লোকটা হাঁটছে অদ্ভুতভাবে; অসহজ অদ্ভুত চলনভঙ্গিমা; কখনো পাঁই পাঁই করে, কখনো শামুকের মত পা টেনে টেনে; ভাবখানা যেন অ্যাডমিরালকে ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা, এ বিষয়ে কিছুতেই মনস্থির করা যাচ্ছে না। অ্যাডমিরাল অবশ্য কানেখাটো মানুষ। কাজেই পেছনে বালির ওপর পদশব্দ শোনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বালুকা-পদচিহ্ন নিয়ে যে কোনো ডিটেকটিভ গবেষণা করলে গোটা কুড়ি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত। মনে হত, পায়ের মালিক কখনো খুঁড়িয়েছে, আবার কখনো নেচেছে। লোকটার মুখ প্রদোষাভায় অস্পষ্ট থাকলেও চঞ্চল চোখ দুটো রীতিমত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সে চোখে উত্তেজনা নেচে নেচে উঠছিল। একবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে শুরু করল লোকটা। কিন্তু আচমকা দাঁড়িয়ে গেল। আবার পা টেনে টেনে মাতালের মত বেসামাল ভঙ্গিমায় বালি মাড়াতে লাগল। তারপরেই একটা বেয়াড়া কাজ করল লোকটা। ইন্দ্রকীল স্বপ্নেও ভাবেনি এমন সৃষ্টিছাড়া কাজ কোনো নৌ-অফিসারের পক্ষে সম্ভব। এক ঝটকায় খাপ থেকে তরোয়াল টেনে বার করল নাচিয়ে মূর্তি।

নাটকের এই চরম মুহূর্তে দুজন মূকাভিনেতাই অদৃশ্য হল একটা ঢিবির আড়ালে। বিদ্যুৎচমকের মত তরবারি ঝলক দেখল ইন্দ্রকীল। দেখল, সহসা শূন্যে আন্দোলিত হল খাপমুক্ত উলঙ্গ কৃপাণ। ফলার এক ঘায়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন কতকগুলো লতাপাতা ছিটকে পড়ল জমির ওপর।

মুখ কালো হয়ে গেল ইন্দ্রকীলের। থমথমে মুখে কি যেন ভাবল। তারপর দৌড়োলো রাস্তার দিকে। প্রাসাদের সামনে দিয়ে রাস্তাটা ঘুরে সমুদ্রের দিকে গিয়েছে। এবং ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে অ্যাডমিরালকে এই পথেই আসতে হবে। সৈকতপথ বেয়ে দত্ত-ভবনে আসবার এইটাই একমাত্র পথ। সুতরাং ইন্দ্রকীল সেই পথেই দৌড়োলো।

কিন্তু অ্যাডমিরাল বাড়ি ফিরলেন না। ইন্দ্রকীলও ফিরল না। অনেক...অনেক ঘণ্টা পরেও যখন কারো টিকি দেখা গেল না, তখন সোরগোল পড়ল দত্ত-ভবনে।

প্রতীক্ষা অবশেষে প্রমাদে পরিণত হল। সুদীর্ঘ থাম আর পাম গাছের ঘেরাটোপে ঢাকা দত্ত-ভবনে ঘর আর দালানের সংখ্যা যত, বাসিন্দার সংখ্যা তার চাইতে অনেক কম। সামনের হলে এদের একজনকে দেখা গেল। লোকটি আকারে অতিকায়, প্রকারে খরগোস, জীবিকায় অ্যাডমিরালের নায়েবস্থানীয়। দীর্ঘদিন ধরে এ বাড়ির এবং বাসিন্দাদের তত্ত্বাবধান করতে করতে বাড়ির একজন হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধের নাম হরিভক্ত।

পাকা চুল, পাকা গোঁফ, কিন্তু অনমনীয় মেরুদণ্ড।

সামনের হলঘরে পায়চারী করছিল হরিভক্ত। জানলার মধ্যে দিয়ে ঘন ঘন উদ্বিগ্ন চাহনি নিক্ষেপ করছিল বক্রাকারে বিস্তৃত শ্বেতপথের দিকে। পাদচারণীয় অস্থিরতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

হরিভক্ত অ্যাডমিরালকে ভক্তি করত মনিব হিসেবে। কিন্তু দাদা হিসেবে অ্যাডমিরালকে তার চাইতেও বেশি ভক্তি করত অ্যাডমিরাল সহোদরা দময়ন্তী। ভদ্রমহিলা বাকপটিয়সী। তবে কথার তোড়ের সঙ্গে জলপ্রপাতের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। চিন্তাবর্জিত চীৎকারেও তিনি পটু। কৌতুকপরিহাস জিনিসটা তাঁর কুষ্ঠিতে লেখা নেই। ভদ্রমহিলার আর এক নাম হিরন্ময়ী হওয়া উচিত। কেননা, বাবার কৌলিন্য বজায় রাখতে গিয়ে তিনি আপাদমস্তক কাঞ্চন অলংকারে ঢেকে রাখতে সদাব্যস্ত। হিরন্ময়ী ওরফে দময়ন্তী এই হলঘরেই উপস্থিত ছিলেন।

ঘরে উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তি একজন যুবতী। রূপসী। নাম মেখলা। অ্যাডমিরালের একমাত্র সন্তান। মেখলার টলটলে দুটি চোখ সদাই স্বপ্নছাওয়া। পিসীর মত কথার জলপ্রপাত নয় মেখলা। ঠিক উল্টো। অপ্রয়োজনে একটি শব্দও শোনা যায় না। কিন্তু শোনা যখন যায়, তখন মনে হয় বুঝি টুং-টাং করে কোথাও জলতরঙ্গ বাজছে। মেখলা বড় একটা হাসে না। কিন্তু যখন হাসে, তখন মনে হয় বুঝি জগৎজুড়ে আনন্দের হাট বসেছে, দোয়েল-কোকিল খুশীর গান গাইছে, নির্ঝরিণীর উৎস খুলে গিয়েছে।

দময়ন্তী ওরফে হিরন্ময়ী মাজু নাড়ালেন এবং স্বর্ণকিঙ্কণীর ফাঁকে ফাঁকে বললেন—'এখনো এসে পৌঁছোলো না কেন বুঝছি না। অথচ সমুদ্রের ধার দিয়ে অ্যাডমিরালকে বাড়ি ফিরতে দেখেছে ডাকপিওন। সঙ্গে অবশ্য ঐ উটকো বিটকেল জীবটা ছিল, লেফটেন্যান্ট নীলকণ্ঠ। হরি, হরি... কেন যে বাঁদরটাকে লেফটেন্যান্ট বলা হয় বুঝি না।'

মেখলার বিষাদময় নয়নে বিজুলী খেলে গেল। বলল, 'লেফটেন্যান্ট বলেই বোধ হয় লেফটেন্যান্ট বলা হয়।'

দময়ন্তী নাসিকাধ্বনি করে বললেন,—'মরণ আর কি! অ্যাডমিরাল ওকে এখনও রেখেছে কেন বুঝি না,' ভাবখানা যেন লেফটেন্যান্ট নীলকণ্ঠ অ্যাডমিরালের বাড়ির চাকর। যখন তখন দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলেই চলে। ভ্রাতৃগর্বে স্ফীত দময়ন্তীর কথার ধরন অবশ্য এইরকমই। দাদাকে দাদা বলে ডাকলে মানে লাগে। অ্যাডমিরাল না বললে অন্তর-ভক্তি প্রকাশ পায় না।

মেখলা জলতরঙ্গ কণ্ঠে বলল—'নীলকণ্ঠ অসামাজিক [illegible] হতে পারে [illegible] অফিসার হবে, এমন কোনো কথা নেই।'

'অফিসার!' নায়েগ্রা জলপ্রপাতের গর্জন শোনা গেল দময়ন্তী ওরফে হিরন্ময়ীর কণ্ঠে—'রামগড়ুরের ছানা আবার অফিসার হবে কী? অফিসার বটে সেক্রেটারী ইন্দ্রকীল। আহা! আহা! কি সুন্দর বক্তৃতা দেয়!'

হাসল মেখলা। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন ত্রিভুবনে আনন্দের হাট বসে গেল। হেসে বলল—'তা ঠিক। বই পড়ে বক্তৃতা শেখা নীলকণ্ঠের ধাতে নেই। ও জিনিসটা ইন্দ্রকীল ভাল পারে। দুনিয়ায় সব কিছুই বই পড়ে শিখতে পারে।'

অকস্মাৎ মুখ অন্ধকার হল দময়ন্তীর—'ইন্দ্রকীলও তো এখনো এল না।'

হাসি থামাল মেখলা—'তাও তো বটে। না এলেই বা কী?'

পিসী জবাব দিল না। নীরবে এসে দাঁড়াল জানলার পাশে।

তখন হলুদ সন্ধ্যে ধূসর হতে হতে আবার সাদা হয়ে আসছে। কারণ, চাঁদ উঠছে। ধু-ধু সৈকত চাঁদের আলোয় অপরূপ হয়ে উঠেছে। মসৃণ বালির ওপর দিয়ে চোখ পিছলে যাচ্ছে অনেক দূরে। কিন্তু গতিরুদ্ধ হচ্ছে এক জায়গায়। সেখানে লম্বা লম্বা তরুবীথির নীচে পাঁক, কাদা আর বদ্ধ জলভরা একটিমাত্র পুকুর। পাড়ে টিনের ছাউনি দেওয়া জেলেদের আস্তাখানা। বিচিত্র নাম আস্তাখানার। চাঁদের আলোতেও দূর থেকে সাইনবোর্ডটা দেখা যাচ্ছিল। জ্বল জ্বল করছিল নামটা—

সবুজ মানুষ।

তাস, জুয়া, দিশি মদের আড্ডায় এ নাম নিশ্চয় বেমানান। এ নামকরণের কোনো কারণও জানা নেই। সৃষ্টিছাড়া নামের ঐ টিনের ছাউনি ছাড়া নির্জন সৈকতে আর কিছুই চোখে পড়ল না। কিছুক্ষণ আগেই বালুকাভূমিতে অ্যাডমিরালকে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন যেন তাঁকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। পেছনের কিম্ভূত-কিমাকার সেই বিচিত্র মূর্তিটিও যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে। কাণ্ড দেখতে সাত তাড়াতাড়ি দৌড়েছিল সেক্রেটারী ইন্দ্রকীল। সে বেচারীও বুঝি কর্পূরের মত উবে গিয়েছে।

রাত দুপুরে কিন্তু দৃশ্যমান হল সেক্রেটারী। ঘূর্ণিবায়ুর মত বাঁই বাঁই করে দৌড়ে এল কোথেকে। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলল। হাঁকডাক শুনে সকলে নেমে এসে দেখল কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছে ইন্দ্রকীলের মুখ। পেছনে পুলিশ ইন্সপেক্টরের লালমুখ কিন্তু ভয়ানক থমথমে। সে মুখে প্রলয়ের সংকেত। মহাকালের সিগন্যাল। দেখেতো সবাই ভড়কে গেল।

ধীরে সুস্থে খবরটা ভাঙা হল। অ্যাডমিরাল রাকা দত্তকে পাওয়া গিয়েছে। শ্যাওলা, কাদা, পাঁক আর পচা জলভরা পুকুরটার মধ্যেই উনি শুয়েছিলেন নিষ্প্রাণ দেহে। মারা গেছেন জলে ডুবে।

ইন্দ্রকীলের উৎসাহ আর উত্তেজনা কিন্তু শতগুণে বৃদ্ধি পেল। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই প্রশ্নে প্রশ্নে বেচারী পুলিশ ইন্সপেক্টরকে জর্জরিত করে ফেলল। 'সবুজ মানুষ' নামক আস্তাখানার অনতিদূরে রাস্তা থেকেই ইন্সপেক্টরকে পাকড়াও করে এনেছিল ইন্দ্রকীল। কাজেই ভদ্রলোককে একটা আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন জেরা আরম্ভ করল যে বাইরের কেউ দেখলে ভাবত ইন্দ্রকীলই পুলিশ আর পুলিশ ইন্দ্রকীল। কিন্তু গোমড়ামুখো ইন্সপেক্টরকে দেখলে যতটা হাঁদামার্কা মনে হয় কাজে ততটা নন। কেন না, ইন্দ্রকীলের প্রশ্নবাণগুলোকে তিনি সুকৌশলে ঘুরিয়ে ইন্দ্রকীলের দিকেই নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং বুমেরাং-ব্যূহে প্রশ্নকর্তাকেই প্রায় কোণঠাসা করে আনলেন।

'দশ দিনে ডিটেক্টিভ হবেন?' শীর্ষক একটা কেতাব পড়ে কেতাবী ডিটেকটিভের কায়দায় ইন্দ্রকীল বলেছিল—'আজ্ঞে, তো মশায় মনে হয় এ হেলে সেই চিরাচরিত ত্রিভুজ। মানে, আত্মহত্যা, খুন অথবা দুর্ঘটনা।'

রামগড়ুর মার্কা পুলিশ ইন্সপেক্টর তখন বললেন—'অন্ধকার এমন কিছু গাঢ় হয়নি তখনও। তাছাড়া, পুকুরটাও চলার পথ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। কাজেই ভুল করে পুকুরে তিনি পড়ে যেতে পারেন না। দুর্ঘটনা অসম্ভব। আত্মহত্যার প্রস্তাবনাও অচল। কেন না, কে না জানে অ্যাডমিরালের মত কৃতী আর সুখী পুরুষ এ অঞ্চলে দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। তাঁর ঘরে শান্তি, কাজে শান্তি, মনে শান্তি, দেহে শান্তি। কাজেই খামোকা আত্মহত্যা করতে যাবেন কেন? টাকার ঘাটতি থাকলেও বরং কথা ছিল। কিন্তু উনি যে কোটিপতি, তা আপনিও জানেন, আমিও জানি।'

ইন্দ্রকীলের চক্ষু বিস্ফারিত এবং পরমুহূর্তেই সংকুচিত হল ব্যাখ্যা শুনে। শেষ হতেই কাংস্যকণ্ঠে বলল—'তাহলে নিশ্চয় খুন।'

'অত ধড়ফড় করে কোনো সিদ্ধান্তে আসাটা ঠিক নয়। 'ইন্দ্রনীকীলের আবার সব কিছুই ধড়ফড় করে করা অভ্যাস—অ্যাডমিরাল তো টাকার কুমীর। আপনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। বলতে পারেন এত টাকা কার ভোগে লাগবে। তিনি না থাকলে?

কাঁচুমাচু করে ইন্দ্রকীল বলল—'অত প্রাইভেট খবর রাখবার মত প্রাইভেট সেক্রেটারী আমি নই। অ্যাডমিরালের সলিসিটর্স-এর কাছে খোঁজ করলে উইলের খবর পেতে পারেন।'

'নাম কি সলিসিটর্স-এর?'

'মেসার্স পাই ডিক্সট মূর্তি।'

'ঠিকানা?'

'বসন্তনগুড়ি।'

'ফাঁক পেলেই একটা চক্কর দিয়ে আসব।'

ফাঁক এখুনি করে নিন। নিয়ে এখুনি যান।' ইন্দ্রকীলের যেন আর তর সইছিল না। অস্থির চরণে নিজেই ঘরময় একপাক ঘুরে এল।

তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল—লাশের কি হল?'

'পোস্টমর্টেম হচ্ছে। ডাক্তার কির্তন দেখছেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রিপোর্ট দেবেন।'

'এক কাজ করলে হয় না? চলুন না, সলিসিটরের অফিসেই দেখা করা যাক ডাক্তারের সঙ্গে।' বলতে বলতে অকস্মাৎ স্তব্ধ হল ইন্দ্রকীল। এতক্ষণ চোখেমুখে অস্বাচ্ছন্দ্যভাব ছিল. এবার দেখা গেল বিমূঢ়তা।

বলল—দেখুন স্যার, অ্যাডমিরালের মেয়ের কথাটাও ভাবা দরকার। মেখলা বলে নাকি এ সবই ঢু-ঢু। মানে বুঝলেন? মানে হল ফক্কা। কিস্যু না। আমরা নাকি ছেলেখেলা করছি। কি কাণ্ড বলুন তো। কোথাকার এক ফাদার ঘনশ্যাম, তার ওপর অগাধ আস্থা মেখলার। ঠিকানাও দিয়েছে আমাকে। বলতে সব......পাদরী-ফাদরীদের আমি আবার—বুঝেছেন কিনা—তেমন আমোল দিই না।'

'পাদরীদের আমিও আমোল দিই না,' বললেন ইন্সপেক্টর। 'তবে ঘনশ্যাম পাদরীকে দিই। হীরে চুরির একটা বিদঘুটে মামলায় ফাদার ঘনশ্যামের কীর্তি আমি দেখেছিলাম ভদ্রলোকের পাদরী না হয়ে দারোগা হওয়া উচিত ছিল।'

'তাহলে ফাদারকেও সলিসিটরের অফিসে আসতে বলি' ঘর থেকে রকেটের মত বেরিয়ে যেতে যেতে বলল ইন্দ্রকীল।

সলিসিটরের অফিসে পৌঁছে দেখা গেল এক বিচিত্র মূর্তিকে। চাঁদপানা মুখে হাসি আর ধরে না। থলথলে চর্বিতে নির্বোধ-ভাব। দুতোজড়ানো ডাঁটিভাঙ্গা চশমা। কালো আলখাল্লায় কাদা আর ধুলোমাখা। প্রায় সহস্র তালিমারা ভাঙ্গা ছাতাটি মিউজিয়ামে রাখবার মত। দিব্যি আয়েস করে চেয়ারে বসেছিল আহাম্মক প্যাটার্নের এই সজীব বস্তুটি। হেসে হেসে গল্প করছিল সলিসিটরের সঙ্গে।

ডাক্তার কির্তন বোধহয় সেই মুহূর্তেই পৌঁছেছিলেন। হাতের ব্যাগটা তিনি কোণের টেবিলে রাখলেন। এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন ঘনশ্যাম পাদরীর বোকা বোকা হাসি হাসি মুখের দিকে।

দৃশ দেখে ইন্দ্রকীল এবং ইন্সপেক্টর দুজনেই বুঝল, দুঃসংবাদটা এখনো ডাক্তার কাউকে জানান নি। জানালে ফাদারের হাসি উবে যেত। মুখ আমসি হত।

ঘনশ্যাম পাদরী বলছিল—কি মিষ্টি সকাল বলুন তো। রাতের ঝড় ভালই করেছে। ধুলো ময়লা উড়িয়ে নিয়ে গেছে—কিন্তু এক ফোঁটাও বৃষ্টি ফ্যালেনি।'

'তা যা বলেছেন,' একটা ফাউন্টেন পেন নাড়াচাড়া করতে করতে বলল সলিসিটর মিঃ মূর্তি। 'আকাশ তো দেখছি নির্মেঘ। ঠিক যেন ছুটির দিন।' বলতে বলতেই চোখ পড়ল অভ্যাগতদের ওপর। কলম রেখে উঠে দাঁড়াল। —'আরে ইন্দ্রকীলবাবু যে! আছেন কেমন? অ্যাডমিরাল ফিরেছেন?'

এতক্ষণে কথা বলল সেক্রেটারী ইন্দ্রকীল। ভিজে ভিজে গলা ভমরুধ্বনির মতই গমগম করে ঘরের মধ্যে।

বলল—'না অ্যাডমিরাল ফেরেন নি। ফিরবেন না। কাল রাত্তিরে উনি জলে ডুবে মারা গিয়েছেন।'

সব চুপ। হৃদপিণ্ডের স্পন্দনও বুঝি সকলের সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল। নিথর নিষ্পন্দ দেহে তাকিয়ে রইল সলিসিটর এবং পাদরী। 'জলে ডুবে' শব্দ দুটি বার কয়েক দুজনেই বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল। তারপর শুরু হল প্রশ্নের ভুড়ভুড়ুনি।

'কবে? কখন?' ফাদারের প্রশ্ন।

'লাশ কোথায়?' সলিসিটরের প্রশ্ন।

'সবুজ মানুষে'র পাশেই, জবাব দিল ইন্সপেক্টর। 'সমুদ্রের ধারে নোংরা পুকুরটায়। শ্যাওলা, কাদা পাঁকে চেনা যাচ্ছিল না অ্যাডমিরালকে। ডাক্তার ফিনি অবশ্য—ও কী! ফাদার! কী হল? শরীর খারাপ?'

থর থর করে কেঁপে উঠল ফাদার—'সবুজ মানুষ! না না, তেমন কিছু নয়। গা'টা হঠাৎ গুলিয়ে গেল।'

'কেন গুলোলো?'

'সবুজ শ্যাওলায় অ্যাডমিরাল নিজেই সবুজ মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন বলে।' কাষ্ঠহাসি হাসল বেঁটে পাদরী। 'শ্যাওলাটা সমুদ্রের হলেই বরং মানাতো।'

'সমুদ্রের শ্যাওলা?'

'মানে, সামুদ্রিক উদ্ভিদ।'

স্থির চোখে সবাই দেখছিল খর্বকায় পাদরীর চাঁদপানা মুখ। লোকটা যে পাগল, সে বিষয়ে কারোরই তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। ক্রিটিয়াল সন্দর ওয়ান! মনে মনেই বলল ইন্দ্রকীল।

অবশেষে নৈঃশব্দ খানখান হল ডাক্তার ফিনির মেঘমন্দ্র কণ্ঠে। উনি বললেন—'অ্যাডমিরাল দত্তর জলে ডুবে মৃত্যু সম্বন্ধে শেষ কথাটা এখনো বলা হয়নি।' বলে একটু থামলেন। পিলপিলে পাদরীর দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং শেষ করলেন—'অ্যাডমিরাল রাকা দত্ত জলে ডুবে মরেন নি।'

সঙ্গে সঙ্গে গাণ্ডীব টংকারের মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মুহূর্তেই একটা প্রশ্ন নিক্ষেপ করল ইন্দ্রকীল।

ডাক্তার তার জবাবে গুরু-গুরু কণ্ঠে বললেন—' লাশকাটা টেবিলে অ্যাডমিরালকে আমি উল্টে পাল্টে চেটেকুটে দেখেছি।

'ধারালো কিছু বুকে বিঁধিয়ে ওঁকে খুন করা হয়েছে। লাশটা জলেফেলা হয়েছে তার অনেক পরে।'

ফাদার ঘনশ্যাম কিছু বলল না। শুধু নিরীক্ষণ করতে লাগল ডাক্তার ফিনিকে। কুতকুতে চোখ দুটিকে বড্ড বেশী প্রদীপ্ত মনে হল। সেক্রেটারী ইন্দ্রকীল মিলিটারী গলায় জানতে চাইল অ্যাডমিরালের উইল বৃত্তান্ত। উইলটাই নিশ্চয় রহস্যের খনি। অর্থই অনর্থের মূল।

তিল থেকে তাল বানানোর প্রচেষ্টা নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল সলিসিটরের জবানিতে। ভদ্রলোক সবিস্ময়ে জানালেন, রহস্যের নামগন্ধ নেই তাঁর উইলে। স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তিনি নয়নের মণি মেখলাকে দিয়েছেন।

শুনে ফেলুন চুপসোনোর মত চুপসে গেল ইন্দ্রকীল। ইন্সপেক্টরের গোমড়ামুখে অবশ্য ভাবান্তর ঘটল না। একে-একে সলিসিটরের ঘর থেকে রাস্তায় নামল সকলে। হন্তদন্ত হয়ে আগে আগে চলল ইন্দ্রকীল। ঘনশ্যাম পাদরী কিন্তু ডাক্তারের গায়ে সেঁটে রইল।

ডাক্তার ফিনি অপাঙ্গে দেখলেন পিগমি পাদরীকে। বললেন,—'কি ভাবছেন?'

'ভাবছি অ্যাডমিরালের মেয়ের কথা' চোখ পিটপিট করে বলল ঘনশ্যাম। 'মেয়েকেই জানি। অ্যাডমিরালের সঙ্গে শুধু মুখচেনা।'

'আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। অ্যাডমিরাল অজাতশত্রু', অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাক্তার।

'অজাতশত্রুরও খবর থাকে। সেগুলো বোধহয় আমাকে বলা যায় না? পাদরী ঘনশ্যামকে একবার কিন্তু আহাম্মক মনে হল না।

ঢোকালের মেথা কঠিন হল ডাক্তারের। বললেন—'দেখুন মশায়, ভদ্রলোক ভয়ানক বদমেজাজী ছিলেন। একটা অপারেশনের ব্যাপারে আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন কোর্টে যাবেন। পরে অবশ্য সুবুদ্ধির উদয় হয়েছিল। ওরকম তেরিয়া মেজাজের লোক অধস্তন কর্মচারীদের তুলকালাম করবে, এ আর আশ্চর্য কি।'

ঠিক এই সময়ে ফাদার ঘনশ্যামের হস্তী-চক্ষু নিবদ্ধ হল ধাবমান ইন্দ্রকীলের ওপর। ইন্দ্রকীল সহসা যেন দৌড়োচ্ছে। কেন দৌড়োচ্ছে, তাও দেখা গেল। দত্ত-ভবনের দিকে ঘাড় হেঁট করে হাঁটছে মেখলা। দেখতে দেখতে মেখলার নাগাল ধরে ফেলল ইন্দ্রকীল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ দুটি চলমান মূর্তির পৃষ্ঠদেশে যে নীরব অভিনয় মঞ্চস্থ হল, তা অনিমেষে অবলোকন করল ঘনশ্যাম পাদরী।

সামনেই ডাক্তারের বাড়ি। দুম করে ফাদার জিজ্ঞেস করল —'তাহলে আপনার আর কিছু বলার নেই?'

'কেন থাকবে?' সমান বেগে জবাব দিলেন ডাক্তার। কেনই বা কিছু বলার থাকবে এবং কেনই বা তিনি তা বলবেন না—এ প্রসঙ্গ শূন্যে রেখেই তিনি সহসা অন্তর্হিত হলেন বাড়ির মধ্যে।

থপথপ করে একাই চলল ফাদার ঘনশ্যাম। দেখল, দত্ত-ভবনের তোরণের সামনে পৌঁছেছে ওরা দুজন। তারপরেই একটা কাণ্ড ঘটল। আচমকা বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল মেখলা। হনহন করে এল ফাদারের সামনে? ফিসফিস করে বলল—'ফাদার, ফাদার, জরুরী কথা আছে। এখুনি শুনতে হবে।'

'নিশ্চয় শুনব', সহজ গলায় বলল ফাদার—'মেখলার বসি বললে হয়?'

'মাঠে', বলে মেখলা নিজেই আগুয়ান হল। একটা ঝোপের সামনে অসঙ্কোচে বসল। ফাদারের হাত ধরে টেনে বসালো সামনে। কালবিলম্ব না করে বলল—'ইন্দ্রকীল ভয়ানক ভয়ানক কথা বলছে।'

ঘাড় কাৎ করল ফাদার। ভাবখানা, তা তো বলবেই।

'কথাটা নীলকণ্ঠ সম্পর্কে। চেনেন নীলকণ্ঠকে?'

'শুনেছি জাহাজে নীলকণ্ঠকে সবাই 'জলি নীলকণ্ঠ' বলে। কারণ, ঠিক উল্টো। নীলকণ্ঠ মোটেই 'জলি' নয়। বরং বোম্বেটেদের মত গোমড়া। মুখ তো নয় যেন নরককোটি।'

'নীলকণ্ঠ এখন 'জলি' নয় বটে—কিন্তু এককালে ছিল', বাতাসের মত সুরে বলল মেখলা। ঐ যে নির্জন সৈকত দেখছেন, ঐখানে আমরা দুজনে কত খেলা খেলেছি। ওর মত হাসিখুশী আমুদে মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। ওর বড় সখ ছিল জাহাজে চাকরী করবে। বোম্বেটেদের মত দাঁতে ছুরি কামড়ে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠবে। কোমরে তরোয়াল বেঁধে সাত সমুদ্রে পাড়ি দেবে। ওর সে স্বপ্ন সফল হয়েছে কিনা জানি না—কিন্তু জাহাজে চাকরী নেওয়ার কিছুদিন পর থেকেই ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে। বোধহয় নীলকণ্ঠের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। তাই হাসতে ভুলে গিয়েছে। আমাকেও ভুলতে চাইছে। আমার ধারে কাছেও আসতে চায় না—এড়িয়ে যায়। মনে হয়, স্বপ্নভঙ্গ ছাড়াও মস্ত একটা বেদনা ওর বুক ভেঙে দিয়েছে। ইন্দ্রকীলের মুখে এখন যা শুনলাম, তা যদি সত্যি হয়। তাহলে বলব নীলকণ্ঠ পাগল হয়ে গিয়েছে। নয়তো ওর ঘাড়ে ভূত চেপেছে।'

'কি বলেছে ইন্দ্রকীল?' ফাদারের প্রশ্ন।

'ভয়ংকর কথা বলেছে, বলতেও কষ্ট হয়। ইন্দ্রকীল নিজের চোখে দেখেছে কাল সন্ধ্যায় বাবার পেছন নিয়েছিল নীলকণ্ঠ। কিছুতেই যেন মনস্থির করতে পারছিল না। তারপর আচমকা তরোয়াল টেনে বার করেছিল...ডাক্তারের মুখে শুনলেন তো বাবার বুকে সরু ফলা ঢুকিয়ে কেউ খুন করেছে...বাবার সঙ্গে নীলকণ্ঠের কথা কাটাকাটি হত জানি। কিন্তু তার জন্যে খুন করা যায় না। নীলকণ্ঠ এককালে বন্ধু ছিল বলে এত কথা বলছি ভাববেন না। নীলকণ্ঠ এখন আর বন্ধু তো নয়ই—আমাকে চিনতেও পারে না। কিন্তু আমি জানতে চাই, কেন ইন্দ্রকীল দিব্যি গেলে বলল—'

'ইন্দ্রকীল সব কিছুই দিব্যি গেলে বলে', ধীরে সুস্থে বলল ফাদার ঘনশ্যাম।

কিছুক্ষণ সব চুপ। তারপর মেখলা কথা বলল। এবার একেবারে আলাদা সুরে।

'ইন্দ্রকীল আরও কিছু বলছে।'

'আরও কিছু?'

'আমাকে বিয়ে করতে চাইছে।'

'অভিনন্দনটা কাকে জানাই বলুন তো? তোমাকে না, ইন্দ্রকীলকে?'

খোঁচটুকু যেন গায়ে মাখল না মেখলা। বলল—'আমি বলেছি পুরো চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি আমি বাবাকে হারিয়েছি। এর মধ্যেই এত বিয়ে পাগল হওয়া সাজে না। তাছাড়া সবুরে মেওয়া ফলে।'

'মেওয়া!' ফাদার ঘনশ্যামের নির্বোধ মুখে যে ভাব জাগ্রত হল, অভিধানে তার নাম অবশ্য কৌতুক।

'ইন্দ্রকীল বলছে, আমি তার স্বপ্নের রাণী, নয়নের নিধি। আমি ছাড়া তার জীবন বৃথা। ইন্দ্রকীল নাকি কবে আমেরিকায় ছিল, সে কথাও বলল। কিন্তু তার প্রমাণ পেলাম ওর হিসেবী মন দেখে।'

পাদরী ঘনশ্যাম গম্ভীর হল—'বুঝেছি। ইন্দ্রকীলের ব্যাপারে মনস্থির করার আগেই তুমি নীলকন্ঠর ব্যাপারটা খোলসা করতে চাও।'

নিমেষে যেন একমুঠো ফাগ পড়ল মেখলার টুকটুকে সুন্দর মুখে। নিখুঁত সতেজ আনন ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হল। পরমুহূর্তেই হাসল মেখলা। বুঝি একঝাঁক পায়রা উড়ে গেল নীল আকাশে। ত্রিভুবনে আনন্দের হাট বসে গেল। মুখ টিপে শুধু বলল—'যাঃ!'

কিছুক্ষণ সব চুপ। মেখলার মুখে স্বর্গসুখের আভাস। তারপর পত্র মর্মরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল মেখলা—'ফাদার।'

'বল।'

'আপনি বড্ডো বেশি জেনে ফেলেছেন।'

'নারে। তেমন কিছুই জানিনি। শুধু একটি ছাড়া।'

'কোনটা?'

'তোর বাবাকে যে খুন করেছে।'

তড়িতাহতের মত সিধে হয়ে বসল মেখলা। সাদা হয়ে গেল মুখ। ঘনশ্যাম পাদরী ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে যেন ছিন্ন ঘাসকেই উদ্দেশ করে বলল—'আমি একটা প্রকাণ্ড উজবুক। খুনীর নাম যখন প্রথম টের পেলাম, তখন এমন 'সিন ক্রিয়েট' করলাম যে সবাই ভাবল আমি বুঝি পাগল।'

'কখন টের পেলেন?'

'যখন ওরা সবুজ শ্যাওলা আর 'সবুজ মানুষ' নিয়ে কথা বলছিল।'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল পিগমী পাদরী। তাপ্পা ছাতাকে বগল দাবা করার বহর দেখেই বোঝা গেল মতলব স্থির। কঠিন সংকল্প চিক-চিক করল কুৎকুতে ঐরাবত-চোখে।

বলল বেজায় গম্ভীর গলায়—'শোন মেখলা, যা বললাম, তা ছাড়াও আমি আরও কিছু জানি। কিন্তু তোকে বলব না। খবরটা খারাপ সন্দেহ নেই, কিন্তু তুই যতটা খারাপ ভাবছিস ততটা নয়। আমি এখন চললাম নীলকন্ঠ দর্শনে। শুনেছি, সমুদ্রের ধারে 'সবুজ মানুষ'-এর আশপাশে কোথাও যেন থাকে ছোকরা। ইন্দ্রকীল অবশ্য ঐখানেই ঘুর ঘুর করতে দেখেছিল ওকে। দেখা যাক,' বলে চলন্ত জালার মত বেগে উধাও হল ঘনশ্যাম পাদরী।

মেখলা সাত-পাঁচ ভাবতে লাগল। উদ্ভট উদ্ভট চিন্তা মাথায় আকার নিতে লাগল। ফাদারের অকস্মাৎ লম্ফ নিয়ে গবেষণা করল। সবুজ শ্যাওলা আর সবুজ মানুষ সম্পর্কিত হেঁয়ালি নিয়ে আকাশ-পাতাল জল্পনা করল। ভরদুপুরেও মনে হল যেন রক্ষকক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসছে। মনে হল, সাগরপাড়ের নোংরা জলার কাদা আর পাঁকে সবুজ প্রেত বিচরণ করছে। যেন 'সবুজ মানুষ' নিছক আস্তাখানা নয়—কায়াহীনদের ষড়যন্ত্র-গৃহ।

সূর্য অস্ত যাবার আগেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। মেখলা যা হারিয়েছিল, তা আবার ফিরে পেল। কিন্তু মনে হল, দুনিয়াটা বুঝি সহসা উল্টে গেছে। নইলে এমন অসম্ভব কাণ্ড কেন ঘটবে? কেন এত বছর পরে বিস্তীর্ণ বালুকাভূমির ওপর দিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে নীলকন্ঠকে এগিয়ে আসতে দেখা যাবে? কেনই বা দূর থেকে মনে হবে নীলকন্ঠ আবার আগের নীলকন্ঠ হয়ে গিয়েছে? সেই রকম হাসি-খুশী, প্রাণবন্ত উচ্ছল?

বহু দূরে প্রথমে বিন্দুর মত দেখা গিয়েছিল নীলকন্ঠকে। কিন্তু তবুও মেখলার মনে হয়েছিল সচল কিছুটা যেন আনন্দে আটখানা, খুশীতে ডগমগ! দৃষ্টি-বিভ্রম নয় তো?

কাছে আসতে মেখলা দেখল, না ভুল নয়। নীলকন্ঠই বটে। কিন্তু যেন মন্ত্রবলে পালটে গিয়েছে তার মুখের চেহারা। আনন্দ, উল্লাস, হাসি যেন ঝলমল করছে তার অবয়ব ঘিরে। নীলকন্ঠ... সেই নীলকন্ঠ...বহু বছর আগের নীলকন্ঠই আবার ফিরে আসছে...বিষণ্ণ নয়—প্রসন্ন নীলকন্ঠ...সোজা সামনে এল সে শক্ত মুঠিতে মেখলার দু কাঁধ চেপে ধরল...কয়লাহীরের মত ঝকঝকে চোখে মেখলার বিহ্বল মুখ দেখল...তারপর অট্টহেসে বলল—'মেখলা, এবার তো আমিই তোমার দেখব।'

মেখলা কেমন কিরকম হয়ে গেল। কি বলল, তা ও নিজেই জানল না। বুকফাটা বেদনাই ঝরে পড়ল আকুল কটি কথার মধ্যে। জানতে চাইল, কেন, কেন নীলকন্ঠর এই পরিবর্তন? কেনই বা আনন্দে আটখানা তার চিত্ত?

'কেন জানো না?' সকৌতুকে বলল নীলকন্ঠ—'দুঃসংবাদটা এই মাত্র শুনলাম যে!'

•

দত্ত-ভবনের সামনের বাগানে সেদিন সবাইকে দেখা গেল। অ্যাডমিরাল রাকা দত্তর সলিসিটর মিঃ মূর্তিও এসেছে। মক্কেলের মৃত্যুতে তার কাজ বেড়েছে। উইলের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। তাই সবার মনেই কৌতুহল।

এসেছে সবাই। যাদের দরকার, তারা তো বটেই; যাদের দরকার নেই, তারাও বাদ যায়নি। যেমন পুলিশ ইন্সপেকটর। দুই চোখে তাঁর জীবন্ত জিজ্ঞাসা। এনার্জি-ঠাসা প্রিসটন-রাজের মত ছটফট করছে প্রাইভেট সেক্রেটারী ইন্দ্রকীল। উল্কাবেগে গেটকে যাচ্ছে, অভ্যাগতদের বাগানে ডেকে আনছে এবং পরমুহূর্তেই আবার নক্ষত্র-বেগে উধাও হয়ে যাচ্ছে নতুন অভ্যাগতদের খাতির করতে। লেফটেন্যান্ট নীলকন্ঠ লাজ-লজ্জার বালাই না রেখে মেখলাকে নিয়ে প্রজাপতির মত ফুরফুর করছে। একটা কদাকার ছাতাকে কবজাস্থ করে বেজায় বদখুটে এক বেঁটে পাদরীও দাঁড়িয়ে আছে একাকোণে। লোকটার নিরেট মুখের নির্বোধ চাহনি দেখে অনেকেই মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

বাগানের সবুজ লনে পুরো দলটাকে ...ড় করিয়ে রেখে সহসা বাড়ির মধ্যে ...াও হল ইন্দ্রকীল। আপ্যায়নের আয়োজন ...ম্পূর্ণ করেই ফিরে আসছে—এ কথাও ...ল গেল। চোখের আড়াল হতেই গুনিয়ে ...নিয়ে বলল নীলকণ্ঠ—'দেখলেই মনে হয় ...ন ক্রিকেট খেলছে—রান তুলতেই ব্যস্ত।'

সলিসিটর বলল—'ছোকরা যেন ঘোড়ায় ...ন দিয়ে এসেছে। আমার ওপরেই ঝাঁপ ...রে গেল কেন উইল অনুযায়ী তাড়াতাড়ি ...জ করছি না। মেখলা কিন্তু বোঝে। ...রির জন্যে তাগাদা লাগায় না।'

ফস করে ডাক্তার বললেন—'ছোকরা ...ন্তু দিব্বি চটপটে। বেশ চৌকস।'

নীলকণ্ঠ ভুরু তুলল—'মানেটা বোঝা ...ল না। চটপটে হওয়াটা কি দোষের?'

'মোটেই না, মোটেই না,' ডাক্তার ...জেই প্রহেলিকা হলেন—'শুধু চটপটে ...লেতো ভালই হত। সেই সঙ্গে বড্ডো ...ড়বড়ে কিনা।'

'এটা কি শব্দ-জব্দর নতুন খেলা?' ...কটু রূঢ় শোনালো নীলকণ্ঠর গলা।

'আজ্ঞে না। ইন্দ্রকীলবাবু ভীষণ ...টপটে। পায়ে যেন অষ্টপ্রহর পাখা ...াগানো। কিন্তু বলতে পারেন, এ হেন ...-পাখা মানুষটা রাতদুপুর পর্যন্ত ...ুকুর আর 'সবুজ মানুষে'র আশপাশে ...কন ঘুটমুট ঘুরঘুর করল? কেনই বা ...ন্সপেকটরের না আসা পর্যন্ত নিড়বিড়ে ...য়ে রইল। ইন্সপেকটরই এসে লাশ ...আবিষ্কার করেন, তাই না? ইন্সপেকটরের ...সঙ্গে 'সবুজ মানুষ' আড্ডাখানার বাইরে ...রাতদুপুরে মোলাকাৎ করার কি দরকার ...ছিল ইন্দ্রকীলবাবুর?'

নীলকণ্ঠ পলকহীন চোখে চেয়ে রইল। বলল—'ইন্দ্রকীল তাহলে মিথ্যে বলছে?'

ডাক্তার মৌনী হয়ে গেলেন। অট্টহাস্য করল সলিসিটর।

বলল—'ছোকরার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ শুধু একটাই। আইন নিয়ে আমাকে জ্ঞান দিতে আসাটা ধৃষ্টতার ...শামিল নয় কি?'

এবার মুখ খুললেন পুলিশ ইন্সপেকটর ...—তা যদি বলেন তো সে অভিযোগ আমারও আছে। ভদ্রলোক আমাকেও গোয়েন্দাগিরি নিয়ে জ্ঞান দিতে এসে-ছিলেন। কিন্তু সেটা দোষের নয়। দোষের ...হল ডাক্তারবাবু যা বলছেন। সিরিয়াস ব্যাপার। এ প্রশ্নের জবাব ইন্দ্রকীলবাবুকে এখুনি দিতে হবে।'

নীলকণ্ঠ বলল—'ঐ তো আসছে ইন্দ্রকীল।'

...মোরগোড়ায় দেখা গেল চলমান ...স্যুটধারীকে। কিন্তু কেউ কিছু বলার আগেই অতর্কিতে ঠিক যেন শঙ্খচিলের ডাক শোনা গেল।

সচমকে সবাই দেখল কদাকার পাদরী লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে সবার আগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দুহাত তুলে রাস্তা আটকেছে এবং অবিকল শঙ্খচিলের মত তীক্ষ্ন গলায় চেঁচাচ্ছে—'দাঁড়ান! এগোবেন না! ইন্দ্রকীলবাবুকে আগে আমি একটা কথা বলব। সেটা বলা না হলে জানবেন যাচ্ছেতাই রকমের একটা ভুল বোঝাবুঝি হবে।'

'এটা কি ধরনের তামাসা?' চোয়াল শক্ত হল সলিসিটরের।

'তামাসা নয়—দুঃসংবাদ,' বলল ফাদার ঘনশ্যাম।

'দেখুন ফাদার,' চোখ গরম করে কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন ইন্সপেকটর। কেননা, হঠাৎ মনে পড়ল এর আগেও কয়েক ক্ষেত্রে এরকম তামাসা দেখিয়েছে বেঁটে পাদরী এবং প্রতিবারে ভেলকিও দেখা গেছে। 'নেহাৎ আপনি বলে আমি—'

ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল ততক্ষণে সচল জালার মতই বিস্ময়কর বেগে দৌড়োচ্ছে ইন্দ্রকীলের দিকে। দুজনেই হাত মুখ নেড়ে কিছুক্ষণ পায়চারী করল গাড়ি-বারান্দায়। অন্তর্হিত হল বাড়ির মধ্যে। মিনিট খানেক পরে ফাদার ঘনশ্যাম একাই বেরিয়ে এল—ইন্দ্রকীল নয়।

তাজ্জব কাণ্ড! বাড়ির মধ্যে পুনঃ-প্রবেশের কোনো বাসনাই দেখাল না ফাদার। সবাই যখন শোভাযাত্রা করে সদর দরজা পেরুলো, পাদরীঘনশ্যাম তখন সবুজ লনে ধপাস করে বসে পড়ল। পাইপ ধরিয়ে স্মিত মুখে বিহঙ্গ-কূজন শুনতে লাগল। দুই চোখে ভাসতে লাগল নিবিড় প্রশান্তি।

*

সদর দরজা আবার যখন সশব্দে দুহাট হল, ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল তখন তাম্রকূটের পুঞ্জ পুঞ্জ ধূম্রে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত। সবার আগে দৌড়ে এল মেখলা আর নীলকণ্ঠ। দুই চোখে তাদের বিপুল বিস্ময়। পেছনে পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে এলেন ইন্সপেকটর। থমথমে মুখে প্রচণ্ড ক্রোধ।

মেখলা জলতরঙ্গ-ঝংকারে বলল—'ফাদার, একী কাণ্ড! ইন্দ্রকীল নেই!'

'পালিয়েছে!' সমান তেজে বলল নীলকণ্ঠ—'সুটকেশ নিয়ে চম্পট দিয়েছে ইন্দ্রকীল। ফাদার, কি বলেছিলেন ওকে?'

রুদ্ধশ্বাসে মেখলা বলল—'বলবেন আবার কি? যা সত্যি তাই বলেছেন। উঃ, হাড়ে হাড়ে এত বদমাসি ছিল?'

বোমার মত ফাটলেন ইন্সপেকটর—'একী করলেন ফাদার? এভাবে আমার মাথা হেঁট করলেন কেন?'

'আমি?' চোখ কপালে তুলল ফাদার ঘনশ্যাম, 'কী করেছি আমি?'

'কি করেন নি?' ইন্সপেকটরের বিকট চীৎকারে সামনের গাছের পাখীগুলো ভয় পেয়ে আকাশে উড়ল।' খুনে বদমাসটাকে আপনি পালাতে দিয়েছেন, হাতে হাত মিলিয়েছেন।'

'অতীতে অনেক খুনে বদমাসের হাতে আমি হাত মিলিয়েছি ঠিকই,' থেমে থেমে বলল ফাদার ঘনশ্যাম, 'কিন্তু খুন করতে নয়।'

মেখলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল—'আপনি কিন্তু জানতেন। তাই লাশ পাওয়ার খবর শুনে আপনি ওরকম হয়ে গেছিলেন। ডাক্তারবাবুও বলেছিলেন, অধস্তন কর্মচারীরা দুচক্ষে দেখতে পারেনি বাবাকে।'

'ছিঃ, ছিঃ, গোড়া থেকেই আপনি জানতেন—' ইন্সপেকটরের শুরু করলেও তাঁর মুখের কথা লুফে নিয়ে বলল মেখলা—'জানতেন আসল হত্যাকারী আসলে—'

'সলিসিটর মিঃ মূর্তি,' ধীর গম্ভীর কণ্ঠে শেষ করল ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডল।

'কে?' যেন বন্দুক নির্ঘোষ শোনা গেল ইন্সপেকটরের কণ্ঠে। আবার কতক-গুলো পাখী আকাশে উড়ল।

কিন্তু তখুনি কোনো জবাব দিল না ফাদার। ধীরেসুস্থে পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়ল। তারপর ঘাসকে উদ্দেশ করে বলল —'আমি জানতাম। গোড়া থেকেই আমি জানতাম সলিসিটর মিঃ মূর্তিই খুন করেছেন অ্যাডমিরাল রাকা মল্লকে। উইল পড়ার জন্যে ঐ তো উনি এসেছেন। জিজ্ঞেস করেই দেখুন না।'

শ্বাসরোধী স্তব্ধতা। জোড়া জোড়া স্তম্ভিত দৃষ্টি নিবদ্ধ ফাদারের ওপর। ফাদার অবশ্য তখন পাইপে নতুন তামাক ঠাসতে ব্যস্ত। দেশলাই ঠুকে অগ্নিসংযোগ করা পর্যন্ত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ইন্সপেকটর। তারপর আবার শুরু হল তর্জনগর্জন।

'কিন্তু কেন?'

'তাও তো বটে; কেন?' বলতে বলতে চিন্তান্বিত মুখে উঠে দাঁড়াল ফাদার। গলগল করে তামাকের ধোঁয়া বেরোতে লাগল নাকমুখ দিয়ে। 'কেন? বড় জটিল প্রশ্ন। কেনর উত্তর দিতে গেলে একটা বড় ক্রাইমের খবর দিতে হয়। জঘন্য অপরাধ। না, না, খুন নয়—খুনের চাইতেও খারাপ।'

বলে, পাইপ নামিয়ে মমতাভরা চোখে তাকাল মেখলার দিকে। বলল স্নেহকোমল কণ্ঠে—'দুঃসংবাদ সহ্য করার মত মন তোর আছে মেখলা। তাই সোজাসুজিই বলছি। তুই অ্যাডমিরাল রাকা মল্লর কপর্দকশূন্য ওয়ারিশ!'

পবনদেবও বুঝি থমকে গেল দুঃসংবাদটা শুনে। পাখীগুলো কিন্তু হঠাৎ মহাউল্লাসে কোলাহল করে উঠল মাথার ওপর।

নির্বিকার গলায় বলল ঘনশ্যাম পাদরী —'সলিসিটর মিঃ মূর্তি হলেন পয়লা নম্বরের প্রতারক। বন্ধুর মুখোশ পরে তিনি তোর বাবাকে পথে বসিয়েছেন। যাঁর হাতে সম্পত্তির যাবতীয় ভালমন্দ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে সাগর পাড়ি দিতেন তোর বাবা, সেই সলিসিটরই অ্যাডমিরালের শেষ কাণাকড়িটিও ফুঁকে উড়িয়ে দিয়েছেন। পথে বসানোর পর অ্যাডমিরালের মুখ বন্ধ করার জন্যেই তাঁকে খুন করার দরকার হয়েছিল। সেকাজও নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে।' বার দুয়েক টান দিয়ে নিভন্ত তামাক আবার জ্বালিয়ে নিল ফাদার। 'তুই যে কপর্দকশূন্য হয়েছিস, এই দুঃসংবাদটাই নীলকণ্ঠকে শুনিয়েছিলাম। শুনেই নীলকণ্ঠ দৌড়ে এল। দুহাতে তোকে আগলে রাখল। অসাধারণ মানুষ এই নীলকণ্ঠ।'

'থামুন মশায়।' খেঁকিয়ে উঠল নীলকণ্ঠ।

'নীলকণ্ঠ এ যুগের মানব-দানব' বিশ্লেষণ-তন্ময় বৈজ্ঞানিকের মত প্রশান্ত কণ্ঠ ফাদার ঘনশ্যামের। 'নীলকণ্ঠ একটা ছন্নছাড়া ব্যতিক্রম, প্রাগৈতিহাসিক অনুকরণ, প্রস্তর যুগের বর্বর জীবাশ্ম। নীলকণ্ঠের মত প্রাণী এ যুগে লোপ পেয়েছে। অধুনা-লুপ্ত সরীসৃপ-দানব। নীলকণ্ঠ বউয়ের পয়সায় খেতে চায়নি—নিজের পয়সায় বউকে খাওয়াতে চেয়েছে। অষ্টপ্রহর বাপের বাড়ির টাকার খোঁটা দেবে, এমন বউ চায়নি নীলকণ্ঠ। তাই ঐরকম ছন্নছাড়া দিকহারা হয়ে গিয়েছিল এতদিন। কিন্তু যেই আমি গিয়ে তোর রাস্তায় বসার সুসংবাদ দিলাম, অমনি হাসিখুশীতে ঝলমল করে উঠল। নীলকণ্ঠ বউকে মুঠোয় রাখতে চায়—বউয়ের মুঠোয় থেকে চায় না। কিরে, গা কিরকম করছে নাকি? গুহামানব চরিত্র তাই না? এবার শোন, ইন্দ্রকীলের কীর্তি।

'ইন্দ্রকীলকে যেই বললাম তুই পথে বসেছিস, অমনি তাড়াতাড়ি সুটকেশ গুছিয়ে জাহাজের চোঁচা দৌড় দিল বেচারী। খামোকা রাগ করিস নি ওর ওপর। ও হল রাজপুত্রী টাইপ। উচ্চাকাঙ্ক্ষী। রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই চায়। রাজত্ব বাদ দিয়ে রাজকন্যা পোষা বড় ঝকমারি ব্যাপার। হিসেবে আসে না। কাজেই প্র্যাকটিক্যাল সেক্রেটারী প্র্যাকটিক্যালি চম্পট দিয়েছে।'

'অ্যাডমিরাল যে রাস্তায় বসেছেন, এ খবর আমি তাঁকে দিইনি। কিন্তু উনি পেয়েছিলেন। পেয়ে রেগে তিনটে হয়ে সোজা জাহাজ থেকে ডাঙায় নামেন। অভ্যেসমত ধড়াচুড়ো ছাড়তেও ভুলে গিয়েছিলেন। হন হন করে চলেছিলেন বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে শায়েস্তা করতে। রাগের চোটে দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। আগেই অবশ্য পুলিশে খবর পাঠিয়েছিলেন। তাই মাঝরাতে ইন্সপেক্টরকে দেখা গিয়েছিল 'সবুজ মানুষ' আড্ডাখানার পাশে। অগ্নিশর্মা অ্যাডমিরালের সামনে যাবার সাহস ছিল না লেফটেন্যান্ট নীলকণ্ঠর। অথচ তাঁর ক্রোধ দেখে সে প্রমাদ গুনেছে—বুক দিয়ে সাহায্য করার জন্যে পেছন পেছন দৌড়েছে। কিন্তু দ্বিধা আর ভয়ের জন্যে সামনে যেতে পারেনি। সৈকতে নীলকণ্ঠর খাপছাড়া হাঁটার এই হল কারণ। আর তরোয়াল? নীলকণ্ঠর ভেতর একটা ছেলেমানুষ আছে। সে অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসে, তরোয়াল ঘুরোতে ভালবাসে—তাই পদমর্যাদায় তরোয়াল খাপ না খুলেই একটা তরোয়াল কোমরে ঝুলিয়ে রাখে। কে না জানে, ফাঁকা জয়গায় হাতিয়ার নিয়ে আস্ফালন করতে শিশু বুড়ো সকলেই ভালবাসে। নির্জন সমুদ্রতীরে হঠাৎ তরোয়াল বার করে মাথার ওপর ঘুরিয়ে গাছপাতা জবাই করে তাই নির্দোষ আনন্দে মেতেছিল নীলকণ্ঠ।

'হাতিয়ার নিয়ে খেলা করার প্রবণতা প্রত্যেক পুরুষের মধ্যেই আছে। হাতিয়ার না হয়ে হাতিয়ারের মত চেহারা হলেও নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছে যায়। কাগজকাটা ছুরিও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই আমি অত অবাক হয়েছিলাম।'

'কখন অবাক হয়েছিলেন?' মেখলার প্রশ্ন।

'সলিসিটর মিঃ মূর্তি যখন এই সহজ প্রবণতার ব্যতিক্রম হলেন।'

'মানে?' ইন্সপেক্টরের হুংকার।

'সলিসিটরের অফিসে সেদিনের কথা মনে নেই?' বলল ফাদার ঘনশ্যাম। 'কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন সলিসিটর—কাগজকাটা ছুরি পাশেই পড়েছিল। দিব্বি ঝকঝকে ছুরি। ফলাটা বেশ ছুঁচোলো। সে তুলনায় কলমটা ভাঙা, ধুলোয় ভর্তি, কালিতে নোংরা। ছুরিটা কিন্তু সদ্য সাফ করা। অথচ ছুরি নিয়ে খেলা করলেন না মিঃ মূর্তি। কেন? গুপ্তঘাতক হলেও মনের সঙ্গে ছলনা করার একটা সীমা আছে।'

কিছুক্ষণ সব চুপ। সবাই যেন মন্ত্র-মুগ্ধ। অকস্মাৎ হুঁশ হল ইন্সপেক্টরের। পেছন ফিরে দেখলেন, সলিসিটর নেই।

কিন্তু ব্যস্ত হলেন না। মাথা চুলকে বললেন—'খুনীকে ঠিক কখন খুনী বলে মনে হল বলুন তো?'

'ঠিক যখন ইন্দ্রকীল সলিসিটর অফিসে গিয়ে খবর দিল অ্যাডমিরাল আ ফিরবেন না। উনি জলে ডুবে মারা গেছে তখন। কিন্তু কারো পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না যে অ্যাডমিরাল কিভাবে মা গিয়েছেন। শুধু জানতাম, অ্যাডমির ফিরছেন। ইন্দ্রকীল যেই বলল, জলে ড উনি মারা গিয়েছেন, অমনি আমি জিজ্ঞেস করলাম—'কবে? কখন? কিন্তু মিঃ মূ জিজ্ঞেস করলেন—লাশ কোথায়?'

ঘনশ্যাম পাদরী থামল। পাইপ ঠু ছাই ঝাড়ল। তারপর যেন নিজেকেই বল লাগল—'সমুদ্রে যাঁর বারোমাস কাটে, ত যদি শোনা যায় তিনি জলে ডুবে ম গিয়েছেন, তাহলে ধরে নিতে হবে সমু তিনি ডুবেছেন। কিন্তু এ জেনেও যদি ফস করে বলে বসেন, লাশ কোথায়, তা স্বভাবতই মনে হয়—প্রশ্নকর্তা জা লাশটা সমুদ্রে নেই—অন্য কোথায় আ মানে, যেখানে উনি রেখে এসেছেন। নি মনের এই হল কারসাজি। অবচেতন সলিসিটরকে সেদিন ধরিয়ে দিল। আমি অমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল ছাজার হলেও খুনীর সামনা সামনি চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। হাত-পা ঠাণ্ডা গিয়েছিল। আবোলতাবোল বকে হবার চেষ্টাও করেছিলাম। বলেছিলাম শ্যাওলায় অ্যাডমিরাল সবুজ হয়েছি সে শ্যাওলাটা বরং সামুদ্রিক উদ্ভিদ হ মানাতো। কথাটা দ্ব্যর্থক।'

'কিন্তু অ্যাডমিরাল খুন হ কোথায়?' ইন্সপেক্টর এবার যেতে হল।

'হায় পোড়াকপাল, সাতকাণ্ড রা শুনে শেষে এই প্রশ্ন?' ফাদার ঘনশ্যা এই প্রথম খেঁকিয়ে উঠতে দেখা 'সোজা সলিসিটরের অফিসে গিয়েছি অ্যাডমিরাল। নীলকণ্ঠ অন্দুর ধাওয়া করে নিজের বাড়ি যায়। সলিসিটর টেবিলের কাগজকাটা ছুরি দিয়ে বধ করে লাশটা রাতারাতি পুকুরে ফেলে হয়েছে?'

শেষ প্রশ্নটা অবশ্য ইন্সপেক্টর শুনেই প্রভঞ্জন-বেগে তিরোহিত হল একঘণ্টার মধ্যেই শাই, ভিজিট, সলিসিটরর্স-এর অন্যতম অংশীদার মূর্তিকে গ্রেপ্তার করল।

ঠিক সেই সময়ে ধু ধু বালুকা ছেলেমানুষের মত ছুটোছুটি ব দুটি মূর্তি। নীলকণ্ঠ আর মেখলা।

(*বিদেশী

চড়া সুদ
চান?
7¼%
বছরে
7 বছরের
জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট (৪র্থ ইস্যু)
সঞ্চয়ের একটি উত্তম প্রস্তাব।
করমুক্ত সিকিউরিটি এবং অন্যান্য জমার সুদ সমেত
3000 পর্যন্ত সুদের টাকায় কর দিতে হবে না।
বিশদ বিবরণীর জন্যে আপনার বাড়ীর কাছের পোষ্ট
অফিসে খোঁজ নিন।
জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা
davp 70/371

স্তং সুর সৃষ্টি সম্ভব একই বিষয়বস্তুর উপর কেন্দ্র করে, কিন্তু দুটির মিল সাম্য-নাই। বিঠোফেন এক সময় তাঁর এক ছাত্রকে 'ডি মাইনর সোনাটা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেকস্পীয়রের 'টেম্পেস্ট' পড়তে উপদেশ দেন। কিন্তু তা তিনি কৌতুক করেই বলে-ছিলেন বলে মনে হয়। নয়তো তিনি 'টেম্পেস্ট'-এর নামই শুনেছেন, পড়েননি। কারণ শিরোনাম ছাড়া দুটি শিল্প কর্মের মিল নেই। সঙ্গীত ভাষাশ্রয়ী হলে তা সার্থক হতে পারে না, সেজন্যই ভাগ্নার প্রতিভাবান সঙ্গীত স্রষ্টা হয়েও তাঁর সঙ্গীত বিঠোফেনের মত প্রাণস্পর্শী হতে পারে নি। বিঠোফেন তাঁর 'এফ মেজর কোয়ারটেট' রচনা কালে 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'-এর কোনও দৃশ্যের কথা স্মরণে রাখলেও দুটি শিল্প-কর্মের রূপ ভিন্ন, তাই বিঠোফেনের রচনা অনুকরণদোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছে। বিঠোফেন ভাবপ্রকাশের একমাত্র স্বাধীন বাহন বলে মনে করতেন সঙ্গীতকে। সঙ্গীতেই সৃষ্টির মূল সুর অব্যাহত থাকে। তাঁর 'সিম্ফনি' এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পরিবর্তিত হয়ে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ছন্দবদ্ধ প্রকাশে সার্থক। সেজন্য তাঁর শেষ জীবনের প্রতিটি রচনার সুর অখণ্ড ঐক্য-বদ্ধ, সুসংহত।

বিঠোফেন প্রচলিত নিয়ম উপেক্ষা করে চলতেন। অবশ্য প্রথম জীবনের রচনায় বাখ্ ও মোৎসারটের পদ্ধতির ক্ষীণ ছায়া-পাত লক্ষ্যণীয়। শেষ জীবনে তিনি হ্যান-ডেলের রচনা নিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে-ছেন। তবু তিনি সকলের প্রভাব-মুক্ত। তাই বলে তিনি জীবনকে অস্বীকার করেন নি, তাঁর সঙ্গীতে আনন্দ, বেদনা, উদ্যম, আশা, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা—কিছুই উপেক্ষিত নয়। এ সব কিছুই তাঁর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছে। বাহ্যিক প্রভাব তিনি উপেক্ষা করে চলতেন। তাঁর 'ইরোইকা সিমফনি' বীর যোদ্ধা নেপো-লিয়ন, এবারক্রোমবে প্রমুখের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও তা কোন একজন বীরের জীবন-গাথা নয়, তাঁর নিজ মনের প্রতিফলনে সে সুর বিশ্বজনীন। সাফল্যের মধ্যেই জীবন—একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, এই বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে, তাঁর 'সি মাইনর সিমফনি'তে। এমনিভাবেই তাঁর উপলব্ধির অনুভূতি সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। 'হ্যামারক্লেভিয়ার সোনাটা' অপরাজেয় আত্মোপলব্ধির অচৈতন্য প্রকাশ, কেননা যে কোনও মহৎ শিল্পসৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত, যা কোন বাঁধাধরা নিয়মের ভিতর দিয়ে উৎসারিত হয় না। বিঠোফেনের ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে, সে ব্যক্তিত্ব একটি নিটোল সুর সৃষ্টির মত অবিচ্ছিন্ন, সুসংযোজিত এবং ছন্দবদ্ধ। তাঁর চিন্তায় গভীরতাও ব্যাপক, যা খুব অল্প সঙ্গীতস্রষ্টার স্পষ্ট।

তখনকার জার্মানীতে লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যানুরাগ ছিল সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান পরিবার মাত্রই ছিল লাতিন ও গ্রীক সাহিত্য-চর্চায় অনুরাগী। সেই সমাজে মিশে পৃথিবীর দুই সমৃদ্ধশালী সাহিত্যের অনেক খবরই তিনি জেনেছিলেন। সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতি-বান পরিবারের কৃতী ছেলে ফন ব্রয়ার্ডনিং-এর বিশিষ্ট বন্ধু হিসেবে সে-সমাজে ছিল তাঁর নিত্য আনাগোনা। আর কাউন্ট ভাল-ডশ্টাইন-এর সংস্পর্শও তাঁকে সে-সুযোগ এনে দিয়েছিল। ছুটির অবসরে বিঠোফেন ব্রয়ার্ডনিং-পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যেতেন। এসব দিনগুলি ছিল মহানন্দের। অন্তরঙ্গ বন্ধু ফন ব্রয়ার্ডনিং-এর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বিঠোফেন দুটি রচনা ব্রয়ার্ডনিং ও তাঁর স্ত্রীর নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

'কোরট চ্যাপেলের' ভায়োলা-বাদক হিসেবে বিঠোফেন ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তার উপর সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'থিয়েট্রিকাল অর্কেস্ট্রা'-তেও তিনি যুক্ত। এখানে চার বছর ভায়োলা-বাদক হিসেবে তিনি সঙ্গীত-পরিচালক জোসেফ রিখা এবং অন্যান্য দক্ষ শিল্পীর সংস্পর্শে আসেন। বিখ্যাত পিয়ানো-বাদক শুটের-কালের সঙ্গীতের সঙ্গেও পরিচয় এ-সময়েই। সঙ্গীত-জীবনের পটভূমি রচনায় এই বছরগুলি প্রভূত সাহায্য করেছে। তিনি কি শিখলেন, তা তাঁর কাছে বড় নয়, বরং যা উপলব্ধি করলেন তাই তাঁর কাছে ছিল প্রধান। সমকালীন সঙ্গীত-রচনায় রীতি-নীতি ও চিন্তাধারার প্রভাবমুক্ত থেকে

বিঠোফেন আমরণ তাঁর নিজ অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, সেজন্যই 'ক্রেডো অব দি মাস ইন ডি' স্বকীয়তায় প্রাণ-স্পর্শী। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর কিশোর বয়সের উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি জোসেফ হেড্‌ন, মোৎসার্ট, এলব্রেটসবারগার প্রমুখের সম্পর্কে বলতেন : 'এ'দের কাছে আমার আর কিছুই শেখার নেই।'

বধিরতার লক্ষণ প্রকট হওয়ায় বিঠো-ফেন অদ্ভুত একাকীত্ব অনুভব করে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। বিঠোফেন ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি আত্মসমাধি চাননি; চেয়েছিলেন পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ পরিপূর্ণ উপভোগ করতে। মানুষের কথা, পাখীর ডাক, গাছগাছালীর মৃদু স্পন্দন শুনতে চেয়েছিলেন। ১৮১০ খৃঃ ২ মে একখানি চিঠিতে লেখেন :

'...কে পারে বাইরের ঝড়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে? তবু আমি সুখী হতাম, সম্ভবত সবচেয়ে সুখী লোকদের একজন হতে পারতাম, যদি শয়তান আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিকার ছিনিয়ে না নিত।... আহা, জীবন এত সুন্দর, অথচ তা আমার কাছে কত বিষময়।'

ভাগলারকে লেখা উপরের চিঠিতে এ-কথা স্পষ্ট যে, তিনি শ্রবণশক্তি হারাবার ভয়ে ভীত, সেজন্যই তাঁর কাছে জীবন বিষময়। নতুবা তিনি পৃথিবীর অন্যতম সুখী মানুষ, অর্থাৎ তিনি 'বাহ্যিক ঝড়' উপেক্ষা করছেন অনায়াসেই। একই চিঠিতে তাঁর বয়স জানার জন্য দীক্ষান্ত অভিজ্ঞানপত্র পাঠাতে লিখে-ছিলেন। তিনি তাঁর প্রকৃত বয়স জানতেন না। তাঁর বাবা বিঠোফেনের বয়স দু' বছর কমিয়ে বলতেন। উদ্দেশ্য : তাঁ অসামান্য প্রতিভা আরো চমকপ্রদ করা। আসলে ১৭৭২ খৃঃ নয়, তিনি জন্মগ্রহ করেছিলেন ১৭৭০ খৃঃ ১ ডিসেম্বর।

বিঠোফেন পরের মাসেই আর এ বন্ধুকে একটি আয়না পাঠাতে অনুরো করেছিলেন, বিঠোফেনের আয়নাটি ভেঙে গিয়েছিল বলেই। এই চিঠিদুটি লেখা সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর, এ বয়সে এমন চিন্তাধারা তাঁর মনোবেদনাকে প্রকাশ করে।

১৮০৯ খৃঃ তিন রাজপুত্রের অর্থানু কূল্য লাভ করলেও ১৮১১ খৃঃ থেকে ১৮১৫ খৃঃ মধ্যে এক এক করে সব অব লম্বন তিনি হারালেন। ১৮১৩ খৃঃ তাঁর আর্থিক অবস্থা চরমে উঠেছিল। ১৮১৪ খৃঃ তাঁকে শেষবারের মত প্রকাশ্যে পিয়ানো বাজাতে দেখা যায়। বধির বিঠোফেনের পিয়ানোতে 'ওপাস-৯৭ ট্রিও'-র যে সুর সেদিন প্রাণ পেয়েছিল, তা শুনে এবং তাঁর মর্মান্তিক হাবভাব লক্ষ্য করে সকলে ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন। এর পর শুধু কমিশনের অর্থ দিয়েই তাঁকে দিন অতি-বাহিত করতে হত। পিয়ানো বাজাতে পারেন না, শিক্ষকতাও সম্ভব নয়। এবং তা তিনি শুনতে পান না বলেই। ১৮১৯ খৃঃ থেকে ১৮২৭ খৃঃ ২৬ মার্চ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কেবল সুর সৃষ্টিতেই মগ্ন ছিলেন। এ-সময়েই তাঁর সব বিখ্যাত সুরের জন্ম।

বিঠোফেনের পরিণত মনের সৃষ্টির তুলনা নেই। সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার মিশ্রণে জন্ম নিয়েছে নতুন অনুভূতি, পরি-পূর্ণ অভিজ্ঞতায় যা অবিস্মরণীয়। প্রকৃত-পক্ষে ১৮২৩ খৃঃ পরই তিনি এক এক করে নতুন সুর সৃষ্টি করে চললেন। 'ই ফ্ল্যাট মেজর, ওপাস-১২৭', 'সি সারপ মাইনর, ওপাস-১৩১', 'এফ মেজর, ওপাস-১৩৫' প্রভৃতি তাঁর সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল। এ-সুরের জন্ম তাঁর প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যেই। সে 'সিম-ফনি' পলে পলে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সুসংযোজন। তাঁর সঙ্গীত তাই 'মিস্টিক' এবং 'মেটাফিজিক্যাল'। বিঠোফেনের মনের গভীরে যে অনুভূতি বাসা বেঁধেছিল, তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে শ্রেষ্ঠসৃষ্টি 'এফ মেজর, ওপাস-১৩৫'-এ। এটি তিনি শেষ করেন ১৮২৬ খৃঃ শেষভাগে, ভাই জোহানের বাড়িতে। ২ ডিসেম্বর ভাইপোকে সঙ্গে করে ভিয়েনা ফিরলেন। দীর্ঘ পথযাত্রায় দুর্বল বিঠোফেন তখন নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত। শোথ রোগের দরুণ তিনি যে মানসিক কষ্ট পাচ্ছিলেন, তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চারবার তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। অবশেষে দু'দিন অচৈতন্য থাকার পর ১৮২৭ খৃঃ ২৬ মার্চ তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।



অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

**সময়ের ব্যবধানে সন্তান উৎপাদনের জন্যে**

আজকাল, নিজের ইচ্ছে মাফিক সময়ে ছেলেপিলের জন্ম দেওয়া সম্ভব। হঠাৎ কিছু হয় না। আপনি যখন চাইবেন, তখনই আপনি সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন। নিরোধ আপনাকে সেই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দেয়।

**মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্যে**

জন্মের পরে প্রথম তিন বা চার বছরের সময়ে শিশুর যত্ন নেওয়া উচিত—তাহলেই ওরা ভালো ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাক্তারেরা মত দিয়ে থাকেন। সন্তান প্রসবের পরে হৃতস্বাস্থ্য আবার ফিরে পাওয়ার জন্যে মায়েরও কিছু সময় দরকার। নিরোধ ব্যবহার করে আপনি খুব সহজেই পরবর্তী সন্তানের জন্ম স্থগিত রাখতে পারেন।

নিরোধ (কন্ডোম) পুরুষদের জন্যে উন্নত ধরণের রবারে তৈরী জন্মনিরোধক। পৃথিবীর সর্বত্র নিরোধ ব্যবহার করা হয় কারণ এটি খুবই সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। যারা ব্যবহার করে, তাদের আদৌ স্বাস্থ্যহানি হয় না। নিরোধ সব জায়গায় পাওয়া যায়।

মুদীর দোকান, মণিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, সাধারণ বিপণী, পানের দোকান আদিতে নিরোধ বিক্রী হয়।

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৪শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 1st January, 1971 শুক্রবার, ১৬ই পৌষ, ১৩৭৭ 40 Paise


# সূচীপত্র

| পৃষ্ঠা | বিষয় | | লেখক |
|---|---|---|---|
| ৭০৮ | চিঠিপত্র | | |
| ৭১০ | সাদা চোখে | | —শ্রীসমদর্শী |
| ৭১২ | দেশেবিদেশে | | —শ্রীপুণ্ডরীক |
| ৭১৪ | ব্যঙ্গচিত্র | | —শ্রীকাফী খাঁ |
| ৭১৫ | সম্পাদকীয় | | |
| ৭১৬ | যে দিকেই যাই | (কবিতা) | —শ্রীমৃগাঙ্ক রায় |
| ৭১৬ | যদি বলি | (কবিতা) | —শ্রীতুলসী মুখোপাধ্যায় |
| ৭১৬ | আমার মা কে | (কবিতা) | —শ্রীজয়তী রায় |
| ৭১৭ | কবি কুমুদরঞ্জন | | —শ্রীনরেন্দ্র দেব |
| ৭১৮ | জোনাকি | (গল্প) | —শ্রীশান্তি পাল |
| ৭২৪ | শতবর্ষের পথিক | | —শ্রীদিলীপ বসু |
| ৭২৬ | এই আমাদের দেশ | | —শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৭২৭ | তুলসীচরিত | (উপন্যাস) | —শ্রীননীমাধব চৌধুরী |
| ৭৩০ | মুখের মেলা | | —আবদুল জব্বার |
| ৭৩৩ | সাহিত্য ও সংস্কৃতি | | —শ্রীঅভয়ঙ্কর |
| ৭৩৭ | বইকুণ্ঠের খাতা | | —শ্রীগ্রন্থদর্শী |
| ৭৪০ | মনের কথা | | —শ্রীমনোবিদ |
| ৭৪৩ | নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে | (উপন্যাস) | —শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৭৪৯ | নিকটেই আছে | | —শ্রীসন্ধিৎসু |
| ৭৫১ | তোমাকে | (উপন্যাস) | —শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য |
| ৭৫৪ | বিজ্ঞানের কথা | | —শ্রীঅয়স্কান্ত |
| ৭৫৭ | অঙ্গনা | | —শ্রীপ্রমীলা |
| ৭৫৯ | পিঞ্জর | (বড় গল্প) | —শ্রীসন্তোষ সিংহ |
| ৭৬৩ | এক বিদেশিনী ও কলকাতার মঞ্চ | | —শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় |
| ৭৬৯ | গোয়েন্দা কবি পরাশর | | —শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত |
| | | | —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত |
| ৭৭০ | পায়ের পদাবলী | | —শ্রীবিমল বসু |
| ৭৭১ | চিলড্রেন্স ফিল্ম | | —শ্রীস্বপনকুমার ঘোষ |
| ৭৭৩ | ফুল কেন প্রিয় | | —শ্রীসন্ধ্যা সেন |
| ৭৭৪ | প্রেক্ষাগৃহ | | —শ্রীনান্দীকর |
| ৭৮০ | আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স | | —শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় |
| ৭৮৩ | খেলাধুলা | | —শ্রীদর্শক |

প্রচ্ছদ : শ্রীদীপ্তি দাশগুপ্ত

## নিয়মাবলী

### লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

### এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

### গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

### চাঁদার হার

| | | কলিকাতা | | মফঃস্বল |
|---|---|---|---|---|
| বার্ষিক | টাকা | ২০·০০ | টাকা | ২২·০০ |
| ষান্মাষিক | টাকা | ১০·০০ | টাকা | ১১·০০ |
| ত্রৈমাসিক | টাকা | ৫·০০ | টাকা | ৫·৫০ |


'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

# চিঠিপত্র

## 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সম্বন্ধে

এই সম্বন্ধে শ্রীগৌরগোবিন্দ চক্রবর্তীর পত্রের (২৭ সংখ্যা ২৭শে কার্তিক ১৩৭৭) সমালোচনা করেছেন শ্রীচন্দন ভট্টাচার্য মহাশয়। সমালোচনা দেখিয়া চন্দনবাবুর চেয়ে আমরা বিস্মিত হয়েছি তার চেয়ে আরও বেশী। ৭১ বৎসরের বৃদ্ধ বিপ্লবী, সাহিত্যিক এবং আগের দিনের সাংবাদিক গৌরবাবু বাহিরে ও ১৯৩০--৩৮ পর্যন্ত বন্দীজীবনে যৌন বিজ্ঞানী হ্যাভেলক এলিস থেকে পৃথিবীর বিখ্যাত যৌন-মনস্তত্ত্ববিদদের বাৎস্যায়ন প্রভৃতিও শুধু অধ্যয়ন করেছেন তাই নয়, ফ্রয়েড থেকে পাভলব প্রভৃতির মনোবিকলনতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন। জেলের বিভিন্ন দাগী কয়েদী (Habitual criminal) অথবা স্বভাব দুর্বৃত্তদের ৩৫০জনের জীবনের বৃত্তান্ত ও স্বীকৃতিও গ্রহণ করেছিলেন, তাদের নিজেদের মুখ থেকে। জেলের বাইরে এসে কিছুদিন perversion (যৌন-বিকৃতি) বা তজ্জনিত ইনসিনিটি প্রভৃতি জাতীয় রোগের চিকিৎসা করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তাতে তিনি দেখেছেন, ১০-১২ বৎসর বয়সের মধ্যে (Libido period) যে ছেলেমেয়েরা যৌন-চেতনা লাভের পূর্বে অসৎ ব্যক্তি বা অসৎ ছেলেমেয়েদের দ্বারা অসময়ে বিকৃত যৌন শিক্ষা লাভ করে তার প্রতীক তার অন্তর্মনে স্থান লাভ করে পরিণত বয়সে যৌন-বিকৃতি--নানারূপ মানসিক রোগ সৃষ্টি করে এবং কখনও কখনও তাদের দুর্বৃত্তে পরিণত করে। এই-জন্যই ৭০।১৯ বৎসরের অমলা ও সোনার এই অপরিণত বয়সের বিকৃত যৌনক্রিয়াকে কিশোর-কিশোরী পাঠক-পাঠিকাকে ঐ নতুন যৌন ক্রিয়াটি শিক্ষা দিতেই শুধু তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। মনে হয় ভট্টাচার্য মহাশয়ও তাদের পরিবারের অমলা ও সোনাদের ঐ নতুন ক্রিয়াটি শেখাতে আপত্তি করবেন। সত্য নয় কি? গৌরবাবু তো মালতী বা আনন্দীবিবিদের ঘটনাগুলির প্রতিবাদ করেন নাই। কারণ, তাদের দেহ ও মনে যৌন চেতনার অভাব ছিল না। স্বয়ং শিশু সোনাইতো ঘৃণা ও পাপবোধকে ছাড়তে পারল না দীর্ঘদিনেও এই তো প্রতিবাদ। শিশুদের প্রাথমিক যৌন-শিক্ষা দিতে পারেন স্বয়ং তাদের মাতৃদেবী।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিলাতী পত্রিকার সংবাদ—দুই নারীর পরস্পরকে বিবাহ বা সমকামিতার কথা যা তিনি লিখেছেন, তা মহাভারতে ভগীরথের জন্মের পুরাতন কাহিনীর নতুন রূপ এখানেও বিষয়টি অবান্তর। ওটা রোগ, ওটা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এর বিচারের ভার 'অমৃত' পত্রিকার অন্যতম বিশেষজ্ঞ লেখক 'মনোবিদ'-এর হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

পরিশেষে জানাচ্ছি, গৌরবাবু তাঁর পত্রখানি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদককে পাঠাননি শুধু সম্পাদক মহাশয়কে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পত্রিকায় সেটা প্রকাশ করে একদিকে উদারতাই দেখিয়েছিলেন।

নীলা চট্টোপাধ্যায়,
কৃষ্ণা চৌধুরী বি-এ, বি-টি,
কলিকাতা-৫৬।

## শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

অমৃতের নিয়মিত পাঠক হিসেবে 'পর্যবেক্ষক' লিখিত শারদ সাহিত্য পরিক্রমা এবং এ সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের আলোচনা খুব আগ্রহ সহকারে পড়ছি। আমার মনে হয় বহুকাল পরে সমাজ-সচেতন এবং জীবননিষ্ঠ সাহিত্যের পক্ষে একটা প্রত্যক্ষ আলোচনা শুরু হয়েছে। এই চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা কেবল কথার মাধ্যমে না থেকে সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে যদি প্রতিফলিত হয় এবং লেখক পত্রিকা সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকগণও যদি সমাজ সচেতন সৎ-সাহিত্যের যথার্থ সমজদার হন তবেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা নতুন জোয়ার আসা সম্ভব হবে। বর্তমান সমাজ-জীবনে নানা সমস্যা যখন বিশেষ প্রকট আকার ধারণ করেছে, মানুষের জীবনই যখন এক বিরাট জিজ্ঞাসার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যখন ভীষণভাবে চিন্তিত, আলোড়িত ও বেঁচে থাকার অর্থ সন্ধানে ব্যস্ত তখন এটা খুবই বিস্ময় ও বেদনার কথা হবে যদি লেখকরা এসব থেকে দূরে সরে থাকেন।

শ্রীপর্যবেক্ষক একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন তাঁর আলোচনায় মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রয়োজন কতটা বোধ করেন, লেখকগণই বা সমাজ-জীবনের কতটা কাছাকাছি আসতে পেরেছেন, একালের সাহিত্যিক মানুষকে সমাজ সভ্যতাকে কোন সত্যে বিধৃত দেখতে চান।'—এসব বিষয় নিশ্চিত জরুরী। কেননা সাহিত্য লিখিত হচ্ছে, পত্র-পত্রিকা চলছে, প্রকাশক বই ছাপছেন, আমরা পাঠকেরা পড়ছি। এগুলো একটা অন্ধ জৈব তাড়নার ব্যাপার, একটা বিশ্বাস করতে মন চায় না। বিশেষ করে সত্তর দশকে পা দিয়ে স্টলে স্টলে দেখা যায় অসংখ্য যৌন ও সিনেমার পত্রিকা। তাতে অনেক নাম করা লেখকগণও লিখে থাকেন। কিন্তু অনেক সময় এটাও লক্ষ্য করি যে, একই লেখক একটি ভাল নামকরা পত্রিকায় যেভাবে চিন্তা ও পরিশ্রম করে লেখেন, যৌন বিষয়ক পত্রিকাদিতে লেখার ব্যাপারে তিনি অন্য মনোভাব পোষণ করেন। পাঠক হিসেবে এখানেই আমাদের আপত্তি। সম্পাদকের মুখ রক্ষা করে লেখক কেন লিখবেন? কোথায় লেখা প্রকাশিত হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, কি মানের লেখা প্রকাশিত হচ্ছে সেইটাই বড় কথা। বহুকাল আগে বিদেশে 'Money Writers' বলে একটা কথা প্রচলিত হয়েছিল। আশা করি বর্তমান সময়ের লেখকগণ তার খপ্পরে পড়বেন না, নিজেই লিখবেন।

বিশেষত তরুণ কবি সাহিত্যিকদের কাছে প্রত্যাশা আমাদের অনেক। তাঁদের সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি একালের সমাজজীবনে স্বচ্ছ আলোকপাত করুক। বাংলা সাহিত্যে সমাজচেতনা ও জীবননিষ্ঠ রচনার তো অভাব নেই। একালেও অবশ্য এ পথের পথিক—অনেকেই। কিন্তু অনেক শক্তিমান তরুণ লেখককেও যখন দেখা যায় অবহেলা ক্রমে যা-তা লিখছেন, ভুরি ভুরি লিখছেন, তখন মনে হয় বুঝি বা তাঁরা নির্লোভ ও নির্মোহ নন।

অত্যন্ত আশার কথা, সাম্প্রতিককালে গল্প কবিতার ক্ষেত্রে বিষয়নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি পেয়েছে। অমৃতে এই সব আলোচনায় সেই দিকটা যে পরিস্ফুট হতে পারছে সেটা আমাদের কাছে খুব সুখেরই বিষয়।

অজিত বসাক
কলিকাতা-১০

(২)

আমি অমৃত নিয়মিত পড়ি। অমৃতে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস ছাড়াও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা ও খবরাখবর আমার খু ভাল লাগে। কয়েক সংখ্যায় শ্রীপর্যবেক্ষক লিখিত শারদ সাহিত্য পরিক্রমা নামক আলোচনাগুলি পড়ে বর্তমান বাংলা সাহি তোর গতি প্রকৃতির বিস্তৃত পরিচয় জে উপকৃত হলাম। আশা করি আরও অনে পাঠক-পাঠিকার কাছে এই আলোচনা সমাদৃত হবে। শ্রীক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ে চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত ' 'অত্যন্ত শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে লেখক প্রবী ও নবীন গল্পকারদের এ সময়ের গল্পে পরিচয় দিয়েছেন।' কেবল গল্পই নয় উপ ন্যাস সম্পর্কেও শ্রীপর্যবেক্ষক যেভাবে তথ

# চিঠিপত্র

নিষ্ঠ আলোচনা করেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয় এই জন্য যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রচুর পাঠের শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর মতামতও আমার বেশ ভাল লেগেছে। বেতার জগতে প্রকাশিত 'হাঁসের আকাশ' আমাদের প্রিয় লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এবার শারদ সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই উপন্যাস পড়তে পড়তে আমি ভাবতেও পারিনি যে অকস্মাৎ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। এই উপন্যাসটির সম্পর্কে শ্রীপর্যবেক্ষক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। 'শিকার শেষ পর্যন্ত গৌণ হয়েছে, এই বিস্তীর্ণ পটভূমিতে স্থাপিত নর-নারীর মানসিক টানা-পোড়েন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রাধান্য পেয়েছে। নারায়ণবাবুর ক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক, তাঁর দেখা প্রকৃতি জীবন-বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং বলা চলে জীবনের বাস্তব দিকগুলি সর্বদাই সেখানে অধিক অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করেছে। সুমন দেবরায় নামে স্কুলের শিল্প শিক্ষকটি যখন বন্ধুকে বলে 'তোমাদের জমিদারীর বাহাদুরী আছে হে, কিছু আর রাখোনি, শুষে সব ছিবড়ে করে দিয়েছো। কয়েকটা হাঁস-টাঁস এদের দু-চারজনকে দিয়ে দিলে পারতে, একটু প্রোটিন খেয়ে বাঁচত।'— তখন এক দীর্ঘ স্খলিত ঐতিহ্যের নিম্নতম পুরুষও চমকে উঠে মুখ ফেরায়, সে মুখ একালের সমাজ-মানসের দিকেই ফেরানো।'

পরিশেষে একটা কথা আমার মনে হয়েছে তরুণ ও নবীন লেখকদের গল্প সম্পর্কে যেমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা হয়নি। কয়েকজন তরুণ লেখক যেমন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখের উপন্যাসের আলোচনা থাকা প্রয়োজন ছিল।

অরুণ সরকার
কলিকাতা-৫১

(৩)

আমি নিয়মিত পাঠক হিসাবে অমৃতে প্রকাশিত পর্যবেক্ষক লিখিত শারদ সাহিত্য পরিক্রমা নিয়মিত পড়ছি। বিশেষ করে কবিতা সম্পর্কে 'পর্যবেক্ষক'-এর আলোচনাটি আমার খুবই ভাল লেগেছে। আমি বরাবরই কবিতা লিখেও থাকি। কিন্তু পড়তে পড়তে কিছু কবিতা আমার পক্ষে দুর্বোধ্য মনে হয়।

পর্যবেক্ষকের এই আলোচনায় পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারলাম যে কোন্ কোন্ কবিতা সাধারণ পাঠকের কাছে বুঝে ওঠা কঠিন হয় এবং কোন্ কোন্ কবিতা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজেই বুঝে ওঠা সম্ভব হয়। এদিক থেকে পর্যবেক্ষকের এই আলোচনাটি কবি মহলে বিশেষ করে উঠতি কবি এবং কবিতার সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদর লাভ করবে।

সমাজ সচেতন কবিতাগুলি পড়তে ব্যক্তিগতভাবে খুব ভাল লাগে। তবে সব সমাজ সচেতন লেখকের পক্ষে সব সময় সমাজ ভাবনার যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এবারের শারদীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলিতে বর্তমানকালের জীবনযাত্রা নির্বাহের সমস্যা সংঘাত, নিম্ন-বিত্ত এবং মধ্যবিত্তের জীবন-সংগ্রাম, দারিদ্র্য, বেকারী, রাজনৈতিক আলোড়ন, শারিরী সংঘর্ষ, অরাজকতা, সর্বস্তরের মানুষের মনে অসন্তোষ, শূন্যতা ও অস্থিরতা এবং সর্বশ্রেণীর সাধারণ মানুষের বাঁচার কথা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে এটা খুবই সুখের বিষয়। বাংলাদেশে এত কবিতার পত্রিকা বের হয়েছে কারও পক্ষেই সবকটি পত্রিকা সংগ্রহ করে পড়বার মত সৌভাগ্য হয় না। সেদিক থেকে পর্যবেক্ষকের বর্তমান আলোচনাটি আমাদের যথেষ্ট সহায়ক হবে সন্দেহ নেই।

অমরেশ চক্রবর্তী
গঙ্গারামপুর
পঃ দিনাজপুর

(৪)

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে এবারে বিভিন্ন শারদীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার দীপ্ত আলোচনাটি পড়লাম। শ্রীপর্যবেক্ষক মহাশয় গভীর দৃষ্টি দিয়ে কবি ও তাঁর কাব্যের আলোচনা করেছেন। সেজন্য পর্যবেক্ষক মহাশয়কে ধন্যবাদ। আলোচনাটি সাহিত্যপিপাসুদের পক্ষে নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় খোরাক। আজকের এই দুর্যোগের অন্ধকারে কোন সাহিত্যিক-কবি কোন্ পথে চলেছেন অথবা তাঁদের সৃষ্টির পরবর্তী অধ্যায় নতুন কিছু পাঠক-মহলকে বিতরণ করবেন কিনা তার সব সংবাদ পর্যবেক্ষক মহাশয় স্বল্প পরিসরে দিয়েছেন। আধুনিক কাব্য-বিপ্লবের যুগে (পর্যবেক্ষকের আলোচনা অনুযায়ী) মনে হয়, বাংলা কাব্য জগতে হয়ত কিছুদিনের মধ্যে নতুন নতুন প্রতিভাধরের আবির্ভাব হবে। এবং সেটা খুবই শিগ্‌গীর। তবে আমার মনে হয় কবিগণ বৈদেশিক ছাঁচে নিজেদের তৈরী করে ফেলেছেন এবং সেইজন্যই কাব্যের বিষয়বস্তুটুকু সাধারণ পাঠক-মহলের কাছে হয়ে উঠেছে দুর্বোধ্য। কিন্তু তাঁরা যদি নিজেদের প্রতিভাকে নিজস্ব পরিকল্পনায় গড়ে তোলেন তবে মনে হয়, এই কাব্য-সংগ্রাম আরও বেশী জোরদার হবে। বর্তমানে কথা হল এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যের ব্যাপারে সম্পাদকদের এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন কি?

অমৃতের পাঠক হিসাবে আমি বলতে পারি আপনারা এ বিষয়ে নবীন কবির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আশা করা যায় আপনারা নবীন কবির কর্ণধার হয়ে আরও বেশী করে কবিতা প্রকাশ করবেন।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্ণপুর, বর্ধমান

(৫)

শারদ সাহিত্য বিভাগে কবি ও কবিতা নিয়ে পর্যবেক্ষক মহোদয় আলোচনা করতে গিয়ে আসাম থেকে প্রকাশিত 'ঔদর্ক' ও 'সর্পিল'-এর নামোল্লেখ করেননি। সেই জন্যেই আমার এ ধারণা হয়েছে যে, পর্যবেক্ষক মহোদয়ের অনিচ্ছাতেই হয়তো কিছু নাম তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সারা উত্তর-বঙ্গ ও আসামসহ প্রকাশিত পত্রিকায় মাত্র একটি কবিতাই পর্যবেক্ষকের ভাল লাগায় কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। এ বছর পূজোয় প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার মধ্যে 'ত্রিবৃত্ত' কবিতা সংখ্যা হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করলে, মেনে নিতেই হয়। কিন্তু শুধু ঐ একটি পত্রিকার কথাই বলছি না। এবার পূজোর যাঁরা ভাল কবিতা লিখেছেন এবং যে পত্রিকাগুলিতে ভাল লিখেছেন অথচ সেই সকল কবি ও পত্রিকার নাম অনুল্লেখিত রয়েছে, তাঁদের নাম উল্লেখিত হলে আরো খুশি হতাম।

অধ্যাপিকা হেমা বড়ুয়া
ধুপড়ী, আসাম

## 'সাহিত্যের খবর' প্রসঙ্গে

গত ২৫ অগ্রহায়ণ তারিখের 'অমৃতে'র ৪৩১ পৃষ্ঠায় 'সাহিত্যের খবর' স্তম্ভে লেখক বলেছেন—'পণ্ডিত ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ বাঙালী তথা ভারতবাসীর নিকট এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।' এ বিষয়ে আমার নিবেদন এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীল কৃষ্ণ-দাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত। ডঃ নাথ উক্ত গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর ভাষ্যের নাম 'গৌর কৃপাতরঙ্গিনী'।

সত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত,
পুটিয়ারী,
২৪-পরগণা।

# শাদা চোখে

সারা দেশব্যাপী আবার নির্বাচনী আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা না রেখেই বিভিন্ন দল ইতিমধ্যেই নেপথ্যে রণনীতি স্থির করবার জন্য অনেক শলাপরামর্শ করেছেন। এমন কি অনেক দল সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকাও প্রস্তুত করে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, বাজার গরম করার জন্য কে কত শক্তিশালী, গণসমক্ষে তার মহড়া দিতেও সুরু করেছেন।

কিন্তু লোকসভার জন্য নির্বাচন হলেও রাষ্ট্রপতি শাসিত পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান অবস্থায় নির্বাচন সম্ভব কিনা তা নিয়ে মতান্তর দেখা দিয়েছে। বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া ইতিমধ্যেই বলেছেন, একমাত্র নির্ভেজাল দলপ্রেমীরাই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অরাজকতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের দাবী করতে পারেন। দেশপ্রেমিকরা পারেন না। বাংলা কংগ্রেস দেশপ্রেমিক, অতএব বর্তমান অবস্থায় তাঁরা নির্বাচনের কথা চিন্তা করছেন না।

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক নীরবতা ভঙ্গ করে আদি কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলনে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেছেন, ইন্দিরাজী হঠাৎ নির্বাচন চাইছেন শুধু ভারতীয় রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা আরও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ চলছে, এবং ফলে যে নিরাপত্তাবোধের অভাব দেখা দিয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব কিনা আদি কংগ্রেস সম্মেলন থেকে এই সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আপাতত তাঁরা নির্বাচনের বিরোধিতা করেছেন বলেই মনে হয়। জনসংঘ, দল হিসাবে ক্ষুদ্র হলেও তাঁদেরও রাজ্য সম্মেলন থেকে নির্বাচনের বিরোধিতা করে প্রস্তাব পাশ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক কংগ্রেস নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত, এই কথা ঘোষণা করেও বর্তমানে আইনশৃঙ্খলাজনক পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটেছে তার উল্লেখ করছেন। সোজাসুজিভাবে না বললেও তাঁদের ইচ্ছা আপাতত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন স্থগিত রাখা হোক। তবে তাঁদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন রাজ্য ইউনিটের পক্ষে তার বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। রাজ্যের বামপন্থী দলগুলি অবশ্য নির্বাচন অবিলম্বেই দাবী করেছেন। এঁদের মধ্যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বিগত নভেম্বরেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দাবী করেছিলেন এবং তা না করা হলে আন্দোলন করে সব অচল করে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিলেন। যা হোক, ক্ষেত্র বিশেষে আন্দোলন হয়েছে, তবে শুধু নির্বাচনের দাবীতে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা তেমন কিছু করেন নি। শ্রমিকদের মাইনে বৃদ্ধির আন্দোলনের সঙ্গে নির্বাচনের দাবীটা অবশ্য সর্বত্রই জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই ইন্দিরাজী যদি এখন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন তবে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা খুশিই হবেন। এবং বামপন্থী কম্যুনিস্টরা যখন খুশী তখন তাঁদের ছয় পার্টির জোটের শরিকরাও খুশী হবেন বলে ধরা যায়। তাঁরা আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে হয়ত বলবেন, তাঁদের আন্দোলনের চাপে পড়েই নির্বাচন করতে হচ্ছে।

অষ্টবামের অন্তর্ভুক্ত দলগুলিও অবিলম্বে নির্বাচন চান। তবে কখন এই নির্বাচন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোন শরিকরাই সুনির্দিষ্ট তারিখ বলতে নারাজ। খবরে প্রকাশ, বড় শরিক দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই তাড়াঘাড়ি নির্বাচন না করার জন্য ইন্দিরাজীর কাছে বলেছেন।

দুই বামপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানের অনিশ্চয়তা ও বর্তমান বিশৃঙ্খলার আবহাওয়া নিরসনকল্পে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনই যে একমাত্র দাওয়াই, এই বিষয়ে মতানৈক্য নেই। তাঁরা বর্তমানের এই ভয়াবহ অবস্থাকে মোটেই প্রশাসনিক ব্যাপার বলে মনে করেন না। রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে বিশ্লেষণ করে তাঁরা এই অস্বস্তিকর পরিবেশের অবসানের জন্য রাজনৈতিক সমাধানের উপর জোর দিচ্ছেন। এতদ্সত্ত্বেও আশু নির্বাচনের তারিখ সম্পর্কে তাঁরা একমত হতে পারছেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন। উত্তর পেতে গেলে ইতিহাসের পুনরালোচনা প্রয়োজন। যুক্তফ্রন্টের রাজত্বকালে বড় অংশীদার বাম কম্যুনিস্টরা সংগঠনকে বাড়াবার জন্য সরকারী যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ শোনা গেছে। সে যাক, যেভাবেই হোক, বাম কম্যুনিস্টরা যে সংগঠন বাড়িয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল তখন তাঁদের প্রভাবও কিছুটা কমে যেতে লাগল। কিন্তু আশু নির্বাচন হলে বাম কম্যুনিস্টরা সেই ক্রমসঙ্কুচিত সংগঠনকে সার্থকতার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারবেন এবং দলীয় শক্তি বৃদ্ধি সম্ভব হবে—এই আশা করেই তাঁরা নির্বাচনের উপরই জোর দিয়ে এসেছেন। বাম কম্যুনিস্টরা মনে করছিলেন এককভাবে লড়লেও তাঁরা পুনরায় ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পারেন বা না পারেন অন্ততপক্ষে তার সিংহদরজায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারবেন। কাজেই আশু নির্বাচনে তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধির ব্যাপারে বাম কম্যুনিস্টরা বিশেষ আশান্বিত।

কিন্তু অষ্টবামের শরিকরা মনে করেন যে, বাম কম্যুনিস্ট[illegible]কে রাজনৈতিক ভাবে

বিচ্ছিন্ন করার যে প্রয়াস সুরু হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ না করে নির্বাচনের মহড়া নেওয়া ঠিক হবে না। তাঁদের অনেকের কাছে বামপন্থী সংকীর্ণতাই সবচেয়ে বড় শত্রুরূপে পরিগণিত হয়েছে। এবং এর বিকল্প হিসাবে গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির সমঝোতা একান্ত প্রয়োজন—এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য জোর চেষ্টা চলছে। ফলে, অষ্টবামের মধ্যে একটা তত্ত্বগত মতানৈক্য ঘটছে। কিন্তু অষ্টবামের বেশীর ভাগ শরিকই মনে করেন, শাসক কংগ্রেস যেমন প্রতিক্রিয়াশীল—বামপন্থী সংকীর্ণতাও অনুরূপভাবে পরিবর্তনকামী সমাজ-সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায়। অতএব, এই দুই শক্তি থেকে তফাৎ থেকে একটি শক্তিশালী তৃতীয় শিবির গঠন করা একান্ত জরুরী। তত্ত্বগত দিক থেকে এই বক্তব্য যথার্থ বলে মানলেও অনেকে শাসক কংগ্রেসের সংগে নিদেনপক্ষে কিছু সংখ্যক আসন ভাগাভাগি করেও উগ্র বামপন্থীদের শক্তি হ্রাসের পক্ষপাতী। এই যুক্তি যাঁদের কাছে থেকে এসেছে তাঁরা উগ্র বামপন্থীরা বা বামপন্থী কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতায় এলে দেশের রাজনৈতিক চিত্র কি রূপ পরিগ্রহ করতে পারে তার সুস্পষ্ট ছবি আঁকতে পারেন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। কাজেই তাঁদের যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছেন না অনেকে। এই দোটানার মধ্যে পড়ে অষ্টবাম বস্তুতপক্ষে এখনও হাবুডুবু খাচ্ছে।

রাজনৈতিক বক্তব্য প্রস্তুত করেও অষ্টবাম এখনও পুরোপুরিভাবে একটি নির্বাচনী জোটে বা ফ্রন্টে উন্নীত হতে পারে নি। দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্টদের পশ্চিমবঙ্গ ইউনিট রাজ্যে নব কংগ্রেসের সংগে যে-কোন প্রকারের আঁতাতের বিরোধী বক্তব্য রেখে অষ্টবামকে একটি সুসংগঠিত ফ্রন্টে যখন রূপ দেবার চেষ্টা করছিলেন, তখনই আবার নতুন করে শাসক কংগ্রেসের সংগে সমঝোতার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। কাজেই অষ্টবাম তাঁদের বর্তমান রূপ বজায় রাখতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের ভাব দেখা দিয়েছে। যা হোক, নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষিত হলে এর একটি ফয়শালা হয়ে যাবে বলে মনে হয়। অষ্টবামের নেতারা অবশ্য আশাবাদী। তা না হলে তাঁরা কে কত আসনে লড়াই করবেন সে সম্পর্কে শরিকদের প্রতি নির্দেশ দিতেন না।

অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক মোর্চার রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠলেও ঐ দল আশু নির্বাচন চাইছেন না বলে শাসক কংগ্রেস কিছুটা বিপাকে পড়েছেন। শাসক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শ্রীঅজয় মুখার্জিকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে না পারলেও কেন্দ্র যদি হাতে থাকে তবে রাজনীতির মোড় ঘোরানো আদৌ কঠিন নয়। বাংলা কংগ্রেস যদি রাজি না হয় তবে লোকসভার নির্বাচনও কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা, পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচন না করে শুধু যদি লোকসভার নির্বাচন করা হয় তা কেমন বিসদৃশ ঠেকে। সত্যিই রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন মুলতুবী রেখে শুধু লোকসভার নির্বাচন করার পক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। সুতরাং, বাংলা কংগ্রেসকে রাজি করাতে না পারলে সমস্যাটা কিছুটা জটিল আকারই ধারণ করতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলা কংগ্রেস কেন বর্তমানে নির্বাচনের কথা চিন্তাই করছেন না। একথা ঠিক নয় যে, বাংলা কংগ্রেস তার পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক মোর্চার ভবিষ্যৎ শরিকদের এক করতে পারেন নি। শাসক কংগ্রেসও এই মোর্চার অংশীদার হিসাবে পি এস পি দলকে সংগে নিতে রাজী। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের সংগে নিতে নিমরাজী। কারণ দলের অভ্যন্তরে এই সম্পর্কে যথেষ্ট মতানৈক্য বর্তমান। শাসক কংগ্রেসের একটি বিরাট অংশ কম্যুনিষ্টদের মধ্যে কোন প্রকারভেদ দেখতে পান না। গত খড়্গপুর শিবিরে অনেক জেলার প্রতিনিধিরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই বক্তব্য রেখেছেন। অবশ্য উপর থেকে নির্দেশ এলে এই সমস্ত কর্মকর্তারা কি পন্থা নেবেন তা জানা যায় নি। তবে কম্যুনিষ্ট বিরোধিতা যে খুবই প্রবল তা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করা গেছে। শাসক কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বে অনেকের আদি কংগ্রেস নেতাদের প্রতি দুর্বলতা আছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু তা থাক বা না থাক, কৌশল হিসাবে তাঁরাও আদি কংগ্রেসের সংগে সমঝোতার বিরোধী। তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে চিহ্নিত করে বাইরে রাখলে অনেকেই মনে করেন এতদিন পর্যন্ত যাঁরা অপ্রত্যক্ষ বামপন্থী হিসাবে নিজেদের ভূমিকা পালন করছিলেন তাঁরা এবার শাসক কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে যাবেন। এবং এ সুযোগ হারানো কোন প্রকারেই উচিত নয়—যদি কংগ্রেসকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে হয়। এ রকমের একটা চিন্তাধারা শাসক কংগ্রেসের মধ্যে জোরালো রূপ নেওয়ার ফলে শ্রীঅজয় মুখার্জি ও শ্রীপ্রফুল্ল সেনের মধ্যে যে আলোচনা চলছে তা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করতে পারছে না। শ্রীমুখার্জির বাংলা কংগ্রেসের ধারণা তিন কংগ্রেস, পি এস পি, এস এস পির ভগ্নাংশ ও সৈয়দ বদরুদ্দোজার নবগঠিত দল যদি একসংগে মিলিত হয় তবে বর্তমান অবস্থায় পুনরায় একই আদর্শে বিশ্বাসী দলগুলির একটি সরকার গঠিত হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। বাংলা কংগ্রেসেরও ধারণা, কম্যুনিষ্টদের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। কাজেই বাংলা কংগ্রেসের শক্তিমান সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়ার সংগে শাসক কংগ্রেসের একটি বিরাট অংশের চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণ মিলে গেছে। অন্য দিকে পি এস পি'র সংগে একাত্মতা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। আর এস এস পি'র ভগ্নাংশ শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রের নেতৃত্বে তাঁদের সংগে হাত মেলাবেন না এমন কথা বলা যায় না। কারণ শ্রীমৈত্র ও তাঁর অনুগামীরা গত জলপাইগুড়ি সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত না থেকে 'ওয়াক আউট' করে বেরিয়ে এসেছেন। কেননা তাঁদের নিছক 'গণতান্ত্রিক মোর্চা' গঠনের প্রস্তাব নাকি সম্মেলনে বিশেষ পাত্তা পায় নি। অধিকন্তু, বাংলা কংগ্রেসের নাগরিক নিরাপত্তা কমিটির সংগে এস এস পির কোন সম্পর্ক নেই—সরকারীভাবে এই ঘোষণা করার পরও দেখা যাচ্ছে শ্রীমৈত্র ও তাঁর সহযোগীরা ঐ কমিটির আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করে চলেছেন। এ সমস্ত উপসর্গ দেখে মনে করা যেতে পারে যে আখেরে শ্রীমৈত্র হয়ত তাঁর দলবল নিয়ে এস এস পি থেকে সরেও যেতে পারেন। চিন্তার পার্থক্য যেখানে বর্তমান সেখানে সরে যাওয়া অসম্ভব নয়। যা হোক বর্তমানে বাংলা কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক মোর্চার এই হচ্ছে রূপ। শুধু আদি কংগ্রেসের সংগে সমঝোতার প্রশ্নটা নিয়েই যা একটু গোলমাল থেকে গেছে। শাসক কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চান, ডান কম্যুনিষ্টদের সংগে নিতে, যাতে দলটি একটা বামপন্থী রূপ লাভ করতে পারে। আর আদি কংগ্রেসকে বাইরে রাখতে, যাতে তাঁদের প্রগতিশীল চরিত্র সম্পর্কে আদৌ কোন সন্দেহ না থাকে। কিন্তু বাংলা দেশে এ চিন্তায় বাধ সাধছে বলেই যত গণ্ডগোল। তবে মনে হচ্ছে কৌশলের খাতিরে ডান কম্যুনিষ্টদের এই রাজ্যে তফাতে রাখার চেষ্টা হবে। যদি নিরংকুশ ক্ষমতা লাভে অসুবিধা হয়, তবে নির্বাচনের পরেও একটি সমঝোতা হতে পারে। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলা কংগ্রেসকে সারা ভারতের রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আর এই অসুবিধাটুকু দূর হলেই হয়ত অরাজক অবস্থার কথা বলে বাংলা কংগ্রেসও নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য চাপ দেবে না।

এদিকে বাম কম্যুনিষ্টরা ইতিমধ্যেই একেবারে প্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা কত আসনে লড়বেন তার সুস্পষ্ট ইংগিতও দিয়েছেন। ছয় পার্টি জোট তাঁরাই প্রধান। কাজেই ২০৭টি আসনে তাঁরা প্রার্থী দেবেন বলে নাকি স্থির করেছেন, অন্য কয়টিতে তাঁদের সহযোগীরা লড়বেন। আসনগুলির নাম প্রকাশ না পেলেও বোঝা যায়—তাঁদের বিরোধী বামপন্থী দলের কিছু কিছু আসনে হয়ত প্রার্থী দাঁড় করাবার কথা ঘোষণা করে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করবেন বা কোন প্রার্থী না দিয়ে একটি বন্ধুত্বমূলক আস্থা প্রদর্শনের চেষ্টা করবেন। মনে হয় আর এস পি ও লোক সেবক সঙ্ঘের আসনগুলিতে তাঁরা প্রার্থী না দেওয়ার কথাই ঘোষণা করবেন। তবে আর এস পির হয়ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিটে প্রার্থীর নাম ঘোষণাও করতে পারেন যাতে আর এস পি তাঁদের নির্বাচনী নীতি অবিলম্বে ঠিক করেন। বাম কম্যুনিষ্টদের পক্ষ থেকে এত বেশি সংখ্যক প্রার্থী দাঁড় করানোর অর্থ হচ্ছে, এই রাজ্যে একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করা যাতে জনসাধারণের মনে ধারণা হয় যে সি পি এমই একমাত্র শক্তিশালী দল এবং তাঁরাই বিকল্প স্থিতিশীল সরকার গঠন করতে পারেন।

কিন্তু রাজনৈতিক আবহাওয়া বর্তমানে যেভাবে বইছে, এর যদি পরিবর্তন না হয় তবে নির্বাচনের ফলশ্রুতি হবে—অনিশ্চয়তা দীর্ঘায়িত করা মাত্র। অন্য কিছু নয়।

# দেশে বিদেশে

সংসদের সদস্যরা শীত অধিবেশনের শেষেও জেনে যেতে পারেন নি, প্রধানমন্ত্রীর মনে কি আছে। এই অধিবেশনের শেষে ইন্দিরা গান্ধী সংসদের দলনেতাদের এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করেছিলেন। সেখানে কেউ-কেউ জানতে চেয়েছিলেন, এটা তাঁদের 'বিদায়ী' ভোজসভা কিনা। প্রধানমন্ত্রী সেদিন মুখ খোলেন নি। স্বভাবতই সংসদ সদস্যরা উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন এবং খবর বেরিয়েছিল যে, পার্লামেন্ট সদস্যদের ভিতর ঘুমের বড়ির চাহিদা বেড়ে গেছে।

কিন্তু কয়েক দিন পরেই জানা গেল, সংসদ সদস্যদের এড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী পরোক্ষভাবে প্রসঙ্গটি শাসক কংগ্রেস দলের ওয়ার্কিং কমিটির সামনে এনেছেন। লোকসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচন আহ্বান করা হবে কিনা সে বিষয়ে অবশ্য তিনি কমিটির মতামত জানতে চান নি, তিনি শুধু এটুকুই জানতে চেয়েছেন, অন্তর্বর্তী নির্বাচন যদি হয় তাহলে শাসক কংগ্রেস দল কোন রাজ্য থেকে লোকসভার কতগুলি আসন পেতে পারেন সেবিষয়ে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের ধারণা কি। কমিটির সদস্যরা তাঁকে যে উত্তর দিয়েছেন তার ভিত্তিতে শ্রীমতী গান্ধী এখন লোকসভা ভাঙার সুপারিশ করবেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর সংসদ সদস্যরা পেয়েছেন। যে প্রশ্নের উত্তর এই পর্যালোচনা লিখবার সময় পর্যন্ত জানতে বাকী আছে সেটা হল, কবে তিনি এই সুপারিশ করবেন এবং লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন করা হবে।

শাসক কংগ্রেস দলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে মোটের উপর এই পরামর্শই দিয়েছেন যে, এখন লোকসভা ভেঙে দিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে যদি অন্তর্বর্তী নির্বাচন করা হয় তাহলে শাসক কংগ্রেস দল লোকসভার ২৮০টির বেশী আসন পেতে পারে। কোন্ রাজ্য থেকে কতগুলি আসন ধরা হয়েছে তার বিস্তারিত হিসাব না বেরোলে বোঝার উপায় নেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা লোকসভায় এই ধরনের একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের আশা করছেন কি গণনার ভিত্তিতে। তবে দলের সদস্যদের আশাবাদী হওয়ার কয়েকটি বাস্তব হেতু আছে। যেমন, হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর যেসব উপ-নির্বাচন হয়েছে সেগুলিতে বিরোধী কংগ্রেসের তুলনায় শাসক কংগ্রেস অনেক বেশী সাফল্য লাভ করেছে। খুব সম্প্রতি শাসক কংগ্রেস দল পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশে বিধানসভার উপনির্বাচনে একটি করে আসন জয় করেছে। আরও একটি গণনা কমিটির সদস্যদের হিসাবের মধ্যে স্থান পেয়ে থাকতে পারে। সেটা হল এই যে, কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর যে দুটি রাজ্যে শাসক কংগ্রেস দলের অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললেই হয় সেই দু রাজ্যেই এই দল এখন আস্তে-আস্তে পা রাখার জায়গা করে নিচ্ছে। বিরোধী কংগ্রেস দলের লখ্‌নৌ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গুজরাটে বিরোধী কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। সেখানে মনুভাই শাহ প্রমুখ বিরোধী কংগ্রেস নেতারা শাসক কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। মহীশূরেও বিরোধী কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

তৃতীয় আর একটি গণনাও করা হয়ে থাকতে পারে। ১৯৭২ সালে যথানির্দিষ্ট সময়ে যদি লোকসভার নির্বাচন হয় তাহলে সেটা করতে হবে অধিকাংশ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে একযোগে। পাঁচটি অথবা বড়জোর ছয়টি রাজ্যে বিধানসভা এই নির্বাচনপর্ব থেকে বাইরে থাকতে পারে। নাগাল্যাণ্ডে স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভার পরবর্তী নির্বাচন ১৯৭৪ সালের আগে হওয়ার কথা নয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও কেরলে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর এক দফা অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে দুই দফা অন্তর্বর্তী নির্বাচন হয়ে গেছে এবং তৃতীয় আর এক দফা অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্য প্রতীক্ষা হচ্ছে। যে রাজ্যগুলিতে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে সেগুলিতে শাসক কংগ্রেস দল আঞ্চলিক পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের সহায়তা বেশী করে নিতে পারবে এবং বিধানসভার নির্বাচনে যেসব স্থানীয় প্রশ্ন ওঠে সেগুলি থেকে তফাতে থাকতে পারবে। ১৯৭২ সালে লোকসভায় নির্বাচন হলে শাসক কংগ্রেস দল কয়েকটি মাত্র রাজ্যে এই সুবিধা পাবে আর ১৯৭১ সালে লোকসভার নির্বাচন হলে শাসক কংগ্রেস প্রায় সব রাজ্যেই পাবে এই সুবিধা।

এই গণনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটা বড় গরমিল। ১৯৭১ সালে লোকসভার নির্বাচন হলে পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা নির্বাচন-কেন্দ্রগুলিতেও ভোট নেওয়া হবে: আর পশ্চিমবঙ্গে যখন লোকসভার নির্বাচন হবে তখন বিধানসভারও নির্বাচন না করার যুক্তি থাকবে না। কিন্তু ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের মধ্যে কি পশ্চিমবঙ্গে ভোট নেওয়ার মতো উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরী হবে? যতদূর খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয়, এই ব্যাপারে শাসক কংগ্রেস দলের নেতারা এক রকম হাল ছেড়েই দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে যাহা ১৯৭১, তাহা ১৯৭২। উপরন্তু সেখানে শাসক কংগ্রেসের সুদিন ফেরার জন্য আরও এক বছর অপেক্ষা করতে গেলে অন্য রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যে দলের অসুবিধা বাড়তে পারে। জিনিসপত্রের দাম চড়ছে, আগামী বছরের বাজেটে ভারত সরকারকে ট্যাক্সের বোঝা বাড়াবার অপ্রিয় কর্তব্য করতেই হবে, পর-পর তিন বছর ভাল ফসলের পর আর একবারও যে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য লাভ করা যাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। অতএব পশ্চিমবঙ্গের ভরসায় না থেকে অন্যান্য রাজ্যের উপর ভরসা করে এখনই লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে নেমে পড়া যাক, এমন একটা হিসাব শাসক কংগ্রেস দলের নেতাদের মধ্যে গুরুত্ব লাভ করে থাকতে পারে।

●

প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করার প্রশ্নটি নিয়ে ইন্দিরা সরকার যে বিড়ম্বনায় পড়েছেন সেটাও প্রধানমন্ত্রীকে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে এমন একটি পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যেখানে রাষ্ট্রপতির আদেশে তো নয়ই, এমন কি সংসদে সংবিধান সংশোধন করেও প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা লোপ করা যাবে কিনা সেবিষয়ে আইনগত প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রশ্নটা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা হল, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ফলে প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা পাওয়ার অধিকারটা সম্পত্তির অধিকার কিনা। সুপ্রীম কোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চের ১১ জন সদস্যের মধ্যে অবশ্য মাত্র দুইজন (প্রধান বিচারপতি হেদায়েতুল্লা ও বিচারপতি হেগড়ে) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সংবিধানের ২৯১ অনুচ্ছেদে প্রাক্তন রাজন্যদের যে ভাতা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার। তাহলেও, অনেক আইনজ্ঞের ব্যাখ্যা এই যে, বেঞ্চের অধিকাংশ সদস্যের

নয়াদিল্লীতে নিজ আবাসে রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি রুশ বিদেশী বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ এন এস. পাটোলিচেভের (বাঁদিকে) সঙ্গে কথা বলছেন। ভারতস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মিঃ এন এম পেগভ. (ডানদিকে)ও এই আলোচনায় যোগ দেন।

রায়ের মর্মার্থ হচ্ছে. প্রাক্তন রাজন্যদের ভাতা পাওয়ার অধিকার কার্যত সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার। মুশকিল এই যে, ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার হল একটি মৌলিক অধিকার। এবং. বিখ্যাত গোলকনাথ মামলায় প্রধান বিচারপতি হেদায়েতুল্লা যে রায় দিয়েছিলেন সেই রায় অনুসারে পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করে কোন মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারেন না। সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উপর যেসব 'ন্যায়সঙ্গত বিধিনিষেধ' আরোপ করার কথা আছে সেগুলি প্রয়োগ করার ব্যাপারেও অসুবিধা আছে। প্রথমত, যে সম্পত্তি হচ্ছে আসলে নগদ টাকা সেটা সরকার নিয়ে নিতে পারেন কিনা সেবিষয়ে আইনগত সংশয় আছে। দ্বিতীয়ত, যদি-বা দখল করা যায় তাহলেও সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী তার দরুণ খেসারত দিতে হবে এবং ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মামলার পর এই খেসারতের পরিমাণ স্থির করে দেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা পার্লামেন্টের নয়, সুপ্রীম কোর্টের। শুধু তাই নয়, সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ হচ্ছে, যে সম্পত্তি দখল করা হচ্ছে তার মূল্যের সঙ্গে খেসারতের পরিমাণের একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। রাজন্যদের বিশেষ ভাতা লোপ করে তার জায়গায় যদি খেসারত হিসাবে সমপরিমাণ অর্থই সরকারী তহবিল থেকে গুনে দিতে হয় তাহলে ভাতা লোপ করায় কোন মানেই থাকে না।

এই গোলকধাঁধা থেকে বেরোবার রাস্তা কি? জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি মনে করেন যে, আজকের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিহীন রাজন্য ভাতাগুলি তুলে দেওয়া উচিত তাহলে সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপের সুযোগ না রেখে জনগণের সেই ইচ্ছাকে কার্যকরী করার উপায় কি? বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও প্রাক্তন অ্যাটর্ণি-জেনারেল এম সি শীতলবাদ বলেছেন যে, ভবিষ্যতে এক দিন সুপ্রীম কোর্টই হয়ত নিজের রায় সংশোধন করবে। পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী জি ডি খোসলা বলেছেন যে, রাজ্যগুলির সীমানা পরিবর্তনের বেলায় যেমন রাজ্য বিধানসভাগুলির মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা আছে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলির সংশোধনের জন্যও যদি সেরকম কোন ব্যবস্থা রাখা যায় তাহলে সুপ্রীম কোর্টের আপত্তি দূর হবে। আবার কেউ-কেউ বলেছেন যে, সবচেয়ে ভাল রাস্তা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংবিধানের ১৪৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের উপদেশ চাওয়া।

চতুর্থ আর একটি অভিমত আছে যেটা রাজনৈতিক ধরনের এবং সেই অভিমত লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনেরই ইঙ্গিত দেয়। অভিমতটা হচ্ছে এই যে, পার্লামেন্ট ও আদালতের দড়ি টানাটানিতে যে অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে সেটা জনগণকে ভাল-ভাবে বুঝিয়ে সরকারের উচিত নূতন করে জনগণের রায় নেওয়া। এই রায়ের ভিত্তিতে গঠিত সরকারের পক্ষে জনগণের ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেওয়া সহজ হতে পারে।

•

লোকসভার আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচন ঘোষণার প্রাক্কালে ভারতীয় রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য খবর হল নয়াদিল্লীতে মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং সেখানে মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলির কার্য-কলাপের সমন্বয় সাধন করার জন্য একটি সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত। নয়াদিল্লীর ঐ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল মুসলিম মজলিস। ১৯৬৪ সালে কলকাতা ও অন্যত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর গঠিত এই অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে যেভাবে মুসলিম রাজনীতির ভিতর স্থান করে নিয়েছে সেটা লক্ষ্য করার মত ঘটনা। মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের এক-মাত্র প্রতিনিধি বলে যে দাবী করে সেই দাবী অবশ্য মুসলিম মজলিসের আবির্ভাব-এর ফলে ক্ষুন্ন হচ্ছে; কিন্তু এটাও লক্ষ্য করার মতো যে, মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক সুলেমান সেইত মজলিসেরও একজন সম্পাদক।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, নূতন

মুসলিম সংগঠনটির কার্যকলাপের প্রতি সমস্ত রাজনৈতিক দল লক্ষ্য রাখবে। অন্তর্বর্তী নির্বাচন হলে এই সংগঠন তাতে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে, উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

●

ঘটনার আশ্চর্য পরিহাস বলতে হবে যে, ১৪ বছর আগে আর একটি দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে যে মানুষটি পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তিনিই আর একটি দাঙ্গার পর সেই দায়িত্ব থেকে অপসৃত হলেন। সরকারীভাবে যদিও বলা হচ্ছে যে, ভ্লাডিস্লাভ গোমুলকা স্বাস্থ্যের কারণে অবসর গ্রহণ করেছেন তাহলেও একথা বুঝতে বাকী থাকছে না যে, পোল্যাণ্ডের বন্দর শহর গডানস্ক শহরে যে শ্রমিক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং পরে যে বিদ্রোহ গডিনিয়া, সোপোট, স্টেটিন প্রভৃতি বাল্টিক উপকূলবর্তী পোলিশ শহরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল সেই বিদ্রোহই গোমুলকা, পোলিশ রাষ্ট্রপ্রধান মারিয়ান স্পাইচালস্কি প্রভৃতির পতন ঘটিয়েছে।

ঘটনার পরিহাস এখানেই যে, গোমুলকা নিজে একজন উদারনীতিবাদী বলে পরিচিত ছিলেন। স্তালিনের আমলে তিনি কারারুদ্ধও হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে পোজনান শহরে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার পরই বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের শান্ত করার জন্য তাঁকে ক্ষমতায় বসান হয়েছিল। ক্ষমতায় এসে গোমুলকা পোল্যাণ্ডে স্তালিনের আমলের রাজনৈতিক কঠোরতা অনেকখানি শিথিল করেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি তিনি আয়ত্তের বাইরে যেতে দেন নি। তাঁর ক্ষমতা লাভ করার পরই হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থানের ঘটনা তাঁকে একথা ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশ পোল্যাণ্ডের পক্ষে রাশিয়ার বিরাগভাজন হওয়া খুবই বিপজ্জনক। ১৯৬৮ সালের বসন্তকালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় যে ঘটনা ঘটে তার ধাক্কাও পোল্যাণ্ডে এসে লেগেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোল্যাণ্ড জার্মান সৈনিকদের আক্রমণের শিকার হয়েছিল, শিকার হয়েছিল চেকোশ্লোভাকিয়াও। সেই স্মৃতি পোল্যাণ্ডের মানুষ ভুলতে পারে নি। ১৯৬৮ সালে তারা যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার মাটিতে পূর্ব জার্মানীর সৈনিকদের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের সৈনিকদেরও প্রবেশ করতে দেখল তখন তারা সেটা খুব ভাল চোখে দেখে নি। এর প্রকাশ ঘটল যখন ওয়ারশ'তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জার-বিরোধী মনোভাবে লেখা উনবিংশ শতাব্দীর একটি নাটক অভিনয় করতে চাইলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁদের এই অনুমতি দিলেন না। ছাত্ররা সে সময়ে রাস্তার বেরিয়ে এসেছিলেন। তার পরও পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু-কিছু হাঙ্গামার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। গত মে মাসে কোটভিচ শহরে গৃহিণীরা খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মাংসের দোকানের কাঁচ ভেঙে ফেলেন। এর মাস তিনেক পরে বিক্ষোভকারীরা ঐ শহরের সরকারী অফিসগুলির সামনে যে হাঙ্গামা করেছিলেন তা দমন করার জন্য সৈন্য ডাকতে হয়েছিল।

চূড়ান্ত পরিণতি ঘটল বড়দিনের ঠিক আগে বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী শহরগুলিতে দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে। এবারকার হাঙ্গামায় উপলক্ষ খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি। খবরে প্রকাশ যে, সম্প্রতি মূল্যতালিকার যে সংশোধন করা হয়েছে তাতে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের দাম কমান হলেও খাদ্যবস্তুর দাম শতকরা ২০—৩০ ভাগ বাড়ান হয়েছে। বড়দিনের আগে এই মূল্যবৃদ্ধি পোল্যাণ্ডের রোমান ক্যাথলিক প্রভাবাধীন মানুষ যে মোটেই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে সেকথা প্রকাশ পেল।

খাদ্যবস্তুর উৎপাদনে পোল্যাণ্ডের ব্যর্থতার পরিচয় আগেও পাওয়া গেছে। পূর্ব ইউরোপের মধ্যে পোল্যাণ্ডই একমাত্র দেশ যে পি এল-৪৮০ অনুযায়ী আমেরিকা থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করেছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় যে খাদ্যশস্য পাঠাতে হয় সেটাও পোল্যাণ্ডের খাদ্যের ঘাটতি বাড়াতে সাহায্য করে থাকতে পারে। ১৯৬৯ সালে পোল্যাণ্ডে যে বন্যা ও অনাবৃষ্টি হয় তাতে কৃষিপণ্যের উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ কমে যায়। এর পর আসে প্রচণ্ড শীত এবং শীতের শেষে বন্যা। হয় খাদ্যদ্রব্যের কঠোর রেশনিং অথবা মূল্যবৃদ্ধি প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। যাঁদের পরামর্শে বড়দিনের ঠিক আগে মূল্যবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল তাঁরা গোমুলকাকে ক্ষমতা থেকে সরাবার উদ্দেশ্য নিয়েই করেছিলেন, এমন সন্দেহ এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ২৬-১২-৭০ —পুণ্ডরীক

## লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন

অনেক দিন ধরেই যে-জল্পনা চলছিল তা এখন প্রায় নিশ্চিত হতে চলেছে। শাসক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই চিন্তা লালন করা হচ্ছিল অনেক দিন থেকেই যে, বর্তমান লোকসভাকে তার পুরো মেয়াদ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ নাগাদ লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন করার পক্ষে শাসক কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মত প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর কাজে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করল। ভারতে এর আগে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন হয় নি। প্রত্যেক লোকসভাই পাঁচ বছর মেয়াদ পুরো করে নতুন নির্বাচনের মুখোমুখি হয়েছে। এবারে তার ব্যতিক্রম ভারতীয় রাজনীতির একটি বাস্তব দিকের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সংগঠনপন্থী কংগ্রেসের নেতারা অবশ্য এ খবর শুনেই হাঁ-হাঁ করে উঠেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল এই যে, লোকসভায় যে-সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই তাঁরা পার্লামেন্ট ভেঙে নতুন নির্বাচনের পরামর্শ রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারেন না। এই যুক্তি আইনের দিক থেকে কতখানি বিচারসহ সে-প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও বলা চলে যে, কোনো সরকারের প্রধানমন্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পার্লামেন্টে পরাজিত না হচ্ছেন ততক্ষণ পার্লামেন্ট ভেঙে দেবার পরামর্শ তিনি দিতে পারেন। এ নজীর বৃটিশ পার্লামেন্টের রয়েছে। দ্বিতীয়ত বিরোধী দলের যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকত কিম্বা বিকল্প সরকার গঠনের ক্ষমতা থাকত তাহলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তো সরকারের নেতৃত্বই করতে পারতেন না। সুতরাং মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য প্রধানমন্ত্রী যদি রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন তাহলে তিনি নিজের ক্ষমতার এক্তিয়ারের মধ্যেই তা করবেন। এতে সংবিধান-বিরোধিতার কোনো প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে না।

ভারতের রাজনীতিতে একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মতো কোনো দল বর্তমানে আছে কিনা সন্দেহ। কংগ্রেস অবিভক্ত থাকার কালে তারা এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। কিন্তু এখন সকল দলকেই চিন্তা করতে হচ্ছে কিভাবে জোটবন্দী হয়ে নির্বাচনে লড়াই করা যায়। রাজ্যগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সরকার কায়েম হয়েছে। অনেক রাজ্যেই সরকারের অবস্থা টলমল। পশ্চিম বাংলায় তো বিধানসভাই নেই। কিন্তু লোকসভাকে বোধ হয় আর অপেক্ষা করানো চলে না। এবং শাসক কংগ্রেস মনে করছেন যে, এখন নির্বাচন হলে হাওয়া তাঁদের অনুকূলে বইবে। বিভিন্ন রাজ্যে উপনির্বাচনে শাসক কংগ্রেস ভাল ফল পেয়েছে। এমন কি সংগঠনপন্থীদের ঘাঁটি গুজরাট এবং মহীশূরেও শাসক কংগ্রেসের অবস্থা এখন ভাল। গুজরাটে সংগঠন-কংগ্রেসে বিরাট ভাঙন ধরেছে। মহীশূরে ও বাঙ্গালোর পৌরসভার নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে।

শাসক কংগ্রেসের প্রতিপক্ষরাও নিশ্চিন্তে বসে নেই। উত্তর প্রদেশ ও হিন্দীভাষী এলাকার জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টি তার প্রবল প্রতিপক্ষ। তবে স্বতন্ত্র পার্টিতেও ভাঙন ধরেছে। জনসঙ্ঘ যতটা হৈ-হল্লা করে নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটবে কিনা তা বিচারসাপেক্ষ। দক্ষিণে তামিলনাড়ুতে ডি এম কে-র আধিপত্য বজায় আছে। কিন্তু সম্প্রতি যুবসমাজ এই দলের সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ। তাই সেখানে কামরাজই সফল হবেন কিম্বা জগজীবনরাম, তা দেখার একটা সুযোগ আসবে মধ্যবর্তী নির্বাচনে। কেরলে বামপন্থীদের একাংশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে শাসক কংগ্রেস বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। এই ধরনের বোঝাপড়া আগামী নির্বাচনেও হতে পারে এবং তাতে প্রধানমন্ত্রী ভাল ফল পাবার আশা রাখেন। এস এস পি ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও নির্বাচনের জন্য তৈরী হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এস এস পি-র সাফল্য লাভের আশা।

শাসক কংগ্রেস বিরোধিতার দরুণ এস এস পি যে কোনো ধরনের নির্বাচনে বোঝাপড়ায় আসতে পারে। তাতে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টিও যদি আসন জেতে, এস এস পি আপত্তি করবে না। কার্যত জনসঙ্ঘের সঙ্গে তাঁরা একত্রে মন্ত্রিত্ব করবেন। উত্তরপ্রদেশে সংগঠন কংগ্রেসকে তাঁরা ক্ষমতায় ফিরে আসতে সাহায্য করেছেন। অবশ্য এ নিয়ে এস এস পি-র মধ্যেও মতবিরোধ আছে তা আসন্ন নির্বাচনে কী রূপ নেবে বলা মুস্কিল। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গত বিধানসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে একক বৃহত্তম দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এবার তাঁদের প্রাক্তন সহযোগীরা দ্বিধাবিভক্ত। গণসংগঠনগুলোতে তাঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকলেও ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ে তাদের প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে অন্য ধরনের শক্তি। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে-অশান্তি চলছে তাতে নির্বাচনে ভোটদাতারা নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে কত সংখ্যায় ভোট দিতে আসেন তার ওপর বিভিন্ন দলের সাফল্য-অসাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল। তাছাড়া লোকসভার নির্বাচন হলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনের প্রশ্নও উঠবে। বামপন্থীরা নির্বাচন দাবী করেছেন কিন্তু বাংলা কংগ্রেস এখনি নির্বাচনের পক্ষপাতী নন। তবু লোকসভার নির্বাচন হলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন না করার কোনো যুক্তি থাকবে না। যদিও এই নির্বাচনের পরেও এখানে স্থায়ী সরকার গঠিত হবে কিনা তা বলা যাচ্ছে না। এককভাবে কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে এখানে সরকার চালানো কঠিন। তবে কেরলের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হলে পশ্চিমবঙ্গও যে জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার পাবে না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

## যেদিকেই যাই ॥

মৃগাঙ্ক রায়

আমি যেদিকে যাই সেদিকেই<br>
তোমার দিকে যাবার পথ,<br>
আমি যেদিকে তাকাই সেদিকেই<br>
তোমার তাকিয়ে-থাকা চোখ আমার চোখে পড়ে,<br>
আমি যখনই তোমাকে ডাকি<br>
তোমার কণ্ঠে আমার ডাক ফিরে আসে।

আমার ফিরে যাবার পথ নেই<br>
দাঁড়িয়ে থাকার মতো স্থির মাটি নেই,<br>
সামনে যেদিকে তাকাই সেদিকেই<br>
নিহত মানুষ।<br>
তোমার আমার মধ্যে নির্মিত সেতু নেই।<br>
অথচ আমি যেদিকেই যাই সেদিকেই<br>
তোমার দিকে যাবার পথ।।

## যদি বলি ॥

তুলসী মুখোপাধ্যায়

যদি বলি, আছে কোথাও বাগানবাড়ী<br>
দীঘির পাড়ে বটের ছায়া, শেতলপাটি<br>
নেমন্তন্ন চিঠির মতো সবুজ মাটি<br>
মুচকে হেসে বলবে মাতাল—<br>
ধুকুনি যেন ঢাকের বাড়ি<br>
কেননা, এই পাতালে সকলকিছুই উল্টাপাল্টা<br>
পায়ে পায়ে শ্মশানমশান<br>
মামদোভূতের হাতের ঝাপ্টা!

যদি বলি, পান্থশালার মতন মানুষ<br>
দাঁড়িয়ে আছেন মোড়ে মোড়ে<br>
কাছে গেলেই জড়িয়ে ধরে<br>
আতরজলে চান করিয়ে ডেকে নেবে ভেতরবাড়ী<br>
বলবে হেসে মিথ্যেবাদী মিথ্যেবাদী—<br>
কেননা, এই অরণ্যে সর্বকিছুই তো উল্টোপাল্টা<br>
একের সঙ্গে অন্যজনার নিত্য আড়ি<br>
এবং হাত বাড়ালেই<br>
বনমানুষের হাতের ঝাপ্টা!

## আমার মা-কে ॥

জয়ন্তী রায়

তুমি তো কিছুই সুখ নিলে না,<br>
দু' চোখ তুলে দেখলে না তো—<br>
শুধুই পথে পরিক্রমা—সময়টুকু ঝরিয়ে দিলে,<br>
ক্লান্ত ডানা অবক্ষয়ে ঃ<br>
তুমি তো কিছুই সুখ নিলে না—<br>
অনেক আলোর সোনা-আকাশ,<br>
ফসল ভরা মেঠো ক্ষেতের আহ্লাদী ঘ্রাণ<br>
এবং কাঁচ দুধ্বোশীষের আলতো ছোঁওয়া—<br>
এলানো রোদ, চড়ুই পাখীর ব্যস্ততা বোধ,<br>
অন্য মনে সৌখীন সাধ—<br>
এসব কিছুই নিলে না তো ঃ<br>
তুমি কিছুই সুখ নিলে না,<br>
আলো জেলে সরিয়ে দিলে<br>
অন্ধকারের অনেক ছায়া;<br>
হৃদয়টাকে কোথায় রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে<br>
সমস্ত দিন এলো চুলে ঘর সাজালে—সমস্ত দিন—<br>
সারা দিনের সহস্র কাজ,<br>
সবার ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবলে শুধু;<br>
স্বাদ নিলে না বিচিত্রতার,<br>
ভাগ নিলে না প্রাত্যাহিকের আসক্তিতে,<br>
সমস্ত দিন এলো চুলে কাটলো তোমার।<br>
সমস্তক্ষণ রইলে নিজে অন্ধকারে,<br>
বাইরে জেলে অনেক আলোর দীপান্বিতা।

নরেন্দ্র দেব

বয়সে বছর কয়েকের বড় হলেও 'দাদা' বলে ডাকিনি কোনওদিন। ভারতী পত্রিকার অফিসে যে সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতো তার কড়া নিষেধ ছিল কেউ কাউকে 'দাদা' বলবে না। বন্ধুরা পরস্পরকে নাম ধরে ডাকবে। স্বর্গীয় সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের আজকের চেয়ে বয়সে বেশ বড় ছিলেন কিন্তু কেউ আমরা কখনো তাঁকে 'সৌরেনদা' বলিনি। কুমুদরঞ্জন যদিও ভারতীর আড্ডার সদস্য ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তিনি কবি ও সাহিত্যিক অতএব বয়স তাঁর যাই হোক আমরা তাঁকে কুমুদরঞ্জন ছাড়া আর কিছু বলিনি কোনও দিন।

কুমুদরঞ্জন গ্রামের ছেলে হলেও কলেজে পড়বার সময় দীর্ঘকাল কলকাতায় কাটিয়েছিলেন। কবি তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই। অবশ্য শুধু 'কবি' বললে সঠিক পরিচয় দেওয়া হল না, 'সুকবি' বলে খ্যাতি তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিল এবং সে খ্যাতি তিনি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অক্ষয় রেখে যেতে পেরেছেন।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যের মধ্যে কোনও রচনা চাতুর্য দেখাবার প্রচেষ্টা নেই। প্রত্যেকটি কবিত সহজ সরল স্বাভাবিক তাই অনায়াসেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের অন্তর স্পর্শ করে। এ গুণ সহজসাধ্য নয়। স্বভাব কবি ভিন্ন অন্য কারুর পক্ষে সর্বজনচিত্ত স্পর্শ করা সম্ভব নয়। কুমুদরঞ্জন এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মানুষ। ছাত্রাবস্থায় বহুকাল এই কলকাতা শহরে কাটালেও কলকাতা কুমুদের 'কোগ্রাম'কে ভোলাতে পারে নি। পড়া শেষ করে 'গ্রাজুয়েট' হয়ে দেশে চলে গেলেন এবং দেশের স্কুলে মাস্টারীর কাজ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন। কবিতা লেখার ঝোঁক তাঁর শুনেছি স্কুলের ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিল। বয়স তখন তাঁর দশ বছরের বেশী নয়। সেই কিশোর বয়সের সহজ সরল রচনার ধারা কুমুদরঞ্জন তাঁর পরিণত বয়স পর্যন্ত অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিলেন। কখনও কোনও দিন দুরূহ দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করে আভিধানিক ভাষায় কবিতা রচনার চেষ্টা করেন নি। কুমুদরঞ্জনের প্রত্যেকটি রচনা সহজ সরল অথচ মর্মস্পর্শী।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় নতুন ধরনের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল কুমুদরঞ্জন মল্লিকের। তাঁর কবিতাগুলি যেমন ছোট-ছোট কবিতার বইগুলিও তেমনি বেশ ছোট-ছোট। একখানি ফুলস্কেপ কাগজের চার পাট করলে যে আকার হয় কুমুদরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থগুলিই আমরা সর্বপ্রথম সেই আকারেই পেয়েছিলুম। কয়েকখানি বইয়ের নাম করলে হয়ত অনেকের মনে পড়বে — তেমন ছোট আকারের কাব্যগ্রন্থ ইতিপূর্বে আর কোনও কবি ছাপান নি। কুমুদরঞ্জনের রচিত কবিতাগুলির মধ্যে কবি তাঁর রচনার আকৃতিতে নূতনত্ব দেবার চেষ্টা না করলেও তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে নূতনত্ব এনেছিলেন। কয়েকখানির নাম করলেই বইগুলির কথা অনেকের মনে পড়বে। যেমন 'শতদল', 'বনতুলসী', 'একতারা', 'বীণা' ইত্যাদি আর ৮।৯ খানি কাব্যগ্রন্থ।

বলা বাহুল্য যে এত বেশী সংখ্যক কাব্যগ্রন্থ আর কোনও বাংলা কবির প্রকাশিত হয় নি। অবশ্য এ কাব্যগ্রন্থগুলি যেমন আকারে ছোট তেমনি মুদ্রিত কবিতাগুলিও সংখ্যায় অল্প। শিশু বালক ও কিশোরদের উপযোগী অসংখ্য কবিতা ইনি রচনা করেছিলেন। এই কবিতাগুলির মধ্য থেকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য হবার উপযোগী কতকগুলি কবিতা নির্বাচিত করে নিয়ে কবিশেখর কালিদাস রায় একখানি 'স্কুল পাঠ্য' কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে গ্রন্থখানি পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হয়েছে।

কুমুদরঞ্জনের একখানি নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশক মিত্র-ঘোষ কোম্পানী। এই বইখানি প্রকাশের অনেক বৎসর আগে একদিন কুমুদরঞ্জন আমাকে ডেকে ছিলেন তাঁর কাছে। তিনি তখন কলকাতায় এসে পটলডাঙ্গায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত বাড়ীতে উঠেছেন। সে বাড়ীটি তখন একটি 'মেসে' রূপান্তরিত হয়েছিল। কবিবন্ধুর ডাকে সেই দিনই বিকেলে গিয়ে হাজির হলুম কবির কাছে। আমি তখন ঠনঠনে কালিবাড়ীর সামনে ৩নং মুক্তারাম রোডে আমাদের পৈতৃক ভবনে বাস করি। পটলডাঙ্গা ওখান থেকে খুবই কাছে।

কুমুদ আমাকে পেয়ে খুবই খুশী। বার করলে তার মস্ত মোটা এক কবিতার ফাইল। বললে একখানা নির্বাচিত কবিতার বই বার করতে চাই। সেই বইয়ের জন্য এই কবিতাগুলো বেছে রেখেছি। তুমি একটু শোন, এগুলো সব দেওয়া চলবে কিনা। পড়তে শুরু করে দিলেন কবি তাঁর নির্বাচিত কবিতাগুলি। কাব্যপ্রিয় কবি তাঁর স্বরচিত কবিতাগুলি সন্তানের তুল্য ভালবাসতেন। তাঁর নির্বাচন শুনে বুঝলুম মা যেমন তাঁর অক্ষম সন্তানের প্রতি একটু অধিক মমতা বোধ করেন, কুমুদরঞ্জন তেমনি তাঁর একাধিক দুর্বল রচনাকেও ফেলতে পারেন নি। বললুম নির্বাচিত কাব্যগ্রন্থে এগুলি দেওয়া ঠিক হবে না, এ সব বাদ দাও। কবি নিতান্ত অনিচ্ছুক মনে সেগুলি বাদ দিয়ে রাখলেন বটে, কিন্তু বুঝলুম কবির মন সেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

কবিশেখর কালিদাস রায় কুমুদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও কবির ছিলেন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। শেষ পর্যন্ত কবিতা নির্বাচনের ভার নিজের ওপর না রেখে কালিদাসের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে কুমুদরঞ্জনের 'স্বনির্বাচিত কবিতা' কবিশেখর কালিদাসের দ্বারা শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়ে প্রকাশিত হল। যেমন হয়েছে তাঁর শিশুপাঠ্য বা স্কুলপাঠ্য কবিতাগুলি।

কোনও কবিই নিজের রচনার সুবিচারক হতে পারেন না। তাঁর কাছে নিজের সব রচনাই ভাল লাগে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই দেখা গেছে স্বরচিত কবিতার শ্রেষ্ঠ অপকৃষ্ট বিচার করে গ্রন্থাকারে ছাপার সময় নির্বাচন করে, ও বাদ দিয়ে ছাপা। কবি কুমুদরঞ্জন তাই কবিবন্ধু কালিদাস রায়ের সাহায্য নিয়ে ভাল করেছিলেন। কবি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এমন বিনীত নম্র সহজ সরল মানুষ তাঁরা এ যুগে দ্বিতীয় কাউকে দেখেন নি।

অজয় ও কুনুর নদীর সংযোগস্থলে কোগ্রামে কবির জন্ম এবং সারা জীবন তিনি এই গ্রামকে ভালবেসে এরই কোলে সামান্য স্কুল শিক্ষকের কাজ নিয়েই স্বচ্ছন্দ জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু শেষ বিদায় নিতে হল তাঁকে এই কলকাতাতেই তাঁর সন্তানের স্বরচিত নবগৃহে। বাংলা দেশের কাব্যাকাশ হতে একটি সুস্নিগ্ধ তারা মিলে গেল।

# জোনাকি

শান্তি পাল

কালকের বিকেলটা এমন ছিল ন। এমন ভারী মেঘলা বিবর্ণ। বেলাশেষের পড়ন্ত নরম রোদ মেখে আকাশ ঝকঝকে ছিল। সদ্য চুনকামকরা দেয়ালের মত পরিচ্ছন্ন। কাল-বিকেলে ঠিক এমন সময়...আড়চোখে জ্যোৎস্না দেয়ালঘড়িতে একবার তাকাল, এমন সময় নির্মল জ্যোৎস্নার হাতের আঙুলে কটি আঙুল দিয়ে আলতো করে ছুঁয়েছিল। আগ্রহভরে সহজ আত্মীয়তায় অথচ কেমন মন-কেমন-করা ঔদাসীন্যে। কমলা রোদমাখা উজ্জ্বল বিকেলে পথ চলতে চলতে নির্মল হঠাৎ বলেছিল, চল না, কোথাও সামান্য সময় বসি।

নির্মলের মনে সে সময় নিশ্চয় কোন দ্বিধা বা ইতস্ততঃ ভাব ছিল না। থাকলে এরকম প্রস্তাবে জ্যোৎস্না কিঞ্চিৎ উত্যক্ত বা আহত হবে কিনা সেকথা ভাবত।

এসব ভাবতে ভাবতে একটা ভারী শ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসল জ্যোৎস্না। এতক্ষণ খাটের ওপর চোখে আড়াআড়ি হাত চাপা রেখে শুয়েছিল বিকাশ। সামান্য শব্দে এবার চোখ খুলে নীচে তাকিয়ে জ্যোৎস্নাকে দেখল।

—কি করছ বলত সেই থেকে?

—সেলাই। দেখছ তো।

—যত সব বাজে কাজ।

—শুয়ে শুয়ে কুঁড়েমি করার থেকে অনেক ভাল।

বিকাশ আর কথা বাড়াল না। যে যার নিজেকে নিয়ে থাকাই ভাল। একথা ভেবে এক পাক গড়াগড়ি খেল বিছানায়। জ্যোৎস্নারও আর ভাল লাগছিল না। সেলাই রেখে উঠে বারান্দার দিকে গেল। সরু ধরণের দোতলা ঝুলবারান্দা রাস্তার ওপর। জ্যোৎস্না পাঁচিলে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। এই বর্ষাতেও কিছু মানুষজন রিকসা ও মোটরের ব্যস্ত যাতায়াত দেখল। আকাশ সারাদিনই মেঘলা। রাশি রাশি ভিজে মেঘ যেন আকাশ জুড়ে থমকে আছে। মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝাপটায় সূক্ষ্ম জলকণা তুষার-পাতের মত ঝরে যায়। শরীরে মুখে চুলে।

—এই, শুনছ? ঘর থেকে মিহি গলায় ডাকল বিকাশ। বাইরের দৃশ্য থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল জ্যোৎস্না,

—বল।

—এদিকে শোন।

জ্যোৎস্না সামনে এল। আঙ্গুল দিয়ে উড়ো চুল ঠিক করল। শনিবারের বিকেল। সকাল সকাল কলেজ থেকে ফিরে চা খেয়েই বিছানায় শুয়েছে বিকাশ। ঠিক ঘুমোচ্ছে না. মেঘলা অপরাহ্নের আলস্যে গড়াচ্ছে শুধু। জ্যোৎস্নাকে আসতে দেখে দুবার আমেজের হাই তুলল. আঙ্গুলে আঙ্গুলে জড়িয়ে মটমট শব্দ করল তারপর ক সেকেন্ড চুপচাপ চেয়ে থাকল ওরদিকে। তা দেখে ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসল জ্যোৎস্না।

—অকারণ ডাকাডাকি করছ কেন বলত?

—এমনি। ইচ্ছে হল তাই।

—আসলে শুধু ইচ্ছেটাই? জ্যোৎস্না তাকাল কটাক্ষে।

—আর এক কাপ চায়ের প্রয়োজন ছিল। বিকাশ একটু থেমে বলল।

—তাই বল। জ্যোৎস্না দু মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মেঘলা আকাশের ছায়ায় সাদা দেয়ালগুলি পর্যন্ত বিবর্ণ লাগছে। ঘরের কোণে কোণে কড়িকাঠে আসবাবের ফাঁকে ঘুপসি অন্ধকার জড়ো হয়ে উঠছে। বাইরে এখন সামান্য শব্দে বৃষ্টি হচ্ছে। এলোমেলো খাটের বিছানায় আধশোয়া বিকাশ, বালিশে কনুয়ের ভর দিয়ে এক নজর ওকে দেখে নিয়ে জ্যোৎস্না রান্নাঘরে চলে এল। স্টোভে কেটলি বসাতে গিয়ে নিজের হাত পায়েও কেমন আলস্য বোধ করল। আসলে এটা মনের বিমুখতা, মনে মনে বলল জ্যোৎস্না. একটানা বিরামহীন সেবাযত্ন কর্তব্যপরায়ণতা মাঝে মাঝে দুরূহ ভার হয়ে ওঠে বইকি। সেটা নিজের স্বামীর প্রতি হলেও। বিকাশ যেন একটা বয়স্ক শিশুর মত। নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে জ্যোৎস্নার ওপর নির্ভরশীল। মেয়েদের অবশ্য এটা ভাল লাগে, জ্যোৎস্না ভাবল, তার নিজেরও লাগত এক সময়। তবু নির্ভরতারও একটা শেষ আছে। সব যত্নেরই ধৈর্যসীমা আছে। সেটা না মানলে আস্তে আস্তে তা একটা কঠিন দায়িত্বই হয়ে যায় শুধু। আর ভালবাসা? ভালবাসার কথা মনে হতে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি খেলল জ্যোৎস্নার। ওটা সম্ভবত তৈরী করা জিনিস। ভালবাসি এই ধারণাটা মনের মধ্যে ধরে রাখতে হয় চেষ্টা করে, না হলেই হঠাৎ হঠাৎ অসাবধানে কখন যেন মিলিয়ে যায় ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বৃষ্টির গন্ধের মধ্যে। জ্যোৎস্নার কয়েক মিনিটের এসব চিন্তার মধ্যেই কেটলির জল ফুটে এল। চা নিয়ে এঘরে এসে বিকাশকে তেমনি শোয়া দেখল জ্যোৎস্না। বিকেলের আলো সম্পূর্ণ মরে গিয়ে অন্ধকার ঘনিয়েছে ঘরে বাইরে সর্বত্র। এমন বর্ষার শব্দ ও মেদুর অন্ধকারে কেমন হাঁফ ধরে গেল জ্যোৎস্নার। তাড়াতাড়ি সুইচ জেলে আলোকিত করল ঘরকে। বিকাশ উঠে কাপ নিল। বলল,

—তুমি খাবে না?

—আমি বারবার চা খাই না।

—তবে এখানে এসে বসো।

—বাঃ আমার গা ধোয়া চুল বাঁধা সবই যে বাকি।

—এমন ধৃষ্টির দিনে কেউ সাজে না। বিকাশ রহস্য করল, সেই যে একটা কবিতা আছে না, যেমন আছো তেমনি এসো—

—থাক, জ্যোৎস্না বাধা দিল, আপাতত তুমি উঠে একটু সাজসজ্জা করলে আমি বাধিত হব।

ওর বলার ভঙ্গিতে বিকাশ হেসে ফেলল। জ্যোৎস্না হাতের ওপর তোয়ালে এনে দিলে উঠে পড়তে বাধ্য হল। ক মুহূর্ত ওর শিথিল পায়ে বাথরুমে যাওয়া লক্ষ্য করল জ্যোৎস্না। তারপর আপনমনে টুকিটাকি কাজে ব্যাপৃত হল। ঘড়িতে ছটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। গতকাল এ সময়টা যেন সন্ধ্যা নেমেও নামেনি। চারদিকে কেমন একটা শান্ত গভীর বিকেলের পরিবেশ তখনও ছিল। সামান্য এলোমেলো বাতাসে ক্রমশ ধূসরতার রং ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু তা এত আস্তে যে চারদিকের বাড়ীর দেয়াল কার্ণিশ গাছগাছালির মাথা এমনকি চলন্ত গাড়ীগুলির গা থেকে উজ্জ্বলভাব মুছেও যেন মুছছিল না। সে সময় বিদায়কালে নির্মল কি রকম তৃপ্ত চোখে বলেছিল,

—দারুণ ভাল লাগল আজ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে। এমনি পথের মধ্যে।

—ধন্যবাদ। জ্যোৎস্না ছোট্ট করে অহংকৃত হেসেছিল।

—আবার কবে দেখা হবে কে জানে। নির্মলের স্বরটা হঠাৎ করুণ লেগেছিল জ্যোৎস্নার কানে।

—হবে নিশ্চয়ই। কোন না কোনদিন। জ্যোৎস্না যেন সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল।

—ক্লাবে আলাপ তো মাঝে মাঝে? ভুলে যেও না যেন আবার।

—নিশ্চয়ই না। নির্মলের মিনতিতে জ্যোৎস্না সৌজন্য করে হেসেছিল। মাঝে মধ্যে ওখানে গেলে ভালই লাগবে আমার।

বিকাশ ঘরে ফিরে আসতেই বাথরুমের দিকে চলে গেল জ্যোৎস্না; আজ আবহাওয়ার বেশ ঠান্ডা ভাব। একটা শীতল শব্দময় সন্ধ্যা যেন চারপাশে বিছিয়ে রয়েছে। তবু শরীরে খানিকটা ঠান্ডা জলের স্পর্শ কাম্য মনে হচ্ছে। দরজা বন্ধ করে বাথরুমের নির্জনতার মধ্যে খানিকটা চুপচাপ রইল জ্যোৎস্না। তারপর বিক্ষিপ্ত মনকে গুছিয়ে এনে গায়ে জল ঢালায় প্রবৃত্ত হল।

কড়া নাড়ার শব্দে ফ্ল্যাটের দরজা খুলেই যুগপৎ বিস্মিত ও খুশী হল জ্যোৎস্না।

—নমিতা, তুই?

—আসতে নেই? ভেতরে পা দিয়ে হাসল নমিতা।

—না, তা নয়। তবে এমন হঠাৎ আশা করতে পারিনি।

—ঘরকন্নায় খুব ব্যস্ত আছিস নাকি এখন?

—না, রবিবারের সকালে তেমন ব্যস্ততা থাকে না। চল, ঘরে বসবি।

নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে বসার ঘরে এল জ্যোৎস্না। চেয়ারে হেলান দিয়ে মুখে খবরের কাগজ মেলে ধরেছিল বিকাশ। ওদের পায়ের শব্দে তাকাল।

—আমার বান্ধবী, নমিতা। সংক্ষেপে জানাল জ্যোৎস্না।

—নমস্কার। বিকাশ হাসি হাসি মুখ করল। আপনাকে তো চিনি, দেখেছি এর আগে।

—অতএব পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এবার খোশ গল্পের পালা। নমিতার কথার ভঙ্গিতে ওরা দুজনেই হাসল। নমিতা ইদানীং বেশ সুশ্রী হয়েছে আগের তুলনায়। জ্যোৎস্না চেয়ে চেয়ে দেখছিল। ওর চোখ-মুখ হাত-পায়ে কেমন একটা খুশীর ঢল। সাজসজ্জায় ঈষৎ মার্জিত উচ্ছলতা।

—তোরা কথা বল আমি চা করে আনি। জ্যোৎস্না সুগৃহিণীর মত বলল।

—তোকে কিন্তু আজকাল টিপিক্যাল সংসারীদের মতই লাগে। নমিতা মন্তব্য করল ঠাট্টা করে।

—যে সংসার করে তাকে সংসারী লাগবে না? উত্তরটা হেসেই দিল জ্যোৎস্না। তবু বুকের গোপন থেকে একটা ম্লান ছায়া যেন তার হাসিতে বিস্তৃত হল। সেটুকু ঢাকতে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে এল সে।

—আমাদের ক্লাবের খবর-টবর রাখিস? চা খেতে-খেতে বলল নমিতা।

—সেই তো বিয়ের পর দু-একবার গিয়েছি মাত্র। ছোড়দার কাছেই যাওয়া হয়ে ওঠে না।

—এই এক বছর না দেড় বছরে মাত্র দুবার? নমিতা অপ্রস্তুত করে দেবার মত মুখভাব করল। বিকাশকে ইঙ্গিতে দেখাল, উনি কি পছন্দ করেন না নাকি? অবশ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপকের এই সমস্ত অবস্তুতে আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক।

—না ঠিক ওর জন্যে নয়, জ্যোৎস্না যেন নিজেকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে তোলবার চেষ্টা করছিল, আমিই ঠিক সময় করে উঠতে পারি না, ব্যাপারটা বুঝলি?

—তোদের আমলের সেই পুরনো ক্লাব আর নেই, জানিস। শুধু মাঝে মধ্যে স্বরচিত কবিতা পাঠ আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঘরোয়া আসর দিয়েই শেষ করি না তোদের মত আজকাল আমরা। যেদিন থেকে আমি আর সনৎ, সনৎকে মনে আছে তো, ক্লাবের ভার নিয়েছি, সেদিন থেকেই তার চেহারা বদলেছে।

—এখন কি-কি হয়? জ্যোৎস্না আগ্রহী হতে চাইল।

—এই নাটক-টাটকও হয়। এই দ্যাখ না, একটা ম্যাগাজিন এবার বের করছি আমরা, নমিতা ব্যাগ খুলে কাগজপত্র বার করা শুরু করল, মান্থলি জার্নাল একটা বুঝলি, মন্দ কবিতার সঙ্গে পলিটিক্যাল নোশনও থাকবে এর।

বিকাশ মনোযোগ দিয়ে ওর কাগজপত্র দেখছিল, জ্যোৎস্নাও দেখল কিছু-কিছু।

—ভালই তো করছিস।

—অবশ্যই ভাল, তবে এর পিছনে তোমাদেরও হেল্প চাই।

—হেল্প? হেসে তাকাল জ্যোৎস্না।

—যেমন তুমি এর জন্য ফিজিক্যালিও খাটতে পার, অথবা কিছু ডোনেশনও দিতে পার। নমিতা পড়া বোঝাবার মত করে বলল।

এতক্ষণে নমিতার এমন হঠাৎ আসার অর্থ আবিষ্কার করল জ্যোৎস্না। সামান্যক্ষণ কি ভাবল মনে-মনে। তারপর বিকাশের দিকে অলক্ষ্যে একবার চেয়ে বলল,—আচ্ছা এ ব্যাপারে আমি পরে তোর সঙ্গে একদিন দেখা করব।

—তার মানে একদিন ক্লাবে আসছিস। সুখবর। নমিতা চটপট বলল, তারপর কি মনে পড়তে বলল আবার, আচ্ছা, সেই নির্মল নামের ছেলেটাকে আজকাল আর দেখি না কেন বলত? সেই যে তোর ছোট-বৌদির ভাই?

—আমি কেমন করে জানব। একটু থেমে-থেমে ঢোক গিলে বলল জ্যোৎস্না।

—যাক গে, ওকে দিয়ে বিশেষ কাজও পাওয়া যেত না বোধহয়। নমিতা কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের মত করে হাসল, দেখলেই মনে হয় ছেলেটা ক্যালাস।

জ্যোৎস্না উঠে আস্তে-আস্তে ঘরের অন্য পাশে সরে এল। এটা-সেটা অনাবশ্যক জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করল। কানের পাশটা কেমন যেন সামান্য উষ্ণ লাগছিল। নমিতার চাল-চলন কথাবার্তা এখন ক্রমশ ওর কাছে সভ্যতাহীন ও উন্নাসিক বলে প্রমাণিত হচ্ছিল। নমিতা এখন বিকাশের সামনে অনবরত কথার ফুলঝুরি ফোটাচ্ছিল।

—কিছুদিনের মধ্যেই, বুঝলেন, একটা বেশ কালচারাল ফাংশন করার ইচ্ছে রয়েছে। গানের পারফরমেন্সই হোক অথবা একটা অ্যাবসার্ড ড্রামা। যাই হোক, আপনাদের কাছে আবার আসতে হবে তো টিকিট বিক্রি করতে। নমিতা মধুর করে হাসল।

—নিশ্চয়ই আসবেন। বিকাশও সৌজন্য করল।

জ্যোৎস্নার মনে হচ্ছিল নমিতা যেমন কথাবার্তায় দক্ষ, ওর একটা সেলস রিপ্রেসেনটেটিভ হওয়াই উচিত ছিল। যদিও অবশ্য নমিতাদের অবস্থা খুব স্বচ্ছল, জ্যোৎস্না জানে, ওর বাবা একজন উচ্চপদস্থ অফিসার।

—আচ্ছা আজ তাহলে উঠি। শব্দ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল নমিতা। জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে বলল, তোর কাজ-কর্মে বোধহয় খুব ব্যাঘাত ঘটালাম।

—না-না, তাতে কি। জ্যোৎস্না মুখে হাসির পর্দা টানল।

—মনে করে যাস কিন্তু। ভুলে থাকিস না যেন।

—ভুলব না, যাব এর মধ্যে একদিন। জ্যোৎস্না দায়সারা গোছের বলল।

নমিতা চলে গেলে জ্যোৎস্না শোবার ঘরে এল। বিকাশও এল ওর সঙ্গে। একটু ইতস্তত করে বলল,—তোমার বান্ধবী বলছিলেন যখন, আজই দিয়ে দিলে না কেন কিছু।

জ্যোৎস্না অনেকক্ষণ কিছু সাড়া দিল না। তারপর কি ভেবে বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে একটু চাপা স্বরে বলল,—বড়-পিসিমার টাকাটা এখনো পাঠান হয় নি।

বিকাশের বড়পিসিমা সহায়সম্বলহীনা। থাকেন বিকাশের দাদার বাসায়। সৌজন্য-বশত বিকাশ কিছু টাকা প্রতি মাসে পাঠায় তাঁকে। এ মাসে প্রথম দিকে বাড়তি কিছু খরচ হওয়ায় টাকা পাঠাতে বিকাশ এখনো ইতস্তত করছে। জ্যোৎস্না এ কথাটা মনে করিয়ে দিতে বিকাশ যেন একটু থিতিয়ে গেল। কপালে সূক্ষ্ম দাগ পড়ল কট।

—তাছাড়া এসব ব্যাপারে বিশেষ কিছু খরচ করতে আমার ইচ্ছেও নেই তেমন। জ্যোৎস্না একটু বিরক্ত সুরেই উচ্চারণ করল।

—কেন? বিকাশ হঠাৎ হাসি টানল ঠোঁটের কোণে, ওই ক্লাব-ট্লাব তো জানি আগে তুমিও করতে।

জ্যোৎস্না এক পলক ওর মুখের দিকে তাকাল, ওর হাসিতে সরলতা অথবা ব্যঙ্গ তা বুঝল না। সামান্য সময় থেমে থেকে বলল, — তখন ওটা একটা ঘরোয়া, প্রায় পারিবারিক ব্যাপার ছিল। এখন বোধহয় আস্তে-আস্তে বারোয়ারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ওতে আর আমার আগ্রহ নেই।

জ্যোৎস্না ইচ্ছে করেই যেন আলোচনা বন্ধ করার জন্যে রান্নাঘরে চলে গেল। সকাল বেলার সমস্ত কাজগুলি এখনও পড়ে রয়েছে। অথচ কোনকিছুতেই যেন ওর মন সংপৃক্ত হতে পারছে না। নমিতা দমকা হাওয়ার মত এসে যেন ওর জীবনযাত্রার একটানা সুরে হঠাৎ সাময়িক ছেদ টেনে দিয়ে গেল। একচিলতে রান্নাঘরের নির্জন একাকিত্বে এই মুহূর্তে নিজের মধ্যে কেমন একটা শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হল জ্যোৎস্না। নিজেকে সমস্ত পৃথিবী থেকে পরিত্যক্ত এক বিচ্ছিন্ন সত্তা বলে উপলব্ধি করল। এবং এই বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি ক্রমশ ওকে এই সংসার এই ঘর-গৃহস্থালী এমন কি বিকাশের প্রতিও বিমুখ করে তুলল।

ও-ঘরে বিকাশ দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নামাচ্ছে, অনুভবে বুঝল জ্যোৎস্না। এখন বেশ কিছুটা সময় যাবে ওর দাড়ি পরি-চর্চায়। জ্যোৎস্না জোর করে কাজকর্মে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করল। আবহাওয়ার

কাল বিকেলের বোলাটে মেঘলা ভাব এখন আর নেই। এই প্রথম বেলাতেই আকাশ বেশ উজ্জ্বল এবং রোদ তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে। অবশ্য এ সময়টায় বৃষ্টি নামার কোন স্থিরতা নেই। তবু এখন বর্ষণক্লান্ত মেঘের ঝর্ণায় আলোর চারপাশ বেশ ছিমছাম ঝকঝকে লাগছে। জানলার বাইরে কার্ণিশে গজিয়ে-ওঠা একটা টুকরো গাছের সদ্য-বৃষ্টিধোয়া অপরূপ রং দেখতে-দেখতে আনমনে আবার নমিতার কথা ভাবল জ্যোৎস্না। এবং নমিতার সূত্র ধরে এখন আস্তে-আস্তে ওর পুরনো জীবন পূর্ব-পরিচিত সব মানুষগুলি ছবির মতন সামনে ভাসছিল। বিয়ের আগে জ্যোৎস্না তার ছোড়দার বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরটিতে একটা ক্লাব মত করেছিল। মাত্র কয়েকজন বান্ধবী ছিল এর মধ্যে। আর ছিল ছোটবৌদির ভাই নির্মল। অল্পবয়সের উচ্ছ্বাসপ্রবণ মানসিকতা আর নিজেকে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস তাদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিল। ওদের তখন কাজকর্মে সর্বদাই অলৌকিক উন্মত্ততা। স্বরচিত কবিতার আসর, ঘরোয়া গানের জলসা, ক্লাবের এই সব কাজেই মেতে থাকত তখন জ্যোৎস্না। মা পছন্দ করতেন না, রাগ করতেন। বিশেষ করে ছোড়দার বাসায় ওর এমন যাতায়াত মাকে বিরক্ত করত। ছোড়দা নিজের মতে বিয়ে করেছিল তাই আলাদা অন্যত্র থাকতে হত তাকে। মা বা অন্য দাদারা তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না। জ্যোৎস্না কিন্তু থাকতে পারত না ছোড়দার কাছে না গিয়ে। ভীষণ ভালবাসত ছোড়দা তাকে, তাই। ছোড়দার বৈঠকখানাকে ক্লাবঘর বানিয়ে প্রায় রোজই যাতায়াত করতে পারত জ্যোৎস্না। ছোড়দার প্রশ্রয়ে বৌদির উৎসাহে হুজুগের দিনগুলি ভালই কাটত ওর।

বিকাশ দাড়ি কামিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে। এখনি হয়ত আর একবার চায়ের ফরমাস হবে। সময়ে মানুষের কত পরিবর্তন হয়, জ্যোৎস্না ভাবল, মানুষের জীবনে, কার্যধারায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রংয়ের পলস্তারা পড়ে। সেই আগের দিনের চঞ্চল স্বপ্নাশ্রয়ী জ্যোৎস্না আজ সংসারের ভাঁজে-ভাঁজে নিজের অস্তিত্বকে বিছিয়ে দিয়েছে। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে একটি মাত্র মানুষের ভাল-লাগা মন্দ-লাগা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের চতুঃসীমানায়। ভেবে একটা শ্বাস ফেলল জ্যোৎস্না। রান্নাঘর ছেড়ে এপাশে চলে এল। তখন তোয়ালে দিয়ে বিকাশ মুখ গাল মুছছিল। জ্যোৎস্না দরজার কাছে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়াল.
—আমি কাল কিম্বা পরশু একবার মায়ের ওখানে যাব।

—যেও। বিকাশ আয়নার সামনে দাঁড়াল।

—সেই সঙ্গে ছোড়দার কাছেও ঘুরে আসব।

তার মানে সারাদিনের জন্য নিশ্চিন্ত তো? বিকাশ রহস্য করে হাসল, আর আমি বেচারা দুরবস্থার কাটাব এদিকে।

জ্যোৎস্না ওর কথার উত্তর দিল না। দরজা থেকে সরে এল। বিকাশের সমস্ত সুবিধে-অসুবিধে দিয়ে জ্যোৎস্না নিজের দিন-রাত্রিকে ভরে ফেলেছে। এর মধ্যে বেশিক্ষণের ফাঁক কোথাও নেই। তা হোক। জ্যোৎস্না তবু যাবে। একদিনের জন্যেও অন্তত খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলে আসবে।

—একি, তুমি যে? একটা অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে ও আনন্দে চমকে গেল নির্মলের স্বর।

—এলাম। রঙিন কাপড়ের ইজিচেয়ারে বসে দুবার দুলে নিল জ্যোৎস্না।

—এ সময় এমন হঠাৎ আসবে, ভাবতে পারি নি। সামান্য অপ্রস্তুতভাবে নির্মল খালি গায়ে গেঞ্জি চাপাল।

—আমিও ভাবি নি। ছোড়দার বাড়ী গিয়েছিলাম, মনে হল ক্লাবে তুমি তো আর আসো না, একবার মেসে গিয়েই দেখা করি। চেনাশোনা মানুষদের কখনো কখনো দেখতে ইচ্ছে হয়। কথাটা বলে আপন মনেই হাসল জ্যোৎস্না।

—তুমি সেই আগের মতই আছো। ছটফটে আর খেয়ালী। সস্নেহে বলল নির্মল।

নমিতার কথাটা মনে পড়ল জ্যোৎস্নার। টিপিক্যাল সংসারী মানুষের মত নয় তাহলে এই মুহূর্তে সে। বেশ খুশী খুশী হল মনটা।

—তারপর কি খবর বল। জ্যোৎস্না মধুর সুরে বলল, ছোট বৌদির মুখে শুনলাম কদিন খুব অসুস্থ ছিলে।

—তাই দেখতে এলে। নির্মলের মুখে পরিতৃপ্তি খেলা করল। তা ওটা কোন খবর নয় তেমন। অসুখ মানুষ মাত্রেরই হয়। আসলে খবর তো এখন তোমার। নির্মল কৌতুকে হাসল।

—কেন, আমি বিয়ে করেছি বলে, নির্মলদা? জ্যোৎস্না কেমন অদ্ভুত হাসি নিয়ে তাকাল ওর দিকে। ক্রমশ হাসিটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে শব্দে পরিণত হল, বিবাহিত জীবনের প্রাইভেসিটাই কি তাহলে আসল খবর? হি হি হাসিতে গড়িয়ে পড়ল জ্যোৎস্না।

—তুমি আগের চেয়েও দুষ্টু হয়ে গেছ। গলার স্বরে প্রশ্রয় মাখিয়ে বলল নির্মল. কি আনাবো বল, শুধু চা না আর কিছু?

—দাঁড়াও ভেবে বলছি। জ্যোৎস্না চেয়ার ছেড়ে উঠে ইতস্তত ঘরের মধ্যে ঘুরল দু একবার। তাকের ওপর রাখা ছোট আয়নায় মুখ দেখল। ইস, কি করে রেখেছ জিনিসপত্র। জ্যোৎস্না টুকিটাকি অগোছালো বস্তুগুলি মসৃণ হাতে সাজিয়ে রাখল।

—আমার রুমমেট এসে আজ অবাক হবে, নির্মল হাসল, আমার এমন গুছানো বিছানা বই তাক সব দেখলে।

—তোমাদের এই মহিলা স্পর্শবিহীন হাহাকারভরা ঘরে আমার চুড়ির শব্দটুকু রেখে যাবো নাকি?

—ফাজিল।

—সত্যি নির্মলদা, একদিক দিয়ে বেশ আছ তোমরা। জ্যোৎস্না হাসি মুখে অথচ আক্ষেপ করার মত বলল, কোন ঝামেলা নেই, দায়-দায়িত্ব নেই। সংসারের বদ্ধ হাওয়ায় শ্বাস নিতে হয় না।

—তা হলেও, জ্যোৎস্নার দিকে কটাক্ষে চেয়ে নির্মল ঠাট্টা করল, সংসারের বদ্ধ হাওয়ায় মানুষের চেহারা কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। বেশ সুখী সুখী ধরনের।

—এই, ইয়ার্কি হচ্ছে? জ্যোৎস্না হৈ-হৈ করে উঠল, তুমি জান না দুপুরে ঘুমোলেই মানুষের চেহারা গোলগাল হয়। ওর সঙ্গে সুখের কোন সম্পর্ক নেই। কথাটা বলে জানলার কাছে সরে এল জ্যোৎস্না। বাইরে তাকিয়ে অপরাহ্ণের মেদুর রক্ত ম্লান ছায়া ও আকাশ দেখল।

—মনে হয় মেঘ করেছে নির্মলদা। বৃষ্টির আগেই আমার চলে যাওয়া উচিত।

—সে কি, তুমি কিছু খেলে না যে? তা হয় না জ্যোৎস্না।

—বেশ তো, চল না বাইরে যাই, জ্যোৎস্না সহজভাবে বলল, পথেই কিছু খেয়ে নেব তোমার কাছে।

—তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তবে তাই। নির্মল গায়ে জামা চাপাল।

পথে বেরিয়ে জ্যোৎস্না ভাবল, নির্মলের মতন পরিচ্ছন্ন দ্বিধাহীন মনের ছেলে কমই হয় এবং সে জন্যই ওর কাছে অনায়াসে সহজ হওয়া যায়।

—ওখানে যাবে? ছিমছাম একটা রেস্তোরাঁ দেখিয়ে বলল নির্মল।

—চল। জ্যোৎস্না খুশি হওয়ার মত বলল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে দু মিনিট চুপচাপ হাঁটল ওরা। ঈষৎ ঝোড়ো হাওয়া থেকে থেকে ওদের চোখে-মুখে ঝাপটা দিচ্ছিল। উড়ন্ত আঁচল ও মুখের ওপর খুচরো চুল সরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল জ্যোৎস্না। স্লেট রঙের মেঘ ক্রমশ ঘন হয়ে পৌঁছিয়ে আসছে দিগন্ত জুড়ে। ব্যস্ত পাখী পাখার ঝাপটে শূন্যে বাসা খোঁজে। মেঘের আড়ালে আড়ালে কখন বিকেল মরে গিয়ে সন্ধ্যার ধূসরতা চারদিকে ব্যাপ্ত হতে শুরু করেছে। সে রকম আবছা আলোয় নির্মলের নিশ্চুপ মুখের দিকে চেয়ে কি এক ধরনের মমত্ববোধে আচ্ছন্ন হল জ্যোৎস্না। সদ্য জ্বরমুক্ত কিছুটা শীর্ণ চেহারা, রুক্ষ এলোমেলো চুল, ক্লান্ত দূরমনস্ক দৃষ্টি এবং শিথিল চলার ভঙ্গিতে নির্মলকে যেন আজ জীবন বঞ্চিত পরিত্যক্ত ও উদাসীন বলে মনে হচ্ছিল।

—আমার কিন্তু এখনও বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে না নির্মলদা। তুমি আমার খাতে ছুটে দেবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ নাকি? জ্যোৎস্না আবদারের গলায় বলল।

—তাছাড়া কি? নির্মল গলায় দুর্দ্দমের গাম্ভীর্য আনল, দেখছ না আকাশের অবস্থা, বৃষ্টি এলে ভিজে একাকার হবে যে?

—অনেকদিন রোদ বৃষ্টি মাথায় করে পথ চলি নি। অনাকাঙ্ক্ষ ইচ্ছেয় রাস্তায় ঘুরেছি কবে, মনেই পড়ে না, নির্মলদা।

—দূর পাগল, নির্মল হাসল, চল তবে কোথায় যাবে।

—এই তো বাঁ-দিক দিয়ে গেলে গঙ্গার পাড়, না? জ্যোৎস্না উৎসাহে ওকে বোঝাল, গঙ্গার পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে খানিকটা যাব। মাঝ পথে যদি বৃষ্টি আসে,—তোমার আবার ভিজলে শরীর খারাপ হবে তাই না? তা যদি বৃষ্টি আসেই, কোথাও না কোথাও একটু মাথা আড়াল করা যাবে, কি বল?

আপন প্রাণের উল্লাসেই জ্যোৎস্না কথা বলে যাচ্ছিল, নির্মল শুনছিল চুপচাপ। ওর খামখেয়ালী ভাবটাকে মমতায় লক্ষ্য করছিল।

—দ্যাখো কি অদ্ভুত লাগছে। জ্যোৎস্না গঙ্গার ধারে এসে জলের দিকে আঙুল দেখাল।

নির্মল চেয়ে দেখল বর্ষায় নদী আশ্চর্য পূর্ণতায় টলমল। দিগন্তবিস্তারী ধূসর আবছায়া জলের বুকে প্রতিবিম্ব হয়ে দুলছে। ঝোড়ো হাওয়ায় অস্থির ঢেউগুলি তীরের কাঠিন্যে পাথা ঝাপটাচ্ছে।

—এস না, একটুক্ষণ বসি তার চেয়ে। এখানটা বেশ পরিচ্ছন্ন আর নির্জন। নির্মল এতক্ষণ পথ হেঁটে এবার একটু স্থিতু হতে চাইল।

—বেশ তো, এসো। জ্যোৎস্না তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। বস্তুত আজকে যেন বেহিসেবী হবার নেশা পেয়ে বসেছিল ওকে। এই মুহূর্তে ও মনে রাখল না, সন্ধ্যার মধ্যে ওর বাড়ী ফেরার কথা, বিকাশের একজন সহকর্মী বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীর আসার কথা এবং তাদের সামনে নিখুঁতভাবে চায়ের ট্রে সাজিয়ে রেখে আপ্যায়ন করার কথা।

গঙ্গার ঘাটে ঘনিয়ে আসা সায়াহ্ন, ইতস্তত কিছু লোকের চলাফেরা, তীরের অতি কাছে পরস্পর সংলগ্ন দুটো নৌকো, ছইয়ের ভেতর ক্ষীণ আলোর রেখা। মাথার ওপর ডালপালা জড়াজড়ি করা ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছ। এসব কিছুই জ্যোৎস্নার অস্তিত্বকে একটা ছন্নছাড়া মোহে ও অনাস্বাদিত ভাললাগায় মুড়ে রেখেছিল।

নির্মল বসে অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। কি যেন ভাবছিল অন্যমনে। তারপর এক সময় খুব থেমে থেমে গম্ভীর গলায় বলল,

—একটা প্রশ্ন করছি, জ্যোৎস্না, তোমার স্বামী কি জানেন, তুমি আজ আমার সঙ্গে দেখা করবে?

চকিতে জ্যোৎস্না তাকাল নির্মলের দিকে। ওর দূরপ্রসারী দৃষ্টি, শান্ত মুখে ও কঠিন ভঙ্গি দেখল।

—না, ঈষৎ থতিয়ে উত্তর দিল জ্যোৎস্না, মানে আমি তো হঠাৎ চলে এলাম তোমার কাছে।

—উনি বোধহয় আমার নামও জানেন না, তাই না। নির্মল সামান্য শব্দ করে হাসল। সে হাসিতে কিসের প্রকাশ, ঝাপসা অন্ধকারে টের পেল না জ্যোৎস্না।

—জানে, জ্যোৎস্না জোর দিয়ে বলে উঠল, তুমি আমার আত্মীয়, বৌদির ভাই, আমার—আমার বন্ধু, তা ও নিশ্চয়ই জানে।

—জ্যোৎস্না, নির্মল এবারে পরিপূর্ণভাবে জ্যোৎস্নার দিকে তাকাল, উনি কি জানেন আমি এক সময় তোমায় ভালবাসতাম?

—না। জ্যোৎস্না কেমন যেন বুকচাপা শ্বাসের শব্দে উচ্চারণ করল।

—তুমি যে আমাকে হঠাৎ একদিন প্রত্যাখ্যান করে ও'র সঙ্গে বিয়েতে মত দিয়েছিলে, তাও তো কখনো বলনি ও'র কাছে?

নির্মলের আচরণ ক্রমশ কেমন দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিল। জ্যোৎস্না বিব্রত হয়ে উঠছিল। এরকম আবছায়া, জোয়ারে ফেঁপে ওঠা নদী ও হাওয়ায় গাছের পাতার শব্দই নির্মলের এমন অস্থির মানসিকতায় পরিবর্তনের জন্য দায়ী, মনে মনে ভাবল, জ্যোৎস্না। জলের গায়ে তীব্র আলোর দাগ ফেলে একটা স্টিমার এগিয়ে আসছিল। সেদিকে চেয়ে খুব আস্তে আস্তে জ্যোৎস্না বলল,

—সে কথা বলা প্রয়োজন মনে করিনি কোনদিন। অনেক কিছু অনুভব আছে যা বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে থাকাই ভাল, প্রকাশ হলে হয়ত তার গাম্ভীর্য তার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

—তা হবে। নির্মল আঙুল দিয়ে চুল সোজা করল। তারপর বলল, বিয়ে করে তুমি সুখী হয়েছ তো, জ্যোৎস্না?

—কঠিন প্রশ্ন, নির্মলদা। জ্যোৎস্না ক্ষীণ হাসল, হেঁয়ালির মত করে বলল, হয়ত হয়েছি, হয়ত বা নয়। আমি অত ভেবে দেখতে পারি না।

দূরে মেঘের স্তর ফুঁড়ে খানিকটা চকিত আলো ফুটল, তারপর গম্ভীর গুমগুম শব্দ বাতাস কেটে দূরদূরান্তে মিলিয়ে গেল।

—এবার ওঠা উচিত, নির্মল তাড়া দিল, জোরে বৃষ্টি নেমে গেলে তোমার বাড়ী ফিরতে অসুবিধে হবে।

—আমার বাড়ী একদিন আসবে তো? জ্যোৎস্না উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

—যাব। নির্মল সৌজন্যে হাসল।

—কবে যাবে বলো। জ্যোৎস্নার কণ্ঠ ব্যাকুল শোনাল, যেন প্রমাণ করতে চাইল, জ্যোৎস্না শুদ্ধ স্বামীর অলক্ষ্যে নির্মলকে নির্মলের একদা অতীতকে সান্ত্বনা দিতেই আসেনি, তার সঙ্গে পূর্বপরিচয়কে স্বীকৃতি দেবার সাহসও জ্যোৎস্নার আছে।

—কবে যাব? নির্মল এক মুহূর্ত চিন্তা করল, তারপর বলল, তোমার যেদিন নেমন্তন্ন খাওয়াবার ইচ্ছে হবে আমার নামে একটা পোস্টকার্ড ফেলে দিও, কেমন?

—বেশ, তাই হবে। জ্যোৎস্না যেন নিশ্চিন্ত হল, তারপর আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাস রাস্তার দিকে এগোল।

রান্নাঘরের ছোট জানলার ফ্রেমে এক-ফালি আকাশ চোখে আসে। কালকের বৃষ্টি সারারাত মাতামাতি করেছে। এখন আকাশ নির্মেঘ। কালচে নীল রঙের। গোটা তিনেক জ্বলজ্বলে তারাও দৃশ্যমান এখান থেকে। ও ঘরে বিকাশ রেডিও খুলে রেখেছে। একটা পরিচিত গান ভেসে আসছে, দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে। গানটা এককালে জ্যোৎস্নার খুব প্রিয় ছিল। প্রায়ই গাইত আপন মনে। গান শুনতে শুনতে কাজ করছিল জ্যোৎস্না। বর্ষণহীন দিন বলে আজ সারাক্ষণ বেশ ঝরঝরে লেগেছে।

রাত সম্ভবত নটা হবে। বিকাশের খাওয়ার সময় হয়েছে। বিকাশ ঘড়ির কাঁটা ধরে খায়। বাক্যটা অবশ্য জ্যোৎস্নারই। জ্যোৎস্না নিজে তা করে না। খাওয়া ঘুমোনোর একটু বেহিসেবীপনাই তার ভাল লাগে। এঘরে টেবিল-চেয়ারে বসে এতক্ষণ বিকাশ তার কলেজের পরীক্ষার খাতা দেখছিল। এখন জ্যোৎস্না এসে দেখল বিকাশ দু আঙুলে কপাল টিপে ধরে আছে। গান শেষ হয়েছিল। জ্যোৎস্না রেডিও বন্ধ করে বিকাশের কাছাকাছি এল।

—মাথা ধরেছে নাকি?

—হ্যাঁ, হঠাৎ বিচ্ছিরিভাবে ধরে গেল মাথাটা। বিকাশ গলায় কষ্ট ব্যক্ত করল।

—তাহলে খাতা দেখা বন্ধ কর তো, জ্যোৎস্না সমবেদনায় রাগ দেখাল। বিকাশের হাতের কলমটা নিয়ে বন্ধ করে রাখল, বলল, এখন খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

—কেমন যেন কিছু ভাল লাগছে না। বিকাশ চেয়ারে হেলান দিয়ে শরীর হাত-পা টান টান করল।

জ্যোৎস্না স্বামীর কপালে হাত রাখল। বলল,

—গা তো ভালই আছে, সারাদিনে কলেজে পড়িয়ে এসে আবার খাতা দেখতে বসেছ, আসলে অবসাদ লাগছে তাই।

—[illegible] খাওয়া [illegible] [illegible], কেন লাগবে।

—না, আগে কিছু খেয়ে নাও, তারপর মাথা টিপে দেব না হয়।

বিকাশ বাধ্য ছেলের মত কথা শুনল। রাতের খাওয়া শেষ করে বিছানায় এসে শুল। জ্যোৎস্না আলো নিভিয়ে ওর শিয়রে এসে বসল।

—তোমার খাওয়া কখন হবে? বিকাশ প্রশ্ন করল।

—হবেখন। রাত তো বেশী নয়। জ্যোৎস্না ওর ঘন চুলে আঙ্গুল ডোবাল। বিকাশ চুপ করে শুয়ে রইল। আরামে অথবা ঘুমের চেষ্টায় বিকাশ বড় নির্ভরশীল, জ্যোৎস্না ভাবল, একেবারে শিশুর মত, কথাটা ভেবে বুকের মধ্যে মমতা উপলব্ধি করল জ্যোৎস্না। বেশিদিন বিয়ে হয়নি ওদের। তবু ইতিমধ্যেই বিকাশ নিজের দৈনন্দিন জীবনে ওকে ছাড়া ভীষণভাবে অসহায় ও অনভিজ্ঞ। ঠোঁটে হাসি এল জ্যোৎস্নার অন্ধকারে। কাল সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নার ফিরতে একটু দেরী হওয়ায় বিকাশকে নিজের জন্য এক কাপ চা করে নিতে হয়েছিল। তাতেই নাকি দারুণ নার্ভাস লেগেছিল বিকাশের। ভাগ্যিস কাল বিকাশের সেই বন্ধুদম্পতি আসেন নি। জ্যোৎস্না মনে মনে জিভ কাটল, আকাশে বর্ষার মেঘ দেখেই নিশ্চয় তাঁদের বেড়াতে আসার শখ স্থগিত রাখতে হয়েছে। হিসেবী সংসারী লোক সব, জ্যোৎস্নার মত কেউ তো আর ছন্নছাড়া খাম-খেয়ালী নয় যে জল-বৃষ্টি মাথায় করে রাস্তায় হাঁটবার জন্যে উৎসাহিত হবে। নিজের গত দিনের খেয়ালীপনার কথা ভেবে আবারও হাসল জ্যোৎস্না। দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে, গানের সুরটা বার বার মনে গুঞ্জন করে ফিরছে। বিকাশ চুপচাপ শুয়ে আছে সোজা হয়ে। হয়ত ঘুমোচ্ছে, হয়ত নয়। এই নিশ্চুপ রাত ঠাণ্ডা হাওয়া অন্ধকার বিছানো ঘর জ্যোৎস্নার মনে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনায় তরঙ্গিত হচ্ছিল। কাল সারারাত বৃষ্টিমুখর ছিল। কাল সন্ধ্যে-বেলা নির্মল ওকে বাসে তুলে দিতে এসে বেশ ভিজে গিয়েছিল। নির্মলের শরীর কেমন আছে কে জানে। ভেবে উদ্বেগ বোধ করল জ্যোৎস্না। নিজের ওপর রাগ হল। অনর্থক নির্মলকে কষ্ট দেবার জন্যে। অবশ্য নির্মল জ্যোৎস্নার জন্য কষ্টকে কষ্ট মনে করে কিনা সন্দেহ আছে। খানিকক্ষণ আলো নেভানো ঘরে থাকতে থাকতে চোখটা বেশ সয়ে এসেছে। খুব আবছা অস্পষ্টভাবে ঘরের সাদা দেয়াল আসবাবপত্রগুলি বিছানা এবং বিছানায় শায়িত বিকাশের শরীরের রেখা দেখা যাচ্ছিল। কেমন যেন সব কিছু ছবির মত লাগছিল জ্যোৎস্নার কাছে। এবং এরকম সাজানো ঘরের ছবি দেখতে দেখতে নির্মলের ঘরের দৃশ্যটা ওর মনে এল। দুটি একক খাট, বইয়ের র‍্যাক, আলনা, চেয়ার ইত্যাদি [illegible] [illegible] [illegible] সাজানো মেয়ের [illegible] ঘর। যেখানে অনেক দিন ঢুকবার নেই। জ্যোৎস্নার ইচ্ছে করেছিল এই ঘর এই জিনিসপত্র সব নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে দেয়। সেই মুহূর্তের এই খেলো ইচ্ছেটার কথা ভেবে এখন হাসি পেল জ্যোৎস্নার। নির্মলের এমনি সাদামাঠা জীবনযাত্রাটাই সব। আজ এবং সম্ভবত চিরকালই। জ্যোৎস্নার ছোট-বৌদির বাবা মা নেই। অবস্থাও তাঁদের খুব ভাল ছিল না। অন্যান্য ভাই-বোন সব বিবাহিত। একমাত্র অকৃতদার ভাই নির্মলের আপাতত একক জীবন। নিঃসঙ্গ এবং বৈশিষ্ট্যহীন। ইদানীং ওর এই নির্বিশেষ ভাবটা বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। নিতান্ত সাধারণ একটা চাকরী, সাধারণ পড়াশোনা, সাধারণ চেহারা। আগে তবু শরীরে একটা উজ্জ্বলতা ছিল, কথাবার্তায় ধার ছিল।

বিকাশকে ঘুমন্ত জেনে আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে এল জ্যোৎস্না। অন্ধকার ঘরে কোথা থেকে একটা জোনাকি চলে এসেছে। আলমারির গায়ে চেয়ারের হাতলে কখনো বা খাটের বাজুতে বিন্দুসম আলোটা দপদপ করে জ্বলছে নিভছে। যেন কার অনুসন্ধানী চোখ এই অন্ধকার নৈঃশব্দে বুকের ভেতরের কোন গোপন সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঈষৎ ক্লান্ত শ্লথ পায়ে জ্যোৎস্না এবার রান্নাঘরের দিকে চলে এল। এরকম একা নির্জনে তার পুরনো জীবনের কথাগুলি মনে আসছিল। এবং নির্মলের কথা। নির্মলের চেহারা বা সংগতি যাই হোক ওর মনটা যেন বড় ভাল। ওর হাসি, আচার ব্যবহার ও হৃদয়, সব কিছু যেন আলাদা রকম, অন্যের থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। কারো সঙ্গে যেন তুলনাই হয় না। সে সময় তাই জ্যোৎস্নার আবেগতাড়িত মন নির্মলকে যেন বেশ পছন্দই করে ফেলেছিল। নির্মলের মুগ্ধতা ও ব্যক্তিত্ব তার ভাল লাগত। তার নিরুচ্চার প্রেমের কদাচিত চকিত প্রকাশ জ্যোৎস্নাকে খুশী করত। যদিও জ্যোৎস্না কখনো তেমন কিছু আশ্বাস ওকে দিয়ে ফেলেনি। হয়ত তাতে লাভই হয়েছে, হয়ত বা তা নয়।

রান্নাঘরে খুঁটিনাটি যাবতীয় রাতের কাজ সেরে অল্প সময়েই আবার এঘরে চলে এল জ্যোৎস্না। তেমনি স্তব্ধ অন্ধকার চতুর্দিকে। শুধু পাখার ব্লেড ও ঘড়ির শব্দ। এবং বিকাশ তেমনি একভাবে শায়িত। এক নজর সব কিছু দেখে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এল জ্যোৎস্না। প্রায় নিঝুম রাস্তা লাইটপোস্টের ম্রিয়মাণ আলোয় কেমন যেন মৃতের মত লাগে। সামনের ফুটপাথে রিকসার মধ্যে বেহুঁস ঘুমন্ত একজন রিকসাওয়ালা ও কদাচিত দুটি একটি মানুষ পথে দেখা যাচ্ছিল। বিকাশকে বিয়ে করায় নির্মলের হয়ত প্রচণ্ড অভিমান। তার সঙ্গে ছোটবৌদিরও। ওরা হয়ত জ্যোৎস্নাকে স্বার্থপর, কেবলমাত্র নি[illegible]লোভী ভাবে। এবং নির্মল একথাও ভাবে যে, জ্যোৎস্না স্বামীর কাছ থেকে নির্মলের অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখতে চায়। এরকম মনে হতে অস্থিরতাতে ছটফট করে উঠল জ্যোৎস্না। না, নির্মলের এধারণার ভুল ভেঙে দেবে সে। ওকে সমাদর করে নিয়ে আসবে একদিন বাড়ীতে। বিকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। এবং অন্তত একথাটা জানিয়ে রাখবে বিকাশকে যে নির্মল ওর যথেষ্ট খাতির ও শ্রদ্ধার পাত্র।

মনে মনে এমন একটা প্রতিজ্ঞা করতে পেরে স্বস্তির শ্বাস ফেলল জ্যোৎস্না। দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে, গানটা মনে মনে সুক্ষ্ম সেতারের সুরের মত বাজল আবার। শিথিল পায়ে বারান্দা থেকে জ্যোৎস্না ঘরে চলে এল। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ বলে উঠল,

—এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ, শরীর খারাপ হবে যে।

বিকাশের গলায় উদ্বেগ ও মমতার উত্তাপ খেলা করল।

—তুমি এখনো ঘুমোও নি? জ্যোৎস্না বিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

—না, এত যন্ত্রণা নিয়ে সহজে ঘুমোন যায় না। চুপচাপ পড়ে আছি তাই। কিন্তু তুমি এবার শুয়ে পড়।

এতক্ষণে শরীরে সত্যিই একটা স্খলিত-ভাব ও অবসাদ বোধ করল জ্যোৎস্না। ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানার কাছে চলে এল। বিকাশ ওপাশ ফিরে শুয়েছে এবার। ও এক্ষুনি ঘুমোবে না। জ্যোৎস্নারও এখন ঘুম আসবে না। এখন অনায়াসেই ওর কাছে নির্মলের কথা বলতে পারে জ্যোৎস্না। ওকে নেমন্তন্ন করে বাড়ীতে ডাকার কথা। কিন্তু কি বলবে জ্যোৎস্না? নির্মল ওর আত্মীয়। নিতান্ত সাধারণ চেহারার সাদা-মাঠা বৈশিষ্ট্যহীন ব্যক্তি। তাকে বিকাশ কিভাবে নেবে কে জানে। হয়ত বাড়ীতে আসবে, দুটো আলাপপরিচয় হবে তারপর চা খেয়ে সৌজন্য বিনিময় করে চলে যাবে নির্মল। সম্ভবত আর কোনদিন আসবে না। কি লাভ তাতে। জ্যোৎস্নার বা নির্মলের অথবা বিকাশের? কে জানে হয়ত বা অমন একজন সাদামাঠা প্রায় শ্রীহীন চেহারার আত্মীয়ের প্রতি জ্যোৎস্নার অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস ও আগ্রহ দেখে বিকাশের ভদ্রচোখ পালিশকরা হাসির আড়ালে ব্যঙ্গে ও করুণায় ঝিকমিক করে উঠবে। তবে থাক, জ্যোৎস্না দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ভাবল, কাজ নেই ওসবে। যে যার নিজের গণ্ডীতে থাকাই ভাল। জ্যোৎস্না তার নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে বিকাশ এবং তার সংসার এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আরো দু একটি প্রাণীকে নিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে থাকুক। এবং সেই বৃত্ত সীমার বাইরে থাকুক অন্য মানুষ, অন্য পৃথিবী। এসব ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল জ্যোৎস্না।

ইউরোপীয় সংগীতের বিরাট সৃজনশীল প্রতিভা, লুডউইগ ভন বীটোভেনের (জার্মান উচ্চারণের প্রতিলিপি না করে আমরা প্রচলিত ইংরাজী উচ্চারণই ব্যবহার করবো) দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এবং তাঁর জন্মভূমি জার্মানীতে।

বাখ্ থেকে হ্যাডেন অবধি যে ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের ধারা ইউরোপে চলেছিল, মোৎসার্টে প্রথম যে রোমান্টিক ধারার সূচনা আমরা দেখি, বীটোভেন সেই রোমান্টিক ধারার প্রকাশ। সেদিক থেকে বীটোভেন ইউরোপীয় সংগীতের ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে এমন একটি স্থান অধিকার করে রয়েছেন, যা একেবারে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এই রোমান্টিকতার প্রভাব একদিকে যেমন তাঁর সারা জীবনকে অস্থির, অন্যদিকে অকাল বধিরত্ব তাঁকে আরো বেশী দুর্দমনীয়, খানিকটা রুক্ষ স্বভাবের এবং আত্মগত শিল্পী করে তুলেছে। তারপর তাঁর ২৯ বছর বয়সে ঘটলো ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯)। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী, গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম ও প্রবল আন্দোলন তাঁর জীবন, তথা শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

জন্ম তাঁর বন্ শহরে; প্রথম সংগীত-শিক্ষা পিতার কাছে পাঁচ বছর বয়স থেকে। পরে ভিয়েনাতে মোৎসার্টের প্রথমে বিশেষ আমোল না পেলেও কথিত আছে, মোৎসার্ট বলেছিলেন, এই ছেলে একদিন সংগীত-জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করবে।

নীফের শিক্ষাধীনে মাত্র এগারো বছর বয়সেই তাঁর প্রথম পিয়ানো সোনাটা প্রকাশিত হয়, কলোন শহরের ইলেকটরকে উৎসর্গীকৃত করে। পরে এঁরই আনুকূল্যে, ১৭৯২-তে বীটোভেন ভিয়েনা যান এবং হ্যাডেনের কাছে প্র্যাকটিক্যাল ও এলব্রেখ্‌ট্‌স্‌বের্গারের কাছে কিছু থিওরী অধ্যয়ন করেন। বিশেষ কোনো কৃতিত্বের পরিচয় তিনি দিতে পারেন নি, কারণ নিজেই ব্যক্ত করেছেন এক চিঠিতে : "আমি সংগীতের নিয়ম শিখতে চাই কেবলমাত্র তাকে ভেঙে নতুন কিছু করবার জন্য।" বিদ্রোহী মেজাজটি এই বাইশ বছর বয়সেই বেশ সুপরিস্ফুট।

সংগীতগুরু হ্যাডেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কেও দেখি একই অবস্থা। আগের যুগের হ্যাডেনের চালচলন কথাবার্তা, লেখাবার পদ্ধতি, পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা—সবই ছিল কেতাদুরস্ত, আর বীটোভেন ঠিক তার উল্টো। ১৭৯৫-তে তাঁর পিয়ানো বাদন ভিয়েনার বিদগ্ধ সংগীতরসিক মহলে বিশেষ উত্তেজনা ও তর্কের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু কেউই তাকে 'ভালো' বলতে পারেন নি। তাঁরা বলেছেন,

"absolutely brilliant but hardly delicate and at times unclear"

এই সময়ে তিনটি পিয়ানোতে রচনা বীটোভেন বন্ধু প্রিন্স লীচোন্‌স্কিকে উৎসর্গ করে তাঁর প্রথম রচনা বলে ঘোষণা করেন (আগের কিছু কিছু রচনা কাজেই বাতিল বলে ধরতে হবে)।

**ব্যক্তিগত জীবন**

বীটোভেনের অভ্যাস ছিল বেশ ভোরে উঠে দুপুরের খাবার সময় অবধি একনাগাড়ে সংগীত রচনা করা। এ সময়ে তিনি নিজের মনে মনে কখনও কখনও উচ্চস্বরে সুর ভাঁজতেন, আর কেউ কথা বলে বা অন্য কোনো ভাবে তাঁকে বিরক্ত করলে রাগারাগির আর অন্ত থাকতো না।

দুপুরে খাওয়াটা অনেক সময়ে ভুল হয়ে যেতো। বেড়াতে বেরোতেন একলা একলা, উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ ও উপভোগ করা, তাঁর মতো প্রকৃতি-প্রেমিক লোক বেশী পাওয়া যায় না, এবং প্রকৃতির প্রতি প্রেম তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর ষষ্ঠ সিম্ফনি বা সিম্ফনিতে, (পরে যথাসময়ে আলোচনা করবো)।

বেড়াবার সময় এবং পরে সন্ধ্যাবেলা যখন তাঁর কোনো না কোনো বন্ধুর বাড়ীতে অথবা থিয়েটারে কাটাতেন, সঙ্গে থাকতো একটি ছোট লেখবার খাতা, যাতে অনেক কিছু টুকরো টুকরো মন্তব্য এবং ছোট ছোট সুরের কলি লিখে রাখতেন। ভিয়েনার পাথর-বাঁধানো অলিগলির মোড়ে মোড়ে জনজীবনের মর্মস্থল থেকে যে লোকসংগীতের ছোট ছোট সরল অনাড়ম্বর প্রকাশ, বীটোভেন তাকে বেঁধে রাখতেন তাঁর ছোট খাতাতে, পরে তার মার্জিত রূপ হয়তো অনেক সময় তাঁরও অজান্তে প্রকাশিত হত, তাঁর পিয়ানো সোনাটা বা এমনকি সিম্ফনির মাধ্যমেও।

বীটোভেন জীবনে কয়েকবার প্রেমে পড়েছেন, বিয়ে করা শেষ অবধি হয়ে ওঠে নি; তার একটা প্রধান কারণ—তিনি যতো বড়ো সংগীতজ্ঞই হোন, ভিয়েনার ভূস্বামী-অধ্যুষিত এরিস্‌টোক্রাটরা তাঁকে সম্মান করলেও কন্যাদান করতে সম্মত ছিলেন না। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বেও আমাদের সমাজেও এর ব্যতিক্রম দেখি না।

যাই হোক, বীটোভেনের জীবনের ট্র্যাজিডির এটাও একটা দিক, আর বলাই বাহুল্য, একেবারে স্বাধীনচেতা মানুষটিকে এই সামাজিক বৈষম্য আরো আত্মস্থ বিমর্ষ করে তুলেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে পেন্সিলে লেখা কয়েকটি প্রেমপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, বহু জল্পনা হয়েছে কাকে লেখা, তার বর্ণনা এখানে আর উত্থাপিত হল না।

**ট্র্যাজেডির প্রথম পর্যায়**

তাঁর জীবনের আসল ট্র্যাজেডি তাঁর বধিরত্বে। ১৮০২ সালেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ক্রমশই শ্রবণশক্তি কমে যাচ্ছে। এই সময়েই লেখা তাঁর 'The Heiligenstadt Testament'—হাইলীজেনস্টাড্ট শহরের নামানুসারে তাঁর দলিল। তিনি লিখছেন :

..."অহো, এটা কি করে সম্ভব হল, যে ইন্দ্রিয়টি আমার সর্বাপেক্ষা জোরালো হওয়া উচিত, সেটিই সর্বাপেক্ষা দুর্বল। ...ক্ষমা করো আমাকে, যদি দেখ আমি মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছি, যেখানে আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাদের সঙ্গে মিশতে

চাই।... আলাপ পরিচয়ে বা বাক্যালাপে আমি কোনো শান্তি পাই না, আমার সহচর বা বন্ধুদের সঙ্গে চিন্তার আদান-প্রদানও সম্ভব নয়। আমাকে নিঃসঙ্গ একাকীত্বে দিন কাটাতে হয়।" সারা দলিলটি এই সুরে বাঁধা। শেষে বলছেন : "মৃত্যু যদি আসেই আমি দুঃখিত হব না। তবে আমার শিল্পগত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই যদি আসে, তাহলে আমার নিদারুণ দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও আমি বলবো, মৃত্যু একটু আগে এসে পড়েছে এবং আমার একান্ত ইচ্ছা, যেন আর একটু পরে আসে।" দলিলটি লেখা ৬ই অকটোবর, ১৮০২। তখনও তাঁর বহু রচনা, এবং বিশেষ করে তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং নবম সিম্ফনি রচিত হয় নি।

* • *

**তৃতীয় সিম্ফনি**

এবারে তাঁর সিম্ফনি কয়েকটি আলোচনা করা যাক।

১৮০২ সালে আরম্ভ করে ১৮০৪-এ তিনি তাঁর তৃতীয় সিম্ফনি (বলা হয় বীরের প্রতি উৎসর্গীকৃত) শেষ করেন। ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক ও অনুরাগী বীটোভেনের কাছে নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের তথা মানুষের মুক্তির প্রতীক। তাঁকেই উৎসর্গ করে রচনা করছিলেন এমন সময়ে খবর পেলেন নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছেন। বীটোভেনের রাগত উক্তি তাঁর বন্ধুরা লিখে রেখেছেন : "শেষকালে তিনিও (নেপোলিয়ন) একজন সাধারণ মানুষের বেশী কিছু নয়! এবার তিনি জনগণের দাবীকে পায়ে মাড়িয়ে চলবেন, আর চালিত হবেন উচ্চাশার বশে। সকলের উপরে নিজেকে বসিয়ে তিনি হবেন একজন স্বৈরাচারী।" বলা বাহুল্য, উৎসর্গটি নেপোলিয়নকে দেওয়া বাতিল করে সাধারণভাবে বীরের সিম্ফনি নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছে। এর সাঙ্গীতিক দিকের কেবল এইটুকু এখানে বলা যেতে পারে যে, এর ষড়জ-গান্ধার-পঞ্চমের কর্ডের ব্যবহার সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এবং বীররসের বিশেষ প্রকাশ বলে লেখকের ব্যক্তিগত ধারণা।

**পঞ্চম সিম্ফনি**

অনেকে এর নাম দিয়েছেন 'ভাগ্য'। পাঁচ বছর ধরে রচনা করে শেষ করেন ১৮০৮ সালের মার্চ মাসে এবং প্রথম জনসাধারণ্যে উপস্থিত করা হয় ঐ বছরের ২২শে ডিসেম্বর।

'ভাগ্য' নামকরণ হয়েছে, কারণ এ সময় বীটোভেন একেবারে বধির এবং তাঁর জীবনীকার সিনডলারকে তিনি বলেছিলেন : "এইভাবেই ভাগ্য দ্বারে করাঘাত করে।"

এই সিম্ফনির একেবারে শুরুতেই ঐরকম দ্বারে করাঘাতের মতো আওয়াজ (সুরে) আছে—ডা ডা ডা ডাঃ—প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিকভাবে মর্সকোডে এই শব্দের পরম্পরা আজ ব্যবহৃত। সিম্ফনির মধ্যে ভাবের উত্থান-পতন, শেষ হচ্ছে দারুণ আশার ঘোষণার সঙ্গে। সারা সিম্ফনির মধ্যে আশা-নিরাশার দোলা, স্পন্দন, আর ভাগ্য যেন আছড়ে আছড়ে পড়ছে, শেষ অবধি তাকে পরাস্ত করে জয়ের সুর ঘোষিত হল।

ভাবতে আশ্চর্য ও দুঃখ হয়, অতো বড়ো সুরসম্পদের রাজা নিজের কানে কিছুই শুনতে পান নি, তবু বিজয়ী মনের জয়বার্তার বাণী শুনিয়েছেন বিশ্বমানবকে।

**ষষ্ঠ বা প্যাসটোরাল সিম্ফনি**

১৮০৭ সালে আরম্ভ করে এক বছর পরে পঞ্চম সিম্ফনির কিছু পরে শেষ করেন। আগেই বলেছি, বীটোভেন ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমিক। তিনি একবার বলেছিলেন : "লোকের অপেক্ষা গাছপালাকে আমি বেশী পছন্দ করি। আমার চেয়ে প্রকৃতিকে কেউ বেশী ভালোবাসে না। বনভূমি, গাছ-পালা, পর্বতমালা—একজনের সমস্যার সমাধান করতে পারে এরাই।"

সিম্ফনিতে সাধারণত চারটি পরিচ্ছেদ বা মুভমেণ্ট থাকে, এতে পাঁচটি। পরিচ্ছেদের নামগুলি যথাক্রমে সাজালে দাঁড়ায় এই যে, বনভূমি সমাচ্ছন্ন গ্রামাঞ্চলে গেলে মনে স্ফূর্তি ও শান্তির উদয় হয়; কুলকুল করে নদী বয়ে যাচ্ছে, পাখীরা ডাকছে (কয়েকটি পাখীর ডাকের সুর বীটোভেন এখানে বসিয়েছেন); কৃষকরা আনন্দ করছে এবং গ্রামের সরাইখানাতে যে সুর বীটোভেন কৃষক-গায়কদের কাছে শুনেছিলেন, তা এখানে বসানো আছে; এমন সময়ে এলো প্রচণ্ড ঝড়, তুফান, বিদ্যুৎ-চমকানো আলো ও বজ্রের আওয়াজ এবং বৃষ্টি। সবকটিই সরাসরি যন্ত্রের আওয়াজে নকল করা হয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীতরসিকের মনে স্বভাবতই মল্লার বা মেঘরাগের সঙ্গে তুলনা এসে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। মল্লারে নি-ধা কে ব্যবহার করে ব্যাঙের ডাকের নকল বা মেঘরাগে প-নি-প নিশ্চয়ই গাঢ় পুঞ্জ মেঘের ছবি আমাদের সামনে উপস্থিত করলেও, আমাদের মতে এ ক্ষেত্রে দুই সঙ্গীতের জাত একেবারে আলাদা। সঙ্গীতের মাধ্যমে বর্ষার বিমূর্ত রূপকে প্রতিষ্ঠা করারই চেষ্টা করি আমরা, হয়তো মেঘরাগে ভারী গমকের ব্যবহার করে তাকে আরো ফুটিয়ে তোলা যায়, কিন্তু প্রকৃতিকে সরাসরি হাজির করার চেষ্টা আমরা কখনও করি নি। সভয়ে বলে রাখি, কোনটা ভালো বা মন্দ, সেটা যেমন আমাদের বিচার্য নয়, তেমনি উপরে লিখিত মন্তব্যটিও একান্তই ব্যক্তিগত মত।

প্যাসটোরাল সিম্ফনির শেষ বা পঞ্চম পরিচ্ছেদে আবার ঝড়ের পর প্রশান্তি, এবং সেটা বুঝতে ভুল করবার কোনো অবকাশই নেই। চতুর্থ এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলে আসে একেবারে পর পর, কোনো ফাঁক নেই।

**নবম সিম্ফনি**

নিশ্চয়ই বীটোভেনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এটি। ১৮২২ থেকে ১৮২৩ এর মধ্যেই তিনটি পরিচ্ছেদের রচনা শেষ। এই সময়ে বীটোভেন জার্মান কবি শীলারের 'Old to Joy' (আনন্দের কাব্যচ্ছন্দ)-এর চারটি লাইনের গান ঢুকিয়ে দিলেন। সিম্ফনির বা সংধ্বনির বহু যন্ত্রের মিলিত স্বরের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতের সমন্বয়—বীটোভেনের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

কবি শীলার ১০৮৫-তে প্রথমে এটিকে 'Ode to Freedom' (মুক্তির কাব্যচ্ছন্দ) নাম দেবেন ঠিক করেছিলেন, রাজরোষ এড়াতে সেটির নামকরণ বদলাতে হয়। বীটোভেন ঘটনাটি জানতেন।

১৮২৪-এর ৭ই মে প্রথম যেদিন নবম সিম্ফনি জনসাধারণ্যে উপস্থিত করা হল, বীটোভেন অর্কেস্টার গায়কদের মধ্যে বসেছিলেন। শেষ হবার পর উচ্ছ্বসিত হল-ফাটানো করতালি, বহুক্ষণ ধরে; অর্কেস্টার মধ্যে বীটোভেনের মুখ শ্রোতাদের থেকে উল্টোদিকে ফেরানো, অতো উচ্চ করতালির কণামাত্র শব্দও তাঁর কানে যায় নি, কাজেই তিনি মুখও ফেরানো দরকার মনে করেন নি। অবশেষে একজন গায়িকা যখন বীটোভেনকে ধরে ঘুরিয়ে দিলেন, তখন হাততালির 'দৃশ্য' দেখে স্রষ্টার চোখে জল এলো।

নবম সিম্ফনিতে সর্বমানুষের ভ্রাতৃত্বের কথা আছে বলেই এবার ইউনাইটেড নেশনসের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতের যশস্বী সঙ্গীতজ্ঞ যুবিন মেহতার পরিচালনায় (যুবিন মেহতা আজ পৃথিবীর অন্যতম মিউজিক কনডাকটার হিসাবে নাম করেছেন) বীটোভেনের নবম সিম্ফনি বাজাবার ব্যবস্থা করা হয়।

বীটোভেনের জীবনের ট্র্যাজেডীর মর্মপীড়া আমরা উপলব্ধি করতে পারি যখন ভাবি, সুরের রাজা অমর সুরস্রষ্টা নিজের সুর নিজে কখনও শুনেন নি। অথচ রচনা করে চলেছেন কোন্ যন্ত্র কোথায় বাজবে, কি স্কেল, নবম সিম্ফনিতে গানের সঙ্গে যন্ত্রের সমন্বয়—বোধহয় শ্রবণশক্তির বদলে অন্য কোনো শক্তি কাজ করে যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের মনু, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে শেষ জীবনে বধির হয়ে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদের এখনো অপ্রকাশিত স্মৃতিকথাতে দেখেছি, ভাতখণ্ডেজী ধূর্জটিপ্রসাদকে বলছেন, 'ঐতো, গতরাত্রে মঙ্গল রাগ আমার কাছে রূপ ধরে এসেছিল।' বীটোভেনও নিশ্চয়ই সুরের রূপ (চিত্রকল্প না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ইয়োরোপীয়ান সঙ্গীতে ওটা চালু নয়) মনের দিব্যচক্ষে দেখতে পেতেন।

---

"Music when soft voices die vibrates in the memory".

# ওলন্দাজ-পর্তুগীজ-নখক্ষত চুঁচুড়া-হুগলীতে

ইমামবাড়া/হুগলী। ফটো : শীতাংশু মিত্র

পাতঝরা শিমুল গাছগুলো ট্রেনপথের দুপাশে একা-একা দাঁড়িয়েছিল। শীত এসে গেছে, পাতা ঝরে গেছে, কুঁড়ি এসে গেছে ডগায়, এখনও ফুল ফোটানোর বেলা হয়নি। ইঁট ভাটায় মাটি তুলে এবড়ো-খেবড়ো পুকুর, পুকুরের পাশে পাশে একটা দুটো খেজুর গাছ, মাথা চিরে গজাল কুটিয়ে রস বার করছে গেছেলরা। শীতের বাংলা দেশ ক্ষেতের লাবণ্য ঝলমলে হয়ে উঠেছে চোখ পড়লে আটকে যায়।

ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়েছিলুম হুগলী লাইনে। ট্রেনে চড়ে বসেই পৌঁছালুম চুঁচুড়ায়। বিদেশী বণিকদের থাবালো নখের ক্ষত বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলেই ছড়িয়ে রয়েছে। চুঁচুড়ায় পর্তুগীজদের প্রচুর আধিপত্য ছিল, মোগলরা সে আধিপত্য লোপ করে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করে। ওলন্দাজরা স্বভাবতই একটু সৌখিন ছিল, জাঁক-জমকের সঙ্গে চলত। সে সময়েই তারা ফোর্ট গাসটেভাস নামে একটা দুর্গ তৈরী করে। তারপর এল ইংরেজ। ইংরেজরা সে দুর্গ ভেঙে ফেলে সেখানে তৈরী করল একটা ব্যারাক—এইরকম দীর্ঘ ব্যারাক খুব কমই দেখা যায়। ইংরেজদের কাছে হেরে যাবার পরও বহুদিন ওলন্দাজরা এদেশে ছিল, শেষে সুমাত্রার বদলে ইংরেজদের চুঁচুড়া ছেড়ে দেয়।

ওলন্দাজদের সময়েই অনেক আর্মেনীয় চুঁচুড়ায় বাস করত। তাদের মধ্যে খোজা জোহানেসের পুত্র আর্মেনীয় মার্কার একটি গির্জা তৈরী করে। গির্জাটি সেন্ট জন দি ব্যাপটিস্ট এর নামে উৎসর্গ করা হয়। এই গির্জাটিই পুরোনো সব কটি গির্জার মধ্যে দ্বিতীয়। হুগলীর মহসীন কলেজ, কলিজিয়েট স্কুল, মাদ্রাসা—এগুলি তৈরী করেছিলেন দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীন। এখানকার প্রাচীন নিদর্শনগুলির মধ্যে আর্মেনীয়দের গির্জা ছাড়াও গঙ্গার ধারের আর একটি গির্জা আর ওলন্দাজ আর্মেনীয়দের গোরস্থান উল্লেখযোগ্য। চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মাঝামাঝি গঙ্গার ধারে গোস্বামীঘাটে ছিল 'কনে বৌ' এর মন্দির। দেবী সরকার নামে স্থানীয় একজন লোকের ছোট বৌ-এর ইচ্ছানুসারে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই নাকি এই রকম নাম হয়েছিল।

চুঁচুড়া থেকে হুগলী। সামান্য দূরে। হুগলীর নাম নিয়ে অনেকে অনুমান করেন আগে প্রচুর হোগলা বন ছিল এখানে, সেই থেকেই এই নাম। বিদেশী বণিকরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন গঙ্গার তীর কেন্দ্র করে. পর্তুগীজরাই সেদিক থেকে প্রথম। তারা সম্রাট আকবরের অনুমতি নিয়ে হুগলীতে একটা কুঠি স্থাপন করে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের ফলে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায়। সপ্তগ্রাম বন্দরেও ভাঁটা পড়ে। শাজাহান সম্রাট হবার পরই কাসিম খাঁকে পর্তুগীজ দমনের জন্যে পাঠিয়ে দেন। কাসিম খাঁর সেনাবাহিনী প্রায় তিন-চার মাস হুগলী অবরোধ করে থাকে, তাতেও পর্তুগীজরা আত্মসমর্পণ না করলে ব্যান্ডেলের গির্জার কাছে বারুদে আগুন দিয়ে দুর্গপ্রাচীর উড়িয়ে দেয়। এই যুদ্ধে নাকি এক হাজার পর্তুগীজ মারা যায় ও হাজার চারেক মোগলদের হাতে বন্দী হয়। তারপর থেকেই পর্তুগীজদের প্রাধান্য কমে যেতে থাকে।

তারপর এল ইংরেজরা। হুগলীতেই কুঠি তৈরী হল। কিন্তু ব্যবসাতে বিশেষ সুবিধে হল না। তারপর কাশিমবাজার, পাটনা, বালেশ্বরে কুঠি তৈরী হল, সেখান থেকে চলতে লাগল সোরা ও রেশমের ব্যবসা। ক্লাইভের সময়ে ইংরেজ সৈন্য হুগলীর দুর্গ, ফৌজদারের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নেয় এবং হুগলীর পাশাপাশি গ্রাম-গুলি লুঠ করে কলকাতায় ফিরে আসে। এখন যেখানে পুরাতন কাছারী বাড়ি সেখানেই মোগলদের দুর্গ ছিল। গৌরী সেনের নাম প্রবাদের মত সকলের মুখে মুখে ফিরে। প্রায় তিনশো বছর আগে গৌরী সেন হুগলীর কাছেই জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসাতে তিনি প্রচুর টাকার মালিক হন। সেই টাকার অনেকটাই তিনি দুঃস্থ মানুষদের দান করেন।

অতিরিক্ত বিলাসী লোকের তুলনা করতে গিয়ে লোকে বলে, নবাব খাঞ্জা খাঁ। এই খাঞ্জা খাঁ তেহরান থেকে এখানে এসে মোগল বাদশাহের কাছে কাজ নেন। তারপর হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হয়ে আসেন।

হুগলীর ইমামবাড়ার নাম সকলেরই জানা। হাজি মহম্মদ মহসীন এটি তৈরী করেছিলেন। তখনকার দিনে খরচ পড়েছিল নাকি পৌনে তিন লাখ টাকা। এর গম্বুজটি উঁচু আশি ফুট। দেওয়ালে উৎকীর্ণ আছে কোরাণের প্রচুর শ্লোক। ইমামবাড়ার সমস্তটি ঘুরে দেখতে বেশ সময় লাগে। এরই ভেতর আর একটি দর্শনীয় বস্তু ঘড়ি ঘর। যদি যান পুরো ঘন্টার সময়ে অর্থাৎ তিনটে কি চারটেতে—তাহলে দেখতে পাবেন বিরাট এক ঘন্টার ওপর বিপুল আয়তনের হাতুড়ি আপনা-আপনিই ঘন্টার ওপর পড়ে ঢং-ঢং করে বাজিয়ে দিচ্ছে তিনটে, চারটে। আধ ঘন্টার ঘন্টা পড়ে না।

চুঁচুড়া, হুগলী একটা দিনেই ঘুরে নেওয়া যায়। শহর থেকে এমন কিছু দূরও নয়, ঘোরাঘুরির খুব একটা পরিশ্রম লাগেকও নয়। অথচ প্রাচীনকালের অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে আনাচে-কানাচে।

—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৬)

মাসের পর মাস গড়িয়ে প্রায় তিনটি বছর কেটে গেল।

ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া করপোরেশন বড়, নাম-করা, সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এই সময়ের মধ্যে, আরও বাড়ছে। অফিসের একাংশ চলে গিয়েছে দেবাশিসের পৈতৃক ভবনে। বাড়ীটা উদ্ধার হয়েছে দেবাশিস জানিয়েছিল, কি করে উদ্ধার হল জানায়নি। বিশেষ কৌতূহল না থাকায় আমিও জানতে চাইনি।

অশোক তার কারবার দু' ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, নিজে শাস্ত্রানুশীলন করে, ধর্মচর্যা করে। তীর্থ ভ্রমণ করে। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসে, নানা রকম কথাবার্তা হয়। তুলসীর ছোট ভাই ফণী অশোকের কারখানায় ভাল কাজ করছে, নিজের চেষ্টায় বি-এসসি পাশ করেছে। ছেলেটি উন্নতি করবে বোঝা যায়।

তুলসী ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক বছরের একটা চাকুরি পেয়েছে, সেই চাকুরি করছে। হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে তাকে থাকতে হয় চাকুরির জন্য। টাকা রোজগারের আকর্ষণে জেঠামণিকে ছেড়ে থাকবার ব্যবস্থা কাঁদা-কাটা না করে মেনে নিয়েছিল। একটা স্থায়ী সরকারী চাকুরির জন্য চেষ্টা করছে, কলকাতার বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকলে পেয়ে যেতে পারে।

অন্য লোকেও চেষ্টা করছিল তুলসীর জন্য। কথাটা আমি জানতাম, তুলসীকে কিছু বলিনি। আমি না বললেও কথাটা যে তার অজ্ঞাত নয় আবিষ্কার করলাম অন্য একটা বিষয় সম্পর্কে তুলসীর সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে। বিষয়টা তুলসীর বিয়ে।

তুলসীর বিয়ের কথা আবার উঠেছিল তার ডাক্তারি পাশ করে বেরোবার পরে। উঠেছিল মহামায়ার শিষ্যা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে।

মহামায়ার একটি শিষ্যা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল পাড়ার ধর্মপ্রাণা বর্ষীয়সী ভদ্র-মহিলাদের নিয়ে। এঁরা আসতেন ধর্ম কথা শুনতে, কইতে, কিন্তু বয়স্কা, অবি-বাহিতা কন্যাদের মাদের মাথায় কন্যার বিবাহ সমস্যা পাকে পাকে জড়িয়ে থাকে। ধর্ম কথার ফাঁকে এ সমস্যাও আলোচিত হত। তাঁরা পরামর্শ দিতেন তুলসীর বিয়ের চেষ্টা করতে। মহামায়া দাদার কানে তুলে দিত তাঁদের পরামর্শ।

ভাবলাম কথাটা তুলসীর কাছে পাড়বার সময় হয়েছে। তার বিয়ে করবার বড় আপত্তির অজুহাত ব্যবহার করা আর চলবে না, আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করারও হয়েছে। কি বলে শোনা দরকার। তার বিয়েটা হয়ে গেলে বাণপ্রস্থ আশ্রম ছেড়ে সন্ন্যাস আশ্রম নেবার কথা ভাববার অবকাশ পাওয়া যাবে। কিছুদিন দেরী করলাম তবু, তার চাকুরির মেয়াদ শেষ হবার মাসখানেক থাকতে একদিন ছুটি উপলক্ষ্যে বাড়ীতে এলে কথাটা পাড়লাম।

খাঁচাঘরে বসে কি পড়ছিল তুলসী সন্ধ্যার দিকে। ঘরে ঢুকে দেখলাম আমার চেয়ারটা দখল করে বসেছে। উঠে দাঁড়াচ্ছিল, বললাম, বোস ওখানে, আমি আরাম চেয়ারে বসছি।

আজ সে বাড়ীতে ছিল। মহামায়াকে সন্ধ্যা দিতে না দিয়ে নিজে দিয়েছিল। তুলসীমঞ্চে প্রণাম করবার সময় কপালে একটু মাটি লেগেছিল, সেটা রয়ে গিয়েছে দেখলাম। একটা স্নিগ্ধ প্রসন্নতার ভাব লেগে রয়েছে মুখে।

বললাম, তুই পড়ছিলি ডিস্টার্ব করলাম একটা কথা বলব বলে। তোর সঙ্গে ভাল করে কথাবার্তা বলবার সময় আজকাল পাওয়া শক্ত, এরপর আরও শক্ত হবে।

আরও শক্ত হবে কেন?

কোথায় চলে যাবি চাকুরি নিয়ে, দেখা পাওয়া যাবে না এরপরে।

তোমার আসল কথাটা কি বলে ফেলো জেঠামণি।

বলছি, তাড়া দিসনে বাপু, বুড়ো মানুষ, গুছিয়ে বলতে একটু সময় লাগে না?

বেশ, সময় নিয়ে বলো। মিষ্টি করে হেসে বলল।

কথাটা কি জানিস, এখন তোর বিয়ে করবার সময় হয়েছে।

বলল, বলো সময় পার হয়ে গিয়েছে।

না, হয়নি। ডাক্তারি পাশ করেছিস, স্বাধীনভাবে রোজগার করবার মত অবস্থা হয়েছে, আপত্তি করিস না আর। তোর বিয়েটা হয়ে গেলে আমিও মুক্তি পাই।

বলল, তার মানে কি হল জেঠামণি?

মানে থাক, তোর মত কি বল? চেষ্টা করি?

উঠে এসে আরাম চেয়ারের হাতলের ওপরে বসল, বলল, তুলসীর বিয়ে হবে না জেঠামণি। কলকাতায় চাকুরি নিয়ে সে তোমার কাছে থাকবে, তোমাকে মুক্তি দেবে না ঠিক করেছে।

বললাম, অনেকগুলো খারাপ কথা বললি এক নিশ্বাসে। কেন তোর বিয়ে হবে না, শুনি? তোর পছন্দমত ছেলে খুঁজে বের করব।

পারবে না জেঠামণি। বাজে খাটতে চাও চেষ্টা করে দেখতে পারো।

চেষ্টা করব। কি রকম ছেলে তোর পছন্দ বলতো?

গালে হাত দিয়ে ভাববার অভিনয় করল এক মিনিট। তারপর বলল, একটু সময় দাও, বলব পরে।

আরেকটা কথা। চাকুরি নিয়ে কল-কাতায় থাকবার কথা বললি, তেমন চাকুরি কোথায় পাবি?

একটু ভেবে বলল, তোমার ছাত্র মিঃ ভাদুড়ী একটা অফার দিয়েছেন। চাকুরির সঙ্গে সর্ত আছে ফার্মাকোলজি পড়তে হবে।

দেবাশিস তাহলে তুলসীর কাছে সরা-সরি প্রস্তাব জানিয়েছে। তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে কারখানার ক্লিনিকসের মেডি-কেল অফিসারের পদ দিতে চায় বলেছিল।

বললাম, দেবাশিসের অফার নিতে চাস?

তুমি কি বলো? আমার নেয়া না নেয়া নির্ভর করছে তোমার ওপরে। তিনি তোমাকে বলেছেন জানি, কথাটা এতদিন চেপে রেখেছিলে তুমি, আমাকে বলবে কিনা ভাবছিলে। তোমার ইতস্তত করা থেকে বুঝব কি আমার তার অফার নেয়া উচিত কিনা তোমার মনে দ্বিধা আছে?

অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে তুলসী, তার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা ভাল মনে হল। বললাম, চেয়ারে গিয়ে বোস, দু'-একটা কথা বলব। তোর এখনকার চাকুরি শেষ হলে, বাড়ীতে ফিরে এলে কথাটা তোকে জানাব বলে চুপ করেছিলাম।

বলল, তার মানে মিঃ ভাদুড়ীর প্রস্তাব শুনে তোমার মনে ভাববার কথা কিছু এসেছিল?

শোন কি বলি। দেবাশিস তোকে শুধু এই চাকুরি দিতে চায় না, তার কাজের মধ্যে তোকে নিতে চায় তার কথা থেকে বুঝলাম। মেলামেশা করতে হবে তার সঙ্গে। তার চেহারায়, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ব্যবহারের একটা ম্যাগনেটিজম আছে। এর প্রভাব এড়াতে পারবি না তুই। তুই এক রকমের মানুষ ও একেবারে অন্য রকমের

মানুষে। এ থেকে হয়ত অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

খুলে বলো।

বললাম, সব কথা বলতে পারব না কিছু বলছি।

বিলাতে, আমেরিকায় তার জীবনযাত্রার কাহিনী, তার আগে দেশে থাকতে তার দুশ্চরিত্রতার কথা না বলে বললাম, আমেরিকায় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল, বয়সে তিনি অনেক বড়, অগাধ টাকার মালিক। আমেরিকায় তার পড়াশোনা করবার সব ব্যয় ইনি বহন করেছিলেন, যে কারখানা সে এখানে গড়ে তুলেছে তার জন্য টাকা দিয়েছিলেন, অনেক টাকা তুলে দিয়েছিলেন। অন্য নানা রকম কাজের জন্য প্রচুর টাকা তার হাতে দিয়েছিলেন মারা যাবার আগে। মারা যাবার আগে দেবাশিসকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সে গিয়েছিল তুই জানিস। এ দেশের অনেক ভাল জিনিস তিনি ভালবাসতে শিখেছিলেন তার প্রভাবে।

হয়ত কিছুটা তাঁর প্রভাবে, বেশীটা নিজের ভেতরের শক্তির বিকাশের ফলে দেবাশিসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রচুর শক্তি তার মধ্যে রয়েছে জেনে তার অনেক মারাত্মক দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আমি প্রথম থেকে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কেন জানি না সেও বরাবর আমাকে শ্রদ্ধা করেছে। মন দিয়ে শুনছিস?

শুনছি, বলো।

তাকিয়ে দেখলাম দেবাশিসের ছবির দিকে তার দৃষ্টি রয়েছে। বললাম, দেবাশিসের মধ্যে দুটো সত্তা ছিল, একটার নাম দিয়েছিলাম জায়েন্ট, অন্যটার নাম দিয়েছিলাম মনস্টার।

মনস্টার কি?

দৈত্য, যে সমাজের শত্রু, মানুষের সুস্থ জীবনের শত্রু। সোশ্যাল এনিমী।

শত্রু বলছ কেন?

কারণ স্ত্রী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক, সমাজনীতির অনুশাসন সম্বন্ধে সে স্বেচ্ছাচারী, প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।

বলল, এখনকার বেশীর ভাগ মানুষে তো তাই।

তারা অজ্ঞ, নির্বোধ, প্রবৃত্তি-চালিত বিদ্রোহী, দেবাশিস বিজ্ঞ, বুদ্ধি-চালিত, শক্তিমান বিদ্রোহী, রূপবান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাহসী বিদ্রোহী।

বলল, জায়েন্ট মনস্টারকে মেরেছে মনে হয় কি তোমার?

কর্মী দেবাশিস জয়ী হয়েছে চোখে দেখছি। মনস্টার মরেছে হয়ত।

বলল, মনস্টার মরে থাকলে মিঃ ভাদুড়ীর মধ্যে আর কি পরিবর্তন দেখতে পাবার আশা কর?

মানব জীবনের পরম সত্য প্রকাশ হবে তার মধ্যে, নির্মল চরিত্র, প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয় পাওয়া যাবে তার ব্যবহারে, কথায়।

বলল, জীবনের পরম সত্য? সেটা কি বুঝিয়ে বলবে একটু?

বললাম, তোকে বুঝিয়ে বলবার দরকার দেখছি না তুলসী, নিজের উপলব্ধির বলে তুই খানিকটা বুঝতে পারিস মনে করি।

কেমন করে একটু হাসল তুলসী। মাথা নামিয়ে কি ভাবল, তারপর বলল, দেবাশিসবাবুকে তুমি তো ভালবাসতে তার মধ্যে মনস্টার আছে জেনেও?

বললাম, সেটা অন্য জিনিস তুলসী, ভুল বুঝিস না। সেটা ইন্টেলেকচুয়াল এডমিরেশন ফর দি জায়েন্ট ইন হিম। আমি তার হিতাকাঙ্ক্ষী এ কথা সত্যি, সেটাও ঐ জায়েন্টের জন্য।

উঠে এসে আমার চেয়ারের হাতলের ওপরে আবার বসল, বলল, আমার মনের একটা সমস্যা সমাধান করবার জন্য কথাটা জিজ্ঞেস করছি। আমাদের গায়ের চামড়া একটা আবরণ। অনেক দেখতে খারাপ জিনিস চোখের আড়ালে রাখে। আমাদের কাপড় একটা আবরণ, দেহের নগ্নতাকে আড়ালে রাখে। দেহের মধ্যে ময়লা জমলে সেটাকে বলে অসুখ। ওষুধ খেতে হয় ময়লা দূর করবার জন্য। চামড়ায় ময়লা জমলে সাবান দিয়ে ঘষে স্নান করতে হয়। কাপড়ে ময়লা হলে কেচে নিতে হয়। মনের মধ্যে ময়লা জমলে সেটা কি করে সাফ করতে হবে?

সাইকিয়াট্রিকস পড়ে দেখ।

পড়ব, তোমার প্রেসক্রিপশান কি বল?

তুলসীর ডান হাতখানা কাঁধের ওপরে উঠে এল, বলো না জেঠামণি।

হেসে বললাম, কার মনের ময়লা কি করে সাফ করবি আমি তার কি জানি! সুতী কাপড়ের ট্রিটমেন্ট, উলের কাপড়ের, সিল্কের কাপড়ের ট্রিটমেন্ট এক নয় জানিস।

একটু হাসল।

আমার মনে যে সন্দেহের উদয় হয়েছিল তুলসীর মনের ময়লা দূরীকরণের প্রেসক্রিপশান সম্বন্ধে আগ্রহের পরিচয় পেয়ে সেটা ঘনীভূত হল তার হাসি দেখে।

প্রশ্ন করলাম, দেবাশিসের প্রস্তাব তোকে জানাব বলেছি। তোকেও যখন বলেছে উত্তর যা ঠিক করিস তাকে দিয়ে দিস।

বলল, মিঃ ভাদুড়ীর সম্বন্ধে যে সব কথা বললে তারপর তাঁর প্রস্তাবে রাজি হওয়া কি সঙ্গত? তোমার কাছে থাকবার জন্য কলকাতায় চাকুরি খুঁজছি, আরও খুঁজব।

খুঁজলেই কি এমন ভাল চাকুরি অন্য জায়গায় পাবি?

রেগে গেল তুলসী, অমন করে কথা বলো না জেঠামণি। তোমার আপত্তি থাকলে ভালতম চাকুরির লোভ আটকাতে পারবে না আমাকে বেশ জানো। তোমার মনের কথাটা কি বলো।

তাকালাম তুলসীর মুখের দিকে। সত্যি রেগেছে এই পলাতক ভাবটাকে নিয়ে টানাটানি করছে মুখের ওপরে আনবার জন্য।

বললাম, আমার মনের নাগাল পাচ্ছি না বাছা, খুঁটির দড়ি ছিঁড়ে মাঠের পানে পালিয়েছে। তোমার মনের কথা জেনে চলবার চেষ্টা করতে পারো।

হেসে ফেলল তুলসী, বলল, ভেবেছিলাম কর্ণার করেছি তোমাকে, পালালে দেখছি।

গাড়ীর শব্দ পেলাম।

তুলসীকে বললাম, দেখ তো কে এল।

বারান্দার আলো কে জ্বালাল। খাঁচাঘর থেকে বেরিয়ে তুলসী বলল, আসুন মিঃ ভাদুড়ী, জেঠামণি এই ঘরে আছেন।

তারপর বলল, একটু চা খাবেন? আচ্ছা বসুন, আনছি।

ঘরে ঢুকে হাতের এটাচি কেস টেবিলে রেখে দেবাশিস বলল, কারখানা থেকে ফিরছিলাম, মনে হল আপনার কাছে একটু বসে যাই।

বললাম, বসো আরাম করে। তুলসী আজ বাড়ীতে আছে। মাছ ডিম যা হোক কিছু এসেছে, খেয়ে যেতে পারো।

ওকে রান্না করতে হবে?

তুমি না এলেও করত। আমিষ ছুঁতে দেয় না মহামায়াকে।

কিছুক্ষণ কি ভাবল, দেখলাম, বলল, একটা অনুরোধ করতে চাই—

বেশ, বলো।

ডিশে পাঁপর ভাজা ও শসার চাকলি নিয়ে ঘরে এল তুলসী, বলল, খান, চা আনছি।

বেরিয়ে যাচ্ছিল বললাম, দেবাশিসকে খেতে দিতে পারবি? মাছটাছ কিছু আছে?

বলল, মাছ নাই, ডিম আছে। ডিমের ডালনা করছি, লুচি ভেজে দেব।

ভেতরে গিয়ে একটু পরে চা নিয়ে এল। নিজের জন্য এক কাপ এনেছিল। চা খেতে খেতে বলল, সাড়ে সাতটা এখন, নটায় খেতে দেবে।

দেবাশিস বলল, কিছুক্ষণ গল্প করবার জন্য এসেছি। দশটা হলেও চলবে।

তুলসী বলল, তাহলে গল্প করুন বসে, আমি একটু দেখে আসি।

বললাম, যা খেতে দিবি শুনলাম, এখুনি দেখতে যাবার মত কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বোস কিছুক্ষণ।

বলল, বড্ড বাজে কথা বলতে শুরু করেছ আজকাল জ্যেঠামণি। দেখতে হবে না কি আছে কি নাই, না থাকলে কি দিয়ে কি করতে হবে, থালার খাদ্যবস্তুর অল্পতা সত্ত্বেও অতিথি যাতে মনে করেন খুব খেলাম—

হাসতে হল, দেবাশিসও হাসল। হাসলাম কিন্তু মনে মনে বললাম, হুঁ। দেবাশিসের সামনে হঠাৎ আজ কথার ফুলঝুরি ছুটোচ্ছ কেন তুমি ডাঃ শ্রীমতী তুলসী ভট্টাচার্য এম বি বি এস? আগে তো এটা চোখে পড়েনি?

বললাম, আচ্ছা, যাও তাহলে।

দেবাশিস বলল, দুটো কাজের ভার আপনাকে দিতে অনুরোধ করছি। স্কলারশিপের জন্য টেকনোলজির শিক্ষার্থী নির্বাচন ও কালচারাল সহযোগের জন্য বরাদ্দ টাকার ব্যবস্থা করা। স্কলারশিপের ক্যান্ডিডেট নির্বাচন করা একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। এত ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে কথা বলতে হয়, এত দরখাস্ত দেখতে হয় যে অনেকটা সময় যায় আমার।

বললাম, অন্য লোক দেখো দেবাশিস, আমি পারব না। কোন সূত্রে কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে জানলে ভারত মহাসাগরের ঢেউ ভেঙে পড়বে দোরের ওপরে, আমি বুড়ো মানুষ—

হেসে বলল, ভাবছিলাম ক'টা য়ুনিভার্সিটি ও দেশের ধর্ম ও কালচার প্রচার করছে এমন দু' একটা প্রতিষ্ঠানের হাতে এ কাজ ছেড়ে দিতে পারলে—

উৎসাহ দিয়ে বললাম, খুব ভাল আইডিয়া দেবাশিস, ঐ ব্যবস্থা করে ফেলো।

আমাদের আলাপ চলছিল তুলসী ঘরে এল কি চিবুতে চিবুতে।

বললাম, চিয়ুয়িং গাম ধরেছিস নাকি?

বলল, লবঙ্গ, লবঙ্গ। হাতে পয়সা হলে চিয়ুয়িং গাম ধরব।

রান্না হয়ে গেল?

জ্যেঠামণির কথা শুনেছেন মিঃ ভাদুড়ী? আধ ঘণ্টার মধ্যে রান্না হয় নাকি? এটা কি বিলাত না আমেরিকা? রান্না করা খাবারের প্যাকেট আনলাম, সুইচ টিপে হিটারে একটু লার্ড বা মারগারিন দিয়ে গরম করে নিয়ে খেতে শুরু করলাম। এখানে তোলা উনুন ধরাতে হয়, ডিম ও আলু সিদ্ধ করতে হয়, আটা মাখতে হয়, নেচি বানাতে হয়, বেলতে হয়, ডালনার জন্য মশলা বাটতে হয় ইত্যাদি। এগুলোর ভার দিয়ে এলাম অধরের হাতে। পিসীমা উপদেশ করছিলেন গীতা হাতে করে, বলে এলাম ভক্তি করে পাঠ করো, পাঠের সময় অন্য চিন্তা করলে পার্থসারথি চটে যাবেন, কত মেহনত করে অর্জুনকে বোঝাতে হয়েছে ভাল ভাল তত্ত্বকথা।

বললাম, তুলসী, প্রেসার নেবার যন্ত্রটা এনেছিস কি? কেমন লাগছে—

এগিয়ে এসে উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ারের হাতলে বসল তুলসী, হাত নিয়ে নাড়ী দেখল, বলল, চলো তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি জ্যেঠামণি, ওঠো, পিঠের নীচে হাত দিল তোলবার জন্য। তোমার প্রেসার বেড়েছে বলোনি, তাই ওটা আনিনি। ওঠো, ওঠো—

হেসে বললাম, তুই উঠে গিয়ে চেয়ারে বোস। আমার কিছু হয়নি, মনে হল তোর প্রেসার বেড়েছে, যে রকম কথা বলছিলি। যন্ত্রটা থাকলে দেখা যেত কতটা বেড়েছে।

হাঁ করে তুলসী আমার দিকে চেয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড, তারপর বলল, ভাল হবে না জ্যেঠামণি যদি এমন করো আমার সঙ্গে।

না বাপু, আর করব না, তুই বোস আমার পাশে চেয়ারটা টেনে নিয়ে।

দেখলাম, দেবাশিস হাসছে তুলসীর কাণ্ড দেখে।

ঠাণ্ডা হতে তুলসীর সময় লাগল না, পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

বললাম, তুলসী, তোর কপালে মাটির মত কি লেগে রয়েছে, মুছে ফেল।

মোছবার জন্য হাত উঠিয়ে নামিয়ে নিল, বলল, তুলসীমঞ্চে প্রণাম করবার সময় লেগেছে বোধ হয়, মুছতে নাই।

তাই বলে মাটি মেখে থাকবি?

থাকব।

বললাম, গলায় কি একটা পরতিস, সেটা দেখছি না।

তুলসীর মালাটা কি করে ছিঁড়ে গিয়েছে জ্যেঠামণি, কাল সকালে খুঁজে দেখব।

শাঁক বাজাতে শুনলাম না আজ, বাজাসনি বুঝি?

প্রদীপ দিয়ে বাজালাম তো, তোমার কানে যায়নি বুঝলাম।

বললাম, একটু পেয়েছিলাম বটে মনে হচ্ছে এখন। ভেবেছিলাম কোয়ার্টারে নানা রকমের মেয়েদের মধ্যে থাকতে এ সব ভুলে গিয়েছিস।

হাসতে লাগল তুলসী। বলল, তোমার কথা বুঝতে পারছিলাম না এতক্ষণ। মিঃ ভাদুড়ীকে জানাচ্ছ আমি তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করি, শাঁখ বাজাই। তুলসীর মালা গলায় পরি, কেমন? ডাক্তারি পাশ করেও আমি সেকেলে মেয়েদের মত হিন্দুয়ানি মানি, তাই নয়?

সাংঘাতিক মেয়ে। ঢোক গিলে বললাম, জানালে কি দোষ?

বলল, দোষের কথা হচ্ছে না, জানাতে হবে কেন?

দেখ তুলসী, বাজে জেরা করিস না। দেবাশিসের মাস্টারমশাই আমি, তার জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্য করা আমার কর্তব্য।

উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে, তোমার কর্তব্য পালন করো, আমি রান্না করতে যাচ্ছি।

চলে গেল।

দেবাশিসকে প্রশ্ন করলাম, তুলসীর কাছে যে প্রস্তাব করেছিলে তার উত্তর দিয়েছে কি?

বলেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলবেন তারপর জানাবেন।

বললাম, তুলসীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল আজ তুমি আসবার আগে। সে কলকাতায় থাকতে চায়, ভাল কাজও চায়। মনে হল তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য সে তৈরী করছে নিজেকে।

প্রশ্নসূচক দৃষ্টি তুলে তাকাল আমার দিকে।

বললাম, তুলসীর নিজের ইচ্ছা আছে মনে হয়, আমার সম্মতি চায়। সম্মতি না পেলে যাবে না। সম্মতি দিতে পারি কিনা ভাবছি। তুলসী আমার কত আদরের তার কিছু জানো তুমি। তোমার অধীনে চাকুরি করতে গিয়ে তার মনে কোন রকম গ্লানির কারণ দেখা দিলে আমার পক্ষে সেটা মারাত্মক হবে। সে অন্য অনেক সাধারণ মেয়েদের মত নয়, একেবারে আলাদা জাতের মেয়ে। ডাক্তারি পাশ করেছে, আমার সামান্য যা কিছু আছে সব তুলসীর। তোমার কাছে চাকুরি না নিলেও তার চলে যাবে।

মাথা নীচু করে দেবাশিস বলল, আপনার কথা বুঝলাম। ও'কে চাকুরি দেবার প্রস্তাবের মূলে রয়েছে শুধু আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধ, আপনার একটু কাজে আসবার আকাঙ্ক্ষা। আমি ও'র হিতাকাঙ্ক্ষী। ও'র মনে কোন গ্লানির কারণ দেখা দেবে না ভরসা করি। উনি তো আপনার কাছে থাকছেন, সব কিছু আপনার চোখের ওপরে থাকবে।

বললাম, আমি জানি তুমি সত্যবাদী। তোমার সত্যনিষ্ঠার জন্য মনে মনে শ্রদ্ধা করেছি আমি, স্নেহ করেছি। আমি সম্মতি দিলাম তুলসীকে জানিয়ে দেব।

চুপ করে বসে রইল দেবাশিস মাথা নামিয়ে।

একটু পরে আমি তার কারখানার কাজ কর্মের কথা তুললাম। অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলল। কোমরে কাপড় জড়িয়ে তোয়ালে কাঁধে তুলসী ঘরে ঢুকে বলল, মিঃ ভাদুড়ী উঠুন, জ্যেঠামণি ওঠো, খাবার দেয়া হয়েছে।

বললাম, এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, মনে লাগিয়ে রান্না করিসনি মনে হচ্ছে।

বলল, আজ বড্ড বাজে বকছ জ্যেঠামণি। বসে যাও, লুচি ভেজে দিচ্ছি, আস্তে আস্তে খাও। (ক্রমশঃ)

# মুখের মেলা

## তিনকড়ি গুরুমশায়

তিনকড়ি গুরুমশাই একজন তোবড়ানো-গাল 'ধকম্‌বেজে' মানুষ। তাঁর বয়েসের নাকি গাছ-পাথর নেই। অন্তত একাশিটা কলাগাছ আত্মহত্যা করেছে।

বিঁড়ি মুড়তে মুড়তে মামদো ওরফে মামুদ সেখ তোতলাতে তোতলাতে বলে, 'শা-শা-শা-শালা, এক একটা বচ্ছরে তো—ক-ক-ক-কলা গাছ কাঁদি বিইয়ে ফি-ফি-ফি-ফিনিশ হয়ে যায়। তার মানে গু-গু-গু-গুরুমশাইয়ের বয়েস একাশি বচ্ছর। শা-শা-শা-শালা, আমরা বলে চাল্লিশ বচ্ছর বাঁচতে গেলে বলে, বা-বা-বা-বাই 'জন্মে' যায়—কাটো, এবার কেটে পড়!'

তিনকড়ি নস্কর রেগে গেলে তাঁর চোখের কোটরের গাঁজার কোলকের ভেতরে যেন আগুন জমকায় দপদপ করে। ঘসঘস করে 'চিতোড়' (উরু) চুলকোন তিনি। ফাকুস ফাকুস করে গাল নাড়েন, যেন কচি ছেলের মতন মায়ের দুধ খাচ্ছেন। তারপর ফাটাচেরা স্বরে চেঁচাতে থাকেন, 'তোর ঠাকুন্দা ছিল ঘরামী, 'হোঁদোল-কুৎকুতে' নাম ছিল তার। মাথায় ছিট ছিল তার। বলত মানুষ আগে হয়েছে না ভগবান আগে হয়েছে বল, বলত ডিম আগে হয়েছে না মুরগী আগে। ঘরের বাঁশ আর বাঁশের ঘর দুটোর তফাৎ কি? আমি বলতুম মানুষ আগে হয়ে, তারপর ভাবলে এই জগৎ সংসার কেউ না কেউ বানিয়েছে, তার নাম দাও ভগবান।'

'শা-শা-শা-শালা ঠাকুন্দার তো মাথা ছ্যালো। তা ডিম আগে না মুরগী আগে?'

'ঐ শালার কথা নিয়ে 'বেঁড়ে-হুজ্জুতি' বেধে যেত।' তাড়ি খেয়ে তখন গাঁয়ের সবাই 'টর' হয়ে থাকত। এ'বলে ডিম আগে তো ও' বললে ডিমটা কি তোর মাসী এসে পেড়েছিল শালা! মানুষ এত বড় প্রাণী, অনেক 'ক্ষ্যামতা' ধরে—উড়োজাহাজ চালাতে পারে আকাশে—ডুবুরি হয়ে পাতালের আঁধার সমুদ্রে নামতে পারে—কিন্তু শালা হাজার কোঁৎ পেড়েও একটা ডিম পাড়তে পারে না! মেয়েমানুষেও না—হাজারের মাসী আর পারবে কেন? হাজারে তেরিয়া হেঁকে দিলে ভোঁদার চাচার নাকে ঘুষি! মারামারি, বসল বিচার সালিশি। কি নিয়ে মারামারি হল? তাইতো তাইতো—কেউ বলতে পারে না। হোঁদোল-কুৎকুতে বললে, ডিম আগে না মুরগী আগে!'

সবাই হৈ হৈ। মুরগী আগে। না, ডিম আগে। শেষে আমি হেঁকে বলে দিলুম, যে ডিম আগে বলবে তাকে ডিম পাড়তে হবে। তাহলে? মানুষ কি ডিম পাড়তে পারে? অতএব প্রমাণ হয়, গোপনে কোনো একদিন অন্ধকার তাঁবুর ভিতরে ডিম রেখে দিয়ে চলে গেছেন স্বয়ং ভগবানই। আর ডিমটা সঙ্গে সঙ্গে ফট করে ফেটে মুরগী বেরিয়ে পড়ল। হাতীর মতন বড় বড় মুরগী!'

তিনকড়ি গুরুমশায় যেখানে থাকবেন আসর সরগরম। একালের শিক্ষিত ছেলেদের দেখলেই তাদের ওপরে বিদ্যে কষে দেখা চাই তাঁর—স্যাকরা যেমন করে সোনা কষে দেখে কষ্টি পাথর দিয়ে। তারাও বেশ রস পায়।

মামদো বলে, 'বা-বা-বাকিটা বল। বাঁশের ঘর আর ঘরের বাঁশ—দুটোতে ত-ত-তফাৎ কি?'

তিনকড়ি মাস্টার বলে, 'বাঁশের ঘর মানে যে ঘরটা বাঁশ দিয়ে তৈরি আর ঘরের বাঁশ মানে ঘরের কোনো একখানা বাঁশ।'

মামদো বলে, 'তাহলে তো ঐ একই হল?'

'দূর শালা, মাসীর ছেলে আর ছেলের মাসী কি এক? বাপের জামাই' (ভগিনপতি) আর বোনাইয়ের বাপ কি এক লোক? একজন পিসেমশায় আর একজন তালুইমশায়। মাসীর ছেলে হল বোয়ের দেওর আর ছেলের মাসী হল মধ্যমিতা শালীকা।'

চা দোকানের মোড়ে খোবড়ায় মধ্যে হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় লোকজনকে আলু ভূতের মতন মনে হয়। ময়লা কাঁথা কাঁধে গায়ে, [illegible] কদকলে পা, মুখে বাঁধা পাকা [illegible] দাড়িগোঁফ। অশ্লীল অশ্রাব্য কথাবার্তা। শুদ্ধীলতার আদি রসাত্মক শব্দটি তাদের সব শব্দের গুরুদেব। হাড়ে মাসে শাণিত। তিনকড়ি মাস্টারের মাইনে না এলে তিনি দিনকতক 'সর্বহারা'। মাইনে এসে গেলেই আবার রবরবা। মহত্ত্ব মনুষ্যত্বের কথা। তাঁকে এবার স্কুল থেকে সরানো হবে জানালেই ক্ষেপে পড়েন, 'সমাজে, কুনো শালার বাপেও পারে? স্কুল বোর্ডের যিনি হেড কর্তা তিনি একজন মেয়ে, আমি মা বলে ডাকলেই তিনি যেন আঁতকে ওঠেন—সবাই 'দিদি' বলতে অজ্ঞান—এ বুড়ো 'মা' বলে কেন? তবু ভদ্দরলোকের মেয়ে কিনা—বলেন, বসুন বসুন—কে বললে আপনাকে ছাঁটাই করা হবে? ছাঁটাই করার বয়স কি আপনার আছে? বোঝ শালা, তোরা কজনে গণ্ডাকে সিরকে দশুকে জানিস? তিন পাতা ইংরেজি পড়া বিদ্যে—এই আলোক মাস্টার—চুরি করে স্কুল ফাঁকি দিয়ে দিয়ে বি-এ পাশ করেছে—বলি, এই কটা শব্দের অর্থ বলত কৈ দেখি?'

'কি শব্দ গুরুমশায়?' শুধোলো জাল বুনতে বুনতে প্রহ্লাদ দাস। চোখে তার ছানি পড়েছে। জল ঝরে। তিনকড়ি মাস্টার বলে, 'শালা রাত কানা' পেল্লাদ। হাত ধরে ধরে ওর বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে যেতে হবে। বউ তারপর হাত ধরে নিয়ে যাবে। ওর বউ আমার নাতবৌ হয়, যদি একটা চুমুও খায় আমাকে, দেখতে পাবে না। তা চোখে না দেখলেও অভ্যাসের বশে কেঁড়েনালি চালিয়ে জাল বুনে যাচ্ছে। আর অভ্যাসের বশে আমরা সবাই তো কাজ করে যাচ্ছি—বেঁচে আছি। —কি কি শব্দ? [illegible] [illegible], কই বলত আনন্দ, তুইতো কলেজে পড়িস। এইসব শব্দের মানে বল। 'সুলকুর্নি', 'মোড়ম্বা', 'ঢিকারি', 'চোরমুড়ো', 'বালামচি', 'গুদড়ি', 'খাবনা', 'টক্কর', 'মলকি', 'ধুদড়ি', 'হাঁগারি', 'কানাচি', 'গলাম', 'গুড্ডিম', 'তা', 'সুমো', 'তেউড়' 'চুমরি' বলতে পারবে? লবডঙ্কা।'

আনন্দ মাল অবস্থাপন্ন ঘরের সৌখিন সুদর্শন ছোকরা। পোশাক-আষাকে কোলকেতিয়া বাবু। সে বলে, 'গেঁইয়া কথা জেনে লাভ কি?'

তিনকড়ি মাস্টারের চোখ দুটো গাঁজার [illegible] মতন আবার [illegible] করে। বলে, 'গেঁইয়া কথা? গাঁ থেকেই তো শহরের জন্ম হে? শহর ছোকরার বয়স কত? ঠাকুরদাদার নাম জানে না [illegible] এমন জুলপিবাজ মাইডিয়ার [illegible] ছোকরা [illegible] ফিস্টি কথা বলে [illegible] তোমাদের ধাম্বা [illegible] শব্দের [illegible] জানবে? [illegible] [illegible] হাতের আঙুলের নখের [illegible] সরু হয়ে যে [illegible] হুঁকোতে তামাক [illegible] সময় [illegible] মধ্যে আগুন তোলার আগে [illegible] একটি ছোট্ট মাটির ঢেলা দিতে হয়, সেইটা। 'মোড়ম্বা'—গরুটা খাঁটাগাছে দড়ি জড়িয়ে 'মোড়ম্বা' হয়ে আছে—মানে মুড়েসুড়ে আছে। 'চোরমুড়ো' একরকম উদ্ভিজ্য—বাঁশবনের মধ্যে হয়—কালো আধ হাত উঁচু—আধ হাত চওড়া—গোলাকার—খোবড়া খোবড়া গা। কোবরেজ ওষুধ হয়। 'বালামচি' ঘোড়ার লেজের চুল। 'গুদড়ি' ছেঁড়া কাঁথা। 'খাবনা' মুসলমানবাড়ির মেয়েরা জানে—একটা মাটির তৈরি জিনিস—তাতে হাঁড়ি বসিয়ে যেন গড়ায়। কতকটা উপুড় করা নিরেট মালসার মতন। ভদ্দরলোকের ছেলেদের এখন বোঝাও 'মালসা' কাকে বলে? 'টক্কর' হল গরুর মাথার মাংসের একটা অংশ। 'মলকি' চালের আটার বড় বড় অংশ। 'ধুদড়ি'—কাঁথাটা ছেঁড়া ধুদড়ি হয়ে গেছে—মানে শতচ্ছিন্ন। 'হাঁগারি' গাছ, 'কানাচি' ভাঁড়ের গলার দড়ি, 'গলাম' গরুর গলার মোটা দড়ি গড়ায় বাঁধবার সময় দেওয়া হয়। 'গুড্ডিম'—পাখির বাচ্চার গুড্ডিম অর্থাৎ গু-ডিম ভাঙে নি। ছোঁড়া তোর এখনো গুড্ডিম ভাঙেনি—মুখে মায়ের দুধের গন্ধ—লম্বা লম্বা বাত ঝাড়ছিস! 'তা' হল মুরগী যাতে বসে ডিম ঘবে। ডিমে 'তা' দিচ্ছে—মানে ওম্ বা গরম দিচ্ছে বলা হয় বটে কিন্তু 'তা' হল একটা পাত্র—যাতে ডিম রেখে মুরগী বসে থাকে। 'সুমো' চিংড়ি মাছের গোঁফ। 'তেউড়' বাঁশের কোঁড়—যা মাটি ফেড়ে সবে গজিয়ে উঠেছে। 'চুমরি' হল নারকোল গাছের মোচ। এখন মোচ মানে হিন্দীতে গোঁফ। শহুরে বাবাজীরা তাই না বুঝে বসে। বাংলা ভাষায় এত শব্দ ছিল, আদি শব্দ, যাদের জন্ম দোয়াশলা ভাবে হয়নি—শহরে নতুন নতুন বিদেশী 'দোয়াশ' আমদানি হওয়ায় তারা গাঁয়ের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।'

আনন্দ বললে, 'ভাষাতত্ত্বের বই আছে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেনের—সে সব পড়লেই জানতে পারা যাবে। তিনকড়ি গুরুমশায় অনেক জানেন সত্যি, কিন্তু তিনটে কড়ি তাঁর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কিনা তিনি জানেন না।'

আনন্দ মাল কোঁচা দুলিয়ে সিগারেট টানতে টানতে চলে গেল। তার কথায় যেন গুরুমশায় অপমান বোধ করলেন। মুখ গোঁজ করে রইলেন কিছুক্ষণ। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি ওসকাতে লাগলেন।

মামদো বললে, 'মাস্টার তুমি রাগ কর না। ওর জন্মের আগে ওর মা কলকাতার বা-বা-বাবুর বাড়ি চাকরি করতে গেল বিধবা হয়ে। একটা বাবু ওর মায়ের টানে এখানে চলে এল। পুরোনো জমিদার ছিল, বাড়ি-ভাড়া মামলা মোকদ্দমা করে সব উড়িয়ে দিয়েছিল। ওর দাদামশায় মেয়ের আবার বি-বি-বি-বিয়ে দিলে সেই বাবুর সঙ্গে। বাবুর টাকা ছিল। শালার ছেলেটার তাই চ্যাঙড়া চ্যাঙড়া বা-বা-বাক্যি।'

তিনকড়ি মাস্টার বললেন, 'ওসব খবর তুই কি জানিস মামদো! জন্মের জন্যে কেউ দোষী নয়। 'মা জানে বাপ, মন জানে পাপ।' তা নয়, ওরা আমাদের অশিক্ষিত গ্রাম্য ভূত বলে ঠাট্টা করে। তিনকড়ি নাকি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাং [illegible] আর [illegible] হয় না?'

চা-দোকানী শাজাহান মিঞা এবার একটা হারমোনিয়ামের [illegible] [illegible] দরাজ গলায় গান গাইতে শুরু করে। লাউয়ের খোলের একতারায় [illegible] মারে মাঝে [illegible] [illegible] শাজা অতুল [illegible]। ঘাড় পর্যন্ত তার ঢেউ খেলানো চুল। 'মেজো-ন্যাকড়া' ভঙ্গি। বাঁশ বনে শিয়াল ডাকে। আমনের মুদিখানায় মাজের চাষীবাসী লোক গল্প-গুজব করছে। কেউ বা কাটারী বঁটি হাঁড়ি বন্ধক দিয়ে আজকের একবেলাটা চালিয়ে দিয়ে বালবাচ্ছাদের নিয়ে বাঁচবার জন্যে এসে বসে আছে তিন মাথা হয়ে গুড়ের ভাঁড়ের মতন।

'রেডিওতে বক্তৃতা দিচ্ছেন শহরের বাবুরা। শহরের মেয়েরা গানও গান বেশ সোন্দর সোন্দর। গান গেয়েই কেউ কেউ নাকি গাড়ি বাড়ি করে ফেলেছেন। তোমরা গান শুনে বাহবা দিলেই তাঁরা সুন্দর কর যুক্ত করে নমস্কার করে কোমর দুলিয়ে চলে যান পরীর মতন। সে এক জীবন।' তিনকড়ি মাস্টার বলেন এসব। আজব শহর নাকি কলকাতা—সেসব এক কাহিনী আছে তিনকড়ি মাস্টারের। একবার নাকি তাঁকে এক বাড়িতে কফি খেতে দিয়েছিলেন—'কী

ঝিহাঁঝাঁর পোড়া গন্ধ। রাস্তায় এসে বমি হয়ে গেল গাড়ির মধ্যে। একজন শহুরে বাবু মস্কারা করে বললেন, 'বমি তো মেয়েরাই করে? বোঝ শালার পোয় কর্তা! যেন আমি পোয়াতি!'

তারপর তিনকড়ি মাস্টার বলেন, 'শালা আমি নিজের চোক্ষে দেখে এসেছি শহুরে মেয়েরা বালিশের খোল পরে আছে, বাড়ির কাঁটা যেন লাঙলের মতন বড় ধর্মতলার একটা বিল্ডিং-বাড়ির মাথার গম্বুজে, মাঠের আলো-অন্ধকারে জোড়া জোড়া নারী পুরুষ বসে আছে কাছে কাছে কত সব—কিন্তু বেশি কাছে এলেই পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে—তারি যন্ত্রণার জীবন মাইরি! বাইরে ঐ চাকচিক্য। আমাদের মতন খোলা মাঠ বন নেই।'

চা-দোকানী শাহজাহান মিদ্যে যাত্রা-দলের বিবেকের গান করে। দরাজ গলায় সে গাইছিল :

জন্মেছ এই বাঙলা দেশে
কি খাবে আর ভাই
ভেজাল ভিন্ন এখানেতে
কোনো কিছু নাই।
সরষের তেলে শিয়াল-কাঁটার দানা
তা খেয়ে লোক কুড়ি বছরেই
হচ্ছে চোখে কানা।
পড়ছে মাথায় টাক
দাঁতগুলো সব যাচ্ছে খসে
গালটা করে ফাঁক।
ভেজাল দুধে, ভেজাল 'আরকে'
ভেজাল বাছাই করতে পার কে?
প্রেমে ভেজাল, স্নেহে ভেজাল
ভেজাল জীবনটাই
ভেজাল ভিন্ন বাংলাদেশে
আসল কিছু নাই।

এ গান তিনকড়ি মাস্টারের লেখা। কত যাত্রাদলের পালা লিখে দিয়েছেন তিনি। জমির 'কালি' মানে জরিপ করতে হলে তাঁর মতন আর ওস্তাদ কেউ নেই। দলিল, মামলা, মাপজোক, খড়, বাঁশ, নারকোল, উলু, প্যাকাটির হিসেব কষে দেন তিনি চাষীদের। তারা বিঁড়ি দেয়। চা খাওয়ায়। কিন্তু মাস্টারের দুঃখের শেষ নেই। পাঁচ পাঁচটা সোমত্ত মেয়ে তাঁর আইবুড়ো হয়ে পড়ে আছে ঘরে। বর জুটছে না, পণ চায়, সোনা চায় দশ ভরি করে। স্কুলের মাইনে আসে না যখন মুখ খারাপ করে গালাগালি করেন আকাশ-বাতাস, সরকার, মুদিঅলা, আধুনিক কাল—সবাইকে।

বড় মেয়ে নন্দিনী, মেজমেয়ে ললিতার যৌবন ঝরে গেছে। ছেলেটা ন্যাংড়া হয়েও বগলে লাঠি দিয়ে চটকলে নলী সাবাড়ের কাজ করতে যায়। বদলি কাজ—তবু যা পায় একবেলা আটার দামটা হয়। তার আবার বায়না, বিয়ে করে আলাদা খাবে। দাড়ির চুল পাকল, কবে বিয়ে হবে?

মুদিঅলা বলে, তিনকড়েটা মাস্টার হলে কি হবে, একের নম্বর ছ্যাঁচড়া। আমার দোকানে দুশো টাকা দেনা। বাস্তুভিটে পর্যন্ত বন্ধক। এবার টাকা না দিলে 'মোড়ম্বা' করে বেঁধে প্যাঁদানি দোব।'

তিনকড়ি মাস্টার বেশি রাত হলে গা আড়াল দিয়ে সটকান দেন মুদিঅলার চোখ এড়িয়ে। রাতকানা প্রহ্লাদ দাশ তখনো জাল বুনছে বসে বসে। একা আসতে পারবে না। হয়তো খানাডোবায় পড়ে যাবে। —কিন্তু হঠাৎ যেন ভ্রম মতো হয়ে গেল তিনকড়ি মাস্টারের। বসে পড়লেন। ধুঁকতে লাগলেন। প্রায় দু'দিন আজ তার খাওয়া হয় নি। স্কুলের একটা ছেলের গোটা কতক মুড়ি চেয়ে খেয়েছিলেন। হেডমাস্টার আলোকবাবু ব্যাপারটা জেনে ফেলে ধিক্কার দিলেন : 'ছি, এসব করবেন না, লজ্জা হয় না, ছাত্রদের টিফিন চেয়ে খান?'

ঠিক ঠিক। তিনকড়ি মাস্টার ভাবলেন, আজ রাত্রেই তিনি গলায় দড়ি দেবেন। কিন্তু আন্দোলন করে মাইনে একটু বাড়ার ফলে যে উপরি পাওনাটা হয়েছে তা যদি কালই এসে পড়ে? না, বাঁচতে হবে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু শরীর টলছে যেন মাতালের মতন। পথ হারিয়ে যাচ্ছে। শেষে হাতে পায়ে ভর দিয়ে চলতে শুরু করলেন তিনকড়ি গুরুমশায়। তবু তাঁকে বাঁচতে হবে।

আবদুল জব্বার

# সাহিত্য ও সংস্কৃতি

## ভিয়েৎনামের প্রাণপুরুষ

এ যুগের বিস্ময় হো চি মিন। শুধু ভিয়েৎনামের মানুষ নন, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জীবনের দীর্ঘ সংযোগের ফলে তিনি মহান নায়কের সম্মানলাভ করেছিলেন। ফরাসী লেখক জাঁ লাকাতুর এক আশ্চর্য রেখাচিত্র এঁকেছেন সেই বিচিত্র মানুষটির যিনি পঞ্চাশ বছর ধরে ঔপনিবেশিক জনগণের বিদ্রোহের প্রতীক।

বইটি অকটোবর ১৯৬৬ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭-র মধ্যে রচিত এবং প্রায় সেই সময়ে মূল ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে আরো অনেক পরে: ফলে গ্রন্থটির শেষাংশ কিঞ্চিৎ ব্যাকডেটেড হয়ে পড়েছে, কারণ ইতিমধ্যে আরো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তথাপি গ্রন্থটির বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ ভিয়েৎনামের সাম্প্রতিক অবস্থাকে অনেকটা সহজবোধ্য করেছে।

লাকাতুর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ফিলিপে ডেভিলার্সের Histoire du Vietnam নামক গ্রন্থের একটি অংশ উদ্ধৃত করেন যা অর্থপূর্ণ।

ডেভিলার্স লিখেছিলেন—১৯৪৫ খৃঃ ২৫ আগস্ট, জাপানীদের অস্ত্র সমর্পণের দশদিন পরে ভিয়েৎমিন ভিয়েৎনামের সমগ্র অঞ্চল অধিকার করে নেয়—তারাই শক্তিতে অধিষ্ঠিত হল।

লাকাতুর বলেছেন—যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশ সরকার উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। তাঁরা স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে ইন্দো-চীনে ফরাসী বিতাড়নের ফলে তাঁদের নিজেদের অবস্থাটা কাহিল হয়ে পড়লে তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি (তখন রুজভেল্টের নীতি) আর ব্রিটিশ নীতির মধ্যে বিরোধ ছিল। লাকাতুর বলেছেন—

'চার্চিল এবং তাঁর পরবর্তী শ্রমিক দল নিয়মিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে বাধা দেন।' এই সূত্রে জেনারেল গ্রেসীর ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। ডাঃ এলান গিল তাঁর 'উইটনেস টু ভিয়েৎনাম' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই সূত্রে বলেছেন—

'এই অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ব্রিটিশ জেনারেলটির কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয় যে তিনি প্রায় নিজের দায়িত্বে তাঁর প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করে গেছেন। এই কর্মে তিনি ভিয়েৎমিনকে (লীগ ফর ভিয়েৎনাম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স—হো চি মিনের নেতৃত্বে পরিচালিত) জব্দ করেছেন এবং কম্যুনিস্টদের ষোড়শ সমান্তরাল রেখার দক্ষিণ অংশে প্রভুত্ব করার দৃঢ়সংকল্প ব্যাহত করেন। তা না হলে হয়ত একটা গণতান্ত্রিক সাউথ ভিয়েৎনাম গড়ে উঠত।'

তাই মনে হয়—জেনারেল গ্রেসী একেবারে নিজের খুশীতে কাজ করেননি। তাঁর ওপর কোনও গোপন নির্দেশ ছিল। যাই হোক, ১৯৪৫ খৃঃ থেকে ভিয়েৎনামে যা কিছু ঘটেছে তার প্রাথমিক দায়িত্ব ব্রিটেনের। হ্যারল্ড উইলসনের শ্রমিক সরকার—কেন জোর গলায় যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি সমর্থন করেছেন তা লাকাতুরের এই বই থেকে জানা যাবে। লাকাতুর এই দিকটির ওপর বিশেষ আলোকপাত করেননি। এই গ্রন্থের শেষে লেখক উল্লেখ করেছেন ফরাসী মধ্যপন্থী জাঁ সাঁতেনী একটা প্রস্তাব করেছিলেন বোঝাপড়ার। কিন্তু সেই প্রস্তাব হো চি মিন ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। সাঁতেনীকে পাশ্চাত্য নব্য উপনিবেশবাদের প্রবক্তা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

মধ্য ভিয়েৎনামের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮৯০ খৃঃ ১৯ মে হো চি মিনের জন্ম। সেই পল্লী পরিবেশেই এই মহান নেতা গড়ে উঠেছেন এবং অতি অল্প বয়সেই ফরাসী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার শোষণ নীতির প্রতি অন্তরে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতি শুধু শোষণ এবং লুণ্ঠনের নীতি ছিল না, স্থানীয় জনগণের প্রতি অযথা নির্যাতনও তাদের নীতির অন্তর্গত ছিল।

এই শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার দূরীকরণে তিনি প্রায় অল্প বয়স থেকেই দৃঢ়-সংকল্প ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তিনি পর্যটন করেছেন পথের সন্ধানে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে হো যখন লণ্ডনের একটি হোটেলে পাচকের সহকারী হিসাবে কাজ করতেন তখন আইরিশ অভ্যুত্থানের সংবাদ পান এবং সেই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন। এর কিছু পরেই সর্ব প্রথম হো চি মিন এবং সেই সঙ্গে তাঁর স্বদেশের নাম সর্বত্র প্রচারিত হয়। ফরাসীরা এই প্রচার চাপবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি।

ফরাসী সরকারের এঁদের সংহতি নষ্ট করার অপচেষ্টায় ১৯১৯ খৃঃ প্যারিস শান্তি বৈঠকে টোনকিন, আনাম এবং কোচিন চীনকে খণ্ডিত করেন। হো চি মিন স্বদেশের মুক্তির জন্য প্রেসিডেন্ট উইলসনের 'চতুর্দশ নীতি'র ভিত্তিতে একটি 'আটদফা' দাবী পেশ করেন। হো চি মিনের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল, কিন্তু এই থেকেই সুরু দীর্ঘকাল প্রসারিত মুক্ত যুদ্ধ।

একদা যা জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকদের সংগ্রাম ছিল তা ক্রমশঃ গণ-বিপ্লবে পরিণত হল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী-কাল ধরে হো চি মিন এবং তাঁর অনুগামীদের ধ্যানজ্ঞান হল ভিয়েৎনামের মুক্তি সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম প্রচেষ্টা সফল হল। ভিয়েৎনামের মানুষ আজ এক আপোষ বিরোধী সংগ্রামে জড়িত, তারা সর্বস্ব পণ করে লড়াই একটা চূড়ান্ত সমাধানের জন্য।

এই দুঃখকর বিরাম বিহীন অভিযানে হো চি মিন দুটি ছদ্মনাম গ্রহণ করেন, এর মধ্যে 'আই কুয়োক' নামটি প্যারিস পীস কনফারেন্সে প্রস্তাব পেশ করার সময় গ্রহণ করেন। হো-র দেশের লোক তাঁকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে বসিয়েছে। বিশ্বাস করেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক মহানায়কের আবির্ভাব দ্বিতীয় রহিত।

লাকাতুর বলেছেন—এ সম্বন্ধে একটি কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, জনগণকে

## রুশ অনুবাদে নজরুল ইসলামের কাব্য সংগ্রহ

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে 'নজরুল ইসলামের নির্বাচিত কবিতা' সংকলন অক্টোবর মস্কো প্রকাশভবন থেকে এ বছর প্রকাশিত হয়েছে। এই নতুন সংস্করণে নজরুলের আরও অনেকগুলি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং কবির ৭০তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে তা প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত নজরুলের কবতাগুলি বাংলা ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কবি এম, কুরগান্তসেভ এবং বইটির এক দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ই, পি, চেলিশেভ। বইয়ের ভূমিকাতে তিনি কবি ও বিপ্লবী নজরুলের জীবনকথা ও তাঁর কাব্যধারা সম্পর্কে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। ১৯৬৯ সালে অধ্যাপক চেলিশেভ কলকাতায় আসেন ও কবির সাক্ষাৎ লাভ করেন। ভূমিকায় তিনি এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সংকলনটি শুরু হয়েছে নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা দিয়ে এবং মোট তাঁর ৩৩টি কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে।

নজরুল ইসলাম নির্বাচিত কবিতা/প্রচ্ছদপট

স্বমতে আনার তাঁর উদগ্র আগ্রহ। তিনি তাঁর নীতি জোর করে কারো ওপর না চাপিয়ে যুক্তি তর্কের দ্বারা বুঝিয়েছেন। আরেকটি অসামান্য গুণ ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠীর মধ্যে অখণ্ড ঐক্য—অনেক রকম সমস্যার মধ্যেও এইভাবে ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার নিদর্শন আধুনিককালের বিপ্লবের ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না।

এর জন্যই ১৯৪৬ খৃঃ যে সরকারী গোষ্ঠী নিয়ে হো চি মিন ফ্রান্সে দরবার করতে গিয়েছিলেন আজো সেই দলই অটুট হয়ে বিরাজমান। এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত অ-কম্যুনিস্টদের সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র [illegible] কুয়োমিনটং চীন উত্তর ভিয়েৎনাম এবং হংকং অধিকার করুক। সেই প্রচেষ্টা বানচাল করার উদ্যোগ পর্বে হো বলছিলেন—

> "It is better to Snig France's dung for a while than to eat China's all our lives".

এরই নাম পরিণত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রথম প্রথম ব্রিটিশ এবং পরে ফরাসীরা হো চি মিনের প্রতি অনেক অপকৌশল প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। এই [illegible] ঘটেছে ১৯৪৬ খৃঃ দুবার। এরপর জেনেভা চুক্তি সম্পর্কে যখন বেশ মিল-মিশের মধ্যে আলোচনা চলছিল তার মধ্যেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে বিকিয়ে দেওয়া হল মার্কিনের হাতে।

লাকাতুর এই গ্রন্থের শেষাংশে লিখেছেন—'স্বদেশের এতটুকু অমর্যাদা ঘটতে দেবেন না হো। তাঁর কাছে স্বদেশের চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই।'

এই গ্রন্থটিতে ভিয়েৎনামের প্রাণপুরুষ হো চি মিনের যে জেখাচিত্র লাকাতুর এঁকেছেন তা সার্থক হয়েছে। [illegible] তথ্য ও সমসাময়িক মন্তব্য সমাবেশে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

—[illegible]

**PORTRAIT OF HO CHI MINH :** By Jean Lacouture: Translated by Peter Wiles, Publishers: Messrs ALLEN LANE, (The Penguin Press) London. Price 35 Shillings.

# সাহিত্যের খবর

**কুমুদরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ।।** বর্তমান বাংলার প্রবীণতম কবি কুমুদরঞ্জনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গত ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সাহিত্যতীর্থের দপ্তরে বিশিষ্ট কবি-লেখকরা সমবেত হন। কবির পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন সর্বশ্রী আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, মনোজ বসু, পুষ্প দেবী, মন্মথ রায়, জরাসন্ধ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, কুমারেশ ঘোষ, কৃষ্ণ ধর, রণজিৎকুমার সেন, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি হলঃ—(১) কুমুদরঞ্জনের স্মৃতি-স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ; (২) সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ, (৩) প্রামান্য জীবনী প্রকাশ; (৪) বালিগঞ্জ প্লেসের যে অংশে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, তার নামকরণ হোক 'কুমুদরঞ্জন সরণী'। প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেন শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক।

**তাহা হোসেন সম্পর্কে বই ।।** তাহা হোসেন একালের মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর ৮০-তম জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে মিশরের প্রখ্যাত প্রকাশন 'দার-এর হিলাই' তাঁর সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম 'তাহা হোসেন ঃ সমকালীনদের দৃষ্টিতে'। এতে তাহা হোসেনের সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট মিশরীয় লেখকরা যে সব আলোচনা করেছেন, তা সংকলিত হয়েছে। ভূমিকায় প্রখ্যাত সমালোচক মহম্মদ তাইমুর লিখেছেন যে, তাহা হোসেনের প্রতিভার দিক তিনটি—তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, তাঁর উদারচেতা হৃদয় ও সাহিত্য রচনায় নব কৌশল অবলম্বন। প্রখ্যাত কবি আবদেল রহমান সেদকি লিখেছেন—'কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মিশরীয় ডীন তাহা হোসেন আরবি সাহিত্যেরও প্রথম ডীন। তিনি এই পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রতীচ্য সাহিত্য ও আরবি সাহিত্যে সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্য।' ডঃ মোহির এল কালামাও শিক্ষাবিদ হিসেবে তাহা হোসেনের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেন। ডঃ আব্দেল হামিদ ইয়ুনুসের মতে—তাহা হোসেন লোক সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর নিজের রচনাও লোক-সাহিত্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ডঃ ব্যামন ফ্রান্সিস—'তাহা হোসেন ও ফরাসী সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—'তাহা হোসেন এমন একজন লেখক ছিলেন যিনি অন্য দেশের সাহিত্য পাঠ করে তার রত্নরাশি নিজ সাহিত্যে উপহার দিয়েছেন। ফরাসী সাহিত্য তিনি খুব ভালভাবে পড়েছিলেন, যার জন্য তাঁর রচনায় ফরাসী দেশ ও ফরাসী ভাষায় অনেক প্রভাব দেখা যায়। যেমন—'দি ভয়েস অব প্যারিস' 'মোমেন্টস' 'পেজেস অব লিটারেচার এণ্ড ক্রিটিসিজম' ইত্যাদি গ্রন্থে ফরাসী দেশ ও ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়।' ডঃ ফ্রান্সিস নিজে তাহা হোসেনের 'দি সং অব দি নাইটএঙ্গেল' বইটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ডঃ মহম্মদ আমিন এল-এলেন বইটির শেষ প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন—'তাঁর জীবন ও দর্শন বিগত অর্ধ-শতাব্দী ধরে আরবিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান প্রবাহ ছিল এবং ভবিষ্যতের সাহিত্যিকদেরও তা সমভাবে অনুপ্রাণিত করবে। মিশরের সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা ধারণা খুব অস্পষ্ট। আশা করি, এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, সাহিত্য সেখানেও আজ সমৃদ্ধির পথে।

**অস্ট্রেলিয়ায় পুস্তক প্রকাশন সংস্থা ।।** অতি সাম্প্রতিক কালেই অস্ট্রেলিয়ায় পুস্তক প্রকাশন সংস্থার সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তখন সরকারী আইন বা দলিল ইত্যাদি নিয়েই বছরে ৫০টির মত বই প্রকাশিত হত। কিন্তু ইদানিং বইয়ের বিক্রী এবং প্রকাশ খুবই উল্লেখ্য স্থান অধিকার করেছে। ১৯৫৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায় প্রকাশন সংস্থা ছিল মোট ২৯টি। গত এপ্রিল মাসে সিডনিতে সম্মেলন হয়, তাতে দেখা যায় মোট প্রকাশন সংস্থা এখন দাঁড়িয়েছে ৫২৫টিতে। পৃথিবীর বিভিন্ন পুস্তক প্রদর্শনীতেও এখন অস্ট্রেলিয়ার বই স্থান পাচ্ছে। ওসাকায় অনুষ্ঠিত এক্সপো—৭০-এ অস্ট্রেলিয়ার বই ছিল এক বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়াও ফ্রাংকফুর্ট বিশ্ব পুস্তক প্রদর্শনীতেও প্রতি বছরই তাঁরা আমন্ত্রিত হন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ায় এখন তাঁদের বই প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। কারণ, সেখানকার গ্রন্থাগার তাঁদের বই সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ছে। ইদানিং ভারতীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে এশিয়া, আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশে খুব আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে অথচ ভারতীয় গ্রন্থ পড়ার সুযোগ তাঁদের হচ্ছে না। যদি বই অনুবাদ করে প্রকাশকরা এই সব দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করেন, তাহলে একদিকে যেমন ব্যবসায়িক লাভ হবে, তেমনি অন্যদিকে সাহিত্যে সমৃদ্ধির পথও উন্মুক্ত হবে।

**শিশু সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ ।।** বাংলা ভাষায় শিশু সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য এ বছর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন অধ্যাপক ডঃ মৃত্যুঞ্জয়-প্রসাদ গুহ। যে বইটির জন্য তিনি এ পুরস্কার লাভ করেছেন তার নাম 'চল যাই চাঁদের দেশে'। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক হাজার টাকা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ডঃ গুহের বিজ্ঞান ভিত্তিক গ্রন্থ 'আকাশ ও পৃথিবী'র জন্য ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন এবং 'বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা' নামক অপর একটি গ্রন্থের জন্য ১৯৬৯ সালে ইউনেস্কো পুরস্কারে সম্মানিত হন।

**বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম-শতবার্ষিকী ।।** রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে সম্প্রতি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় জোড়াসাঁকোয় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিভিন্ন বক্তা বলেন্দ্রনাথের কাব্যে ও প্রবন্ধে রচনাশ্রী সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। বলেন্দ্রনাথের বাংলা গদ্যরীতি, সংস্কৃত কাব্য আলোচনায় বৈশিষ্ট্য, শিল্প প্রসঙ্গে বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে বক্তারা আলোচনা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।

**বাংলার লোক-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা চক্র ।।** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 'তথ্য ও জনসংযোগ' বিভাগের উদ্যোগে গত ১৬—২০ ডিসেম্বর কলকাতা তথ্যকেন্দ্র বাংলার লোক সংস্কৃতির উপর এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—'এই ধরনের প্রচেষ্টা বাংলাদেশে এই প্রথম। উদ্বোধন করেন ডঃ রমা চৌধুরী। বিভিন্ন দিনে আলোচনা সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুরজিৎ সিংহ, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ও ডঃ সীতেন্দ্রনাথ বসু।

যাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয় ভট্টাচার্য, ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, গোপাল হালদার, ডঃ কল্যাণ দাশগুপ্ত, ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ লোক সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচকবৃন্দ।

—চার্বাক

# নতুন বই

**পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গরচনা** (আলোচনা) — মীরা অধিকারী। সাহিত্য প্রকাশ। ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা—৯। দাম নয় টাকা।

বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরসের আমদানী বেশী পুরোন নয়। হাস্যরসের অতি কাছাকাছি ব্যঙ্গের অবস্থান। ব্যঙ্গ বা হাস্যরসকে দীর্ঘস্থায়ী হতে গেলে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যগুণান্বিত হতে হবে। হাস্যরস বা ব্যঙ্গসৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথ বাঙলা সাহিত্যে পথিকৃৎ। এত রোমাঞ্চকর এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ লেখক বিরল। সমকালে তাঁর অসামান্য রচনার যোগ্য স্বীকৃতি মেলেনি। তাঁর ছিল এক সহানুভূতিশীল শিল্পীহৃদয়। হালকা চালে হাসা ও ব্যঙ্গের দ্বিমুখী ধারায়, রূপক আর উদ্ভট কল্পনায় সংশয়ময় পরিবেশ, সহজ ভাষায় ও সাদামাঠা চরিত্র রচনায় ত্রৈলোক্যনাথ সিদ্ধহস্ত। ব্যঙ্গসৃষ্টিতে তাঁর যে নিরাসক্ত মনটি পাই তাই-ই তাঁর সাহিত্যে খাঁটি ব্যঙ্গরসের যোগান দিয়েছে। গ্রামবাঙলার সাদামাঠা জীবন, সমাজ, সংলাপ, পরিবেশ নিখুঁতভাবে ফুটিয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ। প্রকৃত ব্যঙ্গস্রষ্টার আন্তবর্ণ নিরাসক্ত মন। ত্রৈলোক্যনাথে তা স্পষ্ট।

শ্রীমতী অধিকারী এই যুগপ্রবর্তক সাহিত্যস্রষ্টাকে নিয়ে সুদীর্ঘ গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। পুণাঙ্গ রচনা ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামকে কেন্দ্র করে। বর্তমান খণ্ডে আছে ত্রৈলোক্যনাথ, পরবর্তী খণ্ডে থাকবে পরশুরাম। ত্রৈলোক্যনাথের জীবন ও সাহিত্য পরিক্রমার সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোকপাত করা হয়েছে। 'ফোকলা দিগম্বর'কে এখনও বাঙালী ভোলে নি। 'কঙ্কাবতী' ছিল সব থেকে জনপ্রিয় রচনা। সেই সঙ্গে পাপের পরিণাম, ডমরু চরিত, ভূত ও মানুষ, মজার গল্প, মুক্তামালা—সম্ভবত এখনও রসিক পাঠককে মুগ্ধ করে। যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্যসহ শ্রীমতী অধিকারী স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় সার্থক হয়েছেন। আশা করা যায়, তাঁর পরিশ্রম উপযুক্ত স্বীকৃতি পাবে।

**ইতিহাসচক্র—** রামমনোহর লোহিয়া। **ভারত ভাগের অপরাধী যারা**—রামমনোহর লোহিয়া। রামমনোহর লোহিয়া সাহিত্য প্রকাশন ট্রাস্ট। ৮ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট। কলকাতা—১৩। প্রতিখানির দাম চার টাকা।

ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত সৈনিক রামমনোহর লোহিয়া সামাজিক কুসংস্কারমুক্ত এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু পাণ্ডিত্য নয়, স্বাধীন চিন্তা ও দার্শনিক ভাবনায় প্রোজ্জ্বল তাঁর ব্যক্তিত্ব। ভাষণে এবং রচনায় স্পষ্টবাদিতা এবং বলিষ্ঠ মন্তব্যের জন্য তিনি বহুজনের প্রিয় ও অপ্রিয় ছিলেন। লোহিয়াজীর ইংরেজি রচনাবলী বাঙলায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন রামমনোহর লোহিয়া সাহিত্য প্রকাশন ট্রাস্ট। 'হুইল অফ হিস্ট্রি' বা 'ইতিহাসচক্রে' লোহিয়াজী মানব ইতিহাসের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা বিশ্লেষণ করেছেন। 'ভারত ভাগের অপরাধী যারা' বইটি বিভক্ত ভারতের পটভূমিকায় রচিত। লোহিয়াজীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেকের মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর মতকে একেবারে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

## সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

**গ্রন্থপরিক্রমা** (নভেম্বর, ১৯৭০)—সম্পাদক : অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ৩০।১বি, কলেজ রো, কলকাতা—৯। পঁচিশ পয়সা।

সমালোচনা-সাহিত্য-নির্ভর পাক্ষিক পত্রিকা 'গ্রন্থপরিক্রমা' সুদীর্ঘ আট বছর ধরে বলিষ্ঠভাবে সাহিত্যসেবা করে আসছে। সাহিত্যের 'সিরিয়াস' পাঠক যাঁরা বাংলা-সাহিত্যের এবং নতুন বইয়ের সঠিক খবর চান তাঁরা 'গ্রন্থপরিক্রমা'র পরিক্রমণ করলে নিশ্চয়ই খুশী হবেন।

**কালদর্পণ** (ঈদ সংকলন, নভেম্বর, ১৯৭০) সম্পাদক : মুন্সী আবদুর রহীম। মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা। মূল্য : ১·২৫ পয়সা।

'প্রতিভা সাহিত্য চক্রে'র মুখপত্র 'কালদর্পণ'-এর তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যাটি 'বিশেষ সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-জীবনী-ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতির সমাহারে। মুসলিম জনজীবনের নানান সমস্যার ওপর নানান দিক থেকে প্রতিবাদের আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। অধিকাংশ গল্প-কবিতা-প্রবন্ধের পটভূমি এই জনজীবন, বা কুসংস্কারের অন্ধকারে বন্দী, ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যায় পঙ্গু, অচলায়তনের কারাপ্রাচীর ভেঙে সত্যের ও কুসংস্কারমুক্ত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে।

**জাগিকা** (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)—সম্পাদক : প্রশান্ত দাঁ ও জয়ন্ত রায়। ২৫।এ, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলকাতা—৫। মূল্য : চল্লিশ পয়সা।

'মিনি' পত্রিকা কিন্তু 'ম্যাক্সি'র সমস্ত সাহিত্যগুণ এর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে সুচারুরূপে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, হাসির গল্প, শিক্ষা-সমস্যা, বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ, খেলাধুলো প্রভৃতি প্রতিটি রচনাই সুনির্বাচিত এবং সুলিখিত।

**নবায়ন** (বড়দিন-এর বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭০) —সম্পাদক : সুবোধবিকাশ দত্ত। সাহিত্য সদন, ৬৫।এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। মূল্য : এক টাকা।

বঙ্গীয় খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের মুখপত্র মাসিক পত্রিকা নবায়ন-এর তৃতীয় বর্ষের একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যাটি বড়দিন বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকীয়, চলতি প্রসঙ্গ, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটিকা, ভ্রমণ কাহিনী কিশোরমহল, যুব সম্মেলন, রম্যরচনা, মণ্ডলী সংবাদ, আলেখ্য, মধুরেন প্রভৃতি নানান বিভাগে সুরচিত রচনা-সম্ভারে খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের সমাজ-জীবনের জীবন্ত দর্পণ হয়ে উঠেছে এই পত্রিকা। প্রবন্ধ বিভাগটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'বিশ্বাস ও অবিশ্বাস', অরবিন্দ নাথের 'ধর্ম বনাম অধর্ম' এবং বিশু সেনের 'মার্কসবাদীদের চোখে যীশুখৃষ্ট', শুধু খৃষ্ট অনুরাগীদের নয়—সাহিত্যরসিকদের চিন্তার খোরাক যোগাবে।

**নীরাঞ্জনা**—(অকটোবর-ডিসেম্বর, ১৯৭০)—সম্পাদক : প্রিয়লাল মৌলিক। ৩৫সি, মতিলাল নেহরু রোড, কলকাতা-২৯। পঞ্চাশ পয়সা।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনীর সংকলন। প্রতিমা দেবীর ('নিউইয়র্ক ভ্রমণ') এবং সুখরঞ্জন চক্রবর্তীর ('এই দর্শক, এত সংঘাত ও বিভূতিভূষণ') রচনা দুটি উল্লেখ করবার মতো।

**স্বপ্ন-মুখ**—সম্পাদক : শ্যামল শুক্ল। মানকর, বর্ধমান। পঁচিশ পয়সা। দ্বিমাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা।

**বনজ্যোৎ**—(দ্বিমাসিক সাহিত্যপত্র) সম্পাদক : প্রবীর ভট্টাচার্য ও সন্তোষ সিংহ। ৩৩।১, নাথবাগান রোড, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা। পঞ্চাশ পয়সা।

**ছন্দক** (১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা) : সম্পাদক—এম এম ইয়াসিন। বাঁদপুর, হুগলী। কুড়ি পয়সা।

**জিজ্ঞাসা**—সম্পাদক : ইন্দ্রজিৎ বসু, শুকদেব ঘোষ। ১৯ কাশীপুর রোড, কলকাতা ২। পঁচিশ পয়সা।

**ঢেউ**—ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। তিরিশ পয়সা। জগৎপুর রোড, কাঁথি, মেদিনীপুর।

# বইকুণ্ঠের খাতা

## জীবন নির্ভর কবিতার অনুবাদ : গাথা সপ্তশতী

"চর্চার অভাবে একেকটি উন্নত ভাষা পর্যন্ত মানুষ ভুলে যায়, ভুলে গেছে—তার প্রমাণ আছে পৃথিবীর সর্বত্র। এজন্যে কেউ দুঃখ করেন না। দুঃখ করার কিছু নেইও। প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি, প্রতিটি সজীব ভাষাই ক্রমাগত শরীর ও পোশাক বদল করে দূরে সরে যাচ্ছে আদি উৎস থেকে। ঘটছে শব্দের অর্থান্তর, অনুষঙ্গের ভোলবদল। চসারের ইংরেজী, কেবল বিদেশীর কাছে নয়, আজকের লন্ডন-বাসীর কাছেও দুর্বোধ্য। চর্যাপদের বাংলাকেই কি আমরা সহজে বুঝতে পারি ভাষাতাত্ত্বিকের সাহায্য না নিয়ে?"

সেদিন কথাটা যখন শুনেছিলাম, তখন এতটা ভেবে দেখিনি। জনৈক অধ্যাপক দুঃখ করে বলছিলেন : "আমি বিস্মৃত-প্রায় ভাষার পুনরুদ্ধারের কথা বলছি না, তার ভাবসম্পদের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা যখন সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের সন্ধানে য়ুরোপের দিকে যাত্রা করি, তখনও একবার ঘরের কাছে কি আছে তার খোঁজখবর করে পর্যন্ত দেখি না। তার কারণ বোধহয়, আধুনিকতার শিক্ষাটা আমরা পেয়েছি য়ুরোপের কাছ থেকে। ফলে, ও'রা যখন আমাদের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, তখন আমরা নিজেদের দিকে চোখ ফিরিয়েছি। এমন ঘটনাও ঘটেছে, বাংলাদেশে বসে বাঙালীর লেখা লোক-সাহিত্যের বই বেরিয়েছে কলকাতা থেকে নয়, সুদূর জার্মানী থেকে জার্মান ভাষায়। হয়তো এজন্যেই আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় আমরা প্রাচীনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে লজ্জা পাই। অতীতের কাছে ঋণ স্বীকারের কথাটাও মনে পড়ে না।"

তারপর ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন : "অতীতের কাছ থেকে আমরা কি নেবো, সেটা বড়ো কথা নয়, কিভাবে নেবো সেটাই বড়ো কথা। পুরনোর মধ্যে প্রত্যাবর্তনের কথা কেউ বলবেন না। তার মধ্যে যদি কোনো ঐশ্বর্য থাকে, তবেই তাকে গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে—না হলে নয়। রিলকে পুরা-কাহিনীর জগৎ থেকে আধুনিকতার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, ককতোর মধ্যেও দেখেছি প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের প্রয়াস। এ'রা কেউ অনাধুনিক ছিলেন না। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতগুলি রেনেশাঁস হয়েছে, তার মূলে ছিল অতীতের পুনরা-বিষ্কার ও পুনর্মূল্যায়নের আকাঙ্ক্ষা। আজও যদি আমরা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন কিছু করতে চাই, তাহলে আমাদের সেই আলোর সন্ধান পেতে হবে। আজকের সাহিত্য যতই আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন হোক না কেন, যদি কিছু স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে হয়, তাহলে তাকে নিজস্ব ঐতিহ্য থেকেই উপাদান ও প্রেরণা সঞ্চয় করতে হবে।"
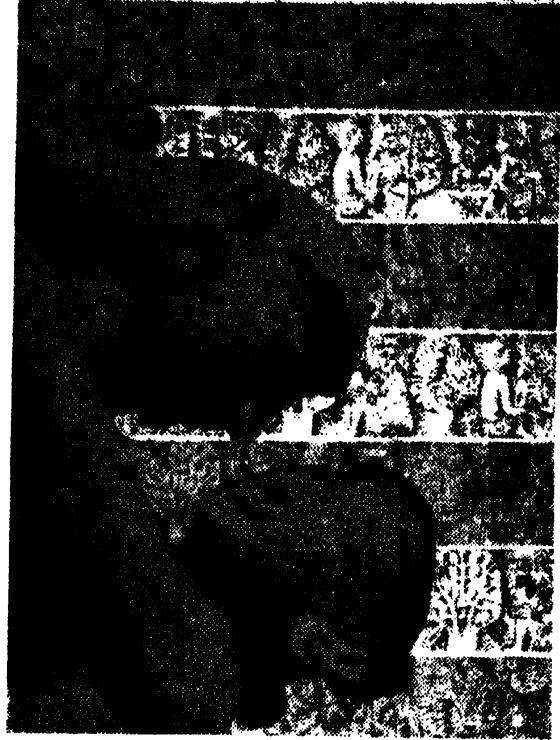
আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারিনি সেদিন। আজও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাইনি। কোন যুক্তিতেই বা বিতর্ক করবো? আধুনিক কবিসাহিত্যিকরা বিষয়টা ভেবে দেখতে পারেন। সত্যি কথা বলতে কি, প্রাচীন সাহিত্যের অতি সামান্য অংশই আমি পড়েছি। তাও সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ, প্রাকৃতের কথা বলতে পারবো না।

### গাথা সপ্তশতী

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা সাত-বাহন-রাজ হাল-সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ'-এর বাংলা পদ্যানুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। এর আগে বইটির গদ্যানুবাদ করেছিলেন ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক। মনে হয়, প্রাকৃত ভাষার অধ্যাপক হিসেবে গাথা সপ্তশতীর বিশ্লেষণ ও আলোচনাই পার্বতীবাবুকে অনুবাদে উৎসাহিত করে। তিনি বলেন : "ভাষা-তত্ত্বের নীরস আলোর মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে এর কাব্যসৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভাষার অস্থি-বিদ্যার অঙ্গুলি সঙ্কেতের মধ্যে যে রূপসী মাঝে মাঝে তার অস্তিত্ব অনুভব করিয়েছে, স্বীকার করি তাকে অবজ্ঞা করা আমার সম্ভব হয়নি।"

তিনি অনুভব করেছেন, গাথাসপ্ত-শতীর শ্লোকগুলি যেন তাঁর কাছে প্রকাশের ভাষা চাইছিল। বুঝতে পেরে-ছিলেন, মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে তাদের বাঙময় করে তুললে, প্রায় দু হাজার বছর পূর্বেকার—কালিদাসের পূর্ব যুগের এক অভিনব সৃষ্টির রূপলাবণ্য ধরা দেবে। সেজন্যে তিনি তাঁর গুরু রাধাগোবিন্দ বসাকের কাছে যান এবং অনুবাদের অনু-মতি প্রার্থনা করেন।

ডঃ বসাক অনুমতি দিয়ে বলেন, 'তোমাকে নতুন কিছু করতে হবে, নতুন কথা বলতে হবে।"

উত্তরে পার্বতীবাবু বললেন : "আপনার ভগীরথ, আপনার ত্যাগ এবং তপস্যা আরা বাঙলার মাটিতে গাথার গঙ্গাধারা নিয়ে এসে আমাদের প্রাণ জুড়িয়েছেন। অনুমতি করুন, আমি সেই গাথার ধারায় অঞ্জলি তুলি—একটু ছন্দের স্পন্দন, আর কিছু না।"

ডঃ বসাক উপদেশ দিলেন : "তুমি গানের জবাব গানেই দিও। তোমারও তপস্যা চাই, গাথার সর্বতোমুখী গুরু-গম্ভীর আলোচনা তোমার কাছে প্রত্যাশা করি।"

কিন্তু কাজে হাত দিয়ে দেখেন, সামনে এক বিষম সমস্যা। একালের বিচারে সপ্তশতীর কোনো কোনো গাথায় রুচি-বিরুদ্ধ বিষয়ের অনাবৃত প্রকাশ রয়ে গেছে। তিনি ভয় পেয়ে আবার ছুটলেন ডঃ বসাকের কাছে। বললেন : "আমি শ' দুই গাথা বাদ দিয়ে অনুবাদ করতে চাই, এবং অনূদিত গ্রন্থের নাম দিতে চাই : 'সপ্ত-শতীর পঞ্চশতী'।"

শুনে ডঃ বসাক বললেন : "অগ্রন্থেয়। তুমি শ্লীল অশ্লীলকে অস্তিত্ববাদীর দৃষ্টি দিয়ে দেখো। সবই তুলামূল্য। প্রকাশেই অশ্লীলের অশ্লীলতা। তোমার প্রকাশের চিত্রকল্পটিতে তাকে ঢেকে দিও, বস্তুটাকে যুগোপযোগী করে বলো।"

তাঁর কথায় পার্বতীবাবুর সংশয় কেটে গেলো। নতুন দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখলেন, নরপতি হাল আধুনিক কালের মূল্য বিচারেও একজন খাঁটি রিয়ালিস্ট। তাঁর অপর গুরু আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যও তিনি পেয়েছেন। বলেন : "আমি আমার ক্ষীণমুষ্টিতে তার কতটুকুই বা ধরে রাখতে পেরেছি? সান্ত্বনা এই, আমার আচার্যদ্বয়ের কাছে এই প্রৌঢ় বয়সেও আবার ছাত্র হয়ে বসতে পেরেছি।"

অবশ্য এসবই হলো, প্রত্যক্ষ প্রেরণার কথা, পূর্বসূরীর সাহায্যের সবিনয় স্বীকৃতি। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও তাঁকে উৎসাহ এবং উপদেশ দিয়েছেন নানা-ভাবে। প্রচলিত গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য 'অজ্জাহি ফুল্লঅলেল্লো বকখউ বো......' গাথাটির সাধান তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন।

আমি বইটি পড়েছি একাধিকবার। সুদীর্ঘ ভূমিকাটিও। সাতটি শতককে বিন্যস্ত মোট অনূদিত গাথার সংখ্যা ৭০০ হলেও, প্রতি শতকের শেষেই একটি করে গাথা আছে অতিরিক্ত। বলা যায়, এগুলি প্রতি শতকের সমাপ্তিসূচক গাথা। বাংলা হরফে প্রাকৃত ভাষায় লেখা গাথাটি ছাপা রয়েছে বইয়ের বাঁদিকের পৃষ্ঠায়, ডানদিকে মুদ্রিত হয়েছে বাংলা অনুবাদ।

পার্বতীবাবু বলেন : "খুব হুঁশিয়ার হয়ে বলতে গেলে, এই প্রাকৃতকে বলতে হবে—মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত নামে অভিহিত, প্রাচীন ভারতের লোকভাষার আধারে গঠিত, একটি সাহিত্যিক ভাষা।......এমন সংগ্রহ বা সংকলনকে সংস্কৃতে বলা হয় কোষকাব্য, ইংরেজীতে অ্যানথোলজি। এ জাতীয় লোকরঞ্জন কবিতা সংগ্রহ অতি প্রাচীনকাল থেকেই সর্বত্র আদৃত হয়ে আসছিল। সংস্কৃতে যেটা কোষ, ফার্সীতে তাকে বলে কুল্লীয়ত্। কুল্লীয়াত-এ-হাফিজ—হাফিজের নানা ভাবের কবিতাসংগ্রহ।" সাতশ' গাথার সংকলন বলেই নৃপতি হাল এই গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন : 'গাহা-সত্তসঈ'।

ইতিহাসের নজীর টেনে তিনি বলেন : 'সংকলনই হোক অথবা একক কবির মৌলিক রচনাই হোক, শ্লোকের সংখ্যায় কাব্যকে পরিচিত করার রীতি ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে ছিল, মধ্যযুগে ছিল, আধুনিক যুগেও আছে। আট শ্লোকের সমষ্টি একদা কালিদাসের নামে প্রচলিত থেকে নাম নিয়েছিল 'শৃঙ্গারাষ্টক।' অমরু কবির নিজ রচনা অথবা সংকলনগ্রন্থ 'অমরুশতক'। ময়ূর কবির 'সূর্যশতক'। এমনই সংখ্যা নামে পরিচিত আমাদের এই গ্রন্থও 'গাথা সপ্তশতী।'

হাজার বছরেরও কিছু বেশী পরে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি আচার্য গোবর্ধন হালকে অনুসরণ করে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি শ্লোক-সংকলনের নাম রেখে-ছিলেন 'আর্যাসপ্তশতী।' পার্বতীবাবুর মতে : হালের রচনায় কামস্য তত্ত্বতন্ত্রীর বিশ্লেষণ আর গোবর্ধনের রচনায় আছে শৃঙ্গারোক্তর সংশ্রমের—বচন বিন্যাস। উদ্দেশ্য এক, শুধু গ্রন্থ দুইখানির ভাষা ভিন্ন। একটির প্রাকৃত—অন্যটির সংস্কৃত। গোবর্ধনের আরো পাঁচ বছর পর জয়-পুরাধিপতি রাজা জয়সিংহের সভাকবি বিহারীলাল চৌবে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ব্রজ-ভাষায় সাতশো দোহা রচনা করে নাম দিলেন 'সতসঈ'।

এ বইয়েরও ভঙ্গি এক। অনেক দোহা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক হলেও নিষ্কাম মানুষের ভাবাবেগই প্রাধান্য পেয়েছে সর্বাধিক। প্রথম দোহাতেই বিহারীলাল লিখেছেন :

'মেরী ভব-বাধা হরৌ,রাধা নাগরি সোই।
জা তনকী ঝাঁঈ পরৈ
স্যামু হরিত-দুতি হোই।।'

অর্থাৎ, 'যার স্তনের আভা পড়ায় শ্যাম হরিত-দ্যুতি হয়ে গেলেন, সেই রাধা নাগরী আমার সংসার বন্ধন দূর করুন।'

গাথা সপ্তশতীর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে পার্বতী-বাবু বলেন : এমন কামকামনায় তত্ত্বতন্ত্রী বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে দেবদেবীর নীরা-জনায় পারদর্শী কবি হলেন জয়দেব-গোবর্ধন-বিহারীলালেরা। শ্রীমন্নরপতি হালও তাঁর দেবতা হরগৌরীকে অনুরূপভাবেই গ্রন্থারম্ভে বন্দনা করেছেন। কিন্তু জয়দেব-বিহারীলালে ভক্তিভাবটা যেমন মাঝে মাঝে তার অস্তিত্ব অনুভব করায় গোবর্ধন ও হালে সে ভাবটা আসে না। মনে হয়, এই দুই কবি যেন দেবতাকে নমস্কারটুকু জানিয়ে কাম-কামনার লীলায় নেমে এলেন। শ্রীকবি হাল আদৌ মধ্যে চ অন্তে চ দেবতাদের রেখেছেন। আদিতে এবং অন্তে মহেশ্বর মহেশ্বরীকে প্রণাম জানিয়েছেন। মন্ত্রের 'ওঁ' কীলকের মতো গ্রন্থারম্ভে এবং গ্রন্থ শেষে ইষ্টদেবতার লীলাকীর্তন করে তিনি গ্রন্থকে অবিনশ্বর করতে চেয়েছেন। কিন্তু ভক্তিভাব তো কোথাও ফোটেনি। যাঁরা একথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না, তাঁদের ২।৫১ গাথাটি পড়তে বলি কবি নিষ্কলঙ্কের নিষ্কলঙ্কা ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করতে বলি। আসলে গোবর্ধন এবং হাল তাঁদের সপ্তশতীতে রক্তে মাংসে গড়া মানুষেরই গান গেয়েছেন—যে মানুষের জীবন-রথ চালিয়ে নিয়ে চলেছে একাদশ ইন্দ্রিয়—ধর্মও নয়, দেবতাও নয়।'

সাধারণত সংস্কৃত ও প্রাকৃত কোষকাব্য-গুলি বিষয় অনুসারে সাজানো হয়ে থাকে। গাথাসপ্তশতী সেভাবে সাজানো হয়নি। পার্বতীবাবু বলেন : 'মতের রাজা সর্বদা সকলের ভালো লাগবে এমন কথা নেই। অযত্নের এলোমেলো সাজও মাঝে মাঝে অপরূপ হয়ে ওঠে। তাই বুঝি হাল রজ্যায় বিষয়গুলি সাজাননি না।' তিনি রবার্ট হেরিক প্রসঙ্গে লেগুইস ও ক্যাজা-মিয়ানের মন্তব্য উদ্ধার করে বলেন : 'এ সুইট ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অ্যানথেটিক প্রিন্সিপল। হি লাভস ইট ইন পোয়েট্রি অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইন উইমেন্স ড্রেস।'

**গাথা সপ্তশতীর অনুবাদ ও অনুবাদ**

গাথা সপ্তশতীর একটা সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ভেবর। ভারতেও কালে কালে এই গ্রন্থের বিভিন্ন টীকা ও ভাষ্য লেখা হয়েছে। তার বহু প্রণেতা ছিল একক্রমে উড়িষ্যা থেকে গুজরাট পর্যন্ত—কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ ভারত। আনন্দবর্ধন, ক্ষেমেন্দ্র, বিশ্বনাথ প্রমুখ প্রখ্যাত আলংকারিকেরা উদাহরণ

সংগ্রহের জন্য এককালে গাথা সপ্তশতীরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন।'

পার্বতীবাবু বলেন : 'সংস্কৃত সাহিত্য যদি তার জীবনীশক্তি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে চলে এসে আধুনিককালে পৌঁছুতে পারতো এবং আধুনিক সাহিত্যের রূপ ও ফর্ম-গুলো স্বীকার করে নিতে পারতো, তবে দেখতাম এই কোষকাব্যের মুক্তকগুলির কোনো কোনো রম্য উপন্যাস হয়ে উঠেছে। এরা এমনি বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল। আমার তো মনে হয়, সপ্তশতীর প্রতি টুকরোতে বীজাকারে এক একটি ছোট গল্প রয়েছে।

'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী একটি প্রাকৃত শ্লোককে হালের বলে নির্দেশ করেছেন। শ্লোকটি হলো :

'লীলাহি তুলিঅসেলো রকখউ
বো রোহিআম্বণফংসো।
হরিণো পঢমসমাগমসন্ধসবেবলিও
হন্বো।।'

যার অর্থ হলো : 'যাঁর হস্ত অক্লেশে গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিল, সেই কৃষ্ণের হস্ত প্রথম সমাগমে শ্রীরাধার স্তনস্পর্শে কম্পিত হলো। সেই হস্ত তোমাদের রক্ষা করুন।' কিন্তু প্রচলিত গাথা সপ্তশতীতে এই শ্লোকটি নেই। সে জন্যেই অনেকের সন্দেহ থাকতে পারে, হালসংকলিত সাতশো শ্লোক হয়তো প্রচলিত গাথা সপ্তশতীতে অবিকৃত নেই। কিংবা অনুলিখনের সময় অদলবদল হয়েছে। মহারাষ্ট্রী পণ্ডিত সদাশিব আত্মারাম জোগলেকর সম্পাদিত গাথা সপ্তশতীর একটি উত্তরার্ধ আছে। ইংরেজী উদ্ধৃতি দিয়ে পার্বতীবাবু বলেন : প্র্যাডিশান ওয়াজ করাপটেড ইন দি হ্যান্ডিং ডাউন অব দি ওরিজিন্যাল অথারিটিজ।'

কিন্তু কে এই সাতবাহন-রাজ হাল? ঐতিহাসিকেরা তাঁর বিশেষ কোনো পরিচয় লিখে রেখে যাননি। পার্বতীবাবুর মতে, 'গাথা সপ্তশতীকে গোদাবরীর গান বললেও অত্যুক্তি হবে না।' ভূমিকায় তিনি সাত-বাহন শাসন ব্যবস্থা ও জনগণ প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'সাতবাহন রাজ্যে নারীর স্থান ছিল সমাজের উচ্চস্তরে। স্ত্রী সম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারতো। ভাস্কর্যে গঠিত মূর্তিগুলিতে দেখা যায় মেয়েরা বৌদ্ধ প্রতীক পুজো করছে।...সপ্ত-শতীর গাথাগুলি নারীর মুখেই উচ্চারিত হয়েছে।...সাতবাহন রাজ্যে গরীবের ঘরও বেশ সাজানো গোছানো থাকতো। কাষ্ঠাসন, বসার চৌকি, পালঙ্ক, খাট সব কিছুর মধ্যেই একটা আকর্ষণীয় শিল্পের সাক্ষ্য রয়েছে।...১।৩৫ গাথায় দেয়াল চিত্রে রামায়ণ কাহিনী অঙ্কিত রয়েছে দেখা যায়।'

বিভিন্ন গাথার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া ছিল সারা দেশে। সপ্তশতীর বেশীর ভাগ শ্লোকের উৎস সাধারণ মানুষ। সেজন্যেই বিস্মিত হয়ে পার্বতীবাবু বলে-ছেন : 'মহারাজ্যের অধীশ্বর নরপতি হাল, যাঁকে ভোজদেব স্মরণ করেছেন আঢ্যরাজ রূপে, তিনি আগ্রহভরে কেমন করে একে-বারে গ্রামীণ জীবনে নেমে এসেছেন, এ একটা পরম বিস্ময়।...সমতার অভ্রভেদী চূড়া থেকে রাজা অবহেলার দৃষ্টিতে জন-সাধারণকে দেখেননি, দেখেছেন ধূলি-ধূসরিত পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তিনি তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করেছেন।'

অর্থাৎ গাথা সপ্তশতীর বড়ো কথা হলো তার রিয়্যালিজম, যে-রিয়্যালিজম গড়ে উঠেছে অতি সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে কেন্দ্র করে—প্রেম-অপ্রেমের নিবিড়তায়। আছে গৃহস্থের সুখ-দুঃখের কথা। দু একটি গাথাকে বলা যায়, প্যাস্টোরাল সং। দ্বিতীয় শতক-এর ৭২ নম্বর গাথাটিকে উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যায়। পার্বতী-বাবু অনুবাদ করেছেন :

মৃত মহিষের ঘণ্টার মালা অতি
সযতনে গৃহেতে রাখে,
মহিষ বাথানে এক পাল আছে
সাধের ঘণ্টা পরাবে কাকে?
গৃহপতি তাই ঘণ্টার মালা
বহুকাল ধরে বহন করি
চণ্ডীর ঘরে টানাইয়া রাখে
সজল নয়নে তাহারে স্মরি।

এ দুঃখের কোনো ভাষা নেই। একজন চাষীর কাছে তার প্রিয় মহিষটিও যে সন্তানতুল্য। তার বেদনা কাউকে বোঝানো যায় না বলেই দুর্বিষহ।

**কাব্য সৌন্দর্য এবং অন্যান্য**

আমি প্রাকৃত জানি না। মধ্যযুগের বাংলা পড়তে গেলেই হোঁচট খাই। গাথা-সপ্তশতী সম্পর্কে আমার যা কিছু ধারণা, সবই পার্বতীবাবুর অনুবাদের ওপর নির্ভর করে। কেননা, ডক্টর বসাকের গদ্যানুবাদটি আমি পড়ার সুযোগ পাইনি। সেজন্যে এখন আর কোনো কষ্টও হচ্ছে না। ভাষা-বিশেষজ্ঞের কলম থেকেই সপ্তশতীর বাংলা রূপান্তর ঘটেছে। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল ও অকৃত্রিম। ভূমিকা হিসেবে প্রদত্ত তাঁর আলোচনাটি অত্যন্ত মূল্যবান।

পার্বতীবাবু বলেন : 'গাথা সপ্তশতীর সর্বত্র সত্যসুন্দরের ছবি আঁকা। সপ্তশতীর কবিরা যা দিয়ে গেছেন, তাতে আমাদের কল্পনা মুহূর্তে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং সেই কল্পনার আলোকেই রূপদর্শন অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিশদ হয়ে ওঠে। কল্পনার পাওয়া বা হয়ে ওঠাই তো সাহিত্যিক উপলব্ধি।... কবিবৎসল হালের দিন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত গোদাবরীতে অনেক জল গড়িয়েছে। সেদিনের ঘটনা পরম্পরা যুগ-যুগ সঞ্চিত বালুর পাহাড়ে সমাধিস্থ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু নদীর কপাটি-বক্ষে ও কার সুস্পষ্ট চিহ্ন?...সে এই বিস্ময়ের রাজ্য সপ্তশতী, গোদাবরীর গান, কিংবদন্তীর প্রতিধ্বনি—সেই 'পোয়েটিক ট্রুথ অব সাবস্ট্যান্স' বস্তুমূল্যে বস্তুর কাব্যরূপ।'

তিনি লক্ষ্য করেছেন : 'সপ্তশতীর সতীরা আর অসতীরা, গ্রামণী আর গ্রাম-বধূরা, বিলাসী আর বিলাসিনীরা, দুষ্টেরা আর দুর্গতরা শিল্পের তুলিতে আঁকা তেমনই অবিনশ্বর ছবি।'

...এই সঙ্কলনের সম্পাদক তথা সঙ্কলক হাল যদি আধুনিক যুগের মানুষ হতেন, তা হলে তাকে নিয়ে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে যেতো। তিনি গাথা সংগ্রহ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন সেই বিস্মৃতপ্রায় যুগে। শ্লীল-অশ্লীলের বিচার করেননি। শুধু কাব্যিক সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে তিনি বিপরীত মানসিকতার কবিদেরও নিঃসঙ্কোচে জায়গা দিয়েছেন পাশাপাশি। পার্বতীবাবু বলেন : 'ঘটনাগুলি ঘটনা বলেই ঘটেছে। এতে জগতের যেমন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, স্বপ্নং কবির মানসরাজ্যেও তেমনি কোনো ক্রিয়া-বিক্রিয়া নেই। স্বপ্নরাজ্যের দুর্বল অন্ধকারেই যত হাসিকান্না। জাগরণের সবল মুহূর্তে হাসিকান্না নেই। গাথার সংকলয়িতা যেন সৃষ্টির মূল রহস্য ধরে টান দিয়েছেন।...সপ্তশতীর শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচারে এই স্থির বিন্দুটির কথা ভুললে চলবে না।'

প্রকৃতপক্ষে গাথাসপ্তশতী সহজাত কবিদের অকুণ্ঠ প্রকাশ। জীবনের বৈচিত্র্যই তার প্রধান ও একমাত্র উৎস। ইংরেজীতে যাকে ভালগার বলা হয়, সে দোষে দোষী করা যায় না সপ্তশতীর কবিদের। পার্বতী-বাবুর মন্তব্যটাই ঠিক : 'গাথার কবিরা গ্রাম্য রচনায় জীবনের উপরেই নির্ভর করে চলেছিলেন। দেবতা ও স্বর্গের জন্য তাঁদের কোনো শিরঃপীড়া ছিল না।' গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য তিনি সকলের কাছেই প্রশংসা পাবেন।

—সুবর্ণকণী

# সুরাসক্তির পরিণতি
## সুরা ও নিঃসঙ্গতা

—ঐ যে ওরা আসছে! গরিলার মত শরীর, মুখটা বাঘের মত, দাঁত দুটো বেরিয়ে পড়েছে! আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে! আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও। ওগুলোকে তাড়াও, নইলে আমি মরে যাবো!...... আমার ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে!......জানালা দিয়ে ওটা কি আসছে? একটা হাত, মস্ত বড় একটা লোমওয়ালা হাত! কড়িকাঠ দিয়ে সাপ নেমে আসছে! সাপ না কুমীর? তাড়িয়ে দাও! তাড়িয়ে দাও! এই! যাঃ! যাঃ!

রোগী বিছানার ওপর উঠে বসলো। চোখ দুটো ভয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বালিশ নিয়ে জানালা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, সারা শরীর কাঁপছে, আত্মরক্ষার ভংগীতে বসে পাশবালিশটা আঁকড়ে ধরে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলো। গলার স্বরে কাঁপন। মুখের পেশীগুলোও কাঁপছে।

—কই কেউ নেইতো। কেন ভয় পাচ্ছেন? ঘরে আমরা ছাড়া কেউ নেই। জানালা তো বন্ধ রয়েছে। দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে সেজদা। এইতো আমি। আমি মিণ্টু। আমাকে চিনতে পারছেন না?

ঠাণ্ডা জল দিয়ে গা হাত মুখ স্পঞ্জ করে দেওয়া হলো। অনেক আশ্বাস দেওয়াতে রোগী চোখ বুজলো। বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়লো।

ডাক্তারবাবু এলেন। দেহের উত্তাপ নিলেন, রক্তচাপ দেখলেন। রোগীর ঘুম ভেঙে গেল। রোগী আবার চীৎকার করে উঠলো। জড়িয়ে জড়িয়েই কথা বলছে, খুব স্পষ্টভাবে কথা বোঝা যায় না।

—আমাকে বেঁধে ফেলেছে। এবার জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। জঙ্গলে ফেলে খাবলা খাবলা করে মাংস তুলে নিয়ে ওরা ব্রেক-ফাস্ট করবে। আমাকে বাঁচাবার জন্যে কেউ আসছে না। ওহো হো...... ডুকরে কেঁদে উঠলো রোগী। ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলো, ঘরময় ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে; প্লেগের বিষ নিয়ে আমাকে কামড়াতে আসছে। ...দেওয়াল বেয়ে পিঁপড়ে নেমে আসছে!... তোমরা দেখতে পাচ্ছো না কেন?

হঠাৎ হাতটা সামনের দিকে প্রসারিত করে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। সে দেখতে পাচ্ছে, ডাক্তারের পকেট থেকে তিনজন খুদে খুদে মানুষ বেরিয়ে আস্তে আস্তে তার হাতের চেটোয় উঠে এসেছে। তাদের পোশাকে কত রঙ! মাথায় পাগড়ী-গুলোতে মণিমাণিক্য জ্বলজ্বল করছে। হাতের তলোয়ারগুলো চকচক করছে। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে!

ডাক্তারবাবু একরকম জোর করিয়েই শুইয়ে দিলেন। চোখ দুটো দেখলেন। জিভ দেখতে চাইলেন, রোগী দেখালো না। মিণ্টু আর তার কাকিমা হাতটা চেপে ধরলো, ডাক্তারবাবু লারগাকটিল ইনজেক-শন করলেন। রোগী তখনও চেঁচাচ্ছে।

—শোনো তোমরা, কিভাবে ওরা আমাকে শাসাচ্ছে। ওরা কি অভদ্রভাষায় গালাগালি দিচ্ছে, শোনো! বাড়ীর বাইরে পেলেই ভোজালী দিয়ে আমার জিভ কেটে নেবে। ......আমাকে নিয়ে যাচ্ছে! কেওড়া-তলা না? এ কোন শ্মশান? কেওড়াতলা বলেই মনে হচ্ছে। বল হরি হরিবোল! বল হরি হরিবোল! কাঠগুলো শুকনো নয়, বিচ্ছিরি ধোঁয়া হচ্ছে। আগুনের চেয়ে ধোঁয়া বেশি।

এইবার ক্রমশ কথা বেশি করে জড়িয়ে এলো, গলার স্বর নেমে এলো, রোগী ঘুমিয়ে পড়লো।

ডাক্তারবাবু রোগীকে চিনতেন। এ বাড়ীর অনেকদিনের ডাক্তার তিনি। রোগীকে হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে বিদায় নিলেন। বাড়িতে রেখে এ রোগের চিকিৎসা চলে না।

সুরাসক্তির শেষ পর্বের ছবি। ডিলিরিয়ম ট্রেমেন্সের টিপিক্যাল কেস।

রোগী ভুল বকছে, ভয় পাচ্ছে, হ্যালুসিনেশনে ভুগছে। দর্শনেন্দ্রিয়ের হ্যালুসিনেশনই বেশী। জন্তুজানোয়ার, অদ্ভুত চেহারার মানুষ, খুদে খুদে পোকা-মাকড়, সব একেবারে অতি স্পষ্ট দেখতে পায় রোগী। উদ্ভট উদ্ভট দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে রোগী চীৎকার করতে থাকে। বিছানা থেকে, শরীর থেকে পোকামাকড় তাড়াতে থাকে।

এই দৃষ্টিমায়া (ভিসুয়াল হ্যালু-সিনেশন) প্রধানত রাতেই দেখতে পায়, দিনের বেলাতে অনেকটা স্বাভাবিক আচরণ করে। স্থানকালের সঠিক নির্দেশ করতে পারে না রোগী, অনেক সময় পরিচিত লোককে চিনতে ভুল করে। প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে চায় না, শুধু ভয়ের কথা হ্যালুসিনেশনের কথাই বলে। বর্তমানের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার কথাবার্তা, চাহনি, হাবভাব ইত্যাদি থেকে মনে হয় যেন অন্য এক কাল্পনিক লোকে বিচরণ করছে। অনেক সময় দেখা যায় দেহের তাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, নাড়ীর গতি বেড়েছে, রক্তের চাপও বেশী হয়েছে। কথা মাতালদের মত জড়ানো ও গলার স্বরে কাঁপন। মুখের পেশীতেও সামান্য কাঁপন দেখা যায়। জিভের ডগার কাঁপন বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় আর মনে হয় চোখের মণি দুটো যেন নাচছে। এই কাঁপন (ট্রেমর) এবং আতংকের প্রলাপ (ডিলিরিয়ম) এই রোগের বিশেষত্ব। এ থেকেই এই রোগের ল্যাটিন নামের উৎপত্তি। চেতনার আচ্ছন্নতা, অসংবদ্ধ প্রলাপ ও ভয়োন্মত্ত আচরণ সুরাসক্তির অন্যতম পরিণতি।

অবশ্য এই অবস্থায় রোগী খুব বেশী দিন থাকে না। বড় জোর চার পাঁচদিন এই উন্মাদ অবস্থা চলতে থাকে; তারপর খুব লম্বা একটা ঘুমের পর রোগী প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। তখন থাকে দুর্বলতা, ক্লান্তির ভাব আর গ্লানি। কিন্তু রোগীকে বিপদমুক্ত বলা চলে না।

ডিলিরিয়াম ট্রেমেন্স আরম্ভ হবার কিছুদিন আগে থেকেই সুরাসক্তি হ্রাস পেতে থাকে। এ্যালকোহল আর সহ্য হচ্ছে না। পান করলেই বমির ভাব, বমি হয়ও। শরীর খারাপ লাগে, আড্ডায় হৈহুল্লোড় আর পছন্দ হয় না, কেমন যেন একটা মনমরা ভাব, ঘুম ভালো হয় না, খিদে একেবারে থাকে না। ঘুমের আগে চোখের সামনে অদ্ভুত অদ্ভুত রঙ বেরঙের দৃশ্য ভাসতে থাকে।

সুরাপান ছাড়তে গেলেও অনেক সময় ডিলিরিয়াম ট্রেমেন্সের উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। আর এক ধরনের সুরাসক্তির পরিণতি দেখা যায়, যা দীর্ঘস্থায়ী ও সুরাপান বন্ধ হবার পরও চলতে পারে। এই অবস্থার প্রধান উপসর্গ শ্রুতিমায়া (অডিটারী হ্যালুসিনেশন)। চেতনা আচ্ছন্ন নয়, পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান স্বাভাবিক ও সঠিক। ঘুম হয় না আর নিশিরজনীতে এরা নানারকমের কথাবার্তা শুনতে থাকে। এদের শ্রুতিবিভ্রম শুরু হয় প্রথমে কোনো একটা বাস্তব শব্দকে ভিত্তি করে। রেল চলার ঝ্যাক ঝ্যাক শব্দ, ঘড়ির টিকটিক শব্দ অথবা ঝিঁঝিপোকার ডাক এদের কাছে বিচিত্র অর্থবহ বলে অনুমিত হয়। মনে হয় যেন অন্তরীক্ষ থেকে কথা ভেসে আসছে, কারা যেন অত্যন্ত ভয় দেখাচ্ছে, কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ

করছে। ভিলিরিয়াম ট্রেমেন্সের ভিস্যুয়াল হ্যালুসিনেশন এখানে নেই। অনেকটা নির্যাতনমূলক ভ্রান্তির রোগীর উপসর্গের মত। সুরাসক্তির ইতিহাস না জানা থাকলে এদের প্যারানইয়াম রোগী মনে হবে। এদের বিশেষত্ব, এদের সংলাপে প্রথম পুরুষ তৃতীয় পুরুষে পরিণত। একজনের সংলাপের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা চলতে পারে।

—মদ আর ওর পেটে যেতে চাইছে না। ওর পেটের মধ্যে-কালনাগিনী কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। পেটে পড়লেই শোঁ করে শুষে নিচ্ছে। কাজেই ও আর বোতল-বাহিনীর পুজো করতে চাইছে না! নিজের পয়সায় ভাতিভোজন করায় কেন আহাম্মুক!

—কাল সারারাত ব্যাটা জেগে ছিলো! না জেগে থেকে উপায় কি? ঘড়ির ভেতর থেকে ও'রা সারারাত ভয় দেখিয়েছেন। বলেছেন—ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্! তোকে ধিক্ তোর বাবাকে ধিক্। তোর মামাকে ধিক্। তোর বাবা মাতাল, মামা মাতাল, তুইও মাতাল।

—লোকটা মহামূর্খ। কিন্তু বুদ্ধি আছে! ঠিক ধরতে পেরেছে। ট্রেনে করে মহারাজ গুম গুম করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। ওর বাড়ীর পাশ দিয়েই তো রেল লাইন। কি বলে গেলেন জানো? এই বল্ না, কি বললেন। চেখে নেব, দেখে নেব, চেখে নেব, দেখে নেব। ব্যাটা ইঁদুরছানার মত ভয় পেয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকলো।

এই তিন উক্তির তৃতীয় পুরুষ স্বয়ং রোগী।

এই অবস্থা তীব্র (অ্যাকিউট) ভাবে দেখা দিলে অনেক সময় স্কিজোফ্রেনিয়ার এ্যাকিউট অবস্থার মত মনে হতে পারে। তবে সুরাসক্ত রোগীরা সঙ্গীসাথী খোঁজে, লোকজনকে এড়িয়ে চলে না। এখানেই এদের সঙ্গে স্কিজোফ্রেনিকদের তফাৎ বোঝা যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় এ্যালকোহোলিক হ্যালুসিনোসিস।

সুরাসক্তির আর এক পরিণতির নাম দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানী করসাকফের নামে। এই অবস্থার প্রধান মানসিক উপসর্গ স্মৃতিবিভ্রম। রোগী একটা নির্দিষ্ট সময়ের সব কিছু ঘটনা ভুলে যায়। সাধারণত রোগের আরম্ভের সময় থেকে তিন কি চার বছরের আগেকার কোনো কিছুই সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে না, কিন্তু পুরনো সব কিছু মনে থাকে। সমকালীন স্মৃতিবিভ্রমের ফলে কাজকর্মের ভারী অসুবিধা ঘটে। অনেক কিছু কাল্পনিক উপাখ্যান তৈরী করে স্মৃতির দৈন্য ঢাকবার চেষ্টা করে। অনেক উদ্ভট কাহিনীর নায়ক হিসেবে নিজেকে কল্পনা করে তৃপ্তি পায়। কিন্তু বুদ্ধিবিবেচনা পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। যদিও বিচারশক্তি কমে যায় এবং অনর্গল বকতে থাকে; তবুও ঠাট্টা বোঝে; খানিকটা আত্মসমালোচনাও মাঝে মাঝে করতে পারে। সাধারণ চিত্ত-প্রবণের (প্রজ্বলিত ডিমেনশিয়া) সঙ্গে রোগ-নির্ণয়ে গোলমাল ঘটতে পারে। তবে সুরাসক্তির ইতিহাস জানা থাকলে ডাক্তারদের খুব অসুবিধা হয় না। স্থানকাল সম্বন্ধে স্মৃতিবিশৃঙ্খলা যতটা ঘটে, পাত্রপাত্রী সম্বন্ধে ততটা নয়। নার্স, ডাক্তার, আত্মীয়স্বজনকে চিনতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে এ ব্যাপারেও গোলমাল ঘটতে পারে। সকালবেলা হয়তো ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে—এখন রাত কটা? কাল এমনি সময়েই তো প্রাইমমিনিস্টারের সঙ্গে ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। ডাক্তারবাবুকেও যেন পাশের টেবিলে দেখেছিল। একটা কূটনৈতিক ব্যাপারে প্রাইমমিনিস্টার ওর পরামর্শ চেয়েছিলেন। ও বলে দিয়েছে, সাদা চামড়ার লোক থেকে দূরে থাকতে। কু-ক্লক্স-ক্লানের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা ওঁকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। মিসিসিপি থেকে ওদের আড্ডা এখন ভারবানে উঠে এসেছে। কিম্বা নিজের এক কাল্পনিক বীরত্বের কাহিনী ফেঁদে বসে নার্স-এর কাছে। এইতো সেদিন, মুখোশধারী কয়েকজন দুর্বৃত্ত নার্সকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছিল, রোগী একলা শুধু জিউজুৎসুর প্যাঁচ কসে তিন ব্যাটাকে ধরাশায়ী করে নার্সকে উদ্ধার করে।

সুরাসক্তির পরিণতি অনেক ক্ষেত্রেই করুণ। প্রায় সব রাষ্ট্রই এ সম্বন্ধে অবহিত। সুরাপান নিবারণের চেষ্টা অনেক রাষ্ট্র মাঝে মাঝে করে থাকেন। কিন্তু সমাজের অন্তর্নিহিত গলদগুলো রেখে দিয়ে শুধু আইন করে সুরাপান নিষিদ্ধ করলে, বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। নিষিদ্ধ চোলাইকারী ও অসাধু সরকারী কর্মচারীরাই শুধু এ নিষেধাজ্ঞার ফলে লাভবান হয়। শুকনো মরুভূমি থেকেও ওরা রস সংগ্রহ করতে ওস্তাদ। অনেক দেশে সুরাপান রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ। সে সব দেশে সুরাসক্তি দূর করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া, সুরাপায়ীরা সরকারী অন্তঃশুল্ক (এক্সাইজ) ভাণ্ডার পূর্ণ করতে সাহায্য করে। সরকারী প্রচেষ্টা তাই আন্তরিক না হওয়াই স্বাভাবিক।

সুরাসক্তির কারণ হিসেবে আমি দুরো-সত্তের মানসিক বিশৃংখলা ও দুর্বলতাকে প্রাধান্য দিয়েছি। অন্য কারণেও যে সুরা-সক্তি ঘটতে না পারে, এমন নয়। সঙ্গদোষে ব্যক্তি সুরাসক্ত হয়ে পড়তে পারে। অসামাজিকতার ফলেও অনেকে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে সুরা পান খানিকটা 'প্রেস্টিজ ও স্ট্যাটাস' বাড়াতে সাহায্য করে। সেই কারণে হয়তো সুরাপায়ীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। নিওলিট ও নিওরিচদের পানাধিক্যের একটা কারণ নিশ্চয়ই 'প্রেস্টিজ' বাড়ানোর চেষ্টা। কিন্তু স্কুল কলেজের অপ্রাপ্তবয়স্কের পানাসক্তি বৃদ্ধির কারণ খুঁজতে হলে আমাদের আরো গভীরে যেতে হবে। ভেঙে পড়া সমাজব্যবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা ও অনিশ্চয়তা, সর্বস্তরে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ, মূল্যবোধের অবলুপ্তি; ইত্যাদি নানা-দিকের বিচারবিশ্লেষণ ছাড়া ক্রমবর্ধমান সুরাসক্তির কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে সব কারণে ডেলিনকুয়েন্সি বাড়তির মুখে, সেই সব কারণেই, মনে হয়, সুরাসক্তিও বেড়ে চলেছে। আধুনিক গল্প-উপন্যাসে হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার ছবি যেভাবে চিত্রিত হচ্ছে, তাতেও তরুণ মন খানিকটা প্রভাবিত হচ্ছে। থিয়েটার সিনেমায় মদ্যপায়ী দুর্বৃত্তকে হিরো দেখলে মদ্যপানের প্রতি কিশোরমানস আকৃষ্ট হবে, এটাই স্বাভাবিক।

সুরা ও নারী নিয়ে অনেক কাব্য-কাহিনী রচিত হয়েছে। রোম্যান্টিক ভাব-বিলাসী ও বাস্তবধর্মী; দু ধরনেরই। এ থেকে কল্পনাশ্রয়ী অনেকে সুরাকে প্রেম-চর্চা ও নারীসঙ্গসুখের একটা অত্যাবশ্যক উপাদান মনে করে থাকেন। আবার বাগান-বাড়ী ও নিষিদ্ধ পল্লীর স্ফূর্তির সঙ্গে মদ্যপান একটা আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান

হিসেবে পরিগণিত। তবে সুরা কি অ্যাফ্রোডিজিয়াক? সুরাপানে যৌনশক্তি বাড়ে কি? আমাদের কাছে অনেকে এই প্রশ্ন তুলেছেন। এ সম্বন্ধে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে সুরা অ্যাফ্রোডিজিয়াক নয়। যৌনশক্তিবর্ধক টনিক হিসেবে সুরাপান একটা মারাত্মক ভুল। বিচারবিবেচনা, নীতিবোধ, সৌন্দর্যবোধকে স্তিমিত করে অ্যালকোহল মানুষকে অস্বাভাবিক অবৈধ যৌন সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করতে পারে, জৈবলালসাকে (উচ্চমস্তিষ্ককে নিস্তেজিত করে) সাময়িকভাবে উত্তেজিত করে প্রেমসম্পর্কহীন যৌনসম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করতে পারে; কিন্তু উপভোগের ক্ষমতা বাড়ানো দূরের কথা নিয়মিত সুরাপানের ফলে ক্রমশ উপভোগ ক্ষমতা হ্রাস পেতে পেতে একেবারে লুপ্ত হবার সম্ভাবনাই অধিক। অ্যালকোহলিকের যৌনক্ষমতা কমে যাবার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার মনে যৌন ভিত্তিক 'ডিলিউশন অফ জেলাসি', অস্বাভাবিক অসুস্থ ঈর্ষার প্রকাশ দেখা যায়। প্রেমিকা বা স্ত্রীকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করে। তার সুরাপান সম্পর্কে যে-কোনো সমালোচনাকে সে পরপুরুষের প্রতি আসক্তির প্রমাণ বলে ধরে নেয়। একজন ডাক্তারের রিপোর্টে পড়েছি যে এক সুরাসক্ত তার ৬০ বছরের স্ত্রীকে পাশের ফ্ল্যাটের এক কুড়ি বছরের ছেলের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত সন্দেহ করে পুলিশের কাছে গিয়ে নালিশ জানিয়েছিল। অন্য একজন মদ্যপায়ী তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে মায়ের সঙ্গে অবৈধ মিলনের অপরাধে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিল। কয়েক বছর আগে আমার পরিচিত একজন মদ্যপায়ী অনুরূপ সন্দেহ করে স্ত্রীকে মারধোর করে, বাড়ী ছেড়ে এক হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সুরা কোনো শক্তিকেই বাড়ায় না। পশুপ্রবৃত্তিকে তীব্র করে তোলে, মানুষকে অমানুষ করে।

সুরাপান মানুষকে সোশ্যাল বা সামাজিক করে তোলে; এই রকম একটা ধারণা খুবই চালু। সুরাকে একটা 'কমুনিকেশন মিডিয়াম' মনে করার কারণ কি? সত্যিই কি সুরাপানে ব্যক্তি বেশী সামাজিক হয়? আধুনিক নগর-সভ্যতায় অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার সুযোগ কম। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থেকেও আমরা অপরিচিত। একই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছি দুবেলা, পরস্পরের মুখ চিনি কিন্তু পরিচয় জানি না। দোকানে বাজারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই জিনিষ একই দরে কিনি, কিন্তু পরস্পরের সংগে আলাপ করি না। কিছু ক্লাব, জিমন্যাসিয়ামে আমরা খুব কাছাকাছি আসি, পরিচিত হই, মুখ খুলি, কিন্তু মন খুলি না। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, পুকুরপাড়ে, নদীর ঘাটে, যে আন্তরিকতার বন্ধনে আগেকার মানুষ বাঁধা থাকতো, আজকের নগরবাসী মানুষের সেই সহজস্ফূর্তির বাঁধনে বাঁধা পড়বার সুযোগ-সুবিধা নেই। মানুষের কাছে এই ভাববিনিময় স্পৃহার গুরুত্ব অপরিসীম। অফিসে, আদালতে সহকর্মীদের সংগে আন্তরিক ভাববিনিময়ের সুযোগ মিললেও, সেখানেও আমরা সহজভাবে মন খুলতে পারি না। আমাদের নাগরিক ভদ্রতার মুখোশ খুলে অন্তরের কথা বলতে পারি না। সব সময়েই আমরা হয়ে থাকি চাপা উত্তেজনায় পীড়িত, নিজের মধ্যে গোটানো সংকুচিত। আমার কথা ও শুনবে কেন? মনে মনে হয়তো হাসবে। এই সব ভেবে আমরা কর্মস্থানে সহকর্মীদের কাছেও নিজেদের ঠিক মতো 'কমুনিকেট' করতে পারি না। কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিকের মতে এই 'টেনসন' দূর করার, এই বিচ্ছিন্নতা নিরসনের একমাত্র জায়গা ভাটিখানা। সুরাপানে 'টেনসন' কাটে, রিলাক্সেশন আসে, সহজ হই, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি, বিচ্ছিন্নতার ঘটে নিরসন। পরিচিতের কাছে প্রগলভ হই, অপরিচিতকে অনায়াসে নিজের টেবিলে ডেকে আনি। অনেক জমানো কথা বলে নিজেকে হাল্কা করি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, কথাটা বোধ হয় সত্যি। আমরা অনেক জমানো কথা বলে নিজেকে হাল্কা করি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, কথাটা বোধ হয় সত্যি। আমরা নিঃসঙ্গতাবোধে অল্পবিস্তর পীড়িত সকলেই। বিচ্ছিন্নতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা বুঝি ভাটিখানায় এলে কাটিয়ে তুলতে পারা যায়। কিন্তু ভাটিখানায় সমবেত সুরাপায়ীদের আলাপ-আলোচনা কিছুক্ষণ মন দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে যে তারা ভাববিনিময় করছে না, কমুনিকেশন ঘটছে না। প্রত্যেকে নিজের কথা বলে চলেছে, অন্যের কথা শুনছে না। জমানো কথা বলে হাল্কা হচ্ছে, কিন্তু বুকের ভার কমছে না। কেউই কারু হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা দিতে পারছে না। নিজেকে জাহির করছে। কিন্তু প্রকাশ করছে না। পুর্ণ নিস্তেজনা নেমে আসার আগে বাড়ী ফিরে অ্যাসপিরিন খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করবে, সকালে উঠে হয় একটা ছোট পেগ, কিম্বা এ্যামফিটামিন খেয়ে দৈনন্দিন কর্মসূচীর সংগে নিজেকে যুক্ত করার চেষ্টা করবে, আবার অনেক আশা নিয়ে সন্ধ্যার আস্তানায় ফিরে আসবে। সে আশা এদের কোনোদিন মিটবে না।

এবার চিকিৎসা সম্বন্ধে সামান্য দুটো-একটা কথা বলে সুরা-পর্ব শেষ করছি। চিকিৎসার দুটি অঙ্গ; একটির উদ্দেশ্য আরোগ্য, অন্যটির প্রতিরোধ। ভিটামিন, টনিক, পথ্য, ওষুধ এসব নিশ্চয়ই দরকারী। কিন্তু সাইকোথেরাপী সুরাশক্তির চিকিৎসায় অপরিহার্য। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বোধ হয় সাইকোথেরাপির। সাইকোথেরাপির উদ্দেশ্য সুরাপায়ীর মনোবিকারের কারণ নির্ণয়, ও সেই কারণ দূরে করা; তার ব্যক্তিত্বকে সংগঠিত করা, তার ইচ্ছাশক্তিকে জোরালো করা ও তার মধ্যে অ্যালকোহল সম্পর্কে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করা। কথাবার্তা, জাগ্রত ও সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবন, অন্যান্য রোগীর সংগে গ্রুপথেরাপী; ইত্যাদি নানাধরনের চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের রোগীর পক্ষে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা উপযোগী ও কার্যকরী। এছাড়া, সংগে সংগে চলে শিক্ষামূলক উপদেশ। অ্যালকোহল সম্পর্কিত [illegible] অলীক ধারণা দূর করা ও অ্যালকোহলের যে শরীর বা মনের উপর ক্ষতিকারক প্রভাবগুলিকে রোগীর সামনে তুলে ধরা এই চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য।

সুরাপান ছাড়ার ফলে আনুষঙ্গিক যে সব উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে; যথা উদ্বেগ, বিষাদ, নিদ্রাহীনতা; সেগুলোর চিকিৎসার জন্যে উপযুক্ত ওষুধ দেওয়া হয়।

কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স চিকিৎসা আজকাল অনেক হাসপাতালে ও ক্লিনিকে চালু হয়েছে। এর ফলে অ্যালকোহল পেটে পড়লেই রোগীর বমনোদ্রেক হবে ও সত্যিই বমি করে অ্যালকোহল পেট থেকে বের করে দেবে। বমনোদ্রেককারী কোনো ওষুধ ইনজেকশন করে রোগীকে অ্যালকোহলের গন্ধ শোঁকানো হয়, সঙ্গে সঙ্গে বলা হয় যে অ্যালকোহল আর তার সহ্য হবে না, খেলেই বমি হবে। ওষুধের ক্রিয়া সুরু হবার পূর্বমুহূর্তে রোগীকে সুরাপান করতে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, সুরা রক্তে মেশবার আগেই বমির সংগে বেরিয়ে যায়। এইভাবে ২০।২৫ দিন ধরে চিকিৎসা চলার ফলে অ্যালকোহল বমনোদ্রেককারী উদ্দীপকে পরিণত হয়ে রোগীর পক্ষে আর সুরাপান সম্ভব হয় না। এরপরও মাসে অন্তত একবার ইনজেকশন ও অ্যালকোহল একসঙ্গে দিয়ে রিফ্লেক্সকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা হয়। বছরখানেক চলার পর আর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

আজকাল সংবেদনশীল রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে (অ্যানটা অ্যাবিউস, অ্যান্টএথিল) সুরাসক্তির চিকিৎসা চলেছে। ফলও পাওয়া যাচ্ছে। এই কেমিক্যাল অ্যালকোহলের বিপাকক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে শরীরের উপর বিষম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দেহের মধ্যে অ্যাসিটালডিহাইড জমে এবং তার ফলে সুরাপায়ীর শারীরিক ক্লেশ অসহ্য হয়ে ওঠে। এ সত্ত্বেও যদি অ্যালকোহল সেবন করতে থাকে, তাহলে বমি হয়, শ্বাসকষ্ট হয়, এবং শেষ পর্যন্ত সুরাপানের ফলে তার ক্রিয়াশক্তি লোপ পায়। সোজা কথায়, অ্যালকোহল আর কিছুতেই সহ্য হয় না। কাজেই সে সুরাপান বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

শেষোক্ত চিকিৎসা ছাড়া আর সব রকম চিকিৎসাই রোগীকে হাসপাতালে আটকে রেখে করা দরকার। শেষোক্ত চিকিৎসা আউটডোর থেকে চলতে পারে। তবে সবরকম চিকিৎসাতেই রোগীর সহযোগিতা দরকার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পর্বত মহম্মদের কাছে আসছে না আর মহম্মদকেও পর্বতের কাছে আনা যাচ্ছে না।

—মনোবিদ

(৩৭)

জানালা খোলা। কামরাঙ্গা গাছের অন্ধকারে কিছু জোনাকি জ্বলছে। বেতঝোপ পার হলে মাঠ। মাঠে আশ্চর্য সাদা জ্যোৎস্না। বড়বৌ সেই সাদা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়েছিল, না ঘরের আয়নায় নিজের মুখ দেখছিল বোঝা যাচ্ছে না। গলায় চন্দ্রহার পরেছে বড়বৌ। নীল রঙের বেনারসি পরেছে। হাতে চুড়। চোখে বড় করে কাজল টেনেছে। মুখে স্নিগ্ধ প্রসাধন। মানুষটা যদি আসে, এই আশায় দরজা খোলা রেখে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সকালে এ-বাড়িতে কিছুটা উৎসবের মতো ঘটনা ঘটেছে। কারণ ভূপেন্দ্রনাথ দুজন মানুষ নিয়ে এসেছিল। ওরা সন্ন্যাসী মানুষ। ওরা এ-বাড়িতে সারা রাত ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। এবং পাগল মানুষকে নিরাময় করার জন্য অপার্থিব সব ঘটনা ঘটিয়ে বাড়ির মানুষদের তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল। ওদের ভোজনের নিমিত্ত নানাবিধ পায়েস হয়েছে। বড়বৌ সারাদিন খেটে স্বামীর শুভ কামনায় রাত হলে নিজের ঘরে চলে এসেছে। তিনি এখনও আসছেন না। এলেই দরজা বন্ধ করে দেবে বড়বৌ। শীতকালটা অন্যবার বেশ শান্ত থাকেন। এবারে তাও না। আজকাল রাত হলে বড়বৌ নানাভাবে সাজতে থাকে। যে যে চেহারায় ওকে বিদেশিনী মনে হতে পারে সে তা তা করার চেষ্টা করে। কখনও কখনও বড়বৌ একেবারে অন্য জগতের ভিতর ডুবে যায়। সে যেন তার স্বামীকে নিয়ে পুতুল খেলাতে বসে। সেই ছোট্ট বয়সের মুখ চোখ তার চারপাশে খেলা করতে থাকে তখন। খেলা করতে করতে কবে সে প্রথম এ-মানুষের সঙ্গে সহবাসের আনন্দ পেয়েছে এখন ভাবছিল। বোধহয় সেটা এক বসন্তকালই হবে, এবং বোধহয় আকাশে সেদিন আশ্চর্য সাদা জ্যোৎস্না ছিল।

কেন জানি বড়বৌর, আজ ঠিক সেই দিনটি এমন তার মনে হল। সে জানে এখনও মানুষটা দক্ষিণের বারান্দায় বসে রয়েছে। না ডাকলে বোধহয় আসবে না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল বারান্দায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। তবু ভারি লজ্জা করছে এই সাজে উঠোনে নেমে যেতে। প্রায় অভিসারে যাবার মতো। সে গেলেই তিনি উঠে পড়বেন। তাঁর মনে হবে তখন বড়বৌ তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছে জানালায়। এ-সব ভাবতে বড় ভাল লাগে। সে নেমে যাবে কিনা ভাবছিল, তখন দেখল তিনি হেঁটে এদিকে আসছেন। তাড়াতাড়ি বড়বৌ জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মানুষটার জন্য যে তার প্রতীক্ষা, তিনি না এলে যে বড়বৌর অভিমানে চোখে ঘুম আসে না এমন বুঝতে দিতে চাইল না। সে শক্ত হয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকল।

মানুষটা এসেই আজ কেমন পাগলের মতো বড়বৌকে জড়িয়ে ধরল। দরজা খোলা। কেউ দেখে ফেলতে পারে। দরজা বন্ধ করে দিলে ভাল হত। কিন্তু এমন যে আবেশ মানুষটার যদি তা হারিয়ে যায়, দরজা বন্ধ করতে গেলে। তিনি যদি রাগ করেন, অথবা পাগলের মতো চোখ মুখ আলগা করে রাখেন তবে এ-রাতের নিঃসঙ্গতা ভয়াবহ হয়ে উঠবে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। সে এমন কি মুখ ঘুরিয়ে মানুষটাকে দেখল না। ওর ঘুম চলে আসছে। মানুষটা এখন নীল রঙের এমন সুন্দর শাড়িটা টেনে খুলে ফেলল। ফের হুঁস হল বড়বৌর। দরজা খোলা। তবু সে দরজা বন্ধ করতে ছুটে গেল না। মানুষটা এখন যা খুশী করুক। অন্যদিন এই মানুষই দরজা বন্ধ করলে ক্ষেপে যায়। হঠাৎ হ্যাঁৎ টেবিল ঠেলে ফেলে দেয়। খাম ধরে ধরে ঝাকাতে থাকে। কখনও কখনও টেবিলে ঘুসি মেরে সব কাচের বাসন ঠেলে ফেলে দেয়। তারপর এক প্রলয়-নাচন নাচতে আরম্ভ করলেই বড়বৌ ডাকে, ঠাকুরপো, ওঃ ছোট ঠাকুরপো দেখুন এসে কি আবার আরম্ভ করছে! সঙ্গে সঙ্গে ভীতু মানুষের মতো মণীন্দ্রনাথ খাটের উপর উঠে লেপের ভিতর ঢুকে যায়। যেন কিছুই সে করেনি। সে বড় ভাল ছেলে। আজ সেই মানুষ কি যে করছে তাকে নিয়ে। বসন ভূষণ খুলে ফেলছে। আবেশে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। প্রায় যেন স্বপ্নের মতো ঘটনা। এমন ভালবাসা সে কতদিন চেয়ে চেয়ে তবে পেয়েছে। ভিতরে ভিতরে বড়বৌ অস্থির হয়ে পড়ছিল। দুহাতে যা খুশী করুক এমন ইচ্ছাতে বড়বৌ শরীর খাটে বিছিয়ে দিল। নরম শরীর, স্তন এবং কোমল হাত এবং কোথায় যেন প্রপাতের মতো জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে, সে ঠেলে সেই মানুষকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু মানুষটা যেন প্রপাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না—কি যে করণীয় এই শরীর নিয়ে বুঝতে পারছে না যেন। বড়বৌ মানুষটাকে এবার জোরে চুমু খেল। এবং পাগলের মতো অস্থির হয়ে পড়তেই মণীন্দ্রনাথ একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেলেন। মণীন্দ্রনাথ খাট থেকে নেমে জানালায় এসে দাঁড়ালেন।

বড়বৌ বলল, এই শোন। আমি আর এমন করব না।

মণীন্দ্রনাথ শান্ত শরীরে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

—আমি কিছু করব না বলছি। এস আমার পাশে শোবে।

মণীন্দ্রনাথ সাদা জ্যোৎস্না দেখছেন এখন।

—তুমি আমার পাশে শুধু শোবে। বলে হাতটা নিয়ে বুকের ভিতর খেলা করতে থাকল।

দরজা খোলা। সে দরজা বন্ধ করে দিল এবার। এবং জানালার পাশে এসে দাঁড়াল।

ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। একটা পাখি ডাকছিল। তারপর একসঙ্গে অনেকগুলি পাখি ডেকে উঠল। ভিতরে বড় কষ্ট বড়বৌর। মানুষটা এমন পাহাড় বেয়ে ছুটতে পারে আবেগে ডুবে যেতে পারে—তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। সে যেন স্বপ্ন দেখে উঠে এসেছে। সব বৃথা। কারণ কতভাবে—বড়বৌ যে চেষ্টা করছে, এই এই দ্যাখো আমার শরীর, এই দ্যাখো নীল শিরা উপশিরায় কি প্রসন্ন আলো খেলা করে বেড়াচ্ছে। তুমি একটু ছুঁয়ে দ্যাখো, মনে হবে তোমার, দীর্ঘদিন তুমি বনবাসে ছিলে। দ্যাখো এই চোখ, মুখ। তুমি আমার কপালে হাত রাখো। আমি তো তোমার কাছে কিছু চাইনি। কিছু চাইনি! কেবল তুমি যদি একবার আমাকে অপলক দেখতে। আমার মনে হয় তবে তুমি এমন-ভাবে গ্রামে মাঠে ঘুরে বেড়াতে না। আমাকে আর একবার জড়িয়ে ধর না গো। আমি কিছু করব না। সত্যি বলছি। তিন সত্যি।

মানুষটা বড়বৌকে কিছুতেই আর স্পর্শ করল না। চোখ দেখলেই টের পাওয়া যায় মানুষটা আর রক্তমাংসের পৃথিবীতে নেই। ফোর্টের গম্বুজে সে জালালি কবুতর উড়ছে দেখতে পাচ্ছে।

বড়বৌ ডাকল, শুনছ!

সে কিছুই শুনছে না। নদীর জলে সে শুনতে পাচ্ছে ঝম ঝম শব্দ। জাহাজের প্রপেলার ঘুরছে। কিছু অপরিচিত পাখি মাস্তুলে। রেলিঙে সেই সোনার হরিণ দাঁড়িয়ে। হাত দিলেই যে দূরে হারিয়ে যায়। কাছে যা কিছুতেই পাওয়া যায় না। পলিন রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বড়বৌ বলল, আমি সত্যি বলছি কিছু করব না। তোমার যা খুশী যেমনভাবে খুশী আমাকে নাও।

বড়বৌ বড় অবুঝ হয়ে গেছে। চোখ দেখলেই সব টের পাওয়া যায়। সে কেন যে এমন করছে তবু সে কেন বুঝতে পারছে না মানুষটা আর মানুষ নেই। মানুষটার ভিতর নদীর নীল জল খেলা করে বেড়াচ্ছে।

বড়বৌ এবার হাত ধরে খাটে নিয়ে যেতে চাইল তাকে। সে গেল না। সে জানালার একটা পাট বন্ধ করে দিল। তারপর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। নিজের বসন ভূষণ সব আলগা করে ছুঁড়ে ফেলল খাটে। শেষে কি দেখল বড়বৌর মুখে। মুখ দেখে হাসল। দুষ্টু বালকের মতো হাসিতে মুখ ভরে গেল। যেন বলল, এস আমরা সাদা জ্যোৎস্নায় হেঁটে হেঁটে নদীর চরে চলে যাই। কেউ দেখবে না। আমরা চুপি চুপি সেখানে দুজনে পালিয়ে বসে থাকব। আকাশের নিচে সাদা জ্যোৎস্নায় দুজনে বসে থাকতে কি যে ভাল লাগবে না!

বড়বৌ কিছু বুঝতে পারল না। কেন এমন সরল বালকের মতো তিনি হাসছেন। সে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তিনি তখনও হাসছেন। হাসতে হাসতে দরজা খুলে ফেলছেন। বড়বৌ তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিল। মানুষটা উঠোনে নেমে যাচ্ছে। কি হবে এখন! বড়বৌ তাড়াতাড়ি সেই বেনারসি শাড়িটাকে কোনরকমে শরীরে জড়িয়ে নিল। পাগল মানুষের কাপড়টা খাট থেকে তুলে নিল। এই মানুষ এমন এক অবয়বে বের হয়ে গেলে কবে ফের ঘরে উঠে আসবে কে জানে! লজ্জায় যেন তার মাথা কাটা যাবে। অন্তত কাপড়টা পরিয়ে দিতে পারলে মানুষটাকে আর পাগল মানুষ মনে হবে না। নিরীহ মানুষ, অবলা জীবের মতো তার চোখ তখন। গ্রামের পর মাঠ, মাঠে মাঠে তিনি এক সন্ত পুরুষের মতো হেঁটে যাবেন।

বড়বৌ উঠোনে নেমে দেখল ধীরে ধীরে বাঁশতলা দিয়ে তিনি নেমে যাচ্ছেন। সে শেকল তুলে দিয়েছিল ঘরের। চারপাশে তাকাল। কোন ঘরে আলো জ্বলছে না। কোন সাড়া শব্দ নেই। একবার ভাবল শচীন্দ্রনাথকে ডাকে, উঠে দেখুন, কিভাবে বের হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু নিজের প্রসাধনের কথা ভেবে ডাকতে সংকোচ বোধ করল। বরং সে গিয়ে সামনে দাঁড়ালে, দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়ালে আর তিনি নড়তে পারবেন না।

কুয়োতলায় এসে দেখল মণীন্দ্রনাথ দ্রুত মাঠে নেমে হাঁটছেন। সেও মাঠে নেমে এল। স্বামী তার এমন বেশে গ্রাম মাঠ ঘুরে বেড়াবে ভাবতেই কান্না পাচ্ছে। সে, যে করে হোক কাপড়টা পরিয়ে দেবে। তারপর যেমন খুশি, যেদিকে খুশি তিনি চলে যাবেন। সেও মাঠের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকল!

বসন্তের মাঠ। ফসল নেই। শুধু কিছু জমিতে পেঁয়াজ রসুনের গাছ, লঙ্কা গাছ। চারপাশে জমির বেড়া। মাঠে নেমেই মনে হল মানুষটা কোথাও যেন তার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে কেবল ছুটে নাগাল পাচ্ছে না। সে দেখল তখন তিনি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। বড়বৌকে মাঠে নেমে আসতে দেখে বুঝি সামান্য বিস্মিত হয়েছেন। তিনি [illegible] না। বড়বৌ জমির উপর দিয়ে [illegible] ছুটে আর পারছে না। [illegible] কাছে গিয়ে সে কথা বলতে পারছে না। তুমি এ-ভাবে বের হয়ে গেলে লোকে কি বলবে! এসব বলতে গিয়ে গলায় আটকে যাচ্ছে।—লক্ষ্মী কাপড়টা পরে নাও। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না। এমনও বলার ইচ্ছা। কাপড়টা বড়বৌ পরিয়ে দেবে, পরিয়ে দিলেই সোনার হরিণের খোঁজে অথবা নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজতে বের হয়ে যাবেন। এমন এক সুদৃশ্য শরীরে টান টান হয়ে দাঁড়ালে, বড়বৌর আর ভয় থাকবে না। ভাবল, কাপড়টা পরিয়ে দিয়েই বলবে, হাঁগো আমাকে বাড়ি দিয়ে আসবে না। একা আমি যাব কি করে!

সে কি ভাবল আর কি হয়ে গেল! হতভম্ব সে। ভেবেছিল কাপড় পরিয়ে দিলেই মানুষটা অকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। তাকে এত বড় মাঠে একা ফেলে যাবেন না। কিন্তু মানুষটার চেহারা অন্যরকম। বড় বেশি হাসি হাসি মুখ। তিনি এক টানে বড়বৌর কাপড় খুলে ফেলেছেন। খুলে ফেলেই একেবারে বালক। বালকের মতো সাদা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে হা হা করে হাসছেন। কুয়াশার ভিতর মাঝে মাঝে মুখ তাঁর অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সাদা জ্যোৎস্নায় একটু একটু কুয়াশায় এক রহস্যজনক ভাব তাঁর মুখে। বগলে কাপড় নিয়ে চিরদিনের তীর্থযাত্রীর মতো তার যেন ভ্রূক্ষেপহীন যাত্রা। বড়বৌকে এমন ভীষণ আড়ষ্ট করে দিল। কিছু সে বলতে পারল না। খেলাচ্ছলে তিনি যেন এমন সব করছেন। দূরে দূরে সব বন মাঠ, সাদা জ্যোৎস্না এবং হালকা কুয়াশা দেখে তিনি বড়বৌকে নিয়ে স্থির থাকতে পারছেন না। কেবল ছোটার ইচ্ছা হচ্ছে তাঁর। কোথাও সেই যে তিনি একটা নীল বর্ণের লতা নিয়ে এসে-ছিলেন কলকাতা থেকে, যেখানে ঈশম নদীর চরে একা রাত যাপন করে, এবং এক নীল বর্ণের লতা থেকে কত হাজার নীলবর্ণ লতা ফুল ফল সৃষ্টি হচ্ছে এখন—তেমন জায়গায় তাঁর চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিছু ভাল লাগছে না তাঁর। তিনি যখন কলকাতা থেকে শেষবারের মতো ফিরে এলেন, সঙ্গে সব নানারকমের গাছ ছিল তার। এখন আর মনে করতে পারছেন না কি গাছ সে সব। কি লতা সে সব। কেবল মনে পড়ছে, একটা নীলবর্ণের লতা ছিল। সবাই সেটা ফেলে এসেছিল গয়না নৌকায়। কেবল ঈশম তুলে এনে চরের জমিতে লাগিয়ে দিয়েছিল। যখন কিছু ভাল লাগত না, তিনি তখন নদীর চরে নেমে লতার গোড়ায় সারা বিকেল জল ঢালতেন। এই মাঠে নেমে বড়বৌর আড়ষ্ট মুখ চোখ দেখে তাঁর সে সব মনে পড়ছিল।

বড়বৌ ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। সে বলল, দাও লক্ষ্মী। আমার কাপড়টা দাও।

আমরা কোথাও যাব বলে ছুটছি। সংসারে কোথাও যাব বলে বের হলে কিছুতে নেই।

—তুমি কি চাইছ বল। কি পেলে তুমি সুখী হবে বল, সব দিচ্ছি। আমি চলে যাব এ-দেশ ছেড়ে। আমি চলে গেলে সুখী হবে! বল তুমি। তুমি যা বলবে আমি তাই করব!

এ-ভাবে কিছু হয় না। আমরা শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারি না। শুধু হাঁটি। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হই। মনে হয় আমাদের একটা সরাইখানা আছে। একটা অদৃশ্য সরাইখানার পিছনে সবাই আমরা ছুটছি।

—কেউ দেখে ফেললে কি হবে বলত! মান সম্মান কোথায় থাকবে। তোমার বৌ আমি। কেউ দেখে ফেললে কত বড় অসম্মান হবে বলত।

জীবনের নানারকমের খেলা আছে। লাল নীল বল নিয়ে তেমন একটি খেলা। কোনটা যে কি রকমভাবে চোখের উপর [illegible] জানি না। তবু খেলি। মনে হয় খেলার মাঠে জয়-পরাজয় হবে। এবং খেলার মাঠ পার হয়ে এলে একটা সেতু দেখতে পাই। সেতুর উপর একজন ফকির মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। যে বলটা ছিল আমাদের খেলার বস্তু, সেই বলটা ফকির সাহেবের প্রাণ মনে হয়।

—শোন এ-ভাবে তুমি আমাকে পিছু পিছু কতদূরে নিয়ে যাবে। তুমি কি ভেবেছ। আমরা চৌতায় বাগের কাছে চলে

[illegible]। [illegible] কি-বিপদে তুমি আমাকে [illegible]। আমাদের নদী। নদীর চর। [illegible] তরমুজের ক্ষেত। তুমি আমার [illegible] হয়। যাও। [illegible]। তুমি না [illegible] আমি উঁচু করব। কি করে ফিরব! এত বড় মাঠ পার হব কি করে!

মাঠ কেউ পার হতে পারে না বড়বৌ। পার হতে গেলে সবাই শেষ হয়ে পড়ি। তারপর রাতদিন [illegible] হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত বিষণ্ণ। কোথাও কোন জলছত্রের কাছে তারপর নিরিবিলি বসে থাকা। কেউ আমাদের বলে দিতে পারে না কতদূর গেলে এই মাঠ শেষ হবে। শুধু জলছত্রের মানুষটি তোমাকে জলদান করবে আর বলবে, জল খেলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। সামনে যে বন আছে, তার ওপারে একটা কদম ফুলের গাছ পাবে। সেখানে আমার মতো আর একজন মানুষ জলছত্র খুলে বসে রয়েছে। মাঠ পার করে দিতে কেউ পারে না বড়বৌ। আমরা সবাই ইচ্ছা করলে শুধু তেষ্টার সময় জলদান করতে পারি। আর কিছু পারি না।

—তুমি কি কিছু বলবে না। নদীর চরে তোমার কি আছে। তুমি ওদিকে হাঁটছ কেন! আমি তোমার সঙ্গে জোর করে কিছু ফিরে পাব না জানি। আমাকে এ-ভাবে কেউ দেখে ফেললে ঠিক আত্মহত্যা করব বলছি।

এবারে পাগল মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। শাড়িটা বগলতলা থেকে বের করে বড়বৌর হাতে দিলেন। তারপর হাঁটতে থাকলে সহসা কেন জানি বড়বৌর মনে হল, মানুষটার অভিমানে বুক ফেটে যাচ্ছে। এই সাদা জ্যোৎস্নায় তিনি তাকে নিয়ে হয়ত এমনি হাঁটতে চান। এবং কেন জানি ওর মনে হল—আর সে একা ফিরে যেতে পারবে না। এক অত্যাশ্চর্য মায়া এখন এই নিরিবিলি সাদা জ্যোৎস্নায় এবং কুয়াশার ভিতর। বড়বৌ মানুষটার পিছু পিছু হেঁটে গেল। যেখানে নদীর চর, চরের ও-পারে ছইয়ের ভিতর ঈশম ঘুমোচ্ছে। ওরা দুজন চুপচাপ নদীর চরে বসে থাকলে কে টের পাবে। কুয়াশার ভিতর সবই অস্পষ্ট এবং মায়াজালে ঢাকা। বড়বৌ তার পাগল স্বামীকে নিয়ে নির্জনতায় ডুবে গেল। বলল, আমার আর কে আছে। তুমি বাদে আমার আর কি আছে!

ঈশম খক খক করে কাসছিল। কাসির জন্য সে ঘুমোতে পারছে না। খুব বেশি কাসি পেলে সে উঠে তামাক খায়। তার হুঁকা কলকি এবং পাটকাঠির আগুন সব ঠিক ঠাক। এখন রাত ক প্রহর সে টের পাচ্ছে না। ছইয়ের বাইরে এলে সে আকাশে চাঁদের অবস্থান দেখে টের পেত—রাত কটা বাজে। অথবা সে চুপচাপ শুয়ে থাকলে টের পায়—ক প্রহর রাত। প্রথম প্রহরে মুসলমানদের আজানের ঘণ্টা বাজে, হিন্দুদের ঘরে আলো জ্বালা থাকে। যে সব খরগোশ হোগলা পাতার জঙ্গল থেকে বের হয়ে নদীর চরে আসবে বলে, তরমুজের পাতা ওদের বড় প্রিয়, তারা প্রথম প্রহর শেষে জমির আলে এসে পড়লে টের পায় ঈশম, ওরা আসছে। সে কান পেতে রাখলে টের পায়—ওরা খরগোশ না সজারু। সে এখন শুয়ে কাসছে বলে টের করতে পারছে না, সজারু কি খরগোশ, খাটাশ না শেয়াল কারা এসে আলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাত গভীর হলেই ওরা চুপি চুপি ঢুকে পড়বে জমিতে ঈশম ওদের তাড়ানোর জন্য টিনের ডংকা বাজায়। প্রহর শেষ হলেই সে ডংকা বাজায়। আর তখন যত এইসব খরগোশ, খাটাশ অথবা শিয়াল সজারু সব ছুটতে শুরু করে নদীর দিকে।

তখন ওর মনে হয় কে যেন হাঁকছে নদীর চরে—কে জাগে?

—আমি আল্লার বান্দা ঈশম জাগি। সে খালি মাঠে চিৎকার করে বলে।

এই নদীর চর সাদা জ্যোৎস্না, বড় বড় তরমুজ এবং নদীর জল তার কাছে তখন এক বেহেস্তের সামিল। সে হাতে তালি বাজায়। চুপচাপ এই নিশীথে ধরণী কি শান্ত। কেবল সব নিশীথের জীবেরা আহারের অন্বেষণে বের হয়েছে। সে টের পাচ্ছে না তারা কতদূর এসে গেছে। সে উঠে বসল। তামুক না খেলে তার কাসি কমবে না। সে ছইয়ের বাতা থেকে কলকি টেনে নিল। একটু তামাক ভরে খড়কুটো জেলে সামান্য আগুন নিল কলকিতে। ওর কাসতে কাসতে দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে যেমন অন্যদিন তরমুজের জমিতে একা নিশীথে দাঁড়িয়ে তামুক খায়, পাখপাখালি অথবা বন্য জীব তাড়ায় তামুক খেতে খেতে, আজ তা পারছে না। কাসিটা ওকে বড় বেশি জব্দ করে ফেলেছে। সে তামুক খেতে খেতে টিনের ডংকা বাজাল। ছইয়ের বাইরে কি সাদা জ্যোৎস্না। কালো কালো ঐ পাখির ডিম! চুপচাপ সেই ডিমের উপর বসে থাকা, তামুক খাওয়া, নদীর জল যে কল কল করে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে সে সব শব্দ শোনা বড় মনোরম। আর আকাশের অজস্র নক্ষত্র দেখতে দেখতে ঈশম যে বার বার কতবার এই জমিতে রাত কাবার করে দিয়েছে, একফোঁটা ঘুমায় না, এখন ঈশমকে দেখলে তা বোঝা যাবে না। আজ ঈশম এমন সাদা জ্যোৎস্না দেখেও ছইয়ের বাইরে হামাগুড়ি দিয়ে বের হল না। সামান্য কুয়াশা নদীর পাড়ে পাড়ে। এই কুয়াশার ভিতর সে অস্পষ্ট এক ছবি দেখে চমকে উঠল।

সে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবে ভাবল। ওরা কারা এল! ওরা তরমুজ খেতে এমন গভীর রাতে [illegible] আসতে পারে। তরমুজ চুরি [illegible], কুমের চাষ, চন্দন [illegible]। সে দেখতেই টের পায়, মানুষেরা তরমুজ চুরি করতে এসেছে। কিন্তু সে যে দেখছে, তরমুজের উপর ওরা নিবিষ্ট মনে বসে রয়েছে। দুজন দুমুখে। একজন পূবে [illegible] পশ্চিমে। ওরা যেন একটা তরমুজের উপর বসে পূব পশ্চিম দেখছে। এবং ওরা যে একেবারে শরীর নাঙ্গা করে রেখেছে—এই মন্দা কুয়াশার ভিতরও যেন তা স্পষ্ট। কুয়াশা প্রবল নয়। হালকা। জমির উপর নদীর পাড়ে কুয়াশা একটা পাতলা সিল্কের মতো বিছিয়ে আছে। সবুজ সব তরমুজের পাতায় শিশির জমছে। আর দুই মানুষ, মনে হল একজন স্ত্রীলোক হবে, তা হউক, সংসারে কত জীব ঘুরে বেড়ায়, ওরা নিশীথে এই পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসে, ওদের যা কিছু আকাঙ্ক্ষা, অথবা বলা যায়, এমন নদীর পাড়ে তরমুজ খেতে নিশীথে নেমে আসতে না পারলে তাদের আত্মা বড় কষ্ট পায়।

তা তোমরা নেমে এসেছ জীবেরা, আত্মা তোমাদের কান্নাকাটি করছে, এই জমিতে সাদা জ্যোৎস্নায় বেড়াবার শখ তোমাদের, বেড়াও। আমি ঈশম আল্লার বান্দা চক্ষু বুইজা থাকি। দ্যাখি না কিছু। তোমাদের লীলাখেলা দেখতে নাই। সে এই ভেবে আর বের হল না ছইয়ের ভিতর থেকে। এমন মায়া এই গাছপালা পাখির, কেউ যেন তা ফেলে চলে যেতে চায় না। গেলেও আবার ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা। এবং তারা নিশীথে নেমে আসে।

ওর মনে হল সেও এই জমিতে আবার একদিন নেমে আসবে। তখন সে থাকবে না। তার আত্মা বিমর্ষ হবে কি হবে না সে তা জানে না। যা সে নিজ হাতে তৈরি করেছে, এই মাটি, মাটির প্রতিটি খণ্ড অংশ, সে যেন মাটি হাতে নিলেই বলতে পারে চাষের সময় কত বাকি, কোন লতা এবারে জমিতে লাগালে বড় বড় তরমুজ হবে, সে তখন তার বড় বড় তরমুজ দেখতে নেমে আসবে। ঠিক মতো চাষাবাদ হচ্ছে কিনা, মরে গেলেও সে না এসে না দেখে থাকতে পারবে না।

অথবা তার মনে হল সংসারে কিছুই বিনষ্ট হয় না। কারণ যারা এই মাটিতে জন্মেছে, মরেছে এবং যারা এখন আকাশে বাতাসে [illegible] করছে তারা এমন সুন্দর এক জগৎ ফেলে স্থির থাকতে পারেনি মানুষের অবয়বে এই তরমুজ খেতে নেমে এসেছে।

এবং এও সে ভেবেছে, দুই জেলাল্ডা, অথবা জীন পরি খোয়াজেলা করছে এই জমিতে। সে ছইয়ের বাইরে বৈঠা হয়ে ওদের এমন লীলাখেলায় বাধার সৃষ্টি করল না। এমন কি সে যে কাশছিল, তাও দম বন্ধ করে থামিয়ে রাখছে। ধীরে ধীরে তামাক টানছে। তামাক টানলেই দুকোটা হালকা লাগে। কাশি কমে যায়। সে কাশি কমাবার জন্য তামাক খাচ্ছিল, আর দূরে জেলাল্ডার লীলাখেলা দেখছে। ঈশম নিশীথের মানুষ। দিনে তার ঘুম যাবার অভ্যাস। সে সেই যে যৌবনে গয়না নৌকার মাঝি ছিল, তার মনে আছে, সে রাতে রাতে গয়না নৌকা চালাত। ওর গয়না নৌকা, বারদি, কাওসার খালে খালে পরাপরদির নদীতে পড়ত। তারপর মহজমপুর হয়ে, আলি-পুরার বাজার পার হয়ে মাঝের চর এবং পরে নাঙ্গলবন্দ, শেষে সকাল হতে না হতে নারানগঞ্জের ইস্টিমার ঘাটে নৌকা লাগিয়ে বসে থাকা। আবার সাঁজ নামলে মানুষ নিয়ে ফিরে আসা ঈশমের। সেই নিশীথের যাত্রা সুগম ছিল না। নানা জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন কিংবদন্তি, ফাঁসির মানুষ ঝোলে কোথাও, পেঁচার আর্তনাদ বড় নিম গাছটায় রাতে কি যে ভয়াবহ লাগে, একবার সে কাওসার বিলে বড় শিমুল গাছের মাথায় আগুন জ্বলতে দেখে পথ হারিয়ে ফেলেছিল—এই সবই এখন ঈশমকে নানা-ভাবে ভাবাচ্ছে। এই যে সে শিশু বয়স থেকে মাটির কাছাকাছি বড় হচ্ছে, সে পাইক খেলত, সামসুদ্দিনের বাপ ছিল তার সাকরেদ, ঠাকুরবাড়িতে তখন দুগগাঠাকুর আসত শরৎকালে। সামসুদ্দিনের হাত ধরে ওর বাপ আসত অষ্টমীর দিনে, আর পাইক খেলা, ছোট লাঠি হাতে ঈশম বুকের শক্ত পেশী তুলে দাঁড়ালে, গ্রামের সব মানুষ ভেঙে পড়ত। ওর অসীম শক্তি ছিল তখন। লাঠি খেলায় সে সামসুদ্দিনের বাপকে কতদিন হারিয়ে দিয়েছে, দিয়েই ওরা দুই দোস্ত হাতে পারের কাদা যে যার মতো ধুয়ে ফেললে কে বলবে—কিছুক্ষণ আগে রক্তচক্ষু দুইজনের, দুইজনাতে লড়ালড়ি, কে মরে কে বাঁচে ঠিক থাকে না তখন।

আর ঠাকুর কর্তা পূজা বন্ধ করে দিলেন, সেই দিন, এক দুঃখের দিন বড়, বড় ছেলে পাগল হল, বুগল ঠাকুর পরা-পরদির জলে ফেলে দিয়ে এসে বসলেন বারান্দায়, মা আমার তুমি তামাশা দ্যাখলা। পোলা আমার ভাল না হইলে তোমার পূজা কে দেয়। তিনি পূজা বন্ধ করে দিলেন। ঈশমের লাঠি খেলা সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল। সে মহরমের দিনে লাঠি খেলার জুৎ পেত না। কি যেন সে দেবীর সামনে এত দিন লাঠি খেলেছে, পূজা বন্ধ হলে তার মনে ভয়, সে ভয়ে-ভয়ে আর হাওয়ায় লাঠি দোলাতে পারত না। কেবল যেন এক দেবী, মা, জননী, ঈশমকে বলছে, তুই আমাকে আর লাঠি খেলা দেখাবি না ঈশম। আমাকে নদীর জলে রেখে আসবি না!

দশমীর দিনে ওরা যখন নৌকা ভাসাত দুগ্‌গা প্রতিমা নিয়ে—কি যে বিজয়-উৎসব, সে ত তখন লাখের ভিতর এক। সে বড় নৌকোর বড় মাঝি। সে জানত প্রতিমা দুলবে কিনা, সে জানত স্রোতের মুখে নৌকা পড়ে গেলে দেবীর চালচিত্র উল্টে যাবে কিনা, সে বৈঠায় দাঁড়িয়ে হাঁকত, মার টান, দুই দিকে মাঠ সামনে নদী, পানিতে শাপলা ফুল, মা জননী ভাইসা যায় জলে। এই ছিল ঈশম, সে কতবার প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে দেবীর তরবারি জল থেকে ডুবে-ডুবে তুলে এনেছে। তরবারি, শঙ্খ, গদা-পদ্ম, সব সে এক-এক করে তুলত। কারণ প্রতিমা জলে উপুড় হয়ে ভাসত। সে ডুবে-ডুবে মাছের মতো গিয়ে তুলে আনত। কারণ বাড়ি গেলে দোলের বেটা সাদু জেগে বসে থাকবে। যতক্ষণ এই তরবারি সাদুকে না দিতে পারবে, ততক্ষণ মনে তার শান্তি থাকে না। একবার কর্তা ঠাকুরের কোন আত্মীয় এসেছিল, সে বিসর্জনের আগেই সব খুলে নিতে চেয়েছিল। কারণ বাবুর সখ, ছেলেপুলের হাতে, তরবারি, চক্র এবং সেই লম্বা টিনের পাতে তৈরি ত্রিশূল দিয়ে দেবেন। নদীর জলে ডুবে গেলে তুলে আনা যাবে না।

কিন্তু ঈশম হাসল—কি কইরা হয়। জননীর গায়ে হাত দিতে নাই। পানিতে জননীরে না ভাসাইলে কার হিম্মত দেবীর গায়ে হাত দেয়।

সেই আত্মীয়, এমন এক চাকর মানুষের মুখে এত বড় কথা শুনে হেঁকে উঠেছিল, বেরো বেটা তুই। দুই দিনের মানুষ, জানতেরে কয় আম।

ঈশম বলেছিল, কর্তা অত সোজা না। আমার নাম ঈশম। দেবীর গায়ে হাত দ্যান ত দ্যাখি।

জানে মাঝামাঝির খাঁর কি। ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ ওরা কত ছোট তখন। মণীন্দ্রনাথ মাত্র কৈশোরের মানুষ। মণীন্দ্রনাথ বলেছিল, মাথা তা হয় না। সংসারে এমন নিয়ম ছিল তখন। ঈশম পূজোর কদিন গয়না নৌকার কাজ বন্ধ রাখত। পূজোর কদিন তার নানাভাবে কেটে যেত। সে শুধু দিনে সে ভাবতেও পারে নি, ঠাকুর বাড়ির এই উড়াট জমিতে কখনও বড়-বড় তরমুজ ফলবে। সে যদি তখন থেকে এই জমিতে এসে নামতে পারত, জমির চেহারা কত পাল্টে যেত আরও। বড় সে বেশি করে ফেলেছে। কত সে আল্লার বিচিত্র লীলা দেখতে পেত। অথবা তার সেই সব জেলাল্ডারা কে যে নেমে এসেছে এখন সে টের পাচ্ছে না। সে চুপচাপ ছইয়ের নিচে বসে দেখতে পাচ্ছে ওরা এখন বালিয়াড়িতে কি একটা বিছিয়ে দিল। প্রায় মন্ত্র পাঠের মতো জোরে-জোরে কি সব বলছে। যেন প্রায় কেউ নদীর জলে দাঁড়িয়ে কোরান শরিফ পাঠ করছে। অথবা মনে হয় নদীর জলে কেউ তর্পণ করছে। গুরুগম্ভীর আওয়াজ, আকাশ-বাতাস মথিত করে উপরে উঠে যাচ্ছে। মুগ্ধ ঈশম চুপচাপ দেখতে-দেখতে এমন ভাবছে। সে আরও ভাবছে কিছু, সে মনে করতে পারছে না, সেটা কোন সাল, কোন সালে বড়কর্তার বিয়ে হল। বিয়ের বছরই তিনি পাগল হলেন, না মনে হচ্ছে, বিয়ের পর তিনি সাত-আট মাস এখানে ছিলেন না। চাকরিতে গিয়ে সাত-আট মাস নিজের এই পাগলামি ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। সরকারি চাকরি, কত দিন আর পাগলামি করে রাখা যায়। সেবারেই তিনি ঘরে ফিরে আসেন, নানা রকমের লতাপাতায় ডাল এবং ফুল নিয়ে আসেন। অদ্ভুত মানুষের ইচ্ছা, সবাই ওকে যখন আনতে গেল, কাওসার খালে গয়না নৌকা লেগে আছে, ঈশম নৌকা বেঁধে বসে রয়েছে, এত গাছপালা, বিচিত্র সব গাছ, সে জানেও না কোনটা কি গাছ, বাড়িতে খবর পাঠিয়ে লোক আনিয়েছে, যারা এসেছিল তারা দেখল মণীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে সব বিদেশী লতা এবং ফুল নিয়ে এসেছেন। তার ভিতর ছোট একটা পাইন গাছ, কিছু ঝাউ জাতীয় গাছ, এবং একটা তরমুজের লতা। বড়োকর্তা নিজে এসে যখন এমন দেখলেন, চোখ

ক্ষেতে তার তখন জল আসছিল। একেবারে মাঝামাঝি মেয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে। শুধু কিছু গাছপালা এবং কীট-পতঙ্গ দিয়ে গিয়েছেন।
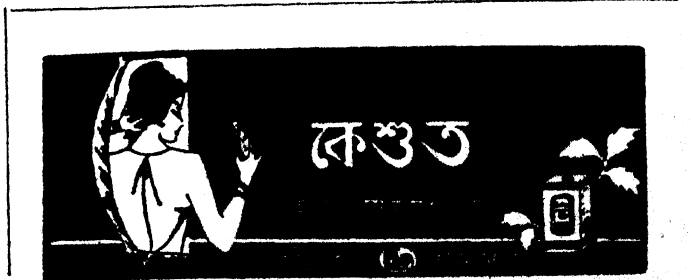
নৌকা খালি করে সব তুলে নিয়ে যেতে হল। না নিলে মানুষটা ঘরে ফিরবে না, কেবল অলক্ষ্যে যা-কিছু ফেলে দেওয়া যায়, ওরা অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ এবং শচি সব কীট-পতঙ্গ মাঠে উঠে ছেড়ে দিয়েছিল। কিছু ফুলের ডাল, যেমন বোগেনভেলিয়ার ডাল, ম্যাগনোলিয়ার শাখা এবং নানা জাতীয় ঝাউ গাছের চারা টবে ওরা বাড়ি এসে হাজির করেছিল। ঈশম নৌকা সাফ করতে গিয়ে দেখল একটা লতা, এ-অঞ্চলে তরমুজ হয় না, ক্ষিরাই হয়, ওর মনে হয়েছিল ওটা ক্ষিরাই-লতা। কিন্তু নীল্‌-নীল আভা, এবং পাতাগুলো বিচিত্র রঙের। সে ওটা নিয়ে গয়না নৌকায় গেরাফি ফেলে উঠে এসেছিল। এসে বলল ঠাইনদি এডা রাখেন। এডা একডা লতা। কি লতা দ্যাখেন।

সবাই দেখল। বড়বৌ কেবল দেখল না। সে বিছানায় পড়ে তখন নাবালিকার মতো কাঁদছে। শিয়রে শচীন্দ্রনাথ বসে ছিল। দক্ষিণের ঘরে আত্মীয়জনের ভিড়। ভূপেন্দ্রনাথ সবাইকে ভিড় করতে বারণ করছে। তরমুজের লতাটা কেউ ভালভাবে দেখল না। একটা বিষাদ সারা বাড়িতে জড়িয়ে আসে। কেউ এ-নিয়ে কিছু বলছে না। সে লতাটা ফেলে দিতেও পারছিল না। কি যে করে এখন — সে ভাবল যেখানে নদীতে চর জেগে উঠেছে, এবং উড়াট জমি, কিছুই ফলছে না, বালি জমিতে কোন চাষাবাদ হয় না, সেখানে এই লতা রোপণ করে রাখলে হয়। যদি ক্ষিরাই হয়, তবে মাস না ঘুরতেই ফুল ফুটবে। হেমন্ত-কালেই লতা লাগান হয়। সে বড় নৌকার মাঝি, এবং দায়ে-অদায়ে সে বাড়ির মানুষের সামিল, অর কিছুতেই লতাটা ফেলে দিতে ইচ্ছা করল না। সে নদীর চরে নেমে খুব যত্ন করে গাছটা রোপণ করল। চার পাশে আদারের ডাল দিয়ে বেড়া দিল। এবং প্রতি সন্ধ্যায় সে এসে দেখতে পেত, গাছটা ক্রমে বড় হচ্ছে—কি গাছ অর্থাৎ কি লতা এটা, কি ফল দেয়, কোন মাসে ফল ধরে, না কি কোন বন্য লতা, এসব দেখার এক অতীব বাসনা ঈশমের। সে গয়না নৌকা নিয়ে এলেই ফাওসার খালে গেরাফি ফেলে উঠে আসত। সে বিবির কাছে প্রথম উঠে না গিয়ে এই গাছটার পাশে দাঁড়াত। বড় বেশি সজীব এই গাছ। সে দেখলে কি সুন্দর লতা ছড়িয়ে দিয়েছে চার পাশে। সে একদিন এসে দেখেছিল গাছটায় পাগল ঠাকুর নদী থেকে জল এনে দিচ্ছে। এবং হলুদ রঙের ফুল ফুটলে সে দেখল গোড়ায় তার কালো রঙের ফল। কুমড়ো নয়ত আবার! না তা হবে কেন। সে সব জানে, গাছ চেনে, শুধু এ-গাছটা চেনে না। বিবি তার মাঝে-মাঝে বিরক্ত হত। কি এত আকর্ষণ সেই গাছে। সারাক্ষণ একটা লতা নিয়ে উড়াট জমিতে সে ডুবে আছে।

আর কিনা সেই বৎসরই দুটো বড় তরমুজ হল। তরমুজের লতা তবে এটা। ভিতরটা কি লাল! যেন চিনির রস ভেসে যাচ্ছে ভিতরে। সে তরমুজ তুলে সব লতা কেটে-কেটে ভাগ দিয়ে রাখল। এবং যখন গয়না নৌকার কাজ বন্ধ হয়ে গেল, দুই গরু নিয়ে সে হাল চাষে নেমে পড়ল। বড়োকর্তা বললেন, তুই কি পাগল! জমিতে কিছু হয় না। উড়াট জমি। তর এই প্রাণ-পাতে কি কাজ। বলে তিনি বুঝি বুঝতে পেরেছিলেন, অভাবে-অনটনে ঈশম এবার কাজ চায়। বয়স হয়ে যাচ্ছে। আর মুরদ নাই শরীরে গয়না নৌকায় দাঁড় বাইবার। সে এবার কাছে-পিঠে বিবির কাছে থাকার জন্য একটা কাজ চায়।

তিনি বললেন, তুই তবে বাড়িতে থাক। কাজ-কাম কর। তর বৌটার অসুখ। তারিণী কবিরাজের কাছ থাইকা অষুধ নিয়া আয়।

সেই থেকে সে বুঝি থেকে গিয়েছিল। না ঠিক সেই থেকে নয়। ওরা যা বুঝেছিল তা নয়। জমি বন্ধ্যা চাষ-বাস হবে না, এমন নদীর পাড়ের জমি, জমিতে তরমুজ ফলবে, জমিতে সব ফসল হয় না—যার যা, তার তা। সে প্রাণপাত করে এই মাটির সঙ্গে প্রায় সেদিন লড়াইয়ে নেমেছিল।

সেই এক লড়াই। মাটির সঙ্গে মানুষের লড়াই। পুরাকালে যখন মানুষ আগুন জ্বালাতে জানত না, পশু-পাখি মেরে কাঁচা খেত, বনজঙ্গলে আহার করত, তখনের মুখ দেখতে তখন একলাই বসে হত। সবাই কি হাসাহাসি করত ঈশমকে নিয়ে। সবাই বলল, ঈশমটাও পাগল হয়ে গেছে। দু-তিন বিঘার মতো শুধু বালির চড়। এ-অঞ্চলে এমন জমিতে কে আবার চাষাবাদ করে! কিন্তু ঈশম সূর্যের মতো লাল রঙ নিয়ে এল মাঠে। চৈত্র মাসে মানুষের চোখে বিস্ময়। ঈশম নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে খেতের তরমুজ কেটে খাওয়াচ্ছে। ভিতরটা তরমুজের কি লাল! কি লাল! সে সবাইকে বলত, ক্যামন লাগে! মিসরির সরবত কইরা দিছি। চৈত্র মাসের আগুন জ্বলছে চার পাশে। খরা দাবদাহে সূর্য পর্যন্ত আকাশ ছেড়ে পালাচ্ছে আর তখন কিনা ঈশম বলছে, কি লাল দ্যাখেন ভিতরটা। খান। য্যান মিসরির দানা।

সেই ঈশম এখন কাসছে। সে তরমুজের সব লতার ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছে—ওরা নদীর পাড়ে-পাড়ে এবং তরমুজ খেতের ভিতর হাঁটাহাঁটি করছে। কখনও ছুটছে স্ত্রীলোকটি। পুরুষটি পিছনে তাড়া করছে। কখনও ওরা চুপচাপ একটা তরমুজের উপর পাশাপাশি বসে থাকছে। কিছু বলছে না। আকাশে কি সব দেখছে। আবার কখনও ধীরে-ধীরে ওরা ঘন হচ্ছে, সংলগ্ন হয়ে আলিঙ্গনে দীর্ঘ সময় আবদ্ধ থাকছে। ঈশম বলল, হ্যাঁ মনুষ্য কুলের তুমি, দেব-দেবীর সুধা পান কর।

সে ভেবেছিল কিছু দেখাবে না। কিন্তু এমন খেলা না দেখে থাকা যায়। নতুন কিংবদন্তি ফের ধর্মের মতো একদিন ঢাক-ঢোল বাজাবে। এই নদীর চরে। তরমুজ খেতে মনুষ্য কুলের কেউ হবে, ইহলীলা সাঙ্গ হলে নেমে আসে। পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দর দৃশ্য এখন এই জমিতে। সে কিছুতেই কাসছে না। দম বন্ধ করে পড়ে আছে। এখানে একজন মনুষ্য জাগে, টের পেলেই ওরা অন্তর্ধান করবে।

আহাঃ কি সুন্দর সুদৃশ্য এই জগৎ। পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কি সুখ! অনন্ত-কাল এই পৃথিবী এবং সৌরজগৎ আপন মহিমায় আবর্তন করছে। মানুষ কীট-পতঙ্গ পশু-পাখি দলে-দলে মিছিলের মত ঘুরছে-ফিরছে। হাজার লক্ষ অথবা কোটি-কোটি বছর ধরে ঘুরছে-ফিরছে। এই যে এক তরমুজের জমি, এখানে এবার নেমে এস তোমরা, এলেই দেখতে পাবে—প্রায় সাদা মোমের মত এক নারী-মূর্তি, এবং হাতীর দাঁতের মত শক্ত অবয়বে এক পুরুষের আশ্চর্য লীলা। কেউ টের পেল না। একমাত্র ঈশম চুরি করে সব দেখে ফেলেছে। সে বলল, আমি ঈশম বড় ভাগ্যবান মানুষ। যেন বলার ইচ্ছা, আমার আর কষ্ট কি। আমার জমিতে ঈশ্বরের আবাস। সুখের আমার শেষ নাই।

(ক্রমশঃ)

## রিজার্ভেশন

দাদা,

একটা ধাঁধার জবাব দেবেন? হাওড়া থেকে এলাহাবাদ আটশো তেরো কিলোমিটার। আজ কুড়িটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হাওড়া ছাড়লে ট্রেন এলাহাবাদ পৌঁছুবে পরদিন ষোলটা পাঁচ কি দশে। মাঝে এক রাত্তিরের জন্য যদি সাড়ে চার টাকা রিজার্ভেশন চার্জ গুনতে হয় তাহলে হাওড়া টু এলাহাবাদের থার্ড ক্লাশের ভাড়া কত পড়বে বলুন তো?

না, না—হাসি-ঠাট্টা না। খুব সিরিয়াসলি জিজ্ঞাসা করছি। আপনি তো হপ্তায় হপ্তায় 'তেনাদের' কীর্তিকলাপের গল্প লিখছেন—এতদিনে বোধহয় কয়েক ডজন গল্পের ডিম ফুটিয়েছেন—দয়া করে আমার প্রশ্নটার সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন তো। একটা অনুরোধ শুধু করব, 'ভাড়া কত?' জানার জন্য রেল কোম্পানীর ডিকশনারীটা ঘাটবেন না—ওটা মিথ্যে কথা বলে।

কারণ আমি ও সুভাষ গোড়ায় তাই করেছিলাম। সুভাষকে আপনি চেনেন না। সুভাষ চক্রবর্তী আমার কলিগ। আপনি তো জানেন আমি খিদিরপুরের কাছে একটা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে পড়াই। অ্যাকচুয়ালি পড়ানোটা আমাদের কাজ নয়, দেখানোই আমাদের নিয়ম। আমরা ডেমনেস্ট্রেটর। মাস গেলে দু'শ পঁচিশ চারশো পঁচাত্তর স্কেলে ডি-এ সমেত মোট মাইনে পাই তিনশো সত্তর টাকা। হাতে পাই কোন মাসে দু'শ নব্বই কোন মাসে দু পাঁচ টাকা বেশী। প্রভিডেন্ড ফাণ্ড, প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের লোন, ইনকাম ট্যাকস আর একটা বিশ বছর মেয়াদী স্যালারী সেভিংস স্কীমের জীবনবীমার বরাদ্দ চুকিয়ে ওর বেশী কখনো হাতে আসে না।

আসে না তো আসে না—তা আর কি করব। হাজার হাজার ইনজিনিয়ার যে দেশে বেকার, সেখানে যে এখনো চাকরীবাকরী করে দু মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে পারছি, তাই যথেষ্ট। আপনি তো জানেন আমি বিয়ে-থা করিনি। বাবা মা অনেক বলেছিলেন। আমি সাফ বলে দিয়েছি যার দু দুটো বয়স্থা ছোট বোনের বিয়ে আজও হয়নি, যার একটা ছোট ভাই এখনো স্কুলের গণ্ডী পেরোয় নি এবং বাবা যার আজ বাদে কাল একশ তিরিশ টাকা পেনসন সম্বল করে ঘরে ফিরে আসবেন, তার এখন ওসব খোয়াব না-দেখানই ভাল।

তবু তো আমাদের অবস্থা ভাল। বাপ বেটা দুজনে মিলে মাসের শেষে শ ছয়েক টাকা ঘরে আনি। সুভাষদের অবস্থা যদি দেখতেন। বাবা নেই। সুভাষের বড়দা একটা বিলেতি কোম্পানীতে ওয়েল্ডারের কাজ করতেন। ভালই মাইনে পেতেন। হঠাৎ কি হল একদিন দুপুরে কোম্পানীর লোকেরা ধরাধরি করে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল—চোখ দুটো জন্মের শোধ গেছে। ওর মা প্যারালিসিসের রুগী। এখন ওই সুভাষের ঘাড়ে গোটা সংসারটা—মা, অন্ধ দাদা, ছোট দুটো ভাই, বৌদি ও একটা ভাইপো। সুভাষ নাইটে বি-ই পড়ছিল। সে সব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সকাল সন্ধ্যে পাড়ায় পাড়ায় পাইকেরী হারে ছাত্র পড়ায়। আর পড়াবেই বা কি? পড়াশোনার পাট তো এদেশে চুকে গেছে। পরীক্ষাই যদি দিতে না হয়, ঢালাও প্রমোশন যদি মেলে তবে কোন গার্জিয়ান মিথ্যে মিথ্যে প্রাইভেট টিউটরের কড়ি গুনবে। কমতে কমতে গত মাসে দুটোয় এসে ঠেকেছিল টিউশনি। এ মাসে সে দুটোও গেছে।

পয়লা তারিখ মাইনে নেওয়ার সময় লাইনে সুভাষকে না দেখে, টিচার্স রুমে ফিরে এলাম। দেখি ও একমনে ছাত্রদের ড্রইং শ্লেট দেখছে। কি রে মাইনে নিবি না?—জিজ্ঞাসা করলাম সুভাষকে। বোধহয় শুনতে পায় নি। চুপ-চাপ শ্লেট দেখছিল। এবার গায়ে একটা ঠেলা মেরে ফের বললাম—কিরে নিবি না?

কি? লাল-নীল পেন্সিলটা শ্লেটগুলোর ওপর নামিয়ে রেখে ভীষণ ক্লান্ত চোখ দুটো একবার শুধু তুলল। দেখে মনে হোল সারা রাত্তির বোধ হয় ঘুমোয় নি। চোখ দুটো কচলাতে কচলাতে বলল—আজ নেব না।

কেন?—আমার কৌতূহল হল জানতে।

আবার একটা লোন চেয়েছিলাম। স্যাংশন হয়েছে। প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের পুরোনো লোনটার জন্য শ দুয়েক এখনো বাকী। অ্যাকাউন্টটেন্টবাবুকে বলে দিয়েছি মাইনের সঙ্গে ওটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে। কাল লোনটা পাব।—বলে খড়িওঠা শুকনো গালে ম্লান হাসির ভুসকুড়ি ফোটাল সুভাষ।

আবার কেন লোন নিচ্ছস?—জিজ্ঞাসা করি আমি।

দুটো কারণে—জবাব দেয় সুভাষ। মার কয়েক দিন ধরেই বাড়াবাড়ি চলছে। রাতে একদিনও ঘুমুতে পারছি না। ওদিকে ছ তারিখ এলাহাবাদে যাব। ইণ্টারভ্যু। ইণ্ডিয়ান কনস্ট্রাকশনে লোক নিচ্ছে। অ্যাপ্লাই করেছিলাম। ওরা ডেকে পাঠিয়েছে। বলেছে যাতায়াত ভাড়া দেবে, তবে এখন নয়, ইণ্টারভিউতে অ্যাপীয়ার হওয়ার পর। হাতে তো পয়সা নেই একটাও। টিউশনি দুটো খতম হয়ে গেছে। যা পেয়েছিলাম ডাক্তার আর ওষুধেই সব বেরিয়ে গেল। সারাটা মাস এখনো পড়ে। তাই লোন না নিয়ে আর উপায় কি বল?

সত্যি ওর আর কোন উপায় নেই। আমার যদি ক্ষমতা থাকত ওকে দিতাম। কিন্তু আমার অবস্থা তো সবই আপনি জানেন। ওদিকে এলাহাবাদের চাকরীটার মাইনে এখানকার চেয়ে অনেক বেশী—কম করেও সোয়া শ টাকা বেশী পাবে, যদি হয়।

আমরা সবাই মাইনে নিলাম এক তারিখ। সুভাষ নিল দু তারিখ। মাইনে নিয়ে এসে বলল—দেখু চ একটু সিটি বুকিং অফিসে যাই। একটা টিকিট কাটব এলাহাবাদের।

আমাদের কলেজের কাছেই একটা সিটি বুকিং অফিস আছে। সেখানে যাওয়ার আগে অফিসের রাস্তায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম—হাওড়া টু এলাহাবাদ

আটশো তেরো কিলোমিটার; থার্ড ক্লাসের ভাড়া চব্বিশ টাকা চব্বিশ পয়সা।

বললে বিশ্বাস করবেন না খোদ হাওড়া স্টেশন ছাড়া সাউথ ক্যালকাটার কোন সিটি বুকিং অফিস আমরা বাদ দিই নি। ওয়ান আপ হাওড়া-কালকা, ইলেভেন আপ হাওড়া-দিল্লী, থ্রীআপ হাওড়া-বম্বে, কোনটার কোন টিকিট নেই। সব বুকে রিজার্ভ হয়ে গেছে। সব জায়গায় এক উত্তর—হাওড়ায় গিয়ে খোঁজ নিন।

এতটা পথ, বিশ-বাইশ ঘণ্টার জার্নি তো আর বসে যাওয়া যায় না। এক আধ দিন আগে যে যাবে, সে রেস্তও সুভাষের পকেটে নেই। একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত শহরে কোথায় কোন হোটেলের দালালের খপ্পরে পড়ে সব খোয়াবে, সে রিস্কও নেওয়া যায় না। ওর প্ল্যান ছিল—ছ তারিখ রওনা দিয়ে সাত তারিখ সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছে বাকী রাতটা ওয়েটিং রুমেই কাটিয়ে দেবে। আট তারিখ সকাল দশটায় ইণ্টারভ্যু। বিকেলের গাড়ীতে কলকাতায় ফিরবে। ফলে ফালতু খরচের ঝামেলা এড়ানো যাবে।

কিন্তু চাইলেই কি ঝামেলা এড়ানো যায়? না—যায় না। কোথাও পাত্তা না পেয়ে আমরা যখন নিরুপায় হয়ে ঠিকই করে ফেলেছি যে এবার হাওড়ায় গিয়ে ঢু মারব, ঠিক তখুনি সামনে তাকিয়ে দেখি মধুসূদনদাদা দইয়ের ভাঁড় নিয়ে দাঁড়িয়ে।

ম্যাড্রের মাথায় পাঁচতলা একটা ম্যানসনের একতলায় বুকিং অফিস। আমরা অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও যখন টিকিটখানা জোটাতে পারলাম না, তখন হতাশ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে উল্টোদিকের বাস স্টপে দাঁড়ালাম। হাওড়া যাব। এতক্ষণ খেয়াল করিনি। এবার করলাম। বুকিং অফিস থেকে একটা লোক পেছন পেছন আসছিল। লোকটার চেহারাটা অনেকটা আমাদের ভূতোদার মত। সমান কালো, রোগা, লম্বা; মাথা জোড়া টাক অথচ দু পাশে দুখানি রাম-দার মত ঝোলানো জুলপি। পরনে নোংরা একটা পাজামা আর গিলে করা পাঞ্জাবি। খুব বিনয়ী। একেবারে আমার কানের কাছে মুখটা এনে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় যাবেন স্যার?

প্রশ্নটা শুনেই চমকে গিয়েছিলাম। সুভাষ পাশে দাঁড়িয়ে তখন অন্যমনস্কের মত ট্রাম বাস ট্যাক্সি লরী হাজার মানুষের ভিড়ের চেহারাটায় ডুবে ছিল। প্রথমে খেয়াল করেনি।

আপনার দরকার?—একটু রূঢ়ভাবেই কথা কটা ছুড়ে মারলাম মুখের ওপর। বুঝতেই পারছেন, তখন মেজাজটা ঠিক ছিল না। তিন তিনটে সিটি বুকিং অফিস ঘুরে একই উত্তর পেয়েছি। তার ওপর কোথাকার কে নবাব বাদশা এলেন জানতে কোথায় যাব? কেন আপনি টিকিট দিতে পারবেন?

বললে বিশ্বাস করবেন না, কেষ্টনগরের স্প্রিংয়ের পুতুলের মত ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল লোকটা—নিশ্চয় পারব। একবার আসুন না সঙ্গে।

বিশ্বাস না করলেও, অবিশ্বাসও পুরোপুরি করিনি লোকটাকে। গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। না বুকিং অফিস নয়। উল্টোদিকের চায়ের দোকানে। আমাদের দোকানের বেঞ্চিতে বসিয়ে খাতির করে চা খাওয়াল। কোন আপত্তিই শুনলো না, যেন আমরা ওর কত নিকট কুটুম্ব। চা খেতে খেতেই বিজনেস টক শুরু হয়ে গেল।

ত্রিরিশটা টাকা ছাড়লে একখানা টিকিট এখখুনি হয়ে যেতে পারে। জিজ্ঞাসা করলাম পাঁচ টাকা ছিয়াত্তর পয়সা কেন বেশী দেব? জবাবে বলল—টিকিট পাবেন বলে। যাচ্ছিলেন তো হাওড়ায়। যান না, গিয়ে দেখুন একখানা টিকিটও পান কিনা। তারপর জলের মত সহজ করে গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল আমাদের।

যেদিন যে ট্রেন ছাড়বে স্যার, তার তিন দিন আগে সব কটা বুকিং অফিস থেকে রিজার্ভেশন প্ল্যান ফেরৎ চলে যায় হাওড়ায়। আপনার টিকিট দরকার ছ তারিখের। আজ দু তারিখ। কাল বিকেলে রিজার্ভেশন প্ল্যান না পাঠানো পর্যন্ত হাওড়াতেও টিকিট পাবেন না। পাবেন না এখানেও। কারণ সব রিজার্ভেশন আমরা গোড়াতেই বুক করে রাখি। তারপর খদ্দেরের চাহিদা বুঝে বাজারে মাল ছাড়ি। বাড়তি মাশুলের অর্ধেকটা আমাদের, অর্ধেকটা কার—বুঝতেই পারছেন। আমি তো বেশী চাইনি স্যার। টিকিটের দাম চব্বিশ চব্বিশ, সে জায়গায় চেয়েছি ত্রিশ টাকা। একখানা টিকিট বেচে যদি পাঁচ টাকা না পাই, তাহলে আমারই বা চলে কি করে স্যার। এর মধ্যে আড়াই পাব আমি বাকী আড়াই পাবেন উনি। আর ছিয়াত্তর পয়সা কেন জানেন স্যার—এই যে চা খেলেন, এর এক ভাঁড়ের দাম পনেরো পয়সা। [illegible] হলে হবে 'ছ চাটা আনার ভাগো'। তিন ভাঁড়ের দাম পঁয়তাল্লিশ পয়সা, একটা [illegible] দেওয়া পান ঐ উল্টো দোকান থেকে নেব, দাম মাত্র দশ পয়সা। [illegible] আর ছটা [illegible] বাকী থাকে এক পয়সা। ওটা নিশ্চয়ই [illegible] চাইবেন না।

এত সুন্দরভাবে বোঝাছিল লোকটা যেন আমরা গুর ছাত্র, উনি আমাদের প্রফেসর। প্রব্লেমটা কত সহজেই সলভ করা যায়, তার পথটা বাতলে দিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

টিকিট পেলাম, সেদিনই। ওই চায়ের দোকানে বসেই পাঁচ টাকা ছিয়াত্তর পয়সা মানে আসল দামের প্রায় সিকি ভাগ বাড়তি মাশুল দিয়ে। টিকিট নিয়ে যখন ফিরছি তখন লোকটা আবার ফিস ফিস করে কানে কানে বলল—আমার নাম স্যার নীলু। যখনই দরকার হবে, এই চায়ের দোকানে এসে খোঁজ করবেন, দেখবেন সব সমাধান করে দেব।

তাই বলছিলুম দাদা, অনেক তো লিখছেন। এ বিষয়টা নিয়ে একটু লিখুন না। আমাদের মত হাজার হাজার লাখ লাখ লোক এমনি এমনি চব্বিশ টাকা চব্বিশ পয়সা দিয়ে তো আর রেলের টিকিট কাটতে যায় না, নেহাৎ ঠেকায় না পড়লে। আমাদের তো আর দেশভ্রমণের সখ মানায় না। আমরা নেহাতই গরীব। আমাদের যারা ঠকায় তারাও তো আমাদেরই ঘরের লোক। তাদেরও তো বাড়ীতে ভাই-বোন, বাবা মা, ছেলেপুলে আছে। চাকরীর প্রয়োজনে তাদের ছোট ভাইদেরও তো কখনো-সখনো রেলের টিকিট কাটতে হতে পারে। এই অন্ধ ধাঁধার হাত থেকে কখনো কোনদিনও কি মুক্তি পাব না?

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

আপনারই
ছোটভাই
দেবরঞ্জন দত্ত।

পুনশ্চঃ চাকরীটা সুভাষের হয়নি।

এমন চিঠির জবাব আমার জানা নেই। ওর অনুরোধ মত খোঁজ নিয়েছিলাম। দেবরঞ্জনের প্রতিটি অভিযোগই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

—শ্রীনিরপেক্ষ

কিছু বলবার আগেই জানতে চাইলেন, নিশ্চয়ই খুব ঘুরোঘুরি করে অনেক বেলায় ফিরেছেন?

আমি একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললাম, খুব বেশী ঘুরাঘুরি করিনি তবে একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল।

'অফিস থেকে বাড়ী গিয়েই আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম...

'তাই নাকি?'

শুনলাম আপনি ঘুমুচ্ছেন। তাই ডাকতে বারণ করেছিলাম। এই একটু আগেও ফোন করে জানলাম ঘুমুচ্ছেন তখন আর না এসে পারলাম না।' মিঃ রায় হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকালেন।

ছি, ছি কি লজ্জার কথা।'

'ওসব লজ্জা-টজ্জা ছাড়ুন মশাই। গেট রেডি। ওদিকে খাবার-দাবার যত ঠান্ডা হবে গিন্নী তত বেশী গরম হতে শুরু করবে।'

আমি না হেসে পারলাম না। কিন্তু সংগে সংগে জিজ্ঞাসা করলাম, এত খাবার-দাবারের কি ব্যাপার?

'এমন কিছু নয়, তবে ইউ আর হ্যাভিং ডিনার উইথ অস টু-নাইট।'

আমি বললাম, আই অ্যাম সিওর দিজ ইজ নট এ রিকোয়েস্ট বাট এ কম্যান্ড ফ্রম হার ম্যাজেস্টি। সুতরাং আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিই।

তাড়াতাড়ি ঘরে এসে জামা-কাপড় পাল্টে নিলাম। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখটাকে পরিষ্কার করলাম। ব্যাস! ঘড়ি পরতে গিয়ে দেখি সাতটা বেজে গেছে। ড্রইংরুমে আসতেই মিঃ রায় উঠে পড়লেন ও দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম।

নিউ ফরেস্ট কলকাতা মহানগরী তো দূরের কথাই, এমন কি কালীঘাট-ভবানীপুরের চাইতেও অনেক ছোট। নিউ ফরেস্টের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত মাইল খানেকের বেশী হবে না। তাছাড়া ভারী সুন্দর ও শান্ত পরিবেশ। অনেকটা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনস আর পুরাণ আমলের ইডেন গার্ডেনের মিকসচার আর কি! তবুও এখানকার বাসিন্দারা এই পথে এই পরিবেশে হাঁটেন না। কেউ গাড়ীতে, কেউ সাইকেলে আমি অবাক হই, আমার ভাল লাগে না।



মিঃ রায়ের গাড়ীতে যেতে যেতেই জিজ্ঞাসা করলাম, এইটুকু পথের জন্য আবার গাড়ী আনলেন কেন?

'প্রথম প্রথম এইটুকু মনে হয়। কিছুদিন পর আর এইটুকু মনে হবে না।'

কথাটার সংগে এক মত হতে পারলাম না কিন্তু কিছুটা সত্য বৈকি। অধিকাংশ লোকের কাছেই বিয়ের পরে, বাসর ঘরে স্ত্রীকে যত ভাল লাগে, অপরূপা, মহীয়সী মনে হয়, পরে তা মনে হয় না। দৈনন্দিন জীবনের সংঘর্ষে মনের কিছু কিছু মিহি সুর, কিছু সত্য নিত্য আহত হয়, কিছু স্বপ্ন হারিয়ে যায়। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরত-হেমন্তের ঘূর্ণি পথে কখনও কিছু হারিয়ে যায়, কখনও কিছু পাওয়া যায়। কোন জমিই চিরকাল উর্বরা থাকে না। জমিকে উর্বরা রাখতে হলে মাঝে মাঝেই সার দিতে হয়। সংসার জীবনে অনেকেই জানেন না, বুঝেন না এসব চিরন্তন সত্য। যাঁরা এসব জানেন না, পারেন না, তাদের কাছে সংসার রসহীন, মাধুর্যহীন হয়ে পড়ে। সবাই তো তা নয়। বাসর ঘরে যাকে মনোরমা মনে হয়েছিল, সংসার জীবনের চরম দুর্যোগের রাত্রিতে তাকে তো আরো আপন মনে হতে পারে, আরো নিবিড় করে তার ভালবাসার উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করাও সম্ভব।

নিউ ফরেস্টের এই শান্ত নিবিড় বনানীর পরিবেশ প্রথম প্রথমই শুধু ভাল লাগবে কেন? তাহলে এই বিশ্ব প্রকৃতির প্রাচুর্যের মেলা কি শুধু শৈশবেই ভাল লাগবে? যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে কি হিমালয়ের রূপ ভাল লাগবে না? আবীর-রাঙা গোধূলির মিষ্টি কয়েকটা মুহূর্ত কি নিউ ফরেস্টের মানুষকে আনমনা করে না?

না, না, তা কি করে হয়? তা কি কখনও সম্ভব? এই রাস্তা দিয়ে আমি আগেও গিয়েছি, এখনও যাচ্ছি। এই পরিবেশ কি আমার তত ভাল লাগছে না? গাড়ীটা মোড় ঘুরতে না ঘুরতেই নিজের মনকে নিজে জেরা করলাম। হাওড়া কোর্টের উকিলের মত কঠোর নির্মম হয়ে জেরা করলাম। কই না তো! আজও তো বেশ লাগছে। বরং বাতাসটা যেন আরও মিষ্টি, আরো স্নিগ্ধ। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমি যদি গাড়ী থেকে নেমে পড়তে পারতাম, তাহলে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতাম এই আবছা অন্ধকারভরা বনবীথিতে।

গেস্টহাউস থেকে মিঃ রায়ের বাড়ী—কতটুকুই বা পথ? দু-তিন মিনিটের পথ! তা হোক। এই দু-তিন মিনিটের মধ্যেই কত কি ভাবছি। ভাবছি রামচন্দ্রের কথা, কৈকেয়ীর কথা। দীর্ঘ চোদ্দ বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন রাম। আশ্রয় নিতে হয়েছিল দণ্ডক মহারণ্যে। রাজপ্রাসাদের প্রাচুর্য হারাতে হয়েছিল কিন্তু তার বিনিময়ে কি তিনি কিছুই পান নি? রঙীন প্রকৃতির অকৃপণ ঔদার্যের মেলায় কি কোন আকর্ষণ নেই? নিশ্চয়ই আছে। সেদিনও ছিল, আজও আছে। তাইতো আজো শহরের-নগরের মানুষ ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ছুটে আসে উদার বিস্তৃত প্রকৃতির কোলে।

মিঃ রায় অ্যাকসিলারেটরের পর থেকে পা তুলে ব্রেক দিয়ে গাড়ী ও বাংলোর গেটের মধ্যে ঢুকতেই আমার ওসব চিন্তা পালিয়ে গেল। আমার খেয়াল হলো, আমি ডিনার খেতে এসেছি।

ছোট ছোট পাথরের পর গাড়ী চলছিল পোর্টিকোর দিকে। গাড়ী থামাবার সংগে সংগেই মিঃ রায় হর্ণ দিলেন, ঘোষিত হলো আমাদের আগমন বার্তা।

গাড়ী থেকে নেমেই মিঃ রায় বললেন, আসুন।

আমি মিঃ রায়ের পিছন পিছন চললাম অন্দরকে আর স্ট্যান্ডিতে নয়, সোজা ড্রইং রুমে। বিরাট ড্রইংরুম। শুধু বসবার জন্য গল্পগুজব করবার জন্য এত বড় ও এত ভাল ঘরের কথা আমি ভাবতেই পারি না। কো দিন দেখিনি বা উপভোগ করিনি ম প্রয়োজনও অনুভব করি না। শিলচা বিহু কিছু লোকের বাড়ীতে বসার ঘ দেখেছি কিন্তু এত ভাল ড্রইংরুম দেখি আমাদের গুরুচরণ কলেজের অন্য পৃষ্ঠপোষক চন্দ্র-বাড়ীতেই শুধু ড্রইংর দেখেছি। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো হয়ত একটা ড্রইংরুম আছে, তবে আ দেখিনি। সে ড্রইংরুম নিশ্চয়ই এত ভ নয়। সত্য কথা বলতে কি, শিলচর বা ক কাতায় থাকতে ড্রইংরুমের কথা বি শুনতামই না। দেখতামও না। প্লা কমিশনের কৃপায় দিল্লীতে এসেই ড্রইংরু সংগে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়।

মিঃ রায়ের ড্রইংরুম দেখে বেশ লাগ এক পাশে একটা বড় সোফা সেট। ফায় প্লেসের ধারে বেতের সোফা নেই। কার্পে টিপাই, সেন্টার টেবিলগুলোও ভারী স কার। ঘরের তিন কোণায় তিনটে লা স্ট্যান্ড। ডিভানের পিছনে একটা চাইন স্ক্রিন। আরো ছোট-খাট টুক-টাক কি যেন আছে।

মিঃ রায়ের পিছনে পিছনে ড্রইংর ঢুকেই বেশ লাগল। শুধু ভাল লাগ লোভ হচ্ছে নাতো? লোভ? হ্যাঁ হ্যাঁ লো ভাল জিনিস দেখলে লোভ হয় না? ছোটবেলায় মামা আর মাগোর স শিলং বেড়াতে গিয়ে পুলিশ বাজা দোকানে নানা রকমের খেলনা দেখে অ লোভ হয়েছিল না? কেন কলকাতায় পো গ্রাজুয়েট হস্টেলে থেকে পড়বার চৌরঙ্গী পাড়ায় গেলে কত কি দেখে হতো না? বড় বড় সুন্দর গাড়ী দেখতাম ঠিক লোভ হতো না। ওগুলো পাবার নয়, লোভ করে লাভ কি? কেস- সাজান সুন্দর সুন্দর জামাক দেখে কিন্তু লোভ হতো। শুধু জামাক কেন? সুন্দর মনের মত একটা বৌয়ের লোভ হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছিল।

সেসব দিন অনেক পিছনে এসেছি। মাঝে কখনও প্রায় সাধ

গিয়েছিলাম। নিজের জীবনের প্রতিটি কোন আকর্ষণ ছিল না, সোজা তো দূরের কথা। কিন্তু নিউ ফরেস্টে আসার পর এ কি হলো? ঐ শান্ত-স্নিগ্ধ শাল-পাইনের মধ্যে ঘুরাঘুরি করে নিজেকে এত ভাল লাগছে কেন? গেস্ট হাউসের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে এত সুন্দর মনে হয়েছে কেন? মিঃ রায়ের এই ড্রইংরুমে এসেই বা এত ভাল লাগছে কেন? এই শাল-পাইনের বনে, শিবালিক পাহাড়ের আড়ালে কোন সূর্য লুকিয়ে নেই তো যে আবার জমাট-বাঁধা আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনার বরফ গলিয়ে দেবে?

জানি না। ভগবানের কি ইচ্ছা, তা জানি না। তবে এই ড্রইংরুমে ঢুকে একবার চার-পাশ দেখে নিয়েই বললাম, হাউ লাভলি!

খুশী হয়ে মিঃ রায় বললেন, ইউ থিংক সো?

'নিশ্চয়ই।'

মিঃ রায় হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা কথা জেনে রাখুন যে, মনের মত একটা আস্তানা আর স্ত্রী যদি না পাওয়া যায় তাহলে এই পৃথিবীর কোন সৌন্দর্য, কোন আনন্দ উপভোগ করা যায় না।

'তাই নাকি?'

'ইয়েস স্যার। ইউ ক্যান অলসো পুট ইট দি আদার-ওয়ে। মনের মত স্ত্রী আর সংসার হলে জীবনের সব দুঃখ, সব ব্যর্থতা, সব সমস্যার মোকাবিলা করা যায়।'

আমি মুখে কিছু বললাম না, বলতে পারলাম না, বলতে ইচ্ছা করল না। শুধু একটু হাসলাম। পাশের একটা সোফায় বসতেই উনি ভিতরে গেলেন, বসুন, আসছি।

আমি চুপ করে সোফায় বসে আছি আর ভাবছি, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো কেন? এর সঙ্গে যত বেশী ঘনিষ্ঠ হচ্ছি, যত বেশী দেখছি, আমার প্রতি, আমার জীবনের প্রতি তত বেশী লোভ হচ্ছে। একটা অদম্য চাপা ইচ্ছা যেন মাথা ফুঁড়ে বেরুতে চাইছে। গর্তের মধ্যে যেন একটা কামনা-বাসনা-লালসার কেউটে সাপ লুকিয়ে আছে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি নাকি?

ড্রইংরুমটা আর একবার ভাল করে দেখলাম। বেশ ভাল লাগল। মনে হলো আমার যদি একটা ছোট্ট সুন্দর ড্রইংরুম থাকত? শীতের সন্ধ্যায় ফায়ার প্লেসের ধারে বসে বসে বই পড়তে পারতাম! না, না, তার চাইতে আরো ভাল হতো যদি গল্প করতে পারতাম! কিন্তু কার সঙ্গে গল্প করব? কে আছে আমার?

প্রায় একই সঙ্গে রায় দম্পতি ড্রইংরুমে এলেন। মিসেস রায় ট্রে থেকে কফির পেয়ালা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, আজ বুঝি খুব ঘুরেছেন?

'খুব বেশী ঘুরাঘুরি করার লোক আমি না।'

অন্য পেয়ালা কফি স্বামীর হাতে তুলে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

'আমি বড় কুঁড়ে।'

মিসেস রায় এবার নিজের এক পেয়ালা কফি নিয়ে আমার পাশের সোফায় বসে বললেন, আপনাকে দেখে তো খুব চটপটে স্মার্ট মনে হয়।

'যা মনে হয় তা কি সব সময় সত্যি হয়?'

এবার মিঃ রায় মুখ খুললেন, এই তো ইন্টেলিজেন্টের মত কথা।

মিসেস রায় শুধু একটু হাসলেন। মনে হলো আমার মন্তব্য উপভোগ করেছেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

আমি এবার মিসেস রায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, নিউ ফরেস্ট আপনার কেমন লাগে?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো, খুব ভাল লাগে।

'কেন বলুন তো?'

'এত সুন্দর জায়গা; ভাল লাগবে না?'

'শুধু সুন্দর জায়গা বলেই ভাল লাগে?'

মিসেস রায় আপন মনেই একটু হাসলেন, না, শুধু তা নয়......

'তবে?'

'নিজেকে দেখার, বুঝার এত ভাল জায়গা বোধকরি আর পাব না—অন্ততঃ আগে পাইনি। তাই নিউ ফরেস্ট আমার খুব ভাল লাগে।'

আমি তারিফ না করে পারলাম না, বাঃ! ভারী সুন্দর কথা বল্লেন তো!

মিঃ রায় আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, ডোণ্ট ফরগেট সী ইজ মাই ওয়াইফ!

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, যদি বলি ইউ আর হার হাসব্যাণ্ড?

'প্রতিবাদ করব না।'

ড্রইংরুমে বসে বসেই আমরা একটা গাড়ী আসার আওয়াজ পেলাম। পোর্টি-কোতে গাড়ী ব্রেক করার সঙ্গে সঙ্গেই হর্ণ বাজল। আমি বসে রইলাম। ওরা দুজনেই উঠে গেলেন।

আমি ড্রইংরুমে বসেই গাড়ীর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। কথাবার্তাও শুনতে পেলাম একটু-আধটু। কথাবার্তা বলতে বলতেই ওরা দুজনে একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকলেন। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক মিঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনিই কি সাগর চট্টোপাধ্যায়?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলবার আগেই মিঃ রায় বললেন, তুমি তো ঠিক ধরেছ দাদা!

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, মাধুরী আমাকে যে ডেসক্রিপসন দিয়েছে তাতে তো না চেনার কোন কারণ নেই।

মিসেস রায় হাসলেন। তারপর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি আমাদের দাদা—ডকটর এস পি সরকার—অরেল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের অ্যাড-ভাইসার।

আমি হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। ডকটর সরকার বললেন, এরা দুজনে তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তা রোজ রোজ এদের এখানে এসে নিজের প্রশংসা না শুনে আমার ওখানে চলে আসবেন।

আমি হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোথায় থাকেন?

'এই কাছেই। ওরা ডাইরেকশন দিয়ে দেবে। কাল চলে আসবেন।' এবার মিঃ আর মিসেস রায়ের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, চলি বুঝলে।

স্বামী-স্ত্রী প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলেন, এক্ষুণি?

'হ্যা এক্ষুণি যাব, তার কারণ আমাকে একটু ঘুরে বুলাকে সিনেমা থেকে আনতে হবে।'

মিসেস রায় বললেন, বুলা সিনেমায় গেছে?

'হ্যা।'

'আজ সকালে যখন টেলিফোন করে-ছিলাম, তখন তো কিছু বললে না।'

'মুসৌরী থেকে রমা এসেই ওকে নিয়ে সিনেমায় গেছে।'

'রমা আজ থাকবে?' মিসেস রায়ই জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, ও কাল সকালেই যাবে।'

ডকটর সরকারকে আমরা সবাই বিদায় জানাতে বারান্দায় এলাম। গাড়ীতে উঠে উনি আর একবার আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, কাল আসছেন তো?

আমি বললাম, আচ্ছা আসব।

ডক্টর সরকার চলে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

# বিজ্ঞানের কথা

## আমরা গন্ধ শুঁকি কি করে?

কোনো একটি জন্তু পালিয়ে যাচ্ছে, শুধু তার গন্ধ শুঁকেই কুকুর তার পিছু ধাওয়া করতে পারে। অপরাধী পালিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরে অপরাধীর ফেলে-যাওয়া কোনো বস্তু থেকে গন্ধ শুঁকে পুলিশের কুকুর সেই গন্ধ ধরে-ধরে এগিয়ে অপরাধীকে খুঁজে বার করেছে, এমন দৃষ্টান্ত এই কলকাতা শহরেও কম নয়। কুকুরের এই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমরা অবাক হই। কিন্তু প্রাণীজগতে গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা কুকুরের চেয়েও বেশি, এমন দৃষ্টান্তও আছে। পুরুষ জিপসি মথ কয়েক মাইল দূরে থেকেও স্ত্রী মথের গন্ধ টের পায়। গন্ধ টের পাবার এই ক্ষমতা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এমনই হতবুদ্ধিকর যে, সাধারণ বুদ্ধি থেকে তার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ফলে এ-ব্যাপারে উদ্ভট সমস্ত কল্পনা করা হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা শারীরবিদ্যায় এই একটি বিষয়ে গবেষণা কিছুটা অবহেলিত। ঘ্রাণ ব্যাপারটি কী, নাকে কি করে গন্ধ ধরা পড়ে—কুড়ি বছর আগেও এ-নিয়ে কোনো গবেষণা হয় নি। প্রথম গবেষণা শুরু করেন যে বিজ্ঞানী তিনি হচ্ছেন লর্ড আড্রিয়ান। তিনিই বিষয়টিতে অন্য বিজ্ঞানীদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন। তারপর থেকে ঘ্রাণ-সম্পর্কিত গবেষণায় ছেদ পড়ে নি। এখনো পর্যন্ত বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান খুব বেশি নয়, তাহলেও নাকে কি করে গন্ধ ধরা পড়ে তার মূল কথাগুলো মোটামুটি জানা গিয়েছে।

পলায়মান পশুর অতি মৃদু গন্ধকে অন্য সমস্ত গন্ধ থেকে আলাদা করে চিনতে পারা—কুকুরের এই আশ্চর্য ক্ষমতার মূলে প্রধান ভূমিকা বিশেষ এক ধরনের কোষের। নাসারন্ধ্রের ধারে-ধারে যে-সমস্ত টিস্যু রয়েছে, এই কোষগুলো রয়েছে তারই মধ্যে। ভিতরের এই ঘ্রাণ-কোষ [illegible] কণিকাকে চিনে নিতে পারে, কতখানি ঘ্রাণ আছে তার মাপ নেয়, তার পরে নার্ভ মারফৎ সেই খবর পাঠিয়ে দেয় মস্তিষ্কে।

সঙ্গের এক নম্বর ছবিটি ঘ্রাণ-কোষের, অনেক বড়ো করে দেখানো। কোষটি দুই মেরু বিশিষ্ট। তার দেহটি অণ্ডাকার। কোষের প্রত্যন্ত অংশ থেকে ছড়িয়েছে দণ্ডের মতো চেহারার একটি ব্যাপার আর তা শেষ হয়েছে বাইরের সীমানার ঝিল্লীতে। এই শেষ হওয়ার জায়গাটি গোল আর বড়ো, একটি ফোসকার মতো, বলা যেতে পারে ঘ্রাণ-ফোসকা। এই ফোসকা থেকে ঠেলে বেরিয়ে শ্লেষ্মা পর্যন্ত গিয়েছে কতকগুলো অতিসরু চুলের মতো ফিলামেন্ট। এগুলোকে বলা হয় সিলিয়া। কোষের অপর দিকটি ক্রমেই সূক্ষ্ম হয়ে মস্তিষ্ক পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

এই হচ্ছে ঘ্রাণ-কোষ। এই ঘ্রাণ-কোষের যে অংশটি আমাদের আলোচনার পক্ষে বিশেষ দরকারী তা হচ্ছে সিলিয়া—অতি সরু চুলের মতো কতকগুলো ফিলামেন্ট। ঘন একটা জালের মতো এগুলো ছড়িয়ে থাকে শ্লেষ্মার ওপরে আর গন্ধযুক্ত কণিকাগুলো এই জালেই ধরা পড়ে। এখনো পর্যন্ত যতোটুকু জানা গিয়েছে তা থেকে বলা চলে, নাকে গন্ধ ধরা পড়ার প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ক্রিয়াটি এই সিলিয়ার ঝিল্লিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে ঠিক কিভাবে এই গন্ধ-রূপ উদ্দীপকটি বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত হয়, যে-সঙ্কেত নার্ভ মারফৎ গিয়ে পৌঁছয় মস্তিষ্কে, তা এখনো পুরোপুরি জানা যায় নি। শুধু এটুকু বলা চলে এ-দুয়ের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক।

সিলিয়া আরো একটি বড়ো কাজ করে থাকে। সিলিয়া ছড়ানো রয়েছে ঘন একটি জালের মতো। ফলে প্রত্যেকটি গন্ধ-কোষে গন্ধ-ধরার এলাকার আয়তন অনেকখানি বেড়ে যায়। মানুষের নাকের এক-একটি দিকে সমস্ত সিলিয়ার মোট আয়তনের পরিমাণ ৩০ থেকে ৫০ বর্গ-সেন্টিমিটার পর্যন্ত। অর্থাৎ সিলিয়ার গ্রাহক ঝিল্লী যেন দুটি মস্ত জাল, যাতে রাসায়নিক সাড়া জাগে। অপর ছবিতে শিল্পীর কল্পনায় এ-ব্যাপারটি দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা যখন নাক দিয়ে বাতাস টানি, এই জালে তা বিশ্লেষিত হয়। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে ঘ্রাণ-কোষ দ্বারা ব্যাপ্ত এলাকাটি মানুষের চেয়ে যথেষ্ট বড়ো। মানুষের চেয়ে এই সব প্রাণীর গন্ধ ধরার ক্ষমতা কেন বেশি, সম্ভবত এই তার একটি কারণ।

কিছুকাল আগেও অনেকের ধারণা ছিল যে, গন্ধযুক্ত কণিকা থেকে একটা কিছু বিকীরণ ঘটে আর তা থেকেই নাকে গন্ধ ধরা পড়ে। এখন স্পষ্টভাবেই বলা চলে, গন্ধযুক্ত কণিকাগুলো গন্ধ-কোষের সরাসরি সংস্পর্শে এলে তবেই গন্ধ ধরা পড়ে। তবে সিলিয়ায় পৌঁছবার আগে গন্ধযুক্ত কণিকাগুলোকে পার হতে হয় শ্লেষ্মার অতি পাতলা একটি জলবৎ স্তর। সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে, গন্ধ ধরা পড়ার প্রক্রিয়ার এই হচ্ছে প্রথম পর্ব। এর ফলে সিলিয়ার ঝিল্লির পরমাণুর বিন্যাসে কিছু অদল-বদল ঘটতে পারে এবং ঝিল্লির বিশেষ বিশেষ অবস্থানে গন্ধযুক্ত কণিকাগুলো স্থান করে নিতে পারে। ঠিক কী চেহারায় ব্যাপারটি ঘটে তা এখনো গবেষণার বিষয়। তবে একথা ঠিক, শুধু পরমাণুর বিন্যাসগত অদল-বদল নয়, অন্য নানাভাবেও গন্ধযুক্ত কণিকাগুলো গন্ধ কোষকে প্রভাবিত করে থাকে।

পর্যন্ত এই লক্ষ-কোটি বছরে জীবদেহের উদ্ভিদ রূপান্তরিত হয়ে সম্ভবত। এই রূপান্তরণের প্রমাণ বিজ্ঞানীদের হাতে আছে ই রূপান্তরণ ঠিক কিভাবে হয়েছে, ক্ত চেহারাটি এখনো বৈজ্ঞানিক বিষয়।

### চো সম্পর্কে জানবার কথা

চো নামক জীবটিকে আমরা যে পছন্দ করি মনে হয় না। জলের, ও আকাশের হরেক রকমের জীব রূপকথায় ও উপকথায়-য়ায় ভিড় করে আছে, আধু-কবি চিল নিয়েও কবিতা ন, আধুনিক চলচ্চিত্রকার অরণ্যের ভূমির জীবদের বিচিত্র জীবন-দেখাতে গিয়ে কাকতাড়ুয়াকেও ন নি, তিমি মাছ নিয়ে বিশ্ব-র স্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, পাখি নিয়ে লেখা এক-একটি উপন্যাসের সংখ্যা বড়ো কম নয়। গুনগুন, পাখির পালক, লেজ ও আরো অনেক কিছুই আমাদের কাছে ভাবপ্রকাশের রূপকল্প— কেঁচো? এই বিশাল প্রেক্ষাপটে স্থান বড়ো একটা নেই। কোনো লেখক মেরুদণ্ডহীন ভীরু স্বভাবের ক কেঁচোর সঙ্গে তুলনা করে াই করুন কেঁচো নামক জীবটি জ্ঞানের পরিচয় দেন নি।

জীববিজ্ঞানীদের কাছে অবশ্য কি কি ব্যাঙ, কি আরশোলা সবই আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের বিষয়। জীব-নের প্রাথমিক ছাত্রকে পর্যন্ত অন্য কিছুর সঙ্গে কেঁচো সম্পর্কেও হয়। ব্যবচ্ছেদ-পাত্রে দুটি মাত্র সাহায্যে একটি জ্যান্ত কেঁচোকে নিয়ে ছুরি চালানোর দক্ষতার হয়ে তবেই তাকে নিজের চোখে র শরীরের অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান হয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, লম্বা একটা সুতোর মতো কেঁচোর টাই ব্যবচ্ছেদবিদ্যায় তাকে পাকা করে । কেঁচোর শরীরে ছুরি চালনায় হাত নিশপিশে ভুল করবে, এমন বনা কম। কেঁচো এদিক থেকে অবশ্যই চ্ছেদবিদ্যা-শিক্ষার্থীর পক্ষে উপকারী ।

আজকের বিজ্ঞানের কথায় কেঁচোদের র্কে অন্য ধরনের একটি খবর জানাতে যা থেকে ধারণা হবে জগৎসংসারে আমাদের জীবনধারণের পক্ষেও এই জীবটির ভূমিকা কম উপকারী নয়।

খবরটি এই : যে-জমিতে কেঁচো আছে সেই জমির গাছ অধিকতর বাড়ন্ত হয়ে থাকে।

খবরটি নতুন নয়। শত একশো বছরেরও বেশি কাল ধরে জমি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মুখে শোনা গেছে। বিবর্তনবাদ তত্ত্বের প্রবক্তা বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে গিয়েছেন। তাঁদের ধারণা ছিল, কেঁচো ও জমির ভিতরকার অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী মৃত উদ্ভিদের জৈব পদার্থকে জমির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, জমির চূর্ণভাসাধন করে, জমিকে আলগা করে দেয় এবং তার ফলে জমি থেকে পাওয়া যায় আরো বেশি পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও উদ্ভিদের বাড়বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য জরুরি পদার্থ। তবে একশো বছরেরও বেশি কাল ধরে এই কথাগুলো যদিও বলাবলি হচ্ছিল কিন্তু এতদিন হাতেকলমে পরীক্ষা করে কেউ প্রমাণ উপস্থিত করেন নি যে, উদ্ভিদের আরো বাড়বৃদ্ধির জন্যে ও আরো ফলনের জন্যে জমির মধ্যেকার এই লক্ষণগত পরিবর্তনগুলো কতখানি জরুরি।

ফ্রান্সের দিঁজতে অনুষ্ঠিত জমি-সংক্রান্ত প্রাণীবিদ্যার চতুর্থ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে (সেপ্টেম্বর, ১৯৭০) দুজন গবেষক স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভিদের বাড়বৃদ্ধি ঘটাবার ব্যাপারে কেঁচোর ভূমিকা সম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রমাণসহ উপস্থিত হয়েছেন।

একজন হচ্ছেন কানাডার ওন্টারিওর মৎস্য ও অরণ্য বিভাগের ভি জি মার্শাল। তিনি কয়েকটি টবে পাইন জাতীয় গাছের চারা পুঁতেছিলেন। কোনো কোনো টবে ছিল সাধারণ মাটি, কোনো কোনো টবে জীবন্ত বা মরা কেঁচো সমেত মাটি। তারপরে উনিশ মাস ধরে তিনি সেই চারাগাছগুলোর শেকড়, কাণ্ড ও শাখার মাপ এবং ওজন নিয়েছিলেন। পরীক্ষার শেষে দেখা গেল যে-সব টবের মাটিতে কেঁচো ছিল সেখানকার চারাগাছের কাণ্ড বেশ লক্ষণীয় রকমের বেশী ভারী ও অপেক্ষাকৃত মোটা, শেকড়ের বুনট অনেক ঘন। যে-সব টবের মাটিতে কেঁচো ছিল না সেখানকার চারা-গাছ এমনটি নয়। তারপরে তিনি বিভিন্ন টবের জমির উর্বরতা বিশ্লেষণ করে দেখলেন। কেঁচো সমেত জমিতে নাইট্রো-জেন, ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম পাওয়া গেল অনেক বেশি, কিন্তু পটাসিয়াম কম। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, জমির এই তারতম্যের দরুনই কেঁচো সমেত জমির চারাগাছের বাড়বৃদ্ধি বেশি। এই পরীক্ষাকার্য চালাতে গিয়ে আরো একটি ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত টানতে পারলেন। অনেকের ধারণা, অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শরীর জমির সঙ্গে মিশলে জমির উর্বরতা বাড়ে। কিন্তু মার্শাল দেখলেন মরা কেঁচো সমেত জমির চারাগাছে আর কেঁচোহীন জমির চারাগাছে কোনো পার্থক্য নেই। এ থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত, ধারণাটি ভুল, অ-মেরুদণ্ডী প্রাণীর পচনশীল শরীর জমির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়।

চিত্র—এক

দ্বিতীয়জন হচ্ছেন হল্যাণ্ডের আর্ন-হেমের জে ভান রী। তিনি পরীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন ফলের বাগানে। ছটি ফলের বাগানে প্রত্যেকটি গাছের চারদিককার জমিতে তিনি কেঁচো ছেড়েছিলেন ছশোটি করে। তারপরে পর-পর দুটি বছর তিনি এই কেঁচোযুক্ত বাগানের গাছের বাড়বৃদ্ধির সঙ্গে কেঁচোহীন বাগানের গাছের বাড়-বৃদ্ধির তুলনা করেছিলেন। শেকড়ের সংখ্যা গণনায় দেখা গেল কেঁচোযুক্ত বাগানের গাছে শেকড়ের সংখ্যা ১৬ থেকে ১৯ শতাংশ বেশি। জমির উর্বরতা বিশ্লেষণেও কেঁচোযুক্ত বাগানের জমির স্থান উঁচুতে।

আজকাল চাষের কাজে অনবরত কীট-নাশক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই কীটনাশক রাসায়নিক কেঁচোকেও ধ্বংস করে। ফলে জমির ফলন কমে যাবারই সম্ভাবনা।

দেখা যাচ্ছে কেঁচো নিতান্ত তাচ্ছিল্য করার মতো জীব নয়। জমির ফলন বাড়িয়ে তুলতে পারে যে জীব তার কদর অবশ্যই থাকা উচিত।

### গানের সুরে ঘুম

বিশ্বের দেশে দেশে গানের সুরের বিচিত্র ব্যবহার শুরু হয়েছে। কানাডার ও সোভিয়েত ইউনিয়নে গানের সুর বাজিয়ে শাকসব্জির ফলন বাড়ানো হচ্ছে। গানের সুর শুনতে শুনতে কাজ করলে কারখানার শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা নাকি বেড়ে ওঠে। সম্প্রতি বিলেতের একটি ডাক্তারী পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, কোনো একটি হাসপাতালে নাকি অনিদ্রার রোগীদের গানের সুর শুনিয়ে ঘুম পাড়ানো হচ্ছে।

হাসপাতালের এই ওয়ার্ডে রোগীর সংখ্যা ছিল বাইশ। প্রত্যেককেই ঘুম

# খোকা ঘুমালে

বাচ্চাকে খাওয়ানো-দাওয়ানো যেমন এক সমস্যা তেমনি ঘুম পাড়ানোও এক বিরাট সমস্যা। প্রত্যেক মা-বাবাকেই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শিশু যে সব সমস্যা বহুল প্রশ্নের অবতারণা করে গোড়া থেকেই তার সূত্রপাত ঘটে। এজন্য খুব একটা ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এসব সমস্যা বহুল প্রশ্নের অর্থ এই নয় যে খুব একটা অবহেলা চলতে পারে। বরং সময় বুঝে অভিজ্ঞ মানসিক চিকিৎসকের দরবারে সমস্যাসহ শিশুটিকে হাজির করা দরকার। ঘাবড়ানোর কিছু নেই এজন্য যে, শিশুর কোন অভ্যাসই খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু যদি শিশুকে অবহেলা করা হয় এবং তার জন্য ভাল ব্যবস্থা না হয় তবে সেই অভ্যাস ভবিষ্যতে খারাপ রূপ নিতে পারে। এর অর্থ হলো এই যে, শিশুকাল থেকেই অভ্যাস বিকশিত হয়।

শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সমস্যায়ও এই একই কথা। অভ্যাস গঠনের ব্যাপারে এসময় থেকে নজর দেওয়া সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বয়স্ক ব্যক্তিদের আচার-আচরণে শিশুকে বিশেষ প্রভাবিত করে। তাই দেখা যায়, এসময় তার খাওয়া-দাওয়ার যেমন অভ্যাস করানো যায় ভবিষ্যতে ঐই চরিত্রের অঙ্গ-রূপে প্রকাশ পায়। অনেক শিশু আছে যারা দুধ খেতে চায় না অথবা বোতলের দুধেও সে গররাজী। খাওয়ার কথা শুনলেই সে উচ্চস্বরে কান্না জুড়ে দেয়। মা-বাবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা প্রলোভন দেখিয়ে শিশুকে সাময়িক নিবৃত্তি করেন। সেই শিশুবেলায়ই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাওয়ানো একান্ত অসম্ভব। এই ইচ্ছার জোর আস্তে আস্তে খাওয়া থেকে অন্যত্রও প্রসারিত হয়। ফলে, শিশুচরিত্রের উন্মেষে যথেষ্ট ত্রুটি থেকে যায়। সে মনে করে মুখের জোরে সবের দাবী আদায় করে নেওয়া খুবই সহজ।

আবার কোন কোন মা শিশুকে দুধের বোতল দিয়ে ঘর-সংসারের কাজে মেতে থাকেন। শিশু হয়তো খাচ্ছে না অথবা কান্নাকাটি করছে। মায়ের কিন্তু সেদিকে নজর দেবার ততটা অবসর নেই। তিনি আপন মনে কাজই করে চলেছেন। শুরুতেই শিশুরা এক্ষেত্রে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। এতে তাদের চরিত্রে বেশ দাগ পড়ে। এসব শিশুরা একটু উগ্র মেজাজী হয়। মা-বাবার দোষে এভাবেই শিশুর জীবন হয়ে ওঠে নিরাশাপূর্ণ। যদি শিশুকে যথার্থ মানুষ করে গড়ে তুলতে হয় অর্থাৎ সব মা-বাবাই যা চান, তবে এ সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে। কারণ, এই সামান্য সব ঘটনা থেকেই তার মনে নানা বিরোধের সৃষ্টি হয়। সে এর বদলা নিতেও ছাড়ে না। নির্ধারিত সময়ে মা যখন আবার তাকে স্তনপান অথবা বোতলের দুধ খাওয়াতে আসবেন তখন সে কামড়াতে শুরু করবে। এসময় মুখই হলো তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

এরকমভাবে শিশু বেড়ে ওঠে। শিশুকালে কান্নায় বাজিমাৎ করার ঘটনা থেকেই তার চরিত্রের বিকাশ। বড় হয়েও সে নিজের কথাকে নষ্ট হতে দেবে না। এর প্রথম এবং স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যাবে সে যখন কথা বলতে শিখবে। তার কথা হবে কটু এবং আচরণ হবে নির্দয়।

বাচ্চা যখন দু-তিন বছরে পা দেবে তখন তার আচার-আচরণে ভাল-মন্দের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। এসময়ে মা-বাবা এবং অভিভাবকদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার। অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং যত্নের সঙ্গে শিশুর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। তাহলেই শিশুর চরিত্র হবে সুগঠিত এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ।

কখনো কখনো শিশু মা-বাবাকে ছাড়িয়ে চিকিৎসককেও এক বিরাট সমস্যায় ফেলে দেয়। শিশুকে ঘুম পাড়ানো নিয়ে সবাই বিব্রত। কেউ কেউ বলেন যে, যেমন সময়ে খাওয়া-দাওয়া তেমনি সময়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানো দরকার। এই অভ্যেস যদি করানো যায় তবে তা তো খুবই ভাল। কিন্তু তা বলে মা-বাবাকে এরকম পরামর্শ দেওয়া সংগত নয় যে, বাচ্চা যদি নির্দিষ্ট সময়ে শুতে কিছু আপত্তি করে তো তাকে জোর করে শুইয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে কান্না বন্ধের জন্য যেমন মিষ্টি ঘুষ দেওয়া হয় তেমনি এবার ঘুমের জন্য ওষুধ খাইয়ে দিতে হবে। এর ফল হয় খুবই মারাত্মক। এর কুফল আর সবকিছুর মতো পরেই ফলে।

শিশুকে ঘুম পাড়ানোর ব্যাপারটা একান্তভাবেই মায়ের। তার ঘুমের জন্য এমন কোন পন্থা বের করতে হবে যে, একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার ঘুমের জন্য তাকে বলতে হবে না। সে ঠিক সময়মাফিক শুয়ে পড়বে। বাচ্চা যখন আর বাচ্চা থাকে না অর্থাৎ চলতে ফিরতে পারে, হেসে খেলে কথা বলে বাড়ির সবাইকে আনন্দ দেয় তাকে ঘুম পাড়ানোর ব্যাপারেও অনেক সময় এই সমস্যার উদ্ভব হয়। এসময় আবার তাকে শোয়ানোর জন্য চেষ্টা করলেও সে এতে মোটেই সন্তুষ্ট হয় না। ইংল্যাণ্ডের এক বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ আর এস ইলিংওয়ার্থ ঘুমের ব্যাপারে শিশুকে কেন্দ্র করে মায়ের মনে যে শংকার সৃষ্টি হয় তিনি তার প্রতিকারের পথ বাৎলে দেন।

প্রত্যেক বাচ্চারই নিজের নিজের শোবার একটা সময় আছে। এজন্য বিশেষ-ভাবে নজর দেওয়া দরকার যে এই নির্দিষ্ট সময়টুকুতে সে কি করে, ঘুমোয় না জেগে থাকে? বাচ্চা রাত্রিবেলা শোবার আগে কিছুক্ষণ জেগে থাকে এবং ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুক্ষণ আগেই তার ঘুম ভেঙে যায়। এজন্য বিশেষ চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ, শিশুর কখন শোওয়া উচিত এবং কতক্ষণ শোওয়া উচিত সে ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে।

শিশুর শোওয়ার ব্যাপারে মায়ের নজর দেওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত দু-তিন বছর পর্যন্ত এ সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকা

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

এসব নিয়ে বীথুর কোন মাথাব্যথা নেই। ও স্পষ্ট করে বলে, গায়ের উপর মাছি বসলে তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কি। এ নিয়ে খুঁতখুঁত না করে নির্বিকার থাকবি মীরা। অত বাছলে রাস্তায় বেরোন যায় না।

বীথুকে চোখের ইসারায় নামতে বলে মীরা। আবার ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি। যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে নামল সে। বীথু দু হাত দিয়ে কাপড় ঠিকঠাক করতে থাকে। হাসি হাসি মুখ। গা জ্বলে যায় ওর হাসি দেখলে। অন্য পুরুষের ছোঁয়া খুব ভাল লাগে বুঝি মুখপুড়ি! ইতর লোকগুলিকে যদি স্যাণ্ডেলের বাড়ি মারতে পারতো!

একটা রিকসা ডেকে উঠল দুজনে। বীথু বক্‌বক্‌ সুরু করেছে। ওর প্রেমিকের গল্প। অনেক শুনেছে মীরা আর ভাল লাগে না শুনতে। অথচ আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে। নইলে চটে যাবে বীথু। মুখ কালো করে কথাই বন্ধ করে দেবে। কী রে শুনছিস তো?

হ্যাঁ শুনছি বীথু। তারপর?

বাড়ির কাছাকাছি রিক্‌সা আসতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মীরা। বীথু ভাড়া দিতে গেলে ধমক দিয়ে বলল, ইয়ার্কি মারিস না। বলে তাড়াতাড়ি ভাড়া মিটিয়ে দেয়।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই পল্টুকে দেখল। একটা বেলুন নিয়ে খেলছিল। ওকে দেখে ছুটে এল। দু' হাত দিয়ে জাপটে চিৎকার করে ওঠে, আমার বল কোথায় মামণি। কই দাও।

মীরা কোলে তুলে নিল পল্টুকে। বীথুকে বলল, ওঘরে চল। ঝিং পল্টু সোনা। দুষ্টুমী করে না। কী ভাববে তোমার এই মাসীটা। তোমার বীথুমাসী। দেখবে চল, তোমার জন্যে কী এনেছি।

পল্টু ঘাড় ফিরিয়ে বারবার বীথুকে দেখতে থাকে।

সবার সঙ্গে বীথুর পরিচয় করিয়ে দেয়। নীহার খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। দু' চারটি কথাবার্তার পর কাজের অজুহাতে সরে যান। মীরা খানিকটা বোঝে। স্নায়ুযুদ্ধের ফলাফল কী হবে তা সে জানে না। আজকাল বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ। শেফালীর সঙ্গে আলাপ করছে বীথু। স্বাভাবিক সাবলীল আলাপ। বীথুর কোলে পল্টু। দু' চোখ বড় বড় করে ওদের মুখ দেখছে। দাদা বাড়ি ফেরেনি এখনও। মনে পড়ল ওর সঙ্গে বেশ জরুরী কথা আছে।

—তোমরা কথা বল। এখুনি আসছি।

দিব্যি বীথুর কোলে পল্টু চুপচাপ। হাসল মনে মনে মীরা। বীথু নিশ্চয়ই অনেক কিছু ভাবছে। বারান্দা দিয়ে এগোবার সময় রান্নাঘরে উঁকি মারল সে। উনুনের দিকে মুখ করে প্রস্তরমূর্তির মত মা বসে।

সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নামতে থাকে মীরা। এই প্রথম বীথু এল বাড়িতে। খালি এক কাপ চা দেওয়া যায় না। কাছেই দোকান। মিষ্টি আর সিঙ্গাড়া কিনে ফিরল মীরা। কী অসভ্য ছেলেগুলি! শিস দিয়ে উঠল। ছ্যাবলার মত হাসি। অশ্লীল উক্তি দূর থেকে ছুঁড়ে মারা। রীতিমত এখনও বুক কাঁপছে। আবছায়া অন্ধকারে রোয়াকে বসে থাকলেও গলার স্বরে চিনেছে। এ বাড়ির কয়েকটা বখাটে ছোকরা।

ঘরে ঢুকে মীরা বলল, রাস্তা থেকে হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কী ব্যাপার বৌদি?

—এমন কিছু নয়। বীথু হাসিমুখে বলে, এবার উঠতে হয়। ভারী লক্ষ্মী ছেলে পল্টু। খুব ভাব হয়ে গেছে আমার সঙ্গে।

—বসুন। এত তাড়াতাড়ি আপনাকে ছাড়ছি না।

শেফালী বেরিয়ে যেতেই বীথু স্পষ্ট চোখে তাকায় মীরার দিকে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখল। বহু কথা জমে রয়েছে। হুড়মুড় করে সব একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

—চুপ! মীরা শাসনের ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বলল, কোন কথা নয়। সব জানাবো তোকে। ছেলেটা দেখছি এরই মধ্যে তোর খুব ন্যাওটা হয়েছে। নিবি ওকে?

পল্টুকে জড়িয়ে আলতো চুমু খেল বীথু, পারবি দিতে? আমার কিন্তু আজ রাত্রে ঘুম হবে না। সত্যি, তোকে বাইরে থেকে দেখলে...। চুপ করে যায় সে। শেফালী ঘরে ঢুকল। মিষ্টি হেসে প্লেট চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়।

—ওকে দে আমার কাছে। মীরা এক-রকম জোর করে পল্টুকে কোলে নেয়। পল্টু কিছুতেই আসবে না। বীথু মাসি খুব ভাল। তুমি শুধু বকো। কিছু কিনে দেও না। তুমি খারাপ দুষ্টু!

তিনজনে খুব হাসল। বীথু একা কিছুতেই খাবে না।

—ঢং করিস না। মীরা চোখ পাকায়, খিদে পেয়েছে অথচ বাইরে ভদ্রতা করছিস।

কিছুক্ষণ পর বীথু বিদায় নেয়।

শেফালী হাসিমুখে [illegible], [illegible] [illegible] আসবেন বিনয়।

—[illegible] বউদি? বিনয়দার সঙ্গে আলাপ হবে না। [illegible] [illegible] রোববার।

সন্ধ্যা [illegible] [illegible] [illegible] না শেফালী। নিশ্চয়ই যাবে। যাওয়ার আগে মীরার কাছে খবর নেবে। পল্টুকে কোলে নিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় শেফালী।

শোভাবাজারের মোড়ে ট্রামে তুলে দেয় বীথিকে। হাঁটতে হাঁটতে সংক্ষেপে বীথির প্রশ্নের জবাব দেয় মীরা। অসংখ্য প্রশ্ন। বুক ভার হয়ে ওঠে। গলা কেঁপে যায়। ফেরার পথে দ্রুত হাঁটে। কে জানে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে সে! রজত একদিন বাড়িতে এসে হাজির হতে পারে। এই চিন্তা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে দাদার মুখোমুখি হল।

কোন কথা বলল না বিনয়। কেমন অস্বাভাবিক গম্ভীর চোখমুখ। মীরা ভাবল আজ কোন আলোচনা করবে না। কাল সকালে দেখা যাবে। ঘরে ঢুকে দেখল চিৎ হয়ে পল্টু ঘুমিয়ে। ঝুঁকে ওর কপালে একটু চুমু খেল। ওর পাশে শুয়ে পড়ল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ল টের পেল না।

।। আট ।।

বাইরে প্রকাশ না করলেও, হাসি হাসি মুখ, খুব স্বাভাবিক, যেন কিছু হয়নি; মীরার হাবভাব দেখে মনে মনে হাসে বিনয়। তুমি একটু কথা বলো দাদা, দ্যাখ লোকটা কী চায়, এভাবে পথে ঘাটে পিছু নেয় কেন। দেখবে যে কি। যদিও কাজটা কঠিন। রীতিমত অস্বস্তিকর। তবু কথা দিয়েছে, হ্যাঁ যাবে রজতদার কাছে, স্পষ্ট আলোচনা করা দরকার।

ভয় পেয়েছে মীরা। অতএব কিছু করা দরকার। বিনয় জানে না, আলাপ আলোচনার ফলাফলটা শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

টেলিফোনে সব কথা বলা যায় না। তবু রজতদা কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে, কী দরকার? প্রতিবার উত্তর দিয়েছে বিনয়, জরুরী কথা আছে। কখন দেখা হবে?

আজ এক পিরিয়ডের পর আর ক্লাস হয়নি। ছাত্ররা স্ট্রাইক করেছে। কারণ কী সঠিক সে জানে না। খুব একটা কৌতূহল প্রকাশও করেনি। সোজা বাড়ি চলে এসেছে।

—এত তাড়াতাড়ি ফিরলে? শেফালীর চোখমুখ ফোলাফোলা। তাড়াতাড়ি সে মাথার কাপড় ঠিকঠাক করতে থাকে।

—স্ট্রাইক। পাঞ্জাবি খুলে আলনায় রাখে বিনয়, কী একটা ব্যাপারে ছাত্ররা স্ট্রাইক করেছে।

সাতটার পর রজতদা যেতে বলেছে। অনেকটা সময় হাতে। শেফালীর চুলের গন্ধ বড় তীব্র। বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এল বিনয়। বারান্দায় মা ঘুমিয়ে। পল্টু একপাশে শুয়ে। ওকে দেখে মিট-মিট করে হাসল। কথা বলতে সাহস পেল না। যা গম্ভীর মুখ বিনয়ের। খুব ভয় করে ওকে।

—চা তৈরী করবো? শেফালী হাসি-মুখে ধুতি গেঞ্জী এগিয়ে দেয়।

—একটু পরে। ও কি, যাচ্ছ কোথায়! বলে দুম শেফালীকে কাছে টেনে নেয়। শেফালী কোন বাধা দিল না। বরং আরও ঘন হয়ে আসল বুকের কাছে। বিনয় পরপর কয়েকটা চুমো খায়। আশ্চর্য! কোন উত্তেজনা সে অনুভব করল না। রক্ত তোলপাড় করে উঠছে না। তাকাল শেফালীর দিকে। দুচোখ বোজা। সমস্ত মুখে হাসি। হঠাৎ ইচ্ছে করল দূরে ঠেলে দেয় ওকে। কিন্তু এরকম অস্বাভাবিক আচরণ করা ঠিক হবে না ভেবে অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করল।

বারান্দায় পল্টু হেসে ওঠে। শেফালী পলকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। ঘন ঘন তাকায় দরোজার দিকে। তারপর মৃদু হেসে বিনয়ের দিকে ভ্রূভঙ্গী করে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বিছানায় শুয়ে বিনয় সিগারেট ধরাল। শেফালী হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। কোন রকম চিহ্ন দেখছে না ওর দিক থেকে স্কুলে কাজ নেবার। এ সম্পর্কে একটা কথাও আজ পর্যন্ত বলেনি। বিনয় ভেবে কোন কূল কিনারা পায় না। বরং বিরক্তিতে মনটা বিষিয়ে ওঠে। কী চায় শেফালী? স্পষ্ট কোন দাবি নেই। গতানুগতিক জীবন-যাপন। বিয়ের পর মেয়েরা কী এরকমই হয়ে যায়? দূর ছাই! সে ছাইদানীর ভিতর সিগারেটের টুকরো গুঁজে দেয়। একটু বিশ্রাম দরকার। রজতদাকে কি কি প্রশ্ন করবে ভাবতে থাকে। নিতান্ত মীরার মুখ চেয়ে যাওয়া। নইলে লোকটার মুখদর্শন আর সে জীবনে করতো না! ওর কথা মনে পড়লেই বিতৃষ্ণা জাগে।

—ঘুমোলে নাকি। শেফালী বেশ জোরে কয়েকবার ঠেলা দেয়। দ্যাখ, এরই মধ্যে নাক ডাকা সুরু হয়ে গেছে। এই শুনছো।

পাতলা ঘুম। চোখ খুলে বিনয় প্রসাধিত মুখ দেখল। চায়ের কাপ হাতে শেফালী দাঁড়িয়ে। কটা বাজে? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল। ইস্ ছটা বেজে দশ।

চায়ের কাপ হাতে তুলে চুমুক দিয়ে বিনয় বলল, আরও আগে ডাকলে না কেন। সাতটার মধ্যে পৌঁছতে হবে।

—কোথায়?

একটু ইতস্তত করল বিনয়। মীরা-রজতদা প্রসঙ্গ সবই জানে শেফালী। তবু এ সম্পর্কে আলোচনা করতে তার ভাল লাগে না। মনে হয় কোথায় যেন একটা অসম্মানের ব্যাপার রয়েছে।

কিছু বলার আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় শেফালী। রেগে গেল বোধহয়। মুখ কালো করে চলে গেছে। আপনমনে হাসল বিনয়। দ্রুত পোশাক পাল্টে নিল। এখন সময় নেই দুটো মিষ্টি কথা বা আদর জানানো। এপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে হবে।

বাইরে বেরুবার আগে রান্নাঘরে শেফালীকে দেখল। আনাজ কুটছে। মা মুখোমুখি [illegible]। [illegible] কিছু জানাল না বিনয়। পল্টু [illegible] ক[illegible] পড়েছে। পড়ার মানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাইরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দাঁড়িয়ে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জানালায় [illegible] [illegible]। দ্রুত হাঁটতে লাগ[illegible] নাকে রুমাল চেপে।

বড় রাস্তায় পা দিয়ে ট্যাক্সি ডাকল নইলে ঠিক সময় পৌঁছতে পারবে না। নরম গদী। হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরাল বিনয়। মানুষজন, আলো, সাইন বোর্ড সব উড়ে যাচ্ছে। কোন কিছু স্পষ্ট চোখে পড়ল না। নানারকম ভাবনা উঁকি মারছে। রজতদা কিভাবে প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে কে জানে। যদি অপমান করে করুক। কোন প্রতিবাদ করবে না। মুখ বুজে সহ্য করবে। ফিরে আসবে। আর কোনদিন যাবে না। কোনরকম সম্পর্ক রাখবে না।

ভাগ্য বা নিয়তি এসব সে মানে না তবু এরকম হয় কেন? এত ভুল বোঝাবুঝি পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা, কুশ্রী কলহ পরিণামে বিচ্ছেদ। এসব নাকি নিয়তি। মানুষের করবার কিছু নেই। তাই কী? বেশ সন্দেহ তার। কেননা মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। আধুনিক মানুষ সবকিছুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

মেয়েদের মন বুঝে চলা কী দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিয়ের পর এ-বোধটা তার তীব্র-তর হয়েছে। শেফালীকে ঠিক বুঝতে পারছে না। খুব কাছে অথচ কত দূরে। যখন তখন রাগ অভিমান চোখের জল। মাঝখানে কোলবালিশ রেখে কৃত্রিম ব্যবধানের প্রাচীর সৃষ্টি করা। মাঝরাত্রে নাটকীয় সুরে সংলাপ। অনেক সময় মনে হয়েছে, যে-স্ত্রীলোকটি তার বুকে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদছে, সে কী শেফালী, না অন্য কেউ!

বিমলটা এল না। গত রোববারে আসার কথা ছিল। যাকগে, না এলে কি করা যাবে। দিন দিন কেমন ভোঁতা হয়ে উঠছে ছেলেটা। চেহারার দিকে তাকালে বোঝা যায়। নিছক দিনগত পাপক্ষয়। ভেবে বিনয় শিউরে উঠল। ঐরকম জীবন-যাপন তার কল্পনার বাইরে। পরক্ষণেই মনে হল তার, সহস্র লক্ষ লক্ষ জনতা, রোজ সকালে যারা শহরতলী থেকে ট্রেনে ট্রামে বাসে চেপে শিয়ালদহ স্টেশন পেরিয়ে পিলপিল করে নানাদিকে ছুটে যায়, নিশ্চয়ই কোনখানে তাদের একটা তীব্র চাহিদা আছে বাঁচবার জন্যে। শুধু সেই জানে না।

ক্রমাগত ব্যবহারে সব জীর্ণ হয়ে যায়। শুকনো একঘেয়ে। ঘুরেফিরে একই কথা। আহার ভোজন শয়ন। পরিচিত শরীরের গন্ধ। কথা বলার ঢং হাসি বেড়ানো—ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। অথচ রেহাই নেই। তুমি মরে যেতে পারবে না বিনয়। মরে গেলে সবাই তোমাকে বলবে কাপুরুষ

ফটো: সুভাষ সরকার

...হীন। এরই মধ্যে শেফালীকে তোমার ...ন লাগছে না। কেন?

...আমি জানি না।' বিনয় অস্ফুট ...োক্ত করল। তারপর ড্রাইভারের দিকে ...ল। ঘড়ি দেখল। প্রায় সাড়ে সাতটা। ...দাকে না পেলে, যদি তার দেরী দেখে ...য়ে যায়, সাতটার মধ্যে পৌঁছবার কথা, ...উচিত ছিল শেফালীকে আগে থাকতে ...য়ে রাখা। শেফালীরও কী উচিত ছিল আরও আগে তাকে জাগিয়ে দেওয়া?

...ট্যাক্‌সির মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে ...প্রায় ছুটতে শুরু করল। তার আগে ...একটা ছায়া ছুটছে। ছায়াটা ক্রমশঃ ...হচ্ছে। ছায়াটাকে মাড়িয়ে সে এগিয়ে ...কলিং বেল টিপে রুদ্ধনিশ্বাসে ...ক্ষায় রইল। শব্দ এগিয়ে আসছে। ...প শব্দ।

...রোজা খুলে রজত হাসিমুখে ...নি জানাল, ভেতরে এসো বিনয়। ...মুখোমুখি দুজনে সোফায় বসল। ...রের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

—জাস্ট এ মিনিট। বলে রজত সোফা ...কিচেনে গিয়ে ঢুকল।

...নিঃশব্দে সিগারেট টেনে চলে বিনয়। ...চারিদিকে তাকায়। কোন চিহ্ন রেখে ...মীরা। কীভাবে কথাটা শুরু করবে ...ার সঙ্গে ভাবতে থাকে। রীতিমত ...তকর ব্যাপার। তবু তাকে বলতে ...হাসতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে ...ভব কুশ্রী উত্তেজনা।

...ক-সেল্‌ফের কাছে নীচু হয়ে ঝুঁকে ...বিনয়। নতুন কোন সংযোজন নেই। ...বছর আগের কেনা সব বই। ইতিহাস ...তির বই বেশি। পড়ার অভ্যেস কী ...র এখনো আছে? নাকি এই সব ...আর ভাল লাগে না। তার চেয়ে ...তুন উত্তেজনার মাঝখানে ডুবে থাকা ...মোহময়। শুধু রজতদা কেন, মনে পড়ল তার, অনেকের মুখ ভেসে উঠল, তারা সর্বশ্রেণীর, ফাস্ট লাইফ পছন্দ করছে। নিজের কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্যে নিত্যিনতুন আনন্দের উপকরণ খুঁজছে। সত্যিই কী নিজের কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যায়?

—কী দেখছো?

চমকে ফিরে তাকাল বিনয়। তারপর অপ্রস্তুতভাবে হেসে সোফায় এসে বসল। রজতদা মিটমিট করে হাসছে। বাইরে বেরোবার পোশাক পরে এসেছে। হাল্কা প্রসাধনের গন্ধ টের পেল। উজ্জ্বল চোখ-মুখ। কত বয়স হল রজতদার? প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। মনে হয় না। অনেক কম মনে হয়। দু'চোখের নীচে কালিমা ভাব। প্রসাধনেও তা ঢাকা পড়েনি।

নানারকম খাবার গোল টেবিলের উপর রাখল রামু। তারপর বিনয়ের উদ্দেশ্যে নত হয়ে অভিবাদন করে রান্নাঘরে ফিরে যায়।

—শুরু কর বিনয়। বলে রজত একটা ডিমের চপ মুখে পুরল। ছেলেটা সহজ হতে পারছে না। মনে মনে হাসল সে। বিয়ে করেছে খবর দেয়নি। এখন তাকে টলারেট করতে পারে না। তাকে শত্রুর চোখে দেখে। সব সে জানে বুঝতে পারে। হঠাৎ মনে হল একটু মজা করা যাক বিনয়ের সঙ্গে।

সাত-পাঁচ ভেবে বিনয় খাবারে হাত দিল। এখানে খেতে ওর প্রবৃত্তি নেই। তবু সামনাসামনি তা প্রকাশ করা যায় না। কেমন বাধ-বাধ ঠেকল। স্বেচ্ছায় এসেছে। অনুরোধ জানাতে। চকিতে মীরার মুখ ভেসে উঠল। আর্জি নিয়ে যখন এসেছে তখন অহঙ্কার, মর্যাদাবোধ এসব ভুলে যেতে হবে।

—বিয়ে করেছো শুনলাম।

সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে বিনয়ের মুখ। চোখাচোখি হল। কৌতুকের হাসি কী রজতদার মুখে? কিন্তু এরকম অস্বস্তির কোন অর্থ হয় না। তাড়াতাড়ি সে একটা সিগারেট ধরায়। হাসিমুখে তাকায়।

—ঠিকই শুনেছেন।

—জানালে না কেন?

—এমনি। খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। একরকম কাউকেই জানাইনি।

অসন্তোষ আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত শরীরে। বিনয় কথা বলার সময় একদম তাকায় না রজতের দিকে। বিশ্রীভাবে তাকনো, খুক্‌খুক্‌ করে হাসি, তাকে কী ছেলেমানুষ পেয়েছে। জেনেশুনে ওসব প্রসঙ্গ তোলা কেন বাপু। আসলে তাকে নার্ভাস করতে চায় রজতদা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খেয়াল হল প্রায় ঘণ্টাখানেক হল এসেছে। এবার আসল প্রসঙ্গ তোলা যাক। যথেষ্ট ভনিতা করা হয়েছে।

—শোন রজতদা। বিনয় দ্বিধাহীনভাবে স্পষ্টকণ্ঠে বলল, মীরাকে তুমি মুক্তি দাও। ও ডিভোর্স চায়।

রজত সোফা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলে, গান শোন বিনয়। প্যাটবুনের গান শুনেছো?

আলমারি খুলে মদের বোতল বের করল। টেবিলের উপর দুটো গ্লাস। রেকর্ড বাজছে। মেঝেতে পা ঠুকে তাল দেয় মাঝে মাঝে রজত। গবগব করে সোডা ঢালে গ্লাসে। ফেনা গ্লাস উপচে পড়ে যায় আর কি। বরফের কুচি গ্লাসের ভিতর ফেলে দেয়।

গ্লাসে গ্লাস ঠুকে রজত মৃদু হাসল, চেখে দেখো। এক নম্বর বিলিতি মাল। দেরী কর না বিনয়। পেটে মাল না পড়লে সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলাপ করবে কিভাবে!

এক চুমুকে অনেকটা পান করল রজত। তারপর সিগারেট ধরাল। গ্লাস হাতে সোফার চারধারে ঘুরল কিছুক্ষণ। একটার

পর একটা রেকর্ড বেজে চলেছে। এলভিস্ প্রেসলি। টুইস্ট নৃত্যের ভঙ্গীতে ঘুরপাক খেল কয়েকবার সে।

—অসভ্য! চুপচাপ বসে আছে কেন বিনু। বলে সে গ্লাস বিনয়ের মুখের কাছে তুলে ধরে।

হাত দিয়ে গ্লাস সরিয়ে বিনয় রূঢ়কণ্ঠে বলল, না। এড়িয়ে যেয়ো না রজতদা, কথার জবাব দাও। মীরা ডিভোর্স চায়। কেন তুমি ওকে অনুসরণ কর? কী লাভ? ও আর ফিরে আসছে না। চিরকালের জন্যে তোমাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। লিভ হার এলোন।

—স্বামী বেঁচে থাকতেও কোন বিবাহিতা রমণী কুমারী সেজে বাইরে চলাফেরা করে, এটা আমার জানা ছিল না বিনয়। এটা ফাঁস হলে ওর অফিসে পজিশন কী হবে জান?

—সেইজন্যেই কী ওর অফিস পর্যন্ত ধাওয়া করেছো? বিনয়ের মুখে ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি, এতটা দুর্বল চিত্ত তোমার, জানতাম না। লিভ হার এলোন রজতদা। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি।

রজতের মুখচোখ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। সোফা ছেড়ে সে রেডিয়োগ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। ক্ষিপ্রহাতে সুইচ অফ করে সোফায় এসে বসে। সিগারেট ধরাবার সময় আগুনের শিখা বারকয়েক কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝে তাকায় বিনয়ের দিকে।

হঠাৎ সে চিৎকার করে ডাকল রামুকে। এবং হন্তদন্ত হয়ে রামু ছুটে আসলে টেবিলের উপর থেকে কাপ-প্লেট সব সরাতে নির্দেশ দিল।

রামু বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রজত ঠাণ্ডা গলায় বলল, আবার আমাকে উঠতে হবে বিনয়। বলে সে এক চুমুকে গ্লাসের সবটুকু মদ গিলে নেয়। সমস্ত মুখটা বিকৃত হয়ে যায়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

একদম পাত্তা দিচ্ছে না রজতদা। বেহেড মাতাল কোথাকার! ইচ্ছে করছিল বিনয়ের, লোকটাকে ধরে দু-চার ঘা লাগিয়ে দেয়। ক্রোধে ওর সর্বশরীর জ্বলছিল। কোন জবাব দেবে না। ইচ্ছাকৃত এড়িয়ে যাওয়া। এখন ফিরে গিয়ে মীরাকে সে কী বলবে। নাকি দিনের পর দিন মীরা ঘরে-বাইরে অসম্মান, অস্বস্তি ও ভয়ের মধ্য দিয়ে দিন কাটাবে?

—যাই কর রজতদা, এটা মনে রেখ, মীরার অসম্মান আমি সহ্য করবো না।

আর অপেক্ষা করে লাভ কি। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে বিনয় নীচে নামতে থাকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। কড়া প্রসাধন মেয়েটির সর্বাঙ্গে। অল্পের জন্যে ধাক্কা লাগেনি। একটু সরে দাঁড়াল সে। ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটি ওকে একবার দেখে উপরে উঠে যায়।

কে মেয়েটি? ফুটপাতে পা দিয়ে বিনয় আস্তে আস্তে হাঁটে। কোথায় গেল? রজতদার ঘরে কী? চারিদিকে কোলাহল। নরনারীর মিছিল। রেস্টুরেন্ট থেকে উজ্জ্বল হাসি বাইরে ছিটকে আসছে। রজতদার ঘরে মেয়েটি যেতে পারে। হয়তো ওকে নিয়ে বেরোবে। বেশ যা ইচ্ছে সে করুক। কিন্তু তুমি রজতদা, মীরার পিছনে লেগেছো কেন। তুমি যত খুসী মদ খাও, নিত্যিনতুন মেয়েছেলে এনজয় কর, সে তোমার ব্যাপার। আমরা নাক গলাবো না। তেমনি তোমারও উচিত নয় মীরাকে বিরক্ত করা।

বাড়ি ফেরা পর্যন্ত বিনয় নিজের সঙ্গে নিঃশব্দে কথা বলে চলল।

বারান্দায় পা দিয়ে প্রথমেই মীরার মুখোমুখি হল। ওর দুচোখে অসংখ্য প্রশ্ন। বিনয় মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে হেঁটে নিজের ঘরে চলে আসে। ওর হাবভাব দেখে মীরা নিশ্চয়ই সব অনুমান করতে পারছে। পারা তো উচিত।

ঘর অন্ধকার দেখে বিনয় অনুচ্চস্বরে ডাকল, শেফালী! শেফালী! পর পর কয়েকবার। কোন সাড়াশব্দ নেই। অভ্যাসমাফিক সুইচ টিপে আলো জেলে দেয়। মশারীর ভিতর শেফালী। মশারী অল্প তুলে ওর ঘুমন্ত মুখ দেখল কিছুক্ষণ। ঠোঁটদুটি সামান্য ফাঁক। গোলাকার দুই উরুর মাঝখানে কোলবালিশ।

—এই শুনছো। বাহু ধরে বেশ জোরে নাড়া দিতে শেফালী অস্ফুটস্বরে দুর্বোধ্য কিছু উচ্চারণ করে চোখ খুলল। বিনয় হাসিমুখে ডাকাল। 'ওঠ শিগ্গী। সবে নটা বেজেছে।। শরীর খারাপ?' বলে সে ঝুঁকে চুমু খেতে গেলে শেফালী সবেগে দূরে সরে যায়।

বিনয় বিমূঢ় দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করল শেফালীকে। এখনও রাগ যায়নি। মনে মনে হাসল সে। পোশাক পাল্টে নিল দ্রুত। তারপর বাথরুমে। রান্নাঘরে জোরে জোরে কে কথা বলছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসল সে। ফের সুরু হয়েছে কলহ। ছিঃ এ কী কুশ্রী ভাষা পরস্পরের দিকে ছুঁড়ে মারছে।

—আস্তে মা। মীরা, এখান থেকে উঠে যা।

এর বেশি কিছু বলতে পারল না বিনয়। ক্রোধে তার সর্বশরীর ঠকঠক করে কাঁপছিল। ছি! ছি: মনে মনে উভয়কে সে ধিক্কার জানাল।

চলে যাবার মুখে নীহার বাধা দিলেন, শোন বিনু। ওর কথা শুনে গা পিত্তি জ্বলে যায়! পল্টুকে নাকি আমি খারাপ কথা শেখাই। আমার জন্যে নাকি ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

—একশোবার! মীরা ফুঁসে উঠল। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

—তোমার মুখে পোকা পড়বে। নী[illegible] কান্নাবিকৃত কণ্ঠে বলেন, নচ্ছার [illegible] কোথাকার! দুটো পয়সা রোজগার ক[illegible] অমনি লোকের মাটিতে পা পড়ে না। [illegible] বিনু, ওর লম্বা লম্বা বাহার দ্যাখ। [illegible] মতলব বুঝি না ভেবেছিস। ছি-ছি! যে[illegible] মরে যাই।

তারপর প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়[illegible] নীহার। কখন এক ফাঁকে শেফালী [illegible] দাঁড়িয়েছে। সে দুহাতে নীহারকে জড়ি[illegible] সরিয়ে নিয়ে যায়।

স্তম্ভিত চোখ বিনয়ের। মীরার [illegible] ফ্যাকাশে। ওর দিকে তাকিয়ে কিছু বল[illegible] চেষ্টা করল সে' শুধু ঠোঁট দুটি ন[illegible] উঠল কয়েকবার। মীরা দ্রুত ছুটে [illegible] নিজের ঘরে। সশব্দে খিল এঁটে দেয়।

রাত্রে কেউ খেল না। ঘরে ঘরে আ[illegible] নিভে যায়। বিনয় চুপচাপ শুয়ে রইল[illegible] শেফালীর আচরণ বিরক্তিজনক। মাঝখা[illegible] কোলবালিশ। এত ক্রোধ কেন তোম[illegible] শেফালী। কথা বলায় প্রবৃত্তি তার নে[illegible] বারান্দায় নেই কোন সাড়া শব্দ। অ[illegible] কান্নার শব্দ সে পাচ্ছে না। এতক্ষণে [illegible] বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর মীরা?

গাঢ় অন্ধকার। পাশ ফিরে তাকা[illegible] বিনয়। শেফালী কী ঘুমিয়েছে? ও হয়তো[illegible] অনেক কিছু ভাবছে। মীরার মুখ রক্তশূ[illegible] হয়ে উঠেছিল। এভাবে কতদিন চলবে জা[illegible] না সে। তার করবার কিছু নেই। নিষ্প[illegible] দর্শকের দৃষ্টিতে শুধু দেখেই যাবে। কে[illegible] শুনবে না তার কথা। না মা, না মীরা।

পরের দিন স্কুল থেকে ফিরতে[illegible] শেফালী নিস্পৃহ কণ্ঠে জানাল, তোমার বো[illegible] চলে গেছে।

—কোথায়? বিনয় বিস্ফারিত চোখে[illegible] তাকাল। তারপর মীরার ঘরে এসে ঢুকল[illegible] খাঁ-খাঁ করছে সমস্ত ঘর। কোন চিহ্ন রেখে[illegible] যায়নি মীরা। কিন্তু কোথায় গেল? তাকে[illegible] কিছু না জানিয়ে চলে গেল!

রান্নাঘরে একরকম ছুটে আসে বিনয়[illegible] নীহার একবার চোখ তুলে তাকালেন।

—আপদ গেছে। হাড় জুড়িয়েছে আমার!

—মা! আর্তকণ্ঠে বিনয় বলল, এসব কি বলছো তুমি। শেষ পর্যন্ত তাড়ালে ওকে!

—কী বললি? আমি তাড়ালাম। নীহার হঠাৎ কপালে করাঘাত করতে শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল অনুনাসিক কণ্ঠে কান্না।

শেফালী রাগত কণ্ঠে বলল, মার কী দোষ। কেউ স্বেচ্ছায় চলে গেলে আমরা কী করতে পারি। মা! উঠুন আপনি। কাঁদবেন না। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি রান্না করছি।

(ক্রমশঃ)

সাঁ স্যুচি থিয়েটার

# এক বিদেশিনী ও কলকাতার মঞ্চ

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

একশ উনত্রিশ বছর আগেকার একটি দিন।

সেদিন সুদূর অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বন্দর থেকে একটি জাহাজ আসছিল কলকাতার পথে। ছোট্ট জাহাজ। নীল সমুদ্রের বুকে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে ভেসে আসছিল জাহাজটি। মাথার ওপর নির্মল নীল আকাশ, নীচে নীল জলের অনন্ত বিস্তার।

জাহাজের মালিকের নাম হেনরী। সেদিন সকালে কিন্তু হেনরীর মনটা বড়োই অপ্রসন্ন। তার চোখে মুখে বড়োই অসহায় ভাব।

ডেকের ওপর স্ত্রীর পাশেই ঐ অসহায় মুখ দাঁড়িয়ে ছিলেন হেনরী। স্ত্রী অভিমান করে দাঁড়িয়ে আছে জলের দিকে তাকিয়ে। সুন্দরী স্ত্রী, তাই তার অভিমান বড়ো প্রবল। শ্রীমতীর মুখের ওপর চোখ রেখে কীভাবে মান ভাঙানো যায়, সে কথাই মনে মনে ভাবছিলেন সাহেব।—শ্রীমতীর [illegible] চুলে সমুদ্রবাতাস তখন উতরোল। ফুলে ফুলে উঠছে কেশদাম। আবার কখনো আবৃত করছে মুখশ্রী—অধর-কপোল-চিবুক। আর নীল চোখে ঝলসে উঠছে 'বে-অব বেঙ্গলের' নীল ঢেউ।

সহর কলকাতার সঙ্গে হেনরীর পরিচয় ছিল অনেক আগে থেকেই। কেননা, বরাবরই তিনি ভাকাবুকো। তাঁর পুরোনাম হেনরী দেরয়্যাজিয়ে। নামেই মালুম যে সাহেব ফরাসী। শৈশব-আজেই এ সাহেবটি ছিলেন অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। বিপদের ভেতর ঝাঁপিয়ে না পড়লে আনন্দ পেতেন না হেনরী। তাই অতি অল্প বয়সে এবং অল্প আয়াসে তাঁর একটি চাকরী জুটে গিয়েছিল বাণিজ্য জাহাজে। সেদিন ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাগ্য প্রসন্ন। ইতিহাস অনুকূল। ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজগুলি পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৈরী করছে নতুন নতুন উপনিবেশ। আর ইউরোপের ঘরে বহন করে নিয়ে আসছে অভাবিত সৌভাগ্য।

হেনরীর ভাগ্যে তেমন বেশি কিছু অবশ্য জোটে নি। তবে অল্প সময়ের ভেতর হয়ে গিয়েছিলেন এক বাণিজ্য জাহাজের ক্যাপটেন। আর পরিণয় হয়েছিল এক ইংরেজ ললনার সঙ্গে। সে ললনা ছিল টেলর সাহেবের মেয়ে। মিস টেলর ফরাসী হেনরীকে বিয়ে করে হন মাদাম দেরয়্যাজিয়ে। কুমারী জীবনে মাদামের ঝোঁক ছিল অভিনয়ে। অভিনেত্রী হিসাবে বেশ ভালোই তাঁর নাম [illegible] এক ডাকে

সকলে চিনত তাকে। অনেক ছিল তার মুগ্ধ অনুরাগী।

বিয়ের পর হঠাৎ একদিন হেনরী মনস্থির করলেন যে পাড়ি দেবেন কলকাতায়। বেরিয়ে পড়লেন একটি জাহাজ নিয়ে। এ বিষয়ে শ্রীমতী হেনরীরও খুব উৎসাহ দেখা গেল। থিয়েটারের আকর্ষণ যদিও উতলা করেছিল মাঝে মাঝে, তবু অস্ট্রেলিয়া তাকে পারল না ধরে রাখতে। হেনরীর মুখে সে কলকাতার মঞ্চ ও অভিনয়ের কথা শুনেছিল, সে টানই সেদিন দুর্বার হয়ে উঠল।

কলকাতার পথে সমুদ্রযাত্রা প্রথম প্রথম খারাপ লাগে নি। বরং ভালোই লেগেছিল ঐ অবিরাম ভেসে চলা। ভালোই লেগেছিল ঐ নীলজলের সীমাহীন বিস্তার। ডেকের ওপর বসে বসে কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আশ্চর্যরকম ভালো লাগত সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মুহূর্তটুকু।

কিন্তু সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে সব কিছুই কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। স্বাদ হারিয়ে গেল প্রতিদিনের জীবনযাত্রার। শ্রীমতীর কাছে তখন যেন আর কিছুই ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে ভেঙে পড়তে ইচ্ছে হয় কান্নায়। কেমন যেন এক নিঃস্তব্ধতা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।

এমন বিষণ্ণ কান্নার মুহূর্তে মাদাম দেরম্যাভিয়ের সব থেকে যাঁকে খারাপ লাগছিল, তিনি হলেন হেনরী। হেনরীকে তার মনে হত একটি ডাকাত। কিংবা কোনো লুটেরা দস্যু। অথচ হেনরী তাকে কত যত্নই না করতেন! কতই না বোঝাতেন।

সেদিনও হেনরী তাঁর মানিনী বধূকে কত বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আঁকিবুকি কাটলেন শ্রীমতীর রেশমী চুলে। বললেন, 'ডার্লিং, তুমি ভেঙে পড়ো না। আর দু-দিনের ভেতরেই আমরা পেঁছে যাবো স্যান্ড হেডস। তখন কলকাতা আর কতদূরে। হাতের মুঠোয়।—ডার্লিং, কলকাতা এক আশ্চর্য সহর। তোমাদের একজন স্বজাতি তৈরী করেছে এ সহর। এখন তোমাদের ভাষায় একে বলা হয়, 'সিটি অব প্যালেসেস'। আগে কোনো প্যালেস ট্যালেস কিছুটি ছিল না। ছিল জঙ্গল আর জঙ্গল। আমাদের দেশে যখন ফরাসী বিপ্লব হয়, তার বছর পনেরো-কুড়ি আগেও এখানকার জঙ্গলে তোমাদের ওয়ারেন হেস্টিংস হাতীতে চড়ে বেরত বাঘ শিকার করতে। ডার্লিং, তুমি কি ওয়ারেন হেস্টিংসের ছবি দেখেছ?'

ডার্লিং নীরব। আন্দোলিত বাতাসে কেবল সোনালী চুলে ঢেউ উঠল। হেনরী মনে করলেন তাঁর অভিনেত্রী বধূ হয়ত অভিনয়ের কথা শুনে খুশি হবেন, তাই প্রসঙ্গ বদলে বলতে আরম্ভ করলেন, 'তুমি নিশ্চয় জানো না, তোমাদের কলকাতার ইংরেজেরা কি ভয়ঙ্কর থিয়েটার পাগল। নিউজ পেপার বের হবার অনেক আগেই ওখানে থিয়েটার পত্তন। আর ক বছর গেলেই ওখানকার নাটুকে সাহেবরা হয়ত থিয়েটারের সেন্টিনারী করে বসে থাকবে। তবে মজার ব্যাপার কি জানো, কোনো এক বিশেষ থিয়েটার ওদেশের মাটিতে, বেশি দিন টেকে না। ম্যাডাম, ডেভিড গ্যারিকের নাম তুমি নিশ্চয় শুনেছ। একটা টেকসই থিয়েটার তৈরী করবার জন্যে ওখানকার সাহেবরা গ্যারিকের কাছে পরামর্শ চেয়ে পাঠাল। গ্যারিক ভারি খুশি। সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর মূল্যবান উপদেশ।—তখন সেই মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে কলকাতার ইংরেজরা কি করল জানো?

শ্রীমতীর চোখে সামান্য একটুখানি হাসির রেখা ফুটে উঠল। ঘাড় নেড়ে বলল, 'না'।—হেনরী এতেই খুশি। দ্বিগুণ উৎসাহে সে হাসি হাসি মুখে বলল : 'কলকাতার ইংরেজেরা গ্যারিককে একটি মজার উপহার পাঠালো। মজার উপহার। আর সে উপহারটি কি জানো?—এক জোড়া কাঠের পাইপ।'

বাংলাদেশের উপকূলের খুবই কাছাকাছি ছিল জাহাজটি। তাই কয়েকটি সমুদ্রের পাখিকে দেখা গেল। ঢেউয়ের মাথায়। কখনো দেখা যায় বিন্দুর মতন। আবার কখনো বা তারা হারিয়ে যায়। সকাল বেলাকার স্নিগ্ধ আলোকরশ্মি হাজার হাজার মণিমুক্তোর মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে সমুদ্রের জলে। মাদাম দেরম্যাভিয়ের চোখে তারই অনিন্দ্যসুন্দর অনুভূতি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ হাসিতে। সে হাসি দেখে হেনরী রীতিমত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকেন, 'কলকাতায় গেলেই, ডার্লিং, আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে। ওখানকার বাতাসে শুনেছি ইউরোপীয়দের 'ফরচুন' উড়ে বেড়াচ্ছে। যে যেমনভাবে পারে, গুছিয়ে নিচ্ছে। আমার এক বন্ধু আছে তার নাম স্টোকেলার।—ভেরি অ্যামবিশাস ইয়ংম্যান। ওখানে 'ইংলিশম্যান' বলে একটি কাগজ আছে, সে তারই এডিটর। কিন্তু কাগজের এডিটর হলে কি হয়, ভারি অভিনয় পাগল মানুষ। ওখানকার থিয়েটার মহলে সে একটা কেষ্ট-বিষ্টু। আরেকজন আমার ইন্টিমেট বন্ধু আছেন, তাকেও তুমি চোনো না। সে বন্ধুটির নাম জর্জ হ্যামিলটন ককস। খুব সুন্দর চেহারা তার। এককালে সৈনিক ছিল। ছিল ক্যাপটেন। এখন কাজ করে ফায়ার ইনসিওরেন্স-এ।—মাই লেডি, মাই ডার্লিং, এরা সকলে আমাদের আপনার লোক। খুব কাছের লোক। এরা সাহায্য করবে আমাদের ফরচুন তৈরীতে। কলকাতা বন্দরে গিয়ে নামলে এরা করে দেবে আমাদের জন্য সকল রকম সুব্যবস্থা! —তুমি থিয়েটার করবে আর আমি এই জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াব নানান দেশের বন্দরে বন্দরে।'

হেনরীর পালতোলা জাহাজে তখন জোর বাতাস ধরেছে। হু হু করে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। সে আঠারোশ একচল্লিশ সালের কথা। বাংলা দেশে তখন বসন্তকাল। সহর কলকাতাতেও তাই। গাছে গাছে নানান ফুলের মেলা। নানা রংয়ের রং-বাহার। দক্ষিণের বাতাসটুকু ভারি মনোরম। ফাগুন যাই যাই করে চলে গেল। পা-পা করে এগিয়ে এলো চৈত্র। সহর কলকাতার আয়েসী মানুষেরা সেদিনের মধুবাতাসে অনুভব করলেন ছোঁয়া গরম।

কলকাতার সাংস্কৃতিক দিকেও চলেছে এমনি ছোঁয়া গরম। রামমোহনের কাল থেকে সবে আমরা বেরিয়ে এসেছি। ইয়ংবেঙ্গলের তখন রীতিমত উগ্র। মধুসূদন বিদ্যাসাগর, ভূদেব তখনও ছাত্রজীবনের কুঁড়ির ভেতর সমাহিত। হেম-বঙ্কিম নিতান্তই শিশু। তখনো অবশ্য মাথার ওপর রয়েছেন হেয়ার সাহেব। ক্যাপটেন রিচার্ডসন দুহাতে কবিতা লিখছেন এবং রসিয়ে রসিয়ে শেকসপীয়ার পড়াচ্ছেন হিন্দু কলেজে। মোটকথা, সহর কলকাতার সেদিন সুদিন। নবযুগের ইতিহাসে ভরা বসন্ত। সেই বসন্তে আমদের চোখে সোনালি স্বপ্ন। মাদাম দেরম্যাভিয়েও স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বামীর হাত ধরে পেঁছুলেন এসে কলকাতায়। জাহাজঘাটে অনেকেই এলেন তাদের দেখতে। এলেন স্টোকেলার সাহেব, এলেন হ্যামিলটন ককস। তাঁরা হাত তুলে উভয়কে বিশেষভাবে স্বাগত জানালেন।

হেনরী দেরম্যাভিয়ে রসিকতা করে বললেন, 'ডার্লিং, এঁদের চিনে রাখো। যদি আমি কোনো দিন দুম করে মরে যাই, এঁরা তোমাকে দেখবেন। দরকার হলে বিয়েরও ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

সকলে হা-হা করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীও।

সেদিন অপরাহ্নে মাদামকে নিয়ে সকলে বেরোলেন কলকাতা পরিক্রমায়। না, ঠিক কলকাতা নয়। থিয়েটার পাড়ায়। বসন্তের অপরাহ্ন ভারি মনোরম। মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ। পলাশে সিমুলে তখন রংয়ের খেলা। গাছে গাছে নানা রংয়ের পাখি বেড়াচ্ছে নেচে-নেচে। তবে কলকাতার রাস্তায় বড়োই ধুলো। মাঝে মাঝে এক আধটি ঘোড়ার গাড়ি যায়, আর সারা অঙ্গ ভরে যায় ধুলোয়। এঁরা সকলে ঢাকা পালকিতে চলেছিলেন বলে কোনো অসুবিধা হল না। ধুলোর মেঘ দেখলেই এঁরা টেনে দিচ্ছিলেন পালকির পরদা।

থিয়েটার পাড়াটি ঘুরে ঘুরে দেখতে ভালোই লাগল মাদামের। সেদিনের সাঁ-সুশী থিয়েটারের অপূর্ব শোভা দেখে ধরাই যেত না অতীত দিনের সঙ্কট-শঙ্কিল মুহূর্তগুলিকে। ছেলেখেলা করতে করতে একদিন কয়েকজন সাদা মানুষ যে বড়ো একটি খেলার পত্তন করেছিলেন, সেদিন তা পূর্ণ মহিমায় বিকশিত। শ্রীমতীর চোখে অবশ্য সে অতীত-স্মৃতি কোনো কৌতূহল জাগাল না। মাঝে মাঝে যে পাদ-প্রদীপের আলো নিভে গিয়েছিল এবং রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে যে অনেক প্রতীক্ষার মুহূর্ত কেটেছিল, স্টোকেলারের মুখে সে সব কাহিনী শুনেও রোমাঞ্চিত হল না শ্রীমতীর চিত্ত। কেননা, সেকালের সাঁ-সুশীকে দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হত যে, আশঙ্কার আর কোনো কারণ নেই। মনসন-বারওয়েল-ইস্টের দাক্ষিণ্যের যুগ সে পেরিয়ে এসেছে

অনেককাল। এমা র‍্যাংহ্যামের সখের থিয়েটারের দিকে নজর পড়ল তখন। ভাঙিয়ে বাকীর দিন কেটে গেছে। ডালহৌসীর পেলস থিয়েটার এবং এথেনিয়ামের স্বর্ণযুগের দিনও ফুরিয়ে গেছে। ওপরে এসেছে চিৎপুরিয়া চৌরঙ্গী রঙ্গালয়ের প্রাণের দৌড়। স্যান্সুপ্রোম্প ও দেশ-দেশান্তের মানুষ সুরেশিত এখানকার মঞ্চে। এ মঞ্চের অভিনেত্রী ছিলেন স্বদেশের মঞ্চেও অভিনয় করে দেশজোড়া নাম কিনেছিলেন। এবং সেই চৌরঙ্গী থিয়েটার পুড়ে একদিন ছাই হয়ে গেল। হঠাৎ আগুনে কেড়ে নিল কলকাতার গৌরব।

তারপর? তারপর নিস্তব্ধ, অন্ধকার। অভিনেত্রী এশথার, সঙ্গে স্টোকেলার, এবং আরো অনেকে নামলেন নতুন উদ্যমে। নতুন থিয়েটার তৈরীর সঙ্কল্প নিয়ে। সেই উদ্যম আর সেই সঙ্কল্প থেকেই তৈরী হল সাঁ-সুসী। নাটুকে সাহেবদের চোখেমুখে দেখা দিল খুশির ঝিলিক। ওদিকে দমদম-বৈঠকখানার আসরও জমজমাট। সেখানকার মঞ্চে নিত্য নতুন নাটক।

না, শ্রীমতী দেরম্যাঁভিয়ে দমদম-বৈঠকখানার পথে আর পা বাড়ালেন না। তিনি দেখতে চাইলেন টাউন হল। সুপ্রিম কোর্টের পাশের সেই বিরাট বাড়িটি। এরকম একটি বাড়ির জন্য সুদীর্ঘকাল স্বপ্ন দেখছিল সেকালের কলকাতা। তৈরী হয়েছিল লটারী কমিটির টাকায়। সে আঠারোশ ছয় সালের বৃত্তান্ত। তিন যুগ আগের ব্যাপার। গারস্টিন আর অবেরী নামে দুজন সুদক্ষ এঞ্জিনীয়ার তৈরী করেছিলেন এ বাড়ি। কলকাতাবাসীর স্বপ্নকে রূপ দিয়েছিলেন তাঁরা বাস্তবে। এরকম প্রশস্ত ও পরিসরওয়ালা বাড়ি সহর কলকাতায় সেদিন দুটি ছিল না। হাজার কয়েক লোক একসঙ্গে বসে সভা করতে পারত। শুধু সভা? নিত্য এখানে লেগে থাকত অভিনয়। টাঙানো হত থিয়েটারের পর্দা। নাচেগানে জম-জমাট হয়ে উঠত মঞ্চ। সারা কলকাতার লোক সেদিন নাটক-পাগল, সুতরাং টাউন হল কি তা থেকে বাদ থাকতে পারে?

শ্রীমতী দেরম্যাঁভিয়ে কলকাতা বন্দরে পা দিয়েই শুনেছিলেন যে, তাঁর অভিনয় করবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছে। আর সেই অভিনয়স্থল ঠিক হয়েছিল, 'টাউন হল।'—অভিনয়ের নাটক?—হ্যাঁ, তাও ঠিক। নাটকটির নাম, 'টেমিং অব দি শ্রু'। মানিনী দেরম্যাঁভিয়ে নিজেকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমি কি শ্রু?' না, তা কেমন করে হবে? শ্রু মানে ত 'কলহপরায়ণা'। খুব মোটা করে যাকে বলে 'কুঁদুনী', তাকেই তো বলে শ্রু। না, দেরম্যাঁভিয়ে তা নয়, সে মানিনী, অভিমানিনী। কে জানে সহর কলকাতা এ মানিনীকে বশ করবার কোনো ষড়যন্ত্র পাকা করেছে কিনা!

কলকাতার মাটিতে মাদামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার অভিনয়ের খবর। পঁচিশে মার্চ টাউন হলে হবে সে অভিনয়। ক্যাথেরিনা ও ডালিংটনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে তাকে। কলকাতার কাগজে কাগজেও বেরিয়ে পড়ল এ খবর। আরম্ভ হয়ে গেল টিকিট বিক্রয়। হোটেল স্পেনসেস ও হোটেল অকল্যাণ্ডে খোলা হল টিকেট-কাউণ্টার। কাগজ অফিস 'হরকরা'ও বাদ গেল না এ সুবর্ণ সুযোগ থেকে। যদিও তখন খৃষ্টীয় ধর্মের 'প্যাসন উইক' আসন্ন, তবু উৎসুক নাট্যামোদীরা তাকিয়ে রইল পঁচিশ তারিখের দিকে। 'বেঙ্গল হরকরা' আরো উদ্দীপিত করে তুলল নতুন অভিনেত্রীর সম্পর্কে কৌতূহল। লিখল: এ'র সম্পর্কে যে সুখ্যাতি শোনা যাচ্ছে, সকল দর্শককে ইনি যে প্রীত করবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?'

এইভাবে একান্তমনে গোটা কলকাতা যখন নতুন অভিনেত্রীকে দেখবার জন্য তৈরী হচ্ছে মনে মনে, তখন দুম করে একটি ঘটনা ঘটে গেল।

ঘটে গেল একটি অঘটন। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সে দুঃসংবাদ।—শোনা গেল, মাদামের সর্বনাশ হয়ে গেছে। সর্বনাশ। সকলে দৌড়ুল তার কাছে। গিয়ে দেখে সে এক অভাবিত পরিস্থিতি। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে এ ফরাসী-বধূ। মাথায় ভেঙে পড়েছে আকাশ। স্বামী শ্রীযুক্ত দেরম্যাঁভিয়ে হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসে আছেন।

কেন?—কেন? সকলের মুখেই উদ্যত হয়ে উঠল এ প্রশ্ন। কোনো জবাব পাওয়া গেল না শ্রীমতীর কাছে। দু গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। কিন্তু নগর কোটাল নীরব থাকলেন না। জিজ্ঞাসুদের কৌতূহল মেটালেন তাঁরা। কোটালমশাই গম্ভীরভাবে জানালেন, 'মসিঁয় দেরম্যাঁভিয়ে একজন সভ্য মানুষ নন, সভ্যতার খোলশ-পরা এক ডাকু। লুটেরা। জাহাজ চুরি করে এই লুটেরা পালিয়ে এসেছেন কলকাতায়। ভেবেছিলেন জানতে পারবে না কেউ, থাকবেন গা-ঢাকা দিয়ে। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। কলকাতার কোতোয়ালীতে খবর পৌঁছুল। গোপন খবর। লোক-লস্কর নিয়ে কোটালমশাই বেরোবেন চোর ধরতে, কিন্তু তার আগেই চোর জেনে ফেলল খবর। অপমানের আঁচর গায়ে লাগতে দেবার আগেই সে করে বসল সুইসাইড।'

*

অজানা দেশ। অচেনা মানুষ। সহায়-সম্বলহীনা এক মহিলা। তার ওপর সে যদি আবার সুন্দরী তরুণী হয়, তার ভয় অনেক। আর সদ্য পতি-বিয়োগের শোক ত' আছেই! শোকে ও ভয়ে বড়োই কাতর হয়ে পড়ল শ্রীমতী দেরম্যাঁভিয়ে। কাঁদল আকুল হয়ে।

এ কদিনে সামান্য পরিচয় হয়েছিল যাদের সঙ্গে তাঁরা অবশ্য অনেক সহানুভূতির সঙ্গে এগিয়ে এলেন। এলেন স্টোকেলার। এলেন জর্জ হ্যামিল্টন কক্স। হ্যামিল্টন আরো ঘনিষ্ঠ হলেন। তালতলার সেই বড়ো বাগান ভিমি-সুহৃদোদ্যানে ছিলেন তাঁর।

অথচ এ সাহেব কতো বড়ো কুলীন। সেকালের 'বেঙ্গল ক্লাব' সাহেবের বাসা। সপরিবারেই হয়ত থাকতেন। তবে এ সময় তাঁর কাছে স্ত্রী ছিলেন না। ছিলেন স্বদেশে। ইংলণ্ডে। 'বেঙ্গল ক্লাবের' বাদশাহী আবহাওয়ায় সাহেব একাই ছিলেন আত্মলীন। অভিজাত বাড়ি না হলে এখানে সেদিন স্থান সংগ্রহ করা ছিল কঠিনতর। হ্যামিল্টন সেই আভিজাত্যের চূড়োয় গিয়ে বসেছিলেন। সামরিক কাজ অবসর নিয়ে তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বীমা কোম্পানীর দায়িত্বভার। এদেশে তখন সবে বীমার ইন্সিওরেন্সের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেই প্রারম্ভিক কর্মযজ্ঞে হ্যামিল্টন কক্স লেগে গিয়েছিলেন নবীন উদ্যমে।

তবে সাহেবের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। ঘরে ছিলেন দজ্জাল স্ত্রী। সে মহিলা এতটুকু সুখ দিতেন না সাহেবকে। বন্ধু-বান্ধব থেকে আরম্ভ করে পাড়া-প্রতিবেশী ইউরোপীয় সমাজে কক্স সাহেবের এই ব্যর্থ দাম্পত্যজীবনের খবর সকলেই জানতেন। মন্দ লোকেরা আবার তাঁর এই 'ডোমেস্টিক অ্যাফ্লিকসনের' কথা আলোচনা করত রসিয়ে রসিয়ে।

কোথায় তালতলা আর কোথায় বেঙ্গল ক্লাব! কোথায় কক্স সাহেব আর কোথায় দেরম্যাঁভিয়ের নবপরিণীতা বধূ! অনেক দূরত্ব, অনেক ব্যবধান। কিন্তু দুটি প্রান্ত মিলল দুঃখের বন্ধনে। একজনের দুঃখ পতিবিয়োগে, অপরের দুঃখ দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতায়।

কলকাতায় সেদিন বসন্ত বড়োই উগ্র হয়ে উঠছে। দুপুরের দিকে চোয়া গরম। লাল ফুলের আভরণ পরেছে পলাশ-শিমুলে। মৌমাছিদের গুঞ্জনে বেঙ্গল ক্লাবের ফুলের বাগান কেমন যেন মোহময়!

দিনে দুবার করে হ্যামিল্টনকে যেতে হত তালতলার বাড়িতে। বেঙ্গল ক্লাব থেকে এ বাড়ির দূরত্ব একটু বেশি বটে, কিন্তু পালকিতে চড়ে একটি মিষ্টি স্বপ্ন দেখতে দেখতে এই দূরপথ যেতে ভালোই লাগত সাহেবের। তখন অনেক গাছ ছিল কলকাতায়। গাছে গাছে শোনা যেত পাখির মিষ্টি কাকলি। দেখা যেত রঙ-বেরঙের পাখি। স্নিগ্ধ পল্লীশ্রী মাখানো ছিল শহর কলকাতার অঙ্গে। সেই শ্রী দেখতে দেখতে ও পাখির গান শুনতে শুনতে আকৃষ্ট হয়ে যেতেন সাহেব।

মাঝে মাঝে দেখা হত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে। কিন্তু ভালো করে কথা বলতে ইচ্ছে করত না। কেমন যেন এক ক্লান্তি আসত। একদিন সাহেব গেলেন স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য ডাঃ গুডিভের কাছে। সেকালের কলকাতার ডাঃ গুডিভ পয়লা নম্বরের চিকিৎসক। একালের বিধান ডাক্তারের মত ছিল তাঁর খ্যাতি। সেই ডাক্তার যত্ন করে পরীক্ষা করলেন হ্যামিল্টনকে, তারপর হা-হা করে হেসে বললেন, 'ভালোই আছো দেখছি। এক্সেলেন্ট হেল্থ!'

'কিন্তু পায়ে যে একটু ব্যথা লাগে'—হাসি হাসি মুখে বলেছিল হ্যামিল্টন।

[illegible] ]

টাউনহল

আরেকদিন হ্যামিল্টন গেলেন স্টোকে-লারের কাছে। একবারে কাগজের অফিসে। সম্পাদকের বিরাট টেবিলের ওপাশে বসে-ছিলেন স্টোকেলার। খুবই ব্যস্ত। তবু হ্যামিল্টনকে দেখে হাসিমুখে স্বাগত জানা লেন। বললেন, 'কী ব্যাপার! মাদাম দের-ম্যাভিয়েরের কাছে গিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই আসছি। তাঁর অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দাও।'

'তাঁর সম্মতি পেয়েছেন?'

'পেয়েছি।'

স্টোকেলার বললেন, 'ঠিক আছে। তবে আসছে সপ্তাহেই অভিনয় হবে।'

ব্যস, ব্যবস্থা হয়ে গেল অভিনয়ের। নিঃস্ব ফরাসী বধূর এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। শোকে মুহ্যমান হলেও, জীবিকার জন্য তাকে নামতে হল মঞ্চে। অবশ্য নামবার আগে যথারীতি আরম্ভ হয়ে গেল বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদ। সেই একই নাটক, 'টেমিং অব দি শ্রু'। সেই একই স্থান 'টাউন হল'।

চৈত্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহে টাউন হলে সেই বহুপ্রতীক্ষিত সন্ধ্যাটি এলো। সাহেব-টোলায় তখন 'প্যাসান উইক' চলছে। মেম সাহেবরা এই প্যাসান-উইক নিয়ে মগ্ন। টাউন হলে সমবেত ও কৌতূহলী দর্শকদের কাছে দাঁড়াল গিয়ে নতুন অভিনেত্রী। শান্ত বিষণ্ণ মুখ। চোখ দুটি জলে ভেজা। নতুন অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা সেকালে প্রথম মঞ্চ-আবির্ভাবের মুহূর্তে আত্মকথা ব্যক্ত করে নান্দীমুখ পাঠ করতেন। মাদাম দের-ম্যাভিয়েরও তাই করল। বলল সে তার দুঃখের যন্ত্রণা। মধ্যে মাঝে কণ্ঠস্বর ভেঙে এলো কান্নায়। সেই কান্নাভরা কণ্ঠে ফরাসী-বধূ নিবেদন করল :

দি উওম্যান, নট্ দি অ্যাকট্রেস,
সিপিকেথ নাউ
এলাস! টু মুন মাস্ট আই রিজিউম
দি মাস্ক!
নেসাসিটি কম্যান্ড্স্ মি টু টাস্ক।

কোনো অভিনেত্রীর ভূমিকায় নয়, সামান্য এক নারী হিসাবে আপনাদের কাছে এসে আমি কথা বলছি। হায়, এত শীগ্গির আমাকে যে মুখোশ পরতে হবে! প্রয়োজন আমাকে চাবুক মারছে। কম্যান্ডস্ মি টু টাস্ক!

অভিনয় শেষে সে রাত্রে নিজের পালকি করেই অভিনেত্রীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন জর্জ হ্যামিল্টন কক্স। গভীর দুঃখ-ভারে ভেঙে পড়লেও মাদামের অভিনয় যে উৎকৃষ্ট, তা অনেকেরই চোখে পড়ল। তবে যথেষ্ট লোক সেদিন অভিনয় দেখতে আসে নি। এটুকুই ছিল কক্স-হ্যামিল্টনের কাছে দুঃখের ব্যাপার। অনেকে বলল : প্যাসান উইক চলছে বলে মেমসাহেবরা আসতে পারলেন না। কাগজঅলারা লিখল : অভি-নেত্রীর অপূর্ব তনুশ্রী এবং সুরেলা কণ্ঠস্বরে মোহিত না হয়ে পারা যায় না!

'না, কোনোটাই নয়,' মনে মনে ভাবলেন হ্যামিল্টন কক্স। পরে স্টোকেলারকে ডেকে বললেন, 'সাঁ-সুসীর অমন আরাম ছেড়ে, অমন প্যামার বাদ দিয়ে কে টাউন হলে থিয়েটার দেখতে আসবে? যদি মাদামকে দাঁড় করাতে চাও, তবে মাদামের জন্য সাঁ-সুসীতে অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

যে কথা, সেই কাজ। মাদামের জন্য সে চেষ্টা চলল।

এরপরে শ্রীমতী দেরম্যাভিয়েরের কিছু-দিনের জন্য অভিনয়-বিরতি। আরো ভালো অভিনয়ের জন্য এই অনাথিনী বিদেশিনী তৈরী হতে থাকল মনে মনে। তালতলার বাড়িতে কাটতে থাকল অবকাশ। এদিকে অফিস করার ফাঁকে ফাঁকে হ্যামিল্টন কক্স যতটুকু সময় পান, তখন কেবলই ভাবেন এই নতুন বান্ধবীটির কথা। অফিসের পর প্রত্যহ সোজা চলে যান তালতলায়। সেখানে নানারকম কথা ওঠে। নানা গল্প। ওঠে অভিনয়ের কথাও। এবং দেখা যায় দুজনেই স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে স্বপ্নজাল বুনিয়ে যাচ্ছে।

এমন স্বপ্ন কোনোদিন দেখেনি তরুণী শ্রীমতী। হেনরীকে নিয়ে সুখ পায়নি এক-দিনের জন্যও। ডাকাবুকো স্বামী। সর্বদাই থাকতে হত ভয়ে ভয়ে। একদিনের জন্যও সুখ ছিল না, সুতরাং স্বপ্ন দেখা ত অনেক দূরের কথা! জীবনের এ মঞ্চে পর্দা ওঠার আগেই নিভে গিয়েছিল পাদপ্রদীপের আলো। আর হ্যামিল্টনের কথা ত আগেই বলা হয়েছে। বেচারি ক্যাপটেন! এতবড়ো একজন সামরিক লোক হয়েও দজ্জাল স্ত্রীর কাছে চিরকাল থেকেছেন ভয়ে ভয়ে। না পেয়েছেন সুখ না পেয়েছেন শান্তি।

আর দুজনে তাই নতুন করে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। অতীতকে মুছে দিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করা যায় কিনা, হয়ত সে কথাও বসলেন ভাবতে।

*

নাটকটি ভালোই জমে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন কয়েকটি আলো দপ্দপ্ করে নিভে গেল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বেঙ্গল ক্লাবে সাহেব হ্যামিল্টন কক্স একটি চিঠি দেখতে পেলেন টেবিলে। হয়ত সেদিনের ডাকেই এসেছে চিঠিখানি। ইংলন্ড থেকে পোস্ট-করা চিঠি। ডাক-বাক্স ঝেড়ে বেহারা আরো পাঁচখানা চিঠির সঙ্গে সেটি রেখে গেছে টেবিলে।

ছোট একটি চিঠি। আঁকাবাঁকা অক্ষরে ইংরেজি ভাষায় লেখা ছিল মাত্র কয়েকটি লাইন। বেশি নয়। শ'খানেক শব্দও চিঠিতে ছিল কিনা সন্দেহ! কিন্তু চিঠিটি পড়ে সাহেবের মনে হল, না ওগুলি শব্দ নয়। শ'খানেক সৈনিক যেন উদ্যত বেয়নেট নিয়ে এগিয়ে আসছে। এখনই তাকে খুন করবে। হ্যামিল্টনের হাত কেঁপে উঠল। চিঠিটা মাটিতে পড়ে গেল। আর সেদিন রাত্রেই সাহেব তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন : আজ স্ত্রীর চিঠি পেলাম। তিনি কিছুদিনের ভেতরে কলকাতায় আসছেন। জাহাজ এখন যে অব বেঙ্গলে ঢুকেছে। সুতরাং আর ক'দিন!

পরেরদিন দেখা হয়ে গেল স্টোকে-লারের সঙ্গে। তিনি জানালেন, ভালো খবর আছে, মিঃ কক্‌স, মাদাম দেরম্যাভিয়ের সাপ্তাহিক অভিনয় [illegible] হয়ে গেছে।'

[illegible] না। তবু হঠাৎ [illegible] কৌতূহলী হয়ে বললেন : [illegible]

স্টোকেলার বললেন, 'আগামী ইস্টারের পর এপ্রিল, শুক্রবার। এসপ্লানেড থিয়েটারে অভিনয় করবেন।' কক্‌স বললেন, 'বাঃ, ভারি সুসংবাদ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ।'

এদিকে সেদিন অফিসে গিয়ে হ্যামিল্টন কক্‌স এক কাণ্ড করে বসলেন। কেবল, এম ওয়েস্টারমান ছিলেন তাঁর কোম্পানির মাথা। সটান ডোণ্ট ঠেলে সোজা গিয়ে ঢুকলেন তাঁর ঘরে। তাঁর টেবিলের ওপর পেশ করলেন লম্বা-ছুটীর একখানি দরখাস্ত। কারণ? না কোনো কারণ দেখালেন না। তবে পাওনা-গণ্ডা যা ছিল তা তুলে নেবার জন্য অনুমতি চাইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে পেয়েও গেলেন সে অনুমতি।

এরপরে নিজের চেম্বারে এসে বসে ডেকে পাঠালেন হেড-রাইটারকে। সেকালে এই দমকল-দীমা কোম্পানির হেড-রাইটার ছিলেন এক বাঙালীবাবু। বাবুর নাম কালীকুমার মুখুজ্যে। বেশ চালাক চতুর লোক আর খুবই সপ্রতিভ ও চটপটে। হ্যামিল্টন তাকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন বাবু? আপনাকে বেশ এফিসিয়েন্ট মনে হচ্ছে। আমি না থাকলে অফিস চালাতে পারবেন তো?'

কালীকুমার ঘাড় নীচু করে হাসল। সাহেবও হাসলেন। বললেন, 'আমি জানি তুমি পারবে। কোম্পানির অবস্থা ভালো—স্টেডিলি প্রোগ্রেসিং—'

ইতিমধ্যে এপ্রিল মাস গড়াতে গড়াতে এসে শেষ দিনটিতে আটকে গেল। বসন্ত হারিয়ে গেল মধ্য বৈশাখে। রোদ্দুরে চাঁপা ফুলের গন্ধ পাওয়া গেল। আই-ঢাই গরমে সাহেবটোলা হাঁসফাঁস করতে থাকল। আর সারা দুপুরটা টা-টা রোদ্দুরে ঝিমঝিম করতে করতে কালবৈশাখীর প্রতীক্ষায় রইল। এরই ফাঁকে সহরের কাগজঅলারা ঘরে ঘরে খবর পৌঁছে দিল যে এপ্রিলর লিচের সঙ্গে আজ রাত্তিরে অভিনয়ে নামবেন অদ্বিতীয়া শিল্পী মাদাম দেরম্যাভিয়ে।

সেদিন সকালবেলায় সাহেব হ্যামিল্টন ডেকে পাঠালেন তাঁর চাকরবাকরদের : পুরনো দিনের কলকাতায় সব সাহেবেরই থাকত একটি করে ভৃত্যবাহিনী। এ ভৃত্যেরা সদা প্রভুদের সেবায় সদা নিযুক্ত থাকত। কেউ সেজে দিত হুঁকো, কেউ ভরে দিত চিলিমভরা জল। গরমের দিনে কেউ কেউ টানত টানা-পাখা, আর প্রতিদিন পালকি বহন করার জন্য পালকি-বেয়ারার দল ত' ছিলই। এই ভৃত্যবাহিনীর আবার একজন প্রধান থাকত। তাকে বলা হত হেড-বেয়ারা। সাহেবের জন্য সে কেনাকাটা করত এবং অনেক সময় টাকা-পয়সাও জমা রাখত।

ছোটখাটো বেয়ারাদের দুপুরে দেখা করার পর সাহেব ডেকে পাঠালেন সর্দার বেহারাকে। সাহেবের এই প্রধান ভৃত্যটির নাম ছিল ইছা। বেশ শক্ত-সমর্থ এক মানুষ। ন'দশ বছর ধরে সে হ্যামিল্টন কক্‌সের আজ্ঞাবহ। খুবই অনুগত। আর খুবই বিশ্বাসী। তার কাছে টাকা-পয়সার সব হিসাব চেয়ে নিলেন সাহেব। দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিলেন কড়ায়-গণ্ডায়। ইছা একবার কাঁদো কাঁদো মুখে জিজ্ঞেস করল, 'স্যর, আপনি কি চলে যাচ্ছেন দেশে?'

সাহেব একটু ক্ষীণ হাসলেন, কোনো উত্তর দিলেন না।

ইছার পর ডাক পড়ল প্রধান পালকি-বেহারা নন্দ দাসের। নন্দ ছিল ওড়িশার লোক। গোটা মাথাটা কামানো। লম্বা এক-হারা চেহারা। পরিধানে স্বল্প কাপড়। সাহেবদের চোখে, বেয়ারহেডেড অ্যান্ড অলমোস্ট নেকেড।'—এই নন্দ দাস লম্বা সেলাম করে এসে দাঁড়াল সাহেবের কাছে। তারও দেনাপাওনা মিটিয়ে দিলেন সাহেব। দিলেন ভালো বকশিস, তারপর বললেন, 'বিকেল চারটের ভেতর বেরুব, পালকি তৈরী রেখো।'

তৈরী ছিল পালকি। মেকাবি ক্লকে টং-টং করে চারটে বাজতেই সাহেব দৌড়ে গিয়ে উঠে বসলেন পালকিতে। সঙ্গে নিলেন একটি বাড়তি সুট। যদি হঠাৎ বৃষ্টিতে জামাকাপড় ভিজে যায়।

পুরনো কলকাতার রাস্তা কাঁপিয়ে নন্দ দাস সেদিন বিকেলে সাহেবের পালকি নিয়ে চলল তালতলায়। তালতলায় মেম-সাহেবের কাছে বহুবার এসেছে নন্দ। বকশিসও পেয়েছে মাঝে মাঝে। আজ সন্ধ্যায় মেমসাহেব যে থিয়েটারে অভিনয় করতে যাবে, তাও জানে নন্দ দাস।—পথে যেতে এক ঘণ্টা সময় লাগল।

হ্যামিলটন ওখানে গিয়ে থাকলেনও এক ঘণ্টা। সন্ধ্যার ডিনার ওখানেই খেলেন। দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে অনেক গল্প করলেন। অনেক। হ্যামিলটন এক সময় বললেন, 'কাল থেকে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।' 'কেন?' মাদাম দেরম্যাভিয়ের চোখে ঘনিয়ে উঠল বিষণ্ণতা। সাহেব হা-হা করে হেসে বললেন, 'এমনিই।'

এরপরে দুজনে খুব তাড়াতাড়ি চলে এলেন থিয়েটারে। থিয়েটার সাঁ-সুসীতে।

এখানে এসে প্রথমে দেখা হয়ে গেল স্টোকেলারের সঙ্গে। সাংবাদিক স্টোকেলার হ্যামিলটনকে দেখে বললেন, 'আপনাকে আজ বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, বয়েস অনেক কমে গেছে।' হ্যামিলটন বললেন : 'তা ঠিকই। তবে মশাইয়ের কম আমোদ দেখছি না তো?'

আরম্ভ হলো থিয়েটার। ওপরের একটি বক্‌সে অভিনয় দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেলেন হ্যামিলটন। হঠাৎ যখন চমক ভাঙলো, তখন দেখলেন আধ ঘণ্টা কেটে গেছে।—উঠে বসলেন। মনে পড়ে গেল, কি যেন জিনিস ফেলে এসেছেন [illegible]। কপালে জমে গেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সুতরাং বেরিয়ে এলেন বাইরে। হঠাৎ বাঁকের মুখে সাংবাদিক স্টোকেলারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। স্টোকেলার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? কোথায় চললেন?'

হ্যামিলটন বললেন, 'না, কোথাও নয়। এখনই আসছি।'

না, তিনি কিন্তু এলেন না। নন্দ দাসকে ডেকে সোজা ফিরে এলেন বেঙ্গল ক্লাবে। ক্লাবে পৌঁছে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে সওয়া নটা বেজেছে।

বৈশাখের আইঢাই গরম। ওপরের জ্যাকেট এবং ওয়েস্ট কোটটি সাহেব এক-টানে টেনে খুলে ফেললেন। হাঁক দিলেন ইছাকে। ইছা এলো। দরাজগলায় বললেন, 'আভি সোডা লাও।'—এলো সোডা। সাহেব আলমারী থেকে একটি বিচিত্র আকারের বোতল বের করলেন। এবং সোডা ঢেলে নরম করে একটু স্নিগ্ধ করলেন। তারপর একটু পা-চারি করে অঙ্গে চাপিয়ে নিলেন মর্নিং গাউনটি। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। দেখলেন, সন্ধ্যাবেলাকার তারাগুলি চলে এসেছে আকাশের মাঝামাঝি।

মৃদু আলো জ্বলছিল টেবিলের ওপর। সাহেব হঠাৎ একটি চিঠি লিখে ফেললেন। তারপর হাঁক দিলেন নন্দ দাসকে। নন্দ এলে তার হাতে ধরিয়ে দিলেন চিঠি। তারপর যেন উদাসভাবে বললেন, 'নন্দ, তোমাকে যেতে হবে তালতলায়। সেখানে গিয়ে এ চিঠিটা একবারে মেমসাহেবের হাতে দিয়ে আসতে হবে। আর একবারে খালি হাতে এলে চলবে না। হাতে হাতে উত্তরও আনতে হবে।'

নন্দ ঘাড় নেড়ে বলল : 'যাচ্ছি হুজুর। এখনই যাচ্ছি।' তারপর মাথায় পাগড়ি বেঁধে সোজা রওনা দিল তালতলা।

এদিকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর ইছা বসল পাখা টানতে। আই-ঢাই গরমে সাহেবরা বেজায় কাবু হয়ে পড়ে। ইছা এসব ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে। তাই সে নিজের সাহেবের সেবায় সদা তৎপর। সারা রাত্তির সে সাহেবকে পাখা টেনে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। পাখার দড়িটা শোবার ঘরের দরজার মাথা দিয়ে বাইরে পর্যন্ত টানা। বাইরে বসে ইছা পাখা টানে, আর সে টানে ঘরে বাতাসের ঢেউ ওঠে।

সে রাতে সাহেব ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। জানালার পাল্লাগুলিও টেনে দিলেন একে একে। তারপর সাহেব একটু গান গাই-লেন। ইছা জানে যে তার প্রভু খুশি হলে এভাবে মাঝে মাঝে গান গেয়ে থাকেন। শুধু কি গান? মাঝে মাঝে নাচেনও আবার নাচেনও ইছা হয়। নাচলেনও। সে রাতেও নাচলেন। ইছা পায়ে করে একটু তালও ঠুকল।

ওদিকে নন্দ দাস যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছল তালতলায়। প্রায় এক ঘণ্টার পথ। সারাটা পথ [illegible]

আন্দাজে সারা ব্যাপারটিকে সে সাজিয়ে নিল নিজের মনের মতন করে। তার মনে হল, এ চিঠি পড়ে মেমসাহেব নিশ্চয় আজ রাতেই ক্লাবে আসতে চাইবেন। নয়ত কাল সকালেই চলে যাবেন গীর্জায়। সেখানে সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবে। আহা! ভারি সুন্দর মেয়েটি। ভারি নম্র!

নন্দ তালতলায় গিয়ে দেখল মেমসাহেব সবে ফিরেছেন থিয়েটার থেকে। মুখখানি বড়ো ক্লান্ত। বড়ো বিষণ্ণ। নন্দ লম্বা একটি সেলাম দিয়ে চিঠিটি এগিয়ে দিল মেমসাহেবের হাতে। চিঠিটি হাতে নিয়ে নন্দকে মেমসাহেব জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার নন্দ। এত্তো রাত্রে!'

নন্দ মিষ্টি হেসে বলল, 'চিঠিতেই সব লেখা আছে, মেমসাব!'

ক্ষিপ্র হাতে চিঠিটি খুলে মেমসাহেব পড়ে ফেললেন। নন্দ দেখল, তাঁর বিষণ্ণ মুখ আরও বিষণ্ণ হয়ে গেল। এবং কিছু না বলেই তিনি ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। নন্দ মুখখানি কাচুমাচু করে বলল : 'মেমসাব, চিঠির উত্তর!'—কিছুক্ষণ পরে একটি ইউরোপীয় ছোকরাকে নিয়ে এলেন বাইরে। নন্দর কাছে তাকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একে নিয়ে যাও, নন্দ। এ ছেলেটিই হল আমার উত্তর। তোমাদের সাহেব একে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।'

কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল নন্দর কাছে। তালগোল পাকিয়ে গেল তার ভাবনাগুলি। মেমসাহেবের কথা মত সে ঐ ছেলেটিকে নিয়ে ক্লাবে ফেরবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু তার পেঁছুনোর আগেই এখানে দারুন একখানি নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল।

সাহেবের নাচগান শুনতে শুনতে, এক পায়ে তাল ঠুকতে ঠুকতে কখন যেন একটু তন্দ্রা এসেছিল ইস্থার। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে ভেঙে গেল তার চটকা। দুম্-দুম্-দুম্!—সাহেবের ঘরের ভেতরেই যেন গর্জে উঠল শব্দ। লাফিয়ে উঠল ইস্থা। কী যে করবে সে ঠিক করতে পারল না। দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মারল সে সাহেবের দরজায়। নাঃ, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

তখন সে দৌড়ে গিয়ে খবর দিল ক্লাবের ইউরোপীয় স্টুয়ার্ডকে। স্টুয়ার্ডসাহেব এলেন হন্তদন্ত হয়ে। দরজা ভাঙলেন। এবং তারপর যে দৃশ্য দেখল ইস্থা, তাতে তার মনে হল পায়ের তলায় মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। দেখল, পিস্তলের গুলি দিয়ে সাহেব নিজেই উড়িয়ে দিয়েছে নিজের মাথা। আর সারা ঘর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। সাহেবের সমস্ত অঙ্গ শোণিতাপ্লুত।

এরপরের ইতিহাস এ কাহিনীর উপসংহার। পুলিশ এলো। যেমন আরো পাঁচটা খুনে আসে। বসল তদন্ত, যেমন আরো পাঁচটা ক্ষেত্রে বসে। দেখা গেল যে হ্যামিলটন সব দিক ভেবেই রেখে গেছেন সব প্রশ্নের জবাব। রেখে গেছেন কয়েকটি চিঠি। তদন্তকারীকেও এক কলম লিখে জানিয়েছেন, 'আপনারা ব্যাকুল হবেন না, অনেক ভেবে চিন্তেই আমি এ আত্মহত্যা করেছি।' তারপরে সে চিঠিতেই জানিয়েছেন একটু একটু করে কোথায় তিনি পিস্তল পেয়েছেন এবং কোথায় তিনি কিনেছেন বারুদ।' একবারে শেষকালে কৌতূহলীদের সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছেন, 'ভাববেন না আমি পাগলামি করে এ কান্ড করেছি। না, মশাই, আমাদের বংশে কেউ কখনো পাগল ছিল না। ইনস্যানিটি ওয়াজ নেভার বিন ইন মাই ফ্যামিলি।'

চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে তিনি লিখেছেন : 'আই সাজেস্ট দি চিপেস্ট অ্যান্ড মিনেস্ট ফিউনারাল—নো পাকা গ্রেভ—নো মোর্ণিং কোচ'—অর্থাৎ আমি অনাড়ম্বরপূর্ণ অতি সাধারণ সৎকার পেলেই আনন্দিত হব। পাকা সমাধি?—না তার কোনো দরকার নেই। দরকার নেই কোনো শোক মিছিলের।

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আরো কয়েকখানি চিঠি লিখে গিয়েছিলেন হ্যামিলটন। এদের ভেতর মুখ্য ছিলেন ডাক্তার গুডিফ এবং সাংবাদিক স্টোকেলার। তদন্ত বসল। এঁদের সকলকেই ডাকা হল তদন্তে। দুজনেই এক বাক্যে স্বীকার করলেন, 'ভারি আমুদে লোক ছিলেন জর্জ হ্যামিলটন কক্স। ভারি আমুদে আর ভারি ভালো মানুষ।' স্টোকেলার জানালেন যে মৃত্যুর কয়েকঘন্টা আগেও তাঁকে দেখেছেন এবং তখনো তিনি ভারি খুশি খুশিই ছিলেন। আর গুডিভ বললেন, 'অমন সুস্থ মানুষ খুব কমই আছে কলকাতায়। খুবই কম। সামান্য একটু বাতের ব্যথা ছিল পায়ে, কিন্তু তার জন্যে কেউ কখনো কি আত্মহত্যা করে?'

কিমাশ্চর্যম! তবু আত্মহত্যা করলেন হ্যামিলটন কক্স। কাগজঅলারা বলল : অসুখী দাম্পত্যজীবনই এর কারণ। স্ত্রীর প্রত্যাবর্তনের চিঠিটিই হল মূল। অবশ্য মন্দলোকে মাদাম দেরম্যাভিয়েকে ছেড়ে দিল না।

*

সেদিন তদন্তকারীরা কেউই মাদাম দেরম্যাভিয়ের কথা তোলেন নি। তার কারণ হ্যামিলটন সেরকম কোনো সুযোগ রেখে যান নি। কিন্তু মন্দ লোকেরা এমন সুযোগ ছাড়বে কেন? তারা মাদামের দিকে বাঁকা চোখেই তাকিয়ে রইল। আর গোঁড়া খৃষ্টানরা এমন সুযোগ কখনো কি হেলায় হারাতে পারেন? তাঁরা হঠাৎ কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন আসরে। কাগজে কাগজে তাঁরা ফেঁদে বসলেন পরোক্ষ আলোচনা! থিয়েটারগুলির ওপর অনেকদিন থেকেই ছিল তাঁদের রাগ। ঐগুলিকে তাঁরা মনে করতেন পাপের আড্ডাখানা! এ সুযোগে তাঁরা এদের ওপর নিয়ে নিলেন এক হাত। 'ক্রিশ্চিয়ান অ্যাডভোকেট'-এর পাতায় লেখা হল, 'দি থিয়েটার ওয়াজ, ফ্রম দি ফার্স্ট, দি ফেভারিট হন্ট অব সিন।' অর্থাৎ এই থিয়েটারগুলি আগাগোড়া নরকের দ্বার। সৎ মানুষগুলিকে পাপের ভেতর টেনে আনাই হল তাদের কাজ।

থিয়েটারগুলি যদি নরকের দ্বার হয়, হয় পাপের আড্ডাখানা, তবে তার অভিনেত্রীরা কী! এই মেয়েগুলি নিশ্চয় আরো জঘন্য। বলাবাহুল্য, মাদাম দেরম্যাভিয়েকে সেই নারকীয় কলঙ্কে লিপ্ত করা হল! পাড়ায় পাড়ায় নানা রকম রসাল ও মুখরোচক খবর ছড়িয়ে পড়ল। গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ অবকাশগুলিতে সহর কলকাতা মগ্ন হয়ে রইল এইসব কুৎসিত রসিকতায়।

কিন্তু কে জানত, নাটকের ওপরেও নাটক হয়।

এবং সব থেকে মজার ব্যাপার, সেই অসম্ভব নাটকই ঘটে গেল। এবং মাত্র বারো দিন পরে। তেরোই মে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে অভিনেত্রী দেরম্যাভিয়ে মারা গেছে। —'আনফরচুনেট ফিমেল হ্যাজ অলসো বিন রিমুভড ফ্রম দি স্টেজ অব লাইফ।' জীবনের মঞ্চ থেকেই চিরদিনের তরে বিদায় নিয়েছে হতভাগিনী!—কারণ? কী ভাবে বিদায় নিয়েছে?—না, আত্মহত্যা নয়। হঠাৎ অসুস্থতা! হ্যামিলটনের মৃত্যু থেকে দু সপ্তাহ আর গেল না। তেরোদিনের মাথায় এক বৃহস্পতিবার সকালে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে সকল যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পেল বিপন্না ফরাসী-বধূটি! কোনো বাঁকা কটাক্ষই আজ আর তাকে স্পর্শ করতে পারল না।

এ মৃত্যুতে অনেকেই না কেঁদে পারলেন না। কেউ কেউ এ মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেন। বললেন, পুরোপুরি আত্মহত্যা না হলেও এটি যে আত্মত্যাগ, তা সুনিশ্চিত!

খৃষ্টান কাগজগুলির কিন্তু এতেও মন ভিজল না। সুন্দরীদের ওপর যেন তাঁদের চিরকালের আক্রোশ। যে রমণীর পাল্লায় পড়ে স্বামী ডাকাত হয়, নিরীহ ভদ্রলোককে বিপথে নিয়ে গিয়ে যে সুন্দরী আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়, তাকে কখনো কি এঁরা ক্ষমা করতে পারেন? তাই সমবেদনার পরিবর্তে নিষ্ঠুরভাবে মাদাম দেরম্যাভিয়ের অবিচুয়ারি লিখলেন তাঁরা। লিখলেন, 'শি ওয়াজ নোন টু বি অ্যান হ্যাবিচুয়াল ড্রাঙ্কার্ড, এ প্যারামোর অব সুইন্ডলার অ্যান্ড অ্যাডালট্রেস। আপন দিস কমেনট্রি ইজ নিডলেস।'

অর্থাৎ দুর্বার পানাসক্তি ছিল দেরম্যাভিয়ের, রোজই নাকি সে মদ খেত। তার-ওপর সে ছিল এক লম্পটের রক্ষিতা, ভ্রষ্টচরিত্রা। সুতরাং এই নিয়ে আর কথা না বাড়ানোই ভালো।—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

হায় দেরম্যাভিয়ে! বেচারি কি এ জন্য ভালোবেসেছিল অভিনয়কে? সুদূর সিডনি থেকে হেনরীর হাত ধরে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এই ভয়ঙ্কর স্বপ্নই কি দেখতে দেখতে এসেছিল?—কি মঞ্চে, কি মঞ্চের বাইরে, সেকালের কলকাতায় অনেক নাটক ঘটে গেছে, কিন্তু এমন নিষ্ঠুর নাটকীয় ঘটনা কখনো ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। কখনো না।

# গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

দরোয়ান চলে যাবার পর সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে পরাশর যেন একটু দ্বিধায় পড়ে·····

# পায়ের পদাবলী

বিমল বসু

মেয়েটিকে বেশ লাগছিল। যেন পটে আঁকা ছবি। প্রসাধনের রুচিসম্মত সংক্ষিপ্ততায় নিজেকে তিলোত্তমা করে তুলেছে। রক্ত-পলাশের আগুন ঠোঁটে। পেনসিলে আঁকা ভুরুটি মদনের ধনু যেন। হাত-আয়নায় তবু মাঝে মাঝে মুখের জেয়ামিতির কাজ চলছিল হাতের মুঠো থেকে ছোট পাউডার-পাফ বুলিয়ে। সমস্ত তনুলাবণ্যে পুষ্পিত যৌবনের চারুসজ্জা। চারদিকের কুশ্রীতার আর উগ্রতার মধ্যে মেয়েটি যেন সৌম সমন্বয়ের এক আশ্চর্য সিম্ফনি।

কিন্তু পায়ের দিকে চোখ পড়তেই গা-টা গুলিয়ে উঠল। একেবারে যাকে বলে 'ক্লাই-ম্যাক্স'—নোংরা, বেড়প আকার আর পরি-চর্যার অভাবে কেমন যেন হতশ্রী। চোখ তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিলাম।

ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালী মেয়েরা পায়ের যত্ন নিতে একেবারেই জানে না—মানে নিতে চায় না তাচ্ছিল্যভরে। তাই দেহের দৃশ্যমান অঙ্গকেই নিখুঁত করে তুলতে কমপরিসর আচ্ছাদনের আড়ালে ফ্যাসানেবল জুতোর মুখোশে লুকানো পা দুটিও যে দেহের অন্যতম অঙ্গ তা যেন আজকাল বাঙালী মেয়েরা একেবারেই ভুলে গেছে।

অথচ ভারতীয় এবং বাংলা সাহিত্যে পদের পদাবলি কম গাওয়া হয় নি—চরণ-পদ্মে প্রাণ ডালি দেবার জন্যে কম মাতা-মাতি হয় নি! শ্রীরামচন্দ্র সীতার কোন হদিশ করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে উঠলেও লক্ষ্মণ ক্ষণেক দৃষ্টিপাতে বনপথের ওপর ক্ষীণ কোমল পদচিহ্ন দেখেই তা সীতা-দেবীর চারু চরণের চিহ্ন বলে চিনতে ভুল করেন নি। সর্ব অবয়বের মধ্যে দেবর লক্ষ্মণ সীতার পা দুটিকেই চিনতেন—বনবাসের চোদ্দ বছর এই চরণপদ্মের দিকে চেয়েই কেটেছিল। এ থেকে এটুকু অনু-মান করে নিলে অপরাধ হয় না যে বরবর্ণিনী সীতার চরণকমলের সৌন্দর্য ছিল অপরূপ এবং সেকালের রূপবতীরা বহিরঙ্গের রূপ-সাধনায় একালের মেয়েদের মতো পা দুটিকে অনাদর করতেন না।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে যাবার দরকার নেই। এই সেদিনও বছর তিরিশ-চল্লিশ আগে একধরনের মেয়েরা এসে বাড়ির মেয়ে-বউ আর গিন্নিবান্নীদের হাতে-পায়ের নখ কেটে পা দুটির ময়লা ঝামায় ঘসে পরিষ্কার করে আলতা পরিয়ে পায়ের 'ছিরি' ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথা তুললে আপনারা বলবেন 'ব্যাক-ডেটেড'। তাই অত দূরে যাবার দরকার নেই। দেহকে সুন্দর এবং দর্শনীয় করার ও ফ্যাসানেবল হওয়ার প্রথম পাট এবং 'আর্ট' যাদের কাছে এদেশের মেয়েরা নিয়েছে এবং নিচ্ছে সেই ভিনদেশী মেয়েদের পায়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছেন কি কখনও? দেহের উত্তমাঙ্গের মতো অধমাঙ্গের বিশেষ করে পায়ের দিকে তাদের নজর বড় কড়া—সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখ ভাইট্যাল স্টাটিস্টিক্স ৩৬-২৩-৩৬ হলেও এই প্রতিযোগিতার পটভূমিতে নিরাভরণ পদযুগলের ললিত লাবণ্য-এর ভূমিকাটুকু কম সোচ্চার নয়—পা দুটিকে তারা দেহ-সৌন্দর্যের অন্যতম আধার বলে মনে করে। দেহসৌন্দর্য যেন টসকে না যায় সেজন্যে মুখের মতো পায়ের ওপরও তাদের সমান সতর্ক নজর। কেননা এই পা দেখেই এবং পা থেকেই প্রেম-অনুরাগ-পসরার প্রথম পালা। প্রেমের প্রাথমিক পাঠ এবং 'পার্ট' ওদেশে এই পা থেকেই শুরু। স্কার্ট আর মিনিস্কার্টের দৌলতে এই পায়ের প্রদর্শনী আরও জোরদার হয়েছে।

পা যে সৌন্দর্যের আধার এ বিচার কিন্তু বিদেশীয় নয়—সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। খুব বেঁচে গেছেন আপনারা একালের মেয়ে হয়ে। সেকালের হবু শাশুড়ীরা বউ খুঁজতে এসে দেখতেন হবু পুত্রবধূর পা 'লক্ষ্মী-পা' কিনা। সেকালে মুখশ্রীর সঙ্গে এই 'লক্ষ্মী-পায়ে'রও অনুসন্ধান চলত। দেখতে সুন্দর, অপূর্ব চোখ-মুখ কিন্তু খড়ম-পা বলে কত ডানাকাটা পরী সেকালে হরবকত বরবাদ হয়ে যেত তা বলার নয়। লক্ষ্মী ঠাকরুনের মতো ছোট সুন্দর গড়নের যে মেয়ে সে হল সুলক্ষণযুক্ত বরণীয়া বধূ। আজকাল মেয়ে দেখতে এসে শুধু মুখশ্রীই দেখা হয় বলে আধুনিক মেয়েরা মুখ-চর্চাতেই অনেক-খানি সময় দেয়। পায়ের দিকে একেবারেই তাকায় না বলেই এই শোচনীয় হাল। আমার মনে হয় হবু শাশুড়ী নয়—হবু বর আর প্রেমিকরা একটু বর্বর হয়ে 'কন্যা'র পা দেখতে চাইলেই মেয়েদের চোখ পায়ের দিকে ফিরবে।

পা দুটির সর্বাঙ্গ শাড়িতে আর পায়ের পাতা জুতোর খোলসে ঢাকা থাকে বলে তাদের অযত্ন করা মোটেই উচিত নয়। আপনি হয়তো পায়ের গড়ন না বদলিয়ে দিতে পারেন কিন্তু দেখতে ভাল-নয় এমন পা দুটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে, পরি-মার্জনা করে আলতা পরিয়ে আলগা সৌন্দর্যের ঢেউ তুলে সারা অবয়বে একটা শান্ত শ্রী ফুটিয়ে তুলতে পারেন অনায়াসেই এবং বিশেষ করে শীতের নিষ্করুণ দিনে।

আপনার পা দুটি লক্ষ্মী-পা না হতে পারে। সেজন্যে লজ্জা পাবার কিছু নেই। মুখের মতো পায়েরও একটু যত্ন নিতে হয়। 'এক্সপোজার' বেশি হলে রমণীয় দৃশ্যের ফটোও কালো হয়ে যায়। সব ব্যাপারে বেশিটাই খারাপ। সমস্ত অঙ্গের মধ্যে পা প্রায় সবসময়ে সবচেয়ে বেশি এক্সপোজড হয় —জলে রোদে ধুলোয়। আর আজকালকার মেয়েরা তো সর্বদাই পায়ে-পথে। কেউই বা মোজা ব্যবহার করে। এই কারণেই পা হতশ্রী হয়ে যায়। পায়ের গড়ন আপনি না বদলাতে পারে কিন্তু পরিমার্জনা এবং পরিচর্যায় পায়ের পাতা, গোড়ালি মসৃণ হতে, নোংরা অপরিচ্ছন্ন পা সুশ্রী হতে পারে, ফাটা বিবর্ণ পায়ে চেকনাই ঝলকে উঠতে পারে। এবং তা করতে আপনার দু জাহাজ কসমেটিক্স লাগে না। এখন শীতকাল। পায়ের পরিচর্যা করার এই-ই তো সেরা সময়।

এজন্যে দরকার স্নানের সময়ের পাঁচ মিনিট একটু গরম জল, এক টুকরো সাবান, বাতিল করা টুথ-ব্রাস একটা আর ঝামার একটা টুকরো (এখন বাক্স মেজের পায়ের পাতার আকারে হাটে-বাজারে মার্কেটে বিক্রি হয়)।

এ দিয়ে কি করতে হবে তাও কি বলে দিতে হবে? গরম জলে পা এবং পায়ের চারপাশ ভাল করে ভিজিয়ে টুথব্রাসে সাবান ঘসে তা দিয়ে পায়ের চারপাশে, আঙুলের মধ্যেকার জায়গা, পায়ের ওপরের অংশটুকু—আর নখগুলি পর্যন্ত পরিষ্কার করে নিন। পায়ের গোড়ালি ঝামা দিয়ে ঘসে পরিষ্কার করে নেবেন। যাদের পা একটু বেশি ফাটে শীতের দিনে তাঁরা গোড়ালী পরিষ্কার করে তরল গ্লিসারিন লাগাতে পারেন। পায়ের নখ কেটে আলতা পরলে পায়ের বিবর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা দূর হয়ে আপনার শরীরে একটা আলাদা শ্রী এনে দেবে। আর তখন যদি কেউ আপনার প্রসাধিত রাঙা মুখ আর পরিচ্ছন্ন আলতা-পরা চারুচরণ দেখে মুগ্ধচোখে চরণ-কমলের জন্যে জয়দেবকে স্মরণ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তাহলে আপনার বুকের ভেতর সুখের ঢেউ উঠবে না কি?

দি ফ্লাইট

দ্য স্টোলেন এয়ার সিপ

'এখানে এত দুঃখ কেন?' ঘর পালানো ছোট্ট ছেলেটার মুখে কথাটা ভুলে যাই কি করে? শিশুদের নিয়ে চলচ্চিত্র ভাবতে গেলে ঋত্বিক ঘটকের দুঃসাহসিক চিত্রকর্ম 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' সর্বাগ্রে মনে পড়ে যায়। একটা শিশুর চোখ দিয়ে ক্যামেরায় মহানগর পরিক্রমণ। জীবনকে দেখা। জীবিকাকে অনুভব করা। ছবির মতো আনন্দ-বেদনা হতাশা দুঃখ। সবশেষে শিশু মনে নিঃসঙ্গতা। আশা ভঙ্গের প্রতিচ্ছবি। এক জায়গায় প্রতীক ব্যবহার স্মৃতির এ্যালবামে সাজিয়ে রাখার মতো। ছেলেটি আশাহত: একটা চিল পড়ে আছে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'চিল' কবিতা অনুসরণে—গভীরতা অনেকখানি। তাছাড়া সংলাপেও গভীরতা বর্তমান। ছবির শেষ দিকে একটা মুটে বলছে : 'এ লড়াইয়ের জায়গা—ক'লকাতা শহর—দয়ামায়া কুছু নেই, যা ঘরে চলে যা।'

সুতরাং শিশুচিত্র বা চিলড্রেন ফিল্ম মানেই নিছক ডকুমেন্টারী স্টাইলে পাহাড়ে ওঠবার অ্যাডভেঞ্চারাস গল্প অথবা বিস্ময়ে হতবাক করে দেওয়া কোনো স্টান্ট ছবি কিংবা হাসিতে ফেটে ওঠার মতো প্রমোদ-চিত্র নয়। দেশ-বিদেশে শিশুচিত্র নিয়ে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে—বেশীর ভাগ ছবিতেই কোনো না কোনো সমস্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যাতে সারাক্ষণ ছবি জুড়ে একটা বিশেষ গভীরতা বজায় থাকে। ছবিকে সহজভাবে গ্রহণ করেও ছবি সম্পর্কে গভীরতর আলোচনা হ'তে পারে। আগেকার শিশুচিত্র এবং আজকের শিশুচিত্রের ব্যবধান অনেকটা—এই পথ পরিক্রমণের ইতিহাস খুব ছোট নয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গে 'গৌরচন্দ্রিকা' আবশ্যক।

রূপকথার যাদুকর ডিজ্‌নী ইহজগতে নেই এখন। কিন্তু ও'র চলচ্চিত্র কর্ম প্রত্যেকটা মানুষের মনে স্মৃতি হয়ে আছে। একদা যিনি সরল নিষ্পাপ বিশুদ্ধ শিশু-হৃদয়কে তৃপ্তি এবং আনন্দ দিতে, ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিতে, শিল্পশ্রী মানবিকতায় উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ছবি আজও শিশুদের কাছে এক বিচিত্র অনুভূতি—সাত সমুদ্দুর তেরো নদীতে উত্তাল তরঙ্গ বহু রঙ্গে রঙ্গীন। অপরূপ স্রষ্টা মানসপটে শিশুদের নিয়ে মেতে থাকতেন সর্বক্ষণ। নির্জনতায় শিশু আর শিশুকে ঘিরে ভেবেছিলেন চলচ্চিত্র—যখন রোমাণ্টিক আর গ্ল্যামার রাজ্য বহুদূরে সুবিস্তৃত। শিশু মনে নিজের মনকে রাখলেন—অনুভব করলেন ওরা কি চায়। মিকি মাউস, ডোনাল্ড ডাক, ক্লারাবেল কাউ, প্লুটো, গুফী ইত্যাদি সব এক এক ধরনের অনন্যসৃষ্টি। সবচেয়ে বড় কথা এত সব নতুন আঙ্গিক প্রয়োগেও তিনি রূপকল্পে বাস্তবকে পাশ কাটিয়ে যাননি। রূপকথার আশ্চর্য জগতে সৃষ্টি করেছেন 'দ্য লিভিং ডেজার্ট' এবং 'দ্য ভ্যানিশিং প্রেইরী'র মতো সব ছবি। এর উপলব্ধি যাঁরা শিশু বয়সে করেছিলেন আজও ভুলতে পারেন নি। শিল্পকর্মের শেষদিকে শিশু-দের জন্য করে গেছেন ডিজ্‌নীল্যাণ্ড—যা স্মরণীয় সৃষ্টির ইতিহাস কোনোদিন ওয়াল্ট ডিজ্‌নীকে ভুলতে পারবে না। আশ্চর্য সৃষ্টি করেছেন কারণ উনি শিশুদের নিয়ে, ভাববার মতো ভেবেছেন। শুধুমাত্র শিশু-চিত্রের ভাবুক হিসেবেই নয়, চলচ্চিত্রের কারিগরী উন্নতি বিধানে তাঁর দান অপরিমিত। শিল্পী নেই—স্মৃতি রয়েছে। পরিমাপ করবার লোক নেই, কিন্তু প্রয়োজন নিশ্চয়ই রয়েছে।

ডিজ্‌নীসম এমন কোন বিশেষ প্রতিভা নেই যাঁরা আমাদের ভাবাতে পারেন। সুতরাং এক্ষেত্রে আমি আমার দেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিশুচিত্র সম্পর্কিত আলোচনা ছু'য়ে ছু'য়ে কোন এক আশ্চর্য প্রতিভার সন্ধানে লেখার ক্রমবিস্তার।

ক'লকাতায় গত ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবে ক্লদ বেরীর 'দ্য ওল্ডম্যান অ্যান্ড দি চাইল্ড' ছবিটা মনে করে রাখার মতো। ছবির গল্প : একটি শিশু এবং এক বৃদ্ধ দম্পতিকে নিয়ে। সময় : নাজী অধিকারের শেষ কয়েক মাস। স্থান : ফ্রান্সের আলপুস পর্বতমালার পাদদেশ। বৃদ্ধ দম্পতি অবসর কাটাচ্ছে নির্জনে। যুদ্ধ সম্পর্কে একমাত্র সংগ্রহ তখন বেতার। সরকারী প্রচারে ইহুদীদের এবং কম্যুনিস্টদের সরকারের কাছে ধরিয়ে দেবার কথা বলা হয়। অথচ শিশুটি ছিল ইহুদী—বৃদ্ধ দম্পতি তা জানত না। তারা শিশুটিকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে। তারপর জানতে পারে। স্কুলে ছেলেটির পরিচয় আবিষ্কৃত হবার পর মাথা ন্যাড়া করে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়—এই সব দৃশ্যগুলো চিরকালের স্মরণীয়।

তারপর শিশুটির জীবন বাড়ীতেই শুরু হয়ে যায়। গ্রীষ্মের মনোরম দিন-গুলোতে। ওরা দুজন ঠিক শিশুর চাপল্যে চপল হয়ে উঠল। তিনটি পৃথক সত্তাই যেন শিশুর মতো। তখন তাদের কাছে বিশ্বসংসার, রাজনীতি, সমকালীন ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ হয়ে উঠলো খেলনার মতো।

একটা রুমানিয়ান ছবি দেখেছিলাম—চাঁদে যাবার গল্প—স্টেপস্ টু দি মুন। ছবিটি ব্যঙ্গাত্মক। কিন্তু ছবিটিকে স্বাভাবিক-ভাবেই সহজভাবে গ্রহণ করা যায়। অ্যাডভেঞ্চার ধরনের গল্প। এক ভদ্রলোক এখনও

ক্লাইট স্টেশনে—তিনি টিকিট কেটেছেন—যাবেন ভেনাসে অথবা শুক্রগ্রহে। ক্লাইট ছাড়তে কিছু সময় বাকী। ভদ্রলোক ল্যাবরেটরীতে গিয়ে ইলেকট্রিক সেভিংএ বিপত্তি ঘটালেন—অন্ধকার হ'ল—বৈদ্যুতিক গোলযোগে ক্লাইট স্টেশনে সম্পূর্ণ অন্ধকার। এখানে অনেকটা ট্রিক সিকোয়েন্সের মতো। ভদ্রলোক চাঁদে যাবার জন্য প্রস্তুত। চাঁদে একটি সুন্দরী মেয়ে ডাকছে। বিভিন্ন উপায়ে যাবার চেষ্টা করলেন। গ্যালিলিও প্রভৃতি বোঝালেন ওকে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হ'ল না। ক্লাইট স্টেশনে আলো আর আলো। আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর হাসির ছবি কিন্তু ছবিতে যা কিছু দেখানোর নেপথ্যে পরিচালক বলতে চেয়েছেন : চাঁদে যাবার জন্য আমরা ইচ্ছুক। এই ইচ্ছেটা আমাদের গ্যালিলিওর আমল থেকে প্রভাবিত করছে কিন্তু কিছুই অসম্ভব নয়—টিকিট কেটে ভেনাসেও যাওয়া যাচ্ছে।

সুতরাং ইদানীং যেসব শিশুচিত্র দেখার সৌভাগ্য আমাদের হচ্ছে—বক্তব্যে গভীরতা এবং বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে। 'ফোর হানড্রেড ব্লোজ' ছবির শিশুটিকে অনুভব করতে বয়স্করা অনেক সময় নিয়েছেন। সেই ছেলেটিকে যখন শেষ দৃশ্যে ফ্রিজ করে রাখা হল—সেখানেই কিন্তু ছবিটার শেষ আবার ভাবনার তরঙ্গে সেখানেই ছবির শুরু।

আবার অনেক শিশুচিত্র দেখা যাচ্ছে যাতে তাদের বাবা-মা'র বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতির সমস্যাগুলো প্রকটভাবে দেখানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটি বেলজিয়াম ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ব্রুনো' ছবির নাম—ছেলেটিরও নাম। বিবাহ বিচ্ছেদের পর বাবা গভীরভাবে ভাবল ছেলেটি সম্পর্কে। মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি স্বভাবের ছেলেটি তার বয়সের তুলনায় তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন। সে বুঝতে পারে এতে তার বাবার দোষই বেশী। মায়ের কাছে থাকত 'ব্রুনো'। ছুটিতে বাবার কাছে এলো। বাবা যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করলেন ছেলেকে খুশী করবার জন্য। একসময় ছেলেটি চেষ্টা করে মা'র কথা বলতে—বাবাকে ভুলটা ধরিয়ে দেবার জন্য। বাবাকে অনুরোধ করে তার সঙ্গে মা'র কাছে যাবার জন্য। বাবা মা'র কাছে আসে। মা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ব্রুনোর চোখে ভেসে ওঠে একটা সুখী জীবন—সুখী সংসার—সুখী আবহাওয়া।

এগুলো ঠিক চিলড্রেন ফিল্মের পর্যায়ে আসে না তবুও চিলড্রেনের সমস্যা বিশেষভাবে অঙ্গীভূত। তাই দেশে দেশে এখন এসব সমস্যা নিয়ে একাধিক ছবি হচ্ছে—একান্তভাবেই শিশুদের দেখানো উচিত। চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও সমস্যা নিয়ে এবং সমস্যার সমাধান নিয়ে একাধিক ছবি নির্মিত হচ্ছে।

বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ায় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে, তখনকার সামরিক অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্ত্বেও, শিশুদের জন্য এক নতুন, সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত কাজ শুরু করা হয়। আজও অব্যাহত এই শিশু চলচ্চিত্র শিল্প। বছরে ২০টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র এবং ৫০ রিলেরও বেশি কার্টুন, সরল-বিজ্ঞান ও দলিলচিত্র তৈরী হয়। কেন্দ্রীয় দলিলচিত্র স্টুডিও 'পাইওনেরিয়া' নামে ছোটদের একটি মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা প্রকাশ করে। শিশুদের জন্য প্রথম সোভিয়েত চলচ্চিত্রটি মুক্তিলাভ করে ১৯১৯ সালে। শিশু চলচ্চিত্র প্রযোজনার পেছনে বয়স্কদের জন্য চলচ্চিত্রের মতোই অকৃপণভাবে খরচ করা হয়। উল্লেখযোগ্য—পরিচালক থেকে বিদ্যুৎবন্দ্রী পর্যন্ত—বেতনহার সমান।

এবার নিয়ে এই দুবার মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কাঠামোর মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। রুশ ফেডারেশনের পরিবেশক সংস্থাগুলি বহু স্কুলে দশ হাজারেরও বেশি ইয়ং পাইওনিয়ার চলচ্চিত্র প্রদর্শন কেন্দ্র রয়েছে। সবিশেষ উল্লেখ্য শিশুরাই এগুলো চালায়।

সোভিয়েত রাশিয়াতে বহু শিশু চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছে। পুরো তালিকাটা হবে বেশ কয়েকশো। তার মধ্যে আছে শিল্পগুণসম্পন্ন মহৎ সৃষ্টি—আজ যাকে ক্লাসিক বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। ভালো চলচ্চিত্র রয়েছে, মাঝারিও। আবার ব্যর্থতাও আছে। কিন্তু এসবের মধ্যে একটিও নিষ্ঠুর চলচ্চিত্র নেই, একটিও নেই মানবিকতা-বিরোধী। সবকটিরই উদ্দেশ্য হল যা কিছু সুস্থ, উন্নত ও মহৎ তার প্রতি তরুণ দর্শকদের আকর্ষণ ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।

এক আশ্চর্য প্রতিভা চেকোশ্লোভাকিয়ার—কার্ল জামান। ওয়াল্ট ডিজ্‌নীর সমকক্ষ না হলেও উনি শিশু চলচ্চিত্রকার হিসেবে যে সম্মান লাভ করেছেন—তা বিশ্বের আর কোন পরিচালকের ভাগ্যে জুটেছে কিনা সন্দেহ। জামান প্রতিভার নতুনতম দিক্‌দর্শন 'স্টোলেন এয়ারশিপ'। এ ছবি যাঁরা একবার দেখেছেন তাঁরা সারা জীবন মনে রাখবেন সেই পাঁচটি শিশু যারা বেরিয়ে পড়েছিল রোমাঞ্চকর এ্যাডভেঞ্চারে। গিয়ে উঠেছিল এক সুন্দর দ্বীপে। ওরা বোধহয় কলম্বাসের মতো আবিষ্কার করেছিল এক নতুন মহাদেশ—সেই জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা এক একদিন এক একটা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের সম্মুখীন হল। ওরা বাড়ী থেকে পালানো ছেলে। পালিয়েছিলো একটা পুরোনো আমলের এয়ারশিপে চড়ে। বাড়ী থেকে খোঁজ খোঁজ। সারা শহরে তুলকালাম কান্ড ব্যতিব্যস্ত। অ্যাডভেঞ্চারের ফাঁকে ফাঁকে শহর জীবনের একটা বিচিত্র রূপ ক্যামেরায় ধরে দেখিয়েছেন জামান। দেখিয়েছেন ঐ এয়ারশিপের জন্য অনাস্থা প্রস্তাব—মন্ত্রিসভার পতন। কাগজে বিচিত্র খবর—সাংঘাতিক বিক্রি। রিপোর্টারদের অদ্ভুত সব সংগ্রহ। সেই পাঁচটি ছেলের একজনের ছ' মাস বয়সের ছবি দিয়ে বিক্রি করল কাগজওয়ালাদের— কাগজওয়ালারা সুন্দর ক্যাপশনে সাজিয়ে এমন সব সংবাদ পরিবেশন করলেন যাতে কাগজের বিক্রি দ্বিগুণ হল। ব্যবসাদার—চোরাকারবারী প্রভৃতিদের কার্যকলাপ। কিভাবে একটা ছোট্ট ঘটনাকে এক্‌সপ্লয়েট করে কত বড় কাজ হতে পারে তিনি তা দেখিয়ে দিয়েছেন। শিশুদের সারাক্ষণ আনন্দে ডুবিয়ে—বয়স্কদের সূক্ষ্ম কৌতুকরসে ভিজিয়ে—মাঝে মাঝে সমস্যাগুলো সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলতে যে দক্ষতা—যে অপরূপ শিল্পসৃষ্টির স্বাক্ষর কার্ল জামান রেখেছেন একটার পর একটা ছবিতে তার অন্য নজীর পাওয়া ভার।

জামান ছাড়া আরো অনেক চেক চলচ্চিত্রকার আছেন যাঁদের শিশুচিত্র দেখলে শিল্পনৈপুণ্যের এক বিচিত্র রূপ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে স্কালাম্বিকর 'ফ্লাইট' ছবিখানি উল্লেখ্য। সুন্দর এবং সহজ চিন্তার উন্মেষ সম্পূর্ণ ছবি জুড়ে। ছোট্ট এক শিশু কিভাবে একজন বাজে ছেলের পাল্লায় পড়ে 'বয়ে' গেল সেই গল্প এবং অহরহ এ ঘটনা ঘটছে পাড়ায় পাড়ায়। গল্পে এমন কোন নতুনত্ব না থাকলেও প্রয়োগ পরিকল্পনায় নতুনত্বের বিশেষ 'ইমেজ' এনে দিয়েছেন পরিচালক স্কালাম্বিক। শিশুচিত্রে চেকোশ্লোভাকিয়া একরকম ইতিহাস। বিশেষতঃ জামানের জুলে ভার্নে'র ওপর বিশেষিত ছবিগুলি একসময় প্রচন্ড আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর ভার্নে ছবি 'ইনভেনশন্‌স অফ ডেস্ট্রাকশন' পুরস্কৃত হয়েছিল বিশ্ব প্রতিযোগিতা—ব্রাসেলস-এ-অনেক পুরস্কারের এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরস্কার। জামান সম্প্রতি যে ছবিটি শেষ করেছেন তাও ভার্নে'র ভিত্তিতে—ছবির নাম : 'অন দি কমেট'। কমেটে করে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিল শিশুরা। তাদের চোখ দিয়ে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা—টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলো এক করে সাজিয়েছেন।

বিখ্যাত গোটওয়ালডো ফিল্ম স্টুডিও চেক দেশের শিশুচিত্র নির্মাণের পীঠস্থান। বিখ্যাত চেক শিশু চলচ্চিত্রকার যোসেফ পিনকোভা, কার্ল জামান প্রভৃতি অনেকেই এখানে শুরু করেছিলেন তাঁর শিল্পীজীবন। এখন অনেক চেক চলচ্চিত্রকারই শিশুদের ছবির কথা ভাবছেন এবং প্রয়োগপদ্ধতিতে নতুনত্ব দেখিয়ে বিশ্বস্বীকৃতি লাভে উন্মুখ।

শুধু চেক দেশেই নয় দেশে দেশেই আজ ভাবছেন এবং এতে প্রয়োগ পরিকল্পনার একটা সুন্দর দিক্‌ রাখছেন—টেকনিকের নতুনত্ব আরোপ করতে পারছেন—তার সুন্দর উদাহরণ সত্যজিৎ রায়ের '[illegible]' নয় কি?

# ফুল কেন প্রিয় ?

সন্ধ্যা সেন

পারিজাত পুষ্পের অধিকার নিয়ে ণী ও সত্যভামার কলহ এবং স্বয়ং য়ণের বিপন্ন হওয়ার কাহিনী কারোরই না নয়। দেবতাদের কামনার বস্তু এই । তাই কি তা মর্ত্যের মানুষকে সীমার মালিন্য বিস্মৃত করে -কল্পনায় আত্মহারা করে দিতে র? হয়ত তা ক্ষণিকের। কিন্তু ক্ষণ-ীন মাধুর্যের গভীরতার মধ্যেই আমরা তীব্রতায় বেঁচে উঠি, দীর্ঘ জীবনব্যাপী ড়ৃতিদীন শ্রীহীন বাঁচা বুঝি তার মিথ্যে হয়ে যায়। স্বর্গলোক থেকে করে মর্ত্য অবধি ফুলের স্থান র ওপরে।

ফুল দেবভোগ্য। দেবপুজোয় ফুল রিহার্য। আবার ফুলেরই দাক্ষিণ্যে ষের সামান্য গৃহও অসামান্য সৌন্দর্য-ত হতে পারে। আসবাবহীন গৃহ-ণ ফুলদানীতে রাখা একগুচ্ছ ফুলের সৌন্দর্য, অভিনন্দন, সভা অথবা ীতাসরে পুষ্পস্তবক, পশ্চাৎপটে পুষ্প-র বাহার, নৃত্যগীতের শেষে ফুলের গ নিয়ে শিল্পী, গুণী অথবা নীয়কে সম্মান প্রদর্শন বুঝিয়ে দেয় ন্দর্যানুভূতির অভিব্যক্তিতে ফুলই শেষ । অনুভবগাঢ়তায় ভাষা যখন স্তব্ধ যায়, তখন সেই অনির্বচনীয়কে আমরা শ করি ফুলের ভাষায়।

বিবাহের পর বরকনের প্রথম মিলন-ির নাম ফুলশয্যা। এমন কাব্য-র নাম ও রূপের স্বপ্ন অন্য কোন র কোন মানুষ দেখেছে কিনা জানি তবে বাংলাদেশে আবহমানকাল থেকে এ বস্তু নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতই সহজ হয়ে উঠেছিল। বধূকে পুষ্পাভরণে সজ্জিত করে পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যায় পৌঁছে দেওয়া হয়। সে শয্যার বাহারই বা কি! নানা রঙের ফুল বিছানো, ফুলের মশারীর কারিগরী, পুষ্পমণ্ডিত পালংএর প্রতিটি কোনের শিল্পকার্য অবাক হয়ে দেখবার মত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় একটি গানের কলি—তথা সাঁওতাল বধূর স্বামীকে শাসানো:—

> 'হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল
> এনে দে, এনে দে, নইলে বাঁধবো না—
> বাঁধবো না, বাঁধবো না চুল'।

আধুনিক যুগে মেয়েদের সাজে ফুলের বাহার একান্তভাবেই শান্তিনিকেতন তথা কবিগুরুর অবদান। সেদিন মেয়েদের সাজের আলোচনা প্রসঙ্গে কণিকা বন্দ্যো-পাধ্যায় বলছিলেন, 'খোঁপায় একগুচ্ছ ফুল ছাড়া অন্য কোনো প্রসাধনের কথা আমি ভাবতেও পারি না।' আর সে সাজ যে কি অপরূপ কণিকাকে দেখেই তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কবরী সংলগ্ন ফুলের স্তবক দেখে ভ্রম হয় কে কার অলংকার? ঐ ফুলের গুচ্ছই সুন্দর মুখখানিকে কবিত্বময় করে তুলেছে? না মুখের সৌন্দর্যলাবণ্য আত্মপ্রকাশের যথাযথ আধার খুঁজে পেয়েছে ঐ পুষ্পস্তবকের মধ্যে? আর এ হেন শিল্পীর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি গানের কলির ছন্দে পুষ্পকলির দুলে ওঠায় ছন্দসুন্দর ভাষা, অনায়াসরচিত সৌন্দর্য ছবির,—কোনো জবাব আছে?

সেদিন মহিলা শিল্পী মহলে মাধবী সম্বর্ধনায় শিল্পীরা মাধবীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ফুলের অলংকারে সাজিয়ে। পুষ্পসজ্জিতা মাধবীকে দেখে যুগ-যুগান্তরের পথ পেরিয়ে মন হারিয়ে গিয়ে-ছিল সুদূর অতীতে ইতিহাসের একটি পাতায়। বাংলাদেশে এসে শাহজাহানের পুত্র এক পত্রে পিতাকে লেখেন, 'কি মণি-মাণিক্যের লোভ দেখাও পিতা! বাংলার ফুলের সাজ দিল্লীর রত্নালঙ্কারকে হার মানায়।'

মানুষের সৌন্দর্য কল্পনা ও সমন্বয়-বোধ কতদূর যেতে পারে ফুল সাজানোর প্রতিযোগিতার নানারঙা ফুলের মিলন সমারোহই তার প্রমাণ।

জাপানে ফুল সাজানো, গৃহসজ্জা, মঞ্চসজ্জা ও দেহসজ্জায় ফুলের একটি বিশেষ স্থানই শুধু নেই—ফুলসজ্জা ওদের গার্হস্থ্যজীবন, সংস্কৃতি লোক ও শিল্প-ভাবনার অঙ্গীভূত।

দক্ষিণ ভারতে মেয়েদের খোঁপায় ফুলের বাহার শুধু প্রসাধনই নয়, কল্যাণ-দ্যোতক অপরিহার্য অঙ্গ। শুধু কি মেয়েরা? সারা পৃথিবীতে পুরুষেরাও ফুল-সজ্জা থেকে বাদ পড়েন নি। বাটনহোলে ফুল মূল্যবান স্যুটে এক পেলব রমণীয়তার ছোঁয়া নয় কি? স্মার্ট সেহেরজীকে বাটনহোলে গোলাপফুল ছাড়া যেন ভাবাই যায় না।

কবি ও শিল্পীদের কাব্য ও শিল্প-কৃতিতে ফুল ত রীতিমত একটি চরিত্র। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় এবারের নজরুল-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তি—"যদি আর বাঁশী না বাজে"-তে কয়েকটি পংক্তি যখন কবি তাঁর জীবনের এক মহান অনুভূতির কথা বলছেন "আমার ছেলে মারা গেছে। আমার মন তীব্র পুত্রশোকে ভেঙে পড়েছে। ঠিক সেইদিন সেই সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে হাস্নাহেনা ফুটেছে। আমি সেই হাস্না-হেনার গন্ধ প্রাণভরে গ্রহণ করেছি। ......আমার মৃত্যুর পর হয়ত বা বড় বড় সভা হবে। কত কবিতা, কত বড় বড় কথা, বিশেষণের ঘটা......তখন সেই অসুন্দরের শ্রদ্ধানিবেদনের শ্রাদ্ধবাসরে বন্ধু তুমি যেন যেওনা। যদি পার তোমার ঘরের আঙিনায় বা আশেপাশে যদি একটি ঝরা পায়ে পেষা ফুল পাও সেইটিকে বুকে চেপে বোলো "বন্ধু আমি তোমায় পেয়েছি।" এখানে কবি তাঁর বঞ্চিত জীবনের ক্ষোভকে রূপ দিয়েছেন দলিত ফুলের মলিন কিন্তু সুকুমার সুষমায়। পুত্রশোকের বেদনার সঙ্গে হাস্নাহেনার করুণ সৌরভ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

ফুলের প্রসঙ্গে কানন দেবী একদিন বলেছিলেন, "ফুল যে ভালবাসে না—পৃথিবীর যে কোনো রকম ঘৃণ্য কাজ করাই তার পক্ষে সম্ভব। হাজার রকম সৌখিন জিনিসে ঘর সাজিয়েও আমার তৃপ্তি হয় না, যদি না তাতে এতটুকুও ফুলের ছোঁওয়া থাকে। মনে হয় কোথায় যেন একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। ঘর সাজানোর শিল্পে কানন দেবীর খ্যাতি কলারসিক মহলে প্রবাদ বাক্যের সামিল। এই কানন দেবীকেই দেখেছি বাগানে যখন ফুল থাকে না অথবা "লগনসা"র কারণে মনের মত ফুল বাজারে পাওয়া গেল না—নানা-রকম পাতা ও অর্কিড দিয়ে ঘরের দেওয়ালে কত রকমারি ডিজাইন তৈরী করে চোখ-জুড়ানো শ্যাম সমারোহের স্নিগ্ধশ্রীতে স্বপ্নময় পরিবেশ রচনা করতে।" "ঘরের ডিসটেম্পারড দেওয়াল, খাট, আলোর ঝাড় যাই-ই থাক তার মধ্যে একটা রুক্ষতা যেন থাকেই। ফুলের স্পর্শে সেটা অনেকটা সফ্‌ট ভাউন করে। তা ছাড়া ফুল দেখলেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অলিখিত ঘনিষ্ঠতাকে যেন নতুন করে অনু-ভব করি।" এই হোলো গৃহসজ্জায় ফুলের ভূমিকা সম্বন্ধে কানন দেবীর অভিমত।

রবিশঙ্করের উক্তি হোলো—"কঠিন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মুহূর্তেও ফুলের দিকে চাইলে যেন শ্রীহীন বেদনাও একটা কোমল কারুণ্যে মধুর হয়ে ওঠে।"

১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির শ্রেণী বিভাগ, মুক্তির তারিখ, প্রযোজক সংস্থার নামসহ তালিকা ঃ

| ক্রমিক সংখ্যা | ছবির নাম | প্রযোজক সংস্থা | মুক্তির তারিখ | শ্রেণী |
|---|---|---|---|---|
| ১। | সমান্তরাল | শ্যাডো মুভীজ | ৯ জানুয়ারী | গার্হস্থ |
| ২। | অরণ্যের দিনরাত্রি | প্রিয়া ফিল্মস্‌ | ১৬ ” | রম্যকাথিকা |
| ৩। | দিবারাত্রির কাব্য | নাবিক প্রোডাকসন্স | ১৬ ” | প্রেমধর্মী গার্হস্থ |
| ৪। | শান্তি | ছায়ালিপি প্রোডাকসন্স | ২০ ফেব্রুয়ারী | গার্হস্থ |
| ৫। | আলেয়ার আলো | ইউনিট প্রোডাকসন্স অব ইণ্ডিয়া | ৬ মার্চ | গার্হস্থ |
| ৬। | মেঘ ও রৌদ্র | কে, এল, কাপুর প্রোডাকসন্স | ১৩ ” | গার্হস্থ |
| ৭। | কলঙ্কিত নায়ক | বেবী অরুন প্রোডাকসন্স | ১৫ মে | গার্হস্থ |
| ৮। | মুক্তিস্নান | রাধারানী পিকচার্স | ১৫ ” | গার্হস্থ |
| ৯। | শীলা | কিনে ইউনিট | ৫ জুন | গার্হস্থ |
| ১০। | বিলম্বিত লয় | অনুরাধা ফিল্মস্‌ | ৫ ” | গার্হস্থ |
| ১১। | পদ্মগোলাপ | এস বি পি প্রোডাকসন্স | ২ জুলাই | সাসপেন্সধর্মী |
| ১২। | প্রথম কদম ফুল | ইকান্স ফিল্মস্‌ | ২৪ ” | প্রেমধর্মী গার্হস্থ |
| ১৩। | দুটি মন | এস এস ফিল্মস্‌ | ২৪ ” | গার্হস্থ |
| ১৪। | সাগিনা মাহাতো | রূপশ্রী ইণ্টারন্যাশনাল | ২১ আগস্ট | সমাজচিত্র |
| ১৫। | এই কোরেছ ভালো | লাইট অ্যাণ্ড শেড | ২১ ” | কৌতুক |
| ১৬। | নলদময়ন্তী | জে, এস, ফিল্ম প্রোডাকসন্স | ২৮ ” | পৌরাণিক |
| ১৭। | মেঘ কালো | পবিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রোডাকসন্স | ৪ সেপ্টেম্বর | গার্হস্থ |
| ১৮। | রাজকুমারী | শ্রীলোকনাথ চিত্রমন্দির | ২ অক্টোবর | গার্হস্থ |
| ১৯। | মহাকবি কৃত্তিবাস | রামায়ণ চিত্রম্‌ | ৯ ” | জীবনী |
| ২০। | নিশিপদ্ম | চিরন্তন চিত্র | ২৩ ” | গার্হস্থ |
| ২১। | প্রতিদ্বন্দ্বী | প্রিয়া ফিল্মস্‌ | ২৭ ” | সমাজচিত্র |
| ২২। | দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন | মিত্র প্রোডাকসন্স | ৫ নভেম্বর | জীবনী |
| ২৩। | ইণ্টারভিউ | দয়াশংকর সুলতানিয়া | ১৩ ” | সমাজচিত্র |
| ২৪। | মঞ্জরী অপেরা | অ্যাপোলো পিকচার্স | ২৭ ” | সমাজচিত্র |
| ২৫। | রূপসী | এ-আর-সি প্রোডাকসন্স | ১০ ডিসেম্বর | গার্হস্থ |
| ২৬। | স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে | সারদা চিত্রমন্দির | ২৫ ” | গার্হস্থ |

# প্রেক্ষাগৃহ

**১৯৭০-এ মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির নালতামামি**

নীচের তালিকা থেকেই দেখতে পাওয়া যাবে, ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির সংখ্যা হচ্ছে ২৬। এর সঙ্গে ২৩ নভেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলাভাষায় ভাষিংকরা দক্ষিণী ছবি শ্রীসুজাতা মুভীজ-এর 'পঙ্কযজ্ঞ'কে যুক্ত করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭, যা ১৯৬৯-এ মুক্তি-প্রাপ্ত বাঙলা ছবির সমান। এ-বছরের ছবিগুলির মধ্যে 'কবি কৃত্তিবাস' ও 'দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন'—এই দুটি হচ্ছে জীবনী-চিত্র, যদিও প্রথমখানিতে কবির আত্মজীবনীমূলক সংক্ষিপ্ত কবিতাটি ছাড়া বিস্তৃত উপাদানের অভাবে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে অনেকখানি। বলা বাহুল্য, 'নল দময়ন্তী' হচ্ছে পৌরাণিক। অজিত লাহিড়ী পরিচালিত 'পদ্ম গোলাপ' হচ্ছে এ-বছরের একমাত্র সাসপেন্সধর্মী চিত্র, যেমন হচ্ছে অজিত বন্দোপাধ্যায় পরিচালিত 'এই করেছো ভালো' একমাত্র কৌতুক চিত্র। 'সাগিনা মাহাতো', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'ইণ্টারভিউ' এবং 'মঞ্জরী অপেরা'—এই চারখানি ছবিকেই যদিও সামাজিক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, তবু যে-অর্থে 'মঞ্জরী অপেরা' সামাজিক, সে-অর্থে বাকী তিনখানি নয়। বাঙলা-দেশের যাত্রাজগতের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে বলেই 'মঞ্জরী অপেরা' সামাজিক-রূপে চিহ্নিত। মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে 'সাগিনা মাহাতো'-তে এবং এই কারণেই এটি সামাজিক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের বেকারত্ব আজকের এই শহুরে জীবনে একটি প্রচন্ড সমস্যা; এই সমকালীন সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' এবং 'ইণ্টারভিউ', এই দু'খানি ছবিরই মাধ্যমে। কিন্তু এই সমস্যা বিষয়ে দুজন পরিচালকের দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে পার্থক্য; একজন যেখানে কনফর্মিস্ট, অন্যজন সেখানে পুরোপুরি নন্-কনফর্মিস্ট। একের নায়ক যেখানে সমাজের উঁচুতলার লোকের অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও জীবনের চিরন্তন মূল্যবোধকে উপেক্ষা করতে পারে না, অপরের নায়ক সেখানে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে সমাজের সব-কিছুর তচনচ করতে চায়। বলতে দ্বিধা নেই, কনফর্মিস্ট হলেও সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' শিল্পব[illegible] যথার্থ আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চি[illegible] মর্যাদায় ভূষিত। সত্যজিৎ রায়েরই অ[illegible] চিত্র 'অরণ্যের দিনরাত্রি'কে আমরা কি[illegible] কোনো শ্রেণীভুক্ত করতে না পেরে র[illegible] কথিকা নাম দিতে বাধ্য হয়েছি। [illegible] কোনো গার্হস্থ বা সামাজিক কিম্বা নি[illegible] প্রেমের চিত্র নয়; এর মাধ্যমে কো[illegible] সুসংবন্ধ কাহিনীও বিবৃত হয়নি অ[illegible] জীবনের কোনোও সমস্যাকেও তুলে [illegible] হয়নি। নিত্যনৈমিত্তিক জীবন থেকে [illegible] নিয়ে কয়েকটি বন্ধু বিহারের এব[illegible] বনাঞ্চলের সন্নিহিত ডাক-বাংলোতে [illegible] দু' তিন দিনের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা স[illegible] করেছিল, তারই একটি বিচিত্র চিত্র [illegible] ধরা হয়েছে ছবিটির মাধ্যমে। এছাড়া বা[illegible] ১৬টিই হচ্ছে গার্হস্থ চিত্র। এবং এ[illegible] প্রতিটির মধ্যেই যদিও আছে প্রেম-ভাল[illegible] বাসার কাহিনী, তবুও 'দিবারাত্রির কা[illegible] ও 'প্রথম কদম ফুল'কে বিশেষভ[illegible] প্রেমধর্মী বলে চিহ্নিত করেছি এ দু[illegible] মধ্যে প্রেমই চূড়ান্তভাবে উপজীব্য বলে[illegible]

এবারের ছবিগুলির মধ্যে 'শান্তি' এ[illegible] 'মেঘ ও রৌদ্র'—দু'টিই রবীন্দ্রনাথের দু[illegible] ছোট গল্প অবলম্বনে নির্মীত হয়ে[illegible] সত্যজিৎ রায় কৃত দু'খানি ছবিরই মূ[illegible] রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা। [illegible]

[illegible] / পরিচালনা ঃ [illegible] । ফটো ঃ অমৃত

নাথ রায়েরও দু'টি উপন্যাস (কলঙ্কিত
ও পদ্মগোলাপ) চিত্রে রূপান্তরিত
হ। এছাড়া আছে মানিক বন্দ্যো-
য়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য-
সেনগুপ্ত, ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত,
দ্রনাথ মিত্র, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়,
কূট (সমরেশ বসু), গৌরকিশোর
বিধায়ক ভট্টাচার্য, শক্তিপদ রাজগুরু,
শান্ত চৌধুরীর একখানি করে রচনার
প। পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী ও
সেন স্বলিখিত কাহিনী অবলম্বনে
র ছবিগুলির রূপ দিয়েছেন। পরি-
মঙ্গল চক্রবর্তী জহর রায়ের
গিতায় তাঁর ছবির কাহিনী রচনা
ছেন। ভূতপূর্ব নিউ থিয়েটার্সের
যশা চিত্রনাট্য ও কাহিনীকার বিনয়
াধ্যায় দু'খানি ছবির মূল কাহিনী
র দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আশীষ
রচিত মূল কাহিনী অবলম্বনে গড়ে
মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ'।
রলোকগত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
বন্ধু চিত্তরঞ্জন'-এর চিত্রনাট্য রচনা
ছলেন। চিত্রনাট্যকার [illegible] [illegible]

'নল দময়ন্তী'র কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এবং পরিচালক অশোক চট্টোপাধ্যায় করেছেন তাঁর ছবি 'মহাকবি কৃত্তিবাস'-এর চিত্রনাট্য রচনা।

এবারের ছবিগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে তপন সিংহ পরিচালিত রূপশ্রী ইন্টারন্যাশানালের ছবি 'সাগিনা মাহাতো'। এই একমাত্র ছবিটিই এ-বছর 'সুবর্ণ-জয়ন্তী' সপ্তাহ পালন করবার পরেও জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে মধ্য কলিকাতার 'রিগ্যাল সিনেমা'য়। ছবিটির এই জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে ছবির নায়কের ভূমিকায় দিলীপকুমারের অনবদ্য অভিনয়।

এবারে সত্যজিৎ রায় ছাড়া আরও তিনজন পরিচালক দু'খানি করে ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন ঃ এক, অজিত গাঙ্গুলী (মুক্তিস্নান ও রূপসী), দুই, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় (পিলা ও নিশিপদ্ম) এবং তিন পীযূষ বসু (দু'টি মন ও স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে)। নতুন পরিচালকরূপে আমরা পেয়েছি স্বদেশ সরকার (শান্তি) এবং গোপালকৃষ্ণ রায় (নল দময়ন্তী)-কে।

[illegible] দিলীপকুমার (সাগিনা মাহাতো), একথা আগেই বলা হয়েছে। আগে ইনি 'পাড়ি' ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন। ওঁর সঙ্গে এই 'সাগিনা মাহাতো' ছবিতেই নেমেছেন সায়রা বানু (ব্যক্তিগত জীবনে যিনি দিলীপকুমারের স্ত্রী)। সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিতে অবতীর্ণ হয়েছেন সিমি। আর তনুজা তো আমাদের বাঙলা ছবির একজন নিয়মিত অভিনেত্রী; এ-বছর তিনি দু'খানি ছবিতে নেমেছেন।

বাঙলা ছবির মহানায়ক উত্তমকুমার এবারে ছ'খানি ছবির নায়ক। তাঁর থেকে এগিয়ে গেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়; তিনি দেখা দিয়েছেন আটখানি ছবিতে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী চক্রবর্তী এবং অপর্ণা সেন—এঁদের প্রত্যেকেই অবতীর্ণ হয়েছেন তিনখানি ছবিতে। বাঙলা চিত্রজগতের অবিসংবাদী নায়িকা সুচিত্রা সেন মাত্র একখানি ছবিতে (মেঘ কালো) অবতীর্ণ হয়ে তাঁর অনুপম নাটনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। নতুন যাঁরা বাংলা ছবির রাজ্যে পা বাড়িয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন হাসু বন্দ্যোপাধ্যায় (মেঘ ও রৌদ্র), রঞ্জিত মল্লিক (ইন্টারভিউ), এবং ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, দেবরাজ রায়, জয়শ্রী রায়, কৃষ্ণা বসু ও মমতা চট্টোপাধ্যায় (প্রতিদ্বন্দ্বী)।

এ-বছর সঙ্গীত পরিচালকরূপে নতুন দেখা দিয়েছেন রাহুল দেববর্মন (রাজকুমারী) এবং অধীর বাগচী (এই করেছো ভালো)। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সুধীন দাশগুপ্ত ও রাজেন সরকার প্রত্যেকে দু'খানি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। বহুদিন বাদে তিমিরবরণকে দেখতে পাওয়া গেছে 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবির সঙ্গীত পরিচালকরূপে।

# চিত্র-সমালোচনা

'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' কাহিনীটি ছায়া-ছবিতে রূপান্তরিত হবার জন্যেই রচিত হয়েছিল কি? অন্তত আর, ডি, বনশল নিবেদিত ও পরলোকগত কালিপদ দত্তগুপ্ত প্রযোজিত আরডা চিত্রমন্দির-এর 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' ছবিটি দেখে কারুর মনে যদি এই প্রশ্ন জাগে, তাহলে তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সেই তিরিশ দশকে প্রমথেশ বড়ুয়া অবিস্মরণীয় 'মুক্তি' ছবি সৃষ্টি করেছিলেন। সেই তখন থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালী দর্শক স্বামীর কর্মাসক্তি সম্পর্কে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় অনুযোগ-অভি-যোগের কাহিনীকে বাঙলা চলচ্চিত্রে নানাভাবে রূপায়িত হতে দেখে রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটু চিন্তা করলে দেখতে পাওয়া যাবে, দর্শকের ক্লান্তির কারণ আর কিছুই নয়, এইসব কল্পিত অনুযোগ - অভিযোগের ভিত্তিহীন অবাস্তবতা। স্বামী তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত না থেকে চব্বিশ ঘণ্টা আমার সঙ্গে গাঁট-ছড়া বেঁধে থাকুন, এ-হেন উৎকট ইচ্ছা মাত্র নববিবাহিতাদেরই মনে জাগ্রৎ থাকে কয়েকটা দিন বা সপ্তাহ কিম্বা বড় জোর দু' তিন মাস। তা নইলে প্রতিটি স্ত্রীরই কাম্য স্বামী যেন যথার্থই কর্মব্যস্ত থাকেন, কর্মব্যস্ততার অছিলায় যেন অপকর্মে ব্যাপৃত না হন। স্বামী একটি

মেরা নাম জোকার-এর প্রযোজক পরিচালক নায়ক রাজকাপুর, সিমি ও কাসানা রেবার্নকিনা। ফটো : অমৃত
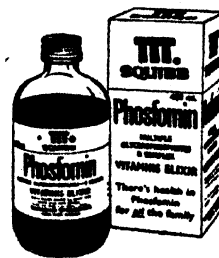
বিশেষ ধরনের যন্ত্র নির্মাণে ব্যস্ত, তাঁর সেই কাজের জন্যে মালিক পক্ষ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঝুঁকি নিয়েছেন—এই কথা জানবার পরে যে-স্ত্রী তাঁর সাফল্যের জন্যে প্রতি-নিয়ত কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা না করে কারণে অকারণে তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করে, সেই স্ত্রীকে সমর্থন জানাবে, এমন প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী কোথাও আছেন বলে আমাদের জানা নেই।

অথচ সেই কাহিনীরই চিত্ররূপকে যথাসম্ভব গ্রহণযোগ্যরূপে চিত্রায়ন করবার প্রয়াস পেয়েছেন পরিচালক পীযূষ বসু। প্রধানত দার্জিলিংয়ের পটভূমিকায় তোলা ছবিটি মাত্র চিত্রের দিক থেকে নয়নানন্দকর তো বটেই, তার ওপর চলন্ত ট্রেনের কামরায় এবং পরে দার্জিলিংয়ের এখানে সেখানে তিনটি তরুণ, তিনটি তরুণী এবং খিটখিটে মেজাজের দাদু পরমেশবাবুর সমাবেশে যে বৈচিত্র্যময় ও মনোহর পরিস্থিতি রচিত হয়, তাও যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু যেখানেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরূপতা ও সংঘর্ষ, সেখানেই ছবিটি দর্শকচিত্তকেও বিরূপ করে তোলে। এমন কি, ছবির একেবারে শেষাংশে যেখানে প্রহৃতা কাকলিকে উপেক্ষা করে স্বামী অমর স্ত্রী সুস্মিতার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাবার পরে কাকলি সম্পর্কে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, সেখানে পরিস্থিতির অবাস্তবতা রীতিমত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে।

অভিনয়ে মাধবী চক্রবর্তী, স্বরূপ দত্ত, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁদের নাটনৈপুণ্য প্রকাশের ত্রুটি করেন নি।

ছবির চিত্রগ্রহণের অসামান্যতার কথা বারংবার বলবার মতো। ছবির চারখানি গান সংগীত, কিন্তু সুপ্রযুক্ত নয়।

—নান্দীকর

## স্টুডিও থেকে

পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় যাঁদের যৌবনের রক্ত টগবগ করে উঠেছিল, সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্যের বেয়নেটের খোঁচা যাঁদের রক্তাক্ত বিপ্লব রোধ করতে পারে নি, যাঁদের আত্মবলিদান ভারতবর্ষকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি দিল, সেই বীর সন্তানদের কর্মসাধনার দলিল 'শপথ নিলাম' মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

শৈলেশ দে'র কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই ছবির প্রযোজক কৃষ্ণা মল্লিক। শচীন অধিকারী পরিচালিত ও সুকুমার মিত্র সুরারোপিত এই ছবির গীতরচয়িতা অমিতাভ নাহা।

কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন শমিত ভঞ্জ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, শমিতা বিশ্বাস, ভাস্কর চৌধুরী, দিলীপ রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শিবানী বসু, মৃণাল, মন্মথ, বলাই মুখোপাধ্যায় এবং নবাগতা সুনেন্দা দাশগুপ্তা। পরিবেশনায় আছেন—ইস্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ।

গীতালি ফিল্মস নিবেদিত নতুন আঙ্গিকের ছবি 'খুঁজে বেড়াই'-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আজকের জীবন ও সমাজের পটভূমিকায় ছবিটির কাহিনী রচিত হয়েছে। সলিল দত্ত ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্যরচয়িতা ও পরিচালক। রবীন চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন ছবিটির সুরকার। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন ছবিটির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, দিলীপ রায়, যুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, রেখা থাপা ও সুনীলেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এস বি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

অশোক দাশগুপ্ত প্রযোজিত গুপ্তশ্রী প্রোডাকসন্সের রহস্য-রোমাঞ্চের ছবি 'নিশাচর' সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে খুব শীগগীর শহর ও শহরতলীর বিশিষ্ট

...; কিন্তু কোন এক মুহূর্তে ব্যর্থতার ... তার মনকে নিদারুণভাবে আচ্ছন্ন ...। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'নর্তকী'র ... এবং বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ ও চন্দ্রপ্রভার জীবনের ট্রাজিক পরিণতি ... এই ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ হয়ে...। এই দ্বন্দ্বের সংঘাতে ভরা নাটকটির ...নায় ভবেন পাল অসাধারণ দক্ষতার ... দিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে আন্ত...বে সহযোগিতা করেছেন প্রতিটি ...। সহমর্মিতার এই আন্তর সেতু- ... সামগ্রিক প্রযোজনা বৈশিষ্ট্য ...ই ছিল। অভিনয়ের দিক দিয়ে যিনি প্রথম দর্শকের মন কেড়ে নেন, তিনি ...ন শ্রীমতী দীপিকা দাস, 'আলাবাঈ' তিনি যেভাবে প্রাণের স্পর্শ এনেছেন, ...ধ্য দিয়ে তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের ...লতাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ...থ' চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব অসাধারণ ... সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন বীরেন্দ্রনাথ শান্তিময় নাগের 'সোলেমান' হয়েছে ...; গীতা দে ও মমতা চ্যাটার্জি তাঁদের ... চরিত্রের দাবী সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে পেরেছেন। তবে 'গুলজারে'র ভূমিকার ...নাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় আমা-...আশা মেটাতে পারেনি। অন্যান্য ... ছিলেন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ...ময় দাস, শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ... ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বীথি ...। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বরুণ-... বিশ্বাস, শিবসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। ...পসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহ-... মূলে নাটকের মেজাজটা সব ... ধরা পড়েছে।

## ...বিধ সংবাদ

**...দ্রসদনে একাঙ্কিকা প্রতিযোগিতা**

...কাঙ্কিকা নাট্যাভিনয়ে উৎসাহ দানের রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষ এ-বছরে পাঁচ ...পী একটি প্রতিযোগিতা উৎসবের ... করেছেন। 'সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙলা ... এই নাট্যশাখাটি কী রূপ পেয়েছে ...কান্ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, ...সক দর্শকদের কাছে তারই একটা ... প্রস্তুত করার মানসেই রবীন্দ্রসদন ...ক্ষের তরফ থেকে এই একাঙ্ক নাটক ...যোগিতার আয়োজন করা হয়েছে এই ...ছর। অবশ্য এই আয়োজনে কলকাতা ... বাদ দিয়ে মাত্র শহরতলী এবং ...বঙ্গের কয়েকটি জেলা থেকে প্রতি-...পনেরোটি দলকে অভিনয়ের সুযোগ ...হয়েছে। প্রতিযোগী দলগুলি থেকে ...সংস্থা, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার (মৌলিক), পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং অভিনেত্রী বলে যাঁরা বিবেচিত হবেন, ... প্রত্যেককে ৫০০্ টাকা নগদ ...র দিয়ে উৎসাহিত করবার ব্যবস্থাও ...ন কর্তৃপক্ষ। রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের ...াধু প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

বিষ্ণুপুর কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন যে, নাট্যামোদী দর্শকদের সুবিধার জন্য ১৯ ডিসেম্বর শনিবার থেকে প্রতি শনিবার আড়াইটায় 'বেগম মেরী বিশ্বাস' অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**শিল্পীলোকের ...**—গত ২৭ নভেম্বর রাণী বিন্দবাসিনী মঞ্চে শিল্পীলোক সংস্থা নাট্যকার শৈলেশ গুহ নিয়োগীর একটি নাটক মঞ্চস্থ করে তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উদযাপন করেন।

সভাপতির অনুপস্থিতিতে প্রধান অতিথি শ্রীঅজিত দে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সাব ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন শ্রীপরেশ পাইন বিভিন্ন ছদ্মবেশের আড়ালে তাঁর অপূর্ব নাটনিপুণতার পরিচয় দিয়ে। অন্যান্য চরিত্র অংশ নেন বাদল বড়াল, চাঁদ সাহা ও দিলীপ বসু। পুলিশের ডেপুটি সুপারের ভূমিকায় মানু সেনও উল্লেখ্য। অন্যান্য ভূমিকায় কুমারী ছবি ভৌমিক, বেলা মিত্র, রাজকিশোর নান, সুনীল সাধুখাঁ, দুলাল দাস, রতন দাস, নিরাপদ পূজারী, দিলীপ দে ও কমল মিত্র চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। পরিচালনায় সুনীলকুমার সাধুখাঁ কোনো বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতে পারেননি।

**বীণাপাণি সঙ্গীত সমাজ :** অনিল স্মৃতি নাট্য নিবেদন উপলক্ষে আগামী ২ জানুয়ারী সন্ধ্যায় বেহালা প্রসূতি সদন ময়দানে মৃণাল ঘোষের ব্যবস্থাপনায় "কেদার রায় নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। নাট্যকার শ্রীরমেশ গোস্বামী ও শ্রীক্ষীরোদ গঙ্গোপাধ্যায় যথা-ক্রমে প্রধান অতিথি ও সভাপতিরূপে উপ-স্থিত থাকবেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেবেন সুশীল চ্যাটার্জী, সন্তোষ লাহিড়ী, প্রকাশ চ্যাটার্জী, ... চক্রবর্তী, ... ভট্টাচার্য এবং সুপ্রকাশ ব্যানার্জী ...।

**অভিনয় ... উৎসব :** অভিনয় পত্রিকার বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে আগামী ২৩ ও ২৪ জানুয়ারী মুক্ত-অঙ্গনে সকাল দশটায় উনিশশো সত্তর সালের কলকাতার শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনা, নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও রূপশিল্পী এবং মফঃস্বলের সর্বাধিক অভিনয়কারী সংস্থা এবং যাঁর নাটক সর্বাপেক্ষা বেশী অভিনীত হয়েছে তাঁদের সম্বর্ধনা ও 'অভিনয় পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হবে। এই দুদিন লোকরঞ্জন এবং বাস্তিক সংস্থা মঞ্চস্থ করবেন "মহাকাব্য" ও "এক যে ছিল রাজা" নাটক দুটি। মূকাভিনয় পরিবেশন করবেন যোগেশ দত্ত। একদিন শ্রেষ্ঠ প্রযোজনায় পুরস্কার প্রাপ্ত সংস্থা তাঁদের নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন।

# আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স

ক্ষেত্রনাথ রায়

আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে অ্যাথলেটিক্সকে শ্রেষ্ঠ কুলীন পর্যায়ে যে পদ-মর্যাদা দেওয়া হয় সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব নেই। পৃথিবীর আদিমতম খেলা বলতে—দৌড়, লাফ-ঝাঁপ এবং ভারী অথবা লম্বা কোন কিছু শূন্যে নিক্ষেপ করে উচ্চতা ও দূরত্ব অতিক্রম করা। এইগুলি একদিকে যেমন খেলাধুলোর আকর্ষণীয় অঙ্গ তেমনি অপর দিকে আজও মানুষের জীবন-ধারণের ক্ষেত্রে অতিপ্রয়োজনীয় অবলম্বন। আধুনিক কালের অ্যাথলেটিকসে রানিং, ওয়াকিং, লংজাম্প, হাইজাম্প, জ্যাভেলিন-ডিসকাস-হ্যামার থ্রোয়িং প্রভৃতি অনুষ্ঠান-গুলি আদিম খেলাধুলোর এক পরিমার্জিত শোভন সংস্করণ। রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশে বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকদের সহযোগিতায় খেলাধুলো সম্পর্কে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে। তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফল ইতিমধ্যেই খেলোয়াড় এবং কোচদের খেলার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বৈজ্ঞানিকরা অ্যাথলেটিকস সম্পর্কে খুব বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের মতে, দেশের জনস্বাস্থ্যের এমন কি সমস্ত খেলারও আদর্শ বনিয়াদ এই অ্যাথলেটিকস। একজন ফুটবল খেলোয়াড়কে অ্যাথলেটিকসের সমস্ত বিষয়েই যে তালিম নিতে হবে এমন নয়। অ্যাথলেটিকসের কোন কোন বিষয় ফুটবল খেলোয়াড়ের ক্রীড়ামান উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হবে তা বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

অ্যাথলেটিকসের আন্তর্জাতিক আসরে যোগ্যতা বিচারের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি হল অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসের ফলাফল। অলিম্পিক গেমসের সব থেকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান অ্যাথলেটিকস। অলিম্পিক গেমসের অ্যাথলেটিকসে আজও আমেরিকা শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকলেও রাশিয়া এবং আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ-গুলি আজ আমেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাথলেটিকসে আমেরিকার এই বিরাট সাফল্যে আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীটদের অবদান যথেষ্ট আছে।

অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসের প্রধান আকর্ষণ ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়। বিগত ১৬টি অলিম্পিক গেমসের ১০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকা যেখানে পুরুষ বিভাগে পেয়েছে ১২টি স্বর্ণপদক সেখানে বাকী চারটি স্বর্ণপদক পেয়েছে এই চারটি দেশ—দক্ষিণ আফ্রিকা (১৯০৮) গ্রেট বৃটেন (১৯২৪), কানাডা (১৯২৮) এবং জার্মানী (১৯৬০)। পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ের মোট পদক জয়ের তালিকাতেও আমেরিকা বিরাট ব্যবধানে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে—আমেরিকার মোট পদক ২৬টি (স্বর্ণ ১২, রৌপ্য ১১ ও ব্রোঞ্জ ৩)। এখানে উল্লেখ্য, ১৯০৪ সালে পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে আমেরিকা প্রথম ৬টি স্থান দখল করে যে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিল তা অপর কোন দেশের পক্ষে আজও সম্ভব হয় নি। মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে আমে-রিকার নিগ্রো অ্যাথলীট কুমারী উইমা টিয়াস উপর্যুপরি দুবার (১৯৬৪ ও ১৯৬৮) স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেছেন কিন্তু কোন পুরুষের পক্ষে ১০০ মিটার দৌড়ে মোট দুবার স্বর্ণপদক জয়ও সম্ভব হয় নি। পুরুষদের পক্ষে ১০০ মিটার দৌড়ে শেষ স্বর্ণপদক পেয়েছেন আমেরিকার

রে ইউরী (আমেরিকা)
সর্বাধিক স্বর্ণপদক (৮টি) বিজয়ী

আলফ্রেড ওর্টার (আমেরিকা)
ডিসকাসে উপর্যুপরি চারবার স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছেন

জিম হাইন্স (সময় ৯·৯ সেকেন্ড—নতু[ন] অলিম্পিক রেকর্ড এবং বিশ্বরেকর্ডে[র] সমান)।

মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়েও আমে-রিকা সর্বাধিক স্বর্ণ এবং সর্বাধিক মো[ট] পদক জয়ের গৌরব লাভ করেছে—আমে-রিকার মোট পদক জয় ৮টি (স্বর্ণ ৫ রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ১)।

## 'ডাবল' সম্মান

একই বছরের অলিম্পিক আসরে এক-জন অ্যাথলীটের পক্ষে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় নিঃসন্দেহে বিশেষ সাফল্যের পরিচায়ক। এইভাবে দুটি স্বর্ণপদক জয়কে বলা হয় 'ডাবল' খেতাব লাভ। ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে এ পর্যন্ত ১০ জন অ্যাথলীট এই বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন—পুরুষ বিভাগে ৬ জন এবং মহিলা বিভাগে ৪ জন। পুরুষ বিভাগে এই সম্মান লাভ করেছেন আমে-রিকার পাঁচজন এবং কানাডার একজন—১৯০৪ সালে আর্চি হ্যান (আমেরিকা), ১৯১২ সালে রালফ ক্রেগ (আমেরিকা), ১৯২৮ সালে পার্শি উইলিয়াম্স (কানাডা), ১৯৩২ সালে এডি টোলা[ন] (আমেরিকা), ১৯৩৬ সালে জেসি ওয়েন্স (আমেরিকা) এবং ১৯৫৬ সালে ববি মে[ক-] রোবো (আমেরিকা)।

মেয়েদের পক্ষে এই 'ডাবল' খেতা[ব] পেয়েছেন এই চারজন—১৯৪৮ সালে শ্রীমতী ফ্যানী ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন (নেদারল্যান্ডস), ১৯৫২ সালে মার্জোরী জ্যাকসন (অস্ট্রে-লিয়া), ১৯৫৬ সালে বেটি কাথবা[র্ট] (অস্ট্রেলিয়া) এবং ১৯৬০ সালে নিগ্রো

অ্যাথলীট কুমারী উইলমা রুডলফ (আমেরিকা)।

পুরুষদের ২০০ মিটার দৌড় ১৯০০ সালে এবং মেয়েদের ২০০ মিটার দৌড় ১৯৪৮ সালে অলিম্পিক গেমসের অ্যাথলেটিকসের তালিকায় প্রথম স্থান পায়। পুরুষদের ২০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকা সর্বাধিক স্বর্ণ এবং সর্বাধিক মোট পদক জয়ী হয়েছে—আমেরিকার মোট পদক জয় ৩০টি (স্বর্ণ ১২, রৌপ্য ১২ ও ব্রোঞ্জ ৬)।

মেয়েদের ২০০ মিটার দৌড়ের পদক জয়ের তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার স্থান প্রথম—মোট পদক ৬ (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ৩) এবং আমেরিকার স্থান দ্বিতীয়—মোট পদক ৩ (স্বর্ণ ২ ও ব্রোঞ্জ ১)।

**দৌড়ে জাতীয় প্রাধান্য**

একই বছরের অলিম্পিক আসরে অ্যাথলেটিকসের কোন একটি বিষয়ে একটি দেশের পক্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক জয় নিঃসন্দেহে বিরাট সাফল্যের পরিচায়ক। পুরুষ বিভাগের মোট ৬টি দৌড় অনুষ্ঠানে এ পর্যন্ত মাত্র দুটি দেশ—আমেরিকা এবং ফিনল্যান্ড এই সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন—আমেরিকা ১২ বার এবং ফিনল্যান্ড ১ বার। মহিলাদের দৌড় অনুষ্ঠানে এই ধরনের কোন নজির নেই।

১০০ মিটার : আমেরিকা (১৯০৪ ও ১৯১২)।

২০০ মিটার : আমেরিকা (১৯০৪, ১৯৩২, ১৯৫২ ও ১৯৫৬)।

৪০০ মিটার : আমেরিকা (১৯০৪ ও ১৯৬৮)।
৮০০ মিটার : আমেরিকা (১৯০৪ ও ১৯১২)।
১,৫০০ মিটার : আমেরিকা (১৯০৪)।
১০,০০০ মিটার : ফিনল্যাণ্ড (১৯৩৬)।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯০৪ সালের অলিম্পিক আসরে আমেরিকা পাঁচটি অনুষ্ঠানে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক জয়ের সূত্রে যে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দেয় তার নজির আজও কোন দেশ স্পর্শ করতে সক্ষম হয় নি।

### অলিম্পিক হিরো ও হিরোইন

অলিম্পিক গেমসের তালিকায় অনেক রকমের খেলা আছে। কিন্তু একমাত্র অ্যাথলেটিকসে যাঁরা অসাধারণ ব্যক্তিগত ক্রীড়া-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদেরই 'অলিম্পিক হিরো বা হিরোইন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং সেই বছরের অলিম্পিক গেমস তাঁদের নামেই উৎসর্গীত হয়েছে। এ পর্যন্ত এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন পাঁচজন অ্যাথলীট—১৯২৪ সালে প্যাভো নুরমি (ফিনল্যাণ্ড), ১৯৩৬ সালে নিগ্রো অ্যাথলীট জেসি ওয়েন্স (আমেরিকা), ১৯৪৮ সালে দুই সন্তানের জননী শ্রীমতী ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন (নেদারল্যাণ্ডস), ১৯৫২ সালে এমিল জেটোপেক (চেকোশ্লোভাকিয়া) এবং ১৯৬০ সালে নিগ্রো অ্যাথলীট কুমারী উইলমা রুডলফ (আমেরিকা)।

### স্বামী-স্ত্রীর সাফল্য

১৯৫২ সালের অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসে চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপেক তিনটি স্বর্ণপদক (৫,০০০ মিটার ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ে এবং ম্যারাথন রেসে) এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী ডানা জেটোপেকোভা জ্যাভেলিনে স্বর্ণপদক জয় করে অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসের আসরে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন। একই বছরের অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসে আজ পর্যন্ত আর কোন দম্পতি এইভাবে স্বর্ণপদক পান নি।

## উল্লেখযোগ্য সাফল্য

(উপর্যুপরি ২ বার অথবা মোট ২ বার স্বর্ণপদক জয়)

### পুরুষ বিভাগ

৮০০ মিটার দৌড় : ইংল্যাণ্ডের ডগলাস লো (১৯২৪ ও ১৯২৮), আমেরিকার মল্ভিন হুইটফিল্ড (১৯৪৮ ও ১৯৫২) এবং নিউজিল্যাণ্ডের পিটার স্নেল (১৯৬০ ও ১৯৬৪)।

১০,০০০ মিটার দৌড় : ফিনল্যাণ্ডের প্যাভো নুর্মি (১৯২০ ও ১৯২৮) এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপেক (১৯৪৮ ও ১৯৫২)।

ম্যারাথন দৌড় : ইথিওপিয়ার আবেবে বিকিলা (১৯৬০ ও ১৯৬৪)।

**এমিল জেটোপেক (চেকোঃ)**

একই বছরে (১৯৫২) ৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড় এবং ম্যারাথনে স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেন
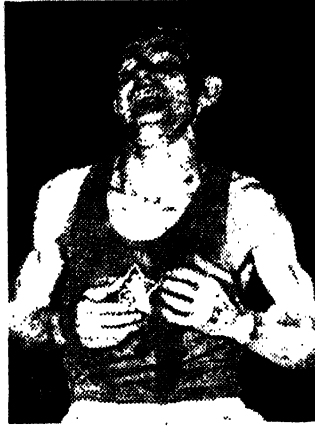
১১০ মিটার হার্ডলস : আমেরিকার লী কলহাউন (১৯৫৬ ও ১৯৬০)।

৪০০ মিটার হার্ডলস : আমেরিকার গ্লিন ডেভিস (১৯৫৬ ও ১৯৬০)।

৩০০ মিটার স্টিপলচেজ : ফিনল্যাণ্ডের ভলমারি আইসো-হোলো (১৯৩২ ও ১৯৩৬)।

ট্রিপল জাম্প : আমেরিকার মেয়ার প্রিন্সটিন (১৯০০ ও ১৯০৪), ব্রেজিলের অ্যাডহেমার ফেরিয়া ডা'সিলভা (১৯৫২ ও ১৯৫৬) এবং পোল্যাণ্ডের জোসেফ স্মিড (১৯৬০ ও ১৯৬৪)।

পোলভল্ট : আমিরকার রবার্ট রিচার্ডস (১৯৫২ ও ১৯৫৬)।

সটপুট : আমেরিকার রালফ রোজ (১৯০৪ ও ১৯০৮) এবং পেরী ও' ব্রিয়েন (১৯৫২ ও ১৯৫৬)।

ডিসকাস : আমেরিকার মার্টিন সেরিডন (১৯০৪ ও ১৯০৮), ক্লারেন্স হাউজার (১৯২৪ ও ১৯২৮) এবং আলফ্রেড ওর্টার (উপর্যুপরি ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮)।

হ্যামার : আমেরিকার জন ফ্লানাগান (উপর্যুপরি ৩ বার—১৯০০, ১৯০৪ ও ১৯০৮) এবং আয়ারল্যাণ্ডের প্যাট্রিক ও' কালাঘান (১৯২৮ ও ১৯৩২)।

জাভেলিন : সুইডেনের এরিক লেমিং (১৯০৮ ও ১৯১২) এবং ফিনল্যাণ্ডের জনি মায়রা (১৯২০ ও ১৯২৪)।

ডেকাথলন : আমেরিকার রবার্ট ম্যাথিয়াজ (১৯৪৮ ও ১৯৫২)।

### মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার দৌড় : আমেরিকার উইমা টিয়াস (১৯৬৪ ও ১৯৬৮)।

৮০ মিটার হার্ডলস : অস্ট্রেলিয়ার শার্লি স্ট্রিকল্যাণ্ড (১৯৫২ ও ১৯৫৬)।

হাইজাম্প : রুমানিয়ার আইয়োল্যাণ্ডা ব্যালাস (১৯৬০ ও ১৯৬৪)।

সটপুট : রাশিয়ার তামারা প্রেস (১৯৬০ ও ১৯৬৪)।

## সর্বাধিক স্বর্ণপদক

### পুরুষ বিভাগ — ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান

৮টি স্বর্ণপদক : রে ইউরী (আমেরিকা)— স্ট্যাণ্ডিং হাইজাম্প (১৯০০, ১৯০৪ ও ১৯০৮), স্ট্যাণ্ডিং লং জাম্প (১৯০০ ১৯০৪ ও ১৯০৮) এবং স্ট্যাণ্ডিং ট্রিপল জাম্প (১৯০০ ও ১৯০৪)।

৬টি স্বর্ণপদক : প্যাভো নুর্মি (ফিনল্যাণ্ড) — ১,৫০০ মিটার দৌড় (১৯২৪), ৫,০০০ মিটার দৌড় (১৯২৪), ১০,০০০ মিটার দৌড় (১৯২০ ও ১৯২৮) এবং ক্রস কান্ট্রি (১৯২০ ও ১৯২৪)।

মহিলা বিভাগে দুই সন্তানের জননী শ্রীমতী ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন (নেদারল্যাণ্ডস) ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসে এই চারটি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয় করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন— ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়, ৮০ মিটার হার্ডলস এবং ৪×১০০ মিটার রীলে।

### অসাধারণ কৃতিত্ব

আলফ্রেড ওর্টার (আমেরিকা) ১৯৬৮ সালে ডিসকাসে স্বর্ণপদক লাভের সূত্রে উপর্যুপরি চারটি অলিম্পিকের ডিসকাস অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয়ী হন এবং অলিম্পিকের অ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন। তাঁর আগে অ্যাথলেটিকসের কোন একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে একজন অ্যাথলীটের পক্ষে মোট চারবার স্বর্ণপদক জয়ই সম্ভব হয় নি, উপর্যুপরি চারবার স্বর্ণপদক জয় দূরের কথা।

বিগত ষোলটি অলিম্পিকেরই পোলভল্টে আমেরিকা স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসের অপর কোন অনুষ্ঠানে কোন একটি দেশের পক্ষে এই রকমের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য নেই।

আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীট কুমারী উইমা টিয়াস মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে উপর্যুপরি দুবার (১৯৬৪ ও ১৯৬৮) স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ১০০ মিটার দৌড়ে কোন পুরুষ অথবা অপর কোন মহিলা মোট দুবারও স্বর্ণপদক পান নি।

রুমানিয়ার আইয়োল্যাণ্ডা ব্যালাস মেয়েদের হাইজাম্পে উপর্যুপরি দুবার (১৯৬০ ও ১৯৬৪) স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছেন। হাইজাম্পে কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলা এমন কি মোট দুবার স্বর্ণপদক জয় করতে সক্ষম হন নি।

দর্শক
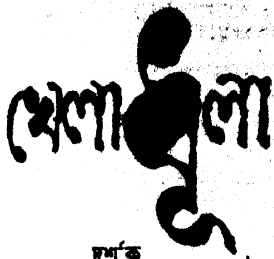
## এশিয়ান গেমস

ব্যাংককে আয়োজিত ৬ষ্ঠ এশিয়ান মস মহাসমারোহে উদযাপিত হয়েছে। ান্ত পদক জয়ের তালিকায় জাপান র্বাধিক সংখ্যক স্বর্ণ (৭৪টি), রৌপ্য ৭টি) এবং ব্রোঞ্জ পদক (২৩টি) জয়ী : প্রথম স্থান লাভ করেছে। ১৯৬৬ লর ৫ম এশিয়ান গেমসেও জাপান পদক য়ের তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছিল। ৬৬ সালের তুলনায় জাপান এবার যেমন টি স্বর্ণপদক কম পেয়েছে তেমনি এ রের ক্রীড়ানুষ্ঠানে লন টেনিস এবং টেবল নস খেলা ছিল না।

### কি বিরাট ব্যবধান

এবারের পদক জয়ের তালিকায় প্রথম ন অধিকারী জাপান যেখানে মোট ৪টি পদক পেয়েছে সেখানে দ্বিতীয় ন অধিকারী দক্ষিণ কোরিয়ার মোট ক সংখ্যা ৫৪টি। আবার লক্ষ্য করুন পান একাই যেখানে ৭৪টি স্বর্ণপদক য়েছে সেখানে ১২টি দেশ মিলে বাকী টি পদক সংগ্রহ করেছে। জাপান াধিক স্বর্ণপদক (৭৪টি), সর্বাধিক প্যপদক (৪৭টি) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার গ যুগ্মভাবে সর্বাধিক ব্রোঞ্জপদক ৩টি) জয়ী হয়েছে।

### ফলাফল

বল : স্বর্ণ ব্রহ্মদেশ (১৯৬৬ সালের বিজয়ী) এবং দক্ষিণ কোরিয়া (যুগ্ম বিজয়ী), ব্রোঞ্জ ভারতবর্ষ।

বল : পুরুষ বিভাগ : স্বর্ণ জাপান, রৌপ্য দঃ কোরিয়া এবং ব্রোঞ্জ তাইওয়ান।

মহিলা বিভাগ : স্বর্ণ জাপান, রৌপ্য দঃ কোরিয়া এবং ব্রোঞ্জ কম্বোডিয়া।

স্কেটবল : স্বর্ণ দক্ষিণ কোরিয়া, রৌপ্য ইস্রাইল এবং ব্রোঞ্জ জাপান

: স্বর্ণ পাকিস্তান, রৌপ্য ভারতবর্ষ এবং ব্রোঞ্জ জাপান। ফাইনালে পাকিস্তান ১—০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

টারপোলো : স্বর্ণ জাপান, রৌপ্য ভারতবর্ষ এবং ব্রোঞ্জ ইন্দোনেশিয়া। ফাইনালে জাপান ৪—২ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

ব্যাডমিন্টন : দলগত বিভাগ — পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান ইন্দোনেশিয়া এবং মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান জাপান।

### ভারতবর্ষের পদক জয়ের খতিয়ান

| | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ |
|---|---|---|---|
| অ্যাথলেটিকস | ৪ | ৫ | ৫ |
| কুস্তী | ১ | ১ | ৩ |
| হকি | ০ | ১ | ০ |
| ফুটবল | ০ | ০ | ১ |
| ওয়াটারপোলো | ০ | ১ | ০ |
| বক্সিং | ১ | ১ | ০ |
| ইয়াচিং | ০ | ০ | ১ |
| মোটঃ | ৬ | ৯ | ১০ |

### অ্যাথলেটিকস

(প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান)

| | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ |
|---|---|---|---|
| জাপান | ১৯ | ৭ | ৬ |
| ভারতবর্ষ | ৪ | ৫ | ৫ |

### মল্লযুদ্ধ

| | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ |
|---|---|---|---|
| ইরাণ | ৬ | ২ | ১ |
| জাপান | ৪ | ৫ | ১ |
| ভারতবর্ষ | ১ | ১ | ৩ |
| কোরিয়া | ০ | ১ | ৩ |
| পাকিস্তান | ০ | ০ | ২ |

### ভারতবর্ষের পদক জয়

#### স্বর্ণপদক (৬)

অ্যাথলেটিকস (৪), মুষ্টিযুদ্ধ (১), কুস্তি (১)

**সটপুট :** যোগীন্দর সিং। দূরত্ব ১৭·০৯ মিটার (নতুন এশিয়ান রেকর্ড)।

**ডিসকাস :** পারভিন কুমার। দূরত্ব ৫২·৩২ মিটার (নতুন এশিয়ান রেকর্ড)।

**ট্রিপল জাম্প :** মহীন্দর সিং গিল। দূরত্ব ১৬·১১ মিটার (নতুন এশিয়ান রেকর্ড)

৪০০ **মিটার (মহিলা) :** কমলজিৎ সাধু।

**কুস্তি** (হেভীওয়েট) : চাঁদগী রাম।

**মুষ্টিযুদ্ধ** (হেভীওয়েট) : হাওয়া সিং।

#### রৌপ্যপদক (৯)

অ্যাথলেটিকস (৫), মুষ্টিযুদ্ধ (১), কুস্তি (১), হকি, ওয়াটারপোলো

৫০০০ **মিটার :** এডওয়ার্ড সিকুইরা।

৮০০ **মিটার :** শ্রীরাম সিং।

**ডেকাথলন :** এম জি শেঠি।

**ট্রিপল জাম্প :** লাভ সিং।

৪×৪০০ **মিটার রীলে :** ভারতীয় দল।

**কুস্তি** (৯০ কে জি) : **জিৎ সিং।**

**মুষ্টিযুদ্ধ** (ফেদারওয়েট) : মুনুস্বামী ভেনু।

**হকি :** ভারতীয় দল।

**ওয়াটারপোলো :** ভারতীয় দল।

#### ব্রোঞ্জপদক (১০)

অ্যাথলেটিকস (৫), কুস্তি (৩), ফুটবল, ইয়াচিং

**হাইজাম্প :** ভীম সিং।

**লংজাম্প :** লাভ সিং।

৪০০ **মিটার :** সুচা সিং।

**স্টিপল চেজ :** গুরমেজ সিং।

৪×১০০ **মিটার রীলে :** ভারতীয় দল।

**কুস্তি** (৬৮ কে জি) : ওমপ্রকাশ।

" (৭৪ কে জি) : মুক্তিয়ার সিং।

" (৮২ কে জি) : নেত্রপাল সিং।

**ইয়াচিং** (এন্টারপ্রাইজ) : সোলি কন্ট্রাক্টর এবং আফসার হোসেন।

**ফুটবল :** ভারতীয় দল।

### সন্তরণ প্রতিযোগিতা

**স্বর্ণ :** জাপান ২৫ এবং দঃ কোরিয়া ৩।

**রৌপ্য :** জাপান ১৮, ফিলিপাইন ৫, সিঙ্গাপুর ৩, দঃ কোরিয়া ১ এবং ইন্দোনেশিয়া ১।

**ব্রোঞ্জ :** সিঙ্গাপুর ৭, তাইওয়ান ৫, জাপান ৪, ফিলিপাইন ৪, ইস্রাইল ৩, কম্বোডিয়া ২, দঃ কোরিয়া ১, ইন্দোনেশিয়া ১, তাইল্যান্ড ১।

### চূড়ান্ত পদক-তালিকা

(প্রথম ৬টি স্থান)

| | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ |
|---|---|---|---|
| জাপান | ৭৪ | ৪৭ | ২৩ |
| দঃ কোরিয়া | ১৮ | ১৩ | ২৩ |
| তাইল্যান্ড | ৯ | ১৭ | ১৩ |
| ইরাণ | ৯ | ৭ | ৭ |
| ভারতবর্ষ | ৬ | ৯ | ১০ |
| ইস্রাইল | ৬ | ৬ | ৫ |

**স্বর্ণপদক :** উপরের ৬টি দেশ ছাড়া আরও ৭টি দেশ স্বর্ণপদক পেয়েছে—মালয়েশিয়া ৫টি, ব্রহ্মদেশ ৩টি, ইন্দোনেশিয়া ২টি, সিংহল ২টি, ফিলিপাইন ১টি, তাইওয়ান ১টি এবং পাকিস্তান ১টি।

### নতুন এশিয়ান গেমস রেকর্ড

অ্যাথলেটিক্‌সে ২৪টি এবং সাঁতারে ২৩টি।

### শ্রেষ্ঠ অ্যাথলীট

বিশেষজ্ঞদের ভোটের মাধ্যমে নিম্নলিখিত অ্যাথলীটরা বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন :

বছরের শ্রেষ্ঠ এশিয়ান অ্যাথলীট : চি চেং (তাইওয়ান)। ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসে শ্রেষ্ঠ অ্যাথলীট : পুরুষ বিভাগে লুসিয়ান রোজা (সিংহল) এবং মহিলা বিভাগে হানা সেজিফি (ইস্রাইল)। রোজা খালি পায়ে পুরুষদের ৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ী হন, অপরদিকে সেজিফ মেয়েদের ৮০০ ও ১,৫০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক পান।

### অ্যাথলেটিক্‌স

অ্যাথলেটিক্‌সে জাপান যেখানে সর্বাধিক স্বর্ণপদক (১৯টি) এবং সর্বাধিক মোট পদক (৪২টি) সংগ্রহ করে শীর্ষস্থান লাভ করেছে, সেখানে দ্বিতীয় স্থান

[illegible] ভারতবর্ষের মোট পদক সংখ্যা [illegible]—স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৫ এবং ব্রোঞ্জ ৫।

**ফুটবল**

ফুটবল প্রতিযোগিতায় গতবারের বিজয়ী (১৯৬৬) ব্রহ্মদেশ বনাম দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইনাল খেলা ড্র যায়। ফলে ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এশিয়া গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতায় দুই দেশের যুগ্ম-ভাবে স্বর্ণপদক জয় এই প্রথম। ভারতবর্ষ ১—০ গোলে জাপানকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ০—২ গোলে ব্রহ্মদেশের কাছে এবং লীগ পর্যায়ের খেলায় জাপানের কাছে ০—১ গোলে হেরেছিল।

এখানে উল্লেখ্য, বিগত ৬টি এশিয়ান গেমসে মোট পাঁচবার ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছে। ভারতবর্ষ ফুটবল খেলায় দুবার স্বর্ণপদক পায় (১৯৫১ ও ১৯৬২ সালে।) ১৯৫৪ সালে ৬ষ্ঠ স্থান পায় এবং ১৯৬৬ সালে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করতেই সক্ষম হয়নি, ১৯৬৬ সালের লীগ পর্যায়ের খেলায় মালয়েশিয়াকে ২—১ গোলে পরাজিত করে জাপানের কাছে ১—২ গোলে এবং ইরাণের কাছে ১—৪ গোলে পরাজিত হয়।

**হকি**

হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাকিস্তান ১—০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে জাপান। জাপান ১—০ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। লীগের খেলায় ভারতবর্ষ ৭—০ গোলে সিঙ্গাপুরকে, ৬—০ গোলে সিংহলকে এবং ২—০ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। অপরদিকে পাকিস্তান লীগ পর্যায়ের খেলায় ৩—০ গোলে জাপানকে এবং ১০—০ গোলে হংকংকে পরাজিত করে তাইল্যান্ডের বিপক্ষে গোলশূন্য অবস্থায় খেলা ড্র করে-ছিল। সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ১—০ গোলে জাপানকে এবং পাকিস্তান ৫—০ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

তৃতীয় এশিয়ান গেমস থেকে হকি প্রতিযোগিতার আসর বসছে। বিগত চারটি হকি প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে পাকিস্তান ৩ বার (১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০) এবং ভারতবর্ষ ১ বার (১৯৬৬)। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান গোলের গড়-পড়তায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে স্বর্ণ-পদক পেয়েছিল। পরবর্তী তিনটি ফাইনাল খেলার ফলাফল ঃ ১৯৬২ সাল—পাকিস্তান ২ ঃ ভারতবর্ষ ০; ১৯৬৬ সাল—ভারতবর্ষ ১ ঃ পাকিস্তান ০; ১৯৭০ সাল—পাকি-স্তান ১ ঃ ভারতবর্ষ ০।

**জাপানের ব্যক্তিগত সাফল্য**

জাপানের ১৭ বছরের স্কুল-ছাত্রী কুমারী ইয়োসিমি নিশিগায়া সাঁতারে ৫টি স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর আগে কোন এক-জনের পক্ষে একই বছরের এশিয়ান গেমসের আসরে মোট পাঁচটি স্বর্ণপদক জয় সম্ভব হয়নি। কুমারী নিশিগায়া নতুন এশিয়ান গেমস রেকর্ড সময়ে তিনটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে (১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলে) স্বর্ণপদক সংগ্রহ করেন। তাছাড়া ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রীলে এবং ৪০০ মিটার মেডলে রীলেতে স্বর্ণপদক বিজয়ী জাপান দলের সভ্যা হিসাবে দুটি স্বর্ণপদক পান।

**ভারতবর্ষ বনাম জাপান**

ভারতবর্ষ তার ভৌগোলিক আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে জাপানের তুলনায় অনেক বেশী সমৃদ্ধশালী দেশ। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা, খেলাধূলা, শিল্প-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাপানের থেকে ভারতবর্ষ অনেক দূর ব্যবধানে পিছিয়ে আছে। ভারতবর্ষ যেখানে ৬ বারের এশিয়ান গেমসে ৪০টি স্বর্ণপদক এবং মোট ১১৮টি পদক পেয়েছে (স্বর্ণ ৪০, রৌপ্য ৩৫ ও ব্রোঞ্জ ৪৩), সেখানে মাত্র গত দুবারের (১৯৬৬ ও ১৯৭০ সাল) এশিয়ান গেমসে জাপানের সংগৃহীত স্বর্ণপদক সংখ্যা ১৫২টি এবং মোট পদক-সংখ্যা ৩১৩টি (স্বর্ণ ১৫২, রৌপ্য ১০৫ এবং ব্রোঞ্জ ৫৬)।

**সাঁতার**

জাপানীরা জাত-সাঁতারু, তার প্রমাণ দিয়েছে সদ্য-সমাপ্ত ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসে। সাঁতারের মোট ২৮টি স্বর্ণপদকের মধ্যে জাপান একাই ২৫টি স্বর্ণপদক পেয়েছে এবং দক্ষিণ কোরিয়া পেয়েছে বাকি তিনটি স্বর্ণপদক। জাপান সর্বাধিক মোট পদক জয়েরও গৌরব লাভ করেছে—মোট পদক ৪৭টি (স্বর্ণ ২৫, রৌপ্য ১৮ ও ব্রোঞ্জ ৪)। সাঁতারে যোগদানকারী দেশ ভারতবর্ষ, হংকং, ইরাণ, মালয়েশিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম কোন পদকই পায়নি।

## ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

**দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট**

**ইংল্যান্ড ঃ** ৩৯৭ রান (লাকহার্স্ট ১৩১ এবং বয়কট ৭০ রান। ম্যাকেঞ্জী ৬৬ রানে ৪ উইকেট) ও ২৮৭ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এডরিচ নট-আউট ১১৫ এবং বয়কট ৫০ রান। [illegible]সন ৬৮ রানে ৩ উইকেট)

**অস্ট্রেলিয়া ঃ** ৪৪০ রান (রেডপাথ ১৭১, গ্রেগ চ্যাপেল ১০৮ এবং আয়ান চ্যাপেল ৫০ রান। স্নো ১৪০ রানে ৪ এবং সাউলওয়ার্থ ১০৫ রানে ২ উইকেট) ও ১০০ রান (৩ উইকেটে। স্নো ১৭ রানে ২ উইকেট)

পার্থে আয়োজিত ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ন্যাটা ব্যাটসম্যান জন এডরিচের নট-আউট ১১৫ রান করার ফলেই খেলার মোড় ঘুরে যায়।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরী টস জয়ী হয়ে ইংল্যান্ডকে প্রথমেই ব্যাট করতে পাঠান। প্রথম দিনের ৬ ঘণ্টার খেলায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২টো উইকেট পড়ে ২৫৭ রান দাঁড়ায়। লাকহার্স্ট তাঁর ১৩১ রানে ১৩টা বাউণ্ডারী করেন।

দ্বিতীয় দিনে ৩৯৭ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস শেষ হলে অস্ট্রে-লিয়া প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮৪ রান সংগ্রহ করেছিল। ১৭ রানের মাথায় তাদের ৩য় উইকেট পড়েছিল।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৩৫৫ রান দাঁড়ায় (৬ উইকেটে)। আয়ান রেডপাথ ১৫৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে গ্রেগ চ্যাপেল (১০৮ রান) এবং রেডপাথ দলের ২১৯ রান সংগ্রহ করেছিলেন। গ্রেগ চ্যাপেলকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার এগারজন খেলোয়াড় তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করলেন।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৪৪০ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ৪৩ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৪ উইকেট খুইয়ে ১৩৭ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে চা-পানের কিছু আগে ২৮৭ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) ইংল্যান্ড তাদের ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। জন এডরিচ ১১৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। টেস্ট খেলায় তাঁর এই নবম সেঞ্চুরী। খেলার বাকি ১৪৩ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়-লাভের প্রয়োজনীয় ২৪৫ রান সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের ১০০ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় টেস্ট খেলা শেষ হয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুধীর সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ ৩য় খণ্ড

৩৬শ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

**Friday, 8th January, 1971** শুক্রবার, ২৩শে পৌষ, ১৩৭৭ **40 Paise**


## সূচীপত্র

| পৃষ্ঠা | বিষয় | | লেখক |
|---|---|---|---|
| ৭৮৮ | চিঠিপত্র | | |
| ৭৯০ | সাদাচোখে | | —শ্রীসমদর্শী |
| ৭৯৩ | দেশেবিদেশে | | —শ্রীপুণ্ডরীক |
| ৭৯৫ | সম্পাদকীয় | | |
| ৭৯৬ | বাকি, আমার অনেক বাকি | (কবিতা) | —শ্রীঅমরেন্দ্র চক্রবর্তী |
| ৭৯৬ | বৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে আসি | (কবিতা) | —শ্রীসত্য গুহ |
| ৭৯৬ | দেখা দেবে | (কবিতা) | —শ্রীনিশিনাথ সেন |
| ৭৯৭ | এই আমাদের দেশ | | —শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৭৯৯ | সীমানা পেরিয়ে | (গল্প) | —শ্রীশচীন বিশ্বাস |
| ৮০৫ | মুখের মেলা | | —আবদুল জব্বার |
| ৮০৯ | তুলসীচরিত | (উপন্যাস) | —শ্রীননীমাধব চৌধুরী |
| ৮১৩ | সাহিত্য ও সংস্কৃতি | | —শ্রীঅভয়ঙ্কর |
| ৮১৮ | বইকুণ্ঠের খাতা | | —শ্রীগ্রন্থদর্শী |
| ৮২১ | নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে | (উপন্যাস) | —শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৮২৮ | নিকটেই আছে | | —শ্রীসন্ধিৎসু |
| ৮৩০ | উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের উপাদান | | —শ্রীস্মরজিত চক্রবর্তী |
| ৮৩৫ | তোমাকে | (উপন্যাস) | —শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য |
| ৮৩৮ | মনের কথা | | —শ্রীমনোবিদ্ |
| ৮৪১ | বিজ্ঞানের কথা | | —শ্রীঅয়স্কান্ত |
| ৮৪৩ | পিঞ্জর | (বড় গল্প) | —শ্রীসুভাষ সিংহ |
| ৮৪৭ | প্রদর্শনী পরিক্রমা | | —শ্রীচিত্ররসিক |
| ৮৪৯ | অঙ্গনা | | —শ্রীপ্রমীলা |
| ৮৫২ | গোয়েন্দা কবি পরাশর | | —শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত —শ্রীশৈল চক্রবর্তী চিত্রিত |
| ৮৫৩ | জলসা | | —শ্রীচিত্রাঙ্গদা |
| ৮৫৫ | প্রেক্ষাগৃহ | | —শ্রীনান্দীকর |
| ৮৬১ | ক্রিকেটে একটি বছর | | —শ্রীশঙ্করবিজয় মিত্র |
| ৮৬৩ | খেলার কথা | | —শ্রীদর্শক |

প্রচ্ছদ : শ্রীগোতম কররায়
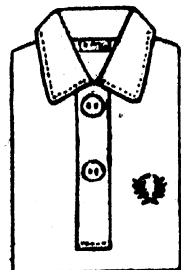
# চিঠিপত্র

### 'অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ'

গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের অমৃতে চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত 'অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ' শীর্ষক পত্রটি আমাকে অবাক করেছে। এ-বিষয় আমার কিছু বলার আছে। আশা করি, আমার মতামত প্রকাশের স্থান আপনার পত্রিকায় অসংকুলান হবে না।

উপরোক্ত চিঠিটি পড়ে আমার প্রথমেই মনে হয়েছে, 'অমৃত' যে একটি সাহিত্যপত্র এবং সাহিত্য সংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহ-পত্র নয়, সে-কথা ঐ চিঠির লেখক শ্রীসত্যানন্দ গুহ মহাশয় জানেন না। সত্যবাবু সম্ভবত এটাও জানেন না যে, গল্প, উপন্যাস (কোনও বিশেষ গল্প বা উপন্যাস নয়—সাধারণভাবে, যে-কোনও গল্প-উপন্যাস) ও নাট্য-চলচ্চিত্র-সংবাদ জাতীয় আরও যেসব সাহিত্যকর্মকে (?) তিনি বিস্বাদের আওতার বাইরে রেখেছেন—সে সমস্ত অমৃতস্বাদ বস্তু যে-কোনও সিনেমা-পত্রিকাতেই পাওয়া যায়।

অমৃত কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাই বরং সত্যবাবু উল্লিখিত ঐ বিস্বাদ লেখাগুলির জন্যেই। যদি আদৌ অমৃত পত্রিকার কোনও মৌলিকত্ব এবং নতুনত্ব থাকে, তবে তা আছে নিঃসন্দেহেই ঐ লেখাগুলির মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সত্যবাবুর 'দুর্বল' লেখক মনোবিদের লেখাগুলিই আবার আমার সবিশেষ ভাল লাগে। আমরা, সাধারণ মানুষেরা, কুম্ভির জন্মবৃত্তান্ত থেকে লুনোখোদের কার্যকলাপ, দুনিয়ার এ-প্রান্ত থেকে মহাজগতের ও-প্রান্তের আধুনিকতম খবরটি পর্যন্ত রাখি—অথচ নিজেদেরই অন্তস্তল সম্পর্কে আমাদের নিঃসীম অজ্ঞতা। এমনকি যাঁরা মানুষের আশা-নিরাশা ভাবনাচিন্তাকে ব্যক্ত করার ব্রত নিয়েছেন, সেই সাহিত্যিকরাও যখন বিভিন্ন সমস্যার কার্যকারণ বিশ্লেষণের প্রয়াস পান, আশ্রয় নেন পুরনো কালের সেই ভাববাদী নির্জ্ঞান তত্ত্বের গহীন গুহায়। প্রগতির প্রবক্তা অনেক বস্তুবাদী লেখকের লেখার মধ্যেও আজ দেখা যায় ভাববাদী বিশ্লেষণ যা ফলত চিন্তাশীল পাঠককে করে বিহ্বল, বিভ্রান্ত এবং বক্তব্য ও উপস্থাপনার এই অন্তর্নিহিত বৈষম্য সাধারণ পাঠকের বিশ্বাসের ভিত্তিকে করে ক্রমশঃ শিথিল। তাই, আমি মনে করি, আজকের দিনে 'মনের কথা' ধরনের লেখার সামাজিক মূল্য অসীম এবং প্রয়োজনও একান্ত। এ-ধরনের লেখা পাঠককে দেয় সামাজিক অর্থনৈতিক এবং আন্তর্মানবিক সম্পর্কের বস্তুবাদী বিশ্লেষণী শক্তি—বহুবিধ সমস্যার মূল্য সন্ধানে যা একান্তই অপরিহার্য।

প্রসঙ্গত আর একটা কথা সত্যবাবুকে জানিয়ে রাখা বোধহয় ভাল যে, প্রবন্ধ—বিশেষত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কখনই প্রবন্ধকারের সাহিত্যনৈপুণ্য, ভাষাজ্ঞান ও রচনাকুশলতা দেখানর স্থান নয়। অমৃতের মত সর্বজনপাঠ্য সাধারণ সাহিত্য পত্রিকার দাবী অনুযায়ী এক্ষেত্রে বরং তা হওয়া উচিত সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য। সেদিক দিয়ে মনোবিদের এই জাতীয় দুরূহ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব গল্পসুলভ সাবলীলতায় ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। সত্যবাবু বোধহয় এই গল্পসুলভ তাত্ত্বিক লেখাগুলির মধ্যে জমাটি ছোটগল্পের আস্বাদ চেয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে অবশ্য মনোবিদের লেখা তাঁর 'দুর্বল' (?) লাগা অনেকাংশেই স্বাভাবিক।

রাগিণী রায়
কলিকাতা-৪

(২)

গত ২রা পৌষ সংখ্যার অমৃত পত্রিকার 'চিঠিপত্রে' প্রকাশিত শ্রীসত্যানন্দ গুহ মহাশয়ের লিখিত 'অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ' শীর্ষক চিঠি পড়ে পাঠক হিসেবে কিছু বক্তব্য রাখতে উৎসাহিত বোধ করলাম।

অমৃত পত্রিকার সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা, গল্প, উপন্যাস ও বিভিন্ন বিষয়ক রম্য রচনাদি 'অমৃত'কে বিভিন্ন রসের স্বাদে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষ করে 'নিকটেই আছে' 'মুখের মেলা' এবং 'মনের কথা' নিবন্ধাদি আমাকে অমৃতের নিয়মিত পাঠক করে তুলেছে। শ্রীগুহ মহাশয় লিখেছেন, 'এই আমাদের দেশ', 'নিকটেই আছে', 'মনের কথা' বিভাগগুলি বিস্বাদ লাগে—"বিষয়বস্তু যাই হোক বড্ড দুর্বলভাবে উপস্থাপিত করা হয়।" অবশ্য এটা তাঁর বিষয়ীগত ধ্যানধারণার প্রকাশ। বিষয়গতভাবে বিচার করলে এগুলি অনন্য। বিশেষ করে ধারাবাহিক 'মনের কথা' নিবন্ধটি মনোবিজ্ঞানের বস্তুবাদী অনেক মূল্যবান জটিল তত্ত্ব ও তথ্য কেস-হিস্ট্রির মাধ্যমে সরল ভাষায় বিশ্লেষিত হয়ে পরিবেশিত হচ্ছে। তাতে সাধারণ পাঠককে এই দ্বন্দ্ববিরোধের সমাজে বিভিন্ন রোগীর তথা ব্যক্তিমানসের মানসিকতা ও তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এ বিষয়ে অবহিত হতে সাহায্য করছে। সম্পাদক মহাশয়কে এর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।—'অমৃত' স্ব-নামেই সার্থক হয়ে উঠেছে।

সুনীল বিশ্বাস
কলিকাতা-৫৪

### বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যের নামকরণ প্রসঙ্গে

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের নামকরণ শিরোনামায় গত ২৫শে অগ্রহায়ণের 'অমৃতে'র চিঠিপত্র স্তম্ভে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিটি পড়লাম।

লেখক যে কবি বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলের' নামকরণ তথা কাব্যটির সামগ্রিক রূপালোচনা করার চেষ্টা করেছেন তা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যটির সমালোচনামূলক আলোচনা করতে যাওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাহিকতার পরিচায়ক হবে হয়তো। তবু কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির বক্তব্যের আলোকে দু'-একটা কথা বলার ইচ্ছেটাকে রোধ করতে পারছি না। 'সারদামঙ্গল' কেন গীতিকাব্য সে প্রসঙ্গে লেখক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। কাব্যটির উপাস্যদেবী লোক-উপাস্য দেবী নয়—কাব্য সরস্বতী, ডঃ সেন মহাশয়ের এই অভিমত সম্পর্কে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রশ্ন রেখেছেন, তাও নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

সারদা সম্বোধনের বিশ্লেষণগুলির প্রতি লেখক যে আলোকপাত করেছেন এবং কবি বিহারীলালের সঙ্গে তাঁর কাব্যের দেবীর সম্পর্কের যে রূপালোচনা করেছেন, তা-ও বিবেচ্য। যদিও এই সম্পর্ক প্রসঙ্গে আরো অনেক ধরনের ব্যাখ্যা থাকতে পারে, তবু কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যাটি নিঃসন্দেহে মনোজ্ঞ। কবি বিহারীলালের সমসাময়িককালে মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে কোন কাব্যের উদ্ভব সম্ভব ছিল না এ-কথা সত্য। কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যটিকে আধুনিক খণ্ড গীতি-কবিতার পর্যায়ে ফেলেছেন। তবে কাব্যটি আত্মসর্বস্বতায় পূর্ণ, লেখকের এ-কথা কতদূর সত্য তা ভেবে দেখা দরকার।

'অমৃতে'র চিঠিপত্র স্তম্ভ একটি নিয়মিত বিভাগ। আমি ব্যক্তিগতভাবে 'অমৃতে'র গুণগ্রাহী পাঠক হিসেবে এটুকু

# চিঠিপত্র

বলতে পারি যে, 'অমৃতের' চিঠিপত্র স্তম্ভ কত অজানা রহস্যময় জ্ঞানমঞ্জুষার গোপনদ্বার উদ্ঘাটনে সব সময়েই অগ্রণী। এর জন্যে আমি 'অমৃতে'র সম্পাদনা বিভাগকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আশিসকুমার রায়,
শিবমন্দির, মাটিগাড়া,
দার্জিলিং।

## মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

গ্রন্থদর্শী তাঁর বইকুণ্ঠের খাতায় 'মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন' শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছেন অমৃতের ২৬শ সংখ্যায়; লেখাটি বেশ ভাল হয়েছে। তবে তিনি ১০'টি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কালে একটা কথা লেখেন নি। আমি যেটা জানাতে চাই।

মফঃস্বলে এবং কলকাতার আশে পাশে কিছু এমন সম্পাদক আছেন যাঁরা খবরের কাগজের মাধ্যমে লেখা চান। কোন নবীন লেখক হয়ত এই বিজ্ঞাপন দেখে লেখা পাঠান। তার জবাবে তাঁকে জানান হয় যে তাঁর লেখা মনোনীত হয়েছে, তবে তাঁদের সাহিত্য চক্রের সভ্য হতে হবে। সঙ্গে নিয়মাবলীও আসে। ২২ টাকা বা ২৫ টাকা পাঠালে লেখা ছাপা হবে লেখকের ফটোসহ আসন্ন শারদীয় সংখ্যায়। ফটো পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। এইরকম প্রতিশ্রুতির উপরে আস্থা রেখে আমার এক বন্ধু এক সাহিত্য চক্রের শারদীয় সংখ্যায় লেখা ও টাকা পাঠান। তবে কাগজ তিনি আজও পাননি। আমি এর আগে এরকম সাহিত্য চক্রের কথা আরও শুনেছি। এ'রা বেশী ভাগই প্রতারক হন। বলা বাহুল্য লিটল ম্যাগাজিনের বিরুদ্ধে আমার বলা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এরকম প্রতারকের ফাঁদে কোন পাঠক ভবিষ্যতে যাতে না পড়েন তাই আমি আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের মাধ্যমে এটা প্রকাশ করতে চাই।

শৈলজা বাগচী
রাউরকেলা-৩

(২)

কার্তিকের ২০ তারিখের 'অমৃতে' 'মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন' আলোচনাটি পড়েছিলাম। পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল কি দুর্ভাগ্য মফঃস্বলের কবি, সাহিত্যিকদের। লেখাটি পড়ে আমার মনে তাঁদের সম্পর্কে যে বেদনাবোধ এবং প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তারই সহজ সমাধান করে দিলেন মফঃস্বলের স্বল্পখ্যাত তরুণ সাহিত্যিক মনসারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৪ অগ্রহায়ণের 'অমৃতে' 'চিঠিপত্র' বিভাগে একটি বলিষ্ঠ চিঠি লিখে। তারপর মনসাবাবুকে, গ্রন্থদর্শীমশাইকে এবং অমৃত সম্পাদকমশাইকে অভিনন্দন জানিয়ে একই প্রসঙ্গে পুনরায় আরেকটি সুন্দর চিঠি লিখেছেন অশোক সাহা। সেই একই অভিযোগ, সেই একই আর্তি।

এবার বলি, শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ 'কল্লোল' পত্রিকা বের করেছিলেন বলে আজ বাংলা-সাহিত্যের অনেক প্রবীণ লেখকদের নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এবং বাংলা-সাহিত্যের সেই কালকে 'কল্লোল যুগের' কাল বলে অভিহিত করি। আমরাও চাই 'অমৃত' পত্রিকা মনসাবাবুর মত দুরান্তের অনেক কৃতী সাহিত্যিকদের সহজ আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়ে 'অমৃতযুগ' সৃষ্টি করুক। এছাড়াও সম্পাদকমশাইয়ের কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। 'অমৃতে' আমরা বহু বিভাগীয় বৈচিত্র্য দেখতে পাই। সেই সঙ্গে সম্পাদকমশাই যদি 'মফঃস্বলের পাতা' নাম দিয়ে শুধুমাত্র মফঃস্বলের লেখকদের জন্য দু-তিনটি পাতা জুড়ে দেন, তাহলে মন্দ হয় না। আমার মনে হয় এতে নিত্যনূতন সাহিত্যিককে পাঠকমণ্ডলীর কাছে পরিচিত করে দেওয়া হবে। কে জানে ভবিষ্যতে হয়তো মফঃস্বলের ঐ তিনটি পাতা থেকেই আমরা অনেক কালজয়ী লেখকের মুখ দেখতে পাব, আর সেইজন্য বাংলা-সাহিত্যের পরবর্তী ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে কল্লোলোত্তর যুগে অমৃত পত্রিকা।

লীলা রায়,
কুমিরদহ,
সাঁওতাল পরগণা

## বইকুণ্ঠের খাতা

অমৃত পত্রিকার গত সংখ্যা দোসরা পৌষ বইকুণ্ঠের খাতা পড়ে আনন্দ পেলাম। ভূমিকায় গ্রন্থদর্শী যে-মন্তব্য করেছেন—"লেখকের নিজস্ব বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে একাধিক জীবনীগ্রন্থ লেখার সার্থকতা কোথায়?" আমিও তাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু তারপরেই তিনি লিখেছেন —"উপলক্ষ্য সন্তোষকুমার অধিকারীর লেখা বিদ্যাসাগর নামে একখানি জীবনীগ্রন্থ।" সন্তোষবাবুর লেখা বিদ্যাসাগর গ্রন্থটি আমিও পড়েছি বলেই বলতে পারছি যে, প্রচলিত জীবনীগ্রন্থ বলতে যা' বোঝায় আলোচ্য গ্রন্থটি তা' নয়। বইটিতে সন্তোষবাবু বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাঁর চরিত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঠিক মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। সন্তোষবাবুর লেখার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিদ্যাসাগরের চারিত্রশক্তির উৎস সন্ধান করেছেন এবং বিদ্যাসাগর যে আধুনিক চিন্তাধারার আলোকেও একই রকম দীপ্ত সেই বিষয়টিই তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর জীবনের বহিরঙ্গে যেমন উত্তুঙ্গ মহত্ত্ব, অন্তরঙ্গে তেমনই করুণ নির্জনতা। তাঁর মৃত্যুর আশি বছর পরে সেই নিঃসঙ্গ জীবনের আর্তিকে কে ফুটিয়ে তুলতে পারে? হয়তো পারা যায়, কিন্তু সে হবে তাঁর জীবনের তথ্যভিত্তিক রমান্যাস।

তবুও সন্তোষবাবুর গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের নিঃসঙ্গ হৃদয়ের পটভূমিকা আঁকা রয়েছে। যে মানবপ্রেমী ব্যক্তি-মানুষে বিশ্বাস হারিয়েছেন, পারিবারিক জীবনে যিনি বিপর্যস্ত, একমাত্র পুত্রের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক ছিন্ন, দাম্পত্যজীবন যাঁর অসুখী, তাঁর কর্মজীবন এত বীর্যবান ও অদম্য হল কেমন করে তা' ভাবা যায় না। সন্তোষকুমার অধিকারী তাঁর ক্ষুদ্রপরিসর গ্রন্থে সেই চেষ্টাই কি করেননি?

গোরা মিত্র
কলিকাতা-৩

## মুখের মেলা

'অমৃত' পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। আবদুল জব্বারের মুখের মেলা পড়ে বেজায় ভাল লাগছে। পল্লী বাংলার সমাজচিত্র এক কথায় অপূর্ব। তবে একটা কথা, জব্বার সাহেবের লেখায় যৌনরসের পরিবেশনে কিছুটা বাড়াবাড়ি ঘটছে। এতোটা না হলেও চলে। পাঠককে আরও সম্মোহিত করার জন্য হয়তো এই টনিক দেওয়া হচ্ছে।

মধু বসু
যোড়াল, ২৪-পরগণা

# শাদা চোখে

নির্বাচন হবে—এই ধারণাটা সুস্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'মিত্রতা' বা 'সমঝোতার' প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে আবার মন দেওয়া-নেওয়ার পালা শুরু হয়ে গেছে। এই সংহতিকরণের প্রচেষ্টায় অন্তবাম ও বাংলা কংগ্রেসের বৈঠক সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় পাঁচ মাসের নীরবতা ভঙ্গ করে নববর্ষের দিনে মিশনের সূত্র খুঁজবার জন্য এই বৈঠক বসে। সূচনা খুব শুভ না হলেও আশাবাদী কিছু অন্তবাম শরিক হাল ছেড়ে দিতে রাজী নন। বাংলা কংগ্রেসকে অন্তবামের সঙ্গে আনতেই হবে—এই মনোভাব নিয়ে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। আর এই আগ্রহ থেকেই জন্মলাভ করেছে নতুন সূত্র 'সীমিত সমঝোতা'।

অন্তবামের নেতাদের ধারণা ছিল, যদি তাঁরা বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জিকে বোঝাতে পারেন যে, অন্তবাম ও বাংলা কংগ্রেস একত্র হয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে জয়মাল্য তাঁরা পাবেনই—তবে বাংলা কংগ্রেস নিজেদের প্রস্তাব পুনরায় বিবেচনা করে অন্তবামের সঙ্গে কাঁধ মেলাতে পারেন। কিন্তু এই সভায় শ্রীমুখার্জি নাকি বলেছেন, তাঁর দল বাংলা কংগ্রেস বাম কম্যুনিস্ট ও আদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লড়বেন। আর এই যুদ্ধে সহকারী হিসেবে তাঁরা শাসক কংগ্রেসকে বেছে নিয়েছেন। অতএব, তাঁদের বন্ধু শাসক কংগ্রেসকে অন্তবাম যদি শত্রু হিসাবে পরিগণিত করে, তবে 'মিত্রতা' কি করে সম্ভব? কথাটা খাঁটি ও বাস্তব। তবে, শ্রীমুখার্জি নাকি অন্তবামের প্রতিনিধিদের একেবারে বিমুখ করেননি। তিনি বলেছেন যে, তাঁর দল অন্য কারও সঙ্গে যদি 'মিত্রতা' বা 'সমঝোতা' করে, তবে অন্তবামের আপত্তির কি থাকতে পারে। অন্তবামের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের 'সীমিত সমঝোতা'ও ত হতে পারে। এই 'সীমিত সমঝোতা'র কথা বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তবামের কিছু শরিক নাকি কথার রেশ ধরে ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট আলোচনার অবতারণা করবার প্রয়াস পান। অমনি অন্তবামের অন্য কয়েকটি শরিক বাধা দিয়ে বসেন। বাধাটা নীতিগত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অন্তবামকে একটি রাজনৈতিক ফ্রণ্টে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তাতে বলা আছে যে, অন্তবামের কোন শরিক বা অন্তবাম শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ বা সমঝোতা করতে পারবে না; কাজেই 'সীমিত সমঝোতা'র নীতি মেনে যদি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত গড়ার কথা ওঠে, তবে অন্তবাম নীতিচ্যুতই হয়। একথা শোনার পর নাকি অন্তবামের অন্যান্য শরিকরাও আলোচনা থেকে বিরত থাকেন এবং অন্তবামের সভায় এই বিষয়ে মতামত বিনিময়ের পর কিছু একটা করা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন।

বস্তুতপক্ষে, অন্তবাম যে রাজনৈতিক বক্তব্য খসড়া করেছিল, তা এখনও খসড়া স্তরেই রয়ে গেছে। হাজার চেষ্টা করেও অদ্যাবধি কোন শরিক তা গ্রহণ করেছেন কিনা তা জানা যায়নি। প্রত্যেকেই ব্যস্ততার অজুহাত তুলে প্রশ্নটা সরাসরি এড়িয়ে গেছেন। কাজেই চূড়ান্তভাবে বক্তব্যটা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এ-কথা বলা চলে যে, এ অবধি অন্তবামের কোন পরিষ্কার নীতি নেই। শুধু ভাসা ভাসা-ভাবে বাম কম্যুনিস্ট, আদি ও শাসক কংগ্রেস বিরোধিতার কথাই বলা হচ্ছে মাত্র। নীতিগত বক্তব্য অন্তবামের সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন দলকেই দোষারোপ করা সম্ভব নয়। মনে হচ্ছে কৌশল হিসাবে অন্তবাম ঐ খসড়া নীতিগত বক্তব্য আপাতত গ্রহণ করবে না। অন্তবামের শরিকদের যে বিভিন্ন চিন্তাধারা আছে, সেই অনুযায়ী 'মিত্রতা' গড়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁরা মনের গহন কোণে প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। সেটা বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে নৈতিক বাধা-বাধকতার মধ্যে তখন যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। খবরে প্রকাশ যে, 'সীমিত সমঝোতার' প্রশ্ন যখন বাংলা কংগ্রেস অন্তবামের সম্মিলিত সভায় উঠেছিল তখন যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের অন্যান্য অংশীদাররা অন্তবামের যে কোন স্বীকৃত বক্তব্য অদ্যাবধি নেই বা গৃহীত হয়নি, এ-কথা নাকি জোরের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

বাংলা কংগ্রেস ও অন্তবামের মিলিত সভার অব্যবহিত পরেই রাজ্য শাসক কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয়সিং নাহার তাঁর দলের কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব যখন সাংবাদিকদের কাছে ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন প্রসঙ্গক্রমে বলেন, 'বাম কম্যুনিস্টদের রুখবার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' উক্তিটা বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। শ্রীনাহার রাজ্য কংগ্রেসের অপর নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়কেও অন্তবাম-বাংলা কংগ্রেসের সভার বিবরণী টেলিফোন করে অবহিত করেন। শ্রীরায় পশ্চিমবাংলার সর্বশেষ হালচালের খবর নিয়ে নয়াদিল্লী গিয়ে ইন্দিরাজীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করবেন। শ্রীনাহারের আশাব্যঞ্জক উক্তি থেকে মনে হয়, "সীমিত সমঝোতা'র ফরমূলা কার্যকর করা সম্ভবপর হবে। অন্ততপক্ষে বাংলা কংগ্রেস নেতারা এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এবং এই ধারণা না হওয়ার মত কোন কারণও নেই। কেননা, বাংলা কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া—যিনি অহিংসার প্রশ্নে অটল, অচল, তিনি নাকি অন্তবামের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, শ্রীধাড়া ইতিপূর্বে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, যে-সমস্ত দল হিংসাশ্রয়ী পন্থায় বিশ্বাস করেন, তাঁদের সঙ্গে 'মিত্রতা' ত দূরের কথা 'সমঝোতা'ও হবে না। নাম, না করেও শ্রীধাড়া এতদিন বোঝাতে চেয়েছেন যে, অন্তবামের মধ্যে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট ও এস ইউ সি হিংসাশ্রয়ী। আর সব বর্ণের কম্যুনিস্টরা একই বস্তু। তাঁদের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। তারপর হঠাৎ অন্তবামের হিংসা-সম্বন্ধীয় বক্তব্য রাখার পর এখন যখন তাঁর চিন্তাধারা পাল্টে গেছে

দেখা যাচ্ছে, তখন বুঝতেই হবে কিছু একটা ঘটেছে। এর সঙ্গে শ্রীনাহারের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য মিলিয়ে দেখলে তথ্যটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। শ্রীনাহারও সাংবাদিকদের বলেছেন যে, তিনিও এখন বাম ও ডান কম্যুনিস্টদের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন। আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে শ্রীনাহার বলেছেন যে, ডান কম্যুনিস্টরা তাঁদের প্রোগ্রামও অনেকখানি সমর্থন করছেন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই উক্তির ফল সুদূরপ্রসারী। কাজেই সংহতিকরণের প্রশ্নে দলগুলি ধীরে ধীরে কোন্ দিকে যাচ্ছে তা কিছুটা আঁচ করা কঠিন নয়।

আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলেও রাজনীতির গতি[illegible] কিছু সরল হয়ে দেখা [illegible] আদি কংগ্রেসের কর্মী[illegible] কিছু কিছু বক্তব্য রাখছেন। তাঁরা বলছেন, বাম কম্যুনিস্টরাই ত একমাত্র সংগঠিত দল। অন্যরা তেমন কিছু নয়। আদি কংগ্রেসের কর্মীদের বাম কম্যুনিস্টদের প্রতি এই প্রেম-ভাব [illegible] নির্দেশ করে যে, আদি কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে নেওয়ার জন্য বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে যে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন, তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এবং হতে বাধ্য। কেননা, শাসক কংগ্রেস যে নির্বাচনী কৌশল স্থির করেছে, তাতে আদি কংগ্রেসকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে সরা-

সীর আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় না করাতে পারে, তবে 'কংগ্রেস ভোট' দ্বিধাভক্ত হয়ে যাবে এবং শাসক কংগ্রেসের ভরাডুবি হতে বাধ্য। অতি গরমপন্থীদের বিকল্প হিসাবে এবং অতি- প্রতিক্রিয়াশীলদের বিকল্প হিসাবে শাসক কংগ্রেস যে-ভূমিকা নিতে চাইছে তা বানচাল হয়ে যাবে যদি আদি কংগ্রেসের সংগে কোন প্রকার সমঝোতা হয়। শাসক কংগ্রেসের এই যুক্তি বাংলা কংগ্রেসও মেনে নিয়েছে এবং সেজন্যই অন্টবামের সভায় শ্রীঅজয় মুখার্জী জনগণের শত্রু কম্যুনিস্ট ও আদি কংগ্রেসকে প্রধান শত্রু হিসাবে ঘোষণা করেছেন বলে মনে হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়ও কি কেরলার অনুরূপ রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করা হবে? কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হয় ঘটনাটা সেদিকেই এগুচ্ছে। কেরলে যখন মিনিফ্রন্ট ও শাসক কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত বলেছিলেন যে, তাঁরা যেসব আসনে লড়াই করছেন, সেখানে যদি মিনিফ্রন্ট প্রার্থী না দাঁড় করান, তবে তিনি কি করতে পারেন। কেরালার ক্ষেত্রে এই সমঝোতার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল ডান কম্যুনিস্টদের। পশ্চিমবংগে সেই ভূমিকা বাংলা কংগ্রেস পালন করার জন্য প্রয়াস পাচ্ছেন। এখানে বাংলা কংগ্রেস শাসক কংগ্রেস ও অন্টবামের সংগে আসনভিত্তিক সমঝোতা করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে না। মনে হয় তাই 'সীমিত সমঝোতার' প্রশ্নটাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তোলা হয়েছে। অন্টবামের মধ্যে এই নিয়ে মন-কষাকষি হতে শুরু হবে। ফলে কোন সমাধানে পেঁছবার আগেই ঘাড়ের উপর নির্বাচন এসে যাবে। অতএব, 'নান্য পন্থাঃ—অয়নায় বিদ্যতে'—অন্টবামের যে সমস্ত শরিক নীতিগতভাবে এরকম সমঝোতা চান না—তাঁরা যদি বুদ্ধিমান হন, তবে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বাঁচবার পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন। নতুবা স্বখাত সলিলে ডুবতে যে হবে, এ-কথা তাঁরা একেবারে বোঝেন না এমন নয়।

শাসক কংগ্রেসের সংগে অপ্রত্যক্ষ মিতালী হলেও ফরওয়ার্ড ব্লক নাকি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সি পি এম-এর সংগে হলেও অবস্থা একই দাঁড়াবে। তাই ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফ থেকে মনে হয় অন্টবামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হয়েই আর এস পি-র সংগে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, আর এস পি বেশ কিছুদিন ধরেই কম্যুনিস্ট ও কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে একটি সমাজবাদী শিবির গঠনের কথা বলছেন। অন্টবামে ভাঙন ধরলে এরকম একটি শক্তির যে উদ্ভব হবে না একথা বলা যায় না। তবে বাম কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন, ডান কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বাংলা কংগ্রেসের সংগে কোনপ্রকার সমঝোতা করার অর্থই হচ্ছে পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষভাবে শাসক কংগ্রেসকে মদৎ দেওয়া। শ্রীদাশগুপ্তের বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে, তিনি অন্টবামের কিছু শরিককে তাঁর সংযুক্ত ফ্রন্টে নিয়ে আসতে চান। কেননা, শ্রীদাশগুপ্ত হয়তো নিশ্চিত নন যে, তাঁদের সংস্থা এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতা দখল করতে পারবে কিনা। তাই তিনি শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরও কিছু দলকে কাছে আনতে চান। কিন্তু অন্টবামের মধ্যে কিছু নেতা আছেন যাঁরা এ-কৌশল বিলক্ষণ বোঝেন। তাই অন্টবামের প্রতি-সভায় আর কোন বক্তব্যের উপর বিশেষ জোর না দিয়ে বামপন্থী সংকীর্ণতার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয় এবং বাম কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপের উপর সার্চলাইট ফেলে শরিকদের তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ রাখা হয়। যাহোক, ঘটনার গতি দেখে মনে হয়, 'সীমিত সমঝোতা'র এই নয়া ফরমুলা নিয়ে সংহতির জন্য জোর প্রচেষ্টা চলবে।

আরও একটি প্রশ্ন পরিষ্কার যে, অন্টবাম সমস্ত বিধানসভা ও লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিনা এ-কথা বলেননি। কে কত আসনে প্রার্থী দাঁড় করাবেন, তাই নিয়ে তালিকা তৈরী করছেন। তালিকা যখন অন্টবামের সভায় আসবে দেখা যাবে, অন্টবামের শরিকরা অপরের আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করাতে ব্যগ্র, অথচ ২৮০টি আসনের মধ্যে নিদেনপক্ষে ১৫০ আসনের দাবীদারই নেই। নিজেদের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হবে, সেই নিয়ে মীমাংসার জন্য কথাবার্তা চালাতে চালাতে দেখা যাবে, ১৫০ আসনের জন্য প্রার্থী খুঁজে পাওয়া গেল না। ঐখানেই থাকবে 'সীমিত সমঝোতা'র মিলনক্ষেত্র।

রাজনৈতিক পণ্ডিতরা বলছেন, এ-কৌশল অবলম্বনের মুখ্য কারণ হচ্ছে, সোজাসুজি 'সীমিত সমঝোতা'র প্রশ্ন গ্রহণ করা অন্টবামের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। যদি অন্টবাম সিরিয়াস হোত, তবে শরিকদের বিলুপ্ত বিধানসভায় যে আসন ছিল, তা প্রথমেই স্বীকার করে নিয়ে বাকি আসনে কোন দল কত প্রার্থী দিতে চান তা নিয়েই আলোচনা হত। এরকম ঘোরালো পন্থায় আবার গোড়া থেকে সুরু করতেন না। এতে কালক্ষেপণ ঘটছে মাত্র। আর এই কালক্ষেপণও একটা স্ট্র্যাটেজি। অন্টবামের মধ্যে যাঁরা বস্তুতপক্ষে নেতৃত্ব দিতে চেষ্টা করছেন তাঁরা যে রাজনীতির পাকা খেলোয়াড় একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। অথচ অন্টবামের শরীকরা জানতেন নির্বাচন নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হবে। ডান কম্যুনিস্ট নেতা ডাঃ রণেন সেন প্রায় দু'মাস পূর্বে সহযাত্রীদের এই খবর দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও অন্টবাম দৃঢ়তর সংকল্পে তাঁদের অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হন নি। এবং এই গড়িমসীর উদ্দেশ্য হচ্ছে "মিত্রতার" জন্য সহযোগীদের মনোভাব নরম করে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, অন্য কিছু নয়।

অন্যদিকে বাম কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত বামপন্থী ফ্রন্ট নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ তৈরী। আম জনতার এই ফ্রন্টের প্রতি কতটা অনুরাগ হবে জানি না, তবে একথা বলতে পারা যায় প্রথম থেকেই এক পরিষ্কার বক্তব্য তাঁরা জনসাধারণের কাছে রেখে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। আর বাংলা কংগ্রেস ও শাসক কংগ্রেস যে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করবেন একথা আর জনতার অজানা নয়। শুধু বিপাকে পড়েছে অন্টবাম। বিশেষ করে অন্টবামের মধ্যে সেই সমস্ত দলগুলি যাঁরা নীতিগতভাবে শাসক কংগ্রেসকে প্রথম ও প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করে আসছেন। তাঁদের পক্ষে কোন প্রকারেই অপ্রত্যক্ষভাবেও শাসক কংগ্রেসের সংগে আসনের প্রশ্নে সমঝোতা করা চলে না। অথচ, অন্টবামের সংগে একত্রে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আশা নিয়ে তাঁরা এখনও প্রতীক্ষা করছেন। হঠাৎ আশাভঙ্গ যখন হবে, তখন তাঁরা দেখবেন যে শ্যাম গেল, কুলও রক্ষা করা গেল না। তখন নতুন সখা খোঁজ করতে গিয়ে দেখবে নির্বাচনের জন্য ঠিক মত প্রার্থীও দাঁড় করাতে পারলেন না। ফলে, দুই শক্তির চাপে পড়ে রাজনৈতিক বিলুপ্তির আশংকা প্রবল হয়ে উঠবে। এ ধারণা ঐ সমস্ত দলের নেতাদের অবশ্য ইতিমধ্যেই কিছুটা ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয় যেন তাঁরা কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, সব কিছু বুঝেও যেন তাঁরা ক্রমশ স্থবির হয়ে যাচ্ছেন।

যাহোক, আদি কংগ্রেস ও সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট নিয়ন্ত্রিত দলগুলি ছাড়া অন্যান্যদের জানুয়ারীর মধ্যভাগের মধ্যে নির্বাচনী কৌশল স্থির করতে হবে। এবং এই সময়টা সত্যিই এই রাজ্যের পক্ষে ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ের মধ্যে হরণ-পূরণের খেলা হবে তার উপরই পশ্চিমবংগে অনিশ্চয়তার অবসান ঘটবে কিনা তার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। অবশ্য, সবই নির্ভর করে পশ্চিমবংগের আম-জনতার উপর। কারণ তাঁরা একটানা কংগ্রেস শাসন প্রত্যক্ষ করেছেন ২০টি বছর। তার পর স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও যুক্তফ্রন্টের দু'দুবারের রাজত্বকালেও তাঁদের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব, এতগুলি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার পর তাঁরা যে অনেকখানি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন—একথা বলাই বাহুল্য।

—সমদর্শী
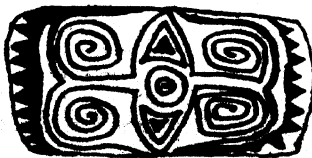
# দেশে বিদেশে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

সংঘাত, সংঘর্ষ ও অশান্তির মধ্য দিয়ে, শতাব্দীর সবচেয়ে লোকক্ষয়কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্মৃতি বহন করে, পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যার আতঙ্কজনক স্ফীতি ও সভ্যতার উচ্ছিষ্ট বিষের দ্বারা সমগ্র জীবন-পরিপোষক পরিমন্ডল আচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কার ভিতর দিয়ে মানুষের ইতিহাসের সুখ-দুঃখের, ব্যর্থতা-সাফল্যের, জয়-পরাজয়ের আর একটি বছর পার হল। পার হয়ে গেল বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের প্রথম বছরটি। পিছনে পড়ে রইল অনেক অমীমাংসিত বিরোধের, পুঞ্জীভূত বিদ্বেষের স্মৃতি আর সামনে একবিংশ শতাব্দীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতের দিনটি থেকে ফিরে তাকালে সদ্যোবিগত সত্তর সালের কোন্ ঘটনাটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, সবচেয়ে স্মরণীয় বলে মনে হবে? সত্তরেই মর্ত্যলোকের বিজ্ঞান দূরনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রমানুষের সাহায্যে চাঁদের মাটিতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, আবার এই সত্তরেই লক্ষ লক্ষ মানুষ অসহায়ভাবে প্রকৃতির রুদ্ররোষের সামনে আত্মসমর্পণ করেছিল। এই সত্তরেই পশ্চিম জার্মানীর দূরদর্শী নেতা হির্বাল ব্রান্ট যুদ্ধোত্তরকালের জার্মানীর পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম দ্বিতীয় যুদ্ধে সেদেশের পরাজয়ের পরিণাম শিরোধার্য করে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে নূতন সম্পর্ক স্থাপন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন আবার এই সত্তরেই দ্বিতীয় যুদ্ধের পর, ও অংশত তার পরিণতিতে, জ্বলে ওঠা দুটি যুদ্ধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল—একটি ভিয়েতনামে আর একটি পশ্চিম এশিয়ায়। এই সত্তরেই হেলসিঙ্কিতে রাশিয়া ও আমেরিকা পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা হ্রাস সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেছিল আবার এই সত্তরেই সর্বপ্রথম ভারত মহাসাগরে ঠান্ডা যুদ্ধের আঁচ লেগেছিল ক্ষুদ্র একটি প্রবালদ্বীপে ইঙ্গ-মার্কিন নৌ যোগাযোগ ঘাঁটি স্থাপনের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে। ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে কোন্ ঘটনাটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে কে জানে?

কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, নিজের দেশের দিকে তাকিয়ে ভারতবর্ষের মানুষ নির্দ্বিধায় বলবে, সত্তর মানে লোকসভা ভাঙার বছর। ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্রের প্রথম কুড়ি বছরের ইতিহাসে এর আগে আর কখনও যা হয়নি তাই হল বছরের প্রায় শেষে এসে। মেয়াদ ফুরোবার আগেই লোকসভা ভেঙে দেওয়া হল এবং অকালবোধন হল ভোটের দেবতার। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে গেল একজন মানুষের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মকান্ডের নির্ভুল ছাপ। সে মানুষ হচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতের কোন মানুষকে যদি সত্তরের মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করতে হয় তাহলে তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী গান্ধী। ভারতবর্ষের সত্তরের রাজনীতির যে নূতন রূপরেখাটি ফুটে উঠল কেরলে তার মধ্যে যেমন শ্রীমতী গান্ধীর নেত্রীত্বের ছাপ দেখা গেল তেমনি দেখা গেল রাজন্যভাতা বিলোপের সিদ্ধান্তে।

রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি

পূর্ববর্তী দশকের শেষভাগ থেকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে ভাংগচুর শুরু হয়েছে সেটা আটকাবার জন্যই শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা ভেঙে দিয়ে নূতন করে জনগণের রায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। এই ভাঙ্গচুরের রাজনীতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে প্রকাশ পেয়েছে গত বছরে। ঐ বছরই পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটেছিল ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে কলহবিবাদের ফলে। চরণ সিংহের মন্ত্রিসভা রাজ্যপাল কর্তৃক বরখাস্ত হওয়ার ফলে উত্তর প্রদেশে এবং বিধান সভায় ভোটে হেরে যাওয়ার ফলে বিহারে শাসক কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। এই দুই রাজ্যেই গঠিত হয়েছে সংযুক্ত বিধায়ক দল যার মুখ্য শরিক হচ্ছে বিরোধী কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ও এস-এস-পি! বিরোধী কংগ্রেসের লখ্নৌ অধিবেশনে যে মহাজোটের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তারই নামান্তর এই সংযুক্ত বিধায়ক দল। যদিও আয়ু ফুরোবার আগে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীই ভারতবর্ষে প্রথম তাহলেও আইনসভা ভাঙার ব্যাপারে পথপ্রদর্শক হচ্ছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেনন। সে ঘটনাও সত্তরের। অচ্যুত মেনন সেই রাজ্যে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি করে নির্বাচন করে ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। বছরের গোড়ার দিকে মনে হয়েছিল, কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে শাসক কংগ্রেসের মিতালির এই চিত্রই হবে পরবর্তী নির্বাচনের সাধারণ চিত্র। বছর যখন গড়িয়ে যাচ্ছে তখন অবশ্য এবিষয়ে কতকটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অন্তত, লোকসভায় [illegible]

বর্তী নির্বাচনের আগে এটা পরিষ্কার যে, শাসক কংগ্রেস সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সি-পি-আই-এর সঙ্গে কোন নির্বাচনী [illegible] জোড়া করছে না। অপরপক্ষে, [illegible] কংগ্রেসের সভাপতি অধিবেশনে [illegible] বুঝেছে যে, তারা আঞ্চলিক [illegible] অন্যান্য জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের [illegible] আঁতাত গড়ে তুলবে, তাহলেও বিরোধী কংগ্রেসের নেতারা সর্বভারতীয় স্তরেই অন্য দলের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মন্ত্রিসভার বদল হয়েছে আসামেও—যদিও তার সঙ্গে রাজনৈতিক ভাঙ্গাচুরের কোন সম্পর্ক নেই। অসুস্থতার দরুন বিমলাপ্রসাদ চালিহা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন। তাঁর জায়গায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

আন্তঃরাজ্য সম্পর্কে বড় দুটি পুরানো সমস্যার মীমাংসা গত বছর হয়েছে; কিন্তু আর একটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আসামের পার্বত্য জেলাগুলি নিয়ে স্বয়ংশাসিত উপরাজ্য মেঘালয় স্থাপিত হয়েছে এই বছরের গোড়ার দিকে আর বছরের শেষে তাকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। চন্ডীগড় পাঞ্জাবকে দিয়ে এবং ফাজিলকা হরিয়ানাকে দিয়ে চন্ডীগড় সম্পর্কে পুরানো বিরোধের মীমাংসা করা গেছে। কিন্তু নূতন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে মহারাষ্ট্র-মহীশূর সীমানা বিরোধ। দীর্ঘকাল অমীমাংসিতভাবে ফেলে রেখেও দুই প্রতিবেশী রাজ্যের নেতাদের একটা স্বীকৃত সিদ্ধান্তে আসার বৃথা চেষ্টা করে ভারত সরকার শেষপর্যন্ত লোকসভা ভাঙার মুখে মুখে মহাজন কমিশনের রিপোর্টটি পার্লামেন্টে পেশ করেছেন। মহীশূরের দাবী, মহাজন কমিশনের সুপারিশই কার্যকর করতে হবে। এই বিরোধের জের একাত্তরেও গড়াবে।

ভারতের ভবিষ্যৎ, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের স্থায়িত্ব, ইত্যাদি দিক দিয়ে অনেক বেশী বিপজ্জনক আরও একটি বিরোধের জের একাত্তর সালে গড়াবে যার তুলনায় দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের এই বিরোধ কিছুই নয়। সেই বৃহত্তর বিরোধের একপক্ষ সরকার ও আইনসভা, অন্যপক্ষে আদালত। এই দেশের সরকার ও আইনসভা সংবিধানের অধীন আর সুপ্রীম কোর্ট বিচারপতিদের জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেক ছাড়া আর কিছুরই অধীন নয়, ভারতবর্ষের সংবিধানেরই এই নির্দেশ। তার মানে, সুপ্রীম কোর্টের 'না'-ই চূড়ান্ত 'না', সত্তর সালে দুবার সুপ্রীম কোর্টের এই 'না' শুনে দেশের বিভিন্ন মহল নিজেদের প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছেন, দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতে যেটা সামাজিক ন্যায়বিচার আর সুপ্রীম কোর্টের মতে যেটা আইনের ন্যায়বিচার, সেই দুইয়ের মধ্যে সঙ্গতি আনা যাবে কিভাবে? সুপ্রীম কোর্টের যে দুটি রায় নিয়ে সত্তর সালে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্বের মূল প্রশ্নে টান পড়েছে, সেই দুটির মধ্যে একটিতে ভারত সরকারের ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের আইন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে আর একটিতে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন রাজন্যদের স্বীকৃতি বাতিল সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ। প্রথম ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে নূতন করে আইন আনতে হয়েছে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভারত সরকার কি করবেন তা এখনও ঠিক করেন নি। তবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সুপ্রীম কোর্টের রায় দুটিকে, বিশেষ করে দ্বিতীয় রায়টিকে, বড় নির্বাচন 'ইস্যু' হিসাবে তুলে ধরে শাসক কংগ্রেস দল বৃহত্তর শক্তি ও অধিকতর ক্ষমতা নিয়ে লোকসভায় ফিরে আসার চেষ্টা করবে।

সুপ্রীম কোর্টের তৃতীয় যে রায়টি সত্তর সালে দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটির দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদে শ্রী ভি ভি গিরির নির্বাচন বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

•

বিদেশের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই, সত্তর সাল আমাদের ঘরের পাশে পাকিস্থানে দুটি বৃহৎ সংবাদ সৃষ্টি করেছে। প্রথম, পূর্ব পাকিস্থানকে হতে হয়েছে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রাণঘাতী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার। সামুদ্রিক ঝড় ও প্লাবনের মুখে জীবন দিল পূর্ব পাকিস্থানের দক্ষিণ অঞ্চলের লাখ পাঁচেক মানুষ। আর এই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঠিক পিঠ-পিঠ এল পাকিস্থানের ২৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন। সমুদ্রের প্লাবনের মতো সেই নির্বাচনও যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল পূর্ব পাকিস্থানে বহুকালের প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির রাজনীতিকে। আর ঢেউয়ের চূড়ায় দেখা গেল যে মুখ সে হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্বে যেমন শেখ মুজিবুর রহমান, পশ্চিমে তেমনি এলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। দুই প্রান্তে এই দুজন আর তাঁদের মাথার উপর জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ—এই তিনজনের উপরই নির্ভর করছে একাত্তরের পাকিস্থানের ভাগ্য।

সত্তরে পাকিস্থানের নির্বাচন ছাড়া আরও যে তিনটি জাতীয় নির্বাচন সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেগুলি হচ্ছে বৃটেন, চিলি ও সিংহলের নির্বাচন। বৃটেনে অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রমিক সরকার নির্বাচনে হেরে গেছেন এবং তাঁদের জায়গায় এসেছেন এডওয়ার্ড হীথের রক্ষণশীল সরকার। চিলির ভোটাররা একজন মার্কসবাদীকে সেদেশের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করেছেন। সারা পৃথিবীতে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল। সিংহলের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক বামপন্থী কর্মসূচী নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এলেন।

সত্তরের শেষ দিকে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধবিরতি হয়েছে বটে; কিন্তু শান্তি বহুদূরে। আর ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি বা শান্তি কোনটিরই দেখা নেই। উপরন্তু কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুককে ক্ষমতাচ্যুত করে সেখানে ভিয়েতনামের যুদ্ধের আগুন ছড়ান হয়েছে এবং উত্তর ভিয়েতনামের হাতে আটক যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্নটি ঘিরে উত্তেজনা বেড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন যদিও ভিয়েতনাম থেকে সরে আসতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাহলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ চালু করে নূতন করে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্যগল, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণের ও পর্তুগালের সালাজারের মৃত্যুতেও ১৯৭০ সাল চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

১-১-৭১ —[illegible]

## সত্তরের দশকের নববর্ষ

বিংশ শতাব্দীর অস্তাচলগামী সূর্য সত্তরের দশকে প্রবেশ করল বিশ্ববাসীর আশা-নিরাশা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে। সত্তরের সম্ভাবনাময় দশকেরও সূত্রপাত হল নববর্ষের প্রথম দিন থেকে। এই দিনটিকে আমরা শুভ বলে মানি। সকলের শুভ কামনা করি আমরা। পৃথিবীর শুভ হোক, কল্যাণে পরিপূর্ণ হোক সকল মানুষের জীবন।

যে-বৎসরকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি তার দিকে তাকিয়ে আমরা কী বলব। কত আশা নিয়ে সেদিনের নববর্ষকে জানিয়েছিলাম অভিনন্দন। তার সবটুকু পূর্ণ হয়নি। পূর্ণতা ও অপূর্ণতায় ভরা একটি বৎসর অপসৃত হয়ে গেল কালের অসীম গহ্বরে। তবু আমরা বলব, মানুষের অগ্রগতির পদচিহ্নে এই বৎসরটিও নানাদিক দিয়ে কম উজ্জ্বল নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি চলেছে সমানে। চাঁদের বুকে স্বয়ংক্রিয় যান মানুষেরই বিজ্ঞান-প্রতিভার নিদর্শন নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবদেহের কৃত্রিম 'জেন' সৃষ্টির প্রচেষ্টাও ফলবতী হয়েছে বিজ্ঞানীর প্রতিভায়। মানুষের আতঙ্ক ক্যান্সার রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের প্রচেষ্টা এখনও ফলপ্রসূ হয়নি। তবে এ-কাজে মানুষের প্রতিভা যে জয়ী হবে তার অভ্রান্ত ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বিগত বৎসর। এ সবই আশার কথা। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। তাই যত ব্যর্থতাই আসুক মানুষ ও মনুষ্যত্বের ওপর রাখতে হবে আমাদের অটুট বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের সত্তরের সম্ভাবনাময় দশকে।

ভারতবর্ষের দিকে তাকালে বিগত বৎসরটিকে বলতে হয় ঘটনার সংঘাতে বিক্ষুব্ধ সময়ের স্মরণিকা। সত্তরের দশক আমাদের দেশের মানুষের কাছেও অনেক আশা নিয়েই উপস্থিত হয়েছে। এই দশকেই আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভর হবার আশা রাখি। এই দশকেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার। জানি না সে-প্রতিশ্রুতি সফল হবে কিনা। তবুও আমরা আশা করে থাকব, সকলের শুভবুদ্ধি ও আন্তরিক সহযোগিতায় ভারতবর্ষের মানুষের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সম্ভব হবে। সরকার সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ঘোষণা করেছেন সংকল্প। কিন্তু তার পথে অনেক বাধা। রাজন্যভাতা বিলোপের যে-নির্দেশ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্টের রায়ে তা বাতিল হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে বেতারভাষণে জানিয়েছেন, সমাজের পরিবর্তনের পথে কত বাধা। তার জন্য তিনি বর্তমান লোকসভা ভেঙে দিয়ে আবার জনগণের কাছে আসছেন নতুন রায় নেবার জন্য। শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে মহৎ প্রচেষ্টা চলছে, ভারতবর্ষ সে-পথ থেকে বিচ্যুত হতে চায় না বলেই জনতার রায় পাবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই আগ্রহ। ভারতের বৈষয়িক উন্নতির পথে যে-বাধা আসছে নানা স্থিত স্বার্থের কাছ থেকে, সে-বাধা অপসারণ না করলে অনিশ্চয়তা ও বিক্ষোভের দিকেই ঠেলে দেওয়া হবে ভারতকে। সেই দুর্দৈব থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। সত্তরের দশকের সূচনায় এই আহ্বানই আজ সর্বত্র উচ্চারিত।

আমাদের হতভাগ্য পশ্চিমবাংলায় চলেছে সামাজিক সংক্ষোভ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ রাজ্য সকল দিক দিয়ে আজ পশ্চাদগামী। তার শিল্পায়ন স্তিমিত ও শিথিলগতি। সাড়ে পাঁচ লাখ পুঞ্জীভূত বেকার রয়েছে ঘরে ঘরে। এদের কর্মসংস্থানের আশা কোথায়? বৈষয়িক উন্নতি ছাড়া আত্মিক বা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অর্থহীন। ভারতবর্ষে পরিকল্পিত অর্থনীতির কর্মসূচী গ্রহণ করে যে-প্রচেষ্টা চলছে তার অনেকখানিই ব্যর্থ হয়েছে দুর্নীতিপরায়ণ কিছু লোকের জন্য। পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের অন্যতম অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সেদিন দুঃখ করে এই কথাই বলেছেন যে, দেশপ্রেমের অভাবের জন্যই আমরা আমাদের বৈষয়িক উন্নয়নের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছুতে পারিনি। অথচ আমাদের জনবল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ উপেক্ষনীয় নয়। এই বিপুল শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে সত্তরের দশকে সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় যা-কিছু তা সরবরাহ করা অসম্ভব হবার কোনো কারণ নেই।

এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে বর্তমান হতাশা থেকে মুক্ত করতে হবে দেশের মানুষকে। সামগ্রিকভাবে ভারতের সকল মানুষের কথাই ভাবতে হবে আমাদের। আঞ্চলিকতা বা প্রাদেশিকতা, ধর্মান্ধতা বা সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই গণতান্ত্রিক সমাজে। দেশের একটি অংশ দুর্বল বা অনুন্নত হলে গোটা দেশের অগ্রগতিকেই তা ব্যাহত করবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য দেশের সকল অঞ্চলের মানুষ যেমন সমান দুঃখভোগ করেছে, তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির সংগ্রামেও তেমনি দেশের সকল মানুষ সমান অংশীদার। কাউকে বঞ্চনা করে কাউকে স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া অপরাধ। দেশের দরিদ্র, বঞ্চিত, বেকার হতভাগ্য সকলের কথা মনে রেখেই সমাজ-কল্যাণের কর্মসূচী রূপায়িত করতে হবে। সত্তরের দশককে ভারতের সার্থকতার দশকে পরিণত করতে হলে সকলকেই আজ নতুন সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হতে হবে অবিচলিত নিষ্ঠায়। নববর্ষ এই সংকল্পের আহ্বানই নিয়ে এসেছে। তা যেন সার্থক হয় আমাদের জীবনে।

## বাকি, আমার অনেক বাকি ॥ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

এদিক সেদিক অচেনা দিকে অনেক দিকে গিয়েছিলাম—
জলস্রোতে জনস্রোতায়;
পায়ের চটি বানের জলে ভেসে যেতে দিয়েছিলাম—
এমনি ছিলাম হাঁটাচলায়।
তাহলে কোন্ যাওয়া বাকি?
জানি তো নই বনের পাখি।
গিয়েছিলাম মুখোশ-আঁটা মানুষজনের শিল্পকলায়।

বাকি, আমার অনেক বাকি,
নইলে কেন প্রবল হাওয়া দেয়াল নাড়ায়!
বাকি, আমার দিনের প্রভায় পরম বাকি
আপন মাঠে, ভিতর-পাড়ায়।

## বৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে আসি ॥ সত্য গুহ

আমার হাসতে দেখে তুমি হিংসেয় জ্বলে যাও
আমার হৃদয় অলিন্দ ছুঁড়ে দাও তীক্ষ্ণ অভিশাপ
কী আমার নেবে তুমি, যত কলকাঠিই নাড়াও
তোমাকে করতেই হবে জ্বলেপুড়ে কেবল বিলাপ

আমার তো জানা নেই হাসি ছাড়া অন্য কোনো স্বাদ
বিপজ্জনকভাবে বেঁচে থাকি, দুঃখই ভূষণ
অল্প যা-কিছু জোটে খুদকুড়ো তাই হে সুস্বাদু
অমরত্ব! দূরে যাক। ধুলো পেতে শুয়েছি দুজন

এই বেশ; খুব সুখে আছি, প্রভু, কাঁদি ও কাঁদাই
এ ওকে পরস্পর বাহুর বন্দিত্ব মেগে জোর
অঙ্গে অঙ্গে নহবতে বেজে যায় শাশ্বত সানাই
প্রিয়, হে প্রিয়, শূন্য হৃদয় ভরিয়া দাও মোর

সুখে আছি, প্রভু, সব দুঃখের কথা করে গান
বৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে আসি জীবনে অঘ্রাণ।।

## দেখা দেবে ॥ নিশিনাথ সেন

যেমন বর্ষার শেষে অনন্ত ক্ষেতের মাঝে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে
ফসলের গান
অথবা চৈত্রের অন্ত্যে মরাগাছে প্রকৃতির জেগে ওঠে প্রাণ
তেমনি, অতীত হলে পৃথিবীর পরিধির স্বল্প মলমাস
সূর্যোদয়ে দেখা দেবে অবশ্যই সবুজ সুন্দর সেই ঘাস
রূপে যার দেবতার ঝরে পড়বে মহানন্দ-প্রীতি
আজন্ম প্রজ্ঞায় দেখি এবম্বিধ জগতের রীতি।
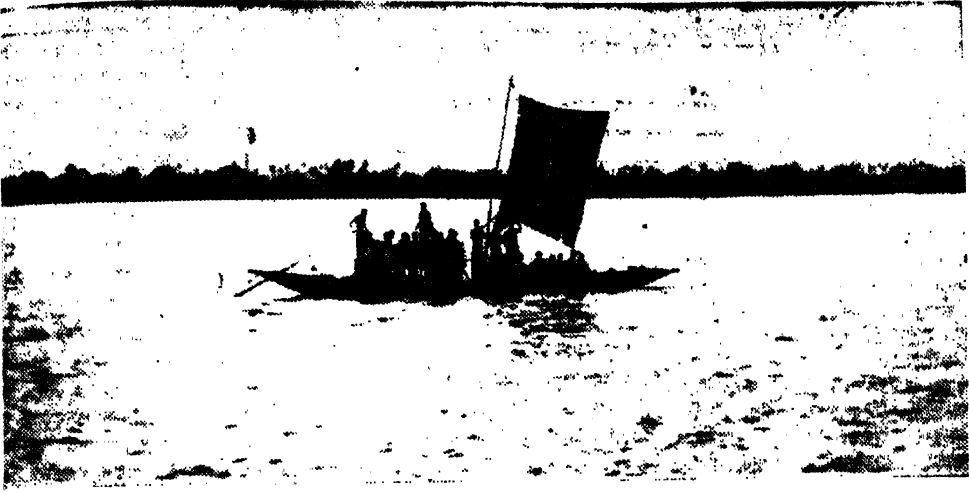
# গঙ্গায় জলপথে ভ্রমন

পাহাড়-ভাঙা জলস্রোত নিজের খেয়ালে কোন পথে পরিক্রমা সুরু করবে আগে ভাগে তা বলে দেওয়া কঠিন। কিংবা যে পথে দীর্ঘকাল ভ্রমর আনাগোনা, হাসি-কান্নার ফুল ঝরানো, ঊষর প্রান্তরে ঋতুতে ঋতুতে ফসলের ভারা ভারা, গঞ্জ বন্দরের পত্তনে ব্যাপারী নৌকার ছাউনি ফেলা, জমজমাট হয়ে ওঠা বন্দরে কখন যে চড়া পড়বে তা কেউই বলতে পারে না। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের খেসারত দিতে হয়েছে অনেক দেশকেই। অবশ্য বাংলা দেশের কথা আলাদা। জলপথের প্রচুর সম্ভাবনাকে আমরা নিজের হাতে নিজেরা টিপে মেরেছি, খানিকটা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা না বুঝে, খানিকটা আত্মম্ভরীতায় নিমগ্ন থেকে। অথচ কলকাতার পত্তনই হোত না যদি না গঙ্গা তার দুকূল ছাপানো জলস্রোত নিয়ে মাঝ বরাবর দাপট সুরু না করত। বিদেশী বণিকরা জলপথের গুরুত্বটা কিছুটা বুঝেছিল, বুঝেছিল বলেই মজে যাওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত উটকে এক পিঠ ছুঁইকে এক পিঠ দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে গেছে।

কলকাতার পুব পাড়ায় যাদের বাস জলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাদের বেশি। আজ যে খালকে বুজিয়ে রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা হচ্ছে একদিন সেই খালই সেদিন অন্যতম প্রথম জলপথের দায়িত্ব পালন করেছিল, শহর শহরতলীকে রূপসী করেছিল। পৃথিবীর বহু জমজমাট নগরীর দুর্লভ বস্তু যে জলপথ, যা দুনিয়ার ব্যবসাদারদের টেনে এনে অর্থ-আনুকূল্য দিতে পারে, ভিড়ের চাপে নাভিশ্বাস-ওঠা শহরকে মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে, সেইসব সম্ভাবনাপূর্ণ জলপথের সংস্কার না করে, নিয়মিত লঞ্চ, মোটরবোট সার্ভিস চালু না করে তাদের বুজিয়ে শিল্পোদ্যোগের ইন্ধন জোগানো সর্বনাশেরই সামিল।

বেলেঘাটার খালে-খালে বওয়া নৌকোর যাতায়াত দেখে পথের হদিস পাওয়া যায়, কিন্তু আজকের খাল ভরাটের মতই আমরা বুঝিনি এমন অনেক খালের পরিচয়, প্রয়োজন। হেস্টিংস-এর মারাঠা ডিচ খোঁড়ার বহুদিন আগে প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া জলপথ ছিল বেলেঘাটার বুক চিরে। জোড়ামন্দির ছাড়িয়ে চিংড়িঘাটার সীমানায় পূর্ব-উত্তরে বয়ে-যাওয়া নতুন খাল আর পূর্ব-দক্ষিণে বয়ে যাওয়া পুরনো খালের দাপট ছিল একদিন। কাল বোশেখীর ঝড়ের মাতন সহ্য করতে হয়েছে অনেক পাকাপোক্ত দাঁড়ি-মাঝিকে। সুন্দরবনের চমকে দেওয়া উত্তাল নদ বিদ্যাধরীর মুখ এটি চিংড়িঘাটা, সম্ভবত চিংড়ি-ক্রিক এর ঘাটে আজও বেলেঘাটার দক্ষিণে যে পুরাতন ও সদ্য-বিলুপ্ত নতুন খালের সংযোগটুকু আছে, ঐ জলপথটি বেলেঘাটার বিদ্যাধরীর মুখ থেকে সুরু হয়ে হিন্তালী ধর্মতলা ক্রিক রোর কোল জুড়ে বয়ে গেছল গঙ্গা পর্যন্ত।

শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা কেরী সাহেবের যুগেও উত্তরবঙ্গ যাওয়ার প্রয়োজনে আসতেন বেলেঘাটায় নৌকা খুঁজতে। আদিগঙ্গা দিয়ে যখন ভাগীরথী প্রবাহিত হতো, তখন যেমন গঙ্গা বেয়ে সাগর-সঙ্গমে সাগর দ্বীপে পৌঁছান যেত, তেমনি বিদ্যাধরীর সংযোগ ছিল আদি গঙ্গার সাথে। সে-পথ গিয়ে উঠল মাতলায়। এই মাতলায় বিদ্যাধরীর মোহনায় পোর্ট ক্যানিং-এর ওপর দিকে ছিল প্রতাপাদিত্যের দুর্গ হায়দার-গড়। এখন সেখানে যুযুজ-খানার উঁচু ঢিবি, প্রতাপনগর গ্রাম। এই সেদিনও নৌকা বেয়ে সুন্দরবন যাওয়ার শর্টকাট ছিল বেলেঘাটার খাল, পুরনো খাল বেয়ে মাইল-তিনেক এগিয়ে বিদ্যাধরীতে ধাপার লক-গেটে টোল দিতে হোত। তারপর আরও এগিয়ে গিয়ে জোয়ারের অপেক্ষায় বিশ্রাম নিতে হোত বসন্তার চরে। জোয়ার এলে বসন্তার চরের পাশ কাটিয়ে

চলতে চলতে সুন্দরবনের কোলে একেবারে মাতাল মাতলায় গিয়ে পড়া যেত। সে-নদীপথ আজ মজে গেছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর 'মনসা মঙ্গল'-এ গঙ্গার এক প্রবাহপথের হদিশ দিয়েছেন। বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগর তাঁর বাণিজ্যতরী রাজঘাটে ভাসিয়ে এগিয়ে চলেছেন সমুদ্রের দিকে। রামেশ্বর পার হয়ে, একে একে পেরিয়ে এলেন অজয় নদী, উজানী, শিবা নদী, কাটোয়া, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণী, গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনা সঙ্গমে সপ্তগ্রাম, কুমারহাট, তারপর ডাইনে হুগলী, বাঁয়ে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরা, পুবে কাঁকিনাড়া, মুলাজোড়, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ডাইনে ভদ্রেশ্বর চাঁপদানী, বামে ইছাপুর, বাঁদিবাজার, ডাইনে নিমাইতীর্থ ঘাটী, মাহেশ, রিষড়া, কোন্নগর, ঘুষুড়ি, বামে খড়দহ, কামারহাটি, চিত্রপুর, কলকাতা, কালীঘাট, বারুইপুর তারপর ছত্রভোগ, হাতিয়াগড়, চৌমুখী, শতমুখী, সাগরসঙ্গম পেরিয়ে চাঁদ সদাগরের মেলানী সাগরে ঢুকল। সেদিন পর্যন্ত ভাগীরথী কলকাতা, বেতড়, কালীঘাট পর্যন্ত এসে আজকের শীর্ণকায়া আদি গঙ্গার বুক বেয়ে সমুদ্রমুখে বয়ে গেছল। আদি গঙ্গার প্রশস্ত দুই কূল সমৃদ্ধ ছিল। তারপর সরু হয়েছে মজে যাওয়ার পালা।

জলপথে ভ্রমণে এক ধরনের বিচিত্র আনন্দ আছে। নদীর টানে, সাগরের উদগ্র নেশায় আজও আমরা ট্রেনে-বাসে গিয়ে পৌঁছাই ডায়মণ্ডহারবার, তারপর পঁচিশ-ত্রিশ মাইল হেঁটে কাকদ্বীপ। এখান থেকে শেষ পাড়ি সাগর। এপার কাকদ্বীপ, ওপার সাগর; মাঝে দিকহারানো বড় গাঙের অকূল পাথার। পারঘাটে দাঁড়িয়ে ছোট নদীর দ্বীপগুলো ছাড়িয়ে চোখ মেললে, ঝাপসা নজরে পড়বে সাগরদ্বীপের সীমানা। সাগর মেলায় কেউ আসেন ধর্মের টানে, কেউ প্রকৃতির মোহে, কেউ সমুদ্রের অতল আস্বাদ পেতে। কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার স্থলপথে যেতে আমরা অভ্যস্ত। পথটুকু চোখ-কান বুজে পেরিয়ে গেলেই পৌঁছাব জলের কাছে। কিন্তু জলপথে যাবার পরিকল্পনাও অনায়াসেই করা যেতে পারে। ধরা যাক আউটরাম ঘাট থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত স্টীমার সার্ভিস যদি চালু করা যায়, আমার তো মনে হয় অনেকেই স্থলপথ ছেড়ে জলপথে যাওয়াই পছন্দ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ স্থলপথে ভ্রমণের প্রচুর হদিশ দিয়েছেন, বাস সার্ভিস চালু করেছেন পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্যে। জলপথে ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধাগুলিও ভেবে দেখা যেতে পারে। নিয়মিত স্টীমার সার্ভিস বা ছুটির দিনে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্টীমারেই থাকবে চা, টিফিন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। এমনকি সকালে গিয়ে সন্ধ্যার দিকে না এসে দু-একদিন স্টীমারে কাটানো গেলেই বা আপত্তি কি! সেক্ষেত্র শোয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। ধরুন, ডায়মণ্ডহারবারের পর কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ যদি ঘুরে আসতে হয়, তাহলে একদিনে কুলোবে না। অথচ ফ্রেজারগঞ্জ দেখার ইচ্ছেটাকে দাবিয়ে রাখাও ঠিক হবে না।

সাগর দ্বীপের দশ-বারো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সাগরের কোলে নারায়ণতলার দ্বীপ। স্থলপথে যেতে হলে নামখানা থেকে নৌকোয় নৌকোয় পেরোনো যায় মাঝের গাঙটুকু। বালি-বিছানো সাগর-সৈকতের নারকেল গাছের সারি, নির্জন প্রকৃতি সবটুকু সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে। ফ্রেজারগঞ্জ পেরোলেই সমুদ্রের দক্ষিণ প্রান্ত। সামনে জল, পিছনে জল, দুপাশে জল। সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে পুবে—আরও পুবে এগিয়ে যান। পারহীন, নিষ্ঠুর অথচ মন কেড়ে নেওয়া সমুদ্র। বামে আরও পুবে একের পর এক দ্বীপ। দ্বীপের পর দ্বীপ, মোহনার পর মোহনা। ম্যাকলেনবার্গ, ডালহাউসি, গোনা, টেরবালি, ভরকুণ্ডা, বাহির জিঞ্জিরা প্রভৃতি। উত্তাল নদীও আছে বামিয়া, মাতলা, ছেঁড়া মাতলা, ছোট হলদী, হাঁড়িয়াভাঙা—এমন কত। এর যে-কোন নদী ধরে উজান ঠেলে উত্তরমুখে এগোলেই সুন্দরবন। যত নদী যত নালা এসে মিশেছে এখানে। গঙ্গা এখানে শতমুখী নয়, বলা যায় সহস্রমুখী।

বড়দিনের ছুটিতে প্রাইভেট স্টীমার পার্টি প্রায়শই পাড়ি জমান ডায়মণ্ডহারবারের পথে। একদিনের বা দু-দিনের প্রমোদভ্রমণ যে-কোন পর্যটককে উৎসাহিত করবে। বাড়ির মত সমস্ত ব্যবস্থা স্টীমারে করে নেওয়ার কোন অসুবিধে নেই। জলের উপর রান্নাবান্না থেকে খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা সবেরই একটা আলাদা আনন্দ আছে। আগেকার দিনে জমিদার-বিত্তবানদের নদীপথে 'বাচ' খেলতে যাওয়ার নজির প্রচুর আছে। এমনকি ছুটির দিনে ফেরী নৌকায় গঙ্গার এপার-ওপার করেও আমরা ভ্রমণের শখ মেটাই। সেক্ষেত্রে তোড়জোড় করে গুছিয়ে-গাছিয়ে স্টীমারে ভ্রমণ উৎসাহের তো বটেই।

এদিকে আউটরাম ঘাট থেকে ডায়মণ্ডহারবার ওদিকে - আপাতত ব্যাণ্ডেল ত্রিবেণী পর্যন্ত ছোট্ট ট্রীপ দেওয়া যেতে পারে। গঙ্গাবক্ষে কলকাতা থেকে ত্রিবেণী—মাঝে দু-পারের দর্শনীয় জায়গা রয়েছে প্রচুর। ঘন্টাখানেকের স্টপ্ থাকলে জায়গাগুলো ঘুরে নেওয়া যায়, আর একনাগাড়ে চলারও ছেদ পড়ে। দর্শনীয় জায়গাগুলো স্টেশন হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। জলপথে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ একটি পরিকল্পনা নিতে পারেন, আমার মনে হয় এতে প্রচুর সাড়া পাওয়া যাবে।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

# সীমানা পেরিয়ে

**শচীন বিশ্বাস**

চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে শুভ্রশীল বাইরে হাই স্ট্রীটের দিকে তাকিয়ে লোক-জন রিকসো বাস চলাচল দেখছিল। মন্মথ সকালের বহু হাতঘোরা ছেঁড়া-ছেঁড়া কাগজের উপর চোখ বুলোচ্ছে। একটু আগে ওরা পুরনো দিনের কথা বলছিল। এখন চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে সম্ভবত কোল-কাতার সেই ছন্নছাড়া বন্ধনহীন দিনগুলির কথা ভাবতে ভাবতে দুই বন্ধু ফুরিয়ে যাওয়ার শূন্যতায় ক্লান্ত এবং বিষাদগ্রস্ত। সেই রাস্তার মোড় ফুটপাথ কফি হাউস রেস্টুরেন্ট বার—সেই গড়ের মাঠ, গঙ্গার ধার ধর্মতলার সেই পাহাড় প্রান্তর; সিনেমা থিয়েটার সাহিত্যের জন্য পাগল হয়ে ছুটো।

শুভ্রশীল সিগারেট ধরাল। বাইরে হাই স্ট্রীটে তখন লোক গিজ-গিজ করছে। রিকসার হর্ণ, বাস-লরীর ঘড়ঘড়ানি, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের সতর্ক টহলদারী। শুভ্রশীল বলল, ধুরে শালা, কোথাও শান্তি নেই। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, বুঝলি মন্মথ, বড় হাঁপিয়ে উঠেছি, আমার আর কিছুই ভাল লাগে না—

মন্মথ খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বলল, কেন, তোরা সরকারী কর্মচারীরা ত' বেশ আছিস, আন্দোলন করছিস, ধর্মঘটও করলি সেদিন, কাগজে দেখলাম তোদের মাইনে-পত্তরও তো কিছু বাড়ছে—

শুভ্রশীল বলল, মাইনে আমাদের বাড়লে তোরা মাস্টাররাও নিশ্চয়ই কিছু পাবি, আজ নয় কাল। কিন্তু আমি এসব কোন কিছুতেই থ্রিল পাচ্ছি না, ইনস্পায়ার্ড হতে পাচ্ছি না। আমি জানলি মন্মথ, পুরোপুরি একটা লস্টম্যান, একদম ফুরিয়ে গেছি—

মন্মথ কিছু বলল না, নীরবে সিগারেট টানতে টানতে তার বর্তমান ছা-পোষা জীবনের কথা ভাবতে লাগল। কুসুমের অসহিষ্ণু সহানুভূতিহীন ব্যবহার, ছেলে-মেয়ে দুটির শারীরিক অসুস্থতা, স্কুলের নিদারুণ-অনিশ্চিত বেতন; অনিচ্ছা সত্ত্বেও টিউশান করে অর্থ সংগ্রহ, শিক্ষায়তনের সাম্প্রতিক গোলমাল, ছেলেদের পরীক্ষা বয়কট, স্কুল উঠে যাওয়ার আশঙ্কা, পাড়ায় যখন তখন পুলিশের আবির্ভাব ইত্যাদির মিলিয়ে দিন যাপনের মধ্যে যে কী অপরি-সীম শূন্যতা—তা বন্ধুকে সে বুঝাবে কি-ভাবে। আসলে কুসুমের কথাই ঠিক, মফস্বলে মাস্টারী নিয়ে কোলকাতার সরকারী চাকরী ছেড়ে আসা খুবই আহাম্মকী হয়ে গেছে—

—তোরা ভালো আছিস মন্মথ, শুভ্র-শীল শূন্যে ধোঁয়া ছাড়ল।

—ভালো আছি।

মন্মথ খুব জোর দিয়ে বলল নয়ত কি— কোলকতা আর এখন ভদ্রলোকের বসবাসের মত নেই। ওফ্ হরিবল! শুভ্র-শীল হঠাৎ উত্তেজিতভাবে রাস্তায় নেমে এসে বলল, চল কোথাও নিরিবিলিতে বসা যাক—তোদের এখানেও দেখছি লোকজন ভিড়, গাড়ি ঘোড়া—ওফ্!

মন্মথ বলল, যা যা কোলকাতায় আছে, এখানে সবই আছে, হয়ত কিছু বাড়তি। হ্যাঁ একটা জিনিস কিন্তু নেই, ভিড়ের মধ্যে একা হওয়ার সুযোগটা। ঐটি ছাড়া লোকজন ভিড় দাঙ্গা খুন রেপ প্রেম আন্দোলন ধর্ম-ঘট উচ্ছৃঙ্খল রেশন অবিশ্বাস ছিনতাই সিনেমা কালচার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন্দল —ক্লান্তি ডিজিজ—

—থাম শালা, বড্ড হতাশাবাদী হয়ে পড়েছিস—

—হতাশাবাদী হতে পারি। আবার নাও হতে পারি। আমি জানিস ত, ভালো পিতা, স্বামী এবং শিক্ষক, আমি রোজ বাজার করি, ঘড়ি ধরে ডাক্তারখানায় যাই, টিউ-শানীতে একদম ফাঁকি দিই না—ক্ষমতা নেই বুঝতে পেরে গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছি—লাইফ ইন্সিওরেন্সে—

—ওফ্, তুই অদ্ভুত মন্মথ। চল, তোর নিভৃত নির্জন জায়গায় নিয়ে চল। তোর

এখানে দু-একদিনের জন্য এসে যদি একটু নিভৃত বিশ্রামই না পেলাম—

মন্মথ বলল, নির্জন জায়গা কোথায়? এখানে আছে তাই ত জানি না, যেহেতু অনেক কাল আমি বাড়ির বাইরে যাই না—হাঁ একদিন গিয়েছিলাম বটে, বাড়ি থেকে পালিয়ে গ্রামের দিকে চলে গিয়েছিলাম—সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরেছিলাম—

—বলিস কি রে, পালিয়ে গিয়েছিলি? হাইলি রোমান্টিক—

—গিয়েছিলাম ত। এই রিকসো। চল শুদ্ধ, নদীর ধারে যাওয়া যাক। ওদিকটা তোর ভাল লাগতে পারে। এখন ওদিকটা কেমন হয়েছে কে জানে। রিকসোয় উঠে বলল, তুই কবিতা-টবিতা লিখছিস না আজকাল? কি রে?

শুদ্ধশীল অন্যমনস্কভাবে বলল, কৈ আর তেমন—

কদমতলা বাস স্টপের পরে রাস্তাটা কিছু দূর এসে নদীর পাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এখানে খাড়া পাড়। ইঁটের তৈরি পুরনো রেলিং। মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলার গাড়ি মাঝে মাঝে দু-এক গাড়ি ঘেঁস ফেলে, বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে তা ধুয়ে মুছে যায়। এখান থেকে নদীর পাড় দিয়ে পায়ে চলা রাস্তা শুরু। ইঁট বের হওয়া এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। রিকসো চলতে পারত। শুদ্ধশীল নদীর ধার দেখে বলল, এবার হাঁটা যাক—

ওরা যেখানে এসে দাঁড়ালো সেখান থেকে রাস্তাটা সোজা পশ্চিমে চলে গেছে। বাঁ-পাশে সদর-শহরের কর্মব্যস্ত জীবন, দোকান বাজার গাড়ি ঘোড়া বাড়ি ঘর সিনেমা হাউস রেল স্টেশন, ডান পাশে আঁকাবাঁকা জলঙ্গী। রাস্তাটা নদীর পাড় ধরে সোজা গ্রামের দিকে চলে গেছে। শহরের শেষ প্রান্তে মাঠ, চাষের জমি, কোম্পানির বাগান, মাঝে মাঝে রাস্তার দুধারে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের খড়-বিচালির ছাওান দেওয়া চালা, এক-আধখানা টিনের ছাপড়া। গাছগাছির মধ্যে নিঃশব্দে পড়ে পড়ে ঝিমুচ্ছে—

শুদ্ধশীলের খুব ভাল লাগছে। এই নদী-তীর মাঠ প্রান্তর ফেলে আসা জীবনের অতীত হয়ে ঈষৎ স্তিমিত শিরা-উপশিরা দিয়ে শরীর-মনে শির শির সাড়া দিচ্ছে। নেশার মত, হুইস্কির স্বাদ বিস্মৃত হওয়ার প্রথম আলোড়নের মত একটা মিঠে কড়া অনুভূতি।

মন্মথও অনেকটা হালকা বোধ করছিল। এ-সব অঞ্চল তার কৈশোরের স্মৃতি জড়ানো অতি-পরিচিত : আমবাগানের পাশে এই যে দেখছ মাঠ, ছেলেরা এখানে ফুটবল ক্রিকেট খেলত, রাস্তার ধারে এইসব বেঞ্চগুলোতে আগে বুড়োরা বসে অবসরের গল্পগুজব করত। এখন এখানে দেখছি জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা আসে! এই জলঙ্গী বাগ, ও-পাশ দিয়ে বড় ঘাট, ওখানে শহরের ঠাকুর বিসর্জন হয়। ওঃ, কতকাল ঠাকুর বিসর্জন দিতে আসি না। বর্ষাকালে এই ঘাটে পানসি নৌকো এসে লাগত। স্কুলের পরে এখানে এসে কতদিন পানসি নৌকার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। মন যেন কোথায় চলে যেত। মনে হত পানসি নৌকাগুলো কতদূর থেকে আসছে কে জানে! ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল। আরও কিছুটা এসে মন্মথ বলল, আরে সেই ছোট্ট মাঠখানা। স্কুল পালিয়ে আমরা কত এসেছি এখানে ছোলার ক্ষেত আর আঁক খেতে। এর নিচেই ত শ্মশান। এই মাঠে রাই-শর্ষের ক্ষেতের আলের উপর একটা বাবলা গাছের ছায়ায় বসে মৃত্যুঞ্জয় কবিতা শুনিয়েছিল। খাতার পর খাতা কবিতায় ভর্তি। ঘণ্টা তিন চার লেগেছিল। একটা কালকাসুন্দির পাতা ছিঁড়ে নাকের কাছে ধরে বলল, এখন মৃত্যুঞ্জয় রেলে চাকরী করে, কবিতা লেখে না। নাকি লেখে, আমাকে কিছু বলে না।

নীরবে সিগারেট টানছিল শুদ্ধশীল। দেবদারু শিরীষ গাছের ছায়া, পাখি-ডাকা বিকেল। গতকাল প্রচণ্ড ঢল নামার পর আজ আকাশ কিঞ্চিৎ শুকনো। আকাশে মেঘ আছে বটে, তবে আলগা বাতাসের ধাক্কায় ছুটোছুটি করছে। এখন বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ নরম হাওয়া। মন্মথর টুকি টুকি স্মৃতি-রোমন্থন! ক্লান্ত দেহে বাতাস লাগার মত সুখ—

—কিরে, কেমন লাগছে?

শুদ্ধশীল অস্ফুটে একটা গানের কলি ভাঁজছিল, বড় বেদনার মত বেজেছো।

সামনে রাস্তার উপর লাল শালুর ফেস্টুন নিয়ে একটা মিছিল এসে থামল। শ্লোগানে শ্লোগানে হঠাৎ সচকিত নৈঃশব্দ, বন মাঠ নদী। দু' একখানা রিকসো। লোকজনের আনাগোনা, চেঁচামেচি। শুদ্ধশীল বলল; কিরে বাবা, এখানেও মিছিল— .

মন্মথ বলল, এখানে একটা ছোট্ট মণ্ড আছে। মাঝে মাঝে সভা বা অন্য কোন সম্মেলন হয়, সিনেমা-থিয়েটারও হয়। এটাই আমাদের শহরের শেষ কোলাহল, এটাই শেষ সীমা; এর পর আমরা সীমানা পেরিয়ে যাব, যাবি নাকি আর, না ফিরবি?

শুদ্ধশীল খুব জোর দিয়ে বলল, আমরা সীমানা পেরিয়ে যাব। হোসিয়ারী শ্রমিকদের সভা হচ্ছিল। দীর্ঘদিন ধরে ওদের আন্দোলন ধর্মঘট চলছে। কোলকাতাতেও ওরা দীর্ঘ মিছিল করেছে কয়েকদিন আগে, দেখেছে শুদ্ধশীল। বলল, এখানে হোসিয়ারী শ্রমিক আছে নাকি?

—আছে। এ-অঞ্চলের হোসিয়ারী শ্রমিকরা বেশীর ভাগ পূর্ব থেকে আগত রিফ্যুজি, পাবনার লোক বেশী—মন্মথ আরও কি সব বলতে যাচ্ছিল, শুদ্ধশীল থামিয়ে দিল। দেখ মন্মথ, ঐ রিফ্যুজি নামটা আর উচ্চারণ করবি না। ওফ! কি সব নিদারুণ দুঃস্বপ্নের দিন গেছে! নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে খয়রাতী সাহায্য ভিক্ষা করা কী দুর্দৈব!

মন্মথ বলল, আমরা বলি না বলি আবার ত সব রিফ্যুজিরা আসছে।

বুকে ব্যাজ আটকানো একজন কর্মী কৌটো হাতে করে এগিয়ে এলো, হোসিয়ারী শ্রমিকদের আন্দোলন ফাণ্ডে কিছু দিন—ওরা দু'জনেই আবার পকেটে হাত ঢুকালো। কর্মীটি বলল, সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, দেখুন না—

মন্মথ বলল, দেখবি নাকি শুদ্ধ?

—সিনেমা দেখার কথা তুই ভাবতে পারলি মন্মথ। এখানে এই পাখি-ডাকা নদীর ধারে এই শান্ত গোধূলি সন্ধ্যায়—

মন্মথ বলল, আসলে এ-ভাবে ছবি দেখতে তোর ভাল লাগছে না। কত ভাল ভাল ছবি নিত্য দেখছিস—। এখানে চটের উপর বসে—

—বাজে বকিস না, শুদ্ধশীল থামিয়ে দিল মন্মথকে, ছবি ত তুইও কম দেখিসনি, দেশী বিদেশী, সিনে ক্লাবের সেই দিনগুলি মনে নেই?

—মনে আছে!

—আমি ত এখন ও-সব ছেড়েই দিয়েছি, ও-সব ফাঁকা আঁতেলেকচুয়াল কাজকর্মে আর উৎসাহ নেই। চল, এগিয়ে যাই, আজ আমার অদ্ভুত ভালো লাগছে। আজ আমরা সীমানা পেরিয়ে যাব—বিরক্তিকর প্রাত্যহিকতা থেকে আজ আমরা মুক্ত—

মন্মথর চোখের সামনে ভেসে উঠল কুসুমের খিটখিটে চেহারা, ছেলেমেয়ে দুটির ম্লান রোগ পাণ্ডুর মুখের ছবি। সীমানা পেরিয়ে যাব! যাবি শুদ্ধ, পারবি যেতে!

—কী বিরাট গাছটা! কি নাম বললি, শিরীষ? দেখ দেখ মন্মথ, পাখিরা কি সুন্দর কিচির মিচির করছে, অস্তগামী সূর্যের শেষ উজ্জ্বল আভা মগ ডালে। চল আমরা ডাইনের এই মেঠো পথ ধরে হাঁটি—

মন্মথ বলল, ও-পথটা নদীর বুকে নেমে গেছে। বালির উপরে হাঁটতে পা ধরে যাবে, কষ্ট হবে। শুদ্ধশীল চলতে শুরু করলে, বলল, আচ্ছা চল। মনের থেকে যেন সায় দিতে পারছে না সে—

সামনে নদীর পাড়ে অতি প্রাচীনকালের একটা তেঁতুল গাছ বর্ষার ভীষণ জলস্রোতে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এখন বিক্ষতমূল, পুরানো ঘুণ-ধরা শেকড়ে নিজের বিরাট দেহটা আর যেন ধরে রাখতে পারছে না—। নদীর বুকে হেলে পড়েছে। হয়ত এবারের বর্ষাই গাছটার জীবনে শেষ বর্ষা হবে। সামনে নাবাল জমি। এই চত্বরটায় এখানে-ওখানে কয়েকটি চালাঘর। শুদ্ধশীল বলল, নদীতে জল বাড়লে ওদের খুব কষ্ট, না? আশ্রয় আশ্রয় বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ততক্ষণে হয়ত নদীর গভীর ঘোলা জলের পাকের মধ্যে অতলে তলিয়ে গেছে—

মন্মথ বলল, দূর, তা কেন? ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কোনবার বড় বন্যা না এলেই বরং ওদের ভাল লাগে না। ভাঙা-গড়ার মধ্যে একটা থ্রিল আছে না? আমরা ঝুঁকে পড়ছি। দেখ, নদীর তটে আমরা অনেকখানি নেমে এসেছি—পেছনে দেখ—। শুদ্ধশীল এসব কথা শুনতে পেল কিনা সন্দেহ, সে ততক্ষণে অতিরিক্ত গতি পেয়েছে। হুড় হুড় করে দৌড় নামছে বালির পাড় ভেঙে। বালির রাজ্য, পা বসে যায়। গরু মোষ উপরে ওঠার জন্য বালি ভেঙেছে বেশী। নতুবা বর্ষাকাল বলে বালি আরও শক্ত থাকত। শুদ্ধশীল হাঁফাচ্ছিল—

মন্মথ ধীরে, সাবধানে নেমে এল। কাঁচা ঘাসের বোঝা মাথায় চাপিয়ে চাষীরা উপরে উঠছে। নদীর চড়া থেকে ঘাস তুলে ধুয়ে ধুয়ে আটি বেঁধেছে ওরা। মাথার উপর থেকে টস টস করে জল গড়াচ্ছে গালের উপর দিয়ে, ঘাড়ে পিঠে জলের ধারা। কিছুটা সমতলে নেমে শুকনো বালির উপর দাঁড়িয়ে শুদ্ধশীল স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ওদের—

মন্মথ কাছে এসে বলল, কিহে ভাব-টাব এল নাকি? কৃষাণের জীবনের শরিক মনে হচ্ছে কি নিজেকে?

—নাঃ। বরং আমাদের গলির কোন রূপসীর গাল গলা বেয়ে ঘাম ঝরার দৃশ্য পর্যন্ত কল্পনা করতে পারি। আমরা এই বড় পৃথিবীর কেউ নইরে মন্মথ—

ডাইনে পুবমুখো বড় ঘাটে মানুষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। ঝাউবনের বাঁকটা পেরিয়ে গেলেই বড় ঘাট পাওয়া যাবে। মন্মথর ইচ্ছা হচ্ছিল, ফিরে যায়। মানুষের কোলাহলের দিকে ফিরে যেতে তার মন ছটফট করছিল। শুদ্ধশীল ততক্ষণে পশ্চিম দিকে চলতে শুরু করেছে। ও-দিকে নদীর জলে সামান্য লালের আভা। পর-পারে বাবলা বনের আড়ালে সূর্য অস্ত গেছে। শুদ্ধশীল তখন মেজাজ পেয়েছে, খেয়ালী হয়ে উঠেছে। আর সে সীমানা পার হয়েছে। ক্লান্তিকর লোকা-লয় থেকে এখন মুক্ত। সে একটা নতুন রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি ভাঁজতে লাগল, ও গো সুন্দর বিপুল সুন্দর—

মন্মথ কোন না কোনভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করল। আসলে সে চাইছিল, শুদ্ধ-শীল পশ্চিমের দিকে যেন না যায়। পশ্চিম-প্রান্ত এখানে বড় নির্জন, বড় শূন্য—সে জানে। এখানে তাকে আসতে হয়েছিল অজন্তাকে নিয়ে। শুদ্ধশীলকে সে আট-কাতে পারল না। সে তখন দ্রুতগতি, অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে সামনে। নদীর চড়া এখনও বিস্তৃতই বলতে হবে। আষাঢ় মাসেও তেমন ভরাট হয়ে ওঠেনি। বোধ-হয় দেরীতে বন্যা আসবে। শুদ্ধশীল টেনে টেনে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে নিতে এগিয়ে চলেছে। পেছনে মন্মথ, অনেকাংশে নীরব। কি সব আজে বাজে ভাবছে। প্রতিটি পদক্ষেপ সে যেন মেপে মেপে ফেলছে। এখানে চড়ায় বালির উপর পোড়া কাঠের টুকরো, কয়লায় কুচি পড়েছিল। ডাইনে বামে ইতস্তত ছেঁড়া মাদুর, কয়েক গাছা দড়ি, পোড়া বাঁশের টুকরো এলো-মেলো ছড়ানো ছিটানো। জলের ধারে কয়েকটা ছোট বড় মাটির হাঁড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শুদ্ধশীল নিচু হয়ে কি যেন তুলল। লোহার বালা একখানা। মন্মথ কাছে এলে বলল, কিহে শ্মশান টশান নাকি? যা বাব্বা—

মন্মথ বালাটি দেখে বলল, বধূটি ভাগ্য-বতী, এয়োতির চিহ্ন নিয়ে চলে গেছে। তাই না?

—হুঁ। মানুষটি ভাগ্যবান, যেহেতু ভাগ্যবানেরই বৌ মরে—

—সত্যিই যদি মরে তখন মজা টের পাবি।

—মন্মথ, তুই কি সত্যি বিশ্বাস করিস মানসীকে বিয়ে করে আমি সুখী? বল বিশ্বাস করিস? শুদ্ধশীল অস্বাভাবিক জোর দিয়ে ওর অসুখের দিকগুলো বুঝাতে চাইছিল।

মন্মথ বলল, সুখ না অসুখ—এসব কিভাবে ভাবতে হয় শুদ্ধ?

—হোপলেস!

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসছে। পেছনে অদূরে পাকুড় গাছটা ঘিরে অন্ধকার গাঢ়-তর হচ্ছে। উঁচু ডালে শকুনেরা বাসা বেঁধেছে। নৈঃশব্দ্য কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে চিঁহি চিঁহি করে ডাকছে, পাখা নাড়ছে বিকট শব্দে। সামনে পরপারে মাঠ, বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি বাবলা গাছ। সেই দিকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শুদ্ধশীল বলল, বড় পবিত্র জায়গা হে, অপূর্ব! শালার চাল ডাল বাজার বৌ সংসার এখন আর আমাদের স্পর্শও করতে পারবে না। কি রে, কথা বলছিস না কেন? ভাব এলো নাকি?

—ভাব! আমি ভাবছিলাম অন্যকথা। ছেলেমেয়ে দুটি নিয়ে কুসুমকে একা একা খুব ঝামেলা সইতে হবে। ভীষণ রেগে যাবে বুঝলি। বিকেলের বাজার-টাজারও নিয়ে যাবার কথা ছিল—

—গুলি মার তোর বাজারের। দেখ, কি সুন্দর মাথার খুলিটা। চল দেখা যাক। শুদ্ধশীল সত্যিই খুলিটার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

অজন্তা নামের মেয়েটা বিদ্যুৎ বেগে মনের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। এই পাকুড় গাছটার নিচেই ত অজন্তাকে দাহ করা হয়েছিল। মন্মথ মরীয়া হয়ে বলল, চল ভাই ফেরা যাক—। মাইরী ভীষণ অসু-বিধায় পড়তে হবে—

—অসুবিধায় পড়তে চয়, পড়ব। দেখ মন্মথ, আজ আমি কোন কম্প্রমাইসের মধ্যে নেই। আজকালপরশুর সংস্কারকে আমরা অস্বীকার করব। আবর্জনা স্তূপের মধ্যে মুখ গুঁজে নিঃশ্বাস নিতে নিতে আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। আ[...] প্রাণভরে মুক্ত বায়ু নেব। তুই না ব[...] থেকে একবার পালিয়েছিলি—?

—হুঁ। পালিয়ে বেশীক্ষণ থাক[তে] পারিনি।

—যা। আয়, ও-সব ঝামেলা ভোল[...] জন্য এই নদীর চড়ায় আমরা দৌড়া[ব] রেডি, ওয়ান-টু-থ্রি—

শুদ্ধশীল সত্যিই দৌড়তে শু[রু] করল। মন্মথ বন্ধুর কাছাকাছি থাক[তে] চাইছিল। পারল না। অনেক পেছনে প[ড়ে] গেল সে। শুদ্ধশীল সামনে এগি[য়ে] একটা আকন্দ ঝাড়ের পাশে বালির উ[পর] শুয়ে পড়ল। দূর থেকে তাকে দে[খা] যাচ্ছিল না। মন্মথ নিজেকে হঠাৎ এ[কা] ভাবল। যথার্থ একা। যেন জগৎ সংসা[রে] তার কেউ নেই। সে এখন অজন্তা না[মের] মেয়েটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভীষণ নিঃস[ঙ্গ] অসহায় বোধ করতে লাগল। সে প্রাণ[পণে] চীৎকার করল, শু-দ্ধ-অ-অ—। কোন সা[ড়া] নেই। ও-পার, এ-পার পাকুড় গাছের ডা[লে] সে ডাক আছড়ে পড়ল ঝন ঝন ক[রে]। শকুনেরা পাখা ঝাপটাতে লাগল। মন্[মথ] শুদ্ধশীলের কাছে যাওয়ার জন্য দৌড়া[তে] লাগল। অনেককাল সে দৌড়ায় না। স্কু[লে] পড়ার সময় দৌড়ে দ্বিতীয় পুরস্[কার] পেয়েছিল সে। এখন বুকের মধ্যে [ঢিপ] ঢিপ করছে। হৃদপিণ্ডটা দাপাদাপি কর[ছে]। শুদ্ধশীল এতক্ষণে আকন্দ গাছের আড়[াল] থেকে উৎসাহ দিল, সাবাস জোয়ান, আ[রো] জোরে— আরও—। শুদ্ধশীলের ক[াছে] এসে ভিজে বালির উপর আছড়ে প[ড়ল] মন্মথ। নিঃশ্বাস নিতে তার খুব [কষ্ট] হচ্ছিল। সে তাড়া খাওয়া জানোয়ারের [মত] হাঁফাচ্ছে।

বালির উপর মাথা রেখে চিত[...] পড়েছিল মন্মথ। শুদ্ধশীল টুকরো টু[করো] কথা বলছিল। জীবনানন্দ দাশের কবি[তা], শীতের ফিকে জ্যোৎস্না রাতের থিয়ে[টার], বাঁধ, ধবধবে চাঁদিনী রাতের গাড়ের [...] পূর্বা নামের মেয়েটি—এসবই তার ক[থায়] ঘুরে-ফিরে আসছিল। মন্মথ কিছুটা শ[ুনছি]ছিল। অনেকটাই শুনছিল না। এখন এ[ত] পথ দৌড়ে এসে, রক্তের দ্রুত ওঠা-না[মার] পরে মন্মথ ক্লান্ত, হাত-পা কেমন ভে[ঙে] আসছে, মাথাটা বালির উপর শিথি[ল]। বাড়ি ছেলেমেয়ে কুসুম লোকালয় আ[র] মন্মথকে ফিরে যেতে টানছে। 'আমি আ[লো] চাই, আলো' অস্ফুটে বলল সে। পা[ড়ার] যাত্রাদলে কিশোর বয়সে একবার [...] সেজেছিল মন্মথ। চঞ্চলা কুমারী মেয়ে দা[...] কথায় রাগ করে দ্রুত প্রস্থান করেছে, [...] রাগে সে ফুঁসছে তখন। সেই সময় [...] খুব আচমকা গ্রিনরুমের আলো দপ [করে] নিভে গেল। আলো নেই, কোথাও আ[লো] নেই। গোটা রঙ্গমঞ্চ জমাট অন্ধকারে

গেল। চারদিকে চেঁচামেচি হৈ চৈ। বৃন্ধ দাদ্, পাড়ায় বলাইদা তখন পাশে, আটা দিয়ে লাগানো দাড়ি-গোঁফ সমেত মন্মথকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল।... মন্মথর সেদিন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে আলো চাইছিল, আলো; রঙ্গমঞ্চেও ফিরে যাবার জন্যে সে তখন ছটফট করছে—

—তুই কি পাগল হয়ে যাওয়ার মত রূপ দেখেছিস মন্মথ। টানা চোখ ঢলঢলে মুখ নরম বুক, আর দীর্ঘ একহারা চেহারা —কী বিরাট চুল—দেখেছিস?

মন্মথ বলল, হয়ত দেখেছি। আসলে কি জানিস শুদ্ধ, অজন্তাকে ভাবতে এখন আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি। আমি ওকে ভুলে যেতে চাই—

কেন?
সে নেই যে—
ও! ভেরি স্যাড্—

নদীর মাঝখান দিয়ে একটা লোক সেই থেকে ডিঙি বেয়ে চলেছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে লোকটা কোথায় কতদূরে যাবে কে জানে। মন্মথ নদীর মাঝখানে লোকটার দিকে তাকাল। পেছনে পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে বুড়ো পাকুড় গাছটা—এখানেই ত অজন্তার রক্ত মাংসের যুবতী শরীরটা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখেছে মন্মথ। এক বোঝা কাঠের তলা থেকে শেষবারের মত এক-টানি ছোট্ট কপাল, ধবধবে সাদা সিঁথি তার লম্বা কালো চুল, আর অজন্তার সেই অর্ধ-মুদিত প্রশান্ত আয়ত চোখজোড়া। তার বিক্ষত শরীরের বাকি অংশ কাঠের তলায় চাপা পড়েছিল। মন্মথ অস্পষ্ট বিড়-বিড় করছিল। স্কাউণ্ড্রেল ভগ্নীপতিটা অজন্তাকে নষ্ট করেছিল, ওর পবিত্র শরীর-কে দূষিত করে ওকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। শুদ্ধশীল তখন পূর্বা প্রসঙ্গে তন্ময়। ফলত ওরা পরস্পর আড়াল হয়ে অন্যমনস্কভাবে জলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

কোথা থেকে কি দিয়ে শুরু করবে শুদ্ধশীল বুঝতে পারছিল না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর হঠাৎ বালির উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। হাত-পা ছুঁড়ে গড়াগড়ি দিয়ে দাপাদাপি করতে লাগল।

মন্মথ হতবাক, বলল, এই শুদ্ধ, অমন করছিস কেন, ওঠ না—

শুদ্ধশীল উঠল না, বালির মধ্যে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, মন্মথরে, আমি বোধ-হয় পাগল হয়ে যাব। আমি দেখ কোথাও স্বস্তি পাইনে। এখানে এসেও ধর্মঘটে মারা যাওয়া অবিনাশদাকে মনে পড়ছে, মানসিক রোগে জরাজীর্ণ মানসী, বহুদিন হারিয়ে যাওয়া পূর্বা—সকলেই আমার মাথার মধ্যে কিলবিল করছে—

মন্মথ কিছুটা সামলে নিয়েছিল। বলল, ও-সব স্রেফ ভুলে যা না। একখানা জমজমাট প্রেমের গল্প শুরু কর, শুনি—
—এই অন্ধকারের মত, এই নদীর স্রোতের মত, ও-পারের বাবলা গাছের অস্পষ্ট ছায়ার মত কোন প্রেমের গল্প বলব?

শুদ্ধ! অস্ফুট চীৎকার করে সোজা হয়ে বসল মন্মথ। না, তুই বল—

শুদ্ধশীলও সোজা হয়ে বসল। কি হলো? যা বাব্বা—
—দে, একটা সিগারেট দে—

শুদ্ধশীল প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে মন্মথকে দিল। নিজের মুখে পুরল একটা। ওর হাতে ফস্ করে দেশলাই জ্বালার শব্দ হল। মুহূর্তে একটা আলোর ঝলক। আবার অন্ধকার। মন্মথ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কি হলো, বল?

শুদ্ধশীল বলল, এখন নন্দার জন্যেও দুঃখ হয়। মেয়েটি আমাদের পাশেই ভাড়া থাকত। আমার প্রতি ওর একটা দুর্বলতা ছিল জানতাম। রাস্তার মোড়ে বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে যেতেই বলল, এত দেরী করে এলেন কেন? দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার পা যে ব্যথা হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে ওকে খুব ভাল লাগল। চায়ের দোকানের খুপরির মধ্যে বসলাম দুজনে। আমি বললাম, বল কি খাবে, নাকি খাওয়াবে—

নন্দা বলল, খাওয়াতেও পারি, বলুন?
কি?
কি খাবেন—
অনেক কিছুই ত খাওয়ার ইচ্ছে—
কী অসভ্য!

আমার তখন খারাপ লাগতে শুরু করল। আর এগোতে দেওয়া ঠিক হবে না নন্দাকে। আমার আসল লক্ষ্য ত নন্দা নয়, ওর বন্ধু পূর্বা। আমি দ্রুত আসল প্রসঙ্গে চলে গেলাম। বললাম, পূর্বাকে ত তুমি চেন, একই সঙ্গে পড়তে! ও প্রথমে ভ্রূ কুচকালো। ওর মুখের আশে পাশে কালো রেখা বিস্তৃত হল। নন্দা পড়ত বটে পূর্বার সঙ্গে, সে স্কুলের গণ্ডীও ছাড়াতে পারেনি। পরীক্ষা এখনও দেয়, এই মাত্র। বলল, হাঁ পড়তাম, কেন?

একখানা চিঠি ওকে পৌঁছে দিতে পারবে, আজই, খুব জরুরী—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল নন্দা, বলল, দূতী হতে পারব না। বলেই দ্রুত বের হয়ে গেল—

চোখের সামনে নদীর মাঝখানে নেংটি পরা মাথায় গামছা বাঁধা লোকটা তখনও ডিঙি বাইছিল। লোকটি কালো অন্ধকারের মত। ও-পারের বাবলা গাছের ছায়ার মত। মন্মথর মুখ থেকে কথাটা বের হয়ে গেল, আমাদের নিয়ে যাবে মাঝি?

মাঝি! মাঝি কোথায় দেখলি? পরে একদিন বেশ মজা হয়েছিল। আমার মেসের ঘরে, কলেজ পালিয়ে দুপুর বেলা, আমার ছোট্ট তক্তাপোষে ঘন হয়ে বসে পূর্বাকে বলেছিলাম নন্দার কথাটা। পূর্বা দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ শুয়েছিল। সব শুনে বলেছিল, তুমি এত ইয়ে, মানে ক্রুয়েল টাইপ—। বোঝ, আমার ত মনে হত, পূর্বাই আসলে ক্রুয়েল। কম জ্বালিয়েছে আমাকে। কিন্তু সে কথা তখন বলা চলে না। পূর্বাকে নিয়ে অন্যতর আকাঙ্ক্ষা মেটানোর ইচ্ছা তখন প্রবলতর, পরিবেশটা তাই হালকা করা হত না। বললাম, সে ত তোমারই জন্যে, বল? ওর মাথার দীর্ঘ বেণী নিয়ে খেলা করছিলাম। পূর্বা দেওয়ালের দিক থেকে মুখ ফেরাচ্ছিল না। হয়ত ভাবছিল, টিকটিকিটা একা কেন, ওর সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে দিব্বি খেলতে পারে ত—

—তুমি ওদিকে কোথায় যাচ্ছ, মন্মথ জলের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল, ব্রিজের ও-দিকটাতে আমাদের নামিয়ে দেবে মাঝি?

শুদ্ধশীল বিরক্ত হল। বলল, সেই থেকে তুমি অহেতুক একটা মাঝি দেখছ। তোমার কি কোন ইলিউশন হচ্ছে?

এবং সত্যি সত্যিই মন্মথর চোখের সামনে থেকে নৌকা এবং মাঝিটা তার কালো ছায়াটা নিয়ে মিলিয়ে গেল। মন্মথ ক্রমশ শিথিল হতে লাগল। হাতখানা পর্যন্ত তুলতে পারছে না, এত ভারী! সারা শরীরে ঘাম। এমন হল কেন? অজন্তা কি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! মন্মথর এক মুহূর্তও আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। ছেলেমেয়ে দুটি আর কুসুমের কথা তার খুব মনে পড়ছে। কুসুমের শরীর ভাল নয়। শুদ্ধশীলের জন্য নিশ্চয়ই রাত্রে রান্না করতে হবে। বাজার করা হয়নি। দুমাস মাইনে নেই। কুসুম একা একা কি যে করছে—

শুদ্ধশীল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পূর্বা প্রসঙ্গে আবার ফিরে গিয়ে-ছিল। অনেককাল পরে শ্যামবাজারের মোড়ে দেখা হয়েছিল পূর্বার সঙ্গে। সে এখন মেয়েদের কলেজে পড়ায় নাকি। চেহারা অনেক স্থূল হয়েছে, গলায় ঘাড়ে মাংসের ভাঁজ। গম্ভীর হয়েছে। দুজনই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ। কেউই কোন কথা বলল না। এক সময় পূর্বা বাসে উঠলে শুদ্ধশীলও হাঁটতে লাগল। সেদিন নাকি শুদ্ধশীল একা একা অনেক মদ খেয়েছিল।

মন্মথ চুপ করে আছে। আসলে শুদ্ধ-শীলের গল্পটা তাকে তেমন আকর্ষণই করতে পারে নি। আজকাল কোন প্রেমের কাহিনীও কেমন যেন আটপৌরে, স্বাভা-বিক এবং রহস্যশূন্য মনে হয়। অথবা এমনও হতে পারে, গল্পটার শুরুতেই অজন্তা এসে তার মনে ভিড় করেছিল।

ফলে গল্পটা ভালভাবে সে শুনতেও পারে নি। মৃত্যুর আগে অজন্তা বলেছিল, আমার খুব ভাল লাগছে, তুমি যে পাশে আছো। কথাগুলো মন্মথকে অজন্তার কাছাকাছি টেনে রেখেছিল। অথচ আলাদা করে এ-সব কথা শুদ্ধশীলকে বলারও এখন আর কোন অর্থ হয় না। কেননা বরানগরের বাসস্টপ, শ্যামবাজারের মোড়, ট্রামে-বাসে গঙ্গার ধারে যা কোন তীর্থ স্থানে শুদ্ধশীল হয়ত পূর্বার দেখা পেতেও পারে। কিন্তু মন্মথ অজন্তাকে দেখতে পাবে না কোথাও। ঐ নিঃসঙ্গ মাঝির ছায়ার মত অজন্তাও এখন অশরীরী, মন্মথর আশে পাশেই ঘুরবে, স্মৃতি হয়ে সুখ অথবা ব্যথা হয়ে, কোন দিনও সে ছুঁতে পারবে না অজন্তাকে—

—তোকে কিন্তু বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে—

—তুই কি লক্ষ্য করেছিস শুদ্ধ, ও-পারের বাবলা গাছগুলো কেমন যেন ছায়া-ছায়া অস্পষ্ট মনে হচ্ছে—

—মনে হচ্ছে, তাতে কি অন্ধকার ত—

—আমার সামনে ন্যাড়া নৌকা ও তার মাঝি আবার আসতে পারে—

—পাগল! বি রিজনেবল—

—অজন্তার নিরক্ত হাত যদি সে বাড়িয়ে দেয়!

—কি সব ননসেন্স বকছিস?

—জানিস, আমার সামনে গ্রিনরুমের আলো দপ করে নিভে গেল। তখন কেউ যেন আমার গলা টিপে ধরছে—

—সে ত সর্বত্র ব্রাদার। আমাদের সময়ের পাঁচটা আঙুল আমাদেরই কণ্ঠ-নালীতে চেপে আছে। নাথিং স্পেশাল—

মন্মথ চুপ করে থাকল। এখানে বিস্তীর্ণ নদীর তটভূমি, সামনে জলস্রোত, পরপারে বাবলা গাছের সারি, আকাশে ধীরে ধীরে দু-চারটে তারা ফুটছে। শুদ্ধ-শীল বলল, মন্মথ, তুই তোর জীবনের কথা কিছু বল—

মন্মথ নীরব।

—কোন দিন ভালবেসেছিস মন্মথ, পাগলের মত, জাস্ট লাইক এনিথিং—ধর, খ্যাপা কুকুরের মত। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, তুই ভারি চাপা, তিন বছর ত একসঙ্গে কাটিয়েছি কোলকাতায়, এখন দেখছি ঐ সময়টায় তুই নিজের সম্পর্কে কোন কথাই বলিসনি—

বাজে বকিস না। এখন আমি অজন্তার মৃত্যুর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। ফলিডলের বিষাক্ত কণা ওর রক্তে রক্তে মিশে গেছে। স্কাউন্ড্রেল ভণ্ডপতিটা, বুঝলি শুদ্ধ, গুলি করে এ-সব মানুষকে মারা দরকার। অজন্তার শরীরে কত রক্ত ছিল। অথচ ওর কুমারী দেহে সন্তানের আবির্ভাব স্পষ্টতর হয়ে উঠতে, কি রকম যেন সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল—

চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল শুদ্ধ-শীল। আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?

—অজন্তার দিকে—

—এই মন্মথ, পাগলামি করিস না। বল কোন্ দিকে যাচ্ছি? বুঝতে পারছিস ত, আকাশের তারা দেখে দিক ঠিক কর—

ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল। মেঘ মেঘ ধূসর আকাশের কোথাও কোথাও এক আধটা তারা মিট-মিট করছে। ছায়াপথ দেখা যাচ্ছে না ত। শুদ্ধশীল উপরে তাকিয়েই বলল, কী অসীম নৈঃশব্দ্য, কী বিরাট!

—বাঁ পাশ ঘেঁষে চল।

একটু এগিয়ে যেতেই কাঁটার বেড়া, শক্ত এবং উঁচু। বাবলা গাছের কাঁটা-ডাল ঘেরাতে দেওয়া আছে। এই কাঁটার বেড়া ডিঙিয়ে যেতে হবে। তারপর মাঠ, তারপর কৃষকদের চালা ঘর। তারপর এগিয়ে গেলে লোকালয়। শহরের সীমানা—ওখানে অনেক মানুষ, কোলাহল। সেই লোকালয়, কোলা-হল ওদের সামনে লক্ষ্য। ওরা ঘন হয়ে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাচ্ছিল। পথের কোন চিহ্ন নেই। কাঁটার বেড়া মনে হচ্ছে অনেক দূরে বিস্তৃত। আকাশের দক্ষিণে মেঘ জমছে। ওদের মুখের কথা সংক্ষিপ্ত হয়ে আঃ এদিকে ইস্ কাঁটা সামনে ইত্যাদিতে শেষ হচ্ছিল। শুদ্ধশীল চলতে চলতে বলল, আমার পায়ে একখানা বইমত কি ঠেকল। দেখ ত। নিজেই দেশলাই জ্বালল। একখানা পাতা ছেঁড়া গীতা। হঠাৎ আলোতে মন্মথ দেখল, আশেপাশে ছেঁড়া মাদুর, টুকরো বাঁশ, কাঠ কয়লা... আবার অন্ধকার।

—আঃ

—কি হলো?

—কাঁটা ফুটেছে পায়ে, চটির প[illegible] দিয়ে—

—দেখি দেখি, শুদ্ধশীল নিচু হ[illegible] মন্মথর পায়ের কাছে মুখ নামিয়ে আন[illegible] [illegible]। এ যে হাড় একখান[illegible] বা [illegible]—

—দাঁড়া। আবার দেশলাই জ্বাল[illegible] শব্দ। তোর পায়ে শালা মানুষের হ[illegible] ফুটেছে—

—অজন্তার নয় ত! কে জানে! শু[illegible] আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে রে! আ[illegible] কি পড়ে যাব!

—কি হচ্ছে এ-সব! এই মন্মথ, এখ[illegible] আমরা পথ পাইনি। সীমানার বাইরে রয়[illegible] —এই, হাত ধর। তোদের শ্মশানটা শ[illegible] এমন গোলকধাঁধা জানলে কে আ[illegible] এখানে—

কিছুদূরে এগিয়ে এসে দুজনেই থম[illegible] দাঁড়াল। বিশ্রী একটা পচা গন্ধ। অদ[illegible] পাকুড় গাছে শকুনেরা ডানা ঝটপট কর[illegible] শেয়ালের খ্যাঁক্ খ্যাঁক্, কুকুরের ঘেউ [illegible] ডাক শোনা যাচ্ছে। শুদ্ধশীল বলল, কা[illegible] ঠিক আধ-পোড়া বা এমনিতেই [illegible] গেছে। শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ছে—। এই ম[illegible] এই কি হলো রে। মন্মথ, বি স্টে[illegible] আমরা এখনও লোকালয় পাইনি, মন্মথ-

বাবলা গাছের কাঁটা ডাল দিয়ে [illegible] বেড়া ভেঙে শুদ্ধশীল টানতে টা[illegible] মন্মথকে ও-পাশের কৃষকদের ধানের জ[illegible] এনে ফেলল। দুজনেরই জামা-কাপড় ছি[illegible] গেল, হাত-পা কেটে ছড়ে রক্ত বের হ[illegible] এ-পাশে এসে ধানের জমির মধ্যে কিছু[illegible] পড়ে থেকে মন্মথ উঠে বসল। শুদ্ধ[illegible] টেনে তুলল মন্মথকে। ধানের মাঠ [illegible] হয়ে মন্মথ বলল, ছেড়ে দে, আমি [illegible] পারব। চলতে চলতে বলল, কি যে [illegible] হয়ে গেল।

শুদ্ধশীল আর কথা বাড়াল না। দু[illegible] ক্লান্ত। কোথায় কতদূরে এক অচেনা জ[illegible] ওরা যেন হারিয়ে গিয়েছিল। এখন অ[illegible] দূরের পথিক দেশে ফিরছে। স[illegible] ভাঁট আর এরাণ্ডি বনের মাঝখান[illegible] আলোর রেখা দেখা গেল। আরও এ[illegible] এগিয়ে এসে ওরা কৃষকদের চাল[illegible] দেখতে পেল। আরও কিছুটা এগিয়ে পাকা সড়কে উঠে দেবদারু আর [illegible] গাছের ছায়ায় হোসিয়ারী শ্রমিকদের ও অনুষ্ঠান। এখানে অনেক মা[illegible] অনেক আলো। ওরা চির পরিচিত [illegible] লয়ের দিকে, আলোর দিকে হাত ধর[illegible] করে ক্লান্ত পায়ে যথাসম্ভব দ্রুত এ[illegible] চলল।

# সুখের মেলা

## ভালবাসা রাঙা ডালিম ফুল

গোটা শরীরে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ক্লান্তি। পেটজোড়া ক্ষুধা-নেকড়ের আঁচড়ানি। কিন্তু তবু কেন যেন বুকের বাঁশিতে গুমরে ওঠে মাতাল-করা সুরের কলি।

রায়েদের নৌকো ঘাটে বেঁধে রেখে দাম কড়ি চেয়ে নিয়ে চাল-ডাল কিনে বাড়িতে ফিরে এল সুন্দর।

চাল ধুয়ে রান্না বসালে। কে আর বাট্‌না বাটে! ডাল কুটা এক টুকরো কানিতে বেঁধে ছেড়ে দিলে হাঁড়িতে। চালের বাতা থেকে আড়বাঁশিটা পেড়ে নিয়ে সারাদিনের পর বসল সে ছিটে-বেড়ার দেওয়ালে হেলান দিয়ে। মাঝে-মাঝে উনোনের জ্বলন্ত কাঠ-কুটোগুলো ঠেলে দেয়। কত কথায় অন্যমনস্ক হয়ে যায় :

নৌকোর লগি ঠেলে এসে সারাদিনটা আজ নির্দানাপানি অবস্থায় কাটল সুন্দরের। সারা গায়ে পরিশ্রান্তির ব্যথাটা চারিয়ে বেড়াচ্ছে। জ্বর-জ্বর ভাব। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। একমুঠো রান্না না করলেও নয়।

আজ যদি তার মা কিম্বা বোনটা থাকত তাহলে এত কষ্ট করে এসে আগুনের ধারে বুক পেতে বসতে হতো না।

মা—বাবা—বোন!...

কোথায় যে গেল তারা!

শংখচূড়ের গর্জনে সমুদ্র তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

বিরাট একটা পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল বাঁসুলী গাঁয়েও। কংকালের হাহাকারে আকাশ আর মাটির ইতিহাস ভরে গেল কালো কলঙ্ক রেখায়।

পঞ্চাশ লক্ষ জীবনের কৈফিয়তহীন রোমহর্ষক একটা কালো রেখা। তারই গভীর অতলে হারিয়ে গেল সুন্দরের নওজোয়ান বাবা, তার মা আর যুবতী বোনটা।

ভোরের আঁধার চিরে পুবের আকাশ আলো করে সূর্য উঠতে তখনো ঢের দেরি। স্পষ্ট মনে পড়ে সুন্দরের : কানাভাঙা মাটির শানকি নিয়ে, সুন্দর যাবে না বলে মেরে-পিটে ফেলে রেখে সেই যে তিনটে বুভুক্ষ প্রাণী চলে গেল কোথায়—কোন্ লঙ্গার-খানার উদ্দেশে, কে জানে! তারা আর ফিরে এল না।

সুন্দর বুকে হাত বেঁধে কেঁদে-কেঁদে অনেক খুঁজেছে। মা-বাবা আর বোনটার কোনো সন্ধানই পায় নি সে।

নিকষ কালো—পোড়া কাঠ কয়লা চেহারা—ক্ষুধার আগুনে ধকধক করে জ্বলছে দুটো ঘোলাটে চোখ। পরনে জড়ানো এক-ফালি নোংরা ন্যাকড়া বয়স তখন আন্দাজ দশ কি বারো।

শহরতলীর নোংরা গলির একটা অতিজঘন্য 'আদর্শ হোটেলে'র সামনে দাঁড়িয়েছিল সুন্দর।

পেটভাতায় থেকেও যদি একটা কাজ পায়...সে বাসন মাজাই হোক আর জল তোলাই হোক।

হোটেলের মালিক একজন অবাঙালি ভদ্রলোক। হাতে-পায়ে ধরে একটু কাকুতি-মিনতি করতেই হয়ে গেল। পেটভাতায়! পরনের কাপড়-চোপড় বা পুজো-পার্বন দেখবার মতো দু-চার আনা পয়সাও না।

বিপদে পড়িয়া সাধু...তাই সই।

কিন্তু বাসি-পচা তরি-তরকারী খেয়ে-খেয়ে দুবেলাই শুধু ঢেঁকুর উঠতে লাগল সুন্দরের। তারপর ঘুষঘুষে জ্বর। মাঝে-

মাঝে কেবলই তার মনে হোত পালিয়ে যাবে সেই শয়তানের আস্তানা থেকে: ছুটে একেবারে বাঁসুলীর মাটিতে। ঘরখানা পড়ে আছে।...হয়তো ফিরে এসেছে তার মা-বাবা-বোন। না, আর নয়—কালই চম্পট দেবে সে।

হাড়ের মজ্জাগুলো বুঝি কুরে-কুরে খাচ্ছে জ্বরের পোকাগুলো। ছামাড়-ঘেরা পাশের খোপটার মধ্যে মালিক রামহরি যেন কার সঙ্গে মিঠে-মিঠে বাত বলছে! রোজই তো বলে! দুটি ভাত দেবার লোভ দেখিয়ে রোজই ও জোগাড় করবে এক-একটা মেয়েমানুষ!

পরের দিন কিন্তু বেতাল জ্বর। হুঁস-পবন নেই সুন্দরের। গলির সেই মিতে ছেলেটা এসে মাথা টিপে দিয়ে, দিয়ে গেল তার সুন্দর নকসা-কাটা আড়বাঁশিখানা। মিতে যদি একটু শান্তি-সোয়াস্তি পায়।

কিন্তু রামহরি যে এতক্ষণ চেঁচাচ্ছিল তা বুঝি শুনতে পায় নি সুন্দর? মিতে কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'সুন্দরের জ্বর!'

'জ্বর হওয়া বার করছি। শালা, বদ-মাসের ধাড়ি। বেরো শালা।'

ছুটে এসে একটা লাথি সাঁটলে রামহরি, সুন্দরের ঠিক পাঁজরে! জ্বরের ঘোরে শুধু একবার খানিকটা এঁকে-বেঁকে উঠে আর্তনাদ করে উঠলো সুন্দরঃ 'মাগো!'...

পরের দিন মাঝ-রাতটায় হঠাৎ যেন জ্বর-টর সব ছেড়ে গেল সুন্দরের।

দারুণ পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পাশের ঘরে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। ছামাড়ের ফুটোকিতে মুখ গলালে সুন্দর।

একটা মেয়ে যেন চাপাস্বরে আর্তনাদ করছে। অবিকল তার বোনের গলার স্বর যেন!

অস্বচ্ছ আলোয় মুখটা বিকৃত! পাশেই রামহরি।

ঝট করে হাতটা বাড়িয়ে কি একটা বস্তুকে টেনে তুলে নেয় সুন্দর। কেরো-সিনের বোতল। মারবে সে রামহরির মাথায়। কাঁকুড়-ফাটা করে দেবে তার বেলের মতো চকচকে টাকঅলা মাথাটা। কিন্তু... না, তার বোন নয়।

কোণের ঘুলঘুলি দিয়ে হুমড়ি খেয়ে গলে বেরিয়ে এল সুন্দর। বাইরে এসে একটা নিঃশ্বাস ফেললে। স্নিগ্ধ এক ঝলক হাওয়া এসে জুড়িয়ে দিয়ে গেল সারা দেহটা।

মাথার ওপরে হীরকখচিত বুটিদার নীল কাপড়ের সীমাহীন সামিয়ানা পাতা। এগিয়ে চলল সুন্দর শহরতলী ফেলে রেখে সবুজ ঘাসে-মোড়া গভীর রাত্রির কালো অন্তঃকরণ জড়ানো পল্লীর পথে।.....

ভাতটা হয়ে গেছে এতক্ষণে। ফ্যান ঝাড়তে হবে।

দুঃস্বপ্ন রাত্রির এলোমেলো স্বপ্নের মতো স্মৃতির কালো ছায়াগুলো সন্তর্পিত পদে ঘোরাফেরা করে।

আটটা বছর কেটে যায় 'কোমেন' দিয়ে। শুধু রামহরির বেঁটে-খাটো শরীরটা আজও যেন একটা হিংস্র হায়েনার মতো জ্বলজ্বল করে তার স্মৃতির আঁধার আকাশ-পটে। তারপর অবিনশ্বর, অচঞ্চল, অবিস্মরণীয় তিনটে নক্ষত্র কোলাহল-মুখর দিনের আলোতেও ভাস্বর থাকে। তার মা-বাবা-বোন।...

নদীতে, মাঠে-ঘাটে কাজ করে সুন্দর। তিনদিন জন খাটে তো চারদিন বসে থাকে। একদিন রান্না করে, দুদিন ধরে খায়। যাত্রা শোনে। মিটিং শোনে। শুয়ে পড়ে থাকে। কত কথা ভাবে।

কালো মিশমিশে পাথর-কোঁদা চেহারা। গড়নটা বেশ সুন্দর। মাথায় লম্বা-লম্বা চুল। 'কাঁকুই' দিয়ে ছোট আয়নাটা ধরে কত করেই না আঁচড়ায়। সাজি-মাটি দিয়ে সপ্তায় একবার করে কাচা ফরসা কাপড় পরে বাঁশিতে সুর ভাঁজে। বেহুলা-লখিন্দরের পালা গান। ভাইয়ের গান। যাত্রার গান।

গোবিন্দ আসে। বেচারী তোতলা। তবু সে এক অব্যক্ত সুরের লহরায় মসগুল হয়ে টেনে-টেনে গেয়ে যায়। তাল মিলিয়ে বাজায় সুন্দর; সেদিন হয়তো আর রান্নাই করলে না। ও এক শালার ঝঞ্চাট। তাছাড়া চালও বাড়ন্ত! তার থেকে সারাটা রাত সে ওই চাঁদের দিকে চেয়ে-চেয়ে গভীরে তান ধরবে আড়বাঁশিতে। সামনের হলদি নদীর চরের ওই শিরীষ শাখার অন্তরালে হঠাৎ ডেকে উঠবে দুরন্ত-সুর একটা কোকিল। উদ্দাম রক্তের প্রতিটি কণায়-কণায় শিহরণ জাগবে সুন্দরের। অনেক দূর থেকে বয়ে এনে বসানো কামিনী ফুলের চারাটার মাথায় থোকা-থোকা ফুলের গুচ্ছ। সৌরভে চারদিকটা মাতিয়ে তুলেছে। আর রক্তরাঙা ফুলে ভরে গেছে ডালিম গাছটার ডাল-পালা। সুন্দরের মনে হয়, একদিন না-একদিন খুব রূপবতী একটা পরী সুরের মোহে পড়ে নেমে আসবে তার বাড়ির উঠোনে। রূপে চারদিক 'উজ্জ্বলা' হয়ে যাবে। তারপরে তার হাতখানা ধরে মিষ্টি সুরে বলবে : আর বাঁশি বাজায়ো না ওহে ঘনশ্যাম!...

হঠাৎ হি-হি করে হেসে ওঠে সুন্দর। যাত্রা দলের মেয়ে সেজে তো ও-পাড়ার নিখিল ডাক্তার বলে অমন করে!

আজ আর গোবিন্দটা এল না। তালগাছ ধরেছে। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে, তিন টাইম ছটা গাছ বাইতে হয়। এখন বুঝি গুড় জ্বাল দিতে বসেছে। পাটালী করে নিয়ে যাবে কাল গঞ্জের হাটে। ওদের অবস্থাটা তবু আছে একটু। ঘরের ধানের ভাত খেতে পায় পাঁচটা মাস।

ঘর ছুতি দুলে, দলুই, গয়ু ব্যাপারী আর চুলীদের নিয়ে সুন্দরদের পাড়াটা বাঁসুলীর দলুইপাড়া বলে হাঁকডাক। সরু শীর্ণ নদী হলদির ওপারে বামুন-কায়েত আর জমিদারদের গ্রাম রায়চক। সেখানে স্কুল, কাছারী, পোস্টাপিস, বাজার, ধানের আড়ত, খাঁটি সব কিছুই আছে। সেখানের মধ্যবিত্ত চাষাভূষোদের জনখন খেটে করে কম্মে' খায় দলুইপাড়ার মানুষগুলো।

নিম্নবিত্ত হাড়-হাভাতের ঘরে জ[ন্ম] সুন্দরের। পাড়ার পাঁচজনে সুন্দরকে ব[লে] ছেলেটা কুড়ের 'যোমরা!' না হলে কেউ কি আর ভরসা করে একটা ছুঁড়ি দেয় নে।

সুন্দর হাসে। পরের উপদেশ বা গা[ল]মন্দ তাকে গভীরে স্পর্শ করে না। তা[র] অন্তরে যেন একটা নিরীহ মানুষ বা[স] করে। লোকটা উদাসীন—আড়মাতালে!

গোবিন্দ শুনে গালের ভেতরে দু[টো] আঙুল পুরে দিয়ে অদ্ভুতভাবে বসে পু[রো] গোটা দুই সিটি মারলে। তারপর ঝাঁ[কি] ঝাঁকি মেরে কাঁধ দুটো তুলে মুখটা ল[ম্বা] করে বাড়িয়ে দেয় সুন্দরের দিকে। আন[ন্দে] ডগমগ হয়ে বলে, 'হলদি লদী টইটুম্ব[র] ওগো নলিতে—বলব কেন বাঁশি বাজাও ডালির পীরিতে!'

তোতলা হলে কি হয়, গোবিন্দ মু[খে] মুখে বেশ গান বাঁধতে পারে!

মাথায় হাত দিয়ে তিন সত্যি গাল[লে] তবে না বলেছে সুন্দর!

ব্যাপারটা একটু জটিল।

হলদির ওপরে লগি মেরে খড় বোঝা[ই] নৌকো নিয়ে গেছিল সে হরিশপুর। মুখ-আঁধারী অন্ধকার নেমে এসেছে ফির[তি] বেলায়, রায়চকের বামুনপাড়ার ঘাটে দাঁ[ড়িয়ে] আছে দুটি মেয়ে। অস্পষ্ট চেনা যায় [না]। সুন্দরের নাম ধরে ডাক দেয়;

'সোন্দর, ও সোন্দর—আমাদের নিয়ে যাবা।'

'সুন্দরদা'—ডালিমের কণ্ঠস্বর না?

লগি মেরে-মেরে চরে ভেড়ালে সু[ন্দর] তার নৌকোখানাকে। ডালিম আর [তার] বুড়ো মা, অবলা। সিধু বৈদ্যদের [বাড়ি] জানতে গেছিল নাকি তারা।

ডালিম তার মুখের দিকে চেয়ে খা[মকা] খামখাই হাসলে এক ঝলক। মলিন [ঠোঁট] দুটোয় এক চমক বিদ্যুৎ যেন। তা[রপর] মুখটা ঘুরিয়ে রইল ওদিকে করে।

হলদির জলে তখন জোয়ার লেগে[ছে]। উজান পাড়ি মেরে যেতে হবে বাঁসুলী। জলের স্রোতে কলকল ছলছল শব্দ।

বুড়ী অবলা বলে, 'সোন্দর! সোন্দর! বলি, এই ন-চ্যাংড়া বয়েসে কানের মাথাটা খেলি নাকি রা[স্তা] ছোঁড়া

'কি বলছ মাসী?' লাগি তুলে শুধোয় সুন্দর।

'বলি কত্‌কে মাছ কটা কিনলি য়্যা বাবা?'

'উ-আর কত্‌কে মাসী! ছ' আনা। কেন, লেবে তুমরা? লও না।'

'না, না। উ-তোর আশায়ের চিজ। তুই নিয়ে যা। 'এ'দে'-বেড়ে খাবি-হোন।'

'না গো মাসী, উ-শালার এক ঝঞ্ঝাট। তুমি লিয়ে যাও। বাচতে-কুটতে পারবু নি আমি।'

অবলা খুশী হল অন্তরে, ছেলেটার সরলতা দেখে। চোখ উল্টে বললে, 'ত্‌ার বাবা সি-একদিন গ্যাছে! তোর বাপের মতন কি-দুটো মনিষ্যি ই-গেরাম অঞ্চলে ছ্যালো? সেতটুকুনই মাছ-মাংস নেসুক, তোর ই-মাসীকে দিতে-থুতে কি ভুলত? সারা-দিনটা তো পড়ে থাকত আমাদের বাড়িতে। তোর ঠাগ্‌-মা 'আস্তিরে' কত কথা বলত যেয়ে আমাকে। বলে, হাঁ-লা বৌ, তুই কি মোর ছাওয়ালটাকে যাদু কল্লি নাকি লা!'

খিলখিল করে হেসে ওঠে ডালিম। পলিমাখা পা দুখানা নামিয়ে দিয়েছে সে হুগলীর উদ্দাম জলরাশির বুকে। জল পাক খেয়ে-খেয়ে ছোট-ছোট আবর্ত এ'কে দূরে সরে যাচ্ছে। তেলাকুচোর ফুলের মতো নরম আর উজ্জ্বল রঙ যৌবন-প্রস্ফুট বছর ষোল বয়েসের চেহারা ডালিমের।

বাঁসুলীর চরে ওদের নামিয়ে দিলে সুন্দর। শালপাতার মাছ কটা ডালিমের হাতে তুলে দিতে গিয়ে সুন্দরের মুখখানা কাছাকাছি হয়ে গেল ডালিমের মুখের। চোখে তার কেমনতর যেন এক মাতাল-করা চাউনি! ফিরে হাঁটতে শুরু করলে ডালিম। পিঠের দিকের আঁচলে বাঁধা গোটা কতক চাল। দুটি মানুষের সারা দিনের উপার্জন! বেলাচরের কাদা-মাটি মাড়িয়ে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ডালিমরা।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার পাড়ি জমালে সুন্দর। নদীর মাঝ বরাবর যেতেই পুব আকাশ জুড়ে চাঁদ উঠল থালার মতন। শরীরে হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ক্লান্তি। পেটজোড়া ক্ষুধা-নেকড়ের আঁচড়ানি। কিন্তু তবুও কেন যেন বুকের বাঁশিতে গুমরে ওঠে মাতাল-করা সুরের কলি।

রায়েদের নৌকো ঘাটে বেঁধে রেখে দাম-কড়ি চেয়ে নিয়ে চাল-ডাল কিনে বাড়িতে ফিরে এল সুন্দর।

আজ যদি তার মা কিম্বা বোনটা থাকত তাহলে এত কষ্ট করে এসে আগুনের ধারে বুক পেতে বসতে হতো না।

ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসেছে, এমন সময় কামিনী গাছটার আড়াল থেকে কে যেন অনুচ্চস্বরে ডাক দেয়।

'সুন্দর-দা!'

'কে, গোবিন্দ? আয় না শালা।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে সুন্দর। চাঁদের আলোয় কামিনী গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে ডালিম!

ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল সে।

'কে ডালিম?'

'খাওয়া হয়ে গেল নাকি তুমার?'

'না। ই-কি! তুই ফিরে তরকারী আনতে গেলি কেন ডালিম?'

অ্যালুমিনিয়ামের তরকারী-ভরা বাটিটা সুন্দরের পাতের পাশে নীরবে বসিয়ে দেয় ডালিম। কোনো কথা বলে না।

বাঁ-হাতে খপ করে তার একখানা হাত ধরে বসে সুন্দর।

'কি!' চমকে উঠে হরিণীর মতন বড়-বড় বোকা চোখ মেলে তাকালে ডালিম।

'কেন তরকারী আনলে!'

'জানি না, যাও! ছাড়ো-না সুন্দর-দা!'

'না, খেতে হবে একগাল!'

'যা দুষ্টু! হি-হি! মা এক্ষুনি ডাকবে। এই—ছাড়ো!'

'না, খেতে হবে।' অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর সুন্দরের।

'যাও!' ডালিম লজ্জায় পড়ে যৌবন-মদায়িত দেহটাকে কাৎ করে একটা মোচড় মেরে ছাড়াতে চায়।

'আচ্ছা খাবে না তো?'

'আর একদিন।'

'না, আজ।'

'হুঁঃ!' ফোঁস করে উঠল ডালিম।

ভাতের থাবাটা ওর গালের মধ্যে গুঁজে দিলে সুন্দর।

ঠিক সেই মুহূর্তে ডাক পড়ল ডালিমের।

'ডালিম—ও ডালি—ওলো ও কমবক্তি—আভাগী—বাপখাকী!'...

ডালিম এক রকম পড়ি-তো-মরি করে দৌড় দিলে বনতুলসী আর গুলোল তুলসী, চাক-চাকন্দ ঝোপভরা সিঁথির মতো সরু পথটা ধরে।

এক মিনিট!

ভাত কোলে করে বসে রইল সুন্দর। কি যেন কি হয়ে গেল!

এর নাম কী! অন্তরে ঢেউয়ের মাতা-মাতি! বুকের আড়বাঁশিতে গুমরে ওঠে সুরের কলগুঞ্জন।

ডালিম! অদ্ভুত!

উঠে পড়ে ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল সে। লম্ফের আলোয় তার কালো ছায়াটাও নাচতে লাগল দেওয়ালে। হঠাৎ সেটা চোখে পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কালো ছায়াটাকে সে পদাঘাত করলে। তারপর হাসতে লাগল হা-হা করে।

কোনো রকমে খেয়ে ফেললে শেষ-মেষ। খেয়ে নিয়ে শুয়ে-শুয়ে ভাল করে ভাববে। বাঁশির সুরে-সুরে পাগল হয়ে যাবে। পাগল করে দেবে ডালিমকে।

গোবিন্দর কাছে একবার যেতেই হল।

দিন কেটে যায়, দিন আসে। বাঁশির সুরে-সুরে কি মধুর ইন্দ্রজাল বুনে যায় সুন্দর।

এক রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে আসে ডালিম। ধীরে-ধীরে কম্পিত বক্ষে এসে দাঁড়ায় সুন্দরের বাড়ির উঠোনে। সামনে ফুল-ভরা কামিনী গাছটার আড়াল। ধীরে-ধীরে ফিরে যায় ডালিম। রাত্রির অভি-সারিকার চরণে-চরণে বিহ্বল নুপুর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় ঝিঁঝিদের ডাকে-ডাকে—সুরে-সুরে।

গোবিন্দর বুদ্ধি মতো সুন্দর তার মনের কথাটা আমতা-আমতা করে পেড়েই বসল বুড়ী অবলার কাছে। বুড়ী তার বকের পালকের মতো সাদা ধবধবে মাথাটা নেড়ে-নেড়ে বলে, 'তোর কি আছে র‍্যা ব্যাটা! তোকে আমার সোনার চাঁদ মেয়ে দোব? খুটবি নি খুটবি নি, সাত সাঁঝেও তোর উনে হাঁড়ি চড়ে নে।'...

'না মাসী, এবার থিগে আমি খাটব। এখন এ্যাগলা বলে, হল-হল, নেই-নেই। না খাটলে চলে? কেন্তুন ডালিমকে আমার ঘরে বউরাণী করে লিয়ে যেয়ে কি শুকিয়ে 'আখতে' পারি? সি ফিরে এ্যাগটা কথার মতো কথা হল মাসী?'

ডালিম দোরের আগড়ের পাশটাতে দাঁড়িয়ে ফিক করে হেসে হাত নেড়ে কি যেন ইসারা করলে। পায়ে ধরতে বলছে নাকি বুড়ীর! তা...তা ক্ষতি কি!

হাতটা বাড়িয়ে পা দুটো যেই না 'পশ্যো' করা অমনি আষাঢ়ে-বর্ষণে-গলা ঢেলাটার মতো গলে জল হয়ে গেল বুড়ী অবলা।

তবে হাঁ ঃ

'তুই ছাড়া আর কাকেই বা দোব বাবা ছুঁড়িটাকে! তবে কি জানিস! আমাকে দু কুড়ি টাকা দিতে হবে। চাঁদের পানা মেয়ে। পণের টাকা নিয়ে কত 'লোগ' 'খোসামোদ' করতেছে।'

ডালিম মাথা হেঁট করে কি যেন চিন্তা করে। গোবিন্দ কালিঝুলিভরা মাথাটা 'কুলুঙ্গি' (ঘুলঘুলি, ছোট্ট জানালা) দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে চাপা গলায় শুধোয় ডালিমকে ঃ

'কি বললে বুড়ী?'

'চুপ! ডালিম আঙুল তুলে ইসারা করে গোবিন্দকে।

'আচ্ছা মাসী, 'আম্মো' দোব দু কুড়ি টাকা।'

'কোথা পাবি?'

'রোজগার করে দোব। কেন, আমি কি মন্দ-ব্যাটাছেলে লয় মাসী? তবে—তবে এট্টুন দেরি করতে হবে।'

বুড়ী রাজি হল।

গোবিন্দ ছুটে এসে লাফ মেরে কাঁধে উঠল সুন্দরের। তাকে কথা মতো এখন সেই শিরীষতলা অব্দি বয়ে নিয়ে যেতে হবে কাঁধে করে।

ডালিম হেসে-হেসে লুটিয়ে পড়ল একান্তে।

তারপর থেকে সারা দিনের মধ্যেও একবার সুন্দরের টিকির নাগাল পেত না গাঁয়ের কেউ। ভোরে উঠে কাজে চলে যেত আর আসত সেই রাত্রে। সপ্তার ভেতরে হয়তো একটিবার মাত্র দেখা হতো তার ডালিমের সঙ্গে।

বলত, 'টাকা জোগাড় করছি।'

ডালিম ম্লান হেসে বলত, 'কত বাকি?'

'আর এক কুড়ি।'

মৃত্যু যদি এসে দাঁড়ায় এখন সুন্দরের সামনে? না, কিছুতেই পারবে না সে মরতে। যুদ্ধ করবে তার কোদাল কাটারী, কাস্তে, লাঙল আর লগিবাড়ি দিয়ে। প্রাণপণ। ডালিমকে তার চাই-ই চাই। সে তার হৃৎপিন্ড!

চারটে মাস। যেন কালের দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পাড়ি।

বাঁশের 'চোঙা' থেকে টাকা-পয়সাগুলো মেঝেয় ঢেলে দশবার করে গুনেছে।

দু' কুড়ি! চাল্লিশ!

আনন্দে বুকটা তোলপাড় করে ওঠে। না-খাওয়া না-দাওয়া...চার-চারটে মাস। এক টাকা দু আনা করে জনের দাম। চুষে নিয়েছে তাকে রায়েরা। নিক।...

যাবে নাকি সে এক্ষুনি বুড়ীর কাছে। গড়-গড় করে ঢেলে দেবে টাকাগুলো। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে বুড়ীর। হাঁ, বাপের বেটা বটে সোন্দর।...

না, কাল সকালেই যাবে সুন্দর।

আজ রাতভর বাঁশি বাজাবে। একটা রাঙা ডালিম ফুল ছিঁড়ে এনে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলে সে। ফুলটা নিয়ে চুপি-চুপি গেল সে ডালিমদের বাড়িতে। অবলা বুড়ী সামনের দিকে মুখ করে খেজুর পাতা দিয়ে চাটাই বুনছে মাথা হেঁট করে। পিছন ফিরে বসে ডালিম চাল বাচছে কুলোয়। সুন্দর রক্তরাঙা আধ-ফোটা ডালিম ফুলটা নিয়ে টুক করে ডালিমের খোঁপায় গুঁজে দিয়ে মারলে এক দৌড়।

ডালিম সন্ত্রস্ত হয়ে খোঁপায় হাত দিয়ে ফুলটা দেখে হাসতে লাগল হি-হি করে—তার হাসির কারণ সুন্দর দৌড়তে গিয়ে পায়ের গলুইয়ে ঢল-কলমীর লতা জড়িয়ে পড়ে গেছে। একেবারে চিৎপাত!

বুড়ী চিল্লে ওঠে, হাসি কিসের লা' হাসি কিসের 'হঠাক'? ভুতে ধরেছে? ফুলটা তখন দেখায় ডালিম তার মাকে।

বুড়ীর গাল হাঁ হয়ে যায়। উঠে এসে উঁকি মেরে দেখে, সুন্দর তখন হাওয়া।

বুড়ী গজ-গজ করে ঃ 'ভালবাসা! ভালবাসার রাঙা ডালিম ফুল! সেই কথায় বলে, 'পেটে ভাত নেই 'ইয়েতে সিঁদুর!'

—আবদুল জব্বার

(৩২)

মাস কয়েক পরের কথা।

অশোক তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিল, ফিরে এসে সস্ত্রীক দেখা করতে এল। তার স্ত্রী ভিতরে গেলেন মহামায়ার কাছে, হাতে একটা প্লাস্টিকের ঝুড়ি বোঝাই কি সব নিয়ে, অশোক আমার কাছে বসল। তীর্থ প্রসঙ্গ চলল কিছুক্ষণ তারপর অশোক বলল, মাস্টারমশাই, একটা অভিযোগ আছে আমার।

বললাম, অভিযোগ? পাণ্ডারা কিছু বেশী প্রণামী আদায় করেছে জুলুম করে?

হেসে বলল, আমার অভিযোগ মিঃ ভাদুড়ীর বিরুদ্ধে।

বললাম, বুঝতে পারলাম না, খুলে বলো।

বলল, ফিরে আসবার পরে আমার বড় ছেলে রমেন রিপোর্ট দিল তুলসীর ছোট ভাই ফণী একমাসের নোটিশ দিয়েছে চাকুরি ছাড়বার। ফণীকে প্রশ্ন করে জানা গিয়েছে মিঃ ভাদুড়ী তাকে স্কলারশিপ দিয়ে আমেরিকা পাঠাচ্ছেন ফাউণ্ড্রির কাজ শেখবার জন্য।

বললাম, এটা তো ভাল খবর অশোক, ছেলেটার উন্নতি হবে।

বলল, আমি একটি ভাল লোক হারাচ্ছি, আমার কাছে থাকলেও উন্নতি হবে।

সে কাজ শিখে এলে তাকে রেখো।

বলল, তখন যে মাইনে চাইবে তা কি দিতে পারব?

বললাম, তোমার কাছে যে উপকার পেয়েছে তার জন্য কিছু কমে রাজি হতে পারে, কথা বলে দেখো না।

বিশেষ ভরসা করি না, কথা বলব যখন বলছেন। একটা কাজের লোক তৈরী করে তোলা অনেক সময়, অনেক মেহনতের ব্যাপার।

বললাম, তা তো বটেই।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করে অশোক সস্ত্রীক বিদায় নিল।

তুলসী ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া করপোরেশনে কাজ করছে। মাইনে ছাড়া যাতায়াতের গাড়ী পায়, টিফিন পায়। কাজ তার ভালই লাগছে মনে হয়।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে কিছুক্ষণ পরে এক কাপ চা হাতে নিয়ে তুলসী আমার কাছে এসে বসল। বলল, বোর্নভিটা দিয়ে তোমার জন্য চা করেছি, খেয়ে দেখ ভাল লাগে কিনা।

হাত বাড়িয়ে কাপটা নিলাম, বললাম, তোর চা বোর্নভিটা দিয়ে করে নিয়ে আয়।

বলল, তোমার জন্য একটা টিন কিনলাম ফ্যাকটারির কো-অপারেটিভ স্টোরস থেকে, আমার চাতে দেব কেন?

দুজনে দু' রকমের চা খেতে থাকলে গল্প জমবে না। যা বোর্নভিটা দিয়ে তোর চা নিয়ে আয়।

আমার স্বাস্থ্যের জন্য একটু চিন্তিত হয়েছে তুলসী। কমলা, আপেল, হর্লিকস, ওভালটিন কিনে আনে, বকাবকি করে খাওয়ায়। আমার স্বাস্থ্য যে কিছু খারাপ হয়েছে তা নয়, একটা উপলক্ষ্য ধরে আমার জন্য কিছু করতে চায়, বাধা দিলে চটে যায়, মুখ ভার করে, শেষ পর্যন্ত চোখ ছলছল করে। আপত্তি করা ছেড়ে দিয়েছি তাই। তার অতি অনুগত সন্তানের অভিনয় করি, বৃদ্ধ বয়সে, ভারি খুশী থাকে তাইতে।

চা খেতে খেতে বললাম, ফণীর সঙ্গে দেখা হয় তোর?

হ্যাঁ, কাল দেখা হয়েছিল, ভাল আছে। কোন খবর দিল না তোকে?

কি খবর দেবে? কিছু বলল না তো? ক্যান্টিন থেকে মাংস কিনে এনেছিল, আমাকে মাংস পাঁউরুটি খাইয়ে দিল জির করে।

বললাম, ফণী অশোকের চাকুরি ছাড়বার নোটিশ দিয়েছে।

সে কি? আর কোথাও কি চাকুরি পেয়েছে? —

স্কলারশিপ নিয়ে ফণী আমেরিকায় যাচ্ছে, ফাউণ্ড্রির কাজ শেখবার জন্য। য়ুনিভার্সিটির সিলেকশন বোর্ড তাকে নির্বাচিত করেছে।

তুমি কোথায় শুনলে?

অশোকের কাছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মিঃ ভাদুড়ীর হাত আছে এর মধ্যে মনে হচ্ছে। জেঠামণি, ফণীকে এ অনুগ্রহ করতে গেলেন কেন তিনি?

অনুগ্রহ আবার কি? এ কাজের জন্য টাকা পেয়েছে সে। কত ছেলে গিয়েছে এর মধ্যে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছে কি সে? ফণী দরখাস্ত করেছিল, যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে নির্বাচিত হয়েছে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ফণী উন্নতি করবে। আমাকে খবরটা দিলেও পারত।

তার মুখে শুনলে তুই অন্য কিছু ভাবতিস হয়ত, তাই বলেনি। এটাও হতে পারে সে ধরে নিয়েছিল তুই জানিস।

তার মানে মিঃ ভাদুড়ী আমাকে আগে থেকে বলেছেন।

হয়ত তাই।

জানো জেঠামণি, এরকম ভাববার মানে কি হয়?

কোন মানে হয় না, বাজে মাথা গরম করিস না।

মাথা গরম করিস না! তোমার ছাত্রের সম্বন্ধে আমার অভিযোগ আছে।

বললাম, অভিযোগ আছে? অশোক অভিযোগ করে গেল দেবাশিস তার কারখানা থেকে ফণীকে ভাগিয়ে নিয়েছে, এখন তুই বলছিস তোর অভিযোগ আছে। কি অভিযোগ আছে শুনি?

বলল, তাঁর ব্যবহার অপমানজনক মনে হয় আমার। তিনি বড় সাহেব, ভয়ানক ব্যস্ত মানুষ। দেখাসাক্ষাৎ হয় না। কোন কোন দিন ফ্যাকটরীর কোথাও যেতে আসতে দেখা হলে নমস্কার করি, যেমন আর সবাই করে। কদিন থেকে দেখছি প্রতিনমস্কারটুকুও করেন না ভদ্রতা করে। একটু হেসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যান। না হয় তাঁর অধীনে চুনোপুঁটি কেরানীর চাকুরি করি—

বাধা দিয়ে বললাম, শুনলাম তোর অভিযোগ। এর পর দেখা হলে তুইও ঐ রকম অপমানজনক ব্যবহার করিস।

কি হবে তাতে?

কি হয় জানাস আমাকে। দরকার হলে তাকে ব্যবহার সংশোধন করতে বলব।

মাস দুই কেটে গেল, তুলসীর কাছে এ সম্বন্ধে আর কোন খবর পাওয়া গেল না। এর মধ্যে ফণী আমেরিকা চলে গেল।

মাসখানেক পরে তুলসীর কাছে খবর পেলাম দেবাশিস কি কাজে বাইরে গিয়েছে, শুনেছে ফিরতে কিছু দেরি হবে।

খবর শুনে খেয়াল হল বাইরে যাবার সময় দেখা করে যায়নি। খুব ব্যস্ত ছিল সম্ভবত, সময় করতে পারেনি। ক'দিন পরে তুলসী খবর দিল, শোনা যাচ্ছে বাইরে কোথায় একটা ব্রাঞ্চ খোলা হবে।

এর দিন দশ পরে বোম্বাই থেকে দেবাশিসের একখানা টেলিগ্রাম এল। জানিয়েছে বিশেষ অসুস্থ হয়ে সে বোম্বাইয়ের হাসপাতালে রয়েছে। সেরে উঠতে পারবে কিনা ডাক্তাররা বলতে পারছেন না। যদি সম্ভব হয় তুলসী রাজি হলে তাকে নিয়ে অতি শীঘ্র আসতে পারলে কৃতজ্ঞ হব।

ভয় পেলাম টেলিগ্রাম পেয়ে। কি অসুখ জানায় নি, কিন্তু মৃত্যুর আশঙ্কা করছে টেলিগ্রাম থেকে বোঝা যায়। তুলসী কাজে বেরোচ্ছিল, তাকে আটকালাম। টেলিগ্রামের কথা তাকে জানিয়ে বললাম, অফিসে গিয়ে কোন খবর এসেছে কি না জানবার জন্য ড্রাইভারকে বলে দে। যদি আজ যাওয়া সম্ভব হয়—যাবি তো তুই?

বলল, আমি গিয়ে কি করব জেঠামণি?

বললাম, তা জানি না। এইটুকু বুঝতে পারছি মৃত্যুর আগে মানুষের মনে দু'একটা ইচ্ছা হয়। তোকে দেখবার ইচ্ছা হয়েছে দেবাশিসের, হয়ত কিছু বলতে চায়। ভগবান জানেন বলবার সুযোগ পাবে কিনা।

তুলসী কিছু বলবার আগে গাড়ীর শব্দ পেলাম। বাইরে গিয়ে দেখলাম জেনারেল ম্যানেজার এসেছেন।

নমস্কার করে বললেন, একজন ডাক্তার এবং একজন এসিস্টান্ট ম্যানেজারকে নিয়ে আমি আজ রাত্রের প্লেনে যাচ্ছি। আপনাদের দুজনকে যেতে অনুরোধ করেছেন জানিয়েছেন মিঃ ভাদুড়ী। আপনাদের সীট বুক করব কি রাত্রের প্লেনে?

বললাম, এক মিনিট বসুন।

ভেতরে গিয়ে তুলসীকে জেনারেল ম্যানেজারের প্রস্তাব জানালাম, বললাম, আমাকে যেতে হবে তুলসী, কিন্তু তোকে না নিয়ে কি করে যাই? সীট বুক করতে বলে দিই?

মুখ নামিয়ে বলল, যা তোমার ইচ্ছা।

বাইরে গিয়ে সীট বুক করবার কথা বললাম। জেনারেল ম্যানেজার বললেন, আমি আপনাদের তুলে নিয়ে যাব।

নমস্কার করে তিনি চলে গেলেন। তুলসী কাজে বেরোবে কিনা ইতস্তত করছে দেখে বললাম, যা, ঘণ্টা দুই পরে ফিরে আসিস।

দমদমে যাবার পথে জেনারেল ম্যানেজার জানালেন ভোপালে একটা ফ্যাকটরী করবার কথা কিছুদিন থেকে চলছে। সেখানে ক'দিন থেকে গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, নাসিক ও পুনা হয়ে বোম্বাই পৌঁছে মিঃ ভাদুড়ী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সম্ভবত কোথাও খারাপ টাইপের ইনফেকশন হয়েছে। আগে নিয়মিত টেলিগ্রাম আসছিল, বোম্বাই পৌঁছে একখানা টেলিগ্রাম করেন। তারপরের টেলিগ্রামে আপনাদের নিয়ে আমাকে যেতে বলেছেন। মনে হয় অবস্থা ক্রিটিকেল।

অসুখের তৃতীয় দিন আমরা পৌঁছলাম। একিয়ুট হেপাটাইটিজ রোগ হয়েছিল দেবাশিসের।

হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। জেনারেল ম্যানেজারের কাছে রোগীর পরিচয় জানবার পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আরও তৎপর হলেন।

বোম্বে পৌঁছে কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম তুলসীকে নিয়ে। জেনারেল ম্যানেজার ও সঙ্গের ডাক্তার আগে গিয়েছিলেন অবস্থা দেখতে। জেনারেল ম্যানেজার ফিরে এলেন হাতে ক'খানা বন্ধ করা খাম নিয়ে। বললেন, আচ্ছন্ন ভাব আসছে প্রায়ই, সেটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে। আপনাদের আসবার কথা বলেছি, যান দেখে আসুন।

মিনিট তিন চার বেডের পাশে অপেক্ষা করবার পরে চোখ খুলে তাকাল। একটু হাসল তুলসীকে, আমাকে দেখে। তুলসীর দিকে চেয়ে বলল, তুমি যে আসবে আশা করিনি। এখন বাইরে যাও, এখানে বেশী সময় থেকো না। ভাল বোধ করলে, কথা বলতে পারলে ডেকে পাঠাব, এখন বড় কষ্ট হচ্ছে।

তুলসীর দিকে তাকালাম, মুখের চেহারা বিশেষ সুবিধের মনে হল না। বললাম, চল, বাইরে যাই, নার্স যেতে বলছে।

বলল, আসছি, তুমি যাও।

আমাকে সরে যেতে বলছে বুঝলাম। সরে যেতে যেতে দেখলাম বুকের কাপড়ের নীচে থেকে ছোট একটা কৌটা বের করল। তার মধ্যে থেকে কোন জিনিস বের করে কপালে ছোঁয়াল, তারপর বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে নার্স কিছু বলবার আগে জিনিসটা রোগীর কপালে ছুঁইয়ে তার বালিশের নীচে গুঁজে দিল।

সরে এসে ডাক্তারকে নিম্নস্বরে কি বলল, তিনি মাথা নাড়লেন। আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে দাঁড়াল মুখ নামিয়ে। পিঠে হাত রেখে বললাম, ভয় নাই, ভাল হয়ে উঠবে।

আমার হাত চেপে ধরল শক্ত করে। বলল, চলো বাইরে গিয়ে বসি।

সঙ্গের ডাক্তার ও জেনারেল ম্যানেজার কি পরামর্শ করতে লাগলেন।

তুলসীকে নিয়ে আমি হোটেলে ফিরলাম, তাঁরা দুজনে কলকাতা থেকে স্পেশালিস্ট আনবার ব্যবস্থা করতে গেলেন।

পরদিন দুজন ডাক্তার পৌঁছলেন রেডিওগ্রাম পেয়ে।

তিনদিন পরে কলকাতার ডাক্তাররা চলে গেলেন, তার একদিন পরে জেনারেল ম্যানেজার চলে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরতে চেয়েছিলাম। তিনি রাজী হলেন না, বললেন, আপনার ভগ্নীর দেখাশোনা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভাবনা করবার কিছু নাই। এসিস্টান্ট ম্যানেজার রইলেন, একজন এসিস্টান্ট রইলেন, তাঁরা থাকবেন মিঃ ভাদুড়ীর ভাল হয়ে ফেরবার অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত, আপনারাও থাকুন। মিস ভটচায ডাক্তার, তিনি কাছে থাকলে রোগী মনে ভরসা পাবেন।

তাকালাম তাঁর মুখের দিকে, কোন ইঙ্গিত আছে শেষ কথাগুলোর মধ্যে মনে হল না, যা ফ্যাক্ট তাই বললেন।

বললাম, বেশ, যা বলছেন তাই হবে।

আসল কথা থাকতে হল 'অন হিউ-ম্যানেটিরিয়ান গ্রাউন্ডস' অর্থাৎ তুলসী ও দেবাশিসের জন্য।

হাসপাতাল থেকে দেবাশিস ছাড়া পেলে দেখলাম তাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে বেড়াতে যায় তুলসী। ফিরে এসে গল্প করে। জেঠামণিকেও ডাকে তুলসী কিন্তু জেঠামণি দু'একটা শক্ত প্রব্লেম সলভ করতে ব্যস্ত বলে নেপথ্যচারী হয়েছেন। তুলসীকে বলেন, তোরা গল্প করগে, আমার হাতে কাজ আছে।

চোখের একরকম ভঙ্গী করে তুলসী তাকায়, তারপর চলে যায়।

ফেরবার ব্যবস্থা হল রেলগাড়ীতে। ডাক্তার হিসাবে রোগীর প্রতি মনোযোগের কোন শৈথিল্য দেখে সমালোচনা করবার সুযোগ পাওয়া গেল না। হয়ত একটু বাড়াবাড়ি ছিল মনোযোগের, কিন্তু রোগী বিরক্তি প্রকাশ না করে হাসিমুখে সেটা সয়ে নিচ্ছিল, কাজেই জেঠামণির মুখের কথা মুখে রয়ে গেল, মুখ থেকে খসাবার প্রয়োজন হল না। তিনি সবকিছু দেখতে লাগলেন আলগা দৃষ্টিতে। সত্যই তো, আলগা দৃষ্টিতে দেখা ছাড়া তাঁর আর কিছু কি করবার আছে জীবনে?

চুপচাপ শুয়ে বসে কাটিয়ে দিলাম। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছোবার ঘণ্টাখানেক আগে মুখ ফসকে একটা কথা বেরিয়ে গেল। বললাম, হাসপাতালে দেবাশিসের বালিশের নীচে কি দিয়েছিলি তুলসী?

বলল, এত দেখেছ যখন, কি দিলাম তা কি আর দেখনি?

বললাম, চশমা চোখে ছিল না, ঝাপসা দেখছিলাম।

কেদারনাথ ও বদরিনাথের নির্মাল্য।

বললাম, ওসব কিছু মানে না দেবাশিস, কেন দিতে গেলি?

চটে গিয়ে বলল, আমি তো মানি। ইচ্ছে হল দিলাম, তুমি চুপ করো এখন।

সারা পথ তো চুপ করে রয়েছি, একটা কথাও কি বলতে দিবি না?

বলল, বেশ, কি বলতে চাও বলো, জবাব চেয়ো না আমার কাছে।

বললাম, জবাব না পেলে কথা বলে কি লাভ হল তুলসী?

সে তুমি বুঝবে, আমি তার কি জানি?

দেবাশিস কি বলছিল বাধা দিয়ে তুলসী বলল, বড়সাহেব, আমার হাতে ওষুধের শিশি নাই, খাবারের ডিশও নাই, আপনার মুখ খোলবার কোন হেতু নাই।

জানালার দিকে মুখ ফেরাল দেবাশিস।

জ্যেঠামণিকে অনেকদিন থেকে শাসন করছে তুলসী, এখন দেখছি ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া করপোরেশনের বড় সাহেবকেও শাসনের আওতার মধ্যে আনতে চাইছে। নতুন ক্ষেত্রে তার শাসক মনোভাবের উৎসের আরও কিছু পরিচয় পাবার ইচ্ছাকে এখনকার মত দমন করতে হল, ভাবলাম, হয়ত সময়ে পরিচয় পাওয়া যাবে।

একটু পরে তুলসী বলল, জ্যেঠামণি, একটা কথা আছে, এদিকে এসো।

কথাটা শুনলাম। বড় সাহেব স্টেশন থেকে নিজের বাড়ীতে গেলে কে তাঁকে দেখবে? মাসখানেক খুব সাবধানে থাকতে হবে ডাক্তার বলে দিয়েছেন।

বললাম, বিস্তর লোকজন আছে দেখবার, ভাববার কি আছে?

লোকজন নাই জ্যেঠামণি, অফিসের লোক দিয়ে কি এ কাজ হয়?

দেখলাম সেও যে অফিসের লোক ভুলে গিয়েছে তুলসী। সে কথা না বলে বললাম, তা নার্স টার্স রাখতে পারে অসুবিধে হলে।

বলল, তোমার মাথার কিছু হয়েছে জ্যেঠামণি। ভাল নার্স কি বোম্বের হাসপাতালে ছিল না? তোমাকে ডাকলেন কেন?

বললাম, আমাকে ডেকেছিল কি? মনে হচ্ছে—

থাক্, মনের কথা মনে রেখে দাও। আমাদের বাড়ীতে অনেক অসুবিধে আছে। ঐ রাস্তার ওপরে যে অফিস-বাড়ী আছে সেখানে থাকলে দুবেলা খবর নেয়া যায়।

বললাম, ভাল মনে হলে সেই ব্যবস্থা করো, আমার কিছু বলবার নাই।

হাসল তুলসী, বলল, আমি একজন ক্ষুদে কর্মচারী, আমি কিছু করতে পারি না, তোমার ছাত্র, তুমি করতে পারো।

মনে মনে বললাম, মন্দ ফন্দি নয় এটা। প্রকাশ্যে বললাম, কি করতে হবে বলো তো বাপু।

এখন আমাদের বাড়ীতে চলো। যাবার পথে ওপরের দুটো ঘর খালি করে মিঃ ভাদুড়ীর থাকবার উপযোগী ব্যবস্থা করতে বলে দিয়ো; নার্স এবং অন্য লোকজন ঠিক করার কথা বলে দিয়ো। ব্যবস্থা হলে কাল ওঁকে ও বাড়ীতে পাঠিয়ো।

জেনারেল ম্যানেজার এবং আরও লোকজন এসেছিল স্টেশনে। দেবাশিসের সামনে তুলসীর শিক্ষামত ব্যবস্থা করবার কথা বললাম। দেবাশিস চুপ করে রইল, জেনারেল ম্যানেজার বললেন, আচ্ছা।

(৩৩)

তুলসীর ইনস্টলমেন্ট।

মিঃ ভাদুড়ী ভাল হয়ে আগের মত কাজকর্ম করছেন, আর সব আগের মত চলছে, শুধু আমার অবস্থা খারাপ হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। একটা কৃত্রিম আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে আমাকে ঘিরে মিঃ ভাদুড়ীর অসুখের পর থেকে। আমার পদের পক্ষে বাহুল্য খাতির করা হচ্ছে আমাকে, একটা মিথ্যা ধারণা জন্মেছে অনেকের মনে আমার প্রভাব সম্বন্ধে। এই আবহাওয়া অসহ্য লাগছে। চাকুরিটা ছাড়তে হবে বুঝতে পারছি।

জ্যেঠামণির জন্য কলকাতার বাইরে যেতে পারব না, কলকাতায় দু'চারটে হাসপাতালে খোঁজখবর নিতে লাগলাম। তেমন সুবিধের না হলেও একটা চাকুরি পাবার সম্ভাবনা দেখলাম। ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া করপোরেশনের চাকুরিতে পদত্যাগপত্র খামে পুরে আমার বিভাগীয় বসের হাতে দিয়ে জ্যেঠামণিকে কথাটা জানালাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, দেবাশিস জানে রেজিগনেশান দিচ্ছিস?

বললাম, জানতে পারবেন দু'একদিনের মধ্যে।

বললেন, খুলে বলতো তোর মনের কথা। আমি তোকে বাধা দিচ্ছি না, জানতে চাইছি কেন এ কাজ করতে হচ্ছে।

বললাম, খুলে বলছি জ্যেঠামণি। মিঃ ভাদুড়ীর অসুখের সময় আমি যা করেছি সেটা অতি সামান্য। তাই নিয়ে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

বললেন, তুই যা করেছিস সেটা সামান্য তোর মতে?

হ্যাঁ, সামান্য। তোমার স্নেহের পাত্র, আমার ও আমার ভাইয়ের উপকারী তিনি। এতবড় ইন্ডাস্ট্রী গড়ে তুলে বহুলোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন যিনি, আরও অনেক বড় কাজ করবার শক্তি রয়েছে যাঁর মধ্যে এমন একজন লোক অসুস্থ হয়ে অকালে মারা যাবেন এই সম্ভাবনা খুব খারাপ লাগছিল আমার। কায়মনবাক্যে চেয়েছি তিনি ভাল হয়ে উঠুন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি। তিনি ভাল হয়ে উঠেছেন, আমি আন্তরিক সুখী হয়েছি। এর মধ্যে আর কোন কথা তো নাই। তবে কেন একটা ভুল ধারণা মনে নিয়ে আমাকে অপদস্থ করছেন অনেকে?

জ্যেঠামণি বললেন, আমার বিশ্বাস, তোর অভিপ্রায়ের কথা জানতে পারলে দুঃখিত হবে সে, হয়ত আমার কাছে আসবে তোর পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেবার কথা তোকে বলতে।

বললাম, তাঁকে বুঝিয়ে বলো আমি অকৃতজ্ঞ নই। তিনি আরও সফলতা লাভ করুন প্রার্থনা করব ভগবানের কাছে, আমি তাঁর একজন এডমায়রার। কিন্তু ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া করপোরেশনে চাকুরি করা আমার পক্ষে শক্ত হয়েছে।

বলব। তার আগে তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। দেবাশিসকে পছন্দ করিস তুই?

হ্যাঁ, পছন্দ করি বই কি।

বোকার মত জবাব দিস না। তাকে ভালবাসিস কি?

না জ্যেঠামণি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসি না আমি।

আবার বোকার মত জবাব দিচ্ছিস?

আমাকে বোকা বলে যদি খুশী হও তুমি বলো। তুলসী যে তুলসী হতে পেরেছে সেটা তোমাকে ভালবাসি বলে। কবে আমি মরে যেতাম, নয়তো জাহান্নমে যেতাম তোমাকে সব মনপ্রাণ দিয়ে ভাল না বাসলে। তোমার কথাও বলছি জ্যেঠামণি। তোমার নিজের সংসার, ছেলেমেয়েদের ত্যাগ করে এখানে এসে আমাকে এমন করে ভালবাসলে কেন তুমি, আমার সব ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলে কেন? আমার বয়েস আটাশ হয়ে গিয়েছে, যে ভালবাসা পেয়েছি যে ভালবাসা দিয়েছি তাইতে আমার চলে যাবে জ্যেঠামণি।

মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন জ্যেঠামণি, তারপর একটু হেসে বললেন, এরকম তেড়েমেড়ে লেকচার দিলি যে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। আরেকটা প্রশ্নের জবাব দে। দেবাশিস তোকে পছন্দ করে মনে হয় কি?

বললাম, তাঁর কাজ থেকেই তো বোঝা যায় পছন্দ করেন, নইলে কিছু করতে

যাবেন কেন আমার জন্য, আমার ভাইয়ের জন্য?

তোকে ভালবাসে মনে হয় কি?

বললাম, কি জবাব দেব তোমার প্রশ্নের? আমার মনের কথা বলতে পারি, তোমার মনের কথাও বোধহয় একটু বলতে পারি, অন্য লোকের মনের কথা কি করে বলব? তাছাড়া আর কেউ আমাকে ভালবাসে সেটা আমার পছন্দ নয়। আর প্রশ্ন করো না।

জ্যেঠামণি আর প্রশ্ন করলেন না, চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন।

হঠাৎ খেয়াল হল জেরার মাথায় বোকার মত উত্তর দিয়েছি। উত্তর থেকে বোঝায় আমি পছন্দ না করলেও তাঁর ছাত্র ভালবাসেন আমাকে। কি উত্তর দিলে ঠিক হত মাথায় এল না, এখনও আসছে না। তাছাড়া জানি যে উত্তরই দিই না কেন চালুনিতে ঝেড়ে তা থেকে কিছু বের করে নেবে তাঁর বুদ্ধি। চোখের যেটুকু খুঁত হয়েছে বয়সের ফলে ধারালো বুদ্ধিতে ষোল আনার ওপরে পুষিয়ে নেন।

মিঃ ভাদুড়ীর ব্যবহারের মধ্যে জ্যেঠামণির চোখে কিছু পড়েছে, নইলে এরকমের প্রশ্ন করতেন না। কিন্তু চোখে কিছু পড়ে থাকলেও আমাকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করবার কোন মানে হয় কি? ইস্টার্ন ইন্ডিয়া করপোরেশনে চাকুরি নেবার সময় মিঃ ভাদুড়ীকে যেসব কথা বলেছিলেন জ্যেঠামণি তার কিছু শুনেছি তাঁর মুখে, মিঃ ভাদুড়ীর জীবনকাহিনীও মোটামুটি বলেছেন আমাকে। হয়ত এখনও তাঁর মন সন্দেহমুক্ত নয় যে, মিঃ ভাদুড়ীর মধ্যেকার মনস্টার সত্যি মরেছে।

মিঃ ভাদুড়ীর সফলতায় আমি সুখী। তিনি প্রতিভাশালী, তিনি জ্যেঠামণির প্রতি শ্রদ্ধাবান, আমাদের উপকারী। কিন্তু জ্যেঠামণির চোখে পড়ে তার ব্যবহারের মধ্যে এমন কিছু আসতে দিয়ে ভুল করেছেন মিঃ ভাদুড়ী। মেয়েদের দুর্বলতাকে এক্সপ্লয়েট করে যাঁকে ভবিষ্যৎ তৈরী করতে হয়েছে তাঁর চোখে মেয়েদের নিজস্ব কোন মূল্য আছে কি? ঈপ্সিত নারীকে পাবার জন্য ট্যাকটিকস্ পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে শক্ত নয় এটা তো জানা কথা।

যাক এসব কথা। আজ এতদিন পরে কোন মেয়েকে বিয়ে করে গৃহের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ভোগ করবার ইচ্ছা যদি তাঁর মনে এসে থাকে সে পথ খোলা আছে; তুলসী নামে একটি বিশেষ মেয়ের প্রতি ভালবাসার অভিনয় করা একেবারে বাহুল্য।

এক মাসের নোটিশ দিয়েছি মাত্র কাল, এক মাস এখনও কাজ করতে হবে। পরদিন কাজে গেলাম। টিফিন টাইমের আগে আমার বস বললেন, ডাঃ ভটচায, মিঃ ভাদুড়ী আপনার খোঁজ করছিলেন। টিফিন টাইমে গেলে চলবে কিনা জিজ্ঞেস করতে মাথা নাড়লেন।

দেখা করতে গেলে বললেন, বসো। তোমার রেজিগনেশান দেবার কারণ কিছু দেখাওনি চিঠিতে। বলতে বাধা না থাকলে বলো।

বললাম, বাধা আছে। আপনার কৌতূহল থাকলে জ্যেঠামণির কাছে জানতে পারবেন।

বললেন, চাকুরি যখন করতে চাইছ না আটকাবো না, এক মাসের বেতন দিয়ে কাল থেকে ছেড়ে দিচ্ছি তোমাকে।

বিস্মিত হলাম একটু। বললাম, কাজ না করে বেতন নিতে পারি না।

চাকুরি করতে অনিচ্ছুক লোককে ধরে রেখে লাভ নেই। ধরো এক মাসের নোটিশের জায়গায় এক মাসের বেতন দেয়া হচ্ছে।

আচ্ছা, নমস্কার।

বসো একটু। টিফিন খাওনি মনে হচ্ছে, কিছু খেয়ে যাও।

ধন্যবাদ। ক্যানটিনে গিয়ে খাব।

উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, তোমার এভাবে চলে যাবার কোন মানে হয় না তুলসী, অনুতাপ করতে হবে তোমাকে।

কোথাও চাকুরি পাব না, না খেয়ে মরতে হবে বলছেন?

এসব কথা কেন বলছ? তুমি পাশ করা ডাক্তার, তোমার জ্যেঠামণি রয়েছেন—

তাহলে অনুতাপ করতে হবে বলছেন কেন?

আমার ওপরে অবিচার করবার জন্য।

বললাম, মিঃ ভাদুড়ী, কোন অবিচার করিনি আপনার ওপরে। এখানে চাকুরি করা আমার আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর হয়েছে বলে চাকুরি ছাড়ছি।

বললেন, আর কিছু বলব না এখন। যদি অল্প কিছু সময় আমাকে দাও দু'চারটে কথা বলবার জন্য কৃতজ্ঞ থাকব।

বললাম, বেশ বলবেন, আপনার সুবিধেমত।

পরশু রবিবারে সকালের দিকে কিছু সময়ের জন্য যদি আসতে পারো—

বললাম, চেষ্টা করব।

আচ্ছা, তাহলে এসো এখন। যদি কিছু খেয়ে যেতে—

বললাম, দিন কি দেবেন।

আমার জায়গায় ফিরে যেতে বস বললেন, লেটার উইথড্র করতে হল মনে হচ্ছে।

না, কাল থেকে আমার সার্ভিস টারমিনেট করছে।

বাড়ী ফিরে মিঃ ভাদুড়ীর সঙ্গে আলাপের রিপোর্ট দিলাম জ্যেঠামণিকে। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন, তারপর বললেন, অবিচারের কথা বলল কেন দেখাশিস?

বললাম, বোধহয় মনে করেছেন তাঁর সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে চাকুরি ছেড়ে দিলাম।

হতে পারে।

কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা তো আমার মনে নাই। লোকের মনে ভুল ধারণার পরিচয় পেয়ে খারাপ লেগেছে আমার।

ভুল ধারণা যখন নাই বুঝতে পারছিস তার বাড়ীতে গিয়ে তার কথা শুনতে রাজী হবার কি দরকার ছিল?

বললাম, কি বলতে চান ভদ্রলোক শুনতে আপত্তি করব কেন? আফটার অল, মিঃ ভাদুড়ী তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছাত্র, তাঁর সম্বন্ধে সব কিছু জেনেও তুমি তাকে স্নেহ করো, একথা কি ঠিক নয়?

একটু হাসলেন জ্যেঠামণি, কিছু বললেন না।

তারপর প্রসঙ্গ বদলে বললেন, যেখানে চাকুরি ঠিক করেছিস তারা লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়েছিল জানবার জন্য আগে যোগ দেয়া সম্ভব কিনা, তাদের লোকের অভাব হয়েছে।

বললাম, ভাল খবর জ্যেঠামণি, বসে থাকতে হচ্ছে না। কাল দেখা করে জানিয়ে দেব আগে যোগ দিতে পারি।

পরদিন শনিবার। আজ সকালে তাড়াতাড়ি খেয়ে কাজে বেরোতে হবে না। পিসিমাকে সরিয়ে দিয়ে দু' একটা পদ রান্না করলাম জ্যেঠামণির জন্য।

এর মধ্যে সস্ত্রীক অশোকবাবু এলেন দেখা করতে।

তারা বিদায় নিলে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ কাছের একটা দোকানে গিয়ে ফোন করলাম হাসপাতালে। সুপারিন্টেন্ডেন্টকে চাইলাম। তাঁকে জানালাম চিঠি পেয়েছি, কবে কাজে যোগ দিলে তাঁদের সুবিধে হয় জানতে চাইলাম। বললেন, ইচ্ছা করলে আজই যোগ দিতে পারেন। বললাম, আজ আর হয় না, কাল থেকে যোগ দেব। ভদ্রলোক রাজী হয়ে জানালেন যে, রেফারেন্সের জন্য তাঁরা এইমাত্র ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার কর্তাকে ফোন করেছিলেন, তাঁর রিপোর্ট সন্তোষজনক।

নমস্কার জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম।

সেদিনের ডাকে আমেরিকা থেকে ফণীর একখানা চিঠি পেলাম। মন দিয়ে কাজ শিখছে ফণী। লিখেছে বছর খানেক পরে সে একসঙ্গে কাজ শিখতে ও কিছু কিছু রোজগার করতে পারবে তাতে করে আরও দু'একটা নামকরা জায়গায় কাজ শেখবার সুবিধে হবে।

খুশী হলাম ফণীর চিঠি পড়ে। ভাল ছেলে ফণী। মানুষ হতে পারবে।

(ক্রমশঃ)

# সাহিত্য ও সংস্কৃতি

## রাতের সংলাপ

লুই ফুরনবার্গ এক নিদারুণ সংকটের লগ্নে জন্মেছিলেন, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সংকট যে যুগকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তিনি সেই যুগের লোক। বিপর্যয়, বিপ্লব এবং বিভীষিকার কালে এই লেখকের উদ্ভব। জীবনের অর্থ সন্ধানে লেখক কৃত্রিম বুর্জোয়া মূল্যবোধ ও আত্মপ্রবঞ্চনার মুখোমুখি এসে পৌঁছেছেন। রিলকের গীতিকবিতা ফুরনবার্গকে প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে এই কাব্যরসে সিক্ত হয়ে একদিকে সৌন্দর্যের জন্য আকুলতা জেগেছে মনে, সৌন্দর্য তৃষ্ণায় তিনি কাতর, আবার অন্যদিকে চারপাশের জগতে দেখেছেন হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস। ব্রেখট্ এবং অন্যান্য লেখকের মত ফুরনবার্গ ছিলেন লেখকের দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন এবং তিনি বুঝেছিলেন যে অতীতের জগৎ থেকে একেবারে সরে আসতে পারলেই হয়ত ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব হবে। সর্বজাগতিক অর্থনৈতিক সংকট, হিটলারী ফ্যাসিবাদ, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রভৃতির ফলে লেখকের মনে এই ভাব আরো সুদৃঢ় হয়ে উঠল যে নতুন সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। সামাজিক রূপান্তরের সমর্থনে তিনি দাঁড়ালেন। ১৯৫৭ খৃঃ ভাইমারে ফুরনবার্গের আটচল্লিশ বছর বয়সে যখন মৃত্যু হল তখন তিনি জার্মাণ সাহিত্যের একজন প্রগতিশীল শক্তিমান লেখক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

যে বৈষম্যের তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তার জট ছাড়ানোর জন্য যে প্রয়াস করেছিলেন ফুরেনবার্গের রচনায় সেই মনোভংগী এনেছে দৃঢ়তা এবং স্পষ্টতা। জার্মান-ইহুদী বংশোদ্ভূত এই লেখক ছিলেন চেক-নাগরিক, জাতিগত উন্মত্ততার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে অসীম ক্লেশ ও শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে। আত্মঅবলুপ্তির হাত থেকে আপনাকে ত্রাণ করতে হয়েছে। সর্ববিষয়ে রূপ, সংগত এবং সততার প্রতি অতিরিক্ত অগ্রহ নিয়ে এই মানুষটিকে বর্বরতা ও পৈশাচিকতায় ভরা এক ভয়ংকর জগতের সংগে মোকাবিলা করতে হয়েছে।

গেস্টাপোর বন্দীশালায়, প্যালেস্টাইনে নির্বাসনে, এবং য়ুরোপ যাত্রায় বসে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছিলেন তার মধ্যে ছিল ভ্রাতৃত্ব এবং প্রেমের শক্তির জয়গান এবং এই কাব্যগ্রন্থই তাঁকে প্রথম শ্রেণীর 'লিরিক পোয়েট' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই লিরিকধর্মী কবিতা লেখকের কবিতায় চড়া সুরের বদলে ছিল শান্ত সুর এবং স্বপ্নের পসরা অথবা যুগের দাবী সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন।

মোৎসার্ট এবং গ্যেটের ওপর তিনি দুটি ছোট উপন্যাস লিখেছেন এবং সেই উপন্যাস রচনায় ঐতিহাসিক তথ্যকে আশ্রয় করলেও সর্বদাই যে কাহিনী ইতিহাসনির্ভর করেছেন তা নয়, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং মনোভংগীও প্রকাশ করেছেন। 'মোৎসার্ট ইন প্রাগে' নিজস্ব ভংগীতে ফুরনবার্গ যে কাহিনী এডুয়ার্ড মোরিকে তাঁর "Mozart auf der Reise nach Prag" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন সেই কাহিনীই তাঁর উপন্যাসে বিধৃত করেছেন। জার্মাণ পাঠকের কাছে এই কাহিনী অতি পরিচিত। উভয় উপন্যাসের উপজীব্য মোৎসার্টের প্রথম আসরের পূর্ববর্তী উত্তেজনাময় দিনগুলির কথা। ১৭৮৭ খৃস্টাব্দের শরৎকালে প্রাগে মোৎসার্টের প্রথমতম সংগীত রচনা 'ডন জিওভান্নি'র আসর বসেছিল। ফুরনবার্গের উপন্যাসে কিন্তু সমস্ত ঘটনা ভিয়েনা থেকে মোৎসার্টের যাত্রাপথে ঘটেনি, ঘটেছে প্রাগে, ঠিক আসর বসবার আগের দিনে। নিজের রচনায় লেখকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত। ফুরনবার্গ ১৯৫৪ খৃঃ এই উপন্যাস যেরুসালেমে রচনা করেন, দীর্ঘ ছটি বছর সেইখানে তিনি নির্বাসনে কাটান। পরে ফুরনবার্গ বলেছেন, 'আমি নিজে প্রাগ শহরের জন্য কাতর হয়ে পড়েছিলুম তাই মোৎসার্টকে প্রাগেই উপস্থাপিত করেছি।'

মোরিকে তাঁর মোৎসার্ট চরিত্রে একটা রোমান্টিক প্রলেপ প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু ফুরনবার্গ তাঁর নায়ককে আত্মবিশ্বাসী, প্রগতিবাদী এবং সাম্যে বিশ্বাসী বুর্জোয়া শিল্পী হিসাবে রূপায়িত করেছেন। এই শিল্পীর শিল্পকর্ম তাঁর কালে বাদানুবাদ সৃষ্টি করেছিল। নিপুণ কৌশল সহকারে প্রাগের সংগীত বিশারদ দুসেকের ভবনে তিনি মোৎসার্টের সংগে ক্যাসানোভার সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছেন। ক্যাসানোভার তখন বয়স বাষট্টি বছর এবং অতিরিক্ত যৌন আবেগের জন্য সারা য়ুরোপ জুড়ে তাঁর নাম। এই ক্যাসানোভাকেও সেই সময় প্রায় দু বছর ধরে বোহিমিয়ান কাউন্ট ফন্ ভ্যালডস্টাইন অ্যাট স্কলস দুক্সের অনুকম্পা প্রদত্ত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছিল। ত্রিশ বছর বয়স্ক শিল্পী মোৎসার্টের সংগে তাঁর দেখা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এর স্বপক্ষে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য নেই। ক্যাসানোভাকে ফুরনবার্গ মোৎসার্টের বিপরীত জীবিত চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। অভিজাত সমাজের পরগাছা শ্রেণীর মানুষের চূড়ামণি হলেন ক্যাসানোভা, সুতরাং ক্যাসানোভার পক্ষে বুর্জোয়া শিল্পী মোৎসার্টের মধ্যে যে সৃজনশীল বৈশিষ্ট্য আছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান সম্ভব।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আর্টের কি ভূমিকা এই প্রশ্নটিই মোৎসার্ট ও ক্যাসানোভার আলাপাচারে সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। এই প্রশ্নটি ফুরনবার্গের মনে এমনই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তাঁর অন্য দুটি গল্পেও অনুরূপে এই প্রশ্ন উঠেছে। 'মোৎসার্ট ইন প্রাগ'-এ তিনি যে আর্ট জীবনকে ঘিরে আছে তাকে সমর্থন করেছেন এবং মাথার ওপরকার আকাশের তারাকে সমর্থন করতে পারেন নি। 'এনকাউণ্টার ইন ভাইমার' উপন্যাসে গেটের জীবনই প্রধান উপজীব্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, এই উপন্যাসেও লেখক তাঁর বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বলেছেন, 'শিল্পীর নিশ্বাস নিশ্চয়ই ফুল ফুটিয়ে তুলবে, ফুলকে ঝরতে দেবে না।' আর 'দি হলিডে' নামক উপন্যাসে এই সমাজবাদী লেখক সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন—

> "Man as he is, with all the passion, joys, fears, griefs, bliss and longing and so to give the living a sign, a proof of their ability to organise the world according to the most widespread will and wishes".

আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্গত তৃতীয় উপন্যাসটির নাম 'দি হলিডে'। লেখক যুদ্ধ-পূর্বকালের এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন।

লেখক স্বয়ং দীর্ঘকাল টিউবারকুলোসিস রোগী ছিলেন। নৈতিক ও শারীরিক দুর্বলতাকে পরাক্রান্ত করে গুরুতর পীড়া থেকে রোগমুক্ত হওয়ার কথা তাঁর প্রায় সব রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা এবং জীবন বিমুখ হয়ে পলায়ন করার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে—তা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন। টমাস মানের 'ম্যাজিক মাউণ্টেনের' প্রতি লেখকের আধা-ভক্তি ও আধা-অভক্তির ভিত্তিতে তিনি এই কাহিনীর আর এক রূপ প্রকাশ করেছেন। 'দি হলিডে' ১৯৪২ খৃঃ প্যালেস্টাইনে রচিত এবং লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

'এনকাউণ্টার ইন ভাইমার' উপন্যাসটি ১৯৫২ খৃঃ শেষ হয়। লেখক বলেছেন, অবান্তরভাবে তিনি কাহিনীর কোনো অংশ উদ্ভাবন করেন নি। গ্যেটে এবং মিকিভিকৎকে রূপায়িত করতে তিনি তাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিই ধরেছেন। ফুরনবার্গ যে ঘটনার ওপর তাঁর উপন্যাসটি দাঁড় করিয়েছেন, সেটি হল গ্যেটের আশীতম জন্মদিনে প্রখ্যাত পোলিস কবি আদম মিকিভিকৎ-এর কবির ভবনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে উপস্থিতি। দুজনের মধ্যে একটা নিদারুণ নিস্পৃহতা ছিল অথচ ছিল সুগভীর সহানুভূতি। ফুরনবার্গের কাহিনী এই দিকটিই ফুটিয়ে তুলেছে। তরুণ পোলিস কবি এডুয়ার্ড অডিনিক যিনি এই উপলক্ষ্যে প্রবীণ কবির সঙ্গে ছিলেন, তিনি ভাইমারের এই স্মরণীয় দিনগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, ফুরনবার্গ সেইসব তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। যথাযথভাবে কাহিনী বিবৃত করলেও ফুরনবার্গ ভাইমারে সম্মিলিত এই বিশ্বজনমণ্ডলীতে একজন আজ্ঞা-প্রত্তোকেতা সৃষ্টি করেছেন তার নাম সেরউড, তার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৮২৫-এর ডিসেম্বিস্টদের জার-বিদ্রোহ চক্রান্ত ধরা পড়ে যায় এবং রাশিয়ার বহু বিদগ্ধ মানুষের নির্যাতন ভোগ করতে হয়। ফুরনবার্গের এই উপন্যাসাবলী 'কনভারসেসনস ইন দি নাইট' নামে এই প্রথম ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন জোন বেকার। ফুরনবার্গ যে সব মানুষের কথা লিখেছেন, তাঁরা ঐতিহাসিক বা উপন্যাসের মানুষ হলেও জীবন্ত হয়ে চোখের ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন।

—অভয়ংকর

---

**CONVERSATIONS IN THE NIGHT**: by LOUIS FURNBERG: Published by Seven Seas Books. BERLIN: (Manufactured by G.D.R. 1969).

# নতুন বই

**রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান** (আলোচনা)—পরিমল গোস্বামী। নবগ্রন্থনা, ৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—তিন টাকা।

বর্তমান গ্রন্থটিতে লেখকের একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছে। 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' নামক এই প্রবন্ধটি শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রায়ণের দ্বিতীয় খণ্ডে ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়ে পাঠক এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। বর্তমান গ্রন্থে উক্ত প্রবন্ধটি কিছুটা পরিবর্জিত ও সংযোজিত আকারে স্থান লাভ করেছে। বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ অবলম্বনে একটি রচনা লেখবার ইচ্ছা তাঁর কিছুকাল পূর্বে হয়েছিল। সেই ইচ্ছার ফলেই তিনি এই প্রবন্ধটি লেখেন। সমগ্র প্রবন্ধটি আবার কতকগুলি পর্বে বিভক্ত। এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ষাট।

শ্রীপরিমল গোস্বামী রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রবন্ধ পত্রাবলী থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখেছেন। সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করার পর রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় পরিচয়ের যেমন প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের স্বচ্ছ ধারণার পরিচয় পেয়েও বিস্মিত হতে হয়। বর্তমান গ্রন্থের 'অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান' এবং 'উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান' অংশ দুটিতে লেখক সংক্ষেপে বিগত দুই শতকে ইউরোপে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতি সম্বন্ধে পাঠকদের একটা ধারণা গড়ে নেবার সুযোগ দিয়েছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে তিনি শুধু বিজ্ঞান-প্রসংগের উল্লেখের উদ্ধৃতি দিয়েই দায় সারেননি, রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে তাঁর কাব্যে সাহিত্যে কিভাবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন, তাও শ্রীগোস্বামী উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ প্রমাণ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই যে রবীন্দ্রনাথের মনে বিশ্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসা জেগেছিল তা লেখক সঠিকভাবেই লক্ষ্য করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের নিজেরও যে প্রকৃত বিজ্ঞানীর মনোভাব ছিল তা রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। তিনি লিখেছেন—'...কিন্তু বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারও যে একজন কবির চিত্তকে এমন গভীরভাবে এবং ব্যাপকভাবে উদ্বেল করে তুলতে পারে তার দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ একা। বিশ্ব-বিষয়ে তাঁর মনে জিজ্ঞাসা জেগেছিল তাঁর বাল্যকাল থেকেই। এটি তাঁর মতো অসাধারণ জ্ঞানতৃষার্ত মনের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। মনে হয়, সব ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যটি দেখবার সহজ ক্ষমতা নিয়েই তিনি জন্মে ছিলেন। আর এই অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কারই হচ্ছে বিজ্ঞানীর মূল লক্ষ্য।' তিনি অরও বলেছেন, 'বিশ্ব-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাকে বলে 'কমন-সেন্স ভিউ'—তাই। আর কমন-সেন্সকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে বিজ্ঞানীর কাজ।'

বর্তমান গ্রন্থের যে কটি অংশ পাঠকদের বিশেষভাবে ভালো লাগবে তা হল 'ছোটকে বড়র সঙ্গে মিলিয়ে দেখা', 'রবীন্দ্রনাথ কতখানি অতীন্দ্রিয়বাদী', 'রবীন্দ্র জীবনদর্শনের মূলসূত্র', 'সেই মূলসূত্র—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আবর্তন', 'বিবর্তনে বিশ্বাস কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ' এবং 'বিজ্ঞানে কবিমানসের বিস্ময়কর ব্যাপ্তি'। সমগ্র গ্রন্থটি পড়বার পর প্রবীণ লেখকের যুক্তিবাদী এবং তথ্যসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পেয়ে পাঠক

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-জয়ন্তী : গত ১১ ডিসেম্বর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিট্যুট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ ভারতের প্রখ্যাত মনীষী, ভারতীয় সাহিত্য একাডেমীর সভাপতি, জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ৮০তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। সোভিয়েট ও ভারতের বৈজ্ঞানিকরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীডি পি ধর তাঁর বক্তৃতায় ভারত ও সোভিয়েটের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ডঃ চ্যাটার্জির মূল্যবান অবদানের কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেন।

মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। বর্তমান গ্রন্থের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানের অতি জটিল তত্ত্বকেও শ্রীগোস্বামী তাঁর ভাষার গুণে পাকঠদের সহজবোধ্য করে তুলতে পেরেছেন। স্থানে স্থানে লেখকের পরিহাস-প্রিয়তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শোভন ও সুন্দর।

**বনজঙ্গল ও শিকারের কথা**—ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ। ওরিয়েন্ট লংম্যানস্ লিমিটেড। ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। কলকাতা-১৩। দাম আট টাকা।

শিকারী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী 'বনজঙ্গল ও শিকারের কথা'। পূর্ব বাংলার প্রাচীনতম জমিদারবংশ সুসঙ্গ রাজপরিবারের সন্তান শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ একজন প্রথম শ্রেণীর শিকারী। দীর্ঘকাল গারো পাহাড় ও অন্যান্য বন-জঙ্গলে ভ্রমণ করেছেন শিকারের সন্ধানে। বন্য জীবনের সঙ্গে পরিচয় তাঁর নিবিড়। শিকারী হয়েও অরণ্যজগৎকে দেখেছেন শিল্পীর চোখে। লেখক সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় শিকার-জীবনের কথা, অতীতের বহু-বিখ্যাত শিকারীর সান্নিধ্য এবং লোম-হর্ষক ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে শিকার সম্পর্কে শিক্ষণীয় বহু তথ্যও দিয়েছেন। বইটি প্রকৃতির আলেখ্য। তাই কেবলমাত্র হত্যাকাহিনী না হয়ে, বন-জগতের সৌন্দর্যকে জীবন্ত করে ফুটিয়েছেন প্রবীণ শিকারী। শিকারের কথা প্রথম বেরোয় ১৩৩৫ সালে। ভূমিকায় শ্রীসিংহ লেখেন : "শিকারের কথা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, রক্তের নেশায় মত্ত না হয়ে বনের জীবজন্তুর দিকে এবং বনজগতের মর্মস্পর্শী সৌন্দর্যানুভূতির প্রতি যাতে আমাদের নবীন যুব-সম্প্রদায়ের মমতাপূর্ণ আকর্ষণ জাগে। এবার নতুন করে 'বনজঙ্গল ও শিকারের কথা' ছাপাবার উদ্দেশ্যও প্রধানত তাই।"—তাই শ্রীসিংহ কাল্পনিক রোমাঞ্চকর কাহিনী সৃষ্টি করে বইটিকে সুলভ চিন্তার পরিচায়ক করেননি। অরণ্যের সৌন্দর্যও যে হিংস্র প্রাণীদের নিয়েই পূর্ণাঙ্গ, বারবার এ-কথা তিনি জানিয়েছেন ভাবীকালের শিকারীদের। অসংখ্য ছবি বইটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

**সময়ের কাছে কেন আমি বা কেন মানুষ** (কবিতা)—শম্ভু রক্ষিত।। শতরূপা, ১৪, মাকড়দহ রোড, হাওড়া ১।। তিন টাকা।।

বইটির নাম রাখা হয়েছে প্রথম কবিতাটির নাম অনুসারে। বাকি সাতাশটি কবিতার মধ্যে তাঁর অনুভব বিচিত্রভাবে প্রসারিত হয়েছে বলেই মনে করা যায়। তিনি লিখেছেন : "আমার জীবন গূঢ় রহস্যাবৃত এবং আমার কান শব্দে ক্লান্ত আমার শরীরের ওপর শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং স্তব্ধ হয়ে শেষ হচ্ছে। মানুষেরা চলে যাচ্ছে এবং পৃথিবী যেন শব্দহীন যাত্রী।"

স্বভাবতই শম্ভু রক্ষিত যে-সময়ের কথা বলেন, তার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ, হয়তো ছদ্ম-দার্শনিক অর্থেই তা অনুমেয়। প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে অবজেকটিভ। শিল্পের অনুরোধেও তিনি শব্দসংক্ষেপে সম্মত হননি। পাঠক সেজন্যে তাঁকে অভিযুক্ত করতে পারেন। শিরোনাম-হীন ভূমিকায় তিনি ঘোষণা করেছেন : "আমার কবিতা অন্তরের স্বর্গীয় ভাব-ধারার আবিষ্কার। কবিতা ছাড়া অন্য কোনো পবিত্রতায় আমার বিশ্বাস নেই।"

বোধহয়, এ-সঙ্কলনের কবিতাগুলিকে তিনি আত্মদানের সামিল বলে মনে করেন। উৎসর্গপত্রের কয়েকটি পংক্তি পড়ে অন্তত তাই মনে হয়। কবি লিখেছেন : "ঈশ্বরের রোষ থেকে মানুষকে ত্রাণ করার জন্যে আর-এক ঈশ্বর-পুত্রের আত্মাহুতি ও রক্তদান।"

**কালক্রম ও প্রতিধ্বনি**— কবিতা। দেবদাস আচার্য। অন্তর্বাস প্রকাশনী। দন্ড-পাণিতলা। নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া। মূল্য—তিন টাকা।

তরুণ কবি দেবদাস আচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি'। সংগ্রামী

চেতনায় ঋজু বলিষ্ঠ পেশল একটি মন নিয়ে হাজির হয়েছেন। গোটা পৃথিবীকে কফিনে পুরে যেসব ডাকাতদল মদের গেলাসে উল্লাসের ঢেউ তুলছে তাদের তিনি বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন—"আমার মনে হয় প্রত্যেকের ঘরেই প্রস্তুত রয়েছে বারুদ' অথবা 'আমি জানি একদিন মহাজাগতিক অগ্নিপিন্ড হয়ে পৃথিবী পর্দা ছিঁড়ে ভেসে যাবে।'

তাই পালিশ চাপান পশুতুল্য কিছু হিংস্র স্বার্থপর মানুষের মধ্যে বাটোয়ারা হয়ে যাওয়া এই বিশ্বে তিনি একটি আশার উর্বর ক্ষেত্রে উত্তরণের মন্ত্র দুর্বিক্রমবাসে উচ্চারণ করেন—

'এই দেশ থেকে দ্রুত প্রেক্ষাপট উল্টে দিতে হবে
নতুবা যে ফসফরাস ফেনার উচ্ছল
এই দীঘার সৈকতে
খাল কেটে তাকে নিয়ে যেতে হবে
অভ্যন্তরে
সমুদ্রে ভাসাতে হবে মাটি
এই বালিয়াড়ি থেকে সেই এক
প্রার্থনা আমার।'

শুধু তাই নয়। শিল্পকে এবং সংগ্রামকে তিনি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখেছেন। বলেছেন, 'আমি জানি ভাঙ্গা ও গড়ার মধ্যে শিল্পকেও সাজাতে হবে বর্মে।'

**মায়ের গান**—কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। দাম তিন টাকা।

মৃন্ময়ী মায়ের স্তুতিগান সংগ্রহ। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ভক্তপ্রাণ-নিঃসৃত এই স্তুতিগান সকলেরই ভাল লাগবে। এই ধরনের মাতৃসঙ্গীত দীর্ঘকাল রচিত হয়নি।

## সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

**কালি ও কলম** (অগ্রহায়ণ ১৩৭৭)—সম্পাদক: শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম দেড় টাকা।

কিছুকাল আগে আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেছেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এই সুলেখক ছিলেন সুষমব্যক্তিত্ব এবং অনন্য-শিল্পদৃষ্টিসম্পন্ন। অতি স্বল্পকালে গল্প, উপন্যাসে বাঙলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন। 'কালি ও কলমে'র বর্তমান সংখ্যাটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অগণিত সাহিত্যিক ও পরিচিত অনুরাগীদের স্মৃতি-অর্ঘ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার, অমলেন্দু বসু, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ মিত্র, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিশু মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সন্তোষকুমার দে, সুমথনাথ ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, সরোজ দত্ত, গণেশ বসু, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরলোকগত সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তাঁর এই ক্ষুদ্র মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটিকে যথেষ্ট মূল্যবান করে তুলেছেন। নারায়ণবাবুর অকাল মৃত্যু যে প্রতিটি বাঙালীর কাছে কতখানি বেদনার তা এই পত্রিকাটির বিভিন্ন রচনা পাঠে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

**একাল** (চতুর্থ বর্ষ : দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা) সম্পাদক: নকুল মৈত্র ও ভরত সিংহ। ২৪ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা—৩৭। এক টাকা।

বাংলা ছোটগল্প নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বিশেষ করে তরুণেরা এ বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহী। 'একালে' তারই প্রতিবিম্ব। ছোটগল্প এবং ছোটগল্প সম্পর্কীয় নানান সাহিত্য-ভাবনার খোরাক এতে আছে।

**উত্তর সাগর :** (প্রথম সংখ্যা—সম্পাদক শৈলেন রাহা ও শুকদেব চট্টোপাধ্যায়। চৈতন্য কলা বিজ্ঞান কেন্দ্র ১০এ নেতাজী সুভাষ রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী।। ত্রিশ পয়সা।।

সম্পাদকীয় পড়ে এবং অন্যান্য রচনা-দৃষ্টে অনুমান হয় পত্রিকাটি মূলত শিল্প-সংস্কৃতিমূলক। প্রচ্ছদে 'প্রথম সংখ্যা' ছাপা হলেও সম্পাদক লিখেছেন: 'এই সংখ্যা একটু ছোট করতে বাধ্য হলুম।' শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের একটি পোর্ট্রেট এঁকেছেন চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ এ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ। তাছাড়া দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের একটি ইংরেজী কবিতা ও রামাই বাউলের কয়েকটি গান ছাপা হয়েছে।

# বাংলা ভাষায় সায়েন্স ফিকশ্যন

কুন্তলীন পুরস্কার ছিল সে যুগের নবীন সাহিত্য যশঃ প্রার্থীদের অন্যতম কাঙ্খিত। ১৮৯৩ খৃঃ অথবা ১৮৯৪ খৃঃ এক বাঙালী বিজ্ঞানসেবীর একটি গল্প উপস্থাপিত হয়েছিল প্রতিযোগিতায়। গল্পের নাম 'পলাতক তুফান।' লেখক শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু। বলা বাহুল্য জগদীশচন্দ্র পুরস্কার লাভ করেননি। কিন্তু ঐ প্রথম বাংলা ভাষায় একটি সার্থক বিজ্ঞান-কল্প কাহিনী রচিত হয়েছিল। আজ যেখানে বিজ্ঞানকল্প কাহিনী মর্যাদার আসনে ভূষিত এবং সার্থক বিজ্ঞান কাহিনীর অপ্রতুলতা ও চাহিদা, সেখানে এই গল্পটির সাবলীলতা ও উপস্থাপনা আমাদের চমৎকৃত করে। জগদীশচন্দ্রের আগে অন্য কোন বাঙালী বিজ্ঞানসেবী সাহিত্য রচনায় সচেষ্ট হননি। এবং আর কেউই বিজ্ঞানকে সাহিত্যে ব্যবহারের জন্য সচেতন চেষ্টা করেননি। (১) যদিও আমরা জানি ততদিনে জুলে ভের্ণের বিজ্ঞানকল্প কাহিনীগুলি ইউরোপে আলোড়ন তুলেছে। তার ধাক্কা এসে লেগেছে এদেশে। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বিজ্ঞানকল্প কাহিনী রচনার সম্ভাবনা ছিল লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তার মত সিরিয়াস লেখক এদিকে নজর দেবার অবকাশই পাননি। গত যুগ পর্যন্ত ডিটেকটিভ ও রহস্য কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানকল্প কাহিনীও ছিল গৌণ সাহিত্যের পর্যায়ে। রবীন্দ্রনাথ সাবলীল দক্ষতায় তাঁর কবিতায় গল্পে উপন্যাসে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছেন। তিনি ভৌতিক রহস্য গল্প লিখেছেন যদিও, কিন্তু বিজ্ঞান গল্প লেখেননি একটিও। অথচ তাঁর স্পর্শ পেলে পরবর্তীকালে সাহিত্যের এই বিভাগটি পরিপুষ্ট হতে পারত। কিন্তু জগদীশচন্দ্র! রচনাকালে তাঁর মানসিকতায় কি ছিল জানি না। তিনি কি বাংলা সাহিত্যে কোন 'এক্সপেরিমেন্ট' চেয়েছিলেন? বিজ্ঞানকল্প কাহিনী বিষয়ে তাঁর কি কোন সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুমোদন ছিল? (২) কিন্তু যাই হোক, জগদীশচন্দ্রের পরেও বহুদিন ওপথ কেউ মাড়াননি।

জগদীশচন্দ্রের অকৃত্রিম রসানুভূতি উদ্ভিখির রচনাটির মধ্যে বৈজ্ঞানিক সম্ভ্রম সৃষ্টির পরিবর্তে একটি লঘু সাহিত্য-রসের আমদানী ঘটিয়েছে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানী মন রচনার বৈজ্ঞানিক ফাঁকিটিও

* সঠিক তারিখটি মূল্যবান। অথচ ওটি আমার পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কেউ এটি জানালে বাধিত হব। পলাতক তুফান রচনাটি সম্পূর্ণ সংকলিত হয়েছে অব্যক্ত গ্রন্থে। গ্রন্থটি বহুদিন অমুদ্রিত।

প্রচ্ছন্ন রাখেনি, তাকে প্রকাশ করেছে। জগদীশচন্দ্রের এই এবং অনয়ান্য রচনা পড়লে একথাই মনে হয় একটু সচেতন দৃষ্টিপাত করলেই, বাংলাভাষায় সাহিত্যের এই শাখাটি বহু পূর্বেই পুষ্ট হত। জগদীশচন্দ্রই হতেন এই বিভাগের পথিকৃৎ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। ভাগিরথীর উৎস সন্ধানের মধ্যেও বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর মূল ফ্যান্টাসীগত ছাপ রয়েছে।

দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি এমন কি একটি বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর সাময়িক পত্রিকা কয়েক বছর চালু থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় সার্থক বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর তেমন সাক্ষাৎ মিলল না। হল না এমন কি কোন সার্থক লেখক সৃষ্টি। আবার একমাত্র ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশাই-ই তাঁর বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান পুস্তকে জগদীশচন্দ্রের ঐ রচনাটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু তিনিও রচনাটির যথাযোগ্য স্থান অনির্ণীত রেখেছেন। কোন গবেষক যদি বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটির প্রতি আলোক বর্ষণ করতে পারেন, উপকার হয়।

প্রচুর বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প-উপন্যাস বর্তমানে লেখা হচ্ছে। অথচ অধিকাংশ রচনাই অসার্থক তো বটেই, এমনকি প্রায়ই সেসব রচনায় বিজ্ঞান বুদ্ধির লেশমাত্র থাকে না। কারা এ ধরনের রচনায় সার্থক হতে পারেন? সাহিত্যানুশীলনকারী বিজ্ঞানী অথবা বিজ্ঞানে যথেষ্ট উৎসাহী ও শিক্ষিত সাহিত্যিক। আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্বল্প পরবর্তীকালে যেসব শক্তিশালী বিজ্ঞানী সাহিত্য চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় ঘোষ তথা ভাস্করের নাম স্মরণীয়। কিন্তু এ'দের কেউ বিজ্ঞানকল্প কাহিনী রচনার চেষ্টা করেননি। চেষ্টা করেননি সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যিক বা বিজ্ঞানী।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা শিশু-কিশোর সাহিত্যের উন্মুক্ত আসরে। সত্য কথা বলতে কি পূর্বাহ্নে যা বলেছি—তথাকথিত সিরিয়াস লেখকদের নাক উঁচু ভাব। অথচ আজ বাংলা সাহিত্য একটা ক্ষীণতনু নদীর অবস্থায়—সেই মধ্যবিত্ত প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কথা নেই।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর দুটি ত্রুটি। প্রথমত সাহিত্যিকরা যখন এ-ধরনের রচনা লিখেছেন, তাঁরা বিজ্ঞানের মূল ও প্রাথমিক সর্তগুলিরও কোন তোয়াক্কা করেননি। আবার বিজ্ঞানের ছাত্র যাঁরা, তাঁরা বৈজ্ঞানিক জড়তার ভাবটি কাটিয়ে উঠে গতিশীল ও সাবলীল হতে পারেননি। গল্পগুলিও প্রবন্ধের মত কড়া হয়ে উঠেছে।

ডঃ বৃন্দাবন বাগচী স্বয়ং বিজ্ঞানসেবী হয়েও ছোটদের জন্য কয়েকটি গল্প ও উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'মহাশূন্যের ডায়েরী' নামক কিশোর উপন্যাস ও শান্তিবাদী বিজ্ঞানী হ্যাজসের গল্পগুলি বড়ই সুন্দর। অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য স্বয়ং রসায়নের অধ্যাপক এবং সাহিত্যিক পরিবারের মানুষ। তিনি ছোটদের জন্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-কাহিনী লিখেছেন। তবে ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণের মধ্যে কখনও কখনও বিজ্ঞানকে অতিক্রমের চেষ্টাও দেখা গেছে। এ'দের দুজনেই কোন রচনায় কতটা বিদেশী ছায়ায় প্রভাবিত বলা দুষ্কর। কিন্তু এ'দের মৌলিকত্বও সম্মানার্হ।

শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন প্রমুখ কয়েকজন বিদেশী গল্পকে দেশী ছাঁচে পুরে কিছু সুন্দর রচনা উপহার দিয়েছেন। কিন্তু মৌলিকতার চেষ্টা মাত্র প্রায়শঃই ব্যর্থ হয়েছেন। কয়েক বছর পূর্বে লোকান্তরিত ডঃ দিলীপকুমার রায়চৌধুরীও এদিকে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর লেখাতেও প্রাবন্ধিক বা বিজ্ঞানী ভাবটা বেশী ফুটে উঠেছে এবং একটি স্বচ্ছল গতির অভাব লক্ষ্য করা গেছে। এ-বিষয়ে কতকটা ব্যতিক্রম বোধহয় প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর 'মনুস্বাদশ' বইটি এদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতম। বইটির বহুল প্রচার না হওয়া দুঃখের। বইটিকে বিশ্ব-সাহিত্যের পর্যায়েও অন্যতম বলতে দ্বিধা হয় না। গত দশ বছরে বাংলা ভাষায় একশটি উল্লেখ্য উপন্যাসের নাম করতে গেলে, এ-বইটির স্থান থাকা উচিত।

স্বর্গত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার' একটি সার্থক বিজ্ঞান-ভিত্তিক কিশোর উপন্যাস। বনফুলের জানা, শঙ্করের নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরী প্রভৃতি দু'একটি রচনায় বিজ্ঞানকে ও বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলকে সুচারুরূপে ব্যবহারের নিদর্শন মেলে। রবীন্দ্রনাথেই এ-জিনিসের সার্থক সূচনা।

সত্যজিৎ রায় যদিও চেষ্টা করেছেন, তবু তাঁর রচনাগুলি সাহিত্য বিচারে যতটা, বিজ্ঞান-কল্পনার বিচারে ততটা নয়।

ছোটদের জন্য আরেকটি সুন্দর বইয়ের নাম মনে পড়ছে। সেটি সুশীল ঘোষের 'চাঁদে পাড়ি'। নিছক বিজ্ঞানকল্প কাহিনী না হয়েও এটি একটি বিজ্ঞানগ্রয়ী উপন্যাস। সমরজিৎ কর কিছু কিছু বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনী রচনা করেছেন। তাঁর রচনাগুলির প্রধানতম ত্রুটি এগুলি কেমন নিছক বর্ণনার মত লাগে। রীতিমত সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি। তবুও ছোটদের কয়েকটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি অনেকদূর সার্থক। আরও অনেক নবীন ও আধুনিক লেখক বিজ্ঞানকে গল্পে উপন্যাসে এমনকি কবিতায় ব্যবহারের চেষ্টা করছেন। এটি শুভলক্ষণ। এদের অনেকেই বিজ্ঞানের ছাত্র। সাহিত্যিক রসময়তা এবং বৈজ্ঞানিক মননশীলতা উভয়ের মণিকাঞ্চন সংযোগ ভিন্ন সার্থক বিজ্ঞানকল্প কাহিনী রচনা অসম্ভব। বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর লেখককে মনে রাখতে হবে তাঁর সৃষ্টি মূলতঃ সাহিত্য। তথাকথিত 'বিজ্ঞান-সাহিত্যের' প্রবন্ধের মত প্রথমতঃ বিজ্ঞান নয়। তবে দ্বিতীয় সর্তই হল বিজ্ঞানকে পাগলের মত অতিক্রম বা অস্বীকার না করা। বাংলা সাহিত্যে যা হচ্ছে হামেশাই।

বাংলা সাহিত্যে এ-ধরনের রচনায় আর একটি ত্রুটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র গ্রহান্তর অভিযান ও পদার্থবিদ্যার জগতেই সীমাবদ্ধ। আর মৌলিকতার ছাপ প্রায়শঃ অলভ্য। আমাদের লেখকদের এই নাবালকত্ব পীড়াদায়ক। কোন বিশেষ রচনার অনুকূল আবহ সৃষ্টির জন্য ভাষার অভিনবত্ব প্রয়োজন। বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর উপস্থাপনার প্রাসঙ্গিক ভাষা নির্মাণে লেখকেরা অধিকাংশই অপারগ থেকে গেছেন। তবে বাংলা ভাষায় বিদেশী বিজ্ঞানকল্প কাহিনীর কয়েকটি বড় সুন্দর অনুবাদ হয়েছে। বিশেষতঃ ছোটদের জন্য।

—সুবীরকুমার সেন

# বইকুণ্ঠের খাঁতা

## বইপাড়ার হালচাল: প্রকাশকের অভিমত

বইপাড়ায় এখন পাঠ্য বইয়ের মরশুম। গল্প নয়, উপন্যাস নয়, স্কুল-কলেজের দিকে তাকিয়ে আছেন প্রকাশকেরা। ক্যানভাসাররা ফিরে আসছেন মফঃস্বলের প্রচার শেষ করে। কেউবা মাস্টারমশাইদের সংগে এখনো ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন, যদি দু'-একটা বই পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সারা বছর উপেক্ষিত বিষয়-শিক্ষকেরা এখন প্রকাশকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। প্রধান শিক্ষকেরা তো বটেই।

সেদিন শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ধরে হাঁটছিলাম। দেখলাম, দোকানে কিছুটা ভিড় বেড়েছে। ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তাও কানে আসছিল দু'-একটা। একজন পরিচিত প্রকাশককে জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম? ব্যবসার খবরাখবর ভালো তো?

ভদ্রলোক হাসলেন নিস্পৃহভাবে। বললেন, একরকম। মানে, কিছুই বুঝতে পারছি না। গত চার-পাঁচ বছর ধরেই খারাপ যাচ্ছিল। এবারের ধরণটা আলাদা। সেজন্যেই মতামত দিতে পারছি না। নতুন বই বের করিনি। পুরনো বই ছেপেছি দু'-একটা। ক্যানভাসারদের মুখে বরাবরই আশার কথা শুনে এসেছি। এবারও তার কোনো ব্যত্যয় ঘটবে বলে মনে হচ্ছে না। সকলেই বলছেন, মন্দ নয়।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি, আপনার কেমন মনে হয়? বইয়ের ব্যবসা কি চলবে?

অপ্রত্যাশিত জিজ্ঞাসায় আমি বিমূঢ় বোধ করছিলাম। বললাম, প্রশ্নটা আমারই হওয়া উচিত ছিল। কেননা, আমি ক্রেতা এবং পাঠক। আপনারাই জানেন, ব্যবসা কিভাবে চলবে বা চলবে না। তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনাটাও মূলত আপনাদেরই।

বিষণ্ণ হেসে বললেন, আমি বরাবরই আশাবাদী। এককালে একটা বড় কোম্পানীর ক্যানভাসার ছিলাম। সে-কোম্পানী এখন নেই। আমি বইয়ের ব্যবসা শুরু করেছি সেই অভিজ্ঞতা সম্বল করে। জানি, আজ না হোক দু'দিন পরে সবই স্বাভাবিক হবে। শুধু বর্তমানটাকে নিয়ে ভাবছি। সন্ধ্যের পরে একবার এ-পাড়ায় আসবেন। দেখবেন, সাতটা বাজতে না বাজতেই অনেকে দোকান বন্ধ করে দিয়ে বাড়ী চলে যান। অথচ, এ-সময়টায় আমরা অন্যান্য বার একটু বেশী রাত পর্যন্ত থাকতাম।

মাস্টারমশাইরা কি বলেন?

—তাঁদের সংগে যোগাযোগই তেমন করে উঠতে পারছি না। যাঁদের সংগে দেখা হচ্ছে, তাঁরা প্রায় সকলেই বলছেন, বই পাল্টানো হবে না। গতবার যেমন ছিল, এবারও তেমনি থাকবে।

বললাম, ভালোই তো! প্রচারের জন্য ছোটাছুটি করতে হল না, ক্যানভাসার পাঠাতে হল না, অথচ ব্যবসাটা আগের মতই সমান চলবে। তাতে তো আপনাদের অনেক খরচ বাঁচলো।

—কিন্তু তা তো হবার নয়। হবেও না। আমরা বড় প্রকাশক নই, এ-লাইনের মেজাজ-মর্জিটা জানি। কণ্টেসপ্টে দু'টো-চারটে বই ছাপি, মাস্টারমশাইদের হাতে-পায়ে ধরে পাঠ্য-তালিকার মধ্যে নিজেদের নামটা ঢোকাই, আর তার ওপরে সংসার চলে, দোকানের ঘড় ভাড়া দিই, পরের বছরের জন্য প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরী করি। যদি বই কেটে যায়, তাহলে তো একেবারে মারা যাবো। উঁচু মহলে আমাদের তেমন পরিচয় নেই। হয়তো দেখা যাবে, পরিবর্তন হচ্ছে নতুন বই ঢুকছে, কেবল আমরাই পাঠ্য-তালিকা থেকে ক্রমাগত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছি।

একটু হেসে বললেন, আমাদের এই ব্যবসাটা সিজন্যাল। সাহিত্যের সংগে যোগ সামানাই। সরস্বতীর চেয়ে লক্ষ্মীর সংগে আমাদের সম্পর্ক বেশী। আমাদের কাজটা বৈশ্যের। হেমন্তে বীজ ছড়াই, শীতে ফসল তুলে আনি। বাকি সময়টা শুয়ে-বসে কাটানো। কোনো রকমে দিন গুজরান করা। এ-সময়ে ক্যানভাসাররা আমাদের কাছ থেকে দু-পয়সা পান। মাস্টারমশাইরাও। কোনো কোনো স্কুলের টিসার্স কাউন্সিল বুক স্টল খুলে বসেন। আমরা তাঁদের বেশী কমিশনে বই দিই। নিশ্চিন্ত থাকি টাকা মার যাবে না। এবার কেউ-ই তেমনভাবে উদ্যোগী হচ্ছেন না। মফঃস্বলের দোকানদাররাও কম আসছেন কলকাতায়। তাঁদের মারফতে বই ছড়িয়ে দেওয়া যেত গ্রামে, গ্রামান্তরে। কাগজে কাগজে পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, যেন শিক্ষকমশাইরা কোনো বইয়ের নমুনা কপি না পেলে বই না কাটেন। চিঠি লিখলেই প্রকাশকরা স্পেসিম্যান কপি পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তাতে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছি কই?

**শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত**

'প্রকাশ ভবনে' বসে কথা হচ্ছিল শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংগে। তিনি

অতটা চিন্তিত নন। বললেন, হ্যাঁত আমি সাহিত্যের প্রকাশক, পাঠ্য বইয়ের নই। তবু দু'টো-চারটে স্কুল-কলেজের বই বের না করে পারি না। পুজোর পর সাহিত্যের বাজারে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। সেটা সামলে ওঠার জন্যই এরকম কিছু বই বের না করলে চলে না। কেবল অস্তিত্ব বজায় রাখার জনাই এসব করতে হয়।

বললাম, বাংলা বইয়ের বাজার কেমন?

—খুব খারাপ। নতুন কোনো গল্প-উপন্যাস এখনই ছাপতে পারছি না। কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে দেখি। যে-সব বই ছাপা হচ্ছিল, তাও চলছে ঢিমেতালে। কাগজের দারুণ টানাটানি। দাম বেড়ে গেছে। আগে হোলসেলাররা ধারে কাগজ-পত্র দিতেন। এখন আর দেন না। প্রেসের অবস্থাও তাই। নগদ কারবার করে বইয়ের ব্যবসা চালানো কঠিন। অন্নবস্ত্রের মতো বই তো আর জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য নয়!

আপনি কি কোনো সংকটের দিকে ইঙ্গিত করছেন?

—সংকট? হ্যাঁ, সংকটই। তবে সেটা বাংলাদেশের। টিটাগড়ে কাগজ তৈরী হয়, কিন্তু আমরা পাই না। শুনেছি, সেসব কাগজ দিয়ে বই ছাপছেন বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লীর প্রকাশকেরা। ও'রা সরাসরি মিলের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, অ্যাডভান্স টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর আমরা এখানে বসে হা-পিত্যেস করছি। মিলওয়ালারা আগে হোলসেলারদের কাছে কাগজ বিক্রী করতেন ধারে। এখন বাইরের চাহিদা থাকায় কেউ ধারে দেন না। ফলে, বাংলার কাগজ বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে।

বললাম, আপনারাই বা নগদ টাকা দিয়ে কাগজ কিনতে পারেন না কেন? দিল্লী, বোম্বাই যদি আপনাদের ওপর টেক্কা দিতে পারে, আপনারাই বা ছাড়বেন কেন?

—না, আমরা পারি না। বাংলা দেশের অধিকাংশ প্রকাশকই অল্প বিত্তের। প্রচুর টাকাকড়ি আর কজনের আছে? তার ওপরে, যে টাকা খরচ করে নগদ রিটার্ণ পাওয়া যায় না বইয়ের ব্যবসায়ে। সেজন্যে অপেক্ষা করতে হয়, রিস্ক নিতে হয়। স্পেকুলেশনে ভুল হলে সব গেল। দু-চারজনকে বাদ দিলে বাংলা দেশে লাখপতি প্রকাশকের সংখ্যা কম। সকলেই ধারে কারবার করেন।

কাগজের অভাবে আপনার কোন বই কি ছাপা বন্ধ আছে?

—আছে। সেগুলি ধীরে-ধীরে ছাপবো। আপাতত দু-এটা স্কুলপাঠ্য বই ছাপছি। বহু কষ্টে কাগজ জোগাড় করা গেছে। বুক সিজনটা পেরুলেই আবার অন্যান্য বইয়ের দিকে নজর দেব। এখন বেশী দাম দিয়ে কাগজ কেনার উৎসাহও নেই।

বললাম, আপনারা যখন উৎসাহ পাচ্ছেন না, তখন দিল্লী-বোম্বাইওয়ালারা বই ছেপে যাচ্ছেন কি করে?

—তার সঠিক কারণ অবশ্য আমি জানি না। বাংলা দেশে বইয়ের বাজার সংকীর্ণ, প্রকাশকের সংখ্যা বেশি, আনুপাতিক হারে পাঠক ও ক্রেতার সংখ্যা বাড়ছে না বলেই মনে হয়। হিন্দী, ইংরেজীর বাজার মোটামুটি সর্বভারতীয়। পাঠকের সংখ্যা বেশি। হয়তো বা বাংলা দেশের তুলনায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পরিমাণটাও ক্রমবর্ধমান। নানা কারণেই পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারে এখন আগের মতো বই-পত্র কেনা হয় না। ফলে, একটা মন্দার ভাব থাকছে কয়েক বছর ধরেই। আগে, জন্মদিন, বিয়ে, উপনয়ন উপলক্ষে নানা রকম বই উপহার দেওয়া হতো। এখন সেই রীতিটাও কমে যাচ্ছে। না হলে, এই মন্দার বাজারেও কিছু বই বিক্রী হতো।

**সুপ্রিয় সরকার বলেন,**

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্সের সুপ্রিয় সরকার প্রায় অনুরূপ কথাই বললেন অন্য একদিন। তাঁর মতে, দিল্লী-বোম্বাইয়ের প্রকাশকরা কলকাতার মতো ঘরকুনো নন, দেশ-বিদেশের প্রতি তাঁদের সমান নজর। নতুন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁরা ব্যবসায়ে নেমেছেন। এককালে কলকাতার প্রকাশকরা সকলকে পথ দেখিয়েছিলেন, এখন তাঁদের পথ দেখাবেন দিল্লী-বোম্বাইওয়ালারা। আগে বড় ব্যবসায়ীরা কেউ এ লাইনে অর্থ বিনিয়োগ করতে চাইতেন না, এখন এগিয়ে এসেছেন অনেকেই।

বললাম, বাংলা দেশে বইয়ের বাজার খারাপ হওয়ার কারণ কি?

—প্রথম এবং প্রধান কারণ, প্রকাশকদের দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁরা বই ছাপেন স্থানীয় পাঠকদের মুখের দিকে তাকিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনপ্রিয় উপন্যাস কিম্বা রম্যরচনার দিকে সকলের নজর। অর্থাৎ পাঠক যেমনটি চান, প্রকাশকও তেমনটিই পরিবেশন করেন। এ ব্যাপারে তাঁদের যে কোন দায়িত্ব থাকতে পারে, পাঠকের মানকে উন্নত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন থাকতে পারে—সে সম্পর্কে অধিকাংশ প্রকাশকই নিস্পৃহ। সেজন্যেই সকলের নজর, অমৃত-দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের ওপর। সবাই মারমারি করেন, জনপ্রিয় লেখক-লেখিকাদের নিয়ে। অথচ, বাংলা দেশ ছাড়াও যে বইয়ের একটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার আছে, তা যেন কেউ মনেই রাখেন না।

সুপ্রিয়বাবু একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন, সম্প্রতি ফ্রাঙ্কফুর্টে যে বইয়ের মেলা হয়ে গেল, তাতে বাংলা দেশের প্রকাশকরা বিশেষ বই পাঠাতে পারেন নি বললেই চলে — সর্বসাকুল্যে দু-তিনটে। পাঠিয়েছেন দিল্লী-বোম্বাইয়ের প্রকাশকেরা। 'ইণ্ডিয়ান বুক ইণ্ডাস্ট্রি'র একটি বিশেষ সংখ্যায় ভারতীয় বইয়ের পূর্ণ তালিকা ছাপা হয়েছে। তা দেখলেই বুঝতে পারেন, বাঙালী প্রকাশকদের অবস্থাটা কি!

একটু থেমে বললেন, আসল কথা হলো মেন্টাল মেক-আপ। আমরা যদি বহি-

ভারতের দিকে কিছুটা নজর দিতাম, সারা ভারতের দিকে তাকাতাম, তাহলে হয়তো এমন দুর্দশা হতো না। বাংলা ভাষার প্রসারে কেবল বাংলা হরফেরই কারবার করতে হবে—এরকম দিব্যি তো কেউ দেয় নি! কেবল লক্ষ্যটাকে একটু বড় করতে পারলেই, আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারতো।

তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসুর বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ বেরুচ্ছে বাংলার বাইরে থেকে। কলকাতার প্রকাশকদের তাই নিয়ে মাথাব্যথা পর্যন্ত নেই।

বললাম, এছাড়া আর কোন কারণ আছে কি?

—আছে হয়তো। সেটা পরোক্ষ। কলেজ স্ট্রীটে এখন লোকের যাতায়াত কম। আগে, মানুষ শো-কেসের দুটো-চারটে বই দেখতে-দেখতে, কিম্বা কোন কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে সূচীপত্রের পাতা ওল্টাতে গিয়ে কিনে ফেলতেন কোন-না-কোন বই। এখন সে সুযোগটা নেই। বুঝতেই তো পারছেন, অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মতো বই কেনা তেমন কিছু একটা জরুরী ব্যাপার নয় কারো কাছেই। তার ওপরে মানুষ তেল-নুন-ডাল কিনতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে—বই কিনবেন কি করে? স্কুল-কলেজের লাইব্রেরীগুলোই বই কিনছে না। অন্যান্যবার প্রাইজ ডিস্ট্রি-বিউসানের জন্য স্কুল-কলেজে কিছু বই যেতো। এবার মনে হয়, তাও হলো না।

পাশেই বসেছিলেন সাহিত্যিক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। তিনি বললেন, বই কেনা-কাটার মধ্যে একটা লাকসারি আছে। এখন লাকসারির সময় নয়।

সুপ্রিয়বাবু অন্য একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, বাঙালী প্রকাশকদের অবস্থা যে কী শোচনীয়, তার প্রমাণ পাবেন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের একটা চিঠিতে। সম্প্রতি ওরা একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন মাদ্রাজে। তাতে সারা ভারতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইয়েরই সমাবেশ ঘটে। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাংলা বইয়ের সংখ্যা নেহাৎ-ই কম। ও'রা আমাদের পাবলিশার্স অ্যাসো-সিয়েশনকে নাকি চিঠি দিয়েছেন বাংলা বইয়ের সংখ্যাল্পতার জন্য। বেশ দ্রুত আরো বই পাঠানো হয়।

প্রকাশ ভবনের শচীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে 'বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা'র একটি নোটিশের কপি এনে তিনি আমাকে দেখালেন। তাতে প্রকাশকদেরই উদ্দেশ্যে আবেদন জানান হয়: 'আগামী ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭০ হইতে ১৫ জানুয়ারী ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত মাদ্রাজে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে সারা ভারত পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের তরফ হইতে প্রকাশকদের পৃথকভাবে প্রদর্শনীতে পুস্তক প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সভাকে জানাইয়াছেন, পুস্তক প্রেরণের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের প্রকাশকদের নিকট হইতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই।'

অর্থাৎ, মাদ্রাজে এখন সর্বভারতীয় বইয়ের প্রদর্শনী চলছে জাতীয় উদ্যোগে। কেবল, বাংলা দেশের প্রকাশকরা কোণঠাসা হয়ে কোন রকমে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করে চলেছেন। তার প্রতিকারের উপায় কি, কে বলবে?

**বিভাস ভট্টাচার্যের বক্তব্য**

সারস্বত লাইব্রেরীর বিভাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে একদিন দেখা। কাউণ্টারে বসেছিলেন মনমরা হয়ে। বললেন, অবস্থা খুব খারাপ।

বললাম, কি রকম? কেন?

—কেন, বলতে পারবো না। বই বিক্রী হচ্ছে না, শুধু এটাই দেখতে পাচ্ছি। আগে আর কোন বই বিক্রী হোক না হোক, সুকান্তর বই বিক্রী হতো রোজই দু-দশটা। এখন তাও হচ্ছে না। আমাদের একটা বড় ভরসা ছিল জলপাইগুড়ি, আসাম আর কোচবিহারের ওপর। বেশ কয়েক দিন ধরে ওসব জায়গা থেকেও তেমন অর্ডার পাচ্ছি না।

বললাম, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের কথা। ওখনে বই পাঠান নি কেন?

তিনি আমাকে হতাশ করে দিয়ে বল-লেন, কি হবে ওখানে বই পাঠিয়ে? শুধু-শুধু টাকা নষ্ট করা। বই কিংবা তার দাম কিছুই ফেরৎ পাওয়া যায় না। মাঝখান থেকে ডাকের খরচটা পর্যন্ত নিজেদের দিতে হয়। গতবার এক চালান বই দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুই ফেরৎ পাই নি। বিনা পয়সায় বই দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই। উৎসাহও নেই।

একটু থেমে বললেন, বই পাঠাতে আমাদের কোন আপত্তি থাকে না, যদি তার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে। আমরা বই ছাপি টাকা খরচ করে, কমার্শিয়াল পার্পাসে। খবরের কাগজে কিম্বা পত্র-পত্রিকায় সমালোচনার জন্য দিই প্রচারের জন্য। যদি তাই না হয়, তাহলে দেবো কেন? একবার আমরা একটা বই ছেপে-ছিলাম, তার দাম একশ টাকা। সে বই আমরা কোথাও রিভিউর জন্য দিই নি। কারণ, বিনামূল্যে এক কপি বই দেওয়ার চাইতে ঐ টাকায় একটি বিজ্ঞাপন দিলে অনেক বেশী কাজ হয় বলে আমাদের ধারণা। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট যদি বিক্রী বইয়ের টাকা ফেরৎ দিতেন কিম্বা ডাক খরচটাও দিতেন—তাহলে অনেক প্রকাশক এ ব্যাপারে উৎসাহিত হতেন। সরকার উদ্যোগে যখন হচ্ছে, তখন তাঁরা তো ক কিনে নিতেও পারেন!

প্রসঙ্গক্রমে তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করে বললেন, বাংলা দেশে যখ প্রকাশকের অবস্থা সঙ্গীন, তখনও ও' একটা করে চিঠি পাঠান আইনের ধমকা দিয়ে। নির্দিষ্ট সময়ে বই না পাঠালে কো কোন্ ধারায় আমাদের শাস্তি হতে পারে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেন আর বি সরকার যদি একটু সহৃদয়তার স আমাদের সমস্যাগুলিকে তলিয়ে দেখতে তাহলে হয়তো বিষয়টি অন্যভাবে ভা যেতো। প্রকাশকরা জাতীয় স্বার্থে বিনা মূল্যে বই দিতে রাজী আছেন, এমন ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দিতেও। দিনের পর দি ডাকের খরচা যে হারে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে আমরা ঘাবড়ে যাচ্ছি। বিনামূল্যে পা জাতীয় গ্রন্থাগারের বইগুলি যদি বিনা ড ব্যয়ে পাঠান যেতো—তাহলে হয়তো কারো কোন অসুবিধা হত না।

আগামী সপ্তাহে বেঙ্গল পাবলিশ মিত্র ঘোষ এবং রূপা অ্যাণ্ড কোম্পা সাক্ষাৎকার প্রকাশের চেষ্টা করা হবে।

—প্রণব

(৩৮)

ঘুম ভাঙতে ঈশমের বেশ বেলা হল। য় সকালে ঘুম ভাঙার অভ্যাস। আজ লা হওয়ায় সে নিজের কাছেই কেমন ছোট য় গেল। খুব সকাল সকাল সে ঠাকুর ড় উঠে যায়। গোয়াল থেকে গরু বের তে হবে। মাঠে গরু দিয়ে আসতে র। গরুর ঘর পরিষ্কার করা তারপর জারে যেতে হতে পারে। তাকে এত বেলা ন্ত না দেখে ছোট কর্তা আবার এদিকে য় আসতে পারে। সে ছইয়ের ভিতর কে উঁকি দিল। না আসছে না। একটু মাক খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ভোরের দিকে নও ঠান্ডা ভাবটা থাকে। ক'দিন থেকে শা পড়ায় সকালের দিকে ঠান্ডা ভাবটা হতেই যেতে চায় না।

ঘুম ভাঙার পর আর একটা চিন্তা ওকে পেয়ে বসেছে। গত রাতে সে , যক্ষ রক্ষ অথবা জিন পরি কিংবা শ্তা হতে পারে—নাকি প্রথম মানব বী সেই আদম ইভ! কারা যে সারারাত তে বিহার করে গেল। সে যে এখন কাকে বে এর ব্যাখ্যা করবে বুঝতে পারছে

সে স্বপ্ন দেখেছে কিনা, না তা কি হয়, সে তখন তামাক খাচ্ছিল, খুব পাচ্ছে বলে তামাক খাচ্ছিল এবং ণ ওরা বিহার করেছে ততক্ষণ সে দম করে বসেছিল—তবে সে কি করে স্বপ্ন রে! সে স্পষ্ট মনে করতে পারছে, ভোর র দিকে ওরা নদীর পাড়ে হাঁটতে তে অন্তর্ধান করেছে। ছইয়ের ভিতর য় আছে বলেই খুব তার কাছাকাছি আসেনি।

সে গ্রামে উঠে যাবার সময় দেখল শশী র অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁত ছ। বাড়ির ছেলেরা ওর পাশে য়ে দাঁত মাজছে। ছুটির দিন। স্কুলে র তাড়া নেই। দাঁত মটকিলা ডালে ঘসে ফেনা তুলে ফেলেছে। সে ওদের দেখেই বলল, বুঝলেননি মাস্টারমশয়, এক তাজ্জব ঘটনা ক্ষেতের ভিতর।

—কি তাজ্জব ঘটনা। মুখের ভিতর বোধ হয় ডালের দুটো একটা আঁশ ঢুকে গেছিল। সেগুলো থুথু ফেলার মতো ফেলে দিতে দিতে কথাটা বলল।

—কি যে কমু আপনেরে! ওড়া যে কার দেবতা, আপনেগে না আমাগ ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না!

—কি হয়েছে বল না!

—দুই ফেরাস্তা মাস্টারমশয়।
—ফেরাস্তা!

—ফেরাস্তা না হইলে মনে লয় আপনেগ দুই দেবদেবী। রাইতের জ্যোৎস্নায় একেবারে পাগল হইয়া গ্যাছে। তরমুজ খেতে সারা রাইত ঘুইরা ফিরা বেড়াইছে।

শশিভূষণ হা হা করে হেসে উঠল। —খুব আজগুবি গপপো তুমি যা হোক বললে একটা।

—কি কান্ড! আপনের বিশ্বাস হয় না!

—তুমি কি মিঞা বুড়ো বয়সে আফিং ধরেছ!

—কি যে কন! সে কেমন ছোট হয়ে গেল মাস্টারমশাইর কাছে। সে আর দাঁড়াল না। ভিতরে ভিতরে সে চটে গেছে। —তা আপনেরা লেখাপড়া জানেন! আপনেগ কাছে এডা অ ফিংখোর মানুষের গল্প। তারপর সে হাঁটতে আরম্ভ করল। এ-সব মানুষের আল্লা যে কত মহান, কি তার বিচিত্র লীলা কিছু বোঝে না। সামান্য মনুষ্য জাতির কি সাধ্য তারে বোঝে—সে খুবই অকিঞ্চিতকর মানুষকে লীলারহস্য বলতে গিয়েছে। যাকে বললে চোখ বড় বড় করে শুনবে তিনি বড়মামী। এ-সংসারের বড়বৌ। সে দেখল বড়মামী স্নান করে তারে কাপড় মেলছে। চুল থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে বড়মামীর। কাপড় রোদে মেলে দিয়েই চুলে শুকনো গামছা প্যাঁচিয়ে খোপা বাঁধবেন। খোঁপা বাঁধার অপেক্ষাতে সে দাঁড়িয়ে থাকল।

বড়বৌ দেখল আতা বেড়ার পাশে ঈশম দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বলবে, কিছু বলার সময়ই সে চুপচাপ এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। —কিছু বলবে আমাকে?

—বড়মামী কান্ড একখানা!
—কি কান্ড ঈশম!

ঈশম সব বললে, বড়বৌ বলল, তা হবে। এমন নদী আর তার বালুচর, তরমুজের খেত আর ঈশমের মতো মানুষ যেখানে আছে—সেখানে ওনারা নামবে না ত কারা নেমে আসবে।

—তবে তাই কন। শশীমাস্টার মনে করে বইয়ের ভিতরই সব লেখা থাকে।

—তা কি থাকে! কত কিছু আছে এ জগতে, যার মানে সামান্য মানুষ কি করে বুঝবে। বইয়ে সব লেখা থাকে না ঈশম। তুমি ঠিকই বলেছ।

—আমি নাকি আফিং খাই বইলা এমন দ্যাখছি।

—তোমাকে ঠাট্টা করেছে।

—না মামী, এ-সকল আউল বাউল নিয়া আমার ঠাট্টা-তামাসা খারাপ লাগে। ওনারা লীলা খেলা করে। আমি ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বইসা থাকি। কাছে যাই না। কাছে গ্যালে ওনারা রুষ্ট হয়। কি হয় কিনা কন।

—তা হয়। এ-ছাড়া বড়বৌর আর কিছু বলার ছিল না। সাদা জ্যোৎস্নায় কুয়াশার ভিতর সে বোধ হয় অন্য এক জগতে যথার্থই চলে গেছিল গত রাতে। তাকে আবার নেমে যেতে হবে। জানালা খুলে রাখলে সাদা জ্যোৎস্নায় তার আবার কোন না কোনদিন তরমুজের জমিতে নেমে যাবার

ইচ্ছা হবে। সে দেখেছে গত রাতে মানুষটা তার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেছিল। আত্মনিগ্রহে আর নিজেকে কোন কষ্ট দেয়নি। এই আত্মনিগ্রহ থেকে রক্ষার জন্য বুড়বৌ সুযোগ এবং সময়ের অপেক্ষায় থাকে। মধ্য যৌবনে তারা বালির চরে আদম ইভের মতো ঘোরাফেরা করে। ঈশম ছইয়ের ভিতর তেমনি বসে থাকে। কোন কোন দিন ঘুমিয়ে থাকে। কখনও ডংকা বাজায়। কখনও সে আর এক নূতন কিংবদন্তি সৃষ্টির জন্য তামুক খেতে খেতে এই ভিটা জমিতে বড় একটা অশ্বত্থ লাগিয়ে দেবে ভাবে এবং একদিন সে সিন্নি দেবে গাছের নিচে এমন ভাবল। মনে হয় তার তখন, হাসানপীর অথবা অন্য আউলেরা এসেছে তার চারপাশে। ওরা সবাই বলছে আল্লার নামে সিন্নি দে ঈশম। আমরা দুইটা খাই। কারণে অকারণে ঈশম ছইয়ের নিচে শুয়ে থাকলে মধ্য যামিনীতে এমন সব আদি ভৌতিক রহস্যের ভিতর ডুবে যায়।

কিন্তু একবার বড়বৌ ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। ওরা দুজন বালির চরে চুপচাপ বসে গল্প করছে। ওর সেই শৈশবের গল্প। মানুষটা তার শুনছে কি শুনছে না সে বুঝতে পারত না। কেবল দুটো একটা কথা সংগোপনে বলতেন। সেও খুব সহসা সহসা। বলতেন যেমন, বড়বৌ আমাকে কি দরকার ছিল বাবার মিথ্যা তার করার।

তিনি বলতেন, দেখা হলে আমি কি বলব তাকে। সে ত আবার ফিরে আসবে।

বড়বৌ মনে মনে হাসত। মানুষটার বিশ্বাস এখনও সে কোথাও না কোথাও তার অপেক্ষায় আছে। বড়বৌ তখন কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলত—তুমি যাবে! আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু কথা দিতে হবে অকারণে তুমি কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে না। গ্যাৎ চোরত শালা বলতে পারবে না! কথা দাও আমাকে, তুমি ভাল হয়ে যাবে। তুমি ভাল হয়ে গেলেই, আমি যে-ভাবে পারি তার কাছে তোমাকে নিয়ে যাব।

তিনি আর তখন কথা বলতে পারতেন না। সারাক্ষণ বড়বৌর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর বুঝি কখনও কখনও ঘুম এসে যেত। নদীর চরে ঠান্ডা হাওয়ায় বড়বৌ জেগে থাকত শিয়রে। মানুষটা এ-ভাবে ঘুমাতে পারলেই ভাল হয়ে যাবেন। সে একথায় শিয়রে পাহারা দেবার সময় নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বালির চরে পাতলা সিল্কের উপর ওরা দুজন পাশাপাশি শুয়ে ছিল। খুব সকালে মসজিদের আজানে ঘুম ভেঙে গেল তার। সে উঠে দেখল, তাঁর আগেই ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি পদ্মাসন করে বসে আছেন। সকাল হয়ে যাচ্ছে তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। বড়বৌর খোঁপা খুলে গেছে। উঠেই সে তার খোঁপা বেঁধে মানুষটাকে বলল, তাড়াতাড়ি এস। ভোর হতে বাঁকি নেই। বড়বৌ মানুষের কাছে ধরা পড়ে যাবে ভয়ে ভোর রাতের অন্ধকারে ছুটছিল। কারণ আর একটু হলেই ইশমের কাছে ধরা পড়ে যেত।

পথে মঞ্জুরের সঙ্গে দেখা। —ঠাইরেন এই সাত সকালে মাঠে!

বড়বৌ বলল, আপনার দাদার কান্ড। ভোর রাতে বের হয়ে যাচ্ছে। ধরে আনলাম নদীর চর থেকে।

সেই থেকে বড়বৌ আর সাহস পায় না। মানুষটা মাঝে মাঝে ঘুমাতে পারলে ভাল হয়ে যাবেন—সেই আশায় মরিয়া বড়বৌ একা একা স্বামীর হাত ধরে অন্ধকারে অথবা ম্লান জ্যোৎস্নায় নেমে যেত। কলঙ্ক রটতে কতক্ষণ। স্বামীর জন্য সে কিছুই ভ্রূক্ষেপ করত না। কিন্তু এখন আর পারে না। কারণ ভাল হওয়ার কোন লক্ষণই নেই তার। জানালা খোলা থাকলে সে তেমনি দূরের মাঠ দেখতে পায়। কোনোদিন সেই মাঠে তার প্রিয় মানুষ পাগল ঠাকুরকে দেখতে পায়। একা একা মানুষটা আত্মনিগ্রহে চলে যাচ্ছে। যেন পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত এই আত্মনিগ্রহ। সে জানে যদি এই মানুষের সঙ্গে নদীর চরে নেমে যাওয়া যেত তবে আর তিনি দূরে যেতেন না। সকাল না হতেই সে তার ঘরের মানুষ ঘরে নিয়ে ফিরতে পারত।

মানুষটার জন্য আর যা হয়, যখন তখন অবোধ মন তার ভার হয়ে যায়। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। রাতে এই মানুষ ফিরে না এলে সে জানালা থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। মনে হয় তার মানুষটা তখন কোন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।

এ-ভাবে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একদিন বড়বৌ দেখল মাঠের ও-পাশে কিছু মশাল জলে উঠছে। একটা দুটো করে, অনেক কটা মশাল। মশালগুলো নদীর পাড়ে পাড়ে অদৃশ্য হতে থাকল। ওরা ধ্বনি দিচ্ছিল আল্লা-হু-আকবর।

তখন সকলে যে যার মতো ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। ঝোপে-জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে। ওরা এ-সব হিন্দুগ্রামে আগুন দেবে বলে উঠে আসতে পারে। বড়বৌ এবং ছোট ছোট শিশুরা, ধনবৌ, গ্রামের নারী এবং শিশুরা যে যার মতো ঝোপে-জঙ্গলে আশ্রয় নিত। বাসনপত্র সব কুয়োতে ফেলে দেওয়া হত। ছাই গাদার নিচে গয়নার বাকস। আর হিন্দু যুবকেরা এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে গোপাটে ধ্বনি তুলত, বন্দে মাতরম।

হাজি সাহেবের ছোট ছেলে আকালুর কান্ড এ-সব, সেই এখন এ-সব করাচ্ছে। পাশের গ্রামে উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সে দশ-বিশ ক্রোশ দূরে-দূরে কোন-কোন হিন্দু গ্রামে আগুন দিয়ে ফিরছে। তাকে ধরা যাচ্ছে না। সে আছে বেশ তার মতো। কারণ ওরা দলে ভারি। শহর থেকে মানুষ আসে। কেউ বলছে ওরা ঢাকা শহরের মানুষ না, ওরা এসছে কলকাতা থেকে। কেউ-কেউ বলছে আকালুর এতে হাত নেই, আরও বড় গোছের নেতা এ-সব করাচ্ছে।

কি যে হয়ে গেল দেশটাতে!

ঈশম নদীর চরে বসে তামাক খায় আর আবোল তাবোল বকে। মিঞারা খুব স্বোয়াব দ্যাখতাম। অগ খেদাইয়া কোন দ্যাশে। নিজের দ্যাশ ছাইড়া কবে কেড কোনখানে যায়!

তখন সে শুনতে পায় নিশীথে কার সব চিৎকার করছে নদীর ও-পাড়ে। আল্লা হু-আকবর ধ্বনি দিচ্ছে। নারায়ে তকবির ধ্বনি উঠছে। এ-পাশের হিন্দু গ্রামে ধ্বনি উঠছে—বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয় ওপাশে ধ্বনি উঠছে—পাকিস্তান জিন্দাবাদ তখন ঈশম মাঝখানে বসে হা-হা কা হাসে। কার দ্যাশ, কে বা দিবে, কে নিবে!

এ দুটো সাল বড় দুঃসময়ের ভি কাটছে। যে যার মতো সুপারির শা শানাচ্ছে। যেন দুঃসময়ের শেষ নেই। আ পল্টু ওর ছোটকাকার সঙ্গে শুত, কি এখন শোয় সে তার মার সঙ্গে। রাতে আজকাল একা শুতে ঘরে ভয় পান। বা থাকেন না রাতে। ওর এক ভয়। সেই য মুসলমান গ্রামগুলোতে ক্রমে ধ্বনি উঠ থাকে—নদীর পাড়ে-পাড়ে গ্রাম থে গ্রামান্তরে সেই ধ্বনি বড় ভয়াবহ। বু রক্ত শুকিয়ে যায়। সবাই কেমন ঘোলা-ঘো চোখ-মুখ নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকা দূরে দেশের নানা রকম দাঙ্গার খবর আ নৃশংস সব ঘটনা ঘটছে কোথাও। কিন্ত যে এটা হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে কেবল শামসুদ্দিন জানে—ডাইরেকট এ শানের ডাক দেওয়া হয়েছে। সুরা সাহেব পারের হুকোতে তামাক খা নদীর জলে মরা গরু-বাছুর ভেসে য গরু-বাছুর না মানুষ কেউ ইচ্ছা করে দেখতে যায় না।

ঘোর দুঃসময়ে বড়বৌ যত ভাবে দীর্ঘস্থায়ী নয়, সব ঘোর কেটে যাবে, অ সব ঠিক হয়ে যাবে, তরমুজ খেতে জ্যোৎস্না উঠবে—তত নিশীথে তার ভয়। সে এখন একা আর ঘুম যেতে না। কারণ আজকাল কি যে হয়েছে সেই যে আছে না এক ষণ্ড, অতিকায় নদীর পাড়ে, তরমুজ খেতে, ভিটা উপর দাঁড়িয়ে থাকে, এক চোখ যে ষ কালো রঙ, গলকম্বল তার ধরণীতে লু চার পা যেন তার কাঠের আর এত শক্ত এমন বলশালী যে মনে হয় এত এক সঙ্গে বসবাস মুহূর্তে বিদীর্ণ দেবে। সেই ষণ্ডের দিকে ভয়ে আর ত যাচ্ছে না। সেই দিনের মতো ষণ্ড ক্ষেপে গেছে। সেই যে একদিন আমু মরি করে প্রাণ বাঁচানো দায়, শিংয়ের গ মারলে পেট এফোঁড়-ওফোঁড়—কে তখন কাকে রক্ষা করে! প্রাণভয়ে সে যাত্রা গরম ফ্যান ফেলে দিয়ে আ করেছিল।

রক্ষা পেল আমু আর চোখ ষণ্ডের। গরম ফ্যান মুখে ঢেলে একটা দিক সাফ হয়ে গেল। দগদগে

ঘায়ের জ্বালায় কি বড়-বড় ডাঁসের (প্রকাণ্ড মাছি) জ্বালায় ছুটতে বোঝা যেত না। অনবরত মাঠে নিশিদিন লেজ তুলে ছুটছে। বড়-বড় ডাঁস কামড়ে খোদল করে ফেলছে ঘা। ঘায়ের জ্বালায় ষণ্ড মরে। রাতদুপুরে দিনদুপুরে ষণ্ড দৌড়ায়। ঘায়ের জ্বালায়, সেই যে বলে না জ্বালা মরে না জলে, জ্বালা সহে না প্রাণে, জ্বালায় মাসাধিককাল মাঠে-মাঠে একবার পুবে আবার পশ্চিমে ছুটেছে ষণ্ড।

আমু যে ষণ্ডের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল, কখনও সে কাউকে ভুলেও বলে নি। চারণ ষণ্ড, ধর্মের ষণ্ড, হাজি সাহেবের পয়ারের ধন। ছোট পোলার মোতাবেক মানুষ। সে গোপন রেখেছে। না রেখে তার উপায় ছিল না। সে এই ষণ্ডের মুখ না পোড়ালে প্রাণে বাঁচত না, ফেলু মরত, ছুরটা হাওয়া হয়ে যেত। সে এমন এক সর্বনাশ কাম কাজ করেই দেখল ষাঁড়টা সুড়-সুড় করে পোষ-মানা জীবের মতো মাঠের দিকে নেমে যাচ্ছে। তারপরই যন্ত্রণায় এবং জ্বালায় মাঠের উপর দিয়ে সেই যে লেজ তুলে ছুটতে থাকল, ছোটার আর বিরাম নেই। তবু ষণ্ড আগে দু চোখে দেখতে পেত। এখন এই দুঃসময়ে ষণ্ডের এক চোখ গিয়ে এক চোখে ঠেকেছে। শালা এক চোখে আর কত দেখতে পাবে। ফলে তার ভয় আমুকে, ফেলুর বিবিকে। কেবল ফুঁসে-ফুঁসে মরছে ষণ্ড। কবে সে বাগে পাবে আমুকে আর তার সেই আদরের বাগি গরুটাকে। পেলেই লম্বা শিঙে পেটে শুলে দেবে।

ঠিক এই ষণ্ডের মতো এক অতিকায় এই দুঃসময়। বড়বৌ এবং তার পরিবার এবং এই হিন্দু পল্লীতে-পল্লীতে অতিকায় এক চক্ষুদানব ক্রমে বড় হচ্ছে। ক্রমে পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করছে। হাত-পা তার বিষ কালো। এবং ঘন-ঘন উষ্ণ নিঃশ্বাস সব নিঃশেষ করে দেবে এবারে। সে পৃথিবী শুয়ে থাকলে টের পায় হাজার-হাজার মানুষের আলোতেও কেউ সেই দানবকে ধরিয়ে মারতে পারছে না। একচক্ষু দানবের গোটা দেশ রসাতলে যাচ্ছে।

আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি শোনার সঙ্গে-সঙ্গে মাস্টার, শচী আর পুরুষেরা উঠে বিছানা থেকে। কখনও-কখনও ওরা রাত ঘুম যায় না। গ্রাম পাহারা দেয়। যার কোন রাতে ওরা অন্ধকারে দরজা খুলতে পর্যন্ত সাহস পায় না। আলো জ্বালে না কেউ। ভয়ে গুটি-গুটি বের হয়ে আসে। আপনারা কেউ কি কিছু শুনতে পান না। একটা গুম-গুম আওয়াজ হয়। মনে হয় না হাজার-হাজার মানুষ অন্ধকারে চুপি-চুপি আপনাদের পুড়িয়ে মারার জন্য ছুটে আসছে! সবাই আর ঘুম যেতে পারে না তখন। জেগে বসে থাকে—আক্রমণ ঘটবে এই আশায়।

কি যে হল এই দেশে! মুড়াপাড়ার সেই গণ্ডগোলের পর থেকেই এমন হল! সেদিন যে কি তারিখ ছিল, মনে করতে পারছে না বড়বৌ। সব এখন ভুল হয়ে যাচ্ছে। সকালে উঠেই বড়বৌ পুকুর পাড়ে দেখেছে কারা যায়। সার বেঁধে যায়। লুঙ্গি পরে, মাথায় কালো রংয়ের ফেজ এবং হাতে সবুজ রংয়ের নিশান। ওরা ধ্বনি দিতে-দিতে যাচ্ছিল, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। ওদের ভিতর কোন চেনা মুখ পড়ে নি। কেবল সে ফেলুকে দেখেছে। ফেলু ভাঙ্গা হাত নিয়ে যাচ্ছে। একটা দড়ি ডান হাতে। কোমরে কোরবানীর চাকু গোঁজা। আর ওর সাধের বাগি গরুটা। গরুটাকে সে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে—সেজন্য সে মাঝে-মাঝে লেজ মুচড়ে দিচ্ছে। নরত যেন একসঙ্গে যাওয়া যাবে না। মিছিলের সঙ্গে তাড়াতাড়ি যেতে না পারলে নামাজ পড়া হবে না।

তার ক'দিন আগে একটা ঢোল বাজছিল নিশিদিন। শচি এসে বাড়িতে খবর দিয়েছে—হাটে-হাটে একটা লোক ঢোল পিটিয়ে যাচ্ছে। লোকটা ঢোল বাজাতে-বাজাতে বলছিল, তার নাম মহম্মদ, ধর্মের নাম পবিত্র ইসলাম। ধর্মকর্ম সব ভুইলা নিজেরা কাফের বইনা যাচ্ছেন। এমন বলছিল। বলছিল যান দ্যাখেন গিয়া কালীবাড়ি পার হয়ে, মসজিদে তিনি যে আছেন, থাকেন, কতকাল আছেন টের পান না, খান দান ঘোমান আর কাফের তার কালীবাড়ির পাশে নামাজ পড়তে দিব না কয়। নামাজ না পড়লে গোনাগার হইতে হয়! তারপর সে ড ড ড করে ঢোল বাজাতে-বাজাতে বলে, দীন এলাহি ভরসা। এই সব বলে, কি যে বলতে হয় সঠিক সে জানে না, তাকে লিখে দিয়ে গেছে লীগের পাণ্ডা আলি সাহেব। তিনি ভাল ভাল ভাষায় লিখে গেছেন। চুলি মুখস্ত করে ব্যকরণের ধর্ম মানছে না। নিজের মতো করে বলে যাচ্ছে, আর ঢোল বাজাচ্ছে। বলছে, সেই এক গাঁ জমিদার বাবুদের, ফ্লুট বাজে দশমীর দিনে। বাবুদের বাড়ি-বাড়ি হাতী বাঁধা। কিবা বাহার দ্যাখ রে হাতীর। হাতী যায় যুদ্ধে। তারপরই সে ফের ঢোলের কাঠি পাল্টাল। বলল, মানুষ যায় যুদ্ধে। ধর্মযুদ্ধে। হাজার-হাজার মানুষ শীতলক্ষ্যার চরে দাঁড়িয়ে ধর্মযুদ্ধের জিগির দিচ্ছিল সেদিন।

হাতীটা এখন আর পীলখানার মাঠে বাঁধা নেই। যুদ্ধের সময় হাতীটাকে সেই যে নিয়ে গিয়েছিল কার্মটোলা ক্যান্টনম্যান্টে আর ফিরিয়ে আনতে পারে নি। হাতী যুদ্ধে গিয়ে পাগল হয়ে গেছিল এবং হাতীর প্রাণনাশ হতেই জসীম একা-একা ফিরে এসেছিল। সেই জসীম নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে একা-একা বক-বক করছে।

জসীম সকাল থেকেই গাছটার নিচে বসে সব দেখছে। সেই সকাল থেকে পায়ে হেঁটে, নৌকায় করে হাজার-হাজার মানুষ জড় হচ্ছে চরে। ওরা সেই ভাঙ্গা মতো শ্যাওলা-ধরা, ভগ্নস্তূপের পাশে হাঁটু মুড়ে নামাজ পড়বে। মিনার অথবা গম্বুজের কোন চিহ্ন নেই। ভাঙ্গা ইঁটের সারি-সারি কঙ্কাল। আর অজস্র ঝোপঝাড়। বাজারের দোকানপাট বন্ধ। দুজন সিপাই কালীবাড়ি ঢোকার রাস্তায় বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দলটা লুটপাট আরম্ভ করতে পারে। নামাজ পড়া শেষ হলেই ওরা মশাল জ্বালিয়ে বাজারের সব হিন্দু দোকানগুলিতে আগুন দিতে পারে, বাবুদের বাড়ি-বাড়ি মশাল নিয়ে আক্রমণ করতে পারে। বাড়ির ছাদে-ছাদে এখন সব মানুষ। লোহার সব দরজা নিচে বন্ধ। একটা পাখি পর্যন্ত উড়ছে না ভয়ে। কেমন নদী মাঠ চর চারপাশটা থমথম করছে। সে ভূপেন্দ্রনাথকে গতকাল স্টিমারে নারানগঞ্জে যেতে দেখেছে। আজ সকালের স্টিমারে তিনি ফিরে এসেছেন। সঙ্গে এসছে পুলিশ সাহেব নিজে। এবং এক কুড়ি হবে বন্দুকধারী সিপাই। রূপগঞ্জের দারোগাবাবু বাবুদের কাছারি-বাড়িতে দু দিন থেকে পাহারা দিচ্ছেন। বাবুদের বৌরা-মেয়েরা শহরে চলে গেছে। ওঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন সবাইকে। যারা জোয়ান, যারা বন্দুক চালাতে জানে এবং লাঠিখেলায়

ওস্তাদ সেই সব মানুষ আছে কেবল। ওরা এখন গ্রামটাকে পাহারা দিচ্ছে।

কালীবাড়ি, আর সেই ভাঙ্গা ইঁট-কাঠের জঙ্গলের চারপাশটায় একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে। কোন মানুষের সাধ্য সেদিকে এগুবে। এ-পারে বন্দুক হাতে সিপাই। লক্ষ্যার চরে হাজার-হাজার মানুষ। মাঝখানে সড়ক। ওরা সড়ক অতিক্রম করে নামাজ পড়ার জন্য উঠে আসতে পারে ভয়ে সীপাইরা বন্দুক উঁচিয়ে রেখেছে। একটা গরু পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে চরে। কোরবাণীর জন্য গরুটাকে বোধ হয় কেউ নিয়ে এসেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। এত বড় একটা ধর্মযুদ্ধের মোকাবিলা প্রায় বলতে গেলে তাকেই সবটা করতে হয়েছে। সাধারণ মনুষ্য তোমরা। তোমাদের ধর্মের নামে ক্ষেপিয়ে দিয়ে পিছনে মাতব্বর মানুষেরা তামাসা দেখছে। আমাদের রক্ত সনাতন। হিন্দুধর্ম, মা করুণাময়ী মায়ের আশ্রয় তাদের আবার ভয় কি। তবু এত সব যে আয়োজন সবই মার অশেষ কৃপায়। তাঁর ইচ্ছা না হলে সাধ্য কি সে এত বড় একটা উন্মত্ত জনতার বিরুদ্ধে লড়ে। সে বড়বাবুর জন্য একটা দূরবীন কিনেছিল। বড়বাবুর ঘোড়ার মাঠে যাবার অভ্যাস ছিল। তার সেই দূরবীনটা এখন বড় কাজে লাগছে। সে এবং বাবুদের যুবক ছেলেরা ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে বন্দুক হাতে সুন্দর আলি। উপরে ওরা ওদের গুপ্ত স্থান বেছে জায়গা নিয়ে নিয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্তপথে সব বাবুদের বাড়ি হেঁটে-হেঁটে আক্রমণের মোকাবিলা করার সব রকমের ফন্দি-ফিকির করে এইমাত্র ছাদে উঠে চরের দিতে তাকাতেই দেখল, হাজার-হাজার মানুষ চরে গিজ-গিজ করছে। এ-পাশে তারকবাবুর বৈঠকখানার নিচে সবুজ যে মাঠ, মাঠের পাশে সিপাইরা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পুতুলের মতো। সে চরে ফের দূরবীনে দেখতেই তাজ্জব বনে গেল। ফেলু এসেছে এই চরে। আর তার হাতের কাছে ওর সেই বাগি গরুটা। গরুটাকে সে এত দূর টেনে নিয়ে এসেছে। এই গরুর জন্য ফেলুর প্রাণপাত। সে এই গরুটাকে শেষে কোরবাণী দিতে নিয়ে এসেছে! তার বড় প্রিয় এই জীব। জীবের জন্য সারাটা শীত-কাল এবং হেমন্তে অথবা বর্ষায় কি না কষ্টে ঘাস সংগ্রহ করে এনেছে!

দূরবীনে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে গরুটার। নীল চোখ। অবলা জীব এমন মানুষের ভিড়ে পাগলা হয়ে গেছে। সেই হাতীটার মতো। ক'জন সিপাই এসেছিল কর্মিটোলা ক্যান্টনম্যাণ্ট থেকে। হাতীটাকে শুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন এ-অঞ্চলে যত নৌকা ছিল যুদ্ধের জন্য সব ইজারা নিচ্ছে সরকার। হাতীটাকেও ওরা ইজারা নিয়ে নিল। হাতী কেন এ সব মানবে। হাতীটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না। জসীমের উপর ভার তাকে ঘাঁটিতে দিয়ে আসার। জসীমের স্ত্রী বেঁচে ছিল না। মাতৃহীন এক শিশুকে সে বড় করছে। আর বড় করছিল যেন এই হাতীকে। সে সারাক্ষণ হাতীর সুখ দুঃখে নিমজ্জিত। নিজের বলতে সে কিছু জানত না। সে হাতী নিয়ে আর পুত্র ওসমানকে নিয়ে হেমন্তের মাঠে আকাশের নিচে হেঁটে হেঁটে কত দূর দেশে চলে যেত। সেই হাতী ঘাঁটিতে যেতে না যেতেই কেমন পাগলের মতো করতে থাকল। জসীম কিছুতেই ছেড়ে আসতে পারছিল না হাতীটাকে। জসীমকে কিছুতেই পিঠ থেকে নামতে দিচ্ছিল না। নেমে গেলে সে, ফের শুঁড়ে ওকে তুলে পিঠে বসিয়ে দিয়েছে হাতী।

এই গরু নিয়ে এমনি কতদিন দেখেছে ভূপেন্দ্রনাথ, ফেলু ঝোপঝাড়ের ভিতর বসে রয়েছে। সে চুরি করে কতদিন অন্যের ফসল খাওয়াচ্ছে। মারধোরের ভয় আছে। মেরে ওর হাড় ভেঙ্গে দিতে পারে প্রতাপ-চন্দ্রের সেই ছেলে অথবা গৌর সরকারের চাকরটা, সে সব ভয় তুচ্ছ করে জীবনপাতে বাগি বাছুরটাকে বড় করে তুলে এখন তাকেই এনেছে কোরবাণী দেবে বলে।

ভূপেন্দ্রনাথ চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে ছাদের আলসেতে ভর দিল। চরের মানুষেরা সহসা সহসা ধ্বনি দিচ্ছে। পাল্টা ধ্বনি দিচ্ছে দীঘির পাড়ে যারা দাঁড়িয়েছিল। যারা সব গ্রামের মানুষ, সবাই এসে দীঘির পাড়ে জড় হয়েছে। রেলীঙ্গের পাশে পাশে গরম জল ফুটছে, ভাঙ্গা ইট জমা করছে এবং বল্লম সড়কি নিয়ে পাহারা। মেয়ে বৌদের ঠেলে সব মন্ডপের দালানে, ভিতর বাড়িতে. রান্নাবাড়ির পাশে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি ওদের ছাদে পর্যন্ত উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। গ্রামের মেয়ে বৌরা পর্যন্ত আলাদা আলাদা ফ্রন্ট করে দাঙ্গার মোকা-বিলা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এতক্ষণ পর কেমন ভূপেন্দ্রনাথ সব দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওরা নামাজ পড়তে না পারলে অন্যদিকে হল্লা করবে। লুটপাট করবে। সুতরাং সর্বদিক থেকেই যাতে মোকাবেলা করা যায়, করতে না পারলে নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটবে। ঠিক যেমন কোরবাণীর পশু দু চোখ উল্টে থাকে, তেমনি সনাতন ধর্ম চোখ উল্টে থাকবে—যা সব আয়োজন, চোখ উল্টে থাকার আর ভয় নেই। যেদিক থেকেই আক্রমণ আসুক তাকে প্রতিহত করার সব সুবন্দোবস্ত আছে ভেবে সে রুমালে নিশ্চিন্তে মুখ মুছল। আর মনে হল তখনই নদীর চরে একটা অবলা জীব হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। ভূপেন্দ্রনাথের শরীরের ভিতর সব রক্ত এক সঙ্গে টগবগ করে ফুটতে থাকল।

এই নামাজে ফেলু পর্যন্ত এসেছে দশ ক্রোশ পথ হেঁটে। সূর্য এখন নদীর ওপারে অস্ত যাবে। ওরা কি তবে রাতে রাতে উঠে আসবে গ্রামে। দুশ্চিন্তায় ফের ভূপেন্দ্র-নাথের মুখটা নীল হয়ে গেল। বাবুরা সব এখন চন্ডীমন্ডপে বসে আছেন। মাঝে মাঝে সব খবর পাঠাতে হচ্ছে। বড়বাবু একবার ছাদে উঠে দূরবীনে সব দেখে গেছেন। এবং কিভাবে ভূপেন্দ্রনাথ এই আক্রমণের মোকা-বেলা করছে দেখে তিনি খুব খুশী হয়েছেন তার উপর।

দূরবীনে নদীর চর বড় দেখাচ্ছে। নদীর জল শান্ত। কাশবনে কোন ফুল নেই। জল খুব নিচে নেমে গেছে। নদীতে একটা নৌকা নেই। যারা নৌকায় এসেছে, তারা নৌকা চরে টেনে তুলে রেখেছে। কালা রঙের সব নৌকা, আর মাথা গিজগিজ করছে। মাথার উপর নিশান উড়ছে এবং হাতের সব সড়কি আসমানের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলছে তারা, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। তখন শঙ্কায় ভূপেন্দ্রনাথের বুকটা কাঁপছে।

ভূপেন্দ্রনাথ দূরবীনেই দেখল ফেলু এক হাত সম্বল করেই চলে এসেছে। সম্বল তার এক চোখ।

আর ঠিক সেই প্রকান্ড ষণ্ডের মতো এক চোখ নিয়ে দুই পারে দুই জনা মোকাবেলায় প্রস্তুত। জসীম গাছের নি[illegible] দুই চোখ খুলে রেখেছে। আর দুই চো[illegible] আছে বলেই বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছে। যেমন বিমর্ষ ছিল, হাতীটাকে ছেড়ে আস[illegible] দিন। সে বার বার হাতীটার পিঠ থে[illegible] নেমে এলে হাতীটা তাকে পিঠে ব[illegible] দিতে থাকল। প্ল্যাটুন কমান্ডার বলল[illegible] জসীম, তুমি এবার নেমেই ছুটে চলে যা[illegible] হাতীর পায়ে শেকল, শেকলে বাঁধা [illegible] হাতী ছুটতে পারবে না।

সে নেমে যেতে পারছিল না। [illegible] দিয়ে ওকে পিঠে তুলে নিচ্ছিল ফের। কত অবলা জীব, জসীম কাছে না থা[illegible] সে বাঁচবে না এমন আকুল চোখ হা[illegible] হাতীর কষ্ট কমাণ্ডার সাব কি জান[illegible] সে এই হাতীর জন্য নিজের বিবির[illegible] ভুলে গেছিল। সে যেদিন ছোট নাবা[illegible] হাত ধরে বিবিকে মাঠে কবর দিয়ে ছিল, কি তখন অন্ধকার চোখে! কার রেখে যাবে এই ওসমানকে। ওসমান থেকে কার কাছে থাকবে! ওসমানকে বাবুদের বাড়িতে এসে হাতীর পিঠে বসলে তার আর বিবির দুঃখ থাকত[illegible] উন্মুক্ত আকাশের নিচে হাতী, সে এবং পুত্র ওসমান। ঘাস কাটতে নদী[illegible] নেমে গেলে ওসমান থাকত হাতীটার [illegible] সে বলত, লক্ষ্মী তর কাছে থাকল ও[illegible] আমি ঘাস কাটতে যাইতাছি।

তখন যত খেলা হাতীর এই ও[illegible] সঙ্গে। সে হাতীকে ছোট ছোট এগিয়ে দিত, সে হাতীর পায়ে [illegible] প্যাঁচ লেগে গেলে খুলে দিত।

চালিয়ে যেখানে ঘাড়ে সামান্য ঘা, সেখানে বড় বড় মাছি উড়ে এসে বসলে খুব কষ্ট হাতীর। ওসমান হাতীর পিঠে বসে মাছি তাড়াত। বাপ যে মালিশ এনে দিত, সে সারাক্ষণ ঘায়ে মালিশ মেখে দিত। কোন কোনদিন সে এইভাবে ঘুমিয়ে পড়ত শানে। অথবা হাতীর পেটে পিঠ রেখে শুয়ে থাকত। হাতী অবলা জীব, লক্ষ্মী এবং পয়মন্ত বলে জসীম এসে দেখতে পেত ওসমান হাতীর পেটে পিঠ দিয়ে দুপুরে আমগাছের ছায়ায় ঘুম যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি ছেলেকে ডেকে তুলত। হাতী এবং ওসমান উভয়কে সে নদীর জলে স্নান করিয়ে এনে খেতে দিত দুজনকে। ওসমানের জন্য চিড়া-গুড়, আর হাতীর জন্য কলাগাছ। বিবি মরে গেলে এই হাতীই ছিল প্রায় বিবির মতো। সে সময়ে-অসময়ে ডাকত, লক্ষ্মী, অ লক্ষ্মী, তরে দিমু ধান্য-দুর্বা, তুই বাঙ্গালাদেশের নদী পার হইয়া আর কোনখানে যাইস না। তুই থাইক্যা যা আমার লগে। হাতী বুঝি জসীমের বুকের ভিতর যে একটা কোড়াপাখি ডাকছে শুনতে পেত। শহরে গঞ্জে কত দূরদেশে গিয়েও হাতী কখনও পথ ভুল করত না। একবার জসীমের কি জ্বর। বাবুরা গিয়েছিল বাঘ শিকারে। শিকার শেষে ওরা জয়দেবপুর থেকে ট্রেনে আর জসীম মৃত বাঘ নিয়ে একা। হাতীর পিঠে বাঘ, জসীম। জসীমের এমন প্রবল জ্বর যে সে খর রোদে চোখ মেলতে পারছে না। ক্ষণে ক্ষণে জলতেষ্টা পাচ্ছে। বেহুঁস জসীম। হাতী যেন সব বুঝতে পেরে নদী থেকে জল তুলে দিয়েছিল শুঁড়ে। হতভাগ্য হাতী নদীর পারে জসীমকে নামিয়ে শুঁড়ে জল তুলে এনে মাথায় ঢাললে জসীম চোখ মেলে তাকিয়েছিল। কোথায় যে যাচ্ছে লক্ষ্মী, সে টের পাচ্ছে না। সে পিঠের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। অথচ লক্ষ্মীর যেন জানা, সে দ্রুত পা চালিয়ে সোজা পথ চিনে চলে এসেছিল। পথ সে এতটুকু ভুল করেনি।

সেই লক্ষ্মীকে ওরা মেরে ফেলল। জসীম চলে যাচ্ছে আর আসছে না, বুঝি টের পেয়ে গিয়েছিল হাতী। তাকে কিছুতেই পিঠ থেকে নামতে দিচ্ছিল না। সে সোজা নিচে নেমে এসে শুঁড়ে হাত বুলাতে থাকল। আবার সে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই নিতে আসবে এমন বলল। পাগলামি করলে চলবে কেন। বাবুরা যারা আছে এখানে সবাই ভালবাসবে তাকে। কেউ কোন কষ্ট দেবে না। এত সব বলেও জসীম পার পেল না। সে একটু দূরে গেলেই হাতী প্রথম শুঁড় তুলে কি দেখল। তারপর জসীম ক্রমে দূরে চলে যেতে থাকলে হাতী শুঁড় তুলে চিৎকার করতে থাকল। যখন আর জসীমকে দেখা গেল না, হাতী শেকল ছিঁড়ে ছুটতে থাকল। সামনে সেই প্ল্যাটুন কমাণ্ডার—সে রোখ্‌কে রোখ্‌কে বলে এগিয়ে গিয়েছিল আর দ্যাখে কে, একেবারে হাতীর পায়ের তলায়। তখন সোরগোল চারপাশে। সামনে যেসব তাঁবু পড়ছে সব ভেঙে দিচ্ছে। জসীমের কাছে যাবার জন্য সে সব বাধা লোপাট করে এগুচ্ছে। জসীম দূর থেকে দেখল হাতীটা ছুটে আসছে। আর সোরগোল। হাতী পাগল হয়ে গেছে। পর পর তিনজন মানুষকে পায়ের তলায় পিষ্ট করেছে। সুতরাং দুম্ দুম্। হাতীর সামনে কাপ্তান দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়েছিল। জসীমও তখন চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছিল—হা আল্লা! সে দেখল তার লক্ষ্মী গুলি খেয়েও পড়ে যায়নি। টলতে টলতে জসীমের পায়ের কাছে এসে হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়ল। কপাল থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। মুখটা চেনা যাচ্ছে না লক্ষ্মীর। রক্তে সমস্ত মাথা লাল হয়ে গেছে। মরতে মরতেও লক্ষ্মী, কি যে ভালবাসা তার, মাঠের মতো অথবা আকাশে পাখি ওড়ার মতো ভালবাসা। লক্ষ্মী অতিকষ্টে শুঁড়টা বাড়িয়ে দিল। যেন এই শুঁড় বেয়ে জসীম তার পিঠে উঠে বসে। এবং তাকে নিয়ে সেই নদীর পাড়ে সে চলে যায়।

জসীম লক্ষ্মীর মাথার কাছে সেদিন চুপচাপ বসেছিল। কত মানুষ চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। বড় বড় সাহেব-সুবা এল, তাকে নানারকম প্রশ্ন করল, সে কোন জবাব দিতে পারছিল না। ডিভিসনের তাবৎ মানুষ এসে ওকে দেখে গেছে—এক হাতী আর তার মাহুত, সারাজীবনের সঙ্গী। কবর খোঁড়ার সময় সে শুধু উঠে কবরে নেমে গিয়ে লক্ষ্মীর ঠাঁই হবে কিনা, এই মাটির নিচে না অন্য কোথাও সে তাকে নিয়ে যাবে, কোথায় আর যাবে, পারলে সে তাবৎ এই মনুষ্যকুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, বলে আমি তারে নিয়া যামু নদীর পারে। এখানে তরে কবর দিমু না। কিন্তু সে জানে তার ক্ষমতা সামান্য, সে কি আর করতে পারে! সারাদিন সে হাতীর মাথার কাছে বসেছিল। মাটি খোঁড়ার শব্দ উঠছে। বুকে এসে শব্দটা ভীষণ তার ধাক্কা মারছে। এখানে এই ঝোপের ভিতর বসে জসীম আর এক ধাক্কার ভিতর পড়ে গেল। সে যাবে কার দলে! সে চরে নেমে যাবে, না বাবুদের রক্ষার্থে তাদের বাড়ি উঠে যাবে। পিলখানার ও-পাশের রাস্তায় সে সেই শক্ত মানুষটিকে দেখতে পেল। তিনি যাচ্ছেন মা আনন্দময়ীর বাড়ি। মুণ্ডমালা গলায় মা হাত তুলে আজ অসুরনাশিনী। জসীম বলতে চাইল—ক্যাডা অসুর মা জননী। তখনই সে দেখল কোমর থেকে কোরবানের চাকুটা ফেলু খাঁ করে বের করে ধরছে রোদে। রোদ ইস্পাতের উপর সহসা এক ঝিলিক খেলে গেল। ফেলু কোরবানের চাকুতে সূর্যের আলোতে ধরে নানা বর্ণের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে চাইছে। কি ভয়াবহ! চাকুটা দেখেই বাগি গরুটা লাফ মারছে। গরুটা লাফ মারছে, কি মরণ নাচন নাচছে বোঝা যাচ্ছে না। চারপাশে মানুষের বড্ড ভিড়। সে এখন ইস্পাতের উপর সূর্যের আলো ধরে রাখতে চাইছে।

ফেলু দেখল, তখনই আকালুদ্দিন ছিক করে পানের পিক ফেলছে। চরে এখন খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। বড় বড় মেটে হাঁড়ি। হাঁড়িতে ডাল-চাল সেদ্ধ। যে যার মতো গলা পর্যন্ত খেয়ে নিচ্ছে। নামাজ পড়ার আগে অজু থাকতে নেই। আকালুদ্দিন কোথা থেকে একটা পান পর্যন্ত সংগ্রহ করে এনেছে। ফেলু বলল, হালার কাওয়া! পান খাইয়া ঠোঁট লাল করছে। হালার কাওয়া। সে এবার লক্ষ্য রাখল ভিড়ের ভিতর আকালুদ্দিন কোনদিকে যায়। যেন আকালুদ্দিন না এলে এই ধর্মযুদ্ধে সে আসত না। সে সব সময় আকালুর উপর কড়া নজর রেখেছে। ধর্মগত প্রাণ তার—নতুবা সে আসত না। পবিত্র ইসলাম সে। তার জন্য কিছু করা চাই। সে প্রায়ই খোয়াব দেখেছে, এক নির্জন মাঠে, ভাঙা ইট-কাঠের সামনে দাঁড়িয়ে সে নামাজ পড়ছে। ভাঙা ইট-কাঠ এবং গম্বুজ কাবা মসজিদের সামিল। মসজিদের পাশে হিন্দুদের দেবদেবীরা পাথর হয়ে আছে। ভাঙা হাত-পা নিয়ে ওরা পড়ে আছে। এমনিতেই ঘুম আসে না। কখন আমু রাতে চুরি করে মাঠে নেমে যায় এই এক ভয় তার, আর যখনই ঘুম আসে তখন শুধু একটা দৃশ্য চোখে ভাসে—সে একটা জঙ্গলের সামনে সবুজ ঘাসের উপর বসে নামাজ পড়ছে। বাবুরা ভাঙা মসজিদের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রেখেছে। সাতটা মসজিদের খরচ চালায়। তবু তোমরা মিঞা মানুষেরা মা আনন্দময়ীর পাশে এই বন-জঙ্গলে নামাজ পড়তে পাবে না।

এ-ভাবেই জিদ বেড়ে গেছে ফেলুর। সে চলে এসেছে। আসার সময় সারাটা পথ সে নজর রেখেছে আকালুর উপর। হলার কাওয়া—সে আবার সবাইকে ধর্মযুদ্ধে পাঠিয়ে নিজে একা গাঁয়ে থেকে যেতে পারে। আন্নুর সাথে বড় তার পিরিত। পিরিতের ভয়ে সে সারাটা পথ, এমনকি এখনও সব সময় চোখের উপর রেখেছে। চোখের উপর থেকে আকালু হারিয়ে গেলেই সর্ষে ফুল দেখছে সে। কিন্তু এখন মুখ দেখে মনেই হয় না আকালুর, সে আন্নুর কথা ভাবছে। ফেলু ভীষণ উত্তেজিত, যেমন সবাই উত্তেজনা নিয়ে এই

চরে ঘোরাফেরা করছে এবং নির্দেশের অপেক্ষায় আছে—কখন ওরা সব ভেঙে তছনছ করে দেবে।

অথচ এই চরে ফেলুর কোরবানের চাকুটা রোদে ঝলসে উঠলে সে দেখতে পেয়েছিল—পিলখানার মাঠ পার হলে এক-দল পুলিশ সঙ্গিন উঁচিয়ে আছে। ওর কেন জানি প্রাণের জন্য মায়া হতে লাগল। তবু রক্তে উত্তেজনা। আল্লা সব দেখতে পাচ্ছেন। মাথার উপর এত বড় ফাকির মানুষটা যখন রয়েছে, তখন আর ডর কিসের। সব বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বের হবে, কোনদিন আর গুলি বের হবে না। কারবালা প্রান্তরে হাসান হোসেনের যুদ্ধ, অথবা এজিদ, কারা যে কি করে! ধর্ম সার জেনে সে তার মন শক্ত করে রাখল এবং এক হাতে বাগি গরুটাকে টেনে রাখল। হালার কাওয়া! গরুটা ভয়ে লেজ তুলে ছুটতে চাইছে। অবলা জীব, সে এ-সবের কোন মানে বুঝতে পারছে না। ফেলু এবার প্রাণের দায়ে হা-হা করে হাসছিল।

তখন দু-পক্ষ থেকেই ধ্বনি উঠছে। এক পক্ষ এই যে দেবী আমাদের সনাতন ধর্মের প্রতীক, গলায় মুণ্ডমালা মা জননীর, হাতে খাঁড়া, চোখে বিদ্যুৎ খেলছে—সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের দেবী মন্দিরে আছেন, থাকেন, কার সাধ্য তারে অপবিত্র করে! তার পাশে এক দল যখন নামাজ পড়ে কোরবানী দিয়ে যাবে সে হয় না, রক্তের ভিতর হিন্দু মানুষের হাজার লক্ষ অসুর নাচছে, টগবগ করে রক্ত ফুটছে। ওরা চরে একটা গাইগরুর হাম্বা ডাক শুনে স্থির থাকতে পারল না। হাত তুলে বর্শা নিক্ষেপ করে চিৎকার করে উঠল, বন্দে মাতরম্। মা আনন্দময়ী কি জয়!

এভাবে জয়ধ্বনি নদীর দু'পাশে। চরে আর পিলখানার মাঠে। দুই দল যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। কালীবাড়ির চারপাশটায় যুবকেরা দাঁড়িয়ে সৈনিকের মতো পাহারা দিচ্ছে। পাশের বনটা শুধু একশো চুয়াল্লিশ ধারা আর যা আছে নিজেরা রক্ষা করো—কিংবা সবটাই আছে, সীমানা কেউ জানে না। কতদূর পর্যন্ত এর বিস্তার। যেমন কেউ জানে না বস্তুত এই ঝোপে জঙ্গলে আদতে এটা কি, মসজিদ, মন্দির না কোন বোম্বেটেদের দুর্গ, কি হাজার রূপসী এখানে নেচে গেয়ে গেছে। কেউ সঠিক জানে না অথচ যে যার মতো একে মসজিদ মন্দির বানিয়ে নিচ্ছে। ভিতরে কেউ যেতে পারে না। রাজ্যের শেয়াল খটাশ এখানে বসবাস করে। রাত্রিবেলা আরতির ঘণ্টা বাজলে গণ্ডায় গণ্ডায় শিয়ালের হুক্কা হুয়া। নিশীথে শিবা-ভোগ হলে অন্ধকারে একজোটা নীল চোখ জীবের, বনের ভিতর উঁকি দিয়ে থাকে। সুতরাং এই সব মাংসাশী প্রাণীরা এখন ঝোপের ভিতর থেকে এত মানুষ দেখে বড় তাজ্জব বনে গেছে।

শেয়াল খটাশের বাস। দিনের বেলা ঢুকতে ভয়। কত সব বিষাক্ত সাপখোপের বসবাস। সূর্যের আলো পর্যন্ত বনের ভিতর ঢুকতে পায় না। এমন সব নিবিড় জঙ্গল। কি যে ছিল এটা! গম্বুজ দেখে মুসলমানরা ভেবেছে এটা মসজিদ, খিলান দেখে বাবুরা ভেবেছে এটা মন্দির এবং ঐতিহাসিকের মতে—কারণ তারা মিনারে নানারকম হলুদ-নীল কাচের সন্ধান পেয়েছিল, স্থাপত্যশিল্পে পর্তুগীজদের কাছাকাছি—সুতরাং জলদস্যুদের আখড়া না হয়ে যায় না। এই হাস্যকর অবস্থায় মানুষেরা এখানে এসে ভয়ঙ্কর এক দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে। মানুষের জন্য মানুষ, না কোরবানীর জন্য মানুষ বোঝা যাচ্ছে না। কারণ ভাবলে বিশ্বাসই করা যায় না, এই এক হাস্যকর ব্যাপারে এ-দেশে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। পারে না হয়ত, কোনদিনই পারে কিনা তাও ভাবা যায় না—যদি না এর ভিতর আলি সাহেবের হাস্য জেগে উঠত। এই দেশে হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষ জাগিয়ে দাও। অর্থনৈতিক সংগ্রামের কথা এখন বলা যাবে না, শ্রেণীসংগ্রামের কথাও বলা যেত, কিন্তু কিছু উপরতলার মানুষ রয়ে গেছি আমরা, আমাদের তবে কি হবে! তার চেয়ে ভাল ধর্ম জাগরণ। ধর্মের নামে ঢোল বাজিয়ে আখের গুছিয়ে নাও।

সুতরাং ধর্মের নামে ঢোল বাজিয়ে আপাতঃ আখের গোছানো হচ্ছে। জসীম বসে আছে মাঝখানে। পিলখানার মাঠে। সে হাতীর স্নানের সময় হলেই একটা কাটা গাছের গুঁড়িতে এসে বসে থাকে। তার এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সে যে বসে রয়েছে পথ থেকে টের পাওয়া যায় না। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ সে সব দেখতে পাচ্ছে। সে আছে মাঝখানে। সে বসে দুদিকে দু-দল মানুষের লম্ফ-ঝম্ফ দেখছে।

আর দেখছে ঈশম। সে দেখছে সকাল থেকেই হাটুরে মানুষের মতো লোক যাচ্ছে সেই ভাঙা মসজিদে নামাজ পড়বে বলে। সে যায়নি। সে তরমুজ খেতে বসেই নামাজ পড়ছে। নামাজ পড়ছে না চুপচাপ বসে আছে হাঁটু মুড়ে বোঝা দায়। দু-হাত সামনে প্রসারিত। পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে থাকা শান্ত মূর্তি এবং লম্বা সাদা দাড়ি, নীল রঙের তফন, বিস্তীর্ণ বালুবেলা, সোনালি বালির নদী আর এক পাগল মানুষ কেবল নদীর পারে পারে হেঁটে হেঁটে যায়—কোথায় যে যায়, কি যে চায় মানুষটা! অথচ তিনি না হেঁটে গেলে কেমন খালি খালি লাগে এই মাঠ এবং নদী। এদেশে তিনি এমন হয়ে গেছেন—তিনি না হেঁটে গেলে যেন সূর্য উঠবে না, পাখি ডাকবে না এবং গাছে গাছে ফল ধরবে না, ফুল ফুটবে না। এই পাগল মানুষ আছেন, নিশিদিন তিনি মাঠে মাঠে বনে বনে অথবা বালুবেলাতে পায়ের ছাপ রেখে যান, যেন নিত্য বেড়ে-ওঠা ঘাস ফুল পাখির মতো তিনিও এই জন্মভূমির খণ্ড অংশ হয়ে গেছেন। তাঁর এই ক্রমান্বয় হাঁটা, কবিতা আবৃত্তি, বড় বড় চোখে তাকানো, সরল শিশুর মতো ঈশ্বরের পৃথিবীতে বেঁচে থাকো তোমরা মুখের অবয়বে এমন ইচ্ছা, ঈশমকে কখনও কখনও বড় অভিভূত করে রাখে। সে বলল, কর্তা বাড়ি যান আসমানের অবস্থা ভাল না।

অথচ দ্যাখো আকাশ কি নির্মল! অথচ ঈশম এমন কথা কেন যে বলল! ঈশম কি টের পেয়ে গেছে এখানে এবার দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। এই নিষ্পাপ মানুষকে কেউ হত্যা করতে পারে! সে তবে এমন নির্মল আকাশের নিচে বসে পাগল মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছে কেন! আসমানের অবস্থা ভাল না বলছে কেন। ওর ভিতরে কি একটা ভয়ংকর আদিম অন্ধ বিবেক বুঝতে পারছে অদৃশ্য এক আকাশের নিচে ভয়ংকর কালো একটা মোষ দিনরাত ফুঁসছে। সুযোগ পেলেই পাগল মানুষকে ফালা ফালা করে দেবে!

(ক্রমশঃ)

## ক্রমে ক্রমে শিখবে

আমার এই টেবিল থেকে সে জায়গাটা কতদূরে? বেশী না, দু বারে মোট পঁচিশ পয়সা লাগবে—গোপালনগর থেকে দশ পয়সার টিকিটে সা-পুরে পেট্রোল পাম্প, সেখান থেকে একখানা পনেরো পয়সার টিকিট। ব্যস, চোখ বুজতে না বুজতেই ঢুলুনির মেজাজটা জমে না উঠতেই, কানে আসবে কন্ডাক্টরের হাত-পা-ছড়ানো চীৎকার—থানা, থানা, নাবুন সব। নামলাম। থানার উল্টো দিকে বড় রাস্তার ওপাশে খোলা ড্রেনের ওপর খাট পেতে, দরজার বেড়া দিয়ে টেম্পোরারী অ্যারেঞ্জমেন্টে পার্মানেন্ট সব পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। যখন ছাত্র ছিলাম, রেগুলার পড়তে আসতাম এই ইউনিভার্সিটিতে, মনে আছে, রোজ ঘরে ফেরার পথে এইসব দোকান থেকে আমরা সিগারেট নিতাম। তারপর টানতে টানতে, হাঁটতে হাঁটতে মাস্টারমশাইদের পড়ানোর বিশেষ পদ্ধতি নিয়ে নানা রকম চুটকি কাটতে কাটতে এগোতাম বড় মোড়টার দিকে। আমরা পাঁচজন—রথীন, সুশীল, আশীষ, দেবেন আর আমি পি কে—নাইট ক্লাস সেরে যখন বাসায় ফিরতাম তখন নির্জন বড় রাস্তার মোড়ে ম্যাড়মেড়ে বারোয়ারী আলোর তলায় গুটি-সুটি মেরে গুজন কয়েক ভিখারী আর কয়েকটা বেওয়ারিশ কুকুর দলপাল পাকিয়ে পড়ে থাকত। সুনসান রাস্তাঘাট। দোকান-টোকান সব বন্ধ। দু একটা সিগারেটের দোকানে তখনো ঝাঁপ পড়ে নি। বাস না ট্রাম কোনটারই পাত্তা নেই। সবাই আমরা তখন ক্লান্ত। সারাদিন স্কুলে বা ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, রাতে নাইট ক্লাস করে প্রচন্ড টায়ার্ড। পরদিন ভোর না হতেই ছুটতে হবে। ভাবতেই মাথাটা কেমন গরম হয়ে যেত। মাঝে মাঝে ভাবতাম—দূর কি হবে পড়াশোনা করে। তার চেয়ে বরং যা করছি, তাই করি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত, দুটো বছর তো হয়ে গেল আর তো মোটে দু বছর। তারপরেই ডিগ্রী পেয়ে গেলে, পুরোপুরি ইঞ্জিনীয়ার। তখন আর পায় কে?

আর এ জন্য কি কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে? শুধু অ্যাডমিশন টেস্টটুকু উতরোনোর জন্য পঁচিশ টাকা দিতে হয়নি দত্তকে? দিতে হয়েছে। ভাগ্যিস দিয়েছিলাম। তাই সেদিন নাইটে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর পেয়েছিলাম বলেই তো আজ খোদ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের টেস্ট হাউসে ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার হয়ে বসে আছি। বেসিক, ডি-এ, হাউস রেন্ট-টেন্ট মিলিয়ে কম করেও এগারোশ টাকা পাচ্ছি। আমার অফিসে কয়েকটি ডিপ্লোমা-পাস ছেলে কাজ করে। কলকাতা বা মফস্বলের পলিটেকনিক থেকে পাশ করেছে ওরা। দু চারজন আছে বিহার আর উড়িষ্যার। ওরাই আমায় ধরেছে—স্যার আপনি তো নাইটে পড়েছেন ওখানে। আমাদের একটু ঢোকার ব্যবস্থা করে দিন না।

হাসতে হাসতে বলেছি, কেন মার্চ-এপ্রিলে তো ওখানে অ্যাডমিশন টেস্ট হয়। তোমরা দাও, নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।

হলে তো স্যার, আপনাকে ডিসটার্ব করতাম না। —মহান্তি ছেলেটা খুব স্মার্ট। বাড়ী জলেশ্বরে। টেস্ট হাউসে আছে বছর খানেক। কাজটাজ করে ভাল। কথাবার্তাতেও চৌখস— দত্তবাবুকে তো আপনি চেনেন। বলে দিন না, আমরাও যাতে ওর কোচিংয়ে চান্স পাই। কোচিংয়ে চান্স পেলে অ্যাডমিশন গ্যারান্টিড।

কি আশ্চর্য! এতদিনেও কিছু পাল্টায় নি! দত্তবাবু, প্রো, সাহা, প্রো, রায়দের কোচিং এই ডামাডোলের বাজারেও বহাল তবিয়তে চলছে। বেকার ইনজিনিয়ারে গুদাম উপচে উঠেছে। তবু প্রোমোশন, বেটার প্রসপেকটের আশায় কাতারে কাতারে ছেলে লাইন লাগাচ্ছে নাইটে। ডিগ্রী পেলে জাতে উঠবে, পাতে পড়ার যুগ্যি হবে। একদিন আমিও তো সেই আশাতেই লাইন লাগিয়েছিলাম।

ফিফটি এইটে এল-এম-ই পাশ করে বারাসাতের কাছে একটা হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের টেকনিক্যাল সেকশনে মাস্টারী জুটিয়েছিলাম। বাড়ী গার্ডেন রীচে। বাসে, ট্রেনে যাতায়াত করে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আশীষ বোসও ঐ স্কুলে মাস্টারী করত। আশীষই বলল—চল না, ডিগ্রী পড়ি নাইটে। ডিগ্রী পেলে চাকরী-বাকরীর ব্যাপারে আর কোন ঝামেলা থাকবে না। তখন দিনকালও ভাল ছিল। ডিগ্রী-ইনজিনিয়াররা পকেটে সর্বদাই খান চার পাঁচেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা ইন্টারভিউ লেটার নিয়ে ঘুরত। বিনে পয়সায় দেশ-ভ্রমণের নেশা মেটানোর জন্য বকস নম্বরে

অ্যাপ্লাই করলেই ইন্টারভিউ জুটত। দিলাম অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে—নাইটে পড়ার।

পড়ব তো কিন্তু চান্স পাব কি? আমাদের দুজনেরই সন্দেহ হোল। অ্যাডমিশন টেস্টের দুটো পেপারের কোর্স দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। পেপার ওয়ান ম্যাথস। ম্যাথমেটিকসে ক্যালকুলাস, হাইড্রো-স্ট্যাটিকস পড়তে হবে। পলিটেকনিকে আমরা ক্যালকুলাস পড়ি নি। আর সেকেণ্ড পেপারে ইঞ্জিনীয়ারিং মেকানিকস। ডিপ্লোমার অ্যাপ্লায়েড মেকানিকসের সঙ্গে সাবজেকটটার যথেষ্ট মিল থাকলেও, গরমিল বিস্তর।

নাইটে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা, যা দরকার—ডিপ্লোমা প্লাস চাকরী—সবই ছিল। কিন্তু ঐ টেস্ট উতরোব কি করে? পথ বাতলাল সুশীল। পলিটেকনিকে এক সঙ্গে তিন বছর পড়েছি। পাশ করে ও তখন একটা ওয়াগন ফ্যাকটরীতে কাজ করছে। ইউনিভার্সিটিতে ঘুরে খোঁজ খবর নিয়ে এসে বলল—সব হয়ে যাবে, কোন ঝামেলা নেই। চাই শুধু পাঁচজনের একটা গ্রুপ আর মাথাপিছু পাঁচশো টাকা।

ব্যাপার কি? না, অ্যাডমিশন টেস্টের পেপার-সেটার আর পরীক্ষকরা মিলে একটা প্রাইভেট কোচিং চালান। কোচিং-এর মধ্যমণি প্রোঃ মধু দত্ত, সঙ্গে আছেন ম্যাথমেটিকসের রীডার প্রোঃ সাহা আর মেকানিক্যালের প্রোঃ রায়। সিভিল ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল মিলিয়ে ইউনিভার্সিটিতে সীট মোটে নব্বইটা। ক্যান্ডিডেট বছরে চার পাঁচশো। যদি চান্স চাও তো কোচিংয়ে নাম লেখাও। প্রাক্তন ছাত্রদের অভিজ্ঞতার সারাংশ জানাল সুশীল—মোটে টেন পারসেন্ট ঠিক-ঠাক নিজেদের চেষ্টায় চান্স পায়, বাদ বাকী নাইনটি পারসেন্ট আসে ঐ কোচিং থেকে।

কোচিং মানে, নিয়মিত যে ক্লাস হবে তা নয়। বড় জোর দুটো দিন হবে ক্লাস। ঐ ক্লাসেই স্যাররা সাইক্লোস্টাইলড কোশ্চেন পেপার আর সলিউশন দিয়ে দেবেন। তার জন্য লাগবে পাঁচশো টাকা। ডিসেম্বরে পড়তে গেলেও যা দিতে হবে, মার্চে নাম লেখালেও তাই। এ ব্যাপারে স্যাররা খুব ডেমোক্রেটিক। তবে হ্যাঁ, একলা গেলে ঠাঁই মিলবে না। পাঁচজনের গ্রুপ, অর্থাৎ থোক আড়াই হাজার টাকার একটা ডালি উপহার দিতে পারলে, তবেই সব ব্যবস্থা পাকা হবে।

তখন স্কুলে মাইনে পেতাম সব শুদ্ধ একশ ষাট টাকা। যাতায়াত ভাড়া আর টিফিন খরচা বাদ দিয়ে বাড়ীতেই কিছু দিতে পারতাম না তো আর জমাব কি। তবু এদিক সেদিক ঘুরে, ধার ধোর করে পাঁচশো টাকা জোটালাম। আশীষও জোটাল। সুশীল ওর দুই কলিগকে ধরে বেঁধে রাজী করাল। তখন আমরা পাঁচজনে—রথীন, সুশীল, আশীষ, দেবেন আর আমি, প্রশান্তকুমার দাস ওরফে পি কে দাস—নাম লেখালাম এক সঙ্গে প্রোঃ দত্তের কোচিংয়ে।

এখনো কানে বাজে প্রোঃ দত্তের সেই সব অমূল্য বাণী। ক্লাসে নোট খুলে, খাতা মিলিয়ে বোর্ডে অংক কষতেন। মাঝে মাঝে পাতা উল্টে যেত। তিন পাতার পর হয়তো পাঁচ পাতায় চলে গেছেন। খেয়াল নেই। অংকের স্টেপ মেলাতে না পেরে, আমরা উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা পয়েন্ট আউট করলে, স্যার টোম্যাটোর মত ফুলো ফুলো গাল দুটো নাচিয়ে, ঢুলু ঢুলু চোখের পাতা আধ বোজা করে পেটেন্ট ইংরেজীতে জবাব দিতেন—ইউ উইল লার্ণ গ্র্যাজুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি। অর্থাৎ তোমরা ক্রমে ক্রমে শিখবে।

পড়াতে পারতেন না কিসসু। বিলেতে বলে সাত বচ্ছর কাটিয়ে এসেছেন। কি যে শিখেছিলেন সেখানে জানতাম না, তবে স্যার ক্লাসে ঢুকলে দামী জর্দার সুগন্ধিতে গোটা ঘর ভরে উঠত। ঢুলু ঢুলু চোখ সর্বদাই আধ বোজা। দারুণ করিৎকর্মা পুরুষ। স্রেফ মাস্টারী করেও যে খান চারেক ফ্ল্যাটবাড়ী, দুটো ট্যাক্সির মালিক হওয়া যায়, তা আমরা স্যারকে দেখেই বুঝেছিলাম। স্যারের গোপন আয়ের সোর্স তো আমাদের মত নাইটের ছেলেরা, যারা বেটার প্রসপেক্টের আশায় ডিগ্রী পড়তে যেত।

সেই স্যারের কাছেই আজ যাচ্ছি। মহান্তির রিকোয়েস্ট। ওদের স্যারের কোচিংয়ে ভর্তি করে দিতে হবে। আগে এত ঝুট ঝামেলা ছিল না। আজকাল ছেলেরা খুব হুজ্জুতি করে। তাই স্যার পুরোনো বিশ্বস্ত ছাত্রের রেকমেনডেশন না পেলে যাকে তাকে কোচিংয়ে নেন না।

বাস থেকে নেমে দরমার বেড়া দেওয়া দোকান থেকে একটা প্যাকেট কিনলাম, সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। সামনেই ইউনিভার্সিটি। মোটে দুটো স্টপ। এটুকু পথ আর বাসে উঠতে ইচ্ছে হল না। হাঁটতে হাঁটতে একটা অঙ্ক কষছিলাম মনে মনে। এক একটা সিজনে কম করেও আশী পঁচাশীটা ছেলে স্যারের কোচিংয়ে পড়ে। 'পার হেড' পাঁচশো হলে, কম করেও চল্লিশ হাজার টাকা আসে এই কোচিং থেকে। টাকাটা ভাগ করে নেন তিনজনে—প্রোঃ মধু দত্ত, প্রোঃ সাহা আর প্রোঃ রায়। বছরের পর বছর এরা চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসাটা। সবাই জানে। জানেন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষও, অথচ প্রতিবাদ করে না কেউ। তাজ্জব ব্যাপার। প্রতিবাদ করবে কি, পাকে-প্রকারে এ'রাই তো ইউনিভার্সিটিটা চালাচ্ছেন।

সামনেই ইউনিভার্সিটির মেন বিল্ডিং। ফুলে ফুলে সাজানো লনের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আমার বেজায় হাসি পেল—কেন কেউ প্রতিবাদ করে না, তার আসল রহস্যটা তো স্যারই বলে দিয়েছেন—ইউ উইল লার্ণ গ্র্যাজুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি। ক্রমে ক্রমে শিখতে শিখতে যৌবনের ঝাঁঝটা মরে যায়, তখন আর প্রতিবাদের ইচ্ছেও অবশিষ্ট থাকে না।

—সম্বংস

# উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের উপাদান

অরিজিৎ চক্রবর্তী

(১)

অথচ অনুকরণপ্রবণতা উত্তরের গ্রাম-বাংলাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাই বাংলায় এই প্রান্তের সংগীত ও সাহিত্য জীবন এবং জনমানস নিজস্ব মৌলিকতায় পুষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছে। উত্তর বাংলার লোকসংস্কৃতির উল্লেখযোগ দিক হচ্ছে এখানকার গান। বিভিন্ন গানের বিচিত্র সমাবেশ উত্তরবঙ্গে যেমন ছিল এবং যতটুকু এখনও আছে—বাংলায় আর কোন পল্লীতে এই ধরনের সংগীত থাকলেও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে হয়ত উত্তরবাংলাই অগ্রাধিকার দাবি করবে। নানান বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্ন পালাগান, অনেক এবং বিশেষ প্রকারের ধর্মীয় সংগীত, প্রেম-পীরিতির আনন্দ-আর্তি মেশানো ভাওয়াইয়া এবং চটকা গান, সর্বোপরি অঞ্চল বিশেষের গান নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের সঙ্গীতসাধনার ব্যাপকতাই নির্দেশ করে। এই গানগুলি শুধুমাত্র এখানকার সংস্কৃতিকেই সমৃদ্ধ করেনি, লোক-সাহিত্যেরও এগুলি মূল্যবান উপাদান এবং দুষ্প্রাপ্য সম্পদ।

যে সমস্ত পালাগান এখানকার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তাদের ভেতরে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় 'বিষহরা' গানের। এই গান চাঁদসাগরের সঙ্গে মনসাদেবীর বাদ-বিসম্বাদের সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে পালাগান। মনসামঙ্গল মধ্যযুগের লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট দিক। তবে সঙ্গীত হিসেবেই পদ্মপুরাণ পাঁচালি রচিত এবং প্রচারিত হয়েছিল। আজকের বাংলার অনেক স্থানে হয়ত এই মঙ্গল সঙ্গীতের শ্রোতার সংখ্যা আর খুব বেশী নেই। কিন্তু উত্তরবঙ্গে একালেও এ গানের সমাদর কমে যায়নি। তার প্রধান কারণ এই অঞ্চলে প্রচলিত 'বিষহরা' গানের পাঁচালীতে আধ্যাত্মিকবোধের সাথে বাস্তবজীবনবোধের মিলন। তাই এখনও এখানকার কৃষক-শিল্পীরা দল বাঁধেন, গ্রামে গ্রামান্তরে আসর বসান—গান করেন। কেবলমাত্র মারাই (মনসা) পুজোর সময়েতেই নয়, প্রধান প্রধান সামাজিক উৎসব এবং হালখাতার এই প্রথমের জনকে বায়না দেওয়া হয়।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে মনসামঙ্গল গান প্রচারিত হয়েছে—কোথাও রয়ানীর দলের দ্বারা, কোন কোন স্থানে ভাসানযাত্রার মাধ্যমে, কোথাও বা পুতুল নাচের মধ্য দিয়ে। কিন্তু পদ্মাপুরাণ গান করার উল্লিখিত রীতিতালিকার কোনটাই উত্তরবঙ্গের 'গীদাল'রা গ্রহণ করেন নি। এদের সঙ্গীত পরিবেশনায় গান, নাচ এবং অভিনয়—এই সব দিকগুলিই রয়েছে। ১৪ জন নিয়ে গঠিত গানের দলে থাকেন দুজন 'বাইন', দুজন 'বাঁশিয়াল', তিনজন পাইল, একজন 'মূল', একজন 'দোয়ারী' এবং পাঁচজন 'ছোকরা' (নারীবেশে)। মূলের হাতে চামর থাকে। খোলাবন চাপড়ানো (কনসার্ট) দিয়ে শুরু হয় গানের আসর। তারপর গায়করা সঙ্গীত সভায় প্রবেশ করেন। গঙ্গা, শচী-পতি, কলিরাজ, ব্রাহ্মণ, রাম এবং দুর্গা-বন্দনার যে-কোন একটি বন্দনা গান দিয়ে পালার সূচনা। ব্রাহ্মণ বন্দনা গানটির কয়েকটি লাইন এইরূপঃ—

শতত প্রণাম হুঁও মুই ব্রাহ্মণের পদে।
ব্রাহ্মণ উত্তম কুল বলে চারি ব্যাদে।।
আগম পুরাণ বলে বেদ শাস্ত্র স্মৃতি।
দ্বিজের কণ্ঠেতে হইল এ সবের বসতি।।
বাহ্মণোক্ দেখিয়া যেবা প্রণাম না করে।
করাতে ছেদিয়া মুণ্ড ফেলে ভূমি তলে।।

এই গানটিতে ব্রাহ্মণকে 'বেদের উত্তম কুল' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই চিন্তা থেকে ওদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। ধর্মীয় সংস্কার কিভাবে সমাজ জীবনকে শাসন করে তারই নমুনা এই বন্দনা গানটিতে পাওয়া যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ভেতরে এখনও অনেকে ব্রাহ্মণদের দেবতাজ্ঞান করেন, তাঁদের গুরুরূপে বরণ করেন। দ্বিজের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ওদের কাছে ধর্মীয় বিধান। অবশ্য যুগবৈশিষ্ট্য শিল্প-সাধনাকে প্রভাবিত করে। মনসা-মঙ্গল যে সময় রচিত হয়েছিল, তখন ধর্মীয় বিষয়বস্তুই ছিল সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। তাই সেই গানে সংযোজিত এই বন্দনা গানটিতে এ জাতীয় ধর্মভাবনা থাকবে এটাই প্রাসঙ্গিক। এইটি ছাড়া কলি-রাজ বন্দনা গানটিও উল্লেখযোগ্য। গানটিতে কলিকালে কিভাবে সত্য নাশ হবে তার চিন্তাই বিশেভাবে স্থান পেয়েছে। গানটি এমনঃ—

বন্দোং প্রভু কলিরাজ
ত্রিলক্ষ ভুবন মাঝ
যাহার মায়ায় সংসার ভরিয়া।
কলিকালে যতগুন
সাবধান হইয়া শুন
দিনে দিনে দেখ না ভাবিয়া
কলিতে বৈষ্ণব হবে
পিতামাতা না মানিবে
এই পাপে যাবে অধোগতি।
শুন নারদ কলির কথা
পুত্রে না মানিবে পিতা
শিষ্যে না মানিবে গুরুজন।।
সধবা হইবে হীন
বিধবার হইবে দিন
এইমত কলির ব্যবহার।
আইলের কচু খুঁরি খাবে
তাক শেষে না পাইবে
এইমত কলির ব্যবহার।।
সমুদ্রে না হইবে জল
বৃক্ষের হবে অল্প ফল
গাহিনেতে বালু দিবে চর।
জমিনে না হবে শস্য
জলে হবে অল্প মৎস্য
গাভীর কমিয়া যাবে দুধ।।
জাতির না থাকিবে ভেদ
ব্রাহ্মণে ছাড়িবে বেদ
এইমত কলির ব্যবহার।।

—কলির ব্যবহার কি হবে তারই বৃত্তান্ত পাওয়া যায় কলিরাজ বন্দনা গানটিতে। কলিকালে পুত্র পিতাকে মানবে না, শিষ্য গুরুকে। সধবার সংখ্যা কমে যাবে, বিধবার সংখ্যা বাড়বে আর মংগা দেখা দেবে যখন মানুষ আলের কচু খুঁড়ে খাবে এবং তাও মিলবে না। সমুদ্রে জল থাকবে না, বৃক্ষের অল্প ফল হবে এবং নদীতে বালুচর দেখা দেবে। জমিনে শস্য হবে না, জলে অল্প মাছ হবে এবং গোদুগ্ধ কমে যাবে। জাতি-ভেদ থাকবে না, ব্রাহ্মণ বেদপাঠ ছেড়ে দেবেন—এই হবে কলির ব্যবহার।

বন্দনার পর শুরু হয় পাঁচালী গান। প্রথমে ধুয়া, তারপর পদ। আগেকার দিনে আগাগোড়া পাঁচালীটি গানের মতো করা হত।

ন্তু এখন আর তা হয় না। তাই যে কোন কটা ভাগ, যেমন—'লখীন্দরের বিয়ে' থবা 'গোদার বাঁক' এক-একটা গানের ঠকে ধরা হয়। পালা দীর্ঘ। তাই শ্রোতা-র বিরক্তি থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য দোয়ারী' হাস্যরস পরিবেশন করেন। মূলের ঙ্গ সংগীতকে পরিচালনা করা এবং দোয়ারীর সহায়তায় পাঁচালীকে ব্যাখ্যা রা। এক এক পসলা গানের পর 'ঘাট' াসে। তখনই মূল, দোয়ারী, ছোকরা ও ন্যান্যরা পাঁচালীর বিভিন্ন পাত্রপাত্রীদের ংশ গ্রহণ করে অভিনয়ের ঢং-এ শ্রোতাদের বষয়টি বুঝিয়ে দেন। তারপরে আবার তুন ধুয়া—পরবর্তী কাহিনীর স্রোত।

একঘেঁয়ে পাঁচালীর গান যাতে শ্রোতা ও দর্শকদের কাছে ক্লান্তিকর না হয় সেই-জন্য এই গানের ভেতর মাঝে মাঝে 'খোসা' দেওয়া হয়। খোসাগুলি বিভিন্ন বিষয়ের উপর হতে পারে। আবার পাঁচালীর কাহিনীর সংগে সামঞ্জস্য থাকে তার দিকেও নজর রাখা হয়। দুটি উদাহরণ নীচে দেওয়া লে :

ওকি বাংলাদ্যাশে গান করা ভাই বেজায়
ঝকমারি।
আরে গাওয়াইয়া যদি গেইল বাড়ী,
মারেয়ার হইল ড্যামাক ভারি,
আরে গোয়াইলঘরে দেয় পোয়াল
থ্যার পারি—
মিট-কুমড়া আর খেসারীর ডাইল
দেয় ডালি ভরি।

এই খোসাটিতে পল্লীর গায়কদের প্রতি মারেয়ার (গৃহস্থের) অবহেলার কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বলা হচ্ছে—বাংলা দেশে গান করা বেজায় ঝকমারি। গাইয়ে বাড়ীতে এলে গৃহস্থের দেমাক বেড়ে যায়, গাইয়েদের শয্যারচনা গোয়ালঘরে বিচালি ছড়িয়ে, খাদ্য মিষ্টি কুমড়ো আর খেসারির ডাল। প্রত্যক্ষভাবে মারেয়ার প্রতি 'আক্রমণ' হলেও পরোক্ষভাবে সমাজের উপর তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে—যে সমাজ শিল্পীর যোগ্য সম্মান দিতে জানে না, কিম্বা দিতে চায় না অবহেলা করে।

পাঁচালীর সংগে মিল রেখেও অনেক 'খোসা' রচিত হয়েছে। বেহুলার ভাসানের পর এই খোসাটি শোনা যায় :

গাও কাপে মোর থরথর—
ধর সোনা হে,
ওকি সোনাহে ওহে।
ওরে পুবাল পইচ্ছাওয়ের বাও—
নাওয়ের বাদাম তুলিয়া দেও,
চাপুক নৌকা কিনারোত্ লাগিয়া।

..................................

অনুসন্ধানের পর উত্তর বাংলার গ্রাম থেকে এই পালাগানের ছিন্ন পান্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। লখীন্দরের জন্ম থেকে শুরু করে বেহুলা লখীন্দরের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত এই পাঁচালী গানের পদগুলি আলোচনা করলে দেখা যায়, এখানকার 'গীদাল'রা মূল কাহিনীটি নারায়ণ দেব এবং অন্যান্য কবিদের পুঁথি থেকে সংগ্রহ করেছেন। পদের ভেতরে—

নারায়ণ দেবে কয়
সুকবি বল্লভ হয়
পদ্মার ছন্দে এক বলিব নাচারী।।

অথবা—

সুকবি নারায়ণ দেবের সুরত পাঁচালী।
বেহুলার করুণাগান বলিব নাচারী।।—

এই ধরনের ভণিতা পাওয়া যায়। আবার একস্থানে—

জগত জীবন কবি নারায়ণ দেবে গায়।

—বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। নারায়ণ দেব রাঢ় দেশ ত্যাগ করে ময়মনসিংহ জেলার বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তবে উত্তর-বংগে তাঁর পুঁথি প্রচারলাভ করে এবং ঐ পথেই তা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রচারিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। নারায়ণ দেব ছাড়া আর যে-সব কবির ভণিতা-ভরা পদ-গুলি পাওয়া যায়, তাঁরা হচ্ছেন জগতজীবন, দৈবজ্ঞ গোপীচন্দ্র, দ্বিজ বংশী দাস এবং রমাকান্ত।

উল্লিখিত কবিদের কাছ থেকে মূল কাহিনীটি গ্রহণ করলেও এখানকার গীদালরা এই পালাগান নিজেদের ভাষা, সামাজিক পরিবেশ ও নিজেদের সংস্কৃতির উপযোগী করে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই রূপান্তরের চিত্র অত্যন্ত মনোগ্রাহী, বাস্তব এবং মৌলিক। উদাহরণ-স্বরূপ চম্পক নগর পার হয়ে হরসাধু মণ্ডলের গ্রামে পৌঁছানোর পর সেখানকার মানুষেরা, এমন কি হরসাধুও, লখীন্দরের বিয়ের শোভাযাত্রা দেখে কিভাবে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল তার চিত্রটি দ্রষ্টব্য :—

ডোম পালায় ডাওয়াই পালায়
ধোপা আর সুরি।
হস্তে লাটি ধরি পালায়
আশিকালিয়া বুড়ি।।
তেলী পালায় মালী পালায়
আর চন্ডাল হারী।
ঘরে বসে যুক্তি করে
গাবুর গাবুর আরি।।
গাবুর আরি যুক্তি করে
দিদি পলাই কার ডরে!
নিভাতারির ভাতার পাব
মঙ্গল চন্ডীর বরে।।
যে পাইকে লইয়া যাবে
তার সংগে যাব।
রানধিয়া বাড়িয়া ভাত
তার বুকে বসি খাব।।
নগরখান পালেয়া গেল
নগরে ভাসে শোলা।
তারপরে পালেয়া গেল
নলী চোড়া জোলা।।
নগরখান পালেয়া গেল
নগরে নাই আর কাউয়া।
তারপরে পালেয়া গেল
চামটীচোরা নাউয়া।।

..................................

ডোম, ডাওয়াই (যারা শুয়োর চরায়), ধোপা, সুরী, লাঠি হস্তে আশি বৎসরের বুড়ি, তেলী (তেল বিক্রেতা), মালী (প্রতিমা তৈরী করে যারা), চন্ডাল, হারী 'নলীচোরা' তাঁতি • (জোলা) 'চামটি চোরা' নাপিত (নাউয়া) সবাই পালিয়ে গেল। নগরে সোলা ভাসছে। নগরে একটি কাকও রইল না—পুরো নগরটাই পালিয়ে গেল। রইলো শুধু যুবতী বিধবা-রা, যারা যুক্তি করছে—যে পাইক নিয়ে যাবে তার সংগেই চলে যাবে—রেঁধে বেড়ে তার বুকে বসে খাবে—অর্থাৎ আধিপত্য বিস্তার করবে। এই বর্ণনায় উত্তরবংগের গ্রামের মানুষের উপ-জীবিকার কথা পাওয়া যাচ্ছে। আর তারই সংগে যুবতী (গাবুর) বিধবাদের জীবন সম্পর্কে চিন্তাও।

লখীন্দরের বিয়ের পর দান-দক্ষিণার বিবরণটিও উল্লেখযোগ্য :—

..................................

তারপর করে দান কন্যার হয় জ্যাটো
তাঁয় তো করিল দান গাভীর নেটু খাটো।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় জ্যাটাই।
তাঁয় তো করিল দান সুতা কাটা নাটাই।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় খুড়া।
তাঁয় তো করিল দান বিচন ধানের পুরা।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় কাকী।
তাঁয়তো করিল দান সুবর্ণের চাকী।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় আজু।
তাঁয়তো করিল দান সুবর্ণের বাজু।।

..................................

তারপরে করে দান কন্যার হয় মামা।
তাঁয়তো করিল দান ভাংগা গাইনের স্বামা।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় মামি।
তাঁয়তো করিল দান ভাংগা কাচির স্বামি।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় মাউসা।
দান নাই দক্ষিণা নাই কেবল কথা চুষা।।
তারপরে করে দান কন্যার হয় মাসি।
ভাংগা থারু হস্তে ধরি
ফাকার ফুকুর হাসি।।

..................................

এই পদগুলিতে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং বিভিন্ন দান-সামগ্রীর তালিকাটিও বৈচিত্র্যময়। কন্যার জ্যাঠা দান করছেন গাভী—যার লেজটা ছোট, কন্যার খুড়ো দান করছেন বীজধান এবং মামা-মামীর দানও পল্লী গৃহস্থালীর উপযোগী টুকিটাকি জিনিষ।

বেহুলার বিয়ের পর পিত্রালয় ত্যাগের প্রাক্কালে তার মা সুমিত্রা দেবী কিভাবে মেয়েকে পরের ঘরে গিয়ে ব্যবহার করতে হবে তার শিক্ষা দিচ্ছেন। এই সংযুক্তিকরণ অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে না যদি এই অঞ্চলের সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় থাকে। উত্তরবংগে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল ফলে অল্প বয়সে কন্যার বিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। এই অপরিণত বয়সে যে মেয়েটি মায়ের আঁচল ছেড়ে চলে যাচ্ছে তার ভাল-মন্দের প্রতি মায়ের দৃষ্টি থাকবে এটাই

স্বাভাবিক। তাই বেহুলার মা তাকে কিছু 'শিক্ষার বচন' ধরতে বলছেন ঃ

মারে মা শিখানু বাছা শিক্ষার বচন ধর।
অল্প বয়সে বাছা যাবু পরার ঘর।।
মনুষ্য করিনু বাছা নালিয়া পালিয়া।
অন্তরের মানিকধন যাইস বোল ছাড়িয়া।।
সুমিত্রার বোলং বাছা শুন রূপবতী।
করবু স্বামির সেবা মা একান্ত ভক্তি।।
শ্বশুর শাশুড়ি তোর হয় গুরুজন।
যতনে করবু সেবা রাখিয়া বচন।।
প্রভাতে উঠিয়া মা ছারাস্থান দিবু।
আরি জয় জায়ের সংগে জলক লাগি যাবু।।
আরি ছয় জাও যাবে তোর হাসিয়া খিলিয়া।
অভাগিনীর বাছা যাইস হেট মুণ্ড হইয়া।।

*স্বামির প্রতি ভক্তি, শ্বশুর শাশুড়ির সেবা এবং তাদের কথার অনুগত থাকা, সকালে উঠে আঙিনায় ছড়া দেওয়া এবং নতমস্তক হয়ে চলাফেরার নির্দেশই নয়, স্নান, রন্ধন, পরিবেশন এবং সন্ধ্যেবেলা প্রদীপ দান সম্পর্কেও 'নিয়ম নীতি'* জানিয়ে দিচ্ছেন বেহুলার মা ঃ—

কুঘাটে নামিয়া সুঘাটে উঠিবু।
ভিজাবস্ত্র ফেলেয়া মা সুকল পৌরাবু।।
ঝিঙ্গারে জল দিয়া দুই হাত পাকুলবু।
রন্ধনশালার দ্রব্য লইয়া রন্ধনশালায় যাবু।।
রন্ধন করিয়া মা ওচাবু পাত্।
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ দেখিয়া দেইস অন্ন ভাত।।
প্রথমে দেইস অন্ন শশুর সদাগর।
তারপর দেইস অন্ন স্বামী লখিন্দর।।
তারপর দেইস অন্ন শাশুড়ি তোর মাও।
তারপরে দেইস অন্ন আরি ছয় জাও।।

সকলকে দিয়া যে মুষ্ঠি বাছে।
বিড়াল কুকুর আসিলে তাক দিয়া
তুই খাইস শেষে।

মায়েনা শিখানু লাছা যত নিয়ম-নীতি।
সন্ধ্যা হইলে মা বাস্তুর গোরে দেইস বাতি।।

পাঁচালীর এই স্থানেই নয় প্রায় সর্বত্র এই ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। বিশেষত গোদার বাঁকে। গোদা বেহুলাকে তার গৃহ-স্থালীর সংবাদ এমনি করে দিচ্ছে ঃ

......................................

গৃহস্থির কথা কন্যা শুন মন দিয়া।
গোটা ছয়েক করচোং নিকা,
গোটা দশেক বিয়া।।
পৃথিবীর অকাল কন্যা হইলে যেই সন।
সেই সন হইচে মোর বড় বিড়ম্বন।।
পাঁচস্যার করি চিনা নাগিয়ে টাকাত্।
সাতজন গুদুনি মইরচে না পায়য়া ভাত।।
মরজনকাক লইয়া আমি করি গৃহবাস।
শীতের সময় চাইরজন হইল পরদ্যাশ।।
পাঁচজনাক লইয়া আমি সুকে বনচি ঘরে।
তিনজনাক পালেয়া নিয়া
গেইল টেপুয়া চাকোরে।।

ঘর মধ্যে আছে কন্যা কিছু নাই শুন।
পাঁচস্যার চিনা আছে ছয় স্যার কাউন।।
মস্ত্যের শুক্টা আছে ডুলি নয়েক দশ।
কহিলাম গৃহস্থির কতা এই মত পৌরষ।।

ঘর মধ্যে আছে মোর সোনার মাচাখান।
অল্প করি তরে থুইচোং
থুচি চাইরেক ধান।।
সেই না ধানের কতা শুনহ উত্তর।
ধরেয়া খাইতানে খায়য়া কইরচে জরজর।।।
শনিবারে মঙ্গলবারে মাচা কড়কড়ায়।
না জানোং অভাগির মাচা
কুনদিন ভাঙিয়া যায়।।
বিলাই চইড়লে মাচা মাচা উমাচাউ করে।
এন্দুর চাঁড়লে মাচা চিত্তোর হয়য়া পরে।।
ঘর মধ্যে আছে কন্য একখানি ছেওটা।
কানি যেদিন পেন্দে সেদিন
থুড়ি হয় নাংটা।।
যেদিন হাটে যাঁও মুই ছেওটা পিন্দিয়া।
কানিথুড়ি বসি থাকে
কুলা আঁওন্ডাল দিয়া।।
*যেদিন না পেন্দে কানি, আর থুড়ি।*
*সেইদিন বান্দোং মুই চালিশা পাগুড়ি।।*
*সেই না পাগড়ির মাতায় বাংগার ফুল দিয়া।*
*নগরেতে বেড়াঁও মুই বিনস্ত রসিয়া।।*

......................................

*গোদার গৃহস্থালীর সংবাদ অত্যন্ত* উপভোগ্য। গোদা ছয়টি নিকা এবং দশটি বিয়ে করেছে। কিন্তু এই ষোলজনের ভেতরে সাতজন মংগার সময় ভাত না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছে, চারজন দেশত্যাগী হয়েছে তার তিনজনকে বাড়ীর চাকর টেপুয়া পালিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ঘরের সম্বল পাঁচসের চিনা, ছয়সের কাউন আর শুকনো মাছ নয়-দশ ডুলি (বড়-বড় ঝাকা)। ঘরের ভেতরে যে সোনার মাচা আছে তাতে ছোট-পালির চার পালি ধান আছে। কিন্তু সে ধানকেও ইঁদুরে খেয়ে শেষ করেছে। শনিবারে, মঙ্গলবারে মাচা কড়মড় শব্দ করে—কবে ভেঙ্গে পড়বে ঠিক নেই। এমন মাচার অবস্থা যে বেড়াল চড়লেও মচমচ শব্দ হয় আর ইঁদুর চাপলে মাচা চিত হয়ে পড়ে। ঘরে আছে একটি মাত্র ছেওটা (কাপড়ের ছাট)। কানি সেটা পরলে থুড়ি নগ্নদেহে থাকে। আর ঐটি পরে গোদা যেদিন হাটে যায় সেদিন কানি এবং থুড়ি, গোদার অবশিষ্ট দুই ভার্য্যা, কুলো দিয়ে দেহ ঢেকে রাখে। যেদিন কানি থুড়ির কেউই ওটা পরে না সেদিন গোদা ঐ ছেওটা দিয়ে রাজার মত পাগড়ি বাঁধে মাথায়, গুজে দেয় কার্পাসের ফুল তার উপর—গোদা রসিক আছে।

এই গানের পাঁচালীর আর একটি অংশ শিবের প্রতি চণ্ডীর উক্তিগুলিও দ্রষ্টব্য ঃ—

শুন শুন দেব তুমি দুঃখের কাহিনী।
জানিয়া জ্বলিয়া উঠে মনের আগুনী।।
বারখান ঢেকি মোর তেরখান কুলা।
গংগা দুর্গা দুই নারী ভাজি
জটিয়া ভাঙ্গের গুড়া।।
প্রভাতে উঠিয়া যায় ভিক্ষা মাগিবারে।
যা কিছু থুইয়া আইসে মেচিনির ঘরে।।
কেহ কিছু বলিলে বুড়া বনের বাঘ গর্জে।
আপনে জুরিয়া খোল ভাঙ্গের গুড়া ভাজে।।

হাড়ির ভিতরে ভাত যখন গদগদ করে।
ভাত হইলে বুড়া তখন পাত ধরিয়া বইসে
ভাঙ্গের ধুন্দে ভাত গাসে গাসে খায়।
কার্তিক গনাই দুইটি ছেলে
ভোগোতে নালায়
গঙ্গা দুর্গা দুই নারী মরি পেটের দুখে
আর নারী করিতে চাও কোন ছার মুখে
নটী লইয়া কর তুমি নটির ঘরবাড়ী।
মোর গৃহে গেইলে তোর
উক্‌রাইম পাকাদাড়ি

গোদার কথা এবং চণ্ডীর বক্ত ভেতর থেকে এই অঞ্চলের সামাজিক আর্থিক জীবনের ছবি মিলছে। গোদা হ উত্তর বাংলার দরিদ্র কৃষক আর শিব হ সংসারের প্রতি উদাসীন ভিক্ষা ব্রাহ্মণ। কোপনস্বভাবা স্ত্রীর বাক্যবাণে জর্জরিত। *গায়করা কেন্দ্রীয় কাহিনী গ্রহণ করে নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সামনে রেখেই পাঁচালীর গানে অনেক বি সংযুক্ত করেছেন।* গ্রামের সমাজ এবং শ্রো *বর্গের দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত 'বিষহর* গানে তাই পল্লীর জীবন ও চিন্তা বিশে ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ফলে রাঢ় পূর্ববঙ্গে প্রচলিত পদ্মাপুরাণ পাঁচা গানের সঙ্গে উত্তর বাংলার এই গানের মি নেই। সেই দিক থেকে উত্তরবঙ্গের 'পদ্মা পুরাণ' গানের আলাদা মূল্য আছে।

মূল কাহিনীতে বিভিন্ন বিষয় সংযু করলেও কিন্তু মনসামঙ্গল পাঁচালীর আস উদ্দেশ্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি। মনসামঙ্গ গানের প্রধান উদ্দেশ্য বিষহরী পুজো প্রচার এবং এ ব্যাপারে গ্রামের গায়করা সচেতন তা বেহুলা-লখীন্দরের দেবপু থেকে প্রত্যাবর্তনের পর চাঁদসদাগরের মনসা পুজোর আয়োজন এবং তাঁর আরাধনা বর্ণনার ভেতরে স্পষ্ট। এই অংশে সামাজিক ভাবনার চাইতে ধর্মভাবেরই প্রাবল্য দেখ যায়। তাই সামাজিক চিন্তার প্রকাশ এ গানে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মচিন্তাই জয়ী হয়েছে। সংযুক্ত অংশগুলি পল্লী গানের আসর জমানোর জন্যই রচিত হয়েছে তা না হলে গ্রামের মানুষের কাছে এ সমাদর থাকতো না। জীবনের সঙ্গে গানের যোগ নেই, সে সুর ওদের কাছে 'বিদেশী'। 'বিষহরা' গান ওদের নিজস্বতা-বোধের প্রামাণ্য প্রতীক—নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্যের নির্ভেজাল নিদর্শন।

(২)

'বিষহরা গান' বাদে আর যে সমস্ত পালা গান উত্তর বাংলার লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের ভেতরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'দোতোরা', 'কুষান' ঠুনকী রাবণ', 'রামলীলা', কৃষ্ণলীলা', জগনামা', 'স্বর্গ-যাত্রা', 'জাগ গান', সোনাই যাত্রা' এবং 'কমলা যাত্রা'।

দোতোরার গান প্রধানত প্রেমকাহিনী অবলম্বনে পালাগান। এ গান দোতোরার

য়ো গীত হয়। যে সমস্ত পালাগুলির
ক হয় সেগুলির ভেতরে দ্রষ্টব্য হচ্ছে
নকুমার মদুমালা', 'রহিমরূপভান', 'মিজাম
গলা', 'করিম বাদশা', 'জলপতি সদাগর',
মগোপাল', 'বেলমতি কন্যা', 'মরুচমতী',
নমাল সদাগর', 'মালাকর', 'নির্বুজ
জ্জা', 'চন্দ্রাসতী', এবং 'গুঞ্জর বিবি'। এই
নের দলে থাকে একজন বাইন, একজন
ইল, হারমনিয়াম একটি, 'চ্যাংরা' (নারী-
শে) ৪ জন, বেহালা একটি, মূল একজন
বং দোয়ারী। মূলের হাতে থাকে
তোরা। উপরে উল্লিখিত যে কোন একটি
লা নিয়ে গানের আসর শুরু হয়। মূল
লা শুরু করার আগে বন্দনা গান গাওয়া
য়। বিভিন্ন বন্দনা গানের একটি—সরস্বতী
ন্দনা, নীচে উদ্ধৃত করা হল :—

আইসেক মাতা সরস্বতী রথে করিয়া ভর—
জ্ঞ জোগারে নামেক আসিয়া
মোর সভার ভিতর।
মার সভা ছারিয়া যদি অন্যের সভায় যাও—
মার কিছু কিরা না দ্যাং ধর্মের মাতা খাও।
শাইল বাইনের মস্তকে মা দিয়া দুই পাঁও—
মার মূলের মস্তকে আসিয়া
সোহারী খেলাও।।
মূলের জিবাত যদি মা এক পদ নড়ে—
লইজ্জা পাব মা জননী সভার ভিতরে।
মোক লইজ্জা দেন যদি মা সভার ভিতরে—
তোমরা লজ্জা পাইবেন মাগো
দ্যাবের দেবপুরে।

শুধু সরস্বতী বা নারায়ণ বন্দনা
জাতীয় দেবদেবী বন্দনাই নয় আসরে
সমবেত সকলকে এমনি করে প্রণতি জানিয়ে
গানের শৈঠক শুরু করা হয় :—

সভা করি বসি আছে হিন্দু-মুসলমান,
দশেরও চরণে আমি করিলাম প্রণাম।

এইরূপ বন্দনার পর মূল পালা শুরু
হয়। শুরু করেন মূল। দোয়ারী হাস্যরস
পরিবেশন করেন এবং গানকে ব্যাখ্যা করার
জন্য মূলকে সহায়তা করেন। এক-এক
পসলা গানের পর 'ঘাট' আসে। তখন মূল,
দোয়ারী এবং চ্যাংড়া-নর্তকীরা অভিনয় করে
বিষয়টি শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেন। গান
ছন্দে বাঁধা। উদাহরণস্বরূপ আমুর বাদশা
বা গুঞ্জর বিবি পালা থেকে প্রথম কয়েকটি
লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে :—
আমুর নামে ছিল বাদশা ইন্দ্রপুর শহরে,
তাহার মত ধার্মিক নাই রাজ্য সংসারে।
সাত রাণী বিয়া করাইচে রাওয়াস ভিতরে,
কন্যা-পুত্র নাই দেয় আল্লা
বদন কোলার মাঝে।
আটকুরা রয়েছে সে দুনাই সংসারে।
.......... ......... ......... .....
সকালে উঠিয়া যেবা হয় আটকুরা দরশন,
দিনান্তর যায় তাদের সাইতের অকারণ।
নিন্দ হাতে উঠিয়া সেই
দ্যাখে আটকুরার মুখ,
দিনমন যায় ক্যাচক্যাচিতে
ভোজনে না হয় সুক।
..... ... ...... ...... ........ ......

এই প্রকারের গান এবং পরে অভিনয়ের
মাধ্যমে পালা প্রবাহিত হয়। পালা দীর্ঘ।
তাই শ্রোতাদের যাতে বিরক্তি না আসে সেই
জন্য এই গানের ভিতরে ভাওয়াইয়া-চট্‌কা
গান 'খোসা' দেওয়া হয়। 'খোসা'র একটি
নমুনা :—

ক্যানে বন্ধু ধন ব্যাজার ক্যানে—
সে কথা কি আচে মনে,
একদিন আসি গেইচেন ঘুরিয়া।
ওরে যেদিন আসি গেইচেন ঘুরি—
সেদিন আমি জবরে পড়ি,
হোর খাবার নাই পাং অসুখ ধরিয়া।
ও কইন্যা যার সঙ্গে যার ভাব থাকে—
হউক বা না হউক আগেয়া দ্যাখে,
না হয় অ্যাখান গুয়া দেওয়া থায়।
ওরে খিরকী দিয়া আচোং চায়য়া—
তুই শুত্‌লু গুয়া খায়য়া,
মোন মনটা সোচোর পোচোর করে।
ও কইন্যা আইত দুপরে গেনু বাড়ী—
ওরে দৌড়ি বিড়াইল বাড়ুন ধরি
মোরমাইয়াটা মানুষ নৌয়ায় ভাল।
ওরে আগম নিগম না বুঝিয়া—
বারুন দিয়া দিল ঝারিয়া,
চাইরপর আইতটা কান্দোং বসিয়া।

কথা দিয়ে সময় মত একদিন কন্যাটি
বন্ধুর কাছে যেতে পারে নি বলে বন্ধু
গোসা হয়েছে। তার অভিমান ভাঙ্গাবার
চেষ্টায় মেয়েটি বলছে যে, সে যেদিন এসে
ফিরে গিয়েছিল, সেদিন প্রেমিকাটি অসুস্থ
ছিল। কিন্তু বন্ধুটি এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট
নয়। সে বলছে যার সঙ্গে যার ভাব থাকে,
সে যেভাবেই হোক একবার এগিয়ে এসে
দেখা করে। অন্ততঃ একটা পান তুলে দেয়
হাতে। কিন্তু বন্ধুটি জানালা দিয়ে দেখলো
মেয়েটি নিজেই গুয়া (সুপারী) খেয়ে শুয়ে
পড়লো। এ অবহেলা অসহ্যকর। অথচ
মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে আসার জন্য
পরে তাকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় নি।
বেশী রাতে বাড়ী ফেরার জন্য স্ত্রী তাকে
ঝাঁটা দিয়ে এমনভাবে পিটিয়ে দিয়েছিল যে,
'চার প্রহর রাত' তাকে কেঁদে কাটাতে
হয়েছিল।

এই জাতীয় প্রেম-ভিত্তিক গান ছাড়া
সমাজের নানা প্রকারের 'সক্যানডাল' এবং
পল্লীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন
নিয়ে রচিত অনেক 'খোসা' এই গানের
ভেতরে পাওয়া যায়। যেমন :—
বুড়া হরির নামের মালা জপে,
একাদশী ব্রত করে—

ঐ বুড়াটা বিদুয়া নিবার চায়।
একটা বিদুয়া ধরি—
বাপে ব্যাটায় কাড়াকাড়ি
এগিলা কতা কেমন দেখা যায়।
বুড়ার বড় ব্যাটা উটিয়া কয়—
বিদুয়া নেওয়া হবার নয়,
ঐ বিদুয়া মোরে নেওয়া থায়।
একজন বিধবাকে নিয়ে পিতাপুত্র
কাড়াকাড়ি করছেন। দুজনেই তাকে
আজীবনের সংগী করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
পিতা বৃদ্ধ, হরিনাম জপ করেন, একাদশী-
ব্রত পালন করেন। একজন ধার্মিক এবং
প্রবীণ মানুষের এই জাতীয় মানসিক
উচ্ছৃঙ্খলতার 'পাবলিসিটি' গানের আসরে
দিয়ে সমাজের বিভিন্ন ছিদ্রগুলিকে বন্ধ
করার চেষ্টার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে।
পত্রিকা যেখানে প্রবেশ করে না, সেখানকার
মানুষের জনমত গঠনের এর চেয়ে বড়
উপায় আর কি হতে পারে?

গ্রামের মানুষের মানসিক পরিবর্তনের
ছবিও 'খোসা'—গুলিতে পাওয়া যায়।
যেমন :

ঘোর কলিতে নাইরে ভাই তবনের সম্মান।
তবন পেনদে ছত্রিশ জাতি,
ডোম, ভাওয়াই, চারাল, মুচি—
কুড়ি, সুরী, নাউয়া, ধোপা
কুমার আর ব্রাহ্মণ।

কলিকালে ভবানের (লুংগির) সম্মান
আর নেই। ছত্রিশ জাতির সবাই তবন
পরিধান করছে। অথচ তবন একসময় শুধু
মাত্র মুসলমানদেরই পরিধেয় ছিল। চিন্তার
এই উদারতা কিম্বা প্রসারতা গ্রামেও দেখা
দিচ্ছে—এটা কম পরিবর্তনের সূচনা নয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে উত্তর
বাংলায় সাইকেলের চল খুব বেড়ে যায়।
তাও গ্রামের গীদালের দৃষ্টি এড়ায় নি।
'ভদ্র' এবং চাষা সাইকেলকে কিভাবে
ব্যবহার করছেন, তার বর্ণনাটিও এদের
'খোসা'য় আছে :—

দেখ ভাই কলিকালে সাইকেলের কি সম্মান।
সাইকেলের দাম তামাকাসা—
কখন ভদ্র কখন চাষা।

বাবু যারা সাইকেল কেনে—
লাফ দিয়া তায় ছিটে চড়ে,
দুই হাতে দুই হ্যান্ডেল ধরে,
দুই পায়ে দুই প্যাটেল মারে,
জল দেখিলে ঘাড়ে করে।
চাষার কতা আমি কই,
সাইকেলে বান্দে একশিয়া মই।
হুকাভূতি হাণ্ডেলে বান্দি
চাষের খেতে চলে যায়।

এট গানটিতে হঠাৎ আলোচ মুখ দেখে
'মুই কি হনু রে' গোছের ভাবকে সমা-
লোচনা করা হয়েছে। সাইকেলে মই, হুক্কো-
ভূতি বেন্দে ক্ষেতে কাজ করতে যাওয়ার
দৃশ্যটি পল্লীর কবির গতানুগতিক চিন্তাকে
আঘাত দিয়েছে। অতিশয়োক্তি থাকলেও,
অনুকরণকারীদের প্রতি আক্রমণটি খুবই
উপভোগ্য। সূক্ষ্ম হাস্যরসবোধ পল্লীর
গায়কদেরও কম নেই এ থেকে বোঝা যাচ্ছে।

'খোসা' ছাড়া গানের সঙ্গে খেমটা,
পরিবেশন করে চ্যাংড়া নর্তকীরা। নমুনা :—

ঘাককাউ করিয়া নাগিল চালের বাতা,
হুককুত করিয়া উটিল দেওরার কতা,
খুককুত করিয়া ঘরোত ভাসুরে কাশে,
বড়দাদাক খবর দে'ও তাঁয়ও না আইসে!

ধূপ করি পইল খ্যাড়ার মাটি
• দমকি উটিল গাও—
পাচিলাবাড়িত্ ব্যাড়াত্ ঠোকায়
না করং মুই রাও।
ওটা কান্দা আসিচে—
আই মুই সুটসুটিয়া ক'ও—
ছিঃস্তু আইসেক না ক্যানে।
ঢ্যাপরা আজর দুইটা মাইয়া
ঝগড়া করি মরে—
তার উপরো মোক্ নিবার চায়,
মন মোর কেমন কেমন করে,
মন মোর উড়াও' বাইড়াও' করে।

যে সমস্ত ভাওয়াইয়া এবং চটকা গান-গুলি 'খোসা' দেবার জন্য এবং 'খ্যামটা'য় ব্যবহার করা হয় তার ভেতরে অনেকগুলি খুব মার্জিত নয়। উদ্ধৃত 'খোসা' এবং 'খ্যামটা'য়—প্রেম নিবেদনের জন্য গভীর রাতে কোন মেয়ের সংগে দেখা করতে যাচ্ছে যারা তারা দুজনেই বিবাহিত। বিশেষত ঢ্যাপরা আজু (দাদু) যার দুটি স্ত্রী আছে, সেও রাতের অন্ধকারে এমন একজনের পেছন বাড়ীর বেড়ায় টোকা দিচ্ছে যে শ্বশুর দেবর পরিবৃত সংসারের গৃহিণী। অবশ্য পরকীয়া প্রেম সামাজিক অনুশাসন-বিরোধী হলেও প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পেয়েছে। তাই অসংখ্য বাধা এবং অশেষ বিপত্তির ঝুঁকি নিয়ে ঢ্যাপরা আজুর একটি বিবাহিত নারীর সঙ্গ লাভের চেষ্টা অসামাজিক হলেও অবাস্তব নয় যদি বাস্তবজীবন সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তবে দোয়ারীদের সূক্ষ্ম রসিকতাবোধ খুব একটা নেই। ফলে অপেক্ষাকৃত আলোকপ্রাপ্ত লোকেরা 'থলা-বাড়ী'তে এই গানের আসর বসানোর পক্ষ-পাতি। তবে বাড়ীর বাহির অংগনেই এই গানের আসর সাধারণত বসে এবং পরিবেশ উপযোগী গান পরিবেশন করা হয়। উপরে উদ্ধৃত গানগুলির বিষয়বস্তুর স্থূলতা থাকলেও একটি দ্রষ্ট বা বিষয় হচ্ছে ভাষা। এই অঞ্চলের ভাষার এর চাইতে অকৃত্রিম নমুনা আর হয় না। খাককাউ, হুককুত্, খুককুত্ শব্দগুলির ঝংকার বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। তাছাড়া 'পাচিলবাড়িত্' (বাড়ীর পেছন দিক), 'সুটসুটিয়া' (চুপি-চুপি) 'উড়াও' বাইড়াও' (আনচান) শব্দগুলিও উত্তরবঙ্গের বাইরের মানুষের কাছে নতুন লাগবে।

দোতোরার পরেই উল্লেখ করতে হয় কুষাণ গানের। কুষাণ রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনার অবলম্বনে পালাগান। 'লব-কুশের যুদ্ধ,' 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'রামের বনবাস' 'সীতার বনবাস', সীতার অগ্নি পরীক্ষা', 'রাবণ বধ' প্রভৃতি কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডে ঘটনাগুলিকে সুরে বেঁধে সংগীতে রূপ দেওয়া হয়েছে। এ গানেও মূল, দোয়ারী এবং চ্যাংড়া-নর্তকী থাকে। মূলের হাতে 'ব্যানা' থাকে।

ঠনকীরাবণ পালাগানে মোট গায়ক সংখ্যা পাঁচজন—চারজন পাইল, একজন মূল। সকলের হাতে একটি করে মন্দিরা। 'মহীরাবণ বধ', 'সীতা অন্বেষণ' 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তবে এ গানের দল এখন অবলুপ্তির পথে। রামায়ণ গান এ যুগের মানুষের বোধহয় পছন্দ নয়। খ্যামটা এবং দোয়ারীর খিস্তি-খেউরের দিকেই আকর্ষণটা যেন প্রবল বলে মনে হয়।

'রামলীলা' গান রামের লীলাকীর্তন করার জন্য পালাগান। এর উল্লেখযোগ্য পালা হচ্ছে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' এবং 'রাবণ বধ'। এই গানে দুইজন মূল (ডাইনা এবং বায়া), ৪-৫ জন পাইল, ২ জন বাইন ও ৪ জন চ্যাংরা-নর্তকী থাকতো। কোন দোয়ারী দলে থাকতো না। কৃষ্ণলীলায় 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম', 'ব্রজলীলা', 'কংশ বধ' প্রভৃতি পালা ছিল। এ গানেও রামলীলা গানের মত দুজন মূল, 'ছোকরা', পাইল ও বাইন থাকতো। দোয়ারীর স্থান ছিল না।

'জগনামা' মুসলমানদের গান। মহরমের সময় এ গান করা হোত হাসান-হোসেনের কাহিনী নিয়ে। মূলের হাতে চামর থাকতো বিষহরা গানের মত। কিন্তু 'বিষহরা'র মুখ্য-বাঁশী এ গানে ছিল না। খোল, করতাল, 'ছোকরা', অধিকারী এ গানের অংগীভূত ছিল। যুগি-জাতি (যারা চুন বিক্রী করতো) যুগিযাত্রা গানের স্রষ্টা। এর পালাগুলির নাম ছিল ময়নামতি, সেন্দুর-মতি ইত্যাদি। এই গানের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে কণ্ঠস্বরের বিকৃতি। বার-চোদ্দজন গায়ক নিয়ে এই গানের দল গঠিত ছিল। মূল, অধিকারী, বায়েন, দোহার এবং 'ছোকরা' এই দলে থাকতো।

জাগগান আগেকার দিনে বাঁশপূজোর সময় করা হোত। পালা—'দাতা কর্ণ', 'কলঙ্ক ভঞ্জন', 'গুরু দক্ষিণা', 'কৃষ্ণের জন্ম'। মূলের হাতে চামর থাকতো। মূল বাদে গানের দলে ছিল পাইল ৬ জন, বাইন ২ জন দোয়ারী একজন এবং ছোকরা ৪টি। মূল পদধুয়া শুরু হওয়ার আগে বন্দনা গান গাওয়া হত। সোনাই যাত্রায় সন্ন্যাস কীর্তন করা হোত আর কমলাযাত্রা চাঁদসদাগরের বৃত্তান্ত নিয়ে পালাগান।

পালাগান সম্পর্কে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি বিভিন্ন পালা-গানের গায়কদের মানস-গঠন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ লিপিবদ্ধ করা না হয়। সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে এ অঞ্চলে অনেকেই পূর্বে এবং বর্তমানে যথেষ্ট খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও বাংলার সংগীত-সমাজে এদের আসন নেই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নেই প্রতিভার প্রচার। অবশ্য গায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধির পরিচয়পত্র পাবার জন্য এ'রা খুব একটা ব্যস্ত নন। কারণ সংগীত পরিবেশনা এদের জীবিকা নয়, এটা শুধুই শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা—নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ। ও'রা গানের ভাষায় সে কথা বলেন :

গান গান করিয়া সর্বনাশ,
তে'ও না মিটিল মোর মনের হাউস,
কোন কুলেতে জন্ম লইয়া
আমি হইলাম গাওয়াইয়া,
হায়রে আমার পাগল মন ছাড়িবার
না পায় এই গানের মায়া।

এই গানের প্রতি 'মায়া' উত্তরের পল্লী বাংলার খেটে-খাওয়া মানুষকে শিল্প-সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিয়েছে। অনশন, অনা-দর, অবহেলাকে তুচ্ছ করে ওরা নিজেদের সর্বনাশ করেও মনের আশ মিটিয়ে শিল্পের সেবা স্বতপ্রণোদিত হয়ে করেছেন। এই সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে কোন সম্পদ লাভ করেন নি ও'রা, বরং দিয়েছেন—লোক-সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য।

(পাঁচ)
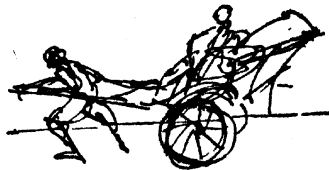
আমরা আবার ড্রইংরুমে ঢুকতে না তেই মিসেস রায় বললেন, তোমরা এখানে বসো না। খেতে খেতেই কথা যাবে।

মিঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে করে বললেন, চলুন, খেতে খেতেই হবে।

'চলুন'।

ড্রইংরুমের পাশেই ডাইনিং রুম। বল সাজানই ছিল। আমি আর মিঃ রায় লাম। মিসেস রায় ভিতরে গেলেন কয়েক নিটের জন্য। চাকর খাবার-দাবার নতেই মিসেস রায় সার্ভ করা সুরু লেন।

আমি বললাম, ডকটর সরকারকে দেখে রী ইন্টারেস্টিং লোক মনে হলো।

মিসেস রায় সার্ভ করতে করতেই ললেন, দাদার মত মানুষ সত্যি বিরল।

মিঃ রায় বললেন, শুধু ডকটর রকারই নয়, বৌদিও অত্যন্ত ভাল মানুষ। র্ঘদিন এখানে আছি কিন্তু এমন মানুষ ার পাইনি।

সুপ খেতে খেতে শুনলাম, ডকটর সরকার একজন যশস্বী ভূতত্ত্ববিদ। লকাতা ইউনিভার্সিটির ডি এস-সি ছাড়াও র্লিনের ডক্টরেট। বার্লিনের ডক্টরেট পেতে পেতেই হিটলার আত্মজ্ঞানশূন্য হয়ে লিয়াস সীজার বা আলেকজান্ডারের মত শ্ব জয়ের নেশায় মেতে উঠেছিলেন। ডকটর সরকার চলে এলেন লন্ডনে।

চাকরটা সুপ প্লেট তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ রায় বললেন, ইন্ডিয়ার একটা প্যাসেজ পাবার জন্য পাঁচ মাস লন্ডনে ছিলেন। ক্যামডেন টাউনে থাকতেন আর রোজ পিকাডিলি সার্কাসে পি অ্যান্ড ও'র দপ্তরে গিয়ে ধর্ণা দিতেন...

'কেন?'

দু'হাত নেড়ে মিঃ রায় একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন, জাহাজ কোথায়? প্যাসেঞ্জার লাইনারগুলোকে নিয়ে তখনই যুদ্ধের তোড়-জোড়ে লাগান শুরু হয়ে গেছে।

নতুন ফুল প্লেট এলো, পাশে একটা হাফ প্লেট। ফুল প্লেটে দু'চামচ সুপার ফাইন ডেরাডুন রাইস দিতে দিতে মিসেস রায় বললেন, দাদা এই পাঁচ মাসে ক্যামডেন টাউন-পিকাডিলি সার্কাস ছাড়া লন্ডনের আর কিচ্ছু দেখেননি।

আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, সত্যি?

আমার হাফ প্লেটে ফিস ফ্রাই তুলে দিতে দিতে মিঃ রায় বললেন, রিয়েলী সো।

ছোলার ডাল দেওয়া-নেওয়া শেষ করে মিসেস রায় মন্তব্য করলেন, দাদা ঐ ধরণেরই লোক! যখন যা মাথায় ঢুকবে তখন তাই নিয়েই পাগল।

ছোলার ডাল-ফিস ফ্রাই খেতে খেতেই জানতে পারলাম, ডকটর সরকার এখনও কাজ-পাগল। একবার ল্যাবরেটরীতে ঢুকলে ঠিক নেই কখন বেরুবেন। কেন বাড়ীতে? কিন্তু সায়েনটিস্টদের রিপোর্টের বান্ডিল নিয়ে পড়তে বসলেই হলো! বাড়ীতে লোক-জনই আসুক আর অন্য কোন কাজই থাক ওকে স্টাডি থেকে বের করা অসম্ভব।

চিংড়ির মালাইকারী খাবার সময় মিসেস রায় শোনালেন, সিনেমার টিকিট আর ডিনারের নেমন্তন্ন স্পয়েল করতে দাদার জুড়ি পাওয়া দায়।

'তাই নাকি?'

'তবে কি? আমি তো কোনদিন দাদাকে খেতে বলি না—কারণ ওর আসার কি কোন ঠিক আছে? কিছু ভালমন্দ রান্না হলে টিফিন কেরিয়ারে ভরে পাঠিয়ে দিই।'

মিসেস রায়ের কথা শুনে হাসলাম কিন্তু পোলাও আর চিকেনকারী দিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের হাসি উড়ে গেল। 'আজ আর সম্ভব নয় বরং কাল দুপুরে......

মিসেস রায় হাসতে হাসতে বললেন, কাল দুপুরের চিন্তা কালকেই করা যাবে। এখন তো একটু নিন।

সংসারে আর কোন বাচ্চাকাচ্চা না থাকায় মাগো আমাকে ভালমন্দ খাওয়াতে কোনদিন ত্রুটি করেনি। মামা একদিন মাছ না আনলে মাগো কি ভীষণ বকাবকি করত, আচ্ছা তুমি কি বলতো?

মামা বলতেন, কেন?

'জান ছেলেটা একটু' মাছ না হলে খেতে পারে না অথচ তুমি......

আমি আমার ঘরে বসে বসেই মামার কথা শুনতাম, আজ তেমন পছন্দমত মাছই দেখলাম না।

আমি পড়াশুনো বন্ধ করে এসব কথা শুনতে শুনতে হাসতাম। মাছ ছাড়া আমি ঠিকই খেতে পারতাম কিন্তু মাগো শান্তি পেত না। তাইতো মামাকে শেষে বলতে হতো, একবেলা ডিম-টিম দিয়ে চালিয়ে দাও, ওবেলায় বরং মাছ এনে দেব।

বিকেলবেলা অফিসের পরে মামা বরাক নদীর পাড়ে জেলেদের আড্ডায় গিয়ে মাছ কিনেই বাড়ী ফিরতেন। শুধু মাছই নয়, মাগো আরো কত কি খাওয়াতো। তাছাড়া মাগো কত কি রাঁধতে পারত! ভাবলেও অবাক লাগে। আমি মাঝে মাঝেই রান্না ঘরে গিয়ে মাগোর সঙ্গে গল্প করতাম। রান্না করা দেখতাম।

পারসে মাছগুলোকে নুন-হলুদ মাখিয়ে এক পাশে সরিয়ে রেখেছে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করতাম, মাগো, মাছ কি ওবেলায়?

মাগো অন্য কাজ করতে করতেই উত্তর দিত, না, না, ওবেলায় কেন হবে?

'তবে যে নুন-হলুদ মাখিয়ে সরিয়ে রেখেছ?'

'নুন-হলুদ না বসলে মাছের পাতুরী ভাল হয় না।'

আমি অবাক হয়ে বলতাম, সে আবার কি?

মাগো হাসতে হাসতে বলতো, দ্যাখ না কি করে হয়।

আমি সত্যি চুপ করে বসে বসে দেখতাম, মাগো মাছগুলোকে অল্প ভেজে তুলে রাখল। তারপর দেখলাম ঐ অল্প অল্প তেলের মধ্যে পেঁয়াজ-লঙ্কা-হলুদ বাটা আর নুন ভেজে নিয়ে বেশ ঘন সরষে বাটার জল কড়ার মধ্যে ঢেলে দিল। একটু পরেই এসব টগবগ করে ফুটতে সুরু করলেই আমি আবার জিজ্ঞাসা করতাম, মাছ দেবে না?

'ঝোলটা একটু শুকিয়ে গেলেই দেব।'

ঝোল শুকিয়ে গেলে মাছ আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু জল দিত মাগো।

'ঝোল শুকিয়ে যাবার পরে আবার জল দিলে কেন?'

কড়াটা ঢেকে দিতে দিতে মাগো জবাব দিত, মাছগুলো সিদ্ধ হবে তো।

আমি আবার পাল্টা প্রশ্ন করতাম, তা আগে দিলে না কেন?

'তাতে ঠিক টেস্ট হয় না।'

অল্প অল্প ঝোল থাকতে থাকতে কড়া নামিয়ে মাগো বলত, খেয়ে দেখবি নাকি কেমন হয়েছে?

মাগো এইভাবে আমাকে খাওয়া-দাওয়া করাত সত্যি তবে কোনদিনই বেশী খেতে পারি না। মিসেস রায়কে তাই বার বার অনুরোধ করলাম, কিন্তু শেষে দু' টুকরো চিকেন নিতেই হলো।

হাত-মুখ ধুয়ে ড্রইংরুমে আসার পর হাতে এলো এক প্লেট পুডিং।

শেষ পুডিংটুকু মুখে দেবার পর মিঃ রায় বললেন, আমার তো ভয় হয় ডকটর সরকারের সঙ্গে আলাপ হবার পর আপনি হয়ত আমাদেরই ভুলে যাবেন।

আমি পুডিং'এর প্লেট সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, আপনাদের ভুলে গেলেও এমন সুন্দর পুডিং খাবার স্মৃতি তো ভুলতে পারব না।

মিঃ আর মিসেস রায় হাসলেন।

কফি খাবার পরও বেশ খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করা হলো। গল্পে-গল্পে অনেক রাত হয়েছিল। আমি উঠে পড়লাম। বিদায় নেবার মুখে মিসেস রায় বললেন, কাল দুপুরে খেতে আসতে ভুলে যাবেন না।

আমি ঠাট্টা করে যে কথা বলেছিলাম সে-কথা ইনি এখনও মনে করে আছেন দেখে একটু অবাক হলাম। শুধু সৌজন্য বা ভদ্রতার জন্য এসব ঠাট্টা মনে রাখতে হয় না।

মিসেস রায়ের আন্তরিকতায় খুশী হলাম, হাসলাম। বললাম, ব্যাঙ্কে কিছু জমা দেবার আগেই পর পর কয়েকটা চেক কাটলাম। কিছু জমা না দিয়ে আর চেক কাটা কি ঠিক হবে?

'আপনার নাম করে যা তুলে রেখেছি, সেসব আর কে খাবে?'

কথাটা শুনেই যেন ইলেকট্রিক শক্ খেলাম। এমন কথা তো মাগো বলত! আমি বেশী কথা বলতে পরলাম না। বললাম, আসব।

নিউ ফরেস্টের সেই শান্ত, নির্জন, প্রায়ান্ধকার রাস্তা দিয়ে গেস্ট হাউসে আসার পথে আমি আবার আমার মুখোমুখি হলাম। আমি হাঁটছি। পিচের রাস্তার 'পর দিয়ে হাঁটছি। পাশেই শাল-পাইনের বন। স্থিত-প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীর মত ওরা অবিচল অপলক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে দাঁড়িয়ে পড়েছি, আমার চলা থেমে গেছে, আমি নিজেই টের পাইনি। শাল-পাইনের বন দেখছিলাম। অবাক হয়ে দেখছিলাম। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরত-হেমন্ত-শীত-বসন্তে একইভাবে মাটির নীচের পাতাল থেকে রস গ্রহণ করে আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই পৃথিবীর অজ্ঞাত অদৃশ্য দুনিয়া থেকে আমিও কেন চলার পথের রসদ সংগ্রহ করছি না? কেন মুক্ত আকাশের কোলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছি না?

আবার হাঁটতে শুরু করলাম। একটা সিগরেট ধরালাম। সিগরেট টানতে টানতেই ভাবছিলাম নানা কথা। এই ডেরাডুন, এই নিউ ফরেস্ট আসার আগে তো মিঃ ও মিসেস রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। ভাবতে পারিনি এদের মত দরদী মানুষের সাক্ষাৎ পাব। আচ্ছা আমি যদি ডকটর সরকারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা করি? নিশ্চয়ই আর একটা দরদী মানুষকে কাছে পাব। এই পৃথিবীতে কখনও অনেক কিছু পেয়েছি, কখনও সব কিছু হারিয়েছি। তা হোক। এ তো জগতের নিয়ম। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার ভীষণ ইচ্ছা করছে আরো অনেকে আমাকে ভালবাসুক, আমিও অনেককে ভালবাসি

সিগরেটটা এখনও টানছি। হঠাৎ বৃদ্ধ পাঠান দোকানদারের কথা মনে হলো। সামান্য সিগরেট কিনতে গিয়ে একজন অপরিচিত দোকানদারের সঙ্গে এত খাতির ভালবাসা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবু হলো। শুধু হলো মানে? দিনে দিনে আমাদের সম্পর্ক নিশ্চয়ই আরো মধুর হবে। তাই না?

মাগোর ভাষায় এক একটা মৌসুম আসে। এক মৌসুমে নদীর জল বাড়ে, এক মৌসুমে কমে। এক সময় আম হয়, এক সময় জাম হয়। এ নিয়ম চলছে, চলবে। কেন ডাক্তাররা বলে না মানুষ হবারও মৌসুম আছে? অন্য মৌসুমেও হয় তবে কম, অনেক কম। এখন কি আমার ভালবাসা পাবার মৌসুম এসেছে?

গেস্ট হাউসে ফিরে এসেও অনেকক্ষণ ভাবলাম। অনেক কিছু ভাবলাম। ভাবলাম? না, না, ভাবলাম কোথায়? কিছু পাবার নেশায় মশগুল হয়ে বসে রইলাম।

শুতে শুতে অনেক রাত হলো। সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গলো অনেক দেরীতে। বেয়ারার ডাকাডাকিতে। মুখে বিরক্তি প্রক[...] করলাম না। চা রেখে গেল, আমিও ম[...] বুজে খেয়ে নিলাম কিন্তু মনে মনে ভী[...] রাগ হলো, বিরক্তি হলো। ঘুম থে[...] উঠেই কি এই গাড়োয়ালী বেয়ারার মু[...] দেখতে ইচ্ছে করে?

ব্রেক ফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়লা[...] খানিকটা বিরক্ত হয়েই বেরিয়ে পড়লা[...] কিছুটা উদ্দেশ্যহীনও বটে। চাক্রাতা রো[...] পর এফ-আর-আই'এর মেন গেটের সাম[...] দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা সিগরেট খেলা[...] একবার ভাবলাম, বৃদ্ধ পাঠানের কাছে যা[...] আবার ভাবলাম, না, না, রোজ রোজ [...] কাছে যাব কেন? গেলাম না। শহ[...] দিকেই এগুতে সুরু করলাম।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লক টাওয়ারের কা[...] পল্টন বাজারে এসে গেলাম। সাম[...] থানা পোস্টাফিস, দোকান-বাজার, স্কু[...] ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। আরো কত কি! ট্রা[...] পুলিশের মত প্রায় রাস্তার মাঝখা[...] দাঁড়িয়ে রইলাম। হাঁ করে চার [...] দেখছি। সব কিছু দেখছি। শুধু শু[...] দেখছি। লোকজন দেখতে ভালই লাগ[...] ওরা ঘুরছে-ফিরছে কেনা-কাটা করছে। [...] তাড়াতাড়ি হাঁটছে, কেউ আস্তে আ[...] কেউ একা, কেউ বা অন্য কারুর সঙ্গে[...] স্বামী-স্ত্রী ভাই-বন্ধুর সঙ্গে। [...] হাসছে, কেউ ভাবছে। কেউ সুন্দর, [...] কুৎসিৎ। কেউ ধনী, কেউ গরীব। আ[...] দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের সবাইকে দেখ[...] মুগ্ধ হয়েই দেখছি।

একটা অটো-রিক্সা আমাকে প্রায় ধ[...] দিয়েছিল আর কি! আমি তাড়াত[...] পিছিয়ে গেলাম—রাস্তার ধারে গা[...] গোড়ায় পান-সিগারেটের দোকানের প[...] আমি এবার একটা সিগরেট ধরিয়ে [...] পাশের মানুষ দেখছি আর ভাবছি। ভা[...] বাহ্যিক দিক থেকে দুটি মানুষের [...] দেখছি না কিন্তু এরা সবাই যেন কোন [...] যাদু মন্ত্রের ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে।

সিগরেট টানছি, দেখছি আর ভাবছি[...]

না, না, যাদুমন্ত্র কেন হবে? মনে [...] আমার চারপাশের সমস্ত মানুষ যেন এ[...] কোরাস গান গাইছে। এক সুর, এক ভ[...] জীবন সঙ্গীত। আমি শুনতে পাচ্ছি কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি এরা সবাই অদৃশ্য সঙ্গীত পরিচালকের নিদে[...] জীবন-সংগীত গাইছে। তাইতো এ[...] মধ্যে একটা বেশ সুন্দর মিল দেখতে পা[...] সবার মধ্যে। এই ট্রাফিক পুলিশ, ঐ দো[...] দার, ঐ আর্মি অফিসার আর স্ত্রী। সব[...] জীবনের তাগিদে, বাঁচার আনন্দে এরা স[...] মত্ত। হয়ত প্রমত্ত কেউ কেউ। এ[...] মধ্যে কেউ ভাল, কেউ মন্দ। তাহে[...] এরা কেউ হারছে, কেউ জিতছে। কেউ [...] করার নেশায় ছুটছে, কেউ সদ্য বিবা[...] স্ত্রীকে নিয়ে আরো সম্ভোগের স্বপ্ন দেখ[...] কেউ হয়ত রুগ্না মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্[...] বাঁচিয়ে তোলার জন্য ছুটোছুটি কর[...] আবার কেউ বা বাবা-মা, হাসিখুশী[...]

…প্রয় সন্তানদের জন্য পল্টন বাজারে …ছে।

…সিগরেটটা শেষ করে ফেলে দিলাম।

কিন্তু আমি এখানে কি করছি? কার … কি কারণে এসেছি এই পল্টন বাজারের … ওরা যে কোরাস গান গাইছে, আমি …গাইতে পারছি না কেন? আমার …নের কোন তাগিদ নেই কেন? গরু … খায়, ঘাস খায়, নিজেকে বাঁচিয়ে … কিন্তু ওরাও তো বাছুরকে দুধ …য়। আমি? আমি কি তার চাইতেও …?

…আর দাঁড়িয়ে থাকলাম না। রাজপুর …ের দিকে গেলাম না। ওদিকটা একটু … পল্টন বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়- … আমি একা। তবু আমার পাশ দিয়ে … কত মানুষ যাতায়াত করছে, আমাকে … দিচ্ছে। বেশ লাগছে। ওদের গন্ধ- … আমার ভীষণ ভাল লাগছে।

…হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই বাজারের … এমন সুন্দর স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করছে? … লাগল। একটু কান পেতে শুনলাম … ঝগড়া। স্ত্রী বলছে, আমার জুতো … দরকার নেই। তুমি বরং সার্টটা কিনে …। স্বামী প্রতিবাদ করছে। বলছে, … সার্ট কি হবে? তুমি জুতোটা কিনে … হঠাৎ কোনদিন ছিঁড়ে যাবে। আমি … দাঁড়ালাম না। এগিয়ে চললাম। … একটা বিচিত্র পরিতৃপ্তিতে ভরে গেল। … জুতো কেনা হলো, নাকি সার্ট … হলো। কিন্তু এইটুকু বেশ বুঝলাম, … উপভোগ করার চাইতে প্রিয়জনকে … আনন্দ অনেক বেশী। আমি কি … আনন্দ, এই তৃপ্তি কোনদিন পাব না?

…আর একটা সিগরেট ধরাতে গিয়েই …ের ঘড়িতে নজর পড়ল। একটা বাজে। …-আর-আই'এর লাঞ্চের ছুটি হয়ে গেছে। … রায় নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা …ছেন। পল্টন বাজারের সরু গলি দিয়ে … ঘুরতে অনেক ভিতরে এসে গেছি।

…ক টাওয়ারের কাছে ফিরে আসতে … সময় লাগল। তাড়াতাড়ি একটা অটো- …রিক্সা নিয়ে রওনা হলাম। গেস্ট হাউসে … হাত-মুখ ধুয়ে মিঃ রায়ের বাংলোয় …জির হতে হতে পৌনে দুটো বাজল। …গাড়ী দেখতে না পেয়েই বুঝলাম, মিঃ … আবার অফিস গিয়েছেন।

মিসেস রায় সামনের বারান্দায় একটা …বেতের চেয়ারে বসে বাংলা খবরের কাগজ …ছিলেন। আমাকে দেখেই খবরের কাগজ …পাশে রেখে করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, … আসুন।

'আমার জন্য বসে আছেন তো?'

'তাতে কি হলো? আমি কি এর আগে …?' হাসি হাসি মুখেই মিসেস রায় বললেন।

এই বাড়ীতে দিনের বেলা আগে আসিনি। এই প্রথম। দিনের বেলায় মিসেস রায়কেও এই প্রথম দেখছি। সন্ধ্যাবেলায় সব মেয়েরাই একটু-আধটু সাজগোজ করে, প্রসাধন চর্চা করে। মিসেস রায়ও করেন। ভালই লেগেছে দেখতে। এখন একটা সাধারণ চিকনের ব্লাউজ আর প্লেন তাঁতের শাড়ী পরেছেন। চুল ভেজা। খোপা বাঁধতে পারেন নি। কপালের'পর সিঁদুরের টিপটা জ্বল জ্বল করছে। আমি একবার দেখলাম। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম।

বললাম, উঠলেন কেন? বসুন।

'উঠব না? আপনার তো নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে।'

'এমন কিছু ক্ষিদে পায়নি।'

মিসেস রায় বসলেন। আমি একটু দূরে একটা চেয়ার টেনে বসলাম।

'অত দূরে বসছেন কেন? এদিকে এগিয়ে আসুন।'

আমি চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নিতে নিতে ভাবলাম, আমি তো আরো কাছে আসতে চাই, চাই ভক্তি করতে, ভালবাসতে, ভালবাসা পেতে। আমি ভদ্রতা-সৌজন্য রক্ষা করে আপনাদের কাছে আসছি, হাসছি, গল্প করছি। কিন্তু মনে মনে কাঁদছি। হাউ হাউ করে কাঁদছি। সারা পৃথবীর সবার সঙ্গে শুধু ভদ্রতা-সৌজন্যের সম্পর্ক নিয়ে কি কেউ বাঁচতে পারে? সুখী হতে পারে?

আমি মাথা নীচু করে বসেছি।

'কি ভাবছেন?'

আমি তাড়াতাড়ি একবার মুখ তুলে বললাম, কই, কিছু তো ভাবছি না।

মিসেস রায় বোধহয় আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনি সব সময় কি যেন ভাবছেন।

কি আশ্চর্য? কি করে ইনি জানলেন? আমি তো কখনও বলি না, আমি ভাবছি, আকাশ-পাতাল ভাবছি। ভাবছি আমার শূন্যতার কথা, তুলনা করছি আশপাশের মানুষের সঙ্গে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে।

'কি করে বুঝলেন?'

'যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে পারব না, তবে আপনার চোখ দুটো আর কপালের রেখাগুলো লক্ষ্য করলে মনে হয় আপনি সব সময় কি যেন ভাবছেন।'

আমি সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললাম, আমি তো বুঝতে পারিনি আপনি এত ভালভাবে আমাকে লক্ষ্য করেছেন।

তখন আর কিছু বলেননি তবে খেতে খেতে উনি বলেছিলেন, একা একা থাকলে অনেক রকমের চিন্তা-ভাবনা মাথায় আসা স্বাভাবিক। তবে অত ভাববেন না। যখন যা পাবেন, তখন তাই প্রাণমন দিয়ে গ্রহণ করবেন।

আমি চুপ করে শুনেছিলাম। একটু পরে মিসেস রায় আবার বলেছিলেন, জীবনে যত বেশী বিচার করবেন, তত বেশী দুঃখ পাবেন। জীবনকে একটু সহজ-ভাবে নিলেই দুঃখ কম পাবেন।

সত্যিই তাই। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বিচার-বিবেচনা করতে গেলেই দুঃখ বেশী পেতে হয়। মামা কদাচিৎ কখনও মাগোর পর রাগ হলে বড় বেশী চেঁচামেচি করতেন। মাগো একটি শব্দ উচ্চারণ করত না। আমি মাগোর কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বলতাম, মামা শুধু শুধুই তোমাকে বক-লেন। তুমি কিছু বল্লে না কেন?

মাগো বলত, বলে কি লাভ? আমি বলব ও দোষী, ও বলবে আমি দোষী। এত বিচার-টিচার করে লাভ কি বল?

আমি হেসে বললাম, আপনি আমার মাগোর মত কথাবার্তা বলেন।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ভালই তো।'

অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। আমি আর দেরী করলাম না। যাবার সময় উনি বললেন, দাদার ওখানে সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই যাবেন।

'যাব।'

'আর হ্যাঁ, রাত্রে ওখানেই খাবেন।'

'প্রথম দিন গিয়েই খাব?'

'তাতে কি? দাদার কাছে লজ্জা করার কিছু নেই।'

আমি আর কথা না বলে আস্তে আস্তে গেস্ট হাউসের দিকে রওনা হলাম। অনেক দূরে এসে একবার পিছন ফিরে দেখি, মিসেস রায় তখনও আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

(ক্রমশঃ)

# অহিফেন সেবীর মন

## বিষ্ণুচরণ ও চন্দ্রকান্ত

**ইংরিজি ও বাঙলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই অহিফেনসেবীর মনের কথার সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত।** ডি কুইন্সী তাঁর কনফেশনস অফ এ্যান ইংলিশ ওপিয়ম ইটার-এর ছত্রে-ছত্রে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে নিজের মনকে কাছে মেলে ধরেছেন আর বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের জবানীতে 'আফিং চড়াইয়া' তৎকালীন সমাজের অন্যায় সমালোচনা করেছেন। দুইজনেই ধ্রুপদী সাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত। ডি কুইন্সী সত্যিই অহিফেনাসক্ত ছিলেন আর বঙ্কিমের অহিফেন আসক্তি কাল্পনিক। এর ফলে ডি কুইন্সীর লেখার দুর্বলতা কমলাকান্তের দপ্তরে নেই। ডি কুইন্সীর লেখার অনেক জায়গাই 'টর্ডার অ্যান্ড আনরিয়াল', আবার জায়গায়-জায়গায় চমক লাগায়। সমালোচকের মতে,—'হি রোট এ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ প্রোজ; মোস্ট অফ ইট ইজ হ্যাক-ওআর্ক, এ ফেয়ার প্রোপোর্শন ইজ অফ গুড কোয়ালিটি, অ্যান্ড এ স্মল অ্যামাউন্ট ইজ অফ দি হাইয়েস্ট মেরিট।' কমলাকান্তের প্রতিটি ছত্র বুদ্ধিদীপ্ত, লজিকাল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ; বাঙলা কেন বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে রক্ষিত মহামূল্য মণি-মাণিক্যের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য। ডি কুইন্সীর বই পড়লেই মনে হবে ভদ্রলোক লেখার সময়ে বোধ হয় প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। নীরস বর্ণনা ভারাক্রান্ত লেখার মাঝে-মাঝে জৌলশহীন বস্তাপচা হিউমারের চমক দেবার চেষ্টা অনেক প্রসঙ্গের অবতারণার মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্য বিধৃত, কিন্তু অনেক জায়গাতেই বক্তব্যের মধ্যে ভুল-প্রমাদের ছড়াছড়ি। কিন্তু কুইন্সী যখন মাঝে-মাঝে ভাবাবেগে অনুপ্রাণিত, তখন লেখার মধ্যে অপূর্ব শক্তি ও সৌন্দর্যের সমাবেশ, ইংরিজি সাহিত্যে যা দুর্লভ। কমলাকান্তের দপ্তরে এই জোয়ার-ভাটা নজরে পড়ে না। ডি কুইন্সীও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি না জেনেও অনায়াসে দুই লেখার এই পার্থক্য থেকে অনুমান করা চলে যে, লেখার সময় একজনের লেখনী সব সময়ে স্ববশে থাকতো না, আর অপরের লেখনী তাঁর শাণিত মার্জিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সব সময়েই পরিচালিত। ডি কুইন্সীর 'কনফেশনস' তাঁর অহিফেনসেবী মানসিকতার পরিচায়ক।

নিয়মিত আফিম খেলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। অনেকের মতে আফিমের নেশায় মদের নেশার মতই ক্রমশ কর্মক্ষমতার ও দক্ষতার অবনতি ঘটে। বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি কমতে থাকে, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কোনো কিছু গড়ে তোলার ইচ্ছা হ্রাস পায়। কাজ করার ক্ষমতা ক্রমশ কমতে কমতে এমন অবস্থায় আসে যে, খাওয়া-দাওয়ার অতিপ্রয়োজনীয় জৈবিক ব্যাপারেও উৎসাহের অভাব ঘটে। অবশ্য জারক রসের কমতির জন্যেও অগ্নিমান্দ্য দেখা দিতে পারে। নৈতিক অবনতির জন্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা চলে যায়। যেন-তেন-প্রকারেণ ঠিক সময়টিতে আফিম সংগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় আফিংখোরের একমাত্র কাজ। তার চিন্তা-ভাবনা শুধু ঐ একই বৃত্তে ঘুরতে থাকে। এত দূর চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে যে, নেশার বস্তুটি সংগ্রহের জন্যে চুরি-জোচ্চুরি, কিছুই আর আটকায় না। নিজের নেশার জোগান নিয়মিত করার আশায় এরা নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়, পরিজনকে নেশা করতে শেখায়। এই রকম একজনের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

বিষ্ণুচরণকে এখন দেখলে বোঝাই যাবে না যে এককালে তিনি একজন ডাকসাইটে খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, তিন বিভাগেই দক্ষতা ছিল। 'এ' ডিভিশনের কোন একটা ক্লাবের হয়ে খেলে কুড়ি বছর আগে নাম করেছিলেন। এছাড়া রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, বক্তৃতা করেছেন, জেল খেটেছেন; কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন। এক কথায় 'চৌকশ' ছেলে ছিলেন, এই বিষ্ণুচরণ। দশ বছর আগে পায়ের একটা হাড় ভেঙে যায়। তখন তিনি এক ছোট্ট মফঃস্বল শহরের স্কুল-মাস্টার। প্ল্যাস্টার দুবার কাটতে হয়েছিল; ঠিকমত হাড়ের মুখ দুটো সেট হয় নি। প্রায় ছ' মাস শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। ক্রমে 'বেডসোর' ও পেটের গোলমাল দেখা দিল। স্থানীয় চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস হারিয়ে এক হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন। তিনি বেদনা দূর করার ও ঘুম আনার জন্যে আফিম খাবার পরামর্শ দেন। সেই থেকে আফিমের অভ্যাস। মাত্রা বেড়ে প্রায় চার গুণ হয়েছে। তবুও ঠিক মত কাজ হচ্ছে না। এখন কোলকাতার কাছাকাছি এক স্কুলের সঙ্গে যুক্ত। মাস ছয়েক হল নিয়মিত স্কুল বসছে না। মাস্টাররা পুরো মাইনে পাচ্ছেন না। আর্থিক অনটন চলেছে। দাদা দিল্লী থেকে কিছু-কিছু পাঠান তাই সংসার চলে। স্ত্রী ও সতেরো বছরের একটি ছেলে নিয়ে সংসার। স্ত্রী একটা প্রাইমারী স্কুলে চাকরী করেন। খুব হিসেবী বলে কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বামীর দৈনিক বরাদ্দের উপর এতদিন হস্তক্ষেপ করেন নি। আফিম ও দুধ মিলে খরচ প্রায় এক টাকা। গত ক
মাস ধরে স্বামীর মত নিয়েই এই
কিছু কমিয়েছিলেন। কয়েক সপ্তাহ
তিনি টের পেয়েছেন যে ছেলে
বাজার থেকে পয়সা চুরি করছে।
আঘাত পেলেও ছেলের কাছে সেকথা
করেন নি। বিড়ি-সিগারেট খায় না,
নেশাও তেমন নেই, তবে পয়সা
স্বামীকে বিশ্বাস করেন না
দিয়েই গেল কয়েক বছর ধরে
করাচ্ছেন, এখন ছেলের উপরও আর
রাখতে পারছেন না। মাস দুয়েক
স্বামী খাট থেকে আর উঠছেন না।
বাড়ী ভস্মীভূত। স্বামী-পুত্র দু
স্কুলে যেতে হয় না। তাবলে দিন-রাত
থাকলে চলবে কেন? ছেলেটাও কেম
শুকিয়ে যাচ্ছে, চোখের কোণে কালি
বুকের হাড় বেরিয়ে গেছে। খাওয়া-
রুচি নেই। বই-খাতা খুলে রেখে
খালি ঝিমুচ্ছে। অনেকবার ডাক
সাড়া দেয়। বাড়ী থেকে বেরোয় না।
ধুলোর ঝোঁক চলে গেছে। তা যাক
বয়সী ছেলেদের এখন বাইরে না বে
ভাল। যা দিনকাল পড়েছে। মনে
এই সব সাত-পাঁচ চিন্তা। হঠাৎ কি
সেদিন সকাল-সকাল স্কুল ছু
অসময়ে বাড়ী ফিরতে হল। বাড়
ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারলেন। দু
ধাক্কা দিতে দরোজা খুললো না। কি
জানি মনে হল। একটু ঘুরে গিয়ে
মেরে জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি
দেখলেন পিতা-পুত্র দুজনে চাপা
ঝগড়া করছে। বাপ ছেলেকে ভৎর্সনা
ছেলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বাপের ধারণ
তার ন্যায্য পরিমাণের থেকে বেশী
আত্মসাৎ করেছে, আর ছেলের ধার
সকালে উঠেই দুপুরের গুলিটা
ফেলেছেন এবং সেকথা বেমালু
গেছেন। এই নিয়ে ঝগড়া। ভ
কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে
বোধ হয় ঐখানেই বসে পড়েছিলেন।
একটি মেয়ে ওঁকে অসুস্থ মা
চেঁচামেচি-সোরগোল করাতে দরোজ
বাপ-বেটায় বাইরে এসে ওঁকে ঘ
যায়। এর পর দিনই এক প্রতিবেশী
উনি আমার সঙ্গে দেখা করেন
ঘটনাটি বলেন। এর কোন প্রতিকা
কিনা জানতে চান।

এই রকম মর্মন্তুদ কাহিনী এ
শুনি নি। বিচলিত ও অভিভূত
করলাম। মর্ফিয়া-অ্যাডিকটের সং

গুচ্ছ জানতাম, দুই বন্ধু পরস্পর পরস্পরকে ইনজেকশন দিয়ে নেশার বিমল আনন্দ উপভোগ করছে শুনতাম, কিন্তু ... ছেলেকে আফিমের নেশায় দীক্ষিত ... এরকম ঘটনা বিরল। মর্ফিন-... আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা মাঝে মাঝে জানতে চান এই সব নেশা-... চিকিৎসা চলে কিনা, চিকিৎসায় ... পাওয়া যায় কিনা, এই রকম আরও ... কথা। অমুক সাহিত্যিক মদ ছেড়ে ... ধরেছেন, অমুক শিল্পী আফিম ছেড়ে মর্ফিয়া নিচ্ছেন, ইত্যাদি খবর শোনা ... প্রত্যক্ষভাবে কোন আফিমখোর বা ... অ্যাডিক্টের সম্বন্ধে কোন অভি-জ্ঞতাই আমার ছিল না। কিছু দিন আগে ... এক ভদ্রলোকের চিকিৎসা প্রসঙ্গে ... আফিং-আসক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তাঁকে আনা হয়েছিল ... অবস্থায়। দৈনিক আফিমের বরাদ্দ ... বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তিনি নির্যাতন-মূলক ডিলিউশনে ভুগছিলেন। স্ত্রী ও পা... তাঁর খাদ্যের সঙ্গে বিষ মেশাচ্ছে সন্দেহে তিনি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁকে এক নার্সিং হোমে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। মর্ফিয়া-অ্যাডিকট বা আফিংখোর সর্বদা স্বেচ্ছায় চিকিৎসকের কাছে কদাচিৎ আত্মসমর্পণ করেন। তবে ঘুমের ওষুধ ও বেদনানাশক (এ্যাসপিরিন জাতীয়) ওষুধের অভ্যাস ছাড়াবার চিকিৎসা মাঝে মাঝে করতে হয়। ওষুধপত্র নিয়ে যাঁদের কাজ-কারবার তাঁরাই সাধারণত এই ধরনের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েন। এঁরা সকলেই শিক্ষিত ও অল্প বয়সেই অভ্যাসটি আয়ত্ত করে বুঝতে পারেন যে, এ অভ্যাস না ছাড়লে জীবন অচল হয়ে পড়বে। তাই তাঁদের মধ্যে সুস্থ হবার আন্তরিক একটা ইচ্ছা থাকে। যাঁদের আগে থেকে কোন মানসিক বিশৃঙ্খলা থাকে না, তাঁরা এ অভ্যাস ছাড়তেও পারেন। কিন্তু আফিমের নেশা ধীরে-ধীরে ব্যক্তিটিকে গ্রাস করে, পূর্ণগ্রাস হবার পর আত্মীয়স্বজন চিকিৎসার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন, তখন আর প্রায়ই কোন উপায় থাকে না। এঁরা প্রায়ই মাঝ বয়সী বা বেশী বয়সী; জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা বিলুপ্ত। কাজেই চিকিৎসার অর্থাৎ ভাল হবার ইচ্ছা এদের স্বভাবতই কম। চিকিৎসায় সুফল পাওয়ার আশা আরও কম।

তবু ভদ্রমহিলার অবস্থা দেখে বিচলিত হলাম। মনে হলো একবার চেষ্টা করে দেখা যাক, কিছু করা যায় কিনা? কোন একটা উপলক্ষ করে একবার বিষ্ণুচরণের বাড়ী তাঁকে দেখা দরকার। বাপকে না হোক ছেলেটিকে বাঁচান হয়ত যেতে পারে। বিষ্ণুচরণকে দেখলাম। হাড়ের উপর চামড়ার আবরণ দেওয়া একটা প্রায় অচল দেহ। চোখ মেলে তাকাবার ক্ষমতা নেই। বিড়বিড় করে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপ চালাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর কথা অসংলগ্ন ও ছাড়া-ছাড়া। বিশেষ কোন অর্থবহ বলে মনে হল না। আমার কিছু করবার নেই, বুঝলাম। হাসপাতালে নেবে কিনা সন্দেহ। হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে, মুখের পেশীতেও কাঁপন। ছেলেটি আমাকে দেখেই বাথরুমে লুকলো, অনেক ডাকাডাকিতেও দরোজা খুললো না। বিষ্ণুচরণের দাদার ঠিকানায় একটা চিঠি দিলাম। ছেলেটির ভার নেবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানালাম। কয়েক দিন পরে বিষ্ণুবাবু স্ত্রী-পুত্রকে অব্যাহতি দিয়ে বাঞ্ছিতধামে প্রস্থান করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একখানা ডায়েরীর মত খাতা আমার হস্তগত হয়। কয়েকটি পাতায় নানা রকম ফুল-পাতা আঁকা, কয়েকটি পাতায় কুড়ি বছরের আগেকার বিবর্ণ খবরের কাগজের কাটিং। পাঠোদ্ধার করা যায় না, কাগজগুলো গুঁড়ো হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করলে বোঝা যায় দৈনিক পত্রিকার ফুটবল খেলার বিবরণী। বোধ হয় বিষ্ণুচরণের ক্রীড়া-কৌশলের পরিচয় এর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। মাঝে-মাঝে ডায়েরীর মত সাল-তারিখ দিয়ে জড়ানো অক্ষরে কি সব লেখা। দু-এক জায়গার পাঠ উদ্ধার করতে পারলাম। পাঠকদের অবগতির জন্যে দু-একটা নমুনা তুলে দিচ্ছি। বিষ্ণুবাবুর স্বপ্নের মধ্যে ডি কুইন্সীর 'ফ্লাইট অফ ইম্যাজিনেশন নেই', শব্দ ঝংকার নেই, সাহিত্যিক মূল্য নেই, তবে আফিমসেবীর মনের পরিচয়, সামান্য হলেও আছে।

অনেকটা দূরে অবাধ ফ্লাড লাইটের আলো। ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে হাইল্যান্ডাররা ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে। আমাদের এখানেও ফ্লাড লাইটে ফুটবল খেলা হচ্ছে। একটা ব্লাডহাউন্ড চেন ছিঁড়ে রেফারীকে কামড়াতে চায়। গোল হয়েছে। গো...গো...ও...ও...ল। যে গোল দিয়েছে কুকুরটা তারই টুঁটি কামড়ে ধরেছে। তার জার্সি ছিঁড়ে গেল। বিষ্ণুচরণ গোল দিয়েছে। গোরার বাজনা সেই পরিচালনা করছে। (সকালের স্বপ্ন)।

আমি যদি মুখচোরা না হতুম তো নিশ্চয়ই...স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দিতুম। আমি দিয়েছি এগারোটা গোল আর অজিত ছটা। অজিত কেন চান্স পেল? আমি পেলাম না। কি হবে চান্স পেয়ে? কদিন আর লোকে খেলোয়াড়কে মনে রাখে। তার থেকে বর্ষায় ছাতি মাথায় দিয়ে ছিপ মেলে মাছ ধরাতে মজা বেশী। কেউ দেখবে না, জানবে না, বুঝবে না। সিলেকশন কমিটিকে অজিত টাকা খাইয়েছে কি? না রবিদার বাড়ী গিয়ে বৌদিকে তেলিয়েছে? আমসত্ত ভালো না ক্ষীর কলা দিয়ে মুড়ি? লোটাস-ইটার কারা? (বিকেলের চিন্তা)।

অলিম্পিক সেমিফাইনাল দেখছি। জায়গাটা লন্ডন না প্যারী? ডবল ডেকারের ছাতে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছি। টিকিট পাই নি। আমাকে টিকিট দিলে না আর পাড়ার অ্যাং-ব্যাংরা টিকিট ব্ল্যাক করছে। একটা গর্ত খুঁড়ে টিউব স্টেশনে ঢুকে পড়েছি। এখুনি ট্রেন ধরতে হবে। কি হবে? অন্ধকারে ঘুমনোই ভালো। ওই তো ওয়েটিং-রুমে সব গাদাগাদি করে ঘুমচ্ছে। সামাদ না গোষ্টরা কেউই টিকিট পায় নি। কত রকম বাজনা বাজছে। তিমিরবরণের স্বরোদ, বীটোফেনের মুনলাইট সনাটা। ট্রেনের চাকায় রবীন্দ্রসঙ্গীত। আমি গুটিয়ে যাচ্ছি, শুকিয়ে যাচ্ছি, গুটি পোকা হয়ে গেছি। আমাকে আর আমি দেখতে পাচ্ছি না। অথচ আমি বাজিয়ে চলেছি। সন্ধ্যা দেহ ধরে আকাশ ছেড়ে শুক্রগ্রহের দিকে চলেছি' যাঃ! ট্রেন ছেড়ে দিল। খেলা দেখা হলো না। তাহলে ঘুমনো যাক।

অসংলগ্ন এই সব উক্তি থেকে এইটুকু মাত্র অনুমান করা চলে যে খেলার ব্যাপারে আশাভঙ্গের দরুণ ভদ্রলোক হতাশাগ্রস্ত হয়ে ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেয়েছেন। মাঝে-মাঝে নিজেকে জাহির করতে চেয়ে-ছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ইচ্ছে হয়েছে, আবার পরমুহূর্তে বাস্তব থেকে সরে গেছেন। লেখাগুলোর মধ্যে বর্তমানের কোন চিন্তা-ভাবনা বা সমস্যার সংকেত কোথাও নেই। সবই খেলোয়াড় বিষ্ণুচরণকে ঘিরে; তাঁর শিক্ষকের জীবন বা পারিবারিক জীবনের কোন কিছুর মধ্যেই যেন তিনি ছিলেন না।

বিষ্ণুচরণের কাহিনী লিখতে গিয়ে চন্দ্রবাবুর কথা মনে পড়লো। ডি কুইন্সীর সঙ্গে পরিচয় চন্দ্রবাবুর আশ্রমে। এইবার চন্দ্রবাবুর প্রসঙ্গে আসা যাক। আর একটি 'ওপিয়াম ইটার'। চন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ হয় এক অধ্যাপক বন্ধুর মারফত। উত্তরপ্রদেশের এক শহরে বেড়াতে গিয়ে অধ্যাপকের অতিথি হয়েছিলাম। তিনি এক-দিন চন্দ্রবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। পথে উচ্ছ্বসিতভাবে চন্দ্রবাবুর পরিচয় দিলেন। একটা অদ্ভুত টাইপের মানুষ এই চন্দ্রবাবু। একটা জিনিয়াস, একটা ধাঁধা, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একটা অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। আফিমের লেথাল ডোজ কত? ·০১ গ্রাম? আচ্ছা যদি কেউ ১ গ্রাম খায়? অভ্যাস হয়ে গেলে হজম করতে পারবে? কিন্তু দেহ-মনের যন্ত্রপাতি ঠিক থাকবে কি? ডাক্তারী মতে তার শরীরের ক্ষয় হবে, ওজন কমবে, ধারণাশক্তি থাকবে না, স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাবে। ভদ্রলোকের শক্তি কমা তো দূরে, বেড়েই চলেছে। দিনে তিনশো পাতার বই পড়ে মনে রাখতে পারেন। গড়-গড় করে রবীন্দ্রনাথ, শেলী, কীটস আউড়ে যেতে পারেন। কান্টের 'ন্যুমেনন্যাল' আর 'ফেনো-মেনাল' নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতে পারেন। আরো অনেক কিছু পারেন; অনেক কিছু জানেন। খাঁটি সিদ্ধপুরুষ, যোগী। আমাকে যদি তার মনে ধরে তবেই মুখ খুলবেন, আর তা না হলে চুপচাপ বসে থাকবেন আর গুলি গিলবেন। ইত্যাদি রকমের ভূমিকার পর চন্দ্রকান্ত-দর্শন ঘটলো। বোধ হয় আমাকে মনে ধরল। আধ ঘন্টার মধ্যে তিনটি কবিতা আওড়ালেন আর দুবার আফিমের গুলি মুখে পুরলেন। চোখ বুজেই অবশ্য কথাবার্তা চালালেন।

সাঁতাই দর্শনীয় চেহারা এই চন্দ্রবাবুর। শালপ্রাংশু, মহাভুজ যাকে বলে, একেবারে তাই। গায়ের রং মিশ কালো, খাড়া নাক, বাবরী চুল, গালপাট্টা সব মিলিয়ে এক জবরজোরালো ব্যাপার। কথা বলার ভঙ্গীও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। আমার আসার খবর মনে হলো আগে থেকেই জেনেছেন। ডাক্তারী বিদ্যাকে ব্যঙ্গ করেই যেন তিনি কথাবার্তা শুরু করলেন। অবশ্য কথাবার্তা যা বললেন সবই আমার বন্ধুকে সম্বোধন করে, অথচ আমাকে উদ্দেশ্য করে।

—তোমার বন্ধুকে একবার গন্ধবাবার কাছে নিয়ে যেও। যে গন্ধ ইচ্ছে শুঁকতে পারবেন। উনি নিজের হাতেই চাঁপার গন্ধ পেতে পারেন। উনি কি বলেন জানো? সুরা তমোগুণ বাড়ায়, গঞ্জিকা রজোগুণ আর সত্ত্ব-গুণবর্ধক এই কৃষ্ণ বটিকা। এই বলে ডিবে থেকে আর একটি সত্ত্বগুণবর্ধক বটিকা মুখে চালান দিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী কুম্ভক করে কতক্ষণ থাকতেন জানো প্রফেসর? এক ছোকরা বৈজ্ঞানিক এই নিয়ে সেদিন টিটকিরি দিয়ে কথা বলছিল, ফিজিওলজির ডক্টরেট। অনেক দিন জার্মানীতে থেকেছে। বোধ হয় পূর্ব জার্মানীর যোগরহস্য নাকি ওরা জেনে গেছে! শুধু নাকি অভ্যাস, সবই নাকি কন্ডিশনড রিফ্লেকস। তুমিও তো মস্ত বড় অধ্যাপক। বল না হে কিছু? আচ্ছা, আফিম খেলে নাকি স্মৃতিশক্তি কমে? তাহলে তো আমার ডোজ কমাতে হচ্ছে। তোমার বন্ধু কিছু জানেন নাকি এ সম্বন্ধে? দেখ তো হে, ঠিক মত বলতে পারি কিনা? না বাহাত্তুরেতেই বাহাত্তর হল!

এই বলে র‍্যাক থেকে একটা বিবর্ণ ছেঁড়াখোড়া বই আমার দিকেই ছুড়ে দিলেন। তুলে দেখি যার কথা আমি মনে-মনে ভাবছিলাম; সেই ডি কুইন্সীর 'কনফেশনস অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়ম ইটার'। একটু অবাক লাগলো। বইটির নাম শুনেছিলাম, পড়া হয় নি। ভদ্রলোক ঢেউ-খেলানো সুরে বলে চললেন— সাম হেয়ার আই নিউ নট হোয়ার—সামহাউ, আই নিউ নট হাউ—বাই সাম বীইংস, আই নিউনট হুম—এ ব্যাটল, এ স্ট্রাইফ, অ্যান এগোনি ওয়াজ কনডাকটিং—ওয়াজ ইভলভিং লাইক এ গ্রেট ড্রামা, অর পিস অফ মিউজিক... ইত্যাদি। চন্দ্রবাবু আমাকে পৃষ্ঠার নির্দেশ দিলেন। আমি মিলিয়ে দেখলাম। হুবহু অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। প্রায় এক পৃষ্ঠা তিনি বলে চললেন।

মনে হলো কথাগুলো যেন আমাকে চ্যালেঞ্জ করেই বলা হচ্ছে। এর পর যেকয় দিন ঐ শহরে ছিলাম, রোজই চন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে আলাপ-আলোচনা করেছি। বুঝেছিলাম তিনি যেন জানতে চান কি করে এটা সম্ভব হলো যে, আজীবন শরীরের উপর নানা রকমের অত্যাচার করে স্নায়ুতন্ত্রকে খেয়ালমত উত্তেজিত-নিস্তেজিত করেও তাঁর মানসিক শক্তির অবনতি ঘটে নি। বুদ্ধিবৃত্তি হ্রাস পায় নি। শরীরে জরার আক্রমণ ঘটে নি। অথচ একথা সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে তাঁর অহমিকায় বাধছে। তিনি বিজ্ঞানকে অর্বাচীন শাস্ত্র মনে করেন, বোধিকে বুদ্ধির চেয়ে প্রাধান্য দেন। মুখে না বললেও তিনি একটা ঐশী শক্তিকে সব কিছুর চালক বলে স্বীকার করেন। সে যাই হোক, 'ওপিয়াম-অ্যাডিকটের' কোন বৈশিষ্ট্য, কোন উপসর্গ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেল না কেন? এই চিন্তাতে আমি ডুবে ছিলাম কয়েক দিন। তারপর কোলকাতায় ফিরে আসি। নানা-সূত্রে চন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য জানতে পারি। আরও দুবার চন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, আরো অনেক আলোচনার সুযোগ পাই। চন্দ্রবাবু গত কয়েক বছর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। এটা তার স্বাভাবিক জীবন যাপন নয়। প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করেছেন। এই কোলকাতা মহানগরী ছিল তাঁর যৌবনের চারণভূমি। প্রচুর পৈত্রিক সম্পত্তি তিনি খামখেয়ালীপনা করে নষ্ট করেছেন। খামখেয়ালীপনা তাঁর এক-এক সময় এক-একভাবে প্রকাশ পেত। কোন এক সময় অখ্যাত লেখকদের লেখা ছাপিয়েছেন হাজার-হাজার টাকা খরচ করে। কোন সময় ভ্রাম্যমান থিয়েটারের দল নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কোন সময় জীবন বীমা কোম্পানী খুলেছেন, কোন সময় বা পতিতা মেয়েদের কো-অপারেটিভ সমিতি খোলার নেশায় মেতেছেন। এই রকম খেয়ালী ব্যবসায় প্রায় লাখখানেক নষ্ট হয়েছে। এছাড়া শিল্পী-সাহিত্যিকদের পার্টি দিয়ে মাঝে-মাঝে টাকা খরচ করতেন। জন-পঞ্চাশেক বন্ধু-বান্ধব নিয়ে চলে গেলেন শ্রীনগর কিম্বা ওয়ালটেয়ার। পনেরো দিন ধরে মদের স্রোত বইলো, খাবারের পাহাড় ধ্বংস হলো। নিজে প্রত্যহ প্রায় এক বোতল করে মদ্যপান করতেন। রাত্রে হুইস্কি, সকালে জিন, দুপুরে বিয়ার। কোন সময় হয়ত ইম্পি-রিয়াল লাইব্রেরীতে (বর্তমান ন্যাশনাল) ঘন্টার-পর-ঘন্টা পড়ে চলেছেন: তিন মাস চার মাস ধরে। আবার কোন সময় একেবারে 'ব্যাক টু নেচার' হয়ে জংলীদের মধ্যে জীবন যাপন করেছেন। নামকরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিশে দেখেছেন তাদের জ্ঞানগরিমা কিছু নেই তারা সহজাত-প্রবৃত্তিবশে যেন লিখে চলেছে। তিনি যা জানেন তার সিকির-সিকিও জ্ঞান তাদের নেই। তারা নাম করেছে, তাদের লেখার চাহিদা হয়েছে, তাই তারা কিছু দেখে না, কিছু শেখে না, শুধু লেখে। একই লেখাকে নানা রঙে সাজিয়ে বিভিন্ন প্রকাশকদের কাছে বিক্রয় করছে। নিজে লিখেছেন। পছন্দ হয় নি বলে ছিঁড়ে ফেলেছেন। নাটক লিখলে অন্তত শ'র কাছাকাছি যেতে হবে। উপন্যাস লিখলে অন্তত টমাসম্যানের স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছুতে হবে। এদেশের সব সাহিত্যিককে যাচিয়ে দেখেছেন, তারা সব ফাঁপা, বাত ভরা বুদ্বুদ বেলুন। একমাত্র ব্যতি রবীন্দ্রনাথ। তিনি হিমলায় আর সব তুচ্ছ বালুর ঢিবি। সাহিত্য ও সাহিত্যিক উপর বিতৃষ্ণা ধরার পর দর্শন ইতি পড়েছেন। লেখার ইচ্ছা ক্রমশ মনের ত চাপা পড়ে গেছে। কি যে চাই, কি যে হ বুঝতে না বুঝতেই বেলা হয়ে যা জীবনসূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ে অনেক মেয়েকে ভালবেসেছেন, কিন্তু বাসা কোথাও দানা বাঁধে নি। বিয়ের মেয়ের তরফ থেকে উঠলেই তিনি স চুকিয়ে দিয়েছেন। মেয়েরা সাহিত্যি চেয়েও ফাঁপা, আরো নিরেট। তাদের হৈ-হুল্লা করা যায়, ঘর বাঁধা যায় না। এ সময় তাঁর জীবনের পরিবর্তন ঘটলো এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। খেয়াল বশে বন্ধুপত্নীকে নিয়ে গাড়ী চালিয়ে হাও বাগ গিয়ে তার সঙ্গে রাত কাটানো পুলিশ এসে ওঁদের গ্রেপ্তার করে। ম কোর্টে ওঠবার আগেই বন্ধুপত্নী আত্ম করেন। বন্ধু পুলিশকে বলে-কয়ে ম তুলে নেয়। তার আগে, শোনা যায়, অবস্থায় সে চন্দ্রবাবুকে হান্টার দিয়ে দশ মিনিট ধরে অবিরত আঘাত করে দৈত্যসদৃশ চন্দ্রবাবু কোন বাধা না নীরবে এই আঘাত সহ্য করেন। এর থেকে চন্দ্রবাবু মদ ছেড়ে দিয়ে অ ধরেন এবং কোলকাতা ছেড়ে ঐ শহরটিতে অজ্ঞাতবাসে আসেন। বর্ত তিনি তাঁর আশ্রমের চৌহদ্দীর বাইরে বাড়ান না। ব্যাঙ্কে এখনো যা আছে, শুনে চললে বাকী কটা বছর নিশ্চ কাটিয়ে দিতে পারবেন।

আরও জানলাম এবং বুঝতেও পা যে, গত পনেরো বছরের মধ্যে চন্দ্রবাবু কিছু পড়েন নি। পুরনো পুঁথিগু আজকাল উল্টে-পাল্টে দেখেন। যে কবিতা বা গদ্যের লাইন আওড়ান, সে ঐ পনেরো বছরের আগে পড়া। পু অভ্যাসগুলোই বজায় আছে, নতুন অ কিছু গড়ে ওঠে নি। আমার মত নতুন দের চমক লাগে। ওঁকে যারা অন্তরঙ্গ জানে, তারা বলে পুরনো অনেক উনি ভুলে গেছেন, বুদ্ধিবৃত্তিও বহু হ্রাস পেয়েছে। চমক দেওয়া কথাগু বলেন, সবই পুনরাবৃত্তি। তবু দেহ-দিক থেকে এই দৈত্যসদৃশ মান মাদকের প্রভাবে যতটা ক্ষতি হবার ততটা হয় নি। এর ব্যাখ্যা আজ হ সম্ভব নয়। 'জিন' সম্পর্কিত আরো বাড়লে চন্দ্রবাবুকে আরো ভালভাবে যাবে। আমাদের বর্তমানে বিবেচ্য চন্দ্র সুরাসক্তি কিভাবে এবং অহিফেন রূপান্তরিত হল।

—অ

এ-সপ্তাহের বিজ্ঞানের কথা শুরু করার [illegible]গে কলকাতার সবকটি বাংলা দৈনিকে [illegible]শিত একটি বিজ্ঞাপন তুলে ধরতে চাই। [illegible]জ্ঞাপনটি দিয়েছেন পশ্চিমবাংলার কৃষি [illegible]ধকর্তা। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—'আলুর [illegible] রোগ থেকে সাবধান হোন। নাবি ধসা [illegible] জলদি ধসা রোগে আলুর ব্যাপক ক্ষতি [illegible] আকাশ মেঘলা ভাব বা কুয়াশাচ্ছন্ন [illegible] রোগ মহামারীরূপে সমস্ত ফসল [illegible] করতে পারে। ধসা রোগ থেকে রক্ষা [illegible] হলে আলু গাছ ২০-২৫ সেন্টিমিটার [illegible] হলে প্রতি বারে ২ কেজি ব্লাইটক্স বা [illegible]ইটালেন বা উপ্রাসল অথবা যে-কোন [illegible]মোদিত ওষুধ বা এক কেজি ডাইথেন [illegible] ক্যাপটেন জাতীয় ওষুধ ২৫০-৪০০ [illegible] জলে গুলে ১০-১৫ দিন অন্তর [illegible]প্রেয়ারের সাহায্যে ছিটাতে হবে। ওষুধ [illegible] ছিটাবেন যাতে গাছের ডগা ও [illegible] নিচেতেও ভালভাবে লাগে। রোদ [illegible] দিনে ওষুধ ছিটাবেন। ধসা রোগ [illegible] দেবার আগে থেকেই ওষুধ ছিটালে [illegible] ফল পাওয়া যায়।'

আলুর এই ধসা রোগ শুধু আমাদের [illegible] সমস্যা নয়, পৃথিবীর সব দেশের। [illegible] রোগ ঠেকাবার জন্য পৃথিবীর সব [illegible]শেই রাসায়নিক ছেটাবার ব্যবস্থা। এখানে [illegible] রাখা ভালো, মানুষকে রোগগ্রস্ত করতে পারে এমন জীবাণুর সংখ্যা যেখানে [illegible] শত, উদ্ভিদকে রোগগ্রস্ত করতে পারে এমন জীবাণুর সংখ্যা সেখানে কম-[illegible] দশ হাজার। কাজেই মানুষের রোগ হবার সম্ভাবনা যতোটা, উদ্ভিদের রোগ হবার সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী মানুষের রোগের ব্যাপক চিকিৎসা আছে, ব্যাপক প্রতিষেধকও, কিন্তু উদ্ভিদের রোগ ঠেকাবার জন্যে এখনো পর্যন্ত ডি ডি টি ও রাসায়নিক ছিটানো ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।

পশ্চিম বাংলার কৃষি অধিকর্তাও তাই আলুর ধসা রোগ ঠেকাবার জন্যে ওষুধ ছেটাবার কথাই শুধু বলতে পেরেছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা কি সর্বোত্তম? বিজ্ঞানীরা কী বলেন? আজকের বিজ্ঞানের কথায় এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা তুলতে চাই। সোভিয়েত তথ্য দপ্তরের একটি বুলেটিনের ভিত্তিতে এই আলোচনা।

**উদ্ভিদের রোগ কেন ও কি-ভাবে?**

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে, চাষ-করা উদ্ভিদে রোগ যতো বেশি, বুনো উদ্ভিদে ততো নয়। বুনো উদ্ভিদ যেন চমৎকারভাবে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে, তাদের অসুখ কদাচিৎ, অসুখে অপমৃত্যু আরো কদাচিৎ।

চাষ-করা উদ্ভিদেই যেন যতো রোগ ভিড় করে আসে—গমে, আলুতে, আঙ্গুরে, কোন্‌টাতে নয়। ব্যাপারটা কী? মানুষের রোগের সঙ্গে উদ্ভিদের রোগের সাদৃশ্য খুঁজতে গেলে একটি বিষয়ে মিল পাওয়া যায়—যেখানে ভিড় সেখানেই রোগ। বড়ো বড়ো শহরে অল্প জায়গায় অনেক মানুষের বসবাস, রোগের প্রকোপও প্রচণ্ড। অর্থাৎ রোগের জীবাণুগুলো যেন একজায়গায় এতগুলো মানুষকে একত্রে পেয়ে মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চাষ-করা উদ্ভিদ সম্পর্কেও একই কথা। কৃষক বীজ বাছাই করছে সেরা জাতের, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় চাষ করে সেই বীজ থেকে চারা গজাচ্ছে, জমিতে দিচ্ছে সার, গাছের গোড়ায় জল, উদ্ভিদ হয়ে উঠছে শর্করায় ও শ্বেতসারে সমৃদ্ধ—জীবাণুরা এমন একটা ভোজের আয়োজন থেকে সরে থাকবে তা হতেই পারে না। ফলে জীবাণুদের গ্রাসে অতি সহজেই মানুষের এত সাধের ও পরিশ্রমের ফল-ফসল ছারখার হতে বসল। কৃষকদের একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল—ফসল কি করে বাঁচানো যায়? কৃষিবিজ্ঞানীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। সম্ভাব্য সকল উপায়ে ও সকল ব্যবস্থা প্রয়োগ করে পরীক্ষা চলতে লাগল। শেষ-পর্যন্ত দেখা গেল, উদ্ভিদকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারে রাসায়নিক। শুরু হল রাসায়নিকের ব্যাপক প্রয়োগ। উদ্ভিদের রোগ দূর হল। ফসলের ও ফলের ফলন হতে লাগল অপর্যাপ্ত। মনে হতে লাগল, উদ্ভিদজগতের শত্রু নিধনের ব্রহ্মাস্ত্র মানুষের হাতে এসে গিয়েছে, আর ভয় করার কোনো কারণ নেই।

তখন থেকেই ক্ষেতের ফসল ও বাগানের ফল বাঁচাবার জন্যে সর্বাত্মক একটা যুদ্ধের আকারে রাসায়নিক ছেটানো শুরু। এই রাসায়নিক হচ্ছে জীবাণুদের পক্ষে বিষের মতো। রাসায়নিক প্রয়োগের অর্থ, বিষ প্রয়োগে শত্রু নিধন। কিন্তু সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাতে হলে বিষের প্রয়োগ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখা চলে না। মাত্রা বেড়েই চলে। শেষপর্যন্ত দেখা যায়, বিষ শুধু জীবাণুদেরই ধ্বংসে করছে না, মানুষের পক্ষেও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

**ভালো যখন মন্দ হয়**

স্পষ্টই বোঝা গেল, যাকে ভাবা গিয়েছিল ব্রহ্মাস্ত্র, তার প্রয়োগে ফললাভ সবটাই ভালো নয়, বেশ খানিকটা মন্দও। রাসায়নিক বিষ ক্ষতি করে শুধু জীবাণুর নয়, মানুষেরও। বিষের প্রয়োগের মাত্রা কড়াকড়ি বেঁধে দিয়েও দেখা গেল, মানুষের ও পশুর খাদ্য বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা তখন এই রাসায়নিক বিষের ফল বিশ্লেষণ করতে বসলেন। তা থেকে যে ছবিটি বেরিয়ে এল, তা আতঙ্কজনক। দেখা গেল, এই বিষের ক্রিয়া শরীরের মধ্যে জমতে জমতে শেষ-পর্যন্ত জীবকোষের বংশানিয়ামক যন্ত্রে পরিবর্তন ঘটিয়ে বসে—ক্রোমোজোম ও জীন বিকৃত হয়ে যায়। ব্যাপারটা তখন আর শুধু এক পুরুষেই শেষ হয় না, বংশ থেকে বংশে সঞ্চারিত হয়ে চলে। এমনিভাবে বংশ-গতির ক্ষেত্রে মারাত্মক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে এবং সুনিশ্চিত মাত্রায় তা বেড়েই চলেছে। এখন সকলেই বুঝতে পারছেন—এমনকি যাঁরা বিশেষজ্ঞ নন তাঁরাও—রাসায়নিক প্রয়োগ করে উদ্ভিদ বাঁচাবার এই পদ্ধতি অবিলম্বে বর্জন করা উচিত।

বিজ্ঞানীরা তাই ভাবছেন, এমন কোনো উপায় কি নেই যাতে উদ্ভিদ নিজেই নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে? বুনো উদ্ভিদ কি-ভাবে নিজেকে বাঁচায়? বুনো উদ্ভিদের মধ্যে এমন কী আছে যা চাষ-করা উদ্ভিদের মধ্যে নেই? আধুনিক জীববিদ্যার সাফল্যগুলো বিজ্ঞানীদের হাতে আছে, তাই নিয়ে বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন উদ্ভিদের শত্রুকে

মধ্যে—তার জৈব-রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে—প্রবেশ করে অনুসন্ধান করে দেখবেন।

### কী করলে উদ্ভিদ নিজেই নিজেকে বাঁচাতে পারে

বুনো উদ্ভিদের গুণাগুণে সন্ধান করতে গিয়ে একটি আবিষ্কার করা গেল। বুনো উদ্ভিদে রোগ প্রতিরোধ করে বিশেষ কতকগুলো অ্যান্টি-বায়োটিক উপাদান। এদের নাম দেওয়া হল ফাইটোআলেকসিন (ফাইটো—উদ্ভিদ, আলেকসিন — আক্রমণ ঠেকানো)। একটি সুস্থ উদ্ভিদে ফাইটো-আলেকসিন থাকে না, কিন্তু উদ্ভিদের রোগ হবার উপক্রম হলেই ফাইটোআলেকসিন হাজির হয়। যে উদ্ভিদ যতো বেশি শক্ত-পোক্ত, তার ফাইটোআলেকসিন গড়ে তোলার ক্ষমতাও ততো বেশি।

চাষ-করা উদ্ভিদ সাধারণত বুনো উদ্ভিদের মতো শক্তপোক্ত হয় না। কারণ কী? কারণ, চাষ-করা উদ্ভিদ ঠিক প্রকৃতি-জগতে স্বাভাবিকভাবে গজিয়ে ওঠা উদ্ভিদ নয়। সেখানে মানুষের নিজের কেরামতি অনেকখানি। মানুষের হাতে পড়ে তার অনেক কিছু অদল-বদল ঘটছে—তার গুণে, তার স্বাদে, তার পুষ্টিতে, আরো অনেক কিছুতে। আরো ফলনশীল, আরো স্বাদ ও পুষ্টি বিশিষ্ট বীজ তৈরি করার জন্যে মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। গম ও ধানের কথাই ধরা যাক। মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কল্যাণে আজকাল গম ও ধানের বীজ যে চেহারা নিয়েছে তা কয়েক হাজার বছর আগেকার বুনো গম ও বুনো ধানের বীজ থেকে একেবারেই আলাদা। এমনি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। এখন সময় হয়েছে উদ্ভিদকে যতোই গুণান্বিত করার চেষ্টা হোক সেটি যাতে শক্তপোক্ত হয়ে বেড়ে ওঠে সেদিকেও নজর দেওয়ার।

উদ্ভিদের মধ্যে যে-সব গুণ থাকলে রোগের প্রতিরোধ হয়, সেই গুণগুলোকে সক্রিয় করে তুলতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার টের পেয়ে গেলেন। উদ্ভিদের কোষে অ্যান্টি-বায়োটিক উপাদান সৃষ্টি হতে পারে যেমন রোগের আক্রমণ ঘটলে, তেমনি অনেকগুলো যৌগ রাসায়নিক ক্রিয়াতেও। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা গেল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। রাসায়নিক যৌগ প্রয়োগ করে উদ্ভিদের মধ্যে প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা যাচ্ছে ঠিকই, তার ফলে শত্রুর নিধনও হচ্ছে, কিন্তু তার-পরেও যে-পরিমাণ বাড়তি রাসায়নিক যৌগ থেকে যাচ্ছে তা মানুষের ও পশুর শরীরের পক্ষে বরদাস্ত করার মাত্রা ছাড়ানো। বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে নতুন-ভাবে ভাবতে শুরু করলেন। রাসায়নিক যৌগ প্রয়োগ করে উদ্ভিদের মধ্যে প্রতি-রোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা যাচ্ছে—তাই যদি হবে তাহলে এমন রাসায়নিক যৌগ কি পাওয়া যায় না, যা মানুষের ও পশুর শরীরের পক্ষে অ-ক্ষতিকর?

বিশেষ বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয় কি-ভাবে? টীকা বা প্রতিষেধকের সাহায্যে। টীকা বা প্রতিষেধক হচ্ছে যে-রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সেই রোগেরই জীবাণু-খুবই সামান্য মাত্রায়। এত সামান্য মাত্রায় যে, মানুষ অনায়াসেই তা প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু বিনা আয়াসে নয়। সেই সামান্য মাত্রার রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়েও শরীরে প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে সক্রিয় হতে হয়। অর্থাৎ ব্যাপারটা যেন এই বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে লড়াইটা কিভাবে চালাতে হবে তারই একটা মহড়া। ফলে শরীরের মধ্যে একটা প্রস্তুতি থেকে যায়। পরে, বড়ো আকারের আক্রমণ ঘটলেও প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীরা স্বভাবতই দেখবার চেষ্টা করলেন, উদ্ভিদের মধ্যেও একই উপায়ে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা সৃষ্টি করা যায় কিনা। শক্তপোক্ত উদ্ভিদ রোগের আক্রমণে কাবু হয় না। কেন? রোগের আক্র-মণ ঘটলেই উদ্ভিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ-ক্ষমতা বা ফাইটোআলেকসিন সৃষ্টি হয়ে থাকে। তার মানে, ধরে নিতে হয়, যে জীবাণুর দ্বারা রোগের আক্রমণ ঘটছে সেই জীবাণুর মধ্যে এমন বিশেষ উপাদান আছে যা ফাইটোআলেকসিন সৃষ্টি করার সহায়ক। এই উপাদানটি যদি পৃথক করে নেওয়া যায় তাহলে তার প্রয়োগেই তো উদ্ভিদকে নিরোগ রাখার উপায় পাওয়া যেতে পারে।

বিজ্ঞানীদের এখন নজর এই বিশেষ উপাদানটির দিকে যা রোগের বিরুদ্ধে উদ্ভিদের প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে সক্রিয় করে তোলে।

আলোচনার শুরুতে আমরা আলুর রোগের কথা বলেছিলাম। একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী আলুর এই রোগের প্রতিষেধক বার করেছেন। তাঁর একটি পরীক্ষার উল্লেখ করেই আমাদের আলোচনা শেষ করছি।

### ধসা রোগের প্রতিষেধক

বিজ্ঞানীর নাম অধ্যাপক লিও মেৎ-লিৎস্কি। তিনি ও তাঁর সহকারীরা পরীক্ষা-কার্যটি চালাচ্ছেন সোভিয়েত বিজ্ঞান আকা-দেমির বাখ্ জৈবরসায়ন ইনস্টিটিউটে। পরীক্ষাকার্যটি এই রকম:

তাঁরা একটি আলু নিলেন। আলুটি খুব ভালো করে পরিষ্কার করলেন, তারপর ফালি ফালি করে কাটলেন। ব্যাপারটা কী, আলুভাজা হবে নাকি? মোটেই নয়। আলুর ফালিগুলো তাঁরা সযত্নে রাখলেন কতক-গুলো ভিজে প্রকোষ্ঠের মধ্যে। তারপরে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ আলাদা করে নিয়ে সেই সব প্রকোষ্ঠের আলুর ফালির ওপরে ছিটিয়ে দিলেন আলুর যা সবচেয়ে মারাত্মক রোগ অর্থাৎ ধসারোগের জীবাণু থেকে পৃথক করে নেওয়া বিশেষ একটি উপাদান খুবই সামান্য মাত্রায়।

কয়েক দিন পরে সবকটি প্রকোষ্ঠের আলুর ফালির ওপরে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করা হল ধসারোগের জীবাণু। আরো কয়েক দিন পরে অবাক কান্ড। সবকটি ফালির ওপরেই প্রচুর ছত্রাক হয়েছে, তবে যেসব ফালির আগে থেকে সেই বিশেষ উপাদানটি ছিটানো হয়েছিল সেগুলো তখনো নিরোগ কিন্তু যে-সব ফালির ওপরে ছিটানো হয়নি সেগুলো রোগগ্রস্ত।

আগে থেকে তৈরী করা আলুর ফালিগুলোতে রোগ প্রতিরোধ করল কে? সেই বিশেষ উপাদানটি কি? না। আসল ঘটনা সেই বিশেষ উপাদানটি সেই বিশেষ আলুর ফালিগুলোর মধ্যে রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা সক্রিয় করে তুলেছে।

উপাদান ছেটাবার মাত্রা কী?

প্রতি লিটার জলে দশ মিলিগ্রাম এখনো পর্যন্ত যে-সব ওষুধ ছিটিয়ে আলুর ধসা রোগ ঠেকাবার চেষ্টা হচ্ছে তার মাত্রার দশ-হাজার ভাগ কম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার ভাগ কম।

এই উপাদানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'লুবিমিন'। 'লুবিমেটস' নামে একজাতীয় আলু থেকে এই উপাদানটি প্রথমে আবিষ্কৃত হয় বলে এই নাম।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই প্রতিষেধকের ব্যবহার শুরু হলে চাষের কাজে আশ্চর্য ফল পাওয়া যাবে। তবে এখনো এ ব্যাপারে অনেক কিছু করার আছে। বিজ্ঞানীদের সামনে এখনো প্রশ্ন: উদ্ভিদে এই প্রতিষেধকটি প্রয়োগ করা হবে কিভাবে? ফাইটোআলেকসিনের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা বজায় রাখার উপায় কী? উদ্ভিদের শুধু একটি বংশকে নয়, গোটা উদ্ভিদটিকেই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বিশিষ্ট করা যায় কেমন করে?

এসব প্রশ্নের জবাব ও সমাধান পেতে খুব বেশি সময় লাগবে না, এ আশা নিশ্চয়ই করা চলে।

—অয়স্কান্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতি কষ্টে রাগ দমন করল বিনয়। এত স্পর্ধা শেফালীর, এত সাহস! জামা-কাপড় না ছেড়ে সে চেয়ারে বসল। শেষ পর্যন্ত এমন চরম সিদ্ধান্ত নিল মীরা। কোথায় যেতে পারে তা জানতে আর কতক্ষণ। কাল ওর অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। কিন্তু যাওয়ার আগে পরামর্শ তো দূরে থাক, একবারটি মুখের কথাও জানাল না। কোন প্রয়োজন বোধ করল না। বেশ তাই হোক। দীর্ঘশ্বাস চাপল বিনয়। সেও কোন খোঁজ নেবে না।

—এখনও জামাকাপড় ছাড়নি?

টেবিলের উপর চায়ের কাপ রাখল শেফালী। আর চিঁড়ে ভাজা একটা প্লেটে। গম্ভীর চোখমুখ। ওর দিকে তাকিয়ে বিনয় মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না।

—কী চাও? নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠল বিনয়। সে কী চিৎকার করে উঠেছে?

—চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় শেফালী।

তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নিল বিনয়। তারপর বারান্দা পেরিয়ে হনহন করে এগোল। কোনদিকে না তাকিয়ে দরজার খিল খুলে বাইরে চলে আসে। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে থাকে। ছাদ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রহস্যময় রূপসী নারীর মত তার আকর্ষণ। অতএব অগ্রাহ্য করে সে কিভাবে!

।। নয় ।।

পল্টু একটু আগে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছুতেই ঘুমোবে না। শুধু আবদার। ভীষণ দুষ্টু হয়েছে ছেলেটা। আজ রেগে ওকে মেরেছে মীরা। একটার পর একটা অশান্তি লেগেই আছে। তাতেই মেজাজ তিরিক্ষে। এরপর ছেলের নিত্য নতুন বায়না। সত্যি, এত ঝক্কি আর সামলাতে পারছে না!

ঘরে হাল্কা সবুজ আলো। এখন রাত সাড়ে আটটা। মীরা টেবিলের সামনে বসে একটা বই পড়ার চেষ্টা করছিল। ছোট্ট ঘর। উপায় কি, এরই মধ্যে রান্না-বান্না, আহার, শয়ন সব করতে হয়। তক্তপোষ ঘরের অর্ধেক জুড়ে। তক্তপোষের নীচে রান্নার বাসন-কোসন, বালতি, ট্রাঙ্ক যাবতীয় সব জিনিষ। ভাড়া তিরিশ। বীথু আপত্তি করেছিল, ভাড়া দিতে হবে না। মীরা ওর কথা শোনেনি। ভাড়া নিতেই হবে। নইলে ভাই এখানে থাকতে পারবো না। বীথু হেসেছে, বেশ তোর যা ইচ্ছে হয় দিস।

মা যেভাবে অত্যাচার সুরু করলেন, অনেক চেষ্টা সে করেছে নির্বিকার থাকতে; কিন্তু একদিন দু'দিনের ব্যাপার নয়, রোজ রোজ কুশ্রী কলহ আর চিৎকার—পালিয়ে আসা ছাড়া উপায় কি! ভাগ্যিস বীথু ছিল। ওকে সব জানাতে ওই একরকম জোর করে নিয়ে এল। ভালই হয়েছে। সবদিক থেকে ভাল।

দোতলা বাড়ি। বীথু ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। একমাত্র মেয়ে। ওর বড় দুই দাদা। বড়ভাই বিবাহিত। মধ্যবয়স্ক গম্ভীর মানুষটি। সরকারী অফিসে ভাল চাকরী করে। ছোট ভাই বছর তিরিশের সুদর্শন যুবক। এখনও অবিবাহিত। কীসের যেন ব্যবসা না চাকরী-বাকরী কী করে মীরা সঠিক জানে না। বাপ মা অল্প কিছুদিন আগে মারা গেছেন। বীথুর চোখে জল এসে যায় ওর বাবা বা মার প্রসঙ্গ তুললে।

দোতলায় তিনখানা ঘর। দু'খানা ঘর ব্যবহার করে বর্তমান অভিভাবক হিমাদ্রী বাবু। তার ছেলেমেয়ে বড় হয়ে উঠছে। ওদের জন্যে আলাদা শোবার ঘর দরকার। বাকি ঘরটিতে ছোট কর্তা অর্থাৎ শোভন থাকে। নীচে দুটো ঘর। বীথুর একখানা। অন্যখানায় সম্প্রতি মীরা এসে থাকছে। এ ঘরটায় জিনিষপত্রে বোঝাই ছিল। সব পরিষ্কার করেছে বীথু। তারপর চুনকাম করার পর ঘরটার চেহারা খুলেছে। বসবাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

মনে মনে বীথুর কাছে কৃতজ্ঞ সে। মনে হয় বেশ ভদ্র একটি পরিবার। হিমাদ্রীবাবুর স্ত্রী মাঝে মধ্যে এসে খোঁজ-খবর নেয়। হাসিমুখে কথা বলার অভ্যেস। হিমাদ্রীবাবু বা শোভন এরাও বেশ সম্মানের সঙ্গেই কথাবার্তা বলে। মীরাও অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এদের খুব আপনজন হয়ে উঠেছে। অন্য কোথায়ও এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘর পেত কিনা সন্দেহ।

তাছাড়া তার কুমারীর বেশবাস, সঙ্গে পল্টু—অন্যরকম সন্দেহ, প্রশ্নের সম্মুখীন. সে। এক অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে। বীথুদের এখানে সেসব দিক থেকে নিরাপদ। বীথু বোধহয় ওদের সব জানিয়েছে। ভালই করেছে। আমি এই, তোমরা যখন সব জানলে, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও। মনে হয় এখানে স্বস্তিতে থাকতে পারবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।

এত তাড়াতাড়ি আসা হোল যে, দাদার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে পারল না মীরা। দাদা হয়তো মনে মনে বিরক্ত হতে পারে। কিন্তু সে রাত্রে যায় ওইসব অশ্রাব্য গালাগালি শোনার পর ঘুম আসেনি চোখে। সারারাত নানারকম চিন্তা করেছে। নিঃশব্দে কেঁদেছে। মাকে মনে হয়েছে অত্যন্ত অন্দোর, সবচেয়ে বড় শত্রু। পরদিন সকালে স্নান সেরে না খেয়ে বেরিয়ে সোজা অফিস। তারপর বীথুর সঙ্গে পরামর্শ। তখন মাথার কী ঠিক ছিল? দাদার কথা ভাববার অবসর কোথায়? অফিসে শরীর খারাপের অজুহাতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাড়ি ফিরে আসা, জিনিষপত্র গুছিয়ে পল্টুকে কোলে তুলে ট্যাক্সি চেপে সোজা বীথুদের বাড়ি। সমস্ত ব্যাপারটা কী দ্রুত ঘটে গেল! এখন ভাবলে রীতিমত অবিশ্বাস্য মনে হয়। এত শক্তি সে পেল কোত্থেকে। যাক সে কথা। দাদার কথাই সে ভাবছে। এখানে এসেছে তা প্রায় এক সপ্তাহের উপর হল। একবারও কী তার কথা মনে হয়নি? একবারটি অফিসে এসে খোঁজ-খবর কী নিতে পারতো না দাদা? সব অপরাধ কী তার?

পাশের ঘরে সরব হাসি। মীরা সামান্য চমকে উঠল। বই বন্ধ করে একমুহূর্ত কী যেন ভাবল। পল্টু না খেয়ে ঘুমিয়েছে। এখন ডাকলে কান্না সুরু করবে। শূন্য-দৃষ্টিতে সে পল্টুর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

উঃ কী হাসির বহর দ্যাখ ওদের। ভাই-বোনে খুব জমিয়ে আড্ডা মারছে। মীরা দরজা ভেজিয়ে পাশের ঘরে এল। ওকে দেখে শোভন আর বীথু হাসি-মুখে আহ্বান জানায়।

—নিশ্চয়ই আমাদের হাসির শব্দ শুনতে পেয়েছেন?

—পাবে না! যা ষাঁড়ের মত গলা তোমার! বীথু হাত ধরে টেনে খাটের উপর বসিয়ে দেয় মীরাকে। ছিমছাম ঘর। তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। একা থাকে। অতএব ফিটফাট রাখতে পারে। পল্টুর মত দুষ্টু ছেলে হলে সব তচনচ করে দিত।

শোভন বলল, আপনি সব সময় এত কী ভাবেন বলুন তো?

—কী আবার ভাববো! মীরা অস্বস্তি-বোধ করে এ ধরনের প্রশ্নে। প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়। আলাপ-আলোচনা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে না এলেই ভাল। কিন্তু শোভন ফট করে এমন সব কথা জিজ্ঞেস করে যে, সে ভীষণ লজ্জায় পড়ে যায়। ঘামতে সুরু করে। তাকাতে পারে না কোনদিকে। বিশেষ করে শোভনের দিকে। নির্ণিমেষে তাকিয়ে থাকে শোভন। না, অশোভন কিছু নয়। তবু সঙ্কোচ লাগে বৈকি।

শোভন আর বীথু পরস্পরকে সুযোগ পেলে আক্রমণ করতে ছাড়ে না। তবে কোন রকম রাগারাগি হয় না। হাসি ঠাট্টার ছলে। বীথু চটে গেলে শোভন হো-হো করে হেসে ওঠে। যতক্ষণ না বীথুর মুখে হাসি ফোটে, রেহাই দেয় না ওকে। বীথুর চেয়ে অন্তত বছর পাঁচেকের বড়। কিন্তু তাই বলে গুরুগম্ভীর দাদাটি সেজে বসে থাকে না। বন্ধুর মত ব্যবহার বীথুর সঙ্গে। ফলে বীথুর ইয়ার্কি অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

—তোমার আবার মীরার মনের খবর জানবার এত কী দরকার হল? খুব যে দরদ!

—মারবো এক গাঁট্টা। শোভন বীথুর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেয়, ভুলে যাস কেন তোর এই জ্যেঠো ইয়ার্কি মীরাদেবীর ভাল নাও লাগতে পারে।

হাসিমুখে চুপচাপ শোনে মীরা। না, বীথুর কথায় সে মোটেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। নির্দোষ হাল্কা ঠাট্টা বা ইয়ার্কি সময়-বিশেষে টনিকের কাজ করে। সারাদিন অফিসে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা রোজ একা ঘরে সময় কাটাতে চায় না। ওদের দুজনের সঙ্গে হাসিগল্পে তবু যা হোক সময় কেটে যায়। বই পড়াটড়া বিশেষ তার ধাতে নেই।

শোভন হাই তোলে কয়েকবার। তারপর কব্জী উল্টে ঘড়ি দেখে দুচোখ কপালে তুলে বলে, সাড়ে নটা। চললাম।

এবার সেও উঠবে। পল্টুকে ঘুম থেকে তুলে খাওয়ানো ভারী ঝকমারি। মীরা লক্ষ্য করল বীথু ওর দিকে তাকিয়ে মিট-মিট করে হাসছে। ভ্রু কুঁচকে সে তাকাল।

—তারপর? বীথু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের উপর চিরুনি চালায়। পিঠের উপর একরাশ কালো চুল। সামান্য কোঁকড়ান।

—চলি বীথু। মীরা দু-এক পা এগিয়ে থেমে যায়। একবার তাকায় বীথুর দিকে। অমন ভাবে মুখ টিপে হাসছে কেন মেয়েটা? যাক, এখন আর কথা বাড়বে না। রাত কম হয়নি!

পরের দিন অফিসে পৌঁছে সবে টাইপ মেসিন পরিস্কার করতে সুরু করেছে—বেয়ারা এসে জানাল ডিরেক্টর ডাকছেন। মীরা একটু অবাক। সাধারণত বারটার আগে বড় সায়েবের ঘরে ডাক পড়ে না। নিশ্চয়ই জরুরী কোন ডিকটেশন আছে। সে খাতা পেন্সিল নিয়ে বড় সায়েবের চেম্বারে গিয়ে ঢুকল।

—বসুন।

ফাইলের উপর মাথা নত। গম্ভীর ভরাট মুখ। সেদিকে একপলক তাকিয়ে মীরা চেয়ারে বসল। কম দিন হয়নি মুখোমুখি বসে ডিকটেশন নিচ্ছে। তবু চোখের দিকে তাকাতে পারে না। হাতের চেটো ঘামে ভিজে যায় আর প্রতিমুহূর্তে অপেক্ষা করে কখন এঘর থেকে চলে যেতে পারবে।

অথচ সঙ্কোচ বা নার্ভাস বোধ করা একান্তই অযৌক্তিক। বড়সাহেব কোনদিন কড়া চোখে বা রুক্ষস্বরে কথা বলেননি। বরং এমন ভদ্র ও সুচিবান পুরুষ খুব কম চোখে পড়েছে। তবে তার পা কাঁপছে কেন? গলা শুকিয়ে আসছে। ছিঃ! নিজেকে ধমক দিল মীরা। একটু সংযত হতে চেষ্টা কর। এত অল্পে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন। সবাইকে ছেড়ে এসেছো সে খেয়াল আছে। সাহসে বুক বাঁধ। চাই আত্মবিশ্বাস।

—শুনুন মীরা দেবী। মিঃ কাপুর সামান্য ইতস্ততঃ করে বললেন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো। অন্যরকম ভাববেন না। প্রশ্নগুলি একটু ব্যক্তিগত।

মীরা একবার চোখ তুলে তাকাল। সত্যি, সে কিছু বুঝতে পারছে না। কোনরকম আঁচ করতে পারছে না। ব্যক্তিগত প্রশ্ন। বুক কাঁপতে সুরু করেছে। সে কিছু বলতে গিয়ে টের পেল গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুচ্ছে না। শুধু নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। কেননা বড়সায়েব তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

—রজত বোস বলে কাউকে চেনেন আপনি?

ভীষণ চমকে উঠল মীরা বিবর্ণ মুখে একবার বড়সায়েবের মুখের দিকে তাকাল। ঠিক এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে জানলে বোধহয় আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত। কিন্তু উনি রজতের কথা জানলেন কিভাবে! কতটুকু জানেন বড়সাহেব?

নীরব থেকে রেহাই পাবে না। সব শেষ হল। এরপর আর কী এখানে চাকরী করা যাবে? অফিসের সবাই জানবে। এসব কথা গোপন থাকে না। সবাই তাকে বিশেষ চোখে দেখবে। বিশেষ করে তার কুমারীর বেশে অফিসে আসা—ছি! সবার কাছে মাথা নত হয়ে আসবে তার। চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। নানারকম প্রশ্ন, অযাচিত সহানুভূতি, বন্ধু সেজে অনেকে ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে। তাকে ভাববে সহজ-লভ্যা। আরও কত কী ভাববে কে জানে!

আবার চোখ তুলে তাকাল মীরা। বড়-সায়েবের মুখে মৃদু হাসি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল সে। ছি ছি! না জানি কত কী ভাবছেন উনি। কিন্তু এভাবে নার্ভাস হলে চলবে না। জবাব দেবে। প্রতিটি কথার জবাব দেবে। যদিও তা বাধ্যতামূলক নয়। স্বেচ্ছায় সে বলবে। সবাইকে ছেড়ে এসেছে। যা হয় হবে। মীরা মরিয়া।

—হ্যাঁ স্যার। লোকটাকে চিনি।

—আপনার স্বামী?

—ছিল। এখন কোন সম্পর্ক নেই।

—সম্পর্ক নেই! মিঃ কাপুর অল্প হাসলেন, ডিভোর্স করেছেন?

মীরার চোখমুখ সামান্য কঠিন হয়ে ওঠে। এত কথার জবাব সে দিতে পারবে না। বোঝা যাচ্ছে সব খবর পেয়েছেন উনি। তবু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এত প্রশ্ন করা কেন!

—দেখা যাচ্ছে স্যার, সব জানেন আপনি। বলে মীরা একটু থমকে যায়। আঃ ভাবা যাচ্ছে না এত সাহস সে পাচ্ছে কোত্থেকে। একটু আগেও বুক কাঁপছিল। কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল ঠোঁটে। কোনদিন এমনি সুরে বড়সায়েবের সঙ্গে কথা বলতে পারবে কল্পনাও করেনি।

মিঃ কাপুরের মুখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে ওঠে।

—দেখুন মীরা দেবী। আপনাকে এসব প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কয়েকটা কারণে করতে হল। মনে রাখবেন আমার সেক্রেটারী হিসেবে আপনি কাজ করছেন। সব চেয়ে আগে আমাদের কোম্পানীর সুনামের কথা ভাবতে হয়। নয় কী?

—আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার! আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্গে কোম্পানীর সুনাম বা দুর্নাম কিভাবে জড়িয়ে আছে। কাজ-কর্মে যদি কোন গাফিলতি দেখেন সেটা আলাদা।

—না। সেদিক থেকে কোন অভিযোগ নেই। এবার আসল প্রশ্ন। আপনি গোপন করেছেন কেন যে, আপনার স্বামী নেই। স্বামী বেঁচে থাকতেও কুমারীর পরিচয়ে চাকরীতে ঢোকা কী সম্মানজনক? এর জন্যে অফিস আপনার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করতে পারে।

এদিক থেকে যে বিপদ আসতে পারে আগেই ভেবেছে সে। কিন্তু ভেবেছিল এই বিরাট শহরে কে কার খোঁজ রাখে। কে জানবে রজত বোসের কথা। কে জানতে পারবে যে, সে স্বেচ্ছায় স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছে। কার এত মাথা ব্যথা এসব স্ক্যান্ডাল খুঁচিয়ে বের করবে! চোখের সামনে কত কী দেখল! অচল সিকি দোয়ানী চালাবার মত কত কী পার হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মনে-প্রাণে সে রজতকে অস্বীকার করে। ডিভোর্সে রজী হল না। দাদাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছে। তবে সে কী করতে পারে? রজতের উদ্দেশ্য আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছে। কিন্তু, দাঁতে দাঁত ঘষে, বড়সায়েব এরপর নিশ্চয়ই তাকে জবাব দেবে—এভাবে রজত তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। না-না-না!

—আমার আর কিছু বলার নেই স্যার।

মাথা নীচু করে বসে রইল মীরা। কপালের দুপাশের রগ দপদপ করছে। উঃ কতক্ষণে সে এঘর ছেড়ে বেরোতে পারবে কে জানে। গেল চাকরীটা। তারপর?

—ঠিক আছে। আপনি এখন যেতে পারেন। কী হল? মাথা ধরেছে? বাড়ি যান—বিশ্রাম দরকার। কয়েকদিনের ছুটির দরকার হলে দরখাস্ত পাঠাবেন।

—থ্যাঙ্ক য়ু স্যার।

বাইরে এসে মীরা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল কয়েকবার। তারপর বুকের উপর আঁচল জড়িয়ে নিজের সিটে এসে বসল। এক চুমুক জল খেল। ড্রয়ার খুলে খাতা পেন্সিল রেখে বেয়ারাকে ডাক দিল।

—বীথুদি দিদিমণিকে একটু ডেকে দাও।

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল মীরা। যতদূর চোখ যায়, সে শুধু সারি সারি বাড়ি দেখল। রাস্তায় জনস্রোত। পিল-পিল করে যাওয়া-আসা করছে। এখান থেকে দেখাচ্ছে বামনের মত। ল্যাম্পপোস্টে লাস্যময়ী অভিনেত্রীর ছবি। হঠাৎ তার মনে পড়ল কয়েক বছর আগে সেও থিয়েটারে কয়েক মাস কাজ করেছিল। শোভাই নিয়ে গিয়েছিল। কোথায় যেন শোভা হারিয়ে গেল। বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে। হয়তো বিয়ে-থা করে সংসার করছে অথবা থিয়েটার লাইনেই পড়ে আছে। তবে তেমন নামধাম হলে জানতে পারত।

সে কী আবার থিয়েটার কী সিনেমা লাইনে ফিরে যাবে? মীরা কি ভেবে একটু হাসল। আজ তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। আজ সে স্বাধীন। নিজের জীবনকে নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে পারে। ছিঃ! এসব বদখেয়াল চাপা উচিত নয়।

বীথুদের ওখানে এসে হয়েছে নতুন ফ্যাসাদ। পল্টুকে হিমাদ্রীবাবুর স্ত্রীর হেফাজতে রেখে আসতে হয়। কিন্তু যা দুষ্টু ছেলে, কখন কী করে বসে, ছুটতে গিয়ে হয়তো পড়ে গেল, অথবা ওদের জিনিষপত্র ভেঙ্গে তচনচ করে একাকার—বাড়ি ফেরার পথে অসম্ভব চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। হিমাদ্রীবাবুর স্ত্রী হাসিমুখে কথা বললেও—ছেলের অবাধ্যতার কথা ভেবে মনে মনে মীরা ভারী অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে। কিন্তু এছাড়া উপায় কী? একা ওকে ঘরে রেখে আসতে পারে না। আরও বছর দুই না পেরোলে বোর্ডিংয়ে দিতে পারছে না। পল্টু এখন মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—ডাকছিলি মীরা?

—হ্যাঁ। মীরা ওর মুখোমুখি দাঁড়াল। কিছুক্ষণ দেখল বীথুকে। ওকে সব বলার দরকার নেই। অন্ততঃ এখন। জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটো। বেশ আছে মেয়েটা। মাথার উপর দুই দাদা। মাস গেলে মাইনে। সুদর্শন প্রেমিক। হয়তো শিগ্গির বিয়ে হবে। নো ট্রাবল।

বীথু খানিকটা অবাক। ব্যাপার কী, মীরার চোখের পলক পড়ছে না। এসে দেখল জানালার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। কাজকর্ম নেই নাকি? অথবা অন্য কিছু! ভাবতেই মনে মনে শিউরে উঠল। সেই লোকটা আবার নতুন কোন উপদ্রব সুরু করেছে কী? লোকটার সঙ্গে দেখা হলে মজা দেখিয়ে ছাড়বে। অপমানের চূড়ান্ত করবে।

—হাঁ করে দেখছিস কী মুখপুড়ি! মীরার বাহুতে চিমটি কাটল বীথু।

—উঃ! সামান্য মুখ বিকৃত করে মীরা বলল, শরীরটা ভাল লাগছে না। বাড়ি যাচ্ছি।

—কী হয়েছে? বীথু কপালে হাত দেয়। না, বেশ ঠান্ডা। কিন্তু মুখচোখ কেমন বিবর্ণ। তীক্ষ্ন চোখে ওকে দেখল।

মীরা আর দাঁড়াতে চাইল না। বীথু অসংখ্য প্রশ্ন করবে। কথা বাড়াতে চায় না। সে দায়সারা দু' একটা কথার জবাব দিয়ে বাইরে চলে আসে। কোনদিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামে। কী অস্বস্তি সহকর্মীদের মুখের দিকে তাকাতে! অথচ গতকাল এমন ছিল না। কোন রকমে বাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়। দপ-দপ্ করছে সমস্ত মাথা। একটা ট্যাক্সী ডেকে উঠে পড়ল। মাথা এলিয়ে দিল সীটের উপর।

কিছুক্ষণ পর টের পেল মীরা, শুধু কপালে নয়, সমস্ত শরীরে ঘাম। বাইরে সবকিছু দ্রুত সরে যাচ্ছে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল সে। তার এমন সর্বনাশ কে করতে পারে সে বিষয়ে অনেক ভেবেছে। একমাত্র ওই লোকটা ছাড়া আর কারও কথা মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, সে নিশ্চিত, রজতই বড় সায়েবকে এ-সব জানিয়েছে। অর্থাৎ শুধু পিছন পিছন অনুসরণ করা নয়, আসল জায়গায় আঘাত করেছে রজত।

বড় সায়েব জানালেন কয়েকদিন বিশ্রাম করতে। কিন্তু তারপর? চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দেবে কী? ভাবতেই মীরার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। চাকরী যাওয়া মানে... দাদার ওখানে ফিরে যাওয়া, অন্যের অনুগ্রহে বেঁচে থাকা, ফের নতুন কাজের সন্ধান, রোজ মার সঙ্গে কুশ্রী কলহ, পাঁচজনে নানান কথা বলা...। উঃ আর সে ভাবতে পারছে না!

বাড়ির সামনে ট্যাক্সী দাঁড়াতে মীরা মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে টলতে টলতে অগ্রসর হয়। পল্টু কী করছে কে জানে।

ওর জন্যে বাইরে কাজে মন দিতে পারে না। তালা খুলে ঘরে ঢুকল। বটুয়া টেবিলের উপর রেখে কি ভেবে একবার আয়নার সামনে দাঁড়াল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। পাউডারের পাফটা সামান্য মুখে বুলিয়ে মাথায় চিরুনি চালাল। তারপর দরোজা বন্ধ করে বাইরে এল।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে ঘরে ঢোকার আগে মীরা মৃদু স্বরে ডাকল, পল্টু।

—ঘুমিয়েছে। ভেতরে এসো।

পল্টু ঘুমোলে ওকে বড় শান্ত দেখায়। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে মীরা মৃদু হাসল, আমি বরং পরে আসবো বৌদি। আপনি বিশ্রাম করুন।

অনুভা চিৎ হয়ে শুয়ে। সখেদে বলল, আর বিশ্রাম। দেখছো না কী অবস্থা। শত্রুর আসছে পেটে! ছি! ছেলেমেয়ে বড় হয়ে উঠেছে—ওদের সামনে হাঁটা-চলা করতে বড় লজ্জা। দাঁড়িয়ে কেন বস মীরা। আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে?

মাঝে মাঝে অনুভা অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে ওর সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। সে দৃষ্টির সামনে মাথা আপনা থেকেই নীচু হয়ে যায় মীরার। যতক্ষণ থাকে তীব্র অস্বস্তি। এখন একটু বিশ্রামের দরকার। বলল, ভীষণ মাথা ধরেছে বৌদি। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি।

—তবে আর তোমাকে বসতে বলবো না। এখানেও বিশ্রাম করতে পার। বলে খাট দেখিয়ে দিল।

ঘর জুড়ে প্রকান্ড খাট। ঘরটা বেশ বড়। বড় বড় জানালা। চারিদিকে খোলা-মেলা। প্রচুর আলো-বাতাস আসে। অন্যের বিছানায় সে শুতে পারবে না। হিমাদ্রী-বাবুর মুখ মনে পড়ল। শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। অনুভা পেট ঢাকতে ব্যস্ত। আড় চোখে একবার দেখে মীরা উঠে দাঁড়াল।

একতলায় নামার সময় সিঁড়িতে শোভনের মুখোমুখি হল মীরা। মৃদু হেসে সে পাশ কাটিয়ে নীচে নামতে থাকে। ভাগ্যিস শোভন কোন কথা বলে নি। নিজের ঘরে ফিরে শাড়ি পাল্টে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুমোক পল্টু। শোভন কী চাকরী করে? বীথু স্পষ্ট করে কিছু বলে নি। যাকগে, তার অত জানবার কী দরকার। অযাচিত কৌতূহল ভাল নয়। ভেবেছিল সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে শোভন কথাটথা বলতে চাইবে।

অনেকক্ষণ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করল সে। না, ঘুম নয়। ঘুমোলে শরীর আরও খারাপ লাগবে। এখন প্রায় চারটে বাজে। আধ ঘন্টা বাদে পল্টুকে নিয়ে আসবে। তারপর স্টোভ জেবলে ওর জল খাবার তৈরী করা। এক কাপ গরম চা খেলে মাথার যন্ত্রণা কমে যাবে। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। কিন্তু কাল সে কী করবে? কাল বিশ্রাম করবে। সমস্ত দিন। আকাশ পাতাল ভাববে। পরন্তু অফিসে যাবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। এত ভাবলে সে ঠিক মরে যাবে। দুটো চোখ সজল হয়ে ওঠে। সব থাকতেও কেউ নেই তার। সবচেয়ে খারাপ লাগছে দাদার কথা ভাবতে। নাকি আপদ বিদেয় হয়েছে ভেবে চুপচাপ আছে! ওদের সুখের সংসারে সে ছিল অবাঞ্ছিত। সরে এসে ভালই করেছে। ওরা স্বস্তিতে বসবাস করুক।

এক সময় মীরা টের পেল নরম কচি কন্ঠে কে যেন ডাকছে, মা মা! মীরার তন্দ্রা কেটে যায়। এক লাফে মেঝেতে নেমে ছুটে গিয়ে দরোজা খুলে পল্টুকে কোলে তুলে নেয়।

।। দশ ।।

বিরাট লম্বা হলঘর। সারি সারি অনেকগুলি বেড। এখন বিকেল। বিনয় মনে মনে হিসেব করে দেখল আরও এক সপ্তাহ তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে। বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় সে একটা বই পড়বার চেষ্টা করল। ধেৎ! বই মুড়ে উঠে বসল। পিঠে ব্যান্ডেজ। ভাগ্যিস ছোরার আঘাত বুকে লাগেনি! বুকে লাগলে বাঁচতো না। দেয়াল ঘড়ি দেখল। সাড়ে চারটে। আর আধঘণ্টা পরে ওরা আসবে। মা, শেফালী, বিমল—হয়তো স্কুলের দু'একজন কলীগ। ওদের জন্যে মন ছটফট করে উঠছে।

আশেপাশে যে-যার নিজের বিছানায়। ওদের সবার সঙ্গে আলাপ নেই। কেউ শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে, কেউ বা বিস্কুট অথবা ফল খাচ্ছে। অনেকে যন্ত্রণায় অস্ফুটস্বরে চিৎকার করছে। সাদা পোষাক পরা নার্স হিলতোলা জুতো পায়ে খটখট শব্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কাউকে ইনজেকসান দিচ্ছে—কারুর জ্বর পরীক্ষা করছে। বিনয় লক্ষ্য করে দেখেছে অনেকের চোখমুখে আশ্চর্য বিষাদ। এমন বিষাদের চিহ্ন হয়তো কোন কোন মুহূর্তে তার মুখেও ফুটে ওঠে। সে টের পায় না।

আবার হাসপাতাল! মনে পড়ল কয়েক বছর আগে কয়েক মাসের জন্যে তাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। গ্যাসট্রিক আলসার। অপারেশনের পর সুস্থ হয়। সেই দিনগুলি মনে পড়ে। রজতদা আসতো। মীরা আসতো। নার্স অরুণার কথা মনে পড়ে। কোথায় অরুণা! হয়তো এই বিরাট শহরের কোথায়ও লুকিয়ে রয়েছে। অকস্মাৎ কোনদিন দেখা হয়ে যেতে পারে। দেখা হলে কী চিনতে পারবে? অরুণার জন্যে তার মনে কী আজও কোন দুর্বলতা আছে? অথচ সে-দিন...অরুণা...দামু বৌদি...ভাবলে আজ হাসি পায়!

...চোখের সামনে ভাসছে সেই ঘটনা। বিনয় নানভাবে ঘটনাটির বিশ্লেষণ করতে চায়। কেন এমন হ'ল! কী দরকার ছিল তার কতগুলি বখাটে গুন্ডা ছেলের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করা? রাস্তায় প্রত্যেক দিন কত কী ঘটছে। কত পাপ, কত অন্যায় অবিচার চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। পারবে কী সে এর প্রত্যেকটির প্রতিবিধান করতে। তবে সেদিন অমনভাবে গুন্ডা ছেলেগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন?

গঙ্গার ধারে সে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে টিউশোনটা সেরে এসেছে। বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছিল না। শেফালীর সঙ্গে কথাবার্তা বলা বা ওর সান্নিধ্য আর তেমন মোহময় লাগছে না। অথচ মনের মধ্যে চেপে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। শেফালী যেন বুঝতে না পারে। এই সব সে ভাবছিল আর দেখছিল অদূরে গঙ্গার জল চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। যেন সোনা গলে গলে জলের সংগে মিশে যাচ্ছে। দূরে দূরে ছোট ছোট নৌকো, পতাকার মত সাদা পাল পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। তন্ময় হয়ে বিনয় দেখছিল।

উৎকট হাসি আর শিসের শব্দে বিনয় বেশ বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছিল। হাত দশেক দূরে ছোটখাট একটা জটলা। অসহায় নারী কন্ঠস্বর ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে বীভৎস গলায় অনেকের হাসি। পাঁচ-ছটা ছেলে। একনজরে ওদের দিকে তাকিয়ে বুঝল রক্‌বাজ ছোকরা সব। কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে বয়েস। পরনে সরু প্যান্ট। কোমরে চওড়া বেল্ট।

নিতান্ত কৌতূহলবশতঃ বিনয় কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। দুটি যুবতী। ওদের চোখমুখে ভীতির ছাপ। দুজনেই কাঁপছিল। ওদের চারপাশে ছেলেগুলি। অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে মারছে মেয়েদুটির দিকে।

সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল বিনয়ের। স্থান কাল পাত্র বিচার করেনি। ফলাফল ভেবে দেখেনি। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে মেয়ে দুটির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছিল, কী হয়েছে?

—দেখুন না সেই তখন থেকে এই ছোটলোকগুলি পিছনে লেগেছে। এদের জন্যে কী ভদ্রভাবে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা যাবে না! ঘরে কী এদের মা বোন নেই?

দুজনের মধ্যে চশমা পরা ফর্সা মেয়েটি ক্রোধে ফেটে পড়ল। দু' চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

বিনয় ছেলেগুলির দিকে ফিরে তাকাল। মিটমিট করে হাসছে। কী নির্লজ্জ!

অতিকষ্টে সে নিজেকে সংযত করেছিল প্রথম দিকে। বেশ ভদ্রভাবেই বলেছিল ওদের একজনকে উদ্দেশ্য করে, ছি! এ কী নীচ ব্যবহার আপনাদের। চলে যান। মেয়ে দুটিকে বিরক্ত করবেন না।

—আপনি আবার কোত্থেকে এলেন। ওদের একজন মুখোমুখি হয় বিনয়ের, র‍্যালা না দেখিয়ে কেটে পড়ুন। এই ভোম্বল ছুঁড়িগুলোর দিকে নজর রাখ! পালিয়ে যেতে পারে।

—ছোট লোক! ইতর কোথাকার। ফর্সা মেয়েটি নীচু হয়ে পায়ের স্যান্ডেল খুলে হাতে তুলে নেয়। এতটা বোধকরি মাস্তান ছেলেগুলির সহ্য হ'ল না। ওদের একজন খপ্ করে ফর্সা মেয়েটির হাত ধরে মুচড়ে দেয়। মেয়েটি যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে।

(ক্রমশঃ)

# প্রদর্শনী পরিক্রমা

ইউ, এস, আই, এস, অডিটোরিয়ামে সুনীল দাসের জলরঙের প্রদর্শনীটি হয়ত অনেকেরই মনে আছে। খবরের কাগজের ম্যাট পেপারকে তিনি তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এবারে ৪ থেকে ১৪ ডিসেম্বর সুনীল দাস কেমুল্ড গ্যালারিতে কতকগুলি চমক দেওয়া ড্রয়িংএর প্রদর্শনী করলেন। ছোট মাপের এই ড্রয়িংগুলি তিনি বিলিতী পত্রপত্রিকার পাতার ওপর সৃষ্টি করেছেন। পাতার ছাপান অক্ষরের সারি বা রঙীন ছবিগুলি তিনি অতি নিপুণভাবে তাঁর ড্রয়িংএর ডিজাইনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। অনেক কমার্শিয়াল ড্রয়িংয়ে এ ধরনের ছবি অবশ্য দেখা গিয়েছে তবু সুনীল দাসের সুপটু হাতের ছবিগুলির রসের মূল্য তার জন্যে কমে যায়নি। মুখ এবং নরদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাজিয়ে কিছুটা ক্যারিকেচারের ভঙ্গীতে আধুনিক জীবনের বিফলতা, ব্যর্থতা বা ধ্বংসোন্মাদনার আভাস কতকগুলি ছবিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কালো কালি কখনো ঘনভাবে লাগিয়ে কখনো বা কলমের সহায়তায় বেশ সুদৃশ্য টেক্সচার তৈরী করেছেন। রঙীন ছবি ছাপা কাগজগুলির রংও খুব সুন্দরভাবে কালো ডিজাইনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া হয়েছে। ১০ এবং ১২ নম্বরের ছবিটি এদিক থেকে খুবই চমৎকার।

*

কুমকুম মুন্সী ৪ থেকে ১২ ডিসেম্বর ম্যাক্সমুলার ভবনে ত্রিশখানির মত জলরঙের ছবি দেখালেন। কতকগুলি ছবি বেশ লম্বা—প্যানেল ডেকরেশনের মত। বিমূর্ত রূপ ঘেঁষা কাজ—একটা মহাশূন্যে পরিভ্রমণের আমেজ রয়েছে। ঘোর নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনী ইত্যাদি রঙের প্রাধান্য। ঘোর রঙের জমির ওপর হালকা উজ্জ্বল রঙের ছোট ছোট ফুটকি—যেন তারাভরা আকাশের ছবি। কোথাও বা বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের সাহায্যে ডিজাইনের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। মাঝে মাঝে টেম্পারা শাদা দিয়ে দ্রুতগতিতে রেখা টেনে প্যানেলের মধ্যে একটা গতিময়তার সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে রবার সলিউশন ও ফটো টিন্টিং রঙ একটু একঘেয়েমি এনে দেয় বৈকি।

• শিল্পী : সুনীল দাস

৫ থেকে ৭ ডিসেম্বর নৃতত্ত্ব বিভাগের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে একটি ছোট কিন্তু তথ্যমূলক প্রদর্শনী হয়ে গেল। চার্ট ও ফটোগ্রাফের সাহায্যে নৃতত্ত্ব বিভাগের বিভিন্ন কাজকর্মের কিছু কিছু হদিশ এখানে পাওয়া গেল। ভারতের বিভিন্ন উপজাতি ও আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির রূপরেখা, কলকাতা শহরের বিভিন্ন জাতির বাসিন্দা ও তাদের জীবনযাত্রার ধরণ ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য তথ্য দিয়ে প্রদর্শনীটি আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা করা হয়। দর্শকদের আগ্রহ দেখে মনে হল এঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

*

৪ থেকে ১০ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টসে 'ওয়ার্ল্ড অব বুকস ৭০' প্রদর্শনীটি পুস্তককীটদের প্রচুর তৃপ্তি দিয়েছে। নানা বিষয়ের বিভিন্ন ধরনের বইয়ের মধ্যে শিল্পসংক্রান্ত বইগুলি শিল্পী ও শিল্পরসিকদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত শিল্পের ক্রমবিকাশের মোটামুটি রূপরেখা এই বইগুলি দেখলেই অনেকটা ধারণা হয়। প্রাচ্য শিল্প সম্বন্ধে বই অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং বিখ্যাত শিল্পীদের ড্রয়িংয়ের বইয়ের সংখ্যা আরেকটু বেশী হলে ভাল হত। ভাল ছাপা বই আজকাল কলকাতার বাজারে কম আসে। এই প্রদর্শনীতে তার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেল।

*

শ্যামশ্রী বসু ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টসে ৯ খানি পেন্টিংয়ের প্রদর্শনী করলেন। ছবিগুলি অধিকাংশই লম্বা ডেকরেটিভ প্যানেল হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। মানুষের দেহকে প্যানেলের ডেকরেশনের অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করে 'প্যাসেজ অব লাইফ', 'অ্যাগনি অ্যান্ড এক্সটাসি', 'এক্সপ্লোডেড মিথ' ইত্যাদি নানারকম নাম দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি বাদামী, কালো, হাল্কা হলুদ বা সামান্য একটু নীলের ছোপ ব্যবহার করে শিল্পী একটু গাঢ় রঙের ছবি তৈরী করেছেন।

কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে ৯ থেকে ১৬ ডিসেম্বর শুভ্রেন্দ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ খানি জলরঙ, টেম্পারা ও গ্রাফিকের প্রদর্শনী করলেন। প্রথাগত ভারতীয় রীতির সঙ্গে আধুনিক ডিজাইনের একটা সংমিশ্রণ আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। ছবির জমিকে কয়েকটি জ্যামিতিক ভাগে ভাগ করে ভারতীয় মিনিয়েচারের ফিগার বা গাছপালা দিয়ে ছবিটি সাজানো হয়েছে। কোথাওবা ছবির অন্তর্গত স্থাপত্যের অংশটি সরল জ্যামিতিক গঠনের মত করে তৈরী করে তার এক কোণে ফিগার বসানো হয়েছে। ফলে 'ড্রীম প্যালেস', 'ম্যাজিক প্যাভিলিয়ন', 'এনচান্টেড কাস্‌ল্' ইত্যাদি ছবিগুলির একটা বিশিষ্ট রূপ এসেছে। অবশ্য শিল্পীর হাত এখনো যথেষ্ট পাকেনি এবং রঙের ব্যবহার এখনো যথেষ্ট পরিণত নয়। তবে ছবিগুলির মধ্যে কিছু সম্ভাবনা দেখা গেল যার জন্য তাঁকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

*

সোসাইটি অব কন্টেম্পরারি আর্টিস্টস-এর বার্ষিক প্রদর্শনী বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ৯ থেকে ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল। এবারে ষোলজন শিল্পী এতে অংশগ্রহণ করেন। জলরঙ, ড্রয়িং, পেন্টিং ও ভাস্কর্য নিয়ে প্রদর্শনীটি বেশ সুসজ্জিত হয়েছিল। জলরঙের ছবির মধ্যে শ্যামল দত্তরায়ের 'সী স্কেপ' ছবিটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অল্প রঙের ব্যবহারে অনেকখানি স্পেস তৈরী করেছেন। তাঁর অন্য দুটি ছবি তাঁর পুরাতন রীতি অনুযায়ী সুঅঙ্কিত কাজ। ধীরাজ চৌধুরীর নিসর্গ দৃশ্যভিত্তিক অ্যাবস্ট্র্যাকশন সুগঠিত হলেও একটু চকমকে এবং যেন কিছুটা কমার্শিয়াল কাজ ঘেঁষা। অনিলবরণ সাহা তাঁর পূর্বের রীতির মত লোকশিল্পের ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করেছেন।

*

তেলরঙের কাজে বিকাশ ভট্টাচার্য এবারে সবচেয়ে ভাল কাজ উপস্থিত করেছেন। তিনটি ছবিই সুঅঙ্কিত, একটি কলাজ রীতিতে করা। তবে 'ভিজিটস' ছবিটিই সবচেয়ে ভাল লাগল। শিল্পীর স্টুডিওতে আগন্তুকদের আবছা আনাগোনা, টেবিলের রঙ, তুলি, ব্যাট, কাগজ ইত্যাদির একটি চমৎকার স্টিল লাইফ। কাতায়ুন শাকলাতের সুররিয়্যালিস্টিক কাজ তেমন জমেনি। তবে তাঁর 'ট্রায়ো' ও 'গেস্ট রাইড' ইন্টারেস্টিং কাজ হয়েছে। লালুপ্রসাদ শার সাদা কালোর অ্যাবস্ট্র্যাকট ড্রয়িংগুলি বাহুল্যবর্জিত পরিচ্ছন্ন কাজ। মনু পারেখের তিনটি পেন্টিং এবারে ভিন্ন ধরনের। সাদা ক্যানভাসে কিছুটা সাদা কালো ড্রয়িং কিছুটা রঙের ছোঁয়া দিয়ে সুররিয়্যালিস্টিক ইমেজ তৈরীর চেষ্টা করেছেন। মনু রাঠোর ও শৈলেশ মিত্রের অ্যাবস্ট্র্যাকশনগুলির রঙ ও প্যাটার্ন মোটামুটি মন্দ নয়। মাটির অন্ধকারে বন্দী গাছের চারার চিত্র দিয়ে সুহাস রায়ের 'ডেসপেয়ার' ছবিটি তৈরী। ঘোর বাদামী ও একটু সবুজ নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। তবে বড় ছবি মিনিয়েচারের মত ফিনিশ করার চেষ্টা আংশিকভাবে সফল হয়েছে। সুনীল দাস তাঁর আগের স্টাইলে বিভিন্ন প্রতীক চিহ্ন নিয়ে তিনটি পেন্টিং দিয়েছেন। অন্যবারের তিনখানি ইন্টাগ্লিওর মধ্যে ৩৫ নম্বরের কাজটি ভাল লাগল। রঘুনাথ সিংহের তিনখানি অ্যাবস্ট্র্যাকট ভাস্কর্যে রঙীন সেরামিকসের ব্যবহার এবারে খুব সংযত। ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত তান্ত্রিক প্রতীকচিহ্ন নিয়ে তিনখানি কম্পোজিশন তৈরী করেছেন, তাঁর আগের কাজের থেকে বেশী কিছু পরিবর্তন হয়নি। গণেশ পাইনের তিনখানি টেম্পারা প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ। তার মধ্যে 'অন দি ব্যালকনি' ছবিটি সূক্ষ্মতা এবং আবেদনের দিক দিয়ে বোধ হয় সবচেয়ে আকর্ষণীয়। অবনীন্দ্রনাথের 'দর্শন দরবাজাতে আলমগীর' ছবির কথা মনে পড়ে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে আধুনিক। 'আণ্ডার দি রেড ক্লাউড' রোমান্টিক ছবি এবং রঙও মধুর। 'মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ডে' তিনি যশোদা ও কৃষ্ণ এই বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করেছেন। সাহসের কাজ। রঙ অনেক গভীর। মিনিয়েচারের সঙ্গে আধুনিক রীতির বর্ণপ্রয়োগের একটা সামঞ্জস্য তৈরী করতে চেয়েছেন। ছবির বাঁদিক ঘেঁষে উর্ধাধঃ সাদা ডিজাইনটি ছবির সুসম্বদ্ধতা ব্যাহত করেছে বলে মনে হল। তবু এবারকার প্রদর্শনীতে গণেশ পাইন ও বিকাশ ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি করেছেন বলা যেতে পারে।

*

স্টেটসম্যান অফিসের সামনে শিল্পী অশোক সাহা ২৫ নভেম্বর থেকে ১৫টি স্কেচের প্রদর্শনী করেন। স্কেচগুলি মাপে বড় এবং সমাজের অবহেলিত মানুষের দুঃখদুর্দশার ছবিই তাঁর কাজের বিষয়বস্তু। বেশীর ভাগ ছবিতেই দুটির বেশী ফিগার নেই। তাও পূর্ণাঙ্গ নয়। পথের ভিখারী, অনশনক্লিষ্টা মাতা ও সন্তান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কয়েকটি ছবি মন্দ নয়—তবে ড্রাফটসম্যানশিপ আরো উন্নতির সম্ভাবনা রাখে।

৩০ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমির পশ্চিমের গ্যালারীতে বাসন্তী সেন, পেগী সাটো ও মরিস সেলিম সর্ব-সমেত ৩১ খানি ছবির প্রদর্শনী করলেন। বাসন্তী সেনের কাজগুলি প্রধানত স্টিল লাইফ ও নিসর্গ দৃশ্য এবং বিশেষত্ব বর্জিত। একটি স্টিল লাইফ-এর মধ্যে কিছুটা রঙের বৈচিত্র্য এনেছে। পেগী সাটোর কাজগুলি হল প্যাস্টেল ও কালি ড্রয়িং। প্রধানত নগ্ন মূর্তি স্টাডি—দু একটি প্রতিকৃতি ড্রয়িংও আছে। সাবলীল রেখায় আঁটসাঁট ড্রয়িং। ৪ ও ৮ নম্বরের নুড উল্লেখ করার মত। মা ও শিশু ড্রয়িংটিতে অল্প প্যাস্টেলের ব্যবহার ও দ্বিধাহীন রেখাপাত প্রশংসনীয়। মরিস সেলিম-এর ছোট তেল রঙের কাজগুলি গতবারের মত। আধুনিক প্রিমিটিভিজমের ছাপ তাঁর কাজে স্পষ্ট। সমান ওজনের রেখা রঙের ব্যবহারে ছোট ছবিগুলির ফ্ল্যাট প্যাটার্ন পরিস্ফুট। তাঁর সব ছবিই হয় নিসর্গ দৃশ্য, নয় নগরের ছবি। এর মধ্যে 'টেরেস', 'দি চার্চ অ্যাট আর্টিলান' বিশেষভাবে ভাল লাগে। হরিদ্বারের ঘাটের একটি ছবিও কম্পোজিশনের সারল্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য ছবিতে দাবার ছকের মত ঘর কাটা প্যাটার্নের ব্যবহার কিছুটা একঘেয়েমির সৃষ্টি করলেও রঙের বাহারে দৃষ্টিকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে।

*

নীরদ মজুমদারের 'শেষ বসন্ত' সিরিজের ১৩ খানি ছবির প্রদর্শনী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হল। মহাভারতের পাণ্ডু রাজার অভিশাপ ও মাদ্রীর ক্রোড়ে মৃত্যু তাঁর ছবিগুলির বিষয়বস্তু। তবে নিছক ইলাস্ট্রেশন হিসেবে ছবিগুলি উপস্থিত করা হয়নি। একটা বিষয়কে যেন আলাপ ও বিস্তারের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। ক্যালিগ্রাফি এবং পেন্টিং প্রতিটি ছবিতেই সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত ডিজাইন রূপে উপস্থিত করা হয়েছে। একদিকে যেমন ঘূর্ণ্যমান চক্রের মত ডিজাইনে বৈচিত্র্য ও একতার সংঘটিত হয়েছে তেমনি রঙের মোজাইক ছবির নাটকীয়তাকে সাহায্য করেছে। যদিও ছবিগুলি একটি সিরিজের ছবি তবু প্রতিটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। ব্যক্তিগতভাবে রঙ ও গঠন পরিপাট্যে 'বসন্ত', 'মোহ', 'বাসনা' ও শেষ ছবিটি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। প্রদর্শনী ২৮ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর খোলা ছিল।

অশ্বারোহণ মেয়েদের প্রাত্যহিক দেহচর্চার অঙ্গ

## নতুন এক শিক্ষাজগৎ

ছোট-ছোট দুঃখ-বেদনা কোন-কোন র বিরাট ব্যাপ্তি লাভ করে। নিজের ঃসঙ্গতা এবং হারানোর বেদনা তখন এক ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই রূপের ধ্যই সব হারানো বিরাট প্রাপ্তিতে উজ্জ্বল য় ওঠে। এমনি ধরনের ঘটনা সাধারণত ল্প-উপন্যাসেই বেশী ঘটে। ব্যক্তিগত বিনে দৈবাৎ। জয়পুরের বনস্থলী বিদ্যা-ঠ এমনি দৈবাৎ ঘটনার একটি,—সম্পূর্ণ ক্তিজীবনের হারানো এবং নিঃসঙ্গতা-সূত।

রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হীরালাল াস্ত্রীর আদরের মেয়ে শান্তি বাঈ। রাজ-র্যের হাজারো ব্যস্ততা এবং ঝামেলার ধ্যেও বাড়িতে তার পরম আনন্দের উৎস েই মেয়ে। মেয়েকে নিয়ে তাঁর কল্পনা ানা মেলে। কিন্তু মেয়ের যখন মাত্র বার ছর বয়স তখন মৃত্যু এসে তাকে অকস্মাৎ ছিনিয়ে নিল। শোকে-বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়লেন হীরালাল শাস্ত্রী। মেয়ের মৃত্যুতে তাঁর সব অঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেল। জীবন হয়ে গেল বিস্বাদ। মেয়ের মৃত্যুর ভাবনায় তিনি যখন গভীরভাবে অভিভূত তখন তিনি এক নতুন বোধে উজ্জীবিত হলেন। তিনি ভাবলেন, শান্তি বাঈ মারা গেছে। মৃত্যু নির্মম এবং নিষ্ঠুর সত্য। এজন্য বেদনা এবং দুঃখে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা কোন সান্ত্বনা নয়। কারণ, যে গেছে সে আর আসবে না। কিন্তু এরকম অসংখ্য শান্তি বাঈ তো আমাদের দেশে আছে। যদি তাদের জন্য শান্তি বাঈয়ের মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তবে এই বেদনা যেমন তার কাছে নতুন-রূপে প্রতিভাত হবে তেমনি এক শান্তি বাঈকে তিনি খুঁজে পাবেন অসংখ্যের মধ্যে।

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মেয়ের চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার বেদনাকে ভুলবার জন্য যে পথের সন্ধান তিনি আপন অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, সেই মতো কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রায় জনা-ছয়েক মেয়েকে তিনি বেছে নিলেন শান্তিবাঈয়ের অভাব পূরণের জন্য। এমনি করে মেয়ের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে লাগলো। তিনি তাদের সকলের শিক্ষার বন্দোবস্ত করলেন। তারপর ১৯৩৫ সালের অক্টোবর বনস্থলীতে স্থাপিত হলো শান্তি বাঈ শিক্ষা কুটির। ছোট-ছোট মাটির ঘরে মেয়েরা পড়াশোনা করতো। কর্মী ছিল মাত্র দুজন। কিন্তু তাতেই কি বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনা। হীরালাল শাস্ত্রীর হাসি-খুশি অতগুলি মেয়ে দেখে নিজের মেয়ের কষ্ট ভুলতে তার বেশী সময় লাগে না।

১৯৭০ সালের ১৩ ডিসেম্বর উদযাপিত হলো এই বিদ্যাপীঠের ৩৫তম প্রতিষ্ঠা উৎসব। উৎসবে সভাপতিত্ব করলেন রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পি এল ভাটনগর। সেই সূচনা থেকে আজকের বিশাল রূপের প্রতিটি সিঁড়ি তিনি উপস্থিত সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। শান্তি বাঈ শিক্ষা কুটির যা পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হলো

বনস্থলী বিদ্যাপীঠে সেই কাহিনীটুকু তিনি উচ্চারণ করলেন পরম শ্রদ্ধার সংগে।

প্রতি বৎসর প্রতিষ্ঠা উৎসবের সময় একটি বিরাট মেলা বসে বনস্থলীতে। আশেপাশের গ্রাম থেকে নরনারী ভিড় করে আসে মেলায়। বিদ্যাপীঠের মেলায় এ সময় মেয়েরা নানা খেলাধুলা এবং নাচ-গানের আসর বসায়। দোকানপাট এবং নানা আয়োজনে মেলা হয়ে ওঠে জমজমাট। এই মেলায় অনেকটা সাদৃশ্য মেলে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার। প্রতি বৎসর শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা যেমন অনেকের কাছে এক বিরাট আকর্ষণ তেমনি এই বনস্থলীর মেলার জন্যও অনেকে সাগ্রহে অপেক্ষা করে সারা বৎসর ধরে।

বনস্থলী বিদ্যাপীঠ শুরু হয়েছিল মাত্র জনা-কয়েক ছাত্রী নিয়ে। কিন্তু আজ এর বিশাল রূপ দেখে অবাক হতে হয়। সবশুদ্ধ ১৫৫৭ জন ছাত্রী এই বিদ্যাপীঠের পড়ুয়া। আর তারা এসেছে ভারতের নানা প্রদেশ থেকে। বিদেশী ছাত্রীও আছে অনেক। সেদিক থেকেও শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। সেখানে যেমন সারা দেশ তথা বিশ্ব মিলিত হয়েছে তেমনি এই বিদ্যাপীঠেও। নানা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় বনস্থলীতে। সব ভারতীয় ভাষার ছাত্রী এখানকার পড়ুয়া।

ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কর্মীর সংখ্যাও বেড়েছে। গোড়ায় ছিল মাত্র দুজন কর্মী। আজ সে সংখ্যা আশ্চর্য রকম স্ফীত হয়েছে। মোট কর্মীসংখ্যা এখন ৩০৯ জন। এ ছাড়া ২১২ জন গ্রামে -লোক এখানে কাজ করে।

এদের সকলকেই স্থান দেওয়া হয়েছে বিদ্যাপীঠের গণ্ডীর মধ্যে। ১৫৫৭ জন ছাত্রীর মধ্যে ১২৪২ জন বাস করে ৮টি হোস্টেলে। এর মধ্যে সাতটি হোস্টেলের নিজস্ব ভবন গড়ে উঠেছে। শুধুমাত্র অষ্টমটির জন্য একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা আছে। তবে শিগগিরই সেটিও স্থায়ী এবং নিজস্ব রূপ পাবে। বাদবাকী ৩১৫ জন ছাত্রী বাস করে তাদের অভিভাবকের সঙ্গে। অবশ্য বিদ্যাপীঠের গণ্ডীর মধ্যেই। তবে এদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য আরো দুটি হোস্টেল এখনি বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বনস্থলী বিদ্যাপীঠের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এখানে কোন রকম মাইনে নেওয়া হয় না। এটা চলে আসছে সেই সূচনা থেকে। শুধুমাত্র ছাত্রীদের থাকা-খাওয়া বাবদ বাৎসরিক একটা টাকা নেওয়া হয়।

বিদ্যাপীঠের ৩০৯ জন কর্মীর মধ্যেও রয়েছেন ভারতের সব রাজ্যের প্রতিনিধি। ছাত্রীদের দিক বিবেচনা করেই কর্মীদের মধ্যেও এই সর্বভারতীয় চরিত্র রক্ষা করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র স্থান জুড়ে সূচনা হয়েছিল এই বিদ্যাপীঠের। কিন্তু বিরাট কর্মকাণ্ড এবং ছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য ৮৭৫ একর জমি জুড়ে এখন বনস্থলী বিদ্যাপীঠ বিস্তৃত। স্বাভাবিকভাবেই এর খরচও খুব বেশী। তবে সুবিধা এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার থেকে এখানে অর্থ সাহায্য করা হয়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্যও আছে। চার দিক থেকে এই অর্থ সাহ[...] বিদ্যাপীঠ চলেছে সুষ্ঠুভাবে।

জলের সমস্যা এই বিদ্যাপীঠকে অ[...] অসুবিধায় ফেলেছে। এজন্য প্রতি ব[...] বহু টাকা খরচ হয়। এবার হয়তো কি[...] সুবিধা হবে এবং বিদ্যাপীঠ জলের সমস[...] কাটিয়ে উঠতে পারবে। নতুন পরিকল[...] কাছেই নির্মিত হচ্ছে একটি জলাধার। [...] সম্পূর্ণ হলেই জলের সমস্যার স[...] হবে। আর এজন্য খরচের বিরাট ব[...] অনেক হ্রাস হবে।

সেই টাকা তখন খরচ করা চলবে [...] পীঠের নানা উন্নয়নমূলক কাজে [...] মেয়েদের শারীরিক চর্চা আর উৎসাহ[...] শরীর চর্চা এই বিদ্যাপীঠের [...] বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি মেয়েকে অবশ্যই [...] অংশ নিতে হবে। যে কোন খেলায় [...] নিয়ে নিজের শরীরকে মজবুত করে [...] ব্যবস্থাও রয়েছে সুপ্রচুর। প্র[...] বৈকালিক ক্রীড়ার আসর তাই এখানে [...] বিশেষ চিত্তাকর্ষক বিষয়। এরই মধ্যে [...] দের যা বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তা [...] ঘোড়ায় চড়া এবং হাওয়াই জাহাজ চা[...] ভারতের আর কোন বিদ্যাপীঠে [...] ব্যবস্থা নেই। মেয়েদের ঘোড়ায় [...] শেখানোর জন্য বিদ্যাপীঠের ৩০টি [...] আছে। আর হাওয়াই জাহাজ চা[...] মেয়েদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। [...] যশোবন্ত কাউর ইতিমধ্যেই পাইলট [...] হাত পাকিয়েছেন। শিগগিরই তিনি [...] চালনার লাইসেন্স পাবেন। তিনি এই [...] পীঠের একজন শি ক্ষি কা— ইতি[...] অধ্যাপিকা।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, ১৯৫[...] পর্যন্ত এই বিদ্যাপীঠ কোন বোর্ড বা

গালয়ের স্বীকৃতি পায় নি। তার পরই শ্য রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি চ করে। তারপর ১৯৫৭ সালে স্বীকৃতি চ করে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দক হিসেবে।

বিভিন্ন মনীষী এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই দ্যাপীঠের সংস্পর্শে এসেছেন। মহাত্মা ধী এই বিদ্যাপীঠে এসেছিলেন এবং নি এর পরিবেশ ও শিক্ষাদর্শে একান্ত ধ হয়ে মন্তব্য করেছেন, বনস্থলী বিদ্যা- ঠ তাঁর হৃদয়ে চিরজাগরূক থাকবে। ন্ডত জওহরলাল নেহরু বিদ্যাপীঠে এসে- ন কম করেও তিনবার। শেষবার তিনি সেন ১৯৬৩ সালে। তাঁর মন্তব্যটি বিশেষ ধানযোগ্য : ইফ আই হ্যাড বিন এ র্ল আই উড কাম টু বনস্থলী ফর মাই কেশন।

১৯৪৬ সালের বাৎসরিক উৎসবে সভা- ত্ব করতে গিয়ে পট্টভি সীতারামাইয়া লন যে, বনস্থলী বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার গ্যতা রাখে।

বনস্থলীতে বর্তমানে স্কুল থেকে শুরু র এম-এ, পি-এইচ-ডি, এবং জার্মান, রাসী ও রুশ ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত ছে। মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বনস্থলী দ্যাপীঠ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে সছে। জয়পুর থেকে মাত্র ৪৫ মাইল দূরে বস্থিত দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং বৃহৎ বাসিক বিদ্যাপীঠ বনস্থলী মেয়েদের ক্ষার এক বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে সারা দেশে তিলাভ করেছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এখানে। ছাত্রের ক্তিত্ব বিকাশে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সঙ্গে রতের পারমার্থিক চেতনার দীপটিও জ্জ্বলিত রাখা হচ্ছে।

হীরালাল শাস্ত্রীর কন্যা শান্তি বাঈ জ অজস্র হয়ে লাভ করছে এই শিক্ষা। ক্তিগত শোক আজ বহুজনের আনন্দে রিণত।

# পরিবার পরিকল্পনায় নতুন উদ্যম

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে তা সরকারী কর্মপ্রচেষ্টা ও আর্থিক সাহায্যের থেকে কম নয়। কম সময়ের মধ্যে সাধারণের বাস্তব অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জন্মহার কমিয়ে আনার একান্ত প্রয়োজন। পরিবার পরিকল্পনার বর্তমান কর্মসূচীর লক্ষ্য আগামী দশ বারো বৎসরে প্রতি হাজারে জন্মহার ৩৯ থেকে কমিয়ে ২৫-এ আনা। ৯জননক্ষম বিবাহিত-দের জন্য একটি বিশিষ্ট কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো যাতে ছোট পরিবারের আদর্শ সমষ্টিগত-ভাবে লোকে গ্রহণ করে, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে জানতে পারে কিভাবে পরিবার পরিকল্পনা করা যায় এবং এর বিভিন্ন পদ্ধতি ও চিকিৎসা যাতে সর্বত্র সহজলভ্য হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার পরিচালন কর্তৃত্ব থাকবে কেন্দ্রের হাতে, সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের স্বাস্থ্য বিভাগকেও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর জন্য যে ৩১৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তার ২৬১ কোটি টাকা নগর ও গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে নির্বীজকরণ ও অন্যান্য-অস্ত্রোপচার খাতে ব্যয় করা হবে এবং বাকি ৫৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রচারে।

এছাড়াও রয়েছে বিদেশী সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ১৫ কোটি টাকা দেওয়ার এক চুক্তি সই করেছে। রাষ্ট্রসংঘের শিশু-কল্যাণ সংস্থা প্রসূতি, শিশু-স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে ৫০ লক্ষ টাকা দান করবে আশা করা যাচ্ছে। নরওয়ে সরকার কর্তৃক চার কোটি টাকা দেবার বিষয়ে এখনো আলোচনা চলছে।

কর্মসূচীকে দ্রুততার সঙ্গে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এবং তাকে বৃহত্তর এলাকায় সম্প্রসারিত করার জন্য কয়েকটি নতুন কর্ম-পন্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। তার মধ্যে নিবিড় জেলা প্রকল্প, প্রসূতি-কল্যাণ এবং জনশিক্ষার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

দেশের মোট ৩৩৫টি জেলার ৫১টিতে বাস করে মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। সেজন্য এই ৫১টি জেলার জনশিক্ষা ও অন্যান্য সেবা কর্মের নিবিড় কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭টি জেলায় কাজও শুরু হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে। ক্রমে অর্থ সাহায্য পাওয়া গেলেই বাকি জেলাগুলিতেও কাজ শুরু হয়ে যাবে। উত্তরপ্রদেশের বারানসী এলাকায় নিবিড় কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ চলছে এবং শীঘ্রই আরো দুটি এলাকায় অনুরূপ কাজ চালু করা হবে।

প্রতি বৎসর প্রসবের জন্য যে বিরাট সংখ্যক মহিলা হাসপাতালে আসেন সেইসব প্রসূতিদের শিক্ষাদান এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫৯টি হাসপাতালে এই কর্মসূচী ইতিমধ্যে চালু হয়ে গেছে এবং আরো ৯২টি হাসপাতালে পরবর্তী বৎসরে কাজ শুরু করা হবে।

প্রত্যেকটি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে বিভিন্ন অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে যাতে সেখানে নির্বীজন ও বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচার এবং লুপ পরানোর কাজ করা যায়। তাছাড়া কয়েকটি সুনির্দিষ্ট হাসপাতালকে এসব যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে।

শিশুদের এন্টিট্রাইপল এবং সন্তান-সম্ভবা মেয়েদের ধনুষ্টংকারের টিকা ছাড়াও অপুষ্টিজনিত রক্তাল্পতা এবং ভিটামিনের অভাবহেতু রাতকানা রোগের প্রতিষেধক দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই সঙ্গে চতুর্থ যোজনাকালে কয়েকটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে বিবাহের সর্বনিম্ন বয়েসকে বাড়িয়ে দেওয়া এবং গর্ভপাতের আইনের কড়াকড়ি হ্রাস। একথা এখন পরিষ্কার যে, এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে একে গণ-আন্দোলনে পরিণত করার উপর। সরকার ছাড়াও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাগুলিকে সর্বতো-ভাবে এর সার্থকতায় এগিয়ে আসতে হবে। সরকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ছাড়াও কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট, কৃষি উন্নতি প্রভৃতি সমাজকল্যাণ কার্যে নিযুক্ত দপ্তরসমূহকে বিবাহিত জনগণকে পরিবার পরিকল্পনায় শিক্ষাদান এবং এর পদ্ধতিগুলি যাতে তারা সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করেন সেজন্যে এই কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

অবার সমাজ-কল্যাণ কার্যে অভিজ্ঞতা থাকার দরুণ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান-গুলি ছোট পরিবারের আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষা ও উৎসাহ দানের ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এসব প্রতিষ্ঠানকে এই প্রকল্পের রূপায়নে পুরোপুরি ভাবে সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টা হচ্ছে।

—প্র[illegible]

# গোয়েন্দা কবি পরাশর • প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

টর্চের আলোয় যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাতে কৃত্তিবাস স্তম্ভিত।

...হিংস্র দুই লড়িয়ে
টর্চের আলো যেন গ্রাহ্যই করে...

কৃত্তিবাস আর দ্বিধা করে না। টর্চটা জ্বেলে ধরেই এগিয়ে যায়...

পুলিসের অবস্থা তখন সত্যিই কাহি...

দুই লড়িয়ে অসুরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কৃত্তিবাস টর্চটা সত্যিই ডাণ্ডার মত দরোয়ানের মাথায় বসি...
দেয়। ব্যস্ত হয়ে টর্চটা নেভাবার দরুন সে ঘা-টা অন্ধকারে ঠিকমত না লাগলেও দরোয়ান তাতেই বেহুঁ...
সেই মুহূর্তে কোথা থেকে আরেকটা টর্চ জ্বলে ওঠে।

# জলসা

শঙ্করস্কোপ
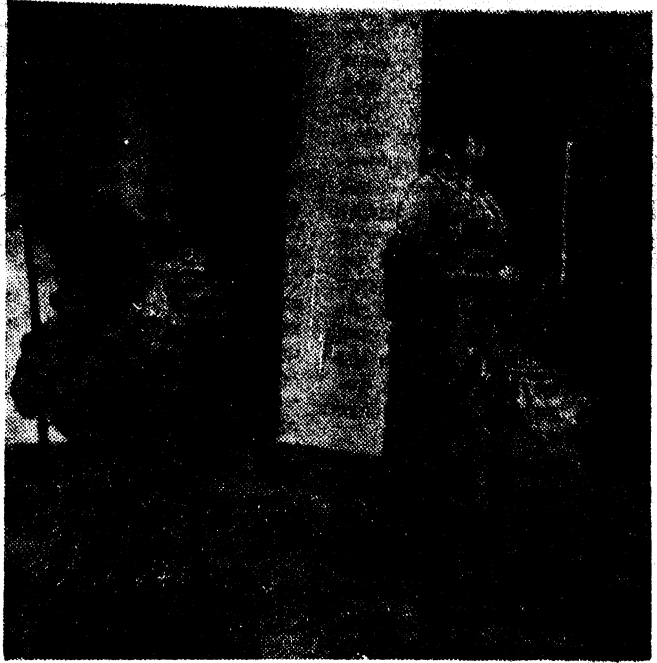
দেখে বিস্মিত হয়েছি। আজব-শহর ভাতার অবসর বিনোদনী আনন্দের ভোজের অভাব নেই, কিন্তু অলোক-য প্রতিভার অসামান্য শক্তির বলে প্রতি-র বহু ব্যবহারে মলিন, জীর্ণ পর্দাকে লহমায় অপসারিত করে জীবনের াছায়ার লীলাকে তার বিস্ময়, আনন্দ উল্লাসের গৌরবলোকে বিছিয়ে দিয়ে এক নির্ণরী পটভূমিকার অন্তহীন াবনালোক মেলে ধরেছেন সারা বিশ্বের ক-মহলের চির-নায়ক উদয়শঙ্কর। স্কোপ শঙ্করের প্রবীণ বয়সের সৃষ্টি। ষ্টির অন্তপ্রবাহে অন্তলীন যৌবনের রেপ রঙিন স্বপ্ন। উচ্ছ্বাস-কল্লোলের ামহীন দোলায় প্রতি মুহূর্তই যেন াণিত। আবার শুধু রোমান্স সর্বস্ব । এ বস্তু অনভিজ্ঞ, সাধারণ দর্শককে মাদ দিত। বিদগ্ধ রসিকচিত্তের ন্দের কারণ হয়ে উঠতে পারত না।

সাংবাদিক সম্মেলনে শঙ্কর আমাদের ান—'নাটক ও নৃত্যের সঙ্গে ম্যাজিকও বে।' এ ম্যাজিক কি? এ নয় ভোজবাজি ষ্টর সস্তা চমক এ ম্যাজিক হোলো র প্রতিভার সেই ম্যাজিক স্টোন যার র্শে অতি সামান্য সাধারণ ঘটনা ও বস্তু নিন্দনের চিহ্নিত সীমা অতিক্রম করে পনার অপরূপতায় অসামান্য হয়ে ওঠে। রশঙ্করের সারা জীবনের শিল্পকৃতি ায়ন করলে দেখা যায় প্রতিটি অধ্যায় র চিত্তের এক আশ্চর্য অভাবনীয় াশ।

প্রথম যুগে প্রতিদিনের অতিজানা ঘটনা য় মঞ্চ নৃত্যের রূপকল্পনা সারা দেশকে ভূত করেছে। 'কল্পনা' চিত্রে এই ল্প ভাবনারই চিরস্থায়ী রূপ। রপরের যুগ ছায়ানৃত্যের যুগ। ১৯৫৬তে ধুমাত্র পর্দার বুকে ছায়ার ভাষায় রাম-লার অপূর্ব লীলা সারা জগতে ালোড়ন সৃষ্টি করেছে, তারপরে রঙীন য়ানৃত্যে বুদ্ধজীবনী। আজকের যুগে য় প্রতি নৃত্যনাট্যানুষ্ঠানে যে ছায়া-তা প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে সেই ানৃত্য বাংলাদেশে উদয়শঙ্করেরই অবদান।

এ যুগে আমরা পেয়েছি 'সামান্য ক্ষতি', ক্লান্ত আনন্দ' যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনন-লতার সঙ্গে শঙ্করের প্রাণধর্মী স্বপ্ন-ল্পনার এক শিল্পনন্দের মিলন ঘটেছে।

কিন্তু সুবিশাল কীর্তিসম্ভারের সামনে াঁড়িয়েও অতৃপ্ত ক্ষোভের সঙ্গে শঙ্কর বারবার ভেবেছেন এবার এমন কিছু করা দরকার যা কারো কল্পনাতেও আসেনি। আর এই ভাবনার ফলশ্রুতি হোলো শঙ্করস্কোপ।

শঙ্করস্কোপে নাটক, চলচ্চিত্র, ম্যাজিক, ডায়ালাগ সবই আছে, কিন্তু এ-সবের উপস্থাপনা গোঁজামিল না হয়ে যেন 'বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে উঠে' শিল্পীর গোধূলি-লগ্নকে উদ্ভাসিত করেছে।

গভীরবোধের সহজ আলোয় দেখতে যাঁরা জানেন না শঙ্কর-স্কোপের চমকের দিকটিই তাঁদের চোখে পড়বে, আর আপাতত সংলগ্ন কাহিনীগুলি খুব একটা চমকপ্রদ মনে না হতেও পারে।

'অ্যানাউনসার আপসাইড ডাউন'-এ 'অ্যানাউনসার অ্যান্ড সিংগার' 'লেডি অ্যান্ড দি থীফ' ইত্যাদিতে জীবনের অসংগতির প্রতি যে 'স্যাট্যায়ার' তার মধ্যে শঙ্করের নিজস্ব ভঙ্গিটি লক্ষ্যটুকু করবার মত। এখানে 'স্যাট্যায়ার'-এর মধ্যে কোনো ঔদ্ধত্যের চাবুক নেই আছে শিল্পীচিত্তের অশ্রুসজল স্নেহস্পর্শের আশ্বাস।

'কার্তিকেয় নৃত্যে' পর্দার বুকে 'কল্পনা' চিত্র থেকে নেওয়া তরুণ উদয়-শঙ্করের নৃত্য আর তারই সঙ্গে সমান্তরাল ধারায় মঞ্চশিল্পীদের নৃত্যের এমন রূপ আর কোনো শিল্পীর কল্পনায় এসেছে বলে জানা নেই। শুধু সৌন্দর্য-সৃষ্টি বিচারেই এ দৃশ্যের মূল্য নয়। যৌবনের উদয়শঙ্করকে যাঁরা দেখেননি, তাঁরা সুযোগ পাবেন সেই দেবদুর্লভ রূপের নৃত্য ও তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী অমলাশঙ্করের 'সিম্বলিক' রূপকে উপভোগ করবার।

এ ছাড়া শিবনৃত্য। ছন্দের স্পন্দনে তিনি অনিত্য চঞ্চল রূপের অন্তরালের অচঞ্চল রূপকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলতে চেয়েছেন ক্ষণলীয়মান বৈচিত্র্যের চেয়ে অনেক বড় শিল্পীর ধ্যানলোক যেখানে তিনি চিরতপস্বী। এরই এক ফাঁকে মমতা শঙ্করের ভারতনাট্যম-এ বর্ণম—কিশোর প্রতিভার উজ্জ্বল বিকাশ আমাদের মনকে নির্মল আনন্দের সরিক করেছে। কবি-গুরুর 'চণ্ডালিকা'র এক সুন্দর প্রতিচ্ছবি অভিনয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রকৃতি জননীর মন্ত্রবলে আনন্দকে বাঁধবার মঞ্চনৃত্য।

সবশেষে 'বিউটি কম্পিটিসন'-এ রূপগর্বিতা সুন্দরীদের যৌবনান্তে রূপ-লাবণ্য অন্তর্ধানের চিরন্তন ট্র্যাজিডিতে কৌতুকের চেয়েও বড় হয়েছে করুণ রস। হয়ত সেই জন্যই এমন মর্মস্পর্শী। তবে এ দৃশ্য আরও একটু সংক্ষিপ্ত হলে সর্বাঙ্গসুন্দর হোত।

সর্বশেষে আলো-জ্বলা ও নেভার তালে তালে নৃত্যশিল্পীরা যেন মানবিকসত্তা বিদীর্ণ করে স্বপ্নলোকের মায়াময় রূপ হয়ে উঠেছেন আর তাঁদের অতৃপ্তি, ক্ষোভ, অপূর্ণতা যেন আলোছায়ার রহস্যময়তা অনন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সবটুকু মিলিয়ে যেন একটা হয়ে উঠেছে। এ চিত্রধর্মিতা একান্তভাবে শঙ্করেরই।

সঙ্গীত সৃষ্টিতে সংযম ও মৌলিকতার প্রশংসনীয় নজীর সৃষ্টি করেছেন কমলেশ মিত্র।

ঘোষকের ভূমিকায় কেউ কেউ মোটা দাগের স্পর্শ পেতে পারেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার শঙ্কর কোনো বিশেষ শ্রেণীর জন্য 'শঙ্কর স্কোপ' সৃষ্টি করেননি। বিদগ্ধ রসিক-জনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ আমোদপ্রিয় দর্শকদের কথাও তিনি মনে রেখেছেন। তাই বিচ্ছিন্ন গল্প-গুলির মধ্যে সূত্রযোজনার্থে সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের মত ঘোষকের ব্যবস্থা করেছেন আর রূপ দিয়েছেন কতকটা সার্কাসের জোকারের মত। ইচ্ছে করেই তার মুখে দিয়েছেন অ-পরিশীলিত ইংরাজী শব্দ। অশিক্ষিত সাধারণ লোককে যদি হঠাৎ স্যুট পরিয়ে কোনো নামী লোকের কাজের ব্যবস্থাপক করা যায়, তবে তার হঠাৎ পাওয়া আভিজাত্যবোধের প্রকাশ কত-খানি হাস্যকর হতে পারে, তারই উদাহরণ এই অ্যানাউন্সার।

কোনো বড় গল্প কেন নির্বাচন করলেন না এ কথার উত্তরে শঙ্কর বলেছেন, 'এটা একটা এক্সপেরিমেণ্ট। এক বছর ধরে কোনো বড় শিল্পীকে প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তাই ছোট ছোট গল্প নানান শিল্পী দিয়ে রূপ দিয়েছি। পরে একটা বড় কিছু করার ইচ্ছে আছে।'

শঙ্করস্কোপ অনেকের দিক থেকে অতুলনীয় নিশ্চয়ই, পর্দার মানুষের পোশাকের রঙের সঙ্গে মিশে মঞ্চে বেরিয়ে আসা অথবা মঞ্চের মানুষের পর্দায় মিলিয়ে যাওয়ার লয়, তাল ও মাত্রা সময়ের একচুলও এদিক ওদিক না হওয়ার কড়া নিয়মের ডিসিপ্লিন দেখে অবাক হতে হয়। এখানে শঙ্কর নিয়মকানুনের কড়া শৃঙ্খলাকে তার প্রতিভার পরশপাথর নূপুরনিক্কণে পরিণত করেছেন। শঙ্কর-স্কোপ উদয়শঙ্করের আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা থেকেই উদ্বুদ্ধ। আর এ স্বপ্নকে কার্যকরী করার জন্য ধন্যবাদার্হ রঞ্জিতমল কাংকারিয়া।

যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন—শান্তি বসু, সাধন গুহ, ধূর্জটি সেন, রামগোপাল ভট্টাচার্য, সুনীত বসু, দেবতোষ চক্রবর্তী, লোচন দে, ওঙ্কার মল্লিক, তন্ময় চ্যাটার্জি, কে জি মেনন ও আরও অনেকে।

সঙ্গীত ও গীতিকাব্য—কমলেশ মিত্র ও গৌরীপ্রসন্ন। সজ্জায়—পালি গুহ। চিত্র-রূপে —মহেন্দ্রকুমার। অডিওগ্রাফিতে—সত্যেন চ্যাটার্জি। শিল্প নির্দেশে—অমিতাভ বর্ধন ও আরো অনেকে।

**সুরলতার সঙ্গীত সম্মেলন :** গত ২৫—২৭ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে সুরসপ্তক উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত সম্মেলনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, হিমাংশুগীতি, পল্লীগীতি, ভজন, অতুলপ্রসাদের গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে কান্তি মৈত্র 'মালকোষ' রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান। অপর শিল্পী গৌর বসাক প্রথমে 'হিন্দোলী' রাগে একটি বাংলা খেয়াল ও পরে একটি ঠুংরী পরিবেশন করেন। দুজনের অনুষ্ঠানই বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। বিভিন্ন দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য লঘু সঙ্গীত পরিবেশকদের ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, চিন্ময় চট্টো-পাধ্যায়, রবীন মুখোপাধ্যায়, গৌতম বসু, তুষার ভঞ্জ, সুস্মিতা রায় চৌধুরী, দীপ্তি রায়, মণিদীপা শ্যাম, মমতা ঘোষ, মধুরিমা বসু, শীলা সেনগুপ্ত, শিপ্রা ভট্টাচার্য, মিলা দে শীল, লক্ষ্মী গুপ্ত, শাশ্বতী গুপ্ত, সর্বাণী শ্যাম, উমা কর ও অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌর বসাকের পরিচালনায় সম্মেলক ভজন ও পল্লীগীতি এক উল্লেখ-যোগ্য অনুষ্ঠান। নৃত্যে শান্তা বসুরায় ও শকুন্তলা বসুরায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যন্ত্রসঙ্গীতে ও সঙ্গতে সহযোগিতা করেন স্বপন মুখোপাধ্যায়, সুশীল দে ভৌমিক, কিশোর নন্দী, শম্ভু পাল ও দুলাল ভট্টাচার্য। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন রথীন চৌধুরী ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হরিদাস দত্ত।

সংযুক্তা পাণিগ্রাহী

**সি-এল-টি'র উৎসবে সংযুক্তা পাণি-গ্রাহী :** সি-এল-টি'র পক্ষকালব্যাপী উৎসবের এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল ওড়িষ্যার স্বনামধন্যা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর ওড়িষী নৃত্য।

১৯৫২ সালে নিউ এম্পায়ারে শিশু-শিল্পীরূপে বাংলা দেশে যে সম্ভাবনা রসিকসমাজের আনন্দের কারণ হয়েছিল নতুন বছরের ১লা জানুয়ারী অবনমহলে তারই পল্লবিত পুষ্পিত পরিণতি। নৃত্যরসে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকচিত্তকে উল্লসিত করেছে। অনুষ্ঠান শুরু হয় মঙ্গলাচরণ দিয়ে। সারা মঞ্চে অন্ধকার। মৃদু আ[lllegible] রশ্মি সহসা এসে প্রণত হল জগ[illegible] শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্তির ওপর। তা[illegible] ভৈরবী ভীমপলাশী মালকোষের বি[illegible] রাগাভাসের সঙ্গে সঙ্গে নূপুরনিক্কণ [illegible] ওঠে। ভক্তির আবেগে শ্রীমতী পাণি[illegible] নৃত্যের ভাষায় বাগ্‌দেবী বন্দনা [illegible] মন্দিরের শুচিশান্ত পরিবেশ রচনা [illegible] সঙ্গীতসঙ্গতে ছিলেন একাধারে [illegible] শিল্পসাথী ও জীবনসঙ্গী রঘুনাথ [illegible] গ্রাহী। কণ্ঠমাধুর্য ও রাগসঙ্গীতের স[illegible] সিদ্ধ শিল্পীর গান অন্তর্প্রবাহী রস[illegible] মতই সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর নৃত্যকে [illegible] ও অনুপ্রেরিত করেছে। এরপর [illegible] অঙ্গে কবি ভক্ত বনমালী রচিত [illegible] কাব্যের সঙ্গতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা [illegible] ও জয়দেব প্রমুখ অন্যান্য কবিদের স্বচ্ছন্দ। রামায়ণ ও দশাবতার নৃত[illegible] অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণীয় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় বাৎসল্য চিত্রকল্পরূপ মাধুর্য আকর্ষণীয় অ[illegible] ভাবব্যঞ্জনায় ছড়িয়ে দিয়ে শিল্পী যুগ্মসম্বন্দের বিচিত্র অধ্যায়ে। এখানে ও সঙ্গীতের মধুর কলহ স্বচ্ছন্দ মু[illegible] উঠল। কে, কাকে হারাতে পারে এ[illegible] বিস্ময়কর নৈপুণ্যে অংশগ্রহণ [illegible] রঘুনাথ পাণিগ্রাহী ও সংযুক্তা। স[illegible] মঞ্জীরে রঘুনাথগীত তানের স্বর[illegible] অনুরণন ও সংযুক্তার নৃত্যের বিভি[illegible] তালের জবাবে রঘুনাথের সুরের জাল বোনা—এ দুই-এর কোনটি চিত্তাকর্ষী বলা শক্ত। শুধু এইটুকুই বার মনে হতে লাগল একে অন্যের পূরক—'দুয়ে মিলেই এক' এবং সুষ্ঠু মিলন যুগ্মবন্দের প্রাণকে স্বচ্ছন্দ মিলনেরই সোপানমাত্র। ভারত[illegible] আঙ্গিকের সঙ্গে ওড়িষীনৃত্যের মাধুর্য মিলে রামায়ণের বিভিন্ন চ[illegible] দশাবতারের দশটি রূপ কখনও [illegible] বীরভঙ্গিমায়—কখনও রমণীয় [illegible] মর্মগ্রাহী করে শ্রীমতী পাণিগ্রাহী কাব্যের বিরাট ঐতিহ্যের প্রতি [illegible] সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আটতালি তালি, স্বো-চম্পক ইত্যাদি ও[illegible] ওড়িষ্যার ভাবকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] লয়দক্ষতার এক অসাধারণ উজ্জ[illegible] যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। [illegible] সারল্য লক্ষ্য করবার মতো। রঘুনা[illegible] গ্রাহীর কণ্ঠসঙ্গীত ছাড়া উপকর[illegible] অতি সরল—একটি সেতার, একটি ও একটি তবলা। সারল্য ও সীমিত সুরেই রাগসঙ্গীতের সীমাহীন বিস্তৃত হয়। মালবী, গুর্জরী টো[illegible] পলাশী, কাফি ইত্যাদি রাগের বিস্তারে ওড়িষী গীতিকাব্যের ভা[illegible] পদাবলীর সাদৃশ্যে বাংলা ও মর্মভাবের ঐক্য যেন দুই দেশকে [illegible] দিয়েছে। সমর চট্টোপাধ্যায়, অসি[illegible] অন্যান্য সংগঠকবৃন্দ এ অনুষ্ঠ[illegible] ধন্যবাদার্হ।

সিনেমা অভিনেত্রী হর্ষার পথে সানন্দে অগ্রসর হল, সেদিন রাজ্ব তার বাবার পরিত্যক্ত 'ক্লাউন-জন'-এর মতো নিজেকেও উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত বোধ করল।

রাজ্বর এই জীবন-কথা বিবৃত হয়েছে প্রৌঢ় 'জোকার' রাজ্বর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে সেইদিন, যেদিন প্রৌঢ় রাজ্ব তার প্রিয় সার্কাসে তার জীবনের শেষ খেলা দেখাতে এসেছে। বিখ্যাত 'ক্লাউন' বা 'জোকার' রাজ্ব সেদিন এক হৃৎরোগাক্রান্ত রোগী সেজেছে; অপর ক্লাউনেরা তাকে অপারেশন টেবিলে ফেলে তার নিয়মের অতিরিক্ত বড়ো অর্থাৎ এনলার্জড হার্ট (হৃদয়)-কে শরীর থেকে বার করে তাকে দিয়ে বলল : তোমার হৃদয়টা ক্রমে এত বড়ো হয়ে উঠছে যে, একদিন সারা জগতটাই তোমার হৃদয়ে স্থান পাবে। এটিকে সাবধানে রেখ। কিন্তু অতর্কিতে রাজ্বর হাত থেকে পড়ে গিয়ে রাজ্বর হৃদয়টি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল; আর সেই টুকরোগুলিতে ফুটে উঠল রাজ্বর বাল্যের প্রথম ভালোবাসার পাত্রী, তার সেই বিদ্যালয়-শিক্ষয়িত্রী মেরীর মুখ। অমনই শুরু হল স্মৃতিচারণ। যখন শেষ হল, তখন সেই টুকরোগুলিতে দেখা গেল মীনার মুখ। 'জোকার'-রাজ্ব ভগ্ন-হৃদয়ে এক এক করে তার হৃদয়ের টুকরোগুলোকে তার হাতের বাজতির মধ্যে তুলে নিল এবং বললে দর্শকদের : আমার কাহিনী এখনও শেষ হয়নি, কাহিনী চলতে থাকবে। মাঝে পনেরো মিনিট বা পনেরো মাসের জন্যে বিরতি।

ভগ্নহৃদয় রাজ্বর এই 'সঙ'-এর জীবনী ২৫ রীল দীর্ঘ টেকনিকালার ছবি মারফত প্রায় চারঘণ্টা ধরে দেখানো হয়ে থাকে তিনটি ভাগে। প্রৌঢ় রাজ্বর শেষ খেলা থেকে শুরু করে কিশোর রাজ্বর স্কুল-জীবনের অকস্মাৎ সমাপ্তি পর্যন্ত প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে রাজ্বর সার্কাসে চাকরির চেষ্টা ও ভাগ্যক্রমে চাকরি লাভ, রুশীয় শিল্পী মেরিণার সঙ্গে ভালোবাসা এবং মেরিণার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে রাজ্বর একাকীত্ব। মীনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় থেকে শেষপর্যন্ত তৃতীয় খণ্ড।



শহরটির নাম কলকাতা / পরিচালনা : কনক মুখোপাধ্যায় ফটো : অমৃত

ছবিটিতে রাজকাপুর একাধারে নায়ক, প্রযোজক, পরিচালক ও সম্পাদক। নায়করূপে তিনি করেছেন অনবদ্য অভিনয়; তাঁর মুখে হাসি, চোখে কান্নার তুলনা নেই। প্রযোজকরূপে তিনি বিরাট ছবিটিকে করেছেন সব দিক দিয়ে নিখুঁত ও জাঁকজমকপূর্ণ। অবশ্য একটি খুঁত আছে এবং সেটি হচ্ছে ছবির দৈর্ঘ্য। দ্বিতীয় খণ্ডে মেরিণার স্বদেশ প্রত্যাগমনের পরে ভগ্নহৃদয় 'জোকার'-রাজ্ব যদি সার্কাস-জগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণের পূর্বে তার শেষ খেলার অনুষ্ঠান করত এবং স্মৃতিচারণের শেষে তার ভগ্ন-হৃদয়-খণ্ডে মেরিণার মুখকে ভেসে উঠতে দেখা যেত, তাহলে 'মেরা নাম জোকার' ছবিটি দর্শকদের কাছে হয়ে উঠত একটি অনবদ্যভাবে উপভোগ্য চিত্র।

পরিচালকরূপে রাজকাপুর প্রায় প্রতিটি ভূমিকাকে তাঁর শিক্ষায় যোগ্য মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছেন, অসংখ্য জনতার দৃশ্যগুলিকে আশ্চর্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। এবং সম্পাদকরূপে তিনি এই সুদীর্ঘ ছবিটির গতিকেই শুধু ক্ষিপ্রতা দেননি, সারা ছবির মধ্যে বিভিন্ন রসের উপস্থাপনে একটি আশ্চর্য ভারসাম্য রক্ষা করেছেন।

প্রথম ভাগে শিক্ষয়িত্রী, কিশোর রাজ্ব ও ডেভিডবেশে যথাক্রমে সিমি, ঋষি কাপুর (রাজের ছেলে) ও মনোজকুমার এবং ছেলের দল প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। ছাত্রদের প্রতি—বিশেষ করে কিশোর রাজ্বর প্রতি সহানুভূতিশীল শিক্ষয়িত্রীবেশে সিমির ভাবভঙ্গী আশ্চর্য রকমে ভূমিকার উপযোগী। দ্বিতীয় ভাগে ট্রাপিজ-খেলোয়াড়রূপে ধর্মেন্দ্র, রুশ-অভিনেত্রী কিশ্‌না রাবিয়াস্কিনা, দারা সিং, রাজকাপুর এবং রাজ্বর মা বেশে অচলা সচদেবের সু-অভিনয় মনোমুগ্ধকর। বিশেষ করে রুশ-অভিনেত্রীটি তাঁর সামগ্রিক সুষমায় একটি অনাস্বাদিত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তৃতীয় ভাগে মীনারূপে পদ্মিনী পুরুষ ও নারী, উভয়বেশেই—বিশেষ করে পুরুষবেশে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। চিত্রপ্রযোজক মিঃ কুমার বেশে রাজেন্দ্রকুমার একটি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রথম ভাগে স্কুলের পরিবেশ এবং মধ্যভাগে সার্কাসের পরিবেশ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। সম্মোহনী পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে ছবির সর্বাংশে এবং এর জন্যে সমান কৃতিত্ব দাবী করবেন আলোকচিত্র-পরিচালক রাধু কর্মকার ও শিল্পনির্দেশক এম আর আচরেকার। বিভিন্ন ট্রিক-ফটোগ্রাফীতে বাবুভাই মিস্ত্রী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবির তেরোখানি গানই সুরযোজনা ও গাওয়ার দিক দিয়ে সার্থক।

রাজকাপুরের নবতম সৃষ্টি 'মেরা নাম জোকার' দৈর্ঘ্যদোষে দুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বক্তব্য, অভিনয়, কলাকৌশল ও সর্বাঙ্গীণ বিরাটত্বের দিক দিয়ে ভারতের চলচ্চিত্রেতিহাসে একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।

—নান্দীকর

# স্টুডিও থেকে

দুজন তরুণ পরিচালকের কথা মনে পড়ছে। একজন অশোক দাস, যিনি এখন 'শবরী' নামে একখানি ছবির কাজে ব্যস্ত। অপরজন সুশীল মুখাজী, যিনি 'মেঘ কালো' ছবিখানি করেছিলেন। আপাততঃ নীরব তিনি। তবে 'আমি সিরাজের বেগম' নামে নতুন একখানি ছবি শুরু করবেন শুনছি।

অশোক দাসের 'শবরী'র কাজ ইতিমধ্যে অনেকটা হয়ে গেছে, কিছুদিন আগে ইলাম বাজারে আউটডোরের কাজও ক'রে এসেছেন। এ ছবির প্রধান শিল্পীরা হলেন অনুপ কুমার, বিদ্যা রাও, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ প্রমুখ।

ইনডোর আউটডোর সব মিলিয়ে এখন বাংলা নির্মীয়মাণ ছবির সংখ্যা বেশ আশাপ্রদ বলা যায়। গত সপ্তাহেই বহু ছবির কাজ হয়েছে। যেমন এন-টির এক নম্বরে পীযূষ বসুর 'জীবন জিজ্ঞাসা' (শিল্পী ছিলেন মণ্টু ব্যানার্জী, সুনন্দা দাশগুপ্তা ও উত্তমকুমার) এখনও চলছে। এন-টির দু নম্বরে সলিল সেনের 'অপর্ণা' (সেট শিল্পী ছিলেন জহর রায়, অরুণ মুখার্জী ও সৌমিত্র চ্যাটার্জী), ক্যালকাটা মুভিটোনে শচীন অধিকারীর 'রৌদ্রছায়া', টেকনিসিয়ানে বিশ্বজিৎ প্রযোজিত অজয় বিশ্বাসের 'জীবন প্রভাত' (নায়িকা সন্ধ্যা রায়) ইত্যাদি।

সাঁইথিয়ার আউটডোরে কাজ হচ্ছে গুরু বাগচীর 'ছন্দ পতন' (অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে আছেন নন্দিনী মালিয়া, অনিল চ্যাটার্জী, শমিত ভঞ্জ, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতি) ছবির; পরিচালক তরুণ মজুমদার 'নিমন্ত্রণ' ছবির আউটডোর করতে গিয়েছেন তোপচাঁচি। পরিচালক অরবিন্দবাবু কলকাতার অলিগলিতে কিছু দৃশ্য গ্রহণ করেছেন 'ধনি্য মেয়ে' ছবির জন্য (এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন জয়া-ভাদুড়ী, তপেন চট্টোপাধ্যায় ও উত্তম-কুমার প্রমুখ)। পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর নতুন ছবি 'স্ত্রীর পত্র' ছবির কাজ করেছেন বেলগাছিয়ায় একটি বাড়ীতে। এ ছবির প্রধান ক'জন শিল্পী হলেন মাধবী চক্রবর্তী, রাজেশ্বরী রায় চৌধুরী, শ্যামল ঘোষ প্রভৃতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ বাজার একবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। গত বছরে অনেক গোলযোগের মধ্যেও ছাব্বিশখানা ছবি মুক্তি পেয়েছে। অনেক ছবিই ব্যবসায়িক দিক থেকে সাফল্যলাভ করেছে। আর প্রতিমাসেই একটা না একটা নতুন ছবির খবর কানে আসছে। এ খবর বাংলা ছবির মত ছোটো ব্যবসার ক্ষেত্রে কম আশাপ্রদ নয়।

সাহা ফিল্মস নামে এক নবগঠিত চিত্র-প্রযোজক সংস্থা তাঁদের প্রথম প্রয়াস হিরণাভ সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে "অর্চণা"-র প্রাথমিক কাজ শেষ করেছেন।

আসামী মন / মিতা চৌধুরী এবং শিবানী বোস

সুখেন দাসের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন— পীযূষ গাঙ্গুলী ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন—অজয় দাস।

বিভিন্ন চরিত্রে এপর্যন্ত যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে—মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, তরুণ কুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জী, সুখেন দাস, শ্যামল ঘোষাল ও সুধীর সাহার নাম উল্লেখযোগ্য। ছবির চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন—এ কে রেজা, রমেশ যোশী ও রবি চ্যাটার্জী।

খবরে প্রকাশ, এ মাসের মাঝামাঝি সংশিলষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলী বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য ভুটানের শাসচো অঞ্চলে রওনা হবেন।

# মঞ্চাভিনয়

**'অন্তরাগ'** : পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রমোদ সংস্থা, চন্দননগরের সদস্যরা গত ২১ ডিসেম্বর রঙমহলে তিনকড়ি ঘোষ রচিত 'অন্তরাগ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। দলগত অভিনয় প্রশংসার যোগ্য। স্বতন্ত্রভাবে যাঁরা সুঅভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সর্বশ্রী অসীম দে, সুনীল চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ মিত্র, রবি ঘোষ, পীযূষ ঘোষ, রবীন রক্ষিত, রবী মুখাজী, স্বপন চৌধুরী ও অধীর সরকার, অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রে যথাযথ রূপ দেন সর্বশ্রী বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, মণি মৌলিক, মণীন্দ্র দাশ, দীপক বসু, রঞ্জিত গুহ, সুনীল ঘোষ রামনাথ উপাধ্যায়, মনোজিৎ বিশ্বাস ও গৌরগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্ত্রী চরিত্রে সুঅভিনয় করেন শ্রীমতী মায়া রায় ও তৃপ্তি দাশ। নাট্য নির্দেশনার কৃতিত্ব শ্রীপান্নালাল চট্টোপাধ্যায়ের।

**স্বিবর্ণ** : নাগপুর সিভিল লাইনস গভর্ণমেন্ট কলোনীর সৌখীন অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ কর্তৃক মন্টু গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'স্বি-বর্ণ' নাটকখানি অভিনীত হয়। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন শ্রীমতী রেবা সিনহা, সর্বশ্রী রমেন সিনহা, রঞ্জন দাশ, অজয় সরকার, দুর্জয় অধিকারী, হৃষিকেশ ব্যানার্জী, কাজল দত্ত, আশিষ সিনহা, অপরেশ মজুমদার, দেবী ভট্টাচার্য, চন্ডী চ্যাটার্জী, প্রকাশ দাশ ও রামদাস বাসু রায়চৌধুরী।

**ডেবসনস্ রিক্রিয়েশন ইউনিট** : ডেবসনস্ রিক্রিয়েশন ইউনিটের শিল্পীরা সম্প্রতি সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটক মঞ্চস্থ করে অন্যান্য বছরের মতো এবারেও বলিষ্ঠ দলগত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটির নিরবচ্ছিন্ন গতিবেগ অটুট রাখার ব্যাপারে নির্দেশক সত্যেন গঙ্গোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রয়াস প্রশংসার দাবী রাখে।

'সাজাহান' চরিত্রে সার্থকভাবে রূপদান করেছেন সুধেন্দু রায়; অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্লান্ত

পবিত্র সেন পরিচালিত রাজঘরের 'সুখের পায়রা' নাটকের একটি দৃশ্যে আলোয় বাঁদিক থেকে: কালীপদ চক্রবর্তী, শান্তিগোপাল এবং গোপাল সিংহরায়।

কয়েকটি অন্তর্দীপ্ত মুহূর্তে শিল্পীর অভিব্যক্তি হয়েছে অনবদ্য। ভাগ্যের বিপর্যয়ে পরিক্লান্ত দারাকে প্রাণময়তার আলোয় দর্শকের সামনে উপস্থিত করেছেন সৌরেন নাগ। সুজিত সেনের 'ঔরংজীব'ও হয়েছে একটি সংযত চরিত্রচিত্রণ। হিমানী গাঙ্গুলীর 'জাহানারা' ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিতে হয়েছে সপ্রতিভ; প্রতিমা পাল 'পিয়ারা'র ভূমিকায় সাবলীলতাকেই উজাড় করে দিয়েছেন। দিলদার চরিত্রে অনিল সিং-এর অভিনয়ও হয়েছে সংযত ও সাবলীল। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন বিজয় ভট্টাচার্য, অজয় ব্যানার্জি, মনবেন্দ্র চক্রবর্তী, বিষ্টু মিত্র, পার্থ বোস, আশিষ মুখার্জি, মদন ভাণ্ডারী, নিমাই চ্যাটার্জি, গৌরীপ্রসাদ দাস, বীরেন গুহ, রঞ্জিত দাস, কুমারী মুক্তি পাল, তপেন সেন, খগেন্দ্রপ্রসাদ রায়, অমূল্য নাথ, হেমরাজ ভরদ্বাজ, চন্দ্রাণী ব্যানার্জি, রঞ্জনা রায়।

**ব্যাটের নতুন নাটক ককটেল :** পালকী থেকে অসমাপ্ত মেল ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ বিহার আর্ট থিয়েটার, যে সংস্থা আজ নাট্যজগতে ব্যাট্ নামে সুপরিচিত, পর পর আধুনিক জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে দশটি নতুন নাটক হিন্দী ও বাংলাভাষায় জনসাধারণকে উপহার দিয়েছেন, তাঁদের আগামী নাটক 'ককটেল্'। নাটকটি লিখেছেন বিহার আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়। আজকের যুবসমাজের যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ তারই পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'ককটেল' নাটক। আগামী বছরের প্রারম্ভেই নাটকটি পাটনাতে মঞ্চস্থ হবে এবং এপ্রিল মাসের ১৬ থেকে ১৮ দিল্লীর ফাইন আর্টস থিয়েটারে অভিনীত হবে।

**অখিল বিহার নাট্য সম্মেলন :** আসছে ফেব্রুয়ারী মাসের ২৫শে থেকে দশম বিশ্বনাট্য দিবস—২৭শে মার্চ বিহার আর্ট থিয়েটারের তত্ত্বাবধানে এক অখিল ভারত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা এবং নাট্য সমারোহ অনুষ্ঠিত হবে। বিহার রাজ্যের চারটি ডিভিসনাল শহর যথা পাটনা, মজঃফরপুর, ভাগলপুর ও রাঁচীতে প্রথমতঃ আটটি করে নাটক অর্থাৎ সবশুদ্ধ বত্রিশটি নাটক প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত হবে। নাটকগুলি ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত যে-কোনও ভাষায় এবং বিহারের জনপ্রিয় উপভাষা যথা ভোজপুরী, মৈথিলী, মগহীতে অভিনীত হতে পারে। ডিভিসনাল শহরগুলি থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি করে নাটক রাজ্য সম্মেলনের জন্য মনোনীত হবে এবং ২০শে মার্চ থেকে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত এই আটটি নাটক পাটনা শহরে অভিনীত হবার পর নয়টি পুরস্কার দেওয়া হবে—শ্রেষ্ঠ নাটক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ মঞ্চপ্রয়োগ ও শ্রেষ্ঠ আলোকসম্পাত। এছাড়া অনেকগুলি বিশেষ পুরস্কার ও মেরিট সার্টিফিকেট সুযোগ্য নাট্যকর্মীদের দেওয়া হবে।



বিহারের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে প্রবেশপত্র নেওয়া হবে এবং ৩১শে জানুয়ারী [...] বত্রিশটি নাটক মনোনীত হবে, তাদের না[ম] ঘোষণা করা হবে। এই নাট্য-প্রতিযোগিতা[র] কর্মসূচী এইরকম : ভাগলপুর—২৫[শে] ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ঠা মার্চ, রাঁচী—২৮[শে] ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ই মার্চ, পাটনা ও মজ[ঃ]ফরপুর—২রা থেকে ১০ই মার্চ এবং রা[জ্য] প্রতিযোগিতা পাটনাতে ২০শে থেকে ২৭[শে] মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। দশম বিশ্বনাট্য দিব[সে] একটি বিরাট থিয়েটার কর্মীদের আলোচ[না] সভা (সেমিনার) হবে।

**বাঘেল :** জ্যোতু ব্যানার্জির 'বা[...] নাটকটি সম্প্রতি ব্যারাকপুরে অভিন[ীত] হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেছি[লেন] 'মন্দিরা শিল্পীদল'। জ্যোতি মুখা[র্জির] পরিচালনায় নাটকটির বিভিন্ন ভূমি[কায়] অংশ নেন পতিত মুখার্জি, বেলা সর[কার,] জ্যোতি মুখার্জি, চন্দন তপাদার, ম[...] নাগ, স্বপ্না মুখার্জি, সুনীল বসু, শ[...] ভৌমিক, খোকন রায়, অনিল পাল, শৈ[...] সেন, তারক দাস।

**ফাঁস অভিনয় :** গত ২৯ নভে[ম্বর] বিশ্বরূপা মঞ্চে বেঙ্গল সার্ভিস সোসাই[টির] প্রযোজনায় শৈলেশ গুহনিয়োগীর [...] নাটকটির অভিনয় করলেন উত্তর ক[লি]কাতার বিখ্যাত নাট্যসংস্থা যাঁ[রা] নাটকটির পরিবেশনায় ও অভিনয়[ে] এদিন প্রতিটি দর্শকমন জয় করে[ন।] নাটকটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা [করেন] সুনীতকুমার দাস। তাঁর ডেপুটির ভূমি[কায়] অভিনয়ও একটি অনন্য অভিনয় স[...] দমফাটা এই হাসির নাটকটির মধ্যে [...] অনায়াসে হাসাতে সক্ষম হয়েছিলেন, [...] হলেন—কিশোর প্রামাণিক, বাসুদেব [...] দীপক ব্যানার্জি, জয়দেব ঘোষ, কে[...] পূর্ণচন্দ্র শীল, দীপক ব্যানার্জি, [...] চ্যাটার্জি, অজিত ঘোষ, নীলু দাশ[...] গোপালচন্দ্র ছড়, শিপ্রা সাহা ও [...] ব্যানার্জি।

কোলকাতায় যে সকল সংস্থা নি[য়মিত] নাট্য প্রযোজনা করে থাকে, পাভলভ ই[ন্স]টিটিউট নাট্য সংস্থা তার অন্যতম[।] সংস্থার বৈশিষ্ট্য শুধু মৌলিক [নাটক] মঞ্চস্থ করাই নয়, সেই নাটকের বিষ[য়ের] মাধ্যমে মনস্তত্ত্বের বিশেষ একটি তত্ত্বকে [জন]মানসের সামনে তুলে ধরা। অ[...] মানুষের রক্তক্ষয়ী যন্ত্রণা এক নতুন [...] জন্ম সূচিত করছে। সেইদিন [...] যেদিন মানুষ প্রযুক্তিগত বিপ্লবের [...] অনায়াসে দৈব প্রয়োজন মিটিয়ে [...] লোকের ঐশ্বর্য সন্ধানে ব্যাপৃত [...] মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, [...] নারীতে মহত্তর সম্পর্ক স্থাপিত হবে[।] মুক্তজানের কাব্য, সেই যুগ-যন্ত্রণার রচনাতে এই নাট্য সংস্থার সমস্ত নিবন্ধ। ১৯৫৮ সালে এই সংস্থার নাটক 'সম্রাট' মঞ্চস্থ হবার পর

নাট্যরসিক নয়, বিভিন্ন মহলে সাড়া যায়। সেই থেকে গেল বারো বছরে ়ি, 'মরুঝঞ্ঝা', 'যুগান্তর', 'একটি স্ত্রী ' 'শিলাকমল', 'অপারেশন ফাউন্টাস' াষপাদ নাটক' বহুবার মঞ্চস্থ হয়। মিক', 'অনন্বয়', 'নাটক ও ভূমিকা', ন সরণী', 'কসম' ইত্যাদি নাটকগুলি শিত হলেও এখনও মঞ্চস্থ হয় নি। নীত ও প্রকাশিত নাটকগুলি যথেষ্ট মাদর লাভ করেছে। নাটকে যেমন শিল্পী অংশ নিয়েছেন, তেমনি র্ণ নবাগতও মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। র এবং রোগী, ছাত্র এবং অফিসকর্মী নির্ভরতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। আসচে ২৩ ও ২৪ জানুয়ারী, ১৯৭১ রূপা মঞ্চে সকাল দশটায় এঁরা 'মরু- ' ও 'কল্মাষপাদ নাটক' দুটি মঞ্চস্থ েন যুগজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে।

# বিবিধ সংবাদ

**টি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান :**

হরনাথ হাইস্কুলে সম্প্রতি রম্য ও ন্দমুখর পরিবেশে বাগবাজার সার্ব- নী দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী আয়োজিত ক রূপন' পুরস্কার-বিতরণী উৎসব ষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমোহিরলাল গুলী। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীসুহৃদ- পাল দত্ত উপস্থিত সকলকে স্বাগত ষণ জানিয়ে বলেন আমি কখনও াপড়া খেলা-ধুলো কিম্বা ভাগ্য ক্ষায় কেন পুরস্কার পাইনি। তবুও স্কার বিতরণ-সভায় আমি উপস্থিত তে খুব উৎসাহ বোধ করি এই কারণে যাঁরা পুরস্কার গ্রহণের জন্য আসেন দের সান্নিধ্য আমাকে খুব আনন্দ । সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅধীর চ্যাটার্জি স্থিত অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করেন।

পুরস্কার গ্রহণের জন্য কলকাতা ও হুগলীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতি- গীরা এসে পুরস্কার গ্রহণের সঙ্গে টি স্নিগ্ধ মধুর সন্ধ্যার যাঁরা শরিক তাঁদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন নিয়ে সভাপতি শ্রীগাঙ্গুলী এই সদিচ্ছাই করেন যে শান্ত সুন্দর একটি সন্ধ্যার তি ও রম্য পরিবেশ উপস্থিত সকলের ধ্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় ও জোরদার র বাংলার সামাজিক জীবনের আলোক- র্তকার কাজ করবে।

**মেরিকার নীরব চলচ্চিত্র :**

গেল ২১ ডিসেম্বর থেকে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেণ্টারে এবং ২৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ৬ জানুয়ারী পর্যন্ত ভবানীপুরের সরলাবালা মেমোরিয়াল হলে আমেরিকার নীরব যুগের যেসব চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছে ,তাতে ১৯১১ থেকে ১৯২৯-এর ভিতর তোলা প্রায় পঁচিশখানি ছবি আছে। এদের মধ্যে যেমন ব্রঙ্কো বিলির 'ওয়েস্টার্ণ' বা 'ম্যাকসেনেট'-এর ছবি স্থান পেয়েছে, তেমনই আছে চ্যাপলিনের ছোট ছোট তিনখানি ছবি, ১৯১৬-তে তোলা 'টোয়েণ্টি থাউজাণ্ড লীগস্ আণ্ডার সী', রুডলফ ভ্যালেণ্টিনো অভিনীত 'ব্লাড অ্যাণ্ড স্যাণ্ড' (১৯২২), 'ফোর হর্সমেন অব দি অ্যাপোক্যালিপস্' লন চ্যানী অভিনীত 'দি আনহোলি থ্রী', বাস্টার কীটনের 'জেনারেল', লরেল হার্ডির ছবি, এফ ডবলু মুরণোর 'সানরাইজ', গ্রেটা গার্বো অভিনীত 'ফ্লেশ অ্যাণ্ড দি ডেভিল' এবং লিলিয়ান গীস্ অভিনীত 'দি উইণ্ড'। এই আমে- রিকান ছবিগুলির সঙ্গে ভারতের প্রথম পূর্ণ দীর্ঘ ছবির পরিচালক ডি জি ফালকের কিছু ছবির অংশ এবং হিমাংশু রায়ের নেতৃত্বে তোলা 'লাইট অব এশিয়া' এবং 'এ থ্রো অব ডাইস' দেখানোর ব্যবস্থা করে ব্যবস্থাপকেরা বহু দর্শকের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। আমরা এই দীর্ঘ প্রদর্শনী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করব বারান্তরে।

আসচে নতুন বছরের ১৭ জানুয়ারী, রবিবার রবীন্দ্রসদনে প্রবীণ ও নবীন শিল্পীর সমন্বয়ে একটি ভারতীয় সম্মেলক যন্ত্রসঙ্গীতের (ইণ্ডিয়ান অর্কেস্ট্রা) আসর বসছে। এই সম্মেলক যন্ত্রসঙ্গীতের পরি- চালনা করবেন যুগ্মভাবে প্রবীণ স্বরোদী ও সঙ্গীতপরিচালক তিমিরবরণ এবং নবীন শিল্পী ভাস্কর মিত্র।

**রবীন্দ্রসদনে একাঙ্কিকা নাট্য উৎসব**

গেল ২৫, ২৬, ২৭, ২৯ ও ৩১ ডিসেম্বর পাঁচ দিন ধরে একটি একাঙ্কিকা নাটকের প্রতিযোগিতা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রসদনের কর্তৃপক্ষ— সুসংবাদ গেল হপ্তাতেই দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন তিনটি করে পাঁচদিনে পনেরোটি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে- ছিলেন। বিচারকরূপে ছিলেন সর্বশ্রী ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত ঘোষ, পশু- পতি চট্টোপাধ্যায়, বীরু মুখোপাধ্যায় এবং সজল সেন। প্রযোজক, পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরূপে যাঁরা শ্রেষ্ঠ- রূপে বিবেচিত হয়েছেন, তাঁদের নাম ঘোষিত ও তাঁরা পুরস্কৃত হবেন ১৭ জানুয়ারী রবীন্দ্রসদনে 'ভারতীয় সম্মেলক যন্ত্রসংগীত' অনুষ্ঠানের আসরে।

শিশু রংমহলের বিশ বর্ষ পূর্তির উৎসবটি এবারকার প্রাণহীন আনন্দহীন কলকাতায় একটি মরুদ্যানের মতো। শীতের কলকাতাতে অন্যান্য বছর বহু আনন্দানু- ষ্ঠান হয়। এবার পার্ক স্ট্রীটের হল্লা ছাড়া উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতা ঝিমিয়ে আছে—একটি স্থান ছাড়া। গড়িয়াহাট পোলের বাঁ পাশের অবনমহল গমগম করছে ছোট—বড়-বুড়োদের আগমনে। পুতুলনাচ, নৃত্যনাট্য, যাত্রা, অভিনয় সব মিলিয়ে এখানকার দিনগুলি একটার পর একটা হাল্কা পাখীর মত উড়ে যাচ্ছে। একটি ছোট মেলা আছে উৎসবের অঙ্গ হিসেবে। কেনা-বেচা কিছু কিছু হচ্ছে—নাগরদোলা ও মেরী গো রাউণ্ড চলছে।

সার্থক হয়েছে এ-উৎসব। প্রতি সন্ধ্যায় উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে সি এল টি প্রাঙ্গণ। রামায়ণ, অবনপটুয়া, সাত ভাই চম্পা, জিজো—সবকটি নৃত্যাভিনয় সর্বাঙ্গ- সুন্দর হয়ে উঠেছে। শিশু রংমহলের সুহৃদ সদ্য পরলোকগত নারায়ণ গঙ্গো- পাধ্যায়ের লেখা যাত্রার আসরে ভীম বধ, মন্মথ রায়ের কানুর বাঁশি, নবপর্যায়ে রামায়ণ, অবনপটুয়া প্রেক্ষাগৃহে বহু দর্শককে আনন্দ দিয়েছে।

ছোটদের ছড়ানৃত্যগুলি সুন্দর হয়েছে। এই হাতেখড়ি থেকেই এদের উত্তরকালের নৃত্যপটিয়সীরা আসবে।

অবনমহলের নিজস্ব একটি রূপ আছে। প্রতি ঘরে ঘরে মহড়া দেবার সমবেত ধ্বনি বাংলাদেশের একটি নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক। কোন ঘরে কথাকলি, কোথাও কত্থক, কোথাও অভিনয় চলছে একই সময়ে। এতো আনন্দধ্বনি আর কোন দেশে হয় বলে জানিনে।

বিশ বর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানটিও সুন্দর সহজভাবে করা হয়েছে। পুতুলনাচ সম্বন্ধে আলোচনাতে আসছেন রঘুনাথ গোস্বামী, শৈল চক্রবর্তী প্রমুখ স্রষ্টারা, থিয়েটার সেমিনারে আছেন, মন্মথবাবু, ক্ষিতীনবাবু, অজিত বসু, প্রেমেনবাবুরা, তার সঙ্গে নবীনের দল—সমীর চট্টো, শৈলেন ঘোষ। ছোটদের ফিল্ম সম্বন্ধে একটি আলোচনা- চক্রে আছেন মৃণালবাবু, পশুপতি চট্টো- পাধ্যায়, শান্তি চৌধুরী। সর্বভারতীয় পাপেট ফেস্টিভালে আছেন আরো অনেক গুণিজন। ছোটদের সর্বভারতীয় একটি সঙ্গীত প্রতিয়োগিতার' ব্যবস্থাও করেছেন একটি বিশেষ কমিটি—এতে আছেন জ্ঞান- প্রকাশ ঘোষ, রাধিকামোহন মৈত্র, বিমান ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, এ সি সেন এবং আরো অনেকে।

ভাবীকালের কলাকার সৃষ্টি শিশু রংমহলের একটি মাত্র উদ্দেশ্য নয়। সে কলাকার তো আসবেই কিন্তু শিশুকালের পরিপূর্ণ আনন্দটি দেবার একটি অসাধারণ উৎস কলকাতার ও বাংলার শিশু রংমহল।

দ্রুত পদক্ষেপ আর অনুপম
আরাম—এই অভিপ্রায়ে বাটার খেলার জুতোর
বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করুন। কুশন আর্চ ও ইনসোল আকস্মিক আঘাত থেকে রক্ষা করে। ক্ষয়শীল
সন্ধিস্থলে টেকসই বন্ধনী। ভারী বাম্পার টোগার্ড। ঢালাই সোল আর হিল এমন
কৌশলে তৈরি যা পারতপক্ষে হড়কাবে না। সব মিলিয়ে
আশ্চর্য সমাবেশ।

Bata

# খেলার কথা

## ক্রিকেটে একটি বছর

শঙ্করবিজয় মিত্র

কালের মহাযাত্রায় আর একটি বছর াপ্তির মুখে। স্বভাবতঃই আমাদের ীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের একটা হিসেব-কেশ করতে ইচ্ছে হয়। দৈহিক ও মান-ক স্তরে আমাদের কতটা অগ্রগতি হল, জানা দরকার বৈকি। তবে মানসিক ক্ষেত্রে জ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি তাতে এ সেব মোটেই সুখপ্রদ হবে না, উল্টে ৎকম্প উপস্থিত হতে পারে। দৈহিক মর্থ্যের হিসেব নিতে গেলে ক্রীড়াক্ষেত্রে রতের কৃতিত্বের কথা আসে। এ কৃতিত্বের াক্ষর কি খুব উজ্জ্বল? দলগত ক্রীড়া-- কি, ফুটবল, বাস্কেটবল বা ক্রিকেটে রতীয় খেলোয়াড়েরা দেশের মান কি চুতে তুলে ধরতে পেরেছেন? ব্যক্তিগত ফল্যে টেনিস বা ব্যাডমিন্টন কি ভারতের রব বৃদ্ধি করেছে? এ্যাথলেটিকসের না বিভাগে আমরা কটা সাফল্যের নজীরে ব প্রতিযোগিতার যোগ্য ফল দেখাতে রেছি?

ভারতবর্ষকে একটা উপমহাদেশ বলা য়। লোক সংখ্যার দিক থেকে সম্ভবতঃ ীনের পরই ভারতের স্থান। প্রায় বাহান্ন কাটি মানুষের বাসভূমি ভারতবর্ষে তেইশ ছরের স্বাধীনতায় কতটুকুই এগোতে পেরেছি আমরা? শম্বুকের মত অগ্রগতির তি মন্থর। জাঁক করে বলবার মত পাথেয়ও আমাদের নেই। হকিতে দীর্ঘদিনের যে গারবময় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তা হস্ত-চ্যুত হয়েছে, খেলার মান বিশ্বের দেশে দেশে যভাবে দ্রুত উন্নত হচ্ছে ভারত তার সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে পেছিয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, এগোবার বা উন্নতি করার করোখা প্রয়াসও আমাদের নেই। হতমান লে যে সংকল্প ও দৃঢ়তা প্রয়োজন হয়, ম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য আসলে আমাদের জাতীয় চরিত্র থেকে সে দৃঢ়তা ও সংকল্প-ন্যতা তিরোহিত হয়েছে। সবই যেন করতে য় করে যাচ্ছি, চলতে হয় চলছি। শুধু তাই নয় পরস্পরকে সাহায্য করার মনোভাব নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিভা বিকাশের জন্য জাতির প্রতিটি সদস্যের যেভাবে সহানুভূতি ও সহযোগিতা দিয়ে তাকে এগিয়ে দিতে হয়, সেভাবে পথ করে দিতে কেউ যেন রাজী নয়। অথচ সাহায্য ও অনুকূল পরিবেশ পেলে অনেক অনেক কৃতী সন্তান আন্ত-র্জাতিক মানে উন্নীত হয়ে ভারতের মুখো-জ্জ্বল করতে পারত।

ক্রিকেটের কথাই ধরা যাক। ভারতে ক্রিকেট এসেছে উনবিংশ শতাব্দীতে। দেশে-বিদেশে বহু প্রতিযোগিতাতেই ভারত অবতীর্ণ হয়েছে। অনেক প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড় দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন ও ক্রীড়াকৃতির অনন্যসাধারণ নজীর রেখেছেন। তবে এ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সাফল্যের ঊর্ধ্বে আর কতটুকু আমরা যেতে পেরেছি। দলগত বিচারে ভারত আন্তর্জাতিক আসরে এমন কোন স্থান করতে পারেনি যাকে গৌরবের বলা যেতে পারে। ভারতের রণজিৎ সিং, দলীপ সিং, সি কে নাইডু, মহম্মদ নিসার, অমর সিং, লালা অমরনাথ, মুস্তাক আলি, বিজয় মার্চেন্ট, ন্যাভলে বিজয় হাজারে, সুঁটে ব্যানার্জি, পলি উমড়িগড়, ভিনু মাকড়, সুভাষ গুপ্তে প্রভৃতির ন্যায় বহু দক্ষ খেলোয়াড় যে কোন দেশের গৌরবের স্থল। এছাড়াও এমন বহু ক্রিকেটার জন্মেছেন যাঁদের প্রতিভা সম্যকভাবে কাজে লাগাতে পারলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার তালিকায় ভারতের নাম জ্বল জ্বল করত। কিন্তু তা হয়নি এবং কেন হয়নি আজ সাধারণ ক্রীড়ামোদীর প্রশ্ন তাই। দেশে প্রতিভার অভাব নেই, কিন্তু তার যোগ্য সমাদর হয় না। দেশের স্বার্থের ও মান-মর্যাদার কথা চিন্তা করে আন্ত-র্জাতিক প্রতিযোগিতার সময় যোগ্য দল গঠন করা হয় না। যার ফলে আমরা উপযুক্ত ফলাফল দেখাতে পারি না।

এরই মাঝে যে বছর অতিক্রম করে আমরা এসেছি সে বছরে ক্রীড়াকৃতির দিক দিয়ে আশার আলোর ঝলক যেন এসে পড়েছে। বেশ কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় তাদের প্রতিভার দীপ্তিতে আমাদের সঞ্জীবিত করেছেন। ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে দুজন অলরাউণ্ডার আমাদের আশা জাগিয়েছেন—তাঁরা হলেন একনাথ সোলকার, অশোক মানকড় ও ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে এস এস নায়েক ও সি চৌহান। বোলার হিসাবে বাংলার মিডিয়াম পেস বোলার সুব্রত গুহ ও ন্যাটা স্পিনার দিলীপ দোসী। বোম্বাই থেকে আর একজন মিডিয়াম বোলার এ এম পাইও বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। রণজি ক্রিকেট ও দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতাগুলি এই সব তরুণ খেলোয়াড়দের সাফল্যের চিহ্নে উজ্জ্বল। ১৯৬৯-৭০ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড থেকে যে দুটি দল ভারতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, এই সব তরুণ খেলোয়াড়েরা সেই সব খেলাতে নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলে আসন করে নিতে সমর্থ হন।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতায় দেখা যাচ্ছে যে, বোম্বাই এখনও সকলের ঊর্ধ্বে তাদের নাম চিহ্নিত করার ক্ষমতা রাখে। রণজি ট্রফিটি তারা পর পর এগার-বার জয় করে এবং ১৯৩৪ এই প্রতিযোগিতা সুরুর সময় থেকে বোম্বাই কুড়ি-বার এতে বিজয়ী হয়। কিন্তু এবার এই জয়ের জন্যে তাদের প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। প্রতিযোগিতায় তারা যে কটি ম্যাচ খেলেছে তাতে একমাত্র সৌরাষ্ট্র ছাড়া আর কোন খেলায় সরাসরি বিজয়ী হতে পারে নি। পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভ করে বোম্বাই রণজি ট্রফির নিয়মানুযায়ী নক-আউট প্রতিযোগিতায় আসে। গুজরাটের বিরুদ্ধে তারা পয়েণ্টে জয়ী হয় এবং সেমিফাইনালে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ও ফাইনালে বাংলার বিরুদ্ধে তারা প্রথম ইনিংসের খেলায় এগিয়ে থাকার দরুণ বিজয়ী হতে সক্ষম হয়।

বাংলা রণজি প্রতিযোগিতায় এবার ভাল ফল দেখিয়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সালের পর এবারই তারা রণজি ফাইনালে উঠেছে। অম্বর রায়ের যোগ্য নেতৃত্বে বাংলা দল যেভাবে খেলেছে, তাতে তাদের জয়ী হবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ক্রিকেটে ক্যাচ ছাড়লে ম্যাচ ছাড়তে হয়। বাংলাকেও তারই খেসারৎ দিতে হয়েছে।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়নসিপ প্রতিযোগিতায় পশ্চিমাঞ্চল দল এবার দলীপ ট্রফি পেয়েছে। হায়দরাবাদে দক্ষিণাঞ্চলকে পরাজিত করে পশ্চিমাঞ্চল দল তিন বছর পর এই চ্যাম্পিয়ানসিপ পুনরায় উদ্ধার করেছে। হায়দরাবাদের এই খেলায় পশ্চিমাঞ্চলের তরুণ খেলোয়াড়েরা তাদের কৃতিত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন রাখে—ব্যাটিং-এ চৌহান ও বোলিংএ অজিত পাই সকলকে পরিতৃপ্ত করে। চৌহান এই খেলায় একটি সুন্দর সেঞ্চুরী করার ও পাই দক্ষিণাঞ্চলের ছ'জন ব্যাটসম্যানকে আউট করার গৌরব অর্জন করে।

১৯৬৮-৬৯ সালের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হলে বোম্বাই তথা ভারতের অন্যতম পেস বোলার আর বি দেশাই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই ক্ষুদে পেস-বোলার প্রায় দশ বছর ধরে ভারতীয় দলের সম্পদরূপে পরিগণিত ছিলেন। ১৯৫৮-৫৯

সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যখন ভারত পর্যটনে আসে, তখন রুসে দেশাই-এর আবির্ভাব ঘটে এবং সেই থেকে পেস বোলিংএ তিনি একজন নির্ভরশীল বোল্লার হয়েছিলেন।

দেশাই-এর কথায় আমাদের দেশে পেস বোলারের অভাবের কথা এসে পড়ে। কিন্তু এই অভাবটা খাঁটি না মেকি বুঝা কঠিন। এই ভারতের মাটিতে প্রবল প্রতাপ ব্যাটসম্যান বা দুরন্ত বোলার জন্মেছে যাদের কৃতিত্বের ও দাপটের বহু স্মৃতি ক্রীড়ানুরাগীরা এখনও সযত্নে বহন করে চলেছেন। কিন্তু ক্রিকেট কর্তাদের সুনজরে আসতে না পারলে বা তাঁদের মন জুগিয়ে চলতে না পারলে যে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে সুঁটে ব্যানার্জি তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সেই সময় থেকে প্রকৃত পেস বোলারের অভাব সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু কোন প্রতিকার হয়নি। একদিকে পেস বোলারের অভাবে এবং সেই অভাবের ভয়ে প্রাণহীন (নিষ্প্রাণ) উইকেট তৈরী করে ভারতের ক্রিকেটকে ক্রমশঃ পঙ্গু করে তুলেছে। আশ্চর্যের কথা এতবড় বিরাট দেশে পেস বোলার পাওয়া যায় না। অথচ এই রহস্যের মূল উদ্ঘাটনে কারুকে এগিয়ে আসতেও দেখা গেল না।

প্রত্যেক দেশেই ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটা উন্নতি বা অবনতির যুগ দেখা যায়। কিছুকাল ধরে যেমন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উন্নতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত এই উন্নতির ধারা বজায় রেখে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বেসরকারীভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আখ্যায় ভূষিত হয়। কিন্তু তারপর থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটা পড়তির সময় এসেছে বলে মনে হয়। সোবার্সের মত দুর্ধর্ষ চৌকস খেলোয়াড় নেতৃত্ব দিয়েও ১৯৬৮-৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে বিজয়ী করতে পারেন নি। তেমনি অস্ট্রেলিয়া একটা সাময়িক অবনতির যুগ থেকে নিজেদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে চলেছে। ইংলণ্ডের কথাও প্রায় অনুরূপ। কিন্তু ভারত কি কোন দিন উন্নতির যুগ দেখতে পাবে না? বাহান্ন কোটি মানুষের মধ্যে থেকে একটা শক্তিশালী ক্রিকেট দল গড়ে তোলা কি এতই অসাধ্য ব্যাপার?

ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে তার প্রভূত সম্ভাবনা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটছে না দেখে বিশ্বের তাবৎ ক্রীড়ানুরাগী মহল বিস্মিত হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি বিশ্ব ও[illegible] লিম্পিকের আন্তর্জাতিক কমিটির সভাপতি আভেরি ব্রাণ্ডেজ ভারতে এসে যে আ[illegible] প্রকাশ করেছেন, তাতে এই চিত্রটি পরি[illegible] হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন ভারতের এত বড় দেশ ক্রীড়া ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযো[illegible] অবদান রাখতে পারছে না দেখে বি[illegible] হতে হয়। মনে হয়, ভারতের খেলাধু[illegible] জগতে কোথাও বিরাট ত্রুটি রয়েছে। সেই ত্রুটিটি পরিচালকদের। মজার এখানকার ক্রীড়া পরিচালনার ভার নি[illegible] কিছু লোকের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে আঞ্চলিক প্রাধান্যও সুপরিস্ফুট। ভা[illegible] ক্রীড়া পরিচালকরা জনগণের আস্থা[illegible] কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। আবার চালকদের মধ্যে বিদ্বেষ ও রেষারেষির ক্রীড়ার অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে।

ভারতের ক্রীড়া ক্ষেত্রের দুরবস্থার আজ দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। কিন্তু প্রতিকারের জন্য কোন সক্রিয় চেষ্টা লক্ষিত হচ্ছে না। কবে আমাদের এই [illegible]জনক অবস্থার অবসান হবে! সরক[illegible] পক্ষ থেকেও এর প্রতিকারের আশা নি[illegible] জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই আমাদে[illegible] দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাতে পার[illegible]

# খেলাধুলা

**দর্শক**

## আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র পুরুষ ও মহিলা বিভাগে এবং তামিলনাড়ু বালক বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্র এই নিয়ে উপর্যুপরি ৩-বার মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ান হয়ে জয়লক্ষ্মী কাপ জয়ী হল। পুরুষ বিভাগে সর্বাধিকবার (১৪ বার) বার্ণা বেলাক কাপ জয়ের রেকর্ড মহারাষ্ট্রের এবং তারা তিন বছর পর (১৯৬৭-৬৯) পুনরায় এই কাপ পেল।

### বাংলার খেলা

তিনটি বিভাগের মধ্যে বাংলা কেবল মহিলা বিভাগের চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। তারা মহিলা বিভাগের পুরস্কার জয়লক্ষ্মী কাপ শেষ পেয়েছে ১৯৬৭ সালে।

### চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ের খেলা

**পুরুষ বিভাগ**

| | খেলা | জয় | হার | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|
| মহারাষ্ট্র (এ) | ৩ | ৩ | ০ | ৩ |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | ৩ | ২ | ১ | ২ |
| মহীশূর | ৩ | ১ | ২ | ১ |
| দিল্লী | ৩ | ০ | ৩ | ০ |

**মহিলা বিভাগ**

| | খেলা | জয় | হার | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|
| মহারাষ্ট্র (এ) | ৩ | ৩ | ০ | ৩ |
| বাংলা | ৩ | ২ | ১ | ২ |
| মহারাষ্ট্র (বি) | ৩ | ১ | ২ | ১ |
| মহীশূর | ৩ | ০ | ৩ | ০ |

**বালক বিভাগ**

| | খেলা | জয় | হার | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|
| তামিলনাড়ু | ৩ | ২ | ১ | ২ |
| মহারাষ্ট্র (এ) | ৩ | ২ | ১ | ২ |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | ৩ | ১ | ২ | ১ |
| মহীশূর | ৩ | ১ | ২ | ১ |

## জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

ইডেন উদ্যানে অবস্থিত ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের ইনডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় টেবল টেনিস এবং আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। দীর্ঘ ১১ বছর পর কলকাতায় এই দুই প্রতিযোগিতার আসর বসলো। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল ১৯টি রাজ্য এবং ভারতীয় রেল দল। জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসে ১২৮ জন, পুরুষদের ডাবলসে ৬৪টি জুটি, মহিলাদের সিঙ্গলসে ৬৪ জন এবং মিক্সড ডাবলসে ৬০টি জুটি নিয়ে খেলার তালিকা তৈরী হয়েছিল। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় প্রধান আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিলেন জাপানের এই তিন বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড়—জাপানের ২নং খেলোয়াড় মিৎসুরু কোনো এবং গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ডাবলস জুটি নিশি এবং কোন্ডো। কোনো পুরুষদের সি[illegible] (প্যারালাল) খেতাব এবং কোন্ডো ভ[illegible] কাশিম আলীর সহযোগিতায় ডাবলস [illegible] পান।

### ত্রিমুকুট সম্মান

মহারাষ্ট্রের কুমারী কোটি চাক্সম্যা[illegible] বছরের মত এবারও মহিলাদের সি[illegible] ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব সূত্রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন। উল্লেখ্য তিনি আন্তঃ রাজ্য এবং [illegible] প্রতিযোগিতায় ও সমস্ত সিঙ্গলস স্ট্রেট সেটে জয়ী হয়ে অসাধারণ [illegible] পরিচয় দেন।

### ফাইনাল খেলার ফলাফল

**পুরুষদের সিঙ্গলস :** জি জগন্নাথ [illegible] ওয়ে) ২২—২০, ২১—১০ ও ২[illegible] পয়েণ্টে গত বছরের চ্যা[illegible] মির কাশিম আলীকে (অন্ধ্র[illegible]) পরাজিত করেন।

**পুরুষদের সিঙ্গলস** (প্যারালাল) কোনো (জাপান) ২১—১৯, [illegible] ১৭—২১, ২১—১৭ ও ২[illegible] পয়েণ্টে টি নিশিকে (জাপান) [illegible] করেন। সেমি-ফাইনালে ভা[illegible] জি জগন্নাথ ১৭—২১, ২১—৮[illegible] ২১ ও ১৩—২১ পয়েণ্টে [illegible] কোনোর কাছে হেরে যান।

**পুরুষদের ডাবলস :** কোন্ডো (জাপা[illegible]) মির কাশিম আলী (ভা[illegible]) ১২—২১, ২১—১২, ২১—[illegible] ২২—২০ পয়েণ্টে কোনো এবং [illegible] (জাপান) পরাজিত করেন।

**বালিকাদের সিঙ্গলস :** কুমারী কেটি চার্জ-ম্যান (মহারাষ্ট্র) ২১—১৫, ২১—৭ ও ২১—১১ পয়েন্টে কুমারী ঊষা সুন্দর-রাজকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

**বালিকাদের ডাবলস :** কুমারী কেটি চার্জম্যান এবং এন মণ্ডলা (মহারাষ্ট্র) ২১—১৯, ১৬—২১, ১৩—২১, ২২—২০ ও ২১—১৬ পয়েন্টে রূপা মুখার্জি এবং ইন্দু পুরীকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

**মিক্সড ডাবলস :** কুমারী কেটি চার্জম্যান এবং এফ আর খোদাজী (মহারাষ্ট্র) ২১—১৯, ২১—১৬ ও ২১—১৯ পয়েন্টে কুমারী ঊষা সুন্দররাজ এবং কে জয়ন্তকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

এখানে উল্লেখ্য ব্যক্তিগত বিভাগের ৯টি খেতাবের মধ্যে মহারাষ্ট্র একাই ৫টি খেতাব লাভ করে (মহিলাদের সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস, বালকদের ডাবলস এবং বালিকাদের সিঙ্গলস)। বাকি ৪টি খেতাব পায় জাপান ২টি (পুরুষদের সিঙ্গলস এবং যুগ্মভাবে পুরুষদের ডাবলস), রেলওয়ে ১টি (পুরুষদের ডাবলস) এবং কেরালা ১টি (বালকদের সিঙ্গলস)।

## জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান

ত্রিবান্দ্রামে আয়োজিত ১৬তম জাতীয় স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠানে (শীতকালীন) পাঞ্জাব দলগত চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। পাঞ্জাব পেয়েছে মোট ২৫টি পদক (স্বর্ণ ১৩, রৌপ্য ৪ ও ব্রোঞ্জ ৮) এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কেরালা সংগ্রহ করেছে মোট ২১টি পদক (স্বর্ণ ১০, রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৪)। পশ্চিম বাংলা নিয়ে এসেছে ৫টি স্বর্ণ এবং ৭টি রৌপ্য পদক। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে বালক বিভাগে উত্তর প্রদেশের জয়নারায়ণ সিং এবং ছাত্রী বিভাগে কেরালার এন রাধা। ক্রীড়ানুষ্ঠানে ২০টি রাজ্যের প্রায় ১,৭৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল।

## পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে মোহনবাগান পুরুষ বিভাগে, ইস্টার্ন রেলওয়ে মহিলা বিভাগে এবং ২৪-পরগণা জেলা তিনটি বিভাগে (বালকদের ১৮ বছর ও ১৬ বছর বয়সের নীচে এবং বালিকাদের ১৬ বছর বয়সের নীচে) দলগত চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। ক্রীড়ানুষ্ঠানে ২২টি নতুন রাজ্য রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

### দলগত চ্যাম্পিয়নশীপ

**পুরুষ বিভাগ :** ১ম মোহনবাগান (৮৯ পয়েন্ট), ২য় ইস্টবেঙ্গল (৭৮ পয়েন্ট), ৩য় ২৪-পরগণা (৩০ পয়েন্ট)

**মহিলা বিভাগ :** ১ম ইস্টার্ন রেলওয়ে (৭৭ পয়েন্ট), ২য় ২৪-পরগণা (১৪ পয়েন্ট), ৩য় এরিয়ান্স (৮ পয়েন্ট)

**বালক বিভাগ :** ১৮ বছর বয়সের নীচে—২৪-পরগণা (৫৬ পয়েন্ট), ১৬ বছর বয়সের নীচে — ২৪-পরগণা (৪৩ পয়েন্ট), ১৪ বছর বয়সের নীচে—সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব (১৮ পয়েন্ট)

**বালিকা বিভাগ :** ১৬ বছর বয়সের নীচে—২৪-পরগণা (৩০ পয়েন্ট), ১৪ বছর বয়সের নীচে—এরিয়ান্স (২৫ পয়েন্ট)

### ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ

**পুরুষ বিভাগ :** জি আর প্যাটেল (মোহনবাগান), ১১ পয়েন্ট

**মহিলা বিভাগ :** কিঙ্করী দাস ও শ্রীরূপা চ্যাটার্জি (ইস্টার্ন রেলওয়ে), ১৫ পয়েন্ট

**বালক বিভাগ :** (১৮ বছরের নীচে) এস ব্যানার্জি (২৪-পরগণা), ১১ পয়েন্ট

## আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্স

কটকের বারবটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৩১তম আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্স মহাসমারোহে শেষ হল। তিনদিনব্যাপী এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৫৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৯০০ জন অ্যাথলীট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ৩১টি বিষয়ের মধ্যে মাত্র তিনটি বিষয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গতবারের ছাত্র বিভাগের চ্যাম্পিয়ান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবার শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র একটি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করে (পোলভল্টে টি দাশ)।

তিনটি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভের গৌরব লাভ করেন একমাত্র কুমারী নির্মলা উট্টিয়া (মহীশূর)। তিনি ১০০ মিটার, ২০০ মিটার এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন। স্প্রিন্টে 'ডাবল খেতাব' লাভ করেন ছাত্রী বিভাগে মহীশূরের কুমারী নির্মলা উট্টিয়া এবং ছাত্র-বিভাগে বাঙ্গালোরের রবিন পাল।

### দলগত চ্যাম্পিয়নশীপ

**ছাত্র বিভাগ :** গুরু নানক বিশ্ববিদ্যালয় (৪৩ পয়েন্ট)

**ছাত্রী বিভাগ :** মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (৩৪ পয়েন্ট)

### নতুন বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড

**১০,০০০ মিটার :** বি সিং (গুরু নানক)। সময় : ৩২ মিঃ ১-০ সেঃ

**১০০ মিটার (ছাত্রী) :** কুমারী অলকা ভিন্ধে সময় : ১২-১ সেঃ (হিট)

## স্কুল টেস্ট ক্রিকেট

দিল্লীর প্রথম টেস্টের মত ইংলিশ স্কুল বনাম ভারতীয় স্কুল দলের দ্বিতীয় টেস্ট (বোম্বাই) এবং তৃতীয় টেস্ট (আমেদাবাদ) অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ভারতীয় স্কুল দলের পক্ষে শেষপর্যন্ত ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্টে অনিল মাথুর (২য় ইনিংসে নট-আউট ৪১ রান) এবং আমেদাবাদের তৃতীয় টেস্টে রমেশ বোরদে (২য় ইনিংসে নট-আউট ৭২ রান)।

### সংক্ষিপ্ত স্কোর

**দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই :**

**ইংলিশ স্কুল :** ৩৮১ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রো ১৩১, ফোর্ট ৫৭ এবং পেজ ৫১ রান)
ও ১৩০ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেঃ। স্টোক্‌ল্ড ৫৬ রান)

**ভারতীয় স্কুল :** ২৯১ রান (এন দাস ৫৯ এবং রমেশ বোরদে ৪৪ রান)
ও ১১২ রান (৬ উইকেটে। অনিল মাথুর নট-আউট ৪১ রান)

**তৃতীয় টেস্ট—আমেদাবাদ :**

**ইংলিশ স্কুল :** ২৬৩ রান (জি মিলার ৭২ রান। পি ওবেরয় ৬৪ রানে ৫ উইকেট)
ও ১৫৫ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেঃ। ফোর্ট নট-আউট ৫৯ এবং ইউপার ৫৩ রান)

**ভারতীয় স্কুল :** ১৪৭ রান (বুথ ৪৬ রানে ৩ উইকেট)
ও ১৭৬ রান (৭ উইকেটে। রমেশ বোরদে নট-আউট ৭২ রান)

### চতুর্থ টেস্ট—কটক

বারবটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ভারতীয় স্কুল বনাম ইংলিশ স্কুল দলের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতীয় স্কুল দল ১২৫ রানে জয়ী হয়ে ১-০ খেলায় (ড্র ৩) অগ্রগামী হয়েছে। ইংলিশ স্কুল দলের অধিনায়ক জে পেজ টসে জয়ী হয়ে ভারতীয় স্কুল দলকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান। তাঁর এই ঝুঁকি নেওয়াতে শেষপর্যন্ত দলের পরাজয় ঘটে।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় স্কুল দলের ৮ উইকেট পড়ে ২০৬ রান উঠেছিল। বোম্বাইয়ের স্কুল-ছাত্র এইচ কে শাহ উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭৬ রান করে আউট হন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় স্কুল দলের প্রথম ইনিংস ২২২ রানের মাথায় শেষ হয়। অপরদিকে ইংলিশ স্কুল দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫৫ রানের মাথায় পড়ে যায়। ভারতীয় স্কুল দল দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৪৫ রান সংগ্রহ করে ১১২ রানে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলায়

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান রেলওয়ে দলের জি জগন্নাথ (বাঁদিকে) এবং পুরুষদের সিঙ্গলসের প্যারাডসের চ্যাম্পিয়ান জাপানের মিৎসুরো কোনো

বোলাররা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মোট ১৪টা উইকেট পড়েছিল—ভারতীয় স্কুল দলের ৪টে (১ম ইনিংসের ২টা এবং ২য় ইনিংসের ২টা) এবং ইংলিশ স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের ১০টা।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ভারতীয় স্কুল দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৫৬ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি করে এবং মাত্র ৯৮ রানের মাথায় ইংলিশ স্কুল দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে ১২৫ রানে জয়ী হয়। ইংলিশ স্কুল দল চা-পানের পর ২৯ মিনিট খেলেছিল।

**ভারতীয় স্কুল:** ২২২ রান (এইচ কে শাহ ৭৬ এবং ওবেরয় ৪৪ রান। বুথ ২৬ রানে ৪ উইকেট)

**ও ১৫৬ রান** (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এইচ কে শাহ ৪০ এবং এম দাস ৩৭ রান। মিলার ৩৯ রানে ৫ এবং বার্কলে ৩১ রানে ২ উইকেট)

**ইংলিশ স্কুল:** ১৫৫ রান (বার্কলে ৪৮ রান। অনিল মাথুর ৩০ রানে ৪, পি ওবেরয় ৩৩ রানে ২ এবং এস সোম ৩৩ রানে ২ উইকেট)

**ও ৯৮ রান** (সো ৩৭ রান। এস সোম রানে ৫, ইকবাল ৮ রানে ২ মদুকুল পাল ৯ রানে ২ উইকেট)

## ইরানী ট্রফি

কলকাতার ইডেন উদ্যানের স্টেডিয়ামে আয়োজিত বোম্বাই অবশিষ্ট ভারতীয় ক্রিকেট দলের বোম্বাই প্রথম ইনিংসে বেশী রান সুবাদে ইরাণী ট্রফি জয়ী হয়েছে।

**বোম্বাই:** ৪১৮ রান (অশোক ১১৩, অজিত ওয়াদেকার ১৬ অমরনাথ ৫২ রানে ৩, গো ৪৮ রানে ২ এবং কুমার ৪ উইকেট)

**ও ৯৯ রান** (১ উইকেটে গাভাস্কার নট-আউট ৪৬ রান)

**ভারতীয় অবশিষ্ট দল:** ৩৭৮ রান দুরানী ১০৫ এবং অম্বর রান। সোলকার ১২১ রানে মানকাদ ১৮ রানে ২ উইকেট

**ও ২৫ রান** (কোন উইকেট না

●

কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামে অ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলে পোলভল্টে কলকাতা বিশ্ববিদ্য তপন দাস ৩.৫৫ মিটার অতিক্রম করে প্রথম স্থান লাভ
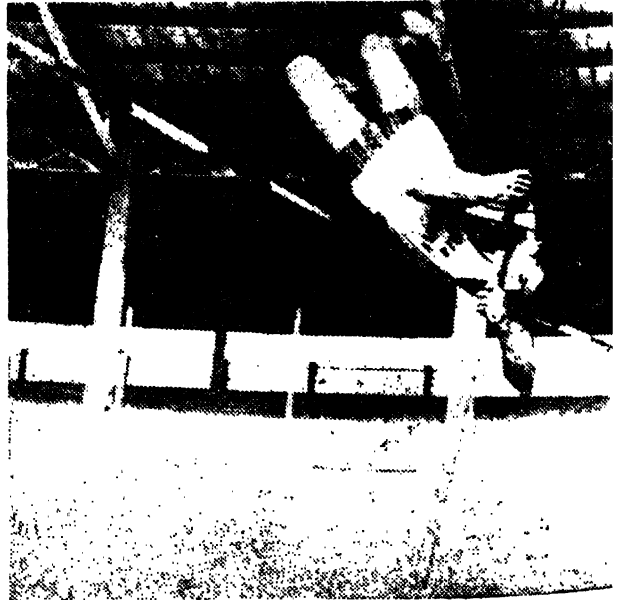
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ভারতে
যে পাতা-চায়ের
সব চেয়ে বেশী বিক্রী
রেড লেবেল
মানে, অনেক বেশী কাপ আর সত্যিই ভালো চা

# নিয়মাবলী

## লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

## এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

## গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

## চাঁদার হার

| | কলিকাতা | মফঃস্বল |
|---|---|---|
| বার্ষিক | টাকা ২০-০০ | টাকা ২২-০০ |
| ষাণ্মাসিক | টাকা ১০-০০ | টাকা ১১-০০ |
| ত্রৈমাসিক | টাকা ৫-০০ | টাকা ৫-৫০ |

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৬শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 15th January, 1971. শুক্রবার, ১লা মাঘ, ১৩৭৭ 40 Paise

## সূচীপত্র



প্রচ্ছদ : শ্রীসুনীল সাহা

# চিঠিপত্র

## মফঃস্বলে লিটল ম্যাগাজিন

গত ৬ই নভেম্বরের বইকুন্ঠের খাতা বিভাগে মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন পর্যায়ের আলোচনাটির জন্যে গ্রন্থদর্শী মহাশয়কে অকুন্ঠ ধন্যবাদ জানাই। এবং আমি বিশ্বাস করি আমার মতো আরও অসংখ্য মানুষ যারা লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনে যুক্ত তারা সকলে অমৃত পত্রিকার এই ভূমিকা গ্রহণের জন্যে সম্পাদককে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করবেন। অতীতে বহুবার অমৃতের পাতায় লিটল ম্যাগাজিন সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচনা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় অভয়ঙ্কর তাঁর 'কলমে' এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলেও জানিয়েছেন। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে কাছের দূরের বহু পত্র-পত্রিকার বিবরণ ও সংবাদ অমৃতের পৃষ্ঠায় থাকে। সুতরাং এই পত্রিকার আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও উৎসাহের মধ্যে যে নিছক লোক দেখানো ভাব নেই তা বারবার প্রমাণিত সত্য। এটা অমৃতের শুধুমাত্র প্রশস্তি নয়। প্রসংগক্রমেই এ সত্য সবার সামনে থাকা দরকার। কারণ বাংলা দেশের অন্যান্য সাপ্তাহিকে যখনমাত্র গোটাকয়েক ম্যাগাজিনকেই তাঁদের পাতায় স্থান দিয়ে কৌলিন্য দান করেন, সেখানে অমৃতের এই ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের ইতিহাস রচিত হবার সময় ভবিষ্যতে অমৃতের কথাও তাই সগৌরবে লিখিত হবে বলেই মনে করি।

এবার মূল আলোচনার সূত্র ধরে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের পেছনে যে অসুবিধা বেদনা ও পরিশ্রম তা শহর ও মফঃস্বল সর্বত্রই সমান। গ্রন্থদর্শী সেসব বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছেন। কিন্তু বাংলার বাইরের কাগজগুলোর অসুবিধা বোধহয় আরও ব্যাপক। বিশেষতঃ ক্রমশঃ যে হারে হিন্দীর দাপট বেড়ে যাচ্ছে তাতে বাইরের পত্রিকাগুলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বজায় রাখার যে চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাও বোধ হয় ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসবে। এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বাইরে থেকে বেশ কিছু পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে সমর্থ হচ্ছে। পাটনার সপ্তদ্বীপা, জব্বলপুরের সাতপুরা, ভাগলপুরের লেখা, হাইলাকান্দির সর্পিল, দিল্লীর আমরা, রাঁচীর স্ফুলিঙ্গ, নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। সুখের কথা সন্দেহ নেই। কোলকাতা, মফঃস্বল বা বাইরের কাগজগুলির সামনে অন্ততঃপক্ষে দু-চারটি সমস্যা একই ধরনের। লিটল ম্যাগাজিন সংরক্ষণ সমিতি জাতীয় কিছু সংস্থার নাম কিছুদিন থেকে শুনে আসছি। তাঁরা অবশ্য কতদূর কি করছেন তা সবার বোধ হয় জানার সৌভাগ্য হয়নি। সকলেই কম করে যে দুটি সমস্যার ভারে ক্রমশঃই দুর্বল ও হীনশক্তি হয়ে পড়ছে আমি তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ প্রসংগে প্রথমেই ম্যাগাজিন পাঠাবার ডাক খরচের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রায় প্রতি-বছর ডাক খরচ ক্রমশঃই বৃদ্ধির পথে। যেসব ম্যাগাজিনের কম করেও ৫০০ জন গ্রাহক আছে তাদের ডাক খরচের বহর সহজেই অনুমেয়। ডাক-বিভাগ মাসিক পত্রিকা পর্যন্ত একটা সুবিধাজনক হারে কাগজ পাঠাবার সুযোগ দিয়ে থাকেন। প্রশ্ন হচ্ছে এই সুবিধা দ্বি-মাসিক ত্রৈ-মাসিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে কেন সম্প্রসারিত হবে না? উত্তরোত্তর যে হারে এই ডাক ব্যয় বাড়ছে তাতে ছোট পত্রিকাগুলির প্রকৃত নাভিশ্বাস উঠতে আরম্ভ হয়ে গেছে।

সরকারী বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির ব্যাপারটাও অদ্ভুত। শুধুমাত্র বড় বড় ও প্রভাবশালী পত্রিকারাই এই আনুকূল্য পায়। লিটল ম্যাগাজিনগুলি কেন বঞ্চিত হবে? এই মূল্য যখন সাধারণের পকেট থেকেই সংগৃহীত হয় তখন তা বন্টনে এই অবাঞ্ছিত নীতি কেন? সরকার কিছু বাস্তব-সম্মত সর্ত রাখতে পারেন লিটল ম্যাগাজিনগুলোর সামনে। যারা সে সর্ত পূরণে সমর্থ হবে তারা বছরে ক্রমান্বয়ে কি এই বিজ্ঞাপন পেতে পারে না?

নিউজ-প্রিন্টের কোটার বন্দোবস্ত ও বন্টনেও সেই একই পর্বত-প্রমাণ বাধা ও অসুবিধা। যা হচ্ছে না তা নিয়ে হা-পিত্যেশ না করে, যা আছে তাকে বজায় রেখে আরও উন্নতির চেষ্টা করা কি গঠনমূলক নয়?

আজকের হালকা ও সেক্স সাহিত্যের যুগে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কান্বিত, তাঁদের সে চিন্তা অমূলক। কারণ পাঠক ও কাল বড় নির্মম সত্য। এ সত্যের কাছে আসলই টিঁকে থাকে পরবর্তী কালের জন্যে, নকলের ছাড়পত্র নিষ্ঠুরভাবেই প্রত্যাখ্যাত হবে। আর সেই সত্যের ধারা বজায় রাখার ব্যাপারে লিটল ম্যাগাজিনের অবদানের কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।

লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে সৎ সাহিত্য ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে চালু রাখতে হলে পত্রিকাগুলোরই বেঁচে থাকা দরকার। আর সেই বেঁচে থাকার পেছনে এই সমস্যার প্রতিকার করার পথ খুঁজে বার করতে হবে এবং সে জন্যে সারা ভারতের বাংলা ও অন্যান্য ভাষার লিটল ম্যাগাজিনের পরিচালক ও পাঠকগোষ্ঠীকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

অমৃতে এ বিষয়ে আরও আলোচনা প্রকাশিত হলে আনন্দিত হব।

জীবনময় দত্ত
সম্পাদক সপ্তদ্বীপা
পাটনা—১।

## তুলসীচরিত প্রসংগে

আপনার বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত' পাঠের আনন্দ আপনাকে জ্ঞাপন না করে পারছি না। বিচিত্রধর্মী রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ 'অমৃত' পাঠ করে উৎফুল্ল হই এই সুদূর প্রবাসে। সমস্ত রচনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে—'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' এবং 'তুলসীচরিত'। বিশেষত তুলসীচরিত সম্বন্ধেই আমার সপ্রশংস অভিমত জানাতে চাই। অভিনব বেশে, বাসে, বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে উপস্থিত হয়েছে এই উপন্যাস এটির উপস্থাপনে সর্বাগ্রে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আর লেখককে জানাই আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। এই লেখকের অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জেগেছে মনে। আপনার পত্রিকা মারফৎ এ বিষয়ে জানতে পারব আশা করি।

সুহাসিনী গাঙ্গুলী
ভাবনগর,
গুজরাট।

( ২ )

ননীমাধব চৌধুরী মহাশয়ের কোনো রচনা আমি আগে পড়িনি। অমৃতে বর্তমানে ধারাবাহিক প্রকাশিত তাঁর তুলসীচরিত পড়তে পড়তে একটা নতুন জিনিস অনুভব করলুম। সেটা হচ্ছে বাংলাভাষার অনাস্বাদিত স্বচ্ছতা। এমন নিরাভরণ স্বচ্ছ অথচ গম্ভীর ভাবোদ্দীপক রচনা বাংলা ভাষায় সম্ভব বলে ধারণা ছিল না। বাংলা ভাষায় আদিযুগ থেকেই, সম্ভবত ভাষাকে কৌলীন্য প্রদানের জন্য, নানা আভরণে ভূষিত করেছেন প্রায় সকলেই। তার জন্যে খর্ব করতে হয়েছে ভাষার স্বচ্ছতাকে যুগে যুগে এই আভরণের হয়েছে পরিবর্তন, হয়েছে আধুনিকীকরণ। জড়োয়া গয়নার বদলে কখনো এসেছে ফুলের সাজ

# চিঠিপত্র

কখনো রূপো-গিল্টী, কখনো বা বুনো লতাপাতা। কিন্তু এত অনাড়ম্বর প্রকাশ-ক্ষম রূপ আগে দেখেছি কিনা মনে পড়ে না।

তুলসী-চরিত্রের কাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় বোধহয় এখনও আসেনি। মনীমাধববাবুর রচনার সাহিত্য-গুণ বিশ্লেষণ করতেও বসিনি। তবে তিনি বাংলা গদ্যের রচনারীতির যে নতুন সম্ভাবনার নির্দেশ দিলেন তার জন্যে লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা—১৯

## একটি নতুন ধরনের গ্রন্থের জন্য

বেশ কয়েকদিন আগে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমার ঘটেছিল। একটি সহজ সরল, কর্তব্যনিষ্ঠ নিরলস ব্যক্তির জীবন সাধনার প্রত্যয় স্বভাবতই চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তিনি অসমীয়া এবং বাংলা ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছেন। তাঁর বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ সুকৃতির পরিচয় তুলে ধরছি। তিনি ৪০ বছর কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে বাংলা পুঁথির বিবরণ প্রকাশের গুরু দায়িত্ব নিচ্ছেন। এই বস্তুটি বাংলা সাহিত্যে অভিনব তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক স্বীকৃতিতে জানা যায়, তিনি Prof. Theodor Aufrecht' 'র পথ অনুসরণ করেও স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছেন। Prof. Aufrecht সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ Works এবং Auothrs দু' ভাগে রেখেছেন। কিন্তু অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য বাংলা পুঁথির, বিবরণে তিনটি অংশের পরিচয় প্রদান করেছেন। প্রথমত বর্ণক্রমানুসারে গ্রন্থের তালিকা, দ্বিতীয়ত বর্ণক্রমানুসারে লেখকের তালিকা এবং বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট। বর্ণক্রমানুসারে গ্রন্থের তালিকায় একই নামে হাজার গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গেছে এবং সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি Dated Manuscripts এবং undated Manuscripts করেছেন। আবার Dated কে সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ এবং unda'ed -কে সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ করেছেন। বহু সালের পরিচয় খৃষ্টাব্দে পর্যবসিত করেছেন। এমন কি খৃষ্টাব্দের রূপান্তর ঘটিয়েছেন। তাঁর এই গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের গবেষকরা উপকৃত হবেন বলা যায়। উল্লিখিত দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে বলা যায় লেখকদের বর্ণক্রমানুসারে নামের তালিকার পাশাপাশি তাঁদের গ্রন্থের নাম থাকবে। এবং বিষয়বস্তু অনুসারে তালিকার বিষয়বস্তুর পাশাপাশি গ্রন্থাবলী থাকবে। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একটা কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, গবেষণার ক্ষেত্রে লেখক গ্রন্থ এবং বিষয়বস্তুর হিসাব-নিকাশ হাতের কাছেই মিলবে। এবং গ্রন্থাবলী কোথায় কোথায় মিলবে তারও সহজ উপায় পাওয়া যাবে। তবে দুঃখের কথা তাঁর কাজটির প্রতি সরকারের শিক্ষাদপ্তর নজর দিচ্ছেন না। আসামের মত জায়গায় থেকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থটি ছাপানো সম্ভব নয়, কখনও নয়।

তাঁর এই কাজের প্রশংসা এবং সহানুভূতি অনেকেই করেছেন। যেমন বলা যেতে পারে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> 'I am certainly of opinion that this great work ought to be published. .... I have been very favourably impressed by this work, which shows not only a very fine scholarship and critical acumen but is also the result of near about 40 years of sincere labour"....

সবশেষে আমার তথা অগণিত সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যসেবীর আবেদন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এই বলে রাখতে চাই—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের

"Catalogus Catalogorum of Bengali Manuscripts"

গ্রন্থটির ছাপানোর দায়িত্ব নিন—অন্যান্য প্রগতিশীল দেশ যেমন সহজেই নিয়ে থাকে।

রতন বিশ্বাস
সম্পাদক
প্রান্তরেখা
শিলিগুড়ি

## 'অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ প্রসঙ্গে'

গত ২রা পৌষ অমৃতের চিঠিপত্রে 'অমৃতের স্বাদ-বিস্বাদ' প্রসঙ্গে শ্রীসত্যানন্দ গুহের বক্তব্যটি পড়ে অবাক হলাম। তিনি কি করে 'মনের কথা', 'নিকটেই আছে' এবং 'মুখের মেলাকে' বিস্বাদের পর্যায় ফেলতে পারলেন ভাবতে পারছি না। মনোবিদ্যা ও শারীর-বিদ্যার বিচিত্র সংমিশ্রনের এক অদ্ভুত সুন্দর ফিচার শ্রীমনোবিদের 'মনের কথা' বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্ভবতঃ এই প্রথম। এ ধরণের প্রশংসনীয় উদ্যোগকে বিস্বাদের পর্যায়ে ফেলার কোন সংগত কারণ দেখিনা। শ্রীসিদ্ধিৎসুর 'নিকটেই আছে'তে জীবনস্রোতে বহমান কতকগুলো বিচিত্র বাস্তব চরিত্র আমাদের পরিবেষ্টনীকে স্মরণ করিয়ে মনকে ভীষণ নাড়া দেবে। আর আধুনিক এই তিক্ত জটিল নগর-কেন্দ্রিক জীবনে জসীম সাহেবের মুখের মেলার সাহিত্যরস আমাদের এক মুহূর্তে টেনে নিয়ে যাবে গ্রাম-বাংলার জনজীবন ও তার পরিবেশকে চাক্ষুষ দেখাতে। তাছাড়া স্বাদ-বিস্বাদ মানুষের ব্যক্তিগত মানসিকতার উপর নির্ভর করে। শ্রীসত্যানন্দ গুহের হাল্কা মনের সিদ্ধান্ত 'দুর্বল উপস্থাপনা' এবং 'ভেজাল' অগণিত পাঠক এবং সাহিত্য-রসিকদের বিরাগ সৃষ্টি করবে। আমি অমৃতের একজন নিয়মিত পাঠক। অমৃত বাংলা ভাষার এক অপূর্ব সাপ্তাহিক। অমৃত আমাদের খাঁটী অমৃত পরিবেশন করেন। কোন তার 'দুর্বল উপস্থাপনা' নয়, এবং কোনটাই 'ভেজাল' নয়।

মাসিরুদ্দিন আহম্মদ, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ।

## উত্তর বাংলার লোকসাহিত্যের উপাদান সম্পর্কে

৮ই জানুয়ারী 'অমৃত'তে প্রকাশিত আমার লেখা 'উত্তর বংগের লোক-সাহিত্যের উপাদান' প্রবন্ধটিতে কয়েকটি ছাপার ভুল আছে। ৮৩০ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমের মাঝখানে 'চাঁদসাগরের' জায়গায় 'চাঁদসদাগর' এবং ঐ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের শেষের দিকে 'অবক্য' শব্দটি 'অনশ্য' পড়তে হবে। ৮৩২ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের প্রথম দিকে 'শুরু' শব্দটির জায়গায় 'শ্বশুর' হবে এবং ঐ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের প্রথম এবং শেষদিকে 'সোনার' জায়গায় 'সোলার', 'মাচা উমাচাউ'-এর স্থানে 'মাচাউ মাচাউ' এবং 'অংশ' কে 'অংশে' পড়তে হবে। ৮৩৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের মাঝখানে 'তাকে লাঞ্ছনা' নয়, 'তাকে কম লাঞ্ছনা' হবে। ঐ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের শেষের দিকে ছাপানো 'আলোচ'কে 'আলোর' ধরতে হবে। ৮৩৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের প্রথম দিকে 'কান্ডে' -র জায়গায় 'কান্ডের' শব্দটি বসবে।

উপরে লিখিত সংশোধনগুলিকে মাথায় রেখে পাঠকদের প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি।

রঞ্জিত চক্রবর্তী, কলিকাতা—৩৭,
৮।১।৭৯

# শাদা চোখে

রাজ্য রাজনীতিতে হালফিল এক ভাবনার উদয় হয়েছে। যাঁরা রাজনীতির চর্চা করেন এমন অনেক গুণীর মুখেই শোনা যাচ্ছে যে বর্তমানে আমজনতা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একদিকে সি পি এম শিবির, আর অন্যদিকে তাঁদেরই মতে নন্-সি পি এম্ ক্যাম্প। কাজেই নন্-সি পি এম্ ক্যাম্পে ডিভিসান্ হলে তাঁরা মনে করছেন সি পি এম্-এরই সুবিধা হবে বেশী।

জনতাকে এই দুই শিবিরে যাঁরা বিভক্ত করতে চান—পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—তাঁরা হচ্ছেন সি পি এম এবং "গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের" সমর্থকরা। এইভাবে শ্রেণী বিন্যাস করলে নির্বাচনের পূর্বেই এমন আবহাওয়া সৃষ্টি হবে যে সি পি এমই একমাত্র শক্তিশালী দল যারা বিকল্প সরকার গড়তে পারেন। সি পি এম-এর বিরুদ্ধবাদীরা মনে হয় ভ্রমবশতই এরকম একটি মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে, বাম কম্যুনিস্টরা তাঁদের পালে হাওয়া লাগাতে সমর্থ হচ্ছেন। তদুপরি তাদের দল রাজ্যের প্রায় সমস্ত বিধানসভার আসনে লড়বার কথা ঘোষণা করে আবহাওয়াকে আরও বেশী করে অনুকূলে টানবার চেষ্টা করছেন।

গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট শ্লোগানের উদ্গাতা বাংলা কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া বার বার এই বক্তব্যই প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে সি পি এম্ ও তার সঙ্গী আরও দু'একটি ক্ষুদ্র দলকে রুখতে হলে একটা সর্বাত্মক ঐক্য গড়ার দরকার। এবং এই ঐক্যের ভিত্তি হওয়া উচিত আদর্শ, প্রোগ্রাম এবং সর্বোপরি হিংসার প্রতি বিরুদ্ধতা। তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় কোন বামপন্থী দলই হিংসাকে বা হিংসাত্মক পন্থাকে একেবারে কোনদিন গ্রহণ করবে না, একথা বলতে পারে না, পারবেও না। পারিপার্শ্বিক বিবেচনা করে কৌশলের খাতিরে সাময়িকভাবে হিংসাকে তাঁরা নিন্দা করতে পারেন। বামপন্থীরা নীতিগতভাবে গণ-একশান সমর্থন করেন। এবং এই গণ-আন্দোলনের গতিপথে যদি তথাকথিত হিংসাত্মক কিছু ঘটে তাকে বামপন্থীরা নিন্দা করতে চাইবেন না। কাজেই শ্রীসুশীল ধাড়া পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে থিয়োরী দাঁড় করতে চাইছেন তার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। এবং ইতিমধ্যেই তাঁর থিয়োরী থেকে বাম কম্যুনিস্টরা লাভবানই হয়েছেন, একথা বলা যায়।

একজন বিখ্যাত বামপন্থী নেতা সেদিন সখেদে বলছিলেন বামপন্থীরা কোন মুখে ভোটারদের কাছে আবার আবেদন জানাবেন সেকথা ভেবে তাঁর শরীর কন্টকিত হয়ে উঠছে। রাজ্যের আম জনতা ২৮০টা আসনের মধ্যে ২১৮টি আসন যুক্তফ্রন্টকে দিয়েছিল। কিন্তু ১৪ শরীকের দল ১২টা মাসে রাজ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে কোন মুখে আবার ভোট চাইতে যাবেন? তিনি মনে করেন, জনতা আশা ভঙ্গের বেদনায় গুলীবিদ্ধ বাঘের মত গজরাচ্ছে। তাঁদের মুখোমুখী হওয়া এখন খুবই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বাম কম্যুনিস্টরা বুদ্ধিমান। তাঁরা জনতার এই মনোভাবকে বোঝেন। তাই আগেভাগেই একদলীয় শাসন না হলে অনিশ্চয়তা বাড়বে একথা প্রাণপণে জনতাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। আর অনবধানতাবশত অন্যরাও বাম কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে একই শ্লোগান দিচ্ছেন। তফাৎ শুধু এই যে তাঁরা একা শ্লোগান তুলে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে জনতার আস্থা অর্জনে চেষ্টা করছেন, আর অন্যরা আবার দলসমষ্টির মাধ্যমে সেই হাওয়া পালে লাগাতে চাইছেন। যুক্তফ্রন্টের পতনের পর বাম কম্যুনিস্টরা যে বিচ্ছিন্নতায় ভুগছিলেন, বিরোধী শিবিরের তত্ত্বগত বিভ্রান্তির ফলে সেই অবস্থা অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছেন বলে মনে হয়। অন্তর্বামের জোট এইখানেই অনেকখানি ব্যর্থ হয়েছেন।

অনেক দেরীতে হলেও অন্তর্বাম কংগ্রেসকে প্রধান রাজনৈতিক শত্রু হিসাবে পরিগণিত করেছেন। বাম কম্যুনিস্ট পরিচালিত ছয় পার্টির জোটও একই কথা বলেছেন। হালফিল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল, যাঁরা দুই জোটের বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরাও বলেছেন যে বামপন্থীদের মধ্যে লড়াই হলে কংগ্রেসের সুবিধা হতে বাধ্য। তাই এই দল দুই জোটের নেতাদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে যে দলের শক্তি যেখানে বেশী অন্য বামপন্থীদল সেখানে যেন কোন প্রার্থী না দেন। অর্থাৎ সাধারণভাবে আসনভিত্তিক সমঝোতার উপর জোর দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, কংগ্রেস যেন আর ক্ষমতায় ফিরে আসতে না পারে। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায়, আর এস পি দুই ফ্রন্টের লড়াইয়ের মধ্যে আত্মঘাতী যজ্ঞের ভয়াবহ রূপ দেখতে পেয়েছেন। দুই জোট ও আর এস পির বক্তব্য প্রণিধান করলে দেখা যায়, কংগ্রেসই যে এখনও পর্যন্ত শক্তিধর শত্রু এই বক্তব্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। অর্থাৎ এনটি-কংগ্রেসইজম-এর পর্যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত শেষ হয়ে যায় নি।

এই রকম তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও কিভাবে বাম কম্যুনিস্টরাই একমাত্র শক্তিশালী দল হিসাবে ক্ষমতা দখল করতে পারবেন বলে কোন কোন মহল থেকে আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করছেন তা বুঝে ওঠা কঠিন। রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা কিভাবে ভুলে যাচ্ছেন যে ১৯৬৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হলেও একক দল হিসাবে শতকরা ৪০টি ভোট পেয়েছিলেন। আবার ১৯৬৭ সালে শতকরা ৪০টা ভোট পেয়ে ১২৬টি আসন দখল করেছিলেন। ১৯৬২ সালে শতকরা ৩৫টি ভোট পেয়ে সর্বাধিক আসন লাভ করে নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে কংগ্রেস বামপন্থীদের মত কোন শ্রেণী সংগঠন গড়েন না। নির্বাচনে তাঁরা যা ভোট পান তা সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে আসে। এবং সেই ট্র্যাডিশনাল ভোটের এখনও তেমন কিছু হেরফের ঘটেনি। বামপন্থীরা হয়ত মনে করছেন, কংগ্রেসে বিভাজন হওয়ার ফলে একটি [illegible] অংশ আদি কংগ্রেসের

দিকে ঝুঁকে যাবে। মনে হয় ধারণাটা ভুল। কারণ, তাঁরাই বলেন বাংলা দেশের জনতার প্রগতিশীলতার দিকে প্রবণতা বেশী। অতএব ট্রাডিশনালি যাঁরা কংগ্রেসের সমর্থক তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই শাসক কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকবেন একথা বলা চলে। যাঁরা অদ্যাবধি বিশেষ কারণে বামপন্থী বলে নিজেদের আখ্যাত করছেন, তাঁরা নির্বাচন যতই আসন্ন হয়ে উঠবে ততই পুরনো বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার জন্য যে ব্যগ্র হবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে।

নির্বাচনী ফলাফলের যাঁরা ভবিষ্যম্বাণী করার চেষ্টা করছেন তাঁরা এই সমস্ত বিষয় নজরে রেখে তবে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করবেন। নতুবা গোড়ায় গলদ হবার সম্ভাবনাই বেশী। সমস্ত আসনেই প্রার্থী দাঁড় করালেই ক্ষমতায় পেণছান যায় একথা বোধহয় ঠিক নয়। সংগঠন কিছু কিছু ক্ষেত্রে জোরদার থাকার অর্থও এই নয় যে সব আসনেই লড়াই করবার ক্ষমতা থাকে। অবশ্য বেশী সংখ্যক আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে হেরে যাওয়ার পর একক দল হিসাবে বেশী ভোট পেয়েছেন বা গণ-সমর্থন লাভ করেছেন এই কথা বলার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। ক্ষমতা দখল করতে না পারলে রাজনীতিতে ঐরকম আত্মপ্রসাদের কোন মূল্যই নেই।

অবশ্য, বাম কম্যুনিষ্টরা বলতে পারেন, তাঁরা সরাসরি লড়াইয়ের দিকে এর ফলে অনেকখানি এগিয়ে যাবেন এবং ভবিষ্যতে সংহতিকরণের কাজ আরও দ্রুততালে এগিয়ে যাবে। সেটা যেমন অনেকখানি সত্য, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ক্ষমতার আস্বাদন পাওয়ার পর ক্ষমতা ক্রমাগত হারাতে থাকলে দলের অভ্যন্তরে প্রশ্নও দেখা দিয়ে থাকে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির মূল সুর এখনও এন্টি-কংগ্রেসইজম-এর পরিপ্রেক্ষিতে ধ্বনিত হচ্ছে। যে দল যে ভাবেই ভাষ্য প্রকাশ করুন না কেন, ঐ এক বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই রাজ্য রাজনীতি ঘুরপাক খাচ্ছে। আর এই অবস্থাকে স্বীকার করে নিলেই বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের মধ্যে হঠাৎ আসন বন্টনের প্রশ্নে মিতালি ভেঙে যাওয়ার উত্তরটা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। খবরে প্রকাশ, বাংলা কংগ্রেস শাসক কংগ্রেসকে বেশী আসনে লড়াই করতে দিতে রাজী নয় বলেই নাকি তাঁরা "বন্ধুর মত" বিচ্ছেদকে মেনে নিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাম কম্যুনিষ্ট পার্টিই যদি 'প্রধান শত্রু' হয় তবে তাঁরা মিলতে পারলেন না কেন? উত্তর : বাংলা কংগ্রেস নব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলালেও নাকি —নব কংগ্রেসকে এমন সংখ্যক আসন ছেড়ে দিতে রাজী নন যাতে শেষোক্ত দল একক-ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সুযোগ পায়। যদি আম-জনতা তাঁদের প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তবে শাসক কংগ্রেসকে বেশী আসনে লড়াই করতে দিলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা অধিক সংখ্যক আসন লাভ করবেন। অতএব, সেক্ষেত্রে সরকার গঠনের প্রশ্নে বাংলা কংগ্রেসের ভূমিকা নগণ্য হয়ে যেতে বাধ্য। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বাংলা কংগ্রেস শাসক কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আসতে দিতে চান না। তাঁরা চান, ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে শাসক কংগ্রেস একটি সাহায্যকারী দল হিসাবে থাকুক মাত্র। এ অবস্থা শাসক কংগ্রেসের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। অবশ্য এখনও বলা যায় না, যে আবার বোঝাপড়ার জন্য চেষ্টা চলবে না। তবুও যে-অবস্থায় এসে আলোচনা ভেঙে গেল তা মোটেই আশা-ব্যঞ্জক নয়।

যেভাবেই সমঝোতা হোক না কেন রাজ্যের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটবে কিনা এ প্রশ্নটা শেষ পর্যন্তই থেকে যাবে। কেননা দুই বামপন্থী ফ্রন্টের লড়াইয়ের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। বাম কম্যুনিষ্টরা কিছু কিছু পকেটে খুবই শক্তিশালী একথা ঠিক। তেমনি অদ্যাবধি যে অষ্ট বামের জোট হয়েছে সেই জোটও অনেক পকেটে শক্তিধর। দুই জোটেরই শ্রেণী সংগঠন আছে। নেতৃত্বও আছে। একে অন্যকে উপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা।

তা সত্ত্বেও দুই জোটের কোন প্রকার বোঝাপড়া হওয়া সম্ভব নয়। মরীয়া হয়েই একের বিরুদ্ধে অন্যকে লড়তে হবে। সমঝোতার কোন রাস্তা থাকলে, যুক্ত-ফ্রন্টের পতনের পরই বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সরকার গড়ার মত ক্ষমতা এই দু-জোটের ছিল। কিন্তু শরীকী সংঘর্ষের প্রচন্ডতার জন্যে তা ঘটেনি। সে অবস্থার পরিবর্তন এখনও দেখা দেয় নি। ফলে, রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতা পুনরায় প্রায় ১৯৬৭ সালের প্রাক নির্বাচনী অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থার যেটুকু হের-ফের ঘটেছে তা হচ্ছে বামপন্থীরা কেউ কেউ হয়ত সংগঠন খানিকটা বাড়াতে পেরেছেন মাত্র। কিন্তু শুধু সংগঠনের জোরে পশ্চিম বাংলায় নির্বাচনী আসরে কিস্তিমাৎ করার মত অবস্থার এখনও সৃষ্টি হয় নি। বামপন্থীদের কথা তুলেই বলছি, জনতা আগের থেকে এখন অনেক জাগ্রত। তাঁরা গুণাগুণ বিচার না করে অন্ধের মত ভোট দিয়ে আসবেন একথা স্বীকার করা যায় না। জনতার মধ্যে একটি বিরাট অংশের যেমন দলের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আরও একটি বিরাট অংশের মধ্যে বিচারের প্রবণতাও আছে। প্রতিবারের নির্বাচনে এই শেষোক্ত অংশই বিরাট ভূমিকা পালন করে এসেছে। এবং এদের উপরই রাজ্যের ভবিষ্যৎ অদ্যাবধি অনেকখানি নির্ভর করছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এবারের নির্বাচনে জয়পরাজয়ের খতিয়ান আগে থেকে ঠিক করা খুবই কঠিন। কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে নব কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতার আলোচনা ভেঙে যাওয়ার ফলে রাজ্য রাজনীতিতে আবার একটি নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে। কারণ অন্টবাম দীর্ঘদিন ধরেই বলছেন যে, বাংলা কংগ্রেস তাঁদের শিবিরে এলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হবে না। তাঁরা ক্ষমতা পেলে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদও ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন। কিন্তু এতো সত্ত্বেও বাংলা কংগ্রেস নব কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কারণ, শ্রীসুশীল ধাড়া ডান কম্যুনিষ্ট ও এস ইউ সি'র সঙ্গে বাম কম্যুনিষ্টদের কোনো পার্থক্য দেখছিলেন না। শ্রীমুখার্জি নাকি শ্রীধাড়ার সঙ্গে এই বিষয়ে একমত ছিলেন না। তাই শ্রীমুখার্জি এতদিন বিশেষ কিছু বলেন নি। যে মুহূর্তে নব কংগ্রেস বেশী সংখ্যক আসন দাবী করেছিলেন তখনই শ্রীমুখার্জি আসরে অবতীর্ণ হন। শ্রীধাড়াও বুঝতে পারেন যে ঐ দাবী মেনে নিলে শ্রীমুখার্জির সরকার গঠনে ভূমিকা থাকবে না। অতএব, শ্রীধাড়াও ঘুরে বসলেন।

এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার আগেই হয়ত নতুন করে সমঝোতার আলোচনা উঠবে। কিন্তু তা কি রূপ নেবে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত বোঝা কষ্টকর হয়ে উঠবে। অভিজ্ঞতা এই যে, আসনই মুখ্য। আদর্শ, নীতিগত বক্তব্য বা প্রোগ্রাম এসব গৌণ। কিন্তু এই হরণ-পূরণের মধ্যেও মূল সুর থাকবে শাসক কংগ্রেসকে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে সাহায্য-কারী হিসাবে পাওয়া। শাসক কংগ্রেসকে পুনরায় শাসনে আসতে সাহায্য করা নয়। দুই বামপন্থী জোটই এই তথ্যকে মেনে নিয়ে দুই কংগ্রেস—আদি ও নবকে—কাজে লাগাতে পারে। রাজনীতিতে এমন অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই ঘটে। প্রেম ও রাজনীতির অভিধানে অন্যায় বলে কোন বস্তু নেই।

—সমদর্শী

কলকাতার সুড়ঙ্গ রেলের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সমীক্ষার জন্য আগত ৫ সদস্যের সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ দলের কার্য সমাপ্তিতে তাঁদের বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এঁরা তিন মাস এখানে ছিলেন।

# দেশে বিদেশে

দেশে এখন সাজ সাজ রব। সামনে ভীষণ যুদ্ধ। যার নাম ভোটযুদ্ধ।

প্রদীপ জ্বালাবার আগে যেমন সলতে পাকানো, যুদ্ধের আগে তেমনি শিবির সমাবেশ। "ইন্দিরা হঠাও" ঝাণ্ডা উড়িয়ে ইতিমধ্যে একটি শিবির খাড়া করা হয়েছে। এই শিবিরে আপাতত আছে তিনটি দল—বিরোধী—কংগ্রেস, জনসংঘ ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল। তবে এই শিবিরের সেনাপতিরা আশা করছেন যে, অন্ততপক্ষে স্বতন্ত্র পার্টি অচিরেই তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেবে।

লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে যেভাবে তিন দলের এই সমঝোতা গড়ে উঠল সেটা রীতিমত নাটকীয়। আসলে কথাটা আরম্ভ হয়েছিল বিরোধী কংগ্রেসের সঙ্গে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির। লক্ষটা তখন আর একটু উঁচু ছিল—শুধু "ইন্দিরা হঠাও" না, নির্বাচনের পর যাতে কেন্দ্রে একটা বিকল্প সরকার গড়ে তোলা যায় সেজন্য একটা অভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে ভোটের আসরে নামা। স্বতন্ত্র পার্টির নেতা শ্রীমিনু মাসানির পকেটে এই ধরনের একটা কর্ম-সূচীর খসড়াও নাকি ছিল। কিন্তু আলো-চনা চলতে চলতে কোন এক সময়ে বিরোধী কংগ্রেসের নেতাদের মনে হয়ে থাকবে, যে পার্টি কাগজে-কলমে এখনও সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার পক্ষে স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসঙ্ঘের মতো দলের সঙ্গে একটা কার্য-সূচীর ভিত্তিতে হাত মেলানোর ব্যাপারটা খুব মানানসই হবে না। এই বিলম্বিত বিবেকের তাড়নায় নির্বাচনী সমঝোতার আলোচনা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। কেন-না, শ্রীমিনু মাসানি বললেন যে, একটা সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে ছাড়া অন্য কোন ভিত্তিতে সমঝোতা করার জন্য তাঁর পার্টি তাঁকে ক্ষমতা দেয় নি। মঞ্চের এ পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল স্বতন্ত্র পা আর এক পাশ দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ কর সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল। যে সংযু সমাজতন্ত্রী দল এ যাবৎকাল যে-কে কোয়ালিশনে যোগ দেওয়ার সর্ত হিসাবে মেয়াদ-বাঁধা কর্মসূচীর কথা বলে এসে সেই পার্টি ইদানীং উত্তরপ্রদেশে বিহারের সংযুক্ত বিধায়ক সরকারে যে দিয়ে দেখিয়েছে যে, শাসক কংগ্রেসকে জ করার সুযোগ পেলে পার্টি কার্যসূচী নি বেশী কড়াকড়ি করতে উৎসুক নয়। অ এর সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির অন্য দ পার্টির একটা বোঝাপড়া হতে দেরী হ না। তিনের নামতা ঠিকই রইল, না শুধু কিঞ্চিৎ বদল হল—স্বতন্ত্র পার্টি জায়গায় সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টি বিরোধী কংগ্রেসের নেতারা এক ঢিলে দ পাখী মারলেন। প্রথমত, তাঁরা জানে

...র ও উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে ...পার্টির চেয়ে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট ...র সহায়তা অনেক বেশী মূল্যবান। ...তীয়ত, নিছক দক্ষিণপন্থী দলগুলির ...আতাত গড়ে তোলার বিরুদ্ধে ...র ভিতরে, বিশেষ করে গুজরাট ও ...শূর রাজ্যে যে তীব্র আপত্তি আছে ...ও বিরোধী কংগ্রেসের নেতাদের জানা নয়। সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির ...টা ধার পেয়ে বিরোধী কংগ্রেস তো ...ত এই বদনাম দূর করার সুযোগ ...ল যে, তারা একটা দক্ষিণপন্থী জোট ...র চেষ্টা করছে।

দীর্ঘ আলোচনার শেষে সেই রাত্রে ...দিল্লীতে নিজলিঙ্গাপ্পার ছয় নম্বর জন-...র বাসভবন থেকে তিন দলের যে যুক্ত ...তাহার বেরোল তাতে ...শ দেড়েক ...র মধ্যে সংক্ষেপে এই বোঝাপড়ার ...ণা ঘোষণা করা হল। বলা হল, ...শের সামনে এখন একটা বিকল্প ...স্থার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই ...কল্প ব্যবস্থা করার জন্য আমরা এক ...র নির্বাচনে লড়তে সম্মত হয়েছি।... ...মাদের চেষ্টা হবে যাতে সারা দেশে ...টি লোকসভা কেন্দ্রে একজন করে ...কৃত প্রার্থী দাঁড় করান যায়। এই ...কৃত প্রার্থীকে আমাদের পার্টিরা ...ই সমর্থন করবে। একটি সমন্বয় কমিটি আসন ভাগ করবে এবং প্রার্থী মনোনীত করবে। এই পার্টিগুলি ও যেসব পার্টি সহযোগিতা করবে তাদের নিয়ে ঐ সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে।'

যে তিন দলের মধ্যে এই চুক্তি হয়েছে তারা একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের পৃথক নির্বাচনী ইস্তাহার নিয়ে ভোটের লড়াইয়ে নামবে এবং কোথাও যৌথ নির্বাচনী অভিযানের কোন কথা উঠবে না। নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে ইন্দিরা-বিরোধী ভোটগুলি যাতে ভাগ না হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করার চেয়ে বড় আর কোন উদ্দেশ্য এখন নেই।

সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির একজন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'কে বললে আমাদের অভিন্ন কর্মসূচী নেই? আমাদের কর্মসূচী আছে। তার একটি মাত্র দফা। সেটা হচ্ছে, 'ইন্দিরা হঠাও।'

'কিন্তু তারপর কি?'

'তারপর কি সেটা পরে দেখা যাবে।'

স্বতন্ত্র দল যদিও এখন এই ত্রিদলীয় বোঝাপড়ার বাইরে রয়েছে তাহলেও নির্বাচনের আগে তারা যে এর মধ্যে ভিড়ে না পড়তে পারে এমন নয়। বয়োজ্যেষ্ঠ স্বতন্ত্র নেতা রাজাগোপালাচারি মাদ্রাজ থেকে বলেছেন, কর্মসূচীর কথা আঁকড়ে বসে থাকার কারণ নেই। একবার বোঝা-পড়া হয়ে গেলে ঘটনার চাপে রাজনৈতিক যুক্তি তার নিজের পথ করে নেবে। স্বতন্ত্র পার্টির জাতীয় সম্মেলন হচ্ছে শীগগিরই। সেখানে যদি রাজাজীর পরামর্শ গৃহীত হয় তাহলে 'ইন্দিরা হঠাও' ধ্বজা ধরার জন্য আরও একটি পার্টিকে পাওয়া যাবে।

বিরোধী কংগ্রেস নেতাদের ইচ্ছা ছিল, ভারতীয় ক্রান্তি দলকেও এই শিবিরে সামিল করবেন। ভারতীয় ক্রান্তি দল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে যোগ দিলে উত্তরপ্রদেশে তাদের শক্তি বাড়বে। কিন্তু নেতাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। ভারতীয় ক্রান্তি দলের নেতা চরণ সিং শোনা গিয়ে-ছিল, এক সময়ে বলেছিলেন, ইন্দিরা-বিরোধী দলগুলির মনোনীত একমাত্র প্রার্থী হিসাবে উত্তরপ্রদেশের রায়-বেরিলি কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজী আছেন, যদি নাকি তাঁকে 'ছায়া প্রধানমন্ত্রী' হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। চরণ সিং বলেছেন, তিনি এমন কোন সর্ত দেন নি। সংবাদপত্রে বরং তাঁর নামে এই বিবৃতি বেরিয়েছে যে, ভারতীয় ক্রান্তি দল মহাজোটে যোগ দিয়ে পুঁজিপতিদের প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত

সম্প্রতি ইরাণের ইয়েজদ শহরে যে ট্রেন দুর্ঘটনা হয় তাতে ৪৫ জন লোক মারা যায়।

## কাজীরাঙ্গা ॥ শান্তিকুমার ঘোষ

খড়্গের গৌরব নিয়ে
গন্ডার ফিরছে ঘাসে
ঘাসের ভিতর ঘাসে
সহজে জলায়।

ক্ষত্রিয়ের দিন আজ বহুকাল পর :
দূরে ওই হিমবন্ত পাহাড়ের শ্রেণী,
নীচে ব্রহ্মপুত্র বয় মাতোয়ারা।

এখানে উহারা কেন—গোপন শিকারী
এ যে স্যাংচুয়ারি!
এইখানে গন্ডারের পিঠ খুঁটে খায় নির্ভয়ে পাখিরা,
প্লাবনের দিনে উঠে যায় পাহাড়ের 'পর;
শরবনে বহ্ন্যুৎসব বৎসরান্তে মারীকে তাড়ায়
আগুনের বেড় এক (সভ্যতার বেড় যেন)
ঘিরে ফেলে কাজীরাঙ্গা!

বাইনকুলার ঘুরে যায়...দুলে ওঠে উদ্ভিদ আঁধার
শৈবাল-শয্যায় শুয়ে তন্দ্রা আসে গন্ডারের :
ছায়ার মতন ফেরে খড়্গের শিকারী
অথর্ব ব্যাপারী,
হংকং বাজার থেকে সে এসেছে বহুদূরে কাজীরাঙ্গা;
ভস্ম-অপমান শয্যা ছেড়ে
হয় যদি অতর্কিতে যৌবনের উজ্জীবন
রাইনোর খড়্গে!

## তোমাকে নিবেদিত ॥ দুলাল ঘোষ

কি এমন পেয়ে হাতের মুঠোয়, তুমি পরম নিশ্চিত হলে
সুখ, শান্তি, ভালোবাসা...
চোখের তারায়—
কি সে সংকেত
তুমি ধরে নিলে, কুটিল অন্ধকার ছিঁড়ে
ফিরে পাবে সেই ফুটন্ত সকাল...

আসলে আমার কিছু নেই, না রূপ না যৌবন
প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ক্ষয়ে গেছে দেহ
শুধু পুরনো কাঠামোয় শক্ত বাঁধনে
কোন ক্রমে বেঁচে থাকা—
মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে...
বলো না, কি এমন সাধ্য-সাধনায় তুমি ধরে নিলে
লখিন্দর ফিরে পাবে, লৌহ বাসর ঘরে।

আমি অসহায়, নেই সুখ, শান্তি, ভালোবাসা...
না রূপ, না যৌবন
শুধু কাঁটা-তার ছিঁড়ে পথ করে চলা ছাড়া—
তবে কেন বিপুল প্রত্যাশায় রাত জেগে আছো
বলো না, কি দেখে এমন পরম নিশ্চিত হলে
ধরে নিলে বন্ধ্যা হৃদয়ে—
আমি তোমায় উপহার দেবো রক্তাক্ত গোলাপ...

## তোমাকে ॥ সীমা মিত্র

তোমাকে আগে কতই না ভালো লাগত
দিনে অন্ততঃ একটিবার না দেখলেই নয়—
পাশে বসিয়ে গান গাওয়া গান শোনা
আগামী দিনের তোমার আমার প্রবন্ধের
খরকুটো জমানো।
আনন্দ দিত তোমার ছেলেমানুষী মুখখানা।
সেদিন তুমিই ছিলে যথেষ্ট,
আজ অন্য চাহিদা—তুমি অসহ্য;
যা শুধু 'বার-গার্ল' দিতে পারে
আমি লুটেপুটে নিতে পারি
ঘোর ঘোর চোখে প্রতিটি রেখা দেখার চেষ্টা
যা পাই না তোমার মধ্যে।
তুমি আজ শুধুই ব্যর্থতা
স্নিগ্ধ লাবণ্যময়ী রজনীগন্ধা—অন্য কিছু নও।
হাসনুহানা হতে পারনি!
তাই এখন আমার এত অধঃপতন
তোমার প্রেম দূর থেকে দেখি,
কাছে যাওয়ার সাহস দুঃস্বপ্নে জর্জরিত।
তবু কেন জানি না
মনে পড়ে তোমাকে।

# সুতপা

### শৈলেন রায়

শীতটা এবার খুব জোর পড়েছে। অথচ সকাল সকাল কোর্টে যাওয়া দরকার। একটা জরুরী কেস রয়েছে। হন্তদন্ত হয়ে কালীঘাট ট্রাম ডিপো পর্যন্ত এসে শুনলাম, আজ ট্রাম স্ট্রাইক। গত রাত্রে কী নাকি একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। তাই স্ট্রাইক। রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন ট্যাকসির খোঁজ করছিলাম হঠাৎ একটা গাড়ি এসে পাশে দাঁড়াল। গাড়ির দাঁড়ানো প্রথমে খেয়াল করিনি। কে যেন ডাকল, 'তপুদা ও তপুদা।' গাড়ির জানালায় একটা মুখ। খুব চেনা মতন। অথচ চিনতে পারছিলাম না। ওর চোখে সান-গ্লাস আঁটা।

'আপনি এখনও ঠিক আগের মত আছেন। ভুলো ভুলো মতন। প্রফেসর হলে ভাল মানাতো।' বলে শব্দ করে হেসে উঠল ও। গগলস খুলে হাতে নিল। ওর মুখ বিষম লাল হয়ে উঠেছে। আগেও এরকম হতো। অন্তে বললাম সেই বছর পনেরো তো বটেই।

হঠাৎ মনের খুব নীচু পর্দা থেকে সুতপা জেগে উঠল।

ও ডাকল, 'অমন দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, উঠে আসুন।'

বসতে না বসতেই ও বলল, 'লোকগুলো সবাই কী রকম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।'

'সুন্দরী মেয়ে অনেকেই দেখে।'

'তাই নাকি! চোখ নামিয়ে নিতে নিতে ও বলল, 'তাছাড়া আমি তো আর মেয়ে বলতে যা বোঝায়, তা নেই।'

'সব বয়সেই কিছু কিছু মেয়ে, মেয়েই থেকে যায়।'

'ওমা, আপনি তো আজকাল বেশ কথা বলতে শিখেছেন, আগে তো সাত কথায় এক কথা বলতেন।'

উত্তর না দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। গাড়ি সোজা রাস্তা ধরে চলছিল।

সুতপা একসময় বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে উকীল হয়েছেন, কোন কোর্টে যাবেন?

'আলিপুর।'

সুতপা ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলল, 'আলিপুর।' আমার দিকে ঘুরে বসে কিছুক্ষণ আমাকে দেখবার চেষ্টা করল ও। চোখ না ফিরিয়েও ঘাড়ের ওপর ওর দৃষ্টির স্পর্শ পেতে লাগলাম, ঘাড় শির শির করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গোটা শরীর। মনে হতে লাগল, লোভে পড়ে সুতপার সঙ্গে গাড়িতে না ওঠাই উচিত ছিল, এটুকু পথ হেঁটেই মেরে দেওয়া যেত। শুধু শুধু একটা অস্বস্তি। অথচ অস্বস্তিটা যে কেন, কে জানে।

'অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হল, কতদিন বলুন তো?'

এখানে চুপ করে থাকা চলে না। বললাম, 'বছর পনেরো হবে।'

'মোটেই না। ষোল বছর তিন মাস, দিনক্ষণ পর্যন্ত হিসেব করে বলে দিতে পারি। কিন্তু কী লাভ অতশত হিসেব করে?'

কোন লাভ নেই। চুপ করে রইলাম। গাড়ি হাজরা রোড ধরে পশ্চিম দিকে এগোতে লাগল।

এবারে এসে দেখি, অনেক কিছু পাল্টে গেছে। রাস্তাঘাটে বড় বড় গর্ত, চারধারে জঞ্জাল। থাকেন কি করে এমন নোংরা জায়গায়?'

এতক্ষণে নিজেকে স্বাভাবিক মনে হল, বললাম, 'না থেকে উপায়? খাবো কি?'

পেটে বিদ্যা থাকলে খাবার ভাবনা? ভেরি-অন-সনে একজনও ভাল উকীল নেই। ঠিক পসার জমিয়ে ফেলতে পারতেন।'

'কোলকাতার একটা টান আছে, ছেড়ে যাওয়া যায় না।'

'কিসের টান? কে কে আছে?'

'কেউ নেই। মাটির টান।'

'যা, মাটির আবার টান থাকে নাকি?'

বড় একটা গর্তে পড়ে গাড়ি লাফিয়ে উঠল। আর একটু হলে সুতপা গায়ের ওপর এসে পড়েছিল প্রায়। দূরে সরে যেতে যেতে বলল, 'এই মাটি, তার আবার টান।' ও নাক-মুখ কোঁচকালো, ওকে সুন্দর দেখালো। শুধু যে সুন্দর তাই না, মনে হল, ও তরুণী, ওর বয়স বড়জোর কুড়ি কিম্বা বাইশ। আসলে, মনে মনে নিমেষের মধ্যে একবার হিসাবও করে ফেললাম, সুতপার বয়স সাঁয়ত্রিশ আটত্রিশের কম হবে না কিছুতেই। সেই কবে, বিয়ের পর বরের সঙ্গে বিদেশে চলে গেল। কম করেও বছর পনেরোর আগের কথা। সুতপার ভাষায় অবিশ্যি ষোল বছর তিন মাস।

'আপনি কিন্তু আগে বেশ কথা বলতেন।'

বাধ্য হয়েই হাসতে হল। 'কিছুক্ষণ আগেই বললে, আগে সাতটা কথার জবাবে একটা উত্তর দিতাম।'

সুতপা চোখের ফাঁক দিয়ে কী রকম করে যেন তাকাল। মনে হল ও বিরক্ত হয়েছে। বিরক্ত হলেও, চুপ করে রইল। আঙুলের মাথায় আঁচল পাকাতে পাকাতে এক সময় বলল, 'রাস্তাটা ড্রাইভারকে চিনিয়ে দেবেন!'

'চেনাবার কিছু নেই, সোজা রাস্তা।'

'সোজা রাস্তাও মানুষ মাঝে মাঝে চিনতে পারে না, অলিগলিতে ঢুকে পড়ে।'

বাইরে অগণিত লোক চলেছে, মানুষের চলার বিরাম নেই। বিরাট এই মিছিলের মধ্যে একদিন নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম গন্তব্য না থাকলেও চলার বিরাম ছিল না, চলা, শুধু চলা।

প্রায় বছর পনেরো হয়ে গেল বৈকি। সুতপার ভাষায় ষোল বছর তিন মাস।

সুধাংশু আমাদের সঙ্গে পড়ত কলেজে চটপটে স্মার্ট ছেলে। হৈ-হুল্লোড় নিয়েই আছে। যদিও আমার চরিত্র ওর ঠিক বিপরীত কী করে যেন ভাব হয়ে গেল। শুধু ভাব না, বন্ধুত্বও। সুধাংশু মাঝে মাঝে বলতো 'তুই যে আমার বন্ধু ভাবতেও অবাক লাগে। বন্ধুত্ব হওয়া উচিত ছিল কানাই, অশোক ওদের সঙ্গে, এক নেচারের আমরা। অবিশ্যি এক নেচারের বলেই হয়ত ভাব হল না। আমাদের কুকুরটা দেখে দেখে শেষ পর্যন্ত ভাব করলো কার সঙ্গে জানিস? মোষ্ট ইনোসেন্ট আর শয়তান পুষিটার সঙ্গে। অবিশ্যি তোকে শয়তান বলছি না। কিন্তু কোথায় যেন পুষিটার সঙ্গে তোর একটা মিল রয়ে গেছে।

সুধাংশুর কথায় রাগ করতাম না, ওর কথার ধরনই এরকম। যাকে যা খুশী বলে দেবে। হয়তো এটাই ওর দিকে আকৃষ্ট হবার একটা বড় কারণ।

সুধাংশুদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতাম। ওই জোর করে ধরে নিয়ে যেত, ওর মা নানা রকম খাবার-টাবার দিতেন। ওরা বেশ বড়লোক ছিল। বাড়িতে কাজ-কর্মের লোকজন, গ্যারেজে মোটর গাড়ি, বাড়িটা বড় আর সুন্দর। সেই সব কারণেই ওদের বাড়িতে যেতে ভাল লাগত, না আরও কোন কারণ ছিল, ঠিক বুঝতে পারতাম না।

গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্রীজের ওদিক থেকে ট্রাম, গাড়ি সব আসছে। ওদিক সাফ না হলে এদিককার রাস্তা বন্ধ। সুতপা বলল, 'কোলকাতার মুস্কিল এক পা হাঁটতে গেলেই বাধা।'

হঠাৎ অনেকটা যেন মুখ ফস্কেই বেরিয়ে গেল, 'বাধা যে কাটাতে জানে তার কোন বাধা থাকে না।'

ও কী বুঝল কে জানে, শব্দ করে হেসে উঠল। আমাকে চোখের ফাঁক দিয়ে দেখলেও একবার। আমি এখন ওদিককার জানালা দিয়ে রাস্তাঘাট মানুষজন দেখছিলাম। নাকি কিছুই দেখছিলাম না, শুধু সুতপাকেই দেখছিলাম। সুতপা যেন একটু মোটা হয়েছে। যদিও বসে থাকলে মানুষকে ঠিকমত বোঝা যায় না, তবুও আমি মনে মনে ওকে মেপে নেবার চেষ্টা করছিলাম। একটু মোটা, একটু ফর্সা, গালে একটু মাংসও লেগেছে। চুলগুলো আগের মতই আছে। ছোট করে ছাঁটা, ঘাড় অবধি, বাতাসে ফুর-ফুর করে উড়ছে। মনে হচ্ছে, এই সব চুলে চাপা চাপা একটা মিষ্টি গন্ধ থাকে। অন্তত আগে থাকতো।

কেন যে বিশ্রী কাণ্ডটা করে বসলাম। এক-একটা কাণ্ড-কারখানার জন্যে আজীবন পস্তাতে হয়। কিন্তু ঘটে যাওয়া কাজটা কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যায় না। যদি যেত, এতদিন পর নতুন করে কানের দুপাশ গরম হয়ে উঠতো না।

সেদিন আমাকে বসিয়ে রেখে সুধাংশু এই আসছি বলে বেরিয়ে গেল। ঘরে ঢুকল সুতপা। ও তখন ফ্রক পরতো। ওর পায়ের গোছা বেশ পুষ্ট ছিল, আর ছিল লম্বা লম্বা সোনালী চুল, গোড়ালির ওপর থেকে উরু পর্যন্ত যা দেখে অনেকদিন মনে হত, ওর পায়ে হাত বুললে খুব নরম নরম লাগবে।'

সুতপা আমাকে দেখে যেন বিস্মিত হল। 'ওমা আপনি একা-একা?'

'ও এই আসছি বলে বেরিয়ে গেল, অথচ এখনও এল না।'

সুতপা হেসে উঠল, 'না এল তো কী হয়েছে। আপনি তো আর জলে পড়েননি। পড়লেই বা সাঁতার জানলে উঠে আসা যায়।

ওর কথা শুনে মনে হল, সুতপা আর ছোট নেই। ক্লাশ এইটে পড়া মেয়েরা ছোট থাকে না।

সুতপা এসে একটা চেয়ারে বসল। মাঝে একটা টেবিল। সুধাংশুর পড়ার টেবিল। দুপাশে আমরা দুজন। সুতপা একটা কাগজ পেন্সিল টেনে নিয়ে বলল, 'দাঁড়ান আপনার একটা পোর্ট্রেট আঁকি। নড়বেন না, হাসি-হাসি মুখ করে বসে থাকুন। বেশ পবিত্র পবিত্র ভাব করে। একটা ফুলটুলের কথা ভাবুন না।' কথা বলতে বলতে ও পাকা শিল্পীর মত পেন্সিলটাকে কাৎ করে ধরে কাগজে লম্বা লম্বা টান দিতে লাগল। যে মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, সুতপা যদি সত্যি সত্যি আমার একটা ছবি আঁকে, যে ছবিটার সঙ্গে আমার আদৌ কোন মিল না থাকলেও আমি সুখী হব, ঠিক সেই মুহূর্তে ও নদীতে জোয়ার আসার মত শব্দ করে হাসিতে ভেঙে পড়ল।

হাসতে-হাসতে ওর মুখ লাল হয়ে উঠল। মাথা নুয়ে পড়ল, ছোট-ছোট চুলের গোছা মুখের সামনে এসে চোখ, নাক, কপাল ঢেকে দিল। তখনই হঠাৎ সেই বিশ্রী কাণ্ডটা করে বসলাম। ওর নুয়ে-পড়া মাথায় নাক ছুঁইয়ে চুলের গন্ধ নিলাম, একটা গন্ধ, দারুণ মিষ্টি, খুব মৃদু, অথচ সমস্ত বুকটা যেন সেই গন্ধে ভরে গেল।

সুতপা হাসি থামিয়ে ধীরে-ধীরে মাথা তুলল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'আমি যাই।'

ও চলে গেল। একটা কথা ওকে বলার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ওকে কী করে বলি, আমি কোন ফুলটুলের কথা ভাবিনি সুতপা, আমি শুধু ভাবছিলাম, আমার ছবিটা, যা তুমি আঁকছিলে, তা যতই খারাপ হোক, এমন কি ছবি দেখে আমাকে যদি একটুও চেনা না যায়, তবু আমি দারুণ খুশী হবো, খুশী হবো এই কারণে যে, তুমি আমার ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলে, কয়েকটা মুহূর্ত শুধু আমার কথাই ভেবেছিলে।

সুতপা চলে না গেলেও একথা ওকে বলা যেত না। সুতপাকে একথা বলা চলে না।

গাড়ি চলতে শুরু করল। একটা ট্রাম খটাং-খটাং করে নেমে এল। পাশ দিয়ে চলে গেল। অনেকগুলো লোক বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওদের মধ্যে অনেকেই নির্ঘাৎ সুতপাকে দেখছে, সুতপা দেখার মত।

কানের পাশ দিয়ে চুল সরিয়ে দিয়ে সুতপা ঝুঁকে পড়ল। ঝুঁকে পড়ে পথঘাট দেখতে লাগল। ওকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম, ওর গলা বেশ লম্বা, এই সব গলাকে গ্রীবা বলে। ও একটা সরু চেন পরেছে। ওর চিকন চামড়ার ভাঁজে চেনটা ঢাকা পড়ে গেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল চেনটাকে টেনে বার করি, বলি, 'একটা মোটা চেন পরলেই পার, তোমাদের তো পয়সার অভাব নেই।'

সুতপা হঠাৎ কথা বলে উঠল, 'কলকাতার মানুষদের যে কী কষ্ট! বাসে-ট্রামে অমানুষিক ভিড়!'

যদিও সুতপা বাইরের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল, আমি যেন নিমেষের জন্য ওর চোখের তারায়-তারায় ঘনিয়ে-আসা বিষণ্ণতা দেখতে পেলাম। মনে হল বলি, 'আমার কোন কষ্ট হয় না, অভ্যেস হয়ে গেছে।'

কিন্তু সুতপা তো আমাকে নিয়ে কিছু বলে নি।

ট্রাম পুলের মাঝ বরাবর এসে গিয়েছে। সুতপা তখনও গঙ্গা দেখছে। আমার দৃষ্টিও সেদিকে গিয়ে পড়ল, একটা জায়গায় গিয়ে আটকে গেল। এখন জোয়ার। বড়-বড় গোটা-কয়েক নৌকা ঢেউয়ের দোলায় দুলছে।

আমরা তিনজন। আমি, সুধাংশু আর সুতপা। সুতপা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সুধাংশু বুক ফুলিয়ে প্রথমে গিয়ে নৌকায় উঠল। আমাদের ডাকল। উঠতে গিয়ে হাতে টান পড়ল। সুতপা। ও বলল, 'ধরুন।' ওর হাত ধরে ধীরে-ধীরে নৌকায় পুল পেরিয়ে চেতলায় এলাম, মাটিতে পা দিয়েই সুতপার অন্য মূর্তি। ভীষণ শব্দ করে হেসে উঠে বলল, 'কী ভীতু আপনি, মেয়েদের হাত ধরে পোল পেরোন!' ওর কথায় সুধাংশুও হেসে উঠল। পরক্ষণেই তাড়া দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি চল, মা উঠে পড়লে আর আস্ত রাখবে না। তুই-ই যত নষ্টের গোড়া। 'সবটাতেই ফেউ।' বলে সুধাংশু চোখ দিয়ে সুতপাকে তিরস্কার করল।

সুতপা সঙ্গে সঙ্গে ভেংচি কেটে উঠল, 'ফেউ! আমি ছিলাম বলেই তোমার কালনাকান্ত বন্ধু এপারে এলো, না হলে—' মুখ ছাড়িয়ে শরীর বেঁকিয়ে ও কী রকম এলিয়ে পড়ার ভঙ্গী করল।

সুধাংশু আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুত-পায়ে চলতে লাগল। চেতলায় ওর এক বন্ধুর পেয়ারা বাগান আছে। বাগানে বড় বড় পেয়ারা হয়েছে, সুধাংশু তখন খুব পেয়ারা খেতে ভালবাসতো।

'সুধাংশু এখন কোথায় আছে? আগে মাঝে-মধ্যে চিঠি দিত। বছর দুয়েক ধরে সব বন্ধ করে দিয়েছে।'

সুতপা যেন চমকে উঠে এদিকে ফিরল। 'হঠাৎ দাদার কথা কেন মনে হল?'

ওর এই প্রশ্নটা সত্যি সত্যি বিস্ময়কর। সুধাংশু আমার বন্ধু ছিল। অন্তরঙ্গ বন্ধু।'

'এতক্ষণ পরে হঠাৎ ওর কথা আপনার মনে হল কেন? ঠিক এই জায়গায় এসে?'

গাড়ির চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। ডানদিকে জেলখানার উঁচু পাঁচিল, বাঁদিকে এঁকে-বেঁকে-যাওয়া নদী, নদীর ওপর গোটা কয়েক নৌকাও। ঢেউয়ের তালে তালে ওরা নাচছে। নাচছে না, দুলছে।

সুতপা আবার বলল, 'দাদা এখন কানপুরে আছে। ওর বিয়ে হয়ে গেছে, একটা ছেলেও হয়েছে।' সুতপার গলা হঠাৎ খুব শান্ত শোনাল।

'আমাকে একটা নেমন্তন্ন চিঠি পর্যন্ত দিল না।'

'দাদা ওরকমই, কাউকে নেমন্তন্ন করে নি। একজন পাঞ্জাবী মেয়েকে বিয়ে করেছে। তারপর আপনার খবর কি? বিয়ে থা হলো?'

'আমার খবর তোমার অ-জানা নেই।'

'ওমা, সে কী! আপনি খুব ফেমাস কোন কেউ, যে সবাই আপনার খবর রাখবে?'

'কারও কারও কাছে সাধারণ মানুষও ফেমাস হয়।'

'তাই নাকি? নিজের সম্বন্ধে খুব অদ্ভুত ধারণা তো। বিয়ে না করে শুধু শুধু কী করছেন?'

'কি আবার করবো, খাচ্ছি, দাচ্ছি, দিনগত পাপক্ষয় করছি।'

'প্রেম ট্রেম?'

'মেয়ে পাওয়া গেল না।'

'এত মেয়ে, অথচ পেলেন না?' আঙুল দিয়ে বাইরের দিকে দেখাল সুতপা। তিন-চারটি মেয়ে দল বেঁধে চলেছে, কোন অফিসে কাজ করে হয়তো। 'মাঝেরটি মন্দ নয়। তবে বড্ড রোগা। রোগাই তো আপনার পছন্দ, তাই না? আগে তো তা-ই ছিল।'

বলতে ইচ্ছে হল, তুমি তো কোনদিনই রোগা ছিলে না সুতপা। মোটা না হলেই মানুষ রোগা হয় না।

একথা সুতপাকে বলা যায় না।

জেলখানা ডাইনে রেখে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। এত বেলা হল, অথচ একটুও বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সবেমাত্র ভোর হল। শহরের ঘুম এখনও ভাঙেনি বুঝি। দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা আমার অভ্যেস, আজ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হয়েছিল। একটু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিলাম। কোর্ট বসার আগে একটা জরুরী দলিল টাইপ করতে হবে, শেষবারের মত মক্কেলদের বুঝিয়ে-পড়িয়ে নিতে হবে। শুধু বুঝিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া। একঘেয়ে ক্লান্তিকর। ধুত্তোর কতকগুলো মানুষ, এমন ভাব দেখাবে যেন কিছুই বোঝে না, অথচ তলে তলে কী অসম্ভব শয়তান। সব সময় ফন্দি আটছে কী করে কাকে ঠকাবে, কী করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবে।

'এত প্রফেশন থাকতে উকীল হতে গেলেন কেন?'

'যে কোন একটা প্রফেশন তো নিতেই হোত। ডাক্তার, জজ, ইঞ্জিনীয়ার—'

'ইঞ্জিনীয়ার অনেক ভাল।'

'কি ভাল?'

'বউকে খুব আদরে রাখে। শাড়ি, বাড়ি, গয়না দেয়।'

'আমলে কেন? আর, আর কী দেয়?'

'আবার কী দেবে? মেয়েরা যা যা চায়, সব দেয়।'

'শুধু সঙ্গ দিতে পারে না। কাজ কাজ করে মরে।'

সুতপা চকিতে আমাকে দেখে নিয়ে নড়ে-চড়ে বসল। গলা উঁচিয়ে ডাইনে বাঁয়ে দেখল, বলল, 'মোটেই না। কাজ থাকলে কর্তব্যপরায়ণ মানুষ কাজ ফেলে রাখতে পারে না। বাব্বাঃ, কোলকাতায় যে কী লোক হয়েছে! এদিকটা তো বলতে গেলে শহরের বাইরে, তবু লোকের বিরাম নেই। দেখুন, দেখুন, লোকটা কী রকম দৌড়চ্ছে। এত বড় ভুঁড়ি, যদি পড়ে-টড়ে যায়।' বলতে বলতে সত্যি-সত্যি লোকটা আর একটু হলে পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল। সুতপা হাসিতে ভেঙে পড়ল। ওর মাথা নুয়ে পড়ল। আমার দিকে একটু হেলেও পড়ল। মাথার দু-পাশ দিয়ে ছোট ছোট চুলগুলো মুখের দিকে নেমে এল। ইচ্ছে হল নাক ছুঁইয়ে ওর চুলের গন্ধ নি-ই, পরখ করে দেখি সেই গন্ধটা এখনও আছে কিনা, সেই যে চাপা চাপা মিষ্টি গন্ধটা।

কিন্তু সুতপার চুলের গন্ধ নিতে নেই।

অনেকক্ষণ ধরে হাসল সুতপা। একবার মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল। ওর চোখে জল এসে গিয়েছে, মুখটা অসম্ভব লাল দেখাচ্ছে, দু হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে আবার হাসিতে ভেঙে পড়ল সুতপা। গাড়ি চলতে লাগল। আর একটু দূরেই কোর্ট, আর মাত্র মিনিট কয়েক সময়।

ডাকলাম, 'সুতপা।'

সুতপা উত্তর দিল না।

আবার ডাকলাম, 'সুতপা মুখ তোল। এবার নামবো।'

ধীরে ধীরে মুখ তুলল সুতপা। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'কী অদ্ভুতভাবে লোকটা পড়ে যাচ্ছিল। আর একটু হলে সত্যি সত্যি পড়ে যেত।'

'মানুষকে পড়তে দেখলে তোমার হাসি পায়?'

'হ্যাঁ, অসাবধান হয় বলেই তো পড়ে।'

'সাবধান মানুষেরও পতন ঘটে। কখন যে কার কী হয়!'

ছোট মেয়ের মত ঘাড় নাড়তে নাড়তে সুতপা বলল, 'পথ দেখে না চললেই মানুষ পড়ে যায়। পড়ে নিজেই শুধু ব্যথা পায় না, অপরকেও সময় সময় খুব ব্যথা দেয়।'

আমার তখন মনে পড়ছিল, ভীরু ভীরু মতন একটি ছেলে পায়ে পায়ে বড় হলঘর পেরিয়ে ডাইনে যে ঘরটায় পাখা ঘুরছিল, সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিরাট ঘর, বিরাট একটা টেবিল, সেই টেবিলের সামনে দরজার দিকে মুখ করে বিরাট এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন, চোখে থীক শেলের চশমা, মুখে বিরাট এক চুরুট। ছেলেটি যে ঘরে ঢুকল ভদ্রলোকের সেদিকে খেয়াল নেই। তন্ময় হয়ে ব্রীফ দেখে চলেছেন তিনি। ছেলেটি গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। কিছু একটা বলতে চাইল। কিন্তু তার গলায় কোন আওয়াজ ছিল না।

অনেকক্ষণ পর ভদ্রলোক মুখ তুললেন, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চিনবার চেষ্টা করলেন যেন। বললেন, 'তুমি হঠাৎ এই সময়ে?'

সুধাংশু বলল, 'আপনি ডেকেছেন।'

'হ্যাঁ ডেকেছি। একটা সু-খবর তোমাকে দেওয়া দরকার। নিজেই দিতে চাই।' বলে পাশের ড্রয়ার টেনে একটা প্যাকেট বার করলেন। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে প্যাকেটটা খুলতে খুলতে মাঝে মাঝে

ছেলেটির দিকে তাকাতে লাগলেন, ছেলেটির হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। ভদ্রলোকের সব কিছুই বিরাট, নাক, মুখ, চোখ, আঙুলে সব কিছু। মাথাটাও জল-হস্তির মত। শুধু বুদ্ধিটা অসম্ভব সূক্ষ্ম, মাকড়সার জালের সুতোর মত। সূক্ষ্ম কিন্তু দারুণ শক্ত। এই সুতোর টানে অনেক জটিল মামলা নিজের দিকে টেনে নেন তিনি।

বিয়ের চিঠি।

একটা চিঠি সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'দ্যাখো, ডিজাইনটা পছন্দ কিনা।'

'ডিজাইন দেখাতেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'খবরটাও নিজের মুখে দিতে চাই। এ মাসের দশই, অর্থাৎ আর দশদিন পর সুতপার বিয়ে।'

'না।'

'না মানে?'

'সুতপা এ বিয়েতে রাজী হবে না।'

ভদ্রলোক ভারী শরীর চেয়ারে ছেড়ে দিতে দিতে হাসলেন। হেসে হেসে বলতে লাগলেন, 'একটা বয়সে মেয়েরা খুব সেন্টি-মেণ্টাল হয়, অনেকে সেই সুযোগ নিতে চায়। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে, ভুল পথে চলেছে, তখন খুব তাড়াতাড়ি সামলে নেয়। মেয়েদের এটাই পিকুলিয়ারিটি।' এমনভাবে উনি কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন, যে, মনে হচ্ছিল উনি কোন কলেজের সাই-কোলজির প্রফেসর আর ক্লাশে লেকচার দিচ্ছেন।

'আমি ওর সঙ্গে একবার দেখা করবো।'

'না। তা ছাড়া সুতপা এখানে নেই। বিয়ে কোলকাতার বাইরে হবে। ছেলে বড় চাকরি করে, ইঞ্জিনীয়ার, ছুটি নিয়ে আসতে পারবে না। আমাদেরই যেতে হবে। ইচ্ছে করলে বিয়েতে যেতে পার। এই তোমার নিমন্ত্রণ চিঠি।' বলে একটা চিঠি টেবিলের এদিকে ছুঁড়ে দিলেন। দিয়েই আবার বললেন, 'কিন্তু সেলফ রেসপেক্ট থাকলে যাওয়া উচিত হবে না। সবচেয়ে বড় কথা কী জানো, সুতপা এ বিয়েতে খুশী হয়েছে। এই দ্যাখো, কী লিখেছে।' আর একটা ভাঁজকরা কাগজ এদিকে ছুঁড়ে মারলেন ভদ্রলোক।

'মেয়েরা—বিশেষ করে আধুনিক মেয়েরা কী চায় জানো চায় অর্থ, মান, প্রতিপত্তি। সব কিছুই দীপংকরের রয়েছে। দীপংকরই পাত্র।'

একরকম ছুটেই বাইরে বেরিয়ে এল ছেলেটি। একটা ক্ষ্যাপা কুকুর যেন ওকে তাড়া করেছে। বাইরে অগণিত মানুষের বিরাট মিছিলের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিল সে। চলা, চলা, শুধু চলা।

সুতপার দিকে তাকাতেই চোখে চোখ পড়ল। সুতপা আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। বলল, 'কী ভাবছিলেন?'

অনেকদিন আগের একটা ঘটনা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। প্রায় বছর পনেরো আগেকার।'

সুতপা হেসে বলল, 'ষোল বছর তিন মাস, কি তার চেয়েও বেশী।'

'এবার নামবো।' বলে উঠতে যাচ্ছিলাম।

সুতপা বাধা দিল। 'জু দেখবো। কত-দিন দেখি না। সেই যে আপনি দেখিয়ে-ছিলেন, তারপর একদিনও না।'

গাড়ি থামল না, চলতেই লাগল। নিমেষের জন্য মনে হল, টাইপিস্ট নিবারণ-বাবু ভাঙা টাইপরাইটারটার সামনে বসে রয়েছেন, মক্কেলের দল হয় এসে গেছে না হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। সমস্ত ব্যাপারটাই হঠাৎ খুব অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে লাগল। শুধু অকিঞ্চিৎকর নয়, বিষম একঘেয়ে আর ক্লান্তিকর। সুতপার ওপর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল। মনে মনে বললাম, 'একটা ক্লান্তিকর দিনের হাত থেকে আজ আমাকে মুক্তি দিলে সুতপা। কী বলে যে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো!'

এক এক সময় কী মনে হয় জানেন, মনে হয় এই যে আমরা বেঁচে আছি, একজন আর একজনের সঙ্গে প্রতারণা করছি, দিন কাটছে, রাত হচ্ছে, আবার সকাল আসছে, কী অদ্ভুত, কী বিচিত্র ছলনা!'

'হঠাৎ এ কথা কেন?'

'হঠাৎ মনে হল। আরও মনে হয়, আমরা হয়তো সবচেয়ে কম ভালবাসি নিজেকে। যদি বাসতাম, নিজেকে খুশী করতে চাইতাম। নিজেকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলতাম না।'

ডাইনে বেঁকে গাড়ি উত্তর দিকে ছুটতে লাগল। এদিকটা ফাঁকা। লোকজন খুব কম। দু দিকে বড় বড় বাড়ি। বিরাট বিরাট কম্পাউণ্ড। নিস্তব্ধ এক জগতের মধ্য দিয়ে আমরা যেন ছুটে চলেছি, আমি, আর সুতপা।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, 'তুমি সুখী হয়েছো?'

সুতপা আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। ও যদিও আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিন্তু ওর চোখের ভাষা আমি পড়তে পারছিলাম। সেখানে কোন ভাষা ছিল না। ও আমাকে দেখছিল না। কিছুই দেখছিল না। শুধুই তাকিয়েছিল।

'সুতপা।'

'উঁ।'

'কথা বলছো না কেন?'

'কী বলবো।'

'সব কথা ফুরিয়ে গেছে?'

সুতপা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসল। আমার দিকে তাকাল। ও আবার আমাকে দেখতে শুরু করেছে। 'কী বলছিলেন?'

'না, তেমন কিছু না।'

'তেমন তেমন কথা শুনতে আর ভাল লাগে না তেমন-না কথা বলুন, শুনবো।'

তুমি খুব দুষ্ট ছিলে। দুষ্টু আর রাগী। একবার আমার হাতে কামড় বসিয়ে-ছিলে। এই দ্যাখ।'

সুতপা হাত বাড়াতে গিয়েও গুটিয়ে নিল। 'আর আপনি! আপনি ছিলেন বেজায় বোকা। এখনও সে রকম আছেন?'

'কী জানি। লোকে তো বলে ধুরন্ধর উকিল।'

সুতপা হেসে উঠল। হেসে-হেসে বলতে লাগল, 'লোকে যা বলে বলুক, আমার মনে হয় আপনি আগের মতই আছেন। মুখচোরা আর লাজুক এই যে কাজের ক্ষতি করে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি, মুখ ফুটে বাধা দিতে পারছেন না। বলতে পারছেন না, আমি যাব না, আমার কাজ রয়েছে। আপনি শুধু লাজুকই না, বেজায় ভিতু একজন পুরুষ।' অতর্কিতে সুতপার মুখের ওপর একটা কঠিন ছায়া নেমে এল। ওকে ক্রুর মনে হতে লাগল, ও আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। তাকিয়ে আমার অন্তস্তল দেখবার চেষ্টা করছে। ও আবার বলতে লাগল, 'এই পুরুষদের আমি ঘৃণা করি।' ওর মুখ বিকৃত দেখায়।

'তুমি আমাকে ঘৃণা করো?'

'হ্যাঁ করি। কেন করব না। আপনি ভুলে গেলেও আমি তো ভুলতে পারি না, সেদিন যদি একটু সাহস দেখাতেন, একবার যদি আমাকে ডাকতেন—'

'কোন দিন?'

'কিছুই মনে পড়ছে না আপনার। অথচ এক মুহূর্তেও আমি সেই মুহূর্তের কথা ভুলতে পারছি না। সিঁড়ির ওপরে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। প্রতি মুহূর্তেই মনে করছি, এই বুঝি এদিকে ফিরে তাকালেন, একজন শক্তিমান পুরুষের মত আমার কাছে এসে বললেন, সুতপা এসো—' বলতে-বলতে সুতপা দু হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে বিকৃত গলায় বলে উঠল, 'অথচ আপনি একটা চোরের মত ছুটে পালিয়ে গেলেন। বাবা যা বলেছিলেন, তাই প্রমাণ করে দিলেন।'

একটা হাত সুতপার পিঠের ওপর রেখে গাঢ় স্বরে বললাম, 'সেদিনের ব্যাপারটা তুমি যদি শোনো—'

'আমি আর কিছু শুনতে চাই না। কী লাভ শুনে। আপনি যদি আর একটু সাহসী হতেন তপুদা!' বলতে-বলতে সুতপা মুখ তুললো।

সুতপা কাঁদছে।

গাড়ি চলছে। ঠাণ্ডা হাওয়া গাড়ির মধ্যে ঢুকছে। বাইরে রোদ ঝলমল করছে। একটা উজ্জ্বল দিনের শুরু।

চোখের জল মুছে নিল সুতপা। শান্ত স্বরে ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বলল, 'গাড়ি ঘুমাও। সাবকো কোর্টমে উতার দেও।' আমার দিকে ফিরে ফিস-ফিস করে বলল 'সত্যি-সত্যি একটা সীন করলাম। আপনি যে বলতেন না, মেয়েদের মাথায় কিছু নেই কথাটা খুব সত্যি।' বলে সুতপা আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

বহু দিন পরে শুধু দূর থেকে একটা চাপা মিষ্টি গন্ধ যেন নাকে এসে লাগল। সুতপার চুলের গন্ধ, নাকি গন্ধটা দূর থেকে আসে নি, বুকের মধ্যেই ছিল, ওপরে উঠে এল।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

বিকেলে অশোকবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। চাকুরি ছাড়বার কথাটা তাঁকে বললাম। কেন ছাড়লাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন না, আমিও বললাম না। বললেন কোন হাসপাতালের সঙ্গে যোগ রেখে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করতে আরম্ভ করো তুলসী। বড় রাস্তার ওপরে একটা ভাল ডাক্তারখানা হচ্ছে, যদি সেখানে ঘন্টাদুই বসতে চাও সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

বললাম, দু'তিন দিন পরে জানাব আপনাকে।

ভেতরে গিয়ে অশোকবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল!

বাড়ী ফিরে দেখলাম খাঁচা ঘরে আলো জ্বলছে। দোর ঠেলতে জ্যেঠামণি বললেন, তুলসী, ফিরলি নাকি? আয়।

ঘরে ঢুকে দেখলাম জ্যেঠামণি কি লিখছেন। বললাম, তুমি লিখছ এখন ডিস্টার্ব করতে চাই না। বললেন, তোকে শোনাব বলে এটা লিখছি। এককাপ চা নিয়ে এসে এখানে বোস।

তুমি চা খাবে?

না। তুই খা আমার সামনে বসে তাইতে গরম হয়ে উঠব।

বললাম, এটা তোমার কি কথা হল জ্যেঠামণি?

সত্যি কথা বলা হল। শোন কি আই-ডিয়া মাথায় এসেছে।

ভাবছিলাম সত্য কি? সত্য কি এক না বহু? খটকা লাগে যাঁরা সব হৃদয়-গ্রন্থী ছিন্ন করে সত্যের সাক্ষাৎ লাভের কথা বলে-ছেন তাঁরা ঠিক কথা বলছেন কি?

প্রকৃতির সত্য বলে একটা সত্য আছে, অতি প্রত্যক্ষ সে সত্য। সব জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, সব প্রাণী প্রকৃতির সৃষ্ট, তার বেঁধে দেয়া নিয়মে তারা জন্মে, বেঁচে থাকে, মরে। প্রাণী জন্মাক, বেঁচে থাকুক, বংশবৃদ্ধি করুক, মরুক, এছাড়া প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে প্রকৃতির আর কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য আছে বলা যায় না। বেঁচে থাকবার জন্য প্রকৃতি যে পথ বেঁধে দিয়েছে সেটা হচ্ছে খাওয়া, এ ওকে খাবে। যদি কেউ এ পথ ধরে বেঁচে থাকবার চেষ্টা না করে সে মরবে। প্রকৃতির সত্য সারভাইভেল অব দি ফিটেস্ট, মানে টিঁকে থাকাটাই বড় কথা। মেরে, কেটে, খেয়ে টিঁকে থাকবার বিদ্যায় যে ওস্তাদ সেই হচ্ছে ফিটেস্ট। এ বিদ্যার পাঠ রয়েছে প্রাণীর ইনসটিংকটএ। বংশ পরম্পরায় এই নিষ্ঠুর দানবিকতার উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মেছে সব প্রাণী এবং মানুষ।

ইনসটিংকট থেকে ওপরে ওঠবার কিছুটা চেষ্টা করেছে মানুষ মস্তিষ্কের বা বুদ্ধির বিকাশের ফলে। ইনসটিংকট থেকে বুদ্ধির বিকাশের অনেকদিন পরে যে বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মাথায় এই সত্য ধরা পড়ল যে প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মকে অতিক্রম করতে না পারলে মানুষ হয়ত বর্বরতার যুগ পার হতে না পেরে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মেসোজোইক যুগের অতিকায় প্রাণীদের মতো তিনি মানব জীবনের পরম সত্য আবিষ্কার করলেন। সে সত্য এই যে, ইনস-টিংকটকে বাইপাস করে মানুষকে নিজের মঙ্গলের পথে চলতে হবে, তাকে উপলব্ধি করতে হবে যে ভালবাসা, মৈত্রী, সংযম, সহানুভূতি, দুর্বল জরামরণশীল মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই পথে চলা হচ্ছে প্রকৃতিকে বাইপাস করা। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের বন্ধন যে প্রকৃতির দাস্য-পীড়িত মানুষের মনের মুক্তির উপায়, মানুষের নিশ্চিত আশ্বাস ও নির্ভর লাভের উপায় এই সহজ, সরল সত্য কারুর চোখে পড়ে না।

তাহলে দেখ সত্য এক নয়। প্রকৃতির সত্য থেকে মানুষের সত্য আলাদা কিনা, হৃদয়গ্রন্থী উন্মোচনে নয় হৃদয়গ্রন্থী বন্ধনের মধ্যে মানবজীবনের পরম সত্য রয়েছে কিনা ভেবে দেখ।

বললাম, জ্যেঠামণি, এই আইডিয়ার কথা তোমার মুখে আগে শুনেছি মনে হচ্ছে।

বললেন, তা শুনে থাকবি হয়ত। মাথার আশপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক-দিন ধরে, ভাল করে ধরা দিতে চায় না।

হৃদয়ের বন্ধন বলতে কি বোঝায়?

বললেন, তুলসী সেটা বোঝবার বয়েস হয়েছে তোর। এই চাকুরিবাকুরির ব্যাপার নিয়ে এত ভাবছিস যে তোর বুদ্ধির ধার ক্ষয়ে গিয়েছে, দু'দিন রেস্ট নিয়ে শান দে। তোর মধ্যে আমার মধ্যে, আমার মধ্যে দেবাশিসের মধ্যে যে বন্ধন রয়েছে সেটা কিসের বন্ধন? হৃদয়ের যে আকর্ষণে মানুষ এ ওর কাছে এগিয়ে আসে তাকে বলে হৃদয়ের বন্ধন, ভালবাসা।

বললাম, এই হচ্ছে তোমার মতে মানব-জীবনের সত্য?

আমার মতে হবে কেন? এ সত্য চির-কাল রয়েছে, কেউ দেখতে পায়, কেউ পায় না?

( ৩৪ )

আমার শেষ ইনস্টলমেণ্ট

রবিবার সকালে নয়টা নাগাদ অধর একটা সাইকেল রিকসা ডেকে আনল দেখলাম। মনে পড়ল সকালে চা দেবার সময় তুলসী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সাড়ে আটটায় সে দেবাশিসের বাড়ী যাবে।

একটু পরে তুলসী বেরিয়ে এল। স্নান সেরে নিয়েছে, টাটকা দেখালো চেহারা কিন্তু মুখের ভাব কিছু গম্ভীর মনে হল।

তার দিকে তাকিয়ে বললাম, দেবাশিসের বাড়ীতে যাচ্ছিস? তোর মেজাজ একটু অপ্রসন্ন ঠেকছে মুখ দেখে। একটু বসে মেজাজটা ভাল করে নিয়ে যা।

একটু হেসে বলল, মিছে ভয় পাচ্ছ জ্যেঠামণি। আমার মেজাজ বেশ নরম আছে, যেতে যেতে গলে যাবে।

আর কিছু বলতে ভরসা পেলাম না। মনে হল কালকার মানবজীবনের সত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা কোন ইম্প্রেশান করেনি ওর মনে।

তুলসী চলে গেলে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার রিসার্চ বিভাগ থেকে ধার করা একখানা জার্নালের পাতা ওল্টাতে লাগলাম। দেবাশিসের বাড়িতে তুলসীর এই যাবার ব্যাপারের ওপর আমি বিশেষ গুরুত্ব দেইনি, কারণ, আমার মনে হয়েছিল তুলসীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তার রেজিগনেশন দেবার আসল হেতু জানবার অভিপ্রায় ছিল দেবাশিসের। আমার কাছে জেনে নেবার কথা তুলসী বললেও আমাকে কোন প্রশ্ন করবার ইচ্ছা ছিল না তার।

সাড়ে এগারো বাজে তুলসী তখনও ফিরল না। মহামায়া স্নান করবার তাগিদ দিয়ে বলল, দেরি হতে পারে তুলসী আমিষ রান্না সেরে রেখে গিয়েছে, ভাত হয়ে এল।

আমি উঠছি একজন সাইকেল পিয়ন তার এক চিট নিয়ে এল। জ্যেঠামণি ও পিসিমাকে খেয়ে নেবার অনুরোধ জানিয়ে লিখেছে তার খাবার ব্যবস্থা ওখানে হয়েছে। আড়াইটে নাগাদ ফিরবে জানিয়েছে।

আড়াইটে নয় চারটার পরে তুলসী ফিরল দেবাশিসের গাড়ীতে। দেখলাম গাড়ী থেকে কিছু জিনিসপত্র নামল।

বললাম, তোর ঘড়িতে বোধহয় আড়াইটে বাজে তুলসী?

হেসে বলল, সোয়া চারটে বাজে।

বাজারে ঘুরছিলাম কিছু কেনাকাটা করবার জন্য, মিঃ ভাদুড়ীকে রাতে খেতে বলেছি।

বললাম, এক কাপ চা নিয়ে মিনিট দশ বসতে পারবি কি?

আসছি বলে চলে গেল ভেতরে। কিছু বুঝতে পারলাম না মুখ দেখে, ভাবভঙ্গী দেখে; চুপ করে বসে রইলাম। আধঘণ্টা পরে চা নিয়ে এসে সামনে বসল।

বললাম, কি জবাব দিলি দেবাশিসকে?

কিসের জবাব জেঠামণি?

অবাক করলি তুলসী। দেবাশিস বিয়ের কথা বলেনি তোকে?

না, বলেনে না তো।

তবে কি বলবে বলে ডেকেছিল তোকে?

বলল, সে এক মহাভারত জেঠামণি। চা খাও তুমি, বলছি। তোমার কাছে যখন পড়তেন মিঃ ভাদুড়ী সেই সময় থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের জীবনচরিত শোনালেন। কি ধরনের সাধনা করেছিলেন তিনি, কেন তা করতে হয়েছিল, তখন যে মনোভাব ছিল, এখন যে মনোভাব হয়েছে, তখনকার দেখবার চোখ থেকে এখনকার দেখবার চোখের পরিবর্তনের কথা শোনালেন। জীবনচরিত যা শোনালেন তার প্রায় সবটা চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছেন বললেন। বাকী কথাগুলোতে তোমার ভাষায় তাঁর মধ্যেকার মনস্টার যে সত্যি মরেছে সেটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন। অনেকটা এবড়ো খেবড়ো পথ ভাঙতে হল কথার মধ্যে. আপেল, পিয়ারা আখরোট, খেজুর দিয়ে কফি খাওয়ালেন মাঝখানে, হাতঘড়ি দেখছি দেখে বললেন, এ বেলা এখানে তোমার খাবার ব্যবস্থা করেছি দেরি হতে পারে ভেবে। লোক পাঠিয়ে খবর দিচ্ছি মাস্টারমশাইকে।

তাঁর কথা শেষ হলে বললাম, যে সব কথা বললেন তার খানিকটা আগে শুনেছি আমি।

মিঃ ভাদুড়ী কিছু বললেন না। আরও বললাম, আর দুটি মাত্র কথা বলব, মনে নোট করে রাখুন। প্রথম কথা. আমি কোন সুখ-সুবিধের প্রত্যাশী নই। দ্বিতীয় কথা, পনের ষোল বছর বয়েস থেকে আমার সব ভালবাসা জেঠামণিকে দিয়েছি, তাঁর কাছে যা পেয়েছি তাতে আমার সারাজীবন চলে যাবে।

একটু হাসলেন, বললেন, বেশ, আমার আর কিছু বলবার নাই।

খেয়ে উঠতে একটা বেজে গেল। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করে বেরোবার মুখে তাঁকে রাতে খাবার কথা বললাম, গাড়ীটা চাইলাম। কেনাকাটা করতে একটু দেরি হয়ে গেল।

চুপ করে তুলসীর কথা শুনছিলাম, ভাবছিলাম নানা কথা। উঠে দাঁড়িয়ে কাপের দিকে চেয়ে তুলসী বলল, চা খাওনি দেখছি, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তুলসী কথা শুনছিলে। নতুন চা আনছি।

কিছু বলবার আগে হাত থেকে কাপ নিয়ে চলে গেল।

একটা কথা মোটামুটি বুঝলাম। তুলসী দেবাশিসকে পছন্দ করে, আর একটু এগোতে পারলে পছন্দ ভালবাসায় পরিণত হতে পারে হয়ত। বিয়ে করবার মত মনের ভাব দেখা যাচ্ছে না কেন তার মধ্যে বুঝতে পারছিলাম না। মনস্থির করবার জন্য দেবাশিসকে সময় দিচ্ছে কি? পছন্দ ভালবাসায় পরিণত না হতে পারে এ সম্ভাবনাও রয়েছে। তুলসীর বন্ধুত্ব ছাড়া দেবাশিস আর কিছু পাবে না তাহলে।

সামনে তুলোর বস্তার দিকে তাকিয়ে কখন তা থেকে কাপড় তৈরী হয়ে হাতে আসবে বসে বসে তার দিন গোনবার ইচ্ছে নাই আমার। যা ইচ্ছে হয় ওদের করুক।

তুলসী তার নতুন কাজে যোগ দিয়েছে, অশোক একটা ডিসপেনসারীতে বসবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। মহামায়ার হেঁসেলে ঢোকা বন্ধ করেছে রান্নার জন্য আলাদা লোক রেখে। সংসারের খরচপত্র নিজেই চালায়, দরকার হলে মাসের শেষের দিকে আমার কাছে কিছু চায়। আমি ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার রিসার্চ বিভাগে বেশী করে সময় দিতে আরম্ভ করেছি। চোখ কান মাথা যখন সচল রয়েছে নির্বিকল্প সমাধির দিকে তাদের ঠেলে দিয়ে কি সুবিধে হবে?

কলকাতায় থাকলে দেবাশিস রবিবার সকালের দিকে আসে. দুপুরে খায়, গল্প করে. চা খেয়ে চারটে নাগাদ চলে যায়। আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসে না, তুলসীর নিমন্ত্রণে আসে।

তুলসী নতুন চাকুরি নেবার প্রায় মাস চারেক পরে।

তুলসী তার কাজ সেরে তখনও ফেরেনি। খাঁচা ঘরে বসে একখানা বই পড়ছিলাম। দোরে আস্তে টোকা পড়তে বললাম, এসো।

দেবাশিসকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু আশ্চর্য হলাম, কারণ, শুনেছিলাম সে বাইরে গিয়েছে, আরও এক সপ্তাহ পরে ফিরবে।

সংক্ষেপে জানাল এখানে জরুরী কাজ থাকায় সে আজ সকালে ফিরেছে। তুলসী এখনও কাজ থেকে ফেরেনি শুনে আর বসল না, পকেট থেকে একখানা খামে মোড়া চিঠি বের করে টেবিলের ওপরে রাখল, বলল, চিঠিখানা তুলসীর, তাকে দেবেন। যদি কলকাতা থাকি আগামী রবিবারে আসব।

দেবাশিসের এই অপ্রত্যাশিত আসা, তুলসীর নামে চিঠি দেয়া এবং না বসে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া একটু বিস্মিত করল আমাকে, মনে হল এটাকে রুটিন-মাফিক ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করা যায় না।

দেবাশিস চলে যাবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তুলসী ফিরল। দেখলাম হাসিখুশি চেহারা মুখের, হাতে একগুচ্ছ গোলাপের তোড়া।

হাসি মুখে বলল, আজ অশোকবাবুর বাড়ী থেকে কল পেয়েছিলাম। তার স্ত্রীর অসুখ। রোগীকে পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলাম। এক ডিশ সন্দেশ আর এই ফুল ফিজ পাওয়া গেল।

বললাম, কাপড় বদলে এখানে আয়, একটা কথা আছে।

চেয়ার টেনে বসে পড়ল। বলল, কি কথা বল।

বললাম, কিছুক্ষণ আগে দেবাশিস এসেছিল, তোর নামে একখানা চিঠি দিয়ে গিয়েছে।

চিঠিখানা তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে টেবিলে রাখল। তারপর উঠে হাতের তোড়াটা দুভাগে ভাগ করে দুটো ফুল-দানিতে রাখল। এ কাজ সেরে আবার টেবিলে বসে চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।

যতক্ষণ চিঠি পড়ছিল চোখ রেখেছিলাম তার মুখের ওপরে।

পড়া শেষ হলে আস্তে আস্তে চিঠিটা খামে ভরে আমার দিকে তাকাল।

বলল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? কিছু পাবে না সেখানে। তার চেয়ে তোমার ছাত্রের চিঠিখানা পড়ে ফেল।

একটু দুষ্টামির হাসি দেখলাম মুখে।

খাম থেকে চিঠি বের করে ঠেলে দিল আমার দিকে।

কাপড় ছাড়তে হবে এবার বলে বেরিয়ে গেল খাঁচা ঘর থেকে।

দেবাশিস লিখেছে—

যে কথা এতদিন নানাভাবে তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি কিন্তু বোঝাতে পেরেছি কিনা সন্দেহ উঠেছে মনে কলমের মুখে সে কথা তোমাকে বলবার চেষ্টা করছি।

আমার ইতিহাস খানিকটা জান তুমি। সে ইতিহাস ভাল না। কিন্তু সে ইতিহাসের নায়ক অতীতের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

ছত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে একটা জায়গায়—আটকে গিয়েছে আমার জীবন। এ রকম যে হতে পারে এর আগে কল্পনা করিনি। আমি রিয়ালিস্ট মানুষ, ইন্টেলেকটে বিশ্বাসী, কোন আদর্শবাদে আস্থা নাই আমার। যে কাজে ব্যস্ত থাকতে আমাকে দেখছ তার মূলে রয়েছে নিজের শক্তির ব্যবহার করে এমন কিছু করবার ইচ্ছা যাতে আমার অর্থের প্রয়োজন মিটবে, বহুলোকের অন্নবস্ত্রের সমস্যা মিটবে। যতটা করেছি এ পর্যন্ত তার অনেক বেশী করবার ইচ্ছা আছে। সময়, পরিশ্রম ও মন লাগলে তা করা যাবে হয়ত।

কিন্তু করতে পারব কিনা জোর করে বলতে পারছি না। কারণ, যে মন দিয়ে কয়েক বছর কাজ করেছি সে মনের পরি-বর্তন হয়েছে. কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ তৃপ্তি আর সে খুঁজে পাচ্ছে না।

এতদিন জানতাম আমি অসংসারী মানুষ। ভালবাসা, সহানুভূতি, আণ্ডার-স্টান্ডিং এবং আরও অনেক জিনিস মিলে মানুষের মধ্যে যে সংসারী বা গৃহীদের

বিকাশ হয়েছে সে জল আমার মধ্যে কখনও আসবে না জানতাম। কিন্তু এ ধারণা ভাঙতে শুরু হয়েছিল তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে।

আজ নিজেকে দিয়ে উপলব্ধি করছি আমার কাজ যত আড়ম্বরের হোক, কাজের খ্যাতি যত বিপুল হোক কাজের লোকের খোলসের মধ্যে যে আমি রয়েছি সে আসলে অতি ক্ষুদ্র, দুর্বল জীব। এই ক্ষুদ্র জীবের হৃদয় যে সার্থকতাবোধ বা তৃপ্তি কামনা করে তা কাজের সাফল্য বা অর্থের পথ ধরে আসে না, আরেকটি ক্ষুদ্র মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে বন্ধন স্বীকারের পথে সে সার্থকতা আছে। এই বন্ধন স্বীকারের বাহ্যরূপ গৃহ। দুটি মানুষের মিলন থেকে যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা।

বোম্বের হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে, মৃত্যু সম্ভাবিত জেনে তোমাকে খবর দিয়েছিলাম কেন জানো? চিরদিনের জন্য চোখ বন্ধ করবার আগে একবার চোখ ভরে তোমাকে দেখবার জন্য। কপালে একখানা স্নেহকোমল হাতের স্পর্শ, এক ফোঁটা চোখের জলের জন্য আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়েছিল মন। আর কারো কাছে নয়, একমাত্র তোমার কাছে এই সান্ত্বনাটুকু চাইছিল মন, সান্ত্বনা না পেতে পারে জেনেও একবার দেখবার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি।

তুমি সাড়া দিয়েছিলে আমার প্রার্থনায়। এজন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আজ শুধু এইটুকু জানাতে চাই যে আমার স্বাধীনতা হারিয়েছি আমি। তুমি কি করবে, করবে না সেটা তোমার হাতে।

পড়া শেষ হলে চিঠিখানা ভাঁজ করে খামে পুরে এক পাশে রেখে দিলাম কাগজ চাপার নীচে।

মনে হল হাঁ, দেবাশিসের ভেতরকার মনস্টার মরেছে সন্দেহ নাই, জায়েণ্ট বিজয়ী হয়েছে। এতদিন পরে গৃহকোণের আশ্বাস, সুখ শান্তির কথা মনে এসেছে। সারাদিন কাজের মধ্যে থেকেও মনের ফাঁক ভরছে না দিখেছে, তুলসীকে ভালবাসে লিখেছে। তুলসী রাজি হলে আপত্তি করবার কিছু নাই। তুলসীর মন আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু বিয়েতে রাজি হচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না। ওর বিয়েটা হয়ে গেলে দায়মুক্ত হতে পারি আমি।

দিন চলে যায়।

দেবাশিসের চিঠির কোন উত্তর সে দিল কিনা তুলসী আমাকে জানাল না। চোখে দেখছি তার কর্মব্যস্ত জীবনের ধারায় কোন তরঙ্গ ওঠবার লক্ষণ নাই।

কলকাতায় থাকলে দেবাশিস রবিবারে আসে। লক্ষ্য করছিলাম জরুরী কাজে তার বাইরে যাবার ও নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করবার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে।

এক রবিবারে বেশ সকালে সে উপস্থিত হল। চা খাওয়া হলে উঠে পড়ল, বলল, কাজের জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে আজ, দু সপ্তাহ বাইরে থাকতে হবে।

তুলসী এক চোখ বুজে তার দিকে তাকাল।

বলল, দু চার মিনিট বসুন মিঃ ভাদুড়ী। আমরা মনে রাখব যে আপনার জরুরী কাজ আছে, শুধু সপ্তা লাভ করবার জন্য আটকে রাখব না আপনাকে। আপনার নিজের সম্পর্কেই একটা কথা, যা আপনি ভুলে গিয়েছেন মনে হয়, সেই কথাটা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আমরা।

এই ভারিক্কী বক্তৃতা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম আমি। হেসে দেবাশিস আবার বসে পড়ল।

গম্ভীর মুখে তার দিকে চোখ রেখে তুলসী বলল, বেশী বাইরে যাওয়া বন্ধ করুন মিঃ ভাদুড়ী। এ কথা জ্যেঠামণির তুলসীর নয়, ডাঃ তুলসী ভট্টাচার্য বলছেন। আপনার চেহারা দেখে চট করে ধরা যায় না কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত। অনিয়ম ও বেশী ঘোরাঘুরি চলছে। আপনার খারাপ হেপাটাইটিস হয়েছিল একথা মনে থাকা উচিত। বাইরে যেতে হয় তো মোটা মাইনে দিয়ে যে সব লোক রেখেছেন তাদের কাউকে পাঠান, যতটা কাজ হবার হবে। আপনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন এখন থেকে সাবধান না হলে। Don't take avoidable risks to your health.

আমি দর্শক ও শ্রোতা মাত্র। তুলসীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দেবাশিসের দিকে চাইলাম।

সে হাসছিল। তুলসী থামতে বলল, ভবিষ্যতে সাবধান হব, এ যাত্রা যেতে হবে।

তুলসী বলল, ভেবে দেখুন কাউকে পাঠানো চলে কিনা। যা বলেছি সিরিয়াসলি বলেছি।

তেমনি হেসে দেবাশিস বলল, তুমি ভাল ডাক্তার, তোমার কথা বিশ্বাস করি আমি। এক মিনিটকাল সবাই নিস্তব্ধ রইল।

নিস্তব্ধতা ভেঙে দেবাশিস বলল, ঝোঁকের মাথায় চাকুরি ছেড়ে দিলে, ভেবেছিলাম কাজ শিখে নিলে তোমার হাতে দায়িত্বের খানিকটা ছেড়ে দিতে পারব। একটু ভেবে দেখ না প্রস্তাবটা।

তুলসী হেসে বলল, আবার চাকুরি নিলে কত টাকা বেশী দিতে পারবেন? আপনি যা দিতেন তার চেয়ে বেশী রোজগার করি এখন।

বলল, যদি আসতে রাজি থাক ডিরেক্টর হয়ে আসবে। চাকুরি নিয়ে আসতে বলছি না।

আমি বললাম, ওর কি শেয়ার আছে, না শেয়ার কেনবার টাকা আছে যে, ডিরেক্টার হয়ে ঢুকবে?

বলল, ওকে রাজি করান মাস্টারমশাই, তারপর দেখা যাবে।

বললাম, কি তুলসী রাজি আছিস?

তাড়া দিয়ো না জ্যেঠামণি। ভেবে দেখতে হবে।

এই আলাপের দিন-তিনেক পরে রিসার্চ বিভাগের প্রাইভেট চেম্বারে বসে একখানা জার্নাল দেখছিলাম। দেবাশিস ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে নিয়ে কাছে বসল। জার্নাল সরিয়ে রেখে বললাম, কোন কথা আছে? তুমি বাইরে যাওনি?

পকেট থেকে একখানা লম্বা খাম বের করে টেবিলে রাখল, বলল, জেনারেল ম্যানেজারকে পাঠিয়েছি। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ায় আমার অর্ধেক শেয়ার তুলসীর নামে ট্রান্সফার করে দলিল রেজেস্টারী করা হয়েছে। এই যে দলিল।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তুলসী রাজি হয়েছে?

বলল, তাকে কিছু বলিনি। বোম্বেতে হাসপাতালে থাকবার সময়ে এই ব্যবস্থা করেছিলাম। দলিল রেজেস্টারী করা হয়েছে মাসখানেক আগে।

একটু পরে উঠে গেল, বলল, দলিলটা আপনার কাছে রাখবেন। তুলসীকে কিছু বলবার প্রয়োজন নাই। আরও বলল, কাজে বাইরে যাচ্ছি। তিনদিন পরে ফিরব।

বাড়ী ফিরে, দেবাশিস জানাবার দরকার নাই বললেও তুলসীকে জানালাম সে যেসব কথা বলেছিল। দলিলটা সামনে রাখলাম।

চুপ করে রইল। কি রিঅ্যাকশ্যান হল বুঝতে পারলাম না।

বললাম, দলিলটা রেখে দে।

বলল, তোমার কাছে থাক।

পরের রবিবার দেবাশিস আসল না। তারপরের রবিবারে এসে তুলসীকে কি একটা কৈফিয়ৎ দিচ্ছে মনে হল। তারপর থেকে দেখলাম রবিবারে দেবাশিস একটু বেলা করে আসে, চান করে খায়, কাজ থাকলে একটু বসে চলে যায়, নইলে চারটা পর্যন্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে শেয়ার ট্রান্সফারের দলিলের কথা তুলসী বা দেবাশিস কেউ তুলল না। তারপর এক রবিবারে দেখলাম সকালে দেবাশিসের সাইকেল পিয়ন তুলসীর নামে চিঠি নিয়ে এল তার এক পুরনো আমেরিকান বন্ধু কাল পৌঁছেছেন, তার বাড়ীতে আছেন, এজন্য আজ আসতে পারবে না। পিয়নকে বসিয়ে রেখে একটু পরে একটা স্লিপ এনে তার হাতে দিল তুলসী, পিয়ন সেলাম করে চলে গেল। আমাকে বলল মিঃ ভাদুড়ীকে লিখলাম বন্ধুকে নিয়ে আসতে।

এগারোটার সময় বন্ধুকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে দেবাশিস এসে তুলসীকে ডাকল। তার সঙ্গে তুলসী বন্ধুকে নামিয়ে আনতে গেল।

আমরা তিনজন পেট পুরে খেলাম বারোটা নাগাদ। কিছু কম পড়ে থাকলে তুলসীর পড়েছিল। রান্নাঘরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখবার সাহস হল না।

সাড়ে চারটায় চা ও খাবার নিয়ে তুলসী দর্শন দিল। বললাম, এখন খাবার দিচ্ছিস—

ইংরাজিতে বলল, তোমার জন্য নয় অন্য দুজন ভদ্রলোককে দেয়া হচ্ছে!

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম তার দিকে। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে এমন চেহারা করেছে যে চোখ ফেরাতে দেরি হচ্ছিল, মুখে বোধহয় হাসির মত কিছু এসে গিয়েছিল। বাংলায় ধমকে উঠল, জেঠামণি ভাল হবে না বলছি।

আমেরিকান ভদ্রলোকটি একবার তুলসীর দিকে একবার আমার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে খাবারের ডিশটি নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন। দেবাশিসও তাই করল একটু হেসে।

তুলসীর জন্য শুধু চা এল আমার মত। দেবাশিস নিজের ডিশটা এগিয়ে ধরল তুলসীর দিকে, বলল, দু-একখানা নিমকি নাও।

একখানা নিমকি তুলে নিয়ে তুলসী বলল, ধন্যবাদ।

বোধহয় আবার একটু হাসি এসেছিল মুখে, তুলসী আবার ধমকাল, জেঠামণি, কি হচ্ছে?

চা খাওয়া শেষ হলে দেবাশিস ও তার বন্ধু চলে গেলেন। দেবাশিস জানাল তার বন্ধুটি এক সপ্তাহ তার কাছে থাকবেন ইণ্ডিয়ার কাজ দেখতে, তারপর তাঁকে নিয়ে বেরোবে ক'টা জায়গা দেখতে।

দেবাশিস বাইরে যাবার আগে তুলসীর সঙ্গে কোন কথা হয়েছিল কিনা আমার জানা নাই। দিন-দশ পরে দেবাশিস কলকাতায় ফিরল, বন্ধুটি দেশে ফিরে গিয়েছেন শুনলাম।

মাস-দুই কেটে গিয়েছে এরপর। বাড়ীতে যে ঘরটাতে লেবরেটরী ছিল, তার যন্ত্রপাতি ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার রিসার্চ বিভাগে দান করে কিছু পরিবর্তন করে আমার থাকবার ঘর করে নিয়েছি। খাঁচা ঘর, বাইরের বারান্দা ছেড়ে দিতে হয়েছে তুলসীকে। তার কাছে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার কর্মচারীরা কেউ কেউ, দু-চারজন রোগী আসে, অন্য লোকও আসে। দেবাশিস রবিবারে রবিবারে আসে। কথাবার্তা তুলসীর সঙ্গে হয়। যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

নিজের ঘরে শুয়ে বসে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার রিসার্চ বিভাগ থেকে ধার করে আনা জার্নাল বই পড়ি। ক্যান্সার রিসার্চ সম্বন্ধে কতকগুলো প্রবন্ধ হাতে এসে পড়েছে, মন দিয়ে সেগুলো পড়ি। পার্থিব ব্যাপারগুলোর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল নাকি প্রোঃ প্রমথ গাঙ্গুলী? হেসে নিজেকেই প্রশ্ন করি মাঝে মাঝে। মন বলে শেষ হল কিনা জানি না, তবে তুমি হাত না লাগালে কোন কাজ অচল হয়ে থাকবে এ-অহঙ্কার ছাড়বার সময় হয়েছে। ক্যান্সার রিসার্চের খবর নেবার উপযুক্ত মানসিক অবস্থা এমনিতে এসে গিয়েছে।

একদিন সন্ধ্যার পরে মহামায়ার সঙ্গে তুলসীর আলাপের খানিকটা কানে এল।

তুলসী বলছিল, আচ্ছা পিসীমা, একজন কমিউনিস্ট, ভগবান কিছু মানে না, শুধু মানুষকে মানে, আরেকজন সব মানে, মানুষকে ঈশ্বরের বস্তু বলে মনে করে, একজন নাস্তিক, একজন আস্তিক, এ দুজনের মধ্যে মিল কোথায় পাওয়া যায়?

মহামায়া বলল, বড় মিল তো রয়েছে দুজনের মধ্যে। যে মানুষকে মানে আর যে মানুষকে ঈশ্বরের যন্ত্রমাত্র বলে মনে করে তারা দুজনেই তো মানুষকে মানছে। মানুষের ওপরে বিশ্বাসে দুজনের মধ্যে মিল রয়েছে দেখতে পাচ্ছিস না?

তুলসী বলল, ধরো নাস্তিক যদি আমার গলায় তোমার দেয়া তুলসীর মালা নিয়ে হাসে তাহলে কি মনে করতে হবে?

মহামায়া বলল, হাসি কত রকমের আছে তুলসী, কি রকমের হাসি সেটা জানা হবে। এক রকমের হাসি আছে যা কারো মুখে দেখলে মনে করতে হবে সে তোকে মানে না। তোর গলায় তুলসীর মালার দাম মনের বিশ্বাসে, সোনার মালার দামও মনের বিশ্বাসে। দামী বলে লোকে মনে করে সোনার মালাকে সেইটুকু তার দাম। তুলসীর মালা তোর চোখে দামী সেইটুকু তার দাম। তোকে যে মানে সে কি পারে তোর গলায় তুলসীর মালা দেখে হাসতে? দাদাও তো হাসেন তোর মালা দেখে, তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেখা দেখে, রাগ হয় কি তোর তাতে?

বুঝতে পারলাম খানিকটা। এ সব কথা জানে, তুলসী তবু পিসীমার কাছে নিজের মনের কথার সমর্থন খুঁজছে। ভাল করেছে পিসীমার কাছে গিয়ে, আমার কাছে আসলে বলতাম হয়ত, মুক্তোর মালা মানায় তোর গলায় তুলসী, ওটা কি যে পরেছিস? আমার যা হাসি পায়—

চটে গিয়ে তুলসী হয়ত বলত, তুমি অতি বড় নাস্তিক জেঠামণি, ঝকমারি হয়েছে তোমাকে কিছু বলা।

এ সব প্রশ্নের উৎস কোথায় সেটাও কিছু বুঝলাম বই কি।

দিন কেটে যাচ্ছিল। কিছু কিছু খবর কানে আসছিল মাঝে মাঝে। এই রাস্তার ওপারে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার অফিস বাড়ী থেকে নাকি উঠে যাচ্ছে। হাসপাতালের কাজ ছাড়বার নোটিশ দিয়েছে তুলসী, গাইনো-কোলজিতে স্পেশালাইজ করবে বলে পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হচ্ছে ইত্যাদি।

সেদিন বোধহয় মঙ্গলবার। সকালে খাঁচা-ঘরে একবার উঁকি দিয়েছিলাম, নতুন একটা পেডেস্টের ডালে বড় একটা লাল গোলাপের তোড়া চোখে পড়ল। সারাদিন কেটে গেল, তুলসীর কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। বুঝলাম বাইরে গিয়েছে। সন্ধ্যার পরে হাতে ক'টা গোলাপ নিয়ে আমার ঘরে ঢুকল। ফুল-গুলো একটা ফুলদানিতে রেখে সামনে বসল। একটু যেন অন্যমনস্ক, কিছু ভাবছে। বুঝলাম কিছু বলবে বলে এসেছে। চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিনিট দুই পরে বলল, ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার কর্মচারীদের সুবিধের জন্য একটা মেটার্নিটি হাসপাতাল করলে কেমন হয় জেঠামণি?

বললাম, ভাল হয়। কোথায় হবে হাসপাতাল?

আস্তে আস্তে বলল, এই বাড়ীতে। ক'টা ঘর বাড়াতে হবে, ভাঙ্গাচোরা করতে হবে।

তুলসীর মাথায় প্ল্যানের খানিকটা প্রকাশিত হল। বাকীটা জানবার কৌতূহল দমন করে চুপ করে রইলাম।

উত্তর না পেয়ে চটে গেল। বলল, আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ? স্বর নামিয়ে এসে বলল, তোমার আর পিসীমার জন্য একটা ব্যবস্থা হবে বই কি।

বললাম, বাড়ীটা তোকে লিখে দিয়েছি জানিস, আমরা ভাইবোন মরবার পরে পাবি। এখুনি তাড়াতে চাস নাকি আমাদের। আমার মরবার সবুর সইছে না?

কেমন করে তাকাল, একটু পরে উঠে এসে কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল আগের দিনের মত।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, কেন অমন কথা বললে? আমি কোথায় থাকব তোমাকে ছেড়ে? কে তোমাকে দেখবে? কিছু করব না আমি এ রকম কথা বললে, যেমন আছি তেমনি থাকব।

মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, তোকে না দেখলে আমার দিন কাটতে চায় না তুলসী, তুই আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবি? কি করতে চাস খুলে বলতো।

একটু শান্ত হয়ে মুখ ওঠাল, দেখলাম দু'চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে।

বলল, বলছি। আর বলো না মরবার কথা। যা বলব তাই করবে বাধ্য ছেলের মত, নইলে সব ভেস্তে দেব ঠিক বলছি।

বললাম, ছেলেরা তেমন বাধ্য হয় না তুলসী, পরে দেখতে পাবি, আমি তোর বাধ্য ছেলের শখ মেটাব।

আবার মুখ গুঁজল কোলে। একটু পরে মুখ তুলে বলল, জেঠামণি, যা যা বলব কোন কথা না কয়ে করবে তো ঠিক?

বললাম, একটু আপত্তি করবার ফাঁক দিস তুলসী নইলে আমি যে তোর বাধ্য ছেলে বুঝতে পারবি কি করে? না না করতে করতে শেষ পর্যন্ত হাঁ করব হয়ত তোর মত।

চট করে পায়া উঠে গেল ওপরের দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে ফুট দুই তফাতে সরে গেল, বলল, তোমার কথায় কি মানে হল?

দেখলাম তখনও দু'এক ফোঁটা জল চিক-চিক করছে গালে। বললাম, সব কথার মানে জিজ্ঞেস করা একটা খারাপ অভ্যাস। অভ্যাসটা ছাড়। মানে জানতে হয় মাথা খাটিয়ে জানবার চেষ্টা কর। সে চেষ্টা করতে দেখছি না। যখন জিজ্ঞেস করলি বলছি, ভিন্নভাবে শোন, চটে যাবার পোজ ছেড়ে দিয়ে। বলব কি?

বলো।

বললাম, খাঁচা-ঘরে দেবাশিসের ফটোর দিকে তোকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি অনেকদিন। ক'দিন আগেও আঁচল দিয়ে ফটোখানা মুছতে দেখেছি। একদিন দিন

কাটিয়ে দিলি তানা-না-না করে, এখনও টাল-বাহানা করছিস। বোঝাপড়া করে নিতে এতটা সময় লাগে নাকি? এর মধ্যে মাথায় হাত বুলিয়ে সাত-আট লাখ টাকার শেয়ার মেরে দিয়ে ঈস্টার্ণ ইন্ডিয়ার একজন কর্তা হয়ে বসেছিস, নতুন গাড়ী চড়ে বেড়াচ্ছিস দেখতে পাচ্ছি। দয়া করে বল দেখি আর কতদিন ঝুলিয়ে রাখবি ওকে?

আমাকে অবাক করে দিয়ে হাসতে লাগল তুলসী। দু' ফুট সরে এল আবার, মাথার পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, জেঠামণি, কথা দিয়েছ আমার বাধা হবে?

তা-তো দিয়েছি, কিন্তু কথাটা বলতে দেরি করছিস কেন এত?

বলব, বলব। এ-বাড়ীতে মেটার্নিটি হাসপাতাল করতে পারব তো?

বললাম, যা ইচ্ছে হয় করিস বাপু, বুড়ো বয়সে আমার কপালে দুর্গতি আছে বুঝতে পারছি।

কিছু বুঝতে পারছ না তুমি। তুমি, পিসীমা আমাদের কাছে থাকবে। কাল নিয়ে যাব তোমাদের ঐ বাড়ীতে, দেখবে পিসীমার জন্য কেমন সুন্দর পুজোর ঘর, তুলসী-মঞ্চ তৈরী করিয়েছি। শুভদিন দেখে তুলসী গাছটি ও বাড়ীতে নিয়ে যাব। বুঝতে পারলে এবার?

উত্তর দেবার আগে গাড়ীর হর্ণ বাজল। বললাম, দেখতো কে এল?

হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে চোখের একরকম ভঙ্গী করে বলল, খেতে বলেছি আজ রাতে। তোমরা দুজন আশীর্বাদ করবে আজ।

চুপ করে বসে রইলাম একা।

মিনিট দশ পরে দেবাশিসকে নিয়ে ঘরে এল তুলসী। দেখলাম জমকালো শাড়ি পরেছে, হাতে শাঁখ। দেবাশিসের পরনে ধুতি, পাঞ্জাবি, খালি পা।

বলল, উঠে বসো জেঠামণি। পিসীমা ধান-দুর্বা নিয়ে আসছেন, আশীর্বাদ হবে এখন।

বললাম, শাঁখ বাজাবে কে?

পিসীমা বাজাবেন, না পারলে আমি বাজাব।

বললাম, আশীর্বাদ তো সব সময়ে করছি তোদের, নতুন করে—

বলল, মনে মনের আশীর্বাদ আজ চলবে না জেঠামণি, মাথায় ধান-দুব্বো দিয়ে আশীর্বাদ করতে হবে।

আচ্ছা, তাই করব।

ধান-দুর্বা দুজনের মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করলাম, জীবনের পরম সত্য অন্তরে উপলব্ধি করে সুখে সংসার করো তোমরা।

মহামায়া আশীর্বাদ করল আমার পরে।

মহামায়াকে বাজাতে না দিয়ে নিজেই তিনবার শাঁখ বাজাল তুলসী।

তার কাণ্ড দেখে হাসতে লাগলাম। দেবাশিসও হাসছিল।

শাঁখ নামিয়ে তুলসী বলল, বড়সাহেব, তুমি হাসছ কেন, ওঁদের দেখাদেখি?

মুখ ফেরাল দেবাশিস।

একটু পরে তুলসী বলল, বড়সাহেব, জেঠামণির সঙ্গে গল্প করো বসে, পিসীমাকে নিয়ে আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি, কিছু রান্না বাকী আছে।

মহামায়াকে নিয়ে তুলসী চলে গেল।

দেবাশিস দাঁড়িয়ে ছিল, একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম, বসো।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। অনেক কথা মনে আসছিল। দেবাশিস ও তুলসীরই কথা।

প্রথম যৌবনে ক্ষুরধার বুদ্ধির দর্পে আইকোনোক্লাস্টের উন্মত্ততা নিয়ে দেবাশিস মানুষের জীবন, সমাজ, সভ্যতাকে বিবস্ত্র করতে গিয়েছিল। হয়ত মনে করেছিল তার আগে এ-কাজ আর কেউ করেনি। কালা-পাহাড়ী উন্মাদরা তাই মনে করে।

জীবনের উলঙ্গ রূপ প্রত্যক্ষ করে মনস্টারে পরিণত হয়েছিল সে। শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও। কিন্তু জাতে দেবাশিস মনস্টার নয়। সবজান্তার দর্প ও যৌবনের উত্তেজনা বিপথগামী করেছিল তাকে।

সে উন্মত্ততা কেটে গিয়েছে, জীবনকে ঠিকভাবে দেখবার চোখ তৈরী হয়েছে।

তাই দেখা গেল যৌবনের শেষ পর্বে উলঙ্গ জীবনকে রূপরসের আচ্ছাদনে সাজিয়ে দেখবার তাগিদবোধ এসেছে তার মধ্যে। মানব-জীবনের যে পরম সত্য হিরণ্ময়-পাত্রের আবরণে আচ্ছাদিত রয়েছে, সে সত্যের দিব্যরূপের সন্ধান এতদিনের পর সে পেয়েছে মনে হয়। এর জন্য ভাগ্যের কৌতুকে তাকে সাহায্য ভিক্ষা করতে হয়েছে এমন একটি মেয়ের কাছে যার স্বভাব একেবারে বিপরীত। তুলসী প্রাঙ্গণের পবিত্র আবহাওয়ায়, তুলসী-মঞ্চে মাটির প্রদীপ দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, গলবস্ত্রে প্রণাম করবার অভ্যাস নিয়ে শিশুকালে যে মানুষ হয়েছে, দেবতার একান্ত নিষ্ঠা যার মজ্জাগত।

এটা প্রতিক্রিয়ার ফল নয়, দেবাশিসের আবিষ্কার এটা। মহৎ আদর্শে যার বিশ্বাস আছে, দেবতায় নির্ভরশীলতা আছে সেই তো একান্তভাবে নির্ভরের যোগ্য পাত্রী।

দেবাশিস মাথা নামিয়ে কি ভাবছিল আমার মত। চাইলাম তার দিকে। নিজের মনে বললাম, ভাগ্যের কৌতুক বটে, কিন্তু মিষ্ট কৌতুক। তুলসী ভালবাসতে জানে, জীবনের ফাঁকগুলো, জীবনের সব দৈন্য, ভালবাসার ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দিতে জানে, তার বলিষ্ঠ ভালবাসা মানুষকে সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা দেবার শক্তি রাখে।

বললাম, দেবাশিস, এবার আমাকে ছুটি দিতে হবে। তীর্থদর্শনে বেরোতে চাই।

মৃদু হাসল দেবাশিস, বলল, তুলসীকে বলবেন।

নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে রয়েছি দুজনে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে তুলসী ডাকল, পিসীমা ডাকছেন তোমাকে, এসো। আমাকে বলল, রান্না হয়ে এল জেঠামণি, একটু পরে খেতে দেব।

দেবাশিসকে নিয়ে তুলসী চলে গেল।

কিছুক্ষণ একা ঘরে বসে থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম।

একটা বিষাদের ভাব এসেছিল মনে, ঠেলে-ঠুলে মনের বাইরে পাঠালাম সেটাকে। গেল অনিচ্ছায় একটু ছায়া রেখে।

ভাবছিলাম আমাকে দিয়ে তুলসীর প্রয়োজন তো শেষ হল; সে ভালবাসবার নতুন মানুষ খুঁজে পেল, সংসার পেল, কর্মের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পেল। যে মেয়েটি হারিয়ে যেতে বসেছিল, বারোটি বছর স্নেহে, যত্নে মানুষ করেছি যাকে আজ সে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হল। আমার কাজ ফুরিয়ে গেল।

জীবনের মধ্যাহ্নে গার্হস্থ্য আশ্রম থেকে বুকভরা রিক্ততা ও বিতৃষ্ণা নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম এই আধা-জঙ্গলে, শখের বান-প্রস্থে। বিনা উৎপাতে নিজের সামান্য কাজ নিয়ে থাকব। চির-উৎপীড়িতা ছোট বোনটিকে যতদিন টিঁকে থাকি, নিরুপদ্রব আশ্রয়ে রাখব এই আশা নিয়ে এসেছিলাম। আরও একটু আশা ছিল গোপন মনে, জীবনের নষ্ট ঐশ্বর্যের কিছুটা যদি পুনরুদ্ধারের সুযোগ আসে এই নতুন অধ্যায়ে। নষ্ট ঐশ্বর্য মানে স্নেহ, প্রীতি, মানুষে বিশ্বাস। এ আশার কথা একবার বলেছি গোড়ার দিকে।

চিরকেলে অজাগা মনের, বিজ্ঞানী ভাবনার মানুষ হয়ে অকপটে স্বীকার করছি, ভাগ্যদেবতা সংসার থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত দুর্বল মানুষটিকে অকৃপণ হস্তে এই ঐশ্বর্য দান করেছেন। তুলসীর প্রতি, দেবাশিসের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। রক্ত-সম্পর্কের কেউ নয় এরা, মাথায় করে রেখেছে তবু। তুলসীর ঋণ তো অপরি-শোধনীয়।

অন্ধকারের মধ্যে বসে ভাবছিলাম এইসব। আরও ভাবনা আসছিল। ভাব-ছিলাম তুলসীকে ছাড়বার সময় এসেছে, ছাড়তে হবে তাকে।

কি করে তুলসীকে মুক্তি দেব আমার বন্ধন থেকে ভাবছিলাম। বড় শক্ত কাজ। ভাবনার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম, বুঝতে পারিনি কতটা সময় কেটেছে। অন্ধকারের মধ্যে এক সময়ে কে এসে পাশে দাঁড়াল, বুঝলাম। দু'হাতে গলা জড়িয়ে কাঁধে মাথা রেখে বলল, এমন করে কি ভাবছিলে জেঠামণি? তুলসীর ভার কাঁধ থেকে নেমে গেল ভাবছিলে?

বললাম, আজকার দিনে আর চোখের জল ফেলিস না মা। তোকে কোনদিন ভার বলে মনে করেছি কি, যে আজ একথা বলছিস? বুড়ো মানুষ, ভাবনা করা ছাড়া তার আর কি করবার আছে বল? দেবাশিস কোথায়?

তোমার ও-পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওঠ তো তুই। খেতে দিবি কি এখন?

দেব। এসো আমার সঙ্গে।

হাত ধরে নিয়ে চলল যেন চোখে দেখতে পাই না আঁধারে।

(শেষ)

# সুখের মেলা

## ডালিম ফুলের পরিণতি

জীবনের যত গান আজ সারা রাত ধরে গাইবে সুন্দর। একটা পিলে-মুরগী চুরি করে আনার কথা আছে গোবিন্দর। তার দিদি যদি গাল দেয় তো নাকের ডগায় ধরে দেবে দেড়টা টাকা। কিন্তু মুরগী নয়, আস্ত রক্তঝরা জ্যান্ত একটা খরগোস শিকার করে এনেছে গোবিন্দ। ঝিঙে ক্ষেতের মধ্যে মাথা গুঁজে লুকিয়ে বসেছিল নাকি আর পাকা ঢেলার বাড়ি দিয়েছে কষে এক-ঘা। ছুটল সারা মাঠে খানিকক্ষণ। তারপর আর এক-ঘা দিতেই ঠ্যাং ভেঙে বাঙ্গাধন ভ্যাড্যাং ড্যাং!

তোফা মাংস আর ভাত!

সুন্দরের কাকা নিতাই দলুই বলে গেল, 'একটু দিস্ রে সোন্দর। তাড়ি দিয়ে 'পক্কাবোহোন' মজাসে!'

খেতে বসে গোবিন্দর যেন মনমরা ভাব। সুন্দর ভাবে, একটু তরকারী দিয়ে এলে কেমন হতো ডালিমদের? বলতেই গোবিন্দ ছুটে গেল কলপাতায় মুড়ে নিয়ে খানিকটা মাংস-আলু দিয়ে আসতে।

কুয়াশা নিথর ভোরের আকাশে তখন পান্ডুর চাঁদটা ডোবে ডোবে। গোবিন্দ ঘুমিয়ে পড়েছে কিছুক্ষণ হল। এগিয়ে এসে দাঁড়াল একটা মূর্তি।

চমকে উঠল সুন্দর। ডালিম এসেছে তার কাছে। উঠে পড়ে ছুটে গিয়ে বুকের মাঝখানে চেপে ধরলে ডালিমকে। কতক্ষণ!

ঘুম ভেঙে গেছে গোবিন্দর। সুন্দর উঠে যাবার সময় বাঁশির গোজা লেগে গিয়েছিল তার পাঁজরে। উঠে বসল। উঠোনে দাঁড়িয়ে একটা সরলরেখা। ঢুস্ করে আবার শুয়ে পড়ে গোবিন্দ। ডালিম আসবে সে তা জানত। কথা কথা পাবার জন্যে সে সাহস পায় নি বলবার। ডালিম নিজে বলুক যদি পারে তো।

'সুন্দর!' কান্নাতে ভেজা কণ্ঠস্বর ডালিমের।

'কি ডালিম?'

'পরশু যে আমার বে!' কেঁদেই ফেললে মেয়েটা। কাঁপা কাঁপা হাতে সুন্দরের মাথা মুখ হাত বুলোতে লাগল সে।

'পরশু!' বাঁধন ছিঁড়ে যায়। একটি সরল রেখা ভেঙে দুটো হয়ে যায়। গোবিন্দ দেখে। তারও চোখে জল।

'হাঁ। পরশু। ভৈরবীতলার নিতাই সরদার বাবাকে বলেছে চার কুড়ি [illegible]ব। মা তাতেই রাজি হয়েছে!'

'চার কুড়ি!'

মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে সুন্দরের।

চার কুড়ি টাকা!

পরশু দিন!

'আচ্ছা, তুমি এখন যাও ডালিম। তুমি যাও'...

ধপ্ করে বসে পড়ল সুন্দর। তাহলে তার আর পাওয়া হল না ডালিমকে। ডালিমের পায়ের ওপরে চোখের জল ফেলে মাথা কুটে কুটে কাঁদতে লাগল সুন্দর। ডালিম তার মাথার চুলগুলো কেবল মুঠো করে চেপে চেপে ধরতে লাগল আর ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। শেষে সে সইতে না পেরে সুন্দরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে—নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে—পাগলের মতন হাউ হাউ করে বুক ভাঙা কান্নায় ফেটে পড়ে—ছুটে পালিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে—অন্ধকারে।

হলদির জলে অস্তমান চাঁদের সোনাগলা হলুদ বর্ণের আলো তখনো ঝিলমিল করছে। একটু পরেই সব নিখাদ আঁধারে ডুবে যাব!...

গোবিন্দ উঠে বসে পায়ের ওপরে হাত বুলোতে লাগল সুন্দরের। ধরা গলায় ডাকলে, 'সুন্দর! সুন্দর-দা!'

সাড়া দেয় না সুন্দর। অনড় অসাড়। মারা গেছে বুঝি সে।

বারবার ডাকায় বিরক্ত হয় সুন্দর। লাথি মারে গোবিন্দকে : 'যা শালা বেরো! ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ মারাসনি এখন।'

আরো খানিকটা, তবুও বসে থাকে গোবিন্দ। তার কি দোষ! অভিমানে বুকটা ভারি হয়ে ওঠে তার। উঠে চলে যায় সে ধীরে ধীরে।

সকালে রায়েদের কাজে যাবার কথা। চার-পাঁচজন রাজমিস্ত্রি লেগেছে—জোগাড় দিতে হবে। সে কথা মনেও হল না সুন্দরের। লোক এল। যাবে না, জ্বর। পাঁচ সিকে দেড় টাকা রোজ দেবে, কিন্তু যাবে না বলছে না সুন্দর! বসে বসে দুপুর হল—দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তারপর সন্ধ্যে। না, কিছুই কুল-কিনারা খুঁজে পায় না সুন্দর।

টাকা! টাকা দিয়ে বেচতে চায় অবলা তার মেয়েকে। নিতাই সরদার বুড়ো। টাক-পড়া, দাঁত ভাঙা—অবিকল সেই হোটেল-অলা বেঁটে রামহরির মতন। শুধু বুড়ো বর নয়, সতীনের সংসার। তবে আর নেয় না নাকি নিতাই তার আগের স্ত্রীকে। দশ বিঘে জলজমি, গোয়ালে গরু, পুকুরভরা মাছ; খেতে-পরতে কোনো কষ্ট পাবে না ডালিম। মরার আগে অবলা যে ক'টা টাকা কামিয়ে নিতে পারে ডালিমের বিয়েতে, সেইটাই হবে তার বাকি জীবনের আয়ু।

অবলার কোনো দোষ নেই। দোষ নেই ডালিমের—নিতাই সরদারেরও। টাকার জয় হয় সংসারে। দোষ তার নিজেরই। অন্ধ ভালবাসার। কাকা শুনে বলে, 'দুনিয়াটা বড্ড ফ্যাচাংয়ের জায়গা রে বাবা! কি আর করবি, ছাই মেখে সাধু হয়ে যা!'

সুন্দর শেষে একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেললে মনে মনে। পরদিন বাঁশের 'চোঙা' থেকে সব ক'টি টাকা ঢেলে নিয়ে চলে গেল শহরে। সেখান থেকে ফিরতে বিকেল। বেশ হাসি হাসি মুখটা। ছেলেদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে ড্যাং-কোড়ে খেললে খানিকটা। খেটে খেটে 'নাক্সে দম'। ডালিম ওদিকের জাম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। তাকে যেন গ্রাহ্যই করে না সুন্দর। তাকায় না একবারো ভাল করে ফিরে। সেই থেকে নিতাই দলুইয়ের বাড়িতে তাড়ির আড্ডায়। কাকা বলে, 'তাড়ি খাবি নি, মদ খাবি নি তো কি খাবি র‍্যা ছোঁড়া? ক'দিন বাঁচবি বল! ভাল ভাল ভদ্দরনোকও আজকাল তাড়ি মদ খায়।'

সে তো বটেই। গেলাস পাঁচেক টানলে সুন্দর। গাঁজা ফোটা দু' দু'দিনের কড়া মাল। পেটে পড়তেই বিক্রম শুরু করে দিলে। কাকা-কাকীকে গড় করে উঠোনে গোটা চারেক ডিগ্‌বাজি খেয়ে বেরিয়ে এল সে।

মুখ-আঁধারী সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

নেশায় চুর!

'পা টলে টলে খানায় পড়ে

এতো বড় মজা,

এক পয়সার দারু কিনে

চাট করেছি তাজা!'...

কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে সুন্দর টলে টলে ডালিমদের বাড়ির পিছন দিয়ে ফিরে এল। বাড়িতে এসে টান হয়ে শুয়ে পড়ে রইল ধুলোয়। সেখান থেকে উঠে আবার নদীর ধারে।

আকাশে খন্ড খন্ড কালো মেঘ।

আর একটা রাত। আজ আসবে নাকি ডালিম!

গোবিন্দটাও আর দেখা করলে না। কেন, কেন সে মারতে গেল তাকে? এই ছন্নছাড়া জীবনকে সোনার তারে গাঁথবার কল্পনা সে নিজে যদি না করে তো কে

আর করে দেবে তাকে? আজ যদি তার বাপ থাকত। মা থাকত!— 'বাপ-মা! আর সোনার পাখি বোনটা! কোথায় যে গেল তারা!...

ঝরঝর অশ্রুধারা গড়ায় সুন্দরের দু' গাল বেয়ে।

গোবিন্দও কি তাকে পর ভাবলে!

'গোবিন্দ!' ফক করে কেঁদে ফেললে সুন্দর।

'সুন্দর-দা!'

'গোবিন্দ!' বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধরে সুন্দর গোবিন্দকে।

পাড়ার লোকে আর আত্মীয়-কুটুম্বের ভিড়ে অবলার বাড়ি-ঘর মুখরিত। বিয়ে হয়ে গেল ডালিমের, নিতাই সরদারের সঙ্গে। নগদ দু' থান সোনার গয়না। চার কুড়ি টাকা। ঢলঢলে আগুন রঙের পেটো শাড়িটা ডালিমের দেহের ঢেউয়ের বাঁকে বাঁকে ভাঁজ ভাঁজ হয়ে লেপটে রয়েছে। আহা! চোখ দুটো যেন জুড়িয়ে যায় ডালিমের পানে তাকালে!

আর ওই নাকি বরের ছিরি! সামনের দাঁত ভাঙা। টোপর হড়কে পড়ে যেতে মাথার ওল বেরিয়ে পড়ল। মেয়েদের খিল খিল হাসি। 'বরের বাবা বর! গালে মাংস নেই। খাঁড়-পাঁজরে চেহারা!... না হয় দুটো টাকাই আছে। ডালিমের ডালিম ফুলের মতন যৌবন নিয়ে কি করবে ও বুড়ো?' কিন্তু...সুন্দর বিয়ে-বাড়িতে গেল। গেল আর ফিরে এল তার দেবার জিনিস ক'টা দিয়ে।

শাড়ি, ব্লাউজ, রুপোর ছ'গাছা চুড়ি, সাবান, বাস-তেল, সিঁদুর! এমনি করে চল্লিশ টাকার মালপত্র। সব দিয়ে এল ডালিমকে।

কাঁদতে লাগল ডালিম উভরায়।

অবলা এক সময় কাজের ফাঁকে বললে, 'আহা অমন 'ছাওয়াল' আর হয় নে গো! কোথা গেল সে? দেখ লো তোরা কেউ!'

ফিরে এসে সুন্দর একটা কাটারী দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেললে প্রথমে রক্তরাঙা ডালিম ফুলের গাছটাকে! তারপর কাটলে থোকা-থোকা সাদা সাদা ফুলে ভরা কামিনী ঝাড়টাকে! সাদা খইয়ের মতন ঝরা ফুলে তার উঠোন ভরে গেল!

গোবিন্দর সঙ্গে একবার দেখা করে আড়বাঁশিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে বাঁসুলী ছেড়ে।

ক'দিন পরেই শ্বশুর-বাড়ি থেকে গাঁয়ের পথে ফিরে এল ডালিম। ঘাটে দেখা গোবিন্দর দিদি সাবিত্রীর সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলে সে সুন্দরের কথা।

গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে সুন্দর।

যাবার বেলা শুধু নিয়ে গেছে তার আড় বাঁশিটা। কেটে ফেলে দিয়ে গেছে ডালিম আর কামিনী গাছ দুটো, তাদের উঠোনের।

গোবিন্দ বললে, 'কোথায় শহরের কোন চালকলে কাজ করবে বলে চলে গেছে সুন্দর।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস পড়ল ডালিমের বুকের পাঁজর ভেঙে।

তারপর দু' দুটো বছর:

সিঁথির সিঁদুর মুছে ফিরে এল ডালিম বাঁসুলীতে। মা তখন তার মারা গেছে। আছে যৌবনের আগুনভরা দেহ। আর হৃদয় জোড়া অসহায়তা।

ঘরটা লাদনা, ডাঁসা, আড়কাঠা, পাড় দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে বুড়োর মতন হুমড়ি খেয়ে আছে। চালে কাক বসে না প্রাণ ভয়ে।

হলদির হাওয়ায় গোপন কানাকানি। মানুষে মানুষে। ডালিমের রূপের আকর্ষণ যেন বিষাক্ত শায়ক। মানুষের অন্তরকে বিদীর্ণ করাই যেন ধর্ম।

কোনো সংস্থান নেই ডালিমের বাঁচার মতন। স্বামী মরার পর সতীন চন্ডী আবার এসে হাত-পা ছড়িয়ে জুড়ে বসল সংসারে। মুখে তার তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম সর্বদাই যেন খই ফোটে। লাঞ্ছনা আর গালমন্দ। সে নাকি তার রূপের ফাঁদে ফেলে তার শায়-শক্ত মানুষটার মাথা খেয়েছে চিবিয়ে। মুড়ি-ঝাঁটা মেরে তাকে দিয়েছে দূর করে খেদিয়ে। কিন্তু এতখানিরও বুঝি দরকার ছিল না। ডালিম কোনো একদিন চলেই আসত বাঁসুলীতে।

কিন্তু বাঁসুলীতেও যে আগুনের জ্বালা!

মাটাও যদি আজ থাকত তার!

ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা! জীবিকা সংগ্রহের জন্যে পথে বের হতে হয় ডালিমকে। ফাগুনের শুকনো হলদির হাঁটুজল পার হয়ে সিধু বৈদ্যদের বাড়িতে যেতে আসতে দেখা হয় কত লোকের সাথে। তাদের চাউনিতেও কেমন ধরনের কুটিলতা।

নিতাই দলুই সম্পর্কে কাকা হলে কি হয়: বলে, 'ডালিম, তুই আমার ঘরে আয়। পাঁচজনের মুখ বন্ধ করে দোষ পাঁচ গন্ডা টাকা খরচা করে এক পেট খাইয়ে দিয়ে।'

'বুড়ো হয়ে মরতে যাও খুড়ো...ছিঃ! ছিঃ! এ কি কথা তোমার!' কেঁদে ফেলে ডালিম।

অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়—দেখা হয় না শুধু সুন্দরের সঙ্গে। কতদিন দেখে নি সে সুন্দরকে! কেমন আছে সে?

কচি কচি কিশলয়ে ভরে গেছে শীতে পাতা ঝরা গাছগুলো। কোকিল ডাকে দুরন্ত সুরে। দখিনা বাতাসে মিশ্র ফুলের গন্ধ।...হলদির ওপারে ডুবছে রক্তকরোজ্জ্বল সূর্যটা। ঠোঁট দুটো শুকনো। আঁচলে বাঁধা দুটি চাল। ঢেঁকিতে 'পাড়' দিয়ে দিয়ে গোটা দেহ বেয়ে যত ঘাম ঝরে পড়েছে তারই কেমন যেন ভ্যাপ্সা গন্ধ। ক্লান্ত পা দুটো টলছে। এমনি একদিনের পড়ন্ত বেলায় হঠাৎ পথে দেখা হল তার সুন্দরের সঙ্গে।

কালো, শীর্ণ চেহারা। গায়ে ময়লা হাফ সার্ট। পায়ে টায়ার কাটা স্যান্ডেল, পরনে কলাপাতা রঙের হেটো লুঙ্গি। হাতে আড়বাঁশি। চোখ দুটো অঙ্গারের মতো জ্বল জ্বল করছে কোটরের ভেতরে। নাকটা খাঁড়ার মতন জেগে উঠেছে। চুল-গুলো এলোমেলো।

চোখে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল।

একটা মুহূর্ত। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে চলে গেল।

বুকের মধ্যে তখনো বানবন্যা বয়ে চলেছে কূলে কূলে আছাড় খেয়ে।...

একটা কথাও বললে না সুন্দর। কত রোগা হয়ে গেছে। চালকলের তেলকালি ময়লা ধুলোয় সুন্দর হারিয়ে ফেলেছে তার গ্রাম্য শ্যামশ্রী। চেনাই যায় না সহজে। কিন্তু কথা বললে না কেন সুন্দর? কি অপরাধ করেছে সে তার কাছে!

কান্নার চাপে গুমরে ওঠে ডালিমের বুকের ভেতরটা। সুন্দর এসে কোথায় গেল কে জানে! বনজঙ্গলে ভরে গেছে তাদের বাড়ির উঠোনটা। বন্য শ্বাপদের নির্বিপদ আস্তানা। কেটে ফেলা ডালিম আর কামিনী গাছ দুটোর গোড়া থেকে আবার গ্যাজ বেরিয়ে ঝাড় বেঁধেছে। ছিটে বেড়ার নোনা-ধরা দেওয়ালের কংকাল বেরিয়ে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। ডালিম নির্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে ফিরে এল।

পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গেছে তখন।

পরদিন সাত-সকালেই হরিণপুরের জমিদার দুর্লভ চক্রবর্তীর খলিফা গোমস্তা বুড়ো সনাতন পোদ্দার এল ডালিমের বাড়িতে।

'রাজাবাবু ডাক কইরেচেন। ক' বছরের খাজনা বাকি। নিলেম হয়ে গেছে। ভিটে-

মাটি ছাড়তে হবে দিদ্‌ঠাগরোন।' ট্যারা চোখে ট্যেরিয়ে ট্যেরিয়ে কথা বলে সনাতন। খোলা ঠোঁটের বাইরে তার বড় বড় দুটো দাঁত। ফুটো করে সোনার টিপ পরানো। লম্বা হয়ে পানের পিক ঝরে পড়েছে পরিপুষ্ট বুক পকেটঅলা পাঞ্জাবিটায়।

'দাঁড়াও বাবু, নিতাই খুড়োকে ডাকি।'

'আরে মাগী, চ' তুই আগে। রাজাবাবু রেগে তালপাতা! কার ঘাড়ে ক'টা গর্দান আছে—বাবু বলে, ছুঁড়িকে বেঁধে আনবি!'...

নিতাই এল। গড় করলে গোমস্তা বাহাদুরকে!

'দশ বচ্ছরের খাজনা বাকি! তা না দিস বাবুর সঙ্গে একবার দেখা কর। পায়ে-হাতে ধরে একটু... মানে হেঁ হেঁ'...

'তাতো বটেই—তাতো বটেই!' সায় দেয় নিতাই।

সনাতন তাকে একটা বিড়ি দিয়ে বলে, 'ধরা রে নিতে।'

ডালিম জানে এ ডাকের অর্থ কি! দিন চারেক আগে হঠাৎ পথের মাঝখানে দেখা দুর্লভ বাবুর সঙ্গে। পানশী থেকে নেমে বাড়ি যাচ্ছেন। সঙ্গে দারোয়ান। হাতে বন্দুক আর ঠোঁট দিয়ে রক্তঝরা গোটা দুই মানিক জোড় পাখি! পথরোধ করে বললেন, দাঁড়াও! কোথায় বাড়ি?'

বাবুর গায়ে ভুর ভুর করছে মদের গন্ধ। জুলপির চুলগুলো রূপোর মতন সাদা চকচকে। চোখে ভারি পাওয়ারের সোনার চশমা।

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে যেতেই বাবু চিবুকটা ধরে তুলে তার মুখটা দেখলে। বললে, হুঁ! কোথায় বাড়ি গো কুন্দকলি?'

'বাঁসুলীতে। বাসুদেব হাজরার মেয়ে আমি।'

'বিয়েতো হয়েছে, কত টাকা লাগবে জিগেস করো তো কাকা। টাকা আমি দেব।'

'আঃ মর মাগী। পিপীলিকার ডানা হয় মরিবার তরে। টাকা যদি দিতে হয়, তো দুনো টাকা দিতে হবে, পারবি?'

সনাতন গোমস্তা হাত-পা ছটকাতে থাকে।

'একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলে নুন কিনে মর্তে যায়—টাকা! মোজা কথা! টাকা! হারামজাদীর কথা দেখ না! এখন এই কথার দরুণ তোকে পনেরো দিন বাবুর পা টিপিয়ে তবে ছাড়ব!'

তোর আর তোর লোকা (পতিতার পালিত নাগর) বাবুর মাথায় মারি আখোরা ঝাঁটা; বেরো হতচ্ছাড়া, হাড়হাভাতে, পোড়ার মুখো, মিনসে। দালালী মারাতে এসেছ! বেরো বলছি!'...

গাছ-কোমর বেঁধে ঝাঁটা হাতে নিয়ে দাপিয়েই এগিয়ে আসে ডালিম।

নিতাই হাঁ করে থাকে। সাক্ষী হবার ভয়ে পাশ কাটায় 'আসছি' বলে।

মেয়েটার কি 'আস্পদ্দা'। দুর্লভ চক্রবর্তীর নাম শুনলে গর্তের সাপ গর্তে সেঁদিয়ে যায় লজ্জ পুটিয়ে আর তার মহামান্য গোমস্তা বাহাদুরকে কিনা ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করা!

'কত বড় বাচাল মাগী তুই, দেখিয়ে তবে ছাড়বে এই সনা গোমস্তা। হাড় পেকে গেছে তোর মতন কত গন্ডাকে এই দু'ট্যাকে খুঁসে। দিনে পাঁচটা-দশটা! বিধবা, সধবা, কুমারী, যা কে ইচ্ছে।'...

'বেরো ছোটলোক, জিব খসে যাবে তোর। বেরো!' ঘা দুই ঝাঁটার বাড়ি কষিয়ে দিতেই হাতের ছড়িটা খুঁজে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বটে কিন্তু তারপর হঠাৎ পাঁই পাঁই করে ঝাছা-কোঁচা খুলে দৌড় মারলে সনাতন গোমস্তা। কেননা ঝাঁটা ফেলে বঁটি খুঁজতে দৌড়েছিল ডালিম: 'গুহোর বেটাকে আজ কুঁচিয়েই ফেলব আমার উঠোনের মাঝখানে। রক্তগঙ্গা বইয়ে দোব।'

পাড়ার লোক শুনে ভয়ে আর বিস্ময়ে দিলে গালে হাত। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে আড়ি।

গোবিন্দ বলে, 'জলে কুমীর না থাকাই ভাল। মাছটাছ সব শালা খেয়ে ফেলবে।'

নিতাই দলুই বলে, 'ডালিম ই-কাজটা কিন্তন তোর ভাল হলনি কো। জমিদার-বাবু য্যাখন ডেকেছে ... এগবার'...

কেন কার জন্যে তার দেহকে লাঞ্ছিত করতে চায় না ডালিম, অতুল উদ্দাম সম্ভোগকে সে পায়ে ঠেলে ফেলে দিতে গেল কিসের জোরেতে—কিসের আশায়?

কান্নায় ভেঙে পড়ল ডালিম। তার কালো আকাশ বুঝি আরো কালো হয়ে গেল।

বড় অসহায় অজ্ঞ সে।

বাইরে থমথমে রাত। পৃথিবী জোড়া জটিল রহস্যের মৌনতা। আশপাশের বন-বাদাড়ে খস্‌খস্‌ শব্দ।

বুক ঢিপ ঢিপ করছে ডালিমের।

ক্ষীণায়ু লম্ফের আলোটা মৃত্যুর পূর্বে হেঁচকি টানতে শুরু করেছে। ভাঙা ছাউনির ফাঁক দিয়ে এক টুকরো আকাশে জ্বলজ্বল করছে কতকগুলো তারা।

বুক ভাঙা কান্নার সমুদ্রে কালবৈশাখীর গর্জন:

চারপাশে বিষাক্ত ছোবল হানবার জন্য ফণা তুলে দুলছে ঢেউয়ের ভুজঙ্গরাশি।

'মা! মাগো!'

কালরাত্রির মৌনতা ভেঙে হঠাৎ কে যেন ডাক দেয়:

'ডালিম!'

চমকে উঠে ঘরের এককোণে জড় হয়ে বসে ডালিম। হাতে টেনে তুলে নেয় একখানা গাছ কাটারী।

ভাঙা আগড়ের পাশে এসে দাঁড়ায় লোকটা।

'ডালিম!'

'কে? সুন্দর! সুন্দর! তুমি!'

'হাঁ।' আলোটা নিভে গেল হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া লেগে। দোরটা খুলে বেরিয়ে এল ডালিম।

অন্ধকারে হাতখানা বাড়িয়ে সুন্দর একখানা হাত ধরলে ডালিমের।

সহায়হীন দুর্বলতা আর অবলম্বন লাভের আকস্মিক উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে ডালিমের দেহটা। পড়ে যাবে নাকি ডালিম! অসুস্থ! সুন্দরের বুকের ওপরে মাথা গোঁজে ডালিম।

কিন্তু সুন্দর বলে, 'এস তাড়াতাড়ি।'

'কোথায়?'

'পরে বলব। আমি যেখানে যাব যেতে যদি আপত্তি না থাকে তো চলে এস চট করে। সময় নেই। পেছনে বিপদ!'

তারার আলোর অচেনা পথ চিনে দুজনে চলেছে হাত ধরাধরি করে। শিথিল আঁচল টেনে কোন্‌ উন্মন মায়াবিনী চলে গেছে কবে তারার কুসুম ছড়িয়ে সারা আকাশের ছায়াপথ বেয়ে।

পৃথিবী গভীর তন্দ্রায় সুসুপ্ত।

ঝুু ঝুু শব্দে ঝিল্লী ডাকে।

রাতচরা পাখি ডাকে একটানা গভীর কুহক-স্বরে।

জমাট হিমশৈল গলে গলে পড়ছে সুন্দরের সুখকর স্পর্শোত্তাপে। অক্লান্ত—অঝোরে! বুকের পাষাণ ভাঙা কান্না বুঝি আর বাগ মানে না ডালিমের।

সুন্দর বলে, 'জমিদারের পেয়দা-পাইক আজ রাত্রে তোকে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে নিয়ে পালাত। যে কদিন এই বাঁসুলীতে ফিরে এসেছিস ডালিম, আমার সোনামুখী, তোর পাশে পাশে থেকে আমি পাহারা দিইচি। অবস্থা দেখে ফিরে গেছি শহরে। কদিন 'ইস্টাইক' গেল। তাই ফুরসত পেতুম আসবার। গোবিন্দ সব খবর দিত আমাকে। তাই ... একটা ঘরও ঠিক করে রেখে এইচি।'

কিছুক্ষণ পরে আবার বলতে থাকে সুন্দর, 'কি হালে আমার দু-দুটো বছর যে কেটেছে ডালিম, তুই যদি জানতিস! কত রাত কত দিন তোর কথা ভেবেছি। কত কেঁদেছি—কত বাঁশি ভেঙে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু মধুমুখী তোকে আমি ভুলতে পারিনি। তোর খোঁপায় দেওয়া সেই রাঙা ডালিম ফুলটার কথা মনে পড়ে ডালিম?'

'হাঁ। মা বলেছিল, ভালবাসার রাঙা ডালিম ফুল!'

তারার আলোয় অশ্রুভাসা ডালিমের মুখখানা করতলে ধরে চুম্বন করলে সুন্দর। বললে, 'যদি কোনোক্রমে আজ আর না আসতে পারতুম ডালিম, আর কোনো দিন তোকে দেখতে পেতুম না। তুই হঠাৎ খরিশ কেউটের মতন সনা গোমস্তাকে ছোবল হানবি আমি ভাবতেও পারি নি। আজ রাত্রে খুব অঘটন ঘটত তোর কপালে—খুব ভয় করছিল না?'

'সুন্দর, তুমি আমার পাখি, আমার সোনা!' ডালিম তার হাসিকান্না মাখা মুখ-খানা চেপে ধরলে সুন্দরের বুকের মাঝ-খানে। সাহারার হাহাকার জ্বালা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে আসে। গভীর প্রশান্তিতে তন্দ্রাঘন চোখ দুটি আরো বিহ্বল হয়ে আসে ডালিমের। টপ্‌ টপ করে দুটো চোখের জল ঝরে পড়তে থাকে সুন্দরের, ডালিমের মাথার ওপরে।।

—আবদুল জব্বার

# সাহিত্য ও সংস্কৃতি

## সংস্কৃতি

মননশীল লেখক ও প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী দিলীপকুমার রায় তাঁর 'ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ' নামক সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থে সংস্কৃতি বিষয়ে লিখেছেন—

'সংস্কৃতি শব্দটির বৈদিক অর্থ মন্ত্রাদি-শোধন : কিনা, শুদ্ধিদান—মন্ত্রশক্তির সাহায্যে। সংস্কার বলতে বোঝায় যে রিফর্ম তারি সগোত্র—কেবল আধ্যাত্মিক ইমেজ আছে, এই যা। সাহেবি 'কালচার' শব্দটির প্রতিরূপ হিসেবেই বাংলায় এ-শব্দটির প্রবর্তন করেন প্রথম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। আমাদের বাংলাভাষাকে তিনি ঢেলে সাজিয়েছেন তাঁর অসামান্য প্রতিভায়, তাই তাঁর কথা না শুনবে কে?'

কৃষ্টি কথাটি তিনি পছন্দ করতেন না। তাসের দেশে কৃষ্টি নিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার মধ্যেই তাঁর মনোভঙ্গী পরিস্ফুট। এ ছাড়া ১৯৩২-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে একটি চিঠিতে লেখেন—(এই গ্রন্থে অংশত উদ্ধৃত)—

'কালচার শব্দের একটা বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েছে—চোখে পড়েছে কি? কৃষ্টি! ইংরেজি শব্দটার আভিধানিক অর্থের বাধ্য অনুগত হলে ঐ কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে? - এঁটেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কামড়ে ধরে, ভাষার গায়ে ওটাও তেমনি কামড়ে ধরেছে। মাতৃ-ভাষার প্রতি দয়া করবে না তোমরা? অন্য প্রদেশের ভদ্রতাবোধ আছে। এই অর্থে সেখানে ব্যবহার হচ্ছে 'সংস্কৃতি'।'

রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের কারণ হয়েছিল কৃষ্টির যথেচ্ছ ব্যবহার—আজ অবশ্য বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি শব্দটির যথেষ্ট প্রচলন ঘটেছে। সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলা। দিলীপকুমারের এই গ্রন্থে সেইসব দিকই প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। সেইদিক থেকে গ্রন্থটির নামকরণ সঙ্গত হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন উঠতে পারে। লেখক এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন—

'প্রবন্ধগুলির এ নামকরণ করেছি কেন এ প্রশ্ন স্বতঃই অনেকের মনে উদয় হতে পারে, অর্থাৎ কেন 'ধর্মবিজ্ঞান' নামকরণের শেষে 'শ্রীঅরবিন্দ' জুড়ে দিলাম? উত্তর এই যে, প্রবন্ধাবলীর মধ্যে দু একটি প্রবন্ধে তাঁর নামোল্লেখ না থাকলেও এ বইটির Leitmotiv শ্রীঅরবিন্দই বটে। এ-চমৎকার জর্মন বিশেষ্যটির প্রতিরূপ খানিকটা আমাদের বাংলায় বলা যেতে পারে—ধুয়া। ফিরে ফিরে নানা অস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগের পরে শ্রীঅরবিন্দের সুর বেজে উঠেছে বারবারই। তাই এ নামকরণ।'

শ্রীঅরবিন্দের নানা কথায় এই গ্রন্থটি যেমন ভরে আছে তেমনই সেই সঙ্গে আছে ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি নানাবিধ সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ। আমাদের আলোচনায় শিরোনামটি এই গ্রন্থ অন্তর্গত অনুরূপ নামাঙ্কিত প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। লেখকের এই গ্রন্থটির মধ্যে সংস্কৃতিই প্রাধান্য পেয়েছে তাই এই শিরোনামটাই নির্বাচন করে নিলাম।

এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অসীম। ১৯৬১ খৃঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদত্ত লেখকের এই ভাষণটির মধ্যে অনেক মূল্যবান কথা আছে যা চিন্তাশীল পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে। জার্মান মনীষী স্পেংলারের মতে 'মানুষের নিয়তি তাকে উর্ধ্বপথে টেনে তুলতে চায় এবং সেই টানটি নিঃশেষিত হলে কালচারের অন্তঃশক্তির মরণদশা ঘনিয়ে আসে—যা থাকে সে তার কাঠামো ওরফে 'সভ্যতা'।' —এই সভ্যতা বা সভ্যতার খোলসটুকু নিয়ে মানুষ মাতামাতি করে। সংস্কৃতির অধোগতির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন স্পেংলার—'যে সভ্যতন্ত্র জীবনরীতি, ধনশালিতা, শক্তিমদ, বুদ্ধিবাদ—এরা সংস্কৃতির অভিজ্ঞান নয়। পরমা সংস্কৃতি বলব সেই প্রেরণাকেই যা আমাদের নিয়তিকে সার্থক করে উর্ধ্বাভিসারে, ইন্দ্রিয়ভোগের সোনার হরিণের পিছনে মিথ্যে ধাওয়া করায় না।'

লেখক স্পেংলারের এই উক্তির সঙ্গে ভারতের মনীষী সাধুসন্ত মুনি-ঋষিদের কথা টেনে এনেছেন। অমৃতের অধিকারীই যদি না হই তাহলে অন্যবিধ আর কিসে প্রয়োজন? যা আমাদের উপলব্ধির পথে চালিত করে 'তারই নাম পরমা সংস্কৃতি—সংস্কৃতির সংস্কৃতি।' লেখক বলেছেন এই সংস্কৃতির সন্ধান করতে হবে 'ধর্মের মণিকোঠায়। শক্তির সাম্রাজ্যে নয়—ধনের ধুমধামে নয়, এমন কি বুদ্ধির বিশ্ববিদ্যালয়েও।'

এই প্রবন্ধটি আরো বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে কারণ মনীষী লেখকের দীর্ঘজীবনের উপলব্ধিপ্রসূত এই বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি, আবেগ ও বলিষ্ঠতা

আছে। তাঁর মতে 'মানবজমিনতে এই পরমা সংস্কৃতির 'কৃষিকাজে • সোনা ফলেছে' সবচেয়ে আমাদের ভারতবর্ষেই বটে—'

এই গ্রন্থ অন্তর্গত অনেকগুলি প্রবন্ধই বিশেষ আলোচনার যোগ্য। 'বিজ্ঞানের ট্রাজেডি ও সুমতি', 'বিজ্ঞানের পুতুল পূজা', 'বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা', 'বিজ্ঞানের জনহিত ধর্ম', 'শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় ও প্রসংগতঃ' প্রভৃতি প্রবন্ধাবলীর মধ্যে লেখকের সদাজাগত বিজ্ঞান সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এডিংটনের 'নেচার অব দি ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড', অ্যালেক্সিস ক্যারলের 'ম্যান দি আননোন', আইনস্টাইনের 'আই বিলিভ', হোয়াইটহেডের 'সায়েন্স অ্যান্ড দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড', জীনসের 'মিস্টিরিয়স ইউনিভার্স' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থাবলী থেকে নানা প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক নিজের যুক্তি সপ্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

'ক্যারেলের বইটি মানুষের আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক আলোচনা। একটি অন্তর্মুখী অন্যটি বহির্মুখী। কিন্তু মজা এই যে, শেষে উভয়েই এসে পৌঁছেছেন একই সিদ্ধান্তে যে জীবন তথা বিশ্ব এতই আশ্চর্য ও অগাধ যে বুদ্ধি দিয়ে কেউই তল পেতে পারে না এ-যুগল রহস্যের। এই রহস্যের (মিস্টি) কথা ভেবেই আইনস্টাইন ও বেগতত্ত্বের খবর দিতে গিয়ে শেষ অধ্যায়ে আপ্লুত হয়েছিলেন। আইনস্টাইন স্তবগান করেছিলেন 'রিলিজিয়াস রেভারেন্সে'র। শ্যাইৎজার 'রেভারেন্স ফর লাইফ'-এর। জীনসও তাঁর 'মিস্টিরিয়স ইউনিভার্স'-এ আকাশতত্ত্ব ও বেগতত্ত্বের খবর দিতে গিয়ে শেষ অধ্যায়ে মানুষের ধর্মভাবকে মান দিয়েছেন। এরই নাম—বিজ্ঞানের সুমতি।'

এই প্রবন্ধটি পত্রাকারে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে। তার পর অনেক জোড়া হয়েছে এবং ছাঁটা হয়েছে একথা বলেছেন লেখক। প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন যে তিনি নানা প্রবন্ধে আইনস্টাইন বা রাসেলের মত অনেক হিতকারী কথা বলেছেন—বিশেষ করে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন : 'আজকের জগতে বিজ্ঞানের দান বিশ্বব্যাপী হলেও শুধু বৈজ্ঞানিক কীর্তি-কলাপে তুষ্ট থাকলে চলবে না—যদি ঐ সঙ্গে আমাদের নীতিবোধের বিকাশ না হয়।' শ্রীঅরবিন্দের 'রিজন অ্যান্ড বিয়ন্ড রিজন' থেকে একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন লেখক :

'মানুষের মন আজ টের পেতে শুরু করেছে যে, বিজ্ঞান কোনো গভীর সমস্যারই মূল ধরতে পারেনি। পেরেছে শুধু বাইরে আলো ফেলে দেখতে নানা শক্তির ক্রম-প্রগতির কার্যকারণের সূত্রটি মাত্র।'

এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'কাজী নজরুল ইসলাম' : 'নীরেন্দ্রনাথ রায়' ও 'তুলসীচরণ গোস্বামী' এই তিনটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। এই তিনটি বিশিষ্ট বাঙালীকে যাঁরা দেখেছেন বা জানতেন তাঁদের কাছে বিশেষ করে এই প্রবন্ধ তিনটির বিশেষ আবেদন আছে। দিলীপ-কুমারের আন্তরিকতাপূর্ণ রেখাচিত্রে মানুষগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে বাঙালী মনীষার একটি খণ্ড চিত্রও এই প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাবে। এই তিনটি প্রবন্ধও সাহিত্য রসসমৃদ্ধ এবং নানাবিধ খুঁটিনাটি তথ্যে পরিপূর্ণ। স্থানাভাবে এই প্রবন্ধগুলির পূর্ণ পরিচয়ও দেওয়া গেল না। পরিশিষ্ট অংশে শ্রীঅরবিন্দের 'Art for arts' sake নামক বিখ্যাত আলোচনাটি সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত হয়েছে।

পরিশেষে, এই গ্রন্থের প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই। গল্প ও উপন্যাসে প্লাবিত বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবন্ধের গ্রন্থ ইদানীং বিরল হয়ে এসেছে। গভীর চিন্তার প্রকাশক গুরুভার প্রবন্ধ গ্রন্থ জনপ্রিয় উপন্যাসের মত কাটে না তাই ইদানীং এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহের অভাব আছে, সেই অবস্থায় এমন একখানি সুমুদ্রিত মননশীল প্রবন্ধের বই প্রকাশের ব্যবস্থা করায় পাঠক সমাজের কাছে তাঁরা কৃতজ্ঞতাভাজন।

—অভয়ঙ্কর

**ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ** — লেখক—শ্রীদিলীপকুমার রায়। প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য—বার টাকা।

# সাহিত্যের খবর

**সাহিত্যে পুরস্কার ।।** যিনি পুরস্কার পান তাঁর বিশেষ কিছু এসে যায় না; কিন্তু যিনি পুরস্কার পান নি, তাঁর অনেক কিছু এসে যায়। তাই দেখি, সাহিত্যে পুরস্কার প্রদান সম্পর্কে অনেকে বিক্ষোভ জানালেও কিন্তু মনে মনে পুরস্কার লাভের ইচ্ছা অধিকাংশই পোষণ করে। প্রখ্যাত আমেরিকান লেখক রবার্ট পেন ওয়ারেন সোজাসুজিভাবে তাই বলেছেন—'না, আমি পুরস্কারের বিরুদ্ধে নই। আমি পুরস্কার লাভ অপছন্দ করি না। যদি বলি অপছন্দ করি, তাহলে একটা ডাহা মিথ্যে বলা হবে।'

কথাগুলো বলেছেন মাত্র কয়েকদিন আগে ওয়াশিংটনের এক সাহিত্য সভায়। এই সভায় তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেস' কর্তৃক প্রদত্ত 'ন্যাশন্যাল মেডেল ফর লিটারেচার' গ্রহণের জন্য। এই পুরস্কারের সঙ্গে আরো পেয়েছেন পাঁচ হাজার ডলার। ১৯৬৫ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে এবং এর আগে যাঁরা এই পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ডবল্যু. এইচ. অডেন, কনার্ড আইকেন, ম্যারিনি মুর, থর্নটন উইলবার ও এডমন্ড উইলসন।

রবার্ট ওয়ারেন এর আগেও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁর 'পুলিটজার' পুরস্কারের কথা। তিনিই একমাত্র সাহিত্যিক যিনি কবিতা ও উপন্যাসের জন্য দুবার এ পুরস্কার পেয়েছেন। অন্যান্য যে সব পুরস্কার তিনি পেয়েছেন তার মধ্যে 'সেন্ট ভিনসেন্ট মিলে পুরস্কার' 'বোলিনজেন পুরস্কার', 'এড্না পুরস্কার' ইত্যাদি উল্লেখ্য।

ওয়ারেনের বর্তমান বয়স ৬৫। এ পর্যন্ত তাঁর ৮টি উপন্যাস এবং শতাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও কয়েকদিনের মধ্যে আর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হবে। তাঁর স্ত্রী এলিনর ক্লার্কও একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও বেশ বিচিত্র। বাড়িতে কুকুর-বেড়ালে ভর্তি। এদের নিয়ে তাঁর অনেক সময় কেটে যায়। অবশ্য আঠার বছরের এক কন্যা, সতের বছরের এক পুত্র এবং সবশেষে তাঁর স্ত্রী রয়েছেন, যাঁদেরকে নিয়ে তাঁর সুখের পরিবার।

**ইংরেজি অনুবাদে সংস্কৃত নাটক ।।** এক সময়ে পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখকরা সংস্কৃত সাহিত্য পাঠের জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তখন তাঁরা কিছু কিছু সংস্কৃত বইয়ের ইংরেজি অনুবাদও

করেন। কিন্তু তারপর এ ব্যাপারে বেশ ভাটা পড়ে। সম্প্রতি আবার এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকজন প্রখ্যাত ভারতীয় ও বিদেশী অনুবাদক সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ প্রকাশে অগ্রণী হয়েছেন। শ্রী সি, সি, মেহতা তিনটি সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন সম্প্রতি। এই নাটকগুলি হলো রাজা মহেন্দ্র বিক্রমের 'ভাগবত অজ্জুকম' এবং 'মত্তবিলাস' আর বররুচির 'উভয় ভিসরিক'। যাঁরা সংস্কৃত জানেন না, তাঁদের কাছে এই অনুবাদগুলি খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে।

**নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ॥** নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের জামশেদপুর শাখার পঞ্চদশ বার্ষিক সম্মেলন সম্প্রতি টেলকো সবুজ কল্যাণ সঙ্ঘ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডাঃ কালী-কিংকর সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শাখা সভাপতি ডাঃ অজিতকুমার বাগচি সকলকে স্বাগত জানান এবং এই সম্মেলনের ঐতিহ্য বর্ণনা করেন। শাখা সম্পাদক শ্রীউষাকান্ত রায় স্থানীয় বাঙালী প্রতিষ্ঠান-গুলির সঙ্গে সহযোগিতার আবেদন জানান।

দ্বিতীয় দিনে কথাসাহিত্য শাখার অধিবেশনে জনপ্রিয় সাহিত্যিক শঙ্কর উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক সুচিন্তিত ভাষণে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল সভায় উপস্থিত ছিলেন।

**জর্জিয় ভাষায় ভারতীয় রূপকথা**

ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ এখন বিদেশে হচ্ছে খুব ধীর গতিতে। তাও সমকালীন কবিতা কিংবা গল্প-উপন্যাসের নয়, প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের। অরুণ রায়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের ওপর একটি বই লিখেছিলেন ডঃ মোদে। পূর্ব জার্মানী থেকে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে জার্মান ভাষায়।

সম্প্রতি জর্জিয় ভাষায় ভারতীয় রূপকথার একটি সঙ্কলন বেরিয়েছে নাকাদুলি স্টেট পাবলিশিং হাউস থেকে। তাসের খবরে প্রকাশ, রূপকথাগুলি অনুবাদ করেছেন মিনো তপচিশভিলি, কেতেভান কাকাবেদজে এবং মেরী মিখারেদজে।

এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে একশটিরও বেশী ভারতীয় রূপকথা। 'বিশ্ব রূপকথা গ্রন্থমালা' নামে বহু খণ্ডে সমাপ্ত একটি সিরিজের অন্যতম বই হিসেবে সঙ্কলনটি বেরিয়েছে। শোনা যায়, জর্জিয় ছেলে-মেয়েদের কাছে বইটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশে এখন সাহিত্যের হাওয়াটা অন্যরকম, এলোপাথাড়ি। বই বেরুচ্ছে কম। কফি হাউসে ভীড় আছে, সাহিত্যের আড্ডা-ঝাঁটি নেই। মাঝে মাঝে একটা দুটো সভা হয় এখানে ওখানে। বিষয় সাহিত্যের আলোচনা নয়, সাহিত্যিকের জন্ম কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী। এই শীতে কোথাও গল্প-কবিতা পাঠের আসর বসলে মন্দ হতো না।

সেদিন কফি হাউস থেকে বেরিয়ে আসছি। জনৈক তরুণ ঔপন্যাসিক প্রশ্ন করলেন, সাহিত্যের খবরাখবর কি?

বললুম, আপনারাই তো স্রষ্টা। লিখছেন কেমন?

—না, এবার লিখতে পারছি কই! মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। এখন আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি। লেখার ধরণধারণও পালটাতে হবে। গতানুগতিক রম্যোপন্যাস লিখে আর দিন কাটছে না। হয়তো সামনেই আসছে দিনবদলের পালা।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনলুম, অমৃতে প্রকাশিত 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড বেরোবে শীঘ্রই। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'তৃণভূমি' বেরিয়েছে কয়েকদিন আগে। সদ্য পরলোক-গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ উপন্যাস ছাপা হতে চলেছে দ্রুতগতিতে। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক একটা কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন প্রকাশের জন্য। তাও হয়তো ছাপা হবে অদূরভবিষ্যতে।

এখন লিটল ম্যাগাজিন বেরুচ্ছে কম। আবার ঝাঁক বেঁধে সবাই নেমে পড়লে আর এমন অবস্থা থাকবে না। অনেক—অনেক কাগজ বেরুতে থাকবে কোলাহল করে। কেবল সময়ের প্রতীক্ষা।

**জাতীয় পুস্তক প্রদর্শনী**

সরকারী উদ্যোগে ভারতীয় বইয়ের একটি প্রদর্শনী চলছে এখন মাদ্রাজে। গতবার কলকাতায় এই প্রদর্শনী হয়েছিল। স্বভাবতই বাংলা বইয়ের সংখ্যা ছিল একটু বেশি। এবার মাদ্রাজে বাংলা বই প্রদর্শিত হচ্ছে কম। প্রকাশকদের বক্তব্য, বই পাঠিয়ে লাভ নেই। শুধু শুধু গাঁটের পয়সা খরচ করে যাওয়া। না পাওয়া যায় বই ফেরত, না পাওয়া যায় বইয়ের দাম।

অন্য একজন প্রকাশকের মতে, গত দুই বছরে বাংলাদেশের প্রকাশকরা তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বই ছাপতে পারেননি, যা সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে পাঠানো যায়। প্রকাশকদের আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে এবং স্থানীয় পাঠকের ওপর অতি-নির্ভরশীলতার জন্য—জাতীয় এবং আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালী পাবলিশাররা ক্রমাগত কোণঠাসা হয়ে পড়ছে।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীটির উদ্বোধন হয়েছে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ সাল। আগামী পনেরোই জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে।

**সিগারেট নয়, মিনি পত্রিকা**

ডবলডেকার বাসের গায়ে, সামনের কাচে কয়েকদিন ধরেই একটা লাল রঙে ছাপা কাগজ দেখা যাচ্ছে। তরুণতম কবি-সাহিত্যিকরা উত্তেজনার একটা খোরাক জুগিয়ে যাচ্ছেন। কেউ লক্ষ্য করছেন, কি করছেন না—সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। বোধহয়, রোম পোড়ার সময়ে নীরুর বেহালা বাদনের শিক্ষাটি ওদের জানা নেই। কিংবা জেনেশুনেই তাতে তাঁরা উল্লাস বোধ করছেন।

সেদিন কফি হাউসে একটি ছেলে মিষ্টি হেসে বলল, নিন। হাতে নিলুম। ধন্যবাদ জানাতেই বলল, সিগারেট নয়, মিনি পত্রিকা। আমি কৌতূহলী হয়ে তার ভাঁজ খুললুম। লম্বা সাইজের একটা কাগজে (হ্যাণ্ডবিলের মতো) কিছু গল্প-কবিতা ছাপা হয়েছে। সবই সংক্ষিপ্ত। দেখতে মন্দ লাগছিল না।

ভাবছিলাম, আর কিছু করার না থাকলে এভাবেই কিছু উত্তেজনা যদি পায় তাহলে ওরা পাক।

পত্রিকাটির নাম 'মাঝি'। ফিল্টার টিপড সিগারেটের মতো পাকিয়ে, একপ্রান্তে হলুদ কাগজ দিয়ে গোল করে এঁটে দেওয়া। পুরো দশটা পত্রিকা পাওয়া যায় একটি সিগারেটের প্যাকেটে। তার ওপরে লেখা আছে 'মাঝি'। সতর্কতাসূচক একটা লাইন : সিগারেট নয়, মিনি পত্রিকা। যেন কেউ ভুল করে,—সিগারেট ভেবে ধূমপানের চেষ্টা না করেন।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের আকাদমি প্রকাশ ভবন থেকে 'ডী ফ্রাউ ইম মডার্নেন হিন্দী রোমান' (ভারতীয় নারীর সমস্যা ও ১৯৪৭—পরবর্তী হিন্দী উপন্যাসে তর প্রতিফলন) নামে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জি ডি আরে এ-ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ এই প্রথম। গ্রন্থে ১৮ জন সমসাময়িক লেখকের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকদের মধ্যে আছেন গুরু দত্ত, ভাগবতী চরণ বর্মা, অমৃতলাল নাগর, জৈনেন্দ্র কুমার, অজ্ঞেয়, যশপাল, রেণু, রাজেন্দ্র যাদব, নাগার্জুন ও উপেন্দ্রনাথ অশ্ক। গ্রন্থের ডঃ ডি আনসারি ভারতীয় নারীর বর্তমান সামাজিক অবস্থা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

—চার্বাক

# নতুন বই

**শ্যামাপ্রসাদ : ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব :** বীরেশ মজুমদার। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১৩। পাঁচ টাকা।

বাংলা তথা ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি বিরল ব্যক্তিত্ব। যেমন ঘটনাবহুল তাঁর জীবন, তেমনি গভীর তার প্রতিক্রিয়া। এই গ্রন্থের লেখক ব্যক্তিগতভাবে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি সমর্থন না থাকায় কুণ্ঠিত ছিলেন লেখার ব্যাপারে। পরবর্তীকালে বিরোধী নেতা হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ যে ভূমিকা পালন করেন, তাতে তাঁর প্রতি লেখকের আকর্ষণ বাড়ে। এই গ্রন্থ সেই আকর্ষণের ফল।

বইটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথাক্রমে (১) প্রথম জীবন—শিক্ষাক্ষেত্র, (২) রাজনীতি ক্ষেত্রে—স্বাধীনতার পূর্বে, (৩) রাজনীতি ক্ষেত্রে—স্বাধীনতার পরে : (ক) রাষ্ট্রপতির ভাষণের আলোচনায়, (খ) বিনা বিচারে আটক আইন, (৩) রাজনীতি ক্ষেত্রে—কাশ্মীর (৪) গণ আন্দোলন ও আত্মোৎসর্গ : বীরেশবাবু লিখছেন : "যদি ইহা জনসাধারণ বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধিকে অনুসরণ করিবার প্রেরণা জাগাইতে না পারে, তাহা হইলে আমার অক্ষমতাই শুধু তাহার জন্য দায়ী, একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা নাই।"

আমাদের ধারণা, তিনি সফল হয়েছেন। ঐতিহাসিক বর্ণনায়ও তিনি সার্থক। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন : "শ্যামাপ্রসাদের নাতিদীর্ঘ জীবনে দেশে এমন অনেক গুরুতর ঘটনা ও অবস্থা বিপর্যয় ঘটিয়াছে, যাহাতে তিনি একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকলের সম্যক আলোচনা দ্বারা লেখক শ্যামাপ্রসাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।"

**মহেন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও মনীষা** [জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ]—সম্পাদক সুনীলবিহারী ঘোষ।। বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি, ১৮।১, সহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-৬।। দাম : দশ টাকা।।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মেজো ভাই মহেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আই অ্যাম কোয়াইট প্রাউড অব হিম।' যাঁরা মহেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরাই জানেন, তাঁর মনীষার পরিচয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ বলেছিলেন : 'মহিম আমার সাদা কাপড়ে সন্ন্যাসীর বড়ো।' তবু মহেন্দ্রনাথ দত্ত সাধারণ্যে তেমন পরিচিত নন। বিবেকানন্দের জীবন ও দীপ্তি তাঁকে নিষ্প্রভ করেছে। তার ওপরে, তিনি ছিলেন সঙ্কলনের সম্পাদকের মতে, গভীর মননশীলতা ও অধ্যাত্মমানস— ভারত সংস্কৃতির দুই স্রোত—স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে মহেন্দ্রনাথ আয়ত্ত করেছিলেন। এই সঙ্কলনের বিভিন্ন লেখায় মহেন্দ্রনাথের জীবন, পারিবারিক ইতিহাস, এবং চরিত্রের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রচনাগুলি তিনটি ভাগে এবং দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। লিখেছেন ভবানী মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় প্রফুল্লচন্দ্র সেন, কুমারেশ ঘোষ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শৈলেন্দ্রনাথ দে এবং আরো অনেকে। ইংরেজী প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে সাতটি। মহেন্দ্রনাথের কতকগুলি লেখার পুনর্মুদ্রন সংযোজিত হওয়ায় সঙ্কলনটি মূল্যবান হয়ে উঠেছে। দশম অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে তাঁর গ্রন্থপঞ্জীর বিবরণ।

সাধারণ পাঠকের পক্ষেও সংকলনটি সুখপাঠ্য এবং সংগ্রহযোগ্য বলে আমরা মনে করি। মহেন্দ্রনাথকে লেখা আচার্য নন্দলাল বসুর চিঠিগুলি মূল্যবান।

**কি পাই নি?** (উপন্যাস)—পারুল ঘোষ। অনুরাধা প্রকাশনী। ১।৭, নন্দলাল বসু লেন, কলকাতা-৫। দাম : পাঁচ টাকা।

পরাধীন ভারতের মুক্তিযুদ্ধের জীবন্ত কাহিনী এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায় এই উপন্যাসের বুনন ও বিস্তার। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এসেছে অহিংস, সেবাধর্ম গান্ধীবাদ। এই দুই প্রবাহের প্রাণগঙ্গায় পরিপূর্ণভাবে অবগাহন করেছিল এদেশের মুক্তি পাগল অসংখ্য মানুষ। অগ্নিমন্ত্রে ও অহিংসা প্রেমে দীক্ষিত দুটি কেন্দ্রচরিত্র সন্ত্রাসবাদী মহিমানাথ ও অহিংসাবাদী দ্বারকানাথকে ঘিরে আরো অসংখ্য জীবন আবর্তিত হয়েছে আপনাপন প্রাণধর্মে। সেই পুরনো দিনের কাহিনীকে জীবন্ত করে তুলেছেন শ্রীমতী পারুল ঘোষ।

**পার্বতী** (ছোট গল্প)—মাধুরী রায়। প্রকাশক : দীপক রায়। ২-এ কবীর রোড, কলকাতা-২৬। দাম : তিন টাকা।

ছোট ছোট আটটি গল্প। একটি দিনের কাহিনী, ফরেস্টার পার্বতী যাযাবর, পাহাড়ী গাঁয়ের ইতিহাস, রাজকন্যার কৌটো কান্তি সাহেবের মেয়ে ও ঘুম পাহাড়ের কথা নিয়েই পার্বতীর সৃষ্টি। সমস্ত গল্পের পটভূমি পাহাড়ী অঞ্চল—কার্সিয়াং-দার্জিলিং। এই পাহাড়ে যে সরল সাধারণ মানুষেরা বসবাস করে নানাভাবে রুজি-রোজগার করে অধিকাংশ কাহিনীই সেই সব সরল সাধারণ মানুষদের দুঃখ সুখকে ঘিরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন লেখিকা।

**বিপ্লবী গজাদা**—নিমাইকুমার ঘোষ। মোহন লাইব্রেরী। ৩৫-এ সূর্য সেন স্ট্রীট কলকাতা-৯। দাম : তিন টাকা।

জীবন যন্ত্রণা আর যুগ যন্ত্রণার কাহিনী পড়তে পড়তে মনপ্রাণ যখন ক্লান্ত ঠিক তখনই বিপ্লবী গজাদার মতো মজার কাহিনী রিলিফের মতো কাজ দেয়। গজাদা একটি কাল্পনিক চরিত্র। এই কৌতুক কাহিনী বিস্তার করেছেন শ্রীনিমাইকুমার ঘোষ।

## সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

**পার্থসারথি** (পৌষ, ১৩৭৭) সম্পাদক : প্রীতিকুমার ঘোষ। ৫।এ অক্ষয় বোস লেন, কলকাতা-৪। পঁয়তাল্লিশ পয়সা।

ধর্ম সম্পর্কীয় জাতীয়তাবাদী পত্রিকা। ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা তাত্ত্বিক আলোচনা এতে আছে। আছে কবিতাও। লিখেছেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী তুলসী, শান্তশীল দাস, শুক্লা ঘোষ, বীরেশ্বরপ্রসাদ বকসী, হরিপদ চক্রবর্তী, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অনিলবরণ রায় রাধাচরণ রায় প্রমুখরা। ধর্মপিপাসু পাঠক-পাঠিকাদের ঈশ্বর-ভাবনার অনেক খোরাক এতে আছে।

**জাগরণী** (১ম বর্ষ : ২য় সংকলন) সম্পাদক : দেবকুমার বসু। ৬ ঈশ্বর মিল লেন, কলকাতা-১৬। পঁচিশ পয়সা।

তরুণ লেখক-লেখিকাদের গল্প-প্রবন্ধ কবিতার সংকলন এতে স্থান পেয়েছে।

**টলিউড** (জানুয়ারী ১৯৭১)—সম্পাদক অমিতাভ মিত্র।। ৩৬।৪।৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। দাম ১-৫০ টাকা।।

হলিউডের অনুকরণে টলিউড? না অন্য কোনো ইংগিত? পত্রিকাটির নামকরণের রহস্য আমাদের জানা নেই। চেহারা চরিত্র দেখে অনুমান হয় সিনেমা-মার্কা একটা কাগজ করাই সম্পাদকের উদ্দেশ্য। এ সংখ্যায় লিখেছেন সুস্মিতা রায়, প্রদ্যোত সাহা, অমিতাভ মিত্র, অখিল রায়, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পত্রিকাটির জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করে সম্পাদক লিখেছেন : 'হতাশার অন্ধকারে এক ঝলক বেপরোয়া বিদ্যুতের আলোয় এক পলকে দেখলাম স্থানটুকু, ধাঁধিয়ে গেল চোখ দুটো। তবুও ঝাঁপ দিলাম। টলিউডের জন্ম হল।' অবশ্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পাদক সন্দিহান।

# ইনি সুচিত্রা দেবী

পাকা গিন্নী—দুই ছেলের মা
ঘুমপাড়ানী গল্পের ঝুড়ি

## "আসল জিনিসটি আমার চাই!"

বারো মাস তিরিশ দিনই সুচিত্রা ব্যস্ত—সারাদিন তার কাজ লেগেই আছে। সে বলে, শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকলে সব ঝক্কিই সামলানো যায়।

তাইতো সুচিত্রা হরলিক্‌সের ওপর অতটা নির্ভর করে। হরলিক্‌সই হ'লো আসল জিনিষ।

হরলিক্‌সের পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন সুচিত্রাকে সারাদিন উদ্যম আর উৎসাহ যোগায়।

হরলিক্‌স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এত গুণ। আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা হরলিক্‌স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।

রোজ হরলিক্‌স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।

হরলিক্‌স সত্যিকারের পুষ্টি এবং বাড়তি শক্তি দেয়।

## 'হরলিক্‌স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্‌স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1883A

# জাগাল

দুর্গাদাস ভট্ট

রাতের ঘোর ফুরিয়ে আসা মাত্রই দিনটি যেন আপন মর্যাদায় টলমল করছিল। দমকা বাতাসে হু হু করছে চারধার। বাদলী তার অশান্ত মন নিয়ে আকাশ দেখছিল।

পুকুর থেকে হাঁসের পাল উঠে এসে পালকের ফাঁকে ঠোঁট দিয়ে জল ঝাড়ছে। ঝটপট করছে। সামনের গোবর্ধন নালার ওপর ঝুঁকে থাকা টোপা কুলে ভরা গাছটা ঝাঁকি দিতে ইচ্ছে হ'ল বাদলীর। ঝাঁকি দিল। পাকাকুলের বৃষ্টি হ'ল চারধারে। অদূরের খোলা মাঠে ভেড়ার-পাল চরছে। অচেনা একজন কদমতলায় বসে রোমশ একটা ভেড়াকে কাত করে ফেলেছে কাঁচি দিয়ে লোম কাটছে।

আজ যেন সবকিছুই সুন্দর হয়ে এসে প্রাণে বাজছিল। বসে বসে সঞ্চিত ধনরত্নের মত তলপেটে খুলেছিল বাদলী। চুপিসাড়ে হাত বুলিয়েছিল। কে যেন অজানায় সোচ্চার। বাইরের জগতে এত আয়োজন—তবু বসনের দেখা নেই।

অভ্যাসমতই গোবরজল দিয়ে উঠোন নিকালো। গোয়াল থেকে গরুদুটো বার করে এসে গোয়াল পরিষ্কার করল। গরু-দুটোকে সামনের মাঠে নিয়ে গিয়ে খোঁটায় লম্বা দড়ি দিয়ে চরতে দিয়ে এল। এবার উনুন নিয়ে বসা। উনুন জ্বালিয়ে ভাত চাপিয়ে দিয়ে চুলের জট ছাড়াতে বসবে বাদলী। কিন্তু সব কাজের মধ্যেই একটা নরম স্তর জেগে উঠছে।

এত বেশী তো হওয়ার নয়, বাদলী দেখল কলা ঝোপের ওপর রোদ এসে পড়েছে। কুয়াশা নেই। অন্যদিন এতক্ষণ স্নানের জন্যে তৈরী হয় বসন। তেল মাখতে মাখতে দাঁতন করে। সে সব কথায় রাগ বিবাদ গালাগালি সবই থাকে। বাদলীও রেগে ওঠে। আজ সে যেকোন অবস্থার জন্যে প্রস্তুত তবু মনটা ফিরছে না।

ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে উনুনের কাঠটা বাড়িয়ে ধরেছে বাদলী। লকলকে শিখায় শীতের সকাল উষ্ণ হয়ে উঠছে। সে স্পষ্টই বুঝতে পারছে বসন আজ স্নানের আগে ভাত খেতে চাইবে। এবং ভাত খেতে খেতেই চোখ জুড়ে ঘুম আসবে। সোহাগ কিম্বা ঝগড়া কোনটাই মনে পড়বে না বসনের। তা না পড়ুক ও যেন

দেরী না করে আর। এমন তো ওর হয় না এত দেরী। মাথা উঁচু করতেই দেখতে পেল তার গাইগরুর একটা মাঠে ঘাস খেতে খেতে চোখ তুলে চাইছে। জল তেষ্টা পেয়েছে হয়ত। উঠে গিয়ে ওকে নালার ধার পর্যন্ত এনে জল খাওয়াল বাদলী। তারপর আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে খোঁটায় বাঁধল। ঘুরতে গিয়ে দেখল দূর থেকে ধরাধরি করে কারা যেন একটা মানুষের দেহ বয়ে নিয়ে আসছে। তবু চিনতে ভয়। যতক্ষণ না চিনে থাকা যায়। উলঙ্গ সত্যটাকে যতক্ষণ না চিনে থাকা যায়। সেইটুকুই নিরাপদ। তবু ভিতরটা যেন চিনচিন করে উঠছে। পট্ করে চোখ চেয়ে বিকট একটা ঘটনাকে চিনে নেওয়া মাত্রই নিজেকে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলার মত হয়। তবু কাঁদতে পারে না। এগুতে পারে না। শুধু তারাপদ বলে—ভয় নেই গো প্রাণ আছে। ভাল করে যত্নআত্তি করো।

কালী বলে—ডাক্তারকে খবর দিইছি। এল বলে।

এখন দুপুর। খড়ের চাল দেওয়া ঘরটিতে পৌষের রোদ ঘিরে আছে। দূরে হাট্টিটি ডাকছে। দরমার ফাঁক দিয়ে রোদের টুকরো ভিতরে এসেছে। খাটিয়ার ওপর বুক চিতিয়ে পড়ে আছে বসন। কালো একখানা মাংসল পাহাড়। ডাক্তার এসে সব গুলি ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে কাপড়ের পট্টি বেঁধে দিয়ে গেছে। মাথায় চোট লেগেছে বেশী। প্রথমে যে সব জায়গায় রক্ত ডেলা ডেলা হয়েছিল ডাক্তারের নির্দেশমতো গরম জল আর তুলো দিয়ে সেগুলিকে মুছিয়ে দিল। জ্ঞান ফিরেছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। একটা অজানা প্রতিজ্ঞা কিম্বা প্রত্যয়, বাদলীর মনে হচ্ছে একটা কিছু বলতে চাইছে বসন। সমস্ত মন প্রাণ নীরেব চিৎকার করছে। বাদলী ওর বুকের ওপর গাল রাখে। এই সেই বুক যা রাতের ভিতরেও ঘুম কাড়ত। আলিঙ্গনের ঘনিষ্ঠ তাপ সারাটা দিন তার সব কাজ ভুলিয়ে দিত। বাপ বংশীলাল, মা যমুনা, ছোট বোন ফুলকি তাকিয়ে দেখত। এ কেমন বাদলী যে যৌবনবতী হয়ে উঠে তাবৎ সব যৌবনকে পিছিয়ে ফেলে তেজী ঘোড়ার মতো টগবগ করছে। অকারণে হাসছে বিনা কারণে কাঁদছে। কান্নাহাসির সব সুর রাতের সোহাগে ডুবে যাচ্ছে। বেষ্টিত হ'চ্ছে, নীরবে। চুপিসারে।

বিয়ে না দিয়ে উপায় ছিল না বলেই বিয়ে হ'ল। বংশীলাল এই উপলক্ষে পাড়ার সকলকে পেটপুরে খাওয়াল। হাড়িয়ার বান ডাকাল। পঞ্চায়েতও বসল।

—এই ভাল হ'লরে বংশী। বসনের জোতজমি নেই ঠিকই। অমন পাহাড়ের মত দেহখান তো আছে। তোর মেয়ে সুখেই থাকবে।

এখন, আজ এই মাটিলেপা ঘরের ম্লান আলোর ভিতর থেকে বুকজুড়ে উঠছিল। অনেকদিন পরে বসনকে সে নিবিড় করে পাচ্ছে। ধীরে হাত বোলাচ্ছে।

বাদলী বুঝতে পারছে না তার করতল-স্পর্শে বসনের কতটুকু আরাম। আবেশ। বসন শুধু এক-আধবার চমকে চমকে উঠছে। বেলা বেড়ে ওঠার সঙ্গে ঘরের ভিতরটা আগের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল। বসনের প্রতিটি ভঙ্গী মুখের রেখা যেন পড়তে পারছে বাদলী। ও মাঝে মাঝে চোখ খুলছে আবার পিটপিট করছে। ঠোঁটের ফাঁকে চাপা হাসছে যেন। বাদলীর মনে হয় আড়ালে কি একটা বলতে চাইছে বসন। বাদলী তাই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

বসনের ঠোঁট নড়ে।

—আমাকে খতম করবে ওরা। আমিও দুটোর ঠ্যাং ভেঙে দিইছি।

—কেন? ওরা কি করেছিল।

—ধান চুরি করতে এসেছিল। ওরা জানে না এ চত্তরের জাগাল হচ্ছে বসন বাগ্দী আমার সঙ্গে চালাকি!

—কিন্তুক তোমার হালটা কেমন করেছে। আর একটু হলেই...

বাদলীর সন্ত্রস্ত চোখদুটির ওপর হাত বাড়িয়ে কাছে টানতে চাইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ককিয়ে উঠল। বগলের কাছে আঘাত আছে। তাতে চাপ পড়ায় ব্যথা পেয়েছে বসন। বাদলী তাড়াতাড়ি ওর হাতটা শুয়ে থাকা বুকের ওপর স্থাপন করে দেয়। নিজেও আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে বসে।

—নোড়ো না চুলা নিভে গেইছে, ঠিক করে দিয়ে আসছি।

—না গো...

বসনের গলায় অন্তর যেন ফেটে বেরোয়।

—কেন কি হ'ল?

বাদলী বিছানা থেকে উঠে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল তড়িৎ গতিতে ফিরল।

—তুমি যেও না, তবু মনে হবে আমার কাছাকাছি কেউ আছে। তখন কত থাকলাম, আশে-পাশে আরো কয়েকজন ছিল, কিন্তু কেউ এল না আমি ওদের মারলাম। ওরাও আমার মাথায় বাড়ি মারল। আমি ধান আগলাতে পারলাম না...

• বাদলীরও চোখের সামনে একখানা জমাট রাত পাক খাচ্ছে, সে রাত আদৌ অপরিচিত নয়। ক্ষণে অক্ষণে আল পথ ধরে সে পাকা ধানের চৌহদ্দিতে গিয়েছে। কখনো হিমঝরা রাতে চাঁদ উঠেছে কখনো অন্ধকার। আবার আলোর চোখ সওয়া হয়ে এলে বাদলী দেখেছে নির্দিষ্ট জমির এক কোণে বাঁশের মাচালের ওপর বসে আছে বসন। বিড়ি ফুঁকছে। এইভাবে একা একা এতটা পথ অতিক্রম করে আসায় বাদলী ধমক খেয়েছে। কিন্তু এই নির্জন অন্ধকারে ধান পাহারা দেওয়াটা যে নিরাপদ নয় সে কথাটাও বলতে ছাড়েনি বাদলী।

সকাল তখন শেষ হয়ে আসছিল। রোদে তেজ ধরেছে। বাদলীর মনে হল ওকে সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা। ভয় দেখানো নিরর্থক। শরীরটা এখন কমজোরী হয়েছে তাই ভয়ের কথা মুখ ফুটে বলছে বসন। ওর একটু ঘুমঘুম ভাব দেখে নিজের ফেলেরাখা কাজগুলো শুরু করল। নিভে যাওয়া চুলা ধরিয়ে কাঠকোটালি গুঁজে দিল। নিজের চোখেই ঘরদুয়ার আজ অপরিষ্কার ঠেকছে। জল নেতা নিয়ে মাটির মেঝে মুছতে বসল বাদলী। কাজের ফাঁকে মানুষটাকে দেখলে আর বেদনা-মিশ্রিত খানিকটা মুখ লাল হয়ে উঠছে। সকাল থেকেই কেমন যেন হাল্কা মনে হচ্ছিল আজ। মাঠ গাছ কলাঝোপের সবেজ বিস্তার পানানিবিড় ডোবাটাও এই ঠান্ডা-গরমে মেশা সকালে তাকে হাত বাজিয়ে ডাকছিল। নিজেকে কেমন যেন ভাবুক মনে হচ্ছিল বাদলীর। সে যে এমন করে ভাবতে পারে ইতিপূর্বে জানত না এমন সময় পেটের বাচ্চাটা নড়ে উঠল। বাদলী জানে না এইটাই ঠিক পরম সুখের

(৩৯)

তখন কোরবানের পশুটা ভয়ে হাম্বা হাম্বা ডাকছে। যেন সে তার বাছুর হারিয়ে এই মানুষের মেলায় চলে এসেছে। সে তার অবলা চোখে সব দেখছিল। ভিড় ক্রমে বাড়ছে। ফেলুর একটা হাতে এত শক্তি! অন্য হাতটাতো ওর মরা। শুকনো লতার মতো শুধু গায়ে লেগে আছে। যে কোন সময় ফেলুর ইচ্ছা হয় ওকে টেনে ছিঁড়ে শরীর থেকে ফেলে দিতে।

ফেলু জীবটাকে এক হাতেই মসজিদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এক হাতেই সে ধর্মের নামে কত কিছু করতে পারে মানুষেরা দেখুক। অঞ্চলের মানুষেরা দেখুক, ফেলু, যে ফেলু এক হাত গেছে বলে সবাই পঙ্গু ভেবেছিল, যায় বিবি আতরের গন্ধে পাগল বনে যায়, দিক-বিদিক ফাঁক পেলেই ছোটে, কান্ডজ্ঞান থাকে না, সেই ফেলু আজ এক হাতে এমন যে পুষে বড় করা জীব, জীব থেকে সে কত বেশি অনুদান পাবে আশা করেছিল, দিন নেই রাত নেই ঘাস চুরি করে এনে খাইয়েছে, দুবলা বাছুরটাকে সে কি আশ্চর্যভাবে সবল করে তুলেছে, সেই বাছুরকে সে এখন বিশমিল্লা রহমানে রহিম বলে ধর্মের নামে কোরবানী দেবে। কত বড় ফেলু এই যেন দেখানোর ইচ্ছা। যেমন সে হাডু ডু ডু ডু বলে প্রতিপক্ষের উপর চেপে বসত তেমনি সে এখন ধর্মের নামে শরীরে জস পাচ্ছে। এক হাত গেছে বলে তার কোন সরম নেই। বরং অন্য হাতটা এত বেশি শক্ত, এবং এত বেশি সাহস তার প্রাণে যে ধর্মের নামে এককোপে দশটা কাফেরের গলা নামিয়ে দিতে পারে। কিন্তু জ্বালা এই কোরবানের পশু নিয়ে। এতটা পথ সে বেশ টেনে এনেছে। শিঙে দুটো প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে বলে খুব বেশি একটা ছুটতে পারে নি। এখন কি বুঝতে পেরে চার পায়ের উপর শক্ত হয়ে গেছে। নড়ছে না। এতবড় মেলার ভিতর তাকে ছোট করে দিচ্ছে। সে যে ফেলু এটা কেন হালার গরু বোঝে না।

এই দশ ক্রোশের মতো পথ মোটা-মুটি ভালোয় ভালোয় চলে এসেছে। কোন গোয়ার্তুমি ছিল না। কিন্তু মসজিদে নিয়ে যেতে যত গোয়ার্তুমি। তা তুমি এক বাগি গরু আর আমি এক এক চক্ষু ফেলা। কে কারে খায় দেখা যাক্। বলেই সে শক্ত হাতে আবার লেজটা মুচড়ে দিল। পাশের লোকেরা বলছে, আরে দ্যাখো মিঞা সিপাইগ কান্ড! নলে গুলি নাই। ফাঁকা আওয়াজ করে। তোমাগ ডর দেখায়।

ফেলু তাচ্ছিল্য করে সব। তার ত সব জানা। জানা বলেই সে ভোররাতে আজান দিয়েছে। লোক জড় করেছে মিছিলের জন্য। মশাল জ্বালিয়ে সে সারারাত এ গাঁ ও গাঁ ঘুরেছে। সে মিছিলের শেষে। মিছিল যায় ধর্মের মিছিল। মিছিলে হাজার সবুজ পতাকা, লাঠি, সড়কি এবং ধুলো উড়ছে। ওরা যায় আর যায়। যারা আরও দূরের মানুষ রাতে রাতে ওরা মশাল জেলে বের হয়েছে। ওরা এসে গোলাকান্দালের বড় বটগাছটার নিচে সবাই থামবে। সেখান থেকে আবার লম্বা মিছিল। বিশ্বাসপাড়া, নয়াপাড়া, শতাব্দি, বলাব্দি এবং দক্ষিণ মাঠ থেকে যারা মিছিল বের করেছে ওরা হাসান পীরের দরগায় এসে থেমেছে। ওরা দেখেছিল হাসান পীরের দরগাতে তখন পাগল ঠাকুর। এতবড় মিছিল দেখেই তিনি বের হয়ে এসেছেন। তিনি বুঝি পীরের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলেন। আর কোরবানের পশুটার কথা ছিল হাসান পীরের দরগা পর্যন্ত জোড়ে কদম দেবে—কারণ তখনও মিছিলটা পুরো মিছিল নয়, ওদের আল্লা-হু-আকবর ধ্বনি শুনে আরও মানুষ এই মিছিলে যোগ দেবে, যারা দেবে না, কাফের তারা, তারা পবিত্র ইসলাম নয়, এমন সব লেখা আছে বড় বড় ইস্তাহারে। দরমাতে সব বড় বড় ইস্তাহার এঁটে নিয়েছে। মাথার উপর সেই সব ইস্তাহার। আর ক্রমে ওরা এগুচ্ছিল। হিন্দু গ্রামের পাশে এলেই ভয়াবহ ধ্বনি। সাধারণ হিন্দু গৃহস্থরা ভয়ে বের হচ্ছে না মাঠে। কেবল পাগল ঠাকুর হাসান পীরের দরগায় মরা একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার উপর অজস্র শকুন। ওরাও দেখছে একটা ধর্মের মিছিল যায়। কেউ কেউ উড়ে গেল। কতদূরে যাচ্ছে মিছিলটা দেখতে।

কোরবানের পশুটা পথে বেশ হাঁটছিল। আর এখন শক্ত হয়ে আছে! ফেলু কিছুতেই নড়াতে পারছে না; ঠিক যেমন হাসান পীরের দরগা পার হলে একটা মশালের মিছিল দেখে চার পা শক্ত করে দিয়েছিল। সে এটা জানত। দলটা বড় হলে মিছিলে মশাল জ্বললে কোরবানের পশুটা ডর পাবে। গলাটা টান টান করে রাখবে। দড়ি টানলে এক পা নড়বে না। চোখে-মুখে আতঙ্ক। আমারে তোমরা কোন পীরের দরগায় নিয়া যাইবা। এই ত আছিল একটা পীরের দরগা, হাসান

পীরের দরগা—এহানে আমারে রাইখা যাও। মনের সুখে ঘাস খাই। কিন্তু শালীর শালী কোরবানের জীবটা একেবারে দুলকি চালে সেই যে হাঁটছিল আর থামেনি। মাঝে মাঝে ঘাস দেখলে মুখ দিতে চেয়েছে, কিন্তু ফেলুর পা থাবে কোথায়! এক পা তুলে হড়কে লাথি। যেন এই লাথি সে জীবের পাছায় মারছে না, মারছে বিবির পাছায়। শক্ত পা ওর নিমেষে এত বেশি রুক্ষ এবং নিষ্ঠুর হয়ে যায় যে আজ হোক কাল হোক বিবি তারে খাবে। খেতে না পারলে নিশুতি রাতে পালাবে। নাকি মানে মানে সে তালাক দেবে বিবিকে! তালাক দিলে লাভ হবে কিথা দুই ভুঁই আর জমি যা আকালুদ্দিন দশকুড়ি দশ টাকায় বন্ধক রেখেছে সব খালাস পাবে। সে যে এখন কি করে বুঝতে পারছে না। এতবড় ধর্মযুদ্ধে এসেও সে তার সামান্য ক্ষয়ক্ষতির কথা ভুলে থাকতে পারছে না। দিমু এক হাতে নালি ছিঁড়া। বোকবা মিঞা মরল আমি ক্যামন একখানা! হালার কাওয়া।

হালার গরু! গরু তোমার মুখ দিমু ভাইঙ্গা! তুমি নড়তেচড়তে চাও না। কেবল মুততে চাও। গরুটা ভয়ে কেবল মুতছে। যে জীবটা এতক্ষণ বেশ আসছিল, বেশ হাঁটছিল, যেন সেও সবাইর সঙ্গে নামাজ পড়তে রওনা হয়েছে, সেই জীব এখন ঘাড় শক্ত করে পা বালিতে ঢুকিয়ে টান টান করে রেখেছে গলা। আর টানাটানি শুরুলেই হড় হড় করে মুতে দিচ্ছে। সে যে কি করে এতবড় চরে! এত ভিড়ের ভিতর তাকে জীবটা কি ছোট করে দিচ্ছে! কিছুতেই সে হাঁটিয়ে নিতে পারছে না। ক্রমে সবাই নদীর পাড়ে উঠে যাচ্ছে। দলে দলে ইস্তাহার মাথার উপর তুলে নাচাচ্ছে। আলি সাহেব একটা চোঙ মুখে ঢিবির উপর উঠে একের পর এক হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের কথা বর্ণনা করছে। ধর্মের প্রতি আবহমানকাল ধরে যে হিন্দুদের ঘৃণা, সেই ঘৃণার কথা তীর্যক ভাষায় প্রকাশ করছে। সবাই শুনতে শুনতে কান খাড়া করে দিচ্ছে। গরম রক্ত এবার টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করেছে। পুব দেশে যত কাফের আছে, কাফের নিধন করে পতাকা ওড়াও। কোরবানের পশুটা পর্যন্ত গলা তুলে শুনতে গেল—সেই যেন ঢাক বাজে ঢোল বাজে—জীবের গলা কাটলে শুধু থাকে রক্ত, অবলা জীবের মুখে টগবগ করে রক্ত ফুটছে, এ জীবের তবে নিদান হাঁকা দায়। ফেলু মরিয়া হয়ে হ্যাঁচকা টান দিল জীবটাকে। এবং হ্যাঁচকা খেয়ে সে পড়ে যেত, ফলে আর এক হাত সম্বল থাকত না, হাতটা তার ভাঙত। কিন্তু তখনই দুটো ফাঁকা আওয়াজ পীলখানার মাঠ পার হলো। ভিড়ের ভিতর থেকে ফেলু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ফাঁকা আওয়াজেই যে যেদিকে পারছে ছুটছে। এবং চরের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। কিছু দূরে এসেই ফেলু বুঝি টের পেল ওটা ফাঁকা আওয়াজ। সে একটা মানুষের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বুঝে ফেলল সবই ফাঁকা আওয়াজ। গরুটা ফাঁক বুঝে লেজ তুলে ছুটতে চাইছে। সেও শালা ফাঁকা আওয়াজ। সে বলল, হালার কাওয়া! তুমি গরুর পো টের পাইছ, গলায় তোমার আমি চাকু চালামু। আল্লার নামে কোরবানী দিমু।

আলি সাহেব যখন ঢিবিতে উঠে চেঁচাচ্ছে। —ভয় নেই। আপনারা ভয় পাবেন না। সব ফাঁকা আওয়াজ। আল্লার কুদরতে বন্দুকের নল থেকে গোলাগুলি বের হবে না। সব ধোঁয়া বের হবে। সব ধোঁয়া! ধোঁয়া! আপনারা কদম কদম বাড়ায়ে যান।

কদম কদম বাড়ায়ে যান, দাঁড়ায়ে যান সামনে। আজ সবে-বরাত। সব মৃত আত্মারা বের হয়ে পড়েছে। তারা আজ মুক্ত। তারা দেখছে আপনারা যা সব জোয়ান পাওয়ান আছেন—আল্লার দুনিয়ার ফিডা করছেন। আলি সাহেব কলিকাতা শহরে থাকেন। কথায় বার্তায় পুব দেশের মানুষের মতো বলে আপনার জন হয়ে যান মাঝে মাঝে। তিনি বললেন, গরু, ভেড়া দুম্বা যা কিছু কোরবানী দেবেন, সবই তারে দিবেন। আল্লার কাছে যে জীবন পেয়েছেন, তারে তা ফিরিয়ে দেবেন। না পারেন নিজেরে দেবেন।

এই শুনে সবাই আবার এগুতে থাকল।

বাবুরা ছাদ থেকে দেখছিলেন এক ফাঁকা আওয়াজেই সব ছুটে পালাচ্ছে! বাবুদের ছেলেরা এমন দেখে কি হাসা! আনন্দে ছুটে এসেছে নদীর পাড়ে। এবং ভূপেন্দ্রনাথ দুরবীন নিয়ে বসে রয়েছে। মাঝে মাঝে বড়বাবুকে দেখতে দিচ্ছে। শংকা তার কমছে না। কারণ আবার সবাই চরে এসে জমা হচ্ছে। ওরা বুঝতে পেরে গেছে পুলিশ সাহেব ভিড়টা এগুতেই ফাঁকা আওয়াজের নির্দেশ দিয়েছেন। ওরা টের পেয়ে ফের মরিয়া হয়ে গেছে। সে দেখল, যারা কোরবানীর জন্য পশু নিয়ে এসেছে তারা এবার সকলের আগে হাঁটছে। ভয় নেই। বিন্দুমাত্র শংকা নেই। আল্লার কাছে যে জীবন পেয়েছেন তারে তা ফিরিয়ে দেবেন—না পারেন, নিজেরে দেবেন। ওরা যেন নিজেকে দিতে এবার যাচ্ছে।

বল্লমের ইস্পাতে সূর্যাস্তের রোদ পড়ে ভীষণ এক কান্ড। হাজার হাজার এমনি সব ইস্পাতের ফলা আকাশের দিকে কারা ছুঁড়ে দিচ্ছে। ওরা কদম কদম এগিয়ে আসছে। কেউ যেন দামামা বাজাচ্ছে। তালে তালে উঠে আসছে কালীবাড়ির দিকে। বাজার বাঁয়ে রেখে ঠিক তারকবাবুর মাঠ বরাবর উঠে আসছে। মঠে এখন কেউ নেই। কিছু কনেস্টবল। হাতে বন্দুক। একপাশে গোঁড়া পুলিশ সাহেব। বাবুরা কৃতীলোক। ভূপেন্দ্রনাথ বাবুদের চিঠি নিয়ে সদরে দেখাসাক্ষাৎ করে এতবড় একটা বন্দোবস্ত করেছে। নতুবা সুরাবর্দি সাহেবের আমল। লীগের রাজত্ব দেশে। সামসুদ্দিন বড় গোছের নেতা। সে আর এ-সবে মাথা দিতে পারে না। হরদম সে কলকাতা যাচ্ছে। আসছে। বাবুরা কৃতী না হলে এমন হয়। বন্দুকের সঙ্গীণে সূর্যাস্তের আলো। ওরা সবাই এখন নিলিং পজিসনে আছে। কেবল আদেশের অপেক্ষায়। হিন্দু-মুসলমানে এমন মার-মুখী দাঙ্গা তাকে রুখতেই হবে।

ওরা উঠে আসছে তো আসছেই। ফাঁকা আওয়াজে ভয় পাচ্ছে না। শুধু অবলা জীবের চোখ ভয়ে লাল হয়ে গেছে। কান ঝুলে গেছে তার। ফেলু একটু হড়কে গেলেই বাস্ গরুটা লেজ তুলে পালাবে। এই যে তামাসা—শালা সে কে, সে কিসের নিমিত্ত এসেছে এখানে বুঝেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। একবার ফেলুর হাত ছিলে গেলেই হল, তখন দেখবে কার সাধ্য তারে আটকায়। কিন্তু ফেলুর এক হাতই এত শক্ত যে সে গলায় টের পাচ্ছে। দড়িটা টানাটানিতে গলায় বসে

রয়েছে। জীবটা শ্বাস নিতে পারছে না। সুতরাং শ্বাস ফেলার জন্য সেও কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে।

—হল্ট। একসঙ্গে বিশটা রাইফেলের ট্রিগারে শব্দ। ওরা সেফটি অন করে দিয়েছে। আর এক পা এগুলেই ট্রিগার টিপবে।

আল্লার কাছে যে জীবন পেয়েছেন তারে তা ফিরায়ে দেবেন। দামামা বাজছে তালে তালে। মহরমের মতো ঢোল বাজছে। আর তালে তালে সেই এক পবিত্র কোর-আনের বাণী ভেসে বেড়াচ্ছে যেন কানে, না পারেন নিজেরে দিবেন। ওরা নিজেদের দিতে যাচ্ছে।

রূপগঞ্জ থানার ইসমাইল দারোগা চোঙ মুখে হাতে লেখা কাগজ পড়ে যাচ্ছিল, আপনারা আর অগ্রসর হইবেন না। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই আইন ভঙ্গ করা হইবে। একশো চোয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করিলে গুলি করিতে বাধ্য থাকিব। আমাদের গোস্তাকি ক্ষমা করিবেন। অন্যত্র আমরা আপনাদের ধর্মকর্মের দাসানুদাস। বলেই সে পুলিশ সাহেবের সামনে এসে সেলুট করল এবং কানে কি ফিস ফিস করে বলল। তারপর কাগজটা ফিরিয়ে দিল।

লাল বর্ণের মানুষ। চোখ মুখ এমনিতেই লাল। সূর্যাস্তের জন্য সে মুখ আরও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। বয়স খুব অল্প। দেখে মনে হয় শংকায় ওর গলা শুকিয়ে আসছে। দামামার শব্দে কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না। ওরা এগিয়ে আসছে ত আসছেই।

নানা রকমের শব্দ উঠছে, গরু ভেড়ার শব্দ, ঢাক-ঢোলের শব্দ, চোঙ মুখে বক্তৃতা। উত্তেজনা জিইয়ে রাখা চাই। সাহেবের মাথায় সব শব্দ রেল গাড়ির চাকার মতো ঝন ঝন করে বাজছে। এবং ঠিক তক্ষুনি ওরা এত কাছে এসে গেছে যে হাতের কাছে পেলে মশালে আগুন জেবলে ওদের সবাইকে পুড়িয়ে মারবে। একটা বর্শা ঠিক তক্ষুনি ইসমাইল দারোগাকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে মারল কে! জনতার ভিতর থেকে হাজার হাজার বর্শা যেন ছুঁড়ে দেবে এবার তারা। এত প্রচন্ড বেগে বের হয়ে গেল যে ইসমাইল টের পেল না, পিছনের দিকে তাকাতেই দেখল সাহেবের কান উড়ে গেছে।

ইসমাইল এবার চোখের উপর সর্ষে ফুল দেখতে থাকল।

যেন একগুচ্ছ মানুষের জীবন রক্ষার্থে সাহেব নিজের রক্তাক্ত মুখ ঢেকে হুকুম দিলেন—ফায়ার!

ফায়ার ফায়ার। ব্যাস্ গুলি ছুটতে থাকল। বন্দুকের নল থেকে এবার আর ধোঁয়া বের হচ্ছে না। কেবল গুলি বের হচ্ছে। বিশ রাউন্ড গুলি ছুঁড়েই সিপাইরা ফের এটেন্‌সান হয়ে গেল। হুকুম পাবার জন্য ফের কান খাড়া করে রাখল। কিন্তু কে কাকে হুকুম দেবে। আহত পুলিশ-সাবকে এখন ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাছারিবাড়িতে। শিলাবৃষ্টির মতো সেই উচ্ছৃঙ্খল জনতা চরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। নিমেষে চর ফাঁকা। সূর্যাস্তের লাল রঙ, আর কত মানুষের তাজা রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। আর সেই কোরবানীর পশুগুলি পড়ি-মরি করে ছুটছে। ফেলু ছুটছে। ধুনধুমার লেগে গেল চোখে-কানে। সে টের পাচ্ছে না কখন ওর মরা হাত উড়ে গেছে। হাতটা যা এতদিন রক্তশূন্য ছিল, অচল অসাড় হাত, যা সে বার বার কতবার ভেবেছে সময় ও সুযোগ-মতো একদিন কলার ফ্যাতা কাটার মতো শুকনো হাতটা হ্যাঁৎ করে কেটে ফেলবে, পারেনি। বড় মায়া তার হাতের জন্য। অসাড় হাতটার জন্য সে কষ্ট পায়, তবু সে পারে না ফেলে দিতে— আজ একটা বন্দুকের নল থেকে গুলি বের হয়ে সোজা ওর হাত উড়িয়ে নিয়ে গেল। প্রাণটা উড়ে যেত, একটু ডান দিক ঘেঁসে গেলেই বুকের অন্তরটা ফালা ফালা হয়ে যেত।

এমন তার ধুনধুমার লেগে গেছে যে সে এই অন্ধকারে কোথায় ছুটে যাচ্ছে টের পাচ্ছে না। কেবল মনে হচ্ছে হাতটা থেকে একটু একটু করে পানসে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সে যে কোরবানী দেবে বলে একটা পশু নিয়ে এসেছিল—সেটা না থাকলে খালি খালি লাগার কথা—তা পর্যন্ত সে টের পাচ্ছে না। সে একা, কেউ নেই পাশে। সে দাঙ্গার আসামী। তাকে ধরার জন্য এবার যেন সবাই বের হয়ে পড়েছে। কেউ পাশে নেই। সবাই যে যেখান পেরেছে পালিয়েছে। ওর চোখের সামনে ত্রিশ চল্লিশটা মানুষ জবাই করা পশুর মতো হাঁটু মুড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। এই অন্ধকারেও সেই সব লাস তাকে ধরার জন্য ছুটছে,—কোনখানে যাও মিঞা। আমাগ কার কাছে রাইখা যাও।

ফেলু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। অন্ধকারে মাঠের উপর বলতে বলতে যাচ্ছে—হা আল্লা এডা কি হইল! কোথায় গ্যালা মিঞা ভাইরা! এই রক্ত এখন কার বদলে যায়!

কেবল মনে হতে লাগল ওর মাথার ভিতর এখন কে মহরমের ঢোল বাজাচ্ছে। কেউ তার কথার জবাব দিচ্ছে না। দিলেও সে শুনতে পাচ্ছে না। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তো ছুটছেই।

পঙ্গু হাতটা নেই বলে শরীর হাল্কা। শুধু ক্ষতস্থানটা টনটন করে ব্যথা করছে। তাও সে কানেচোখে ধুনধুমার লেগে যাওয়ায় টের পাচ্ছে না। সে উথাল-পাতাল ছুটছে। কোনদিকে যে যেতে হবে, কোথায় কিভাবে ছুটলে পথ সংক্ষিপ্ত হবে সে তা পর্যন্ত বুঝতে পারছে না। কেবল সে যেখানে হিন্দুগ্রাম পড়ছে, সেসব গ্রাম এড়িয়ে যাচ্ছে। সে একটাও মিছিলের লোক পাশে দেখতে পেল না। সে, কোন লোক ছুটছে দেখতে পেলেই ভয় পেয়ে যাচ্ছে। ওকে ধরতে আসছে হয়ত। বাবুদের সব জংলী কুকুরের মতো ছেলেরা বন্দুক কাঁধে বের হয়ে পড়তে পারে, এবং খবর রটতে কতক্ষণ, সবাই জেনে গেছে বুঝি ত্রিশ-চল্লিশটা লাস পড়ে আছে শীতলক্ষ্যার চরে। সে হেরে যাওয়া মানুষ। বড় মাঠের অন্ধকারে সে টের পাচ্ছে না সে এখন কোথায় আছে। বাগি গরুটা থাকলেও এ-সময় ওর সামান্য বুদ্ধি সাহস থাকত।
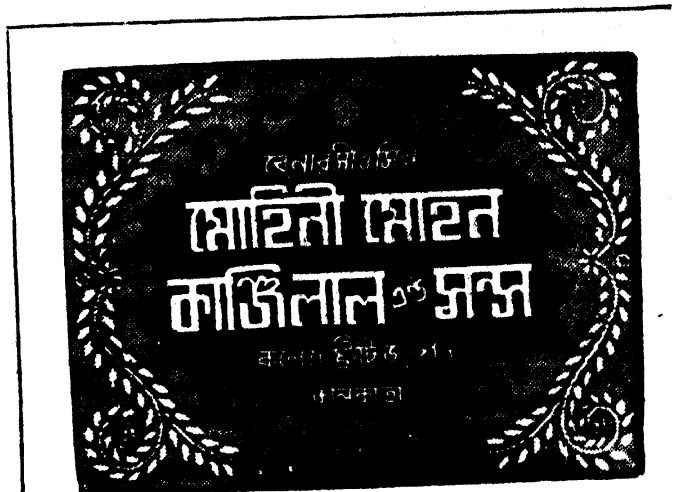
নিজের বলতে তার এখন কিছু নেই। এমন কি একদিনের হাতটা বা পাগল ঠাকুর হাতী নিয়ে ভেঙে দিয়েছিল, সে যে কি ভালবাসার হাতটা, শরীরে ঝুলিয়ে রেখেছিল, এবং কত হেকিম দাদির সে করেছে হাতটার জন্য, হাতে কালো তারে কড়ি বেঁধেছে, এই ধর্মযুদ্ধে এসে তার তাও গেল। এখন হাজার কাওয়া, সে কানা ফেলু, সে ঠুণ্ডা ফেলু। হাজার কাওয়া পাগল ঠাকুর তাকে এমন করেছে। সে কেন জানি একা! এই অন্ধকার মাঠে এসে তার হাতটার জন্য কষ্ট পেতে থাকল। সবাই দেখতে পাবে সকাল হলে একটা মরা হাত নদীর চরে পড়ে আছে। লাসগুলোর সঙ্গে মরা হাতটা বড় বেমানান।

সে আর পারছে না। চারপাশে ঘন অন্ধকার এবং কিছু জোনাকি জ্বলছে ভুতুড়ে চোখের মতো। সে যে কতক্ষণ তাড়া খেয়ে ছুটেছে এবং কতটা পথ এসে গেছে এক তাড়ায় অনুমান করতে পারল না। মনে হল সে একটা বড় গাছের নিচে এখন দাঁড়িয়ে আছে। সে এবার গাছটার নিচে শুয়ে পড়বে ভাবল। সকাল হলে সে বুঝতে পারবে কোথায় এসেছে এবং কিভাবে যে দেশে ফিরে যাওয়া যাবে, আকালুদ্দিন যদি আগে আগে ফিরে যায়। সে নেই গাঁয়ে। ওর তবে পোয়াবারো। সে ফের উঠে আবার ছুটবে ভাবল। কিন্তু দাঁড়াতেই মনে হল, শরীরে আর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। অবশ হয়ে গেছে পা। এত শক্তি পায়ে তার, আর এখন সে এক পা নড়তে পারছে না। সে বসে পড়ল এবং তার ঘুম এসে গেল।

সকালবেলার তাজা রোদের ভিতর তাকে কে যেন ঠেলছে। তাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। শেষ রাতের ঘুমে সে এমন অচেতন যে, সে কিছুতেই চোখ মেলতে পারছে না। ওর পিঠ কে চেটে চেটে দিচ্ছে। পিঠে ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে। তবু সে আলস্যে উঠতে পারছে না। চোখ মেলতে পারছে না। সে যে পালা করতে গেছিল গতকাল তা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে। এবং চোখের উপর সূর্যের আলো এসে পড়লে সে ধড়ফড় করে জেগে গেল। প্রথম সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, ওর বাগি গরু এটা। গরুটা ওর পিঠে জিব দিয়ে এতক্ষণ চেটেছে। ঘামে পিঠে যা নুন ছিল চেটে চেটে খেয়েছে। হাজার গরু বড় সেয়ানা। পথ চিনে ঠিক চলে এসেছে। না কি গরুটা ওর সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। সে খেয়াল করেনি। গরুর আর ধুনধুমার লাগার কথা নয়। সে তাড়াতাড়ি ভাবল, গরুটার মুখে একটা চুমু খাবে। কিন্তু খেতে গিয়েই মনে হল ওর বাঁ হাতটা কাঁধে আর ঝুলে নেই। গরুটা দেখে ফেললে ভীষণ সরমের ব্যাপার। সে তাড়াতাড়ি গামছা দিয়ে ক্ষতস্থানটা ঢেকে দিল। গাইগরু আর বিবি সব সমান। দুবলা স্বামী টের পেলে কেবল মাঠে পালাবার চায়।

সে বাগি গরুটা নিয়ে উঠে চারদিকে তাকাতেই এবার বুঝল—সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঠিক পথেই চলে এসেছে। এই সেই দাওসার বিল সামনে, এখানে কাটা মোষের মাথা ফেলে চলে গিয়েছিল কারা। এখানেই জালালি জলে ডুবে মরেছিল আর পাগল ঠাকুর জালালির মৃতদেহ নিয়ে মাঠের উপর তরে ছুটেছিলেন সাদা জ্যোৎস্নায়।

সে গরুটাকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রায় দুলকি চালে। যান সে তার বিবিকে নিয়ে মেমানবাড়ি বেড়াতে গেছিল। দেখলে কে বলবে ওর মরা হাতটা নদীর চরে পড়ে আছে। হাতটা কার. এই হাত, দুবলা হাত, না কি সারা রাত রক্ত পড়ার হাতটা এমন শীর্ণ হয়ে গেছে—হাতটা নিয়ে একটা ভীষণ কাণ্ড বেঁধে যাবে। মানুষটা কে, কোন মানুষের এমন একটা শীর্ণ হাত থাকতে পারে।

কিন্তু গ্রামের কাছে এসেই ওর বুকটা শুকিয়ে গেল। বিবিটা ওর ঘরে আছে ত! যদি থাকে তবু ডর। ওর কাটা হাত দেখে বিবিটা আহ্লাদে হাসবে। ক্ষতস্থানে দুব্বা ঘাসের রস ঢেলে দিতে দিতে মুখ গোমরা করে রাখবে। যান কত ভাব ভালবাসা। ফেলুর দুঃখে আন্নুর ঘুম আসছে না। তর ছিনালি আমার ভাল লাগে না বিবি। তর ছিনালি দ্যাখলে নিজের গলায় কোরবানীর চাকু চালাইতে ইসছা হয়। আমারে ফালাইয়া কোনখানে যাইস না। তুই ঘরে থাকলে বাথানের গরুর মত আমি হাম্বা হাম্বা করমু। আমি বেইমানি করমু না। কথা দে যাইবি না। সে নিজেই কেমন একা একা নিজের সঙ্গে কথা বলছে।

এখন ফেলুকে দেখলে মনেই হয় না গতকাল সে গিয়েছিল ওই জীব নিয়ে শীতলক্ষার চরে। সে জীবটাকে কোরবানী দেবে বলে নিয়ে গিয়েছিল।

সকালবেলা অনেকেই দেখেছিল ফেলু যাচ্ছে মাঠের উপর দিয়ে। গরুটাকে সে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মনে হয় না। গরুটাই তাকে যেন টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গরুটা আগে আগে হাঁটছে। ফেলু পিছনে। সে তার আদরের পশুটাকে নিয়ে গিয়েছিল কোরবানী দেবে বলে। কিন্তু কি ব্যাপার। ফেলু ফিরে এসেছে! সঙ্গে এসেছে বাগি গরুটা! শীতলক্ষার চরে নামাজ পড়ার কথা। বাড়িতে ওরা সারা দিনরাত দুঃশ্চিন্তায় থেকেছে। কোন খবর আসেনি। দাঙ্গা বেঁধে যেতে কতক্ষণ। একবার ইচ্ছা হল ঈশমকে দিয়ে খবর নেয়। কি খবর নিয়ে এসেছে ফেলু।

বিকেলে ঈশম গিয়েছিল ফেলুর কাছে। ফেলু ঈশমের সঙ্গে কথা বলেনি। সে একটা ছেঁড়া কাঁথায় শরীর ঢেকে শুয়েছিল। খোয় এ-গ্রাম থেকে গেছে আকালুদ্দিন। আকালুদ্দিনের খবর নিয়ে জানল, সে ফিরে আসেনি। আন্নুকে হাতের ইশারায় বড় কাফিলা গাছটার নিচে ডেকে নিয়ে গেল. আন্নু বলেছে, তাকে কিছু বলছে না মানুষটা। এসেই যে কাঁথা গায়ে শুয়ে পড়েছে আর উঠছে না। এমনকি আন্নুকে খুব কাছে যেতে দিচ্ছে না। কেবল মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে।

সুতরাং বিকেলের দিকে ঈশম কোন খবর নিয়ে আসতে পারল না। আর কার কাছে খবর পাওয়া যায়। সে সুলতানসাদি যাবে কিনা ভাবল। অথবা নদীর চরে চুপচাপ বসে থাকলে টের পাবে, হাটুরে মানুষেরা যাবে, তারা ঠিক খবর নিয়ে আসবে। বিকেলে সে আর বাড়ি বসে থাকল না। ছইয়ের নিচে বসে তামাক খেতে থাকল এবং হাটুরে মানুষেরা যখন ফিরছে, কি বলাবলি করছে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল।

ঈশমই সন্ধ্যার পর এসে খবর দিয়েছিল, খুব দুঃসম্বাদ। জমিদারবাবুরা চাঁদশটা লাস নামিয়ে দিয়েছে। সময় বড় খারাপ। বড় মামীর চোখের দিকে তাকালেই ঈশম যেন ভয় পেয়ে যায়। সে বলল, বড় মামী এডা যে কি হইতাছে বুঝি না।

শচি বলল, তুই কাইল চইলা যা মুড়াপাড়া। ঠিক ঠিক কি হইছে জাইনা আয়।

—কাইল ক্যান। আইজ রওনা দেই। তবে কাইল বিকাল বেলা ফিরা আসতে পারমু।

ঈশম পরদিন বিকেলে এসে সব বিস্তারিত বললে হিন্দু গ্রামের সব মানুষেরা ভীষণ খুশী হয়েছিল। ওরা সেদিন রাতে বিজয় উৎসব করেছিল গ্রামে। ওরা খোলকরতাল বাজিয়ে হরি সংকীর্তন দিয়েছে।

(ক্রমশঃ)

**বদীল**

তখনই সিপ্রাকে পই-পই করে বলে-ছিলাম, দেখো একটা টাকার জন্য ও-রকম কোর না। ঝড়, জল, বৃষ্টি, ঠান্ডা, গরম সব সময় যে লোকটাকে হাতের কাছে পাও তাকে এক-আধ টাকা বেশী দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। এক ধামটায় আমায় বোকা করে দিল সিপ্রা, আমি কি তোমার কাজের ব্যাপারে কিছু বলি কখনো যে তুমি আমার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছ? এমনিতেই তিন টাকা দি, তাই বেশী। পাশের ফ্ল্যাটের মন্টুদারা কত দেয় জানো? দু'টাকা মাত্র, বুঝলে। ওরা যখন যা চাইবে, তাতেই যদি সায় দাও, তাহলে একটা টাকায় আমি সংসার চালাতে পারব না। তুমি বেশী করে দাও, আমিও বেশী বেশী মাইনে দেব। মাইনে কম দিতাম বলেই তো বিমলা কাজ ছেড়ে চলে গেল। বাগচী বাড়ীতে উনিশ টাকা দেবে, সেখানে আমরা দিতাম মোটে তেরো টাকা। তুমি যদি সাধুরামকে চার টাকা দিতে চাও তো দাও, তবে আমার সংসার খরচের টাকায় টান মেরো না। বাড়তিটা নিজের পকেট থেকেই দিও।

এরপর আর কিছু বলা চলে কি? একেবারে ফাস্তা ধরে টান মেরেছে গিন্নী, তাই চুপ করে গেলাম। সব কুড়িয়ে কাড়িয়ে পৌনে চারশ ঘরে আনি—এক পয়সা বেশীও না, কমও না। কোথেকে একটা টাকা বেশী দেব? সে মুরোদ নেই। তাই চুপ করে গেলাম।

ওদিকে মওকা বুঝে সাধুরামও ডুব মারল। পর-পর দু-তিন দিন এল না। বাথরুমের কোণে ময়লা ফেলার টিনটা উপচে সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। বালতি বালতি জল ঢেলেও পায়খানা সাফ হয় না। গন্ধে নাড়ি উল্টে যাবার উপক্রম। বাজার সেরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই একটা বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছিলাম। সে কথাটা সিপ্রাকে বলতেই তোলা উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপাতে চাপাতে দাঁতের ফাঁকে ফুর-ফুরে গোলাপী ঠোঁটের আধখানা কামড়ে ধরে সেন গলায় বলল, যাও না আমের আগে তুমিই ময়লাটা ফেলে এসো। নীচের তলার ননীবাবু তো রোজ নিজেই ময়লা ফেলেন, বাথরুম ধুয়ে দেন।

একটা কথা বললেই যদি এপ্রায়েন্সল সমেত আমার কি কি করণীয়, সে-সব কাজের ফিরিস্তি শুনতে হয়, তারচেয়ে কথা না-বলাই ভাল। তাছাড়া বড় রাস্তার ওপর বাড়ী। আমি এখন লুঙ্গি পরে গায়ে গামছা জড়িয়ে হাতে ময়লা ফেলার টিন ঝুলিয়ে ফাঁড়ির গায়ে লাগানো ডাস্ট-বিনে নোংরা ফেলতে যেতে পারব না। রাস্তার দোকানদাররা সবাই চেনে আমায়। বড় রাস্তার দিকের বারান্দাটায় যে আমি কখনো খালি গায়ে দাঁড়াই না, সর্বদাই কিছু না কিছু একটা গায়ে দিয়ে নি, সেই আমি কি-না ময়লা-ফেলার টিন নিয়ে...। ধুর তাও কি হয়।

হয় না বলেই, আর কথা না বাড়িয়ে সকালের কাগজখানা নিয়ে সোজা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। হাত-ঘড়িতে দেখলাম সোয়া আটটা। একটু চা হলে মন্দ হত না। কিন্তু—কাকে বলব? একে বিমলা কাজ ছেড়ে চলে গেছে, তার ওপর সাধু-রামের এই কীর্তি এখন কিছু করমায়েস করলেই সিপ্রা শুনিয়ে দেবে নীচের তলার স্বাবলম্বী ননীবাবু বা পাশের ফ্ল্যাটের বৌ-অন্ত-প্রাণ মন্টুদা কি কি করেন। তার চেয়ে চুপ থাকাই ভাল।

কাগজ আর পড়তেও ইচ্ছে করে না। কাগজখানা মুড়ে বগলদাবা করে, গ্রেলিংয়ে বডিটা হেলিয়ে দিয়ে রাস্তার শোভা চোখ কান খুলে দেখতে লাগলাম। এখনো ভিড় জমেনি। ঢাউস ঢাউস সরকারী বাস গদাই-লস্করী চালে দক্ষিণ-উত্তর, উত্তর-দক্ষিণ করছে। ট্যাং-ট্যাং করে বাজনা বাজিয়ে ট্রাম ছুটছে। ফাঁকা ট্যাকসি কেঁপে কঁকিয়ে ভোঁকর ভোঁকর করে খদ্দের খুঁজে গাড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। আর আমাদের সাধুরাম উল্টোদিকের কাঁচা ড্রেন থেকে ঝাঁঝরি হাতা দিয়ে খুবলো খুঁচি তোলার কাদার বিড়ির পাতা, কলার খোসা, খড়, টুকরো-টাকরা ময়লা তুলছে। আরে ব্যাটা তাই এখানে, আর তোর জন্যায় বাড়ীতে টেকা দায় হয়ে উঠেছে। গ্রেলিংয়ে হেলা বডিটা স্ট্রেইট তুলে, মারকরোক গলা খাঁকারি দিয়ে হাঁক পাড়লাম—এই সাধু, সাধুরাম।

ময়লা ছাঁকতে ছাঁকতে তেরচা একটা চাউনীতে আমায় দেখল সাধুরাম। তারপর ঝাঁঝরিখানা ড্রেন আর বিড়ির দোকানের কোণে তুলে রেখে ঘুরে দাঁড়াল। হাফ-প্যান্টের ওপর হাতকাটা শতচ্ছিন্ন একটা গেঞ্জি শুধু ওর গায়ে। কালো-কুণ্ডি একটা মাফলার গলায় জড়ানো হেলেটার। উঠতি গোঁফের রেখা ঠোঁটের কোল বেয়ে দু'দিকে গড়িয়ে পড়েছে। হাতছানি দিয়ে ডাকলাম—শোন ইদিকে।

এল। তলায় এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে চাইল আমার দিকে। ঝুঁকে পড়ে বললাম—আসিস-নি কেন দু'দিন? কোন জবাব না দিয়ে দাঁতে নখ খুঁটতে লাগল। বুঝলাম এ-ভাবে লং ডিসটান্স কনভারসেশনে কাজ হবে না কোন। চেঁচিয়ে বললাম—ওপরে আয়। এইবার মুখ খুলল ব্যাটা—নেহি যাবু। অবাক হয়ে গেলাম—নেহি কেন রে? সংক্ষেপে যা বলল তার অর্থ ওপরে মাইজী আছেন। দেখলেই গালাগালি করবেন, তার চেয়ে তুমিই বাবু নীচে এস।

অগত্যা। নীচে এলাম। কি ব্যাপার, তুই কাজ ছাড়লি কেন?

তিন টাকায় পোষায় না বাবু—সাফ জবাব দেয় সাধুরাম।

সঙ্গে সঙ্গে তেড়েফুঁড়ে কথাটা বাঁধাই—তিন টাকায় পোষায় না তো পাশের ফ্ল্যাটে দু' টাকায় যে কাজ করিস।

ও-তো বাবু শুধু ময়লাটা ফেলে দি। আর কিছু তো করি না। সাধু আমাদের ময়লা ফেলে, বাথরুম ধুয়ে দেয়, পায়খানা সাফ করে আর একদিন অন্তর সিঁড়িটাও ঝাঁট দিয়ে দেয়। এত সব করতে গিয়ে রোজই দশ-পনেরো মিনিট লেগে যায়। সরকার-বাবু রাগ করেন। নিজেকে খোলসা করে খুলে দেয় সাধু।

সরকার বাবু! কে সরকারবাবু?—জিজ্ঞাসা করি সাধুরামকে।

কেন ব্রুক সরকার চৌধুরী বাবু। একটু দাঁড়ান এই সাড়ে ন'টার ভিতর এসে যাবেন।—বিনীত ভাবে আমার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেয় সধুরাম।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় ডিউটি শুরু সাধুরামের। সকালে চার ঘন্টা, সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। বিকেলে আড়াই ঘন্টা, আড়াইটা থেকে পাঁচটা। করপোরেশনের ব্রুক মজদুর সাধুরাম নিত্য সাড়ে ছ' ঘন্টা রাস্তা আর ড্রেন সাফ সুতরো করে। মাস গেলে পায় একশো পঞ্চাশ টাকা আট আনা। পুরো টাকাটা কোনদিন বেচারা পায় না। পাবে কি? ও-তো টেম্পোরারী স্টাফ। দশ মাস কাজ করছে। এর আগে ওর জায়গায় কাজ করত ওর কাকা রামায়ণ সিং। যক্ষ্মা-কাশে ভুগতে ভুগতে ধুঁকতে ধুঁকতে গয়া জেলার ডিহানি গাঁয়ে ফিরবার আগে ব্রুক সরকারের হাতে পায়ে ধরে ভাইপোকে কাজে বসিয়ে দিয়ে গেছে রামায়ণ।

এর জন্য কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি সাধুরামকে। দেশের এক ভিটা জমি মহাজনের কাছে রেখে নিয়ে পাঁচশো টাকা ব্রুকবাবুর পায়ে প্রণামী দিতে হয়েছে। বদলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্রুক সরকাররাই দেন। পরে করপোরেশনের ডিসট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের একটা অ্যাপ্রুভাল আদায় করে নিলেই হয়। পাঁচশো টাকাতে শ্যাম, কুল দুই-ই বজায় রেখেছে সাধু।

কিন্তু চৌধুরীবাবু দারুণ কড়া লোক। সাধুরামের মত 'বদলি'দের কাছ থেকে চাকরী পাইয়ে দেওয়ার দরুণ পাঁচশো পেয়েই তিনি খুশী নন। আরও তার চাই। ফি মাসে পঁচিশ টাকা মাইনে থেকে আদায় করেন। সাধুরামরা যে পঁচিশ টাকা গচ্চা দেয় প্রতি মাসে, সেটা আবার পুষিয়ে নেয়, করপোরেশনের কাজে গাফিলতি দিয়ে, বাড়ী বাড়ী কাজ করে। সকালে এসে একটু-আধটু রাস্তা ঝাঁট দিয়ে সাধুরাম তার বে-আইনী কারবার শুরু করে দেয়। এগারোটা বাড়ীর ময়লা সাফ করে, ডাস্টবিন ফেলে, বাথরুম ধোয়। এগারোটা বাড়ী থেকে ওর মাস গেলে আয় হয় তিরিশ টাকা। ব্রুক সরকার চৌধুরী সব জানেন। জানেন বলেই ভোর সাড়ে পাঁচটার পর তার টিকিও দেখা মেলে না এই তল্লাটে। আবার জানেন সেই মাটির পাড়া [illegible] জুড়ে বাড়ী বাড়ী কাজ সেরে পরে সান্ধ্যবেলা আবার ঝাঁটা, বরুশ নিয়ে রাস্তার সাফ করার কাজে লেগে পড়ে। আইন বাঁচিয়ে [illegible] এই বে-আইনী [illegible] চৌধুরীবাবু বাড়ী [illegible] এক টাকা। এতদিন [illegible] ছিলেন। চলতি মাসে রেট বাড়িয়ে [illegible] করে দিয়েছেন। তাই সাধুরাম নাচার। সেও রেট বাড়িয়েছে। নইলে তার চলবে কি? ওদিকে দেশে সাতটা প্রাণী ওর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। যে করেই হোক আশী নব্বই টাকা কি মাসে দেশে পাঠাতে হবে। নইলে যে সব না খেয়ে মরবে।

মন্টুমামা এ-মাস থেকে তিন টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। তাই ওদের কাজ করে দিয়ে যাচ্ছে সাধুরাম। অন্য সব বাড়ী নারাজ। তাই সাধুও হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তবে আমি যদি একটা টাকা বাড়াই তাহলে কাল থেকে সাধু আমার বাড়ীতে আগের মতই আসবে।

বেশ তাই দেব। তবে আজই বাবা ময়লাটা সাফ করে দিয়ে যা। গন্ধে যে আর টিঁকতে পারছি না।—সব শুনে ওর কথাতেই রাজী হয়ে যাই।

এ-পাশ ওপাশ তাকিয়ে সোজাসুজি আমার চোখে চোখ রেখে সাধু জবাব দিল—আজ না বাবু। ঐ দেখুন সরকারবাবু আসছেন। জায়গায় না পেলে চাকরী খতম করে দিবেন। কাল ঠিক টাইমে আসব। কথা কটা শেষ করেই, একলাফে রাস্তাটা পেরিয়ে ড্রেন সাফ করার ঝাঁঝরিটা তুলে নিয়ে কাজে লেগে যায় সাধুরাম। রাস্তায় তখন অফিসের ভিড় জমে উঠেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঠিক বুঝতে পারলাম না কোনজন ব্রুক সরকার চৌধুরীবাবু। দারুণ ব্যবসা ফেঁদেছেন ভদ্রলোক। চাকরী করে দেওয়ার জন্য এককালীন পাঁচশো, ফি মাসে পঁচিশ প্লাস বাড়তি আয়ের শাঁস-টুকু সব নিজের পকেটে ঢোকাচ্ছেন। সাধুরাম তো আর প্রতিবাদ করতে পারবে না। প্রতিবাদ করলেই যে তার চাকরী নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ও-তো টেম্পোরারী—'বদলি'-স্টাফ। শুধু জানতে ইচ্ছে হয় কত হাজার সাধুরাম এই শহরটাকে নিত্য দুবেলা ঝাটপাট দিয়ে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে? আর ক'শো চৌধুরীবাবু ওদের মাথার ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে টু-পাইস রোজগার করেন?

সিপ্রাকে এখনো বলিনি সাধুরামের সঙ্গে আমার নতুন চুক্তির কথা। বললেই তো এখুনি ঝাঁঝিয়ে উঠবে—কেন তুমি আমার সংসারের ব্যাপারে নাক গলাতে আস? আরে বাবা কত দুঃখে যে নাক গলাই সে কথাটা যদি জানতে। যাক কাল থেকে তো আর এই ঝামেলা থাকবে না। একটা টাকা বেশী দিলেই যখন নিস্তার মিলবে, তখন দরকার কি মিথ্যে ঝগড়াটা বাড়ানোর।

—প্রভিকণ্ঠ

অনন্য সেন

সমাজে শিল্পীর অবস্থান নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। সত্যিকার শিল্পী কখনই ঘটনার নিস্পৃহ দর্শকমাত্র হতে পারেন না। জীবন থেকে শিক্ষালাভ করেন শিল্পী। বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে তা থেকে বিচিত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং বাস্তবের নন্দনতাত্ত্বিক বিচারও করে থাকেন। শিল্পী অবশ্য বাস্তবতার অংশ-বিশেষকে নানা পদ্ধতিতে গ্রহণ অথবা বর্জনে সমর্থ। গ্রহণ-বর্জনের এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণত শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যয় ও জীবনাদর্শের উপর নির্ভরশীল।

সাহিত্য সমাজতান্ত্রিক সমাজের আত্মিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ, মতাদর্শের সংঘর্ষে এক তীক্ষ্ণ ও অনন্য অস্ত্র। জনসাধারণের তত্ত্বগত নৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। এই ভূমিকাকে কোনোক্রমেই খাটো করা চলে না। সমাজে সাহিত্যের কদর তার বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যের জন্যে নয়, বরং সর্বোপরি তার জনগণকে সেবা করার বাসনায় বিশেষ দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতার জন্যেই।

এমন অনেক তাত্ত্বিক পুরুষের সন্ধান মেলাবে, বেশ জোরের সঙ্গেই তারা বলে থাকেন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে। ধর্মস্থানের মতো শিল্পেরও রাজনীতির ছোঁয়াছুঁয়ি এড়িয়ে চলা উচিত, এই হল ও'দের সুপারিশ। শিল্প ও রাজনীতির মধ্যে যোগাযোগ ও'দের মতে অসমঞ্জস। নুসংগত কেবল শিল্পীর নিজের মধ্যে ডুব দেওয়া। কেননা, পূর্ণ প্রশান্তিই একমাত্র শিল্পকৃতির পটভূমি। শিল্পীর পেশা যে কতখানি স্বতন্ত্র ও অতি-মানবিক প্রকৃতির, অন্যসব মানুষের থেকে শিল্পী যে পৃথক, তাঁর জীবিকা যে কত বিচিত্র এটা প্রচার করার জন্যেই উপরোক্ত তত্ত্বগুলি সর্বদা পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

স্থিতি-শান্তি মন্দ জিনিস নয়। কেই বা না চায় তা। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, এই শান্তি যখন প্রাণঘাতী বোমা বিস্ফোরণে বিদীর্ণ হয়, শিশুর স্বপন জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয় যখন, কামান-বন্দুকের মৃত্যুবর্ষী নলগুলো যখন তাক করে মাথা উঁচিয়ে থাকে সত্য, পৃথিবী আর কবিতার দিকে, যখন আমাদেরই মতো মানুষ আমাদের চোখের সামনে মারা পড়ে, আমাদের যা কিছু কীর্তি আর যা আমরা করছি সবই নিন্দিত হয় বছরের পর বছর প্রতিদিন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় যখন ভিয়েতনামে রক্তপাত ঘটতে থাকে, সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে গৃহযুদ্ধের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হয়, স্বদেশভূমি বিতাড়িত মানুষেরা নারকীয় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়, দেশী ধনীদের মধ্য দিয়ে বিদেশীরা যেখানে চরম নিপীড়ন চালায়, তখন রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করে, সব কিছু দেখেশুনেও অন্ধ ও বধিরের ভাণ করে শান্তি ও স্বস্তিতে বাস করা কতখানি অসম্ভব ব্যাপার। পরিপার্শ্ব পৃথিবী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বোধই কবিতার প্রাণ। কবিদের মধ্যে ঠিক এই চেতনারই অভাব ঘটে থাকে; তাঁদের পদ্য হয় নিছক মিল-মেলানো শূন্যতা'। কবি আসলে খোঁজেন তাৎপর্য, গভীর অন্তঃসার, সত্যিকার আবেগ। জীবনের জন্যে সংগ্রাম ও তাতে যোগদানের ফলে কবির সৃষ্টিকর্ম ব্যাহত তো হয়ই না, বরং তা কবিকৃতির মহত্ত্ব অর্জনে সহায়ক। ভীরু পাখিরাই কেবল ঝোড়ো বাতাস, প্রাণ-সংহারক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিনে গান গাইতে পিছপা হয়। শিল্পের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে, লেখকদের মিলিত শক্তি সম্পর্কে চেতনা সম্পাদনে, পৃথিবী ও মানবজাতির ভাগ্য নির্ণয়ে হাত লাগাতে প্রণোদিত করে এই সংগ্রাম। তাই আজকের লেখককে হতে হবে জনসংযোগকামী নাগরিক, চিন্তানায়ক, বিতার্কিক এমন কি ভবিষ্যৎবক্তা হতে পারলে আরো ভালো।

সুতরাং সমাজসচেতন কবি, শিল্পী জীবনকে বাদ দিয়ে চলবেন কীভাবে? সমাজ সংগ্রামের গতিরূপই ফুটিয়ে তুলবেন তিনি। একজন তরুণ কবি দ্বিধাহীনকণ্ঠে তাই স্বীকার করেছেন :

> সৃষ্টি শুধু, শ্রমে-ঘামে।
> তোমার ও শক্তি যেন না রয় অব্যক্ত,
> মত্ত হও, হয়ো নাক শীতল, হিসেবি,
> যত এ দহন আর যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হৃদয়,
> ততই জ্বলন্ত শিখা তোমার যে, কবি।
>
> (গেন্নাদি ইয়াকুশেভ্‌ স্কো)

> ঈশ্বরদত্ত একটি স্ফুলিঙ্গ
> যদি থাকে হৃদয়কন্দরে
> আমাদের লিখতে হবে প্রত্যেকের কাছে,
> আমাদের লিখতে হবে প্রত্যেকের জন্যে।
>
> (এভ্‌গেনি এভ্‌তুশেংকো)

কথাটা মিথ্যা নয়, শিল্পী মানুষের বক্তৃতামঞ্চ হোল লেখার টেবিল। লেখার টেবিল থেকেই কবি সমগ্র পৃথিবীর কাছে বক্তৃতা দেন। লেনিন পুরস্কার জয়ী কবি রসুল গামজাতোভ বলেছেন : 'রচনার অস্ত্র হাতেই আমরা সময়ের সংঘর্ষে যুদ্ধে নামি। অস্ত্রাঘাতকে অব্যর্থ করার জন্যে হাতিয়ারকে সব সময়ে ঝকঝকে ধারালো করে রাখতে হয়। আর এই হাতিয়ার মরচে ধরে ভোঁতা হয়ে যায়, যদি জীবনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সংগ্রামের আহ্বান আমাদের চার দেওয়ালের আবরণ ভেদ করতে না পারে, যদি আমরা নিজেরাই দরজা খুলে দিয়ে জনগণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে ও তাঁদের চোখে চোখ রাখতে না পারি। চারপাশের দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে তা যদি আমাদের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে অসমর্থ হয়, তাহলে আমাদের রচনার অস্ত্র অতিরেই হয়ে পড়ে অকেজো।'

খেতেখামারে কাজ করা মানুষ, শিল্পোদ্যোগের শ্রমিক, অভিনেতা অভিনেত্রী, সার্কাসের ক্লাউন, সীমান্তের সৈনিক, দূরদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের লড়াই—জীবনের আরও বিচিত্র রূপ ধরা পড়ে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক শিল্পীর চোখে। জীবন থেকে দূরে সরে যাওয়ার মনোভাব ওদের মধ্যে দানা বাঁধতে পারে না। কারণ, ওরা বাস করেন মানুষের মাঝখানে।

আলেকসাই টলস্টয় একবার বলেছিলেন : 'অনেকে ভেবেছিলেন যে আজ কামানের গর্জন শিল্পের মধুকণ্ঠকে ডুবিয়ে দেবে। যুদ্ধের সময় সাহিত্য তার উৎকর্ষ হারিয়ে ফেলবে, সাহিত্য বিকৃত হয়ে পড়বে, হয়তো বা একেবারে নীরব হয়ে যাবে।' কিন্তু ফ্যাশিজম্ যে বর্বর বাহিনী পাঠিয়ে সোভিয়েত দখল করতে চেয়েছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে সোভিয়েত শিল্প ও জনগণের বিপুল বীর্যের বহুরূপী প্রকাশ সাধন করছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লব জনতার হাতে শিল্পের মহাস্ত্র তুলে দিয়েছিল; তখনই রাতারাতি অবশ্য জনশিল্প জন্মায়নি, কিন্তু বহু বাধা অতিক্রম করে সোভিয়েত শিল্প আজ জনগণেরই শিল্প হয়েছে, সোভিয়েত সংস্কৃতি আজ বহু বিচিত্র রূপে পরিগ্রহ করছে।'

সোভিয়েত সমাজ ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ে নতুন বিষয়বস্তু, রূপায়ণের নতুন পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে সোভিয়েত সাহিত্য। সৃজনশীল সন্ধান, নানা রীতির, নানা ধরনের ও নানা জাতের লেখা এবং প্রত্যেক লেখকের সাহিত্যিক ব্যক্তিস্বরূপ বিকাশের বিপুল সুযোগ মেলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে। যে কোন দেশের প্রকাশিত বই-এর বিপুলতা থেকে সাহিত্যের গুণাগুণ পরিমাপ করা যায় না। বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রচনা পাঠের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় উচ্চশ্রেণীর রচনার সন্ধান। গর্কি বলতেন, টলস্টয়ই বিশ্ব। সুতরাং তিনিই যেন গোটা রাশিয়ার প্রতীক। আজকের সোভিয়েত লেখকদের মধ্যেও ঠিক এমনই প্রতিভাময়, স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন লেখকদের সন্ধান মেলে। সাহিত্য পরিসংখ্যান নয়। সাহিত্য হোল প্রতিভা—পরিসংখ্যানে অ-পরিমাপযোগ্য।

(২)

তরুণ লেখকদের প্রথম সম্মেলনে ১৯৪৭ খৃঃ স্যামুয়েল মারশাক সবে ফৌজী পোশাক ত্যাগ করেছেন এমন একজন তরুণ কবি ও সৈনিককে বলেন : 'এরপর আপনারা বাঁচার আনন্দ সম্বন্ধে লিখবেন।' সম্মেলনে যোগদানকারী কবিদের মনে কথাগুলি দৃঢ় রেখাপাত করে। প্রতিটি নতুন পুরুষে নব নব উদ্দীপনা অননুকরণীয় ভাবায় রূপ লাভ করে থাকে—পূর্বাকনের এই ধারণার সঙ্গে কবিরা উপরোক্ত কথা কটিকে পরস্পর সম্পর্কিত জ্ঞান করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাঁরা উত্তরপুরুষের এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সদ্য-আগত তরুণদের কবিতার বিচার করতেন। এ-বিশ্বাস তাঁরা রাখেন যে নবাগত তরুণরা সারাজীবন সাহিত্যক্ষেত্রের সেবক ও একনিষ্ঠ বন্ধু থাকবেন।

তরুণ লেখকদের সেদিনের প্রথম সম্মেলনে সেইসব অল্পবয়স্করা যোগ দিয়েছিলেন, যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ও তার অব্যবহিত পরে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। সমালোচকদের কাছে এঁরা 'যুদ্ধকালীন পুরুষ' বলে পরিচিত। এই যুদ্ধকালীন পুরুষ সোভিয়েত কবিদের নবীনতম পুরুষের কাব্যকৃতির বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তরুণ কবিরা যে তাঁদের রচনায় পিতৃপুরুষ ও অগ্রজদের শৌর্য ও কীর্তির যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে ফিরে ফিরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষয়ের অবতারণা করছেন, এই ব্যাপারটি অগ্রজ কবিদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। তরুণদের কবিতায় শুধু বিগত যুদ্ধের স্মৃতির রেশটুকু মাত্র নেই, আরও বেশি কিছু আছে। এই তরুণরা সেই নতুন যুগের মানুষ, যাঁরা পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার, সোভিয়েতের বিজয়, সোভিয়েত জীবন ও শান্তির সমক্ষে দাঁড়াতে সর্বদাই প্রস্তুত। এইসব কিছু জয় করে নিতে গিয়ে একদিন যে কী মূল্য দিতে হয়েছে তা এঁরা জানতেন, এঁরা বোঝেন এদের কতখানি মূল্যবান মনে করতে হবে, রক্ষা করতে হবে কীভাবে।

জেট যুগের হাওয়ায় প্রভাবিত হয়ে আজকের কবি পূর্ববর্তী পুরুষের চেয়ে দ্রুত পরিণত হয়ে উঠেছেন। আজকের দিনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সময়ের সঙ্গে তাল রেখে মৌল সমাজ অগ্রগতিতে তরুণ কবিদের নির্ভীক ও দৃঢ় অংশ গ্রহণে। নানা ব্যাপারে আজ কবিদের অনুরাগ কল্পনাতীত রকম ব্যাপ্ত ও গভীর। তারুণ্যের কাব্য সাবালক হয়ে উঠেছে। ঐকান্তিক পক্ষভুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে উচ্চমানের দায়িত্ববোধের প্রমাণ দিয়েছে। আমাদের কালের সমস্যাবলী, মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সমাজ-সমস্যার প্রশ্নে মনোযোগী হয়ে উঠেছে এই কবিতা। সময়ের অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য রক্ষা করায় এবং জাতিগত ঐতিহ্য অতীতের সংস্কৃতি ও সংগ্রামের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা থেকে বিকাশমান আধুনিক ঐতিহ্যকে বিচ্ছিন্ন করার প্রতিপক্ষে থাকায়, এ কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং মননশীল বোঝাপড়ায় পথ সহজতর করে তুলেছে।

বিভিন্ন তরুণ কবির রচনায় একটি মৌল মিল লক্ষ্য করা যায়। অপর কেউ যে-কথা যে-ভাবে বলেছেন তার পুনরুক্তি না করাই এই মিলের ভিত্তি। অনেক সময় প্রথাগত উচ্চারণ ও প্রকাশ পদ্ধতির বাইরে অনন্য ভঙ্গির সন্ধানে তরুণরা অতিরিক্ত মাতামাতি করলে তার নিন্দা করা হয়। কারণ, সত্যিই খাঁটি কবির পক্ষে কাব্যশরীর বা লক্ষণীয় মৌল প্রকাশ-পদ্ধতির সন্ধান অপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হতে পারে না। আজকের তরুণরা আপনাদের সব কিছুর নতুন দাবিদার, প্রকৃতির রূপান্তর ঘটানোর বাদু ওঁদের হাতে। ওঁরা বিশ্বনিখিলের রহস্য ভেদ করেছেন, প্রবেশ করেছেন গভীরে। ওঁরা পাঠককে আহ্বান করছেন বিস্তৃততর দিগন্তের মুনিরায়। সত্যিকার সৎ আর দুঃসাহসী মানুষের জন্যে অবারিত সেই জগতের দ্বার। সাহিত্যে এ পর্যন্ত অভিনব যত পাত্রপাত্রী আমাদের পরিচিত, তাদের সকলের চেয়ে জটিল এই তরুণরা। এঁরাই প্রধান কুশীলব সমকালের।

তরুণ কবিদের জীবনের অভিজ্ঞতাও বহু বিচিত্র। কেউ-বা কাজ করেছেন সৈন্যদলে, কেউ কলকারখানায়, কেউ খামারে কেউ গৃহনির্মাণ প্রকল্পে, কেউ মাছ ধরার জাহাজে, আবার কেউ-বা স্কুলে। আর এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, এঁরা বহু বিচিত্র মানুষের সাহচর্যে এসেছেন, মানুষের জীবনের গভীরে ডুব দেবার দুর্লভ অধিকার অর্জন করেছেন এঁরা।

কবি আলেকজাণ্ডার ব্লক বলেছিলেন একবার, 'শিল্প হোল দুধরনের সঙ্গীত-প্রবাহের সংমিশ্রণের ফলশ্রুতি। সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের সঙ্গীতপ্রবাহ এবং জনগণের মধ্যে প্রবাহিত সূক্ষ্ম সঙ্গীত—যাকে বলা যায় জনগণের আত্মা, এই দুয়ে মিলেই জন্ম দেয় মহৎ শিল্পের।' —সোভিয়েত কবিদের রচনার গুণগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে, একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তাছাড়া চেখভের সেই বিখ্যাত উক্তিটি. 'সব সেরা লিখিয়ে হলেন তাঁরাই, যাঁরা বাস্তব-বাদী, যাঁরা জীবনকে যেমনটি দেখেন তেমনই আঁকেন। তবে যেহেতু এঁদের লেখার প্রতিটি ছত্রবুকে বহতা রসধারার মতো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যবোধে অভিষিক্ত, পাঠক সেইহেতু তা থেকে শুধু যে জীবনের হুবহু স্বাদটুকু লাভ করেন তাই নয়, জীবনের পক্ষে যা হওয়া উচিত তাও অনুভব করেন এবং করে মুগ্ধ হন।'

(৩)

সম্প্রতিকালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিগতভাবে কবিদের এবং সাধারণভাবে কবিতা-বিষয়ে বিতর্কের অবধি নেই। কবিতা পাঠের সান্ধ্য আসরগুলিতে হাজার হাজার শ্রোতার সমাগম লেগেই আছে। কবিতার বইয়ের সংস্করণ এক লক্ষ কপি ছুঁয়ে চলে। ২,২৫০ খানা কবিতার বই ছাপা হয় বছরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি মিখাইল ইসাকোভস্কি বলেছেন, এখন কোথাও একটা থামা দরকার। 'সাহিত্যের সমস্যা' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে সাম্প্রতিক সোভিয়েত কবিতার গুণগত ও পরিমাণগত অনুপাতের হার-বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। 'আজকাল প্রতিদিনই কয়েক খণ্ড করে কবিতার বই প্রকাশিত হচ্ছে। এদের সবই প্রায় কাব্যক্ষেত্রে নবাগতদের লেখা। প্রায় সবই রীতিমতো দুর্বল রচনা। যে-কেউ পংক্তির শেষে মিল দিতে পারে, তাকেই কবি আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।'

বলা বাহুল্য, ইসাকোভস্কির প্রবন্ধের ফলে কবিদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। সমালোচক ও পাঠকরা পিছিয়ে
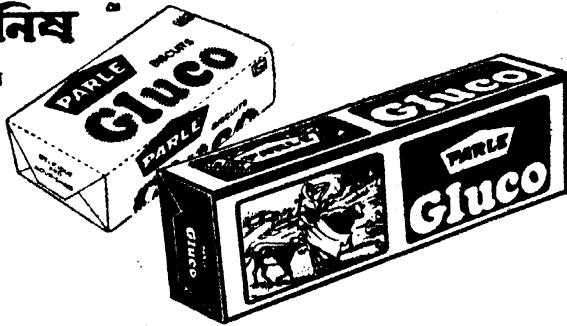
রইলেন না। 'সাহিত্যের সমস্যা' পত্রিকার চিঠিপত্রের স্তম্ভে এবং পত্রিকা উপরে অন্যান্য পত্রপত্রিকার উত্তপ্ত তর্কাতর্কি ছড়িয়ে পড়ল।

কবিতার উদ্ভবের ব্যাপারে অন্যো ইসাকোভ্‌স্কির আবেদন অবশ্যই সকলেই সমর্থন করেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে উন্নয়নের পন্থা কী, তাই নিয়ে মতভেদ দেখা গেল প্রচুর। কেউ কেউ বললেন, পঞ্চাশের দশকে কবিতা-ব্যাপারে যে প্রবল ঔৎসুক্য ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল, তার কারণ, এই সময়ে এভ্‌গেনি এভ্‌তুশেঙ্কো, রোবার্ত রোঝ্‌দেস্‌ত্‌ভেন্‌স্কি এবং আন্দ্রেই ভোজ্‌নেসেন্‌স্কির মতো তরুণ কবিরা প্রথম কলম ধরেছিলেন। সমালোচক ভ্লাদিমির ওগ্‌নেভের মতে, উপরোক্ত কবিদের রচনা সম্পর্কে প্রাথমিক উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসার পর 'আহত অহংকার সম্বল করে ও জনপ্রিয়তার জন্যে ছুলকানি নিয়ে একদল পদ্যকার সেই শূন্যস্থান পূরণে ছুটে এসেছিলেন।'

অপর কারো কারো মতে, প্রথমোক্ত তরুণ কবিদের কাব্য-সাফল্যের মূলে প্রধানত ছিল তাঁদের রচনার 'রোমাঞ্চক-গুণ।' 'অগ্রদূত' হিসেবে সাময়িকভাবে তাঁরা নাকি আসর জাঁকিয়েছিলেন। অথচ ঐ একই সময়ে আরও অনেকে লেখার উপাদান সংগ্রহে অথবা সত্যিকার সাহিত্যিক মূল্যমানবিশিষ্ট রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। বহু পাঠক আবার মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধ পূর্বসূরীদের সপক্ষে কলম ধরেছেন। সত্যিকার কবিকুল ও পদ্য-লেখায় বাতিকগ্রস্তরা সমান সুযোগ-সুবিধে পাওয়ায় এ'রা মর্মাহত। তৃতীয় একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী দেশে সুসাহিত্য ও কুসাহিত্যের সহ-অবস্থান এক চিরকালীন ব্যাপার। এ'দের মতে, বাছাবাছির কাজটা পাঠককেই করতে হয়, ধুলিমুঠি থেকে সোনা খুঁজে নিতে হয় তাঁদেরই। আর কবিতা যদি খুব বেশি-বেশি লেখা হয়, তবে তার অনেকখানিই দ্বিতীয় শ্রেণীর হতে বাধ্য। সোভিয়েত কবিতার প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি অনবরত ঘটে চলেছে, আর এই বৈচিত্র্যের ডামাডোলে সুর্বল কবিদের অধিকারীরাও প্রতিপত্তি অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

সাধারণভাবে সকলের ধারণা, বর্তমান এই কাব্যোচ্ছ্বাসের আবহাওয়ায় অনেক কিছুই লেখা হচ্ছে যা হয়তো সুলিখিত কিন্তু বক্তব্যশূন্য।

এ প্রসঙ্গে কবি সের্গেই নারোভ্‌চাতোভ বলেন : 'প্রথম প্রথম আমরা এই ভেবে আনন্দিত হয়েছিলাম যে কবিরা তাঁদের চিন্তা ও অনুভূতির যথার্থ 'শৃঙ্খলমোচন' করছেন। পরে অবশ্য আবিষ্কার করলাম, শৃঙ্খলমোচন বলতে চিন্তা ও অনুভূতির সত্যিকার মুক্তির চেয়ে শব্দ নিয়ে ভোজবাজির খেলাই বোঝানো হচ্ছে বেশি। আজকের কবিতাকে পড় পড় মজবুত। তা মাইল মাইল লম্বা হবে, অথচ তার মধ্যে সৎচিন্তা ও সৎ আবেগের পরিমাণ কয়েক ইঞ্চি-মাত্র হবে কিনা সন্দেহ। প্রত্যেকেই আজ নাকি 'কবিতা লিখতে' পারে। অথচ আমরা কী করে ভুলি যে বলিষ্ঠ শব্দ-চয়নের গর্ভে ভাবকে যিনি ধারণ করাতে পারেন একমাত্র তিনিই যথার্থ কবি!' কবি এভ্‌গেনি ভিনোকুরভ্‌ বলেন, 'সৎ কবিতা। অসত্যের প্রতিরোধ করে থাকে।' মিথ্যা কখনো হৃদয়ে গান হয়ে বাজে না, ছন্দে-মিলে মেলে না।'

সকলেই স্বীকার করেন যে, এই অবস্থার প্রতিকারের সবচেয়ে সেরা উপায় হল পত্রিকা-সম্পাদক ও সমালোচকদের রচনা-নির্বাচন ও সমালোচনার মান উন্নয়ন। কিন্তু কথাটা মুখে বলা যত সহজ, কাজে ততটা নয়।

আরসেনি তারকোভ্‌স্কি বলেন : জিজ্ঞেস করতে পারেন, দৈবাৎ এক-একজন যাচ্‌মানিনভের উৎপত্তির জন্যে একটা গোটা সংগীতশিক্ষার স্কুল চালানোর প্রয়োজন আছে কিনা। আমি বলি, আছে। কারণ, সংগীত-শিক্ষার স্কুল শুধু প্রতিভা-বান তৈরি করায় আবদ্ধ নয়, অর্কেস্ট্রার দলকে রীতিমত শিক্ষাদানও তার উদ্দেশ্যের অংশীভূত।

"সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। বহুকাল ধরে পড়া হবে এমন একখানি কাব্যগ্রন্থের প্রয়োজনে, বছরে ৩০০ বা ৫০০ কবিতার বই প্রকাশ অযৌক্তিক নয়। তাছাড়া, পরস্পর প্রতি-যোগিতা ও উৎসাহদানেরও একটা মূল্য আছে। আর বই প্রকাশ না করা হলে একজন লেখক কীভাবেই বা নিজের মূল্য প্রমাণ করতে পারেন? এমন তো প্রায়ই দেখা যায় যে কোনো লেখকের প্রথম বইটি অনুল্লেখ্য হলেও দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ভালো ও তৃতীয় বইটি আরো ভালো হয়েছে।

ইসাকোভ্‌স্কি কিন্তু বলেন, 'যত্ন নিয়ে ঝাড়াইবাছাই করলে গল্প থেকে তুষ আলাদা করা খুব কঠিন কাজ নয়। তলস্তয়ও একদা বলেছিলেন যে পদ্য রচনার বাতিক মারাত্মক মহামারীর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। একে উৎসাহ না যুগিয়ে এ-রোগের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করা দরকার'। ...'সাহিত্যের 'ভালোমন্দ' বিচারের কোনো অভ্রান্ত মাপ-কাঠি নেই। কিন্তু পাঠক, সমালোচক ও কবিরা যদি একযোগে সর্বপ্রকার নগণ্য, তুচ্ছ, অপদার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তাহলেই একমাত্র কবিতার মানোন্নয়ন সম্ভব। আর এই কাজটি যথাযথ সম্পন্ন হলে তবেই কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা রাখা চলে।'

বিশিষ্ট উক্রাইন কবি ও গদ্যলেখক লিওনিদ পেরভোমাইস্কি-র একটি রচনায় তরুণ কবি ও কবিতার জন্ম, স্বরূপ বৃত্তির পরিমণ্ডল পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। তিনি বলছেন : নিজেকে কবি হিসাবে গড়ে তোলা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। কাজটি মোটেই সোজা নয়। এর অর্থ, কারো স্বাভাবিক ক্ষমতাকে শিল্প সৃষ্টির উপযোগী সচেতন ইচ্ছাশক্তির অধীন করা। অল্প কয়েকজনই এ-কাজে স্বল্প আয়াসে সফল হন। আমাদের মতো বেশির ভাগকেই কিন্তু এর জন্যে দীর্ঘ অনুসন্ধান বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণা, পরাজয় ও ব্যর্থতার পথ অতিক্রম করতে হয়।

শেষ পর্যন্ত লেখক যাঁদের সাহিত্যে চিত্রিত করেন এমন সব চরিত্রই লেখকের চৈতন্যের উপাদান। চরিত্রচিত্রণে লেখকের যোগ্যতা তাঁর চেতনার বৃহত্তর স্তর বিন্যাসের উপর, পৃথিবীর যাবতীয় অভিজ্ঞতার অংশভাক হতে তাঁর আন্তর প্রবণতার উপর নির্ভরশীল। শুধু ভদ্র-চরিত্র নয়, পাক্‌কা বদ্‌মায়েস চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য।...এ-থেকে কারো অব্যাহতি নেই। ব্যাপারটা এইরকম যেন মানবিক আচরণের সব ক্রটি সম্ভাব্য রকমফেরে লেখকের মধ্যেই স্তরে স্তরে বিদ্যমান।......

'যে-মাটিতে গাছ জন্মায় তার ভালো-মন্দ নিয়ে গাছের মাথাব্যথা নেই। গাছের কাজ হল শুধু বেড়ে ওঠা আর ফল দেওয়া। এমন কি গাছে যে ফল ধরল তা যতখানি গাছের, ঠিক ততখানিই যে-মাটিতে গাছ জন্মায় সেই মাটির, এও জানে না সে। কিন্তু প্রকৃতির এই অমীহা দেখে মানুষের আত্মসন্তুষ্ট হওয়া মানায় না। অন্যান্য অনেক গুণের সঙ্গে প্রকৃতি কিন্তু একাধারে জমি ও জমিতে উৎপন্ন ফল উভয়ের সম্পর্কেই দায়িত্ববোধের অধিকারী করেছে মানুষকে।

পাঠকের উপর প্রভাব-বিস্তারের উপায় দুটি। এক, তাঁর কাছে তাঁর নিজস্ব আন্তর প্রকৃতি বা অন্তঃসার উদ্‌ঘাটিত করা; আর নয়তো, দুই, তাঁর কাছে লেখকের স্বীয় অন্তঃসারের স্বরূপ উন্মোচন করা। এর মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট উপায় জানি না। কেবল যে বিভিন্ন লেখকের পৃথক রচনায় ঐ দুটি পদ্ধতির সাক্ষাৎ মিলেছে আবার তাই নয়, একই লেখকের বিভিন্ন রচনায় দুটি পদ্ধতির ব্যবহার দেখেছি। আর এ থেকে আমার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে ঐ দুটির কোনো একটি পদ্ধতিই আকস্মিক নয়।

...অতীতের প্রায় সমস্ত বড় লেখক মানুষকে কখনও বাস্তবে সে যেমন সেই-ভাবে, আবার কখনও কল্পনায় সে যেমনটি হলে ভালো হয় তেমনভাবে চিত্রিত করেছেন। ঠিক এই ব্যাপারটিই মিলিত-ভাবে সাহিত্যে নতুন ধরণের মানুষ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। পৃথিবীতে তাদের অবস্থান, দায়দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নতুন বোধবিশিষ্ট এক নতুন জাতের মানুষ।

মোটকথা সৃষ্টিশীল রচনা স্বপ্নের দ্যুতিতে আলোকিত না হলে আমার কাছে তা নিষ্প্রভ ঠেকে।'

(৪)

রুশ সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে একটিমাত্র সামাজিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বাসনা রুশ দেশের সাহিত্য সমাজের একটি দীর্ঘকালের বৈশিষ্ট্য। গত উনিশ শতকে প্রগতিশীল লেখকদের প্রায়ই প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক পত্রিকাগুলির সম্পাদক-মন্ডলীকে ঘিরে এবং তথাকথিত সাহিত্যের সালঁগুলিতে মিলিত হতে দেখা যেত। ১৯১৭ খৃঃ অকটোবর বিপ্লবের পর দেশের প্রায় সমস্ত লেখককে নিয়ে বহুবিধ সাহিত্যসংঘ, গোষ্ঠী ইত্যাদি গড়ে উঠতে থাকে। রুশ ফেডারেশনের লেখক ইউ-নিয়নের পাশাপাশি রুশ প্রোলেতারীয় লেখক সংঘ ও অন্যান্য বহুগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। শতাব্দীর বিশের দশকের সূচনায় একমাত্র মস্কোতেই ত্রিশটিরও বেশি সাহিত্য সমিতির অস্তিত্ব দেখা যায়। এছাড়া জাতীয় প্রজাতন্ত্র বা রুশ দেশের প্রত্যন্ত উপকন্ঠগুলিতে, সাহিত্যের দ্রুত উন্নতির ফলেও পূর্বোক্ত সমস্ত লেখকের শক্তিকে, প্রতিটি লেখকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে আঘাত না করেও, একটিমাত্র সামাজিক সংগঠনে সংহত করার প্রয়োজ-নীয়তা দেখা দেয়। এরই ফলে গড়ে ওঠে লেখক ইউনিয়ন।

যাঁরা মনে করেন ১৯৩৪ খৃঃ 'সব লেখককে একই ছকে ধরিয়ে দেওয়ার' চেষ্টা করা হয়েছিল তাঁরা ভ্রান্ত। সোভিয়েতের লেখকদের প্রথম কংগ্রেসেই প্রতিনিধিরা শিল্প-সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতিকে শিল্পগত প্রকরণ, রচনাশৈলী ও প্লট তৈরির সমস্যা সমাধানের হাতে-গরম মন্ত্রগুপ্তি মনে করার অতি-সরলী-করণের ঝোঁকের বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক করে দেন। লেখক ইউনিয়নের সংবিধিতেও তখন লিপিবদ্ধ করা হয়ঃ 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা শিল্পসৃষ্টিতে, বহু বিচিত্র প্রকরণ, রচনাশৈলী ও রচনার ধরনসৃষ্টিতে সৃষ্টিশীল উদ্যোগ প্রয়োগের অসামান্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। এই আদর্শ সামনে রেখেই তখন থেকে সোভিয়েত সাহিত্য বিকশিত হয়ে চলেছে। তখন থেকে এপর্যন্ত একজন লেখককেও কীভাবে তিনি লিখবেন তার নির্দেশ দেওয়া হয় নি।

মিখাইল শোলোখভ, ১৯৫৪ খৃঃ ডিসেম্বরে, সারা সোভিয়েত লেখক সম্মে-লনে বলেছিলেন : 'আমাদের সম্পর্কে অর্থাৎ সোভিয়েত সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিদেশে বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুরা বলে থাকেন, আমরা নাকি পার্টির নির্দেশে লিখি। অবস্থাটা কিন্তু অন্যরকম। আমরা প্রত্যেকেই লিখি আপন হৃদয়ের নির্দেশে, আর আমাদের সেই হৃদয়টি পড়ে থাকে পার্টি ও জনগণের কাছে, সাহিত্যকর্ম দিয়ে আমরা যাদের সেবা করি।'

সোভিয়েত সমাজ ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ে নতুন বিষয়বস্তু, রূপায়ণের নতুন পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে সোভিয়েত সাহিত্য। সৃজনশীল সন্ধান, নানা রীতির, নানা ধরণের ও নানাজাতের লেখা এবং প্রত্যেক লেখকের সাহিত্যিক ব্যক্তিস্বরূপ বিকাশের বিপুল সুযোগ মেলে সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতি বলতে গর্কি বুঝিয়ে-ছিলেন : 'জীবনকে দেখে কর্মকান্ডরূপে, সৃষ্টিশীল ধারারূপে। এর লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মূল্যবান ব্যক্তিগত সামর্থ্যগুলির অনিরুদ্ধবিকাশ সাধন। উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মানুষের বিজয় অর্জন, তার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ু, পৃথিবীতে বাঁচার আনন্দ অর্থাৎ যা মানুষ চায় এবং পৃথিবীকে সমস্ত মানুষের এক পরিবারের আবাসভূমিতে রূপান্তরিত করার মানুষের যে ক্রমবর্ধমান দাবি তার সংগে যে ইচ্ছার পূর্ণ সংগতি রয়েছে।'

পক্ষাবলম্বন না করেই জীবনের সত্যকে চিত্রিত করার, যে-ব্যাপারে বিষয়মুখ হবার চেষ্টা অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সংগে সামঞ্জস্যহীন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যে এর ফলে সত্যের বিকৃতি ঘটে এবং পরিণতিতে সত্যই বর্জিত হয়ে থাকে।

তর্ক উঠতে পারে, সম্ভবত কোনো লেখকই সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত জীবনচিত্র পরিবেশন করতে পারেন না। কথাটা সত্যি। লেখকের কাছে এ-বস্তু দাবি করা অন্যায় ও অবাস্তব। তবে জীবনের যত সীমাবদ্ধ অংশই লেখকের রচনার বিষয় হোক না কেন, তাঁকে সমগ্র জীবন সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়, জীবনের সামগ্রিক গতি ও পরিপ্রেক্ষিতের সংগে যুক্ত এমন বহুবিধ কর্মপ্রবাহের অংশ হিসাবে সর্বদা প্রতিটি ক্রিয়াকলাপকে বিচার করতে হয়।

---

কোনো কোনো সোভিয়েত লেখক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পাশ্চাত্যের সমালোচকরা বলেন, তাঁরা নাকি 'খুবই বিস্ফোরক বুদ্ধিসম্পন্ন, বাহাদুরিতে বেশি পটু'। কিন্তু ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ঐ সব লেখকের 'বাহাদুরি'-এর ঊর্ধ্বে আর কিছুই নয় কেবল তাঁদের সাহিত্যে জীবনের অন্ধকার, ক্লেদাক্ত অংশের বর্ণনা। এই সমালোচকরা 'সত্য' বলতে একমাত্র না হলেও প্রধানত, 'স্বরূপ উদ্-ঘাটন', বীভৎস ও নৈতিক দিক থেকে অস্বাভাবিক চরিত্র-চিত্রের প্রদর্শনীকে বোঝান।

কোনো সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই অস্বীকার করবেন না যে বিকাশের বিশেষ পর্যায়ে সমাজের ক্লেদাক্তদিকের, ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা শিল্পের স্বাভাবিক কর্তব্য। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বাস্তবতার উপলব্ধি ও তার বিবর্তন সাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি এটি। কিন্তু কোনো শিল্পই, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিল্প তো নয়ই, শুধুমাত্র ঐ কর্তব্যটুকু পালনের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না।

শিল্পীকে শুধু বর্জন করতে জানলেই চলে না, তাঁকে গ্রহণ করাও শিখতে হয়। অসুবিধে ও ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে তিনি শুধু সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেই চলে না, সেই অসম্পূর্ণতা পূরণে তাঁকে সাহায্যও করতে হয়, সমাজবিকাশের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন প্রতিটি প্রবণতাকে সমর্থন জানাতে হয়।

'সত্য' কথাটির অর্থ যে 'স্বরূপ উদ্‌ঘাটন' এই মত অংশত জনসাধারণের জীবনে সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে অতি-রঞ্জিত ধারণার ফল। এ-কারণেই দাবি করা হয়, সাহিত্য সমাজের বিবেক। অসম্পূর্ণতাকে নগ্ন করে দেখিয়ে এবং ত্রুটিকে তীব্র কশাঘাত করে সাহিত্য-সমাজকে উদ্দীপিত করে ও নিশ্চল নিশ্চেষ্ট অবস্থা থেকে বাঁচায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী লেখক ভবিষ্যদ্‌বক্তা, ত্রাণকর্তা এবং কার্যত রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে জনগণের একমাত্র রক্ষক ছাড়া কিছু নন। হাতিয়ার হিসেবে কলমের শক্তি যে কী, তা সোভিয়েত সমাজের চেয়ে বেশি আর কেউ বোঝে না। তবু লেখক অন্য সকলের চেয়ে বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, এটা সোভিয়েতের মানুষও সত্য বলে মনে করেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে লেখক সকলের চেয়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি কিংবা সবচেয়ে সঠিকভাবে সবকিছু বোঝেন, অথবা, জনগণের সঙ্গে তিনিই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সুখদুঃখের কথা তাঁর পক্ষেই সবচেয়ে ভালোভাবে জানা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জীবন ও শিল্পের এবং শিল্পী ও সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক অপর সকল উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিবর্তন শিল্পীকে অস্বীকার করতে হবে, এও তাঁরা মানেন না।

# অহিফেন-স্বপ্ন
# চন্দ্রবাবু ও ইউরিপিডিস্

চন্দ্রবাবু আমার কাছে রোগী হিসেবে আসেননি, কাজেই তাঁর মনের কথা সঠিক-ভাবে জানবার সুযোগ ঘটেনি। বন্ধুপত্নীর আত্মহত্যা তাঁর সুরাত্যাগ ও অহিফেনাসক্তির কারণ কিনা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার ফলে আমার ধারণা জন্মেছে যে, তিনি ছিলেন দুরন্ত অন্তর্মুখীন (ইয়ুং-এর ভাষায় ইন্ট্রোভার্ট)। অন্তর্মুখীনতা আত্মপ্রকাশের অন্তরায়। অন্তর্মুখীনরা সুরাপানে, অভ্যস্ত হয় অন্তর্মুখীনতা দূর করতে, আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পেতে। বহির্মুখীনদের (এক্সট্রোভার্ট) হিংসে করতেন চন্দ্রবাবু। কি সহজে তারা নিজের কথা বলতে পারে, নিজেকে জাহির করতে পারে, নিজের ঢাক নিজের কাঁধে তুলে নির্লজ্জভাবে আত্ম-প্রচারের আওয়াজ তুলতে পারে। চন্দ্রবাবু অনেক জানেন, অনেক পড়েছেন, অনেক লিখেছেন; অথচ অন্যকে, বিশেষ করে নাম-করা, কোনো লোককে স্বাভাবিক অবস্থায় সে-কথা জানাতে পারতেন না। তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন, সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় নিজের কথা বলার মত ভাল-গারিটি থেকে ঈশ্বর চিরকাল যেন তাকে দূরে রাখেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি নিজের বিদ্যা জাহির করার দিকে তাঁর ভালগার না হলেও সসংকোচ সলজ্জ প্রচেষ্টা। আমি যখন তাঁকে দেখেছি, তখন তিনি অ্যালকোহল ছেড়ে অহিফেনের নেশায় ব্রতী। অহিফেন, আগেই বলেছি, অ্যালকোহলের অনেকটা বিপরীতধর্মী গুণ-সম্পন্ন। অন্তর্মুখীনতার সহায়ক। অন্ত-র্মুখীন স্বভাবের চন্দ্রবাবু আফিমের প্রসাদে আরো বেশি অন্তর্মুখীন হয়েও আত্ম-প্রচারের অভ্যাস ছাড়তে পারছেন না। এ-থেকে আমার মনে হয়েছিল, আত্মপ্রচার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছাতেই চন্দ্রবাবু অ্যালকোহলের ভক্ত হয়েছিলেন। এই ধরনের মানুষ অনেকখানি অ্যালকোহল হজম করতে পারে। বহির্মুখীনরা অল্প-মাত্রা সুরার প্রভাবে যখন বেসামাল হয়ে পড়ে, তখন এরা আত্মস্থ থেকে অন্যদের বেসামাল অবস্থায় বেলেল্লাগিরি উপভোগ করে, তাদের থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শনে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। অন্যদিক দিয়ে যারা চন্দ্রবাবুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেই সব নামী ও দামী মানুষদের দুর্বলতা চন্দ্রবাবুকে খানিকটা খুশি করতো, নিজের অসাফল্যের (সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ না করার দরুণ) বেদনা ভুলে থাকতে সাহায্য করতো। কয়েক ঘন্টার জন্যেও তিনি এদের চোখা চোখা বাক্যবাণে বিধ্বস্ত করতে পারতেন, নিজের হীনমন্যতার গ্লানি থেকে মুক্ত থাকতে পারতেন। অ্যালকোহল-আসক্তির মূলে ছিল এই মানসিকতা। কিন্তু প্রতিষ্ঠা লাভ যখন অসম্ভব মনে হল, পরিচিত মহলে যখন বন্ধুপত্নীর প্রতি দুর্বলতার দরুন মর্যাদাহানি ঘটলো, তখন সুরার প্রতি অনাসক্তি জন্মালো। বহির্মুখীন হয়েও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে উঠতে পারলেন না, কাজেই বহির্মুখীন হবার চেষ্টা ছেড়ে অন্তর্মুখিনতাকে প্রশ্রয় দিলেন; মদ ছেড়ে আফিমের ভজনা শুরু করলেন। আর একটি কথা, চন্দ্রবাবুর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ও বাজারে বিলিতি মদের সরবরাহ কমে যাওয়া চন্দ্রবাবুর সুরাবর্জন ও অহিফেন সেবনকে খানিকটা প্রভাবিত করেছিল নিশ্চয়ই।

অহিফেনসেবী চন্দ্রবাবুও স্বপ্ন দেখ-তেন। স্বপ্ন তিনি ডিকুইন্সীর মত লিপি-বদ্ধ করেননি, তবে মাঝে মাঝে ভক্তদের কাছে প্রকাশ করতেন। সে সময় তাঁর হাবভাব অন্যরকম হয়ে যেত। স্বরগ্রামে উদারা-মুদারা-তারা ওঠানামা করত, আধবোজা চোখ মাঝে মাঝে বিস্ফারিত হয়ে উঠত, চোয়াল শক্ত হয়ে যেত। বলার ভঙ্গীতে নাটকীয়তা প্রকাশ পেত। তাঁর স্বপ্নে ডি কুইন্সীর মত রঙ-রসের সমারোহ থাকতো না, কোনো অভিষেকের অর্কেস্ট্রা বাজতো না; তাঁর স্বপ্নে শোনা যেত ধ্বংসের আর মরণের আর্তনাদ। তিনি স্বপ্নে শুনতে পেতেন সাইক্লোনের ভয়াল শব্দ; সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস আর ভূমিকম্পের আওয়াজ; দেখতে পেতেন এক কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিত-মস্তক বিকটাকার কালপুরুষকে, যাকে যদুকুল ধ্বংসের পূর্বমুহূর্তে যাদবগণ দেখেছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখতে পেতেন কৃষ্ণপুত্র শাম্ব লৌহমুসল প্রসব করছে। রাজা উগ্রসেন রাজ্যে সুরা প্রস্তুত বন্ধের হুকুমনামা জারী করা সত্ত্বেও বে-আইনী চোলাই চলেছে। স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ সকলেই সুরাপানে মত্ত হয়েছে। তামসিক বিচ্ছিন্নতায় বৃষ্ণিবংশীয় যুবক-বালক সকলেই আচ্ছন্ন। অগ্রজদের সামনে সুরামত্ত যুবকযুবতী আদিরসাত্মক হাসিপরিহাস করে চলেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ধ্বংসলীলার জন্য অন্ধ-কবংশীয়েরা কৃষ্ণকে দোষারোপ করছে। কৃষ্ণ-বলরামের নেতৃত্ব মানতে চাইছে না যাদব-দের একাংশ। গাভীরা সিংহনাদ করছে, ছাগশিশু মত্ত হয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী লড়াই শুরু করে দিয়েছে যাদবরা। সাত্যকী কৃতবর্মার শিরচ্ছেদ করেছে, ভোজ ও অন্ধকগণ সাত্যকী ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়দের বেষ্টন করে উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র দিয়ে আঘাত করছে। নারীরা মত্ত অবস্থায় দস্যুদের কণ্ঠলগ্ন হয়ে সমুদ্রসৈকতে নির্লজ্জ রতি-ক্রীড়ায় ব্রতী। দলনায়ক কৃষ্ণের প্রতি অনাস্থা জানাচ্ছে, তিনি কুশগুচ্ছকে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন করে যাদবদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। বালক-বৃদ্ধ সবাই ধ্বংস হল। সমুদ্র থেকে এক বিশাল জলস্তম্ভ আকাশে উঠলো। মাটি ফুঁড়ে অগ্নিশিখা বেরুচ্ছে। পাহাড়ের চূড়া ভেঙে সাগরে পড়ছে। দ্বারকা নিশ্চিহ্ন, নিশ্চিহ্ন দুরাচার অনাচার ব্যভিচারে লিপ্ত দ্বারকা নগরীর সভ্য মানুষ। গাণ্ডীব তোলার ক্ষমতা হারিয়েছেন গাণ্ডীবী। নিপীড়িত বঞ্চিত অনার্য নামে অভিহিত ক্ষুধার্ত মানুষের দল দ্বারকার ধনদৌলত আর সুন্দরী রমণীদের অধিকার করে বন-জঙ্গলে অন্তর্হিত। মদমত্ত নাগরিক-সভ্যতা, প্রকৃতির স্পর্শবঞ্চিত বিচ্ছিন্ন সভ্য মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির কাছে পরাভূত।

চন্দ্রবাবুর এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করতেন ডাকিয়ার হেলান দিয়ে, সিগার-এর

দিকে তাকিয়ে। এই রকম [illegible] জনপদের কথা বলে গেছেন। তখন তাঁকে আর আহিফেন-উপাসক অন্তর্মুখীন বলে মনে হত না। বরঞ্চ মনে হচ্ছ সুরামত্ত এক উন্মাদ প্রলাপ বকে চলেছে। অন্তর্মুখীন বহির্মুখীন হয়ে গেছে। একদিন এই অবস্থায় আমি তাঁকে দেখেছিলাম। ঘোর কেটে যেতে স্বাভাবিক সহজ সুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তামসিকরা মদ খায় আবার মদ তামসিকতা বাড়ায়। তামসিকতা কি জানেন? পশুষড়রিপুর তাড়না। তোমাদের বিজ্ঞান এই রিপুটিকে বাড়িয়ে তুলেছে। প্রকৃতিকে জয় করেছ মনে করে তোমরা অহঙ্কৃত। নগর-সভ্যতা গড়ে তোমরা উল্লাসে নৃত্য করছ, তোমাদের অবস্থা একদিন হবে ঐ দ্বারকার যাদবদের মত। আমি কোলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছি। তোমাদের শহরনগর সব একদিন দ্বারকার মত ধ্বংস হয়ে যাবে' সে-দৃশ্য সইতে পারব না বলেই পালিয়ে এসেছি। ইউরিপিডিসের মত একটা নাটক লিখব মতলব করেছি। ইউরিপিডিসও এথেন্স ছেড়ে ম্যাসিডনের পাহাড়ে-গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এথেন্সে তখন হানাহানি কাটাকাটি চলেছে। দ্বারকাতে যেমন বৃষ্ণিভোজ ইত্যাদি নানা উপজাতির লড়াই হয়েছিল, এথেন্সেও ঠিক তেমনি চলছিল। নানা দল-উপদলের লড়াই। নেতারা তাতিয়ে দিয়ে মজা দেখছিল। একদিন যোদ্ধাদের তরোয়ালে যে নিজেদের গলা কাটতে পারে, সে-কথা ভাবেনি। মদ, মদ, সেখানেও মদের স্রোত বয়ে চলেছিল। একদিকে মনের মধ্যে গর্বের প্রবাহ, অন্যদিকে রক্তের মধ্যে সুরার প্রবাহ। বুড়ো ইউরিপিডিস বুঝতে পারলেন এরা মরবে। সত্তর বছরে তিনি সেই মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়ে লিখলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক দি বাক্কে। আমার এখনও সত্তর হয়নি। সত্তরে পৌঁছে আমিও ঐরকম একখানা নাটক লিখব। এই সভ্যতার মৃত্যু-কাহিনী লেখা থাকবে আমার সেই নাটকে। সভ্যতার কুষ্ঠ হয়েছে, সেই জন্যে তাকে সাদা মনে হচ্ছে। তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লেপ্রা-ব্যাসিলাস। হিংসাদ্বেষ অহঙ্কারের চারণভূমি তোমাদের সভ্যতার পীঠস্থান নগর-শহর। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুৎসিত হয়ে পড়েছে মানুষ। উদ্বেগ অশান্তিতে ভরা মন নিয়ে মানুষ আর চলতে পারছে না। সভ্যতার মধ্যে বাস করে সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার কথা বলা আহাম্মুকী। নগর ছেড়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে যাও, নিজেকে সেখানে খুঁজে পাবে। কিন্তু সভ্যতার স্বাদ একবার যে পেয়েছে, সে আর প্রকৃতির সঙ্গে এক হতে পারে না। বিচ্ছিন্নতা দূর করতে তাকে মদের আশ্রয় নিতেই হয়। প্রকৃতির মদ আর চোলাই মদ, এই দুয়ে মিলে তাকে মত্ত করে তোলে।

—আচ্ছা, তুমি কি মনে কর ডাক্তার? যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে কি কাজ হয়? যুক্তিবাদী [illegible] গলা টিপে মারতে পারে। জান আমরা কোন্ কাজে লাগাই? প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কাজে জ্ঞানীগুণীরাই অগ্রণী। নারীর সৌন্দর্য কেন? পুরুষকে প্রলুব্ধ ও প্রমত্ত করার জন্যে। ন্যায় কি? বদলা নেওয়াকে নীতিসম্মত করার বিধি। দেবতা দানবের চেয়ে রক্তলোভী ও ভয়ঙ্কর; মানুষের ভেতরকার পশু বনের পশুর থেকে অনেক বেশী দানব। বিশ্বাস না হয় তো ইউরিপিডিসের ঐ নাটকটা পড়ে দেখ।

—আমিও ঐরকম একটা নাটক লিখতে চাই। থিবিসনগরী গড়ে তুলে রাজা ক্যাডমাসের মনে তমোভাব জেগেছিল। তার বংশধর পেনথিয়াস আরো অহঙ্কারী। ডায়োনিসাস পেনথিয়াসের ভাই, দেবতার ঔরসে জন্ম। তাই আরো অহঙ্কারী, আরো ভয়ঙ্কর। পেনথিয়াসের নাগরিক মন নেতৃত্ব, রাজত্ব বজায় রাখতে চায় পুরনো সভ্যতার ঐতিহ্য দিয়ে, সৈন্য আর সোনার সাহায্যে। ডায়োনিসাস নিয়ে এল পাগলা হাওয়া, সুরার ঝরণা, মনমাতানো গান। বেরিয়ে পড়লো থিবিস ছেড়ে মেয়ে-পুরুষের দল। সভ্যতার কঙ্কাল ছেড়ে প্রকৃতির রাজ্যে, বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে। শুরু হলো সংগ্রাম। একদিকে পুরনো ঐতিহ্য, অন্যদিকে অর্বাচীনের সামগান। একদিকে নগর, অন্যদিকে প্রকৃতি। ধ্বংস হলো থিবিস, ধ্বংস হলো সভ্যতা। পেনথিয়াসকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো নিজের হাতে তার সুরামত্ত মা-বোনেরা। দেবতার প্রতিশোধ লালসা মিটলো। ওরা গণহিস্টিরিয়ায় ভুগছিল।

—তোমরা ক্যালকাটানরা কার বংশধর? জব চার্ণকের? না, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের? ফিরিঙ্গীদেবতা ডায়োনিসাসের দলে, না নরদেবতা পেনথিয়াসের দলে? যার দলেই হও না কেন, বাঁচার আশা করো না। জানো, মায়ের হাতে আজও সন্তানের মুণ্ড দেখতে পাই। পেনথিয়াসের মায়ের হাতে সন্তানের মুণ্ড। সে ছেলেকে চিনতে পারছে না। তেমনি দেখতে পাই বাপের শবদেহের উপর উল্লাসে নৃত্য করছে বালক-বালিকার দল। তাদের হাত বাপের রক্তে রাঙা। আবার একটু পরেই দেখি তারা, ঐ ডায়োনিসাসের ভক্তরা নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়েছে। তখন আর তারা গ্রীক-পোষাকে নেই, তারা সব যাত্রার দলের কৃষ্ণ-বলরাম সেজে গদাচক্র নিয়ে যুদ্ধ করছে। থিবিস থেকে একেবারে দ্বারকায় চলে আসে আমার স্বপ্ন-রাজ্য। যাদবরাও কি হিস্টিরিক?

এইরকম সুসংবদ্ধ অর্থবহ স্বপ্ন কেউই দেখে না। দিবাস্বপ্নও এরকম হতে শুনিনি। চন্দ্রবাবু তাঁর চিন্তাধারা সাজিয়ে-গুছিয়ে আমাকে শোনাচ্ছেন। আহিফেন-প্রসাদে তাঁর কল্পনার বিস্তার ঘটেছে। তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করছেন। নিজেকে সরবে প্রচার করবার চেষ্টা করছেন। কিম্বা হয়ত, অনেকদিন ধরে এই রকম চিন্তা করে করে তাঁর চোখের সামনে দৃশ্যগুলো জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠছে। হয়ত, যা বলছেন, সেটা বিশ্বাস করেন, তাই চোখেমুখে ঐরকম অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছে। হিস্টিরিয়ার রোগীর মত মনে হচ্ছে ওঁকে। কিন্তু অন্তর্মুখীন টাইপের সঙ্গে হিস্টিরিক টাইপের অনেক তফাৎ। ইয়ুং-এর ইন্ট্রোভার্ট এবং পাভলভের দার্শনিক টাইপের অন্তর্ভুক্ত। তাদের চিন্তাবৃত্তির স্তর (দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর) বেশী প্রবল। এ-সবটাই বোধহয় অভিনয়। ভদ্রলোক আমাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে অভিনয় করছেন। আবার ভেবে দেখলাম, আমার এ-অনুমানও ঠিক নয়। কেননা, আমার অধ্যাপক বন্ধুর

কাছে শুনেছি, এই স্বপ্নবৃত্তান্ত আমার অনুপস্থিতিতে তাকেও শুনিয়েছেন। আরো অনেক জনকে এই অভিজ্ঞতা শোনিয়েছেন। কমলাকান্তের ভূমিকায় অভিনয় করতে চান নাকি ভদ্রলোক? মোট কথা, চন্দ্রবাবুর কাছ থেকে অনেক বারের মতই হতভম্ব হয়েই বিদায় নিলাম। ভদ্রলোকের মানসিকতা কিছুমাত্র বুঝতে পারলাম না। তাঁর মনের কথা মনোবিদদের কাছে দুর্বোধ্যই রয়ে গেল।

কয়েকদিন আগে এক ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু দেখা করতে এলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে চন্দ্রবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি জানতে চাইলেন, হ্যালুসিনেশনের শারীরবৃত্ত ও মনস্তত্ত্ব। যতটা পারি সহজ করে তাঁকে জানালাম। 'অমৃত'-এর পাঠকরা আমার সে-বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত। বন্ধু হ্যালুসিনেশন দেখছেন। রিটায়ার করে হাজারীবাগের দিকে বাড়ী করেছেন। সেখানেই চাকর-ঠাকুর নিয়ে তাঁর সংসার। ছেলেদুটি কৃতবিদ্য; নিজেদের কর্মস্থলে আছে। বন্ধু বিপত্নীক। একা থাকেন। রাত্রে খাওয়ার আগে কিঞ্চিৎ মাত্রায় অহিফেন সেবন করে থাকেন। সেই সময় বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে সামনের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তিনি হ্যালুসিনেশন দেখেন, হ্যালুসিনেশন শোনেন। মনের অন্য কোনো রকম বিশৃঙ্খলার কথা তিনি সেদিন বলেননি। তিনি স্বপ্ন দেখছেন না। স্বপ্ন কেউ জেগে দেখে না বললেন তিনি। চন্দ্রবাবুর মত অবশ্য নাট্যরসের আমদানী করার চেষ্টা করলেন না বন্ধু। ইটপাথরের মত নিরেট তিনি চিরকাল। হ্যালুসিনেশন তাঁকে কাব্যরসী করে তোলেনি। চন্দ্রবাবুর মত ডি কুইন্সীর অক্ষম অনুকরণের চেষ্টাও তিনি করলেন না। হয়ত, ডি কুইন্সীর নামই শোনেননি, কমলাকান্তের নাম শুনলেও পড়ে দেখেননি। সোজাসুজি কথাগুলো বলে গেলেন।

—প্রথমে জঙ্গলের মধ্যে বাঘের ডাক শুনতে পাই। প্রথমটায় মনে হত, জঙ্গলে সত্যিই বুঝি বাঘ এসেছে। তারপর শুনি সিংহের ডাক। এ-অঞ্চলে বাঘ দু'একটা থাকলেও থাকতে পারে, সিংহ কোথা থেকে আসবে? ভুল শুনছি নাকি? ঘুমিয়ে পড়িনি ত? হাতের চুরুটটায় টান দিয়ে বুঝতে পারি যে জেগে আছি। তারপর জেলীদের হৈ-হল্লা শুনি। পাল্কী নিয়ে রাস্তা দিয়ে বেহারারা চলছে শুনতে পাই, তাদের সেই পরিচিত কোরাস, 'হুকুম দৌড়' 'হুকুম দৌড়'। হয়ত একটু ঝিমুনী আসে। জোর করে তাকাই। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। একটা উঁচু গম্বুজের ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাই। চিনতে পারি। এটা আমাদের গড়ের মাঠের মনুমেণ্ট। এখন নাম শহীদ মিনার, তাই না? সামনে তাকিয়ে দেখি আদি গঙ্গার খালের মত ক্ষীণ জলস্রোত বয়ে চলেছে। বুঝতে পারি ঐটে এক সময় ছিল হুগলী নদী। এখন, টালীর নালা হয়ে গেছে। বুকের কাছটা মোচড় দিয়ে ওঠে। তাহলে আমাদের কোলকাতার এই অবস্থা হয়েছে। মনে পড়ে যায় কোথায় যেন পড়েছি এই সব কথা। ফারাক্কার বাঁধে কাজ হল না। হুগলী শুকিয়ে গেল। তার আগে কোলকাতার মানুষগুলো শহর ছেড়ে বনে পালাল, আর সুন্দরবনের পশুগুলো কোলকাতায় এসে আস্তানা পাতলো। একটু দূরে একটা বিরাট অজগর হাঁ করে এগিয়ে আসছে। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাব, এমন সময় শুনি ঠাকুর এসে খবর দিচ্ছে যে, খানা তৈয়ার। সামান্য একটু চমকে উঠে তার দিকে তাকাই। বন্ধুর কথা শেষ হল। রোজই এরকম দেখছি, তা নয়। তবে মোটামুটি এরকম বলা চলে। অন্য লোকের সঙ্গে যে-সন্ধ্যা গল্পগুজবে কাটে, সে-সন্ধ্যায় এসব দেখি না, শুনি না। বাইরে কোথাও গেলে হ্যালুসিনেশন থাকে না। দু' রাত কোলকাতায় কাটিয়েছি, কোনো গোলমাল ঘটে নি। আফিমের মাত্রা একই আছে। খাবার আগে নিয়মিত আফিম খাচ্ছি, কিন্তু হ্যালুসিনেশন নেই।

বন্ধুবর স্থানীয় এক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। স্বাস্থ্যের কারণে দু' বছর আগে রিটায়ার করেছেন। কলেজের হাঙ্গামা-হুজ্জত এড়াবার জন্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, আমি জানতাম। হুগলী নদীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন। ফারাক্কা প্রকল্পে কোনো কাজ হবে না, তাঁর ধারণা। তাঁর এক পৌত্র কিছুদিন আগে দুর্ঘটনাহত হয়ে মারা গেছে। ছেলেটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিল। তাঁর হ্যালুসিনেশনের কারণ অতি সহজেই বোঝা গেল। কোলকাতায় থাকতে মাঝে মাঝে দেখা হলেই তিনি বলতেন, হোগলাবন কেটে কোলকাতা হয়েছিল, আবার দালান কোঠা ভেঙে এটা হোগলাবনই হয়ে যাবে। চন্দ্রবাবু স্বপ্নের উপর রং চড়িয়ে আমাকে শুনিয়েছেন, সাহিত্য করতে চেয়েছেন, আমার বন্ধু দু'চার কথায় তাঁর হ্যালুসিনেশন আমাকে বলেছেন। বন্ধুকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম তাই তাঁর হ্যালুসিনেশনের হদিশ পেলাম, চন্দ্রবাবু ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেলেন। শুধু বুঝলাম তাঁর স্বপ্নের মধ্যে, প্রতিটি ইচ্ছার মধ্যে অহং-এর আধিক্য। যে তামসিকতাকে তিনি ঘৃণা করেন, সেই তমোভাবে তিনি ঘোরতর আচ্ছন্ন।

এইবার চিকিৎসা। হাসপাতাল ছাড়া উপায় নেই। অনেকে রাতারাতি আফিম বন্ধ করার পক্ষপাতী, কেউ কেউ আবার ধীরে ধীরে মাত্রা কমানোর সপক্ষে। আফিম বন্ধ হলে অনেক রকমের উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। সেগুলো দূর করার জন্যে ট্রাঙ্কুইলাইজার দেওয়া হয়। আজকাল আবার দুটো একটা নতুন ওষুধ দিয়ে আরো ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। ভিটামিন ও নিকোটিনিক এ্যাসিড ইনজেকশন খুবই কার্যকর। ০·৬ গ্রাম এ্যাসপিরিন দিনে দু-চারবার খেতে দিলে বেশ উপকার হয়। নানা রকমের ফিজিওথেরাপীর বন্দোবস্ত ভাল ভাল হাসপাতালে থাকে। মরফিন আসক্তদের রক্তে অ্যাসিটিল-কোলিনের মাত্রা বেশী পাওয়া যায়। সোভিয়েত চিকিৎসক রামখেনের নতুন চিকিৎসাবিধিতে কোলিনোলাইটিক ও কুরারের মত ওষুধের প্রয়োগ করা হয়। এতে নাকি খুব সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

—মনোবিদ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

বিনয় উন্মাদের মত যে ছেলেটি মেয়েটির হাত মুচড়ে দিয়েছিল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ধস্তাধস্তি। চিৎকার হৈ-হট্টগোল। চার-পাঁচজন তাকে ঘিরে অনবরত আঘাত করেছিল। সে লড়েছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। কিন্তু পিঠে ছোরার আঘাতের পর চিৎকার করে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। এবং আস্তে আস্তে চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে এসেছিল।...

তীব্র ওষুধের গন্ধে বিনয় সচকিত হয়ে চারিদিকে তাকাল। দু'একজন করে ভিজিটার্স আসছে। ওদেরও আসবার সময় হয়ে এল। সেই ঘটনাই এতক্ষণ ধরে সে ভাবছিল। এখন মনে হয় ওইসব ব্যাপারে তার এগিয়ে না গেলেই হোত। দূরে কোথাও সরে যেত। অথবা বাড়ি ফিরে যেত। কিন্তু তা পারেনি। কী আশ্চর্য সাহস সেই ফর্সা মেয়েটির!

শেফালী কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল, জেনেশুনে তুমি বিপদ ডেকে আনলে কেন?

বিনয় নীরবে তাকিয়েছে স্ত্রীর দিকে। কোন উত্তর দেয়নি। কিই বা বলবে। সবাই পাশ কাটিয়ে বাঁচতে চায়। কী বিশ্রী অবস্থা চারিদিকে! ভাবলে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। এই রকম কথা বলাই স্বাভাবিক শেফালীর পক্ষে। দুটি মেয়েকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে অপমান করছিল বাজে কতগুলি ছেলে, তাতে তোমার কী! আরও অনেকে আশেপাশে ছিল। সঙ্গিনী সহ ভ্রমণ করছিল। কই তারা তো কেউ এগিয়ে আসেনি। তুমি গেলে কেন?

এই সব কথা ঠিক বলেনি শেফালী। তবে বিনয় আন্দাজ করতে পারে। শেফালীর মনে ডুব দিয়ে জানতে পেরেছে সে। এই রকমই মনোভাব শেফালীর।

—চুপ করে এড়িয়ে যেতে পারবে না। একটু থেমে শেফালী অল্প হেসেছিল, বুঝেছি। মেয়েদুটির কাছে শিভালরি দেখাতে চেয়েছিলে। তাই না?

—জানি না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে বিনয় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অশিক্ষিতা নয় শেফালী। নির্বোধও নয়। অতএব বুঝেসুঝে ইচ্ছে করেই ওকে খুঁচিয়ে দেখছে। তপ্ত করছে ওকে। দেখতে চায় সে ক্রোধে ফেটে পড়ে কিনা। এখন মনে হয় বিনয়ের, অনেক ব্যাপারে, সব মেয়ে সমান। শিক্ষা কালচার কোন কাজে লাগে না। বিশ্রী পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষাবোধ, নীচতা—এর পিছনে বিরাট কোন কারণ খোঁজার দরকার নেই। যে-কোন তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে দপ করে জ্বলে উঠতে পারে।

আজ এত দেরী হচ্ছে কেন ওদের আসতে? অসহিষ্ণুভাবে ঘড়ির দিকে তাকাল বিনয়। সাড়ে পাঁচটা প্রায় বাজে। নাকি আজ কেউ আসবে না। আশেপাশের পেসেন্টদের মাথার কাছে প্রিয়জনদের ভীড়। সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখল বিনয়।

ওই তো ওরা আসছে। বিমল আর শেফালী।

—দেরী হয়ে গেল। বিমল বেতের একপাশে বসে বলল, তোকে আজ অনেকটা ফ্রেস দেখাচ্ছে।

নীরবে হাসল বিনয়। শেফালী আপেল কাটছে। চোখমুখ কেমন গম্ভীর। মা আজ এলেন না। হয়তো শরীর ভাল নেই। বিমল সিগারেট ধরিয়েছে দেখে সে চাইল একটা।

না। শেফালী ভ্রূ কুঁচকে বলল, কয়েকটা দিন সিগারেট না খেলে কি হয়। বিমলবাবু, আপনি ওকে সিগারেট দেবেন না।

—কিছু হবে না। কই ছাড় একটা সিগারেট।

—বৌদি কিন্তু আমার উপর রেগে যাবেন। বলে দাঁত বের করে হেসে বিমল সিগারেট গুঁজে দেয় বিনয়ের ঠোঁটে। দেশলাই জেবলে ধরিয়ে দেয়।

খানিকক্ষণ গল্প করে বিমল উঠে দাঁড়াল, আমি আসছি। বলে সে বিনয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হেসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

মনে মনে হাসল বিনয়। শেফালীর দিকে তাকাল। নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। কথা বলছে না। কেন কে জানে। অন্য সময় হলে নানারকম প্রশ্ন করত সে। আজ আর কোনরকম ইচ্ছে বা উৎসাহবোধ করছে না।

—মার কী হয়েছে? আজ এলেন না যে বড়।

—জানি না। নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর শেফালীর।

—শরীর খারাপ? কিছু বলেনি বুঝি?

—না। শুধু আসবেন না জানিয়েছেন।

শেফালী স্থির হয়ে বসে ছিল না। উসখুস করছিল। অনেকটা যন্ত্রের মত। বিনয় আর কোন কথা খুঁজে পেল না। শেফালীর কথাবার্তা বা চালচলনে ইদানীং সে অন্যকিছু দেখতে পাচ্ছে। ও যেন সর্বদা সবার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়। সবার সঙ্গে মেলামেশা করতে চায় না। কেমন নাকউঁচু ভাব ওর। এখানে যেন কয়েকদিন এসেছে। কোন মহিলা যদি দু'একটা প্রশ্ন করেছে, দায়সারা গোছের উত্তর দিয়েছে শেফালী। কথা বলার সময় ঠোঁটের কোণে ঈষৎ বিরক্তি দেখা গেছে। ব্যাপারটা কী? আগে তো শেফালী এমন ছিল না।

বিমল একটু দেরী করে ফিরল। কী ব্যাপার? বিনয় উদাসীনভাবে বাইরে তাকিয়ে। আর শেফালী মাথা নীচু করে বসে। রীতিমত অবাক সে। ভেবেছিল এসে দেখবে ওরা আলাপে মত্ত। দেখবে বিনয়ের উজ্জ্বল মুখ। শেফালীর মুখে হাসি। কিন্তু এখন দুজনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যেন কেউ কাউকে চেনে না। মান অভিমানের পালা চলছে বোধহয়।

বিনয় একটু হাসল, বাইরের হালচাল কী রকম বল তো?

—কে জানে। বিমল ভেংচি কাটে, কোন খবর রাখি না। সময় কোথায়? খবরের কাগজের হেডিং পড়ে আমরা আলোচনা করি, ঝগড়া করি পরস্পরের সঙ্গে!

এক নিঃশ্বাসে আরও অনেক কিছু বলল বিমল। হঠাৎ মুখ ফসকে 'শালা' বা ঐ জাতীয় একটা শব্দ বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর শেফালীর দিকে তাকিয়ে ওর যেন সঙ্কোচের সীমা রইল না।

একই সঙ্গে ওরা দুজনে চলে যায়। যাওয়ার আগে অবশ্য শেফালী ছোট্ট করে বলেছে, আজ আসি।

পরের দিন সবচেয়ে প্রথমে এল মীরা।

—বোস। বাড়িতে গিয়েছিলি? খুব শান্ত কণ্ঠস্বর বিনয়ের। যদিও মীরাকে দেখে অনেক প্রশ্ন উঁকি মারছে মনে। কিন্তু বাইরে কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না।

—বা। আশ্চর্য দাদা। কী অবস্থার মধ্যে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি সব জান তুমি। কিন্তু একবারটি খোঁজ পর্যন্ত রাখলে না! তোমার কাছে আমি এরকম ব্যবহার আশা করিনি।

—কেন চলে গেলি? বিনয় মৃদু হাসল, কই যাওয়ার আগে একবারটি তো জানালিনি। যাকগে মীরা। ও সব কথা আজ থাক। কেমন আছিস।

—বেশ ভাল। খারাপ থাকব কোন দুঃখে! কিন্তু দাদা, তোমার এ অবস্থা কেন? অবশ্য শুনেছি সব। তোমার স্কুলে ফোন করাতে সব জানতে পারলাম।

খুব একচোট হেসে নেয় মীরা। ফল কেটে প্লেটে সাজায়। বিনয় নীরবে দেখতে থাকে। মীরার দু'চোখের নীচে কেমন কালো দাগ। মনে হয় কাল রাতে ঘুময়নি। কেন? কোনদিন কিছু লুকোয়নি ওর কাছে। আজ গোপন করছে কেন? রাগ বা অভিমান বোধ হয়। সাহস আছে মীরার। এখন শেষ পর্যন্ত টিকতে পারলে হয়। ঘরে বাইরে বিশৃঙ্খল। হ্যাঁ, লড়াই করে বাঁচতে হবে। পারবে কী মীরা শেষ-পর্যন্ত লড়াই করে বাঁচতে?

—ওসব ফলটল খেতে আর ভাল লাগে না। বিনয় প্লেটের দিকে বিরসচোখে তাকিয়ে বলে, আমাকে তেলেভাজা এনে খাওয়াতে পারিস মীরা। খুব গরম তেলেভাজা।

—পাগলামী কর না দাদা। আগে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফের। তারপর যত পার তেলেভাজা খেয়ো।

—তুই তো জানিস, তেলেভাজা আমার কত প্রিয়।

—জানি। যে কদিন এখানে আছ ও-সব খেতে চেয়ো না। এখন এই ফল তোমাকে খেতেই হবে। আমি কিন্তু বেশি-ক্ষণ বসব না। ওরা আসবার আগেই চলে যাব।

এক টুকরো আপেল মুখে পুরে বিনয় বলল, তোর বাসার ঠিকানা রেখে যা। যাব একদিন। পল্টুকে কোথায় রেখে এলি?

সংক্ষেপে মীরা ওদের কথা জানায়। অফিস প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। মুখচোখ অনেকটা ফ্যাকাসে বিবর্ণ দেখায়।

—জানি না ওখানে আর কাজ করতে পারবো কিনা। মিঃ কাপুর সব জেনেছেন। তোমার রজতদা আমাকে জব্দ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

বিনয় কী বলবে ভেবে পেল না। মীরা কোন সাহায্য চায় না। কোনরকম পরামর্শ চায় না। শুধু যা ঘটে গেছে তাই জানাচ্ছে। হয়ত ভেঙে পড়েছে কিন্তু বাইরে তা পাঁচজনকে ডেকে বলতে চায় না। অতএব চুপচাপ শোনা ছাড়া তার করবার কিছু নেই।

—আমি চললাম। মীরা উঠে দাঁড়াল, আগে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফের। তারপর এক-দিন যেয়ো। আর দাদা, দোহাই তোমার, মানুষের উপকার এখন থেকে একটু কম করার চেষ্টা কর! নিতান্ত তোমার গায়ে আঁচড় না লাগলে কোন ব্যাপারে যেয়ো না। ইস্ বুকে ছোরা লাগলে...!

সবার এক কথা। মীরার দেওয়া ঠিকানা বালিশের নীচে রেখে দেয় বিনয়। নিজেকে বাঁচিয়ে চল। রাস্তা ঘাটে ট্রেনে ট্রামে সর্বত্র সবাই নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে চায়। কোথাও ভীড় দেখলে উঁকি মেরে দেখতে পার, জিজ্ঞেস করতে পার; 'কী হয়েছে মশাই? কী বললেন, পকেটমার? মারুন শালাকে!' এই বলে কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে থেক না, চলে যেয়ো নিরাপদ স্থানে, যেখান থেকে দাঁড়ালে তুমি মজা দেখতে পাবে অথচ কোনকিছু তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। গুলির রেঞ্জের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। যারা বুদ্ধিমান তারা তাই করে। আর বোকারা বিনা দোষে মার খায়। সে কোন দলে? নিজের প্রতি বিনয়ের এই প্রশ্ন বহুদিনের।

—বিনু! নরম স্পর্শ মাথার চুলে। বিনয় চোখ খুলে মাকে দেখল। তারপর শেফালীর দিকে চোখ পড়ল। ফের তাকাল মার দিকে। এবং দুজনের চোখেই সে কি যেন খুঁজতে লাগল।

সাতদিনের ছুটি ফুরোতে আর বাকি নেই। পরশু অফিস জয়েন করতে হবে। এর মধ্যে অনেক কিছু ভেবেছে মীরা কিন্তু সমাধান আসেনি মনে। এরপর মিঃ কাপুর তাকে কী চোখে দেখবেন কে জানে। চাকরী থাকবে কিনা তাও সে নিশ্চিত জানে না। সে মিথ্যে কথা বলেছে। স্বামী বেঁচে থাকতেও গোপন করেছে তার কথা। এটা নাকি মারাত্মক অপরাধ। এর সঙ্গে কোম্পানীর সুনাম-দুর্নাম জড়িয়ে আছে। মিঃ কাপুরের কথার কোন প্রতিবাদ করেনি মীরা। মুখ বুঁজে শুনেছে সব।

মাঝে মাঝে ভাবে, তাকে নাজেহাল করে রজতের লাভ কী! সে-তো আর ফিরে যাচ্ছে না। কোন প্রলোভনেও ফিরে যাবে না। যে সম্পর্ক ভেঙে গেছে, কোন দিন তা আর জোড়া লাগবে না। রজত কী জানে না এসব? না-কি যতদিন বেঁচে থাকবে এভাবেই তাকে যন্ত্রণা দেবে, অপমানিত করবে। মনে হয়, সে যদি সবার অলক্ষ্যে বাইরে কোথাও চাকরী নিয়ে চলে যায়, বাঁচতে চায় সম্মানের সঙ্গে—সেখানেও ঝড়ের বেগে হাজির হবে রজত তাকে তচনচ করে দিতে। কোথাও সে লুকোতে পারবে না। অর্থাৎ রজতের হাত থেকে তার বোধকরি আর নিষ্কৃতি নেই!

জানালা কপাট বন্ধ। বিছানায় শুয়ে মীরা এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। দুপুর এখন বড় বেশী দীর্ঘ মনে হয়। ঘুমোতে পারলে আজেবাজে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেত। কিন্তু ছুটি নেওয়ার পর থেকে একদিনও দুপুরে সে ঘুমোতে পারেনি। চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তার। পল্টু ওপরে অনুভার পাশে শুয়ে রয়েছে। অথবা লোটনের সঙ্গে হয়ত খেলা করছে। অনুভার বড় ছেলে ছোটন, বছর পনের কি ষোল বয়স, ক্লাস নাইনে পড়ে। তারপর পরপর দুই মেয়ে। একজনের বয়স বার। অন্যজনের দশ। তারপর লোটন। পাঁচ বছরের। এর পরেও নতুন অতিথি আসছে ওদের সংসারে।

চোখের সামনে ভেসে উঠল অনুভার উঁচু পেট। ইস্ কী কষ্ট! এত বাচ্চা-কাচ্চা কেন, একটু রাশ টেনে চলতে পারে না— আজকাল কত কী ওষুধ বেরিয়েছে। হিমাদ্রীবাবুর নিরীহ মুখ মনে পড়ল। বাইরে থেকে শান্ত দেখলে কী হয়, রাত্রে ওরই চেহারা হয়ে যায় অন্যরকম। বেচারী অনুভাকে ভদ্রলোক কোন রাত্রেই বোধকরি রেহাই দিতে চান না। লোকটা এক নম্বরের কামুক।

দিন দিন পল্টুর কথা ভেবে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। মাঝে মাঝেই পল্টু প্রশ্ন করে, 'মা, বাবা কোথায়? আমাকে তার কাছে নিয়ে চল!' আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। যা তা একটা বলে মুখ বন্ধ করতে বেশিদিন পারবে না। একদিন তাকে সত্য কথা বলতেই হবে। সেদিন যদি পল্টু

বেকে বলে? যদি তাকে তার মনের মতন বার। যদি বলে, 'মা, তোমরা এতদিন আমাকে বাবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে-ছিলে?' কী উত্তর সে দেবে সেদিন? পল্টু ভুল বুঝতে পারে। ও চলে গেলে সে প্রাণে বাঁচবে না। মীরা হঠাৎ টের পায় দু-চোখের কোল বেয়ে জল নীচে গড়িয়ে পড়ছে। বালিশ ভিজে গিয়েছে।

বাথরুমে গিয়ে চোখমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ফিরে এল মীরা। টেবিল ঘড়িটা টিক্‌টিক করে বাজছে। সোটে তিনটে। স্টোভ ধরিয়ে একবার চা করবে কিনা ভাবল। থাক, আর কিছুক্ষণ বাদে চা করা যাবে। কিছুতেই ঘরে থাকবে না ছেলেটা। কেন পাশে শুয়ে থাক। ওপরে না গেলে পেটের ভাত হজম হবে না। লোটনের ডাক শুনলে ছেলেকে আটকে রাখে কার সাধ্য। জোর করলে কেঁদে-কেটে একাকার। অনুভা নীচে নেমে এসে খোঁচা দিয়ে কথা বলে, 'ওইটুকু ছেলে কী সব সময় ঘরে থাকতে পারে! ছেড়ে দাও, একটু খেলা করুক। সব সময় আগলে রাখতে চেয়ো না মীরা। তাতে ফল ভাল হবে না।'

মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশি। অনুভার কথা শুনলে সমস্ত শরীর জ্বলে যায় মীরার। লোটনের সঙ্গে বেশি মেলা-মেশা সে পছন্দ করে না। এখানে থাকলে পল্টুর বারটা বেজে যাবে। মেয়ে দুটি বিশেষ সুবিধের না। ওদের আবার নাম মিলিয়ে রাখা হয়েছে : গীতা মিতা। সংক্ষেপে গীতু মিতু। বার বছরের মেয়ে গীতুর সাজগোজের ঘটা দেখলে টেরা হয়ে যেতে হয়। মেয়েটা এরই মধ্যে পেকে ঝুনো নারকেল। প্রথমে ভেবেছিল, সত্যি-কারের ভদ্র একটি পরিবারের মধ্যে এসে পড়েছে। এখন ধারণা পালটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

আর একটা ব্যাপারে সে মনে মনে ঈষৎ শংকিত। যদিও এখন পর্যন্ত আপত্তি-কর কোন কিছু সে লক্ষ্য করেনি। তবু মনে মনে তার আশংকা। আগে যদিও মা থাকলে শোভন ঘরে ঢুকত না বা কথা বলার চেষ্টা করত না। কয়েকদিন যাবৎ অন্য ব্যাপার সে লক্ষ্য করছে। যখন-তখন শোভন ঘরে ঢুকছে। অবশ্য ঢোকার আগে প্রতিবারই জানিয়ে ঢুকছে। বিশেষ করে দুপুরবেলা ঘরে ঢুকে গল্প করবে। এ কয়েকদিন সুযোগও এসেছে। পল্টু থাকত না। দরজায় নক করত শোভন। হাসি-মুখে বলত, 'ইস, আপনি বিশ্রাম করছেন। আমি বরং অন্য সময় আসব।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসেছে।

মীরা তাড়াতাড়ি জানালা কপাট খুলে দিয়েছে। হাসিমুখে বলেছে, 'বসুন না। বিশ্রাম আর কোথায়। শুধু এপাশ ওপাশ করছিলুম।' তারপর নানারকম কথা! উঃ শোভন এত কথা বলতে পারে আগে ভাবেনি মীরা। নানা প্রসঙ্গ। রাজনীতি, সিনেমা, খেলাধুলো—আলোচনার কোন কিছু বাদ দেয়নি। উপায় কি! হাসিমুখে আলো-চনায় অংশ গ্রহণ করেছে। বার-বার শাড়ির আঁচল দিয়ে বুক ঢেকেছে। চা বানিয়ে কাপ এগিয়ে দিয়েছে শোভনকে। তারপর পল্টু এলে নিষ্কৃতি পেয়েছে মীরা।

এমনি ভেবে দেখলে ব্যাপারটা এমন কিছু দোষের নয়। অস্বীকার করবে না—শোভনের সঙ্গে গল্প-গুজব করতে খারাপ লাগে না। বরং ভালভাবেই সময় কেটে যায়। দুপুরের নির্জনতায় একা থাকলে নানা চিন্তা উঁকি মারে। ফলে মন খারাপ হয়ে ওঠে। তার চেয়ে সমস্ত দুর্ভাবনা থেকে যদি অনেকটা সময় ভুলে থাকা যায় মন্দ কী। এ-ছাড়াও আর কতগুলি দিক আছে। কোন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তোলে না শোভন। অযাচিত ভাবে সহানুভূতি দেখাতে আসে না। করুণার সুরে কথা বলে না। ফলে স্বস্তি মীরার।

কিন্তু অন্যদিকের কথাও ভাবতে হয়। অনুভা টের পেয়েছে কিনা তা সে জানে না। হয়তো জানে। হিমাদ্রীবাবুরও জানার কথা। ওদের কাছে ব্যাপারটা অশোভন মনে হতে পারে। গল্প করার আর কী সময় নেই? নির্জন দুপুরই কী গল্প করার উপযুক্ত সময় বেছে নিয়েছে শোভন? আর ওর সঙ্গে এত গল্পেরই বা কী থাকতে পারে?

নিঃসন্দেহে এসব দৃষ্টিকটু ঠেকবে ওদের কাছে। হয়ত বাড়াবাড়ি দেখলে অনুভা ফের খোঁচা দিয়ে কথা বলবে। অসম্ভব কিছু নয়। মেয়েদের গায়ে কলঙ্কের ছাপ একবার পড়লে আর রক্ষে নেই। অনুভা আজ পর্যন্ত কিছু না বললেও, সে বুঝতে পারে, তার সম্পর্কে কৌতূহলের সীমা নেই। শুধু বাঁধুনির ভয়ে কিছু জিগ্যেস করতে পারছে না। এসব সে অনুমান করতে পারে। কেচ্ছা শুনতে মেয়েদের আগ্রহ যে কী প্রবল তা সে বেশ ভালভাবেই জানে।

আচ্ছা, শোভন কী চায় তার কাছে? নিছক গল্প করবার জন্যেই কী আসে? না-কি অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করছে। নারী-পুরুষের মধ্যে নিছক বন্ধুত্ব হতে পারে তা সে অস্বীকার করছে না। কিন্তু তার ভয় নানাদিকে। ভয় হয় শেষ পর্যন্ত শোভন তার মৌনতাকে অন্য কিছু মনে না করে। ছি, কথাটা ভাবতেই তার সমস্ত শরীরে এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পল্টু সোনামানিক, তুই আমার সর্বস্ব! তাকে বুকের পাশে পেলে আর আমি চাই না কিছু।

এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আজ যদি শোভন আসে, সে যেন দরোজার উপর করাঘাতের শব্দ শোনবার জন্যে উন্মুখ, পরোক্ষে সাবধান করে দেবে। কিছুতেই হাসবে না। গম্ভীর চোখ-মুখ দেখলেই শোভন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে ওর উপ-স্থিতি তার ভাল লাগছে না। পারবে তো শেষ পর্যন্ত গম্ভীর থাকতে? যদি শোভন সব বুঝেও না বোঝার ভান করে বসে

থাকে, তবে সে কী করবে। কারু ওরে তো আর [illegible] দিতে পারবে না। অথচ মুখ ফুটে [illegible] [illegible] শোভনবাবু, আপনি [illegible] [illegible] আসবেন না। [illegible] গল্প করছে দেখলে লোকে কী ভাববে বলুন তো?' অসম্ভব। ওরে [illegible] একথা [illegible] বলতে পারবে না। তবে সে কী হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে। জানি না, কিছু জানি না!' মীরা দুচোখ বন্ধ করার জন্যে যেন বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে দিল।

রাতের রান্নার জন্যে মীরা বেশি হাঙ্গামা করে না। এক ফাঁকে সে এসে পল্টুর পিছনে দাঁড়ায়। সামনে বই। অবোল-তাবোল বকছে ছেলেটা। একমাথা ঘন কালো চুল। টকটক করছে গায়ের রঙ। টানা টানা নাক চোখ মুখ। সব ওর বাবার মত। তার কিছু পায়নি। বড় হলে এও কী ওর বাবার মত হবে? দুর্নীতিপরায়ণ অত্যাচারী।

—কী হচ্ছে? মৃদু ধমক দিল মীরা, খালি দুষ্টুমী। ঠিকমত পড়।

—আমি আর পড়বো না। পল্টুর উচ্চারণে কোন জড়তা নেই। শীঘ্র সে চার বছরে পড়বে।

—কেন? মীরার ভ্রূ কুঁচকে যায়, কটা বাজে শুনি। মোটে সাতটা। হাত ধুয়ে আসছি। এসে যেন দেখি তুমি পড়ছো।

রান্নার ঝামেলা মিটিয়ে মীরা বাথরুমে ঢুকল। আর ভরসা হয় না। পল্টুকে যত তাড়াতাড়ি পারে কোন বোর্ডিংয়ে রাখবে। ইদানীং ওর দিকে কেমনভাবে যেন তাকিয়ে থাকে মেয়েটা। হ্যাঁ, সিঁথির দিকে তাকায়। কী লজ্জা! ওর মনে সন্দেহ জাগবার আগেই কোন ব্যবস্থা করা দরকার। কী ব্যবস্থা করবে? পরশু জয়েন করার পর ভাবা যাবে। চাকরী ঠিক থাকলে সব হবে। নইলে...। তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। তাড়াতাড়ি সে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেয়।

এখুনি বীথু এসে পড়বে। মীরা ঘাড়ে গলায় পাউডার ছিটোয়। পল্টুর দিকে আড়চোখে তাকায়। একমনে বই-এর দিকে ঝুঁকে ছবি দেখছে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত প্রশ্ন করছে ওকে। সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ওর প্রশ্নবানে। তারপর ধমক। তারপর কান্না।

হ্যাঁ, বীথুর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকতো! পল্টুর সামনে যে-ধরনের আলোচনা শুরু করে, বাচ্চা হলেও হালে অনেকটা বুঝতে শিখেছে, ওর সামনে রেখে-ঢেকে কথা বলতে হয়। আর রোজ সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে আড্ডা মারা, এতে কী পড়াশুনার ক্ষতি হয় না?

মেয়েটাও তেমনি। হাঁ করে কথা শোনে। দুলতে দুলতে দাঁড়িয়ে পড়ে। রোজ রোজ এসব ভাল লাগে না মীরার। অথচ মুখ ফুটে বীথুকে নিষেধ করতেও পারে না। মনে অশান্তিকর অবস্থা। আজকাল আর ভাল লাগে না বেশি হৈ-চৈ। বরং একটু একা থাকা, অন্ধকার ঘরে জানালার সামনে চেয়ার টেনে বসা, নিজেকে নিয়ে কিছুক্ষণ...। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলিকে ছুঁতে ইচ্ছে করে। মনে হয় বয়স অনেক বেড়েছে। আবার সে কৈশোরে ফিরে যেতে চায়। বাবার কথা মনে পড়ে। হঠাৎ মীরা চমকে উঠল দরোজার কড়া নাড়ার শব্দে।

দরোজা খোলার আগে কী একটা কথা ভেবে কেঁপে উঠল মীরা। না, সে এসময় আসবে না। তবু যদি আসে, লোকটা তো সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান হারাতে বসেছে, পল্টুর সামনে...। আর ভাবতে পারে না সে। তাড়াতাড়ি খিল খুলে বীথু আর প্রদীপকে দেখল।

হাত জোড় করে প্রদীপ নমস্কার করল, কেমন আছেন? অনেকদিন পর দেখা।

—এই চলে যাচ্ছে। মীরা হাসিমুখে বীথুর দিকে তাকাল, ভেতরে আয়।

—মা। বীথুর সারা মুখ উদ্ভাসিত, আমার ঘরে চল। খুব ঘুমিয়েছিস বুঝি? মুখ-চোখ ফোলা।

লম্বা একহারা চেহারা প্রদীপের। সুদর্শন যুবক। বীথুর ভাগ্য ভাল। অমন একটা ছেলেকে বাগাতে পেরেছে।

—কবে হচ্ছে বলুন? মীরা মুচকি হাসল, আমরা কবে লুচি মাংস খাব।

—বাজে বকিস না! বীথু যেতে যেতে বলে, তাড়াতাড়ি আয় মীরা।

ওরা চলে যেতে মীরা পল্টুর কাছে এসে দাঁড়াল। প্রায় সাড়ে আটটা। পল্টু ঝিমুচ্ছে। ওর পিঠে ছোট্ট একটা কিল মারল সে। দস্যি ছেলে। সারাদিন হৈ-চৈ করবে। সন্ধ্যের পর পড়তে বসতে না বসতেই ঘুমিয়ে পড়বে।

রোজকার মত আজও ঘুম-ঘুম চোখে খেয়ে শুয়ে পড়ল পল্টু। মশারি তক্তপোষের চারধারে গুঁজে মীরা আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। আপন প্রতিবিম্বের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল। আশ্চর্য! সে যেন নিজেকে চিনতে পারছে না। পথে-ঘাটে চলার সময় লক্ষ্য করেছে, লোকে বিশেষ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। বীথুর কথা মনে পড়ল। মুখপুড়ির লজ্জা-সরম কম। কী যাচ্ছেতাই কথা! ওকে নাকি এখন কলেজের মেয়েদের মত দেখায়।

[illegible] আদুরী, খুকী। কে বলবে [illegible] [illegible] না?

হি-হি! [illegible] বিদায় জানাল মীরা। এখন [illegible] [illegible] আসাও পাপ। লাইট নিভিয়ে সে [illegible] দরোজা ভেজিয়ে বাইরে আসে। এতক্ষণ হৈ-চৈ কানে আসছিল তার। আলতো পায়ে এগিয়ে গেল সে। শোভনের কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়াল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নানারকম চিন্তা এল তার। দোতলা থেকে পড়ার শব্দ ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে মেয়েলি হাসি। এত জানিজ গাঁট্টা। এখন থেকে কড়া শাসনে না রাখলে উচ্ছন্নে যাবে মেয়েটা। শোভনের সামনে যেতে সে চায় না। ওর চোখের দৃষ্টি যেন কী রকম। ঘরে ফিরে পল্টুর পাশে শুয়ে পড়বে কিনা একবার ভাবল। কিন্তু বীথু কী সহজে রেহাই দেবে? ওর কি। নতুন জীবনের স্বপ্নে মশগুল। প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বেচারি!

শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারল না মীরা। পর্দা সরিয়ে ঢুকতেই সবাই ওর দিকে তাকাল।

—আসুন। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল প্রদীপ, আপনার দেরী দেখে ভাবছিলাম আর বোধহয় আসবেন না।

—আপনি বসুন। মীরা বীথুর পাশে খাটের ওপর বসল। একবার আড়চোখে তাকাল শোভনের দিকে। একমুখ দাড়ি। বিশৃংখল মাথার চুল। একমনে সিগারেট টানছে।

বীথু ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে নীচু গলায় বলে, জানিস, আজ অফিস পালিয়ে দুজনে সিনেমা দেখেছি। প্রদীপটা ভারী অসভ্য! অন্ধকারে কিস্ করেছে আমাকে।

ওরা এদিকে তাকিয়ে। মীরা নীচু করে বলে, চুপ কর। বেহায়া কোথাকার!

—এ ভারী অন্যায়। এখানে ফিস্‌ফাস্ করা চলবে না।

—ঠিক। শোভন একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় প্রদীপের দিকে, আমাদের অস্তিত্বকে ওরা অস্বীকার করছে।

—বাঃ, সব কথা কী তোমাদের বলা যায়। বীথু খাট থেকে নেমে দাঁড়াল, মেয়েদের গোপন কথা শুনতে এত আগ্রহ কেন!

শোঁ-শোঁ শব্দে জল ফুটছে। চায়ের সরঞ্জাম ঠিকঠাক করতে থাকে বীথু। মীরা চুপচাপ ওদের কথাবার্তা শুনতে থাকে। প্রাণ খুলে মিশতে পারছে না। তবু বাইরে হাসিমুখে তাকে কথা বলতে হয়। জোর করে হাসতে হয়।

(ক্রমশঃ)

# বিজ্ঞানের কথা

## সংক্রামক রোগ ও সামাজিক পরিবর্তন

কলেরা রোগটিকে কি সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয়েছে? হয় নি। পৃথিবীর কোনো না কোনো অংশে এই রোগটি মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিছুকাল আগে মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় এই রোগটি বেশ প্রচন্ডভাবেই দেখা দিয়েছিল। আমাদের দেশে তো কলেরা রোগ প্রতি বছরের ঘটনা। প্রশ্ন উঠতে পারে, কলেরা বা এই ধরনের সংক্রামক রোগগুলোকে কেন একেবারে দূর করা যায় না? কেন এই রোগগুলোর বিরুদ্ধে এমন একটা বিরতি-হীন লড়াই চালিয়ে যেতে হয়? মানুষ যতোদিন ধরে এই পৃথিবীতে আছে ততোদিন ধরেই কি এই রোগগুলো আছে! তা যদি না হয় তাহলে কখন কী অবস্থায় এই রোগগুলোর প্রাদুর্ভাব? আমাদের কি সবেরই প্রতি বছরে এমনি কলেরার ইনজেকশন, বসন্তের টিকে ইত্যাদি নিয়ে চলতে হবে? মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের সঙ্গে কি এ-সব রোগের কোনো সম্পর্ক আছে?

গত ১০ই সেপ্টেম্বরের 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায় অধ্যাপক ফ্রাংক ফেনার এফ-আর-এস (অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা সিটির অস্ট্রেলীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন কার্টিন মেডিকেল রিসার্চ স্কুলের অধ্যক্ষ) বিষয়টি নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। এবারের বিজ্ঞানের কথায় অধ্যাপক ফেনারের এই আলোচনা সহজ ভাষায় উপস্থিত করার চেষ্টা করছি।

বিগত দশ হাজার বছরে মানুষ অনেক বদলে গিয়েছে। শরীরের গড়নের দিক থেকে নয়, সামাজিক সংগঠনে। এই বদল অসম্ভব দ্রুত ও অতিমাত্রায় ব্যাপক। অন্য সমস্ত জীব থেকে মানুষ এখানে আলাদা। যদি বংশের হিসেব ধরা যায় তাহলে এই দশ হাজার বছরের মধ্যে মানুষের ইতিহাসে বংশ পার হয়েছে মাত্র প্রায় পাঁচশোটি। এত অল্প সময়ের মধ্যে শরীরের গড়নগত কোনো পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়, দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে।

আদি প্রস্তর যুগের গোটা সময়টা ধরে মানুষ বাস করত ছোট ছোট দলে, কোনো এক জায়গায় স্থিতি হয়ে নয়, ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়ে। এক-একটি দলে মানুষের সংখ্যা হত শ'খানেক। এক দল অপর দলের সংস্পর্শে কদাচিৎ আসত, এলেও খুব বেশিক্ষণের জন্যে নয়। তারপরে কৃষিকাজ শুরু হবার পরে শুরু হল মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন। কিন্তু এ-জীবনও একেবারে স্থিতি নয়, কৃষির প্রয়োজনেই মাঝে মাঝে জায়গা বদলাত। আজ থেকে প্রায় ছ' হাজার বছর আগে কৃষি কাজে সেচ শুরু হতে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে এল স্থিতি। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক সংগঠনে সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তনগুলো এসেছে গত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে, বিশেষ করে গত কয়েক শত বছরের মধ্যে। গ্রাম-জীবন থেকে শহর-জীবনের সূত্রপাত খুব বেশি দিনের কথা নয়, বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রবর্তনের সময় থেকে।

মানুষের সামাজিক সংগঠনে এত যে সব পরিবর্তন তার দৃষ্টান্ত কিন্তু আজও পাওয়া যায়। প্রায় সমস্ত রকমের সামাজিক সংগঠনের নিদর্শন আজও পৃথিবীর কোনো না কোনো অংশে টিঁকে আছে। আদি প্রস্তর যুগে যারা খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত ও শিকার করত, যারা প্রথম কৃষি-কাজ শুরু করেছিল, যারা পশু পালনের যাযাবর জীবন কাটাত, শিল্পপত্তনের গোড়ার দিকের শহর (যেখানে কোনো মলনির্গমের ব্যবস্থা ছিল না) ও পরের যুগের সর্বব্যবস্থা-সমন্বিত শহর—সবক'টি নিদর্শনই এখনো পাওয়া যায়।

এই নিদর্শনগুলিকে সামনে রেখে আলোচনা করা যেতে পারে সংক্রামক রোগের ওপরে সামাজিক সংগঠনের ক্রিয়া কতখানি।

প্রথমে ধরা যাক কতকগুলো জীবাণু-গত (ব্যাকটিরিয়া) ব্যাধির কথা, যার দ্বারা পাকস্থলী ও অন্ত্রের পথ আক্রান্ত হয়। এই রোগগুলো স্থানিক হতে পারে বা টাইফয়েড ব্যাসিলাস ধরনের হলে সর্বব্যাপ্ত হতে পারে। এই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে। নিঃসৃত হয় মানুষের বা তার গৃহপালিত জীবের মল বা কখনো কখনো প্রস্রাবের সঙ্গে। নিঃসরণ চলে কয়েক সপ্তাহ ধরে, যখন রোগের প্রকোপ থাকে সবচেয়ে বেশি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যাযাবর গোষ্ঠীর মধ্যে এই রোগ সহজে টিঁকে থাকতে পারে না। কিন্তু যেখানেই মানুষ স্থিতি হয়েছে, এক জায়গায় অনেক মানুষের বসবাস, এক জায়গা থেকেই সকলের জলের যোগান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়, সেখানে এই রোগ ছড়াবেই। শিশুকে এই রোগ ধরলে হয় তার মৃত্যু, আর যদি বেঁচে যায় তো বাকি জীবন এই রোগ থেকে অব্যাহতি। অতএব এমনও হতে পারে, প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মানুষ এমনিতে চোখের দেখায় পুরোপুরি নিরোগ, কিন্তু কার্যত এই বিশেষ রোগের জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত—যেহেতু শৈশবে একবার ভুগে উঠেছে তাই আর দ্বিতীয়বার ভুগতে হচ্ছে না।

আধুনিক শহরগুলিতে এই রোগ দূর হয়েছে তার কারণ জীবাণুমুক্ত জল সরবরাহ ও উন্নত মলনির্গম ব্যবস্থা।

এই বর্গেরই আর একটি রোগ হচ্ছে ফুড পয়জনিং। আধুনিক শহরগুলিতেই এই রোগের প্রকোপ বেশি। এই রোগটি কিন্তু ছড়ায় জীবজন্তু থেকে এবং তা ঠেকানো শক্ত। কেননা, মানুষের ও জীব-জন্তুর খাদ্য আমদানী করা হচ্ছে বিশ্বের নানা দেশ থেকে আর তারই সঙ্গে রোগের জীবাণুও চলে আসছে। শুধু এই একটিই কারণ নয়, আরো আছে। আমাদের শহরের জীবনের ধরনটাই এমন যে রোগের জীবাণু ছড়ানো কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না।

আদি প্রস্তরযুগে কি এ-সব রোগ ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু ছড়াতে পারত না। সে-সময়ে হয়তো একজন শিকারী একটি জন্তু শিকার করেছে, সেই জন্তুর মাংস খেয়ে তার এই রোগটি হল। সেই মাংস আরো যারা যারা খেল তাদেরও হল। কিন্তু ছড়াবে কি করে? ছড়াতে পারল তখনই যখন মানুষ গ্রামের পত্তন করল, একই জায়গা থেকে সকলের জলের যোগান দেবার ব্যবস্থা করল, কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকল অনুন্নত। পরবর্তীকালে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা উন্নত হবার পরে এই রোগ দূর হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি খাদ্য-চালান ও খাদ্য-প্রস্তুতের বিশেষ ধরনের জন্যেই আবার এই রোগ দেখা গিয়েছে। . . .

এবারে আরো একটি রোগের দিকে তাকানো যাক। মীজল্‌ বা হাম। এটি একেবারেই মানুষের রোগ, মানুষ থেকেই মানুষে ছড়ায়, একবার ভুগে উঠলে দ্বিতীয়বার আর এই রোগে ভুগতে হয় না। রোগের জীবাণু (ভাইরাস) নিঃসৃত হয়ে থাকে মাত্র কয়েক দিন ধরে। এবং এই রোগ যেমন দ্বিতীয়বার হয় না, জীবাণুরও দ্বিতীয়বার নিঃসরণ নয়। কাজেই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে থাকা মানুষের মধ্যে এই রোগ ছড়াবার ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। জন্তুজানোয়ার এই রোগের বাহন হতে পারে না, মানুষ থেকেই মানুষে ছড়ায়, কাজেই বিচ্ছিন্ন কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে (আজকের দিনেও যারা হয়তো কোনো একটি দ্বীপে বসবাস করছে) এই রোগ কিছুতেই টি'কে থাকতে পারে না।

যদি টি'কে থাকতে হয় তাহলে সারা বছর ধরেই এই রোগের একজন না একজন রোগী থাকা দরকার। যদি ঠিক একজনের পরে একজনের হয়ে চলে তাহলে এই রোগীর সংখ্যা হওয়া চাই অন্তত ত্রিশ। কিন্তু বাস্তবের হিসেব এত সরল নয়। সেখানে একজনের পর একজন রোগের আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করে না, অনেকগুলোই ফসকে যায়। হিসেব করে দেখা হয়েছে, রোগীর সংখ্যা যদি হয় বছরে অন্তত তিন হাজার তাহলে রোগটি টি'কে যাবার সম্ভাবনা। মোট অধিবাসীর সংখ্যা অন্তত তিন লাখ না হলে এমন ব্যাপার কিছুতেই ঘটা সম্ভব নয়। বাস্তব সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, যে-সব দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা পাঁচ লক্ষের কম সেখানে হামরোগ স্থায়ী বাসা বাঁধতে পারে না।

হামরোগ মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়, তাই যদি হবে তাহলে ধরে নিতে হয় ছ' হাজার বছর আগের ছোট ছোট দলে বিভক্ত মানুষের মধ্যে এই রোগের অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে পরে এই রোগ এল কোথা থেকে? সম্ভবত পাগলা কুকুর থেকে কিম্বা গবাদি পশুর বিশেষ এক ধরনের সংক্রামক রোগ থেকে। যে জীবাণু থেকে কুকুরের ও গবাদি পশুর এই বিশেষ রোগ তার সঙ্গে হামরোগের জীবাণুর মিল আছে। একটি থেকে অপরটির উদ্ভব অসম্ভব নয়। ছ' হাজার বছর আগের প্রথম শহরে সম্ভবত এই উৎস থেকেই রোগটি ছড়িয়েছে।

চিকেন পক্‌স বা জল-বসন্তের কথা ধরা যাক। এই রোগটিও মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। হামরোগের মতো এই রোগটিও একবার হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার হয় না। কিন্তু এই রোগটিকে যদি টি'কে থাকতে হয় তাহলে কিন্তু হামরোগের মতো অধিবাসীর সংখ্যা তিন লাখ হওয়ার দরকার নেই, এক হাজারেরও কম হলেই চলে। এর কারণ, জলবসন্তের জীবাণু (ভাইরাস) বহু বছর পর্যন্ত মানুষের শরীরে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে, তারপরে এক সময়ে আবার সক্রিয় হয়। তখন কিন্তু রোগের যে চেহারা প্রকাশ পায় তা জল-বসন্ত নয়, তার অন্য নাম—যদিও এই অন্য নামের রোগের ফোস্‌কার মধ্যে জলবসন্তের জীবাণুও থেকে যায়। এ থেকে কোনো শিশু আবার সহজেই জলবসন্তে আক্রান্ত হতে পারে। এমনিভাবে জলবসন্তের একটি রোগীও যদি পাওয়া যায় তাহলেই রোগটির আবার ছড়িয়ে পড়তে বাধা নেই।

সর্দির কথা ধরা যাক। সাধারণ সর্দি, শীতকালে শহরের অধিকাংশ মানুষই যে রোগে ভুগে থাকে। এই রোগের কারণ আশিটি বা তারও বেশি বিভিন্ন ধরনের জীবাণু।

এক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে এমন ছোট গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে এই রোগ টি'কে থাকতে পারে না। এমনও দেখা গিয়েছে, বিমান-চলাচল শুরু হবার আগে যে-সব দ্বীপের মানুষের সঙ্গে বাইরের জগতের কোনো সংস্পর্শ ছিল না, যেখানে সর্দিও ছিল না, বিমান-চলাচল শুরু হবার পরে বাইরের মানুষের যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গেই সর্দি শুরু হয়ে গিয়েছে। যখন থেকে বহু মানুষ একজোট হয়ে থাকতে শুরু করেছে ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সংস্পর্শ বেড়েছে তখন থেকেই সর্দির জীবাণুর উদ্ভব।

আদি প্রস্তর যুগের মানুষ অন্তত সর্দি বা হাম বা জলবসন্ত রোগে ভুগত না, একথা জোর দিয়েই বলা চলে। সে-সময়ে মানুষ থাকত ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, একদল অপর দলের সংস্পর্শে খুব কমই আসত—কাজেই মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় এমন রোগ সে-সময়ে টি'কে থাকা অসম্ভব ছিল। এমন কি সেই আদি প্রস্তর যুগেও জীব হিসেবে মানুষ ছিল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী।

কৃষি কাজ শুরু হবার পর থেকেই মানুষের অভ্যাসে বড়ো রকমের পরিবর্তন আসে। মানুষকে আর ঘুরে বেড়াতে হয় না, খাদ্যের যোগান থাকার ফলে অনেক মানুষ এক সঙ্গে থাকতে পারে। এতদিন পর্যন্ত সে প্রকৃতিজগৎ থেকে খাদ্য আহরণ করত, ফলে তার দলের সংখ্যা বাড়তে পারত না। কিন্তু যখন সে নিজেই খাদ্য-উৎপাদক, খাদ্যের প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে দলের মানুষের সংখ্যাও বেড়ে চলে। পত্তন হয় গ্রামের, তারপরে কৃষি কাজে সেচ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের ও নগরের। শুরু হয় বহু বহু মানুষের এক সঙ্গে বসবাস। অধিবাসীদের সংখ্যা সেই সীমানা অতিক্রম করে যার ফলে সংক্রামক রোগ টি'কে থাকার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, নব্য প্রস্তর যুগে সংক্রামক রোগের প্রথম শুরু কি-ভাবে? যে-সব জীবাণু থেকে রোগের শুরু তা এল কোথা থেকে? এ-প্রশ্নের জবাব অনেকখানি অনুমান-নির্ভর। তাহলেও একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে উৎস হচ্ছে জন্তু-জানোয়ার। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে অনেকেরই প্রচুর বাচ্চা হয়ে থাকে, সংখ্যা বৃদ্ধিও যথেষ্ট, দল বেঁধেই থাকে, এই আশ্রয়ে জীবাণুর পক্ষে টি'কে থাকা অসম্ভব নয়। তারপরে কোনো রকমে একবার যদি মানুষের আশ্রয় পেয়ে যায় তখন মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়াটা অবধারিত।

আজকের দিনে মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, সেই সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগও। শহরগুলো ক্রমবর্ধমান। শহরের মানুষের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বিমানে যাতায়াত শুরু হবার পরে পৃথিবীর কোনো অংশের মানুষই আর বিচ্ছিন্ন নয়। এ-অবস্থায় সংক্রামক রোগ ছড়াবেই। বসন্ত বা কলেরার মতো কঠিন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক অবশ্যই থাকবে কিন্তু সর্দির মতো সামান্য রোগের বিরুদ্ধে? থাকলেও তার ব্যাপক ব্যবহার হয়তো সম্ভব হবে না, যুক্তিযুক্তও নয়। আর অন্য কোনো উপায়ে সর্দি ঠেকানো যাবে তারও উপায় নেই।

শুধু সর্দি কেন, জলবসন্ত বা ম্যালেরিয়ার মতো রোগ সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ব্যাপক কর্মসূচী সত্ত্বেও এই দুটি রোগের টি'কে থাকার মতো অবস্থায় কোনো হেরফের ঘটছে না। অর্থাৎ মানুষ যদি আবার সেই আদি প্রস্তর যুগে ফিরে না যায়, তবে সংক্রামক রোগ দূর হতে পারে বড়ো জোর কোনো একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। জাতীয় ভিত্তিতে দূর করাটা খুবই শক্ত, সারা বিশ্বে দূর করাটা একেবারেই অসম্ভব।

অতএব, দাও ফিরে সে অরণ্য—সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার এটাই একমাত্র পথ।

—অয়স্কান্ত

# পুষ্প প্রদর্শনী

আলিপুরে এগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটি আয়োজিত পুষ্প প্রদর্শনীর দৃশ্য।

ফটো : অমৃত

# ভবিষ্যৎ অন্ধকার ?

—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

লেমিংদের দেশত্যাগ

ইউরোপের পত্র-পত্রিকায় স্ক্যানডো-নেভিয়ান পর্বতমালায়, উত্তর ফিনল্যান্ডের তুন্দ্রা অঞ্চলে এবং উত্তর-পশ্চিম রাশিয়া থেকে ইঁদুর জাতীয় লক্ষ লক্ষ লেমিংদের এক তাজ্জব মৃত্যু অভিযানের বিবরণ প্রকাশিত হয় গত বছরের গ্রীষ্মে। লেমিংরা তাদের অরণ্য-পর্বত ও প্রান্তরের বসতি ত্যাগ করে দীর্ঘ মৃত্যু-মিছিল করে সমুদ্রে চলেছে। সমুদ্রে পৌঁছে তারা দূরে দিক-চক্রবালের অভিমুখে সাঁতার দিতে সুরু করে। তারা ভাল সাঁতারু নয়, তাই স্বল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের সলিল সমাধি হয়। লেমিংদের ঐ গণআত্মহত্যা নতুন নয়। বছর চারেক অন্তর তারা ঐ মরণ-অভিযান করে থাকে। '৭০ সালের অভি-যানটি গত দশ বছরের মধ্যে বৃহত্তম বলেই তা নিয়ে অত চাঞ্চল্য। জীব বিজ্ঞানীরা লেমিংদের ব্যাপক আত্ম-নিধনের আপাত কারণ সম্পর্কে বিবিধ ব্যাখ্যা দিলেও এবিষয়ে তাঁদের অদ্বিতীয় মত যে নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যেই লেমিংরা ঐ মারাত্মক পন্থা গ্রহণ করে থাকে।

বস্তুত, মানুষের হস্তক্ষেপের দ্বারা বিপর্যস্ত না হলে প্রকৃতির রাজ্যে প্রায় সর্বজীবের মধ্যেই আয়ু ও মৃত্যুর, সংখ্যার ও খাদ্য সংস্থানের, প্রজনন লীলায় প্রয়ো-জনীয় পরিবেশের, শাবকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশের সুবিধায় সর্বোপরি পারস্পরিক অতি-নৈকট্যজনিত স্নায়ু উত্তেজনা পরি-হারের জন্যে সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে কিম্বা ছিল। ঐ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিবিধ পদ্ধতির মধ্যে আছে, আপনা থেকেই গর্ভপাত, শিশু হত্যা কিম্বা পিতা-মাতার অনাদরে মৃত্যু, জন্মগতভাবে জৈব গুণাবলীর অবনতি,—অন্যান্য সব প্রবৃত্তি ব্যর্থ হলে স্নায়ু বিকারে বা উত্তেজনায় মৃত্যু। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে ঐ প্রাকৃতিক পদ্ধতি শুধু জীব-জগতে নয়, আদিম মনুষ্য-সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।

সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপরোক্ত পদ্ধতির মধ্যে জীববিজ্ঞানীরা প্রজনন এলাকার স্থান দেন সর্বাগ্রে। কারণ একটি এলাকার অধিকার কায়েম করার অর্থ হচ্ছে সেই এলাকার আটঘাট সম্পর্কে তার শত্রুদের চেয়ে অধিকারীর অধিকতর জ্ঞানলাভ।

সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা এক বিচিত্র উপায়ে জীবের উৎসাহ ও কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি করে। সে তার নিজের এলাকায় তার চেয়েও শক্তিশালী অনধিকারীর হামলাবাজি বন্ধ করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া এক-একটি এলাকায় স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা জীব-জন্তুরা দৈহিকভাবে পরস্পরের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ফলে তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব কমে যায়। সুতরাং বিপদজনক ঘেঁষা-ঘেঁষিতে যা মারাত্মক খুনোখুনিতে পরিণত হতে পারতো তা পরস্পরের এলাকার সীমান্তে হাঁক-ডাক, হম্বি-তম্বিতেই শেষ হয়। সর্বোপরি এলাকা বিশেষের অধিকার জীবদম্পতি ও তার সন্তানদের খাদ্য সংস্থান সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয়।—সুতরাং প্রকৃতির রাজ্যে, জীব-জন্তুর সমাজে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর হরিণ, পাখি ও শ্বাপদ-দের মধ্যে প্রজনন ঋতুর প্রাক্কালে পুরু-ষদের প্রবল-প্রতিযোগিতায় প্রথমনী সেই সব প্রেমিকদের যৌন-মনোরঞ্জন করে যারা একটি এলাকার ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। আর সে বিষয়ে ব্যর্থ, অক্ষম, দুর্বল পুরুষেরা সেই যৌন-প্রতি-দ্বন্দ্বিতা থেকে হটে গিয়ে তাদের মত অন্য পুরুষদের পালে গিয়ে যোগ দেয়। কিম্বা নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ জীবন যাপন করে। এইভাবে এলাকা বিশেষে প্রাণীর সংখ্যায় সামঞ্জস্যতা রক্ষিত হয়।

যে-সব প্রাণীর মধ্যে এলাকা অধি-কারের প্রথা নেই, তাদের মধ্যে অনেকের ক্ষেত্রে শিশু হত্যা কিম্বা পিতামাতার অনাদরের দ্বারা সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয় এবিষয়ে আফ্রিকা মহাদেশের উইলডা বীস্ট বা নুহরিণ এবং তার হন্তারক সিংহদের সম্পর্কে আলোচনাতেই বিষয় পরিষ্কার হবে। নুহরিণেরা দেখতে কদাকার, তারা মাছের মত ঝাঁক বেঁধে বিচরণ করে। এক-একটি এলাকায় এক একটি ষাঁড়-হরিণে যৌন সম্ভোগের এক চেটিয়া অধিকার ছাড়া, তাদের পালে বিশেষ কোন কৌতূহলোদ্দীপক নিয়ম কানুন নেই। তানজানিয়া প্রভৃতি পূ আফ্রিকার দেশগুলোর সমতলভূমি থে বর্ষারম্ভে তারা হাজারে হাজারে প্রচর (মাইগ্রেশনে) যায়। সেই যাযাবর বৃত্তি কালে দলের গর্ভিনীরা অতি-সহজে, প্র মল ত্যাগের মত অনায়াসে শাবক প্র করে। প্রকৃতির ঐ বিচিত্র বিধানে ন জাতকেরাও জন্ম থেকেই স্বনির্ভ ভূমিষ্ঠ হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ধাব দলের সঙ্গে দৌড় দেবার মত ক্ষিপ্রপদ হ ওঠে। সেই সময় তারা যদি ভাগ্য নিজের মায়ের কাছে পৌঁছায় তবে প্রসূতি তার অঙ্গ লেহন করে তা নিজের বলে গ্রহণ করে। কিন্তু বাচ্চা যদি তার নিজের মায়ের কাছে পৌঁছো না পারে তাহলে সেই বিশাল দলে কেউ তাকে গ্রহণ করবে না। তখন অনাথ চলমান পালের পায়ে নিষ্ঠুর চাঁট খেয়ে খেয়ে দলচ্যুত পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত শেয়াল বি হায়েনার উদরস্থ হবে। এইভাবে প্রতি

শত শত বাছুর বর্জন করে মহিষীগুলো তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে।

অরণ্য রাজ্যে পশুরাজ সিংহের জন্যে ভিন্ন কোন হন্তারক নেই। তাদের আধি ব্যাধি, মারী, মড়ক নগণ্য। তাদের লোম ও কেশরে পরগাছা লোলুপ শোষক-মাকড়শা, মাছি, উকুন এঁটুলী জোঁক ধরে কম। সিংহীদের গর্ভধারণের অন্তর সংক্ষিপ্ত এবং প্রতি প্রসবে শাবক সংখ্যাও কয়েকটি। তবু সিংহেরা সংখ্যার সমস্যায় পীড়িত হয় না। এমনকি তানজেনিয়ার সারেনগেতি সমতলের মত স্থানে যেখানে মৃগয়ার প্রাচুর্য, সেখানেও সিংহ সংখ্যার বিশেষ তারতম্য ঘটে না। কারণ সিংহ-গোষ্ঠিতে শিশু হত্যার দ্বারা সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাদের প্রথা হচ্ছে শিকার মিললে পুরুষেরা খাবে আগে। তারপর মেয়েরা, শেষে শিশুরা। কোন শিশু সে নিয়ম ভঙ্গ করলে তার কপালে হয় প্রচন্ড প্রহার, নয় নিষ্ঠুর মৃত্যু। প্রাচুর্যের সময় সিংহ-শিশুদের পক্ষে ব্যবস্থাটা হয়তো তত মারাত্মক হয় না। কিন্তু অনটনের সময় অনেক শিশুরই অনাহারে প্রাণ যায়।

সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে শিশু হত্যা এক কালে আদিম মানুষের মধ্যেও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। সভ্য মানুষের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার আগে পর্যন্ত এই সেদিন অস্ট্রেলিয়ার আদি-বাসী এবং এস্কিমোদের মধ্যে ব্যাপক-ভাবে শিশু নিধন ব্যবস্থা চালু ছিল। নিহত শিশুদের মধ্যে বেশির ভাগই হতো মেয়ে। তাই ওই দুটি আদিবাসীর মধ্যে নারী-পুরুষের আনুপাতিক হার হোত ১৫০—১০০ জন। রাজপুতদের শিশু-কন্যা হত্যা এবং আমাদের গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি ভিন্ন কারণে ও সংস্কারের জন্যে অনুষ্ঠিত হলেও ফল দাঁড়াতো একই। অন্যান্য যে-সব পন্থায় প্রস্তর যুগ থেকে মানুষ সচেতনভাবে কিম্বা পশুদের মত প্রাকৃতিক নির্দেশে অনুভূতি চালিত হয়ে, সংস্কার বশে, সামাজিক পরিণতি ইত্যাদি কারণে জন-সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে তা হচ্ছে যুদ্ধ, অর্থাৎ অপর গোষ্ঠিকে ক্ষেত্রবিশেষে থেকে উৎখাৎ চেষ্টা, নরমাংস বা স্বগোত্র ভক্ষণ, খুন-দাঙ্গা; নরবলি, যৌন-সম্ভোগের ওপর বিবিধ বিধি নিষেধ আরোপ এবং যাযাবর মূলকভাবে গর্ভপাত ইত্যাদি। এছাড়া মারী মড়ক, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগও মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

**ম্যালথাসের ধারণা অর্ধসত্য**

১৭৯৮ খৃঃ রেভারেন্ড টমাস ম্যালথাস এই তথ্য প্রচার করেন যে যতদিন না খাদ্যাভাব ঘটে ততদিন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলে এবং যে হেতু খাদ্য উৎপাদন ঘটছে গাণিতিক হারে এবং মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে জ্যামিতিক হারে তাই মহামন্বন্তর আসন্ন। কিন্তু ম্যালথাসের সেই ভয়াল ভবিষ্যৎ বাণীর পর নতুন মহাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ-মহাদেশে মানুষের বসতি বিস্তার, উর্বরা জমিতে চাষ-আবাদ, চাষের উন্নতর পদ্ধতির আবিষ্কারে মানুষের খাদ্যোৎ-পাদন বৃদ্ধি পেয়ে জগৎব্যাপী মন্বন্তর দেখা দেয় নি, যদিও অঞ্চল বিশেষে কিম্বা বিশেষ বিশেষ দেশে দুর্ভিক্ষে বহু লোকের মৃত্যু ঘটেছে এবং আজো ঘটছে। আজকে বহু অনুসন্ধিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জীব-বিজ্ঞানী, সমাজ-বিজ্ঞানী ও মনোস্তাত্বিকেরা এই তথ্যে উপনীত হয়েছেন যে খাদ্যাভাব ছাড়াও সংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে ঘেঁষা-ঘেঁষিতে প্রাণী জগতে যে স্নায়ু উত্তে-জনা বা বিকার দেখা দেয় তাও মারাত্মক হতে পারে।

যেমন, ১৯১৬ খৃঃ যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব উপকূলে চেসাপিক উপসাগরে জেমস দ্বীপে চার-পাঁচটি সিকা হরিণ ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ খৃঃ সেই হরিণের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩০০তে। তারপর ১৯৫৮ খৃঃ অর্ধেক হরিণ মারা গেল। পরের বছরও মৃত্যু অব্যাহত থাকলো। শেষপর্যন্ত হরিণের সংখ্যা যখন ৮০তে নেমে গেল তখন মড়ক বন্ধ হলো। অর্থাৎ, গণ-মড়কের যা সাধারণ নিয়ম, মূল সংখ্যা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের মৃত্যু ঘটা, তা ঘটে যাবার পর মৃত্যু বন্ধ হলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে হরিণদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়ে থাকুক তাদের খাদ্যাভাব ঘটে নি। তাদের বসতির ঘনত্ব ছিল একর প্রতি একটি। তাহলে হঠাৎ এই মরণের কারণ কি? পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তাদের বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থিগুলি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্নায়ু উত্তেজনাই হচ্ছে তার কারণ।

স্নায়ু উত্তেজনাও যে জীবসংখ্যা নিয়-ন্ত্রণের একটা বড় কারণ হতে পারে তা গত বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতীয়মান হয়। ১৯৩৯ সালে উত্তর আমেরিকার অসংখ্য স্নো-সু খরগোস এক অদ্ভুত আক্ষেপ বা কাঁপুনি রোগে মারা যেতে থাকে। তাদের মাথা ও ঘাড় সঙ্কুচিত ও পা প্রসারিত হতে থাকে। সেই অবস্থায় তারা একটা আচম্বিত লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে খাবি খেতে থাকে। কোন-কোনটি আবার অদ্ভুৎ হতচৈতন্য হয়ে মারা যেতে থাকে। মৃত খরগোসগুলি ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেল মূত্রগ্রন্থি, থাইরইড ও মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ এবং লিভারে চর্বি-বৃদ্ধি তাদের মৃত্যুর কারণ। খাদ্যাভাব কিম্বা মারী নয়। একর পেছু ৫০, এমনকি ১০০ খরগোস হলেও তাদের স্নায়ু স্বাভাবিকই থাকে। কিন্তু ২০০ পৌঁছোলেই নাটকীয়-ভাবে গণমৃত্যু দেখা দেয়। সুচনায় লেমিঙদের যে গণ-আত্মহত্যার কথা বলা হয়েছে, সেই লেমিঙদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাদের বেশিরভাগই যুবক, অনাহারী কেউ নয় তবু স্ত্রী লেমিঙরা কেউ গর্ভবতী নয়। অথচ সবাই উত্তেজিত। এমন উত্তেজিত যে স্ত্রী-পুরুষ মুখোমুখি হলে পুরুষের প্রাণবায়ু উড়ে যায়। জোরে কোন শব্দ হলে গন্ডায় গন্ডায় মরে যায়। সুতরাং জে জে খৃসটিয়ানের মত বিজ্ঞানীরা তার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, খাদ্যাভাবে অনাহারে মৃত্যুর অনেক আগেই সংখ্যাবৃদ্ধি জীব-জগতে একটা গণস্নায়ুবিকার ঘটায়। বড়দের মধ্যে প্রতিযোগিতা, ছোটদের সংখ্যাবৃদ্ধি, নবাগতদের অতিবৃদ্ধিতে গোষ্ঠীর বিশৃংখলা স্নায়ু উত্তেজনা ও প্রচন্ড অবসাদ ঘটায়। তারপর চক্রাকারে শীতে কষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাই শীতশেষে বসন্তে যৌন তাগিদ চরমে ওঠে। আচম্বিতে গণমৃত্যু ঘটে।

ঘেঁষাঘেঁষি কি ধরনের দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটে কোন জীববিজ্ঞানী তা ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। একটি খাঁচায় বহু ইঁদুরকে ঠেসাঠেসি করে ভরে দিয়ে (১৪×১০ ফিট খাঁচায় ৮০টি) দেখা গেছে পুরুষগুলো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে, পরস্পরের ল্যাজ কামড়াচ্ছে। মেয়ে-গুলো মাতৃদায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে। যৌন

# তীর্থ

মনোতোষ সরকার

গতকালের বিকেলে কেন জানি তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছিল অফিসে। হাতে কোন কাজ না থাকায় এমনি হাঁটতে শুরু করে দিল বাসব। উদ্দেশ্যহীনভাবে। এখানে সেখানে। সিনেমা দেখার কথা মনে উঁকি-ঝুঁকি দিলেও তাকে আমল দেয়নি বাসব। কি বই দেখবে? বাংলা? যে-কটা ভাল বই এসেছে তা দেখা হয়ে গেছে। হিন্দী? ও-বই দেখার মত মনের ধৈর্য এখন নেই বাসবের। আর ইংরেজী? কোন হলেই তেমন বই দেখানো হচ্ছে না। তাহলে? আজ যেন হেঁটেই ভাল লাগছে বাসবের এবং হেঁটে হেঁটে।

এই রকম হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল তীর্থকে।

বাসব অনেকবার যাকে খুঁজেছে। সেই তীর্থকে। অনেকদিন ধরে। কিন্তু খুঁজে পায়নি। তখন ভেবেছে পাবে না বুঝি। আর কোনদিন। কোথায় যে হারিয়ে গেল তীর্থ! অথচ প্রয়োজন ছিল। তীর্থকে। খুঁজেছে তাই। খুঁজেছে। অনেকবার। অনেকদিন ধরে। কিন্তু অনেককে ত আর খুঁজে পাওয়া যায় না শেষপর্যন্ত। আর তাদের জন্য অনুশোচনা থাকে না হয়ত। এমন অনেক নাম ত হারিয়ে যায়। হারিয়ে গেছে। তাদের যে আর কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না— এটা ভাল করেই জানে বাসব। বিশ্বাসও করে। তবুও কেন যেন সেই নামগুলোর সঙ্গে তীর্থর নামটা কিছুতেই মেলাতে চায় না। তীর্থকে যে ফিরে পেতে চায়। আবার। আশা রাখে আবার ফিরে পাবে তীর্থকে।

সত্যি কোথায় পাবে তীর্থকে? সম্ভাব্য সব ঠিকানায় হাজির হয়েছে বাসব। কিন্তু নেই—তীর্থ যে কোনখানেই নেই। এমনকি তার যাবার ঠিকানা থেকেও হারিয়ে গেছে। অনেকদিন। এই তীর্থ। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন-প্রিয়জন কারো কাছে গেলেও তীর্থকে আর পাওয়া যাবে না। সত্যি কি আর পাওয়া যাবে না তীর্থকে? বাসবের ভাবনাগুলো ট্রাফিক জ্যাম হয়ে থাকা গাড়ীগুলোর মত অনড়। তখন। সেই মুহূর্তে। এই ট্রাফিক 'জ্যাম হয়ত এক সময় আর থাকবে না। থমকে থাকা গাড়ীগুলোও আপন আপন গন্তব্যে

রচনা হবে। কিন্তু বাসবের ভাবনাগুলো কি গতি পাবে এই সব অনড় গাড়ীগুলোর মত? কোনদিন কি তীর্থকে পাওয়া যাবে? আবার?

তাই ত ভেবেছে বাসব। আর ভাবতে ভাবতে চলেছে। এই রাস্তা ধরে। ওই রাস্তা ধরে। যতক্ষণ চলেছে ততক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে। এই ফুটপাতে আর ওই ফুটপাতে। বাস-স্টপে আর ট্রাম-স্টপে। যদি দেখতে পায় তীর্থকে। আবার। এখন—হয়ত এখন নয় অন্য সময়ে। আজকে—হয়ত আজকে নয় অন্যদিন। অথবা কোনদিন—

অন্য কোনদিন নয় আজকে, আজকে নয় এখন, এখন নয় এই মুহূর্তে দেখতে পেল তীর্থকে। এই ফুটপাতে নয় ওই ফুটপাতে।

কি করছে তীর্থ? কথা বলছে? কারো সঙ্গে? কার সঙ্গে? এর চেয়ে আর বে বেশী দৃষ্টি চলে না এই ফুটপাত থেকে ওই ফুটপাতে। তবুও আরও বেশী করে দেখতে চেয়েছিল।

ডাকবে নাকি বাসব? এখান থেকেই তীর্থকে ডাকবে? এখন—এই মুহূর্তে? যদি শুনতে না পায় এই ডাক? তাহলে? অথবা এই ডাককে যদি অগ্রাহ্য করে? তখন? ডাক শুনে যদি পালিয়ে যায়? তবে? আবার কি খুঁজে পাবে তীর্থকে? তাই ডাকতে সাহস পেল না বাসব। দৃষ্টিটাকে সরল রেখা করে ছুঁয়ে থেকেছে তীর্থকে। এখান থেকেই। এই ফুটপাত থেকে। তারপর দৃষ্টিটাকে ছোট করে ক'রে গুটিয়ে নিয়েছে। আর এদিক থেকে হাঁটতে চেয়েছে ওদিকে। এই ফুটপাত থেকে ওই ফুটপাতে। যেখানে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে তীর্থ। হয়ত কথা বলছে। কার সঙ্গে? এখনও তা জানে না বাসব। কি কথা বলছে? তাও জানতে চায় না বাসব। তীর্থকে শুধু পেতে চায়। পেতে চেয়েছে। অনেকবার। অনেকদিন। আর মুখোমুখি হতে চেয়েছে। এখন—এই মুহূর্তে।

পা রেখেছে বাসব ফুটপাত থেকে রাস্তায়। তখন, ঠিক তখন আলো জ্বলেছে। লাল, হলুদ তারপরে নীল। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ী আবার ছুটে চলেছে। আর পিছিয়ে এসেছে বাসব। আবার। এই ফুটপাতে। চলন্ত গাড়ীগুলোর ধাক্কায় দৃষ্টির রেখাটা মুছে মুছে যাচ্ছে। ভেঙে ভেঙে যাওয়া দৃষ্টির রেখাটা কিছুতেই আর তীর্থকে ছুঁতে পাচ্ছে না। কেমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা তখন। বাসবকে ঘিরে। তীর্থকে খুঁজে পেয়েও ফিরে না পাবার বেদনা বুঝি বাসবকে অনেক বেশী যন্ত্রণা দিচ্ছে। নীল আলোটা কখন আবার লাল হবে? তাই ভাবছে বাসব। তাহলেই বুঝি তীর্থকে কাছে পাবে আবার। আর দৃষ্টির রেখাটা তখন এ-ফুটপাত থেকে ওই ফুটপাতে কয়েকটা কাল্পনিক বিন্দু তৈরী করেছে এবং সেই বিন্দুগুলোর মধ্যে রেখা টেনে টেনে ব্যূহ রচনা করতে চেয়েছে বাসব। আর সেই ব্যূহের মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছে তীর্থকে।

কখন আবার সেই নীল আলো হলুদ হয়েছে। আর বাসব আস্তে আস্তে একটা উত্তেজনার দিকে এগিয়েছে। বাসবের দৃষ্টিটা তীর্থকে ঘিরে থাকলেও হলুদ আলোর কাছে লাল আলোর ভিক্ষে চেয়েছে। আর তখন—ঠিক তখন গাড়ীগুলো কেমন থেমে গেছে। এক এক করে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। হলুদ আলোটাও সরে গেছে। সেখানে তখন লাল আলো চোখ রাঙাচ্ছে। শাসাচ্ছে যেন সবাইকে। আর বাসব আবার পথে নেমেছে।

'কেমন আছিস তীর্থ?' বাসব তীর্থর পাশে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হতে চেয়েছে।

'আপনি?'

'আপনি কিরে—আমি বাসব।'

'হ্যাঁ, তুমি বাসব, চিনতে পারিনি—এখন এখানে?' কেমন সঙ্কোচ-মাখানো কতগুলো শব্দ তীর্থর মুখে।

'তোকে দেখেই ত এখানে এলাম। কোথায় আছিস? কি করছিস আজকাল?'

তীর্থর তখন কেমন অসহায় অবস্থা। এই মুহূর্তে। বাসবের পোষাক-আষাক, চেহারা এবং উপস্থিতি সব মিলিয়ে তীর্থকে কেমন বে-মানান লাগছে এখন।

'কিরে কথা বলছিস না যে?'

তীর্থ কথা বলবে কি, নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য অতি ব্যস্ত তখন। নিজের হৃত-দৈন্য চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে জামা-কাপড়ের মধ্যে আরও দৈন্যের ছবি। তার ওপর ফুটপাতে বসা নীচুমানের সব্জী নিয়ে সব্জীওয়ালার সঙ্গে সামান্য ক'টা পয়সা নিয়ে অযথা কথা-কাটাকাটি। সবই কেমন বিসদৃশ। তীর্থর লজ্জা ঢাকবার যেন আর মুখ নেই।

'সামান্য ক'টা পয়সা ত দিয়ে দে। তারপর চল আর দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই। চায়ের দোকানে গিয়ে বসা যাক বরং। কি বল,—' হাত ধরে টেনেছে তীর্থকে।

ইতস্ততঃ করেছে তীর্থ। একবার তাকিয়েছে বাসবের দিকে। তারপর বাসবের সারা শরীরে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে হোঁচট খেয়েছে। নিজের নির্লজ্জ দৈন্যতার মুখোমুখি হয়ে আরও লজ্জা পেয়েছে। আর কেমন অসহায় বোধ করেছে। হাতে ছেঁড়া বাজারের থলে, তাতে আবার সস্তা দরের সব্জী, এর জন্যও অস্বস্তিবোধ কম নয়।

'কইরে, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকাব?' বাসব আবার তাগাদা দিয়েছে।

'আজ থাক বরং অন্যদিন—' থেমে গেছে তীর্থ।

'তাই কি হয় কখনো? কতদিন ধরে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি।'

'জানি। সব খবর পেয়েছি আমি।'

'তবে? দেখা করিসনি কেন?'

'কেন?' থেমে গেল তীর্থ। আর কোন কথা বলতে পারেনি। কেমন গুম মেরে গেল তখন।

এদিকে বাসব আজ যখন পেয়েছে তীর্থকে তখন কিছুতেই ছাড়বে না। জোর করে নিয়ে তুলবে চায়ের দোকানে। সেখানে বসে নিজের অহঙ্কারকে সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করাবে তীর্থর সামনে। এটাই চাইছে বাসব। কারণ, তার জীবনে এই একটাই মাত্র নাম যাকে কোনদিন বাগে পায়নি বাসব। অথচ আজই পেয়েছে। তাই অত সহজে এই সুযোগকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

'কি খাবি বল?' বাসবই প্রথম জিজ্ঞেস করল।

'কি খাব—কি খাব—আচ্ছা চা-ই বল।'

'চা ত সব সময়েই খাস—আরও অন্য কিছু বল।'

তীর্থ কিছুই বলতে চায় না। কি ভেবে তাকিয়ে থাকে বাসবের মুখের দিকে। এমন একটা মুহূর্তে যে বাসবের মুখোমুখি কোনদিন হতে হবে তাকে এ যেন ভাবাই যায় না। আর এভাবে দেখা না হলে হয়ত অলক্ষ্যেই ছিল এক রকম।

তীর্থ কথা না বললেও বাসব বলতে চেয়েছে। বয়কে ডেকে অর্ডার দিয়েছে দেখ-পর্যন্ত। বলেছে, 'ফিস ফ্রাই আর পুডিং দুটো করে।'

তবু তীর্থ কেমন অন্যমনস্ক। এমন একটা ব্যাপারের জন্য তীর্থর অপ্রস্তুত মনটা কিছুতেই সহজ হতে পারছে না।

বাসব তবু বলে, 'বিয়ে করেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় বাসা করেছিস?'

'এই বাগমারীর কাছাকাছি।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথা বলতে হচ্ছে তীর্থর।

ইতিমধ্যে খাবার এসেছে। ছুরি দি[illegible] কেটে কাঁটা দিয়ে ফিস-ফ্রাইয়ের টুকরোটা মুখে পুরেছে বাসব। তারপর জিভ দি[illegible] নাড়াচাড়া করতে করতে বলেছে, 'খেয়ে নে[illegible]'

'খাব ত নিশ্চয়, এখানে এসেছি যখন'

'কি করছিস আজকাল?'

'কেন?' ছুরি-কাঁটাকে অলস করে রে[illegible] বাসবের দিকে তাকিয়েছে তীর্থ। তারপ[র] আবার বলেছে, 'মাস্টারী করি। তুই ত বি[illegible] করেছিস বাসব তাই না?' সহজ হতে খু[illegible] চেষ্টা করছে তীর্থ।

'হ্যাঁ।' পুডিং-এর প্লেটটা সরিয়ে রে[illegible] চায়ের কাপটা টেনে নিতে নিতে বলে[illegible] বাসব, 'সত্যি তোর সঙ্গে দেখা হওয়ার এ[illegible] প্রয়োজন ছিল—'

'কেন?' বাসবকে থামিয়ে দিয়ে প্র[illegible] করল তীর্থ।

কেন? তাই ত ভাবতে বসল বাস[ব] ভাবতে ভাবতে ফিরে গেল সেই ছেলেবেল[া]কালে। যেখানে তীর্থ একমাত্র বাস[বের] প্রতিদ্বন্দ্বী। কি লেখাপড়ায়, কি খেল[ায়] কি ডিবেটিং-এ। বাসবও ছেলে খারাপ [illegible] না কিন্তু এই তীর্থকে কোনদিনের জন[্য] ডিঙোতে পারল না। সেবার পরীক্ষ[ার] প্রশ্ন ইচ্ছে করেই শক্ত করা হয়েছিল এ[illegible] ইচ্ছে করে খাতাও দেখা হয়েছে খুবই [illegible] করে। তাই নম্বর কিছুতেই বেশী উঠ[illegible]

না। পপ্তাশ পেল বাসব এবং বাসব ভেবেছিল নিশ্চয় তীর্থকে হারাতে পারবে। কিন্তু কোথায়, বাহান্ন নম্বর পেয়ে তীর্থ ঠিক বাসবকে টেক্কা দিয়েছে। একবার ঠিক হল ক্লাসের সব ছেলেরা মিলে স্কুলের বার্ষিকী দিবসে ফুটবল খেলবে। তীর্থর ইচ্ছে ছিল বাসব ওদের সঙ্গে খেলুক কিন্তু বাসব ইচ্ছে করেই অপর দলে খেলল। বাসব চেয়েছিল তীর্থকে কাটিয়ে নিয়ে গোল দেবে, তাই যতবার বল নিয়ে এগিয়েছে, ততবারই তীর্থর কাছ থেকে বাধা পেয়েছে অথচ তীর্থ যখন একবার মাত্র সুযোগ পেয়েছে এবং সেই সুযোগে বাসবকে কাটিয়ে গোলে বল ঠেলে দিয়েছে। এক গোলে তীর্থরা জিতে গেল। তীর্থকে নিয়ে কি নাচানাচি সেদিন। ডিবেটিং-এও কোনদিন হারাতে পারল না তীর্থকে। সেই থেকে তীর্থর ওপর কেমন রোখ চেপে রইল বাসবের। তারপর স্কুল ছাড়বার পর ছাড়াছাড়ি হল দুজনে। কিন্তু তীর্থের ওপর থেকে সেই চাপা বিদ্বেষ কিছুতেই তুলে নিতে পারল না। কলেজ থেকেও বেরিয়ে এল বাসব। কিন্তু কোথায় তখন তীর্থ? এখন ভাল চাকরী পেয়েছে বাসব। বিয়ে করেছে ভাল ঘরে। সুখী হয়েছে বাসব। এবং এখন আবার পেতে চেয়েছে তীর্থকে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন-প্রিয়জন সবার কাছে গেছে বাসব। কিন্তু না, কোথাও আর তীর্থকে খুঁজে পেল না বাসব। অথচ তীর্থকে তার প্রয়োজন ছিল। তাই ত কেমন করে যেন আজ সত্যি সত্যি তীর্থকে আবার পেয়ে গেল। বাসবের এই চাকরী, জামা-কাপড়ের বাহার আর সুখী মনটা তীর্থর এই অসহায় অবস্থার ওপর এক হাত নিতে চেয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে যে প্রতিদ্বন্দ্বী মনটাকে জীইয়ে রেখেছিল বাসব, সে বুঝি একটু একটু করে মাথা-চাড়া দিচ্ছিল। এবং এই চরম মুহূর্তে বুঝি ফেটে পড়তে চাইল।

'কই তোদের বাড়ীতে যেতে বললি না ত তীর্থ?' চায়ে চুমুক দিতে দিতে এক সময় বলেছিল বাসব।

একটুক্ষণ থেমে থেকেছে তীর্থ। মনে মনে কি ভেবেছে। তারপর সহজভাবেই বলতে চেয়েছে, 'যাবি তাতে ঘটা করে বলবার কি আছে।'

'এই রোববারে যাব তোদের বাড়ী, কেমন? বাড়ীতে থাকিস আবার!' খোঁচা দিতে গেছে বাসব।

'থাকব। লিখে নে ঠিকানাটা।' থামল তীর্থ। একটু আগে বাসবের খোঁচা-খাওয়া তীর্থর মুখটা গম্ভীর হতে যেয়েও হাসির বান ডাকল সেখানে। 'তোর বৌকে নিয়ে আসিস, বুঝলি।'

'আচ্ছা।' কোন খেলায় যেন মেতে উঠল বাসব।

রাত্তিরে রমা চেপে ধরেছে বাসবকে, 'কিগো, সকালের হাসির ব্যাপার সম্বন্ধে বললে না ত কিছু?'

'পরে বলব। জানো রোববারে আমাদের নেমন্তন্ন।' কথাটাকে ইচ্ছে করেই ঘুরিয়ে নিয়েছে বাসব।

'কোথায়?' রমা জিগ্যেস করেছে এবার।

'তীর্থদের বাড়ী।'

'কোন্ তীর্থর কথা বলছ? তোমার ছেলেবেলাকার বন্ধু সেই তীর্থ?'

মাথা নেড়েছে বাসব।

এই তীর্থ সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে রমা। বাসবই বলেছে। একে হারাবার জন্য বাসবের কত চেষ্টা। কিন্তু কোনবারই হারাতে পারেনি। তাই রমা হাসতে হাসতে বলতে পেরেছে, 'একে ত কোনদিন হারাতে পারনি, তাই না?'

'হ্যাঁ।' থেমে গেছে বাসব। আর মনে মনে ভেবেছে এতদিন বাদে প্রথম ধাপের খেলায় হারিয়ে দিতে পেরেছে তীর্থকে এবং রোববারে আবার রমার সামনে শেষ খেলাতে হারাতে পারলে ছেলেবেলার সব পরাজয়ের শোধ ঠিক ঠিক নিতে পারবে বাসব। হঠাৎ থমকে থাকা বাসবের মনটা অজানা এক আনন্দে ময়ূরের পেখম তুলল।

রোববারে অনেক ভোরেই ঘুম ভেঙে গেছে বাসবের। সকাল থেকেই মনটা বেশ ঝরঝরে। সপ্তাহের ক্লান্তি এক রাত্তিরের মধ্যে মুছে গেছে মন থেকে। হাত-মুখ ধুয়ে আসতে আসতেই রমা এসে হাজির হয়েছে। হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ। বলেছে রমা, 'আজ যে গুড বয় দেখছি। ডাকতে হয়নি, চা খেতে তাগাদা করতে হয়নি।'

হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ তুলে নিয়েছে বাসব। আর ফিরিয়ে দিয়েছে কিছু হাসি। বলতে চেয়েছে, 'আজকের কথা মনে আছে ত?'

'কি কথা?' না বোঝার ভাণ করে মজা করতে চেয়েছে রমা।

'তীর্থদের বাড়ীতে যেতে হবে না?'

'কেন?' বাসবের মুখের দিকে তাকাতে চেয়েছে রমা।

'ওদের ওখানে আমাদের নেমন্তন্ন, সেটা কি ভুলে গেলে?' বিস্কুটে কামড় দিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেছে বাসব।

'ও হ্যাঁ, বলেছিলে বটে তুমি।'

'তুমি তাড়াতাড়ি সেরে নাও বুঝলে, আমি ততক্ষণে বাজারটা একবার ঘুরে আসি।'

'বাজারে কেন? নেমন্তন্ন আছে না বললে?' অবাক হয়েছে যেন রমা।

'হ্যাঁ। বাজারও করতে হবে, নেমন্তন্নেও যেতে হবে।' রমাকে অবাক করে রেখেই থলে হাতে বেরিয়ে পড়ল বাসব।

* * *

দমদম থেকে ট্যাক্সিটা সোজা ভি আই পি রোড ধরে চলেছে। লেক টাউনের কাছে আসতেই রমা বলেছে, 'কি ব্যাপার বল ত?'

'কিসের কি ব্যাপার?' রমার মুখোমুখি হতে চেয়েছে বাসব।

'তীর্থবাবুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন অথচ পুরো বাজারটা করে নিয়ে চলেছ তুমিই? মাছ, মাংস, শাকসব্জী কিছুই ত বাদ দাওনি দেখছি।'

হেসেছে বাসব। কিন্তু মুখে কোন জবাব দেয়নি।

'কি মতলব তোমার বলতে পার?' রমা ত কিছুই বুঝতে পারছে না এসবের। সব কেমন রহস্য। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন তখন থেকে হেঁয়ালী ঠেকছে রমার কাছে।

ট্যাক্সিটা ইতিমধ্যে তিন নম্বর বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে এসে পড়াতে বাসব বলল, ট্যাক্সিওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে, 'ডাইনে মানিকতলা মেইন রোড।' তারপর রাস্তার ধারে বড় মিষ্টির দোকানের কাছে দাঁড় করাতে বলল আবার। দোকান থেকে মিষ্টি, দই কিনে এনে ট্যাক্সিওয়ালাকে এবার বলল, 'চালাও।'

'একি করছ তুমি?' রমা এক সময় কথা বলে উঠল। রহস্যটা যেন আরও ঘন হয়ে উঠেছে রমার কাছে।

এবারও হাসল বাসব।

ট্যাক্সিটা ততক্ষণে রেলপুল পেরিয়ে গেছে। ট্যাক্সির গতিটাকে কমিয়ে ড্রাইভার জিগ্যেস করল, 'আভি কিধার চলেগা সাহাব?'

'বাঁয়ে।' ড্রাইভারকে বাসব নর্থ রোডে ঢুকতে বলেছে। তারপর ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নম্বর মেলাতে গেছে। কিন্তু না, তীর্থর দেওয়া নম্বর ত পাচ্ছে না। তাহলে? ট্যাক্সিটাকে অবশেষে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে বাসব রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে জিগ্যেস করেছে নম্বরের কথা। কারণ, এটা জানে বাসব নম্বরের যদি কোন অস্তিত্ব থাকে, তাহলে চায়ের দোকানের কেউ না কেউ তা বলে দিতে পারবে। চায়ের দোকান পেয়ে যেন অনেক ভরসা পেয়েছে বাসব।

পাড়ার কতগুলো ছোকরা চায়ের দোকানে বসে গুলতানি করছিল তখন। সবাই নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করল। বাসবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাওয়ালা ওই ছেলেগুলোর মধ্যে একজনকে বলল, 'হ্যাঁরে পল্টা, পঁচিশের বাই পাঁচ নম্বর বাড়ীটা কোথায় রে?'

পল্টা সত্যি সত্যি কি যেন ভাবল কতক্ষণ। বাসবের মুখের দিকেও তাকাল। এবার ট্যাক্সির ভেতরে দৃষ্টি রেখে বলল, 'ওটা ত ভক্তবাবুদের বাড়ী মনাদা।' তারপর আবার বাসবের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আপনি এক কাজ করুন, সামনের ওই গলিটার ভেতরে যান। এবং ডানদিকের শেষ বাড়ীটাই পঁচিশের বাই পাঁচ।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' এতক্ষণে যেন আশ্বস্ত হল বাসব। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে এ-কথাই ভাবছিল বাসব যে তীর্থটা বুঝি তাকে একটা ভুল নম্বর দিয়েছে এবং এই নম্বরটা শত চেষ্টা করলেও কোনদিন আর খুঁজে পাবে না। তীর্থকে হাতে পেয়েও বুঝি শেষ চেষ্টাটা করতে পারল না।

বাড়ীটার কাছে ট্যাক্সির হর্ণ বাজতেই কে একজন দরজাটা খুলে দিল। এক মুখ ঘোমটা টেনে জিগ্যেস করল, 'কাকে চাই ?'

'তীর্থ আছে ?' বাসবই জিগ্যেস করল।

'উনি বাজারে গেছেন। আপনি কি—'

'আমি বাসব।'

'আসুন।'

'রমা নেমে এসো।'

রমা এগিয়ে গেল ভদ্রমহিলার সঙ্গে। পেছনে বাজারের থলে ও মিষ্টি-দই হাতে বাসবও এগোল।'

'একি করেছেন আপনারা। উনি এলে ভীষণ রাগ করবেন।'

হেসেছে বাসব। 'তাতে কি হয়েছে তীর্থ ত বাজার করত না হয় আমিই করলাম।'

কোথায় ছিল কে জানে, একটা বাচ্চা মেয়ে এসে তীর্থের স্ত্রীর কাপড় ধরে পার্থর হাতে মিষ্টির কৌটো দেখে বলল, 'মা আমি মিষ্টি খাব।' অবুঝের মত বায়না করে কাঁদতে লাগল মেয়েটা।

লজ্জায় পড়ে গেল তীর্থর স্ত্রী। বলল, 'একি পানু, হ্যাংলামী করো না।' তারপর পানুর গালে একটা চড় দিয়ে আবার বলল, 'বাবা আসুক বাড়ীতে পিঠের চামড়া তুলে দেবে।'

এসব কথায় রমারও কেমন লজ্জা লজ্জা করছিল। বলল, 'ছিঃ দিদি, ওরা ত বাচ্চা, ওরা ত বায়না করবেই। দাও ত আমাকে মিষ্টির কৌটোটা বাসবের হাত থেকে কৌটো নিয়ে রমা তার থেকে একটা মিষ্টি তুলে দিল পানুর হাতে।

'দাঁড়াও তোমার বাবা আসুক।' তীর্থর স্ত্রী আবার গর্জাল।

মিষ্টি হাতে পেয়ে কান্না থামিয়ে আবার কোথায় যেন সরে পড়ল পানু।

'আসুন। আপনারা কি শেষ পর্যন্ত এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবেন?' ওদের ঘরে বসিয়ে তীর্থর স্ত্রী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

তীর্থর স্ত্রী চলে যেতে রমা জিগ্যেস করল, 'কি ব্যাপার হল বলত ?'

'তাই ত!'

'কি যে ব্যাপার করছ কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার জন্য বলতে গেলে বাচ্চা মেয়েটা মার খেল।'

'বোধহয় তাই।' কেমন অপরাধী মনে হল নিজেকে। কিন্তু এমন একটা ঘটনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না বাসব। সে তীর্থকেই জব্দ করতে গেছিল। তীর্থর ওপর তার যত আক্রোশ। ছেলেবেলায় প্রতি ক্ষেত্রে তীর্থই তাকে জব্দ করে এসেছে। আজ হাতে সুযোগ পেয়ে এবং তীর্থকে খুঁজে পেয়ে পুরনো দিনের পরাজয়ের জের টেনে প্রতিদ্বন্দ্বী তীর্থর অস্বচ্ছলতার সুযোগ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু একটু আগে যে ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য কেমন অনুতপ্ত এখন বাসব।

এদিকে গলা পাওয়া গেল তীর্থর। 'বাসব তোরা এসেছিস নাকি ?'

'হ্যাঁ, এদিকে আয়।' বাসব বলল।

এগিয়ে এল তীর্থ। বড় ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত মনে হল তীর্থকে। বলল, 'তোরা এসব কি করেছিস বলত? এই এত বাজার— লাবণ্য বলছিল।' তীর্থকে যেন এবার একজন অক্ষম, অপদার্থ বলে মনে হচ্ছিল।

'তাতে কি হয়েছে? তুই কি আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করিস না?'

'তা করব না কেন, করি।'

'তা হলে?'

'কিন্তু আমার মেয়েটা যা করেছে তার জন্য সত্যি আমি লজ্জিত। বৌদি আপনি কিছু মনে করলেন না ত? শত খেয়েও মেয়েটার লোভ গেল না।'

রমা এমনিতেই কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল প্রথম থেকেই। বাসবের পুরো ব্যাপারটাই পীড়া দিচ্ছিল তখন থেকে। তারপরে আবার এই ঘটনা—তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আপনি খামোখা ব্যস্ত হবেন না।'

তীর্থ এবার বলল, 'কৈগো লাবণ্য বাসবদের চা দিলে?'

'এই নিয়ে আসছি।'

খেতে বসেছে বাসব আর তীর্থ। রমাকেও বলা হয়েছিল এই সঙ্গে খেয়ে নিতে। কিন্তু রমা নিজেই রাজী হয়নি। লাবণ্যর সঙ্গে খাবে বলেছে।

তীর্থ বলল, 'বাসবকে একটু দেখে-শুনে দাও লাবণ্য।'

'ঠিক আছে, অত ব্যস্ত না হলেও চলবে।'

'আমি আর কি করেছি বল, তোরটাই ত তুই খাচ্ছিস। বরং আমরাই আবার উলটে তোরটা খাচ্ছি। বাসবের বাটিতে আরও মাছ এবং মাংস দাও লাবণ্য।'

এর জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিল না বাসব। রমারও যেন কেমন লাগছে। এরকম জানলে কিছুতেই রমা এখানে আসত না। বাসবের ওপর ভীষণ রাগ হতে লাগল। এত ছেলেমানুষী করার কোন মানে হয় না।

'সত্যি আর দেবেন না, এমনিতেই ত অনেক বেশী দিয়েছেন—' হাত দিয়ে লাবণ্যকে বাধা দিতে লাগল বাসব।

'নে নে খা। আর লজ্জা করতে হবে না। তোর জিনিস তুই খাচ্ছিস।' আবার খোঁচা দিল যেন তীর্থ।

'আমার আনা হলেও তোদের জন্যও ত এনেছি এটা ভুল করছিস কেন?' বাসব পালটা দেবার চেষ্টা করল।

'ও বুঝেছি বৌদি খায়নি এখনও, তার জনাই বেশী করে ভাবছিস তুই।' তীর্থ মজা করার জন্য বলল এই কথাগুলো।

'না না কি বলছেন আপনি?' অপ্রস্তুত রমা বলতে চেষ্টা করল এবার।

'দই-মিষ্টিগুলো সত্যি ভাল এনেছিস। আর রান্নাগুলো বেশ ভালই করেছে লাবণ্য। তুই জানিস না বোধহয় লাবণ্য রান্না এমনিতেই ভাল করে।' তীর্থ অনেক বেশী মুখর। বাসবের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী দাঁড়াতে আর ভীত নয়। ক্লান্তি নেই, কোন জড়তাও নেই। প্রথম জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই তীর্থ যেন আবার ভেড়ে ফুঁড়ে এসে দাঁড়িয়েছে বাসবের সামনে। এবারও বুঝি রেহাই নেই বাসবের। বাসবের সব চালাকি যেন ধরা পড়ে গেছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে গল্প করতে করতে কখন দিনের রঙ পালটে গেছে। আলোর তেজও কমে এসেছে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাসব বলেছে, 'এবার উঠব তীর্থ।'

'হ্যাঁ, যাবি ত নিশ্চয়।'

'আবার কবে দেখা হবে আর একটু থাকুন না।' লাবণ্য বলল।

'কেন আপনারা একদিন আসুন তা হলে আবার দেখা হবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব একদিন।'

এদিকে ট্যাক্সি এসেছে। হর্ন দিচ্ছে বাইরে। কাউকে দিয়ে তীর্থই আনিয়েছে ট্যাক্সিটা।

'চলিরে তীর্থ, চলি বৌদি। আচ্ছা তোর মেয়েটা কোথায়?'

'খেলতে গেছে কোথাও।' লাবণ্য বলেছিল।

এগিয়ে গেল বাসব। পেছনে রমা ও লাবণ্য। এবং সব শেষে তীর্থ। তীর্থই দরজা খুলে দিল ট্যাক্সির। বলল, 'উঠুন বৌদি। বাসব ওঠ।' দরজাটা ফের বন্ধ করে দিয়ে কি যেন ভাবল তীর্থ। ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিয়েছে ততক্ষণে। হঠাৎ বলল আবার, দাঁড়া বাসব আমি এখুনি একবার আসছি ভেতর থেকে। তক্ষুনি আবার ফিরে এল তীর্থ। হাতে কিসের যেন একটা প্যাকেট নিয়ে।

ট্যাকসি নড়ে চড়ে উঠেছে। তীর্থর কথা পেলেই যেন ছুট লাগায়।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল তীর্থ। তারপর হাতের প্যাকেটটা বাসবের হাতে দিয়ে এবার বলল, 'এই নে।'

'এটা আবার কি?' তীর্থর দেওয়া চকচকে ঝকঝকে নতুন দামী শাড়ীটা হাতে নিয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে গেল বাসব। আর হাত দুটোও থেকে থেকে কেমন কাঁপছে যেন।

'আমার সাধ্যমত উপহার। বৌদির সঙ্গে যখন আমার এই প্রথম দেখা হল তখন কিছু একটা দিতে হবে ত! তাই—'

নতুন শাড়ীটার গন্ধ বাসবকে কেমন কাঁদাচ্ছে তখন। তবুও তীর্থকে আবার ভাল করে দেখছে বাসব। কিন্তু তীর্থর অতি সরল দুটো চোখের ওপর থেকে দৃষ্টিটাকে সরিয়ে কিছুতেই আর রমার দিকে তাকাতে পারছে না বাসব।

# গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

# অভিযান : ভ্রমণ

বেশ কিছুদিন আগের কথা। একদল মেয়ে অভিযাত্রী দুঃসাহসিকতার পথে পা বাড়িয়েছেন। পায়ে হেঁটে চলেছেন দীঘা। কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে দীঘার সমাপ্তি। কোন সহায়-সম্বল না নিয়ে সেহাত পথের দু' ধারের গাঁয়ের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে ওঁরা বেরিয়ে পড়েছেন। সকলের শুভেচ্ছাই ওঁরা পেয়েছেন। অপার আনন্দে পথ হেঁটেছেন। দিনের খাদ্য এবং রাতের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিতে অনেকে সাগ্রহে এগিয়ে এসেছেন। সকলের সম্মিলিত শুভেচ্ছা নিয়ে ওঁরা একদিন ভোরবেলায় শঙ্খধ্বনিনাদ আর পুষ্পমাল্যের অভ্যর্থনায় দীঘা পৌঁছে গেলেন।

সেদিন থেকেই পথ ওঁদের আপন করে নিয়েছে। তারপর ওঁরা আবার পদব্রজে যাত্রা করেছেন। এবার লক্ষ্য হলো দিল্লী, যদিও কলকাতা থেকে দিল্লী বহুত দূর কিন্তু প্রথম দুঃসাহসিকতার ভরসায় এবার এই দূরকেই ওঁরা বেছে নিলেন। যাত্রা শুরু হলো। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ওঁরা গিয়ে পৌঁছেছেন আর সবাই ওঁদের অভ্যর্থনা করতে ছুটে এসেছেন। এক ভদ্রলোক তো স্রেফ খবরের কাগজ দেখে ওঁদের নিজের বাড়িতে নিয়ে তুললেন। সারা পথেই এরকম অভ্যর্থনা। সবাই আন্তরিকতায় ভরপুর। এক মা তো ওঁদের রাতের আশ্রয় দিয়ে সারারাত গল্পগুজবে কাটিয়ে দিলেন। পরদিন ভোরবেলা বিদায় দিতে গিয়ে তিনিও ওঁদের সঙ্গী হয়ে যান আর কি! এমনি তাঁদের আপ্যায়নে কলকাতা থেকে দিল্লীর পথ ওঁদের কাছে মনে হয়েছে স্বপ্নজগৎ। এতো যে আত্মীয় ছড়িয়ে আছে পথের দু'ধারে তা ওঁদের অজানাই ছিল। আর পথে না বেরোলে তো বন্ধুর পরিচয় মেলে না। তাই এই পথ-পরিক্রমা। দিল্লী পৌঁছে ওঁদের জুটলো প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন।

এই দুটি অভিযানের উদ্যোক্তা ছিল এক্সপ্লোরারস ক্লাব। হেঁসেল-হাঁড়ির সঙ্গে একান্ত পরিচিত মেয়েদের এবার ঠেলে দেওয়া হলো অজানা অচেনা পথে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, ঘরকুনো মেয়েরা পথের সঙ্গে পরিচিত হোক। পথের দু'ধারে যে আত্মীয়তা ছড়িয়ে আছে তার পরিচয় লাভ করুক। সবচেয়ে বড়ো কথা যে, নিজের পায়ে ভরসা রেখে চলতে শিখুক। পশ্চিমে এভাবে চলা অনেক দিনের চল। কিন্তু আমাদের মেয়েরা এভাবে পায়ে হেঁটে, নিঃসম্বল অবস্থায় এবং আহার ও আশ্রয় খাপ্পা করে বেরিয়ে পড়বে পথের ডাকে এটা ছিল কল্পনাতীত। এই মেয়ে অভিযাত্রীরা সে অতীত কল্পনাকে বর্তমানে রূপ দিলেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, আমরা কোনটাতেই পিছিয়ে নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলতেই আমরা অভ্যস্ত।

ওঁদের দেখে পথ চলায় এক নতুন উৎসাহের জোয়ার এলো। অনেক ছেলে এবার এই পরীক্ষায় মেতে উঠলো। সবাই এমনি নিঃসম্বল অবস্থায়, শুধু জনসাধারণের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে পথের ডাকে সাড়া দিয়ে যাত্রা শুরু করলো। পথের ডাক ওঁদের কাছে অনেক দিন পৌঁছে গেছে কিন্তু ভরসার অভাব ছিল। সে-অভাবটুকু কাটিয়ে উঠতেই ওঁরা বেরিয়ে পড়লেন। আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ নয়। সবচেয়ে মজার কথা যে, এ-ব্যাপারে সকলের চোখ ফোটালো এই মেয়ে অভিযাত্রী দল। পথকে ওঁরাই প্রথম আপন ভেবে ঝাঁপ দিয়েছিলেন অজানিতের স্রোতে।

এবার এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের উদ্যোগে আর একটি অভিযান হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, অভিযাত্রী দলের সব সদস্যাই মহিলা। পদব্রজের পরিবর্তে দ্বি-চক্র যানে কলকাতা থেকে শিলং পাড়ি দিতে হবে। সেই পথের পরিজনদের আতিথ্য স্বীকার করে। ওঁরা সফল হয়েছেন। নির্দিষ্ট দিন এবং সময়ে ওঁরা শিলং পৌঁছে গেছেন। সাইকেলে অভিযান ওঁদের এই প্রথম। ওঁরা কলকাতায় ফিরেও এসেছেন। এবার জানা যাবে, ওঁদের যাত্রাপথের বিচিত্র ইতিহাস। তবে কোন সন্দেহ নেই যে, একাধিক সহানুভূতিশীল হৃদয়ের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় ঘটেছে। গুটিকয় মেয়ের এহেন দুঃসাহসিকতার নেশায় সবাই ধন্য ধন্য করছেন। সবাই বাহবা দিচ্ছেন মেয়েদের এই এগিয়ে যাওয়াকে।

পায়ে হেঁটে বা দ্বিচক্র যানে এ ধরনের অভিযান আমাদের দেশে সম্প্রতি হচ্ছে।

শীতের ফ্যাশানের পরিবর্তন আমরা প্রতি বছরই দেখে আসছি। এইতো কয়েক বছর আগেও আমরা শীতের পোশাকে ক্লোক, বেশী, উলের ও ফেরের কার্ডিগান দেখেছি। তারপর সব পোশাকেরই ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। এবারে শীতে ফ্যাশান-বিলাসীরা বেল-বটম ও কুর্তার সঙ্গে ছোট গরম চাদর সুন্দর করে গায়ে জড়িয়ে রাখছে। এটাই নাকি লেটেস্ট।

আশা করা যায়, এই সংখ্যা আরো বাড়বে। কিন্তু এরকম ভ্রমণের উপযোগী কোন ব্যবস্থা গড়ে উঠছে না। পশ্চিমের দেশে এধরনের অভিযাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই করা হয়ে থাকে। তাই ওঁরা নিজের দেশ ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে বেরিয়ে পড়েন বিশ্ব পরিভ্রমণে। সারা পৃথিবীকে জানতে হবে। ভ্রমণের তো আর শেষ নেই। আর এতে আনন্দও অপার।

আবার সকলের পথে পায়ে হেঁটে বেরোন সম্ভব নয়। তাদের ভরসা করে থাকতে হয় অন্য কিছুর উপর। কিন্তু সেরকম কোন ব্যবস্থাও নেই। তাই নিজের দেশ খুঁটিয়ে দেখাটাও আমাদের অনেকের ভাগ্যে হয়ে ওঠে না। ভ্রমণ সম্বন্ধে সেজন্যই আমাদের আগ্রহ এতো কম। নিজের দেশের ভূগোল ভাল করে জানি না।

একটা শোনা কথা মনে পড়ে গেল। আমার এক পরিচিতা বিদেশে গিয়েছিলেন।

হতো না বেড়াতে তারচেয়েও বেশি শিখতে। একদিনের এক ঘটনার কথা তিনি বলেছিলেন। রেলে চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য এক জায়গায় চলেছিলেন। দু'ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন। পরিচয় হলো পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে। দু' এক কথার পর ওদের দেশ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। পার্শ্ববর্তিনী অনর্গল বলে গেলেন। ভূগোল এবং ইতিহাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তিনি হলেন অবাক। মনে করলেন, এ বোধহয় ইতিহাস-ভূগোলের মাস্টার হবেন। কিন্তু জিগ্যেস করে ঠকলেন। জবাব এলো, এক অফিসের স্টেনো-টাইপিস্ট তিনি। পরে জানা গেল এসব জায়গার অধিকাংশই তাঁর ঘোরা। অবশেষে মন্তব্য করলেন, নিজের দেশ অদেখা হলে কিছুই জানা বা চেনা যায় না। এবার তিনি বুঝলেন কেন ওরা ওদের দেশের ইতিহাস-ভূগোল এতো ভালো জানে। আর আমরা জানি না। নিজের দেশ দেখার কোন সুযোগই তো আমাদের নেই। আর আগ্রহের অভাবটাই হলো আসল কারণ। নিজের চৌহদ্দি ঘুরে দেখার শখ আমাদের নেই বললেই চলে। তাই ইতিহাস-ভূগোলও আমাদের অপরিচিত।

ডেনমার্কের মেয়েরা এই সুযোগটি পায় পুরোপুরি। ইতিহাস বিখ্যাত ৫০০ দ্বীপ-মালার দেশ ফুনেন ও'রা ঘুরে বেড়াতে পারেন একটিমাত্র সাইকেল সম্বল করে। ও'রা এক সপ্তাহ সময় হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন দল বেঁধে। শুরু হয় ও'দের ছুটি কাটানো। মনে হয় পৃথিবীতে এধরনের ভ্রমণের ব্যবস্থা এই প্রথম। এবং এই ব্যবস্থা ও'দের দেশে পুরোপুরি সফল হয়েছে। বিদেশীদেরও এই দ্বিচক্র যানে ভ্রমণ বেশ আকর্ষণ করেছে। তাই শুধু ডেনমার্কের মেয়েমহল নয়, সবাই দেশ ভ্রমণের অপার আনন্দে বেরিয়ে পড়ছেন দ্বিচক্র যানে।

ফুনেন বা ফিন হলো ডেনমার্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপমালা। এ অঞ্চলেই দেশের বৃহত্তম কৃষিক্ষেত্র এবং ফলের রাজ্য। তাছাড়া এটি ডেনমার্কের হৃদয়স্থল। জুটল্যান্ড এবং জীল্যান্ডের মধ্যে অবস্থিত।

সুন্দর সুন্দর কৃষি বাড়ি, খামার, গীর্জা আর দুর্গে ভর্তি এই দ্বীপমালা। সবকিছু ঘুরে দেখার সুন্দর ব্যবস্থা। শহরে যাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন এখানে এসে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পান। ঘন নীল আকাশ আর সবুজ-ক্ষেত তাঁদের চোখ জুড়োয়। গ্রাম্য পরিবেশে ভ্রমণ করতে গিয়ে কোথাও রাজপথের ধার দিয়ে যেতে হয় না। ভ্রমণের মধ্যে এই সুযোগ খুবই মূল্যবান। সব সময়ই মনে লেগে থাকে এক বিরাট আবিষ্কারের নেশা।

খাওয়া-দাওয়া বা বিশ্রামের জন্য কোন ভাবনা নেই। পথের মাঝে মাঝেই সরাইখানা আছে। সেখানে যেমন দিনের খাওয়া সেরে নেওয়া যায় তেমনি রাতের বিশ্রামের বন্দোবস্তও আছে। যাত্রা থেকে দিনের শেষ পর্যন্ত এরকম দুটো সরাইখানার সন্ধান মিলবেই। দিনে ৩০ মাইল মতো চলতে হয়। এর বেশি চলা হয়ে ওঠে না। তিনদশটা এজন্য সাইকেল চালানো প্রয়োজন। চলতে চলতে থামতে হয়। দু'চোখ ভরে দেখতে হয় সবুজ দৃশ্য। ঐতিহাসিক স্থানগুলি ঘুরে বেড়াতে হয়। আবার একটু বা বেশি চান করার ব্যবস্থাও আছে। পথের ধারে ধারে ছড়িয়ে আছে সমুদ্রসৈকত।

ভ্রমণ শুরু এবং শেষ হয় সেভেনতভবর্গে এসে। এ জায়গাটি একটি বিখ্যাত সী-সাইড। এমনিতেই এখানে অনেকের সমাগম হয় সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার জন্য।

ঘুরতে ঘুরতে ভ্রমণার্থী এসে হাজির হয় কালিকো মোলেতে। সবচেয়ে পুরোন ওয়াটার মিল। রাজা ভালদেমার আটের-ডাগের রাজত্বকালে এটি তৈরি হয়। সেটা হবে ১৩৭০ সাল। এখন মিউজিয়মে রূপান্তরিত। সুন্দরভাবে বর্ণনা করা আছে এখানে কিভাবে কর্মীরা কাজ করতেন আর থাকতেন।

একটি অত্যন্ত পুরোন শহরে রাত্রিবাস করতে হবে অভিযাত্রীকে। শহরের নাম ফাবোর্গ। সরু সরু গলি আর কাঠের তৈরি বাড়ি এই শহরের বৈশিষ্ট্য। আজকের সভ্যতার বিরাট জাঁকজমকের মধ্যে এমন একটি শান্তির স্থান পেয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়া চলবে। প্রাচীনত্বের গৌরব আছে শহরটির। ১২৫১ সাল থেকে এই শহর এভাবে আছে। শহরের লাগোয়া একটি মিউজিয়মে দেখা যাবে ফুনেনের শিল্পীদের আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি। এছাড়া মার্চেণ্টস হাউস এবং নানা ঐতিহাসিক নিদর্শনের সন্ধান মিলবে।

১৪২১ সালে নির্মিত হর্ন চার্চ ভ্রমণ-কারীকে মুগ্ধ করবে। সম্পূর্ণ গোলাকৃতি এই গীর্জার দেওয়াল হলো সাত ফুট চওড়া। এই গীর্জা একই সঙ্গে একটি দুর্গ এবং দেবস্থান।

১৭৭২ সালে নির্মিত ব্রেমসেরাপ-এর ম্যানর হাউসটি ফুনেনের অন্যতম আকর্ষণ। সবসেরার তালিকায় এটি পড়ে।

এসব ঐতিহাসিক স্থান তো আছেই— আরো আছে অনন্যসুন্দর দৃশ্যাবলী। ফুনেনের প্রাদেশিক রাজধানী ওডেন্সে, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যাবে দু'চোখ ভরে। এই জায়গাটি আরো একটি কারণে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত রূপকথা কাহিনী লেখক হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের জন্মস্থল এই শহর। লেখকের বাড়িটি এখন যাদুঘরে পরিণত। ভ্রমণকারীর পক্ষে তার আকর্ষণ কিছু কম নয়। অনেক কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটে এখানে।

ফুনেনের সঙ্গে একটি আধুনিক সেতুর বাঁধনে ধরা পড়েছে সুন্দর বাগানের দ্বীপ টাসিঙ্গেও। একটি দিন কেটে যাবে এই শহর ঘুরে বেড়াতে। সারাদিন সাইকেল চালিয়েও কিন্দুমাত্র ক্লান্তি লাগবে না। চারদিকে শুধু বাগান; এত শোভায় নিজেকে পাগল হয়ে যেতে হয়।

সপ্তদশ দশকের ভালদেমার দুর্গ অন্যতম দ্রষ্টব্য। ব্রেগনিঙ্গেও গির্জা থেকে সারা শহরটি দেখা যায়। লাগোয়া গ্রাম-গুলিকে মনে হবে যেন সবুজ শস্যক্ষেত্র। যদি ভ্রমণকারীর মাছ ধরার শখ থাকে তবে সে লম্ব পুরেণ করবে ট্রোয়েনেস এবং ফিসিং ভিলেজ।

টাসিঙ্গেও-এর গির্জা প্রাঙ্গণে চিরনিদ্রায় অভিভূত এলভিরা মাডিগানের সমাধি ভ্রমণকারীকে স্মরণ করিয়ে দেবে বিখ্যাত সুইডিস ফিল্মের আসল নায়িকাকে। ফিল্মের নামও ছিল এই। তিনি ঘুমিয়ে আছেন তাঁর প্রেমিকের পাশে।

এবার ভ্রমণের সমাপ্তি লগ্ন উপস্থিত। চোখের সামনে ফুটে উঠবে ছবির মতো একটি গ্রাম। ডেনমার্কের সবচেয়ে সুন্দর এবং সমৃদ্ধ গ্রাম এটি। আর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অষ্টাদশ শতকের নিদর্শন। ভ্রমণশেষে মনে স্ফূর্তির জোয়ার।

থাওয়া বা থাকা এই বেড়ানোর কোন সমস্যা নয়। এমনকি সাইকেল ভাড়ারও ব্যবস্থা আছে। আর খরচও তেমন নয়। তাই সবাই এই ভ্রমণে উৎসাহ পান। বিশেষ উৎসাহ মেয়েদের। এই ভ্রমণে ওদের কোন দুশ্চিন্তাই নেই।

অভিযানের দুরন্ত নেশায় বেরিয়ে পড়ছেন অভিযাত্রীরা। কিন্তু বেড়াতে চান যাঁরা তাদের সুব্যবস্থায় এহেন নজীর আমাদের গড়ে উঠছে না কেন? নাহলে নিজের দেশ নিজের কাছেই অচেনা থেকে যাবে।

—প্রমীলা

# কারিয়ালা : পাহাড়ী গণনাট্য

অজিত দে

গণ-আন্দোলন আর গণ-নাট্যের সঙ্গে শহুরে মানুষদের শুধু নয়—শহর থেকে দূরের মানুষদেরও পরিচয় নেহাৎ কম দিনের নয়।

কিন্তু শহুরে সভ্যতার বাইরে নগরের পালিশকরা ঝলমলে আলোকউজ্জ্বল পরিবেশের কৃত্রিমতা এড়িয়ে পাহাড়ের কঠোর-কঠিনের মধ্যে লালিত সৎ কর্মঠ পাহাড়ীরা ক্লান্তি দূর করার এবং স্বভাবসুন্দর আনন্দ আহরণের জন্যে যে গণ-নাট্য-এর শরিক হয় সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বুঝি তুলনা মেলে না।

হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ী গণনাট্য অনুষ্ঠান তারই একটি জীবন্ত নিদর্শন। পাহাড়ীরা কিন্তু একে গণনাট্য বলে না—বলে 'কারিয়ালা' আর গাঁয়ের মানুষদের মধ্যে যারা এতে অংশ নেয়—অর্থাৎ অভিনেতারা ওদের কাছে পরিচিত 'কারিয়ালাচিস' বলে।

মাহাসু জেলার শাক্তরোরি আর ধামি গ্রামের এবং মাণ্ডি জেলার ঘাসনু এলাকার কারিয়ালাচিস দলের খুব নামডাক। কারিয়ালায় এদের জুড়ি মেলা ভার। দিওয়ালি আর বৈশাখী পর্বের সময় এই ক'টি দলই কাছে দূরের নানা গ্রামে ঘুরে ঘুরে আনন্দের পসরা বিলিয়ে বেড়ায়।

পাহাড়ী জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-বেদনার জারক রসে রসিয়ে গ্রামবাসীরা যে মুক্ত আবহাওয়ায় জীবনের গান গায় পূর্ব-প্রস্তুতির মহড়া না দিয়ে, হিমাচল প্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে তা আবার বন্ধারা-ও বলে পরিচিত। কারিয়ালা আর বান্ধারা মূলতঃ একই বস্তু, শুধু আঞ্চলিক ভাষার হেরফেরে ভিন্ন নামে পরিচিত।

গহন গভীর অন্ধকার পাহাড়ের কোলে প্রাকৃতিক সবুজের সীমাহীন মুক্ত অঙ্গনে, পাহাড়ের মতই আদিম প্রবীণ ঐসব গ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির সামগ্রিক ছবি ওরা ফুটিয়ে তোলে তাদের গণনাট্যে, অর্থাৎ কারিয়ালা বা বান্ধারা-র—, বিবর্তনের ধারায় প্রভাবিত জনগণের জীবনের নিখুঁত সজীব কাহিনী।

অক্লান্ত শ্রমে আর যন্ত্রণায় ওরা যখন নীরস সেই পাথরের বুকেও সবুজের বন্যা বইয়ে দিয়ে মাঠের ফসল ঘরে তোলে তখনই আসে ওদের জীবনের জিরিয়ে নেওয়ার অবসর, হাসি-ঠাট্টা নাচ-গানের বিলাসী আরাম। এই অবসর কালটাকে পাহাড়ীরা বেশ রসিয়ে মজিয়ে ভোগ করে কারিয়ালা আর বান্ধারা-র আসর জমিয়ে।

ডাণ্ডা কাট-কাটরা আর লোহালক্কড় সাজিয়ে গুজিয়ে একটা মঞ্চ তৈরী করে কারিয়ালাচিসরা তাদের রাত-ভোর করা গণ-নাট্যের আসর বসায় গাঁয়ের মধ্যে।

আমাদের বিচিত্রানুষ্ঠানের ধরনে ওদের এই সব আসরে নাচ গান কৌতুক রসের মাধ্যমে গ্রাম্যগাথা, পৌরাণিক কাহিনী, চলতি ঘটনা এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক একাঙ্ক নাটকই সাধারণত পরিবেশিত হয়।

নাচ-গানে বেশির ভাগই পাহাড়ীরা দাদরা আর কাহারবা তাল দুটোকেই জনপ্রিয় করে তুলেছে। স্থানীয় চলতি বাজনার মধ্যে থাকে নাগারা (আমাদের কাড়া-নাকাড়া জাতীয় কি?), ঢোল, সানাই, শিঙা। তবে আজকাল শহুরে যন্ত্র হারমনিয়মও ঠাঁই করে নিয়েছে তাদের ঐকতানে।

সুপ্রচলিত জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী পাহাড়ীরা বেছে নিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-কাহিনী থেকে। এই সব নাটকে নারদমুণিকে একটি প্রধান রসিক চরিত্রে চিত্রিত করা হয়ে থাকে।

সামাজিক নাটকে স্থানীয় কালোপযোগী চলতি প্রয়োজনের দিকেই নজর দেয়া হয় বেশি। বর্তমান সময়ের একাঙ্কগুলিতে পরিবার পরিকল্পনা, বিবাহবিধি সরলীকরণ আর কৃষিপদ্ধতির উন্নতিকরণ ইত্যাদি বিষয়বস্তুগুলিই খুব বেশি স্থান পাচ্ছে।

কারিয়ালার ভিত্তিমূল উচ্ছল কৌতুকরস সৃষ্টির ওপর প্রোথিত। বেশির ভাগ সংলাপের অংশ ছড়া কবিতায় গাঁথা। এই আদিমতম নাট্যরীতি শ্লেষ-ব্যঙ্গে আর তামাসা-রসিকতায় এমনি উৎকটভাবে খোলা-মেলা যে তা শুনে গাঁয়ের দর্শকরা হেসে হেসে একেবারে নাজেহাল হয়ে যায়।

এই তামাসা ব্যঙ্গের সংলাপ আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আদি রসে রসিয়ে মজিয়ে বেশ উপাদেয় করে রচিত, ফলে দর্শকমনে হাসির বাণ ডেকে যায়।

কিন্তু এতো যে রসসমৃদ্ধ—সে রস হোক না অশ্লীল, কারিয়ালার সংলাপাংশ তা আমাদের দেশের তরজা গানের মতো সবই পূর্ব প্রস্তুতিহীন তাৎক্ষণিক মৌখিক রচনা। প্রত্যেক শিল্পীই নাটকের বিষয়বস্তু আর অবস্থা-সন্নিবেশ অনুযায়ী তখুনি-তখুনি মুখে মুখে রচনা করে আবৃত্তি করে। অনেক সময় শিল্পী যখন ঠিক লাগসই কথা বা ভাষা হাতড়ে খুঁজে পায় না, আর বোবার মতো ত ত ত করে তখন সে হাতমুখ বেঁকিয়ে উৎকট হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি দিয়ে সেই অভাব পূরণ করে। দর্শকও তার অদ্ভুত বিকৃত দেহভঙ্গি দেখে আনন্দে মজায় একেবারে লুটিয়ে পড়ে।

চটুল মজাদার সুরে গাওয়া গ্রাম্যগীতিও কারিয়ালার অন্যতম মাধ্যম। ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের বহুপ্রচলিত পাহাড়ি আর ঝনৎ-জ্যোতি রাগের সুরে বাঁধা গানগুলি এদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হোয়ে উঠে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে গাঁয়ের মানুষজনেরা একটা খোলামতো চত্বরে বিরাট এক শহ্নোৎসব জ্বালিয়ে চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায়। একটু দূরের একটা কোণে ছেঁড়া পাগড়ি, চাদর ঘিরে কোনো রকমে একটু আড়াল করে নিয়ে কারিয়ালাচিসরা সাজগোজ করে নেয়। গ্রাম্যগীতি বা নাচের উৎসবের মতো কারিয়ালা-তে কিন্তু মেয়েরা অংশ গ্রহণ করে না। মেয়েদের ভূমিকায় পুরুষেরাই মেয়ে সেজে নামে আমাদের সেকালের যাত্রার মতো।

'মেক-আপে'ও ওরা পেছিয়ে থাকে না। এ কাজে ওরা দিশী গাছ গাছড়ার রং, শোনপাটের দড়াদড়ি আর ছাগল ভেড়ার লোম ব্যবহার করে। আজকাল আবার আধুনিক প্রসাধন রূপাঙ্কনের উপকরণের দিকে ওরা নজর ফিরিয়েছে।

অনুষ্ঠান শুরুর গোড়াতেই মঞ্চে আবির্ভূত হয় লক্ষ্মীদেবীর মতো সাজগোজ করা এক নারীমূর্তি—এই চরিত্রের ওরা নাম দিয়েছে চন্দ্রাবলী। চন্দ্রালোকে ওরা আমাদের লক্ষ্মীদেবীর মতো ধনৈশ্বর্যের দেবী হিসেবে পুজো করে।

চন্দ্রাবলী এসে বহ্ন্যুৎসবের চারদিকে হাতে ধূপধুনোর পাত্র নিয়ে বারকয়েক ঘুরে মঞ্চ-অঙ্গন অভিনেতা আর বাজিয়েদের আশীর্বাদ করে শুদ্ধ পবিত্র করে। পবিত্রকরণ শেষ হলেই শিল্পীদল বাজনা শুরু করে দেয়।

প্রায় মিনিট দশেক ধরে চন্দ্রাবলী বহ্ন্যুৎসবের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচে—তার পরেই আরম্ভ হয় সোয়াং—অর্থাৎ একাঙ্কিকা পর্ব।

কতকগুলি বাছা বাছা একাঙ্কিকা ওদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়—এবং কারিয়ালাচিসরা প্রায় প্রত্যেক আসরে সেইগুলো অভিনয় করে। কয়েকটির নাম—'সাধুদের সোয়াং', 'গিন্নির ঝগড়া', 'পলাতকা ছুঁড়ি', সুদখোর আর তার চাকর', 'পিলপিল সাহেব' এবং 'নাগিন'।

এর মধ্যে 'সাধুদের সোয়াং' একাঙ্কিকাটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এই একাঙ্কিকার পাত্রদের মধ্যে আছেন দুটি জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত সাধু আর একজন সাধুর বেশে রসিক ভাঁড়। পণ্ডিত সাধুরা যা বলেন, বা যা করেন ভাঁড় সাধুটি ঠিক তার উল্টো ধারায় গিয়ে হাসির বান ডাকায়।

এই একাঙ্কিকাগুলির মাঝে মাঝে 'নাটি' আর 'গীধা' নাচ আর গ্রাম্যগীতির ছোট ছোট যতিবিরতির চাটনী দিয়ে একঘেয়েমি কাটানো হয়।

কিন্তু, হায়রে! আধুনিক সংস্কৃতির কূলভাঙা বানে আজকাল গ্রাম্যগীতির বদলে হিন্দী ফিল্মী গানেরও ঢল নেমেছে পাহাড়ী গণনাট্যের আসরে।

এমনিধারায় রাত-ভোর করা আনন্দ-হুল্লোড় যখন শেষের সমে এসে থামে তখন পূব আকাশে পাহাড়ের কাঁধ টপকে কচি সোনা রোদের ছটার ইসারা পেয়ে কারিয়ালাচিস-দল তাদের নতুন আসরের দিকে যাত্রা শুরু করে।

# দাদাসাহেব ফালকে

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সময় ১৯১০।১১ সাল। ভারতে ইংরেজ শাসন আরো জাঁকিয়ে বসেছে। অন্যদিকে জেগে উঠেছে বাংলা-মহারাষ্ট্র—জেগে উঠেছে ভারত। ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাতেই হবে। নানাজনে বেছে নিলেন নানা পথ। স্বাদেশিকতার উৎস মুখ গেল খুলে। স্বদেশ আর স্বদেশীয়দের প্রতি দেখা দিয়েছে আগ্রহ আর সহানুভূতি। এই পটভূমিকায় জন্ম নিল প্রথম ভারতীয় কাহিনীচিত্র 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'—পরিচালক প্রযোজক থেকে সব কিছু যার ঢুন্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে—চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যিনি বিখ্যাত দাদাসাহেব ফালকে নামে।

'রাজা হরিশ্চন্দ্র' ও ফালকের সংগেই মনে পড়ে আরেকটি নাম—লোকমান্য তিলকের 'কেশরী' পত্রিকার। ১৯১৩ সালে রাজা হরিশ্চন্দ্রে'র মুক্তির পর 'কেশরী'তে প্রকাশিত হলো দাদাসাহেবের এক সাক্ষাৎকার। সুখ্যাত সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ ও বিশ্লেষণের মাধ্যম 'কেশরী'তে ফিল্ম সম্পর্কে রচনার প্রকাশ আশ্চর্যজনক 'সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওই প্রবন্ধের লেখক ও দাদাসাহেব দুজনেই মনে করতেন ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ একটি স্বদেশী কাজ। তাই বিষয়টির শিরোনামও ছিল স্বদেশী চলচ্চিত্র'।

স্বদেশী কথাটার বহু অর্থের মধ্যে একটি হচ্ছে, ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয়দের জন্য ভারতীয় বিষয়। এখানে একজন ভারতীয় ভারতীয়দের জন্য একটি ভারতীয় ফিল্ম তৈরী করলেন। চলচ্চিত্রের প্রতি এই যে জাতীয়তাবোধ তা কিন্তু আজও সমানে প্রবাহিত। শৈল্পিক গুণের কথা বাদ দিয়ে শুধু ভারতীয় বলেই বহু চিত্রকে এখনও বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

ফেরা যাক গোড়ার কথায়। স্মরণ করা যাক দাদাসাহেবের জীবনকথায়। বরোদার কলাভূষণ ও বোম্বাই-এর জে, জে, স্কুল অব আর্টে ফটোগ্রাফি ও অংকন বিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষালাভের পর তিনিই হলেন কলাভুবন ফটোগ্রাফি স্টুডিওর অধিকর্তা।
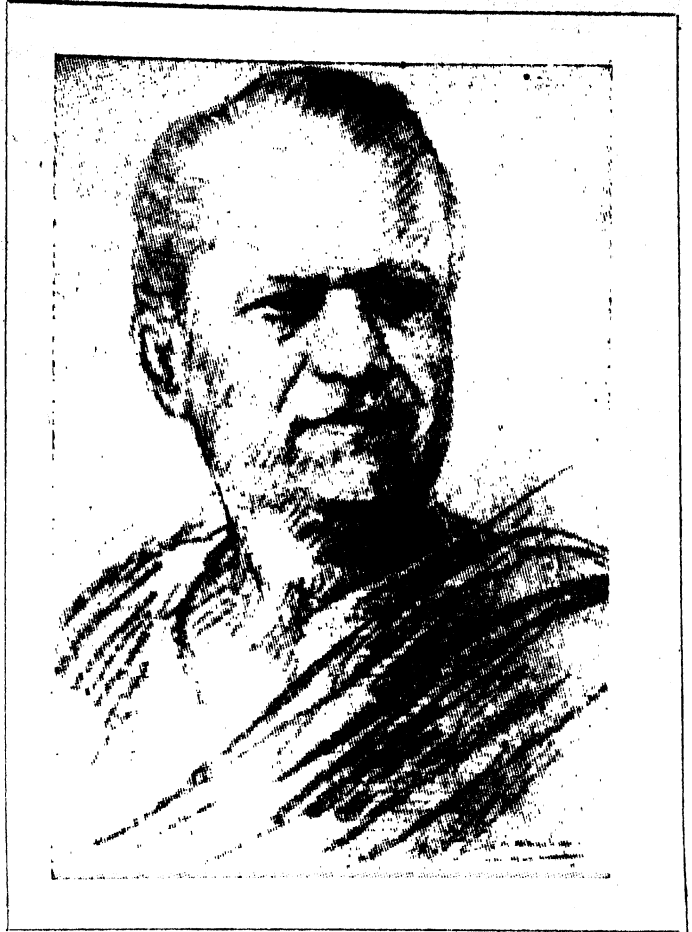
কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের ফটোগ্রাফার এনগ্রেভিং-এ দক্ষ শ্রীফালকে চাকুরী ছেড়ে নামলেন ব্যবসায়। শুরু করলেন বোম্বাইতে লক্ষ্মী আর্ট প্রিণ্টিং প্রেস। কিন্তু কিছুদিন বাদেই অন্য অংশীদারদের সঙ্গে ঘটলো মনান্তর। ছেড়ে দিলেন ব্যবসা। সূচিত হলো ভারতীয় কাহিনীচিত্রের আগমনী পর্ব।

দিনটা ছিল ১৯১৩ সালের কোন এক শনিবার। যন্ত্রণা অস্থির মন নিয়ে দাদাসাহেব ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বোম্বাই-এর সমুদ্রবেলায়। হঠাৎ ঢুকে পড়লেন এক সিনেমার তাঁবুতে। সেদিন সেখানে দেখানো হচ্ছিল 'দি লাইফ অব ক্রাইস্ট'। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যান তিনি। মনের পর্দায় দ্রুত ঘটে চিত্রপরিবর্তন। প্রদর্শনী শেষ হলো। অদ্ভুত রোমাঞ্চিত অথচ আত্মমগ্ন অবস্থায় শ্রীফালকে টিকিট কেটে আবার ঢুকে পড়েন পরবর্তী প্রদর্শনী দেখতে।

সেদিন সারারাত তিনি ঘুমতে পারলেন না। স্বাদেশিকতার আলোয় ধোয়া মনে জমাট বেঁধেছে ততক্ষণে এক কঠিন সংকল্প—'তৈরী করতে হবে ভারতীয় চলচ্চিত্র'। পরদিন সকাল থেকেই মেতে উঠলেন ছবি তোলার কাজে। কলাকৌশলের নানাদিক সম্পর্কে আগেই জ্ঞান ছিল। অভিনয় আর নাট্যপরিচালনাও করেছেন। তাই ভরসার অভাব হলো না এতটুকু। অথচ চারিদিকে শুধু তখন অজস্র অসুবিধা। যন্ত্রপাতি নেই—নেই সুযোগসুবিধা—অর্থ কিংবা সহানুভূতি। এর উপর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সব কিছুকে করে তুলেছে আরো

শোচনীয়। তবু ওরি মধ্যে দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হবে তরী।

তাঁর আর তাঁর পরিবারের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছে ভারতীয় কাহিনীচিত্রের। এর আগে টুকরো টুকরো ছবির কাজ কেউ কেউ শুরু করেছেন। বাংলার হীরালাল সেনও তুলেছেন কিছু চিত্রাংশ। কিন্তু একথা আজ প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন দাদাসাহেব ফালকেই হয়েছেন ভারতীয় কাহিনীচিত্রের জনক।

প্রথম কাহিনীচিত্রের সূচনা সম্পর্কে দাদাসাহেব ১৯১৩ সালে কেশরীতে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমার পূর্বতন জীবিকায় কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় আমি অস্থির হয়ে পড়ি। এ সময় মনকে ভিন্নমুখী করার জন্য আমি অদৃষ্টবাদীরে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দেখতে আরম্ভ করি। চলচ্চিত্রায়ণ কৌশল ফটোগ্রাফির পরবর্তী স্তর। ওদিকে আমিও গত বছর পনের ধরে ফটোগ্রাফির কাজ করে আসছি—কাজেই বিশেষভাবে আমি সিনেমাশিল্পের দিকে আকর্ষিত হই। ভাবতে থাকি ভারতেও এ শিল্প শুরু করা যায় কিনা?

এ শিল্প সম্পর্কে যতগুলি লেখা বা বই সংগ্রহ করতে পারি তাই পড়তে থাকি। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ক্যাটালগও চেয়ে পাঠাই। সব মিলিয়ে শেষে এই সিন্ধান্তে আসি, হাজার পঁচিশ টাকা লগ্নী করলে ভারতেও এ শিল্প চালু করা যায়।'

এই আত্মপ্রত্যয় দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিন্ধান্ত নিলেন বিদেশে যাওয়ার। কিন্তু তার জন্য চাই টাকা। শ্রীফালকে তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের সৌভাগ্য টাকাটা অল্পেই যোগাড় হলো। ফটোগ্রাফির মালপত্রের ডিলার শ্রীনাদকার্নীর দাদাসাহেবের শৈল্পিক বোধের উপর ছিল গভীর আস্থা। তাই তিনি বিলেত যাবার টাকাটা দিলেন ঋণ হিসেবে। ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে এটি চিহ্নিত হয়ে আছে এক সুখদায়ক ঘটনা হিসেবে।

১৯১২ সালে দাদাসাহেব বিলেত গেলেন। সেখানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্রভাবে তাঁর হাতে-কলমেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হতে থাকে। সে সময় সিনেমার যন্ত্রপাতি বিক্রেতারা ওইসব যন্ত্র কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে ক্রেতাদের কাছে মহড়া দিতেন। এক এক যন্ত্রের বিভিন্ন মডেল ছিল এবং প্রত্যেক প্রস্তুতকারক সংস্থা বা ডিলারই তাঁদের মডেলই শ্রেষ্ঠ বলে বোঝাতে চাইতেন। তাই প্রচুর সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হলেও তাঁরা এসব মেশিন চালিয়ে দেখাতে এতটুকু ইতস্তত করতেন না।

এইভাবে জ্ঞান সঞ্চয় করা ছাড়াও তিনি বৃটেনের এক বিখ্যাত সিনেমা পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর নিজের ভাষায় 'চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক বায়োস্কোপ'-এর সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে আমি তাঁর কাছে সিনেমার যন্ত্রপাতি সম্পর্কে উপদেশ চাই। এ শিল্প সম্পর্কে এতটা জ্ঞান আমি শুধু বই পড়ে সংগ্রহ করেছি শুনে তিনি অবাক হয়ে যান। আমি নিরামিশাষী, কোনরকম পান বা ধূমসেবন করি না শুনে আমার প্রতি তাঁর কিছুটা শ্রদ্ধাও জন্মাল। এর পর আমার চলচ্চিত্র নির্মাণের সংকল্পের কথা জানাতে তিনি বলেন, আমি এক অনিশ্চিত অ্যাডভেঞ্চার করতে চলেছি। যেমন অন্যান্য জিনিস ছাড়াও ভারতীয় আবহাওয়াও এ শিল্পের পক্ষে অনুকূল নয় বলে তিনি মনে করেন।

আমি তাঁকে সম্ভাব্য অসুবিধা ও তা প্রতিকারের কথা জানালাম। সব শুনে তিনি বেশ খুশীই হলেন। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন থেকে ৩০।৩৫ মাইল দূরে হেপওয়ার্থ সিনেমা কোং'র ম্যানেজারকে ফোন করে তিনি ফিল্ম ফ্যাকটরীটি বিস্তারিতভাবে দেখার ব্যবস্থা করলেন।...কো'র ম্যানেজার আমাকে রেল স্টেশনে নিতে এলেন। তিনি শুধু আমাকে সব কিছু দেখালেনই না, আমার জন্য সেটে শ্যুটিং-এর বিশেষ মহলার ব্যবস্থা পর্যন্ত করলেন।

অর্জিত জ্ঞান নিয়ে দাদাসাহেব দেশে ফিরে এলেন। শ' দুয়েক ফুটের মত ছবি তুলে অর্থলগ্নীকারকদের দেখালেন। টাকা যোগাড় হলো। কিন্তু বন্ধক রাখতে হলো স্ত্রীর গহনা নিজের ইনসিওর পলিসি ইত্যাদি সব কিছু।

দাদাসাহেব ফালকে কাজের জন্য নাসিককে পছন্দ করলেও অন্য কারণে দাদার মেন রোডে তাঁর স্টুডিও স্থাপন করলেন। ১৯১২ সালের শেষে তিনি শুরু করলেন 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'র কাজ। এবার যেন তিনি সব্যসাচী। একাই অভিনয় শেখাচ্ছেন, ক্যামেরার হাতল ঘোরাচ্ছেন আবার আলো, সেট প্রত্যেকটি জিনিস নিজেই ঠিক করছেন। দারুন পরিশ্রম করে ছ' মাসে ছবিটির কাজ শেষ হলো। সেকালীন রেওয়াজ অনুযায়ী এতে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করেন ছেলেরাই। ১৯১৩ সালের ৮ মে বোম্বাই-এর করনেশন সিনেমায় ছবিটি মুক্তি পেলো। সম্ভবত ছবিটির প্রাক মুক্তি প্রদর্শনী হয় বোম্বাই-এর অলিম্পিক থিয়েটারে ২১ এপ্রিল।

ছবিটি বোম্বাইতে দু মাস প্রদর্শিত হবার পর সুরাট ও পুণার বালিওয়ালা থিয়েটারে দেখান হয়। এখান থেকে এটি আসে কলম্বো, রেঙ্গুন ও কলকাতায়, এবং সব জায়গায়ই এটি জনসমর্থন আদায় করে।

'রাজা হরিশ্চন্দ্র'র পর তিনি তোলেন 'মোহিনী ভস্মাসুর' ও 'সাবিত্রী সত্যবান'। এ ছবিগুলিও লণ্ডনে প্রদর্শিত হয়। ফালকের কারিগরিক কুশলতাতেই তারা শুধু মুগ্ধ হননি। সেখানে তাঁর চিত্রের অর্ডার পর্যন্ত দেওয়া হয় এবং লণ্ডনে চিত্র নির্মাণের জন্যও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এবং শুধু লণ্ডন নয় আমেরিকা আফ্রিকাতেও তাঁর ছবি দেখানো হয়।

চার বছর পর্যন্ত ভারতের একমাত্র চিত্র-প্রযোজক ফালকে জনচিত্তের চাহিদা বুঝতে পেরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বক্স অফিস হিট ছবির ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন তাঁর 'লঙ্কাদহন' ও 'কালীয় মর্দন' ছবি দিয়ে।

কথিত আছে বোম্বাই-এ 'কালীয় মর্দন' ছবিতে এত ভীড় হতো যে, এটি পুরনো ওয়েস্টএণ্ড সিনেমায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একনাগাড়ে প্রদর্শিত হতো এবং কোন একটি কেন্দ্র থেকে টাকা বলদগাড়ীতে করে বয়ে নিয়ে যেতে হয়।

দাদাসাহেবের প্রথম দিকের ছবিগুলি 'ফালকেস ফিল্ম' নামেই পরিচিত। বছর ছয়েক বাদে তিনি একটি কোম্পানী নির্মাণ করেন হিন্দুস্থান ফিল্ম কোং নামে। এখানে বছরে প্রায় ১২।১৪টি ছবি তৈরী হতো। ছবির মানের চেয়ে সংখ্যার দিকে জোর দেওয়ায় এ সময় ফালকে আশংকা প্রকাশ করেন যে, 'এভাবে চললে এ শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে।'

যাই হোক হিন্দুস্থান ও ভারত ফিল্মের অংশীদার ও কারিগরী উপদেষ্টা ফালকের এ প্রতিষ্ঠান নির্বাকযুগে বহু সফল ছবি তৈরী করে।

দাদাসাহেব সম্পর্কে আরেকটি কথা তিনি শুধু কাহিনীচিত্রই নয় বহু শিক্ষামূলক বিজ্ঞানভিত্তিক বা তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, স্টপ মোশন ক্যামেরায় তোলা 'গ্রোথ অব এ পী প্ল্যান্ট', 'গেম অব ম্যাচ স্টিকস' ইত্যাদি। কীভাবে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় সে সম্পর্কেও তাঁর একটি ছবি আছে। তাঁর 'পাঁথাচে পানজে'তে হাস্যরস, 'সিমহস্তা' বা 'প্লাসওয়ার্ক অ্যাট তেলেগাঁও' ছবিতে তথ্যচিত্রের উৎকৃষ্ট গুণের সমাবেশ ঘটে। এসব বিভিন্ন ছবিতে তিনি যেসব ট্রিকশট ব্যবহার করতেন তা আজ রূপকথার বিষয়।

শতাধিক চিত্রের নির্মাতা ফালকের বহু ছবিই হিট করে। এর কারণ তিনি সংখ্যার চেয়ে ছবির গুণগত মানের উপরই বেশী জোর দিতেন।

মূলত সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনীকেই চলচ্চিত্রে প্রকাশ করলে অন্যান্য বিষয় নিয়েও তিনি যে ছবি তুলতেন একথা আগেই বলা হয়েছে। মোটামুটিভাবে সেগুলির এক তালিকা দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

(১) সামাজিক—কন্যা বিক্রয় (শারদা)—
(১৯২৩): সাত্তাতি মাস্টার (জেলাস কাউওয়াইফ) (১৯৩০)
টাঁকাশেঠ (১৯২৯)

ফটো ঃ সুভাষ সরকার

(২) **ঐতিহাসিক**—শিবাজী'স এসকেপস ফ্রম মোগল ফোর্ট অ্যাট আগ্রা—(১৯২৪); বাবাজী নিম্বলকর—(১৯২৬)

(৩) **জীবনী**—বুদ্ধদেব (১৯২২) গোরাকুম্ভর (১৯২৩)

(৪) **তথ্য ও শিক্ষামূলক**—গ্রোথ অব এ পী প্ল্যান্ট (১৯১২)
টেলিগ্রাম— ?
গ্লাস ফ্যাকটরী— ?
ভেরুলাচি লেনি (ইলোরা কেভস) ?
লক্ষ্মীচা গালিচা ?

আজকের ভারতীয় কাহিনীচিত্রের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণেই তিনি স্মরণীয়। ফালকের জনৈক গুণগ্রাহীর কথার অনুকরণে বলতে হয়, ফালকের অধ্যবসায় ও স্থিরপ্রতিজ্ঞা ভারতে এ শিল্পের স্থায়ী ভিত্তি রচনা করে এবং শত শত শ্রমিক-শিল্পীকে নতুন জীবিকারও সন্ধান দেয়।

তিনি বলতেন, চলচ্চিত্র প্রমোদের মাধ্যম সন্দেহ নেই তবে এর মধ্য দিয়ে অদ্ভুতভাবে জ্ঞানেরও প্রসার ঘটে। এবং সে যুগে বসেও তিনি বলেছিলেন, সিনেমাশিল্প শেখার জন্য ফিল্ম ইন্সস্টিটিউট জাতীয় একটি সংস্থা স্থাপন করা উচিত।

দাদাসাহেবের বিভিন্ন লেখায় তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু প্রতিভাত হয়েছে। সৌভাগ্যবশত সে সব লেখার অনুবাদ হয়েছে এবং তা রক্ষিত হয়েছে ভবিষ্যতের জন্য। এগুলো হচ্ছে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য বক্তৃতা ও 'রঙ্গভূমি' নামে একটি দীর্ঘ নাটক যাতে পরোক্ষভাবে নিজের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করেছেন।

ভারতীয় কাহিনীচিত্রের জনক দাদাসাহেব ফালকের দূরদর্শিতা আভাসিত হয় ১৯২৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী 'সিনেমাটোগ্রাফ এনকোয়ারি কমিটিতে' (১৯২৭ সালে নিযুক্ত) প্রদত্ত মৌখিক সাক্ষ্যে। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন দেওয়ান বাহাদুর টি, রঙ্গচারী। সাক্ষ্যদানকালে ফালকে প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রযোজনার মান উন্নয়ন, প্রযোজকদের সমস্যা, মানের দিকে নজর না দিয়ে অযথা খরচের প্রবণতা, সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি আরো বলেন, চলচ্চিত্র বিজ্ঞাপনের পোস্টারে চুম্বন বা আলিঙ্গনের ছবি না দেওয়াই ভালো। দরকার পড়লে ওটা সেন্সারও করা যেতে পারে।

তাঁর ধারণা চুম্বনের ব্যবহার ছাড়াও অন্য দৃশ্যের মাধ্যমে ছবিকে জনপ্রিয় করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে চলচ্চিত্রে চুম্বনের বিরোধী না হলেও তিনি বলেন, চুম্বনের ব্যবহার শিশু ও উঠতি তরুণ-তরুণীদের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করবে।

সেদিন চলচ্চিত্রের যেসব সমস্যার দিকে তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করেন, আজ কিন্তু তার সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি।

এই বিশিষ্ট প্রতিভাধর শিল্পী সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনে হয়, এহেন ব্যক্তিকেও শেষ জীবনটা নিদারুণ কষ্টের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়। জীবিকার প্রয়োজনে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক ফালকেকেও এ শিল্প ছেড়ে অন্য ব্যবসায় নামতে হয়।

বি-এফ-জে-এ আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় সংস্থা সভ্যদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ

বি এফ জে এ কর্তৃক

## শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সম্বর্ধিত

সাংবাদিকতায় পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে অমৃতবাজার পত্রিকা ও অমৃত সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন হিন্দুস্থান ইণ্টারন্যাশনাল হোটেলে সম্বর্ধিত করেন। শ্রীঘোষ বি এফ জে এ'র প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমানে তিনি এই সংস্থার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বি এফ জে এ সভাপতি শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বি এফ জে এ'কে গৌরবের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার শ্রীঘোষের ভূমিকা ছিল মুখ্য। শ্রীভঞ্জ বলেন, সরকারী উচ্চ মহলে চিত্র সমালোচকদের স্বীকৃতি আদায়ে তাঁর ভূমিকা সকলে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখবে। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন, 'আপনাদের ভালবাসায় আমি অভিভূত।' তিনি বলেন, বি এফ জে এ'র প্রয়োজনে তিনি যথাসাধ্য করবেন। শ্রীঘোষ ছবি দেখতে ভালবাসেন। প্রমোদকর আদায়ের বর্তমান প্রথা বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে জেনে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শ্রীঘোষ বলেন, পঃ বঙ্গের সংবাদ-পত্রে চলচ্চিত্রের পাতার উন্নতি হয়েছে। এই পাতায় চলচ্চিত্র বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশের বিষয়ে চলচ্চিত্র-সমালোচকদের গুরুত্ব দেওয়ার কথা তিনি বলেন। পরিশেষে তিনি তাঁর জীবনের কয়েকটি মজার ঘটনা শোনান। স্বাগত ভাষণ দেন বি এফ জে এ সম্পাদক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

**'লোকায়ন'-এর নাট্যোৎসব :** লোকায়ন সংস্থা আগামী ১৮ই জানুয়ারি থেকে ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন অবন মহলে। প্রথম দিনে অরুণ রায়ের পরি-চালনায় অভিনীত হবে মোহিত চট্টো-পাধ্যায়ের দ্বীপের রাজা ও দ্বিতীয় দিন ওই একই নাট্যকারের গন্ধরাজের হাততালি। তৃতীয় দিন পরিবেশিত হবে রবীন্দ্রনাথের শ্যামা। সঙ্গীতাংশে থাকছেন সুমিত্রা সেন, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখার্জী ও রাখাল রক্ষিত। নৃত্যে শান্তি নাগ, নরেশকুমার ও আরতি মজুমদার।

---

# প্রেক্ষাগৃহ

## পরলোকে জাদু সম্রাট

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই সংবাদ এল বুধবার, ৬ জানুয়ারী সকালে উত্তর জাপানের হোক্কাইডোর আসাহিকাওয়া শহরের একটি হোটেলে বিশ্ববিশ্রুত জাদু-সম্রাট পি, সি, সরকার (প্রতুলচন্দ্র সরকার) চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন।

প্রকাশ, ডাক্তাররা বলেছেন, শ্রীসরকার বেশ কয়েক বছর ধরে উচ্চ রক্তচাপ রোগে ভুগছিলেন; সেই কারণেই তিনি জাপানের হিমাঙ্কের শৈত্য সহ্য করতে পারেননি। স্নায়ুজনিত অবসাদও তাঁর শরীরের অবস্থাকে খারাপ করে তুলেছিল।

২৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত ২০০টি প্রদর্শনী করবার জন্যে শ্রীসরকার হোমা এণ্টারপ্রাইজ লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ষোলজন সদস্যবিশিষ্ট একটি দল নিয়ে জাপানে গিয়েছিলেন। সাতটি মাত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবার পরেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন।

বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম জাদুকর পি, সি, সরকার ময়মনসিংহ জেলার (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) টাঙ্গাইল মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৩৩ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে অঙ্কে অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হবার আগেই তিনি পেশাদারী জাদুকর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এই আত্মপ্রকাশের ঘটনাটি আমাদের চোখের সামনে আজও ভাসছে। সাল-তারিখ মনে নেই; বোধকরি ১৯৩০ দশকের গোড়ার দিক। কলকাতার সুরেন ব্যানার্জি রোডের ওয়াই, ডাবলু, সিএ গৃহের দ্বিতলের হলঘরটি বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের দ্বারা পূর্ণ। অনুষ্ঠানসূচীতে আছে নৃত্য ও ম্যাজিক। নৃত্য প্রদর্শন করলেন ইকনমিক জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী অক্ষয় নন্দী মহাশয়ের কন্যা কুমারী অমলা নন্দী, যিনি আজ উদয়শঙ্করের সহধর্মিণী, বিশ্ববিখ্যাতা অমলাশঙ্কর। তাঁর সেদিনের লীলায়িত ভঙ্গীতে 'গঙ্গাস্নান' নৃত্যটি আজও আমাদের স্মরণ আছে। ম্যাজিক যিনি দেখালেন, তিনি কিছুটা তোৎলা, হয়ত নার্ভাস বলে তোৎলামোটা বেশী; কিন্তু খেলা যা দেখালেন, তা চমৎকার, রীতিমত বিস্ময়কর। এই অনুষ্ঠানের যিনি ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই বিখ্যাত ইম্প্রে-

পি সি সরকার

সারিও, পরলোকগত হরেন ঘোষের মুখে ম্যাজিসিয়ান যুবকের নাম শুনেছিলুম— প্রতুলচন্দ্র সরকার। ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলুম, এই দুজনেই বড়ো হবে, অবশ্য ছেলেটি যদি তার তোৎলামো কাটিয়ে উঠতে পারে। আপ্রাণ চেষ্টায় বাচনের এই অক্ষমতাকে দূর করে সেদিনের প্রতুলচন্দ্র পরে হয়ে উঠেছিলেন জাদু-সম্রাট পি, সি, সরকার। ১৯৩৪ সালেই তিনি বর্মা, শ্যাম, সিঙ্গাপুর ও চীনে গিয়েছিলেন তাঁর জাদুবিদ্যা দেখাতে। জাপানে তিনি প্রথম যান ১৯৩৭ সালে। সেই থেকে আরম্ভ করে প্রায় প্রতি বছরই তিনি ভারতের সীমা অতিক্রম করে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তাঁর 'ইন্দ্রজাল''-দল নিয়ে পরিভ্রমণ করেছেন এবং গর্বের কথা, প্রতি দেশেই জাদুবিদ্যায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তিনিই একমাত্র জাদুকর, যাঁকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দু' দুবার 'স্ফিংক্স' স্বর্ণ পদক পুরস্কার দ্বারা ভূষিত করেছে। জার্মানী তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাদুকর বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৬২ সালে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। জাদু-সম্রাটের 'ভারতের জল' (ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া), মনুষ্যদেহকে শায়িত অবস্থায় শূন্যে রেখে মাধ্যাকর্ষণকে অস্বীকার করা, বন্ধচক্ষু অবস্থায় নানা ভাষার লেখা পাঠ, হস্তপদ-বন্ধ অবস্থায় তালা-লাগানো সিন্দুক থেকে নিজেকে অদৃশ্য করা, টেবিলের ওপর শায়িত নারীদেহকে মোটরচালিত করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডকরণ ইত্যাদি ভুরি ভুরি তাক-লাগানো ভোজবিদ্যা অনুষ্ঠান শিশু-যুবক-বৃদ্ধকে সমভাবে সম্মোহিত রেখেছে। সেই রাজোচিত মুকুটধারী ঝলমলে পোশাক-পরা মানুষটির সামনে আমরা বারংবার বোকা বনেছি এবং যত বেশী বোকা বনেছি, তত বেশী করে ভালোবেসেছি। ইংরাজীতে জাদুকরকে বলে SORCERER ; এরই সঙ্গে কিছু মিল রেখে কি তিনি তাঁর পদবীর ইংরেজী বানান লিখতেন SOR-CAR, কে জানে?

জাপান তাঁর প্রিয় লীলাভূমি ছিল; বহুবার তিনি জাপান থেকে আমাদের চিঠি লিখেছেন, ছবি পাঠিয়েছেন। এবারেও জাপান থেকে বার্তা পেলুম—নিদারুণ বার্তা—তিনি আর নেই। তাঁর শোকার্ত স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়েকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমাদের নেই। আমরাও তাঁদের মতোই আত্মীয় বিয়োগ ব্যথায় শোকার্ত।

# চিত্র-সমালোচনা

**আমার নাম জনি নয়**

সত্যই, ত্রিমূর্তি ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড নির্মিত ইস্টম্যানকালারে তোলা ছবি "জনি মেরা নাম"-এর নায়কের নাম আদপেই জনি নয়, যদিও সে নিজেকে 'জনি' বলে জাহির করত। তার আসল নাম ছিল—সোহন। যেমন নামের বেলায়, তেমনই কাজের ক্ষেত্রেও। যদিও তাকে প্রথম দেখা গেল হাজত-ঘরের লোহার রেলিং লুকিয়ে লুকিয়ে করাত দিয়ে কাটতে, আসলে কিন্তু সে একজন গোয়েন্দা বিভাগীয় পুলিশ ইন্‌সপেক্টার। কিন্তু পুলিশ ইন্সপেক্টার সোহন জনি নাম নিয়ে যে-ভাবে আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারীদের দলে মিশেছে এবং যে-সব অসমসাহসিক কাণ্ড করেছে, তা' মাত্র বোম্বাই শহরে তৈরী ছবির কাহিনীতেই সম্ভব। বাস্তব জগতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ধুরন্ধর গোয়েন্দারাও এই সব কাণ্ড-কারখানা দেখে তাজ্জব বনে যাবেন, এমনই অবিশ্বাস্য সে-সব কার্য-কলাপ। সোহন ওরফে জনিকে কখনও দেখা যায়, পুলিশ কমিশনারের ঘরে, আবার কখনও চোরাকারবারীর খাস কামরায়—বায়ুর মতো সে অবাধ গতি। সে কেন যে কোথায় যাচ্ছে, তাও বোঝা দুষ্কর। কখনও সে চোরাকারবারীর দলভুক্ত সুন্দরী রেখার প্রেমের ঢেউয়ে আছড়ে পড়ছে, কখনও আবার তার নিখোঁজ ভাই মোহনের সন্ধানে ব্যস্ত, আবার কখনও প্রধান চোরা-কারবারী রায় ভূপেন্দ্র সিং ব'লে পরিচিত লোকটির প্রকৃত পরিচয় জানতে ব্যস্ত।—সত্যি কথা বলতে কি, এমন অবাস্তব জগা-খিচুড়ী কাহিনী সাম্প্রতিককালের মধ্যে দেখেছি ব'লে মনে করতে পারছি না।

কিন্তু হিন্দী ছবির সাধারণ দর্শকরা হয়ত' ততটা কাহিনীর বাস্তবতা-অবাস্তবতা নিয়ে মাথা ঘামায় না, যতটা তারা চায় যে-কোনো রকমে আনন্দে ডগমগ হতে। 'জনি মেরা নাম' দেখে তারা যে তা হয়েছে বেশ প্রচুরভাবেই, তা' প্রেক্ষাগৃহে তাদের নানাভাবে মুখর প্রতিক্রিয়া দেখে ও শুনে বুঝতে কষ্ট হয় না। সোহন ওরফে জনিরূপী দেবআনন্দ যে তাদের প্রত্যাশাকে আনন্দে দান করেছেন, তাও প্রমাণ দিয়েছেন। 'মার-দুরা কাম কর্‌তা হয়, লেকিন ইমান কি সাথ'-গোছের সংলাপ শ্রীআনন্দের মুখ থেকে বেরোবা মাত্র সাধারণ দর্শকরা যেন লুফে নিয়েছেন। 'জুয়েল থীফ' থেকে 'জনি মেরা নাম'—খুব দীর্ঘ পথ নয় দেবআনন্দের পক্ষে। মনে হয়, দেবআনন্দ আসলে ভালো, অথচ দেখতে দুর্বৃত্ত-চরিত্র চিত্রিত করতে ভালোবাসেন। তা' বাসুন, ক্ষতি নেই, কিন্তু এই ধরণের চরিত্রাভিনয় দেখে জনসাধারণের মধ্যে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, তা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। হেমা মালিনী সুন্দরী; নাচে, গানে, অভিনয়ে তিনি দর্শকমন জয়ের ক্ষমতা রাখেন এবং আলোচ্য চিত্রের নায়িকা রেখার ভূমিকাতেও তিনি তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রচণ্ড শক্তিশালী আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী রণজিৎ সিংয়ের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছেন বহু দিনের অদর্শনের পর প্রেমনাথ। এই ভূমিকাতে তিনি তাঁর যে-ম্যাটিনেপালের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন, এ-কথা অনস্বীকার্য। অপরাপর ভূমিকায় পদ্মা (তারা), জীবন (চোরাকারবারীর দক্ষিণ হস্ত) প্রাণ (মোহন ওরফে শ্যাতি), সজ্জন (রায় ভূপেন্দ্র সিং) এবং আই এস জোহর (তিনটি বিভিন্ন চরিত্রে) চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। কল্যাণজী-আনন্দজী সুর যোজনা করেছেন জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে। [illegible] উপভোগ্য হয়েছে। বিশেষ করে কিশোরকুমারের গীত "নফরত করনে বালোঁসে সীনোঁমে প্যার ভর দু" ও 'পলভরকে লিয়ে কোই

আটাত্তর দিন পরে/জয়া ভাদুড়ী

হয়ে প্যার কর লে" গান দুখানিকে তো এখনই লোকের মুখে মুখে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

'ত্রিমূর্তি' ফিল্মস লিমিটেড কৃত "জান মেরা নাম" কাহিনীগত অবাস্তবতা সত্ত্বেও জনপ্রিয়তালাভে সমর্থ হবে নিঃসংশয়ে।

—নান্দীকর

# স্টুডিও থেকে

স্টুডিওর ধর্মঘটের জনাই বিশ্বজিৎ তাঁর বাংলা ছবি 'জীবন প্রভাতে'র কাজ টেকনিসিয়ানে করতে পারলেন না। তার পরিবর্তে ইণ্ডিয়ান হরটিকালচারাল সোসাইটিতে দু' দিন কাজ হলো। অংশ নিয়েছিলেন প্রযোজক বিশ্বজিৎ ও নায়িকা সন্ধ্যা রায়। বহুদিন বাদে বিশ্বজিৎবাবু আবার ফিরে এলেন ছবি প্রযোজনার কাজে। 'ছোটো জিজ্ঞাসা'র পর এইপ্রথম বাংলা ছবির কাজ শুরু করলেন বিশ্বজিৎ। আগে 'রক্ততিলক' নামে একখানি হিন্দী ছবি করার কথা হয়েছিল। আপাততঃ সে ছবির কাজ বন্ধ রেখেই আগে বাংলা ছবির কাজ শেষ করতে চান বিশ্বজিৎবাবু। 'জীবন প্রভাত' ছবির পরিচালক হলেন প্রযোজকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অজয় বিশ্বাস। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ত্রীয়ো ফিল্মসের ব্যানারে তোলা এ ছবির ইনডোরের কাজ খুব শিগগির শুরু হবে বলে শুনেছি।

তরুণ মজুমদারের নবতম ছবি 'নিমন্ত্রণের' কাজ প্রায় শেষ পথে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রীমজুমদারের পূর্ববর্তী ছবি 'কুহেলী' এখনও মুক্তি পায় নি। দুটি ছবিরই প্রধান নারী চরিত্রে রূপ দিয়েছেন শ্রীমতী সন্ধ্যা রায়। মুক্তি পায় নি অথচ বহুদিন যাবৎ শেষ হয়ে বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে আছে এমনতরো ছবির সংখ্যা অনেক। 'এখানে পিঞ্জর' মুক্তি পাচ্ছে এক সপ্তাহ বাদে। বিজয় বসুর 'নবরাগ' শেষ হয়ে গেছে প্রায় ছ' মাস আগে, সেন্সরও হয়ে গেছে। তপেশ্বর প্রসাদের 'প্রতিবাদে'রও একই অবস্থা। অরবিন্দবাবুর 'ধনী মেয়ে'র কাজ শেষ। সেন্সর অবশ্য এখনও হয় নি। সুধীর মুখার্জীর 'চৈতালী' তো বহুদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। সলিল সেনের 'অপর্ণা' এখন শেষ হবার পথে। আরও আরও অনেক আছে। এ বছরের মুক্তি তালিকায় ক'টা নাম আসবে কে জানে?

# মঞ্চাভিনয়

শিল্পী যাযাবরের 'প্রমত্ত প্রহসন' ও 'সব হিসেবের বাইরে' : একটি নাটকের সার্থক প্রযোজনা শুধু আঙ্গিকের চমৎকারিত্বের ওপরই নির্ভর করেনা, মঞ্চের আলোয় যথার্থ কাহিনী ও চরিত্রগত সংঘাতের সমাবেশেই সার্থক নাটকীয় গতিবেগ সঞ্চারিত হয় : আর এই অটুট গতিবেগই প্রযোজনার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সত্যের প্রতি সচেতনতা নিবিড় ও সম্পূর্ণ না হয়ে উঠলে কোন গোষ্ঠীর নাট্যপ্রয়াসকে মুক্ত কণ্ঠে অভিনন্দন জানাতে দ্বিধা বোধ হয়। সম্প্রতি 'রঙ্গনায়' শিল্পী যাযাবরের 'প্রমত্ত প্রহসন' ও 'সব হিসাবের বাইরে' নাটক দুটির মঞ্চরূপ দেখতে দেখতে একটা সংশয়ের মধ্যে আবর্তিত হয়েছিল সবটুকু অনুভূতি। সংশয়টা হোল, শুধু আলোকসম্পাত আর মঞ্চসজ্জার কসরতটাকেই কি সার্থক নাটক বলে মেনে নেওয়া যায়?

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রমত্ত প্রহসন'কে 'শিল্পী যাযাবর' বলেছেন 'একটি বহু-বিতর্কিত নাটক'। কিন্তু একটি বিতর্কিত নাটকের নেপথ্যে সম্ভব ও অসম্ভবের সীমারেখার মধ্যে যে গভীরতা লুকিয়ে থাকে, তা আলোচ্য নাটকের সংলাপে সংঘাতে সবসময়ে ছিল কিনা সন্দেহ। বিষয়বস্তুর মধ্যে খুব স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত কিছু না থাকলেও, সংলাপের সরসতায় 'প্রমত্ত প্রহসন' কিছুটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। এ নাটকের প্রযোজনায় নির্দেশক জগন্নাথ বসু আন্তরিকতার পরিচয় চিহ্নিত করতে পেরেছেন, কিন্তু অকারণে শিল্পীদের মঞ্চ ছেড়ে অন্য জোনে গিয়ে অভিনয় করার ব্যাপারটা কিছুতেই সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় বহন করেনা। হঠাৎ 'নটবর' ও 'জাহেদা' কেন 'ব্যালকনি'তে উঠে গেলো? তাছাড়া প্রতিটি আঙ্গিক রচনার পেছনে বক্তব্যের একটা সাজেসান থাকে। 'প্রমত্ত প্রহসনের' আঙ্গিকগত অভিনবত্ব কি সব সময়ে এক একটি বিশেষ বক্তব্যের ব্যঞ্জনাময় রূপ হোতে পেরেছে? এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও শিল্পীদের অভিনয়ের ব্যাপারে আমরা মোটামুটি সংশয়মুক্ত। 'নটবর নরেনে'র ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন নির্দেশক জগন্নাথ বসু; তাঁর বাচনভংগী সত্যিই সুন্দর। কৃষ্ণা চক্রবর্তীর 'জাহেদা জাবেরী' ও দর্শককে মুগ্ধ করেছে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন গৌতম বসু, হীরক মুখোপাধ্যায়, দীপংকর চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাবল্লভ দাস, গৌতম চক্রবর্তী, ভোলানাথ ধর। বক্তব্যের সমর্থন না থাকলেও আলোকসম্পাত মাঝে মাঝে সুন্দর দু' একটি পরিবেশ রচনা করতে পেরেছে।

দ্বিতীয় নাটক কবিতা সিংহের 'সব হিসেরের বাইরে' হাউস সারজেন 'সত্যেন'এর জীবন সমস্যা নিয়ে একটি অসাধারণ সংঘাতসমৃদ্ধ সৃষ্টি হোতে পারতো। কিন্তু এতো দ্রুত ঘটনার সমাবেশের জন্য সামগ্রিকতা রসোত্তীর্ণতায় বিলীন হোতে পারলোনা। নাটকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া উচিত ছিল। এ ব্যাপার অসম্পূর্ণ থাকায় 'সব হিসেবের বাইরে'র 'সত্যেন' 'বাসন্তী' মনে দাগ কাটতে পারলোনা, অথচ ওদের যন্ত্রণায় অসাধারণ কিছু নাট্যমুহূর্ত গড়ে উঠতে পারতো। এ নাটকের অভিনয়ে 'সত্যেন'রূপী জগন্নাথ বসু সব সময়ে প্রত্যাশিত ছবি তুলে ধরতে পারেন নি; কৃষ্ণা চক্রবর্তীর 'বাসন্তী' প্রাণের স্পর্শ পায়নি। স্বাতী লাহিড়ীর 'সরোজিনী' আমাদের হতাশ করেছে। শুধুই

আঙ্গিকের ছাপ এ নাটকেও আছে। তবে মঞ্চসজ্জার মধ্যে গভীরতর শিল্পবোধের ছাপ আছে। শেষে একটি স্বতন্ত্র জোনে বিলাস মেসায়েশ সঙ্গে সত্যেনের ছুটে ... চলার আভাসটাই একমাত্র ...

সাহিত্যে এমন কিছু কিছু ক্লাসিক সৃষ্টি আছে, যা প্রবহমান কালের সঙ্গে চিরকালী রেখে আগামী দিনের উপলব্ধিতেও প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। প্রায় দুহাজার বছর আগে রচিত হলেও শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটক এমনি একটি চিরন্তন সম্পদ। যে বাস্তব দৃষ্টিভংগী ও প্রগতিশীল চিন্তা এর মধ্যে ভাষা পেয়েছে তা যে কোন দেশের নাট্যকার ও নাট্য-প্রযোজককে উদ্বুদ্ধ করবে নিশ্চয়ই। সম্প্রতি 'সংগীত-কলা-মন্দিরে'র শিল্পীরা এই অসাধারণ বাস্তবনিষ্ঠ নাটকটিকে হিন্দী রূপক মঞ্চের আলোয় তুলে ধরে নাট্য-প্রযোজনার ইতিহাসে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'মৃচ্ছকটিকে'র বাংলা নাট্য-রূপ পরিবেশন করে এর আগে লিটল থিয়েটার গ্রুপ ইউনিটের শিল্পীরা নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন কুড়িয়েছিলেন। হিন্দী নাট্যরূপ দিয়েছেন ডাঃ সত্যব্রত সিনহা।

নর্তকী বসন্তসেনা আর দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্তের নিবিড় ও একনিষ্ঠ প্রেম কাহিনীর ওপর বিবর্তিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটি তখনকার দিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক ছবিও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। মদনিকা, শর্বিলক, শকার, মৈত্রেয়ী সব চরিত্রেই কঠোর বাস্তব জীবনের আলো হাওয়া লেগে আছে। এই ধরণের ক্লাসিক নাটককে মঞ্চে পরিবেশন করতে গেলে মঞ্চসজ্জা, আলোক-সম্পাত ও আবহসংগীতের মধ্য দিয়ে যে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় তার পূর্ণাঙ্গ রূপ সঙ্গীত কলা মন্দিরের প্রযোজনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এর জন্য প্রথমেই নির্দেশক শ্রীবদ্রীপ্রসাদ তেওয়ারীকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। শ্রীতেওয়ারীর সূক্ষ্ম শিল্পবোধ মাঝে মাঝে আমাদের সত্যি বিমুগ্ধ করেছে। বসন্ত সেনার একটি নৃত্যের দৃশ্য পরিকল্পনায় তাঁর গভীরতম চিন্তার প্রতিফলন দেখেছি।

অভিনয়ের ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই আন্তরিকতার পরিচয় রেখেছেন। আনন্দস্বরূপ মিত্রের 'চারুদত্ত' হয়েছে শান্ত এবং সংযত ; উষা গাঙ্গুলী 'বসন্ত-সেনা' চরিত্রের গভীরতা স্পর্শ করতে পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর প্রাণময়তা বোধ হয় সব সময় সোচ্চার হয়ে উঠতে পারেনি। 'মদনিকা'র ভূমিকায় আশ্চর্য সুন্দরভাবে সাবলীল অভিনয় করেছেন বীণা মিশ্র। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন শরৎ শেঠ (মৈত্রেয়ী), সুবল ঘোষ (ভিৎ), রাজেন্দ্র শর্মা (শকার), অমর গুপ্ত (শর্বিলক), সুরেশ শর্মা (সম্ভক), রাজকুমার শর্মা (আর্যক), মানিক চৌধুরী (সধনক), কান্তিলাল শ্রীমল (ন্যায়াধীশ)। নেপথ্য থেকে যাঁরা নাটকটির অগ্রসরমানতায় সাহায্য করেন তাঁরা হোলেন সুরেশ দত্ত (মঞ্চসজ্জা), শ্যাম জৈন (পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা), রবি জৈন (সংগীত), আবদুল রেহমান, শ্রীপতি (আবহসংগীত), অজিত মিত্র (আলোকসম্পাত)।

নাবী/পরিচালনা কনক মুখোপাধ্যায়/নায়িকা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। —ফটো : অমৃত

**রবীন্দ্রসদন আয়োজিত একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা :** রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় এই প্রথম পাঁচদিনব্যাপী একাংক নাটকের একটি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হোল। নাট্যানুশীলনের ক্ষেত্রে এই আয়োজন নিশ্চয়ই একটি সম্ভাবনাময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় যে শ্রেষ্ঠ পনেরোটি সংস্থা চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলা থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রযোজিত নাটকগুলোতে আধুনিক নাট্যচর্চার সবটুকু স্বাতন্ত্র্যই ধরা পড়েছে। শহর কলকাতার দর্শকের কাছে মফস্বলের নাট্যসংস্থাগুলোর অনুশীলন নিষ্ঠার ছবি তুলে ধরার যে প্রয়োজন আছে, সেই সত্য থেকেই এই একাংক নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে আন্তরিকভাবে জড়িত বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীদের মধ্যে একটি নিবিড় সহমর্মিতার সেতু-বন্ধন করতে রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ রীতিমত আগ্রহী।

**প্রতিযোগিতার ফলাফল :**

শ্রেষ্ঠ সংস্থা : সেন র‍্যালে অ্যাথেলেটিক ক্লাব—'আমরা কবরে যাব না', শ্রেষ্ঠ নাট্যকার : তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়—'শ্লোগান', রতন কুমার ঘোষ—'পিতামহদের উদ্দেশ্যে', শ্রেষ্ঠ পরিচালক : কৃষ্ণেন্দু কারক—'আমরা কবরে যাব না' (সেন র‍্যালে অ্যাথেলেটিক ক্লাব), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : সুব্রত সান্যাল—'এক যে ছিল রাজা' শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : নীলিমা চক্রবর্তী—'তাহার নামটি রঞ্জনা', (বরানগর মিউনিসিপাল এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব)।

হায়দরাবাদে রবীন্দ্র ভারতী ভবনে গত ১ ডিসেম্বর কবিগুরু [illegible] 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করেন [illegible] অঞ্চলের স্থানীয় বাঙালীরা। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীপ্রসূন গুপ্ত। অভিনয়ে অংশ নেন অমরেশ গাঙ্গুলী, প্রসূন গুপ্ত, সমীর ঘোষ, শিবশংকর ঘোষ, মনীগোপাল দাশগুপ্ত, শম্ভু সিংহ, [illegible] মিত্র, মদন দত্ত, অলোক মণ্ডল, আত্রেয়ী দেব, দীপ্তি মিত্র, উত্তমা দাস, স্বপ্না দাশগুপ্তা, রথীন্দ্র ঘোষ, ঝর্ণা গাঙ্গুলী, সুধা বোস ও পাপিয়া লোমাত্র। সঙ্গীতে ছিলেন অনন্ত গাঙ্গুলী, সংঘমিত্রা দাস, মঞ্জুলা দাস ও ধর্মজিৎ গুপ্তশর্মা। সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনা করেন অমরেশ গাঙ্গুলী, আত্রেয়ী দেব ও উত্তমা দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন ডি, কে, ডাওয়াল ও বি, বি, সেনগুপ্ত।

হুগলী জেলার অন্যতম প্রবীণ নাট্য-সংস্থা মাহেশ **উদয় সংঘ-এর** ১০৭তম অভিনয়রজনী উদ্‌যাপিত হল গত ১৩ ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে। সংঘের শিল্পী-গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করলেন তাঁদের বহু অভি-নীত ও পুরস্কৃত নাটক শ্রীনরেশচন্দ্র চক্র-বর্তী রচিত 'মাকড়শা'। সামগ্রিক সুঅভি-নয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন প্রদ্যোৎশংকর দাশ-গুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং শিবনাথ নাথ।

**লোকায়ন :** আসছে ১৮-২০ জানুয়ারী 'অবন মহলে' তিনদিনব্যাপী একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন লোকায়ন নাট্য সংস্থা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্যামা' এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপের রাজা' ও 'গন্ধরাজের হাততালি' নাটক তিনটি উৎসবে মঞ্চস্থ হবে। পরিচালনা করবেন অরুণ রায় ও শক্তি নাগ (শ্যামা)।

# বিবিধ সংবাদ

নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে 'ব্লো হট, ব্লো কোল্ড' এর রজতজয়ন্তী সপ্তাহ ওয়ার্নার ব্রাদার্সের বহুল আলোচিত এই ইতালীয় ছবিটি এ সপ্তাহে ২৫তম সপ্তাহে পড়লো. ছবিটির জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় আরো কিছুদিন এ ছবি বিদেশী ছবির আসর গরম করে রাখবে। বম্বেতে ছবিটি একই প্রেক্ষাগৃহে ২৩ সপ্তাহের বেশী প্রদর্শিত হয়েছে। এমনকি সুদূর সিংহলেও ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সমস্ত বিদেশী ছবির বক্স অফিস রেকর্ড ভঙ্গ করে দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে কলকাতাতেও 'ক্লিওপেট্রা' এবং 'সাউন্ড অফ মিউজিক' এর পর একই প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘদিন ধরে কোনদিন বিদেশী ছবি প্রদর্শিত হয়নি।

এই মনস্তত্ত্বমূলক ও যৌন-উদ্দীপক প্রণয়কাহিনীর প্রধান ভূমিকায় আছেন ব্রিটেনের রোসমেরী ডেকসটার; ইতালীর গিউলিয়াবো গেম্পা, এবং সুইডেনের বিবি এ্যান্ডারসন ও গুনোর

জীবনজিজ্ঞাসা/পরিচালক পীযূষ বসু এবং উত্তমকুমার

রেজোস্ত্যান্ড প্রভৃতি। ছবিটির পরিচালক ইতালীর মাইকেল আঞ্জেলো আন্তনিওনি এবং ফেডরিকো ফেলিনির সম্প্রদায়ভুক্ত ইতালীয় ছবির 'নব্য বাস্তবতার' অন্যতম সদস্যভুক্ত (ফ্লোরেন্স ভারসিনি)। ছবিটি স্টুডিওর বাইরে ইতালীর সিসিলি দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশে গৃহীত হয়েছে। নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহেও ইতিপূর্বে কোনো বিদেশী ছবি ২৫ সপ্তাহ চলেনি; সুতরাং এটাও বক্স অফিসের রেকর্ডই নয়—প্রেক্ষা-গৃহের প্রদর্শনীর একটি রেকর্ড বলা চলে।

**জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ** (২৪ পরগণা) **ষষ্ঠ বার্ষিক শিক্ষা শিবির** ইছাপুর পার্ক গ্রাউন্ডে ১৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর—চারদিন ধরে বিপুল উদ্যম ও উৎসাহে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন শ্রীব্রজরঞ্জন রায় ও স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীরঞ্জিতকুমার মজুমদার। এই উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে আয়োজিত স্বল্পসঞ্চয় সংস্থার প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘটে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ পোদ্দারের পৌরোহিত্যে। শিক্ষাশিবিরের সার্থক রূপায়ণের জন্য শ্রীরমেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্য বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দেন কার্যকরী সভাপতি শ্রীপ্রভাস-চন্দ্র সিংহ।

চারদিনব্যাপী এই শিক্ষাশিবিরে জেলার বিভিন্ন সংস্থা এবং স্কুলের দু'শ কিশোর-কিশোরী শিক্ষার্থী যোগ দেয়। সামরিক শৃঙ্খলার মধ্যে শিবির-জীবনের চারদিন নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে কিশোর-কিশোরী-দের কাছে দেশ জাতি সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা, মিলেমিশে কাজ করার প্রবণতা, নিয়মশৃঙ্খলা, মন ও শরীর গড়ে তোলার শপথ সানন্দে গ্রহণ করে কিশোর-কিশোরীরা এই শিক্ষাশিবিরে।

বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী-দের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন : সর্বশ্রী ডি কে মনোভেলন, অধ্যাপক সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী দে সরকার, শম্ভুনাথ মল্লিক, ডি বি ঘোষদস্তিদার, সন্তোষ চক্রবর্তী, কার্তিক দাশ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী ভট্টাচার্য, শিবানী দত্ত, নীলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়ন-সিমহন প্রমুখ।

নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপনে 'এইচ-এম-ভি'র' 'হরবোলা' বেতারশিল্পী শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা যে কি বিপুল, বিশেষভাবে তার প্রমাণ পাওয়া গেল গত ২৩ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর লেক স্টেডিয়াম হলে। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর লেক স্টেডিয়াম হলে 'চিলড্রেন্স নভেল থিয়েটার'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে অন্যান্যবারের মতন নেপথ্য থেকে মুখ দিয়ে নানান জন্তুর ডাক ও বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে নাটকীয় আবেগ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের বিস্মিত করেছেন। যে সকল ডাক আর শব্দ কণ্ঠের সাহায্যে প্রকাশ করা অসম্ভব 'হরবোলা গঙ্গোপাধ্যায়' নিষ্ঠা আর পরিশ্রমে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন। 'সোনালী সিং' ও 'নকল রাজা'

বিদেশ কোম্পানি/পরিচালক : চিদানন্দ দাশগুপ্ত এবং অপর্ণা সেন। —ফটো : অমৃত

সামক দুটি মুখোশ নাটকে দৃশ্যের শব্দ দিয়ে আরো আকর্ষণীয় করে তোলেন। সম্প্রতি অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় যে কয়েকটি অনুষ্ঠানে এককভাবে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে তিনি 'পার্ক সার্কাস নিউ গোল্ডেন ক্লাব'-এর আয়োজিত সারারাতব্যাপী এক বিচিত্রানুষ্ঠানে 'কৌতুক হরবোলা' হিসাবে অংশগ্রহণ করে এতো জনপ্রিয়তা লাভ করেন যে সমবেত দর্শকমন্ডলীর অনুরোধে পুনরায় তিনি কয়েকটি হিন্দি ফিচারের মাধ্যমে 'হরবোলার ডাক' পরিবেশন করেন।

**চিলড্রেন্স হাট্ :** গত ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতার কিন্ডার গার্ডেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয় 'চিলড্রেন্স হাট্'এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল। ইউ এস আই এস-এর ইস্টার্ণ ইন্ডিয়ার ডাইরেক্টরের পত্নী শ্রীমতী জোনা কোর্টনী প্রধান অতিথিরূপে এক ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ এই শিক্ষার উদ্যোগ আয়োজনের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব এডুকেশানের সভাপতি শ্রীভূপেশচন্দ্র মুখার্জি অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষানুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে সভাপতি তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে বিশেষ জোর দেন এবং সার্থক পরীক্ষার্থীদের উৎসাহদানে পুরস্কার বিতরণী উৎসব আয়োজন করায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রশংসা করেন। প্রধান অতিথি মিসেস জোনা কোর্টনী পুরস্কার বিতরণ করেন। বহু গণ্যমান্য অতিথিদের উপস্থিতিতে উপসংহারে একটি চমকপ্রদ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রিন্সিপ্যাল মিসেস লীলা মিত্র সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।



**মূকাভিনয় :** সম্প্রতি ড্রইং অফিস রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যরা রঙমহল মঞ্চে আয়োজন করেছিলেন শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর একক মূকাভিনয় ও নাটক 'সেমসাইড'। এ দিন শিল্পী শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী পরিবেশিত মূকাভিনয়ের মধ্যে সর্বআকর্ষণীয় ছিল 'অফিসযাত্রী'। বর্তমান নিচের তলার কর্মচারীদের জীবনের সমস্যার এক কৌতুক-দীপ্ত এবং চিত্তগ্রাহী রূপ প্রকাশিত হয়েছে এই ফিচারে। এছাড়া 'ফটোগ্রাফার' ফিচারটিও আকর্ষণীয়।

**দক্ষিণী :** আগামী ২৪ জানুয়ারী, রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় 'কলা-মন্দিরে' 'দক্ষিণী'র বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে। অনুষ্ঠানে দক্ষিণীর শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করবেন।

**মূকাভিনয় :** সম্প্রতি মূকাভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু মঞ্চে মূকাভিনয় পরিবেশন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। স্ত্রী-লোকের চলাফেরা ও প্রসাধনের অদ্ভুত অনুকরণ সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। জনৈক ফটোগ্রাফারের আচরণ বিধি অনুকরণও উল্লেখযোগ্য। 'অফিস যাত্রী', 'নটিবর', 'সেলুন' ইত্যাদি ফিচারগুলি খুব ভাল হয়েছে। সম্প্রতি রঙমহল মঞ্চে অনুষ্ঠিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পী শ্যামলেন্দুর মূকাভিনয় প্রত্যেকটি দর্শককে প্রচুর আনন্দ দান করে।

**মা-কালী ব্যায়াম সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব :** বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মা-কালী ব্যায়াম সমিতি পাঁচদিন ধরে তাদের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব পালন করলেন। নিলমণি মল্লিক লেনে সমিতির নিজস্ব স্কুল প্রাঙ্গণে ১৮ ডিসেম্বর প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী রমা চৌধুরী, প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলাশাসক শ্রীদীপক রুদ্র। শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্যের ভক্তিগীতির পর শ্রীমন্মথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় —'শিল্পী-সম্মিলনী' অভিনয় করেন শ্রীকিরণ মৈত্রের 'ধারোঘন্টা'। আয়রণম্যান নীলমণি দাস ও নীরোদ সরকারের পরিচালনায় সমিতির সভ্যরা শারীরিক কলা-কৌশল প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় দিন সারারাত্রীব্যাপী বিচিত্রা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়। মান্না দে, রবি ঘোষ, বনশ্রী সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা যোগ দেন। তৃতীয় দিন শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়-এর ভক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের পর এম জি এন্টারপ্রাইজ অভিনয় করেন 'ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' এবং উৎসবের শেষদিন হাওড়া উৎসাহী সঙ্ঘের শিল্পীরা মিলে 'রক্তে রাঙা মাটি' যাত্রাভিনয় করেন।

ন্যাশনাল কোম্পানী স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত 'উস্ রাতকে বাদ' নাটকে নিমু ভৌমিক ও অলকা সিন্হা।

মল্লারের অনুষ্ঠান/একটি দৃশ্য

# জলসা

**বাণীচক্রর 'আম্রপালী' :** রবীন্দ্রসদনে সম্প্রতি নিবেদিত বাণীচক্র প্রযোজিত 'আম্রপালী' এক উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আম্রপালীর যৌবনসমৃদ্ধ রূপ, এই রূপের কারণে তার জীবনের ট্র্যাজেডী এবং অবশেষে বুদ্ধচরণে আত্মনিবেদন করে সকল জ্বালার পরিসমাপ্তিরই এক সুন্দর রূপ বুদ্ধযুগের আম্রপালী। নৃত্যে ও সঙ্গীতে এই কাহিনীর সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন বাণীচক্রের শিল্পীরা।

শক্তি নাগের নৃত্য পরিচালনা স্বমানে প্রতিষ্ঠিত তবে কোনো কোনো অংশে যেমন পুতুলরূপী শিশু আম্রপালীকে কোলে নিয়ে দর্শকদের দৃষ্টির গোচরে আনা) স্থূল রুচির পরিচয়। এই বক্তব্যকে নৃত্যভঙ্গী ও মুদ্রা দ্বারা আরো শিল্পব্যঞ্জক আভাষিত করা যেত। অনল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীতপরিচালনা প্রশংসনীয়। নৃত্য ও অভিনয়ে প্রথমেই উল্লেখ্য হলেন মারাত মজুমদার (আম্রপালী), নরেশকুমার (বিম্বিসার), গণেশ সিংহ (বৈশালীরাজ)। এরা ছাড়াও শম্ভু ভট্টাচার্য (বেতালভট্ট) শক্তি নাগ (মালী) দেবাদন মুখোপাধ্যায় (গৌতম বুদ্ধ), তপতী ঘোষাল অভিনীত চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেছেন। নেপথ্যসঙ্গীতে মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র গীত গানগুলি দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য কণ্ঠ ললিতা ধরচৌধুরী। দীনেশ চন্দ্রর আবহসঙ্গীত যথাযথ। দিলীপ ঘোষের ভাষ্যপাঠ, বিমল মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার ঘোষ ও নিমাই দে'র রূপসজ্জা, সুনীল দাস ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ সামগ্রিক সাফল্যের সহায়ক।

**সুর সপ্তয়নের 'কচ ও দেবযানী' :** কবিগুরুর 'বিদায় অভিশাপ' অবলম্বনে মিহির সেন নাট্যকায়িত 'কচ ও দেবযানী' সুরসপ্তয়নের এক সুপরিচিত প্রযোজনা। এর আগেও রবীন্দ্রসদনে এই নৃত্যনাট্য দেখেছি। কিন্তু এবারের পরিবেশনা আরো পরিশীলিত এবং সেই কারণেই অধিকতর চিত্তগ্রাহী।

নৃত্যনাট্য সুরু শিক্ষা সমাপনান্তে কচের স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের প্রাক-মুহূর্তে দেবযানীর কাছে বিদায়গ্রহণ লগ্ন দিয়ে। তারপর বিয়োগকাতরা দেবযানীর বিলম্বিত অতীতাচারণ তথা ফ্লাশব্যাকে কচ ও দেবযানীর পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা ও প্রণয়ের বিচিত্র আবেগের প্রকাশ নৃত্য গান ও অভিনয়ে মূর্ত হয়েছে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনা ভঙ্গীতেই পরিণত শিল্পকৃতির পরিচয় ছিল আর এ পরিচয়কে সার্থক করেছে সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীর সমবেত প্রয়াস।

কচের ভূমিকায় নরেশকুমারের রূপাভিনয় হার্দ্য ও যথাযথ, তবে চরিত্রটিতে আরও একটু ব্যক্তিত্ব আরোপ করা উচিত ছিল। কথাকলি ও মণিপুরের আঙ্গিকনৈপুণ্য উচ্চমানের। দেবযানী চরিত্রকে চিত্তস্পর্শী করে তোলার আন্তরিকতায় কোনো কার্পণ্য রাখেন নি পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়। তবে উল্লাসমুখর মুহূর্তের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হয়েছে তার করুণ মুহূর্তের অভিব্যক্তি। ভাস্কর বসুর সুনির্বাচিত গানগুলি নৃত্যনাট্যের শিল্পসৌন্দর্য পরিস্ফুটন ঘটিয়েছে। বিশেষভাবে প্রশংসার দাবীদার বাণী ঠাকুর। তাঁর পরিবেশনার ক্রমোন্নতি রবীন্দ্র সদনের 'প্রাঙ্গণ সন্ধ্যা'য় আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে কিন্তু এবারে তাঁর গাওয়া গানগুলিতে (তবু মনে রেখ, 'নারে নারে ভয় করব না', 'দীপ নিভে গেছে', 'ওলো সই, না যেওনা) রয়েছে পরিণত শিল্পবোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। গোরা সর্বাধিকারী 'তুমি যে সুরের আগুন' গানটি যথাযোগ্য ভাবের অনুরণন সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র দুটি গানেই ('তুমি যেও না', 'বড় আশা') কারুকার্যসমৃদ্ধ কণ্ঠের অনুপমেয় মাধুর্য বিস্তার করেন। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়-গীত 'ভালবেসে সখী' ও 'হে নিরুপমা' আপন ভংগীতে চিত্তজয়ী। দেবব্রত বিশ্বাসের 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়' ও 'তুমি রবে নীরবে' ধ্রুপদী গাম্ভীর্যে নাটকের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। নৃত্য ও সংগীত পরিচালক দুলাল দাসগুপ্ত ও অমিত চট্টোপাধ্যায় তাঁদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। সু-ব্যবস্থাপনার জন্য ধন্যবাদার্হ প্রযোজক বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

**মল্লার প্রযোজিত 'স্বপ্নরাজকন্যা' :** গত সপ্তাহে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে 'মল্লার' প্রযোজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠান কলারসিক মহলকে কয়েকটি উপভোগ্য মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। উপলক্ষ্য উক্ত সংগীত ও নৃত্য প্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ বার্ষিকী প্রতিষ্ঠা উৎসব পালন। উৎসবের সূচনা সুজিত নাথ ও প্রভাস দত্ত পরিচালিত সমবেত গীটার বাদ্যের অনুষ্ঠান দিয়ে। পরের অনুষ্ঠান ছিল 'চল যাই ছড়ার দেশে'। মনের দিক থেকে শিশুরাই প্রকৃতির সবচেয়ে কাছাকাছি। তাই প্রকৃতির অন্তরশায়ী স্বপ্ন, রঙ, কল্পনার দেশ যেন তাদের কাছে স্বতোৎসারিত। এই স্বপ্নের দেশে সেদিন আমরা বয়স ও অভিজ্ঞতার বাধা অতিক্রম করে ক্ষণিকের জন্য প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম। এই নির্মল আনন্দের শরিক হতে পারার জন্য ধন্যবাদ দেব কাকে? শিশু

শিল্পীদের? নাট্যরচয়িতা জ্যোতিভূষণ চাকীকে? সংগীতপরিচালিকা রুবী রায়কে না নৃত্যপরিচালিকা রুবী দত্তকে? বোধহয় সকলেই সমান কৃতিত্বের অধিকারী, আর সুন্দর টীম ওয়ার্ক-এর জন্য সাধুবাদ প্রাপ্য 'মহুয়া' সংগীতানুষ্ঠানের প্রতিটি সভ্যের। সর্বশেষ ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল কথা-সরিৎ সাগর অনুসৃত নৃত্যনাট্য 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা'। বাসবদত্তা ও উদয়নের প্রণয়-বিরহ মিলন কাহিনীই এই নৃত্যনাট্যের পটভূমি। এই সরস কাহিনী মূর্ত হয়ে উঠেছিল অরুপরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর মিত্র, দীনেশ চন্দ, সলিল ভট্টাচার্য, কণিষ্ক সেন ও রুবী দত্তর সংগীত, সংলাপ, আবহ-সংগীত, মঞ্চনির্দেশনা, আলোক ও নৃত্য-নিয়ন্ত্রণে। তরুণ উদয়নের ভূমিকায় রুবী দত্ত সুন্দর। নৃত্যে তো বটেই, অভিনয়েও। অবন্তিকার ভূমিকায় ইন্দ্রাণী সেন ও পদ্মা-বতীর ভূমিকায় এমিলি রায় অভিনীত চরিত্রের দায়িত্ব প্রশংসনীয়ভাবেই পালন করেছেন। উমা বসু ও উমা ঘোষ যোগীন্দ্র-নারায়ণ ও বিদূষকের ভূমিকায় উত্তীর্ণা। একমাত্র ত্রুটি ছিল উদয়নের ভূমিকায় নেপথ্যে গীত বিভিন্ন কণ্ঠের সংগীতে। এভাবে চরিত্রের সংগতি ক্ষুণ্ণ করা অনুচিত। মনপ্রাণ ভরিয়ে দিয়েছে নেপথ্য শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান। অশোক-বাবুর গীত গানগুলি অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। সুস্মিতা সেনের গানও শোনবার মত। সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়ের গানও। দিলীপ চক্রবর্তী, শ্যামলী চক্রবর্তী ও অরুপরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও এদিক দিয়ে উল্লেখ্য।

সি এল টি'র নৃত্যানুষ্ঠানের দৃশ্য

পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়

**নবফাল্গুনীর সংগীতানুষ্ঠান :** গত ২৭শে ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতার সু-পরিচিত সংগীত সংস্থা 'নব-ফাল্গুনী'র বিংশতিতম মাসিক অধিবেশন শুরু হয় শ্রীমতী শুক্লা মুখোপাধ্যায়ের নজরুল-গীতি ও ভজন গান দিয়ে। প্রাণগোপাল গোস্বামীর নিপুণ তবলাসংগতে আন্তরিকতা-সিক্ত গানগুলি যথেষ্ট উপভোগ্য হয়। পরের একক তবলা অনুষ্ঠানে প্রাণগোপাল গোস্বামী ত্রিতালে পরিবেশিত টুকরা, চক্রধার, বোল—ইত্যাদি বিভিন্ন অংশে উল্লেখযোগ্য যোগ্য-তার পরিচয় দিয়েছেন। পঙ্কজ চক্রবর্তীর তবলাসংগতে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পুরিয়া কল্যাণ রাগে খেয়াল ও তারানা গেয়ে শোনা-লেন। সর্বশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতৃ-বৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। শুদ্ধকল্যাণ রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালে বিস্তার ও তানে রেওয়াজী, স্বরও শুদ্ধ। বিশেষ অনুরোধে শ্রীমতী চক্রবর্তী তিনটি ঠুংরী গেয়ে আসরের পরিসমাপ্তি ঘটান। এর সঙ্গে উপযুক্ত তবলাসংগতে ছিলেন রাজা রায়।

**সুরঙ্গনার অনুষ্ঠান :** গত ২৬শে ডিসেম্বর ল্যান্সডাউন রোডে এক উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতাসরের আয়োজন করেছিলেন প্রতি-ষ্ঠান নেত্রী সুরশ্রী কল্যাণী রায়।

শিল্পী পরিচিতি ও উপস্থিত অভ্যা-গতদের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপনে ছিলেন শ্রীঅদ্রিজা মুখোপাধ্যায় ও কল্যাণী রায়।

শ্রীমতী রায়ের ছাত্রী শ্রীলা মিত্রের সেতার দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তরুণ শিল্পীর 'হংসধ্বনি' রাগ পরিবেশনায় শিক্ষা ও অনুশীলনীর স্বাক্ষর প্রীতিদায়ক। কণ্ঠসঙ্গীতে ছিলেন বোম্বের শ্রীমতী অনিমা রায়। এ'র অনুষ্ঠান তালিকায় ছিল পুরিয়া কল্যাণ রাগে খেয়াল, তেলেনা ও ঠুংরী। শিল্পীর সঙ্গীত ধারণা যতখানি পরিণত পরিবেশনা তার সঙ্গে ঠিক সমমানের সংগতি রাখতে পারে নি। উভয় শিল্পীর সঙ্গে তবলা ও হারমোনিয়াম সঙ্গতে ছিলেন যথাক্রমে মানিক দাস ও শুভেন্দু কর্মকার।

**রবীন্দ্র সদনের উদ্যোগে 'ভারতীয় সম্মেলক যন্ত্রসংগীত'-এর অনুষ্ঠান**

রবীন্দ্র সদন সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় আসচে ১৭ জানুয়ারী, ৭১ তারিখে একটি ভারতীয় সম্মেলক যন্ত্রসংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ঐ অনুষ্ঠান পরি-চালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রখ্যাত প্রবীণ সুরকার শ্রীতিমিরবরণ এবং উদীয়মান শিল্পী শ্রীভাস্কর মিত্রের উপর। এই প্রথম এ ধরনের অনুষ্ঠান করা স্থির হয়েছে।

সম্মেলক যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবসায়িক সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবার দিন এখনো আসেনি। কারণ, বিভিন্ন নৃত্য, নাট্য বা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নিজেদের শিল্পসৃষ্টি উপস্থাপনা করবার আমন্ত্রণ পেলেও ঐকতানগোষ্ঠী একমাত্র নিজেদের প্রযোজনা ছাড়া এ পর্যন্ত এ ধরনের কোন অনুষ্ঠান করবার সুযোগ পেয়েছেন বলে জানা যায়নি। বিদেশে এই ধরণের সম্মেলক যন্ত্রসঙ্গীতের শ্রোতা বা দর্শক সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু এদেশে ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্মেলক যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান খুবই বিরল। অথচ মনে হয়, সাধারণ মানুষ সম্মেলক যন্ত্রসঙ্গীত বিমুখ নয়। তাই রবীন্দ্র সদন সমিতি সম্মেলক যন্ত্রসঙ্গীতের স্বকীয় উন্নতিবিধান এবং উপযুক্ত সমঝদার শ্রোতৃমণ্ডলী গঠনের উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

—চিত্রাঙ্গদা

# ঢাকের কাঠি অন্যের হাতে

অজয় বসু

চার বছর পর এশীয় ক্রীড়ার আর একটি অনুষ্ঠান এবারে হোলো। বলা বাহুল্য যে ভারত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। চতুর্বার্ষিকী এশীয় ক্রীড়ার পুনরনুষ্ঠান ও সেই প্রতিযোগিতায় ভারতের অংশ নেওয়া, সবই পুরানো ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। নতুন বলতে যে একটি ঘটনাকে চিহ্নিত করা যায় তা হলো, এশীয় ক্রীড়ায় যোগদান অন্তে স্বদেশে প্রত্যাগত ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সম্বর্ধনা।

এই সম্বর্ধনা জানানো হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এবং এই উপলক্ষ্যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিনিধিদের পিঠ চাপড়ে উৎসাহিত করেছেন।

আমাদের দেশে খেলাধুলাকে যে চোখে দেখা হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ক্রীড়াবিদদের সম্বর্ধনা জানানোর রীতিটি কিছুটা অভিনব। ক্রীড়াবিদরা উচ্চ ও উচ্চতর মহলের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তাঁদের মনোবল বাড়ে জানি। কিন্তু এশীয় ক্রীড়ার ঠিক পরেই ব্যাঙ্কক প্রত্যাগত দলটিকে সম্বর্ধনা জানানোর আয়োজনের সূত্রে শুধুই কি ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিনিধিদের মনোবল বাড়াবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল? না, সেই সঙ্গে অনুচ্চারিত কন্ঠে এই কথা বলে বেড়াবার প্রয়াস পাওয়া হয়েছিল যে ব্যাঙ্ককে ভারতীয় ভূমিকা রীতিমতো সফল হয়েছে?

ভারতীয় ভূমিকা সফল হয়েছে এবং ভারতীয় ক্রীড়াবিদেরা যা করতে পেরেছেন তার জন্যে তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য, এই মনোভাবের তাগিদেই যদি শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্কক প্রত্যাগত প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে শিক্ষা মন্ত্রক এখনও ভুলের স্বর্গেই বাস করছে এবং সে স্বর্গ ছেড়ে বাস্তব দুনিয়ায় নেমে আসার ইচ্ছাও এই মন্ত্রকের নেই। ভুলের স্বর্গের বাসিন্দা সেজে থাকতেই যার এতো লোভ তারই হাতে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের বাঁচন মরণের প্রশ্নটিকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাঙ্কক যাত্রার মুখে যদি ক্রীড়া প্রতিনিধিদের বিদায় সম্ভাষণ জানানো হোত তাহলে সত্যিই ও'দের মনোবল বাড়তো। কিন্তু প্রতিযোগিতা অন্তে বাড়তি মনোবলের যখন প্রয়োজন নেই, তখন ঘটা করে সম্বর্ধনা সভা সাজালে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, কেন এই সম্বর্ধনা? কোন্ ভূমিকার মূল্যায়নে এমন সোচ্চার তারিফ?

ষষ্ঠ এশীয় ক্রীড়ায় ভারত এমন কি করেছে যে ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে ফেরামাত্রই সম্বর্ধনা জানাতে হবে? চার বছর আগেকার সঙ্গে এবারের ভূমিকার তফাৎ কি, কতোটুকু?

চার বছর আগে ওই ব্যাঙ্ককেই পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ায় ভারত পেয়েছিল মোট একুশটি পদক। আর এবার পেলো পঁচিশটি। সংগৃহীত পদকের হিসেবে চারের তফাৎ থাকলেও এই ব্যবধানকে বড় বলে মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। যেহেতু ১৯৬৬ সালের অনুপাতে অন্ততঃ ত্রিশজন বাড়তি প্রতিযোগীকে এই ১৯৭০-এ ব্যাঙ্ককে পাঠানো হয়েছিল। বাড়তি এই ত্রিশজনকে যদি ১৯৬৬তে ব্যাঙ্ককে পাঠানো হোত তাহলে সেদিন ভারতের সংগ্রহশালায় আরও চারটি পদক জমা পড়তো কিনা তাই বা কে বলতে পারে। সুতরাং পদক বেশি পাওয়া গিয়েছে এই ধারণায় আত্মতুষ্ট থেকে ব্যাঙ্ককে প্রেরিত প্রতিযোগীদের বাড়তি সংখ্যার দিকে চোখ বুজে থাকাটা ঠিক হবে না।

১৯৬৬তে ভারত হকিতে স্বর্ণপদক পেয়েছিল। এবারে জুটলো রুপো। এই নজীরকে কি বলবো? ভারতীয় হকির উজ্জ্বলতর ভূমিকা! বিভিন্ন মহল থেকে বলার চেষ্টা হচ্ছে যে, ফাইনালে হারলেও ভারত ভাল খেলেছিল। তাই ভারতীয় হকির ভূমিকা আগের অনুপাতে অনুজ্জ্বল এমনটি যেন মনে না করা হয়। তাই যদি হয় তাহলে ১৯৬৬-র ফাইনালে ভারত কি খুব ভাল খেলেছিল? অথচ স্বর্ণ সঞ্চয় করেছিল। তাহলে সেবারের সেই স্বর্ণ স্বীকৃতি ঘিরে উচ্ছ্বাস ও আনন্দে গলা ফাটিয়ে চীৎকার জোড়া হয়েছিল কেন?

খেলায় হার হারই, জিৎ জিৎই। ভাল খেলে হার যে কি বস্তু তা আমার জানা নেই, যেমন জানা নেই সোনার পাথরবাটি কি চীজ। জিততে হলে ভাল খেলতে হয়, স্টিক হাতে ড্রিব্লিং করা, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা, গোলের সুযোগ সৃষ্টি করে সেই সুযোগের অপচয় ঘটানো—এসব ভাল খেলার লক্ষণ নয়। ভাল খেলা তাকেই বলে যে পদ্ধতি অনুসরণে বিপক্ষকে ফাঁদে জড়িয়ে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। আমাদের হকি দল ব্যাঙ্ককে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি। কাজেই খেলা ভাল হয়নি। মানে ফলপ্রসূ হয়নি। তবে অপেক্ষাকৃত তরুণ দল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কিছুটা প্রতিশ্রুতি হয়তো জাগিয়ে থাকতে পারে।

ষষ্ঠ এশীয় ক্রীড়ায় যে ভারতীয় দলটি সত্যিই অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করেছে তা হলো ওয়াটারপোলো টিম। শুনেছি যে সব সেরা পর্যায়ের খেলোয়াড়ের এই দলে ঠাঁই মেলে নি। নির্বাচনে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব হয়েছে। তবু ভারতীয় ওয়াটারপোলো দল ব্যাঙ্কক থেকে রুপো নিয়ে ফিরেছে। ১৯৫১ সালের পর থেকে ভারতীয় ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্তারা বলে আসছিলেন যে আমাদের ওয়াটারপোলোর মান নীচু। এই অপবাদ যে মিথ্যে

প্রচার তারই প্রমাণ এবারে পাওয়া গেল। বহু দিনের এক মিথ্যে ধারণাকে যাঁরা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন, শুধু তাঁদেরই যদি সম্বর্ধনা জানানো হোতো, তাহলেও নয় শিক্ষা মন্ত্রকের অনুষ্ঠানের যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারতাম। কিন্তু সবাইকে রাজধানীতে ডেকে, মালা-চন্দনে আপ্যায়িত করে শিক্ষা মন্ত্রক সব যেন কেমন গুলিয়ে দেবার মতলব ফেঁদেছেন।

গত চার বছরে ভারতীয় ক্রীড়ার মান এশীয় মানের অনুপাতে আদৌ এগোয় নি এই সত্যকে চেপে রাখার জন্যে এই সম্বর্ধনার ব্যবস্থা নয় তো? শুধু প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় ভূমিকার সাজানো রঙিন ছবিটিকে বারবার তুলে ধরা হলে হয়তো কারুর কারুর চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে কি সকলের চোখে এই-ভাবে ধুলো দেওয়া যাবে?

বেশি সংখ্যক অ্যাথলিট পাঠাবার সূত্রে এবার অ্যাথলেটিকসে তিনটি বাড়তি পদক পাওয়া গেছে। কিন্তু ওদিকে অ্যাথলেটিকসে স্বর্ণপদক সঞ্চয়ের প্রতিযোগিতায় ভারতকে এবার একধাপ পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। নজীরটি লক্ষ্য করে অনেক দুঃখেই বিখ্যাত অ্যাথলিট মিলখা সিং বলেছেন—'এর আগে প্রতিবারই আমাদের অ্যাথলিটরা অন্ততঃ পাঁচটি করে স্বর্ণপদক পেয়ে আসছিলেন। এবারেই প্রথম চারটি খেলায় আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হলো! সোনা কমলো, রুপো বাড়লো। তাতেই কি বুঝতে হবে যে এশীয় মানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অ্যাথলেটিক মানের গতি উর্ধমুখী? এবং তার জন্যে অ্যাথলিটদের সম্বর্ধনা জানানো দরকার?

১৯৬৬তে ভারতীয় কুস্তিগীরেরা একটি রৌপ্য ও পাঁচটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন। এবারে পেলেন সব মিলিয়ে পাঁচটি—আগের বারের অনুপাতে একটি কম। এতে আফশোষ নেই যেহেতু আগের বারে মল্লক্রীড়ায় যা পাওয়া যায় নি সেই স্বর্ণপদক নিয়ে ফিরেছেন মাস্টার চাঁদগীরাম।

ফুটবলে ও পালতোলা নৌ চালনায় একটি করে ব্রোঞ্জ পাওয়া মন্দের ভাল। সাঁতার, সাইক্লিং, বাস্কেটবলে কোনো পদক আসে নি এবং মুষ্টিযুদ্ধে স্বর্ণসমেত দুটি পদক ভারতীয়েরা পেলেও আগের বারের অনুপাতে এ বিভাগে স্থিতাবস্থাই বজায় থেকেছে।

এক আধটি পদক এদিক ওদিক হলেও সবশুদ্ধের বিচারে বলা যায় যে, সদ্য সমাপ্ত ষষ্ঠ এশীয় ক্রীড়ায় ভারতীয়রা শুধু স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই পেরেছেন। তার বেশি কিছু করা সম্ভব হয় নি। শ চারেক পদক ঘিরে ব্যাংককে যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল তার প্রায় সবকটি বিভাগে যোগ দিয়ে ভারত সবসমেত পঁচিশটি পদক সংগ্রহ করতে পেরেছে। এতো বড় দেশ আমাদের এই ভারতভূমির সামর্থ্য মাত্র পঁচিশটি পদকে সীমাবদ্ধ রয়েছে জেনেও যাঁরা আমাদের ক্রীড়া প্রতিনিধিদের সাদর সম্বর্ধনা জানাতে এবং আমাদের ক্রীড়াকর্মকর্তাদের পিঠ চাপড়াতে কুন্ঠাবোধ করেন না তাঁদের আদিখ্যেতা আকাশ সমান। এই অসুস্থ মনোভাবের আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে ভারতীয় ক্রীড়ার ভবিষ্যত বলে কিছুই থাকবে না। চিরায়ু কর্মকর্তাদের চক্রান্তে যেভাবে চলছে তাতে ভবিষ্যত বলতে যে কিছু আছে তাই মনে করা যায় না। কর্মকর্তারাও নিজেদের ঢাক নিজেরাই বাজিয়ে চলেছেন। এরপর সরকারী প্রশাসকেরা যদি ঢাকের সেই কাঠিগুলি নিজেদের হাতে তুলে নেন তাহলে গোদের ওপর বিষফোড়ার যন্ত্রণাই শুধু বাড়বে। গোদের ভার বিন্দুমাত্রও লাঘব হবে কি?

# খেলাধুলা

**দর্শক**
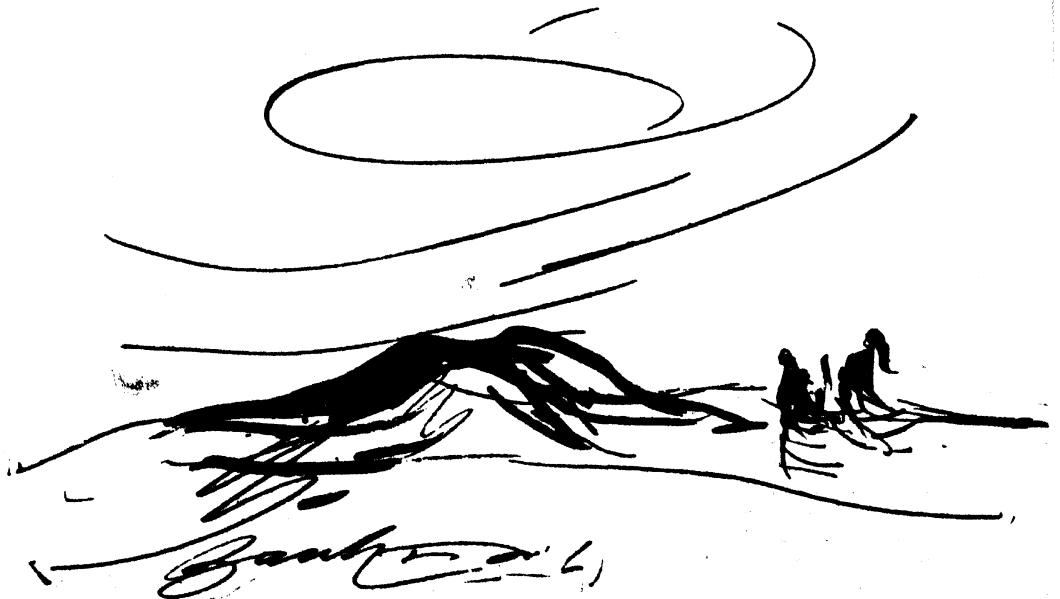
## শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা

'অমৃতবাজার পত্রিকা' এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সাংবাদিক জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন (সি-এ-বি) ইডেন উদ্যানে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। এই সভায় এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্মারক হিসাবে তাঁকে একটি রূপোর থালা এবং মানপত্র দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সি-এ-বি'র সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। এখানে উল্লেখ্য, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ দীর্ঘ দশ বছর বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন এবং বর্তমানে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান। তাঁর সভাপতি থাকার সময়ে এসোসিয়েশন নানা দিক থেকে সাফল্যের উচ্চ শিখরে উঠেছিল। সি-এ-বি'র সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন, 'ক্রিকেটের পরিভাষায় সাংবাদিকতার কণ্টকিত দুরূহ উইকেটে কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে তুষারবাবু ৫০ রান করে এখনও অপরাজিত আছেন এবং শতরান পূর্ণ করে তিনি যেন অপরাজিত থাকেন।'

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর হাস্যকৌতুক ভরা বক্তৃতায় সমবেত সকলেই প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। বাংলা দেশে ক্রিকেট খেলার ক্রমাবনতির কথা উল্লেখ করে তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বাংলার ক্রিকেট সংস্থা, সংশ্লিষ্ট ক্লাব এবং ক্রীড়ানুরাগীদের বাংলার ক্রিকেট খেলার উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেন।

## নতুন অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে আড়াই মাসের ক্রিকেট খেলার সফর সুরু করবে। বোম্বাইয়ের অজিত ওয়াদেকার ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী এই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। অধিনায়ক নির্বাচন পর্বের শেষ দিকে দুজন প্রার্থী ছিলেন—মনসুর আলি এবং অজিত ওয়াদেকার। ভারতবর্ষ মনসুর আলীর নেতৃত্বে এ পর্যন্ত ৩৬টি টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলে সাত বার জয়ী হয়েছে (হার ১৭ ও ড্র ১২)। ১৯৬১-৬২ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর দুর্ভাগ্যবশতঃ আহত অবস্থায় শয্যাশায়ী হলে দলের সহ-অধিনায়ক মনসুর আলী দলের নেতৃত্বভার লাভ করেন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাঁর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ শেষ তিনটি টেস্ট খেলায় পরাজয় বরণ করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজ ধরে ভারতবর্ষ মনসুর আলীর নেতৃত্বে যে দশটি টেস্ট সিরিজ খেলেছে (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৭-৬৮ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে বোরদে অধিনায়ক ছিলেন) তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের জয় ২ (১৯৬৫ সালে ও ১৯৬৮ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে), পরাজয় ৫ (১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৬-৬৭ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৬৭ সালে ইংল্যান্ড, ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে) এবং সিরিজ ড্র ৩ (১৯৬৪ সালে ইংল্যান্ড, ১৯৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়া এবং ১৯৬৯ সালে নিউজিল্যান্ড)। ভারতবর্ষ মনসুর আলীর নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে বিদেশের মাটিতে প্রথম 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করেছিল। মাত্র ২১ বছর বয়সে মনসুর আলী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অধিনায়কের পদ লাভ করেন। তাঁর আগে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই বয়সে কেউ অধিনায়ক নির্বাচিত হন নি। মনসুর আলীর পিতা পরলোকগত ইফতিকার আলী ১৯৪৬ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে পিতা-পুত্রের অধিনায়ক পদ লাভের নজির আর মাত্র একটি আছে।

খবরে প্রকাশ, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলীর পক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাওয়া সম্ভব হবে না যেহেতু তিনি আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে লোকসভার প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। হরিয়ানার গুরগাঁও নির্বাচন কেন্দ্রে মনসুর আলীর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেট অধিনায়ক লালা অমরনাথ।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' এবং বাংলা 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে তাঁর সাংবাদিক-জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ (ডান দিকে) সি-এ-বি'র পক্ষ থেকে স্মারক হিসাবে রূপার থালা উপহার দিচ্ছেন।

অজিত ওয়াদেকার।

জয়পুরে ভারতবর্ষ বনাম উগান্ডার হকি টেস্ট খেলা আরম্ভের আগে রাজস্থানের অর্থমন্ত্রী শ্রীমথুরাদাস মাথুর উগান্ডার মহিলা হকি দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করছেন। ভারতবর্ষ ৬—১ টেস্টখেলায় (গোলে) আবার জয়ী হয়েছে।

## দলীপ ট্রফি

### সেমি-ফাইনাল

কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দলীপ ট্রফি আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে পূর্বাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসে উত্তরাঞ্চল দলের থেকে ৫৬ রান বেশী করার সূবাদে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পূর্বাঞ্চল দলের এই প্রথম খেলা।

উত্তরাঞ্চল দলের অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী টসে জয়ী হয়ে পূর্বাঞ্চল দলকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠান। প্রথম দিনের খেলায় পূর্বাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের ৪ উইকেটে খুইয়ে ২৪২ রান সংগ্রহ করেছিল। অম্বর রায় ৫০ রান এবং শ্যামসুন্দর মিত্র ২১ রান করে অপরাজিত ছিলেন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে প্রকাশ পোদ্দার এবং গোপাল বোস ৮০ মিনিটের খেলায় দলের ৮১ রান তুলেছিলেন। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে দলের অধিনায়ক রমেশ সাকসেনা এবং অম্বর রায় তুলেছিলেন ৭১ রান। পোদ্দার ১৩৫ মিনিটের খেলায় তাঁর ৬৫ রান সংগ্রহ করে আউট হন।

দ্বিতীয় দিনে পূর্বাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ৩১৩ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন তাদের বাকি ৬ উইকেটে ৭১ রান যোগ হয়েছিল। খেলার বাকি সময়ে উত্তরাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের ৫ উইকেট খুইয়ে ১৭২ রান সংগ্রহ করে। সুরীন্দর অমরনাথ ৪০ এবং হায়দার আলী ৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। দিলীপ দোসী ৪৮ রানে ৪টি উইকেট পান।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ২৫৭ রানের মাথায় শেষ হলে পূর্বাঞ্চল দল ৫৬ রানের ব্যবধানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় সুরীন্দর অমরনাথ (৬৬ রান) এবং হায়দার আলী (৭৪ রান) ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ১৩৭ মিনিটের খেলায় দলের ১২৪ রান তুলেছিলেন। পূর্বাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ১১৯ রানের মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। দলজিৎ সিং উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭৯ রান করেন। খেলার সমাপ্তি ঘোষণার পর খেলা শেষ হতে মাত্র ৫৮ মিনিট বাকি ছিল। এই সময়ে উত্তরাঞ্চল দলের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭৬ রান সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। উত্তরাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ১২১ রানের (২ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে আয়োজিত দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতার অপর দিকের সেমি-ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল প্রথম ইনিংসে রান বেশী করার সূবাদে গত দুবারের দলীপ ট্রফি বিজয়ী পশ্চিমাঞ্চল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। পশ্চিমাঞ্চল দলের অধিনায়ক চান্দু বোরদে টসে জয়ী হয়ে দক্ষিণাঞ্চল দলকে প্রথ ব্যাট করতে পাঠান।

দক্ষিণাঞ্চল দলের প্রথম ইনিং সূচনা মোটেই শুভ হয়নি। মাত্র ১৩ রা মাথায় প্রথম উইকেট পড়ে যায়। প্র দিনের খেলায় দক্ষিণাঞ্চল ৬টা উই খুইয়ে ২৪৬ রান সংগ্রহ করে। ওপ ব্যাটসম্যান জয়ন্তীলাল ১১৮ রান ক অপরাজিত থাকেন। হাতিয়া ৭৪ রানে ৩ উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের প্র ইনিংস ৩৭১ রানের মাথায় শেষ হ পশ্চিমাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসে ৬টা উই খুইয়ে মাত্র ১০৭ রান সংগ্রহ করে। ত ৯ রানের মাথায় ১ম এবং ১০ রানের মাথা ২য় এবং ৩য় উইকেট পড়ে যায়। প্রধ আবিদ আলী ৩৪ রানে ৪টে উইকেট নি পশ্চিমাঞ্চল দলকে কাবু করে ফেলে দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গে পশ্চিমাঞ্চল দল ২৬৪ রাণের পিছনে প আছে।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দি পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ১৮৬ রা মাথায় শেষ হলে দক্ষিণাঞ্চল দল প্র ইনিংসের খেলায় ১৮৫ রানে অগ্রগামী হ দক্ষিণাঞ্চল দল তাদের দ্বিতীয় ইনিং ১০২ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খে সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং পশ্চিমা দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ৬৫ রানের ( উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩
হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

লাভ করুন
6 3/4 %
5 বছরের
পোষ্ট অফিস মেয়াদী জমায়
3 বছরের জমায় 6 1/4 % এবং 1 বছরের জমায় 5 1/2 % সুদ পাবেন।
করমুক্ত সিকিউরিটি এবং অন্যান্য জমার সুদ
সমেত 3000 পর্যান্ত সুদের টাকায়
কর দিতে হবে না।
বিশদ বিবরণীর জন্যে আপনার বাড়ীর কাছের পোষ্ট অফিসে খোঁজ নিন।
জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

davp 70/370

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৭শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 22nd January, 1971 শুক্রবার, ৮ই মাঘ, ১৩৭৭ 40 Paise


## সূচীপত্র



প্রচ্ছদ : শ্রীগৌতম কর রায়

# চিঠিপত্র

## বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' প্রসঙ্গে

বিগত ৩৫শ সংখ্যা 'অমৃতে' সারদামঙ্গলের আলোচনা প্রসঙ্গে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর চিঠিটির প্রতিবাদে আশিসকুমার রায়ের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। সারদামঙ্গল কাব্যটি যে 'খণ্ড গীতি কবিতা' এবং 'আত্মসর্বস্বতায় পূর্ণ' এ বিষয়ে আশিসবাবু দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দ্বিমত না হওয়ার কতগুলো কারণ উপস্থাপন করতে চেষ্টা করছি।

সারদামঙ্গল কাব্য বিহারীলালের মানসলক্ষ্মীর বন্দনা গান। বিরহ-মিলনের মধ্য দিয়ে কবির আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মনিবেদন। কবিচিত্ত এখানে কেন্দ্রাবস্থিত প্রধান চরিত্র, কিন্তু আলম্বন বিভাব 'সারদা'। এই সারদাকে অবলম্বন করেই বিরহমিলনের পালাগান রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 'প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হইবে না।" কিন্তু বিহারীলালের নিজেরই কথায় জানা যায় খণ্ড কবিতারূপে 'সারদামঙ্গল' পরিকল্পিত হয়নি। কবি বেদনাময় কবিচৈতন্যের প্রকাশে, সংগীতময় সুরের আবেশে এবং রোমান্টিক কবি-কল্পনায় সারদামঙ্গলকে গীতিকবিতার ভাবস্পন্দনে জাগিয়ে তোলার জন্যে সারদাকে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-তত্ত্বে রেখে কাব্যসৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু অরূপ ভাবকে কবি স্পষ্ট রূপমূর্তি দান করতে পারেন নি। তাঁর Mysticism-ই এর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রহস্যধ্যানে নিমগ্ন হয়ে কাব্য সৃষ্টি না করে কবি কাব্যাকাঙ্ক্ষারই আরতি করেছেন। কিন্তু কাব্যে শুধু রহস্য থাকলেই চলে না, কবিকে কাব্যসৃষ্টি দ্বারা সেই রহস্যকে রসরূপে প্রকাশ করতে হবে। বিহারীলালের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তাইতো মোহিতলাল মজুমদারকে বলতে শুনি, 'এইজন্য বিহারীলালের কাব্য হইতে অতি উৎকৃষ্ট বিচ্ছিন্ন শ্লোক বা শ্লোকসমষ্টি উদ্ধার করা যত সহজ ভাবে ও আকারে একটি সম্পূর্ণ কবিতা সংগ্রহ করা তার তুলনায় কঠিন।' এই প্রসঙ্গে তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি দিলে বোধহয় বক্তব্যটি আরো স্পষ্টতর হবে: 'এই শ্রেণীর গীতি-কবিতায় যে ভাবগুলির অবতারণা করা হয় সেগুলি স্ফটিকের ন্যায় এমন স্বচ্ছ হয় যে সেই স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া মূল কাব্যের কেন্দ্রানুগ মর্মটি সহজেই দেখা যায়।...তাই এই কাব্যেও ভাবকে ঠিক ততখানি পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ করিয়া উপস্থাপিত করা উচিত ছিল এবং তাহা হইলে বিভিন্ন ভাব-দর্পণে মূল ভাবের প্রতিবিম্ব পড়িতে পারিত। কিন্তু সারদামঙ্গল কাব্যে বিহারীলাল যে ভাবগুলি উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেগুলি অলৌকিক দর্পণ নয়, লৌকিক মৃৎপিণ্ড; ইহার উপর প্রতিবিম্ব পড়ে না।'

রণজিৎ দেব
শিবমন্দির, জলপাইগুড়ি

## শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

### লেখকের বক্তব্য

এবারের শারদ সাহিত্য বিষয়ে অমৃতে আমি কয়েকটি আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম মাত্র। অনেক কবি-সাহিত্যিক, পাঠক-পাঠিকা সে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে প্রমাণ করেছেন আমাদের এই সমস্যাসংকুল সময়েও সাহিত্য জীবনধারণের এক অপরিহার্য অঙ্গ, নিছক সময় কাটানোর উপকরণ নয়। উৎসাহব্যঞ্জক আলোচনা করে পরিপূরক বক্তব্য রেখে অনেকে এই জাতীয় আলোচনার গুরুত্ব ও দায়িত্বের প্রতি আমার আস্থাকে সুদৃঢ় করেছেন। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এবারে ভালো লিখেছেন এমন কোন বিশেষ কবি-সাহিত্যিকের উল্লেখ না-থাকাটা আমারই ত্রুটি, তেমনি তরুণতর কবিদের মধ্যে যাঁরা ভাল লিখেছেন তাঁদের আরও অনেকের উল্লেখও বাঞ্ছনীয়। মফস্বল বাংলা, উত্তর বঙ্গ ও বহির্বঙ্গের পত্র-পত্রিকার বিষয়ে আরও বিস্তৃত তথ্যবহুল আলোচনা করতে পারলে সন্দেহ নেই আমার আলোচনা ব্যাপ্ত ও সম্পূর্ণ হতে পারত। পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে কবি-লেখক বা পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করে উক্ত আলোচনার অসম্পূর্ণতার দিকটা সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের উৎসাহ ও কর্তব্যবোধ সাহিত্যের প্রতি অসীম আগ্রহ ও শ্রদ্ধারই পরিচায়ক। এই জাতীয় সাময়িক সাহিত্য পর্যালোচনায় যেখানে পরিশ্রমের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, তথাপিও যেখানে বহু বিস্তৃত ও ব্যাপক, সেখানে কোন একটি রচনা-ই সম্পূর্ণতার দাবি করতে পারে না। উৎসাহী সচেতন সাহিত্যরসিক পাঠক-পাঠিকার সময়োপযোগী অংশ গ্রহণেই তা অনেকাংশে সম্পূর্ণ ও যথাযথ রূপ লাভ করতে পারে। আমার আলোচনার বর্তমান সময় ও সমাজ জিজ্ঞাসার রূপ সাহিত্যে কতটা কি প্রতিফলিত হয়ে চলেছে সেই সাধারণ প্রশ্নটা তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। ভিন্ন কোটির সাহিত্য-ভাবনাও যথাযোগ্য মর্যাদাসহ স্থানলাভ করেছে। চেষ্টা ও আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ও বাংলার বাইরের বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সবগুলি পড়া সম্ভব হয়নি। আদৌ সম্ভব কিনা তাও বিবেচ্য। সব কবি সাহিত্যিকদের নামোল্লেখও কি সম্ভব! কয়েকটি পত্রিকা আবার বিলম্বে হাতে পাওয়ার দরুণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উল্লেখ করা যায়নি। আমার দিক থেকে এইটুকু বলার কথা যে, কোন লেখক, পত্রিকা বা পত্রিকা-গোষ্ঠীর প্রতিই আমার অনাগ্রহ নেই।

পর্যবেক্ষক
কলিকাতা—৩

## মুখের মেলা

আব্দুল জব্বারের 'মুখের মেলা' যতই পড়ছি, উত্তরোত্তর মুগ্ধও হচ্ছি তত বেশী। গ্রাম বাংলার বিভিন্ন পেশার মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে এমন তথ্যবহুল, সরস ও উপভোগ্য রচনা আস্বাদন করেই এই মুগ্ধতা। প্রতিটি রচনাই পল্লীবাংলার মানুষ ও প্রকৃতির তাজা স্পর্শে ভরা। শুধু তাই নয়, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে লেখকের পরিচয়ের প্রগাঢ়তাও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়—এবং এই প্রগাঢ়তার জন্যই লেখাগুলি এত জীবন্ত, এত প্রাণবন্ত। লেখকের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব সত্যিই প্রশংসনীয়।

জব্বার সাহেবের বর্ণনার ভাষা খুবই সহজ সরল, তাজা এবং ঝরঝরে। তাঁর বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যেও সরসতা বিদ্যমান।

এই প্রসঙ্গে অমৃত পত্রিকার গত ২৩শে পৌষ সংখ্যায় 'চিঠিপত্রে' প্রকাশিত মধু বসু মহাশয়ের 'মুখের মেলা' শীর্ষক চিঠি পড়ে একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে তাঁর বক্তব্যের আমি প্রতিবাদ করছি। লেখক তাঁর রচনাগুলিতে যে রসের পরিবেশনে এমন কিছু বাড়াবাড়ি করেন না যাতে মূল রচনার রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটে, কিম্বা এই সব সরেস রচনার মাধুর্য ক্ষুণ্ন হয়। আর একথা তো ভাবাই যায় না যে লেখক পাঠকের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্যে যৌনরসকে টনিক হিসেবে ব্যবহার করছেন।

আব্দুল জব্বার মহাশয়ের লেখাগুলির কোনো কোনোটায় সামান্য কিছু দোষ আছে বলে আমার মনে হয়। গ্রামবাংলার সমাজ-চিত্রকে গল্পের আকারে পরিবেশন করতে গিয়ে তিনি কোথাও কোথাও কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন; ফলে কোনো কোনো রচনা কিছুটা কৃত্রিম বলে মনে হয়।

পল্লীবাংলার দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত নানান ধরনের মানুষ, তাঁদের আচার-

# চিঠিপত্র

ব্যবহার এবং সেখানকার প্রকৃতিকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কিছুটা দুর্বলতা সত্ত্বেও লেখাগুলি খুবই হৃদয়-গ্রাহী এবং মূল্যবানও বটে। এই লেখাগুলি অমৃত পত্রিকায় উপস্থাপিত করার জন্যে লেখককে জানাই অকুণ্ঠ সাধুবাদ, ধন্যবাদ জানাই সম্পাদক মহাশয়কেও।

কল্যাণ ঘোষ
আশুতোষ কলেজ, কলকাতা-২৬

## মৈমনসিংহ-গীতিকা

কিছুদিন পূর্বে আপনার সম্পাদিত 'অমৃতে' ব্যোমকেশ মজুমদার শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উপর অযথা দোষারোপ করেছেন, তিনি গীতি সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের প্রাপ্য যশোপহারক বলে।

এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেছেন—গীতিকারের কাহিনী ও আঞ্চলিক শব্দ-সমূহের অযথা সংস্কার সাধনের জন্যে।

এই বিষয়ে বাগবিস্তার না করে তাঁকে অনুরোধ করছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মৈমনসিংহ-গীতিকার (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) ভূমিকা অংশটি পাঠ করতে। তাহলেই তিনি তাঁর অভিযোগের উত্তর পাবেন।

সুনীল পাল
কামাখ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

## মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

'মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন' শীর্ষক চিঠিতে লীলা রায়ের বক্তব্যের সঙ্গে অনেকাংশে একমত না হতে পেরেই এই চিঠি লিখছি।

মাননীয়া লেখিকার মতে অমৃতেতে মফঃস্বলের পাতা নাম দিয়ে মফঃস্বলের লেখকদের জন্য দু তিনটে পাতা জুড়ে দিলে মফঃস্বলের লেখক-লেখিকাদের সুবিধা হয়। কিন্তু আমার মনে হয় লেখককে, ইনি মফঃস্বলের লেখক বা ইনি শহর কলকাতার লেখক, এইভাবে ভাগ করা অন্যায়। লেখকের মান এইভাবে বিচার করলে লেখকের রচনায় অবিশ্বাসী হয়ে পড়তে হয়। হ্যাঁ, মফঃস্বলের লেখকদের অগ্রাধিকার দিতে রাজী হওয়া উচিত, কিন্তু তা বলে তাঁদের মাথায় 'মফঃস্বলের লেখক' এই রাজ-টীকা পরিয়ে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। বর্তমানে অনেক লিটল ম্যাগাজিনে এইরূপ টীকা পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে মফঃস্বলের লেখক-দের। আমার সেইসব লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের কাছে এবং আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, মফঃস্বলের লেখকদের অগ্রাধিকার দিন, কিন্তু কোন রাজটীকা দিয়া করে তাঁদের পরাবেন না।

মুকুলেশ শুকুল
কৃষ্ণনগর

(২)

অমৃতের 'চিঠিপত্র' স্তম্ভে মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে একাধিক ব্যক্তির মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়ায় আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই প্রসঙ্গে আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিটল ম্যাগাজিন ও এর গ্রাহক-লেখক সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে চাই। বলা বাহুল্য মফঃস্বল ও কলকাতার কোন লিটল ম্যাগা-জিনেরই আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। এগুলি প্রধানত বিজ্ঞাপনের টাকার উপর নির্ভরশীল। কোন লিটল ম্যাগাজিনেরই গ্রাহক-সংখ্যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার মত নয়। কিন্তু এজন্যে দায়ী কে? লিটল ম্যাগাজিনের যাঁরা গ্রাহক-পাঠক, তাঁদের অধিকাংশই আবার এর লেখক। খুব অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই কেবল পত্রিকা পাঠের উদ্দেশ্যে লিটল ম্যাগাজিনের গ্রাহক হন। লিটল ম্যাগাজিন-গুলি গ্রাহকদের লেখা প্রকাশে অগ্রাধিকার দেয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই তরুণ লেখকগণ আত্মপ্রকাশের তাগিদে লিটল ম্যাগাজিনের গ্রাহক হন। লিটল ম্যাগাজিনগুলির অনিয়মিত প্রকাশ এবং হঠাৎ কোন না কোন লিটল ম্যাগাজিনের অপমৃত্যু ঘটায় অনেকে এর গ্রাহক হতে সাহস পান না। অনেক সময় লিটল ম্যাগাজিনগুলি গ্রাহক সংগ্রহ করার জন্য চাতুরীর আশ্রয় নেয়। কোন কোন লিটল ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রের মাধ্যমে লেখা আহ্বান করেন এবং লেখার সংগে অতি অবশ্য ডাক-টিকিট প্রেরণ করতে বলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রেরিত ডাক-টিকিটে লেখককে লেখা সম্পর্কে কোন মতা-মত না জানিয়ে স্ব-স্ব পত্রিকায় গ্রাহক হতে অনুরোধ করা হয়। আমার বক্তব্য, লেখকের খরচে এভাবে আত্মপ্রচার করা কেন? শুধু তাই নয়, লিটল ম্যাগাজিনের গ্রাহক হলেও পত্রিকা প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই বলি, লিটল ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ যদি নিয়-মিত পত্রিকা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন এবং গ্রাহকদের পত্রিকা প্রাপ্তির (যথাসময়ে) কোন নিশ্চয়তা না থাকে তা হলে কেউই লিটল ম্যাগাজিনের গ্রাহক হতে উৎসাহিত হবেন না। লিটল ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষের এ-ব্যাপারে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য বলে মনে করি। লিটল ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষের উচিত দুইটি সংখ্যা প্রকাশের মধ্যেকার ব্যবধান যথাসম্ভব হ্রাস করা।

অজিতকুমার দাস
হাওড়া।

(৩)

অমৃত পত্রিকার ৩৫শ সংখ্যায় 'মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিন' আলোচনা প্রসংগে শ্রীমতী লীলা রায়ের অমৃতযুগ সৃষ্টির আহ্বান দূর-দূরান্তের সম্ভাবনা-পূর্ণ সাহিত্যিকদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করেছে সন্দেহ নেই। এ আহ্বানে সাড়া দিলে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'অমৃতের' ভূমিকা ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে। কিন্তু মফঃস্বলের লেখকদের জন্য আলাদাভাবে 'মফঃস্বলের পাতা' খোলার ব্যাপারটা যুক্তিযুক্ত নয়। এ যেন ভেজের নিমন্ত্রণে বারবাড়ির উঠানে পাতা পেড়ে কাঙ্গালীভোজনের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় মফঃস্বলের লেখককুলের সায় থাকতে পারে বলে মনে হয় না। সম্ভবত তাঁদের সম্পর্কে শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকার অধিকাংশ সম্পাদকগণ যে করুণার মনোযোগ পোষণ করে থাকেন সেই-দিকে লক্ষ্য রেখেই লেখিকার এই সহানু-ভূতিমাখা প্রস্তাব। দূর মফঃস্বল থেকে গল্প বা কবিতা সাধারণত ডাকযোগেই লেখকেরা পাঠিয়ে থাকেন এবং তাঁদের অনেকেরই শহরে এসে পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। এ সুযোগ কলকাতার লেখকদের আছে। মফঃস্বলের লেখকদের ডাকযোগে পাঠানো রচনা অব-হেলিত হবে, বিচিত্র কী। এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে সম্পাদকদের প্রতিবাদ যথারীতি মামুলী ও গতানুগতিক। আশা করব, এ গতানুগতিকতা থেকে অমৃত নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। আলাদা পাতা জুড়ে নয়, সবার সঙ্গে এক হয়েই মফস্বলী লেখকদের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ রচনা যেন যথেষ্ট পরিমাণে অমৃতের পাতায় আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায়। তারাশংকরের জন্য 'মফস্বলের পাতা' খোলার প্রয়োজন ঘটেনি। মুক্তার সন্ধানে মুক্তাডুবুরী 'কল্লোলের' যে ভূমিকা,—প্রয়োজন সেই ভূমিকার। সেই প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে 'অমৃত' যুগসৃষ্টির কাজে অগ্রণী হোক, এ আশা সবার, আমারও।

রণজিৎ ভট্টাচার্য
কালানবগ্রাম, বর্ধমান

[আমরা মফঃস্বলের লেখকদের রচনা সাগ্রহে পড়ি, এবং কোথাও প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর দেখলেই তা যত্নের সংগে প্রকাশ করি। কেননা, 'অমৃত' প্রধানত নতুন লেখক-দেরই কাগজ। অঃ সঃ]

# শাদা চোখে

আগামী ৯ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বার মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৬৭ সাল থেকে রাজ্য রাজনীতিতে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে সেই অস্থিরতার অবসানের জন্যে আর একবার গণআদালতের রায় নেওয়া হবে। অস্থিরতা মানুষের মনেও। কাজেই স্থিরতা আসবে কিনা বলা বড় কঠিন। সমস্যাজর্জরিত এই রাজ্যে সরকার যদি স্থায়ীও হয় তবে চট করেই সামাজিক অস্থিরতা কাটবে, এমন গ্যারান্টি দেওয়া শক্ত। তবু চেষ্টা করাও যে প্রয়োজন তাতে দ্বিমত নেই।

অতীত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মানুষ ভবিষ্যতের সমস্যার সম্মুখীন হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বর্তমানে অনেক অভিজ্ঞ তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই ভোটযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেও তাঁরা লক্ষ্যহীন হবেন না বলে আশা করা যায়। বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাঁরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণে ব্রতী হবেন। শ্লোগানের চাকচিক্যে ভুলে যদি পথবিভ্রম ঘটে তবে আবার অস্থিরতা আসবে। আর রাজনৈতিক অস্থিরতা আসলে সামাজিক অস্থিরতা আরও প্রবল হয়ে উঠবে। তবে একথাও মনে রাখা দরকার, অস্থিরতা সব সময়েই অখণ্ড নয়। অস্থিরতা অনেক সময়েই নয়া জমানার ইঙ্গিতবাহীও হয়ে থাকে। অস্থিরতা নতুন সৃষ্টির দ্যোতনা মাত্র। যে অস্থিরতা এই রাজ্যকে কাঁপিয়ে তুলেছে তার শুভদিক একটা আছে। সেটা হচ্ছে বাঙালী নতুন করে চিন্তা করছে। চিন্তাই নয়া পথের নিশানা দেয়।

এই রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হচ্ছে কংগ্রেসের একক শক্তি হিসাবে পতন, এবং তার বিকল্প হিসাবে যে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তার ব্যর্থতা। শ্রীঅজয় মুখার্জি ও তাঁর সহযোগীরা অদ্যাবধি সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারেন নি। বরঞ্চ বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টির পথে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁরা সঞ্চয় করেছেন তাকে পরিহার করে যে নতুন পথ সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন জনসাধারণ সাগ্রহে তার পরিণতির দিকে নজর রেখেছেন।

১৯৬৭ সালেও পশ্চিমবঙ্গে তিনটি শিবির স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীমুখার্জি কংগ্রেস ত্যাগ করলেও তখনও কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিধানসভা ও লোকসভা আসনে সেদিনও লড়াই করতে বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেসের সেই শক্তি নেই। এখন কংগ্রেস সংগীর খোঁজে ব্যস্ত। উদ্দেশ্য হতে গৌরব নিদেনপক্ষে কথঞ্চিৎ উদ্ধার করা। ক্ষমতা দখলের চিন্তা তাঁদের নেই এমন কথা ঠিক নয়, তবে এককভাবে সেই প্রচেষ্টা চালাতে কংগ্রেস যে ভরসা পাচ্ছে না আসন ভাগাভাগির মধ্যে সেটা সুস্পষ্ট। কংগ্রেসের আর একটি অংশ যাঁরা এযাবৎকাল কংগ্রেস (আদি) বলে চিহ্নিত হয়ে আসছিলেন, অনেকেই তাঁদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে চিহ্নিত করছেন। তাঁদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু যাঁরা নির্বাচন কমিশনারের রায়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বলে স্বীকৃত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও এ রাজ্যে শক্তির এমন সমাবেশ দেখছি না যার বলে তাঁরা তাঁদের চিহ্নিত সমাজতন্ত্রের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। কোয়ালিশান করার অর্থই হচ্ছে কনসেশান দেওয়া। আর ঐ কনসেশান কতটুকু দিতে পারলে কোয়ালিশান বজায় থাকে তার অনেক নজীর ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। যা হোক, বোধ হয় কনসেশান কম দেওয়ার জনাই কংগ্রেস এই ভোটযুদ্ধে বাংলা কংগ্রেসকে প্রধান সহযোগী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আর তাঁদের অভীষ্ট পথ যাতে কন্টকাকীর্ণ না হয় সেজন্য তাঁরা সমাজতন্ত্রী সমর গুহ, নরেন দাস, কাশীকান্ত মৈত্র ও ডঃ ভূপাল বসুর সহযোগী হাতগুলোকে সমাদরে গ্রহণ করেছেন। দেখা যাক, অবস্থা কি দাঁড়ায়।

বস্তুতপক্ষে, পশ্চিম বাংলার নির্বাচনে এবার তিনটি জোট গঠিত হয়েছে। ফ্রন্ট হিসাবে তিনটিই হচ্ছে। অবশ্য আরও অনেক দল নির্বাচনে লড়বেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ফ্রন্টের মধ্যে তিনটিই হবে মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। বাম কম্যুনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত ষড়বাম ১৯৬৭ সালেও আলাদা ছিলেন। তবে সহযোগীদের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। সেবার এস এস পি ও এস ইউ সি সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের মধ্যে সি পি এমের সহযোগী ছিলেন। সমস্ত বামপন্থী দল সেবার নির্বাচনের পূর্বে এক হতে পারেন নি। সেবারও তাঁদের মুখ্য শত্রু ছিল কংগ্রেস। এবারও ষড়বাম ও অষ্টবাম একই কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু মিলতে পারেন নি। কারণ, সেবার ছিল আসন ভাগাভাগির সমস্যা। এবার কিন্তু খানিকটা নীতিগত ও কৌশলগত সমস্যা তাঁদের পৃথকভাবে রেখেছে।

১৯৬৭ সালে যখন নির্বাচন আসে তখন দুই কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের কোনটা আসল কম্যুনিষ্ট পার্টি বা কোনটা সবচেয়ে মিলিটান্ট বা ভাগাভাগির পর কার শক্তি বেশী এ সমস্ত বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা ছিল সমধিক। ফলে, কে কিভাবে কাকে টেক্কা মারবে তার জন্য ছলে, বলে ও কৌশলে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। কাজেই, আসন বন্টনের প্রশ্নে ১৯৬৭ সালে বামপন্থীরা ঐক্যমত হতে পারে নি। ফলে উলফ ও পালফের জন্ম হয়েছিল। বর্তমানে আদি কংগ্রেস ও নবকংগ্রেসের মধ্যে যে বৈরীভাব গড়ে উঠেছে সেদিন দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে শত্রুতা এর চেয়েও অনেক বেশী ছিল। এখন যেমন আদি কংগ্রেস 'প্রতিক্রিয়াশীল', তেমিন সেদিন ছিল ডান কম্যুনিষ্টরা সংশোধনবাদী। তারপর, অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই, কি সংশোধনবাদী কি 'বিপ্লবী' সকলেই এক হয়ে রাজভবনে গিয়ে হাজির হন। দাবী ছিল, উলফ ও পালফ এক হয়েও গেছেন। ফলে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন, অতএব তাঁদের সরকার গড়তে দিতে হবে। আর শ্রীঅজয় মুখার্জিকে ডেকে তখনি তার বন্দোবস্ত করা হোক। সেদিনকার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ইতস্তত করছিলেন, কারণ, নিয়ম হচ্ছে সরকার গঠনের প্রশ্নে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করলেও একক বৃহত্তম দলকে বা তার দলপতিকে ডেকে সরকার গড়তে সক্ষম কিনা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার। এ পন্থা পরিষদীয় গণতন্ত্রসম্মত। শ্রীমতী নাইডু কর্তব্যে অবহেলা করেন নি। কিন্তু সেদিন কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ সদম্ভে বলেছিলেন ১২৬টা আসন নিয়েই কংগ্রেস বিরোধী আসনে বসবে। তাঁর ধারণা ছিল বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী এতগুলো দল একত্রে সরকার চালাতে পারবে না। অতএব, ভেঙেই যাবে। তখন নির্বাচন পুনরায় অনুষ্ঠিত হলে কংগ্রেসকেই জনতা আবার সাদর আমন্ত্রণ জানাবে, আর পরিষদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে উজ্জ্বল। প্রথম ধারণা তাঁর সঠিক হলেও শেষোক্তটি ভুলই প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে দুই ফ্রন্ট ও কিছু

ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট মিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। কিন্তু সেদিনের কংগ্রেস নেতৃবর্গ শ্রীঅজয় মুখার্জির সংগে মিটমাট করে ফেললে হয়ত পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস আজও অপরিবর্তিত থাকত।

এবারও জোট বাঁধার গতি-প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া কোন একটি জোটের পক্ষে কঠিনই হবে। এবারও দুই বামপন্থী জোট কংগ্রেসকে প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন। বাম কম্যুনিস্টরা তাঁদের কৌশলের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাঁরা কংগ্রেস (শ্রীনিজলিংগাপ্পার দলসহ) স্বতন্ত্র-সিণ্ডিকেট-জনসংঘের সমানভাবে বিরোধী। এস এস পি'র সংগে তাঁদের কোন রফা হবে না, কারণ এস এস পি শেষোক্ত দলগুলির সংগে আসনের ব্যাপারে সমঝোতা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁরা কেন্দ্রে কি দুই শক্তিকেই হঠাতে পারবেন? সে শক্তি তাঁদের হবে কি? কিন্তু তবুও রাজনীতিতে তাঁরা বিশুদ্ধবাদী হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যে বিশুদ্ধ লাইন বাম কম্যুনিস্টরা নিয়েছেন তার ফলে এবারকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর তাঁরা নিশ্চয়ই কোয়ালিশনের কথা তুলবেন না।

এসব বক্তব্য বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন কোন মহলে ধারণা, এবারও নির্বাচনের পর দুই বামপন্থী জোট আবার একাত্ম হয়ে যাবে। তাঁদের আশা ফলবতী হবে না—এমন কথা যেমন জোর করে বলা যায় না, তেমনি আশা পূরণ হবে একথাও জোর দিয়ে বলা খুবই কঠিন। কারণ, এবারের অনৈক্য আদর্শগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাম কম্যুনিস্টরা চাইছেন, রাজনৈতিক প্রচারের চাপে তাঁরা অন্য দলকে সরিয়ে সংখ্যাধিক্য পাবেন। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি এই কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত বলেই শ্রীঅজয় মুখার্জির পদত্যাগের পর বাম কম্যুনিস্টদের সংগে মিতালি করে আর সরকার গঠনে ব্রতী হন নি। সরকারে গিয়ে দলীয় প্রভুত্ব বিস্তারে বাম কম্যুনিস্টরা যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন অন্যান্য বামপন্থীরা এমন কি কংগ্রেসও সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ, এটা তাঁদের প্রস্তাবের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাজেই এদিক থেকে অষ্টবাম ও কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস সমমতের অংশীদার।

এই বিভিন্ন চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনটি ফ্রন্টের জন্ম হয়েছে। কিন্তু এত বিভিন্নতা সত্ত্বেও তলে-তলে প্রত্যেকটি জোটই স্থানীয় ভিত্তিতে সমঝোতা করার চেষ্টা যে করছেন তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য, অধিক সংখ্যক আসনে জয়লাভ করা, এবং এই অভিপ্রায় নিয়েই সুযোগ বুঝে রাজনীতির বড়ে চালান হচ্ছে। হালফিল কাশ্মীরের গণভোট ফ্রন্টকে বেআইনী ঘোষণা করার সংগে-সংগে ডান কম্যুনিস্টরা তার নিন্দা করে আসর জমিয়েছেন। এমন কি এই সুযোগে সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেবকে পকেটস্থ করার জন্য তাঁরা উঠে-পড়ে লেগেছেন। বাম কম্যুনিস্টরাও বসে নেই। সৈয়দ সাহেব এখন দিল্লীতে। কিন্তু তাঁর বিবৃতি সংবাদপত্রে পেঁছে গেছে। সৈয়দ সাহেব সেই বিবৃতিতে বলেছেন, কোনো প্রস্তাবিত ফ্রন্টের সংগে তাঁর দল 'ফেডারেশন অফ মাইনরিটি এণ্ড আদার কম্যুনিটিজ' যোগ দেওয়ার কথা আদৌ হয় নি। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, যখন দল গঠন করেন তখনই কাজেম আলি মীর্জার সংগে এক সাংবাদিক বৈঠকে বদরুদ্দোজা সাহেব গদ-গদ কণ্ঠে বলেছিলেন যে, বাংলা দেশের চারটি মহান সন্তানের মধ্যে শ্রীঅজয় মুখার্জি অন্যতম। তাঁর মতে আর তিনজন ছিল—নেতাজী, দেশবন্ধু ও ফজলুল হক সাহেব। তারপর ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে বাংলা কংগ্রেসের সংগে কথা হয় নি এমন নয়। কিন্তু সৈয়দ সাহেব তা অসত্য বলে চালাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অন্য কথাই শোনালেন স্বয়ং কাজেম আলী সাহেব। তিনি বললেন—কথা হয়েছে—সৈয়দ সাহেবও সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, এবং সেকথা দলীয় নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই হয়েছে। সৈয়দ সাহেবের এরকম মতিগতি পাল্টালো কেন? যাই হোক, আখেরে সৈয়দ সাহেব কি করেন দেখা যাক।

আবার আর এস পিকে নিয়েও রাজনৈতিক জটিলতা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবে আর এস পি নেতারা যাই বলুন না কেন—তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রন্টে না গিয়ে ষড়বাম বা বাম কম্যুনিষ্ট পার্টির সংগে আসন ভিত্তিক একটু সমঝোতা করা। কিন্তু বাম কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত তাতে শর্ত আরোপ করে বসলেন। এই শর্ত মানতে আর এস পি রাজী ছিলেন না এমন নয়। তাঁরা শুধু বলেছিলেন সংবাদটা গোপন রাখতে। কিন্তু শ্রীদাশগুপ্ত সেটা প্রচার করে দিলেন। ফলে, আর এস পি নেতারা বিপাকে পড়লেন। কিন্তু এর পরও তাঁদের নিষ্কৃতি দিতে রাজী হলেন না শ্রীসুন্দরায়া। ক্রুদ্ধভাবে জানালেন, কেরালায় আর এস পি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেটা মনে রাখা দরকার। এবং শুধু তাই নয় নতুন করে শর্ত দিয়ে বললেন, সেই কেরালা ইউনিটের বিরুদ্ধে আর এস পি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা পরিষ্কারভাবে বলতে হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর আর এস পি বাম কম্যুনিস্টদের সরকার গঠনে সাহায্য করে নি। স্বাভাবিকভাবেই শ্রীসুন্দরায়ার সন্দেহ জন্মাতে বাধ্য। তা সত্ত্বেও আর এস পি'র কিছু-কিছু নেতা নাকি তাঁদের আসন নিরাপদ করবার জন্য বাম কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে নিজেদের সুহৃদ যাঁরা আছেন তাঁদের সংগে কিঞ্চিৎ কথাবার্তা বলছেন। এটা আঁচ করেই হয়ত শ্রীসুন্দরায়া আর এস পি'র কাছে সোজা-সুজি সব জানতে চেয়েছেন। যা হোক, আর এস পি'র নিরপেক্ষ থাকার ঘোষণা সত্ত্বেও তলে-তলে দলের কতিপয় নেতা যে আলোচনা চালাচ্ছেন তা স্পষ্টই শোনা যায়। এমনি করে তলে-তলে অনেক স্রোতই বইছে। আর এই সমস্ত ফলগু ধারার উপস্থিতি বোঝা যাবে তখনই যখন নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসবে। অষ্টবাম সম্বন্ধেও একথা খাটে। বাংলা ও জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

—সমদর্শী

নন্দিতা মুখোপাধ্যায়

'কৃষি-বিপ্লব' যে আমাদের কালের একটি অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা তাতে আজ আর কারোই বোধহয় সন্দেহ নেই। নানান রকম উপায়ের মাধ্যমে ফসলের ফলন বাড়ানোর প্রচেষ্টা বরাবরই হয়ে আসছে, কিন্তু সে উপায়গুলি ছিল সবই একান্তভাবে প্রকৃতিনির্ভর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির কবলে পড়ে সেই সব প্রচেষ্টা হত নিষ্ফল। কদাচিৎ কখনও পর্যাপ্ত ও সময়োচিত বর্ষণের সহায়তা পেলে তবেই কৃষক তার পরিশ্রমের ফসল নিশ্চিন্ত মনে ঘরে তুলতে পারত।

কিন্তু এ যুগের কৃষি বৈজ্ঞানিকের সাধনায় কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটেছে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অল্প সময়ে বেশী ফসল উৎপাদনের নিশ্চিত উপায় আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। কৃষি-বিপ্লব আজ সারা দুনিয়ায় সাড়া জাগিয়েছে, পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশই পূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ করে খাদ্য সমস্যা প্রায় সমাধান করে ফেলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ঘুম এখনও ভাঙছে না। বিশেষজ্ঞরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন আমাদের দেশের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকার্যের উপায়গুলিকে খুব অল্প জায়গাতেই কাজে লাগান হয়েছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি বিভাগের কর্ণধাররূপে যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকেরই এই নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক ও গবেষণামূলক কৃষিকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। আমাদের সবজান্তা প্রশাসক সম্প্রদায় তাঁদের আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গজদন্ত মিনার থেকে নেমে এসে কৃষি বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পূর্ণ সহযোগিতা না করলে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্য দেশগুলির সঙ্গে তাল রেখে কিছুতেই আমরা এগিয়ে যেতে পারব না।

ভারতের কৃষিজীবীদের সম্পর্কে একটা বদনাম খুবই সুপ্রচলিত, তাঁরা নাকি গতানুগতিক ধারার পক্ষপাতী, তাঁদের পূর্বপুরুষরা যে প্রথায় কৃষি কাজ করে গেছেন সে পথ ছেড়ে ভুলেও নাকি তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থা গ্রহণ করতে চান না। কিন্তু এ বদনাম যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তা বহু ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। নতুন প্রথায় কৃষিকাজ যে সত্যিই অনেক বেশী লাভজনক এ সত্য যে সমস্ত কৃষকেরা স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা এই নতুন প্রথা গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছেন না। গ্রামের কৃষককে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষ করার উপকারিতা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করাতে পারলে তবেই কৃষি-বিপ্লব সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পারবে; তাই এই নতুন আন্দোলনের প্রথম থেকে সেই দিকেই দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

এতদিন জেলা কৃষি কর্মচারীর সঙ্গে সুদূর গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর কৃষকের যোগাযোগের সেতুর কাজটি করতেন গ্রামসেবকেরা। কিন্তু গ্রামসেবকদের কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্তই সীমিত, তা কৃষকদের এই নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলবার পক্ষে একেবারেই যথেষ্ট নয়। কাজেই শুধু তাঁদের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না, কৃষি বৈজ্ঞানিক ও মাঠের কৃষকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেগুলি এই যোগাযোগের পথই সুগম করে তুলছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্মসূচী প্রধানত ত্রিমুখী। শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রসারমূলক কাজ। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিকেরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষিকার্য সংক্রান্ত সমস্ত রকম সমস্যার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকেন এবং তার ফলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারমূলক কাজকর্মের শাখাটি, প্রযোগশালার গবেষণার সুফলগুলিকে মাঠে-ময়দানে কাজে লাগাতে পারেন। প্রত্যেকটি রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যদি সেই অঞ্চলের জল-বায়ু ও ভূমি সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন এবং কৃষকদের মধ্যে সেই গবেষণার ফলাফলগুলি প্রচার করার কাজে যদি রাজ্য কৃষি বিভাগ পূর্ণ সহযোগিতা করেন তবেই কৃষি দপ্তর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষক সমাজের মধ্যে একটি সুদৃঢ় আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং তার দ্বারাই সেই

অঞ্চলের কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটা সম্ভব হবে।

[illegible] কৃষি গবেষণা পরিষদ একটি পরি[illegible] তাতে এক জন কৃষি বৈজ্ঞানিক [illegible] একজন কৃষকের কয়েক বিঘা জমিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফসল ফলিয়ে হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখাবেন পূর্বপ্রচলিত প্রথার তুলনায় এই আধুনিক পদ্ধতিতে কত বেশী পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। সারা দেশের সমস্ত কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলিতেই এইভাবে কৃষিক্ষেত্রে নিজেরা কাজ করে বৈজ্ঞানিকেরা কৃষকদের নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলবেন। রাজ্য কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের সাহায্যে এবং আকাশবাণীর ঘোষণার দ্বারা বিশেষ পদ্ধতি প্রদর্শনের দিনগুলিতে আশে-পাশের সমস্ত কৃষকদের সেই নির্দিষ্ট কৃষিক্ষেত্রের পাশে সমবেত করা হবে, যাতে তাঁরা স্বচক্ষে দেখে অধিক ফলনশীল ফসল চাষের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রত্যেকটি ধাপ ও তার প্রয়োগ-কৌশল শিখে নিতে পারেন।

এই সমস্ত কাজকর্মের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে হবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্য কৃষি বিভাগ ও কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে বেশ একটা সহযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে নি। এই সহযোগিতা গড়ে তোলার ব্যাপারে রাজ্য কৃষি ও পশুপালন দপ্তরের নির্দেশকদের দায়িত্ব যথেষ্ট। তাঁদের মধ্যে একাধারে প্রশাসন ও নির্দেশন ক্ষমতা এবং নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই দু দিকের কোন একটি দিকেই যদি ঘাটতি থাকে তাহলেই কাজকর্ম সুসমঞ্জসভাবে চলতে পারে না। কাজেই ভারত প্রশাসন কৃত্যক (আই-এ-এস) থেকে এসে কোন কর্মচারী যখন কৃষি বিভাগের পরিচালক হয়ে বসেন তখন অনেক সময়েই আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকর্ম সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতার ফলে গবেষণা ও প্রসারমূলক কাজকর্মের অগ্রগতি যথেষ্ট ব্যাহত হয়। কৃষি বৈজ্ঞানিকদের যদি প্রয়োজনীয় প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার কাজে কিছুদিন ট্রেনিং দিয়ে বিভাগ পরিচালনার ভার অর্পণ করা যায় তাহলে মনে হয় রাজ্য কৃষি বিভাগ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষির উন্নতি-কল্পে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে পারবে, আমলাতান্ত্রিক লালফিতার ফাঁসে জড়িয়ে পদে-পদে কৃষির অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে না।

বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীরা অনেক সময়েই সাধারণ কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে অপারগ হন এবং প্রায়ই তাঁদের কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের উপদেশ ও নির্দেশের ওপর নির্ভর করে কাজ চালাতে হয়। যে সব সমস্যা রাজ্যের কৃষি দপ্তরের নির্দেশেই সমাধান হয়ে যাওয়া সম্ভব, সেগুলিও প্রায়ই অযথা বিলম্বের ফলে আরও জটিল হয়ে ওঠে শুধু মাত্র এই কারণে যে, যাঁরা সমস্যার গুরুত্ব বুঝে তার সমাধান করতে সক্ষম তাঁদের হাতে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, আর যাঁদের হাতে আদেশ-নির্দেশ পরিচালনা সব কিছুর ক্ষমতা অর্পিত তাঁদের সমস্যার গুরুত্ব বুঝবার মত প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান নেই। রাজ্য কৃষি দপ্তরের সর্বোচ্চ স্তরে প্রশাসন দক্ষতা এবং প্রযুক্তিকৌশলের মণিকাঞ্চন সংযোগ খুব কমই ঘটে থাকে।

প্রযুক্তিবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে যখন কোন প্রায়োগিক (টেকনিক্যাল) বিভাগের ভার ন্যস্ত হয় তখন কত রকম অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় তার দু-একটি উদাহরণ দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

বেশীদিনের কথা নয়, কোন একটি অনগ্রসর রাজ্যের জনৈক অতিউৎসাহী ডেভেলপমেন্ট কমিশনার হুকুম জারী করলেন সেই বছরের শংকর ভুট্টার সমস্ত ফসল পরের বছরের চাষের জন্য বীজ হিসাবে রেখে দিতে হবে। কিন্তু এই বীজ থেকে চাষ করলে পরবর্তী ফসলে শংকরত্ব আর বজায় থাকবে না এবং সেই কারণে উৎপাদনী শক্তিও যথেষ্ট হ্রাস পাবে. এ কথাটা বুঝিয়ে দেবার মত জ্ঞান যে সব কৃষিবিদ কর্মচারীদের ছিল, তাঁরা কমিশনার সাহেবের দাপটে মুখ খুলতেই পারেন নি।

পূর্বাঞ্চলের কোন একটি রাজ্যে তখন কৃষি বিভাগের নির্দেশকের পদে অনেক [illegible] কর্মচারী. সেই সময় সেখানে অধিক ফলনশীল তাই চুং ধানের চাষে এক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। সমস্ত কৃষি-ক্ষেত্রেই ধানগাছগুলি হলদে ও নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল, স্থানীয় কৃষি কর্মচারী ভেবেছিলেন রোগটা এক রকমের বীজাণুর আক্রমণ, যার আজ পর্যন্ত কোন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই ধান চারাগুলি বাঁচাবার বিশেষ কোন চেষ্টাই হল না। পরে খবর পেয়ে দিল্লী থেকে বিশেষজ্ঞেরা গিয়ে দেখলেন স্থানীয় কর্মচারীরা রোগ নির্ণয়ে ভুল করেছিলেন, রোগটা দুরারোগ্য মোটেই ছিল না। আসলে এক ধরনের পোকার আক্রমণ ঘটেছিল এবং এই আক্রমণের প্রথম অবস্থাতেই কিছু কীট-বিনাশক ওষুধ ছড়াতে পারলেই অধিকাংশ ফসলই বাঁচান যেত। বিপদ হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ রাজ্যেই জেলায় ও গ্রামে কৃষি বিভাগের যে সব কর্মচারীরা কাজ করেন, তাঁরা অত্যন্ত সীমিত ও প্রাথমিক জ্ঞান নিয়েই কাজ চালিয়ে যান। প্রতিদিন যে কত নতুন নতুন আবিষ্কার কৃষি বিজ্ঞানকে কি বিপুল অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছে তার খোঁজ তাঁরা বিশেষ রাখেন না। কৃষির

ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী হাতে পাবার পরই অধিকাংশ কর্মচারী পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়ে দেন। উল্লিখিত রাজ্যটিতে সেই সময় যদি কোন কৃষি বৈজ্ঞানিক কৃষি-নির্দেশকের পদে থাকতেন তাহলে হয়ত ধানের চারায় রোগটি তিনি সূত্রপাতেই বুঝতে পারতেন এবং যথাযোগ্য প্রতিকারও সম্ভব হত।

বহুদিন আগে সেই 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের সময়ও এই রকম বহু গুরুতর ভুল ঘটেছিল। কারণ তখনও প্রশাসন বিভাগ থেকেই এমন বহু কর্মচারী এ ব্যাপারে কর্তা হয়েছিলেন যাঁদের কৃষি-কার্য সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান বিন্দুমাত্রও ছিল না।

জাপানী প্রথায় ধানচাষ নিয়ে কিছু-দিন আগেই যথেষ্ট মাতামাতি হয়েছিল, কিন্তু আশানুরূপ সুফল কিছুই পাওয়া যায় নি। আসল ব্যাপার হয়েছিল এই যে, খাদি গ্রামোদ্যোগের একজন কর্মী জাপান ভ্রমণে গিয়ে এই প্রথায় চাষ দেখে চমৎকৃত হয়ে ফিরে এসে কর্তাব্যক্তিদের জানিয়ে-ছিলেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রসার ও উন্নয়ন দপ্তরের কর্ণধারেরা এই জাপানী প্রথা আমাদের দেশের জল-বায়ুতে সফল হবে কিনা সে বিষয়ে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণা না করেই ব্যাপারটা চালু করে দিয়েছিলেন।

১৯৫২ খৃঃ কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট আন্দোলনের শুরু থেকেই কৃষির উন্নতির জন্য অনেক পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়েছে শুধু অর্থের অপব্যয়, আসল কাজ কিছুই হয় নি। কারণ বেশীর ভাগ প্রকল্পেরই উচ্চতম পদগুলি অলংকৃত করেছেন যাঁরা তাঁদের সঙ্গে গ্রামের কৃষকদের জীবনের সমস্যা-গুলির পরিচয় একেবারেই নেই। কৃষকদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝবার এবং তাঁদের কাছে আধুনিক কৃষি পদ্ধতির বাণী পেঁৗছে দেবার ভার ছিল গ্রামসেবকদের ওপর, যাঁদের নিজেদেরই ঐ বিষয়ে জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

আর একদিকেও আমাদের শৈথিল্য অপরিসীম। আজ পৃথিবীর প্রত্যেকটি উন্নত দেশ অন্যান্য দেশে তাদের দূতাবাস-গুলিতে একজন করে কৃষি বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত রেখেছে যাতে বিশ্বের সর্বত্র থেকে কৃষি বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের খবরটি পেতে বিন্দুমাত্রও দেরী না হয়ে যায়। কিন্তু ভারতের দূতাবাসগুলির মধ্যে একমাত্র রোমের দূতাবাসে একজন এগ্রি-কালচারাল অ্যাটাচি আছেন এবং বলা-বাহুল্য তিনি একজন আই, এ, এস, কর্মচারী। যদি মেক্সিকোর ভারতীয় দূতাবাসে একটিও কৃষি বৈজ্ঞানিক থাকতেন তাহলে এই অধিক ফলনশীল মেক্সিকোর গম আরো দশ বছর আগেই আমাদের দেশে পেঁৗছে যেত, এবং হয়ত ১৯৬৭ সালের দুর্ভিক্ষও এড়ানো যেত। তাশখন্দের লম্বা আঁশের তুলোর খবরও আমরা বহুদিন পাইনি। কারণ রাশিয়া বা জাপানে আমাদের দূতাবাসে কোন উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ ছিলেন না।

সম্প্রতি কোপেনহেগেনে যে আন্ত-র্জাতিক কৃষিশিক্ষা বিষয়ে কনফারেন্স হয়ে গেল তাতে বহু দেশের কৃষিবিশারদরা যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের তরফ থেকে গিয়েছিলেন কয়েকজন আই, এ, এস, কর্মচারী, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত কখনও কৌতুহলের বশেও কোন কৃষি কলেজের ধারে কাছেও যান নি।

আমাদের কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি দপ্তর-গুলিতে কর্মচারীরা পর্বতপ্রমাণ ফাইলের স্তূপ নিয়ে হিমসিম খান। কাগজে কলমে প্রচুর উত্তর প্রত্যুত্তর রিপোর্ট আর নোট লেখার বিরাম নেই, কিন্তু যাঁরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্ষেতে ফসল ফলাচ্ছেন তাঁরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে সেইটিই আসল বিচার্য। আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে প্রধানত তিনটি দিক থেকে। প্রথম হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞতা, দ্বিতীয়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও উপকরণের অভাব, এবং তৃতীয় পর্যাপ্ত অর্থের অভাব। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা খুব একটা নৈরাশ্যজনক নয়। অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করবার জন্য হাজির রয়েছেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক আর বৈজ্ঞানিকের দল; তাঁরা সব সময় রাজ্য কৃষি কর্মচারীদের সহযোগিতা করতে ও কৃষক সমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে প্রস্তুত। আধুনিক কৃষিকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সার, যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি উপকরণ বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত কারখানাতেও প্রস্তুত হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং দেশী, বিদেশী বহু সংস্থা ঋণ দিয়ে আর্থিক সমস্যাও অনেকটা সমাধান করে ফেলেছেন।

এখন এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে কৃষি প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

'অল ইন্ডিয়া এগ্রিকালচারাল সার্ভিস' চালু হবার প্রস্তাব কয়েক বছর আগে নানা বাধার ফলে মুলতুবী রাখা হয়েছিল। কিন্তু সর্বভারতীয় কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনে এই প্রস্তাবকে অবিলম্বে কাজে পরিণত করা প্রয়োজন। কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের চাকুরীরত অবস্থাতে স্বল্পকালীন ট্রেনিং কোর্সের ব্যবস্থা করে সমস্তরকম আধুনিক কৃষিপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দিতে হবে, যাতে তাঁদের ছাত্রাবস্থায় অধিত প্রযুক্তিবিদ্যায় কেবল ফাইল ঠেলতে ঠেলতে মরচে পড়ে না যায়। অবশ্য এইজন্য একটি কেন্দ্রীয় স্টাফ কলেজ স্থাপিত করার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই উঠেছে। এই কাজের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাহায্যও সহজেই নেওয়া যেতে পারে।

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে, কৃষি প্রশাসনের উচ্চতম স্তরে শুধু প্রশাসন দক্ষতাকেই বড় করে দেখলে চলবে না, কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষককেও নেতৃত্ব ও নির্দেশনার ক্ষমতা দিতে হবে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রশাসক-কুলের জ্ঞান এখনও খুব স্বচ্ছ নয়। সেইজন্যই অনেক ক্ষেত্রে রাজ্য কৃষি দপ্তর ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতার ভাবও গড়ে উঠছে না। কিন্তু রাজ্য কৃষি দপ্তর ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরস্পরের পরিপূরক, এই মনোভাব নিয়ে কাজ করে যেতে পারলে তবেই কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে।

## বাঙালীর কর্মসংস্থান

বিষয়টি নিয়ে ভাবা হচ্ছে অনেকদিন থেকেই। বাংলাদেশে বাঙালী যুবকদের সকল কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় কিনা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে লোকান্তরিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলাদেশে বৃহৎ সরকারী শিল্পোদ্যোগ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী অধুনা মৃত আবদুস সত্তার সাহেবও বঙ্গসন্তানদের চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেবার নির্দেশ দিয়ে অনেক অবাঙালী শিল্পপতির বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে অবস্থার ঘটেছে অবনতি। বাঙালী বেকারবাহিনীর সংখ্যা বেড়ে প্রায় ভীতিপ্রদ পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে। এখন তাই আবার নতুন করে চিন্তা শুরু হয়েছে এই বেকার বাঙালী যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুবিধা করা যায় কী উপায়ে।

বাঙালীর কর্মহীনতার জন্য তার পূর্বপুরুষদের উদাসীনতা কম দায়ী নয়। বৃটিশ আমলে বাংলাদেশেই শিল্পের পত্তন হয়েছিল সবার আগে। হুগলী নদীর দুই তীর বরাবর কত কল-কারখানা। কলকাতা ও তার আশেপাশে দেশী বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এই রাজ্যে রয়েছে কয়লাখনি। ইস্পাত শিল্পেও এই রাজ্যে গোড়াপত্তন হয়েছিল অনেক আগেই। তা ছাড়া পাটের কল তো ছিলই। নবশিক্ষিত বাঙালী এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির দখলীস্বত্বভোগকারী বাঙালীর একটা শ্রেণী এই ধরনের কায়িকশ্রমের জীবিকাকে আগে ভালো চোখে দেখত না বলেই পাশের রাজ্য থেকে, বিহার ও ইউ. পি. ওড়িশা ও অন্ধ্র থেকে অদক্ষ শ্রমজীবী মানুষেরা এসে বাংলার শিল্পকর্মে হাত দেয়। গত পঞ্চাশ-একশো বছরে বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণী বলতে এই অবাঙালীপ্রধান শ্রমিকদেরই বোঝাত। এমনকি যে সমস্ত কাজে বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন সামান্য সেই প্রহরী, দারোয়ান প্রভৃতি কাজেও বাঙালীদের আকর্ষণ ছিল না বললেই চলে। আজ দিন বদলেছে। কর্মের জন্য হাহাকার পড়ে গেছে সর্বত্র। বাঙালী তরুণরা কাজের জন্য উৎসুক, কিন্তু কাজ নেই।

রাজ্যের এমপ্লয়মেণ্ট কমিশনার সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, এখন থেকে নতুন কাজে বাঙালীদেরই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কমিশনারের উদ্দেশ্য সৎ এবং বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই নির্দেশ খানিকটা আশার সঞ্চার করবে। কিন্তু শুধু নির্দেশেই কি কাজ হবে? প্রথমত, কাজ কতটা আছে এবং থাকলেও নিয়োগকর্তারা এই বিধান মেনে চলতে বাধ্য কিনা এবং মানবেন কিনা। সম্প্রতি একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি বলেছেন যে, বাঙালী বেকার যুবকদেরই সকলের আগে কাজ দিতে হবে। কিন্তু সব শিল্পপতির মানসিকতা তো একরকম নয়। বাংলাদেশে শ্রমিক অশান্তি বেশি—ধর্মঘট, হরতাল, ঘেরাও এখানে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক লেগে থাকে। এজন্য বাঙালী যুবক কর্মীদের প্রতি একটা বিরূপতা আছে কোনো কোনো মহলে। কিন্তু অবস্থা ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এবং দিনে দিনে বেকার যত সংখ্যা বাড়ছে তত কাজ খালি হচ্ছে না বা নতুন কাজ তৈরী হচ্ছে না। তাই শুধু সরকারী নয়, সরকারী ও বেসরকারী উভয়ের মিলিত উদ্যোগে এই বৃহৎ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। বাঙালীদের মধ্যে একটা 'ভদ্রলোকে'র মানসিকতা আছে। এর ফলে শিক্ষিত বাঙালী ধোপ-দুরস্ত জামা কাপড় পরে টেবিল-চেয়ারে বসে কাজ করতে যতটা উৎসুক, অন্যান্য হাতের কাজে, যাতে শ্রম বেশি, জামা-কাপড় নোংরা হয় বা ঝুঁকি আছে এমন কাজের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই ছিল কম। অর্থাৎ কেরানীর কাজের জন্য ভীড় যত বেশি, কারখানার শ্রমিকের কাজের জন্য ততটা নয়। তবে এখন অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মানসিকতাও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন সব রকম কাজের জন্য বাঙালী প্রার্থী প্রচুর। এবং তারা দক্ষতার সঙ্গেই সব রকম কাজ করতে পারবে, এ বিশ্বাসও জন্মেছে আজকের তরুণদের মনে।

কিন্তু কর্মপ্রার্থী লক্ষ জোড়া হাতের জন্য সমপরিমাণ কাজ কোথায়? এবং প্রত্যেকের শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা না করতে পারলে কর্মসংস্থানের আসল উদ্দেশ্য—সামাজিক স্থিতি কি সহজে আনা সম্ভব ? তাই বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দুটো উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের এগোতে হবে—কর্মসংস্থান এবং শিক্ষিত বেকারের সামাজিক আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ। অবাঙালী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এতদিন বাঙালীদের যে ঔদাসীন্য দেখানো হয়েছে তার ফল কী বিষময়, তা এখন সবাই খানিকটা বুঝতে পারছেন। এই অশান্তি ও উচ্ছৃংখলার অনেকখানি অবসান ঘটানো সম্ভব যদি আমাদের শিক্ষিত তরুণদের যথাযোগ্য কর্মসংস্থান করে দেওয়া যায়। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কমিশনার বাঙালীদের অগ্রাধিকার দেবার নির্দেশ দিয়ে বাস্তব পরিস্থিতিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। এখন বাকী দায়িত্ব পালন করবেন সরকার এবং বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের কর্তাব্যক্তিরা। বাংলাদেশকে বাঁচাবার এই পথকে আর অবহেলা করলে সমূহ বিপত্তিরই সম্ভাবনা।

# তোমারই হোক জয়

# সুভাষ জীবনের দ্বৈতরূপ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বিশ শতকের শুরুতেই আমাদের রাজনীতিক চেতনা প্রথম স্পষ্ট চেহারা নেয় এবং তখনই তা পরস্পর বিরোধী দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। একটা ধারা ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ এবং তা সফল করার জন্যে এক দিকে যেমন দেশের ইতস্তত ছোট-বড় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটতে থাকে, অন্য দিকে তেমনি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সহায়তা লাভের জন্যে আনাগোনাও শুরু হয়ে যায়। আর একটা ধারা ধরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ, আন্দোলন, বিক্ষোভ, সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হতে থাকে একের-পর-এক। সেই সঙ্গেই ঐক্য, অহিংসা ও সংগঠনের আদর্শ প্রচারিত হতে থাকে। এই দুটো ধারা পরোক্ষভাবে অবশ্য একে অন্যের পরিপূরকতা করেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে এরা কেউ কারোকে স্পর্শ করে নি। সুভাষচন্দ্রই প্রথম জাতীয় নেতা, যিনি দুটি ধারাকে একত্র মেলান। তাই তাঁর জীবনে আমরা দেখি একই সঙ্গে অগ্নিযুগের সংগ্রামী পৌরুষ, আবার কংগ্রেসী রাজনীতির সংগঠনী দৃষ্টিভঙ্গী। দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি আমাদের ইতিহাসে অনন্য।

এই অনন্যতার গুণেই তিনি যুব ভারতের অন্তর্লোকে যত বড় শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এমন আর কারোকে হতে দেখা যায় না। ভারতে এমন শহর নেই যেখানে পথে, পার্কে শিক্ষায়তনে তাঁর একটা-দুটো মূর্তি না চোখে পড়ে। সর্বত্র তাঁর নামে পাঠাগার, সংস্কৃতি ভবন, ক্রীড়া-সত্র। সমস্ত মাতৃভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবনী, বক্তৃতা ও রাজনীতিক মত-বাদের ব্যাখ্যান। এমন সর্বাত্মক স্বীকৃতি ও আনুগত্যের মূলে আছে তাঁর আপোষহীন সংগ্রামশীল ব্যক্তিত্ব, সেই সঙ্গেই আছে তাঁর সমৃদ্ধ ও কল্যাণাশ্রিত ভাবী সমাজ গঠনের আদর্শও। আমাদের প্রধানতম রাজনীতিক কর্মপ্রবাহ শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। তাই তাতে চিন্তার ঐশ্বর্য ছিল বরাবরই। কিন্তু ফুটন্ত সংগ্রামের তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক এসে-ছিল শুধু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নায়কদের কাছ থেকে। একাধারে দুদিকের পূর্ণতা হয়েছিল সুভাষচন্দ্রে, তাই রাজনীতিক মঞ্চে আবির্ভূত হবার সঙ্গে-সঙ্গে তরুণ সমাজের অধি-নায়ক হতে পেরেছিলেন তিনি এত অনায়াসে। তাঁর সেই সার্বিক নেতৃত্বের পূর্ণ পরিচিতি এখনো ভাল করে উদ্ঘাটিত হয় নি।

যাঁরা নেতাজী হিসাবে তাঁর সেনাপতির রূপটিকে প্রধান করে দেখেন, তাঁরা ভুলে যান যে, আমাদের আন্দোলনের রাজনীতিকে তিনিই প্রথম গঠনের রাজনীতিতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ সাহাকে ডেকেছিলেন তিনি পূর্ণাঙ্গ একটি জাতীয় পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করতে। তিনি বলেছিলেন, শুধু স্বাধীনতা লাভ নয়, লব্ধ স্বাধীনতাকে জীবনের উপ-যোগীও করতে হবে। সেই সাহা পরি-কল্পনার খবর যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন, নদী নিয়ন্ত্রণ, সার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন, ছোট-ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ কারখানার দ্বারা গ্রাম ভারতের আত্মনির্ভরশীলতা বিধান এক দিকে, অন্য দিকে অতিকায় ইস্পাত কারখানা, মোটর ও বিমান নির্মাণশালা, পারমাণবিক বীক্ষণশালা...দুইয়েরই স্থান সুচিহ্নিত হয়েছিল তাতে, যদিও দ্বিতীয়-টিকে করা হয়েছিল প্রথমটির অনুবর্তী। আগে বিত্ত উৎপাদন, তারপর তার বিনিয়োগ, এই ছিল তাঁর নীতি। দুঃখের বিষয় এই সাহা-সুভাষ পরিকল্পনার শেষার্ধকেই শুধু অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে দেশে। তাই দেশের ধনভাণ্ডার হয়েছে নিঃশেষিত। গ্রামগুলি হয়েছে অরক্ষিত, আর শহরগুলি হয়েছে অতিস্ফীত এবং ভারসাম্য ভ্রষ্ট। এই পরিকল্পনার অপরার্ধে দৃষ্টি দিয়ে এখনো সঙ্কটমুক্ত হওয়া যায় কিনা, সে বিচার বিশেষজ্ঞদেরই করণীয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উজ্জ্বলতম কীর্তি অবশ্য আজাদ হিন্দ সরকারই এবং তার পৃষ্ঠপোষিত আজাদ হিন্দ ফৌজও। ইংরেজ শাসিত ভারতে এই ফৌজই প্রথম বাইরে থেকে ভারতের মাটিতে হানা দেয় এবং পরাধীন দেশের এক প্রান্তে স্বাধী-নতার পতাকা ওড়ায়। ইংরেজের উন্নত

অস্ত্রবলের যুদ্ধে এই অভিযান বেশী দিন আত্মরক্ষা করতে পারে নি যদিও, তবু ১৮৫৭র বিদ্রোহ ছাড়া সামরিক অভিযানের পথে স্বাধীনতা লাভের উদ্যম আর কোন দিন হয় নি বলে, এই গৌরবজনক প্রচেষ্টার সামনে জাতি চিরদিনই মাথা নুইয়ে দেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্স জার্মানীর দ্বারা অধিকৃত হলে, জেনারেল দ্য গল দেশের বাইরে স্বাধীন ফরাসী সরকার স্থাপন করেছিলেন এবং উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো প্রভৃতি তদানীন্তন ফরাসী উপনিবেশে প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করে প্রত্যাক্রমণের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

সে স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে পারেন নি তিনি। ফ্ল্যান্ডার্সে যে প্রত্যাক্রমণ হয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিল রাশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের মিলিত ত্রিশক্তি। তা সত্ত্বেও দ্য গলের দেশপ্রেম, ফ্যাসিস্ট গ্রাসের বিরুদ্ধে জাতির প্রতিরোধ শক্তি জীইয়ে রাখার বলিষ্ঠ প্রয়াস ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ শুধু প্রতিরোধের আদর্শটিই সঞ্চারিত রাখে নি, তাকে কর্মেও রূপ দিয়েছিল। তাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তার দান অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধাবসানের পরই যে ইংরেজ ভারতের মৃত্তিকা থেকে সাম্রাজ্যের কারবার গুটিয়ে সরে পড়েছিল, তার একটা বড় কারণ আজাদ হিন্দ সম্ভূত উদ্দীপনা, যা বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহে, জব্বলপুরের বৈমানিক বিদ্রোহে উত্তর প্রদেশের পুলিশ ধর্মঘটে এবং সারা ভারতব্যাপী রেলপথ ও ডাক-তার ধর্মঘটে রূপ পেয়েছিল। চতুর ইংরেজ বুঝেছিল আর নয়, এবার সরে পড়তে হবে।

অবশ্য আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও জুগিয়েছিল তাকে কিছুটা হুঁসিয়ারী। লাল চীন যখন ইয়াংসী পার হয়ে দক্ষিণে পৌঁছল এবং কুয়োমিনটাং সরকার পিছু হঠতে শুরু করল ফরমোজার দিকে, তখন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা সবাই দেওয়ালের লেখা পড়তে পেরেছিলেন। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, সবাই তখন দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের হাতে রাজ্যপাট ছেড়ে পালানই শ্রেয় বলে বুঝেছিলেন। ইংরেজের ক্ষেত্রে নেতাজীর আজাদ হিন্দ এই বুঝকে ত্বরান্বিত করেছিল। ফরাসীকে দিয়েন-বিয়েন ফুর পর জেনেভা হয়ে পালানর রাস্তা খুঁজতে হয়েছিল। মোটের ওপর বন্দী এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামে নেতাজীর অনুপ্রেরণা ঠিক ততটাই কাজ করেছিল, যতটা করেছিল ১৯০৪ সালে রুশো-জাপান যুদ্ধে পোর্ট আর্থার বিজয়ী এডমিরাল টোগোর দৃষ্টান্ত। একথা কে না জানেন যে,
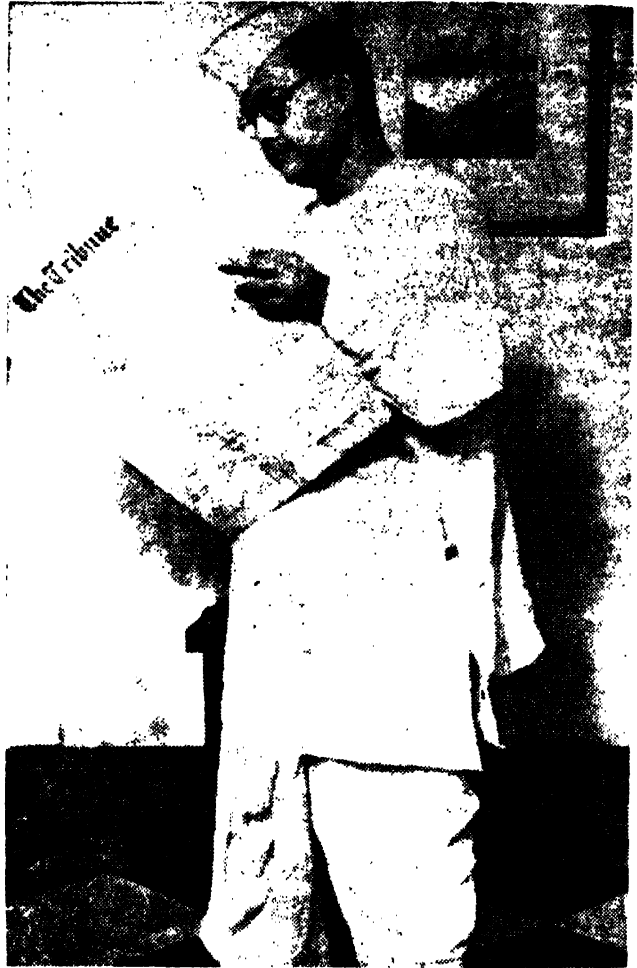
তখন থেকেই ভারতের সন্ত্রাসবাদী তরুণরা জাপানের শরণার্থী হতে থাকেন সামরিক সহায়তার আশায়? নেতাজী এই ধারার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর আগে ছিলেন রাসবিহারী বসু, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, আরো অনেকে।

আজাদ হিন্দের গঠন ও প্রস্তুতিতে জাপানের সাহায্য যাই থেকে থাকুক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতবাসীই এর পিছনে ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকায় এবং তাঁদের 'সুপ্ত দেশপ্রেম জাগিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। তদানীন্তন জাপানের অভিপ্রায় কি ছিল বলা কঠিন। হয়ত ভাল ছিল না, কারণ ব্যারণ তানাকার যে পরিকল্পনা ধরে জাপান কোরিয়া দখল করেছিল, মাঞ্চুরিয়ায় ও চীনে অভিযান শুরু করেছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক দুনিয়ায় একটু-একটু করে থাবা বাড়াচ্ছিল, তার খতিয়ানে ভারতের নামটাও অনুপস্থিত নয়। অবশ্য নিখিল এশিয়ার সমসমৃদ্ধি বলয় গড়ার নামেই এই সর্বগ্রাসের নীতি ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র জাপানের আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করেন নি। ভারতের সংগ্রাম নামক বইয়ে তিনি বলেছেন, নীতি ও আদর্শে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়েও রাশিয়া যদি বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে গাঠছড়া বাঁধতে পেরে থাকে তাহলে ভারত কেন পারবে না বৃটিশের চিরশত্রু জাপানের সঙ্গে হাত মেলাতে? বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ হল নিজস্ব প্রত্যয়ের কথা। তাছাড়া নেতাজী জানতেন চীন ও ভারতকে কবলিত করা জাপানের পক্ষে সাধ্যাতীত। তাই উদ্বেগ বোধ করেন নি তিনি।

## টিরানোসোরাস ॥

বিষ্ণু দে

এশিয়ায় আফ্রিকায়
আদিম ও অতিকায় জন্তুদের মতো
লুপ্ত হবে অচিরেই।

আজও শক্তিমদঅন্ধ, তাই নিজে বোঝো না জানো না
আজ কিংবা কাল ঐ অসমঞ্জস দেহ
সর্বংসহা মাটির তলায় হবে গত
যাথাতুর জন্ধ পৃথিবীতে, শুধু শাবে গোণা
কটা হাড় ছিল কার, কবে, এখানে ওখানে।

কুৎসিত বেয়াড়া যত বেপে শরীর
আর স্থূল হিংস্রতায় চৈতন্যে বীভৎস
অজ্ঞান পশুত্বে পাবে শোকহীন নির্বংশ মরণ।

প্রকৃতির পরীক্ষায় আদিপর্বে পেয়েছিলে
সঙ্গতির অভাবে অস্থির
অপশক্তি, তাই আজও ভাবো চিরজীবী
কিন্তু বৃথা চাও আজ নৃশংস উৎসবে
হতাহত বঞ্চিত সমাজে নিজেদের সূচিকাভরণ।

বয়স্ক বিজ্ঞানে আজ বহু পরীক্ষায় স্থির জানি
অন্তে সেই নিয়ম লঙ্ঘন,
মানি দীর্ঘসূত্র ছিল আমাদের মানবতা এতদিন।
আজ তার ছিঁড়েছে বন্ধন, ছেঁড়ে প্রায়।
সীমাহীন ধৈর্যে জানে তার ক্ষীণ কণ্ঠে তীক্ষ্ম তূর্যে বাজে
সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর সূর্যের ব্যঞ্জনা,
আফ্রিকায় এশিয়ায়।।

## জলের চৈতন্যে কেউ ॥

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জলের ভিতরে ডুবে আছে কত মুখ, কত বিমূর্ত যন্ত্রণা
হাজামজা মাঠ, শৈশবের চিকেমার, বিবর্ণ দুপুর
মাঝে মাঝে পানকৌড়ির মত উঠে আসে জলের উপরে
রৌদ্রস্রোত, শব্দের ইমারতগুলি ভেসে চলে হাওয়ার ঝোঁকায়।

---

আমাদের শোক-তাপ, স্বাচ্ছন্দ, বিবেক জন্মাবধি ডুবে আছে
জলের তলায়, হামাগুড়ি দিয়ে যারা ডুবুরির মত অন্ধকারে
সুখ হাতড়ায়, দুচারটে গেঁড়ি গুগলি উঠে আসে সুখের মতন
অবিবেক ভালবাসা তপ্ত বালি শুষে নেয় নৈকষ্য কুলিন।

কবে আমরা ক্ষণিক চমকে ফুল কুড়াতে চেয়েছিলাম
সর্পিল অরণ্যে
হেমন্ত গোধূলি থেকে বসন্তের স্বভাব-সোহাগে হাতে হাত রাখা
তারপর শিলাবৃষ্টি, বিদ্যুৎ চমক, কোথায় হারিয়ে গেল
গন্ধবহ লজ্জাবতী, তারুণ্যের দিনগুলি বৃষ্টিহীন মেঘের প্রবাসে।

এই বৃক্ষছায়া, তুলসীমঞ্চ, বুকের উষ্ণতা, বারোমাস
নিষ্ফল বন্দনায়
পরিচিত নিপুণ কৌতুকে ডুবে যায় জলের তলায়
[illegible] [illegible] [illegible]রের তাপে দগ্ধ হচ্ছে জীবিকা, সময়
জলের চৈতন্যে কেউ স্বাতী নক্ষত্রের ঝিনুকের বুকে বড় হয়।

**অন্নদাশঙ্কর রায়**

**প্রশ্ন :** চণ্ডীদাসকে নিয়ে বাঁকুড়া-বীরভূমের একটি প্রবাদ আছে অনেকদিনের। এবার উড়িষ্যা গিয়ে শুনলাম জয়দেবকে নিয়েও নাকি দুই প্রতিবেশী প্রদেশে কিঞ্চিৎ রেষারেষি আছে। ভয় হয় অধুনা বীরভূম নিবাসী আপনাকে নিয়েও শ' দু-শ' বছর বাদে এরকম একটা বিবাদের আশঙ্কা আছে। আপনি তো সব্যসাচীর মতো বাংলা ও ওড়িয়া দুই ভাষাতেই কলম চালিয়েছেন?

**উত্তর :** ষোল বছর বয়স থেকে বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত কখনো লিখেছি 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'তে। কখনো লিখেছি 'উৎকল সাহিত্য' ও 'সহকার'-এ। মধ্যে মধ্যে ইংরেজীতে লিখতুম, কলেজ ম্যাগাজিনে বা তার বাইরে। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে ইংরেজীতে সাহিত্যসৃষ্টি করা যায় না, সাংবাদিকতা করা যায় ও সেটাই আমি করব। সাহিত্য-সৃষ্টিও দুই ভাষায় করা যায় না, তার জন্যে বরণ করে নিতে হয় একটিকেই। আমরা মোগল আমলের জমিদার, সেই সূত্রে ওড়িশাকে আপনার করে নিয়েছি। ওড়িশাও আমাদের আপনার করে নিয়েছে। বরণ করে নিতে হলে ওড়িয়াকেই বরণ করে নিতে হয়। রাধানাথ রায় তাই করেছিলেন। আমি কিন্তু উল্টোটি করি।

**প্রশ্ন :** আচ্ছা, প্রথম সাহিত্য পদবাচ্য আপনি যে লেখাটি লিখলেন—অর্থাৎ লেখার ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করলেন—তার ভাষা কি ছিল—ওড়িয়া না বাংলা?

**উত্তর :** সংগ্রহ করে রাখার মতো রচনা প্রথম 'প্রবাসী'তেই বেরোয়। তার আগের কাঁচা হাতের লেখা ওড়িয়াতে শুরু হয়। ওই ছিল আমার স্কুলের ভার্নাকুলার।

**প্রশ্ন :** ভাষা সমস্যার কথা তুলব না। কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছে করে মাতৃভাষা, আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজী—একসঙ্গে এই তিনটি ভাষায় চর্চা ও ব্যবহারে আপনার কোনো অসুবিধে হতো না?

**উত্তর :** স্কুলে যখন আমার সাহিত্যিকতার হাতে খড়ি তেমনি সাংবাদিকবৃত্তি অবলম্বনের সংকল্প। সাংবাদিক হয়ে আমি সারা ভারত, সারা দুনিয়া ঘুরব। তার অবশ্যম্ভাবী মাধ্যম ইংরেজী। ইংরেজীকে আমি সাহিত্যচর্চার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিহার করিনি। বরঞ্চ তার পরিপূরক বলে গ্রহণ করেছি। 'প্রবাসী' যখন আমি সাংবাদিকতার মায়া কাটিয়ে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মায়ায় আবদ্ধ হই। সেখানেই ইংরেজী চর্চা অপরিহার্য। কিন্তু তা বলে আমি তাকে সাহিত্যিকতার বাহন হতে দিই নি। তবে ওড়িয়াচর্চা আমি ইচ্ছা করেই ত্যাগ করেছি। একসঙ্গে অতগুলো ভাষায় হাত দিলে কোনোটাই চলনসইয়ের উপরে উঠত না।

**প্রশ্ন :** আপনাদের বাড়ীতে কি সাহিত্যের আবহাওয়া ছিল? শুনেছি আপনার বাবা ঢেঙ্কানল রাজ এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন আর আপনি ছিলেন বাড়ির বড়ো ছেলে। অনুমান করি অন্যান্য জ্যেষ্ঠদের মতো আপনার উপরেও পড়াশুনোর যথেষ্ট চাপ ছিল। সাহিত্য আলোচনার তাগিদ ও অবকাশ পেতেন কী করে তাহলে?

**উত্তর :** ঢেঙ্কানাল ছিল কোচবিহারের মতো একটি দেশীয় রাজ্য। আমার বাল্যকালে সেখানকার স্কুল ছিল ওড়িশার বাছা বাছা স্কুলগুলোর একটি। রাজারা ছিলেন প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। হেডমাস্টার রাজেন্দ্রলাল দত্ত থিওসফিস্ট। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মনোমোহন ঘোষ ব্রাহ্মভাবাপন্ন। এঁরা সাহিত্যরসিক। বাবাও তাই। বাড়ীতে লাইব্রেরী ছিল। বাবা আমাকে লাইব্রেরীর ভার দিয়েছিলেন। স্কুলের লাইব্রেরীতে গিয়ে পছন্দমতো বইপত্র বেছে নিয়ে বেশীরভাগ সময় পড়তুম বইয়ের পড়া। ইংরেজী ভাষায় সেল্‌ফ এডুকেটর, এনসাইক্লোপীডিয়া, ইতিহাস, জীবনী, বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বই, 'প্রবাসী' প্রভৃতি যাবতীয় বিখ্যাত মাসিকপত্র, মায় 'সবুজপত্র'। ওড়িয়া ভাষায় তখনকার দিনে খুব কম বই কাগজপত্র বেরোত। যা পেতুম পড়তুম। মানচিত্র ছিল আমার নখদর্পণে। প্রাণের বাসনা ছিল আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সাংবাদিক হওয়া। এর জন্যে দায়ী 'মডার্ন রিভিউ' পাঠ।

**প্রশ্ন :** আচ্ছা, প্রথম আপনার লেখা যা ছাপা হয়ে বেরুল তার বিষয়ে আপনার নিশ্চয় মনে আছে? সে বিষয়ে খুব জানতে ইচ্ছে করে।

**উত্তর :** স্কুলের প্রাইজ হিসাবে পাই টলস্টয়ের 'তেইশটি গল্প'। তার থেকে বাংলায় তর্জমা করি 'তিনটি প্রশ্ন'। পাঠিয়ে দিই 'প্রবাসী'তে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারু হস্তলিপি বলে, মঞ্জুর। পরের সংখ্যাতেই দেখি টলস্টয়ের নামের সঙ্গে আমারও নাম। এ যোগাযোগ তখন মনে হয়েছিল আকস্মিক। পরে দেখি চিরস্থায়ী।

**প্রশ্ন :** আপনি তো ম্যাট্রিক পাশ করলেন ১৯২০ সালে—কটক থেকে না? শুনেছি সেই বছরেই আপনার মা মারা যান এবং স্কুলে থাকতে ওড়িয়া মাধ্যমে পড়াশুনো করেও আপনি নাকি পরীক্ষার হলে বসে স্থির করলেন বাংলায় পরীক্ষা দেবেন—পরীক্ষায় আশানুরূপ ভালো করতে পারেন নি বলে আপনি ঘর থেকে পালিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়—উদ্দেশ্য ছিল নাকি সাংবাদিক হয়ে আমেরিকা যাওয়া। সে কথা কি সত্যি? সেই কি ছিল উড়িষ্যা প্রবাসীর প্রথম বাংলা দেশে আসা?

**উত্তর :** ম্যাট্রিক পরীক্ষা ১৯২১ সালে, কটক কেন্দ্র থেকে। সেটা অসহযোগের যুগ, আমি বিচলিত। তৈরি ছিলুম না, গুরুজনের কথায় রাজী হলুম, ভার্নাকুলারের দিন প্রশ্নপত্র বিলি করতে যিনি এলেন তিনি জানতে চাইলেন আমার ভার্নাকুলার কী? বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানো হয়েছে ওড়িয়া, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বাংলা। তিনি বাংলা প্রশ্ন দেন, আমি তারই উত্তর দিই। পরে এ নিয়ে জবাবদিহি করতে হয়। পাশ করি ঠিকই, কিন্তু ফল খারাপ হয়। ইতিমধ্যে মাকে হারাই। কলকাতা যাই সাংবাদিকতা শিখে সুযোগ পেলে আমেরিকা যাত্রা করতে। কাকার আহ্বানে কটকে ফিরে কলেজে ভর্তি হই। হাঁ, সেই ছিল প্রথম বাংলাদেশ দেখা।

**প্রশ্ন :** উড়িষ্যা তো হল পুরী শ্রীক্ষেত্রের দেশ। দেশের ধর্মীয় আবহাওয়ার সঙ্গে কি আপনার কখনো গভীর যোগাযোগ ঘটেছিল?

**উত্তর :** আমরা শাক্ত পরিবার। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর বাবা বৈষ্ণবদীক্ষা নেন ও বাড়িতে গোপাল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায়ই কীর্তন হতো। ছেলেবেলায় আমি ধর্মপ্রাণ ছিলুম। পুরীতেও মাস ছয়েক পড়েছি। ঠাকুমাকে প্রায়ই জগন্নাথের মন্দিরে নিয়ে গেছি। কিন্তু স্কুল থেকে যখন বেরোই তখন আমি ব্রাহ্মভাবাপন্ন সমাজ সংস্কারক। মূর্তিপূজা থেকে, জাতপাত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে আমার মন। বিশ্ববিদ্যা-

দ্বয়ের দ্বিতীয় পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করার সময় ধর্মের ঘরে লিখি, Monotheistic eclectic Hinduism.

প্রশ্ন : আপনি যখন কটক র‍্যাভেনশ কলেজে ভর্তি হলেন তখন তো 'সত্যবাদী যুগের' অবসান ঘটেছে। রাজনীতিক আন্দোলন এসে সাহিত্যের জগতে অধিকার বিস্তার করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তখন ওড়িয়া জাতীয়তাবাদীরা অল্প-বিস্তর বিরূপও ছিলেন নাকি? সেই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভক্ত হয়ে আপনি কী করে কল্কে পেলেন সেই কথা ভাবি। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হিসাবে তখন আপনার উড়িষ্যাজোড়া নাম। কিন্তু ভালো ছাত্র হওয়া আর নতুন একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈরি করে তার নেতৃত্ব করা—এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। এই প্রসঙ্গে 'সবুজ' দলের বিষয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।

উত্তর : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর বিরূপ ভাব যাঁদের মধ্যে ছিল তাঁরা প্রাচীন ওড়িয়া কাব্যসাহিত্যের অন্ধ ভক্ত। 'ছান্দ' তাঁদের মতে ওড়িয়া বৈশিষ্ট্যের শেষ কথা। আধুনিক ওড়িয়া কবিতা ইংরেজী ও বাংলা রীতির, সুতরাং বিজাতীয়। আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের তিন প্রধানের একজন বাঙালী ও দুজন ব্রাহ্ম, তাঁদের পুত্রকন্যাদের বিবাহ বাঙালীদের সঙ্গে। 'পদ্মমালী' উপন্যাসের লেখকও বাঙালী। 'কাঞ্চীকাবেরী' নাটকের লেখকও বাঙালী। 'উৎকলদীপিকা'র সম্পাদকও বাঙালী। 'উৎকল সাহিত্যে'র সম্পাদক ব্রাহ্ম। তাঁর পুত্রকন্যার বিবাহ বাঙালীদের সঙ্গে। এঁদের বাদ দিলে আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যকে খর্ব করা হয়। তাই বিরূপভাব যদি বা ছিল সেটা সীমাবদ্ধ ছিল। আমাকে স্পর্শ করেনি। তবে আমার বন্ধুরা ও আমি 'সবুজ' শব্দটা ওড়িয়ায় ব্যবহার করতুম। সেটা ওড়িয়া শব্দ নয়। আমাদের মতবাদও অত্যাধুনিক। সমালোচকেরা শ্লেষ করে বলতেন 'সবুজ দল।'। 'দল' শব্দটার আরেক অর্থ 'পানা' বা 'শ্যাওলা'। শ্লেষটাই পরে বিশেষত্বসূচক হয়। বন্ধুরা যখন দলবদ্ধ হন তখন আমি পাটনা থেকে লন্ডনে। নেতা আমি নই। শব্দটা হয়তো আমারই দেওয়া।

প্রশ্ন : সেই সময়কার লেখা আপনার কবিতার বিষয়ে ডঃ মায়াধর মানসিংহ কী বলেন শুনেছেন? "His poems, though small in number, are aesthetically among the finest treasures of Oriya Literature."

আচ্ছা, আপনার ওড়িয়া রচনার একটা সংগ্রহ বের করা যায় না?

উত্তর : আমার ওড়িয়া কবিতা বলতে এক ডজন। ওড়িয়া প্রবন্ধ বলতে দু'ডজন। এত কম লিখে আর কেউ এত ভালোবাসা পেয়েছে কিনা জানিনে। সংগ্রহ প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে।

প্রশ্ন : শোনা যায় আপনার 'কমলবিলাসীর বিদায়' বলে কবিতায় ওড়িয়া ভাষা পরিহার করে বাংলা ভাষায় চলে আসার একটা ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। ওই রকম সময়েই তো আপনি কটক ছেড়ে চলে গেলেন পাটনা এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পড়তে পড়তে আই-সি-এস পরীক্ষার রেকর্ড নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। সে তো ঘটেছিল ১৯২৬ সালে না? তারপর কী হলো?

উত্তর : 'কমলবিলাসীর বিদায়' ১৯২৬ সালে লিখে আমি ওড়িয়া সাহিত্য থেকে বিদায় নিই। তার তিন বছর আগেই কটক কলেজ ছেড়ে পাটনা কলেজে ভর্তি হয়েছি। পাটনার চার বছরও আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আমার অধ্যাপক যাঁরা ছিলেন তাঁরা নানা দেশের ও নানা প্রদেশের বিদ্বান। সেখানেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক মিটিং-এ গান্ধীজীকে প্রথম দেখি। সর্বভারতীয় নেতাদের প্রায় সবাইকে একসঙ্গে পাই। ভারতের সঙ্গে পরিচয় গভীর হয়। সচ্চিদানন্দ সিংহের লাইব্রেরীতে বসে ভারতকেও অতিক্রম করি।

প্রশ্ন : বিলেতে আপনি যখন সিভিলিয়ান শিক্ষানবীশ ছিলেন তখন তো ইংলণ্ড ও য়ুরোপে বহু ঘুরেছেন, পাশ্চাত্য দেশের মনোজগৎ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেছেন, আপনার সেই সময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তো 'পথে প্রবাসে' বইখানি লিখেছিলেন, না? আমার মনে আছে 'বিচিত্রা'য় যখন এ লেখা ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় তখন ছাত্র-মহলে, সাহিত্যিক মহলে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বই আকারে 'পথে প্রবাসে' তো বের হয় ১৯৩১-এ। যদিচ এ বই লিখেই আপনার প্রথম সাহিত্যিক খ্যাতি, আপনার প্রথম যে বই সে তো প্রবন্ধের বই, 'তারুণ্য' তার নাম, বেরিয়েছিল ১৯২৮ সালে। কেমন, ঠিক কি না? তিনদিনে তো আপনি সিভিলিয়ান হয়ে দেশে ফিরলেন, আর কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন বাংলা দেশ। স্থির করলেন আপনার সাহিত্য সৃষ্টির বাহন হবে মাতৃভাষা। লোকে বলে নিজের নামে লেখা প্রকাশে সরকারী বাধা ছিল বলে নাম নিয়েছিলেন 'লীলাময়'। আচ্ছা এ নামের সঙ্গে কি আপনার স্ত্রী লীলা দেবীর নামের কোনো যোগাযোগ আছে?

উত্তর : বিলেতে আমি ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ এই দু'বছর ছিলুম। এর ফলশ্রুতি কেবল 'পথে প্রবাসে' ও 'তারুণ্য' নয়, এই দু' বছরের ফ্রেমে বাঁধা আরো বারো বছর ধরে লেখা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত 'সত্যাসত্য'। ইউরোপের সঙ্গে ভারতকে মিলিয়ে নেবার এ সুযোগ না পেলে আমি বাংলা সাহিত্যের আসরে অত সহজে আসন করে নিতে পারতুম না। এরই মতো আর একটি সুযোগ সিভিলিয়ান হয়ে বাংলাদেশে নিযুক্তি। ধরুন, যদি আমাকে বিহারে চাকরি করতে হতো তাহলে আমি মাঝে মাঝে কলকাতা এলেও তার বাইরে দেখতুম বড়জোর দার্জিলিং আর শান্তিনিকেতন। কিন্তু অবিভক্ত বঙ্গের যতখানি দেখেছি ততখানি দেখবার সুযোগ পেতুম না। সরকারী বাধা ছিল বলে ছদ্মনাম ধারণ করি 'লীলাময় রায়'। তার এক বছর পরে যাঁর সঙ্গে দেখা তিনিই আমার সঙ্গে চরণ মেলাবার জন্যে নাম নিলেন 'লীলা রায়'।

প্রশ্ন : আচ্ছা, সিভিলিয়ান হিসেবে আপনার প্রথম কর্মক্ষেত্র তো ছিল পদ্মার ওপারে রাজশাহী জেলার নওগাঁ সাবডিভিসনে—না? সেখানে গিয়েই তো আপনি 'ছিন্নপত্রে'র, 'গল্পগুচ্ছে'র দেশে গিয়ে পড়লেন—ছেলেভুলানো ছড়া ও বাউল গানের রাজত্বে। বোধকরি 'হারামণি'র মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে সেইখানেই আপনার আলাপ। তারপর শুনেছি ২১ বছরের কার্যকালে ২১ বার আপনি বদলী হয়েছেন, সংযুক্ত বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরেছেন কখনো মহকুমা শাসকরূপে কখনো বা জজ হয়ে। এও শোনা যায় যে ব্রিটিশ কর্তারা খানিকটা ইচ্ছা করেই আপনাকে বেশিদিন এক জায়গাতে তিষ্ঠোতে দেননি। উড়িষ্যায় থাকতে

আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন প্রখ্যাত গান্ধীবাদী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী—তাঁর সংসর্গ দোষে আপনার নাকি স্বদেশী ছোঁয়াচ লেগেছিল। তাহলে তো পরিস্থিতি বেশ সংকটজনক হয়ে থাকবে নিশ্চয়। ইংরেজ আপনাকে বলেছে স্বদেশী ভক্ত—আর স্বদেশীরা আপনাকে অপবাদ দিয়েছে আমলাতন্ত্রের সিভিলিয়ান দালাল বলে। আপনার তখনকার কর্মজীবন বিষয়ে দু-চার কথা জানতে ইচ্ছা করে।

উত্তর : চাকরির প্রথম স্টেশন বহরমপুর। শেষ স্টেশন কলকাতা। একুশ বছরে একুশবার বদলী। তবে এটা ইচ্ছে করে নয়। ঘটনাচক্রে। রাজশাহীর নওগাঁ আমার প্রথম মহকুমা। রবীন্দ্রনাথের পতিসর সেইখানেই। মনসুর উদ্দীন সাহেবের সঙ্গে নওগাঁতেই আলাপ। কুষ্টিয়া মহকুমাতেও কাজ করেছি। সেখানে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ ও লালন ফকিরের আস্তানা। পদ্মাকে পাই সেখানে ও রাজশাহীতে যখন আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। পদ্মা ও মেঘনাবক্ষে ভেসে চট্টগ্রামে যাই, সেখানে পাই সমুদ্রকে আর কর্ণফুলীকে। তেমনি ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রকে। ঢাকায় বুড়িগঙ্গাকে, কুমিল্লায় গোমতীকে। পূর্ববঙ্গ যে পর হয়ে যাবে তখন তো জানতুম না, জানলে আরো বেশী করে দেখতে চেষ্টা করতুম। তবে আবহাওয়া ১৯৩৭-এর পর থেকে গরম হতে আরম্ভ করে। তার আগে পর্যন্ত চলছিল ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের অহিংস বা সহিংস সংগ্রাম। আমি ছিলুম ইংরেজ শিবিরে। নবদা ভারতী শিবিরে। দুই শিবিরের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। দেশের লোক তো আমাকে ভুল বুঝবেই। তেমনি ইংরেজরাও কখনো কখনো কী-পোস্ট দেয়নি। ওরই মধ্যে একটু ভালো যা দিয়েছে তাও সাময়িকভাবে। বাংলাদেশে একটা সংগ্রাম সারা হতে না হতে আরেকটা সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের। এটার পদ্ধতি আইন অমান্য বা সন্ত্রাসবাদ নয়। এটার পদ্ধতি দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঠান্ডা লড়াই, কারণে অকারণে ঝগড়া। আবার দুই শিবির। এক শিবিরে না এক শিবিরে সব ভারতীয় কর্মচারীদের ভিতরে ভিতরে ভিড়ে যেতে হয়। পার্টিশন হলো বলে এটা হলো, বাইরে থেকে দেখলে সেইরকমই মনে হবে বটে, কিন্তু প্রকৃত কথা, এটা হলো বলেই পার্টিশন হলো। আমাকে জজ করে দেওয়ায় আমি ব্যথিত হয়েছি, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট করলে আরো ব্যথা পেতুম। তাহলে দুই পক্ষই আমাকে ভুল বুঝত। জজ হয়ে সঞ্জয়ের মতো দূর থেকে দেখেছি তিন তিনটে এপিক সংগ্রাম, নাৎসীদের সঙ্গে গণতন্ত্রী তথা সমাজতান্ত্রিক শক্তিদের, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের, জাতীয়তাবাদী তথা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের। মহাযুদ্ধে জয়লাভ করলেও ইংরেজের আর সে বল ছিল না, সে মানে মানে সরে গেল। তেমনি সমগ্র দেশের জন্য সংগ্রাম করে থাকলেও কংগ্রেসের সারা ভারত আয়ত্তে রাখার মতো বল ছিল না। সেও এক ভাগ ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দিল। তেমনি সারা বাংলা দেশের জন্য হামলা করে থাকলেও মুসলিম লীগের সারা বাংলা আয়ত্তে রাখার মতো বল ছিল না। সেও একভাগ নাচার হয়ে ছেড়ে দিল। এই শোচনীয় অধ্যায় যখন সমাপ্ত হলো তখন উপলব্ধি করলুম যে আমি একটা বৃহৎ শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে বৃহৎ ভারত ও বৃহৎ বঙ্গ দর্শন করেছি। এমনটি আর কেউ কোনোদিন দেখতে পাবে না। এক স্টেশনে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অফিসার মিলে মিশে কাজ করা ইতিহাসে ওই শেষ। এলটা মিশ্র প্যাটার্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

প্রশ্ন : তারপর ১৯৪৭ এল। দেশ দুখণ্ডে ভাগ হয়ে হলো ভারত ও পাকিস্তান, রক্তের বন্যা বইল বাংলায়, বিহারে, পাঞ্জাবে, সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর কঠিন চেষ্টায় গান্ধীজী প্রাণ দিলেন। কবি ও লেখকরূপে আপনার স্পর্শকাতর মনে এসব ঘটনার প্রভাব পড়েছিল নিশ্চয়। খুব সম্ভব এই কারণেই আপনি নির্দিষ্ট কার্যকালের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার প্রায় বছর চোদ্দ আগে সিভিল সার্ভিস থেকে ইস্তফা দিলেন। তারপর তো ১৯৪৯ সালে চলে এলেন এই শান্তিনিকেতনে। পুরী না দার্জিলিং কালিম্পং নয়, এই রোদে পোড়া লালমাটির দেশে কেন যে বাকী জীবন কাটাতে এলেন, কেনই বা স্বর্ণসুখের সোনার চাকরি ছেড়ে দিলেন—এসব প্রশ্ন নিয়ে অনেকেই কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ করে থাকেন। আশা করি আপনি এসব প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার নিরসন করবেন।

উত্তর : আমার সাহিত্য ইতিমধ্যে মাথায় উঠেছিল। লিখতে সময় পাইনে, সময় পেলেও প্রেরণা পাইনে। গভীর অস্বস্তির মধ্যে পার্টিশনের পূর্বের ও পরের কয়েক বছর কেটেছে। আবার আমাকে বরণ করতে হবে দুটোর থেকে একটা। চাকরি না সাহিত্য - দুই হাতে দুই ঘোড়ার লাগাম ধরে সার্কাস দেখিয়েছি আমি। কিন্তু বেশীদিন পারতুম না। প্রকৃতি আমাকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে একটার জন্যে আরেকটা ছাড়তে হবে, নইলে অকালে সার্কাস সাঙ্গ হবে। চাকরি ছাড়ার কথা চাকরির গোড়া থেকেই ভেবেছি, ছাড়িনি তার প্রথম কারণ সাহিত্য করে সংসার চলত না, সাংবাদিকতা করলে সাহিত্য চলত না। ইংরেজ যাবার সময় স্থির হয়ে যায় যে আনুপাতিক পেনসন আমরাও পাব, যদি অকালে অবসর নিই। অকালে দেহত্যাগের চেয়ে অকালে চাকরিত্যাগ ভালো নয় কি? নইলে করতে হতো সাহিত্যত্যাগ। একদিন চাকরির মায়া কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসি ১৯৫১ সালে। তার উপর সেই ১৯২৪ সাল থেকেই একটা টান ছিল যেবার প্রথম দেখি। নিজে ছাত্র হতে পারিনি, ছেলেমেয়েদের ছাত্রছাত্রী করে দিই। এখন ওরা বড়ো হয়ে অন্যত্র চলে গেছে। আমরা দুটি প্রাণী বাকী। বাকী জীবনটা যে এইখানেই কাটাব এমন কোনো স্থিরতা নেই।

প্রশ্ন। এবার আপনার সাহিত্যকর্ম বিষয়ে দু-চার কথা জিজ্ঞেস করব। আপনি তো কবিতা লিখেছেন, ছড়া কেটেছেন, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস প্রচুর লিখেছেন। কোনোকালে নাটক লিখেছেন কিনা জানি না। আত্মপ্রকাশের এই যেসব বিচিত্র মাধ্যম—এর মধ্যে কোন রাস্তা আপনার দিক থেকে সবচাইতে প্রশস্ত মনে হয়।

উত্তর। উপন্যাসের মাধ্যমে যত কথা বলতে পারা যায় তত আর কোনো মাধ্যমে নয়। কিন্তু আর্ট হিসাবে কাব্য ও নাটক আরো উঁচু। পারলে নাটকও লিখতুম, লিখেওছি, কিন্তু কবিতা আমি পারি। সাধ্যের অতীত নয়, অথচ আর্টকে রয়েছে। ওতেই আমার সবচেয়ে তৃপ্তি। কিন্তু যাই লিখি না কেন, ছড়া বা প্রবন্ধ বা গল্প প্রত্যেকটি আমার কাছে আর্ট। আর্ট মুক্ত করে।

প্রশ্ন। আপনি তো বেশ অনেক বছর ধরে লেখার ব্যাপারে যান্ত্রিক, অর্থাৎ হাতে না লিখে টাইপরাইটার ব্যবহার করেন। লিখেছেনও প্রচুর। আচ্ছা, এত লেখা উৎপাদনের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ যান্ত্রিকতার ছোঁয়াচ এসে যায় না কি? আপনার সৃষ্টিকর্মের ধরণধারণ, নীতিপদ্ধতি, লেখকরূপে আপনার দিনচর্যা এসব নিয়ে অনেকে কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ করে থাকেন। এবিষয়ে আপনার নিজের কথাটুকু জানতে ইচ্ছা হয়। আপনি কি চরিত্র ও ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, সূচনা ও পরিণাম ইত্যাদি সব কথা আগেম স্থির করে ধরাবাঁধা রাস্তায় প্ল্যানমাফিক চলেন? কর্মজীবনে থাকতে এত সব লেখার সময় বা অবসরই-বা পেতেন কেমন করে? এত শত লেখার মালমশলা অভিজ্ঞতাই বা কোথা থেকে পেলেন?

উত্তর। টাইপরাইটারে লিখলে কপি তৈরি করার পরিশ্রম বাঁচে। টাইপরাইটারে বার্নার্ড শ লিখতেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখতেন। যন্ত্রে লিখলেই যান্ত্রিক হয় না। যান্ত্রিক হয় যদি ফরমুলা অনুসারে লেখা হয়। আমি প্রত্যেকটি গল্প উপন্যাসের জন্যে নতুন করে ভাবি, প্রত্যেকটি লাইনের জন্যে শব্দের জন্যে মাথা ঘামাই। এটাও আমার কর্মজীবন। অবসর মানে সরকারী কর্মচারীর অবসর, সরস্বতীর সেবকের নয়। সরকার আমাকে হপ্তায় একদিন ও বছরে কয়েকদিন ছুটি দিতেন। সরস্বতী তাও দেন না। আমি পুরো সময়ের লেখক হতে চেয়েছিলুম, পুরো সময়ের লেখক হয়েছি। স্বাধীন লেখক হতে চেয়েছিলুম। স্বাধীন লেখক হয়েছি। কাজে ফাঁকি দিতে চাইনি, কাজে ফাঁকি দিইনে। কী পরিমাণ পরিশ্রম এক একটি রচনার পিছনে আছে পাঠকদের বোঝানো যাবে না। তাঁরা এক বছরের পথ একঘণ্টায় অতিক্রম করবেন। কষ্ট করে বুঝতে চাইবেন না। যত লিখি তার চেয়ে না লিখি ঢের বেশী। ছাঁটাই করা পৃষ্ঠাও

জমতে জমতে বইয়ের সমান হয়। কোথায় শুরু করব, কোথায় শেষ করব, স্টাইল কী রকম হবে, ভাষা কী রকম হবে, টেকনিক কী রকম হবে এসব স্থির না করে আমি শান্তি পাইনে। তবে সব কিছু অগ্রিম স্থির করা যায় না। লেখার একটা মস্ত সুখ হচ্ছে সারপ্রাইজ। আমার হাতে কলম, কিন্তু লেখা আপনাকে আপনি লিখিয়ে নেয়। এক একটি বই এক একটি আশ্চর্য। সৃষ্টির আনন্দের মতো আর কী আছে? এই যে ক্ষমতা ভগবান আমাকে দিয়েছেন এটার সদ্ব্যবহার করে আমিও কিছু দান করে যাচ্ছি।

প্রশ্ন। এই পর্যন্ত আপনি যেসব বই লিখেছেন তার মধ্যে সৃষ্টিকর্মের দিক থেকে কিংবা রচনাশৈলীর দিক থেকে কোনটি আপনার সবচেয়ে পছন্দ? 'বিনুর বই'-এর মতো এমন আপনার আর কোন কোন লেখা আছে কি যার মধ্যে দিয়ে আপনি আপন কথা বলেছেন?

উত্তর। ইংরেজরা যেমন বলে আমিও তেমনি বলি, আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমার কোনো প্রিয়পাত্র নেই। বহু প্রবন্ধে আমার আপন কথা বলেছি। 'বিনুর বই' মোটামুটি আমারই লেখকজীবনের কথা।

প্রশ্ন। লোকে বলে যেসব মনস্বী, সাধক ও শিল্পী আপনার ব্যক্তিগত ও সাহিত্য-জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন তলস্তয়, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। এ বিষয়ে আপনার নিজের কথাটুকু শুনতে চাই।

উত্তর। আমার লেখকজীবনের প্রথম থেকে আজ অবধি দুটি জিজ্ঞাসা আমাকে অহরহ ব্যাপৃত রেখেছে। সত্যজিজ্ঞাসা ও রূপজিজ্ঞাসা। আমি যদি রূপদক্ষ না হতে চাইতুম তবে দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা আমাকে দগ্ধ করত না। কিন্তু আমি যেহেতু আমি সেহেতু আমি প্রথম জিজ্ঞাসায় জর্জর। একটি না একটি জিজ্ঞাসা আমাকে নিয়ে গেছে দেশবিদেশের সাধক ও মনস্বী ও শিল্পীদের কাছে। টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী এই ত্রয়ী আমাকে সবচেয়ে বেশী শিখিয়েছেন। আর যাঁদের কাছে গেছি তাঁদের একজন রমাঁ রলাঁ, একজন প্রমথ চৌধুরী। রচনা কেমন করে রূপবান হবে এ ভাবনা তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি। গতানুগতিকের উপর বিরাগ 'সবুজপত্র'ই ধরিয়ে দেয়। বাউল বৈষ্ণব সহজিয়ার প্রতি আমার একটি আত্মীয়তাবোধ আছে। এঁদের কাছেও আমি গেছি আমার জিজ্ঞাসা নিয়ে। উত্তর পেয়েছি মিস্টিক ভাষায়।

প্রশ্ন। সাহিত্যজীবনে যেমন আপনাকে নিগ্রহ সইতে হয়েছে তেমনি নিশ্চয় পুরস্কারও পেয়েছেন অনেক। মৌচাকে ঢিল আপনি তো খুব কম ছোড়েন না। আবার হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ বিস্তর শুনিয়েছেন। এবিষয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।

উত্তর। গোড়া থেকেই আমার ব্রত জীবনে আপস করলেও আর্টে আপস করব না। তা বলে গায়ে পড়ে আঘাত করতেও চাইনে। আমি স্বভাবত নির্বিবাদী। অথচ আমার লেখনী আমাকে বারবার কী বিপদেই না ফেলেছে! আর কেউ না করলে আমাকেই করতে হয় অপ্রিয় কৃত্য।

প্রশ্ন। আপনি তো বৃহত্তর জীবন থেকে সরে এসে শান্তিনিকেতনে একান্তে বসবাস করছেন। অথচ সাহিত্যের মূলে উদ্দেশ্যই হলো মন দেয়ানেয়া। শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেলামেশার আপনি কি খুব সুযোগ পেয়েছেন?

উত্তর। শান্তিনিকেতনে আপনাদের সহযোগিতায় 'সাহিত্য মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। আমার আহ্বানে পূর্ব পাকিস্থান থেকে কয়েকজন সাহিত্যিক এসে পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলিত হন। পূর্বপশ্চিম সাহিত্যিক সমাবেশ সেই প্রথম। পরে বাধা পাই। আপাতত সেই শেষ। বরাবরই আমি আন্তর্জাতিক পি-ই-এন সংস্থার ভারতীয় কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। পি-ই-এন'এর সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও জাপানে গেছি। সাহিত্য আকাদেমি যখন দিল্লীতে প্রতি-ষ্ঠিত হয় তখন তার উপর মহলে আমিও ছিলুম। বছর পাঁচেক সেই উপলক্ষে দিল্লী যাতায়াত করতে হতো। জবাহরলাল, রাধা-কৃষ্ণন্, আজাদ্ প্রভৃতির সঙ্গে বসে ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশ লক্ষ করেছি। সাহিত্য আকাদেমির সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহুদিন পূর্বেই ছিন্ন হয়েছে। তার দায়িত্ব বহন করতে সময় পাইনি। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়তে চাইনি। মাঝে মাঝে যোগ রেখেছি।

প্রশ্ন। সংসারজীবন ও সাহিত্যজীবনের মধ্যে যিনি সমন্বয় করতে পারেন—আপনি তাঁকেই হয়তো বলেছেন জীবনশিল্পী। আপনার নিজের জীবনকে এভাবে শিল্পিত করে তোলার প্রয়াস কতটা সফল হয়েছে—আপনার মুখেই জানতে ইচ্ছা করি।

উত্তর। জীবনটাই যাঁর কাছে একটা শিল্পকর্ম তাঁকেই বলি জীবনশিল্পী। তিনি হয়তো শিল্পীই নন। যেমন গান্ধীজী। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শিল্পী তথা জীবন-শিল্পীর মিলন দেখেছি। এরকম কদাচিৎ চোখে পড়ে। আমার কথা যদি বলেন, আমারও আদর্শ তাই, কিন্তু একদা এ নিয়ে যেমন যত্নবান ছিলুম এখন তেমন নই। অকল্পনীয়, অপ্রত্যাশিত ঢেউ এসে আমাকে ধাক্কা দিয়েছে, জীবনটাকে ঠিক করতেই আমি ব্যতিব্যস্ত। সেইসঙ্গে সাহিত্যপ্রয়াস-কেও। জীবনকে জীবনের মতো, শিল্পকে শিল্পের মতো করি আগে। তারপরে জীবনকে শিল্পকর্মের মতো করার কথা ভাবব। নিজের সীমা বুঝতে পারাই বিজ্ঞতা।
(১৯৬৫)

---

এই সাক্ষাৎকার আংশিকভাবে বেতারে প্রচারিত হয়। এখন পূর্ণভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। উত্তর স্থলে স্থলে পরিবর্তিত হয়েছে। ক্ষিতীশ রায় প্রশ্নকর্তা।
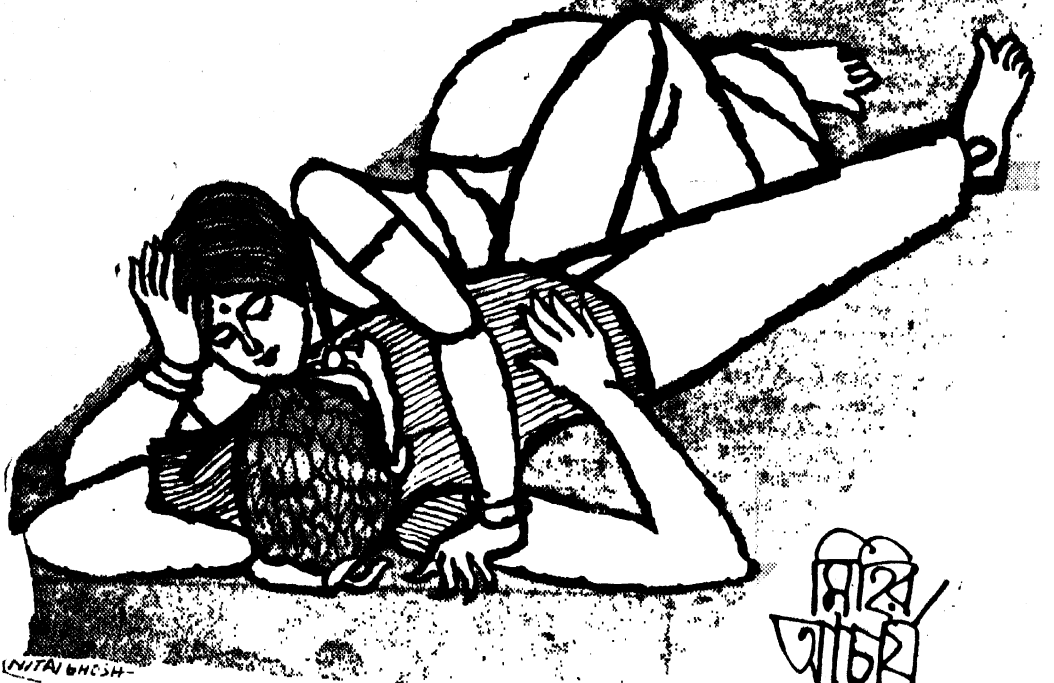
হেডমিসট্রেস কমলাদি আবার বললেন : 'ভেবে দেখো, এই দুদিনে চাকরিটা ছেড়ে দিলে ভবিষ্যতে অর্থকষ্টে...'

মিনতি হেসে বলল : 'আমার কোন উপায় নেই কমলাদি। এই ছ' বছর অনেক ভাবলাম। এ হয় না সম্ভব নয়। আর্থিক অভাবটা দূর করতে গিয়ে আমি যে নিঃস্ব অর্থহীন হয়ে পড়ছি। অনেক সময় দস্তুর মতো নিজেকে ভীষণ স্বার্থপর লাগে। হয়তো সংসারের দায়িত্ব এড়াতেই আমি পালিয়ে এসেছি। সুকুমারের প্রতি আমার অনেক কর্তব্য আছে। দূরে থেকে আমি তা পালন করতে পারি নে।'

'কিন্তু সুকুমারবাবু তো শুনেছি সামান্য চাকরি করেন। ওঁর একার রোজগারে...'

'কী মানে হয়? বাস্তব ক্ষেত্রে ওর সংসার আর আমার সংসার তো এক হতে পারছে না। আমি মেয়ে নিয়ে এখানে ও ছেলে নিয়ে ওখানে। ওর সংসারের বাজেট আমার সংসারের সঙ্গে এক নয়। ও যা একা, তাই। তাহলে কোন্ সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ওর বা আমার আত্মত্যাগ। মানুষ তো নিছক পয়সা রোজগারের যন্ত্র নয়, কমলাদি।'

কিন্তু সুকুমারবাবু কী তোমার এই সিদ্ধান্তে সুখী হবেন?

মিনতি বলল : 'আরো কয়েক বছর আগে হলে হত। এখন আর হবে না।'

'তবে? ভেবে দ্যাখো।'

'সেইটেই তো চিন্তার কারণ হয়েছে। আমি ওর কাছে প্রয়োজনহীন হয়ে পড়ছি। আরো কয়েক বছর গেলে আমি ওর চেতনা থেকে একেবারে বাতিল হয়ে যাব। সে-লজ্জা সে-দুঃখ মেয়ে হয়ে আমি সহ্য করতে পারব না।'

'তারচেয়ে ছুটি নিয়ে যাও। দ্যাখো মানিয়ে নিতে পারো কিনা। দরকার হলে ফিরে আসবে। নতুবা চাকরি ছেড়ে দেবে।'

মিনতি বলল : 'তাহলে আর আমি কোনদিন এই বন্ধন থেকে উদ্ধার পাবো না। ইতিমধ্যেই আমি অভ্যেসের দাস হয়ে পড়েছি। এই আত্মম্ভরতা, এই অনায়াস স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা আমাকে অনেকখানি কাবু করে ফেলেছে। ফিরে গিয়ে আমার সংসারে ছেলে মেয়ে স্বামীর প্রয়োজনে নিজেকে আটকে রাখতে পারব কিনা সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট দুর্ভাবনা আছে। শুধু আমাকে চেষ্টা করতে হবে।'

কমলাদি হেসে বললেন, 'তাহলে আর তোমার ইউনিভার্সিটির ডিগ্রির মানে কী হল? কী কাজে লাগল?'

মিনতিও হাসল। 'কেন? আমার ছেলে-মেয়েদের দেখতে পারব। আলাদা টিউটর

তো রাখা যাবে না? আর যদি নেহাতই দরকার হয় কলকাতায় কী চেষ্টা-চরিত্তির করে একটা চাকরি জোগাড় করা যাবে না?'

রমলাদি বললেন, 'বুঝেছি। তুমি স্বামীকে ছেড়ে থাকতে চাও না, এই তো?'

মিনতি বলল : 'দিদি, এই ইচ্ছেটা কী খুব অন্যায় হবে? বিয়ে যখন করেছি, আমরা আলাদা থাকব কেন? দেখলাম তো কোন লাভ হল না। মাঝে-মাঝে ওকে সাহায্য করেছি। এই সাহায্য করার অহংকারটা আমাদের দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ওর কাছে আমি টাকা পাঠানোর অঙ্ক ছাড়া কিছু নই। এই আর্থিকতার গন্ধটাই বিশ্রী।' একটু থেমে : 'বেঁচে-থাকা মানেই দায়িত্ব নেয়া। সেটা উপযুক্ত সন্তানের দরিদ্র বাবার কাছে টাকা সাহায্য করার ব্যাপার নয়। আমার অসুখ-বিসুখ হলে কিম্বা মেয়ের, তখন মনে হয় আমাদের জন্যে কারুর কিছু করার নেই. ডাক্তার দেখান থেকে ওষুধ-খাওয়া পর্যন্ত আমাদেরই করতে হয়। ঈশ্বর না করুন, যদি আমার মেয়েরই কিছু একটা হয়ে যায়, আমি ওর বাবার কাছে কী জবাবদিহি করব? কিম্বা আমার স্বামীই যদি অসুস্থ হন, এই তো সেবার ওর টাইফয়েড হল, আমাকে জানান নি পর্যন্ত...'

'তোমার চাকরি করতে আসাই উচিত হয়নি।'

'ভেবেছিলাম পারব। দেখলাম পারব না। সুখের চেহারা একেকজনের কাছে একেক রকম।'

'এইতো সান্ত্বনা, যূথী, জয়া। ওরা...'

মিনতি বলল : 'ওদের মনের কথা কী আমরা জানি রমলাদি? বেঁচে থাকার সর্বসাধারণের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট ছক নেই দিদি। সেইখানেই ভুল হয়। একদা ভেবেছিলাম বাইরে থেকে কিছু টাকা আনতে পারলেই সংসারের মুখ উজ্জ্বল হবে। চিন্তাটা সর্বজনীন। ব্যক্তিবিশেষের সীমাবদ্ধতার দিকটা তখন আমি ভাবিনি। কেউ পারে কেউ পারে না। সকলের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো ছক নেই।'

রমলাদি বললেন, 'দ্যাখো তুমি কী করবে। তবে বছরের মাঝামাঝি, মেয়েদের কথা ভেবে...'

মিনতি বলল : 'চিন্তা যখন শেষ হল, বছরের মাঝামাঝি এসে পড়লাম। কী করব? বড় মেয়েরা জানবে, ওরাও তো একদিন আমারি মতো সমস্যায় পড়বে। আমি ওদের কাছে কোনোদিন শিক্ষিকার খোলস পরে থাকতে চাইনি। ওরাও জানুক আমার একটা আসল সংসার আছে, যেখানে আমার জায়গা, আমার একমাত্র আশ্রয়।'

রমলাদি হাসলেন। 'তুমি একেবারে শরৎচন্দ্রের নায়িকা হয়ে যাচ্ছ।'

'কী করব? আমার মানসিক শারীরিক সুখবোধের তো ধারণা রয়েছে, আমি যে মেয়ে সেটা ভুলব কী করে?'

চাপা খবরটা আগুনের মতো উসকে উঠল।

সান্ত্বনা বলল : 'ঢঙ।'

যূথী বলল : 'স্বামী সোহাগ দেখানো।'

জয়া বলল : 'আমাদের অভিনন্দন জানানো উচিত। এই অন্ধকার নিরানন্দ বোকার রাজত্ব থেকে...'

'তুই থাম।'

'মিনতিদি বেঁচে গেল।' জয়া নিশ্বাস ফেলল।

'যেন আমরা মরে রয়েছি। যত ন্যাকামো। ওর স্বামী নিশ্চয় লটারির টিকেট পেয়েছে।' যূথীর ভাবখানা সে ইচ্ছে করলেই মিনতির পদাংক অনুসরণ করতে পারে।

জয়া বলল : 'আমি মিনতিদির কাছে যাই।'

'এই খবরদার। আমাদের ওপর টেক্কা দেয়া। যেন আমরা মরে গেছি। কেঁদেকেটে আবার যখন ফিরতে হবে।'

'অমন কথা বোলো না।'

উৎসাহের অভাবে ওরা কুঁকড়ে গেল। কিংবা মিনতি-সম্পর্কে একটা ভয়। অথবা ভয়টা নিজেদের জন্যে। সংশয় দ্বিধা হীনমন্যতায় ভরা আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

সন্ধেবেলা গাড়ি ডেকে মিনতি যখন উজ্জ্বল হেসে ওদের বলল : 'আসি।' ওরা উত্তর খুঁজে না পেয়ে বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

।। ২ ।।

'তুমি।' দরজা খুলে সুকুমারের প্রথম সম্ভাষণ।

'কেন? ভেবেছিলে অন্য কেউ?' মিনতির গলায় গাম্ভীর্য।

'না, এমন অসময়ে...'

'সময়-অসময় কী? আমাকে কী নিয়ম ধরে আসতে হবে? আহা।'

'ছুটি নিয়েছ?' সুকুমার ওর শরীরের ওপর চোখ বুলোলো : 'শরীর খারাপ?'

মিনতি এবার রাগল। কিংবা ক্রোধ প্রকাশটাই এখন তাকে আশ্রয় দেবে। বলল : 'এত জেরার মুখে পড়ব জানলে কে আসত। আমার বাড়িতে আসব তবু অন্যকে কৈফিয়ত দিতে হবে?'

সুকুমার ট্যাকসি থেকে মিনতির বেডিঙ ট্রাংক উদ্ধার করল। লালি মার পিছনে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

সুকুমার সদর বন্ধ করে দিল।

ওঘরে মিনতির জোরালো গলা। সুকুমারের মনে হল ওর গলার স্বরটা তেমনি কিশোরের মতো অস্ফুট। বোধহয় গৌতমকে বিছানা থেকে ঠেলে তুলেছে। ওর নিজস্ব সম্পত্তিগুলো যথাযথ রয়েছে কিনা সরেজমিনে তদন্ত করে নেয়া।

সুকুমার বলল : 'ওকে সাত-সকালে তুলছ কেন?'

মিনতি বলল : 'আহ, মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি। বেশ করছি। তোমায় কথা বলতে হবে না।'

সুকুমার মেনে নিল। ঘুম ভেঙে উঠে সব অদ্ভুত লাগছে। মিনতির খবর না-দিয়ে হঠাৎ চলে-আসা। অনেক রাত্রির যাত্রা ভাঙা আসরের মতো এলোমেলো। সুকুমার হাই তুলে আবার শয্যায় গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু চেতনায় মিনতির অস্তিত্বের রহস্যটা অদৃশ্য হল না। লালিও বোধকরি মার সঙ্গে ও ঘরে। গৌতমকে দুজনে ঘুম থেকে ডেকে তুলবেই। বাইরে এখনো কুয়াশা, সুকুমার ভাবল : ওরা যা ইচ্ছে করুক, তাকে চুপ করে থাকতে হবে। কিন্তু বিষয়টা কী? মিনতির আগমনগুলো তো দীর্ঘ ছুটির সঙ্গে নির্দিষ্ট। কোনো অপ্রস্তুত রোমাঞ্চ নেই তার মধ্যে। মিনতির স্বভাবে রোমাণ্টিকতার এক ফার্দিং-ও নেই।

মিনতির ডাকে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ। 'তুমি। কেন লক্ষ্মীর মা?'

মিনতি কড়া মেজাজে বলল : 'কেন লক্ষ্মীর মা থেকে আমার চা কী খারাপ হবে?'

'শুধু শুধু তুমি কষ্ট করবে কেন?'

'আমার কষ্টের কথা ভেবে তোমার ঘুম হচ্ছে না। তোমরা না ভীষণ স্বার্থপর।'

'তাই বুঝি?'

'লক্ষ্মীর মাকে আমি ছুটি দিয়েছি—'

সুকুমার বলল : 'মানে?'

'কেন? আমি ওকে ছুটি দিতে পারিনে?'

'তা পারে। ... ওর কাজগুলো করবে কে?'

'কেন? আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দাসী আছি? তোমার চিন্তা কেটে গেল?'

'পাগলামো।' সুকুমার এবার বিরক্ত হল।

মিনতি হঠাৎ রুঢ় হয়ে উঠল। ওর নাকের পাতা কাঁপছে।

'আমার চলে-আসাটা তুমি ভালো মনে নিতে পারছ না।'

'আচ্ছা, ছেলেমানুষি।' সুকুমার বলল।

মিনতি বলল : 'তোমার ভাবটা দেখে মনে হচ্ছে আমি তোমার সংসারের অতিথি, দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি। আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে তুমি বাঁচো।' কে জানে, মিনতি এ সকল কথা বলছে কেন নাকি তার ভেতরেরই প্রচ্ছন্ন সংশয়টা কাটাবার জন্যে সে প্রস্তুতি করছে।

সুকুমার বলল : 'তোমার কষ্টের জন্যেই বলা...'

মিনতি বলল : 'আমার কষ্টের কথা একটু কম ভাবলে বেঁচে যাই।'

মিনতি ঝড়ের মতো চলে যেতেই সুকুমার ক্লান্ত হয়ে সিগারেট ধরাল। সকাল থেকে সমস্ত দিনটা হঠাৎ বিনা নোটিশে হরতালে-স্তব্ধ মহানগরীর মতো ভারি হয়ে উঠল। এখন মুহূর্তগুলোর ওপর কড়া পাহারা, গুনে গুনে খরচ করতে হবে। বড় বেশি আত্মসচেতন হয়ে পড়ে সুকুমার। লক্ষ্মীর মা কী বাজারে গেছে? নাকি সে কাজ থেকেও ছুটি দিয়েছেন মানব? আপিস যাওয়া আছে, গৌতমের ইস্কুল। অথবা আজ বাড়িশুদ্ধ গো-অ্যাজ-ইউ-লাইক। আচ্ছা : সুকুমারই বা এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন। মিনতির তো যে কোনো সময়েই এ বাড়িতে আসার অধিকার। না হয় না-জানিয়েই এসেছে। নাই বা ঘোষণা করুক তার স্থায়িত্বের মেয়াদ। অপ্রস্তুত ঘটনাগুলোও কী কম মজাদার। নাঃ মজা করার বয়েস নেই. সুকুমার নিজেকে ধমকাল : আপিসে আর্জেন্ট ফাইল জমে গেছে। সে ইচ্ছে

করলেও ছুটি নিতে পারে না। এবং গৌতমেরও কয়েকমাস বাদে পরীক্ষা। মিনতির খেয়ালের খেসারত তারা দিতে পারে না। তাছাড়া সংসারের বাজেটেরও একটা ব্যাপার আছে। মিনতি বলুক কতদিন থাকবে। বাড়তি দুধের জন্যেও তো বলে আসতে হবে। রেশনের চালে না হয় কদিন চলে যাবে।

সুকুমার এবার উঠে পড়ল।

ওঘরে ভাইবোনে স্ট্যাম্প অ্যালবাম নিয়ে মেতে উঠেছে। দৃশ্যটা কদাচিৎ চোখে পড়ে। আপন মনে মাথা নেড়ে দৃশ্যটাকে যেন সমর্থন জানাল সুকুমার। তার মতো বয়স্কের সঙ্গে একা থাকতে থাকতে গৌতম বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। ওর সাথী দরকার, সমবয়সী। এরা দুজন কাছে না থাকলে পরস্পরের আকর্ষণটা বোঝা যায় না। গৌতম দিদিকে খুব ভালোবাসে। অথচ একা থাকতে ওর এই ঝোঁকটা বোঝা যায় না। যেন একটা দুর্লভ চিত্র দেখছে তেমনি স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সরে এল সুকুমার। বুকের ভেতরটা কেমন করছে! সে কী আবেগে জড়িয়ে পড়ছে। এই দৃশ্য থেকে বঞ্চনাজনিত ব্যথা অনুভব করে সুকুমার। এবং তখনি একটা রাগ দুঃখ ঈর্ষা তাকে কালো করে তোলে।

'বাজার যেতে হবে?'

বারান্দায় বেরিয়ে এল সুকুমার।

মিনতি বলল : 'তার আমি কী জানি?'

সুকুমার হেসে উঠল। 'রাগ কোরো না। আমার তো বারো মাস শিবের সংসার। তুমি না এলে বুঝতে পারিনে সংসারের প্রয়োজনটা।'

মিনতি বলল. 'আহা।'

সুকুমার রান্নার ঘরে পা দিল।

'কই, কি আনতে হবে বলো? দেরি হয়ে যাবে।'

মিনতি বলল : 'ভাবখানা এমন দেখাচ্ছ আমার ওপর নির্ভর করে তুমি সংসার চালাচ্ছ? আমাকে তুমি থোড়াই কেয়ার করো।'

সুকুমার হাসল। 'এই বয়েসে কারুর ওপর নির্ভর করা কী ভালো হবে? বদভ্যেস হয়ে যাবে।'

'তাই বুঝি একা স্বর্গসুখে থাকতে চাও? নিজেকে হালকা তরুণ ভাবা যায়?'

'বিয়ে করেছি বলে তো আমাদের কপালে কোনো ছাপ নিতে হয় না। অনেক সুবিধে।'

'তাই দেখতে পাচ্ছি। আমাকে অভ্যর্থনার যা ঘটা দেখলাম...'

'না. এই বয়েসে অতিথি-অভ্যাগতও ভালো লাগে না। সেবার দুদিনের জন্যে সুরেন এল, বড়দির ছেলে, যেদিন সত্যিই ও চলে গেল হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।'

হঠাৎ মুখ তুলে কঠিন গলায় মিনতি জিগ্যেস করল : 'এসব কথা আমাকে শোনানোর অর্থ কী? তুমি কী আমাকেও তাড়িয়ে দেবার আয়োজন করছ?'

'এই, কী হচ্ছে, ওরা শুনতে পাবে যে—'

'পাক। আমি আর কিছুতে ভয় পাইনে। আসার পর থেকে তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ যে আমি তোমার সুখের শত্রু। কেন, আমি কী করেছি? আমাকে এমন অবহেলা করার মানে কী?'

'এই, প্লিজ—নাটক কোরো না।'

'নাটক।' চোখ গোল করল মিনতি : 'নাটক তুমিই করছ। এসে পড়ে যেন অন্যায় করেছি। এখানে আসতে আমাকে আগে থেকে ঘণ্টা নেড়ে আসতে হবে? তবে বিয়ে করেছিলে কেন? ইয়ারকি, না?'

মিনতির এই অহেতুক উষ্ণতার কারণ বুঝতে না পেরে সুকুমার প্রথমত স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু বিরক্ত হল না। কেমন যেন এই উত্তেজনার আবহাওয়ার সে একধরনের আরাম বোধ করছে। কতদিন যে ঝগড়া হয়নি মিনতির সঙ্গে। স্বাদটাই ভুলে গেছে। কিন্তু...বিষয়টা কী? এতদিন পর মিনতি বিয়ের তাৎপর্য তাকে বোঝাতে চাইছে। সত্যিই তো জানা দরকার। মিনতিই বলুক বিয়ে মানেটা কী? না, সে ইয়ার্কি করতে চায় না।

'মা, খিদে পেয়েছে।' গৌতম।

'বাবাকে বল—'

সুকুমার তাড়াতাড়ি বলল : 'দোকান থেকে মিষ্টি এনে দেবো?'

মিনতি মুখ বেঁকিয়ে বলল : 'ও বুঝি রোজ মিষ্টি খায়?'

'না, তা নয়।' সুকুমার বেসামাল।

'টোস্ট করেছি। লালিকে ডেকে নিয়ে এসো।' গম্ভীর গলায় গৌতমকে আদেশ করল মিনতি।

গৌতম পালাল।

'আমি তাহলে বাজার ঘুরে আসি—' সুকুমার অনুমতি চাইল।

'খেয়ে যাও।'

'আচ্ছা।' পরিতৃপ্ত জন্তুর মতো সুকুমার ঘরে গিয়ে সিগারেট ধরাল।

দাম্পত্যের কী নিজস্ব কোনো গন্ধ আছে! এবং এতদিন পর সেই ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধটা নেশাঘন করে তুলছে নাকি! সুকুমার, তোমার বয়েস কমছে না বাড়ছে হে? কী যেন প্রশ্নটা? বিয়ে করেছিলে কেন! আহা, যেন জিগ্যেস করছ : ভাত খাই কেন? কলেজ জীবন থেকে আপিসের ছক, তারপর বিবাহ। ভালোবাসা। চাকুরে মেয়ে, সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য। লালি, গৌতম...। পরিপূর্ণ উদ্ভিদের জীবন। সব হল, সব পেয়েছে। তাহলে প্রশ্নটার উত্তর হল : একটা সম্পূর্ণ জীবনের চিত্রনির্মাণের জন্যে। শিল্পীর মতো, নাকি মিস্ত্রির মতো।

মিনতি খাবার নিয়ে এল।

'ওরা খেয়েছে?'

'হুঁ।'

'এখুনি বাজারে না গেলে মাছ পাওয়া যাবে না।'

'যাও।'

সুকুমার খাবার খেয়ে বাইরে বেরুতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বাজার-করাটা আজকে তার কাছে গুরুদায়িত্বের

মতো মনে হচ্ছে। বহুদিন পর বাজার-করার আনন্দ পাচ্ছে সে। লালি চিংড়িমাছ ভালোবাসে। ফুলকপি না বাঁধাকপি? টমেটো? সুকুমার কবিতার চিত্রশালা নির্মাণ করছে যেন। ঘেমে নেয়ে দিগ্‌বিজয় করে ফিরল সুকুমার।

বাজার দেখে মিনতি ওর খুশি গোপন করল না।

তবু যতক্ষণ আপিসে যাবার আগে পর্যন্ত সুকুমার বাড়িতে রইল ততক্ষণ একটা উদ্‌বেগ, একটা অর্থহীন অশান্তি তাকে কামড়াতে লাগল। আপিসে কাজের ফাঁকে তার অন্যমনস্কতা নিজেকেই অবাক করে দিল। তার মাঝেমাঝেই মনে হতে লাগল বাড়িতে কিছু একটা তার জানার অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করে রয়েছে। আর, মনে পড়তেই সে অকারণ অস্থিরতা অনুভব করছে। সুকুমার কী প্রথম বিয়ের দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছে। সেই অন্যমনস্কতা উদ্বিগ্নতা বেদনার দিনগুলো। নিজেকে যেন স্বাধীন ভাবা যাচ্ছে না। অন্তরঙ্গতা নামক একটা বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়ছে। মিনতির অস্তিত্বটা আরক্ত অন্ধকারের ঢেউয়ের মতো বারবার চেতনাকে সিক্ত করে দিচ্ছে।

সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়ি ফিরতে হঠাৎ অগাধ লজ্জা কলেজেপড়া প্রবাসী ছেলের বাড়িতে ফেরার মতো গ্রাস করে ফেলল সুকুমারকে। জোনাকির আলোর মতো আনন্দগুলো যেন ইতস্তত চমকে চমকে উঠছে। বিবাহিত জীবনের একটি বিশেষ দিন ইন্দ্রিয়ে ঘন হয়ে আসছে। পক্ষকাল বাদে সমস্ত ধাঁধাকে সরিয়ে যে দুর্লভ রাত্রে প্রথম তার অস্তিত্বের তীব্রতাকে তরবারির মতো প্রতিপক্ষকে বিদ্ধ করতে পেরেছিল! সেই আশ্চর্য সফলতার সুখ, লজ্জা, বেদনা, এবং...।

দরজায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারে-ডোবা পাথরের মতো নিশ্চুপ বাড়ির দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ পর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। এত অন্ধকার কেন, এত নির্জনতা। মি-ন-তি। ফুসফুস যেন ফেঁসে গেল।

লক্ষ্মীর মা বলল: 'দিদিমণি বেরিয়েছেন। চা করে দেবো?'

সুকুমার বলল: 'না।'

লক্ষ্মীর মা অবাক হয়ে রইল।

'আলোটা নিবিয়ে দাও।'

স্তূপাকার অন্ধকারে সুকুমার নিঃসাড়ে পড়ে রইল।

বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত সুকুমার। আহ্‌।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

'একী ব্যাপার। অন্ধকারে শুয়ে আছ কেন? শুনলাম চাও খাওনি।'

সুকুমার ধূসর চোখে তাকিয়ে রইল।

'কথা বলছ না কেন? আমার ওপর রাগ করেছ? বেরুলে কী ইচ্ছে মতো ফেরা যায়? জানো না ট্রাম-বাসের ব্যাপার।'

'মিনতি—'

'অ্যাঁ'

'আমি কৈফিয়ত চাইনি।'

'এখ্‌খুনি তোমার চা করে দিচ্ছি। রাগ কোরো না। দেখো আর কোনোদিন দেরি হবে না। আপিস থেকে ফিরলেই দেখবে আমি ছবির মতো বসে আছি।'

'ঠাট্টা?' আশ্চর্য, কী করে মিনতি ওর মনের কথা বুঝতে পারে!

'নাগো।' মিনতির চোখের পুকুর বর্ষার জলে থইথই করছে। 'লালি, গৌতম, ওঘরে পড়তে বোসো।'

চা খাবার নিয়ে ফিরে এল মিনতি।

'দ্যাখো তো ছিটটা কেমন হবে? গৌতমের বুশশার্ট করে দেবো। ওর ভারি শখ।'

'ভালো।'

'লালির এই শর্টফ্রক। এইজন্যেই একটু বেরিয়েছিলাম।' মিনতি হাসল।

অকস্মাৎ ওর মুখের দিকে চেয়ে সুকুমারও হেসে ফেলল। তার বদখত মনের আয়নার ওপর পরদাটা টেনে দেবার দ্বিতীয় কোনো উপায় সুকুমার খুঁজে পেল না। কী ডেঞ্জেরাস, স্বগত উচ্চারণ করল সুকুমার। ঊর্ধ্বশ্বাস নাটকের মতো।

'তুমি একটুও বদলাওনি।' মিনতি ছোট্ট করে বলল।

'তাই বুঝি?'

'কী করে একলা থাকো?'

'জানিনে।'

'আমার একটুও ভালো লাগে না। তুমি দশজনের মতো নও।'

'দশজনের মতো?'

'চুপ।'

'এতদিন পর তোমার এই জ্ঞান নিয়ে তুমি কী করবে?'

'দেখো না কী করি।'

'আমাকে বেঁধে নিয়ে যাবে?'

মিনতি হাসল ফের। 'ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে আমাদের কাজ অনেক কমে আসে। এখন...'

সুকুমার বলল: 'কী বলছ? ওদের কী চিরকাল ছোটো করে রাখবে?'

'তখন মনে হয় আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। বুড়ো আর বাতিল। নিজের মুখ আয়নায় দেখতে ভয় পাই।'

'আমার কাছে সে-ভয় নেই বুঝি?' সুকুমার হাসল।

'না। তাহলে তো মরেই যেতাম।' মিনতি রান্নার তদারকে চলে গেল।

সুকুমার উঠে গিয়ে ওঘরে বসল। লালি, গৌতম। আশ্চর্য, এদের কাছে বাতিল হয়ে যাচ্ছে মিনতি। এই, যারা স্বাভাবিক সূর্যালোকের মতো তাদের মা বাবার অস্তিত্বকে নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে রয়েছে। ওদের চেতনায় কী মা বাবা একদিন থাকবে না এই ভয়ংকর নির্মম সত্যের উপস্থিতি আছে! ওরা বিশ্বাসই করবে না। মিনতি ভুল করছে। কিংবা—

'বাপি—'

'কী রে?' বা-পি শব্দটা জন্মজন্মান্তরের বাসনার মতো তার অন্তস্তলকে মথিত করে তুলছে। শৈশবে লালির কান্না যেমন মনের তন্ত্রীগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে যেত। বস্তুত সুকুমারও তার শৈশবে ফিরে যাচ্ছে। হ্যারিকেনের আলোয় সতরঞ্চি পেতে এক দঙ্গল ভাইবোন, সেই পড়া-পড়া খেলা। হায়, সেই স্মৃতি সময়ের তীব্র স্রোতে কবে ভেঙেচুরে গেছে। ভায়েরা কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠিত, বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। আহ, শৈশব, সেই মুগ্ধবোধ দিনগুলি। অন্যায়ভাবে এদের, এই ছেলেমেয়েদের শৈশবের স্মৃতিটাকে কী তারা বঞ্চিত করছে না! এম্নি বিচ্ছিন্ন করে, স্বার্থপর করে তুলে। বা...পি-ই-ই-ই।

'আয় লুডো খেলি।' সুকুমার আহ্বান জানাল।

'মা পড়তে বলেছে।'

'বলুক।'

'মা বকবে।'

'বকুক।'

নিষেধের বেড়াভাঙা উচ্ছ্বাসে ওরা মেতে উঠল।

'অমা একী হচ্ছে...' আঁচলে হাত মুছতে মুছতে মিনতি বলল। তারপর হাটু

মুড়ে বসে গৌতমের ছয় পড়তেই চিৎকার করে উঠল : 'এই বাবার পাকা ঘুঁটিটা কাট।' গৌতম দুর্জয় আক্রমণে বাবাকে পর্যুদস্ত করল। তারপর তুমুল কোলাহল। সুকুমারের ছদ্মরাগ, ছেলেদের মজা। হেসে কুটিকুটি হয়ে গড়িয়ে পড়ল মিনতি।

রাত্রি নামল নিঃশব্দ শিশিরপাতে।

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? এই।'

'না।' মিনতির শরীরের গন্ধ।

'কথা বলছ না কেন?'

'ভাবছি।'

'আমাকে নয় নিশ্চয়।'

'তোমাকেই।'

'এই এতক্ষণ ধরে? সত্যি, কী ভাবলে বলো না?'

'শুনতে চাইলে আমার ঘুম পাবে।'

'আহা, তাহলে এতক্ষণ জেগে রইলে কেন?'

'কী জানি।' মিনতির শরীরের গন্ধ।

মিনতি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তারপর? এবার কী হবে?' সুকুমার জানতে চাইল।

'মানে?' মিনতির পুন প্রশ্ন।

'সকাল সন্ধ্যে রাত্রি। একটা দিন শেষ...'

'আবার একটা সকাল সন্ধ্যে রাত্রি...'

'হুঁ—'

'জীবনে অনেক সকাল সন্ধ্যে রাত্রি। হিসেব কে করবে?'

'আমাকে করতে হয়।'

'কোরো না।' মিনতি পাশ ফিরল।

'তা কী পারি?'

'পারবে। আমি করতে দেবো না।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'একেক সময় তোমাকে বুঝতে...'

'কোনোদিন চেষ্টা করেছ?'

'বোধহয়...'

'আমরা কেউ কাউকে কখনো...'

'যা আমরা পারিনে, কোনোদিনও...'

'চিন্তার নিষ্ক্রিয়তা আমাদের আটকে দিচ্ছে। সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করলে'

'তোমার সে-সাহস আছে?' সুকুমার শূন্যে হাসল।

'তুমি সাহায্য করলে...' মিনতি ফিশফিশ করে বলল।

'আমার সাহায্যের ওপর তোমার আস্থা আছে?'

'তাহলে কার কাছে যাব?'

সুকুমার বলল : 'আমি স্বার্থপরের মতো অনেক কিছু দাবি করতে পারি তোমার কাছে। কিন্তু তা হয় না। আমার জোরগুলো তোমাকে খাটো করে। এই ঘর-গৃহস্থালির বাইরে তোমার একটা স্বতন্ত্র জগৎ এতদিনে গড়ে উঠেছে। একে আমি নিছক অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বলে ভুল করতে পারিনে।'

মিনতি বলল : 'আমার কথা তোমাকে অত ভাবতে হবে না।'

'আমি লালির মুখে সব শুনেছি।'

'কী?'

'চাকরি ছেড়ে দিয়েছ।'

মিনতির নিশ্বাস সুকুমারের কাঁধে। মিনতির আঙুলগুলো সুকুমারের গলায়।

'তুমি বিশ্বাস করোনি?' মিনতি বলল : 'তোমাকে জানাতে সাহস হয়নি। তুমি রাগ করোনি তো?'

'না।'

'তোমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আমি বাড়তি বোঝা হলাম।'

'না। আমি ভাবছি তুমি একদিন এই স্থূল সংসারের বোঝা টেনে ক্লান্ত হয়ে যাবে কিনা। জীবনধারণের প্রক্রিয়াগুলো আপিসের রুটিনের থেকেও নীরস একঘেয়ে।'

'তোমার জন্যে, তোমাদের জন্যে খাটছি জানলে...' মিনতি বলল : 'বাড়িতে বসেও অনেক কাজ করা যায়। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া দেখা। ও-ফ্ল্যাটের কুমকুমদি দুপুরে পরামর্শের জন্যে এসেছিলেন। ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা নার্শারি ইস্কুল খুলেছেন। আমাকে বলছিলেন সাহায্য করতে। পাড়ায় কিছু ডোনেশনও পেয়েছেন। ইস্কুল বড় হলে সকলেই কিছু কিছু ভাগ করে নিতে পারবে। তোমরা বেরিয়ে গেলে এই দুপুরটা...'

সুকুমার পাশ ফিরল। অন্ধকারে মিনতির মুখের পাণ্ডুলিপি, কপাল বেয়ে একরাশ চুল, গভীর কালো চোখ, পুরু বাঁকানো ঠোঁটের ধনুক...

অস্ফুটে কী বলতে উদ্যত হয়েছিল মিনতি হঠাৎ নির্ভুল লক্ষ্যে ওর ভাঙা কথাগুলোকে কেড়ে নিল সুকুমার। বাঁশির সুরের মতো কেঁপে কেঁপে উঠল মিনতি. অনেক মুদ্রা সৃষ্টি করে সজীব প্রার্থনার মতো রাত্রির বেদনায় হারিয়ে গেল।

রাত্রি নদীর মতো বয়ে চলল।

# অতুলনীয় আদিনা মসজিদ দেখতে পাণ্ডুয়া চলুন

গৌড়-পাণ্ডুয়ার কথা মনে হলেই প্রাচীন ইতিহাসের দরজা খুলে যায়। সেকালের দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজারাজড়ারা যেখানে তৈরী করেছিলেন শিল্প সুষমামণ্ডিত মন্দির-মসজিদ আজ তা ঘন অরণ্যের রূপ নিয়েছে। কালের হাঁ-মুখ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে এখনও যা বেঁচে আছে তা দেখেও বিস্মিত হতে হয়।

হাওড়া থেকে ফারাক্কার ট্রেনে চড়ে বসে ফারাক্কায় পৌঁছালুম। ফারাক্কা থেকে গঙ্গা পেরিয়ে খেজুরিয়াঘাট। খেজুরিয়াঘাট থেকে আবার ট্রেনে মালদহ। মালদহে নেমে খাওয়া দাওয়া করে নেওয়া যায়। কারণ গৌড়-পাণ্ডুয়া ঘুরতে হলে মালদহেই হলটিং স্টেশন করতে হবে। এখানে প্রাইভেট হোটেল পাবেন। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টুরিস্ট লজ আছে সেখানেও থাকতে পারেন। শহরটা একটু ফাঁকা-ফাঁকা, তবে পরিচ্ছন্ন। মালদহ থেকে পিচঢালা রাস্তায় টাঙ্গায় চড়ে পাণ্ডুয়া যেতে পারছেন। মাইল ছয়েক টাঙ্গায় যেতে হবে। দু পাশে ঘন-পাতলা গাছের সারি। রাস্তা থেকে মাইল দুয়েক দূরে মহানন্দা নদী। বলা যায় আদিনা রেল স্টেশনের পর থেকেই বেশ বন-জঙ্গল।

পাণ্ডুয়া ঢুকেই প্রথমে আপনার চোখে পড়বে 'বড় দরগাহ'। এই দরগাহতেই পীর সৈয়দ মখদুম শাহ জলাল তবরিজীর সমাধি আছে। এককালে এই দরগাহতে প্রতিদিন মুসলমান ফকিররা পেত খাওয়া-দাওয়া। সম্পত্তির আয় থেকেই খরচ চলে যেত। প্রায় বাইশ হাজার বিঘে সম্পত্তির আয় ছিল। এজন্য এই দরগাহের আর এক নাম বাইশ হাজারী দরগাহ। দরগার সামনের চত্বরে এক বিরাট নিম গাছ। এ নিয়ে একটা প্রবাদ আছে। লোকে বলে ফকির সাহেবের দাঁতন থেকেই নাকি এই নিম গাছের জন্ম। রাভেনশ বলেছেন, ফকির দেহ রেখেছিলেন দাক্ষিণাত্যে, সেখানকার কবরটিই আসল, তারই অনুকরণে এখানকার কবর তৈরী। দরগার ভেতরে জুম্মা মসজিদ তৈরী করেছিলেন আলি মুবারক ১৩৪৫ সালে। মসজিদের ভেতরে যেখানে ফকির জলাল তবরিজী বসে উপাসনা করতেন তার চারদিক রুপোর বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। এখন অবশ্য সে বেড়া আর নেই। বছরে দুবার এখানে বেশ বড় রকমের মেলা হয়। মুসলমান ফকিররা সমবেত হন।

পাঁচটি খিলান দিয়ে এই দরগা। চত্বরের এক ধারে বহু দিন আগে একটা ডালিম গাছ ছিল, পুত্র কামনায় মহিলারা এই গাছে ইঁটের টুকরো ঝুলিয়ে যেতেন। বড় দরগার পাশেই হিন্দু মন্দিরের আকারে একটা ছোট মসজিদ আছে। দরগাতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পীর জলাল সাহেবের বড় দরগায় ঢোকবার মুখেই ছোট দরগাহ। এটিকে ছয় হাজারী দরগাও বলা হয়। বিখ্যাত সাধক নূর কুতব-উল-আলম ও আলাউল-হকের সমাধিস্থান। আলা-উল-হক গৌড় সাদুল্লাপুরের পীর শেখ আখি সিরাজউদ্দিন সাহেবের শিষ্য ছিলেন। তাঁরই পুত্র সাধক হজরত নূর-কুতব-উল-আলম রাজা গণেশের সমসাময়িক ছিলেন। এই দরগাটি তৈরী করেছিলেন সুলতান শমস-উদ্দীন ইসুফ শাহ। কবরের এক-তলার ছোট ঘরটিকে বলা হয় চিল্লিখানা। এই ঘরেই কুতব আলম উপাসনা করতেন। দরগার উত্তর দিকের পাঁচিলের বাইরে ধ্বংস-স্তূপ খুঁড়ে বিচিত্র কারুকাজমণ্ডিত চতুষ্কোণ কষ্টি পাথরের স্তম্ভ ও আরও মূল্যবান পাথর পাওয়া গিয়েছিল।

ছোট দরগার গম্বুজ তিনটি, তার মধ্যে একটি ভাঙ্গা। তার সামনেই পাঁচিল-ঘেরা পুকুর। আর প্রাঙ্গণে কবরের সারি। অনেক পাথর আছে যার গায়ে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই আছে।

ছোট দরগা থেকে কয়েক পা এগোলেই সোনা মসজিদ। আর এক নাম কুতুবসাহী মসজিদ। এটি ভেঙ্গেচুরে শেষ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর গম্বুজ ছিল দশটি, এখন একটিরও চিহ্ন নেই। কষ্টি পাথরের ফলকে লেখা থেকে জানা যায় এ মসজিদ মুখদুম উবেদ কাজি তৈরী করিয়েছিলেন।

আর একটি দেখবার মত সৌধ এক-লাখী সমাধি। সমাধির দক্ষিণ দিকে কষ্টি পাথরের প্রবেশ পথের পাশের পাথরে হিন্দু মূর্তি খোদিত আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের প্রচুর নিদর্শন একলাখী সমাধিতে বিদ্যমান। পাথরের দেওয়ালে লতাপাতা খোদাই। গৌড়ের চিকা মসজিদের মত নকসা। প্রস্তর নির্মিত চূড়ায় গণেশ মূর্তি খোদিত। এতে রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জলালউদ্দিনের, তাঁর পত্নীর ও পুত্র সুলতান শমস-উদ্দীন আহম্মদ শাহের সমাধি আছে। একলাখী বাংলার পাঠান সুলতানদের স্থাপত্য শিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ। এটি তৈরী করাতে খরচ পড়েছিল এক লাখ টাকা। মনে হয় সেজন্যেই এর নাম এক-লাখী।

পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত মসজিদ আদিনা। কিন্তু তারও শেষ অবস্থা। হুগলীর ইমাম-বাড়া, মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদের থেকেও এটি বড়। লম্বায় ৫০০ ফুট, চওড়া ৩০০ ফুট, উঁচু ৬০ ফুট। এই রকম বিশাল মসজিদ ভারতবর্ষে নাকি আর কোথাও নেই। মুসলমান যুগের স্থাপত্য শিল্পের এটি সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মসজিদের ভেতরে কষ্টি পাথরের একটি ছোট ঘর, এখানে আচার্য উপাসনা করতেন। উপাসনা বেদীটি কাল পাথরের, ঠিক হিন্দু মন্দিরের আদলে তৈরী। বিরাট ব্যারাকের মত একটি হল-ঘরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, এখানে নাকি এক হাজার লোক এক সঙ্গে নামাজ করতে পারত। কয়েকটি ভাঙ্গাচোরা ঘরের কষ্টি পাথরের চৌকাঠে লতা-পাতার পরিচ্ছন্ন নক্সা। মসজিদের উপাসনা ঘর দেড়তলা বলা যায়, এখানে বাংলার সুলতানের বসবার জায়গা ছিল। কেউ বলেন বেগমরা এখানে নামাজ পড়তেন।

মসজিদের অধিকাংশ স্তম্ভ, মিনার ভেঙ্গে গেছে, এখনও যা অবশিষ্ট আছে তা দেখেও বিস্মিত হতে হয়। কোন-কোন গোল থাম এত চকচকে যে তাতে মুখ দেখা যায়। ঘরের দেওয়ালে তোগরা অক্ষরে কোরাণের শ্লোক খোদিত আছে।

স্থানীয় লোকজনরা বলেন, এখানে আদিনাথ নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আদিনা নামটি তারই অপভ্রংশ। এই কিংবদন্তীকে ভিত্তি করে বহু দিন আগে সাঁওতালরা এই মসজিদ অধিকার করতে আসে কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয় নি। উপাসনা বেদীর উপর ওঠবার ছটি ধাপ আছে তার শেষের ধাপে একটি হিন্দু দেব মূর্তির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। মসজিদের গায়েও কোথাও-কোথাও গণেশের মূর্তি খোদিত আছে। হ্যাভেল প্রমুখ স্থপতি শিল্পীরা অনুমান করেছিলেন, আদিনা মসজিদ ও গৌড়ের অনেক প্রাসাদ পুরাতন হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে তৈরী করা হয়েছে। আদিনা মসজিদের খিলান দেখবার মত, কষ্টি পাথর কেটে-কেটে নকসা করা হয়েছে। দুশো বছর মুসলমান শাসনের যুগে সারা ভারতে প্রস্তর শিল্পের যে সমস্ত নমুনা পাওয়া যায় তাতে বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিল শাহের কবরের সঙ্গেই কেবলমাত্র আদিনা মসজিদের তুলনা করা যেতে পারে। আদিনা মসজিদের বেদীটি দেখে মনে হয় এটি যেন আম দরবার ছিল।

পাণ্ডুয়ার ধ্বংসস্তূপ, কবরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এই কথাই মনে হয়, সময়মত এটিকে সংরক্ষণ করলে প্রাচীন ভারতের দক্ষ শিল্পীদের সৃষ্টিকে আরও বহু বছর জীবন্ত করে রাখা যেত।

—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

# মুখের মেলা

## স্যায়দালী সেখের খোঁয়াড়

হাঁস-মুরগী গরু-ছাগল ঘোড়া-মোষ সাত রকমের পাগল নিয়ে গাঁয়ের চাষীবাসীরা সংসার প্রতিপালন করে। তাদের শহুবৎ শেখাবার এখনো—পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশেও তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক উপায় বের হয়নি বলে যে খোঁয়াড় বা জেলখানাও থাকবে না এমন নয়। সব দেশের সরকারই বিনা খরচায় দুটো উপায়ের ব্যবস্থা করে রেখেছেন—এক নম্বর হল খোঁয়াড়, দু' নম্বর ফেরিঘাটা। পশু-পাখিদের মানবিকতার বালাই নেই কিন্তু পাশবিকতা তো আছে? পশুর ক্রিয়াকর্মকে আমরা পাশবিকতা বলি। কিন্তু গরুর হালকরা এক রকম কাজ হলেও তাকে পাশবিকতা বলি না। ঘোড়া যখন সওয়ার বয়ে নিয়ে ছোটে কিম্বা গাধা যখন মোট বয় তখনো না। গরু যখন গুঁতিয়ে দেয় তাকে পাশবিকতা বলতে পারি। যখন অন্যের ফসল খেয়ে ফেলে অজ্ঞানে, তখনো কি পাশবিকতা বলব? তাহলে তাদের মার দিয়ে বা খোঁয়াড়ে পুরে দিয়ে শাস্তিটা দেওয়া হয় কেন? সরকারী বিধান আছে। গরু-ছাগল মোষ-ঘোড়া হাঁস-মুরগী উট-হাতী যাই হোক না কেন, ফসল নষ্ট করলেই তাকে ধরে খোঁয়াড়ে দিয়ে এস। খোঁয়াড়অলা তোমাকে সামান্য কিছু খেসারত দেবে। আর যার পশু তার অর্থদণ্ড হবে। চারগুণ টাকা আদায় করা হবে তার কাছে।

মোদ্দা কথাটা দাঁড়ায় তাহলে এই, আমার আকাট মূর্খ এঁড়ে গরুটা তোমার ফসল 'সাবাড়' করেছে বলে তার যতখানি অপরাধ কিছুটা খোলাই দিলেই তোমার রাগটার কিছু লাঘব হবে বটে, যদিও আইনে সে-কথা বলে না, কিন্তু আমার অসাবধানতার অপরাধটা আমি মানুষ নামক প্রাণী হলেও কিঞ্চিৎ অত্যাচারের পর্যায়ে পড়বে—অজ্ঞান পশুর জেল হবে, আর আমার হবে জরিমানা।

পাশবিক কথাটা উল্টে-পাল্টে ভেবে দেখেছেন? গৃহ-পালিত পশু তেমন কোনো পাশবিক অত্যাচার করে না, বরং উপকার করতে করতে জীবন দেয়, তাদের দুধ, মাংস, পশম, হাড়, চামড়া সবই আমরা ভদ্দরলোকের মতন ব্যবহার করি, অথচ তাদের কাছ থেকে কি এমন পাশবিক অত্যাচার পাই? অরণ্যের বাঘ, ভালুক, সিংহ এরা অবশ্য পাশবিকতা কি জিনিস ঘোর মানবিকতাবাদী সাধুপুরুষ হলেও আপনি সামনে পড়লেই তা জানিয়ে দিতে এতটুকু কসুর করবে না। কিন্তু তাদের ধরে গলায় দড়ি বেঁধে কোন পাহালবানই বা আর খোঁয়াড়ে দিয়ে আসছে বলুন! আর কোন্ দুঃসাহসী সরকারী খোঁয়াড়অলাই বা তাদের রাখবে?

ছোটবেলায় বায়স্কোপ দেখবার ঝোঁক ধরলে মামাদের মটর, খেলারী ঝিঙে-কাঁকুড় বা অন্য ফসলের ক্ষেতের পাশে বসে থাকতাম ডাণ্ডা কাঁধে নিয়ে গা-আড়াল দিয়ে। কারো গরু-ছাগল ক্ষেতে এসে পড়ে ফসলে মুখ দিলেই ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতাম খোঁয়াড়ে। ছোটমামা দেখলে বলতেন, বেঁধে রেখে দে, যাদের গরু-ছাগল, নিয়ে যেতে এলে দুটো বচন দিয়ে দিতে বলবিখন মেয়েদের। 'খোঁড়ে' দিসনি —গরীব' লোক হলে কাঁদাকাটা করবে।'

পাঁঠা ধরলে আনন্দের আর শেষ নেই। ল্যাজে এক টুকরো ইট বেঁধে দিয়ে দৌড় করাও। অথবা খাসী বা ছাগল হলে মাটিতে শুইয়ে কান মুড়ে চোখ চাপা দিয়ে তার ওপরে দাও একটা কচুপাতা—তার ওপরে একটা মাটির ঢেলা—ব্যাস, দম ফেটে মারা যাবে তবু উঠবে না! আর ছাগলঅলা বেশি চালাকি করে রোজ রোজ ফসল নষ্ট করালে ছাগলকে ধরে জলে চুবিয়ে দিলেই খেল খতম! কানে জল ঢুকে গেলেই ছাগল মারা যাবে দিনকতক ভ্যাবানীর পর। এসব করার চাইতে খোঁয়াড়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা আমাদের পয়সার দরকার। কিন্তু বড়মামা দেখলে ছাগল কেড়ে নিয়ে খড়কাটা বঁটি হাতের কাছে পেয়ে গেলেও তাই দিয়েই ভ্যাস্ করে জবাই করে ফেলবেন। যার ছাগল সে চিৎকার করে ইউনিয়ন বোর্ডে নালিশ ঠুকে এলে বড়মামা উচিত মূল্য দিয়ে দিতেন। পঁচিশ রকমের আমের কলম বারুইপুর থেকে বয়ে এনে বসিয়ে-ছিলেন তিনি, কামিনীর মায়ের ছাগলে সব গাছ রোজ নষ্ট করত; বড়মামা বলতেন, 'গরু খেলে গাছ আবার গজায়, কালমুড়ো জাত-বকরী খেলে আর গাছ হবে না—শালার জাত একেবারে দাঁত দিয়ে কুরে কুরে গাছের মাঝ পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। ধরতে পারলেই জবাই করব আমি।'

তা তিনি করেছিলেন। তাই তাঁকে লুকিয়ে গরু-ছাগল নিয়ে আমরা স্যায়দালী সেখের খোঁয়াড়ে যেতাম। স্যায়দালী সেখ খলখল করে হেসে এগিয়ে এসে গরু-ছাগলের দড়ি ধরে নিয়ে বলত, 'আয় ভাই, কত দিতে হবে? আচ্ছা পাঁচ আনা নে।'

সেই পাঁচ আনা পয়সা নিয়ে দশ মাইল পথ হেঁটে গিয়ে ছোটবেলায় সিনেমা দেখে এসেছি। তারপর দু'দিন পরে যখন দেখেছি সেই গরু-ছাগল ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ও-পাড়ার বৌটা এসে কাঁদছে, তখন আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে!

স্যায়দালী বলছে, 'ন্যাকা সেজে চোখের পানি ফেললে কি গরু-বকরী ছেড়ে দোব? তিনটে টাকা দিয়েছি যাদের ফসল ওইরূপ করেছিল তোদের পাগালে। গরু দিনে এক টাকা, রাখালী বাবদ চার আনা, খোরাকী আট আনা—মানে দিনে সাত সিকে রেট—দু'দিনে চোদ্দ সিকে, সাড়ে তিন টাকা। ছাগল আট আনা, রাখালী বাবদ দুআনা, খোরাকী চার আনা। চোদ্দ আনা দ্বিগুণে আটাশ আনা—মানে এক টাকা বারো আনা। একুনে পাঁচ টাকা চার আনা। ফেলে দিয়ে গরু-ছাগল নিয়ে যাও।'

'তুমি আমার ধরম বাপ, তুমি আমার গরু-ছাগল ফিরে দাও। ছেলেদের 'টাইফর' জবর—'বাল্লি' কিনবার পয়সা নেই। একখানা থালা বন্ধক দিয়ে দু'টো টাকা এনেছি সাহাদের দোকান থেকে। এবারের মতন ছেড়ে দাও বাবা। তোমার দুটো পায়ে ধরি। আর কখনো গরু-ছাগল ছাড়ব না। পয়সার অভাবে পাট কিনে দাঁড় কেটে গরুদের গলায় দিতে পারি নি। পচা দড়ি ছিঁড়ে জানোয়ারগুলো মানুষের ফসলে মুখ দিতে চলে যায়। পিয়ালীতে আমার বাপের বাড়ি—সেখানের বড় বড় মাঠে ধান উঠে যাবার পর যদ্দিন না আষাঢ়ের 'ভেজা' লাগে গরুর 'বাথান' উদোম চরাট খেয়ে বেড়ায়। মাঠের কাদা আর ওকড়া ফল জড়িয়ে গরুর ল্যাজটা বলের মতন তাল হয়ে যেত। আমরা বাছুর সমেত গরু ঘরে এলে ছাড়িয়ে দিতাম। এদিকে বড় মাঠও নেই, আর গরুর বাথানও চরাট খেতে পায় না। জায়গার অভাবে মানুষও যেমন পাতকোর ব্যাং হয়ে আছে—গরু ছাগলও তেমনি। একটু ফসলে মুখ দিলেই খোঁয়াড়ে পুরে দিয়ে যায়। 'ধম্মো'র বাবা, তোমার দুটো পায়ে ধরি—আমার অবলা পাগলদের ছেড়ে দাও।'

স্যায়দালী সেখের খুনীর মতন নির্মম চেহারা, গুলিভাটা লাল চোখ। হাতে ধরে আমিও বলেছি, 'দিয়ে দাও দাদা'—এখন তার চোখ দুটো স্থির হয়ে দাঁড়ায় মেয়েটির পায়ে ধরার ঠেলায়, তারপর ধুরতে থাকে তার লাল চোখ দুটো। সজল হয়ে ওঠে। বলে, 'আচ্ছা যা মা, ধরম বাপ বলে যাখন শালীর বেটি তুই মোর পায়ে ধরেচিস, লিয়ে যা আজকের মতন। হঠাৎ স্যায়দালী বজ্রনির্ঘোষে চিৎকার করে বড় বড় সজল স্থির বিস্ফারিত চোখ মেলে বলতে থাকে : 'কিন্তু আর কোনোদিন যেন কারো ফসলে তোর গরু-ছাগলে মুখ না দেয়—তাহলে বিশ টাকা 'চার্জো' করে তোর বিষ ছাড়িয়ে দোব মুই। মুই হনু সায়দালী সেখ। সরকারের খোঁয়াড় লিতে পঞ্চাশ টাকা লাগে বচ্ছরে। আমি সরকারের 'শাসন-কর্তা'!'

সত্যিই, শাসনকর্তার মতন চেহারা আর মেজাজ স্যায়দালী সেখের। এক কলসী তাড়ি খেয়ে একটা তেল পাকানো লাঠি কাঁধে নিয়ে বসে থাকে সে তার 'দলিজে' মানে সদর দরজায়। মানুষকে হয়রান করে মারার জন্যে দূরে গ্রাম থেকে গাধা, ঘোড়া, মোষ, ভেড়া, গরু, আনে কেউ কেউ। খুঁজে মরুক এখন কোথায় কোন খোঁয়াড়ে দিয়ে এসেছে কে তাদের অবলা জানোয়ারকে। তিন মাস পেরিয়ে গেলে নিলাম হয়ে যাবে—যে কেউ ডেকে কিনে নিতে পারে। বাইরে থেকে জীব-জন্তু এলে স্যায়দালী তার খোঁয়াড়ের পাশ বই বার করে কড়ে আঙুলের মতন ইঞ্চি দেড়েক উডপেনসিলটা বার করে তার মুখে বার বার থুথু দিয়ে নাম ধাম গরু কি ছাগল কত দেওয়া হল ইত্যাদি বানান করে করে লিখে দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত তার বিদ্যে —তিরিশ বিঘে সম্পত্তি —নিজে আবার গাড়ি-গরু চালায়, হাল-লাঙল করে—বিশটা মামলা করেছে—খুন করে পাঁচ বছর জেল খেটেছে যৌবনে—তাই বেশ রাশভারি লোক। 'ধনঞ্জয়' বা 'গোবর্ধন' নাম বললে তার বানান করতে মুশকিল হয় স্যায়দালীর। বলে, 'বল বেটা একটা 'সিদে' গোছের নাম। তোর নাম ভোলা আর এনেছিস একটা গাধা।' কিন্তু গরু খোঁয়াড়ে দিতে যদি আসে ধনঞ্জয় আর ছাড়াতে আসে গোবর্ধন, তাহলে? তখন আমাদের বলে, এই তোরা তো অনেক ল্যাঠামাছ পুড়িয়েছিস (অর্থাৎ লেখাপড়া শিখেছিস), বানানটা বলে দে তো।'

সবাইকে যে ছাড়পত্র দেয় স্যায়দালী এমন নয়। না চাইলে দেবে না। কেননা সরকারী দেনা-পাওনার রেট অনেক কম। দূরের লোক হলে—নিজের গরু হলেও ছাড়পত্র নিতে হবে। নইলে 'গরুচোর' বলে পথে ধরলে তখন? উত্তম মধ্যম মার। মারের চোটে 'পগার' ঢিলে করে ফেলবে!

খোঁয়াড়ের উপায় মন্দ নয়। সরকার যখন খোঁয়াড় বিলির জন্যে ডাক দেন, ডেকে নিতে পারলেই হল। এক বছর ডেকে নিলে জনমে আর তা যায় না। কেবল বাৎসরিক সরকারী 'ট্যাক্সো'টা আদায় না দিলে অঞ্চল পঞ্চায়েতে চিঠি আসবে। গিয়ে একদিন দিয়ে এস।

গাই গরু খোঁয়াড়ে এলে যদি তার দুধ হয় স্যায়দালী ছাঁদন বেঁধে হাতে সরষের তেল মাখিয়ে চোঁক-চাঁক করে দুয়ে নেয়। বাছুর সমেত এলে তো কথাই নেই। এমন 'চার্জো' করবে যে 'চোখে খুতরো কদম কুটে যাবে।' 'গালে ধোঁয়া উড়তে থাকবে'।

'পাজান' ভারি পাটনাইয়ে ছাগল এলেও দুধ দুয়ে নিয়ে মজাসে ঘটিখানেক

করে চা খাবে স্যায়দালীর বউ। কালো, মোটা গমাড়ুখানেক চেহারা। নাকে ফাঁদি নথ।

স্যায়দালীর খোঁয়াড়ে কারখানা অঞ্চলের যে ঘোড়া এলে আমরা পাড়ার সব ছেলেরা তার পিঠে উঠে দৌড় করিয়ে আনন্দ করতাম।

একদিন একটা মাদী কুকুরের গলায় দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে গেলাম স্যায়দালীর খোঁয়াড়ে। বললাম, 'স্যায়দালী-দা, নবাদের এই কুকুরটা—মাদী কুত্তা—সদাই ছোঁক-ছোঁক করে—ছোঁচা নংনংয়ে হয়ে গেছে—চার পাঁচটা বাচ্চা বিইয়েছে—অনেক দুঃখ হয়, দুয়ে নিও—আমাদের হাঁড়ির ভাত খেয়েছে—একে 'খোঁড়ে' দিয়ে গেলাম—দাও রশিদ লিখে—চার পয়সা দিলেই হবে।'

স্যায়দালী সেখ উঠে পড়ে তেল পাকানো তেঁতুলে বিছের মতন লালচে লাঠিখানা বাগিয়ে তুলে ধরে ছুটে এল: 'তবে রে শালা, কুকুর খোঁড়ে দিতে এয়েচ'...

কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে মার দৌড়!—দৌড়—দৌড়...

ধরতে পারলে আমাদেরই খোঁয়াড়ে পুরে রেখে দিত বোধহয় সে। কেন না সে হল সরকারের শাসনকর্তা! খোঁয়াড়অলা স্যায়দালী সেখ!
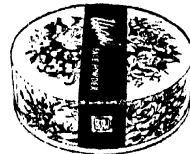
আবদুল জব্বার

(৪০)

এর ভিতর সেদিন দুজন মানুষ এসেছিল ফেলুর বাড়ি। মাথায় তাদের কালো রঙের টুপি। লাল রংয়ের পুচ্ছ টুপিতে। কালো রঙের পাতলা সস্তা আদ্দির পাঞ্জাবী। নিচে সাদা গেঞ্জি। গেঞ্জিটা ভেতর থেকে জেল্লা মারছে। পরনে খোপ কাটা লুঙ্গি। পাতলা নুর থুতনিতে। ওরা এসে লম্বা কাফিলা গাছটার নিচে দাঁড়াল। গরুর ঘরটা ফেলুর এখন পড়ে গেছে। একটা ঘর সম্বল। শোলার বেড়া ঘরে। নাড়া দিয়ে আন্নুর জন্যালায় একটা আভাবেড়া পর্যন্ত করতে হয়েছে। একটু আড়াল না করে রাখলে বিবি ধনেখালি শাড়ির মতো। চিৎপাত হয়ে থাকে খালি উঠোনে। যারা পথ দিয়ে যায়—এক খুবসুরত বিবি বান্ধা আছে এই ঘরে। ওরা চোখ মেরে যায়। ফেলু এটা বোঝে। এখানে, এই বড় কাফিলা গাছটার নিচে এলেই শালা মনুষ্য জাতির লোভ বেড়ে যায়। উঁকি দিয়া দ্যাখে—ফেলু বাড়ি আছে কি নেই। বিবিটা তার কি করছে! দেখে ফেললে আন্নুকে, লোভে দু ঠোঁটে চুকচুক করতে থাকে। হালার কাওয়া।

সে সেজন্য এক হাতেই সব ঠিকঠাক করে রাখছে। কেউ যেন তার বিবিকে যখন তখন দেখতে না পায়, চারপাশে নাড়ার বেড়া, সব সময় বিবি ভিতরে থাকুক এমন ইচ্ছা তার। এটা শীতকাল নয়। গ্রীষ্মের দিন। এ-দিনে বড় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায়। কারণ সেই যে সূর্য মাথার উপর উঠে কিরণ দিতে থাকে, কিছুতেই আর পশ্চিমে নেমে হালার কাওয়া অস্ত যেতে চায় না। চারপাশটায় যত জমি সবই রোদে খাঁ খাঁ করছে। গাছের পাতা ঝরছে। উড়ছে। পুকুরের জল শ্যাওলায় নীল রঙ। নদীতে পারের পাতা ডোবে না। মানুষের দুর্দিন বলতে যা বোঝায়, একটু পাতা পর্যন্ত পড়ে থাকে না গাছের নিচে। গরীব দুঃখী মানুষেরা সব গাছের পাতা সংগ্রহ করে রাখছে। বর্ষার দিনে আগুন জ্বালাবে বলে। সারাদিন এখন আন্নু পাতা জড় করছে বাঁশ ঝাড়ের অন্ধকারে। আভাবেড়ার আড়ালে বলে ফেলুর পরানে ডর থাকে না। ফেলুর বাঁ-হাতটা উড়ে গিয়ে যে ঘাটা হয়েছে, কিছুতেই শুকাচ্ছে না। এখন প্রায় কুষ্ঠের আকার ধারণ করেছে। সারাক্ষণ ভনভন করে মাছি বসছে। সে বসে গামছা দিয়ে ঘায়ের মাছি তাড়াচ্ছিল তখন। আর ঘাটাতে গরম রসুন গোটার তেল লাগাচ্ছিল। ঘায়ের ভিতরটা সারাক্ষণ জ্বলে। খাঁ খাঁ করে দাবদাহের মতো। হেকিমি কবিরাজিতে কাজ দিল না। গোপাল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল চুপিচুপি অষুধ আনতে। কিছুতেই কিছু হয় নি। মূলে আছে এর এক মানুষ। পাগল মানুষ। মুড়াপাড়ায় হাতী দিয়ে মানুষটা তার এমন শক্ত শরীর বিনষ্ট করে দিল। সে যে কি করে! হালার কাওয়া এখন বাতাসে ফু দিয়া পাখি উড়ায়। পদ্য কয় দুই চাইর লাইন। মেম সাহেবানির কইলজা চিবাইতে না পাইরা গাছের নিচে থাকে বইসা। হেসে কন, গ্যাত চোরত শালা! মাইনসে কয় সাধুসন্ত। ফকির। পীর হইতে পারে। ফেলু কয়, ঐ হালার কাওয়া যত নষ্টের গোড়া।

তখনই সে দেখল, কাফিলা গাছটার নিচে মোল্লাজানের মতো দুই মানুষ। ফিক্ ফিক্ করে দুই গালের ফাঁকে হাসছে। ফেলু মানুষ দুটাকে দেখেই দ্রুত চোখ নামিয়ে আনল। আবার দুই মোল্লা মোতাবেক মানুষ। তারা কেন এসেছে সে জানে। গত শালেও একবার এসেছিল ওরা। সে সেদিন হাঁসুয়া নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল। সে শালা কারে ডরায়। সে টুন্ডা ফেলু। তবু মনের রোষটা ঠিক বেঁচে আছে। এখনও ফেলু হাঁক দিলে আন্নুর কলিজা কাঁপে। সে তেমনি হাঁকল, কেডা মিঞা গাছের নিচে খাড়ইয়া আছেন!

—আমি ভাইসাব আমিনুল্লা।

—আবার কি মনে কইরা!

—আইছিলাম একবার আকালুসাবের খুঁজে।

—তা সাহেব কি উঠানে আমার খাড়ইয়া আছে।

—তা ঠিক না।

—তবে কি ঠিক! উঠানে পাখি খুঁইজা বেড়ান।

ওরা এবার আমতা আমতা করতে থাকল।

—মিঞা মনে করেন বুঝি না কিছু!

—তা ঠিক না। মনে হইল একবার ফ্যালু মিঞার খবর নিয়া যাই।

—তা ভাল কাম করছেন। তামুক খান তাইলে।

—খাই তবে। যখন কইলেন খাইতে।

ফেলুর চোখটা এবার আভাবেড়ার ও-পাশে উঠে গেল। আন্নুটা আবার মানুষের গলা পেয়ে উঁকি দিচ্ছে কি-না! উঁকি দিলেই সে যদি হাতের কাছে হাঁসুয়া পায় তবে ফিকে দেবে বেড়ার ফাঁকে। এমন চোখে মুখে যখন ফেলু আভাবেড়ার দিকে তাকাচ্ছে তখন আমিনুল্লা বলল, নাই।

চমকে উঠল ফেলু। —কি নাই।

—আকালুসাব নাই।

—নাই ত কই গ্যাছে। ফেলুর পরাণে জল এল।

—গ্যাছে নারানগঞ্জে।

—গ্যাছে ক্যান!

—গ্যাছে মামলা করতে।

—তা পয়সা থাকলে মামলা করব না। আপনের মত গাছের নিচে খাড়াইয়া থাকব!

—সেই কথা।

ওরা এসে এবার নির্ভয়ে হোগলার উপর বসল।

—নেন তামুকটা টান দ্যান। নিভা যাইব।

আমিনুল্লা বলল, আপনের ভাইসাব কড়া তামাক পছন্দ।

ফেলু দেখল বিবিটা কোথায় এখন! বলল, বড় পছন্দ। তারপর সে ডান হাত দিয়ে গামছায় আড়াল করা ঘা থেকে মাছি তাড়াল। ফেলুর শরীর থেকে কেমন একটা দুর্গন্ধ উঠছে। ফেলু বুঝি টের পেয়ে গেছে বিবি মানুষের গন্ধ পেয়ে বাঁশ ঝাড়ের নিচ থেকে উঠে এসেছে। কোন এক অদৃশ্য স্থান থেকে সে তাজা মানুষদের দেখছে।

ফেলু উঠে যাবার সময় ওরা দেখল, সে তার ঘাটা গামছার আড়ালে ঢেকে রেখেছে। ওরা বুঝতে পারল দুর্গন্ধ উঠছে ঘা থেকে। তাছাড়া ওর এই হাতটা কবে গেল জানে না। ওরা জানত, এই মানুষের হাত পাগল ঠাকুর হাতী দিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। বাঁ-হাতের কব্জি কতকাল ফুলে ফেঁপে ছিল। তারপর হাতটা একদা শুকিয়ে গেল। শুকনো লতার মতো হাতটা ওর শরীরে দুলত। হাতটার কোন ধর্মকর্ম ছিল না। কোন বোধ ছিল না। রক্ত চলাচল না হলে যা হয়। সেই হাত ওর ব্যাঙের লেজের মতো কবে খসে পড়েছে কেউ জানে না। সে সারাক্ষণ বাঁ দিকের হাতে একটা গামছা ফেলে রাখে। কাঁধের নিচে লাল দগদগে ঘা। ঘা দেখে ওদের শরীর কেমন গুলাতে থাকল। এত বড় একটা ঘা নিয়ে মানুষটা বেঁচে আছে কি করে। ওরা এসেছিল এই পথে আন্নুকে একবার দেখবে বলে। বিবি নাকি এ-তল্লাটে চান্দের লাখান মুখখান আর আকালুসাব আছে বিবির পিছনে এবং ফেলু এই বিবিকে নিয়ে রাত বিরাতে ঘাস বিচালি, ধানের চাড়া, মটর দান্য যা পায় জমি থেকে চুরি করে আনে।

ফেলু ভিতরে কি যেন খোঁজাখুঁজি করতে গেছে। সে ফের আসছে। কলকিতে আগুন। সে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আসছে কলকিতে। আর একটা চোখ ওর সজাগ, সে গোপনে দেখছে দুই মিঞার চক্ষু কি কর, কোন দিকে চক্ষু তাড়া করে। বিবি তার বড় লবেজান। ওরা এসেছে চুরি করে বিবিকে দেখে যাবে বলে। এরা সবাই আকালুর বান্দা। আকালুকে খুশী করতে পারলে এই ইবলিশদের আর কিছু লাগে না। তবু ডেকে তামুক সেবন, যেন আল্লা মেহেরবান বলে বসে যাওয়া মুখোমুখী তারপর হাঁকি দেওয়া—তোমরা মিঞা মনে কর আমি কিছু বুঝি না।

না কি সে মনে মনে আকালুকে ভয় পায়। ভয় পায় বলে ডেকে এনেছে—বইসা যান মিঞা, গরীবখানায় বইসা যান। আবার কখনও কখনও ফেলুর মনে হয় ওরা এসেছে গরু ছাগলের ব্যাপারির মতো। আকালুই হয়ত পাঠিয়েছে। জমি বাড়ি সব তার বন্ধক। তালাকনামা লিখে দিলে যদি বন্ধক ছুটে যায়, সব মিলে যায়, তবে মন্দ হয় না। এবং দুই বিঘা ভুঁই মিলে গেলে সে কিছু একটা ফসল করে বাকি দিন গুজরান করে ফেলতে পারবে। ওরা ব্যাপারির মতো খোঁচা দিয়া দ্যাখতে চায় ফেলুর বিবির দামদর কত।

কিন্তু মিঞা দুজন ফুতফাত তামুক খেয়ে বসে থাকল। কিছু আর বলছে না। ওরা আতাবেড়ার ফাঁকে আন্নু বিবির মুখ দেখে ফেলেছে। দেখেই কেমন গুম্ হয়ে গেছে। ঘরে যান শয়তানটা একটা পরী মন্ত্র পড়ে বেঁধে রেখেছে। ডানা কেটে দিয়েছে। উড়তে পারছে না। কষ্টে বিবির চোখ মরা গাঙের মতো।

বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়েই আন্নু অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু আতাবেড়ার ও-পাশ থেকে কচ্ছপের মতো গলা বের করেছিল। আর কিছু ওরা দেখতে পায় নি। আন্নু আর অধিক বের করতে পারে না। ওর গায়ে ফুটা-ফাটা হাজার রকমের তালিমারা শাড়ি।

একবার আকালু একটা শাড়ি কিনে দিয়েছিল। শাড়ি দেখে ফেলু তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিল। এবং যা হয়, কেউ কিছু দিলেই আন্নুর পিঠ আর ঠিক থাকে না। ভয়ে আন্নু তেল সাবান, গন্ধ তেল এবং চিরুনি খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখে। পরবের দিনে অথবা মানুষটা মেঘনাতে চাইন মাছ শিকারে গেলে পটের বিবি সেজে বসে থাকে আকালু কখন আসবে। অবশ্য আন্নু জানে ফেলু কোন নির্দিষ্ট তারিখে ফিরে আসে না। আগে অথবা পরে আসে। ফেলু ফেরার আগেই সে ফের তার ফুটা-ফাটা শাড়ি অথবা গামছা পরে বাঁশঝাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফেলু ফিরেই শুকনো মুখ দেখে বলবে, তুই এহানে বিবি?

—তোমার লাইগা মনডা বড় কান্দে।

আর সেই ফেলুর এখন কিছুই নেই। সে মেঘনা নদীতে আর চাইন মাছ শিকার করতে যেতে পারে না। সে টের পায় বিবি তার কাছে আসে না। কেবল দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্গন্ধে টেঁকা দায় এমন চোখ মুখ তার। এখন বিবি কেবল আকালুর বিবি হতে চায়। আকালুর বিবি হওয়ার জন্য সে হাতে পায়ে ধরে কাঁদতে পারত, আমারে তালাক দ্যাও মিঞা, আমি যাই সাগরের জলে, তুমি আমারে ছাইড়া দ্যাও। কিন্তু পারে না, প্রাণে বড় ভয়। মান্দাতা আমলের কোরবানীর চাকুটার ভয়। সেই ভয়ে বাড়ির চারপাশটায় বিবি ঘুর ঘুর করে। বিবি তার হকের ধন। আন্নু তার দু বিঘা জমি জিরাতের মতো। ওর বাড়ি ঘরের মতো সে বিবিকে ভোগের নিমিত্ত পেয়েছে। তার ভোগ শেষ না হলে কোন শালা লেবে। যেমন তার দুটো মাটির সানকি, একটা পেতলের বদনা, বাঁশঝাড়, পাটকাঠির ঘর, উড়াট জমি, এক বিবি, সে তো দশটা পাঁচটা বিবি রাখে নি ঘরে, তবু তার এই সামান্য সম্পত্তির জন্য কি লোভ আকালুর। তার হাত গিয়ে সে এখন এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সে মরলেই আকালু তাজিয়া নাচাবে উঠোনে। ফেলু এবার বলল, তা মিঞা আকালু মামলা করতে গ্যাল ক্যান!

কালু মিঞা বলল, ওডা ত তোমার জানার কথা।

—আমার জানার কথা! কি যে কন! ফেলু একেবারে বিনয়ের অবতার বনে গেল। সে যে এ-সব টের পায় না তা নয়। সব টের পায়। এই দুই হোমদির পুত আইছে আকালুর পক্ষে। আকালুর ছিনালি করতে আইছে।

আমিনুল্লা মোল্লা মোতাবেক বলল, গ্যাছে তোমার নামে এক নম্বর ঠুইকা দিতে।

ফেলু চোখ বড় বড় করে ফেলল। সে মামলামোকদ্দমাকে বড় ভয় পায়। ওর নামে মামলা রজু করলেই দুদিন পর পর ছোটো নারানগঞ্জে। তার তাজা বিবিটা একা একা থাকবে। ফাঁক বুঝে তাজিয়া নাচাবে আকালু। সে ভীষণ শক্ত হয়ে গেল। সে মামলা করতে গেলে বিবিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। তবু সে মামলার নামে ঘাবড়ে গেল। তার এখন প্রায় ভিক্ষা সম্বল। তার নামে এতবড় মানুষটা মামলা করতে গেল।

বস্তুত এই আমিনুল্লা আর কালু মিঞা এসেছিল যেনতেন প্রকারেন ফেলুকে ঘাবড়ে দিতে। বুদ্ধিটা আকালুসাবেরই।

সেই ফেলুকে যখন তখন ভয় দেখাতে বসেছে। টাকার জোরে আকালু বাজি ফাটাচ্ছে। আকালুর দল ভারি। সে পঙ্গু তার অর্থবল নেই। সে গরীব। সে আকালুর কাছে কিছু না। তবু যে তার পিছনে কেন লাগে। একটা বিবি তার। —দ্যাশে কত খুসুরত বিবি আছে মিঞা। তোমার টাকার অভাব নাই। শহরে যাও, খইরা আন। ফেলু বড় অসহায় বোধ করল। এই কামডা ভাল না মিঞা। ফেলু দু হাত তুলে মোনাজাত করল আল্লার কাছে। আমি অমানুষ আল্লা। তুমি আমার কসুর ক্ষেমা দিও। বিবিরে নিয়া যদি তামাসা করে না যান। গলার নালি ছ্যাঁক কইরা দিমু তবে ছিড়া।

আমিনুল্লা বলল, তা মিঞা কথা কওনা ক্যান?

—কি কমু কন!

—একটা ফয়সালা কইরা ফ্যালা। আকালু সাব সেডা মানুষ, তার লগে তুমি পার!

—কি ফয়সালা?

—তালাকনামা লিখা ফ্যাল। গোপনে কাজটা হইয়া যাউক।

ফেলুর মনে হল বজ্রাঘাত মাথায়। অথবা মনে হচ্ছে ওর মাথায় কারা হাতুড়ি পেটাচ্ছে। সে সেই দিনের মতো উঠে দাঁড়াল। খাটো গামছায় ঢাকা। তবু মাছি ভনভন করছে। খড়খড়ি উঠে গেছে শরীরে। তার শরীর সেই আদিকালের একটা গাছের মতো। ডালপালা ভেঙে গেছে। তবু সে মহাসমারোহে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। মহাসমারোহে পৃথিবীর ঝড় জল রোদ সহ্য করতে করতে সহসা নিজের ভিতর দুটো হাত গলিয়ে নিতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে আর পারছে না। ভয়ঙ্কর কঠিন

উত্তর ওর মুখে এসে গেছিল। সে তা প্রকাশ করল না। করলেই ওরা পালাবে। সে ঘরের ভিতর টলতে টলতে ঢুকে গেল। তখন দুই মিঞা বুঝতে পারল ফেলু ক্ষেপে গেছে। ওর উঠোনে এখন বসে থাকলে এই দিনের বেলাতেই সে হাঁসুয়া দিয়ে গলা দু-খান করে দেবে। ফেলু যত সত্বর ঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছে তার চেয়ে ছুটে ওরা মাঠে দৌড়ে নেমে গেল।

ফেলু ঘর থেকে বের হয়ে দেখল ওরা উঠোনে নেই। হাতে ওর সেই কোরবানের চাকুটা। উঠোনের এক কোণে ওর রাখি গরুটা ফেলুকে জাবর কাটতে কাটতে দেখছে। ফেলু উঁকি দিয়ে কি যেন মাঠে খুঁজছে। উঠোনের চারপাশে তাকাচ্ছে। ফেলু তাকাতেই দেখল জাফরি যেন সব বুঝে গেছে। সে তার রাগি গরুটাকে বলল, দুই মিঞা কোনদিকে গ্যাল জাফরি! গলার নালিতে কত খুন আছে একবার দ্যাখতাম।

বাড়ির শেষে ফেলু বড় কাফিলা গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। গাছটা থেকে আঠা পড়ে পড়ে গোড়া আর চেনা যায় না। ডালপালা নেই। পাতা দুটো একটা। দেখলে মনে হয়, গাছটা মরে গেছে। শুধু ফেলু জানে গাছ ভিতরে তেমনি তাজা, এখনও এক কোপে কত আঠা যে ওগলায়। গাছটা মাথায় খুব লম্বা নয়। খুশি মতো ফেলু ডালপালা কেটে বাড়ির চারপাশে বেড়া দেয়। কাণ্ড এখনও এত নরম যে সে একবার শাবল দিয়ে গাছটা এফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়েছিল। সে এই গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালেই বড় মাঠ দেখতে পায়। আর দেখতে পায় সেই ষণ্ড। সে দেখল আজ দুই মিঞা ভয়ে প্রায় মুখপোড়া ষণ্ডের মতোই লুঙ্গি তুলে ছুটছে। সে এবার চিৎকার করে উঠল, অঃ হালার পো হালারা, কুত্তার মত পালাও ক্যান। খাড়াও। দ্যাহি মরদখানা ক্যামন। বিবিরে নিয়া আমার তাজিয়া নাচাইতে পার কিনা দ্যাহি!

তখনই দেখল ফেলু কোত্থেকে সেই ধর্মের ষণ্ড মাথা নিচু করে উঠে আসছে। কালো রঙ। কি কালো, প্রায় ঈশান কোণের কাল বোশেখিতে মেঘের রঙ এমন হয়। দুই শিঙ তরবারির মতো আকাশের দিকে উঠে গেছে। কি ধারালো, নিমেষে সে কসুখরা এফোঁড়ওফোঁড় করে দেবে যেন।

ফেলু তার এক চোখে দেখছে ষণ্ডটাকে। ষণ্ড ও-পাশ থেকে আর এক চোখে দেখছে। ফেলু একটা গোলাপফুলের মতো কোরবাণীর চাকুটা দু আঙুলে ধরে রেখেছে। ষণ্ডটা এতক্ষণে ফেলুকে হয়ত তেড়ে এসে কাফিলা গাছটার গেঁথে দিত—কিন্তু হাতে এক কোরবাণীর চাকু। দেখলেই ষণ্ড টের পায়, বড় ধারালো ওটা, গলার ভিতর ঢুকিয়ে দিলে নালি ফাঁক। যেন ফেলু ওটা একটা গোলাপফুল তুলে এনেছে বাগান থেকে। আও মিঞা, খাড়াইলা ক্যান। বাগিচা থাইকা তোমার লাইগা ফুল তুইলা আনছি। আও। আও। বলে এক হাতে ফেলু ষণ্ডটাকে উদ্দেশ করে উরু থাবড়াতে থাকল। আর চাকুটাকে নাচাতে থাকল হাতের উপর।

ষণ্ড নিমেষে বেমালুম ভালমানুষ হয়ে গেল। শিঙ দিয়ে আর মাটি তুলল না। গোঁত্তা খেল না আর মাটিতে। সরল খুবার মতো হেঁটে হেঁটে পাশাপাশি দেখতে দেখতে নেমে যেতে থাকল। যেন এক পোষমানা জীব, ফেলুকে দেখেই মাঠে ঘাস খেতে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু ফেলুর কেমন দুই মিঞাকে কাছে না পেয়ে জিদ চড়ে গেল। মিঞার বদলে এই ষণ্ড। সে মাঠে নেমে লড়াই করবে, সে হাঁকল, হাঁ হাঁ হাঁ। ষণ্ডটা এবার ঘুরে দাঁড়াল। মাঠের দুই পাশে দুইজনা। দুই জীব। আদিম এবং উৎকট চোখ মুখ দুই জীবের। ফেলুর নেই ডানদিকের চোখটা, ষণ্ডের নেই বাঁ দিকের চোখটা। জীবের চার পা। ফেলুর দু পা, এক হাত। এখন ওরা এত কাছাকাছি যে উভয়ের অর্ধেকটা দেখছে। সবটা দেখতে পাচ্ছে না। ফেলু এখন যেন চিনতেই পারছে না, এটা জীব না অন্য কিছু। কি তার ধর্ম, কি তার স্বভাব। ষণ্ডটাও বুঝতে পারছে না সামনের জীবটা মানুষ, না পীর, না ইবলিশ। ষণ্ডের মনে হল, হালার এক আজব জীব। সে ভয়ে লেজ খাড়া করে বিলের দিকে ছুটতে থাকল। পথে আসছিল তারিণী সেন। তারিণী কবিরাজ। ঘোড়ায় চড়ে আসছে। এত বেশি জোড়ে ছুটছে ষণ্ড যে তারিণী সেনের ঘোড়া পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে।

ফেলু জোরে জোরে হাঁকল, হাজিসাব আপনের ষণ্ড আমারে ডরাইছে।

তারিণী কবিরাজ যাচ্ছে ঠাকুরবাড়ি। বুড়ো ঠাকুরের এখন-তখন অবস্থা। সঙ্গে

রেখেছে মকরধ্বজ। পকেটের ভিতর ঘোড়ার পিঠে কত রকমের সব লাল নীল রঙের বড়ি। ঘোড়ার পিঠে তারিণী কবিরাজ একবার উঠছে আবার নামছে। মাঠের উপরে এমন একজন মানী লোককে আসতে দেখে সে ভাবল একবার যাবে কবিরাজমশাইর কাছে। হাতের ঘাটা তাকে দেখাবে। এই না ভেবে সেও ঘোড়ার পিছনে লেজ খাড়া করে ছুটতে থাকল।

সকাল থেকেই বাড়ির ভিতর সবাই ব্যস্ত। সোনা অর্জুন গাছের নিচে এসেছিল পাগল জ্যাঠামশাইকে ডেকে নিয়ে যেতে। তিনি গাছটার নিচে বসে আছেন। কিছুতেই বাড়ির ভিতর যাচ্ছেন না। সোনা নিয়ে যেতে না পারলে বড়বৌ আসবে। তখনই সে দেখল সম্মান্দীর তারিণী কবিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসছে। সে জ্যাঠামশাইকে ফেলে ছুটে গেছে—তারিণী দাদা আইতাছে। বড়বৌ এবং শচীন্দ্রনাথ খবর পেয়ে উঠোনে নেমে এল। নরেন দাস ছুটে এল। কবিরাজমশাই বড় ঘরে ঢুকে বলল, ঠাকুরদা কেমন আছেন?

বড়বৌ সব উত্তর দিচ্ছিল কবিরাজমশাইকে। কারণ বৃদ্ধ মানুষটির কথা বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল ভোরে তিনি সবাইকে কাছে ডাকলেন। বড়বৌ, শচি, শশীবালা, ধনবৌ সবাইকে। তাঁর বড় ইচ্ছা নৌকাবিলাস পালাগান শোনার। সহজমপুরের যোগেশ চক্রবর্তীকে খবর দিতে হবে। ঈশম যাবে ভাবছিল—তখনই হঠাৎ চোখ বুজে যেন কি বুঝতে পারলেন, বললেন, না দরকার নেই। কাল আমার একশ বছর পূর্ণ হবে। তোমরা আত্মীয়স্বজন সবাইরে খবর দাও। তারপর থেকেই হৈচৈ বাড়িতে। তিনি বলেছেন, পরদিন ভোররাতে সবার মায়া কাটাবেন। আর সবুজ বনে মৃত বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থকবেন না।

ফেলু দৌড়ে এসেছিল গোপাট পর্যন্ত। সে আগে এসে ধরতে পারল না। ঠাকুরবাড়ি সে কোনদিন উঠে যেতে সাহস পায় না। সে হারমাদ মানুষ। ওকে দেখলেই ভয় পায় সকলে। সে সেজন্য গোপাটের মাদার গাছের নিচে বসে থাকল, কখন কবিরাজমশাই আবার ঘোড়ায় চড়ে গোপাটে নেমে আসবে।

তারিণী সেন বলল, ঠাকুরদা আমি তারিণী। কি কষ্ট হইতাছে কন!

মহেন্দ্রনাথ হাত সামান্য উপরে তুলে ইসারায় যেন বললেন, কোন কষ্ট না। এখন তাঁর সব কৃপা। তোমরা আর আমাকে তাড়না করবে না, এমন মুখ চোখ তার।

শচি বলল, তারিণীকাকা কি মনে হয়?

—টিকব না। যা কইছে ঠিকই কইছে।

—কিছু খাইতে চায় না।

—সবাই কাছে বইসা থাক। অষুধ দিয়া আর কোন দরকার নাই।

মন মানে না। বড়বৌই বিকেলে ঈশমকে পাঠিয়ে দিয়েছিল তারিণী কবিরাজের কাছে। তিনি প্রবীণ মানুষ। প্রবীণ বদ্যি। তিনি এই সংসারের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত। এবং প্রায় আত্মীয় সম্পর্ক। সেই থেকে মানুষজন সব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আত্মীয়স্বজন যা আছে সবার কাছে এবং তারিণী কবিরাজকে খবরটা দিতে বলা হয়েছিল। খবর পেয়েই চার ক্রোশ পথ ঘোড়ায় চড়ে চলে এসেছেন। ঈশম আসেনি। সে আসবে দক্ষিণে যত আত্মীয়-স্বজন আছে তাদের খবর দিয়ে। হারান পাল গেছে উত্তরে, নরেন দাস গেছে পুবে আর শশীমাস্টার গেছে মুড়াপাড়া। সে যাবার সময় গোলাকান্দাল, পেরাব পোনাব এবং দূরে দূরে যেসব গ্রামে আত্মীয়স্বজন আছে সবাইকে খবর দিয়ে চলে যাচ্ছে —সে বলে যাচ্ছে, মুড়াপাড়া যাচ্ছি। ঠাকুরের দুই ছেলে আছে তাদের খবর দিতে। ঠাকুরকর্তা আগামীকাল দেহ রাখবেন।

আর দীনবন্ধু থাকল নানারকম কাজ-কর্মের তদারকিতে। কোথায় দাহ করা হবে ঠিক আছে। অর্জুন গাছটার নিচে রাখা হবে। তিনি গাছ লাগিয়ে তাঁর দাহ করার জায়গা ঠিক করে রেখেছেন। কোন আমগাছ কাটা হবে, সেটাও ঠিক করে রাখতে হয়।

তারিণী কবিরাজ বলল, পাগল কর্তারে দ্যাখতাছি না।

—অর্জুন গাছের নিচে বসে আছে।

—ডাইকা আনেন। কাছে বইসা থাকুক।

বড়বৌ সোনাকে পাঠিয়েছিল ডাকতে। কিন্তু তিনি আসছেন না। দীনবন্ধু একবার খবর নিয়ে গেল, কি রকম লাগছে। কেমন আছে?

বড়বৌ বলল, বিকেলের টানে চলে যাবে মনে হয়।

—ধনবৌদিরে কন রান্নাবান্না শেষ করতে। পোলাপান যা আছে অগ খাওয়াইয়া দ্যান। আপনেরা অ দুইডা মুখে দ্যান।

বড়বৌ সে সবের কোন উত্তর দিল না। বলল, দেখুন তো ঠাকুরপো আপনার দাদাকে নিয়ে আসতে পারেন কিনা?

—তাইন কোনখানে।

—অর্জুন গাছটার নিচে বসে আছে। সোনাকে পাঠিয়েছিলাম। আসছে না।

—আপনি যান বৌদি। আপনি না গ্যালে আসব না।

—যাই কি করে বলুন। তারিণীদা এসেছে, ওর জন্য জলখাবার করতে হবে। ধন রান্না করছে। মা তো বিছানাতেই চুপচাপ বসে আছেন। কাল থেকে কিছু খাচ্ছেন না। কোন দিকে সামলাই বলুন।

সুতরাং দীনবন্ধু অর্জুন গাছটার নিচে গিয়ে ডাকল, এখানে বইসা থাকলে হইব! বাড়ি যান।

পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ দেখল দীনবন্ধু তাকে নিতে এসেছে। সে পিছন ফিরে বসে থাকল।

শচি এল। সেও নিয়ে যেতে পারল না। শচি ফিরে এসে বলল, আপনি যান। দেখেন আনতে পারেন কিনা।

অগত্যা সব কাজ ফেলে বড়বৌ পুকুর-পাড়ে এসে দাঁড়াল। দেখল, তাঁর মানুষ এখন ঘাসের উপর বসে আছে। দুটো একটা পাতা গাছ থেকে ওর মাথার উপর ঝরে পড়ছে। সে কাছে গেলেও মানুষটা চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। কাছে গিয়ে মাথার চুলে নরম আঙুলে বিলি কাটতে থাকল। প্রায় সন্তানের মতো যেন তার আদর। সে বলল, ওঠ। এ-সময় এখানে বসে থাকতে নেই। চারপাশে তিনি হাতড়াচ্ছেন। সবাই বলছে তিনি তোমাকে খুঁজছেন। ওঠ। ও'র পায়ের কাছে বসে থাকবে। কোথাও আজ বের হবে না।

বড়বৌ একটু থেমে দূরের গোপাটে কাকে যেন আলগা হয়ে বসে থাকতে দেখল। কে বসে আছে এমনভাবে! ঝোপজঙ্গলের জন্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বড়বৌ উঁকি দিলে জঙ্গলের ও-পাশে মানুষটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সুতরাং ফের বলা এই মানুষকে, কিছু না কিছু একা একা বলে যেতেই হয়, সে তো আর কোন জবাব দেবে না। সে বলল, মেজ ঠাকুরপো, ধন ঠাকুরপোকে খবর দেবার জন্য শশীমাস্টারমশাই গেছেন। কবিরাজদা এসেছেন। এসেই তিনি তোমার খোঁজ করেছেন। তোমার বোনের কাছে লোক পাঠানো হয়েছে। পলি, ইছাপুরা লোক গেছে। তোমার মামাবাড়িতে খবর দিতে গেছে হারান পাল।

সে সব খুলে বলছে। কিভাবে কি সব কাজ হচ্ছে সংসারে সব বলছে। এই মানুষ বাড়ির বড় ছেলে! তাঁর সব জানা উচিত। তিনিই দাঁড়িয়ে থেকে সব করাতেন। তাঁর হয়ে বুঝি বড়বৌ আর শচি সব করছে। সুতরাং ঠিক ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, না কোথাও ভুল থেকে গেল মানুষটাকে এমন জানানো। বলতে বলতে নিজের কাছেই ভুল ধরা পড়বে। অঃ তাই তো, সোনার

মামাবাড়িতে লোক পাঠানো হয় নি। তাঐ মশাই খুব দুঃখ পাবেন। সে তাড়াতাড়ি সোনাকে ডেকে বলল, তোর ছোট কাকাকে ডাক তো।

শচি এসে বলল, সোনার মামাবাড়িতে কে গেছে?

—কেউ যায় নাই।

—কাউকে পাঠিয়ে দিন।

এ-সময়ে কি কি করণীয়, বড় ছেলে বলেই তাঁর সব জানা উচিত। অথবা এই যে সব করা হচ্ছে, আত্মীয়পরিজনদের খবর দেওয়া হচ্ছে—তিনি যেন সবই জানেন এবং তাঁর পরামর্শ মতোই হচ্ছে এমন সম্মান দেখানো প্রয়োজন। বড়বৌ এ-জন্য সব বিস্তারিত বলে যাচ্ছে মানুষটার পাশে দাঁড়িয়ে।

বড়বৌ বলল, কি দেখছ?

মণীন্দ্রনাথ গাছের ডালের দিকে চোখ তুলে দিলেন।

বড়বৌ বলল সামনে শুধু মাঠ। ফসল নেই। জমি চাষ করা। বৃষ্টি পড়লেই পাটের বীজ বুনে দেওয়া হবে। এ-সময়ে ধু-ধু কিছু দেখতে পাবে না।

মণীন্দ্রনাথ পা ছড়িয়ে বসলেন। যেন তিনি কোন বড় নদীর পাড়ে বসে আছেন। [illegible] বেলা। স্রোতের তোড় তেমন প্রচণ্ড নয়। দক্ষিণ থেকে বাতাস বইছে। ক ঘন চুল এই বয়সে। চুল তাঁর একটিও পাকে নি। ছেলেমানুষের মতো বড় বড় চুল। বাতাসে চুল উড়ছে। ঘাটে জল কম। ঘোলা জল। কলমিলতার সবুজ আভা মরে যাচ্ছে। রুক্ষ কঠিন মাঠ। শুধু বালিহাঁস আর কিছুক্ষণ পরই নদীর চরে উড়তে থাকবে।

বড়বৌ বলল, তিনি যাই করে থাকেন, তোমার ভালো [illegible] করেছেন।

মণীন্দ্রনাথ ছোট ছেলের মতো অভিমানের চোখ নিয়ে দেখলেন বড়বৌকে। কোন কথা বললেন না। কথা বলেনও না তিনি। বেশি পীড়াপীড়ি করলে তাঁর প্রিয়

কোন কবিতা আবৃত্তি করেন। বড়বৌ এই অভিমানী মানুষটিকে দেখে ভাবল, তিনি হয়ত এখুনি কোন কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। বড়বৌ তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, এ-সময় সবাইকে কাছে থাকতে হয়। তুমি তাঁর বড় ছেলে। কত আশা ছিল তাঁর তোমাকে নিয়ে।

মানুষটা এবার মাথা গুঁজে দিল দু হাঁটুর ভিতর। ওঁর কি কান্না পাচ্ছে! অহংকারে, রাগে, অভিমানে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন! বড়বৌ প্রায় এসেছে এখন জননীর মতো। বড়বৌ মাথায় কেবল হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।—লক্ষ্মী এস। এমন করতে নেই। তুমি যদি পাশে না থাক, তিনি মরেও শান্তি পাবেন না।

পাগল মানুষ সেই যে মাথা গুঁজে দিয়েছেন হাঁটুর ভিতর, কিছুতেই মাথা তুলছেন না। বড়বৌ হাত ধরে টানছে. ওর মাথার ঘোমটা সরে গেছে সামান্য, বাঁ হাতে ঘোমটা টেনে ঠিক রাখছে। বুকের আঁচল সরে যাচ্ছে। ঝোপের ও-পাশে একটা মানুষ লুকিয়ে বসে আছে। সব দেখছে বসে বসে। সকালের রোদ্দুর গাছের ডালে, পাতার ফাঁকে মাটিতে এসে পড়েছে। মুখে বড়বৌর সকালের রোদ্দুর বড় মায়াময়। মুখে কপালে তার ঘাম। কপালে সিঁদুর বাসি দাগের মতো। লালপেড়ে কাপড়, শ্যামলা রঙ তার, আর এই শ্রী সকালবেলার মাঠে বড় মাধুর্য বয়ে আনছে। ফেলু কবিরাজের আশায় বসে থেকে ঝোপের ভিতরে সব দেখছে। সুন্দর লাবণ্যময় পা, পাতার উপর লালপেড়ে শাড়ি কি পবিত্র মনে হচ্ছে। অথচ এত টানাটানিতেও মানুষটা উঠছে না। সামনের জমিতে সেই ষাঁড়টা এখন নিরিবিলি ঘাস খাচ্ছে। কোথায় কি হচ্ছে কিছু দেখছে না।

বড়বৌ টেনে তুলতে না পেরে বলল, তুমি তো জানো তোমাকে ভালো করার জন্য তিনি কি না করেছেন।

পাগল মানুষের হাই উঠছে। তার এ-সব শুনতে আর ভাল লাগছে না।

বড়বৌ এক এক করে এবার এ-সংসারের পুরোনো ইতিহাস বলে গেল। মানুষটার তবু যদি চৈতন্য হয়। এমন সময়ে এ-পাগলামি বড়বৌরও ভাল লাগছে না। কবে একবার মহেন্দ্রনাথ নদী পার হয়ে শ্মশানে চলে গিয়েছিলেন, মৃতদেহের জন্য সেই শ্মশানে একা একা রাত্রিবাস এবং মৃতদেহ চুরি তারপর সেই কাপালিকের জন্য কত কিছু হোমের কাঠ, বিল্বপত্র আর আমাবস্যা রাতের অন্ধকারে নিশীথে শিবা ভোগ এবং নদীর পাড়ে শ্মশান ভূমিতে এক ভয়ঙ্কর কঠিন যাগযজ্ঞে এই মানুষের আরোগ্য কামনা করেছিলেন। যেমন তিনি জীবনে একবার মিথ্যা তার করে, সন্তানের ভালবাসা কেড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি তিনি প্রৌঢ় বয়সে প্রায় তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে হার-জিতের বাজিতে পড়ে গিয়ে—যা কিছু

অকল্পনীয়, যা কিছু মানুষের দ্বারা সিদ্ধ, ভূত অথবা পিশাচ কোন কিছুই বাদ রাখেন নি। যেন তিনি দৈবের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য ক্রোশের পর ক্রোশ নিশীথে হেঁটে যেতেন, কোন ফকির অথবা আউলবাউলের উদ্দেশে। তাঁর বড় ছেলে পাগল। কেউ বান মারতে পারে, বন্ধন করে দিতে পারে—তিনি মন্ত্রসিদ্ধ মানুষের খোঁজে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও তেমন মানুষ খুঁজে পেলেন না। শুধু মিথ্যার অহঙ্কার। যাগযজ্ঞ, তুকতাক সব মিথ্যার সঙ্গে লড়াই। যেদিন যথার্থই হেরে গেছেন, সেদিন থেকে আর ঘরের বার হলেন না। সবাই দেখল, মানুষটা অন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছে মানুষটা হেরে গিয়ে সারারাত মাঠে শীতের ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে মানুষটার দুটো চোখই চলে গেল। এখন সেই মানুষ নিজেও চলে যাচ্ছেন। বড়বৌর মায়া হতে লাগল। কোন রকমে একবার নিয়ে যাওয়া, এই শেষ সময়ে শিয়রে অথবা পায়ের কাছে বসিয়ে রাখা। সে কেমন কান্না কান্না গলায় বলল, তোমার এতটুকু মায়াদয়া নেই। তিনি তোমাকে কিভাবে চারপাশে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছেন!

পাগল মানুষ দেখল তখন একটা ষাঁড়, বড় ধর্মের ষাঁড় ঘাসের জন্য ফোঁপাচ্ছে। কঠিন মাটি, জল নেই কতদিন। ঘাস পুড়ে গেছে। সূর্য মাথার পর থেকে যেন নামে না। কঠিন দাবদাহে ষাঁড়টা লাফাচ্ছিল। এমন কি সেটা এই পুকুরপাড়ে উঠে আসতে পারে। কেমন ভয়ে ভয়ে পাগল ঠাকুর এবার উঠে দাঁড়ালেন।

মনের ভিতর ভয় জাগলেই তিনি দেখতে পান এক কাটামুণ্ডু হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে। দুই কান তার লম্বা। সাপের চোখের মতো চোখ। নীল এবং অন্ধকার। তিনি দেখতে পান কখনও মুণ্ডুটা অতিকায় বাদুর হয়ে তাঁর চোখের উপর ঝুলছে। তিনি তখন কাটা মুণ্ডুর ভয়ে পিছনে ছুটতে থাকেন। নিশিদিন সেই কাটামুণ্ডু কে যেন সুতো দিয়ে অদৃশ্য এক স্থান থেকে তার চোখ বরাবর ঝুলিয়ে দিয়ে বলছে, এই দ্যাখো, এই হচ্ছে তোমার ধর্ম। তার সবটা থাকে না। কিছুটা থাকে। যা দেখলেই সত্যিকারের মানুষ ভয় পায়। নিশীথে সে এক অতিকায় বাদুর হয়ে যেতে পারে। যক্ষ রক্ষ সব তার দোসর। তুমি তার ভয়ে কীটের সামিল। খুশি মতো তখন তোমাকে বলি অথবা জবাই দেওয়া চলে। তখনই ভয়ে মণীন্দ্রনাথের নিরিবিলি এক আশ্রয়ের কথা মনে হয়। বড়বৌ সেখানে সাদা পাথরে লাল বর্ণের ফলমূল আহার নিমিত্ত রেখে দিয়েছে। পানীয়ের নিমিত্ত রেখেছে ঠাণ্ডা জল। সে তখন একা একা সেই জানালায় যাবে বলে ছুটিতে থাকে।

বড়বৌ দেখল, মানুষটা এবার ঘরের দিকে ফিরছে।

(ক্রমশঃ)

# সাহিত্য ও সংস্কৃতি

## নদীর পারে ঘর

ইংরাজ লেখিকা দাফনে দ্য মরিয়ার এ যুগের একজন জনপ্রিয় লেখিকা। ১৯৩৮ খৃঃ তাঁর 'রেবেকা' উপন্যাসটি প্রকাশের পর সারা বিশ্বে সাড়া জাগে। বলিষ্ঠ কল্পনাকুশলতার সঙ্গে মানবিক সমস্যার সংমিশ্রণে প্রচলিত বিষয়বস্তুর বাইরে কাহিনী রচনা তাঁর বৈশিষ্ট্য। 'রেবেকা'র জনপ্রিয়তায় লেখিকা বিস্মিত হলেন। বাংলা ভাষাতেও প্রায় পনের বছর আগে এই উপন্যাসটির অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী শিউলি মজুমদার। দাফনের বাবা স্যর জিরাল্ড দ্য মরিয়র ছিলেন একজন প্রখ্যাত নট এবং থিয়েটার-ম্যানেজার, আর তাঁর পিতামহ জর্জ দ্যু মরিয়র ছিলেন 'পাঞ্চ' পত্রিকার সর্বজনপ্রিয় কার্টুনিস্ট এবং 'ট্রিলবি' এবং 'পিটার ইবেটসন' নামক দুটি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থের লেখক। এছাড়া দাফনের এক প্রপিতামহী ছিলেন সম্রাট নেপোলিয়ান-এর রক্ষিতা—বংশধারায় সেই মহিলার পদবীটুকু আজো চলে আসছে। 'দি দ্য মরিয়রস' গ্রন্থে বিগত শতাব্দীর পারিবারিক কথা লেখিকা নিজেই লিখেছেন।

দাফনের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা হয় বাড়ীতে আর সব বোনদের সঙ্গে, তারপর প্যারিসে পড়াশোনা করার পর ১৯২৮ খৃঃ থেকে তাঁর ছোটগল্প সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩১ খৃঃ প্রথম উপন্যাস 'দি লাভিং স্পিরিট' বেরোয়। এর পর আরো দুটি উপন্যাস লেখেন। খ্যাতি বৃদ্ধি পেল পিতার জীবনী রচনার পর। এই জীবনী-গ্রন্থের নাম—'জিরাল্ড-এ পোর্ট্রেট'। এই জীবনীর রচনা রীতি প্রশংসিত হয়। এই সঙ্গেই বেরোয় কর্নিস পটভূমিকায় 'জ্যামাইকা ইন' কিন্তু আসল প্রতিষ্ঠা ১৯৩৮ খৃঃ 'রেবেকা' প্রকাশিত হওয়ার পর। এতখানি জনপ্রিয়তা যে সম্ভব তা দাফনে কোন দিন আশা করেন নি। উন-চল্লিশ সংস্করণ ছাপা হয়েছে গ্রন্থটি প্রকাশের কুড়ি বছরের মধ্যে এবং অন্তত কুড়িটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। রহস্যভরা এই উপন্যাসের চিত্ররূপ পরিচালনা করেছেন আলফ্রেড হিচকক এবং স্যর লরেন্স অলিভার মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন এই ছবিতে।

সেই অবধি দাফনে দ্য মরিয়র লিখে-ছেন প্রচুর। তাঁর আর একটি জীবনীগ্রন্থ 'বার্ণওয়েল ব্রন্তে'র খ্যাতি যথেষ্ট। দ্য মরিয়র ১৯৬৩তে 'দি গ্লাস ব্লোয়ার্স', ১৯৬৫ খৃঃ 'ফ্লাইট অব দি ফ্যালকন' এবং ১৯৬৯ খৃঃ 'দি হাউস অন দি স্ট্রান্ড' রচনা করেছেন। প্রতিটি উপন্যাসই অসীম জন-প্রিয়তার অধিকারী।

অর্ধ সত্য ও অর্ধেক কল্পনার খাদ মিশিয়ে তিনি লিখেছেন 'দি হাউস অন দি স্ট্রান্ড'। কর্ণওয়ালের কিলমার্থে লেখিকা নতুন বাড়ী করেছেন। এই কর্ণওয়ালের পরিবেশ তাঁকে এই উপন্যাসটি রচনার প্রেরণা দিয়েছে। টাই তার শ্রেথ-এর 'ম্যানব' এবং 'প্রিয়রি'র অনেক ঐতিহাসিক তথ্য তিনি উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। এই উপন্যাসের জন্য তিনি অজস্র তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তার শিল্পসঙ্গত ব্যবহার করেছেন কল্পনার জগতে এনে।

রিচার্ড ইয়ং একজন পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশক, জীবনে বীতস্পৃহ, ক্লান্ত। তার স্ত্রী ভিটা এবং দুটি সৎ-সন্তানের জ্বালায় সে জর্জরিত। তাই চলে এসেছে কর্ণওয়ালে তার বন্ধু ম্যাগনাসের বাড়ী বাস করার জন্য। ম্যাগনাস একজন বিজ্ঞানী। নানাবিধ গবেষণায় তার দিন কাটে। একটি চিত্তবিভ্রান্তকারক দাওয়াই আবিষ্কার করেছিল ম্যাগনাস, রিচার্ড জানলা থেকে ঘ্রাণ পাওয়ার বাসনাতেই হয়ত এই দাওয়াই পরখ করে দেখল। এই দাওয়াই-এর কৃপায় রিচার্ড চলে গেল এমন এক জগতে যে জগৎ ছ'শ বছরের প্রাচীন। এই প্রাচীন জগতে সে এক অদৃশ্য পর্যবেক্ষক, সে সবই দেখতে পাচ্ছে, সব কিছুর সাক্ষী কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, এই অবস্থায় সে এমন এক জগতের সন্ধান পেল তা তার নিজের জীবনের চেয়েও অনেক চমকপ্রদ, অনেক উত্তেজনাময়। এই অতীতলোকের কল্পনাবিলাস কিন্তু তার বাস্তব জীবনে এক প্রতিক্রিয়া শুরু করে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে 'রিচার্ড বিভ্রান্ত, বিমূঢ়।

এই উপন্যাসের লেখিকা দাফনে দ্য মরিয়র অত্যাশ্চর্য লিপিকুশলতায় বর্তমানের রিচার্ড এবং তার দ্বিতীয় সত্তা অতীতের রোজার কিলমার্থ চরিত্রের জীবনের এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন — দুটি জীবনই পৃথক, উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত, কিন্তু মৃত্যু বিপর্যয় এবং জীবনরঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় সমান। কর্নওয়ালের টাই আর শ্রেথ প্যারিস নামক গীর্জার অতীত এবং বর্তমানের খুঁটিনাটিতে এক অবিস্মরণীয় বাস্তবানুগ রেখাচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা।

'দি হাউস অন দি স্ট্রান্ডে' দ্য মরিয়র যে সব প্রশ্ন তুলেছেন তা বর্তমান কালের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে চিত্ত-বিভ্রমকর অতীতের প্রভেদ কতটুকু? 'দি হাউস অন দি স্ট্রান্ড' দুটি পরিপূরক জগতের কাহিনী মাত্র নয়, এ এক বিচিত্র রহস্যালোকের কাহিনী।

গ্রন্থারম্ভে লেখিকার বর্ণনায় রিচার্ড ভাবছে ঃ প্রথমেই দেখলাম এখানকার বাতাসের মধ্যে এক স্বচ্ছতা আর তার পর দেখলাম তীক্ষ্ণ সবুজ রঙের ঘাস। কোথাও এতটুকু কোমলতা নেই। দূরের পাহাড়-গুলি আকাশে মিশিয়ে নেই, বরং পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। এত কাছে যেন আমি এখনই তা স্পর্শ করতে পারি। এই নৈকট্য আমার মনে বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করেছে। টেলিস্কোপের ভিতর কোন কিছু দেখে শিশুর মনে যে বিস্ময় ও চমক লাগে এ সেই চমক। আমার কাছাকাছি সব কিছুই কঠিন আকৃতির, ঘাসগুলি কেমন ছাড়া-ছাড়া—যে মাটি আমার পরিচিত এ সে মাটি নয়, তার চেয়ে কঠিন ও কর্কশ।

আমি আশা করেছিলাম — সব রকমই আশা করেছিলাম—এ আরেক রকমের রূপান্তর। একটা ভাল হওয়ার মত মানসিক প্রশান্তি—স্বপ্নের একটা আচ্ছন্ন মাদকতা—আমায় সব কিছুই কেমন কুয়াশা মাখা, কোন রকম পরিষ্কার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না—এ এক বাস্তবতা। এমনই সুস্পষ্ট বাস্তবতা যা ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় আর কখনও অভিজ্ঞতা হয় নি। এখন সব অনুভূতিই সুতীব্র। আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে সচেতন: চোখ, কান, ঘ্রাণশক্তি, সব কিছুই কেমন যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে হঠাৎ।

সবই হয়েছে কিন্তু স্পর্শের অনুভূতি নেই, আমি আমার পায়ের তলার মাটি অনুভব করতে পারছি না। ম্যাগনাস আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল, সে বলেছিল, 'অচেতন পদার্থের সংস্পর্শে তোমার দেহ আসছে তা তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি

চলবে, দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে, ওদের সঙ্গে ধাক্কা মারবে কিন্তু কিছুই অনুভব করবে না। তার জন্য চিন্তা করো না। কোন অনুভূতি ব্যতিরেকেই যে তুমি চলাফেরা করতে পারছ এইটাই অর্ধেক আশ্চর্য !'

আমি অবশ্য এই কথা রসিকতা মনে করেছিলাম, একটা পরীক্ষায় আমাকে নামাবার জন্য সে নানা রকম উৎকোচে প্রলুব্ধ করছিল। এখন দেখছি ওর কথাই ঠিক, আমি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি—এ এক পরম বিস্ময়ের অনুভূতি কারণ আমি যেন বিনা চেষ্টাতেই চলাফেরা করছি, মাটির সঙ্গে কোন সংস্পর্শ অনুভূত হচ্ছে না।

'ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড হাইড' যে বিস্ময় পাঠকের অন্তরে সৃষ্টি করে, দাফনে দ্য মুরিয়রের এই উপন্যাসটিতে সেই বিস্ময় পাঠককে আচ্ছন্ন করে তুলবে আর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগবে লেখিকার অনন্যসাধারণ লিপিচাতুর্য যা অতীত ও বর্তমানকে এক সূত্রে বাঁধতে পেরেছে। বর্তমানের রূঢ় বাস্তবের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। দাফনে দ্য মুরিয়রের আর সব উপন্যাসে যে স্বচ্ছতা আর উজ্জ্বল্য বর্তমান এই উপন্যাসটিতেও তার অভাব ঘটে নি। পেঙ্গুইন সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত 'দি হাউস অব দি স্ট্রাণ্ড' উপন্যাসের এক সুলভ সংস্করণ এদেশে পাওয়া যাচ্ছে।

—অভয়ঙ্কর

THE HOUSE ON THE STRAND: (A Novel) By DAPHNE DU MAURIER. — (Penguin Books) — Messrs: Rupa & Co., 15 Bankim Chatterjee Street. Calcutta-12.

# সাহিত্যের খবর

**ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা ।।** সাধারণতঃ ভারত সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ ফরাসী জনসাধারণের একটু কম বলেই শোনা যায়। কিন্তু সে ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হল অধ্যাপক অলিভার লাকম্বের ভাষণ পড়ে। অধ্যাপক লাকম্বে সাবর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক দর্শন ও ভারততত্ত্বের অধ্যাপক। সম্প্রতি তিনি ভারত সফর করছেন। গত ২৩ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে মুঙ্গালাল গোয়েঙ্কা ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলেন সেখানকার শিক্ষণধারা পরিদর্শন করতে। বিকেলে তাঁকে এক সভায় সম্বর্ধনা জানান হয়। ঐ সভায় তিনি বলেন—'ফরাসী দেশে ভারত সম্পর্কে জানবার আগ্রহ রয়েছে। সেখানে সংস্কৃত, পালি, হিন্দি, বাংলা, উর্দু ও তামিল ভাষা ও সাহিত্য নিয়মিত পড়ানো হয়ে থাকে। প্যারিসে ভারততত্ত্ব সম্বন্ধে পড়াবার জন্য কুড়িটি অধ্যাপক পদ রয়েছে বলে তিনি জানান।

**কিরঘিজ লেখক আইত্মাতোভ ।।** প্রতি দেশের সাহিত্যেই রূপকল্প ব্যবহারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রখ্যাত কিরঘিজ লেখক চিঙগিজ আইত্মাতোভ সুন্দরভাবে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন—'ভারতে সুন্দরী রমণীদের হাঁটার সঙ্গে গজেন্দ্রগমনের তুলনা দেওয়া হয়, আর আমাদের দেশে এই উপমা দেওয়া হয় বাচ্চা উটের হাঁটার সঙ্গে।' সাহিত্যরসিকদের কাছে কথাগুলো খুবই উল্লেখযোগ্য মনে হবে। ভেবে দেখুন, বাংলাদেশে যদি কোন কবি কোনো সুন্দরী নারীর হাঁটার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন—'উটের বাচ্চার মত হেঁটে যাও যখন সুন্দরী'—তখন কিন্তু পাঠক না হেসে পারবেন না। অথচ আরেক দেশে এটি স্মরণীয় উপমা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। আইত্মাতোভ কিছুদিন আগে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে' এসেছিলেন। তখন অমৃতের প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ইংরেজি তিনি জানতেন না। ফলে দোভাষীর সাহায্য নিতে হয়েছে তাঁর সঙ্গে কথা বলার প্রতি সময়ে। চেহারা অনেকটা আমাদের ভুটানের লোকদের মত।

কিরঘিজ সাহিত্যের সাম্প্রতিককালে তিনিই বোধকরি সর্বশ্রেষ্ঠ। উপন্যাস, ছোটগল্প এবং চলচ্চিত্রের কাহিনীকার তিনি। বর্তমানে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজেও গভীরভাবে জড়িত আছেন। এছাড়া তিনি 'নোভি মির' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং দেশের সর্বোচ্চ সোভিয়েটের সদস্য। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'গুলসারি, বিদায়' প্রথমে ধারাবাহিকভাবে 'নোভি মির' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে পুস্তকাকারে। এর কাহিনীবস্তু গড়ে উঠেছে একটি সমবায় খামারের একজন বৃদ্ধের চরিত্র নিয়ে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে 'জামিল্যা', 'লাল রুমাল খামারে ছোট্ট পপলার গাছ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

**জাপানের ডোমেস্টিক বুক ক্লাব ।।** জাপানের চারটি প্রকাশন সংস্থা একটি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। গত ডিসেম্বর মাসে উক্ত প্রকাশন সংস্থার প্রতিনিধিরা টোকিওতে এক সভায় মিলিত হয়ে ঠিক করেন যে 'জাপান বুক ক্লাব' নামে তাঁরা একটি সংস্থা গঠন করবেন। এর মাধ্যমে তাঁরা পুস্তক প্রকাশ এবং বিক্রীর সুব্যবস্থা করতে পারবেন। যে চারটি সংস্থা এর উদ্যোক্তা, তাঁরা হলেন 'জাপান পাবলিশার্স এ্যাসোসিয়েশন', 'জাপান ম্যাগাজিন পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন', 'নিপ্পন শুপ্পন তোরিতসুগি কায়োকাই' এবং 'জাপান বুক সেলার্স ফেডারেশন'।

**পূর্ব ইউরোপের নতুন কালের সাহিত্য ।।** পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সাহিত্য নতুন কালের সাহিত্যিকরা রচনা করেছেন, তার একটি অভিনব ইংরেজি অনুবাদ সংকলন সম্প্রতি চিকাগো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন চার্লস নিউম্যান ও জর্জ গোমোরি। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ—অর্থাৎ সাহিত্যের সমস্ত বিভাগ থেকেই কিছু কিছু রচনা নির্বাচন করে এখানে সংকলন করা হয়েছে। প্রতিটি রচনাই সুন্দরভাবে অনূদিত। বইটিতে একই সঙ্গে লেখক এবং অনুবাদকের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। ফলে রচনাটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে লেখক সম্পর্কেও একটা ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়। তবে বইটি সম্পর্কে কিছু সমালোচনাও চোখে পড়লো। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক হেনরি নিউজেলেকসি বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, বইটিতে লেখক নির্বাচন ঠিক মত হয়নি। এতে সংকলিত স্ট্যামিশল মারা গিয়েছেন ১৯৩৯ খৃঃ। যদি তিনি এই সংকলনে স্থান পেয়ে থাকেন, তাহলে কাফকাকে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হলো না। অবশ্য এরকম সমালোচনা সমস্ত সংকলন সম্বন্ধেই উঠতে পারে। এই সংকলনটির সবচেয়ে উল্লেখ্য দিক হল, সম্পাদকদ্বয় বিষয় বৈচিত্র্যের দিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। যেমন লেজেক কোলাকোজির লেখা 'যিসাস খ্রাইস্ট : প্রোফেট এণ্ড রিফর্মার প্রবন্ধে ইতিহাসে যিশুখৃস্টের অবদান অত্যন্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার 'অ্যাটিলার নিশা' নামক উপন্যাসে জুলিয়াস হে রোমান সাম্রাজ্যের শেষ দশক বর্ণনা করেছেন এমনভাবে যাতে মনে হয়েছে, সেই যুগ যেন ফুটে উঠেছে আমাদের সামনে। কবিতা নির্বাচনেও সম্পাদকদ্বয় এই বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। ভারতীয় সাহিত্যের নতুন কালের রচনার উপরও একটি সংকলন প্রকাশেও নাকি এই সংস্থা উদ্যোগী হয়েছেন।

**একটি তাজা আমার উপন্যাস ।।** এডওয়ার্ড হ্রুবনিক আজ জার্মানির একজন বিশিষ্ট লেখক। সম্প্রতি তার জার্মান থেকে তাঁর একটি উপন্যাস বেরিয়েছে। উপন্যাস হিসেবে তেমন কিছু নয়, তবে এর মধ্যে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা এমন করুণভাবে ফুটে উঠেছে যে, তা সহজেই পাঠকের মন আকর্ষণ করে।

হ্রুবনিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বন্দী অবস্থায় হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-এ দীর্ঘ কয়েক মাস কাটিয়েছিলেন। সেই নিদারুণ অত্যাচারের কথা তিনি কখনও ভুলতে পারেন নি। আলোচ্য 'দ্য ওভার-লেজেনদা' উপন্যাসেও সেই অভিজ্ঞতাই ফুটে উঠেছে। কাহিনী অংশটিও মর্মস্পর্শী। একজন সাংবাদিক সমুদ্রতীরে এক স্প্যানিশ হোটেলে উঠেছেন। সেখানে যে ঘরে তিনি থাকেন, তার থেকে সমস্ত শহরটা দেখা যায়। এখানেই পড়লো একদিন বোমা। দেখতে দেখতে সমস্ত শহরটা শ্মশানে পরিণত হয়ে গেলো। সবাই পালিয়ে গেল শহর থেকে। কিন্তু সাংবাদিকটি রয়ে গেলেন সেখানে। বোমায় তার ভয় নেই। তবু এই চরম নৈশব্দ্যকে। একটি কাকাতুয়ার ডাক শুনলেও যেন আতঙ্কে শিউরে ওঠেন তিনি। তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো বিগত দিনের কথা। তিনি তখন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দী। সেখানে তিনি দেখেছিলেন তার বাল্যপ্রণয়ী লোরাকে। লোরার সঙ্গে আবার তার চিঠি-পত্র লেখা আরম্ভ হল। কিন্তু বেশিদিন নয়। তাকে একদিন ধরে নিয়ে গ্যাস ঘরে মারা হল। যখন গ্যাস ঘর থেকে তার নগ্ন দেহ বের করে ক্যাম্পে আনা হল, তখন দূর থেকে তিনি দেখতে পেলেন লোরার বীভৎস চোখের চাহনি। যেন সে বাঁচবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিল ঈশ্বরের কাছে। এখানেই কাহিনীটির শেষ। এই কাহিনী এবং বাস্তব বর্ণনায় জন্যই বইটি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

চার্বাক

# নতুন বই

**পূব-পশ্চিম (কবিতা)—অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত।** আনন্দধারা প্রকাশন। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। তিন টাকা।

অচিন্ত্যকুমার মূলত গদ্যের মহলের মানুষ হলেও তাঁর অন্তর কবিতার সুষমায় পরিপূর্ণ। তাঁর গদ্যরচনাতেও আমরা পাই কবিতার স্বাদ। শব্দের ব্যঞ্জনায়, অনুভূতির অনাবিলতায় তিনি সিদ্ধকাম কবি। 'পূব-পশ্চিম' তাঁর সদ্যপ্রকাশিত কবিতা সংকলন। এর প্রতি পৃষ্ঠায় আমরা সেই কবিকে পাই যিনি তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে বাংলাদেশকে অনেক আশ্চর্য ঋজু, সংযত ও চিত্রকল্প ঝলসিত কবিতা উপহার দিয়েছেন। 'পূব-পশ্চিমে'র অনেক কবিতাই বাঙলী পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের প্রতি মমতায় এই কবিকণ্ঠ উদ্বেলিত। ভাঙা বাংলার হৃদয় বেদনার এমন চিত্ররূপময় কবিতা খুব কমই লিখিত হয়েছে আধুনিক-কালে। অসামান্য কল্যাণস্পর্শে উজ্জীবিত এই কবিতা 'পূব-পশ্চিম' দেশের অখন্ড চেতনাকে নিবিড় ভালবাসার মন্ত্রে জাগ্রত করেছে। তেমনি এক সহৃদয় কবিতা 'ছন্নছাড়া'। প্রাণের অপরাজেয় শক্তিতে কী অসীম বিশ্বাস তাঁর। তাই তিনি বলেন, 'প্রাণ আছে, প্রাণ আছে—শুধু প্রাণই এক আশ্চর্য সম্পদ। এক ক্ষয়হীন আশা। এক মৃত্যুহীন মর্যাদা।' ছিন্নমূল মানুষের বেদনাকে তিনি শিল্পীর সংবেদনশীলতায় রূপায়িত করেছেন 'উদ্বাস্তু' কবিতায়। মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাস রাখাই শিল্পীর কাজ। অচিন্ত্যকুমার সুন্দরের রহস্যসন্ধানে যখন আত্মমগ্ন তখনও তিনি মানুষের মহিমাকেই প্রত্যক্ষ করেন। সেখানেই তাঁর কবিসত্তার অনন্যতা। কবির নিঃসঙ্গতাকে তিনি ভাষা দেন রূপকের গভীরতায়। তিনি বলেন, 'কে সে দুঃখী মহাবীর। দৃঢ়চিত্ত নির্মম একক। সেই শিল্পী সেই কবি সুহৃত্তম সেই সে লেখক।' তাঁরও সংগ্রাম চলে অনন্ত প্রবাহে। মানুষকে নিয়েই দেশ, তার ভাষাতেই প্রকাশিত হয় দেশপ্রেম। এই পবিত্রতায় তিনি পরিশুদ্ধ করেন নিজেকে। তাই তিনি নিজেকে বলেন যোদ্ধা —'কাগজ কলম কালি—এই সব আমার আয়ুধ।' অচিন্ত্যকুমার শব্দের শিল্পী। স্রোতস্বিনীর মতো প্রবহমান এই শব্দস্রোত ভাবের গভীরতায় আমাদের বিমোহিত করে রাখে। 'পূব-পশ্চিম' এই প্রবীণ কবির নবতম জীবন-ভাষ্য। তাকে অন্তর থেকে 'আমরা গ্রহণ করি একজন জীবনবাদী কবির সত্যোপলব্ধির মহৎ প্রকাশরূপে। সুরুচিময় প্রচ্ছদে ও মুদ্রণে গ্রন্থটি আকর্ষণীয়।

—[illegible]

**ব্রহ্মোপাসনা (ধর্মগ্রন্থ)—রামমোহন রায়।** সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ২১১ বিধান সরণি, কলকাতা-৬। দাম : ১·৫০ টাকা।

নানারকম যুক্তি, তর্ক ও প্রতিপক্ষের প্রতি উত্তর-প্রত্যুত্তরে লেখাগুলি সমৃদ্ধ। এমনকি ধর্মীয় চিন্তাভাবনারও তিনি আশ্চর্যরকমে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। এই সঙ্কলনে গৃহীত কয়েকটি

লেখা আগে বেরিয়েছিল পুস্তিকাকারে। ঈশানচন্দ্র রায়ের ভূমিকাসহ ছাপা হয়েছে 'গায়ত্রীর অর্থ', 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' ও 'অনুষ্ঠান'। আলোচনাকালে রামমোহন যে-সকল শাস্ত্রীয় বচন ব্যবহার করেছেন, সেসব উদ্ধৃতির অনুবাদ যথাসম্ভব রামমোহনের ভাষাতেই দেওয়া হয়েছে। ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বর্জাইস অক্ষর।

প্রকাশক এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে ধর্মপিপাসু পাঠকের কাছে ধন্যবাদার্হ হবেন নানা কারণে। ব্রহ্মসংগীতসহ অন্যান্য কিছু কিছু রচনা এতদিন অন্যের নামে চলে আসছিল। এই গ্রন্থে সেসব লেখাও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে রামমোহনের নামে।

**BENGALI LITERATURE IN ENGLISH (Bibliography) — By Jogomohon Mukherji, M. C. Sarkar & Sons Private Limited. 14, Bankim Chatterji Street, Calcutta 12. Price Rupees Eight only.**

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিক থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত বহু বাঙালী লেখক ইংরেজী বই লিখেছেন, অনেকের লেখা ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। বেশীদিন আগের কথা নয়, গত দু'তিন দশকে অনেক আধুনিক লেখকের লেখা অনূদিত হয়েছে ইংরেজীতে। মাইকেল-বঙ্কিমকে আমরা ভুলতে পারিনি, বোধহয় তাঁদের খ্যাতির জন্যই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজমোহন'স ওয়াইফ'কেও মনে রাখতে হয়েছে আমাদের। মাইকেল ইংরেজীতে শুরু করে, পরে বাঙলা ভাষায় লিখতে থাকেন। আর, তরু দত্ত বরাবরই লিখে গেছেন ইংরেজীতে। যেমন পরবর্তীকালের সরোজিনী নাইডু।

এম, সি, সরকার বর্তমান গ্রন্থপঞ্জীটি ছেপে বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদার্হ হবেন। এতদিন যেসব গ্রন্থের নাম জানার জন্য গবেষককে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতা ওল্টাতে হতো, এখন অনায়াসেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে এই বইয়ে।

বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে পড়ে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন ১৯৪৮ সালে। সমর সেন এবং অন্যান্যরা অনুবাদ করেছিলেন মানিকবাবুর কতকগুলি গল্প। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসটিরও অনুবাদ করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই তো সেদিন মণীন্দ্র রায়ের 'মোহিনী আড়াল'-এর অনুবাদ করেছেন সুজিত মুখোপাধ্যায়। তারও উল্লেখ আছে বইটিতে।

সংকলকের উদ্দেশ্য হয়তো স্বদেশী পাঠককে সন্তুষ্ট করা নয়, বিদেশী গবেষককে সাহায্য করা। কেননা, বাংলা ভাষায় কি বই, কখন, কোথায় অনূদিত হয়েছে—তার খবরাখবরে সাধারণ পাঠক ততটা আগ্রহী হবে কি না বলা শক্ত। তবে আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এবং পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ বলে মনে হয় এই গ্রন্থটিকে।

ভবিষ্যতে এই সংকলনের আদর্শে যদি বাংলা বইয়ের কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী বেরোয়, তাহলেও 'আমরা বিস্মিত হবো না: সুলভ মূল্যে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা থেকেও একটি করে জাতীয় বার্ষিক সংকলন বেরুতে পারে।

আমরা প্রকাশক এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্সকে ধন্যবাদ জানাই। সংকলক জগমোহন মুখোপাধ্যায়ও পাঠকের ধন্যবাদ পাবেন।

**ধর্মপথিক রবীন্দ্রনাথ** (আলোচনা)—বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা-৬। দশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে বিশ্বখ্যাতির অধিকারী হলেও তাঁর ধর্মজীবনও উল্লেখযোগ্য। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতবাদ অবশ্য সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায়, মানবতারই নামান্তর। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর জীবন ও সাহিত্যে প্রতিফলিত সেই অন্তঃভাবনার ওপরে গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছেন। তিনি লিখেছেন : 'রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির যে ধর্মচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে, সেইগুলি আলোচনাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।'

এর আগেও রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত বিষয়ে বহু আলোচনা, সমালোচনা হয়েছে। সবই সাময়িক পত্রিকার পাতায়। সম্ভবত বীরেন্দ্রবাবুই প্রথম গবেষণামূলক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে : 'দর্শনশাস্ত্রের ছাত্ররা যে-দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্র দর্শন আলোচনা করেন এবং দর্শনশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সেসব টেকনিকাল রূপ ও ভাষা দেন, এই গবেষণা কাজের মধ্যে সে-শ্রেণীর ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যাবে না।' রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা থেকে তিনি যে চিন্তাধারা লক্ষ্য করেছেন, হয়তো কবির নিজস্ব উক্তির সংগেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মোট নয়টি পরিচ্ছেদে বইটি সমাপ্ত। প্রথম অধ্যায়ে বীরেন্দ্রবাবু প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, সভ্যতার প্রসার, ঐশ্বরিক সত্তার অনুভব, দেবতার কল্পনা ও ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে, উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার ধর্মীয় অবস্থা, উনিশ শতকের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় (রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যবর্গ), উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় দর্শন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন. প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকের চারটি অধ্যায়ে নেপথ্যেই রয়েছেন। পঞ্চম অধ্যায় থেকে তাঁর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ কিভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ ও ধারণাকে আত্মস্থ করে, আচারের তুচ্ছতা ও গুরুবাদকে অস্বীকার করে—মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যুক্তিগ্রাহ্য ভাষায় লেখক তা প্রমাণিত করতে পেরেছেন।

**লেনিন চিরকালীন** (দীর্ঘ কবিতা)—কালীপদ ভট্টাচার্য। শোভনা প্রেস পাবলিকেশানস, ১৬, সৈয়দ আমির আলি এভিনিউ, কলকাতা-১৭।। দু টাকা।।

ছোট আকারের পকেট-বুক ধরনের বই। বইটি উৎসর্গীকৃত হয়েছে: 'সেদিনের, আজকের এবং আগামীকালের লেনিন সরণীর পথিকদের হাতে।' ১০৮ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ কবিতায় শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য লেনিনের জীবন ও জাগরণের বাণী প্রকাশ করেছেন সাবলীল ছন্দে। তিনি লিখেছেন: 'যুগের আহ্বানে মুখরিত কলরবে দিকচক্রবালে। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি তুলে বিগত রাত্রির অন্তরালে। সূর্যোদয় তপস্যায় জাগি লেনিনের নিত্য-জাগরণী।'

## সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

**OCARINA (Oct.-Nov. 1970) — Chief Editor : AMAL GHOSH, 30-B, Chamiers Road, Madras 28. Price : Re 1.00**

বাংলা দেশের বাইরে সুদূর মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক আলোচনার দ্বিমাসিক সংকলন। পত্রিকাটির লক্ষ্য সর্বভারতীয়। বাংলা, মালয়ালাম প্রভৃতি কবিতার ইংরেজী অনুবাদে সমৃদ্ধ। প্রাচীন ও ধ্রুপদী কবিতার অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি। মূল লেখকদের মধ্যে আছেন তিরুভাল্লুভর, মনোজ দাস, পি পার্থসারথী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, জগদীশ ভট্টাচার্য, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, পরমানন্দ সরস্বতী, নীলামপেরুর, মধুসূদন নায়ার, জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকে। ছাপা হয়েছে রঙ্গনাথনের একটি প্রবন্ধ। প্রচ্ছদটি সুরুচিসম্পন্ন ও সুন্দর। সিল্ক স্ক্রিনে ছাপা। সাধারণত প্রায় প্রত্যেক পত্রিকারই প্রথম সংখ্যায় যেসব দোষ-ত্রুটি থাকে, এ পত্রিকাটিতেও সেই অসম্পূর্ণতা কম-বেশী রয়ে গেছে। আশা করবো, সম্পাদক ভবিষ্যতে আরো প্রতিনিধিত্বমূলক আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের রচনা উপস্থাপিত করতে পারবেন।

**বাংলা সাহিত্যপত্র :** সম্পাদক উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৬ বাবুপাড়া লেন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। চল্লিশ পয়সা।

লেখকদের মধ্যে আছেন সুনীল কর্মকার, সৈয়দ কওসর জামাল, সুদীপ ঘোষ, মদনমোহন বিশ্বাস, দাউস হায়দার, বিমান চট্টোপাধ্যায়, অরূপ চৌধুরী এবং আরো অনেকে। গল্প, হাল্কা রচনা, সমালোচনা—সবই আছে। অনেকের কাছে সংখ্যাটি ভাল লাগবে।

# বইকুণ্ঠের খাতা

## বই পাড়ার হালচাল : প্রকাশকের বক্তব্য

বাংলাদেশে বিদেশী বইয়ের অন্যতম পরিবেশক 'রূপা অ্যান্ড কোম্পানী'। তার অন্যতম কর্ণধার ডি. মেহরার সঙ্গে কথা হচ্ছিল সেদিন। কলকাতা সম্পর্কে আশাবাদী। বললেন : "আমার বয়স ষাট। কলকাতায় জন্মেছি কলকাতা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি না। ভারতে এমন শহর আর নেই।"

চোখে পড়ল একটি বিজ্ঞাপন : 'উই নো অব নো মোর রিওয়ার্ডিং প্রফেশান দ্যান বুক সেলিং।' কথা বললেন, নম্র সুরে—প্রাণখোলা কন্ঠস্বর।

বললুম, আপনার কাছে আসার একটা উদ্দেশ্য আছে। শুনেছি, বইয়ের বাজারে নাকি এখন দারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে? আপনারা তো বিদেশী বই সরবরাহ করেন। আমি জানতে চাই, কি ধরনের বই এখানে বেশী বিক্রী হয়? ক্রেতা ও পাঠক কারা?

কিছুটা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, বাংলাদেশে রীডার আছে। এখানে সবরকম বই-ই বিক্রী হয়। তবে অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানে পাঠকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। কলকাতার পাঠক নতুন বইয়ের চেয়ে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থ পছন্দ করেন বেশী। বুক-সেলাররা মূলত বিক্রী করেন নাটক, নভেল, ফিকশান—আর, স্কুল-কলেজে টেক্সট বুক ও টেকনিক্যাল বইয়ের চাহিদা।

কোনো বিশেষ ধরনের বইয়ের প্রতি কি পশ্চিমবাংলার পাঠকের ঝোঁক নেই?

—আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশ কিংবা দেশ-সম্পর্কিত বই এখানে ভালো বিক্রী হয়। কম্যুনিস্ট লিটারেচার বিক্রী হয় খুবই। তবে, হুজুগের বই এখানে বিশেষ বিক্রী হয় না।

বললুম, যেমন?

—কিছুকাল আগে 'পাকিস্তান মিলিটারী রুল অর পিপলস পাওয়ার' নামে একটা বই এসেছিল কলকাতায়। ভেবেছিলুম অনেক বিক্রী হবে। কার্যত দেখা গেল সে ধারণা ভুল। বইটি কলকাতায় বিক্রী হয়েছে পঞ্চাশ কপি। বোম্বেতেও তাই। কিন্তু দিল্লীতে মাত্র দু'ঘণ্টায় বিক্রী হয়েছিল ১০০ কপি।

একটু থেমে বললেন, কলকাতায় বেশী দামের বই বিক্রী হয় না। ক্রিয়েটিভ রচনার চাহিদা বেশী। দিল্লীতে বেশী দামের বই বিক্রী হয়। বোধহয়, বিদেশীদের আনাগোনা বেশী বলে। তা ছাড়া, দিল্লীর লাইব্রেরী-গুলো কলকাতার চেয়ে অনেক বেশী গ্র্যান্ট পায়।

আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশে বিদেশী বইয়ের কারবার ভালো চলতে পারে?

পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, এখানে অ্যাকচুয়েলি রীডার আছে। ভারতের আর কোথাও এমন পাঠক নেই। বাঙালী পড়ুয়া জাত। আমার ধারণা, এখানে বিদেশী বইয়ের ব্যবসা ভালো চলতে পারে। মূলধন লাগাতে পারলে বই-ব্যবসায় ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলতে পারা যায়।

বললুম, কলকাতায় এখন বইয়ের ব্যবসা কি খারাপ যাচ্ছে?

—সেল কমে গেছে। বুঝতে পারছি না কি করবো। আমরা পেঙ্গুইনের বই স্টকে রাখি। অন্য চৌত্রিশটি বৃটিশ প্রকাশকের প্রতিনিধি। কারো বই-ই বেশী আনি না। বাংলা বই কিছু কিছু ছেপে-ছিলুম। এখন আর ছাপতে সাহস হচ্ছে না। আগে মাসে অন্তত একটা বই ছাপতুম। এখন বছরে দু' তিনটের বেশী ছাপছি না।

আপনাদের ব্রাঞ্চ কোথায় কোথায় আছে?

—বোম্বে, দিল্লী, এলাহাবাদ।

ওখানকার অবস্থা কি রকম?

—এখানকার মতো এতটা খারাপ নয়।

একটু থেমে বললেন, বড় পাবলিশাররা হয়তো টিকে থাকতে পারবেন। তাঁদের টিকে থাকতেই হবে। ছোট প্রকাশক-

দের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেকে মনে করেন, খাদ্যবস্তুর মতো বই নাকি জীবনধারণের পক্ষে এসেনসিয়েল নয়। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। বই না হলে—এমন মানুষ আছেন—যাঁর একদিনও চলে না। আমি তো রোজ দু' তিন ঘণ্টা বই না পড়লে অস্বস্তি বোধ করি।

**বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর বক্তব্য**

বেঙ্গল পাবলিশার্সে গিয়েছিলুম খোঁজ খবর নিতে। সাহিত্যিক মনোজ বসু বললেন, বইয়ের সাম্প্রতিক বাজার কেমন জানি না, এখন ব্যবসা-বাণিজ্য দেখছেন ময়ূখ। ও বলতে পারবে।

ময়ূখ বসু বললেন, এখন গল্প-উপন্যাসের মরশুম নয়। তবু অন্যান্য বছরের তুলনায় খারাপ যাচ্ছে। কোনো বই-ই বিক্রী হচ্ছে না। রাজনৈতিক উপন্যাস, রম্যরচনা জাতীয় বই অবশ্য কিছু কিছু বিক্রী হয়। কিন্তু সে ব্যাপারে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা চলছে। একই বিষয়ের ওপর বই বেরিয়ে যাচ্ছে অনেকগুলো। তবে ভালো বই হলে বিক্রী হয়। আমরা বরুণ রায়ের 'ভিয়েতনাম : ঝড়ের কেন্দ্রে' বের করেছিলুম। ভালো বিক্রী হয়েছে।

মনোজবাবুকে বললুম, বর্তমান পরিস্থিতির ওপরে লেখা বই কি ভালো বিক্রী হবে বলে মনে হয়? আপনি তো লিখেছেন?

—অমৃতে এবার পুজো সংখ্যায় একটি উপন্যাস লিখেছি 'আমি সম্রাট' নামে। অনেকে প্রশংসা করছেন। বোধহয় সেরকম বইয়ের চাহিদা আছে। এ তো সময়েরই দাবী।

তিনি আমাকে একটি চিঠি দেখালেন। অমৃতের ঠিকানায় এসেছিল। রিডাইরেক্ট হয়ে বাড়ীতে গেছে। বললেন, সাধারণ পাঠকও বর্তমান পরিস্থিতির ওপর ভালো লেখা চায়। উপন্যাসও তো কালেরই দর্পণ।

বললুম, বাংলা বইয়ের বাজার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

বললেন, বাজার ছোট, বাঙালী প্রকাশকদের দৃষ্টিও তেমন হয়ে ওঠেনি। কিছুকাল আগে দিল্লী গিয়েছিলুম। সঙ্গে সুনীতিবাবু ছিলেন। দেখেছি, লেখকদের সম্পর্কে অবাঙালী প্রকাশকদের ধারণা কতো উঁচু। ও'রা লেখকদের রেসপেক্ট করেন ধনী প্রকাশকরাও দরিদ্র লেখকদের হেলাফেলা করেন না।

একটু থেমে বললেন, এককালে বাঙালীরা হিন্দী প্রচার করেছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিশাল ভারত' এবং এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস সে কর্তব্যই পালন করেছে। এখন হিন্দী বই বেশী বের করছেন, পাঞ্জাবী প্রকাশকেরা। বাঙালী প্রকাশকদের সেদিকে তেমন দৃষ্টি নেই।

উদাহরণ দিয়ে বললেন, হিন্দী প্রকাশকেরা পকেট বুক এডিশনে বহু উপন্যাসের হাজার হাজার কপি বিক্রী করে। আমার অনেক বই ওরা হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন। 'নিশিকুটুম্ব' উপন্যাসটির ইংরেজী অনুবাদও বেরুবে শীঘ্রই।

বাংলা বইয়ের অবস্থা খারাপ কেন?

—অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যই সব কিছু গোলমাল ঘটে যাচ্ছে।

ময়ূখ বসু বললেন, জাল লেখকের বইতে বাংলাদেশ ছেয়ে গেছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা জনপ্রিয় লেখকদের নাম দিয়ে বহু বই ছেপে যাচ্ছেন। তবে আমরা বইয়ের বাজারটাকে চাঙা করে তুলবার জন্য অন্য কথা ভাবছি, আমেরিকান বুক ক্লাব ধরনের একটা ক্লাব তৈরী করে। যাঁরা এ ক্লাবের সদস্য হবেন, তাঁরা উপযুক্ত কমিশনে আমাদের প্রকাশিত বইগুলি কিনতে পারবেন। আগে একবার পেপার বুক-এ কিছু উপন্যাস ছেপেছিলুম। তখন সাকসেসফুল হইনি। আবার বের করছি। দেখা যাক, কি হয়।

মনোজবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম, বাংলা-দেশের লেখকরা কি এখন কেবল লেখালেখি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারছেন?

—দু' একজন পারছেন। অনেকের পক্ষেই অসুবিধা হচ্ছে।

**'মিত্র ও ঘোষ' বলেন**

'মিত্র ও ঘোষ'-এর শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্রও অস্বস্তি বোধ করছেন এখন। বললেন, গতবারের চেয়ে এখন বইয়ের বাজার খুবই খারাপ। লাইব্রেরী গ্র্যান্ট হয়তো বিভিন্ন গ্রন্থাগার পাচ্ছেন, কিন্তু বই কিনতে পারছেন না। তার কারণ, আগে লাইব্রেরীয়ানরা ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবৈতনিক। ইদানীং ওরা গ্র্যান্টের টাকা থেকে যৎসামান্য পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়ে থাকেন। ফলে, যেখানে বছরে দু' তিন শ টাকা গ্র্যান্ট দেওয়া হয়, সেসব লাইব্রেরী বই কিনতে পারছেন না কিছুতেই।

আর অন্য কোনো কারণ কি আছে?

—বই পাড়ায় লোক আসছে না। কলকাতা সম্পর্কে অনেকে ভীত।

ব্যবসায়ের পুরনো মাধ্যমগুলি কি ঠিক আছে?

—সবই ঠিক আছে। কেবল বিক্রী হচ্ছে না। যাঁরা দু' দশ কপি নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরাও ফেরত পাঠাচ্ছেন বিক্রী হচ্ছে না বলে। এদিকে আরেক ফ্যাসাদ দেখা দিয়েছে। দপ্তরীখানায় তাগাদা। ওরা বই ঘরে রাখতে চায় না। ছাপা ফর্মাগুলোই বা কোথায় রাখবো? সেজন্যে ভাড়া গুনতে হচ্ছে। বই বিক্রী হলে, এ অবস্থা হতো না।

বললুম, প্রতিকারের উপায় কি?

—স্কুল-কলেজের অবস্থা স্বাভাবিক হলে হয়তো ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসতো। অন্যান্য বার প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশানের সময় কিছু বই বিক্রী হতো। এবার সে সম্ভাবনাও নেই।

সাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষ বললেন আরেকটা সমস্যার কথা। বইয়ের ওপর থেকে ট্যাক্স উঠে গেছে। কিন্তু ইদানীং বাড়তি খরচার দায়ে পড়েছি আমরা। একে তো ডাকের খরচ বেড়েছে, তার ওপরে এখন প্যাকিং চার্জের ওপরেও সেলট্যাক্স বসেছে অর্থাৎ, একটা বই পাঠাবার জন্য আমরা যে প্যাকিং চার্জটা দাবী করি—মনে করা যাক তার পরিমাণ এক টাকা—এখন তার ওপরেও ক্রেতাকে সেলস ট্যাক্স দিতে হচ্ছে।

বললুম, তা হলে বইয়ের ব্যবসা চলবে কি করে?

—চলতে পারে, সরকার যদি কটেজ ইণ্ডাস্ট্রির মতো বুক ইণ্ডাস্ট্রিকেও নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেন, তাহলে। খাদি ইণ্ডাস্ট্রিকে তো ও'রা এভাবেই বাঁচিয়ে রেখেছেন।

গতবারের তুলনায় কি এ সময়ে আপনারা তেমন বই বের করতে পারেননি?

—গতবার এ সময়ে আমরা যত বই বের করেছি, এবার তার অর্ধেকও করিনি।

গজেনবাবু বললেন, এখন আমার আলমারীতে ৩০।৪০টি ছাপবার মতো পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে।

লেখক তৈরীতে প্রকাশকদেরও তো একটা ভূমিকা আছে? আপনারা কি তা পালন করে যাচ্ছেন?
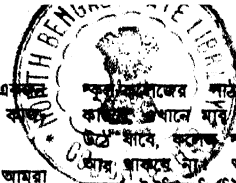
লেখক আমরা তৈরী করি না। পাঠকরা তৈরী করেন। এবং লেখক নিজেই তৈরী হন। কোনো প্রকাশক লোকসান দিতে হবে জেনে বই ছাপতে পারেন না। অন্তত কোনো ব্যবসায়ীর পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাগজওয়ালারা কি সাহিত্য-রুচি তৈরীর ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নিয়েছে? ও'রা পাঠককে চালিত করছেন বলা যায়। আমরা সে-দায়িত্ব কি পালন করতে পারি?

একটু থেমে বললেন, জীবন শুরু করে-ছিলুম ক্যানভাসার হিসেবে। জানি, কি করে, কি করতে হয়। 'হিন্দু' কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি বাংলা বইয়ের। তাতেও বই বিক্রী হয়েছে। কিন্তু যে-বই একেবারেই বিক্রী হবে না, তা ছাপবো কোন্ ভরসায়?

বললুম, বাংলা বইয়ের দাম কি এখন বেশী হচ্ছে না?

—কাগজ, ছাপার খরচ, বাঁধাই ইত্যাদির দাম যে-হারে বেড়েছে, আমরা সে-তুলনায় অনেক কম দামে বই দিই। আসল কথাটা, দামের নয়—জাতীয় জীবনের অস্থিরতা।

আপনারা তো সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বই করতে পারেন? কেবল বাংলা বইয়ের ওপর নির্ভর করে লাভ কি?

—কলকাতায় বসে হিন্দীতে বই ছাপলে চলবে না। সেজন্যে দিল্লী-বোম্বেতে দোকান খুলে বসতে হয়। বাংলাদেশের লেখক-পাঠকদের খবরাখবরই আমরা জানি। ওখানে না গেলে ওখানকার খবরাখবর ও মাধ্যমগুলি ঠিক বোঝা যাবে না।

**অন্য মত, ভিন্ন প্রসঙ্গ**

বইপাড়া ঘুরে দেখেছি, প্রকাশকের রকমফেরে, একেকজনের মতামত একেক রকম। কেউ বলেন, মন্দার সময়। কারোর মতে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা স্বাভাবিক। অবশ্য প্রত্যেকেই এক ধরনের অস্থিরতার কথা বলেন, যার রূপ বা স্বরূপ কি বা কেমন, তা কেউ ব্যাখ্যা করেন না। একজন ছোট প্রকাশককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাজ-কারবার কেমন চলছে?

মনমরা হয়ে তিনি বললেন, আমরা পাঠ্য বইয়ের প্রকাশক। সাহিত্যের কারবারী নই। নতুন বই একটা বের করে ফেলেছি ঝোঁকের মাথায়। কি হবে বলতে পারি না।

মণ্ডল অ্যাণ্ড সন্সের সুধীরকুমার মণ্ডল বললেন, ভালোই। অন্য বছরের তুলনায় খারাপ হবে বলে মনে করি না। এবার ক্লাস এইটের একটা বিজ্ঞানের বই নতুন অ্যাপ্রোভড্ হয়েছে। স্কুলে স্কুলে ক্যানভাসার পাঠিয়েছি। শুনছি, মাস্টার-মশাইরা বই পাল্টাচ্ছেন কম।

অন্য একজন প্রকাশক বললেন, বইয়ের বাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে আজ নয়, ১৯৬৫ সাল থেকে। আগে এ-লাইনে প্রতিযোগীর সংখ্যা কম ছিল। এখন অনেক বেশী। সেজন্যেই ভাবছিলাম, ব্যবসার ধরণ-ধারণ পাল্টাবে। দু-একটা প্রবন্ধ, উপন্যাসের বইও ছেপেছিলাম। কিন্তু সুবিধা করতে পারিনি।

ব্যাখ্যা করে বললেন, অর্থাৎ নির্ভেজাল সাহিত্য কিংবা পাঠ্যপুস্তক ছেপে এখন আর ব্যবসা চালানো যাবে না। দুটোই চাই। কিছু পাঠ্যবই, কিছু গল্প-উপন্যাস ছেপে নিজেদের সচল রাখতে হবে। হয়তো সে-জন্যেই বাকসাহিত্য, প্রকাশভবন, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী, মিত্র ও ঘোষ-এর মতো সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত পাঠ্যবই ছাপেন। অন্যদিকে মডার্ন বুক এজেন্সী, ক্যালকাটা বুক হাউসের মতো প্রকাশকেরা বের করছেন সিরিয়াস প্রবন্ধের বই—গবেষণামূলক গ্রন্থ।

আসল কথা কি জানেন?

বললাম, কি?

—আসল কথা হলো, বাংলাদেশে অধিকাংশ প্রকাশকের মূলধন যোগান দেয় স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইগুলি। কোনো কারণে এখানে মার খেলে অনেকের ব্যবসা উঠে যাবে, কলেজ স্ট্রীটের সরগরম ভাবটা আর থাকবে না। আমাদের দেশে অক্স-ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ওরিয়েন্ট লং-ম্যান-এর মতো প্রকাশক নেই। নির্ভরযোগ্য ভালো বইয়ের সংখ্যাও কম। কোনো প্রকাশকই জোর করে বলতে পারেন না, তাঁর বইটিই শ্রেষ্ঠ। একই ধরনের অজস্র বই থাকায় প্রতিযোগিতার পরিমাণটাও বেশী। ক্যানভাসার পাঠিয়ে, মাস্টারমশাইদের ধরে, বেশী কমিশনের প্রলোভন দেখিয়ে বই পাঠ্য করাতে হয়। দু হাজার বই ছেপে তিনশ' কপি নমুনা হিসেবে না বিলোলে একটা এডিশনই শেষ হতে চায় না।

আর এই পাঠ্য-বইয়ের লেখকদের কথা বলছেন?

অধিকাংশই স্কুল-কলেজের শিক্ষক। তাঁরা পূর্ব-প্রকাশিত বইগুলির ভাষা অদল-বদল করে একেকটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দেন। বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা পর্যন্ত এই ফাঁকিবাজির প্রথাটাকেই প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হন। কেননা, তাঁরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা রয়েলটি পান না। প্রকাশকের কাছে সেই গ্রন্থকারেরই মর্যাদা বেশী, যিনি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করে আসছেন, এবং যাঁর নামে দশ-বিশটা স্কুলে বই পাঠ্য হয়ে যাবে অনায়াসে—তাঁরই।

একটু হেসে বললেন, বুঝতেই পারছেন, অসুখটা অনেক গভীরে। তার উপশম এক-দিনে হবে না। প্রকাশকরা যদি ঝুড়ি ঝুড়ি বই না ছেপে দুটো-চারটে নির্ভরযোগ্য বইয়ের ওপর নির্ভর করতেন এবং শিক্ষকেরা যদি গ্রন্থকার হবার লোভ সামলাতে পারতেন—তাহলে হয়তো প্রতিযোগিতার অসুস্থ ভাবটা কমতো, ছাত্ররাও উপকৃত হতো নির্ভুল একেকটি বই পড়ার সুযোগ পেয়ে।

—গ্রন্থদর্শী

(ছয়)

রুমন্ট হাউসে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম সিগরেট শেষ। তাই গেস্ট হাউসে না ঢুকে এগিয়ে গেলাম ট্রেঞ্চর রোডের দিকে এফ-আর-আই-এর ঐ ছোট্ট মার্কেটের দিকে। বেশী দূরে নয়, মাত্র করেক মিনিটের পথ। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম।

এফ আর আই'এর এই মার্কেটটা নেহাতই ছোট। মাত্র কয়েকটা দোকান। প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়। চাল-ডাল-আটা-ময়দা থেকে ওল্ড স্পাইস—উইলকিনসন ব্লেড—হেয়ার রিমুভার পর্যন্ত। একটা রেস্তোরাঁও আছে। এফ-আর-আই আর মিলিটারী আকাডেমির ছেলেরাই এর এক-মাত্র পৃষ্ঠপোষক। আমি নিজেও এখানে চা খেয়েছি। চা খেতে খেতেই ছেলেছোকরা-দের সরস আলোচনা কানে ভেসে এসেছে। বুঝেছি, চা খাওয়াটা এদের কাছে গৌণ, মুখ্য হচ্ছে কিছু গোপন আলোচনা করা। এফ-আর-আই'এর প্রেসিডেন্টের ভাইঝিকে অনেকটা বৈজয়ন্তীমালার মত দেখতে বা আই-এম-এ-এর ব্রিগেডিয়ার রাও মেজর জেনারেলের ককটেলে গিয়ে মিস সাব্দারকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, এসব খবর একমাত্র এই রেস্তোরাঁয় এলেই জানা যেতে পারে। আর কোথাও না।

সকালে-বিকেলে এই মার্কেটে কিছু লোকজন দেখা যায়। দুপুরের দিকে ফাঁকা থাকে। আজও ফাঁকা। তবু রেস্তোরাঁয় কয়েকটা ছেলের জটলা দেখলাম।

আমি কোনার দিকের দোকানে গেলাম। দেখলাম একজন আর্মি অফিসার কিছু কেনাকাটা করছেন। আমি চুপ করে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোকানদার অফিসারকে একটা টুথপেস্ট এগিয়ে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ইয়েস প্লীজ?

'সিগরেট হ্যায়?'

'জি হা। কোনসে সিগরেট চাইয়ে?'

'দো প্যাকেট উইলস ফিল্টার।'

অফিসারটি পার্স থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে একটা ফিডিং বোতল চাইলেন। ফিডিং বোতল আর চেঞ্জ পাবার পর অফিসারটি চলে গেলেন। আমিও দু'প্যাকেট সিগারেট নিয়ে একটা দশ টাকার নোট দিলাম। চেঞ্জ ফেরত দেবার সময় দোকানদারটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ইউ আর এ নিউকামার স্যার?

হ্যাঁ।'

'ডু প্লীজ ভিজিট এগেন।'

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

গেস্টহাউসে ফিরতে গিয়েও ফিরলাম না। বাঁ দিকে ঘুরে গেলাম। নিউ ফরেস্টের সর্বত্রই শান্ত, স্নিগ্ধ, ফাঁকা-ফাঁকা। এদিক আরো ফাঁকা। লোকজন নেই বললেই চলে। বিকেলের দিকে আই-এম-এ'র কিছু কিছু ক্যাডেটদের এ পথ দিয়ে সাইকেলে যাতায়াত করতে দেখা যায়। কখনও কখনও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায় কিন্তু এখন, এই অপরাহ্ন-বেলায় কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

শাল-তমাল-পাইনের মধ্যে দিয়ে সুন্দর মসৃণ পিচের রাস্তা নিজের খেয়াল খুশী মত ঘুরপাক খেয়ে এগিয়ে গেছে। আমিও সেই রাস্তা দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। ডান দিক দেখছি, বাঁদিক দেখছি, সামনে দেখছি। কখনও কখনও আবার পিছন ফিরে দেখছি। ভারী সুন্দর। ভারী ভাল লাগছে। দেখতে দেখতে দুটো চোখ মাতাল হয়ে উঠছে, স্বপ্নালু হয়ে উঠছে।

মাতাল স্বপ্নালু দুটো চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে গলফ কোর্সের কাছে হাজির হলাম। একটু বসলাম। এবার একটা সিগ-রেট ধরালাম।

আমি গান গাইতে জানি না কিন্তু এখানে বসে সিগরেট খেতে খেতে তরুণ ব্যানার্জির একটা খুব পুরানো গান 'শেষ প্রহরের ভীরু নয়ন ব্যথায় ছল ছল, তবু তুমি নীরব কেন একটু কিছু বলো' আপন মনে গাইতে লাগলাম। গানটা আমি জানি না। ঐ প্রথম দুটো একটা লাইনই মনে আছে।

সিগারেট খাওয়া শেষ হলো। আমার গানও বন্ধ হলো। এবার নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, হঠাৎ এই গানটা মনে এলো কেন?

কেন?

সেও তো এক ইতিহাস।

আমাদের শিলচরের নাজিরপট্টীর আর-ডি-আই হলে বছর বছর জলসা হতো। কলকাতা থেকে নামকরা আর্টিস্টরা যেতেন। সারা শিলচর শহর ভেঙে পড়ত ওদের গান শুনতে। শিলচরের যেসব মানুষ কাজকর্ম চাকরি-বাকরির জন্য আইজল বা শিলং-এ থাকতেন, তাদের অনেকেও এই জলসা শুনতে আসতেন। করিমগঞ্জ আর হাইলা-কান্দি থেকে তো বাস বোঝাই করে লোক আসত আর-ডি-আই'এর জলসা শুনতে। ছোটবেলায় মাসীমার কোলে বসে আমি জলসা শুনেছি কিন্তু সেসব দিনের কথা আমার মনে নেই। শুনেছি আমাদের নাজিরপট্টীর এই আর-ডি-আই হলে সায়গল, পঙ্কজ, ভীষ্মদেব, জগন্ময়, যূথিকা রায় ও আরো কত নামকরা আর্টিস্ট গান গেয়েছেন। কে সি দে শেষবার এসে নাকি গেয়েছিলেন 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলি-দান'। কে সি দে'র এই গান শুনে সারা শিলচরের মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল বলে মাগোর কাছে গল্প শুনেছি।

আমি যেবার বুকে ব্যাচ লাগিয়ে প্রথম ভলান্টিয়ার হলাম তখন বোধহয় সেভেন কি এইটে পড়ি। লাল আর হলুদ রিবনের পরে আর ডি আই-এর রবার স্ট্যাম্প দেওয়া ব্যাচ পরে আমার সে কি উন্মাদনা। কত ছেলে-মেয়ের অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে দ্বিজেন-তরুণ-শ্যামল-মানবেন্দ্র আর সন্ধ্যা-প্রতিমা-ইলার সই জোগাড় করে দিয়েছিলাম, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

মিলিটারী আকাদমির তিন-চারজন ক্যাডেট খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল।

এবার আমার খেয়াল হলো, আমি কি ভাবছি? কোন কারণে একবার শিলচরের কথা মনে এলেই হলো!' শত সহস্র টুকরো টুকরো স্মৃতির মেঘ আমার মনের সারা আকাশ ছেয়ে যায়। শিলচর ছাড়া তখন আর কিছু ভাবতে পারি না। কতদিন শিল-চর ছেড়ে এসেছি কিন্তু এখনও সেসব স্মৃতি অম্লান। শিলচরের স্মৃতির চাইতে বড় আকর্ষণ আজও আমার নেই। তাইতো এই গলফ্ কোর্সে বসে তরুণ ব্যানার্জির ঐ গান গাইতে গাইতে আবার শিলচরের নাজির-পট্টীতে হারিয়ে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। উকিলপট্টীর জয়াদি আমার হাতে একটা শ্লিপ দিয়ে বললেন, এই মানিক, এই শ্লিপটা তরুণ-বাবুকে দিয়ে আয় তো।

উকিলপট্টীকে আমরা অনেকেই শিল-চরের বালীগঞ্জ মনে করতাম। জয়াদিদের বাড়ীর একটা আলাদা মর্যাদা ছিল। এছাড়া শিলচরে জয়াদি একটাই ছিল। রূপ-গুণের জন্য উনি তখন বহু আলোচিতা। আমি তখন স্কুলে পড়লেও মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে টিকর বস্তীতে যেতাম। জি সি কলেজের ছেলেরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা করত জয়াদিকে দেখতে, কথা বলতে। এসব আমি জানতাম, বুঝতাম। সেই জয়াদি যখন লম্বা বিনুনিটা দুলিয়ে প্রায় ছুটে এসে আমার হাতে শ্লিপটা দিয়ে গেল, তখন আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম।

'শ্লিপটা দিলে উনি কি বলেন আমাকে বলে যাবি। বুঝলি?'

'আচ্ছা।'

আমি স্টেজের পিছনে গ্রীণরুমে গিয়ে তরুণবাবুর হাতে শ্লিপটা দিতে গিয়ে

উত্তেজনায় বলেছিলাম, জয়াদির রিকোয়েস্ট। রাখবেন তো?'

উনি হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই।

আমি আনন্দে, উত্তেজনায় ছুটে গিয়েছিলাম জয়াদির কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, তরুণদা বললেন, 'নিশ্চয়ই গাইব।'

সবার সামনে জয়াদি আমার গাল টিপে আদর করে বললেন, ভেরী গুড।

কিন্তু আজ কি সে জন্য আমি এই গানটা গাইছিলাম? না, না,। অনেক দিন, অনেক বছর পরে আমি নিজেই এই গানটা শুনতে চেয়েছিলাম। কলকাতায় পোস্ট-গ্রাজুয়েট হোস্টেলে থেকে এম-এ পড়ছি। আই এস সি পাশ করে মানসী কলকাতায় এলো ডাক্তারী পড়তে। মানসী মেডিক্যাল কলেজ রি-ইউনিয়নের জলসার একটা এক্সট্রা কার্ড জোগাড় করে আমাকেও নিয়ে গিয়েছিল। সেই জলসাতে আমি নিজেই ঐ গানটা শুনতে চেয়েছিলাম, শুনেছিলাম। মানসীর পাশে বসে ঐ গানটা ভীষণ ভাল লেগেছিল। সেই ভাললাগার স্মৃতি আজও অম্লান?

নিশ্চয়ই।

তা নয়ত নিউ ফরেস্টের এই গল্‌ফ খেলার মাঠের ধারে একলা বসে বসে ঐ গানটাই মনে এলো কেন? এই অনিত্য পৃথিবীতে কিছুই তো থাকে না। সবাই চলে যায়। কেউ দু'দিন আগে, কেউ দু'দিন পরে। আমার চার পাশের অনেকেই চলে গিয়েছেন। আমি পড়ে আছি কিন্তু ক'দিন? যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে আমিও চলে যেতে পারি। ছোটবেলায় মনে হতো সর্বদাই [illegible] করে। প্রথম জীবনে মামা আর মাগোর কাছে থাকবার সময় ভেবেছি এসব আনন্দ চিরদিন উপভোগ করব। কিন্তু পারলাম কি? কেউ পারে? মামা বেঁচে থাকার সময় একটি দিনের জন্যও ফটক বাজার যাইনি। যাবার প্রয়োজন হয়নি, তাগিদ বোধ করিনি। মামা মারা যাবার পর সেই আমি রোজ থলি হাতে করে ফটক বাজার গিয়েছি, দরদস্তুর করে আলু-পটল-কুমড়ো-বেগুন কিনেছি। যে আমি বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন মাছ খেয়েছি, মামা মারা যাবার পর সেই আমি মাগোর পাশে বসে মাছ খেতে ভয় পেতাম, ঘেন্না করতাম।

কত কথা মনে পড়ছে! একলা একলা থাকার এই হচ্ছে বিপদ। এই হচ্ছে মজা!

মামা মারা যাবার পর সামান্য কিছু-দিনের জন্য আমি আর মাগো বাবার কাছে গিয়েছিলাম। আমি মাছ খেতাম না দেখে আমার ছোটমা— বিমাতা অস্বস্তি বোধ করতেন। মাছ খাবার জন্য উনি আমাকে পীড়াপীড়ি করতেন। আমি ভীষণ বিরক্ত হতাম।......

একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিতেই মনে হলো, কি আবোল-তাবোল ভাবছি? কোন মাথা নেই, মুণ্ডু নেই। কি ভাবতে কি ভাবছি?

ভাবছিলাম, মানুষ চলে যায়, থেকে যায় তার স্মৃতি। টুকরো টুকরো স্মৃতি। কখন, কিভাবে, কি কারণে সে স্মৃতি মনে পড়বে কেউ জানে না, জানতে পারে না।

সন্ধ্যাবেলায় ডক্‌টর সরকারের বাড়ীতে গিয়ে 'বেল' বাজাতেই দরজা খুলে দিলেন ও'র মেয়ে। মিসেস রায়ের কাছে ওর নাম শুনেছি। বুলা। নিশ্চয়ই ডাকনাম। ভাল নাম জানি না। শুধু ভাল নাম কেন, ওর সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না।

পর্দা সরিয়ে হাসি মুখে বললেন, আসুন।

ঘরের ভিতরে যেতেই বললেন, বসুন।

বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলাম, ডক্‌টর সরকার আসেন নি?

বুলা আমার সামনের দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললো, আপনি চা খেতে খেতেই বাবা এসে যাবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি আসবেন তো?

বুলা হাসল। আঁচল টেনে গলায় জড়াতে জড়াতে হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে প্রশ্ন এলো, মানসীও ঠিক এমনি করে গলায় আঁচল জড়াতে জড়াতে হাসতো না? লেক রোডে ওর মাসীর বাড়ীতে গেলে ঠিক এমনি করে হাসতে হাসতেই বলত না, কি খিদে পেয়েছে নাকি সিনেমার টিকিটের টাকা কম পড়েছে?

বুলার হাসি দেখে এসব কথা মনে পড়ছে কেন? আজকাল তো অনেক মেয়েই গলায় আঁচল জড়ায়। এটাই তো ফ্যাশান। কিন্তু তার জন্য অতীত দিনের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি মনের মধ্যে ভীড় করছে কেন?

আমি মানসীকে জিজ্ঞাসা করতাম, গলায় আঁচল না জড়ালে বুঝি ঠিক স্টাইল হয় না?

'আমার সব কিছুতেই তো তুমি স্টাইল দেখ।'

'তবে কি?'

'ডি-সেক্‌সন করার সময় আঁচল লুজ থাকলে কাজ করা যায় না। তাই অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'মড়া কাটার সময় গলায় আঁচল জড়িয়ে ছুরি-কাঁচি চালাও বলে এখন জড়াচ্ছ কেন?'

'কেন খারাপ লাগে?'

'না, না, খারাপ লাগবে কেন? বরং......

আমি থেমে যেতাম। মানসী থামতে দিত না। বরং কি?'

'না কিছু না।'

'না বললে কিচ্ছু পাবে না।'

আমি উঠে গিয়ে ওর কানে কানে ফিস-ফিস করে বলতাম, বরং ভাল লাগে। খুব ভাল লাগে। ইউ লুক ভেরী অ্যাট্রাকটিভ।

ডক্‌টর সরকারের মেয়ে বুলা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমার সামনে সেই মানসীই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু এক টুকরো মুহূর্তের জন্যই মনে হলো। পর মুহূর্তেই দেখলাম, মানসী নয়, বুলাই দাঁড়িয়ে আছে।

আমি যেন হুস একটু দূরে [illegible] দেখলাম। ভারী ভাল লাগল।

স্মৃতির মেঘ কেটে যাবার পর জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন কেন?

'এর মধ্যেই পিসী সব বলে দিয়েছেন?'

'খারাপ কিছু বলেন নি।'

'তা জানি। পিসীর ধারণা বাবার মত লোক হয় না আর বাবা বলেন [illegible] মত মেয়ে হয় না।'

আমি হাসলাম।

'বসুন। চা আনছি।'

বুলা ভিতরে চলে গেল। আমি একলা ড্রইংরুমে বসে রইলাম। একলা [illegible] আছি অথচ ঠিক নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে না [illegible]! বরং ভালই লাগছে।

একটু পরে একটা ছোকরা [illegible] এক প্লেট পাকোড়া আর নাটস এনে আমার সামনে রেখে চলে গেল। দু-এক মিনিট পর বুলা এক কাপ কফি দিয়ে বলল, কফি দিলাম। আপনি তো কফিই বেশী পছন্দ করেন।

'এর মধ্যেই সে খবর জানা হয়ে গেছে?'

বুলা একটু হাসল। তারপর বলল, আসলে খুব বেশী লোকের সঙ্গে এখানে ঘনিষ্ঠতা হয় না বা হতে পারে না। এই লিমিটেড সোসাইটিতে নতুন কেউ এলে তাঁর সম্পর্কে জানাজানি হতে সময় লাগে না।

প্লেট থেকে একটা নাটস মুখে দেবার পর খেয়াল হলো উনি তখনও দাঁড়িয়েই আছেন।

'আপনি বসবেন না?'

'এই ত বসছি।' বুলা সামনের সোফায় বসল।

'একটু আগেই চা খেয়েছি, এখন আর কফি খাব না।'

'তাহলে নাটস আর পাকোড়া নিন।'

'এগুলো আপনার জন্যই দিয়েছি।'

'তা তো জানি কিন্তু আপনি একটু না নিলে আমিও শান্তিতে খেতে পারছি না।'

কফি-নাটস-পাকোড়া খাওয়া শেষ হলো।

'আপনার মাকে দেখছি না তো?'

'বৌদির ছোট্ট বাচ্চা [illegible] কলকাতায় গিয়েছেন।'

'আপনার দাদা কলকাতায় থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

কথা বলতে বলতেই পকেট থেকে সিগ-রেট কেস বের করে জিজ্ঞাসা করলাম, খেতে পারি?'

'বাই অল মিনস।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

সিগরেট ধরালাম।

'কই আপনার বাবা তো [illegible] না?'

'আমি টেলিফোন করছি।'

বুলা টেলিফোন করতে ভিতরে [illegible] গেল। আমি পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সিগ-রেট টানছি। সেই ছোট্ট ছোকরাটা [illegible] এসে কাপ-প্লেটগুলো নিয়ে গেল। [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]। কোথাও হলো অ্যাডভেঞ্চার তো নেই। ড্রইংরুমে [illegible] বারান্দায় গিয়ে হাই ফেলে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ বুলা এসে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

'কেন?' আসতে দেরী আছে নাকি?'

'না।'

বুলার পিছন পিছন আমি ভিতরের একটা ঘরে গেলাম। টেলিফোন তুলে নিলাম।

'আমি সাগর বলছি।'

ডক্টর সরকার ওপাশ থেকে বললেন, তুমি সাগর। সবকিছু জানিয়ে নিয়ে যেতে পার কিন্তু আমি তো সরকার। অনেক নিয়ম-কানুনে বাঁধা।

আমি হাসলাম।

'একটা চিঠি টাইপ হচ্ছে। এটা সই করেই আসছি। ডোণ্ট মাইণ্ড।'

'না, না, এসে কথার কি আছে?'

টেলিফোন রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। ড্রইংরুমটা মোটামুটি সাধারণ। ভাবতে পারিনি ভিতরের ঘর এত সুন্দর হবে।

'চমৎকার।'

'কি চমৎকার?'

'আপনাদের এই ঘরটি।'

বুলা চুপ করে দাঁড়িয়ে।

'এই ঘরটা বুঝি আপনার বাবার?'

'এটা আমার ঘর।'

'কনগ্রাচুলেশনস ফর ইওর টেস্ট।'

বুলা আমার হাসল। 'ঘরটাকেই সবাই পছন্দ করেন, মানুষটাকে না।'

কথাবার্তার ধরণটাও অনেকটা মাসীর মত। নতুন শাড়ী পরেই একবার মাগোকে দেখাতে আসত। মাগোকে দেখাবার পর আমার ঘরে আসবেই। কোন কথা না বলে চুপটি করে আমার পড়ার টেবিলের পাশে দাঁড়াত।

'বাঃ! সুন্দর শাড়ীটা তো?'

'শাড়ীটা সুন্দর আর আমি কুৎসিত, তাই না?'

আমি বলতাম, তোমার মত ইয়ং সুন্দরী মেয়েকে আমার মত হ্যাণ্ডসাম ইয়ং ছেলের প্রশংসা করা কি ঠিক?

বুলাকেও ঐ রকম একটা উত্তর দিলেই ভাল হত কিন্তু দিলাম না, পারলাম না।

'আপনাকে ভাল-মন্দ বলার অধিকার তো আমার নেই।'

ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় বুলা বলল, এ ঘরেই বসুন না কেন।

'আজ থাক।'

ড্রইং রুমে ফিরে আসার পর বুলার সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলছিলাম। একটু পরেই ডক্টর সরকার এলেন।

ঘরে ঢুকেই গাড়ীর চাবিটা মেয়ের হাতে দিয়ে আমাকে বললেন, আই অ্যাম সো সরি। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আজ ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী ফিরব কিন্তু কিছুতেই হলো না।

'আজ তো বরং তাড়াতাড়ি ফিরেছেন। সুতরাং আমিই আপনাকে ধন্যবাদ জানাব।'

বুলা হেসে ফেলল। 'দেখছ বাবা, তোমার কি রেপুটেশন?'

ডক্টর সরকার মিষ্টি হাসলেন। 'মাধুরী অমনিই বলে।'

বুলা বলল, তোমরা চা খাও। আমি গাড়ীটা তুলে আসি।

'আরে না-না। গাড়ী তুলিস না। সাগরকে ছেড়ে আসতে হবে তো।'

আমি আপত্তি করলাম, আমাকে ছাড়তে যেতে হবে না, আমি নিজেই যেতে পারব।

ডক্টর সরকার আমার আপত্তি গ্রাহ্যই করলেন না, এই রাত্তিরে তুমি হেঁটে যাবে, তাই না?

চা খেতে-খেতে ডক্টর সরকার বললেন, আমি এমন গাড়ী চালাই যে সাইকেল রিকসাও আমাকে ওভারটেক করে চলে যায় যাই বুলো? একসেলেন্ট ড্রাইভ করে।

'তাই নাকি?'

'তবে কি? আমি তো আমার ছেলে-মেয়ের কাছেই গাড়ী চালান শিখেছি।'

'তাই বুঝি?'

'তবে ঐ সেকেণ্ড কি থার্ড গিয়ার পর্যন্ত। টপ গিয়ারে গাড়ী চালিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।'

আমি না হেসে পারলাম না।

'তুমি ড্রাইভ করতে পার?'

'না।'

'শিখে নাও। বুলা দু দিনের মধ্যে তোমাকে শিখিয়ে দেবে।'

বুলা ভিতরে ছিল। একটু পরে ড্রইং-রুমে এলে ডক্টর সরকার বললেন, হ্যাঁরে বুলা, সাগরকে ড্রাইভ করা শিখিয়ে দিবি তো!

বুলা মজা করে জানতে চাইল, এক্ষুনি শিখবেন?

'আঃ! তুইও তোর মা'র মত কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিস।'

আমি বুলার দিকে তাকালাম, বুলা আমার দিকে তাকাল। দুজনেই হাসলাম।

ডক্টর সরকার এবার প্রসঙ্গ পাল্টা-লেন। 'আমার স্ত্রী কলকাতায়।'

'হ্যাঁ, তাই শুনলাম।'

'আমার নাতি হয়েছে। খবর পেয়েই আমরা সবাই গিয়েছিলাম। আমি আর বুলা চলে এলাম, উনি থেকে গেলেন।'

ডক্টর সরকার একটু পরে আবার বললেন, ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে বৌমার পক্ষে [illegible] [illegible] অসুবিধা। তাই ওকে কিছু দিন কলকাতায় থাকতেই হবে।

'আপনার বৌমা কি পড়ান?'

'বৌমা [illegible] গার্লস কলেজের লেকচারার।'

বুলা আর একবার ভিতর থেকে ঘুরে ড্রইংরুমে এলো। 'তুমি জামা-কাপড় চেঞ্জ করবে না?'

'হ্যাঁ এই যাচ্ছি।' ডক্টর সরকার উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, তুমি একটু বুলার সঙ্গে গল্প কর, আমি আসছি।

ডক্টর সরকার চলে গেলেন। আমি একবার হাতের ঘড়ি দেখলাম।

'আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে?'

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কেউ তো আমার জন্য বসে নেই, সুতরাং দেরী হবার কিছু নেই।

কথাটা বলে ফেলেই লজ্জিত বোধ করলাম। আমার নিঃসঙ্গতার বেদনা প্রকাশ করতে চাই নি কিন্তু তবুও প্রকাশ হয়ে পড়ল।

'তাহলে ঘড়ি দেখছেন কেন?'

'ওটা অভ্যাস।'

'আমাদের এখানে আসার আগে ঘড়িটা খুলে আসবেন।'

আমি শুধু হাসলাম।

'বাবার সঙ্গে গল্প করতে বসলে ঘড়ি-টড়ি দেখা চলবে না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।' বুলা একটু থেমে আবার বলল, খুব বেশী লোকের সঙ্গে বাবা গল্প-গুজব করতে পারেন না কিন্তু যাঁদের পছন্দ করেন তাঁদের সঙ্গে ঘন্টার-পর-ঘন্টা কাটাবেন।

'আমাকে পছন্দ-অপছন্দ করার সময় তো এখনও আসে নি।'

'পিসী যখন রিকমেণ্ড করেছেন তখন আর চিন্তা নেই।'

খাবার টেবিলে বসেও বেশ গল্প হল। মাঝে একবার বুলা মন্তব্য করল, আপনার মাগো বা পিসীর মত রান্না করতে আমি জানি না। সুতরাং......

'আপনি মাগোর কথাও শুনেছেন?'

'পিসী যতটুকু জানেন ততটুকুই জেনেছি।'

খাওয়া-দাওয়ার পর ডক্টর সরকার বলেছিলেন, যে কদিন এখানে আছ, রোজ একবার করে ঘুরে যেও। তাছাড়া শহর যাতায়াতের পথে আমার বাড়ীর সামনে দিয়েই যেতে হবে।

ডক্টর সরকার আর বুলা দুজনে এসেই আমাকে গেস্ট-হাউসে ছেড়ে গেলেন। আমি নেমে নমস্কার করে ধন্যবাদ জানালাম।

বুলা বলল, কাল আসবেন।

(ক্রমশঃ)

# বই-এর ক্যানভাসার

**"১৯৭১ সালের প্রাইমারী পুস্তকের তালিকা**

মাননীয় শিক্ষক মহাশয় ও মহাশয়া সমিপেষু,

আমরা সানন্দের সঙ্গে ঘোষণা করিতেছি যে প্রতিবারের ন্যায় এবারও (১৯৭১) আমাদের প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তকগুলিতে উচ্চহারে কমিশন দিচ্ছি।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও যাহাতে আমাদের প্রকাশিত পাঠ্য-পুস্তকগুলি আপনার স্কুলে পাঠ্য তালিকায় স্থান পায় এ বিষয়ে আপনার সক্রিয় সহযোগীতা কামনা করি।

ইতি—
নমস্কারান্তে"

—হুঁ, আপনারা তো 'সানন্দের সঙ্গে' ঘোষণা করেই খালাস, কিন্তু যে কোম্পানীর সামান্য একখানা চিঠিতেই এত বানান ভুল, সিনট্যাকসের গণ্ডগোল, গুরু-চণ্ডালীর ছয়লাপ—না মশাই, না, এসব বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। আমরা 'সহযোগীতা' করতে পারব না। আপনি বরং অন্য স্কুলে যান।—ঘর ভর্তি ক্যানভাসারে। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, সাদা নানা রংয়ের কাগজে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল আর লিফলেটে হেডস্যারের টেবিলটাকে দেখাচ্ছে যেন একখানা ময়ূরপঙ্খী ঘুড়ি। ঘুর ঘুর করছে টেবিলের চারপাশে ছারপোকার মত ক্যানভাসারের পাল। হেড় মন দিয়ে লিফলেটগুলো পড়ে কোনটা সরাসরি বাতিল করছেন, কোনটা বা অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডসারের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ফাইলিংয়ের জন্য।

ভোর ছটায় এসেছে তারিণী। একঘন্টার ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে যেন ফাঁসীর আসামী। এতক্ষণে বিচারক রায় দিলেন। এবার কি করা? নেপালচন্দ্র জি এস এফ পি স্কুলের হেডস্যার ঠিক স্কুলের নামখানার মতই জাঁদরেল, জাঁকালো। অনুনয়ে, বিনয়ে দই ঘুঁটে হয়তো বা ঘোল বানানো সম্ভব কিন্তু নেপালচন্দ্র গভঃ স্পনসরড ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের বাইশ বছরের পুরোনো হেডস্যার কেষ্টবাবুকে রাজী করানো অসম্ভব।

অক্ষয় মুচকি হেসে চাপা গলায় বলল—এবার কেটে পড় তারিণী। চলবে না তোদের বই এই স্কুলে।

অক্ষয় ঝানু ক্যানভাসার। দেড়যুগ এই লাইনে। সাউথের প্রায় সবকটা স্কুলই ওকে চেনে। বহু স্কুলে হেডস্যার থেকে আরম্ভ করে মিউনিসিপ্যালিটির খোদ এডুকেশন অফিসার পর্যন্ত খাতির করে ওকে। এক এক সিজনে সত্তর আশীখানার ওপর বই ধরায়। কম করেও শতখানেক স্কুলে ওর নিত্য আনাগোনা। পাল্লা দিতে পারবে কেন তারিণী। মাত্র দু বছর এই লাইনে। লাইনের মার প্যাঁচই আজো সব ক্লিয়ার নয়। এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মাঠে পাবলিশার যদি এরকম একখানা ওল নামায় তো কি করে বই ধরাবে তারিণী? অক্ষয়, বিজন খুড়ো, সাধন সরকার, ধনঞ্জয় পাল সব বাঘা বাঘা ক্যানভাসার—তাদের মাঝে তারিণী কোন ছার স্বয়ং পাবলিশার এলেও বই ধরাতে পারত কিনা সন্দেহ।

সাতখানা বই, স্কুল নেবে না জেনেও টেবিলে ফেলে, হেডসারকে নমস্কার ঠুকে অফিসের বাইরে বেরিয়ে এল তারিণী। তখন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। পরীক্ষা শেষ, খাতা দেখা চলছে। ছেলেরা কেউ নেই। শুধু সাতজন শিক্ষকের মধ্যে দুজন এসেছেন স্কুলে—হেডস্যার কেষ্ট কুণ্ডু আর অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড় বিপিন ঘোড়ুই। সরু ফালি রাস্তার ওপরে একটা দোতালা বসত বাড়ীর একতলায় এই স্কুল। খান তিনেক ছোট ছোট ঘর আর এক চিলতে বারান্দা—ব্যস এতেই ঠাসাঠাসি করে চারশো ছেলে আর সাতজন মাস্টারমশায়ের জায়গা হয়ে যায়। এলাকার সবচেয়ে বড় প্রাইমারী স্কুল এটাই। সাতখানা বই ধরাতে পারলে কম করেও টাকা পঁচিশেক কমিশন পেত তারিণী। বইয়ের যা ফেস ভ্যালু তার ডবল কমিশন। ওয়ান টু ফোর, ধারাপাত টু ইংলিশ গ্রামার সব রকমের বই ছাপিয়েছে তারিণীর পাবলিশার। সবচেয়ে কম যেটার দাম সেটাই আশী পয়সা—দু ফর্মার ধারাপাত। ইংলিশ গ্রামারখানার দাম তিন টাকা, ক্লাস ফোরের জন্য। কিন্তু একখানাও গছাতে পারল না তারিণী। সকালটাই মাটি হয়ে গেল।

অথচ কেষ্টবাবু রাজী হলে যে শুধু এই স্কুলে তাই নয়, আরো আশ পাশের দু দশটা স্কুলে হেসে খেলে বই গছানো যেত। কেষ্টবাবুর সুনামকে খাতির করে সবাই। জানে কেষ্টবাবু ঘুষ খান না। নেহাৎ বিচার করেই বই ধরেন। তাই কেষ্টবাবু সিলেক্ট করেছেন, এটুকু শুধু বাতলাতে পারলেই আরো কয়েকটা স্কুল তারিণীর বই নিত। কিন্তু লিফলেটখানাই দিল সব মাটি করে।

দেবে না? যেমন বিদ্যে ঐ পাবলিশারের। নিজে বই লেখে, বউকে দিয়ে লেখায়—সেই সব বই তারিণীর হাত দিয়ে স্কুলে স্কুলে পাঠায়। তারিণী নিজে ভুলটুলগুলো ধরতে পারে না ঠিকই, কিন্তু মাস্টার মশাইদের মুখ পড়তে তো অসুবিধে হওয়ার নয়। তাঁরা সব পড়াশোনা করা লোক—খাঁটি আর ভেজাল ঠিক চিনে ফেলেন। মাঝখান থেকে তারিণীর হয়রাণির আর শেষ নেই।

দু বছর ধরে লাইনটাকে বুঝবার চেষ্টা করছে, কিন্তু হচ্ছে না কিছুতেই। এই বয়সে কি আর বোঝা যায়? বিশ বছর সিনেমার গেট-কিপার ছিল তারিণী। বুড়ো বয়সে স্ট্রাইক করতে গিয়ে চাকরী খুইয়ে শেষে বইয়ের ক্যানভাসার হয়েছে। তাও সারা বছরের চাকরী নয়। দশ মাস কাটে পাবলিশারেরই ফাই-ফরমাস খেটে। তখন বড়জোর যাট-সত্তর টাকা হাতে পায় মাস গেলে। ডিসেম্বর আর জানুয়ারী—এ দুটি মাসই ওর ভরসা। গত বছর এ দু মাসে সব মিলিয়ে ঝুলিয়ে শ চারেক অবধি কমিশন আদায় করেছিল। এবার যে কি হবে?

ঘরে বয়স্থা মেয়ে। বিয়ে আর হবে না। বস্তির ঘরে ঘরে প্রেম করে আলতা, স্নো, চুলের ফিতে আর সিনেমার টিকিট আদায় করে বেড়ায়। বাপের দৌলতে আগে মিনিমাগনা 'শেষ সপ্তাহে' ছবি দেখবার নেশাটা বাগিয়েছিল—এখন বস্তির উঠতিরা তার জোগান দিচ্ছে। ছেলেটাকে খেতেই দিতে পারে না নিয়মিত, তার পড়াবে কি? সিনেমা হলের সামনে তেলেভাজাওয়ালা বালমুকুন্দর জোগানদার হয়েছে তারিণীর দশ বছরের ছেলে কালু। স্ত্রী সারা বছরই বিছানায় পড়ে থাকে। পেটে দিন-রাত একটা জ্বালা দাউ-দাউ করে জ্বলছে। হাসপাতালে গেছিল—ডাক্তার বলেছে চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখাতে, তাদের কিছু নাকি করার নেই। এই তো তারিণীর হাল। নতুন করে লাইন বাগাতে গিয়ে পুরোনো মানুষটা কেমন দিন দিন বেহাল হয়ে পড়ছে। ওদিকে পাবলিশারের তাড়া। এদিকে ক্যানভাসারদের ধাক্কা—কোথায় যে যাবে তারিণী?

দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে অন্যমনস্কের মত হাঁটছিল তারিণী। হঠাৎ মনে পড়ল—আজ না তেইশ তারিখ। আজই তো মিটিং-এর কথা। মিটিং বসবে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে। সতেরোটা প্রাইমারী স্কুল চালায় মিউনিসিপ্যালিটি। এই সতেরোটা স্কুলে সাতখানা বই ধরাতে পারলে—ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে তারিণীর। সে যে অনেক টাকা। একটা স্কুলে সাতখানা ধরাতে পারলেই যেখানে কমিশন পাবে পঁচিশ টাকা, সেখানে সতেরোখানায়!...। তাড়াতাড়ি পা চালায় তারিণী।

খাস রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে মিনিট সাতেকের পথ—কাঁচা ড্রেনের ওপর বাঁশের সাঁকো। তার পরেই মিউনিসি-প্যালিটির এডুকেশন অফিসার গণেশ রায়ের বাড়ী। রায়বাবু বাড়ীতেই ছিলেন। দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এসে তারিণীকে দেখে বললেন—কি চাই? এখানে কেন? বাসায় আসা আমি একদম পছন্দ করি না জানেন, অফিসে দেখা করবেন। কথা কটা শেষ করেই দরজার পাল্লা দুটো সাঁটতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মাছের থলিটা ভেতরে চালিয়ে দিয়েছে তারিণী।

অফিসেই দেখা করব স্যার। যাচ্ছিলাম এ পথ দিয়ে। পথেই বাজার পড়ল। দারুণ টাটকা গলদা স্যার। তাই এক কেজি নিয়ে এলাম। জানি স্যার চিংড়ি খুব ভালবাসেন।

আধ ভেজানো দরজা মুহূর্তে হাট হয়ে গেল। সতেরোটা প্রাইমারী স্কুল যার গোঁফের রেখায় ওঠে বসে তার গোঁফ সমেত আস্ত মুখখানাই বাঁধাকপির মত ঝুড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। এসব আবার কেন? ছি, ছি।

আবার ন্যাকামো হচ্ছে। নাচতে নেবে ঘোমটা টানছ। দাঁড়াও, তোমার ঘোমটা আমি খুলবই। অক্ষয় বা ধনঞ্জয় কাউকে ঘেঁষতে দেবো না তোমার কাছে নাচওয়ালী—তুমি শুধু আমারই। বিনয়ে গদগদ তারিণী। শতচ্ছিন্ন র‍্যাপারের আড়াল সরিয়ে গ্রিল বসানো জানলার মত হাফ-সার্টের বুক পকেট খুঁজে দুটো দশ টাকার নোট তুলে এনে সামনে উঁচিয়ে ধরে বলল, বই পিছু তা স্যার পাঁচ টাকা। এই বিশ ধরুন। মিটিং হয়ে গেলে বাকী টাকাটা বাড়ীতেই দিয়ে যাব।

মুহূর্তে বাঁধাকপির পাতাগুলো টান-টান হয়ে উঠল। এডুকেশন অফিসার গণেশ রায় ছোট ছোট চোখ দুটো একবার বোধ-করি লোভের জিভ দিয়ে মনে মনে চেটে নিলেন। তারপর ভুরু আর গোঁফ সমান্তরাল ভাবে নাচিয়ে বললেন, ত্রিলোক প্রকাশনীর অক্ষয়বাবু কিন্তু এবার পার বই ছ'টাকা দিচ্ছেন। তাছাড়া দাস বুক স্টলের সাধন সরকার, মোহিনী পাবলিশিংয়ের বিজন সাহা, জ্ঞানদা বুক স্টলের ধনঞ্জয় পাল সবাই রাজী হয়ে দিতে। পাঁচে ঠিক পোষায় না তারিণীবাবু।

কেমন জানি মরীয়া হয়ে ওঠে তারিণী। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেও অন্য স্কুলেই বই বাছায়ের কাজ চলছে। আজ পর্যন্ত মাত্র ছটা স্কুলে বই গছাতে পেরেছে। তাও সব কখানা নয়—চারটে মাত্র। এরপর কাল বাদে পরশু থেকে পড়বে বড় পরবের ছুটি। স্কুল খুলবে সেই দু তারিখ, জানুয়ারীর। আর জানুয়ারীতে বই ধরানো প্রায় অসম্ভব। অধিকাংশ স্কুলই তাদের বই ডিসেম্বরেই ঠিক করে, বুকলিস্ট ছাপাতে দেয়। তখন তারিণী কি করবে? আঙুল চুষবে? ওদিকে অক্ষয়, ধনঞ্জয়, বিজন খুড়ো, সাধনরা তো মার্কেট ক্যাপচার করে ফেলবে। এ'কদিনে। কিন্তু পাঁচের বেশী দিলে তারিণীর থাকবে কি? আট মাসের ওপর ঘরভাড়া বাকী। মুদি ফিরিয়ে দিচ্ছে আজ দু মাস ধরে—প্রায় একশো টাকা ধার ওখানে। বৌটার চিকিচ্ছের হচ্ছে না কিছুই। বলতে গেলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। তবু যদি এ দুটো মাসে বাড়তি কিছু আসে তাহলে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। আর সেই সঙ্গে দেখবে যদি কালুটাকে কোন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া যায়। চিন্তার শুকনো মরা পাতাগুলো রুক্ষ বিস্তীর্ণ ক্যানভাসার তারিণীর ভেতরে ভেতরে ঝড়ের দাপটে ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে। সাতখানা বই, সতেরোটা স্কুল—মানে প্রায় সোয়া চারশো টাকা। বেশ, তাই সই। বেশীই দেব। ছয় নয় সাত করে দেব বই পিছু। কিন্তু বই ধরাতেই হবে। তারিণীর বোবো গলা চিরে কান্নার মত বেরিয়ে আসে কথা কটা—ছয় না স্যার সাত করেই দেব। দয়া করে একটা হিল্লে করে দিন।

মাছের থলিটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে বরাভয় দানের মত মুদ্রা করে আশ্বাস দেন গণেশ রায়, তাহলে আজ বিকেলে বাকী টাকা কটা নিয়ে অফিসে দেখা করবেন। ব্যবস্থা করে দেব। কথা কটা শেষ করতে করতে ছিপে গাঁথা নোট দুখানা একটানে নিজের মুঠোয় টেনে নেন এডুকেশন অফিসার।

তারিণীর দুটো দশ টাকা, বারো টাকা কেজির এক কিলো গলদা ও আরো তিনখানা দশ টাকার নোটের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সাতখানা বই, সতেরোটা স্কুলে ধরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে আবিষ্কার করল—অক্ষয় বাস রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে গুটি গুটি চলেছে। যাত্রা একই লক্ষ্যে। জানে না গণেশ রায়কে কিনে ট্যাঁকে গুঁজে ফেলেছে তারিণী। এখন ধারা-পাতে যদি বৃষ্টির ধারার মত ভুল বেরোয়, বা ইংলিশ গ্রামারে যদি ইংরেজিরই ছিটে-ফোঁটা নাও থাকে তবুও তারিণীর বই স্কুলে স্কুলে চলবে। এ স্কুলগুলো তো আর নেপালচন্দ্র গভঃ স্পনসরড ফ্রি প্রাইমারী স্কুল নয়, এখানে তো আর কেষ্টবাবুর মত বাধা হেড বসে নেই। বারোয়ারী সতেরোটা স্কুলের দন্ডমুন্ডের কর্তা গণেশ রায়। বাবু গণেশ রায় হাটে বসে নিজেকে বিকোচ্ছেন—যে বেশী দাম হাঁকবে উনি তারই।

শুধু তারিণী জানে না, অক্ষয় আরো চড়া দাম হাঁকবে কিনা?

# শৃংখলিত প্রমেথিউস

## প্রমথবাবুর আত্মকথা

পাহাড়ের চূড়ায় ভারী পাথরে বাঁধা প্রমেথিউস। হাতে-পায়ে শিকল নড়বার উপায় নেই। সারাদিন রোদে পুড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে। রক্তচক্ষু ঈগল ধারালো ঠোঁট দিয়ে তার লিভারটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। রাতের বেলায় লিভারটা আবার বেড়ে প্রমাণসাইজের হয়ে যাচ্ছে। পরের দিন আবার নিষ্ঠুর ঈগল লিভারটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এমনি করে স্বর্গের আগুন চুরির শাস্তি ভোগ করছে মানবদরদী প্রমেথিউস। আগুন নিয়ে যারা খেলা করে তাদের এমনি দশাই হয়। এই দেখুন, এই জায়গাটা আমার, এই লিভারের জায়গাটা জ্বলে যাচ্ছে। ঈগলের ঠোঁটে আগুন ছিল বোধ হয়।

এই পর্যন্ত বলে প্রমথবাবু চোখ বুজলেন। যন্ত্রণায় তাঁর দেহটা কুঁকড়ে গেছে, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিয়েছে।

বাড়ীর লোকেদের কাছে রোগ-ইতিহাস শুনলাম। এই রকম বাড়াবাড়ি চলেছে গত একমাস ধরে। প্রথম প্রথম পেথিডিন ইনজেকশন দেওয়া হত, আজকাল ইনজেকশন দিচ্ছেন না। দুবার একস-রে করা হয়েছে, বড় বড় ডাক্তার দেখানো হয়েছে। পেটের মধ্যে কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। লিভারটা সামান্য একটু বেড়েছে এইমাত্র। তাঁরা বলছেন রোগটা দেহে নয় মনে। বছর খানেক ধরে প্রমথবাবু অসুস্থ। প্রথমে সুরু হয় আগুনের ভয়। বাড়ীর পাশের বস্তিটা যেদিন আগুন লেগে পুড়ে যায়; তার কিছুদিন পর থেকে আগুনের ভয় দেখা দিয়েছে। দেশলাই জ্বালাতে ভয় হতে লাগল। পকেট থেকে দেশলাই কোনো রকমে সাহস করে যদিও বের করতে পারতেন, কাঠি ঘসে আগুন জ্বালাতে পারতেন না। হাতটা অবশ হয়ে যেত, আঙ্গুলগুলো অল্প অল্প কাঁপতে থাকত। সিগারেট ধরানো হত না। দেশলাই ছেড়ে লাইটার ব্যবহার করতে লাগলেন। দু-চারদিন পরে সেই অসুবিধা। লাইটার জ্বালাতে গেলেও আঙ্গুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে যায়, অল্প অল্প কাঁপতে থাকে, লাইটার হাত থেকে পড়ে যায়। এই সময় একরাত্রে 'আগুন' 'আগুন' বলে চীৎকার করে খাট থেকে মেঝেতে পড়ে যান। বোধহয় বস্তির আগুন লাগার দৃশ্য স্বপ্ন দেখছিলেন। ঘরের মধ্যে কোথাও দেশলাই থাকলে রাত্রে ঘুম আসত না। পাশে বসে কেউ সিগারেট ধরালে ভয়ে চমকে উঠতেন। রান্না ঘরে বসে খেতে পারতেন না, কয়লার উনুনের আঁচ দেখলেও অস্বস্তি হত। তবে কাজ-কর্ম কোনো রকমে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর অগ্নিভীতির কথা বাড়ীর লোকরাই শুধু জানত। বাড়ীর লোক বলতে ভাই, ভাইপো ও বৌদি। প্রমথবাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ। শীর্ণ চেহারা, ভালমানুষের মত দেখতে। একটা জেনারেল ইনসিওরেন্স কাম্পানীতে চাকরী করেন। শৈশব থেকে নানারকম রোগে ভুগছেন, তাই বিয়ে করার কথা মনে হয়নি। দিন-রাত লেখাপড়া নিয়েই আছেন। পুরনো পুঁথি-পত্র কেনেন, পড়েন, নোট রাখেন, আবার কিছুদিন পরে বেচে দিয়ে একসেট নতুন বই কিনে আনেন। রামায়ণ, মহাভারতের অনেক সংস্করণ ওঁর আছে। গ্রীক মাইথোলজি আর নাটকের বইও প্রচুর। আজ বছরখানেক ধরে কোনো নতুন বই কেনেননি। আত্মজীবনী লিখছেন। কয়েকটা বাঁধানো খাতা ভরতি হয়ে গেছে। বন্ধু-বান্ধব বড় কেউ নেই। স্কুল-কলেজের কোনো সহপাঠীকে বাড়ীতে আসতে দেখা যায় না। পুরনো ইতিহাস পুরাণ পড়া আর ধূমপান করা, এই ওঁর একমাত্র নেশা। কথাবার্তা খুব কম বলেন। আজকাল ঐ লিভারের ব্যথাটা ওঠবার পর থেকে একটু বেশি কথা বলছেন। এরপর দুদিন ধরে প্রমথবাবুর আত্মকথা পড়লাম ও তাঁর মুখে তাঁর রোগ-বৃত্তান্ত শুনলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হল। চেহারায় বিশেষত্ব নেই, কিন্তু চিন্তা-ধারায় ও মানসিকতায় প্রমথবাবু একেবারে অনন্য। তাঁর সব কথা খুব সংক্ষেপে বিবৃত করছি। যতটা সম্ভব তাঁর জবানীতে বলার চেষ্টা করব।

—আগুন নিয়ে আমার কৌতূহল শৈশব থেকে। দেশলাই-এর বাকস চুরি করে পুকুর পাড়ে বসে একটার পর একটা জ্বেলে যেতাম। আঙ্গুলে আগুনের তাপ না লাগা পর্যন্ত কাঠিটা ধরে থাকতাম। তারপর শেষ কাঠিটা জ্বেলে শুকনো পাতায় আগুন ধরাতাম। পাতাগুলো প্রাণ পেয়ে নড়ে উঠত। আগুনের তাপে কুঁকড়ে যেত। শীতকালে মাঝে মাঝে দাউ-দাউ করে অনেকগুলো জড়ো করা পাতা জ্বলে উঠত। চেয়ে চেয়ে দেখতাম। একদিন আগুন গিয়ে আমাদের খড়ের গাদায় পৌঁছুতে দারুন অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায়। বাড়ীর লোকেদের সে কি আতংক আর আগুন নেভাবার জন্য ছুটোছুটি! ভয় পেয়ে আমি ছুটে পালিয়ে অন্য পাড়ায় গিয়ে লুকিয়েছিলাম। কেউ বুঝতে পারেনি কি করে আগুন লাগল। বাবার পায়ে একটা লোহার বেড়ি লাগানো থাকত। মাঝে মাঝে তিনি গুম মেরে যেতেন। তারপর খুব চেঁচামেচি করতেন। ঠাকুর ঘরের মধ্যে তাঁকে বেঁধে রাখা হত। এই সময় আমার দেশলাই চুরির ইচ্ছেটা দারুন রকম বেড়ে যেত। দাদার কাকার পকেট হাতড়ে দেশলাই-এর সংগে বিড়ির টুকরো, কাগজের টুকরো, আনি দুআনি, যা পেতাম চুরি করতাম। মাঝে মাঝে ধরা পড়ে খুব পিটুনি খেতাম। কিন্তু আগুন দেখবার ইচ্ছে আমার কমত না।

...বাবা মারা যাবার পর আমরা দেশের জমিজমা বেচে কোলকাতায় চলে আসি। দাদার ব্যবসাতে তখন আমাদের বেশ দু-পয়সা রোজগার হচ্ছিল। আমার এই সময় থেকে হাঁপানির সূত্রপাত। শীতের মুখে কয়েকদিন খুব বাড়াবাড়ি চলত। বসে রাত কাটাতে হত। সেই অবস্থাতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতাম বস্তির লোকেরা আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসে হাত-পা গরম করছে। আগুনটা মাঝে মাঝে উসকে দিচ্ছে, শিখাটা হাওয়ায় কেঁপে উঠে আবার বেঁকে নিভে যাচ্ছে। আমার চোখের সামনে খড়ের গাদায় আগুন লাগার ছবিটা ভেসে উঠত। হাঁপানি কমে যেত, আমি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। এল ৪২-এর আগষ্ট। চারদিকে আগুন জ্বলে উঠল। বস্তির ছেলেদের সংগে মিশে আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় গিয়ে ট্রামে-বাসে আগুন লাগাতাম। আমি ছিলাম একাজে সব থেকে উৎসাহী। একদিন পুলিশের লাঠিতে জখম হলাম। বেশ কয়েক সপ্তাহ ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুয়ে থাকতে হল।...স্কুল থেকে কলেজে ঢুকলাম। বোধহয় ৪৯ সাল। আমার বয়স ১৮।১৯। আবার গোলমাল সুরু হল রাস্তায় রাস্তায়। কিসের গোলমাল, কিসের আন্দোলন, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না। আমার কাজ ছিল আগুন লাগানো। মিনিট কয়েকের মধ্যে ট্রাম কি বাস থামিয়ে, পেট্রল কি কেরসিন ছিটিয়ে, সেটাকে আগুন ধরিয়ে, গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে আমি জ্বলন্ত গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। এক অপূর্ব আনন্দে আমার মন ভরে যেত। বাড়ীর লোক বা ক্লাসের ছেলেরা আমার এই খেয়ালের কথা জানতো না। অন্য পাড়ায় গিয়ে আমি আমার 'অ্যাকশন স্কোয়াড' নিয়ে কাজ চালাতাম। একদিন ধরা পড়লাম। জেলে থাকতে হল বছর দুয়েক। চেনা লোকরা ভাবল আমি বুঝি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছি। না, রাজনীতির সংগে আমার কোনো সংযোগ ছিল না। অনবরত হাঁপানিতে ভুগতাম [illegible] ল আমার স্থান হল জেল হাসপাতালে। আমার ঘরে কয়েকটা বেড খালি ছিল। তার একটাতে এক বয়স্ক

আগুন ধরে গেল। ওয়ার্ডবয় নার্সদের চেষ্টায় অল্পেতেই আগুন নিভলো। আমার তৃপ্তি হল না, হাঁপানিও কমলো না। এই সময় আমি পড়াশুনো সুরু করি। আগুনের ইতিহাসচর্চা আরম্ভ করি। এক ছোকরা ডাক্তারের সংগে ভাব হয়। তার কাছ থেকে ডাক্তারী বই, বিশেষ করে মনের রোগের বই পেতাম। কিছুটা পড়ে কিছুটা ঐ ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারি, আমি মনের অসুখে ভুগছি। 'পাইরো-ম্যানিয়া' অস্বাভাবিক অগ্নিপ্রীতি, এই রোগের নাম। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর দাদার দৌলতে একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরী পাই। 'অগ্নিবীমা' বিভাগের কাজ আমি বেছে নিই। ট্রাম-বাস পোড়ানোর ইচ্ছেটা কমে যায়। শীতের প্রথমটায় হাঁপানির আক্রমণটা আগের মতই চলতে থাকত, আর তখন একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়তাম। খবরের কাগজ পুরনো বই জড়ো করে জ্বলন্ত দেশলাই-এর কাঠি সংযোগে আগুন জ্বালিয়ে এই অস্থিরতা দমন করতাম। তারপর কয়েক বছর শীতের সুরুতেই ছুটি নিয়ে জংগলের দিকে বেড়াতে যেতাম। বনের আগুন দেখার ইচ্ছে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতাম। নিজে শুকনা পাতায় আগুন ধরিয়ে অগ্নিপিপাসা মেটাতাম। আর সংগে সংগে চলত আত্মবিশ্লেষণের চেষ্টা! কেন আমি অস্বাভাবিক? কেন আমি অসুস্থ। কেন আমি পাইরো-ম্যানিয়াতে ভুগছি। ফ্রয়েড পড়লাম। হ্যাভেলক এলিস পড়লাম। তাঁদের মতে শৈশবের অতৃপ্ত যৌনকামনার সংগে নাকি এই পাইরোম্যানিয়ার সম্পর্ক আছে। অনেক হাতড়েও অতৃপ্ত কামনার হদিশ পেলাম না। যৌনব্যাপারেও আমি বোধ হয় অস্বাভাবিক। স্ত্রীজাতির প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। যৌনউত্তেজনাও বোধহয় সাধারণের থেকে আমার অনেক কম। এক ডাক্তারের সংগে এ নিয়ে কথা বলেছিলাম। যৌন কামনার নাকি কোনো অ্যাভারেজ বা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড নেই। এক-একজনের এক একরকম। কথাটা মনে লেগেছিল। অথবা যৌনকামনার তীব্রতা না থাকার দরুন ব্যাপারটা নিয়ে আদৌ কোনো চিন্তাই করিনি। ঐ উত্তরেই তাই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। আমার তখন চিন্তা ট্রয়ের আর লঙ্কার আগুন নিয়ে। আগুন দেখার ইচ্ছা মানুষের সহজাত কামনা। হেলেন নয়, সীতা নয়, গ্রীকদের আর রাম অনুচরদের আগুন দেখার আদিম প্রবৃত্তি, ট্রয় আর লঙ্কা ধ্বংসের কারণ। হ্যাভেলক এলিস লিখেছেন পাইরো-ম্যানিয়া কথাটা অচল, সেকেলে। পাইরো-ল্যাগনিয়া কথাটাই ঠিক। আমি মানি না এলিসের কথা। কামেচ্ছা আর আগুন লাগাবার প্রবণতার মধ্যে অন্তত আমার বেলায়, কোনো সম্পর্ক নেই। আগুনকে বশে আনার ফলে মানুষ সভ্য হয়েছে, অগ্নিবশ্যতার কালই সভ্যতার কাল। পণ্ডিতদের এই মতও অভ্রান্ত নয়। এখানেও গোঁজামিল আছে। আগুনকে আমরা বশে এনেছি কিন্তু তার ফলে নিজেরা অগ্নিদগ্ধ হচ্ছি। আগুনকে কি সত্যিই বশে এনেছি? তাহলে ট্রয় পোড়ে কেন? আমি খড়ের গাদায় ট্রাম গাড়ীতে আগুন লাগাই কেন? বোমার আগুনে শহর পোড়ে কেন? ধানক্ষেত পোড়ে কেন?

প্রমেথিউস স্বর্গের আগুন চুরি করে পাপ করেছিল। আগুন এনে মানুষের সর্বনাশ করেছে প্রমেথিউস। জিউস তাকে শৃংখলিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে। 'প্রমেথিউস বাউন্ড' নাটকটা ঠিকই লেখা হয়েছে। শেলীর 'প্রমেথিউস আনবাউন্ড'এ মানুষের উচ্চ আকাংক্ষার প্রকাশ, যে আকাংক্ষার আগুনে সে দিন-রাত জ্বলে-পুড়ে মরছে! এইসকিলাস নিজের লেখা ঐ নামের নাটকটা অগ্নিতে সমর্পণ করেছিলেন। বুঝেছিলেন, আগুন মানুষের কোনো কাজে লাগে না। মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তাকে ধ্বংস করে। আমরা যজ্ঞাগ্নিতে অনেক কিছু আহুতি দিই, কিন্তু উচ্চাশাকে মনের কোণে সংগোপনে জীইয়ে রাখি। তাই আমরা অসুখী, তাই আমরা অতৃপ্ত। আমি আগুন জ্বালিয়ে নিজেকে তৃপ্ত করতে, তুষ্ট করতে চেয়েছি। পেরেছি কি?

এই রকম অনেক কিছু বলেছিলেন প্রমথবাবু। তাঁর ডায়েরীর পাতা আর মুখের কথার কিছু অংশ মাত্র পাঠকদের পরিবেশন করেছি। তিনি স্বীকার করলেন যে বস্তিতে তিনিই আগুন দিয়েছিলেন। আশেপাশে কিছুদিন ধরে আগুন জ্বলছিল। ৪২-এর মত, ৪৯-এর মত তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল, অ্যাকশন স্কোয়াড তৈরী করে আবার কাজে নেমে পড়তে। কিন্তু এই বয়সে আর সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু একেবারে চুপ করে থাকা যায় না। অধীর উন্মাদনায় তাঁর রাতে ঘুম হচ্ছিল না। হাঁপানির টানটা খুব বেড়ে উঠেছিল। তাই গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে চুপি চুপি জমানো ময়লার গাদায় খানিকটা পেট্রল ঢেলে তিনি আগুন লাগালেন। অগ্নিশিখা কয়েক মিনিটের মধ্যে রাতের অন্ধকার দূর করে বাতাসে কাঁপতে লাগল। এবার কিন্তু তাঁর তৃপ্তি হল না। বস্তির বাচ্চাদের করুণ আর্তনাদে তিনি বিচলিত হলেন। আগুন নেভাতে অন্যদের সঙ্গে মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। অনেক বাচ্চা বৃদ্ধদের আগুন-ঘেরা খুপরি থেকে বাইরে নিয়ে এলেন। অনেকের প্রাণরক্ষা করলেন। দুটো ছেলেকে কিছুতেই বাঁচান গেল না। প্রমথবাবুর চোখের সামনে চলন্ত মশালের মত ছেলে দুটো ছুটোছুটি করতে লাগল, চিৎকার করে মাটিতে শুয়ে গড়াতে লাগল, তাদের মা-বাপের হাহাকারে চারদিক ভরে গেল। প্রমথবাবু ছুটে বেরিয়ে গেলেন। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুড়ে বেড়ালেন। ভোরের দিকে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই সময় থেকে অগ্নিপ্রীতি অগ্নিভীতিতে রূপান্তরিত। এই সময় থেকে তিনি প্রমেথিয়ুসকে [illegible] দেওয়া শুরু করলেন। মাস-খানেক আগে হঠাৎ এক রাতে মনে হল তিনিই বোধ হয় প্রমেথিয়ুস। প্রমথ আর প্রমেথিয়ুস এক কথা। শিবের অনুচর তিনি আর জিউসের অনুচর প্রমেথিউস। শিবের চোখের আগুন তিনি মর্তের মানুষদের দেখাতে চেয়েছেন আর প্রমেথিউস অলিম্পাস-এর আগুন দিয়ে মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছেন : দুই-ই সমান অপরাধ। শিবের আদেশে শ্মশানের শকুনি ধারাল ঠোঁট দিয়ে তাঁর লিভার টেনে বের করছে। অসহ্য যন্ত্রণায় দিন-রাত তাঁকে ছটফট করতে হচ্ছে।

অতিবিচিত্র এই প্রমথবাবুর কাহিনী। পাইরোম্যানিয়া (আগুন লাগানোর অদম্য প্রবণতা) ক্লেপ্টোম্যানিয়ার (উদ্দেশ্যহীন চৌর্যপ্রবণতা) রোগী সাধারণত চিকিৎসকদের কাছে আসে না। পুলিশ ও জেলের ডাক্তাররা হয়ত এদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন, আমার এই ধরনের রোগী সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না। পরোক্ষ অভিজ্ঞতা অর্থাৎ পুঁথির বিদ্যার সংগেও প্রমথবাবুর কেসটি ঠিকমত মেলাতে পারলাম না।

প্রমথবাবুর মানসিক বিকারের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক। প্রমথবাবু বোধ হয় পাইরোম্যানিয়কদের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম। এরকম জ্ঞানগর্ভ কথা এর আগে এই ধরনের লোকের কাছে কেউ বোধ হয় শোনেন নি। প্রথমে দেখি, আগুনের উপর মোহ, পরে অগ্নিভীতি। অগ্নিভীতির কারণ তাঁর নিজের কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে। এর আগে তাঁর পাইরোম্যানিয়ার দরুণ কোন প্রাণহানি হয় নি। এই প্রথম নিজের চোখে নিজের অগ্নিসংযোগের ভয়াবহ পরিণতি দেখার ফলে তাঁর এধরনের পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। কেন তাঁর শৈশব থেকে এই আগুন জ্বালার প্রবণতা? তাঁর আত্মচরিতটা খুঁটিয়ে পড়েছি, তাঁকে অনেক প্রশ্নও করেছি। প্রমথবাবুরা ছিলেন অবস্থাপন্ন জোতদার। তাঁর ঠাকুরদার আমলে দুষ্ট প্রজাদের দমন করতে 'লাল ঘোড়া' ছোটানোর নিয়ম ছিল। প্রজাদের ঘরের দরোজা বন্ধ করে ঘরে আগুন দিয়ে তাদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হত। ডায়েরীটায় এই রকম দু-একটা শোনা কথার উল্লেখ আছে। বাবার আমলে এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল বোধ হয়। ব্যাপারটা খুব গোপনে সম্পন্ন হয়েছিল। এক প্রতিপত্তিশালী প্রজা জোর করে ধান কেটে নিজের গোলাজাত করেছিল। জোতদারবাবু বিষ দাঁত ভাঙ্গা সাপের মত ক্রোধে ফুলে-ফুলে উঠেও কোন কিছু করতে পারেন নি। সেই সময়টায় তিনি উন্মাদ হয়ে দাপাদাপি করেছিলেন। কাকা ও মা বাবার উন্মত্ততা দূর করার দাওয়াই হিসেবেই বোধ হয় নেপাল বক্সীকে একশো টাকা দিয়ে—জোতদারের গোলায় আগুন লাগিয়ে ছিলেন। এই সময়টা প্রমথবাবুর কাকা অসুস্থ দাদার চিকিৎসার জন্যে কোলকাতায় ছিলেন। প্রমথবাবু মায়ের সংগে ছাতে দাঁড়িয়ে আগুনের লেলিহান শিখা দেখেছিলেন। প্রমথবাবুর আত্মচরিতে এক জায়গায় লিখেছেন, মায়ের চোখে প্রশান্তির ছায়া দেখলাম। বাবা থাকলে কি নীরোর মত বাঁশী বাজাতেন? —মনোবিদ

## রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সবচেয়ে উঁচু চুড়োটা সাড়ে তিন হাজার ফিট। সেটা টপকাতে পারলেই ঠিক ওপারে ফরেস্ট বাংলোটা। অরণ্যসংকুল উড়িষ্যার এ অঞ্চলটার কুখ্যাতি সবচেয়ে বেশী। শুধু পাহাড় আর জংগল। শাল, কিরাগ্যাল, মহুয়া, চার, আসন, আর সহস্র রকমের বনৌষধিতে ভরা গভীর জঙ্গল ছড়িয়ে গেছে সমতলের দিকে রংগড়া, তল্লিপেটা, বিষমকটক, শিকারপাই অঞ্চলে। এসব জায়গায় দিনের বেলাতেই মানুষকে বাঘে ধরে। বাঁয়ে কোরাপুটের পার্বত্য উপত্যকা, ডাইনে পাহাড় পার হয়ে বলাংগির।

সূর্য ডোববার আগেই আমাদের ফরেস্ট বাংলোতে পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু গোটাকতক পাহাড় টপকাতেই আধপথে জীপ গেল বিগড়ে। দুপাশের কালো জংগলের দিকে তাকিয়ে ফরেস্ট রেঞ্জার জগবন্ধু পানিগ্রাহী ফিকে হাসি হেসে ড্রাইভারকে বললেন, চক্রধারী, তোমার সংগে তো আমাদের এমন শত্রুতা কিছু ছিল না বাবা। একেবারে জ্যান্ত এনে বাঘের মুখে ধরে দিচ্ছ। এখানে রাত কাটাতে হলে নির্ঘাৎ—

চক্রধারী ইঞ্জিনের খোলের ভিতর মুখ ঢুকিয়ে মেরামতির কাজ চালাচ্ছিল। পানি-গ্রাহীর কথার ওপরেই বলে উঠল—ধরে দিয়ে তো আর পালাতে পারবো না স্যর।

আমাকেও তো যেতে হবে বাঘের পেটে সেই সঙ্গে। সেটাও তো ভয়ের কথা।

ভয় পাবারই কথা। দু-পাশে থম-থম করছে নিস্তব্ধ গভীর অরণ্য। তার লতা-জটিল অন্ধকার রাজত্বের নৈঃশব্দ্য সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর হয়ে উঠছে। চারদিক থেকে আদিম অন্ধকার ছায়া মেলে এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ। যা-ও দু-একটা পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছিল এদিক ওদিক তাও থেমে থেমে আসছে। মাথার উপরকার একটুখানি খোলা আকাশে ধূসর ছায়া ঘনিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ বুঝতে পারছি এটা হল জানোয়ারদের শিকারে বার হবার সন্ধিক্ষণ।

এমন সময় চক্রধারী বনেট বন্ধ করে এসে স্টার্ট লাগাল জীপে। সৌভাগ্যের কথা, জীপও সুবোধ বালকের মতো স্টার্ট নিয়ে নিল। জীপের ভিতর চেপে বসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে পানিগ্রাহী হাত জোড়া করে কপালে ঠেকালেন।

জীপ এগিয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে। জীপের দু'টো হেডলাইট জ্বলছে। একটা পথের মোড় ফিরেই এসে পড়লাম একটা দৌড়দার চড়াই-এর সামনে। সম্মুখের পথটা সোজা উঠে গেছে ওপর-দিকে। অন্ধকারে পথের ওপর জীপের আলোটা পড়তে বেশ খানিকটা দূরে হঠাৎ চোখে পড়ল কি একটা সাদামতো যেন নড়াচড়া করছে।

পাণিগ্রাহী বললেন—কি হে চক্রধারী, ওটা কি জানোয়ার?

চক্রধারী কোন জবাব দিল না। পাহাড়ে চড়ার গিয়ারটা বেশ করে চেপে দিয়ে সে জীপের স্পীড বাড়িয়ে দিল। জীপটা গোঙাতে গোঙাতে উপরে উঠতে লাগল। একটু পরে চক্রধারী জবাব দিল—স্যার, ওটা একটা মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

—এ্যাঁ, বল কি? এই সময়ে এই পথে মানুষ! সন্ধ্যার পর এ-রাস্তায় বুনোরাও বার হয় না মানুষখেকো বাঘ আর ভালুকের উৎপাতে।

জীপ আরও একটু এগিয়ে যেতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। দেখতে পেলাম একটা লোক দু-হাতে দুটো বড় বড় কানেস্তারা টিন নিয়ে সেই খাড়া পাহাড়ী রাস্তায় প্রায় হামগুড়ি দিয়ে ওপরের দিকে উঠছে। উঠছে সে অতি কষ্টে। এক-একবার টিনদুটো তার হাত থেকে ফস্কে যাবার উপক্রম করছে। সেগুলোকে ঠিক রাখতে গিয়েই বোধহয় তার পাও যাচ্ছে এখন-তখন ফস্কে। একবার সে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ে গেল নীচের দিকে। কিন্তু হাতের টিনদুটো ছাড়ল না। উঠে দাঁড়িয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে তুলতে লাগল টিন-দুটো। যেন সে টাগ্-অব-ওয়ার চালাচ্ছে ও-দুটোর সঙ্গে। আমরা তার কাছাকাছি আসতেই লোকটা পা ফস্কে পড়ে গেল আবার রাস্তার পাশে। তারপর আর নড়ে-চড়ে না। ওঠে না।

—জীপটা একটু থামাও তো—পানি-গ্রাহী হুকুম করলেন। জীপটা থামল। নেমে লোকটার কাছে গেলাম। নামবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুকের ভিতরটা যেন জমে যাবার উপক্রম হল। একে শীত-কাল, তার ওপর এই আড়াই হাজার ফিট উঁচুতে জঙ্গলে পাহাড়ী রাস্তা। হাত-পা হিম হয়ে আসতে লাগল।

চক্রধারী এগিয়ে গিয়ে রূঢ়ভাবে ধমকে উঠল—এই, কে তুমি? এই অন্ধকারে এ-পথে চলেছ, ভয়-ডর নেই?

লোকটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। রোগা চিমড়ে চেহারা। মাথায় বড় বড় নোংরা ঝাঁকড়া চুলের রাশ। তাতে তেল পড়েনি বোধহয় বছরের পর বছর। গাল-দুটো বড় বড় গর্ত হয়ে তুবড়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। পরনে একটা চিট্-ময়লা শতচ্ছিন্ন ধুতি। গায়েও ঐ রকম নোংরা তুরতুরে ছেঁড়া একটা হাফ-সার্ট। চেহারা দেখে বোঝা গেল লোকটা আদিবাসী নয়।

জীপের আলোয় সামনে পড়ে সে দু' হাত দিয়ে দু-চোখ চেপে ধরেছিল। চড়া আলোতে চোখ মেলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। সে হাত সরিয়ে আমাদের দিকে চাইল। টকটকে রাঙা দুটো চোখ। যেন এই মাত্র ঘুম ভেঙে উঠল। অতি কষ্টে টেনে টেনে চাইতে চেষ্টা করতে লাগল।

পানিগ্রাহী জিগ্যেস করলেন—কে তুমি? নাম কি?

—আজ্ঞে সঙ্কীর্ণ পাত্র।

—বাড়ী কোথায়?

—রাস্তায়।—দুটো চোখ হাতের তেলোতে চেপে ধরে জবাব দিল লোকটা। তার মুখ দিয়ে দেশী মদের বীভৎস গন্ধ ভক-ভক করে বার হয়ে আসছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টলছিল সে।

—এঃ। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ধমকে উঠলেন, পানি-গ্রাহী।—তোমার ভয়-ডর নেই? জান তো এখানে মানুষখেকো বাঘের আড্ডা?

—বাঘে খেলে তো সাহেব বেঁচে যাই! কিন্তু কোন বাঘ এই ক'খানা হাড় চিবোবার জন্যে এত খাটতে চাইবে বলুন? —জড়িয়ে জড়িয়ে জবাব দিলে লোকটা।

বলেই সামনে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বিড়-বিড় করে বললে—উঃ বড্ড শীত। সাহেব একটা বিড়ি দেবেন দয়া করে? দু'-চোখ কিন্তু সে আগের মতোই বন্ধ করে রাখল। হাতটা পেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল।

চক্রধারী ধমকে উঠল দাঁত খিঁচিয়ে—শালা, লজ্জা করে না? বে-আইনী চোলাই মদ নিয়ে যাচ্ছিস ওপরের বুনোদের বস্তিতে। সবশুদ্ধ ধরে থানায় নিয়ে যাব।

লোকটা এবার চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসল। আধ-বোজা চোখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—সাহেব, আপনারা তো সরকারী লোক। হাকিম মানুষ। বিচার করুন। লজ্জা কেন হবে আমার? পেটের জন্যে খাবার বয়ে নিয়ে যেতে কি কারুর লজ্জা হয়?

—মদ আর খাবার এক জিনিস?

—সাহেব মিছে কথা বলছি না। আমি স্রেফ এই খেয়েই সপ্তার সাতটা দিন কাটাই। বিশ্বাস না হয়, আমাকে আপনার কাছে রেখে পরখ করে দেখুন। কারুর মুখের খাবার কেড়ে নেওয়া কি আমাদের গণতন্ত্রে আইনসিদ্ধ?

লোকটা হাত জোড় করে দু'চোখ বুঁজিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল।

চক্রধারী পানিগ্রাহীর দিকে ফিরে তাকাল—সাহেব এই মাতালটার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। এত মদ খেয়েও আইন আওড়ায়। চলুন আমরা যাই।

পানিগ্রাহী বললেন—তোমাকে থানায় নিয়ে যাব, চল।

লোকটা এতটুকু বিচলিত হল না। বললে—তা'হলে তো বেঁচে যাই। বাইরে যা ঠাণ্ডা। তারপর এই ভারী বোঝাদুটো—বলে আপন মনেই বিড়-বিড় করে বকতে লাগল—মিতেকে বলেছিলুম অতটা খাইও না। যেতে হবে অনেকটা দূরে। তা শালা বায়নার টাকাটা আগাম পেয়ে ফুর্তির চোটে আমাকে আকণ্ঠ ঠেসে দিলে। আর শালার এই পা-দুটো, এমন নেকমহারাম! কিছুতেই কথা শুনবে না। চড়াই-এর পথে এক ইঞ্চিও নড়তে চাইবে না। যেন নবাব-বাচ্চা। তার ওপর এই ভারী বোঝা!

চক্রধারী বললে—সাহেব মিথ্যে দেরী করছেন। চলুন যাই। ও থাক এখানে। ওর কপালে থাকে তো আজ রাতটা টেঁকে যাবে। নৈলে—

পানিগ্রাহী বাইরে কড়া অফিসার হলেও ভিতরে ভিতরে ভারী নরম মনের মানুষ। বেশ বুঝলাম বাঘের মুখে একটা লোককে (তা সে যেই হোক) ফেলে যেতে তাঁর মন একেবারেই রাজী হচ্ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ কর রইলেন। তারপর কঠিন গলায় বললেন—শয়তানটাকে তোল গাড়ীতে টিনদুটো সুদ্ধ। আমার সঙ্গে নিয়ে চল বাংলোয়। দেখি ও কেমন মাতাল। নিজের হাতেই ওকে আজ আমি শিক্ষা দেব।

লোকটাকে আর ওঠাতে হল না। সে দিব্যি তড়বড়িয়ে উঠে গিয়ে বসল জীপের পিছনের সীটে। চক্রধারী তার টিনদুটো ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। জীপ ছেড়ে দিল। লোকটা বসে বসে ঝিমুতে লাগল।

ঝিমোতে ঝিমোতে আপন মনে বিড়-বিড় করে বকতে লাগল।

এক-একবার হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল। কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে চেঁচিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় নিজেকে গালাগাল করে উঠল। ঝাঁপের আওয়াজ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগল—শালা সঙ্কলি; হারামজাদা সঙ্কলি, শুয়োরের বাচ্চা। এই ননাজকমের কটু-বাক্য।

চক্রধারী তাকে সমানে ধমকে যেতে লাগল বার-বার।

ফরেস্ট বাংলোতে গাড়ী পৌঁছতেই পানিগ্রাহী মাতালটাকে মালপত্র সমেত নামাবার হুকুম দিয়ে আমাকে নিয়ে এসে বসালেন বৈঠকখানায়। তারপর হাকলেন—চক্রধারী, মাতালটাকে এখানে হাজির কর।

সঙ্কলি পাত্রকে ধরে নিয়ে এল বাংলোর চৌকিদার, সঙ্গে চক্রধারী। ধর্মভীরু পানিগ্রাহী নিজে তো মদ স্পর্শ করেন না, কারুকে খেতে দেখলেও ভারী বিরক্ত হন। আমার দিকে চেয়ে বললেন—ওকে আমি আজ মজা দেখাচ্ছি। আবগারীর হাতে ছাড়বার আগে আমার দাওয়াই দেব আজ ওকে।

চক্রধারীকে বললেন—গাড়ীটা নিয়ে একবার গাঁয়ে যাও তো। ফরেস্ট অফিসের পাশেই আছে কবিরাজখানা। কবিরাজ অনন্ত শর্মাকে ডেকে আন, আর বোলো পেট ধোয়াবার যন্ত্রটা যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসেন তিনি।

আমার দিকে ফিরে পানিগ্রাহী আবার বললেন—এখানকার ফরেস্ট স্টাফ প্রায়ই মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে পড়ে থাকে দিনের পর দিন। কাজকর্ম কিছুই তখন হয় না তাদের দিয়ে। তাদের জন্যে আমি এই স্টম্যাক পাম্পটা আনিয়ে রেখেছি কবিরাজখানায়।

চক্রধারী তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে চেঁচিয়ে বললেন—যাও; স্টম্যাক পাম্পটা নিয়ে এস।

সঙ্কলি পাত্র আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিল। স্টম্যাক পাম্পের কথাটা কানে যেতেই ঝিমুনি ছুটে গেল। হুড়মুড় করে এসে সে ভেঙে পড়ল পানিগ্রাহীর পায়ের ওপরে। একটু আগেই তার কথাবার্তায় যে বেপরোয়া ভাবটা ছিল সেটা উবে গেল এক নিমেষে। আর্তনাদ করে উঠল—সাহেব, আমাকে গুলী করে মারুন। স্টম্যাক পাম্প দেবেন না!

তার চেঁচানিতে আমরা অবাক হলাম। স্টম্যাক পাম্প দিলে মানুষ এমন কিছু খুন হয়ে যায় না। এরকম বলিদানের পাঁঠার মতো চেঁচানি চেঁচাচ্ছে কেন লোকটা।

লোকটা তখন চেঁচিয়ে বাচ্ছিল—পেট ধরিয়ে ফেললে সাহেব আমি বুক ফেটে মরে যাব। সে যন্ত্রণার হাত থেকে আপনি আমাকে দয়া করে বাঁচান। বরং আমাকে আপনি এক ঘায়ে খতম করে দিন, তা সইবে।

তার চীৎকার শুনে রান্নাঘর থেকে চৌকিদার দৌড়ে এল। হাবভাবে মনে হল, দেয় বুঝি সে কষিয়ে কথা লোকটাকে। সাহেবের সামনে ঐ রকম ফেরাদপি তার সহ্য হচ্ছিল না।

পাণিগ্রাহী কিন্তু কি মনে করে চক্রধারী আর চৌকিদারকে হাতের ইঙ্গিতে বাইরে চলে যেতে বললেন।—দেখলাম সঙ্কলি দুটো হাঁটুর ভিতর মাথাটা রেখে উবু হয়ে বসে আবার ঝিমুনি সুরু করেছে।

পানিগ্রাহী এবার আস্তে আস্তে ডাকলেন—সঙ্কলি!

—আজ্ঞে হুজুর!

—কতো বয়স তোমার?

—আপনি অনুমান করুন।—মাথাটা সুদ্ধ মুখটা তুলে ধরল সঙ্কলি। ভুরু থেকে দুটো চোখ সন্দেহে কুঁচকে আছে।

—পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে বোধহয়।

—তার থেকে বিশটা বছর বাদ দেন সাহেব।

—হ্যাঁ, বল না এই বারো-কি তেরো। কচি খোকা তুমি! খেঁকিয়ে উঠলেন পানিগ্রাহী।—পেটের থেকে মাল না নামলে মাথা তোমার ঠিক হবে না দেখছি।

আপনি ব্রাহ্মণ, আমার বাবার বয়সী। পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি সাহেব। বিশ্বাস না হয় আমার ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটটা—

—ও, ম্যাট্রিক পাশও করেছ?—নরম গলা পানিগ্রাহীর।

হ্যাঁ সাহেব, পাশও করেছি, সরকারি কাজও করতাম এক সময়ে—

—তা তোমার এ-হাল কেন? নিশ্চয় অফিসের ক্যাশ ভেঙেছিলে? তারপর জেল থেকে পালিয়েছ? তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় তুমি জেলপালান ঘুঘু।

সঙ্কলি চুপচাপ বসেছিল। মুখে কোন কথাবার্তাই ছিল না আর। কিন্তু আমি দেখছিলাম পানিগ্রাহীর মুখের ভাবটা ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। সেই কঠোর ঘৃণা ক্রমশ গলে গিয়ে মুখটা নরম হয়ে আসছে। ভুরু দুটো কোঁচকান অবস্থা থেকে ক্রমশঃ সোজা হয়ে আসছে।

ইতিমধ্যে চক্রধারী আর চৌকিদার আমাদের জন্যে গরম চা তৈরী করে এনে সামনে ধরে দিল। তাতে চুমুক দিয়ে পাণিগ্রাহী বললেন—দুধ-ছাড়া এক কাপ কড়া চা এনে দাও তো সঙ্কলিকে।

দু' মিনিটের মধ্যে কড়া চা এসে গেল। সেটা সঙ্কলির সামনে ধরে দিতেই সে তৃষ্ণার্ত গরুর মতো সেই গরম চায়ের গ্লাসটাতে চো-চো করে চুমুক দিতে লাগল।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে পানিগ্রাহী নরম সুরে বললেন—পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নেশা করে ঐ চেহারা করেছ। লিভার পচে, মুখে রক্ত উঠে মরবে যে। আমি তোমার বাবার বয়সী। আমার কথাটা শোন। ঐ পাপ ছেড়ে দাও।

সঙ্কলি চায়ের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে জিভ কেটে বললে—পাপ আমি করিনে। পাপ আমার সয় না।

—কের মিছে কথা। চৌকিদারকে বলব দুটো ঘুষি মেরে মুখখানা থেঁতো করে দিতে? মিছে কথা বললে জিভ কেটে নেব। দারুণ রাগে ফেটে পড়লেন পানিগ্রাহী।

—তা বলতে পারেন, কিন্তু মিছে কথা আমি বলিনে। সঙ্কলি শক্ত করে তার কথায় খুঁট ধরে রইল।

—নাঃ, তুমি স্বয়ং ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! ভেংচে উঠলেন পানিগ্রাহী

—হুজুর মিছে কথা আমি বলিনে। পাপ আমি করিনে। পাপ আমার সয় না। ছেলেবেলায় একবার মিছে কথা বলেছিলাম, পাপ করেছিলাম। মা-বুড়ী আমাকে অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছিল পরের বাড়ী ধান ভেনে। শেষে দু'চোখে ছানি পড়ে যায়। কিছু দেখতে পেত না। একটা বাক্সের ভিতর টাকা জমাত। সুদে খাটাত। যা পেত, দশ টাকার নোট করে জমিয়ে রাখত। জমি কিনবে, বাড়ী করবে। টাকার ওপর বড় মায়া ছিল বুড়ীর।—একবার আমি সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে মার বাকস থেকে টাকা চুরি করি। তারপর ক্যালেণ্ডারের পাতা মাপ করে কেটে ভরে রাখি বাকসের ভিতরে। মা বুড়ী জমি কেনবার জন্যে টাকা দিতে গিয়ে ধ্যাত্তম। জমির মালিক বলে—টাকা কোথায়? এতো সব ক্যালেণ্ডারের কাগজ।

—বুড়ী রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আমাকে চেপে ধরেছিল।—নিশ্চয় এ তোর কাজ।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম—আমি তোর টাকার খবর জানিই না। এ তোর মেয়ে করেছে।

—পরেরদিন সকালে দেখি ইঁদুরমারা সেঁকো বিষ খেয়ে বুড়ী মরে পড়ে আছে।

এবার সঙ্কলির গলা দিয়ে আর্তনাদের মতো একটা আওয়াজ বার হল। রাঙা টকটকে চোখদুটো তার গর্ত থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল। ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তার গলা চিরে কথাগুলো বার হতে লাগল—জানেন সাহেব, আমার সেই মা, যার বুকের দুধ গিলে এই শালা শুয়োরের বাচ্চা সঙ্কলি বড় হয়েছে, যে মা ধান ভেনে ভেনে

ফটো : শ্যামলকুমার দাশ
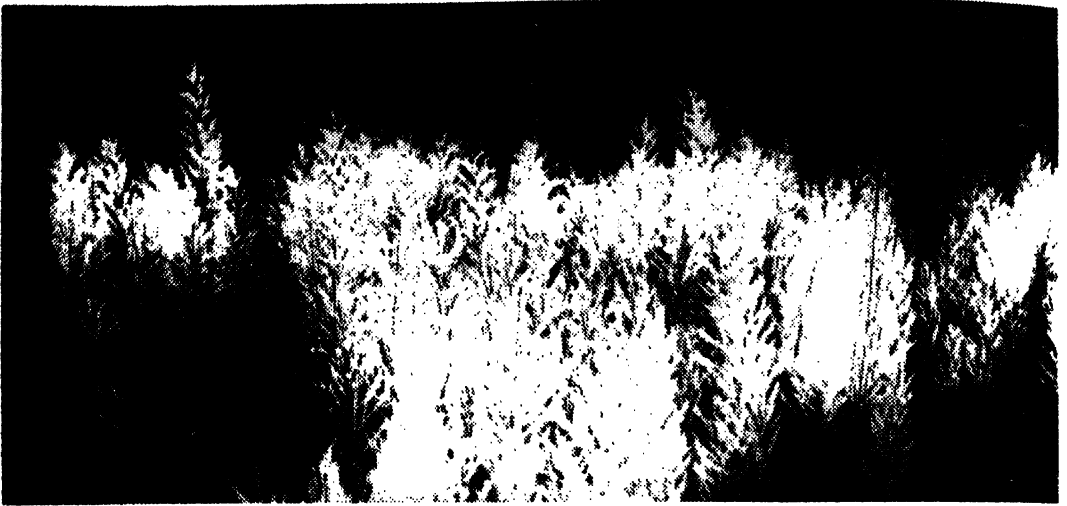
ইস্কুলে পড়িয়েছে. সেই মা—তার সব অপরাধের বোঝা নিয়ে আত্মঘাতী হল।

কিছুক্ষণ সে ঝিম মেরে মাথাটা নীচু করে বসে রইল। তারপর বললে—মনে বড় ধিক্কার এসেছিল। মাকে চিতেয় তুলে দিয়ে দুপায়ে মাথা রেখে বলেছিলাম—মা মিছে কথা আর জীবনে বলব না। পাপ কাজ জীবনে করব না। সেই থেকে সাহেব পাপ আমি কোনদিন করিনি।

—এইসব নিষিদ্ধ এলাকায় মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হওয়া পাপ নয়? বে-আইনী চোলাই মদ চালান দেওয়া পাপ নয়?

সংকলি এবার ফ্যালফ্যাল করে পানিগ্রাহীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একটু ফিকে হাসি হেসে বললে—আইনের কথা যদি বলেন. সাহেব, আমাদের দেশের আইন তো পাপ-পুণ্যির সংগে ঠিকে মিলিয়ে তৈরী হয়নি। এদেশে আইন এক জিনিস আর পাপ-পুণ্যি আর এক জিনিস হুজুর।

—সে আবার কি কথা! সব দেশেই আইন তৈরী হয়েছে অন্যায়কে শাস্তি দিয়ে দাবিয়ে রেখে ন্যায়কে টিকিয়ে রাখবার জন্যে।

আবার মুখ তুলল সংকলি। নেশায় ঢুলু-ঢুলু চোখদুটো টান টান করে মেলে ধরল পানিগ্রাহীর মুখের উপর। সেইভাবে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা প্রশ্ন ছুটে বার হয়ে এল তার মুখ থেকে—এটা আপনি কি কথা বললেন সাহেব? আপনার বাবা-মার কিরে। একবার সত্যি করে বলুন দেখি সাহেব আপনার এই সরকারী চাকরিটা বজায় রাখতে কোনটাকে হাতের পাঁচ করতে হয়েছে? ন্যায়কে না অন্যায়কে? সত্যকে না মিথ্যাকে?

মনে হল পানিগ্রাহী এখুনি হয়তো ওর মুখে একটা জবরদস্ত থাপ্পড় মেরে এই ধৃষ্টতার জবাব দেবে। কিম্বা বন্ধ করে দেবেন ওই মুখের কথাগুলো চৌকিদারের ঘুষি দিয়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য! তিনি সে-সব কিছুই করলেন না। দেখলাম, প্যানিগ্রাহী যেন কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন ফ্যাল-ফ্যাল করে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি সজাগ হলেন। সংগে সংগে ভিন্ন পথ ধরলেন তিনি।—তোমার কথা-বার্তা শুনে বোধ হচ্ছে তুমি বেশ বুদ্ধিমান। এই জঘন্য জীবন ছেড়ে ভদ্র হতে তোমার ইচ্ছে করে না?

—ভদ্র?—সংকলি মুখের ভাবটা এমন করল যেন সে কুইনিন খেয়েছে। পরমুহূর্তেই বললে—নাঃ, আদবে না।

—খুবই আশ্চর্যের কথা। তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, মোটামুটি লেখা-পড়াও শিখেছ, তবু—

—হুজুর তা হলে বলি শুনুন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর চাকরি পেয়েছিলাম। থানার কেরানী। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শীরা হিংসেয় প্রায় ফেটে মরবার যো হয়েছিল। থানার কেরানী, মাইনে যাই হোক উপরি পাওনার সীমা-সংখ্যা নেই। দু'দিনেই তুই বড়লোক হবি সংকলি। কোটাবাড়ি বানাবি। ক্ষেত-খামার করবি। সুন্দরী বৌ আসবে ঘরে।

সংকলি চাকরিতে যেদিন ঢুকল সে রাতেই স্বপ্ন দেখল তার মাকে। মা তার বলছে—তুই ওখানে কাজ করতে গেলি বাছা, ওটা যে পাপের রাজত্বি। ওখানে যে ঘুষের টাকায় দিনকে রাত, রাতকে দিন বানাচ্ছে।

সংকলি বলেছিল—মা তুই কিছু ভাবিসনি। ঘুষ আমার গো-রক্ত। তুই দেখিস—

অনেক কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে বোনটার বিয়ে দিয়ে দিল সংকলি। পাত্র জোগাড় করে দিল থানার বড়বাবু। মাস চারেক শ্বশুরঘর করার পর সেই বোন ফিরে এল আবার সংকলির কাছে। জামাইটার বাতের ব্যামো। তার ঘর সে করবে না।

সব শুনে দারোগাবাবু বললেন—কি আর করবে বল, সবই বরাত। নেলে অত জমি-জমা—। তা তুমি এক কাজ কর সংকলি। আমার বৌটা তো চিররুগ্ন। তোমার বোন যদি আমার সংসার দেখা-শোনা করে, ছেলেপিলেগুলোকে সামলায়, তারও মন-মেজাজ ভাল থাকে, আমারও সাশ্রয় হয়।

সংকলি ভাবল ভালই হল। ঘরে বসে বসে কেবল কোঁদল করে। তার চেয়ে দারোগাবাবুর ছেলেমেয়েগুলোকে নাড়া-চাড়া করুক, থাকবে ভাল।

সে রাজী হয়ে গেল।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ সংকলি পাত্রের মুখের ভাবটা পাল্টে গেল। চোখ-দুটো বুনো হয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল সে—শালা সংকলি, তুই ভেবেছিলি, তুই ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে সরকারি কাজ চালাবি। শালা বন্ধুলে, ভেবেছিলে চালাকি করে ঘুষ খাওয়া এড়াবি। ওরে গাধা, তাই কি হয় কখনো? তুই ব্যাটা এক নম্বরের পাঁঠা। তুই গেলি পদ্মপাতার ঝাঁকায় ছাতার আড়াল দিয়ে আটকাতে।

এ হাতে পয়সা গুঁজে দেয়, ও ওদিক থেকে বাড়ী বয়ে আনে জিনিসপত্তর, ভেট।

সংকলি নানান ছলে-ছুতোয় এড়িয়ে যায়। অফিসের বড়বাবুর নজর এড়াল না। একদিন ডেকে মিষ্টি মিষ্টি করে বললেন—ওহে সংকলি, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই, হে। পস্তাবে। কি করে আদায় করতে হয় শেখো।

কিন্তু সংকলির চাল বেগড়ায় না। ঘুষ সে কিছুতেই নেবে না।

আরও কয়েকটা মাস যেতেই বড়বাবু নিজ মূর্তি ধরলেন। তুমি তো বড় ভয়ানক ছোকরা হে! আমাদের এখানকার এতদিনের উপরি পাওনার রেওয়াজ উঠিয়ে দিতে চাও। ফল ভাল হবে না কিন্তু।

প্রতি কাজে খুঁত ধরতে লাগলেন বড়বাবু।

দারোগাবাবুর বাড়ী থেকে রোজ বাজারের ফর্দ আসত। কিন্তু তার সংগে আসত না কোন পয়সাকড়ি। বড়বাবু আগে নিজেই সব ব্যবস্থা করতেন। এবার সংকলির হাতে ফর্দটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন—যাও বাজার করে নিয়ে এসো।

সংকলি বললেন—পয়সা ?

বড়বাবু তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন—দারোগাবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সংকলি দারোগাবাবুর কাছে। বললে—বাজারের ফর্দ পাঠিয়েছেন, টাকা তো দেননি।

দারোগা গম্ভীর মুখে সংকলির হাত থেকে ফর্দটা নিয়ে বলেছিলেন—অপদার্থ! তোমাকে দিয়ে আমার অফিসের কাজ চলবে না!

পনেরো দিনের মধ্যেই সংকলির চার্জ-সীট এল! টেম্পোরারি চাকরির এখানেই খতম।

চাকরি খুইয়ে বোনের হাত ধরে সে বাড়ীতে ফিরে এল। এসে শুনল বোনটা ছ' মাস অন্তঃসত্ত্বা।

মাথাটা খারাপ হয়ে গেল সংকলির। বোনকে কাটতে গেল একটা ধারাল দা দিয়ে। বল কে করেছে এ-কাজ।

ভয়ে ভয়ে বোন সব কথা কবুল করল। আসামী দারোগাবাবু।

রুখে উঠে সে গেল মোকাবিলা করতে দারোগাবাবুর সংগে। ফল হল—পিঠের জামাটা সরাতে সরাতে সংকলি বললে—দুজন কনস্টেবল জুতো দিয়ে পিটিয়ে আমার পিঠের এক পর্দা ছাল তুলে নিয়েছিল দারোগার হুকুমে। বলেছিল—শালা, তোর বোনটা বাজারের বেশ্যা। তাকে আমার বাড়িতে তুলে দিয়ে আমার বদনাম?

বোনটা সত্যি সত্যি হুজুর বাজারের বেশ্যা হয়ে গেল। আশপাশের লোকেদের কু-দৃষ্টি আর কু-কথার চোটে সে বালাশিরের বাজারে গিয়ে নাম লেখালে।

আবার সংকলির মুখ-চোখের ভাবটা পাল্টে গেল। আবার সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল চোখ পাকিয়ে ভুরু কুঁচকে!—খুব তো লম্ফঝম্প করলি মনে মনে। পারলি রে শালা তুই নিজের হাতে খুন করতে দারোগাটাকে? নিজের বোনের ইজ্জত খোয়া যেতে দেখলে বুকে আগুন জ্বলে না কার? তুই শালা কেঁচো, পারলি কি তার শোধ নিতে। আসল কাজের বেলায় তো পালিয়ে এলি ল্যাজ গুটিয়ে। শালা, তুই কি মানুষ রে? তুই একটা আরশোলার অধম। নেংটি ইঁদুরের বাচ্চা। কি লজ্জা ছিঃ ছিঃ। শেষে কিছু করতে না পেরে আকণ্ঠ মদ গিলে মরলি।

সংকলি হাঁপাচ্ছিল। তর মুখের দু-পাশে সাদা সাদা ফেনা জমে উঠেছিল। লাল চোখদুটো অস্বাভাবিক বড় হয়ে ঠেলে বার হয়ে আসছিল। একটু থেমে সে বললে—একটা বিড়ি দেবেন সাহেব?

বোধহয় তার ভিতরের দম ফুরিয়ে এসেছিল। প্রয়োজন হয়েছিল কিছু একটা দিয়ে স্নায়ুকে চাংগা করে তোলা।

পানিগ্রাহী বিড়ি সিগারেট খান না। আমি আমার প্যাকেট থেকে একটা চারমিনার বার করে ধরিয়ে দিলাম সংকলিকে। সে তাতে চোঁ করে একটা প্রকাণ্ড দম দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল অনেকক্ষণ ধরে। ধোঁয়াটা তার সামনে কুণ্ডলী পাকাতে লাগল। আর সে তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল গুম হয়ে।

পানিগ্রাহী নিস্তব্ধতা ভাঙলেন।—মদ গেলাটা কি তখন থেকেই রপ্ত হল?

—না সাহেব বিষকে হজম করতে সময় লাগে। তবে মনের জ্বলুনি যে কি যে হয় তার কাছে ও মদ ভাঙ আফিং ওসব কিছুই কিছু নয়। তবে মাতাল হলে কিছুটা সে জ্বলুনির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বুকটা যখন হু-হু করে জ্বলে তখন ঢোকে ঢোকে মদ খেয়ে সে জ্বলুনি থামাতে হয়। মদ না খেলে সাহেব আমার চলে না। আমি দুদণ্ড মদ না খেলে শুকনো কাঠের মতো ফেটে মরব।

—বাড়ী ঘর জমি-জমা যা ছিল সব বেচে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলাম। তারপর রুজি-রোজগারের ধান্ধায় আজ এটা কাল সেটা। কোথায় কটকের ধানকলে চাকরি, কোথায় ঢেংকানলের জংগলে কাঠের ব্যবসা। কালাহাণ্ডিতে হরিণের শিঙের কারবার। দু' বছরে দশ-বারোটা কাজ নিলাম ছাড়লাম। ছাড়লাম মানে ছাড়তে বাধ্য হলাম। উড়িষ্যার সম্বলপুর থেকে পুরী, ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ চষে ফেললাম।

বলতে বলতে আবার সংকলির মুখের ভাব বদলে গেল। মুখচোখ পাকিয়ে দম করে বুকে একটা ঘুষি মেরে বললে—সু-শালা ঃ বোকা বাঁদর! তোর জন্যে সবাই ব্যবসা-বাণিজ্যের রাস্তা জড়া কাঁটা দিয়ে গংগাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে রেখেছে, না? মিথ্যে কথা বলতে পারবে না, ব্যবসা করবে? লোক ঠকাতে পারবে না কারবার করবে? হারামজাদা তুমি ন্যাকা? কিছু তুমি জান না?

তারপর দারুণ রাগে গর্জন করে উঠল সে—মিথ্যে আর জাল-জোচ্চুরি ছাড়া কোন পথটা তোর খোলা আছে বাঁচবার? ভাগ শলা সত্যপীরের বাচ্চা, অপদার্থ নচ্ছার! গলায় দড়ি দিয়ে মর।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে লাগল—কি কুক্ষণেই যে তোর পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছিলাম রে হতভাগীর বেটী। মা হয়ে আমাকে এমন ফাঁসিয়ে গেলি যে জীবনে আমি আর কিছু করতে পারলাম না। তখন কি আমি এতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে এ-শালার দুনিয়ায় ভালর কোন জায়গা নেই। যেগুলো বোকা বন্ধুলে, যাদের বুকের পাটা নেই, নেই ঝুটে এতটুকু বুদ্ধি তারাই থাকে শুধু ভাল হয়ে। লোকে ভাল হয় খারাপ হবার সুযোগ আর সাহস পায় না বলে। দূরে দূরে, এ শালার দুনিয়ায় ধিক্‌কার!

সংকলির ঘেন্না এসে গেল সারা দুনিয়ার ওপর। শহর, লোকালয় ছেড়ে সে চলে গেল পার্লাকিমিডির একটা জংগলে জায়গায়। সেখানে জংগলে আছে বাঘ, ভালুক বুনো মহিষ। আর তার মাঝে মাঝে আছে বুনোদের বস্তি। আছে কোল, মুণ্ডা হো, খাড়িয়া।

এদিকে মনে যতই আগুন জ্বলুক, শরীর বাগ মানে না। সংকলি জুড়ে পড়ল একটা মুণ্ডা মেয়ের সংগে। মেয়েটা সংকলির সংগে সংগে ঘোরে যেন ছায়ার মতো। ক্ষেতে চাষ করে সংকলির সংগে, ঘর ছায়, বন সাফ করে। ঘরকন্নার কাজ দেখাশুনা করে।

মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা হতেই সংকলি তাকে বিয়ে করে ফেললে। সেই সংগে বেশ খানিকটা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে সে শুরু করল বড় করে চাষের কাজ। পাথুরে জমি সাফ করে চাষের উপযুক্ত জমি তৈরী করা বড় সহজ কথা নয়। সংকলিরা স্বামী-স্ত্রীতে হাড়ভাংগা খাটুনি খেটে বেশ খানিকটা জমি তৈরী করে ফেললে। ফসল ফলল তাতে। ক্রমশঃ একটা একটা করে চার সন্তান হল অদের। সংকলি এতদিন পরে মনের মতো ঘর খুঁজে পেল।

—বেশ কটা বছর ছিলাম সাহেব।—জ্বলজ্বলে মুখে বললে সংকলি।

পরের চাকরি ঝকমারি, তা সে সরকারি হোক আর বেসরকারি হোক। স্বাধীন কাজ করে খাব, ছেলেপিলে মানুষ করব। কারুর কোন তোয়াক্কা করব না। গরীব ছিলুম বটে, কিন্তু মাথা উঁচু করে থাকতে পারতাম। আর বুনোদের সংগে থাকার একটা সুবিধে হল, ওদের পাপ-পুণ্যির ধারণাগুলো আপনাদের মতো

ভাবিত্য নয়। আমার সঙ্গে ওদের বনিবনা হবে না।

সিগারেটে গোটাকতক লম্বা লম্বা টান দিয়ে সেটা পাশের মেঝেতে রগড়ে নিভিয়ে রেখে সংকলি এবার একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দু'চোখ বুজিয়ে মাথার চুলগুলো মুঠো করে পাকিয়ে ধরে বললে—এরপর এল সেই সর্বনাশা খরা।

ওঃ, সে যে কি খরা! সাহেব আমার জন্মে অমন খরা দেখিনি। তল্লাট জুড়ে গাছপালা মায় ঘাসের সবুজটুকু শুকিয়ে হলদে হয়ে যায় দেখেছেন কি? দেখেছেন কি তাজা গাছের গুঁড়িগুলো শুকিয়ে ফট-ফট করে ফেটে যায়? মানুষ, গরু-ছাগল হাঁস-মুরগী সব শুকিয়ে চিমড়ে হ'য়ে যায় দেখেছেন কি? দু'বছরের মধ্যে একফোঁটা বৃষ্টি নেই। নদীনালা খালবিল, সব শুকিয়ে কাঠ, মাটি ফেটে চৌচির। কোথাও এতটুকু জল নেই রস নেই। সে বড় ভয়ানক অবস্থা সাহেব, চোখ মেলে দেখা যায় না। বৃষ্টি একেবারে জলেপুড়ে থাক।

পাঁচখানা গাঁয়ের ভিতর একটা পুকুর কি একটা টিউবওয়েল নেই। তেষ্টার জলের জন্যে গাঁয়ে গাঁয়ে হাহাকার। পাঁচ মাইল দূরে একটি মাত্র টিউবওয়েল। সেখানে ভীড় লাগল পিঁপড়ের সারের মতো।

একদিন দুপুরে সংকলির ছোট ছেলেটা তেষ্টায় কাতরাতে লাগল। তার মা গিয়েছিল জল আনতে। আসতে দেরী হচ্ছিল। দেড় বছরের ছেলেটার কাতরানি শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল ছটফটানিতে। অসহায়ের মতো সংকলি দেখতে লাগল সেই ছটফটানি কি রকম আস্তে আস্তে কমে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত লটকে পড়ল বাচ্চাটা সংকলির কোলে। তারপরে আর নড়ন-চড়ন নেই তার। বুকের ধুকধুকিটুকু বন্ধ হয়ে গেছে।

ঘন্টাচারেক পরে তার মা ফিরে আসতে সংকলি মরা ছেলেটার শরীরটা তার কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে বার হয়ে পড়েছিল রাস্তায়। আদিবাসী মেয়েটা বুক চাপড়ে হাহাকার করেছিল। কিন্তু তার চোখে ছিল না একফোঁটা জল। সমস্ত শরীর শুকিয়ে কাঠ, জল পড়বে কোথা থেকে?

চারদিকে লোক মরে উড়-কুড় হয়ে গেল। জল নেই, খাবার নেই। খবর পেয়ে দেশহিতৈষীরা এসে জুটলেন। কাগজে কাগজে হৈ-হৈ উঠল। সরকারের তরফ থেকে জেলা হাকিম এলেন খোঁজ-খবর নিতে। হাকিম তহশীলদারকে জিজ্ঞাসা করলেন— পুকুর কাটান খাতে দেখছি বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচা হয়েছে। পুকুর কোথায়?

তহশীলদার একটা নীচু জমি দেখিয়ে বললেন—এই যে স্যর।

হাকিম সন্দেহের সুরে জিজ্ঞসা করলেন —এটা তো মাঠ। এ-কি পুকুর?

তহশীলদার একগাল হেসে বিনয়ের সঙ্গে বললে—হ্যাঁ, স্যার। এটাই পুকুর ছিল। খরাতে সব জল শুকিয়ে গেছে। এই যে এই দেখুন—

বলে একটা ম্যাপ খুলে ধরে দিলে হাকিমের সামনে।

সংকলি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে। ছেলেটা মরে যাওয়াতে তার বুকের ভিতর তখনও আগুন জ্বলছিল। চেঁচিয়ে উঠল সে পাগলের মতো।—শালা এক নম্বরের চোর। পুকুর এখানে ওর বাবার জন্মেও ছিল না।

তহশীলদার চোখ রাঙিয়ে ধমকে উঠল—'চোপ রও মিথ্যেবাদী।

তহশীলদারের চাপরাশী ঘুসি উঁচিয়ে গেল তাকে মারতে। হাকিমসাহেব থামিয়ে দিলেন।

সংকলি কিন্তু রেহাই পেল না। সাত-দিনের মধ্যেই পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে একটা মিথ্যে খুনের মামলায় তাকে আসামী করে বেঁধে নিয়ে গেল। যাবার সময় সংকলি স্বচক্ষে দেখে গেল বাড়ীতে একদানা খাবার নেই।

বিচারে অবশ্য খালাস পেয়েছিল সংকলি। দশটা দিন মিথ্যে হাজতবাস করে ফিরে এল সে। এসে দেখল ঘরবাড়ী সব খালি। ফাঁকা ঘরগুলো হাঁ করে যেন গিলতে আসছে তাকে।

বৌটা গেল কোথায় ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে। এ-বাড়ী ও-বাড়ী খোঁজ নেয় সংকলি। কিন্তু সারা গাঁটাই তো তখন শ্মশান। কে কার খোঁজ রাখে?

পাগলের মতো খুঁজে খুঁজে হয়রান সংকলি। একবার ভাবল হয়তো বৌটা চলে গেছে তার বাপের কাছে। সেখানে খোঁজ নেবে কিনা ভাবছে ঘরের দাবায় বসে! একটা বীভৎস পচা দুর্গন্ধ এসে ঢুকল নাকে এক ঝলক বাতাসের সঙ্গে। মানুষ পচা গন্ধ!

সংকলি এদিক-ওদিক শুঁকে দেখ[illegible] গন্ধটা আসছে কুয়োর দিক থেকে। বলতে বলতে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল সংকলি।

সাহেব, সেই শুকনো কুয়োর ভিতর আমার বৌ, দুটো ব্যাটা একটা বেটী—ও হো হো হো—

দম-দম করে বুকটা চাপড়াতে লাগ[illegible] সংকলি।—ওরে হারামজাদা; শুয়োরের বাচ্চা! ওরে গাধা, এতো দেখে শুনে তোর এতটুকু হুঁস হয়নি? তুই গে[illegible] সরকারের লোকের সঙ্গে লাগতে? এখ[illegible] ঐ কুয়োর গর্ত নিজের হাতে মাটি [illegible] বুজো। পাথুরে জমি ভেজা তোর চোখে[illegible] জলে। ওরে শালা, কে তোর কান্নার [illegible] ধারে? তোর পাপ-পুণ্যির হিসেবে[illegible] তোয়াক্কা করে কে?

সংকলির সমস্ত শক্তিটা [illegible] নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সে চুপ করে [illegible] অনেকক্ষণ। সমস্ত ঘরটায় একটা [illegible] থমথমে আবহাওয়া চেপে বসেছিল।

সে মুখ খুলল বেশ অনেক [illegible] বিড়বিড় করে বলতে লাগল—[illegible] আমেরিকা থেকে খাবার এল জল [illegible] তুই বেলজ্জে বেহায়ার মতো [illegible] বেঁচে রইলি—

পানিগ্রাহী বললেন—হাঁ, ওরা [illegible] সময়ে প্রচুর সাহায্য করেছিল। স[illegible] হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল আবার। চোখ [illegible] বললে—শেয়াল কুকুরের জাত [illegible] আমরা কি মানুষ! বেনো জল এল [illegible] গেল। তাতে কি দেশের খরা গেল?

হঠাৎ আমাদের দিকে চোখ তুলে সেই অদ্ভুত হাসিটা হাসতে হাসতে ধীরে ধীরে বলতে লাগল—সাহেব, খরা তো বাইরের নয়, এ খরা হল আমাদের মনের খরা। লোকের মনে এতটুকু দয়া নেই, ভালবাসা নেই, মমতা নেই। শুধু দুপুরের [illegible] মতো সব শুষে খাবার ইচ্ছে। ছিষ্টি যে নাশ হয়ে যায় গ্রাহ্যি নেই।

বলতে বলতে সংকলি কাতরে উঠল— সাহেব দয়া করে আমার টিনের একটা আমাকে দিতে হুকুম করুন। যন্ত্রণাটা বড় বেড়ে উঠেছে বুকের ভিতরে। ওটা না পেলে আমি নির্ঘাৎ মরে যাব—

পানিগ্রাহী একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। নীচু গলায় বললেন— চক্রধারী ওর টিনদুটো ওকে দিয়ে দাও।

## প্রযুক্তিবিদ্যার জগতে

সমৃদ্ধ অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে টেকনোলজি বা প্রযুক্তিবিদ্যা। দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলেও এই ভিত্তিটি বজায় থাকা চাই। অতএব যে-কোনো দেশের অর্থনীতিতে ইঞ্জিনিয়ার ও তার সহযোগী বিজ্ঞানীর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

ইঞ্জিনিয়ারিং পুরোপুরি একালের ব্যাপার নয়। কোনো না কোনো আকারে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চর্চা বহুকাল ধরে চলে আসছে। আগুনের ব্যবহার, কৃষি, মাটির পাত্র নির্মাণ ও চাকা যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদের নাম আমরা জানি না, কিন্তু তাঁরা হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক। আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা যে এতখানি উন্নত তার মূলে তাঁদের অবদান সর্বাধিক।

যুগে যুগে মানুষ বহু বৃহৎ নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন করেছে। সবের পিছনেই রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্‌নিক বা কৃৎকৌশল। খ্রীস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে নির্মিত হয়েছিল পিরামিড। সেই নির্মাণ-কার্যে যদিও বিজ্ঞানের চেয়ে মানুষের শ্রমের প্রয়োজন ছিল বেশি, তা সত্ত্বেও নির্মাণকার্যগত সমস্যা নিয়েও স্রষ্টারা নিশ্চয়ই মাথা ঘামিয়েছিলেন। এতগুলো মানুষকে দিয়ে কিভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করানো যায়, সেটাই তো ছিল বড়ো রকমের একটা সমস্যা। অতীতের বহু অট্টালিকা, বহু খাল ও পুল, বহু পয়ঃপ্রণালী দেখে বোঝা যায় সেগুলো নির্মাণ করতে নির্মাণ-কারীদের কম সামর্থ্য ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়নি।

প্রাচীনকালে কৃৎকৌশলগত উন্নতির গতি ছিল ধীর, যদিও বহু বিজ্ঞানের ভিত্তি সেই সময়েই। কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যাক। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আলোচনা তুলেছিলেন পিথাগোরাস (খ্রীস্টপূর্ব ৫২৮-৫০০), জ্যামিতি নিয়ে ইউক্লিড (খ্রীস্টপূর্ব ৩০০), মেকানিক্‌স ও হাইড্রো-স্ট্যাটিক্‌স নিয়ে আর্কিমিডিস (খ্রীস্টপূর্ব ২৮৭-২১২), চিকিৎসা বিদ্যা নিয়ে হিপোক্রাটিস (খ্রীস্টপূর্ব ৪৬০-৩৭৭) ও গালেন (খ্রীস্টপূর্ব ২০০-১৩০)।

গ্রীক বিজ্ঞানের যুগ শেষ হয়ে যাবার পরে রেনেশাঁস পর্যন্ত সৃজনমূলক চিন্তার স্রোত প্রায় রুদ্ধ ছিল। তারপরেই অনেকগুলো বিখ্যাত নাম। যেমন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, একাধারে শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ারিং উদ্ভাবক, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চর্চাতেও সমান উৎসাহী। তাঁর নোট বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো বহু ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং ও বিবরণে ভরা। তাঁকে বলা চলে মেকানিকাল বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চর্চা করে গিয়েছেন এমন বিখ্যাত ব্যক্তির সংখ্যা তৎকালে অনেক। মিকেল্যাঞ্জেলকেও নিশ্চয়ই কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেকানিকাল বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

ব্যাপক উৎপাদনের শুরুও এই সময়ে, মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন হবার সময় থেকে।

১৭৬০ সাল নাগাদ ইংলন্ডে শুরু হয় শিল্প বিপ্লব। চলে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত। এই শিল্প বিপ্লবের, সময়েই শিল্প বলতে আজকাল আমরা যা বুঝি তার কাঠামোটি স্থাপিত। এই সময় থেকেই যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাপক হারে উৎপাদন শুরু। এই সময় থেকেই ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থার পত্তন—শুধু পরিবহণগত নয়, চিন্তারও।

শুরু বস্ত্রশিল্প। ১৭৩৩ সালে কে আবিষ্কার করেছিলেন সঞ্চরণশীল মাকু। ১৭৬৪ সালে জেম্‌স হারগ্রীভ্‌স নামে এক অশিক্ষিত ছুতোর আবিষ্কার করেছিলেন ঘুরন্ত সুতো পাকাবার কল। এই দুটি আবিষ্কার ও পরবর্তীকালে আর্করাইট ও কম্পটনের আবিষ্কারের ফলে গৃহপালিত হস্তশিল্পের অবসান ঘটে ও কারখানা-ব্যবস্থার পত্তন হয়।

শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন। উদ্ভব হয় ট্রেড ইউনিয়নবাদের, সংস্কারসাধন হয় আইনের, অবসান ঘটে দাস ব্যবস্থার, রূপায়ণ হয় রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন বহু মানবিক সংস্কারের। সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের রূপটিও প্রকট হয়ে পড়ে যা সৃষ্টি করে অভূতপূর্ব এক সমাজ-সচেতনতা।

তারপর থেকেই প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত বিকাশ ঘটেছে, বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রে, আর তার আনুষঙ্গিক ফল হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে বহু প্রকারের বৃত্তি ও পেশা। আজকের দিনে বিশ্বের সকল উন্নত দেশে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে প্রধান স্থান অধিকার করে আছে প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অবশ্যই বিজ্ঞান।

আজকের মানুষ রকেটবাহিত হয়ে চাঁদে যাচ্ছে। সেই রকেটটিও আবার দূর-নিয়ন্ত্রিত, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গতিবেগও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে নির্ধারিত। অগ্রসর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত এ-ঘটনা। এমনি দৃষ্টান্ত আরো অনেক। রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর জানছে, সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে পরমাণুর ভিতরকার খবর—সবকিছুই নিখুঁত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও নির্মাণকার্যের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানকালের জীবনের প্রতিটি দিক সোপায়ত্ত হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে।

বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশেই ইঞ্জিনিয়ারদের সংগঠন আছে। ইঞ্জিনিয়ারদের শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর সমস্যা, যন্ত্রের উন্নতিসাধনের সমস্যা, কর্মস্থানের পরিবেশগত উন্নয়নের সমস্যা ইত্যাদি নিয়েই সংগঠনের মধ্যে ইঞ্জিনিয়াররা প্রধানত আলোচনা করে থাকেন। দেশের পরিচালনার ভার যাঁদের হাতে তাঁরা ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ গুরুত্বের সংগে শুনে থাকেন।

ইঞ্জিনিয়াররা হচ্ছেন মাথার মণির মতো।

**আরো পেঁয়াজ খান**

একদল সোভিয়েত বিজ্ঞানী গত দশ বছর ধরে মানুষের শরীরের ওপরে পেঁয়াজের ক্রিয়া নিয়ে গবেষণার পরে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পেঁয়াজে এমন সব প্রয়োজনীয় পদার্থ আছে—যেমন ভিটামিন সি, ভিটামিন বি-২, ক্যারোটিন ইত্যাদি—যা বহু প্রকারের জীবাণু ধ্বংস করতে পারে।

গবেষণাটি চলেছে খারকভে। গবেষণার ফলে পেঁয়াজ থেকে কয়েকটি নতুন ভেষজও তৈরি হয়েছে। এমনি একটি ভেষজের নাম আলিলসেপাম। এই ভেষজটি পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়ক ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার উন্নতিসাধক। পাকস্থলীর ও অন্ত্রের বহু প্রকারের রোগে পেঁয়াজ থেকে প্রস্তুত ভেষজ ব্যবহার করে খারকভের বিজ্ঞানীরা সুফল পেয়েছেন।

একই সংগে শুকনো পেঁয়াজ নিয়েও গবেষণা চালানো হয়েছে। পরীক্ষাকার্যে একদল খরগোশের শরীরে কৃত্রিম রোগ সৃষ্টি করা হয়। তারপরে প্রয়োগ করা হয় শুকনো পেঁয়াজ থেকে প্রস্তুত ভেষজ। দেখা যায়, খরগোশের শরীরে রক্তের কোলেস্টেরিন স্তর অনেক নিচে নেমে গিয়েছে।

টাটকা পেঁয়াজের রস নিয়েও এই বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষাকার্য চালিয়েছেন। ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বহুপ্রকারের রোগে পেঁয়াজের রস যে নিরাময়ের সহায়ক তার প্রমাণ তাঁরা পেয়েছেন। এমনকি ডিপথিরিয়া ও যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতাও পেঁয়াজের রসের আছে।

খারকভের এই বিজ্ঞানীরা দশ বছর গবেষণা চালাবার পরে জোরের সংগে ঘোষণা করেছেন : আরো বেশি পেঁয়াজ খান! কি ছোট কি বড়ো, পেঁয়াজ সকলের পক্ষেই উপকারী। পেঁয়াজ বহুপ্রকারের রোগের আক্রমণ ঠেকাতে পারে। যাঁরা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন, যাঁদের অন্ত্রের নিঃসরণগত ক্রিয়ার গোলমাল আছে, খারকভের বিজ্ঞানীরা তাঁদের আরো বেশি করে পেঁয়াজ খেতে বলছেন। তাতে উপকার ছাড়া অপকার হবে না।

খাদ্যবস্তু হিসেবে পেঁয়াজ এমনকি আমাদের দেশেও অপেক্ষাকৃত সস্তা। পেঁয়াজ মজুদ করে রাখাও অপেক্ষাকৃত সহজ। বহুকাল মজুদ থাকলেও পেঁয়াজের গুণ নষ্ট হয় না। খাদ্যবস্তু হিসেবে পেঁয়াজের ওপরে অনায়াসেই আরো বেশি নির্ভর করা যেতে পারে।

যদি কাঁচা পেঁয়াজ খেতে কেউ নারাজ থাকেন তাঁকে জানাই—আস্ত একটি করে কাঁচা পেঁয়াজ রোজ যদি চিবিয়ে খেতে পারেন তাহলে আপনার দাঁত নিরোগ থাকবে। বিখ্যাত একজন দন্ত-চিকিৎসক একথাটি বলেছেন।

**মানুষের শরীর জীবাণুর আক্রমণ ঠেকায় কি করে?**

ইংরেজ বিজ্ঞানী ডঃ জন বুলেন এ-বিষয়ে একটি নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। তত্ত্বটি এখনো সাধারণভাবে গৃহীত নয় তবে তত্ত্বের সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্ট। যদি এই তত্ত্বটি শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয় তাহলে চিকিৎসা-সংক্রান্ত গবেষণায় বড়ো রকমের ধাক্কা পৌঁছবে।

মোটা কথায় তত্ত্বটি এই : মানুষের শরীর জীবাণুর আক্রমণ ঠেকিয়ে থাকে জীবাণুরা যাতে লোহের যোগান না পায় তার ব্যবস্থা করে। শরীরের ভিতরে জীবাণুর বাড়বৃদ্ধির জন্যে যে মৌলিক পদার্থটি অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন তা হচ্ছে লোহ। এই লোহ থেকে যদি জীবাণুকে উপোস করিয়ে রাখা যায় তবে জীবাণুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

শরীরের ভিতরের জীবাণুগুলো লোহের যোগান পায় কোথা থেকে? একটি প্রোটিন থেকে, যার নাম ট্রানসফেরিন। এই প্রোটিনটিকে বলা চলে রক্তের মধ্যে লোহের বাহন। অর্থাৎ রক্তের মধ্যে লোহ আসছে ট্রানসফেরিনের মাধ্যমে। যদিও লোহের সংগে ট্রানসফেরিনের বন্ধন রাসায়নিক কিন্তু জীবাণুর এমন একটা বিশেষ আয়োজন আছে যে, এই রাসায়নিক বন্ধন শিথিল করে লোহ আত্মসাৎ করতে পারে। এই লোহের যোগান বজায় থাকলেই জীবাণুর বাড়বৃদ্ধি। ডঃ বুলেন বিশ্বাস করেন, মানুষের শরীরে রোগের আক্রমণ ঠেকাবার যে ব্যবস্থা আছে তা সক্রিয় হলে জীবাণুর বাড়বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য লোহের যোগান বন্ধ হয়ে যায়।

রোগের আক্রমণ ঠেকাবার ব্যবস্থার যা প্রতিষেধক ব্যবস্থার প্রধান ভূমিকা দুটি পদার্থের : অ্যান্টিবডি ও কমপ্লিমেন্ট। অ্যান্টিবডি হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক যৌগ, রক্তের শ্বেতকণিকার দ্বারা সৃষ্ট। শরীরের মধ্যে যখনই বাইরে থেকে কোন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় অ্যান্টিবডি। শেষোক্ত পদার্থটি এখনো পর্যন্ত কিছুটা রহস্যজনক একটি রাসায়নিক যৌগ, রক্তের মধ্যে যা পাওয়া যায়।

শরীরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবার পরে বাইরের পদার্থ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে অন্তত তিনটি উপায়ে। অ্যান্টিবডি ও কমপ্লিমেন্ট একযোগে এমন একটি ব্যবস্থা করে যাতে জীবাণুর মধ্যে লোহ আত্মসাৎ করার বিশেষ আয়োজন কার্যকর না হয়। কিম্বা এমন একটা ব্যবস্থা করে যাতে লোহ আত্মসাতে বাধা সৃষ্টি হয়। তার মানে, জীবাণুর মধ্যে যে আয়োজনটি থাকার জন্যে ট্রানসফেরিন থেকে লোহ বেরিয়ে আসে তা যাতে জীবাণুর সংগে যুক্ত হতে না পারে, কোন-না-কোন ভাবে তারই একটি ব্যবস্থা।

এই তত্ত্বের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব নেই। একটি বেশ জোরাল সাক্ষ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। মনে করা যাক, একটি জীবদেহে কোন একটি জীবাণুর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিষেধ খাড়া আছে। অর্থাৎ এই জীবাণুর আক্রমণে এই জীবদেহ কখনোই কাবু হয় না। ধরা যাক এই বিশেষ জীবদেহে এই বিশেষ জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ধরা যাক জীবাণু তখনো শরীরের মধ্যে জীবিত। এমনি অবস্থায় যদি শরীরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লোহঘটিত যৌগ সরবরাহ করা যায় তাহলে দেখা যাবে শরীরের প্রতিষেধ ভেঙে পড়েছে ও জীবাণুর বাড়-বৃদ্ধি ঘটছে। কেন এমন হয়? প্রচুর পরিমাণে লোহঘটিত যৌগ সরবরাহ করার ফলে রক্তে লোহের যোগান বেড়েছে এবং জীবাণুগুলো সরাসরি লোহ টেনে নিতে পারছে। প্রতিষেধ-ব্যবস্থার আর কোন কার্যকারিতা তার ফলে থাকছে না। কেননা প্রতিষেধ-ব্যবস্থার ফলে মূল যোগান থেকে লোহ টেনে নেওয়া সম্ভব না হলেও বাড়তি যোগান থেকে অনায়াসেই সম্ভব হচ্ছে। কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই : প্রতিষেধ গড়ে ওঠা শরীরেও যদি প্রচুর পরিমাণ লোহ সরবরাহ করা যায় তাহলে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবডি থাকা সত্ত্বেও জীবাণুর বাড়-বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

এই তত্ত্ব এখনো পর্যন্ত সমর্থিত নয়। সমর্থিত হলেও এই মুহূর্তে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাবে তাও নয়। তবে এই তত্ত্বটি যদি সঠিক হয় তাহলে দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তন আনতে পারে। তখন চেষ্টা থাকবে শরীরের নিজস্ব প্রতিষেধ-ব্যবস্থাটিকে আরো শক্তিশালী করে তোলার।

—অমলকান্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—আপনার শরীর কি ভাল নেই?

শোভনের আচমকা প্রশ্নে চমকে উঠল মীরা। ওকে এতক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। উঃ কী ধারালো চোখ! চোখাচোখি হবার ভয়ে সে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। জবাব দেবার ইচ্ছা ছিল না! কিন্তু ওরা কী ভাববে। কোনরকম সন্দেহ জেগে উঠুক তা সে চায় না।

—বেশ আছি। সামান্য হাসল সে, বরং আপনিই ঠিক নেই।

—সত্যি। প্রদীপ রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। একবার চোরা-চাহনী দিল বীথুর দিকে। বীথুর সাজ-সজ্জা একটু বিশেষ ধরণের। উগ্রতা ফুটে বেরুচ্ছে। বারবার বুক ঢাকছে বীথু। তেরচা চোখে দেখছে প্রদীপকে। কোন কিছু চোখ এড়াল না মীরার।

শোভন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আজ সারাদিন রোদের মধ্যে ঘুরেছি। তোমাদের মত আরামের চাকরী নয়। রোদ-বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে কাজ। আর ভাল লাগে না। ভাবছি সব ছেড়ে রাজনীতি সুরু করি। দিন-দিন দেশটার যা হাল হচ্ছে...!

—থাম দাদা! বীথু ঠাট্টার সুরে বলে, চা খাও। তারপর স্নানটান করে এসো। মাথা ঠাণ্ডা হবে।

—হোয়াট ডু ইয়ু মিন? শোভন সোজা হয়ে বসল, দেখলে প্রদীপ। কথায় ঠাট্টা। বিয়ে তো করছো—পরে টের পাবে। তোমাকে ডোবাবে মেয়েটা।

প্রদীপ অপ্রস্তুতভাবে হাসল। বেচারীর অবস্থা দেখে মনে মনে হাসল মীরা। বীথুর মুখ কালো হয়ে উঠেছে। ভাইবোনে কী ঝগড়ায় মেতে উঠবে?

কিন্তু শোভন আর বসল না। হঠাৎ কিছু না বলে বেরিয়ে গেল।

—শোভনদা রেগে গেছেন।

—ভারী বয়ে গেল! বীথু ভেংচি কাটল, শুধু বড় বড় কথা। বহুদিন শুনে আসছি। দাদা ওইরকম। আজ ব্যবসা কাল চাকরী পরশু রাজনীতি। বিয়ে করবে না। ও যে কী চায় জানি না। এখন আবার রাজনীতি ওর মাথায় ঢুকেছে। এই রকম ভাবেই জীবন কাটাবে। শুনলে তো ওর কথা। আমি তোমাকে ডোবাবো প্রদীপ?

প্রদীপ হাসল, বাদ দাও বীথু। ঠাট্টা করেছেন শোভনদা। তাই না মীরা দেবী?

—তাই হবে। সংক্ষিপ্ত উত্তর মীরার, বীথু আমি এবার যাই।

—যা না। তোকে কী বেঁধে রেখেছি!

—বাঃ আমার ওপর রাগছিস কেন? মীরা তাকাল প্রদীপের দিকে, আপনারা গল্প করুন। আমি চলি।

অনুভা ঘরে ঢুকল। প্রদীপ নত হয়ে প্রণাম করতে যায়। মীরা আড়চোখে একবার তাকায়। রীতিমত হাঁপাচ্ছে অনুভা। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এই সময়ে অল্প হাঁটা-চলা করা উচিত।

—থাক। বেঁচে থাক বাবা। অনুভা দুপা সরে যায়, রাত্রে খেয়ে যেয়ো প্রদীপ।

—আজ থাক। বাড়িতে বলে আসিনি বৌদি।

—বৌদির কথা শুনতে হয়। খেয়ে যাও। তুমি একবার বল না বীথু। বলে খুকখুক করে হাসতে থাকে অনুভা।

—কী হচ্ছে বৌদি! বীথু চোখ পাকিয়ে বলে, তোমরা কথা বল আমি আসছি।

পালিয়ে যায় বীথু। কেননা অনুভার হাসি ঠাট্টা একটু স্থূল ধরনের। শুনলে কান চেপে ধরতে ইচ্ছে করে। প্রদীপের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করে অনুভা। মীরা চুপচাপ শোনে। একটু পরে বীথু ঘরে ঢোকে। ওকে একপাশে টেনে নেয়। প্রদীপ সম্পর্কে নানাকথা। এদিকে রাত ক্রমশ বাড়ছে। মীরা এক সময় ওদের কাছ থেকে রেহাই পায়।

ঘরে ফিরে কিছু খেতে ইচ্ছে করল না। নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল পল্টুর পাশে। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করল মীরা। শেষে কখন ঘুমিয়ে পড়ল টের পেল না।

।। বারো ।।

অফিস থেকে ফিরে পোশাক না পাল্টে ড্রইংরুমে বসে রইল রজত। অনেকক্ষণ। কিচেন থেকে ঘ্যাকঘোক শব্দ ভেসে আসছে।

সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। একমাত্র রামু বাবুর্চি। নিঃশব্দভাবে তার সেবা করে যাচ্ছে।

—সাব!

ট্রের ওপর ধূমায়িত কফি। হাত বাড়িয়ে কফির কাপ টেনে নেয় রজত। রামু চলে যায়।

সিগারেট ধরাল রজত। আজ ক্লাবে যায়নি। কদাচিৎ এ সময়ে বাড়ি ফেরে। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা ক্লাব। খানিকক্ষণ হৈ-হুল্লোর। বেশি রাতে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে আসা। স্নান করে খেয়ে বিছানায় পড়া মাত্র গাঢ় ঘুম। এভাবেই দিনগুলি কাটছে। লতা ছিল। এখন নেই।

নিঃশব্দে খানিকটা হাসল সে। নতুন আর একটা সিগারেট ধরাল। টেবিলের ওপর বাসি কাগজ। একটা ছবি। বন্যায় ভেসে যাচ্ছে ঘর বাড়ি। চারিদিকে অথৈ জল। একটা ডুবন্ত বাড়ির ছাদের ওপর একটা বিড়াল স্থির হয়ে বসে। চমৎকার ছবিটা। চোখ সরিয়ে আনল রজত কাগজ থেকে। ধবধব করছে দেয়াল। বুকসেলফ্। কয়েকটা ক্যালেণ্ডার। হাসি হাসি মুখ পাহাড়ী মেয়েদের। পিঠে বাচ্চা। নীচু হয়ে ঝুঁকে চা-পাতা তুলছে। সোফায় হেলান দিয়ে শরীর এলিয়ে দিল সে।

হ্যাঁ, লতা নেই। সরিয়ে দিয়েছে ইচ্ছে করে। এখন লতা নিশ্চয়ই মিঃ মেননের ঘরে। অথবা কোন হোটেলে কি বারে মুখোমুখি দুজনে বসে। মিঃ মেনন খুব প্লীজড। ভাল লেগেছে মেয়েটিকে। সত্য মেয়েটা খারাপ নয়। অবসর সময়ে সঙ্গিনী হিসেবে বেশ ভালই।

কিন্তু মেয়েটা অতিরিক্ত কিছু চাইছিল। প্রেম ভালবাসা এমনকি নীরব গৃহকোণ; ভীষণ হাসি পেল রজতের এইসব কথা ভেবে. সেই জন্যেই ইদানীং কোন মেয়ে বা মহিলার সঙ্গে হৃদয় সম্পর্কিত কোন কথা সে বলতে চায় না. বরং ওসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে। লতার অভিপ্রায় জেনে আর সে এগোল না। মিঃ মেননের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিল ওকে।

বার বার মীরার কথা মনে পড়ছে। কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অথচ ভোলা তার উচিত। কী একগুঁয়ে আর জেদী! সব জানিয়ে দিয়েছে। এখন দেখবে সেখানে আর চাকরী করতে পারে কিনা। পল্টুকে সে তার কাছে এনে রাখবে। যদি না দেয়?

অশান্তভাবে উঠে দাঁড়াল রজত। পায়ে পায়ে শোবার ঘরে এল। সমস্ত শরীরে ঘাম। বিশ্রী গরম। পোশাক পাল্টে বাথরুমে ঢুকল। শাওয়ার বাথের নীচে দাঁড়াল অনেকক্ষণ।

বারান্দায় আবছা অন্ধকার। ইজিচেয়ারে বসে রজত আকাশের তারা গোনার ব্যর্থ চেষ্টা করল। পাশের ফ্ল্যাট থেকে গান ভেসে আসছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত। কান খাড়া করে রইল। একটু পরে ড্রইংরুমে ফিরে এলো। বুক সেলফের কাছে এসে দাঁড়াল। একটা বই টেনে নিল সে। কয়েকটা পাতা ওলটপালট করে যথাস্থানে রেখে দিল বইটা। তারপর রেকর্ড প্লেয়ার বাজাল। সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে......।

যদি পল্টুকে না দেয় মীরা? সে কী করবে?

কবজী উল্টে হাতঘড়ি দেখল রজত। সবে সাড়ে আটটা। পাশের ফ্ল্যাট থেকে মিহিকণ্ঠের ক্ষীণ হাসি ভেসে আসছে। কে হাসছে অমন করে? কে জানে। সে জানে না, চেনে না ওদের। এত বছর পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থেকেও ভাল করে আলাপই হয়নি ওদের সঙ্গে। এখন কেউ এলে মন্দ হয় না।

—রামু! রামু! চিৎকার করে ডাকল রজত।

—সাব! সঙ্গে সঙ্গে দরোজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল রামু। ভাবলেশহীন চোখ-মুখ। একবার মনিবের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—খানা রেডি?

—হ্যাঁ সাব। নিয়ে আসবো?

রজত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর উঠে গিয়ে রেকর্ডপ্লেয়ার বন্ধ করল। কী যে হল আজ। কেন ক্লাবে না গিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। যত রাজ্যের আজেবাজে চিন্তা। অল রাবিশ! ধীরে সুস্থে মুরগীর ঠ্যাং চিবোতে লাগল সে। ব্যাটা রান্না করে তোফা। মীরার চেয়ে ভাল। ওই দ্যাখ। আবার তার কথা মনে পড়ছে! বলে কিনা স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করবে। সেই যে চিঠি রেখে নাটক করে চলে যাওয়া। কিছুই সে ভোলেনি।

পরের দিন অফিসে কাজের মধ্যে ডুব দিতে পারল না রজত। বার বার মনে হচ্ছিল সে হেরে গেছে। অথচ পরাজয়কে সহজে মেনে নিতে পারছে না। প্রথমে ভেবেছিল, মীরা বেশিদিন রাগ করে দূরে সরে থাকতে পারবে না। ঠিক ফিরে আসবে। জীবন তো সমান্তরাল রেখায় চলে না। একসঙ্গে থাকলে মনোমালিন্য হয়। আবার শান্তিও ফিরে আসে। একদম চিরকালের জন্যে চলে যাওয়া, বিবাহকে অস্বীকার করা—এ যে বড় বেশি দুঃসাহস মীরার পক্ষে! এত সাহস হল কোত্থেকে?

একপাশে ফাইল সরিয়ে রাখল রজত। চারটে বাজে। এবার সে বেরোবে। হ্যাঁ, মনস্থির করে ফেলেছে। সরাসরি মীরার কাছে দাবী করবে: পল্টুকে দাও। আমার ছেলে—আমিই মানুষ করবো। তোমার সংস্পর্শে থাকলে ও মানুষ হবে না। যদি সেও পল্টুর ওপর দাবি করে বসে? যদি বলে, 'পল্টু আমারও ছেলে। ওকে কেন আমি তোমার হাতে তুলে দেব?'

ইস্, বললেই সে কী মাথা নীচু করে চলে আসবে! দরকার হলে জোর করবে। ভয় দেখাবে। কিন্তু কী জেদী মেয়ে! সব জানিয়ে এসেছে। এর পরও কোন্ মুখে সেখানে চাকরী করতে যায়। একদম লজ্জা নেই।

একটু আগেই রজত বেরোল। ফুটপাত ধরে মন্থরগতিতে হাঁটতে লাগল। পাঁচটার আগে পৌঁছন চাই। সেইসব দিনের কথা ওরা ভুলে গেছে। মানুষ এমনি অকৃতজ্ঞ। সে এগিয়ে না গেলে শুকিয়ে মরতো সব। একবার মনে হয়েছিল নীহারের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু লাভ কী। সে ভদ্রমহিলাকে ওরা কেউ পাত্তাই দেয় না। তাছাড়া মীরা এখন ওদের সঙ্গে থাকে না। সব খবর সে রাখে। যত নষ্টের গোড়া বিনয়টা। বোনটির মাথায় কী যে ঢুকিয়েছে......ভাবপ্রবণ হলে যায় হয়। শুধু কথার সার।

ফাঁকা ট্যাক্সী দেখে ডাকল রজত। নরম গদীর ওপর আলগোছে বসল। বাইরে ভীষণ ভীড়। রাস্তায় কথা বলার চেয়ে বাড়ি যাওয়াই ভাল। রাস্তায় কোনরকম সীন করতে চায় না সে। তার চেয়ে ঘরে বসে মুখোমুখি বোঝাপড়া হবে। কি ভেবে আপনমনে হাসল। খুব চমকে যাবে মীরা। চোখের সামনে ভেসে উঠল ভীতিবিহ্বল বিস্ফারিত একটি মুখ।

ড্রাইভারকে বাড়ির ঠিকানায় যেতে বলল সে। একদিন সে মীরার পিছু নিয়েছিল। ছায়ার মত ওকে অনুসরণ করেছে। একটা সিগারেট ধরাল রজত। ভেতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। কী অপমান!

বেশ কিছুটা দূরে গাড়ি থামাতে বলল রজত। তারপর মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দিল। প্রায় সাড়ে পাঁচটা। হয়তো এখনও আসেনি। ছটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কিন্তু আধঘণ্টা কোথায় অপেক্ষা করবে। এদিক ওদিক তাকাল। একটু দূরে একটা রেস্টুরেন্ট।

শুধু চা-এর অর্ডার দিতে গিয়ে কী ভেবে মাংসের চপও দিতে বলল সে। রাস্তার দিকে মুখ করে বসল। দুদিকে সারি সারি পর্দা ঘেরা কেবিন। মেয়েলি কণ্ঠের হাসি। অনামনস্কভাবে চপের একটা অংশ ছুরি দিয়ে কেটে মুখে পুরল রজত। আশে-পাশের নানা টেবিলে সশব্দ হাসি, ফুটবল, সিনেমা, রাজনীতি; স্পষ্ট কোন কিছু তার কানে আসছিল না। সে কোন মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেনি।

রাস্তায় আলো জ্বলেছে। ঘড়ি দেখল রজত। ছটা বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ। কী ভাবে সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে! টের পাওয়া যায় না। ছোঁয়া যায় না। আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে সে। এখন যেন কোন-রকম উৎসাহ পাচ্ছে না। কী হবে পল্টুকে... কে দেখবে ওকে? পল্টু কী ওকে চিনতে পারবে? যদি ওকে দেখে 'বাবা' ডাক দিয়ে

ছুটে আসে? সে নিশ্চয়ই সংযত করতে পারবে না নিজেকে। দু'হাত বাড়িয়ে দেবে। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল। রজত থমকে দাঁড়াল। এ কোথায় সে এল? হ্যাঁ, কোন ভুল হয়নি তার। রাস্তার দিকের জানালা বন্ধ। এখনও কী ফেরেনি মীরা?

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় রজত। দরোজা খোলা। পর্দা ঝুলছে। সে একমুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়ায়। তারপর দরোজার ওপর টোকা মারল কয়েকবার। দ্রুত পদশব্দে পর্দা তুলে বেরিয়ে এল মীরা। চোখাচোখি হল রজতের সঙ্গে। পলকে মীরার মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। সে কোন কথা বলতে পারে না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মীরার সিঁথিতে সামান্য সিঁদুরের আভাস। সেদিকে তাকিয়ে রজত একটু অবাক।

—কার সঙ্গে কথা বলছিল মীরা?

রজত মীরার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। চোখাচোখি হয় বিনয়ের সঙ্গে। বিনয়ের কোলে পল্টু। পল্টুর দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকায় রজত। পল্টুও অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওর চোখমুখের চেহারা আস্তে আস্তে পাল্টে যায়। আস্তে আস্তে যেন তার সব মনে পড়ছে। হাসি হাসি মুখ। চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারপর ছমফট করে ওঠে বিনয়ের কোলে।

—বাবা! বাবা!

রজত তাড়াতাড়ি এসে কোলে তুলে নেয় পল্টুকে।

—ছেড়ে দাও ওকে। তুমি কেন এসেছো? মীরা রজতের কোল থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে পল্টুকে। কিন্তু পল্টু আরও জোরে আঁকড়ে ধরে রজতকে। আর কান্নার সুরে বলে, তোমার কাছে যাব না। আমি বাবার কাছে থাকবো। বাবা! বাবা!

নিস্তব্ধতা নেমে আসে ঘরে। তিনজনে কেউ কারুর দিকে তাকাতে পারে না। রজত মীরার চুপসে যাওয়া মুখ দেখতে পায়। বিনয়ের গম্ভীর মুখ। মনে মনে রজত হাসে। পল্টু আপন মনে কথা বলে চলেছে। ঠিক কী বলছে স্পষ্ট সে শুনতে পায় না। যা আশংকা করেছিল তা নয়। ঠিক পল্টু ওকে চিনতে পেরেছে। শত হলেও রক্তের টান তো!

—আমি পল্টুকে নিতে এসেছি। স্পষ্ট উচ্চারণ রজতের। কোনদিকে সে তাকাল না। পল্টুকে মেঝেতে নামিয়ে একটা চেয়ারে বসল। কেউ তাকে বসতে বলেনি। ওর উপস্থিতি যেন ঝড়ের মত। ফলে ওরা দিশেহারা টালমাটাল। ধীরে সুস্থে সে একটা সিগারেট ধরাল।

—পল্টুকে নিতে এসেছো! মীরার চোখমুখ বিস্ফারিত, ওকে আমি তোমার কাছে ছেড়ে দেব না। পল্টু, চলে আয় আমার কাছে।

মীরা এগিয়ে এল কয়েক পা। কিন্তু পল্টু রজতকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে বলে, না না না! আমি বাবার কাছে থাকবো।

—দেখলে তো। রজত মৃদু হাসল, সুতরাং জোর করা বৃথা। ও বড় হয়ে উঠেছে। আমাদের ভিতর যাই হয়ে থাক, ওর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে। ওকে আমি সামনের মাসে বোর্ডিংয়ে ভর্তি করে দেব। চিন্তা কর না। ও যাতে সুশিক্ষা পায় যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

মীরার দুচোখ বেয়ে জল এল। দুহাতে সে মুখ লুকোয়। বিনয় ওর মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে বলে, কাঁদিস না। পল্টুর কথা তুই ভুলে যা। আমি জানতাম, শেষ পর্যন্ত তোকে আঘাত হানবে রজতদা। সমস্ত দিক থেকে হেরে গিয়ে লোকটা উন্মাদ হয়ে গেছে!

—চমৎকার! ব্যঙ্গের হাসি রজতের মুখে, তোমার অন্তর্দৃষ্টির তারিফ করতে হয়। বিনয়, তুমি ছেলেমানুষ। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। যদি বেঁচে থাকি দেখবো, আমরা কে কিভাবে হেরে গেলাম। আচ্ছা, এবার আমি উঠছি।

মীরা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে এসে জড়িয়ে ধরতে যায় পল্টুকে। পল্টু তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে। রজতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে কান্না শুরু করে। রজত মীরাকে বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে পল্টুকে কোলে তুলে দ্রুত ঘর ছেড়ে বাইরে এল। পিছনে আর্ত চিৎকার। রজত লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়। একটা ট্যাক্সীতে উঠে পড়ে। গাড়ি ছুটে চললে পল্টুর দিকে হাসিমুখে তাকায়। পল্টুর চোখে জল।

।। তের ।।

নীরব দর্শকের মত বিনয় চুপচাপ বসে থাকে। ঘরের মধ্যে অনেকের উপস্থিতি টের পায়। মীরাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই। নানা-রকম প্রশ্ন করছে। মীরা কোন উত্তর দিচ্ছে না। তাকাচ্ছে না কোনদিকে। সর্বস্ব হারিয়ে সে যেন নিঃস্ব, অসহায় তার চোখ-মুখের চেহারা।

—আমার নাম বীথু।

বিনয় হাত জোর করে নমস্কার করল, বুঝতে পেরেছি। আপনার কথা খুব বলত মীরা।

—'আপনি' নয়। ছোটবোনকে কী 'আপনি' করে কেউ বলে?

—বেশ। মৃদু হাসল বিনয়, শোন বীথু। তুমি তো সবই জান। মীরার মনের অবস্থাটা বুঝতেই পারছো। তাই বলছি ওকে এখন একটু একা......।

—নিশ্চয়ই। বীথু বিনয়ের সঙ্গে অনুভা আর শোভনের পরিচয় করিয়ে দিল। মীরাকে জেরার ভঙ্গীতে প্রশ্ন করছিল অনুভা। ব্যাপারটা বিনয়ের কাছে চরম বিরক্তিকর।

অনুভা বলল, কেস করা উচিত। জোর করে ছেলে নিয়ে যাবে, কেন দেশে আইন আদালত নেই। কী বলেন বিনয়বাবু?

কী আর বলবে বিনয়। সে শুধু মৃদু হেসে সায় দিল। তার লক্ষ্য ছিল শোভনের দিকে। চেনা চেনা মুখ মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না। এরকম হয়, হঠাৎ কাউকে দেখলে, ভীড়ের মধ্যে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, খুব পরিচিত মনে হয়। তারপর স্মৃতির সিন্দুক তুলে পাগলের মত খোঁজা, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া।

—আমার কী মনে হয় জানেন? শোভন একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় বিনয়ের দিকে, এখন মীরা দেবীর একা থাকা উচিত নয়। দ্যাট ম্যান, কিছু মনে করবেন না, রজত-বাবুর কথা বলছি—রিয়েলি এ ক্রুয়েল ফেলো! আপনি মশাই ওকে সহজে রেহাই দেবেন না।

বিনয় অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করল। এরা, দেখা যাচ্ছে, মীরার সত্যিকারের আপনজন! এদের আন্তরিকতায় তার মুগ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু সে আর এখানে বসে থাকতে পারছে না।

—দেখি কি করা যায়। বিনয় আর কথা বাড়াল না। শোভনের কথা বলার ঢং তাকানো কেমন যেন। একটু চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে। মানুষকে এত অল্প সময়ে বিচার করা যায় না। কিন্তু বিনয়ের স্বভাব, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকে যাচাই করা। ঘনিষ্ঠ না হলে সহজে সে মুখই খোলে না।

একটু পরে ওরা সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ঘরে বিশ্রী স্তব্ধতা। বিনয় চুপচাপ মীরার আনত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেচারী বড় কঠিন আঘাত পেয়েছে। পল্টুর শোক ও ভুলতে পারবে কিনা সন্দেহ। রজতদা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চায়। সুযোগ পেয়েছে। জানে কোথায় আঘাত দিলে মীরা ভেঙে পড়বে।

সে কোন বাধা দেয়নি। দেবে কী, পল্টুর কান্ড দেখে অবাক। কিছুতেই মীরার ডাকে সাড়া দিল না। রজতদা ডাকা মাত্র ওর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। পল্টু যদি যেতে অস্বীকার করত, কান্নাকাটি অথবা অসম্মতি জানাত, তখন কিছু একটা করা যেত। রজতদা জোর করলে প্রতিবাদ করতো।

এ ছাড়াও আপত্তির কারণ অনেক। মীরার ওভাবে পল্টুকে সঙ্গে করে চলে আসা, যদিও প্রথম দিকে সেই অনেক

আশ্বাস জানিয়েছে; আজ মনে হয়, ওদের মধ্যে কিসের বিরোধ, কেন একসঙ্গে থাকতে পারল না? স্পষ্ট করে কিছু বলেনি মীরা। হয়ত বলা সম্ভব নয় ওর পক্ষে অথবা বলতে চায় না। যাই হোক, আজ মনে হয়, সমস্ত রকম কাজের জন্যে ফল ভোগ করবে মীরা একাই। কেননা সে অন্যের পরামর্শ চায় না। গুরুতর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় সে একাই। এতে আপত্তির কিছু নেই। ক্ষমতা থাকে, লড়ে যাও একা! অন্যকে বিব্রত করা ঠিক না।

—মীরা!

একবার বিনয়ের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় মীরা। একটু পরে ফিরে আসে। চোখমুখে জলকণা চিকচিক করছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মোছে। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। পল্টুর বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না বিনয়। মীরার হাবভাব মোটেই ভাল লাগছে না। কিছু বলুক। চিৎকার করুক। প্রাণভরে কাঁদুক। সেও ভাল। কিন্তু এভাবে পাষাণ প্রতিমার মত স্থির হয়ে দাঁড়ানো, উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকানো, আর সে সহ্য করতে পারছে না। কোনরকম সান্ত্বনা দেবার ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছে না।

আবার বিনয় নরম গলায় ডাকল, মীরা! লক্ষ্মী বোন এদিকে তাকা।

বিনয়ের মুখোমুখি দাঁড়াল মীরা, ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, টলটল দুটো বড় বড় চোখ।

—পল্টুকে ছাড়া আমি বাঁচবো কিভাবে দাদা! দু' হাতে মুখ ঢেকে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল মীরা।

—ছি! বিনয় এগিয়ে এসে মীরার মাথায় হাত রাখল, এত নরম মেয়ে তুই জানতাম না। চোখ মোছ। শোন যা বলছি। ও কি, প্লীজ আমার কথা শোন!

মীরার ফোলা ফোলা চোখমুখ। ওর দিকে তাকাতে পারছিল না বিনয়। বলল, বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে আয়।

বিনয়ের কথা শোনে মীরা। এবার ওর ফিরতে একটু দেরী হয়। পায়চারী করে বিনয়। ঘন ঘন সিগারেট টানে। খুব শক্ত পছন্দমত বাঁচা। স্বাধীনভাবে বাঁচার চেষ্টা এখন তার কাছে অলীক মনে হয়! বরং ছকের মধ্যে চলাফেরা সহজ। সেভাবেই তো সবাই একটির পর একটি দিন...। ঠাট্টা করে বলে দিনগত পাপক্ষয়। কিন্তু ঐ তো সত্য। বড় নিষ্ঠুরভাবে সত্য!

—তুমি রাত্রের খাবার এখানেই খেয়ে যাও। স্থির শান্ত উচ্চারণ মীরার। ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বিনয়।

—আজ থাক। শোন, যা হবার হয়ে গেছে। কেঁদে লাভ নেই কিছু। এখন তুই কী করবি? আমাদের ওখানে ফিরে চল।

—না! আমি একা থাকতে চাই দাদা।

—ভাল করে ভেবে দ্যাখ। তুই মার সঙ্গে কী একটু মানিয়ে চলতে পারবি না?

—না। কিছু মনে কর না দাদা। মাকে তুমি জান। ফিরে গেলে প্রথম প্রথম দু'-চারদিন কিছু হবে না। ফের শুরু হবে চিৎকার, অশ্রাব্য ভাষার ঝগড়া, কী দরকার লোক হাসিয়ে!

বিনয় গম্ভীর মুখে বলল, বেশ তাই হবে। আমি চললাম। যখনই দরকার হবে ডাকবি।

—কেন দরকার ছাড়া বুঝি খোঁজ নেবে না! বিনয়ের পিছন পিছন সদর দরোজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল মীরা।

বিনয় জোর করে হাসার চেষ্টা করল, তা নয়। চিন্তা করিস না। দেখবি ঠিক তোর খবর নিচ্ছি।

হনহন করে এগিয়ে যায় বিনয়। অনেকটা হাঁটার পর পিছন ফিরে তাকায়। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে রয়েছে মীরা। মুখ ফিরিয়ে সে আরও জোরে হাঁটতে থাকে। মীরার বিরুদ্ধে রাগ বা অভিমান কিছুই হচ্ছে না। একমাত্র বিরক্তি ছাড়া। বড় স্বার্থপর মীরা! অন্যের কথা ভাবে না। এত যে কান্না পল্টুর জন্যে, দুদিন পরে ওকেও ভুলে যাবে। হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাকগে যা খুশি করুক। সে আর মাথা ঘামাবে না। তবে প্রতিবার কোন না কোন ঘটনায় তার এ সংকল্প ভেঙে যায়।

।। চোদ্দ ।।

দরোজা খুলে রান্নাঘরের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যান নীহার। বিনয় একটু থমকে দাঁড়ায়। মার মুখ গম্ভীর। আজকাল মুখে হাসি নেই। মাকে কী জানাবে ওদের কথা? পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সে। সেই একভাবে বসে আছেন মা। উনুনের দিকে মুখ, চোখে বিষাদ। মার এই চেহারা তার খুব পরিচিত। কী এত ভাবেন? বাবার কথা কী? নাকি মীরার জন্যে দুশ্চিন্তা। বাইরে ক্রোধ প্রকাশ করলেও, মীরার স্বাধীনভাবে চলাফেরায় অসন্তুষ্ট হলেও, মনে মনে ওর কথা ভেবে ছটফট করেন। অতি কষ্টে দুঃখ চেপে রাখেন। সহসা মার জন্যে বিনয়ের প্রাণ কেঁদে উঠল।

—মা। মাগো!

নীহারের পাশ ঘেঁষে উবু হয়ে বসে বিনয়। বহুদিন পরে মার কোলে আশ্রয় পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল। বিয়ের পর থেকে সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে একটা দূরত্বের দৃষ্টি হয়েছে। তার মনে হল আগের মত মা আর তাকে ডাকেন না। মাথায় হাত বুলিয়ে দেন না।

ভাবলেশহীন চোখে নীহার তাকালেন, কী?

—তুমি একা বসে রয়েছো। শেফালী কোথায়?

—জানি না। মুখ ফিরিয়ে নেন নীহার। বলেন, তোমরা কে কোথায় কখন যাও—আমি কী করে জানবো। বুড়ো লোকের সংসারে আস্তে আস্তে প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে।

—বুঝেছি। বিনয় মৃদু হেসে মার গলা জড়িয়ে ধরে, কী হল? রাগ করেছো তুমি।

—ছেড়ে দে। নীহার ছটফট করে ওঠেন, বিনু আমার আজকাল কিছু ভাল লাগছে না। আমাকে তুই কোন তীর্থস্থানে পাঠিয়ে দে। শেষ বয়সে আর সংসারের ঝামেলা...।

—আমাদের ছেড়ে পারবে তুমি থাকতে?

—না পারার কী আছে। সবাই পারছে। চোখের সামনে তো সব দেখছিস।

—সত্যি তুমি রেগে গেছো। কেন? শেফালী কোথায়?

—ও তো ওপরে। ফাঁক পেলেই ছুটে যায়। কিছু বলি না। আজকালকার মেয়ে। সেদিন তো আর নেই যে, পাঁচ কথা বললে মুখ বুজে থাকবে। মানুষ চেনা বড় কঠিন।

নীহারের অপ্রসন্ন মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে বিনয়। সত্যি ভীষণ অন্যায়। শেফালীর এরকম যখন তখন উপরে মা বাবার কাছে যাওয়া অশোভন।

ঘরে ফিরে পোশাক পাল্টায় বিনয়। সাড়ে নটা বাজে। কখন গেছে শেফালী কে জানে। বিছানায় চিত হয়ে শোয়। ঘরের চারিদিকে তাকায়। শেফালী কোন কথা শুনবে না। বেশি কথা বিনয় বলে না। আজ মনে হয় বিয়ে করা তার উচিত হয়নি। ভেবেছিল বিয়ের পর নিঃসঙ্গ থেকে মুক্তি পাবে। মানুষকে ভালবাসতে পারবে। জীবনের প্রতি আসক্তি জন্মাবে। এখন মনে হয়, বিয়ের পর, আরও বেশি বন্ধন তাকে আঁকড়ে ধরেছে। আর জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত বিস্বাদ ঠেকছে সব কিছু। বিশ্বাস হয় না, এক সময়ে সে প্রেমে পড়েছিল শেফালীর। প্রেম ফ্রেম বাজে ব্যাপার।

হঠাৎ সে শেফালীর কণ্ঠস্বর শুনল। বারান্দায় পায়ের শব্দ। একটু পরে শেফালী ঘরে ঢুকল। বিনয় চোখ বুজে ঘুমোবার ভান করল। একটা হাত চোখের ওপর। আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিট পিট করে তাকাল সে।

—শুনছো! ঘুমোলে নাকি! এত তাড়াতাড়ি।

এ কি! চিমটি কাটছে কেন শেফালী। রাত বাজে দশটা—বলে কিনা তাড়াতাড়ি। বিনয় আড়মোড়া ভেঙে তাকাল। চোখাচোখি হল শেফালীর সঙ্গে।

—ঘুম ভাঙল। হাসি হাসি মুখ শেফালীর, কখন ফিরলে?

—তুমি কখন ফিরলে? গম্ভীর মুখ বিনয়ের। তীক্ষ্ণচোখে সে তাকায়। ওসব

হাসিতে সে ভুলছে না। শেফালী ভেবেছে কী?

হাসি মিলিয়ে যায় শেফালীর। সে একমুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, এখন খাবে তুমি।

—তিনতলায় কী আজকাল রোজই যাওয়া হচ্ছে?

—খোঁচা দিচ্ছ কেন। মাঝে মধ্যে যাই। ওরা ডাকে, না গিয়ে পারি না। বেশ তো আর যাব না।

—আমার মার দিকটাও তো চিন্তা করতে হয়।

—কেন, মা কিছু বলেছেন? তেরচা চোখে তাকায় শেফালী। আস্তে আস্তে এগিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ায়। পিছন ফিরে।

—মা কী বলবেন। সব কথা বলার দরকার হয় না। বিনয় আর কথা বাড়াতে চাইল না। অসহ্য লাগছে তার। শেফালীর ব্যবহার, কথা বলার ঢং দেখে সে মনে মনে রীতিমত আহত।

—তোমরা যেভাবে চাইবে সেভাবেই চলবো। শেফালীর কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনাল, মানুষকে চেনা বড় কঠিন!

—কি বলতে চাও! বিনয় অতিকষ্টে উত্তেজনা দমন করল, তোমার কী ভাল লাগছে না আমাদের এখানে থাকতে? তোমার চলাফেরায় কোনদিন একটা কথা বলিনি। তবে?

শেফালী ঘুরে দাঁড়াল. কিছু না। থাক আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চল, তোমাকে খেতে দি।

বিনয় আর কিছু বলল না। নীরবে খাওয়া শেষ করল। হাতমুখ ধুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে দরোজা খুলে বারান্দায় দাঁড়াল। একবার ভাবল ছাদে যায়। পরক্ষণেই মনে হল ঘুম আসছে তার। আশেপাশের ফ্ল্যাট থেকে ছেলেমেয়েদের পড়ার শব্দ রেডিওতে আধুনিক গান, ছিটকে আসা অস্পষ্ট হাসি, কথাবার্তার টুকরো টুকরো অংশ শুনতে পেল সে।

এভাবে একসঙ্গে থাকার কোন মানে হয় না। হ্যাঁ, শেফালী সম্পর্কে একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তার মনে হল, বিরোধ ক্রমশ বেড়ে চলবে। হঠাৎ মনে পড়ল রজতদা আর মীরার কথা। মীরাও শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে থাকতে না পেরে পালিয়ে আসে। তার আসাটাকে এখন সুনজরে দেখছে না সে। কিন্তু তার নিজের বেলায়? সেই বা কেন মানিয়ে চলতে পারছে না শেফালীর সঙ্গে? সব দোষ কী শেফালীর?

ঘরে ফিরে যায় বিনয়। শেফালী জানালার সামনে দাঁড়িয়ে। মা শুয়ে পড়েছেন। খিল আটকে দেয় সে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। মাথার চুল কপালের ওপরে অনেকটা উঠে গেছে। পাতলা হয়ে আসছে চুল। একটু পাউডার ছিটোল ঘাড়ে গলায়।

শেফালীর পিছনে এসে দাঁড়াল সে। নরম গলায় বলল, চল শোবে। বলে পিছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরল। সজোরে কাছে টানল।

—আঃ ছাড়। দু'হাত দিয়ে বিনয়কে সরিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে শেফালী, ভাল লাগে না।

শেফালীর চোখ মুখ ঠোঁটে ঘন ঘন চুম্বন করল বিনয়।

—ছেড়ে দাও! থাক আর আদর করতে হবে না। তোমার খেয়াল মাফিক আর আমি চলতে পারছি না। আমাকে তুমি রেহাই দাও!

নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল শেফালী। আলিঙ্গন আস্তে আস্তে শিথিল হতে থাকে। বিনয় বিছানার দিকে এগোয়।

চিৎকার হৈচৈ একটা কিছু করতে পারলে বিনয় স্বস্তি পেত মনে মনে। কিন্তু নিঃশব্দে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। স্তম্ভিত হয়ে গেছে শেফালীর কথা শুনে। মুক্তি চায়। রেহাই পেতে চায়। এ কী নিছক ক্রোধের কথা? শেফালী কী সত্যিই মুক্তি চায়?

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে শেফালী। এক-পলক সেদিকে তাকাল বিনয়। মশারির ঘেরা টোপের মধ্যে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসল। কিন্তু কোথায় সে যাবে? না, কোন রকম অস্বাভাবিক আচরণ তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিছানায় পাশাপাশি শেফালীর সঙ্গে তাকে শুতে হবে। আরও বহু বছর। মৃত্যু পর্যন্ত! আর সে ভাবতে পারছে না। ঝিমঝিম করছে মাথা।

আসলে শেফালী কী চায়? যতদূর মনে পড়ে, স্ত্রীর সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার সে করেনি কোনদিন। বড়জোর পছন্দ অপছন্দের কথা বলেছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে। তাদের মধ্যে এমন কী ঘটতে পারে যে, একজন মুক্তি পেতে চায়?

সারারাত ঘুমোতে পারল না বিনয়। এপাশ ওপাশ করে কাটাল। শেফালী বিছানায় এসে শোয়নি। মেঝেতে আলাদা মাদুর পেতে শুয়েছে। কোন বাধা দেয়নি সে।

পরের দিন স্কুলে গেল না বিনয়। ভোরবেলা স্নান করল। শেফালীর সঙ্গে কথা বলবে না, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া, মনে মনে স্থির করল। মা যেন কিছু বুঝতে না পারেন। মা জানতে পারলে খুব আঘাত পাবেন। বিয়ের ব্যাপারে তার আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি।

দুপুর পর্যন্ত বই পড়ে সময় কাটাল বিনয়। একটানা পড়তে পারেনি। ঘন ঘন সিগারেট খেয়েছে। পায়চারী করেছে একমনে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে লোকজনের যাওয়া আসা। অস্পষ্টভাবে কানে ভেসে এসেছে জাহাজের ভোঁ ভোঁ শব্দ। আড়চোখে দেখেছে শেফালীর চলাফেরা। আর সব সময় একধরনের অস্বস্তি। অনেকটা জ্বর জ্বর ভাব। কখনও বিছানায় শুয়ে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সীলিংয়ের দিকে।

এখন নিস্তব্ধতা চারিদিকে। মা ঘরে নেই। তিনতলায় মেজদিদির সঙ্গে বোধহয় গল্প করতে গেছেন। শেফালী বারান্দায় আর বিছানায় শুয়ে। বিনয় একবার ভাবল ডাক দেবে কিনা শেফালীকে। খোলাখুলি কথা বলার দরকার। হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনতে চায়। তারপর একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু কী ব্যবস্থা সে করতে পারে?

বিছানায় শুয়ে বিনয় ঘুমোবার চেষ্টা করল। সারারাত ঘুমোতে পারেনি। এখন ঘুম আসা উচিত। আজেবাজে চিন্তা থেকে যদি সে মুক্তি পেত! কিন্তু মজা হচ্ছে— মন আয়ত্তের বাইরে। নিজের শরীরের ওপর অধিকার থাকলেও, মন পাগলা ঘোড়ার। আপন খেয়ালে ছুটবে। রুখবে কার সাধ্য!

বারান্দায় এল সে। ডানদিকে ফিরে শুয়েছে শেফালী। দু' চোখ বোজা। অসতর্ক কয়েকটা রুখু চুল কপালের ওপর মৃদু হাওয়ায় উড়ছে। একদৃষ্টিতে বিনয় তাকিয়ে রইল। ঘুমন্ত শেফালীকে এমন মনোযোগ দিয়ে কোনদিন দেখেনি। কী কমনীয় মুখ। কোথায়ও কুটিলতার চিহ্ন নেই। নাকি ঘুমোলে সবাইকে এমন শান্ত সমাহিত মনে হয়!

মাথা নীচু করে স্ত্রীকে চুম্বন করতে গিয়েও কী ভেবে বিনয় থমকে যায়। তারপর নিঃশব্দে ফিরে আসে ঘরে। আবার সেই কথা মনে পড়ছে। ফলে সহজ হতে পারছে না সে। ঘড়ি দেখল। তিনটে বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিল সে।

—শুনছো। জোর গলায় ডাকল বিনয়। শেফালী চমকে উঠে বসল। বিনয়ের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নীচু করল।

—আমি একটু বেরুচ্ছি। আর কোন কথা না বলে বিনয় তাড়াতাড়ি বারান্দা পেরিয়ে দরোজা শব্দ করে খুলল। পিছনে তাকাল না। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো।

।। পনের ।।

পরপর অনেকগুলি ট্রাম আসছে। একটাতে উঠে পড়ল বিনয়। জানালার ধার ঘেঁষে বসল। এখনও ভীড় শুরু হয়নি তেমন। কোথায় যেতে পারে মনে মনে ভাবল অনেকক্ষণ। বস্তুত যতক্ষণ ঘরে ছিল, ছটফট করেছে। শেফালীর কথা ভেবে বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল। ওর দিকে তাকাতে

পারেনি. সহজভাবে কথা বলতে পারেনি। সব সময় ভাল-না-লাগা একটা জ্বালায়...।

সাড়ে চারটার মত বাজে। বিনয় ধর্মতলা পর্যন্ত টিকিট কাটল। একবার সিনেমায় যাবার কথা মনে হল। যে-কোন হলে টিকিট কেটে ঢুকে যাবে। সে ভুলতে চায় শেফালীর কথা। সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে চায়। প্রতি মুহূর্তে এমন শ্বাসরোধকারী মানসিকতা নিয়ে বাঁচা অসম্ভব! এই তো তার চারপাশে অসংখ্য নরনারী। কই কে এমন তার মত ছটফট করছে? বাড়ি ফেরার ব্যস্ততা অনেকের চোখেমুখে। কেউ মার্কেটিংয়ে যাচ্ছে। কেউ হয়ত সিনেমায় যাবে অথবা প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছে। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য আছে। তাদের গন্তব্যস্থান ঠিক আছে। কিন্তু সে অনেক ভেবেও কোথায় যাবে ঠিক করতে পারল না। এমন কোথায়ও যেতে পারলে ভাল হয়, যেখানে মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশার ফলে সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারবে।

একবার বিমলের কথা মনে পড়ল। অনেকদিন যেতে বলেছে। নানা কারণে যাওয়া হয়নি। বিমলকেও সে আসতে বলেছিল কোন এক রোববারে। আসেনি! না, ওর ওখানে যাবে না। আসলে ওর সঙ্গ ভাল লাগে না। ওর কথাবার্তা চালচলন সবকিছু কেরানীসুলভ। আলোচনার প্রসঙ্গও প্রায় একধরনের। তাছাড়া অফিসের কথা শুনতে ভাল লাগে না। ওর অভিযোগ সবার বিরুদ্ধে। সবাই চোর শঠ প্রতারক। শুধু ওই সাচ্চা! খালি আস্ফালন। অর্থাৎ খুবই করুণার পাত্র। ওর কাছে জীবন হচ্ছে ভোরবেলায় জেগে গরম এক কাপ চা, খবরের কাগজ, বাজার, অফিস আর রাত্রে অভ্যাসমাফিক সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মশারি তুলে স্ত্রীর পাশে শোওয়া।

হঠাৎ বিনয়ের মনে হল তাকে লক্ষ্য করে কে যেন বলছে, 'তুমিই বা নিজেকে আর সবার থেকে আলাদা ভাবছো কিভাবে? নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পার না, আবার বড় বড় কথা ভাবছো! তুমি চরম স্বার্থপর, আত্মমুখী ও আত্মকেন্দ্রিক। তুমি কোন দায়িত্ব স্বীকার করতে চাও না অথচ বিয়ে করেছো। স্বার্থহীনভাবে বাঁচতে চাও। কিন্তু ভেবে দ্যাখ, অত সহজ নয় জীবন! কষ্ট স্বীকার কর। কমপ্লেকসকে বাদ দিয়ে সাদা চোখে সব কিছু দেখার চেষ্টা কর। দম্ভ পরিত্যাগ কর। বাস্তবদৃষ্টিতে সবকিছু বিচার করতে শেখ। আর কবে শিখবে? বয়স তো কম হল না। তিরিশ পেরিয়েছে। এখন আর ভাবালুতা মানায় না হে যুবক!'

চারদিকে তাকিয়ে বিনয় ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। পর পর অনেক ট্রাম দাঁড়িয়ে। লোকজন রাস্তায় ক্রমশ বাড়ছে। ভীড়ের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে হাঁটতে থাকে। কোন পরিচিত ব্যক্তির মুখোমুখি সে এখন হতে চায় না।

মাঝে মাঝে তাকে উদ্দেশ্য করে কে বা কারা যেন রক্তচোখে অভিযোগ করে। ঘাড় ফিরিয়ে সামনে পিছনে তাকিয়ে নির্বোধ মুখের মিছিল শুধু চোখে পড়ে। ঘর্মাক্ত মুখ। ফ্যাকাসে। দু'চোখের নীচে কালি। কী পুরুষ কী নারী—খুব কম লক্ষ্য করা যায় স্বাস্থ্যে ভরপুর হাস্যোজ্জ্বল চোখমুখ।

মেট্রো সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে সে বাইরের ছবি দেখতে থাকে। আজ শেফালী সঙ্গে থাকলে...। খুব কম ওকে নিয়ে সিনেমায় এসেছে। সত্যি, সেই রূঢ় ব্যবহার করেছে শেফালীর সঙ্গে। অবহেলা করেছে। ভালবাসা দরকার। হাসিমুখে দুটো কথা বললে অনেক তিক্ততার অবসান ঘটে।

হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, বিনয় আপনমনে মাথা নাড়ল কয়েকবার; নিছক রাগের বশে শেফালী 'মুক্তি দাও' বলে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। ও জানে না, কেউ কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সবাই তো মুক্তি চায়। রেহাই পেতে চায় সবরকম বন্ধন থেকে। কেউ পেরেছে কী না—ধর্মে বা ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই—সে সঠিক জানে না। তার মনে হয় মৃত্যুই হচ্ছে চরম মুক্তি। স্বাভাবিক মৃত্যু। আত্মহত্যা বা অন্য কিছু নয়। যদিও আত্মহত্যার সপক্ষে বিশিষ্ট এক ফরাসী লেখকের সরব ঘোষণার কথা তার জানা।

টিকিট কেটে বিনয় ভেতরে ঢুকল। লবিতে কয়েকটা সোফা। একটায় বসে সিগারেট ধরাল। ছবি শুরু হতে কিছুটা দেরী। দেয়ালে বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছবি। এবং আগামী দু' একটি ছবির বর্ণাঢ্য বিজ্ঞাপন।

জেদ বা অভিমান করে দূরে সরে থাকা বোকামী। এমনিতেই বাইরের নানারকম চাপে স্নায়ু দুর্বল। এরপর আর স্ত্রীর সঙ্গে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মতান্তর পোষায় না। বরং শেফালীর হাসিমুখ...।

হঠাৎ বিনয় চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি সে একটু দূরে সরে যায়। আত্মগোপন করে ভীড়ের মধ্যে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকায়। দুজনের হাসিমুখ। মীরা আর শোভন।

হলের ভিতর ওরা ঢুকে গেলে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। না, ওকে সম্ভবত ওরা দেখতে পায়নি। হাতঘড়ি দেখল। মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে। হাসিমুখ মীরার। এই তো ক'দিন আগে পল্টুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল রজত। কী কান্না মীরার! 'আমি পল্টুকে ছাড়া বাঁচবো কী করে দাদা!' সে শুধু মনে মনে হেসেছিল।

হনহন করে বেরিয়ে এল বাইরে বিনয়। টিকিটটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

—দাদা, একস্ট্রা আছে?

—ওই যে। বিনয় ছেঁড়া টুকরো টিকিটের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখাল।

—ছিঁড়ে ফেললেন? ভদ্রলোক অবাক দৃষ্টিতে তাকাল বিনয়ের দিকে।

মৃদু হেসে বিনয় এগিয়ে যায়।

কী ভাবল ভদ্রলোক কে জানে। চুলোয় যাক। ভীড়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি হাঁটার ফলে বেশ জোরে ধাক্কা লাগল একজন মহিলার সঙ্গে। মহিলার হাতের ব্যাগ ফুটপাথে ছিটকে পড়ে। হতভম্ব বিনয় কী করবে বুঝতে পারে না। বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

ব্যাগ কুড়িয়ে মহিলা কাছে এগিয়ে আসে। ফর্সা একহারা চেহারা। উগ্র পোশাক। চোখমুখ লাল। দ্রুত বুক ওঠানামা করছে। বিনয় বিপন্ন দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাল।

—ভদ্রভাবে রাস্তায় চলতে শেখেন নি?

—মাফ করবেন। বিনয় নীচু গলায় বলল, ভীষণ লজ্জিত। তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে...।

ইতিমধ্যে কৌতূহলী কয়েকজন পথচারী ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

—কী হয়েছে? একজন স্বাস্থ্যবান যুবক এগিয়ে এসে ভদ্রমহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমি দেখেছি এই লোকটা আপনাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা মেরেছে।

বিনয়ের মনে হল তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। সে কাতর চোখে মহিলার দিকে তাকাল। টের পেল পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে গলগল করে ঘাম নীচে নেমে যাচ্ছে।

—কিছু না। উনি কেন ধাক্কা মারবেন। চলুন সমীরদা। বলে মহিলা বিনয়ের একটা হাত ধরে মৃদু টান দেয়। চোখের ইসারায় হাঁটতে নির্দেশ করল।

মুহূর্তে যে-যার চলে যায়। বিনয় মৃদুস্বরে বলল, ধন্যবাদ। মহিলার মুঠো থেকে হাত সরিয়ে নিল, বিশ্বাস করুন আমি ইচ্ছে করে ধাক্কা দেইনি।

জবাব না দিয়ে মহিলা মৃদু হাসল। আড়চোখে তাকাল বিনয়ের দিকে।

নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে বিনয়। ব্যাপার কী? মহিলা চলে যাচ্ছে না কেন? রীতিমত সুন্দরী। বারবার ওভাবে তাকাচ্ছে কেন? এখন তো চলে যাওয়া উচিত। তা নয় অপাঙ্গে তাকিয়ে মুচকি হাসা। তবে কী... তবে কী...।

—আচ্ছা চলি কেমন। হাতজোড় করে নমস্কার করল বিনয়, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

—শুধু ধন্যবাদ। গভীর চোখে তাকাল মহিলা, খুব ব্যস্ত বুঝি?

(ক্রমশঃ)

# গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

# ক্রীড়াক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে
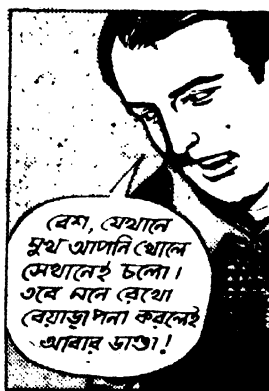
কারো কারো অভিযোগ, সমানাধিকারের বাঁধবন্ধ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হয় না। তাদের দেখা হয় দ্বিতীয় নজরে। মেয়েদের প্রতি দ্বিতীয় নজরের প্রবণতা যে পুরুষের মধ্যে খুব বেশি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এটা খুব লক্ষ্য করা যায়। পুরস্কারের হার পুরুষ এবং মহিলা প্রতিযোগীর বেলায় বেশ তারতম্য হয়। পুরুষের তুলনায় মহিলা বিজয়ী অনেক কম পুরস্কার পান। এরকম চলে আসছে অনেক দিন। তখন অবশ্য নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথাটা চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আসতো না। সে দিন বদল হয়ে গেছে কবে। সমানাধিকারের প্রতিশ্রুতিতে এখন আমরা সবাই মুখর। নানা ব্যাপারে মেয়েদের স্বার্থরক্ষার জন্য কারো কারো চোখ থেকে রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছে। কর্তৃপক্ষ সজাগ এবং সতর্ক। পান থেকে চুণ খসবার উপায় নেই। কিন্তু সেই রেওয়াজ সমানে চলছে। তার কোথাও কোন পরিবর্তন হয় নি। ক্রীড়াক্ষেত্রে মহিলা-পুরুষের ফারাকটুকু অক্ষুন্ন রেখেই সমানাধিকারের বুলি সবাই আউড়ে যাচ্ছেন। ভেবেছিলেন, এখানে যেমন চলছে চলুক, অন্যত্র যেন কোন গোলমাল না হয়। এ ভেবেই তাঁরা প্রতিযোগিতার পর প্রতিযোগিতার আয়োজন করছিলেন আর বিজয়ীর পুরস্কারের ব্যবধানটুকু বজায় রেখে চলছিলেন।

কিন্তু তাঁদের এ হেন সুখ স্বপ্নের পরমায়ু আর কত দিন বলা কঠিন। ক্রীড়াক্ষেত্রে এবার প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্বের সেরা মহিলা টেনিস খেলোয়াড়রা দাবী করেছেন যে, তাঁদের পুরুষের সমান মর্যাদা দিতে হবে। আমেরিকার প্যাসিফিক সাউথ ওয়েস্ট টুর্ণামেন্টের খেলা নিয়েই এই বিতণ্ডার সূত্রপাত। এই টুর্ণামেন্টে পুরুষ ও মহিলা বিজয়ীর পুরস্কারে আকাশ-পাতাল তফাৎ। পুরুষ বিজয়ী এখানে পাবেন ১২,৫০০ ডলার। এ হলো মহিলা বিজয়ীর পুরস্কারের প্রায় সাতগুণ। এসবই অবশ্য সিংগলস বিজয়ীর বরাদ্দ। অপর একটি খেলায় মহিলা বিজয়ী পান মাত্র ২০০০ ডলার। এটি অবশ্য শুধু মেয়েদের জনাই আয়োজিত। সাংবাদিকদের এই খবর দিয়ে শ্রীমতী রোজমেরী ক্যাসেল বলেন যে, এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। বিশ্বের নয়জন নামকরা টেনিস পটিয়সী সাউথ প্যাসিফিক ওয়েস্ট টুর্ণামেন্ট বর্জন করেন।

এর উৎস হচ্ছে একটি আমেরিকান পত্রিকা। তাতে বলা হয়েছে যে, দর্শকরা পুরুষদের খেলা যেমন উপভোগ করে, তেমনি মেয়েদেরও। এরপরই মহিলা খেলোয়াড়রা পুরস্কারের বৈষম্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

প্রতিবাদ জানাচ্ছেন পশ্চিম জার্মানীর মেয়েরাও। তাঁরা বলেছেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁদের দেখা হচ্ছে দ্বিতীয় নজরে। সম্প্রতি তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় মেয়েদের খেলাধুলা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক। এতে উপস্থিত ছিলেন সব ক্রীড়াসংস্থার প্রতিনিধি। সম্মেলনের শেষের দিকে প্রতিনিধিদের ক্ষুব্ধ কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে। ও'রা অভিযোগ করেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি দীর্ঘ দিনের এই বৈষম্য এখনো চলছে কেন? উপস্থিত প্রতিনিধিরা দাবী করেন, এই বৈষম্য দূর করে মেয়েদের খেলাধুলায় নতুন আবহাওয়া চালু করতে হবে। এতে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই, ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি বর্তমান অনুসৃত নীতি তীব্র সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। আর সেই সুযোগ নিয়েই এবারের সম্মেলনে ঝড় ওঠে।

ঝড় উঠেছে সত্যি কথা। কিন্তু সেই ঝড়ে পুরনো এবং স্তূপীকৃত সংস্কারের [illegible] উড়ে যাবে বলা খুবই শক্ত। কারণ, এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা কমিটি শুধুমাত্র সমালোচনা করতে পারে এবং পরিবর্তনের দাবী জানিয়ে নতুন পথ অনুসরণের অনুরোধ করতে পারে। তারপর আর তাঁদের করণীয় কিছু নেই। দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসংস্থাকে প্রভাবিত করার অধিকারী তাঁরা নয়।

দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসংস্থা স্বাভাবিক নিয়মেই দীর্ঘ দিন এ সম্পর্কে বেশ উদাসীন ছিল। গত কুড়ি বছরের হিসেব নিকেশ করলে দেখা যাবে যে, মেয়েদের খেলাধুলার উন্নতির জন্য তাঁরা বিশেষ কিছুই করেন নি। এমন কি মেয়েদের এতদসংক্রান্ত ছোটখাটো সংস্থাগুলিকে স্বীকৃতি পর্যন্ত দিতে তাঁরা প্রচুর গড়িমসি করেছেন এবং কোথাও কোথাও স্বীকৃতিও দেন নি। অর্থাৎ ইচ্ছা করেই মেয়েদের খেলাধুলাকে পিছিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এখন আর সে সুবিধা নেই। সবাই চাইছেন, মেয়েদের খেলাধুলায় যথার্থ গুরুত্ব আরোপিত হোক। তাই পরিবর্তনের একটা হাওয়াও বইছে। খেলাধুলায় মেয়েদের অগ্রণী করার ব্যাপারে যথেষ্ট সুযোগ এখন বর্তমান।

সম্মেলনে কোন কোন মহিলা বক্তা মেয়েদের খেলাধুলায় দ্বিতীয় নজরে দেখার জন্য সরাসরি পুরুষদের দায়ী করেন। তাঁরা নানা তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটান তাঁদের বক্তৃতায়। কেউ কেউ ক্রীড়াক্ষেত্রের মেয়েদের অগ্রগতির ব্যাপারে নানা অসুবিধার কথা বললে উপস্থিত মহিলা প্রতিনিধিরা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এবং তাঁরা বলেন যে, পুরুষদের গা ঢিলেমির জন্য ইতিপূর্বের সব ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেছে। এছাড়াও তাঁরা আরো নানা অভিযোগে মুখর হয়ে ওঠেন। সর্বোচ্চ ক্রীড়াসংস্থা কোনো সময়েই খেলাধুলায় মেয়েদের আরো আগ্রহ সঞ্চারের জন্য এবং তাঁদের আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন চেষ্টাই করে নি।

একজন মহিলা বক্তা সম্মেলনে সবচেয়ে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটান। সর্বোচ্চ ক্রীড়া-সংস্থায় মহিলা সদস্য গ্রহণের দাবী তাঁরা জানিয়ে এসেছেন দীর্ঘদিন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন আমলই দেওয়া হয় নি। বরাবর পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহিলাদের বক্তব্য রাখার জন্য সেখানে কেউ নেই। পুরুষ প্রতিনিধিরা হচ্ছেন দেশের খেলাধুলার একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা। এভাবে মেয়েদের দীর্ঘদিন বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ ক্রীড়া-সংস্থায় মহিলা প্রতিনিধিত্বের দাবীকে দূরে সরিয়ে রেখে এভাবে মেয়েদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের এতক্ষণে যেন হুঁশ হলো। কেউ এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারলেন না। সবাই প্রায় মাথা নীচু করে বসে রইলেন। এমন সময় সংস্থার নবনির্বাচিত সভাপতি উঠে সকলের মুখ রক্ষা করলেন। তিনি বললেন, সর্বোচ্চ ক্রীড়াসংস্থায় মোট নয়জন প্রতিনিধি আছেন। এতকাল প্রতিনিধিদের সবাই ছিলেন পুরুষ। এবার থেকে নিয়মের একটু হেরফের করা হবে। সংস্থার নবম সদস্যটি হবেন একজন মহিলা। তিনি মহিলাদের ব্যাপারটা দেখা-শোনা করবেন। তবে এ ব্যাপারে তাকে যোগ্য হতে হবে। মহিলা স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার মতো ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে তাঁকে। অবশ্য পুরুষ সহযোগীরাও তাঁকে সাহায্য করবেন।

নব নির্বাচিত সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় খেলাধুলায় মেয়েদের ব্যাপারে পূর্বতন কর্তাদের অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সে জন্য তিনি সংস্থাকে নতুন করে 'রাশ-আপ' করার কথা বলেন। সংস্থার কাজ বিগত কুড়ি বছরে মোটেই সন্তোষজনক হয় নি। যা হওয়া উচিত ছিল ঠিক তার উল্টো-টাই হয়েছে। যে সুযোগ সুবিধা পাওয়া গিয়েছিল তার প্রতি যথার্থ মনোযোগ দেওয়া হয়নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগের অসদ্ব্যবহার করা হয়েছে। তাই সংস্থাকে এই সমালোচনার মুখোমুখি পড়তে হয়েছে।

সংস্থার কাজকর্ম এবং বিশেষত মেয়েদের ক্রীড়াক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ দেবার জন্য ও বৈষম্য বিলোপের উদ্দেশ্যে তিনি জন-সংযোগ আরো বাড়াতে বলেন। সংস্থা সম্পর্কে লোকের আগ্রহ যত বাড়বে ততই খেলাধুলার মান উন্নত হবে। এর সদস্য-সংখ্যাও বাড়াতে হবে এবং বিশেষভাবে মহিলা সদস্য। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা দশ মিলিয়ন। তবু জনগণের মনোযোগ এদিকে পড়ছে না। এর প্রকৃত কারণ অনু-সন্ধান করে বের করতে হবে।

সংস্থাকে আরো কর্মক্ষম করার জন্য তিনি এর চারটি কর্মবিভাগ করে প্রত্যেক বিভাগের কাজ নির্দিষ্ট করে দেন।

ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে সংবাদপত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এক সময়ে সংবাদপত্রের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাওয়া যেতো। খেলাধুলায় মেয়েদের মান উন্নয়নে সবাই তখন হাত লাগিয়েছিল। এখনো যে এই সহযোগিতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। তবে গত বৎসর এথেন্সে যে ঘটনা ঘটে গেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সবাই একটু বিমনা হয়ে পড়েছে। এথেন্সে ইউ-রোপীয়ান অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় এক-জন এমন প্রতিযোগী ছিলেন যাঁর উপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। এই দুর্বলতা কাটিয়ে আগামী মিউনিখ অলি-ম্পিকের প্রস্তুতির জন্য মেয়েদের সমস্ত দাবী মেনে নেওয়া হবে বলে সভাপতি প্রতি-শ্রুতি দিয়েছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের সমানাধিকারের সমস্ত দাবী ধাপে ধাপে পূরণ করা হবে এবং বৈষম্যও লোপ করা হবে। এজন্য প্রয়োজনবোধে সংবাদপত্রে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা হবে।

সমবেত মহিলা প্রতিনিধিদের কয়েকজন সাংবাদিকদের কাছে এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেছেন, কেন মেয়েদের খেলাধুলায় বিশেষ উন্নতি এবং অগ্রগতি সাধিত হয়নি। যদিও কিছু কিছু প্রচেষ্টা ছিল তবুও কোন লাভ হয় নি। কোন প্রচেষ্টা ফলপ্রসু না হওয়ার মূলে ছিল আন্তরিকতার অভাব। যদিও এ সময়ে মেয়েদের সদস্যসংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। এই সদস্যসংখ্যা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মেয়েদের খেলাধুলায় আগ্রহ বাড়লেও তার সুপ্রয়োগ ঘটে নি। এবার তাই মেয়েরা কোমর বেঁধে লেগেছে এ বিষয়ে আরো মনোযোগ দেবার জন্য।

দশ বছর আগে বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থায় মেয়েদের সংখ্যা ছিল স্বল্প। তখন পুরুষরা ছিল মেয়েদের সাতগুণ। কিন্তু এখন সে সংখ্যা পাল্টে গেছে। পুরুষ ও মহিলার আনুপাতিক হার এখন দাঁড়িয়েছে প্রতি তিনজনে একজন। এই হলো আর একটি তথ্য যেখান থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খেলাধুলায় মেয়েদের আগ্রহ আর আগের মতো পিছিয়ে নেই। তাই সর্বোচ্চ ক্রীড়া-সংস্থায় মহিলা বিভাগের কাজও বেড়েছে অনেক।

আগামীতে যিনি মা হবেন খেলাধুলার জগত থেকে তিনিও বিদায় নিতে চান না। এরকম প্রমাণও এখন পাওয়া যাচ্ছে। সারা দেশে একটি কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, কিপ ফিট উইথ স্পোর্ট। এ শুধু কথার কথা হতে পারে না। খেলাধুলার দিকে সবাই যখন ঝুঁকছে তখন তার সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। আর ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের সমান সুযোগ দিয়ে সমস্ত বৈষম্য বিলোপ করলেই আজকের আগ্রহ আগামী দিনে নতুন প্রতিশ্রুতি হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

—প্রমীলা

সারা রাত ধরে বাইরে টিপ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে শুনেছি কান পেতে। ভোরে উঠে দেখি সারা আকাশ জুড়ে কৃষ্ণ মেঘের মেলা। ইনসপেকসন বাংলোর জনহীন পুরীতে আমি একা, তার চার দেওয়ালের মাঝে একটি মানুষ নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সময় গুনে চলেছে সারাটি রাত।

নিখুঁত করে সাজানো বাংলোর ড্রয়িং রুম। ডাইনিং হলে সান মাইকার টেবল চেয়ার—বাসনের কাঁচের আলমারী ঝকঝকে তকতকে। বারান্দায় সামনে পেছনে টবে টবে সাজানো অর্কিড, রং বেরংয়ের লতা পাতা, দেশীয় রাজ্যের যবনিকা পাতে ময়ূর-ভঞ্জের পথে ঘাটে বনবীথিকার সে সৌন্দর্য আর নেই, তাই পথ চলতে গিয়ে দুধারে সাজানো গাছের শোভা দেখতে আজ কেউ থমকে দাঁড়ায় না, তবু বাইরে থেকে যারা এখানে আসে তাদের চোখে পথের ধারে সাজানো শাল মহুয়ার উপবন—ইউক্যালিপ-টাসের সারি সারি গাছের বাগান বেশ লাগে।

বাংলোতে বসে বারিংপোসী বাদাম পাহাড়ের পর্বতমালা চোখে পড়ে, মাইলের পর মাইল জুড়ে উঁচু নীচু পাহাড়। সবুজের জয়গাথা পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে। পাহাড় জুড়ে সন্ধ্যার ধূসরতা নামতে দেখে মনে হয় বিধাতা পুরুষের অপূর্ব সৃষ্টিরহস্য এ সব পাহাড় মানুষের মনে অহঙ্কার দূর করার জন্যে, মানুষের সৃষ্টি কত তুচ্ছ স্রষ্টার সৃষ্টিরহস্যের দুজ্ঞের্য়তার কাছে।

পাহাড়ের শৃঙ্গ ছাড়িয়ে অত উঁচুতে মেঘ উঠতে পারে না জানি। ভোরে উঠে দেখি জলভরা সাদা কালো মেঘ কুয়াশার মত পাহাড়ের গায়ে জমে। জোর বর্ষা নামেনি ক'দিন। দুদিন ধরে ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি পড়েই চলেছে। পাহাড়ের চারধারে গুরুগম্ভীর মেঘ জমতে দেখে মনে হল—যে কোন সময় আকাশ ভেঙ্গে বাদল নামতে পারে।

কাল সকালে খড়গপুর স্টেশনে নেমে অনেক দিন পর বাংলার মাটির ছোঁয়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, নিজেকে মনে হল প্রবাসী সন্তান মায়ের কোলে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। স্টেশন ছেড়ে আসতে পা আটকে এল—পঁচিশ বছর আগেকার স্মৃতি এখনও সেখানে জমে। স্টেশনের বাইরে গোলবাজারে গুজরাটী রেস্তোঁরায় চা খেতে উঠলাম—পঁচিশ বছর আগেকার দোকান আজও ঠিক তেমনি আছে। শুধু মালিকানা বদলে পুত্রের হাতে পরিচালনার ভার এসেছে।

পঁচিশ বছর আগে এমনি এক দুঃখের দিনে খড়গপুরে কর্মভার নিয়ে এসেছিলাম। ভবিষ্যৎ ভেবে কত দুর্ভাবনা করেছি সেদিন। বাইশ বছর পরে কাজের খাতিরে আমায় আসতে হয়েছে অতীতে ফেলে যাওয়া পরি-চিত সে শহরে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশ কাল সবই বদলে গেছে। বিংশ শতাব্দীর মানুষ বড় বেশী বদলেছে এসময়ে। বয়স বাড়লে মানুষের আবেগ অনুভূতি কমে আসে সাধারণভাবে। আমার বেলায় কিন্তু তার বিপরীত। বয়স বেড়েছে, দায়িত্বের বোঝাও—কিন্তু আবেগ ও অনুভূতি বেড়েছে দ্বিগুন।

রাতে ট্রেণে এক রকম জেগেই কেটেছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেণ সারা রাতের ভেতর এসেছে মাত্র চারশ' কিলোমিটার পথ। কখন ভোর হয়েছে, রোদ উঠেছে, বন্ধ কামরার ভেতর থেকে তা জানতে পারি নি। ভোর হওয়ার আগে জানালা খুলে উঁকি দিয়ে দেখেছি ট্রেণ টাটানগরে দাঁড়িয়ে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ ধীর গতিতে শালজঙ্গল, কাঁকর মাটির রাস্তা ঘেরা গিধনি, ঝাড়গ্রাম, সরডিহা, কলাইকুণ্ডা স্টেশন ছাড়িয়ে খড়গপুর জংসনে এসে দাঁড়িয়েছে, নিমপুরা ইয়ার্ড ও শিল্পনগরী খড়গপুরের নতুন সাজ চোখে বেশী করে ধরা পড়ে। শিল্পশ্রী বৃদ্ধির মান ধরা পড়েছে পথের দুধারে সাজানো বাংলো দেখে। সর-ডিহা কলাইকুণ্ডা সামরিক বিমানঘাটির আশেপাশে শাল জঙ্গলের গা ঘেঁষে জেগে ওঠা রেস্তোঁরা। পিচ মাড়ানো রাস্তা বিজলী বাতির আলোকস্তম্ভ চোখে পড়ল। দেখ-লাম কালের সঙ্গে সব কিছুরই আমূল পরি-বর্তন এসেছে। শুধু বদলে যায়নি আমার মন। সে আজও পঁচিশ বছর আগেকার অনুভূতি নিয়ে খুঁজে ফেরে মালঞ্চা নিমপুরায় ফেলে আসা পুরাতন পরিচিত শহরতলীকে।

গোলবাজার তেমনি আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম তার চারধার—কোন পরি-বর্তন চোখে পড়ল না। মসজিদ, গুরুদ্বার, গির্জার পাশ কাটিয়ে গোরস্থানের পাশ দিয়ে চলেছি জাতীয় সড়কের পাশে। মনে পড়ল, কত রাতে গোরস্থানের পাশ দিয়ে ফিরতে গিয়ে গা থম্ থম্ করছে অজানা ভয়ে। আজ তার পাশাপাশি রেল কলোনীর বিরাট বিরাট সৌধ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দিনের আলোয় ঝলমল করছে। দূর থেকে মালঞ্চা রোডে নাইডু বিল্ডিং চোখে পড়ল। সামনে ভেসে উঠল এক পল্লীবধূর সরল মুখচ্ছবি—কোলে তার দু বছরের মেয়ে একগোছা তাজা গোলাপের মত। কতদিন আগেকার ছবি—মনে হয় যেন এই সেদিনের। পঁচিশ বছর বয়সের মেয়ে আজ কুলবধূ—পল্লীবধূ, সংসারের সর্বময় কর্ত্রী। থমকে দাঁড়ালাম বাড়িটীর দিকে চেয়ে। তাকিয়ে দেখলাম—তিনতলার একখানি ফ্ল্যাট। অজান্তে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে প্রশ্ন করল—সেদিন কি আর ফিরে পাওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম প্রবোধদার ভবিষ্যৎবাণী—অনেক বড় হতে হবে। সংসারের তুচ্ছ ছোটখাটো ঘটনাকে ধীরের মত মন থেকে ঝেড়ে ফেল।

বন্দে বদলী হয়ে চলে যাওয়ার পথে খড়গপুর ছেড়ে গেছি কতকাল আগে। আমার মনের গন্ধ আলমারির অন্ধকারে ভরা কোন তাকে তার স্মৃতি এতদিন ধূলি ধূসরিত হয়ে পড়েছিল জানি না। আজ [illegible] পথে আবিষ্কার করলাম—আমার মন থেকে কিছুই হারিয়ে যায় নি—সব জমা

হয়ে আছে আমার অন্তরের মণিকোঠায়—স্মৃতির অ্যালবামের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। শুধু হারিয়ে গেছে সেদিনের হাসিখুসীতে ভরা যুবক—আজকের ভারাক্রান্ত জরাজীর্ণ প্রৌঢ়ত্বের মাঝে।

উত্তপুকুর-নিমপুরার পথে চোখে পড়ল মিঃ সুবিরয়া নারায়ণের পুরাতন বাংলো। কমলা সুবিরয়া নারায়ণের ঢলঢলে শ্যামল মুখখানি ফুটে উঠল। পঁচিশ বছর আগেকার কমলা আজ পঞ্চাশের কোঠায়। আমারই সমবয়েসী সে। আমার অফিসে কাজ করত। ঘর বাঁধার কত রঙ্গীণ স্বপ্ন দেখেছি তার চোখেমুখে। অবসর পেলেই সে আমায় শোনাত তার মনের কথা। কেমন করে সে আমায় বিশ্বাস করতে শিখেছিল কে জানে? বিশ্বাসের জোরে মেয়েদের মনের অতি বড় গোপন কথাও সে আমায় শুনিয়েছে।

কমলা দেখতে সুশ্রী নয়। বসন্তের দাগ সুস্পষ্ট তার উজ্জ্বল শ্যাম মুখে। তাই তাকে ফুলের ডোরে বাঁধতে কেউ এগিয়ে আসেনি তখনও। তাতে কোন ক্ষোভ ছিল না তার। জরাজীর্ণ পিতার শেষ যাত্রার পথের কথা ভেবে কমলা মুষড়ে পড়ে। তার ভবিষ্যৎ পথের নিশানা না পেয়ে।

তখন মাঘের শেষ। আকাশে বাতাসে শীতের মৃদু আমেজ। সেদিন ছিল মাঘী-পূর্ণিমার চাঁদনীরাত। কমলা আমায় নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের বাসায় রাতের খাওয়া খেতে। আগেই বাসার পাট চুকিয়ে প্রবোধদার বাড়ীতে উঠেছিলাম, নিমন্ত্রণে আপত্তি জানাবার কোন কারণ ছিল না। সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে কমলাদের বাসায় যাই। অসুস্থ বাবা ও বৃদ্ধা ঝি ছাড়া তাদের বাড়ীতে কেউ থাকে না।

রেলওয়ের রিটায়ার্ড অফিসার সুবিরয়া নারায়ণ—অন্ধ্রের অধিবাসী। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি আমায় ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার যে সারগর্ভ উপদেশ দিয়েছিলেন তা আজও আমার মনে আছে। তিনি বলেছিলেন—চাকরী জীবনে স্বীকৃতি জোটে কাজের উপর নয়—উপরওয়ালার খেয়াল খুসীর উপর নির্ভর করে। তাই চাকরী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত বঞ্চিতের অভিশাপ হয়ে দেখা দেয় বেশীর ভাগ অফিসারদের জীবনে। কমলা সব শুনেও একটা কথা বলে নি।

খাওয়ার শেষে সামনের লনে দাঁড়িয়ে সে আমায় বলেছিল—অফিসে অনেকে আপনাকে উপহার দিয়েছে অনেক কিছু। আমারও ইচ্ছা হয়েছিল দেবার। লজ্জায় চেপে রেখেছি। দুটি বছর ধরে আপনার কাছ থেকে যে সব অমূল্য সম্পদ আহরণ করেছি তার বিনিময়ে উপহার দেবার মত কোন কিছু আমার নজরে পড়েনি। সবই তুচ্ছ মনে হয়েছে।

এখানে কেউ নেই। তাই আমার ক্ষুদ্র উপহার দেখে কেউ হাসবে না—শুধু দেখবে নীল আকাশের বুকে পূর্ণিমার চাঁদ—ছায়া-ঘেরা বনবীথিকা। সাক্ষী থাকবে রাত্রি। ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানিয়ে সে বলেছিল, বম্বে গিয়ে কমলার বিষয়ে কিছু লিখবেন—দু বছর ধরে তাকে যা দেখে গেলেন তার নিখুঁত একটা চিত্র আঁকবেন কালি-কলমের আঁচড়ে।

তাকে কথা দিয়ে এসেছিলাম—কিন্তু তার কথা লেখা হয়ে ওঠে নি। এত বছর পর, আজকে অদেখা কমলার কথা মনে করে তার কথা লিখে গেলাম।

কমলার জবাব খুঁজতে খুঁজতে কলাই-কুণ্ডা বিমান বন্দরের পাশ দিয়ে জোরে গাড়ী ছুটিয়ে বেরিয়ে এসেছি। শালবনের ভেতর দিয়ে সোজা নতুন পথ। মাইলের পর মাইল জঙ্গল পথ ছেড়ে চোখে পড়ে আদিবাসী কিষাণের গ্রাম। খড়িমাটির আলপনা আঁকা তাদের ছোট্ট কুটির। আদিবাসীদের হাতে সাজানো ছবির মত জাপানী প্রথায় সবুজ ধানের ক্ষেত।

শস্য শ্যামলা ক্ষেতের বুক বেয়ে কালো মেঘের ছায়া ঘিরে বয়ে এসেছে হিমেল হাওয়া পাহাড়ের গায় লুটোপুটি খেয়ে, শালবনের একটানা সন্‌সন্‌ শব্দ গাড়ীর গায়ে আছড়ে পড়ে মনে আনে দূরের পরশ। লোধাশোল পেরিয়ে—ঝাড়গ্রাম মোহনপুর ডাইনে বাঁয়ে ফেলে বহরাগড়ার রাস্তার নিশানা দেখে চলেছি। চড়াই বনপথ থেকে দীঘলচুলের বেণীর শেষ প্রান্তের মত দূরে রাস্তার উপর চোখে ভেসে উঠল একটি তোরণ—ইংরেজী বাংলা ও হিন্দীতে লেখা—নানা কথা, ড্রাইভার জানায়—বাংলা বিহার সীমান্ত গ্রাম—চিঁচড়া-দারিসোল।

এতক্ষণ ভুলেছিলাম আমি বাংলা ছাড়া, বাংলার মাটিতে অতিথির মত এসেছিলাম কয়েক ঘন্টার মত। অনাহূতের মতই আমায় বাংলা ছেড়ে যেতে হচ্ছে। চেক-পোস্টে গাড়ী বেঁধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুটো লেখার উপর আমার দৃষ্টি আটকে রইল—বাংলা তোমার আশা পথ চেয়ে রইল—যাত্রা তোমার শুভ হোক্।

চেক্‌পোস্ট ছেড়ে বিহারের সিংভূম জেলার শস্যশ্যামল ক্ষেতের মাঝপথ ধরে গাড়ী ছুটে চলেছে। পল্লীর নিভৃত নিকেতনে আমার মনে তার ছবি মিলিয়ে আলপনা এঁকে কখন রাজপথ ছেড়ে জনপথ ধরেছি, বিহার উড়িষ্যা সীমান্তে। দূরে কেওনঝড় ময়ূরভঞ্জ পর্বতমালার নিলাদ্রি শিখরে শিখরে তখনও চোখে ভাসছে—বাংলা দেশ তোমার আশাপথ চেয়ে।

পূব আকাশে অরুণোদয়ের আগে ময়ূর-ভঞ্জের পাহাড় উপত্যকা ঘেরা শালপিয়ালের বনপথ ধরে একশ সত্তর মাইল দূরে রাজধানী ভুবনেশ্বরের পথে বেরিয়ে পড়েছি। গতকাল সন্ধ্যে অবধি মনে মনে সময়ের ছক্ কষেছি ভুবনেশ্বর হয়ে পুরীর সমুদ্র-তটে অনাথের নাথ পুরুষোত্তম দর্শন করে ফিরে আসব পরদিন। রাতে বন্ধুবর সাইটিকা ব্যথার কথা জানিয়ে সঙ্গে যেতে অসম্মত হলেন। একা যেতে হবে এতখানি পথ ভেবে মনমরা হয়ে স্থির করলাম ভুবনেশ্বর পোঁছে দেখব প্রভু জগন্নাথ আমায় দর্শনে টানেন কিনা:

বর্ষা বাদল মাথায় করে অতি ক্ষিপ্রতায় গাড়ী চলেছে রাজধানীর পানে। আকাশ ভেঙ্গে অঝোরে ঝরছে বৃষ্টিধারা—গুরু-গম্ভীর মেঘের গর্জন। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলক খেলছে দিগ্বলয় রেখায় রেখায়। স্তব্ধ প্রকৃতির থমথমে ভাব। ছত্রিশ মাইল দূরে বালেশ্বর-ময়ূরভঞ্জ সীমান্তে বুড়িবালাম নদীর অপর পারে রোদের ঝলক দেখে মনে আশা জাগল রাজধানীতে সময়ে পোঁছানো যেতে পারে।

পথে বুড়ি বালামের তীরে খুঁজেছি শহীদ যতীন মুখার্জী আর তার সঙ্গীদের, স্মৃতি-নদীর চরে বালুকা বেলায়। যে সব কিশোর বুকের রক্তে অর্ঘ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে তাদের স্মৃতি কি দেশবাসী ভুলেছে। তাই বুড়িবালামের তীরে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে খুঁজে ফিরলাম বাঘা যতীনের বীরত্ব কাহিনী। খুঁজতে খুঁজতে চোখে পড়েছে বুড়ীবালামের সুদীর্ঘ সেতুর স্তম্ভে স্তম্ভে বিজয় বৈজয়ন্তী হাতে ধরে অতন্দ্র প্রহরীর মত জেগে বাঘা যতীনের দল। বুড়িবালাম, সালন্দী নদী ছাড়িয়ে পাঁচনম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে এগিয়ে এসেছি অনেকটা পথ। আম কাঁঠালের ছায়া ঘেরা বৈতরণী নদীর তীরে তাঁবু ফেলেছে বানে ভাসা গ্রামের উদ্বাস্তুর দল। সর্বস্বান্ত বন্যাগ্রস্ত মানুষরা উদ্বাস্তু শিবিরে মাথা গুঁজে দিন কাটায় সরকারী লংগরখানার লপসী, চিড়ে মুড়ি খেয়ে।

বানের জলে ডোবা ধানের ক্ষেতে জেগেছে বালুর চর, বাড়ন্ত ধানের চারার শিরে শিরে জমে থাকা লাল পলি শুকিয়ে ফেলছে আধমরা চারাগুলিকে। আউসের শিষ মাথায় ধরে শুয়ে আছে মাঠের পর মাঠ পলিমাটী, কাঁকর বালুকা ঢাকা হয়ে। মজে যাওয়া মাঠের পানে তাকিয়ে কিষাণের দুচোখ বেয়ে ঝরতে থাকে শ্রাবণের বাদলধারা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা ভাবে বানের জলে ভেসে যাওয়া মাঠের বুকে তারা ফলিয়েছে সোনার ফসল বছরের পর বছর। হেমন্তের শেষে সোনার ফসল তুলে উঠোন ভরে তোলার রঙীন স্বপ্ন দেখেছে এই সেদিনও: সে স্বপ্ন সফল করতে আগামী ফসলের পানে তাকিয়ে তাদের সময় গুনতে হবে দীর্ঘ একটা বছর।

ব্রাহ্মণী নদীর পুলের পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম বালুচরে ঢাকা খরস্রোতা নদীর পানে, ওপারে পাহাড় কেটে তৈরী হয়েছে নতুন পুল। পাহাড়ের তটদেশে নদীর কোল ঘেঁষে শিবের মন্দির, স্নানের ঘাট—সাধুর আস্তানা। গাঁয়ের মেয়েরা ব্রাহ্মণীর ঘাটে স্নান সেরে শিবের মাথায় বেলপাতা চড়িয়ে মানত করে দূরের গাঁয়ে ফিরে যায় আপন আপন ঘরে। আতপচালের নৈবেদ্য সাজিয়ে কেউ মানত

করে পতি পুত্রের কল্যাণ—কেউ ধনদৌলত—কেউ রোগ নিরাময়। পুল পার হয়ে গাড়ী থেকে প্রণাম জানিয়েছি মহাপ্রভুকে, আনন্দ করতে মন সায় দেয়নি।

দুদিক থেকে মহানদী-কাঠজুড়ী নদী-ঘেরা পুরাতন রাজধানী কটক শহর—দ্বীপের মত, কালের কবলে কাঠজুড়ী মহানদীর প্লাবনে কটকের অস্তিত্ব কোনদিন লোপ পেতে পারে ভেবে নতুন রাজধানীর পত্তন হয়েছে ভুবনেশ্বরে। সরকারী দফতর সব স্থানান্তরিত হয়েছে সেখানে। শুধু পড়ে আছে উড়িষ্যা হাইকোর্ট অতীতের ঐতিহ্য বুকে ধরে।

কখন মহানদী কাঠজুড়ীর পুল পেরিয়ে ডেলটা ক্যানেলের উপর এসেছি জানি না। ক্যানেলের সুউচ্চ সেতুর উপর থেকে নজরে পড়ল লাজনম্র নববধূর বেশে রাজধানী ভুবনেশ্বর—উদয়গিরি খণ্ডগিরির প্রচ্ছদপটে আঁকা ছবির মত শহর। যুগে যুগে লিঙ্গরাজ যে আশিস জানিয়েছেন, ভাবীকালের ভারতীয় স্থপতিরা তাঁর সে আশিসকে রূপ দিয়েছেন পাহাড় জঙ্গলঘেরা কাঁকর পাথরের বুকে রাজপথের দুধারে মনমাতানো স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শনের মাঝে।

বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, আলো জল—সব প্ল্যান করে তৈরী—ছবির মত দেখতে। কোন সে নিপুণ শিল্পী—যার কল্পনা রূপ নিয়েছে ধু ধু মরুপ্রান্তরের মত শূন্য পার্বত্যভূমির দিকে দিকে—পটে আঁকা ছবির মতন। কার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত স্বপ্ন দিয়ে গড়া বিশ্বকবির বিরাট এ কল্পনা।

ভুবনেশ্বরের সঙ্গে কলকাতার তুলনা করে দেখলাম জরাভারে সে শহর ধুঁকছে—গুনে চলেছে শেষের দিন আর কতদূর। এককালে প্রাচ্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহর, শিল্পে, বাণিজ্যে, আভিজাত্যে প্রাচ্যের দেশগুলির ঈর্ষার ইন্ধন জোগাত। পাশ্চাত্যে লণ্ডন শহরের পর দ্বিতীয় নগরী কলকাতা ইংরেজ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের এডেন বন্দর থেকে প্রাচ্যে বার্মা, সিঙ্গাপুর, মালয় নির্ভর করত তার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর। অবহেলা অনাদর সয়ে সয়ে কলকাতা শেষ হতে চলেছে,—সে সব হারাতে বসেছে—শক্তি, সামর্থ্য, ঐশ্বর্য। সবার উপর আভিজাত্য—যার উপর নির্ভর করে সে ভারতের দিকে দিকে জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র প্রচার করেছিল, যে বাংলাকে লক্ষ্য করে মহামতি গোখেল বলেছিলেন—বাংলা যা আজ ভাববে—সারা ভারত কাল তা ভাবতে শিখবে—সে বাংলা আজ দ্বিখণ্ডিত। স্বাধীন ভারত বাংলার মহিমা আজ ভুলে গেছে—তাই কলকাতা অবজ্ঞায় অবহেলায় দূরে সরে আছে।

দফতরের কাজ শেষ করে ছত্রিশ মাইল দূরে মহাসিন্ধুর পারে নীলমাধব দর্শনে চলেছি। শরতের ম্লান সন্ধ্যা নেমে এসেছে চিল্কা হ্রদের ওপারে। তারই মূর্ছনা বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে মহাসাগরের পরপার হতে দূর দূরান্তের পথে। নিশ্চিন্ত আরামে গাড়ীতে বসে চলেছি। দূর থেকে জগন্নাথের ধ্বজা চোখে পড়লে হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে বললাম—করুণাময়—অপার করুণা তোমার।

আমার আকুল আবেদনে তুমি সাড়া দিয়ে আমায় টেনে এনেছ তোমার দরবারে কি এক অমোঘ আকর্ষণে। বিলীয়মান সূর্যরশ্মির এক ঝলক, চোখে মুখে আবির কুঙ্কুম মাখিয়ে জানিয়ে গেলেন—তিনি ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু, চিরযুগে তাঁর স্থান ভক্তের হৃদয়।

সন্ধ্যার অনতি পরে স্বর্গদ্বারে সাগর বেলায় দাঁড়িয়ে দেখেছি সান্ধ্যবায়ুসেবীদের—মহামানবের সাগর তীরে। কেউ এসেছে স্বাস্থ্যের সন্ধানে—কেউ মনের খোরাক জোগাড়ে—কেউ দেশে দেশে ঘুরে ফিরছে মানুষের সন্ধানে। মনের মানুষ খুঁজে পেয়ে কেউ এসেছে নতুন করে ঘর বাঁধার কল্পনাজাল বুনতে।

মানুষের মেলায় এসে আমিও খুঁজে ফিরছি এমনি এক মানুষকে মানুষের মাঝে। ক্ষেপার পরশ পাথর খুঁজে ফেরার মত। শাল পিয়ালের বনে বনে, নদীনালার তীরে তীরে, রাজপথ জনপদের দুধারে পার্বত্য অরণ্যের গুহায় গুহায় শতাব্দীর পর ... মানুষ মানুষ খুঁজেছে ... আমি তাদেরই একজন।

ময়ূরভঞ্জের পাহাড়ের আড়ালে যে সূর্যকে উঁকি দিতে দেখেছিলাম সাতসকালে, সে অস্ত গেল দুশ মাইল দূরে পুরীর ঝাউ-মালার অন্তরালে. সারাদিনে সে এক চক্রবাল থেকে অন্য চক্রবালে ঘুরে এসেছে—আমিও ছুটে এসেছি তার পেছনে পেছনে।

কাজের চাকার আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেকে বেঁধে রেখেছি সারা দিনমান। রাতের অন্ধকারে বিশ্রামের অবসরে সাগর বেলার হোটেলের নিভৃত কক্ষে শুয়ে একমনে শুনে চলেছি—কার মর্মব্যথা গুমরে উঠছে বহুদূর থেকে। সাগরের উত্তাল তরঙ্গে ভর করে সে ব্যথার গুঞ্জন ছুটে এসেছে আমার কাছে। সে ব্যথার ঢেউ আমার মনের গহনে উঠছে, ভাঙছে—অশ্রুধারায় উপচে পড়ছে শেষে।

নির্জন সাগরের কোলে, ফেনিল উচ্ছ্বাসের মাঝে কার মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস শুনি কান পেতে। ব্যর্থ জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা কত পাহাড় পর্বত, নদনদী, গিরি-কান্তার পেরিয়ে মহাসাগরের হাহাকার রব ধরে ছুটে এসেছে আমার পেছনে পেছনে। রাতের অন্ধকারে তাই আমার চোখে ঘুম নেই। দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায় হেলান দিয়ে আঁধারে ভরা সাগরের পানে তাকিয়ে। অশ্রুভারাক্রান্ত মনের বেদনা জানাতে সাগরের শুভ্র জলরাশি গড়িয়ে পড়ছে বালুকা বেলায় বুকে শত মিনতি নিয়ে।

ভোরের আলোয় চোখ খুলে খুঁজে ফিরেছি কে সে? সারারাত ধরে তার ব্যথার কাহিনী আমায় শুনিয়ে গেল বিনিয়ে বিনিয়ে। নীল সাগরের জলরাশির পানে তাকিয়ে উত্তাল তরঙ্গের মাঝে দেখতে পেলাম ফেলে আসা অতীতের শত দুঃখ-দুঃখের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা কুঞ্জবীথিতলের হারিয়ে যাওয়া এক মানুষকে।

(ওপরে) হরপার্বতী, (নীচে) কৃষ্ণলীলা
ডানদিকে (ওপরে) বিলেত ফেরৎ—অপর্ণা সেন, (মধ্যে) নিমন্ত্রণ—সন্ধ্যা রায়, (নীচে) প্রতিবাদ — বিশ্বজিৎ এবং মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়।

### একাঙ্কিকা প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রসদনে সম্প্রতি পাঁচদিনব্যাপী যে একাঙ্ক নাট্য উৎসব হয়ে গেল, সেই উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকার আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, 'সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই নাট্যশাখাটি কী রূপ পেয়েছে এবং কোন্ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে', তারই একটি সুস্পষ্ট চিত্র ঐ উৎসব মারফৎ ধরা পড়বে।

পাঁচ দিনে পনেরোখানি একাঙ্ক নাটক অভিনয় করবার জন্যে যে পনেরোটি দল উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা এসেছিলেন বর্ধমান, ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী—মাত্র এই চারটি জেলা থেকে। অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের একাঙ্ক নাট্য-আন্দোলনের রূপটি এই উৎসবের মাধ্যমে ধরা পড়েনি। রবীন্দ্রসদনের কার্যনির্ধারক সমিতির সম্পাদিকার বিবৃতি থেকে জানা যায়, যথেষ্ট সময় হাতে না থাকায় তাঁরা সবক'টি জেলার নাট্যকে দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেননি।

যে-পনেরোটি একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়েছিল, সেগুলি নিশ্চয়ই বর্তমান কালের সাধারণ মানুষের ধ্যানধারণাকে মূর্ত করে তুলেছে। চিন্তার গভীরতায় সবগুলি যেমন সমান নয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এদের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। রমেন লাহিড়ী রচিত **'রাজযোটক'**—যা হচ্ছে শেকভের 'দি প্রোপোজাল'-এর অনুবাদ—দুই 'খড়ের আগুন'-ধর্মী বিবাহাকাঙ্ক্ষী যুবক-যুবতীর 'চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা' নিয়ে সুন্দর একটি হাল্কা হাসির নাটক। এ-নাটকের ঘটনা কোনো বিশেষ কাল বা দেশে সীমাবদ্ধ নয়। শৈলেশ (পিকু) গুহ নিয়োগীর **'রিহার্সাল'** ছোট ছোট নাট্যসংস্থার আর্থিক ও সাংগঠনিক সমস্যাকে দর্শকসমক্ষে তুলে ধরে; অবশ্য দর্শকরা এই সব সমস্যা ও তাদের সমাধান সম্পর্কে যে খুব বেশী আগ্রহী, প্রেক্ষাগৃহের প্রতিক্রিয়া থেকে তা বোধ হয় না। তরুণ সংঘের নাট্যশাখা ফোকাস নিবেদিত **'হর-বদলের মেলায়'**ও একটি হাসির নাটক; রচয়িতা হচ্ছেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্য। 'হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশান'কে বাহ্য বিষয়বস্তু করে আজকের দিনের মানুষের নানাবিধ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার আপ্রাণ চেষ্টা এই একাঙ্কিকার ভিতর দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে পরিস্থিতি রচনায় হাল্কা হাস্যরস সৃষ্টির দিকে নজর দিতে গিয়ে নাট্যকার সম্ভাব্যতাকে প্রায়ই উপেক্ষা করেছেন। চব্বিশ পরগণার বাণীরূপা অভিনীত ও বাবলু দাশগুপ্ত রচিত 'উত্তর এই অবক্ষয়' নাটকে একটি হ্যান্ডব্যাগকে কেন্দ্র করে বাসযাত্রী ও পথচারীদের মধ্যে একটি রহস্যপূর্ণ আবর্তের সৃষ্টি করা হয়েছে বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত একটি চমকের মাধ্যমে নাটকের গতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটায় আমাদের মনে হয়েছে, ঐ চমকটুকুর (কোনো বাসযাত্রীর ফেলে-যাওয়া হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে একটি সদ্যমৃত শিশুর সন্ধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাগটির মালিক বলে দাবিকারীর দাবি পরিত্যাগ করা) জন্যেই অতিবিস্তৃত বাগাড়ম্বরের ঘনঘটা। চিত্তরঞ্জন থেকে আগত নাট্যরূপা নিবেদিত **'রাত্রি'** নাটকের মর্মার্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'রাত্রির অন্ধকার পেরিয়ে আলোক প্রত্যাশী সমগ্র মানুষের সংস্কার মুক্তির ও অন্যায়ের প্রতিরোধের বলিষ্ঠ ঘোষণা, সার্থক জীবনবোধের পূর্ণ উপলব্ধি এই নাটকের মূল উপজীব্য।' নাট্যরূপ দানের সময়ে হয়ত এই উদ্দেশ্যই ছিল; কিন্তু শেষপর্যন্ত এই নাটক থেকে যা উপলব্ধি করা যায়, তা হচ্ছে মৃত্যু থেকে মৃত্যুভয় ভয়ঙ্কর এবং সেই কারণেই বর্জনীয়। একটি অত্যন্ত নতুন ধরনের নাটক হচ্ছে ইছাপুরের শিল্পায়ন অভিনীত

ও সত্যেন ভদ্র রচিত 'খবিদিকা কঙ্কাল'। আসলে এটি পাঁচটি বঞ্চিত, শোষিত, উৎপীড়িত চরিত্রের পাঁচটি মর্মন্তুদ কাহিনী। পাঁচটি শিল্পী বারে বারে পাঁচটি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পাঁচটি আট থেকে দশ মিনিট স্থায়ী নাটকে অভিনয় করেছেন এবং শেষপর্যন্ত সকলে মিলিত কণ্ঠে বলেছেন : ভাবীকাল, বর্তমানের আবর্জনা-স্তূপ সরিয়ে দিয়ে তুমি এস। 'হৃদ-বদলের মেলায়' নাটকের রচয়িতা রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের আর একটি নাটক—'এক যে ছিল রাজা' অভিনীত হয়েছে নৈহাটি থেকে আগত যান্ত্রিক গোষ্ঠী দ্বারা। নাটকটি রূপকধর্মী. এর বক্তব্য পরিষ্কার—প্রজাপুঞ্জ যদি সংগঠিত শক্তি নিয়ে অত্যাচারী শাসকদলকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে, তাহলে শাসকদলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। রূপকের রূপটি যথাসম্ভব বজায় রাখবার চেষ্টা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে পরিস্থিতি ও সংলাপ কিছুটা মোটা ধরনের বাস্তবঘেঁষা হয়ে নাটকের সমগ্র রূপকে ক্ষুণ্ণ করেছে। সমান কথাই একটু ছোট করে বলা হয়েছে আরও দুটি নাটকে—এক. দুর্গাপুর থেকে আগত মহুয়া সম্প্রদায় নিবেদিত ও রবি সাহা রচিত 'আখের স্বাদ নোন্‌তা' এবং দুই, শিয়ালদাবাজারের জাগরণ সংঘ অভিনীত ও রতনকুমার ঘোষ লিখিত 'সমুদ্র সন্ধানে'-তে। দুটি নাটকেই বলা হয়েছে সমাজের বঞ্চিত মানুষেরা একযোগে আঘাত হানতে পারলে ভীরু, কাপুরুষ শোষক শ্রেণীর পরাজয় সুনিশ্চিত।

নবীন নাট্যকারদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নাট্যকার রতনকুমার ঘোষের আরও দু'খানি নাটক এই উৎসবে অভিনীত হয়েছে—এক, আড়পুরের জাগৃতি সম্প্রদায় নিবেদিত 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে' এবং দুই, হাওড়া থেকে আগত লোকরঙ্গ দ্বারা উপস্থাপিত 'মহাকাব্য'। আমরা অন্যত্র বলেছি এবং এখনও বলছি, শ্রীঘোষ তাঁর চিন্তায় ভাবনায় মৌলিক এবং অভিনব, কিন্তু নাটকের মধ্যে তাঁর চিন্তা আজও বেশ সুসংবদ্ধভাবে যথেষ্ট দানা বাঁধতে পারে না সব সময়ে। ধরুন, তাঁর 'মহাকাব্য' নাটকটি। তিনি বলতে চেয়েছেন, জনসাধারণ তাদের মাতৃভূমিকে ভালোবাসে; কিন্তু বারে বারে তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। অথচ দেখা যায়, নেতৃবৃন্দ দেশের ভালো-মন্দের দিকে অন্ধ থেকে নিজেদের মতবাদকে ভালোবাসেন এবং জনসাধারণকে তাঁদের প্রদর্শিত পথের পথিক করতে চান। তিনি আরও বলতে চেয়েছেন, এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ অংকে দেখা যাবে, জনসাধারণ আর নেতৃত্ব দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে নিজেরাই দেশকে ভালোবাসবার পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু তিনি এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে-রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন, তার মধ্যে শ্বেতাধিপতি, সংগ্রাম সিংহ, অগ্নিদূত ও বিচিত্রকুমার পর্যন্ত বোঝা গেলেও তাঁর সৃষ্ট 'সর্বশূন্য'কে হৃদয়ঙ্গম করা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এবং বাজীকর কে? নাট্যকার স্বয়ং? অথবা কোনো যথার্থ দেশভক্ত? 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে' না 'পিতামহদের উদ্দেশে'? উদ্দেশ্য কথাটা অভিপ্রায় অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন, কি উদ্দেশ্যে আগমন? আর উদ্দেশ কথার অর্থ হচ্ছে লক্ষ্য; যেমন, আমি অমুককে উদ্দেশ করে কথাটা বলছি। নাটকটির নামকরণ 'পিতামহদের উদ্দেশে' হলেই শোভন ও নাট্যকারের উদ্দেশ্যানুযায়ী হত। নাট্যকার কল্পনা করেছেন, পঞ্চবিংশ শতাব্দীর লোক সভ্যতার পথে অগ্রসর হবার ব্যাপারে অকৃতকার্যতার দরুণ বিংশ শতাব্দীর লোকেদের দোষী সাব্যস্ত করে তাদের বিচার করছে। বিংশ শতাব্দীর প্রতিভূস্বরূপ মঞ্চে তথা নাটকে তিনি উপস্থিত করেছেন, লেখক, প্রশাসক ও বাহককে। বাহক অর্থে নিশ্চয়ই নির্বাহী বা এক্সিকিউটিভ। আমরা তো জানি, জুডিসিয়ারি অর্থাৎ বিচার বিভাগ প্রশাসক বা গভর্নমেন্টকে সব সময়ে মানতে বাধ্য নয় এবং তার কার্যের সমালোচনা করবারও অধিকারী। কিন্তু নির্বাহী অর্থাৎ নাট্যকার যাকে বাহক বলেছেন, সে তো প্রশাসকের ইচ্ছার অধীন। কাজেই অন্যায়ের জন্যে তাকে আলাদা করে অভিযুক্ত করা যায় কি হিসেবে, তা বোঝা শক্ত। এবং পঞ্চবিংশ শতাব্দীর লোকেদের নামকরণেও যথেষ্ট ত্রুটি আছে। নাটকের বিশেষ করে একাঙ্ক নাটকের ভাষাকে অযথা পল্লবিত না করে ঋজু করারও প্রয়োজন উপেক্ষনীয় নয়।

সেন-র‍্যালে অ্যাথেলেটিক ক্লাব অভিনীত ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী লিখিত 'আমরা কবরে যাব না' আরউইন শ' রচিত 'বেরি দি ডেড' দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও একটি অত্যন্ত সু-রচিত নাটক। ভিয়েতনামের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বহু সাধারণ সৈনিকই যে এই যুদ্ধকে অন্যায় ও মানবতা-বিরোধী বলে মনে করছেন, এই বক্তব্যকে যথেষ্ট নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে নাটকটির মাধ্যমে। নাটকটির উপস্থাপনা দেখে মনে হয়, জোনাল লাইটিংয়ের সাহায্যে নাটকটি অভিনয়ের কথা ভাবা হয়েছে। রবীন্দ্র সদনে সম্ভবত এই ধরনের আলোর ব্যবস্থা করার সুবিধা না থাকায় সেন-র‍্যালে ফ্রিজ (বা ট্যাব্লো) প্রথায় অভিনয় করেছেন। নৈহাটীর কুশীলব নিবেদিত ও ভোলা দত্ত রচিত 'কিউবা' নাটকটিতে রক্তস্নাত কিউবার পটভূমিকায় মানুষের মুক্তিযুদ্ধের চিত্র আঁকবার প্রয়াস দেখা যায়। সাধারণ মানুষও কেমন করে ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে পড়ে, তাও দেখানো হয়েছে; কিন্তু পরিস্থিতি সৃষ্টি সর্বত্র বাস্তব ও বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া ভাষা সম্বন্ধে সতর্কতার প্রয়োজন। বরাহনগর মিউনিসিপ্যাল এম্‌প্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব মধুসংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'তার নামটি রঞ্জনা' নাটকটি অভিনয় করেছেন। বিদেশী নাটকের অনুসরণে রচিত এই নাটকের মূল উপজীব্য হচ্ছে আবেগপ্রবণতা। একটি যুবক ফাঁসীর মঞ্চের মুখোমুখী দাঁড়িয়েও নিজের বহুকালের অদেখা ছোট বোনের কাছে কিছুতেই স্বীকার করল না যে, সে তারই সেই হারিয়ে-যাওয়া দাদা। বোন তাকে কবুল করাতে ব্যর্থ হয়ে চলে যাবার পরে তার করুণ আত্মপ্রকাশ দর্শকদের চক্ষুকে ক্ষণিকের জন্যে সজল করে তোলে। কিন্তু যুবকটি তার বেকারত্বের জন্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় সমাজবিরোধী খুনীরূপে চিহ্নিত করে কোন্ সামাজিক প্রতিবাদ জানিয়ে গেল, তা আমরা বুঝতে পারলুম না। হুগলী জেলার উত্তরপাড়া থেকে আগত আমরা সংস্থাটি তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় রচিত, পরিচালিত এবং অভিনীত 'শ্লোগান' নামে যে একাঙ্ক মৌলিক নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন, সেটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বিক্ষিপ্ততার আবহাওয়ায় যুবক সম্প্রদায়ের উদ্দেশে লিখিত। লেখক আশাবাদী, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, কৌতুকপ্রবণতা ও সহানুভূতিপূর্ণ বাস্তববোধ প্রশংসনীয়। যদিও বেকারত্বের সমস্যার সমাধান তিনি বড় সহজে করেছেন,

বাস্তব ক্ষেত্রে তা তত সহজ নয়; তবু তাঁর আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আজকের দিগন্তবিস্তৃত নৈরাশ্যের মধ্যে আমাদের মুগ্ধ করেছে।

এই একাঙ্ক নাট্য উৎসবের ব্যবস্থা করে রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষ নাট্যামোদীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

# স্টুডিও থেকে

**গোত্রান্তর :** মৃণাল সেনের নতুন ছবি 'গোত্রান্তর' এখন প্রস্তুতির পথে। পাটনা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ হয়েছে বেশ কিছুদিন। ছবির নায়িকা আরতি ভট্টাচার্য খুব ভালো কাজ করছেন—একজন সংশিলষ্ট কুশলীর মতো, যদিও তিনি বাঙালী, কিন্তু হিন্দী উচ্চারণ ও ভাবভঙ্গীতে নিপুণ অভিনেত্রীর মত কাজ করে চলেছেন।

আচার আচরণ ও উচ্চারণে বিহারীয়ানার প্রভাব কিছুটা তাঁর জন্মগত বলা চলে। জন্ম জামসেদপুরে। ছোটোবেলাই শুধু নয়, যৌবনেরও কয়েকটা বছর কেটেছে বাংলা-বিহারের সেই সীমান্ত শহরে। বাবা চেয়েছিলেন মেয়ে ডাক্তার হোক। কিন্তু বিধি বাম। অভিনয়ের প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক আকর্ষণ। তাই কলকাতায় এসে যোগাযোগ ঘটে গেল। রঙমহলে 'নহবতে'র একটি প্রধান ভূমিকায় কাজ পেয়ে গেলেন।

সেই শুরু। ইতিমধ্যে বম্বে গিয়েছিলেন একাধিক বার, দু-একটি ছবিতে ছোটোখাটো কাজও করেছেন। মন ভরে নি, ফিরে এসেছেন কলকাতায়। শেষ পর্যন্ত মৃণালবাবুর কাছ থেকে ডাক পেয়ে আবার ফিরে এসেছেন পাদপ্রদীপে। মৃণালবাবুর এ ছবিতে এক দেহাতী মেয়ের চরিত্র তাঁর। ভয়ানক ছটফটে অথচ কাজের সময় যথেষ্ট সিরিয়াস্ তিনি। কথায় কথায় হিন্দী শের্ তৈরী করতে পারেন, পুরোপুরি দেহাতী ঢঙে সেই সকল শের যখন নিজেই বলেন তখন বোঝা দায় তিনি বাঙালী না বিহারী।

*

**হিন্দী সাগিনা মাহাতো :** 'সাগিনা মাহাতো'র হিন্দী ভার্সান 'হবে হচ্ছে' এ রকম খবর বহুবার পাওয়া গেছে। সেই 'হবে হচ্ছে'র অবসান ঘটিয়ে গত বৃহস্পতিবার টেকনিসিয়ান স্টুডিওয় সত্যি সত্যিই শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হলো হিন্দী 'সাগিনা মাহাতো'র। এখন কাজ চলবে কিছুদিন। রঙীন এ ছবিখানি প্রযোজনা করছেন শ্রীহেমেন গাঙ্গুলী এবং পরিচালক স্বভাবতঃই শ্রীতপন সিংহ। মহরৎ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে দিলীপকুমার ও সায়রাবানু বম্বে থেকে এসেছেন কলকাতায়। ও'রা আরও কিছুদিন থেকে স্যুটিং-এ অংশ নেবেন।

**অরুন্ধতী দেবীর নতুন ছবি :** 'মেঘ ও রৌদ্রে'র পর থেকেই অরুন্ধতী দেবী লীলা মজুমদারের লেখা 'পদী পিসির বর্মিবাক্স' গল্প নিয়ে ছবি করছেন—এমন সংবাদ বহুবার এ পাতায় ছাপা হয়েছে। ক'দিন কাজও হয়েছিল। আউটডোর লোকেশন অরুন্ধতী দেবী দেখেও এসেছেন। সম্প্রতি তিনি এ ছবির কাজ রিজিউম্ করছেন এন্-টির দু নম্বরে। আউটডোরের কাজ পরে হবে। প্রধান চরিত্র পদী পিসির ভূমিকায় আছেন ছায়া দেবী এবং অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন রবি ঘোষ, জহর রায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত হরিধন মুখোপাধ্যায় ও নির্মলকুমার।

*

**এখনই :** 'এখনই' ছবির কাজ তপনবাবু শেষ করে ফেলেছেন বহুদিন আগেই। এ ছবির প্রধান ক'টি চরিত্রে রূপদান করেছেন অপর্ণা সেন (উর্মি), স্বরূপ দত্ত (অরুণ), মৃণাল মুখোপাধ্যায় (সুজিত), মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় (রুনু), ভাস্কর চৌধুরী (বিমান), খুশী বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দিনী), দিলীপ বসু (টিকলু), চিন্ময় রায় (হিপি) ও আরও অনেকে। ওপরের নামগুলোর মধ্যে একমাত্র দিলীপ বসু ছাড়া প্রত্যেকেই বাংলা ছবির দর্শকের কাছে অচেনা তো নয়ই বরং জনপ্রিয় নাম বলা যায়। তবে 'এখনই' মুক্তির পর তপনবাবুর নতুন আবিষ্কার টিকলুবেশী এই দিলীপ বসু যে দর্শকের মধ্যে সাড়া জাগাবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। যে ক'দিন ওর কাজ দেখেছি, তার ফ্র্যাংকনেস, সেটের বাইরে ও ভেতরে তার

জনতার আদালত—শুভেন্দু চ্যাটার্জি, সন্ধ্যারাণী এবং নবাগতা চৈতালী দত্ত

সহজ সরল কথাবার্তা টিকলুর চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছে। নতুন ছবি অবশ্য বিশেষ কিছু তার হাতে নেই, কিন্তু এ ছবির মুক্তির পর কি হবে বলা যায় না।

## মঞ্চাভিনয়

**রোটারী ক্লাবের 'শেষ লগ্ন' :** দক্ষিণ কলকাতার রোটারী ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে মনোজ বসুর শেষ লগ্ন নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। সুধীর মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় পরিবেশিত এই নাটকটির নির্দেশনায় শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন অশ্রু ভট্টাচার্য।



চরিত্রাভিনয়ে যাঁরা সব সময়ে আন্তরিক নিষ্ঠা দেখান তাঁরা হোলেন বিভূতি সরকার (রাজমোহন), বিনোদ ভট্টাচার্য (নিশিকান্ত), সুধীর মুখোপাধ্যায় (গোবিন্দ), সুনীত ঘোষ (বনমালী), চিন্ময়ী বসু (সুরবালা), কৃষ্ণা সরকার (তমালবাসিনী), জয়ন্তী সেন (গৌরী)।

**দুটি দক্ষিণ ভারতীয় নাটক :** দক্ষিণ ভারতীয় নাটক পরিবেশন করে 'কলকাতা কালাই কাদহগম'এর শিল্পীরা নাট্যানুরাগীদের কাছে একটি স্বতন্ত্র স্বাদ ইতিমধ্যেই এনে দিয়েছেন। সম্প্রতি এই সংস্থার অষ্টমবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে ত্যাগরাজ হলে একটি তামিল নাটক ও একটি মালয়লম নাটক মঞ্চস্থ হোল। প্রথম দিনে এন, এস, ভি রামানির 'নান্ নি আন্ডাই' তামিল নাটকটি সার্থকতার সঙ্গে শিল্পীরা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। এ এস নারায়ণের দক্ষ পরিচালনায় নাটকটির কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন গ্যারি গোপাল, নারায়ণ, আথী, শেখর। সি এল জসে'র মালয়লম নাটক 'মানলকাদু' পরিচালনায় কে সুব্রাহ্মানিয়াম প্রায় সব সময়েই নিজের সপ্রতিভ ভূমিকাটিকে স্পষ্ট করে রাখতে পেরেছিলেন। এ নাটকের উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হোলেন পপ্পন, নানু কুরুপ, মিস গঙ্গা, মিস চেল্লাম, রামমূর্তি, কৃষ্ণমূর্তি, অনাথকৃষ্ণন, চাক্কো।

**লৌহকপাট :** সম্প্রতি কমার্শিয়াল ইউনিয়ন স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' নাটকটি পরিবেশিত হোল বিশ্বরূপার মঞ্চে। যাঁরা সুঅভিনয় করে প্রযোজনাটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন তাঁরা হোলেন প্রভাত সরকার (বদর মুন্সী), সুব্রত ভট্টাচার্য (মলয়), অজিত মিত্র (ভূতনাথ), দিলীপ মুখার্জী (সালাম), শান্তি সাহা, বিদ্যুৎ গুহ, মুকুল রায়। সুন্দরভাবে নাট্যানুষ্ঠানটিকে পরিচালনা করেছেন অময় দে, অনিলবরণ রায়, অমিতলাল ঘোষ।

**ইছাপুর অনুশীলনী আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা :**—শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : 'এক যে ছিল রাজা' (যান্ত্রিক, নৈহাটী), শ্রেষ্ঠ পরিচালনানুপুঙ্খ : [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ('সূর্যের সন্ধানে', শিল্পায়ন, ইছাপুর), শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি : রবীন্দ্র ভট্টাচার্য (এক যে ছিল রাজা), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : নৃপেন দেব, (তৃতীয় কণ্ঠ, করবী); শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : পুতুল চক্রবর্তী (স্ফুলিঙ্গ, চন্দ্রবিন্দু)।

# বিবিধ সংবাদ

### বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের পুরস্কারবিতরণী সভা

গত ২২শে ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের পুরস্কারবিতরণী উৎসবের উদ্বোধন সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রমা চৌধুরী। বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে বিদ্যাভবনের ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন। নৃত্যে অরুণেশ্বর ও কমলিকার ভূমিকায় রূপদান করেন দেবাহুতি দেব ও শান্তা রায়চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন শাশ্বতী দত্ত, স্বাগতা ভট্টাচার্য, মাধুরী নিয়োগী, ইলা সামন্ত, রাখী রায়চৌধুরী, গীতা দাশগুপ্ত, গৌরী মুখোপাধ্যায়, শুক্লা সাহা। অরুণেশ্বরের গানগুলি গেয়েছিলেন ভাস্বতী চক্রবর্তী ও মনীষা দত্ত, তন্দ্রা দত্ত, তপতী গাঙ্গুলী, রীণা দাশগুপ্ত, জয়ন্তী মুখার্জী, সীমা ঘোষ, অনুরাধা সরকার, প্রভা দাশগুপ্ত, রাখী রায়চৌধুরী। নাচ ও গানের প্রশংসনীয় সমন্বয় লক্ষ্য করবার মত। গ্রন্থনাংশে ছিলেন তপতী গাঙ্গুলী ও প্রভা দাশগুপ্ত।

### সংস্কৃত নাটকের জয়যাত্রা

সু-পরিচিত সুধী-দম্পতি ডক্টর যতীন্দ্র বিমল ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যা ডক্টর রমা চৌধুরী স্থাপিত (১৯৪৩ অব্দে) 'প্রাচ্যবাণী' সংস্থা গবেষণা, গ্রন্থ প্রকাশন, প্রচার, নাট্য, প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃত এবং পালি নাট্য চর্চা ইত্যাদি শিক্ষামূলক কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে লিপ্ত আছেন। ডক্টর চৌধুরী দম্পতি বিরচিত সংস্কৃত নাট্যসমূহ ভারতের সর্বত্র এবং বাহিরেও অভিনীত হয়ে বিদগ্ধ সমাজে অভিনন্দিত হয়েছে। ১৯৭০ অব্দে এই এ্যামেচার নাট্য সংঘ আ-সমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণকালে জম্মু, কাশ্মীর ও কন্যাকুমারিকাতে বেশ কয়েকটি আধুনিক ও সংস্কৃত নাটক মঞ্চস্থ করে বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদৃত হয়েছেন। বিগত খ্রীষ্ট মাসের মধ্যে এ'রা ভারত-[illegible] আয়োজিত সর্বভারতীয় বৌদিক-[illegible] ডাঃ রমা চৌধুরী রচিত তিনটি সংস্কৃত নাটক অভিনয় করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

# জলসা

**তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন :** ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের সারারাতব্যাপী চারটি আসরের আয়োজন অতীতের আনন্দ-ভরা সম্মেলনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সারারাতব্যাপী আসরের ফলশ্রুতিস্বরূপ রাত্রের রাগ ছাড়াও আমরা কিছু ভোরের রাগ শোনবার অবকাশ পেলাম।

সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, সঙ্ঘের উদ্দেশ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা-বর্ধন। তানসেন সঙ্গীত বিদ্যায়তন, প্রদর্শনী, সঙ্গীত, বক্তৃতামালা, মাসিক অধিবেশন, নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও নিখিল ভারত তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন—এই পর্যাবধ পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির লক্ষ্যে নিষ্ঠা ভরে কাজ করে যাচ্ছেন—তাঁর পরিকল্পনা সঙ্গীতানুরাগীর সাড়া ও সহযোগিতা পেয়েছে। তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে কণ্ঠসঙ্গীতে তরুণ শিল্পীদের মধ্যে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'ছায়ানট' রাগ রূপায়ণ ও পরিবেশনা পদ্ধতির গুণে শ্রোতাদের প্রশংসা পেয়েছে, তবে তানের সঙ্গে আর একটু বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। আলো মুখোপাধ্যায়ের পুরিয়া ধানশ্রী মাঝামাঝি। শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যাদ্বয় সুচিতা সেনগুপ্ত ও তপতী সরকারের 'কেদারা' সু-পরিবেশিত, বিশেষ করে বিস্তারঙ্গে। তানাঙ্গ অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ঝিঁঝোটি রাগে খেয়াল ও পরে টপ্পা গেয়ে শোনান। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্য অনস্বীকার্য। কিন্তু ঝিঁঝিটের মত সহজ মধুর রাগে এমন বীররসের প্রাধান্য কেন? টপ্পা'র ঐতিহ্যকে ইনি সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। রবি কিচলু ও বিজয় কিচলু গীত আগ্রা ঘরানার 'ভৈরব' পরিচ্ছন্ন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'বাগেশ্রী' শুধু রাগশুদ্ধতা অথবা তানসমৃদ্ধিতেই নয় প্রাণবন্ত গায়নশৈলীতে উপভোগ্য হয়েছে। তবে সবচেয়ে চিত্তগ্রাহী তাঁর ঠুংরী। বিশেষ শেষের ঠুংরীটি যেখানে তিনি মারু গাম্বাজের আলতো ছোঁয়ায় বিরহের ভাবটি মূর্ত করে তুলেছেন। কেরামৎ খাঁ ও সগীরুদ্দিনের তবলা ও সারেঙ্গী সঙ্গত অনুষ্ঠানটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। মুনাব্বর আলি খাঁ শোনালেন রামকেলী'। তার আগের রুক্ষভাব ক্রমশঃ কোমল হয়ে আসছে বলেই তাঁর অনুষ্ঠান চিত্তস্পর্শী হয়ে উঠছে। ঠুংরীতে দুনাব্বর খাঁর কৃতিত্বের কথা বলাই বাহুল্য।

কণ্ঠসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ সুনন্দা পট্টনায়ক স্ব-মানে সু-প্রতিষ্ঠিত। সঙ্গীতানুরাগীবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে দুটি ভজন গেয়ে শুনিয়েছেন। ধ্রুপদানুষ্ঠানের একমাত্র শিল্পী সুবোধ দে পরিবেশন করেন জয়জয়ন্তী ও পটমঞ্জরী। এঁর লয় ভাল, আলাপ ও ধ্রুপদের সাবেকী বন্দেজ শোনবার মতো। তবে শান্ত ভাবটি যদি বজায় থাকত এ অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠত। অসুস্থতার কারণে শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় গাইতে পারেন নি।

যন্ত্রসঙ্গীতের প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে পদ্মভূষণ বিসমিল্লা খাঁ ও পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। মিঞা বিসমিল্লা বাজিয়েছেন বৈরাগী ভৈরব। সাধক শিল্পীর একটি ফুঁকরে শুদ্ধ স্বরশ্রুতির অনুরণনে সারা প্রেক্ষাগৃহ ভরে ওঠে। রাগ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী যেন ভাবের অতলে সমাহিত হয়ে যান—আর তাঁর ধ্যানলোকের বৈরাগ্য ও শান্তির আবেশ শ্রোতাদের মনে আবেশ সৃষ্টি করে। উপসংহারীয় 'ভৈরবী'তে এই আকৃতি আরো উদ্বেল হয়ে উঠেছে। এ বছর এই সম্মেলনেই বিসমিল্লাজীর অনুষ্ঠান প্রথম শোনা গেল। আর এ শোনা যে সার্থক—বাজনা শেষ হয়ে যাবার পরেও মনের মধ্যে সুরের অনুক্ষণ গুঞ্জন স্মৃতিই তার প্রমাণ। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বহুদিন বাদে শোনা গেল আহির ভৈরব। শিল্পীকে ধন্যবাদ প্রতিবারের মত বহুশ্রুত 'ললিত রাগকেই অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু করে তোলেন নি বলে। আহির ভৈরব রাগটির সঙ্গে আলি আকবর খাঁ সাহেব প্রথম শ্রোতাদের পরিচয় করান উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' চিত্রের মাধ্যমে। তারপর রবিশঙ্কর ও আলি আকবরই সারা ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাসরে এই রাগকে জনপ্রিয় করে তোলেন। আজ এই রাগ শ্রোতাদের অত্যন্ত আদরের। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এখন খ্যাতি ও সঙ্গীত-পরিণতির মধ্যগগনে। তাঁর হাতে এ রাগ শুনতে পাওয়াটা শ্রোতাদের পক্ষে দুর্লভ সৌভাগ্য। তাঁদের আশা বিফল হয় নি। ধ্রুপদী বিস্তারে, বিলম্বিত, গমক-জোড়, লড়ী জোড়, দাগার-বাণী বাজের সুগম্ভীর আধারে রাগের ক্রমবিকাশ একটি-একটি করে দল-মেলা ফুলের পাপড়ির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। বিলম্বিত গতের ও দ্রুত গতের বন্দেজে গুরু আলাউদ্দীন খাঁ তথা রামপুর ঘরানার গায়কী ও তন্ত্রকার পদ্ধতিতে একাধারে আঙ্গিক-সিদ্ধতা ও কল্পনার ঐশ্বর্যের আশ্চর্য সমন্বয়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। 'ভৈরবী' দিয়ে ইনি অনুষ্ঠানের মধুর পরিসমাপ্তি ঘটান। বলরাম পাঠকের 'আহিরী'তে বাঁ-হাতের টিপ্ ও মীড়ের কারুকার্য মুগ্ধকারী, তবে বাজ্ তেমন জোরালো না হওয়ায় বাজনায় কোনো শিল্পী-ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় নি। মণিলাল নাগের 'সুহা-কানাড়া' কি রাগ বিচারে, কি তানের বাহারে উচ্চাঙ্গের বাজনা। তবে অনেক বড় বড় তেহাই এবং ছন্দের নানান বৈচিত্র্যের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার জনাই হয়ত গতের মুখে ফিরে আসার মজা থেকে শ্রোতাদের বঞ্চিত করেছেন। গুরু আলাউদ্দীন-সৃষ্ট 'হেমবেহাগ' রাগে বেহালা বাজিয়ে শোনান রবীন ঘোষ। সুবিনাস্ত বিস্তার, সুর ও ছন্দে শিল্পীর নিষ্ঠা ও রেওয়াজ চিহ্নিত। এক জায়গায় স্বরসমন্বয় অত্যন্ত চিত্তহারী, তবে নিয়ম ও শৃঙ্খলার দিকে বড্ড বেশী নজর থাকায় মাঝে মাঝে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব অনুভূত হয়েছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পদ্ধতি মানা অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু রসসৃষ্টির তাগিদে মাঝে মাঝে দুঃসাহসী হওয়ারও প্রয়োজন আছে। সরোদে ছিলেন প্রবীণ শিল্পী শ্যাম গাঙ্গুলী ও নবীন আমজাদ আলি খান। শ্যাম গাঙ্গুলীও আলাউদ্দীন খাঁ-সৃষ্ট 'হেমন্ত' বাজালেন। শ্রীগাঙ্গুলীর পাণ্ডিত্য ও শিল্পবোধের সুন্দর সামঞ্জস্যে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য। সর্বশেষ অনুষ্ঠান আমজাদ আলি খাঁর গুর্জরী টোড়ি রংদার তান ও সুরে ভোরের বাতাস মাতিয়ে দিয়েছে। সঙ্গতে প্রথিতনামা ও উদীয়মান সকল শিল্পীই আপনাপন মানানুসারে সম্মেলনের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন।

**সপ্তক সঙ্গীত শিক্ষা পরিষদ :** শ্রীরামপুর টাউন হলে ৯ জানুয়ারী সপ্তক সঙ্গীত শিক্ষা পরিষদের বিচিত্রানুষ্ঠান ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। তরুণ গীতিকার লক্ষ্মীকান্ত রায় ও কণ্ঠসংগীত শিল্পী গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানান হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। শ্রোতাদের অনুরোধে গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব রেকর্ডের জনপ্রিয় দুটি গান শোনান। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী কমল চক্রবর্তী, মানিক চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব ভাদুড়ী, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, শিল্পী চক্রবর্তী ও প্রখ্যাত কৌতুক অভিনেতা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ দত্ত।

—চিত্রাঙ্গদা

# খেলার কথা

## ভারতীয় ক্রিকেট ইরাণী ট্রফি-দলীপ ট্রফি

চলতি বছরের ক্রিকেট মরশুমে কোন বিদেশী ক্রিকেট দলের ভারতে আসার কথা নেই। তাই ক্রিকেট রসিকদের কাছে এ-বছরের একমাত্র আকর্ষণ রঞ্জি ট্রফি, দলীপ ট্রফি ও ইরানী ট্রফির খেলা। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে (১৯শে—২২শে ডিসেম্বর) ইরানী ট্রফির খেলা হয়ে গেল কলকাতার ইডেন উদ্যানে। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল ভারতের অবশিষ্ট দলের সঙ্গে গতবারের রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাই দল। দুটি দলই তৈরী হয়েছিল। ভারতের বর্তমান কালের বাছাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে। অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ছিলেন বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় তরুণ। এই জন্যেই ইরানী ট্রফির খেলাটি কলকাতার ক্রিকেট অনুরাগীরা খুব আকর্ষণীয় হবে ভেবেছিলেন। এছাড়া এই খেলা সম্পর্কে আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সেটি হলো, এই বছরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের জন্য ভারতীয় দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন করা হবে মোটামুটি এই খেলাটির উপর ভিত্তি করেই।

আমরা প্রত্যেকেই ভেবেছিলাম যে, খেলাটি অত্যন্ত উপভোগ্য হবে। কিন্তু দুঃখের কথা, খেলার আকর্ষণ যত প্রবলই হোক না কেন, খেলাটিকে কখনই সজীব-প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে দেখি নি। একথা জোর করেই বলা যায় বাংলার দর্শক তথা ক্রীড়ারসিকদের কারও মন ভরে নি এ খেলাটি দেখে। তার প্রধান কারণ খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মেজাজের অভাব ছিল।

শেষ পর্যন্ত খেলায় বোম্বাই যোগ্য দল হিসেবে জয়ী হয়েছে। দল হিসেবে ভারতের অবশিষ্ট দল কিম্বা বোম্বাই—দুটিই সমান ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তবে ভারতের অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়দের খেলায় প্রাণের অভাব ছিল। তারা ব্যক্তিগত খেলা নিয়েই যেন বেশি ব্যস্ত ছিলেন। কি করে আগামী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে নিজের জায়গাটুকু পাকাপাকি করে নেওয়া যায় তারই চিন্তা অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়দের মাথায় বেশী রকম ছিল। ফলে, প্রত্যেক খেলোয়াড় ব্যক্তিগত খেলা দেখাবার জন্য একটু বেশীমাত্রায় সচেষ্ট ছিলেন। এটি অবশ্য উঠতি খেলোয়াড়দের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। দলের প্রয়োজনে যে ধরনের খেলা হওয়া উচিত অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়দের খেলায় তার অভাব বিশেষভাবে দেখা গেছে। অথচ, বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়রা বরাবরই দলীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে খেলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 'টিম ওয়ার্ক'। ও'দের খেলা দেখে মনে হয়েছিল, যেন একটা সুখী পরিবার মাঠে নেমেছে। ক্রীড়া বিজ্ঞানের মূলকথা হলো বোঝাপড়া। খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া একান্ত প্রয়োজন। এই মূলমন্ত্রটিকে বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়রা সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। ফলও তারা পেয়েছেন বৈকি। দলের পুঁজি তাঁদের যাই হোক না কেন, শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাপকাঠিতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করতে তাঁদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

খেলায় অবশিষ্ট দলের জয়ন্তীলাল, সেলিম দুরাণী, কানিৎকার, অম্বর রায় এবং বোম্বাইয়ের মানকড় এবং ওয়াদেকরের ব্যাটিং বলার মতো হয়েছে। বোলিংয়ে যাঁরা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা হলেন বোম্বাইয়ের একনাথ সোলকার এবং অবশিষ্ট দলের মাহিন্দর অমরনাথ। সত্যিই এঁদের বোলিং প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য এ-কথাও বলতে হয় এইসব খেলোয়াড়দের খেলা উল্লেখযোগ্য হলেও, মানের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পারে নি।

**কমল ভট্টাচার্য**

কিন্তু শুধু খেলোয়াড়দের দোষ দেওয়া চলে না। ইডেনের উইকেটের জন্যেই এঁদের খেলা উচ্চমানে উঠতে পারে নি। অত্যন্ত প্রাণহীন 'স্লো' উইকেট আমাদের ইডেনে। খেলোয়াড় যত দক্ষই হোন না কেন, এই রকম প্রাণহীন 'স্লো' উইকেটে দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। কোন খেলোয়াড়ের পক্ষেই সম্ভব নয়—না ব্যাটসম্যান না বোলার। ফলে মনোনয়ন কমিটির সদস্যদের ভারতীয় দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, আগামী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে আমাদের খেলোয়াড়দের খেলতে হবে প্রত্যেকটি প্রাণবন্ত উইকেটে। অর্থাৎ 'হার্ড এ্যাণ্ড ফাস্ট' উইকেটে।

বোম্বাই দলের ফিল্ডিং কিন্তু খুব চমৎকার হয়েছিল। তবুও এক মুহূর্তের জন্যেও খেলায় প্রাণের সঞ্চার হয়নি। ইরানী ট্রফির খেলা, এত বড় খেলা, অথচ এ খেলা দেখে কেন ক্রীড়ামোদীই সত্যিকারের আনন্দ পান নি। খুব আফশোষের কথা।

এ বছরের শুরুতেই পয়লা জানুয়ারী থেকে এই ইডেন উদ্যানেই পাতা হয়েছিল ক্রিকেটের আর এক মস্ত আসর—দলীপ ট্রফির সেমি-ফাইনাল খেলা। খেলা হয়েছিল পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে। এই খেলাটিকে নিয়েও কলকাতার দর্শকদের মনে কম উত্তেজনা ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, ইরানী ট্রফির খেলা দেখে দর্শকরা যতোটা নিরাশ হয়েছেন ঠিক ততটা আনন্দ পেয়েছেন দলীপ ট্রফির খেলা দেখে। খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মেজাজ সব সময়েই উপভোগ করেছেন দর্শকরা।

খেলার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই যাঁদের কথা মনে আসে তাঁরা হলেন পূর্বাঞ্চল দলের প্রকাশ পোদ্দার এবং গোপাল বোস। সত্যিই ও'দের দুজনের ব্যাটিং দেখবার মতো হয়েছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি বলের সদ্ব্যবহার করেছেন ও'রা দুজনে। যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন খুব সজীবতার সঙ্গে রান তুলেছেন ও'রা। মোট কথা ও'দের খেলার মধ্যে এমন একটা গতি ছিল, যা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁদের খেলার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ছিল তাঁরা কখনই বোলারকে অযথা প্রাধান্য দেন নি। সমস্ত খেলার মধ্যে কোন সময়েই আলগা বল বা মারার মত বলের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য উত্তরাঞ্চলের সুরিন্দর অমরনাথ ও হায়দর আলির ক্ষেত্রে। এঁরাও বোলারকে অযথা প্রাধান্য দিয়ে খেলার গতিরুদ্ধ করেন নি।

এঁদের পরেই আসে পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক রমেশ সাকসেনা এবং অম্বর রায়ের খেলার কথা। রমেশ সাকসেনা যতক্ষণ খেলেছিলেন ততক্ষণ ও'র মধ্যে দেখেছি এক অদ্ভুত তৎপরতা। অত্যন্ত নির্ভীকভাবে সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রত্যেকটি বল খেলেছেন উনি। রমেশ সাকসেনার খেলা বহু দর্শককে মুগ্ধ করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অম্বর রায়ের খেলা তুলনামূলকভাবে তাঁর সাম্প্রতিককালের খেলার থেকে ভালো হয়েছে। তবে রমেশ সাকসেনা এবং অম্বর রায়ের খেলা মোটামুটি ভালো হলেও এঁদের খেলায় বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। উইকেটে পুরোপুরি সেট হয়ে যাওয়ার পরও এঁদের বোলারকে অযথা প্রাধান্য দিতে দেখেছি। অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের কাছ থেকে এটা আমরা নিশ্চয়ই আশা করিনি। বোলারকে অযথা প্রাধান্য দেওয়াতে ও'দের খেলায় সময়ে সময়ে যথেষ্ট প্রাণের অভাব দেখা দিয়েছিল।

ফিল্ডিং যখন রক্ষণাত্মক আকারে সাজানো হয়, অর্থাৎ খেলোয়াড়দের দূরে

দূরে ছড়িয়ে রাখা হয়, তখন আস্তে মেরে 'সিঙ্গল' রানের উপরেই খেলা উচিত। কারণ দূরের ফিল্ডারদের ফাঁক গলিয়ে বাউন্ডারীর বাইরে বল পাঠানো কোন মতেই সম্ভব নয়। অম্বর এবং সাকসেনাকে দেখেছি এই একই ভুল করতে। জোরে মারার ফলে তাঁরা বার-বার 'সিঙ্গল' রান সংগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আর ঠিক এই কারণেই পূর্বাঞ্চলের রানের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। তবে খেলা যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত জয় হলো পূর্বাঞ্চল দলেরই। এই গৌরব অর্জনের পিছনে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশী বলে মনে হয়, তাঁরা হলেন দিলীপ দোশী এবং গোপাল বোস—দোশীর মারাত্মক বোলিং (৮৮ রানে ৫ উইকেট) গোপাল বোসের চমৎকার ফিল্ডিং।

উত্তরাঞ্চলের চরম বিপর্যয়ের মুখে সুরিন্দর অমরনাথ (৬৬ রান) এবং হায়দার আলি (৭৪) রান যেভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে নির্ভয়ে খেলেছেন তাতে ক্রিকেট রসিকরা সত্যিই মুগ্ধ হয়েছেন। তরুণ বোলার ও ব্যাটসম্যান হায়দার আলি আলতো বলগুলি যথেষ্ট জোরের সঙ্গে খেলে খেলাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। উত্তরাঞ্চলের ওপেনার আকাশলালের (৪৭ রান) খেলার মধ্যে যে দৃঢ়তা দেখেছিলাম তা সত্যিই মনে রাখবার মতো।

দলীপ ট্রফির ফাইনাল খেলা হয়ে গেল বোম্বাইতে। উত্তরাঞ্চলকে হারিয়ে পূর্বাঞ্চল এই প্রথম ফাইনাল খেললো দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে।

গত ১২ই জানুয়ারী শেষ হয়ে গেল দলীপ ট্রফির ফাইন্যাল খেলা। এই খেলায় দশ উইকেটে জিতে গেল দক্ষিণাঞ্চল দল। একথা স্বীকার করতেই হবে, প্রকৃত যোগ্য দল হিসাবেই দক্ষিণাঞ্চল দল জয়ী হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চল দল খেলার সব দিক দিয়েই পূর্বাঞ্চলের থেকে শক্তিশালী ছিল। তবে একথা বলতে হয় ভাগ্যদেবী পূর্বাঞ্চলকে জিতবার একাধিকবার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন সময়েই পূর্বাঞ্চল দল তার সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। একথা প্রত্যেকেই জানেন যে, কোন শক্তিশালী দলকে পরাজিত করতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজন ফিল্ডিংয়ে দক্ষতা। ফাইন্যাল খেলায় যদি পূর্বাঞ্চলের ফিল্ডিং উচ্চমানের হতো, তাহলে হয়তো দলীপ ট্রফি এবার পূর্বাঞ্চলের ঘরে আসতো। দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চল দল যেভাবে ফিল্ডিংয়ে ব্যর্থতা দেখিয়েছে তা সত্যিই কল্পনার বাইরে। এই দলের পরাজয়ের একমাত্র কারণ বলা যেতে পারে খেলার গোড়ার দিকে দু-দুটো ক্যাচ ফেলে দেওয়া।

অথচ এই পূর্বাঞ্চল দল যথেষ্ট উচ্চমানের ফিল্ডিং দেখিয়ে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সেমিফাইন্যাল খেলায় নিজেদের জয়কে সম্ভব করে তুলেছিল। একমাত্র দিলীপ দোশী ছাড়া আর কেউ এই দলে ছিলেন না, যিনি ভালো উইকেটে একজন জাত ব্যাটসম্যানকে সরাসরি আউট করতে পারেন। সুতরাং ফিল্ডিংয়ে দক্ষতা এক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, উত্তরাঞ্চল বা দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের খেলার ফলাফল যাই হোক না কেন, ভারতের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ দল দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চল দল যা খেলেছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। কারণ হিসেবে বলতে হয়, খুব শক্তিশালী বোলারদের নিয়ে দক্ষিণাঞ্চল দল তৈরী হয়েছিল। জয়সীমা, আবিদ আলি, বিশ্বনাথ, আব্বাস আলি বেগের মতো ব্যাটসম্যান ছাড়াও যে দলে প্রসন্ন, গোবিন্দরাজ, চন্দ্রশেখর, আবিদ আলি, ভেংকটরাঘবনের মতো বোলার আছেন, সেই দলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৩৮২ রান তোলা সহজ কথা নয়। এছাড়া আরও একটা কথা আছে, দু'দলেরই সেরা ব্যাটসম্যানের অনুপস্থিতি। দক্ষিণাঞ্চলের পতৌদি যেমন খেলেন নি, অনুপস্থিত ছিলেন।। তেমনি পূর্বাঞ্চলের সেরা ব্যাটসম্যান শ্যামসুন্দর মিত্রও অনুপস্থিত ছিলেন। ক্ষতি দু'দলেরই হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলের ক্ষতি বেশী।

দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে ফাইন্যাল খেলায় আমরা যাঁর পরিচয় সঠিকভাবে পেলাম তিনি গোপাল বোস। গোপাল বোস যদিও দলের সেরা অল-রাউন্ডার, কিন্তু তাঁকে আমরা জানতাম বোলার হিসেবে। বাংলার অধিনায়ক অম্বর রায়ই গোপালকে ব্যাটসম্যান হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। যে খেলোয়াড় সাত কি আট নম্বর হিসেবে মাঠে নামতেন, তিনি প্রথম ইনিংসের খেলায় তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতে নেমে ১১৩ রান সংগ্রহের সূত্রে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, পূর্বাঞ্চলের তিনি একজন সেরা 'অল-রাউন্ডার'।

# স্মরণীয় ক্রিকেটার ডন ব্র্যাডম্যান

**প্রবীর ঘোষ**

১৯৩০ সালে উডফুলের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফরে যায়। সেদিন ডন ব্র্যাডম্যান ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান দলের তরুণ ব্যাটসম্যান। ১৯২৮-২৯ সালের ক্রিকেট মরসুমে স্বদেশের মাটিতে তিনি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চারটে টেস্ট ম্যাচ খেলে মোট ৪৬৮ রান (গড় ৬৬-৮৫) সংগ্রহের সূত্রে দলের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন। ১৯২৮-২৯ সালে টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে (ব্রিসবেন) ব্র্যাডম্যান তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে মাত্র ১৮ ও ১ রান করে আউট হন। দ্বিতীয় টেস্টে তিনি দলে স্থান পাননি। ১৯২৮-২৯ সালের টেস্ট সিরিজে তাঁর খেলা দেখে কেউ ধারণা করেন নি ডন ব্র্যাডম্যান একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হবেন। মাত্র চারটে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্র্যাডম্যান ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ড সফরে যান। ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে তাঁর এই প্রথম বিদেশ সফর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৩০ সালে ব্র্যাডম্যান তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট সিরিজে মোট ৯৭৪ রান (গড় ১৩৯-১৪) সংগ্রহ করে টেস্ট খেলার এক সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান করার যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা আজও কেউ স্পর্শ করতে পারেননি।

১৯৩০ সালে লীডস্-এর তৃতীয় টেস্ট খেলার প্রথম দিনের (১১ই জুলাই) ৩৪০ মিনিটে তাঁর রান সংখ্যা দাঁড়ায় নট আউট ৩০৯। এইদিন (১১ই জুলাই) অস্ট্রেলিয়া যে ৪৫৬ রান করেছিল তার মধ্যে একা ব্র্যাডম্যানেরই রান ছিল নট আউট ৩০৯ রান, যা আজও একদিনের টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড হয়ে আছে। এই খেলার প্রথম ইনিংসে তিনি মোট ৩৩৪ রান করে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা সাত বছর পর ১৯৩৮ সালে ওভাল মাঠে লেন হাটন (ইংল্যান্ড) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৬৪ রান করে ভেংগেছিলেন। ১৯৩০ সালের টেস্ট সিরিজে ব্র্যাডম্যানের খেলা দেখে ইংলন্ডের ক্রিকেট রসিকরা একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন—এমন খেলা তাঁরা জীবনে আর দেখেন নি। সেই সিরিজে ব্র্যাডম্যান এক নতুন যুগের সূচনা করলেন যার নাম ব্র্যাডম্যানের যুগ। তাঁর ব্যাটের গ্রিপ্ ধরার বৈশিষ্ট্যকে বলা হত—ব্র্যাডম্যান গ্রিপ্।

### ক্রিকেটকে বলা হয়—

**A game of glorious uncertanties** কিন্তু ব্র্যাডম্যানের খেলায় কোন অনিশ্চয়তা ছিল না। সেঞ্চুরি তিনি করবেনই,—অথবা তার কাছাকাছি রান। এ যেন তাঁর খেলায় বাঁধাধরা ব্যাপার। তাই বোধকরি তাঁকে বলা হত— **"a run-getting machine."**

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৩০ সালের টেস্ট সিরিজে মোট ৯৭৪ রান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৩১-৩২ সালের টেস্ট সিরিজে মোট ৮০৬ রান তুলে ডন ব্র্যাডম্যান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন। প্রধানতঃ ব্র্যাডম্যানের স্বাভাবিক খেলা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ডি আর জার্ডিন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৩২-৩৩ সালের টেস্ট সিরিজে মাথা খাটিয়ে দলের ফাস্ট বোলার লারউডকে দিয়ে বিপদজনক 'বডি লাইন বোলিং' উদ্ভাবন করে বেশ কিছুটা সফল হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৩২-৩৩ সালের টেস্ট সিরিজে ব্র্যাডম্যানের মোট রান দাঁড়ায় ৩৯৬ (গড় ৫৬-৫৭)। তবে জার্ডিন এবং লারউডকে বডিলাইন বোলিং নিয়ে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের পর লারউডকে টেস্ট খেলায় দেখা যায়নি।

ক্রিকেটের ইতিহাসে ব্র্যাডম্যান একজন অনন্য মনীষা এবং পুরুষাকারে প্রদীপ্ত পুরুষ-সিংহ। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান বলতে একমাত্র তাঁকেই বোঝায়।

সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে মোট রান সংখ্যায় এ পর্যন্ত মাত্র হ্যামন্ড (ইংল্যান্ড) তাঁর রান সংখ্যাকে অতিক্রম করেছেন—হ্যামন্ডের মোট রান ৭২৪৯। কিন্তু তাঁর থেকে অনেক কম সংখ্যক টেস্ট ইনিংসে খেলেছেন ব্র্যাডম্যান। মাত্র ৮০টি ইনিংসে খেলে ৬৯৯৬ রান করেছেন—গড়ে ৯৯-৯৪ রান। হ্যামন্ডের গড় ৫৮-৪৫। ইংল্যান্ডের কলিন কাউড্রের শুধু সরকারী টেস্ট খেলায় এ পর্যন্ত (জানুয়ারী ১৯, ১৯৭১) মোট রান দাঁড়িয়েছে ৬৯৭০।

ক্রিকেটার হিসাবে ডন ব্র্যাডম্যান দর্শকদের হৃদয়ে ক্রিকেটের মহাসঙ্গীত রচনা করে গেছেন। তাঁদের চিত্তে এক অনাস্বাদিত রোমান্টিক ভাবের সৃষ্টি করেছেন, যা, তাঁর খেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা চিরকাল অনুভব করবেন। ক্রিকেট খেলায় যে আশা মৃত্যুঞ্জয়ী, যে আশা জড়ত্বনাশা তাকেই তিনি দর্শকমনে সঞ্চারিত করেছেন, তাঁদের উদ্দীপ্ত করেছেন তাঁর গৌরবদীপ্ত খেলোয়াড়-জীবনে।

স্যার ডোনাল্ড ব্যাডম্যানের ক্রিকেট জীবন নিয়ে অনেক প্রবন্ধ-বই লেখা হয়েছে। আরও হবে, কারণ তাঁর ক্রিকেট-জীবন বিশ্ব-ক্রিকেট ইতিহাসেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর সেই ভাস্বর জীবনের আদর্শ তাঁর উত্তরসূরীদের উদ্বুদ্ধ করবে, প্রেরণা যোগাবে অনাগত যুগ ধরে।

তাই সর্বদেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা তাঁর শতায়ু কামনা করেন। বিশ্বের ক্রিকেট ইতিহাসে এত জনপ্রিয়তা, এত প্রীতি, এত সম্মান আর কোন ক্রিকেটার পান নি।

ক্রিকেট যতদিন থাকবে ততদিন সারা বিশ্বের ক্রিকেট-রসিকরা তাঁর নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবেন।

### ব্র্যাডম্যানের বিশ্ব রেকর্ড

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ব্র্যাডম্যান যেসব বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন তা[র] মধ্যে নীচের বিশ্বরেকর্ডগুলি আজও অক্ষু[ণ্ণ] আছে।

**এক সিরিজে সর্বাধিক রান:** ৯৭৪ (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৩০। খেলা ৫, ইনিং[স] ৭, নট আউট ০, এক ইনিংসে সর্বো[চ্চ] রান ৩৩৪, সেঞ্চুরী ৪ এবং গ[ড়] ১৩৯-১৪)

**একদিনে সর্বাধিক রান :** ৩০৯ রা[ন] (৩৪০ মিনিটে) বিপক্ষে ইংল্যান্[ড] লিডস, ১৯৩০)

**এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউন্ডারী :** ৪৬ (৩৩৪ রানের মধ্যে, বিপক্ষে ইংল্যান্[ড] লিডস, ১৯৩০)

**সর্বাধিক সেঞ্চুরী :** ২৯টি (৫২টি টেস্[ট] ৮০ ইনিংসে, ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮)

**এক সিরিজে সর্বাধিক 'ডাবল' সেঞ্চুরী** ৩টি (লর্ডসে ২৫৪ রান, লিডসে ৩[০৯] রান এবং ওভালে ২৩২ রান), বিপ[ক্ষে] ইংল্যান্ড, ১৯৩০

**সর্বাধিক গড় :** ৯৯-৯৪ (খেলা ৫২, ইনিং[স] ৮০, নট আউট ১০ বার এবং মো[ট] রান ৬৯৯৬)

#### পার্টনারশিপ রেকর্ড

**২য় উইকেট :** ৪৫১ রান—ব্র্যাডম্যান [ও] পনসফোর্ড, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ওভা[ল] ১৯৩৪

**৫ম উইকেট :** ৪০৫ রান—ব্র্যাডম্যান [ও] বার্নেস, ইংলন্ডের বিপক্ষে, সিডনি ১৯৪৬-৪৭

**৬ষ্ঠ উইকেট** ৩৪৬ রান—ব্র্যাডম্যান [ও] ফিংগলটন, ইংলন্ডের বিপক্ষে, মেলবো[র্ন] ১৯৩৬-৩৭

দর্শক

## দলীপ ট্রফি

### ফাইনাল খেলা

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯৭০-৭১ সালের দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতার ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল ১০ উইকেটে পূর্বাঞ্চলকে পরাজিত করে মোট ৫ বার (১৯৬৩-৬৪ সালে পশ্চিমাঞ্চলের সংগে যুগ্মভাবে একবার) দলীপ ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে দক্ষিণাঞ্চল দলের ফাইনালে খেলা হল ৮বার এবং অপরদিকে পূর্বাঞ্চল দলের মাত্র একবার। দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতার গত দশ বছরের খেলায় মাত্র এই দুটি দল দলীপ ট্রফি জয়ী হয়েছে—পশ্চিমাঞ্চল ৬বার (১৯৬৩-৬৪ সালে দক্ষিণাঞ্চল দলের সংগে যুগ্মভাবে একবার) এবং দক্ষিণাঞ্চল ৫বার।

প্রথম দিনের খেলায় পূর্বাঞ্চল ৫ উইকেট খুইয়ে ৩২৩ রান সংগ্রহ করেছিল। ৫ম উইকেটের জুটিতে গোপাল বোস (১১৩ রান) এবং রমেশ সাকসেনা (৯০ রান) ১৬৮ মিনিটের খেলায় ১৭৭ রান সংগ্রহ করে খেলার ভিত শক্ত করেছিলেন। গোপাল বোস ২০৫ মিনিটে তাঁর ১১৩ রানে ১৯টা বাউণ্ডারী করেন।

দ্বিতীয় দিনে পূর্বাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ৩৮২ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিনে তাদের বাকি পাঁচ উইকেটে মাত্র ৫৯ রান উঠেছিল। খেলার বাকি সময়ে দক্ষিণাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের তিন উইকেট খুইয়ে ১৭৯ রান সংগ্রহ করেছিল। জয়সীমা ৫৪ রান এবং আবিদ আলী ২১ রান করে অপরাজিত থাকেন। দক্ষিণাঞ্চল দলের খেলার সূচনা খুব আলগা হয়েছিল—৪৫ মিনিটের খেলায় মাত্র ৩০ রানের মাথায় তাদের দ্বিতীয় উইকেট পড়ে যায়। এই অবস্থায় আব্বাস আলী বেগ এবং জয়সীমা তৃতীয় উইকেটের জুটি বেঁধে ১৪৫ মিনিটের খেলায় দলের ১১৭ রান তুলে দলের ভাঙ্গন প্রতিরোধ করেন।

তৃতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ৪৫১ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৬৯ রানে অগ্রগামী হয়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে জয়সীমা (১৩১ রান) এবং আবিদ আলী ২১২ মিনিটের খেলায় দলের ২০৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন। পূর্বাঞ্চল দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের খারাপ ফিল্ডিংয়ের দরুণই দক্ষিণাঞ্চল দলের এত বেশী রান উঠেছিল। পূর্বাঞ্চল দল এইদিন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৪টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪৮ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে পূর্বাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৩০ রানের মাথায় শেষ হলে দক্ষিণাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং কোন উইকেট না খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৬২ রান তুলে দশ উইকেটে জয়ী হয়।

### সংক্ষিপ্ত স্কোর

**পূর্বাঞ্চল : ৩৮২** রান (গোপাল বোস ১১৩ এবং রমেশ সাকসেনা ৯০ রান। গোবিন্দরাজ ১১৪ রানে ৫ এবং চন্দ্রশেখর ১০২ রানে ৩ উইকেট)।

**ও ১৩০ রান** (শুক্লা ৪৪ রান। গোবিন্দরাজ ৪০ রানে ৩ উইকেট)।

**দক্ষিণাঞ্চল : ৪৫১** রান (জয়সীমা ১৩১, আবিদ আলী ১২০ এবং বেগ ৮০ রান। সাংভি ১০৪ রানে ৩ উইকেট)।

**ও ৬২ রান** (কোন উইকেট না পড়ে। বেলিয়াপ্পা ৩৮ নট আউট)।

## ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

### চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট

**ইংল্যান্ড : ৩৩২ রান** (বয়কট ৭৭ এবং এডরিচ ৫৫ রান। গ্লিসন ৮৩ রানে ৪ এবং ম্যালেট ৪০ রানে ৪ উইকেট)

**ও ৩১৯ রান** (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বয়কট ১৪২ নট-আউট, ওলিভিয়েরা ৫৬ এবং ইলিংওয়ার্থ ৫৩ রান। ম্যালেট ৮৫ রানে ২ উইকেট)

**অস্ট্রেলিয়া : ২৩৬ রান** (রেডপাথ ৬৪ এবং ওয়াল্টার্স ৫৫ রান। আন্ডারউড ৬৬ রানে ৪ উইকেট)

**ও ১১৬ রান** (লরী ৬০ নট-আউট এবং স্ট্যাকপোল ৩০ রান। জন স্নো ৪০ রানে ৭ উইকেট)।

সিডনিতে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ২৯৯ রানে জয়ী হয়ে ১৯৭০-৭১ সালের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। এই সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায় এবং বৃষ্টির ফলে তৃতীয় টেস্ট খেলায় একটা বলও খেলা হয়নি। সিডনি মাঠে এই নিয়ে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ৪০টি টেস্ট খেলা হল, তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ২০, ইংল্যান্ডের জয় ১৭ এবং খেলা ড্র ৩।

প্রথম দিনে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ২৬৭ রান সংগ্রহ করে। প্রথম উইকেটের জুটিতে বয়কট এবং লাকহার্স্ট ১১৬ রান সংগ্রহ করে খেলার ভিত বেশ শক্ত করলেও চা-পানের পর খেলতে নেমে অস্ট্রেলিয়া মাত্র ১৮ রানের বিনিময়ে ৪টে উইকেট ফেলে দেয়। যেখানে এক সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ২ উইকেট পড়ে ২০১, সেখানে প্রথম দিনের খেলার শেষে রান দাঁড়াল ৭ উইকেট পড়ে ২৬৭। খেলার এক সময় অস্ট্রেলিয়ার অফ-স্পিন বোলার ম্যালেট ৩১টি বল দিয়ে মাত্র ৪ রানের বিনিময়ে ৩টে উইকেট নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৩২ রানের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের সূচনা মোটেই সুবিধার হয়নি—১৪ রানের মাথায় ১ম এবং ৩৮ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ওয়াল্টার্স এবং রেডপাথ ৯৯ রান সংগ্রহ করে সাময়িকভাবে অস্ট্রেলিয়ার পতন রোধ করেন। ইংল্যান্ডের ফিল্ডিংয়ে গলতি না হলে অস্ট্রেলিয়াকে আরও শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হত।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২৩৬ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ৯৬ রানের ব্যবধানে এগিয়ে যায়। ন্যাটা স্পিন-বোলার আন্ডারউড শেষপর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার কাল হয়ে দাঁড়ান। আন্ডারউড মাত্র ৫ রানের বিনিময়ে ৩টে উইকেট পান।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১৭৮ রান সংগ্রহ করে জয়লাভের পথ সুগম করে নেয়। বয়কট ৮৪ এবং ওলিভিয়েরা ৫৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ইংল্যান্ড ২৭৪ রানে অগ্রগামী এবং দু'দিনের খেলা বাকি।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৩১৯ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪১৬ রানের পিছনে ধাওয়া করে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৬৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

অস্ট্রেলিয়া শেষপর্যন্ত পরাজয় এড়াতে পারলো না। পঞ্চম দিনে লাঞ্চের পর অস্ট্রেলিয়া মাত্র তিন মিনিট খেলেছিল। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ১১৬ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ২৯৯ রানে জয়ী হয়। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে জন স্নো ৪০ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে জয়লাভে প্রভূত সাহায্য করেন। তাঁর এই ৪০ রানে ৭ উইকেট—টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠ বোলিংয়ের পরিচয়। তাঁর পূর্বের রেকর্ড ছিল ৪৯ রানে ৭ উইকেট (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কিংস্টনের ২য় টেস্ট, ১৯৬৮)।

## আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

হায়দরাবাদে আয়োজিত ২৬তম আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগের ফাইনালে মহারাষ্ট্র জয়ী হয়ে উপর্যুপরি ৫ বার ছাড্ডা কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। পুরুষ বিভাগে রেলওয়ে উপর্যুপরি ২ বার রহিমতুল্লা কাপ পেয়েছে। বালকদের জুনিয়ার বিভাগে মার্গাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছে মহীশূর।

### ফাইনাল খেলা

**পুরুষ বিভাগ :** রেলওয়ে ৩-২ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : মহারাষ্ট্র ৩-০ খেলায় পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

জুনিয়র বিভাগ : মহীশূর ৩-০ খেলায় উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করে।

## জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

হায়দরাবাদে আয়োজিত ৩৫তম জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগের ফাইনালে উত্তরপ্রদেশের শ্রীমতী দময়ন্তী তাম্বে (কুমারী জীবনে সুবেদার) উপর্যুপরি ৩বার খেতাব জয়ী হয়েছেন। পুরুষ বিভাগের ফাইনালে রেলওয়ের সুরেশ গোয়েল রেলওয়েরই দীপু ঘোষকে পরাজিত করে গতবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন।

একমাত্র মহারাষ্ট্রের কুমারী শোভা মূর্তি তিনটি বিভাগের ফাইনালে খেলে দুটি খেতাব জয়ের সূত্রে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

### ফাইনাল খেলা

**পুরুষ সিঙ্গলস :** সুরেশ গোয়েল (রেলওয়ে) ১৫-১১, ৫-১৫ ও ১৭-১৬ পয়েন্টে দীপু ঘোষকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

**মহিলা সিঙ্গলস :** শ্রীমতী দময়ন্তী তাম্বে (উত্তরপ্রদেশ) ১১-৮ ও ১১-৩ পয়েন্টে কুমারী শোভা মূর্তিকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

**পুরুষদের ডাবলস :** দীপু ঘোষ এবং রমেন ঘোষ (রেলওয়ে) ১৫-৬ ও ১৫-৩ পয়েন্টে নান্দু নাটেকার এবং অনিল প্রধানকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

**মহিলাদের ডাবলস :** কুমারী শোভা মূর্তি এবং কুমারী মৌরিন ম্যাথিয়াজ (মহারাষ্ট্র) ১৭-১৪ ও ১৫-১২ পয়েন্টে কুমারী রফিক্কা লতিফ এবং কুমারী সুনিলা আপ্তেকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

**মিক্সড ডাবলস :** কুমারী শোভা মূর্তি এবং নান্দু নাটেকার (মহারাষ্ট্র) ১৫-৭ ও ১৫-১১ পয়েন্টে কুমারী তুলসী ব্যানার্জি এবং অনিল সোন্ধীকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

## রোভার্স কাপ ফাইনাল

বোম্বাইয়ের কুপারেজ মাঠে ১৯৭০ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার দ্বিতীয় দিনে কলকাতার মোহনবাগান ১-০ গোলে বোম্বাইয়ের মাহিন্দর অ্যাণ্ড মাহিন্দর ক্লাবকে পরাজিত করে মোট চারবার রোভার্স কাপ জয়ী হয়েছে। ইতিপূর্বে তারা ১৯৫৫, ১৯৬৬ এবং ১৯৬৮ সালে রোভার্স কাপ পেয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে মোহনবাগানের রোভার্স কাপের ফাইনালে খেলা হল মোট ১২বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি ৭ বার) এবং অপরদিকে মাহিন্দর এ্যাণ্ড মাহিন্দর ক্লাবের একবার। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা গোলশূন্য ভাবে ড্র ছিল; দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধে মোহনবাগান বিপক্ষের আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে খেলার ৫২ মিনিটে গোল দেয়, সুভাষ ভৌমিক দলের জয়সূচক গোলটি দেন। এই গোল খাওয়ার পর বোম্বাই দল ৬১ মিনিটে গোল শোধ দেওয়ার শেষ সুবর্ণ-সুযোগ নষ্ট করে।

## ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে যে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে ক্রিকেট খেলার সফর সুরু করবে তার খেলোয়াড় নির্বাচন পর্ব শেষ হয়েছে। দলের নির্বাচিত ১৬জন খেলোয়াড়ের মধ্যে পাঁচজন খেলোয়াড় ভারতবর্ষের পক্ষে কোন টেস্ট ম্যাচ খেলেননি। তাঁরা হলেন— জয়ন্তীলাল, কৃষ্ণমূর্তি, গোবিন্দরাজ, গাভাস্কার এবং জিজিবয়। দলের এগারজন টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে জয়সীমা, সারদেশাই, দুরাণী এবং প্রসন্ন—এই চারজন খেলোয়াড়ের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের অভিজ্ঞতা আছে। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় হলেন সেলিম দুরানী (বয়স ৩৬) এবং সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় সুনীল গাভাস্কার (বয়স ২০)। সাধারণের অভিমত অভিজ্ঞ এবং তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দলটি তৈরী হয়েছে এবং যোগ্যতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তবে বাংলার উইকেটকিপার জিজিবয়ের নির্বাচন কোন কোন মহলকে বিস্মিত করেছে। দলে নির্বাচিত ১৬জন খেলোয়াড়ের মধ্যে বোম্বাইয়ের ৫জন, হায়দরাবাদের ৩জন, মহীশূরের ২জন এবং একজন করে খেলোয়াড় আছেন তামিলনাড়ু, দিল্লী, বাংলা এবং রাজস্থানের।

**খেলোয়াড়বৃন্দ :** অজিত ওয়াদেকার (অধিনায়ক), এস ভেঙ্কটরাঘবন (সহ-অধিনায়ক), অশোক মানকাদ, কে জয়ন্তীলাল, জি আর বিশ্বনাথ, ই ডি সোলকর, এম এল গাভাস্কার, এম এল জয়সীমা, ই এস প্রসন্ন, বি এস বেদী, আর জিজিবয় (উইকেট কিপার) পি কৃষ্ণমূর্তি (উইকেট কিপার), ডি গোবিন্দরাজ, আবিদ আলী, এন সারদেশাই এবং এস এ দুরাণী।

## জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

আগ্রায় ২১তম জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগের খেতাব জয়ের সূত্রে সর্বাধিক বার খেতাব জয়ের রেকর্ড (১৩ বার) করেছে। তাছাড়া তাদের উপর্যুপরি সর্বাধিকবার খেতাব জয়ের রেকর্ড (১১ বার) অক্ষুণ্ণ আছে। মহিলা বিভাগে ফাইনালে বাংলা দলের কাছে গত চ বছরের চ্যাম্পিয়ান মহারাষ্ট্র পরাজয় ক করেছে।

## জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা

গৌহাটিতে ১৯তম জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে খেতাব জয়ের সূত্রে পাঞ্জাব মোট ৯ বার এবং উপর্যুপরি ৫ বার বিক্রম মেধী ট্রফি জয়ী হয়েছে। মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ান হিসাবে তিলোত্তমা বসু কাপ জয়ী হয়েছে অ প্রদেশ।

## পরলোকে সনি লিস্টন

ভূতপূর্ব বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ন চার্লস (সনি) লিস্টনের অকালমৃত্যুতে এব অস্বাভাবিক বৈচিত্র্যময় জীবনের অবসান হ তাঁর স্ত্রী সাত দিন শহরের বাইরে ছিলে বাড়ি ফিরে ঘরের মধ্যে লিস্টনকে অবস্থায় আবিষ্কার করেন। এই মৃ কারণ উদ্ঘাটনে জোর পুলিশী ত চলেছে। অখ্যাতি এবং খ্যাতির লিস্টনের জীবন কেটেছিল। একবার ডাক করার অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড হয় কারাগারে তিনি মুষ্টিযুদ্ধ শিখে ফ্ল প্যাটারসনকে উপর্যুপরি দুবার (১৯৬২ ১৯৬৩ সালে) পরাজিত করে হেভীও বিভাগে বিশ্বখেতাব লাভ করেন। পেশা মুষ্টিযুদ্ধের আসরে নেমে তিনি অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লিস্টন ৭ম রাউ ক্যাসিয়াস ক্লে-এর কাছে নক-আউটে জিত হয়ে বিশ্ব খেতাব হাতছাড়া করে

অমৃতে পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

### লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।
২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।
৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

### গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

### চাঁদার হার

| | কলিকাতা | মফঃস্বল |
|---|---|---|
| বার্ষিক | টাকা ২০-০০ | টাকা ২২-০০ |
| ষান্মাষিক | টাকা ১০-০০ | টাকা ১১-০০ |
| ত্রৈমাসিক | টাকা ৫-০০ | টাকা ৫-৫০ |

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১০ম বর্ষ
৩য় খণ্ড

৩৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, January 29th 1971 শুক্রবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৭৭ 40 Paise

## সূচীপত্র



প্রচ্ছদ : শ্রীবাণীব্রত পোদ্দার

# চিঠিপত্র

## উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের উপাদান

গত ২৪শে পৌষ তারিখের সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীঅমরজিৎ চক্রবর্তী মহাশয়ের একটি লেখা দেখলাম। এই প্রবন্ধে শ্রীচক্রবর্তী মহাশয়ের শুধু আঞ্চলিক অভিজ্ঞতাই অধিক ফুটে উঠেছে মনে করি। তাঁর প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লেখা আছে—'অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা উত্তরের গ্রাম বাংলাকে প্রভাবিত করতে পারে নি।' তাঁর এই উদ্ধৃতির তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না। তাঁর জ্ঞাতার্থে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, সার্বভৌম্ বঙ্গের লোক-সংস্কৃতির বা লোকগীতির মধ্যে 'সুরমা-মেঘনা-পদ্মা' পারের লোক সংস্কৃতিই সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য ও আকর্ষণীয়। শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ ধামাইল, ভাটিয়ালী, মারফতি, গোবিন্দ-কীর্তন, গোপিনীকীর্তন ও সূর্য-ব্রতের গান, ময়মনসিংহের গীতিকা 'এবং কুষ্ঠিয়ার লালন ফকিরের গানই বাংলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে গৌরব অর্জন করেছে। সুরমা পারের রাধা-রমন, সৈয়দ শাহ্‌নূর, হাছন রজা, মৃণাল দাস, সুখময় দাস, মনোমোহিনী দাস, পঞ্চানন্দ দাস, সর্বানন্দ দাস, রূপচাঁদ, আক্‌কল আলী, মেঘনা পারের দীন শরৎ, কাঙ্গাল আতপ ও সেখ জালালোদ্দিন এবং পদ্মা পারের লালন ফকিরের কীর্তি সর্বজনবিদিত। শ্রীচক্রবর্তী মহাশয় আরও জানিয়েছেন যে, মনসামঙ্গলের কবি নারায়ণ দেব নাকি রাঢ় দেশীয় ছিলেন। অবশ্য তিনি বহু বৎসর রাঢ় দেশে এবং পরে ময়মনসিংহে অতিবাহিত করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলার সুপ্রসিদ্ধ জলসুকা গ্রামে। কবি বল্লভচন্দ্র দেব তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, এবং উভয়ে মিলে কাব্য লেখেন। একটি ভণিতায় আছে 'নারায়ণ দেবে কয়, সুকবি বল্লভ হয়।' শ্রীহট্ট জেলায় তাঁদের কাব্য খুবই প্রচলিত।

লেখকের জ্ঞাতার্থে আরও জানাচ্ছি যে 'মনসা-মঙ্গল বা পদ্ম-পুরাণ' প্রথম লেখেন শ্রীহট্টের কবি হরি দত্ত (হরিহর দত্ত)। তাঁর অনেক পরে বরিশালের বিজয় গুপ্ত, এবং শ্রীহট্টের ষষ্ঠীবর দত্ত 'মনসা-মঙ্গল' কাব্য লেখেন। শ্রীহট্ট জেলায় ষষ্ঠীবর দত্তের কাব্য সর্বাধিক প্রচলিত। ষষ্ঠীবর দত্তের লেখায়ও ভণিতা যুক্ত আছে।

'কহে ষষ্ঠীবর কবি, কণ্ঠে ভারতী দেবী,
জয়দেবী যারে দিলুম বর।'

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ষষ্ঠীবর দত্তের বিদুষী পত্নী চন্দ্রাবতীও একখানা পূর্ণাঙ্গ কাব্য লেখেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'মনসা-মঙ্গল' কাব্য লেখেন। তাঁরও কাব্যে ভণিতা আছে—

'কহে কবি চন্দ্রাবতী, ষষ্ঠীবর পতি।
ত্রিজগতের মা তুমি, তোমার কি দুর্গতি।।
এই আশীর্বাদ কর মা গো, জুড়ি দুই হাত।
সুখেতে রাখিও মোর, পুত্র সিদ্ধনাথ।।'

শ্রীহট্ট জেলায় এ পর্যন্ত ২৫ জন মনসা-মঙ্গলের কবির নাম পাওয়া গেছে। তাঁদের সকলের বিরচিত পূর্ণাঙ্গ কাব্যও শ্রীহট্ট-সাহিত্য পরিষদে রাখা হয়েছে। এ সমুদয় কাব্য ভাব-গম্ভীর ও শব্দ-সম্পত্তিতে ভরপুর।

সুরেশচন্দ্র দেবনাথ
কীডগঞ্জ, এলাহাবাদ।

## "বৈকুন্ঠের খাতা" 'গাহা সত্তসঈ' প্রসঙ্গে

আপনাদের বহুল প্রচারিত অমৃত পত্রিকায় 'বৈকুন্ঠের খাতা' বিভাগে গ্রন্থদর্শী প্রতি সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যের হাল আমলের এক একখানি উল্লেখযোগ্য রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। তার জন্য তাঁকে গ্রন্থপিপাসু মাত্রেই ধন্যবাদ জানাবেন। শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য কৃত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা সাত বাহন-রাজ হাল-সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ'-এর বাংলা পদ্যানুবাদ বইখানির প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গত শুক্রবার ১৬ই পৌষ, ১৩৭৭। পার্বতীবাবু বাংলা কাব্য পাঠকদের বহুদিনের এক সযত্ন পালিত আশা এই মূল্যবান গ্রন্থে পূরণ করেছেন। এ কাজ তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তিনি একাধারে কবি ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। সেই কারণে প্রাকৃতের অনাস্বাদিত মেজাজ বাংলা ছন্দের স্বচ্ছ পেলব প্রবহমানতায় তিনি এক অভিনব কাব্যিক রসের আমেজ এনে দিলেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থদর্শী বলেছেন—'কিন্তু কে এই সাত বাহন-রাজ হাল? ঐতিহাসিকেরা তাঁর বিশেষ কোন পরিচয় দিয়ে গেছেন বলে জানা যায় নি।' কথাটা সত্য, এ বিষয়ে বহুদিন আগে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধের কথা মনে পড়ছে। 'হরপ্রসাদ-সংবর্ধন - লেখমালা' গ্রন্থে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব 'রাজা হাল ও পাটলি পুত্র' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—হাল ছিলেন—সাতবাহন বা শালিবাহন বংশের একজন রাজা। মৎস্যাদি পুরাণে রাজবংশ কথন প্রসঙ্গে আমরা হালের নাম পাই; তাঁহার রাজ্যকাল মাত্র পাঁচ বৎসর বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। লিপিতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে হালের একশত বৎসর পূর্বে সাতবাহন রাজা প্রথম পুলোমা (যাঁহাকে নাসিকাদি স্থানের শিলালিপিতে বাসিঠীপুত্র পুলুমায়ি' বলা হইয়াছে) খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর মাঝখানে পড়েন। সুতরাং আমরা হালকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কোন কোন প্রতীচ্য পন্ডিত অনুমান করেন যে, সপ্ত-শতীকে অত প্রাচীনকালের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না, ইহার ভাষার পদের নাদিস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ প্রায়শই দৃষ্ট হয় এবং নাসিক প্রভৃতি স্থানের শিলা-লিপির প্রাকৃতে ও অশ্বঘোষের প্রাকৃতে তাদৃশ লোপ দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সপ্তশতীর ভাষা মহারাস্ট্রী প্রাকৃত। সে প্রাকৃতের প্রধান লক্ষণই হইতেছে—ব্যঞ্জনবর্ণের প্রায়শ লোপ। তাহার কারণ, মহারাস্ট্রীয়দের মধ্যে যখন প্রথমে সংস্কৃত ভাষার প্রচার হয়, তখন তাহাদের জিহ্বার জড়তা এতটা ছিল যে, তাহারা সংস্কৃত কোন পদের মধ্যে কিংবা অন্তে স্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ না করিয়া, তাহার পরিবর্তে স্বরবর্ণের প্রয়োগ করা অল্পায়াসসাধ্য মনে করিত। উত্তর ভারতের প্রাকৃতে ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ দেখা যায় না; সে স্থানের অধিবাসীদিগের উচ্চারণের রীতি অন্য রূপ ছিল। সেই জন্য অশ্ব-ঘোষের প্রাকৃত কিংবা উত্তর ভারতের অপর কোন প্রাকৃতের সঙ্গে সপ্তশতীর ভাষার তুলনা করিয়া তাহার কাল নির্ণয় করা উচিত হইবে না। নাসিক প্রভৃতি স্থানের শিলালিপির ভাষার সঙ্গে তুলনা করিয়া ফরাসী পন্ডিত ( Senart • ) 'সেনার' সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাসিঠীপুত্র পুলুমায়ি ও তাঁহার পিতা গোতমীপুত্র সাতকর্ণির একশত বৎসর পরে সপ্তশতী রচিত। সেনার সাধারণ মতের অনুসরণ করিয়া এই দুই রাজাকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ফেলিয়াছেন। কিন্তু আমি দেখাইয়াছি যে, তাঁহারা খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং শিলালিপির ভাষা পর্যালোচনা করিলেও হালের সপ্তশতীকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত বলা যায়।'

রাজদেব মুখোপাধ্যায়
বালি, হাওড়া।

# চিঠিপত্র

## এই আমাদের দেশ

গত ১৬ পৌষ ১৩৭৭ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'এই আমাদের দেশ'-এর অন্তর্গত 'ওলন্দাজ - পর্তুগীজ - নখক্ষত চুঁচুড়া-হুগলীতে' শীর্ষক রচনাটি পড়লাম।

হুগলীর নামকরণ নিয়ে লেখক তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে, এখানে প্রচুর হোগলা বন থাকায় এই শহরের নামকরণ হয়েছে 'হুগলী।' এটি যেমন ঠিক কথা, তেমনি এটিও ঠিক যে, পর্তুগীজরা হুগলীতে এসেই কতকগুলো গুদোমঘর তৈরী করেছিল। এই গুদোম কথাটির উৎপত্তি হোল পর্তুগীজ 'Gudao' কথা থেকে। দিশী ভাষায় যার নাম হোল 'ওগলী।' এই 'ওগলী' থেকেই প্রচলিত হয়েছে 'হুগলী' নামটি।

দ্বিতীয়, সেন্ট জন আর্মেনীয় গির্জাটির নির্মাণ কাজ সুরু করেন জোহানস মার্কার ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তিনি এটি শেষ করে যেতে পারেননি। শেষ করেছিলেন তাঁর ভাই। গির্জার সামনের দিকটা তখনও তৈরী হয়নি। সে হয়েছিল অনেক পরে ১৮২২ সালে। কলকাতার এক আর্মানী সাহেবের বিধবা স্ত্রী মাদাম বেগরাম ঐ গির্জাটি নতুন করে তৈরী করে দেন।

কাসিম খাঁর প্রসঙ্গে এটুকু বলতে চাই যে, ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে কাসিম শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন এই হুগলীতে। কিংবদন্তী, দিল্লীর এক সম্রাট বাংলাদেশকে মনে করতেন 'দোজখ' অর্থাৎ নরকের দেশ। তাই কোন আমীর ওমরাহ বা কোন পদস্থ ব্যক্তি কোন গুরুতর অপরাধ করলে তাঁদের শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা না করে নির্বাসন দেওয়া হতো এই বাংলা দেশে। মল্লিক কাসিম ছিলেন ঐ ধরণের অপরাধী। তাই শাস্তি স্বরূপ তাঁকে আসতে হয়েছিল হুগলীর শাসনকর্তা হিসেবে। এই মল্লিক কাসিমের নাম অনুসারেই হুগলী-চুঁচুড়ার হাটের নামকরণ হোল 'মল্লিক-কাসিম-হাট।' লেখক তাঁর প্রবন্ধে এই নামকরা হাটের উল্লেখ করতে বোধহয় ভুলে গেছেন।

পরিশেষে হাজী মহম্মদ মহসীনের দ্বারা তৈরী হুগলী কলেজ, ইমামবাড়া ইত্যাদি তৈরী প্রসঙ্গে পাঠকদের মনে স্বভাবতই উদয় হতে পারে, হাজী মহম্মদ মহসীন অত্যন্ত গরীব হয়েও কি করে এরূপ ব্যয়সাধ্য কাজ নিষ্পন্ন করেন।

মহসীনের সম্পর্কিত বোন ছিলেন মন্নু-বেগম। তিনি ছিলেন অগাধ ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। পিতার মৃত্যুর পর মন্নু বেগমের অভিভাবক হলেন মহসীন। তিনি তাঁর বোনের তখন বিবাহ দিলেন মির্জা সালাউদ্দিনের সঙ্গে। কয়েক বছর যেতে না যেতেই মন্নু বেগম বিধবা হয়ে গেলেন। কাজেই মহসীন আবার হলেন তাঁর অভি-ভাবক। তারপর কিছুকাল পরে মন্নু বেগম ইহলোক ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক করে গেলেন মহসীনকে। কিন্তু বিষয়ে অনাসক্ত মহসীনের এত ধন-সম্পত্তি পছন্দ হোল না। তাই তিনি একটা চরম দানপত্র লিখে দেওয়ার কথা মনে মনে ভাবতে লাগলেন। তারপর ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মহসীন সেই সম্পত্তি সৎ কাজে ব্যয় করবার জন্যে লিখে দিলেন এক চরম দানপত্র। যার ইংরেজী অনুবাদ আজও লেখা রয়েছে ইমামবাড়ার দেওয়ালে। এই সম্পত্তি দেখার কাজে মহসীন মাতোয়ালী নিযুক্ত করলেন রাজাউলি খাঁ এবং সফিরউলি খাঁকে। কিন্তু তাঁরা দুজন মতলব করে এই সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করলেন। ফলে এ ব্যাপারে গভর্ণমেন্টকে হস্তক্ষেপ করতে হলো। সে হলো ১৮১০ সালের কথা। প্রিভি কাউন্সিলের মধ্যস্থতায় এই সম্পত্তি অবশেষে গভর্ণমেন্টের হস্তগত হয়। তারপর সরকার ঐ টাকায় মহসীনের নামে তৈরী করে দিলেন ইমামবাড়া, হাসপাতাল ও হুগলী কলেজ।

বারিদবরণ ঘোষ
চুঁচুড়া, হুগলী

## মফস্বলের লিটল ম্যাগাজিন

মফস্বলে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে গ্রন্থদর্শী যে আলোচনা করেছেন সে জন্যে অমৃতের একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে গ্রন্থদর্শী ও অমৃত সম্পাদককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে আসামের করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'উদক' এবং সর্পিল' যে গ্রন্থদর্শীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সে বিষয়ে ধুবড়ীর অধ্যাপিকা হেমা বড়ুয়া ১৬ই পৌষ তারিখের অমৃতে আলোকপাত করেছেন। সে জন্যে অধ্যাপিকা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু ১লা মাঘের অমৃতে পাটনার সপ্তর্ষীপার সম্পাদক জীবনময় দত্ত 'সর্পিলে'র লেখক হয়েও করিমগঞ্জের 'সর্পিল'কে কেন যে হাইলাকান্দিতে ঠেলে দিলেন তা বুঝতে পারলাম না। আবার জীবনময়বাবুর গল্প তো আমি 'উদকে'ও পড়েছি। 'উদক' যে করিমগঞ্জ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় সে কথা জেনেও জীবনময়-বাবু কেন যে উদকের নাম বেমালুম চেপে গেলেন তাও ঈশ্বর জানেন। জীবনময়-বাবুর ভুলগুলো যে ইচ্ছাকৃত তা বলছি না, কিন্তু একজন ম্যাগাজিন সম্পাদক তথ্য সরবরাহে আর একটু সচেতন হবেন এটুকু আশা নিশ্চয়ই করতে পারি। মফস্বলের এক অখ্যাত অমৃত পাঠকের এই চিঠিখানি অমৃতে প্রকাশিত হলে বাধিত হব।

মুকুলদেব পুরকায়স্থ
করিমগঞ্জ,
আসাম।

## পিঞ্জর প্রসঙ্গে

আমি 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। সবদিক থেকে 'অমৃত' প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা বলে আমার মনে হয়। 'অমৃত' হাতে পেয়েই আমি এখন যেটা প্রথমেই পড়ি, তাহল সুভাষ সিংহ মহাশয়ের 'পিঞ্জর' উপন্যাস। এরজন্য লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাই। গল্পের সহজ সরল ভাষা ও বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ খুবই ভাল। লেখক মীরার মানসিক স্পন্দন ও রজতের আচরণ সুন্দরভাবে ফোটাতে পেরে-ছেন। বিনয় ও শেফালীর ঘটনা পাঠককে স্বাভাবিক আনন্দ দান করবে। আলোর পাশে কালোর মতো এই দু-জোড়া নায়ক-নায়িকার সংস্থাপন নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। লেখকের কাছে গল্পের সুন্দর পরিণতি যেমন আশা করব, তেমন সম্পাদক মহাশয়ের কাছে আশা করব এ ধরনের আরও উপন্যাস।

অশোককুমার সাউ,
দক্ষিণ দুর্গাপুর,
হাওড়া।

## 'অমৃত প্রসঙ্গে'

'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকাটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার জগতে একটি অদ্বিতীয় সংযোজন, একথা আমি একবাক্যে স্বীকার করবো। এই পত্রিকার দুটি নিয়মিত বিভাগ 'নিসর্গেই আছে' ও 'মুখের মেলা' আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এছাড়া গল্প, কবিতা, উপন্যাস, খেলাধুলা, সিনেমা ইত্যাদি তো রয়েছেই।

অসীম দত্ত
কলকাতা-৪০।

# শা[illegible]চোখে

পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারবে কি? অথবা এই অশান্ত পরিবেশে নির্বাচন আদৌ সম্ভব কি? এ দুটি প্রশ্ন রাজ্যের প্রায় সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের মনকেই বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। এতদিন অনেকেই মনে করছিলেন নির্বাচনের কথা ঘোষিত হলেই আবহাওয়া ভাল হতে সুরু করবে। কিন্তু নেতাদের ধারণা অনেকটা আবহাওয়াবিদদের ভবিষ্যদ্বাণীর মতই মনে হচ্ছে। দিন যত এগুচ্ছে পরিবেশ ততই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। যাঁরা নির্বাচন চান না তাঁদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু যাঁরা নির্বাচনকে অপরিহার্য বলে মেনে নিয়েছেন তাঁরাও এখন ইতস্ততঃ করছেন, এবং কি পরিণাম ঘটতে পারে, এই আশঙ্কায় সতর্কভাবে কথাবার্তা বলছেন।

পরিবেশ আবার ভয়াবহভাবে অশান্ত রূপ নেওয়ার মূলে রয়েছে দলগুলির হৃত সংগঠন পুনরুদ্ধার করার সংকল্প। কারণ প্রত্যেকেই জানেন বর্তমানে রাজ্যের অনেক স্থানে দলীয় তালিকা চিহ্নিত হয়ে গেছে। কাজেই শুধু 'এলাকার' উপর নির্ভর করে একটি নির্বাচনী ক্ষেত্রে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। অন্যান্যবার এ হেন 'এলাকা' ছিল না এমন নয়। তবে সেই 'এলাকা' ছিল সাংগঠনিক ক্ষেত্র। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রার্থীরা প্রচার করেও ঐ সমস্ত 'সাংগঠনিক এলাকা' থেকে খুব বেশী ভোট টেনে নিতে পারত না। অবাধে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা ছিল বলে নির্বাচনী আবহাওয়া দলের অনুকূলে টানবার চেষ্টাও করতে পারত। কিন্তু এবার তার বিপরীত অবস্থা। এক 'এলাকার' লোক অন্য 'এলাকায়' এবার যেতে পারবে বলে মনে হয় না। গেলেও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ভোট চাওয়ার অর্থটা কি দাঁড়াবে গুণীজন তা অনায়াসেই অনুমান করতে পারেন, আবার 'এলাকার' মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভোট কেন্দ্র স্থাপিত হবে। অতএব, ঐ কেন্দ্রে একজন ভোটারও যদি 'এলাকা' সমর্থিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দেন তবে তাঁর অবস্থা কি হতে পারে তা ভাবতেও শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে। এ হচ্ছে বাস্তব সত্য, বাস্তব ঘটনা। রাজ্যের সমস্ত বিধানসভা ক্ষেত্রে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে একথা বলছি না। তবে প্রায় ১০০টা আসনের ক্ষেত্রে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার অধিকর্তারা এই প্রশ্নগুলি কিভাবে এড়িয়ে যাবেন বা যাচ্ছেন জানি না। তবে চিরাচরিত নিয়মে সত্যকে গোপন রেখে বড় কর্তাদের খুশী করার জন্য অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে এহেন রিপোর্ট যদি ওপরে পাঠিয়ে থাকেন, তবে তাঁরা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ক্ষতিই করেছেন। এবং শুধু তাই নয়, আরও অশান্তির পরোক্ষ ইন্ধন জুগিয়েছেন।

একথা অবশ্য সকল গণতান্ত্রিক মানুষই স্বীকার করবেন যে এ যাবৎ এই রাজ্যে যত নিবাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কোনবারই এহেন পরিস্থিতি ছিল না। যাঁরা নির্বাচন বয়কট করতে চান তাঁরা তা করতে পারেন। কেউ যদি বলেন, নির্বাচন হতে দেব না তখন তা রাষ্ট্র শক্তির মোকাবেলার প্রশ্ন আসে। সে অবস্থাও উপলব্ধি করা কঠিন নয়। শত দুর্যোগের ঝুঁকি নিয়েও নির্বাচন চালাবার জন্য প্রস্তুত হতে পারা যায়। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তা সত্যিই অদ্ভুত। নির্বাচনে বাধা দেওয়ার জন্য নয়, নির্বাচনে দলীয় শক্তি বাড়াবার জন্য যেভাবে 'এলাকা' বিস্তারের লড়াই চলছে তা সত্যিই ভয়াবহ। যখন এই রাজ্যে 'কাকদ্বীপ' অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখনও এমন সাংঘাতিক রূপ প্রকট হয়নি। কোথাও কোথাও যে সে সময় নির্বাচনী প্রচারে বাধা আসেনি তা নয়—কিন্তু তা আজকের মত অত হিংস্র ও ভয়াবহ ছিল না। এখন ত এক পাড়ার লোক ভিন পাড়ায় যেতেও সাহসী নয়। আত্মীয়তা রক্ষার জন্য পর্যন্ত আজকাল ভিন পাড়ায় যেতে লোক পারছে না। নির্বাচনী প্রচার ত দূরের কথা। এই বাস্তব ঘটনাকে কেউ যদি উপেক্ষা করে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা নিজেদেরই ক্ষতি করবেন মাত্র। অবাধ নির্বাচনী প্রচার করার অধিকার না থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব কি? আর সেই নির্বাচনে নাগরিকদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ সুযোগ না থাকলে নির্বাচনের গুরুত্ব থাকে কি? সেই নির্বাচন প্রতিনিধিত্বমূলক হতে পারে কি? কোন রকমে একটা নির্বাচন হয়ে গেলেই কি গণতন্ত্র রক্ষা পাবে? না গণতন্ত্রের প্রতি লোকের আসক্তি ও বিশ্বাস শিথিল হবে? কোনটা সত্যি?

বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তাতে যাঁরা ভোটার তাঁরা নিরাপদ বোধ করছেন বলে ত মনে হয় না। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এই আশঙ্কার কথা প্রায়শই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আগে দেখা গেছে প্রায় সব নির্বাচনী কেন্দ্রেই শতকরা ৬০ ভাগ লোক গড়ে তাঁদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এবার আশঙ্কা হয় হয়ত ভোটাররা অত্যন্ত কম সংখ্যায় ভোট কেন্দ্রে হাজির হবেন। কারণ, জীবন বিপন্ন করে সাধারণ নাগরিক ভোট দিতে সাহসী হবেন কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। যাঁরা নিতান্ত দল-অনুগত তাঁরা হয়ত সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি শতকরা ৪০ জন ভোটার ভোট দিতে আসেন তবে তাকে নৈতিক দিক থেকে সাধারণ নির্বাচন বলে মেনে নেওয়া উচিত কি? প্রথম যখন নির্বাচন এই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন নাগরিকরা ভোট সম্বন্ধে তত সজাগ ছিলেন না। কিন্তু আজ তাঁরা অনেক বেশী সচেতন। কর্তৃপক্ষ হয়ত বলবেন যে আমরা ত ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলাম, লোক যদি না আসে আমরা কি করতে পারি। এ যুক্তি কিন্তু খুব বিচারসহ হবে না। কেননা, শান্ত পরিবেশে যদি ভোটার ভোট না দেন তবে সে দায়িত্ব নাগরিকদের। কিন্তু বর্তমানের অশান্ত পরিবেশ—যদি শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের নিশ্চেষ্ট করে তোলে তবে তাঁদের দোষ দেওয়ার কিছু থাকবে কি? এই প্রশ্ন বিশেষভাবে প্রণিধান করা একান্ত কর্তব্য।

এটা হল নির্বাচনের একটি দিক। অন্যদিকে সরকারী প্রস্তুতি আছে কিনা সেই সম্পর্কেও অনেকের মনে বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রথমে নির্বাচন হবে কি হবে না, এই দোটানার মধ্যে পড়ে রাজ্য নির্বাচনী সংস্থা হাবুডুবু খেয়েছে। তারপরও যখন নির্বাচনের দিন স্থির হলো, তখন কত তারিখ অবধি ভোটার তালিকায় নাম তোলা যাবে সেই সম্পর্কে টানা-হ্যাঁচড়া চলল। ১৮ই

জানুয়ারী নাম তালিকাভুক্ত করার শেষদিন ছিল। সরকারী প্রস্তুতি সেভাবেই চলছিল। কারণ, নাম তালিকাভুক্তির কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর নতুন করে ভোটারের মূল তালিকার তাকে সংযোজিত করে তালিকার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার বিধান আছে। আর সেই চূড়ান্ত তালিকার ভিত্তিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবারে নির্বাচনের সময় অত্যন্ত নিকট। রাজ্য নির্বাচনী 'মেশিনারী' এত পটু নয় যে সংশোধিত ভোটার তালিকা পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব। আবার সেই নতুনভাবে ভোটার হওয়ার সময় নির্ঘণ্টও মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীসেনবর্মা মহোদয় এক কলমের খোঁচায় আরও এক সপ্তাহ অর্থাৎ ২৩শে জানুয়ারী পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন। এই রাজ্যে যাঁরা নির্বাচন পরিচালনা করবেন, সেই সমস্ত অফিসাররা আগে জানতেই পারলেন না যে শ্রীসেনবর্মা এরকম একটি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন। আকাশবাণী মারফৎ এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলা অধিকর্তারা বিস্মিত হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাকরণে টেলিফোন করে প্রকৃত অবস্থা কি তা জানবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। মহাকরণ থেকে উত্তর গেল, হ্যাঁ শ্রীসেনবর্মা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ঐ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব, প্রতিশ্রুতি এবার সার্কুলারের রূপ নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই জেলাতে গিয়ে হাজির হবে। সরকারী কাজ যেভাবে চলে তাতে একজন জেলা অধিকর্তা ইচ্ছা করলে আইনানুগভাবেই সার্কুলার না পাওয়া পর্যন্ত ঐ সংগৃহীত খবরের মর্যাদা না দিয়ে প্রয়োগবিধি স্থগিত রাখতে পারেন। কিন্তু ভোটার হওয়ার তারিখ বাড়ানোর ফলে নতুন সংশোধিত তালিকা প্রার্থীরা পাবেন কিনা সেই সম্বন্ধে যথেষ্ট আশংকা দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, পুরনো যে ভোটার তালিকা আছে, সরকার তা প্রার্থীদের সরবরাহ করতে অক্ষম। কেননা যা ছাপানো ছিল তাই দিয়ে নাকি সরকারী কাজ চালাবারই চেষ্টা হচ্ছে। নতুন করে ছাপাবার পরিকল্পনাও নেই কিম্বা সঙ্গতিও নেই। যতদূর জানা যায় এক একটি নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট পরিচালনার জন্য সরকারের জন্যই ৩০ কপি করে ভোটার তালিকা লাগে। বর্তমানে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভোটার তালিকা চাইছেন সরকার পক্ষ থেকে নাকি বলা হচ্ছে, এই ত সেই '৬৯ সালে তালিকা নিয়ে গেছেন, ঐ তালিকা দিয়ে কাজ সারুন। যদিও বা স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির এক আধটা পাওয়ার আশা আছে নতুন কোন দল বা প্রার্থী ভোটার তালিকা পাবেন না বলেই মনে হয়। অতএব, বুঝুন, নির্বাচন কিভাবে হবে। কে ভোটার কে ভোটার নন, না জেনেই 'ভোট দিন', 'ভোট দিন' চেঁচিয়ে আসর গরম করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। নির্বাচনের আগে যাঁরাই প্রার্থী হোন না কেন—প্রত্যেকের পক্ষ থেকেই তালিকা ধরে ভোটার অনুসন্ধানের কাজ চলে। জীবিত কি মৃত, এখানে থাকেন কি অন্যত্র চলে গেছেন বা বয়সটা ঠিক মত উঠেছে কিনা—ইত্যাদি আগেভাগে খুঁটিয়ে দেখা হয়। যদি ভোটার তালিকাই প্রার্থীরা না পান তবে সুষ্ঠু নির্বাচন কিভাবে হবে তা বোঝা দুষ্কর। কোন দল কিভাবে ভোটার সংগ্রহ করবেন তাও আন্দাজ করা মুস্কিল হয়ে উঠবে। কাজেই বলছিলাম, ঘোষণা করেই সরকার নিয়ম রক্ষা করছেন। আনুষঙ্গিক কর্তব্য সাধিত না হলে যে গোড়ায় গলদ হয়ে যাবে—প্রশাসনের অধিকর্তারা সেই সম্পর্কে অবহিত আছেন কিনা, এই প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীসেনবর্মা আসমুদ্র-হিমাচল পরিভ্রমণ করে নির্বাচনের জন্য তাঁর দপ্তর সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে বলে ঘোষণা করে যাচ্ছেন। তিনি নাকি আবার পশ্চিমবঙ্গে এই নির্দেশও দিয়ে গেছেন যে নির্বাচনী আইন অনুযায়ী এবার ভোট কেন্দ্রে যেতে ভোটারদের যাতে ২ কিলোমিটারের বেশী হাঁটতে না হয় সেভাবেই ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে, রাজ্যে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা বর্তমানে যেরূপ, তাতে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির জন্য অধিকসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ১ লক্ষ ৩০ হাজার পুলিশের ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন। এবং এই তথ্য শ্রীসেনবর্মার নিকটও পেশ করা হয়েছে। শুধু ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্যই এতসংখ্যক পুলিশ দরকার। কিন্তু গোটা রাজ্যে ভোট গ্রহণের দিন বা আগে থেকে যে অবস্থার উদ্ভব হবে বলে আশংকা করা যাচ্ছে তার জন্য কি ব্যবস্থা? ইতিমধ্যেই অনেক নেতাকে নিরাপত্তার জন্য পুলিশী সাহায্য দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের প্রত্যেক প্রার্থীই ভি আই পি। কেননা, আগেভাগে ত কেউ বলতে পারবে না, কে জয়ী হবেন বা জয়ী হবেন না। অতএব, এই ভবিষ্যৎ সদস্যরা যদি স্বীয় নিরাপত্তার জন্য পুলিশ প্রহরা দাবী করেন তবে তাঁদের বক্তব্যকে উপেক্ষা করা যাবে কি করে? তখন কি কর্তৃপক্ষ যাঁদের ইতিমধ্যে দেহরক্ষী দিয়েছেন তাঁদের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে অন্যদের দাবীর মোকাবিলা করবেন? এই সমস্ত ভি আই পি ছাড়া আবার অন্যরাও আছেন যাঁদের নিরাপত্তা সম্পর্কেও সরকার দৃষ্টি না দিয়ে পারবেন না। অতএব, অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে, গুণীরা উপলব্ধি করতে পারছেন কি? অন্যদিকে আবার পুলিশের নিরাপত্তার জন্যও পুলিশ দরকার হয়ে পড়ছে। কাজেই, কিভাবে এই গণতান্ত্রিক যজ্ঞ সমাধা হবে তা চিন্তার বিষয়।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলিও কে কার সঙ্গে জোট বাঁধবে—এ নিয়ে ফয়সালা করতে পারছে না। ফলে, একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক মানসিকতাও গড়ে উঠছে না। প্রত্যেকেই ভাবছে অন্য দল থেকে নিশ্চয়ই কিছু প্রভাবশালী লোক বেরিয়ে আসবে। এবং তখনই প্রার্থীদের নাম যথাযথভাবে প্রকাশ করা ঠিক হবে। আগে নয়। কেননা আগেভাগে কারও নাম প্রার্থী হিসাবে প্রকাশ করলে—দলে যতই নিয়মানুবর্তিতা থাকুক না কেন—সেই ঘোষিত প্রার্থীকে নির্বাচনী লড়াই থেকে সরিয়ে আনা কণ্টকর হবে। অতএব, অসুবিধা বাড়িয়ে ত কোন লাভ নেই। এই জন্যে শতকরা ১০০ ভাগ নিঃসন্দেহ না হলে দলের প্রার্থীর হয়ে কেউ বক্তব্য রাখছেন না। যে প্রচার চলছে শুধু তা প্রতীকে ভোট দেবার আবেদন মাত্র। শুধু যে দলছুট হবার ভয়ে এ হেন প্রচার করা হচ্ছে তা নয়। যতই আস্ফালন করা হোক না কেন প্রত্যেক সম্ভাবিত জোটের শরিকরাই একথা পুরো বিশ্বাস করছেন যে কোন একটি জোটের পক্ষে এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা শক্ত। তাই দলছুট যোগাড় করার চেষ্টায় সকলেই কালহরণ করছেন।

বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের মিলনের সূত্র আবার হঠাৎ ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে জোটবন্দীর রাজনীতিতে এক নতুন অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে হয়ত দিল্লির চাপে পড়ে আবার মিলনের পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু মিলনের পথে বারবার বাধা আসার কারণ কি? অন্য কিছু নয়—কংগ্রেস এযাবৎ জয়েন্ট ফ্রন্টের রাজনীতিতে অভ্যস্ত ছিল না। এই হালফিল কংগ্রেসকে এই নতুন নীতির সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে। ফলে এতদিনের একক শক্তিধর কংগ্রেস তার নতুন অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না। কাজে কাজেই আসন বণ্টনের বা ভাগাভাগির প্রশ্নে প্রতি মুহূর্তেই হোঁচট খেতে হচ্ছে। বাংলা কংগ্রেস ইতিমধ্যেই এই ফ্রণ্টের রাজনীতির কলাকৌশল সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ হয়ে গেছে। কাজেই ফ্রণ্ট ভাঙলেও তাল সামলিয়ে নেওয়া বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে খুব কঠিন হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আলোচনা ভেঙে যাওয়ার ফলে শাসক কংগ্রেসকে যে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতে হবে একথা তাঁদের ভেবে দেখা দরকার।

যাহোক, জোট বাঁধার অনিশ্চয়তা, সরকারী অব্যবস্থার পূর্বাভাষ সব মিলিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তাতে মনে হয় মানুষের মনে আরও সংশয় ঘনিয়ে তুলছে। ফলে যদি বেশীর ভাগ ভোটাররা ভোট কেন্দ্রমুখী না হন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। সামান্য কয়েক শতাংশ রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই হয়ত ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের কাঠামো রক্ষা করবেন। এই আশংকা দূরীভূত করবার জন্য কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে এগিয়ে আসুন, এই দাবী জানাচ্ছি।

—দলদর্শী

শাসক কংগ্রেসের সংসদীয় বোর্ডের সভা

# দেশে বিদেশে

'আসছে মার্চে এই কুহেলি কেটে যাবে আর সব কিছুই কুয়াসার মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।'—এয়ার ইণ্ডিয়ার 'মহারাজা' এই ভবিষ্যম্বাণী করেছেন। আর সেই কুয়াসার মত পরিষ্কার মার্চ মাসের দিকেই এখন এগিয়ে চলেছে দেশ নানা দলের নির্বাচনী প্রস্তুতি ও জোট বাঁধার মধ্য দিয়ে।

বিরোধী কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ও এস এস পি—এই চার পার্টির ফ্রন্ট ইতিমধ্যে নীতিগতভাবে স্থির করেছে যে, লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে তারা বিকল্প সরকার গঠন করবে। অবাধ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশ্বাসী স্বতন্ত্র পার্টির সংগে একত্রে মিলে সমাজতন্ত্রীরা কিভাবে সরকার চালাবেন এবং সংবিধানের আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সংগে একই সরকারের মধ্যে বর্তমান সংবিধানের কাঠামোতে আস্থাবান জনসঙ্ঘের সহাবস্থান কিভাবে সম্ভব সেকথা অবশ্য কুয়াসার মতোই পরিষ্কার।

ইন্দিরা-বিরোধী চার-পার্টি ফ্রন্ট যখন নয়াদিল্লীতে কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার স্লোগান নিয়ে লোকসভার আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন শাসক কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দলের নির্বাচন অভিযান শুরু করে দিয়েছেন সম্পূর্ণ বিপরীত স্লোগান নিয়ে। তাঁর কথা হল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে কোয়ালিশন সরকারগুলির যে হাল হয়েছে তা লক্ষ্য করে ভোটদাতারা যেন কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাযুক্ত একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। রাজ্যগুলিতে কোয়ালিশন সরকার ভেঙ্গে গেলে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা যায়, কিন্তু কেন্দ্রে তেমন কিছু করা সম্ভব নয়, সুতরাং একদলীয় সরকার স্থাপন করা আরও জরুরী।

এবারকার নির্বাচন অভিযান যে খুব শান্তিপূর্ণ হবে না তার লক্ষণ ইতিমধ্যে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রথম দফার নির্বাচনী সফরে বেরিয়েই তিনটি রাজ্যের তিনটি শহরে বিরূপ সম্বর্ধনার সম্মুখীন হয়েছেন। সুরাট, বোম্বাই ও ভুবনেশ্বরে তাঁর জনসভায় ইট-পাটকেল ছোড়া হয়েছে ও হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এয়ার-ইন্ডিয়ার মহারাজা যে কুয়াসার কথা বলেছেন তার মধ্য দিয়ে এটুকু আস্তে অস্তে পরিষ্কার হচ্ছে যে, এবারকার লোকসভা নির্বাচনে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ হবে একদিকে শাসক কংগ্রেস আর একদিকে বিরোধী কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন চার-পার্টি ফ্রন্ট। দুই কংগ্রেসের এই লড়াই প্রতিফলিত হয়েছে 'জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ' প্রতীকের জন দলের মধ্যে লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে। এই প্রতীকের লড়াইয়ের মীমাংসা এখনও হয় নি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে এই লড়াইয়ের দুই রাউন্ড হয়ে গেছে। প্রথম রাউন্ডে জিতেছিল শাসক কংগ্রেস, কেননা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার দীর্ঘ শুনানীর পর রায় দিয়েছিলেন যে, জগজ্জীবন রাম যে দলের সভাপতি সেটিই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং তারাই কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক 'জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ' ব্যবহার করার অধিকারী। কিন্তু বিরোধী কংগ্রেস দল আইনের পাল্টা চাল চেলে প্রতিপক্ষকে লোকসভায় আগামী নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এই রায়ের সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করতে পেরেছে। বিরোধী কংগ্রেসের আবেদন গ্রহণ করে সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চ আদেশ দিয়েছেন যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের রায় যেন কার্যকর করা না হয়। সুপ্রীম কোর্টের এই আদেশের অর্থ হল, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দেশে সর্বত্র বিধানসভাগুলি ও লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের জন্য যে প্রতীকটি সংরক্ষিত ছিল সেটি এবার দুই কংগ্রেসের কোনটিই ব্যবহার করতে পারবে না। বিরোধী

রুশ বিশেষজ্ঞ দল কলকাতায় যে ভূগর্ভ রেল তৈরী করবার প্রস্তাব দিয়েছেন, তার মানচিত্র। দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত এই রেলপথটি হবে সাড়ে ১৬ কিলোমিটার লম্বা এবং তাতে স্টেশন থাকবে ১৭টি। দমদমের বর্তমান রেল স্টেশনের পাশেই ভূগর্ভ রেলের স্টেশন হবে। সেখান থেকে বেলগাছিয়া রোডের রেলপুল পর্যন্ত লাইনটি বর্তমান রেল লাইনের সমান্তরালে মাটির ওপর দিয়েই আসবে। বেলগাছিয়া থেকে একটি পুরোপুরি সুড়ঙ্গ কেটে লাইনটি বেলগাছিয়া রোড-আর জি কর রোডের নিচে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে শ্যামবাজারে। তারপর ভূপেন বসু অ্যাভিনিউ, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, জহরলাল নেহরু রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড ও দেশপ্রাণ শাসমল রোড হয়ে লাইনটি শেষ হবে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোয়। এই অংশটুকু 'কাট এণ্ড কভার' পদ্ধতিতে তৈরি হবে। রুশ বিশেষজ্ঞরা ঢালাও ২৫ পয়সা ভাড়া ধার্য করার সুপারিশ করেছেন।

কংগ্রেসের সভাপতি নিজলিংগাপ্পা সুপ্রীম কোর্টের আদেশ সম্পর্কে বলেছেন যে, এর দ্বারা তাঁদের দলের প্রতি ন্যায় বিচার করা হল। নিজলিঙ্গাপ্পার দল অবশ্য নিজেরাও 'জোড়া বলদ' প্রতীক পেল না. কিন্তু প্রতিপক্ষ যে এই পুরানো প্রতীক ব্যবহারের সুযোগ পাবে না, আপাতত এটুকুতেই বিরোধী কংগ্রেস সন্তুষ্ট।

এদিকে চার-পার্টি ফ্রন্ট নিজেদের মধ্যে লোকসভার আসন বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেছে। যতদূর খবর পাওয়া যাচ্ছে, এই আলোচনা এখন পর্যন্ত খুব বেশী দূর এগোয় নি। গুজরাটে অনেকগুলি আসন নিয়ে বিরোধী কংগ্রেসের সংগে স্বতন্ত্র পার্টির টানা-হ্যাঁচড়া চলছে। সেখানে বিরোধী কংগ্রেস দল এমন কি স্বতন্ত্র নেতা মিনু মসানিকেও আসন ছেড়ে দিতে নারাজ। বোম্বাই শহরে লোকসভার একটি আসনের উপর বিরোধী কংগ্রেস নেতা এস কে পাতিল ও এস এস পি নেতা জর্জ ফার্ণান্ডেজ কেউই দাবী ছাড়তে রাজী নন। বলা হয়েছে যে, আসন ভাগের আলোচনা যেভাবে চলছে সেভাবে চললে সারা ভারতে লোকসভার অন্তত ৪০টি আসনে ফ্রন্টের চার পার্টির মধ্যে পারস্পরিক শক্তির লড়াই এড়ান সম্ভব হবে না।

তবে, এই ফ্রন্টের চার দল একটা বিষয়ে একমত হতে পেরেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, উত্তরপ্রদেশে রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এস এস পির রাজনারায়ণ। ভারতীয় ক্রান্তি দলের চরণ সিং নাকি আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনিও রাজনারায়ণকে সমর্থন করে ঐ কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে যোগ দেবেন। বিনিময়ে চার-পার্টি ফ্রন্টের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, শ্রীসিং ও
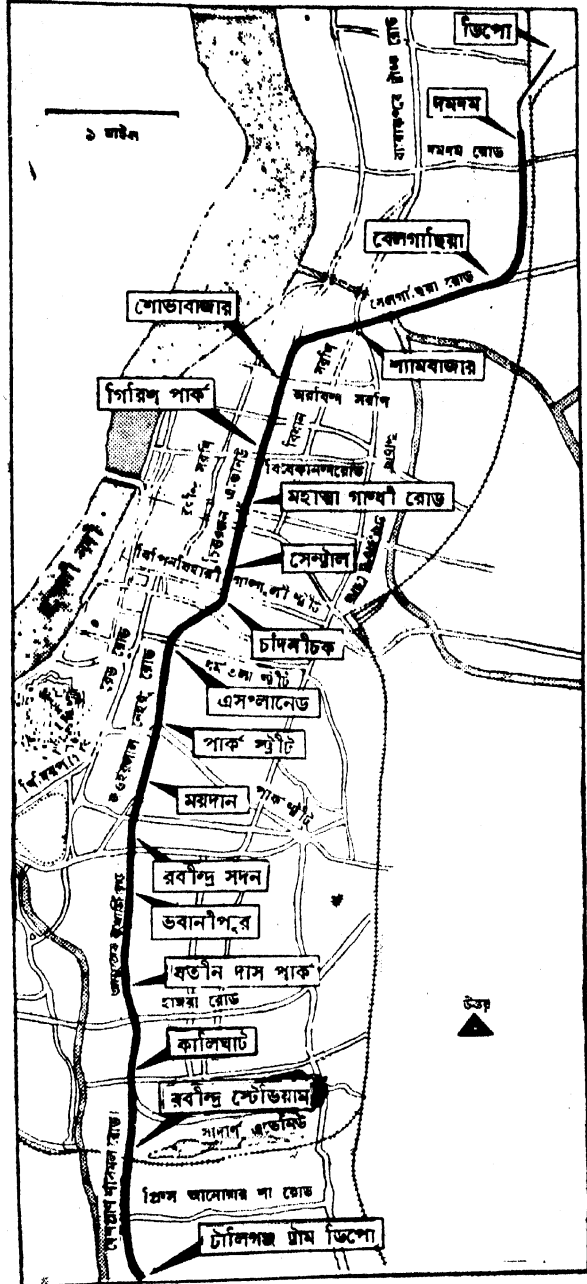
কৃষ্ণপুর-ভাঙ্গার কাটা খাল

অন্যান্য বি কে ডি নেতারা যেসব নির্বাচন কেন্দ্রে দাঁড়াবেন সে সব কেন্দ্রে ফ্রণ্টের কোন প্রার্থী দেওয়া হবে না।

ফ্রণ্টের চার-পার্টির ভিতর জনসংঘ ও সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে। দুটি ইস্তাহারের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী। যেমন, জনসংঘ মনে করে, ভারতবর্ষের বর্তমান সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে তার বৈষয়িক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব এবং অপর পক্ষে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল মনে করে, এই সংবিধানের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। সম্পত্তির অধিকারকে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করতে চায় না আর জনসংঘ ঐ অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দিতে চায় না। তবে বহুৎ প্রতিশ্রুতির দিক থেকে দুই দলের কোনটিই কম যায় নি। জনসংঘের আশ্বাস, তিন বছরের মধ্যে সমস্ত দক্ষ কর্মীর জীবিকার সংস্থান করা হবে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত বেকারকে কাজ দেওয়া হবে। তাদের আরও প্রতিশ্রুতি, দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের হার বছরে দশ শতাংশতে তোলা হবে। সংগে সংগে জনসংঘ এই আশ্বাস দিয়েছে যে, জনগণের উপর নূতন ট্যাক্স না চাপিয়ে এবং জিনিসপত্রের দাম না বাড়িয়ে এসব কাজ করা হবে। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের আশ্বাস, সরকারী চাকরীর ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, (সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির সংজ্ঞা অনুসারে নারীরাও অনুন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত), তিব্বতকে চীনের অধিকার থেকে মুক্ত করা হবে, কৃত্রিম দেশবিভাগ রদ করা হবে ইত্যাদি।

*

লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সংগে যে সব রাজ্য-বিধানসভারও অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে তার সংখ্যা আর একটি বাড়তে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে ও তামিলনাড়ু বিধানসভার নির্বাচনের কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বশেষ যে রাজ্যের বিধানসভা ভেংগে দিয়ে আগামী মার্চের নির্বাচনপর্বের সঙ্গে সামিল করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেটি হচ্ছে উড়িষ্যা। সেখানে রাজেন্দ্রনাথ সিং দেওয়ের মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেও রাজ্যপাল ডাঃ শৌকতুল্লা শাহ্ আনসারি প্রায় দিন-দশেক অপেক্ষা করে ছিলেন একটি বিকল্প সরকার গঠন করা যায় কিনা তার সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। একদিকে শাসক কংগ্রেস, পি এস পি, সি পি আই প্রভৃতি দল আর একদিকে স্বতন্ত্র পার্টি, উৎকল কংগ্রেস প্রভৃতি সরকার গঠনের দাবীদার ছিলেন। দুই পক্ষই আরও কিছু সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যপাল তাঁদের আর সময় দিতে অস্বীকার করে বিধানসভা ভেংগে দিয়ে নতুন নির্বাচন করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ পাঠিয়েছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন যে, তাঁকে অবিলম্বে জানান হলে তিনি উড়িষ্যায় লোকসভার নির্বাচনের সংগে একই সময়ে বিধানসভার নির্বাচনের আয়োজন করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতির কাছে রাজ্যপালের সুপারিশ পাঠাবার প্রায় সংগে সংগেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, উড়িষ্যার পুরানো কংগ্রেসী ও অধুনা জনকংগ্রেস দলের নেতা ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব তাঁর কিছু অনুগামীকে নিয়ে শাসক কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন।

*

কেউ কেউ আশংকা করেছিলেন যে, সিংগাপুরে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের অষ্টাদশ সম্মেলনেই কমনওয়েলথ নামক রাষ্ট্রজোটের পরমায়ু শেষ হবে। এই আশংকা অবশ্য সত্য হয়নি। কিন্তু বৃটেনের রক্ষণশীল হীথ সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী সরকারকে অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য গোঁ ধরে বসে থাকায় কমনওয়েলথে যে গভীর সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসার কোন রাস্তাও সিংগাপুরে দেখা যায় নি। প্রশ্নটি একটি কমিটির কাছে পাঠিয়ে ব্যাপারটা আপাতত ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে মাত্র।

২২-১-৭১

—পর্যবেক্ষক

## জনসাধারণের সাধারণতন্ত্র

আরেকটি সাধারণতন্ত্র দিবস আমরা উদ্‌যাপন করলাম সারাদেশে। ছাব্বিশে জানুয়ারির এই দিনটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য আজ আরও বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কারণ ভারতের সাধারণতন্ত্র এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। ঔপনিবেশিক শক্তির দীর্ঘ শতাব্দীর শাসন অবসানের পর ভারত উপমহাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার পতাকা যখন উড্ডীন হয় তখন একটিমাত্রই আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের যে, এই স্বাধীনতা যেন গণতন্ত্রসম্মত ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এশিয়ার মানুষ যে সংগ্রাম করেছিল তার পুরোভাগে ছিল ভারত। ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতার জন্য যে-পথ বেছে নেবে, এশিয়ার অন্যান্য দেশে তার প্রভাব পড়বে নিঃসন্দেহে। তাই আমাদের স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্রের তাৎপর্য শুধু ভারতের জন্যই নয়, গোটা এশিয়ার স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এটা অবশ্যই গৌরবের কথা যে, ভারত বেছে নিয়েছিল জনকরায়ত্ত সাধারণতন্ত্রের কাঠামো। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি এই সাধারণতন্ত্রী সংবিধান প্রবর্তিত হয়। দুই দশকের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে তৃতীয় দশকে প্রবেশ করল এই গণতান্ত্রিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সার্থকতা কিংবা ব্যর্থতা সম্পর্কে আজ বিচারের দিন এসেছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশ যখন গণতান্ত্রিক পরীক্ষায় বারবার ব্যর্থ হয়েছে, তখন ভারত তার সীমিত শক্তি নিয়ে ও বহুবিধ বাধা-বিপত্তির মধ্যেও এই সাধারণতন্ত্রী সংবিধানের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে এটা কম কৃতিত্ব নয়। নিশ্চিতই ভারতের মানুষকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের ইচ্ছামত সরকার নির্বাচনের এবং পর পর কয়েকটি সাধারণ নির্বাচনে এই অধিকার তাঁরা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু কালের নিয়মে অনেক জিনিসই বদলায়। সাধারণতন্ত্রী সংবিধানেরও অনেক সংশোধন করা হয়েছে গত কুড়ি বছরে। এবং প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতেও এর সংশোধন করা হবে জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে।

> নিবেদন
>
> মুদ্রণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ মাত্রাধিকভাবে বেড়ে যাওয়ায়, বিশেষ করে নিউজ প্রিন্টের বহুলাংশে মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ থেকে সাপ্তাহিক 'অমৃত'-র প্রতি কপির দাম আরও ১০ পয়সা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হচ্ছি। অর্থাৎ ঐদিন থেকে প্রতি কপির মূল্য ৫০ পয়সা হবে।
> আশা করি এই সামান্য মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও আগের মতোই আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গের আনুকূল্য লাভ করতে সমর্থ হব।
>
> সার্কুলেশন ম্যানেজার

গণতান্ত্রিক অধিকারই একটি জাতির পক্ষে মহামূল্যবান তা সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই অধিকার কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটাও সমান মূল্যবান। ভারতবর্ষে আজ যে-প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের বৈষয়িক উন্নতির পথ সুগম রাখা। পঞ্চান্ন কোটি মানুষকে নিয়ে গণতান্ত্রিক পরীক্ষা সহজ কথা নয়। বিশেষ করে যে-দেশের মানুষের বৃহৎ অংশ দরিদ্র, অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ সে-দেশে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে এই গণতন্ত্রের অপব্যবহারও করতে পারে। কারণ অজ্ঞ, দরিদ্র জনসাধারণ সংখ্যায় বেশি হলেও তাদের শক্তি কম, ন্যায়বিচারের জন্য তাদের হাত পাততে হয় শিক্ষিত অগ্রসর শ্রেণীর কাছেই। তাই গণতন্ত্রকে আজ মিলিয়ে দিতে হবে সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে। গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের সমার্থক করে তুলতে হবে।

এই প্রশ্ন নিয়েই আজ চলছে বিচার। এই প্রশ্নেই বহুদিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত শাসক পার্টি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন আজ সেই সমবেত শক্তিকে লড়াই করতে হবে প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়াপন্থীদের বিরুদ্ধে। প্রতিক্রিয়াপন্থীরা কম শক্তিশালী নয়। তারাও একটা জোট বেঁধে আসন্ন নির্বাচনে প্রগতিবাদীদের জানিয়েছে চ্যালেঞ্জ। আগামী সাধারণ নির্বাচনে তাই লড়াই হবে প্রগতি বনাম প্রতিক্রিয়ার, সামাজিক ন্যায়বিচার বনাম সামাজিক স্থিতাবস্থার। ভারতের সাধারণতন্ত্রী সংবিধানের মুখবন্ধে স্পষ্টতই উল্লেখ করা ছিল যে, দেশে সর্বসাধারণের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যখনই কাজ করতে চাওয়া হয়েছে, তখনি শক্তিশালী স্থিতস্বার্থের প্রতিভূদের কাছ থেকে এসেছে বাধা। তার ফলে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের নানারকম ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। সেই ব্যাখ্যার জোরে আমাদের সংবিধান এমন একটি পরীক্ষার সামনে উপস্থিত হয়েছে যে তার সুষ্ঠু সমাধান না হলে আমাদের সাধারণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবার আশঙ্কা। প্রধানমন্ত্রীও এ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চিত যে, জনগণের কল্যাণ করার পথে কোনো বাধাই বরদাস্ত করা চলে না। আজ ভারতবর্ষে যে বিপুল জনজাগরণ ঘটেছে, লক্ষ লক্ষ তরুণমনে যে-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কোনো মতেই ব্যর্থ হতে দেওয়া চলে না। এই ব্যর্থতা ঘটতে দিলে তা জনগণকে বিপথে চালিত করার সম্ভাবনা। আমরা যেন ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিত গ্রহণ করে ভারতের সাধারণতন্ত্রকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারি। এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসের তাৎপর্যই হল এই।

## খেলার পরে ॥ গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

[illegible]
[illegible]
হেসে ওঠে। আমাদের আপাদ মস্তক যান্ত্রিক ছিল কি?
কথা ছিল, যান্ত্রিকতা পরিহার করা; কথা ছিল,
হাতে, পায়ে বুকে মুখে স্বাভাবিক হওয়া, ঐকতানে
কথায় ও কাজে মজে থাকা, সামঞ্জস্যে।

অথচ এখন দেখি সিঁড়ি-ভাঙা
দুরারোহ শিখরে শিখরে। একেকটা সিঁড়ির
অববাহিকাও আছে। থাকা ভালো কিনা
আমি তা জানি না। সময়ের চাকা ঘোরে নিজস্ব নিয়মে,
অবশ্যই, তবু মনে হয় কখনো সময়
ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগতি পায়,
বিমান কি রকেটকে ছাড়ায়; কখনো মনের
গতি তার।

তবু তো সময় কোনো কিছুতেই লগ্ন নয়।
অথচ আবিল হয় কখনো কখনো সময়ের প্রতীক ও পরিচয়,
কিন্তু যান্ত্রিকতা আজ অস্তিত্বের মূলে নাড়া দেয়

প্রায়শই। যে-খেলা খেলার জন্যে, আজ তার
জয়ের মুকুট অধিকার
প্রধান প্রেরণা, তাই লীলা বাজিকর, কিংবা জাদুকর গতি।

নিয়তি, নিয়তি ফেলে মধ্যপথে ধাঁধা,
মা-মেনে উপায় নেই দুর্বলের,
সবল, সাহসে ভর করে, খেলা শেষ হলে পরে
নিজ মূর্তি প্রায়শ প্রকট হয়, কখনো গোপন,
অথচ আদিতে আকাঙ্ক্ষিত কী ছিল তা
ভেবেও দেখে না।

অন্ধকার পরিখার পারে
যেখানে সূর্যের আলো, সেখানেই ফল্গুস্রোত
ছিল, হাওয়ার স্তব্ধতা কুয়াশায়,
অথবা মেঘের ঘোরে রহস্যও, আশা-নিরাশার স্পন্দন।

চাকার ঘর্ঘর মন্দ্র থেমে গেলে
রহস্যে কঠিন অন্ধকার
হেসে ওঠে।

## প্রবাসে যাবার আগে ॥ অনন্ত দাশ

সমস্ত ক্ষোভের চিহ্ন একে একে মুছে ফেলি
সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে সামুদ্রিক ক্ষত
উল্কাপাতে আহত হৃদয়
পিছনে পথের চিহ্ন মুছে যায়
সামনের ধূলন্ত উদ্যানে
অবশিষ্ট দিন।

কারা যেন অন্ধকারে মুছে দিচ্ছে আলোর আলপনা
নিদ্রাহীন নৌকায় কারা পারাপার করে,
ঊর্ধ্বমুখী চাঁদে
ভীষণ বিষন্ন রাত কাঁদে
অরণ্যে উদাস পাখি, আকাশের প্রেক্ষাপটে
দৃশ্যাবলী পাল্টে যায়
হাতের তালুর নীচে
অতিদ্রুত ছায়া নেমে আসে

কণ্ঠে আর্তনাদ নিয়ে আমি ছুটে যাই
ভীতবিহ্বল পাখি যেন সারারাত ছটফট করে
বিস্ফোরণে — ধূলন্ত উদ্যান
প্রবাসে যাবার আগে অন্ধকারে আমি দেখি
কারো চোখ সিক্ত হয়ে ওঠে
দুঃখের শিশিরে।

## যতদিন ...॥ গার্গী চক্রবর্তী

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ হয়ে অশরীরী সত্তাগুলো
পাহাড়ের বুকে মিলিয়ে যায়। আমার দেহটা
লাঠিতে ভর দিয়ে কিছু দূর এগোয়; তারপর আর
পারে না, বসে পড়ে হাঁটু ভেঙে। কান পেতে
থাকে; কিন্তু শুনতে পায় না আর — সেই সব
পিয়ানোর সুর, সেই সব বৃষ্টির অজস্র শব্দ। শুধু
চার পাশে...অরণ্যের বোবা আর্তনাদ। রাত্রি
নেমে আসে—পৃথিবী ঢেকে যায় ঘুমের কুয়াশায়।

কিন্তু আমার দেহটা দু চোখ মেলে
প্রেতাত্মার ছায়া দেখছে। শব্দহীন যন্ত্রণা।
কফিনের স্পর্শ এনে দেয় আমার শরীরে।

গল্প নয়, সত্যি। তবে শেষটা গল্প না
স্বপ্ন, ছায়া না ছবি কিছুই জানি না।
দিনটা, প্রায় শতাব্দীর পর, মনে হল
আমার শেষ স্মৃতি। — দু একটা পাখীর
ডাক, ভোরের প্রথম আলোর আস্বাদ
হয়তো-বা আমার সমস্ত স্মৃতির উপর
দু একটা ফুল দিয়ে যাবে — নীল ফুল
ও সবুজ পাতায় স্পর্শ দিয়ে যাবে আমার
কবর যাদের বুকে আমি নতজানু,
বিশ্বাস। এ কথা আমি নিশ্চিত জানি — যতদিন
আকাশ, বাতাস, সমুদ্র বেঁচে থাকবে।

**সুধীরকুমার সেন**

উত্তর-দক্ষিণে হুগলী নদীর দু' তীর ধরে বারুইপুর থেকে কাঁচরাপাড়া এবং হাওড়া থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত যে ৪৯০ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চল—সাধারণ্যে দীর্ঘকাল ধরে যার পরিচয় বৃহত্তর কলকাতা বলে—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট তারই আজকের নবলব্ধ নাম। এই নাম অবশ্য কোন গৌরবের নয়, আবর্জনা, রোগ-মহামারীর সুতিকাগৃহ, জলাভাব, যানবাহনের নিদারুণ অভাব, গৃহের অভাব—সব কিছু নাগরিক অস্বাচ্ছন্দ্যকে যদি একটি নামে পরিচিত করতে হয় তাহলেও সর্বসম্মতিক্রমে বলা যাবে কলকাতা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট। অথচ এই বিশাল এলাকা—যার জনসংখ্যা আজ ৮৫ লক্ষে পৌঁছেছে, তার মধ্যে আছে কলকাতা ও হাওড়া দুটো কর্পোরেশন, ৩৩টা মিউনিসিপ্যালিটি এবং ৩৭টা অঞ্চল, মিউনিসিপ্যালিটি না থাকলেও যা শহররূপে পরিচিত। এই বিশাল জনবহুল এলাকায় শহরের সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্যও নেই, আবার গ্রামের স্বাভাবিক, পরিচ্ছন্ন পরিবেশও নেই—অসংখ্য কল-কারখানা, হাট-বাজার বিপণী সমন্বিত এই সুবিস্তৃত অঞ্চল একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের হৃদপিণ্ড, অন্যদিকে তা সমগ্র রাজ্যদেহে এক দুরারোগ্য দুষ্ট ক্ষত।

এই ক্ষতের উপশমের জন্য পরিকল্পনার আড়ম্বর কম হয় নি, কখনো বা সত্যিকার প্রলেপও কিছু লাগান হয়েছে বটে কিন্তু তাতে আসল রোগের কোন উপশম হয় নি বরং বেড়ে তার যা আকৃতি দাঁড়িয়েছে তাই-ই আজকের কলকাতা, বাসিন্দাদের প্রাত্যাহিক জীবন যেখানে যন্ত্রণা, বিদেশীরা যে স্থান বর্জন করে এবং জীবিকার্জনের একমাত্র আকর্ষণই যেখানে মানুষকে টেনে রাখে ও টেনে আনে, অথচ জীবিকাও আজ সেখানে অতি দুর্লভ।

এই শহরের চেহারা পাল্টানোর জন্য কয়েক বছর আগে সি এম পি ও (ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান অর্গানাইজেশন) যে পরিকল্পনা তৈরী করে তাও অর্থের অভাব, কর্তৃত্বের বিরোধ প্রভৃতির জন্য রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। সি এম পি ও'র পরিকল্পনাগুলো ছিল এই ঃ

১। কলিকাতা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্টের ২০ বছর মেয়াদী (১৯৬৬—১৯৮৬) মৌল উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২। ঐ ডিস্ট্রিক্টের জল সরবরাহ, পয়ঃনালী ও জলনিকাশী পরিকল্পনা, যার ব্যাপ্তি ধরা হয়েছিল ১৯৬৬ খৃঃ থেকে ২০০০ খৃস্টাব্দ, ৩। ২০ বছর (১৯৬৬—৮৬) মেয়াদী পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা, ৪। হাওড়া অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা যার শুরু ১৯৬৬ খৃঃ আর শেষ '৮৬ খৃঃ।

সি এম পি ও শুধু পরিকল্পনা তৈরী সংস্থা, রূপদানের কোন কর্তৃত্ব তার ছিল না। এই জন্যই সি এম পি ও পরিকল্পনাকে রূপদানের জন্য ১৯৭০ খৃঃ ২৯ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আইনরূপে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি অ্যাক্ট চালু হয় এবং ঐ বছরেরই ৭ই সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকার সি এম ডি এ গঠন করেন। চেয়ারম্যানসহ (বর্তমানে রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ) সাতজন এর সদস্য। এই সংস্থাকে পরামর্শ দানের জন্য আছে ২২ জন সদস্যের একটি অ্যাডভাইসার কাউন্সিল।

সি এম ডি-এর এই বিরাট পরিকল্পনায় বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। টাকা আসবার সূত্র-গুলো এই ঃ কেন্দ্র, রাজ্য বা অপর কোন সংস্থার কাছ থেকে সাহায্য বা ঋণ বাবদে প্রাপ্ত অর্থ; বাজার থেকে ঋণ; কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকায় পণ্য প্রবেশ কর হিসাবে সংগৃহীত অর্থের হিস্যা। ১৫০ কোটি টাকার মধ্যে ৪৪ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ যোজনায় বরাদ্দ হিসাবে ধরা

আছে। চলতি আর্থিক বছরে (৭০-৭১) বরাদ্দ আছে ২০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা।

**খাতওয়ারী বরাদ্দ**

উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ অর্থকে বিভিন্ন খাতে এইভাবে বিভক্ত করা হয়েছে :

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

১। জল সরবরাহ— ২৮৮০-৯৭
২। পয়ঃনালী ও জলনিকাশ—২৮৯৩·৫৮
৩। পরিবহন— ৩১৫২·৬৫
৪। আবর্জনা অপসারণ— ২৬০·৭৭
৫। বস্তী উন্নয়ন— ১০০০-০০
৬। বস্তী দখল, পরিষ্কার ও সংস্কার—৯৯৮·৯৬
৭। মানিকতলা কাজ ও বাসস্থানের সংস্থান—৩১·৮৫
৮। কোণা, কল্যাণী প্রভৃতি উন্নয়ন—১৩৬০·০০
৯। হাসপাতাল, প্রাথমিক বিদ্যালয়—১৬৬২·৩৪
১০। শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্তের গৃহ সংস্থান—৬০০·০০
১১। ট্রাম, স্টেট বাস প্রভৃতি—৯২৮-০০

**রূপদানের দায়িত্ব**

কলকাতার সামগ্রিক পরিকল্পনাকে ভাগ করা হয়েছে ৯২টি প্রকল্পে। এর ভেতর ২৬টি প্রকল্প সি এম ডি এ গঠিত হওয়ার আগেই অনুমোদিত হয়। এর পর আরো ৪৬টির অনুমোদন মিলেছে এবং মাত্র ২০টি চূড়ান্ত রূপদানের প্রতীক্ষায় আছে।

সি এম ডি এ যেখানে নিজে কোন প্রকল্পের রূপদান করবে না, সেখানে অন্য কোন সংস্থার ওপর তা কার্যকরী করার ভার দিয়ে অর্থ সঙ্কুলান-এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেবে। যে সংস্থাগুলোর মারফৎ কাজ করান হবে তা এই :

**সরকারী বিভাগ**

১) সি এম পি ও'র মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সেকশন, ২) জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তর, ৩) সেচ ও জলপথ দপ্তর, ৪) পূর্ত দপ্তর, ৫) পূর্ত (সড়ক) দপ্তর, ৬) পূর্ত (বিশেষ সড়ক) দপ্তর, ৭) কেন্সট্রাকশন বোর্ড, ৮) গৃহনির্মাণ দপ্তর, ৯) ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোং সংস্থা।

**বিধিবদ্ধ সংস্থা**

১) ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, ২) হাওড়া ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, ৩) ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন অথরিটি, ৪) ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোঃ, ৫) ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং।

**স্বশাসক সংস্থা**

১) কলিকাতা কর্পোরেশন, ২) হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও ৩) অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটি।

**যেগুলোর কাজ চলছে**

জল সরবরাহের জন্য প্রকল্পের সংখ্যা মোট প্রকল্প ১৯টি। এর মধ্যে ২টি শেষ হয়ে গেছে, ১২টিতে কাজ চলছে। এর মধ্যে আছে কলিকাতা কর্পোরেশন পলতা থেকে জল সরবরাহ বৃদ্ধির প্রকল্প, ১৩টি মিউনিসিপ্যালিটিতে জল সরবরাহের প্রথম পর্যায়ের প্রকল্প এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে মিউনিসিপ্যালিটিবহির্ভূত শহর এলাকায় জল সরবরাহ, মানিকতলা-তপসিয়া ট্যাংরা এলাকায় জল সরবরাহ প্রকল্প, হাওড়া, বালী মিউনিসিপ্যালিটি ও সংলগ্ন এলাকায় ওয়াটার ওয়ার্কস স্থাপন ও গার্ডেনরীচে ওয়াটার ওয়ার্কস নির্মাণ।

**পয়ঃনালী, জলনিকাশ**

মোট ৩৪টি প্রকল্প। কাজ চলছে ২২টির। এর মধ্যে আছে কলকাতার আউট-ফল চ্যানেলের সংস্কার ও বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশনের সামর্থ্য বৃদ্ধি। পামারবাজার পাম্পিং স্টেশনের সামর্থ্য বৃদ্ধির কাজও সম্প্রতি শুরু হয়েছে।

**পরিবহন**

মোট প্রকল্প ২৪টি, শেষ হয়েছে ১টি, কাজ চলছে ১২টিতে। এই পরিকল্পনায় বি টি রোড, যশোর রোড, হাওড়া-আমতা রোডের আমূল সংস্কার হবে। কলিকাতা কর্পোরেশন পাবে ৯৮টি রাস্তা সংস্কারের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে দেওয়া হবে মোট ৩৭ লক্ষ টাকা এবং কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটিকে ৬ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া আছে বালিগঞ্জ-কসবা ওভার ব্রীজ নির্মাণ, ব্রাবোর্ণ রোড থেকে হাওড়া ব্রীজ অ্যাপ্রোচ পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রভৃতি। স্টেট ট্রান্সপোর্টকে দেওয়া হবে গাড়ী বাড়াবার জন্য এক কোটি টাকা, ট্রামওয়েকে ৮৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা।

**আবর্জনা অপসারণ**

এর মোট দুটি প্রকল্পতেই কাজ চলছে। একটিতে হাওড়া অঞ্চলের জন্য লরী প্রভৃতি কেনার বাবদ ৩৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকল্পে আছে ধাপায় আবর্জনা ফেলার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং লরী ক্রয়।

**বস্তী উন্নয়ন**

কলকাতায় রেজিস্ট্রিকৃত বস্তীর সংখ্যা নাকি ৩ হাজার, এতে লোক বাস করে সাত লক্ষ। কিন্তু বৃহত্তর কলকাতায় মোট ১৫ লক্ষ লোক বস্তীতে বাস করে বলে হিসেব করা হয়েছে। কলকাতার বর্তমানে ৩ লক্ষ বাসিন্দা অধ্যুষিত বস্তীর উন্নয়ন প্রভৃতির পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বস্তীবাসীদের জন্য বহুতল বাড়ী নির্মাণের প্রকল্প আছে। এ বাবদ ব্যয় হবে পরিবার-পিছু প্রায় ৪ হাজার টাকা। ইতিমধ্যে বস্তীর সংস্কার, জল সরবরাহের উন্নতি, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

**পাতাল রেল**

কলকাতায় যানবাহন সমস্যার সমাধানে দীর্ঘকাল ধরে যে নানা রেলপথের পরিকল্পনা চলছিল তার সম্ভবত কিনারা হয়েছে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে। কলকাতায় কি ধরনের রেলপথ চলতে পারে তৎসম্পর্কে সমীক্ষার জন্য কয়েক মাস আগে এ'রা ভারতে আসেন। কাজ শেষ করে সম্প্রতি এ'রা সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছেন। তাঁদের প্রস্তাব অনুযায়ী রেলপথের দৈর্ঘ্য হবে সাড়ে ১৬ কিলোমিটার, খরচ পড়বে ১২০ কোটি টাকা। প্রথম পর্যায়ে তৈরী হতে সময় লাগবে ছ' বছর। গোড়ার দিকে এই পাতাল রেলপথে ৪৯ হাজার যাত্রী বহন করা যাবে, শেষ পর্যন্ত বাড়ান যাবে ৮৭ হাজারে।

পরিকল্পনাটি ভাগ করে প্রথম পর্যায়ে টালিগঞ্জ থেকে ডালহৌসী এবং পরে ডালহৌসী থেকে দমদম করা যেতে পারে। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের মতে, যেখানে ভূতাত্ত্বিক অবস্থার জন্য খোঁড়ার কোন সুবিধা নেই, সেখানেই টানেল করা হবে। ময়দান এলাকায় লাইন পাতার জন্য 'কাট অ্যান্ড কভার' পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে, এতে ট্রাফিক চলাচল সামান্য সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে হবে।

রেল পরিকল্পনাটির সঙ্গে অবশ্য সি এম ডি এর কোন সম্পর্ক নেই, এটি রেলওয়ে তথা কেন্দ্রীয় সরকারের, ব্যয়ও সমগ্রভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের। পরিকল্পনা কমিশন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই প্রকল্প অনুমোদন করলেই কাজ শুরু হতে পারবে।

কলকাতা এক দীর্ঘকালের উপেক্ষিত নগরী। সরকারী ও মিউনিসিপ্যাল স্তরে প্রশাসনিক ঔদাসীন্য ছাড়া, রাজনৈতিক দলাদলিও কলকাতার উন্নয়নে গুরুতর বাধা। বিশেষভাবে গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। এই সমস্যাগুলো এড়ানোর ওপরেই নির্ভর করবে সি এম ডি এর সাফল্য। রাজনৈতিক আবহাওয়া যদি অনুকূল না হয়, তাহলে পরিকল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহ থাকবে।

# এতটুকু বাসা

মিত্র ঘোষ
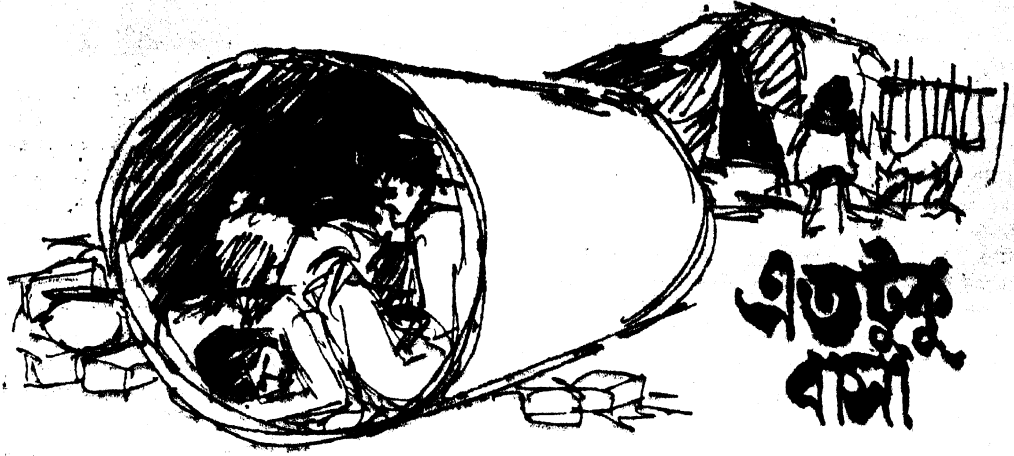
কলকাতা বা বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলে বাসা-বাড়ী পাওয়া কত দুষ্কর ও তার সমাধান খুবই প্রয়োজন এ সম্পর্কে কোন কথা-ই মানুষের কানে ক্লান্তিকর লাগবে, কেন-না এটা সবাই জানে। সুতরাং সে-সব কথায় না গিয়ে সরাসরি গৃহ-সমস্যার সামগ্রিক ব্যাপকতা ও ভয়াবহতাটা তুলে ধরা যাক।

প্রায় ন' বছরের পুরানো ১৯৬১ খৃঃ আদমসুমারি অনুযায়ী বৃহত্তর কলকাতা বা ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান জেলায় (সি-এম-ডি) লোকসংখ্যা হোল ৬৭ লক্ষ। তার মধ্যে ৩,৬৬,০০০ লোক কোন বাসা-বাড়ীতে বাস করেন না—হাসপাতালে, কলেজে, চায়ের দোকানে থাকেন। আর ফুটপাতে থাকেন প্রায় ৩০,০০০ লোক। মনে রাখবেন এই ফুটপাতবাসীরা সবাই ভিক্ষুক নন, যাযাবর নন, অনেকেই কলে-কারখানায় বা অফিসে কাজ করেন। ফুটপাতবাসীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ন খুবই কঠিন যে-হিসাব দেওয়া হোল তা কমের দিকেই—অর্থনীতির ভাষায় কনসারভেটিভ এষ্টিমেট। জনসংখ্যার অবশিষ্টাংশ 'বাসায়' থাকেন। মোট ১৩,২৯,০০০ বাসা ইউনিটে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন তার অর্থ হোল প্রতি ৪-৭৬ জন-পিছু একটি ইউনিট। গাণিতিক হারের উপরোক্ত হিসাবটা এমনিতে খুব ভয়াবহ দেখাতে লাগে না। কিন্তু এই বাসা-ইউনিটের আয়তন যদি আমরা হিসাবে ধরি তাহলে খানিকটা আন্দাজ করা যাবে যে বাসা-বাড়ীর মানুষ কীভাবে থাকতে বাধ্য হন। ১৯৬১ খৃঃ সুমার অনুযায়ী সি-এম-ডি অঞ্চলে বাসা ইউনিটের গড় পরিসর হোল ১·৫৫ খানি ঘর। প্রতি ঘরে ২-৯৯ জন লোক থাকেন গড়ে। আজ থেকে বারো বছর আগের একটা হিসাবে কলকাতায় এক-জন ৪০ বর্গ ফুটেরও কম জায়গায় মাথা গুঁজতে পেতেন। এটা তো পাটিগণিতের গড় হিসাব। গৃহ-বণ্টনের বৈষম্য যদি মনে রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে নিম্ন-আয়ের মানুষরা মাথা পিছু ৪০ বর্গফুটেরও অনেক কম জায়গায় মাথা-গোঁজার ঠাঁই পান—উপরন্তু সবাই একলা থাকেন না, অনেকেই পুত্র-পরিবার নিয়ে থাকেন। মরণকালে কবর দিলে ছ' ফুটের বেশী জায়গা কারুরই লাগে না। কিন্তু জীবিত অবস্থায় ঐ পরিমাণ জায়গায় থাকতে বাধ্য হওয়াটা কী রকম লাগে?

কিন্তু তা-ও কি বাসা-বাড়ীগুলো মানুষের বসবাসের যোগ্য? বেশীর ভাগ বাড়ী কাঁচা বাড়ী—জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে—মেরামতির অভাবে বহুযুগের পুরনো বাড়ীতে শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় সি-এম-ডির বিপুল জনসংখ্যা কর্মক্লান্ত দিনের শেষে বিশ্রামের মরীচিকার পেছনে ধাওয়া করে বাসায় এসে ঢোকেন। আর কাঁচা বস্তীর জীবন তো সম্পূর্ণ অসাদা জগত।

সি-এম-ডি অঞ্চলে বাসা-বাড়ীর যোগান ও প্রয়োজনের ব্যবধান ক্রমশই দুস্তর থেকে দুস্তরতর হচ্ছে। বাসস্থানের আয়তনের একটা গড় মান যদি ধরা যায় ঘর পিছু ২-৫ জন লোক আর হাউসিং ইউনিট পিছু দুখানা ঘর তাহলে ১৯৬৯ সালের হিসাব অনুযায়ী গৃহহীনদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে ৪৩০,০০০ ঘর অথবা ২,১৫,০০০ বাসা-বাড়ীর প্রয়োজন। ১৯৮৬ খৃঃ পর্যন্ত সি-এম-ডি অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গাণিতিক হিসাব করা গেছে তাতে দুকোমরা বিশিষ্ট ১৩ লক্ষ বাসা-বাড়ীর দরকার। তার অর্থ হোল এখন যত-সংখ্যক বাসা-বাড়ী আছে ('১৯৬১) তার শতকরা ৮৪ ভাগ বাড়ী আগামী ১৬ বছরে দরকার হবে। ষাটের দশকে গোটা সি-এম-ডি অঞ্চলে প্রতি বছর ৬,০০০ থেকে ৯,০০০ পাকা ইউনিট তৈরী হয়েছে। ঐ সময়কার বর্ধিত জন-সংখ্যাকে ঠাঁই দিতে গেলে ৫৩,০০০ বাড়ী প্রতি বছর দরকার। কিন্তু এই বর্ধিত জনসংখ্যা জায়গা না পেয়ে ঠাঁই করে নিয়েছে ভীড়ে উপচে পড়া বাড়ীতে বা বস্তীতে, জবর দখল করা জমিতে, ফুটপাথে, রাস্তায় ছাউনি গেড়ে। বাড়ীর এই অপ্রতুলতা কলকাতার ধনী বাড়ীওয়ালাদের কাছে স্বর্গ-রাজ্য—অস্বাভাবিক বেশী ভাড়া, সেলামি ইত্যাদি আর এক অন্য প্রসঙ্গ—মহাভারত।

এ' তো গেল বাসস্থানের চাহিদার ও প্রয়োজনের কথা। বাড়ী তৈরী করে চাহিদা বা প্রয়োজন মেটানোর সমস্যা অনুধাবন করতে গেলে প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে, সি-এম-ডি অঞ্চলে ব্যক্তিগত বে-সরকারী সংস্থার উদ্যোগে নির্মিত পাকাবাড়ীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। বাৎসরিক যা প্রয়োজন তার মাত্র শতকরা দশভাগ পূরণ হয়েছে হাল আমলে। এই অল্প কাজটিরও বেশীর ভাগ সম্পন্ন হয়েছে সরকারী বা আধা-সরকারী সংস্থা দ্বারা। এর নানা কারণ আছে, তবে একটা বড় কারণ হোল সি-এম-ডি অঞ্চলে বিপুল জনসংখ্যার অবর্ণনীয় দারিদ্র্য—এই দারিদ্র্যের ফলে তাদের বাসস্থানের প্রয়োজন থাকলে

সত্ত্বেও পাকা স্ট্যান্ডার্ড বাড়ীতে একটা ছোটো-খাটো সস্তা ভাড়া দিয়েও বাস করা তাঁদের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে। সি-এম-ডি অঞ্চলে পারিবারিক মাসিক আয়ের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে নীচের দিকের ৪৫ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ১৮৪ টাকারও কম। যদি আয়ের ১৫ শতাংশ বাড়ীভাড়া বাবদ খরচ করা সম্ভব বলে ধরা যায় (তা-ও সম্ভব কিনা বলা শক্ত) তাহলে এ'দের পক্ষে মাসে ২৮ টাকার বেশী মাসিক ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। ঐ সমীক্ষায় আরও দেখা যায় যে নীচের দিকের ৮৫ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ৫১৮ টাকার নীচে। ১৫ শতাংশ হারে এ'দের পক্ষেও মাসিক ৭৮ টাকার বেশী মাসিক ভাড়া বহন করার সামর্থ্য নেই। কিন্তু বাড়ী তৈরীর খরচ এমন বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে যে উপরোক্ত ভাড়ায় ন্যূনতম মানের স্ট্যান্ডার্ড বাড়ী ভাড়া দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। খরচ কোনকালেই উঠবে না—রক্ষণাবেক্ষণ তো দূরের কথা।

গৃহ-নির্মাণে অস্বাভাবিক ব্যয়বাহুল্যের নানা আর্থিক ও অন্যান্য কারণ আছে। প্রথমত বাড়ী তৈরীর মালমশলার দাম অত্যন্ত বেশী, বহু জিনিষ দুষ্প্রাপ্য-ও বটে। ভারত-সরকারের পাঁচ বছর আগেকার হিসাব অনুযায়ী গৃহ-নির্মাণে মালমশলার খরচে ৬০ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ মোট খরচ বেরিয়ে যায়। এ পাটিগণিতের হিসাব খুব বেশী দরকার নেই। সি-এম-ডি অঞ্চলে, বিশেষ করে কলকাতা ও হাওড়ায় জমির দাম গত বারো-তেরো বছরে কী প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে গেছে তা সবাই জানে। (গত চার বছরে কিঞ্চিত কমেছে, তা-ও আগের তুলনায় এখনও অনেক বেশী।) কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর দখলীকৃত জমির নীলাম করার পলিসি, ভূ-সম্পত্তি কেনাবেচার কারবারে লিপ্ত কোম্পানীগুলির স্পেকুলেশন, চড়া দামে বিক্রয় ইত্যাদি ব্যাপার অত্যধিক চাহিদার যুগে জমির দামকে আকাশ-ছোঁয়া করে দিয়েছে। হালে কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতার বেসরকারী উদ্যোগে গৃহনির্মাণ কাজে যে মন্থর গতি দেখা দিয়েছে বা বেশী ভাড়া-বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের (৩০০ টাকা ও তদূর্ধ্বে) চাহিদা কমার ফলে যে ঐ ভাড়া যে খানিকটা পড়ে গেছে তাতে উপরে বর্ণিত স্বল্প আয়ের লোকেদের ভাগ্যের কোন হেরফের বড় একটা হয় নি। গৃহ-চাহিদায় মন্দাটা খুবই আংশিক উপরন্তু গৃহ-নির্মাণে মন্দাটা সস্তা গৃহ-নির্মাণকেও স্পর্শ করেছে, তার ফলে স্বল্প-আয়বিশিষ্ট লোকেদের অথবা পরিবারের মধ্যে বাসা-বাড়ীর জন্য হাহাকার আরও বেড়ে গিয়েছে।

গৃহ-নির্মাণ শিল্পে দ্বিতীয় বড় বাধাটা আন্দাজ করা খুবই সহজ—মূলধন জোগাড় করা। উপরের আলোচনায় পরিষ্কার যে সি-এম-ডি অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল আয়ের লোক বা পরিবারের পক্ষেও নিজের বাড়ী তৈরী করা প্রায় অসম্ভব। ঋণ-কর্জ অবশ্যম্ভাবী, অথচ প্রাইভেট ঋণদানকারীদের ঋণের স্বল্পপরিমাণ, চড়া সুদের হার ঋণ করার ব্যাপারে মস্ত বাধা। কতকগুলি বিকল্প ব্যবস্থা আজকাল অবশ্য চালু হয়েছে—প্রাইভেট ট্রাস্ট, জীবনবীমা কর্পোরেশান ইত্যাদি। যদিও জীবনবীমা কর্পোরেশান পলিসি-হোল্ডার ছাড়া আর কাউকেই ঋণ দেয় না তবুও এ'কথা সত্য যে জীবনবীমা কর্পোরেশানের ঋণের শর্ত খুব অনুদার নয়।

সব দিক দেখে শুনে একথা সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে বে-সরকারী উদ্যোগে ব্যাপকহারে গৃহনির্মাণ শিল্পে মূলধন নিয়োগের সম্ভাবনা খুবই কম। সুতরাং গৃহ-সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারী বা আধা-সরকারী সংস্থাসমূহের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়—যে দায়িত্ব সমগ্র আর্থনীতিক খাতিরেই অস্বীকার করা যায় না। তবে একথা সত্য যে সামগ্রিক সুসংহত আর্থনীতিক পরিকল্পনায় গৃহ-নির্মাণ সবচেয়ে অগ্রাধিকার পায় না। তাছাড়া বর্তমানে পরিকল্পনার যা অবস্থা—বিনিয়োগের জন্য সম্পদ ক্রমশই এত অপ্রতুল হয়ে যাচ্ছে যে সি-এম-ডি অঞ্চলে আগামী বিশ বছরে গৃহ-সমস্যার পূর্ণ সমাধানের আশা সম্পূর্ণ দুরাশা। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে আংশিক সমাধান অসম্ভব, সমস্যার বোঝা বেশ খানিকটা হাল্কা করা দুঃসাধ্য। তার জন্য চাই সুসংহত, বাস্তব সরকারী গৃহ-নির্মাণ পলিসি। কাঁচা হোক বা পাকা হোক চালু বাসস্থানকেও বাসযোগ্য করাও এই পলিসির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সে-ব্যাপারে মূল্যায়ন করতে গেলে সরকারী স্কীমগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহ-নির্মাণ ও পূর্ত বিভাগের আওতায় যে সোস্যাল হাউসিং স্কীম চালু আছে সেই বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যে গৃহ-নির্মাণের জন্য অনুদান বা ঋণ দিয়ে থাকে। এই স্কীমের আওতায় সি-এম-ডি অঞ্চলে সাতটি স্কীম প্রচলিত আছে :

১। অনুদান সাপেক্ষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কিম।

২। নিম্ন আয়ের লোকেদের জন্য গ্রুপ হাউসিং স্কিম।

৩। বস্তি অপসারণ ও উন্নয়ন স্কিম।

৪। অর্থনৈতিক দিক থেকে নিপীড়িতদের জন্য স্কিম।

৫। মধ্যবর্তী আয়ের লোকেদের জন্য স্কিম।

৬। রেন্টাল হাউসিং স্কিম।

৭। ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন ও ডেভেলাপমেন্ট স্কিম।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৃহ-নির্মাণ দফতর ছাড়া, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতর, কলকাতা ও হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এই স্কিমগুলি রূপায়িত করার চেষ্টা করেন।

(১) স্কিম খাতে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের গৃহ-নির্মাণের জন্য অনুদান ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ রাজ্য সরকারকে দিয়ে থাকেন। রাজ্য সরকার নিজে এই বাবদ টাকাটা খরচ করতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে কোন হাউসিং বোর্ড, রেজিস্টার্ড কো-অপারেটিভকে ঋণ দিতে পারেন। মাসিক ৩৫০ টাকার অনূর্ধ্বে যে-সব শ্রমিকের আয় (১)নং স্কিমের বাড়ী তাঁদের জন্য। এই স্কিম অনুযায়ী ১৯৫৬-৬৬ খৃঃ এই দশ বৎসরে এক অথবা দুই কামরা বিশিষ্ট বাড়ী বিভিন্ন সংস্থা নির্মাণ করেছেন—তার সংখ্যা হোল ৮,৩৬৮। অথচ অনুমতি ছিল ১২,১৮৮টি বাড়ীর। কাজ না হওয়ায় প্রয়োজনীয় অর্থ ফেরত চলে গিয়েছে।

(২)নং স্কিম অনুযায়ী, বাৎসরিক ৩ হাজার টাকার আয়ের লোকেদের বাড়ী তৈরীর দামের ২৫ শতাংশ অনুদান ও ৭৫ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (সুদ আছে) দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বার্ষিক ৬ হাজার টাকা আয় হ'লে বাড়ী নির্মাণের খরচের ৮০ শতাংশ ৩০ বৎসর মেয়াদে ৫ শতাংশ সুদের হারে ঋণ দেওয়া হয়। পশ্চিমবংগ গৃহ-নির্মাণ দফতর ও কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গত চার বছর আগে ১৩০০র কিছু বেশী বাড়ী এই স্কিম অনুযায়ী নির্মাণ শেষ করেছেন।

(৩)নং স্কিম অনুযায়ী বস্তী অপসারণ ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দামের ৩৭½ শতাংশ অনুদান এবং ৩৭½ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেন। রাজ্য সরকার ২৫ শতাংশ অনুদান দিতে পারেন—তবে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এতদিন পর্যন্ত বস্তী অপসারণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৫৮ খৃঃ আইন অনুযায়ী কলিকাতা কর্পোরেশানের চৌহদ্দির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, সি-এম-ডি'র অন্যান্য অঞ্চল বাদ ছিল। হালে সি-এম-ডি-এ হাওড়াতে বস্তী উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী পয়ঃপ্রণালী পাকা করা, সুষ্ঠু জল নিষ্কাসনের বন্দোবস্ত, আবর্জনা অপসারণ, পানীয় জল সরবরাহের নিয়মিত ব্যবস্থা করার কথা।

বস্তী অপসারণ করে ছোট টেনেমেন্ট তৈরী করার ব্যাপারে গত চার বছর আগে পর্যন্ত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট তৈরী করেছিল ৪,১৭৬টা টেনেমেন্ট। আর সরকারী গৃহ-নির্মাণ দফতর ১,১৯২টি টেনেমেন্ট।

বস্তী অপসারণ ও উন্নয়ন স্কিম সম্পর্কে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হোল কাজের শোচনীয় শম্বুকগতি। সমস্যাটি এত ব্যাপক, বৃহৎ ও স্বতন্ত্র ধরণের। সে-আলোচনা আলাদাভাবে করা প্রয়োজন।

(৪)নং স্কিম অনুযায়ী কলিকাতার (ও বম্বে) বাইরে বসবাসকারী কোন লোকের মাসিক আয় ১৭৫ টাকা অথবা কলকাতার (ও বম্বে) ভিতরে বসবাসকারী কোন লোকের আয় যদি মাসিক ২৫০্ টাকার অনুর্ধে হয় তা'হলে এই স্কিমের আওতায় আসবে। এই স্কিম অনুযায়ী বাড়ী তৈরীর দামের ৭৫ শতাংশ, ৩০ বৎসরের মেয়াদে ৫২ শতাংশ সুদের হারে ঋণ পাওয়া যায় আর দামের বাকী ২৫ শতাংশ অনুদান পাওয়া যায়। **আশ্চর্যের কথা এই স্কিম অনুযায়ী কোন প্রকল্পই আজ অবধি আরম্ভ হয় নি।**

(৫)নং স্কিম অনুযায়ী, যে-লোকের বার্ষিক আয় ৬,০০০ টাকার নীচে নয় অথবা বার্ষিক ১৫,০০০ টাকার অনুর্ধে, তাদের সুবিধা দেওয়া হবে। ঋণের পরিমাণ নির্মাণ খরচের ৩০ শতাংশ, তবে ২০,০০০ হাজার টাকার বেশী কোনক্ষেত্রেই নয়। **১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনা ছিল, এই ঋণ সরবরাহ করবে লাইফ ইন্সিওরেন্স করপোরেশন। ১৯৬৪-৬৫ খৃঃ মধ্যে সর্বসাকুল্যে ৫,৭৩৯ খানা বাড়ী, বেশীর ভাগই** সি-এম-ডি অঞ্চলে নির্মাণ করা হবে। ১৯৬৫ খৃঃ পর্যন্ত মাত্র **৬৬টি ইউনিট তৈরী হয়েছিল। তার মানে লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন ফেরত চলে গিয়েছিল।**

(৬)নং স্কিম অনুযায়ী, রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের জন্য লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশান থেকে বিশ বৎসরের মেয়াদে ঋণ নিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ী তৈরী করা হবে। বাড়ী পিছু খরচ করা হবে ১৮,০০০ হাজার টাকা। গত তিন বৎসর আগেকার হিসাব হোল সি-এম-ডিতে এইরকম মোট ৪০০ ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।

(৭)নং স্কিম অনুযায়ী রাজ্য সরকার জমি দখল ও গৃহ-নির্মাণের জন্য জমি উন্নয়ন করার জন্য দশ বৎসরের মেয়াদে ঋণ পেতে পারে। এই স্কিমের উদ্দেশ্য হোল শহর অঞ্চলে জমির দামে একটা ন্যায্য স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনাকে একটা সুষ্ঠু অবস্থায় নিয়ে আসা। সি-এম-ডি অঞ্চলে তৃতীয় যোজনা পর্যন্ত ২২৯-২ একর জমি সরকারী য়্যাকুইজিশনের আওতায় আনা হয়েছে। চতুর্থ যোজনায় কাজ একেবারে নামমাত্র।

**উপরোক্ত স্কিমগুলি ছাড়া রাজ্য সরকারের গৃহ-নির্মাণ দফতর, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এবং পশ্চিমবংগ সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে অন্য স্কিম অনুযায়ী কিছু গৃহ নির্মাণ করেছে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের অধীনে প্রায় ৪৫০ ফ্ল্যাট আছে যা সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিককে ভাড়া দেওয়া হয়।**

**সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা বেশ স্পষ্ট সি-এম-ডি অঞ্চলের জন্য সরকারের সুষ্ঠু, সুসংহত কোন নির্দিষ্ট হাউসিং পলিসি নেই, আছে অসংখ্য স্কিমের জটের ভিতর কতকগুলো য়্যাড-হক প্রকল্প। উপরন্তু প্রশাসনিক গাফিলতির জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প অনুযায়ী গৃহ-নির্মাণ কাজ আরম্ভ না করার দরুণ সেই অনুমোদিত অর্থ ফেরত চলে গেছে; দারুণ গৃহ-সমস্যার দিনে এইরকম ত্রুটি অমার্জনীয়। যে-প্রকল্পগুলি যতটুকু রূপায়িত হয়েছে সেইগুলি লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে নীচুতলার আয়ের জনসাধারণ যে-সমস্ত স্কিমে খানিকটা উপকৃত হোতে পারে, সেখানেই প্রকল্প অনুযায়ী কাজ একেবারেই না হওয়া অথবা কম হওয়া—এইরকম নজির বড় বেশী চোখে পড়ে। শ্রমিকদের গৃহ-নির্মাণ ব্যাপারে শিল্পপতিদের দায়িত্ব কেন থাকবে না তার কোন সদুত্তর আজকাল কেউ দিতে পারবে না। বম্বেতে এটা একটা চালু নীতি। সুষ্ঠু সরকারী নীতি, বে-সরকারী মূলধনকে গৃহ-নির্মাণ শিল্পে খানিকটা আইন করে নিয়ে আসা গৃহ-সমস্যার সমাধানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।**

**সি-এম-ডি অঞ্চলে, বিশেষ করে কলিকাতা ও হাওড়ায় জমির অস্বাভাবিক চড়া দর যদি নামিয়ে আনতে হয়, জমি নিয়ে যদি ফাটকাবাজি বন্ধ করতে হয় তা'হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃক নীলাম নীতি পরিত্যাগ করা ও কলকাতা অঞ্চলে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ক'রে জমিকে মিউনিসিপ্যালিটির আওতায় আনা।**

প্রথমে ছিটকিনি খোলার শব্দ তারপর পা যাচ্ছি—দুটোই আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলাম। বুলো ভেবেছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। আমাকে দেখে অবশ্য তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমার মাথাটা ডান দিকে কাত করা, চোখ দুটো বোজা, ঘুমোলে মানুষে যে রকম নিঃশ্বাস নেয় সে রকমই নিঃশ্বাস নিচ্ছি। সুতরাং বুলার ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

আসলে আমার ঘুম অনেক আগেই ভেঙেছে। কিন্তু যেহেতু ডাক্তারের নির্দেশে আমার হাঁটা-চলা করা বারণ, শুধু শুয়ে থাকাই আমার একমাত্র কাজ, তাই অনেক সময় আমি চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকি। একটা লোক কতক্ষণ ঘুমোতে পারে? আমি যখন সুস্থ ছিলাম তখন আমি

রাত জেগে বই পড়লে ছ-সাত ঘণ্টা ঘুমোতাম। কোনদিন একটু বেশি রাত জেগে বই পড়লে অতটা সময়ও ঘুমোবার জন্য পেতাম না। কিন্তু তাতে আমার কোন অসুবিধে হয় নি। এখন আমার ঘুমোবার অফুরন্ত অবসর। কোন কাজ নেই। কিছু পড়ারও নেই। আমি ইচ্ছে করলে দিনের মধ্যে কুড়ি ঘণ্টাই ঘুমোতে পারি। কিন্তু ঘুমোতে চাইলেই কি ঘুম আসে?

আমি তাই অনেক সময় চোখ বুজে শুয়ে থাকি। আর সাত-পাঁচ ভাবি। ভাবি, আমার অতীত জীবনের কথা, বর্তমানের কথা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। ডাক্তার যদিও আমাকে ভাবনা-চিন্তা করতে বারণ করেছে, বলেছে 'সব-সময় মনটা প্রফুল্ল রাখবেন', তবুও অষ্ট-প্রহর রাশি রাশি ভাবনা আমার মাথায় এসে জড়ো হয়। অলস মনে ভাবনা এসে ভীড় করবেই। মাঝে মাঝে তাই আমি হাল্‌কা ধরনের বই পড়ি। কিন্তু বেশিক্ষণ পড়তে পারি না। মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে। তখন আমি বই বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকি।

আজ অবশ্য অন্য কথা। আজ সকালে বুলা হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে বসলেই আমার মনে পড়ে সেই চিঠিটার কথা। দিন দশ-বারো আগে চিঠিটা আমার হাতেই পড়েছিল। আমি যেহেতু বাইরের ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা থাকি সুতরাং কোন চিঠি-পত্র এলে আমারই সেটা সবার আগে নজরে পড়ে। সেদিন দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে আছি। এমন সময় কিসের ছোঁয়া লাগতে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। জেগে দেখি আমার বিছানার উপর একটা ইন্‌ল্যান্ডের চিঠি পড়ে আছে। বুঝলাম পিওন জানলার ফাঁক দিয়ে চিঠিটা ফেলে দিয়ে গেছে।

প্রায়ই এ রকম হয়। পিওনটি খুব ভদ্র এবং সুবিবেচক। সে ভর-দুপুরে গৃহস্থের ঘুম না ভাঙিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে চিঠিটা ফেলে দিয়ে গেছে।

চিঠিটা পেয়ে প্রথমে সেটা কার চিঠি তা বুঝতে একটু দেরি হয়েছিল। বুলার একটা ভালো নাম আছে। সেটা স্কুলের খাতা ছাড়া আর কোথাও ব্যবহৃত হয় না। সচরাচর বুলা সেন নামেই তার চিঠিপত্র আসে। তাই চিঠির উপর বুলার সেই অনতি ব্যবহৃত নামটি দেখে আমি একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। তাছাড়া তখন আমার সদ্য ঘুম ভেঙেছিল। আমার চোখে তখনও দুপুরের ঘুমের রেশ জড়ানো। তাই প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর যখন তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল এবং যখন বুঝলাম যে চিঠিটা বুলারই তখনই মনে প্রশ্ন জাগল, চিঠিটা কে লিখেছে? নিশ্চয়ই কোন আত্মীয়-স্বজন বা ওর কোন বান্ধবী। কিন্তু চিঠির উপরে প্রেরকের কোন নাম-ঠিকানা নেই। তাছাড়া বুলার নাম-ঠিকানা যে লিখেছে তার হাতের লেখাও আমার খুব পরিচিত বলে মনে হল না। একবার মনে হল এটা সোনাকাকুর হাতের লেখা। পরে একটু খুঁটিয়ে দেখে মনে হল, না, এ তাঁর হাতের লেখা নয়। তবু সন্দেহ নিরসনের জন্য ইনল্যাণ্ড চিঠির দু-ভাঁজের মধ্যে যতটুকু পড়া যায় তাই পড়বার চেষ্টা করলাম। আর দু-এক লাইন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম এ চিঠি সোনাকাকুর লেখা নয়। এ চিঠি কার লেখা আমি জানি না। কিন্তু এ চিঠি আমার পড়া উচিত নয়। আমি তাই আর সে-চিঠি পড়বার চেষ্টা করি নি।

তবে স্বীকার করতে লজ্জা নেই সেদিন আমার খুব কৌতূহল হয়েছিল। যদিও বুলার যা বয়স তাতে ওর পক্ষে প্রেম করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে এখন রীতিমত সাবালিকা। উচ্চশিক্ষিতা। সুতরাং তার নিজের ভালো-মন্দ বোঝবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু তবুও বুলা, সেই বুলা, যাকে আমি জন্মের পর থেকে কুড়ি বছর ধরে দেখে আসছি, যার নিকার-বোকার ছেড়ে ফ্রক, ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরা পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনাই আমার চোখের সামনে ঘটেছে তার পছন্দটা কি রকম তা জানবার আমার খুব কৌতূহল হয়েছিল। তাকেই বা কার পছন্দ হয়েছে তাও জানবার তীব্র আগ্রহ হচ্ছিল বৈ-কি। ছেলেটি কেমন দেখতে? মোটা-সোটা, ফোলা-ফোলা মুখ, ছোট ছোট চোখ শান্তশিষ্ট কোন তরুণের মতো না ছিপছিপে, ঝাঁকড়া চুল, চশমার আড়ালে দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ কোন দামাল-ছেলের মতো? বুলা যাকে নির্বাচন করেছে তাকে আমি পাস-মার্ক দিতে পারি কি না সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে না পারায় বড়ো অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

চিঠিটার উপরে পোস্টঅফিসের ছাপ দেখে বুঝলাম সেটা কলকাতার বাইরে থেকে এসেছে। মফস্বলের একটি শহর থেকে। কি করে সেখানে ছেলেটি? চাকরি? না অন্য কিছু? কিছুই তো জানবার উপায় নেই। এমন কি ছেলেটির নামও জানতে পারা গেল না। বুলাকে একথা মুখ ফুটে আমি জিজ্ঞাসাও করতে পারবো না। এমন কি আমি যে তার এই একান্ত গোপন ব্যাপারটাও জেনে গেছি তাও তাকে জানানো চলবে না। কারণ তাহলে বুলা খুব লজ্জা পাবে। আর আমার সম্বন্ধেই বা সে কী ধারণা করবে!

বুলার হাতে চিঠিটা দিতে আমার খুব লজ্জা করল। মাকে ডেকে তার হাতে সেটা দিয়ে বললাম, বুলার চিঠি—

মা চিঠিটা নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে বলল, কে লিখেছে?

—কে জানে। হয়তো ওর কোন বান্ধবী-টান্ধবী হবে।

মা চিঠি নিয়ে বুলাকে দিতে চলে গেল। মায়ের কাছে সত্য গোপন করাটা অন্যায় হল জানি। কিন্তু উপায় কি? আমার মা-বাবা সেকেলে লোক। তাঁরা বাড়ীর মেয়েদের বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মেলা-মেশা আদৌ পছন্দ করেন না। আমার কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কোন সহপাঠিনীকে সেইজন্য আমি বাড়ীতে আনতে সাহস পেতাম না। কিন্তু যুগ পাল্টেছে, কাল পাল্টেছে। এখনকার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মেলা-মেশাটা যে নিতান্তই স্বাভাবিক এবং অপ্রতিরোধ্য তা মা-বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। অথচ তাঁদের সন্তানেরা বাড়ীতে যতই অনুগত আর বাধ্য থাকুক না কেন তাদের উপরেও যে এই যুগের প্রভাব পড়ছে তার প্রমাণ বুলার নামে প্রেমপত্র আসে। তার প্রমাণ, আমিও তো এক সময় রুচিরাকে ভালোবেসেছিলাম—

কিন্তু সে কথা থাক। আমার প্রেমোপাখ্যান বর্ণনার জন্য এ কাহিনীর অবতারণা করা হয় নি।

আমি ঠিক করলাম বুলার চিঠির কথা মা-বাবা ছোট ভাই বোনদের কাউকেই জানানো চলবে না। এবং তার একমাত্র উপায় মাকে খুলে না বলা। মা জানলেই বাড়ীর আর কারোরই জানতে বাকি থাকবে না। তাছাড়া বুলাকে প্রশ্নে প্রশ্নে নাজেহাল করে তার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করে মা এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা করবে যা আমার কাছে মোটেই অভিপ্রেত নয়। হয়তো কুড়ি বছরের বুলার চুলের মুঠি ধরে তাকে মারতেও শুরু করতে পারে। বাবা সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারলে হয়তো তেমন কোন দৃশ্যের অবতারণা করবেন না। কিন্তু আমার বাবার জন্য আমার খুব মায়া হয়। তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। শরীর একেবারে ভেঙে গেছে।। যখন তিনি উপার্জনক্ষম পুত্রের ভরসায় ছিলেন তখনই আমি অসুখে পড়ি। সুতরাং এই সাত-আটটি প্রাণীর অন্ন যোগাতে, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়াশোনার খরচ যোগাতে এবং অসুস্থ ছেলের চিকিৎসা করাতে তাঁর যে শুধু সদাগরী অফিসের চাকরি করলেই চলে না তা আমি সহজেই অনুমান করতে পারি। অফিসের পর বাবা নিশ্চয়ই কোন পার্ট-টাইম চাকরি বা ঐ জাতীয় কিছু করেন না হলে বাড়ী ফিরতে তাঁর রাত দশটা-সাড়ে দশটা হয় কেন? যখন বাড়ী ফেরেন তখন তাঁর পরিশ্রম-ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না। নিজের অসুস্থতার জন্য নিজেরই উপর রাগ হয়। সুতরাং সেই বাবাকে বুলার খবর দিয়ে আমি আর তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে চাই না। একেবারে চরম যদি কিছু ঘটে তাহলে তখন তো তিনি জানতে পারবেনই। আমি যেচে তাঁর দুশ্চিন্তার

বোঝা বাড়াই কেন? তাছাড়া বুলা নিজেই যদি নিজের পায়ে ভর করে নেয় তাহলে বাবাও অনেক একটি কন্যার দায় থেকে মুক্ত হতে পারবেন। আমি কবে সুস্থ হয়ে চাকরি করতে পারবো তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। অথচ বাবার যা সামান্য আয় তা দিয়ে সংসারের খরচ সামলে বুলার বিয়ে দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং বাবার বিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকলে বুলাকে আজীবন হয়তো কুমারী হয়েই থাকতে হবে। বিবাহ-যোগ্য মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য নেই, অথচ বুলা কোন যুবকের সঙ্গে প্রেম করছে শুনলে বাবা তাও সহ্য করতে পারবেন না। লোক-লজ্জার ভয় আছে তো। আমি তাই বাবাকে বুলার চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও জানাই নি।

আর যার কথা সবচেয়ে বেশি ভেবে আমি ঐ চিঠির কথা কাউকে বলতে পারি নি সে হচ্ছে স্বয়ং বুলা। বুলা যদি জানতে পারে যে আমিই বাবা-মার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছি তাহলে ও আমাকে কী ভাববে? আমার শিক্ষা কালচার রুচি সবকিছুকে তখন সে ঘৃণা করতে শুরু করবে না? একালের কোন আধুনিক শিক্ষিত যুবক এ কাজ করতে পারে? আমার বাবা-মা যে দৃষ্টিতে বুলার এ ব্যাপারটা দেখবেন আমিও কি সেই দৃষ্টিতে দেখবো? আমার মনটা তাঁদের থেকে আরও আধুনিক আরও প্রগতিশীল হওয়া উচিত নয় কি? সুতরাং আমি কী করে বুলাকে বাধা দেবো? তাছাড়া আমি নিজেও তো বাবা-মার ধারণা অনুযায়ী নিষ্কলঙ্ক পবিত্র নই। আমার সঙ্গে রুচিরার সম্পর্কটা বাড়ির কেউ না জানুক আমি তো জানি। সেইজন্য আমার বুলার সম্বন্ধে একটা ভয় ছিল। কিন্তু আমার বাবা-মা যে ধরনের ভয় করেন আমার ভয়টা সে ধরনের নয়। আমার ভয়টা একটু অন্যধরনের।

কিন্তু সে ভয়ের কথা এখন থাক। কদিন ধরে আমি দেখতে পাচ্ছি চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে বুলার মধ্যে যেন এক অদ্ভুত ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এখন সে অকারণে একটু বেশি হাসে, মায়ের কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, রেডিওটা খুলে দিয়ে গানের সঙ্গে গলা মেলায়। কখনও বা ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে খুনসুটি করে। অথচ দিন দশ-বারো আগে যখন ঐ চিঠিটা আসে নি তখন প্রায় সর্বদাই ওর মুখটা গম্ভীর হয়ে থাকত। ওই চিঠিটা কে পাঠিয়েছে তার নাম-ধাম আমি জানি না, কিন্তু ওটা যেন পরশমণির কাজ করেছে। ওর স্পর্শে বুলার সমস্ত শরীর-মন গান গেয়ে উঠেছে। শরতের সকালের মতো ওর মুখটা খুশির রোদে ঝিলমিল করছে। তার এতদিনের বিষণ্ণতা সে কাটিয়ে উঠেছে। আমি কী করে ওর মন থেকে আশার অংকুরটি টেনে ছিঁড়ে ফেলবো? ওর দু-চোখে যে আশার প্রদীপ-শিখা জ্বলে উঠেছে তা আমি কী করে এক ফুঁ-য়ে নিভিয়ে দেবো?

আজ সকালে বুলা যখন হারমোনিয়াম নিয়ে হঠাৎ গান গাইতে শুরু করল তখন প্রথমে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজই তো তিনশে জুলাই। আজকেই তো বুলার সঙ্গে সেই অজ্ঞাতপরিচয় ছেলেটির দেখা হওয়ার কথা। বুলার চিঠি থেকে আমি যেটুকু আমার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়েছিলাম তাতে লেখা ছিল আজই সেই ছেলেটির কলকাতায় আসবার কথা। তারিখটা আমার মনে ছিল। আজ তাই অনেকদিন পর বুলাকে হঠাৎ হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে শুনে আমার খুব মজা লাগছিল। কারণ বুলার মনের এই গোপন খুশির কথা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি।

আজ সারা সকাল ধরে বুলার গতিবিধি আমি নিঃশব্দে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কাউকে তা বুঝতে দিই নি। বুলা আজ সকালে পর পর অনেকগুলো গান গেয়েছে। তারপর মায়ের ফাই-ফরমাস একটু বেশি আগ্রহ নিয়েই খেটে দিয়েছে। অন্য দিনের থেকে আজ অনেক বেশি সময় নিয়ে চান করেছে। আমি বাইরের ঘরে শুয়ে শুয়ে সব টের পেয়েছি।

অন্যদিন খাওয়ার সময় বুলা প্রায়ই এটা-ওটা ফেলে দেয়। খাওয়ার ব্যাপারে তার সঙ্গে মায়ের প্রায়ই কিছু কিছু কথা কাটাকাটি হয়। এটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই মা বুলাকে বলছে, এটা খাবে না ওটা খাবে না এমন রাজরাণীর মতো মুখ করেছ কার ঘরে পড়বে কে জানে! দেখবো তখন এত আবদার কোথায় থাকে—

বুলা উত্তর দেয়, আমি বিয়েই করবো না—

মা বলে, না বিয়ে করবেন না—ধিঙ্গি হয়ে ঘুরে বেড়াবেন—

আজ কিন্তু বুলার সঙ্গে খাওয়া নিয়ে মায়ের কথা কাটাকাটি বিশেষ হল না। শুধু মাকে একবার বলতে শুনলাম, আর দুটো ভাত দিই—এইটুকু খেয়ে কেউ সারা-দিন থাকতে পারে—

বুলা না-না করে উঠল। কিন্তু তার সেই আপত্তির মধ্যে অন্যদিনের মতো কোন তেজ ছিল না। আজ বুলার কণ্ঠস্বরকে আশ্চর্য স্নিগ্ধ ও নম্র বলে মনে হল।

খাওয়ার পর বুলার ঘুম চাই-ই চাই। এ সময় হাতে একটা সিনেমা-পত্রিকা বা কোন রংচঙে উপন্যাস না হলে বুলার চলে না। আর বুলার সংগ্রহ করার শক্তিও প্রচুর। সে এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বা কারোর বিবাহে সদ্য-পাওয়া নতুন নতুন উপন্যাস নিয়ে আসত। তার ফলে আমারও সেগুলো দেখার সুযোগ ঘটত। আজ কিন্তু বুলা পত্রিকা পড়ে সময় নষ্ট করল না। আজ তার তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া দরকার।

দুপুরে আমার একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। তাও কয়েক মিনিটের জন্য। তারপর শুয়েছিলাম ঘুমের ভান করে। কিন্তু আসলে ঘুমোচ্ছিলাম না। চুপচাপ শুয়েছিলাম। আর চোখ বুজে সাত-পাঁচ ভাবছিলাম।

এর মধ্যে বুলা কখন উঠেছে, সাজ-গোজ করেছে আমি কিছুই জানতে পারি নি।

হঠাৎ নাকে একটা সুগন্ধ যেতেই এবং গুন-গুন গান শুনতেই আমি বুঝতে পারলাম বুলা এখন বেরুচ্ছে।

ও-ঘর থেকে মা জিজ্ঞাসা করল, কটায় ফিরবি?

বুলা গলা নামিয়ে উত্তর দিল, সন্ধ্যের মধ্যে ফিরব।

মা বলল, ছবিদের বাড়িতে এতক্ষণ থাকার কি দরকার?

—কি করব। ও যে ছাড়তে চায় না।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম বুলা কী অসংকোচে মিথ্যে কথা বলছে। ছবিদের বাড়িতে আজ হয়তো ও যাবে না কিম্বা গেলেও কয়েক মিনিটের জন্য মায়ের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্য যাবে। কিন্তু এমনভাবে বলছে যেন ছবির পীড়াপীড়ির জন্যই ও নিতান্ত অনিচ্ছায় যাচ্ছে।

মা আবার শুধোল, সিনেমায় যাবি নাকি?

বুলা জুতো পরতে পরতে উত্তর দিল, দেখি ছবি যদি টিকিট কেটে রাখে তাহলে যেতেই হবে।

—তাহলে তো ফিরতে অনেক রাত হবে।

বুলা এ কথার কোন উত্তর দিল না। ও যখন পিছন ফিরে জুতো পরছিল তখন আমি একবার ওর সাজ-সজ্জা দেখে নিয়েছি। আজ বুলা চমৎকার সেজেছে। গত বছর পুজোর সময় আমি ওকে যে বেগুনি রঙের সিল্কের শাড়ীটা দিয়েছিলাম সেটাই পরেছে। তার সঙ্গে মানিয়ে পরেছে একই রঙের সিল্কের ব্লাউজ। বুলার গায়ের ধপধপে ফর্সা রংয়ের সঙ্গে বেগুনি রংটা দারুণ খুলেছে। পিঠের ওপর দিয়ে লম্বা করে বেণীটা দুলিয়ে দিয়েছে।

তারপরেই ছিট্‌কিনি খোলার খুট্‌ করে শব্দ এবং 'মা যাচ্ছি।'

আমি বুলার উদ্দেশে মনে মনে বললাম, তোর যাত্রা শুভ হোক। তুই যে আশা নিয়ে যাচ্ছিস তোর সে আশা যেন পূরণ হয়। আমার হয়নি, তোর যেন হয়।

মা এসে দরজার ছিটকিনি আটকে দিয়ে গেল। আমি শুয়ে শুয়ে তাও লক্ষ্য করলাম।

বিকেলে মা যখন আমাকে চা-খাবার দিয়ে গেল তখন যেন আমাকে জানাবার জন্যই বলল, বুলা ছবিদের বাড়িতে গেছে।

আমি অজ্ঞতার ভান করে বললাম, তাই নাকি। কখন ফিরবে?

—কি জানি। আমায় তো বলে গেল সন্ধ্যে হবে।

আমার মাকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, আজ বুলার জীবনে কত বড় একটা দিন তা তুমি জানো না মা। আজ যদি বুলার ফিরতে দু-এক ঘন্টা দেরি হয় তুমি তাকে কিছু বোলো না।

মা চলে যেতেই আমার রুচিরার সঙ্গে কলেজের বাইরে গোপনে প্রথম দিন সাক্ষাৎ করার ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। সেদিন রুচিরা আমার জন্য কলেজের সামনে বিকেল পাঁচটার সময় অপেক্ষা করবে কথা দিয়েছিল। আমি যতই নির্দিষ্ট জায়গার দিকে এগোচ্ছিলাম ততই ভয় উদ্বেগ আশংকা আনন্দ এইসব কিছু মিলে আমার একটা অদ্ভুত মানসিক অবস্থা হয়েছিল। কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে আমার পা যেন চলতে চাইছিল না। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল রুচিরা হয়তো আসে নি। হয়তো ও আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাটা ভুলেই গেছে। কিন্তু কলেজের সামনের ফুটপাথ ধরে কিছুটা এগুতেই আমি দূর থেকে রুচিরাকে দেখতে পেয়েছিলাম। বুকের উপর দুখানা হাত আড়াআড়িভাবে রেখে ও সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। সেদিন আমার সমস্ত আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণিত করে রুচিরা নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল। নিজেকে সেদিন অশেষ সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়েছিল।

তারপর রুচিরার সঙ্গে কতদিন গোপনে দেখা করেছি, এক সঙ্গে পার্কে বা রেস্তোরাঁয় আড্ডা দিয়েছি, সিনেমা দেখেছি, কিন্তু প্রথম দিন ওর সঙ্গে গোপনে দেখা করার সময় আশঙ্কা উদ্বেগ নিষিদ্ধ আনন্দ এই সবকিছু মিলে যে অদ্ভুত একটা মানসিক অবস্থা হয়েছিল তা আর কখনও হয় নি।

সেই রুচিরা এখন মিলিটারী অফিসারের ঘরণী হয়ে পরম সুখে আছে। শুনেছি কাশ্মীরে থাকে। আমার মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে, রুচিরার কি সেই সব পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে?

কিন্তু রুচিরার কথা এখন থাক...

বুলা যখন ফিরল তখন আটটা বেজে গেছে। বাবা তখনও টুইশান সেরে ফেরেন নি। আমার ঠিক পরের ভাই রোজ সন্ধ্যেবেলা ওদের স্কুলের মাস্টারমশাইর কাছে পড়তে যায়। সাড়ে সাতটার মধ্যে সে ফিরে আসে। আজও ও পড়ে ফিরে এসেছে। আমার এক দূরসম্পর্কের পিসীমা এবং পিসেমশাই আমার অসুখের খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছিলেন। পিসীমা মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বুলা কোথায়? মা বলেছিল, ওর এক বন্ধুর বাড়িতে গেছে। আমি লক্ষ্য করেছিলাম মায়ের উত্তর শুনে ও'রা একটু অবাকই হয়েছিলেন। এত বড় মেয়ে সন্ধ্যের পরও বাড়ির বাইরে একা থাকে এটা ও'দের পছন্দ নয়। আমার পিসীমা আবার একটু গোঁড়া ধরনের। আমি মনে মনে এই ভেবে মজা পাচ্ছিলাম যে বুলা প্রকৃতই কোথায় গেছে তা যদি ও'রা জানতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই শিউরে উঠবেন।

অবশ্য বুলার জন্য আমারও যে কিছুটা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল না তা নয়। আটটা বাজতেই দরজায় কড়া যখন নড়ে উঠল তখনই আমি বুঝেছিলাম যে বুলা এসেছে। মা দরজা খুলে দিতেই বুলা যখন ঘরে ঢুকল তখন ওর মুখটা আমার খুব ফ্যাকাশে বলে মনে হল। ওর রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখটা দেখে আমার কিরকম একটা সন্দেহ হল। তারপর ভাবলাম হয়তো অনেক ঘোরাঘুরি করেছে বলেই অত ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

লক্ষ্য করলাম বুলা আমার দিকে একবারও তাকাল না। আমার দৃষ্টি থেকে নিজের মুখটা আড়াল করে রাখবার চেষ্টা করল। তারপর ভিতরের ঘরে ঢুকে গেল।

মাকে একবার বলতে শুনলাম, এত রাত হল যে। বুলা তার উত্তরে কী বলল আমি শুনতে পেলাম না।

তখন রাত কটা আমি ঠিক বলতে পারবো না। তবে এগারোটা সাড়ে এগারোটার কম হবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘরটা অন্ধকার ছিল। হঠাৎ আমি ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ শুনতে পেলাম। প্রথমে চমকে উঠলাম। তারপর মনে যে প্রশ্নের উদয় হল তা হল, এত রাতে আমার ঘরে কে কাঁদছে? আর তখনই হঠাৎ আমার মনে হল, বুলা কাঁদছে। অন্ধকারে যদিও কিছু দেখা যায় না তবুও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে আমার শিয়রের কাছে যেখানে পড়ার টেবিলটা আছে বুলা সেখানে বসে কাঁদছে।

বুলার কান্না শুনে ওর ফ্যাকাশে মুখটা দেখে আমার যে সন্দেহটা দানা বেঁধেছিল সেটাই সঠিক বলে আমার মনে হল। আমার মন বলে উঠল, বুলা প্রতারিত হয়েছে। ও ঠকেছে। কেন যে একথা আমার মনে হল তা আমি বলতে পারবো না। যে ছেলেটি বুলাকে চিঠি লিখেছিল তার সঙ্গে ওর আবেগেই লেখা হয়েছে কিনা আমি জানি না। ওদের দুজনার মধ্যে কী কথা হয়েছে তাও আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মন বারবার বলতে লাগল বুলা নিশ্চয়ই ঠকেছে। আর কেন যেন আমার মনে হল এছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। কারণ বুলা আমারই বোন তো। আমরা একই ভাগ্য নিয়ে মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাকেও তো রুচিরা নামে সেই মেয়েটি ফাঁকি দিয়েছিল। আমি প্রতারিত হয়েছিলাম। বুলা আমারই বোন। ওর ভাগ্য অন্যরকম হবে কী করে?

মা রান্নাঘর থেকে ডাকল, বুলা, খাবি আয়।

বুলা বলল, আমি খাবো না। আমার বড্ড মাথাব্যথা করছে।

বুলার কষ্ট আমি বুঝতে পারি। এ এমন এক ধরনের কষ্ট যার ভাগ কাউকে দেওয়া যায় না। গোপন করে রাখতে হয়। অথচ এ দুঃখ মনে মনে লালন করেও এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া যায়। আমিও তো রুচিরার কথা আজও ভুলতে পারি নি। আজও তো তার কথা ভেবে কোন কোন গোধূলিবেলায় আমারও মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। তাহলে বুলার আর দোষ কি।

মা আবার বলল, মাথা ধরলে শুয়ে পড়গে। ও-ঘরে বসে আছিস কেন?

বুলা সংক্ষেপে বলল, যাচ্ছি।

আমি জানি বুলা আরও কিছুক্ষণ এ ঘরে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার চোখের জল নিঃশেষিত না হয় ততক্ষণ সে কাঁদবে। এ বাড়িতে আর একখানা ঘর নেই যেখানে বসে সে নিঃশব্দে কাঁদতে পারে। ভাই-বোনেরা যদি তাকে কাঁদতে দেখে তাহলে সে খুব লজ্জায় পড়ে যাবে। মা-বাবার চোখে ধরা পড়ে গেলে সে কী কৈফিয়ৎ দেবে? সুতরাং এই ঘরটা তার সব থেকে নিরাপদ আশ্রয়। বুলা নিশ্চয়ই ভেবেছে, বড়দা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই সে তার কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছে না।

মনে মনে বললাম, বোকা মেয়ে। তোর কোন গোপন কথা আমার জানতে বাকি নেই। কিন্তু পাছে তুই লজ্জা পাস তাই তোকে আমি প্রকাশ্যে কোন সহানুভূতি জানাতে পারছি না। কিন্তু তোর জন্য আমার হৃদয়ে ভালোবাসা সহানুভূতি সমবেদনা সব জড়ো করে রেখেছি। কারণ আমি তো জানি ভালোবেসে প্রতারিত হবার দুঃখ কি অসীম।

বুলা আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আহা, বুলা কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে ও ওর মনের ভার হাল্কা করুক। ততক্ষণ কেউ এ ঘরে কেউ না আসে। কেউ না।

আমি অন্ধকার আগলে আমার অভাগী বোনকে পাহারা দেব।

# সুখের মেলা

## নন্দর কাহিনী

হাতে লাঠি। মাথায় বারো হাত গোলাপী রঙের একটা পাগড়ির প্যাঁচ। জরির আঁচলটা উষ্ণীষের মতন করে ঊর্ধ্বগামী করা। টিকোলো লম্বা নাক। কালো মোছার মতন একজোড়া গোঁফ। ফর্সা সাদা একেন গা। পরনে কালো চওড়া পাড় দামী ধুতি। বয়স বছর আটাশ হবে। বিরাট একটা কাপড়ের পোঁটলা গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে লোকটা সবুজ ঘাসের ঢালু জমি দিয়ে গান গাইতে-গাইতে নেমে এলো দীঘির পাড় পেরিয়ে একেবারে নিচে—বিস্তীর্ণ জলের কাছে। যেখানে হিস-হিস শব্দ তুলে দুটি যুবতী মেয়ে কাপড় কাচছিল এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরিয়ে হাতের ভাঁজ-করা কাপড় ফেলছিল তারা পটাস-পটাস শব্দ করে—ক্রমাগত এক-টানা জল ঝাপা জলে। শব্দটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল নারকেল গাছ সমান উঁচু পাড়-ঘেরা দীঘির সীমানার মধ্যে। বট গাছের ডাল-পালার ঝোপের মধ্যে পাকা ফল খাবার জন্যে এসে জুটেছে কাক-কোকিল-শালিক। মাছধরা চারকাঠির মাথায় বসে আছে একাগ্র-মন শিকার সন্ধানী একটা লাল ঠোঁট সবুজে-নীল মাছরাঙা।

লোকটা এসে লাঠি ধরে দাঁড়াল মেয়ে দুটির ঠিক সামনে।

মেয়ে দুটি হাসল। একজন ফর্সা আর একজন কালো।

লোকটা বললে, 'এই আমার গাধা। এর নাম 'শালা'। যে কেউ শালা বলে ডাকতে পারে, আমার আপত্তি নেই।'

'আর তোমার নামটা বুঝি বোনাই?' পাটায় কাপড় ফেলে হাঁপাতে-হাঁপাতে মুখটা লাল হয়ে-যাওয়া ফর্সা যুবতী মেয়েটি বুকের কাপড় সামলাতে-সামলাতে শুধোলে অন্য মেয়েটির দিকে কটাক্ষ হেনে।

নাটকীয় কায়দায় দাঁড়ায় লোকটা। তারপর ব্যঙ্গস্বরে বলে, 'গেছলুম শালা কলকাতায়। হাঁ, ইয়া বড় শহর। শহর তো নয় যেন নগর। অনেক নাগর আছে সেথা। তা যে এক বড় বাড়িতে শালা ঠাকুদ্দা বুড়হা নিগ্যালো মোকে। একটা সাহেব-পানা ছোঁড়া মোর গোঁফ দুটো হাত দিয়ে দেখে চোখ মেরে চলে গেল? আরে বাপ, শালা ইঁকিয়ে!'

মেয়ে দুটো হি-হি করে হেসে উঠে গাধাঅলাটার গায়ে জল ছিটিয়ে দিলে।

'হাঁ মাইরি! বিশ্বাস কর তুই পরী! পরীর পানা একটা জোয়ান মেয়ে এসে কাপড় ফেলে দিয়ে বললে, ও বাবা! এ কে! ও 'পেসাদ' বুড়ো? নাতি? তা এত বড় করে গোঁফ কেন? শালা আশ্চায্যি, মেয়েটা পর্যন্তও আঙুলের মাথায় দাঁইড়ে আমার মতন লম্বা হয়ে গোঁফে পাক দিয়ে দিলে।'

হি-হি...হি-হি পাতিহাঁসের মতন জলে যেন কোলাহল তুললে পরী আর মন্দাকিনী।

'তারপর এলো বাড়ির বউরাণী! কি দুধে-আলতা গোলা চেহারা মাইরি! চোখ দুটো ঝিনুক-ঝিনুক। এই তার শাড়ি। মাথায় পরে আছি। শালা কি বাস! যেন চাঁপা ফুলের গন্ধ মাইরি!'

পরী বললে, 'তোমার সঙ্গে কথা বললে না বউটা?'

'হাঁ। বললে, কি নাম?'

"আজ্ঞে, নন্দচন্দ্র দাস।"

'আজ্ঞে, জিব শালা মোর ঘোরে না। 'ন্যাকাপড়া' জানি না। বউটা খইয়ের মতন সাদা দাঁত মেলে চোখ দিয়ে হাসতে লাগল। শুধোলে, 'বিয়ে করেছ?'

'আজ্ঞে, বয়েস পার হয়ে গেছে, তাই কেউ মেয়ে দেয় না।'

'কত তোমার 'বয়েস' গো? বছর পঞ্চাশ হবে?'

'কি জানি। ঐ বুড়ো জানে।'

'নিজের বয়স, অন্যে জানবে কেন?'

'আজ্ঞে ও অন্য লোক নয়, আমার বাবার বাবা। আমাদের কত্তা। আমার ছেড়ে আমার বাবার জন্মের খবর, সাল, তারিখ সব জানে। ও শালা বুড়োই সব হিসেব রাখার মালিক।'

বউটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বোধহয় বুঝলে আমি যতখানি বোকা ঠাউরে ছিল, ঠিক ততখানিটা নই। বুড়ো বলে বসল, 'শালার মাথায় ছিট আছে! কার কাপড় কারে দিয়ে দেয়। ভাল মতন মেয়ে দেখলে ভাল দেখে শাড়ি দিয়ে দেয়।'

আমি বললুম 'আরে ধেস শালা বুড়ো। মুই কি লেখাপড়া জানি যে নাম নম্বর পড়তে পারব?' মাইরি, শহর এক আজব জায়গা। যে দিদিমণি আমার গোঁফে পাক দিয়ে দিয়েছিল, তার কোটের পকেটে মাইরি একটা পত্তর পেয়েছি। একেবারে নির্জলা প্রেমপত্তর।'

নন্দ বসে পড়ল পা মেলে। গাধাটার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বললে, 'আরে শালা, শ্বশুরের ছাওয়াল, বোঝাটা ফেলে এট্টু ঘুরে বেড়িয়ে, ঘাস খেয়ে এসো না ধন। যাও, ভগমান তোমার ভাল করবে। মনের মতন বউ পাবে। গাঁক-গাঁক করে চেল্লাও বেয়ে খানিকক্ষণ।'

গাধাটা সত্যিই বোঝাটা ফেলে দিলে। তারপর গুটি-গুটি এগুতে থাকলে নন্দ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার লেজের বালামচি ধরতে যেতেই হুক্‌কা হুক্‌কা স্বর তুলে মারলে দৌড়।

নন্দ পান চিবুচ্ছিল। ঠোঁট দুটো লাল হয়ে গেছে। বললে, 'শালা গাধাটা একদিন কাপড়ের বোঝা নিয়ে পড়ল জলের মধ্যে। বোঝা ভারী হয়ে যেতে আর চাগাতে পারে না। আর ডাঙ্গা, তারপর কোঁতাতে-কোঁতাতে শালা বোঝাটা বয়ে নিয়ে এলো। সেই থেকে ও-সুমুন্দি জলের ধারে যাবে না!'

নন্দ একটা নীল খাম বার করে পড়তে লাগল : 'পার্ব্বতিন, আমার ছোট্ট মিন্টি একটা কীস নিয়ো। 'তোমার নার্গিস চোখ বুলবুলের বাসা পুড়িয়ে দিয়েছে।' কবে দেখা হবে সেই প্রতীক্ষায় আছি। তোমার দিদির বর আমাকে সেদিন চোখ মেরেছে। আমাকে ফোন করতে বারণ করেছে। আমার সঙ্গে বিয়েতে তোমার আপত্তি নেই বলেছ। অথচ আমার দেখা হবে কিনা শুধোতে ফোনে তুমি বললে 'কি জানি!' দেখো পারুতিন, এই অনিশ্চয়তা 'গুহুযাহে'র অতলায় মধ্যেও ছিল তাই সে ধ্বংসে হয়ে গিয়েছিল। তোমার স্থির নিশ্চয় হওয়া দরকার। জানি তুমি সোসাইটি গার্ল। অনেক তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে। সবাইকে কি তুমি কথা দিয়েছ? তাহলে ভারী মজা তো? ইতি, তোমার প্রবীর।'

পরী আর মন্দার চোখে জিজ্ঞাসা।

নন্দ চিঠিটা দুমড়ে-মুচড়ে নদীর জলে ফেলে দিলে। বললে, 'এই ওদের জীবন। ইন্দ্রজালের মধ্যে পড়া সোনার হরিণী। লে-লে তোরা কাপড় কাচ। গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিক করে নে। আমি বলে শালা পাগল। মাথায় এট্টু ছিট আছে, আবার বিয়ে করি নি!'

মেয়ে দুটো খিল-খিল করে হাসে।

মন্দা বলে, 'পরীকে তুমি বিয়ে করো না, ওর জন্যে তোমার এত আসনাই।'

নন্দ বলে ফেললে পরীর ভাতার হতে পারে একমাত্র আমার ঐ প্রিয় অনুচর 'আমার' মানে গাধাটা।'

মন্দা জিব কেটে বললে 'এ-মা-গো!'

পরীর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল হঠাৎ। বললে, 'হারামীর পানা কথা বলবি না নন্দ। তোর আর তোর বুড়ো ঠাকুদ্দার আর তোর গাধার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব ডান্ডা মেরে। আমার বাপ যদি বাসগাড়ি থেকে পড়ে ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে না যেত তাহলে কি তোদের কাপড় কাচতে আসতুম। পাঁচটা ভাইবোন, তাদের পেট চলে না। মা যায় আর একজনের ভাঁটিতে কাপড় সেদ্ধ করতে। আমাদের ভাঙা কপাল বলে ঠাট্টা করতে পারলি তুই।' কাঁদতে লাগল পরী।

নন্দ অনুশোচনায় হাঁ করে রইল তার দিকে তাকিয়ে। আকাশে সাদা মেঘের চাঁই ভেসে চলেছে। গাধাটা দীঘির পাড়ের মাথায় আকাশের পটে আঁকা ছবির মতন দাঁড়িয়ে তারস্বরে চীৎকার করছে: হুক্কা হুক্কা ... কাহো কাহো ...

নন্দ হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, 'এই পরী, শালা তুই কাঁদবি না মোটে—আমি সইতে পারি না। একটা কথা শালা গাধার মতন বলে ফেলেছি। কানে পাক খাচ্ছি।'

জলে নেমে গিয়ে পরীর হাত ধরে চোখের জল মুছে দিতে গেল নন্দ।

পরী তাকে ঠেলে দিলে। গোঁফ ধরে একটা টান মেরে ঝাঁঝিয়ে উঠল। দূর হও। তোমার 'লন্ড্রীর'তে যেয়ে 'প্যানসিল' ধরে শহরের সুন্দরী মেয়েদের শাড়িতে নম্বর দাও যেয়ে।'

'ওরে ব্যাস! কেউটে যে! তোর পায়ে ধরছি। আমিই না হয় তোর গাধা হচ্ছি।'

মন্দা বললে, 'এই—বুড়ো আসছে।'

সত্যি। সাদা মাথা, সাদা গোঁফ কালো চেহারা, লাল গামছা কোমরে বাঁধা নুব্জ বুড়ো প্রসাদ দাস আসছে গুটি গুটি।

জলে নেমে গিয়ে কাপড় কাচতে শুরু করে দিলে নন্দচন্দ দাসও। হিস হিস হিস।

বুড়ো বললে, 'নন্দ কখানা কাপড় কেচেছে?'

নন্দ বললে, 'ঐ তো—অতগুলো।'

পরী বললে, 'ও আমার কাপড়!'

মন্দা বললে, 'আমার কাপড়ের সঙ্গে কেচেছে সাতখানা বোধ হয় হবে ঠাকুদ্দা!'

'আলার মাথায় বাড়ি মারব। তোর চারটে থেকে লোক উঠে কাপড় কাচছে। লম্বা লম্বা কথা। শালা লন্ডিতে বসলেই যত ছোঁড়ারা আসবে। তোর বাপটা লেখাপড়া শিখে অমনি বিগড়ে গেল। জাত ব্যবসার খেয়া ধরল। বলত পরে পরনের কাপড় কাচব না। কারখানায় গেল কাজ করতে। কিসে কি হল, গুন্ডারা মেরে দিলে। বুড়ো বয়েসে পুত্তুর শোক, তুই শালা বোঝা কি বুঝবি। বলি শালা বে' কর না হয় ঐ পরীকে। বলে, ভদ্দরলোক কক্ষনো বে' করে না। ওঃ! শালা ভদ্দরলোক! মাস্টারদের অপমান করেছে বলে সেক্রেটারীকে মেরে ইস্কুলটাও ছেড়ে গেল। হালেও না, বইয়েও না শালা, কাঁড়ের গোবর! সব এই পঁচাশী বছরের বুড়োর ঘাড়ে। এখন চলবে কি করে?'

পরী বলে, 'রজকের ঘর পুড়লেই বড়-লোক। তোমারও তো ঘর পুড়ে গেল দাদু!' হি হি করে হাসতে লাগল পরী। বললে, 'সেই কাপড় চোপড় বেচে এক বিঘে জমি কিনলে, দু কামরা ঘর করলে, পানবিড়ি দোকান খুললে! অনেক টাকার গরম কাপড় মেরে দিলে! নীলহারী সাধুলোক বাবা তোমরা!'

বুড়ো খেঁকিয়ে ওঠে, 'ঘর পোড়ে নি বলছিস তুই ছুঁড়ি?'

'সে তো রান্নাঘর! সুতোর কটা কাপড় নাহয় পুড়েছিল। কলকাতা শহরের বড়-লোকদের সিল্ক, তসর, গরদ, মটকা, পশমের দামী দামী কাপড়গুলো?'

নন্দ বললে, 'বেশ করেছে দাদু! বড়-লোকদের কাপড়! তার বদলি দাদু ঢের পায়ে ধরে এসেছে। ব্যাস, খেল খতম। তারা যে আমার বাপকে গুন্ডায় মেরে ফেললে তার বেলা?'

পরী হঠাৎ বলে বসল, 'তাহলে ভালটা কে?'

'এ্যা!' নন্দ হাঁ করে পরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'বলি ভালটা কে তাহলে?' পরী চোখ ট্যারা করে তাকিয়ে রইল এমন মনোরম অথচ নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে যে নন্দ কোনো উত্তর করতেই পারলে না।

বুড়ো কাচা কাপড়গুলো মেলে দিতে গেলে মন্দা তাকে সাহায্য করতে উঠে গেল।

তারা দুজনে লাল-নীল-হলদে-সবুজ নানান রঙের শাড়ির প্রান্ত ধরে রোদ্দুর-ঝলমল-করা ঘাসের ওপরে বিছিয়ে দিতে লাগল।

নন্দ বললে, 'ভাল তুই, পরী! তোর পিদিম পিদিম দুটো চোখ। তুই আমাকে বিয়ে করবি?'

'আবার?'

'কেন আমার চাইতেও গাধা কি তুই পাবি আর?'

'দাদু নন্দ বাজে কথা বলছে!'

'ও শালা আবার কাজের কথা বলে কবে দিদি?'

'এই!'

'কি?'

'বিয়ে করবি?'

'ধরপোড়াদের পুড়ো ছেলেকে আমি বিয়ে করি না। তোমাকে বিয়ে করলে তাড়া-তাড়ি বিধবা হতে হবে। তোমার বাপের আক্রোশ জ্বলছে তোমার ভেতরে। তুমি খুন জখম করে জেলে যাবে অথবা মরবে।

'পরী!' চীৎকার করে উঠল নন্দ।

পরী ধারালো চোখে হাসতে লাগল মিটিমিটি।

তার গালটা টিপে দিলে নন্দ। চুমো খাবার ভঙ্গি করলে। তারপর হঠাৎ উঠে হনহন করে চলে গেল পাড় ঘাস দূরে পথ পায় হয়ে। পরী ভাবে, রজকের ছেলে, তোমার মনে সুখ নেই, একটা হিংস্র কেউটে খেলা করছে সারাক্ষণ তোমার ভেতরে।

পরদিন সকালে পরী সকালে কাপড় কাচতে এসে যখন শুনলে নন্দ মারামারি করতে গিয়ে মারা গেছে আগের দিন। শুনে সে 'হায়রে কপাল!' বলে বসে পড়ল তারপর হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

প্রসাদ বুড়ো দীঘির পাড়ে এসে পরীর কান্না দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। কাল বিকেল থেকে নন্দ বেরিয়েছে কোথায় কে জানে! তার বন্ধু-বান্ধব ছোঁড়ারাও কেউ নেই।

'কি হয়েছে পরী! কাঁদিস কেন? তোর বাপটা কি মরে গেছে?

'নন্দ নেই গো দাদু! সে পিস্তলের গুলীতে খুন হয়ে মারা গেছে—যে তার বাপকে খুন করেছিল তাকেও নিকেশ করে গেছে!'...

প্রসাদ দাস বসে পড়ল। তার কোটরে ঢোকা চোখ দুটো ঘুরতে লাগল। মাথা কুটতে লাগল। টলতে টলতে বাড়িতে ফিরে এসে কেরোসিন ঢেলে নিজের ঘরদোর আগুন ধরিয়ে দিলে সে। লোকজন ছুটে এসে জল ঢেলে আগুন নেভাতে গেলে ডাণ্ডা নিয়ে সে তেড়ে গেল.—'কোনো শালা আগুন নেভাবি না! মাথা ফাটিয়ে দোব!'

পরী তখনো দীঘির জলে আকাশের কালো মেঘের টুকরো ভেসে যাওয়া দেখ-ছিল নরম ঘাসের ওপরে পা ছড়িয়ে বসে। মন্দা আসেনি। আর আসবেও না। দীঘির পাড়ের সব স্মৃতি মুছে যাবে। ঠিকই সে আঁচ করেছিল। নন্দ মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেত। দুর্বোধ্য কিসব বকতো। শুধু নন্দর গাধাটা এখন ঘুরে বেড়াবে স্বাধীন-ভাবে নন্দর পরিতৃপ্ত দুর্দান্ত আত্মার মতন।

—আবদুল জব্বার

(৪১)

সোনা বিকেলের দিকেই দেখল এই বাড়ি মানুষজনে গিজগিজ করছে। ঘোড়ায় চড়ে এল তারিণী সেন. তিনি ঘোড়ায় চড়ে ফের নেমেও গেলেন। ব্রাহ্মন্দী থেকে রায়-মশাইরা খবর পেয়ে বের হয়ে পড়েছেন। গোপালদি থেকে এসেছে অর্জুন সাহা, তার বৌ মা সবাই। লতব্দি থেকে এসেছেন অম্বিকা রায়। এসেছেন হাজি সাহেব, তার দুই ছেলে। আবেদালি, হাসিমের বাপ মনজুর, সবাই এসেছে। ওরা বৈঠকখানা ঘরে বসে রয়েছে। মনজুর আম গাছ কেটে কাঠ করার দায়িত্ব নিয়েছে। যেখানে যা কিছু খবর এখন, সে শুধু এক খবর, বুড়ো কর্তার মহাপ্রয়াণ হচ্ছে। শতবর্ষ পার করে মানুষটা আর একদিনও সবুজ বনে মৃত বৃক্ষ হয়ে বাঁচলেন না।

সারাদিন ধরেই এ-ভাবে মানুষজন আসছে যাচ্ছে। ছোট কাকা শিয়রে বসে গীতা পাঠ করছেন। রায়মশাই পিঁড়িতে বসে মহাভারত থেকে বিরাট পর্ব পড়ে শোনাচ্ছে। ঠাকুমা পায়ের কাছে সারাদিন বসে আছে। জ্যাঠামশাইকে ধরে এনে পাশে বসিয়ে দিয়েছে জ্যাঠিমা। মুখের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে ডেকেছে, বাবা, বাবা।

তখন যেন এই মানুষ কত দূরে চলে যেতে যেতে কার ডাক শুনে চোখ মেলে একটু তাকাচ্ছেন, তারপরই চোখ বুজে আবার কোন দূরাগত মায়ার সন্ধানে বের হয়ে পড়ছেন। জ্যাঠিমা বলছেন, বাবা, বাবা, আপনার বড় ছেলে। বলে জ্যাঠিমা শীর্ণ হাতখানা তুলে, পাগল মানুষের মাথায় ধরে রাখছে। বাবা, বাবা, আপনি আশীর্বাদ করুন আপনার পাগল ছেলেকে। তাঁকে বলুন, তুই আর কোথাও যাবি না। ওকে আপনি বলে যান সে কি করবে।

সোনা দেখেছিল তখন ঠাকুর্দার চোখে জল। দু চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। জ্যাঠিমা খুব ধীরে ধীরে সেই জল মুছিয়ে দেবার সময় ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। সবারই চোখ ছলছল করছে। ছোট কাকা বোধ হয় দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি কিছুক্ষণের জন্য গীতা পাঠ বন্ধ রেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। বুঝি এ-সময় ঠাকুর্দার পাশে জ্যাঠামশাইর এই চেহারা সহ্য করা যায় না। বুক ভেঙে কান্না উঠে আসে।

জ্যাঠিমা বললেন, আপনি, ওকে কিন্তু চোখে চোখে রাখবেন সব সময়।

সোনার কেমন অস্বস্তি লাগছিল। বুকের ভিতর ওরও একটা কষ্ট হচ্ছে। যা সে ঠিক এখন ছুঁতে পারছে না। ঠাকুর্দা মরে গিয়ে স্বর্গ থেকে সবসময় চোখে চোখে রাখবেন। জ্যাঠিমা কাঁদছেন। সোনার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। আর ভয় কি। এখন থেকে সবসময় একজন পাহারাদার পাওয়া গেল। তিনি সব লক্ষ্য রাখবেন। তবে আর কান্নার কি আছে! তবু কেন জানি কান্না পায়। সোনারও কান্না পাচ্ছিল। এতক্ষণ যে বুকের ভিতর অস্বস্তি, এই কান্নার জন্য। ঠাকুরদা মরে যাবে। এটা ভাবতেই এখন ওর কান্না পাচ্ছে। অর্জুনগাছের নিচে ঠাকুরদাকে পোড়ানো হবে, বাবা জ্যাঠামশাই মন্দির বানিয়ে দেবেন। সোনা বিকেলে মন্দিরের চাতালে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে বসে থাকবে। বর্ষাকাল এলে চাতালের পাশে জল উঠে আসবে। জলের নিচে রুপালি রঙের পুঁটিমাছ। সে এবং জ্যাঠামশাই ছিপ ফেলে পুঁটিমাছ ধরবে।

সে নিজে এ-ভাবে জ্যাঠামশাইকে কোন না কোন কাজের ভিতর নিযুক্ত করে রাখবে। কোথাও যেতে দেবে না। কোন কাজের ভিতর এই যেমন মাছধরা, ফলের দিনে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে ফল-পাকুড় পেড়ে আনা, ফসলের দিনে ঈশমদাদার পাশে বসে জমি পাহারা দেওয়া বিদ্যালয়ে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং কোন গাছের নিচে বসিয়ে রেখে ক্লাশ সেরে আসা, ফেরার পথে কোঁচড়ে জাম-জামরুল, অথবা চিনাবাদাম, চৈত্রমাসে দু পাকেচক্রে খিরাই, দুজনে পথে পথে খেতে খেতে আসা—এমন একটা ছবি ওর চোখের উপর ভেসে উঠল। ঠাকুরদার কানের কাছে এ-সব বলে দেবার ইচ্ছা তার। ঠাকুরদা কেন কাঁদেন আপনি। আমি ত আছি। সারাজীবন জ্যাঠামশাইর সঙ্গে সঙ্গে আমি থাকব। তাঁকে ফেলে কোথাও যাব না।

কিন্তু এত মানুষজন ঘরের ভিতর, ওরা আসছে যাচ্ছে, দেখে উঠোনে নেমে যাচ্ছে, ঠাকুরদার সততা সম্পর্কে ওরা কথাবার্তা বলছে, এমন মানুষ হয় না, কথিত আছে রাম রাজত্ব করেন, সীতা বনবাসে যায়—প্রায় যেন এ-সংসারে তেমন চিত্র, এক পাগল মানুষ নিশিদিন হাটে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, এক সীতার মতো সাধ্বী নারী জানালায় দাঁড়িয়ে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করে অথবা সংসারের কাজেকর্মে ডুবে থাকে সে।

সোনা ঠাকুরদার কানের কাছে গিয়ে বলতে পারল না, আমি সোনা কথা বলছি, আপনার ছোট নাতি। জ্যাঠামশয়কে আমি দেইখা রাখুম। আপনে কাঁদছেন কেন? কিন্তু এত লোকজনের ভিতর সে যে কি করে বলবে! তবু সে কোনরকমে, শিয়রের দিকে ভিড়ের ভিতর মাথা ঠেলে ঠিক ডান-দিকে এসে গেল। একটা মোটা কম্বলে শরীর ঢাকা ঠাকুরদার। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছেন। সব শরীরটা তাঁর কাঁপছে। সোনা কোনরকমে মাথার কাছে মুখ নিতেই, কারা যেন তাকে জোর করে সরিয়ে নিল। ওর চোখে জল। সবাই হয়ত ভেবেছে, সোনা এখন ঠাকুরদার গলা জড়িয়ে কাঁদবে। সে বলতে পারল না, আমি কাঁদছি না, আমি গলা জড়িয়ে কাঁদব না। সোনাকে এখন তবু কারা জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওকে বোঝা প্রবোধ দিচ্ছে, ঠাকুরদা বুড়ো হয়েছে, মরে যাচ্ছে, কাঁদছ কেন? কি ভাগ্যবান মানুষ তিনি। তাঁর কত সুনাম। তোমরা কাঁদলে ঠাকুরদার আত্মা শান্তি পাবে না।

সে এসে দাঁড়াল জামরুল গাছটার নিচে। তারিণী কবিরাজ গোপাটে ঘোড়ার উপর বসেই একটা মানুষের কি যেন দেখছে। সেই মানুষ ফেলু শেখ। সে একজন প্রবীণ মানুষকে তার কুষ্ঠের মতো ঘা দেখাচ্ছে। এবং লোকজন চারপাশে। সোনার মনটা ক্রমশ ভারি হয়ে আসছিল। তারিণী সেন ঘোড়ায় চড়ে চলে যাচ্ছে। যারা দূরের মানুষ তারা উঠে আসছে। তারা কত রকমের সব মহৎ গল্প ঠাকুরদা সম্পর্কে বলছে। সব প্রাচীন গাথার মতো মনে হয়। একজন মানুষ মরে গেলে বুঝি তার অতীত সবার চোখে ঘুরেফিরে আসে। সোনার এখন এ-সব শুনতে ভাল লাগছে। সে সব মানুষদের ভিতর ঘুরেফিরে—তার ঠাকুরদার অতীত ইতিহাস, সত্যবাদিতা, পৌরুষ এবং দানশীলতা সম্পর্কে সব শুনছে। কিন্তু একজন শুধু বলেছে, তিনি একবার মিথ্যা

আর ধরেছিলেন, তার বড়ছেলেকে। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। অথচ ভান করলেন, তিনি অসুস্থ, বাঁচা দায়। তিনি সেই মিথ্যা তার করে ছেলেকে আনিয়েছিলেন, এবং বড় ছেলে তার ফিরে এলেই, বিবাহ। বড় ছেলে তার বৈঠকখানার সারাটা দিন মাথা নিচু করে বসে রয়েছিল। পিতার সম্ভ্রমের কথা ভেবে কেমন নিরন্তর দুঃখী মানুষের মতো মুখ। সে মানুষটা সবাইকে রামায়ণ গানের মতো তার বর্ণনা দিচ্ছিল। যেন পিতার সত্যরক্ষার্থে পুত্রের বনে গমন। জীবনের সব কিছু ভালবাসা বনবাসে রেখে আসা।

সোনার কেন জানি মনে হল, মানুষ কখনও সারাজীবন সত্য কথা বলতে পারে না। ঠাকুরদা যখন পারেননি, তখন আর কেউ পারবে না। বড় জ্যাঠামশাই কেন যে পাগল হয়ে গেলেন! এমন একটা মিথ্যা তার না করলে তার বড় জ্যাঠিমা এ-সংসারে আসত কি করে। বড় জ্যাঠিমার, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কেবল সেবা সুশ্রূষা সকলের, নিজের বলতে তাঁর কিছু নেই—আর কি সুন্দর তাঁর কথা! সোনা জ্যাঠিমার মতো অনায়াসে এখন কথা বলতে পারে। তার কখন খিদে লাগে তিনি টের পান। সে কখন অসুস্থ বোধ করে জ্যাঠিমা চোখ দেখে ধরে ফেলেন। এবং সোনা যে বড় হয়ে গেছে তাও তিনি আজকাল ধরতে পেরে কেমন মাঝে মাঝে বলে দেন, আর কি তোমাদের এখন পাখা হয়েছে, উড়ে যাবে। আমাদের কথা তোমরা কেউ ভাববে না।

সে শুধু তখন বলতে পারে—না জ্যাঠিমা, আমি কখনও এমন হব না। ভাল হব আমি। আমি এই পরিবারের জন্য সব করব। ঠাকুরদা মরে যাচ্ছে বলে কি হয়েছে। আমরা ত আছি। আমি মেজদা বড়দা। সংসারের সব দুঃখ আমরা মুছে দেব। কত কিছু তার এখন বলতে ইচ্ছা হয়। সুন্দর, যা কিছু মহৎ এই পৃথিবীতে আছে সব কিছু তার হতে ইচ্ছা হয়। সে জামরুল গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠাকুরদা মরে যাচ্ছে। মৃত্যু সম্পর্কে নানা-রকম ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে তার। ওর মনে হয় ঠাকুরদা মরে কোথাও যাবেন না। সবাই অনর্থক কাঁদছে। সংসারের এমন ভালবাসা ফেলে কেউ কখনও দূরে গিয়ে থাকতে পারে না। তিনি এ-বাড়িতেই থাকবেন। তবে অদৃশ্য হয়ে থাকবেন। মরে গিয়ে মানুষ কোথাও বেশিদূর যেতে পারে না। ঠাকুরদাও বেশিদূরে যেতে পারবেন না। সংসারে তার বড় জ্যাঠিমার মতো বৌ আছে, পাগল জ্যাঠামশাইর মতো ছেলে আছে, ঈশমদাদার মতো মানুষ আছে, মার মতো ধনবৌ আছে তবে তিনি যাবেন কোথায়। তিনি থাকবেন, এ-সংসারেই থাকবেন। সকলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে থাকবেন। বিপদে আপদে তিনি সকলকে দেখবেন।

আবার এও কেন জানি মনে হয় সোনার, ঠাকুরদা মরে গেলে আকাশের নিচে বড় বটগাছটার মাথায় একটা নক্ষত্র হয়ে জ্বলবেন। তিনি বড় ধার্মিক মানুষ, পুত্রের স্নেহ আচরণের জন্য জীবনপণ করে যাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে—এ-সব তাঁকে দেবতা বানিয়ে দেবে। তিনি এত পুণ্যবান মানুষ, যে সে দেখল এখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। লণ্ঠন জ্বেলে মানুষজন আসছে। সে মাথা তুলে আকাশ দেখে বুঝল, চাঁদের চারপাশে গোল মণ্ডল। সেখানে দেবতারা সব চুপচাপ বসে একজন গুণী জ্ঞানী মানুষের অপেক্ষায় আছেন। তিনি এলে তাঁর নিবাস ঠিক করা হবে। একজন পুণ্যবান মানুষ মাটি ছেড়ে চলে আসছে—সে কোথায় থাকবে, তার বাড়ি বাগান, ঠাকুরপুজোর ঘর এ-সবের আয়োজন করছেন তাঁরা। তার ঠাকুরদা যথার্থই পুণ্যবান মানুষ। তিনি আকাশে নক্ষত্র হয়ে যাবেন। এবং তাঁর পাগল ছেলে কোথায় নিরুদ্দেশে যায় ঠিক তিনি সেখান থেকে টের পাবেন এবং তাকে চোখে চোখে রাখবেন। ঠাকুরদার আর জন্ম হবে না। তিনি আকাশ থেকে দেখতে পাবেন সোনা কি করছে, জ্যাঠামশাই হেঁটে হেঁটে কোথায় চলে যাচ্ছেন, ঈশমদাদা তরমুজ খেতে পাহারা দিতে দিতে ঘুমোচ্ছে কিনা—যেন সংসারের সব ফাঁকি এবার তিনি ধরে ফেলবেন। এবং রাতে ছোট কাকাকে স্বপ্নে বলে দেবেন, আগামী বছর দুর্দিন কি সুদিন। সোনাকে বলে দেবেন, জ্যাঠামশাই কোথায় কোন গাছের নিচে বসে আছে। দুঃখ বলতে যেটুকু সংসারে আছে ঠাকুরদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হয়ে যাবে।

সোনা যখন এসব ভাবছিল তখন কেউ বলে গেল—তুমি সোনা যাও, ঠাকুর্দার মুখে গঙ্গাজল দ্যাও—তখন ফেলু ট্যাবার পুকুর-পাড়ের দিকে ছুটছে। সে জোনাকি ধরার জন্য ছুটছে। একটা জোনাকি ওকে সেই মাঠ থেকে উড়ে উড়ে এতদূর নিয়ে এসেছে।

—কবিরাজমশয় আমার ঘাওডা সারাইয়া দ্যান। আপনের গোলাম হইয়া থাকমু।

—তুই কেডারে!

--আমি ফেলু। আপনেগ ফ্যালা। হাডুডু খ্যালছি কত। আপনের মনে নাই আমার নামডা!

—অঃ তুই ফ্যালা। তা তর কি হইছে।

—ঘাও হইছে।

—কাছে আয় দ্যাখি।

—এই যে কবিরাজ মশয়। দ্যাখেন।

ফেলুর মাথার উপর মাছি উড়ছিল। কাছে যেতেই কি দুর্গন্ধ। —আরে ফ্যালু তুই ত মইরা যাইবি!

—এডা কি কন কবিরাজ মশয়। আমি মইরা গ্যালে আমুডার কি হইব।

—তর যে বড় কঠিন অসুখ শরীরে।

—এখনে আর ছাড়ব না।

তারিণী কবিরাজ ঘাটার চারপাশে টিপে টিপে দেখল।

—জ্বলে?

—হ জ্বলে। দাবদাহের মত জ্বলে।

—জোনাকি জ্বললে নিভলে যেমন জ্বলে তেমন জ্বলে না।

—হ কবিরাজ মশয় ঠিক ধরছেন। জ্বালাডা ধপ কইরা নিভা যায় আবার দপ কইরা জ্বইলা ওঠে।

--বড় কঠিন অসুখরে ফ্যালা। তুই এক কাম করতে পারস।

—কি কাম কন দেখি। যা কন মাথা পাইতা দিমু।

—শতমূলের গাছ চিনস।

—চিনতে কতক্ষণ। বলে সে গামছা দিয়ে ওর ঘাটা ফের ঢেকে দিল। তারিণী সেন ঘোড়ার উপর বসে রয়েছে। সে নামছে না। ফেলুকে খুব কাছে আসতে বারণ করছে। সে চোখ বুজে কি যেন ভাবছে। তার পরই যেন বলে দিল, ঠিক কবিরাজীতে তর ব্যারামের অষুধ নাই। এডা আমি শিখছিলাম এক হেকিমদার মানুষের কাছে। সে কইছে, কুষ্ঠরোগে এডা লাগে।

—আমার কি কুষ্ঠ হইছে কবিরাজ মশয়।

—ঠিক কুষ্ঠ না। তবে তর এই ঘাও আর ছাড়নের কথা না। সূর্যমুখি ঘাও। রোদ উঠলেই জ্বালাটা বাড়ে। রোদ পইড়া আইলে কমে জ্বালা।

—হ বাড়ে কমে।

—সারে না। কবিরাজি মতে এর অষুধ নাই।

—আমি যে কি করিগ কবিরাজ মশয়।

—এটা কইরা দ্যাখতে পারস। আর তুই উবুৎ ল্যাঙরার গাছ চিনস!

—না গ কবিরাজ মশয় চিনি না।

--চিন কি তবে! সারা জন্ম শুধু ভাত গিল্যো চলে।

—তা চলে কবিরাজ মশয়! হায় কি যে আমার হইল!

—আইজ ত পূর্ণিমা। বৈশাখি পূর্ণিমা।

—হ কবিরাজ মশয়।

—দিনটা ভাল আছে। শুক্লা তিথিতে এই জ্যোৎস্নায় একশটা জোনাকি ধইরা ফ্যাল। পক্ষকাল জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখ। তারপর যখন দ্যাখবি জলটা ঘোলা ঘোলা হইয়া গ্যাছে তখন শতমূলি গাছের

মূলে জোনাকির গন্ধ আছেই জোনাকির জলে বেটে লাগাইবি। কবিরাজীশাস্ত্রে এ-সব লেখা নাই। দেখবি কয়দিনে তর শরীরে আর শরীর থাকে না। দরদর বইয়া যায়। কবিরাজি অষুধে কামে লাগব না। দিয়া গ্যালাম একবার লাগাইয়া দ্যাখতে পারস। লাগানোর আগে জোনাকির জল দিয়া ঘা ধুইয়া দিবি।

কবিরাজ মশায় ওষুধ ল্যাওরা গাছের নিমিত্ত কি কইলেন যেন।

—পঞ্চকাল কষ্ট পাইবি। তার আগে গাছটা সিদ্ধ কইরা কিছু বাসকের ছাল, অর্জুনের ছাল, জায়ফল, লবঙ্গ ফেইলা দিয়া একটা পাচন খাইতে পারস। শরীরের রক্ত তর খারাপ। কালোমেঘের পাতা সিদ্ধ কইরা খাইতে পারস। রক্তটা ঠিক হইলে ঘাও শুকাইতে সময় লাগব না। বলেই তারিণী সেন মাঠের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটালো। ফেলু দেখল চারপাশে তার জ্যোৎস্না। একটা জোনাকি, একটা একটা করে একশটা। একশটা জোনাকি। ওর চোখের উপর এখন জীবনের সবচেয়ে দামী এবং নামী বস্তু জোনাকি। তখনই সে দেখল মরীচিকার মতো একটা জোনাকি বেশ পুচ্ছ তুলে উড়ে যাচ্ছে।

সে জোনাকিটাকে ডান হাতে খপ করে ধরতে গেল।

হাওয়ায় হাওয়ায় দুলে দুলে জোনাকিটা যাচ্ছে। ফেলু ছুটছে তার পিছনে। মাঠের ভিতর ওর মনে হল আর একটা জোনাকি। এত কাছের জোনাকি হাতের বাইরে চলে যাবে, সে স্থির থাকতে পারছে না। যত সোজা মনে করেছিল জোনাকি ধরা, যত সহজে সে ভেবেছিল খপ করে ধরে কোঁচড়ে ফসলের মতো তুলে নেবে তত সে দেখল মরীচিকার মতো হাতের ফাঁকে জোনাকি উধাও। সে বলল, হালার কাওয়া।

সে সুতরাং জিদের বশে, অথবা এক দুই মিলে এক গন্ডা, পাঁচ গন্ডা মিলে এক কুড়ি, পাঁচ কুড়িতে শ। একশ জোনাকি। সে গন্ডার হিসাব জানে। কুড়ির হিসাব জানে। শয়ের হিসাব তার জানা নেই। সে যে এত বড় হাডু ডুডু খেলোয়াড় ছিল, নাম তার ফেলু ছিল, ভয়ে তাকে কেউ কাঁইচি চালাত না. তার নামে কিংবদন্তি ছিল কত, ফেলু খেলার দিন সারারাত তেল মাখে গায়ে, রসুন গোটার তেল। তেলটা তার ভিতর বসে যায়। সে পিছল করে রাখে শরীর। ঠিক পাঁকাল মাছের মতো সে বের হয়ে যায়। যত বড় প্যাঁচ দাও, যত বড় কাঁইচি চালাও, কি করতসই সে যে ফুস ফাঁস বের হয়ে আসে কেউ টের পায় না। কেউ বলে মানুষটা এক ফকিরের কাছে তাবিজ নিয়েছে, মাদুলি গলায় বড় ঝোলে তার. পারো তো সেটা কেড়ে নাও। দ্যাখবে কেমন ভূতের ভয়ে মন্তরোষধি খেলা খেলে। ক্যাক্যা।

এখন সেই ফেলা মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে। গলায় তার সেই কালো তার জড়ানো। রুপোর চাকতি। সে একটা জোনাকির সঙ্গে পারছে না। তার সব কেড়ে নিল এক মানুষে। পাগল মানুষে। মনে হল তার তখন ঠাকুরবাড়ি লন্ঠন হাতে কান্না উঠে যায়। বড়ো ঠাকুর চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। কত লোক যাচ্ছে দেখতে তাকে, আর ফেলু এখন কানা খোঁড়া বলে কেউ একবার তাকাচ্ছে না। তার যা ইজ্জত, ধর্ম সব কেড়ে নিয়েছে মানুষটা। সে উন্মত্ত হয়ে ছুটছে। জোনাকিটা সাদা জ্যোৎস্নায় ভারি খেলা খেলছে বটে। কাছে এসে যাচ্ছে, খপ করে ধরতে যাচ্ছে, আবার উড়ে যাচ্ছে, হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে. উপরে উঠে যাচ্ছে, সে ভেবেছে ছেড়ে দেবে. অন্য ঝোপে খুঁজবে জোনাকি। যেখানে জল ঘোলা, অথবা পচা ডোবা সে সেখানে চলে যাবে, তখনই আবার জোনাকিটা চোখের সামনে নেমে আসছে। যেন ধরা দিতে আসছে। সে বলল, আহারে আমার সুন্দর জোনাকি। আয় তরে ধইরা লই। পরান আমার তর লাইগা কত না কান্দে!

সে খপ করে ধরতে গেল। আর উড়ে গেল ফের জোনাকি। হাওয়ায় দুলতে দুলতে কঠিন রুক্ষ মাঠের উপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল সে।

ফেলুর মনে হল শরীরে তার পাখা গজিয়েছে। জোনাকির মতো দুই পাখা মেলে সেও যেন উড়ছে। কঠিন রুক্ষ মাঠের উপর দিয়ে সে ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে। জোনাকিটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে সে ভেসে যাচ্ছে। জোনাকিটা যত দুলে দুলে যাচ্ছে, সেও তত দুলে দুলে যাচ্ছে। সে কি এক হাজার আরব্য রজনী গল্পের নায়ক হয়ে যাচ্ছে। তার যে কি ইচ্ছা হচ্ছে এখন, আহা সে কোথায় যাচ্ছে, তার যে কি ইচ্ছা, আল্লার কুদরতে সে আবার সব ফিরে পাবে, এমন কি এটা যখন ফকির প্রদত্ত অষুধ, দানারি ফানারিতে কি না হয়, মনে হয় তার জোনাকিটা তাকে উড়ে উড়ে আল্লার দরবারে নিয়ে যাচ্ছে। অথবা এই জোনাকি বুঝি তাকে একশটা জোনাকির খবর দেবে। খবর দিলেই সে খপ করে ধরে ফেলবে, জলে ভিজিয়ে একবার শতমুলি বেটে লাগাতে পারলেই নিরাময় হবে শরীর। এমন কি তার সেখানে একটা ব্যাঙের লেজ গজানোর মতো সুন্দর হাত গজাতে পারে। সে তার ডান হাতটা নেড়ে বাঁ হাতটা আবার গজালে—কি কি করবে, প্রথমেই তার কি করণীয় এমন ভাবতে ভাবতে সে যে কোথায় চলে যাচ্ছে!

ফেলু ট্যাবার পুকুর পাড়ে এসে দেখল জোনাকিটা ঝোপের ভিতর লুকিয়ে পড়েছে। সে ভাবল, বারে বেশ মজা, তুমি কুহেলিকা, পদ্ম ফোটালে। না চক্ষে, তুমি আমারে লক্ষ্মী কেমনধারে নিয়া আইলা! বলেই সে ঝোপটার অন্তরালে উঁকি মারল, কিন্তু মাইজলা বিবির মতো যেন জানালা দিয়া তার। সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঝোপের ভিতর, যেমন সে একবার বাড়ি-গাছটার নিচে উঁকি দিয়েছিল, কখন মাইজলা বিবি তারে দেখা দেবার জন্যে পানিতে নেমে আসে।

এখানেও ঠিক সেই উঁকি দিয়ে থাকা। জোনাকিটা ঝোপের এ-পাশে উড়ে এলেই খপ করে ধরে ফেলবে। আর কি আশ্চর্য সে দেখল জোনাকিটা তার দলে ভিড়ে গেছে। এখানে সে যে উড়ে এল, সে তার দলে ভিড়ে যাবার জন্য। মাঁরু হায় হায়। কলিজা কামড়ায়, সে নাগাল পাচ্ছে না জোনাকিগুলোরে। একডা দুইডা জোনাকি না, হাজার গন্ডা জোনাকি। কেবল ঝোপের ভিতর বসে থাকতে ভালে। নাড়া খেলেই উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে।

সে বুঝল নড়লে উপায় নেই। চুপচাপ চিত হয়ে পড়ে থাকা। যেই না উড়তে উড়তে কাছে চলে আসবে খপ করে ধরে ফেলা। ফেলু সেই আশায় ঝোপের ভিতর চিত হয়ে শুয়ে থাকল। শিকারী মানুষের মতো সে জোনাকি ধরার কায়দা শিখে ফেলেছে। সে চুপচাপ শুয়ে থেকে বেশ ফল পেল। গন্ডা দুই জোনাকি এখন তার করতলে। কোঁচড়ে রেখে সে আবার মরা মানুষের মতো পড়ে থাকল। টুপটাপ কি যেন পড়ছে ডাল বেয়ে। সে সে-সব লক্ষ্য রাখছে না। ওরা বেশ উড়ে উড়ে আসছে। কোনটা ধরতে পারছে, কোনটা ধরতে পারছে না। ওর বুক জ্বালা করছে। গামছা দিয়ে ঘা ঢেকে রেখেছে। মনে হল ফোঁটাগুলো শরীরে পড়ে নিচে ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টিপাত নয়। কারণ আকাশ পরিষ্কার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিপাতের মতো কিছু পড়ছে। এক ফোঁটা দু ফোঁটা পড়ছে। সে আঙ্গুল

ফটো : আশীষকুমার রায়
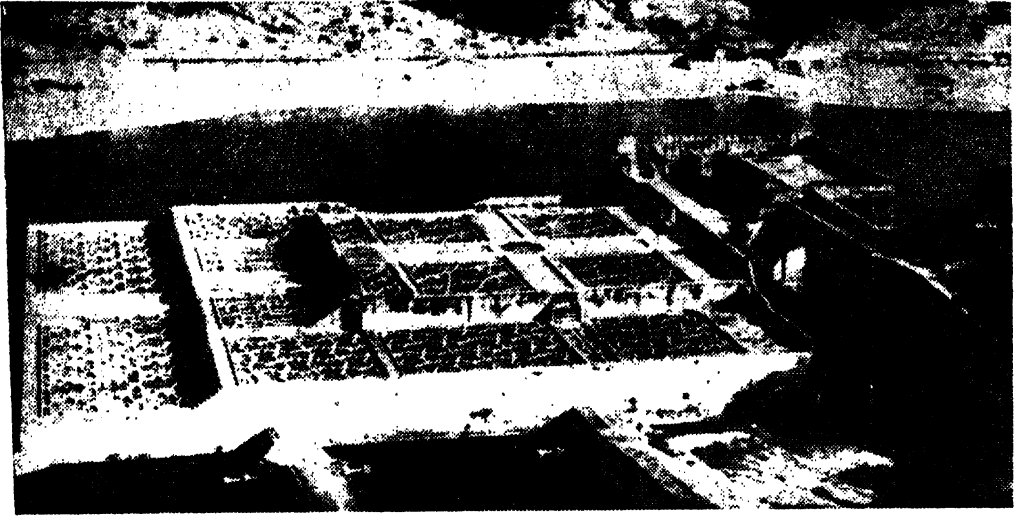
দিয়ে দেখল আঠা আঠা। তখনই আবার ওর বুকের কাছে দুটো জোনাকি খেলা দেখাচ্ছে। সে হাতটা তুলে একটা ধরে ফেলল। অন্য জোনাকিটা দূরে সরে গেল। দলে ভিড়ে গেল। ওরা সবাই কেন উড়ে আসছে না। চারপাশে গুঞ্জন করছে না। ফোটা পড়ছে। বুকে পিঠে ফোটা আঠার মতো। সে সে-সব ভ্রূক্ষেপ করছে না। পড়ুক। উঠে গেলেই এমন রাত আর মিলবে না। কাল, পক্ষ বিচার ঠিক না থাকলে অষুধে কাজ দেয় না। সে বলল, আমু রে আবার আমি ফেলু শেখ। তরে নিয়া উজানে যামু। আমার শরীরে গন্ধ থাকব না। তরে নিয়া যামু শহরে। আকালু তরে আর কি আতর আইনা দ্যায়, আমি দিমু তরে পারস্য দেশের আতর। আমার শরীর সবল হইলে কি দিতে না পারি তরে। থপ্। থপ্ করে সে ফের আর একটা জোনাকি ধরে ফেলল। আকালু ঘরে যায় নাই ত। বিবি তুই আমারে দুইটা মাস সময় দে। তরে আমি জোনাকির মত উড়াইয়া নিমু বাতাসে। থপ্।

সে থপ্ করে আরও একটা জোনাকি ধরে ফেলল। আর কি আশ্চর্য! থপ্। সে দেখল বুকের ভিতর আঠার একটা জোনাকি আটকে গেছে। থপ্। সে তুলে কোঁচড়ে রেখে দিল। আঙ্গুলে সে আঠার মতো বস্তুটি ঠোঁটে ছোঁয়াল। আরে হালার কাওয়া এর রে কয় মধু। মধু বর্ষণ হইতাছে। উপরে কোন বড় বৃক্ষ আছে। বৃক্ষ তুমি কার?

—রাজার।

—এখন কার?

—এখন তোমার।

—তবে মধু বর্ষণ কর। ডালে তোমার মধুর চাক যখন আছে, বর্ষণ কর। চান্দের রাইতে মধুতে আমার শরীর ভাইসা যাউক আমি শুইয়া থাকি। জোনাকিরা উইড়া আসুক। মরা কাঠ ভাইবা বসলেই, থপ্। সে থপ করে আরও একটা জোনাকি পায়ের পাতা থেকে তুলে আনল। ওর গোটা শরীর আঠাময় হয়ে গেছে। এখন সে ওদের না ধরলেও পারে। গোটা শরীরে জোনাকি, বিন্দু বিন্দু জোনাকি এক দুই করে উড়ে এসে পড়তে থাকল।

তাকে আর মানুষ মনে হচ্ছিল না। প্রথম একটা কাঠের গুঁড়ি মনে হচ্ছিল। উপরে ঝোপ ঝাড়। তার উপর বড় বৃক্ষের ডাল। ডালে প্রকাণ্ড মধুর চাক। কোন বন্য জীব হয়ত মধুভাণ্ডে মুখ দিতে এসে কামড় খেয়ে চলে গেছে। সব মধু এখন ঝোপের উপর বৃষ্টিপাতের মতো পড়ে পড়ে নিচের মানুষটাকে ভিজিয়ে দিয়েছে। সে নড়ছে না। নড়লে জোনাকি উড়ে আসবে না। ওকে একটা কালো কাঠের গুঁড়ি ভেবে এক দুই করে সব জোনাকি শরীরে বসে গেলে সে যেন জোনাকির রাজা হয়ে গেল। তার ঘরে বিবি আমু যে এখন একা আছে, একেবারে সে তা ভুলে গেছে। আমুর কাছে সে আবার রাজার মতো ফিরতে পারবে, সে আবার ফসলের মাঠে ছুটতে পারবে—কি আনন্দ, কি আনন্দ। সে মসগুল হয়ে গেছে। নানা রকম লতাপাতার স্বপ্ন দেখছে। একশটা জোনাকি সে গুনে এক কুড়ি পাঁচ গণ্ডা করে ফেলেছে। কিছু সে বেশি সংগ্রহ করেছে। সে উঠে বসল। এখন রাতের শেষ প্রহর। কালো মোষের মতো এক খণ্ড মেঘ আকাশের চাঁদ ঢেকে দিলে সে দেখল, ফেলু এক আশ্চর্য মানুষ হয়ে গেছে। তার শরীরে এখন অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু জোনাকি জ্বলছে। আঠায় ওরা আটকে গিয়ে আর উড়তে পারছে না।

তখনই তার মনে হল বিবিটা ঘরে একা একা ঘুমাচ্ছে। তালে আছে আকালুদ্দিন। সে আর দেরি করতে পারল না। মাঠের উপর দিয়ে পাগলের মতো ছুটতে থাকল।

আর তখনই শচীন্দ্রনাথ বলছে, বাবা জল খান। গঙ্গাজল। হাইজাদির পরান আইছে আপনের মুখে গঙ্গাজল দিতে।

বুড়ো মানুষ হাঁ করার চেষ্টা করল। তার শ্বাসকষ্ট প্রবল। নাকের বাঁশি ফুলছে। নাভিশ্বাসে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। গোটা শরীর দুলছে তাঁর। ঝড়ের ভিতর সমুদ্রের তরঙ্গে যেন এক পালবিহীন নৌকা দুলে দুলে এই সসাগরা ভূমণ্ডল পার হচ্ছে।

সোনা ঠাকুরদার মুখে সেই যে গঙ্গাজল দিতে এসেছিল আর নড়ে নি। সেও পায়ের কাছে চুপচাপ বসে রয়েছে। এখন পর্যন্ত চন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ কেউ ফিরে আসে নি। তারা আসে নি বলেই এখনও

আত্মাটা আছে। ওদের জন্য ঠাকুরদার প্রাণপাখিটা বুকের ভিতর এখনও বসে আছে। ওরা এলেই ওদের দেখে সে উড়ে যাবে। নাক অথবা কানের ভিতর দিয়ে সে বের হবে। চোখের ভিতর দিয়েও বের হয়ে আসতে পারে। চোখের ভিতর দিয়ে বের হলে চোখটা খোলা থাকবে। নাকের ভিতর দিয়ে বের হলে ডগা হেলে যাবে। আর মুখের ভিতর দিয়ে বের হলে তিনি হাঁ করে থাকবেন। ওর বড় ইচ্ছা দেখার ঠাকুরদার প্রাণপাখিটা কিভাবে বের হয়ে আসে।

সোনা, সেই আত্মা পাখির মতো না পাখির হৃৎপিণ্ডের মতো, আত্মার কি চেহারা, বুকের কোন জায়গাটায় থাকে, কি সে খায়, নিঃশ্বাস ফেলে কি করে বের হবার মুখে সে আত্মাটাকে দেখতে পাবে কিনা, সংসারে এই আত্মা কেউ কোন দিন দেখেছে কিনা, একটা ছোট্ট হাওয়ার মতো, তাই হয়ত সেটা দেখা যায় না—তবু ওর মনে হয়েছে, নিরিবিলি চুপচাপ বসে থাকলে টের পাওয়া যাবে আত্মা বড় অভিমানী বস্তু। চারপাশের দরজা জানালা বন্ধ করে দিলে কোথায় যাবে তুমি, আবার ফিরে এসে এই দেহ তোমাকে আশ্রয় করতে হবে। অথচ সোনা ঘরটার চারপাশে তাকালে দেখল, দরজা জানালা বন্ধ করলেও অজস্র ফাঁকফোকর রয়েছে। সে কিছুতেই তাকে আর আটকে রাখতে পারবে না। সেই চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূর মতো ওর ইচ্ছা এখন নিশ্ছিদ্র কোন ঘরে নিয়ে তুলতে পারলেই—ঠাকুরদা আবার শতবর্ষ বেঁচে যাবেন। কেন যে মানুষ মরে যায়, বাঁচে না, সেও একদিন মরে যাবে ভাবতে ভারি কষ্ট হল তার। ঠাকুরদার মতো, বাবা মা, জ্যাঠা-মশাই, ছোট কাকা সবাই মরে যাবে। সে বড় হলে একটা এমন ঘর তৈরি করবে, যেখানে হাওয়া ঢুকতে পারে না। সে ঘরটায় সে তার মা বাবা অথবা জ্যাঠা-মশাইকে রেখে দেবে। অভিমানী আত্মা বের হয়ে যখন দেখবে যাবার পথ নেই, তখনই ফের সে ভিতরে ঢুকে যাবে অথবা সে যদি বের হয়ে যায়, সে ঈশ্বরকে বলবে আমাকে দিব্যদৃষ্টি দাও ভগবান। আমি আত্মার পিছনে পিছনে ছুটব। খপ করে ধরে ফেলব তাকে। যার আত্মা তাঁকে আমি ফিরিয়ে দেব। তখনই কে যেন বলল, বের করে আনুন। ঘর থেকে বের করে আনুন। বাইরে এই ধরণীর শান্ত চন্দ্রালোকে শত-বর্ষ পার করে মানুষটা এবার মুক্ত হোক। ঠাকুরদাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাবার সময়ই হুঁশ হল সোনার, এতক্ষণ সে কি সব আজেবাজে ভেবেছে। ঠাকুরদাকে সেও ধরাধরি করে উঠোনে নিয়ে নামাল। শিয়রে একটা লণ্ঠন রেখে দেওয়া গেল। শেষ প্রহরে ফিরে এল ভূপেন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ। তারা ঠাকুরদার পায়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে থাকল। দেখলে মনে হবে ওরা যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

দেখলে মনে হবে ফেলুও যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সে বাড়িতে উঠেই ডাকল, আন্নু দ্যাখ আমি আইছি। তারিণী কবিরাজ ধন্বন্তরি। তার অষুধ পাইছি আমি। দ্যাখ আমার শরীরে কি জ্বলতাছে। দ্যাখ। তুইলা রাখ। পানিতে ভিজাইয়া রাখ। আর মাসাধিককাল আমার কষ্ট। আন্নু, আন্নু, তুই ঘরের ভিতর আছস, রা কয়স না ক্যান। ভাল হইব না কিন্তু। কথা ক। কথা ক কইতাছি। কাফিলা গাছটার নিচে আমি খাড়ইয়া আছি। তুই আয়। খুইটা খুইটা জোনাকি তুইলা নে শরীর থাইকা।

কোন সাড়া শব্দ নেই ভিতরে। ঝাঁপের দরজা ভেজানো। বাগি গরুটা ফেলুর সারা পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, অম্রুডা কথা কয় না। কি কারণ। কাকে উদ্দেশ করে যে বলা! যেন সে জাফরিকে উদ্দেশ করে বলছে, আমারে চিনতে কষ্ট হয় জাফরি। আমার শরীরে কি জ্বলতাছে দ্যাখ। আমি ইবারে ফাল্গ হইয়া যামু। দ্যাখবি তগ আর অভাব অনটন থাকব না। আন্নু, আন্নু রে!

না কোন সাড়া দিচ্ছে না। বড় অভিমানী মেয়ে। সে এই ভেবে বলল, রাইতে ফিরি নাই, কারণ ধন্বন্তরি আমারে কইল, ফালা, পূর্ণিমার রাইতে একশাড়া জোনাকি ধইরা রাখ। কামে লাগব।

--তা কি কাম? সে নিজেই প্রশ্ন করছে নিজেকে। যেন সে আন্নুর হয়ে জবাব দিচ্ছে। কাম হইছে দুরারোগ্য ব্যাধি ছাইড়া যায়। আমি ঝোপ জঙ্গল খাইবা দ্যাখ কি কৌশলে জোনাকি ধইরা আনছি।

তবু সাড়া দিচ্ছে না। তা দেবে না। ঘুম ত ওর ষোলআনা। ঘুমালে আর উঠতে চায় না। সে এবার ঝাঁপের দরজাটা সামান্য ঠেলে ভিতরে উঁকি দেবে ভাবল, অথবা ডাকবে, আন্নু ওঠ। আর ঘুমাইস না। ভোর হইতে আর দেরি নাই।

এটা কি হয়ে গেল! দরজাটা পড়ে যাচ্ছে কেন। ভিতরের দিকে একটা বাঁশে আটকানো থাকে। ঘুমোবার আগে আন্নু বাঁশটা ঠেলে দেয়। বাইরে থেকে সহজে ঠেলে দিলে দরজাটা ফেলে দেওয়া যায় না। কিন্তু এমন অদ্ভুত, সে দেখল দরজাটা পড়ে যাচ্ছে। ভিতরে কেউ যেন বাঁশ সরিয়ে রেখেছে। সে বলল, আমার লাইগা দরজা খোলা রাখছস! তা ভাল। তর ঘুম পরীর মত, ঘুমাইলে আর হুঁশ থাকে না। কাপড়চোপড় উইঠা যায়। একখানে তুই অন্যখানে তর কাপড়। তা তুই এডা ভাল করস নাই। আকালু নারানগঞ্জে যাইব মোকদ্দমা করতে। অরে আমি কোরবানি দিমু। বলেই সে হা হয়ে গেল।

যা ভেবেছিল তাই। ঘর খালি। সে এতক্ষণ জোরজার করে মনকে প্রবোধ দিয়েছে। যেন পাশেই আছে, সাড়া দেবে। জলের তরঙ্গ ভাইসা যায় মত বিবি তার লুকুচুরি খেলছে। সে বলল, তা ভাল হইছে। সে জোরে জোরে বলল, তা ভাল হইছে! সে চিৎকার করে আসমান জমিন কাঁপিয়ে হেঁকে উঠল, তা ভাল হইছে! ওর হাতের মুষ্টিতে সেই কোরবানির চাকু। ভাল হইছে! আমার পরাণ কাইরা নিছে আকালুদ্দিন।

—তুমি আকালুদ্দিন কই যাইবা। হালার কাওয়া। বলতে বলতে সে কেমন স্থবির হয়ে গেল। মেঝের উপর সেও ভূলুণ্ঠিত হল। বালকের মতো কাঁদল, আন্নু তুই আমারে ফালাইয়া কৈ গ্যালি। আমার মাটি জমিন কার লাইগা!

(ক্রমশঃ)

## বাংলার নারী-সমাজ

বাংলার নারী-সমাজ বাঙালী জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা রচনা করেছেন তাঁদের কল্যাণহস্তের পবিত্র স্পর্শে। যুগ যুগ ধরে এই নারী-সমাজ নানাবিধ সামাজিক উত্থান-পতনের মধ্যে ক্লেশে ও দুর্দশায় দিন যাপন করেছেন আবার নিদারুণ দারিদ্র্য ও দীনতার মধ্যেও গৃহকোণে উজ্জ্বল দীপ-শিখার মতো বিরাজ করে সকল আঁধার, সকল মলিনতা বিদূরিত করেছেন। এই নারী-সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, গল্প, উপন্যাস ও নাটকে তাঁদের দুঃখভোগ ও নির্যাতনের কাহিনীর সঙ্গে মহিমামণ্ডিত মাতৃমূর্তিরও জ্যোতির্ময়ীরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বাঙালী রমণী-জীবনের নানা বৃত্তান্ত ছড়িয়ে আছে প্রাচীন লোকগাথা এবং অজস্র পুঁথি-পত্রে। অনেক ছড়া, প্রবাদবাক্য, লোক-গাথা, উপকথা প্রভৃতির মধ্যেও বাঙালী রমণী-জীবনের কথা ছড়ানো আছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইদিক থেকে গবেষণা করে বাঙালী রমণীর ভূমিকা, সামাজিক মর্যাদা, সমাজ-জীবনে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন প্রখ্যাত লোক-সংস্কৃতি গবেষক শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত। তাঁর 'এ স্টাডি অব ওম্যান অব বেঙ্গল' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল অবধি বাংলার নারী-সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গবেষণা কর্মে তিনি ধনী দরিদ্র উভয়বিধ সমাজের জীবনধারা নিয়ে সমীক্ষা করেছেন। তাঁদের জীবনের ঐতিহ্য-আশ্রয়ী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, গার্হস্থ্য, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারা পুঁথিপত্র এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন। এই গবেষণা কর্মের প্রয়োজনে তিনি ইতিহাস মনস্তত্ত্ব এবং নানা ধরণের ছড়া ও প্রবাদের পটভূমি সন্ধান করেছেন। সেই সঙ্গে লোক-কথার উৎপত্তি এবং শ্রেণীগত ভিত্তি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন শুধু মাত্র আক্ষরিক অর্থটুকু গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলেছেন—'এই গ্রন্থ রিসার্চ-রিপোর্ট ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, রিপোর্টগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশ না করে গ্রন্থাকারে একত্রে মুদ্রিত করাতে লুব্ধ হয়েছি।' এই কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। অবশ্য তার জন্য গ্রন্থ পাঠে অসুবিধা হয় না।

জায়া ও জননী, কন্যা ও ভগিনী, বিধবা, বন্ধ্যা, প্রভৃতি সর্ববিধ স্তরের রমণী-সমাজ এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এ ছাড়া বিবাহিত ও অবিবাহিত মহিলা কর্মীদের বিষয়ও এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

বাঙলা বা বঙ্গ শব্দটি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে। দশম শতাব্দীতে ভুসুকপাদের চর্যাপদে প্রাচীন বাংলার কথা আছে, চর্যাপদে ব্যবহৃত ভাষাই বাঙালীর প্রাচীন ভাষা এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বঙ্গদেশের সঠিক সীমানা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত আছে। তবে ঐতিহাসিক তর্ক থেকে সরে এসেও গৌড়, সমতট, তাম্রলিপ্ত, হারিকেল প্রভৃতি অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব ও সীমানা সম্পর্কে বিশেষ বিতণ্ডা নেই। মুসলমান রাজত্বেই বাঙলাদেশ কথাটির উৎপত্তি হয় এবং শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে সুবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা গড়ে ওঠে। তারপর ক্রমে আধুনিক বাঙলার উৎপত্তি হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলা হয়েছে এবং বাঙলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

গ্রন্থকার বাঙালীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিচার করে বলেছেন বাঙালী সভ্যতা সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং প্রাচীন সুমেরু সংস্কৃতির সঙ্গে তার আত্মীয়তা-সূত্র যতখানি দৃঢ় বৈদিক আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগ সেই অনুপাতে ক্ষীণ। মৌর্য যুগে বাঙালীর সঙ্গে আর্যদের সংযোগ ঘটে এবং গুপ্ত যুগে এই সংযোগ সুদৃঢ় হয়। গ্রন্থকারের মতে বাংলা দেশের কৌলীন্য ব্যবস্থার উদ্ভব গুপ্ত যুগে। এই বিষয়ে এদেশে প্রচলিত মত কিন্তু অন্যরূপ। তবে জাতি-ধর্ম ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগের বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থকার দিয়েছেন। এই শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে

সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে। বিবাহ, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং সেই সঙ্গে ভাষাগত বন্ধনের সামাজিক জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা বর্তমান।

লোক-কথা কোনো বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির দর্পণ নয়, তবে এইসব লোক-কথা, ছড়া ইত্যাদির মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস, আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতরা মনে করেন যে লোক-কথা এবং প্রবাদের মধ্যে জনমানসের প্রতিফলন ঘটে। কোনো ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা এইসব লোককথা বা প্রবাদ গড়ে ওঠে না, একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ই এইসব প্রবাদ, ছড়া, লোক-কথা প্রভৃতির রচনাকার।

গ্রন্থকার তাঁর সমীক্ষায় 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' এই শ্লোকটিকে স্মরণ করে বলেছেন একটি নারী-সমাজের ওপর পারিবারিক শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে। তাই লেখক বঙ্গ-রমণীকুলের সামাজিক মর্যাদা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বিশ্লেষণে বাঙলা দেশের যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন এবং সেই সঙ্গে সর্ব-ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর কথাও মনে রেখেছেন। পৃথিবীর আর সব দেশের মেয়েদের মত বাঙালী মেয়ের জীবনেও যে সেই একই ধরণের প্রেম, প্রীতি, আশা, আশঙ্কা, আকাঙ্ক্ষা, সংসারনিষ্ঠা, স্বামী-পুত্র অন্য পরিজনদের প্রতি আকর্ষণ বর্তমান তার অজস্র প্রমাণ প্রচলিত প্রবাদ, ছড়া ও লোক-কথার মধ্যে বর্তমান। বাঙালী রমণীর জীবন বৈচিত্র্য-হীন নয়।

প্রাচীন কালে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ অসমান অবস্থার প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে নি এবং এই মনোভঙ্গী এদেশের সামাজিক জীবনের এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। এদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই অবস্থা একটা সুদৃঢ় চাপ সৃষ্টি করেছে।

নারীরা সাধারণতঃ রক্ষণশীল মনোবৃত্তির অধিকারিণী। গৃহে নারী সর্বময়ী কর্ত্রী। প্রাচীন শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের স্থান অতিশয় মর্যাদায় এবং সম্মানের। শাস্ত্রে আছে নারীরা যেখানে পূজা পান সেইখানেই দেবতাদের আবাস। স্বামীর সকল কর্মে গৃহিণী বা অর্ধাঙ্গিনী অংশীদার। সস্ত্রীক ধর্ম আচরণ করার নির্দেশ আছে। সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্বামীর মত স্ত্রীরও একটি ভূমিকা আছে। স্ত্রী শক্তি-স্বরূপিণী, তিনিই প্রকৃতি এবং পুরুষের সৃজনীশক্তির উৎস। ভারতীয়রা স্ত্রী-জাতিকে শুধু জীবনের শরিকদার হিসাবে বিবেচনা করে না, স্ত্রী-জাতি মাতৃজাতি। ভারতীয় নারীত্বের চরম বিকাশ মাতৃত্বে। জননী আর জন্মভূমি এদেশে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়।

—গ্রন্থকার নারী-জাতি সংক্রান্ত লোক-কথা, প্রচলিত সংস্কার, বিধি-নিষেধ, বিশ্বাস ও আচার-আচরণ, ব্রত অনুষ্ঠান, লোক-কাহিনী, লোকগাথা, ইত্যাদির মাধ্যমে জননী, বিমাতা, জায়া, কন্যা ভগিনী ইত্যাদির স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রাচীন এবং মৌখিক সাহিত্যে নারী, বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগে নারী, বিবাহ এবং বিবাহ সংক্রান্ত [illegible] নারী, কর্মরত রমণীর সামাজিক অবস্থা, স্বাধীনতা সংগ্রামে রমণীর ভূমিকা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থকার নানাবিধ প্রামাণ্য-গ্রন্থাবলী এবং সেনসাস রিপোর্ট প্রভৃতি সহযোগে বিশ্লেষণ করেছেন।

এছাড়া জীবনধারায় রীতি-নীতি, সৌন্দর্য, ভোজন-রীতি, চোখ, কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রেম, রমণীর শক্তি, লজ্জা, চাঞ্চল্য কৌতূহল, চোখের জল, মুখের হাসি, ইত্যাদি অতি পরিচিত বিষয়গুলি সম্পর্কিত বিবরণগুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

গ্রন্থটিতে অনেকগুলি ছবিও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রায় চারশত পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থে সব রকমের সম্ভাব্য দিক আলোচিত হয়েছে এবং সেখানেই গ্রন্থকারের অসামান কৃতিত্ব। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণায় দীর্ঘদিন নানা বিভাগে কাজ করেছেন এবং 'ফোকলোর' এবং 'হিউম্যান ইভেন্টস' নামক দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন, আলোচ্য গ্রন্থটিতে যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

—অভয়ঙ্কর

A STUDY OF WOMEN OF BENGAL by SANKAR SENGUPTA. Published by Indian Publications 3, British Indian Street, Calcutta-1. Price Rs. Fifty only:

# সাহিত্যের খবর

**অনুবাদের সমস্যা : একটি আলোচনা সভা।।** গত সপ্তাহে লক্ষ্নৌ শহরে অনুবাদের সমস্যা বিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রথমে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে যে ইস্তাহার বিতরণ করা হয়, তা থেকে জানা যায়, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং যেসব বেসরকারী উদ্যোগে অনুবাদ হয়েছে, সাহিত্যকর্ম হিসেবে তার সফলতা বিচার এই সভার উদ্দেশ্য। আলোচনা সভার প্রথম বক্তা রাম বিনায়ক সিংহ ভাষান্তর এবং অনুবাদের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, সাহিত্য অনুবাদকে একই সঙ্গে সাহিত্য এবং ভাষার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী উদ্যোগে যেসব অনুবাদ হয়েছে, তা এই দাবী পূর্ণ করতে পারেনি। কৃষ্ণনারায়ণ কক্কড় বলেন যে, অনুবাদে কেবল শব্দই নয়, মূল ভাষা এবং অনূদিত ভাষায় অনুবাদককে দক্ষ হতে হবে। ঠাকুর প্রসাদ সিংহ এবং অমৃতলাল নাগরও সভায় বিষয়টির উপর আলোচনা করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি হল:— (১) সরকারী উদ্যোগে যেসব অনুবাদ হচ্ছে, তার মান স্থির করার জন্য লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের থেকে একটি উচ্চ পর্যায়ের সমিতি গঠন করতে হবে। (২) বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদকের জন্য সরকারকে পুরস্কার ঘোষণা করতে হবে। (৩) বেসরকারী অনুবাদক সংস্থা বা পত্রপত্রিকাকে সরকারের সাহায্য দিতে হবে।

**নাম্বুদ্রিপদের সাহিত্য পুরস্কার লাভ।।** এবার কেবল সাহিত্য আকাদমির পুরস্কার লাভ করেছেন বিশিষ্ট সি পি এম নেতা ও কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপদ। তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন মালয়ালম ভাষায় তাঁর আত্মজীবনী লিখে। নাম্বুদ্রিপদকে রাজনীতিবিদ হিসেবেই আমাদের জানা ছিল। কিন্তু সাহিত্যেও যে তাঁর অধিকার আছে, এই পুরস্কার প্রাপ্তির ভেতর দিয়ে তা জানা গেল।

**বঙ্গীয় কবি পরিষদের অধিবেশন।।** গত রবিবার, বঙ্গীয় কবি পরিষদের শীতকালীন অধিবেশন ২৪-পরগণার আগড়পাড়া বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দীনেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী হাসিরাশি দেবীকে 'কাব্য সারস্বত' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। সভায় কয়েকজন কবি কবিতা পাঠ করেন। এছাড়া সমরেন্দ্র মৈত্র, রাধানাথ সিংহ ভাষণ দেন। পরিষদের সম্পাদক হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদকীয় বিবরণী পেশ করেন।

**টলস্টয় স্মরণ।।** প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক টলস্টয়ের ৬০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সম্প্রতি মস্কোতে একটি সুন্দর

সাহিত্য সভা আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে টলস্টয়ের উপর একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসলাহুদ্দীন। তিনি বলেন—'ধনিক টলস্টয় উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবু তিনি তাঁর শ্রেণীর নির্মম সমালোচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্বহারার জীবন যাপন করেন। তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।' প্রখ্যাত তামিল লেখক শ্রীঅখিলান টলস্টয়ের গল্প এবং উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে বলেন—'টলস্টয় বিশ্বসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছেন।' শ্রী টি এম সি রঘুনাথন বলেন—'আমি যখন সবে লিখতে আরম্ভ করি, তখনই টলস্টয়ের দ্বারা প্রভাবিত হই। প্রখ্যাত তামিল লেখক ভারতীও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।' জি গস্তারিন, এমন-পি শিভগ্নানম প্রমুখও সভায় ভাষণ দেন।

**পুস্তক প্রদর্শনী।।** গত ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর রাঁচির কেশব হলে রুশ গ্রন্থের একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হল। হাজারিবাগ ডিস্ট্রিক্টসমালিটির চেয়ারম্যান ডঃ এস এন রায় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে প্রায় চার হাজার বই প্রদর্শিত হয়েছে। কয়েকদিন আগে পাতিয়ালাতেও অনুরূপ একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ কৃপাল সিং নারাং এর উদ্বোধন করেন। ডঃ এইচ কে মনমোহন সিং, এস সুরজিৎ শেঠি, এস হুকুম সিং প্রমুখও এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। প্রদর্শনীটি চারদিন সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে।

**সেফেরিসের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ।।** জর্জ সেফেরিসের কবিতার কিছু কিছু অনুবাদ ইংরেজিতে এর আগেও প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি 'থ্রি সেক্রেট পোয়েমস' নামে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি অনূদিত গ্রন্থ বেরিয়েছে। মূল গ্রীক থেকে অনুবাদ করেছেন কাইজার ও পল মার্চেন্ট। প্রখ্যাত সমালোচক কিমন ফ্রাইয়ার বইটি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আলোচ্য অনুবাদে সেফেরিসকে সবচেয়ে বেশি চেনা যায়। অনুবাদকদের কৃতিত্ব এখানে যে তাঁরা মূলের শব্দ, ছন্দ ইত্যাদিকেও ইংরেজিতে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, অনুবাদ ত্রুটিহীন। তবে এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনুবাদে একটা স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়।

**পার্শিয়ান সাহিত্য সম্পর্কে।।** পার্শিয়ান সাহিত্যের উপর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে। রইবেন লেভী লিখিত এই বইটির নাম 'এ্যান ইনট্রোডাকসন টু পার্শিয়ান লিটারেচার'। ইউনেসকো বইটিকে সম্মানিত করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে পার্শী সাহিত্য সম্বন্ধে বিদেশীদের জানাবার পক্ষে এটি খুবই মূল্যবান। প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে দেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয়। এর পরবর্তী পরিচ্ছেদে পার্শিয়ান কবিতার গতি-প্রকৃতি এবং তারপর বিশিষ্ট লেখকদের উপর আলোচনা। এরকম একটি বই রচনার জন্য গ্রন্থকার যে সকলের অভিনন্দন লাভ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

চার্বাক

# নতুন বই

**বালজাক** (জীবনী)—যজ্ঞেশ্বর রায়। প্রকাশ ভবন। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

**বালজাক মারা গেছেন ১৮৫০ খৃঃ।** আজও তাঁর বই নানান দেশের ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশ হয়ে থাকে। বিশ্বসাহিত্যের এই অবিস্মরণীয় পুরুষ আজও পরম-শ্রদ্ধেয়। বালজাকের জীবন যেমন অস্থির, ফেনাময়, সমগ্র সৃষ্টিতেও পড়েছে তেমনি তাঁর যুগের ছায়া। সামন্ততন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থার নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে হৃতসর্বস্ব মানুষের যে দুর্বিষহ জীবন, তার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। অকল্পনীয় উচ্চাশা, অভিজাত সমাজে স্থান পাওয়ার প্রলোভন, ঐশ্বর্য-প্রিয়তার সংগে সংগে উচ্ছৃংখল জীবনাচরণ বালজাকের পরিণতিকে যে কি ভয়ংকর করে তুলেছিল, তাও একটি সার্থক উপন্যাসের মতই আকর্ষণীয়। বালজাক ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। কার্লমার্কস বলেছেন, ধনবৈষম্যের রাষ্ট্র ও পরাশ্রয়ী অভিজাত সমাজের অনিবার্য অবক্ষয় বালজাকের আগে এমন স্বচ্ছ চোখে আর কেউ দেখাতে পারেন নি। এ অবক্ষয়ের মূল লোভার হেতু কী তাঁর আগে তার এমন নিপুণ বিশ্লেষণও কেউ উপস্থাপিত করেন নি। এঙ্গেলস বলেছেন, 'আমি পেশাদার ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, পরিসংখ্যানবিদ প্রভৃতির বহু মূল্যবান রচনা অনেকবার করে পড়েছি। কিন্তু এঁদের কাছ থেকে আমি যা শিখেছি তার থেকে ঢের ঢের বেশী শিখেছি বালজাকের উপন্যাস পড়ে। বালজাক তাঁর রচিত চরিত্রাবলীর মারফত যেন এক বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করে গেছেন। ইতিহাস রাজনীতি ধর্ম দর্শন—সব মিলে এক নতুন জগত যেন তিনি গড়ে তুলেছেন। এই দরদী কথাশিল্পী নিজস্ব দর্শনের আলোয় দেখেছিলেন জটিল পৃথিবীকে।' তাইন লিখছেন, 'তাঁর বই পড়তে পড়তে কষ্টের শব্দ উচ্চারণ করবে না এমন মানুষ কম। তাঁর রচনারীতি অতি ভাবভারাক্রান্ত এক জটিল শিল্প-শৈলী। সেখানে চিন্তাগুলি বারংবার পরস্পরের সংগে জট পাকিয়ে গেছে, নানা ভাবনার ভীড়ের মধ্যে তারা ক্রমাগত আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে...। তবু তারই মধ্যে থেকে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে অসংখ্য চরিত্র। জীবনে আমরা হামেশা যাদের মুখোমুখি হই, ওইসব চরিত্রের ঘৃণা হিংসা ধিক্কার বিকৃতি ও ক্ষুধা তাদের চেয়েও অনেক বেশী বাঙ্ময় ও বলিষ্ঠ। এই সব চরিত্রের অধিকাংশই নামে মানুষ, জাতে কীট-পতঙ্গ। তারা কেউ বীভৎস উকুন, কেউ বিষাক্ত বোলতা, কেউ হিংস্র মাকড়। সভ্যতার আস্তাকুঁড়ে তাদের জন্ম, সেখানেই তারা বাঁচছে, বাড়ছে—খুঁজছে, ছিঁড়ছে, গিলছে, চিবি করছে। আর সেই সব কিছুর উর্ধ্বে স্বর্ণ, শক্তি, শিল্প বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যের ষড়যন্ত্রে উন্মোলিত হয়েছে আর এক বিষন্ন দুঃস্বপ্নের আশ্চর্য এক রূপকথার দেশ।" সেই রূপকথার দেশ আজও মন টানে পাঠকের। আজ বালজাকের পথ ধরে ফরাসী সাহিত্যের আঙিনায় শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যে চলেছে পরীক্ষা নিরীক্ষা। কুশলী কথাশিল্পী বালজাক তাঁর ক্ষুব্ধ হৃদয়ের আকুল ভাষায় যে ইতিহাসকে জীবন্ত করে গেছেন আজও চলেছে তার বিশ্লেষণ।

বালজাকের জীবনকথা, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতিটি পর্বের সংগে জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। সেই জীবনের আলেখ্য তুলে ধরেছেন শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়। সমাজের অবক্ষয়কে ভিত্তি করে সৎসাহিত্যের নামে নোংরামি পরিবেশন আজ যেখানে আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময়ে শ্রীরায় এমন একজন মানুষের জীবনকথা রচনা করলেন, যিনি ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতাকে অবলম্বন করে সার্থক শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্রীরায়ের বইটি সমাদর পাওয়ার যোগ্য। তাঁর ভাষা মনোজ্ঞ, রচনাভঙ্গি গতিশীল। বইটি পড়তে পড়তে লেখক বালজাককে যেমন চেনা যায়, তেমনি চেনা যায় মানুষ বালজাককে। এবং সেইসংগেই স্পষ্ট অনুভব করা যায় তাঁর সময়কেও। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

**থামো, সুন্দর মুহূর্ত** (কাব্যগ্রন্থ)—শান্তিকুমার ঘোষ। বিন্যাস, ২৮।১ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা—১৯। দু টাকা।

কবিতা বেশী না লিখলেও শান্তিকুমার ঘোষ শান্ত মেজাজের ভাবগম্ভীর কবি। কখনো তাঁকে সোরগোল করতে দেখা যায় নি। আবার কখনো অনুপস্থিতও মনে হয় নি কবিতার আসরে। এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই তিনি পাঠককে আকর্ষণ করেন নিজের দিকে। কথা বলেন আত্মগত সুরে।

এই সঙ্কলনের প্রথম কবিতা 'প্রণয়রী চলে গেল'—যেন স্বপ্নাতুর কোনো প্রেমিকের উচ্চারণ। পাঠককে আবিষ্ট করেন তিনি অনায়াসে। যখন বলেন : 'বিস্ময়ের ঢেউ তুলে প্রণয়ী গেল কালের বন্যায়'— তখনও কানে বাজে আরেকটি পংক্তি : 'এই গ্রহ থেকে ওই উপগ্রহে ডানায় ডানায় শুনি আকাশ-বিহার।'

মোট ত্রিশটি কবিতা উপহার দিয়েছেন তিনি এই গ্রন্থে। চিত্রকল্পবহুল প্রতিটি কবিতাই যেন স্পর্শকাতর, স্বল্পবাক একটি মানুষের নানামুখী অভিব্যক্তি ও আত্ম-সম্প্রসারণ। দু-একটি কবিতা হাল্কা ছন্দের আশ্রয়ে কিছুটা লঘুতার স্বাদ এনেছে।

সম্ভবত 'থামো, সুন্দর মুহূর্ত' শান্তিকুমার ঘোষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম বই বেরুবার প্রায় এক দশক পরে এই সঙ্কলনটি বেরোল মনে হয়। বইটি হাতে পেয়ে বাংলা কবিতার পাঠক তাঁকে একজন শক্তিমান কবি হিসেবে চিনে নিতে পারবেন।

**একটি শিশিরবিন্দু** (কাব্যগ্রন্থ)—সত্যব্রত রায়। কণ্ঠস্বর, ৯৩।২এ বিধান সরণী, কলকাতা ৪। তিন টাকা।

কবিতার প্রাণশক্তি কোথায় নিহিত? তার উৎস সন্ধানে সমালোচক তৎপরতা দেখান, কবি ভ্রূক্ষেপ করেন না। হয়তো এটাই সার্থক কবির লক্ষণ। সার্থক সমালোচকেরও। একজন সৃজনশীল, অন্যজন পর্যবেক্ষণরত। কবি সত্যব্রত রায় অতি-সাম্প্রতিকের যন্ত্রণায় পীড়িত হলেও সন্তোষ এবং সান্ত্বনা চেয়েছেন অতীতের কাছ থেকে। নবজন্মের আকাঙ্ক্ষায় তিনি বলেন : "অভিজ্ঞানে ছবি এঁকে মৌন প্রতীক্ষায়/খুঁজি এক বেহুলাকে—যে আমাকে নবজন্ম দেবে।" এই সঙ্কলনের একত্রিশটি কবিতায় কবি এমনসব উপমা ও চিত্রকল্প উপহার দিয়েছেন, যা পাঠককে মুগ্ধ করে।

### সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

**এবং** : (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি সংখ্যা)—ডিসেম্বর, ১৯৭০। সম্পাদক অমিয় সিংহ ও গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩-এক, সর্বজ্ঞানানন্দ লেন, কলকাতা—২৭। মূল্য এক টাকা।

'এবং' পত্রিকাটি রচনা-সৌষ্ঠবে ইতিমধ্যেই প্রশংসা অর্জন করেছে—বর্তমান সংখ্যাটি পরলোকগত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিরঞ্জিত। ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, উষা ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দিব্যেশ দাস, শান্তনু দাস, নির্মলেন্দু গৌতম, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় সিংহ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। দায় সারা মামুলী ধরণের আলোচনায় পত্রিকাটিকে না সাজিয়ে সম্পাদক দুজন বিশেষ ধরণের রচনায় 'এবং'কে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তার জন্য তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য। এই সংখ্যায় একটি মাত্র কবিতা 'সর্বরসের পরায়ণ, নামটিও তার নারায়ণ' লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সাহিত্যপত্র হিসাবে 'এবং' স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

# বঙ্কিমচন্দ্র। নতুন বিশ্লেষণ

উনিশ শতকের ভারতীয় লেখকদের মধ্যে সোভিয়েতের মানুষের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই সবচেয়ে বেশী পরিচিত। রুশ পাঠক-পাঠিকারা তাঁকে প্রথম আবিষ্কার করে ১৯২০ খৃঃ। সে-সময়ে 'তোস্তোক' নামক একটি পত্রিকায় 'বন্দে-মাতরম' প্রকাশিত হয়েছিল। আর বাংলা থেকে তা রুশভাষায় অনুবাদ করেছিলেন বিখ্যাত রুশ ভারততত্ত্ববিদ মিখাইল তুবিয়ান্সকি। তাতে অনুবাদকের একটি ভূমিকাও ছিল। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলো রুশভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে আছে 'রাজসিংহ', 'চন্দ্রশেখর', ('সাহেব আসছে' এই নামে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়) 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল।' আর অনূদিত হয় ছোটগল্প 'রাধারাণী' এবং 'ইন্দিরা।' তাছাড়া শ্লেষাত্মক রচনা সংগ্রহ 'কমলাকান্তের দপ্তর'ও অনূদিত হয়। এই রচনা অন্য কোনো ভাষায় আগে কখনো অনূদিত হয়নি। কোনো ভারতীয় ভাষায়ও হয় নি। তার কারণ এই লেখা অনুবাদ করা খুবই কষ্টসাধ্য। এতে ভাষার এমন অপূর্ব কলাকৌশল আছে যা অনুবাদে আনা খুব শক্ত। রুশ অনুবাদক বরিস কারপুশাবিনই প্রথম এই কঠিন কাজে হাত দিলেন এবং এই রচনার সমস্ত ব্যঙ্গ শ্লেষ এবং ভাষার আশ্চর্য শিল্পকে অনুবাদে রূপায়িত করে তুললেন।

বাংলা দেশের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও রচনা সম্পর্কে ভেরা নোভিকোভা যে গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করেছেন তা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকখানি বাড়ায়। এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের সাহিত্যিক জীবন কি রকম ছিল, সে সম্পর্কেও এক গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। লেখিকা লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার কাজে রত। সেজন্য তাঁর খ্যাতিও সামান্য নয়। এবং এই গবেষণার কাজে তিনি বহু বছর কঠিন পরিশ্রম করেছেন। বহুদিন আগে, ১৯৫০ সালে, 'বঙ্কিমচন্দ্র'কেই তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি বেছে নেন। এই গবেষণা-গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি মহাফেজখানার নানা দলিলপত্র এবং পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালায় (১), এশিয়াটিক সোসাইটিতে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন পাঠাগারে এবং সংগ্রহশালাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর যেসব দুর্লভ সংস্করণ রক্ষিত আছে, সেইসব প্রাচীন সংস্করণগুলিও তিনি পাঠ করেছেন। তার মধ্যে এমন সংস্করণও আছে যা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হয়েছিল। সেইজন্য এই বিশ্লেষণ নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক হয়ে উঠেছে। একজন অসামান্য লেখক এবং গণতান্ত্রিক মানুষ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে রুশ পাঠকদের কাছে উপস্থিত করে এবং তাঁর রচনাবলীর সাধারণ বিশ্লেষণ করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান নিরূপণেই ভেরা নোভিকোভা ক্ষান্ত হননি। তিনি উনিশ শতকের মধ্য এবং শেষ ভাগের সামাজিক এবং সাহিত্যিক পটভূমিকে চোখের সামনে তুলে ধরেছেন এবং লেখকের রচনার সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যের যোগসূত্রে

আবিষ্কার করেছেন। ('জাগরণ', 'দীনবন্ধু মিত্র', 'সংবাদদাতা', 'বঙ্গদর্শন' এবং 'প্রথম বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক' প্রভৃতি পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

বঙ্কিমচন্দ্রের (২) জীবনদর্শনের জটিল প্রশ্নটিও ভেরা নোভিকোভা এড়িয়ে যান নি। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় অন্বেষারও পর্যালোচনা করেছেন। কি করে জাতি এবং শ্রেণী বিভাগের অবসান ঘটানো যায় তাঁর অন্বেষা সেই সমস্যার সমাধানের পথ সন্ধান করেছে। আর সে পথ তিনি খুঁজেছেন হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনের মধ্যে। ভাগবতগীতার একটা নতুন ধর্মীয় ও দার্শনিক ব্যাখ্যার মধ্যে এবং একদের ভিত্তিতে একটা নতুন ধর্ম, নব হিন্দুধর্ম সৃষ্টির মধ্যে। সে 'ধর্ম' হবে দেশপ্রেমের ধর্ম, দেশকে ভালবাসার ধর্ম।' বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে ভেরা নোভিকোভা দেখিয়েছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিশেষ অবস্থায় জনগণের সামাজিক এবং জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ধর্ম একটি কার্যকর অস্ত্র বলে মনে হয়েছিল। তখনও মধ্যযুগীয় অবস্থার অবসান ঘটেনি। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের সুরুর দিকে বহু ভারতীয় পাতি বুর্জোয়া দেশপ্রেমিক এবং গণতান্ত্রবাদী এই চিন্তাধারায়ই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ভেরা নোভিকোভার বইটিতে তিনটি প্রবন্ধ আছে: 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (জীবনী ও তৎসংক্রান্ত টিকা), 'বংগদর্শনে'র সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র' এবং ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্র)।'

পূর্ববর্তী যেসব বাঙ্গালী এবং বিদেশী সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই শিক্ষক, গণতন্ত্রবাদী এবং দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রকে উপেক্ষা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণার এই অভাবের দিকটা ভেরা নোভিকোভা প্রবন্ধকার ও প্রকাশক বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধে পূরণ করেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শিক্ষক, প্রচারক এবং সম্পাদক হিসেবে তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রভাব তাঁর সময়ের বাংলা দেশের সাহিত্যিক এবং সামাজিক জীবনের উপর প্রচণ্ডভাবে পড়েছিল। এবং এই প্রভাব ভারতের জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। বইটির এই অংশ পাঠ করলে একটি প্রতিভাবান মানুষের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একজন অনুপ্রাণিত মানুষের ছবি ভেসে ওঠে। তিনি বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তিনি ফরাসী শিক্ষা এবং ইউরোপীয় ভাববাদী সমাজবাদের বীজ প্রথম বাংলা দেশের মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একজন অসাধারণ সমালোচক, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয়ের জ্ঞানসম্পন্ন একজন বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞ, দেশের একজন পণ্ডিত ঐতিহাসিক এবং একজন জননেতা যাঁর প্রবন্ধাবলীর বিষয়বস্তু ছিল দেশের সমসাময়িক সমস্যা (কৃষকদের অবস্থা, নারীজীবনের দুর্গতি, জাতীয় সম্পদের বন্টন, শিক্ষার সমস্যা, বেকারী ইত্যাদি বিষয়ে)।

ভেরা নোভিকোভা তাঁর গবেষণা-গ্রন্থের অনেকটা জায়গা জুড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর পর্যালোচনা করেছেন। এই উপন্যাসগুলো শুধু যে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ তা নয়, এই উপন্যাসগুলো জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণাস্থলও। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংগ্রামের কাহিনী ঐসব উপন্যাসে উপস্থিত করা হয়েছে। এবং তাতে জ্বলন্তভাবে যেন দেশের বীরত্বপূর্ণ অতীতের সংগে পরাধীন অপমানকর বর্তমানের তুলনামূলক রূপ ফুটে উঠেছে। আর এভাবেই স্বদেশবাসীর মনে তিনি দেশাত্মবোধ ও জাতীয়-চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিতরা এইসব উপন্যাসের মূল্যায়ন সম্পর্কে আজও একমত নন। সুকুমার সেন, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। কিন্তু ভেরা নোভিকোভা তাঁদের সংগে একমত নন। পক্ষান্তরে তিনি জোর দিয়ে এটা বলতে চেয়েছেন যে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তার নিজস্ব ধারণা তৈরি করেছিলেন আর তা তৈরি হয়েছিল ইউরোপের রোমান্টিক উপন্যাস লেখকদের রচনা পাঠ করে (যেমন ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস)।

'রাজসিংহ', 'আনন্দ মঠ', 'মৃণালিনী' 'চন্দ্রশেখর' এবং অন্যান্য উপন্যাস বিশ্লেষণ করে নোভিকোভা দেখিয়েছেন যে অতীতের যেসব ঘটনাবলী ইতিহাসে স্থান পেয়েছে সেই ইতিহাস রচনার মধ্যে কোন শিক্ষার ব্যাপার নেই কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের উপাদানকে ব্যবহার করেছিলেন গভীর অনুভূতি মিশিয়ে এবং একজন খাঁটি শিল্পীর মত অতীতের বিস্মৃত অথবা বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাবলীকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। নোভিকোভা আবার এটাও দেখিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত প্রাচীন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তারা যে শুধু শিল্পসম্মত তাই নয়, লেখক সমকালের মনস্তত্ত্বকে সেসব চরিত্রে প্রয়োগ করেছেন, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অদল-বদল করেছেন এবং সেই সমস্ত ঘটনাবলীর পরম্পরা রক্ষা করেননি। নোভিকোভা 'রাজসিংহ' এবং 'আনন্দ মঠ' বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র এমন করেছিলেন শিল্পসম্মত এবং দেশপ্রেমিক ভাবধারাকে আরো সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে।

প্রবন্ধ লেখিকা অনেক জটিল এবং কঠিন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। প্রাচ্য সাহিত্যের সেসব সমস্যার এখনও কোন সমাধান হয়নি। আর তা হল লেখকের শিল্প পদ্ধতির সংগে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সম্বন্ধের সমন্বয়।

ভেরা নোভিকোভা উপসংহারে বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি ঐতিহাসিক বাস্তবকে নিজের মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলেন। তিনি যেভাবে ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করেন, নায়কদের চরিত্র কাব্যমণ্ডিত করেন, তার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রগতিশীল রোমান্টিক লেখকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

—ইলেনা আজতুরিভ

---

(১) লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিষয়ক গ্রন্থাগারে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত তার রচনাবলীর একটি সংকলন রক্ষিত আছে। একদা এই সংকলনটির মালিক ছিলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট রুশ ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ইভান মিনায়েভ। গ্রন্থে লেখকের হস্তাক্ষর দেখে মনে হয় যে অধ্যাপক মিনায়েভ যখন ১৮৭০ এবং ১৮৮০ সালে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, লেখকের সংগে তখন তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। চোখের সামনে তুলে ধরেছেন এবং লেখকের রচনার সংগে প্রাচীন ঐতিহ্যের যোগসূত্র আবিষ্কার করেছেন। ('জাগরণ', 'দীনবন্ধু' মিত্র', 'সংবাদদাতা', 'বঙ্গদর্শন' এবং 'প্রথম বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক' প্রভৃতি পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

(২) 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর সুরুর দিকে বাংলা দেশের সামাজিক চিন্তা' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে ভারততত্ত্ববিদ এরিক কোমারোভ বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার পর্যালোচনা করেছেন (ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের অবদান বিষয়ে ১৯৫৮ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্র) এবং ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ পত্রিকায় প্রকাশিত এলিজাভেতা পারেভস্কিয়ার 'বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামত' প্রবন্ধ।

# বইকুণ্ঠের খাতা

## গবেষণার অতীত-বর্তমান

'গবেষণা' বস্তুটি ইদানীং অনেক সহজ, অথচ এককালে তা ছিল না। ছিল অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের অবিরল আগ্রহ। আশু প্রাপ্তির কোনো আশা না রেখেই আগেকার দিনের সাহিত্যপ্রাণ মানুষেরা একেকটি বিষয়ের পেছনে নিজেদের নিযুক্ত রাখতে পারতেন দীর্ঘকাল। তাঁদের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, একালীন অনেক গবেষক সম্পর্কে অনীহা জাগে। কেন, কি কারণে যে তাঁরা ডক্টরেট পান—তাই বা কে বলবে? তাঁদের পাশা-পাশি আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন কিম্বা আচার্য যদুনাথ সরকারের নাম করতে গেলে কেমন যেন কষ্ট হয়। কেউবা ইংরেজীর লোক হয়ে ইতিহাসের চর্চা করেছেন, কেউবা প্রাচীন কিম্বা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের। তাঁদের সামনে ডিগ্রী-ডিপ্লোমার প্রলোভন তো নয়ই, ডক্টরেটের অদৃশ্য হাতছানিটিও ছিল না।

অর্থাৎ সেকালে ছিল নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের ইচ্ছা, যা আজকের দিনে একান্তই দুর্লভ। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না হওয়া পর্যন্ত কখনো কেউ হঠাৎ করে কিছু লিখতে বসতেন না। এই তো সেদিন ক্ষুদিরাম দাস যখন 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' লিখছিলেন, তখন তাঁর সামনে ডি-ফিল, ডি-লিট-এর আমন্ত্রণ ছিল না বলেই মনে হয়, সে বই হাতে পেয়ে অনেকের কাছে একটি 'গবেষণা গ্রন্থ' বলেই মনে হয়েছিল।

এখন অভিযোগটা দীর্ঘস্থায়ী আক্ষেপ-এর চেহারা নিচ্ছে। ভয় হয়, কেউ না কুৎসা রটাবার দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করে বসেন। প্রায়শ দেখতে পাচ্ছি একেকটা গবেষণা গ্রন্থ বেরুচ্ছে আর বাংলা সাহিত্যের পাঠক ততোধিক বিমুখতায় সে সব বই সম্পর্কে অনাগ্রহী হয়ে পড়ছেন। নতুন কিছু পাবার জন্যে যে-পাঠক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাঁদের দাবীটাকে তো একেবারে উপেক্ষা করা চলে না! উপেক্ষা করলেই-বা কেমন করে?

সেদিন জনৈক তরুণ অধ্যাপক ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন : 'তথ্যসঞ্চয় ছাড়া যে গবেষকের আর কিছু করণীয় আছে, তা বোধহয় আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিখে আসতে পারি নি, পারছি না। গতকালের বিষয়কে যে বর্তমানের আলোকে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে, নতুন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া দরকার—সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি গবেষকেরা। নতুন চিন্তাকে অভ্যর্থনা জানাবার মতো মানুষও যেন কমে যাচ্ছে।'

অভিযোগ করে তিনি বললেন : 'এজন্যে দায়ী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দিকে দেখুন, চাকুরী ক্ষেত্রে সকল শিক্ষকেরা ওখানে অধ্যাপনা করেন, কিন্তু ব্যবস্থার অদল-বদলে প্রায় সকলেই গররাজী—চিন্তা-ভাবনায় একেবারে অচল অনড়। রবীন্দ্র-নাথের শেষ কয়েক বছর ও সত্যতার সঙ্কট নিয়ে যদি কেউ গবেষণা করতে চান, তা হলেই অনেকে ঘাবড়ে যাবেন। আধুনিক কবিতা কিম্বা ছোট গল্প নিয়ে তো ওঁরা মহাফাপড়েই পড়বেন। যদি-বা কোনো অধ্যাপক এসব বিষয় নিয়ে গবেষণার অনুমতি দেনও, তাহলেও তাঁর রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূল না হলে সেই থিসিস-এ কেউ ডক্টরেট পাবেন—এমন কথা কোনো গবেষক ভাবতে পারেন না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মোটা থামওয়ালা বাড়ীগুলি ভেঙে গেছে, কেবল তার স্মৃতি বয়ে অনড় থাকতে হবে তরুণতম অধ্যাপকদেরও।'

আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারি নি। একেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ অধ্যাপকদের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা নতুন চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত বলেই জানি। কেবল ইউনিভার্সিটির দোষ দিয়ে এ সমস্যার প্রতিকার হবে বলে মনে হয় না, নিজেদের জড়ত্বকেও সঙ্গে সঙ্গে ঘোচাতে হবে। সতীনাথ ভাদুড়ী কবে মারা গেছেন, তবু তাঁর ওপরে গবেষণা করার মতো একজন তরুণের আবির্ভাব হলো না। রমেশ সেন, জগদীশ গুপ্তের ছোট গল্প নিয়ে কি আজও কেউ থিসিস করেছেন, না, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরেই তেমন কোনো গবেষণা হয়েছে? জানি, হওয়া দরকার বললেই হয় না, গবেষণা গ্রন্থটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও গবেষককে ভাবতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় রেফারেন্স বই হিসেবে স্থান পাবে কিনা তাই নিয়ে মনে-মনে অঙ্ক কষতে হয়।

যাঁরা এই সব অসুবিধা এবং প্রলোভনকে জয় করতে পারেন, তাঁরা শুধু পাঠকের কাছ থেকেই প্রশংসা পান না, অর্জিতপ্রজ্ঞা সত্যকে জানতে পেরে নিজেরাও তৃপ্তি পান। তাতে সাহিত্যেরও কিছু কাজ হয়। আবিষ্কারের আনন্দটা তাঁদের অবশ্যপ্রাপ্য।

### হিমাংশুভূষণ সরকার ও রবীন্দ্রনাথ

তেমনি একজন মানুষ হিমাংশুভূষণ সরকার, যিনি প্রায় সারা জীবন নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পেরেছেন ভারত ও বহির্ভারতে ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুসন্ধানে। আজ থেকে বহুকাল আগে, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তিনি একটি বিস্তৃত গবেষণামূলক বই লিখেছিলেন—'ইণ্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্সেস অন দি লিটারেচার অব জাভা অ্যাণ্ড বলি' নামে। রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে তাঁকে লিখেছেন :

'পশ্চিম ভারতে ভ্রমণে বেরোবার মুখে তোমার 'ইণ্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্সেস অন দি লিটারেচার অব জাভা অ্যাণ্ড বলি' নামক বইখানি পেয়ে রাস্তায় যেতে-যেতে পড়েছিলুম। অনেক কাল থেকেই এই রকম বইয়ের জন্যে অপেক্ষা করেছি। অবশেষে এখানি পেয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হলো। এতে যে বহুবিস্তৃত গবেষণার পরিচয় পেয়েছি তা আমাদের দেশে দুর্লভ। এই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আলোচনায়

কল্যাণীয়েষু

ইতিমধ্যে পশ্চিমভারতে ভ্রমণে বেরোবার মুখে তোমার "Indian influences on the Literature of Java and Bali" নামক বইখানি পেয়ে রাস্তায় যেতে যেতে পড়েছিলুম। অনেককাল থেকেই এই রকম বইয়ের জন্যে অপেক্ষা করেছি, অবশেষে এখানি পেয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হোলো। এতে যে বহুবিস্তৃত গবেষণার পরিচয় পেয়েছি তা আমাদের দেশে দুর্লভ। এই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আলোচনার সুযোগ দাবী করবার অধিকার তুমি প্রমাণ করেছ। ইতি ১১।৩।৩৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

[illegible] বাণী [illegible] অধিকার তুমি প্রমাণ করেছো।'

[illegible] পড়ে, রবীন্দ্রনাথের এমনি আরো বিস্তর উদ্ধৃতি [illegible]। আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা কাব্যের ইতিহাস' পড়েও তিনি খুশি হয়েছিলেন, লেখককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের বহু-মুখীতার দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক, নতুনতর চিন্তার দিকে নজর। যেন সাহিত্য ও সমালোচনার অস্পৃশ্য দেয়ালগুলি তিনি খুলে দিতে চেয়েছিলেন এবং কেউ সে কাজে অগ্রসর হলে তিনি খুশি হতেন।

ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ, গল্প-কবিতা-উপন্যাস লেখার ফাঁকে-ফাঁকে, সৃজনশীল সাহিত্যের সমান্তরাল বলে ভাবতে চেয়েছিলেন এই সব মহৎ কর্তব্যকে। একটি ভাষাকে অপুষ্টি ও রুগ্নতার হাত থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন লোকসাহিত্যের পুনরুদ্ধারে, প্রাচীন ছড়া-গান-রূপকথা-উপকথার সংগ্রহে নানাজনকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন শিশুসাহিত্যের অসাধারণ বইগুলি। রূপকথা ও উপকথার স্বাভাবিক সারল্যকে বজায় রাখার জন্য বুড়ো-বুড়ী ও গ্রাম্য মহিলাদের শ্বারস্থ হয়েছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুর মা'র ঝুলি' সেজন্যেই তাঁর ভালো লেগেছিল। সাহিত্য পরিষদের মারফতেও তিনি সে চেষ্টাই করেছিলেন। আজকের দিনের কোনো কবি-সাহিত্যিকের কি এই দায়িত্ব-বোধ আছে, না, তাঁরা বর্তমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হতে পারেন?

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশিষ্ট ছিলেন না, মহৎ এবং ব্যাপ্ত ছিলেন। হিমাংশু-বাবুর বইটি হাতে পেয়ে সেজন্যেই তিনি, বিস্মিত না হয়ে পারেন নি, আলোচনার যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। হিমাংশুবাবুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন এমন এক নিরলস গবেষককে, যিনি কেবল অতীতের ঐশ্বর্যে মুগ্ধ নন, সাহিত্যের দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন একটিমাত্র গ্রন্থ লিখে। এর আগে বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে আর কোন বই লেখা হয় নি। পরেও, তাই হয়ে রইল অনন্য এবং অদ্বিতীয়। বইটি বের করেছিল, 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি' বা বৃহত্তর ভারত-পরিষদ।

হিমাংশুবাবু দুঃখ করে লিখেছেন : 'এই বিষয়ে গভীরতর মৌলিক গবেষণার পথ যেন ক্রমশ সঙ্কুচিত হইতেছে।—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-কয়টি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা স্বাধীনোত্তর যুগে নির্মমভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। অথচ একদিন এই অঞ্চলের সঙ্গেই না আমাদের প্রাণের নিবিড়তম বাখিবন্ধন হইয়াছিল।'

[illegible] বিষয়ের [illegible] আকর্ষণ [illegible] আসক্তিই তাঁর এই আক্ষেপের কারণ। ভারতের মতো দরিদ্র দেশের কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা, জানি না। তবে বাংলা কিম্বা ইংরেজী ভাষায় অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখতে পারলে সাধারণ পাঠকও উৎসাহিত হতেন। ইউরোপ-আমেরিকা এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছে রাজনৈতিক কারণে।

কিন্তু কে এই হিমাংশুভূষণ সরকার? কী তাঁর পরিচয়?

সাধারণ পাঠক তাঁকে জানেন না, বিশিষ্টরা চেনেন। ১৯০৫ খৃঃ তাঁর জন্ম, ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ইতিহাসে এম-এ পাশ করেছেন প্রথম শ্রেণীতে। একেবারে আচার্য যদুনাথ সরকারের বিপরীত। যদুনাথ সরকার এম-এ পাশ করেছিলেন ইংরেজীতে, চর্চা করেছেন ইতিহাস। আর হিমাংশুবাবু ইতিহাসের ছাত্র হয়েও তাঁর গবেষণার বিষয় হলো সাহিত্য এবং সংস্কৃতি। ১৯৪২ থেকে ৪৯ খৃঃ অবধি তিনি মাণিকগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তারপর থেকে কাজ করে আসছেন খড়গপুর কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে। ১৯৬৪ খৃঃ অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের আন্ত-র্জাতিক কংগ্রেসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শাখা-সম্পাদক হিসাবে যোগদান। তাঁর লেখা পঞ্চাশটিরও বেশী বই ও প্রবন্ধ ভারত ও ইউরোপ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

**দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য**

'দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য' হিমাংশুভূষণ সরকারের অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য বই, বোধহয় শেষতম দীর্ঘ রচনা। 'ইণ্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্সেস অন দি লিটারেচার অব জাভা অ্যাণ্ড বালি'র আন্তর্জাতিক সমাদর, সম্ভবত তাঁকে এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ উৎসাহ জুগিয়েছে।

এ ছাড়া আছে অন্য একটি কারণ।

তিনি লিখেছেন : 'প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন যব-দ্বীপীয় ও মালয় ভাষায় অধ্যাপক ডঃ হুইকাশ আমাকে ইংরেজী গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই অনুরোধের পট-ভূমিকায় ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহের প্রতি গভর্নমেন্টের সাম্প্রতিক উৎসাহের কথা স্মরণ করিয়া এই গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় লিখিয়াছিলাম।'

তবু এ বই তাঁর ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ নয়, সারসংযোগও নয়, পুরনো উপাদান ও নতুন গবেষণার ভিত্তিতে লেখা সম্পূর্ণ নতুন বই। এই সময়ের মধ্যে তাঁর ইংরেজী বইটিরও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কথা। কিন্তু অন্য বিষয়ে লেখালেখি নিয়ে [illegible] থাকায় ইংরেজী বইটি বেরুতে পারে নি।

[illegible] পৃথিবীর ছাত্রছাত্রীরা যে বইয়ের ওপর নির্ভর করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে চিনেছেন, রবীন্দ্রনাথ যে-বইয়ের [illegible] পাঠক হিসেবে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, তার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুলো না [illegible] পরেও? বিচিত্র এই দেশে বসে প্রায় পঁচিশ বছর গবেষণা করেছেন দ্বীপময় ভারতের সাহিত্য সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন : 'এই গ্রন্থে আমার ৩৫ বৎসরের গবেষণার ফল লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। দ্বীপময় ভারতের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সুদীর্ঘকালে যে গবেষণা বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় হইয়াছে, তাহার আধুনিকতম পরিচয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।'

একটি কথা বলা প্রয়োজন। বইটি লেখায় প্রধান প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রমণসঙ্গী ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে। কিন্তু বৃহত্তম ভারত সম্বন্ধে পঠন-পাঠনে তাঁর দীক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর তত্ত্বাবধানেই তিনি শুরু করে-ছিলেন গবেষণার কাজ। বই লিখেও তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে উদাসীন হন নি।

বইটি উপসংহারসহ বাইশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। দ্বীপময় ভারতের ভাষা, ভাষাতত্ত্ব, সংস্কৃতের স্থান, বৈদিক সাহিত্য, মন্ত্র-সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও মহা-কাব্য, ছায়া নাটক, পশুদের গল্প, ইতিহাস ও কিম্বদন্তী প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কিভাবে স্থানীয় সংস্কার ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সমাহার ঘটেছে জাভা ও বালিদ্বীপে। দেখিয়েছেন রামায়ণ-মহাভারতের প্রচ্ছন্ন প্রভাব পড়েছে সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক জীবনে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত হয়েছে আলোচনার সূত্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর পরি-বর্তিত, ইন্দোনেশীয় ভাষান্তর ও প্রভেদ-গুলি তিনি দেখিয়েছেন ঘটনার পর ঘটনা, বর্ণনার পর বর্ণনা করে। ভারতীয় হিতোপ-দেশের গল্পগুলি জাভা-বালিদ্বীপের মানুষ যেভাবে গ্রহণ করেছে, তাও আলোচিত হয়েছে উদাহরণসহ।

একটি জাগ্রত মন ও একাগ্রতাই গবেষককে সার্থকতার পথে এগিয়ে দেয়, পরবর্তীকালে স্মরণীয় করে তোলে। এই বইটি উপহার দেবার জন্যে আমরা হিমাংশু-বাবুকে অভিনন্দন জানাই।

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ : যাঁরা 'দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য' পড়তে চান, তাঁরা যদি তাঁর 'হিন্দু যুগে দ্বীপময় ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পট-ভূমিকা' নামে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত বইটি পড়ে নেন, তাহলে বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হওয়া তাঁদের পক্ষে সহজতর হবে। কেননা, নাটক-উপন্যাস-নোটবই প্লাবিত বাংলা দেশে এ বইয়ের প্রকাশক জোটানো যায় নি দীর্ঘ চার বছর। স্বভাবতই লেখক স্তিমিত উৎসাহে শঙ্কিত হয়ে এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদটিকে কক্ষচ্যুত করে প্রকাশ করে-ছিলেন ঐ নামে।

—[illegible]

(সাত)

ঘরে ঢুকেই মনে হলো, আমি পাল্টে গেছি। ঠিক যে সাগর চট্টোপাধ্যায় ডকটর সরকারের বাড়ীতে ডিনার খেতে গিয়েছিল, আমি যেন সেই সাগর নই। যে চৌকিদার সেলাম দিয়ে আমার ঘরের দরজা খুলে দিল, ঘরের আলো জেবলে দিল, খাবার জলের গ্লাস রেখে গেল, তার কাছে আমি ঠিকই আছি। একটুও বদলাই নি। কিন্তু আমি নিজেই যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছি।

অস্বস্তি?

না না অস্বস্তি কেন হবে? চাপা দুঃখের জবালা বোধ করছি না তো?

একটু ভাবলাম। বসে বসে, পায়চারী করতে করতে ভাবলাম। না, তা নয়। তবে কি আনন্দ? ডক্‌টর সরকার আর বুলা যথেষ্ট আদর-যত্ন করেছেন ঠিকই। দুজনের সঙ্গেই গল্পগুজব করে ভাল লেগেছে তবে...

তবে কি?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

চেয়ারে বসে জুতো পরা পা দুটো টেবিলে তুলে দিলাম। এবার পকেট থেকে আমার পুরাণ বন্ধু সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা ধরালাম।

আঃ! কি আরাম!

ঘুমের মধ্যে গ্লুকোজ ইনজেকশন নেবার পর ঘুম ভাঙলে যেমন একটু বেশী সতেজ, প্রাণবন্ত মনে হয় অথচ কারণটা বুঝা যায় না—আমার কি সেইরকম কিছু হলো?

মহা আনন্দে সিগারেট টানছি আর ভাবছি, ভাবছি আর সিগারেট টানছি।

আমি তো নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম, ঘুমুবার অবকাশ পেলাম কোথায়? সাধু-সন্ন্যাসীরা জেগে জেগেও ভাবান্তরের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, কিন্তু আমি তো মহাপ্রাণ মহাত্মা নই। আমি সাগর। মাগোর মানিক, মামার মানিক, জয়াদির মানিক, মানসীর মানিকদা...

সিগারেট টানতে গিয়েও টানলাম না।

বুলার চালচলন কথাবার্তার ধরণ অনেকটা মানসীর মতন। তাই না?

এবার সিগারেটে টান দিয়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ, তা বেশ একটু মিল আছে। আস্তে আস্তে অল্প অল্প কথা বলা, ঠোঁট চেপে একটু একটু হাসি। মানসী কোনদিন একসঙ্গে বেশী কথা বলত না, বুলাও বলে না। ছোট ছোট কাটা কাটা কথা।

শেষবারের মত সিগারেট টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিতে দিতে মনে পড়ল, সব চাইতে বেশী মিল হাঁটাতে। লম্বা বিনুনিটা দুলিয়ে দুলিয়ে বুলা যখন হাঁটছিল, আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। আমি নেহাত জানতাম যে ও ডক্‌টর সরকারের মেয়ে বুলা। হঠাৎ অন্য কোন মেয়েকে পিছন থেকে অমন করে হাঁটতে দেখলে হয়ত ভুল করে ডাক দিতাম, মা-ন-সী!

শিলচরে আমাদের বাড়ীতে সারা নাজিরপট্টীর মেয়েরা আসত। উকিলপট্টী থেকেও বহু মেয়ে আসত। মাগো আমাকে পেয়ে অনেক দুঃখ ভুলেছিল, কিন্তু বড় সখ ছিল একটা মেয়ের। সারা পাড়ার মেয়েরা এসে কি উৎপাতই করত! বাপরে বাপ! তবু কিচ্ছু বলার উপায় ছিল না। না আমার, না মামার। আমি আমার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে মেয়েদের দেখতাম, কিন্তু একটাও মানসীর মত হাঁটতে চলতে পারত না। পুকুরের জলে হাঁস ঘুরে বেড়াবার সময় যেমন পিছন দিকে ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর ঢেউ তুলে যায়, মানসী হেঁটে গেলেও যেন ঠিক ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর ঢেউ উঠত। আর সেই ছোট্ট ছোট্ট ঢেউয়ের আঘাতেই আমার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠত। আমি অস্বস্তি বোধ করতাম, চাঞ্চল্য বোধ করতাম। আমার ভাল লাগত। বেশ ভাল লাগত।

কোন কারণে মানসী যখন আমার ঘরে আসত আমি ওকে বলতাম, হাউ গ্রেসফুলি ইউ ওয়াক।

'তার মানে?'

'তুমি হাঁটলে ভারী সুন্দর লাগে।'

'কেন, এখন সামনা-সামনি বুঝি খারাপ লাগছে?'

'তা তো বলছি না তবে...

আমি আর কিছু না বলে শুধু ওর দিকে তাকাতাম। ও কি বুঝত জানি না, তবে মুখে বলত, আজকাল বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠছ দেখছি।

আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ছি। [illegible] [illegible] হতে শুরু করেছি। কিন্তু ও তো তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। সবাই বুঝত।

আমি না হয় অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতাম কিন্তু মাগো?

'মানসীকে দেখলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি জানতে চাইতাম, কেন মাগো?

'আমার যদি অমন একটা মেয়ে হতো!'

আমি মজা করে বলতাম, ওর চাইতে অনেক ভাল মেয়ে তোমার পুত্রবধূ হবে।

'সঙ্গে সঙ্গে মাগো বলত, ওর চাইতে আবার ভাল কি হবে রে?

মানসীর রূপ-গুণের বর্ণনা করার শেষে মাগো বলত, মেয়েটার হাঁটা-চলা কথাবার্তা কি সুন্দর। সব কিছুতেই একটা সৌন্দর্য আছে।

শুধু রূপ-যৌবনই নয়, মেয়েদের হাঁটা-চলাও যে সৌন্দর্য তা জয়াদিকে দেখে প্রথম বুঝেছিলাম। আমি জয়াদির চাইতে অনেক ছোট ছিলাম, তবু ওর হাঁটা-চলা দেখতে আমার ভীষণ ভাল লাগত। কলেজ টিলার মোড়ে মোড়ে কলেজের বড় বড় ছেলেরা কি এমনি এমনি জটলা করত? আমি তখন কলেজে না পড়লেও বেশ বুঝতাম ওরা জয়াদিকে দেখত। জয়াদির হাঁটা-চলা দেখত।

বুলাকে দেখে, বুলার হাঁটা-চলা দেখে এত কথা মনে পড়ল?

তাই কি আমার এই চাপা আনন্দ? উত্তেজনা? অস্বস্তি?

একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে। তবে বুলার কথা ভাবতে ভাল লাগছে। বেশ সহজ সরল আলগোছা হয়ে মিশতে পারে। কোন আধিক্য নেই, চাঞ্চল্য নেই অথচ বেশ নিবিড়। শুধু সৌজন্য নয়, তার সঙ্গে আরো কিছু। আর এই আরো কিছুটাই যেন ওর বৈশিষ্ট্য।

আরো কিছুক্ষণ গল্প করলে বেশ হতো। ওরা দুজনেই তো বার বার বলছিলেন। আমিই তাড়াহুড়ো করে চলে এলাম। এত তাড়াহুড়ো করে না এলেই ভাল হতো।

চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। ঘরের মধ্যেই একটু পায়চারী করলাম। তারপর কি মনে হলো। ড্রইং-রুম পার হয়ে সামনের লবীতে এলাম। দরজা বন্ধ। চৌকিদার দরজা বন্ধ করে পোর্টিকোতে বেঞ্চ পেতে শুয়েছে। দরজার পাশেই টেলিফোন।

টেলিফোন!

একবার টেলিফোন করব? এগিয়ে গেলাম টেলিফোনের কাছে, কিন্তু নম্বর? নম্বর তো জানা নেই।

তাতে কি হলো? ঐ তো পাশেই টেলিফোন ডাইরেক্‌টরী। আর ডাইরেক্‌টরীতেও যদি না থাকে তবে এনকোয়ারিতে জেনে নিলেই হবে। কিন্তু...

এত রাতে টেলিফোন করব? একটু আগে করলেই ভাল হতো।

টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভাবছি। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে বসে আকাশ-পাতাল না ভেবে একটা টেলিফোন করলেই ভাল হতো। মজা হতো।

আবার ভাবছি, একবার কানেকসন নিয়েই দেখা যাক না কি হয়। বুলার বিছানার পাশেই তো টেলিফোন। আমি তো মোড়াটায় না বসে ওর বিছানায় বসেই টেলিফোনে ডক্টর সরকারের সঙ্গে কথা বললাম। টেলিফোনের বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ও রিসিভার তুলে কথা বলে তাহলে তো ঠিকই আছে। যদি দেখি বেল বেজে যাচ্ছে তাহলে টেলিফোন নামিয়ে রাখব।

কিন্তু এত রাত্রে?

এতক্ষণে মনে পড়ল হাতের ঘড়িটা দেখলেই হয়। মোটে সওয়া দশটা! এমন আর কি রাত হয়েছে?

আমার চিন্তা-ভাবনা লণ্ডভণ্ড করে হঠাৎ আমার সামনের টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি চমকে উঠলাম, কিন্তু কি কেন কি কারণে রিসিভার তুলে নিলাম, হ্যালো!

'চ্যাটার্জী সাব হ্যায়?'

মেয়ের গলা শুনে আমার প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম হলো। কোনমতে সামলে নিয়ে বললাম, কথা বলছি।

'আমি বুলা।'

মনে মনে বললাম, দেখেছ আমার মনের শক্তি? প্রাণের টান? তোমার কথাই ভাবছিলাম...

'বলুন কি খবর?'

'টেলিফোন বাজতে না বাজতেই আপনি ধরলেন, কি ব্যাপার?'

এতক্ষণে আমি স্বাভাবিক হয়েছি। মজা করে বললাম, আমি জানতাম এক্ষুনি আপনার টেলিফোন আসবে।

'জানতেন?'

'নিশ্চয়ই?'

'গেস্ট হাউসে গিয়েই বোধহয় আপনার খেয়াল হয়েছে?'

কি বলছে ও? আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

'খেয়াল আবার কি হবে?'

বুলা যেন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে এখনও খেয়াল হয়নি?'

'কি খেয়াল হবে বলুন তো?'

'বেসিনে হাত ধোবার সময় আংটি খুলে রেখেছিলেন, মনে আছে?'

এতক্ষণে বুঝলাম।

আমি তাড়াতাড়ি ডান হাতটা দেখে বললাম, তাই তো!

আংটিটা আমার নয়, মাগোর। মাগো বলত, এখন তুই এটা পর কিন্তু তোর বউ এলে এটা তারই হবে।

আমি বলতাম, তোমার নীচের ট্রাংকে যে গহনাগুলো আছে, সেগুলো আমার বউকে দেবে না?

মাগো হাসত।...

নীচের ট্রাংকের গহনাগুলো আর নেই। সংসারের প্রয়োজনে সেসব গিয়েছে। শুধু এই আংটিটাই আছে। এটা আমি কিছুতেই হাতছাড়া করি না। সত্যি যদি কোনদিন দিয়ে করি তাহলে...

'শুতে যাবার আগে বেসিনে জল খেতে গিয়ে দেখলাম আংটিটা পড়ে আছে। বুঝলাম আপনারই হবে...

'আপনি শুয়ে পড়েছেন?'

'না তবে বিছানায় বসে বসেই টেলিফোন করছি।'

'আপনার বাবা শুয়েছেন?'

বুলা হাসল। 'আপনাকে পেঁছে দিয়ে আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাবা শুয়ে পড়েছেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বাবা বেশী রাত জাগতে পারেন না।'

'আপনি বুঝি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন?'

'অনেক রাত নয়, তবে বাবার মত খাওয়া-দাওয়ার পর পরই ঘুমুতে পারি না।'

এতক্ষণ কথা বলা কি ঠিক হচ্ছে?

'যাইহোক, অশেষ ধন্যবাদ। এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'ধন্যবাদের কি আছে? কাল এসে আংটিটা নিয়ে যাবেন।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবলাম, শুধু আংটিটা আনতে যাব তোমার কাছে? আংটিটা তোমার কাছে থাকলেই বা ক্ষতি কি? আমি যাব তো নিশ্চয়ই। হয়ত রোজই যাব। সম্ভব হলে সকাল-বিকেল যাব—যাব তোমাকে দেখতে, তোমার হাঁটা-চলা দেখতে, তোমার কথা শুনতে।

ঘরে এসে পায়চারী করতে করতে ভাবলাম, আর কোন কারণে তোমার কাছে যাব না তো? একটা বিরাট শূন্যতার বোঝা আমার বুকের পর চেপে আছে। বাইরের দুনিয়ার কেউ সে বোঝা দেখতে পারে না, বুঝতে পারে না কিন্তু আমি তো জানি। আমি তো নিত্য তা অনুভব করছি, জ্বালা বোধ করছি। মাঝে মাঝে মনে হয় কেউ যদি আমাকে এই বোঝা থেকে মুক্তি দিত?

তাছাড়া?

তাছাড়া এই নিউ ফরেস্টে এসে এই শাল পাইনের রোদ্দুরছায়ার কাঠবিড়ালীটাকে দেখার পরই শূন্যতার জ্বালা যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। বড় বেসুরো মনে হচ্ছে নিজেকে। চারদিকে একটা ছন্দ, একটা সংগীত, একটা সুর। আমার সঙ্গে এদের কারুর মিল নেই, সঙ্গতি নেই। আমি এই পৃথিবীর মানুষ হয়েও এই পৃথিবীতে আমার কোন দাবী নেই। আমি আছি কিন্তু আমার কোন সত্তা নেই। আমি যেন তার-বিহীন সেতার!

পায়চারী করতে করতে বিছানায় বসে পড়লাম। সিগরেট ধরালাম। পর পর দুটো নয়, দুটো সিগরেট টানছি আর ভাবছি।

বিকেল রাতের পরে বোধহয় ধরা পড়েছি। তাই না? বুলার কাছেও ধরা পড়িনি তো?

জামা-কাপড় বদলে নিলাম। পাজামা আর গেঞ্জি পরে একবার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ালাম।

শিলচরেও আমার ঘরে একটা বড় আয়না ছিল। মাঝে মাঝেই আমি সে আয়নার সামনে দাঁড়াতাম। নিজেকে দেখতাম। নিজের সঙ্গে কথা বলতাম। মাগো হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লে আমি মাগোকে জড়িয়ে ধরে আয়নার সামনে দাঁড়াতাম। বলতাম, দেখেছ মাগো, তোমাকে আর আমাকে কি ওয়াণ্ডারফুল দেখায়?

কথা ছিল এমনি একটা ফটো তোলা হবে, কিন্তু তা আর হয়নি। সেণ্ট্রাল রোডের দেব স্টুডিওর পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছি, ভিতরে ঢুকে ছবি তোলা হয়ে ওঠেনি।

মাঝে মাঝে মানসীও ঢুকে পড়ত ঘরে। আমাকে আয়নার সামনে দেখেই হেসে ফেলত। আমি তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াতাম। ও বলত, নিজেকে সুন্দর বলে এত দেখার কি আছে?

আমি ওর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিতে নিতে বলতাম, যে ফুলে মৌমাছি আসে না, যে নদী সমুদ্রে হারিয়ে যায় না, তার কি সার্থকতা?

আচ্ছা এই গেস্ট হাউসে আমার এই ঘরের ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় বুলা আসবে না তো?

এখন তো অসম্ভব, কিন্তু অন্য কোন দিন? অন্য কোন সময়?

শিলচরে মাঝে মাঝে ডায়েরী লিখতাম। কলকাতায় পোস্ট-গ্রাজুয়েট হোস্টেলে থাকার সময়েও লিখেছি। মাগোর কথা, মামার কথা, মানসীর কথা লিখেছি। লিখেছি আমার কথা, আমার মনের কথা। মনের গোপন কথা—যে-কথা কাউকে বলা যায় না, অথচ নিজের মধ্যে চেপে রাখাও যায় না, সেই সব কথা।

আমি বরাবরই কেয়ারলেস! ডায়েরীটা প্রায়ই পড়ার টেবিলের পর পড়ে থাকত। আমি জানতাম মানসী ঘরে এসেই ডায়েরীটা পড়তে বসত। বই-পত্তর গোছাতে গোছাতে মাঝে মাঝে মাগোর হাতেও পড়ত নিশ্চয়ই।

যাকগে সেসব কথা! সেসব দিনের ইতিহাসের কি শেষ আছে?

আজ আবার ডায়েরী লিখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কেন? তাতো জানি না, তবে ইচ্ছা করছে। মনে হচ্ছে কিছু অবাক কথা লিখতে পারলে ভাল লাগত।

সত্যি সত্যিই কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। কি লিখতে কি লিখলাম জানি না, তবে অনেক কিছু লিখলাম। ঘুম না পেলে হয়ত আরো লিখতাম।

(ক্রমশঃ)

# যে বালি গান গায়

বনবিহারী মোদক

আজ থেকে সাতশো বছর আগেকার কথা। দূর-দুর্গম অজানা পথে দুঃসাহসিক অভিযানের পথিকৃৎ মার্কো পোলো তখন মধ্য-এশিয়ার ভয়ঙ্কর মৃত্যুপুরী 'টাকলা মাকান' মরুভূমি ধরে এগিয়ে চলেছেন। উত্তর আকাশে পিঙ্গল মেঘ জমতে দেখে, মার্কো সেদিন বেলা থাকতে থাকতেই ছাউনি ফেলতে বললেন। সঙ্গের লোকজন তো পথেই মরতে মরতে প্রায় সাবাড় হয়ে এসেছে। আর মাত্র ছ'জন। এরাও শেষ অবধি টি'কবে তো?—ভয়তাড়িত বিষণ্ণ মনে এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে, অগত্যা মার্কোও তখন হাত লাগিয়েছেন তাঁবু খাটানোর কাজে। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল—ওরা সবাই হাত গুটিয়ে, পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে কেন?

কাউকে কিছু শুধোতে হল না। খুঁটির মাথায় হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজ থামাতেই, মার্কো স্পষ্ট শুনলেন—একটানা শীষ দেবার মতো, তীক্ষ্ণ একটা শব্দ। মৃদু বা অস্পষ্ট নয়; কানে তালা এবং বুকে ভয়ের কাঁপন ধরিয়ে দেবার মতোই গমগমে অথচ সুরেলা ও নিরবচ্ছিন্ন একটা গর্জন। আশ্চর্য ব্যাপার! মানুষ-জন তো দূরের কথা, জীবিত কোনো জন্তু-জানোয়ারও তো এই মৃত্যুপুরীর ত্রি-সীমানাতেও নেই। ভয়ঙ্কর এই গর্জন কি তাহলে...?

কিন্তু ব্যাপার যত ভয়ানকই হোক, আপাতত তার চেয়েও বেশি জরুরী হল—মাথা গুঁজবার মতো একটু ঠাঁই। ঝড় তো প্রায় এলো বলে। খোলা জায়গায় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে, বালু ও তুষারকণার এই প্রচণ্ড ঝঞ্জা, এক নিমেষেই সকলের দফা শেষ করে দেবে। তাই, যেন কিছুই শুনতে পাননি—এইরকম ভান করে, মার্কো সবাইকে ধমক দিলেন "কি দেখছ সব হাঁ করে? ঝড় এসে গেল যে। লাগাও, লাগাও..."

লোকগুলোর মুখের সমস্ত রক্ত কেউ যেন নিঃশেষে শুষে নিয়েছে! ভীতি-বিহ্বল ফ্যাকাশে মুখে, একে একে তারা মার্কোর সামনে এসে দাঁড়ালো। "জিন্, কর্তা, জিন্। এবার আর কারুরই রেহাই নেই। আমরা চললাম—" অর্ধস্ফুট ভয়ার্ত-স্বরে এই কথা ক'টি বলেই, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, মরিয়ার মতো দৌড়তে সুরু করল ওরা।

এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থেকে, মার্কোও ছুটলেন ওদের পিছু পিছু। "করছিস কি, মূর্খের দল? ঝড়ের মধ্যে এভাবে ছুটলে পাঁচ মিনিটেই শেষ হবি তোরা! তুফানটা কমুক, তারপর যাস। কাল সকালেই তোরা মাইনে নিয়ে, খাবার নিয়ে, যাস"—বলতে বলতে পেছনের কুলিটার জামা চেপে ধরলেন মার্কো। ঠিক সেই সময়েই সামনের আরেকটা লোক পাথরে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তার ঠিক পেছনেই যে কুলিটা ছুটছিল, তাল সামলাতে না পেরে সেও হুড়মুড় করে পড়ল আগের লোকটার ঘাড়ের ওপর। বাকি তিনজন ততক্ষণে বালির ঢিপির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

* * *

তাঁবুটাও যুৎ-মতন খাটানো যায়নি। নড়বড়ে কয়েকটা মাত্র খোঁটা; ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপ্টায় সব যেন উপ্ড়ে আসতে চাইছে। তাঁবুর মধ্যে আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে, ভীত-সন্ত্রস্ত চারটি প্রাণী কান খাড়া করে শুধু সেই আওয়াজটাই শুনছে। ঝড়ের জোর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, গর্জনটাও যেন ফুঁসে ফুঁসে উঠছে! হাওয়ার গতি মাঝে মাঝে একটু স্তিমিত হলে, প্রেতাত্মার আস্ফালনের মতো ঐ শব্দটাও একটু কমছে। দলছুট ঐ তিনজনের অবস্থা এতক্ষণে কী হল—তা-ই বা কে জানে?

* * *

দুঃখের রাত পোহাতে চায় না। তবু সে-রাতের অবসানেও ভোরের সূর্যোদয় দেখা গিয়েছিল। ভয়ঙ্কর সেই আওয়াজটাও তখন আর নেই। আলো ঝলমল নির্মেঘ আকাশে তখন শান্ত প্রসন্নতায় নির্মল হাসি। সকাল হতে না হতেই মার্কো গিয়েছিলেন গত সন্ধ্যার পলাতক লোক তিনটির সন্ধানে। সঙ্গীসহ বালিয়াড়িটার চড়া সুরু করতেই হঠাৎ আবার শোনা গেল কালকের সেই বীভৎস আওয়াজ; এবার যেন কিছুটা গমকে গমকে! পা ফেললেই শব্দটা জোরালো হয়, কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে থেমে যায়! আবার পা ফেললে, আওয়াজটা আবারও জোরদার হয়ে ওঠে! সঙ্গী কুলিটা এইবার হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। পাছে সে-ও আবার দৌড় লাগায়, এই ভয়ে লোকটার হাত ধরে তাড়াতাড়ি মার্কো তাঁবুতে ফিরলেন।

তাঁবু পাহারায় যে দু'জন ছিল, এই কুলিটির মুখে বিবরণ শুনে, তারাও আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাইল না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, প্রচুর বকশিসের লোভ দেখিয়েও মার্কো তাদের নিরস্ত করতে পারলেন না। নিরুপায় হয়ে, অবশেষে মোক্ষম একটা চাল চাললেন মার্কো। ঝোলা থেকে কবচের মতো একটা জিনিস বের করে, সেটা ওদের দেখিয়ে মার্কো বললেন "দ্যাখো, আমার কথা না শুনে ওরা তিনজন পালাতে গিয়েছিল; ঐ দিকে গিয়ে দ্যাখোগে, ওদের তিনজনেরই লাশ পড়ে রয়েছে। আমার সঙ্গে এই সিদ্ধাই তাবিজ আছে, এখানকার ভূতটা আমার কোনো ক্ষতি করবে না। আমার কথা শুনে চললে, তোমাদেরও কোনো ভয় নেই। কিন্তু খবরদার, আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে বা আমার কথা না শুনলেই ভূতটা তোমাদের সকলের হাড়-মাসে কড়-মড়িয়ে চিবিয়ে খাবে, চামড়া দিয়ে ঐরকম কোরে ডুগ্ডুগি বাজাবে। কাল যে বাজনা শুনেছ, সেও অবাধ্য নিমকহারামদের চামড়ার ডুগ্ডুগি। এইবার যেতে চাও তো যাও! গিয়ে মজাটা দ্যাখোগে।

এইবার কাজ হল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মার্কোর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল সবাই। কাকুতি-মিনতি করে বলতে লাগল—দোহাই কর্তা, আমরা আপনার সব কথা শুনব। আর কোনোদিনও পালাতে চাইব না। আপনার ভূতটাকে আপনি বেঁধে রাখুন। দোহাই আপনার শ্রী-চরণের।'

* * *

আজ থেকে সাতশো বছর আগেকার অবস্থায়, মরুভূমির বালিয়াড়ির এই ভুতুড়ে গর্জনের যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া মার্কো পোলোর পক্ষেও কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। তথাপি, সাত নকলে আসল খাস্তা অবস্থায়, নানা লোকের জবানীতে ও ছড়ানো-ছিটানো নানা লেখায়, তাঁর বিস্ময়কর ভ্রমণ-বিবরণীগুলোর যে রূপটা আজ আমরা হাতে পাচ্ছি, তা থেকেও একটি কথা কিন্তু সংশয়াতীতভাবেই বুঝতে পারা যায়। সঠিক কারণ নির্ণয়ে সক্ষম না হলেও, মরু-বালুকার এই রহস্যময় ধ্বনিতরঙ্গ সম্পর্কে মার্কোর মনেও কিন্তু প্রচণ্ড একটা খটকা এবং জিজ্ঞাসা জেগেছিল। অকুতোভয় এই অভিযাত্রী, এ-আওয়াজের কারণটা বুঝবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু এর কোনো কূলকিনারা তিনি পেয়েছিলেন কিনা বা এর আসল রহস্যটা তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন কিনা—আজ আর সেটা নিরূপণের কোনো উপায়ই আমাদের হাতে নেই।

মার্কোর বর্ণিত অনেক বিস্ময়কর তথ্যকেই সে-আমলের জ্ঞানী-গুণীরা স্রেফ গাঁজাখুরী গালগল্প বলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি, এই সেদিন উনবিংশ শতক পর্যন্ত এ'রা তাঁর অনেক বিবরণকেই অবিশ্বাস্য ধাপ্পা বলে ব্যঙ্গের হাসি হেসে-ছেন। মরুবালুকার এই গর্জনকেও অলীক কল্পনা বলে রায় দিতে সে-সব মহাপণ্ডিত-দের তখন একটুও বাধেনি। তারপর বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে, স্যার অরেল স্টেইন নিজে যখন গোবি মরুভূমির 'টাকলা

মাকান অঞ্চলে সত্যি সত্যিই ধ্বনিমুখর বালির বাস্তব অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণ এবং ঘোষণা করলেন, অবিশ্বাসী ভূ-বিজ্ঞানীরা তখন একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন বৈকি। ক্রমে ক্রমে অবিসংবাদিতভাবে জানা গেল— আট লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের গোবি মরুভূমি তার রহস্যময় বিশাল বুকের বহু স্থলেই, বিচিত্র এই সব ধ্বনি-তরঙ্গ আজ পর্যন্ত বাজিয়েই চলেছে। টাকলা মাকান অঞ্চলের পশ্চিম দিকে, 'অর্দাস্ পাসুলো' নামক স্থান তো প্রায় পুরোটাই এরকম আওয়াজকারী বালিয়াড়িতে ভর্তি।

॥ ২ ॥

ধ্বনিকারক বালুকা শুধু যে গোবি মরুভূমিতেই দেখা যায়, এমন নয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মরু-অঞ্চল তো বটেই, এমনকি কোনো কোনো সমুদ্র সৈকতেও প্রকৃতির এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য আজও মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক করে।

এর সবগুলোর আওয়াজও কিন্তু একরকমের নয়। কোনো কোনো বালুকা দূরাগত ঘন্টাধ্বনির মতো শব্দ করে। কোথাও আবার শোনা যায় ড্রাম বাজানোর মতো গম্‌গমে আওয়াজ; মনে হয়—শত-সহস্র বাজনদার যেন উন্মাদ হয়ে একই সঙ্গে ড্রাম পেটাচ্ছে। সাপের রুদ্ধ ফোঁস-ফোঁসানি বা ঝাউবনের মর্মরের মতো শন্‌-শন্‌-শন্‌ শব্দও কোনো কোনো বালিয়াড়িতে সুস্পষ্ট শোনা যায়। কোনো জায়গার বালুভূমি আবার অবিকল ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারদলের খট্‌-খট্‌ খট-খট্‌ আওয়াজ তুলে, ভয়াল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আশ্চর্য স্পষ্ট ও জোরালো প্রতিধ্বনি জাগিয়েও কোনো কোনো মরু-বালুকা অসন্দিগ্ধ পথচারীদের বুকে আতঙ্কের কাঁপন ধরিয়ে দেয়। কোথাও আবার দুঃশ্রুত সুরেলা গানেরও সাক্ষাৎ মেলে।

শুধু কি গানের শব্দ? বাদ্যযন্ত্র, বিশেষত তার-যন্ত্রের একটানা ও সুরেলা ধ্বনি-তরঙ্গ তো বহুস্থলেই মরুবালুকার জনমানবহীন নিঃসীমতাকে উদাস গীতি-ময়তার মূর্ছনায় আকুল করে তোলে! দূরস্থিত গোলন্দাজবাহিনীর অবিশ্রান্ত চাঁদমারির মহড়ার মতো গম্‌ গম্‌ গুম্‌ গুম আওয়াজও কোনো কোনো মরু-বালুতে অবিকল শ্রুতিগোচর হয়। কোনো বালু-ভূমির শব্দ থেমে থেমে, গমকে গমকে ওঠে। কোথাও আবার শোনা যায় একটানা নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনি। কোনো কোনোটির শব্দ অস্ফুট ও মৃদু; কোনো কোনোটিতে শুনতে পাওয়া যায় বজ্রনির্ঘোষের মতো কর্ণবিদারী ভয়ঙ্কর গর্জন।

কোন্‌ জায়গায় বালুকায় কিরকম ধ্বনি ওঠে, এবার আমরা অতি সংক্ষেপে সেইটে দেখে নিতে চেষ্টা করব।

প্রখ্যাত স্পেনীয় পর্যটক ও রাজনীতিক অ্যান্টোনিও ডি আল্লোআ তখন আন্ডিজ পর্বতমালার সানুদেশ ছাড়িয়ে, পশ্চিম উপকূলের মরুময় সৈকতভূমির দিকে এগিয়ে চলেছেন। নানা উদ্ভট অভিজ্ঞতা এবং হরেকরকম হতবুদ্ধিকর দৃশ্য দেখতে দেখতে, তাঁদের দুঃসাহসী মনও তখন কুসংস্কারে অন্ধ হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগেই তো পাম্বামার্কা পাহাড়ের চূড়োয় তাঁরা ভয়ঙ্কর ভৌতিক ছায়া দেখে এসেছেন। এখানে জনমানবশূন্য ফাঁকা জায়গাতে যন্ত্রসংগীতের মধুর বাজনা শুনে, এই অভিযাত্রীদলের অবশিষ্ট মনোবলটুকুও এবার কর্পূরের মতো উবে গেল। হতবুদ্ধি ও ভীত আল্লোআ আর একটা মুহূর্তও এখানে থাকার ভরসা পেলেন না।

বিগত যুগের কথা থাকুক। বর্তমান এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও আমরা গর্জনকারী বালুকার রোমাঞ্চকর বর্ণনা পেয়েছি, লে ভেরীর বিবরণে। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল বর্ণিত 'লস্ট ওয়ার্লড'-এর বাস্তব অস্তিত্ব খুঁজে বের করায় উন্মাদনময়, দুঃসাহসী এই অভিযাত্রী দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গমতম অঞ্চল, বৃটিশ গুয়ানার গভীর অভ্যন্তরভাগে, সভ্য মানুষের পদচিহ্নহীন অরণ্য ও নদী-পর্বতে সুদীর্ঘ প্রায় দশ বছর যাবৎ ঘুরে বেড়িয়েছেন। লে ভেরী, একদিকে যেমন অসংখ্য রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, অন্য দিকে তেমনি আবার অজ্ঞাত অনেক বিস্ময়কেও তিনি আবিষ্কারের আলোয় এনে উপস্থাপিত করেছেন। স্কুইবো নদীর উজানে বালির বজ্রনিনাদী সাঁ-সাঁ গর্জনের কথা তাঁর অত্যাশ্চর্য ভ্রমণ-বিবরণী থেকেই আজ আমরা জানতে পেরেছি।

বিশাল আরব মরুভূমিতেও ধ্বনি-মুখর বালির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। গর্জনকারী এই বালুকার আশ্চর্যজনক বিবরণ আমরা পাই এইচ সেন্ট জন ফিল্‌বি-র লেখায়। এটা খুব বেশি দিনের কথা নয়। ১৯৩২ খৃঃ জন ফিল্‌বি এই মরু-অঞ্চল অতিক্রম করছিলেন। তিনি লিখেছেন—"একদিন বিকেলে আমি তাঁবুর মধ্যে বিশ্রাম করছি, এমন সময় দূরাগত বু-উ-ম্‌ বু-উ-উ-ম্‌ শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। প্রায় মিনিট দুয়েক এই শব্দ শোনা গেল। আওয়াজটা খুব জোরেই হচ্ছিল, তবে ধ্বনিটা ছিল সুরেলা। মনে হচ্ছিল—দূরে অনেকগুলো জাহাজ থেকে যেন একই সঙ্গে সাইরেন বাজানো হচ্ছে।

"কিসের আওয়াজ দেখবার জন্যে তাঁবুর বাইরে ছুটে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে; দেখি—আমাদেরই দলের একজন লোক অল্প দূরের উঁচু একটা বালির ঢিপিতে উঠতে উঠতে, থমকে থেমে বেকুবের মতো এদিক ওদিক ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকাচ্ছে। আওয়াজটা আসছে সেই ঢিপিটার দিক থেকেই।

"কৌতূহলী হয়ে আমিও ঐ ঢিপিটার দিকেই এগিয়ে গেলাম। পায়ের নীচের আলগা বালিগুলো ঝর্‌ ঝর্‌ করে গড়িয়ে নামতে সুরু করা মাত্রই, এবার একেবারে আমারই পায়ের গোড়ায় আওয়াজ শোনা গেল—বু-উ-ম্‌ বু-উ-উ-ম্‌। পা ফেলা থামালেও পরও, শব্দটা প্রায় মিনিট দুয়েক রীতিমতো জোরে এবং সুস্পষ্টভাবে শোনা গেল। এরপর ক্ষীণ হতে হতে আওয়াজটা শেষে ধীরে ধীরে একেবারেই মিলিয়ে গেল। আবার যেই পা ফেলেছি, আবারও শোনা গেল ঐ ভয়ানক আওয়াজ। এতক্ষণে আমি ব্যাপারটা অনুমান করতে পারলাম। বালির ওপর উবু হয়ে বসে পড়তেই মনে হল—পায়ের নীচের সমস্ত বালিগুলো যেন কাঁপছে! আলগা বালির মধ্যে ডান হাতখানা প্রায় কনুই পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিলাম। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপনটাও এবার বেশ স্পষ্টভাবেই অনুভব করা গেল।"

বিগত আরব-ইজ্রায়েল যুদ্ধে, সংবাদ-শিরোনামের মাধ্যমে যে-জায়গাটি বাংলা-দেশের পাঠকসাধারণের নিকট সুপরিচিত হয়েছে, সেই সিনাই উপদ্বীপেও এইরকম ধ্বনিকারক বালুকা আছে। মাউন্ট সিনাই নামক পাহাড়টি সেখানে এই কারণেই রীতিমত কুখ্যাত। আরবী ভাষায় একে বলে 'DJEBEL NAKUS' অর্থাৎ 'ঘন্টা পর্বত।' এই পাহাড়ের সানুদেশের বালিতে হুবহু ঘন্টাধ্বনির মতো জোরালো আওয়াজ শোনা যায়। এই ঘন্টার শব্দ আবার থেমে যাবার আগে, দূরাগত গর্জনের মতো শোনায়। বিদেশীদের কাছে এই কৌতূহলোদ্দীপক পাহাড়টি 'Bell Mountain' নামেই প্রসিদ্ধ। ওদেশের মরুচারী বেদুইনদের দৃঢ় বিশ্বাস—খৃষ্টানদের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত সঙ্ঘারামের প্রেতাত্মারাই আজও এইরকম ঘন্টাধ্বনি ও হুঙ্কার-গর্জন করে। অর্থাৎ এগুলো সবই সাহেব ভূতের শয়তানি!

পূর্বোল্লিখিত এই যুদ্ধের বহু বছর আগেই, লেফটেন্যান্ট নিউবোল্ড সিনাইয়ের এই ঘন্টা পর্বতটি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা কোরে, এবিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ও তথ্যবহুল বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। লেফটেন্যান্ট নিউবোল্ড নিজের কানে যা শুনেছেন, তা হল প্রথমে অতি মৃদু ও অস্পষ্ট একটা খস্‌ খস্‌ শব্দ, তারপর দূর-শ্রুত একটি গভীর সুরেলা ধ্বনি। এই আওয়াজটিই ক্রমে অতি নিকটে গীর্জার ঘন্টাধ্বনির মতো সজোরে এবং খুব ঘন ঘন শোনা গেল।

আফগানিস্থানে, কাবুলের কাছেও এইরকম আরেকটা বালিয়াড়ির সন্ধান

১ পাহাড়ের চূড়োয় জলকণাসম্পৃক্ত হাল্কা মেঘ বা ঘন কুয়াশা থাকলে, উদীয়মান সূর্যের বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিমাকাশে; অথবা অস্তগামী সূর্যের বিপরীতে অর্থাৎ পূর্বাকাশে, রামধনু রঙের আলোকোজ্জ্বল তিনটি (কদাচিৎ বা চারটি) জ্যোতির্বলয় ও তার কেন্দ্রে, দ্রষ্টার নিজের প্রতিচ্ছবি অতি-সুস্পষ্ট দেখা যায়। মরীচিকাসদৃশ এই বিস্ময়কর দৃশ্যের সর্বপ্রথম বিবরণদাতা আল্লোআ-র নামানুসারে, নিসর্গপ্রকৃতির এই স্বল্পজ্ঞাত ও দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভূগোলবিদ্যায় আজ "আল্লোআ বৃত্ত" নামেই পরিচিত।

মেলে। এটির বিবরণ পাই লর্ড কার্জনের লেখায়। এটার আওয়াজটা আরও ভুতুড়ে। মনে হয়—একদল অশ্বারোহী বুঝি ড্রাম বাজাতে বাজাতে খট-খট খট-খট আওয়াজ তুলে সজোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে! এসম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তীটিও কার্জনসাহেব লিপিবদ্ধ করতে ভোলেন নি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস—অন্যায়যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার বলি সৈনিকদের প্রেতাত্মারাই ক্রুদ্ধ আক্রোশে আজও এখানে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উপায় খুঁজে চলেছে! দিনের কলকোলাহল থেমে যাওয়ামাত্রই, পাতালপুরীর গুহাবাসী এই সৈন্যদলের ক্রুদ্ধ রণ-প্রস্তুতি, নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে আজও তাই স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়।

হাওয়াই দ্বীপেও আরেকটা বিদঘুটে শব্দ-সৃষ্টিকারী বালুভূমি ও ঢিপি দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার আওয়াজটাই সবচেয়ে মজার। এখানে শোনা যায় কুকুরের ডাক। কবে কোন্‌কালে অথর্বপ্রায় এক বুড়ো সাহেব নাকি তার কুকুর নিয়ে ওদিকে বেড়াতে গিয়েছিল। বেচারী আর ফেরেনি। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরও কেউ আর তার সন্ধান পায়নি। পথ-হারানো সেই কুকুরটাই নাকি আজও সেখানে কেঁদে কেঁদে পথ খুঁজে বেড়ায়!

স্কটল্যান্ডের পশ্চিমে, অতলান্তিক মহাসাগরে হেব্রাইডস নামে যে দ্বীপমালা আছে, তার মধ্যে আছে ছোট্ট একরত্তি একটা দ্বীপ; নাম—'এইগ্'। এই এইগ্-দ্বীপে আছে আরেকটি তাজ্জব বালুবেলা। এখানে শোনা যায় সুতীক্ষ্ণ শীষ। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ হুফ মিলার এটি সম্পর্কে অনেক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে—এখানকার আওয়াজটা থেমে যাবার আগে শীষের মতো শোনা গেলেও, প্রথমে কিন্তু এটা শুনতে অন্যরকম লাগে। খুব শক্ত একগাছা মোম-মাখানো সুতো টান করে বেঁধে নখ দিয়ে টোকা মারতে থাকলে, যেরকম টং টং শব্দ হয়, এই বালিয়াড়িটার শব্দ প্রথমটায় ঠিক সেইরকমই শোনায়।

ইরানের মরু-অঞ্চলে বালির ঢিপি-পূর্ণ এমন একটি বিশাল এলাকা আছে, বীণা-ধ্বনির মতো সুরেলা আওয়াজ যেখানে প্রায় সতের কিলোমিটারব্যাপী স্থানে একনাগাড়ে ঘণ্টাখানেক ধরে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়! ডর্সেটের স্টুডল্যান্ড উপসাগরের সৈকতে; কার্নার্বনশায়ারে নেভিনের অনতিদূরে এবং ওয়েলসেও সিংগিং স্যান্ডের অস্তিত্ব রয়েছে। স্যার আর্চিবল্ড গাইকীর লেখা থেকে এগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানতে পারা যায়। দিগন্তপ্রসারী ফাঁকা মাঠে টেলিগ্রাফের অনেকগুলো তার টাঙানো থাকলে, খুঁটি-গুলো সজোরে ঝাঁকি দিয়ে তারগুলো নাড়িয়ে, তারপর কাঠি দিয়ে তারগুলোতে ক্রমাগত বাড়ি মারতে থাকলে যেরকম শব্দ ওঠে, এগুলোর দু-একটির আওয়াজও নাকি

[illegible]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কা, কান্‌জাস্ এবং উয়োমিং রাজ্যে হাজার হাজার কিলোমিটারব্যাপী শুষ্ক, বালুকাময় ও মরুসদৃশ যেসব সমভূমি আছে, সেগুলোর কোনো কোনো জায়গাতেও বালির ধ্বনি বা সুউচ্চ প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

দুনিয়ার প্রায় সব অঞ্চলের কথাই এপর্যন্ত বলা হল। কিন্তু সুধী পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন—বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি সাহারার নাম কিন্তু এ-প্রসঙ্গে একবারও উল্লিখিত হয় নি। তাহলে কি রহস্যময়ী সাহারার বিশাল বুকে ধ্বনিমুখর বালুকা কোথাও নেই? বস্তুতঃ তা নয়। পণ্ডিতদের অনুমান—আওয়াজকারী বালি সাহারাতেও নিশ্চয়ই আছে। হয়ত বা বহু জায়গাতেই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাত্র দুটি এলাকা ছাড়া, আর কোথাও এগুলোর অবস্থিতি আজও সঠিকভাবে নিরূপিত বা নিবন্ধভুক্ত হয় নি। এই অধম প্রবন্ধকার বহু খুঁজেও, সাহারার অন্য কোথাও সিংগিং স্যান্ডের কোনো উল্লেখ বের করতে পারেনি। কালক্রমে অন্যান্য এলাকার ধ্বনিকারক বালির অস্তিত্বও হয়ত জানা যাবে।

এখন পর্যন্ত যে-দুটি স্থানের সঠিক বিবরণ আমরা হদিস করতে পেরেছি, তার একটি হল—সাহারার ঔআরগ্লা জেলার সাগরতট সন্নিহিত বালিয়াড়িগুলোতে। আরেকটি এই মরুভূমির প্রাচীনতম জনপদ অথচ সুদুর্গম তিম্বুক্তু-র কাছে। পূর্ব সাহারার মাঝামাঝি, সুদানে অবস্থিত এই শেষোক্ত স্থানটি, ফরাসী অভিযাত্রীদের বহুদিনব্যাপী পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পরও, সভ্য মানুষের চোখে আজও একটি রহস্যময় বিস্ময় হয়েই রয়েছে। সাহারার রহস্যের অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচিত হলে, ধ্বনিময় বালুকা ছাড়াও, আরও অনেক বিস্ময়কর তথ্যই হয়ত জানা যাবে।

॥ ৩ ॥

স্থানীয় অধিবাসীরা বালির এইসব আওয়াজকে ভুতুড়ে বা অতিপ্রাকৃত যাই-ই বলুক না কেন, এসব ধ্বনির আসল কারণটা কি? কী এর গোপন রহস্য? এত লোক, এত জায়গা সম্পর্কে, এতদিন কি শুধু বানানো মিথ্যে কথাই বলে এসেছেন? তা যদি না হয়, তাহলে আওয়াজটা আসে কোত্থেকে? কিভাবেই বা শব্দটা সৃষ্টি হয়? উপসংহারে আমরা শুধু এই প্রশ্ন-গুলোরই জবাব খুঁজে নিতে চেষ্টা করব।

আপাতদৃষ্টিতে হতবুদ্ধিকর এই ব্যাপারটার মোট তিনটি কারণ বিজ্ঞানীরা নির্দেশ করেছেন :

(১) নীচের শক্ত বালি এবং ওপরের আলগা বালির মধ্যে, বাতাস ঢোকার মতো যে শূন্যতা বা ফাঁক থাকে, উপরের বালি নাড়া খেয়ে সেই শূন্যতায় আছড়ে পড়তে থাকলেই আওয়াজ শোনা যায়।

(২) হাওয়ার ঝাপটা বা পথচারীর পদভারে, আর্দ্র বালুকণাগুলো একে অন্যের ঘাড়ে গড়িয়ে নামতে থাকলেও, বালুকণা-সমূহে নীচের বাতাস বুদ্বুদের মতো উপরে উঠতে থাকে। এতেও শব্দ হয়। লক্ষণীয় এই যে, সম্পূর্ণ শুকনো বা বেশি ভিজে থাকলে, সে-বালিতে কিন্তু কোনো আওয়াজই শোনা যায় না। কেবল সঠিক পরিমাণ আর্দ্রতাই এই ধরনের বালিকে ধ্বনিমুখর করতে পারে।

(৩) বায়ুর অতি-সূক্ষ্ম একটি আস্তরণ, আলগা বালির প্রতিটি কণাকে মুড়ে রাখে। পাতলা এই আবরণগুলো একত্রে, ঘনীভূত গ্যাসের স্থিতিস্থাপক একটা কুশন গড়ে তোলে। সামান্যতম নাড়া, চাপ বা ধাক্কা খেলেই, এই কুশনটি স্থিতিস্থাপকতার দরুণ, ক্রমবর্ধমান কম্পন সৃষ্টি করে। তখনই সে-বালি শব্দ-তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে।

বিশ্বের যে কোনো বালু-ধ্বনির মূলেই এই তিনটির যে কোনো এক বা একাধিক কারণ ক্রিয়াশীল থাকে।

আরেকটি কথাও কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা দরকার। কোনো কোনো বালুভূমি তার শব্দসৃষ্টির ক্ষমতাটি কালক্রমে হারিয়ে ফেলতেও পারে। বালু-ধ্বনির অস্তিত্বে অবিশ্বাসী উন্নাসিকরা সাধারণত এই ব্যাপারটা আঁকড়ে ধরেই, কোমর বেঁধে তর্ক করতে নামেন। যেহেতু কিছুদিন পরে আর কোনো আওয়াজ শোনা যায়নি, সেইজন্যে আগে যাঁরাই সেটা শুনেছেন বলে দাবী করেছেন—তাঁরা সবাই মিথ্যেবাদী। এই-ই হল অবিশ্বাসীদের একমাত্র যুক্তি।

এইবার দেখা যাক, এটা কেন হয়? এর কারণটা কিন্তু মোটেই দুর্বোধ্য নয়। বায়ুবাহিত সঞ্চরমান বালুকা জমে জমে, একটা জায়গার চেহারাটাই বিলকুল পাল্টে দিতে পারে—এটা আমরা সবাই জানি। ধ্বনিমুখর বালুকার উপর, বায়ুবাহিত নতুন বালির পুরু ও ভারি স্তর জমে উঠলেই, নীচে চাপা-পড়া আওয়াজকারী বালি তার পূর্বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। তখন আর সে কম্পন ও শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না।

* * *

আমাদের দেশে, রাজস্থানের থর মরু-এলাকার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে এরকম সিঙ্গিং স্যান্ডস কি একেবারেই নেই? এক-আধটা হয়ত নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু লোকচক্ষুর আড়ালে আত্মগোপনকারী সেসব নিসর্গ-রহস্যের সঠিক অবস্থিতি খুঁজে বের করা ও পরিচয় ঘটানোর জন্যে, আমাদের তরুণ অভিযাত্রীরা কি আগুয়ান হবেন? অজানার সন্ধানে, দুর্গম পথের বিঘ্ন-বিপদকে হাসিমুখে মাথায় তুলে নিতে যাঁরা একটুও দ্বিধা করবেন না, পুরোগামী সেই পথি-কৃৎদের জন্যেই আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। তাঁদের পদধ্বনি কি শোনা যাচ্ছে?

## ভয় পেতে পেতে একদিন

[illegible] গাড়ি ভেড়াতেই এক ঝাঁক বোলতার মত চোঙা প্যান্ট, জোনাকি-জ্বলা চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরল। নটাও বাজেনি। অথচ এরই মধ্যে রাস্তা-ঘাট শুনশান। সিনেমা হলের মার্কারির লাইট-টাইট সব নেভানো। কোলাপসিবল গেটের সর্বাঙ্গ ছেয়ে তাবিজ, কবচ, মাদুলীর মত পেল্লায়-পেল্লায় তালা ঝুলেছে। বাস স্ট্যান্ডের ছাউনীর তলায় একটা পাগলী সংসার সাজিয়ে বসেছে — এক কোণে ওর ছেলেটা ঠাণ্ডা মাটিতে ন্যাকড়া জড়ান বলের মত পড়ে আছে; পাশেই কাঠ-কুটোর উনুনে মেটে হাঁড়িতে চাপানো ওর সারা দিনের সঞ্চয়। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি কিছু নেই রাস্তায়। ও-ফুটে পাগলী আর এ-ফুটে জগা। ট্যাক্সির দরজাটা আলগা করে বেরোতে-বেরোতে প্ল্যান করছিল উল্টো-দিকের পাঞ্জাবী হোটেলে তরকা রুটি খেয়ে, গাড়ি গ্যারেজে তুলে দিয়ে, বাসায় ফিরবে। ঠিক এমনি সময়—!

চলুন দাদা — বোলতার ঝাঁক ভন-ভন করে উঠল। হঠাৎ এক সঙ্গে ছ-সাতটা ছেলে, যাদের যে কোন একজনই জগার পক্ষে যথেষ্ট—ভয়ে কেমন থ মেরে গেল জগা। রাস্তাঘাটে কেউ কোথাও নেই। কে থাকবে, এক যার ঠেকা আছে, সে ছাড়া? জগার উপায় নেই। কমিশনে খাটে। একশ টাকায় পঁচিশ টাকা। আগে তবু সারাটা দিন খাটলে সত্তর-পঁচাত্তর পর্যন্ত ওঠানো যেত। এখন তো কলকাতাটা কেমন গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। রাসবিহারী আর ধর্মতলার বাইরে সন্ধ্যের পর গাড়ী চালান নিরাপদ নয়। আর এটুকু জায়গায় গোটা শহরের ট্যাক্সি এসে জুটেছে। সওয়ারী কৈ, ট্যাক্সিওয়ালাই বেশী। ঝুঁকি নিয়েও জগা নিরুপায় হয়েই গাড়ী ছোটায় যাদবপুরে, বেহালায়, কলেজ স্ট্রীটে, চিৎপুরে। নইলে খাবে কি? কে খাওয়াবে মাকে, ছোট--ছোট ভাই-বোনগুলোকে আর তাকে, যাকে এই সেদিন টোপর পরে আদর করে ঘরে এনে তুলেছে? কেউ না, জগাকেই করতে হবে সব। তাই বিপদ মাথায় নিয়ে পাগলের মত যেখানে-সেখানে গাড়ী ছোটায়। নিরুপমা ভয় পায়। ভয়ে, আতঙ্কে থর-থর করে কাঁপে, জানালার দিকে মাথা গুঁজে চুপ করে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন মানুষটা ফিরবে। যতক্ষণ না ফেরে, ততক্ষণ বুকের ভেতরে যে কি হতে থাকে, সে তো নিরুপমাই শুধু জানে। আর কেউ তো বোঝে না।

জগা সব বোঝে। বোঝে বলেই আজ-কাল নিরুপমার কাছে গল্প করা বন্ধ করেছে। মেয়েটাকে শুধুমুধু ভয় পাইয়ে কি লাভ, বীরত্বের স্বাদ-গন্ধ কবে মুছে গেছে এ শহর থেকে। আগে প্যাসেঞ্জার বড়জোর ভাড়া না দিয়ে পালাত, আজকাল সেই সঙ্গে দক্ষিণাও আদায় করে—ট্যাক্সি-ওয়ালার বুক পকেটে যা থাকে সব প্লাস পকেটের ইঞ্চিখানেক তলায় লুকোনো আশ্চর্য সেই ঘড়িটা পর্যন্ত।

বাঁ হাতে বুক পকেটটা চেপে ধরে, ডান হাতে খোলা দরজার পাল্লাটা ঠেলে ধরে, খুব সতর্কভাবে ছেলেগুলোকে লক্ষ্য করল জগা। বেশী নয় বড়জোর তেইশ-চব্বিশ হবে—জগার চেয়ে বয়সে ওরা সবাই ছোট। জামা-কাপড় বেশ ফাইন। শুধু চোখের কোলে ওদের প্রত্যেকেরই চাপ বাঁধা অন্ধকার, মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে। সন্ধেটা জল খেয়েই কাটিয়েছেন বাবুরা, এখন বোধ হয় আরো কিছু চাই—জ্যান্ত চাট।

ভাবল একবার জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবেন? তক্ষুনি খেয়াল হোল এদের সঙ্গে দিক্ করে সুবিধে হবে না। গাড়ী যখন গ্যারেজে সাড়ে নটার মধ্যেই তুলতে হবে, মালিকের কড়া হুকুম, তখন মিথ্যি-মিথ্যি নতুন বাহানা ঘাড়ে চাপানোর দরকার কি? প্যান্ট সার্ট দেখে তো মালুম হয় পকেটে রেস্ত আছে, এরা কি আর সহজে ছাড়বে। হয়তো সত্যি কোথাও যাবে না, চৌরঙ্গীতে ফাঁকা রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে দিদিদের সঙ্গে দরাদরি করবে। দেরী হলে নিরুপমা কাঁদবে। জগা শান্ত গলায় বলল—না দাদা, এখন গাড়ী গ্যারেজে তুলব। আমায় ছেড়ে দিন। আর একটা দেখুন।

কোথায় দেখব বাওয়া, তুমিই একটা দেখে দাও তাহলে—মিটারের গায়ে গড়িয়ে-পড়া ছেলেটার নেশা যে রীতিমত জমে উঠেছে, তা ওর গলার আওয়াজেই বুঝতে পারল জগা। ভদ্রলোকের সব ছেলে, জগা ওদের সম্মান দেখিয়ে আপনি বলল, অথচ জবাবে নির্দ্বিধায় অপরিচিত লোককে তুমি বলতে একটুও আটকাল না ওর। জগা তো ট্যাক্সিওয়ালা। রেগে লাভ নেই, দিনকাল ভাল না, তাই গলাটা একদম নামিয়ে আস্তে-আস্তে বলল—আমায় ছেড়ে দিন। সাড়ে নটার মধ্যে গ্যারেজে গাড়ি তুলতে হবে।

পেছন থেকে ল্যাপাপোছা মুখের একটি ছেলে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, সে তো অনেক দেরী, এখন তো মোটে পৌনে নটা।

না দাদা, পৌনে নটা হলে কি হবে, হাসি-হাসি মুখেই জগা সমস্যাটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে, গ্যারেজ তো সেই চড়ক-ডাঙ্গায়। গাড়ী তুলে, বাড়ী পৌঁছোতে পৌঁছোতে এগারোটা বেজে যাবে।

বাজুক শালা, উনি বাড়ী যাবেন, আমরা যাব না—মিটার ছেড়ে ধনুকের ছিলার মত টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল আগের ছেলেটি—ছোড় বাতেলা। শালা চড়কডাঙ্গা দেখাচ্ছে, ঘুঘুডাঙ্গা দেখিয়ে ছেড়ে দোব না। ওঠ বে ওঠ। উদিকে দেরী হয়ে যাবে।

তিনটে দরজা পট-পট খুলে গেল। ছেলে কটা মুহূর্তে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে। একজন গলায় স্কার্ফ খুলে আষ্টেপৃষ্ঠে মিটারটাকে জড়িয়ে নিয়ে একটা চুমু চেপে দিয়ে চিৎকার করে উঠল—শালা যেন চুমকি মাইরী। গোটা দলটা রসিকতায় উল্লাসে ফেটে পড়ে হাঁকার পাড়ল—চালাও পানসি সামবাজার।

টালিগঞ্জ ব্রীজ, রাসবিহারী, হাজরা, পূর্ণ সিনেমা, এলগিন রোড—একটার পর একটা মোড়, আলো-জ্বলা শহরের জয়েন্ট-গুলো মাড়িয়ে-গুঁড়িয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলল। বুক পকেটে সারা দিনের রোজগার। চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ হবে। ভোর সাতটা থেকে রাত নটা অবধি পরিশ্রমের ফসল। এর বারো আনাই যাবে মালিকের গোলায়, চার আনা মাত্র পাবে জগা। আর সেই চার আনার ওপর নির্ভর করে আছে পাঁচটি প্রাণী। ওদের দেখবার আর কেউ নেই। আজ যদি জগার কিছু হয় তাহলে...।

এই শালা উল্লু কাহাকার,—চিৎকারটা কানে আসতেই সামলে নেয় জগা। আর একটু হলেই টার্ণের মুখে অয়েল-ট্যাঙ্কারের তলায় সবশুদ্ধ ঢুকে যেত। পৌষের কালিয়ে-ওঠা শীতেও ফোটা-ফোটা ঘামের দানা ঘাড়ে গলায় কপালে গজিয়ে ওঠে। স্টিয়ারিং থেকে ডান হাতটা সরিয়ে এনে

ফেটো দিয়ে যায় মুহূর্তে-মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাবেন?

কেউ কোন জবাব দিল না। পেছনে চারজন নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত। পাশের দুজন হিন্দী সিনেমার গানে গলা ডুবিয়ে ফ্ল্যাট। বুকল এদের জিজ্ঞাসা করে এখন জবাব মিলবে না। গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞাসা করবে? সর্বনাশ! [illegible] কুয়েলেতে এখনো আধ মাইলটাক বাকী। ফলজে-ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ বাঁচাতে আসবে না। তার চেয়ে বরং পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে থামাবে—ওখানে সর্বদাই পুলিশ থাকে।

সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মাঝারী স্পীডে গাড়ী চালাতে লাগল জগা। চোখজোড়া সুমুখে ছুটে-আসা হেড লাইট থেকে গাড়ির আয়নায় টপ স্পীডে ছুটতে লাগল। কান পড়ে রইল পেছনের সীটে। শুনতে পেল টুকরো-টুকরো কথা—।

তিনুদার লেটেস্ট মালটাকে দেখেছিস। একদম গরম,—বোধ হয় ল্যাপা-পোঁছা-মুখের ছেলেটার গলা। পাশ থেকে আর একজন বলল, ধুর ওটাতো একটা কোল-বালিশ। সেদিন বাবার অফিসে একটা বা স্টেনো দেখেছি না। কথাকটা শেষ না করেই সড়াৎ করে জিভে ঝোল টানার আওয়াজ করল ছেলেটি।

হঠাৎ সামনের সীট থেকে গান বন্ধ করে একটি ছেলে হেঁকে উঠল—আর কি শালা পরীক্ষা-টরীক্ষা এদেশে হবে মাইরী? এতো ইচ্ছে ছিল নামের পাশে লিখব সঞ্জীব-কুমার রায় এম-এ। যেন কত বড় রসিকতা, ছেলেগুলো সব এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। আর তক্ষুনি সামনের সীটের অন্য ছেলেটি বিকট গলায় ধমকে উঠল—অ্যাই ব্যাটা। ইধার গাড়ি কিউ ভিড়াতা হ্যায় রে?

সঙ্গে-সঙ্গে বাদ বাকী কজন ধুঁয়া ধরল—কিউ বে? হিয়া পর কিউ? গাড়ি এখানে ধরাচ্ছিস কেন? শালা মামু দেখে গাড়ি ধরাচ্ছে। জান খিঁচে দোব না।

এর পর আর সাহস পেল না জগা। সার্জেন্ট দেখে পার্ক স্ট্রীটের মোড়েই থামাচ্ছিল। কিন্তু ওরা টের পেয়ে গেছে। ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে যদি এখুনি ছোরা-টোরা বার করে বা একটা পাইপ...। নিরুপমা জানলার শিকে ঠুকে-ঠুকে মাথাটা ফাটিয়ে ফেলবে। ঝর-ঝর করে রক্ত ঝরবে সরু সিঁথি ফাঁক হয়ে, মাত্র ন মাস আগে যেখানে নিজের হাতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে জগা।

লিন্ডসে স্ট্রীট, ধর্মতলার মোড় ছাড়িয়ে ওদের নির্দেশেই কপালিটোলার দিকে গাড়ী ঘোরাল জগা। চওড়া রাস্তা আস্তে-আস্তে সরু হয়ে এল। অফিস পাড়ার ঢাউস-ঢাউস বাড়ীগুলো এখন কোলাপ-সিবেল গেটের আড়ালে ঝিম মেরে পড়ে আছে। কানে আসছে কেতালা-বেসুরো [illegible]। টলতে-

টলতে আধ-ভেজানো দরজা ঠেলে মানুষজন বেরিয়ে আসছে আশ-পাশের কোন কোন বাড়ী থেকে। খুব সাবধানে তাদের পাশ কাটিয়ে সরু গলিটা যেখানে সমকোণে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে গাড়িটা ঘোরাতে গিয়েই হাতটা আলগা হয়ে খুলে এল স্টিয়ারিং থেকে, ব্রেকের ওপর পাটা অপনা-আপনি শিথিল হয়ে গেল। গলার কাছেই, খুব কাছে, ঠান্ডা অথচ শক্ত মত কি একটা এসে জানি ঠেকল। জগা মুখ ঘোরাতে-ঘোরাতে টের পেল, গাড়িটা ধাক্কা খাচ্ছে ল্যাম্প পোস্টের গায়ে, কানে এল—যা আছে চটপট বার কর শালা। ব্যাঁ করলেই ন্যাপলাখানা ঝলসে দেব।

পৌষের হিমঝরা সেই রাতে, গ্যারেজে গাড়ি তুলে দিয়ে জগা হাঁটতে-হাঁটতে যখন বাড়ী ফিরছিল তখন ল্যাম্প পোস্টের নির্জন আলোগুলো কেমন ম্লান হয়ে এসেছে। দু ধারে ঝাঁপ-ফেলা সারি-সারি দোকান-পাট। একা-একা এই পথে এত রাতে কোন দিন বাড়ী ফেরেনি জগা। অন্য পেত। কিন্তু প্রাণ [illegible] তাগিদে প্রাণের [illegible] সমেত বুকের কোণে জমা ভয়টুকুও ওদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে কেমন নির্ভার হাল্কা লাগছিল। একটা অবাক বিস্ময় ওকে বোবা করে দিয়েছে। এরা সবাই শিক্ষিত। কেউ-কেউ এম-এ পড়ে, বাড়ীর অবস্থা ভালো, তবু কত সহজে, কি অক্লেশে ছিনতাই, জবরদস্তি পেশায় হাত পাকাচ্ছে। কাল সকালে যখন জগার বাড়ীতে চায়ের জলও ফুটবে না, তখন তো এরা লেপের তলায় শুয়ে বেড-টির অপেক্ষায় খোয়াড়ি কাটাতে হাই তুলবে। পাড়ায়-পাড়ায় টহল দিয়ে রাত জেগে নেশা করে বেড়ালেও, সুখের ফোয়ারা এদের সামনে চিরদিনই উন্মুক্ত। হাঁটতে-হাঁটতে, বড় রাস্তা ছেড়ে, সরু ফালি গলি কয়েকটা পেরিয়ে বস্তি আর ফাঁকা মাঠের মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়াল জগা। সামনেই টালির চাল দেওয়া ওর বাসা। জানালায় অনেকগুলো মুখ। অন্ধকারে কার মুখে কি রেখা জেগে আছে, কিছুই পড়তে পারল না জগা। মনে-মনে তো জানে এখন সবাই আমরা [illegible] আছি।

—[illegible]

# পার্থসারথির প্রেম
# বিচ্ছিন্নতার মর্মপীড়া

অবিনাশবাবুর কোচিং ইনস্টিটিউশনের একজন শিক্ষক পার্থসারথি। অবিনাশবাবুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, পার্থ সাতাশ বছরের যুবক। পার্থ ছাড়া অবিনাশবাবুর কোচিং অচল। পার্থ প্রায় সব বিষয়েই পড়াতে পারে। আজ কয়েক দিন হল পার্থ কোন কিছুতে মন বসাতে পারছে না। তাই অবিনাশবাবু অস্থির হয়ে উঠেছেন। পার্থকে বাইরের ঘরে বসিয়ে অবিনাশবাবু আমাকে সংক্ষেপে পার্থ-পরিচিতি জানালেন।

—ও আর কাজ করতে পারবে না বলছে। ও কোন কিছু মনে করতে পারছে না, আমাদেরও ঠিক মত চিনতে পারছে না। বাইরে কোথাও চলে যেতে চায়। ও চলে গেলে প্রথমটায় আমার খানিকটা অসুবিধা হবে, কিন্তু সেটা আমি সামলে নিতে পারব। আমি ভাবছি ওর ভবিষ্যতের কথা। ছেলেটা খামখেয়ালীপনার জন্যে এ যাবৎ কোন কিছু করে উঠতে পারে নি। এম-এ পরীক্ষাটা কিছুতেই দিল না। অথচ ছাই সেকেণ্ড ক্লাস নম্বর পাওয়া ওর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। বাড়ীতে মা-বাবা ভাই-বোন সবাই আছে; কিন্তু ওর সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। বছর চারেক ও বাড়ী ছাড়া। আমার কোচিং-এ ও বাসা নিয়েছে। এই রকম একজন লোক সব সময়ে হাতের কাছে পাওয়াতে আমারও খুব সুবিধা হয়েছে। লাইব্রেরী থেকে বই আনে, বই পড়ে, নোট রাখে। নিয়মিতভাবে কোচিং-এর কোন কাজ করে না বটে, কিন্তু কোনো শিক্ষক না এলে, ও অনায়াসে তার বদলে পড়ানোর কাজ চালিয়ে দিতে পারে। হায়ার সেকেণ্ডারীর ইংরাজী, বাংলা, ইতিহাস, কোনটাতেই ওর আটকায় না। কথা খুব কম বলে, তবে যখন বলে তখন বেশ গুছিয়ে নিজের বক্তব্য জাহির করতে পারে। আমরা মানে আমি এবং আমার ইনস্টিটিউটের অন্যান্য শিক্ষকরা ওকে ভালবাসি। অল্পবয়সী শিক্ষক অধ্যাপকদের একটা আড্ডা জমে প্রতি রবিবার বিকেলে। সেখানে মাঝে-মাঝে ও কিছু বলে। ইয়ং জেনারেশনের সকলেই প্রায় ওর ভক্ত। মন্ত্রমুগ্ধ বলা চলে। কারণ, ওর র‍্যাডিক্যাল ধ্যান-ধারণা।- সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, সব ব্যাপারেই ওর মতামত অভিনব। আমরা বয়স্করা, ওর মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিই না বটে; কিন্তু ওর কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগে না। প্রচলিত সব কিছুর উপর ওর দারুণ অশ্রদ্ধা। অবিশ্বাস, সন্দেহ, হতাশা, ক্রোধ, অহঙ্কার, প্রকাশ পায় ওর বক্তব্যের ছত্রে-ছত্রে; তবু ওকে আমাদের ভাল লাগে। ওর লজিক আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাছাড়া ওর কোন বিষয়ে আসক্তি নেই বলেই ওর সঙ্গে আমাদের কারুর কোন বিষয়ে রেষারেষি নেই, বিরোধ নেই। তাই ওকে অনায়াসে ভালবাসতে পারি, ওর অদ্ভুত মতামত সহ্য করতে পারি। মাপ করবেন, ভূমিকাটা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এইবার কাজের কথায় আসি। মাস দুয়েক হল পার্থ আমাকে জানায় যে, আমার শ্যালিকা তার প্রেমে পড়েছে, অথচ সে চেষ্টা করেও গৌরীকে মানে আমার শ্যালিকাকে ভাল বাসতে পারছে না। এই কারণে সে বিচলিত। গৌরী আমার কাছে থাকে, কোচিং-এর ম্যানেজমেন্ট অনেকটা তারই হাতে। বছর চারেক আগে বাংলায় অনার্সসহ বি-এ পাশ করেছে। প্রাইভেটে এম-এ দেবার চেষ্টা করছে। তাকে পড়াশুনার ব্যাপারে পার্থ মাঝে-মাঝে সাহায্য করে থাকে। গৌরীকে কথাটা বলতে সে অবাক হয়ে গেল। তার কোন রকম দুর্বলতা আছে বলে আমার কোন দিন মনে হয় নি; তার সঙ্গে কথা-বার্তার পর বুঝলাম পার্থ ভুল ধারণা করেছে। তাছাড়া, গৌরী তার দিদির কাছে জানিয়েছে যে, বিয়ে সে করবেই না, যদিও করে পার্থকে তো নয়ই। একথা অবশ্য পার্থ জানে না। দু মাস ধরে তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। রবিবারের সভায় থাকে না, ক্লাস নিতে রাজী হয় না, পড়াশুনোতেও মন দিতে পারে না। কয়েক দিন আগে আমাকে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, সে গৌরীকে বোধ হয় ভালবাসে। তবে মুস্কিল এই যে, প্রচলিত রীতিতে সে গৌরীর পাণিগ্রহণ করতে পারবে না। বিবাহ নামক সংস্কারের সে ঘোরতর বিরোধী। গৌরীকে সে প্রেম বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে যে সব কথা বলেছে, তার পর তাকে বিবাহের কথা বলা চলে না। অথচ গৌরীকে ছাড়া তার জীবন দুর্বিসহ মনে হচ্ছে। আমি বললাম যে গৌরী তাকে পছন্দ করে বটে, কিন্তু পার্থ যে রকম ভাবছে, গৌরী সে রকম ভাবছে না। প্রেম বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে বর্তমানে গৌরীর কোন ইন্টারেস্ট নেই। ওকে আঘাত দেবার ইচ্ছা ছিল না বলেই খোলাখুলি বলতে পারলাম না যে গৌরী তাকে পছন্দ করে না। আমার এত সতর্কতা সত্ত্বেও পার্থ আহত হল। আমার সামান্য কথায় ও এতটা বিচলিত হবে, তার ফল এতটা গুরুতর হবে আমি ধারণা করতে পারি নি। পার্থ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। সারা দিন ফিরল না, রাতেও দেখা মিলল না। পরদিন নানা জায়গা খোঁজাখুঁজি করেও ওর পাত্তা পেলাম না। মাত্র কাল ওর সন্ধান পেয়েছি। বারাকপুরে এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ী থেকে ওকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে এসেছি। ও প্রথমটায় আমাদের চিনতে পারে নি। অচেনার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তবে আমাদের সঙ্গে আসতেও কোন আপত্তি করে নি। ইনস্টিটিউটে আমার পর ও গৌ[illegible] ভুলবে, ওখানে সে থাকবে না। বাইরে কোথাও [illegible]। [illegible] করে বোঝাতে

ডাক্তারের কাছে আসতে রাজী হয়েছে। ওর এই সব পাগলামী দেখে আমার স্ত্রী গৌরীকে নিয়ে বাসবদত্তা তার দাদার কাছে চলে গেছে। ওর নিজের জিনিসপত্র চিনতে পারছে, এই বাক্সগুলো নিয়ে নাড়াচাড়াও করছে, পড়বারও চেষ্টা করছে; কিন্তু বলছে ও নাকি কিছুই বুঝতে পারছে না।

পার্থকে দেখলাম। রোগা, লম্বা, মুখে দু-একটা বসন্তের দাগ, মাথায় অবিন্যস্ত চুল। অবিনাশবাবুকে সে আগে চিনতো কিনা বলতে পারল না। বর্তমানে সে অবিনাশবাবুর বাড়ীতে আছে। সে বাড়ীতে আগে কোন দিন ছিল কিনা জানে না। অবিনাশবাবুর সঙ্গে, তার ধারণা, দু-এক দিনের মধ্যে তার আলাপ হয়েছে।

সামান্য কিছু ওষুধপত্র ও হিপনটিক সাজেশানের ফলে তিন-চার দিনের মধ্যে পার্থ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল। এই ধরনের হিস্টিরিয়ার রোগীর সঙ্গে মনের কথার পাঠকদের পরিচয় আছে, কাজেই রোগ-বৃত্তান্ত নিয়ে বেশী কিছু বলব না। পার্থ-সারথির শৈশব ও কৈশোরের ইতিহাসের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। এই ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। আধুনিক তরুণ মনের অনেক চিন্তা-ভাবনা, বিচ্ছিন্নতার সামাজিক ও মানসিক কারণ, পার্থসারথিকে জানলে আমরা বুঝতে পারব।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে পার্থ। মাতা-পিতার প্রথম সন্তান। বাবা ডাক্তার; সারা দিন প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত। মা নার্স, তিনি স্বামীর এক নার্সিং হোম পরিচালনা করেন। পার্থ জন্ম থেকেই ধাইমার কাছে মানুষ। মা ও বাবা দুজনেই দিনান্তে এক-বার কি দুবার ওর খোঁজ-খবর নিতেন। শৈশব থেকেই পার্থ নিঃসঙ্গ। ঠাকুর, চাকর ও ধাইমাকে নিয়ে তার জগৎ। স্কুল-জীবনেও সে নিঃসঙ্গ বোধ করেছে। ছেলেদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে নি, খেলাধুলোয় কোনো উৎসাহ ছিল না, অন্য ছেলেরাও ওকে এড়িয়ে চলত। নিজের গড়া এক স্বপ্ন রাজ্যের মধ্যে ও বাস করত। সাত বছর বয়সে মায়ের দ্বিতীয় সন্তান জন্মানোর পর থেকে মনে হতে লাগল যে, ও যেন এ বাড়ীর কেউ নয়। ওকে বোধ হয় মা-বাবা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছেন। নিজের মায়ের সন্ধানে মাঝে-মাঝে রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হত। মনে হত, এই বড় রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কোন ছোট্ট ভাঙা বাড়ীর অন্ধকার ঘরে শুয়ে-শুয়ে মা বোধ হয় পার্থর কথা ভাবছে। আরো চার বছর পরে এল মায়ের কোলে আর একটি সন্তান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তানের প্রতি মা-বাবার অনেক বেশী ভালবাসা, অনেক বেশী আকর্ষণ। পার্থ নিজের ঘরে বসে-বসে ভাবত যে, সে আর একটু বড় হলেই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। তৃতীয় সন্তানের মা হবার পর থেকে পার্থজননী নার্সিং হোমের পরিচালনাভার ছেড়ে দিলেন। গৃহ-কর্মের কাজে মন লাগালেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির জন্যেই তিনি বাইরের কাজ থেকে অবসর নিলেন। পার্থ কিন্তু ব্যাপারটাকে ওভাবে দেখল না। তার মনে হল ছোট বোনের প্রতি স্নেহের টানেই মা বুঝি ঘর-মুখো হয়েছেন। মা মাঝে-মাঝে তার ঘরে আসতেন, তার বইপত্র গুছিয়ে দিতেন, তার মাথায় হাত রেখে আদর করতেন। পার্থ সহজ মনে এই আদর নিতে পারত না। মা চলে যাবার পরই জিনিসপত্র ছিটিয়ে, ঘরটাকে আবার অগোছাল করে রাখত। মায়ের ইচ্ছে ছিল পার্থ সায়েন্স নিয়ে পড়ুক; পাশ করে ইঞ্জিনীয়ারিং কিম্বা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবে। বাবাও হয়ত তাই চাইতেন, কিন্তু মুখ ফুটে কোন দিন কিছু বলেন নি। পার্থ ইতিহাস সংস্কৃত নিয়ে পড়বে জানাল। তাঁরা বিশেষ কিছু বললেন না। পাশ করে কলেজে ভর্তি হল। সেখানেও সে একা। মাঝে-মাঝে ক্লাসে দাঁড়িয়ে অধ্যাপকদের চমকে দেওয়ার মত প্রশ্ন তুলে সে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা এড়িয়েই চলল। ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা অনেক চেষ্টা করেও তাকে কোন দলে ভেড়াতে পারল না। মাঝে-মাঝে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে প্রশংসা লাভ করলেও, বক্তৃতা দেবার জন্যে কোন আমন্ত্রণ আসলে সে প্রত্যাখ্যান করত। পরীক্ষার আগে একদিন বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হল একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। ব্যাপারটা পার্থ তুচ্ছ মনে করলেও তার বাবা বোধহয় মনে করেন নি। বাবা ইলেকশনে দাঁড়াবেন বলে পাড়ার সর্বজনীন উৎসবে, ক্লাবের বাৎসরিক খেলাধুলোয়, বেশ মোটা চাঁদা দিয়ে পপুলার হবার চেষ্টা করছিলেন এবং নানা জায়গায় প্রাচীন ভারতের মহিমা কীর্তন করে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। খাবার টেবিলে তাঁর এই রকম একটা বক্তৃতা সম্বন্ধে পার্থর অভিমত জানতে চেয়ে-ছিলেন বাবা। পার্থ শুধু বলেছিল, প্রাচীনের মহিমা কীর্তন একটা সিলি ব্যাপার। মিথ্ তৈরী করা স্বার্থান্বেষীদের কাজ। পুরনো দিনের কোন সময় 'গোল্ডেন এজ' ছিল ভাবা আহাম্মুকী। আবার ভবিষ্যতের ইউটোপিয়া নিয়ে স্বপ্ন দেখাও বোকামী। বাবা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। উঠে যেতে যেতে বলেছিলেন, পুরনো থেকেই নতুনের জন্ম, শুধু তাই নয়; পুরনোই নতুনকে বাঁচিয়ে রাখে। বাপ-ঠাকুরদার পুরনো ছাদের তলায় নিশ্চিন্ত মনে বসে যেরূপ নতুনরা পুরনোকে অগ্রাহ্য করে, তাদের কোন মতেই সৎ বলা চলে না। সেই সন্ধ্যাতেই বাড়ী ছেড়ে একটা বোর্ডিং-এ উঠে যায় পার্থ। কয়েক দিন খুব কষ্টে কাটে। কোন মতে দুটো টিউশনী জোগাড় করে নিজের খরচা চালাতে থাকে। প্রথম দিকে মা-বাবা বিশেষ কোন খবর নিতেন না, ভেবেছিলেন রাগ কমলেই ফিরে আসবে। তারপর মা-বাবা পর-পর কয়েক দিন এসেও পার্থকে বাড়ী ফেরাতে পারেন নি। সেই থেকে ঘরের সঙ্গে বিচ্ছেদ। কয়েক বার পোস্টে চেক পাঠিয়েছেন বাবা, পার্থ চেক ছিঁড়ে ফেলেছে। এই টিউশনী করতে গিয়েই অবিনাশবাবুর সঙ্গে যোগা-যোগ, এবং তাঁর ইনস্টিটিউটে আশ্রয় লাভ ঘটে।

পার্থর শৈশবের ইতিহাসের মধ্যে সাম্প্রতিককালের অনেক তরুণের ইতি-হাসের ছায়া পড়েছে। কঠোর জীবন সংগ্রামে নিজেদের টিঁকিয়ে রাখা ও কেরিয়ার তৈরীর চেষ্টায় যে সব পিতা-মাতা অতি-মাত্রায় ব্যস্ত, তাঁরা স্বভাবতই সন্তানদের দিকে ঠিক মত নজর দিতে পারেন না। ছেলে-মেয়েরা অর্থকষ্টের মধ্যে মানুষ না হয়েও অনেকটা অযত্নে আগাছার মত বেড়ে ওঠে। গৃহের সঙ্গে, তাদের সংযোগসূত্র খুবই ক্ষীণ, উষ্ণ স্নেহ থেকে তারা বঞ্চিত। কাজেই তারা ক্রমশ পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পুরনো ঐতিহ্যের প্রতি, ট্রাডিশনের প্রতি তাদের কোন মমত্ববোধ থাকে না।

বর্তমান সম্পর্কেও তাদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা হয়ে ওঠে উদাসীন। মস্তিষ্কের বিশিষ্ট টাইপ

অনুভূতি তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে এই জীবনবিমুখতা। পার্থর দুর্বল মস্তিষ্কে বিপরীত আবেগজনিত স্নায়ুর প্রাধান্য। সে নিজেকে, অন্যকে সমাজকে বোঝবার জন্য যুক্তি-চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তার সমস্যার-সমাধানের চেষ্টা করেছে বিচ্ছিন্নভাবে, একান্ত নিজের চেষ্টায়। মস্তিষ্কের সহ্যক্ষমতা কম বলেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, একথা বলা চলে না। মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়লেই মানুষ নিউরোটিক হয়ে পড়ে না। অনেকের কাছে জীবনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা জীবনবোধকে বাড়ায়, জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। সমস্যা ছাড়া জীবন অনেকের কাছেই অর্থহীন। পার্থ কি সমস্যায় ভাবেই অসুস্থ? একই রকমের সমস্যা কেউ সমাধান করতে পারে, কেউ পারে না। মস্তিষ্কের সঙ্গে সব সময় এই সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার সম্পর্ক থাকে না। আমরা উপায় নেই জানলে অনেক কিছু সহ্য করতে পারি। যে দারিদ্র্য সুইডেন বা আমেরিকার মত দেশে অসহ্য মনে হয়, তার থেকে অনেক গুণ বেশী অভাব-অনটনের পীড়ন অনুন্নত দেশের মানুষ হাসিমুখে সহ্য করে। ইংরাজ আমলে যে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হয়েছি, তার থেকে অনেক বেশী অন্যায়-অত্যাচার আমরা মগ আর বর্গীর আমলে মুখ বুজে সহ্য করেছি। বাস্তব পরিবেশের অন্যায়-অবিচার দুঃখ-দারিদ্র্যের চাপে পড়লেই উপায়ান্তর না দেখে মানুষ বিপ্লব করে, এ ধারণা ঠিক নয়। ইতিহাস বলে যে, বরং যখন অবস্থার উন্নতি দেখা যায়, যখন চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে, যখন নিপীড়িত মানুষ বুঝতে পারে যে, তাদের দাবী-দাওয়া মেটবার পথ আছে, তখনই মানুষ চরম আত্মত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিয়ে বিপ্লবের তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুধু 'অবজেকটিভ বঞ্চনাবোধ' নয়, 'সাবজেকটিভ বঞ্চনাও' বিপ্লবের পূর্বশর্ত। ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্য, নিজের দেশকে উন্নত করার জন্য, সাময়িকভাবে মানুষ অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী। তেমনি ব্যক্তির সহ্যশক্তিও তার ভবিষ্যতের কল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত। যে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, সে বর্তমানের সমস্যা সমাধানে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করতে সক্ষম, সে সংকট নিরসনে আপ্রাণ সংগ্রাম করার ক্ষমতা রাখে। দুর্বল মস্তিষ্কই তখন সবল হয়ে ওঠে, নার্ভগুলো ইস্পাতের মত শক্ত হয়, মস্তিষ্ক ক্ষোভের উত্তেজনা-নিস্তেজনার সহ্যের পরিধি বেড়ে যায়। আমাদের পার্থ অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে, তাই তার সহ্যশক্তি নিঃশেষিত, তাই গৌরীর প্রত্যাখ্যানে সে মর্মাহত। ওর কথাতেই ওর মনোভাব জানাচ্ছি। বিচ্ছিন্নতা নিরসনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ওর মনে জেগেছে। ও সেটা বুঝতে পারছে না, কিম্বা বুঝেও স্বীকার করতে চাইছে না।

—আমি কোন কিছুর মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না, শুধু দেখে যেতে চাই। ছোটবেলায় মাকে দেখেছি। বাবাকে দেখেছি। সতীর্থদের দেখেছি। তাদের সঙ্গে কখনও নিজেকে জড়িয়ে ফেলি নি, সব সময় নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছি। আমার ছোট বোনটা একদিন বারান্দা থেকে পড়ে যায়, তার কপাল কেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে, আর্তস্বরে সে কাঁদতে থাকে; আমি তাকিয়ে দেখেছি শুধু। চাকর এসে তাকে তুলে নিয়েছে, রক্ত ধুইয়ে দিয়েছে থাইমা আইওডিন লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করেছে, আমি কিছু করি নি। আমার কোন ভাবান্তর ঘটে নি। রাস্তায় কেউ গাড়ী চাপা পড়লে আমি পাশ দিয়ে নির্বিকারভাবে হেঁটে চলে গেছি। দুঃখ-কষ্ট ভোগের জন্যেই জীব জন্মায়। অসংখ্য মানুষ এই মুহূর্তে কত রকমের দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছে, কল্পনা করতে পারেন কি? কেউ শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে পরিচিত পৃথিবীটাকে দেখতে চাইছে, কেউ ক্ষুধা মেটাবার জন্যে নিজের সব কিছু বেচে দিয়ে নিঃস্ব হতে চাইছে, কেউ প্রিয়জনের মৃত্যুশয্যার পাশে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রিয়জনের জন্যে আরও ক'বছরের পরমায়ু ভিক্ষা করছে। হয়ত এই মুহূর্তে আল্‌পস-এর শিখরে একটা ছোট প্লেন ভেঙে পড়ল। আরামপ্রিয় যাত্রীরা জ্বলন্ত প্লেন থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টায় পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে। এই তো জীবন। এই রকম ছিল, এই রকম থাকবে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট সেই দিনই শুধু দূর হতে পারে, যেদিন জীবনের স্রোতটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। আমি তাই কারুর দুঃখ-কষ্ট নিয়ে মাথা ঘামাই না, দুঃখ-কষ্টে বিচলিত হই না। কাউকে ভালবাসি না, কেউ আমাকে ভালবাসুক এও আমি চাই না। একটা বইয়ে সেদিন পড়ছিলাম মানুষের মিথ্ সৃষ্টির কথা। মিথ্যে মিথ্ সৃষ্টি করে মানুষ বাঁচার কষ্ট লাঘব করতে চায়। রামরাজ্যের মিথ, শ্রেণীহীন সমাজের মিথ, এক পৃথিবী এক জাতির মিথ্—এই সব মিথের মিথ্যা আশা দিয়ে ছেলে ভুলানো ছড়া লেখা যায়, বড়দের জীবন-আনুগত্য জাগান যায় না। তবে আমি ভালবাসলাম কেন? গৌরীকে ভালবাসলাম, প্রেমের মিথের ভিকটিম হলাম। আমি ভালবেসেছি কিনা এ সম্বন্ধে কিন্তু এখনও আমার সন্দেহ আছে। ভালবাসা আমার কাছে একটা শব্দ মাত্র। একটা অনাবিষ্কৃত দেশের স্বপ্ন দেখার দুর্বলতা মাঝে-মাঝে আমাকেও পেয়ে বসে। সেই যে, রাজপথটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা ভাঙা বাড়ী, তার মধ্যে একটা অন্ধকার ঘরে বসে একজন কাঁদছে। সেই একজন আমার মা। গৌরীকে দেখে হঠাৎ একদিন মনে হয়েছিল গৌরী বোধ হয় হারিয়ে-যাওয়া কোন কিছু খুঁজছে। আপনার সামনে বসে গৌরীর কথা শুনে বুঝেছি আমার ধারণা ভুল। গৌরী মিথ, প্রেমের মিথ ছেড়েও আমি সুস্থ থাকতে পারব। আমার কিন্তু সন্দেহ আছে।

—মনোবিদ
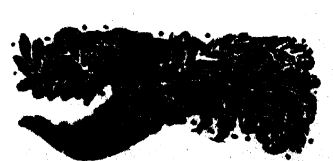
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুহূর্তে একটা সন্দেহে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাল বিনয়। তাহলে এই ব্যাপার। কিন্তু চেহারা দেখে বোঝবার জো নেই। মনে মনে হাসল সে। নীরবে হাঁটতে থাকে। পাশাপাশি মেয়েমানুষটি হেঁটে চলেছে। বারবার মুচকি হাসছে আর দু' চোখে বিদ্যুত কটাক্ষ।

—একটু আস্তে হাঁটুন।

—কী চাই? রুক্ষ কণ্ঠস্বর বিনয়ের, কেন বিরক্ত করছেন।

—চলুন না একটু গঙ্গার ধারে। প্লীজ।

—না! কঠিন চোখে তাকাল বিনয়, আমার কাছে টাকা নেই।

—সত্যি? স্ত্রীলোকটি থমকে দাঁড়াল। চোখমুখে বিষাদ আর হতাশা।

—তা। বিনয় এবার প্রায় ছুটতে থাকে। অনেকটা হাঁটার পর একবার পিছন ফিরে তাকায়। মিশে গেছে লোকজনের ভীড়ে বেবুশ্যে মেয়েমানুষটি।

আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। বরং তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে। শেফালীর হাসি মুখ সে দেখতে চায়। বাসে ওঠার আগে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা কিনল। তারপর কী ভেবে আপনমনে হাসল।

তেমন ভীড় নেই বাসে। বিনয় ফুলের গন্ধ শুঁকল কয়েকবার। আশ্চর্য! মীরা এত তাড়াতাড়ি পল্টুকে ভুলে...। শোভনের সঙ্গে কী এই প্রথম সিনেমা দেখছে? বোঝা যাচ্ছে ওদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা বোধকরি ঘনিষ্ঠ। মীরা কী নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছে? নতুন ভালবাসার মানুষকে নিয়ে? কী জানি...অদ্ভুত মীরা! কোনদিন ওর কাছে গোপন কিছু করে না। যাক্ কী হবে এসব ভেবে। যা খুশি করুক মীরা—হয়ত আবার আঘাত পাবে, আবার ব্যর্থতা আর চোখের জল!

লাফ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল। দরোজা বন্ধ। কড়া নাড়ল বেশ জোরে বিনয়। বেশ হালকা হয়ে গেছে মনটা। দরোজা খুলে যায়। শেফালীর গম্ভীর মুখ। সে একবার শুধু বিনয়ের দিকে তাকায়। তারপর মাথা নীচু করে রান্নাঘরের দিকে এগোয়।

বিনয় দেখল বারান্দায় তক্তপোষের ওপর মা শুয়ে। সে আস্তে আস্তে রান্না-ঘরের চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল। শেফালী মাথা নীচু করে আনাজ কুটছে।

—আর কী শরীর খারাপ? নীচু গলায় বিনয় বলে, দ্যাখ তোমার জন্য কী এনেছি।

মাথা তোলে না শেফালী। কোন জবাব দেয় না।

বিনয় এগিয়ে যায়। উবু হয়ে বসে শেফালীর মুখ এক হাতে তুলে ধরে। চুমু খেতে গেলে শেফালী ঘাড় নামিয়ে মুখ সরিয়ে তীব্রস্বরে বলে, থাক! আমাকে কাজ করতে দাও।

—এখনও রাগ কমেনি?

—রাগ কিসের। কার ওপর রাগ করবো?

—আমার ওপর। শেফালী একটু হাসিমুখে কথা বল। কেন এভাবে কষ্ট দিচ্ছ!

হাসল শেফালী, অবাক হচ্ছি তোমাকে দেখে। হঠাৎ ফুল?

—এমনি। বিনয় এবার অতর্কিতে নীচু হয়ে ঝপ্ করে চুমু খায় শেফালীর ঠোঁটে।

—ইস! মা রয়েছেন খেয়াল আছে

—শুয়ে আছেন এ সময়। শরীর খারাপ?

—জানি না। উনি আজকাল বোধহয় আমাকে সহ্য করতে পারছেন না।

—ছি শেফালী! বিনয় আহত কণ্ঠে বলল, তুমি মাকে চেন না। তোমাকে খুব ভালবাসেন। এমনকি আমার চেয়েও।

—তাই? বড় বড় চোখে শেফালী তাকাল, এবার [illegible]

[illegible]। বাইরে বেরোয়ো কিছু? সারাদিন মুখে [illegible] তোমার দিকে তাকিয়ে আমার কান্না [illegible]। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। কী [illegible] তুমি!

[illegible] [illegible] আমায় শেফালী বুকে [illegible] মুখ গুঁজে দেয়।

[illegible] কিছু বলতে চায় কিন্তু কোন [illegible] খুঁজে পায় না। যা ভেবেছিল তা নয়। [illegible] কাঁধে সে আলতোভাবে হাত রাখে। [illegible] চুপচাপ থাকা রীতিমত [illegible]। ক'দিন শেফালী কিছুক্ষণ। [illegible] রাতটা কেটে যাক।

[illegible] সে বারান্দায় দাঁড়ায়। মা [illegible] এ সময়ে ঘুমিয়ে থাকেন না। [illegible] কী? বিনয় পায়ে পায়ে এগোয়।

—মা। মা।

—কী? নীহার অবসন্ন কণ্ঠে বলেন, [illegible] এলি বিনু।

—[illegible] তোমার কপাল। বিনয় মার [illegible] দিকে তাকায়, শরীর খারাপ?

—ও কিছু না। নীহার দীর্ঘশ্বাস [illegible], তুই বিশ্রাম করগে।

বিনয় একপলক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে মার [illegible] লক্ষ্য করল। কেমন মলিন আর [illegible]। সে আর দাঁড়াল না। শোবার ঘরে ঢুকল। জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুম থেকে মুখ হাত ধুয়ে এল।

মা জানতে পারলে ভীষণ আঘাত পাবেন। বিনয় ঘাড়ে গলায় পাউডার [illegible]। তারপর বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরাল। না, ওদের জানান ঠিক হবে না। এমনকি শেফালীকেও নয়। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। অনেক ব্যাপার গোপন করতে হয়। তাতে সমস্ত দিক থেকে মঙ্গল।

হঠাৎ পল্টুর মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। ছেলেটা রজতদাকে দেখা মাত্র সব ভুলে গেল। নীহার তাকে একবার ফিরেও তাকাল না। আশ্চর্য।

জানালায় পর্দা কাঁপছে। বেশ হাওয়া ঢোকে এ ঘরে। প্রচুর রোদ ঢোকে। সিটি [illegible] জাহাজ গঙ্গার বুকে সাঁতার কাটছে। আজ খাওয়ার পর শেফালীকে সঙ্গে করে একটু গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবে কিনা ভাবল। কিন্তু মার কথা মনে পড়ল। সব সময়ে ফ্যাকাসে চোখমুখ। সে [illegible] দেখবে? [illegible] সামলাবে?

—চল একটু ছাদে যাই।

শেফালী গালে ক্রিম ঘষতে ঘষতে একবার তাকাল। শেফালীর শরীর থেকে সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে। সে [illegible] [illegible] ওপর পরপর কয়েকবার চুমু খেল।

—ঘুম পাচ্ছে। শেফালী ঘুরে দাঁড়াল। হাসিমুখ। মুখোমুখি দুজনে। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসল।

—আস্তে। শেফালী চোখ বুজে নিঃশব্দে হাসল। ঘনঘন নিশ্বাস ছাড়ল কয়েকবার। বিনয় শেফালীর জিভ কামড়ে ধরল। সর্বদা এক ভয়। কখন কী হয় বলা যায় না। সাবধানের মার নেই। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মাথার দিকের জানালার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো এসে বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়েছে। সেই আলোয় শেফালীর মুখ দেখল। দু'চোখ বোজা। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

—এক গ্লাস জল দাও। বিনয় কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে সামান্য উঠে শেফালীর হাত থেকে গ্লাস নিল। এক চুমুকে গ্লাস শেষ।

ঘুমোলে?

না। বিনয় হাত বাড়িয়ে শেফালীকে কাছে টেনে নেয়।

বিনয়ের বুকে মুখ গুঁজে শেফালী অস্ফুটস্বরে বলে, তুমি যা বলবে তাই শুনবো।

অনেকক্ষণ পর বিনয় টের পায় শেফালীর গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস। তার চোখে ঘুম আসে না। নানারকম চিন্তায় শুধু এ-পাশ ওপাশ করেছে। শেফালীর কথা ভেবে সে আপন মনে হাসল। না, কোন-কিছুতে তার বিশ্বাস নেই। দিনের আলোয় হয়ত সব পাল্টে যাবে। অতএব প্রস্তুত থাকা ভাল। যুদ্ধের জন্যে।

সে মশারি তুলে বাইরে এল। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। এক ঝলক হাওয়া এসে চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

। ষোল।।

মিঃ হনুমান প্রসাদের চেম্বার থেকে হাসিমুখে বেরোল রজত। নিজের চেম্বারে যাওয়ার আগে একবার আড়চোখে কর্মরত কেরানীদের দিকে তাকাল। তাকে দেখে মুহূর্তে যে যার কাজে গভীর মনোযোগ দিয়েছে। মৃদু গুঞ্জন চুপ। মনে মনে হাসল সে। বেয়ারা সেলাম ঠুকে উঠে দাঁড়ায়। সে গম্ভীর মুখে চেম্বারে ঢুকল।

চেয়ারে বসতেই চোখ পড়ল ঐ দিকে। ওখানে একদিন মীরা বসত। বহু দিন চেয়ার টেবিল খালি পড়েছিল। এখন সেখানে টাইপ মেসিনের খট্‌খট্‌ আওয়াজ। নতুন মুখ। মিসেস চন্দ্রাণী মুখার্জি। নতুন ঢুকেছে। স্টেনো-কাম সেক্রেটারী।

খুব তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকালে বোঝা যায় চন্দ্রাণী মুখার্জি বিবাহিতা। সিঁথিতে সামান্য সিঁদুরের আভাষ। চেহারা কথা-বার্তায় বেশ স্মার্ট। তিরিশের নীচে বয়স। ভদ্রমহিলা সাজসজ্জায় রীতিমত আধুনিকা। নিটোল স্বাস্থ্য। হ্যাঁ, মোটামুটি সুশ্রীও বলা যায়।

একটা লিফট পেয়েছে রজত। কাজ বেড়েছে। মিঃ হনুমানপ্রসাদ তাকে ডেকে অভিনন্দন জানালেন। লোকটা বুদ্ধিমান। কাজ আদায় করতে জানেন। আজকাল চার-দিকে যে রকম কল-কারখানা অফিসে ধর্মঘট। ছাঁটাই লে-অফ চলছে, তাতে কখন কী হয় বলা যায় না। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা খুব খারাপ। সতর্ক থাকা দরকার। এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে মিঃ হনুমানপ্রসাদের সঙ্গে।

সিগারেট ধরিয়ে কাজে মন দিল রজত। কিন্তু চিঠিটার দিকে তাকিয়ে তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। একবার তাকাল মিসেস মুখার্জির দিকে। মাথা নীচু করে টাইপ করছে।

—মিসেস মুখার্জি।

—স্যার।

উৎকণ্ঠিত মুখে মিসেস মুখার্জি কাছে এসে দাঁড়াল। একটা মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে। সোজাসুজি তাকাল না। অধস্তন কর্মচারীদের দিকে তাকাতে নেই। রজত চিঠির দিকে চোখ রেখে বলল, দুটো ভুল। রবার ব্যবহার করেছেন বোঝা যাচ্ছে। দু-এক জায়গার কালো-কালো দাগ। লে আউট ভাল লাগছে না। এই নিন। আবার টাইপ করুন।

চিঠিটা হাতে নিয়ে মিসেস মুখার্জি বলল, দুঃখিত স্যার।

রজত মাথা নীচু করে ফাইলের পাতা ওল্টায়। শুধু দুঃখিত বললে চলবে না। কাজ করতে হবে। তিনশ টাকা মাইনে তো এমনি দেওয়া হচ্ছে না। টের পায় মিসেস মুখার্জি নিজের সীটে ফিরে গেছে।

ইন্টারভিউ সেই নিয়েছিল। লোকজন নেওয়া বা প্রমোশন ইত্যাদির কর্তাব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সে। মিঃ হনুমানপ্রসাদ কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। দশজন পরীক্ষা দিয়ে-ছিল। মিসেস মুখার্জির চেয়ে যোগ্য ক্যান্ডি-ডেট যে ছিল না এমন নয়। তবে?

আলাদাভাবে সবাইকে চেম্বারে ডেকে-ছিল রজত। মিসেস মুখার্জির করুণ মুখ আর কাতর অনুরোধ শুনে সে আর স্থির থাকতে পারে নি। অসুস্থ স্বামী। বুড়ো শ্বশুর শাশুড়ি। ছোট ছোট দেওর ননদ। সাত-আটজনের সংসার। সুতরাং সহানুভূতি স্বাভাবিক।

চোখের জল ফেলতে শুধু বাকি। মিসেস মুখার্জির চোখের দিকে সে তাকাতে পারে নি। খারাপ লাগছিল। এইসব অভাব অভিযোগ—ভাল লাগে না শুনতে। সহ্য করতে পারে না।

—দেখুন কথা দিতে পারছি না। তবে চেষ্টা করবো।

প্রথম দিন কাজে জয়েন করে মিসেস মুখার্জি অন্তরঙ্গ সুরে বলেছিল, ধন্যবাদ স্যার। আপনার উপকারের কথা জীবনে ভুলবো না।

রজত কোন জবাব দেয় নি। বরং আশে-পাশে [illegible] কেউ যদি শোনে, হয়ত

মনোরঞ্জন ভাদুড়ে। সে তাড়াতাড়ি বলেছে, বলুন। ডিকটেশন দিন।

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল রজত।

—বড়বাবুকে ডাক।

সেদিন মিসেস মুখার্জির কথা শুনে সে মনে মনে হেসেছে। সে ভেবেছিল মানুষের উপকার আর করবে না। বরং পারলে অপকার করবে। মাঝে মাঝে তার ওদের কথা মনে হয়। হ্যাঁ, মীরাদের কথা। উপকার তো করেছিল। ঐ সময়ে মীরার চাকরি না হলে ওরা ভদ্রভাবে বাঁচতে পারত না। থিয়েটার লাইনে মীরা আর কিছুদিন থাকলে বেশ্যা বনে যেত। ওদের বাঁচাল সে। কিন্তু পরিবর্তে কী পেল? নির্মম আঘাত। কী দেমাক মীরার। ডিভোর্স চায়। বিনয় এসে প্রস্তাব জানায়। তার সঙ্গে একত্রে বসবাস নাকি মীরার পক্ষে অসম্মানজনক। হাউ ফানি!

—স্যার।

রজত ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, পরশু মিটিং। কালকের মধ্যে কাগজপত্র রেডি চাই।

—ঠিক আছে স্যার। বড়বাবু চশমার ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে তাকাল, ড্রাফট আমার তৈরী। শুধু আপনি দেখে দিলেই টাইপে চলে যাবে।

—নিয়ে আসুন।

বড়বাবু ড্রাফট রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। রজত ড্রাফটের ওপর চোখ বুলোয়। বেশ কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে দেখে বড়বাবু দাঁড়িয়ে। মনে মনে সে হাসে। সে না বলা পর্যন্ত যাবে না। মাঝে মাঝে এদের নিয়ে সে খেলা করে। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। প্রায় বাপের বয়সী। ওকে অনেক সময় ধমকায়। ভদ্রলোক ফ্যাকাসে চোখমুখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে হাত কচলায়।

—দাঁড়িয়ে আছেন কেন! কাজে যান।

প্রায় ছুটে পালায় বড়বাবু। রজত মৃদু হাসল আপনমনে। প্রতিহিংসা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে অনেক সময়। মনে হয় চরম একটা কিছু ঘটুক। লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক সবকিছু।

—মিসেস মুখার্জি।

—স্যার।

—আসতে হবে না। বসুন। যে ডিকটেশনগুলো দিয়েছিলাম টাইপ হয়েছে?

—আর একটা বাকী স্যার। দশ মিনিটের মধ্যে দিচ্ছি।

—তাড়াতাড়ি করুন।

গম্ভীর স্বরে কথা বলে রজত। মিসেস মুখার্জি প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে তার জন্যে সন্দেশ কিনে এনেছিল। সে তো প্রথমে অবাক। পরে কঠোর স্বরে বলেছিল, এসব কী?

কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল মিসেস মুখার্জির মুখ। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল।

—নিয়ে যান। আমি এসব পছন্দ করি না। আশা করি ভবিষ্যতে আপনি আর এরকম ভুল করবেন না।

কঠিন না হয়ে উপায় কী। দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। নইলে অফিস ডিসিপ্লিন বজায় থাকে না। একবার সহজ ব্যবহার করলে পেয়ে বসবে। অন্যায় সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে।

নির্মমভাবে সে ড্রাফটের ওপর কলম চালায়। ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যায়। এত বড় বড় শব্দ ব্যবহারের কী দরকার। আর এত অনাবশ্যক কথা কেন! বড়বাবুকে ডাকতে গিয়েও থেমে যায়। বেচারীকে আর কড়া কথা বলবে না। লাভ নেই কিছু।

ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। রজত টেলিফোন তুলে বলল, রজত বোস বলছি।

—আমি লতা।

—কী খবর?

—তোমার কোন পাত্তাই নেই দেখছি। পর পর দুদিন তোমার ফ্লাটে খোঁজ করেছি। আজ সন্ধেবেলা তুমি কী ফ্রি আছ?

—না। রজত এক মুহূর্ত কী ভেবে বলল, মিঃ মেননের কী খবর?

—জানি না। রজত, দিন দিন তুমি কেমন যেন হয়ে উঠছো। তুমি কী আমার সঙ্গ চাও না?

রজত কোন উত্তর দিল না। চুপচাপ রিসিভার কানে লাগিয়ে বসে রইল। ওদিক থেকে লতার অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। অনবরত 'হ্যালো' 'হ্যালো'। রীতিমত অসহ্য। রজত বেশ জোরে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

—স্যার। মিসেস মুখার্জি টেবিলের ওপর চিঠিগুলো রাখে। রজত একবার তাকায়। ভদ্রমহিলার মুখ কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। চোখাচোখি হতে সে মাথা নীচু করে চিঠিগুলোর ওপর নজর বোলায়।

তাড়াতাড়ি সে একটার পর একটা চিঠিতে সই করে। ওরই মধ্যে দেখে নেয় ভুল-টুল আছে কিনা। টিফিনের সময় হয়েছে। আজ আর বাইরে যাবে না।

মিসেস মুখার্জি টিফিন করতে বেরিয়ে যায়।

রজত কফির কাপে চুমুক দেয়। লতাকে খুব হতাশ করেছে। না, আর এসব ভাল লাগে না। লতার মতলব খুব সুবিধের নয়। ও শুধু চেনে টাকা। যে বেশি টাকা ঢালতে পারবে তার সঙ্গে শোবে। অথচ বাইরে এমন ভাব দেখাবে যেন খুব সতী-সাধ্বী!

কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করেছে পল্টুকে। থাকে স্কুলসংলগ্ন হোস্টেলে। মাসে দু-তিনবার গিয়ে দেখে আসে। পকেট ভর্তি টফি চকলেট নিয়ে যায়। বড় হলে ওকে বাইরে পাঠাবে। অবশ্য যদি ব্রিলিয়ান্ট হয়।

পারল না মীরা পল্টুকে ধরে রাখতে। হিংস্র আনন্দে রজত একটু শব্দ করে হাসল। মনে পড়ছে বিনয়ের অসহায় মুখ। মীরা বারবার পল্টুকে কোলে নিতে চায়. পল্টু আরও বেশি করে ওকে আঁকড়ে ধরে। সে এক মজার দৃশ্য।

এবার দেখবো তোমার জেদ অহঙ্কার কোথায় যায়। মীরার উদ্দেশ্যে রজত মনে মনে বলে, কতদিন বাঁচো জানার মত ক্ষমতা আছে অনুমান করব. ছেলেকে আমি কাছে থাকতে দেব না। সব সময় তাকে পাওয়ার কুকুরের মত ছুটবে তুমি। পালাবে কোথায়?

এখন একবার দেখতে ইচ্ছে করে কেমনভাবে বেঁচে আছে মীরা। কিছু না, নিছক কৌতূহল। পল্টুর শোকে বিমর্ষ, নাকি বেমালুম সব ভুলে গেছে?

—স্যার।

রজত চমকে তাকাল মিসেস মুখার্জির দিকে। হাতঘড়ি দেখল। ইস্। অনেকটা সময় সে আজেবাজে চিন্তায় নষ্ট করেছে। অথচ কত কাজ। অফিসে বসে স্মৃতিচারণ বা আবোলতাবোল সময় কাটানোর জন্যে মিঃ হনুমানপ্রসাদ তাকে মোটা মাইনে দেন না।

—বলুন। রজত বড়বাবুর দেওয়া ড্রাফট পড়তে থাকে। এত ঘনঘন কেন যে এই ভদ্রমহিলা তার কাছে আসে সে বুঝতে পারে না। নির্বোধ নয়। তবে?

—কালকের দিনটা আমার ছুটি দরকার।

বুড়ো শ্বশুরের খুব জ্বর। বড় কেউ নেই যে, দেখাশুনা করবে। আর শাশুড়ি তো বাতের ব্যথায় অথর্বভাবে চলাফেরা করতে পারে না। স্বামীবেচারী শয্যাশায়ী গত দুবছর। তার সাংঘাতিক ব্যাধি। হ্যাঁ, রাজরোগ। চিকিৎসা প্রথম থেকে ভালভাবে হয় নি। কীভাবে হবে? মিসেস মুখার্জি সামান্য যা রোজগার করত, বেসরকারী অফিসে একশ টাকার টাইপিস্ট; আর শ্বশুরের পেনশনের সামান্য টাকা, সবার কোন রকমে দুবেলা আহার জুটত। ধৈর্য ধরে সর্বস্বান্ত শিখে, দুটো বছর ভাল কাটে হয়নি, এখন না হয় মোটামুটি একটা ভাল চাকরী ইত্যাদি।

—দেখুন মিসেস মুখার্জি। রজত চেয়ারে হেলান দিল, মনে রাখবেন আপনার নতুন চাকরী। আর মিঃ হনুমানপ্রসাদ আপনার কাজে বিশেষ সন্তুষ্ট নন। আপনাকে সময় দেওয়া হচ্ছে। ভালভাবে কাজ শিখবেন। আপনার দায়িত্ব অনেক। সমস্ত দরকারী ফাইল আপনার কাছে। আপনি অফিস কামাই করলে চলে কি করে। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে যে ছুটি চাইছেন বুঝতে পারছি।

—আমার খুব দরকার। নইলে বিরক্ত করতাম না।

—ঠিক আছে। দরখাস্ত দেবেন। তবে মনে রাখবেন আপনার নতুন চাকরী।

মিসেস মুখার্জি নিঃশব্দে ফিরে যায়।

রজত টেবিলের দুধারে স্তূপীকৃত ফাইলের দিকে তাকাল। আজ ছুটির পর ঘণ্টা দুয়েক বসে কাজ করতে হবে। নইলে কাজ সারতে পারবে না। মিসেস মুখার্জিকেও থাকতে বলবে।

বেল বাজাতে বেয়ারা ছুটে এল। বড়বাবুকে খবর দাও। বড়বাবু টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতে রজত ড্রাফট এগিয়ে বলে, এখুনি টাইপ করতে দিন। ড্রাফট ঠিক তৈরী

[illegible] অনুগ্রহ? বল, তোমার মত [illegible] ভাবেন না।

বাইরে বেরিয়ে বড়বাবু নিশ্চয়ই ওকে পাকড়াও করেছে। শুধু বড়বাবু কেন, অন্যান্য কর্মচারীরা নিশ্চয় ওর বাপ চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে। হ্যাঁ, ওদের চোখে সে মোটেই প্রশংসার ব্যক্তি নয়। সে জন্যে মনে কোন ক্ষোভ নেই। সংসারে এই নিয়ম।

—স্যার! বেয়ারা একটা স্লিপ এগিয়ে দেয়। রজত স্লিপের দিকে একবার তাকিয়ে খানিকটা অবাক। বিমল এতদিন পর কী জন্যে তার কাছে এসেছে?

—নিয়ে এসো।

রজত হাসিমুখে বিমলকে অভ্যর্থনা জানায়, পথ ভুলে নাকি? বস।

বিমল একটু হাসার চেষ্টা করল। গালে কয়েক দিনের জমানো দাড়ি। চোখমুখ শুকনো। পোশাক পরিচ্ছদ খুব শোভন নয়। খুব দ্রুত এসব দেখে নিল রজত।

—কেমন আছ রজতদা? বিমল রজতের দেওয়া সিগারেট টানতে থাকে। পিছন ফিরে একবার ভদ্রমহিলাকে দেখবে নাকি? বেশ চেকনাই চেহারা! একেবারে নিজের ঘরে বসিয়েছে রজতদা।

—চলে যাচ্ছে। রজত বেয়ারা ডেকে চা আনতে নির্দেশ করল, তোমার কী শরীর খারাপ বিমল?

—আমার নয়। বিমল মাথা নীচু করে কী যেন ভাবতে থাকে। ওর দিকে তাকিয়ে রজত অস্বস্তি বোধ করল। কেউ এসে যদি বলে ভাল নেই, তাতে সে ভয় পায়। বিশেষ করে পরিচিতজন হলে তো কথাই নেই।

—রজতদা আমি বড় বিপদে পড়েছি। তোমার সাহায্য চাইছি।

রজতের দুটি হাত চেপে ধরে বিমল। করুণ অসহায় চোখমুখ। বেয়ারা দু'কাপ চা রেখে চলে যায়।

—চা খাও বিমল। অতি কষ্টে হাত ছাড়িয়ে নিল রজত, কী হয়েছে?

—তোমার বোনের খুব অসুখ। তুমি তো আর কোন দিন গেলে না। হাসপাতালে রয়েছে। আমার এখুনি দুশো টাকার দরকার।

রজতের মুখের হাসি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। বিপদে পড়ে এসেছে। নইলে আসত না। এতদিন কোন খোঁজখবর নেয় নি। আর কাছে প্রয়োজন ছাড়া কেউ আসে না।

—তোমার প্রিয় বন্ধুর কাছে না গিয়ে আমার কাছে যে বড় এলে!

—ওর কথা আর বলবেন না রজতদা। বিমল ক্ষুব্ধস্বরে বলে, বিমর আজকাল পথেঘাটে দেখা হলে এড়িয়ে যায়। আমাদের হয়ত আর আজকাল মানুষ বলেই গণ্য করে না।

—ভাই নাকি! রজত মৃদু হাসল, তোমার বন্ধু, তুমি ভাল জান।

—বাদ দিন ওর কথা। বিমল একটু ইতস্ততঃ করে বলল, যেমন ভাই তেমন বোন। আমি সব শুনেছি রজতদা। আপনার সঙ্গে আর বনিবনা হয় না...। আপনি রাগ করবেন না। বলতে দিন। আপনি কাজের মানুষ, অনেক খবর রাখেন না। এদিকে কিন্তু যেন...জানি না ভদ্রলোক কে... হাসতে হাসতে সিনেমা হলে ঢুকছে...।

—বিমল! রজত চিৎকার করে উঠল। বেশ জোরে।

মিসেস মুখার্জি চমকে ফিরে তাকাল। বাইরে বেয়ারা একবার ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। ওঘরে বড়বাবু আর অন্যান্য কর্মচারীরা চমকে একে অন্যের দিকে তাকাল।

বিমলের মুখ সাদা রক্তশূন্য। সে মাথা নীচু করে বসে থাকে।

একশো টাকার দুটো নোট বিমলের হাতে গুঁজে দেয় রজত, লিভ মি এলোন!

একরকম ছুটে পালিয়ে যায় বিমল।

রজত টের পেল সমস্ত শরীর দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। সে একবার আড়চোখে মিসেস মুখার্জিকে দেখল। সে কী খুব জোরে চিৎকার করে উঠেছিল? সিনেমাহল...মীরা... ভদ্রলোক... হাসতে হাসতে... ...অন্ধকার হল...হাতে হাত বাহুতে বাহু ছোঁয়াছুঁয়ি...কে ভদ্রলোক... কবে... মীরা... পল্টুকে ভুলে......।

—মিসেস মুখার্জি।

—স্যার।

—অনেক কাজ জমেছে। আজ ঘন্টা দুয়েক অফিসের পর থাকতে হবে।

—স্যার। শ্বশুরের অসুখ—তাড়াতাড়ি না ফিরলে...।

—দেখুন মিসেস মুখার্জি, প্রয়োজনে অফিসের পর কাজ করতে হয়। শুধু নিজের সুখ-সুবিধে দেখলে চলে না। আপনি তো এমনি কাজ করবেন না—ওভারটাইম পাবেন।

—স্যার।

—বলুন। রজত ভ্রূ কুঁচকে চন্দ্রাণীর দিকে তাকাল।

—কিছু না। মিসেস মুখার্জি সীটে ফিরে যায়। মলিন চোখমুখ।

সমস্ত চিন্তা ভাবনা বিসর্জন দিয়ে রজত ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। কালো কালো অক্ষর। ঝাপসা লাগছে। টনটন করছে দু' চোখের পাতা। এভাবে অনেকটা সময় কেটে যায়।

—স্যার।

—কী? রজত বড়বাবুর ক্লান্ত ফ্যাকাসে মুখ দেখল। বলল, আপনি যান। কাল বারটার মধ্যে মিটিংয়ের সমস্ত কাগজপত্র তৈরী যেন থাকে।

বড়বাবু ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

মুখে কলম কামড়ে থাকে রজত। মাঝে মাঝে মিসেস মুখার্জিকে ডেকে ডিকটেশন দেয়। স্তব্ধতার মধ্যে শুধু টাইপ মেসিনের খটাখট আওয়াজ। দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ। মাঝে মাঝে মোটরের হর্ণ ক্ষীণশব্দে ভেসে আসে।

কাজের মধ্যে ডুবে যদি সব ভুলে যেতে পারত সে!

অসহিষ্ণু শব্দে কলিং বেল বাজায়। বেয়ারা এলে তাকে দু'কাপ চা আনতে নির্দেশ জানায়। মিসেস মুখার্জির মুখ দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এই মহিলা স্বামী-শ্বশুর সম্পর্কে যা সব বলে তা কী সত্যি? অনেক সময় মনে হয় বানানো। শুধু এসব বলে সহানুভূতি আকর্ষণ করা। মিসেস মুখার্জিকে, মাঝে মাঝে একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে, শুধু একটা কথা ভাবলে; আর নতুন করে কোন রমণীর সঙ্গে হৃদয় সম্পর্ক বা অন্য কিছু, কোন রকম উৎসাহ পায় না সে। বরং কেউ স্বেচ্ছায় এলে, যেমন লতা, আকর্ষণ কম নয়, তবু তাকে বিমুখ করেছে। অবশ্য এই মনোভাব তার কতদিন থাকবে বলতে পারছে না। নিজেকেই সে চেনে না।

কে ভদ্রলোক? মীরার দ্বারা কী তা সম্ভব? হয়তো। ও সব কিছু পারে। কখনও সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলতে বা এই রকম অনেক কিছু। তার ধারণা ভুল। পল্টুর জন্যে শোক প্রকাশ তো দূরের কথা—বরং নতুন প্রেমে...।

—স্যার।

—বসুন। চা খান।

মিসেস মুখার্জি মাথা নীচু করে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

—সব চিঠি টাইপ হয়েছে?

—দুটো বাকী স্যার। এখুনি হয়ে যাবে।

—আজ থাক। প্রায় সাতটা বাজে। আপনাকে আবার অনেকটা দূর যেতে হবে। কোথায় যেন থাকেন আপনি?

—যাদবপুর। একটা কলোনীতে।

—চলুন ওঠা যাক।

বেয়ারা উঠে সেলাম জানায়। পাশাপাশি দুজনে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে থাকে। নীরবে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। বাসস্ট্যান্ড। প্রচুর নরনারী অপেক্ষারত।

একটা বাস এসে দাঁড়ায়। মানুষে বোঝাই। মিসেস মুখার্জি একবার তাকায় রজতের দিকে। রজত অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানছে। মানুষজনের দিকে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকায়।

—দেখুন মিসেস মুখার্জি। আমি দুঃখিত। অফিসের পর কাজ করতে হল বলে। মনে কোন ক্ষোভ রাখবেন না। চলুন একটা ট্যাকসী করে আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

চলমান একটা খালি ট্যাকসী সৌভাগ্যক্রমে পেয়ে যায় রজত।

—স্যার। মিসেস মুখার্জি চমকে ওঠে, কী দরকার ট্যাকসীর। আমি বাসেই যেতে

পারব। আপনি আর [illegible] কষ্ট করবেন মিছিমিছি।

ট্যাকসীর দরোজা খুলে রজত শান্ত-স্বরে বলল, উঠুন। আমার জন্য ভাববেন না। অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

সামান্য ইতস্তত করল মিসেস মুখার্জি। একবার তাকাল রজতের দিকে। মুখে সামান্য হাসি। তারপর মাথা নীচু করে ট্যাকসীতে উঠে যায়। রজত সীটে বসে দরোজা বন্ধ করতে করতে ভাবল, কেন হাসি! গম্ভীরস্বরে সে ড্রাইভারকে যাদবপুর যেতে নির্দেশ করল।

॥ সতের ॥

বিস্ফারিত চোখে অনুভার দিকে তাকায় মীরা। থর থর করে সমস্ত শরীর কাঁপছে। বীথুর সঙ্গে চোখাচোখি হল একবার। বীথুর দুচোখে ঘৃণা। অনুভার দুচোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। ঘরের এক-কোণে শোভন দাঁড়িয়ে। কঠিন চোখমুখ। পর্দার আড়ালে হিমাদ্রীবাবুর অশান্ত পদ-চারণা।

—ছি ছি! তোমাকে আমরা চিনতে পারিনি। তুমি যে এত নীচ কে জানত।

—বৌদি! শোভন উত্তেজিতভাবে এক পা এগিয়ে এল, কেন ওকে বিরক্ত করছো! বীথু, বৌদিকে নিয়ে ওপরে যা। আর নাটক করিস না।

—তুমি থাম! বীথু তিক্তস্বরে বলে, তোমাদের ব্যাপার জানতে আর বাকি নেই। নাটক তো তোমরা শুরু করেছো! লজ্জা থাকলে আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে না!

অনুভা চিৎকার করে বলল, এটা ভদ্র-লোকের বাড়ি। এখানে ওসব অনাসৃষ্টি চলতে দেব না। তুমি অন্যত্র চলে যাও মীরা। হ্যাঁ, আজ রাত্রেই। যত তাড়াতাড়ি পাপ বিদেয় হয় তত মঙ্গল।

—আজ রাত্রেই? মীরার কন্ঠস্বর খুব শান্ত, আপনি আস্তে কথা বলুন বৌদি। বীথু, আজ রাতটাও কী আমাকে থাকতে দিবি না

—না। বীথু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, মানুষের ভাল করতে নেই। উঃ তুই যে শেষকালে এমন একটা......। বৌদি, এখান থেকে তাড়াতাড়ি চল। আমার মাথা ঘুরছে।

অনুভাকে একরকম ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় বীথু।

মাথা ঝিমঝিম করছে। মীরা অতিকষ্টে এগোয়। তক্তপোষের একটা কোণ ধরে নিজেকে সামলায়। একবার তাকায় শোভনের দিকে। বিবর্ণ চোখমুখ। বারান্দায় এখন আর কেউ পায়চারী করছে না।

উঃ মাগো! মীরা অস্ফুটে কান্নায় তক্ত-পোষের ওপর আছড়ে পড়ে। কাঁধের ওপর নরম স্পর্শ। শিরশির করে উঠল সমস্ত দেহ। এক ধরনের তীব্র উত্তেজনা পলকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

—ওঠ। ছি! এখন ভেঙে পড়লে চলবে না মীরা।

—চুপ করুন। মীরা আরক্তিম চোখে তাকায়, আপনি কেন আমার পেছনে লেগে-ছেন? এত রাত্রে কোথায় যাই। এখন কী করবো?

শোভনের মুখ পলকে ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। সে এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল। আস্তে আস্তে মুখে হাসি ফুটল।

—তোমার দাদার কাছে ফিরে যাও মীরা।

—না। মীরা শাড়ির আঁচল দিয়ে দু'-চোখ মুছল, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলে যান। আপনার জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা।

শোভন হাসল, তোমার মাথার ঠিক নেই। এমন কী হয়েছে যে, এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছো। এক কাজ কর। বাথরুম থেকে চোখমুখ ধুয়ে এস।

হাসবেন না ওভাবে। আপনার বৌদি কী সব বলল......ছি ছি ছি!

—বলুক। মিথ্যে তো বলেনি।

—তার মানে? মীরার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, মিথ্যে নয়। আপনি কী ইয়ারকি করছেন।

শোভন চোখ বড় বড় করে বলে, এখন কী ইয়ারকি করবার সময়। তবে কী জান, তথ্যের দিক দিয়ে ওদের কোন ভুল হয়নি। এটা তো সত্যি, আমরা দুজনে বেশ কয়েক-দিন সিনেমা দেখেছি, গঙ্গার ধারে বেড়িয়েছি, হোটেলে পাশাপাশি বসে চপ-কাটলেট খেয়েছি। তুমি রাস্তায় হাঁটার সময় মাঝে মাঝেই হেসে উঠেছো, এক আধবার আলতোভাবে আমার হাত চেপে ধরেছো......। তা এতে দোষের কী থাকতে পারে জানি না। হয়তো বীথু এমন সব মুহূর্তে আমাদের দেখেছে। তার-পর সবিস্তারে বলেছে বৌদিকে। মান্য রং মিশিয়ে। কী হল তাতে? কী এসে যায়? তোমার যা খুশি তাই করবে। তুমি কী ভয় পাচ্ছ মীরা?

—হ্যাঁ। মীরা হঠাৎ তক্তপোষের তলা থেকে চামড়ার সুটকেস বের করল। তারপর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে চাবি এনে সুটকেস খুলল। আলনা থেকে একে একে শাড়ি ব্লাউজ এনে সুটকেসের ভিতর রাখল।

—এসব কী! শোভন একটা সিগারেট ধরিয়ে শূন্যে রিং করল কয়েকবার, লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না। কোথায় যাবে?

সুটকেস বন্ধ করে মীরা ঘরের চারি-দিকটা একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিল। শোভনের কথার কোন জবাব না দিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে যায়। একটু পরে ফিরে আসে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছে। আয়নার সামনে দাঁড়ায়। চুলে আলতোভাবে চিরুনি বোলায়। মুখে সামান্য পাউডার মাখে। তারপর শোভনের দিকে ফিরে এক পলক তাকিয়ে সুটকেস হাতে তুলে নেয়। এবং দ্রুতপায়ে পর্দা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে যায়।

পিছন ফিরে তাকায় না মীরা। দ্রুত হাঁটতে থাকে। [illegible] শোভন আসছে। বুক কেঁপে ওঠে। চারি-দিকে তাকায়। একটা ট্যাকসী দরকার। কিন্তু কোথায় সে যাবে?

—মীরা! মীরা!

শোভন এবার পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। এভাবে সে মীরাকে একা ছেড়ে দিতে পারে না। ভীষণ রেগে উঠেছে মীরা। ওকে কীভাবে শান্ত করবে ভাবতে থাকে সে।

—আপনি আসছেন কেন! মীরা তাকায় না শোভনের দিকে, ভয়ের চাবি বীথুকে দিয়ে দেবেন। আর তাকায় টাকাটা।

—কিন্তু যাচ্ছ কোথায়?

—জানি না। আপনি ফিরে যান।

—না। তোমাকে একভাবে ছেড়ে দিতে পারি না।

—কেন! আপনি কী আমার গার্জি-য়ান? দেখুন শোভনবাবু, মিথ্যে আমার সঙ্গে আসবেন না। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন।

—কী রকম? শোভনের মুখে অল্প হাসি, একটু আস্তে হাঁট।

—দু' একদিন সিনেমা দেখা কিম্বা গঙ্গার ধারে বেড়ানো..... আপনি তো আর অপরিচিত কেউ না......বান্ধবীর দাদা...... কিন্তু এতে অন্যরকম ভাববেন না......।

—কী রকম? এবারও শোভনের হাসি, হাসিমুখ।

—জানি না। মীরা হঠাৎ দাঁড়ায়, হাস-বেন না ওভাবে। দেখুন, আপনি চলে যান আমার বলছি। নইলে লোকজন ডাকব।

—ডাক। উদাস কন্ঠস্বর শোভনের, দেরী করছো কেন মীরা।

কিন্তু ডাকবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না মীরার। সে নীরবে হাঁটতে থাকে। মনে মনে হাসল শোভন। কেমনভাবে যেন সে নিজের অজান্তে জড়িয়ে পড়েছে মীরার সুখ-দুঃখের সঙ্গে। যাও বললেই সে চলে যেতে পারে না। কিন্তু কোথায় যেতে চায় মীরা এত রাত্রে?

—শোভনবাবু।

—কী হুকুম মীরা। শোভন মুখ টিপে হাসল, এভাবে যদি সারারাত হাঁটা যায়..... একটু পরে লোকজন কমে আসবে, মোটরের হর্ণ শোনা যাবে না, চতুর্দিকে স্তব্ধতা, শুধু কঠিন ফুটপাথের ওপর আমাদের পদ-শব্দ, মাঝে মাঝে পুলিশ......তাই করা যাক, হাঁটিবে সারারাত?

আমার মাথা খারাপ হয়নি। আপনি হঠাৎ রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন? শুনুন, এখন হাসি ঠাট্টার সময় নয়। আজ রাত্রের মত একটা মাথা গোঁজার ব্যবস্থা হলে......।

—চল আমার সঙ্গে। শোভন একটা রিকশা ডাক দিল।

—কোথায়?

—উঠে এসে রিকশায় বস। তারপর বলছি।

মীরা সঙ্কুচিত হয়ে সীটের এক কোণে বসেছে। কিন্তু মাঝে মাঝেই টাল সামলাতে পারছে না। ফলে ছোঁয়াছুঁয়ি। বুকের ভিতর এত কাঁপুনি কেন। মীরা শোভনের বুকের

দিকে তাকাতে পারছে না। যদিও টের পাচ্ছিল একজোড়া চোখের অতল চাহনি।

আলতোভাবে মীরার কাঁধ স্পর্শ করল শোভন, আমাকে কী অবিশ্বাস কর তুমি? এটা জানবে আমার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

—কোথায় যাচ্ছি?

—এত রাত্রে আর কোথায় যাব। কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি। ওর ওখানেই উঠতে হবে। ভয় নেই, বন্ধু বিবাহিত। চরিত্র ভাল। স্ত্রীর কথার অবাধ্য হয় না। কোনরকম নেশা নেই। যাকে বলে আদর্শ স্বামী।

মীরা ভ্রূকুঁচকে তাকাল। মিটমিট করে হাসছে শোভন। শুধু ইয়ারকি। আশ্চর্য! কোনরকম চিন্তা ভাবনা নেই। সমস্ত কিছুকে সিগারেটের ধোঁয়ার মত উড়িয়ে দিতে চায়। মনে পড়ছে একে একে সব। মিথ্যে নয় কিছু। শুধু শোভন নয়, সেও এগিয়ে এসেছে। একত্রে সিনেমা দেখা, রেস্টুরেন্টে বসে পরস্পরের দিকে গভীর চোখে তাকানো, ভীড়ের মধ্যে পাশাপাশি মন্থরে হাঁটা......তাহলে এসব কী? না, প্রেম ভালবাসা সে বলছে না। অত সহজে ওসব হয় না। তবে সে স্বীকার করবে, ভাল লাগে শোভনকে, বন্ধু হিসেবে দেখে। হ্যাঁ, কিছুটা বিশ্বাস তো আছেই। নইলে এত রাতে ওর সঙ্গে আসবেই বা কেন! প্রথম দিকে অবশ্য ওর ওপর রেগে উঠেছিল।

—কাছাকাছি কোথাও কী ভাল একটা হোটেল নেই?

শোভন তীক্ষ্ণচোখে তাকাল, অভাব কি। কিন্তু তুমি কী হোটেলে থাকতে চাও?

—হ্যাঁ। মৃদু হাসল মীরা, কাউকে এত রাত্রে বিরক্ত করতে চাই না। দেখুন না একটা রুম পাওয়া যায় কিনা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বড় হোটেলের সামনে রিকশা দাঁড়াল। শোভন ভাড়া দিতে গেলে মীরা বাধা দেয়, থাক। আমি দিচ্ছি।

কাউন্টারে বসে একটা লোক ঝিমুচ্ছে। শোভনের ডাকাডাকিতে লাল চোখ মেলে তাকাল। কেমন যেন রুক্ষ চোয়াড়ে চেহারা। মীরা কোন গ্রাহ্য করল না লোকটার বিশ্রী-ভাবে তাকানো দেখে।

—রুম খালি আছে?

—কটা? লোকটা হাই তুলতে তুলতে আড়চোখে একবার তাকায় মীরার দিকে।

—একটা হলেই চলবে। মীরা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আজ রাতের জন্যে। হাসল লোকটা, কিন্তু কোন খাবার পাবেন না। চলুন ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

বেশ বড় ঘর। মাঝখানে ডবল বেডের তক্তপোষ। বিছানার চাদর বালিশ ধবধব করছে। এককোণে গোলটেবিলের চারধারে কয়েকটা চেয়ার। ড্রেসিং টেবিল। মীরা ঘুরে ফিরে দেখছিল—কোন কিছুর অভাব নেই। জানালা বন্ধ। খুলে দিল সে। পর্দা টেনে দিল।

—লোকটা এখনও কেন দাঁড়িয়ে? মীরা বিরক্তি চেপে বলল, আমাদের আর কিছু দরকার নেই।

হলুদ দাঁত বের করে অল্প হাসল লোকটা, ভাড়ার টাকাটা অ্যাডভান্স দিতে হবে।

—কত?

—কুড়ি।

—এই নিন। ব্যাগ খুলে মীরা দু'খানা দশ টাকার নোট লোকটার হাতের ওপর ছেড়ে দেয়। আর কোন কথা না বলে লোকটা বেরিয়ে যায়।

শোভন চুপচাপ। শুধু লক্ষ্য করছিল মীরাকে। একটা ঘরে দুজনে থাকবে...... তাকে কোন কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত দিল না। সে পাশাপাশি দুটো ঘর চাইত। মীরার সিঁথি সাদা। লোকটা যেভাবে হাসছিল, কী ভেবেছে মনে মনে তা সে আন্দাজ করতে পারে।

—আমি থাকবো কোথায়?

—এখানে। আপনি খাটে শোবেন। আমি মেঝেতে বিছানা করে নিচ্ছি।

অবাক চোখে তাকায় শোভন। কিন্তু সে আর এ প্রসঙ্গে কোন কথা ওঠাল না। সঙ্গে কোন কিছু আনেনি সে। ভাবতেই পারেনি এমন একটা ব্যাপার ঘটবে।

সুটকেস খুলে মীরা বিছানার চাদর বের করল। শোভন একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। হাতঘড়ি দেখল—রাত বারোটা। বাইরে শূন্য রাজ-পথ। সে ভাবছিল অনেক কিছু। বলাবাহুল্য মীরাকে কেন্দ্র করে।

—শোভনবাবু। এদিকে আসুন। কী ভাবছেন?

এরই মধ্যে মেঝেতে বিছানা পেতে ফেলেছে মীরা। একবার তাকায় ওর দিকে। চোখাচোখি হয়। মীরার মুখে কোন গ্লানির চিহ্ন নেই। নির্বিকার চোখমুখ।

—আমার জন্যে তোমায় এসব ঝামেলা সহ্য করতে হল।

—ওসব কথা থাক। আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। কিন্তু লোকটা তো বললে কিছু পাওয়া যাবে না।

—থাক। একটা রাত না খেলে কী হয়। ওকি! তুমি দেখছি শুয়ে পড়ছো।

—মীরা টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। বুক পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা।

—ঘুম পাচ্ছে। আপনিও শুয়ে পড়ুন।

কিন্তু ঘুম আসে না ওদের চোখে। শোভন এপাশ ওপাশ করতে থাকে। পরনে মীরার একটা শাড়ি। ঘরে সবুজ আলো। মীরা পিছন ফিরে শুয়ে। ঘুমিয়েছে কিনা কে জানে। চাদর সরে গিয়েছে। একদৃষ্টিতে শোভন অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার দু'চোখ জ্বালা করছিল।

মীরা পিছন ফিরে তাকায় না। সে যেন কিছু একটা......কিছু! কিসের [illegible] কথা সে ভাবছে। মনে পড়ছে অনেক কিছু। চোখের সামনে ভাসছে পিন্টুর মুখ। অজান্তে ওর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে প্রাণপণে কান্না রোধ করার চেষ্টা করে। ভোর হওয়া পর্যন্ত সে পিছন ফিরে তাকায় না।

।। আট ।।

[illegible] দু'খানা শোবার ঘর। রান্নাঘর আলাদা। বাথরুম এবং পায়খানা সব ওপরে। সমস্ত দিক থেকে সুবন্দোবস্ত। মীরা সব দেখেশুনে মনে মনে খুশি। কিন্তু দু'খানা শোবার ঘর কেন? ভাড়ার দিকটা দেখতে হবে। তার যা রোজগার তাতে সে অত ভাড়া দিতে অক্ষম।

শোভন মিটমিট করে হাসে, পছন্দ হয়েছে?

—দু'খানা ঘর দিয়ে কী করবো। মীরা ভ্রূকুঁচকে তাকাল, অত ভাড়া তো দিতে পারবো না।

—দু'খানা ঘর ছাড়া দু'জনের হবে কি করে।

—দু'জন! বুঝেও না বোঝার ভান করল মীরা। সর্বনাশ। শোভনের মনে মনে তাহলে এই ছিল।

—হ্যাঁ, দু'জন। তুমি আর আর আমি। যে কান্ড ঘটে গেল, এরপর আর ওখানে থাকতে পারবো ভেবেছো। বৌদিকে তাহলে তুমি চেন না।

বাঃ হাসির বহর দ্যাখ! কোন কান্ডজ্ঞান নেই লোকটার। মীরা কী বলবে ভেবে পেল না। তুমি আর আমি! শুনতে ভাল লাগে। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সর্ব শরীর। কত সহজ বলার ভঙ্গি। এত সাহস বা আত্মবিশ্বাস পেল কোত্থেকে শোভন?

—আরে হাঁ করে দেখছো কী। হাত লাগাও। মনের মত ঘর সাজাও। ভাড়া টাকার কথা চিন্তা ক'র না। কোন ভাবনা নেই আমি দেখবো সব।

ব্যাস একপর কী আর কথা চলে। মীরার হতভম্ব ভাবটা কাটতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। এদিকে শোভন কাজ শুরু করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে আপনমনে কথা বলছে। জানালার পর্দার রং কিরকম হবে, তক্তপোষ ঘরের মাঝখানে কি এককোণে, ড্রেসিং টেবিল আলনা চেয়ার টেবিল কোথায় রাখবে, দেয়ালে কি কি ছবি থাকবে ইত্যাদি।

—কী ব্যাপার? তুমি কিছু বলছো না। ওরকম গম্ভীর মুখ করে থেক না। কী ভাবছো?

—আপনি কী সব ঠিক করে ফেলেছেন? মীরা স্থির চোখে শোভনের দিকে তাকাল, ঠাট্টা করছেন না তো।

—সব ব্যাপারে ঠাট্টা করি না। অত খেলো নই। কিন্তু এত ভাবনা কেন তোমার বুঝতে পারছি না।

(ক্রমশ

## কয়েকটি টুকরো প্রসঙ্গ

### জাপানীরা কৃত্রিম মাংস খাচ্ছে

শুনতে অদ্ভুত লাগছে বটে কিন্তু কথাটা সত্যি। জাপানীরা কৃত্রিম মাংস খাচ্ছে। জাপানীদের চিরাচরিত খাদ্য হচ্ছে ভাত আর মাছ। গত বছর থেকে এই খাদ্য তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরো একটি পদ : কৃত্রিম মাংস। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে জাপানের নিস্‌হিন অয়েল মিলস এই খাদ্যবস্তুটি বাজারে ছেড়েছে, মাংসের বদলে যা ব্যবহার করা চলবে। সম্ভবত এই কৃত্রিম মাংস সয়াবীন থেকে তৈরী। এতে আছে প্রচুর প্রোটিন কিন্তু ফ্যাট বা স্নেহদ্রব্য নেই। অনেকের মতে মাংসের স্নেহদ্রব্য হৃৎপিণ্ডের পীড়ার কারণ হতে পারে। তাই যদি হয় তাহলে জাপানীদের এই কৃত্রিম মাংস খাদ্য-বস্তু হিসেবে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কিন্তু স্বাদ? স্বাদেও কি এই কৃত্রিম মাংস আসল মাংসের মতোই? পুরোপুরি নয়। এদিক থেকে কৃত্রিম্ মাংসের এখনো কিছুটা ঘাটতি আছে।

গোড়ার দিকে এই কৃত্রিম মাংস বিক্রি করা হয়েছে হ্যাম্ সসেজ জাতীয় মাংসের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারকদের কাছে। সেখানে আসল মাংসের সঙ্গে এই কৃত্রিম মাংস মিশিয়ে দেওয়া হয়। এবারে টিনে ভর্তি করে সরাসরি মাংসের বিকল্প খাদ্য হিসেবে বিক্রি করার পরিকল্পনা হয়েছে। দাম পড়বে আসল মাংসের দামের অর্ধেক। স্বাদটি হয়তো পুরোপুরি পাওয়া যাবে না কিন্তু পুষ্টির দিক থেকে আসল মাংসের চেয়ে বেশি তো কম নয়। অথচ স্নেহদ্রব্য না থাকার দরুণ হৃৎপিণ্ডের পীড়া হবার কোনো আশঙ্কা থাকছে না।

দেখাদেখি আরো দুটি কোম্পানীও কৃত্রিম মাংস প্রস্তুত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সম্ভবত বিদেশেও রপ্তানী করার চেষ্টা হবে।

শুধু কৃত্রিম মাংস নয়, জাপানী কোম্পানীগুলো আরো চেষ্টা করছে সয়াবীন থেকে নতুন ধরনের দুধ তৈরি করতে ও পেট্রোলিয়ম থেকে খাদ্যবস্তু।

এ-প্রসঙ্গে মনে পড়েছে, দিন কয়েক আগে কলকাতার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের একজন বিজ্ঞানী ঘোষণা করেছেন ঘাস নাকি অতিমাত্রায় প্রোটিন-সমৃদ্ধ। এক্ষেত্রে, সয়াবীন থেকে যদি কৃত্রিম মাংস তৈরি হতে পারে তাহলে ঘাস থেকেও না হতে পারার কোনো কারণ নেই। জাপানের মতো উদ্যোগী কোনো কোম্পানী থাকলে এতদিনে তা হয়তো হয়েও যেত। তবে মাংসের স্বাদ-যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা বাজারে চলত কিনা বলা মুশকিল। আমাদের দেশে রান্নার প্রক্রিয়াটাই এমন যে নজর থাকে স্বাদ তৈরি করার দিকে। পুষ্টি বজায় থাকছে কিনা তা নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। নইলে আমাদের দেশে এমন প্রচুর গাছগাছরা ফলফলাদি আছে যা থেকে অনেক খাদ্যেরই বিকল্প প্রস্তুত হতে পারে। অন্তত জাপানের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় ও ব্যাপকভাবে। কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত পটুত্ব দেখাতে পেরেছি, কথাটা দুঃখের হলেও সত্যি, খাদ্যের ভেজাল প্রস্তুত করার ব্যাপারে, তাও এমন ভেজাল যা থেকে মারাত্মক সব রোগ হবার সম্ভাবনা।

### মদ্যপানের কথা

যাঁরা মদ খেয়ে নেশা করতে চান, বিশেষ করে তাঁদের জন্যে বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ একটি তথ্য উপস্থিত করতে চাই। হালে আমাদের দেশে মদ খাওয়াটা খুবই বেড়েছে। অনেক বাড়িতেই আজকাল সন্ধ্যার পরে চায়ের আসরের বদলে মদের আসর বসে। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব এলে অনেকেই আজকাল গেলাস সাজিয়ে বসেন। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারেও আজকাল আনাজ-পাতি মজুদ থাকার মতো মদের বোতল মজুদ থাকছে—এটা একেবারে চোখে না পড়ার মতো ঘটনা নয়। কিছুকাল আগেও মদ্যপান সম্পর্কে যে একটা অন্যায়বোধ ছিল, তা এখন প্রায় অন্তর্হিত। ভারতের কোনো কোনো এলাকা নামেই ড্রাই, খোঁজ নিলে জানা যাবে তলে তলে ভিজে জবজব করছে। যাই হোক, তথ্যটি বলি।

মদ খাওয়া কেন? অবশ্যই নেশা করার জন্যে। মাতাল হওয়া নয়, নেশা করা। নেশার বর্ণনা দেওয়া শক্ত, তবে একটা সাধারণ লক্ষণ এই যে, একটা ভালো-লাগা ভালো-লাগা ভাব এসে যায়, মনের মধ্যে কোনো রকম ভার থাকে না আর নিজেকে বেশ একটা বড়ো গোছের মানুষ বলে মনে হতে থাকে। এটুকুই তো যথেষ্ট। রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা যে অনেকেই নেশা করে থাকেন, তা এই মানসিকতা অর্জনের জন্যে। নেশাগ্রস্ত মানুষ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকেন, এমনি একটা ধারণা প্রচলিত আছে।

যাঁরা নেশাগ্রস্ত হতে চান, তাঁদের সকলের সামনেই চিরন্তন সমস্যা : কত-খানি খেলে পরে নেশা? নেশা না হওয়া পর্যন্ত কি খেয়েই যেতে হবে? নেশা কি পরিমাণনির্ভর?

সম্প্রতি মেরিল্যাণ্ডের দুজন বিজ্ঞানী বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত—নেশা নির্ভর করে পরিমাণের ওপরে নয়, মেজাজের ওপরে; কতখানি খাওয়া হচ্ছে তার ওপরে নয়, কি-ভাবে খাওয়া হচ্ছে তার ওপরে।

বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাকার্যটি ছিল এই রকম :

মদ্যপানে অভ্যস্ত একটি দলকে নজরে রাখা হল, দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করে। একটি গোষ্ঠীকে দেওয়া হতে লাগল চার আউন্স করে মদ, প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর। অন্য গোষ্ঠীকেও একই পরিমাণ মদ কিন্তু তাদের বেলায় এই স্বাধীনতা থাকল তারা যখন খুশি এবং এক-একবারে যতোখানি খুশি (সারাদিনের মোট পরিমাণটি ঠিক রেখে) মদ খেয়ে যেতে পারে। দেখা গেল দ্বিতীয় দলভুক্তদের বেলায় পানীয়টি সহ্য হল অনেক ভালোভাবে, প্রথম দলভুক্তরা তো কেউ কেউ বমি করতে শুরু করে দিল। অথচ, বমি যারা করছে, তারা যদি যখন-খুশি ও যতোখানি খুশি মদ খাবার সুযোগ পায় তো অনেক বেশি পরিমাণ মদ সহ্য করতে পারে।

শুধু চোখের দেখায় নয়, রক্তের রাসায়নিক পরীক্ষাতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হল।

এ থেকে কী বোঝা যাচ্ছে? মোটা করতে হলে কতখানি খাওয়া হচ্ছে তা গৌণ, কী মনোভাব নিয়ে খাওয়া হচ্ছে, কী পরিবেশে, তা-ই মুখ্য। তার মানে, বেশি খাবার দরকার নেই, মেজাজে খাবেন।

এ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়টি এই যে, মদ যদি খেতেই হয়, তাহলে তার উপযোগী মেজাজটি আগে আয়ত্ত করুন। সেক্ষেত্রে, চাই কি, হয়তো হোমিওপ্যাথিক ডোজে খেয়েও ঈপ্সিত ফললাভ করতে পারেন। এমনকি হয়তো বিন্দুমাত্র না মুখে দিয়ে শুধু চোখের দেখা দেখেই। এমন অসাধারণ ক্ষমতাবান পুরুষ অন্তত একজন আমি নিজের চোখে দেখেছি।

### স্বপ্ন দেখাটা আসলে দেখা নয়

তা তো বটেই, আমরা স্বপ্ন দেখি চোখের পাতা বন্ধ করে, চোখ খোলা রেখে তো নয়, তবে আর দেখব কি করে! কথাটা তা নয়। স্বপ্ন দেখার সময়ে বন্ধ পাতার নিচে আমাদের চোখের মণি ঠিক তেমনিভাবে নড়াচড়া করে যেমন করে থাকে খোলা চোখে কোনো বাস্তবিক দৃশ্য দেখতে গিয়ে। অর্থাৎ চোখের মণি যেন স্বপ্নের দৃশ্যগুলো সত্যি সত্যিই দেখছে, চোখের পাতা থাকা সত্ত্বেও। স্বপ্ন দেখার সঙ্গে চোখের মণির যুগপৎ নড়াচড়ার এর চেয়ে সহজ ও সরল ব্যাখ্যা আর কিছু হতে পারে না।

দুঃখের বিষয়, এই ব্যাখ্যা টেকেনি। শুধু টেকেনি নয়, একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে নিউইয়র্কের মাউণ্ট সিনাই হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের গবেষণায়।

পরীক্ষাকার্যের ধরনটি এই রকম। ঘুমন্ত মানুষের ওপরে নজর রাখার ব্যবস্থা হল। চোখের মণি নড়াচড়া শুরু করতেই বোঝা গেল সে স্বপ্ন দেখছে। এই স্বপ্ন দেখা যখন চলছে, তখন তিন রকম অবস্থায় তাকে জাগিয়ে তোলা হল : (১) চোখের মণি আচমকা নড়ে ওঠা, (২) চোখের মণি পর-পর কয়েকবার নড়ে ওঠা, (৩) চোখের মণি স্থির হয়ে থাকা। প্রত্যেক বারই তাকে জিজ্ঞেস করা হল কী স্বপ্ন সে দেখছিল। তারপরে চেষ্টা করা হল স্বপ্নের ছবির সঙ্গে চোখের মণির নড়াচড়া বা স্থির হয়ে থাকা মেলাবার। দেখা গেল কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। চোখের মণি যার আচমকা নড়ে উঠেছে তার মুখে যে-স্বপ্ন শোনা গেল সেখানে শতকরা ৭২টি ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্কই পাওয়া গেল না। শতকরা ১০টি ক্ষেত্রে দেখা গেল চোখের মণি নড়েছে স্বপ্নের ছবি দেখতে হলে যেদিকে নড়া উচিত ছিল তার বিপরীত দিকে।

বিষয়টিকে আরো খতিয়ে দেখা হল। তখন ধারণা হল যে স্বপ্ন দেখার সময়ে চোখের মণির নড়াচড়াটা নিতান্ত এলোমেলো ব্যাপার নয়, তার মধ্যে আছে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত প্যাটার্ণ, যা নির্ভর করে স্বপ্নের বিষয়ের ওপরে। আরও ধারণা হল, জেগে-থাকার অবস্থায় চোখের মণি যেমনভাবে নড়াচড়া করে, স্বপ্ন-দেখার অবস্থায় তেমনভাবে নয়।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, চোখের মণির নড়াচড়া দেখে স্বপ্ন সম্পর্কে ধারণা করা যায় না, স্বপ্নের বিষয় জানতে পারলেই চোখের মণির নড়াচড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বপ্ন আমরা দেখি ঠিকই কিন্তু সেটা ঠিক সাধারণ দেখা নয়।

### আমরা কেউ-ই পুরো দেখি না

স্বপ্ন দেখার বেলায় যাই হোক, আমরা যখন জেগে থাকা অবস্থায় তাকাই, তখনো কি ঠিক ঠিক দেখি? অর্থাৎ, পুরোটাই কি দেখি? শুনে অনেকেই হয়তো অবিশ্বাস করবেন, আমরা কেউ-ই পুরো দেখি না। আমাদের নাক-বরাবর জিনিসেও একটা বিশেষ অংশ আছে যেখানে আমাদের দৃষ্টি অন্ধ।
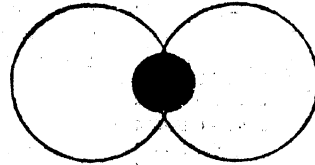
কথাটা সত্যি কিনা নিজেই পরখ করে দেখতে পারেন। এই সঙ্গে যে-ছবিটি দেওয়া হয়েছে, তা ডান চোখের সামনে ২০ সেন্টিমিটার দূরে ধরুন, বাঁ চোখের ওপরে হাত চাপা দিন, এবারে বাঁ-দিকে ঢেরাচিহ্নের দিকে তাকিয়ে ছবিটি আস্তে আস্তে সামনে আনতে থাকুন। আনতে আনতে একটা সময় আসবে যখন বৃত্তদুটি যেখানে ছেদ করেছে সেখানকার বড়ো কালো বর্তুলটি আপনি আর দেখতে পাবেন না। অথচ বৃত্তদুটি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন, পুরো ছবিটিই রয়েছে দৃষ্টির সীমানার মধ্যেই।

এ-ব্যাপারটি নিয়ে আরো একটি মজার ঘটনা ঘটানো যেতে পারে। দুটি মানুষকে দুই মিটার দূরত্বে মুখোমুখি বসান। তারপরে নির্দিষ্ট মাপ ঠিক করে নিয়ে দুজনকে সেই মাপমতো কোণাকুণি তাকাতে বলুন। এ-অবস্থায় দুজনেই একে অপরের মুণ্ডহীন ধড় দেখবে মাত্র। সামান্য একটু চেষ্টা করলেই এই পরীক্ষাকার্যের সাহায্যে দুজন মানুষের পিলে চমকে দেওয়া যেতে পারে।

এমনটি যে ঘটে তার কারণ আমাদের রেটিনায় আছে একটি অন্ধ বিন্দু যেখান দিয়ে অপ্টিক নার্ভগুলো ভিতরে প্রবেশ করে। এই বিশেষ বিন্দুটি কোষশূন্য, ফলে সাড়া জাগে না।

তাহলে, আমরা যে পুরো দেখি না, এ-ব্যাপারটা আমরা কেন টের পাই না? তার কারণ, ব্যাপারটাতে আমরা বহুকাল ধরে অভ্যস্ত, যেটুকু আমরা দেখি না তা কল্পনায় পূরণ করে নিই। তাছাড়া, আমরা দেখি দু-চোখে। এক চোখের না-দেখা অংশটুকু অপর চোখের দেখা দিয়ে অনায়াসেই পূরণ করে নিতে পারি। তবে এক চোখের দেখা কোনো ক্ষেত্রেই পুরো দেখা নয়।

### এক টন কাঠ ও এক টন লোহা

কোনটি বেশি ভারী—এক টন কাঠ, না এক টন লোহা? অনেকে না ভেবেচিন্তেই জবাব দিয়ে বসেন, এক টন লোহা বেশি ভারী। শুনে অন্যরা হাসেন। কিন্তু যদি বলা হয় এক টন কাঠ বেশি ভারী, তাহলে হয়তো হাসির মাত্রা আরো চড়বে। কিন্তু যদি পুরোপুরি সঠিক জবাব দিতে হয়, তাহলে বলতেই হবে, এক টন কাঠ বেশি ভারী।

কেন? জবাবে প্রথমে আর্কিমিডিসের সূত্রের কথা তুলতে হয়। সূত্রটি গ্যাসের বেলাতেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, বাতাসে নিমজ্জমান কোনো বস্তুর ওজনও কমতে বাধ্য। কতখানি? যতোখানি ওজনের বাতাস স্থানচ্যুত হয়েছে ততোখানি। কতখানি বাতাস স্থানচ্যুত হতে পারে? বস্তুর যা আয়তন ততোখানি।

অতএব কাঠ ও লোহারও খানিকটা করে ওজন খোয়া যাচ্ছে। কাজেই কাঠ ও লোহার যে ওজন আমরা টের পাচ্ছি, তা আসল ওজন নয়, তার সঙ্গে খেয়ে-যাওয়া ওজন যোগ করা দরকার।

এক টন কাঠ যতোখানি জায়গা জুড়ে থাকে, তা এক টন লোহার জুড়ে-থাকা জায়গা থেকে ১৫ গুণ বেশি। কাজেই লোহার চেয়ে কাঠ অনেক বেশি বাতাস স্থানচ্যুত করে। অর্থাৎ কাঠের খোয়া-যাওয়া ওজন লোহার চেয়ে বেশি। অতএব, আসল ওজন বিচার করলে এক টন কাঠের ওজন এক টন লোহার ওজনের চেয়ে অবশ্যই বেশি।

—অয়স্কান্ত

পঞ্চানন এত হাঁকডাক করে পাড়া জানায় না দিলে অনেকে হয়তো জানতেই পারত না এ বাড়িতে আরেক ঘর নতুন ভাড়াটে এল।

এত সরু গলিতে মালপত্তর নিয়ে ঠেলা-গাড়ি যে ঢুকতে পারে না আগেই বোঝা উচিত ছিল পঞ্চাননের। নিজে দেখেশুনে ভাড়া করেছে বাড়ি। এখন মিথ্যে ঠেলা-ওলার ওপর তড়পে তো কিছু লাভ নেই। কিন্তু পঞ্চানন ওসব কথা শুনতে চায় না। ওর সেই এক হুংকার—খেয়াল রাখিস রাম-খেলোয়ান, এক পয়সা পাবি না। দেখে নিস আমি যদি বাপের বেটা হই, ব্রাহ্মণের রক্ত থাকে আমার গায়ে তো এই সাফ কথা শুনে রাখ—মালপত্তর ঘরে না উঠলে একটা পয়সাও দিচ্ছি না তোকে।

রামখেলোয়ান বোধহয় নতুন ভাড়াটের জানা মানুষ। তা না হলে এত তড়পানির পরও রাগ না করে গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে দাঁত বার করে হাসে কী করে। বলে—আরে বড়োবাবু, আগে তো শুনিয়ে আমার কুথাটা। খামকা এতো গুস্সা হইয়েন না। আপনেই বাতাইয়ে দিয়েন এতনা সরু গল্লি দিয়ে গাড়িটা যাইবে কেমন কোরে।

পঞ্চানন আরো ক্ষেপে ওঠে—ব্যাটা বদ-মাস কাঁহাকা, আমায় জ্ঞান দিচ্ছিস? গাড়ি

যাইবে কী, আটকে থাকবে এখানে সে তোমার ব্যাপার। জনুম হুদু, আমার মালপত্তর সব ঘরে ওঠা চুকি-ই। না হলে যা আছে, একটী পয়সাও বাকি দিয়েছি তোকে। বাদ ব্রাহ্মণের মত থাকে, আয়ার ঘাড়ে...

কৃষ্ণেন্দু দোতলায় পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে নিচে ওদের কথা-কাটাকাটি লক্ষ্য করছিল। ওদের দুজনের কথা বলার ভাবভঙ্গি দেখে হাসিই পাচ্ছিল ওর। শীর্ণকায় বৃদ্ধ-মানুষ পঞ্চানন। কিন্তু রামখেলোয়ান মটমট করছে। অথচ বিশালদেহী ঠেলাওয়ালা এত ধমকের পর কেমন হাসছে। কৃষ্ণেন্দুর মনে হল ঠেলাওয়ালার মত এইটুকু সময়ের মধ্যেই নতুন ভাড়াটেকেও যেন চিনে নিতে পেরেছে।

রামখেলোয়ান গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে হাসছে—হাঁ হাঁ ঘাবড়াইয়েন না বুড়াবাবু, সব হইয়ে যাবে। বহুত পরিশান্ত হইয়েছে হামার, থোড়া জিরাইতে দিজেন। লেকিন একঠো বাত হামি জরুর বলবে বুড়াবাবু...এ কোঠি আপনেকে মানাইবে না। এ কোই আচ্ছা ঘর আছে বুড়াবাবু? যাইবার আইবার রাস্তা ভি নেহী আছে। পাড়া ঘরসে ভি বহুত দূর হইয়ে গেছে। দিদিমণি লোকন কী বহুত তকলিফ হোবে। নেহী নেহী বহুত বুরা কাম হইয়েছে বুড়াবাবু।

একতলার চেঁচামেচি শুনে মলয়াও ছেলের ঘরের জানলায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রামখেলোয়ানের কথা শুনে ফিসফিস করে বললেন—তা কথাটা কিছু মিথ্যে বলেনি বাপু লোকটা, এ ঘরে কী মানুষ থাকতে পারে। পেছনে এঁদো পুকুর। হাওদা উঠোন, অন্ধকার ভাঙা ঘর। তাও যদি বাড়ির সামনের দিকে হত অন্য কথা ছিল। এদিকে দিনের বেলাতেও যদি চোরডাকাত পড়ে কেউ টের পারে না।

রামখেলোয়ান ততক্ষণে গলির রাস্তায় ঠেলা রেখে মাথায় করে মালপত্তর নিয়ে আসতে শুরু করেছে। আর পঞ্চানন উঠোনের বকুলগাছটার নিচে বেদীর ওপর পা গুটিয়ে বসে পড়েছে। আগেই নিজে দেখেশুনে বাড়ি পছন্দ করে গেছে। কিন্তু ওঁর বিব্রত বিরক্ত দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন না বলেকয়ে বাড়িওয়ালা দারুণ ঠকিয়েছে ওকে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করছে আর চেঁচাচ্ছে—বলি পেছনের ভাড়াটে কী মানুষ নয়। না তার যাতায়াতের দরকার নেই। ঢেঁকীশাল দিয়ে ফটক যাবার ঐ রাস্তাটুকুও না রাখলে ক্ষতি কী ছিল!

রামখেলোয়ান একটা মান্ধাতার আমলের পুরনো ট্রাঙ্ক এনে ওদিকের ঘরের দাওয়ায় নামিয়ে রাখল। পঞ্চাননের কথাটা কানে যেতে বলল—আউর দিনে কো পানি ভি নেহী আছে হামার জানমে হচ্ছে বুড়াবাবু। এ তো শহর নেহী আছে। বহুত কাম দূর না। হিঁয়া কাঁহা পানি কল মিলবে! দিদিমণিদের বহুত তকলিফ হোবে।

পঞ্চানন যেন চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠল এবার—দিদিমণিদের জন্যে তোকে এত ভাবতে হবে না রামখেলান। ইস্—শহর নেহী আছে। নেহী আছে তো কী হয়েছে রে ব্যাটা মূর্খ কাঁহাকা। এখানে মানুষ থাকে না না জল না খেয়ে বেঁচে আছে সবাই। বলি আচ্ছা কুঠি যে নোব আচ্ছা পয়সা দিতে হবে না? না কী সেটা মাগনা আসবে।

বাবা একরকম আর মেয়েরা অন্যরকম। মনেই হয় না বাক্যবাগীশ ওই বাবার মেয়ে সব। সকাল থেকেই মলয়ার রীতিমত দুর্ভাবনা ছিল। কিন্তু ওদের দেখে স্বস্তি পেলেন। শুধু তাই নয় মেয়েগুলোর আব-ভাব আচার আচরণ দেখার পর শান্তির স্নিগ্ধ পরশে যেন চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল মলয়ার। লক্ষ্মীশ্রী পাঁচ পাঁচটি যুবতী কুমারী মেয়ে। বয়সে পিঠোপিঠি সবাই। এমন হাসি হুল্লোড় করতে করতে ওরা এসে পৌঁছল নতুন ডেরায় যেন এতটুকু ক্ষোভ নেই কারো মনে। ঠেলাগাড়ির মালপত্র আর ওদের বেশবাস দেখেই বোঝা যায় কঠিন দারিদ্র্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু ওদের জীবন আর উচ্ছল হাসির বেগকে একটুও স্তিমিত করেনি এখানের বেমানান পরিবেশ। শুধু তাই নয়। যেন একগুচ্ছ সূর্যমুখী ফুল আশপাশের আগাছার বহু ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে অনির্বাণ হাসছে। একই জমিতে দাঁড়িয়েও আগাছারা ওদের নাগাল পাচ্ছে না।

মা নেই। মেয়েদেরই সংসার। বাবা সংসারবিরাগী। ব্রাহ্মণ, গুরুগিরিই পেশা। বাঁধা যজমানদের বাড়ি বাড়ি পুজো করে বেড়ান। কখনও বাড়ি ফেরেন। আবার কখনও শিষ্যবাড়িতে কাটিয়ে আসেন। অভাবের সংসার। তার ওপর পাঁচ পাঁচটি অবিবাহিত মেয়ে। তাই দুনিয়ার সব-কিছুতেই অসীম বিরক্তি। মাসের যে কটা দিন বাড়ি থাকেন মনে মনে গজগজ করেন সর্বক্ষণ। মেয়েরা তখন বড় চুপচাপ। দেখে-শুনে মনেই হয় না এমন প্রাণবন্ত পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে রয়েছে এই পুরোন বাড়ির নিভৃত জঠরে। বাবা আর মেয়েদের বনি-বনা নেই। শুধু বিবাদ এড়িয়ে চলতে দুপক্ষই যেন সমঝোতা করে নিয়েছে নিজে-দের মধ্যে।

পঞ্চানন বাড়ি থাকলে ওরা চুপচাপ থাকে কিন্তু ওর পিছন ফিরতে যতক্ষণ। নিমেষে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় বাড়িতে। কেউ বা গলা ছেড়ে গান ধরছে, কেউ রসিক-তায় ফেটে পড়ে জলতরঙ্গের সুরে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। তারই মধ্যে হাতে হাতে সংসারের কাজ করে যাচ্ছে ওরা। বাজার করে আনছে, পাড়ার মুদিখানার দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে আনছে। কেউ বালতি হাতে জেতরবাড়ির টিউবওয়েল থেকে জল নিতে চলেছে। যেন অখণ্ড একটা সত্তা ওরা। কাউকেই বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না।

পাড়ার বাসিন্দারা ওদের নাম রেখেছে পঞ্চ-পাণ্ডবী। কোন অভিশাপে কে জানে এমন বনবাস হয়েছে ওদের জানা নেই কারো। প্রথম প্রথম সন্দেহ হত হয়তো বা স্বভাব-চরিত্র খারাপই মেয়েগুলোর। হতেও পারে, মা নেই বাবা বিবাগী। কুমারী মেয়েদের পদস্খলন হবার মত প্রলোভনও তো কিছু কম নেই। কিন্তু সে সন্দেহ আর কারো নেই। পাড়ার জোয়ান ছেলেরা তো ওদের পেছন পেছন ঘুরঘুর করে হাল ছেড়ে দিয়েছে এর মধ্যেই, নজর এড়ায় নি ওদের। অসহায় ওরা কিন্তু অবলা নয়। কেমন একটা দৃঢ়তা আছে ওদের মধ্যে। ডানাকাটা পরী নয় কেউ কিন্তু সুশ্রী তো বটেই। গানের গলাও মিষ্টি। তবু এমন প্রাণবন্ত মেয়েদের ঘর বর জোটে না কোন দুর্বাশার অভিশাপে বুঝে উঠতে পারে না ওরা।

হ্যাঁ, ওদের গানের গলা যে মিষ্টি এর মধ্যেই পাড়াপড়শির জানা হয়ে গেছে সে কথা। সারা দিনটা কাটে যেমন তেমন। মনে হয় না পাঁচ পাঁচটা প্রাণবন্ত কুমারী মেয়ে বনবাসে কাটাচ্ছে এখানে। কিন্তু সন্ধ্যের পর এখানকার পৃথিবী যখন আশ্চর্য শান্ত হয়ে ওঠে, পেছনের ডোবায় ব্যাঙেরা একে একে ডেকে ওঠে, ওবাড়ির রাখালমাস্টারের দশ বছরের ছেলেটা যখন দুলে দুলে উচ্চৈস্বরে কবিতা মুখস্ত করে তখন ওদের হাতে তানপুরার তারে সুরের ঝঙ্কার মন্থর বাতাসকে যেন ধীরে ধীরে চঞ্চল করে তোলে।

কৃষ্ণেন্দুর পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে একতলার বকুলগাছের নিচটা নজরে পড়ে। ঝকঝকে তকতকে করে নিকনো মাটির বেদীটার প্রতি ইদানীং কৃষ্ণেন্দুর আকর্ষণটা যেন বড় বেশী। পরীক্ষার পড়া থেকে বারবার মনটা ছুটে চলে যায় ওদিকে। ওর তৃষিত চোখদুটো কী যেন খুঁজে বেড়ায়। সংসারের কাজ সারা হলে কখন পঞ্চপাণ্ডবীরা তানপুরাটা হাতে নিয়ে একে একে বেদী জুড়ে বসবে—কৃষ্ণেন্দু যেন উন্মুখ হয়ে থাকে। তারপর কখন এক আশ্চর্যমধুর সুরের ঝঙ্কার রাত্রির স্তব্ধতাকে মাতোয়ারা করে তুলবে—সেই প্রতীক্ষায় সময় মন্থরগতিতে কোন্ দিক দিয়ে যে কেটে যায়, খেয়াল থাকে না ওর।

ওরা পাঁচ বোন—নন্দিনী, শিবানী, হিমানী, সর্বাণী আর রিনি। এখনও ওদের সঙ্গে ভাল করে আলাপ হয়নি কৃষ্ণেন্দুর। খুব ইচ্ছে করে ওর ওদের সঙ্গে আলাপ করতে, প্রাণখুলে মিশতে। নিজে গান জানে না কিন্তু ইচ্ছে করে ওদের গানের ভাষা হয়ে উঠতে। কিন্তু কোথায় যেন একটা দুর্লঙ্ঘ্য দ্বিধার প্রাচীর দাঁড়িয়ে রয়েছে। হয়তো বা মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অনভ্যাস থেকেই এই স্বাভাবিক সঙ্কোচ। তবু ওদের চালচলন প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি ওর জানা হয়ে গেছে এতদিন। আড়াল থেকে ওদের কণ্ঠস্বর শুনে বলে দিতে পারে—কার গলা, কে গুনগুন করে গান গাইছে।

রান্নাঘর থেকে নলিনীর গলাটা ভেসে এল কৃষ্ণেন্দুর কানে—হিমানী হল তোর!

সেই মুহূর্তে ভেতরের ঘর থেকে একটা সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওর কানে—তানপুরাটা বাঁধছি রে দিদি। আর দেরী নেই, হয়ে এল বলে। নলিনীর মুখ থেকে নামটা না শুনতে পেলেও কিন্তু কৃষ্ণেন্দু চোখ বুজে বলে দিতে পারত কার গলা।

সর্বাণী ওদিকে পঞ্চাননের ঘরের উ'চু ধাপির ওপর ঝকঝকে লণ্ঠনটা সরিয়ে রাখল দেখতে পেল কৃষ্ণেন্দু। কিন্তু...তারপরই যে সর্বাণী মুখ তুলে খোলা জানলা দিয়ে অমন সোজাসুজি তাকিয়ে থাকবে ওর দিকে—জানবে কী করে ও। না বুঝে কৃষ্ণেন্দু নিজেও ওর চোখে চোখ রেখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল বলে এই মুহূর্তে কেমন একটি অনাস্বাদিত শিহরণ অনুভব করছে।

চোখটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল কৃষ্ণেন্দু। না সরিয়ে উপায় নেই। অপরিচিত কোন মেয়ের চোখে চোখ রেখে এমন করে আগে কখনো তাকায়নি। কেন কে জানে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর কৌতূহল যত ভয়ও তত বেশী। কিন্তু সেই মুহূর্তে সর্বাণীর ফিসফিস কণ্ঠস্বরটা কানে আসতেই ভয়ে বুক হিম হয়ে উঠল কৃষ্ণেন্দুর। ওর কথাগুলো শুনতে পায়নি ঠিকই, তবু সর্বাণী কী বলতে পারে তাও

যেন আজ আর অজানা নয় ওর কাছে। আর আশ্চর্য, ওর অনুমানই যে ঠিক, সেটা প্রমাণ করার জন্যেই যেন পরক্ষণে এক ঝাঁক উজ্জ্বল উন্দাম পায়রা নীল আকাশের বুকে চঞ্চল ডানা মেলে দিল—হিহি...হিহি... হিহি...

নিজের অজান্তেই কৃষ্ণেন্দুর মাথাটা সঙ্কোচে আরো হেঁট হয়ে এল। হাসিটা যে ওকে উদ্দেশ করেই ছুঁড়ে দেওয়া হল, বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না ওর।

হিমানীর হাসির দমকটা যেন থামতেই চায় না কিছুতেই। শিবানী একবার ধমকে উঠল—আঃ কী করছিস হিমানী! এবার থাম। নলিনীও বিরক্তি প্রকাশ করল—সত্যি বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলছিস তুই! হাসির আর সময় পেলি না। অকারণ হেসে মরে শেষে দমটা খোয়াবি! সে এবার ধর আমি বাজাচ্ছি।

আশ্চর্য, তবু জলতরঙ্গের সুরে আরো কিছুক্ষণ হেসে খুন হল হিমানী। ভীরু লাজুক প্রকৃতির কৃষ্ণেন্দুর সবকিছুতেই যেন ভীষণ মজা পায় ও। ওদের দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখার আগ্রহ আর অপটু ভঙ্গীটাও বড় সুন্দর মনে হয় হিমানীর। আর ধরা পড়ে গেলে তো কথাই নেই। বিব্রত কুণ্ঠিত চোখদুটো এত তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নেয়—না হেসে পারে না ও।

ওর সুরেলা হাসির মধ্যেই যেন আচমকা জন্ম নিল এক আশ্চর্য সুরের ঝঙ্কার। নলিনীর আঙুলের টানে টানে তানপুরার তারে শব্দ উঠছে...টং...টং...ট...অ... অ...উ। কী এক অব্যক্ত ব্যাকুলতা নিয়ে যেন তারগুলোকে আদর করছে নলিনী। আর পোষা মেনিবেড়ালের মত সোহাগে সোহাগে কাঁইকুঁই করে শিউরে উঠছে তারগুলো।

একটু পর হিমানীর জলতরঙ্গের মত হাসিটা যেন ঢেউ হয়ে ধীরেসুস্থে ফুলে-ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ল নিঝুম তটভূমির কূলে কূলে—

কাছে থেকে দূরে রচিল যেন গো আঁধার



মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাঁধে রে
সম্মুখে রয়েছে সুধা পারাবার
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার।

বাইরে শুক্লাচতুর্দশীর রুপোলী আলো। বাতাসে বকুলের গন্ধ। খোলা জানলা দিয়ে এলোমেলা দামাল হাওয়ায় ভেসেআসা মোহিনী সুরের ঝঙ্কার। সব মিলিয়ে কেমন যেন আবেশ জড়িয়ে ওঠে কৃষ্ণেন্দুর চেতনায়।

আর সেই চটুল হাসির দমক নেই। নেই একটু আগের সেই হাল্কা খুশীর আমেজ। যেন একটা কঠিন সাধনায় এখন তলিয়ে রয়েছে ওরা পাঁচ বোন। হিমানী থামছে। নলিনী গাইছে। তারপর শিবানী সর্বাণী কিম্বা রিনি। সুরে সুরে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে এখানের নিথর রাত্রি।

দিনমানের সেই পঞ্চপাণ্ডবীদের এখন যেন বড় অচেনা মনে হয় কৃষ্ণেন্দুর। বড় অদ্ভুত লাগে ওদের। দূর থেকে দেখার দিনগুলোতে পঞ্চপাণ্ডবীদের যেমন অদ্ভুত মনে হত, ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার পরও তাই মনে হয় ওর। এত কাছে তবু মনে হয় ওরা যেন কতদূরে।

মলয়ার সঙ্গে ইদানীং পঞ্চপাণ্ডবীদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠেছে। অল্পসল্প আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। মেয়ের বড় সাধ ছিল মলয়ার। সেই মধুর কামনাটা মনের অন্তঃস্থলে গোপনই ছিল। কিন্তু ওদের দেখার পর থেকে কামনাটা যেন জ্বালা হয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে। মনে হয় যে-বাড়িতে যুবতী মেয়ে নেই, সে-বাড়ি যেন প্রাণহীন, ম্রিয়মাণ। তাই বোধহয় ওদের অনেক কাছা-কাছি এগিয়ে এসেছেন তিনি।

এ-বাড়িতে পঞ্চপাণ্ডবীদের সহজ-সচ্ছন্দ যাতায়াতের ফলেই ধীরে ধীরে কৃষ্ণেন্দুর সংগেও আলাপ হয়ে গেছে ওদের। আগের মত অতটা লজ্জা-সঙ্কোচ নেই ঠিকই, তবু ওদের মধ্যে এসে দাঁড়ালে নিজেকে এখনো অসহায় মনে হয় ওর। তাই দেখে শিবানী মুখ টিপে হাসে। হিমানীর চোখদুটোতে হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বড় বোন নলিনীও হাসে, কিন্তু সে-হাসি অন্যরকম। একটু যেন প্রশ্রয় আছে তাতে। কৃষ্ণেন্দু এসে দাঁড়ালে নলিনী হেসে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় ওর সামনে, ওকী, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন কৃষ্ণেন্দু? ভেতরে এসে বোস। না, দেখছি এখনো তোমার লজ্জা গেল না।

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণেন্দু কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই হিমানী জলতরঙ্গের সুরে আচমকা হেসে ওঠায়, থমকে গেল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে হিমানী বলল, 'আমরা সব বাঘ-ভালুক রে দিদি। কখন হালুম করে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ি—তাই এত ভয়।'

রোজ রোজ ওদের ইয়ার্কি-ফাজলামি বিশেষ করে হিমানীর প্রগলভতায় বিব্রত কৃষ্ণেন্দুর ভেতরটা নিদারুণ অপমানে দপ্ করে জ্বলে উঠতে চাইল। কিন্তু ওর সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে কেমন যেন সাহস হল না মুখ খুলতে। বরং না শোনার ভান করে ঘরের বাইরে চটি খুলে রেখে নলিনীর পেছন পেছন ভেতরে এসে বসল।

কৃষ্ণেন্দুর হয়ে নলিনীই জবাব দিল—আর বাকী রাখলি কী বল? ও এলেই যা করিস তোরা, ভয় পাবারই তো কথা! বেচারী মুখচোরা ভালমানুষ। কিছু বলতে পারে না, তাই তোদের এত সাহস।

মেঝের ওপর মাদুরে বসে অন্যমনস্কের মত ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল কৃষ্ণেন্দু। অতিসাধারণ কয়েকটা হাল্কা আসবাব মাত্র ঘরে। কিন্তু পরিচ্ছন্ন হাতে সাজান সবকিছুই। দেয়ালে কয়েকজন মহাপুরুষের ছবি টাঙান রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রতিকৃতিতে সযত্নে ফুলের মালা দেয়া হয়েছে। ওদিকে, দেয়ালের দিকে পরিষ্কার একটা চাদরের নীচে বিছানাপত্তর গুছিয়ে তোলা রয়েছে। ঘরের এক কোণে আলাদা একটা মাদুরে তানপুরাটা শোয়ান রয়েছে। ঘরের পেছনের খোলা জানলা দিয়ে ফুর-ফুরে হাওয়া এসে ঢুকেছে। কৃষ্ণেন্দু জানলার বাইরে পুকুরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। সব মিলিয়ে এ-ঘরটা, এখানের বাতাস, তানপুরা, আলনায় ঝোলান পঞ্চপাণ্ডবীদের শাড়ি-জামা, মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি, জানলার বাইরে নির্জন শান্ত পুকুর—ওর চেতনায় কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব সৃষ্টি করে।

নলিনী ওকে বসিয়ে রেখে ততক্ষণে রান্নাঘর থেকে ঘুরে এল। তারপর হাতে একটা এমব্রয়ডারি নিয়ে মাদুরের ও-প্রান্তে বসে পড়ল। কৃষ্ণেন্দুর মনে হল এবার ওর নিজে থেকে কিছু বলা দরকার। কিন্তু কী বলা উচিত ভেবে ঠিক করে উঠতে পারল না কৃষ্ণেন্দু। ও জানে শিবানী আর সর্বাণী এখন বাড়িতে নেই। ওদের কথাও জিজ্ঞেস করা যেত। কিন্তু এত অল্প আলাপে এক-জন যুবকের পক্ষে ওদের সম্বন্ধে খোঁজ নেয়াটা অশোভন হবে কী না, বুঝে উঠতে পারল না। শুধু আজ নয়, মাঝে মাঝে পঞ্চপাণ্ডবীদের এক-একজন হঠাৎ হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যায় খুব জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে ওর কৌতূহল যাই থাক, প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। শেষ-পর্যন্ত কথা বলার প্রয়োজনেই পঞ্চাননের কথা দিয়ে শুরু করল,—আপনার বাবার খবর কী? এবার অনেকদিন হয়ে গেল উনি বাড়ি আসেননি তো?

নলিনী এমব্রয়ডারিতে ছুঁচের ফোঁড় তুলতে তুলতে উত্তর দিল—কে বাবা! বাবা এখন মালদায় আছেন। আগে লিখেছিলেন এ-মাসের শেষে ফিরতে পারেন। আবার সেদিন চিঠি দিয়েছেন। লিখেছেন, রায়গঞ্জে এক শিষ্যবাড়িতে কিছুদিন থেকে আসবেন।

তারপর আবার হয়ত লিখবেন জলপাইগুড়ি যাবেন। কিম্বা অন্য কোথাও। একেবারে না আসতে হলেই যেন বাবা বাঁচেন।

নলিনীর দেখাদেখি হিমানী আর রিনিও দিদির পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। নলিনী দাঁত দিয়ে সুতোটা কেটে ফেলে, মাথা উঁচু করে বসে বলল,—যাকগে আমাদের কথা! এখন বলো পরীক্ষা কেমন দিলে কৃষ্ণেন্দু।

কৃষ্ণেন্দু একটু সলজ্জ হেসে উত্তর দিল, মোটামুটি হয়েছে একরকম।

হিমানীর ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠল এবার—দিদি তুই লক্ষ্য করেছিস একটা জিনিস? কৃষ্ণেন্দুদার মধ্যে ভাল ছেলের সব লক্ষণগুলো আছে—তাই না? কেমন বিনয় করে কথা বলেন—লক্ষ্য কর। ভাল পরীক্ষা দিয়েছেন, স্বীকার করতেও লজ্জা। ওদিকে মাসীমার মুখে শুনলাম কোলকাতায় কোন হোস্টেলে থেকে এম-এস-সি পড়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নলিনী তাড়াতাড়ি ধমকে উঠল ওকে,—আঃ, তুই থাম তো হিমানী। ওর সব কিছুতেই তোর ঠাট্টা। লেখাপড়া তো করবেই কৃষ্ণেন্দু। সবাই কী আর আমাদের মত!

তারপর একটু চুপ করে থেকে নলিনী আবার শুরু করল—জান কৃষ্ণেন্দু, ঠিক তোমার মত আমাদের এক ভাই ছিল। আমাদের বড় দুঃখ অকালেই তাকে হারাতে হয়েছে আমাদের। সে থাকলে আজ তোমারই মত বড় হত সে। বাবা বলতেন—ও অনেক বড় হবে। বাবা বড় জ্যোতিষী ছিলেন এক সময়। চিরদিনই বাবা তো এরকম ছিলেন না। অনেক শোকে-দুঃখে এমন হয়ে গেছেন। নির্ভুল গণনা ছিল বাবার। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য জান কৃষ্ণেন্দু, আমার ভায়ের বেলাতেই শুধু বাবার হিসেবে গরমিল হয়ে গেল।

আবার হঠাৎ কথা থামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল নলিনী। তারপর হেসে বলল—দেখছো, ঘুরে-ফিরে আবার সেই আমাদের কথাই এসে পড়ছে। কিন্তু কী করি বলো, যখন মনের মধ্যে হতাশা জাগে, তখন ওর কথা ভীষণ মনে পড়ে যায়। আর কী মনে হয় জান, ও বেঁচে থাকলে আমাদের এত কষ্ট হত না কৃষ্ণেন্দু।

নলিনী আর শিবানী কৃষ্ণেন্দুর থেকে বয়েসে কিছু বড়, তাই ওদের নলিনীদি, শিবানীদি বলে কৃষ্ণেন্দু। আর হিমানী থেকে রিনি—সবাই ওর থেকে ছোট। ওদের নাম ধরে তুমি বলে কথা বলে কৃষ্ণেন্দু।

আজকে হাল্কা আলাপের শুরুতেই এমন বিষণ্ণ সুর বেজে উঠবে ওর গলায়, ভাবতে পারেনি নলিনী। তাই হয়ত তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে ফেলতে চেষ্টা করল—তুমি গান ভালবাস, তাই না কৃষ্ণেন্দু!

হিমানী আবার খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর হাসির দমক সামলাতে সামলাতে বলল—দিদি, তুই তো কম নোস। উনি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের গান শোনেন বলে নিজেদের খুব সুকণ্ঠী ভাবিস বুঝি!

কৃষ্ণেন্দুর বিব্রত ভাব লক্ষ্য করে নলিনী এবার হেসে ফেলল—বারে, লুকিয়েই বা শুনতে যাবে কেন কৃষ্ণেন্দু। লুকিয়ে লুকিয়ে বরং তোরাই দেখিস ওকে। না হলে ও কী করছে, না করছে তোরা জানলি কী করে।

—দিদি! নিমেষে হিমানী এবার কপট রাগে ফুঁসে ওঠে—কবে দেখেছিস বলতো! ইস্ লুকিয়ে দেখতে ভারি বয়ে গেছে আমাদের।

যতদিন যাচ্ছে দু'পক্ষই সহজ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। এখন বাইরে থেকে বেরিয়ে ফেরার সময় সদর দরজা দিয়ে বাড়ি ঢোকে না কৃষ্ণেন্দু। পেছনের দরজা দিয়ে ওপরে উঠে আসার আগে একতলায় একবার থমকে দাঁড়ান এখন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে ওর। বকুলগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ডাকে—নলিনীদি।

রান্নাঘর কিম্বা ভেতরের ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও আসে ওর কানে—আছি, এসো। ওমা, ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

নলিনী কিম্বা শিবানী না থাকলে অন্য কেউ সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে—ওরা কলকাতায় গেছে কৃষ্ণেন্দুদা। ফিরতে বোধহয় রাতই হয়ে যাবে ওদের। ভেতরে আসুন না আপনি। ভালই হল আপনি এসেছেন। ওরা বাড়ি নেই, একলা একলা আমাদেরও ভাল লাগছে না মোটেই।

এমনি একটা সাড়া পাবার জন্যেই যেন কৃষ্ণেন্দুর কান উৎকর্ণ হয়ে থাকে। তা সে যেই সাড়া দিক। ঠিক যে কাউকে প্রয়োজন ওর তা নয়। কাউকেই আলাদা করে ভাবতে ইচ্ছে করে না কৃষ্ণেন্দুর। দল থেকে একজনকে বিচ্ছিন্ন করেও ভাবা যায় না পঞ্চপান্ডবীদের।

সেদিন কী খেয়াল হল কৃষ্ণেন্দুর। সাড়া না দিয়েই নিঃশব্দে উঠোনের ওপর এসে দাঁড়ায়। দরজাটা খোলা কিন্তু বাইরে থেকে কাউকেই নজরে পড়ল না ওর। ওদের চাপা হাসি আর গুঞ্জনে ঘরের ভেতরটা গম গম করছে। লণ্ঠনের আলোয় ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ওদের ছায়া-মূর্তিগুলো নেচে বেড়াচ্ছে, দেখতে পেল কৃষ্ণেন্দু। হঠাৎ ওর মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি কিলবিল করে উঠল। এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভেবে নিল মনে মনে। তারপর পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেই ঘরের মধ্যে মহাত্রাসের সঞ্চার হল। সোরগোল জুড়ে দিল পঞ্চপান্ডবীরা। পরক্ষণেই ওদের আর্ত-চিৎকারটা উদ্দাম হাসি হয়ে ফেটে পড়ল—হিহি, হিহি...কৃষ্ণেন্দুদা। ভারি অসভ্য লোক তো তুমি। বাবাঃ তো আত্মা থেকে, মাগো। কী লজ্জা! ছিঃ ছিঃ কোথাকার! দাঁড়াও তোমার দা বলে ভেতরে ঢোকা আজ বার করছি।

উপায়ান্তরবিহীন হয়ে কে যেন সেই মুহূর্তে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিতেই ঘরের ভেতরটা ঘন অন্ধকারে ভরে উঠল।

কৃষ্ণেন্দুও ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠে ভয়জড়িত গলায় তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আমি নলিনীদি, আমি কৃষ্ণেন্দু, ভয় নেই।

অন্ধকারের মধ্যে হিমানীর চাপা হাসিটা তখনো উদ্দাম বেগে বেজে চলেছে—ভয় নেই, সে আমরাও জানি। যান তো, এখন বেরোন। একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান দিকি, লক্ষ্মীটি।

কৃষ্ণেন্দু তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে কে যেন দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল। তারপর লণ্ঠনটা আবার জেলে নিল, বাইরে থেকে বোঝা গেল। একটু পরে জামাকাপড় বদলে শিবানী দরজা খুলে হাসতে হাসতে বাইরে এসে ডাকল—কৃষ্ণেন্দু, এবার ভেতরে এসো, হয়ে গেছে আমাদের।

কৃষ্ণেন্দু কুণ্ঠিত গলায় ক্ষমা চাইল—আমায় ক্ষমা করুন শিবানীদি, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

শিবানীর চোখে-মুখে কিন্তু ক্ষোভের এতটুকু ছায়া পড়েনি বরং কৌতুকের হাসিই চকচক করছে ওর লজ্জাবিনত চোখ দুটোতে। অন্ধকারে কৃষ্ণেন্দুর সাড়া পেয়ে এগিয়ে এসে ওর হাতটা টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে—না, না এত কুণ্ঠিত হতে হবে না তোমাকে। দোষ তো আমাদেরও। দরজাটা বন্ধ করে রাখাই উচিত ছিল। যাকগে এখন ভেতরে এসো। বিশ্বাস করো, তোমাকেই খুঁজছিলাম আমরা।

শিবানীর পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকে পড়ে সকলের দিকে তাকাল কৃষ্ণেন্দু। অন্যদিনও ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে ও। কিন্তু আজ কেন সকলকেই অন্যরকম লাগছে। পরিপাটি করে চুল বেঁধেছে সবাই। খোঁপায় তাজা গন্ধরাজ আর বেলকুঁড়ির মালা জড়িয়ে নিয়েছে। মুখে হাল্কা প্রসাধন করায় এই মুহূর্তে সকলকেই সুন্দরী মনে হচ্ছে ওর। এর আগে এত দামী শাড়ি-জামাও কখনো পরতে দেখেনি কৃষ্ণেন্দু। আজ যেন সবকিছুই বিস্ময় সৃষ্টি করছে ওর চোখে। পরনের রেশমী শাড়ির ভাঁজগুলো যেন আগের চেয়ে অনেক দুরন্ত, অনেক মুখরিত হয়ে উঠেছে।

নলিনীর ঠোঁটে চাপাহাসি লেগেই ছিল। এবার কথা বলার সময় সেটা যেন ফুলেফেঁপে ঢেউ হয়ে উঠল—আমাদের মুখের দিকে অমন করে কী দেখছ বলতো কৃষ্ণেন্দু। তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে শুরু করল,—

আজ আমার জন্মদিন। আবার সামনের মাসে ঠিক এমনি দিনেই শিবানীর জন্মদিন। আমাদের সকলের জন্মদিনই আমরা এমনি করে পালন করি। আর কোনদিন নয়। শুধু জন্মদিনটাই আমাদের জীবনে এখনো বিশেষ দিন হয়েই ঘুরে ঘুরে আসছে। তাই এই দিনে আমরা ঘরদোর সাজাই। নিজেদের সাজাই। তুলসীমঞ্চে মঙ্গলপ্রদীপ জেবলে দি। প্রাণভরে গান গেয়ে করুণাঘন ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদ কামনা করি। প্রার্থনা করি, আবার যেন এই দিনটি ঘুরে আসে আমাদের জীবনে। সকলের মত আমরাও যেন তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত না হই।

একটু থেমে নলিনী আবার বলল,—আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই বাইরের লোক কৃষ্ণেন্দু। তুমি আমাদের কাছের মানুষ। আজ আমরা তোমাকে খাওয়াব, তোমাকে গান শোনাব। তোমার মন যা চাইবে, তাই করব আমরা। তারপর তুমি যদি খুশী হও, যদি পরিতৃপ্ত হও, তখন আমাদের জন্যে তুমিও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। এ-জন্মে নাও যদি হয়, পরের জন্মেও যেন তাঁর আশীর্বাদ পাই। সুখী হতে পারি আমরা।

আরেকটু পরেই বকুলতলার বেদীতে পঞ্চপাণ্ডবীরা তানপুরা হাতে গোল হয়ে বসে পড়ল। নলিনীর গলায় কেবল সাদা গোড়ের মালা। আজকের দিনটি ওরই। মাত্র এই একটি দিন ও সবার থেকে একটু স্বতন্ত্র। হিমানীর হাতের তানপুরায় ধীরে ধীরে সুরের মূর্ছনা জেগে উঠল। শিবানীই প্রথম শুরু করল—

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি।

ঘাটে ঘাটে ফিরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

কৃষ্ণেন্দুও আজ ওদের সঙ্গে বেদীর একধারে মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপচাপ বসে গান শুনছে। ওরা বিভোর হয়ে গান গাইছে। হয়তো বা এই মুহূর্তে ভুলেই গেছে ওর কথা। তপ্ত বৈশাখী সন্ধ্যার গরম এলোমেলো হাওয়া ছুটে এসে মাঝে মাঝে বকুলের ডালে ডালে কাঁপন জাগিয়ে তুলছে। পঞ্চপাণ্ডবীদের শাড়ির আঁচল খসে পড়ছে বারবার। ঝোড়ো হাওয়ায় চূর্ণকুন্তল এসে পড়ছে ওদের মুখের ওপর। কিন্তু কোনদিকেই হুঁশ নেই ওদের। যেন কোন ভাবরাজ্যে ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ নিখোঁজ হয়ে রয়েছে ওরা।

হঠাৎ ওপরের জানলা থেকে মলয়ার বেসুরো কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই সুরের জাল আচমকা ছিঁড়ে গেল। মলয়া ডেকে নিলেন কৃষ্ণেন্দুকে। বোধহয় ওদের সঙ্গে ছেলের এত ঘনিষ্ঠতা ভাল লাগে না ওঁর। কিম্বা অর্ধেন্দুবাবু এসব পছন্দ করেন না বলেই তাঁর ফিরে আসার আগে ছেলেকে ডেকে নিলেন।

নিমেষে গান থেমে গেল। আরেকটু পর হিমানীর হাতের তানপুরা স্তব্ধ হয়ে থেমে পড়তেই সুরের রেশটুকুও যেন হারিয়ে গেল কতদূরে। মার ডাকে কৃষ্ণেন্দু উঠে দাঁড়াতেই নলিনী এবার কথা বলে উঠল—একটু দাঁড়াও ভাই কৃষ্ণেন্দু। তোমার জন্যে খাবার করে রেখেছি। না খেয়ে গেলে কিন্তু আমরা দুঃখ পাব খুব।

কৃষ্ণেন্দুর অনিচ্ছে থাকার কথা নয়। বিশেষ করে আজকের দিনটিতে। মা না বুঝুন কিন্তু এ-দিনটির কী অপরিসীম মূল্য পঞ্চপাণ্ডবীদের কাছে, ওর অজানা নয়। তবু মার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু মেশান ছিল যা ওর কানে একটুও ভাল লাগেনি।

নলিনীদি নিজেই উঠে পড়ে হন-হন করে রান্নাঘরের দিকে ছুটছিলেন, কৃষ্ণেন্দু বাধা দিল—আজ থাক নলিনীদি। ঠিক এই সময় খেতে কী ভাল লাগে কারো? কাল সকালে আসব। এসে যত খাওয়াবেন খেয়ে যাব। তাই বলে ভাববেন না আপনাদের কথাটা ভুলে গেছি।

নলিনীদি খুব অবাক হয়ে উঠলেন—কী কথা বল তো? কী ভুলে যাবে না তুমি...। পরক্ষণেই কৃষ্ণেন্দুর কথাটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে একটু হাসল—দূর পাগল। ও-কথার কোন মানে আছে। তখন এমনি একটা কথার কথা বলেছিলাম তোমায়। প্রার্থনা-টার্থনা আমরাই মানি নাকি? অনেক করে দেখেছি, ওসব বাজে। এখন থাকগে ওসব কথা। মা ডাকছেন যাও। কাল এসো কিন্তু, না হলে রাগ করব আমরা।

সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ওদের গান শুনেছিল কৃষ্ণেন্দু। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত তখন কত খেয়াল নেই। নীচে বকুলতলায় সেই মোহিনী সুরও আর বেঁচে নেই। বাইরে নিঝুম স্তব্ধ পৃথিবী, কোনদিকে কোন শব্দ নেই। তাই বোধহয় অত আস্তে চাপা গলার কান্নাটাকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না ওর।

চকিতে সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ শিহরন বয়ে গেল কৃষ্ণেন্দুর। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে পা টিপে টিপে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একতলায় বকুল গাছটার নীচে চাপ-চাপ অন্ধকার থমথম করছে। শুধু ওদিকের তুলসীমঞ্চে প্রদীপের শিখাটা এখনো কৃপণ আলোটা বুকে ধরে থরথর করে কেঁপে চলেছে। সে-আলো যত সামান্যই হোক চিনে নিতে অসুবিধে হবার কথা নয় ওর।

আশ্চর্য, জন্মদিনেই নলিনীদি কাঁদছে! তবে কী জন্মদিনের এত আনন্দ-হাসি-হুল্লোড়—সব মিথ্যে? নিছক একটা সংস্কার। কিন্তু কেন কাঁদছে নলিনীদি! কোন অভিশাপে এত কান্না জমে ছিল ওর বুকে।

খর জৈষ্ঠের দিন। তপ্তনিদাঘের শেষে আকাশে মেঘ জমে উঠল সেদিন। সন্ধের পর ঘনঘটা করে বৃষ্টি নামল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাল। রান্নাঘরের টিনের চালায় একটানা প্রবল বৃষ্টির শব্দ বেজে চলল... ঝপ্ ঝপ্...ঝপ...ঝপ...

আজ শিবানীর জন্মদিন। সারাদিন প্রাণান্ত গরমে ঝিমিয়ে থেকে, বর্ষার নতুন জল পেয়ে সতেজ তরুলতার মত পঞ্চপাণ্ডবীরাও চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বাইরের উঠোনে এর মধ্যেই জল জমে উঠেছে। বকুলতলার বেদীটাও জলকাদায় জবজবে হয়ে রয়েছে। কৃষ্ণেন্দু নিজের ঘরের খোলা জানলা দিয়ে কখনো বাইরে দুর্যোগভরা প্রকৃতিকে দেখছে। কখনো একতলায় বৃষ্টির মধ্যে পঞ্চপাণ্ডবীদের দুরবস্থা লক্ষ্য করে মজা পাচ্ছে। বোধহয় ওদের রান্নাঘরের কাজ সারা হতে এখনো দেরী আছে। বৃষ্টি মাথায় করে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছে কৃষ্ণেন্দু।

তারপর অনেকক্ষণ আর ওদিকে মনোযোগ ছিল না কৃষ্ণেন্দুর। বৃষ্টির ঝাপটায় ঘরের ভেতরটা ভিজে যাচ্ছিল। জানলাটা বন্ধ করে একটা বই খুলে শুয়ে শুয়ে পড়ছিল। খাওয়াদাওয়া যখন হয়ে গেল এক সময়। শোবার আগে অন্ধকার ঘরের খোলা জানলায় বসে বসে অন্যদিনের মত

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। বাইরের প্রবল বৃষ্টিটা যেন থেমে গেছে। শুধু ঝিপঝিপ করে বৃষ্টির রেশটুকু এখনো টিকে আছে। নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে পৃথিবী। দূরে পুকুরের ব্যাঙগুলো এখনো মহানন্দে একটানা ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে ডেকে চলেছে। ঝিল্লীর ঐকতান মৃদুমন্দ ঝিঁঝির ডাক কানে ভেসে আসছে।

আশ্চর্য! একতলায় এখনো বাতি জ্বলছে। কৃষ্ণেন্দু অবাক হল খুব। ওদের ঘরগুলো এখান থেকে চোখে পড়ে না। কিন্তু দরজা খোলা থাকলে লণ্ঠনের আলো পড়ে উঠোনে। নিশ্চয়ই এখনও জেগে পঞ্চ-পাণ্ডবীরা। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো ওদের। আরো কিছুক্ষণ একতলায় নজর রেখে অপেক্ষা করল কৃষ্ণেন্দু। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই। ভেতরের ঘরে চলাফেরা করলে উঠোনে ছায়া পড়ে। আশ্চর্য, এতক্ষণ হয়ে গেল কারো ছায়াও তো পড়ল না।

পাশের ঘরে মা-বাবা বোধহয় এতক্ষণ জেগে আছেন। জোরে কথা বললে শুনতে পাবেন ওঁরা। না হলে কৃষ্ণেন্দুর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল...কারো নাম ধরে ডেকে সাড়া নেয়। বাধ্য হয়ে ইচ্ছেটাকে চেপে রেখে শুয়ে পড়তে হল।

কিন্তু মনের মধ্যে অস্বস্তিটাকে বোধ-হয় ভুলতে পারছিল না কিছুতেই, বারবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল ওর। আর কখনো এমন হয়নি। আজই প্রথম। কেমন একটা অশুভ ইঙ্গিত যেন বারবার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল।

অনেক রাতে আবার ঘুম ভেঙে গেল কৃষ্ণেন্দুর। কিন্তু না, এবার নিজে থেকে ঘুম ভাঙেনি। একতলায় অনেকগুলো অপরিচিত মানুষের দৌড়াদৌড়ি, চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। কিন্তু কিসের এত সোরগোল! এত রাতে ভারি বুটের শব্দই বা কেন! তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। কিন্তু নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না কৃষ্ণেন্দু। নীচের উঠোনে রাইফেলধারী এতগুলো পুলিশ কেন! তিনজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ অফিসার ব্যস্তসমস্তভাবে কথা বলছে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে। এত রাতে পাড়াপড়শিরা এসেছে...অথচ ও কিছু জানতে পারল না। কিন্তু কী ব্যাপার হতে পারে বুঝে উঠতে পারল না কৃষ্ণেন্দু। নলিনীদিরাই বা কী করছে কে জানে। এত লোক রয়েছে কিন্তু ওদের কাউকে তো চোখে পড়ছে না। ওদিকের পুকুরের পাড়ে পাড়ে অন্ধকার ঝোপেঝাড়ে টর্চের তীব্র আলো ফেলে কারা যেন কী খুঁজে বেড়াচ্ছে। কে যেন একজন বলে উঠল—ওদের তো পাওয়া যাচ্ছে না স্যার। মনে হচ্ছে এবারও সরে পড়েছে।

মোটামত একজন পুলিশ অফিসার কর্কশ ভোঁতাবাজ গলায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—বলেন কী! এ যে দেখছি রীতিমত ভানুমতীর খেল দেখাল শয়তানিগুলো। ভাল করে খুঁজে দেখেছেন তো লুকিয়ে থাকার জায়গাগুলো? দেখুন আরেকবার ভাল করে। চারদিকে ওয়াচ রাখা সত্ত্বেও যদি পালায়...সেটা ডিসক্রেডিট নিশ্চয়ই।

বাড়ির মালিক সত্যবাবুর গলাটা ভেসে এল কৃষ্ণেন্দুর কানে—দিনকাল কী হল বলুন তো স্যার! এত বড় স্মাগলার, এমন ভয়ংকর মেয়েছেলে তো মশাই জীবনে শুনিনি। দেখেশুনে তো কিছুই মনে হত না। এতদিন ছিল মশাই আমাদের বাড়ি, বিশ্বাস না হয় এই তো এঁরা রয়েছেন, জিজ্ঞেস করে দেখুন...সন্দেহ হবার মত কিছুই নজরে পড়েনি আমাদের...

সত্যবাবুর বাকী কথা আর কানে গেল না কৃষ্ণেন্দুর, তার আগেই ওর কানদুটো ভোঁ-ভোঁ করতে শুরু করে দিয়েছে। আশ্চর্য, নলিনীদিরা স্মাগলার! দাগী আসামী...একী সত্যি, না এখনো ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখছে ও!

হঠাৎ কার হাতের টর্চের আলো এসে পড়ল ওর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসার একজন ডেকে উঠলেন—আপনিই কৃষ্ণেন্দুবাবু? শুনলাম এঁদের সঙ্গে আপনার মেলামেশা ছিল। বলতে পারেন কোথায় গেছে ওরা...খবর রাখেন কিছু?

অন্য একজন পুলিশ অফিসার বলে উঠলেন—দয়া করে একবার নীচে আসবেন! আমাদের একটু সাহায্য করুন না প্লিজ।

নিদারুণ বিহ্বলতার মধ্যেই নীচে নেমে এল কৃষ্ণেন্দু। মোটামত পুলিশ অফিসারটি কথা বললেন এবার—এদের হালচাল সম্বন্ধে কিছু খবর রাখতেন... কখনো সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেছেন...!

কৃষ্ণেন্দু মাথা নাড়ল—না।

শেষ কখন দেখেছেন এদের। দেখে তো মনে হচ্ছে...বিপদের গন্ধ পেতেই সরে পড়েছে। ঘরদোর সব খোলা, উনুনে ভাত ফুটছিল। একটু আগেও ছিল নিশ্চয়ই...

ঠিক সেই সময়ে অন্য আরেকজন পুলিশ অফিসার ইউনিফর্মে জলকাদামাখা অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ালেন—চৌধুরী, পুকুরপাড় দিয়েই যে পালিয়েছে আর সন্দেহ নেই। কাদার রাস্তায় অনেক-গুলো পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তারপর যা বনঝাদাড় এগোয় কার সাধ্য। আশ্চর্য, আমিই যেতে পারলাম না, ওরা পালাল কী করে ভেবে পাচ্ছি না।

মোটা পুলিশ অফিসারটি এবার রেগে ক্ষেপে উঠলেন—ওদিকে ওয়াচ রাখা হয়নি? ওকে পালাল কী করে। আরো সাবধান হবার প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই।

আগন্তুক পুলিশ অফিসারটি এবার হো-হো করে হেসে উঠল—আর কী ব্যবস্থা করা উচিত ছিল বল। তারপরই হয়তো মনে পড়ল, পাবলিকের সামনে এসব পুলিশী গোপনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা না হওয়াই ভাল। তাই প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি পাল্টে নিল—তুমি হয়তো ভুলে যাচ্ছ, আগেই পাঁচবার ওরা আমাদের জাল কেটে পালিয়েছে। এই প্রথম নয়। আর মেয়ে তো নয়—এক-একখানি রত্ন সব। পয়মাল। আত্মগোপন করে থাকার উপযুক্ত জায়গাই খুঁজে নিয়েছিল বটে!

একটু পর পাড়াপড়শিদের সাক্ষ্য রেখে বাড়ি সার্চ শুরু হল। কৃষ্ণেন্দু ওদের সঙ্গে ঘরে এল। কিন্তু এতক্ষণ ওদের সম্বন্ধে উক্তিগুলো না শুনলে পঞ্চপাণ্ডবীরা এত ভয়ংকর মেয়ে ভাবতেই পারত না। এখনো পারছে না কৃষ্ণেন্দু। পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না চোখদুটোকে। ঘরের মধ্যে জিনিসপত্রগুলো এমন করে ছড়ানছিটনো রয়েছে মনে হয়...এখনো ওরা এ-বাড়িতেই আছে। কিম্বা কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে কোথাও গেছে, এখুনি ফিরে আসবে।

পুলিশ অফিসারের কথাই ঠিক। পাঁচ বোনের জন্যে ঘরজোড়া বিছানাটা বোধহয় সবেমাত্র পাতা হয়েছিল। মশারিটা শুধু পড়ে রয়েছে মেঝের ওপর। হয়তো ওটা টাঙাবার আগেই ওরা বিপদের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল। আলনায় ওদের শাড়ি-জামা পরিপাটি করে সাজান রয়েছে। মাদুরের ওপর লণ্ঠনটা জ্বালা রয়েছে। পাশেই তানপুরাটা পড়ে রয়েছে। হয়তো কেউ আজও ওটা বাজিয়ে গান গাইছিল। আর কেউ না পারুক, কৃষ্ণেন্দু যেন সব-কিছুই ছবির মত দেখতে পাচ্ছে। রান্নাঘরে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি চড়ান এখনো। নিশ্চয় খাওয়া হয়নি ওদের। পঞ্চপাণ্ডবী-দের জন্যে মনটা যেন হু-হু করে কেঁদে উঠল কৃষ্ণেন্দুর। আশ্চর্য, ওদের চারদিকে এত বিপদ তাহলে অজানা ছিল না মোটেই। সব জেনেশুনেও তাহলে কেমন হাসত ওরা। শিবানীর সেদিনের সেই প্রশ্নটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল কৃষ্ণেন্দুর। এত দুঃখ বুকে করে হাসে কী করে মানুষ...। আর হয়তো এ-জীবনে দেখা হবে না ওদের সঙ্গে। হলে...প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে নিতে চেষ্টা করবে কৃষ্ণেন্দু।

# গোয়েন্দা কবি পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত
শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত

দরোয়ানকে নিয়ে যাওয়ায় সিপাইজি আপত্তি জানায়....

পরাশর এবার যা করে বসে তা বুঝি চূড়ান্ত পাগলামি ...

## দেশের সীমা ছাড়িয়ে

এতদিন দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার দেশ ছাড়িয়ে বিদেশ। পথ চলার দুরন্ত নেশায় আমাদের মেয়েরা এবার পাড়ি জমিয়েছে কলকাতা থেকে সিংহলে। দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশ পর্যন্ত এই পদযাত্রা মেয়েদের অগ্রগতির ইতিহাসে এক নয়া-সংযোজন, নতুন অধ্যায়।

পথের ভয় অবশ্য ওদের ভেঙেছে অনেক আগেই। যেদিন ওরা কলকাতা থেকে দীঘা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষায় বেরিয়ে পড়ে। সেদিনই [illegible] বুঝেছিল ওরা নিরাশ্রয় নয়, একা নয়। পথে পথে ছড়িয়ে আছে অজস্র আত্মীয়স্বজন। সবাই ওদের আদর করে ডেকে নিয়েছে, খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আবার পরদিন প্রত্যুষে ক্ষণিক পরিচয়ের অসামান্য স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে ওরা পথ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছে। এমনি করে পথ ভাঙতে ভাঙতে একদিন মোরগ ডাকা ভোরে ওরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। বিরাট সম্বর্ধনায় তখন ওরা অভিভূত।

সেই প্রথম হাতেখড়ি। ওরা বুঝলো পথ ওদের কতো আপন। আর পথের পাশে ছড়ানো স্বতঃস্ফূর্ত আত্মীয়তায় ওদের কৃতজ্ঞতার ঝুলি কানায় কনায় পূর্ণ। সেই কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞতাকে অকৃতজ্ঞের মতো অস্বীকার করে বেশিদিন চুপ করে বসে থাকা ওদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর হলোও তাই। পথ আবার ওদের ডেকে নিল। এবার দূরত্ব আরো বেশি। কলকাতা থেকে দিল্লী এভাবেই ওদের অতিক্রম করতে হবে।

পিঠে রুকস্যাক, পরনে প্যাণ্ট-সার্ট, মাথায় টুপি আর পায়ে জঙ্গল বুট দেখেই পথ ওদের চিনতে পারলো। দিব্যি আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ওরা পথ চলতে শুরু করলো। চলতে চলতে এলো লাল মাটির দেশ বীরভূম। শান্তিনিকেতন ওদের স্বাগত জানালো। চলতে চলতে থেমে থেমে ওরা এগিয়ে চললো। কখনো কখনো দূর থেকে ওদের লক্ষ্য করে রাস্তার দ্রুতগতি গাড়িগুলো আস্তে আস্তে পাশে দাঁড়িয়েছে। ওদের সাহায্য করার জন্য কিছুটা এগিয়ে দিয়েছে। চলার পথে এই আত্মীয়তা ওদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। ওরা মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। আর আতিথেয়তায় উষ্ণ পরশ নিয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের তো ভোলাই দায়।

অসংখ্য রাজপথ-জনপথ মাড়িয়ে ওরা পেঁছে গেল দিল্লী। ওদের স্বাগত জানানোয় হাজারো আয়োজন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ওদের ডেকে অভিনন্দন জানালেন। ওদের দুঃসাহিসক পদযাত্রাকে স্বীকৃতি দিলেন বিমানে কলকাতা ফেরার ব্যবস্থা করে দিয়ে। অভিযাত্রীদের হৃদয় তখন আনন্দের জোয়ারে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী বললেন, তোমাদের আদর্শে অনুকূলো আমাদের মেয়েরা চিনে নিক নিজেদের পথ।

সেটা ছিল জানুয়ারি, ১৯৭০। ঠিক এক বছর পরে জানুয়ারি, ১৯৭১-এ কলকাতা—সিংহল পদযাত্রা।

ইতিমধ্যে আরেকটি নতুন ধরনের পরীক্ষা হয়। তিনজনের একটি মহিলা

দল সাইকেলে কলকাতা থেকে শিলং যাত্রা করে। সেই একই উপায়ে। তরুণদের মধ্যে নিজ পায়ে চলার বদলে সাইকেল। এই [illegible] লাভ করে পার্বত্য সাফল্য। প্রায় এক মাসে ওরা শিলং পৌঁছায়। সম্প্রতি এই সকল অভিযাত্রীরা ফিরে এসেছে কলকাতায়। সঙ্গের সামান্য পাথেয় মাত্র পাঁচটি টাকাও হাত শূন্য এদের।

পথ এবার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাই ঘর ছেড়ে পথের সন্ধানে আমাদের মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে। অজানার হাত-ছানিতে সাড়া দিয়ে দুর্জ্ঞেয়তার রহস্য ভেদই এ-যুগের মূলমন্ত্র। মেয়েরা এ-আবাহনকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই দুর্গম গিরিশৃঙ্গ আজ তাঁদের পদভরে কম্পিত।

অনুরূপ রহস্য আর সৌন্দর্যে ঘেরা পাহাড় অভিযানে আমাদের মেয়েরা অংশ নিয়েছে একাধিকবার। রোন্টি শৃঙ্গ বিজয় দিয়ে ওদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এমনি-ভাবেই ক্রমে ওরা এগুচ্ছিল। সারাদেশ জুড়ে মেয়েদের মধ্যে পাহাড় অভিযানের এক দুরন্ত নেশা জেগে উঠেছে। বাংলাদেশ থেকে গুজরাট সবাই এই অভিযানে অংশী-দার। অধিকাংশ অভিযানেই ওরা সাফল্যের হাসিতে উজ্জ্বল।

এই সাফল্য কিন্তু এমনিতে আসেনি। এজন্য আমাদের যথেষ্ট মাশুল গুণতে হয়েছে। অভিযানের গোড়ার দিকেই একটি বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেইল গিরিবর্ত্ম কেড়ে নেয় অভিযাত্রী অনিমা সেনকে। মেয়েদের পাহাড় জয়ের আকাঙ্ক্ষা এতে বিরাট ঘা খায়। কিন্তু কেউ পেছিয়ে যায় না। পাহাড়ের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করতে সবাই সংকল্পবদ্ধ।

একের পর এক বিজয় পতাকা উড়তে লাগলো। পাহাড় কিন্তু আবার কুটিল হাসি হাসলো। বিরাট আঘাতে আমাদের মনোবল গুঁড়িয়ে দেবার জন্য চক্রান্তজাল বিস্তার করলো। কলকাতা থেকে এক অভিযাত্রী দল হিমালয়ের লাহুল শৃঙ্গ অভিযানে যাত্রা করলো। দলনেত্রী সুজয়া গুহ। সুদক্ষ এই পর্বতারোহী ইতিপূর্বেও একাধিকবার হিমালয়ে অভিযান চালিয়েছে। এবং প্রতিটি অভিযানই সাফল্যদীপ্ত। সঙ্গে রয়েছে কমলা সাহা এবং আরো কয়েকজন।

দুর্গম গিরিশৃঙ্গে ওদের বিজয়-পতাকা উড়লো। আনন্দের আতিশয্যে ওরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো। এবার ফেরার পালা। পর্বতের চক্রান্ত এতক্ষণে সম্পূর্ণ। একটি পাহাড়ী নদী পেরোতে গিয়ে হারিয়ে গেল সুজয়া এবং কমলা। সফল অভিযাত্রী-দের কেড়ে নিয়ে পর্বত হাসলো পরি-তৃপ্তির হাসি।

আমাদের মনোবল প্রচণ্ড আঘাত পেল। কিন্তু মুষড়ে পড়বার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। ওদের আরব্ধ কাজ এখনো অনেক বাকি। সম্মিলিত প্রয়াসে তা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এভারেস্ট শিরিশৃঙ্গে যেদিন উড়বে আমাদের বিজয় কেতন সেদিনই সফল হবে পাহাড়ের বুকে ওদের এই আত্মদান। আর সেদিনই হবে পাহাড়ের দুর্জয়তার যোগ্য জবাব।

দলে দলে মেয়ে আজ পাহাড়ে চড়ার তালিম নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে অভিযানে। অনিমা-সুজয়া-কমলার আত্মদান ওদের নতুন প্রেরণায় উন্মুখ এবং আরো সংকল্প-বদ্ধ করেছে।

ঘরকুনো নাম আমাদের ভাঙছে এই-ভাবে। পাহাড় অভিযান এবং অজানা পথের সন্ধানে সাড়া দিয়ে আমরা নয়া ইতিহাস রচনা করে চলেছি। আকাশে বাতাসে আজ তারই নামগান।

তিনজনের মহিলা অভিযাত্রী দলটি ১৬ জানুয়ারীর সকালে কলকাতা থেকে যাত্রা করলো সিংহল অভিমুখে। অবশ্যই হিচ-হাইক করে। যাত্রার প্রাক্কালে কল-কাতা তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত এক অনু-ষ্ঠানের আয়োজন করে উদ্যোক্তা এক্স-প্লোরারস ক্লাব। সেখানে অনেকেই ওদের অভিনন্দন জানালেন। বিশেষ, ওদের মনে ভরসা জোগাতে সদ্য সাইকেলে কলকাতা থেকে শিলং ঘুরে আসা অভিযাত্রী দলটিও উপস্থিত ছিল।

অভিযাত্রী দলের নেত্রী শ্রীমতী পুষ্পা সাক্সেনার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা দুঃসাহসিক এবং দুঃসাধ্য কোন কিছু নিয়ে বেশ গভীরভাবে নাড়াচাড়া করা। সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন দীর্ঘদিন থেকেই। আগাগোড়া তার খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহ স্কুলকলেজে খেলাধুলায় সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেত পুষ্পা। নিজের দুঃ-সাহসিকতার নেশা সে অনেকটা পূরণ করেছে সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করে। ডাক্তারী পাশ করার পর পুষ্পা কমিশনড অফিসার হিসেবে ঢুকে পড়ে মিলি-টারীতে। এখন তার কর্মস্থল হলো সিমলা হিলস।

তবু তার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হচ্ছিল না। তার সেই দুঃসাহসিকতার স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়া স্বপ্নই রয়ে গেল। এমন সময়ে একটি পত্রিকায় পুষ্পা জানতে পারলো এই অভি-যানের কথা। কালবিলম্ব না করে সে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। তারপরই অভিযানে তার মনোনয়ন।

সাত ভাইবোনের মধ্যে বড় পুষ্পার বয়স ছাব্বিশ। প্রসঙ্গত, গীটারে তার হাত খুব ভাল।

অপর দুই অভিযাত্রী হলো মীরা সরকার এবং মীনা গুহ। হিচ-হাইক করে রাজপথ-জনপথে বেরিয়ে পড়ে অজানিতের সঙ্গে প্রথম মোলাকাতের অভিজ্ঞতা এদের। প্রথম যে অভিযান হয় কলকাতা থেকে দীঘা তাতেও এরা ছিল। সেই এদের প্রথম পথ-পরিচয়। ধীরে ধীরে সে আকাঙ্ক্ষা আরো বেড়েছে। পথের মোহ এবং ভালবাসা নিবিড়ভাবে এদের জড়িয়ে ফেলেছে। তাই ১৯৭০ সালের জানু-য়ারীতে যখন কলকাতা থেকে দিল্লী হিচ-হাইক করে যাওয়া হয় তখন এই দুজনাই সেই মতো [illegible] এবং অর্জন করে দ্বিতীয় সাফল্য।

কলকাতা-দিল্লী অভিযানের দলনেত্রী ছিল চারজন [illegible] নেত্রী। আর সেটাই [illegible] অভিযাত্রীদের সর্ব-প্রথম [illegible] হিচ-হাইকিং। ওদের সেদিনের [illegible] আর নতুন করে উল্লেখের [illegible]। কলকাতা-দিল্লীর সাফল্যই যে এই আন্তর্জাতিক হিচ-হাইকিংয়ের প্রেরণা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

টালিগঞ্জের মেয়ে মীরা আমাদের অত্যন্ত কাছের। এখনও কলেজের পড়ুয়া। বি-এ ক্লাশের ছাত্রী। বয়স মাত্র চব্বিশ।

কলকাতা-দিল্লী অভিযানের অপর সফল অভিযাত্রী হলো মীনা। অসাধারণ তার মনোবল। উৎসাহ এবং প্রাণচাঞ্চল্যে ভর-পুর। পূর্বোক্ত অভিযানে তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর সেদিন থেকেই মীনা নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে পরবর্তী অভি-যানের জন্য। কলকাতা-সিংহল আন্ত-র্জাতিক হিচ-হাইকিংয়ে তার স্থান তাই খুবই স্বাভাবিক।

মীরার মতো মীনাও কলেজের পড়ুয়া। ডিগ্রি ক্লাশের ছাত্রী। দলের সে সর্বকনিষ্ঠ। বয়স মাত্র বাইশ। কলকাতার কাছেই বেল-ঘরিয়ায় তার বাস।

ওদের যাত্রা শুরু হয়েছে। সঙ্গে সম্বল বলতে মাত্র পাঁচটি টাকা আর কিছু বৈদে-শিক মুদ্রা এবং প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র—এই সামান্য পাথেয় নিয়ে এরা বেরিয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক হিচ-হাইকিংয়ে। খাওয়া-দাওয়ার বা থাকার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। পথেই মেয়েরা তার ব্যবস্থা করে নেবে।

এই অভিযানের আসল উদ্দেশ্য হলো দেশানুরাগ। নিজের দেশ এবং পারি-পার্শ্বিককে ওরা জানুক এক নতুন অভি-জ্ঞতার মাধ্যমে। সেই সঙ্গে ওদের অভি-জ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হয়ে জেগে উঠুক পিছিয়ে পড়া গ্রামের লোক। অভিযাত্রীদের পথের অধিকাংশই তাই গ্রামের পথ। শহরও আছে। এমনিভাবে জেগে উঠবে এক বিরাট একাত্মবোধ। ওদের বুকে এঁকে দেওয়া 'পহেলে হিন্দুস্তান' সফল হয়ে উঠবে এই আন্তর্জাতিক হিচ-হাইকিংয়ে।

কলকাতা থেকে সিংহলে পৌঁছুলেই ওদের অভিযান শেষ হবে না। ওরা ঘুরবে সিংহলের পথে পথে। সব মিলিয়ে ওদের লাগবে ছয় সপ্তাহ। তার মধ্যে তিন সপ্তাহ শুধু সিংহলে কাটবে।

সকল বাধা তুচ্ছ করে, দুর্জয় সাহসে ভর করে নবীন প্রাণের বার্তা নিয়ে ঘুম ভাঙানিয়া গান গাইতে গাইতে ওরা পথ হাঁটবে। পাহাড়, সাগর, নদী, ঝর্ণা ওদের গানে সুর মেলাবে। পথে পথে ওদের জন্য সবাই এগিয়ে আসবে আত্মীয়তার সাদর আমন্ত্রণ নিয়ে মঙ্গলশঙ্খ আর বিজয় তোরণে ওদের যাত্রাপথ হবে মুখরিত। এক অনাবিষ্কৃত দিগন্তে উড়বে ওদের বিজয় বৈজয়ন্তী।

—প্রমীল

# থিয়েটার-পাগল এক দেশ

বিমল বসু

'ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার!'

কিন্তু চমক লাগবে যদি জানা যায় যে বিধি বাম না হলেই 'নিধিরাম'রা সত্যিই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্দার হয়ে উঠতে পারে। উঠেছেও।

'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার'—প্রমাণ? জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে হাতের কাছে। জন্ম-বাউণ্ডুলে জাত—'দেশে দেশে মোর ঘর আছে আমি সেই দেশ লব খুঁজিয়া' করতে করতেই কত যুগ পার হয়ে এ-দেশ সে-দেশ ঘুরে নানা নির্যাতন আর চিরদিনের জন্যে উৎসাদনের বাড়বানল পার হয়ে অবশেষে ঠাঁই পেল। ঘর পেল, পেল 'বর'ও—জীবনজয়ের সাধনায় চিরজয়ী হবার। দক্ষ শিল্পীর আর নিপুণ কারিগরের মতো আস্তে আস্তে গড়ে তুলতে লাগল জাতীয় জীবনে অপরিহার্য সবকিছুই। নিজের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন, জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি রক্ষার উন্মাদনায় সারাদেশ যখন ব্যস্ত-বিব্রত, অস্থির ও উত্তেজিত, তার মধ্যেই এই নিধিরামরা তাদের নিজেদের জাগ্রত দৃষ্টি সংহত করেছে নিজেদের রঙ্গমঞ্চের দিকে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধোদ্যমের নিদারুণ প্রস্তুতির মধ্যেও নবীন রাষ্ট্র ইসরাইল মঞ্চাভিনয় নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে আন্তরিকভাবে।

পুঁজি হিব্রুভাষা। নিয়মের নিগড়ে তার প্রাণস্পন্দন ক্ষীণ, খঞ্জ ও আড়ষ্ট তার চলার গতি। শুরু হল ভাষা-পরিমার্জনা। হিব্রুভাষার নবীকরণ, আধুনিকীকরণ এবং তাতে নতুন নতুন শব্দ-সংযোজনার কাজ জোর কদমে চলতে লাগল। চলতে থাকল ঘসামাজা করে অনড় আড়ষ্ট ভাষাশরীরে প্রাণগঙ্গার প্রবাহ বহাবার। তা না হল কিন্তু নাটক কই? নাট্যকার নেই তো নাটক! নেই বলে ধার করতে তো মানা নেই। শুরু হল ভিনদেশী খ্যাতনামা নাট্যকারদের প্রসিদ্ধ নাটকগুলির ভাষান্তর। আন্তন চেকভ-এর ক্লাসিক নাটক 'দ্য শী গাল'ও বাদ গেল না।

এক নজরে সমস্ত ব্যাপারটার দিকে তাকালে মনে হবে ঃ পাগলের পাগলামি! সত্যিই পাগলামি। অকপটে সে-কথা সানন্দে স্বীকার করেছেন ইসরাইল নাট্য-সমালোচকদের ডীন এমিল ফিউয়ারেস্টিন ঃ 'গোটা জাতটাই থিয়েটার-পাগল!' তেল আভিভের ক্যামেরি থিয়েটারের প্রয়োগ-প্রধান ইয়াশায়াহু উয়েনবার্গ মন্তব্য করেছেন ঃ 'দর্শক সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে ইসরাইল সব সেরা।' তেল আভিভের ১৯৬৯ সালের এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, শতকরা পঁচিশজন মাসে একবার না একবার নাটকাভিনয় দেখতে থিয়েটারে আসবেই। এদিক দিয়ে ইসরাইল সত্যিই দ্বিতীয়-রহিত। আমেরিকা এমনকি বিশ্ববন্দিত নাট্যকার শেকসপীয়রের দেশের মানুষরা এদের ধারে-কাছে যেতে পারে না—তাজ্জব ব্যাপার একেবারে! অবিশ্বাস্যও।

ইসরাইলের অধুনাখ্যাত জাতীয় নাট্যামোদী সংস্থা 'হাবিমা' মস্কোতে আধুনিক হিব্রু থিয়েটারের পত্তন করে তিপ্পান্ন বছর আগে। তদানীন্তন সোভিয়েত সরকারের এক 'অতিসাধারণ' অফিসার যোসেফ স্তালিনের সম্মতি নিয়ে পরবাসে পরদেশে থিয়েটার-পাগল বাউণ্ডুলেদের জাতীয় থিয়েটারের শুভ-সূচনা ঘটল সোভিয়েতের সবসেরা পরিচালক কনস্তানতিন স্তানিস্লাভস্কির আশিসধন্য পৃষ্ঠপোষকতায়। পাঁচ বছর বাদে ইদ্দিশ থেকে হিব্রুতে অনূদিত নাটক 'ডাইব্বাক' হাবিমা নাট্য সংস্থা সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে বিস্তর সুনাম কুড়িয়ে নিল।

১৯২৭ খৃঃ মস্কো থেকে এই নাট্যামোদী দল এলো ইসরাইলে। জোর কদমে তাদের যাত্রা হল শুরু। অনেক ভিজির রাত্রি পার হয়ে বাধা-বিপত্তির প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এগিয়ে চলার পর বছর-তিনেক আগে হঠাৎ আর্থিক বিপর্যয়ে 'হাবিমা'র নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। সাহায্য-সহায়তার উদার হাত বন্ধুর মতো বাড়িয়ে দিল ইসরাইল সরকার। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় নাট্যালয় সরকারী সাহায্যে গড়া বিরাট বাড়িতে। দুটি প্রেক্ষাগৃহ সেখানে। প্রথমটিতে আসন-সংখ্যা ৯০০, অপরটিতে ৩০০ মাত্র—শেষোক্তটি কলকাতার মিনিয়েচার লাইটহাউসের প্রেক্ষাগৃহ ও থিয়েটার সেন্টার-এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

বাহাত্তর বছর আগে 'দ্য শী গাল' মঞ্চস্থ করে 'দ্য নিউ মস্কো আর্ট থিয়েটার' রাতারাতি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষসীমা কৃতিত্বের সঙ্গে স্পর্শ করেছিল সমগ্র জাতির প্রশংসার শিরোপা শিরে ধারণ করে। মস্কোর আর্ট থিয়েটারের স্নেহ-ছায়ায় গড়ে-ওঠা যাযাবরদের জাতীয় নাট্যামোদী সংস্থা ইসরাইলের হাবিমা বুঝি নতুন করে পূর্বখ্যাতির দর্পণে নিজের মুখ দেখতে চায়। তাই জাতীয় নাট্যালয়ের পরিচালক গাব্রিয়েল জিফ্রনি নিউইয়র্ক থেকে খ্যাতনামা পরিচালক জন হিরশ্চকে সাদরে আহ্বান করে এনে 'দ্য শী গাল' পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব নিলেন। 'দ্য শী গাল' হিব্রুতে ভাষান্তরিত হয়ে জাতীয় নাট্যালয়ের উদ্বোধন রজনীতে প্রথম অভিনীত হল। পরিচালক জন হিরশ্চ জীবনে হিব্রু-ভাষার হরফই দেখেননি। কিন্তু ভাষা এখানে বাধা হয়ে এলো না। কেননা, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই ছিলেন ইংরেজি ভাষায় পারঙ্গম। পরিচালক হিরশ্চ ইংরেজি ভাষাকে সাঁকো করে অনায়াসে পার হলেন দুরূহ হিব্রুভাষা-না-জানার দুরন্ত নদী। নতুন করে সার্থক সাফল্যে উজ্জীবিত হল হাবিমা নাট্যকে দল। এমনি আরো পুরনো নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হল জাতীয় রঙ্গমঞ্চে পরিচালক জন হিরশ্চ-এর অধিনায়কতায়।

সব দেশে যা হয়ে থাকে এই তরুণ রাষ্ট্রের নাট্যামোদী সংস্থায় তারই প্রতিচ্ছবি দেখি। শুরু হল 'খেলা ভাঙার খেলা'। ছিল এক, হল দুই। হাবিমা ভেঙে দুখান হল। হল তরুণতর এক নাট্যদলের সৃষ্টি ১৯৪৪ সালে। [illegible] ক্যামেরি থিয়েটার যার নাম। এ যেন নতুন করে জীবন[illegible] [illegible] [illegible]। আমাদের দেশেও এই ভাঙচুর হয়েছে। ভেঙেছে গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী আর এক রূপ পেয়েছে 'রূপকার'। 'হাবিমা'র বিদ্রোহী দল নিয়েই 'ক্যামেরি'র 'অসন্তুষ্ট রাগী ছোকরাদের' নতুন করে পথচলা। নাট্যজগতের প্রাণপ্রবাহকে আরো বেগবান করে নতুন দিগন্তের সন্ধানে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

এক থেকে আর এক-এর সৃষ্টি হলেও এরা কিন্তু কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়—মত ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন। ক্যামেরির মতে হাবিমার ধ্যানধারণা পুরাতনপন্থী, মঞ্চস্থাপনা, প্রথা-প্রকরণ, নাট্য-বক্তব্য ও অভিনয়-শৈলী সেকেলে ও বাঁধা প্যাটার্নের। ওরা ওল্ড স্কুল। এই গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল ক্যামেরি নাট্য-পরিচালক যোসেফ মিল-এর নেতৃত্বে। চলতি হাওয়ার পন্থী হল ক্যামেরি। এতদিন হাবিমা এক-চক্ষু হরিণের মতো তাকিয়ে ছিল পূর্ব ইউরোপের দিকে—রাশিয়া, রুমানিয়া, পোল্যান্ড এবং কখনো কখনো ঈদিশ থেকে হিব্রুতে ভাষান্তরিত করে গতানুগতিক স্টাইলে নাটক মঞ্চস্থ করছিল—কিন্তু ক্যামেরি যেন বদ্ধ খোলাজলে [illegible] [illegible] ঘটাতে চাইল—নাট্য-[illegible] দিগন্তের স্বাভাবিক বিস্তার ঘটাতে তারা যেন নতুন করে অঙ্গীকার নিল। শুধু পূর্ব ইয়োরোপ নয়—তারা বিশ্বজগতের নাট্যকারদের আহবান করে আনলে। ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটক অভিনয় করে যেন নতুন প্রাণ ও দ্যোতনার সঞ্চার করল। ক্যামেরির আর এক আকর্ষণ ইসরাইলের সবসেরা অভিনেত্রী হানলা মেরন। অতুলনীয়া তিনি নানা দিক থেকে। চার-পাঁচটি ভাষায় পটিয়সী। দেশের সীমানা পার হয়ে তাঁর অভিনয়-প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়েছে, বিশ্বজগতের অন্যান্য দেশে। 'পিগমেলিয়ন', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট', 'বরন ইয়েসটারডে', 'হেডা গাবলার', 'দ্য গ্লাস মিনাজিরি' ও 'মেরি স্টুয়ার্ট' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটকে প্রধান ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করে দু হাতে প্রশংসা কুড়িয়েছেন নাট্য-রসিকদের। এই তরুণী অভিনেত্রী ক্যামেরির অসাধারণ জনপ্রিয়তা এনেছেন।

হাবিমার পদক্ষেপ ছিল ভীরু। নাট্য-আঙ্গিক, উপস্থাপনা এবং অভিনয়ে ছিল বলিষ্ঠতার অভাব। নাটক অনুবাদে হিব্রুর কাঠিন্যের মধ্যে তারা সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্যামেরি সেইখানেই হানল প্রচণ্ড আঘাত। চিন্তা-ভাবনা এবং নাটক নির্বাচনের দিক থেকে ক্যামেরি নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে হিব্রুর অচলায়তনকে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল— ব্যাকরণ ও ব্যবহারের অনড় দুর্গ থেকে যেন টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে এনে তাকে করে তুলল জনসাধারণের মুখের ভাষা। নাটক ভাষান্তরিত করতে গিয়েই গরীব গেঁয়ো মানুষদের সমাজে চলতি কথ্য-ভাষার বেনো জল দিল ঢুকিয়ে ভাষা-সরোবরে 'স্লাং' ও হাটে-বাজারের গেঁয়ো ও নিচুতলার মানুষদের মুখের বুলি নাটকে প্রয়োগ করতে তারা পিছ-পা হল না। এমনি ভাষায় রচিত ক্যামেরির প্রথম দিকের নাট্য-নিবেদন : 'য়ু কান্ট টেক ইট উইথ য়ু' যেন জনমনে ঝড় নিয়ে এল।

ঝড় উঠে থেমেও গেল। কিন্তু চেয়ে-চিন্তে ধার করে চিরকাল চলবে? বিদেশীয় নাট্যভাবনা নিয়ে নাট্যরসিকদের মন আর ভরছে না। মন ভরাতে শক্তিমান নাট্যকার ইসরাইল নাট্যজগতে আজও দেখা দেয়নি। অবশ্য কিছু কিছু কথাশিল্পী ও কবি নাট্যজগতের সংকটত্রাণে এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা কেউ কেউ কিছু নাটক লিখেছেনও। কিছু দীপ্তি কিছু চমক ঝিলিক দিয়ে উঠছেও। হালের এমনি ঝিলিক দিয়ে-ওঠা নাটক কথাশিল্পী যোসেফ বার-যোসেফের 'তুরা'। পরিচিত প্রগতিবাদী কবি নাথান অল্টারম্যান [গত বছর মারা গেছেন]-রচিত 'ইনন অব দ্য ঘোস্ট' দর্শক-বন্দনাও লাভ করেছিল।

কিন্তু ওই পর্যন্ত। সার্থক সৃষ্টির ব্যাকুল প্রত্যাশায় রয়েছে ইসরাইলের নাট্যজগৎ। দিন গুনছে মহৎ নাট্যকারের শুভ আবির্ভাবের। অবশ্য তরুণতর সম্প্রদায়ের কিছু 'রাগী এবং অসন্তুষ্ট ছোকরা'—হালে যাঁদের নামাকরণ হয়েছে 'অ্যাংগ্রি জেনারেশন'—তাঁরা অবশ্য নাটক লিখে চলেছেন। কিন্তু সেসব রচনা জনগণের আনন্দভোগের পংক্তিভোজনের আসরে পাতে দেবার মতো হয়ে উঠছে না। বছরে অন্তত পঞ্চাশখানা নাটক লেখা হচ্ছে ঠিকই, তবে অধিকাংশই অন্তঃসারশূন্য। বক্তব্যের গভীরতার মূল্য কানাকড়িও নয়—কেবল ভঙ্গি দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা।
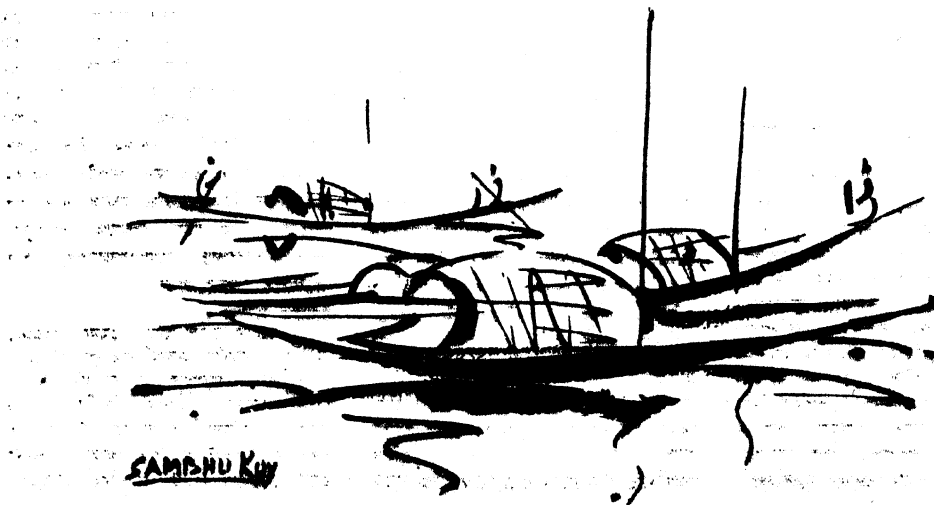
# জলসা

উদয়শঙ্করের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি শঙ্করস্কোপের উদ্যোক্তা শ্রী[illegible] কাংকারিয়া এবং শ্রীউদয়শঙ্কর একটি সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হন।

**'সীতা-স্বয়ম্বরা'— অমলা শঙ্করের এক উজ্জ্বল অবদান**—বর্তমান যুগের হাজারো বৈষম্য ও অশান্ত পরিস্থিতির যন্ত্রণাজর্জর মুহূর্তেই অতীতের ধ্যান-লোকের প্রশান্তিতে অবগাহন করার তাগিদেই আমি এবার মহাকাব্যের নৃত্য-রূপায়ণে ব্রতী হয়েছি। আমাদের অধ্যাত্ম-চেতনা-লীন ভারতবর্ষ, ঋষিদের তপস্যা-পূত তপোবন ও ত্যাগ, বীরত্ব তথা একাধারে বন্ধন ও বৈরাগ্যের মন্ত্র আজকের যুগের নবীন গোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলেই আমি মনে করি। শঙ্করের শিল্পকৃতি অতীতের গৌরবময় পটভূমিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই আজও সংস্কৃতিলোকে তিনি অজেয়।" গত ৮ থেকে ১১ জানুয়ারী উদয়শঙ্কর কালচারাল সেণ্টারের পক্ষ হতে রবীন্দ্র সদনে 'সীতা-স্বয়ম্বরা' মঞ্চস্থ করার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে অমৃতের প্রতিনিধিকে জানান প্রতিষ্ঠান পরিচালিকা শ্রীমতী অমলাশঙ্কর।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের ভাবনালোকে আজকের মানুষও যে আশ্রয় চায় জন-সাধারণের বিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্র সদন মঞ্চে আরো দু'দিন (১২ ও ১৩ জানুয়ারী) 'সীতা-স্বয়ম্বরা' সম্প্রসারণই তার প্রমাণ। শুধু তাই নয় আগামী ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র সদনে 'সীতা-স্বয়ম্বরা' পুনঃ প্রদর্শিত হবে জানা গেছে।

অনুষ্ঠান শুরু হয় আনন্দশঙ্কর রচিত ও পরিচালিত অর্কেস্ট্রা নিয়ে। বসন্তমুখারীর রূপাভাস থাকলেও ঠিক কোনো গতানুগতিকতায় বদ্ধ না থেকে মুক্তমনে যুগযন্ত্রণা ও অস্থিরতার প্রতি-ফলন ৭ মাত্রা ১২ মাত্রা ছন্দে পূর্ণ দক্ষতায় শ্রোতাদের অনুভব গোচর করিয়ে পরিশেষে মঞ্চের একাধারে দাঁড়ানো উদয়শঙ্কর কালচারাল সেণ্টারের ছাত্রীদের ভঙ্গিমায় ও অর্কেস্ট্রার সুরে 'রঘুপতি-রাঘব'-র অনুরণন দিয়ে এ কথাই কি আভাষিত হয়েছে যে আদর্শ নিয়ে, মূল্যবোধ নিয়ে ভেদ-বৈষম্য থাকলেও শাশ্বত চেতনার মহিমা সর্বকালে, সর্বদেশে, সকল মানুষের মনে [illegible]?

এর পর পূর্বসৃষ্ট 'চিদাম্বরম'-এর কয়েকটি নৃত্যাংশ দেখিয়েই শুরু হোলো 'সীতা-স্বয়ম্বরা' নৃত্যনাট্য। তুলসীদাস রামায়ণ এর পটভূমি। রাজা দশরথের সভায় বশিষ্ঠ মুনির আগমন থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিপদসঙ্কুল ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিক্রমণের শেষে জনক রাজার সভায় রামের হরধনু ভঙ্গ করে জানকীর বরমাল্য লাভ দিয়েই এই নৃত্যনাট্যের সমাপ্তিরেখা টানা হয়েছে।

নৃত্য ও অভিনয় প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে শঙ্করদুহিতা শ্রীরামরূপী মমতা-শঙ্করের কথা। প্রথম দৃশ্যে শুভ্রবেশে তীর ধনুক হাতে দশরথের সভায় রামের প্রবেশ ও দৃপ্ত তেজে বশিষ্ঠের প্রস্তাবকে গ্রহণে যে ক্ষাত্রয়োচিত তেজ, শৌর্য ও রাজকীয় মর্যাদাবোধ ঝলকে উঠেছে সারা নাটকে কখনও বীর্য প্রকাশে কখনও শ্যাম-কোমলতায় কখনও করুণায় সেই মর্যাদা সগৌরবে অটলপ্রতিষ্ঠ। বীর, বীভৎস, মধুর, করুণ, বাৎসল্য ইত্যাদি মহাকাব্যোচিত সকল রসের সঙ্গম 'সীতা-স্বয়ম্বরা'র মূল সুর কিন্তু ভক্তির। এই ভক্তির আলোকেই ঈশ্বরের অবতার-স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের জীবন উদ্ভাসিত। ভাবতে আশ্চর্য লাগে কিশোরী মমতা এত অল্প বয়সেই মহাকাব্যের অতলস্পর্শী ভাবের অতলে সমাহিত হতে পারলেন কেমন করে? শুধুমাত্র আঙ্গিক দক্ষতা অথবা শিক্ষায় এ বস্তু সম্ভব নয়—অনুভব-গভীরতাই এ সার্থকতায় রহস্য-মন্ত্র। বিশেষ করে যে দৃশ্যটি দর্শকের মনে রেখাপাত করে সেটি হোলো প্রথম সীতা-সন্দর্শনে সদা-আনন্দময় রামচন্দ্রের [illegible] পদক্ষেপে এক মন্থর গতি, তারপরই ধনুকে [illegible] অবনত মস্তকে ঈষৎ বিষণ্ণভাবে দাঁড়ানো ও পটভূমিকায় পিলু রাগের গুঞ্জন সব মিলিয়ে এক অবর্ণনীয় মধুরতায় মন ভরিয়ে দেয়। শ্রীরামচন্দ্র এখানে বিষাদগ্রস্ত কেন? ভগবান তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে কি দেখতে পেলেন কি অন্তহীন বেদনায় অরণ্যে সীতার জীবন চিরনির্বাসিত? না, জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গিনীকে দেখে দীর্ঘজীবনের নিঃসঙ্গতাকে নতুন করে অনুভব করলেন? এইরকম নানা প্রশ্নের ব্যাকুলতায় যেন নীরব মুহূর্তটি ভরে উঠেছে। রাজা জনক-রূপী অমলাশঙ্করের সংযত ও অভিব্যক্তি উজ্জ্বল নৃত্য ও অভিনয় এ নৃত্যনাট্যের প্রধান আকর্ষণ। রবীন দাসের সঙ্গীত রচনায় উদয়শঙ্করের ঐতিহ্য অনাহত। গুরু রাঘবনের সহায়তা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। নৃত্যরচনায় কথাকলির সাত্ত্বিক অঙ্গের প্রাধান্য থাকলেও উপযুক্ত ভাবানু-যায়ী উদয়শঙ্কর রীতির স্বতঃস্ফূর্ত পদক্ষেপ ও ভাবব্যঞ্জনায় শিল্পসম্মত প্রয়োগে শ্রীমতী শঙ্করের শিল্পীমনের স্বাক্ষর মুদ্রিত। ৫০ জন শিল্পীর প্রত্যেকেই অত্যুজ্জ্বল টিমওয়ার্কের সার্থক অংশ হয়ে উঠেছেন। এ বছর শীতের মরসুমের উৎসব তালিকায় শঙ্করস্কোপের পরই 'সীতা-স্বয়ম্বরা'র স্থান।

**আমজাদ আলি খাঁর একক [illegible] আসরে :** সম্প্রতি কলামন্দিরে কলোইসিয়াম আয়োজিত আমজাদ আলি খাঁর একক সরোদ বাদনের আসরে উপস্থিত হবার সুযোগ ঘটেছিল। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য হোলো এই যে এক বছরের মধ্যেই একই প্রতিষ্ঠান একই শিল্পীকে তৃতীয়বার

একক সরোদ অনুষ্ঠানে সংগীতানুরাগীদের সামনে হাজির করলেন। একাগ্রচিত্তের শিল্পী ও শিল্প পূজার এ-হেন নজীর এ-যুগে সত্যিই দুর্লভ। উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। উদ্যোক্তারা সংগীতানুরাগীদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবেন যদি সংগীত জগতের উপেক্ষিত অথচ সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীদের আমজাদের মত পরম সমাদরে অনুরাগীদের সামনে হাজির করেন। প্রতিভাবান আমজাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, সংগীতরসিকদের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই আনন্দের কথা। সেদিন আমজাদ আলি খাঁ বাজালেন আড়ানী কানাড়া। আলাপ, গৎ, বিস্তার ও ঝালা পুরোপুরি আলি আকবরীয় রীতিতেই বিন্যস্ত হয়েছে এবং প্রতিটি অঙ্গেই মেওয়াতী হাতের অনুশীলন, পরিচ্ছন্ন অলংকার সাপট তান ও গমকের ওজন, বিলায়েতী ঢং-এ পরিশীলিত মীড় অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবী রাখে। দ্রুত তান ও লড়ী জোড়ের ঝালা ত রীতিমত চমকপ্রদ। তৈরীর দিক বিচার করে দেখলে আমজাদের হাতটি পুরোপুরিই প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর। কিন্তু রাগশুদ্ধতা, সংযত অভিব্যক্তির প্রকাশের দিকে লক্ষ্য না রেখে যন্ত্রের ওপর দখল প্রদর্শনের ব্যগ্রতা ও বয়োজ্যেষ্ঠ সংগতিয়াকে বার বার জনক অংগে নিয়ে এসে তাঁর অন্যমনস্ক মুহূর্তে অকস্মাৎ জোরে স্ট্রোক দিয়ে কৃত্রিম জয়োল্লাসের প্রকাশে সংগীতানভিজ্ঞ সাধারণ শ্রোতাদের হাততালির হট্টগোল সৃষ্টি করেই তাঁর মত শিল্পী কি করে খুশী থাকতে পারলেন? সস্তা উত্তেজনায় মগদ বিদায় কোনো সাধক শিল্পীর কাম্য হওয়া উচিত নয়—গভীর বোধের সম্পদে প্রকৃত সংগীতবোদ্ধাদের পরিতৃপ্তি সাধন তথা ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন-ই ভারতীয় উচ্চাংগ সংগীত শিল্পীর জপমন্ত্র।

•

আভোগী কানাড়া রাগ শোনাবেন বলে অনুষ্ঠানপত্রে ঘোষণা ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কি সত্যিই 'আভোগী কানাড়া' বাজিয়েছেন, দক্ষিণ ভারতীয় 'আভোগী' উত্তর ভারতীয় শিল্পীরা 'আভোগী কানাড়া' করে নিয়েছেন বাগেশ্রীর সংগে সংগে 'কানাড়া' অংগের প্রতিও যথোপযুক্ত আলোকপাত করে। কিন্তু আমজাদ বাজালেন পুরোপুরি বাগেশ্রী ঢং-এ (সারেগা-মাধা, মাধা, মাগারে সা ইত্যাদি স্বরসমন্বয়ে জোর দিয়ে), কানাড়া অংগের রূপ এতে ফুটল কই?

আমজাদ বিলম্বিত গৎ বাজিয়েছেন ঝাঁপতালে। ঝাঁপতালে তালের সম্ভাবনা সীমিত তাই অকারণ বিলম্বিত বাজনা অবশ্যম্ভাবী একঘেয়েমির হাত এড়াতে পারে নি। তুলনামূলক বিচারে গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের বহুদিন আগের রেকর্ডে বাজানো 'তিলক কামোদ' গৎটি আমজাদ তবলায় বাজিয়েছেন। এখানে অকারণ নাটকীয় হাসি, হাততালি আদায়ের উদগ্র লিপ্সামুক্ত ছিল বলেই সত্যিকারের রসসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কানাই দত্ত শুধু তবলা সংগতেই পাণ্ডিত্য দেখান নি, শিল্পীর সস্তা হাততালির শরিক হননি। শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের অর্থহীন প্রচেষ্টাকে হাসিমুখে সযত্নভাবে অস্বীকার করে রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

**রাগিণী নিবেদিত গোপীচন্দ্রের কাহিনী :** উত্তরবংগের জনপ্রিয় লোক-গাথা তরুণ রাজা গোপীচন্দ্রের মাতার আদেশে সন্ন্যাস গ্রহণ ও সকল প্রলোভন অসাধারণ চরিত্রবলে উত্তীর্ণ হয়ে দুই মহিষী অদুনা-পদুনার কাছে প্রত্যাবর্তন কাহিনী এক সময় বিষয়বস্তুর আবেদনে সারা বাংলাদেশ পরিপ্লাবিত করেছিল। রবীন্দ্রসদন মঞ্চে সেই লোক-কাহিনীর নৃত্য-রূপায়ণ উপহার দিয়ে বাংলাদেশের একটি বিশেষ সংস্কৃতি-ধারার প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন নৃত্যপরিচালক অসিত চট্টোপাধ্যায় ও 'রাগিণী'র অন্যান্য সভ্যবৃন্দ। গোপীচন্দ্রের প্রশংসনীয় চরিত্র-চিত্রণে ছিলেন অসিতবাবু স্বয়ং। গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের ময়নামতী রূপায়ণও চরিত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। অদুনা-পদুনার চরিত্রে নৃত্যদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়। শিবশঙ্করণের যোগী জালন্ধরীর ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তবে লোক-গাথা রূপায়ণে লোকনৃত্যের মাধ্যমে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। সুচিত্রা মিত্র গীত লোকসংগীত স্টান্ট নয় সত্যিই উপভোগ্য বস্তু। বনশ্রী সেনগুপ্ত ও সুজাতা মুখোপাধ্যায়ের গানও শোনবার মত। সামগ্রিকভাবে এই নৃত্যনাট্য হয়েছে রসোত্তীর্ণ এবং উপভোগ্য।

**পার্কসার্কাস সংগীত সম্মেলন :** পার্ক-সার্কাস সংগীত সম্মেলনের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন আগামী ১১ ফেব্রুয়ারী কলা-মন্দিরে শুরু হবে। তিনদিনের এই সম্মেলনে শিল্পীরা হলেন : আমীর খাঁ, সুনন্দা পট্টনায়ক, মুনাব্বর খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, মণিলাল নাগ, বাহাদুর খান, সুমিত্রা মিত্র, মায়া চ্যাটার্জি, দিলীপ দাশগুপ্ত, শ্যামল বসু, কানাই দত্ত, অনিল ভট্টাচার্য ও মহেশ প্রসাদ। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় বৃন্দসংগীত ও শ্রীমতী সোনাল মানসিং-এর ওড়িশী নৃত্য এই সংগীত সম্মেলনের বিশেষ আকর্ষণ।

**বীণাপাণি সংগীত সমাজ :** সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত 'অনিল স্মৃতি নাট্য নিবেদন' উপলক্ষে সংস্থার সভারা রমেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়' নাটকটি অত্যন্ত সার্থকভাবে অভিনয় করেন। শ্রীক্ষীরোদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানটির শুরু হয় সমীর দাশগুপ্ত ও যূথিকা গাঙ্গুলীর দ্বৈতকণ্ঠে উদ্বোধন সংগীতে। বলিষ্ঠ নির্দেশনা, দলগত অভিনয়, মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত প্রভৃতির গুণে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকবৃন্দ প্রভূত প্রশংসা করেন। বিশেষ নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীমন্ত), রণজিৎ বসু (কেদার), সুপ্রকাশ ব্যানার্জি (ঈশা খাঁ) ও অতুল চক্রবর্তী (কার্ভালো)। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সন্তোষ লাহিড়ী, সুনীল ভট্টাচার্য, সুশীল ভট্টাচার্য, মানিক গাঙ্গুলী, প্রভাত ব্যানার্জি, বিশ্বনাথ পাল, সুকুমার মজুমদার, সুশীল চ্যাটার্জি, অরবিন্দ ব্যানার্জি, মৃণাল ঘোষ, কমল মিত্র, সুধীর দাস, প্রবোধ ব্যানার্জি, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জি, আরতী ঘোষ, বেবী ঘোষ, মায়া রায় ও তাপসী গুহ। নর্তকীর সাথে ওসমাক খাঁর (মৃণাল ঘোষ) অশোভন নৃত্যটি ব্যতীত, যা বাদ্যসংগীতে বিঘ্ন ঘটিয়েছে, অভিনয়টি সর্বাংগসুন্দর হয়েছে।

**আর্ট সেন্টারের বাৎসরিক উৎসব :** গত ৩ সপ্তাহের প্রতি রবিবারে 'মহাজাতি সদন' শিবপুর, হাওড়া ও আশুতোষ কলেজ হলে আর্ট সেন্টার অফ দি ওরিয়েন্ট-এর ৪টি কেন্দ্রের ৩২শ বার্ষিক সমাবর্তন ও পুরস্কার বিতরণ উৎসবটি প্রায় ৪০০ শত ছাত্রীর দ্বারা পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে গীটার, সিম্ফনি, সেতার, তবলা লহরা, উচ্চাংগ কণ্ঠসংগীত নানারূপ নৃত্য, 'মানভঞ্জন', 'স্বর্ণ সীতা'সহ কবি জসীমউদ্দিনের 'নকসী কাঁথার মাঠ' বইখানি সম্পূর্ণ লোকনৃত্যের মাধ্যমে পূর্ববংগের কথায় ও সুরে নতুন ধারা নিয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। দীর্ঘ অনুষ্ঠানসূচীর ছোট বড় প্রতিটি অনুষ্ঠান দর্শনীয় ও সুশ্রাব্য হলেও 'নকসী কাঁথার মাঠ' (নৃত্যনাট্য) মনে রাখার মত। এতে অংশগ্রহণকারী কুমারী কাজরী সমাদ্দার, লক্ষ্মী মুখার্জি, কাকলী কাড়ার, ঝুমুর ভট্টাচার্য, মীনাক্ষী বসু, শুক্লা বিশ্বাস, শ্যামলী দত্ত, মিলা বসু, গোপা চ্যাটার্জি প্রভৃতির অভিনয় অপূর্ব। এর নাট্যরূপ কমলেশ মজুমদার, পরিচালনা শিশির শোভন, সুর ও সংগীত প্রদ্যোৎ-নারায়ণ, সহকারী রানু গুহঠাকুরতা, মালবিকা ভৌমিক ও নীহাররঞ্জন সিংহ।

**সুরসুন্দরের শ্যামা ও বিচিত্রানুষ্ঠান :** গত ৮ জানুয়ারী মহাজাতি সদনে সুরসুন্দর সংগীত প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে। অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই গোস্বামী, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, অজয় ভট্টাচার্য, অনু দত্ত (হাস্যকৌতুক), প্রেমাংশু চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় দাস, ভারতী মুখোপাধ্যায়, শুকদেব গোস্বামী (সংগীত)। পরবর্তী অনুষ্ঠানে "শ্যামা" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন সংস্থার শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। কণ্ঠসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, দীপালী দত্তরায় ও স্বরাজ বসু। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী জয়ন্তী মুখোপাধ্যায়, শুভ্রা বিশ্বাস, ডালিয়া রায় ও মঞ্জুলিকা চৌধুরী।

—চিত্রাঙ্গদা

# আমেরিকার নীরব চলচ্চিত্র

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেণ্টার এবং ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস-এর উদ্যোগে নিউইয়র্কের মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্ট-এর ফিল্ম ডিপার্টমেণ্ট দ্বারা সংগৃহীত আমেরিকার নীরব চলচ্চিত্রের একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হল কলকাতার দুটি জায়গায়—এক, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেণ্টারের অডিটোরিয়মে এবং দুই, সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে। এই উৎসবে ছোট-বড়ো মিলিয়ে যে চব্বিশ-পঁচিশটি আমেরিকার নীরব ছবি দেখানো হল, সেগুলি ১৯১১ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে নির্মিত। বলা যেতে পারে, ১৯০৩ সালে এডউইন স্ট্যাণ্টন পোর্টার দ্বারা প্রথম কাহিনী চিত্রদুটি—লাইফ অব অ্যান আমেরিকান ফায়ারম্যান এবং দি গ্রেট ট্রেন রবারী—নির্মিত হবার পরে মাত্র বৈজ্ঞানিক বিস্ময় থেকে নীরব চলচ্চিত্র ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে কেমন করে নিজেকে একটি নিখুঁত শিল্পবস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তারই একটি প্রস্থচ্ছেদ (ক্রস সেকশান) পাওয়া গেছে এই উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলি থেকে। অবশ্য এ-কথা কিছুতেই বলা যায় না যে, প্রদর্শিত ছবিগুলিই হচ্ছে নীরব যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলী বা ঐ যুগের সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে আমরা ঐ ছবিগুলির মধ্যে দেখতে পেয়েছি। ধরুন, নাজিমোভা, মেরী পিকফোর্ড, নর্মা টালমাজ, হ্যারল্ড লয়েড, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস বা এমিল জেনিংস অভিনীত কোনোও ছবিই এই প্রদর্শনীতে স্থান পায়নি। জেমস ক্রুজ, সিসিল বি ডেমিল, ডি ডাবলু গ্রিফিথ, আলফ্রেড হিচকক, কিং ভিডর প্রভৃতি পরিচালকের নীরব ছবিগুলোও এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বো জেস্ট, বেন হুর, দি বিগ প্যারেড, ক্যাবিরিয়া, ক্যামিলি, ক্যাসানোভা, সার্কাস, ড্যাডি লং লেগস, ফরবিডন প্যারাডাইস, ফ্যান লেটারস, দি গোল্ড রাশ, [illegible], হাঞ্চব্যাক অব নোতরদাম, দি কিং অব কিংস, [illegible] [illegible] মার্ক অব [illegible], ডন কিউ সান অব জোরো, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দি [illegible] অব দি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দি [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], রেসা- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অব [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] থীফ অব বাগদাদ, [illegible] [illegible] [illegible] টমস কেবিন, ওয়ে ডাউন ইস্ট প্রভৃতি এমন বহু ছবির নাম করতে পারি, যেগুলি না দেখলে আমেরিকার নীরব যুগের চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গীন ধারণা করা সম্ভব নয়।

তবু স্বীকার করতেই হয়, কম-বেশী দু' হপ্তাব্যাপী আমেরিকার নীরব ছবির এই প্রদর্শনী আজকের যুগের চলচ্চিত্রোৎসাহীদের সামনে ছবি যখন কথা কইত না, সেই যুগের আমেরিকান ছবির ক্রমোন্নতি সম্পর্কে বেশ কিছুটা ধারণা জন্মিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলা প্রয়োজন, যাঁরা উৎসাহভরে ছবিগুলি দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁদের একটি বড়ো অংশ অধিকাংশ ছবি দেখেই বেশ কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। আজকের দিনে একটি ভালো সরব ছবি (সাউন্ড ফিল্ম) দেখে তাঁদের মনে যে-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেই প্রতিক্রিয়াই বোধ করি তাঁরা আশা করেছিলেন, এই নীরব ছবিগুলি (সাইলেণ্ট ফিল্মস) দেখবার ফলে এবং এইখানেই তাঁরা ভুল করেছিলেন। সরব ছবির আবেদন আমাদের দুটি ইন্দ্রিয়ের—চক্ষু ও কর্ণ—মাধ্যমে হয়ে থাকে; কিন্তু নীরব ছবি মাত্র একটি ইন্দ্রিয়ের চক্ষুর সহায়তা পায়। এছাড়াও যেটা জানবার কথা, সেটি হচ্ছে চলচ্চিত্র একটি শিল্পবস্তুর (এ পীস অব আর্ট) রূপ নিতে শুরু করেছে বড়জোর মাত্র ষাট বছর আগে থেকে—গ্রিফিথের 'বার্থ অব নেশন' হয়েছিল ১৯১৫ সালে; ১৯০৯-এ তিনি করেছিলেন 'দি লোনলি ভিলা' ও 'পিপ্পা পাসেস'। বলা যেতে পারে এই নতুন শিল্পবস্তুটির শৈশব এখনও অতিক্রান্ত হয়নি। রূপ ও কর্মের দিক দিয়ে এর পরিবর্তন হচ্ছে প্রতি নিয়তই। একদিকে চিত্রগ্রহণ ও শব্দধারণ যন্ত্রের চলেছে ক্রমবিবর্তন, ফোটোগ্রাফিক লেন্স এবং আলোর চলেছে বহু রকম উন্নতিসাধন, নাইট্রেট জমি (বেস) ছেড়ে অ্যাসিটেট বেস গ্রহণ করেই কাঁচা ফিল্ম থেমে যায়নি, প্রায় সকল দেশেই এখন সাদা-কালোকে বর্জন করে রঙীন রূপ ধারণ করেছে বা করছে; অন্যদিকে চিত্রনাট্য রচনা-পদ্ধতি থেকে শুরু করে অভিনয়-পদ্ধতি, সেট নির্মাণ-পদ্ধতি, এমনকি মেক-আপ ও রূপসজ্জার রীতি-নীতিও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তন ও ক্রমবিবর্তন এমনই বিস্ময়করভাবে দ্রুত যে, আজ যে-ছবি অসাধারণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, আগামীকাল সেই ছবিকে সর্বদিক থেকে পুরোনো এবং আকর্ষণহীন মনে হচ্ছে। খুব বেশী দিন পেছিয়ে যাবার দরকার নেই, মাত্র পঞ্চাশ দশকে নির্মিত 'ডেথ অব এ সেলসম্যান', 'দি [illegible] হার্ট', 'সেভেন ব্রাইডস ফর সেভেন ব্রাদার্স', 'দি কোয়ায়েট ম্যান', 'দি [illegible] পীট', 'অ্যান আমেরিকান ইন প্যারিস', 'এ প্লেস ইন দি সান' প্রভৃতি ছবি যদি আজ দেখা যায়, তাহলেই আমরা বুঝতে পারব, সেদিন থেকে আমরা আজ কি বিস্ময়করভাবে এগিয়ে চলেছি।

তাহলে কি এই সদ্যসমাপ্ত নীরব ছবির উৎসবের কোনই সার্থকতা নেই? নিশ্চয়ই আছে। ঐতিহাসিকের মন নিয়ে চলচ্চিত্রের ক্রমোন্নয়নের গতিপথকে লক্ষ্য করবার জন্যে এই ধরনের উৎসবের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। চিত্রজগতে আমেরিকার প্রসিদ্ধি হচ্ছে এক, ওয়েস্টার্ন ছবিতে, যাতে আধুনিক সভ্যতা থেকে বহুদূরে বিস্তৃত তৃণভূমি ও পার্বত্য দেশে ঘোড়সওয়ার-চড়া, মৃত্যুভয়হীন, পরাক্রমশালী বীরেরা বন্দুক বা রিভলবারের সাহায্যে দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে। সেই ছবির প্রাথমিক রূপ দেখা গেছে গিলবার্ট এম আণ্ডারসন রচিত, পরিচালিত এবং অভিনীত 'ব্রঙ্কো বিলিজ ক্যাপচার' (১৯১৩) ছবিতে। নীরব যুগে এই ওয়েস্টার্ন ছবির উন্নত রূপ দেখা যায় ১৯২২-এ নির্মিত টম মিক্স অভিনীত 'স্কাই হাই' ও ১৯২৪-এ নির্মিত জন ফোর্ড পরিচালিত 'দি আয়রণ হর্স' ছবিতে। আমেরিকান ছবির আর একটি সার্থক রূপ দেখা যায়—ওখানকার কমেডি চিত্রগুলিতে। এই কমেডির শুরু করেন ম্যাক সেনেট; তাঁর (১) কমরেডস-১৯১১; (২) ম্যাবেলস ড্রামাটিক কেরিয়ার—১৯১৩ এবং (৩) হিজ [illegible] অ্যান্ড বাটার—১৯১৬ যে স্ল্যাপস্টিক কমেডির সূত্রপাত করেছে, তাই চার্লি চ্যাপলিনের কীস্টোন এবং এসেনে কোম্পানীতে থাকবার সময়ে আরও অনেক বেশী সার্থকতা লাভ করেছিল, তার [illegible] পাওয়া যায় তাঁর 'লোটিং [illegible]', 'এ উওম্যান' ও 'পুলিস' ছবিতে। বিশ দশকে এই কমেডি নূতনতর রূপ [illegible] করে লরেল হার্ডি নির্মিত 'টু টার' ও 'বিগ বিজনেস' এবং বাস্টার কীটন অভিনীত 'দি জেনারাল' ছবিতে। লক্ষ্য করার বিষয়, আমেরিকার কমেডিগুলির জনপ্রিয়তা পুরাতন হলেও বিশেষ কমে না। এবং ওয়েস্টার্নগুলিকে আজও বেশ [illegible] থ্রীলিং বলে বোধ হয়।

# প্রেক্ষাগৃহ

শ্রীমতী সরযূবালা দেবী এই বছর অভিনয়ের জন্য সঙ্গীত নাটক আকাদামির পুরস্কার পেয়েছেন।

## চিত্র-সমালোচনা

### সহানুভূতি থেকে প্রেম

[illegible] নিবেদিত, মিতালী ফিল্মস্ পরিবেশিত ও যাত্রিক পরিচালিত 'এখানে পিঞ্জর' ছবির উপজীব্য হচ্ছে সহানুভূতি থেকে প্রেম। তরুণ সাহিত্যিক অমল বসুর সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত গুণ্ডা-শ্রেণীর নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় হয়ে যায় থানার ও-সি অমিয় হালদারের মধ্যস্থতায়। নবেন্দুর স্বল্প কথায় তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে অমল। কিন্তু তাকে পাঁক থেকে টেনে তুলে ভদ্রজীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা সাফল্য-লাভ করবার আগেই অমল খবর পেল পুলিশের গুলীতে ওয়াগনব্রেকার নবেন্দুর মৃত্যু ঘটেছে। এবং এই মৃত্যু-সংবাদ নবেন্দুর দুস্থ বাপ-মা, ভাইবোনদের কাছে সহজ করে নিতে গিয়ে অমল আবিষ্কার করল, কি অসম্ভবভাবেই না নির্ভরশীল ঐ পরিবারটি বাড়ীর বড় ছেলে নবেন্দুর উপার্জনের উপর। চট করে অমল ঐ রূঢ় মৃত্যু-সংবাদটি ওদের কাছে পরিবেশন করতে ত' পারলই না, বরং মিথ্যার পলেস্তারা দিয়েও নবেন্দুর বন্ধুরূপে ঐ সমগ্র পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষীর আসন গ্রহণ করে বসল। সে দেখল, ও-বাড়ীর বড় মেয়ে নীলা চোরাচালানকারীদের দলে ভিড়ে অর্থোপার্জন করছে ঐ পরিবারেরই সাহায্যের জন্যে। আরও দেখল, ও-বাড়ীর ছোট ছেলে শুভেন্দু নিজের কোনোও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়ে পাড়ার মাস্তান সেজে বোমা তৈরী করতে ব্যস্ত। এবং এও দেখল, পাড়ার ধনী হীন-চরিত্র অবিনাশ মিত্র বাড়ীর অনূঢ়া বয়ঃপ্রাপ্তা দুই মেয়ের প্রতি লালসার জিহ্বা বাড়িয়ে দিয়েছে ওদের ভদ্রাসনটিকে বন্ধক রাখবার পর থেকে। অমল জড়িয়ে পড়ল ঐ পরিবারটির সঙ্গে এবং শেষপর্যন্ত কেমন করে ওদের সর্বদিক থেকে রক্ষা করবার সঙ্গে সঙ্গে নীলাকে ওর জীবন-সাথী করবার ইচ্ছাটিকেও ব্যক্ত করল, তাই নিয়ে ছবির শেষ উত্তেজক অংশটি রচিত হয়েছে।

ছবিটিতে বিভিন্ন রসের সমাবেশ সত্ত্বেও ভাবপ্রবণতার টানাপোড়েনই বেশী এবং এই ভাবপ্রবণতার আধিক্যই দর্শকচিত্তকে আবেগময় করে তোলে। নীলার তিরস্কারের জবাবে যখন মমতাময়ী মা মলিনা উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন : তিন-তিনটি মেয়ের গরীব মা যদি হতিস, তাহলে বুঝতিস আমার ব্যথা, তখন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকদের আশু প্রতিক্রিয়া আমাদের উক্তিকে সমর্থন করবে। পুরাতন সামাজিক মূল্যবোধ যে আজও নিশ্চিহ্ন হয়নি, 'এখানে পিঞ্জর' ছবির সাফল্য সেই কথাই প্রতিপন্ন করছে।

ছবিটিতে প্রতিটি শিল্পীই সুযোগমত সু-অভিনয় করেছেন, এ-কথা স্বীকার করে নিয়েও বলব, তিনজনের অত্যুজ্জ্বল অভিনয় ছবিটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে এবং এই তিনজন হচ্ছেন—উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন এবং গৌর শী। নবীন সাহিত্যিক অমল-এর ভূমিকায় উত্তমকুমার যে বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় করেছেন, তা এক-মাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাঁর মুখের শ্লেষাত্মক বাচনগুলি দর্শকমহলকে অতি-মাত্রায় পুলকিত করেছে। অপর্ণা সেন পল্লীকিশোরী নীলাকে সুন্দরভাবে সজীব করে তুলেছেন তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। অমলের অযাচিত সহানুভূতিতে ক্ষোভে ফেটে-পড়ার সময়ে তাঁর মুখের সংলাপ এবং অমলের মুখ থেকে নবেন্দুর মৃত্যু-সংবাদে তার সাশ্রু আক্ষেপ দৃশ্য ভোলবার নয়। কিন্তু বিস্মিত করেছেন আমাদের পঙ্গু মহীতোষ চাটুজ্জের ভূমিকায় গৌর শী। বাচনের গভীরতা চরিত্রকে কি আশ্চর্যভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে, তা এই ভূমিকায় তাঁর অভিনয় না দেখলে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় অপর্ণা দেবী (মা মলিনা), দিলীপ মুখোপাধ্যায় (নবেন্দু), গঙ্গাপদ বসু (অবিনাশ মিত্র), জহর রায় (স্টেশন মাস্টার), তরুণকুমার (রেলযাত্রী), কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় (অমিয় হালদার) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সু-অভিনয় করেছেন।
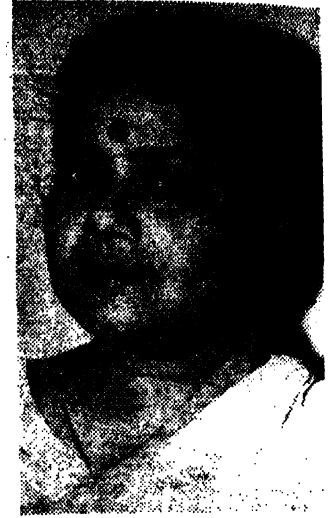
ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে, বিশেষ করে প্রশংসা করতে হয় চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনার। এই তিনটি বিভাগেই অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে। ছবির গান-তিনটির মধ্যে প্রথম গানের শেষ দুটি চরণ ছবির শেষতম দৃশ্যে সুপ্রযুক্ত। গানের সুরগুলি আমাদের যতটা না চমৎকৃত করেছে, আবহ-সঙ্গীতের সার্থকতা তার থেকে বেশী।

'এখানে পিঞ্জর' দর্শকচিত্তে আবেগ-সৃষ্টি করতে যে অপরিসীম সাফল্যলাভ করেছে, তাই ছবিখানিকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তুলবে। —নান্দীকর

অর্চনা—সংগীত গ্রহণে শ্যামল মিত্র, সলিল মিত্র, মৃণাল চক্রবর্তী, বনশ্রী সেনগুপ্ত, সংগীত পরিচালক অজয় দাস পরিচালক পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায় প্রযোজক সুধীর সাহা, সুখেন দাস।

ফটো : অমৃত

[illegible] প্রথম ভাগ—কণিকা মজুমদার এবং নীরা মালিয়া

## স্টুডিও থেকে

**নবরাগের শুভমুক্তি :** গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত ও বিজয় বসু পরিচালিত নবরাগ ছবিটি ৪ ফেব্রুয়ারী থেকে মিনার বিজলী ছবিঘরে মুক্তিলাভ করছে। বহুদিন বাদে এই ছবিতে নায়ক-নায়িকা চরিত্রে দেখা যাবে উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেনকে। চণ্ডীমাতা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

**অন্য চিন্তা**

ঠাকুরমার কাছে পুরোনো দিনের গল্প শুনতে গেলেই কোনো কিছু বলার আগেই বলতেন,—'তোরা আর কি খেলি, কি দেখলি বাবা! সে আমাদের একটা সময় ছিল! এখন তো জলও কিনে খাস... ইত্যাদি। তারপর তিনি চলে যেতেন অতীত স্মৃতিচারণে। ধীরে ধীরে আসর বেশ জমিয়ে তুলতেন।

সিনেমাতেও অতীতের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ঠাকুরমা দিদিমাদের জায়গার মত পরিচালকরা বহুদিন পর্যন্ত চরিত্রের মুখ দিয়ে কিছু কথা বলাতেন। তারপর চলে যেতেন অতীতে। চলচ্চিত্রের ভাষায় নাম তার ফ্ল্যাশব্যাক। এখনও যে সে-পদ্ধতির খুব একটা পরিবর্তন এসেছে তেমন নয়। চরিত্রকে অতীতে ফিরিয়ে নেওয়ার দৃশ্যে এখনও পর্যন্ত পরিচালক চরিত্রের ক্লোজ-আপ শটের ফেড-আউট পদ্ধতি ব্যবহার করার দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠেননি। তবে মাঝে-মধ্যে নানারকম কারি-কুরিও চোখে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার পরিচালক এক ধাপ এগিয়ে ব্যাক-গ্রাউন্ড মিউজিক বন্ধ করে দেন অতীতের দৃশ্যগুলোতে। বর্তমানে ফিরে এলেই আবার শোনা যায় সংগীতের মূর্ছনা, কেউ কেউ আবার সফট ফোকাস ব্যবহার করে অতীতের দৃশ্যের মধ্যে এক সুখ-স্বপ্নের আমেজ আনেন। আবার কেউ সরাসরি 'কাট' করে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবখানেই ঘুরে বেড়ান। আজকাল পরিচালকরা অবশ্য 'কাট' পদ্ধতিতে দৃশ্যান্তরে যাওয়াটাই পছন্দ করছেন বেশী। প্রথম যখন এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল পর্দায়, দর্শকরা চমকে গিয়েছিলেন, আচমকা ধাক্কায় 'খেল্'টা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। তবে আজকের দর্শকের কথা আলাদা।

সত্যজিৎ রায় 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-তে যে-দুটি ফ্ল্যাশব্যাক ব্যবহার করেছেন, দর্শকরা অতি সহজেই তা ধরতে পেরেছেন। নেশাগ্রস্ত সৌমিত্রের মুখের ক্লোজ শট থেকে যে ফ্ল্যাশব্যাক সেখানে পরিচালক এক ধোঁয়াটে আবহাওয়ার সৃষ্টি করে দৃশ্যটাকে বাস্তবানুগ করে তুলেছেন। কারণ সে-অবস্থায় তার স্মৃতি ধোঁয়াটেই। 'নায়ক' ছবিতে ফ্ল্যাশব্যাকে যাবার আগে পরিচালক উত্তমকুমারের চোখের ক্লোজ-আপ থেকে গেছেন ট্রেনের জোরালো লাইটের ক্লোজ-আপে। তারপর অতীতে। সুতরাং চিরাচরিত প্রথা ছেড়ে তাঁরায় এ-ছবিতে অন্য পথে পা বাড়িয়েছিলেন।

যাই হোক, এমনতরো উদাহরণ অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু ফ্ল্যাশব্যাক কি শুধু অতীতের ঘটনা দেখানোর জন্যই—অন্য কোনো উদ্দেশ্য কি নেই তার? যদি থাকে সেটা কি? এর জন্য সাগরপারের ছবির দিকে হাত বাড়ানো ছাড়া উপায় দেখিনে। কারণ, সময় নিয়ে খেলা—এ-ব্যাপারটা এখনও অবধি ও-দেশের লোকেরাই একচেটিয়া বলা যায়। আজ পর্যন্ত ফ্ল্যাশব্যাকের শিল্প-সম্মত ব্যবহার সবচেয়ে বেশী যে ছবিতে ঘটেছে, সেটি হল, আঁল রেনের 'হিরোশিমা [illegible]। এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রথম [illegible]। [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]তে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তার [illegible]...[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]...[illegible] ইত্যাদি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ফটো : অমৃত

[illegible]—পরিচালনায় : সলিল সেন, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং তনুজা।

[illegible] কেড-ইনের ঝামেলা না করে [illegible] 'কাট' করে চলে গেছেন অতীতে, আবার ফিরে এসেছেন বর্তমানে। জাপানী [illegible] চেহারার মেয়েটির মন বারবার ফিরে গেছে অতীতে। একটা দৃশ্য আছে [illegible] অতীত আর বর্তমানকে একই রেখায় টেনে এনে পরিচালক মেয়েটির অতীত স্মৃতি-[illegible] কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ [illegible]।

[illegible] জুলীতেও 'মোশন' খুব সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন এই ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতিকে। কয়েকটা উদাহরণ দিলে [illegible] হবে যে কিভাবে পরি-চালক অতীত আর বর্তমানের মধ্যে কোন [illegible] না রেখে এগিয়ে গেছেন। একটা [illegible] নায়ক আটবেলা আপেল চুরি [illegible] পালাচ্ছে। পরবর্তী শট বয়স্ক নায়ক নায়িকার সঙ্গে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার একটা দৃশ্য। প্রথম শট—জুলী অতীতের যন্ত্রণাকে ভোলার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু স্মৃতি তো তাকে ছাড়ে না। একই শটের মধ্যে দেখা গেল বাচ্চা জুলীকে কোলে করে মা দাঁড়িয়ে। একই ফ্রেমের মধ্যে অতীত আর বর্তমান। কোনো শিল্প মাধ্যমে এ-ধরনের রিপ্রেজে-ন্টেশন সম্ভব কি? বোধহয় না। একমাত্র চলচ্চিত্রই তার ব্যতিক্রম।

পর্দায় প্রথম দিকে এ-ধরনের দৃশ্য দেখে দর্শকরা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার দুর্বোধ্যতার অপবাদ দিয়েছিলেন কিছু ছবিকে। আমাদের দেশেও এখনও সে-ধরনের অনুভূতি আছে। নইলে রে'নের 'আই লভ ইউ আই লভ ইউ' সবিশেষ প্রশংসিত হোল না কেন? অবশ্য প্রথমোক্ত ছবির চাইতে রে'নের এ-ছবিতে দৃশ্য-বিন্যাসে অতিরিক্ত জটিলতা কিছু আছে। কোন্ দৃশ্য থেকে কোন্ দৃশ্যে যাওয়া হচ্ছে বা হবে তার কোন স্থিরতা নেই। সিনেমার ব্যাকরণ না মেনে যত্রতত্র যখন-তখন এ'রা যেতে চাইছেন। সাহিত্যে যেমন স্মৃতি-চারণের এক বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজন, কিন্তু মন যখন অতীতে যায়, তখন কেনো নির্দিষ্ট পথ ধরে বা দৃশ্যের অবতারণা করে সব সময় এগোয় না। আপনা থেকেই চলে যায়।

চরিত্রের এই কালাতীত যাতায়াত দর্শকরা কিভাবে নেবে, সেটা পুরোপুরি নির্ভর করে ছবির বিষয়বস্তু ও চরিত্রের গঠনের ওপর। পরিচালক কিভাবে কোন্ দৃশ্যকে উপস্থাপিত করবেন, সেটা তাঁরই নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও কুশলতার ওপর নির্ভর করে। নইলে এ-পদ্ধতির অপব্যবহার হতে পারে, হয়ও অনেক ক্ষেত্রে।

আসল কথা ক্যামেরা সময়কে যেমন বাড়িয়ে দিতে পারে (স্লো মোশন) আবার কমিয়েও দিতে পারে। গদারের প্রায় সব ছবিতেই এ-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাবে। স্বাভাবিক গতিতে যখন ক্যামেরা চলে, তখন স্বাভাবিক সময় ও স্থানের সঙ্গে তার একটা আইডেন্টিফিকেশন হয়, কিন্তু গতি বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারভেনিং স্পেস যায় কমে, সময়ের গতিও বেড়ে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সিনেমায় সময় বা স্থান পরিবর্তন কোনো সমস্যা নয়, দর্শকের কাছে ঠিকমত উপস্থাপিত করাটাই সমস্যা। অতীতে ফিরে যাবেন কি ভবিষ্যতের কথা বলবেন (স্বপ্নদৃশ্য) তা কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা হোল সেটিকে দর্শকের চোখে ও মনে মানিয়ে দেওয়া। সিনেমা সব পারে। উল্টেপাল্টে যে-কোনো দৃশ্যকে যা-খুশি-ভাবে পর্দায় ফেলতে পারে, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে একসঙ্গে মিশিয়ে আপাতঃ জটিলতার সৃষ্টিও করতে পারে। সুতরাং সিনেমায় 'সময়' বলতে সাধারণ অর্থে 'ফিজিক্যাল টাইম' যা তা নয়। সিনেমার আলাদা 'সময়' আছে যাকে কিছুটা বলা যেতে পারে 'ফিল্ম টাইম'। এ-সময়কে ঘড়ির কাঁটা দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। কাহিনীর সঙ্গে না ফেলে পরিচালকের নির্দেশে সে চলে, কখনও ঘড়ির কাঁটার দিকে, কখনও বিপরীতে; আবার কখনও দ্রুত, কখনও ধীরে।

স্লো মোশন, অ্যাকসিলারেটেড মোশন ও ফ্ল্যাশব্যাক তারই ব্যবহারিক হাতিয়ার।

**নিমন্ত্রণ :** 'বালিকা বধূ'র পরে পরিচালক হিসেবে তরুণ মজুমদারের পরবর্তী ছবি হল 'নিমন্ত্রণ'। অপরাজেয় কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য এই কাহিনীটিতে প্রেম ও জীবন সত্যের কিছু গভীরতম উপলব্ধি বিধৃত। ইতিমধ্যেই পরিচালক তাঁর শিল্পী ও কলাকুশলী গোষ্ঠীসহ বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজে বেরিয়ে গেছেন। সন্ধ্যা রায় ও অনুপকুমার ('পলাতক'-এর জুটি) এই ছবির প্রধান দুই শিল্পী, অপর একটি প্রধান নারী চরিত্রে আছেন নন্দিনী মালিয়া, অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, জহর রায়, পাহাড়ী সান্যাল, শিবানী বসু, কল্যাণী মন্ডল, শিউলি মুখোপাধ্যায়, সুরুচি সেনগুপ্তা, রাম চৌধুরী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলেন্দু পাল ও অন্যান্য বহু শিল্পী। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশ ও সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করবেন যথাক্রমে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ চন্দ্র ও দুলাল দত্ত। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও তাঁকে সহযোগিতা করছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, পিয়ালী পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তিলাভ করবে।

**প্রতিবাদ :** সেন্সর ছাড়পত্র পেয়ে বিশ্বজিৎ নিবেদিত আর্ট মুভিজের 'প্রতিবাদ' এখন রাধা, পূর্ণ ও অন্যত্র পরবর্তী মুক্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। 'প্রতিবাদ' বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, মানুষের কুৎসিত রুচি ও মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগ্রামের বাণী বহন করে আনছে। ছবিখানির পরিচালনা করেছেন—তপেশ্বর প্রসাদ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানে সুর সৃষ্টি করেছেন সুরকার শ্যামল মিত্র। নেপথ্য কন্ঠে আছেন—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও বিশ্বজিৎ স্বয়ং। অজিত গাঙ্গুলী প্রতিবাদের কাহিনী রচনা করেছেন। ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে আছেন যথাক্রমে বিশ্বজিৎ ও বালিকা বধূ ও পরিণীতা খ্যাত মৌসুমী চ্যাটার্জী। সহ-নায়িকা চরিত্রে আছেন বুই ব্যানার্জী। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে আছেন—রবি ঘোষ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, কালীপদ চক্রবর্তী, সুলতা চৌধুরী, অর্পণা দেবী, পদ্মা দেবী, তরুণকুমার, চিন্ময় রায়, সুলেখা রায় প্রভৃতি। দি মিলি ডিস্ট্রিবিউটার্স ও মিলি পিকচার্স ছবিখানির পরিবেশন সত্ব গ্রহণ করেছেন।

**তীর ভাঙা ঢেউ :** 'মাস্ অ্যান্ড মুভিজের' প্রথম প্রচেষ্টা 'তীর ভাঙা ঢেউ' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে প্রযোজক ও পরিচালক অরুণ চৌধুরী ফিরেছেন। তিনি নায়িকা চরিত্রে একটি নতুন মুখ উপহার দেবেন—নাম বিশাখা মজুমদার। দিলীপ গাঙ্গুলী ও অরুণ চৌধুরী রচিত গানে অনিল দত্তর সুরারোপে কন্ঠ দিচ্ছেন সন্ধ্যা মুখার্জী, কৃষ্ণা রায় ও অনিল দত্ত স্বয়ং।

**পিক্‌নিক্‌ :** বাংলাদেশে ভালো ছবি যাঁরা করেন এবং ভালো ছবি যাঁরা দেখেন তাঁদের পছন্দ এই দুটি তালিকাতেই পরিচালক ইন্দোর সেনের নাম নিশ্চয়ই আছে। 'প্রথম কদম ফুলের' অসামান্য সাফল্যের পর তিনি এখন নতুন ছবির জন্য বেছে নিয়েছেন রমাপদ চৌধুরীর একটি উপন্যাস। নাম 'পিক্‌নিক্‌'। ক'দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন 'চিত্রনাট্যের কাজ চলছে।' ভূমিকালিপি সম্পর্কে তিনি এখনও নিশ্চিত না হলেও তাঁর পছন্দ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ ও রনজিৎ মল্লিক (ইন্টারভিউ খ্যাত)। নারী চরিত্রের শিল্পী নির্বাচন নিয়ে তিনি কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত। তার এবং প্রধান কারণ প্রথম ছবিটির বাজেট তিনি খুব নীচু অঙ্কের মধ্যে রাখতে চান। দামী শিল্পীর কথা তাই ভাবা যাচ্ছে না। নতুন মুখের সন্ধান চলছে। বিশেষ করে 'ইতু' নামের একটি চরিত্রের জন্য।

ইকাল্স ফিল্মসের ব্যানারে এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সুধীন দাশগুপ্ত। সম্প্রতি জানলাম এ মাসের শেষাশেষি সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে 'পিক্‌নিকে'র শুভ যাত্রা শুরু হবে। আউটডোর লোকেশন ইতিমধ্যে দেখে এসেছেন পরিচালক। পুরোদমে কাজ শুরু হতে সম্ভবত ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি

## মঞ্চাভিনয়

**কাঞ্চনরঙ্গ :** এয়ার লাইন ট্রাফিক এ্যামেচার্সের শিল্পীরা সম্প্রতি 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকটি স্টার রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করলেন। শ্রীমণি দত্তের দক্ষ পরিচালনায় সামগ্রিক প্রযোজনাটি প্রায় প্রতিটি দর্শককেই মুগ্ধ করেছে। প্রাণবন্ত চরিত্রচিত্রণের যাঁরা স্বাক্ষর রাখেন তাঁরা হলেন দিলীপ রায়চৌধুরী (পাঁচু), আশু ব্যানার্জি (যদুগোপাল), অলোক লাহিড়ী (অমর), হরিদাস গাঙ্গুলী (চিত্তবাবু), আশা বোস (গিন্নী), তৃপ্তি দাস (তরলা)। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন রমাপদ ভট্টাচার্য, নিতাই বসু, বেবী ঘোষ, চৈতালী চ্যাটার্জি।

**মিশরকুমারী :** সম্প্রতি বান্দুরা গোবিন্দপুর হোলি ক্রুশ হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সংসদের পঞ্চম বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে 'মিশরকুমারী' নাটকটি অভিনীত হল তেরেসা গীর্জা হলে। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন লরেন্স ডি রোজারিও। প্রয়োগনৈপুণ্যে দীপ্ত এই নাটকটির কয়েকটি ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেন কিডেলিশ ডোনা, স্টানিস্‌লস গোমেজ, অনন্ত সাহা, প্রতিমা পাল ও লরেন্স ডি রোজারিও।

**মেঘে ঢাকা তারা :** শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' নাটকটি কিছুদিন আগে রঙমহলে পরিবেশিত হল। নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন মঞ্চশিখার শিল্পীরা। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন সাধন সাহা, সমীর

পোদ্দার, শচীন সাহা, ডাঃ অসিত সাহা, তরুণ দত্ত, অলোক ঘোষ, ইন্দ্রা চ্যাটার্জি, দীপালি চৌধুরী, শিবানী ভট্টাচার্য। নাট্যনির্দেশনা ও সংগীত পরিচালনায় ছিলেন চন্দ্র মুখার্জি ও সুকুমার চক্রবর্তী।

**কালাপানি :** স্টাফ ওয়েলফেয়ার ক্লাব, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের (রাইটার্স বিল্ডিংস) শিল্পী-সদস্যরা ক'দিন আগে তারাপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'কালাপানি' নাটকটি 'রঙমহলে' মঞ্চস্থ করলেন। চরিত্রচিত্রণের ব্যাপারে শিল্পীরা সবাই নিষ্ঠাবান থাকায় নাটকের গতি কখনো শ্লথ হয়নি। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'শ্যামসুন্দর', প্রশান্ত চৌধুরীর 'প্রেমনাথ', হরিপদ খাসনবীশের 'গণেশ' চরিত্রচিত্রণে কয়েকটি সুন্দর ও স্বাভাবিক নজীর তুলে ধরেছে। অন্য কয়েকটি ভূমিকায় সাবলীল অভিনয় করেছেন সমীর গুপ্ত, নিখিলেন্দু চক্রবর্তী, সোমেন রায়, বনমালী ভট্টাচার্য, মঞ্জু ব্যানার্জি, বিজয় চৌধুরী, বুলো মুখার্জি, পুতুল চক্রবর্তী। প্রয়োগ-পরিকল্পনায় প্রিয়তোষ মুখার্জি স্বতন্ত্র শিল্পবোধের পরিচয় রাখেন।

**এই মন সেই মন :** স্নেহপ্রীতি আর ভালোবাসায় সিক্ত সাধারণ মানুষ কখনোই নিষ্ঠুর যুদ্ধের পদধ্বনি শুনতে চায় না। তারা চায় না পৃথিবীর সব কোমল অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করুক যুদ্ধের করাল ছায়া। তবু যুদ্ধ আসে, বিপর্যস্ত হয় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, মনের আকাশে বারুদ গন্ধ জমে। সাধারণ মানুষের দল তাদের সংঘবদ্ধ শক্তি দিয়ে এই অশুভ আবির্ভাবকে মুছে দিয়ে ভালোবাসার মমতা দিয়ে গড়ে তুলতে চায় জীবন। এই অনুভূতি আর প্রত্যয়ের ওপরই গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের নাটক 'এই মন সেই মন'। সম্প্রতি 'অভিব্যক্তি' গোষ্ঠীর শিল্পীরা এই নাটকের একটি সপ্রতিভ মঞ্চরূপ উপস্থিত করলেন।

সংবেদনশীল এই নাটকটির প্রযোজনাকে দর্শকের সামনে প্রাণবন্ত করে তুলতে নির্দেশক তুষার মজুমদার যে নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। সমষ্টিগত অভিনয়ে যাঁরা দীপ্তি আনতে পেরেছেন তাঁরা হলেন রাধা বসু, তুষার মজুমদার, বিমান গুপ্ত, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন চট্টোপাধ্যায়, নির্মল চক্রবর্তী, স্বপন সেন, অমলেন্দু দত্ত, জ্যোতিভূষণ চৌধুরী, মায়া বসু।

**সায়ন্তনী :** আগামী ৬ ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে সায়ন্তনী কর্তৃক তাঁদের বহু প্রশংসিত তিনটি একাংক নাটক অভিনীত হবে। নাটক তিনটি শ্রীমিহির সেনের 'আদাব' এবং শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায়ের 'বিরহী' ও 'বাগবাজারপাড়া দিয়ে'। নাটক তিনটির নির্দেশনায় শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায়।

**যদুবংশ :** প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা থিয়েটার গিল্ড ২৯ জানুয়ারী (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা সাতটায় মুক্ত অঙ্গনে "যদুবংশ" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। সমকালীন যুবমানস ভিত্তিক বিমল করের এই কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন সমীর লাহিড়ী। গিল্ডের শিল্পিবৃন্দ অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। পরিচালনার দায়িত্ব শ্যামল সেনের।

**নাটক প্রতিযোগিতা :** কোনো বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা নয়, শুধু দর্শকদের ভোটেই বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ—পাটনার শিল্পী-সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সর্ব-ভারতীয় বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য। গত ১৯ ডিসেম্বর প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক (তিসরী কসমের লেখক) পদ্মশ্রী ফণীশ্বর নাথ রেণু তৃতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পাটনার রবীন্দ্র-ভবনে। ১ জানুয়ারী পুরস্কার বিতরণ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন সুসাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ সান্যাল, নাট্যকার শ্রীবাদল সরকার ছিলেন সেদিনকার প্রধান অতিথি। কলকাতার ইস্পাত ক্লাব 'সকলের জন্য' নাটক মঞ্চস্থ করে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা এবং দলগত নৈপুণ্যের জন্যে পুরস্কৃত হল। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান লাভ করেন ঐ দলেরই শ্রী এস পি সরস্বতী। শ্রীসনৎ সেন (বালুরঘাট নাট্যমন্দির) শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। এবং শ্রীমতী দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায় (পরিবেশক, কলকাতা) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিবেচিত হন। নাটানগর থিয়েটার ইউনিটের শ্রীঅমল মজুমদার এবং জমুরংগ, পাটনার শ্রীমতী মালবিকা ঘোষাল যথাক্রমে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন তাঁরা রবীন্দ্র গোষ্ঠীর অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষ (পাণ্ডুলিপি নাটকের জন্যে) এবং নাটানগর থিয়েটার ইউনিটের মাস্টার বাবলু (শিশু অভিনেতা হিসেবে)। অভিনয়-দক্ষতার জন্যে আরো বারোজন শিল্পীকে মানপত্র দেওয়া হয়।

উপরোক্ত দলগুলি ছাড়া পাটনার বিদ্রোহী ড্রামাটিক সোসাইটি কলকাতার বিন্ধ্যাচল ও অ্যাম্ফি থিয়েটার, কুলটির প্রবাসী, কুমারডুবির বার্ডস ইভনিং ক্লাব এবং চিত্তরঞ্জনের কৌশিকী এবারকার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। ৩১ ডিসেম্বর কলকাতার নাট্যসংস্থা শতাব্দী শ্রীবাদল সরকার রচিত ও পরিচালিত বল্লভপুরের রূপকথা নাটকটির প্রদর্শনী অভিনয় করে সকলের মনোরঞ্জন করেন।

**জীবনায়ণ :** কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন রিক্রিয়েশন ক্লাব বিগত ১৬ জানুয়ারী তাঁদের নিজস্ব মঞ্চে গঙ্গাপদ বসুর 'জীবনায়ণ' নাটকটি সার্থকতার সাথে মঞ্চস্থ করেন। উত্তরবাংলার সুপরিচিত কবি-নাট্যকার, পরিচালক-অভিনেতা নীরজ বিশ্বাস তাঁর বলিষ্ঠ অভিনয়ে দর্শকদের তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। অধ্যাপক ও অধ্যাপকের স্ত্রীর ভূমিকায়, নীলমণি হাজরা এবং ন্যাংটা চ্যাটার্জির ভূমিকায় প্রফুল্ল দাশগুপ্তের অভিনয় সহজ-স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলতায় ভরপুর। এ ছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় নাট্যপ্রিয় দর্শকদের মনে যাঁরা সাড়া জাগিয়েছেন, তাঁরা হলেন, নিখিল ভট্টাচার্য, ষষ্ঠী ভৌমিক, শিপ্রা বাগচী, ছায়া গুপ্ত প্রমুখ। আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জা রীতিমত বিস্ময়কর। উত্তরবাংলার মঞ্চে এ-রকম আলোর কাজ স্বভাবতই চোখে পড়ে না। সঙ্গীতের ব্যবহার সংযত ও সুপ্রযুক্ত।

**শ্রীলতা ইনস্টিটিউট, চিত্তরঞ্জন আয়োজিত তুলসী লাহিড়ী স্মৃতি একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা :**—শ্রেষ্ঠ নাট্যগোষ্ঠী—গ্রীণ অ্যামেচার গ্রুপ,—'ভুবনপুরের পথে'। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী—ইয়ংম্যান্স কালচারাল এসোসিয়েশন—'বাদক'। শ্রেষ্ঠ পরিচালক—স্বরূপ গুপ্ত (বিসর্জনের বাজনা', মঞ্চমুখ, চিত্তরঞ্জন)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—সুনীল ভট্টাচার্য ('গিনিপিগ', অযান্ত্রিক)। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—বেলা রায়—'ভুবনপুরের পথে'। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি—'বাদক'—শ্রীশ্যামলচন্দ্র দাশগুপ্ত। শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেতা—কমলনয়ন কাসোটিয়ার—

(বিপ্লবী কোন, হিন্দী নাট্য-সমিতি, চিত্ত-রঞ্জন)।

**অপরাজিতা :** কে সি থাপার রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে 'অপরাজিতা' নাটকটি পরিবেশন করলেন। নায়িকার জীবন সংগ্রাম, আশা-নিরাশ ও বলিষ্ঠতার ওপরে গড়ে ওঠা এই নাটকটি সব সময়েই যে আমাদের প্রত্যাশা মিটিয়েছে তা নয়। কিছু কিছু শৈথিল্য এসেছে ঘটনার দিক থেকে, আর মাঝে মাঝে মন্থরতা এসেছে অপ্রাসঙ্গিক দু' একটি চরিত্র সৃষ্টিতে। কিন্তু শিল্পীদের চরিত্রচিত্রণ বিষয়বস্তুগত দুর্বলতাকে ঢেকে দিয়েছে প্রায়ই; এবং এ ব্যাপারে নাট্যনির্দেশক মন্মথ মুখার্জীর আন্তরিক প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। চরিত্রের সাথে সুষম ছন্দ বজায় রেখে যাঁরা নির্ভরতার সঙ্গে অভিনয় করে প্রযোজনায় দীপ্তি এনেছেন তাঁরা হোলেন সুশান্ত ভাদুড়ী, মমতা চ্যাটার্জী, ইন্দিরা দে, উর্মিৎকুমার চাকী। কার্তিক অধিকারী, দিলীপ ভট্টাচার্য, আশুতোষ বোস, শ্রীমতী পলিনের চরিত্রচিত্রণও দর্শকদের তৃপ্ত করেছে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সৌমেন্দ্র চ্যাটার্জী, হেমলাল কর্মকার, প্রদীপ রায়চৌধুরী, পান্নালাল দত্ত, শঙ্করীপ্রসাদ কর, রাজকুমার মুখার্জী, শিয়ারীমোহন ঘোষ, বিষ্ণুগোপাল ব্যানার্জী, স্বদেশ গোস্বামী, শঙ্করেন্দু দাস।

**সান্ধ্য মজলিসের প্রফুল্ল :** গত ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৭০ শনিবার 'সান্ধ্য মজলিস' দক্ষিণ নিউদিল্লীর নাট্যানুরাগীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি নাট্য সংস্থা গিরিশবাবুর বিখ্যাত নাটক 'প্রফুল্ল' নিউদিল্লীর ফাইন আর্টস থিয়েটারে মঞ্চস্থ করে প্রভূত সুনাম অর্জন করে। ডাঃ ত্রিগুণা সেন এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

গত এপ্রিল মাসে (১৯৭০) এই সংস্থাই 'রীতিমত নাটক' মঞ্চস্থ করে সুনাম অর্জন করেছিল। ডাঃ সেনের মতে সান্ধ্য মজলিসই এই সব পুরানো দিনের বিখ্যাত নাটক মঞ্চস্থ করে প্রাচীন বিখ্যাত নাট্যকারদের যাতে আমরা ভুলে না যাই তার চেষ্টা করছেন।

প্রফুল্ল নাটকে সকলেরই অভিনয় প্রাণবন্ত হয়েছিল, বিশেষ করে যাদবের ভূমিকায় মাষ্টার রঞ্জন কুণ্ডু, যোগেশের ভূমিকায় দিল্লীর বিখ্যাত সব্যসাচী ও জ্ঞানদার ভূমিকায় ডাঃ (মিসেস) অঞ্জলি চ্যাটার্জি নিজেদের অভিনয় নৈপুণ্যে নাট্যরসিকদের মুগ্ধ করেন।

হিন্দী 'সাগিনা মাহাতো'র মহরত ও শ্যুটিং-এ প্রযোজক হেমেন গঙ্গোপাধ্যায়, পরিচালক তপন সিংহ, বলাই সেন, সায়রা বানু, দিলীপকুমার এবং ক্যামেরাম্যান বিমল মুখোপাধ্যায়।
ফটো : অমৃত

# বিবিধ সংবাদ

**উদয়শঙ্করের** সকল সৃষ্টি শঙ্করস্কোপ আগামী পাঁচই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় কলকাতায় শেষবারের মতো প্রদর্শিত হবে। তারপর? পুনঃপ্রদর্শনের কোনো স্থিরতা নেই। নব-নব শিল্পের লীলাক্ষেত্র কলকাতার নতুন প্রমোদউপকরণ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না, বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। সবচাইতে দুঃখের কথা সেটাই। বন্ধের কারণপ্রসঙ্গে শঙ্করস্কোপের প্রযোজক রঞ্জিৎমল কাঙ্কারিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে গভীর দুঃখের সঙ্গে জানালেন, দর্শকের প্রচুর উৎসাহ ও চাহিদা থাকা সত্ত্বেও একটানা বহুদিন প্রদর্শনী চালিয়ে যাবার মতো কোনো প্রেক্ষাগৃহ শহরে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই অসময়ে ছেদ পড়ছে শঙ্করস্কোপের প্রদর্শনীর। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে যদি তেমন কোনো প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া যায়, সেখানে পাঁচ বা দশ বছরের লীজ নিয়ে প্রযোজক শুধুমাত্র শঙ্কর-স্কোপের জন্য, উদয়শঙ্করের নব-নব সৃষ্টির পরিচয় তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর।

**উদয়শঙ্করের** স্বপ্ন 'শঙ্করস্কোপ'-এর সাফল্য সম্পর্কে প্রযোজক সন্দিহান ছিলেন। শেষপর্যন্ত এই প্রদর্শনীর অভাবিত সাফল্যে প্রযোজক রসিক দর্শকের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। কলকাতায় শঙ্কর-স্কোপের প্রদর্শনী বন্ধ হলেও ভারতের বিভিন্ন শহরে, এমনকি ভারতের বাইরেও উদয়শঙ্করের এই অত্যাশ্চর্য শিল্পসৃষ্টির ব্যাপক প্রদর্শনীর আয়োজন চলছে। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীকাঙ্কারিয়া শঙ্কর-স্কোপের প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে বাধ্য হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করে শ্রীউদয়শঙ্করের শিল্পপ্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

**নান্দীবিতান :** গত ২৩ জানুয়ারীর সন্ধ্যায় বিধান সরণীর লাহা ভবনে প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'নান্দীবিতান'-এর উদ্যোগে ও প্রবীণ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ের পৌরোহিত্যে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বাংলার সাধারণ নাট্যালয় : নাটক, অভিনয় ও নাট্য-প্রযোজনা সম্পর্কীয় আলোচনায় অংশ নেন সর্বশ্রী দেবনারায়ণ গুপ্ত, সন্তোষ সিংহ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ডঃ উমা রায় প্রমুখ। সর্বশ্রী গোকুল মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র দে, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্লভ মুখোপাধ্যায় ও বীথিকা চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত দৃশ্যাভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। বিভিন্ন নাট্য-সঙ্গীতগুলি পরিবেশন করেন সর্বশ্রী জয়কৃষ্ণ সান্যাল, রেণুকা ভৌমিক, কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, কালিপদ দাস, মীরা মুখোপাধ্যায়, অনীতা চট্টোপাধ্যায়, রমা মুখোপাধ্যায়, রেখারাণী দত্ত, তপতী কুণ্ডু, তনিমা ঘোষ, শিখা পান্ডা, রমা কুণ্ডু, রীতা মুখোপাধ্যায়, ভক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলবুল মুখোপাধ্যায়।

**'শ্রীলেখার স্মরণে কলাভারতী' :** সম্প্রতি পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। এ দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিল্পপ্রীতির প্রসার ও বিদেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি বহু শিল্পী শিক্ষক ও শিক্ষিকার সাহায্যে গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিভাময়ী ছাত্রী শ্রীলেখা মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে ১৯৭০ এর ৫ সেপ্টেম্বর অকস্মাৎ পরলোকগমন করে। শ্রীলেখা লেখাপড়া, গান বাজনা, নাটক, ছবি আঁকায় একাধারে সর্বগুণের অধিকারিণী ছিলেন।

কিছুকাল আগে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস হলে 'কলাভারতী' ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা ছবিগুলির এক প্রদর্শনী কলারসিকদের সম্বর্ধনা লাভ করে। এতে শ্রীলেখার 'দি বিউটি অব নেচার' (৪৯), 'জাপানী বার্ড' (৫০) ও 'ডায়মন্ড-উইন্ডবার' (৪৬) খুবই প্রশংসনীয়। তাছাড়া অমিতা বোসের 'স্টীল লাইফ', (২) বিশ্বনাথ চ্যাটার্জির 'লাভ লেটার' (৯), বিমল ঘোষের 'হলিহক্স' (১৩) হিমানিশ সেনের 'এগেনস্ট দি স্কাই' (১৫) 'কৃষ্ণা দত্তের' 'আফটার দি সাওয়ার' (১৮), পার্থ চ্যাটার্জির 'সান ফ্লাওয়ার' (২৬), রাধারাণী বোসের 'মুন লিট নাইট' (২১), সুস্মিতা সিনহার 'দিয়া' (৩৮), সুমিত্রা ঘোষের 'সীতা ও জনক রাজা' (৩৯), শুক্লা দত্তের 'উত্তরা ও অভিমন্যু' (৪৪), প্রণব মিত্রের 'ভিলেজ সিন' (২৩), নন্দিনী সেনগুপ্ত ও সোমা সেনগুপ্তের 'এগেনস্ট দি রক' (২০), ও 'হ্যামলেট' (৪৩) উল্লেখযোগ্য।

**আবৃত্তি প্রতিযোগিতা :** আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী বালিগঞ্জ ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২৯ বার্ষিক দক্ষিণ কলিকাতা আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। রচনার বিষয়—'প্রাণচঞ্চল কলকাতার রাজপথ'। আবৃত্তির বিষয়—ক) সর্বসাধারণ 'তুমি প্রভাতের শুকতারা' রবীন্দ্রনাথ; খ) স্কুল ছাত্রছাত্রী (১১—১৬) 'দুরন্ত আশা' রবীন্দ্রনাথ; গ) বালকবালিকা (৬—১০) 'কাঁদুনি' অন্নদাশঙ্কর রায়; ঘ) শিশু (৬ এর নীচে) 'মাসী গো মাসী' সুকুমার রায়; ঙ) অবাঙালী বিভাগ—'নগরলক্ষ্মী' রবীন্দ্রনাথ। যোগাযোগ ও সাক্ষাৎকার—২২৭নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-১৯।

**নয়ালীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :** সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে 'নয়ালী'র দ্বিতীয় বার্ষিকী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হোল। এই উপলক্ষ্যে সংস্থার শিল্পীরা বাংলার লোকনৃত্য ও রবীন্দ্র-নাথের 'কচ ও দেবযানী' নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করে শিল্পবোধ ও আন্তরিকতার পরিচয় রেখেছেন। উপভোগ্য দুটি অনুষ্ঠানের শিল্পীতালিকায় ছিলেন অলি রায়, সোনা পাল, ঊর্মি বর্ধন, সুপর্ণা মিত্র, সংঘমিত্রা ঘোষ রায়, মিঠু ঘোষ, মালবিকা দাস, গীতশ্রী দত্ত, মধুমিতা ব্যানার্জি, মধুমিতা সরকার, মীরা দত্ত, শ্রীলতা বসু-রায়, সুস্মিতা সরকার, চিত্রা ঘোষ, শকুন্তলা ভৌমিক। কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ নিয়েছিলেন সুনির্মল দাশগুপ্ত, রঞ্জিতা দে, অনুরাধা পাল, দীপ্তি কুণ্ডু চৌধুরী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সার্থক আয়োজনের সম্পূর্ণ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন সংস্থার সম্পাদিকা দীপালি বসুরায়।
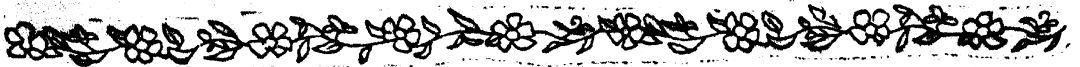
# খেলার কথা

# ১৯৭০ সালের সালতামামি

১৯৭০ সালে আন্তর্জাতিক খেলাধূলার আসর খুবই সরগরম ছিল। যে সমস্ত খেলা নিয়ে বিশ্ব প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ভারোত্তোলন এবং জিমন্যাসটিকস। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হিসাবে ইউনিভারসিটি গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং এশিয়ান গেমসেরও গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল।

১৯৭০ সালে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ব্রেজিল দলের মোট ৩বার জুল রিমে কাপ জয়ের আনন্দে ব্রেজিলের বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড় পেলেকে তুলে ধরেছেন দলের অপর এক খেলোয়াড়।

মেকসিকো সিটিতে আয়োজিত ৯ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফাইনালে ব্রেজিল ৪—১ গোলে ইতালীকে পরাজিত করে মোট ৩বার জুল রিমে কাপ জয়ের রেকর্ড করে এবং সেই সূত্রে প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে চিরদিনের মত জুল রিমে কাপটি নিজেদের অধিকারে পেয়ে যায়। ব্রেজিলের আগে দু'বার করে জুল রিমে কাপ জয়ী হয়েছিল এই দুটি দেশ—ইতালী (১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে) এবং উরুগুয়ে (১৯৩০ ও ১৯৫০ সালে)। ১৯৭০ সালের ফাইনালে ওঠার ফলে ব্রেজিল এবং ইতালী উভয় দেশেরই কাছে তিনবার করে জুল রিমে কাপ জয়ের সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল। ১৯৭০ সালের ফাইনাল খেলায় কাপ বিজয়ী ব্রেজিল প্রথম গোল দিয়ে প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার ইতিহাসে এক নজির সৃষ্টি করে। কারণ আগের ৮টি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় বিজয়ী দল প্রথম গোল দিতে পারে নি। ১৯৭০ সালে মেকসিকো সিটিতে আয়োজিত ৯ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোট ৩২টি খেলা হয়—লীগ পর্যায়ে ২৪টি, কোয়ার্টার

**ক্ষেত্রনাথ রায়**

ফাইনালে ৪টি, সেমিফাইনালে ২টি, ফাইনালে ১টি এবং ৩য় স্থান নির্ধারণের জন্য ১টি খেলা। এই ৩২টি খেলায় গোলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৫টি। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ে এবং নকআউট পর্যায়ে মোট সর্বাধিক গোলের রেকর্ড ১৩৫টি (১৩৫৪ সালে জার্মাণীর বার্ণে)। মেকসিকোর খেলায় সর্বাধিক গোল খেয়েছিলেন পশ্চিম জার্মাণীর গোলকিপার মিয়ার (৫টি খেলায় ১০টি গোল)। অপরদিকে সর্বাধিক গোল দিয়েছিলেন পশ্চিম জার্মাণীর মুলার (৫টি খেলায় ১০টি গোল)—লীগের খেলায় ৭টি (বিপক্ষে মরোক্কো ১, বুলগেরিয়া ৩ এবং পেরু ৩), কোয়ার্টার ফাইনালে ১টি (বিপক্ষে ইংল্যান্ড) এবং সেমিফাইনালে ২টি (বিপক্ষে ইতালী)। বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ব্রেজিল আর একবার ইতালীর সঙ্গে খেলেছিল—৩২ বছর আগে ১৯৩৮ সালের সেমিফাইনালে। এই খেলায় ইতালী জয়ী হয় এবং ফাইনালে হাঙ্গেরীকে ৪—২ গোলে পরাজিত করে উপর্যুপরি ২বার (১৯৩৪ ও ১৯৩৮) জুল রিমে কাপ জয়ের রেকর্ড করেছিল।

১৯৭০ সালের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় অনেক কিছু অঘটন ঘটে গেছে। পুরুষবিভাগে ইতিপূর্বে খেতাব জয়ী হয়েছিল মাত্র এই দুটি দেশ—রাশিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া। কিন্তু ১৯৭০ সালের প্রতিযোগিতায় এই দুটি দেশ পুরুষবিভাগের কোন পদকই সংগ্রহ করতে পারেনি। গতবারের বিশ্ব খেতাব বিজয়ী ও ১৯৬৮ সালের ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী চেকোশ্লোভাকিয়া ৪র্থ স্থান পেয়েছে এবং ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী রাশিয়া পেয়েছে ৬ষ্ঠ স্থান। ১৯৭০ সালে পুরুষবিভাগের স্বর্ণপদক পেয়েছে পূর্ব

মার্গারেট কোর্ট

লুডমিলা তুরিসচেভা (রাশিয়া) : ১৯৭০ সালে বিশ্ব জিমন্যাস্টিক্সের মহিলা বিভাগের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান। তাঁর বর্তমান বয়স ১৮। ইতিপূর্বে এত কম বয়সে অপর কেউ বিশ্ব জিমন্যাস্টিক্সের মহিলা বিভাগে ব্যক্তিগত খেতাব অর্জন করেননি।

জার্মাণী, রৌপ্যপদক বুলগেরিয়া এবং ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক ভলিবলের রৌপ্যপদক বিজয়ী জাপান ব্রোঞ্জপদক জয়ী হয়েছে। মহিলা বিভাগে ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান রাশিয়া স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। গতবারের বিজয়ী এবং ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক ভলিবলের রৌপ্যপদক বিজয়ী জাপান পেয়েছে রৌপ্য-পদক। ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে উত্তর কোরিয়া। প্রতিযোগিতায় দুটি পদক জয়ের গৌরব লাভ করেছিল একমাত্র জাপান—পুরুষ বিভাগে ব্রোঞ্জপদক এবং মহিলা বিভাগে রৌপ্য-পদক।

বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত ফলাফল দাঁড়ায় : ১ম রাশিয়া (৪১ পয়েন্ট), ২য় পোল্যান্ড (২৪ পয়েন্ট) এবং ৩য় হাঙ্গেরী (১৭ পয়েন্ট)।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত ১৯তম বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় রাশিয়া প্রথম স্থান অধিকারের সূত্রে উপর্যুপরি ১০বার দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব লাভ করে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল হাঙ্গেরী।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিশ্রুতা মহিলা টেনিস খেলোয়াড় শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট ১৯৭০ সালের অস্ট্রেলিয়ান, উইম্বলেডন, ফ্রেঞ্চ এবং আমেরিকান টেনিস প্রতি-যোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে দুর্লভ 'গ্র্যান্ড স্লাম' খেতাব পেয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, একই বছরে উল্লিখিত প্রধান চারটি টেনিস প্রতিযোগিতায় সিংগলস খেতাব জয়ের সূত্রে এই 'গ্র্যান্ড স্লাম' খেতাব পাওয়া যায়। এপর্যন্ত এই 'গ্র্যান্ড স্লাম' খেতাব পেয়েছেন মাত্র এই চারজন খেলোয়াড়—১৯৩৮ সালে ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা), ১৯৬২ ও ১৯৬৯ সালে রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া), ১৯৫৩ সালে কুমারী মরীন ক্যাথীরন কনোলী (আমেরিকা) এবং ১৯৭০ সালে শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া)।

১৯৭০ সালে পুরুষদের দলগত আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে আমেরিকা ৫—০ খেলায় পশ্চিম জার্মাণীকে পরাজিত করে অস্ট্রেলিয়ার সর্বাধিকবার ডেভিস কাপ জয়ের রেকর্ড (মোট ২২বার) স্পর্শ করেছে।

স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় আয়োজিত ৯ম কমনওয়েলথ গেমসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় প্রথম তিনটি স্থান : ১ম অস্ট্রেলিয়া (স্বর্ণ ৩৬, রৌপ্য ২৪ ও ব্রোঞ্জ ২২), ২য় ইংল্যান্ড (স্বর্ণ ২৭, রৌপ্য ২৫ ও ব্রোঞ্জ ৩২) এবং ৩য় কানাডা (স্বর্ণ ১৮, রৌপ্য ২৪ ও ব্রোঞ্জ ২৪)। তালিকায় ভারতবর্ষ ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করে (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ৪)

ইতালীর তুরিণে আয়োজিত ৬ষ্ঠ 'ইউনিভার্সিয়াড গেমসে'র চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় প্রথম তিনটি স্থান : ১ম রাশিয়া (স্বর্ণ ২৬, রৌপ্য ১৭ ও ব্রোঞ্জ ১৬), ২য় আমেরিকা (স্বর্ণ ২২, রৌপ্য ১৮ ও ব্রোঞ্জ ১১), ৩য় পূর্ব জার্মাণী (স্বর্ণ ৮, রৌপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ৪)।

১৯৭০ সালের অল-ইংল্যান্ড ব্যাড-মিন্টন প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার রুডি হার্টোনো পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে উপর্যুপরি ৩বার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে তিনি সিংগলস খেতাব পেয়েছিলেন। এই অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার যে কোন খেতাব জয়ের গুরুত্বকে সরকারী-ভাবে ব্যক্তিগত বিশ্ব খেতাব জয়ের সমতুল্য।

পুরুষদের দলগত ৮ম বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৬—২ খেলায় মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে টমাস কাপ জয়ী হয়। এপর্যন্ত মাত্র এই দুটি দেশ টমাস কাপ জয়ী হয়েছে—মালয়েশিয়া ৪বার এবং ইন্দোনেশিয়া ৪বার।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পুরুষদের ৬ষ্ঠ বিশ্ব বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় যুগোশ্লাভিয়া স্বর্ণ, ব্রেজিল রৌপ্য এবং রাশিয়া ব্রোঞ্জপদক জয়ী হয়।

১৯৭০ সালের বিশ্ব জিমন্যাসটিকস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের দলগত বিভাগে জাপান এবং মহিলাদের দলগত বিভাগে রাশিয়া স্বর্ণপদক জয়ী হয়। মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে ৫টি পদক (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১) জয়ের সূত্রে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন রাশিয়ার ১৮ বছরের কুমারী লুডমিলা তুরিসচেভা। ইতিপূর্বে এই বয়সে অপর কেউ বিশ্ব জিমন্যাসটিকস প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগে ব্যক্তিগত খেতাব জয় করেননি। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক জিমন্যাসটিক্স প্রতিযোগিতায় জাপান পুরুষ বিভাগে এবং রাশিয়া মহিলা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছিল।

১৯৭০ সালে ব্যাঙ্ককে আয়োজিত ৬ষ্ঠ এশিয়ান গেমসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় প্রথম তিনটি স্থান এইরকম দাঁড়ায় : ১ম জাপান ১৪৪টি পদক (স্বর্ণ ৭৪, রৌপ্য ৪৭ ও ব্রোঞ্জ ২৩), ২য় দক্ষিণ কোরিয়া ৫৪টি পদক (স্বর্ণ ১৮, রৌপ্য ১৩ ও ব্রোঞ্জ ২৩) এবং ৩য় থাইল্যান্ড ৩৯টি পদক (স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ১৭ ও ব্রোঞ্জ ১৩)। যেখানে জাপান একাই ৭৪টি স্বর্ণপদক পেয়েছিল, সেখানে ১২টি দেশ একত্রে বাকি ৩৫টি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করেছিল। কি বিরাট ব্যবধান! এই পদক তালিকায় ভারত-বর্ষের স্থান ছিল ৬ষ্ঠ (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ৯ ও ব্রোঞ্জ ১০)। ভারতবর্ষের স্বর্ণপদক—অ্যাথলেটিকসে ৪টি, কুস্তিতে ১টি এবং বকসিংয়ে ১টি। হকি খেলার ফাইনালে ভারতবর্ষ ০—১ গোলে পাকিস্তানের কাছে হেরে যায়। এশিয়ান গেমসের হকি প্রতি-যোগিতায় পাকিস্তান ৩বার (১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০) এবং ভারতবর্ষ ১বার (১৯৬৬) স্বর্ণপদক পেয়েছে।

ভারোত্তোলনের ইতিহাসে মোট ৬০০ কিলোগ্রাম ওজন উত্তোলন করার সর্বপ্রথম গৌরব লাভ করেন রাশিয়ার ভ্যাসিলি এ্যালেকসিয়েভ, ১৯৭০ সালের ১৮ই মার্চ।

পোলভল্টে ১৮ ফিটের উচ্চতা অতিক্রম করার প্রথম গৌরব অর্জন করেন গ্রীসের ক্রিসটন পাপানিকোলাউ, ১৯৭০ সালের অকটোবর মাস। তিনি ১৮ ফিট ¼ ইঞ্চি (৫·৪৯ মিটার) উচ্চতা অতিক্রম করেছিলেন।

১৯৭০ সালে যে-সব বিশ্ব প্রতি-যোগিতা এবং ইউরোপীয়ন প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল তার প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল সমাজতান্ত্রিক দেশ। এবিষয়ে বিরাট অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে পূর্ব জার্মাণী।

# খেলাধুলা

**দর্শক**

## জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা

দিল্লীর জিমখানা কোর্টে আয়োজিত জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে ভারতবর্ষের ২নং খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি স্ট্রেট সেটে (৭-৫, ৬-৩ ও ৬-৩ গেমে) ভারতবর্ষের ১নং খেলোয়াড় প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করে এই নিয়ে দু'বার জাতীয় সিংগলস খেতাব জয়ী হলেন। এখানে উল্লেখ্য, তিনি প্রথম সিংগলস খেতাব পেয়েছিলেন ১৯৬৬ সালে এবং ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রেমজিৎলাল। পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে এই দু'জনের সাক্ষাৎ এই নিয়ে দু'বার। মহিলাদের সিংগলস খেতাব পেয়েছেন টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অশোক মানকাদের সহধর্মিণী শ্রীমতী নিরুপমা মানকাদ। শ্রীমতী মানকাদ তাঁর কুমারী জীবনে (নিরুপমা বসন্ত নামে) একবার জাতীয় সিংগলস খেতাব পেয়েছিলেন।

### ফাইনাল খেলা

**পুরুষদের সিংগলস ঃ** জয়দীপ মুখার্জি ৭-৫, ৬-৩ ও ৬-৩ গেমে প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেন।

**মহিলাদের সিংগলস ঃ** ১নং বাছাই শ্রীমতী নিরুপমা মানকাদ ৪-৬, ৬-১ ও ৬-১ গেমে ২নং বাছাই শ্রীমতী কিরণ পেশওয়ারীকে পরাজিত করেন।

**পুরুষদের ডাবলস ঃ** নরউইক এবং নিডজুইডজাক (পোলাণ্ড) ৩-৬, ৬-৩, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে ভারতবর্ষের আখতার আলি এবং রুমানিয়ার পি মোরমুনিউকে পরাজিত করেন।

জয়দীপ মুখার্জি

**মিক্সড ডাবলস ঃ** রেখা মিত্র এবং এস পি মিত্র ৬-২ ও ৭-৫ গেমে সুখান দাস এবং বলরাম সিংকে পরাজিত করেন।

## ভারতীয় স্কুল বনাম ইংলিস স্কুল

### পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট

মাদ্রাজে ভারতীয় স্কুল বনাম ইংলিস স্কুল দলের শেষ ৫ম টেস্ট ক্রিকেট খেলা 'অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই দুই দলের পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে চারটি খেলা ড্র যায়। কটকের ৪র্থ টেস্টে ভারতীয় স্কুল দল ১২৫ রানে জয়লাভ করে 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

প্রথম দিনেই ভারতীয় স্কুল দলের প্রথম ইনিংস ২২৩ রানের মাথায় শেষ হয় এবং ইংলিশ স্কুল দল ১০টা উইকেট বজায় রেখে ১৭ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের পর ইংলিস স্কুল তাদের প্রথম ইনিংসের ১৯০ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে খেলার বাকি সময়ে ভারতীয় স্কুল দ্বিতীয় ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে ৬৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ভারতীয় স্কুল দলের ২য় ইনিংস ২১৩ রানের মাথায় শেষ হয়। এইচ কে শাহ সেঞ্চুরী (১০০ রান) করেন। টেস্ট সিরিজে ভারতীয় স্কুল দলের পক্ষে এই প্রথম সেঞ্চুরী। ৮ম উইকেটের জুটিতে এইচ কে শাহ এবং এম বটলে (নটআউট ২৭ রান) দলের ৫৯ রান তুলে পরাজয়ের হাত থেকে দলকে রক্ষা করেন। ইংলিস স্কুল দলের পক্ষে খেলার বাকি ১২০ মিনিটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪৭ রান সংগ্রহ করা কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ১১০ রানের মাথায় (১) উইকেটে খেলাটি শেষ হয়।

### সংক্ষিপ্ত স্কোর

**ভারতীয় স্কুল ঃ** ২২৩ রান (ইমতিয়াজ আমেদ ৬৯ রান। ডাভলে ৪৪ রানে ৩, বি মিলার ৪০ রানে ৩ এবং রো ২৫ রানে ২ উইকেট)

ও ২১৩ রান (এম কে শাহ ১০০ রান; বুথ ৬৩ রানে ৩ এবং রো ৬৪ রানে ৪ উইকেট)

**ইংলিস স্কুল ঃ** ১৯০ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জে সি ফোট ৬৩ এবং সি জে রো নটআউট ৮০ রান। মুকুল দাস ৪৪ রানে ২ উইকেট)

ও ১১০ রান (৫ উইকেটে) এল কুপার ৪১ রান)

১৯৭০-৭১ সালের ভারত সফরে ইংলিশ স্কুল ক্রিকেট দল মোট ৯টি খেলায় যোগদান করেছিল—৫টি টেস্ট খেলা এবং ৪টি আঞ্চলিক খেলা। তাদের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—হার ১ (৪র্থ টেস্টে ১২৫ রানে), জয় ২ (পূর্বাঞ্চলের বিপক্ষে ৭ উইকেটে এবং দক্ষিণাঞ্চলের বিপক্ষে এক ইনিংস ও ৩২ রানে) এবং ড্র ৬ (৪টি টেস্ট এবং ২টি আঞ্চলিক খেলা)।

শ্রীমতী নিরুপমা মানকাদ

## ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে যে ভারতীয় ক্রিকেট দলটি ওয়েস্ট ইন্ডিজে ক্রিকেট খেলার সফর শুরু করবে তার নির্বাচিত ষোলজন খেলোয়াড়ের পরিচয় নীচে দেওয়া হল। এখানে উল্লেখ্য, এই ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ১১ জন খেলোয়াড় ভারতবর্ষের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছেন।

**অজিত ওয়াদেকার** (বোম্বাই) **ঃ জন্ম এপ্রিল** ১, ১৯৪১। অধিনায়ক। চটকদার ন্যাটা ব্যাটসম্যান। ১৯৫৮ সালে দিল্লীর বিপক্ষে ৩৫৯ মিনিটে ৩২৪ রান করে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করেন। তাছাড়া রঞ্জি ট্রফি এবং দলীপ ট্রফির খেলায় তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৬৬ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজ খেলে মোট ৭৯ রান করেছিলেন—বোম্বাইয়ের ১ম টেস্টে ৮ ও ৪ রান এবং মাদ্রাজের ৩য় টেস্টে ০ ও ৬৭ রান।

**টেস্ট পরিসংখ্যান ঃ** খেলা ২১, ইনিংস ৪২, নট-আউট ২ বার, মোট রান ১৩৬৬ সেঞ্চুরী এক এবং গড় ৩৪·১৫; এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান—১৪৩ (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, ১৯৬৮)।

**দিলীপ সারদেশাই** (বোম্বাই) **ঃ জন্ম আগস্ট** ৮, ১৯৪০। একজন নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান। প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৬১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে (কানপুরের ২য় টেস্ট)।

**টেস্ট পরিসংখ্যান ঃ** খেলা ২১, ইনিংস ৩৯, নট-আউট ৩ বার, মোট রান ১১৮৯, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৩৩·০২; এক

ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০০ নট-আউট (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, বোম্বাইয়ের ৩য় টেস্ট, ১৯৬৫)।

**সেলিম দুরানী** (রাজস্থান) : জন্ম আগস্ট ১৫, ১৯৩৫। অল-রাউন্ডার। লেফট-আর্ম স্পিন বোলার। প্রথম টেস্ট খেলা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ১৯৫৯ সালে। ১৯৬১-৬২ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের প্রথম 'রাবার' জয়ের মূলে ছিল দুরানীর বোলিং সাফল্য। পর-পর তিনটি টেস্ট খেলা ড্র যাওয়ার পর ভারতবর্ষ ৪র্থ এবং ৫ম টেস্টে জয়ী হয়। দুরানী ৪র্থ টেস্টে ৪৭ রানে ৫ ও ৬৬ রানে ৩ উইকেট এবং ৫ম টেস্টে ১০৬ রানে ৬ ও ৭২ রানে ৪ উইকেট পান। এই সিরিজে (১৯৬১-৬২) তিনি উভয় দলের পক্ষে বোলিংয়ে সর্বাধিক উইকেট এবং শীর্ষস্থান (গড় ১৭·০৪) পেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের বিগত পাঁচটি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে তিনি দলভুক্ত হন নি (ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সফর এবং স্বদেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে)। শেষ টেস্ট খেলেছেন ওঃ ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর, বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্ট (রান ৫৫ ও ১৭ এবং উইকেট লাভ ৮৩ রানে ১ ও ৪২ রানে ০)।

**টেস্ট পরিসংখ্যান :** খেলা ২৩, ইনিংস ৪০, নট-আউট ২ বার, মোট রান ৯৩৫, সেঞ্চুরী এক এবং গড় ২৪·৬০। এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান—১০৪ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ত্রিনিদাদ, ১৯৬১-৬২)। **বোলিং :** ২৪৩৭ রানে ৭১ উইকট (গড় ৩৪-৩২), এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট পেয়েছেন ৩ বার এবং একটি খেলায় ১০ উইকেট একবার (১৭৭ রানে ১০ উইকেট, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মাদ্রাজ, ১৯৬১-৬২)।

**এম এল জয়সীমা** (হায়দরাবাদ) : জন্ম মার্চ ৩, ১৯৩৯। নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান। প্রথম খেলা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৯ সালে।

**টেস্ট পরিসংখ্যান :** খেলা ৩৬, ইনিংস ৬৬; নট-আউট ৪ বার, মোট রান ২০১৩, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ৩২·৪৬। এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২৯ (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, কলকাতা, ১৯৬৪)। **বোলিং :** ৭৬৫ রানে ৯ উইকেট।

**এরাপল্লী প্রসন্ন** (মহীশূর) : জন্ম মে ২২, ১৯৪০। অফ-স্পিন বোলার। প্রথম টেস্ট খেলা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে (মাদ্রাজ, ১৯৬১-৬২)।

**টেস্ট পরিসংখ্যান :** খেলা ২২, ইনিংস ৩৮, নট-আউট ৬ বার, মোট রান ৩৬২ এবং গড় ১১·৩১। **বোলিং :** ৩০৫৭ রানে ১১৩ উইকেট (গড় ২৭·০৫), এক ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন ৮ বার এবং একটি খেলায় ১০ উইকেট ১ বার (১৭৪ রানে ১০ উইকেট, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, মাদ্রাজের ৫ম টেস্ট, ১৯৬৯)। **শ্রেষ্ঠ বোলিং :** ৭৪ রানে ৬ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, মাদ্রাজের ৫ম টেস্টের ২য় ইনিংস, ১৯৬৯)।

**বিষেণ সিং বেদী** (দিল্লী) : জন্ম সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৪৬। লেফট-আর্ম স্পিন বোলার। প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে (২য় টেস্ট, কলকাতা)।

**টেস্ট পরিসংখ্যান :** খেলা ১৯, ইনিংস ৩২, নট-আউট ৮ বার, মোট রান ২০৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২ এবং গড় ৮-৫০। বোলিং : ১৭৯৮ রানে ৭০ উইকেটে (গড় ২৫-৬৮) এবং এক ইনিংসে ৫টা উইকেট পেয়েছেন ৪ বার। এক ইনিংসে শ্রেষ্ঠ বোলিং : ৯৮ রানে ৭ উইকেট (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ৪র্থ টেস্ট, কলকাতা, ১৯৬৯)।

**এস ভেঙ্কটরাঘবন** (তামিল নাড়ু) : জন্ম এপ্রিল ২১, ১৯৪৫। অফ-স্পিন বোলার। প্রথম টেস্ট খেলা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬৫ সালে (মাদ্রাজ, প্রথম টেস্ট)। এই সিরিজে ২১টি উইকেট পেয়ে উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন।

**টেস্ট পরিসংখ্যান :** খেলা ১৪, ইনিংস ২৩, নট-আউট ৬ বার, মোট রান ২৫৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৬ নট-আউট। বোলিং : ১১৮৩ রানে ৪৭ উইকেট (গড় ২৫-১৭) এবং এক ইনিংসে ৫টা করে উইকেট পেয়েছেন ২ বার এবং একটা খেলায় ১০ উইকেট একবার (১৫২ রানে ১২ উইকেট, বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, নিউ দিল্লীর ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬৫); এক ইনিংসে শ্রেষ্ঠ বোলিং : ৭২ রানে ৮ উইকেট (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, নিউ দিল্লীর ৪র্থ টেস্টের প্রথম ইনিংস, ১৯৬৫)।

**জি আর বিশ্বনাথ** (মহীশূর) : বয়স ২২। প্রথম টেস্ট খেলা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৯ সালে (কানপুরের ২য় টেস্ট)। তিনি তাঁর এই প্রথম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে শূন্য রান করে ২য় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১৩৭ রান) করেন। ফলে রাতারাতি ভারতীয় ক্রিকেট মহলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই সিরিজের ৪টে টেস্ট খেলায় তাঁর মোট রান দাঁড়ায় ৩৩৪ (গড় ৪৭·৭১)—উভয় দলের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান।

**টেস্ট পরিসংখ্যান :** খেলা ৪, ইনিংসে নট আউট ১ বার, মোট রান ৩৩ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩ সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৪৭-৭১।

**একনাথ সোলকার** (বোম্বাই) : বয়স ২ অল-রাউন্ডার। ন্যাটা খেলোয়াড়। প্র টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৯ সা (কানপুর, ২য় টেস্ট)।

**টেস্ট পরিসংখ্যান :** খেলা ৫, ইনিংস নট-আউট ২ বার, মোট রান ১৯১, ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৪৪ এবং ২৭·২৮। বোলিং : ১৭০ রানে উইকেট (গড় ৫৬-৬৬)।

**সৈয়দ আবিদ আলী** (হায়দরাবাদ) : জ সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৪২। অল-রাউন্ডা প্রথম টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার বিপ ১৯৬৭-৬৮ সালে (এডিলেড প্র টেস্ট।

**টেস্ট পরিসংখ্যান :** খেলা ১২, ইনিংস : নট-আউট ০, মোট রান ৫৩০, ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৮১ (বিপ অস্ট্রেলিয়া, সিডনির ৪র্থ টেস্টের ইনিংস, ১৯৬৭-৬৮), এবং ২৪-০৯। বোলিং : ৬২৬ রানে উইকেট (গড় ২৯-৮০) এবং ইনিংসে ৫ উইকেট একবার। ইনিংসে শ্রেষ্ঠ বোলিং : ৫৫ র ৬ উইকেট (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, এডিলেডের প্রথম টেস্ট, ১৯৬৭-৬৮)।

**অশোক মানকাদ** (বোম্বাই) : বয়স ২৪। প্রথম টেস্ট খেলা অস্ট্রেলিয়ার বিপ ১৯৬৯ সালে (বোম্বাই, প্রথম টেস্ট)

**টেস্ট পরিসংখ্যান :** খেলা ৭, ইনিংস ১-, নট-আউট একবার, মোট রান ৪২২ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৯৭ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, নিউ দিল্লী ৩য় টেস্ট ১৯৬৯) এবং গড় ৩২·৪৬।

ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলে নির্বাচিত ১৬জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এই ৫জন খেলোয়াড় নবাগত অর্থাৎ ভারতীয় ক্রিকেট দলে এই প্রথম নির্বাচিত হলেন—সুনীল গাভাস্কার (বোম্বাই, বয়স ২১), কে জয়ন্তীলাল (হায়দরাবাদ, বয়স ২২), ডি গোবিন্দরাজ (হায়দরাবাদ, বয়স ২৩), পি কৃষ্ণমূর্তি (হায়দরাবাদ, বয়স ২২) এবং রুশী জিজিবয় (বাংলা, বয়স ২৫)। বোম্বাইয়ের সুনীল গাভাস্কার ১৯৭১ সালের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের পক্ষে ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দ গুজরাট দলের বিপক্ষে প্রথম ইনিং খেলায় গাভাস্কার ৩২৭ রান করে অ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রা রেকর্ড করেছেন। পূর্ব রেকর্ড ৩২৪ অজিত ওয়াদেকার (বিপক্ষে দি ১৯৫৮-৫৯)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।